"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

সন্তান হবে তখনই যখন আপনি চাইবেন, না চাইতে নয়

হঠাৎ সন্তান এলে বিবাহিত জীবনের নানা রঙীন মুহূর্ত, নানা পরিকল্পনার শোচনীয় অবসান ঘটাতে পারে। অনেকে এই ধরণের ভুলের মাশুল দিতে বাধ্য হয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই সেই একই ভুল করবেন না।

মনে রাখবেন, রোগ সারানোর চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া ভাল।

দৈবের ওপর. সব কিছু ছেড়ে দেবেন না।

নিরোধ ব্যবহার করুন

জন্মশাসনের জন্য পুরুষদের পক্ষে এটি খুব সহজ ব্যবস্থা। আপনার কাছাকাছি ঔষধের দোকানে বা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নিরোধ পাবেন।

NIRODH

নিরোধ
আপনাকে
ঠিক পথে
নিয়ে যাবে

সুখী বিবাহিত জীবন যাপনের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়

অমৃত

১১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা
৭ ভাদ্র, ১৩৮৬
24 AUGUST, 1979

এক গুচ্ছ অসমীয়া গল্প

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
নোপ্যাথ আজও কাজের
খেছেন প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাত চৌধুরী ও
র্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের গল্প

শেষ সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী নির্বাচন

রাষ্ট্রপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি বর্তমান লোকসভা ভেঙে দিয়ে নভেম্বর মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী যে একটা অনিশ্চয়তার ঝড় উঠেছিল তার অবসান ঘটল। দেশের প্রকৃত প্রভু এখন জনসাধারণ। তাঁরাই স্থির করবেন, কে বা কারা বসবেন দিল্লির ঐ তখতে। ইতিমধ্যে তদারকী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন চরণ সিং।

পূর্বের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সংক্ষেপেই তা স্মরণ করা যেতে পারে। মাত্র ২৪ দিন প্রধানমন্ত্রী থাকার পর চরণ সিং বিদায় নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতিকে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্রে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্যেও সুপারিশ করেছেন।

চরণ সিং সরকার অবশ্য প্রথম থেকেই সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সরকার ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস (ই) তাঁকে সমর্থন জানাবে বলাতেই ঐ সরকারের স্থায়ী হবার বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শ্রীমতী গান্ধী সেই সমর্থন প্রত্যাহার করে বিরুদ্ধতা করবেন বলে ঘোষণা করাতে আস্থা প্রস্তাবে চরণ সরকারের টিকে যাবার সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। শ্রীসিং তাই শ্রীদেশাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে পদত্যাগই সমীচীন মনে করেন। এবং যা ভারতের ইতিহাসে নতুন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বস্তুত একটি দিনও লোকসভায় বসতে পারেন নি।

চরণ সিং-এর পদত্যাগের পর জনতা দলনেতা জগজীবন রাম প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দেখা করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীও। মোরারজি দেশাই এবং চন্দ্রশেখর জগজীবনবাবুকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সংবিধান বিশেষজ্ঞ কোনো কোনো খ্যাতনামা আইনজীবীও সে মতে সায় দিয়েছেন, কেউ কেউ বিরুদ্ধেও বলেছেন। অন্যদিকে জনতা (এস) কংগ্রেস এবং পাঁচটি বামপন্থী দল লোকসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতামত জেনে নিয়েছেন। এবং পরিশেষে তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। গত দু' মাসের নাটালীলার শেষে বর্তমান লোকসভার অধিকাংশ সদস্যেরই নৈতিক অধঃপতন এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এই ব্যক্তিদের অন্য কোন রকম যোগ-বিয়োগে যে সত্যিকারের কোনো কর্মক্ষম সরকার গঠিত হতে পারত এমন আস্থা রাখা কঠিনই ছিল।

প্রত্যেকেই এখন জনসাধারণের বহতা নদীস্রোতে নতুন করে মুক্তিস্নান করে নতুন লোকসভায় ফিরে আসার সুযোগ পেলেন।

সাহিত্য ইত্যাদি

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই

এটা খুবই আনন্দের কথা, খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৮৫ বছর বয়সেও সৃষ্টিশীল, তার পরিচয় মাঝে মাঝেই পাই আমরা। হাসির গল্প তিনি একদা অনেক লিখেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি এমন গল্প লিখেছেন, যা আপাত হাসির মধ্যেও বেদনার স্পর্শ রেখে যায়। তাঁর টেলিগ্রাফের দোতা বা মধুলৌঢ় পড়ে যে পরিমাণে খুশি হয়েছি, রাণুর প্রথম ভাগ পড়ে তার চেয়ে কম আন্দোলিত হই নি। আর তাঁর সিনেমা-খ্যাত 'বরযাত্রী' তো চিরস্থায়ী সম্পদ। ঐ গল্পটির কোনো চরিত্রই জ্যান্ত মানুষ নয় এ আমরা ভাবতেই পারি না। শিবপুর জেটি-র ধারে সেই সব একদা তরুণ ব্যক্তিরা হয়তো অনেকে প্রৌঢ়ের বৈকালিক ভ্রমণ সারেন। অনেকে হয়তো ভালো চাকরি বা ব্যবসা করে বালিগঞ্জে বা নিউ আলিপুরেও চলে গেছেন। কিন্ত তাঁরা যে শুধু বইয়ের পাতাতেই আটকে রয়েছেন, একথা আমরা বিশ্বাসই করি না।

ব্যক্তিগতভাবে বিভূতিবাবুকে আমি কমই দেখেছি। একে তিনি কলকাতায় বাস করেন না, থাকেন দ্বারভাঙ্গায়। তার ওপর খুব একটা যাতায়াতও করেন না। কিন্তু যতোবারই দেখেছি, তাঁর মধ্যে সংযতবাক মানুষের আভিজাত্য লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছি। কেউ কেউ লিখেছেন, তিনি নাকি হাসেন না। আমি কিন্তু তাঁকে অতোটা গম্ভীর বা নিঃস্পৃহ দেখি নি। বরং তাঁর মুখমন্ডলে প্রায় সব সময়েই দেখেছি, স্মিত প্রসন্নতা। এমনকি অনেক সময় তাঁর পাতলা ঠোঁটের সামান্য বঙ্কিমতায় হাসির আভাসও দেখতে পেয়েছি। তিনি নতুন কী লিখছেন জানি না। শারদীয় সংখ্যাগুলো বেরোলে নিশ্চয়ই আমরা কোথাও না কোথাও তাঁর পাকা হাতের তাজা লেখা পেয়ে আরো একবার কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ পাব।

বয়সের সিঁড়ি ভেঙে অন্নদাশঙ্কর রায়ও এবার ৭৫ বছর পার হলেন। বাংলা সাহিত্যে সামান্য যে কয়জন লেখক প্রথম আবির্ভাবেই হৃদয় জয় করেছেন, অন্নদাশঙ্কর তাঁদেরই একজন। ইশকুলের গোড়ার দিকের ক্লাসে পাড়ি যখন বিচিত্রায় তার 'পথে-প্রবাসে' দেখেছি। পাবনা জেলার এক দূর পল্লীতে ছিলাম যদিও, কিন্তু আমার দাদা 'বিচিত্রা' আনাতেন, সুযোগ পেলেই আমি তা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। কোনো লেখাই ঠিক ভালো মতো বোঝবার বয়স হয়নি তখনো। ঈষৎ অকালপক্ব হওয়া সত্ত্বেও আমিও সে লেখার রসাস্বাদন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

করতে পারি নি। কিন্তু ক্লাস সেভেনে উঠে প্রাইজ হিসেবে পেলাম যখন 'পথে-প্রবাসে', হঠাৎ যেন আমার বন্ধু সম্মিলনের মতো আনন্দ জেগেছিল মনে। সে কথা এখনো ভুলতে পারি নি। 'পথে-প্রবাসে' তখন মোটামুটি বোধ্য আমার কাছে, তার ভাষার যাদু যে অপ্রতিরোধ্য তাও টের পেতে শুরু করেছি। কেননা বঙ্কিম-শরৎ আগেই পড়া হয়ে গেছে। 'পথে-প্রবাসে' আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিল। মাস দুয়েক ধরে কতোবার যে বইখানা পড়েছি বলতে পারব না। অনেক লাইন এখনো মুখস্থ রয়ে গেছে।

সেই থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় আমার প্রিয় লেখক। অবিশ্যি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরো অনেক কিছুতে আকর্ষণ বেড়েছে। রুচিরও রদবদল ঘটেছে। আর, সমস্তও ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ব্যক্তিগত এবং পরিবেশগত, দুদিক থেকেই বিস্তর ভাঙাচোরা ঘটে গেছে গত ৪০।৪৫ বছরে। তবু অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্য যে সত্যিই অ-সাধারণ এবোধ এখনো ম্লান হয়নি। এবং তিনি রবীন্দ্রভক্ত হওয়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

সত্ত্বেও তাঁর প্রধান ঝোঁক যেহেতু আবেগের চেয়ে বুদ্ধির দিকে, সেজন্যে তাঁর কোনো কোনো মতের সঙ্গে সব সময় সায় দিতে না পারলেও তাঁকে এখনো পর্যন্ত আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার সহযাত্রী বলেই মনে হয়। এটা কম কথা নয়। কেননা যে লেখকের জীবনের প্রায় ৩৫ বছর কেটেছে যুদ্ধপূর্ব যুগে তাঁর পক্ষে চলতি জীবনের জটিলতাতে সাড়া দেওয়া শক্তই বলতে হবে। সেটা তাঁর সমবয়সী অন্য অনেক বাঙালী লেখকের দিকে চোখ ফেরালেও স্পষ্ট বোঝা যায়। ফলে, জীবনের ব্যাপ্ত পটভূমি এবং তার সমস্যা ইত্যাদির বিষয়ে আন্তরিক কৌতূহল পোষণ করেন বলে, একালের বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতি জগতে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন অভিভাবকের মতো।

অনেক কিছুই আরো বলা যায় অন্নদাশঙ্করের বিষয়ে। তাঁকে আমি অনেক কাল ধরে চিনি। আমাকে তিনি বেশ প্রীতির চোখে দেখেন তাও জানি। মুক্ত মনের জন্যে বহু ব্যাপারে তাঁকে শ্রদ্ধা করি, আমার মনে হয় তিনিও জানেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার ইতিহাস সুদীর্ঘ। জন্মসূত্রে তিনি ঢেনকানলের অধিবাসী ছিলেন, ফলে ওড়িয়া ছিল তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা। আর সে ভাষায় এমন সাহিত্য রচনা করেছেন যা দিকচিহ্ন হয়ে আছে এখনো। তারপর তিনি বাংলা লিখতে শুরু করেন। ভ্রমণ কাহিনী, এপিক উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ—সব দিকেই স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য অন্নদাশঙ্করের সর্বতোমুখী প্রতিভার আলোচনা নয়, তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো। অতএব ছোটোজাই ভালো।

শেষ করার আগে তবু তাঁর ছড়াগুলোর কথা উল্লেখ না করলে স্বস্তি পাব না কিছুতেই। তাঁর তেলের শিশি ভাঙলে পরে ছড়াটি দেশভাগের বেদনাকে এমন মোক্ষমভাবে রূপায়িত করেছে যে এক সময়ে এমন ইশকুলই ছিল না যেখানে এই রচনা আবৃত্তির জন্যে নির্বাচিত না হয়েছে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। অন্নদাশঙ্কর এমন ছড়াও অজস্র লিখেছেন যা নিছক ভাষা ও মিলের ঐশ্বর্যেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যেমন, এক্ষুণি মনে পড়ল—

'শুদ্ধোদন দাশগুপ্ত
শুদ্ধোদন দাশগুপ্ত,
কেন এমন গোমরা মুখে
বসে আছ চাপচুপ!'
'হায়রে আমার পোড়াকপাল
হায়রে আমার পোড়া কপ্,
হোটেল থেকে দিয়ে গেল
গন্ডা দশেক মটন চপ
বেড়াল এসে খেয়ে গেল
কপাকপ গপাগপ।'

অন্নদাশঙ্কর রায়কে আবার একবার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমিও আপাতত চাপচুপ হলাম।

মণীন্দ্র রায়

ারানো বই

তখন বয়স কম। নতুন ধরনের কিছু
। পেলেই পড়ার শখ. ভাল লাগে।
ঃশীলা' পড়েছিলাম সে রকম এক ভাল
র সময়ে। লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখো-
য়। বক্তব্য আর স্টাইল যে
নব ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
। শুনেছি মস্ত পণ্ডিত।
ুজপত্র-র প্রমথ চৌধুরী আর
য়ের জাঁদরেল বুদ্ধিজীবীদের
। মেলামেশা। লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে
। বছর অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্ব
য়েছেন। সরকারী চাকরি করেছেন।
গড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়িয়ে-
। ইকনমিক ডেলিগেট হয়ে গেছেন
য়। হেগের ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল
জের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন।
: সম্মেলনে ইকনমিক কোঅপারেশন
ারে বক্তৃতা করেন। সারা জীবন
লেন অর্থনীতি নিয়ে। মার্কসীয়
শীল মানুষ ধূর্জটিপ্রসাদ কিন্ত
ীতি নিয়ে একখানাও বই লিখলেন
বরং সঙ্গীতরসিক এই মানুষটি
র একজন সাচ্চা শিল্পী। 'অন্তঃশীলা'
। লিখেছিলেন আরও দু'খানা উপ-
আবর্ত ও মোহনা। 'সুর ও সঙ্গীত'
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংগীত বিষয়ে
পের সংকলন। ইংরেজিতে ১১ আর
য় ১২—ধূর্জটিপ্রসাদের বই-এর
।

'মনে এলো' আর 'ঝিলিমিলি'
দকের রচনা। দীর্ঘ দিনের পথ চলায়,
ফিরে এসেছে যারা, যেসব ঘটনা, যার
থেকে মুক্তি মেলেনি তাদের কথায়
আশ্চর্য দুখানা বই। কোন লজ্জা
চ নেই—দ্বিধাহীনভাবে খুলে দিয়ে
নের দরজা। অজস্র মানুষ আর
এসেছে পরপর। যখন তিনি বলছে
ন 'জীবনের অন্তে সিদ্ধান্ত। ইতি-
ধান্তাধাক্কি রগড়া-বগড়ি। খেটে
য়ার ঘণ্টায় ষাট মিনিট বেগে মৃত্যুর
গ্রসর হও।' ব্যস!'

নিষদ, ওপেন হাইমার, মার্কস,
স্টালিন, মাও সে তুঙ, রবীন্দ্রনাথ,
ড, রবিশঙ্কর, এম এন রায়, এসব
রীর জগৎ, তাকে সহজ মানসিকতার
মেনে নেওয়া যায় না। আচার্য
সুন্দর, ফাদার পাওয়ার, বিপিন-
গুপ্ত, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,
চট্টোপাধ্যায় মনোমোহন ঘোষ,
মাস্টারমশায়। ধূর্জটিপ্রসাদ রজেন
প্রমথ চৌধুরী অবনবাবু, গগনবাবু,
: গাঙ্গুলী কুমারস্বামী রাধিকা
কেরামৎ ... প্যাট্রিক গেডিস এসব
ছিলেন এক দুর্লভ মানুষ।
ার এগজিবিশন নামকরা ওস্তাদদের

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মজলিস, সুধীন দত্তের কবিতা, বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের ক্লাশ, জন গ্যান্থারের 'ইনসাইড
আফ্রিকা', কামুর 'মিথ অব সিসিফাস',
প্ল্যানিং কমিশনের রিসার্চ প্রোগ্রাম, এসব
নিয়েই কেটেছে যার জীবন তার কলমের
ডগায় কী করে ভেসে আসে—'বারাসাত থেকে
নীলগঞ্জে যাবার রাস্তা সোজা। দু'পাশে
মাঠ, বিল, আর দূরে দূরে গ্রাম। ভোরে
গিয়েছি, সন্ধ্যায় গিয়েছি, দুপুরে বট
গাছের তলায় ঘুমিয়েছি। বুড়ির বাগানের
তিনকড়িবাবুর বাগানের আম, আর ক্ষেতের
আখ চুরি, আর সরস্বতী পুজোর দিন
ভোরে যবের শীষ আনতে যাওয়া, শিশিরে
ধুতিভেজা, রাতে কলপুকুরে যাওয়া—
এককালে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ ছিল বলেই
এখনও বেঁচে আছি।'

ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু এখন তার কত
দাম! ছবির এগজিবিশান হবে। প্রতিমার
নেমন্তন্ন পেয়ে গেছেন হিন্দুস্থান ইন্সিও-
রেন্স বিল্ডিং-এ। সঙ্গে ইন্দিরা দেবী।
আলখাল্লা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অবনীন্দ্র-
নাথ, গগনেন্দ্রনাথ আর সমরেন্দ্রনাথ। আর
ছিলেন অসিত হালদার, নন্দলাল, সুরেন
কর। অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী উডরফ আর
কেস্টেভেন ছিলেন সেখানে। পরদিন
রোনাল্ডসে এসেছিলেন ছবি দেখতে।

গান নিয়ে কত কথা! কত মানুষের
ভীড়! রমণীয় সব মুহূর্ত। ফাঁকে ফাঁকে
হাল্কা কৌতুক। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে
বলতে গিয়ে লিখলেন : 'বাংলা কি হিন্দী
আধুনিক গান চেষ্টা সত্ত্বেও বরদাস্ত
করতে পারছি না। মোটামুটি বলা চলে যে,
রবীন্দ্রসংগীত খারাপ হয়ে যাচ্ছে।
সুচিত্রার কণ্ঠ শুনতে বড্ড ইচ্ছে হয়।
রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাক ও ন্যাকামি' এই
বিষয়ে যদি কেউ মজা করে কিছু লেখেন
তো তাঁকে মনে মনে আশীর্বাদ করবো।
ভাগ্যিস দিনুদা বেঁচে নেই! কী মিষ্টি,
কি মধুর কণ্ঠ, বাঙ্গালী মেয়েদের! গান
শুনলে বিশ্বাসই হয় না যে, এঁরা স্বামী,
ছোট ভাইবোন, ঝি-চাকরদের খিঁচুতে

পারেন। কিন্তু পারেন। জীবন আর আর্ট
ভিন্ন জগৎ। তা হোক, দুটোর মধ্যে ...
অন্তত তো বাসযোগ্য হোক।'

ভাতখণ্ডেজীর এক মজার ঘটনা
দিয়েছেন। পণ্ডিতজী এক ওস্তাদকে
নাকাল করেছিলেন হাম্বির গাইয়ে। সব
কূট রাগ তার জানা। পণ্ডিতজী সবিনয়ে
অনুরোধ জানালেন, ছোট্ট সোজা রাগ
হাম্বির গাইতে। 'বেসক জরুর' বলে ওস্তাদ
হাম্বির শুরু করলে। মুখড়াটি বেশ হলো।
তারপরই স্বর থেকে ওঠবার সময় কেদারা!
ভুল হচ্ছে আর পণ্ডিতজী ঘাড় নাড়ছেন,
বাহবা দিচ্ছেন। ওস্তাদ না বুঝে আরো
ভুল তান দিতে লাগলো। আমাকে
পণ্ডিতজী পরে বলেছিলেন 'প্রচলিত
রাগেরই বিস্তারে কৃতিত্ব ধরা পড়ে।' যে
মেয়ে রাঁধতে জানে না সেই খানিক
গুড়, লঙ্কা, মশলা ঢালে। পান সাজার
বেলাও তাই। জরদা জাফরাণ মুক্তোর
গুঁড়ো সোনা চাঁদির পাতী মোড়া পান
তীর্থযাত্রীদের জন্যে। কাশীর রইসরা
মুখে দেন না। মিষ্টি চা, বাংলা কীর্তন
আর অ-প্রচলিত মিশ্ররাগ একই মনোবৃত্তির
পরিচয়।' আর 'রবিশংকর হরফ, ফ্রেজ,
ইডিয়ম, বাক্য, বেলে-র রাজা। এমন স্পষ্ট
হরফ, ফ্রেজ, বাক্য (সেন্টেন্স) আমি জীবনে
শুনিনি। এত স্পষ্ট যেন মনে হয় রাগিণীর
পটভূমি থেকে বেরিয়ে এসে, চোখের
সামনে দাঁড়ালো। এই বেরিয়ে এসে দাঁড়ানো
আধুনিক আর্টের একটি প্রধান লক্ষণ।
এতে একটু পশ্চিমী আমেজ থাকে নিশ্চয়
—রবিশংকর পশ্চিমের অনেক ভালো জিনিস
হজম করেছেন। তাঁর বাজনা শুনলে আমার
পূর্ব বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, সঙ্গীত মনের
অন্য স্তরের ভাষা। সাহিত্য ছাড়া অন্য,
তবু ভাষা। তার হরফ, ফ্রেজ, ইডিয়ম,
বাক্য থাকবেই! এই নকশাটা ততটা ছন্দ-
প্রাণ নয়, যতটা ভাষাপ্রাণ। অবশ্য দুজনের
সব গুণই আছে, আমি কেবল আমার কাছে
যতটুকু বিশেষত্ব মনে হয় তাই ভাবছি।
রবিশংকরের ভাব, এক্সপ্রেশন, সিন্ট্যাক্সের
ওপর বেশি নির্ভর করে। তাই একটু বেশি
ইন্টেলেকচুয়েল মনে হয়।'

'মনে এলো' ছাপা হয়ে বেরোল ১৯৬৩
সালে নিউএজ থেকে। চার টাকা দামের
প্রায় তিনশ পাতার বই। এখন ভাবাই
যায় না। কেবল দামেই নয়! এমন বিচিত্র
বিষয়ে মন্তব্য করার মত মানসিক গঠন,
পড়াশুনো একালে বোধহয় পাওয়া
কঠিন। বক্তব্যে ফারাক হতে পারে, কিন্তু
পড়ুয়া, দর্শক আর শ্রোতা হিসেবে ধূর্জটি-
প্রসাদে যে ফাঁকি ছিল না, তা মানতেই
হবে। 'মনে এলো' ডায়েরি নয়। নিজের
মনে একা একা কথা বললে, কেবল
অতীত আসে না, আসে বর্তমানের সঙ্গে
ভবিষ্যৎও। কিন্তু কোন ঘটনাই অসংলগ্ন
নয়, দায়িত্বহীনও নয়। শোভনও সঙ্গত
রচনা। যা একান্ত ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষেই
সম্ভব ছিল।

কমল চৌধুরী

বিশাল ক্যানভাসে

অনন্ত দাশ

কয়েকটা বছর যেন পুরাকীর্তির মতন পড়ে থাকে।
ধূলির উপর নাম-না-জানা পাখির অসংখ্য পায়ের দাগ
কোন দরকারে তারা আসে, কোনদিকে যায়
অন্ধকার আকাশ শুধু জানে।

ঘরে ফিরব না বলে বারবার বেড়িয়ে যাই
ক্রোধে, লাথি মেরে ভাঙি পুরাতন রীতি
মাথায় রোদ্দুর নিয়ে
ফুটপাথে, ফালতু ভিড়ে ঘুরে ঘুরে
দেখি

রাত কাটাবার মত কোথাও আশ্রয় নেই
ব্যতিব্যস্ত মানুষ
পাকা দর্জির মত কেটে ফেলছে অপ্রয়োজনীয় সময়ের কাপড়।

যা কিছু আমরা ভাঙি সাময়িক শান্তি শুধু
সমুদ্রের বিরতি কোথায়?
ঘন ঘন জাম্প কাটে দৃশ্যগুলি পাল্টে যাচ্ছে
জোড়াতালি দিয়ে ফের শুরু হয় নিষ্পত্তির জীবন।
আমি এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখি
একাংক নাটকের সহস্র রজনী
বিচ্ছেদ, মৃত্যু, ভালবাসা বারবার ফিরে আসছে
জীবনের বিশাল ক্যানভাসে।

কেউ দেখে

রবীন্দ্র মল্লিক

প্রেম কি উড়ন্ত চাকি? কেউ দেখে
দেখে না অনেকে?
নাকি প্রেম অপার্থিব হাওয়া?
চন্দ্রাহত রাতে
সহসা দাপিয়ে আসে নিষ্করুণ
নিয়তির মত, যেন সবকিছু
তছনছ করে দেবে—
অপটু কুশলীর ভুল অনুবাদে
শুদ্ধপ্রাণ যে চেয়েছে তাকে।

এমনও ঘটেছে প্রেম কবন্ধ দর্শক
কিছুই দেখে না তার হিম দুটি চোখ
অথচ অবাক সারাক্ষণ
মাছের মতন অবিকল চেয়ে থাকে।
কেউ দেখে, দেখে না অনেকে

না—আঁধারে

প্রভাত মিশ্র

কঠিন যে সুখে আমাকে বেঁধেছো তুমি, আমি তা চাই না।
জলের ওপরে শিলা ভেসে ভেসে যায়, কোথায় যেতে হবে
যেন। হাতের মুঠোয় কাল ও কালীযন্ত্র—
নাহ'লে এ হাত অতীত, ভবিষ্যতে ঘা দিতো কখনো?,

তুমি জানলে না কখন এ হাতে আজ তোমার গলাটা টিপে ধরলাম;
তুমি প্রায় মৃত, বৃষ্টি হ'লো না তবু, মেঘের শহরে
ওই জ্বলেছে আগুন। ভ্রমণসংগী তুমি দাঁড়িয়ে রইলে
দেয়ালের গায়, ঝুলন্ত মাথা। আঁধার এলো না আজ?

সন্তানহীন রোদ—, কোন সংগমেই যাওয়া হয় না আমার;
জানলায় উঁকি দিয়ে সে চ'লে যায় একা, রাগী—
ভাবে,—কীরকম লোক, কথা দিল, দেখালো বুকের অবাকপাথর;
আর, না—আঁধারে আজ কার শাদা বিষঠোঁটে
চুমু দিয়ে মরে যাবে নিচু হয়ে ও।

র্জুন

রাধা মহাপাত্র

তরে কি শেকড় ছড়ালো, না অশ্রুর উন্মূল গর্জন ?
কের ভিতরে ছিলাটান
শেকল আমাকে পোড়ায়, দুদিকে ডেকেছে হুম
গুন মুখেই রাখো নিখাদ সোনার
পায়ে জ্বালিয়ে রেখেছি ধূপ, না কিছু ক্ষমার ?
তমার সব রঙ, উন্মোচন—
পুড়িয়ে করেছি জন্মহীন
শর্ত স্বাধীন
যাকেই যুঝে নেব ঘাতকের প্রতিদ্বন্দ্বী
অর্জুন আমার।

এক তরুণ কবিকে

ব্রত চক্রবর্তী

প্রবুদ্ধের অফিসে একদিন তোমাকে দেখেছিলুম
প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে প্রবুদ্ধের সঙ্গে ব'সে ব'সে তুমি
কবিতার কথা আলোচনা করছো।
তুমি কি এখনও কোলকাতায় আছো নাকি ? লেখো কবিতা ?
তারপরে বদলে গেছে অনেক কিছুই; আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি
কীভাবে সময় আক্রমণ করে বয়সকে, স্মৃতি বর্তমানকে,
কীভাবে পাতা ঝ'রে নতুন পাতার পত্রবিন্যাস শুরু হয় গাছে গাছে!
আমিও এই শহরের সমস্ত টিউবওয়েলে জল খেতে গিয়ে
প্রথমে লবণ তারপর বালি শেষে অনেক অ-নেক দেরীতে
স্বচ্ছ, সাবলীল জলধারার মতন দেখতে পেয়েছি জীবনকে।
আজ খুব মনে পড়ে আমার তোমার সেদিনের সেই তাকি'ক ঠোঁট,
উজ্জ্বল দু-চোখ, ভ্রূভঙ্গীর ফাঁকে ফাঁকে আঙুলের ধাক্কায়
কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দেওয়া চুল, সমস্তই মনে পড়ে।
একটা ইস্পাতের ফলার মতন যেন, তুমি সেদিন ঝকঝক করছিলে
শরীরে, কবিতায়, আলাপে, তর্কে, যুক্তির বিপরীতে
যুক্তি দিতে দিতে!

সেই একদিন মাত্র প্রবুদ্ধের অফিসে তোমাকে দেখেছিলুম
তাপদগ্ধ সময়ের বিড়ম্বনা অগ্রাহ্য ক'রে,
প্রবুদ্ধের সঙ্গে বসে বসে কবিতার কথা আলোচনা ক'রে যাচ্ছো।
খুব জানতে ইচ্ছা হয় তাই আমার,—তুমি কি
এখনও কোলকাতায় থাকো ? সেইভাবে ? লেখোনাকি, কবিতা ?

শব্দ নিয়ে

নটকৃষ্ণ দে

কিছু কিছু শব্দ আছে
যার প্রতিবিম্বে, উদাস—
ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে, কিছু না দেখার মত, মনোযোগ,
পাওয়া-না-পাওয়ার দুঃখ ছুঁয়ে যায়, গোপন
সোনালী আনন্দে।
কোনো কোনো শব্দ আছে
যার দেহে তিস্তার যৌবন,
বন্যা নিয়ে কেটে পড়ে বেপরোয়া প্রে
কোনো কোনো শব্দের শরীরে
উজ্জ্বল চপল প্রজাপতি—
পাখায় প্রসন্ন রঙ, চলনে ছন্দতা;
বসন্তের পুষ্পিত সম্ভারে, আকাংক্ষার উদ্যত আকৃতি—
অথচ আবার দ্যাখো,
শব্দ নিয়ে সন্ন্যাসী গৈরিক,
যার চোখে আঁকা, ত্যাগী আকাশের বিষণ্ণ গোধূলি
এই সব শব্দ, তার প্রতিবিম্ব নিয়ে, একান্তে—
যৌবন, বানপ্রস্থ, অথবা সন্ন্যাস
সব নিয়ে খেলা করে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
এক নিপুণ কারিগর (কিংবা জাদুকর)—
যে বিখ্যাত সব সৌধ বানায়, জীবনভর।।

চিঠিপত্র

গল্প সংখ্যা ভাল লেগেছে

তরুণ গল্পকারদের আটটি গল্পের সংকলন 'এক গুচ্ছ বাংলা গল্প' পড়লাম। এই রকম সংকলনে আধুনিক গল্পের গতি-প্রকৃতি, চিন্তা-ভাবনা এবং বিষয়-বস্তুর বৈচিত্রের সঙ্গে সহজ পরিচিতির সুযোগ পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত নির্মলকুমার দাশের 'শত্রুর' গল্পটি। বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্রে ও অভিনবত্বে তিনি একটি বলিষ্ঠ গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর গল্পের সমস্যা সমকালীন ও গভীর মানবিক বোধে সমুজ্জ্বল। নেতিবাচক হলেও ঘটনাপ্রবাহে তিনি সত্যনিষ্ঠ। তবে নির্মলবাবুর প্রধান ত্রুটি গল্পের বিন্যাস ও বাক্যবন্ধে। তাঁর গল্পকথন পরিমিতি বোধের অভাবে সৌন্দর্যহানিকর। গল্পগদ্যে পারিপাট্যের অভাব এবং সমাপ্তি নাটকীয়।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুদিকে দুজন' গল্পে মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কথা আছে। তারাদাসবাবুর গল্প অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও আতিশয্যহীন। বাড়তি কথা তিনি একটুও বলেন না। যা বলেন, তা একান্ত প্রয়োজনে। তারাদাসবাবুর এটাই বৈশিষ্ট্য। ছোট গল্পের আদর্শ ও ভাব পুরোপুরি বজায় রেখে কলম ধরে এগিয়ে যান বিজনকুমার ঘোষ। তাঁর 'পরুষ' গল্পটি মধ্যযৌবনোত্তর এক নারীর মানসিক জটিলতা এবং অবদমিত বাসনা ও বেদনাকে কেন্দ্র করে রচিত। স্বল্প পরিসরে গল্পের ভেতর নারীর হৃদয়যন্ত্রণা ও হাহাকারকে অন্তঃসলিলার মত বইয়ে দিয়েছেন বিজনবাবু। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সুজিত দাসগুপ্তের 'কোন পাষাণের ঘায়' গল্পটি প্রচণ্ড আবেগধর্মী। তবে কবিতার স্নিগ্ধ অনুভূতি ও কল্পনার কোমলতা গল্পের সর্বাংশে। গল্পের সুষম গতি, পেলব উপমা পাঠককে অনায়াসে গল্পের পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই গল্পে একক আত্মলীন সৌম্য নগরজীবনের উৎকেন্দ্রিকতায় পারিপার্শ্বিক সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্নবোধ করলেও এবং বিচ্ছিন্ন জীবনের ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি থেকে মুক্তি-লাভের আশায় কল্পনায় প্রেমিকার শান্ত স্মৃতিতে বারবার ফিরে গেলেও মানসিক টান তার জীবনমুখী।

তবে বিজয় পালের 'রোদ পড়ে আছে', প্রলয় শূরের 'ঝিনুকের ডানা' এবং সোমক দাসের 'অবিশ্বাস' গল্পত্রয়ী অঙ্গসৌষ্ঠবের চমৎকারীত্বে ও মসৃণ গতিবেগ ব্যতীত অধিক কিছুর দাবীদার নয়।

অমৃত

এক গুচ্ছ বাংলা গল্প

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজনকুমার ঘোষ
সুজিত দাশগুপ্ত
সিদ্ধার্থ রায়
সোমক দাশ
বিজয় পাল
নির্মলকুমার দাস
প্রলয় শূর

কিন্তু 'মড়া' গল্পের প্রতিপাদ্য আমাদের হতবাক করে। আমরা দেখি উদরের জ্বালা নিবৃত্তির জন্য অভাবগ্রস্থ মানুষ অনেক সময় উঞ্ছবৃত্তির বাছ বিচার করে না। শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে বেছে নিতে হয় ঘৃণ্য কোন পথ কিংবা মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয়। এই গল্পে সিদ্ধার্থবাবুর শাণিত দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ-জীবনের সকল ঘটনাসমূহ আমূল বিদ্ধ করে। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত আবেগ গল্পের প্রয়োজনে অনিবার্যভাবে উপস্থিত না হওয়ার দরুন সেগুলি পৃথকভাবে একক বৈশিষ্ট্যে সৌন্দর্যের দাবী করলেও বক্তব্যের সামগ্রিক মূল্যায়ণে নিরর্থক ও মূল্যহীন। সমগ্র গল্পে পারিপার্শ্বের বর্ণনায় আতিশয্য ও অস্থিরতা পাঠককে তাৎক্ষণিক স্টান্ট দেয়। সমস্যার গভীরে পৌঁছে দেয় না। যে লোকটি সারাদিন মড়া সেজে শারীরিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে, তার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য গ্লানিকর দুঃখভোগ অসংখ্য উপঘটনার প্রাবল্যে ক্ষীণ হয়ে যায়। মনে হয় সিদ্ধার্থবাবুর এই গল্প তাঁর নিজের কথাতেই 'জীবনের নগ্ন কৌতুক'। তপতী মোদক, ১৯, শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া-২।

আরও গল্প সংখ্যা চাই

অমৃতের ২২ জুন সংখ্যায় আধুনিক হিন্দী লেখকদের একগুচ্ছ গল্প পড়বার সুযোগ পেলাম। এর আগে ফণীশ্বর নাথ রেণুর গল্পও পড়েছি। অমৃতকে নবকলেবরে সাজাতে আমার অনুরোধ যদি একটু বিবেচনা করেন তাহলে আশা করি আমার মতো আরও অনেক পাঠক খুশী হবেন।

প্রথমতঃ দীর্ঘ সাত বছরে সাপ্ অমৃত আমাদের হাসির গল্প উপহার পারেনি। এটা কি হাসির গল্প লেখ অভাব না শিব্রাম চক্রবর্তীর পর আর কেউ নেই যে হাসির গল্প লিখতে প আমরা হাসতে ভুলে গিয়েছি। তাই মাঝে মাঝে দু'একটি হাস্যরসের কিম্বা কবিতা ছাপান তাহলে অনেক খুশী হবেন। এ সম্পর্কে অমৃত পাঠক মতামত নিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ শুধু হিন্দী লেখকদের অনূদিত গল্প নে অসমীয়া, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, মাল লম প্রভৃতি সাহিত্যের বাংলা অন করা গল্প লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবন সহ ছাপান। ওপার বাংলার নামী/অন লেখকদের মৌলিক রচনা/গল্প ছাপানো যায় না? ঐতিহাসিক পটভূমি লেখা গল্প একআধবার ছাপুন। নির্মল সিনহা, পং বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, রাম পঃ দিনাজপুর।

২

১৫ই জুন, ১৯৭৯ 'একগুচ্ছ বাং গল্প' ও ২২শে জুন-এর (১৯৭৯) 'এক গুচ্ছ হিন্দি গল্প' ভাল লাগ বাংলা গল্প তো সব সময় পড়েই থাকি তবু ভাল লাগলে 'অমৃত'-এর একগু বাংলা গল্পের সংখ্যাটি। তার পরেই পেলা 'একগুচ্ছ হিন্দি গল্প'। সত্যিই অপূ এই সংখ্যাটি। হিন্দী গল্পগুলোও সুন্দর আর এমন অপ্রকাশিত গল্পগুলো এ সহজভাবে পাব তা আশা করিনি। বারবা পড়েছি এ গল্পগুলো। কিন্তু আশা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আশা করেছিলা এরপর হয়তো একগুচ্ছ হিন্দী গল্পে মতোই পরপর বের হবে 'একগুচ্ছ মণি পুরী গল্প', 'একগুচ্ছ অসমীয়া গল্প', 'একগুচ্ছ উর্দু গল্প', 'একগুচ্ছ পাঞ্জাবী গল্প', 'একগুচ্ছ মালয়ালাম গল্প' 'একগুচ্ছ তামিল গল্প', 'একগুচ্ছ তেলেগু গল্প'।

কিন্তু 'একগুচ্ছ হিন্দী গল্প' অমৃত উপহার দিয়েই কৃপণ হয়ে গেল। আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠক। পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত অমৃত পড়ি। আমি 'অমৃত' দশটা করে সংখ্যা এক এক জায়গায় করে বড় বড় বই বাঁধিয়ে রেখেছি। ভেবেছিলাম বিভিন্ন ভাষাভাষীর গল্প সংকলন পেলেও বাঁধিয়ে রাখব। কিন্তু 'অমৃত' বিমুখ।

আর একটি কথা, কবিতা বুঝি কম, তবু পড়ি। 'অমৃত'র সব সংখ্যায় কবিতা থাকে না, সেজন্য খুব দুঃখ লাগে। অনুবাদ কবিতাও খুব কম।

২৯শে জুন (১৯৭৯) সংখ্যায় কবি ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকা-র সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছে।

ভাল লাগল। আমার মতো বহু পাঠকই মাঝে এমনটি আশা করে। —রথীন ...ক, অজিত পাঠাগার, পোঃ পাখিহাগা, ...বিহার।

রবীন্দ্রকুমার ও বাহারউদ্দিন

'অমৃত' যাঁরা নিয়মিত পাঠ করেন, ...রা জানেন এখানে মাঝে মাঝেই এমন ...ছু নতুন ধরনের রচনা আত্মপ্রকাশ ...য, যা পাঠকের যুগপৎ আনন্দ ও চিন্তার ...রাক জাগিয়ে থাকে। ২৯শে জুন, ৭৯-এর 'অমৃতে' প্রকাশিত এরূপ দুটি ...নার কথা উল্লেখ করছি : একটি— ...ন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'স্বপ্নলব্ধ বঙ্গ-...শের ইতিহাস' অন্যটি বাহারউদ্দিনের ...রদাদাজীর গল্পগল্প'। বিষয়ের গুরুত্বের ...ঃ থেকে এই দুটি রচনা পাঠককে ভাবিয়ে ...লে। আর প্রকাশভঙ্গির সরসতায় তা ...নন্দ দেয়। মূল বক্তব্য অবিকৃত রেখে ...ক্য শ্লেষ ও কৌতুক মিশিয়ে কথা ...ই এই শ্রেণীর রচনার বড় বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্তের বলদ এবং ...্যাসী অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বঙ্গদেশের ...ীত-বর্তমান ইতিহাসের আলোকে ...য়াদের সঞ্জীবনী সত্তা— এই সত্তার ...ন বলা, সেই সন্ন্যাসীর দুঃখ কম নয়, ...া পেশ করে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে ...। লেখকের স্বদেশচেতনার স্বপ্ন এভাবে ...পথেই না প্রতিমা হতে চায়। বাহার-...দ্দনের ক্ষেত্রেও তাই। ইয়ারদাদাজী ...ত্তে লেখকেরা গল্প বলার সচেতন ...। আর এই গল্প কোন ঠাকুরমার ...র গল্প নয় - বঙ্গভূমিতে, বাঙ্গালী ...বারে একজন মুসলমান ছেলে বড় হয়ে ...তে যেসব সংস্কৃতিগত টানাপোড়েনে ...কিত হয়, এটি তারই কাহিনী। এখানে ...কদের একটি প্রশ্ন রয়েছে, ইয়ারদাদা-...র মৃত্যুসংবাদ আমাদের খুব ভাল ...গেনি। সন্ন্যাসীর মত সন্ধ্যার অন্ধকারে ...রয়ে গেলেও আমরা প্রত্যাশায় থাকতাম ...ক প্রভাতে তার বক্তা বা গল্প ...তে। —শামীম আজাদ, নারকেলডাঙ্গা ...কাতা।

স্বপ্নলব্ধ বঙ্গদেশের ইতিহাস

মাননীয় রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের ...প্নলব্ধ বঙ্গদেশের ইতিহাস' নামক ...ক প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে বঙ্কিম ...ন্দ্রের কথা মনে পড়ল। রবীন্দ্রকুমার ...গুপ্তের পশ্চাতে যে নামটি গুপ্ত হয়ে ... করছে সেই নামটি উল্লেখ করার ...ইচ্ছে এবং আগ্রহ ছিল, তবুও উল্লেখ ...ত দ্বিধা আছে, কারণ প্রবন্ধকার নিজেই ...গুপ্ত হয়ে কাজ করতে চাইছেন তখন ...না করাই শ্রেয়। অপূর্ব লেখা, রবীন্দ্র...র দাশগুপ্ত বলেই এ লেখা সম্ভব। লেখাটি প্রমাণ করে দিচ্ছে, প্রবন্ধকার ...এ যুগের বঙ্কিম। প্রবন্ধে তিনি ...ক ছাড়েন নি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ...স্পষ্টাই করে তিনি বলেছেন 'উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপকগণ রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া রাজনীতিকে উন্নত করে নাই, শিক্ষার অবনতি ঘটাইয়াছে। আপনারা মন্থরগতি। আপনারা দেশব্রতী হইলে আমাদের রাজনীতির ঘোড়দৌড় বন্ধ হইবে।' প্রতিটি ছত্রে তিনি আবেগমথিত কণ্ঠে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অমৃতে এই লেখাটি ছেপে মানুষের, জাতির জ্ঞানচক্ষুর দ্বার খুলে দিয়েছে। যতখানি সাধারণ মানুষের মনে দাগ না কাটবে তার চেয়ে বেশি দাগ কাটবে শিক্ষিত মানুষের মনে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লজ্জা হওয়া উচিত, এই সব বলদ সম্প্রদায়ের মনে যদি অনুকম্পার স্পর্শ আসে তাহলে হয়ত নবজাগরণ হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস 'অমৃত' পত্রিকার প্রচার আরও বাড়ুক, এই জাতের লেখার জন্য আমরাই 'অমৃত' মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। সম্পাদককে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা শেষ করলাম। বিধান দত্ত, আলমবাজার, কলিঃ-৩৫।

কাহিনীর সঙ্গে বেমানান

৬ জুলাই ১৯৭৯-র অমৃতে প্রকাশিত শ্রীরাববসুর লেখা 'তারাশঙ্কর।তরুণ মজুমদার।গণদেবতা' শীর্ষক সমালোচনাটি পড়লাম। লেখাটিকে সমালোচনা না বলে স্তুতি বলাই সঙ্গত মনে হয়।

প্রথমেই শ্রীবসু লিখেছেন সাহিত্যে তারাশঙ্কর এবং চলচ্চিত্রে তরুণ মজুমদার — দুই একত্র হলে তার যোগফল একটা ভূমিকম্প হতে পারে।......ইত্যাদি। লেখার এই অংশটি আপত্তিকর। বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের অবদান কী, অথবা অবস্থান কোথায় তা আজ আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। সেই তারাশঙ্করের সঙ্গে তরুণবাবুকে সমান আসনে বসানো অসম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। উনি লিখেছেন 'শিল্পের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এবং তরুণ মজুমদার একই ঘরানার'। ঘরানা শব্দটি ব্যবহৃত হয় স্টাইলের ক্ষেত্রে। উনি দুজনের স্টাইলে কোথায় কী মিল পেয়েছেন জানালে বাধিত হতাম। যে সত্তা নিয়ে 'গণদেবতা'-র মত কালজয়ী উপন্যাস লেখা হয়, তার চিত্ররূপ দিতে গিয়ে—প্রায় চোদ্দ-পনের লক্ষ টাকা যে ছবির পেছনে খরচ সে ছবির ব্যবসায়িক দিকটি তো উপেক্ষা করার নয়।— এই কথা ভাবা নিশ্চয় অসঙ্গত। ট্যালেন্টের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। গণদেবতার আগে তরুণ মজুমদার যে কটি বায়োস্কোপ তৈরি করেছেন তার কোনটির জনাই মহৎ কোন সাহিত্যের সাহায্য নেননি, অথবা মহৎ কিছু সৃষ্টির চেষ্টাও করেননি। বুড়ো খোকাদের জন্য রূপকথার মত এক-ধরণের বায়োস্কোপ তৈরি করেন উনি। এমন কি 'সংসার সীমান্ত'-এর মত কাহিনীর নায়ককেও করে দিয়েছেন কবি-চোর এবং নায়িকাকে সতী—বেশ্যা। 'গণ-দেবতা'তেও ছিরু পালকে করেছেন বোম্বাই মার্কা ভিলেন। এই চরিত্রটিতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচন করাই একমাত্র ব্যবসায়িক কারণে। দুর্গাকে করেছেন তরুণ-সুলভ নায়িকা, যার মেকাপ এবং পোষাক দুই-ই আধুনিক। ডোমপাড়ায় আগুন লাগার পরেও যার ব্যতিক্রম হয় না। এখানে সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত'-এর উল্লেখ হয়তো প্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু তরুণবাবুর বায়োস্কোপ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ছবির আলোচনায় সত্যজিৎকে ছোট করা হয় বলে তার থেকে বিরত থাকলাম। আসলে তরুণ-বাবু সব ছবিতে যা করে থাকেন এখানেও তাই করেছেন। ব্যতিক্রম শুধু মূল কাহিনী নির্বাচনে। ছবির প্রথম পর্বটিতে অনিরুদ্ধ এবং দুর্গার গল্পো বলেছেন নিজের স্বভাবেই, এবং রবি ঘোষকেও উপস্থিত করেছেন একই কারণে। ন্যায়রত্ন মশাইকে বাদ দিয়েছেন, এমন কি কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবু পণ্ডিতও এ ছবিতে অব-হেলিত। যতীনকে দেখে 'বালিকা বধূ'র কথা মনে পড়ে যায়। বেহালা অথবা বাঁশি বাজানো মেয়েলি স্বভাবের বিপ্লবী ওনার ছবিতে ঘুরে ফিরেই আসেন। 'সংসার সীমান্তে'র ডাক্তারই আবার জগন ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছেন এ ছবিতে। ছিরু পাল তার যেকোন শত্রুর বিরুদ্ধেই নির্মম। কিন্তু জগন ডাক্তারের প্রতি আশ্চর্য রকমের উদাসীন।

তরুণবাবুর প্রিয় পটভূমি নাকি বীরভূম। অথচ এই ছবিতে প্রধান চরিত্রগুলির কেউই বীরভূমের ভাষায় কথা বলে না। বাক্যের শেষে একটা করে 'ক্যানে' জুড়ে দিলেই বীরভূমের ভাষা হয় না। এ ব্যাপারে ছিরু পাল অবশ্যই ব্যতিক্রম। শব্দগ্রহণ, হলের সাউন্ড সিস্টেম অথবা বার্ধক্যজনিত কর্ণকুহরের জন্য শ্রীবসু পুরোটাই বীর-ভূমের ভাষা ভেবেছেন? উনি লিখেছেন—'ছবির সম্পাদনার কাজটিও উল্লেখ করার মত।' কেন তা লেখেন নি। প্রায় প্রতিটি দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাবার মাঝে সম্পাদক মশাই একটি করে সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে দিয়েছেন অকারণে, যা আগের অথবা পরের কোন দৃশ্যের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত নয়। ছিরু পালের পদ্মর দেহ উপভোগের কল্পনার ডিগজাগ দৃশ্যটি পুরো পট-ভূমির মেজাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অপ্রয়োজনীয়। ছবিটির বহু দৃশ্যই অকারণ দীর্ঘ। দৃশ্যকে টেনে লম্বা করে গ্রামের মন্থর জীবন বোঝানো যায় না। ছবির সঙ্গীতাংশটি সবচেয়ে দুর্বল, যা কাহিনীর সময় অথবা ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

তরুণবাবু চিরকাল অগভীর ব্যবসায়িক ছবি তৈরি করেন। সিরিয়াস কিছু করার চেষ্টা অথবা ভাণ না করে তাই-ই উনি করুন। সেটা করার লোকেরও তো টালিগঞ্জে বড় অভাব।

তাছাড়া ১৪র বদলে ২৮ রীলেও সম্ভবতঃ 'গণদেবতা'র মত কাহিনীর চিত্র-রূপ সম্ভব নয়। শিব চৌধুরী, কালিঘাট।

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে,' দ্বিতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান'। প্রথম পর্বে সে সোনা, দ্বিতীয় পর্বে ছোটবাবু, তৃতীয় পর্বে অতীশ দীপঙ্কর। তিনটি পর্বেই এরা যেন তিন আলাদা মানুষ। এক পরিমণ্ডল থেকে অন্য এক পরিমণ্ডলে পরিবর্তিত জীবনে মানুষের ভিতরের সত্যের এরা সঙ্গী যে মূল্যবোধগুলি নায়ক আশৈশব লালন করে এসেছিল, সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্নে সে বিভোর ছিল নগরজীবনে এসে দেখল তা খুবই অর্থহীন। চারপাশের বিচিত্র সব জটিলতায় সে অবরুদ্ধ। নিশিদিন এক ভাঙ্গা গড়া নায়ককে এক পবিত্র সত্যের সন্ধান দেয়। বড় হতে হতে সে নিজেই এক কঠিন বেড়াজালে অবরুদ্ধ হয়। সে বার বার তা ভাঙতে চেষ্টা করে। সে অর্থাৎ মানুষ। ফলে মানুষ ফেরেব্বাজ হয়, ধানদাবাজ হয়, পাগল হয়ে যায়—সে হয় হা-অন্নের ক্রীতদাস। মানুষ যতক্ষণ না তার নিজের এই অন্তর্গত পাপ থেকে মুক্তি পায় ততক্ষণ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র মানুষের জন্য নিরর্থক। ঈশ্বরের বাগানে লেখক সেই সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।

পাগল হাঁকছে দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। পাগল হাঁকছে—ছবি গণ্ডারের এক যুগে থাকে সদর দেউড়ীতে। এইসব হাঁকডাক কোন এক অদৃশ্য গোপন অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছিল। সে সদর দেউড়ীতে এসে এমন সব শব্দে থমকে দাঁড়াতেই দেখল, সত্যি সত্যি মাথার ওপরে একটা গণ্ডারের ছবি—একটা দেড় হাত গণ্ডারের ছুঁচ লেজটা লম্বা হয়ে ঝুলে আছে—নীল রঙের ছবি, ভেড়ে ফুঁড়ে যাচ্ছে আর বাতাসে ওটা পত পত করে উড়ছে। দেউড়ীতে এক সিপাই— লম্বা ততোধিক, তালপাতার সামিল। হাতে জীর্ণ একটা একনলা বন্দুক। মরচে-পড়া। খাঁকি পোশাক গায়, মাথায় লম্বা টুপি জোকারের মতো। মুটেক একটা ফিতা বাধা। তানাটা হাঁ হয়ে আছে। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। এই সকালে, এখন আর কটা হবে, নটাও বাজেনি, অথচ লোকটা বসে নেই, শুয়ে নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে চোখ কোটরাগত, বহুদিনের উপবাসে এমন একটা ভঙ্গী মানুষের মুখে থাকে।

সে বলল, এটা রাজবাড়ি?

সিপাই চোখ খুলে দেখে হাই তুলল বন্দুকটা নিয়ে সটান এটেনসান, তারপর খুব তাচ্ছিল্য—যেন কিছুই আসে যায় না কে কখন যায় আসে খবর রাখার কথা না তার। এই লোকটা তাকে রাজার বাড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে—বেয়াদপ আর কাকে বলে! চোখ নেই! সামনে অতবড় পাথরে লেখা কুমারদহ রাজবাটী। লোকটা কি লেখা-পড়া শেখেনি? তারপরই হুঁস ফিরে আসার মত—অর্থাৎ একটা আহাম্মক লোকের সঙ্গে এতবড় মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কথা বলতে পারল না, বরং ধিক্কার দিতে গিয়ে ভাল করে তাকাতেই অবাক। এক উঁচু লম্বা সৌম্যকান্তি যুবক দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে। মুখে বড়ই ভালমানুষের ছাপ। সে রাজার বাড়িতে ঢুকতে চায়।

তখনই সৌম্যকান্তি যুবক লক্ষ্য করল বিশাল পেল্লাই দেউড়ীর এক কোণে ছোট্ট চৌকো মতো ফুট তিনেকের দরজা। কুকুর-বেড়াল লাফিয়ে ঢুকতে পারে। দুজন মানুষও ঢুকে গেল। ঘাড় মাথা হেঁট করে ঢুকে যাচ্ছে তারা। এই তবে সেই দরজাটা, যা দিয়ে মানুষ এই বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। সে ভাবল, কি করবে? মাথা হেঁট করে ঢুকবে, না সোজা মাথায় অপেক্ষা করবে। আর তখনই তালপাতা ঘটাং ঘটাং করে কি সব খুলে ফেলছিল, টেনে নিচ্ছিল জোরে দেউড়ীর এক কপাট। সে তার জান কবুল করে কোনরকমে একটা পাট কিছুটা ঠেলে দিতেই হাঁ হয়ে গেল রাজার বাড়ি। যুবক ভিতরে ঢুকে সিপাইকে বলল, রাজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

এত ভাল কথা নয়—বাড়ির হালচাল জানে না মানুষটা। এই বাড়ির মধ্যে কার বুকের পাটা আছে নাম নিয়ে কথা কয়! যুবকের কথায় সিপাই খুবই হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলল, কুমার বাহাদুর?

সে সহসা ভুলে হয়ে গেছে মতো বলল, কুমার বাহাদুর।

সিপাই এতক্ষণে কিছুটা আশ্বস্ত হল যেন। হাত তুলে বলল, সামনে যান। বাবুরা আছে বলে দেবে সব।

যেন বাবুরা তাকে প্রথম এ-বাড়ির সহবত শেখাবে। এখানে এলে এমনিতেই রাজার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কথা না। কত বড় আহাম্মক আর কিছুটা গেলেই টের পাবে। মনে মনে কিঞ্চিত শঙ্কা। সেখানে গিয়ে না আবার বলে ফেলে, রাজেনবাবু। তোবা তোবা. সে কান ছুঁল। এরকম এ-বাড়িতে কেউ ভাবতেও ভয় পায়। লোকটা এত সুন্দর দেখতে এমন উঁচু লম্বা, মুখে চোখে আশ্চর্য আচ্ছন্ন এক

যেন এত সুখের মধ্যেও কি সব গভীর া মানুষটার মধ্যে কাজ করছে। সিপাই ৮ আলি একটু এগিয়ে গিয়ে বলবে ন। হুজোরের নাম জেকেন না বাবু। মে লাগে। কিসে কি বিপদ আসবে লতে পারে। কিন্তু কিছুটা গিয়েও কে দেখতে পেল না। গাড়িবারান্দার বড় বড় থামের আড়ালে পড়ে গেছে। অতদূরে যাওয়া আর সম্ভব না। া সম্ভব না। অষ্ট প্রহর দেউড়ী ানোর কাজ। এদিক ওদিক হলেই রত তলব।

মাসজে নবীন যুবক যায়, কেউ হাঁকে, কোন গোপন গভীর অদৃশ্য অন্ত থেকে হাঁকে, নবীন যুবক যায়। সে যায় আর চারপাশ দেখে। দেউড়ীতে য় ভেবেছিল, বড় ভগ্ন প্রাসাদ। বাড়ি ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু র যত ঢুকছে জেল্লা বাড়ছে। বাঁদিকে ন। সবুজ ঘাস, কিছু বিদেশী ফুলের ঝাউগাছ, পাম-ট্রি, ছোট্ট জলাশয়। নে শালুক এবং পদ্মপাতা তারপরই ব গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ পাতার প্রাচীর। া কত বড় ভেতরে। যেন শেষ নেই। কে পথ, বাঁদিকে পথ। একটা দোতলা লম্বা কতদূর চলে গেছে পাশ দিয়ে। াড়ি-বারান্দায় উঠে যেতেই এ-সব । তবু সব কিছু পুরানো, প্রাচীন একটা সোঁদা গন্ধ। গাড়ি-বারান্দায় ই সে এটা টের পেল। গাড়ি-বারান্দা হলে লম্বা আর একটা বারান্দা— চত্বর জুড়ে যেন। কোণায় কোণায় শ্বেত-পাথরের টেবিল, কারুকাজ করা । দেয়ালে বড় বড় আয়না। যুবক আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চোখেমুখে ক্লান্তি জমেছে। রাত গাড়িতে আসায় এটা হয়েছে। তখনই রেজায় উঁকি মেরে বলল, কাকে চাই?

ুবক বলল, রাজেনবাবুর সঙ্গে আজ করার কথা।

াকটা যেন কি বুঝে ফেলল, আরে সই লোক—যে আসবে আসবে কথা ভালমানুষ, সত্যবাদী এবং যাকে কুমার বাহাদুরের অনেক উপকার পলকে চিনে ফেলে বলল, বসুন হুজুর এখনও নামেন নি। তারপরই যে বলল, দাঁড়ান। লোকটা যাদুকরের অন্তর্হিত হয়ে গেল। এবার সে একা া। আরও একজন সঙ্গে। সঙ্গের বলল, —কুমার বাহাদুরের কাছে চান?

তেমনই কথা আছে।

কোত্থেকে আসছেন।

অনেক দূর থেকে।

নাম?

অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।

মানে আপনি আমাদের নতুন...।

আর কথা শেষ করতে পারল না। দস্তপাটি নিমেষে বের করে দিল, কিছুটা কুঁজো হয়ে গেছে অল্পবয়সেই। যুবক চোখ তুলে লোকটিকে দেখে রাজেনবাবুর কথাবার্তার সঙ্গে কি যেন মিল খুঁজে দেখার চেষ্টা করল। যখন কুঁজো হয়ে গেছে তখন বুঝতে বাকি থাকল না, রাজেনবাবুর বড় বিশ্বাসীজন।

—ওরে সুরেন। কোথায় গেলি বাবা।

ও-পাশের একটা ঘর থেকে সুরেন হাঁকল, আজ্ঞে যাই বাবু।

এবার অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল বসুন। এখনও নামার সময় হয়নি। ও সুরেন, কি করছিস?

—আজ্ঞে যাই।

অন্যপাশের টেবিলগুলিতেও কিছু দর্শনার্থী।

বাবুটি বলল, ভিতরে এসে বসুন।

যুবক বলল, বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

সুরেন কোথায় গেল কে জানে। সেই খবর দেবে কুমার বাহাদুর নেমেছেন কি না। সেই এখন তার কাণ্ডারী। সে লোকটি হারিয়ে গেলে যা বিরাট প্রাসাদ তার পক্ষে রাজেনবাবু ওরফে কুমার বাহাদুরকে খুঁজে বার করা কঠিন হবে।

বাবুটি বলল, পথে কোন কষ্ট হয়নি ত?

—ঘুম হয়নি। গরম।

—তালে খুব কষ্ট গেছে। ওরে সুরেন বাবা, তোর হল?

—আজ্ঞে যাই।

অতীশ এই কথাগুলিতে মজা পাচ্ছে। সুরেন ভেতর থেকে যাই করছে, আর বাবুটি অনবরত হেঁকে যাচ্ছে, তোর হল?

শেষপর্যন্ত যা হল, তাতে অতীশ আরও মজা পেল। হল অর্থাৎ এক কাপ চা এবং দুটো বিসকুট। এই হতে এতক্ষণ সময়! এ বাড়িতে একসময় দানধ্যান পুজা-পার্বন দোল দুর্গোৎসব, বাই-নাচ, সঙ্গীত সম্মেলন এবং রাজা-বাদশা-মহাত্মারা পায়ের ধুলো রেখে গেছেন কত। সে এখন এই বাড়ির বিশাল বারান্দায় বসে এক-কাপ চা দুটো ক্রিমকেকার খাচ্ছে।

খেতে খেতে তার ওপরের দিকে চোখ গেল। বড় বড় তৈলচিত্র। কবেকার কে জানে। অধিকাংশ ছবি উলঙ্গ যুবতীদের। বিদেশীনি। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন সুদূরের এক বাসভূমি তার চোখে ভেসে উঠল। সমুদ্র বেলায় সে আর কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অথবা কোন ভাঙ্গা জাহাজের মাস্তুলে সে, দূরে সমুদ্রগর্ভে অতিকায় সেই ক্রস। কখনও ঢেউয়ে ভেসে উঠছে কখনও ডুবে যাচ্ছে। মাস্তুলের ডগায় সে সম্ভ্রস্ত জানালিসে নেমে আসছে। এইসব স্মৃতি মনে হলেই তার ভেতরে হাহাকার বাজে। কত বছর আগেকার এক দৈব ঘটনা তাকে এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এবং সেই আচ্ছন্ন ভাবটা আবার তার মধ্যে ঢুকে গেলে সে কেমন আনমনা হয়ে গেল। সে চুপচাপ বসে দেয়ালের ছবি, দূরের দিগন্ত বেলা, অথবা নীল সমুদ্রে সেই অতিকায় পাখির আর্ত চিৎকারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

—বাবু।

অতীশ চোখ তুলে তাকাল।

—আসুন।

সে উঠে গেল ভিতরে। ঘরটা ফাঁকা। ডানদিকে কাঠের পার্টিসান দেয়া দেয়াল। পাশে দরজা। ভেতরে কিছু বাবু। বড় টেবিলে দলিল দস্তাবেজের পাহাড়। তারা মনোযোগ দিয়ে কি-সব দেখছে। সে সেই ঘরটা অতিক্রম করতেই বড় একটা হলঘরে পড়ল। সেই ঘরটাও চিত্রিত তেলরঙের ছবিতে সাজানো। কোথায় একটা লোক উবু হয়ে কি যেন করছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে গিয়ে বুঝল লোকটার সম্বল বলতে একটা বালতি কিছু জল এবং পাতা। সে টেনে টেনে ঘর মুছে যাচ্ছে।

বাইরে থেকে সে ভাবতেই পারেনি ভেতরে এখনও সেই জাঁকজমক আছে। হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া আছে সব কিছু, এখানে বড় বেশি মহার্ঘ মনে হচ্ছিল। ঘরটার মাঝখানে কাশ্মীরি কার্পেট, সোফা, মাথায় রকমারি কাঁচের ঝালর। দুপাশে সেই বড় বড় বেলজিয়াম কাঁচের আয়না। একটি ঘড়ি লম্বা কালো রঙের, চারপাশটা সোনার জলে কাজ করা। থেকে থেকে বাজছে। ঠিক যেন জলতরঙ্গ বাজনা। ঘড়িটার দিকে তাকাতেই সুরেন বলল দাঁড়ান। সুরেন চবর চবর করে পান চিবুচ্ছিল। মুখের গহ্বর আগুনের মতো লাল।

সে দাঁড়াল।

সামনে আবার একটা লম্বা ঘর। দেয়াল জুড়ে বুক-সমান উঁচু লম্বা চেয়ার। কালো রঙের। বেতের বুনন। এখানে দাঁড়ালে সে পর পর আরও সামনে তিনটে অতিকায় দরজা দেখতে পেল। কতবড় এই বাড়ি একবার পেছনে না তাকালে যেন বোঝা যাবে না। সে পেছনে তাকালে বুঝল, ওদিকের দরজাটা কেউ বন্ধ করে দিয়ে গেছে। এখান থেকে একা পালাতে চাইলে সে আর পালাতে পর্যন্ত পারবে না।

সুরেন পরেছে একটা খাটো কাপড়। গায়ে রাজবাড়ির ছাপ-মারা খাকি উর্দি। বোতামেও রাজবাড়ির ছাপ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গালে। মাঝারি হাইট। চোয়ালে মাংস কম। এক সময় শক্ত মজবুত ছিল মানুষটা, এখন সে-সব নেই। হাতের রগ ভেসে উঠেছে চোখে-মুখে সব সময় কেমন শঙ্কা। সে সুরেনের দিকে তাকিয়ে থাকলে বলল, ওখানটায় গিয়ে বসুন। এখনি নামবেন।

সেই উঁচু মতো লম্বা চেয়ারটায় সে উঠে গিয়ে বসল। সামনে বিলিয়ার্ড টেবিল।

লালরঙের সিল্ক কাপড়ে সবটা ঢাকা। কোণায় একটা রিংয়ের মধ্যে ছোট বড় মাঝারি স্টিক। এ-ঘরে রাজেনবাবুর পূর্ব-পুরুষদের বড় বড় তৈলচিত্র। নিচে বড় লাটের সংগে গ্রুপ ছবি। রাজেনবাবুর প্রপিতামহের আমলে বড়লাট এ-বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন বলে একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি কোণায় সযত্নে এখনও রাখা। তার নিচের ছবিটা যেমন ছোট তেমনি বিদঘুটে। একটা কালো কোট ছবিটাতে ঝুলেছে খালি হাতা ভেতর দিয়ে একটা হাত ফুটে বের হচ্ছে। কাঠের বেড়া ফাঁক করে হাতটা নিচে জলে কিছু যেন খুঁজছে। ছবিটা ভাল করে দেখার জন্য অতীশ নিচে নেমে গেল। কেউ নেই। সুরেনও না। কেমন এক নিঃসঙ্গপুরী বাইরে ট্রাম বাসের শব্দ কান পাতলে শোনা যায়। আর মনে হচ্ছিল আর একটু গেলেই অন্দর মহল—সেখানে রাজেনবাবুর পিতৃপুরুষদের কেচ্ছা-কাহিনীর কুট-গন্ধ এখনও নাক টানলে পাওয়া যাবে। বিলিয়ার্ড টেবিলের অদূরেই পিয়ানো। ঢাকনাটায় ময়লা জমে আছে। একসময় এই ঘরটা ময়ফেলের জায়গা ছিল বোঝা যায়। সাহেব সুবোরা আসত। মেমসাবরা আসত। সারা রাত খানাপিনা চলত। কতকাল আগে সে-সব পাট উঠে গেছে বোধহয়। মানুষ মরে গেলে সাদা চাদরে ঢেকে দেবার মতো বিলিয়ার্ড টেবিল, পিয়ানো সব ঢেকে রাখা হয়েছে এখন।

সে এই প্রথম এখানে। রাজেনবাবুর বাইরে একটা পোশাক ভালমানুষের চেহারা আছে। তার সঙ্গে কথাবার্তায় সেদিন এমন মনে হয়েছিল। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই তাকে অতীশের খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু যত বাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকছে, তত এক সংশয় দানা বাধছে। ওর কিছুটা ভয় ভয়ও করছিল। রাজেনবাবুর বাড়ির ভেতরের হালচাল ওর কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক লাগছে। এ-সময় এক ধু-ধু মরুভূমির বুকে কোনো এক জরদগব পাখি তার চোখে ভেসে উঠল। এই এক ল্যাঠা তার। সে অনেক কিছু দূরে অদূরে দেখতে পায়। পাখিটা ঠোঁট গুঁজে বসে আছে। একটা মরুভূমির কাঁকড়া গোপনে হেঁটে আসছে। টুক করে গলায় থাবা বসাবে। সে সহসা হাত তুলে কাঁকড়াটাকে তাড়াতে গেল। এবং ছবিটাতে হাত লাগায় জলটা যেন নড়ে উঠল। সে ভাবল, এটা কি করতে যাচ্ছে সে!

তারপরই মনে হল ছবির জলটা নড়ে কি নড়ে না, সে প্রায় ছবির মধ্যে মুখ গুঁজে দেখার মত দাঁড়িয়ে থাকল। এবং [illegible] মনের [illegible] সে এ-সব দেখে ফেলে—এটা তার সেই কবে থেকে যে হয়ে আসছে। সে ছবিটা থেকে ভয়ে [illegible] সরে সরে দাঁড়াল। [illegible] এই এক ভয় সে বয়ে বেড়াচ্ছে। তখনই মনে [illegible] দাঁড়িয়ে কেউ [illegible] আসছে। সে [illegible] নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ল। এটা তার নির্দিষ্ট জায়গা। এখানে সুরেন তাকে বসতে বলে গেছে। তার এদিক ওদিক যাবার নিয়ম নাও থাকতে পারে। আসলে সে সেই সরল ভীতু স্বভাবের মানুষ। ভেতরে কখনও কখনও যে গোঁয়াড় মানুষটা উঁকি দেয়, তা নিতান্ত ফেরে পড়ে গেলে।

বাড়িটাতে সোজা টানা লম্বা দরজা একের পর এক। একটা পার হলে আর একটা। যেখানটায় বসেছিল, সেখান থেকে ডাইনে বায়ে দু-দুটো দরজা চোখে পড়ছে। সেই লোকটা এখনও ঘরের মেঝে মুছে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছিল তার। মারবেল পাথরের মেঝে সে ঘসে ঘসে চকচকে করে তুলছে। এই একমাত্র মানুষ তার কাছাকাছি। সিঁড়িতে তখন আর শব্দ হচ্ছে না। দূরে সরে যাচ্ছে। সে উঁকি দিয়ে দেখল রাজেনবাবু। সাদা সার্ট, গলায় টাই, সাদা জিনের প্যান্ট—বড় গম্ভীর কোন দিকে না তাকিয়ে দেয়ালের আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। আর তার ঠিক পিছু পিছু ফতুয়া গায় একজন মাঝবয়সী মানুষ কাঠের একটা ছোট্ট বাকস নিয়ে রাজেনবাবুকে অনুসরণ করছে। অতীশের মনে হল, এবারই সেই হা হা হাসি শুনতে পাবে। আরে এস এস। কটায় এলে। সব ঠিক ত। কারণ অতীশের ধারণা তার আসার খবর রাজেনবাবু পেয়ে গেছে। এত অন্তরঙ্গ কথাবার্তার পর তাকে আর দশটা মানুষের মতো দেখতে না পারারই কথা। সেই বাকসধারী লোকটা তখন পাশের দরজা দিয়ে বের হয়ে এল। হাতে বাকস নেই। ভেতরের কোন ঘরে রাজেনবাবু আর তার বাকস বুঝি রেখে এল। মাঝবয়সী লোকটা একা এদিকের দরজায় আসতেই কুর কুর করে দৌড়ে এল সুরেন।

মাঝবয়সী মানুষটা এত্তেলা দিল—কুমারবাহাদুর নেমেছেন। তার আগে মহারাজাধিরাজ গণ-নারায়ণ বীর বিক্রম এমন সব কিছু কি হাবিজাবি কথা—এবং অতীশের বুঝতে দেরি হল না, জমিদারী চলে গেলেও ঠাট বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন রাজেনবাবু। তার ফিক করে হাসি পেল।

খবর পেয়ে সুরেন কোথায় আবার কুর কুর করে দৌড়ে গেল। তাকে কেউ কোন আমলই দিচ্ছে না। মাঝবয়সী মানুষট তার দিকে ফিরেও তাকাল না। সে সোজা দরজাগুলির একটা দিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং দেখতে দেখতে মনে হল সারি সারি ক'জন নানা বয়সী মানুষ। পাটভাঙ্গা ধুতি, পায়ে পামসু। পাশের অফিসটাতে ওদের সে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখেছিল। ওরা ঘরটায় ঢুকে প্রথম একে-একে জুতো খুলে ফেলল। অতীশের বড় বেশি কৌতূহল—কোথায় এরা যায় দেখার বড় বাসনা। দেখলে মনে হবে ঈশ্বর দর্শনে যাচ্ছে। সে গুটি গুটি নেমে গেল। দেখল বড় কাঠের দরজা [illegible] সবাই একে একে প্রণিপাত [illegible]। তারপর বের হয়ে আসছে। টের পেলে অধর্ম হতে পারে—অতীশ তাড়াতাড়ি দেয়ালের ছবিতে মনযোগ দি[illegible]

পাশ থেকে তখনই সেই বাবু, বা[illegible] সুরেন তোর হল—সেই বাবু কালো আ[illegible] পুরুশ কাঠের রং, চুল কাঁচাপাকা, চাঁচা ম[illegible] তেমনি দাঁত বের করে হাসল। বলল, এ[illegible] হয়ে গেল। এবারে আপনাকে ডে[illegible] পাঠাবেন কুমার বাহাদুর। আর এক[illegible] অপেক্ষা করুন। খবর দেওয়া হয়েছে।

অতীশ ভারি বিভ্রমের মধ্যে পড়ে গেল[illegible] সবাই জুতো খুলে ঘরে ঢুকছে। [illegible] হচ্ছে। তার পায়ে সু। কালো টেরিকটনে[illegible] প্যান্ট সে পরে আছে। ফুল ফল আঁ[illegible] হাওয়াইন সার্ট গায়। সে জুতো খু[illegible] ঢুকবে কি ঢুকবে না, জুতো খুলে ঢাক[illegible] রাজদর্শন, বড়ই পুণ্য কাজ, প্রায় ঈশ্ব[illegible] দর্শনের সামিল—নেহাত দৈব বলে এ[illegible] ঘরানার একমাত্র উত্তরাধিকারের সংগে তা[illegible] যোগাযোগ, অত সহজে হেলায় নষ্ট করা[illegible] মতো আহাম্মক সে নয়। কিন্তু তখনই তা[illegible] ভেতরের গোঁয়াড় মানুষটা ফুঁসে উঠল[illegible] এই গোঁয়াড় মানুষটাকে অতীশ বড় ভ[illegible] পায়। গোঁয়াড় মানুষটার মাথা গরম হ[illegible] হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ঘিলু ফে[illegible] যায়। রক্ত ঝরে। খুনখারাপি করতে দ্বিধা[illegible] করে না। সে জুতোর ফিতা আলগা ক[illegible] দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু পা থেকে জুতো খুলতে সাহস পেল না।

সুরেন আবার কুর কুর করে হাজির হলল, আজ্ঞে আপনি অতীশবাবু?

অতীশ বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হুজুর ডেকেছেন।

সে দরজার কাছে যেতেই সুরেন হা-হা করে উঠল। অতীশ পেছন ফিরে তাকাল। দেখল সুরেন [illegible] হয়ে গেছে। চোখ ওর পায়ের দিকে।

অতীশ কিছু বলল না। আসলে অতীশের ভেতরে সেই রাগী মানুষটা এখন একটা দৈত্যের মতো সব অগ্রাহ্য করতে চাইছে। সে দরজা ঠেলে গট গট করে ঘরে ঢুকতেই রাজেনবাবুর অন্তরঙ্গ সেই ডাক —আরে এস এস। কি রকম আছ? রাস্তায় কোন অসুবিধা হয়নি ত! কটায় গাড়িতে এলে!

সঙ্গে সঙ্গে অতীশের রাগী মানুষটা ভোঁ করে কোথায় ছুটে পালাল। সে আবার সেই অতীশ দীপঙ্কর। সোজা সরল মানুষ। বলল, আর বলবেন না, বড্ড বেশি নিয়ম-কানুন বাড়িতে। সব ঠিক বুঝি না দাদা।

—ও ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এ-জন্য ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই।

(চলবে)

অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

উনবিংশ শতকের উত্তাল কলকাতার নায়ক, উপনায়করা সকলেই কমবেশী নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিকপাল-খ্যাতকীর্তি। এই সব বড়সড় ব্যক্তিত্বের মাঝে দাঁড়িয়েই অখ্যাত-পরিচয় এক 'নায়ক সুদূর বিক্রমপুর থেকে এসে কলকাতার যুবমন দেখামাত্রই জয় করে নিলেন! নারীমুক্তি আন্দোলনের ধ্বজা দিলেন উড়িয়ে। তিনিই দ্বারকানাথ। আর, কাদম্বিনী—তাঁরই হাতে-গড়া শিষ্যা—স্বয়ংবরা, সহধর্মিণী। সহকারিণী। নবযুগের নায়িকা। এই বিচিত্র দম্পতির জীবনালেখ্য—লিখেছেন নারায়ণ দত্ত।

একদিন কলেজে পড়িতেছি এমন য় উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া াকে বলিল, "ওরে ভাই, অবলাবান্ধবের টর কলিকাতায় এসেছে, আমাদের সঙ্গে া করতে এসেছে।" অমনি আমি আমা- 'হিরো'কে দেখিবার জন্য বাহির লাম। গিয়া দেখি এক দীর্ঘাকৃতি এক- া পুরুষ, স্কুল মাস্টারের মত, লম্বা চাপ- া পরা, দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারকা- া গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিন আর অধিক া হইল না। সে যাত্রা বোধহয় তিনি একদিন পরেই দেশে চলিয়া গেলেন। তু কিছুদিন পরেই অবলাবান্ধব লইয়া কাতায় আসিলেন। এবং পূর্ববঙ্গীয় কদিগের নেতাস্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে -স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন।' শবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত)

এটা আঠারশ' উনসত্তর-সত্তর লের ঘটনা। শহর কলকাতার ক নানা ঘটনাচক্রের আবর্তে া বাঙ্গালী সমাজ তখন উত্তাল। কয়েক া আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় া গ্রাজুয়েটের অন্যতম ডেপুটি ম্যাজি া বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস দুর্গেশ- নন্দিনী লিখেছেন। তার প্রতিনায়িকা লাজ- ের মাথা খেয়ে সরবে ঘোষণা করেছে, বন্দী অন্তর [illegible] চারেক আগে আর এক কবির কল্পনায় দৃপ্ত নায়িকা রুষ্ট কণ্ঠে বলেছে, 'কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি, বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে, কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?'

এ শুধু রাবণ-শ্বশুর ও মেঘনাদ-স্বামী প্রমীলার সতেজ উক্তি নয়। ভবিষ্য-দর্শী কবির কল্পনায় আঁকা জাগ্রত দুর্দমনীয় নারী-শক্তির প্রথম রণধ্বনির চিত্রকল্প। সমাজ নেতারা পরে যা চেয়েছেন, নারী-মুক্তির সেই আগামী দিনের ছবিকে শঙ্খ-ধ্বনি করে সাদর 'সংবর্ধনা' জানিয়ে গেলেন নবযুগের প্রফেট-কবি শ্রীমধুসূদন। প্রায় বছর চার হয়ে গেল বহুবিবাহ রহিত করার জন্যে দ্বিতীয়বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে আবেদন করেছেন ফতুয়া চাদর গায়ে চটি জুতা পায়ে এক বামুন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মন: বিধবা বিবাহ বেশ কয়েক বছর হল আইনের স্বীকৃতি পেয়েছে। বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেকগুলি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে খাস কলকাতার বুকে ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে। বেলগাছিয়া ভিলায় হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। অধিকতর প্রগতিশীল কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছেন ইতোমধ্যে। দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়-কুমারের কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম হয়েছে আদি ব্রাহ্মসমাজ।

বাংলাদেশের এই রঙ্গমঞ্চে শিয়ালদহ স্টেশনের গথিক থামের নীচু দিয়ে মাথা উঁচু করে আবির্ভূত হলেন নতুন নায়ক। সেকালের অত্যন্ত এক প্রগ্রেসিভ যুবক শিবনাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর দলের 'হিরো'। কিন্তু কি ছিল সেই নায়কের চরিত্রে? কি এমন তাঁর বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে নব্যযুবক সম্প্রদায়ের কাছে 'আইডল' করে তুলেছিল? চেহারাটা যে মোটেই আকর্ষণীয় নয় শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের বিবরণ থেকেই তা স্পষ্ট। একেবারে সাদামাটা লম্বাটে রোগা চেহারা। স্কুলমাস্টারের মত লম্বা চাপকান পরা পোশাকেও কোন বৈচিত্র্য নেই বরং একেবারে সাদাসিধে পোশাক। —এটাই যেন বেশি করে বলতে চেয়েছেন তরুণ শিবনাথ। তবে? কোন গুণে দর্শনমাত্রেই জয় করে নিলেন তিনি উনবিংশ শতকের শেষপাদের তরুণমন?

সাক্ষাৎ পরিচয়ের আগে কিন্তু শিবনাথের দলের সঙ্গে অন্যভাবে পরিচয় হয়েছিল অবলাবান্ধবের এডিটরের। শিবনাথ লিখেছেন: 'এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবলাবান্ধব সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত মিলন। তখন ঢাকা সমাজ সংস্কারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে 'মহাপাপ বাল্য বিবাহ' নামে এক পত্রিকা ঢাকা হইতে বাহির হয়। তাহাতে সেখানকার যুবকদলের উপরে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মে। এই বঙ্গভূমিতে অবলাবান্ধব দেখা দিল। আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশের এককোণ হইতে নারীকুলের হিতৈষী হইয়া দেখা দিল? অবলাবান্ধবের সম্পাদককে তখন চিনিতাম না, কিন্তু তাঁহার তাজা তাজা কথা প্রাণ হইতে আসিতেছে বোধ হইত ও আমাদের বড় ভাল লাগিত।'

এই আশ্চর্য সাদামাটা মানুষটির সজীব এই প্রাণবন্ত বাণীই নবযুবকদের মন কেড়ে নিয়েছিল। বাংলার নবযুগ তখন টাট্টু ঘোড়ার মত টগবগ করে দেশের মানস-রাজ্যের ওপর দিয়ে অপূর্ব ছন্দে এগিয়ে চলেছে এবং তার সেই প্রাণরথের আরোহী এই বিস্ময়কর ব্যক্তিটি। তাঁর ঝুলিতে দেবার মত কিইবা এমন ধনরত্ন ছিল? এমনকি সেকালের স্বীকৃতির ন্যূনতম পাশপোর্ট শিক্ষার বারিধি হওয়া ত দূরের কথা, সামান্য ম্যাট্রিক পাশের অভিজ্ঞান-পত্রটিও তাঁর নেই। নেই অর্থের কোন কৌলিন্য। কোন রাজা-মহারাজা বংশের কনক কিরীটিও তাঁর শিরোদেশ অলঙ্কৃত করে ছিল না। বাংলার নবজাগ্রত জনমানসের মানস লীলাক্ষেত্র কলকাতা শহর থেকে কয়েক শত মাইল দূরে দারিদ্র-জর্জরিত এক অতি সাধারণ পরিবারে

জন্মগ্রহণ করে কি এমন অসাধারণ গুণ অর্জন করেছিলেন তিনি যা আকৃষ্ট করেছিল সুদূর কলকাতায় বাংলার চিরচঞ্চল দুর্বার যুবমানসকে?

শিবনাথ শাস্ত্রীর কথাতে জানা যায় মুখ্যত দুটি গুণের কথা। এক, নারীজাতির প্রতি গভীর সহমর্মিতা, তাদের হিতৈষণার উগ্রসংকল্প এবং দুই, তার সজীব সতেজ অভিব্যক্তি সাধারণ এই মানুষটিকে অসাধারণ করে তুলেছিল। হৃদয়ের গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত তাঁর দ্রোহবাণী যুবমানসের অন্তঃস্থলে স্পন্দন তুলেছিল। নারীমুক্তি আন্দোলনের এই বীর সেনাপতির রণদামামার বজ্রনির্ঘোষ সংবেদনশীল সকল অন্তরে তার প্রতিধ্বনি তুলেছিল এবং তাঁদের তাঁর দীর্ঘ ব্যক্তিত্বের পাশে জমায়েত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়েই গেল। কি সেই মহৎ গুণ, কি সেই দীপ্তি যা দিয়ে কলকাতার যুবকসমাজকে আকৃষ্ট বা মুগ্ধই শুধু করেন নি দ্বারকানাথ, অনায়াসে তাদের হৃদয়ে নায়কের সাধের আসনে সহজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। সেটা এককথায় তাঁর 'র‍্যাডিক্যালিজম'। তাঁর আপোসহীন অগ্রগামিতা। 'পল্লীবিজ্ঞানের' প্রতিবেদক শুধু আক্ষেপ করে গেলেন, নরম সুরে কাতর আবেদন করে গেলেন সংস্কারের। কিন্তু দ্বারকানাথ এই ক্লেদাক্ত সমাজের অবসান চাইলেন। সামিল হলেন নিজে। নিজে গোঁড়া কুলীন বংশের সন্তান হয়েও তিনি তারই রেওয়াজমত চল্লিশ পঞ্চাশটা বিয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে একটার বেশি বিয়ে না করবার শপথ নিলেন। এবং সারা জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করলেন। এর জন্যে তাঁকে অশেষ কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। নিষ্ঠুর অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সমাজের মাতব্বরদের কাছ থেকে। তাঁর বোনেদের বিয়ে হয়নি, তবুও এই গোঁড়ামির কাছে মাথা নত করেননি। সাহস সহকারে তাকে আক্রমণ করেছেন। সমুচ্চ কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন।

প্রসঙ্গত তারপাশা বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখুজ্জেমশায়ের ঘটনাটা মনে পড়ে। তাঁকে তাঁর কাকা আটটা বিয়ে দিয়ে দেন নেহাৎ ছোটবেলাতেই। তিনি আর বেশি বিয়ে করতে না চাওয়াতে কাকা তিনশ' টাকার ঋণের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে পৃথক করে দেন। [illegible] ঋণমুক্তির জন্য আরও কয়েকটি বিয়ে করেন এবং পরে বাংলা শিখে [illegible] জমিদারী সেরেস্তায়। [illegible] বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসে 'সর্বজনীন বিবাহ প্রচলিত' করবার জন্য উদ্যোগী হন। রাসবিহারী দুঃখ করেছেন যে তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহুবিবাহ করেছেন। দ্বারকানাথের [illegible] ইচ্ছার বিরুদ্ধে [illegible] করাতে পারেননি। 'নারীজাতির [illegible]' [illegible] জীবন [illegible] সংস্কারের প্রশস্ত ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ করিয়া ছিল।' এবং এর জন্যে তাঁকে দেশ, এমনকি বাপ-মাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। অবশ্য তার আগেই বৃহত্তর কলকাতার কর্মক্ষেত্র তাঁকে ডাক দিয়েছে।

দেশত্যাগ করেন কিন্তু কখনও ধর্ম ত্যাগ করেননি তিনি। মাত্র চুয়ান্ন বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন দ্বারকানাথের। তাঁর জীবন-পথ ধরে তাঁর সঙ্গে যত এগিয়ে যাওয়া যাবে দেখা যাবে দ্বারকানাথ ছিলেন এক প্রগতির আধুনিকমনের অধিকারী। সব সময়েই তিনি অগ্রগামীদের দলে। তাঁর সঙ্গীরা খানিকটা এগিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। বলেছেন 'এই থাক। এই অবধি। আর নয়।' কিন্তু দ্বারকানাথ এগিয়েছেন নির্দ্বিধায়। সমাজ, কাল, মানুষের ডাক কখনও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। সাড়া দিয়েছেন। অনেকেই তাঁর শত্রুতা করেছে, বিরুদ্ধতা করেছে। বৈরিতার কাঁটা পুঁতে দিয়েছে পথে। বিদ্রূপ করেছে তাঁর আধুনিকতাকে। তাঁর গতিময়তাকে। কিন্তু দ্বারকানাথ এগিয়ে গেছেন। এই না-থামার জীবনই তাঁর অন্যান্য সকল সহযোগী থেকে এখানেই তাঁর পার্থক্য। তাঁর স্বাতন্ত্র্য। এইখানেই দ্বারকানাথ দলছাড়া। বিশিষ্ট। তিনি যেন মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠির। অন্যান্য সহযাত্রীরা সব পথের ধারেই রয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি ঠিকই চলেছেন। একমাত্র সঙ্গী তাঁর মানবধর্ম। তিনি চলেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, স্থির দৃষ্টিতে। সে লক্ষ্য-সত্যের, তাঁর ধর্মের, তাঁর আদর্শের।

গ্রাম থেকে শহরে

গ্রামের নাম মাগুর খণ্ড। পাশেই গণ্ডগ্রাম কালীপাড়া। কালীপাড়ায় এন্ট্রান্স স্কুল। এবং সেকালের বিক্রমপুর পরগণার বেশ নামকরা স্কুল। সমসাময়িক বিবরণে জানা যাচ্ছে, বিক্রমপুর পরগণায় এমনি প্রায় সতেরটি স্কুল ছিল। সেগুলো হচ্ছে—কালীপাড়া, শ্রীনগর, বহর, মুন্সিগঞ্জ, মাইজপাড়া, কুকুটীয়া, হাসাড়া, সালখানগর, জৈনসার, জপসা কাচাসিয়া, কুমারভোগ, কনকসার, তারপাশা, ঢোলা, কেতকা, ব্রাহ্মণগাঁ ও বজ্রযোগিনী। এটা 'আঠারশ' সাতষট্টি খৃষ্টাব্দের হিসেব। দ্বারকানাথের বয়স তখন তেইশ। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে তখন তিনি শিক্ষক। লোনসিংহে। এবং এরই বছর দুই পরে এখানে বসেই তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অবলাবান্ধব' কাগজ বার করা শুরু করেন।

কিন্তু আগের কথা আগে। দ্বারকানাথের বাবা কৃষ্ণপ্রাণ। মা-উদয়তারা। কৃষ্ণপ্রাণ খুবই বড় বংশের ছেলে। হৃদয়টাও বড়। গরীবের দুঃখে কাতর। গরীবের দুঃখ ঘোচাতে তৎপর। আবার কুলীন ব্রাহ্মণ হিসেবে তাঁদের সামাজিক সম্মানও খুবই উঁচুতে। মা উদয়তারা ত্রিপুরা জেলার সামগ্রামের জমিদার রায় বংশের মেয়ে। কৃষ্ণপ্রাণের সহধর্মিণী মর্মপ্রাণা। নিজ সংকল্পে অটল। অথচ উদারচিত্ত। মহাপ্রাণা।

দ্বারকানাথের নিজের যেমন, ত… মায়েরও মনের জোর ছিল খুব। একবার কোন সিদ্ধান্ত নিলে কোনক্রমেই যে… থেকে তাঁকে টলাতে পারা যেত না… সম্বন্ধে একটা কাহিনী শোনা যা… একবার উদয়তারা ঠিক করলেন তি… শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করবেন। আজ… কথা নয়। শতাব্দীর বেড়া ডিঙিয়ে শহ… কলকাতার অশান্ত কলরোল পিছনে ফে… শিয়ালদহ স্টেশনের সদ্যপাতা রে… লাইনের কোন প্যাসেঞ্জার বা মেল ট্রেন ধ… চলুন যাই অখণ্ড বঙ্গের পদ্মা-মেঘনা ধলেশ্বরীর স্নেহধারা বিজড়িত সেই নরম কোমল দেশটার বুকে—যেখানে বিক্রমপুর পরগণার ছোট্ট সেই গ্রাম—মাগুরখণ্ড। গ্রামটা ছোট, মানুষগুলি ছোট নয়। ছো… নয় তাদের মানমর্যাদা। আষাঢ়ে সে এ… মেঘে ঢাকা দিন। আকাশটা গুরুগম্ভীর। দুকুলভরা অশান্ত নদনদী খালবিলে… বুকে যেন কোন সামাজিক অশা… নিস্তব্ধতা। অকালে ঘনিয়ে আসা রাত্রি… অন্ধকারে গ্রামখানির এক পরিচ্ছন্ন কুটিরে পিলসুজের ওপরে রাখা প্রদীপের শান্ত আলোয় চারপাশের কয়েকটা মানুষকে সিলুয়েটের ছবির মত মনে হয়। পিছনে ছায়াগুলো যেন তারই কোন … প্রতিচ্ছবি। বাইরে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে আবার বুঝি আসরে নামার জোড় করছে। পুকুরে তাই বুঝি জোরে জোরে ব্যাঙ ডাকছে। হঠাৎ অবগুণ্ঠনবতী মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে বলে থাকবেন, না আমি যাব, হেঁটেই যাব।

বিস্ফারিত বিস্ময়ে আলোছায়াঘেরা পুরুষগুলি তাই শুনল। বীর সিংহের ছোকরা পণ্ডিত তখন বিধবা বিবাহ নিয়ে খুবই হৈ-চৈ করছে কলকাতায়। বাংলাদেশের গ্রামগ্রামান্তরে তাঁর ঐতিহাসিক বিক্রমা তখনও শুরু হয়নি। সতীদাহের পাশব অগ্নিশিখায় আলোকিত নির্দয় কুলীনসমাজ তখনও প্রচণ্ড মত্ততায় হা-হা করছে হাসছে। নারীজাতি তখনও মর্যাদাহীন অবহেলিত গবাদি পশুর জীবনযাপন করছে কৌলিন্য-শাসিত রাঢ়ে, সমতটে, বারেন্দ্র বঙ্গে। সেই সময় তেজোদ্দীপ্ত মহিলাটি পরিবারের সকল নিষেধ উপেক্ষা করে বললেন, আমি যাব।

উদয়তারা পুরী গেলেন। গেলেন পদব্রজে। খবর শুনে বাপের বাড়ীর লোকেরা এলেন হাঁ হাঁ করে। আরে করছ কি? আমরা পাল্কী করে দিচ্ছি। সঙ্গে যাবেন রায়বাড়ীর দারোয়ানরা [illegible] লাঠি সড়কি নিয়ে। যাবে পাইক [illegible] সামগ্রামের জমিদারবাড়ীর একটা ইজ্জত আছে না? দরিদ্র কৃষ্ণপ্রাণ তখন ফরিদপুরে, জীবিকা উপার্জনের জন্য। ঢাকা থেকে পুরী—এই দীর্ঘ বিপদসংকুল পথ পায়ে হেঁটে যাবেন উদয়তারা—কৃষ্ণপ্রাণও নিষেধ করে থাকবেন। কিন্তু প্রবল আত্মজ্ঞানসম্পন্না ভক্তিপ্রাণা **উদয়তারা কারও কথা শুনলেন** না।

পার বাড়ীর ঐশ্বর্যের দম্ভের কাছে ন তাঁর শ্বশুরবাড়ীর দারিদ্র্যকে ছোট দিলেন না। আবার স্বামীর বলা পথ- র কথাও তিনি শুনলেন না। তাঁর া—ভয়ের কি আছে? ঈশ্বরই তাঁকে ়য়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। পথ াই দীর্ঘ। প্রায় সেই একই সময়ে লার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে পুরী য়েছিলেন, সঙ্গে লালবিহারী দে-র বিন্দ সামন্তের ঠাকুমা বৃদ্ধা অলঙ্গা বী। অলঙ্গা ফেরেন নি। গ্রাম থেকে নেক দূরে মহাপ্রভু দর্শন করে ফিরে সার পথে তিনি দেহরক্ষা করেন। এটা ধু অলঙ্গা দেবীর একার কাহিনী নয়। কালে 'জয়-জগন্নাথ' বলে যাঁরাই বাড়ী কে বেরোতেন, অনেকেই আর ফিরতেন । কাজেই কৃষ্ণপ্রাণের এই আশঙ্কা মূলক নয়। স্ত্রীকে বারণও হয়ত তাই র থাকবেন। কিন্তু ঈশ্বরগতপ্রাণা উদয়- রা। তাঁর বুঝি সেই এককথা। পঙ্গুকে নি গিরিলঙ্ঘন করান, তিনিই আমাকে র দর্শন করাবেন। মা-ভৈঃ। অনেক মানা, তেক নিষেধ—কোন কিছুই তাঁকে ঙ্কল্পচ্যুত করতে পারল না। শ্রীক্ষেত্রে নি গেলেন এবং ঘুরেও এলেন।

এই মায়েরই ছেলে দ্বারকানাথ। এমনি চিত্ত। বাবা ত গাঁয়ে থাকতেন না। জেই দ্বারকানাথের ছোটবেলা কেটেছে মায়েরই কোলে, মায়েরই কাছে। তাঁর ছেই তার লেখাপড়া। লালন-পালন। দয়তারা আজকের হিসেবে তেমন কিছু খাপড়া জানা মহিলা ছিলেন না কিন্তু লেকে মানবিকতার কয়েকটি মৌলশিক্ষা য়েছিলেন তিনি। দিয়েছিলেন সত্য কথা বার শিক্ষা, দিয়েছিলেন ন্যায়পরায়ণ ার দীক্ষা, দিয়েছিলেন ধর্মপথে চলার ঠা। ছোটবেলায় মায়ের এই শিক্ষা- ই দ্বারকানাথের সারা জীবনের সম্বল য়েছিল। বহু বাধা এসেছে, বহু বিঘ্নে র চলার পথ কণ্টকিত, কিন্তু কখনও মৌল জীবনচর্যাগুলি থেকে বিচ্যুত নি তিনি। তাঁর ছোটবেলার সব কথা না যায় না কিন্তু বছর সাতেক তিনি র মায়ের কাছে ছিলেন। এবং মাগুর- ড গ্রামেরই কোন পাঠশালার আটচালাতে র শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু শিশু রকানাথ বায়না ধরলেন স্কুলে পড়বেন। হর কলকাতায় ছেলেদের লেখাপড়ার ন্য কলেজ হয়েছে। এমনকি মেয়েদের ুল পর্যন্ত বসেছে ডিরোজিয়ান দক্ষিণা- ঞ্জন মশায়ের বাড়ীর বৈঠকখানায়। পাড়াগাঁয়ের ছেলে বিদ্যাসাগর খাস স্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছেন। ব উড়ো খবর ঢাকা হয়ে বারেন্দ্রভূমির অখ্যাত গ্রামের বুকে কি আলোড়ন নছিল? চঞ্চল করেছিল সাত বছরের রোগাপানা হ্যাংলা ছেলেটাকে? কেইবা খবর দেবে?

কিন্তু বালক দ্বারকানাথের স্কুলে পড়ার গোঁ এক সময় মেনে নিলেন উদয়- তারা। ফরিদপুরে স্কুল আছে। কৃষ্ণপ্রাণ রয়েছেন সেখানে। কাজেই ফরিদপুরে পাঠিয়ে দিলেন ছেলেকে। এবং সেখানেই অচিরে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন তাকে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ফরিদপুরের জল-হাওয়ায় দ্বারকানাথের শরীর একদম টিঁকল না। এটা-ওটা নিত্যি অসুখ। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল। এবং এত খারাপ হতে লাগল যে কৃষ্ণপ্রাণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এবং এক সময় ছেলেকে নিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। ফরিদপুর পর্বের পড়াশুনা এই- খানেই ইতি।

মাগুরখণ্ডের পাশেই কালীপাড়া। সেখানে তখন এন্ট্রান্স স্কুল এবং বেশ কিছুটা নামকরাও স্কুলটা। সেখানেই দ্বারকানাথের পড়ার ব্যবস্থা হল। কেমন ছাত্র ছিলেন দ্বারকানাথ? তাঁর শৈশবের বারাণসীতে কেমনভাবে জ্ঞান আহরণ করে- ছিলেন। কারা কারা ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে কেমন ছায়া ফেলে- ছিলেন তাঁরা। কেমনতর ছিল তাঁদের প্রভাব, তার কিছুই বলার উপায় নেই আজ। কেবল একটা খবরই জানা যায় যে, 'এক পণ্ডিতমশায় নাকি বালক দ্বারকানাথের মনের ওপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে- ছিলেন। দেশকে ভালোবাসার পচা-গলা সমাজকে সংস্কার করে তার অগ্নিশুদ্ধি করার বাসনা তিনিই জাগিয়ে দিয়েছিলেন তরুণ দ্বারকানাথের মনে। এ খবরের ভিত্তি কি বলা শক্ত তবে এই কালীপাড়া স্কুলের ছাত্রজীবনেই দ্বারকানাথের ভবিষ্যৎ জীবনের সংগ্রামের হাতে খড়ি হয়ে যায়। সেই গল্পটা এই।

কিন্তু সে গল্প বলার আগে আর এক মস্ত মানুষের গল্প বলা দরকার। কয়েক দিন আগে আর্চডিকন ডিয়ালট্রি এখনকার মিশন রোর ওল্ড মিশন চার্চে মুন্সী রাজ- নারায়ণের ছেলে মধুসূদনের মাথায় জর্ডন নদীর পূতঃ বারি দিয়ে তাঁকে হিন্দুধর্মের অন্ধকার থেকে খৃষ্টধর্মের আলোকে নিয়ে গেছেন। আঠারশ তেতাল্লিশ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ফিরেছেন বিলেত থেকে বিখ্যাত বাগ্মীজর্জ টমসনকে সঙ্গে নিয়ে। ইয়ং বেঙ্গল-এর কয়েকজনের আনুকূল্যে বানী মন্দির গলিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। এমন সময়, তারিখটা ষোলই আগস্ট, একটা কাগজ বেরোল— তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। কাগজ বার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ—তখনও তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেননি—একজন সম্পাদক খোঁজ করতে বেরোলেন। ঠিক হল যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে সম্পাদককে আসতে হবে। 'কোন্ ব্যক্তিকে ইহার সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায়, এই গুরুতর বিষয়টি সভায় বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রার্থিগণ 'বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসী দিগের প্রশংসাবাদ' এই বিষয়টি অব- লম্বনপূর্বক এক-একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্বোৎ- কৃষ্ট হইবে তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন।'

সেকালের কলকাতার তাবড় তাবড় লোকেরা সব পরীক্ষায় বসলেন। কিন্তু যাঁর প্রবন্ধটি প্রথম বলে বিবেচিত হল তাঁর নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়বাবু অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের অপরিচিত কিছু নন। প্রসন্ন- কৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে কয়েক বছর আগে হিন্দু কলেজের আদর্শে যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বসে, অক্ষয়কুমার তার শিক্ষক ছিলেন। এবং এই পাঠশালার কয়েকটি বই-ও লেখেন দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে। কিন্তু পাঠশালা বাঁশবেড়িয়াতে উঠে যেতে অক্ষয়কুমার সেখানে যেতে রাজী হলেন না। তাঁর জায়গায় গেলেন শ্যামাচরণ তর্ক- বাগীশ। আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খুললে অক্ষয়কুমার কলমের জোরে তার সম্পাদকের চেয়ারটা দখল করে নিলেন। এবং কয়েক মাসের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মও গ্রহণ করলেন। তাই শুধু নয়, 'ব্রাহ্ম সমাজের জ্ঞানমার্গের প্রহরি' হয়ে দাঁড়ালেন।

কাগজের সম্পাদনা অবশ্য এই নতুন নয়। আগে 'বিদ্যাদর্শন' বলে কাগজ চালিয়েছিলেন তিনি কিছুকাল। তাছাড়া পাঠ্যবইও লিখেছিলেন। এবার পরপর গোটা তিনেক বই লিখে ফেললেন অক্ষয়- কুমার। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—দুই খণ্ড। আর 'ধর্ম- নীতি'। এই বই ক'খানা ত বই নয়, বোমা।

ফাটল গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের মাথার ওপর। যে সমাজটা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে' নিজের চারিদিকে অচলায়তনের আকাশ- ছোঁয়া পাঁচিল তৈরী করে নিশ্চিন্তে বসে ছিল—এই একটা লোকের যুক্তিতর্ক তাকে কাঁপিয়ে দিলে, বুঝি বা ফাটিয়ে চৌচির করে দিলে তার বল্মীক ভিত। বাংলাদেশের বুকে নবযুগের এই ভাবচেতনার পূতঃ- প্রবাহিনী রক্ষণশীলতার ঐরাবতকে একে- বারে হৈ-হৈ করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এবং বলতে কি গ্রামে গ্রামে স্কুলে স্কুলে তার ঢেউ আছড়ে পড়ল। সে যৌবন জল- তরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে। হরে গুরারে। কাঁচড়াপাড়ার বিদ্যাকাব্যি ঈশ্বর গুপ্ত তখনও বেঁচে। যুবসমাজের ওপর এই বই দুটির প্রভাবের যেন রিপোর্ট লিখলেন তিনি :

'এস 'অক্ষয় দত্তে' গুরু কেড়ে
'বাহ্যবস্তু' পাড় তবে।'

কিন্তু কি লেখা হয়েছিল সেই দুই খণ্ডের বইখানাতে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এ? অক্ষয়- বাবুর 'প্যাট্রন' দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু এ বইটা সম্বন্ধে লিখেছেন : 'আমি কোথায় আর

তিনি কোথায়? আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ! প্রভেদ থাক—তবু এই বই দুখানা তিনি এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উভয়েই যত্ন করে দেখে দিয়েছিলেন সেকথা অক্ষয়কুমার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতে স্বয়ং সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছেন। তবে কি ছিল সেই বই-এ যা তোলপাড় করেছিল বাঙ্গালী যুবমানসকে? নবযুগের ভাবী নেতা দ্বারকানাথকে?

অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' জর্জ কুম্বের 'কনস্টিটিউশন অব ম্যান' অবলম্বনে লেখা। হুবহু অনুবাদ নয়। এতে অক্ষয়-কুমার নিজের বিশ্বাস ও যুক্তি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করেছেন। প্রথম খণ্ডে শারীরিক নিয়ম ও তার লঙ্ঘনের ফল, জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিচার ও নিরামিষ খাওয়ার উপকার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ড ধর্ম ও সমাজের নানা বিধি-বিধান ও সুরাপানের অপকার নিয়ে লেখা।

কিন্তু যেসব ব্যাপার নিয়ে তখন খুব টালমাটাল হয়েছিল বাংলাদেশে সেগুলি হচ্ছে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে মন্তব্য, বাল্যবিবাহ, বৃদ্ধকালে বিবাহ ও রোগাক্রান্তের বিবাহ; স্বকুলসন্নিহিত কোন বংশে বিবাহের নিন্দা ও অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন। কৌলীন্য প্রথার প্রতি আক্রমণে অক্ষয়কুমার মূল অর্থনৈতিক সমস্যাটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন :

পরিবার প্রতিপালনের উপায় ধার্য না করিয়া যে বিবাহ করা উচিত নয়, ইহা এদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে কখনও উদয় হয় নাই। কেহ কেহ বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারের দুঃখ স্রোত ও পাপ প্রবাহ বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হইতেছেন। এই অধি-বেদনের প্রথা যে পর্যন্ত অপকারক, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। অতএব, এদেশীয় লোকে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা অধিবেদন ও তৎপ্রয়োজক কৌলীন্য মর্যাদা এই উভয় প্রথা প্রচলিত রাখাতে, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগের দারিদ্র্য দশা বর্ধিত ও পাপানল প্রবল করিতেছেন।' অক্ষয়কুমারের মূল প্রশ্ন, জাতি হিসাবে বাঙালী এত হীনবীর্য হয়ে উঠেছে কেন? বহু বিবাহ যে তার প্রধান কারণ সে কথা বলেই তিনি বাল্য বিবাহের কথা বলেছেন—

এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গালাদেশ এবিষয়ের সম্পূর্ণ উদাহরণ-স্থল। যে স্থানে [illegible] মাতা সচেষ্টিত হইয়া দশ বর্ষ[illegible]কের এবং অতি ক্ষীণজীবী চিররোগি[illegible]কেও বিবাহ দেন, এবং যে স্থানে কন্যা ক্ষিপ্ত ও মহারোগগ্রস্ত হইলেও কন্যকের জন্যে

শিবনাথ শাস্ত্রী
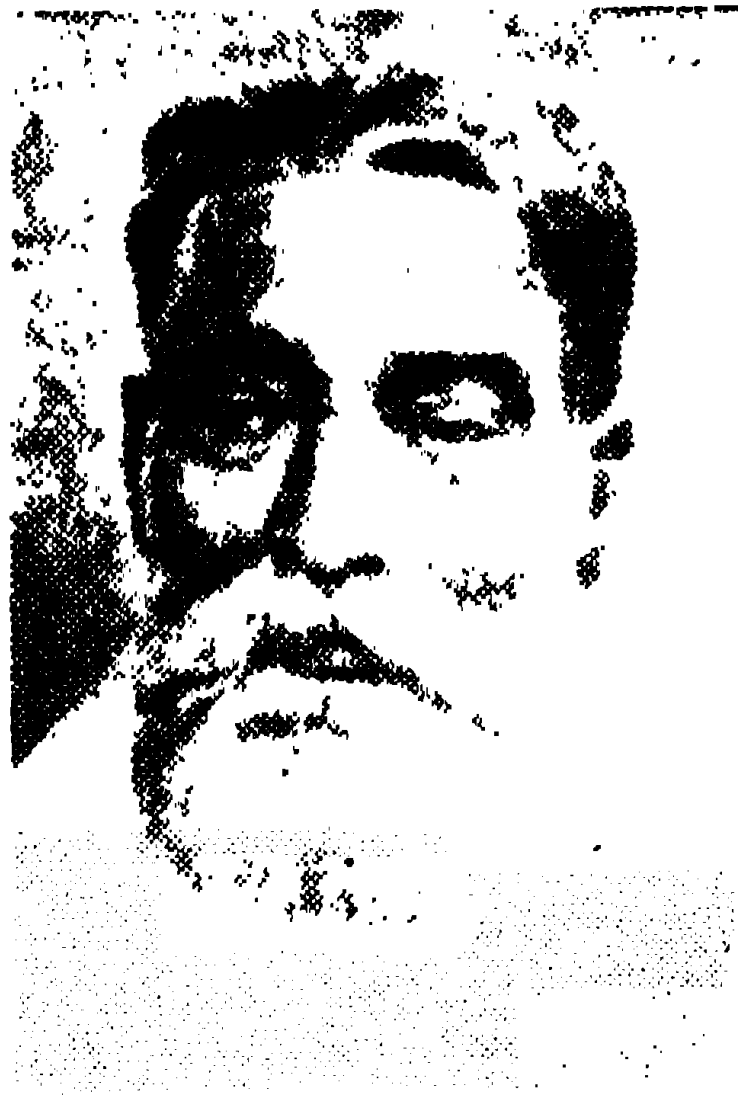
তাহাকে পাত্রস্থ করিতে হয়, সে স্থানের লোক যে এমন নির্বীর্য, অসমর্থ ও অকর্মণ্য হইবেক ইহাতে আশ্চর্য কি? যাহা হউক ইহা স্থির জানা উচিত, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়মের প্রতি-পালনেই সুখ ও লঙ্ঘনেই দুঃখ।'

অক্ষয়কুমার মনে করতেন বলিষ্ঠ জাতি গঠনের জন্য 'উদ্বাহ বিষয়ক ত্রৈশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করিয়া সম্যকরূপে করা কর্তব্য।' সেই নিয়মগুলি তিনি তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন :

বিশেষতঃ পশ্চাল্লেখিত নিয়ম-এর সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক করা আবশ্যক এবং ইহা নিশ্চিত জানা উচিত, যে যতদিন আমারদের তদ্বিষয়ে ত্রুটি থাকিবে, ততদিন পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে।

১—ভূয়ো ভয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অল্পবয়সে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে, এবং যক্ষ্মা, শ্বাস বাত, কুষ্ঠ, উন্মাদ ইত্যাদি উৎকট রোগগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের কখনই পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য নয়। প্রাচীন হিন্দুরা এবিষয়ে অজ্ঞাত ছিলেন না। তাহারা এবিষয়ে আমাদের চেয়ে অপেক্ষায় বিচক্ষণ ছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত বিহিত বিধানে উদ্বাহ সংস্কার সমাধানপূর্বক পরমেশ্বরের প্রসাদভাজন হইয়া স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন। আমরা তদ্বিপরীত ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফলভোগ করিতেছি।

২—স্বকুল সন্নিহিত কোন বংশের কন্যা গ্রহণ করাও কর্তব্য নহে। যেরূপ এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ একরূপ শস্যবপন করিলে সুচারুরূপে শস্যোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ সমকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পরস্পর পাণিগ্রহণ হইলে সে কুলে অত্যন্ত দোষ স্পর্শে। তদীয় সন্তান সকল সর্বাংশে অশক্ত ও নির্বীর্য হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তদ্বংশের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়।...আমারদের পরম সৌভাগ্য, যে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রয়োজক মহানুভাব পণ্ডিতগণ এই অতুল মঙ্গলদায়ক ত্রৈশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন এবং অদ্যাপি আমরা তাঁহারদের সুখাবহ ব্যবস্থানুসারে এই উদ্বাহবিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে নিয়োজিত হইতেছি। তাঁহারদের নিয়মানু-সারে অদ্যাপি এই লোকপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে পিতামাতার সগোত্রা ও সপিণ্ডা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে কখনই বংশ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।...ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে এমন প্রবল শাসন সত্ত্বেও বাঙ্গলাদেশীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণকর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বকুলের লোপাপত্তি সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছেন।

৩—কিন্তু আর আর সমুদয় নিয়ম-পালন করিলেও যদি কোন দেশে বিজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা নিতান্ত ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়, তবে তত্রত্য লোকের বিশিষ্ট-রূপে বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে, কারণ তাহারদের যে সমুদয় মূলীভূত প্রাকৃত দোষ থাকে, তাহা আর কোনক্রমেই দূরীভূত হয় না। কোন জাতির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য থাকিলে তত্তৎ অংশে সুলক্ষণসম্পন্ন অন্য জাতির সহিত উদ্বাহ সূত্রে সংযুক্ত না হইলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না।...ভিন্ন দেশীয় লোকের সহিত আমারদের উদ্বাহ সম্পর্ক থাকা দূরে থাকুক, স্বদেশীয় সকল বংশে সকলের বিবাহ করিবার বিধি নাই। প্রথমে বর্ণভেদরূপ বিষবৃক্ষে এই গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, পরে পরম্পরাগত কৌলীন্য প্রথা তাহাকে আরও দূষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রতিবন্ধক নিরাকরণ করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। ইহা হইলেও অনেক উপকার দর্শে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর বিবাহের রীতি না থাকাতে যে বর্ণের প্রকৃতিসিদ্ধ দোষ আছে, তাহা কোনক্রমেই নিরাকৃত হইতেছে না। কিন্তু এদেশে ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত না হইলে আমারদিগের বিশিষ্টরূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে।'

একালের নিরিখে বিষয়গুলি নিতান্তই সাদামাটা মনে হলেও সেকালে কৌলীন্য শাসিত আহার-বিহার-মৈথুন প্রধান রক্ষণশীল সমাজে এগুলি নিতান্তই আক্রমণাত্মক ও বিপ্লবী ব্যাপার। কুলীন সমাজ ত চটে লাল। এসব কি সর্বনেশে ব্যাপার! সেকালের চিন্তাশীল মহল, ছাত্র-সমাজের মধ্যে এই বইখানা খুবই আলোড়ন তুলল। এগুলির 'অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চালু হওয়াতে নানা জায়গায় জোর আন্দোলনের সৃষ্টি হল। কালীপাড়াও বাদ গেল না। সেখানেও খুব তুলকালাম ব্যাপার।

(চলবে)

একটা মোমবাতির মূল্য

সৈয়দ আব্দুল মালিক
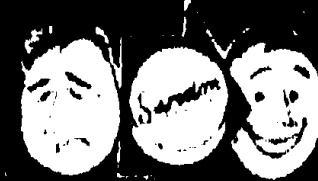
শান্তভাবে মোমবাতিটা জ্বলছিল।

তার কোমল আলো এসে লোকটার মুখের ওপর পড়ছিল। বেশ মনোযোগ দিয়ে কাছে রাখা কাগজপত্রগুলি পড়ছিলেন এবং মাঝে মাঝে কিছু লিখছিলেন।

তার মুখখানা প্রাঞ্জল ও অনুদ্বিগ্ন, চোখের চাহনি দৃপ্ত এবং তীব্র। শারীরিক অবয়বে বয়স ও কঠোর নিয়মানিষ্ঠ জীবন-নির্বাহের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। খাটো চুলে ঢাকা তার মাথায় একটা খদ্দর কাপড়ের ধবধবে সাদা টুপি। দাড়িটা বুক পর্যন্ত নেমে গেছে। মোমবাতিটা নীরবে জ্বলছিল। বাতিটার সঙ্গে মেশানো কোন কিছু সুগন্ধি জিনিসের সুবাস সেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ছিল।

বাইরে আঁধার—হাল্কা, নিস্পন্দ। অন্য সবসময়ের মত রাতটা কিছু শীতল। ঠান্ডা।

ঘরটার দুয়ার খোলা। খোলা থাকটাই নিয়ম।

দুয়ারের বাইরে কিছু দূরে সেপাইর উর্দিপরা একজন লোক দাঁড়াচ্ছিল। মাঝে মাঝে আঁধারের মধ্য দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল, মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে বসে লেখায় ব্যস্ত লোকটার দিকে।

কিছু দূরে শহরটার সান্ধ্য কোলাহলের মিশ্রিত ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। কোথাও কেউ কিছু গাইছে, কেউ কিছু বলছে। একটা অস্পষ্ট সজীব ধ্বনি চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। ধ্বনিটা রাতটাকে করে তুলছে অর্থবহ।

এখানে, ঘরটার ভিতরে ও বাইরে প্রশান্ত নীরবতা। লোকটা পড়ছেন, লিখছেন এবং মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে থেমে থেমে কিছু চিন্তা করছেন।

মোমবাতিটা জ্বলছে।

সেপাইটা বাইরে দাঁড়িয়ে ... বেশি রাত হয়নি, তবুও মনে হচ্ছে যেন এখন অনেকটা রাত।

কারুর কোন কথা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

কেউ একজন আসছে এবং সেপাইটাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে। লোকটা নিবিষ্টমনে লিখেই চলেছেন।

সেপাইটা ঘরে ঢুকল এবং বলল যে, একটি লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

'আসতে দাও। এবং ও'কে জিজ্ঞেস করো—উনি কোন সরকারী কাজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, না কোন ব্যক্তিগত কারণে।'

সালাম দিয়ে সেপাইটা বাইরে বেরিয়ে এল এবং অভ্যাগতকে জিজ্ঞেস করল—কিজন্য তিনি দেখা করতে চাইছেন।

পরে এসে সেপাইটা বলল যে, তিনি কোন সরকারী কাজে দেখা করতে আসেননি, এসেছেন ব্যক্তিগত স্বার্থে।

'ও'কে ভিতরে নিয়ে এসো।'

সেপাইটা বেরিয়ে গেল।

তার সঙ্গে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এসে দুয়ার-মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং সসম্মানে অভিবাদন জানালেন। মাথা তুলে দেখে নিয়ে লেখায় ব্যস্ত সেই লোকটি উঠে দাঁড়ালেন, সসম্মানে প্রতি-অভিবাদন জানালেন এবং অভ্যাগতকে স্বাগত জানিয়ে বললেন : 'আসুন ,ভেতরে আসুন।'

তিনি যে-গদিতে বসেছিলেন, তার পাশের একটা আসনে লোকটাকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু মনে করবেন না। কোন ব্যক্তিগত কাজে এসেছেন বলে বলছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। লোকটি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

বেশ। ভাল কথা।

বলেই তিনি মুখের বাতাসে মোম... নিভিয়ে দিলেন। বাইরের অন্ধকার ... প্রবেশ করল। দুটি লোকই হাল্কা আঁধারের মাঝে অন্তর্লীন হল। দূরে থাকা দু-একটা তারার ক্ষীণ আলো নীচে নেমে এল :

অন্ধকারে বসে তারা আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলেন। আঁধারে বসে থাকতে অভ্যাগত ব্যক্তির বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট বোধ করছেন। কিন্তু মুখ খুলে কিছু বলার শক্তি তাঁর ছিল না। মুখ খুলে বলাটা এক্ষেত্রে ততটা সহজ নয়।

কেননা—

তিনি বসে আছেন স্বয়ং খলিফা দ্বিতীয় ওমরের কার্যালয়ে। তিনি কথা বলছেন স্বয়ং খলিফার সঙ্গে। খলিফা দ্বিতীয় ওমর এক বিশাল সাম্রাজ্যের এক-ছত্র অধিপতি। পূর্বের চার খলিফার মত ইনিও ধার্মিক, বিনয়ী, দাতা, নিরহংকারী এবং অত্যন্ত প্রজাবৎসল বলে প্রখ্যাত। রাষ্ট্রের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তিনি দিন-রাত কঠোর কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম করে

থাকেন। তদুপরি কর্তব্যে কোন ত্রুটি করে থাকলে রোজ আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সেই খলিফা ওমরের সঙ্গে বসে ব্যক্তি-গত আলোচনা! সেটাও ত কম কথা নয়।

তবুও লোকটার মনের সঙ্কুচিত এবং ইতস্ততঃ ভাব গেল না। আমাকে বসতে বলেই প্রজ্বলিত মোমবাতিটা খলিফা নিভিয়ে দিলেন কেন? এক মহান সম্রাটের সঙ্গে এভাবে অন্ধকারে বসে আলাপ-আলোচনা করাটা বিসদৃশ নয় কি?' কিন্তু খলিফা গৃহস্থ। আমার কি করার আছে?

আলোচনা শেষ হল।

যাবার জন্য লোকটি পা বাড়ালেন। খলিফা ওমরও উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মোমবাতিটা জ্বালালেন। ঘরটা আলোময় হয়ে উঠল। দুজনেরই মুখে আলো এসে পড়ল।

দুয়ার-মুখে দাঁড়িয়ে লোকটা ওমরের দিকে একবার ফিরে তাকালেন। এবং কিছু কঠিনভাবে অথচ সম্ভ্রম রেখেই বললেন, আমার বেয়াদপি মাফ করবেন। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে আমি উপকৃত ও আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি না জানিয়ে পারব না। আমার প্রতি আপনার ব্যবহার দেখে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছি।

খলিফা ওমর বললেন, না জেনে-শুনে যদি আপনার মনে কোন অসন্তুষ্টি দিয়ে থাকি আল্লার ওয়াস্তে আপনি আমাকে মাফ করবেন। কিন্তু কেন আপনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, সে-কথাটা জানালে আমি বাধিত ও অনুগৃহীত থাকব।

মোমবাতির আলোয় স্পষ্ট দেখা খলিফা ওমরের সরল মুখটার দিকে লোকটি তাকালেন। তাঁর মুখমণ্ডলে গর্ব অহংকারের সামান্য অভিব্যক্তিও নেই।

সপ্রতিভভাবে বলব-বলব-না করে লোকটা বললেন, আমি আপনার সঙ্গে কোন সরকারী কাজে আলোচনা করতে আসিনি, এ-কথা ঠিক, আমি ব্যক্তিগত কাজেই এসেছিলাম। আপনার সহৃদয় ব্যবহার ও পরামর্শ পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমি কিছু বিস্মিত হয়েছি এজন্যই যে, আমি বসতে না বসতেই আপনি মোম-বাতিটা নিভিয়ে দিলেন, অন্ধকারে আমার

সৈয়দ আবদুল মালিক যুদ্ধোত্তর যুগের অসমীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পকার। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দেড়শ-রও বেশি; উপন্যাসের সংখ্যাও গল্প-সংগ্রহের সমানুপাতিক। অঘরী আত্মার কাহিনী উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সূর্যমুখীর স্বপ্ন। গল্প-সংগ্রহগুলির অন্যতম হল : শিল আরু শিখা, এজনী নতুন ছোওয়ালী, বঙা-গড়া, পরশমণি, অস্থায়ী আরু অন্তরা ইত্যাদি। বহুকাল ধরে তিনি জোড়-হাটের জে বি কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।

সঙ্গে কথা বললেন আর এখন আমাকে বিদায় দিতেই আবার বাতিটা জ্বালালেন। এটা আমাকে কিছু দুঃখ দিয়েছে। ঠিক কথা—আপনি আমাদের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং আমি আপনার একজন সাধারণ প্রজা। কিন্তু আমি কি এতই কুশ্রী যে আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে প্রস্তুত হলেন না! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। এ-কথায় আমার সত্যিই খারাপ লাগছে। কিন্তু কথাটা না বলে গেলে আমার ভাল লাগত না। সেজন্যই বললাম।

খলিফা ওমর শান্তভাবে হাসলেন এবং বললেন, সেজন্য আপনি আমাকে খারাপ ভেবেছেন, তাই না অন্য কেউ হলেও তাই ভাবত। অতএব, আমি আগে থাকতেই আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম—কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

এটা আমার সরকারী অফিস। নিজের বাড়ি নয়। খলিফা হওয়া সত্ত্বেও এখানে কাজ করার সময়ে আমি একজন সরকারী কর্মী। দিন-রাতের বেশিটুকু সময় আমাকে রাজকর্মের খাতিরে এখানে কাটাতে হয়। এই যে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে আমি কাজ করছি, সেই বাতিটা শুধু সরকারী কাজ করার জন্যই সরকার আমাকে দিয়েছে, ব্যক্তিগত কার্যে ব্যবহারের জন্য নয়। অবশ্য এখানে যদি আমার নিজস্ব একটা মোমবাতি থাকত, আমি তাই জ্বালিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম।'

'জন-সাধারণের জন্য সরকারী কাজের স্বার্থে সরকারী ভাণ্ডারের মোমবাতিটা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলে কি অন্যায় হবে না? আমার কাজে কিছু খারাপ না মনে করলেই আমি খুশী হব; কেউ যদি খারাপও মনে করে থাকে, তবুও যেদিন পর্যন্ত আমি খলিফা থাকব, তত দিন সর-কারের দেওয়া সামান্য জিনিস একটাও আমি নিজের কাজে লাগাব না। জন-সাধারণের জিনিস যতই সামান্য হোক না কেন, নিজের জন্য খরচ করার অধিকার আমার নেই।'

খলিফা ওমরের কথায় লোকটি বেশ লজ্জিত বোধ করলেন। এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে সসম্ভ্রমে বিদায় নিয়ে বললেন, 'আপনার ত্যাগ এবং কর্তব্য নিষ্ঠার কথা আমি বহু দিন আগের থেকে শুনে এসেছি। আজ নিজ চোখে দেখলাম। আমি আসি। আপনার দুর্মূল্য সময় নষ্ট করব না। আপনার সময় আপনার জন্য নয়, জন-সাধারণের জন্য। প্রজার জন্য আপনি তা খরচ করেন। আমার জন্য বেশ কিছু সময় আপনি অপচয় করলেন। আমাকে সেজন্য ক্ষমা করবেন।'

লোকটি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। খলিফা ওমর আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে রাজকার্যে মন দিলেন।

মোমবাতিটা জ্বলতে লাগল।

অনুবাদ : ভূপেন শর্মা

অমৃত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

রচনার অভিনবত্বে 'অমৃত' দিনে দিনে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তার আরও উন্নতি কামনা করি। যদিও অমৃতের প্রতিটি রচনাই সুখপাঠ্য, তবুও দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত একগুচ্ছ বাংলা ও হিন্দী গল্পের সমাবেশে এই দুটি সংখ্যা আরো লোভনীয় হয়ে উঠেছে। কারণ, গতানুগতিকতার মধ্যে এইরকম দু একটি ব্যতিক্রম অমৃতকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এর জন্য আমার ধন্যবাদ জানবেন।

সন্ধ্যা চক্রবর্তী, জামসেদপুর-৩, বিহার।

ওদের জাগিয়ে দিন

অরুণ গোস্বামী

ভোটদান করে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত মাঠটাতে ওরা জড়ো হয়েছিল। গুড়ের দানার ওপর জমা হওয়া পিঁপড়ের মত। অবশিষ্ট লোকগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে নির্বাচনের প্রার্থীদের বিষয়ে নানা মন্তব্য সহযোগে আলোচনা করছিলো। এমন সময় কোথা থেকে এলো স্বরাজ কাকা। স্বরাজ কাকার আসল নাম কি, এ বিষয়ে এখনকার দিনের ছেলেমেয়েরা কিছুই জানে না। অনর্গল কথা বলে যাওয়া এই মধ্যবয়স্ক লোকটিকে সবাই স্বরাজ কাকা বলেই জানে, কারণ সমবয়স্ক বা বেশীবয়স্ক লোকেরাও ওকে ওই নামেই ডাকে। তা বলে স্বরাজ কাকার একটা নিজস্ব পরিচয় যে নেই তা নয়। স্বরাজ কাকা একসময় হাইস্কুলে মাস্টারি করতো। এবং সে তখনকার দিনের এম-এ। চাকরি করা অবস্থাতেই স্বরাজ কাকার মাথায় ভূত চাপে, কারণ তখন তার গায়ে লেগেছিল দেশ স্বাধীন করার ঝড়ো হাওয়া। তারপরেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে আন্দোলনে নেমে পড়ে এবং ওই আন্দোলন চলাকালেই শেষে সে ভুলে যায় যে তারও একটা পরিবার আছে। এই আন্দোলনের স্রোতে এদিক-ওদিক করে বেড়ানোর সময় নেই তার। স্ত্রী মারা যায়। থাকল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কটা। তবু স্বরাজ কাকা বাড়িতে ফিরে এলো না। বহুবার পুলিশের লাঠি, চড়, ঘুষি খেয়ে, চার-পাঁচবার জেল খেটে স্বাধীন দেশে ফিরে এলো সে। দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীন দেশে স্বরাজ কাকা বাধ্য হয়ে বাড়ি ঢুকে দেখলো যে তার ছেলে মেয়েগুলো স্কুল-কলেজের কথা ভুলে কেউ মামার বাড়ি, কেউ কাকার বাড়ি, কেউবা আবার মোজাদারের বাড়িতে থাকতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে ওরা চাকরের কাজই করে, না পড়াশোনাই করে, সে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। কি কারণে বলা যায় না স্বরাজ কাকা বহুদিন ধরে বোবার মত নির্বাক হল। আবার বহু বছরের পরে সে যখন মুখ খুললো, তখন তার মুখ বন্ধ করাই অসম্ভব হয়ে উঠলো। কথা, কথা, শুধু কথা। সেজন্যই লোকেরা স্বরাজ কাকাকে বোধ হয় পাগল বলতে আরম্ভ করলো। যদিও বেশি কথাবলা অভ্যাসটা ছাড়া ওর গায়ে পাগলামির অন্য কোন লক্ষণ লোকেরা খুঁজে পেল না। সে হাতে পুরনো সংবাদপত্রের বাণ্ডিল একটা নিয়ে বেরোয়। লোক পেলে স্বরাজ কাকা কখনো ঐ কাগজ খুলে কিছু পড়ে শোনায়, আর বেশির ভাগ সময় কথা বলেই কাটায়। তার বক্তব্য হলো দেশের কথা, আন্দোলনের কথা, গান্ধীজীর কথা, বৃটিশদের কথা, স্বাধীনতার কথা। আর শেষে স্বাধীন দেশের দুরবস্থা এবং সরকার তথা নেতাদের কথাগুলো বলে দুঃখ প্রকাশ করে সে। কখনো দেশের বর্তমান দুর্দশা ও মন্ত্রী, এম-এল-এ, নেতাদের দুর্নীতির কথা বলতে বলতে ছোট-ছেলের মতো ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে স্বরাজ কাকা। অতএব লোকেরা অন্য কোন ক্ষেত্রে পাগলামি না দেখলেও কেবল এই কারণেই ওকে পাগল বলে। বহু লোক এরকম মন্তব্য করে যে আন্দোলনের সময় পুলিশ লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে ওর মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দিয়েছিল। আর সেই কারণেই এখন লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। স্বরাজ কাকা মানুষের দলটার দিকে এগিয়ে এলো। স্বরাজ কাকা ভোট দিতে এলেন কি? কেউ একজন প্রশ্ন করল। 'ভোট! একদল বাঁদরকে দেশটা চালাতে আমি সুবিধা করে দেব বলে ভাববেন না, ভোট দেওয়ার মতো উপযুক্ত লোক একজনও নেই।' হেসে স্বরাজ কাকা বললো। 'আচ্ছা দাঁড়ান, বাঁদরদের ভোট দিয়ে এলেনই যখন, আমি একটা গল্প বলি শুনুন। বসুন তো সবাই, বসুন।' সবাই বসলো। স্বরাজ কাকা সবার দিকে একবার লক্ষ্য করে আবার বললো, 'হ্যাঁ, গল্প বলছি একটা! শুনবেন তো?'

'শুনবো, শুনবো, বলো', হৈ হৈ করে সম্মতি জানালো ওরা। লোকেরা জানে—স্বরাজ কাকা যখন বিরক্ত হয়, তখন অদ্ভুত ধরনের গল্প শোনা যায় তার মুখে। গৎ-বাঁধা গল্প সে বলে না।

—'তখনই যে দেশটায় লোকেদের অবস্থা বড় হৃদয়-বিদারক হয়ে উঠলো। দেশের চারিদিকে মানুষ, মানুষ আর মানুষ। দেশে রাজা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আমলা, উপদেষ্টা সমস্ত নিয়ে বহু বড়ো বড়ো লোক ছিলো। তাদের মুখের রং পাকা কমলা লেবুর মতো। শরীরের অবয়ব পাকা কলার মতো এবং ওদের পেটগুলো ছিল স্বাস্থ্যবতী পূর্ণগর্ভা নারীর পেটের মতো। ওরা অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অভেদ্য দুর্গের মত বাড়িতে বাস করতো। ওদের বাসস্থান বা রাজত্ব ছিলো এমন এক টুকরো জমিতে—যে জমিতে সমস্ত দেশটা বন্যায় ডুবে গেলেও জলের একটা ফোঁটা পর্যন্ত পড়ত না। সাধারণ লোকেরা নিচ থেকে আকাশের দিকে তাকিয়েও সে জমিটা দেখতে পেত না, অতএব লোকেরা সেই স্থানটিকে নাম দিয়েছিলো অমরাবতী। সেখানে শুধু রাজা মন্ত্রী উপমন্ত্রী ও উচ্চস্তরের কর্মচারীরা থাকতো। কিন্তু দেশের মানুষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে এসেছিলো। খাবার নেই, চারিদিকে হাহাকার, প্রবাদ আছে যে মানুষ পেটের খিদেতে থাকতে না পেরে মরা গরু-ছাগল খুঁজে এনে সিদ্ধ করে খেতেও কুণ্ঠিত হতো না। ক্ষুধার্ত বালক অথবা মুখ থেকে মায়ের স্তন কেড়ে নেওয়া পিপাসার্ত শিশুর মতো তারা অসহায়তায় চিৎকার করতো। তাদের এই করুণ কান্না অন্য দেশের মানুষ সমবেত সঙ্গীতের মতো কান পেতে শুনতো। কিন্তু এমন অবস্থায়

'সমাজ অবক্ষয়ের ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে', 'সামাজিক দুর্নীতি, বৈষম্য, ভণ্ড দেশনেতার ভণ্ডামি, তীব্র বেকার সমস্যার ভয়াবহ রূপ', স্বাধীনতা যুদ্ধের অক্লান্ত যোদ্ধাদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার উপর আজকের বিভ্রান্ত ছেলেমেয়েদের বিতৃষ্ণা শ্রীগোস্বামীর রচনার বিষয়বস্তু। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশ্বাসী। ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত 'সাদিনীয়া নবযুগ' পত্রিকার গল্প প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ।

বহু লোকের পেটে ক্ষিদে ছিলো না, কারণ ওরা নানা উপায়ে রাজার অনুগ্রহ লাভ করেছিলো। রাজবাড়ির বড় চাকরি ওদের পেট ভরিয়ে রাখতো। রাজবাড়িতে চাকরি করার দরুণ বহুলোক ওদের ভয় করতো। আর প্রয়োজন বুঝে অন্ধকারে ওদের সাহায্যও করতো। খেতে না পাওয়া লোকেদের আস্তে আস্তে চোখের জোর কমে এলো, তারা অন্ধ হয়ে এলো, পায়ে হাঁটবার শক্তি তারা হারিয়ে ফেললো এবং এক সময় আস্তে আস্তে ওরা বসে থাকার জায়গায় শুয়ে পড়লো। তখন মাত্র কয়েকজন তরুণ ক্ষুধাতুর সিংহের মতো গর্জে উঠে দেশের চারিদিকে চোখ ফেলে দেখলো। ওরা দেখলো যে দেশটায় আসলে কোনো অভাব নেই। . এই শুয়ে থাকা লোকেরা শোবার আগে যেটুকু পরিশ্রম করে গেছে তার বিনিময়ে উৎপন্ন হওয়া সম্ভার দিয়ে দেশটা পরিপূর্ণ। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের গুদামে তা জমা হয়ে আছে। আর সাধারণ লোকের ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে বেশি লাভের আশায় ওরা সেগুলো অন্য দেশে চালান করছে। এই ছেলেরা গর্জে উঠলো, যদিও ওরা অগ্রসর হতে পারলো না। বসে থাকা অবস্থাতেই খাঁচার বাঘের মত এক-একবার তারা গর্জে উঠলো। ওদের গর্জন শুনে রাজা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী আর বড় বড় কর্মচারীদের বুক কেঁপে উঠলো। ওরা তাড়াতাড়ি করে সঙ্গীত সাধনা ও সঙ্গে সঙ্গে সম্মোহিনী যাদুমন্ত্রের সাধনায় ব্রতী হয়ে বিশ্বামিত্রের মতো তপস্যা করতে লাগলো। তারপর ওরা ক্রুদ্ধ ছেলে আর ক্ষুধার্ত লোকেদের মাঝে এসে মোহিনী নৃত্য করতে আরম্ভ করলো। ওরা ভালো ভালো গল্প বললো, ছত্রিশ রাগেতে গান শোনালো আর মোহিনী বেশে নাচ দেখালো। গর্জে ওঠা ছেলেরা ওদের নাচ দেখে পরিতৃপ্ত শিশুর মতো ঠোঁট বাঁকা করে সশব্দে হাসতে সুরু করলো, আর ছেলে-ভোলানো গান শুনে বাচ্চা ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়লো। যারা ইতিমধ্যে জমিতে শুয়ে পড়েছিলো তারাও এই রাজা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং কর্মচারীদের গল্প এবং গান শুনে সর্বশক্তি সংগ্রহ করে এক-বার হাততালি দিয়ে জয়ধ্বনি করলো। তারপর সবাই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো। শান্তিপূর্ণ মাঝরাত্রের একটা গ্রামের মতো গোটা দেশটা ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। দেশে শান্তি এলো। রাজা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং কর্মচারীবৃন্দ নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেলো। দেশটায় জেগে রইলো শুধু প্যাঁচা, কাল-প্যাঁচা, ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, ছিনাজোঁক। চুপচাপ নিদ্রিত জনতার সর্বস্ব লুট করে নিজের নিজের উদর ভাণ্ডার অথবা চোরা গর্তগুলি ভরিয়ে ফেললো ঐ জীবগুলি। তাদের ফূর্তি দেখে কে? রাজা, মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী এবং বড় বড় কর্মচারী যখন যুদ্ধের আনন্দে নৃত্যগীত করতে ব্যস্ত, ঠিক এমনি সময় একটা বড় ঘটনা ঘটলো। হয়তো রাজা মন্ত্রীদের আনন্দ উল্লাসের কোলাহলে অথবা ইঁদুর প্যাঁচার ছোঁয়া পেয়ে শিশুরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো; ওদের চিৎকারে বয়স্ক লোকেদেরও ঘুম ভাঙ্গলো। তারা দেখলো শিশুদের গা ক্ষত-বিক্ষত। ওদের গায়ে অসংখ্য জোঁক। লাফ দিয়ে উঠে তারা প্রথমেই ডাকতে লাগলো ঘুমন্ত তরুণ ছেলেদের। তারা উঠে বসলো, চোখ মেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো যে রাজা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বড় বড় কর্মচারীরা আনন্দমনে কিছু উৎসবের ছেলেমেয়েদের মতো গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে। ওদের হাত আর ঠোঁটে রক্তের লাল দাগ। একটু ভেবে দেখে ওরা বুঝতে পারলো যে ঐ প্যাঁচা ইঁদুরের দল তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে দেশের জনতার রক্ত গেলাসে গেলাসে, কলসীতে কলসীতে যোগান দিচ্ছে ঐ লোকগুলোর মুখে। ছেলেদের চোখ পাকা লঙ্কার মতো রাঙ্গা হলো, আর সেই চোখ থেকে আগুন বেরোতে লাগলো। সেই আগুন লাখ লাখ টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। চতুর্দিক থেকে এগিয়ে এলো রাজা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আমলা কর্মচারী আর শকুন, প্যাঁচা সবাইকে ঘিরে ধরার জন্য। ওরা কিন্তু তখনও গান গেয়ে নৃত্য করে চলেছে। হঠাৎ আগুনের তাপ গায়ে লাগতে ওদের চেতনা হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রথমে নিজেদের চোখের জল দিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করলো। তারপরে গান গাইলো, নাচলো, গল্প বললো, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলো, তবুও আগুন এগিয়েই আসছে। ওরা উপায় না দেখে মার-বারুদ ছিটিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু কি আশ্চর্য! মার-বারুদ পড়ে আগুন ঘি-ঢালা হোমের আগুনের মতো দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো। তারপরে ক্রমশ রাজা মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, পরিষদ, আমলা, প্যাঁচা, কালপ্যাঁচা, শকুন, ইঁদুর, সবাই সেই আগুনের মধ্যে পড়ে খৈ ফোটার মতো ফুটতে লাগলো। সবগুলো ফুটে যাওয়ার পরে সেই আগুনে এতদিন দেশে দম বেঁধে থাকা আবর্জনা-গুলোও পুড়তে লাগলো। তারও পরে একদিন দেশ ছাইময় হলো, আর ক্ষুধাতুর জনতার চোখের জল দেশের ছাইগুলো ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। কিছু দিনের পর দেশে নতুন গাছ গজাতে আরম্ভ করলো। গাছ গজাতেই আবার যাতে পর-গাছার বীজ পড়তে না পারে তার জন্য প্রত্যেকজন লোক সচেতন হলো। আগুনে পোড়েনি এমন কয়েকজন রাজবাড়ির কর্ম-চারী রক্তচোষা জীব তখনও বেঁচে ছিলো। জনতা ওদেরকে ঘাড়ে ধরে দড়ি বেঁধে পিঠে চুনের ছিটে দিয়ে পথে পথে টেনে নিয়ে ঘোরাতে লাগলো। আর শেষে নতুন চিড়িয়াখানা একটা নির্মাণ করে উত্তর-পুরুষের লোকগুলোকে দেখানোর জন্য বেঁধে রাখলো। শুয়ে থাকা লোকগুলোই তখন দিনের বেলা চাষ করে। রাত্রে দেশের শাসন দেখাশোনা করে বা করার দায়িত্ব নেয়। তখন কে একজন গায়ক গান ধরলো—'এক হাতে ধরি লাঙলের মুঠো, অন্যহাতে ধরি শাসনের চাকা।' সবাই গানটি গাইতে লাগলো। কিন্তু কি আশ্চর্য! একজন লোকেরও ক্ষিদেতে শুয়ে থাকার প্রয়োজন হলো না।

এই পর্যন্ত বলে স্বরাজ কাকা থামলো। এতক্ষণ লোকগুলো মুখে টু-শব্দটি না করে গল্পটা শুনছিলো। তাদের সম্পূর্ণ নির্বাক দেখে স্বরাজ কাকা ঘাড় তুলে চেয়ে দেখলো—তরুণ ছেলেরা সেই গল্পের চিৎকার করে করে এলিয়ে পড়া ছেলেদের মতই শুয়ে আছে। ওদের গভীর নিদ্রা। স্বরাজ কাকা একগাল হেসে বুড়োগোছের লোকেদের দিকে তাকিয়ে বললো—ছেলেদের সম্ভবত পেটে কিছু পড়েনি। মুখগুলো শুকনো শুকনো। ভোট দিতে এসে ক্ষিদেতে গল্প শুনে শুয়ে পড়লো। ওদের জাগিয়ে দিন, না হলে ভোটের বাকসোয় থাকা লোকটি বিজয়-উল্লাসে ওদের গায়ের উপর দিয়ে পা মাড়িয়ে চলে যাবে। বুড়ো-মানুষগুলো ছেলেদের আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিতে আরম্ভ করলো।

অনুবাদ : আনন্দ গোস্বামী

গ্রহণ

ভবেন্দ্রনাথ সইকিয়া

এরা বোধ হয় আমাকে বোকা বলে ভাবে। যদি ভাবে, তাহলে তারা ভুল করছে। তাদের বয়সে আমি, তারা এখন যতটা চালাক, তার চেয়ে বেশি চালাক ছিলাম। এই যে একদিন গীতা এসে আমাকে বলল, 'বাবা, এ হল সুবোধ দাদা, আমি যে তোমাকে বলেছিলাম আমার বন্ধু সুরভিদের—' ইত্যাদি ইত্যাদি এবং আমি যে হাসি মুখে সুবোধকে সম্ভাষণ জানালাম, সে কথায় গীতা বোধ হয় ভাবল—বাবা ত সহজ সরল, বোকা, সোকা লোক, আলাপ করিয়ে দেওয়ার কাজটুকু বাকি ছিল, করে রাখলাম, ল্যাঠা চুকল, বাবা আর এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু আসলে আমি এত বোকা নই। আমি চালাক লোক। আমি ঠিক বুঝলাম—এই যে বাড়িতে সুবোধ এল, তার মানে একটা ল্যাঠাও এল। এর ভিতরে গণ্ডগোল আছে। মেয়ের বন্ধুর দাদা হয়ে এসে বাবাকে শান্ত, নিরীহ, পৃথিবীর কোন পাক চক্রের হদিস না জানা ভঙ্গীতে প্রণাম করা—এগুলো অতি পুরনো কথা। আমাদের দিনে এমন কি, এসব কথা নিয়ে গল্পও লেখা হয়েছিল একটা দুটো নয়, অজস্র গল্প। পরে এরকম ইঙ্গিত যে গল্পটা পড়তে [illegible] একটি যুবকের আবির্ভাব হবে, তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম এবং যুবকের আবির্ভাবের একটু পরেই গল্পটা [illegible] কি হবে না হবে অনুমান করে নিতাম এবং [illegible] শেষ পর্যন্ত পড়তাম শুধু আমার অনুমানের সঙ্গে মিলল কি মিলল না তা দেখতে। বন্ধুর দাদা বন্ধুর বোন, পড়াশোনা করতে আসা ছাত্রী, পড়াতে আসা গরীব সাদা পাঞ্জাবী পরা অথচ মহাজ্ঞানী যুবক টিউটর এসব আমার জন্য ঢেঁকি শাকের মত জিনিস, কেউই সখ করে এর দাম করে না. কিন্তু রোজ গজায়. পালং-নটে টক পালং, ধনে পাতার সঙ্গেই কখনো বা রান্নাঘরে ঢুকে যায়, খেতে খারাপ লাগে না। লাগলেও খারাপ বলার সাহস নেই, বললেই সবাই তেড়ে-মেড়ে আসে।

অথচ, আমি কথাগুলো বুঝি বলে এরা অনেকে আমাকে সন্দেহও করে না। 'বাবা, এটা গরম কোট, আমি যে বলেছিলাম অর্ডার দিয়েছি বলে'—ঠিক তেমনই সুরে গীতা 'এই হল সুবোধ দাদা' বলে নিঃসংশয়ে, নির্ভয়ে বলে রাখল। গরম কোট বা সুবোধ সম্পর্কে আমার যেন বলার কিছুই নেই! অবশ্য এ কথা ঠিক যে গীতা যদি পিছনের দিকটায় জেব্রার ছালের মত দাগ কাটা এবং সামনের দিকটায় চিতাবাঘের ছালের মত ফুটফুটে বোতামগুলোতে এক একটি পরীর ছবি থাকা একটা কোটও এনে দিত, তবুও আমি বলতাম শুধু এ কথাই, 'ভালই হয়েছে ত। কাপড়ের ডিজাইনে কি আসে যায়? গরম লাগবে কিনা সেটাই আসল কথা। কাপড়টায় তাপ আছে ত? [illegible] হল। ও হ্যাঁ, একটা কথা, ভাল করে রাখবি, আর মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে ভাল করে ব্রাশ করবি। কিছু করে পোকা কাটলে সর্বনাশ হবে। আরেকটা কথা—পকেটে, ভিতরের দিকে পকেট আছে কি নেই দেখি—হ্যাঁ আছে, আচ্ছা এই ভিতরের পকেটে কয়েকটা ন্যাপথালিন ঢুকিয়ে রাখবি।' এর বেশি আমি কিছুই বলতাম না।

এদের আমি বেশি কথা বলি না। 'আর বোল না—বাবা হচ্ছে বুড়ো মানুষ, বাবার টেস্টের সঙ্গে আমাদের টেস্ট'—ইত্যাদি নিয়ে অপর ঘরটায় তারা বলাবলি করবে; কথাগুলো আমি না শুনলেও আমার আত্মা শুনবে; আমি লঘু হব, ছোট হব, আমাকে সে রকম অবস্থায় ফেলার সুযোগ আমি তাদের দিই না।

সুবোধ সম্পর্কেও আমি কিছু বলি নি। গীতা যখন আলাপ করিয়ে দিল, সে তখন আমাদের দিনের গল্পের নায়কের মত শান্ত, নিরীহ, পৃথিবীর কোন পাক-[illegible] প্রণাম [illegible] করে নমস্কারটা সম্পূর্ণ করার প্রয়োজন ছিল না, আমি বয়স্ক লোক, গুরুস্থানীয় লোক, অসময়ে খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য অবসর গ্রহণ করা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মানুষ:- আমি ডান হাতটা কপালের ওপরে তুললাম আর হাতটা নামিয়ে আনতে চশমাটাও চোখ থেকে খুলে আনলাম। অভ্যাসবশতঃ বুকের ওপরে জামার কাপড়ে চশমার কাঁচ দুটো ঘষে নিলাম, তারপরে আবার চশমাটা চোখে দিয়ে দেখলাম—গীতা আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্যে হলেও, অমূলক হলেও তার বোধ হয় একটু আশংকা হয়েছে—প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে বাবা সুবোধদাকে বা কি ভাবে নেয়! আমি সঙ্গে সঙ্গেই সুবোধের দিকে তাকালাম। চশমার কাঁচ দুটো মুছে নেওয়ার এই সামান্য সময়টুকুর মৌনতার জন্য অভ্যর্থনাটা কি শীতল হয়ে গেল? না, না, আমি ওরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হতে দিতে পারি না। আমি সুরুচিপূর্ণ সামাজিক আচার ব্যাবহারে অভ্যস্ত ভদ্র মানুষ। সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি মৃদু

দিনের আগেকার পরিচিত অথচ ভুলে যাওয়া বন্ধুকে চিনতে পারার আনন্দ নিয়ে উচ্চ গলায় চিৎকার করে উঠলাম, 'আরে. বসো, বসো। তোমার নাম আমি গীতার মুখে প্রায়ই শুনি। তা তোমার ত অনেক দিন আগেই আসার কথা ছিল।' বলেই আমি হাসলাম। সুবোধ বা গীতার বদলে যদি আমি হতাম, তাহলে আমার এই হাসিকে মুক্ত হাসি বলেই বর্ণনা করতাম।

দেহ-মন দুটোকেই সংকুচিত করে সুবোধ বসল। আমার কথার প্রত্যুত্তরে সে লাজুক এবং শীতল ভাবে হাসল। তার পর কিছুক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। হঠাৎ আমার মনে হল—এটা খুব খারাপ। আমি গৃহস্থ আলাপ-আলোচনা শুরু করে নতুন অতিথির জড়তা ভেঙে দেওয়া আমারই উচিত।

'ও, হ্যাঁ।'—আমি কথা বলা শুরু করলাম, 'তুমি ভিকটোরিয়া কলেজে—তুই ত ভিকটোরিয়া কলেজ বলেই বলেছিলিস, তাই না গীতা?—হ্যাঁ। কেমন? কলেজের খবর আজ কাল কি রকম?—হবেই ভাল হবে না কেন? আসল কথাটা হচ্ছে বেসিক ফাউন্ডেশান। ফাউন্ডেশ্যান ভাল হলে পরের দিকে ভালই চলে। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোটখাটো উত্থান-পতনের মত ঘটনা ঘটবেই, কিন্তু মেজর ক্রাইসিস বলে তেমন কিছু হয় না—ও হ্যাঁ, সেই লাইব্রেরীর পাশের এপ্রিল ফুলের গাছটা--তোরা কি যেন অন্য একটা নাম বলিস—কি বলিস, বল ত গীতা?—হ্যাঁ, কৃষ্ণচূড়া—কৃষ্ণচূড়ার গাছটা আছে কি নেই? কেটে ফেলল? ছিঃ, ছিঃ, খুব খারাপ কাজ হল। তোমরা দেখেছিলে কি? দেখ নি? তা হলে তোমরা কি বুঝবে? কি প্রকাণ্ড গাছ! 'তোমার'—গোড়াটা—ওই পিতলের ফুলদানীটার থেকে, না আরো বড়—ওই ফুলের গুচ্ছটা যে পড়ে আছে—ও হ্যাঁ, গীতা, তুই এই ফুলের গুচ্ছটা নিয়ে যাবি ত, শুকিয়ে গেছে, আমি নিজেই ফেলে দেব বলে ভাবছিলাম, ভাবতে ভাবতেই অন্য একটা কাজে মন দিলাম আর ভুলেই গেলাম, ওখানেই পড়ে রইল। সেটা ফেলে দিয়ে নতুন কিছু ফুল ফুলদানীটায় রেখে দিবিখন। না হলে অন্য একটা কাজ কর, রোজ রোজ ফুল সাজিয়ে রাখাটাও একটা আন-নেসেস্যারি ঝমারেশ্যান—ফুলদানীটাকেই নিয়ে যা, ভিতরের আলমারিতে রেখে দে গে যা। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, সেই ফুলের গুচ্ছটা থেকে এইখান পর্যন্ত—এত মোটা গাছের গোড়াটা। আর মাটির ওপরে বেরিয়ে থাকা শিকড়গুলোই ছিল আমাদের কয়েকজনের কমনরুম, বুঝেছ? একবার হল কি—প্রিয়তোষবাবু—তোমরা বোধহয় নামই শোন নি,—প্রিয়তোষবাবুর হিস্ট্রির ক্লাশ ছিল। ক্লাশে তিনি বেশ ধমকান, বুঝেছ?—আমরা কয়েকজন মিলে, কি মনে

পঞ্চাশের দশকে অসমিয়া ছোটগল্পে নতুন ব্যাপ্তি এবং আয়তন সৃষ্টিকারী গল্পকারদের অন্যতম ভবেন্দ্রনাথ সইকীয়া।

প্রকাশিত গল্প-সংগ্রহ : 'বৃন্দাবন' 'প্রহরী', 'সেন্দুর' 'গহ্বর' ও শৃংখল। 'সেন্দুর' পেয়েছে আসাম প্রকাশন পরিষদের বাৎসরিক শ্রেষ্ঠ অসমীয়া সাহিত্য-কীর্তির পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার। 'শৃংখল' পেয়েছে 'সাহিত্য একাডেমির' পুরস্কার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্পের অনুবাদ হয়েছে। নিজের লেখা গল্প 'বানপ্রস্থর' ভিত্তিতে তিনি একখানা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের অসমীয়া ছবিও পরিচালনা করেছেন। নাট্যকার হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত।

ডঃ সইকীয়া পপদার্থ বিজ্ঞানের ডকটরেট এবং এককালে তিনি গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। অনেক দিন বিদেশে ছিলেন গবেষণার ব্যাপারে। গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেকসট্ বুক কোঅর-ডিনেশান কমিটির' সচিব পদে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন বছর কয়েক আগে।

করে জানি না, ঠিক করলাম—করব না ক্লাশ। এলাম, এসে বসে পড়লাম গাছের শিকড়-গুলোর ওপরে। মিনিট কয়েক পার হয়েছে মাত্র, হঠাৎ দেখলাম 'তোমার' প্রিন্সিপ্যাল ডব-সন সাহেব পেছন দিকে হাত দুটো রেখে বেশ গম্ভীর পদক্ষেপে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে গাছটার দিকেই আসছেন। তাঁকে দেখেই আমরা বসে থাকা শেকড়গুলোকে অজগর সাপ যেন মনে হল। ঝট করে আমরা সবাই উঠে গিয়ে গাছটার আড়ালে লুকো-লাম। প্রকাণ্ড গাছ—আমরা ক-জনকে কেন, আরো দশটাকে সে নির্বিঘ্নে লুকিয়ে রাখতে পারে। আমরা ভাবলাম—গাছটা আমাদের বেশ লুকিয়ে রাখল। কিন্তু তার পরের ইকনমিকসের ক্লাশটায় বসেছি, প্রফেসরের রোল-কল করা হয়ে গেছে, এমন সময়ে পিয়ন এসে প্রফেসরকে একটুকরো কাগজ দিয়ে গেল। ওখানে আমাদের সবারই নাম—প্রিন্সিপ্যাল আমাদের ডেকেছেন। বুঝলে কথাটা? আমিও ত প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম। ছেলেদের চিনতে পারা তো দূরের কথা, কলেজে কত ছেলে-মেয়ে পড়ছে, কেউ ঝট করে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারতাম কি-না হেড ক্লার্ককে ডেকে পাঠাতাম ঠিক নেই।

তার পরে আমি সুবোধকে প্রিয়তোষ-বাবুর একটা বর্ণনা দিলাম। কি গোঁফ, কি গলা, কি চোখের পাক, আর কি জ্ঞান!! প্রসঙ্গক্রমে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল লেভিন ভুলিয়ে ছেলেদের কি করে গির্জায় নিয়ে গিয়েছিলেন সে-কথা উঠল, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সাহেব প্রিন্সিপ্যাল-এর কর্তৃত্বাধীনে কাজ করব না বলে নিবারণ বাবুর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা উঠল এবং এইসব কথার ফাঁকে ফাঁকে কলেজের সেই দিনগুলোতে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথাগুলো স্থান পেতে লাগল। আমার দুটো ধুতি ছিল—একটা বুধবার বিকেলে ধুয়েছিলাম, অন্যটা রবি-বারে। আমার গ্রামের বাড়ির উঠোনে ছোট-ছোট গোল গোল করে পোকা-খাওয়া পায়ের তলা দুটো কলেজ খোলা দিনগুলোতে ভাল হয়েছিল, ছুটিতে বাড়ি এলে দিন-কয়েকের ভিতরেই আবার পোকা ধরেছিল। কথাগুলো বলতে আমার খুব ইচ্ছা হল।

'বুঝেছ'—আরম্ভ করতে গিয়ে গীতার চোখে চোখ পড়তে আমি থমকে দাঁড়ালাম। শুকনো ফুলের গুচ্ছটা হাতে নিয়ে গীতা বেরিয়ে গিয়েছিল, আমি নিবারণবাবুর কথা বলার সময়ে সে একবার এসে রুমটার এদিক-ওদিক করেছিল, তার পরে সে আবার দ্বিতীয় বারের জন্য দুয়ার মুখে হাজির হয়েছে।

সুবোধকে বলতে চাওয়া বাক্যটা শুরু না করে আমি গীতার চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করলাম। কি? আমি কি বিরক্তি-করভাবে বেশি কথা বলেছি, না কি? গীতা কি আমাকে দেখিয়ে তার হাত-ঘড়িটায় সময় দেখছে? হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্তিকর আড্ডা শেষ করতে চেষ্টা করা বা লোক তাড়ানোর বুদ্ধি একটা আছে বলে আমি জানি, আমাকে বোকা বলে ধরে নিয়ে গীতা কি আমার ওপর সেই বুদ্ধিটা খাটাতে চাইছে, না কি? না, না, আমি সেটা হতে দিতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আমি ত তেমন কোন লম্বা বক্তৃতা দিই নি, কিন্তু গীতা দু-দুবার এল—এদিক - ওদিক করল—ও যে ঘড়ি দেখল, তা হলে? পরে সুবোধকে সে বলবে কি—বাবা আজকাল বড্ড বোর হয়ে গেল বলে? ছিঃ, ছিঃ, আমি কখনো সেটা হতে দিতে পারি না।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, হ্যাঁরে গীতা এর জন্য চা-টায়ের ব্যবস্থা করিস নি?

সব ঠিক হয়েই আছে, আমি চা ঢালতে রেডি হয়েই আছি। —গীতা বলল।

ও, তুই নাকি?' আমি চিৎকার করে উঠলাম, তা হলে এতক্ষণ বলিস নি কেন? আমি ভাবলাম, —তুই ভিতরে চা-টায়ের আয়োজনে ব্যস্ত থাকবি, এখানে ও একা একা চুপ-চাপ বসে থেকে বৌরিং ফিল করবে, সে-জন্যই। এসো বাবা, তোমরা ওই ঘরটায় এসো, ওখানে বসে চাও খাবে, কথা বলাও হবে, আরে না, না, আমার হবেখন, আমি ত সারা দিন চা খেয়েই থাকি। আমি খুবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম, দ্বিতীয়বার যাতে সুবোধের সঙ্গে কথা বলে মগ্ন হওয়ার সুবিধা না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে আমি ওকে একেবারেই বিদায় দিয়ে দিলাম, —হ্যাঁ, ভাল কথা, সময় পেলে আবার আসবে, কেমন?

নিজের বাড়ি বলেই মনে করবে, এ-জাতীয় কিছু একটা বলা উচিত ছিল বোধহয়, কিন্তু প্রথম দিনটাতেই লোকেরা সেভাবে বলে কি বলে না ঠিক করতে না পেরে বললাম না।

গীতার পেছন পেছন সুবোধ বেরিয়ে গেল। আমি ঘড়িটার দিকে তাকালাম। এখনকার সময়টা পেলাম, কিন্তু সুবোধের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করেছিলাম ক-টায় ছিঃ, ছিঃ, বোর হওয়াটাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। যৌবন বয়স, —না, তারও আগের থেকে, এই সহরে মাথা গোঁজার আস্তানা নেওয়ার দিন থেকে, যাচ্ছেতাই বিরক্তিকর কথা বলাবলি করে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দেওয়া সহরের প্রত্যেকজন বুড়োর জীবন-চরিত্র, কথা বলার ঢং, হাঁটা-চলা, মুদ্রা-দোষ ইত্যাদি আমাদের কয়েকজনের রসিক আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। আমরা চালাক ছিলাম। প্রতাপ মৌজাদারের গলাটা সদানন্দ হুবহু নকল করতে পেরেছিল। আচ্ছা এসো, তোমরা কাজের লোক, ধরে রাখব না বলার পরেও গিরিন গোস্বামী যে দু-তিন ঘণ্টা কথা বলা শেষ করবে না—সেই কৌশলটা ইয়ার্কির ছলে কমলাপতি আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিল। আমারতো প্রায় প্রত্যেক দিনেই বিপদ ঘটেছিল। আমার বাড়িটার কয়েকটা বাড়ির পরেই বুড়োর বাড়ি। তাঁর বাড়ির সামনের দিকের বারান্দায় আর্ম-চেয়ার এবং ঘন বুড়ো, এই দুটোকে আমরা একই বস্তুর দুটো অংশ বলে ধরে নিয়েছিলাম। কখনো জরুরী কাজে কোথাও তাড়াতাড়ি যেতে হলে দূর থেকে আমি ভয় ভয়ে চেয়ারটার দিকে তাকাতাম, ভাগ্যক্রমে কখনো চেয়ারটায় বুড়ো না থাকলে মাথার তেল লেগে লেগে চেয়ারটার কাপড়ে তৈরী হওয়া কালো গোলটা দেখেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, থমকে দাঁড়িয়ে ভাল করে একবার নিরীক্ষণ করি, হ্যাঁ ঠিক, বুড়ো নয়, গোলটা শুধু। তার পর তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়ির চৌহদ্দি পার হই। তাঁর বাড়ির চৌহদ্দির সামনে দুলাটা পাতা-বাহারের একটা সারি আছে। গাছগুলো ঝাঁকড়া, রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা লোক ঘন বুড়োর চোখ থেকে একবার আড়াল হয়, একবার তাঁর সামনে বেরিয়ে পড়ে। প্রথম দুটো গাছের ফাঁকটায় লোকটা এসে পড়লেই ঘন বুড়ো চেয়ারটায় সোজা হয়ে দাঁড়ান, সূর্যের আলোর উগ্রতা অনুযায়ী কখনো দ্বিতীয়, কখনো তৃতীয়, কখনো বা চতুর্থ ফাঁকটায় তিনি লোকটাকে সনাক্ত করেন এবং তার পরক্ষণেই আহ্বান জানান। আমি প্রায়ই রাস্তার দূরের দিকটা অনুসরণ করে ওদিকের লোকেদের বাড়িগুলোর বেড়ায় যেন ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে, তেমন একটা ভঙ্গী দেখিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটি আর মনে মনে অস্থির হয়ে হিসেব করি—একটা ফাঁক গেল—বাঁচলাম, দুটো ফাঁক গেল—বাঁচলাম, তিনটে—

'ও হে। ওটা নীরেন না কি?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।'
'দেখি, এদিকে এসো ত—'

'জ্যাঠামশাই, আমি বাজার করতে এসেছি, বাড়িতে একজন অতিথি এসেছে—'

'ছাড়ো দিকিনি, বাজারে পরে যাবেখন। বাজারটা কি উঠে যাবে, নাকি? তোমার আবার কোথেকে অতিথি এল?'

অতিথি বলে যে লোকেরই নাম বলি না কেন, তাঁকেই বা তাঁর বংশের কাউকে না কাউকে ঘন বুড়ো চেনে। সেই লোকটাকে কেন্দ্র করে তিনি মানব জাতির ইতিহাস, আমাদের দেশের ভূগোল, এই পাড়ার ক্রম-বিকাশ, মাধব মাস্টারের বাড়ির উত্থান, হরি-হর বিশ্বরার পতন — এইসব বিষয়ের আলোচনা শেষ করে যখন আমাকে হুড়কো-মুখে এগিয়ে দিয়ে গেটটা ভালভাবে বন্ধ হয়েছে কিনা পরীক্ষা করেন, তখন আর আমার বাজারে যাওয়ার আগ্রহ থাকে না, এবং যখন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে তিনি আমাকে বিদায় দেন, তখন বোধহয় বাজারটা সত্যিই উঠে যায়। তীব্র বিরক্তিতে আমার তখন বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

আর আমি, সেই লোকটা এখন অন্য লোককে কথা বলে বিরক্ত করব? না, না, কখনো করব না। আমি বুড়ো হয়েছি, কিন্তু প্রখর বুদ্ধি আমার এখনো আছে। শুধু লোককে বকর বকর করে বিরক্তি দেওয়ার ব্যাপারে নয়, বৃদ্ধ বয়সের প্রত্যেকটা দিনের প্রত্যেকটা বিষয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উদার বিবেচনা শক্তির পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছা এবং সুচিন্তিত কার্যসূচী আমার সেই যৌবন-কাল থেকেই ছিল। এমনকি আমি আমার স্ত্রীকে বলেওছিলাম, 'আমরা একটা কাজ করব, বুঝেছ? আমরা বুড়ো হলে এই বুড়ো-বুড়ীদের মত টিপিকেল বুড়ো-বুড়ী হব না। এই যে দেখেছ—এই বড়ো-বুড়ী-দের ছেলেমেয়েদের নিয়ে রোজ অশান্তি, ঝগড়া-ঝাঁটি, আমরা সেরকম কোন অশান্তি হতে দেব না। অতুল-গীতারা আমাদের অশান্তি দেওয়ার ত কোন সুবিধাই পাবে না, বরঞ্চ আমরা রোজ লক্ষ্য করব—তারা আমাদের কাছে কোন অশান্তি পাচ্ছে কিনা। কখনো যদি টের পাই যে তারা আমাদের সামান্য হলেও বোঝা বলে ভাবছে, তাহলে হাতে টাকা-কড়ি থাকলে আমরা দুজন কোথাও চলে যাব, যদি নাও থাকে, তখন কিছু একটা করে দুজনেই মরে থাকব।'

আমার স্ত্রী আবার আমার ঠিক বিপরীত, একদম বোকা। আমি কলেজের শিক্ষক ছিলাম বলে, এবং সঙ্গে কোন দুষ্টু মেয়ে শিখিয়ে দিয়েছিল বলেই বোধহয় বিয়ের পরে সে আমাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করত। হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবার দাখিল। কথাটা মনে পড়লে আজও আমার হাসি পায়।

আমি সেভাবে মরে থাকব বলতে সে মুখের ভিতরেই 'ছিঃ, ওকথা বলতে নেই' এ-জাতীয় কিছু একটা বলেছিল।

আমি যেটুকু শুনলাম, তারই সূত্র ধরে বলেছিলাম, নেই কেন? কেন নেই? তুমি কি ভেবেছ নাকি যে আমরা দুজন ওদের গোলামি করে থাকব এবং বড় হয়ে তারা 'আমরা একাই পারব, আমাদের চৌকিদারের প্রয়োজন নেই' বলে আমাদের বিসর্জন দেবে আর আমরা মায়া ছাড়তে না পারা বিশ্বস্ত চৌকিদারের মত বারান্দায় বসে বসে কাল কাটাব? না সেটা হতে পারে না। বরঞ্চ আমরা বাড়ির গৃহস্থ হয়ে বসে থাকব, এবং প্রয়োজন হলে তারা এসে আমাদের সাহায্য চাইবে, পরামর্শ চাইবে, তারা যখন মুখ খুলে বলবে—'আমাদের চৌকিদারের প্রয়োজন হয়েছে'—তখন আমরা চৌকিদারী করব। 'ফুটবল খেলা দেখতে হবে না, পাটিগণিত খুলে নে, অঙ্ক কষ'—'সেদিন জুতো এক-জোড়া কিনেছিলিস, আর এখনই নতুন একজোড়া কেনবার সময় হল?' —'দেখি, এদিকে আয় ত গীতা, আমার মাথাটার এইখানে খুব চুলকোচ্ছে, এইখান থেকে কয়েকটা পাকা চুল তুলে দে ত মা'—এইসব কান্ড আমার দ্বারা হবে না। তাদের আমি ছেড়ে দেব, ছেড়ে দিয়ে দেখব তাদের গতি-বিধি। আমাদের গ্রামের পিসীমাদের টিয়া-পাখিটার কথা মনে আছে? তা খাঁচার দুয়ার রোজ খোলা থাকে, সকালে সে বাইরে বেরোয়, আর সন্ধ্যা হলে নিজে নিজেই খাঁচায় ঢোকে। মনে আছে কি—কিভাবে সে পিসীমার কাঁধে চড়ে তাঁর মাথাটা ঠোকরায় আর আস্তে আস্তে পিসীমার চোখ বুঁজে আসে? এটা কেন হতে পেরেছিল জান? জাত, ভাল জাতের পাখি—সেজন্য।

এরা যদি আমাদের সন্তান হয়—তারা ভাল হতে বাধ্য। গীতা নিজেই এসে আমাকে বলবে, 'ওমা, বাবার অতগুলো চুল পাকল দাঁড়াও, আমি এক এক করে সব-শুদ্ধ পাকা চুল আজ শেষ করব!' একঘন্টা পরে আমি বলব—'থাক, আজকের মত হবে। একইভাবে মাথাটা রাখতে গিয়ে শিরদাঁড়াটা ব্যথায় কনকন করছে।' সে বলবে, 'দাঁড়াও না একটু। এই ত হয়েই গেল, আজ এ

দিকটা শেষ করে দিই, কাল ওদিকটা করব।' প্রতিবাদ নিষ্ফল ভেবে আমি আবার চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকব।

আমার মনে আছে—স্ত্রীকে এ কথাগুলো বলার সময় এক পবিত্র, অনির্বচনীয় আনন্দে আমার দু'চোখ ভরে উঠেছিল। একটু পরে চোখের কোণায় সামান্য জল দানা বেঁধেছিল, আমি হাতের তলা দিয়ে মুছে ফেলেছিলাম।

কিন্তু কথাগুলো বলে ফেলার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম—আমার বোকা পত্নীর জন্য বেশ কলা হল, সেজন্য আমাদের নিজেকে অভিভূত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে আমি হালকা কথা বলা শুরু করে-ছিলাম, ছোটবেলায় এমন মুস্কিলে পড়ে-ছিলাম, বুঝেছ? 'নামঘরের' পাশের কদম গাছটার নীচে ডাং-কড়ে খেলতে ছেলেরা জমায়েত হয়েছিল, তাদের হৈ-হুল্লোড় আমার মনে ডানা গজিয়ে দিয়েছিল, মন উড়ু উড়ু, এদিকে বাবা বলতেন পাকা চুল তোল, পা-টা ডলে দে, আঙুলগুলো ফুটিয়ে দে...ভেবে দ্যাখো ত—কত কষ্ট। পরে শুনেছি—সব বাবা-মারাই নাকি ছেলে-মেয়েদের এসব কাজে লাগায়, কেউ কেউ নাকি ছেলে-মেয়েদের দশ-পনেরটা চুল বাবদ একটা করে পয়সা দেওয়ারও বন্দোবস্ত করে। না, না, এগুলো খুবই খারাপ। ছোট-বেলার নিজের নির্যাতনের কথাগুলো আমার মনে আছে। ছেলে-মেয়েদের এভাবে বিরক্ত করা উচিত নয়।'

আসলে আমি করিনি। স্ত্রীর সঙ্গে বসে সেই সময়ে বুড়ো বয়সের জন্য করা প্ল্যান আমি আজও মেনে চলছি। আমার স্ত্রী গত হয়েছে, এখন আমার পায়ের গাঁট-গুলোয় মাঝে মাঝে ব্যথা হয়, কিন্তু আমি আমার ছেলেমেয়েদের পা টিপে দিতে বলিনি। অতুল বড় হয়েছে, সে চাকরি করে, তাকে পা টিপে দিতে বলার প্রশ্নই ওঠে না, গীতাকে অবশ্য বলা যায়, কিন্তু ওকেও আমি বলি না। আমি মানুষের মন বুঝি, আমি চালাক লোক।

কিন্তু আমার বহু অসুবিধাও হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুতে আমি বেশ কষ্ট পেলাম। একটি বোকা মানুষ চলে যেতে আমার মনে হল যেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা জীবধারী প্রাণী চলে যাচ্ছে। আর কেউ নেই। একে-বারেই নিঃসঙ্গ। কিছুদিন কথা বলতে মন চাইছিল না, বলতে গেলেও গলাটা আটকে যাচ্ছিল।

পাকে প্রকারে আমার কানে পড়ল, লোকেরা নাকি বলাবলি করে—অফিস ও বইয়ের জগতে ডুবে থেকে আমি আমার স্ত্রীর চিকিৎসায় অবহেলা করলাম, না হলে ভদ্রমহিলা বাঁচত। কথাটা কতদূর সত্যি সেটা ভাবতেই আমার বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল। পরের দিকে আমার শরীরটাও আর ভাল থাকল না; একদিন কলেজের গভর্নিং বডির কাছে চাকরি থেকে অবসর প্রার্থনা করে দরখাস্ত করলাম, জোর করে ওটা মঞ্জুর করালাম।

বই-পত্র পড়া আমি ছেড়েই দিলাম। ভাল লাগে না। ফলে আমার বেশ অসুবিধা হয়েছে। একসময়ে স্ত্রীকে বলতাম, 'বুড়ো বয়সে কি করে সময় কাটাব! ও হ্যাঁ, পেয়েছি একটা ভাল উপায় খুঁজে পেয়েছি। গীতাকে ত বিয়ে দিয়ে বের করে দিতেই হবে; কিন্তু এর জন্য, মানে অতুলের জন্য কম পড়া-শোনা করা ধরে নাও—এই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়া একটি লক্ষ্মী মেয়ে ঘরে আনব; তাকে আমি বাড়িতেই রোজ দুপুরে পড়াব। দেখবে, ন' বছরের মধ্যে আমি ডক্টরেট পাইয়ে দেব।'

কিন্তু কিছু হল না। হবেও না বোধ-হয়। 'বিয়ে দিয়ে বের করে দেওয়া'—'লক্ষ্মী মেয়ে বাড়িতে আনা'—এসব ঘটনা ঘটার আশা নেই। গীতা ও অতুলকে লক্ষ্য করেই আমি একথা উপলব্ধি করেছি। আমি বুঝি। সব বুঝি। কিন্তু আমি বুঝি বলে এরা বোঝে না। অথচ তাদের বোকামি দেখে আমারই খারাপ লাগে। এই যে—গীতার কাছে সুবোধ আসে, গীতার সঙ্গে ওর বন্ধু, অণু! অণু নাকি ওর খুব আদরের, পৃথিবীর ভিতরেই শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এরা চার-জন যখন পাশের ঘরটায় প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে সময় কাটায়, আমি কি এটুকুও বুঝি না যে অণু ও অতুল, গীতা এবং সুবোধ জোড়ায় কথা বলছে? হঠাৎ কিছুদিন থেকে আমাকে একদিকে সরিয়ে রেখে অতুল ও গীতা তাদের দু'জনের মাঝে যে এক অপূর্ব মেলা-মেশা, ভাই বোনের এক আদর্শনীয় আদরের নমুনা তুলে ধরেছে, এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি আমি কি বুঝি না ভেবেছ? আমি ভাল-ভাবেই জানি—আজ গীতা অনুকে একটা খারাপ কথা বলুক, কাল অতুল গীতাকে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেবে। আজ অতুল সুবোধকে সামান্য খারাপ ব্যবহার করুক, কাল অনু ও গীতার মাঝে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্ধুত্বের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে॥

আমি কিছু বলি না। যুগ যুগ ধরে নাকি বোকা বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের অশান্তি, বিরহ, বেদনার কারণ হয়েছে তাদের অভিশাপের পাত্র হয়েছে। আমি হব না। তাদের কিছু একটা বলব,—তারা আমাকে সেকেলে, সংকীর্ণ মনের লোক বলে আড়ালে হম্বি-তম্বি করবে, আমি সেটা হতে দিতে পারব না। আমি তাদের প্রেমের খেলা যা দেখি,—উদার খোলা মন নিয়ে লক্ষ্য করব, যা শুনি সেটা উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করব। তাদের জন্ম দিয়েছি বলেই আজীবন তাদের লাগাম ধরে থাকাটাকে আমি সংকীর্ণ মনের কাজ বলে মনে করি। সেটা আমার দায়িত্ব নয়।

দায়িত্ব। দায়িত্বের কথা মনে এলে আমার বুকের কোন এক জায়গায় কিছু একটা যেন খোঁচা দেয়—এমন লাগে, সামান্য যন্ত্রণা অনুভব করি। আমার স্ত্রী বেঁচে থাকলে সে আমার পাশে চেয়ার একটায় বসে—না, না, সে আমার কি রকম যেন পতিভক্তি পরায়ণা মহিলা ছিল, সে আমার কাছে চেয়ারে বসত না, তার কথা ছিল খাটো একটা মোড়ায় বসে থাকার...., মোড়ায় বসে সে মাঝে মাঝে মেয়েটাকে সুপাত্রস্থ করার দায়িত্ব, ছেলেটার জন্য একটি লক্ষ্মী মেয়ে আনার দায়িত্বের কথা বলত নাকি? এরকম কিছু একটা করা আমার পক্ষে উচিত নাকি? কি জানি, উচিতই। আমি কিছু ধরতে পারছি না। কথাগুলো ভেবে আমি শুধু একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

দিন যাচ্ছে। এদের দু জোড়ার পাশের ঘরটার কথা গুঞ্জন আরো নিবিড়, আরো ঘনিষ্ঠ হতে যাচ্ছে। আমি আরো নিঃসঙ্গ, আরো দুর্বল, আরো অসহায় হয়ে পড়ছি।

প্রায়ই আমার মন যায়—"শোন ত অতুল,—দেখি ম্য গীতা, এদিকে আয় ত, কথা বলি।' -কিন্তু ডাকি না। তাদের সময় কম। আমি চুপ-চাপ বসে থাকি।

কিন্তু একদিন যখন টের পেলাম—আমার এই চুপ-চাপ বসে থাকাটা ওদের সহ্য হচ্ছে না, সেদিন আমি খুব দুঃখ পেলাম। অতুল আমাকে একদিন বলল "বাবা, তোমার পক্ষে বিকেলে বেরুনো ভাল। একটু হাত-পা নাড়া-চাড়া করলে তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সব সময় বসে থাকলে—" ইত্যাদি।

প্রথম প্রথম আমি তার পরামর্শ সরল সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু পরে বিকেল হলেই সে যখন রোজই একই কথা বলতে শুরু করল, এবং একদিন গীতাও তার সঙ্গে যোগ দিল, তখন হঠাৎ আমি আসল কথাটা বুঝতে পারলাম। এরা আমাকে বোকা বলে ভাবছে। আসল কথাটা আমি বুঝি নি বলে ভাবছে। তাদের বিকেলের প্রেম এতই নিবিড় হয়ে আসছে যে পাশের ঘরে আমার নিষ্প্রাণ-প্রায় উপস্থিতিও তাদের জন্য অসুবিধা স্বরূপ। আমার বাড়িতে না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।

ঠিক আছে। যাব বেরিয়ে। উঠলাম। উঠতেই আমার সমস্ত শরীরটায়, সারা মনটায় কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি টের পেলাম আমার দুচোখ ভিজতে সুরু করছে। চশমা খুলে চোখের কোন দুটো ধুতীর কাপড় দিয়ে মুছে নিলাম। কিভাবে লাঠিটা ধরলে সুবিধা হবে, বারকয়েক আলাদা-আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম, তার পরে একটা সুবিধাজনক ভংগীতে লাঠিটা থামচা মেরে ধরলাম। রাস্তার বেরুনোর সময় আমার সমস্ত শরীরটা আবার একবার কেঁপে উঠল।

বহু দূর এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার পায়ের গিটগুলোয় ব্যথা হচ্ছে, আর হাটিতে আমার কষ্ট হয়। কি করা যায়? কোথাও ত একটু দাঁড়াতে হবে? কোথাও একটু বসার জো নেই। রাস্তার দু-পাশে মানুষের বাড়িগুলো আছে। সব মানুষকেই আমি চিনি, আমাকেও তারা চেনে। আমি যে কোন একটা বাড়িতে ঢুকে যেতে পারি। কিন্তু আমি যে আগে রোজ ভাবতাম—বুড়ো হলে বিনা কাজে কারুর বাড়িতেই যাব না। বিকেলে লোকের বাড়ি চষে চষে ঘুরে বেড়ানো একটা খুবই খারাপ অভ্যাস। সেসব কথা আমার মনে আছে, আমার সেই প্রখর বুদ্ধিও আছে, কিন্তু সত্যিই আমার পায়ের গাটিগুলোতে ব্যথা হচ্ছে। কোন একটা বাড়িতে ঢুকতেই হবে। কার বাড়িতে ঢুকব; অচ্যুত, প্রদীপ, রমা, না রামপ্রসাদের বাড়িটাই ভাল হবে। সাধারণ মানুষ কখনো আসে না এবং কারুর বাড়িতে যায় না—এরকম লোক পেলে খুব আদর করবে। আমার অনুমান সত্যি হল। রামপ্রসাদ স্বয়ং, তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চা? না থাক। সরবৎ? না, না, এই বিকেলে সরবৎ কেন? শুধু এক গ্লাস জল হলেই হবে।

জল এক গ্লাস খেয়ে আমি শান্তি পেলাম। আমার দু'একটা কথা বলতে ইচ্ছা হল। সুবিধা পেলেই লোকগুলো আমার স্ত্রীর গুণ-কীর্তন করতে সুরু করে দেয়, সেই ভয়ে আমি নিজেই অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। সহরের ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কথা, এই জায়গারই একটা কুয়োতে একটা ঘোড়া পড়ার কথা, ঘোড়ার ল্যাজের চুল কি কি কাজে লাগে—এই সব কথা—বহু কথা। বহু কথা বললাম। বহু সময় পরে আমি যখন রামপ্রসাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন কেন জানি না, আমার মনটা বেশ খোলা খোলা লাগল, বুকটা হাল্কা যেন মনে হল।

পরের দিন ঘুরে ফিরে রামপ্রসাদের বাড়িতে ঢুকলাম, তারও পরেরদিন, তার পরের দিনেও। পরের দিনগুলোতে কখনো রামপ্রসাদ বাড়িতে থাকে না, কখনো তার স্ত্রী থাকে রান্নাঘরে, ছেলেটি প্রায়ই খেলতে বেড়াতে বা বাজারে যায়, শেষে একদিন টের পেলম— রামপ্রসাদ বিকেলে দেরি করে বাড়ি ফেরে, তার দুই ছেলে-মেয়েরই পরীক্ষা, তারা বিকেলে পড়তে বসে, আর রামপ্রসাদের স্ত্রীর ঘরোয়া কাজও অনেক।

তাদের হুড়কোমুখ থেকে ফিরে এসে আমি এদিক-ওদিক তাকালাম— কার বাড়িতে একটু বসব। অচ্যুত আমাকে বেশ সম্মান করে, তার বাড়িতেই যাই তা হলে। তাই গেলাম।

প্রদীপও ভাল লোক, রমাও খারাপ নয়। শেষের দিকে তাদের বাড়িতেও গেলাম। আরো অনেকেরই বাড়িতে, অনেকেরই বাড়িতে।

ইতিমধ্যে আর একটা বড় আনন্দের কথা হল। যাব না যাব না বলে ভাবা সত্ত্বেও একদিন একটা মিটিংয়ে গেলাম। গেলাম। মিটিংয়ে শ্রোতামন্ডলীর দিক থেকে কেউ দু কথা বলবেন নাকি' বলে সভাপতি জিজ্ঞেস করায় আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বহু দিন পরে লোকের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালাম। একটা অদ্ভুত শক্তি আমার নিজের মধ্যে খুঁজে পেলাম। আমি বললাম বহু কথা বললাম, এবং লক্ষ্য করলাম—পরের দিকে আমার বলা কথাগুলো লোকেরা তাদের মাঝে আলোচনা করছে [illegible] বার শ্রোতামন্ডলীর পেছন দিক [illegible] গুঞ্জন ধ্বনি উঠছে, একজন দুজন [illegible] কিছু লোক মিটিং থেকে উঠে [illegible]—নিশ্চয়ই আড়ালে আমার কথার সারাংশের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে। সভার শেষে আমার বক্তৃতাটা বেশ লম্বা হয়েছে বলে লোকেরা প্রশংসাও করল। আমি ঠিক করলাম—অন্তত এই সভাগুলোতে আমি যাবই। এবং যাচ্ছিও। প্রায় সব সভাতেই।

ইতিমধ্যে কিন্তু একটা বড় রকমের দুর্ঘটনাও ঘটল। সুবোধ আর অপার নাকি বিয়ে হয়ে গেল। বিশেষ কিছু আমি জানি না। গল্প। আমাদের দিনের গল্পের মত হল। আমার হাসি পেল।

হঠাৎ হোম-সায়েন্স পড়ার প্রতি গীতার তীব্র আগ্রহ হল। আমি সব বুঝি। সে বিরহ যন্ত্রণায় ভুগছে। সে পালাতে চাচ্ছে। আমাদের দিনের গল্প।

গীতা যেদিন চলে গেল, আমি একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সুবোধ ম্লান এবং নিষ্প্রভ হয়ে গেল। আমার চোখের দিকে সে সোজাসুজি তাকায় না, আমি তার দিকে আমার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত করে চেয়ে থাকি। ওকে দেখে দেখে আমার মন ভরে না।

একদিন আমার বোনের মেয়ে একজনের মুখে শুনলাম—আমাদের বাড়ির ক্লাবটায়, মানে আমাদের বাড়িটার কথা সবার মুখে শুনে ওর খুব খারাপ লাগছে।

মানে বদনাম, নেই, এখানে বদনামের আর কি আছে? বোকা লোকেদের আর অন্য কাজ নেই। কিন্তু একটা কথা, এই লোকগুলো যে আমার কাছে আসে না, রাস্তায় আমার সঙ্গে যেচে খুব বেশি কথা-টথা বলে না, এই মিথ্যে বদনামটার ঘৃণার জন্য কি? না, না, সেটা হতে দিতে পারব না। আমার বাড়িটা একটা ভদ্র বাড়ি, একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্রলোকের বাড়ি, একদল স্বাধীনচেতা মানুষের বাড়ি। ঠিক আছে, আমি একটা কাজ করব, আমি সব লোকের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে দেখব, দেখব আমাদের প্রতি তাদের কি রকম মনোভাব, এবং তাদের মনোভাব খারাপ বলে মনে হলে আমি প্রকারান্তরে তাদের বুঝিয়ে দেব—আমার জীবনের দর্শন কি!

কিন্তু লোকগুলো দেখছি বাড়িতেই থাকে না। প্রায় ভাগ লোকের বাড়িতেই সকালে চেষ্টা করে দেখছি, দুপুরে দেখছি, বিকেলে চেষ্টা করছি, নেই, যাকেই খুঁজছি—কাউকেই বাড়িতে দেখতে পাই না। সবাই 'কোথাও না কোথাও বেরিয়ে গেছে'। উত্তরগুলো আসে বাড়িগুলোর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে।

পায়ের গাঁটগুলোর যন্ত্রণা দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। সেজন্য বেশিরভাগ [illegible] বাড়ির সামনের দিকের আর্ম চে[illegible]য় বসে থাকি।

কিন্তু কথাগুলো আমার গলার কাছে খচ্ খচ্ করে। বহু কথা, বহু কথা আমার গলায় আছে। আমার লোকের দরকার। সব সময় আমার পাশে একজন লোকের দরকার। অন্যথায় আমি খুব কষ্ট পাই। লোক না থাকলেই, গলায় শব্দ হয়ে না থাকলেই, নিঃসঙ্গতার সুযোগ পেলেই একটা সম্পূর্ণ জীবনের ব্যাথা-বেদনা আমাকে চেপে ধরে, যন্ত্রণায় আমি হাহাকার করে উঠি।

আমার লোকের দরকার। ওটা কে—?

'ও হে! ওটা ধীরেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—'

'দেখি, এদিকে এসো ত—'

'স্যার, আমি বাজার করতে এসেছি, বাড়িতে একজন অতিথি এসেছে—'

'ছাড়ো দিকিনি, বাজারে পরে যাবেখন। বাজারটা কি উঠে যাবে, না কি? এসো, এসো! তোমার আবার কোথেকে অতিথি এল?'

অনুবাদ : ভূপেন শর্মা

আমি অমলের বন্ধু

মহেন্দ্র বরঠাকুর
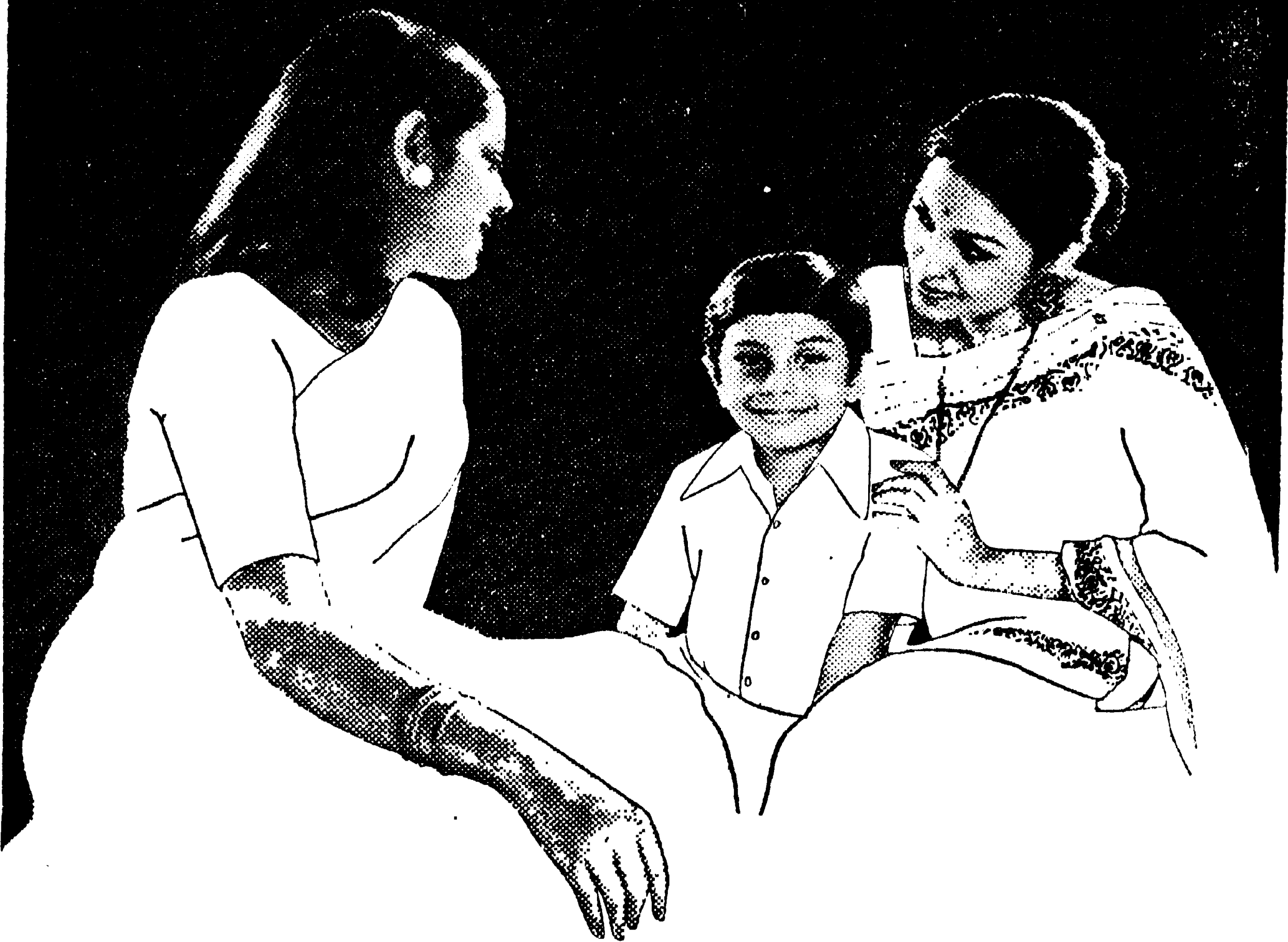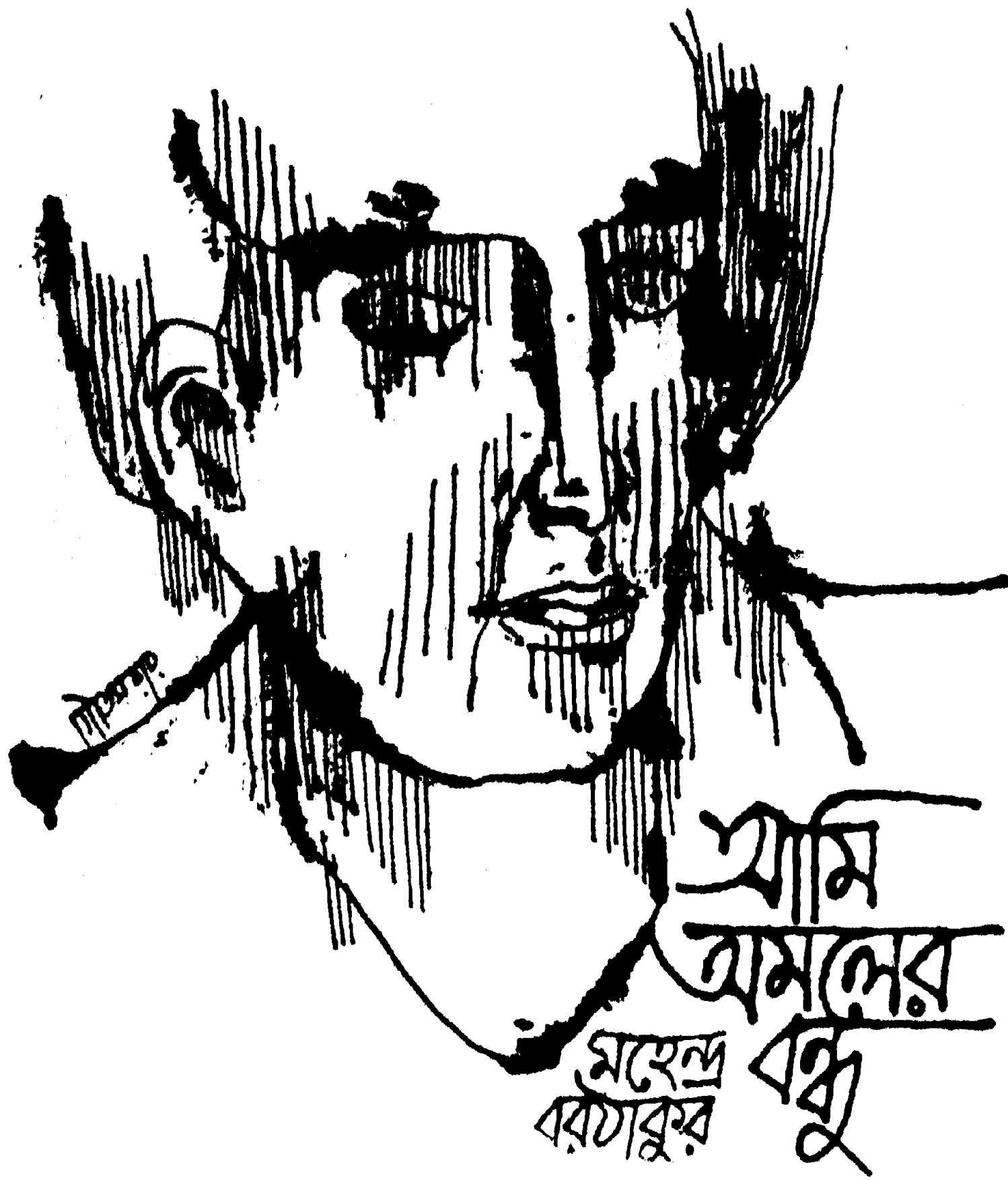
বলতে পারছি না কেন জানি আমার বুকটা কাঁপছে। আমার ঠিকানাটা বার বার পড়ছি। খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে ফেলতে পারি, কিন্তু কি যেন এক অজানা আশংকায় চিঠিটা খুলে পড়তে পারছি না। গত আট বছর আমি এই হাতের লেখাটা দেখতে পাইনি। অথচ এই হাতের লেখাটা কার আমি নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারি। চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসলাম ও চিঠিটা পড়বার জন্য খুলে নিলাম।)

আদরের বনু,

আমাকে যে তুই 'বনু' বলে ডাকতিস তা আমি ভুলিনি। তোর মুখে 'বনু' উচ্চারণটা শুনে আমার বড় ভাল লাগে। আজ থেকে দেড় বছর আগে নীতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি লক্ষ্য করিনি, নীতাই আমাকে আগে দেখতে পেয়ে প্রায় চিৎকার করে ডাকলো—এই বুদা। নীতা আমাকে বুদা বলে ডাকতে তোর কাছ থেকেই শিখেছিল। নীতা এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে। একটি কলেজে অধ্যাপনা করে। দেড় বছর আগে এখানে এসেছিল, এবং হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার বাড়িতে আসতে বলেছিলাম। সময় পাবে না বললো। সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি—লক্ষ্য করেছিলাম—দেখলাম, না নেই। তোর কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, সময়ই পেলাম না। মাত্র কয়েক মিনিট একতরফা কথা বলে নীতা চলে গেল। সেদিনও সারা রাত তোর কথাই ভেবেছিলাম, এখন পর্যন্ত তোর সম্পর্কে যতগুলো খবর পেয়েছি—সেগুলো এর ওর মুখ থেকে শোনা খবর। গত আট বছর তুই আমাকে তোর সম্পর্কে একটুও কিছু না জানিয়ে থাকা উচিত হল কি? আমি কি করে তোর খবরা-খবর নেব বল? তুই কোথায় আছিস, কি করে আছিস, কি করছিস, আমি কি করে জানব। তবু তোকে দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এর ওর মুখ থেকে তোর সম্পর্কে যতগুলো খবর শুনেছি, সেগুলো আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে। তোর প্রতি আমার ভালবাসা তীব্র হয়ে উঠে।

ভালো আছিস নিশ্চয়—

আমি যেভাবে ভালো-মন্দ বিচার করি, তুই কি সেভাবেই করিস? চলার মত হাতে টাকা-পয়সা থাকলে, ইচ্ছানুযায়ী করার কাজটা করতে পারলে অসুখ-বিসুখ না হলেই আমি ভাল আছি মনে করি। কিন্তু তোর ভাল থাকার হিসাবটা যে আমার সঙ্গে মেলে না। দেড় হাজারের মত মাইনে পেতিস সুসজ্জিত যে ফ্ল্যাটে থাকতিস, সেই চাকরীটি ছেড়ে দিলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেললি এবং তার পরিবর্তে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করলি, পর পর কয়েক বেলা অনাহারে কাটিয়ে রোদ বৃষ্টিতে, পাহাড়ে জঙ্গলে, তুই ঘুরে বেড়াতে লাগলি, তোর মা-বাবারা তোর খবর জানে না, তোর বন্ধুরা জানে না, তোর যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল—সেই নীতাও তোর খবর জানে না। কই, আমি ত ওদের বাদ দিয়ে বাঁচতে পারলাম না। মা-বাবা ভাই-বোন সবাইর স্নেহ-ভালবাসায় আমি বন্দী, আর বন্দী রুণু এবং মুনকে নিয়ে। রুনের ব্যাপারটা ত তুই জানিসই। সেই রুণুকেই আমি বিয়ে করেছি। রুণু এখন মা হয়েছে। মুন আমাদের সন্তান, রুণু-মুন ভাল থাকা মানে আমার ভাল থাকা। কিন্তু তোর কাছে ভাল থাকার অর্থ কি এটাই? প্রায় দেড় হাজার টাকার চাকরি পেয়েও তুই ভাল থাকতে পারিস সেটা বুঝতে পারলি না, তোদের ইচ্ছানুযায়ীই তোর আর নীতার উভয়ের বাড়িরই উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যেই বিয়ের বন্দোবস্ত হয়েছিল, অথচ নীতাকে বিয়ে করলেই তুই ভাল থাকতে পারবি এটা ভাবতে পারলি না। অনেকদিন আগে একদিন তুই-ই বলেছিলি—আদতে আমরা এখন ভাল থাকতে পারি না বুঝেছিস। তুই বা আমি ভাল আছি সেটা দিয়েই ভাল থাকা বুঝায় না। আমরা সবাই যদি খেতে পাই, থাকার জায়গা পাই—সেটাও ভাল থাকা, আর আমরা সবাই যদি খেতে না পাই, রাস্তায় পড়ে থাকি—তার নামও ভাল থাকা। এখন যেভাবে আছি সেটাকে ভাল থাকা বলে না—তোর এই কথা কটা আমার বেশ মনে আছে। এই অর্থেই যদি তুই আমাকে ভাল থাকা না থাকার কথা জিজ্ঞেস করিস তাহলে—আমি তার উত্তর দিতে পারব না।

একদিন অনেক দূরে, কোর্টের সামনে গুণু পিসেকে দেখেছিলাম। ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল, একবার দেখা দিয়ে আসতে...

গুণু পিসের সব খবরা-খবর তুই পেয়েছিস কি? গুণু পিসে আর [illegible] গুণু পিসে নেই রে। যে গুণু পিসে একাই একটা আস্ত কাঁঠাল খেতে পারতো, দা-কাটারী ছাড়াই একটা আস্ত নারকেল খেতে পারতো, চারটে হাঁসের মাংস একাই খেতে পারতো, কলা পাতায় ছড়িয়ে থাকা আড়াই সের চালের ভাত নিমেষে খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারতো—সেই গুণু পিসের এখন হাড্ডিসার অবস্থা হয়েছে। কথা বলার সুযোগ পেলেই—নিজের দেখে আসা মান অত্যাচার থেকে আরম্ভ করে মণিরাম পিয়ালী ফুকনের ফাঁসী পর্যন্ত বর্ণনা করতে পারা গুণু পিসে এখন কথা বলতেই পারেন না রে। নদীর পারের বটগাছটা আর তার নীচে ঢিবিটায় বসে থাকা বুদ্ধটির কথা বোধহয় গুণু পিসে একেবারে ভুলেই গেছেন। এই গুণু পিসের কাছ থেকেই ছোটবেলায় সেই বুদ্ধের কথা শুনেছিলাম। তখন থেকেই সূর্যাস্তের পর সেদিকে যেতে ত পারিই না, দিনের বেলাতে একা যেতে ভয় পাই। শুনেছি, গুণু পিসে নাকি মাঝ রাত পর্যন্ত সেই বটগাছের নীচে ঢিবিটায় বসে থাকতেন। গুণু পিসের ছোট ছেলে বাপু ওত রাম

শর্মাকে কোদাল দিয়ে মেরেই ফেলেছে। বাপু রাম শর্মার বাড়ির চাষী ছিল। রাম শর্মার মুখখানা ত জানিসই। একটা রাম চোঁয়ার। মানুষকে মানুষ ভাবতে পারে না। মাঠে লাঙল দেবার সময় রামশর্মা বাপুকে কি সব গালাগাল দিয়েছিল। জোয়ান ছেলে, মাথায় রক্ত গেল চড়ে। হাতের কোদালটা রামশর্মার মাথায় দিল বসিয়ে। তারপর নিজে নিজেই গেল থানায়। তার কয়েকদিন বাদেই পিসের বড় মেয়ে ভুনুর কেলেঙ্কারীর কথা রটলো।—ভুনুর চেয়ে দশ বছরের ছোট কাকা না জেঠার ছেলের সঙ্গে। তা নিয়ে ত একেবারে রমরমা কান্ড। পাড়া পড়িবেশীরা গুণ পিসেকে একঘরে করল। দেড় কুড়িরও বেশী বয়েস পর্যন্ত মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখার জন্য সবাই পিসে-পিসিকেই দায়ী করল। একদিন ভুনু নিঃশব্দে বাচচাটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে সটকে পড়ল। কোথায় যে গেল কেউ জানে না। ভুনু চলে যাবার এক হপ্তা কি দিন দশেক বাদে পিসি গলায় দড়ি দিল। বাপু এখনও জেলে। গুণ পিসের বাড়ির অবস্থা এখন যে কি সে খবর আমি পাইনি। গ্রামে আমিও অনেক কাল যেতে পারিনি। এদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেলেই অসুখ-বিসুখ হয়। এখানে একা ছেড়ে যেতে পারি না। অতএব চাকরী আর সংসার এই নিয়েই ব্যস্ত আছি। অনেক দিন আগে তুই একবার নিতাই জামাই বাবুর বিপর্যয় দেখে বলেছিলি—এই মানুষগুলো যুগ-যুগান্তর ধরে এভাবেই আছে। যদি এদের জন্য কিছু একটা করতে না পারি তাহলে এইভাবেই থাকবে। আজও তুই হয়তো বলবি—গুণ পিসে একজন নয়, গুণ পিসে অনেক আছে। এক গুণ পিসেকে চোখের সামনে দেখে বাড়িতে গিয়ে মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই। —লাভ নেই বুঝলাম কিন্তু কিই বা করতে পারি?

তারপর আজকাল তুই বক্তৃতা-টক্তৃতা কেমন দিচ্ছিস?

বক্তৃতা! তুই আমাকে কি বিদ্রূপ করছিস? বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তাম তখনই যা ছাত্র নেতা ছিলাম। বহু আন্দোলনের পুরোধা ছিলাম। হরতাল, মিছিল পিকেটিং ইত্যাদি অনেক আন্দোলনই আমি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছি। তবে তুই কিন্তু এগুলোতে অংশ গ্রহণ করতিস না। তুই কেবল বই পড়তিস। ফরেষ্ট ফিল্ডের সেই বিরাট বিরাট জনসভায় তোকে আমি কতবার বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তুই কিন্তু তখন মাইকের মুখোমুখি হতে চাইতিস না। একদিন, মাত্র একদিনই তুই বক্তৃতা দিয়েছিলি, একদিন তোর রাগ আমি দেখেছিলাম। সেদিনই তুই আমার বিরুদ্ধে [illegible] প্রতিবাদ করলি। তোর বোধহয় মনে নেই। আমার কিন্তু বেশ মনে আছে। আমরা অনগ্রসর শ্রেণীর বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি। সকালবেলা দুমাইল লম্বা বিরাট একটা শোভাযাত্রা বের করবার সাফল্যই সেদিন আমাকে আপ্লুত করে রেখেছিল। বিকেলে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষের জনসভা। আমি সেখানে উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে চলেছি। অনগ্রসর শ্রেণীর ন্যায্য দাবীগুলো সরকার অবহেলা করছেন এর উপরে সরকারকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছি। (অথচ সরকার থেকে দশ হাজার টাকার অনুদান পেয়েছিলাম। এবং সম্মেলন উদ্বোধন করবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।) ঘন ঘন হাততালি পড়ছে, আমার উত্তেজনা বেড়ে চলেছে, এখুনি যেন আমি এই সরকার ভেঙেগ ফেলতে পারি, এরকম এক বজ্রমুষ্ঠি প্রদর্শন করে বক্তৃতা করে চলেছি। এমন সময় হঠাৎ তুই আমার হাত থেকে মাইকটা প্রায় ছিনিয়ে নিলি, তোর মুখটা অসম্ভব লাল হয়ে উঠেছিল, আর চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলছিল। তুই বলেছিলি—সম্মেলন করে দরিদ্র কৃষকের পেট ভরবে না। আর যদি করতেই হয় তবে এই সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হোক—আমাদের পড়ে থাকা মানুষদের মধ্যে থেকে শতকরা পঞ্চাশ জনকে চাকরি দিতে হবে, আমাদের ছেলে-মেয়েকে পড়াশুনার সুযোগ দিতে হবে, তারপর আসুক ব্রাহ্মণের সম্মেলন, কায়স্থের সম্মেলন, কলিতা, কৈবর্ত্য, মেস, বড়ো বড়ো (অনগ্রসরও উপজাতি শ্রেণী), মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, জৈন, অসমীয়া ভাষী, বাংলা ভাষী, হিন্দী ভাষীদের সম্মেলন। মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব বজায় রাখার পথ সুগম করে নিক এরা। প্রস্তাবের বিপ্লবকে, হরতাল, ধর্মঘট, সত্যাগ্রহের বিপ্লবকে আমি প্রকৃত বিপ্লবের পরিপন্থী বলে গণ্য করি।—তোর এসব কথাবার্তা শুনে এক মুহূর্তের জন্য বিরাট জনসমুদ্র। নিস্তব্ধ হয়ে গেছিল, আমিও হতভম্ব হয়ে গেছিলাম। তার মৃদু গুঞ্জরণ আরম্ভ হল। তুই জোর দিয়ে বলে গেলি—পৃথিবীতে দুটো শ্রেণী আছে, একটার নাম বিলাসভোগী এবং অন্যটির নাম শ্রমিক। অর্থহারা এর মধ্যে অন্য কোন ধর্ম নেই। সম্প্রদায় নেই, ভাষা নেই, কিছু নেই। এই বলে তুই একটানে স্যার ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক চিহ্ন পইতেটাকে ছিঁড়ে ফেললি আর সেই মুহূর্তেই তোর কপালে, মাথায় কয়েকটা ইঁটের টুকরো এসে

কলেজ জীবন থেকেই লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯৬১ সালে প্রথম উপন্যাস 'উদাসী সন্ধ্যা' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য প্রকাশিত আরও তিনখানা উপন্যাস—'বেগমপারা', 'বোলফুল' এবং শিশু উপযোগী 'পনীয়া সোনর দেশ।' বহু রেডিও নাটক ও ব্যঙ্গরচনা লিখেছেনঃ আকাশবাণীর অভিনয় শিল্পী। মঞ্চ নাটক—জন্ম, শিপা, পিতামহর শরশয্যা। আসামের তরুণ প্রগতিশীল প্রথম সারির লেখকদের অন্যতম।
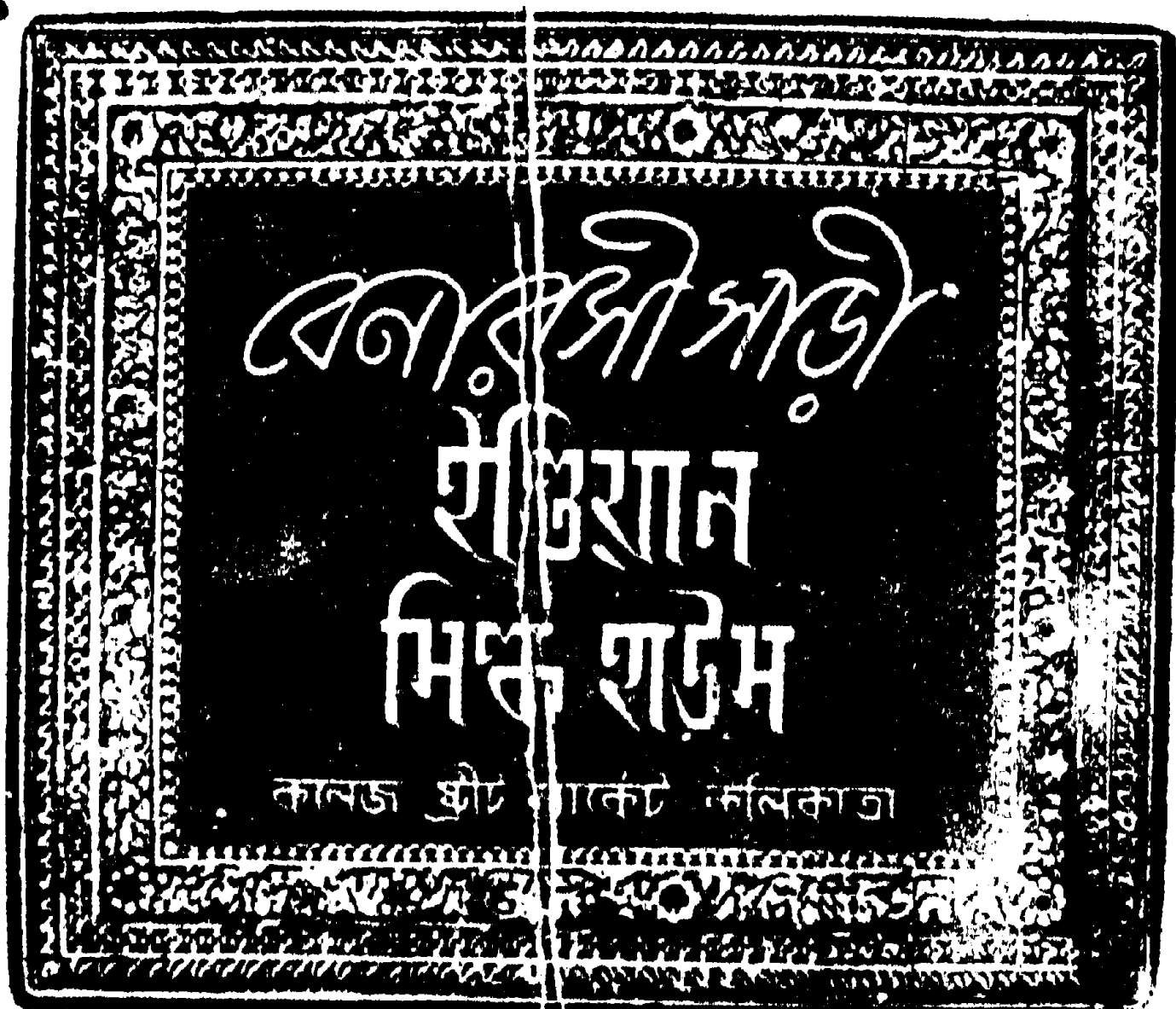
পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তুই পড়ে গেলি। চারদিকে তখন তুলকালাম কাণ্ড। একটা সুসংগঠিত সভাকে এইভাবে পণ্ড করে দেবার জন্য কেবল তুই-ই নয়, তোদের বর্ণের মানুষগুলোকেও অনেকেই দোষারোপ করেছিল, এবং একে পূর্বপরিকল্পিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল কারণ তুই বাগের মুহূর্তে কিছু অপ্রাসংগিক কথাবার্তা বলেছিলি। এই ঘটনার পর থেকেই কিছু দিনের জন্য তোর আমার বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরেছিল, সত্যি করে বলতে কি তুই আমাদের শত্রু বলে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছিল। একদিন তুই আমার কাছে এসে বলেছিলি, 'আমার দাদা ঠাকুরদাদের ভুলে। সেই তোরা যখন আমাকে দোষারোপ করিস আমি তখন ভীষণ অসহায় বোধ করি। আর কি জানিস—মানুষ মানুষ হিসাবে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত তোদের বাঞ্ছিত পরিবর্তন অসম্ভব, আসতে পারে না। মানুষের মধ্যে —আমাদের এই খেতে না পাওয়া মানুষগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মণ আহোম, কলিতা, কৈবর্ত্ত, হিন্দু-মুসলমান, তপসিলী উপজাতি, পাহাড় সমতল ইত্যাদি ইত্যাদি সেখানে যে রকম আছে থাক— এটাই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো কামনা করে।

বিভাজনের মধ্য দিয়ে বিরাট উদ্দেশ্যকে ভাঙ্গাতে পারলেই—সেই শক্তি নিজের হাতে নেতৃত্ব রাখতে পারবে। আর এই যে তোদের বিপ্লব—বন্ধ করলি, না খেয়ে থাকলি— এইগুলোতে কি পরিবর্তন আনতে পারবি?

—তোর এসব কথা শুনে আমার মনে মনে ভীষণ রাগ হচ্ছিল। তোর উদ্দেশ্য, তোর আগ্রহ, তোর একাগ্রতা, তোর আন্তরিকতা —উপলব্ধি করতে পারার মত মানসিক অবস্থা সেদিন আমার ছিল না। বলতে গেলে এই ঘটনার পর থেকেই আমরা প্রায় ছাড়াছাড়ি হলাম। তারপর আমি চাকরিতে ঢুকলাম, তুইও কিছু দিনের জন্য চাকরি নিলি। আমার বিপ্লবী কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল—এবং একদিন শুনলাম তুইও নাকি কোথায় চলে গেলি। নীতাকে কেবল একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছিলি—যদি সম্ভব হয় নতুন জগতে আমাদের মিলন হবে— নীতাকে লেখা এই চিঠির বক্তব্য নীতার বাবা আমাকে বলেছিলেন। সম্ভবতঃ সেই নতুন জগতের সন্ধানে এখনো আছে, এখনও সে সিঁথিতে সিঁদুর দেয়নি, তোর প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন করে চলেছে। তুই সর্বাত্মক বিপ্লব চাইছিস আর আমি অফিসের গেটের সামনে কয়েকজন পিকেটারকে দেখেই সন্তুষ্ট হয়েছি, তুই যাকে পরিবর্তনের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছিস, আমি সেখানে কিছু একটা না হওয়ার চাইতে এইগুলোই চলতে থাকুক বলে ভেবেছি। তুই যে পথ নির্ণয় করেছিস সেই পথ ধরেই চলেছিস। আমি পথ খুঁজে পথে নেমেছি। লক্ষ্য রেখে নয়। গুণে পিসের জন্য আমি কেবল দুঃখই করি, ভুলুকে আশ্রয় দিতে পারি না। অমল, তোর কপালের দাগটা এখনও আছে কি? তোর কথা যখনই মনে হয়, তখনই সেদিনের তোর কপালে-মাথায় ইট-পাটকেলের আঘাতের কথা মনে হয়। সেদিন কি তোর মাথায় রক্ত উঠেছিল? পইতেটা খুলে ফেলার জন্য তোদের বাড়ী তোকে ত্যাগ করল। চোখের জল মুছতে মুছতে তোর দাদা আমাকে বলেছিলা, ভাইটা মারা গেছে এই ভেবে দাঁড়ি পাতিল ফেলেছি, তোর দাদার দু' চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও সেদিন দু চোখ ছলছল করছিল।

আচ্ছা এবার আসল কথায় আসি— তোর কাছে আমার জিনিস আছে...

জিনিস? কি জিনিস? আমার কাছে তোর কি জিনিস রয়েছে? নীতার লেখা চিঠি কখানা? সেই কবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখনকার চিঠি। রূপের কাছে রেখে দিয়েছি। কিন্তু সেগুলো তোর কিসের প্রয়োজন? নীতার সঙ্গে তোর সেই সম্পর্কের কথা আজও মনে রেখেছিস নাকি? যদি রেখে থাকিস তাহলে এভাবে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? নাকি তোর ছবিটার কথা বলছিস? হতে পারে, তুই বোধ হয় ছবিটার কথাই লিখেছিস। কিন্তু ছবিটা তোর কিসের প্রয়োজন? পুলিশ কি তোর পিছু নিয়েছে? তাহলে?

আমি যে কোন একদিন রাতে তোর বাড়ী গিয়ে উঠবো। একরাত থাকতে দিবি নিশ্চয়ই? বেশী না একটা রাতের জন্য। কিরে, থাকতে দিবি তো?

কেন থাকতে দেব না বল? তোকে দেখার জন্য, তোর সঙ্গ পাবার জন্য, তোর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি কি যে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি—তুই কি করে বুঝবি অমল, তোর কপালের সেই দাগটার কথা মনে পড়লে আজও গা শিউরে উঠে। আমার ইচ্ছে হয়, তোর সেই দাগটা আমি মুছে দিই। আসলে তোকে আমি যে ভালবাসি তুই জানিস না অমল, তোর কাছ থেকে সরে থাকা দিনগুলো যত বেড়ে যাচ্ছে তুই সে পরিমাণ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিস আমার কাছে। শুধু এক রাতের জন্য কেন—চির দিনের জন্য আমার এখানে সমস্ত আতিথ্য সকল রকম সেবা, যত্ন দিয়ে তোকে রাখতে আমি প্রস্তুত অমল। বিশ্বাস কর, শুধু আমি নই, রূপও তোকে শ্রদ্ধা করে, তুই আসিস অমল, তুই আসিস.... কিন্তু... কিন্তু তুই পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? পুলিশ কি তোর পিছু নিয়েছে? আমার বাড়ীতে যদি পুলিশ আসে? আমার কাছে যদি কৈফিয়ৎ চায়? আমার চাকরির ব্যাপারে যদি কোন গণ্ডগোল হয়? সামনে আমার প্রমোশন, তুই রাজনীতির শত্রু হয়ে এখানে আসবি না অমল। হ্যাঁ, রাজনীতির শত্রু হয়ে এখানে আসবি না। একদিন বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলাম, আজকাল তা চাই না...চাকরি না থাকলে রূপকে খাওয়াব কি? বাবার চিকিৎসা করাব কি করে, বোনটার বিয়ে দেবো কি দিয়ে? আমি পারব না অমল, আমি পারব না, আমি ভীরু, আমি সেই সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের প্রতিভূ, আমাকে টানাটানি না করে তোরা যেভাবে পরিবর্তন আনতে চাইছিস আন কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর। তুই আসিস না অমল, তোর সামনে মুখোশটা খুলে ফেললে ভীষণ লজ্জা পাবো, অথচ এ না করে আর কোন উপায় নেই। বিপ্লব আমি আজও করি—বেতন বৃদ্ধির বিপ্লব। পদোন্নতির বিপ্লব, সুবিধা আদায়ের বিপ্লব—এ ধরনের বিপ্লব আমি করতে পারি। কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার পথ নিশ্চিত করার মত বিপ্লবকে আমি ভয় পাই। হ্যাঁ, আমি ভয় পাই। আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর অমল।

অনুবাদ : অমর দে

অনুরোধ রাখলাম

অমৃত সাপ্তাহিকের একগুচ্ছ হিন্দী গল্প সংখ্যাটির প্রত্যেকটি গল্পের অনুবাদ এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী নির্বাচন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সেই তুলনায় একগুচ্ছ বাংলা গল্প সংখ্যাটি অত্যন্ত নিষ্প্রভ। দু'একটি গল্প ছাড়া মোটেই ভাল লাগে না। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে বিনীত অনুরোধ নববর্ষ সংখ্যা-৮৩ র মত আর একটি বিদেশী গল্প সংকলন আমাদের উপহার দিন না। সবশেষে পরপর দুটো সুন্দর গল্প সংকলন প্রকাশের জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অনুরোধ রাখি ভারতীয় অন্যান্য ভাষার গল্প সংকলন প্রকাশ করে আমাদের আনন্দ দেবেন।

মদনমোহন দত্ত, মজলিশপুর, ২৪-পরগণা।

করে কর্কটা খুলে একটা স্ট্র ঢুকিয়ে সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। একটা চুমুক দিলাম আর এমনিতে ভাব করার জন্য ছেলেটার হাব-ভাব আমার ভাল লাগছে। বললাম যে তাঁরা একটা ফ্রিজ রাখেন না কেন। ফ্রিজ? হ্যাঁ, আপনাদের দোকানটার লোকেশনটা বেশ ভাল, গরম পড়লেই, অনেক বেশি কোকোকোলার দরকার হবে, বড় একটা ফ্রিজ থাকলে—ইত্যাদি। ঠিকই, সে বলল, কিন্তু দোকান তার নয়, সে সেলসম্যান। এরিয়াটা বেশ বিজি, সত্যি কথা, দু-এক সপ্তাহেই কোকোকোলার ডিমাণ্ড অসম্ভব বেড়ে যাবে, তারা ডিমাণ্ড মিট করতে পারবে না। কিন্তু বড় ফ্রিজ একটা নেওয়ার কথা মালিক এখনও ভাবেন নি, এইটুকু ছোট্ট ঘর, এরই ভাড়া মাসে দশ টাকা, তাদের দোকান ছোট, এসব রানিং এক্সপেন্স মিট করাটাই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে, সে জেনে—। তা বটে, আমি বললাম এবং নীরবে দুই ইঞ্চি পরিমাণ কোকোকোলা টানলাম, তারপরে বললাম যে আমি এখানে নতুন এসেছি, বন্ধু একজনের বাড়িতে বর্তমানে থাকছি, আমি একটা ভাড়া-বাড়ি খুঁজছি, যদি এনি চান্স সে জানে কি এই অঞ্চলে কোন—? ভাড়া বাড়ি? সে বলল, ভাড়া-বাড়ি ত এ জায়গায় তেমন রেসিডেন্শিয়েল পারপাসে পাওয়া মুস্কিল, আচ্ছা আপনার ফেমিলি মেম্বার কজন? আট দিন (সে বলল), তার পরিচিত চেনা-শোনা একজন লোকের একটা বিল্ডিং-এর কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, কিন্তু এখানে নয়, একেবারে সাউথ পেরিয়ে—। আরে না না, আমি বললাম, অত দূরে হবে না—আচ্ছা এই যে এই-খানে বীণা কুটির—

বীণা কুটির? বীণা কুটির?

মৃদু হাসলাম এবং বললাম, সেই যে বীণা ফুলের একটা গাছ আছে সামনে, আসাম-টাইপ বাড়িটা—'

'ও, সেই বাড়িটা?'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকালাম।

'কি জানি—সেটা ত ভাড়া দেওয়ার কোন লক্ষণই দেখিনি, অনেক দিন থেকে ও-ভাবেই খালি পড়ে আছে—আমাদের দোকানটা স্টার্ট দেওয়ার আগে প্রায় ন-মাস হল, রোজ সেই একই অবস্থায় দেখছি। লোকজন কখনও—'

'কেন, ভাড়া দেয় না কেন? বাড়িটা কার?'

'কি জানি—', সামান্য লজ্জিতভাবে হেসে ছেলেটা বলল, ভাল করে কথাটা আজ অবধি টেরই পাইনি, কাউকে জিজ্ঞেসও করিনি—আমি নিজেই পঞ্চাশটা ধান্দায় থাকি—'

কথায় কথায় জানতে পারলাম সে এবার প্রাইভেট বি এ পরীক্ষায় বসার কথা

সৌরভকুমার চলিহা অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার। তাঁর গল্প বলার রীতি এবং কৌশল অন্যান্য অসমীয়া লেখকের থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। 'গোলাম' শীর্ষক গল্প-সংগ্রহ সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

অসমীয়া সাহিত্যের তিনি পঞ্চাশের দশকের লেখক। অসমীয়া কথা-সাহিত্যে আধুনিক চরিত্রের গীতিধর্মিতা, ইম্প্রেসনিজম্-এর প্রবর্তনকারী এই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল গল্পকার পাশ্চাত্যের মার্গ-সঙ্গীত এবং পদার্থ-তরঙ্গের প্রতি সমানে সজাগ। বহুদিন জার্মানীতে ছিলেন। এখন আসামে। পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং 'আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে'র সঙ্গে যুক্ত।

গল্প তিনি কম লেখেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অনেক গল্প এখনো সংকলিত হয়নি।

ভাবছে, গতবার এপিয়ার হতে পারল না, বাড়িটাও তাকেই চালাতে হয় কি না। বহু লেখা, দোকানে অবকাশ পেলেই এই নোট-গুলোকেই একটু দেখে দেখে—

'তা বটে', আমি বললাম, তার পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়িটা কার?' এবং স্ট্রটার সাহায্যে চুক চুক শব্দ করে তলানির শেষ বিন্দুটা টেনে নিয়ে খালি বোতলটা তাকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, 'আরেকটা কোকোকোলা দেবেন।'

সে আরেকটা বোতল বের করল এবং বলল, 'ঠিক জানি না। এই এরিয়াটার কথা আমি খুব ভাল করে জানি না। আমি থাকি কুমোরপাড়ায়। বহু দিন পূর্বে একবার আমাদের স্কুলটা মিলিটারিরা দখল করেছিল, সেই সময় এদিকে বিষ্ণুরাম হাই স্কুলে কয়েক মাস ভোরবেলা আমাদের ক্লাশ হয়েছিল। তখন হেঁটে হেঁটে এ দিক দিয়ে গিয়েছিলাম—ছোটবেলার কথা—ভাল করে মনেই পড়ে না—সে সময় এই বিল্ডিং-গুলো হয়নি—আমাদের এই বিল্ডিংটার জায়গায় তখন সেই বাড়িটার মত একটা ছোট আসাম-টাইপ বাড়ি ছিল পি ডব্লু ডি-র ওভারসিয়ার একজনের—বসন্ত কলিতা তাঁর নাম—তিনিই এখন এই বিল্ডিংটা তৈরি করেছেন, এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িগুলো তৈরি করতে লোকেরা যে কোথেকে এত টাকা-কড়ি পায়— সামনের লনটাও রাখলেন না—ন্যাচারেলি কারণ এখন এটা পুরো কমার্শিয়াল এরিয়া হল, প্রত্যেক স্কোয়ার ফিট জমি যতটা ইউটিলাইজ করতে পারা যায় ততই লাভ, কেউই আর সখ করে ঘাসের লন বানাতে জমি-জায়গা ফেলে রাখে না—

'তা ঠিক', আমি বললাম, এবং স্ট্রটার অবস্থান ঠিক করে নিয়ে সর্ন্তর্পণে ভাবে আবার প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু, বাড়িটা কার?'

'ও হ্যাঁ', একটু হোঁচট খেয়ে ছেলেটা বলল, 'আপনি যেটাকে বীণা কুটির বলেছেন—', আমার দিকে তাকিয়ে সে একবার সামান্য হাসল, 'ঠিক বলতে পারলাম না—আমরা নিজের কাজেই বিজি থাকতাম। স্কুলের দেরি হবে বলে বা বাড়ি পৌঁছতে দেরি হওয়ার ভয়ে আমরা তাড়া-তাড়ি এই বাড়িগুলো পার হয়ে যেতাম—তখন বেশির ভাগই রেসিডেন্শিয়েল বাড়ি ছিল—কোন বাড়িটা কার সেই বয়সে কে আর তার খোঁজ-খবর রাখে—এনি ওয়ে, বিষ্ণুরাম হাইস্কুলেরই শিক্ষক একজনের বাড়ি বলে শুনেছিলাম—পরে তিনি হেড-মাস্টারও হয়েছিলেন—', সে এবার কপালের বলিরেখা কুঞ্চিত করে মনে করতে চেষ্টা করল, 'ভূধর গোস্বামী—ভূধর শর্মা—ভূধর, হ্যাঁ সেই রকমই— সংস্কৃতের টিচার, বেশ স্কলার লোক ছিলেন। কাশী থেকে কি সব উপাধিও পেয়েছিলেন, গেটের একখানা সাইনবোর্ডে লেখা থাকত 'সঞ্জীবনী সমাজ', তিনিই নাকি খুলেছিলেন, তার প্রেসিডেন্টও ছিলেন সম্ভবতঃ মাঝে মাঝে কয়েকজন রাশভারি চেহারার টাক-মাথা দাড়িওয়ালা বুড়ো ভদ্রলোককে বারান্দায় বসে আলাপ-আলোচনা করে থাকা দেখতাম ... আর্টিকেল-টার্টিকেলও নাকি মাঝে মাঝে লিখতেন— 'বৈদিক যুগে ছাত্রদের.......',—এই রকম কিছু জিনিস—'

'তিনি এখন কোথায়?'

'এখন? কি জানি—বুঝেছেন, একচল্লিশ ম্যাট্রিকের পরে আমি অনেক দিন এই সহরে ছিলামই না—একটু ইতস্ততঃ করে ছেলেটা থামল (অতএব, আমিও কিছু জিজ্ঞেস করলাম না)' ইতিমধ্যে বহু চেঞ্জ হল, এখানে এসে ত দেখছি আমাদের আগের পরিচিতরা কেউই নেই—সব পাঞ্জাবী মাড়োয়ারী বিজনেস ম্যানদের ফেমিলি—ও আচ্ছা, ভূধর গোস্বামী—তিনি মারা গেলেন বোধহয় এত দিনে—'

'আচ্ছা? তাহলে এখন কে—'

'দুটো ছেলে ছিল, আমাদের চেয়ে বড়-তখনই আমাদের চেয়ে বেশ বড়সড়। একজন বোধ হয় বাবার মতই ছিল, মানে লেখা-পড়া নিয়েই ব্যস্ত, কোন কলেজের প্রফেসর। ধুতি-চাদর পরা প্রফেসর, তখনকার দিনের, কখনো কিছু ভেবে ভেবে লনটায় পায়চারি করতেন। দ্বিতীয়টা, মানে ছোটটা ডিব্রুগড়ে ডাক্তারি পড়ছিল, না অন্য কিছু,—আমাদের ক্যাপ্টেনই একটা ছেলে মাঝে মাঝে এইসব খবর দিয়েছিল, সে তখন এই রাস্তার মোড়েই থাকত, এখন অবশ্য সেখানে নেই। ছোট ছেলেকে আমরা দেখিইনি, ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, না সে-রকমই কিছু, একটা

এনিওয়ে, কোথাকার লোক কোথায় গেল, কে জানে—'

কোকোকোলায় একটা টান দিলাম এবং নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম—'মেয়ে?'

'নেই—মানে, এক কি দু'দিন শুধু একটি মেয়ে ছিল যেন দেখেছিলাম—বয়স্কা ভদ্রমহিলা কোনো দিনই চোখে পড়েনি। একদিন সিনেমার পোস্টার টাঙিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে একটা ঘোড়াগাড়ি যাচ্ছিল (আজকাল সেই গাড়িগুলো আর নেই, রিকসা আসার পর থেকে ব্যাণ্ড বাজায় না, খালি মাইক), তাই দেখতে একটি মেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল—হাল্কা ফেশ্যানের—দেখতে খারাপ নয়—সবাইকে সে-দিকে তাকিয়ে থাকা দেখে ভিতরে ঢুকে গেল। মাঝে মাঝে ঘাসের লনটায় একটা সাদা রংয়ের ফোর্ড গাড়ি থাকত, বেশ হেলদি একজন লোক সেটাকে চালাতেন—মেয়েটার সঙ্গে নাকি ভাব ছিল, পরে বিয়েও হল। মানে ঘর জামাই। আমাদের ক্যাশ রিফ্যুজ্রামে শুধু ছয়মাস হয়েছিল, তার পরে ত এদিকে আসাটা একরকম বন্ধ—নেই, অন্য কোন মেয়ে-টেয়ে থাকলে,' সে একবার বিব্রতভাবে মৃদু হাসল, 'ন্যাচারেলি আমাদের চোখে পড়ত.' ছেলেটা ঝট ক'রে প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'এত ভেল্যুয়েবল প্রপার্টি এই এরিয়ায়! কেন যে এভাবে রুইনড হতে দিচ্ছে! কি জানি, হয়ত ফোর্ড গাড়িওয়ালা সেই জামাই-ই পাচ্ছেন এই সম্পত্তি—অ্যাই মিন আফটার অল তার নিজের বাড়ি ত নয়। নিজের লোকের হাতে থাকলে কেউ কি এভাবে নষ্ট হতে দেয়—একটু ইম্প্রুভ্ ক'রে নিলেই এই এরিয়ায় মাসে কম ক'রেও এইট হান্ড্রেড—'

'তা বটে—'

দোকানে লোকজন ঢুকছে। কোকোকোলার জন্য দু'জন পাঞ্জাবী, টুথপেস্ট-এর জন্য একটি ছেলে, এবং প্ল্যাস্টার এই কোটা এসেছে কিনা একটি দম্পতি জানতে চাইছে। নীরবে এক কোনায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে স্ট্রটার সাহায্যে কোকোকোলা টানতে লাগলাম, আমার নাকে কোকোকোলার অনির্দেশ্য স্বাদের ঝাঁঝ ...... ছোট দোকানটার বহুবর্ণ দ্রব্য-সম্ভারের র‍্যাকে উজ্জ্বল টিউব লাইটের আলোয় ধীরে ধীরে যেন একটা অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে শুরু করলাম, একটা চেনা কাফের অত্যন্ত কোণা একটার মত একটা উষ্ণ আমেজ বোতলের অবশিষ্ট তরলটুকু লক্ষ্য করলাম—লাল তরলটুকুতে যেন প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠছে একটা ছোট এলপেটার্নের আসামটাইপ বাড়ি : বীণা কুটির। অজস্র বীণা ফুল বারান্দার নীচের ঘাস-বনে ঝরে পড়েছে, মাথা নীচু করে একটি মেয়ে কোমরে চাদর গুঁজে বারান্দাটা ঝাঁট দিচ্ছে ... হঠাৎ শুনলাম একটা মোটরের হর্ন, একটা সাদা ফোর্ড গাড়ি ঢুকছে, চটপট মেয়েটা ঝাঁটা তুলে রেখে চাদরটা ঠিক করে নিল এবং চুলে হাত দিল, চকিত দৃষ্টি দিয়ে একবার গাড়িটা দেখল, গাড়ির পেছন দিকের কাঁচ দিয়ে দেখা যায় দুটো বলিষ্ঠ রোমশ হাত স্টিয়ারিং হুইলে, দুটো প্রশস্ত কাঁধ, মেয়েটার মুখটা অস্পষ্ট, কিন্তু ধরতে পারা যায় তরুণী, তন্বী, অকস্মাৎ কিছু একটার প্রত্যাশায় সপ্রতিভ...দৃশ্যটা মুছে গেল, বারান্দার দুয়ারখানা খোলা, ভিতরে মেয়েটা পেছন-মুখো হয়ে বড় গোল টেবিল একটার বইপত্রগুলো থেকে কাপড় দিয়ে ধুলো ঝাড়ছে, টেবিলের ওপরে শুকিয়ে যাওয়া গাঁদা ফুলের মালা পরানো একটা বড় ফটো—সাদা গোঁফ, টাকওয়ালা মাথার চারিদিকে সাদা চুল, গোল ফ্রেমের বাই-ফোকাল চশমা, ঈষৎ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি : 'ভূধর গোস্বামী (বা শর্মা—আর কে হবে?), তার ওপরের দেওয়ালে কারোর দেওয়া মানপত্র বাঁধিয়ে রাখা আছে। প্রাচীন কাঠের চেয়ারে ধুতি-চাদর পরিহিত একটি লোক বসে কিছু বলছেন ধীরে ধীরে, তাঁরও চোখে চশমা (কিন্তু চৌকোণা), একটা পা পাম্পশুর ভিতরে, অন্য পাটা পাম্পশু থেকে বের করে আঙুলগুলো ঝাঁকাচ্ছেন—সেটুকুই শুধু লোকটার চাঞ্চল্যের চিহ্ন, বাকি সমস্ত প্রশান্ত—তাঁর মুখ, তাঁর ভঙ্গি, তাঁর কথা (স্পষ্ট কিন্তু অনুচ্চ)। নিঃসন্দেহে সেই 'প্রফেসর' ছেলে, তাঁর নাম—ভূধর গোস্বামীর ছেলের নাম—কি হবে? প্রেমধর? পরমেশ? ধরা হোক, পরমেশ। পরমেশ গোস্বামী—কিছু খারাপ হবে না। তিনি কি বলছেন? তাঁর শ্রোতা সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট খদ্দরের পাঞ্জাবী পরিহিত একটি বয়স্ক লোক—তিনি কে? প্রফেসর বলছেন (সত্যিই আমি কোথা থেকে কণ্ঠস্বর শুনলাম!)

'......অতএব গণেশদা, আপনি কিছু মনে করবেন না—এই বাড়িটার সাথে একটা স্কলারলি এটমসফিয়ার জড়িত। এখানে আমি লোহা-লক্কড় সিমেন্ট-বালি টাকা-পয়সার হিসাব শুরু করতে দিলে বাবার আত্মা শান্তি পাবে না, বাবা আমাকে কখনো ক্ষমা করবে না...আপনি আমাকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন, এখন এই পৈতৃক বাড়িটা আমার হাতে পড়েছে, আপনি আমার কাছে বাড়িটা ভাড়া চেয়েছেন, আপনার কন্ট্রাক্টের কাজ দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে, আপনাকে বাড়িটা ভাড়া দিতে পারলে আমার কি ভাল লাগত না, বলুন? কিন্তু এখন বাবার লাইফ-লং ওয়ার্কের স্মৃতি রক্ষা করাটাও আমার একটা কর্তব্য, একটা ফিলিয়েল ডিউটি, আমি নিজে এখানে বাস না করলেও এই বাড়ির পরিবেশ আমাকে বজায় রাখতে হবে—যতদূর পারা যায়, যদি পারি বাবার নামে এই বাড়িটায় একটা লাইব্রেরি-টাইব্রেরি করে দিতে হবে—আপনিও ত বাবাকে রোজ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে আসছেন, আপনিও ত দেখে আসছেন এই টেবিলটাতেই (তিনি টেবিলটার দিকে হাতটা মেলে দিলেন, সিনেমার ক্লোজ-আপ শটের মত সমস্ত টেবিলটা সামনে এসে তরল পর্দাটা পূর্ণ করে দিল : অসংখ্য কাগজ - বই মেগাজিন, ভূর্জপত্রের পুঁথি, একটা লাল ফিতায় মোড়া ফাইলের ওপরে বড় বড় করে লাল কালিতে লেখা 'বৈদিক যুগে (অস্পষ্ট, অস্পষ্ট) সম্বন্ধের আধ্যাত্মিক দিক, দোয়াত-কলম ও আঠার বোতল, ব্লটার এবং তাম্বুলের বাটা, চশমার খাপ...) বাবা দিন-রাত বুড়ো বয়স পর্যন্ত মাথা গুঁজে লেখা-পড়া করতেন, নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন, আপনি কতদিন এসে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতেন, আপনি কাশি একটা মারা পর্যন্ত বাবা টেরই পাননি—এই যে একটা সাধনা, কোন আর্থিক লাভের কথা না ভেবে, মান-সম্মানের কথা না ভেবে এই যে একটা জ্ঞানের সন্ধান, একটা ডিস-ইন্টারেস্টেড কুয়েস্ট ফর নলেজ, এই যে ঘর-ময় দেখছেন বাবার অসংখ্য আধ-করা কাজ, আধা-লেখা প্রবন্ধ-টবন্ধ—যেগুলো এখন পারলে প্রকাশ করতে হবে—এই পরিবেশকে কি কমার্শিয়েলিজম-এর কবলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াটা আমার উচিত হবে, আপনিই বলুন গণেশদা....বাড়িটা আমার থাকার জন্য প্রয়োজন নেই সত্যি, বাড়িটা এখন আমার সম্পত্তি, আমি তা থেকে দু' পয়সা উপার্জন করে থাকতে পারি বটে, কিন্তু তা বলেই কি আমি বাবার এতদিনের অধ্যবসায়ের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন—'

ঠ-কৃ!

তার কথা বলা বন্ধ হল এবং 'আমি বুঝতে পারলাম পাঞ্জাবী লোকটা তাদের কথোপকথনের শেষে কোকাকোলার বোতল 'ঠক' করে নামিয়ে রাখল। বোতলের গা থেকে ছবিগুলো হারিয়ে গেল, আমিও 'চুক' শব্দ করে শেষ বিন্দুটা টেনে ঠ-ক্ করে বোতলটা কাউন্টারে নামিয়ে রাখলাম। নোট একখানা এগিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে এমনি জিজ্ঞেস করলাম দোকান রাত্রি কটা অবধি খোলা থাকে। বাড়িটা ভাড়া দেবে কিনা, পারলে সে কি একবার খোঁজখবর নেবে? আমি আবার আসব কাল-পরশুর মধ্যে। কাল সে থাকবে না? আচ্ছা, প...-টরশু? হবে, হবে। আচ্ছা...

বাইরে এসে সাইকেলের তালা খুললাম। .... উজ্জ্বল ... জ্বালিয়ে স্পিডওয়েল ট্রান্সপোর্টের সামনে ডিজেল ট্রাকগুলো থেকে বস্তু লোডিং-অনলোডিং হচ্ছে, অনেকগুলো লোক উচ্চস্বরে নির্দেশ দিচ্ছে এবং সব কিছুকে ডুবিয়ে দিয়ে অন্য একটা ট্রাক প্রচুর কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ করে বিকট শব্দে স্টার্ট নিতে চেষ্টা করছে, ... সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে গেলাম। বীণা কুটির অন্ধকার, শুধু তার বাঁ দিকের দেওয়ালে এ পাশের দালানটার জানলা-গুলোর আলো পড়ে আলো-আঁধারের একটা নক্সা সৃষ্টি হচ্ছে—এবং নিঃশব্দ। দালানটার আলোকিত জানলাগুলোর কোনদিকে রেডিও বাজছে, কোন একটা অফিসে একটা টাইপ-রাইটারের খটখট শব্দ, নিশ্চয় রুমে রুমে কথাবার্তা হচ্ছে, বাণিজ্য এবং গৃহসংসার, তৃপ্তি-আনন্দ - ক্ষোভ-বেদনা-কামনা-লালসা-প্রেম-বিরহ বিভিন্ন টুকরো টুকরো নাটকের সংলাপ যেগুলো নাটকের ওপরে আজকের

এই অন্ধকার নীরব বীণা কুটিরের মঞ্চে কবে কোন সময়ে যবনিকা পড়েছে, কবে তার শব্দ ও প্রাণ-ভঙ্গি শেষ হয়ে গেছে—!

একেবারেই কি শেষ হয়ে গিয়েছে?... রাত্রে বীণা কুটিরের কথা ভেবে ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং সকালে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আশ্চর্য হয়ে মনে করলাম, রাত্রে স্বপ্নে আমি একবারও বীণা কুটিরকে দেখিনি—(বস্তুতঃ কোন স্বপ্নই দেখিনি, বোধহয় খুব ক্লান্তি লাগছিল)!

সারাটা দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার অস্পষ্টভাবে বীণা কুটিরের কথা মনে এল, এবং ভুলেও গেলাম। বিকেলে আবার সাইকেলটা নিয়ে একটা ভাড়াবাড়ির খোঁজ করতে গেলাম। সুবিধা হল না। সাইকেলে চাপলাম—কিছু একটা মনে করতে চেষ্টা করে করে অন্যমনস্কভাবে প্যাডেল চালিয়ে গেলাম এবং অকস্মাৎ দেখলাম বীণা কুটির পার হতে যাচ্ছি—সেই একই জীর্ণ, পরিত্যক্ত রূপ, সন্ধ্যার আবছা আলো-ছায়ায় তার বিশীর্ণ বীণা গাছটা মৃদু মৃদু কাঁপছে, বোধহয় কোন এক দিক থেকে হাওয়া লাগছে। সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়লাম, কান পেতে কিছু শুনতে চেষ্টা করলাম, কানে পড়ল বিভিন্ন বালিগঞ্জ-বিপণির সংমিশ্রিত অনির্ণেয় রব এবং কোথাও একটা টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করছে এবং বীণা কুটিরের পুরনো বাতাসের কাঠ একটুকরোতে সম্ভবতঃ এড়িয়ে যাওয়া এক-খানা টিন থেমে থেমে খট্‌খট্‌ শব্দ করছে, কোন একটা কোণা থেকে পায়রার বক-বকম্‌ বক্‌......কোকাকোলার দোকানটায় ছেলেটা নেই, তার বদলে বুশ সার্ট পরা পুরুষ্টু মুখের এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। সাইকেলটা বাইরে রেখে ঢুকে গেলাম এবং কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কোকোকোলা চাইলাম।

দোকানে আজ বেশ ভিড় আছে, জোর বিক্রি হচ্ছে। নতুন লোকটার মুখভঙ্গি খুব সুবিধাজনক বলে মনে হল না, আমি তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম না। এক কোণায় দাঁড়িয়ে স্ট্রটা দিয়ে একটা টান দিলাম। আঃ! নাকে পরিচিত ঝাঁঝটা লাগল। কাউন্টারের ওপরে বোতলটা বাঁকিয়ে ধরে স্ট্রটার মুখে ডান হাতের তর্জনীটা রেখে লাল তরলটুকুর দিকে তাকালাম...... তরলটুকু কাঁপছে...তার গায় অন্য একটা ছবি ফুটে উঠতে শুরু করছে...হাওয়া দিচ্ছে, বীণা গাছটার পাতাগুলো কাঁপছে, রাত হয়েছে, বীণা কুটিরের বারান্দা অস্পষ্ট ...মোটরের হেড-লাইটের আলোয় বীণা-ফুলের গাছ ও বাঁশের জালিটা ঝলকে উঠল, লম্বা লম্বা দু' দুবার 'রেস' দিয়ে ফোর্ড গাড়িটার ইঞ্জিন বন্ধ হল, লাইট নিভল, গাড়ির দরজা খোলার শব্দ, স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে এলেন সেদিনের সেই প্রশস্তবক্ষ যুবক, এখনও পিছন থেকে দেখা গেল শুধু তার চওড়া দুটো কাঁধ ও সুগঠিত মাথা (নিশ্চয় গোঁফ আছে!), বাড়ির নতুন জমাইঃ জয়ন্ত? ভবানন্দ? কোন—ভবানন্দ। ভবানন্দ গাড়ির বাঁদিকের দরজাটা খুলে হাত এগিয়ে দিলেন, তার হাত ধরে নেমে এল বারান্দা ঝাঁট দেওয়া সেই মেয়েটাঃ বীণা (আবার অন্য নাম কি হতে পারে)। আবছা আলোতেও যেন বুঝতে পারা যায়—তার মুখ ঝলমল করছে, চোখে কি যেন একটা মদির আবেশ, সিঁথিতে নতুন লাল রেখা, তার দেহ-ভঙ্গির সাথে সাথে মুগার নতুন মেখলা-চাদরের মতো খচমচ শব্দ, যা হয়তো বেনারসী, এবং অন্ধকারে মাঝে মাঝে গা-ভরা গয়নার ঝিলিক—ভবানন্দের হাত ছেড়ে দিয়ে সে ঝট করে সিঁড়িটা লাফিয়ে বারান্দায় উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভবানন্দের হাত দুটো পেছন থেকে তার মসৃন কোমর জড়িয়ে ধরল—

'এই! কি হচছে কি! বাবা এসে পড়লে কি ভাববে।'

ইঃ, এই রাত দুপুরে আমাদের দেখতে

বাবা যেন জেগেই আছে—' চাপা হাসি মুখে নিয়ে বীণাকে জড়িয়ে ভবানন্দ বারান্দায় উঠলেন।

'মিছে গাড়ির শব্দ করে বাড়িতে ঢুকলে—খেৎ, এখানে নয়—ছাড়—ছেড়ে দাও না—লক্ষ্মীটি—প্লিজ। বড়দা এখনও পড়ছে. যদি হঠাৎ এসে পড়ে, কি যে—'

অস্ফুটে গলায় ভবানন্দ বললেন, 'বড়দা এত বেরসিক নয় যে নতুন বর-কনে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে এসে এত রাতে ঘরে ঢুকলে সে অভদ্রের মত...দেখি—'

বারান্দার বেড়ার দোলায়মান আলো-ছায়ার মাঝে মিশে গিয়েছে ভবানন্দ এবং বীণার ছায়া, কতক্ষণ দুজন বাহু বন্ধনে আবদ্ধ ছিল কারুর খেয়াল নেই, তাদের চুলে কোথাকার যেন উন্মাদ হাওয়ার বোল, হাওয়ায় কোন অজানা ফুলের সুবাস, আকাশে গুচ্ছ গুচ্ছ তারা, হয়তো ফাল্গুন মাস—

বহু সময়ের নীরবতার পর ভবানন্দ বললেন, 'বীণা, আগে যখন বিকেলে আমি তোমার সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, কত দিন ইচ্ছা হয়েছে এই বীণা গাছটার নীচে, এই জালিটার এদিকে তোমাকে জড়িয়ে ধরি, তোমাকে আদর করি, এত ইচ্ছা হয়েছিল, এত মন গিয়েছিল—তুমি কি কখনো বুঝেছিলে?'

বীণা কোন উত্তর দিল না, অন্ধকারে ভবানন্দের বুকে নিজের মাথাটা আরো জোরে চেপে রাখল। 'এবং আজ—যখন বড়দা কলেজে যেতে তুমি বারান্দায় বেরিয়ে আসছিলে, আমি বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম—সেই আগের মত তোমার সঙ্গে এই জায়গায় দাঁড়াতে এত মন গিয়েছিল—তুমি বুঝতে পেরেছিলে?'

—বীণা এবারো কোন উত্তর দিল না।

'বীণা?'

অন্ধকারে ভবানন্দের বুকের মাঝে বীণা অস্পষ্টে হাসলঃ 'তুমিও যে কি—সেটাও ঠিক বুঝি না। আর আজ বারান্দায় তোমার জেদী মূর্তি দেখে আমার যে মনে মনে এত হাসি পাচ্ছিল—চার বছর লজ্জার মাথা খেয়ে এইখানে আমার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেই গেল, আজকেই শুধু বড্ড লজ্জা লাগল একবারও কাছে এলে না, বাবার সঙ্গে কথা বলাই শেষ হল না—।'

ভবানন্দও লজ্জিতভাবে হাসলেন, 'হ্যাঁ..., চল, ভিতরে যাবে এখন?'

উঁ, বীণা বলল এবং হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, ইস। ভিতরে যেতে একেবারেই ইচ্ছা হয়নি এত যে ভাল লাগছে—কত দিন পরে আমরা এই কোণটায় এভাবে দাঁড়াতে পেরেছি—আর কবে যে তোমাকে এভাবে এখানে পাব বীণার গলার স্বর বিষণ্ণ হয়ে উঠল, আর ক'দিন পরে ত আমরা চলে যাব, তুমি যে কি একটা ঝামেলার চাকরিতে ঢুকলে—কোথায় কোথায় কোন লঙ্কায় যে ঘুরে বেড়াতে হবে, আজ পাসি-ঘাট, কাল আইজল...বাবা আজ তোমাকে যেভাবে কথাগুলো বলতে সুরু করছিল, শুনে আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে আরম্ভ করছিলঃ 'আমার আর ক'দিন, আমি চলে গেলে তোমাদেরই এই বাড়িটা দেখতে হবে, তোমাদের নামেই বাড়িটা লিখে দেব.... বাবা কেন সে ভাবে বলল?'

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে ভবানন্দ বললেন, 'বড়দার ত এখান থেকে চলে যাওয়াটা প্রায় ঠিক হয়েই গেছে. বাড়ি জমি চালাবার মত প্রকৃতি তার নয়। আর ছোড়দা ত ঘর থেকে বেরিয়েই গেছে, বাবা বোধহয় সে কারণেই এই সব ভাবছে—

'এত খারাপ লাগে...বাবা যে বলেছে তোরা নিজে থাকিস বা ভাড়া দিস, যা খুসী করবি...এত খারাপ লাগছে—আমরা আমরা কোথায় দূরে দূরে থাকব—আমরা কেউ না থাকলে বাড়িটার কিবা অবস্থা হয়. কোত্থেকার কোন লোক এসে এখানে থাকবে. সব আলাদা হয়ে যাবে—এই বীণা গাছটাই বা কতদিন এভাবে থাকতে দেবে—'

ভবানন্দের দু হাত ধীরে ধীরে আবার বীণাকে বেষ্টন করে চেপে ধরল, বীণার গালে গাল রেখে ভবানন্দ আস্তে আস্তে বললেন, 'বীণা, তোমাকে আমি প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, তুমি এখানটায় দাঁড়িয়েছিলে. রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সিনেমার পোস্টার টাঙিয়ে একটা ঘোড়াগাড়ি পার হয়ে যাচ্ছিল— আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়ে ছিলাম, ভাবলে এখনো আশ্চর্য লাগে...এই বারান্দা, এই বীণা গাছটা আমারও জীবনের একটা অংশ,—যেমন এই বাড়ির প্রত্যেকটি, চেয়ার-টেবিল, প্রত্যেক-খানা ফটো, প্রতি জোড়া কাপ-প্লেট তোমার নিজের নিজের লাগে, প্রতিটা কোণায় তোমার হাতের যত্ন...ঠিক আছে, এই বাড়ি যদি ভবিষ্যতে আমাকেই চালাতে হয়, আমিই চালাব, এর কোন আকর্ষণ নষ্ট হতে দেব না, কোন অচেনা লোককে কখনো এই ঘর এই বারান্দার মায়া পাল্টাতে দেব না, আমরা যখনই আসব—এই সব আমরা ঠিক এভাবেই পাবো—যতদূর আমার ক্ষমতায় কুলোয়—'

এই আলো আঁধার, পাতার দোলনের এই সর-সর শব্দ, মদির হাওয়ায় ভেসে আসা ফুলের রেণু, আকাশের এই গুচ্ছ গুচ্ছ তারা...আমি নিজ মনে বললাম, এবং দোকানের গোলমাল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, দোকান ফাঁকা হয়ে গেছে, দোকানদার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোকোকোলার বোতলে কোনো ছবি নেই। টান দিয়ে বাকি তরল টুকু গলাধঃকরণ করে বোতলটা ঠ-ক করে নামিয়ে রাখলাম, নিজ মনে চুপচাপ বললাম, 'খালি বাড়ি একটায় ভাড়া পাওয়ার কথা ভাবে না, এখনও এমন লোক আছে' ভবানন্দ আছেন, বীণা আছে।'

'কি বলছেন?' সামান্য আচাম্বিত হয়ে দোকানদার বল, 'ফিফটি ফাইভ পয়সা।'

উৎফুল্লচিত্তে সাইকেলে চড়ে বাড়ি পৌঁছলাম। রাতে খুব ভাল ঘুম হলঃ কি শান্তি...বাণিজ্য ও অর্থাগম চিন্তায় যখন প্রতি বর্গ ফুট জমি প্রতি ঘনফুট বায়ু দালানীকৃত। ডিজেলের ধোঁয়া, কল-কব্জার ঘর্ঘর, লাভ লোকসানের চক্রব্যূহ, এবং বায়ু সঙ্কুচিত ফ্লোরোসেন্ট ঔজ্জ্বল্যের নিচের যথেচ্ছ ধুলো ও কর্দমতা ও দুর্গন্ধময় আবর্জনায় বায়ুমণ্ডল সংপৃক্ত, তেমন অবস্থায় এই পৃথিবীতে আজও আছে এক-জন পরমেশ, এক যুগল ভবানন্দ-বীণা, রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের রুচি বিবর্জিত আকাশচুম্বী ঔদ্ধত্য যাকে প্রভাবিত করে না, যাদের ভাড়াটিয়ার দরকার নেই, মাসে অতিরিক্ত শ'-তিনেক টাকা লাগে না—বা হয়ত, লাগে (কাকে লাগে না?), কিন্তু যারা এখনও উপলব্ধি করে যে তার চেয়ে দামের কথা হল একটা শ্রদ্ধেয় স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা, তার চেয়ে বড় কথা আত্মার নিশ্বাসের জন্য এক টুকরো খোলা আকাশ, প্রাণের স্পন্দনের জন্য এক ঝলক উন্মুক্ত বাতাস, চোখের শান্তির জন্য এক টুকরো সবুজ ঘাসের লন, একটা গাছ, যেখানে মনের মুকুলে ধরাবে, নিস্তব্ধ রাত ও অলস মধ্যাহ্ন, একটা বারান্দা, একটা পুরানো গুঞ্জন ধ্বনি একটা বিলীয়মান প্রিয় পরিবেশ—

পরের দিন অফিসের টিফিনে যখন একজন প্রস্তাব করল যে আজ চায়ের বদলে কোকোকোলা খাওয়া যাক, আমি মৃদু হেসে অসম্মতি জানালাম—আমি কোকোকোলার আসল ঝাঁঝ পাব বিকেলে আমার সেই মনিহারী দোকানটায়...সেদিন ভাড়া বাড়ির সন্ধানে গেলাম না (যদিও অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট একটা খবর দিয়েছিলেন), সন্ধ্যার আধা অন্ধকারে বীণা কুটিরের সামনে সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম, চোখে পড়ল বারান্দায় একটা চিঠির ক... আছে (কেন যে আগে দেখিনি) এবং বারান্দায় যেন কিছু নোংরা কাপড়ের একটা বান্ডিল পড়ে আছে কাল রাতে একবার বৃষ্টি হয়েছিল,—অনুমান করলাম কোন ভিখিরি জাতের লোক হয়ত রাত্রিতে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল, এবং বেওয়ারিশ বাড়ি দেখে হয়ত এখন ওখানেই রাতের শোয়াটা আরম্ভ করে দেবে...সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে দোকানটার সামনে দাঁড় করালাম—আঃ, ছেলেটা আছে (আজ দাড়ি কামিয়ে এসেছে, কিন্তু সেই একই জামা), কিন্তু আজ ব্যস্ত। এই গরমেও স্যুট-টাই পরা ফিটফাট এক মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক কাউণ্টারে কতকগুলো বাকস থেকে নানান প্রসাধন দ্রব্য ও স্টোর সামগ্রী বের করছেন এবং একটা খাতায় কাঠ-পেন্সিল দিয়ে কিছু সংখ্যা বসাচ্ছেন, বুঝলাম কোন কোম্পানীর প্রতিনিধি। ছেলেটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক-বার মৃদু হাসল এবং লোকটাকে এক মিনিট বলে আমার দিকে এগিয়ে এল, মাথা নাড়ল।

'বুঝলেন, হবে না—

সেটা অবশ্য আমিও জানি! আমিও সন্তুষ্টচিত্তে মৃদু হাসলাম। বাড়িটা ভাড়া হবে না বলেই আমি আশা করছিলাম।

কোকোকোলা দেব?'

'দিন।'

স্ট্র একটা প্যাকেট থেকে বের করে ছেলেটা বলল, আমাদের প্রোপ্রাইটারকে [illegible] লোকাল মানুষ, এই পাড়ারই—তিনি বাড়িটার সমস্ত ইতিবৃত্তটা জানেন। আমিও সেদিন আপনাকে ঠিক বলছিলাম, বড় ছেলেটা প্রফেসর, বড় কেপেবল লোক, ছোটটা ডাক্তার, স্ত্রী পাঞ্জাবী কি সেই রকম—কিন্তু [illegible] সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ বড়—মানে বাবা তাঁকে সো[illegible]টু সে বাড়ি থেকে একরকম বের করে—কোম্পানীর প্রতিনিধির দিকে তার চোখ পড়ল, 'আচ্ছা, আপনি এটা খেয়ে নিন, আমি এ'কে ওয়েট করিয়ে রাখছি—'

ছেলেটা তাঁর কাছে গেল। স্ট্রটা দিয়ে একটা টান মেরে কাউন্টারে বোতলটা বাঁকা করে দাঁড় করিয়ে তরলটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকলাম...ছবি...বীনা কুটিরের পিছন উঠোনে রোদ পড়ছে পড়ছে, একটা পুরনো বেঞ্চ, শূন্য খরির মাচাং, তুলসী তলায় শিখাহীন প্রদীপ, একটা বুড়ো পেঁপে গাছ...অস্থিরভাবে একজন ৩০।৩২ বছরের লম্বা লোক পায়চারি করছেন, তাঁর মাথাটা মাঝে মাঝে উঠোনের কাপড় মেলে দেওয়া দড়িটায় ঠোক্কর খাচ্ছে, তিনি বিরক্ত হয়ে দড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন এবং চোখ কুঞ্চিত করে ক্রুদ্ধভাবে সিগারেট খাচ্ছেন তাঁর টুইড কোটটার পকেট থেকে স্টেথোস্কোপ একটার একটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। বেঞ্চটায় বসে প্রকান্ড খোঁপা মাথা চুড়িদার কুর্তা পরা একটি মেয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে তার মুখচ্ছবি অস্পষ্ট কিন্তু বক্ষাস্ত পাতলা দোপাটার নীচে দেখা যায় তার বাহু সুগোল ও গোলাপী হঠাৎ পায়চারি বন্ধ করে একটা ক্রুদ্ধ টান মেরে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে ডাক্তার বেঞ্চটার কাছে এলেন এবং তীক্ষ্ণ মনোযোগে নীচে তাকালেন চোখের দিকে, তাঁর ঠোঁট দুটো নড়তে লাগল....আবার সিনেমার ক্লোজ-আপ দৃশ্যের মত ছবিটা সামনে এগিয়ে এসে বোতলের গা ভরিয়ে দিল, ডাক্তারের সুদৃঢ় ঠোঁট ও চৌকোণা বেপরোয়া চিবুকের নীচে মেয়েটার যৌবনোজ্জ্বল গোলাকার মুখের উৎকণ্ঠিত লাবণ্য, বিস্ফারিত দুটো আয়ত চোখ (ঠিক যেমন একটা ক্লোজ-আপ শট কদিন আগে একটা হিন্দী বইয়ে দেখেছি।).....ডাক্তার কথা বলছেন (তাঁর গলা সেই কোম্পানির প্রতিনিধির গলার মত), তিনি বলছেন...আমি তার মানে বাবার ত্যাজ্যপুত্র, রেহানা, আমি ত্যাজ্যপুত্র হয়েই থাকব...আমি ত দাদার মত নই, আমার সব কথা আমি নিজে নিজে ডিসাইড করেছি, কারুর কথা গ্রাহ্য করিনি, বাবা বললেও আমার অপছন্দ কাজ আমি করিনি...বাবাদের অমতে তার পরে মেডিকেল পড়তে গিয়েছি—শুধু বীণা আমাকে সাপোর্ট করেছে—বাবা টাকা-কড়ি দিতে চায়নি, তবুও যা হয় হবে বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে এডমিশন নিয়েছি—আমাকে এডামেন্ট দেখে তবেই বাবা আল্টিমেটলি আমার ডিসিশান মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তারপরে আমার লাইফে তুমি এসে পড়লে, তোমার সাথে আমি দিন দিন ইনভলভড হয়ে পড়লাম, তুমি ছাড়া আমি থাকতে পারব না—এমন অবস্থা হল—কত কথা শুনলাম কিন্তু সব কথা আমি উড়িয়ে দিলাম, তোমার ব্যাক-গ্রাউন্ড, তোমার জাত-ধর্ম, তোমার পূর্বের হিস্ট্রি, সব আমি ইগনোর করলাম, তোমাকে আমি বিয়ে করব বলে ডিক্লেয়ার করে দিলাম। সবারই কি আপত্তি, কত কথা কাটাকাটি, কত রাগারাগি—তুমি ত সবই জানো। বাবা বলে দিল, দেখ—এই মেয়েটার কথা আমরাও সব শুনেছি, তুইও শুনেছিস, সব জেনে-শুনেও তুই এই মেয়েটাকে আমার বাড়িতে—যা হোক, বাবা বলে দিল আমার অমতে যদি তুই এই বিয়ে করিস, তোকে আমি একটা ফুটো পয়সা দিয়েও সাহায্য করব না। আমিও বলে ফেললাম, ঠিক আছে, আমিও আর আপনার কাছ থেকে একটা ফুটো কড়িও নেব না—তার পরে কত দুর্দিন গেছে, কত কষ্টে ধারটার করে বৃত্তি-টৃত্তির সাহায্যে মেডিকেলের পড়া শেষ করেছি, তুমি সব জান, তুমি ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছ.... আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে (মাত্র বীণা এই ক্ষেত্রে আমাকে দূর থেকে সাপোর্ট দিয়ে আসছে)—এবং এখন, সব সম্পর্ক কেটে যাওয়ার পরে, মৃত্যুর আগে আমাকে কি এই সমস্যায় বাবা ফেলে রেখে গেল—কেন এরকম এক-খানা উইল করে রেখে গেল, কি ভেবে বাবা মৃত্যুর আগে এই বাড়িটার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে গেল। আমি এই প্রপার্টি নিয়ে কি করব, এই বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে গিয়েছি (ডাক্তার মেয়েটার কাঁধে একটা হাত রাখল, ছবিটা থেকে ভঙ্গিটা মেয়েটার মুখখানার অর্ধেক কেটে দিল)—রেহানা, রেহানা, তোমার জন্যই আমি আল্টিমেটলি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, এই উঠোনের এই জিনিসগুলো আজ আমি আর চিনতে পারি না—তুমি অন্তত আমাকে এই বাড়িটায় থাকতে বলো না, এই বাড়িটা ভাড়া দিয়ে তার [illegible] আমাকে বল না—বুঝেছি, এই [illegible] অবশেষে বাবা তার ত্যাজ্যপুত্রকে বাড়িতে ডাকল, বুঝেছি, বুঝে আমার চোখে জল আসছে, কিন্তু আমি কখনো কথা পাল্টাইনি, বাবাকে বলে দিয়েছি আমি আর কখনো তোমার কাছ থেকে একটা কানা কড়িও নেব না—ঠিক আছে, বাড়িটা আমি মেইনটেইন করে যাব। যেখানে যা লাগে টেকস দিয়ে যাব আমার নিজের পকেট থেকে টাকার শ্রাদ্ধ হতেই থাকবে, যদি সেটাই হওয়ার কথা ছিল—তা হলে তাই কথা রইল, কালকেই আমি আমাদের কোলকাতার অফিসে মিস্টার মেহতাকে ট্রাংক-কল করছি, সোমবার নাগাদ আপনি পুরো কনসাইনমেন্টটা পেয়ে যাবেন, আমি খবর দেওয়াব, রেস্ট এসিওরড—আচ্ছা তা হলে, নমস্কার—'

শেষের কথাগুলো কোম্পানির প্রতি-নিধি ভদ্রলোকের। বোতলের লাল তরলের গায় টিউব লাইটের আলো ঝিলিক দিচ্ছে, ছবি অন্তর্হিত।

প্রতিনিধি ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

আঃ আমি নিজেই নিজেকে বললাম, সম্পত্তির চেয়ে প্রতিজ্ঞাকে বেশি মূল্য দেয়, এখনো পৃথিবীতে এমন লোক আছে! টাকাই কি সব?

ছেলেটা এগিয়ে এল।

'যা হোক, হবে না। অন্ততঃ আরো বহু দিন। দুই ভাইয়ের মাঝে বাড়িটার স্বত্ব নিয়ে মোকদ্দমা চলছে, বাড়িটা সেজন্য এমনি পড়ে আছে। কে পাবে কেস শেষ হলেই বোঝা যাবে। বহুদিন আছে, আপনি এই বাড়িটার আশা ছাড়ুন। বড়টা প্রফেসর— আজকাল নাকি ধুমধাম টেকস্ট বুক ও নোট লেখেন, অনেক টাকা কামালেন, তিনি বাড়িটায় নিজের প্রেস খুলতে চাচ্ছেন, নিজে পাবিলশ করতে পারলে বহু বেশি লাভ। ছোটটার— মানে ডাক্তারের নাকি একটা আর-সি-সি করে ভাড়া-টাড়া দেওয়ার ইচ্ছা, নিজের চেম্বারও করবেন গ্রাউন্ড-ফ্লোরে। এনিওয়ে, আপনাকে ইমিডিয়েটলি যদি লাগে, আমি লাচিত-নগরে একটা বাড়ির খবর পেয়েছি—'

চু-ক শব্দ করে অবশিষ্ট তরলটুকু টেনে নিলাম, বোতলটা ঠক করে কাউন্টারে নামিয়ে রাখলাম এবং তার মুখ দিয়ে ভিতরের শূন্য গর্ভের দিকে অনেক ক্ষণ নিরুত্তর হয়ে তাকিয়ে থাকলাম......

অনুবাদ : ভূপেন শর্মা

ভয়

হেমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যাস্তের দিকে মুখ রেখে আমি বসেছিলাম। একটা নলের ভিতর দিয়ে জল বা বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো আমার মাঝে সময় বয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে মনে কিছু না ভাবা সত্ত্বেও মন্ত্রের মতো একটা বাক্য আমি আওড়ে যাচ্ছিলাম : 'আমার মাথায় আছে একটা সূর্য আর হৃদয়ে একটি ঝড়।' বাক্যটা আদৌ আমার উদ্ভাবনপ্রসূত নয়। সম্ভবত কোথাও কোন জায়গায় পড়েছিলাম, এখন সেটা আমার স্মৃতির উত্তরাধিকার। হঠাৎ আমার পেছন দিকে কারুর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। পা মাড়ালে শুকনো পাতার বুকে যে রকম মর্মর শব্দ হয়, ঠিক তেমন করে আগন্তুকের পায়ের চাপে পিষ্ট হওয়া নিরবতার বুক থেকে ভেসে এল একটা বিষণ্ণ মর্মর ধ্বনি। কিছু বিরক্তি নিয়ে আমি পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম : একটি লোক আমার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর মুখটা আমি ভাল করে চিনতে পারিনি। আমি পেছনে ফিরে তাকাবার মুহূর্তেই সূর্যাস্তের সবটুকু শেষ আলো এসে ও'র মুখের ওপর ঠিকরে পড়ল এবং সেই সোনালী রশ্মিপুঞ্জে তাঁর মুখখানা ঢাকা পড়ে আবছা আবছা চিনতে পারা যায় না হয়ে গেল। শুধু একটি মুহূর্ত। পরের মুহূর্তেই সূর্য ডুবে গেল চোখের পলকেই। দ্বিতীয়বারের জন্য সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকার তাঁর মুখখানা অস্পষ্ট করে তুলল।

'আপনি?...আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনি কে?'

'আমি অমল বড়ুয়া।'

লোকটি এমনভাবে কথাটা বললেন যেন নিজের কথার সত্যতা সম্পর্কে তাঁর নিজের মনেই সন্দেহের অবকাশ ছিল। আমার ধারণা হল যে এই ভদ্রলোক বরং বলতে চেয়েছিলেন, 'আমি বোধহয় অমল বড়ুয়া।'

আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না যে মানুষটা নিশ্চয় পাগল। তা না হলে অমল বড়ুয়ার বাড়িতে এসে সেই অমল বড়ুয়ারই সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কি করে বলতে পারলেন যে তিনিই অমল বড়ুয়া? মাত্র এক মুহূর্ত আগে আমি ওঁকে বসতে বলব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন আমি ভাবলাম—যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তাঁকে বিদায় করা ভাল। বিস্ময় এবং বিরক্তি চেপে রেখে যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম 'এই পৃথিবীতে অমল বড়ুয়া শুধু একজনই থাকতে পারে। আর সে-ই হলাম আমি। আচ্ছা, এখন আপনি আসতে পারেন।' আমি ও'র থেকে আমার মুখটা ঘুরিয়ে আনলাম এবং এবার পশ্চিমমুখো হয়ে বসলাম। পাগল লোকটার জন্য আমার কি যেন দয়া হয়েছিল, কিন্তু একজন পাগলের সঙ্গে কথা বলে এই দুর্লভ অপার্থিব মুহূর্তগুলো নষ্ট করতে আমার মন চাইছিল না।

কিন্তু একটু পরে আমি টের পেলাম—লোকটা তখনও যাননি, একই জায়গায় তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আচ্ছা ঝামেলা বাবা! আমি আবার ও'র দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। এবার তাঁর মুখটা আগের চেয়ে কিছু স্পষ্ট, কেননা কয়েকটা তারার আলো তাঁর মুখে ঝলসে উঠছে। আশ্চর্যের কথা হল এই যে লোকটার মুখখানা এবার কিছু স্পষ্ট দেখার পর ও'কে আর তেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হল না। কোথায় যেন ও'কে কালে-ভদ্রে দেখেছিলাম, আলাপ হয়েছিল, পুরু কুয়াশার মাঝে কোন একটা জিনিস জোর করে তাকিয়ে দেখার মত আমি কিছুক্ষণ ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমি ভাবলাম—তিনি আর যাই হন না কেন, তিনি কখনো 'আমি' অর্থাৎ অমল বড়ুয়া হতে পারেন না! কিছুক্ষণের জন্য আমার চিন্তা এমন জট পাকিয়ে গেল যে আমি অনুভব করলাম—একটা পাগলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পাগল হয়ে যাইনি ত? যদ্দুর সম্ভব শান্তকণ্ঠেই তাঁকে বললাম, 'আপনি এখনো যাননি কেন? আপনি নিশ্চয় কোন ভুল করে ভুল জায়গায় এসেছেন। আমি এখন একটা জরুরী কথার চিন্তায় বড় ব্যস্ত। আপনি যত তাড়াতাড়ি বিদায় নেন, আমি ততই খুশী হব।'

আমার কথা লোকটাকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করল না। সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে তিনি বললেন, 'ভুল আমি করিনি করেছেন আপনি। মনে করতে চেষ্টা করুন—বহু দিন আগে খবরের কাগজের নিরুদ্দেশ কলমে আপনি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, : আজ থেকে কিছুদিন আগে অমল বড়ুয়া নামে একটি লোক বাড়ি থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। একটা স্বপ্নের সন্ধানে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি আর ফিরে আসেন নি। কোন সদাশয় লোক তাঁর সন্ধান দিতে পারলে বা তাঁকে বাড়িতে আনিয়ে দিলে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ও'র প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞতায় বাঁধা থাকবে।' আপনি কিন্তু একটা বড় রকমের ভুল করেছিলেন। ওই বিজ্ঞাপনে নিরুদ্দিষ্ট লোকের কোন বিবরণ আপনি দেননি। ফলে আপনার বিজ্ঞাপন কোন কাজে এল না। যাকগে, শেষে আমি তো নিজেই ফিরে এলাম।'

লোকটার কথার দৃঢ়তা এবং আত্মপ্রত্যয় আমাকে স্তম্ভিত করে তুলল। প্রকৃত অমল বড়ুয়া তিনি না আমি সেই প্রশ্নের মীমাংসা পরেও হবে। কিন্তু আসল পাগল তিনি না আমি সেই প্রশ্নটা ওই মুহূর্তে আমার মনে একটা বাস্তব সমস্যা হয়ে

হোমেন বরগোহাঞি অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এবং অগ্রণী সমালোচক। তিনি সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রবন্ধকার, গল্প লেখক, কবি এবং ঔপন্যাসিক। সরকারের সঙ্গে মত-বিরোধ ঘটে 'বিভিন্ন নরক' নামের বইটার জন্য। পরে সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি সম্পাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক বার্তালোচনী সাপ্তাহিক নীলাচলের। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গল্প সংগ্রহ ঃ 'স্বপ্ন স্মৃতি বিষাদ' গল্প আরু নকসা, বিভিন্ন কোরাছ উপন্যাস-গুলির অন্যতম ঃ 'সুবালা', 'কুশীলব' 'সন্ধ্যার পূরবী পুয়ার বিভাস', পিতা-পুত্র আদি।

সম্পাদিত গল্প সংগ্রহ ঃ রৌদ্র নীলিমা, 'শ্রেষ্ঠ অসমীয়া গল্প'। সুবালা তাঁর অন্যতম বিতর্কিত উপন্যাস এবং পিতা-পুত্র সাম্প্রতিকতম অনন্য সৃষ্টি। শ্রীবরগোহাঞি জর্জ লুই বরহেস-এর রচনার একান্ত অনুরাগী এবং তাঁর প্রিয় গান হল রবীন্দ্রসংগীত। তিনি অন্ত-র্মুখী। তাঁর রচনা অসমীয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

উঠল। ওরকম একটা বিজ্ঞাপন সত্যিই দিয়ে-ছিলাম কিনা তা অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না। নিজের মানসিক সুস্থতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা মানুষের মতো আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই বিজ্ঞাপন ঠিক কবে দিয়েছিলাম আপনার মনে আছে কি?'

'কবে?'—প্রশ্নটা তিনি নিজেকেই কর-লেন না আমাকেই করলেন আমি ভাল করে বুঝতে পারলাম না। বেশ খানিকটা বিব্রত বোধ করা মানুষের মত তিনি আবার বললেন, 'কবে? অর্থাৎ আপনি সময়ের কথা বলছেন? এই সময় জিনিসটা আমার জন্য একটা অতি দুর্বোধ্য আর ঝঞ্ঝাটপূর্ণ কথা। আমি এর রহস্য কিছুই বুঝি না। নদীর পাড়ে বসে থাকা কোন লোক বলতে পারে নদী কোন দিকে বইছে। কিন্তু সাগরের পাড়ে বসে থাকা লোক কি তা বলতে পারে? ঠিক কবে বলতে পারব না, কিন্তু একটা বিন্দুতে সময় আমার জন্য বহুকাল আগেই স্তব্ধ হয়ে গেল—ঠিক যেভাবে ফ্রিজ প্রয়োগে সিনেমার পর্দায় সময় স্তব্ধ হয়ে যায়, যৌবন কিম্বা বার্ধক্য, আনন্দ, যন্ত্রণা, ভয়, বিষাদ—প্রেম কিম্বা অপ্রেম—মোট কথায় মুহূর্তের অভিজ্ঞতা জীবন সেই মুহূর্তের ফ্রেমে চিরকালের জন্য যেভাবে অপরিবর্তনীয় রূপে বন্দী হয়ে যায়। আপনার 'কবে' শব্দটার আমার জন্য কোন অর্থ নেই।'

লোকটার কথা শুনে আমার ভয় বাড়তে থাকল। তিনি যে একজন পাগল, সেই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন তিনি বোধহয় আমাকে পাগল না করে ছাড়বেন না। নিরুপায় হয়ে আমি তাঁকে আবার একবার জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনার নামটা কি বলবেন?'

'অমল বড়ুয়া।'

'কিন্তু আমার নামও অমল বড়ুয়া।' আমি প্রায় অধৈর্য হয়েই বলে ফেললাম।

'তা হলে আমিই আপনি—বা',—একটু থেমে তিনি বললেন, 'আপনিই আমি।'

এর পরের নিরবতা ঠিক কতক্ষণ অক্ষত ছিল আমি বলতে পারব না। খুব সম্ভব কয়েকটা মুহূর্তমাত্র, কিন্তু আমার হঠাৎ অনুভব হল যেন ইতিমধ্যে বহু যুগ পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই আমি বোধহয় সময় সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা পাল্টাতে সুরু করেছি অর্থাৎ আমি নিজের অজ্ঞাত-সারে 'আমি' থেকে 'তিনি' হতে আরম্ভ করেছি। এক নামহীন ভয় আমাকে আস্তে আস্তে গিলতে সুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'দাঁড়ান, আপনি আমাকে পাগল করে তুলেছেন। দুজন লোক কি করে এক হতে পারে? এখনই এই মুহূর্তেই এই প্রশ্নের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করতে হবেই'—পরনের জামাটা ওপর দিকে তুলে বুকটা বের করে আমি বললাম, 'এই দেখুন, আমার বুকে একটা দাগ আছে। এক সময়ে একটা গুরুতর আঘাত লেগে এখানে একটুকরো ঘা হয়ে-ছিল। সেটা কবে শুকিয়ে গেল, কিন্তু তার দাগটা গেল না। আপনি আপনার শরীরের একই জায়গায় এইরকম একটা দাগ দেখাতে পারবেন?'

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বিষণ্ণ রহস্যময় হাসি ছুঁড়ে দিলেন। পরে নিরবে গার জামাটা তুলে বুকটা দেখা-লেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লাম। আমার বুকের মত তাঁর বুকেও ঠিক একই জায়গায় এক টুকরো প্রকাণ্ড ঘা। পার্থক্য

শুধু একটাই যে তাঁর ঘা ঠিক আমার মত শুকনো নয়, তাঁর সেই কাঁচা রক্তাক্ত ঘা থেকে বের হচ্ছে যন্ত্রণার উজ্জ্বল জ্যোতি।

আমি জামাটা ঠিক করে নিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মত তাঁকে বললাম, কিন্তু আপনার ঘা টুকরো ঠিক আমার মত নয়। আমার ঘা শুকনো, এখন সে কেবল একটা দাগ। কিন্তু আপনার ঘা থেকে এখনও রক্ত বের হচ্ছে।

তিনিও তাঁর জামাটা ঠিক করে নিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েই যেন বললেন, 'সেটা এমন কিছু কথা নয়। সময় সব ঘা শুকিয়ে দেয়। সময়ের বাইরে দাঁড়ালেই আবার তা থেকে রক্ত বেরোয়, যন্ত্রণার জ্যোতি বিকিরণ হয়।'

তাঁর কথার উত্তরে কি বলব কিছুই খুঁজে পেলাম না। সাফ কথা, আমি বোধহয় চিন্তা করা ছেড়েই দিয়েছিলাম, নিজের অজ্ঞাতসারে আমি তাঁর মন দিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছিলাম। আমার একান্ত নিজস্ব আত্মপরিচয় অর্থাৎ আইডেনটিটি কিভাবে প্রমাণ করা যায় তার জন্য আমি একটা নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করলাম। হঠাৎ আমি দৌড়ে গিয়ে ভিতর থেকে একটি ভদ্রমহিলাকে তার হাত ধরে টেনে আনলাম বাইরে। তাঁর মুখমণ্ডলে কোন ভাবান্তর দেখতে পেলাম না। আমি বললাম, দেখুন, এই ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী। এ হচ্ছে আমার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তার শরীরে আমি অতীতের অজস্র দিন-রাত্রি, আঁধার-আলোক, সময়ের হাজার-বর্তন পরংস সৃষ্টি—এই সব বেঁধে রেখেছি। তার মনে লিখে রাখছি একান্ত-ভাবে ব্যক্তিগত আমার জীবনের ইতিহাস।'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে তিনি শান্তভাবে বললেন, 'এই ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী।'

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল। উত্তেজিতভাবে আমি বললাম, 'তার শরীরটা, যেটা আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি—তার সেই শরীরটা আপনি কি বর্ণনা করতে পারবেন?'

'তার বুকে আছে দুটো জোৎস্নার ঝাড়ু, আর দুধফোটা জমে যাওয়া রক্ত। তার উরুতে আছে দুটো সূর্যাস্ত। সে যখন বিছানায় একাত-ওকাত করে, তখন রক্তের সমুদ্রে প্রকাণ্ড জোয়ার ওঠে।

আমার ঠোঁটে একটা বিজয়ী গর্বের হাসি ফুটে উঠল। উত্তেজিত হয়ে আমি বললাম, 'আপনি হেরে গেলেন। প্রমাণ হয়ে গেল যে আপনি 'আমি' নন। আসলে তার বুকে আছে দুটো ঘনীভূত মধু-ঝোলের নাড়ু, তার ওপরে দুটো ছোট্ট মৌমাছি। তার উরুতে আছে মেঘ-মেদুর আকাশের ছায়া পড়া দুখানা শ্যামলী শস্যক্ষেত্র। সে যখন বিছানায় একাত-ওকাত করে, তখন আদিম অরণ্যানী ঝড়ে আন্দোলিত হয়...'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে তিনি শান্তভাবে বলে উঠলেন, 'সীমার মাঝে বন্দী হয়ে থাকলেই সেরকম দেখায়। আমি দাঁড়িয়ে থাকা জায়গা থেকে দেখুন, অবিকল আমি দেখার মতই দেখবেন।'

চিৎকার করে কিছু একটা বলতে চেয়েও আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাঁর প্রশান্তির মাঝে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস। অপর পক্ষে অস্থির এবং উত্তেজিত হয়ে আমি বোধহয় এ কথাকেই প্রমাণ করছি যে আমার কথায় আর আগের মত বিশ্বাসের জোর নেই। তবুও শেষ চেষ্টা একটা করে দেখার প্রবণতায় আমি আবার একবার বললাম, 'আপনি যদি 'আমি-ই' হন, তাহলে আমি যা ভাবি আপনাকেও ঠিক সেই একই কথাই ভাবতে হবে। আচ্ছা বলুন ত, ঠিক এই সময়ে আমি কি কথা ভাবছি।'

'আপনার প্রশ্নটাই ভুল,' তিনি অবিচলিত হয়ে বললেন, 'আপনি কেন ধরে নিয়েছেন যে কোন এক মুহূর্তে আপনি শুধু একটি কথাই ভাবতে পারেন বা ভাবেন? একটা দৃষ্টান্ত দিই। একদা সূর্যাস্তের সময়ে, পৃথিবী অপার্থিব হওয়ার মুহূর্তে এই ভদ্রমহিলা একটা অদ্ভুত রহস্যময় হাসি হাসছিলেন। আপনার ইচ্ছা হল—তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে আপনি সেই হাসিটা খেয়ে ফেলবেন। আমার কিন্তু ইচ্ছা হয়েছিল—সূর্যাস্তের মত সেই হাসিটা আমি সন্ধ্যার আকাশে চিরকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখব, তার আলো গায়ে মেখে আমি চিরকাল বসে থাকব।' আসলে একজন মানুষই এই দুটো কথা ভেবেছিলেন।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই চাঁদ উঠছিল। আমি পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে বললাম, 'আমাদের দু'জনার বিবাদ শেষ করতে এখন শুধু একটা উপায়-ই বাকি আছে। আসুন, আমরা 'টস' করি। টসে যিনিই জিতবেন, তাঁর কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হবে। বলুন, অক্ষর না মূর্তি।'

'অক্ষর।'

আমি হাতের তালুতে মুদ্রাটা টস করলাম। মুদ্রাটা শূন্য থেকে তালুতে এসে পড়ার সংগে সংগেই চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে উঠল অক্ষরের দিকটা। আমার বুক থেকে একটা শব্দহীন আর্তনাদ বের হয়ে এল। নিরাশার শেষ সীমায় এসে উপনীত মানুষের মত শূন্য দৃষ্টি দিয়ে আমি তাঁর চোখে চোখ রাখলাম। আলোতো জোৎস্নায় তাঁর মুখের ভাষা আমি ভাল করে পড়তে পারলাম না। কিন্তু দেখতে পেলাম যে তিনি হঠাৎ এক পা দু'পা করে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি তাঁর দিকে মুখ রেখে, তাঁর চোখে চোখ রেখেই এক পা এক পা করে পিছোতে লাগলাম। একটা বিরাট শক্তিমান জন্তু তার অসহায় আর অনন্যোপায় শিকারকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে পরম আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে চলার মত তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন......। তিনি আমার একেবারে কাছে পৌঁছে গেছেন......এইবার তিনি আমাকে গিলে ফেলবেন...... হঠাৎ আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে বিকটভাবে প্রাণপণ চিৎকার করে উঠলাম।

হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এবং অতিশয় কোমল গলায় বললেন, 'ভয় করবেন না। এই ভয় প্রত্যেক মানুষেরই স্বাভাবিক। প্রত্যেক মানুষই নিজেকে এভাবে ভয় করে।'

অনুবাদ : ভূপেন শর্মা

স্বপ্নালোকে নিয়ে যায়

অমর মিত্রের 'পাহাড়ের মত মানুষ', খুব ভাল লাগছে। প্রথম সংখ্যা পড়ার পর দ্বিতীয় সংখ্যাটার জন্য মনটা গভীর প্রত্যাশায় ছিল। সন্ন্যাসীর বর্ণনাটা একটু বেশী একঘেয়ে লেগেছে। তবে, গুজিরাম, লাবণ্যময়ী ও পুষ্পার চরিত্র অপূর্ব লাগছে। পড়তে পড়তে চোখের সামনে ছবি ভেসে ওঠে। বিশেষ করে গত ৮ জুনের সংখ্যাটি কি যে ভাল লেগেছে তা প্রকাশ করা যায় না। অমর মিত্রের লেখার মধ্যে যেন এক জাদু লুকিয়ে আছে। মা-হিয়েনের বর্ণনা ও চরিত্র আমাকে যেন এক স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়।

শান্তি মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুর।

আদি আছে অন্ত নেই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

তারপর একটু মুচকি হেসে আরও বলেন, বলবেন না কিছু—কেন না উনি বেশ জানেন, বললেই আমি এক ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দোব। আমার বাবার দেওয়া একটি একটি বাকস গয়না উনি খুইয়েছেন ব্যবসা করতে আর বাড়ি ফাঁদতে গিয়ে। নতুনবাজার থেকে গিলটির চুড়ি হার আনিয়ে রেখেছি—এমনি অবশ্য কোথাও নেমন্তন্নে যাই না—তবে আত্মীয়দের বাড়ি কোন কাজ হলে তো যেতেই হয়, দিদি আছেন, ভাই আছে, ননদ আছেন এই শহরেই, না বলা যায় না—গেলে ঐ চুড়ি হারই পরি, আবার সিঁদুর দিয়ে মেজে তুলে রাখি। উনি তো কখনও একখানা গয়না দেনই নি, খোকা হবার সময় সাধে শাশুড়ি নিজের গয়না ভেঙ্গে গাড়িয়ে দিয়েছিলেন যা, তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন—নিয়েছেন সব। আমি কখনও সেজন্যে একটা কথাও বলিনি, কোনদিন কিছু পাইও নি। একটা শাড়ি কিনতে বলি না। ঐ গিলটির চুড়ি হার উনিই এনে দিয়েছেন, নিজের প্রেস্টিজ বাঁচাতে। নইলে আমি শাঁখা লোহা পরেই যেতে পারি। আত্মীয়রা তো সব জানেই—তাদের কাছে আর অসম্মান কি! এ সব কথা আমার মনে চুপড়ি চাপা আছে তা তিনি বেশ জানেন, কিছু বললেই চুপড়ি খুলব না!'

তুলি রঙ কাগজ—পাঁচ টাকায় কুলোয় না, সামান্য সামান্যই আনে। ছবি আঁকেও। প্রাণপণেই সুভদ্রার স্নেহের যোগ্য হবার চেষ্টা করে।

এর মধ্যে একদিন বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়েছিল। তখন সূর্যাস্তের সময়, বসে বসে সে ছবি দেখছে প্রাণভরে। একটা পালতোলা বড় নৌকো যাচ্ছিল, পালের অর্ধেকটায় ছায়া অর্ধেকটার রাঙা রোদ—দৃশ্যটা ছুঁতে পারেনি। হাঁড়ি কলসী নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটা, ঘাটাল থেকে আসছে হয়ত, বাগবাজারের খড়ো ঘাটে নামবে।

তখনই সেটা আঁকবার জন্যে মনটা আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠেছিল। কিন্তু কোন আয়োজনই নেই, শুধু ইচ্ছায় কি হবে? চেষ্টা করে সেই ছবিটাই আঁকতে—সেই অনির্বচনীয় অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলতে, তার আস্বাদ আনতে তুলিতে রঙে কাগজে।

প্রাণপণেই এঁকেছিল, ওর সামান্য শক্তি প্রয়োগ করে।

কেমন দাঁড়াল তা ঠিক বুঝতে পারে না। সন্দেহ হয় মনে মনে ছবিটা অপরকে দেখাতে। কিন্তু সুভদ্রা প্রচুর প্রশংসা করেন। পিনাকীবাবুও বলতে বাধ্য হন যে, 'ছোকরার আঁকার হাত ভাল।'

সেই দুর্বলতাটুকুর সুযোগে তাঁর কাছ থেকে দশ আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে বাঁধিয়ে নেন সুভদ্রা, নিচের বাইরের ঘরে নিজে হাতে টাঙিয়ে দেন ভাল ক'রে।

এই প্রথম নিজের সৃষ্টির স্বীকৃতি পেল বিনু।

॥ ৩৩ ॥

এ দিনটা ওর চিরকাল মনে থাকবে।

তবু মনে প্রশ্ন দুটো থেকেই যায়। হাত খরচার টাকা এবং তার চেয়েও যেটা বড়—ভবিষ্যৎ।

যত দিন যায় আর যেন লেখাতেও মন বসে না। এ লেখারই বা পরিণাম কি? কেউ কি ছাপাবে কোন দিন? ছাপলেই কি কেউ পড়বে? বই হয়ে কি বাজারে বেরোবে কখনও?

এসব প্রশ্ন নিরুত্তরই থেকে যায়। কোন রকম আশা করতে—এমন কি স্বপ্ন দেখতেও যেন ভরসায় কুলোয় না। জীবনে ভরসা বা আশার মুখ তো দেখেনি এতাবৎ কাল। ওর ভাগ্যে শিল্পী কি লেখক বলে স্বীকৃতি! দূরে। কি ক'রে হ'তে পারে তাই তো কল্পনার অতীত।

মনে পড়ে যায় বিভূতিবাবুর সেই শ্লোকটা। কবি যশঃ প্রার্থীদের যুগে যুগেই এক অবস্থা।

এরা খুবই ভাল, কিন্তু এটা ওর ঘর নয়। এখানে থাকা। নিতান্তই দয়ার উপর নির্ভর ক'রে।

মার কথা মনে পড়ে, দাদার কথাও। সেটাই ওর ঘর, তারাই আপন। মা ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে পড়বেন তবু মচকাবেন না। কিন্তু তাঁর দৈহিক ও মানসিক কষ্ট কতটা হচ্ছে তা সকলের চেয়ে বেশী ওই জানে।

সেখানের দরজা খোলাই আছে। কিন্তু এইভাবে হার মেনে গিয়ে দাঁড়াবে। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে শুধু হাতে মাথা হেঁট ক'রে!

মা তিরস্কার করবেন, আজকাল তাঁর ভাষা কঠোর কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন। দাদা বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবেন। যাকেই বলবেন কথাগুলো, ওকে শুনিয়ে।

হয়ত বলবেন, এখনও ঢের সময় আছে, একটা বছর গেছে যাক, কোন একটা অল্প মাইনের কলেজে গিয়ে ভর্তি হও। নয়তো চাকরি বাকরি খুঁজে নাও। বিধবা বোনের মতো বসে খাওয়াতে পারব না।

পড়া আর হবে না। সহপাঠীদের থেকে এক বছর পিছিয়ে থেকে—ছিঃ! এমনিই ঢের হয়ে গেছে, এখন আবার শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশতে পারবে না। আর চাকরি। ম্যাট্রিক পাশ ছেলের কি চাকরিই বা হতে পারে—এই বিশ্বজোড়া মন্দার বাজারে। হয়ত অনেক ধরাধরি অনেক খোরাঘুরি করলে কোন মুদীর দোকানে বা ছোট-খাটো লন্ড্রীতে কাজ পেতে পারে কুড়ি কি পঁচিশ টাকা মাইনেয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব করতে হবে, ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। মাইনের অঙ্কটা চল্লিশ কি বড় জোর পঁয়তাল্লিশে পৌঁছবে।

না। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের লাইনটা মনে পড়ে যায়, 'তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।'......

আবার এক এক সময় নিজের মধ্যে একটা বিরাট উদ্দীপনা—অপরিসীম বল বোধ করে—অগাধ ভরসা, বিপুল শক্তি।

ভগবান তাকে বড় একটা কিছু করার—খুব বড়—সনদ দিয়ে পাঠিয়েছেন। অনেক বড় হবে সে। নিজের পথ নিজে করে নেবে। স্বনামধন্য বিখ্যাত লোক হবে—কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। আজ যারা করুণার চোখে দেখছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে হয়ত—তারাই বিস্ময় বোধ করবে ওর সে অভাবনীয় অভ্যুত্থানে, সমীহ করবে, সম্মান করবে। ওর সামান্য অনুগ্রহের জন্যে ধর্না দেবে।

এখন হয়ত পথ দেখতে পাচ্ছে না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাবে। পথ করে নেবে। নইলে ভগবান তাকে এমন কল্পনা আর উচ্চ আশা দিয়ে পাঠাতেন না পৃথিবীতে।

খুব, খুব বড় হবে সে।

রবীন্দ্রনাথের মতো লেখক হবে, অবনীন্দ্রনাথের মতো শিল্পী। পড়াশুনো করলে সে

অধ্যাপক হ'ত, পণ্ডিত হ'ত যথার্থ। পৃথিবীর লোক তার নাম শুনলে সম্ভ্রমে দু হাত ঠেকাত মাথায়।...

লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও পড়াশুনো তো ছাড়েনি। লিখবে সে, ভাল ভাল বই লিখবে। অপরের বই, কলেজের বই পড়বে না বলে মা ধিক্কার দিচ্ছেন, তার বই লক্ষ লক্ষ লোক পড়বে।

সবাই যেন এ কথাটা সে সময় মিলিয়ে নেয়।

এই সব সহসা অনুভব করা আশা-উদ্দীপনার দিনগুলোতে সে স্থির থাকতে পারে না। এই ঘরে, এই খাটের ওপর ছোবড়ার গদীর শক্ত বিছানায় শুয়ে থাকা—অসহ্য লাগে। ছটফট করে বেরিয়ে পড়ে হন-হন করে হাঁটতে থাকে।

কিছু একটা করতে হবে তাকে। ধরিত্রীর মধ্যেকার তরল আগুনের মতো তার উত্তেজনা ভেতরে ফুটতে থাকে। আর কিছু না পেলে যেচে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করে।

কোন দোকানে কেউ চুপ ক'রে বসে আছে—বিনু কোন একটা উপলক্ষ ক'রে আলাপ জুড়ে দেয়। হেদো কি শ্যাম স্কোয়ারে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করে। কেউ বিস্মিত হন, কেউ শঙ্কিত—পুলিশের গোয়েন্দা ভেবে। কেউ বা মজা দেখেন। বিনু অত লক্ষ্য করে না, মাথাও ঘামায় না। সে মন তখন একটা ঘোরে থাকে।

আরও—তার কেমন মনে হয় এইভাবে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে একদিন সৌভাগ্যের পথটা খুঁজে পাবে, এদেরই কারও দ্বারা উপকৃত হবে। অথবা কারও মুখ থেকে পাবে যে পথের ইঙ্গিত— কল্পনার স্বপ্নপুরীর ঠিকানা।

এই ভাবেই একদিন দত্ত মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

হেদোর কাছে একটি পুরনো ফার্ণিচারের দোকান। তারই মালিক দত্তবাবু সামনের দিকে আড়াআড়ি করে রাখা একটা বেঞ্চির এক পাশে—রাস্তার দিকের পাশে—বসে ক্রমাগত বিড়ি টানেন। দুটি ছোকরা কর্মচারী আছে— সাগরেদ গোছের, বোধহয় মাইনে টাইনে বিশেষ দেন না—তারা কাজ যে জোর চলছে সেটা দেখাবার জন্যে কেউ বা স্পিরিট গালায় গুঁড়ো দিয়ে বার্নিশ তৈরী করে, কেউ বা পুরনো আসবাবের গায়ে আলতো হাতে বালি কাগজ ঘষে।

কে জানে কেন—এই দোকানটা সম্বন্ধে বিনু একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে।

দু একটা নতুন আলমারী কি খাট যে নেই তা নয়—মিস্ত্রীদের কাজ দিয়ে হাতে রাখবার জন্যে তাও করাতে হয়—তবে আসল ব্যবসা ওঁর পুরনো আসবাবেরই। কোথাও কেউ ভাল আসবাব বিক্রী করছে শুনলেই দত্ত মশাই পেট কাপড়ে কিছু টাকা বেঁধে নিয়ে ছোটেন। মালগুলো কোন নীলামওলার কাছে গিয়ে পড়লে দত্ত মশাইয়ের সাধ্যর বাইরে বলে যাবে, উনি চেষ্টা করেন তার আগেই গিয়ে হাতাতে। সাহেবরাই ভাল ভাল ফার্ণিচার ব্যবহার করে— বিক্রীও করে দেয় কথায় কথায়— তবে সে সব মাল ধরা বড় মুশকিল। তারা একেবারে এক লটে বেচতে চায়, সোজাসুজি নীলামওলাদের ডেকে ছেড়ে দেয়—কিন্তু বাঙ্গালীবাবুদের অন্য রকম। যে সব সম্ভ্রান্ত লোক এককালে খুব ধনী হয়ে উঠেছিলেন বা জমিদার ছিলেন, তাঁদের বংশধররা সে সব পয়সা খোয়ালেও তাঁদের ইজ্জৎ জ্ঞানটা থাকে টনটনে। পয়সার চেয়ে মানসম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়টা অনেক বড়। তারা গাড়ি ডেকে এক লপ্তে সব ছাড়তে পারেন না, একটা একটা করে ছাড়েন। দত্ত মশাই—শকুনি যেমন ভাগাড়ে গরু পড়ার অপেক্ষায় থাকে—এমনি কটি বিখ্যাত বনেদী ঘরের দিকে চোখ কান খোলা রাখেন সর্বদা।

এদের ঘরের আসবাব সেই কারণেই জলের দামে বিক্রী হয়। এমন পুরনো ফার্ণিচারের দোকান আরও আছে। তবে তারা নাকি ওঁর মতো এত সুবিধে করতে পারে না। সেজন্যে দরও ওঁর মতো দিতে সাহস করে না।

দত্ত মশাই হেসে বলেন, বোকা, বোকা। শালারা ঘরে মাল তুলেই শিরীষ কাগজ ঘষে সাফ করতে লেগে যায়। পুরনো রঙ চেঁচে তুলে নতুন রঙ করে চকচকে করে তোলে নতুনের মতো। আহাম্মক বেটারা জানেনা, মদ থেকে শুরু করে আসবাব পত্তর পুরনোরই কদর বেশী। আরে—আগে খদ্দের আসুক, দেখুক সাবাস মাল কিনা—তারপর তার কাছে বায়না নিয়ে তবে বালিকাগজ তর বার্নিশে হাত দোব—তার ফরমাশ মতো। পুরনো ছোপ তুলে দিয়ে নতুন কাঁচা কাঠের আসবাবের সঙ্গে পুরনোর তফাৎ কি রইল। কাঠের ফাইবার দেখে বুঝবে—কী কাঠ, কদ্দিনের কাঠ এমন জহুরী কলকাতায় কটা আছে। হুঁ।'

দত্ত মশাইয়ের সঙ্গেও একদিন যেচেই আলাপ করেছিল, ভাল লেগেছিল মানুষটিকে। তার পর থেকে প্রায়ই আসে, কিছুক্ষণ বসে দত্তবাবুর বক্তৃতা শুনে যায়। বেশ লাগে এসব ব্যবসার গোপন রহস্যগুলো, ভাল লাগে এই সব দামী পুরনো আসবাবগুলোকেও।

কাঠের সে কিছুই চেনে না, কাকে সেগুন বলে, তার মধ্যে কোনটা বার্মা। টীক, আর কোনটা সি পি—কোনটা মেহগনি কোনটা আবলুষ— আবার কোনটাই বা কাষ্ঠ সমাজে আপাংক্তেয় নিহাৎ ব্রাত্য। জারুল—কিছুই বুঝতে পারে না। অনেক কষ্টে বেশ কয়েকদিনের চেষ্টায় দত্তবাবু মেহগনী ও আবলুষের রঙটা চিনিয়ে দিয়েছেন।

উনি বলেন, 'তোমার ভাগ্যি ভাল ছোকরা, এই সময়ই অমর বোসের এই মালগুলো এসে পড়েছে। নইলে শীলেদের বাড়ির চলে যাওয়ার পরে—অনেকদিন আর আবলুষের চেহারা দেখিনি। আবলুষ তো এসব অঞ্চলে হয় নি, অন্তত আমি জানিনে কোথায় হয়, মেহগনি হয় অবিশ্যি কেষ্টনগরে দেখে এই বি রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ—আবলুষ গাছ কখনও দেখিনি। মেহগনিই থাকে তবু দু একটা কিন্তু আবলুষ? রাম কহো। বাঙ্গালীর দেড়-ছটাকে কাঁপা কাঁপা কাকে বলে জানোতো? আধখানা নারকেল মালা, মাপ মতো, কোনটা এক ছটাকে, কোনটা দেড় ছটাকে—একটা কাঠে পরিয়ে তেলের টিনে ডুবিয়ে রাখে, অল্পেস্বল্প তেল আর বার বার পাত্তর শুদ্ধ ওজন করতে হয় না। কাঁপা গুনীত করে খদ্দেরের শিশি কি বাটিতে ঢেলে দেয়। —হ্যাঁ, য়া বলছিলুম, বাঙালীর এক ছটাকে বড় জোর দেড় ছটাকে কাঁপা এ কাঠ কে ব্যবহার করতে। করে এক রাজা মহারাজারা আর করে যাযাবরেরা। তাও সে সব খানদানা সায়েব গেলেই কমে আসছে। পুরনো লোক যারা এসবের কদর বুঝত তারা বেচে কিনে বিলেতে ফিরে যাচ্ছে, নতুন যারা যারা— হাল ফ্যাসানের কথা রেখে মাল কিনছে। এ বেটারা ভাল মাল চেনেও না, কদরও বোঝে না। এক বেটা সাহেব এসেছিল বলে আয়রণউডের মাল নেই, আয়রণউড বুঝবে? লোহা কাঠ। লোহা যখন তখন খুব মজবুত হবে। বোঝ ব্যাটাদের বুদ্ধি?

বিনুও এসব চেনে না। তবে এই ধোঁয়া ময়লায় চিট ধরে যাওয়া বড় বড় আলমারী আর ভারী ভারী পালঙ্কগুলো ওর দেখতে বেশ লাগে।

দত্ত মশাই এই প্রীতিকে ব্যবসায়িক আকর্ষণ বলে ভুল করেন। তিনি চেনাতে

চেষ্টা করেন কোন কাঠের কি লক্ষণ, কি কি দেখে চিনবে কোনটা সীজনড টিক আর কোনটা নয়—কেমন করে তা পরীক্ষা করা যায়, ইত্যাদি। এসব যে ওর মাথায় ঢোকেনা তা নয়, এদিকে মন দিতে পারে না।

এসব আসবাব দেখতে দেখতে ওর মন চলে যায় বহু দূরে— কল্পনা ও কাহিনীতে গড়া এক সুদূর অতীতে, সেখানেই মন নব নব পুরাতন কাহিনী বা ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত থাকে।

এই দামী কাঠে সুদক্ষ মিস্ত্রীকে দিয়ে তৈরী করানো আসবাব অথবা নাম করা ফার্ণিচারের দোকান থেকে খরচার বহুগুণ বেশী দাম দিয়ে কেনা—যাঁরা এসব করেছিলেন না জানি তাঁদের কত আশা, কত আকাঙ্খা, কত অভিমান বা অহঙ্কার ছিল সেদিন এই অকারণ বিলাসের পিছনে। না জানি তাঁরা কেমন লোক ছিলেন, কী মেজাজের মানুষ, কত পয়সা তাঁদের, না জানি পয়সা নিয়ে কি ছেলেখেলা করে গেছেন সামান্য সামান্য খেয়াল চরিতার্থ করতে বা জেদ বজায় দিতে—আজ তাদের বংশধররাই পেটের দায়ে অভাবে পড়ে এই সব জিনিস জলের দামে বেচে দিচছে বাধ্য হয়ে।

হয়ত তারা এর দাম, এদের ইজ্জৎ কিছুই জানেনা, চেনেও না কী জিনিস তারা এমনভাবে জলের দামে ছেড়ে দিচছে। সেটুকু শিক্ষাও তাদের পূর্বপুরুষরা দিয়ে যেতে পারেন নি।

এই সব ভারী বিচিত্র অলঙ্কারে সমৃদ্ধ পালঙ্কে কারা শুত? ব্রাহ্মণের ঘরের বিবাহিতা স্ত্রী, না বাইরের বাইজী, না বাবুরা ক্ষণিকের কদর্য কামনা চরিতার্থ করতে সামান্য দাসীকে নিয়ে শুতেন এই সব মহার্ঘ্য শয্যা? যারা শুত যারা করিয়েছে এসব কে তারা? কি তাদের পরিচয়? এই পালঙ্কে শুয়ে কত মেয়ে হয়ত রাতের পর রাত তারা ভর্তা বা দয়িতের অপেক্ষা করেছে, ব্যর্থ হয়ে হতশায় চোখের জল ফেলেছে সেই প্রতিটি রাত্রেই। আবার হয়ত কত কুরূপা মেয়ের কানের কাছে তার রূপবান স্বামী প্রণয় কুজন করেছে দীর্ঘ রাত্রি ধরে। কত অবিশ্বাসিনী স্ত্রী হয়ত প্রতীক্ষা করেছে স্বামীর ঘুমিয়ে পড়ার—তারপর উঠে গেছে উপপতির সামান্য কঠিন শয্যায়।

এই খাট, এই পালঙ্ক, এইসব আলমারী, বুককেস বা দেরাজগুলো, না জানি কত বিচিত্র অবিশ্বাস্য ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। কত মর্মন্তুদ ব্যথা কত অব্যক্ত বেদনা আজও এদের এই কাষ্ট হৃদয়ের কোষে কোষে সঞ্চিত আছে। কত বিয়োগান্ত নাটকের সাক্ষী এরা, কত দুর্দশা কত দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বহন করছে। কত কুমারী মেয়ের বাপ হয়ত এইসব আসবাব দিয়েছেন তার বিবাহে, কিন্তু সে মেয়ে হয়ত একদিনও সুখে কি
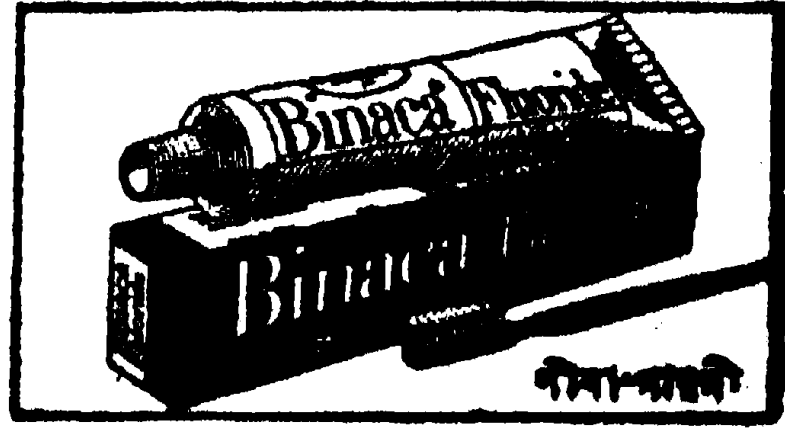
শান্তিতে ভোগ করতে পারেনি এসব, হয়ত আদৌ ভোগে আসেনি—হয়ত ফুলশয্যার রাত্রেই তার স্বামী গাড়ি জুতিয়ে বেরিয়ে গেছেন তাঁর রসিকতার বাড়ি, কিম্বা সে মেয়ে হয়ত একমাস কি দুমাস কি এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়েছে।

এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে হয়ত ঘুমোয় সে। এগুলোকে স্পর্শ করেও যেন একটা অনুভূতি জাগে, সৃষ্টির প্রেরণা। কল্পনার সিংহদ্বার খুলে যায় মনের সামনে। আজও এইসব আলমারী খুললে কোনটায় ন্যাপথলিনের গন্ধ কোনটায় আতর বা উগ্র বিলিতী সৌরভের গন্ধ মেলে। এরা মৃত নয়, এরা এখনও জীবিত, শুধু নীরব হয়ে আছে। এই দরিদ্র পরিবেশ এই অগৌরবের মধ্যে এসে পড়ে। নিঃশব্দে পূর্ব গৌরবের রোমন্থন করছে। এদের কাছে সে মনে মনে ভিক্ষা জানায়—সেই বিস্মৃত বিচিত্র আনন্দবেদনায় ভরা ইতিহাসের কিছু শোনাতে, ওর অনির্বাণ গল্প শোনার আর গল্প পড়ার ক্ষুধা খানিকটা অন্তত মেটাতে।

এইসব ভাবতে ভাবতে এক এক সময় বিভোর হয়ে যায়—চমক ভাঙ্গে দত্ত-মশাইয়ের তিরস্কারে, 'না', তোমার কিছু হবে না, একদম মন নেই তোমার। ভেবে-ছিলুম বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ, জিনিসটা ধরে ফেলতে পারবে চট করে। চাই কি পরে এই ব্যবসাই করে খেতে পারবে। তা মনই দিতে পারো না। শিখবে কি?'

অপরাধীর মতো মুখ করে বিনু বলে, আসল কথাটা কি জানেন, এই কাঠগুলো দেখতে দেখতে এদের মালিকদের কথা মনে পড়ে যায়—আর আপনার কথা মাথায় ঢোকে না!

'আরে ছোঃ। তাদের কথা ভাবারই বা কি আছে, শোনারই বা কি আছে! মাতাল লোচ্চা, কোন গতিকে বরাতের জোরে লক্ষ্মীবন্তর ঘরে এসে পড়েছিল। বাপ পিতেমো ফন্দী ফিকির করে খেটে খুটে দুটো পয়সা করে রেখে গেল তো বাস, শুরু হয়ে গেল মদ জুয়া আর খানকীর রেলা! কাপ্তেনী করে মোসায়েব পুষে বেড়াল কুকুরের বেদিয়ে পঞ্চাশ বছরের সঞ্চয় তিন বছরে উড়িয়ে দিলে। তারপর আর কি রইলেন তার পরের পুরুষে যো সো করে টিকে থাকতে পারল হয়ত কোনমতে, কিছুটা ঠাট বজায় দিয়ে—তার পরেই ভাঙ্গাবাড়ির ভাগ কিম্বা পুরনো আসবাব বেচে দিন কাটানো—রোগের ডিপো এক একটি বাবু। অন্ধকার ঘরে বসে হাঁপাচ্ছেন দেখগে যাও। সেই কথায় আছে না—এক পুরুষে কেনারাম, তারা কিনে এসব মজুত করে বাড়িঘর জমিদারী আসবাব গহনা গাড়ি জুড়ি—পরপুরুষে রাজরাম, নবাবী চালায় সেই বেটারাই—তার পরের পুরুষে বেচারাম, ঠাকুদার আমলের মাল বেচে বেচে খাও।

তারপর একটু নিভে যাওয়া বিড়িটা পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, 'এইসব ল্যাজারাসের বাড়ির জিনিস, খাঁটি মেহগনীর—একো একো আলমারী তখন-কার দিনেই সাতশো আটশো টাকা দাম ছিল। আর সে জায়গায় এইতো আমিই দুটো আলমারী আর দুখানা পালং—চীনেমিস্ত্রির হাতের কাজকরা—হাজার টাকায় নিয়ে এইচি। অমর বোসের বাবা গৌরাঙ্গ বোসের অনেক কুকুর ছিল, দামী দামী বিলিতী কুকুর চোদ্দপুরুষের কুলুজী মিলিয়ে তবে আনাত বিলেত আমেরিকা থেকে—ঐসব কুকুরের স্যাপ করার জন্যে ত্যাখনকার দিনেই পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে সায়েব চাকর পুষেছিল। তাতেও জলজ্যান্ত একটা জামাইকে খেয়ে ফেলেছিল কত্তার পোষা ভাল কুত্তা। রাত্রে ছাড়া থাকত, জামাইকে বলে দিয়েছিল বৌকে না ডেকে কলঘরে যেও নি—তা সে বেটার নেয়ৎ ঘনিয়ে এয়েচে—অত খেয়াল করে নি। অধম্মের পয়সা বোধহয়—তিন মাসের মধ্যে মেয়ে রাঁড় হল।

আবার একটু দম নিয়ে বলেন, 'অবিশ্যি অমর বোস কাপ্তেনী করে ওড়ায় নি এটা বলব। উকীল ছিল, নামকরা উকীল। কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, আরও টাকা করব ফুসমন্তরে ভেবে ফাটকা খেলতে গিয়ে সব ডুবল। অমন মান্যমান লোকটাকে এইসব মাল বেচে বেচে খেতে ইচ্চে, জলের দামও নয় ঘোলাজলের দামে। গেরো, নইলে উকীল দুদিনেই কামিয়ে নিতে পারত। এক বিধবার সম্পত্তি দেখা-শুনো করতে, মাস মাস ফী নিত তার জন্যে, টাকা খাটিয়ে দেবে এই কথা—অগাধ বিশ্বাস করত মেয়েছেলেটা, অমর বোস ফাট করে দেনা সামলাতে সব খেয়ে বসে রইল। সে বুড়ি হয়ত বিশেষ কিছু করত না, 'মা' 'মা' করে খুব ভিজিয়ে দিছল বুড়িকে অমর বোস, কিন্তু বুড়ির ভাই-পোরা ওয়ারিশ্যান, তারা ছাড়বে কেন?

দিনে চারশো সাত ধারায় না আট ধারার মামলা ঠুকে! বোসের পো লড়েছিলেন খুব কিন্তু শেষ রাখতে পারলেন না। এক ঘর জামাই গোছের বোনাই ছিল। দূর সম্পর্কের তবে ছিল গৌরবোসের আমল থেকে—তাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিছল, সে-ই ভাগ্নিপোতই আদালতে গিয়ে ওদের হয়ে সাক্ষী দিলে, মায় পুলিশে জানিয়ে আসল কাগজপত্তর কোথায় আছে সে সন্ধান দিয়ে একেবারে হাতে নাতে ধরিয়ে দিলে। বাস। আর কি জেল হয়ে গেল। বেশী দিনের কয়েদ হয়নি—মানী লোক তো—কিন্তু উকীলের খাতা থেকে নাম কাটা গেল—আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হল না। এখন বাপের এইসব দামী দামী জিনিস বেচে খাচ্ছে। বড়লোক শ্বশুর কিছু কিছু মাসোহারা দেয়—তবে তাতে কি পুরো সংসার চলে? আর একবার বড় মানষী ধাতে এসে গেলে—মানষে হাজার কষ্টেও হাত গুটোতে পারে না।'

এই পর্যন্ত বলে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে একটু চুপ করে বসে সেটা টানেন দত্তমশাই। তারপর হঠাৎ বলে বসেন, তা দ্যাখো না ছোকরা, তুমি তো ভ্যাগাবেনের মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছো—দু-চারটে বড়লোকের বাড়ি যাও না। শুনেছি এখন মা লক্ষ্মী ভবানীপুর ছেড়ে বালিগঞ্জে নতুন বাসা করেছেন—ঐদিকেই সব উঠতি বড়লোকরা গিয়ে বাড়ি করছে। দেখেশুনে—আগে হালচাল দেখবে, কেমন কাপড় শুকোচ্ছে বাড়িতে, আস্তাকুঁড়ে বড় মাছের আঁশ না কুঁচো চিংড়ির খোলা—হ্যাঁ হ্যাঁ, হেসোনা, এতেই বুঝতে হয় বাড়ির মালিকের নজর কেমন, পয়সা কেমন—তেমন বুঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথাটা পাড়বে। দামী ফার্ণিচার জলের দামে বিকুচ্ছে, বাবুরা রাখবেন?'

তারপর অকারণেই গলাটা নামিয়ে বলেন, 'অবিশ্যি মেহগনী কাঠ আর ল্যাজারাসের বাড়ি এসব হয়ত বানান করে বোঝাতে হবে বাবুদের, এক পুরুষে পয়সা তো, এসব জিনিসের মর্ম্ম বুঝবে না। দু একজন হয়ত নাম শুনেও থাকতে পারে। দ্যাখো না, যদি পারো বেচে দেওয়াতে, তোমাকে কিছু দোব। কিছু মানে দু-এক টাকা নয়, ভালই দোব—যদি অবশ্যি তেমন দাম তুলতে পারো। দ্যাখো না, বেকার বসে আছ—এও একটা লাইন, সেলসম্যানশিপ। ভাল লাইন। দালালি বলতে খারাপ শোনায়, আর এ ঠিক তা নয়ও—ভাল কাজ। যদি এলেম থাকে এই করেই অমন লাখো টাকা কামাতে পারবে জীবনে। ভেবে দ্যাখো গে।

ভেবে দ্যাখে বিনু, সত্যিই ভাবে।

ওর মনে হয় এটা দৈবেরই ইঙ্গিত, ভগবানই এদিকে যেতে বলছেন। নইলে ঐ বুড়ো মানুষটার সঙ্গে অত ভাবই বা হবে কেন, আর ও লোকটাই বা দুম করে একথাটা পাড়বে কেন?

উত্তেজনায় আগ্রহে অস্থির হয়ে পড়ে—কিন্তু কল্পনা বা আশাকে বাস্তবে পরিণত করায় অনেক বাধা। এমন অনেক বাধা বা অসুবিধা আছে যা লোককে বলা যায় না এতই সামান্য, অথচ তার জন্য অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়। হাতে একটা পয়সা নেই। বালিগঞ্জ এখান থেকে বিস্তর দূরে। বেলেঘাটা থেকে ট্রেনে করে গেলেও পাঁচ পয়সা করে দশ পয়সা খরচ, আর—এখান থেকে স্টেশন অবধি হেঁটে যাওয়া-আসাতেই তো একটি ঘন্টা চলে যাবে। সকালে এদের পড়াবার সময়, সকালে হবে না। বিকেলে গিয়ে বালিগঞ্জ, সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে বালিগঞ্জের বড়লোক পাড়ায় ঘুরে—ফিরে আসতে, যদি এক ঘন্টাও ঘোরে সেখানে—রাত দশটা বেজে যাবে। এ'দের আশ্রমপীড়া ঘটানো হবে।

(ক্রমশ)

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

পিথার হঠাৎ মনে হয় এদের সব বলা যেতে পারে। নাহ'লে আর বিশ্বস্ত মানুষ কোথায়! যাকে বলবে সে হাসবে। পিথার এত বড় দেহটা অন্যের হাসির খোরাক হবে, সে তো সহ্য হবার নয়। এই মানুষটাকেই বিশ্বাস ক'রে সব বলা যায়। রাজকন্যে, রাজকন্যের প্রতি মোহ, হঠাৎ জেগে ওঠা ভালবাসা সব বলা যায়। বলা যায় তার কল্পিত ভয়ের কথা। ভয় মৃত্যুর। ওখানে যে হাত দেয় তার মৃত্যু আসে, যেমন মরেছে ভিখা আর রাজেন। সে কি ক্রমশঃ সাপের ছোবলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!

পিথা যেন ভেঙে যাচ্ছে। ব'লে ফেলবে সব। তাহলে ভারমুক্ত হয়ে যাবে। আবার আগের মত মানুষ। গুহিরাম বাঁক তুলে নিয়েছে কাঁধে। পিথা দেখছে গুহিরাম এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কি হ'ল! তাহলে বলা হবে না?

জানু গুহিয়া, আজ রাজবাড়ি গিছিলম, রাজ কনিয়া......। বলতে আরম্ভ করেই পিথার চমক ভাঙে। এতো শুনতে পাবে না। শুনলেও বলতে পারবে না কিছু। কোন নির্দেশই আসবে না এর কাছ থেকে। শুধু ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবে। চেয়ে আছে সেরকমই।

বোবা গুহিরাম এগিয়ে যায়। পিথা নদীর বালির দিকে চেয়ে মনের কথা বিড়-বিড়িয়ে বলতে বলতে হেঁটে যায়। গুহিয়াটা খারাপ নয় তার মনে হ'তে থাকে।

।। ১৭ ।।

ঘরের ভিতর মহুলের গন্ধ গাঢ়। বারান্দায় খাটিয়া পেতে পাট-পাট প'ড়েছিল নবীন। রাত গভীর হলে বুকের ভিতরে একটা মানুষ জেগে ওঠে। শীর্ণকায় দাড়িঅলা উজ্জ্বল চক্ষু, মানুষ, একটু ঝুঁকে হাঁটে। বয়স কতই বা দেড় কুড়ির কাছাকাছি। অনেক অভিজ্ঞতা অনেক জানার ভারে নত হয়ে পড়েছে। একটা ভয়াবহ মানুষ। তার ভিতরে সেই যে ঢুকে পড়েছে সাত আট বছর আগে, আর বেরোবার নাম করে না, ধুলোবালির অন্তরালে চাপাও পড়ে না। অফুরন্ত জীবনী শক্তি।

সেই যে মানুষটা হারিয়ে গেল, তারপর কতদিন তো কেটে গেল। পীতাম কিস্কু উধাও হয়ে গেল। গাঁ ঘর নিথর হয়ে গেল, গাঁয়ে এল পুণ্যব্রত স্বামীর খবর নিয়ে নিখিলানন্দ, তার ঘর পুড়ল, নিখিলানন্দ আশ্রয় দিল, কিন্তু সে মুছে গেল না। রাত গভীরে বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়ায়। আরম্ভ করে সুবর্ণ কাহিনী।

অন্ধকার স'রে যায়। চোখের সামনে ফুটে ওঠে এক নদী। এক নদী নয় দুই নদীর মোহনা। মোরেল আর সুমানি। দিকু দারোগা সামনে হাজার মানুষ দেখে চিৎকার ক'রে ওঠে, কে আমার কাজে বাধা দিতে আসে, কে তুই?

নবীন উঠে দাঁড়ায়, ফিসফিসিয়ে বলে, আমি কানু, এ আমার দেশ।

নবীন উঠে দাঁড়ায়, ফিসফিসিয়ে বলে, আমি সিদু, এ আমার দেশ।

দাড়িঅলা মানুষটা বুকের ভিতর থেকে চিৎকার করে ওঠে, মেঘের গর্জন, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, বল আমি নবীন, এ আমার দেশ...।

নবীন উঠে দাঁড়ায়, আকাশ নক্ষত্র শূন্যতায় স্থবিরতা, বাড়ির সামনের মহুল গাছটা ভূতের মত দাঁড়িয়ে, সে দুহাত তুলে ধরে নক্ষত্রের দিকে, বাবু তু বল, মু ম্যাঘনাদ, ইহা মুর দিশ।

বুকের ভিতর কল কল ক'রে নদী বয়ে যায়, ধামসা আর মাদল বেজে ওঠে, কে যেন গান গায়, পীতামের বাঁশির শব্দ শোনা যায় .....

সিদো কানু খড়্খড়ি ভিতরে
চাঁদ ভায়রো ঘোড়া উপরে
দেখ সে রে! চাঁদ রে! ভায়রোরে!
ঘোড়া ভায়য়োরে মুলিনে মুলিন।

এখনো অনেক কিছু জানার আছে। সিদু কানুর পরে কি সব শেষ হয়ে যায়। সে-সব কে জানে! মেঘনাদ চ'লে যাওয়ার পরে তো আর একটা মানুষও এলো না, এলো নিখিলানন্দ, শোনাল অন্য কাহিনী। নিখিলানন্দের সঙ্গে মেঘনাদের পার্থক্য হাজার সমুদ্রের। নিখিলানন্দের কাহিনী তো রাত গভীরে ঘুম ভাঙায় না, আকাশ-নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থাকতে বাধ্য করায় না। মেঘনাদ যদি থাকত তাহলে আরো অনেক স্বপ্ন মাথার ভিতরে ঢুকে পড়ত। সে সব স্বপ্ন অশ্রুত, অজানা। আর কেউ জানে না, শুধু সেই মানুষটা জানত। আর জানে এই অনন্ত নক্ষত্র, আকাশ মাটি হাওয়া, ওদের মুখে ভাষা নেই। অনাদিকাল থেকে নীরবে দেখে আসছে জগতের যাবতীয় নিয়মের ব্যত্যয়। দেখে গম্ভীর হয়েছে, শোনাতে পারে না অভিজ্ঞতার কাহিনী অন্য মানুষকে। ভাষাহীন নক্ষত্রের বড় কষ্ট, ভাষাহীন আকাশ হাওয়ার বড় কষ্ট!

ঝড় ওঠে কেন? কেন সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হয়, কেন মধ্যরাতে তারা খ'সে যায়! মুক সৌরমণ্ডল এক একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে ভেঙে-চুরে ফেলতে চায় মানুষের সভ্যতার অহংকার। এত পাপ। সব মুছে যাক।

পাপ কি? পাপ আলো বাতাস নক্ষত্রের মত স্থির হয়ে বেঁচে না থাকায়, পাপ আলো হাওয়ার মত পৃথিবীর মাটিটা সমান ভাবে ভাগ না হওয়ায়।

প্রভু পুণ্যব্রত এক দেবতা। নিখিলানন্দ বলে পুণ্যব্রতর সন্ধান পেলে মানুষের যাবতীয় দুঃখের শেষ হবে। কি ক'রে হবে তা বলেনা সন্ন্যাসী। সে তো এক নবীন হেমব্রম, দেবতার সন্ধান পেলে তার দুঃখের ইতি হবে, কিন্তু এই কোড়াকুড়ি, মেয়ে-মানুষ, পীতাম কিস্কু এরা কি ক'রে সুখী হবে? এরা তো পুণ্যব্রতর কথা জানে না। নবীন প্রভু পুণ্যব্রত স্বামীর দেখা পেলে সুখী হবে, সুখী করতে পারবে সকলকে, তাহলে নিখিলানন্দ কেন নবীনের দুঃখ দূর করতে পারে না। কেন গরীব সাঁওতাল-গুলো সন্ন্যাসীর উপর ক্ষেপে থাকে।

একা নবীনের সুখ হবে, সে সুখ তো সুখ নয়। চোখের সামনে এতগুলো মানুষ দুমড়ে মুচড়ে হাঁটবে, দেহে কুষ্ঠরোগ নিয়ে বহুদূর পাড়ি দেবে, এসব কি নবীনের সুখের জন্য! মেঘনাদ তো তেমন শেখায়নি।

দেবতা হবে কেমন! যিনি সূর্যকে আলো দেন, যিনি নদীকে জল দেন, যিনি মানুষের মুখে ভাষা দেন, যিনি মানুষকে নীরোগ ক'রে তোলেন তিনিই তো দেবতা। তার সঙ্গে পুণ্যব্রতর মিল এখনো খুঁজে পেলনা নবীন। পুণ্যব্রত তো মাটির সমান ভাগের কথা বলে না, নিখিলানন্দ নবীনকে তো তা শেখায়নি।

সিদু কানু এক দেবতা পেয়েছিল। সিং বোঙা। সেই বোঙা যুদ্ধ করতে বলে-ছিল। হুল্! হুল্ হ'ল মাটির জন্য, হুল্ হ'ল চাম্পা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য। সেই দেশে খাজনা নাই, দিকু মহাজন নাই। উপরে আছে আকাশ নক্ষত্র, নিচে বনভূমি। বনভূমিতে সাঁওতাল জাতির ঘর-বাড়ি। পাহাড়ে সাঁওতাল জাতির হৃদয়। নদীতে সাঁওতাল জাতির চক্ষু। সে চক্ষু অনন্তকাল জেগে থাকে। মানুষের সুখে উজ্জ্বল হয়।

দামিন-ই-কোহ তে, পাহাড়তলীতে আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বলল কেন? জঙ্গল নিয়ে নিচেছে সায়েব আর দিকু মানুষ। দেহের রক্ত বার ক'রে নিয়ে সেই রক্ত তোমার কাছে বেচতে আসছে মহাজন। দিকু মহাজন এসে বলল, এ পাহাড় এ তোমার নয়। দিকু মহাজন গর্জে উঠল এ

জঙ্গল এ তোমার নয়। দিকু মহাজন হাসতে লাগল, এ দেশ তোমার নয়।

হ্বল হলো। জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে আরম্ভ হলো সুখের জন্য যুদ্ধ। হুল শেষ হলেই নেমে আসবে সুখ। আবার পাহাড় জঙ্গল মাটি হবে সাঁওতাল জাতির। গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠান হল শালগাছের ডাল। সব এক হও। গিরা চলে গেল পাহাড় থেকে পাহাড়ে, জঙ্গল থেকে জঙ্গলে। দূরের মানুষ সব জানল। মানুষ জানল সিদু কানু দুই মানুষ জেগেছে পাহাড়ের মত। সাঁওতাল জাতির সুখের দিন সমাগত। বন পাহাড় থম থম করছে।

কালো মানুষের কাছে খবর আসে! খবর আসে দূরে বন-পাহাড় থেকে। কতরকম খবর। বুকের রক্তে ঝিমঝিমে নেশা লাগল। মানুষ খবরের জন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

খবর এল বিষ নিঃশ্বাস নিয়ে এক অজগর আসছে। নিঃশ্বাসে বিষ, শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেবে সাঁওতাল জাতিকে। বিপদ সামনে। তখন পাঁচগাঁয়ের সাঁওতাল এক হল, এক হয়ে আর সব গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে লাগল। সিং বোঙ্গার পুজো হলো। সিং-বোঙ্গা সূর্যের মত। সিবোঙ্গা পাহাড় অরণ্য সব ফিরিয়ে দেবে দিকু মহাজনের কাছ থেকে। গাঁয়ের মুরুব্বি মাঝির বাড়ির উঠানে নাচ শুরু হলো। নাগরা বাজল, নাচিয়েদের কোমরের ঘুঙ্গুর বাজল। অন্ধকারে চারপাশে গাঁয়ের সব মানুষ দাঁড়িয়ে। গা ছম ছম করছে। এসব কি হয়? এরকম তো হয়নি কখনো। দুটো সাঁওতাল মরদের গায়ে পৈতে ঝুলছে। তারা নাচছে। পাঁচ গ্রাম শেষ করে এক ফাঁকা মাঠে এসে জড়ো হল সবাই। সেখানে বিপদের সম্ভাবনার কথা বলা হলো। পুজো হলো। শেষে তারা যাওয়ার সময় আবো দুই মরদকে পৈতে পরিয়ে দেয়। হুল-এর গান শিখিয়ে দেয়। এই দুই মরদ আবার পাঁচ গাঁয়ে ঘুরতে যায়। এইভাবে সকলে এক হয়।

মরদের বউগুলো একে অন্যের বাড়ি গিয়ে সই পাতায়। একে অপরের মিতা হয়ে যায়। ফিসফিসিয়ে বলে, হুল-এর সময় যেন কোন গোপন খবর প্রকাশ না হয়। আমরা সবাই এক। কুমোর, তেলি, কামার, তাঁতী,

চামার, ডোম সব সাঁওতাল জাতির সঙ্গে মিলে যায়। হুল হুল হুল, রাতে বন-পাহাড়ের বাতাস হুলের শব্দ নিয়ে দূর-দূরান্তে ছুটে যায়। দিনে হুলের শব্দে লালমাটিতে নদীগর্ভে ঘূর্ণী ওঠে।

আকাশে মেঘ আসে। পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় মেঘ কুণ্ডলী পাকায়। সনসনিয়ে বিদ্যুত সরে। বিদ্যুতে কালো মানুষের দেহে শিহরণ জাগায়। দেবতা হুলের কথা বলছে। মারাং বুরু-বড়পাহাড় বলছে হুল হোক।

চল কলকাতা। অরণ্য নেমে এল সমতলে। পাহাড় নামল সমতলে। অরণ্য পাহাড়ের মিছিল শুরু হলো। সিদু কানু চললো, চাঁদভৈরব চললো, কির্তা মাঝি ভাদু আর সুন্নো মাঝি হুঙ্কার তুললো সিদু কানুর সঙ্গে। আকাশের মেঘ চললো মাথার মাথার। মেঘের হাতে বিদ্যুৎ অস্ত্র। রাত গভীরে গান শোনা যায়।

'সিএর জঙ্গল শিকারে যায়
সরগরম মাঝরাত
কলকাতা দরবারে যায়
সারাদিন সারারাত'

এসব করলো কে? সিদু কানু। কি করে হল? সিদু কানু দেবতার বর পেয়েছিল। দেবতা সাঁওতাল জাতির সুখের জন্য, বন-পাহাড়ের সুখের জন্য তাদের মাথায় নামিয়ে দিয়েছিল হাত। সেই দেবতার কতরকম রূপ!

একদিন বনপাহাড়ের আকাশ থেকে নেমে এল কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। সেই মেঘই হলেন দেবতা। একদিন সিদু কানুর সামনে জ্বলে উঠল ভয়াবহ অগ্নিশিখা। সেই আগুনই হলেন দেবতা। দেবতা এলেন ছদ্মবেশে মুখখানি ঘন কুয়াশার ভিতর ঢেকে। তিনি এলেন সূর্যের নিচে এক ছায়ার মত, তাঁর ছায়া মাটিতে পড়ল না। একদিন সিদু কানু দেখল তাদের চোখের সামনের লালমাটির প্রান্তর ভেদ করে উঠে এল গম্ভীর এক বুরু। পাহাড়। দুই ভাই অবাক চোখে চেয়ে রইল। বিস্ময় কাটে না [illegible] নিঃসীম জীবনধারা [illegible] মাটির উপর এক নবীন শালবৃক্ষ জন্মালো। এই শালবৃক্ষই [illegible] দেবতা। সব বিস্ময় কেটে যায় যখন তিনি কাছে এলেন।

গৌরবর্ণ এক পুরুষ সাঁওতালের বেশে দুই ভাইয়ের সামনে দেখা দিলেন। তিনি জানালেন তাঁর কথা। তিনি বললেন হুল হোক! মানুষের সুখ আসুক।

দেবতার কথায় সিদু কানু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। শালগাছের গিরা চলে গেল গাঁয়ে গাঁয়ে। বনপাহাড় সচকিত হয়ে উঠল —চল ভাগনা ডিহি। সিদু কানু দেবতার নামে ডেকেছে মানুষকে 'দেলা দোমেল দোমেল, দেলা লগন লগন'।

এই তো এক দেবতার কথা জানে নবীন হেমব্রম। সে দেবতা সিদু কানু চাঁদ ভৈরবকে মানুষের ভালর জন্য হুলের কথা বলেছিল। দূরে চলে যেতে বলেনি। নিখিলানন্দ যে দেবতার কথা বলে সে কেমন। পুণ্যব্রত সঙ্ঘ তাকে দীক্ষা দেবে পুণ্যধর্মে, নাম বদলে করে দেবে ভবানন্দ। তাকে পাঠিয়ে দেবে বাঁকুড়ায়। ঘরের সঙ্গে যোগ রাখতে পারবে না। নতুন জন্ম হবে তোমার, পিতার নাম প্রভু পুণ্যব্রতস্বামী। ধর্ম, পুণ্য ধর্ম। নবীন এখন করবে কি?

সময় চেয়েছে নিখিলানন্দের কাছ থেকে। না বলতে পারেনি। না বলা নবীনের কাছে বড় লজ্জার। সন্ন্যাসী একদিন তাকে, তার স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করেছিল। সে কথা সে ভুলতে পারে না। ভুলতে পারে না বলেই মনে বড় দ্বিধা। সিদু কানু দেবতার দেখা পেয়েছিল, সাঁওতাল জাতি তাদের জনমভর মনে রেখেছে। নবীন এক দেবতার দেখা পেতে যাচ্ছে, তাকে কি মনে রাখবে সাঁওতাল পল্লী।

মহুল গাছের মাথায় রাতের আকাশ। আকাশে নক্ষত্রেরা স্থির। চরাচরে কোন শব্দ নেই। নবীন মাটির উপর বসে পড়ে। বুক গম্ভীর হয়ে যায়। বুকের ভিতর যে মানুষটা জেগে আছে সে তো কোন কথা বলে না। অনাথ মণ্ডলের মরার পর সাঁওতাল গরীব মানুষগুলোর উপকার কি হলো? মোড়লের বেটা মরেছে সেই দুঃখেই আত্মহারা হয়ে দিন কেটে গেল। এখন তো গাঁয়ে কারো ঘুম নেই। এত জমি, এসব তো ভোগ করা যাচ্ছে না। ভেবেছিল তাদের জমি তাদের ঘরে ফিরে এল, কিন্তু তা তো হল না। সন্ন্যাসীর বড় গোঁ। নবীন পড়েছে বিপদে। গাঁয়ের মানুষ তাকে বিশ্বাস করে না, বলে দালাল। কথা বলা বন্ধ করেছে সকলে। নবীন আকাশ নক্ষত্রের নিচ দিয়ে অন্ধকারে হাঁটতে থাকে। থকথকে অন্ধকার, জ্বলে গুলে যেন অনেকটা তরল হয়ে গেছে। ঐ জঙ্গলের দিকে সরু একখানা আগুনে লাল চাঁদ উঠেছে।

গাঁয়ের মানুষ সব জেগে আছে? জেগে না ঘুমিয়ে বোঝা যায় না। ঘুমিয়ে [illegible]লেও স্বস্তিতে নেই। অনাথ মণ্ডলের [illegible] তাদের ঘুম পাতলা করে দিয়েছে। শ্লথ পায়ে নবীন হাঁটে। আজ সব মানুষগুলোকে জাগিয়ে তুলবে। সন্ন্যাসী তো জানছে না। সন্ন্যাসীর সামনে এসব করতে লজ্জা হয়। লজ্জার সঙ্গে ভয় এসে জুটেছে আজকাল।

এখন গভীর রাতে মানুষগুলোকে ডাকবে, ডেকে বলবে, দালাল! মু দালাল নহিরে, মু বড় দুখে আছি, তুহারা মুর শিরে হাত রাখ, শিরে হাত রাখ, গোড় চাপা, মু দালাল নহি।

মেঘনাদকে ভুলে গেছে সকলে। এখন মুখে শুধু সন্ন্যাসী আর মোড়লের জমি। তার বুকের ভিতর ঢুকে সেই মানুষটাও ক্রমশ ভাষা হারাচ্ছে। সে তো [illegible] নবীন এমন হয়ে থাক। তার জাত [illegible] ভবানন্দ হয়ে যাক। মেঘনাদ [illegible] থেকে এবার বেরিয়ে উঠে যাবে হরিণডাঙ্গা কলাবনির

আকাশে। সেখানে মূক নক্ষত্র হয়ে পৃথিবীর সব পাপ দেখবে।

আবছা অন্ধকারে একটা ছায়া হয়ে মানুষটা এগোচ্ছে। গাছগাছালি সব ভূতুড়ে হয়ে আছে। এটা হাড়িরামের ঘর। একেবারে নিথর। নবীন নুয়ে যায় ঘরের সামনে এসে। ডাকবে মানুষটাকে। ডেকে সব বলে দেবে, বুকের সমস্ত অন্ধকার দিয়ে দেবে রাত্রিকে। কদিন বাদে চাঁদ বড় হয়ে সে অন্ধকার খেয়ে ফেলবে। গলার ভিতরে শব্দ বাক্য জড়িয়ে যাচ্ছে, গোঙানী উঠে আসছে যেন। নবীনের শরীর কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়ে। মুখে ভাষা নেই।

আবার ওঠে মানুষটা। ভূতের মত এগোয়। সাঁওতাল পল্লীর ঘরগুলো রাস্তার দু-পাশে সাজান। অন্ধকারে স্থির। নবীন এক একটা ঘরের সামনে দাঁড়ায়, ডাকতে পারে না কাউকে।

সে ভয় পেয়ে যায়। সত্যি কি বোবা হয়ে যাচ্ছে। গলা দিয়ে আর কোনদিন শব্দ বেরোবে না। কোন কথা বলতে পারবে না, নাহলে এমন হচ্ছে কেন। এদের জাগিয়ে তোলার জন্যই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। অথচ—!

এগোতে এগোতে একসময় সে থমকে দাঁড়ায়। ঘরটার চাল উধাও হয়ে গেছে। ঝড় এসে ভেঙে দিয়েছে রাস্তাটা। বাতাস অন্ধকার ফিনফিনে সরু চাঁদের আলো খেলা করে যাচ্ছে মাটি আর বাঁশের উপর। শুকনো খড় ফরফর করে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। এই রাস্তাটা পীতাম কিস্কুর। নবীন হেমব্রম টানটান হয়ে দাঁড়ায়।

—পীতাম হে জাগি আছ?

বাতাস খল খল করে হেসে চলে যায়। সব নৈঃশব্দ্য ডোবে।

—নিদ যাও নাকি পীতাম হে।

আকাশের নক্ষত্ররা জায়গা পরিবর্তন করে। চাঁদের আলো কেঁপে ওঠে। নবীন ঘোরের মাথায় সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। একটা মেঠো ইঁদুর কাছের মাঠ থেকে এদিকে আসছিল মানুষের পায়ের শব্দে ফিরে যায়।

—জানু হে মরু বড় বিপদ!

—বিপদের কথা শুনবু পীতাম!

কেউ জেগে নেই। এই ঘরের মানুষ ঘরে নেই। নবীন বেরিয়ে আসে। যখন কথা বলালো তখন মানুষ নেই। মানুষের ঘরের সামনে তার কথা ফোটে না। সে মাঠে নেমে পড়ে। আলে আলে ভাগ করা মাটির পৃথিবী। একদিন এসব জমির কোন সীমানা ছিল না। বলবান সীমানা তৈরী করে দিল। জমির গায়ে মানুষের নাম লিখে দিল। সকলের হল না। কেউ কেউ পেল, রাজা হবে গেল অনাথ মণ্ডল।

সে উবু হয়ে বসে। কোমর থেকে কি যেন বার করে। একটা তাবিজ। সোনার তাবিজটা সে মাটিতে ছোঁয়ায়। থমথমে হয়ে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মাঠ-পাথরে জ্যোৎস্না বিদীর্ণ করে একটা চিৎকার ওঠে। মরু বড় বিপদ, কি করি বলছে!

ভোর ভোর নিখিলানন্দ হরিণডাঙার ঘুরে বেড়ায়। মাথার ভিতরে অনেক ভাবনা খেলা করে। পুরো হরিণডাঙাটা করে তুলবে পুণ্যব্রত সংঘের দ্বিতীয় হেড-কোয়ার্টার। জমিজমা মন্দির, লাঠি-ছুরি খেলার আখড়া করে সে হয়ে যাবে এখানকার প্রধান। প্রশান্ত চোখ-মুখে গাঁয়ে যখন বেরোবে, সমস্ত মানুষে মাথা নুয়ে প্রণাম জানাবে। ততদিনে নিশ্চয় এই সাধন মার্গে তার গোটা তিনেক প্রমোশন হয়ে গেছে। পুণ্যব্রত স্বামীর পরেই তার নাম উচ্চারিত হবে।

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনল নিখিলানন্দ। মানুষের কণ্ঠস্বর। কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। চেনা মনে হচ্ছে। সে এগিয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে দেখে, একটা মানুষ উপুড় হয়ে কাঁদছে। মাটিতে মুখ ঘষছে। নিখিলানন্দ নবীনকে তুলে ধরে, 'কি হয়েছে?'

নবীন থতমত খেয়ে বোবা হয়ে যায়। কথা বলে না। নিখিলানন্দের সঙ্গে হাঁটে ঘোরের ভিতর। সোনার তাবিজটা মাঠে পড়ে থাকল। আলো ফুটছে। নভমণ্ডলে নীল রঙছড়িয়ে পড়ছে। পূবে রক্তিম রেখা।

কয়েকদিনের অসহ্য গরমেও কলাবনি ছিল শান্ত। একদিন বিকেলে সব অন্য রকম হয়ে গেল। কলাবনিতে শনিবার হাট বসে। ছোট হাট, চারপাশের গ্রাম থেকে চাষীরা আনাজপত্তর নিয়ে আসে। এখন বৈশাখের মাঝামাঝি। শীতকালীন শাকসব্জি কবে শেষ হয়ে গেছে, ফলে হাটটার রমরমানি তেমন নেই। রমরমানি এখন তেমন থাকেও না। কারণ, মানুষের হাতের পয়সায় এই সময় টান ধরে। মহুয়া আর শুঁটকি মাছের গন্ধে বাতাস ভারি।

অম্বুজাক্ষ বারিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে দীপংকরের। অম্বুজাক্ষ বলছিল, তাড়াতাড়ি যে-কোন ডিসিসন নিতে।

—এত তাড়া কিসের? দীপঙ্কর প্রশ্ন করেছে।

—চাষের সময় চলে আসছে, তখন তো আপনার ডিসিসন মতই কাজ হবে।

—ডিসিসন যদি আপনাদের ফেবারে না যায়? দীপংকর পাল্টা প্রশ্ন করেছে।

—তখন আমাদের পথ আমরা দেখব। অম্বুজ টান টান হয়ে জবাব দিয়েছে। এই দীপঙ্কর চৌধুরীকে সে সহ্য করতে পারে না। লোকটা সেদিন তাকে অপমানই করেছে, তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

—তাহলে বলুন আপনারা আমার উপর নির্ভর করে নেই। দীপংকর বলেছে। অম্বুজাক্ষ চুপ করে থেকেছে। কি বলবে এর উত্তরে সে।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে আবার বলেছে, 'সেটাই স্বাভাবিক অম্বুজবাবু, আপনি নন, পিজাণ্টরা নিজেদের পথ নিজেরাই নেবে, আমি কি করতে পারি?'

—তবু আপনার ডিসিসনটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। অম্বুজ কথা বলেছে। সিগারেট মুখে নিয়ে লাইটার ঘষেছে।

—চেষ্টা করছি যাতে সমস্ত ব্যাপারটার গোড়ায় ঢুকে পড়া যায়। হুট করে কেন ডিসিসন নেওয়া এখানে সম্ভব নয়....।

অম্বুজাক্ষর সঙ্গে দীপঙ্ককে কথা বলতে দেখে রজনীকান্ত এগোবে এগোবে করেও এগোয় না। রাগ ঝাড়ে গুহিরামের উপর। গুহিরাম মাথায় ধামার ভিতর রজনীবাবুর কেনা আলু-পিঁয়াজ নিয়ে তাঁর পিছনে হাঁটছে। সে মলিন চোখে দীপংকরকে দেখতে দেখতে এগোয়। দীপঙ্করের সামনে এসে দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল গুহিরামের।

পিথা নায়েক লাল পাঞ্জাবীটা পরে উবু হয়ে বসে আট আনায় তিন গ্লাস মহুয়ার মদ মেরে দিয়ে হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে রাজবাড়ির দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকল। রাজবাড়ির ছাতে হলুদ শাড়ির আঁচল উড়ছে, পিথা দেখতে দেখতে ঘোরের মাথায় বসে থাকল।

ঠিক এই সময়ে সমস্বর চিৎকার উঠল, হুড়, হুড়, হুড় [illegible]ছে। ঠক-ঠক শব্দ হচ্ছে দোকানঘরের টিনের চালার উপরে। ঢিল পড়ছে মনে হচ্ছে। বাতাস প্রবল বেগে ধেয়ে আসে। পিথার গায়ের উপর একটা বরফের টুকরো পড়ল। সে চিৎকার করে উঠল, হুড়, হুড় পড়িছে।

রাজবাড়ির মাথা থেকে হলুদ আঁচল উধাও। শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বাতাসে হাটটা মুহূর্তে তছনছ হয়ে গেল। হঠাৎ সব খাঁ খাঁ করে। মানুষজন আশ্রয় নিয়েছে দোকান আর রাসমঞ্চের নিচে। যেন

বড় বড় বরফ পড়ছিল, বাতাসও জোরে। তারপরে আকাশ কাঁপিয়ে এল বৃষ্টি। ছাই-রঙা মেঘ উড়ে এসেছে কোন্ ফাঁকে উপরের আকাশে। শিলাবর্ষণ থেমে গেল। বৃষ্টি আধঘণ্টার উপর হয়ে আস্তে আস্তে থেমে এল। হাট আর জমল না। পিথা নায়েক চললো রাজবাড়ির দিকে। মাটি ঠান্ডা হল।

দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার উপরে। কি করবে ভাবছে। এখন ঘরে ফিরতে ভাল লাগছে না। মাঝেমধ্যে এই বিকেলটা অসহ্য হয়ে আসে। সে আস্তে আস্তে নদীর দিকে হাঁটে। পিথা নায়েক তো নদী পার হয়ে আজ ওপারে নেশা করতে গেল না। ব্যাপারটা কি? হাটে বসেই নেশা করেছে, তবুও। প্রাত্যহিক অভ্যেস ত্যাগ করল কেন, দীপঙ্করের মাথায় ঢোকে না। সে এক পা এক পা নদীর দিকে এগোয়।

কংসাবতীকে এই সময় ভীষণ ভাল লাগে। দীপঙ্কর বালির দিকে চোখ মেলে নিশ্চুপ বসে থাকে। হাট ফেরত লোকগুলো গুন্ধরে নদী পার হচ্ছে। কেউ কেউ অবাক চোখে দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবু মানুষদের এইসব ব্যাপার তাদের অবাক করে। তারা সারাদিন কাজেকর্মে এইরকম বসে থাকার সময় পায় না। যেটুকু পায় সেটুকু মদ নিয়ে বসে কাটিয়ে দেয়। কেউ কেউ পীরিত করতে ছোটে মনের মানুষের কাছে। একা একা এইভাবে বসে থাকার কি আছে!

দীপঙ্কর সামনের দিনগুলোর কথা ভাবছিল। কলাবনির গন্ডগোলের সূত্রটি বার না করলেই নয়। আজ তো বৃষ্টি হয়ে গেল। বর্ষা আসলেই গন্ডগোল পাকিয়ে যাবে। আজ তো সামান্য বৃষ্টি, শুকনো মাটি সব টেনে নিয়েছে। মাটি ভেজেনি উপরে উপরে। কলাবনির সমস্যা মাথায় চেপে বসেছে। পরশু রজনীকান্ত সাউ আর চার-জন লোক বসেছিল অফিসে। দীপঙ্কর ওদের সময় দিতে পারেনি। বলেছে অন্য দিন আসতে। লোকগুলোর চোখ-মুখ মলিন হয়ে গিয়েছিল। বিপন্ন মুখ সকলের। এর পর বাইরে বেরিয়ে চাষীদের সঙ্গে দেখা। তাদের চোখ-মুখে জিজ্ঞাসা। সকলেই, জমির মালিক থেকে চাষীরা দীপঙ্করের দিকে তৃষিত দৃষ্টি রেখেছে। ঠাউরেছে বড়-সড় কিছু। ম্যাজিকের বাক্স তার হাতে, যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যাপার ঘটাতে পারবে। এতগুলো লোকের ভাগ্য যেন তার হাতের মুঠোয়। চাষীরাও তেমনি বিশ্বাস করে, অম্বুজাক্ষ বারিক, চাষীদের নেতা সেও সেই রকম চায়। দীপঙ্কর চৌধুরীর হাত থেকে সব হয়ে যাক। এসব সত্যিই কি হয়! কলাবনির রহস্য অতলে। অগ্নিগর্ভ এই মাঠ প্রান্তরের আগুন নেভানোর চাবি-কাঠি সে কখন কোত্থেকে পেয়ে গেল জানে না। সমস্তটাই সরকারী পদের আনুকূল্যে। অস্পষ্টতা আইন। কলাবনির জন্য কোন আইন লেখা হয়নি। কোন আইনে সে-সব সমস্যার ইতি করে দেবে।

যাবতীয় শিক্ষা কলাবনিতে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। এত মানুষ একজন বাইরের অচেনা মানুষের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। এসব হয় না, এভাবে হয় না। এই-ভাবে হওয়াতে গিয়ে সমস্যা আরো জটিল হয়ে গেছে। এসব কথা ওদের বোঝালেও বুঝবে না।

বেলা নেমে আসে। অন্ধকার হওয়ার আগেই ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে। হাতে টর্চ নেই আজ। অন্ধকারে এইসব মাটি বিপজ্জনক। সাপ চলাফেরা করে হাল্কা হাওয়ায়, দীপঙ্কর এগোতেই দেখে সামনে গুহিরাম।

সে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এই বোবা মানুষটা তাকে কলাবনি চিনিয়েছিল। সেদিনের কথা তো এখনো মাঝেমধ্যে মনে হয়। লোকটা তারপরে আর আসেনি। কোন কারণেই আসেনি। আসতে পারত। তার তো জমি নিয়ে চাকরী এই বোবা মানুষটা আসে না কেন? জমি দখল করেনি একটুও। সেই জেনেছে।

বোবা গুহিরাম দীপঙ্করের সামনে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেছে। এই বাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি। কি বলবে বাবুকে! বলতে পারবে না তো সে। গুহিরাম দু-হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। দীপঙ্কর চৌধুরী অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

বোবা মানুষটাকে দেখলে দীপঙ্করের কষ্ট হয় হঠাৎ। তাকে যদি কোন প্রতিদান সে দিতে পারত। অনেক উপকার করেছিল সেইদিন। তারপর আর একদিনও আসেনি।

আসেনি কেন? বাবু রজনীকান্তর ভয়ে নাকি চাষীগুলির ভয়ে। দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'ভাল আছ?'

লোকটা নিশ্চুপ ভাষাহীন চোখে তাকে দেখে, তারপর হনহন করে অতিক্রম করে কাঁসাই-এর বুকে নেমে যায়। দীপঙ্কর দেখে ধবধবে বালির উপর অন্ধকার নামাতে নামাতে মানুষটা এগোচ্ছে। এই মানুষ ভোর সকালে আলো ফোটাতে ফোটাতে নদী পার হয়ে যায়। নদীটা বোধহয় এর মুখ চেয়ে সারাদিন নিথর হয়ে পড়ে থাকে। বোবা মানুষটাই সকাল-সন্ধ্যার মালিক।

হাঁটতে হাঁটতে দীপঙ্কর নিজের ভিতরেই মন্তব্য করে, আশ্চর্য মানুষ। কিছু নেই ওর, অথচ দেখায় সব আছে। তোয়াক্কা করে না কাউকে।

পিথা নায়েক বৃষ্টি থামতেই রাজ-বাড়ির দিকে এগিয়েছে। বৃষ্টির আগে ছাদে হলুদ চিহ্ন দেখেছিল। নেশা আরো গভীর হয়ে চেপে বসেছে তার উপর। সে হন-হন করে রাজবাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দেউড়ি পার হবে হবে করেও পার হয় না। অবাক চোখে রাজবাড়িটাকে দেখতে থাকে। এতদিন ধরে দেখছে, আজ যেন সব অন্যরকম মনে হচ্ছে। নতুন চোখে দেখছে রাজবাড়িটাকে। পিথা নিজের পোশাকের দিকে নজর দেয়, প্রতি হাটবারে সে এই লাল পাঞ্জাবী আর সবুজ চেকের লুঙ্গিটা পরবে। আজ মাথায় চপ-চপ করে সরষের তেল মেখেছে। এই গরমে ও গায়ে মহুয়ার তেল ঘষেছে স্নানের আগে। তারপর ভালভাবে সব জল দিয়ে ধুয়ে ফেলেছে। পিথা রাজবাড়ির সামনে এসে কি করবে ভেবে পায় না, মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধলে ভাল হত। রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথায় হলুদ পাগড়ি বাঁধলে কাজ হত। হলুদ পাগড়ির সামনে গোলাপী পালক। পাখির পালক। কোথা থেকে জোগাড় হবে গোলাপী পালক। কোন পাখি গোলাপী। পিথা মনে করতে চেষ্টা করে, মাথায় আসে না, যত পাখি দেখেছে, তার কোনটাই তো গোলাপী নয়। অথচ গোলাপী পালক না জোগাড় করলেই নয়। গোলাপী পাখি কখন উড়ে যায়, দেখলেই তীর-কাঁড়া নিয়ে দাঁড়াবে। জমির উপর জানু পেতে পিথা নায়েক স্থির হবে, তারপর ধনুকে আর তীর নেবে হাতে, সাঁই সাঁই করে তীর ছুটবে। হাই তীর ছুটবে মাছরাঙা পাখির মত, স্যাং করে তুলে নেবে রঙীন মাছ, রঙীন মাছ বা রঙীন পাখি। হলুদ উষ্ণীষ গোলাপী পালক, তির-তির করে বাতাসে পালক কাঁপতে থাকবে। সে গম্ভীর স্বরে চিৎকার করে উঠবে...। কি বলবে! পিথা মাথা ঝাঁকাতে থাকে। কি বলবে মাথায় ঢোকে না। সে রাজ-বাড়ির সামনে বসে গালে হাত দেয়।

বিকেলে ডাক্তার এসেছিল। ডাকতারদার সঙ্গে লাবণ্য দাঁড়িয়েছিল ছাদের উপর। সেই সময় এল শিলাবৃষ্টি। লাবণ্যদের ঘরে নামতে হল। ডাক্তারদা আবার বেশ স্ফূর্তি হয়ে গেছে। লাবণ্যই মাঝেমধ্যে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ডাক্তারদা আমার উপর খবরদারী করলে কি হবে, আসলে সম্পর্কে তুমি ছোট মনে রাখবে। ডাক্তার মলিন হেসেছে। মুখটা বিষাদে ভরে গেছে। লাবণ্যর তা নজর এড়ায়নি।

(ক্রমশঃ)

নাথু যেদিন বাদশা ও শকুন

বাহারুদ্দিন

ঘুম থেকে উঠেই মনু বড় বয়রার (বয়রা পুরুষ মোষ) বাথানে ছুটল, সে তখনো হাতমুখ ধোয়নি, পোড়া তামাক দিয়ে দাঁত মাজেনি, তার পরণে মারকিনের গামছা, তার কান-পিঠে কাদার দাগ, গতকাল সারাদিন বিলের জলে সাঁতার কেটেছে, ভইস নিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছে অনেক, পাঁক ভেঙে বাথানে মোষ বেঁধে ছোট বয়রাটাকে খের দিয়েই চলে আসল, বড় বয়রা বুধ. খের চিবোতে পারে না, কোনমতে নরম টাটু ঘাস চিবোয় সারাদিনের পরিশ্রান্ত মনু ঘাস দিতে ভুলে গেল, ভাত খেতে বসে দিনের কাজকম্মের হিসেব নেয় বাপ, বাপ-পুতের দেখা হয় এই ভাত খেতেই একবার—বিশেষ করে ক্ষেতের মরসুমে। বাপ জিজ্ঞেস করে, বড় মিয়াকে ঘাস দিসত নি রে মনু, মনু চুপ থাকে, ভুলে গেছি বলবে সাহস নেই, সে দম মেরে বসে থাকে, বাপ টের পায় ঘাস দেয়া হয়নি, বাপ ফুলে ওঠে, ফুসফুস করে, মনুও কষ্ট পায়, বেচারা বড় বয়রা অসহায়, আগেরমত চলাফেরা করতে পারে না, পাঁক ভেঙে একটুকুতেই হাঁপিয়ে ওঠে, লাঙল টানতে অক্ষম, কাঁধে জোয়াল লাগালেই শুয়ে পড়ে, মনুর বাবা মজাই মিয়া বোঝে দিন আর বেশী নেই, বড়বয়রা একদিন পড়বে, আর উঠবে না, বড় বয়রাকে মজাই মিয়া আদর করে ডাকে বড় মিয়া, বড় মিয়া আজকাল সকালে আট-নটা অব্দি বাথানে শুয়ে থাকে, কেউ এসে তুলে দিতে হয়, ক্ষেতে যাবার আগে মনুই ঘাস দিয়ে যায়, ক্ষেত থেকে ফিরে মজাই মিয়া ঠেলে ঠেলে ঘাস খাইয়ে দেয়, একসময় বড় মিয়া অনেক মেহনত করেছে, অনেক খাইয়েছে মজাই মিয়াকে, মজাই মিয়ার মাত্র তিন বিঘা জমি ছিল, বড় মিয়ার কাঁধ দিয়েই তিন বিঘা বাড়তে বাড়তে দশ বিঘা হল। পুবের বাড়ির ইমান চাচা বলেন, 'কি করতায় মজাই মিয়া আরো কি কামাই খাইবার সাধ আছে, তোমার বড় মিয়ারে ইবার ছাড়ো—নাথুও দুই পয়সা পাউক।' মজাই জবাব দেয় না। এই কথা শুনলে বড় কষ্ট লাগে। নাথু শাগা বেপারী। ধাপ্পড়। দয়া-ধর্ম নেই। পনেরো বিশ টাকায় কিনে নেবে। জ্যান্ত বড় মিয়ার গলায় দা চালাবে, চামড়া তুলবে, শিং কাটবে, মাংস কাটবে—এসব মজাই সইতে পারে না, বড় বয়রা পড়ে পড়ে মরুক, আপত্তি নেই,—বড় বয়রাকে জান থাকতে সে নাথুর কাছে বিক্রি করতে পারে না, বড় বয়রা প্রাণের ধন, বুদ্ধ বড় বয়রাকে কিনে নিয়ে যাবার জন্যে নাথু দু-একবার মজাই মিয়ার বাড়ী এসেছে, মজাই মিয়ার বউয়ের কাছে হাঁটাহাঁটি করেছে, মজাই মিয়ার মন গলেনি, নাথুকে আমল দেয়নি,—নিজের ছেলের মত বড় বয়রা, বড় বয়রা সুখে দুখে মজাইকে সঙ্গ দিয়েছে। অন্য ভাইরা আসাম চলে গেল মিরাশ করবে বলে, মজাই সবার বড়, মজাইকে ওরা বলে। মজাই বলল, 'স্থান ছাড়িলে মান হারা,'—বউও রাজী হল না, সে দেওর দেরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে,

তিন লড়ায় কলাগাছ মরে, আল্লায় খাওয়াইলে অনু খাইমু, অনু মরমু।' মজাই বাপের ভিটে ছাড়তে রাজী হল না, বাপ-দাদার মাটি আঁকড়ে বসে থাকল, ভাইরা নিজের নিজের ভাগের জমি বিক্রি করে দিল, মজাই দুঃখ পেল, কিনতে পারেনি, জমি কিনলেন বাশের বাড়ি হাজী আরিফ আলী, মজাই আজো বিশ্বাস করে ভাইরা অত কিনলেন পাশের বাড়ি হাজী আরিফ আলী, রাঘব বোয়াল, হাড়ে হারামি, পেছন থেকে উঁকি ঝুঁকি দিলেন এটা তার স্বভাব, আরিফ আলী জমি পাগল, যদি শুনলেন কেউ জমি বিক্রি করবে, সঙ্গে সঙ্গেই তার বাড়ি হাজির হবেন, যেনেতেনে মাটি তার চাই, এই করে করে কত গরীব লোকের মাটি গ্রাস করলেন, কেউই জমির পুরো দাম পায় না, পায় না এককালীন, আরিফ আলী প্রভাবশালী, তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পায় না কেউ, জলের দামে খরিদ করলেন ভাইদের জমি, মরুব্বত-চোখের ছায়া সরম নেই, খরিদ করার আগে একবার ও জিজ্ঞেস করেন নি মজাই মিয়াকে, তার ছোট তিন ভাইকে রাত্তিরে দাওত খাইয়ে ভুলিয়ে দিলেন, তিন ভাই হাজী সাবের বাড়িতে ভাত খেয়েই উঠে গেল আসমানে, জমি কেওলা করে দিয়ে দিল। মজাই দুঃখ পেল ভেতর ভেতর, টু শব্দ করে নি। সবর করে বসে থাকল। ধীরে ধীরে গ্রামে গোষ্ঠী-গাড়া বলে কেউ থাকল না, সবাই অভাবের তাড়নায় জমি বিক্রি করে আসাম চলে যায়, জমি গ্রাস করলো আরিফ আলী, মজাই মিয়াও শেষের দিকে দু-তিন বিঘে কিনেছে, তাও কি সহজে, সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন আরিফ আলী, আরেকজন তুচ্ছ কৃষক জমি কিনবে, হতে পারে না, ছলে বলে কৌশলে মজাইকে বারণ করলেন, মজাই মিয়া তোয়াক্কা করেনি, খোদার উপর ভরসা করে করেই পা বাড়াল। প্রথম দিকে তিন বিঘে জমি, বড় বয়রা আর পরিবারই ছিল একমাত্র সম্বল, এর উপর নির্ভর করেই নিজের মেনত-মজুরী দিয়ে সে গোলা ভরে ধান তুলত। অন্যের জমিতে পাঁচ মণ ফসল হলে তার জমিতে ফসল ফলে দশ মণ, লেকে বলে তকদীর, মজাই বলে তদবীর, কামাই করতে হয়, মেহনতের ফসল। বিয়ের দু বছর পরেই মনু এল সংসারে। মনুর মুখ দেখে সে সব দুঃখ ভুলে যায়, কাম-কাজে উৎসাহ বাড়ে, মনু ধীরে ধীরে বড় হয়, মজাই ক্ষেত বাড়ায়, তার আয় বাড়ে, বউ ভাবে ছেলেটা কপালী আদর করে নাম রাখে নসীব আলী, ডাক মনুরাজা।

এখন রোয়ার মরসুম। কয়েক দিন থেকে বিষ্টি নেই। মাঠের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। সব কাজেই তাড়াহুড়ো। খুব ভোরে উঠল মজাই। তখনো কাক-পক্ষী ডাকে নি, আজান পড়েনি, তার আর ঘুম আসে না, সে উঠেই বাথানে গিয়ে মেজো বয়রার সামনে খের দিল, বড় বয়রাকে ঘাস দিল। অজু করে নামাজ পড়ল। নামাজ পড়তে পড়তে অনেক কথা মনে পড়ে। সে একমনে নামাজ পড়ার চেষ্টা করে, পারে না, নামাজের নিয়ত দোয়া-আরবী পড়া সে কিসুই বোঝে না, ফিসফিস করে মনে মনে বলে যায় তার মন চলে যায় অন্যত্র। মাঠে। ক্ষেতে। সে ফরজ-সুন্নত চার রাকাত নামাজ আদায় করে চা-পিঠা খেয়ে মেজো বয়রাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তার কাঁধে লাঙ্গল, হাতে পাঁচন, পিঠে রসি দিয়ে ঝোলানো বাঁশের ছাতা, যাবার আগে বউকে বলে, '—মনুরে জলদি জলদি পাঠাই দিস, আইজ অনেক কাম। আইল তোলা, মাটি টানা, কাছা কাটা —কামের শেষ নাই।' বউ সায় দেয়। সবার আগেই মজাই আজ হাল নিয়ে বেরিয়েছে, এখনো তেমন ফর্সা হয়নি, কোন কোন মসজিদে আজান পড়ছে—আল্লাহ আকবর—

—আচ্ছ - ছলোতু খাইরুম মিনা-নাউম- (মহান আল্লাহ...ঘুম থেকে নামাজ শ্রেষ্ঠ) —মজাই আজানের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না, কেবল জানে এ হচ্ছে নামাজের ডাক। ভোরের আজান তার খুব ভালো লাগে, আজকাল আর কেউ তেমন আজান দিতে পারে না, আজান দিত রসীদ দাদা, শোনা যেত দু মাইল দূর থেকে, আজান শুনতে শুনতে মজাই মিয়ার মন নরম হয়ে আসে, সে মনে মনে আজানের উত্তর দেয়, আজান শেষ হলে সে দরুদ পড়তে পড়তে এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে রাস্তার পাঁক ভেঙ্গে, মোষ আর তার চলায় পাঁকে হড়াৎ হড়াৎ শব্দ হয়। শব্দ ভেসে যায় গো-পাট থেকে পাশের বাড়ির দিকে, পাশের বাড়ি ইরমান চাচার, ইরমান চাচার বউ জেগে উঠেন। ইরমান প্রতিবেশী, ইরমান চাচার বউকে মজাই মিয়া চাচী বলে ডাকে। মজাই মেজো বয়রার নাম দিয়েছে ভোলা, মেজো বয়রার আর্থের জন্য, আগন-কার্তিক মাসে মেজো বয়রাকে সামাল দেয়াই মুশকিল, রাগে ফেটে পড়ে। চোখে চোখে রাখতে হয়। বড় বয়রা অবসর নিচ্ছে। সমস্ত দায় দায়িত্ব মেজো বয়রার উপর। পুরো বারো হাল চষে। মাড়াব দিনে মাড়া দেয়। মইয়ের দিনে মই। ফুরসত নেই। এত কাজ, তবুও হিলে না। যেন লোহার শরীর। আশপাশের লোকজনেরা বলে, মজাই মিয়ার তকদীরই এরকম মোষ তাকে চেয়েছে। সময় ভালো। লোকের নজর (কু-দৃষ্টি) লেগে যাবে বলে সে মেজো বয়রার গলায় তাবিজ লাগিয়ে দিয়েছে। তাবিজ নিয়ে এসেছে নতুন পুরের নুরাই মোল্লার বাড়ি থেকে। তাবিজ আনতে তার তিন চারবার হাঁটাহাঁটি করতে হয়। নুরাই মোল্লা ব্যস্ত মানুষ। অনেক বলে টলে মজাই তাবিজ যোগাড় করেছে। কেবল তাবিজ দিয়েই সে শান্তি পায় নি। আম্বর আলী মৌলবীর কাছ থেকে সরায় কোরানের আয়াত লিখিয়ে নিয়ে এসেছে। আম্বর আলী কামিল মানুষ। যে তার আশ্রয় পেয়েছে-আর তার ডর ভয় নেই। মজাই মিয়ার বাড়িতে জিনাতের বড় উৎপাত। ঘুমোলেই সে টের পায় বাথানে ওরা যেন লড়াই করছে। মোষের মায়ায় হাতে লাঠি আর টর্চ নিয়ে বাথানের কাছাকাছি এসে দেখে কিছুই নেই—বড় বয়রা হাঁপাচ্ছে। একদিন দুদিন নয়, অনেক দিন। জিনে প্রথম বড় বয়রার উপর চড়া করে। বড় বয়রা মরণা-পন্ন। ঘাস খায় না, শুয়ে থাকে, পাশের গ্রামের লতীফ ডাক্তার এল। পরীক্ষা করে ইনজেকশন দিয়ে পঁচিশ টাকা গুণে নিল। রোগ সারা তো দূরের কথা, দিন দিন বড় বয়রা যাই যাই অবস্থা, ইরমান চাচা ভালো মানুষ, বিপদ- আপদে সহায়, মজাইকে বাতলে দিলেন নুরাই মোল্লার কথা, বললেন, ভূত ফেরতর কারবার, আম্বর আলী ছায়বর কাছে থাকি সরা লেখাই আন, ভূত মরি মরি করি পালাইবা। মজাই সেই করল। তাবিজ লাগাল। বড় মিয়া উঠে পড়ল। দু দিনেই তনু ফিরে আসল। ফিরে আসল আগের কাটাকাটি শরীর। নুরাই মোল্লাকে নিয়ে লোকে অনেক কথা বলে মজাই টের পেয়েছে মোল্লার কামাই। এদিনে এসেছে মোল্লার উপর। পরে সে ভোলার জন্যে একটা তাবিজ আনিয়ে রাখল, তাবিজ বেঁধে রেখেছে চালের নিচে।

বাবা বাবা চা—চা বলে [illegible] পাঁক ভেঙ্গে খনন পাড়ার রাস্তা [illegible] ভোলাকে নিয়ে বড় সড়কে উঠল, তি[illegible]র আলোয় দু-একজন করে করে কৃষক মাঠে বেরোচ্ছে সবার মুখেই চা-চা হেই হেই গরু-মোষ চালানোর শব্দ, ভোরের ফুর-ফুরে হাওয়া আর চড়াই উৎপাত শব্দ-গুলোর মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে দিন, সূর্য উঠি উঠি করছে, যেন কারো অপেক্ষায়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া ইতস্তত কৃষকের আওয়াজ খালি ক্ষেতের মাঠে ক্ষীণ প্রতি-ধ্বনি করে করে ছুটে যায় ঘুমন্ত অলস কৃষকের বাড়ির দিকে। —মজাই রেল লাইন পেরিয়ে বোয়ালি বিলের মাঠে নামে। তার সাড়া শব্দ পেয়ে কোনের বাড়ীর রেজার মা জেগে উঠেন। হাঁক ডাক আরম্ভ হয়। —অ শংগুলে, অ রেজা উঠো রে, উঠ, আর কত ঘুমাই তার, বিহানের গাড়ি আই-বার সময় অইছে—কোন সময় হাল ধরতায় তোমরা। শংগুল, আর রেজা দুই ভাই নড়ে না, ঘুমোয়। তাদের ঘুম পুরো হয় না। শংগুলের মা চেঁচিয়ে ডাকেন, তার ডাক ভেসে যায় বিলের দিকে, বিলের ওপার থেকে ও শোনা যায়, সে শংগুল,

দিয়ে শোধ করতে পারে না, ধীরে ধীরে হাজী আরিফ আলী গ্রাস করেন জমি নিঃস্ব হয় কৃষক, বিক্রি করে ভিটে বাড়ি, চলে যেতে হয় আসামে, পাড়া প্রতিবেশীর দুঃখে মজাই কাঁদে, অশ্রুহীন কান্নার শরীক সে একাই, সে নির্ভীক এবং নিরুপায়। বাড়িতে বলে এসেছে মনুকে জলদি জলদি পাঠিয়ে দিতে। পুরো জমিটাই সে একবার চষে ফেলেছে। কাটাখান থেকে ভোরের রেলগাড়ি দক্ষিণ দিকে চলে গেল। এখানে মনু আসে নি। মজাই মনুর আসার পথ দেখছে। মনু আসছে না। পানী শুকিয়ে যাচ্ছে। আজকাল কাজের লোকের অভাব, ভিখিরির অভাব নেই। পাকিস্থান হিন্দুস্থান হবার পর থেকেই সিলেট জয়েনতীয়ার লোক আর ক্ষেতের কাজে এদিকে আসে না বর্ডার বন্ধ হয়ে গেল, ক্ষেত-কামের লোকের দাম বেড়ে উঠল, বিশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ হল। দিন দিন বেড়েই চলেছে। চারদিকে হাহাকার। দিন মজুরের হদিস নেই। রোয়া-উলীর অভাব। কাল মজাই গেল মুচি-পাড়ায়। ওরা বলে আর ক্ষেতের কাম পোষায় না চাচা, ওদের চাহিদা অনেক, মজাই গরীব কৃষক, রোজদারীর চাহিদা সে পূরণ করতে পারে না, একা সামলাতেও পারে না ক্ষেতে-কাম, মনু ও অল্প-বয়সী, তবু ও তো সকাল বিকেল বাপের সাথে লেগে আছে, মনুরে জল আন, মনুরে মাঠে যা, মনুরে বয়রাকে খের দেয়, বউ দুঃখ করে, চাঁদের বরণ ছেলে দেখতে দেখতে রোদে পুড়ে কাল ছাই হয়ে গেল, গাঁটির দুশন গুয়া, আর চকুর দুশমন পোয়া, গিটে সুপোরী থাকলেই যেতে ইচ্ছে করে। আর চোখের সামনে ছেলে থাকলেই কাজ দিতে ইচ্ছে করে, মজাই বউয়ের এসব কথা কানে না তোলার মতই হজম করে, ছেলের জন্যে তারও দুঃখ হয়, লোকের গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে তার মাত্র একটা, কি ছিল আর কি হল! সবই নসীবের দোষ।

এক সময় দেখা গেল মনু দৌড়ে দৌড়ে আসছে। মনু আসছে বেফানা হয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে খানিকটা দূরে থেকেই চেঁচিয়ে ডাকল, 'অ বাজান, বাজান, বড় মিয়া নাই.' বলেই কান্না থামাতে পারে না। মনু ভেঙ্গে পড়ে। জল বিষ্টি ঝড়ে মনু বড় মিয়ার পিঠে চড়ে বাড়ি আসত, বোয়ালি বিলের ওপার থেকে উঠত, দক্ষিণপার, বিষ্ণুঘর, সিঙ্গারকুড়ি ঘুরে ঘুরে বড় মিয়া আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলে আসত, বড় মিয়া ছিল মনুর খেলার সাথী, ঝড়ের সঙ্গী, সাঁতার কাটার সঙ্গী। একবার সাঁতার কাটতে কাটতে মনুর ইয়েতে একটা জোঁক ধরে। মনু কোন মতেই জোঁক ছাড়াতে পারে না, পিছল জোঁক বেদম রক্ত চুষছে, হঠাৎ মনুর খেয়াল হয়, সে বড় মিয়ার দিকে এগিয়ে যায়, বড় মিয়া দেখে, বড় মিয়া জিহ্বা দিয়ে চেটে চেটে জোঁকটাকে ফেলে দিল মনু রেহাই পায়, মনু সেদিন সোনা সোনা বলে বড় মিয়াকে আদর করে, বড় মিয়া ভীষণ শান্ত, রাগ বলে কিছুই ছিল না, উৎপাত করত না, মাঠে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলেই হল, ঘাস খেয়ে পেট ভরে নিজেই নিজেই বাড়ির দিকে রওনা দিত বিকেলে, মনু খালিবাড়ির খেলা ছেড়ে এসে পিছু নিত, পিঠে জল দিয়ে কাদা ছাড়িয়ে আদর করত, পিঠে চড়ে বসত, বড় মিয়া তখন বৃদ্ধের সুপোরী চিবোনোর মত জাবর কেটে কেটে এগিয়ে যেত বাড়ির দিকে।

কান্দিগ্রামের একজন হালুয়া, পেন্দা আবুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি অইল রে মনু?' মনু কেঁদে কেঁদে জবাব দেয়, 'আমরার বড় বয়রা মরি গেছে'। পেন্দা আবুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মনু হাঁটু-ভাঙ্গা পাঁক মাড়িয়ে দৌড়ে, পাঁক-জল ছিটকে পড়ে শরীরের এদিক সেদিক, আবুলের গরুর হাল, সে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়, গরুর লেজ টিপে গরুকে ধমক দেয়, গরুর পিঠে কঞ্চি কষায়, গরু আর যেন টানতে পারছে না, তবু ত চলছে, আবুল চেঁচায়, কথা বলে গরুর সঙ্গে, বেলা দশটা অইলরে গরু, হাটো হাটো।' গরু-জোড়া এগোয়, মনু পৌঁছোয় বাপের কাছাকাছি, মজাই খবর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভোলাও শ্বাস ফেলছে, লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, তাকিয়ে আছে মনুর দিকে, মনুর হাত খালি অন্যদিন মনু আসার সময় কাঁচা ধান নিয়ে আসে বয়রার জন্যে, বাপের জন্যে ভাতের পুটলা, ভোলা যেন অবাক; মজাইর হাত-পা অবশ হয়ে আসে, বুকের ভেতর খালি খালি, শৈশবে বাপ মারা যায় খবর শুনেই বুকের ভেতর শব্দহীন ধড়ফড় সুরু হয়েছিল এরকম। মজাই হাল ছেড়ে দেয়, জমি চসা হয় না, বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল ভোলা। বড়মিয়া ছিল মজাইর বরাতের চিজ অনেক কষ্ট দিয়েছে বড় মিয়াকে, হেমান জানোয়ার কথা বলতে পারে নি, নীরবে সহ্য করেছে, হাল ধরত ভোরে সবার আগে, ছাড়ত সবার শেষে বারোটায়, লোকে দোহাই পাড়ত, 'এত কষ্ট দিও না মজাই ভাই হেমান পশুরে, গুনাহ অইব।' মজাই শুনত, চুপ থাকত, কাজ শেষে বয়রাকে পেট ভরে খাওয়াত। মজাইর ভেতরে আজ ঝড় বইছে, বড় মিঞাকে কিনে এনেছিল লস্করের বাজার থেকে মাত্র দুশ টাকায়, বড় মিয়ার তখনো দাঁত উঠেনি নাদুসনুদুস ফোলো ফোলা শরীর, চোখ গুলো বড় বড় লাল, দেখেই পছন্দ হল মালিক বলল, 'দইশো পঞ্চাশ', মজাই বলল, 'এক কলোম ছায়েব'। মালিক রাজী হয়ে গেল, মজাই মিয়া কিনে নিয়ে আসল, সেদিন মনুর কি আনন্দ, একবার এদিক—একবার ওদিক ছোটাছুটি করছে, বয়রার কাছে যাবে ভয়, ধীরে ধীরে মনুর সব ভয় কেটে যায়, বয়রা হল মনুর খেলার সাথী, কথা শুনে না, সারাদিন বয়রা নিয়েই মেতে থাকে। আগে ছিল গরুর হাল, মজাইর অনেকদিনের সাধ মোষ কিনবে, কিনল, বড়মিয়া মজাইর কপাল ফিরাল, মজাই চাষ-বাস বাড়ল, আজ বড়মিয়া চলে গেল, এরকম হঠাৎ চলে যাবে মজাই ভাবেনি, বড় মিয়ার চলে যাওয়ায় আবার দিনের মন্দ ফিরে আসবে নাকি? একথা ভাবতেই শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়, না সেদিনগুলো আর সে চায় না, বড় মিয়া বৃদ্ধ হয়েছিল, চলে গেছে ভালোই হয়েছে, তাকেও একদিন যেতে হবে, সে তাড়াতাড়ি হাঁটে, অনেকদিন মসজিদে সিন্নি দেওয়া হয়নি, সিন্নি দিতে হবে, 'আল্লারম'।

ঘুম থেকে উঠেই মনু বাথানে গিয়ে দেখে বড় বয়রা গোঙরাচ্ছে। বাথানের চারদিকে নরম পায়খানা, পায়খানার ওপর বয়রা শুয়ে আছে, মুখে ফেনা উঠছে, শ্বাস ফেলছে ঘন ঘন, অতি কষ্টে, চোখ নীল, কাতরভাবে তাকিয়ে আছে মনুর দিকে, মনু মাকে ডেকে আনল, মা-ছেলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখে বড় বয়রা নিস্তেজ। মনু আর দাঁড়ায় না, বাপকে খবর দিতে ছুটল।

দুপুর বেলা মজাই ও মনু পাড়া প্রতিবেশীর সাহায্যে বড় মিয়ার মড়া বাথান থেকে টানতে টানতে রেললাইনের ধারে খাস জমিতে ফেলে আসল, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ধারালো ছোরা হাতে নাথু এগিয়ে আসছে, উড়ে আসছে শকুন ও চিল, মজাই দেখল, নাথু বড় মিয়ার শরীরে ছোরা চালাচ্ছে, মজাই পুকুর পাড় থেকে বাড়ির ভেতর চলে আসে, মনু বাথানে [illegible] দেখছে, নাথু ছোরা চালাচ্ছে, নাথু নিষ্ঠুর, নাথুর দয়মায়া নেই, নাথুর কাছাকাছি অপেক্ষারত চিল ও শকুন, নাথু অনেকদিন থেকে বড় মিয়ার মড়ার জন্যে বসে আছে, দেখতে দেখতে মনুর দাঁত কিড়মিড় করে উঠে, নাথু একমনে চামড়া ছাড়ায়, শকুনীরা এগিয়ে আসে, নাথু বাধা দেয় না, নাথু লেজের ধার-কাছের চামড়া ছাছাড়, নাথুর মুখ লেজের দিকে, শকুনীরা বয়রার মাথার দিকে, একটা শকুন বয়রার চোখে ঠোঁট মারল, নাথু চামড়া ছাড়িয়ে শেষ করে, মনু আর সইতে পারে না, 'অই হালার হালা হকুন। হকুনর বাইচর', চেঁচিয়ে গালি ছুড়ল, নাথু না-শোনার মতই চামড়া গুটাতে ব্যস্ত, সে প্রতিবাদ করে না, তার কাজ হাসিল, অনেকদিন পর কপালে একটা চামড়া জুটেছে, সে এখন বাদশা।

রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি

তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য

ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও রবি ঠাকুরের কাছে নিবেদিতার চরিত্র জটিল বলে মনে হত। অনেক আপাত বিরোধ তাঁর স্বভাবে। নিবেদিতার কল্পনার ঔদার্যে কবি মুগ্ধ হয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁর স্বভাবের বোধ আর মাত্রাছাড়া উৎসাহ তাঁর ভাল লাগত না। (নারায়ণী দেবী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত) এর থেকে আসল যে কথাটি বোঝা গেল, তা হল, প্রথমতঃ

ভগিনী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে একজন জটিল ও পরস্পর বিরোধী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ, ভগিনী নিবেদিতার আধ্যাত্মিক জীবনে নিজের ইচ্ছাকে দমন করে রাখা। আর এই দুটি ব্যাপারই রবীন্দ্রনাথকে খুব অবাক করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে [রবীন্দ্র রচনাবলী॥ অষ্টাদশ খন্ড ॥ বিশ্বভারতী] লিখেছেন :

'অন্ততঃ আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার (ভগিনী নিবেদিতা) সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।'

বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ

এই 'বলবান আক্রমণের বাধা' বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝাতে চেয়েছেন তা কিন্তু খুলে বলেননি। শ্রীমতি লিজেল রেমঁ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একদিনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমতি রেমঁ-র ভাষায় :

একদিন সকালে দুজনে (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা) একটা জটিল দর্শনের বই নিয়ে আলোচনা করছেন—বইটা বাংলায়। এমন সময় বেলুড় থেকে খবর এল স্বামীজি নিবেদিতাকে ডাকছেন। নিবেদিতা অমনি থেমে গেলেন, তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। বুদ্ধি যেন আর কাজ করছে না। আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রাহ্ম বন্ধুর কাছে এসব গোপন করবার চেষ্টাও করলেন না বলে উঠলেন, স্বামীজীর আশীর্বাদ অনুক্ষণ আমায় ঘিরে আছে। এক্ষুনি আমার যেতে হবে। হতবাক বিস্ময়ে রবিঠাকুর দেখলেন, তাঁর প্রখর বুদ্ধিমতী বান্ধবী হঠাৎ গুরুগত প্রাণা সেবিকা হয়ে গেছেন। অস্ফুটে বললেন, নিবেদিতা অন্তরের ভক্তি নিবেদন করবার মানুষ পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নাই।'

স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাঝপথে স্বামী বিবেকানন্দের ডাকে ভগিনী নিবেদিতার উঠে চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ বেশ খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, ক্রমে ক্রমে ভগিনী নিবেদিতার আত্মত্যাগ ও কর্মধারা সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুরা একটা অ' ? পেলেন। শ্রীমতি রেমঁ লিখেছেন যে :

'নিবেদিতার কাজের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর পরিকল্পনার ঔদার্যে। তাঁর বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত কর্মযোগের পিছনে যে উদার হৃদয়ের প্রেরণা, তারই প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য-সূত্রে বাঁধা পড়লেন। ঘন ঘন সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করে নিবেদিতাকে তাঁরা জনকয়েক প্রগতিবাদী মুসলমান নবাব আর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নিবেদিতাও সরলা ঘোষালের সঙ্গে মিলে একটা পাঠচক্র গড়ে তোলবার আয়োজনে লাগলেন ঃ

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা

এদিকে রবীন্দ্রনাথের ২৬ বছরের ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও ভগিনী নিবেদিতার আলাপ পরিচয় নিবিড় হয়েছে। এই সুরেন ঠাকুরের মাধ্যমেই আবার আরো বহুজনের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় স্থাপিত হয়েছে। আর এই সুরেন ঠাকুরের কাছ থেকেই ভগিনী নিবেদিতা বাংলাদেশের কৃষক সমাজের দুরবস্থা জানতে পেরেছিলেন। আর সুরেন্দ্রনাথও অন্যদিকে ভগিনী নিবেদিতার কাজকর্ম, বিশেষ করে তাঁর স্কুল সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসা করতেন। শ্রীমতি লিজেল রেমঁ এ সম্পর্কে লিখেছেন যে :

'ঠাকুর পরিবারের একটি ছেলে বিশেষ করে নিবেদিতার প্রতি অনুরক্ত হলেন। ছেলেটির বয়স ছাব্বিশ, কবির এক ভাইপো। তারুণ্যের দীপ্তি তাঁর স্বভাবে। ভারতবর্ষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ছেলেটির উপর নিবেদিতার পূর্ণ বিশ্বাস।

বাগবাজারে গিয়ে দেশের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন। জমিদারির তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে বহুদিন সেইসূত্রে বাংলার চাষীদের কথা খুব ভাল করেই জানেন। বেশীর ভাগ তাদেরই সুখ-দুঃখের কথা হত। কেমন করে সারা বছর তারা কাজ করে, রোদে-পোড়া শক্ত মাটিতে মাসের পর মাস লাঙল চালায়, অনাবৃষ্টির ভয়ে সর্বদাই কাঁটা হয়ে থাকে, তারপর যখন বর্ষা নামে তখন সে কী প্রাণান্তিক খাটুনি বন্যার ভয় বা আর কিছুই তাদের দমাতে পারে না। শুনতে শুনতে গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির অসহায় রায়তদের বুকফাটা কান্না ভেসে আসে নিবেদিতার কানে।

নানা প্রশ্ন করেন তিনি। সুরেন্দ্র জবাব দেন। সম্ভাবিত নানা সংস্কারের কথা তোলেন, সুরেন্দ্র কি বলেন তা শোনেন। ঘন্টার পর ঘন্টা দেশের কথা আলোচনা করেন দুজন।

সুরেন্দ্রনাথ একে একে তাঁর বন্ধুদের নিবেদিতার কাছে নিয়ে আসেন, বালিকা বিদ্যালয়টি দেখান সবাইকে। নাটোরের মহারাজকে বলেন, 'দেখুন, এই বিদ্যালয় হতে কালে বড়-একটা কিছু গড়ে উঠবে। ছাত্রীরা কেমন স্বচ্ছ আনন্দে এখানে বেড়ে উঠছে। দেশের ভবিষ্যৎ দৃপ্ত মহিমাকে নিবেদিতা এমনি করে রূপ দিচ্ছেন।'

সুরেন্দ্র প্রায়ই বলতেন, 'আপনার কাজ করবার মত বয়স আমার হয়নি, আমি এখনও ছেলেমানুষ। কিন্তু কি করব আপনার জন্য বলুন না!'

রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ

উত্তর হত, 'যেসব চাষী তোমার জিম্মায় আছে তাদের ভার নাও। তাদের যন্ত্রপাতি যোগাও, ভাল বাড়িঘর করে দাও, জমির খাজনা কমাও, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাও, বুড়োদের দেখাশোনা কর। একটা জমিদারের পক্ষে এই কাজই তো ঢের!'

উৎসাহ-ভরে তরুণ সুরেন্দ্রনাথ জমিদারির উন্নততর বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে নানা খসড়া করতে থাকেন। একদিন নিবেদিতা বললেন, পরের জন্য কাজ করাটা যে রীতিমত একটা 'তপস্যা' এটা বোঝ তো?'

এই সনাতনী কথাটা যুবকের কানে বাজে, তিনি অসন্তুষ্ট হন। নিবেদিতা বুঝতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, 'জানি, নিজের অজানতে আপনি আমায় হিন্দু করে তুলতে চান। তাই আপনার সঙ্গে চণ্ডী পড়তে বলেন।'

উত্তর হল, 'ঠিকই বলেছ বোধহয়। আমার কাজ করতে চাও না? ওতেও আমারই কাজ করা করা......'

দুই বন্ধু ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঝগড়াটা ভুলে যান।'

১৮৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ভগিনী নিবেদিতা অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। কলকাতার স্টার থিয়েটারে, এ্যালবার্ট হলে এবং ব্রাহ্মসমাজে তিনি শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে নানা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা দিলেন 'ইয়োং ইণ্ডিয়া' আন্দোলন সম্পর্কে। এর মধ্যে অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'কালী'। আসলে এই বক্তৃতাটি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সংস্কারপন্থী, একেশ্বরবাদী, মিশনারী ও এ্যাঙলো ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জের মতো ছিল। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। ঘটনাটি শ্রীমতী লিজেল রেম' তাঁর গ্রন্থে এইভাবে বিবৃত করেছেন :

'সুরেন্দ্রনাথ একদিন নিবেদিতাকে বললেন, 'মূর্তিপূজাই যদি করতে হয়, এই বীভৎস কালীমূর্তির পূজা কেন?'

নিবেদিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে জবাব দেন, 'আমি মূর্তিপূজা করি না। কালী যেমন আমার বুকে তেমনি তোমার বুকেও আছেন। এ অস্বীকার করা চলে না। এতে এত আপত্তির কি দেখছ?'

এই প্রথম নিবেদিতা সরাসরি স্বীকার করলেন যে মহাশক্তির প্রতীককে তিনি অন্তরে 'আমার' বলে গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্ম বন্ধুটি প্রশ্ন না করলে তিনি হয়তো নিজেকে যাচাই করে দেখতেন না, বা শুরু থেকে আজ অবধি কতটা পথ এগিয়ে এসেছেন তাও মাপতে যেতেন না। স্বামীজী কখনও তাঁকে এ ধরনের আত্মবিশ্লেষণ করতে বলেন নি। সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হওয়াতেই অমন করে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবের পর্দা সরে গেল। তবুও এ পুরোপুরি কবুল জবাব নয়।

কিন্তু নিজেকে খুঁটিয়ে বিচার করতে গিয়ে নিবেদিতা আবিষ্কার করলেন, কেমন করে নিষ্ঠাবতী এক প্রোটেস্টান্ট তিলে-তিলে পৌত্তলিক হয়ে উঠেছে। কেন যে বিশ্বজননী কালীর নাম বিশ্বশক্তির মূর্ত প্রতীকরূপে তাঁর অন্তরে রণিত হচ্ছে তাও তাঁর অজানা রইল না। কালশক্তিকেই কল্পনা করা হয়েছে কালীরূপে, তিনি আছেন বিশ্বের প্রাণনের মূলে। এ যে বিজ্ঞানসিদ্ধ কল্পনা।'

এ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা

যাই হোক, কলকাতার শিক্ষিত সমাজ শিহরিত এবং আতঙ্কিত, কারণ, 'কালী' বিষয়ে বক্তৃতা করবেন একজন ইংরেজ মহিলা! ১৮৯৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এ্যালবার্ট হলে এই বক্তৃতা হল। এ্যালবার্ট হল একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার ভাষ্য অনুযায়ী উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন ঠাকুর (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর? সমকালীন পত্রিকায় এস-এন টেগোর আছে।) ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মহিলাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরলা ঘোষাল ও মিসেস সালজার। এই 'কালী' সম্পর্কে নিবেদিতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীমতি লিজেল রেম' জানিয়েছেন যে—

'যেদিন নিবেদিতা জীবনকে সঁপে দিয়েছেন দেবতার পায়ে, যেদিন থেকেই বুঝেছেন তাঁকে একা চলতে হবে।

নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে ডাকেন মাকে, 'জয় মা কালী, জয় মা কালী'। এ তাঁর মন্ত্র।

নিবেদিতার এই অগ্রাভিযানের দিকে খরদৃষ্টি বিবেকানন্দের। যখন বুঝলেন নিবেদিতা শক্তি অর্জন করেছেন, তখন পরীক্ষায় ফেললেন তাঁকে।

বললেন 'এবার তোমায় কালীর সম্বন্ধে বলতে হবে—তোমার কালী। যেমন বুঝেছ তেমনি তাঁকে প্রকাশ কর।

বিদেশী খৃষ্টান হয়ে [illegible] হবে মা কালীর বিশ্লেষণ। তাতে [illegible]র ধর্মান্ধ জনসাধারণের মনকে খুশী করা চাই, খুশী করা চাই উত্তর পথিক গুরু, আর ব্রাহ্মসমাজের পাণ্ডাদের। এই প্রথম এক কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে নিবেদিতাকে। মনে ভাবেন, 'কি বলতে যাচ্ছ? মাগো, দেখো যেন একেবারে ডুবে না যাই।'

অ্যালবার্ট হলে ব্যবস্থা হল। বক্তৃতার বিষয় যে কালীপূজা তাও ঘোষণা করা হয়ে গেল।......

নিবেদিতা জানতেন ব্রাহ্ম বন্ধুরা ওত-পেতে আছেন—কালীপূজার যে ভাল আর মন্দ দুটো দিকই আছে এই ধরনের কথাটি একবার বললেই হয়! কিন্তু নিবেদিতা তো মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান না। তাঁর ভাষণ হবে দেবতার পায়ে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।...

মঞ্চে যখন উঠে দাঁড়ালেন, নিবেদিতার মনে তখন এমনি সব ভাবনার বিদ্যুৎ।

হলে তিল ধারনের স্থান নাই। আস্তে কথা বলেন নিবেদিতা, নিজের কথা নিজেই কান পেতে শোনেন। বলা শেষ হলে জনতা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। শুরু হল দীর্ঘ বিতর্ক। কিন্তু নিবেদিতা তখন ক্লান্ত।...

দেখলেন গুরু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, সরলা ঘোষালের সঙ্গে কথা বলছেন। বললেন, 'চমৎকার বলেছ, মার্গট।' সমালোচনাগুলো গাড়িতে যাওয়ার সময়ের জন্য তোলা রইল।...

ঠাকুর পরিবারের আগমন প্রতীক্ষা করেন নিবেদিতা, ওঁদের সমালোচনার অপেক্ষায় থাকেন। সমালোচনা কঠোর হল।

নিবেদিতা বাধ [illegible] 'আমাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। লোক এটা দেখছে [illegible]

যে কেউ ব্যবসাদারির মতলব নিয়ে কিছু করছে না। শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিকে হাতানোর জন্য কালীপুজোর কারবার চালু করা হচ্ছে, এ তো নয়। কালী যা তা জেনে শুনেই তাঁর পুজো করি। তিনি ভগবতী। ভগবানের নামের মত তাঁর রূপের কল্পনা আছে, সে কল্পনার শক্তিও আছে। এও তাই। কোনও দরকারে কিংবা ভালবেসে কেউ যদি তোমার নাম ধরে ডাকে, তুমি সাড়া দাও। দেবতার কালী নামটিও তাই। আমাদের যেমন ডাকার মন্ত্র হল, "দিব্যধামবাসী হে পিতা!" তেমনি মা কালী। (৯ই মার্চ, ১৮৯৯-এর চিঠি)।

ব্রাহ্ম বন্ধুরা বললেন, 'তোমার ভাষণটি চমৎকার হয়েছে। ওতে আমাদের বুদ্ধি তৃপ্ত হয়েছে, আবার শুধু প্রাণের সংস্কার বলেই সাড়া দেয় যে সাধারণ শ্রোতা তারাও খুশী হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তোমার কালীর স্বরূপ কি বলতে পার?'

নিবেদিতা তাঁদের কি বলে বোঝাবেন? যাঁরা মাকে উপলব্ধি করবার জন্য শক্তি-সাধনায় ব্রতী হয়েছে তারাও তো বলতে পারবে না মা কি। যাঁরা তাঁর পৌরহিত্য করেন তাঁরাও যে নীরব।

'ব্রাহ্মদের ব্যূহ ভেদ কর'

বলার কথা এই যে, ভগিনী নিবেদিতার এই সমস্ত বক্তৃতাগুলির পেছনে একটি বিশেষ কারণ ছিল। কারণটি হল স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন মেক ইনরোডস ইন টু দি ব্রাহ্মস অর্থাৎ ব্রাহ্মদের ব্যূহ ভেদ কর দেখি। বলাবাহুল্য, ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরুর আদেশ পালন করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সামনে নিবেদিতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাতের ইচ্ছে বহুদিনের। বন্ধুবান্ধবের কাছে এই ইচ্ছে প্রকাশ করাতে তাঁরা এর একটি ব্যবস্থা করে দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোয় থাকেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গেলেন। কেমন লেগেছিল ভগিনী নিবেদিতার? শ্রীমতী লিজেল রেম' জানিয়েছেন যে ঃ

'দেবেন্দ্রনাথ তখন পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে উত্তর কলকাতায় তাঁর জন্মভিটার পুরানো বাড়িতে চলে এসেছেন। তাঁর জন্যে ছাদের উপর একটি ছোট্ট ঘর করা হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার এখন সেইখানে প্রার্থনা আর ধ্যান-ধারণায় দিন কাটান, একলা থাকেন।

নিবেদিতা তাঁর দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন। বন্ধুদের কাছে একথা বলতে তাঁরা পরদিন ভোরে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন ঠিক হল সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে যাবেন।

বৃদ্ধের দৃষ্টিতে অপার করুণা, আর তাঁকে ঘিরে স্নিগ্ধ প্রশান্তির পরিমণ্ডল। দেখে নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরে বলেছেন, '...মনে হল, আমার আর স্বামীজীর যুক্ত প্রণাম ওঁকে নিবেদন করে দিলাম যেন। তাঁকে একথা বললামও। আর সত্যি, স্বামীজীও আমায় বলে পাঠিয়েছিলেন, মহর্ষির ওখানে যাচ্ছি শুনে তিনি খুব খুশী হয়েছেন। মহর্ষি বললেন, "স্বামীজীকে যখন দেখেছি তখন তিনি বালক, আমি তখন বোটে করে ঘুরতাম। আরেকবার যদি আমার এখানে আসেন, খুব খুশী হব......।"

ভগিনী নিবেদিতা মহর্ষিকে দেখে মুগ্ধ। আর স্বামী বিবেকানন্দ খুব খুশী এই কথা জেনে যে ভগিনী নিবেদিতা মহর্ষিকে দেখতে গিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে এই সাক্ষাকারের সময় স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন না এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার কবে এই সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাও কিন্তু কোথাও বলা হয় নি।

আড়ষ্ট বিবেকানন্দ

ভগিনী নিবেদিতার কাছে দেবেন্দ্রনাথ আরেকবার স্বামী বিবেকানন্দকে দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেকথা শুনে স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে কি বলেছিলেন এবং তার পরে কি কি ঘটনা ঘটেছিল তার সুন্দর বর্ণনা শ্রীমতী লিজেল রেম' তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন ঃ

যখন শুনলেন দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, স্বামীজী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন ঃ 'সত্যি একথা বলেছেন? নিশ্চয়ই যাব আমি, তুমিও এস না। শিগগির একটা দিন স্থির কর।'

কয়েকদিন পরে গুরুর সঙ্গে নিবেদিতা ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। সেদিনের কথায় বলছেন, 'আমাদের তখনই মহর্ষির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ির দু-একজন সঙ্গে চললেন। স্বামীজী এগিয়ে গিয়ে বললেন, প্রণাম, আমি দুটি গোলাপ ফুল দিয়ে প্রণাম করলাম। মহর্ষি আমাকে আশীর্বাদ করে স্বামীজীকে বসতে বললেন। তারপর মিনিট দশেক বাংলায় কথা চলল। স্বামীজী যেসব বাণী প্রচার করেছেন, মহর্ষি একে একে তার উল্লেখ করতে লাগলেন। বললেন, আগাগোড়া তিনি স্বামীজীর কার্যকলাপের পরে নজর রেখেছেন, গভীর আনন্দ ও গৌরববোধ নিয়ে তাঁর ভাষণ শুনে গেছেন। ঠাকুরবাড়ির সবাই আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছিল কেন জানি না মনে হচ্ছিল ওসব কথা যেন তাঁর কানেই যাচ্ছে না। এটা তাঁর সলজ্জতা। তারপর বন্ধ চুপ করালেন। স্বামীজী তখন খুব বিনীতভাবে তাঁর আশিস ভিক্ষা করলেন। মহর্ষি আশীর্বাদ করলে পর আগের মতই প্রণাম করে আমরা নীচে চলে এলাম।

কেন এই 'আড়ষ্ট[illegible]

ভগিনী নিবেদিতা [illegible] মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় স্বামী বিবেকানন্দ 'আড়ষ্ট' ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সলজ্জ হওয়ার কথাও বলেছেন। অথচ এটা যেন কিছুটা আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষ লজ্জা পেয়েছিলেন। আর আড়ষ্ট থাকারই বা কারণ কি? স্বামী বিবেকানন্দ কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন সেই কথা মনে রেখেই আড়ষ্ট ছিলেন? কিন্তু তাতো হবার কথা নয়। তাহলে তো স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে মহর্ষির কাছেই যেতে দিতে চাইতেন না। অথবা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে মাঘোৎসবে চিঠি লিখে যেতে বারণ করেছিলেন বলেই কি বিবেকানন্দ আড়ষ্ট বোধ করেছিলেন? কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতো যুক্তিবাদী মানুষ তো জানতেন যে মহর্ষি বারণ করেছিলেন এই জন্যেই যে শ্রীরামকৃষ্ণকে যাতে কেউ অপমান করতে না পারে। ব্রাহ্মসমাজের একাংশের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মতবিরোধের কারণও স্বামীজীর আড়ষ্টতার কারণ হতে পারে না, বিশেষ করে এই কারণে যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন—তাতো আমরা ভগিনী নিবেদিতার কথাতেই পাচ্ছি। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার ঐ সাক্ষাতের ব্যাপারে আমাদের আরো কিছু জানবার আছে। সেই আরো কিছুই শ্রীমতী লিজেল রেম' আমাদের জানিয়েছেন ঃ

স্বামীজী তখনই বেলুড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ও'রা ছাড়লেন না। পুরুষেরা একে একে তাঁর চারপাশে এসে ঘিরে বসলেন। তিনি চা খেলেন না, একটি পাইপ নিলেন শুধু।

যথারীতি আপ্যায়নের পর স্বামীজি বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন, 'তিনি নব্য ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।' সকলে তাঁর মুখে এই যেন শুনতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সামনে এ ধরনের কথা বলায় নতুন একটা সম্ভাবনার গোড়াপত্তন হল। তারপর অবশ্য শুরু হল প্রতীকোপাসনা আর কালী সম্বন্ধে আলোচনা। এ-প্রসঙ্গ উঠতেই নিবেদিতা আর তাঁর অনুগত সুহৃৎ সুরেন্দ্রের কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। এক পক্ষের কাছে কালী হলেন মদ-মাতাল শাক্তদের দেবতা, আবার অন্য পক্ষের কাছে তিনি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী বিশ্বজননী। ভাগ্য ভাল, স্বামীজি সেদিন আপসের সুরেই বললেন 'আপনাদের মতটাই শাস্ত্রসম্মত তা ঠিক। কিন্তু অপর মতটাও আপনাদের মেনে নেওয়া উচিত;

অন্ততঃ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতীকোপাসনার যে একটা সম্পর্ক আছে এটা স্বীকার করাই ভাল।' দু'দিকই রক্ষা হল। স্বামীজি চলে যাওয়ার সময় খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আবার তাঁকে আসতে বলা হল, তিনিও তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন।'

এখন কথা হল যে ঐ ঠাকুর পরিবারের উপস্থিত পুরুষ সদস্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কিনা, তার কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়তঃ এই সাক্ষাৎকারের সময়কালও শ্রীমতী রেম' জানান নি, যার ফলে রবীন্দ্রনাথ তখন কোথায় ছিলেন তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয়তঃ এই সাক্ষাতের ব্যাপারে 'নতুন কিছু ঘটনা' পরবর্তীকালে ঘটেছে কিনা তা জানা দরকার। এবং চতুর্থ, দু' তরফের মধ্যেই তখনও পর্যন্ত সম্পর্ক সৌজন্যমূলক ছিল এবং এমন কিছু ঘটনা ঘটে নি যার ফলে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন রকম মনোমালিন্যের ব্যাপার হতে পারে।

সরলা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের দূতিয়ালী

যাইহোক, এই সাক্ষাতের সূত্র ধরেই পরবর্তী ঘটনার সূত্রপাত। শ্রীমতী লিজেল রেম' সেই পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন যে :

'ঠাকুর পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে সরলা আর সুরেন্দ্রনাথ বেলুড়ে গেলেন। বিবেকানন্দ তাঁদের নিয়ে ঘুরে ফিরে মঠের সবকিছু দেখালেন। সরলার সঙ্গে ছিলেন তিনি আর ব্রহ্মানন্দ। আরেকজন সাধুকে নিয়ে নিবেদিতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। বেলুড় মঠ সেদিন যেন ঝলমল করছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে স্বামীজি ভক্তি ভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। সরলা তখন উদাসিনীর মত তফাতে দাঁড়িয়ে। নিবেদিতা তাঁর বন্ধুর জন্য মনে মনে ঠাকুরকে ডাকেন, 'ঠাকুর, তোমার বিরুদ্ধে এই যে বিরূপতার বাধা, এ তুমি চূর্ণ করে দেবে না কি? প্রসন্ন হও ঠাকুর, আমিও একদিন অমন ছিলাম...'

বিকালবেলা বিবেকানন্দ অতিথিদের নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার প্রস্তাব করেন।

মেয়েরা ঘাটে গা ধুচ্ছে, যাত্রীরা নদীর পারে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে। স্বামীজিকে দেখেই রব উঠল, 'জয় গুরু মহারাজকী জয়!' স্বামীজি পাল্টা জবাব দিলেন, 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ কী জয়!' সরলা আর সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী উপরে উঠলেন। স্বামীজী রইলেন বোটেই। ও'রা বাগানে বেড়ালেন কিছুক্ষণ।

সেদিন রাতে নিবেদিতা লিখলেন, 'কী সুন্দর যে লাগল আজকের দিনটি। সরলা সুরেন আর আমি গাছতলায় বসেছিলুম। তখন উঠে আসি, সরলা দেখাল সিঁড়ির [illegible]

ঝরে পড়ছে ডাল-পাতার নকসা কেটে। নদীর ধারে ধারে দেখা যাচ্ছে বাতির আলো। এক জায়গায় রক্তশিখা বিরাট দুটি চিতার আগুন জ্বলছে। পাল তুলে দিয়ে বড় বড় নৌকা উজিয়ে চলেছে।

'তারপর এলাম শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ঘরে। মন্দির দেখাবার জন্য চত্বর দিয়ে ওদের নিয়ে আসা হল। (সেই সময় নিম্ন-শ্রেণীর লোকেদের অথবা বিদেশীদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হোতো না। এর অর্থ হল এই যে নিবেদিতা নিজে কখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে পান নি এবং মা কালীর মন্দিরেও ঢোকার অধিকার পান নি।) কিন্তু এই উৎসাহী ছেলেমেয়ে দুটি দেউলের জাঁকালো স্থাপত্য দেখেই খুশী হয়ে ফিরে এল।'

রাজা ততক্ষণ আমাদের জন্যে বোটেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের নিয়ে মঠে ফিরলেন। সবাই একত্রে ছিলাম। উনি এবার সরলার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমরা স্বামীজিকে যেমন ভালবাসি, মনে হল সরলাও ও'কে সেই চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। উনি বললেন, 'সরলা একটি রত্ন, ও অনেক বড় কাজ করবে।'

দৌত্য ব্যর্থ

কিন্তু এই সম্প্রীতির, শ্রদ্ধার ও ভাব বিনিময়ের পরিবেশ বেশীদিন স্থায়ী হতে পারল না। কারণ? শ্রীমতী লিজেল রেম'র ভাষায় :

'কিন্তু দু'দিন পরে সরলার কাছ থেকে একখানা চিঠি এল। স্বামীজির সাদর আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সরলা লিখেছেন, ঠাকুরবাড়ীর সহযোগিতা পেতে হলে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ছাড়তে হবে। তাহলে তাঁরাও স্বামীজির কাজে যোগ দেবেন তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়ে।

চিঠি পড়ে নিবেদিতা কেঁদে ফেললেন। মনে হল, যা ঘটল তার জন্য তিনিই দায়ী। ব্রাহ্ম সমাজ আর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ঠাকুর বাড়ির ওরা কে যে সে চেষ্টাকে এমনভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে! মায়াবতীর সন্ন্যাসীদের যে নিরাকার উপাসনায় ব্রতী করেছেন স্বামীজি, ওরাও তো তাই করে। বাগবাজারের বাড়িতে একখানিও পট নাই দেখে ওরা খুশী! কিছুতেই ওরা শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে মাথা নোয়াবে না, এ কী জিদ!

গুরু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'যদি নিশ্চিত জানতাম, মূর্তি পূজো তুলে দিলেই মানুষের কল্যাণ হবে, বিনা দ্বিধায় ওটা উঠিয়ে দিতাম। কিন্তু গভীর দীনতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী স্মরণ করি, 'ঈশ্বর সাকার-নিরাকার দুই-ই, আবার তা ছাড়াও কিছু। তিনিই শুধু বলতে পারেন, আরও কত কি তিনি।' দেখ মার্গট, যারা একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে জগতে আসে, তাদের কখনও এমন প্রত্যাশা রাখতে নাই যে মানুষ তাঁদের কথা মানবে।

আবার এ-ও জেনো, যাঁরা মনে করে তাঁরা স্বতন্ত্র, তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই তাদের, অন্তরে অন্তরে তারাই আবার সব চাইতে তোমার পা-চাটা। যারা সাকার পূজো উড়িয়ে দেবার জন্য বাড়াবাড়ি করে, তারা নিজেদের মন জানে না। যে-ভাবের বিরুদ্ধে নিজেরা মনে মনে লড়াই করছে, অন্যের মধ্যে তার প্রকাশ দেখে তারা জ্বলে ওঠে। যদি নিজের মন বুঝত তারা।'

নিবেদিতার কিন্তু খুব শিক্ষা হল। তিনি মাথা নীচু করে থাকেন। মনটা ভার ভার লাগে।'

উপরের এই বিবরণ থেকে আমরা মোটামুটিভাবে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারছি: সেগুলি হল :

(ক) তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে 'নিম্ন শ্রেণীর' লোকেদের এবং বিদেশীদের ঢুকতে দেওয়া হোত না, যার জন্য ভগিনী নিবেদিতা নিজেই কোনদিন এই কালী মন্দিরে ঢুকতে পান নি।

(খ) সরলা ঘোষালের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নিবিড় বন্ধুত্বের কথা ভগিনী নিবেদিতার চোখে ধরা পড়েছিল।

(গ) ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সহযোগিতার শর্ত হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে চিরতরে ত্যাগ করতে হবে একথা সরলা ঘোষালই একটি চিঠিতে লেখেন।

(ঘ) স্বামী বিবেকানন্দ এই শর্ত মানতে পারেন নি কারণ তাঁর মতে শ্রীরামকৃষ্ণকে ত্যাগ করলে যদি মানুষের জন্য কোন উপকার করা যায় তবে তিনি প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ত্যাগ করতেন।

(ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে সরলা ঘোষাল এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই অরাজী।

শর্ত আরোপের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের নিশ্চুপ থাকার কারণ হিসাবে যদি কেউ মনে করেন যে উপরে কথিত শর্তটি অন্যতম প্রধান, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটি এসে পড়ে যে গুরুবাদের বিরোধী হলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে কি এই শর্ত আরোপের ব্যাপারে সায় দিয়েছিলেন অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি কখনও কোনো বিরূপ মন্তব্য করেছেন? দুটিরই উত্তর—না। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে পারব। শুধু এইটুকু এইখানে বলে রাখা ভাল যে স্বামী বিবেকানন্দ যদি এই শর্তটির জন্যই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা ঠিক করে থাকেন অথবা রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন তবে সেটি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন ঘটনা। কারণ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভাবনায় কখনই কোন রকম গোঁড়ামির স্থান ছিল না। এমন কি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পুত্রের এই ধর্মীয় স্বাধীনতাকে পুরোপুরিভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন •

তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি তিনি কোনো-মতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ কাজ অনেক করিয়াছি—তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু কখনও তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এ জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না—তিনি জানিতেন, সত্যকে ভাল-বাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায় কিন্তু কৃত্রিম শাসনে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

...আর একবার যখন আমি আদি সমাজের সেক্রেটারি পদে নতুন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।' তিনি তখনই আমাকে বললেন, 'বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিয়ো।'... যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদবিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়া-ছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।'

আবার 'আত্মপরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যেঃ

'ঠিক যাকে সাধারণ ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়-রূপে লাভ করতে পেরেছি বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ক্রমে ক্রমে যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়েছে অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়—এ একটি নিগূঢ় চেতনা একটা নতুন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব। আমার সুখ-দুঃখ অন্তর বাহির বিশ্বাস আচরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তার সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। সেই আমার চরম সত্য।'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য হলঃ

'রবীন্দ্রনাথ সেরকম কোন মতবাদ পোষণ করতেন না। এমন কি ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ মতবাদের মধ্যেও। শেষ পর্যন্ত তিনি আবদ্ধ থাকতে পারেন নাই। তাঁহার আশ্রমে চিরদিন পাঁচমিশালী লোকের আনাগোনা হয়েছে। সেইজন্য একনিষ্ঠ সংঘ গড়েন নাই। এ সত্ত্বেও জীবনদর্শনও চরিত্র নীতিতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বিপরীত প্রান্তের লোক হলেও বর্ণাশ্রম ধর্মের ক্ষেত্রে দুজনের সমর্থন ছিল। শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তা হোল তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম, একদিকে কালি-দাসের তপোবন অন্যদিকে উপনিষদের আরণ্যকের সংমিশ্রণে ব্রহ্মচর্যাশ্রম।' (রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড)

সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা গেল যে এ হেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বামী বিবেকা-নন্দকে সহযোগীতা করার ব্যাপারে কোন রকম শর্ত আরোপ করার ক্ষেত্রে সায় দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। অর্থাৎ, শর্ত আরোপের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে জড়ানো সম্পূর্ণভাবেই অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বিবেকানন্দের পত্রাঘাত যাই হোক শর্ত আরোপ করে সরলা ঘোষাল স্বামী বিবেকানন্দকে যে চিঠি লেখেন, তার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ সরলা ঘোষালকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি এখানে তুলে দেওয়া হলঃ

ভারতী সম্পাদিকার প্রতি

বেলুড় মঠ
১৬ এপ্রিল, ১৮৯৯

মহাশয়াসু—

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরু-ভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ দেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও ত দেখি নাই সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু-একজন আমাদের হবির (খেয়ালের) জায়গায় তাঁহাদের হবি বসাইতে চাহিয়াছেন এই পর্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোন উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হতে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেকদিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন—সেইটি মনে পড়িল।

'মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা,
সে দু-এক জনা,
সে রসের মানুষ উজান পথে করে
আনাগোনা।'

এই ত গেল আমার তরফ থেকে। আর একটিও অতিরঞ্জিত নয় জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন।

তারপর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরু পূজাটি ছাড়িলেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কালজা ছেঁড়ে ছেঁড়ে, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে? এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্বত যেন ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে? বলি, ওরকম দেশ-হিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃত-প্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সিঁটকান? কে জানে কার কি মতিগতি! আমার যেন মনে হয়, ওসব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল, কাজের সময় যত ওরা পেছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীতি না মানে জাত কুজাত।
ভুখ না মানে বাসী ভাত।।

আমি ত এই জানি। তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের আঁটিটি গলায় আটকে যদি সব মারা যায় ত না হয় আঁটিটি ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার অত্যন্ত আকাঙ্খা রহিল।

এ সমস্ত কথা কহিবার জন্য রোগ, শোক, মৃত্যু সকলেই আমায় এ পর্যন্ত সময় দিয়াছেন—বিশ্বাস, এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ হউক।

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ।'

(পরের সংখ্যায় শেষ হবে)

উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণ

'এপিক' কথাটা বিদেশী—ইউরোপীয়। এপিক সাহিত্যের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে সবচেয়ে সুস্পষ্ট তার সবগুলিই ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে সঞ্জাত। তাই হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্য জাতীয়সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই ফসল। ইউরোপীয় 'ইলিয়ড' ও 'অডিসি' কাব্যদ্বয়কে যে অর্থে এপিক বলা হয়ে থাকে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'কে সে অর্থে কদাপি এপিক কাব্য বলা চলে না। এ দুখানি কাব্য বিশেষভাবে ভারতীয় চিন্তা ও অনুভূতি, ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকেই উদ্ভূত। কোন ইউরোপীয় সাহিত্যিক ফর্মুলার সাহায্যে এদের স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'পাঞ্চজন্য' এপিক উপন্যাস নয়। বস্তুত এ গ্রন্থকে এপিক উপন্যাস বলে বর্ণনা করলে একে অনেকখানি খাটো করে ফেলা হয়। এ উপন্যাস 'মহাভারতীয়' উপন্যাস—সাহিত্যবস্তু হিসাবে ইউরোপীয় এপিকের চেয়ে পরিমাণে বহুগুণ বৃহত্তর ও শিল্প তাৎপর্যে বহুগুণ মহত্তর। এই গ্রন্থ রচনায় গজেন্দ্রকুমার তাঁর বিষয়বস্তুর যে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য অতি অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন, শিল্পসৃষ্টির যে অপরিসীম বৈচিত্র্যের ও গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে এপিক সাহিত্যধর্মের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। দৃষ্টির এই আদিগন্ত প্রসার এবং ঘটনা-ও চরিত্র বর্ণনার এই নির্মম সত্যনিষ্ঠার সন্ধান একমাত্র মহাভারতেই পাওয়া যায়।

'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা দরকার। এ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাত্র একবারই আমরা এই অপরূপ ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখতে পেয়েছি—সুবোধ ঘোষ রচিত 'ভারত প্রেমকথায়'। কিন্তু সেখানে বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ এবং সেই জন্যই মহাভারতীয় প্রেমকাহিনী বর্ণনায় যথাযোগ্য গাম্ভীর্য গভীরতা ও সঙ্গীতধর্মিতা থাকা সত্ত্বেও 'পাঞ্চজন্যে'র ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য সে ভাষায় প্রত্যাশা করা অনুচিত। গজেন্দ্রকুমার তাঁর ভাষাকে ব্যবহার করেছেন মহাভারতের অনন্যসাধারণ ঘটনা সংঘাত ও মহাভারতীয় নর-নারীর চিত্তবৃত্তির সর্ববিধ উত্থান পতন সম্যকরূপে প্রকাশ করার জন্য। কাজেই দুই গ্রন্থের ভাষার মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। গজেন্দ্রকুমার তাঁর ভাষাকে [illegible] মহাভারতীয় [illegible] গাম্ভীর্য নয়, মহাভারতীয় জীবনধর্মের বহুবৈচিত্র্য ও বিশালতাও

পাঞ্চজন্য
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
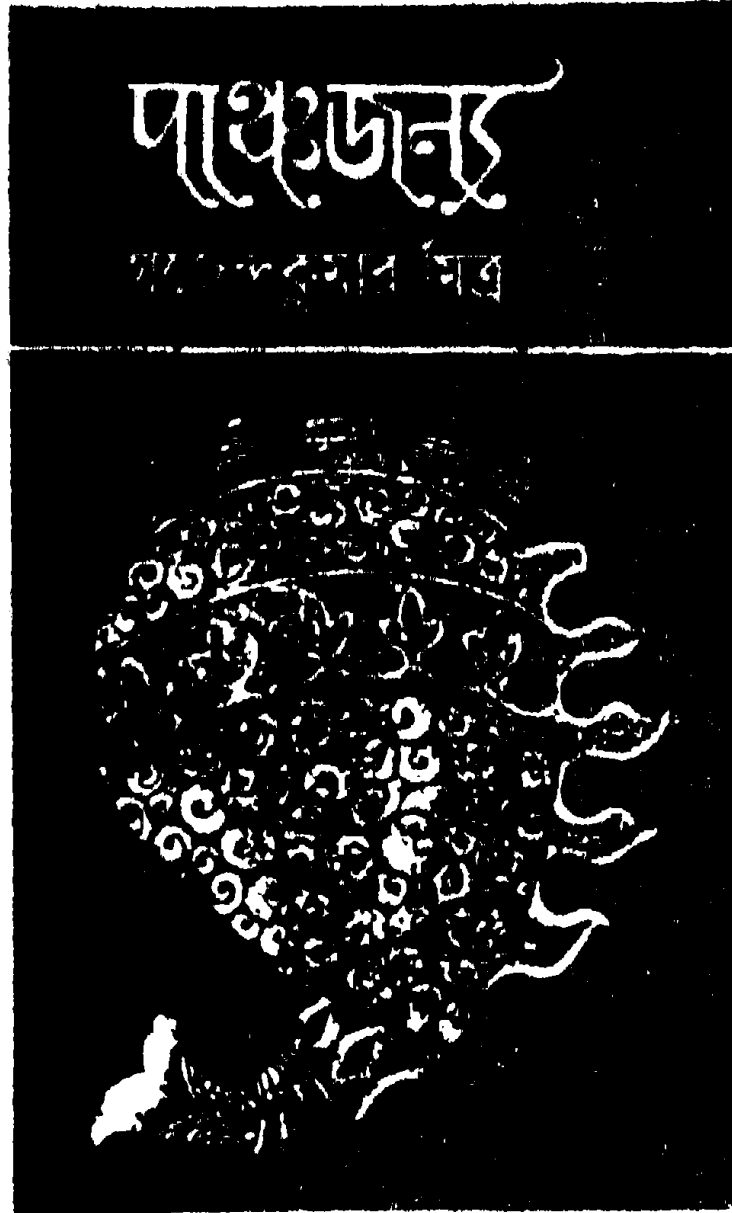
সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। এদিক দিয়ে গজেন্দ্রকুমার আমাদের একটুও হতাশ করেন নি। দ্যূতক্রীড়া পর্বের তীব্র বেদনা ও নিরুদ্ধ ক্রোধ, প্রথম খণ্ডের উপসংহারে দ্রৌপদীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত নিষ্ঠুর সান্ত্বনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের হত্যা-মহোৎসবের নিষ্করুণ উন্মাদনা, যুদ্ধান্তের সমূহ-সর্বনাশজনিত সামগ্রিক নৈরাশ্য ও অবসাদ এবং সর্বশেষে যুগাবতার মহামানবের নির্মম আত্মবিশ্লেষণ ও সান্ত্বনাহীন মনস্তাপ—প্রত্যেকটি বর্ণনারই একটা করে নিজস্ব ছন্দ, নিজস্ব সুর ও নিজস্ব রস আছে। কখনও বা এই সুর ও ছন্দ দেখা দিয়েছে সুতীব্র বংশীধ্বনির রূপ ধরে, কখনও বা প্রকাশ পেয়েছে দুন্দুভি-দামামা-মৃদঙ্গ নির্ঘোষের মধ্য দিয়ে, আবার তাদের শুনেছে পেয়েছি বীণার মৃদুগম্ভীর ঝংকারময় দীর্ঘশ্বাসের বিষণ্ণতায়।

মূলে মহাভারতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধোত্তর দৃশ্যের ও ঘটনাবলীর যে বিস্তারিত কথাচিত্র আমরা দেখতে পাই তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন বর্ণনা বোধহয় বিশ্বসাহিত্যের অন্য কোথাও নেই।

আমার বরাবরই ধারণা ছিল যে শুধু বাংলায় কেন, আধুনিক কোন ভাষাতেই বোধহয় এই অনন্যসাধারণ মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ রস-রূপটি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গজেন্দ্রকুমারকে ধন্যবাদ, তিনি এই অসম্ভবকেও আংশিকভাবে সম্ভব করে তুলেছেন। 'আংশিকভাবে' বলছি এইজন্য যে সংস্কৃত ভাষার অলংকার-ঝনংকার এবং তার অন্তরালে লুক্কায়িত ধ্বনি-তাৎপর্য-নিপুণতম শিল্পীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার পরিচিত বাগভঙ্গির আয়ত্তাধীন করা যায় না।

কিন্তু 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসে মহাভারতের এই অন্তিম মহা-ট্র্যাজেডির যে বর্ণনা আমরা পাই, রূপের দিক দিয়ে তা কিছু পরিমাণে অসম্পূর্ণ হলেও রসের বিচারে তার মধ্যে কোথাও কোন ত্রুটি বা ন্যূনতা নেই। আমি নিজে এই বর্ণনার ইন্দ্রজালে মোহগ্রস্ত হয়েছি—মনের কানে শুনতে পেয়েছি সহস্র সহস্র শোকার্ত নর-নারীর সমবেত দীর্ঘনিঃশ্বাসের মর্মস্পর্শী আকুলতা, মনের চোখে দেখতে পেয়েছি স্তূপীকৃত ছিন্ন-বিচ্ছিন্নাঙ্গ মৃতদেহ ও নরাশ্বগজদেহনিঃসৃত ভয়াবহ রুধির-স্রোত, আর এই পূতিগন্ধময় মহাশ্মশানে প্রেত-মূর্তির ন্যায় সঞ্চরমাণ মুষ্টিমেয় যুদ্ধাবশেষ কুরুপাণ্ডবদের সঙ্গে মনে মনে পরিভ্রমণ করেছি। নিষ্ঠুরতম ট্র্যাজেডির রস-পরিবেশনে 'পাঞ্চজন্যে'র রচয়িতা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছেন—সে সার্থকতা প্রায় ব্যাসদেবের সার্থকতারই সমতুল্য।

যুদ্ধান্তদৃশ্যের এই বর্ণনা পাঠকের মনের গোপন শিকড় ধরে নাড়া দেয়, অনুভূতির রাজ্যে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে পাঠককে অভিভূত করে ফেলে। বর্ণনাশিল্পের এমন ট্রায়াম্প বাংলা সাহিত্যে অন্য কোথাও আমরা দেখতে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

মহাভারতীয় কাহিনীর অতি-বৃহৎ একটা অংশ 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে—দ্রৌপদী-স্বয়ংবর থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু পর্যন্ত। তাছাড়া পু[illegible]নের পরিমাণও নেহাৎ কম নয় শাখা-কাহিনী, উপকাহিনী ও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান প্রক্ষিপ্ত বর্ণনা ও কাহিনী বর্জন করলে মূল মহাভারতের যতখানি অবশিষ্ট থাকে তার দুই-তৃতীয়াংশ না হলেও অর্ধাংশ তো বটেই। এই সুদীর্ঘ কাব্যকথাকে সংক্ষেপিত করে মাত্র ছয়শত পৃষ্ঠার একখানি উপন্যাসে পরিণত করতে হলে যে সুপরিণত শিল্পবুদ্ধি ও কলাকৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবার বস্তু নয়। মূল বর্ণ[illegible] কোন অংশটুকু অপরিত্যাজ্য কোন ঘটনার [illegible] কতখানি, কাহিনীর কোন অং[illegible] অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয়, কোন চরিত্র বিস্তৃত চিত্রণের অপেক্ষা রাখে, কোনটির সংক্ষিপ্ত আদরা মাত্রই যথেষ্ট—এইসব প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর খুঁজে বের করতে হবে সার্থক সংক্ষেপণ-শিল্পীকে এবং তদনুযায়ী নিজের রচনাশৈলীকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। গজেন্দ্রকুমার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তা করতে সক্ষম হয়েছেন—তাঁর কৃত

সংক্ষেপণের ফলে ভারতকথার রূপ ও রস কিছুরই কোন বিকৃতি বা বৈকল্য সাধিত হয়নি। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁর নৈপুণ্য সত্যই অনন্যসাধারণ।

রসগ্রাহী সমালোচক ও পাঠকমাত্রই কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে কাহিনীর গ্রন্থনে ও উপস্থাপনায় তিনি বেশ কিছু মৌলিকতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মৌলিকতার পরিচয় আমরা প্রধানতঃ পেয়ে থাকি কোন কোন ঘটনার তাৎপর্য-ব্যাখ্যানের ও কোন কোন চরিত্রের চিন্তানুবর্তনের মাধ্যমে। তাছাড়া অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে তিনি যে উদ্ভাবন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তার মৌলিকতা ও শিল্পসঙ্গতি সত্যই উচ্চ প্রশংসা দাবী করতে পারে। বহু নরনারীর সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচয় ঘটে 'পাঞ্চজন্য' পড়তে পড়তে—যারা মহাভারত-কাহিনীতে একটু দূরের মানুষরূপে দেখা দিয়েছিল, গজেন্দ্রকুমারের লেখনীর ইন্দ্রজালে তারা আমাদের অন্তরঙ্গ চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে নেহাৎ আপনজন হয়ে দেখা দেয়।

একটি মৌলিক চরিত্র-সৃষ্টির দৃষ্টান্তের কথাই প্রথমে বলি। বারণাবতে জতুগৃহ দাহের সময় পান্ডবেরা শুধু নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে এক নিরপরাধিনী নিষাদ-রমণী ও তার পঞ্চপুত্রকে সুরাপানে অচৈতন্য করে যেভাবে পুড়িয়ে মেরেছিলেন তার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে ব্যাসদেব ভালমন্দ কোন মন্তব্যই করেন নি; কিন্তু 'পাঞ্চজন্য'-রচয়িতা এই নির্মম ঘটনাটির অনুবৃত্তি হিসাবে একটি সম্পূর্ণ মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং পরবর্তীকালে তাকে দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন যাদের কোন উল্লেখ মহাভারতের কোথাও আমরা পাই না।—কীলক নামধেয় নিষাদটি গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত সম্পূর্ণ মৌলিক চরিত্র। এরই স্ত্রী-পুত্রকে পান্ডবেরা জতুগৃহের বহ্নিকুন্ডে আহুতি দিয়েছিলেন। কাজেই সে যে মনে মনে তাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করবে ও তাঁদের সর্বনাশ কামনা করবে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? এই হল কীলক-চরিত্রের প্রধান অনুপ্রেরণা, আর স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই অনুপ্রেরণা-বহ্নিতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন।—তারপর উপন্যাসের নানা স্থানে আমরা কীলকের সাক্ষাৎ পাই। খান্ডবারণ্যে পান্ডবদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার, পান্ডবদের প্রতি কটূক্তি ও অভিশাপ-বর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বমুগ্ধ দাসরূপে পান্ডব-শিবিরে প্রতিদিন মাংস যোগান দেবার কর্মগ্রহণ, সহজাত কবচ-কুন্ডল অপহরণের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কর্ণকে সতর্কীকরণ, দ্বৈপায়ন-হ্রদপ্রান্তে গুপ্তমধ্যে আত্মগোপনকারী দুর্যোধনকে পান্ডবদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া এবং সর্বশেষে সর্বনাশা যুদ্ধের অবসানে পান্ডবদের সামগ্রিক নৈরাশ্য ও বিষাদ দর্শনে এবং নিজের প্রতিশোধস্পৃহার চরিতার্থতায় অতি-নিষ্ঠুর উল্লাস প্রদর্শন—এসব ঘটনার সবগুলিই মহাভারতে অনুপস্থিত এবং গ্রন্থকারের নিজস্ব উদ্ভাবন। অথচ এগুলিকে এমন শিল্পসঙ্গতভাবে মহাভরত-কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা মূল কাহিনীর অলঙ্কারমাত্র না হয়ে তার জীবন্ত প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। নিষাদের নামটিও মহাভারত থেকে ধার করা নয়। সূত্রধর নির্মীয়মান বস্তুর এক অংশের সঙ্গে অপর অংশ জুড়ে দেবার জন্য কাষ্ঠনির্মিত যে ছোট ছোট গোঁজগুলি ব্যবহার করে সেইগুলিকে বলা হয় কীলক। 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসেও মূল ঘটনার সঙ্গে নানা খন্ড ঘটনাকে সংযুক্ত করে দেবার জন্যই গ্রন্থকার এই সুরাপানোন্মত্ত কদাচারী কটুভাষী উদ্ধত স্বভাব নিষাদ-চরিত্রটিকে ব্যবহার করেছেন।

চরিত্রসৃষ্টির এই মৌলিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আংশিক পরিবর্তনের ফলেও সাধিত হয়েছে—দুটি কি তিনটি মাত্র চরিত্রের বেলায় এই পরিবর্তন সামগ্রিক। কিন্তু আংশিকই হোক অথবা সামগ্রিকই হোক, পরিবর্তন ঘটেছে শুধু মনের মধ্যে—অভিলাষে আকাঙ্ক্ষায়, উদ্দেশ্যে আদর্শে, ধ্যানে ধারণায়, কল্পনায় পরিকল্পনায়। বাহ্যিক পরিবর্তন—আলাপে, আচরণে বা ক্রিয়াকলাপে—কিছুই কখনও দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকে পাঞ্চজন্য উপন্যাসের নায়ক মাত্র বললে তাঁর ভূমিকাকে অত্যন্ত সংকুচিত করে ফেলা হয়—এবং তার ফলে উপন্যাসের পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তিনি নায়ক তো বটেই, কিন্তু তাছাড়াও তিনি আরও অনেক, অনেক কিছু। উপন্যাসের কাহিনী-চক্রের পিছনে তিনি চক্রী, কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধযন্ত্রের পরিচালনায় তিনিই যন্ত্রী, প্রধান প্রধান সবগুলি চরিত্রের ভাগ্যনিয়ন্তাও তিনি। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই উপন্যাসদেহের অভ্যন্তরে শিল্পচেতনাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত প্রাণপুরুষ।

'পাঞ্চজন্য'-রচয়িতা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে দেবমাহাত্ম্যে ও দেবমহিমায় বিভূষিত করে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' যা করেছিলেন, তিনিও তাই করেছেন, তবে সাধারণ মানবরূপে নয়, মহামানব বা অতি-মানবরূপে। তথাপি 'কৃষ্ণচরিত্রে'র কৃষ্ণ এবং 'পাঞ্চজন্যে'র শ্রীকৃষ্ণ—এ দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই বেশি।

শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন ভারতের বড়ই দুর্দিন চলছে। 'ধর্মস্য গ্লানি' এবং 'অভ্যুত্থানমধর্মস্য' দুইই তখন অতি প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজশক্তি তথা ক্ষাত্রশক্তি তখন অত্যাচারী, বিবেকবুদ্ধিহীন, ব্যভিচারী, সম্ভোগমত্ত ও ক্ষমতার নেশায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। সাধারণ মানুষ অবহেলিত, শাসকশ্রেণীর পদদলিত ও নির্মমভাবে শোষিত। শক্তিমানের একমাত্র ধর্ম তখন শক্তিহীনকে রক্ষা করা বা আশ্রয় দেওয়া নয়—উৎপীড়ন করা, উচ্ছেদ করা, গ্রাস করা। মাৎস্যন্যায়ের সব লক্ষণই তখন সুপরিস্ফুট।

শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন এই কলুষ-কলঙ্কিত পঙ্কশয্যার হীনতা থেকে ভারতকে ঊর্ধ্বে টেনে তুলতে, মদগর্বিত কলহপরায়ণ পাপাসক্ত অত্যাচারী বিকার-গ্রস্ত বুদ্ধি ক্ষাত্রশক্তিকে সমূলে ধ্বংস করতে, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সজ্জনদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিতে, নিপীড়িত জনগণের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে—তাদের মনে আশ্বাস ও আশার সঞ্চার করতে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ তাঁরই সৃষ্টি—এই লোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধের সাহায্যেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে, তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় নি—তাঁর মহান প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের ব্যর্থতার এই ট্র্যাজেডি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহ ট্র্যাজেডির চেয়েও অনেক বেশি মর্মন্তুদ ও শোচনীয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর চেয়ে একটিমাত্র মহান আদর্শের মৃত্যু অনেক বেশি মারাত্মক ও ক্ষতিকর ব্যাপার নয় কি?

'পাঞ্চজন্য'-রচয়িতা তাঁর শ্রীকৃষ্ণকে মহামানবরূপেই চিত্রিত করেছেন। সত্যই সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শের উত্তুঙ্গ মহত্ত্ব, দৃষ্টির অপরিসীম বিস্তার, রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার হৃৎস্তম্ভনকারী বিরাটত্ব, মানবচরিত্র-সংক্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি সাধারণ মানুষের প্রতি প্রীতিস্নিগ্ধ সমবেদনা এবং সর্বোপরি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মানুসন্ধানের ক্ষমতা—সবই ঘোষণা করছে তাঁর অনন্যতা ও অসাধারণত্ব। শুধু সেকালের মাপকাঠিতেই নয়, সর্বকালের বিচারেই তিনি পুরুষোত্তম।

তাঁর সুমহান পরিকল্পনার ব্যর্থতা শুধু যে আমাদের বেদনার্তই করে তোলে তা নয়, তার মধ্যে সত্যকার চিত্ত-সমুন্নতির সন্ধানও আমরা পেয়ে থাকি। হিটলারের ব্যর্থতা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের ব্যর্থতা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি-রচিত ট্র্যাজেডির যবনিকা-পতন।

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পাঞ্চজন্য (উপন্যাস)—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। ১ম ও ২য় খণ্ড—১৬্, ১৬্।

জেভিয়ার যেন নতুন আবিষ্কার

অজয় বসু

ফুটবল নাটকের তখন শেষাঙ্ক। এক গোলে পিছিয়ে থাকা মহামেডান স্পোর্টিং যেন ব্যবধান মুছে ফেলতে কোমর কষে বেঁধেছে। আক্রমণের ঢেউ তুলে প্রতিনিয়তই ধেয়ে আসছে মোহনবাগানের সীমানায়। এগিয়ে থাকা মোহনবাগান যেন নিজের সব সুবিধার কথা ভুলে গিয়ে ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছে। নিরন্তর চাপে অস্থিরপ্রায়। সমর্থকদের দুশ্চিন্তা, মহামেডান গোল শোধ করে দেবে নাকি! গোল শোধ হয়ে গেলে যে লীগ জয়ের আশাও নস্যাৎ হয়ে যায়।

ওঁরা যখন রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগে প্রহর গুনছেন, মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা যখন প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিতে কী করে উঠবেন ভেবে পাচ্ছেন না, ঠিক তখনই দূরে থেকে লতিফুদ্দিন সজোরে একটি সট হাঁকালেন। আচমকা সট, সর্বাঙ্গে তার সর্বনাশের আভাস আঁকা। উঁচু সট, মোহনবাগানের রক্ষণভাগের মাথা টপকে বলটি বারে গিয়ে ধাক্কা খাইয়ে বাইরে চলে গেল। দেখে লতিফুদ্দিন হায় হায় করে উঠলেন। আর মোহনবাগানের সমর্থকমণ্ডলীর থেমে যাওয়া হৃদপিণ্ডটি আবার সচল হয়ে উঠল। ইঞ্চি কয়েক নীচু দিয়ে বলটি ছুটলেই হয়েছিল আর কি! জয়ের স্বাদ মোহনবাগানের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত মহামেডান স্পোর্টিং।

শেষাংকের নাটক। পঞ্চমাংকের উত্তেজনা জানিয়ে রীতিমত জমে উঠেছিল। ঘড়ির কাটা নির্দিষ্ট সময় ছুঁতে তখনও মিনিট দেড়েকের মত বাকি। এমন সময় ছন্দপতন। রেফারি লম্বা বাঁশী বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন, সময় অতিক্রান্ত। পর্ব শেষ। খেলার ইতি ওই লগ্নেই। চূড়ান্ত ফলাফল, মোহনবাগানের জিৎ এক গোলে। জিৎ মানে লীগ জয়ের স্বপ্ন আগের মতই জিইয়ে রইল। অনেক কষ্টে, উদ্বেগে অনেক প্রহর অতিক্রম করার পর তবেই মোহনবাগান সেদিন বিজয়ীর বেশে মাঠ ছাড়তে পেরেছিল।

কিন্তু সময়ের আগেই খেলাটিকে খতম করা হল কেন? রেফারি বলেছেন যে তিনি কম সময় খেলান নি। মাঝপর্বে সময় কিছুটা নষ্ট হয়েছিল বলে তিনি নাকি বাড়তি সময় মঞ্জুর করেছিলেন। তবে, রেফারির সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। যেহেতু ঘড়ির কাটার নির্দেশ অন্য অভিমতের সাক্ষ্য ধরে রেখেছিল। তবে মত-অমত যাই হোক না কেন রেফারির রায়ই তো শিরোধার্য। তিনিই বিচারক। তাঁর সিদ্ধান্ত মনঃপূত না হলেও মানতে হয়।

সেদিনের খেলায় রেফারির সিদ্ধান্ত ঘিরে আরও একবার বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনাটি উল্টোদিকের, মহামেডান দলের গোল প্রান্তের। মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল করার চেষ্টা বারে লেগে ব্যাহত হওয়ার পর বল মাটিতে পিচ পড়ে মাঠের দিকে ফিরে আসে। অনেকের দাবি, মাটি ছোঁয়ার মুখে বা পরে বলটি গোল লাইন অতিক্রম করেছিল। কাজেই মোহনবাগানের আরও একটি গোল পাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও রেফারির অভিমত ছিল ভিন্ন রকমের, বল গোললাইন অতিক্রম করেনি বলেই তাঁর ধারণা। তাই তিনি গোল নির্দেশক সংকেত জানাতে রাজী হননি।

বল গোল লাইন ডিঙিয়ে গিয়েছিল কিনা, তার ঠাওর পাওয়ার সুবিধে থাকে একমাত্র তাঁদেরই যারা গোল লাইন বরাবরে থাকেন। গ্যালারির অন্য অঞ্চল থেকে তার সঠিক আন্দাজ পাওয়া কঠিন। অসম্ভবপ্রায়। কলকাতার মাঠে যে অঞ্চল থেকে টিভি ক্যামেরা কাজ করে সেখান থেকে ব্যাপারটি বোঝা যায় না। কারণ ক্যামেরার দৃষ্টি চলে কোণাকুণি। বোঝা সহজ ও সুবিধাজনক প্রান্তিক লাইন্সম্যানের পক্ষেই যেহেতু লাইন ধরে ছোটাছুটি করে খেলার গতিবিধির ওপর নজর রাখাই হল তাঁর কাজ। বলটি মাটিতে পড়ার মুহূর্তে গোল লাইন অতিক্রম করেছিল, একথা প্রান্তিক লাইন্সম্যান জানান নি। কাজেই প্রাসঙ্গিক বিতর্কের ওইখানেই অবসান ঘটানো উচিত।

বিতর্কের অবসান না ঘটালে লাভই কী হবে? খেলা চলে কতগুলি বাঁধা নিয়ম অনুসরণে। নিয়মের মর্যাদা রাখার দায়িত্ব নিয়েই রেফারি লাইন্সম্যানেরা মাঠে নামেন। পরিচালনা সম্পর্কিত আইনগত অধিকার থাকে তাঁদেরই হাতে। তাঁদের মান্য না করলে খেলা ভণ্ডুল হয়ে যায়। ভুলভ্রান্তি তাঁদেরও হতে পারে। ভুলচুক মানুষ মাত্রেরই হয়। রেফারি লাইন্সম্যানেরাও তো মানুষ। ওঁদের ভুলচুক হলে তাও মেনে নিতে হয়। ক্ষোভ, অসন্তোষ ও অন্য মতের উৎসকে পাথর চাপা দিয়ে আটকে রাখতে হয়। রাখতে পারলেই খেলা হয় নির্বিঘ্নে। এসব কথা যত তাড়াতাড়ি আমরা উপলব্ধি করতে পারি ততই কলকাতার ক্রীড়া জগতের পক্ষে মঙ্গল। মোহনবাগান বনাম মহামেডানের লীগ খেলার দিনে বাদ বিসম্বাদের গুঞ্জন উঠেও যে শেষ পর্যন্ত থিতিয়ে পড়েছিল, এটা সুখেরই কথা। থিতিয়ে না পড়লে হয়ত বিষয় দুটি ঘিরে জল অনেকভাবেই ঘোলা করে তোলার অনর্থক প্রয়াস পাওয়া যেত।

মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং কলকাতা তথা ভারতের দুই নামী, ঐতিহ্যশালী দল। নানা কীর্তিতে কীর্তিমান। গৌরবে গৌরবান্বিত। তাদের মুখোমুখি মোলাকাৎ উপলক্ষে ভাল খেলা দেখতে পাওয়ার আশা সকলেই রাখে। সেদিনেও সেই আশায় বুক বেঁধে হাজারো মানুষ মাঠে হাজিরা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যাশা কি দল দুটি মিটিয়ে দিতে পেরেছিল? পারেনি।

খেলা হয়েছে দুলকি চালে। গতির সঙ্গে আড়ি পাতিয়ে রেখেছিলেন অনেকেই। বিনা গতিতে বিপক্ষকে যে বেসামাল করা কঠিন, সাদামাটা এই কথাটি যেন অনেকেই ভুলে বসেছিলেন। তার ওপর তাঁরা আবার এলোমেলো চিন্তা পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপের বোঝাটিকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এলোমেলো চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের প্রভাব এমনই [illegible] সানো নিশ্চল বলকে ফ্রি-কিকে মাঠে [illegible] বাইরে পাঠিয়ে দিতে কেউ কেউ কুণ্ঠিত হননি। আজকাল প্রশিক্ষণের যুগ। খেলোয়াড়েরা কোচের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পাঠ নেন। অনুশীলন করেন। তবুও খেলতে নেমে তাঁরা যদি এলোমেলো চিন্তাকেই পরিত্রাণের উপায় বলে মনে করতে থাকেন, তাহলে তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারাতে হয় বৈকি।

সামগ্রিকভাবে ওই খেলায় মোহনবাগানের সুনিশ্চিত প্রাধান্য ছিল। প্রায় সারাক্ষণ রক্ষণকাজে ব্যস্ত থাকার পর একেবারে শেষ লগ্নেই যা মহামেডান উজ্জীবিত ভূমিকা নিতে পেরেছিল। ওইটুকু না করে উঠতে পারলে সেদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারে একমুখী, একপেশে হয়ে যেত। মোহনবাগানের গোলরক্ষককে মহামেডান দল প্রায় সারাক্ষণই আলস্যে সময় কাটানোর সুযোগ উপহার দিয়েছিলেন।

তবে এমন সংশয়াতীত প্রাধান্য সত্ত্বেও

মোহনবাগানও একটির বেশি গোল করতে পারেনি। পারে নি। নিজেদের দোষে। আরও গোলের সুযোগ এসেছিল সামনে। কিন্তু রঞ্জিত মুখার্জি, শ্যামা থাপারা তাড়াহুড়োয় সেই সব সুযোগ হাতছাড়া করে দলের জয়ের পথকে কঠিন, কষ্টসাধ্য করে তোলেন। শ্যাম থাপা অবশ্য নিজের দোষ স্খালন করেছেন দিনের একমাত্র গোলটি করে।

গোলের মত গোল সেটি। বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকার মত দৃষ্টান্ত। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার মত সামগ্রী বটে। বলটি যখন শ্যামের কাছে আসে তখন তাঁর আশে-পাশে দাঁড়িয়ে মহামেডানের অনেকে। বলটিকে নামিয়ে আয়ত্বে আনার চেষ্টা করলে ও'রা শ্যামের নাগাল থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেতেন। কিন্তু শ্যাম সে সুযোগ তাঁদের দেন নি। সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেই শূন্যে পা চালান পলক ফেলতে না ফেলতেই। ভারি পরিচ্ছন্ন কাজ। বলে পায়ে ছোঁয়াছুঁয়িতেই পড়ন্ত বল উড়ন্ত পাখীর মত জালের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। যেমন প্রতিবর্তী ক্রিয়ার তাৎক্ষণিক তাগিদ, তেমনি তার প্রয়োগ কৌশল। সব মিলিয়ে শ্যাম সেদিন কেতাবের পাতা থেকে একটি গোলের নজির কুড়িয়ে এনে সেটিকে দর্শকদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছিলেন। ভঙ্গিতেই বাজীমাৎ করে দিলেন তিনি: আগেকার দিনে এমনি ভঙ্গি মারতে শ্যাম অনেক ওস্তাদী দেখাতেন। কিন্তু ইদানীং তাঁর ঠিকেতে বড়ই ভুল হয়ে যাচ্ছিল। অনেক দিন পর আবার পুরানো মেজাজে প্রতিভাত হয়ে শ্যাম দলানুরাগীদের মেজাজ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সত্যিকারের কার্যকর ভূমিকা নিয়ে।

তবে শ্যাম বা অন্য কেউই নন দিনের হিসেবে সেরা ফরোয়ার্ড ছিলেন জেভিয়ার পায়াস। ফরোয়ার্ড তো নন, যেন সৃষ্টিধর্মী শিল্পী। বুদ্ধির ছোঁয়ায়, পায়ের টানে তিনি কত কী যে গড়েছেন। লোক কাটিয়েছেন, মাটিঘেঁষা মাপা পাশে বিপক্ষের ব্যূহকে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। সতীর্থদের গোলের সুযোগ উপহার দিয়েছেন দরাজ মেজাজে। আক্ষরিক অর্থে যাকে বলে 'স্কিমার' জেভিয়ার ছিলেন ঠিক তাই-ই। দিনটি ছিল যেন তাঁর জন্যেই চিহ্নিত। লীগ মরশুমের হিসেবে মোহনবাগানের আক্রমণের মূল উৎস হলেন দুই উইং ফরোয়ার্ড। কিন্তু মহামেডানের সঙ্গে খেলার দিনে যুগল উইংয়ের কেউই স্বাভাবিক মূর্তি ধরতে পারেন নি। একা জেভিয়ারই হঠাৎ উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত চেহারা ধরে আক্রমণের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে যান। এ বছরে আগে কোনো দিন জেভিয়ার এমন সৃজনধর্মীতায় দর্শনীয় ও কার্যকর হতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাই নতুন বেগে, নতুন রূপে তাঁকে দেখে পৃষ্ঠপোষকরা জেভিয়ারকে যেন ভাল করে চিনে নিতে পেরেছেন। ওই লগ্নের জেভিয়ার যেন এক নতুন আবিষ্কার।

জেভিয়ারের দুর্ভাগ্য যে সতীর্থ ফরোয়ার্ডেরা তাঁর ভাল কাজের মূল্য নিজেদের আচরণে বড় একটা ধরে রাখতে পারেন নি। তাছাড়া তাঁর অনেক সুকৃতিকে ভোঁতা করে দিয়েছিলেন মহামেডানের রক্ষণব্যূহের অতন্দ্র প্রহরী মৈদুল ইসলাম। দলের স্বার্থ আগলাতে অনেক কিছু করার দায়িত্ব মৈদুল নিজেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এবং সে কাজের ভার তাঁর ক্ষেত্রে দুর্বহ হয়েও দাঁড়ায়নি। রক্ষণব্যূহের ফাঁক ফোকর ভরাট করেছেন। চাপের মুখে দাঁড়িয়েও বারবার অবিচল থেকে গেছেন। পাশের স্টপার অশোক চক্রবর্তীও সাধ্যমত চেষ্টা করে গেছেন। এবং উইং ব্যাক গৌরাঙ্গ ব্যানার্জিও মানসকে চোখে চোখে রাখায় বিফল হননি। মৈদুল, অশোক, গৌরাঙ্গ সবাই স্থানীয় খেলোয়াড়। অথচ তাঁদের টপকে আজকাল ক্লাব কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি যেন বাইরের খেলোয়াড়দের দিকেই প্রসারিত হচ্ছে। বাইরে থেকে আমদানী করা নাজিব, দীনকরেরা সেদিন মাঠে না নামলেই তো ছিল ভাল। তাঁদের বদলে অন্য কাউকে মাঠে নামালে তাঁরা নাজিব, দীনকরের চেয়ে কি খারাপ খেলতেন নাকি?

মোহনবাগানের স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্যও শেষদিকে অনমনীয়তার পরিচয় রেখেছিলেন। আকৃতিগত দৈর্ঘ্যকে কাজে লাগিয়ে ওই সময় তিনি অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। বলতে গেলে, শেষ প্রহরে মহামেডানের আক্রমণাত্মক অনেক চেষ্টা একা সুব্রতই ব্যাহত করে দেন। অন্যেরা যখন বেদম ও অস্থির তখন দীর্ঘদেহী সুব্রত যদি পাহাড়ের মত স্থির হয়ে দাঁড়াতে পায়ের নীচে শক্ত জমি খুঁজে না পেতেন তাহলে মোহনবাগান-মহামেডানের খেলার ফলাফল অন্য রকম হোত কিনা তা অনুমানেরই বিষয়।

চিত্রধ্বনি

হিন্দী স্টাইলে বাঙলা ছবি

সুখেন দাসের অন্য ছবির তুলনায় 'সুনয়নী'র ভাল লোকেরা আরো বেশী ভালো। খারাপেরা আরো খারাপ। মাঝামাঝি বা স্বাভাবিক একেবারেই কেউ নেই। ১৩ রীলের মধ্যে ১৩ রীলই ভিলেনের আধিপত্য। আর পড়ে পড়ে মার খেয়ে একেবারে শেষ রীলে ভালোদের জয়জয়কার। ছবিতে এই থিওরিই বলবৎ। সস্তা সেন্টিমেন্টের এখানেও ঢালাও কারবার। আর মেলোড্রামাকে 'টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি' বললেও হয়ত কম বলা হবে। সবকিছুই বেশী বেশী। অভিনয় তো বটেই।

টাইটেলের পর ফোটো এ্যালবাম দিয়ে ছবির শুরু। জনৈক ব্যক্তি একটার পর একটা পাতা ওল্টান, আর নেপথ্যে কোনো একজন সেইসব ছবির লোকেদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে চলেন। এরই ফাঁকে এ্যালবাম হাতে ভদ্রলোক সিগারেট ধরান। আবার পাতা ওল্টান। এইভাবে কিছু চরিত্র পরিচয়ের পর (এ্যাকশন সহ) ছবি এগোয়।

অন্ধ সুনয়নী ওর বাবার বন্ধুর আশ্রয়ে লাথিঝাঁটা খেয়ে বেঁচে থাকে। বন্ধু ভদ্রলোক আবার উত্তমকুমারের মামা। অতএব সুনয়নীর কষ্ট উত্তমের নজরে পড়ে। সহৃদয় উত্তমকুমার আবার চোখের ডাক্তার। তার ওপর আত্মহত্যা করতে গিয়ে সুনয়নী ওই উত্তমকুমারের গাড়ীতেই ধাক্কা খায়। অতঃপর উত্তমকুমারের মৃত বোনের স্থান গ্রহণ করে। অন্ধ সুনয়নী তখন নিজের হাতে ট্যাংরা মাছের ঝোল রেঁধে দাদাকে খাওয়াতে থাকে। ওদিকে আরেক নাটক। বড় ভাই শুভেন্দু, ছোট ভাই সুখেন এবং ওদের মাকে হত্যা করে সৎভাই দিলীপ ওদের বিরাট ব্যবসা ও সম্পত্তি হজম করতে চায়। সুখেনকে সে আগে থেকেই ইঞ্জেকশন দিয়ে পাগল করে রাখে (বিশেষ পরিচালনা—সুখেনের ক্লোজ-আপ দৃশ্যের সময় নেপথ্যে শিস বা হুইশিল জাতীয় আওয়াজ)। এরপর শুভেন্দুকে একদিন ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। স্বামীকে হারাবার পর শোক পেয়ে পঙ্গু শুভেন্দুর মা ছেলের মৃত্যুসংবাদে হুইল-চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ে মারা যান। আর ওই মৃতদেহের সামনেই আরেক ছেলে সুখেনকে ধরে দিলীপ বেধড়ক পিটোতে থাকে। কিছু পরে সুখেনকে সে কোনো এক উঁচু জায়গা থেকে জলে ফেলে দেয়। শুভেন্দু-সুখেন এরা দুজনেই আশ্চর্যভাবে বেঁচে যায়। কিন্তু পাগলা সুখেনকে বাড়ি ফিরে আবার ইঞ্জেকশনের তাড়া খেতে হয়। আর দুর্ঘটনায় মুখ পুড়ে যাবার জন শুভেন্দুকে ওর হবু স্ত্রী প্রত্যাখ্যান করে। শুভেন্দু তখন এমন একজনকে বিয়ে করতে চায়, যে ওর পোড়ামুখ দেখতে পাবে না। অর্থাৎ অন্ধ হবে। বন্ধু উত্তমকুমার তখনই সুনয়নীকে হাজির করে দেয়। সুনয়নী গাইতে থাকে 'জানি না কেন যে আলো নেই'। দাদা যখন চোখের ডাক্তার তখন বোন আর ক'দিন আলো ছাড়া থাকতে পারে। সুনয়নীর অন্ধত্ব ঘোচে এবং ওর চেষ্টাতেই শেষে দিলীপের মুখোশ খুলে যায়। ছুটে আসে চাবুক হাতে সুস্থ সুখেন। শুরু হয় দিলীপের সঙ্গে মার-পিট। একেবারে হিন্দী ছবির কায়দায়। ক্যারাটে, কুংফু ইত্যাদি কায়দায় দুজনেই দারুণ লড়ে। শেষে হয় উত্তমকুমারের আবির্ভাব। অতঃপর দিলীপের শ্রীঘর। ছবি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু পরিচালক সুখেন দাস তখনও কিছু প্রেমের কথা ভেবেছেন। তা হল শুভেন্দুর পোড়ামুখ। তাই ছবির শেষ দৃশ্যে নেপথ্য ভাষণের সঙ্গে এয়ারপোর্টে একটি প্লেন নামে। শুভেন্দু বিলেত থেকে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে ফেরে। চকচকে মুখে অপেক্ষমান বৌকে জড়িয়ে ধরে। ৭৯-র একটি বাংলা ছবি এভাবেই শেষ হয়।

অসিতবরণ মিত্র

বিজন থিয়েটার

উত্তর কলকাতায় 'বিশ্বরূপা-রঙ্গনা-সারকারিনা' শাসিত থিয়েটার গলিতে সাড়ে পাঁচ বছরের একটি শিশু নাট্যগোষ্ঠী একটি পুরোপুরি মঞ্চ নির্মাণ করে ফেললেন, এই খবরটা উদ্বোধনের কিছু আগেই জানানো উচিত ছিলো অন্তত তার সংগ্রামী চরিত্রের দাবিতে। উদ্বোধন রজনী এবং পরবর্তী বারটি সন্ধ্যার নাট্যোৎসবের কথা বলার ফাঁকে সেই ত্রুটি কিছুটা শুধরে নিতে চাই।

'সায়ক' নাট্যসংস্থা ও 'নটরাজ এন্টারপ্রাইজ' (সায়কেরই আত্মীয়বন্ধু নিয়ে গঠিত)এর যৌথ উদ্যোগে, একটি ব্যাঙ্ক ও কিছু শুভার্থীর আর্থিক সহযোগিতায় সরকারী সাহায্য ছাড়াই গত ৩১ জুলাই 'বিজন থিয়েটার'-এর উদ্বোধন হয়ে গেল। প্রয়াত বিজন ভট্টাচার্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে এমন এক ব্যক্তিত্ব যে তাঁর নামে একটি মঞ্চ প্রস্তুত হওয়ার ঘটনা চূড়ান্ত অবিশ্বাসীর কাছেও একদিন সূর্যোদয়ের মত স্বাভাবিক সত্য মনে হবে বসে আমার বিশ্বাস। কিন্তু বর্তমান অবিশ্বস্ত সময়ে এই কাজটি সম্ভব করেছেন কয়েকটি অনভিজ্ঞ তরুণ, শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের সততা এবং আন্তরিক পরিশ্রমে ভর করে—এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার নাট্যানুরাগীদের কাছে আর কি হতে পারে এই মুহূর্তে?

উদ্বোধন রজনীতে মেঘনাদ ভট্টাচার্য সায়ক-এর পক্ষ থেকে জানিয়েছেন তাঁদের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত, আশাআকাঙ্ক্ষা, অতীত এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। বর্তমানটা বড়ো প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চোখের সামনে ছিল। দেখছিলাম একটা অসম্পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ, ঈষৎ অপরিশীলিত মঞ্চ, তবু এও সম্ভব! বাকিটা সকলের শুভেচ্ছা থাকলে অবিলম্বেই হয়ে যাবে। কিন্তু এতোদুরই বা সম্ভব হল কি করে? এর মূলসূত্র ছিলো বিভাস চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত ভাষণে। তিনি বলেছিলেন বিজন ভট্টাচার্যর স্মরণ সভায় কেমন করে বিভিন্ন নাট্যদলের অগ্রজ মহারথীরা তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের সময় পিছিয়ে গিয়েছিলেন নানান হিসেবনিকেশ করে। এই স্ট্যাটাস-এর হিসেবনিকেশ, ভাগ-বাঁটোয়ারার স্বার্থ-চিন্তাতেই আমাদের প্রথম সারির নাটকের দল একটা মঞ্চ আজও তৈরি করতে পারলেন না, অথচ তরুণ, অনভিজ্ঞ, গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে অপ্রতিষ্ঠিত 'সায়ক' সেই কাজটা করে ফেলতে পারলেন বেহিসাবের গুণে।

'বিজন থিয়েটার'-এর সূচনায় গ্রুপ থিয়েটারের প্রতি ঐকান্তিক সৌহার্দ্য সূচিত। বারোদিনব্যাপী নাট্যোৎসবে অংশ নিয়েছেন 'নান্দীকার', 'চেতনা', 'থিয়েটার ইউনিট', 'শূদ্রক', 'লাইমলাইট', 'নান্দীমুখ', 'থিয়েটার কমিউন', 'সুন্দরম্', 'বহুরূপী', 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ', 'পি-এল-টি' এবং 'চার্বাক' গোষ্ঠী। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন বা যাঁরা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন তাঁরাও সকলেই গ্রুপ-থিয়েটারের সঙ্গে কোন না কোনভাবে কমবেশি যুক্ত। এবং আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে এর মধ্যে 'সায়ক'-এর প্রচারের কোন চেষ্টা ছিলো না, উদ্বোধন রজনীর সামান্য দু-একটি পরিচয়জ্ঞাপক ভাষণ ছাড়া। সেটুকু না থাকলেই বরং অন্যায় হতো। যেমন, প্রচারবিমুখ শিশির বোসের অবদান প্রসঙ্গে অনেকেই জানতে পারতাম না, জানাতে পারতাম না তাঁর কাছে বাংলার নাট্য-অনুরাগীদের ঋণ। মূলত তাঁরই আর্থিক সহায়তায় যে এই কর্মকান্ড সম্ভব হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলো! কিন্তু এটুকু বাদ দিলে সায়কের উপস্থিত আয়োজন সবই অন্যদের জন্য, অন্য দলের জন্য এবং দর্শকের জন্য। উদ্বোধন রজনীতে উদ্বোধক হিসেবে কোন আনুষ্ঠানিক ব্যক্তি ছিলেন না, উদ্বোধক ছিলেন উপস্থিত দর্শক। সভাপতির আসনে ছিলেন নিরলস নাট্যকর্মী তাপস সেন। বক্তৃতার বদলে তিনি বিনম্র উপস্থাপনায় শোনালেন 'বিজন ভট্টাচার্য'-র শেষ সাক্ষাৎকারের দূরদর্শনে টেপ। বক্তাদের মধ্যে অরুণ মিত্র বললেন অন্তরঙ্গ বিজন ভট্টাচার্য-র কয়েকটি উজ্জ্বল প্রসঙ্গ। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রশান্তকুমার শূর এবং প্রবোধবন্ধু অধিকারীর প্রতিবেদনে আমাদের আরো বেশি মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা সে বিষয়ে সরকারের মনোভাব এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা ছিল। সেদিনের অনুষ্ঠানে 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিচালনায় 'মাস সিংগার্স'-এর সঙ্গীতের পর ছিল 'নবান্ন' প্রযোজিত বিজন ভট্টাচার্য-র 'জবানবন্দী'।
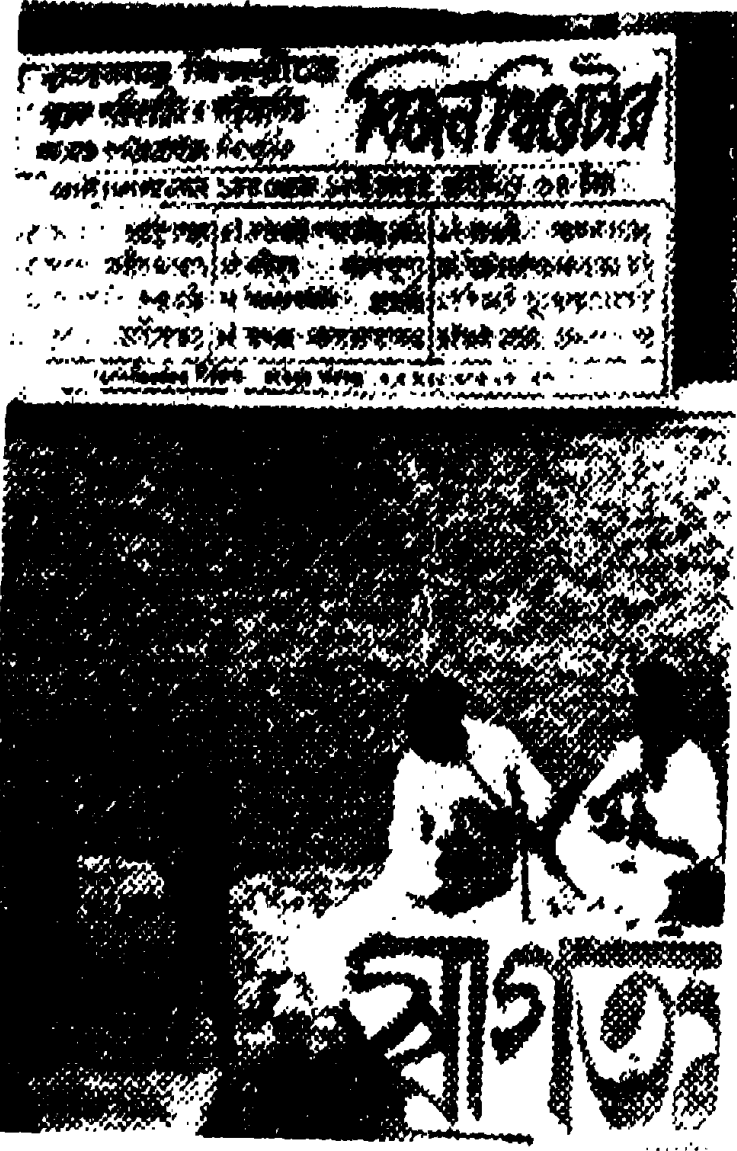
'বিজন থিয়েটার' এখনও অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হওয়ার পর উদ্যোক্তাদের সামনে নতুন আর এক সমস্যা আসবে। ব্যবসাদারির কাছে আত্মবিক্রয় না করে, রূপান্তরিত না হয়ে বেঁচে থাকার সমস্যা। [illegible] এখনও কিছু দেরি আছে। প্রার্থনা করি 'সায়ক' ও নটরাজ 'এন্টারপ্রাইজ' সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আপাতত উৎসবের কথা।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য সঙ্গীত

১০ জুলাই 'নবনালন্দার' এই নিবেদনের সঙ্গে একটি স্মারক পুস্তিকা ছিল এবং তাতে এই নামের একটি নিবন্ধে এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল যে 'একেকটি দৃশ্য মনের ভেতর সাজিয়ে তুলবে, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই ঠিক, সেই দৃশ্যের বাইরে আরেকটি দৃশ্য ভেসে উঠবে, যে দৃশ্য সাজিয়ে তুলবে সুর ও বাণীর স্বর্গ—যার আকাঙ্খায় আমরা জীবনের দুর্লভ মুহূর্তগুলো অবলীলায় সমর্পণ করতে পারি।'

সত্যি কথা বলতে কি এত বড় আশা নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে যাই নি। তবু ভরসা ছিল যে, গ্রন্থনার সূত্রে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন গানগুলো হয়ত অন্যতর নাট্য-তাৎপর্যসম্পন্ন হয়ে উঠবে। এবং সে আশাটুকু মেটার মধ্যে বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গীত আশার্তিরিক্ত লাভ হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানের একেবারে শুরুতে সেই ইঙ্গিত সমর্থন পেয়েছিল পর্দার আড়াল থেকে সুগ্রন্থিত এবং সুপঠিত ভাষ্যের মাধ্যমে। পর্দা খুলে যাবার পরে বনানী ঘোষ-এর একক দুটি গানও সেই অনুষ্ঠানের রেশ জিইয়ে রেখেছিল। কিন্তু তার একটু পর থেকেই সব গোলমাল হয়ে গেল। প্রথমে 'সুদীপ্ত রায়'-এর একটি [illegible] শানে যে গান মনে এলো, পরমুহূর্তেই 'রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্য তা সম্পূর্ণ পাল্টে দিল এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ধরলেন 'অমল ধবল পালে লেগেছে'। এর পর থেকেই ক্রমে গ্রন্থনার সংলাপের ফাঁক অসম্পূর্ণতা এবং অনুপযুক্ত প্রয়োগ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নির্দেশনা এবং পরিকল্পনার ত্রুটিই এক সময় ধীরে ধীরে অনুষ্ঠানটির সমস্ত রস শুষে নিল এবং তার জন্য নিশ্চয়ই 'ভারতী মিত্র'কে অভিযুক্ত করা যায়।

অথচ অপূর্ব গাইছিলেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং কণিকা [illegible]পাধ্যায়। প্রণতি লাহিড়ী, শ্যামলী গুপ্তবক্সী, প্রবীর লাহিড়ী, শৈবাল মজুমদার প্রমুখ শিল্পী। আপ্রাণ সাহায্য করছিলেন অনুষ্ঠানকে তাঁদের সমবেত গানে। সংলাপ ও পাঠ অংশে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন [illegible] মিত্র। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, উপযুক্ত নির্দেশনা ও শিক্ষায় বেড়ে উঠতে পারলে ভবিষ্যতে আগামী সময়ের অন্যতম প্রয়োজনীয় শিল্পী হয়ে উঠতে পারবেন এই বিষয়ে। এ ছাড়া [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদিপ্ত রায়, দেবযানী মল্লিকও সংলাপ পাঠে [illegible] [illegible]দের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব [illegible] করে গেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাজা। [illegible] প্রয়োগ যথার্থ ছিল না, তার ওপর সেই সংলাপ

লোক নৃত্যাভিনয়ের শিল্পীরা

অংশ যেভাবে বিন্যাস ও বন্টন করা হয়েছিল তার মধ্যে কোন সামগ্রিক সুষমা আবিষ্কার করা যায় নি। এক এক সময় অশোকতরু বা কণিকাকে ব্যবহার করে যাওয়ার ফলে বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সুষম পরিকল্পনার অভাবই সমস্ত অনুষ্ঠানকে সারাক্ষণ শ্লথ ও শিথিল করে রেখেছিল।

আরও অভিনবত্ব চাই

বিভিন্ন লোকসংগীত ও লোকনৃত্যে গাঁথা অনুষ্ঠান পরিবেশনায় 'স্ট্র্যাডিভেরিয়াস' একটি পরিচিত নাম। সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে ৪ জুলাই তাঁদের একটি অনুষ্ঠানের পরিসরে তাঁরা আবার দর্শকদের মুগ্ধ করে গেলেন। বিশেষত মহারাষ্ট্রের লোকসংগীত বা অতিপরিচিত গঙ্গা-গঙ্গার তরঙ্গের গানে ইন্দ্রাণী সেন অনবদ্য। সমবেত কণ্ঠে ইজরায়েলী লোকগীতি এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এছাড়া বিহারী নাচ কিংবা 'কন্যার পদ্মকলি মুখ' গানটির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন পিয়ালী রায়। শেষোক্তটিতে তাঁর সহশিল্পী অভিজিৎ রায়ও প্রশংসা দাবি করতে পারেন। তবে কন্যার পদ্মকলি মুখ গানটি গাইবার সময় সেদিন তপন মল্লিকের গলা সব সময় সুরে থাকে নি।

পরিচালক চন্দ্রোদয় ঘোষ গানের দিক দিয়ে নিজেও কতটা সম্পন্ন তার প্রমাণ রেখেছেন পরিচিত গোয়ানিজ লোকগীতি 'চিত্ত চিত্ত চি'র মাধ্যমে।

সুরজিৎ ঘোষ

একটি সাঙ্গীতিক সন্ধ্যা

গত ১৫ এপ্রিল শিশির মঞ্চে ভারতীয় মার্গ সংগীতের এক সান্ধ্য সম্মেলনের প্রথম আইটেমে ছিল বন্দনা সেনের কথক নাচ। গত কুড়ি [illegible] ধরে তাঁর পরিবেশনায় খুব একটা [illegible] অক্ষত। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি কম শারীরিক পরিশ্রমেও দর্শকদের হৃদয় জয় করতে পারেন। 'তৈয়ারী'র তুলনায় ভাব ও অভিব্যক্তিতে এবং দ্রুতগতির তুলনায় মন্থর গতির দিকে তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন। তাঁর অনুষ্ঠানটি মাঝে মাঝে গীত প্রয়োগ করে সুন্দরভাবে ভরাট করা হয়েছিল।

মালবিকা কাননের মারু বেহাগ রাগে খেয়াল সময়ের অভাবের জন্যে অত্যন্ত চঞ্চলগতিতে শুরু হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠ সেদিন ভাল অবস্থায় ছিল না। এবং সুরে আসতে তাঁর বেশ কিছু সময় লেগেছিল। যদিও সেদিন তিনি তাঁর ফর্মে ছিলেন না, তবু ভাল সংগীতের বুনিয়াদ ও সঠিক রাগশিক্ষার জন্যে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সরগমগুলি ছিল অত্যন্ত দ্রুত, স্পষ্ট এবং উপভোগ্য। একটি মাত্র পর্দায় কারুকার্য দেখানোর চেয়ে, তাঁর সুসংবদ্ধ সমগ্র পরিবেশনাটিই অতীব প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছিল। খুবই পরিপাটি এবং যথাযথ ছিল তাঁর পরজবসন্ত রাগে ভজন।

ভি জি যোগ এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ভায়োলিন-হার্মোনিয়মের দ্বৈত পরিবেশনটি ছিল উক্ত সান্ধ্য সম্মেলনের শেষ অনুষ্ঠান। বছরের পর বছর নিষ্ঠার সঙ্গে সংগীত সাধনা এবং গবেষণার মাধ্যমে এই প্রবীণ শিল্পীদ্বয় আজ সংগীতের অমূল্য রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ। তাই তাঁদের পরিবেশনে কখনো কোনো ছন্দ পতন হয়নি। যুগলবন্দীতে আজকাল যেটা চোখেই পড়ে না। আবেগের চেয়ে আমোদ, মনোনিবেশের চেয়ে মজা এবং মানসিক চাপের চেয়ে উপভোগের দিকেই যুগলবন্দী পরিবেশনে শিল্পীদের ঝোঁক ছিল। খুবই সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্গে তাঁরা রাগ 'বাগেশ্রী' এবং 'পাহাড়ী' বাজিয়েছেন। 'বাগেশ্রী'তে ঝাঁপতাল বন্দীশ খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

সুরলহরী মিউজিক সার্কল

সুরলহরী মিউজিক সার্কেলের ব্যবস্থাপনায় গত ২৯ এপ্রিল বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনের খেমকা হলে শুনলাম বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদ এবং মৃণাল সেনের ভায়োলিন প্রথমোক্ত শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠান শুরু করেন 'হামীর'-এ সংলাপ, জোড় ও ঝালা দিয়ে। এই বক্রচলন সন্ধ্যা রাগটি সাধারণত রাগ প্রতিষ্ঠার থেকে শুদ্ধ ধৈবতের সাহায্য নেওয়া হয়; কিন্তু এই শিল্পী প্রচলিত সেই পথ পরিহার করে রেখাব পঞ্চমের মাধ্যমে রাগ প্রকাশের দিকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং প্রতি পদক্ষেপেই অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন যাতে না কামোদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁর প্রচেষ্টা যে বিফলে যায়নি, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এটা নির্ভুল রাগ আঙ্গিকের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। যে দক্ষতায় তা আজকের সরোদিয়াদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। প্রত্যেকটি স্বর প্রয়োগ অত্যন্ত সাবধানতার সযত্নে গঠিত এবং বাহুল্য বর্জিত ছিল। মার্গ সংগীতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি নবযুগের পরিমিতিবোধসম্পন্ন চাহিদার ডাকে সাড়া দিতে পারেন বলেই, তাঁর পরিবেশনে নতুন ও পুরনো সরোদচর্চার যোগসূত্র পাওয়া গেছে। বোলবাণী ধরনের বেশকিছু জটিল কাজ ছিল পরিবেশিত দুর্গা রাগের ভাবগুলিতে—যা তাঁর ঘরানার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। বাজনার গুণে 'আড়'-এর মতই তাঁর 'একহারা'গুলি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। চমৎকারভাবে অনিল পালিত তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন।

ভায়োলিনে মৃণাল সেন বাজিয়েছেন রাগশ্রী এবং ঝিঁঝিট। এই আলাবাদী ভায়োলিন শিল্পী প্রতিমুহূর্তেই সাফল্যের পথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। খুবই একনিষ্ঠ তাঁর সঙ্গীত চর্চা। তাই তাঁর পরিবেশনে একটা পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠেছিল। গমক অঙ্গের প্রতিই তাঁর ঝোঁক বেশী বলে মনে হল—ভায়োলিনে যা বাজানো খুবই শ্রমসাধ্য। অনিল রায়চৌধুরী তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন।

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল আয়োজিত এক সংগীত সন্ধ্যায় ওস্তাদ ইমরাত খান সেতারে বাজালেন রাজ ঝিঁঝিট এবং সুরবাহারে মিয়া কি মল্লার। প্রাথমিক ভাবে তাঁর বাজনায় ভাই ওস্তাদ বিলায়েৎ খান এবং পিতা ওস্তাদ এনায়েৎ খানের প্রভাব থাকলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তিনি উজ্জ্বল। এমন একটি ঢং তিনি গড়ে নিয়েছেন যা তাঁর একান্তই নিজস্ব। সেই গুণেই তাঁকে জনপ্রিয় সব প্রবীণও তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে থেকে আলাদা করে চেনা যায়। সেতারে ও সুরবাহারে তাঁর মীড়ের কাজ অত্যন্ত উঁচু মানের এবং এগুলি তাঁর গবেষণা ও চর্চারই সুফল। এরই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে গায়কী অঙ্গ—কখনো আংশিকভাবে, কখনো সংগীতকে বর্ণবহুল করে তোলার জন্যে পূর্ণ মাত্রায়। গায়কী অঙ্গের মতই তাঁর তন্ত্রকারী অঙ্গ খুব জোরালো।

খুবই বাঁকিদার ও জটিল মীড় দিয়ে গঠিত হয়েছিল তাঁর ঝিঁঝিট। শুধু মাত্র একটি কিংবা দুটি পর্দা থেকেই নয়, বরং সম্ভাব্য সব জায়গা থেকেই ছিল মীড়ের কাজ, পরপর এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সেতারের মীড়ের ওপর এতটা দখল আজকাল সচরাচর চোখে পড়ে না। স্বরবিস্তারে তাঁর চক্রনং গতি কখনো কখনো আমাদের 'দেশ' রাগের সীমানার কাছে নিয়ে গেছে। পরমুহূর্তেই পঞ্চমের থেকে গান্ধারকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে ঝিঁঝিটকে সজীব করে তুলেছে। দ্রুত জোড়ের কাজে খুবই উজ্জ্বল গমক এবং গতে চমৎকার তেহাইয়ের কাজ ছিল।

তুলনামূলক বিচারে সুরবাহারের অনুষ্ঠানটি ছিল আরো ভাল। মিয়া কি মল্লার অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে [illegible]

একটি সাঙ্গীতিক পরিবেশনা রচনা করেছিল, টেকনিক যেখানে গৌণ হয়ে পড়েছিল। খুবই আবেগময়তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল রেখাব, পঞ্চম এবং কোমল-গান্ধার। সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে সুরবাহার নামক এই কঠিন যন্ত্রটি বাজানোর জন্যেই বর্তমান ইমরাত খান শ্রেষ্ঠ সুরবাহার শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত।

তবলায় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন সাবীর খান। সুব্রত রায়চৌধুরী

সতী দেবী

১৪ আগস্ট প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সতী দেবী মারা গেছেন। পাটনার ব্যারিস্টার স্বর্গত চারুচন্দ্র দাশের মেজ মেয়ে সতী দাশ। ১৯২৭ সালে ছোট পিসি কনক দাশের সঙ্গে একদা দমদমে এইচ এম ভি-র স্টুডিওতে এসে দুটি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেন। রেকর্ডে প্রথম তাঁর গাওয়া গান হে ক্ষণিকের অতিথি ও বাদলধারা হল সারা তাঁর শিল্পী-জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী করেছিল। পরে রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদী, সুরসাগরের গান মীরার ভজন রেকর্ডে ও বেতারে গেয়ে তাঁর সার্থক শিল্পী জীবনের পরিচয় রেখেছিলেন। এইভাবে সফল সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে সতী দেবীর নাম চতুর্দিকে ছড়ায়। তাঁর কলকাতার ইন্দ্র রায় রোড ও বেলতলা রোডের বাড়িতে কয়েক বছর ধরে মেয়েদের জন্য একটি গানের ক্লাস পরিচালনা করতেন তিনি। এবং উৎসাহ মাসতুতো দিদি স্বর্গতা অপর্ণা দেবীর (দেশবন্ধু-কন্যা) কীর্তন-গানের স্কুলের সঙ্গেও সহযোগিতা করেন। ১৯১১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম। ১৯২৮ সালে স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ [illegible] সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সদলে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯৩৮ সালে ও পরে বোম্বাই শহরে দেশাত্মবোধক গান গাইতে যান। ১৯৫১-৫২ সালে প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গত পৃথ্বিরাজ কাপুরের নাট্য গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে বহুকাল বোম্বাই শহরে কাটান। হিন্দি, পাঞ্জাবী, উর্দু নাটকে তাঁর সাবলীল অভিনয় ও মুখে অনর্গল পুশতু ভাষায় সংলাপ শুনে তিনি যে কনভেন্টে-পড়া বাঙালী মহিলা তা বোঝাই যেত না। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের প্রতিষ্ঠাতৃ ও সুঅভিনেত্রী রুমাগুহঠাকুরতা সতী দেবীর একমাত্র কন্যা।

ভটনারায়ণ শর্মা

ক্ষীরের পুতুল

বিবেকানন্দ শিশু সংসদ রঙ্গনা মঞ্চে একাদশ বর্ষ পূর্তি ২৭ জুন আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ও সংস্থার উৎসব উপলক্ষে নিবেদন করলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় নিঃসীম আকাশ দিগন্তে মেঘের মধ্যে বকের উড়ে চলা। আলো 'ফেড আউট' হলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে চির পরিচিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির দোতলার দালান। অবনীন্দ্রনাথ পায়চারি করছেন, নিচে শিশুদের কাতর আবেদন—আমাদের জন্য কিছু লিখুন। আচার্যের উত্তর 'হ্যাঁ তোমাদের জন্য কিছু লিখবো'। শুরুতেই এই দৃশ্যের অবতারণা, অবশ্যই প্রয়োগ প্রধানের (কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে।

ভালো লাগলো আলোর কাজ (অলোক দে)। অনেকটা 'সিনেমাটিক'। সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনা (ধনঞ্জয় মল্লিক ও ধূর্জটি সেন) সুন্দর। দৃশ্যসজ্জা (অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়) মনোরম। নাট্যরূপ পরিকল্পনা ও প্রয়োগে কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়।

কলকাতায় রত্না এই প্রথম

বত্রিশে শ্রাবণ, শুক্রবার ওড়িশী নৃত্যের সাক্ষাৎ জগন্নাথ কেলুচরণ মহাপাত্রের নিজের হাতে গড়া দেবদাসী রত্না রায় (ঘোষ) যখন কলামন্দিরের মায়াবী আলোয় গনমতি বন্দনায় নিজেকে সমর্পণ করলেন, তখন বিশাল সভাগৃহের অধিকাংশ আসনই অন্ধকারে শূন্য। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র, গনমতি বন্দনা শেষে পল্লবী নৃত্যে পল্লবিত হওয়ার ঢের আগেই উপস্থিত দর্শকবৃন্দের ভাবং মনোযোগ নির্বাক বিস্ময়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে মঞ্চে—দেহ নিছক মানুষী, অথচ কি অক্লেশ অবহেলা অবলীলায় দৈবী রূপ পরিগ্রহ করছে, চোখে না দেখলে যা বিশ্বাস হয় না।

রত্না রায়

রত্নার নাচার বৈশিষ্ট্য—নাচতে নাচতে গোটা দেহ একটা আইডিয়ায় রূপান্তরিত হয়। ওই আইডিয়া ধীরে ধীরে দর্শক মনে সঞ্চারিত হয়।

অভিনয়াঙ্গে রত্না মিউনের বরপুত্রী। সরস্বতী না বলে মিউজ-এর উল্লেখ এখানে অনিবার্যভাবেই প্রাসঙ্গিক। হস্তধৃত অদৃশ্য লীলা কমল, চরণপাতে অশোক মঞ্জরীর অকুণ্ঠ উদ্ভাসের দ্যোতনা, চোখের রেখায় বিশ্ব নিনিদের আমন্ত্রণ—নৃত্য যেন রোমান্টিক ভাববিলাসের একটি আউটলাইন। আর এখানেই রত্নার সার্থকতা, এখানেই [illegible] সাফল্য। কলকাতায় রত্না এই প্রথম —বারীণ রায়

পার্থসারথি

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাগবাজার পত্রিকা ভবনে ভাব-[illegible] ছবির পরিবেশের মধ্যে রাজবল্লভপাড়া [illegible] সমিতির শিক্ষা-সাংস্কৃতিক শাখার সদস্যরা নিবেদন করলেন তাঁদের নতুন প্রযোজনা উৎপলেন্দু সেনগুপ্তের ভক্তি ও ধর্মমূলক নাটক 'পার্থ সারথি' নাটকটির সম্পাদনা [illegible]মোহন মিত্রের। বিভিন্ন ভূমিকায় অধীরেন্দু ঘোষ (অর্জুন), ছবি ভট্টাচার্য (বভ্রুবাহন), অনাদি ভট্টাচার্য (শ্রীকৃষ্ণ), কানাইলাল ঘোষ (চিত্ররথ), উদয় সাহা (বৃষকেতু), রবীন দে (সেনানী), মিলনী সরকার (চিত্রাঙ্গদা), বরুণা ঘোষ (গঙ্গা), রূপা ঘোষ (গঙ্গাপুত্র) এবং ইরাবর ভূমিকায় দীপালি দাস ও সাত্যকির ভূমিকায় আশিস ভট্টাচার্য দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নলিনীকান্ত করণের সুর দেওয়া গানগুলি সুগীত। শশাঙ্ক ভট্টাচার্যের সুপরিচালনা প্রশংসার দাবি রাখে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকো প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৩০ পয়সা।

পুজোর আগেই বেরিয়ে পড়ল 'ছ জনে মিলে'

আশাপূর্ণা দেবীর লেখা
ছোটদের নতুন গল্পের বই
আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষে ভারত সরকারের
প্রকাশন বিভাগের অবদান।

অম্লমধুর রসে ভরা ছ'টি
আনকোরা-নতুন অসাধারণ গল্প।
প্রচুর হাসির খোরাকের সঙ্গে
আছে দুঃস্থ অবহেলিত ও পীড়িত
মানুষের জন্য গভীর সমবেদনা।
বহুবর্ণে ছাপা ঝকঝকে মলাট,
প্রখ্যাত শিল্পী পুলক বিশ্বাসের আঁকা
ছবিতে বোঝাই এই দামী পুজো
উপহারের দাম মাত্র ন'টাকা।

ছ জনে মিলে
আশাপূর্ণা দেবী

কলকাতায় প্রকাশন বিভাগের
সেল্‌স্‌ এম্‌পোরিয়ম
৮ নং এসপ্ল্যানেড ইস্টে বইটি পাওয়া যাবে।

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের আরো বই

ভারতের গৌরব (১ম খণ্ড)	৩ টাকা ৫০ পয়সা
ভারতের গৌরব (২য় খণ্ড)	৭ টাকা
ভারতের গৌরব (৩য় খণ্ড)	৭ টাকা
ছোটদের বিবেকানন্দ	২ টাকা ৫০ পয়সা
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এস ডি সাওয়ন্ত	৩ টাকা ৫০ পয়সা
রবি-পরিক্রমা (রবীন্দ্রনাথের জীবন কথা)—ক্ষিতীশ রায়	৬ টাকা ৫০ পয়সা
শক্তি গোয়েন্দা কাহিনী	৫ টাকা
জওহরলাল নেহরুর কাহিনী এস ডি সাওয়ন্ত ও এস ডি বাদলকর	৩ টাকা
এই ভারত—লীলা ধর	১০ টাকা

(স্কুল, কলেজ, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীকে ১০% কমিশন দেওয়া হবে)

davp 79/238

অমৃত

১৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা
৪ আশ্বিন, ১৩৮৬
21st SEPTEMBER, 1979

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
পশ্চিমবঙ্গে দু বছরে ১০৬ কোটি
টাকার নতুন কর বসেছে
লিখেছেন রমেন দাশ
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর বিশেষ রচনা
সারমেয়-মার্জার সংবাদ
প্রলয় শূর ও বিজয় পালের গল্প

পুজো এসে গেল

পুজো এসে গেল। বাঙালির জীবনে সব থেকে বড় উৎসব। কিম্বা তার চেয়েও বেশি। শারদ-উৎসব বাঙালির জীবনে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সম্ভবত মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এমন একটি উপলক্ষ যার তুল্য অনুষ্ঠান অন্য কোনো রাজ্যে আছে বলে জানা নেই।

বোধকরি পুজোর এই ব্যাপক আকর্ষণের ফলেই উৎসবের আনন্দ এখন আর শুধু বাঙালিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতায় বাস করেন এমন অনেক অবাঙালিও একালে পুজো উপলক্ষে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এমন কি কোনো কারণে যদি কোনো পাড়ায় পুজোর আয়োজনে দেরি ঘটে, তাঁরা কৌতূহলী হয়ে খোঁজ-খবর নেন, এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন।

একথা অবিশ্যি ঠিকই যে পুজোর সময় হাজার হাজার মানুষ কলকাতার বাইরে চলে যান। ট্রেনের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নজর দিলেও সেটা টের পাওয়া যায়। কিন্তু এটাও বলা দরকার যে, পুজোর সময় কলকাতার বাইরে থেকেও বহু যাত্রী কলকাতায় আসেন। এবং তাঁরা কেবল প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর দেহাতী মানুষই নন। বিদেশী ট্যুরিস্টও কম থাকেন না তাঁদের মধ্যে। পুজোর দিনগুলোতে প্যান্ডেলের দিকে নজর রাখলে দেখতে পাবেন, সঙ্গে দোভাষী নিয়ে তাঁরা দুর্গা প্রতিমার চালচিত্র ও শিল্পবৈচিত্র্য নিয়ে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করছেন, পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে পুজোর ধর্মীয় ও পৌরাণিক দিকটির বিষয়ে অবহিত হচ্ছেন।

সম্ভবত এইসব কথা মনে রেখেই পুজোর সময়ে ট্যুরিস্টদের কাছে বিশেষ আহ্বান জানানো হয় কলকাতা পরিদর্শনের জন্যে। তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, কলকাতায় যদি আসতে হয় তবে এই মরশুমেই। পুজোর দিনগুলোতে কলকাতার যে বিশেষ উৎসব সজ্জা তা অন্য সময়ে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এ বছর ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ ছাটাইয়ের ফলে সমস্ত প্রত্যাশা ও পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে আশঙ্কা হচ্ছে। প্যান্ডেল শ্রমিক ও ঘরামিদের ধর্মঘটের দরুণ উৎসবের আয়োজন দেরিতে শুরু হয়েছে। ক্রম-বর্ধমান বাজার দরের চাপে চাঁদার পরিমাণেও টান পরার সম্ভাবনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেটুকু যা উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে এখন তারও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

তবু, এত কিছু বলার পরও আমরা আশা করব বাঙালির এই সারা বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিনগুলো যেন আনন্দের বাণী বহন করে আনে। বছরের অন্তত তিনটি দিনও যেন বাঙালি ভুলতে পারে তার দৈনন্দিন দুঃখের কথা। মানুষ হিসেবে তারা যে অমৃতের সন্তান, তা যেন তারা এই ক'টি দিনও অন্তত অনুভব করতে পারে।

সাহিত্য ইত্যাদি

শেষ চল্লিশের কবি

দেশের দিক দিয়েও যেমন তেমনি সাহিত্যের দিক থেকে চল্লিশের দশক ছিল যুগসন্ধির মতো। কিম্বা কথাটা এভাবে বলা ভুল হল। বলা উচিত দেশের জীবনে যুগসন্ধির ভাঙচুর চলছিল বলে সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটছিল। তাই '৪০-এর গোড়ার দিকে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে '৪০-এর শেষের দিকের লেখকদের বক্তব্য এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা যাচ্ছিল যথেষ্টই।

নতুন এই লেখকদের মধ্যে নাম করেছিলেন সেকালে অনেকেই। এ'রা ছিলেন তখনকার অ্যাংগ্রি ইয়াংমেন। আর এ'দের প্রধান উপজীব্য ছিল রাজনীতি।

রাম বসু ছিলেন এমনই একজন কবি। ছিলেন বলছি এই কারণে যে রাম বসু শারীরিকভাবে বর্তমান থাকলেও কবিতার দিক থেকে তিনি এখন অন্য জাতের লেখক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সেদিনের বেশ কয়েকটি কবিতা স্মরণযোগ্য রয়ে গেছে এখনো। যেমন 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে', কিম্বা এরই কিছুকাল পরে লেখা 'রক্তাক্ত যামিনী', বা 'সোহাগীর সংসার'। পিতৃ-পরিত্যক্ত হলেও এরা যাকে বলে অরফ্যান, তেমন কিছু অনাথ হয়ে যায় নি। নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে।

বরং রাম বসুর এখনকার কবিতাই কিঞ্চিৎ ডিফিউজড—অস্পষ্ট। হয়তো বা নতুন পথ খুঁজতে খুঁজতে ঈষৎ ক্লান্তও। তবে তিনি যে একজন সৎ কবি, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি এবং গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে উড়িষ্যার সেরাইকেলা অঞ্চল অন্য ব্যঞ্জনা পায়। ভাঙা-ভাঙা ইমেজ তৈরিতেও তাঁর দক্ষতা লক্ষ করার মতো। তিনি লিখে চলেছেন। লিখুন।

প্রায় এরই কাছাকাছি সময়ে লিখতে শুরু করেন সিদ্ধেশ্বর সেন আর মৃগাঙ্ক রায়। দুজন দু' জাতের কবি, এবং দুজনই রাজনীতি সচেতন হলেও কেউই রাম বসুর মতো সরব নন। এ'রা কথা বলেন মিচু গলায়। আবেগ এ'দের চাপা, প্রকাশ ভঙ্গিতেও সতর্ক। সবকিছু মিলিয়ে বিশিষ্ট, এক নজরেই তা চেনা যায়।

অবিশ্যি চিনতে পারার আরো একটি কারণ এ'দের আঙ্গিক। সিদ্ধেশ্বর এমন ভাঙা ভাঙা শব্দে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে সাজান তাঁর পংক্তিগুলো যে চোখে দেখলেই তা অন্য রকম লাগে। পড়তে গেলেও অন্যভাবে পড়তে হয়। মার্কিনী কবি কামিংস আর সোভিয়েত কবি মায়াকোভস্কির ধরণ মিশিয়ে এ এক নতুন আঙ্গিক। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি মোটামুটি এই একটি ফর্মেই লিখে চলেছেন। ফলে, কিছু কিছু তাঁর ভক্ত এবং অনুসারকও জুটেছে। কবির পক্ষে এও এক ধরনের পুরস্কার নিশ্চয়ই!

মৃগাঙ্ক রায়ও খুবই শক্তিমান কবি। তাঁর ছন্দও নতুন। এবং তিনিও মোটামুটি সেই এক ছন্দেই লেখেন। কিন্তু লেখেন তিনি বড় কম। একালে এ রকম মেজাজী লেখকের মান পাওয়া কঠিন। মৃগাঙ্ক রায়ও তাই বেশ একটু অবহেলিত।

কিন্তু একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, সমর সেনের পর বাংলা কবিতায় গদ্য ছন্দ তাঁর মতো এত স্বতন্ত্র এবং সার্থকভাবে খুব কম কবিই ব্যবহার করতে পেরেছেন। অলংকারহীন টান-টান গদ্য, চিত্রকল্পের নিজস্বতায় অব্যর্থভাবে সাড়া তোলে মনে। তাঁর সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত বয়সে লেখা সমুদ্র কন্যা বইতেই চোখে পড়ে প্রথম এই নিজস্বতা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা অনেক স্পষ্ট হয়েছে, উজ্জ্বলও হয়েছে। আর কবি নিজেও বোধ করি তা জানেন। কিন্তু জেনে শুনেও তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন কেন, সে এক রহস্য।

মানুষ হিসেবে রাম, সিদ্ধেশ্বর এবং মৃগাঙ্ক তিনজন তিন স্বভাবের। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি। বর্ষার দিনে রাম সিদ্ধেশ্বর এবং মৃগাঙ্ককে ছাতা দিতে চাইলে তিনজনই নিতে অস্বীকার করবেন। কারণ হারিয়ে যেতে পারে। এ'দের মধ্যে রাম আর মৃগাঙ্ককে আপনি ঠাট্টা করে বলতে পারবেন, তাঁরা কখনো ছাতা হারাবেন না, কারণ তাঁরা অত্যন্ত বৈষয়িক স্বভাবের। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সত্যিই একটু এলোমেলো ভুলো ধরনের মানুষ, তাঁর সম্বন্ধে অতোটা জোর দিয়ে বলতে পারবেন না। তবু যদি তিনজনের হাতেই ছাতা গুঁজে দেন, দেখবেন—রাম আর মৃগাঙ্ক সত্যিই ছাতা ফেলে আসবেন। এবং বাড়ি এসে রামের মনে পড়বে, আর পরদিন ফেরৎ আসবেন। মৃগাঙ্কের কোনো দিনই মনে পড়বে না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর আপনাকে অবাক করে প্রথম দিনই ছাতা এনে দেবেন। যদিও একটু পর্যবেক্ষণ করার পরই টের পাবেন তা অন্য কারো ছাতা।

এ'দেরই সমবয়সী লেখক কৃষ্ণ ধর। ঠিক কবে লিখতে শুরু করেছেন জানি না। কিন্তু চোখে পড়েছে, তাও কুড়ি পঁচিশ বছর তো বটেই। এই বিস্তীর্ণ সময়ে তিনি নানা জাতের নানা স্তরের কবিতা লিখেছেন। ইদানীং বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি লেখায় একটি নতুন মোড় এনেছেন যা আগ্রহের দিক থেকে বিস্তৃত, কিন্তু আবেগের দিক দিয়ে গভীর।

কৃষ্ণ ধর পেশায় সাংবাদিক, সে জন্যে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁর ব্যাপক। আচার ব্যবহারে ভদ্র, সমার্জিত, বিনয়ী। স্বভাবের এই স্নিগ্ধতা তাঁর কবিতার মধ্যেও স্পষ্ট।

এই ধরনের ভদ্র স্বভাবেরই আরেকজন কবি আছেন, তিনি শঙ্খ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় এক মিটিংয়ে, বোধহয় ভবানীপুরের দিকে। তখন সবে নাম করেছেন। তারপর তাঁর প্রথম বই বেরোল। রিভিউ করেছিলাম সে বইয়ের 'নতুন সাহিত্যে'। শঙ্খের ভালো লেগেছিল, সেটা তিনি একাডেমি পুরস্কার পাবার পর জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অবিশ্যি শঙ্খ আরো অনেক পরিচিত হয়েছেন আমার সঙ্গে, খানিকটা অন্তরঙ্গও হয়েছেন। তবে তিনি ব্যস্ত অধ্যাপক, স্বল্পভাষী মানুষ এবং পড়ুয়া স্বভাবের লেখক বলে থিতিয়ে বসে আড্ডা দেওয়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু যখন দেখা হয়—হাসি মস্করায় ঘাটতি পড়ে না। শঙ্খ কম কথা বললেও মজার কথা শুনতে ভালোবাসেন এবং মজা করে উত্তরও দিতে জানেন।

এই সময়েরই আগে পিছে ক'জন কবি রীতিমতো প্রতিশ্রুতি নিয়ে লেখা শুরু করে পরে কেমন যেন স্তিমিত এবং অনিশ্চিত হয়ে উঠলেন। এ'দের মধ্যে গোলাম কুদ্দুস, অরুণকুমার সরকার, অশোকবিজয় রাহা, ধনঞ্জয় দাশ, বটকৃষ্ণ দে জগন্নাথ চক্রবর্তী নানা কারণেই উল্লেখ করার মতো। বক্তব্যে এবং আঙ্গিকে এ'রা বিশিষ্ট। এখনো এ'রা মাঝে মাঝে লেখেনও কেউ কেউ। বিশেষ করে শারদীয় মরশুমে তো বটেই। ইদানীং বছর দুয়েক ধরে দেখছি, ধনঞ্জয় দাশ কিছুটা নতুনভাবে লেখার চেষ্টা করছেন। অরুণকুমার সরকার এবং গোলাম কুদ্দুসও লিখছেন। কিন্তু অন্যরা? অশোকবিজয় রাহা, যিনি শুরু করেছিলেন 'ডিহাং নদীর বাঁকে'র কবিতার মতো অনবদ্য রচনা দিয়ে, তিনি কোথায় গেলেন? এখনো তো ভুলতে পারিনি তাঁর সেই, চেয়ে দেখি, আরে! আধখানা চাঁদ ঝুলে আছে টেলিগ্রাফের তারে। কবি কি তা ভুলে গেছেন?

[illegible]

হারানো বই

"আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। আরো দীর্ঘকাল অধিকাংশ লোককে কৃষির উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিরাচরিত গতানুগতিক ধারায় কৃষিকার্য দ্বারা পল্লীর সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে। বর্তমান যুগে অন্যান্য উন্নতিশীল দেশে বিজ্ঞান, সমবায় নীতি প্রভৃতি দ্বারা কৃষি ও কৃষকের উন্নতি যেভাবে সম্ভব হইয়াছে আমাদিগকেও সেই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।" লিখেছিলেন সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'বাংলার শিল্প' বইয়ের ভূমিকায়। সতীশচন্দ্রের বিখ্যাত 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' বছর কয়েক আগে আবার ছাপা হয়েছিল। বিক্রমপুরের ইতিহাসের মত এই বইটিরও গুরুত্ব অসীম।

'বাংলার শিল্প' প্রায় আড়াইশ পাতার বই। দামী কাগজে ছাপা। কবে বেরিয়েছিল, সঠিক বলতে পারছি না। কেননা, সংগৃহীত বইটির নামপত্র নেই। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, ৩৪ সালের পরে লেখা। লেখক কৃষির সঙ্গে শিল্পোন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পল্লীঅঞ্চলে কুটীর-শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। পল্লীতে কাঁচামালের অভাব নেই। কৃষিকাজের অবসরে কৃষক কুটীরশিল্প, ছোটখাট কল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্য উৎপাদনে অংশ নিতে পারে। ভারতে বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠলেও হস্তশিল্পের গুরুত্ব কম নয়। আজও একথা সত্য।

১৭৮৭ সালে ইংলন্ডে ৩,০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের মসলিন রপ্তানী হলেও, ১৮১৭ সালে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সতের শতকে যখন বার্ণিয়ের এদেশ ভ্রমণ করেন তখনও ভারত থেকে নানা ধরনের বস্ত্র বিদেশী বণিকরা কিনে নিয়ে যেত। সবই ছিল হস্তচালিত যন্ত্রে তৈরি। রেশম শিল্পের ইতিহাসে, ভারতের ঐতিহ্য ৩০০০ বছরেরও বেশী বার্নিয়ার বলেছিলেন : "বাঙ্গালায় এত বিপুল পরিমাণ কার্পাস ও রেশম আছে যে, এই রাজ্যটিকে এই দুই প্রকার পণ্যের সাধারণ ভান্ডার ঘর বলা যাইতে পারে—কেবলমাত্র হিন্দুস্থান বা মোগল সাম্রাজ্যরই নহে, পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ এবং ইউরোপের পর্যন্ত।...রেশমগুলি অবশ্যই পারস্য, সিরিয়া, সৈদ ও বায়রুতের রেশমের ন্যায় এত সূক্ষ্ম নহে; কিন্তু তাহাদের মূল্য অনেক কম এবং আমি সুনিশ্চিত রূপে জানি যে, উত্তমরূপে বাছাই করিয়া যত্নের সহিত কাজ করিলে উহার দ্বারা অতিসুন্দর সূক্ষ্ম তৈয়ারী হইতে পারে। কাশিমবাজারে ওলন্দাজদের রেশমের কারখানায় ৭।৮শ' দেশীয় লোক কার্যে নিযুক্ত আছে এবং সেখানে ইংরাজ ও অন্যান্য বণিকদের কারখানায়ও বহু সংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে।" মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ছিল রেশম-শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। ঊনিশ শতকের সপ্তম দশকের শেষে ভারতের রেশম বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল সব থেকে বেশী। সেই সময়ে দেড় কোটি টাকার ২২,৫০,০০০ পাউন্ড রেশম পাঠান হয় বিদেশে। এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রেশম পোকা পালন শুরু হয় ১৮৯৮ সালে। সবশেষে আসা বিদেশী বণিক ইংরেজ, বাণিজ্যের মুখোশ-টাকে খুলে ফেলে তুলে নেয় এদেশের শাসন ভার। তারপর চলে এক নিরবচ্ছিন্ন শোষণ। যে দেশের পণ্য দ্রব্য রোম বা গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে বছরে তিন-চার কোটি টাকার মত বিক্রি হত, সে দেশ ধীরে ধীরে পরিণত হল সম্পূর্ণ কাঁচামালের উপকরণে। বিদেশী নিজের স্বার্থে কিছু কলকারখানা তৈরি করেছিল মাত্র। ১৯৩১ সালের হিসাবে দেখা যায়, সে সময়ে ভারতের বিভিন্ন কল-কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৪,৭৮,০১০ জন। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত বৃহৎ শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটে নি।

বাংলার শিল্প নিদর্শন

যুগের বিবর্তনে শিল্পরূপও বদলায়। প্রয়োজন অনুসারে এদেশের শিল্প ভিন্নরূপ নিল। নারিকেল ছোবড়ার শিল্প, ডুরি ও কার্পেট শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, জুতা শিল্প, বোতাম শিল্প, পিতল ও কাঁসার শিল্প, অলংকার ও দেশ শিল্পের বিকাশ ও পরিস্থিতি দেশের সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল। এদেশের মৃৎশিল্প ও খেলনা প্রসঙ্গে হ্যাভেলের একটি সুন্দর মন্তব্য : 'কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় কয়েকটি বিশিষ্ট গৃহনির্মাণ করিবার সময় উহাদের বাহিরের শোভা সাধনের জন্য ইংলন্ড হইতে এক লক্ষ টাকার টেরা কোটা (মাটির মূর্তি) আনা হয়। এই সমস্ত মাটির মূর্তিতে শিল্পোৎ-কর্ষের দিক দিয়া বাঙ্গালী কারিগরদিগের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে এইরূপ অসাধারণ কিছুই ছিল না। ইউরোপের উৎপাদকগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সাধারণ সজ্জাদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বর্গগজ হিসাবে বিক্রয় করে, এইগুলি তাহাই, কিন্তু বাঙ্গলা একটি শ্রেষ্ঠ ইট-উৎপাদক দেশ, এখানে এক সময়ে ছাঁচেগড়া ইটের গাঁথুনির একটি সুন্দর শিল্প ছিল এবং এই প্রদেশের বহু অংশে পুরাতন দালানে এখনও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য যদি এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত তাহা হইলে কলিকাতার সরকারী দালানসমূহের সজ্জা অনেক ভাল হইত এবং একটি প্রাচীন শিল্পও পুনরুজ্জীবিত হইতে পারিত।" হাতির দাঁতের শিল্পেও বাঙলার শিল্পীদের নৈপুণ্য বিশিষ্ট ইংরেজ শিল্প রসিকরাও স্বীকার করেছিলেন। ১৮৬০ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ ও তার আশপাশ হাতির দাঁতের কাজের জন্য ছিল বিখ্যাত। অবশ্য এই শিল্পে শ্রীহট্টেরও খ্যাতি ছিল।

বিশশতকের প্রারম্ভে চিনি, লবণ, পাট, চামড়া, কাচ, ছুরি, কাঁচি শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। স্বল্প মূলধনে এসব শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব কিভাবে এবং কি পরিমাণ মূলধনে এক একটি শিল্প গড়ে উঠতে পারে, তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারী আনুকূল্য একালের মত, সেকালেও সম্ভব ছিল না। আর ভারতীয় ব্যাংক তখনও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ঋণদানের উপযোগীও হয়ে ওঠেনি। ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসার ঘটাবার সুপারিশ করে লেখক বলেছেন : "এই গ্রন্থে কেবল কুটীরশিল্প ও ছোট ছোট কলকারখানার কথার উল্লেখ করিয়াছি। কেননা, যে সকল উৎসাহী কর্মী ও যুবক, ব্যক্তিগত ওদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য শিল্প-বাণিজ্য বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের জন্যই। বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে।" মূল বই ইংরেজিতে লেখা। আরও ব্যাপক বিষয় নিয়ে বাঙলায় একখানি বই বেরোয় অনেক পরে, ১৩৫০ সালে। মুহম্মদ-কুদরত-এ-খুদার লেখা যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প।' আকারে ছোট। কিন্তু অসাধারণ রচনা। এখানিও এখন ছাপা নেই।

[illegible] চৌধুরী

কমল চক্রবর্তীর কবিতা

স্মাগলার

সারা জঙ্গলে সে সোনার বাঁট ছড়িয়ে দিয়ে যাবে
কাশ্মীরী চরসের গন্ধে বিগত যুদ্ধের এই ট্রেন
দাঁড়িয়ে পড়েছে পুরনো টাঁড়ে

চকলেট মোদক এনেছে স্মাগলার
নেপালী গাঁজার খন্দ ফেরাতে পারবে না কোনদিন
স্মাগলার, ও আমাদের চেনা স্মাগলার
পুলিশ খুঁজছে যাকে রাইফেলে, বেয়নেটে, উনিশশো আশির লক্ষ্য মাথায়
হেগেলের গুপ্তচর তাই জেগে উঠে একা পথ চলে,
একা ব্যারাক পেরিয়ে যায়
গোপন তুর্কীর তাবু মধ্যরাতে ফেলে চলে যায়
সারা জঙ্গলে একা রুকস্যাকে পাতা ভরে নেয়, শুকনো খয়ের ফুল
লোকাচার ছিন্ন করে সমাধির নির্জনতায় সঙ্গম করেছে সারা রাত
আমার, আলিঙ্গনে, চোরা খাঁজে, জুতো নিয়ে যাবে
শুকনো পাতার ছিন্ন মালতীরা, গাঢ় রঞ্জনের লতা
বাঘনখ, শুয়োরের চর্বি-মাখা হাত সমস্ত শাসন টেক্কা দিয়ে
সে সারাবেলা রেস্তোরাঁয় অবাঞ্ছিত চোরাকারবারী
হাঁশসের মত দীর্ঘ চোখ কেউ জানতে পারবে না রাজদ্রোহ।

মানুষের মাংস খাওয়া হয়

ইদি আমিনের বদলে প্রফেসার ইউসুফ লুলে প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন
মানুষ খাওয়ার ইতিহাস বদলায় নি
যেমন রোডোসিয়ায় মাছের মত মানুষ গেঁথে শুকানো হয়।

নন-ভেজ যুবতী শুধু ছেটালো প্রকৃতির দিকে
সে পুঁইমাচা ঢ্যাঁড়স চচ্চড়ি কোনদিন ছুঁয়েও দেখবে না
কত রাতে নটে শাকে কাঁচ পোকা হেঁটে যায়
জোয়ারী রুটির মত লাল গণ্ডদেশ, কেউ একা রণক্লান্ত নয়
হ্যাম বেকনের মত সারাদিন ঠোঁট থেকে ঠোঁটে একা একা
কেউ জানবে না মানুষের মৃতদেহে শকুন বসার মত সত্যি কত
বড় বেশী পৃথিবীতে নেই
মদেও সংকর চলে, শাড়ির ওপারে হয়ত মিরে-ভাজা চিকেন রয়েছে
বড় মাংসময় ঠ্যাং

ছিন্ন ভুলে যাও বিচ্ছিন্ন আরও অজস্রতাড়ি ভুলে যাও
ঐ যে দলিতকলা মৃতদেহ, আমার চোখের মতই কতকাল
স্তব্ধ হয়ে আছে।

কয়েকটি অশ্লীল দৃশ্য

অনেকগুলি লাল টুকটুকে আপেলের পাশে একটা চকচকে
খোলা ছুরি পড়ে আছে
এই যৌন দৃশ্যটি দেখে শিউরে উঠলাম
কতকাল আগে একটা খোলা সিঁদুরের কৌটো দেখে এমনি
চমকে উঠেছিলাম
কলমে বসানো বোঁটাশুদ্ধ পদ্মফুলের মাথায় কালো চকচকে ভ্রমর
কালো ভ্রমরের পায়ে পরানো লাল আলিপুরি মোজা
আমার প্রথম যৌবনের পাগলা ছবি
গর্ব করে বলা যায় একবার আমি মাধবের বাটিতে
একটা শুকনো ফুল ঝরে পড়তে দেখেছিলাম
নতুন বই-এর গভীর দুই পৃষ্ঠা
এক বর্ষার দুপুরে জানালার পাশে খোলা পড়েছিল
আর গোপন সৃষ্টির ফোঁটা।

আমাদের প্রেম নেই

আমাদের প্রেম নেই সৌন্দর্য যুবতী নেই
হায় ঈশ্বর! সব মানুষকে প্রেম দাও, হায়স্টোন বুক দাও
অফুরন্ত কাম দাও
লোহিত নির্মিত সাবেক কালের ভালোবাসা, হারিয়ে যেওনা
অথ মহান অন্তর্ধানের দলপতি হে, সমস্ত অকৃত্রিম ভ্রম
ফিরিয়ে দাও
আজও এই গলি দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির বলদ-টানা গাড়ি চলে গেছে
উঁচু পাহাড়ের জঙ্গলে এন্টেনা
হয়ত একদিন চোখের জলে পাগল মেয়েরে, জোছনায় বিনুনিতে পাখি
অবশেষে কোন বিকল্প নেই শুধু শেষ রাতে জানলা ফাটিয়ে চাঁদ নামে

কত লক্ষ লক্ষ মানুষ টেবিলের মুখে হাত, হয়ে গেছে
তবু পাউন্ড পাউন্ড ম্যাপলিফের, কি জগদ্বিখ্যাত জেনারেলিপনা
সারা কাগজে চোখের জলে ভেসে সব পাইকা লাফিয়ে নামছে
সারা কাগজে কায়-উলমলে-মেয়েমানুষ থালি পা হয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে
[illegible]

অপারেশন বর্গা

মাজরা পোকার মত বর্গাদার ধান ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে।
ধানে যখন ফুল হয়, ফল হয়, অনেক কাল গ্রামের বাতাস
গ্রামে থাকে না
গ্রামের পুব পাড়ায় বুড়ো শিব, পশ্চিমে সাঁকোর ওপরে
স্পায়ী কমিউনের স্বপ্নে ডগমগ বাংলা ভাটির খয়েরী বোতল
মাছধরা জালের তৈরী স্লিভলেস ব্লাউজ পরে চাষী বৌ
মিটিং শুনতে এসেছে
ফলিডলের বদলে কোকাকোলা ঢেলে দাও অভিমানিনীর রাঙা ঠোঁটে
বরগাদার খুঁজতে জোতদারের দাদা পর-দাদা সড়কি হাতে
অপারেশনে বেরিয়েছে
কানুনগোর দিশি কুত্তা দিনের বেলায় মশা তাড়াবার ভঙ্গিতে
ঘেউ ঘেউ করল
কুকুরের লেজের চেয়েও কড়া দিশি মদে চোবানো গলা
সারা বিলে পদ্মফুল ফুটে কমিউনের ঢংএ আকাশ মাতিয়ে তুলেছে
কেউ কাউকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না.
সবাই গেরিলা হয়ে যাচ্ছে।
অপারেশন চলছে টেবিলে টেবিলে মানুষে মুৎসুদ্দীতে
যারা আগে খদ্দর দেখলে ভয় পেত, তারা এখন
মানুষ দেখলে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ছে।

লাল টমাটো কালা আদমী

টমাটো বাগানে কালা আদমী ঢুকে পড়েছে
কালা আদমীর হ্যাট কোট পায়ে চপ্ চপ্ জুতো
জুতোর পেরেক, নাল, লোহালক্কড়, কাস্টআয়রনের ধুলো
বন্ধ ঘড়ির অন্ধকার
দিশি অ্যালকোহল পরদেশি চুরুট, চুট্টা, খেন্দিপিয়াল
সব ভেঙে ভুবড়ে ঢুকে পড়েছে
লোডশেডিং-এ টমাটোতে হাত বোলানো আদমীর অভ্যাস
কেউ দেখে না বলে জুতো জামা প্যান্ট
জামার পকেটে গেটপাস
প্যান্টের পকেটে ঘামে ভেজা রুমাল
বুকের হাড়ে কুড়ি বছর আগেকার দুর্ভিক্ষের মত গজিয়ে ওঠা চুল
তিন সেট আমেরিকান গ্রেহাউন্ডকে ডিঙিয়ে মেরে, ঢুকে পড়েছে
কালা আদমী কয়লাখনির মত বড় হাঁ করে
হাত পা নখ চুলের ডগা দেখা যায় না
ধমনীতন্ত্র, রক্ত, থুথু, বীর্য, চোখের জল
কালো আলকাতরার মত গড়িয়ে পড়েছে
কালা আদমী কয়লাখনির মত বড় হাঁ করে
হাসতে হাসতে লালটমাটো বাগানে ঢুকে পড়েছে।

[বিভাব পত্রিকার সৌজন্যে]

শিল্পী : বরুণ সিমলাই

চিঠিপত্র

এ তথ্য কোথায় পেলেন ?

অমৃতে প্রকাশিত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর "দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গ দেবতা" (বীরেন্দ্র মিত্র) সম্বন্ধে সমালোচনা পড়লাম। এ প্রসঙ্গে কিছু লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

বহির্বিশ্ব থেকে পৃথিবীতে আসা প্রসঙ্গে তারাদাসবাবু লিখেছেন—গতি বাড়তে বাড়তে আলোর গতির কাছাকাছি পৌঁছুলে সেই গতিতে ভ্রমণরত জীবের পক্ষে সময়ের বিপুল সংকোচন ঘটবে ঠিকই, কিন্তু আইনস্টাইনের মতে তার ভর ও অসীম হয়ে যাবে। মহাকাশচারী স্বদেশে ফিরে গিয়ে দেখবেন তিনি চার হাজার বছরের ইতিহাস হয়ে গেছেন। এমন একটা সাইকোলজিক্যাল ঝুঁকি বুদ্ধিমান হলে তিনি নেবেন কেন?

এপ্রসঙ্গে বলি, নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের প্রফেসর জি, ফাইনবার্গ যে টাকিয়ন সূত্র দিয়েছেন তা স্পেশ সন্ডে (মহাকাশযান) পরিচালনার শক্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলছে। আইনস্টাইন এর আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে, বস্তুর ভর বৃদ্ধি পায় তা আলোর গতিবেগ পেলে। ফাইনবার্গের মতে টাকিয়ন আলোর চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ দ্রুততর এবং আলোর গতিতে এলে আর তার অস্তিত্ব থাকে না। আইনস্টাইন প্রমাণ করেছেন গতির চরমসীমাই হচ্ছে আলোর গতি। টাকিয়ন সূত্র জানার পর তারাদাসবাবু কি বলেন? তাছাড়া আইনস্টাইন নিজেও বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস পূর্বকালে কোনদিন অপার্থিব বুদ্ধিমান জীবেরা এ গ্রহে পদার্পণ করেছিলেন।

সাইকোলজিক্যাল ঝুঁকির কোন ব্যাপারই নেই এখানে। নভশ্চর দেহকে হিমায়িত করে তাদের জীবনীশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে মহাকাশে পাঠানো যে সম্ভব একথা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে চলেছেন। টাইম ডাইলেশন এবং অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, তারাদাস বাবুর চার হাজার জাগতিক বছর সম্পূর্ণ অর্থহীন।

তারাদাসবাবু ফ্রেড হয়েলের আর অরু এর গ্রন্থটি পড়েছেন কিনা জানি না। তবে সবটা জেনেছি হয়েলের মতবাদ ইন্টারপ্রিটেশন ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। পাথরের যন্ত্র দিয়ে ঐসব বিশাল মূর্তি তৈরী করা দূরের কথা হয়েলের হিসেবে পর হয়তো পাথরের কোনো ভাঙ্গার চেষ্টা করেই হতাশ হয়েছেন। শুধু দানিকেন-ই নন, বিশেষ অনেক গ্রন্থবিদই হয়েলের মতবাদকে অস্বীকার করেন।

তারাদাসবাবু আরো লিখেছেন অন্য তারামণ্ডলের গ্রহে বিকাশিত প্রাণী বিকাশ লাভ করবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এবং তার অবয়ব যে মানুষের মত হবে না একথা নিরাপদে বলা যায়। এ প্রসঙ্গে আমি একটা হিসেব দিচ্ছি। আমাদের এই ছায়াপথেই ১৮ হাজার গ্রহ আছে যার বাতাবরণ পৃথিবীর মত। যদি এর শতকরা ধরে নিই, শতকরা একটিতে মাত্র মানুষের মত জীবের বসবাস আছে, তাহলে হিসেবে দাঁড়ায় ১৮০টা। এর মধ্যে অন্যান্য গ্রহমণ্ডলের গ্যাস মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি অন্য অনেক কিছু আমাদের পৃথিবীর মত হওয়াই স্বাভাবিক।

তারাদাসবাবু দানিকেন সাহেবের ব্যাখ্যাকে (ভিনগ্রহের প্রাণীরা কৈব প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা এবং পার্থিব নারীদের সঙ্গে সরাসরি মিলনে লিপ্ত হয়ে এক নতুন জীবনধারার সৃষ্টি করেছিলেন) কষ্টকল্পিত বলে আখ্যা দিয়েছেন। মোটেই তা নয়। ডারউইন বা হাক্সলি বিজ্ঞানের একটা অগ্রগতিকে ধরে নিয়ে তো আর থিয়োরী বানাননি। তাছাড়া ডারউইনকে বিশ্লেষণ করলে জড় জেনেটিক্সের বিশ্বাসকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, জীবন এসেছে দূর মহাবিশ্ব সঙ্গে সঙ্গে থেকে বীজগুটি রূপে উল্কাকণাকে বাহন করে প্রশ্ন জাগে, দূর মহাবিশ্বে জীবন এলো কেমন করে?

টেস্টটিউব বেবির যুগে হাই ব্রীড প্রজন্মের প্রাণী অত্যন্ত দুর্বল অথবা কম আয়ুসম্পন্ন হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার নিজের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না—তারাদাসবাবুর এ চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অন্য। তাছাড়া তিনি যাচ্ছেন ভিন গ্রহের জীবেরা আমাদের থেকে বেশী বুদ্ধিমান এবং অগ্রসর ছিলেন।

আমরা আমাদেরই পিতার সন্তান—নিশ্চয়ই গৌরবজনক। তাই বলে আমাদের পিতার উৎস জানতে চাইব না এ কেমন কথা? বীরেন্দ্র মিত্রর 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা'—নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

নরাকার পশু থেকে আদিম মানুষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বছর সে কিছুই করল না কিছুই শিখল না, তারপর সেই আদিম মানুষেই লাফিয়ে লাফিয়ে আজকের যুগে পড়ল— এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই দানিকেন সাহেব এখন পৃথিবীর ব্যস্ততম লোকেদের মধ্যে একজন। তাই তারাদাসবাবুর কাছে আমার জিজ্ঞাসা, তিনি কোথায় পেলেন যে, নিজের দেশে অন্যান্য ইউরোপীয় এবং মার্কিন দেশে দানিকেনতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে চলেছে?

অরুণ অরুণাচলম
১২- নিউট্রাফিক। খড়গপুর। মেদিনীপুর

সত্যিই প্রশংসার

অমৃত একমাত্র পত্রিকা যে নামী সাহিত্যিকদের নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকে না, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবীন লেখকদের যেভাবে অমৃত সুযোগ দিয়ে পাঠক মহলে লেখক হিসাবে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসার। আর আমার মনে হয় এই কারণেই বোধহয় অমৃতের আদর পাঠক মহলে বেড়ে চলেছে। বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক অমৃতের দীর্ঘায়ু কামনা করি। —**অতীন বসু**, হরিণাভী, ২৪ পরগণা।

ভেবে দেখবেন

আপনাদের এই পাক্ষিক পত্রিকা পড়ে বিশেষ আনন্দ পাই। অবশ্য একথা বলা ঠিক হবে না যে, এই সাময়িক পত্রিকাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর, তবে বলা যায় একে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলা সম্ভব।

আমি সমালোচক নই, কিন্তু যা মনে হয় সেকথা নিবেদন করছি।

প্রথমতঃ এর ছাপা ও কাগজ এবং প্রচ্ছদপট আরও সুন্দর করা আপনাদের মত শক্তিমান সংস্থার পক্ষে দুরূহ নয় এবং সামান্য যত্ন নিলেই তা করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা নবীন লেখকদের উৎসাহিত করার জন্য যেমন অজস্র ধন্যবাদ পেতে পারেন, তেমনই আবার ঐ নতুন লেখাগুলি কিছু সম্পাদনা করলে আরও বেশী ধন্যবাদভাজন হবেন।

তৃতীয়তঃ অপরাপর বিভাগের সঙ্গে একটি বিজ্ঞান বিভাগ থাকলে ভাল হয়—অবশ্যই তাতে মহাকাশ, পরমাণু বিভাজন বা বিজ্ঞানের জটিলতত্ত্বের আলোচনা থাকতে পারে, তবে সেগুলি যেন সাধারণের বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বা কারিগরি, কৃষি প্রভৃতি ব্যাপারের আলোচনা সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আশা করি এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখবেন।
—**সন্তোষকুমার দাস**, ১৫৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭

ঘরগেরস্থি

হাসান আজিজুল হক

জল থেকে নেমে গুটি গুটি পায়ে রামশরণ সপরিবারে বাঁধের উপর উঠে আসে। এর মধ্যে তিনবার সে পা ফস্কে পড়ে গেছে। হাঁড়িকুঁড়ি, হুঁকো-কল্কে কুল্লে সের সাতেক চাল, বিছানাপত্র সব জলে ভিজে জবজবে হয়ে গেল। বইতে সুবিধে হবে বলে রামশরণ একটা বাঁক জোগাড় করেছিলো—শহরে ফলের বাজারে গিয়ে চেয়ে-চিন্তে পেয়ে গিয়েছিল দুটো ভাঙ্গা ঝুড়ি। এই ঝুড়ি দুটিতেই তার সংসার মোটামুটি ধরে গেল। অবশ্য বউ, বারো বছরের ছেলে, দশ বছরের মেয়ে আর তিন বছরের কনিষ্ঠ কন্যাটিকে বাঁকে জায়গা দিতে পারা যায় নি। বরং বাঁকে যা ধরেনি তাই ওদের কোলে পিঠে হাতে কাঁধে ধরিয়ে দিয়েছিলো রামশরণ। ছেলেটি নিয়েছিলো সে। কিন্তু বউয়ের ভারটাই বেশি হয়ে গেল। ছোটো মেয়েটা বাঁ কাঁকালে, ডানদিকে সংসারের টুকিটাকি জিনিস।

বাঁশে উঠে হাঁফ ছাড়ালো রামশরণ। ভানুমতী ডান কাঁধটা ফাঁকা করে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে দাঁড়ালো। জিনিসপত্র-গুলো মাটিতে নামিয়ে ফেলেছিলো সে। কোলের মেয়েটাকে নামাতে যেতেই সে দু হাতে আঁকড়ে ধরলো মাকে।

ভানুমতী বলে, তুই কি আমারে চিব্যায়ে খাবি—হাঁ লা? জবাবে মেয়ে খিমচি দিয়ে ভানুমতীর শুকনো স্তনের বোঁটা ধরে এমন করে চুষতে শুরু করে যে, যন্ত্রণায় তার চোখে জল এসে যায়। ধহি ধহি করে মেয়েটির পিঠে চড় বসিয়ে বলে, ছাড় ছাড়, ছাড়ে দে রাক্ষুসী—বলে সে স্বামী-পুত্র কন্যার সামনেই বুক উদোম করে ফেলে। রামশরণ নিস্পৃহ চোখে সেদিকে পিট পিট করে চেয়ে বলে, মারিস না—কি আছে মাইয়্যাটার দেহে, অমন করে মারলি বাঁচপে?

ভানুমতী বলে, মলে ত আপদ যায়। ও মাইয়্যা তোমার মরবে ভাবিছ? ভানু-মতীকে দোষ দেওয়া মুস্কিল। গত ন'মাস ধরে এই মেয়ে তার কোলে চড়ে আছে। ভানুমতী বিনা সংকোচে কোমরের ফাঁস একটানে খুলে ফেলে রামশরণকে দেখায়, দেহো দিহি কেমন ঘা করে দেছে কোমরে।

সত্যিই কাঁকালটার ঘা হয়ে গেছে। এমনিতে কিন্তু আজকাল আর ভানুমতীর কোলে মেয়েটাকে আলাদা করে চেনা যায় না। কদাকার কুৎসিৎ একটা টিউমারের মত ভানুমতীর বাঁ দিকের পাঁজরে সে লেগে আছে। উলঙ্গ মেয়েটার দুদিকের কুঁচকির চামড়া ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে—মাথায় একটিও চুল নেই—সমস্ত শরীরে শুকনো দাদের মত দাগ। রামশরণ জানে মেয়েটা মরছে, ভানুমতীও জানে—শুধু অভ্যাস নেহাৎ ওরা মানুষ বলে বলে বেড়াচ্ছে।

রোদটা চড়চড় করে উঠে গেলে তাল গাছের মাথার ছায়া কুঁজো একটা জানোয়ারের মতো সুট করে গুঁড়ির কাছে চলে গেল। হাল্কা, গরম স্বস্তিহীন ছায়া সামান্য একটু জায়গা জুড়ে। রামশরণ সেই ছায়াটুকুর মধ্যেই পুরো পরিবারের জায়গা কুলিয়ে ফেললো। বড় ছেলেটাকে টেনে নিল কোলের মধ্যে, ভানুমতী শাড়িটা কোলের উপর জড়ো করে রামশরণকে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে বসলো আর বড় মেয়েটা সেঁটে রইল মায়ের গায়ে। এইটুকু জায়গার মধ্যে একটা পরিবার এঁটে যেতে পারে এ এক তাজ্জব ব্যাপার। রামশরণ হুঁকো কল্কে বের করে তামাক সাজতে বসলো।

গরম বাতাস আসছিলো থেকে থেকে। দম আটকে আসছিলো তখন, রামশরণ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিলো বললো, কি যে দ্যাখবো বাড়ী গিয়ে! ভানুমতী বলে, দ্যাখবে আবার কি? দ্যাখবে কিছুই নেই।

আহারে কত যেন ছেলো আমাদের?

ভানুমতী অতিষ্ঠ হয়ে দুহাতে মেয়ে-টার মাথা ধরে জোর করে একটা স্তন থেকে তার মুখটা সরিয়ে দিতেই মেয়েটা তার এই দেহের দিকে, মা বাবা দাদা দিদির দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে ঠিক স্থিতিস্থাপক রবারের মতো অন্য স্তনটায় মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ টানতে থাকে।

ইকি জন্মের খাওয়া খাচ্ছে গো? কথা-গুলি ভানুমতী কাউকেই বলে না—কিন্তু মেয়ের তেলো মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে উকুন খোঁজার চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে রামশরণ হুঁকো ধরিয়ে ফেলেছে। চোখ বুজে আরাম করে সে টানতে থাকে। শূন্য মাঠ আর ফাঁকা আধ-শুকনো খাল, অজন্মা ও অনাবাদি বছরের পাটকিলে রং-এর বদমেজাজী [illegible] জঙ্গল, লোনা জলে ডোবা ঝাঁঝালো অফলা বিল—এইসব তীব্র রোদে মিশে গিয়ে নেশার মদের মতো রামশরণের ভিতরে ঢোকে তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে। সে চোখ বন্ধ করে বলে, কতদিন সংসার করতেছিরে ভানু? ভানুমতী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি কোলে জড়ো করা শাড়ি তুলে নিয়ে গা ঢেকে ফেলে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রামশরণের দিকে তাকায় সে। তখন রামশরণ মজার কান্ড করছিলো। হুঁকো টানা বন্ধ করে ছেলেটাকে বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে আঁকাবাঁকা গাঁট ওঠা আঙ্গুলে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে পরিবারের সন্তান-দের বয়েসের হিসেব আরম্ভ করে দিয়েছে।

জগোর বয়েস হয়েছে তের বছর—না রে? তার আগে দুটো গেছে। মনো মরিছে পাঁচ বছর বয়েসে—সেই যেবার গাঁশুদ্ধ লোকে শামুক-গুগলি আর শাপলা খাই-ছিলো সারাবছর। মনোর ছোট পুন্নিমে মরিছে তিন বছর বয়েসে। বিয়ের জন্য তো

চুপটে আইছিলো মনো! তাহালি আমাদের বিয়ে হইছে আঠারো বছর।

গত বছর এই সময় রামশরণ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলো। ব্যাপার যা ঘটে-ছিলো, রামশরণ বাপের জন্মে কোনদিন শোনেওনি, দেখাতো দূরের কথা। দূরেশি দূরের বাড়ির ছেলে রশিদ এসে গোয়ালের গোজ থেকে দুধেল গাইটিকে খুলে দড়ি ধরে নিয়ে গেল যেন, চরাতে নিয়ে যাচ্ছে মাঠে। রামশরণ বলে, অ বাবা রশিদ, কর-তিছিস কি বাবা, গাইটোকে নিয়ে যাচ্ছিস কনে? রশিদ কিছু বলেছিলো কিনা মনে নেই—বেচারি বোধ হয় লজ্জায় কিছু বলতে পারেনি—একবার শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে-ছিলো বুঝি। কিন্তু দুপুরে যখন খেতে বসে রামশরণ, সেই সময় পশ্চিম বাড়ির রিদয়চরণ নিজেরই বাড়িতে খড়ের গাদায় পুড়ে পোড়াকয়লার মতো হয়ে গেল, ঘটনাটা ঠিক মত বুঝে ওঠার আগেই চার-পাঁচটা ছেলে এসে বলে, কাকা, আর কত খাবা? তাতে রামশরণ বলে, ক্যানো বাবারা, কোথায় যেতে হবে? এতে অন্য ছেলেগুলো চুপ করে থাকলেও, বসন্তের দাগঅলা অল্প চেনা ছেলেটো বলে বসলো, কাঁসার থালাটা—বেটায় খাচছো, ওটা আমাদের লাগবে। দেরি করতি পারতিছি না—অন্য বাড়ীতে যাতি হবে। তাই কচ্ছি তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে থালাটা দ্যাও।

বড়ো বড়ো ফোঁটায় রামশরণের চোখ থেকে জল পড়ে তার ভাতই লোনা হয়ে গেল। মোটামুটি আধ ঘন্টার মধ্যেই উৎখাত হয়ে গেল সে। ঐ যে দুপুরে লোনা লেগে-ছিলো মুখে, কোনো জল কি অন্য কিছুই পাওয়া গেল না স্বাদ ফেরানোর—পথে পথে ঘুরে, নদীতে নদীতে আঁকু পাঁকু করে, সীমান্তে চেঁচিয়ে, সীমান্ত ছাড়িয়ে মুখে পাথরের মুখ এঁকে মানুষের সারিতে নরক পর্যন্ত অপেক্ষা করে—দাঁড়িয়ে বসে চলে হেঁটে কোনোভাবেই যে মানুষ পারেনি নুনের ঝাঁঝ থেকে মুক্তি পেতে—এক বছর পরে বাড়ির কাছে এসেই কেমন দিব্যি হুঁকো ধরিয়ে সেই মানুষ সন্তানদের বয়েসের হিসেব নিতে শুরু করেছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলেমেয়েদের খোঁজ-খবর করায় ভানুমতীর ভিতরে সেই রহস্য-ময় দরজা হাট হয়ে খুলে যায়—যেখানে সচরাচর দৃষ্টিহীন অন্ধকারই থাকে। বুক টনটন করে ওঠে ভানুমতীর। হঠাৎ মনে পড়ে যায় মোট ছটি ছেলেমেয়ে ছিলো তার। গরম ভাপঅলা রোদের দিকে চেয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলেও ভানুমতী অবাক হয় যখন দেখে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মুখই তার মনে পড়ছে। বড়ো ছেলেটার থুতনির উপর একটা তিল ছিলো—মেয়ের কপালে ছিলো একটা বিশ্রী আঁচিল আর ছোটো ছেলেটার ডান পায়ের একটা আঙুল অন্য আঙুলগুলোর চেয়ে উপরে ছিলো এসবও স্পষ্ট মনে পড়লো তার।

ভানুমতী বলে, ভগোমান ঠিক আধা আধি ভাগ করে দেছে। ছটার তিনটে আছে। রামশরণ কিছু বললো না—ছোটো মেয়েটার দিকে চাইলো একটু অন্যমনস্কভাবে। মেয়ে-টাকে এখন ঢেকে নিয়েছে ভানুমতী বউ-মানুষের মতো।

রামশরণ একটু ভেবে নিলো, একটু চিন্তাভাবনা করে শেষে বললো, গাছ থাকলি আবার ফল ধরে। গাছটা তো আছে!

দেখে মনে হয় ভানুমতী এই কথায় লজ্জা পেয়ে গেছে। সে আড়চোখে চাইছে রামশরণের দিকে। রামশরণের পরনে আছে রং জ্বলে-যাওয়া ময়লা একটা গামছা। তার বেঢপ লম্বা হাত দুটোর পেশী দড়ির মতো পাকানো—ছোট ছোট চুল বিবর্ণপ্রায়, সব-গুলো দাঁতই পড়ে গেছে তার।

বাড়িটা কি আছে? কি যে দ্যাখবো গিয়ে!

থাকতিও পারে।

শুনিছি পরে পোড়ায়ে দিছিলো মেলিটারী গিয়ে। তাহালিও ভিটেটা আছে কি বলিস?

থাকতিও পারে—ভানুমতি আবার বলে।

থাকতিও পারে বলতিছিস ক্যানো? থাকবে না তো যাবে কনে? একটু ক্ষেপে উঠে রাগী গলায় বলে রামশরণ।

তাহালি আছে—ভানুমতী এবার বললো।

এতেও রাগ বেড়ে গেল রামশরণের। কিন্তু সে কথা কাটাকাটি করতে চাইলো না। বললো, কি কষ্টই না পাইছি এই নটা মাস। এ্যাহন, এই এ্যাতো কষ্টের পর কি দ্যাশে যাইয়ে বসতে পারবো না কস?

ভানুমতী এইবারে ঝেঁজে উঠলো, কি সুখটা জেবনে পাইছো আমারে এট্টু কও তো? প্যাট ভরে খাতি পাইছো কোনদিন—পরের বাড়ি খেটে খেয়ে জেবন গেল। পোলাপানদের কোনোদিন দুটো ভালো জিনিস দিতি পারিছ—এট্টু ভালো জামা-কাপড় দিতি পারিছ কও?

রামশরণও সমান তেজে জবাব দিলো, আরি বাপু, ভিটেটা তো নিজের ছেলো—সারাদিন পরে নিজের ঘরে শুয়ে তো থাকতি পারতাম—

ভানুমতী একটানা কিন্তু বকে গেল, বলো কেমন করে তোমার মনো মরিছে? পেরথম ছোওয়ালটা কেমন বিনি ওষুধে বিনি পথ্যে মরিছে, কও? পুন্নিমে মরিছে কেমন করে? সঙ্গে সঙ্গে রামশরণ বলে তাহালি বল্ দয়াল মরিছে কেমন করে? কই থামলি ক্যানো—বল্ তোর ছোডো ছওয়ালটা কেমন করে মরিছে? বেশি দিন তো না, এই তো সেদিন মলো পোলাটা। বল্, কেমন করে মরিছে?

ভানুমতী একেবারে থেমে গেল—কোনো কথা বলতে পারলো না সে।

তবে? রামশরণ বলে, বাড়িতে মরলি অমন শ্যাল কুকুরের ছানার মত ফেলে তো দিতি হয় না।

ভানুমতী চোখে আঁচল চাপা দিলো।

কেঁদে কোন লাভ নেই বুঝলি। তিনডে এ্যাহনো বেঁচে আছে। ফিরেতো আইছি আবার। ইন্ডে গেলাম—কবে মরে ভূত হবার কথা—ফিরে আলাম। দ্যাশে ফিরে কোথা ইস্টিশান, কোথা জাহাজঘাট, রিলিফের লাইন আর লোকের কাছে দ্যাও দ্যাও করা—তার চাইতে নিজের ভিটিতে—একটু উত্তে-জনা হয়েছিলো রামশরণের, হুঁকোটা নিভে গিয়েছিলো, ফের ধরিয়ে নিল সে। ঐ দুপুরে রোদ ছিলো অসহ্য—স্যাঁতসেঁতে দেশ, সবকিছু ঠিক পুড়ে যায় না, কিন্তু ভেজা মাটি থেকে বিশ্রী ভাপ উঠতে থাকে, আধশুকনো খানাখন্দ থেকে গরম জলীয় বাষ্প ধোঁয়ার মত ভাসতে থাকে বাঁদিকে গাঙ রোদে জ্বলছে বলে সেদিকে চাইলেই চোখে আচমকা ধাক্কা লাগে—এইসব কারণে রামশরণের চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে, পেটের ভিতরে যন্ত্রণা, মাথায় ঝিমঝিমধরা বেদনা সে খানিকটা অভিভূত হয়ে হুঁকো টানতে টানতে ভানুমতীর সামনে একটি চমৎকার জগৎ খুলে দিতে থাকে। রামশরণের ভঙ্গি রূপকথা বর্ণনার—সামনের ময়লা নোংরা

জগৎটা একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে, সেখানে তার বদলে জাগছে শক্ত মজবুত বাড়ী, ঘর-দুয়োর যা ঝড়ে বন্যায় টিকে থাকবে, খাদ্য এবং বস্ত্রেরও কোনো অভাব থাকবে না। অবশ্য জগৎটা খুবই খাটো—রামশরণের কল্পনা আর আকাঙ্ক্ষার মাপমতো।

ভানুমতী মেয়েটাকে আর ঠেকাচ্ছে না—কাপড়-চোপড় ঠিক-ঠাক করে নিয়ে, কপালের উপর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে চুপচাপ শুনছে। তার মুখের কঠিন রেখাগুলো নরম হয়ে এলো—অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা আর অনশনের জন্যে গজিয়ে-ওঠা চোখের কোণের গভীর কালো রেখা মুছে গিয়ে চোখ দুটো কেমন টানা টানা মনে হতে থাকে।

রামশরণ তার বাপের গল্প বললো, তার বাল্যের কেচ্ছা শোনালো, সন্তানদের কথা বললো ফেনিয়ে ফেনিয়ে। শুনতে শুনতে ভানুমতীর চোখে বারে বারে জল চলে এলো, সে মোছবার চেষ্টাও করলো না।

ভাবনা কি? ঠিক আবার গুছিয়ে বসবানে—বললো রামশরণ। এত সব কথার পর ভানুমতীও সাধ মিটিয়ে স্বপ্ন দেখে নিল। উত্তর পূব আর পশ্চিম পোতার তিনটে ঘর পরিষ্কার ঝকঝকে উঠোন ঘিরে। ছেলে বউ নিয়ে আছে একটার, একটার তারা নিজেরা আছে, উত্তরেরটা ফাঁকা, জামাই মেয়ে এলে ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশের বউ ভানুমতী, কতো দিন ধরে সংসার করছে—কি বিচিত্র ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা তার! সে কি জানে না কেমন হলে হয় সুখের সংসার? জানে না কি কেমন করে পাততে হয় চমৎকার পরিবার? গোয়াল, গাই-গরু, হাল-বলদ, জমি-জমা, পুকুরভর্তি মাছ আর গোলাভরা ধান দুর্লভ স্বপ্নের মতো ভানুমতীকে প্রচণ্ড আকর্ষণে টানে, ভানুমতীর চোখ বিশাল গভীর দীপ্ত, প্রায় মেঘভরা জলভরা শ্রাবণের আকাশের মতো। রামশরণ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে উঃ উঃ শব্দে বসে পড়ে। কিন্তু সে বসেও থাকতে পারে না—তাকে খুব তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হয়। কিছুদিন থেকে তার কোমরে একটা শিক লাজা চলছে—[illegible] বসে থাকার পর উঠে দাঁড়াতে গেলেই এই ব্যাপার। ভানুমতী বলে, কি হইছে, কষ্ট পাইছ? রামশরণ বিকৃত মুখ [illegible] তিন টান করার চেষ্টা করে, উঠে বসে ঘাড় নিচু করে থাকে কিছুক্ষণ—শেষে দুহাতে কোমর ধরে উঠে দাঁড়ায়।

উঃ, শালার কোমরটা! অস্ফুটে মন্তব্য করলো সে। রামশরণ তার মাথাটা কিছুতেই [illegible] উপর ঝুঁকে পড়তে দেবে না—এমনি বোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—তার সেই চেষ্টায় ঘাড়ের পিছনে দু গোছা দড়ির মতো শিরা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে, হাড়-সেঁকা রোদে [illegible] তার খাকি গায়ের চামড়া সেই কাজে [illegible] করে [illegible] হাত তুলে। [illegible] সে বাঁক কাঁধে নিয়ে, প্রতিটি [illegible] আপন মতো [illegible] দিয়ে বাঁধ ধরে টুকটুক করে এগিয়ে চললো।

খুব কাছেই রামশরণদের গাঁ—উঁচু বাঁধটা চোখের উপর বেধে গেছে বলেই গাঁ-ঘর দেখতে পাওয়া যায় না। রামশরণের চেষ্টা হলো বাঁকটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার। এমন তেজে সে হাঁটতে থাকে যে, মনে হয় দরকার হলে বাড়িতে গিয়েই সে তার জীবনের সর্বশেষ নিশ্বাসটি ফেলবে। তার বুকের ভিতর গুড়গুড়ুনি শুরু হয়—কাটা মুরগীর মতো ধড়ফড় করতে থাকে তার হৃৎপিণ্ড, সাপের মতো কিলবিলিয়ে ওঠে নাড়িভুঁড়ি। বাঁকটা পার হয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো রামশরণ, চোখ পিটপিটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো, রোদের জন্যে কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না সে।

ফিরে তাকালো সে ভানুমতীর দিকে, গাঁ কইরে? গাঁটা গেলো কনে?

রামশরণ ধমক দেয়, চোহে দেহিস না? গাঁটা গেলো কনে?

বাঁধ থেকে নেমে পড়লো সে সপরিবারে। গাঁয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না—এই কথাটা সে ঠিক বলছিলো না। আসলে দূর থেকে দেখতে পায়নি রামশরণ। এখন সে ঘরবাড়ির অবশেষ কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছিলো। কালো মাটির ভাঙ্গাচোরা ভিটে, আধপোড়া খুঁটি, তোবড়ানো এনামেলের বাটি, ভগ্ন ঝুড়ি, ঝাঁটা, উনুনের পোড়া মাটি আর ছাই—এসব ভাবে কিসের চিহ্ন? রামশরণ ঠিকই চিনতে পেরেছিলো—কিন্তু সে বোবা হয়ে গিয়েছিল এতো কাছে এসেও নিজের ভিটেটাকে চিনতে না পেরে। অবাক হয়ে ভাবছিলো এত ছোট ছিলো নাকি তাদের গাঁ—মাত্র এই কটি ঘর? বাড়িঘরগুলোর ভিতর দিয়ে যে অসংখ্য গলি ছিলো—যেখানে সেখানে কুমড়ো আর লাউয়ের মাচা—খোলা বাথানে গরু বাঁধা, এতগুলো ডোবা। এসব গেল কোথায়? সব উবে গিয়ে এই গুটিকতক ন্যাংটো ভিটে? রামশরণ যদি কাঁদে দুলতে দুলতে বলে, এইডা না?

ভানুমতী এদিক ওদিক চেয়ে ফুলচরণের বাড়ির দিকের গলিটা খুঁজতে থাকলে রামশরণই আবার বলে, দুরো, জলসীদার ভিটে এটা। রামশরণ একবার এ ভিটের কাছে গিয়ে বললো, বিপিন খুড়োর বাড়ি, একবার সে ভিটের কাছে গিয়ে, এইডা শেখজানের মাঝে চল—এই রকম চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সে আবাদিলালের মতো চেঁচাতে শুরু করে, কাঁদের যদি তার চোখ ফাটিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, ভিটেটা কৈ? [illegible]

সান্ত্বনা দেবার [illegible] ভানুমতী কহু, কাঁদো ক্যা? [illegible] বাড়ি-ঘরদোর কি আছে যে ঘরে গিয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বানে? [illegible] ভিটেটা তো সমান—শরীলে কি কাপড় কেনাকি আসীড়ছে? কথাটা ভাল করে শুনে বিচার করে দেখলো রামশরণ। কোন বাড়িই এখন আস্ত নেই তাড়াতাড়ির জন্যে দ্বিতীয় প্রাণীও এখন নেই চারদিকে, তখন নিজের ভিটের কাছে [illegible]

দুর্দান্ত কৌতূহলেই রামশরণ আঁতিপাঁতি খুঁজে দেখছিলো, কোথায় যেতে পারে তা সাধের বাড়িটার পোড়ো ভিটে, পা-গাজা [illegible] পালিয়ে তো যেতে পারে না। নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আছে এখানে—পোড়ো খুঁটি ভাঙা বাঁশ, টিনের বাসন-কোসন, মাটি শানকি—এই সবের মধ্যে। যোগেশ খাসে প্রচণ্ড রোদ, হু হু হাওয়া আর বিরান নিষ্ফলা অঞ্চল এমন করেই কি তার ভিটেটাকে লুকিয়ে ফেলতে পারে যে খুঁজে মিলবে না? বাড়ি তো জন্তু নয়।

রাত দশটার দিকে খানিকটা হাল্কা হয়ে গেলো রামশরণের পরিবার। ভানুমতী প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে শুরু করলেও বেশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারলো না, নেতিয়ে পড়লো সে। তাছাড়া এই খোলা মাঠে চিৎকার করে একা একা কান্না কোথাও যেন ঠিক পৌঁছোয় না। ভানুমতী কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে ককিয়ে কেঁদেই বোধ হয় বুঝলো নালিশ ঈশ্বরের কানে পৌঁছে দেওয়া তার কর্ম নয়। খানিক পরেই রামশরণ আর তার তীক্ষ্ণ বুকফাটা চিৎকার শোনে না। ভানুমতী ফাটা ফেঁসে যাওয়া গলায় বার বার ডাকছিলো, অরু, অরু রে, কোথায় গেলি মা। সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হয়ে উঠছিলো তার মুখ। গলার ঘাড়ের আর মুখের মাংসপেশী টানটান হয়ে যাচ্ছিল যেন তার বুকের ভিতর রয়েছে কঠিন কোনো ভার যা ভানুমতী চাইছে উগরে ফেলতে। খুব প্রিয়জন মরে গেলে হয়তো প্রথম কয়েক ঘণ্টা শোক এই-রকম পাথরের মতোই বুকের ভিতর বেড়ে ওঠে।

ছোট মেয়েটার নাম ছিলো অরুন্ধতী। এমন সুন্দর নাম নিয়ে সে মরে গেল কোনো সাড়াশব্দ না করে। ভানুমতী একটা পড়ো ভিটের উপর ইঁট পেতে রান্না চড়িয়েছিলো সন্ধের পরে। শহর থেকে আসার সময়ে রিলিফের চাল সে জোগাড় করে এনেছিলো তাই ফুটিয়ে নিয়েছিলো। মেয়েটা পেট পুরে খেয়েছিলো সেই ভাত। খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে, বড়ো ছেলেমেয়ে দুটোও অসাড় হয়ে পড়ে আছে, ভানুমতী রামশরণকে খেতে দিতে যাবে—তখন দেখা গেলো মেয়েটা মরে গেছে। ঘুমের মধ্যেই চলে গেছে সে। ভানুমতী ন্যস্ত হাতে মেয়েটার বুকে হাতের পাতা রেখে দেখলো, নাকে হাতের উল্টো পিঠ রাখলো, ঝুঁকে পড়ে মেয়ের মাথার উপর নিজের মুখ দিয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে টুঁ শব্দ করলো না ভানুমতী। পর্যবেক্ষণ শেষ করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে কেমন বুনো চোখে একবার রামশরণের দিকে তাকালো, তারপর বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভানুমতীর প্রায় সমস্ত শোকটাই বেরিয়ে গিয়ে সে হাল্কা বোধ করে—কিন্তু সেই আক্রোশভরা ভয়ানক শোক যায় কোথায়? কোথায় সে মিলিয়ে যায়? রামশরণ এখন আর কোনো চিৎকার শোনে না। একটা চটের উপর চিৎ হয়ে [illegible]

দেখতে সে ভানুমতীর মৃদু একঘেয়ে গোঙানি শুনতে থাকে। নদীর দিক থেকে খোলা মাঠের উপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া ছুটে আসে—প্রায়-নেভা ইটের উনুনের ছাইয়ের তলায় লাল গনগনে আগুন অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে ওঠে। তখন ভিটেটো চাপা আলোয় আবছা দেখা যায়—রামশরণ চেয়ে চেয়ে দেখে, বড় ছেলেটা হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোয়, বড়ো মেয়েটা কোলের ভিতর গুটিয়ে নেয় নিজেকে আর তাদের পাশে, প্রায় গায়ে গায়েই মরা মেয়েটা পড়ে আছে। মাথায় একটা চুল নেই, কাঠির মত সরু সরু হাত পা, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে চামড়া ঝুলে পড়েছে—পেটে এখনো রিলিফের ভাত ভরা আছে। ওহোহো জাতীয় একটা অতর্কিত চিৎকার করে রামশরণ কেঁদে উঠতে চাইলো। খুব বেখাপ্পা শোনায় সেটা। রামশরণ চুপ করতেই উঁচু বাঁধে বাধা পেয়ে বাতাস যে হুড়মুড় করে ফিরে গেল সেই শব্দ শোনা যায়। আশেপাশে কোনো বড় গাছপালা নেই—বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ নেই সেজন্যে—কি রকম হাহাকারের মতো বাতাস ছুটোছুটি করে বেড়ায় শুধু। ভানুমতীর গোঙানি একটানা চলছে এখন সেটা আরো মৃদু। অসম্ভব খিদে বোধ করলো রামশরণ।

উঠে বসে সে কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করে, মরে হাড় জুড়োল মেয়েটার, কাঁদিসনে, আমাদের ভাগ্যে তো তা নেই! নাড়ী জ্বলে যাচ্ছেল তার। সব ভাত কি এখন ফেলে দেবে ভানুমতী? তাহলে তো মরা মেয়ের পাশে তাকেও জায়গা নিতে হচ্ছে আজ।

ভানুমতী একরকম কেঁদে চললো ইনিয়ে বিনিয়ে। অস্থির হয়ে আবার শুয়ে পড়লো রামশরণ। যখন ঘর থাকে, বাড়ি থাকে, শিশুর কান্না থাকে—গৃহপোষ্য পশু, ক্ষেত আর কিছু কিছু ফসল থাকে, আকাশ তখন ছোটো, নিচু ছাদেরমতো—আর এখন শস্যহীন, বসতিহীন ভূখণ্ডের বহু উপরে কুচকুচে কালো বিশাল আকাশ। রামশরণ সেই আকাশের দিকে চেয়ে ভেবে চললো ভানুমতী তৈরি ভাত তাকে খেতে দেবে কিনা।

কিন্তু উঠে বসলো ভানুমতী—শানকি টেনে নিয়ে ভাত বাড়লো দুজনের জন্যে। [illegible] সে চুপচাপ বসে থাকলো [illegible] ভাবে। রামশরণ দেরি করলো না, নিজের কাছে একটা শানকি টেনে নিয়ে আর একটা এগিয়ে দিলো ভানুমতীর দিকে। কোনো কথা না বলে ঠান্ডা কড়কড়ে ভাটার মতো বড়ো বড়ো শক্ত বিস্বাদ রিলিফের চালের ভাত নুন মাখিয়ে খেতে শুরু করে সে। কচ করে কাঁচা মরিচ দাঁতে কেটে নেয় রামশরণ হু হু করে মুখে জল চলে আসে—সন্তানশোক ভুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে ভাত খেয়ে যায় সে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে শুকনো করে তুললো ভানুমতী—কিন্তু ভাতের প্রথম গ্রাসটা মুখে তুলতেই চোখ আবার ভর্তি হয়ে গেল জলে। সুবিধে হবে না বুঝে আর মুছলো না ভানুমতী—ভাতে আলাদা করে আর নুন মাখানোর প্রয়োজন হোল না তার।

ভানুমতীর পাশেই শুয়ে পড়লো রামশরণ। বিশ্রী আঁশটে গন্ধ বেরুচ্ছে তার গা থেকে। শুকনো ছাইয়ের গন্ধও পাচ্ছে রামশরণ। সে বলে, কি করবো এ্যাহন?

ভানুমতী কিছু বলে না। গলগল করে অন্ধকার নামছে আকাশ থেকে। বাঁধে আটকে বাতাস ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আর কোনো আবাদ হবে না, চাষ হবে না, কেউ আসবে না এখানে বাস করতে—বিশাল এই ভাগাড়ে রামশরণ হঠাৎ এতো ভয় পেয়ে গেল যে, সে ভানুমতীর কাছ ঘেঁষে এগিয়ে গেল।

কি করবানে এ্যাহন ওডাকে নিয়ে? ভানুমতী নতুন করে কেঁদে বলে, ওরে এট্টু আগুন দেবা না? মেয়েডা এট্টু আগুন পাবে না, হায় রে!

রামশরণ চেয়ে দেখলো ছাইয়ের নিচে আগুন খুব তাড়াতাড়ি নিভে আসছে। সে বললো, পুড়িয়ে আর কি সদগতি হবেনে? ভগোবান ফগোবান নাই বুঝলি। কাল সকালে এট্টু গর্ত করে পুঁতে দেবানে—শিয়েল-টিয়েল যাতে না খাতি পারে। যাবে পঞ্চভূতে মিশে।

মৃত মেয়েটা ভিতরে ভিতরে খুব শক্ত হয়ে যায়। মেয়েডা আমার পরাণ ছিলো গো—ওরে পোড়াও তুমি—ভানুমতী ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে বলে, কেমন করে আমার দুলাল মরিছে তোমার মনে নাই? ছেলেডা ইন্ডেয় শুকিয়ে মলো—জংগোলে চেলে ফেলে দেলাম।

স্বাধীন হইছি আমরা—ঘৃণায় আর রাগে রামশরণের গলার আওয়াজ চিড় খেয়ে গেল, স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কি? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরাণের ভয়ে পালালাম—ইন্ডেয়—নটা মাস শ্যাল-কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছোওয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ ইস্টিশান, কাল জাহাজঘাট—রামশরণের কথা থেকে ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দের ধার ছিটকোতে থাকে, স্বাধীনটা কি, আঁ? আমি খাতি পালাম না—ছোওয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কোয়ানে? খিলিকের লাইনে দাঁড়াও ফহিরের মতো—ভিক্ষে করো লোকের বাড়ি বাড়ি।

ভানুমতী বলে, কেমন করে এহানে বাস করবা—কি খাবা এহানে—অরুন্ধতী রে—

রামশরণ বলে, ভাবনা কি তোর? সরকার জমি দেছে, গাড়ি গাড়ি চাল দেছে—বাঁশ বেড়া টিন দিয়ে ভিটের বাড়ি তুলে দেছে—তারপর আকাশ থেকে পড়বেনে একজোড়া জুয়ান বলদ।

ভানুমতী ফকিয়ে কাঁদে, অ মা অরুন্ধতী, কোথা গেলিরে তুই? দুতিনবার চিৎকার করে আবার গলা নামায় ভানুমতী, সাপের মন্ত্র পড়ার মতো একঘেয়ে ঝিম-ধরা সুরে গুণ গুণ করতে থাকে। শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে ওঠে রামশরণের। সে বলে, অ ভানুমতী, আমি বলতিছি কি—স্বাধীন হইছি না কি হইছি আমি বোঝবো কেমন করে? আগে এট্টা ভিটেছিলো—এখন তাও নেই। আমি স্বাধীনটা কিসি?

কান্না থামিয়ে ভানুমতী [illegible]

ম্রিয়মাণ গলায় বলে, ক্যানো সরকার থে পাবে না কোনো কিছু?

এই যে পাইছি সাত সের চাল আর ইন্ডে থেকে দিইছে কটা কম্বল। এই পাইছি।

ঘরদোর বানিতে দিছু দেবে না আমাদের?

তোর কি মনে হয়? রামশরণ পাল্টা জিগগেস করে। এখেনে তোরে কি দেবেনক।

তবে যে কয় গেরামে গেরামে ঘর বানিয়ে দেবে।

আচ্ছা, আচ্ছা দেচ্ছে, রামশরণ বলে, তিনদিনের চাল আছে তোর—চালটা ফুরিয়ে গেলে কি করবি? চাল ফুরোলি ভিক্ষে করবি কনে? কেউ আছে হীদগে? তিনদিন পর চাল নে আসছে কি সরকারের লোক? বাঁশ বেড়া আনতিছে? ভাবসাব যা দ্যাখলাম সরকারের লোক যদি আসেও ততদিনে তোর আমার হাড়ে ঘাস গজিয়ে যাবেনে।

ভানুমতীর গা থেকে উৎকট গন্ধ আসছে। তার পাশে শুয়ে রামশরণের গলা পর্যন্ত শোক ফেনিয়ে ওঠে। রান্না করার জন্যে ভানুমতী জোগাড় করেছিলো কটা বড়ো বড়ো শুকনো ডাল। একটা মোটা ডাল আধপোড়া পড়ে আছে। মরা মেয়েটা শুয়ে আছে ঐ ডালটারই পাশে ছেঁড়া চটের উপর। আলাদা করে তাকে চেনা যায় না। আর একটা ডালের মতোই মনে হয়। রামশরণের চোখ জ্বালা করে ওঠে—শোকের ভার বুকে যেন পাষাণ হয়ে চাপে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার—ভিটের নিচে জোড়া শিয়াল ঘুরে বেড়ায়। ভানুমতীর গা থেকে মাটি আর ছাইয়ের গন্ধের সঙ্গে মেশা আঁশটে গন্ধটা খুব জোরালো হয়ে উঠলে রামশরণ ধীরে ধীরে মোহে পড়ে—কি একটু ঘোরে ভানুমতীর দিকে সে এগিয়ে গেলে ভানুমতীর চোখ অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে, তারার আলোতে রামশরণ সেই চোখে মারাত্মক আক্রোশ এবং অসহনীয় দুঃখ দেখে জোর করতে থাকে। তখন লাথি ছোঁড়ে ভানুমতী—সে রামশরণকে ফেলে দেয় ছিটকে, মুখে শুধু বলে, লজ্জা করে না তোমার?

মরা মেয়েটার ব্যবস্থা শিয়াল দুটোই করে ফেলেছে। সবাই ঈশ্বরের জীব—এই কথা বললো রামশরণ। ভানুমতী মোটামুটি সান্ত্বনা পেয়ে গেলে ধোঁয়ার দাগ লাগা ইটগুলো ছিটিয়ে দিয়ে উনুনটা ভেঙে দিলো রামশরণ, জিনিসপত্র ঝুড়িতে তুলে বাঁক কাঁধে নিল। এবারে ভানুমতী নির্ঝঞ্ঝাট—ফাঁকা হাত-পা। বড়ো ছেলেমেয়ে দুটোর হাতেও কিছু নেই। বাঁধের উপর উঠে এলো রামশরণ। তার পরিবারটিকে নিয়ে গুটি গুটি করে বাঁধ ধরে এগিয়ে গেল সে পিঁপড়ের সারির মতো। যখন বাঁকটা তারা পার হচ্ছিল, তখন, এই সেলা নটার দিকে, গড় গড় শব্দে লঞ্চটা ঘাট ছেড়ে চলে গেল।

কিন্তু লঞ্চে যাবে না রামশরণ। লঞ্চ ধরে কোথাও যাবার নেই তার। তবে কোথাও [illegible]

আমার বাবা-ই দায়ী

আবুল হাসনাত

আজ জেলে রয়েছি বলে এ-ভাবনা। কারণ, নিরুত্তাপভাবে নিজেকে দেখার প্রয়াস পাচ্ছি। আমি যে জেলে, দুর্ধর্ষ মুখ্যমন্ত্রী ইলিয়াসের পুত্র এর মধ্যেই অব্যক্ত উচ্চারিত হতে পারে। আপনারা হয়ত মনে করবেন নিজের দায়-দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা, অপপ্রয়াস, তাহলে আমি বিনীত-ভাবে নিবেদন করব অক্ষমের হাতে পড়লে সকলেরই সর্বনাশ। রাজনীতি বড় কঠিন স্থান। বহুদিন বহু রাত যায়, অর্ধাহারে অনাহারে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, তারপর আসে বিজয়মাল্য, সম্মান, অর্ঘ। দুঃখের পর সুখ, কান্নার পর হাসি।

একদিন এদেশে মার্শাল ল' ঘোষণা করা হল। রাজনীতি পুস্তকের পাতায় রইল সীমাবদ্ধ। কিন্তু পর পরই রাজনীতি আবার জাঁকিয়ে বসল। স্বয়ং আয়াজ খান পার্টি গঠন করলেন আর সেই সুবাদে পূর্ব পাকিস্তানে চীফ মিনিষ্টার হলেন আমার বাবা। সে পরম সৌভাগ্য। কারণ, তিনি প্রায় তলিয়ে যাচ্ছিলেন—পবিত্র লীগকে আর কে মনে রাখে। তবে আমার বাবা বলে নয়, পার্টির মধ্যে যোগ্য লোককে চীফ মিনিষ্টার করেছেন বলে আয়াজ খানের নির্বাচনের প্রশংসা করতে দ্বিধা করলাম না।

কলেজে একপাল ছেলে আর বন্ধুরা ঘিরে ধরল। ফিসফিস আওয়াজ শুনতে পেলাম, হ্যাঁ, ওর বাবাই তো। চীফ মিনিষ্টারের ছেলে ও। গর্বে বুকটি ভরে যায়। মনে হয় মনের আনন্দে একটু ক্রিকেট খেলে আসি।

এই আনন্দে আমার বড় ভাই, অধ্যাপক ভুরু কুঁচকে মুখ গম্ভীর করে, চশমার কাচ মুছতে মুছতে বল্লেন, বাবার এ দায়িত্ব নেয়া উচিত হচ্ছে না।

কেন? কেন? আমরা বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

দক্ষ শিকারীর মত আমাদের ঠেকিয়ে শাহেদ বল্লেন, রাজনীতি খুব জটিল আবর্তে বয়ে যাচ্ছে। আয়াজ সরকার প্রচণ্ড ছাত্র-বিক্ষোভে অচিরেই তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে। তখন গণ-ধিকৃত বাবাকে মানুষ পিটিয়েই মেরে ফেলবে।

আমি প্রতিবাদ করি : এ তোমার অতি সতর্কতা ভাইয়া।

বাবা চায়ের কাপটি তুলে নিলেন। কোন কথা বললেন না। তাঁর আচার-আচরণে তেমন কিছু আমি লক্ষ্য করলাম না। মনে হল তিনি এ পোষ্ট পাবেন আগে থাকতেই জানতেন। একনিষ্ঠ প্রত্যয় তাঁর থাকা অস্বাভাবিক নয়, কারণ পার্টি ও মানুষের কাছে জনপ্রিয় নন, এ-কথা বলা যায় না। কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী তার সমালোচক, সাধারণ লোক তার সরলতা ও সাহসিকতার প্রশংসা করে থাকে। তাছাড়া দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি যে ভাষণ দেন তা নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম একটি বছর আমার বাবা বক্তৃতা, আশ্বাস ও মিঠা বাক্যে দেশটি তোলপাড় করে তুললেন। তারপরই শুরু হল এক পিচ্ছিল যাত্রা। আমিও শরীক হলাম। না হয়েও যেন উপায় ছিল না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুর আত্মীয় কেউ না কেউ আসতো, দেখা করতো মন্ত্রী তনয়ের সঙ্গে—শাহেদ এসব ধার ধারতো না, তাই কেউ যেতো না তার কাছে। দাবী, অনুরোধ-উপরোধের অন্ত নেই—কেউ চাকরীর জন্য, কেউ বদলীর জন্য, কেউ শুভেচ্ছা সফরের সদস্যের জন্য। এ-এক এলাহী কাণ্ড। লোকজন...টাকা পয়সা, প্লেয়ার্স থ্রি, মেয়ে-মানুষ, মদ... নাচ-গান ফূর্তি... এ এক জগৎ, এ জগতের খোঁজ খবর এর আগে আমি কোন দিন পাই নি। প্রথম প্রথম আমি তেমন উৎসাহিত হইনি। কারণ, বাবার কাছে গিয়ে এ-সব আবদার করা খুব সাচ্চা মনে হয়নি আমার। কিন্তু বাবা-ই যেন আমাকে পথ দেখালেন। অফিসে ভিড়, বাসায় ভিড়। দিনে ভিড় রাত্রে ভিড়। আর কত লোকজন। আসে আর যায়। বাবা সবাইকে যেন আতর বিলান। আমার এটা খারাপ লাগে—আমি দেখলাম পার্টির দুটি দল এল, সমস্যা নিয়ে, দু দলকে পিঠ চাপড়িয়ে দিলেন—কোন মীমাংসা করলেন না; কোন পদ নিয়ে কলহ শুরু হলে তিনি দুজনেরই ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু দেখা সত্ত্বেও আমি ভাব-লাম আমি রাজনীতির জটিল আবর্তের কি জানি! নিশ্চয়ই এই ভাবেই মীমাংসা করতে হয়।

আমার অবশ্য সুস্থির হওয়ার উপায় নেই। পড়াশুনা মাথায় উঠেছে। আর পড়েই বা কি হবে। পড়ে যা হয় তা তো পাচ্ছিই।

বাবার রাজত্বকালের দু বছর পার হল। তথাকথিত শাসনে দুটো ফল দেখা গেল : নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি আর প্রশাসন যন্ত্রে কলুষতা। বাবা কিন্তু তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এটার সুরাহা করলেন। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় বল্লেন, অনুন্নত এবং অশিক্ষিত দেশে এমনটি হয়ে থাকে। এর জন্য চিন্তা করার কোন কারণ নেই। অধিক ফসল ফলান আপনারা এবং কাজ করুন।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল। এবং বাবা আমাকে কিছু না বলায় আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এক নারী কেলেঙ্কারীতে পড়ে গেলাম। বাবার কানে পৌঁছুতে দেরী হল না। মা বকলেন এবং বাবার কাছে অভিযোগ করলে তিনি তার অননুকরণীয় বক্তব্য পেশ করলেন : শহীদ তরুণ যুবক; যুবকরাই হঠাৎ ভুল করে যৌবনের উত্তেজনায়। ওকে তুমি অত বড় করে দেখছ কেন, শাহেদের মা।

তাই। যৌবনেই ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে। এবং বাবা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তার সমাধানও করে ফেললেন। বিয়ের ব্যবস্থা। শাহেদ ভাইকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই।

চিরকুমার তিনি। বাবা নিজেই মেয়ে পছন্দ করেছেন। কোন এক ঘরোয়া সভায় দেখেছেন পোস্ট অফিসের কোন এক সুপারভাইজারের মেয়ে। আমি তো থ। মন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে কিনা কেরাণীর মেয়ের। বাবার কি ভিমরতি হল।

কিন্তু আমার আরো অবাক হওয়ার বাকী ছিল। জানা গেল কন্যা-পিতা বিনীতভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। সামান্য মানুষ তিনি। অসামান্য মন্ত্রী-পুত্রের স্ত্রী হতে পারে না তার কন্যা।

বাবা হো হো করে হাসলেন। এবং কয়েক দিন পর জানা গেল কন্যার পিতা রাজী হয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হল না রাজী হতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। বিয়ে হল খুব ধুমধাম করে।

এর কিছুদিন পর একটি বিরাট ছাত্র-আন্দোলন শুরু হল। এ ছাত্র-আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় স্বরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পর বাবা একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ছাত্র-নেতাদের পিট চাপড়াতে শুরু করলেন। শিক্ষা-সংস্কার সাধনের জন্য কমিশনে ছাত্র-প্রতিনিধি নিলেন। ছাত্রদের পাঠালেন বিদেশে, স্কলারশীপ দিয়ে, প্রতিনিধি করে আর একটি দরজা খুলে গেল লাইসেন্সের। ফলে ছাত্র-শক্তির একটি বিরাট অংশ ঝুঁকে পড়ল অবৈধ ও গর্হিত পথে। বাবাকে ঘিরে ধরে ছিল, যারা, তাঁর প্রশংসা করত, কিন্তু কাজের সমালোচনা করতো না—সে সাহস তাদের কেন ছিল না, জানি না। সোজা কথায়, দেশটি আমার বাবার কথামত চলতে থাকলো এবং একটি ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগোতে থাকলো।

সেদিন আমি আমার ঘরে বসে আছি এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক এসে ঢুকল। অকস্মাৎ। আমি বিরক্তবোধ করলাম এবং উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু বলার আগেই চিনতে পারলাম আমার স্কুলের শিক্ষক—

উমেদারী? ভুরু কুঁচকে মনে মনে জিজ্ঞেস করি।

মুখে বলি, বসুন স্যার, কেমন আছেন! কখন এলেন!

সদাচারীতি উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, বাবা দেশের অবস্থা খুব খারাপ, দেশ মানে আমি গ্রামের কথা বলছি। চুরি ডাকাতি বেড়েছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা বেড়েছে। তোমার বাবাকে বল, শুনলাম, তিনি তোমার কথা শোনেন।

আমি মৃদু হেসে চাকরকে বলে চা-নাস্তা খাইয়ে তাকে বিদায় দিলাম এবং পরের দিন নাস্তার টেবিলে আমার নিজের একটা আর্জি পেশ করব ভেবেছিলাম, দেখি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইকবাল চৌধুরী বসে। এই লোকটিকে বাবা কেন প্রশ্রয় দেন বুঝি না। কারণ কানে যা আসে কাগজ তো পড়ি না আমি তাতে মনে হয় দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির জন্য এই লোকটি দায়ী। বাবার খুব পেয়ারের তিনি ও প্রিয়।

কিন্তু সে যাক, মন্ত্রী পুত্র আমি, শহীদ বিয়ে করলাম। আমার নতুন বউ যথার্থ সুন্দরী। বাবার চোখ আছে বলতে হয়। কিন্তু মেয়েটি, সায়মা কিছুটা রাজনৈতিক সচেতন। সে আমাদেরকে দেখতে তো পারেই না, উপরন্তু ঘৃণা করে। একটি মানুষকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের স্ত্রী ঘৃণা করে ভাবতেও কষ্ট। বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে।

একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেললাম : তোমার যখন এত ঘৃণা বিয়েতে মত দিলে কেন, সায়মা?

আমার মতামতের কোন দাম দিয়েছে কী কেউ?

ওঃ। তা এখন কী করবে?

কী করব!

কী গভীর দীর্ঘশ্বাস। আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু ওর শান্ত মুখের পানে তাকিয়ে এই অব্যক্ত বেদনার স্পর্শ পাওয়া ভার।

মৃদুকণ্ঠে বললাম: এ্যাডজাস্ট করে নেওয়াই নাকি দাম্পত্য জীবনের প্রথম পাঠ।

চেষ্টা করব। কিন্তু...

কিন্তু?

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে আমি কী এ্যাডজাস্ট করব? সবই তাদের ভিন্ন। খাওয়া-চলা-ফেরা। সরকার কতই বা মাইনে দেয়। কিন্তু তোমাদের চলা-ফেরা রাজার মত। এ টাকা আসে কোথা থেকে, নিশ্চয় চুরি করে। চোরের সঙ্গে কী এ্যাডজাস্ট করা যায়?

কথা বলব কি? আমি বিস্ময়ে তার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকি।

চোর। বলে কি!

এ সব বরদাস্ত করার বান্দা আমি না। কিন্তু কী আশ্চর্য আমি নিশ্চুপ ও নির্বাক রইলাম। সায়মার অপরিসীম সাহস যেন আমাকে মূক করে দিয়েছে।

আজ এই বন্দী অবস্থায়, সেলের মধ্যে, কারাগারে একাকী এসব ভাবলে বাবার কথা-ই মনে পড়ে এবং তাকে ক্ষমাহীন অভিশাপে জর্জরিত করি। সায়মা যে আমাকে গ্রহণ করেনি তার জন্য তিনিই দায়ী। বিয়ে আমি করিনি, তিনি দিয়েছেন। আর এ বিয়ে মেনে নিতে আমি পারিনি বলেই ঐ কেলেঙ্কারীটা ঘটে গেল।

আমি তখন উৎকট জীবন যাপন করছি। বন্ধুবান্ধব, খেলাধুলা, মদ-মেয়েমানুষ নিয়ে। দু হাতে টাকা আসছে। দু হাতে উড়াচ্ছি।

এই সময় সীমা এল। অসাধারণ সুন্দরী নয়, রংও ফর্সা নয়, কিন্তু যে অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সায়মার অবহেলা আমাকে পূর্বেই দূরে ঠেলে ফেলেছিল —সীমার আহ্বান আমাকে তার বুকের মধ্যে নিয়ে গেল।

এক সময় সে গর্ভবতী হল। এবং তা জানাজানি হয়ে গেল। বাবার কানে গেল। সায়মার কানে গেল বলেই, বাবার কানে।

সায়মা সোজা বাবার কাছে গিয়ে বলল, সে ডিভোর্স চায়। সে আপ্রাণ সামঞ্জস্য করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু তার ভাল পুরস্কার পেল সে। অতএব ডিভোর্স যত দ্রুত....

বাবা ভয়ানক ধমক দিয়ে সায়মাকে থামিয়ে দিলেন। আমাকে ডেকে বললেন, সীমাকে বিদায় দিতে, কিছু টাকাকড়ি দিয়ে।

আজ আমি ভাবি বাবা কী ভয়ানক স্বার্থপর ছিলেন। আমার এ অপরাধের জন্য কোন ভর্ৎসনা করলেন না। সায়মার অবস্থার দিকে কোন করুণার, বিচার দূরের কথা, আলো ফেললেন না।

কিন্তু সীমাকে এত সহজে ফেলে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাকে আলাদা বাড়ীতে রানীর মত রাখলাম। সায়মা আছিলা করে বাবার বাড়ী গেল। তখন সে গর্ভবতী। পরে এক পুত্র হয়। তাকে দেখিনি আমি। সায়মার সাথেও দেখা হয়নি।

আশ্চর্যের কথা তখন এ-অবস্থা আমাকে মোটেই পীড়া দেয়নি, বরং আনন্দ দিয়েছে। আমি সায়মার হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় গভীর তৃপ্তির শ্বাস ফেলেছি। এবং সে যেন আমাকে আর ডিস্টার্ব না করে সে বাসনা পোষণ করেছি মনে মনে। সীমার ভয়াবহ যৌবন ও ভালবাসা আমাকে ডুব সাঁতারে রেখেছিল।

এর মধ্যে একদিন এক বিয়েতে ফারুকের সাথে দেখা। স্কুলে আমার সাথে পড়ত। বেশ বন্ধুত্ব ছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি চিনতে পারলাম। সে-ই একথার পর বলল, সামনের দিনগুলো খুব খারাপ শহীদ, তোমরা বুঝতে পারছ না। তোমার বাবা যেভাবে চালাচ্ছে দেশটি, তাতে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একে তো পশ্চিমা স্বার্থ অক্ষুণ্ণ, সেই দাউদ ইস্পাহানীরাই লুটে-পুটে খাচ্ছে ব্যবসার নামে, সে না-হয় হোক, সব কাজ তো করা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের অন্ত নেই। আমাদের কথাই ধর না কেন, প্রতিদিন তিনি বুদ্ধিজীবীদের নাকি গাল দেন, কারণ তারা সমালোচনা করে, এতে মানুষ চটে যায়, বিরক্ত হয়। আর কোন নীতি নিয়ে চলছেন না তো। সকলের প্রতি প্রেম, ভালবাসা! রাজনীতিতে এটা হতে পারে না।

আমি শুনেছি এ জাতীয় কথা। কোন-রকম উৎসাহ পাই না।

মৃদুকণ্ঠে বলি থাক তাঁর কাজ তিনি করুন। আমরা কী করব।

আমরা কী করব বলা ঠিক নয়। তুমি বুঝিয়ে বল। এত দুর্নীতি ও অপশাসন চলতে পারে না।

শুনতে হয় এসব কথা, কিন্তু মূর্খদের কী বলব আমি। আমার কাছে তেমন অস্বাভাবিক কিছুই মনে হয় না।

সেদিন কাগজেও দেখলাম। সহজে কাগজ পড়ি না। সীমার ওখানে দেখে অবহেলা ভরে তুলে নিলাম। ডঃ হাসিবের গ্রেপ্তারের খবরটি ছিল। কাগজে এজন্য খুব সমালোচনা হয়েছে। আমি এর মধ্যে যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না। প্রতিষ্ঠিত সরকারের

বিরুদ্ধে কথা বললে এ্যাকশান নিতেই হয়। বাবাও নিয়েছেন। এবং এটাই স্বাভাবিক। কাগজে লিখেছিল পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বক্তৃতা রাখতে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার অর্থ মিথ্যা সমালোচনা নয়। এগুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

আমি কাগজটি রেখে দিয়ে কেবল শুয়েছি। তলব এল মুখ্যমন্ত্রী ডেকে পাঠিয়েছেন। দুপুরে আমার ঘুমানো অভ্যেস। মহা বিরক্ত হলাম। বাবার কোন কাণ্ড জ্ঞান নাই।

বাবা আমাকে দেখে বললেন, কী রে শরীর খারাপ নাকি?

না। তুমি ডেকেছ?

ওঃ। খুব অন্যায় হয়ে গেছেরে। তা শোন। তিনি ঘর ফাটান হাসি হাসলেন।

যুব ডেলিগেট যাচ্ছে আমেরিকায়। তুই যাবি?

যাব না কেন?

যা। তোকে প্রতিনিধি-নেতা করেছি।

খুশিতে আমি উদ্ভাসিত হলে বাবা বললেন, তৈরি হয়ে নে। সপ্তাহ খানিকের মধ্যে যেতে হবে।

আচ্ছা।

খবরটি শুনে লিয়াকত এল।

আমার চাই। ও যেতে চায় আমার সঙ্গে। বাবাকে বললাম।

বাবা বললেন, তালিকা ফাইনাল, এখন কিছু করার নেই।

আমি মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র। লিয়াকতকে দাপটের সঙ্গেই বলে ফেলেছি, হবে না কেন, নিশ্চয় হবে। কত যদু-মধু বিদেশে যাচ্ছে আর তুমি...

বাবা আমার মুখের পানে চেয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন ঠিক আছে হবে, যা। তৈরি হতে বলগে বন্ধুকে।

এই না হলে আমার বাবা!
কী ভাবছেন?
চমকে চোখ ফেরাই।

না, কেউ নেই। এ আমার অন্তরের বাণী। এই জেলখানায় আমি ভাবব না কে ভাববে। কি ছিলাম কি হলাম। অথচ এর জন্য আমি দায়ী নয়। মোটেই না, আমার বাবা দায়ী। আমার জন্মদাতা, আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছেন। তাকে অস্বীকার করতে পারলে, তার পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারলে আজ বেঁচে যেতাম। কিন্তু তা আর হল না। নিঃশেষে পোড়ায় মত আজ জ্বলি। অথচ এর জন্য তিনি দায়ী। আজ নিজেকে যাচাই করি, তাঁকে জিজ্ঞেস করি, ভাবি, দেখি, হ্যাঁ, তার জন্যই আমার এ অবস্থা।

আরে তুমি চীফ মিনিস্টার তো আমার কী! কিন্তু আমিও ভাব নিলাম মন্ত্রীর। তোমার প্রশ্রয়ে।

ভাইয়ার কথা মনে পড়ে যায়। শাহেদ। তীক্ষ্ণ-চোখা শাহেদ ভাই। আমাদের এই কাণ্ড-কারখানায় বাড়ি ছেড়ে মিনি মেসে চলে গিয়েছিলেন। যাবার আগে আমাকে, আমি তার একমাত্র ভাই যে, বলেছিলেন, এখনও সময় আছে শহীদ। যেমন ছিলি তেমন থাক। তুই তো খারাপ ছেলে নস, পড়াশুনা চালিয়ে যা, বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে দে। নিজের কেরিয়ার গড়ে তোল।

আমি বলি, পাশ করে কি হবে ভাইয়া? চাকরী-বাকরী করে কত টাকা আর পাব?

তাই বলে চুরি-ডাকাতি করবি?
চুরি-ডাকাতির কি দেখলে তুমি?
ও-তুমি যা করছ তা চুরি-ডাকাতি নয়। বেশ।

তুমি বেশী চিন্তা কর ভাইয়া।

না। যথার্থ চিন্তা করি। কিন্তু তুমি এইভাবে কতদিন চলবে। এ-রাজত্ব খতম আজ-কাল-পরশুর মধ্যে। তখন? তখন তোমরা কী করবে? কোথায় পালাবে?

কী যে বল তুমি। বিশ-পঁচিশ বছরের আগে এ-সব চিন্তা করাও পাপ।

বল কী তুমি! এ-তাসের ঘর তো পাঁচ বছরেই ভেঙ্গে যাবে।

ফুঃ।
ফুঃ?

হ্যাঁ।
ইতিহাস ভুলে গেছ তোমরা।

ইতিহাস? যত্ত সব।
ইতিহাস বিশ্বাস হয় না? ইতিহাসের অমোঘ নীতি মানো না!

আমি চুপ করে থাকলে বললেন, সে না হয় হল—কিন্তু ব্যক্তি—জীবনটা ভাবো। সায়মার মত মেয়েকে তুমি ত্যাগ করেছ।

আমি না। সে চলে গেছে।

সে যেতে বাধ্য হয়েছে শহীদ। কোন ভদ্র-সন্তান কন্যা এ অবস্থায় থাকতে পারে?

কী এমন করেছি যে থাকতে পারে না। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।

থেভো।

তারপর স্বগতোক্তির মত বলেছিলেন : এই হয়, সর্বনাশের পথ থেকে কেউ ফেরাতে পারে না। অবধারিত মৃত্যু যে ডাকছে। রক্ত, মৃত্যু দিয়ে এ-সবের ইতি হবে। ইতিহাস। ইতিহাস বড় ক্ষমাহীন।

কী বলে ভাইয়া। পাগল হয়ে গেল নাকি! আমার মুখ দেখেই যেন টের পেয়েছিলেন, বললেন, না আমি ভালই আছি শহীদ। দেখ, সৎপথে ফিরে আসতে পার নাকি। বাবার ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে নিস্তার পেতে চেও না। তোমরা সবাই দায়ী।

বাবাকে বল।

বাবা! হাসলেন তিনি। কথায় বলে না শহীদ, চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী' তোমার বাবার অবস্থা তাই।

এখন ভাবি ভাইয়া কী অমোঘ কথাই না বলেছিলেন। এখন নিজেকে বিশ্লেষণ করার অবকাশ পাচ্ছি। ভাইয়ার কথামত পড়লে আজ এম-এ পাশ করতাম। তাঁর মত কলেজে অধ্যাপনা করতে পারতাম। নিরিবিলি সুখী শান্ত জীবন অতিবাহিত করতাম। কিন্তু...বাবা, কই আমাকে কোন কোন দিন বললেন না, ভাল করে পড়। মানুষ হতে হবে। কই বললেন না কেন এ-সব বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গুণ্ডামী করে বেড়াচ্ছিস, মন্ত্রীর ছেলে তুই, সম্মান আছে না! কই কোনদিন তো বলতে শুনলাম না, আর যাই করিস নষ্টামি করিস না। সায়মার সংগে কেন বিয়ে দিলেন! আমার অমতে! কেন সীমার সংগে আমি জড়িয়ে গেলাম' কেন? কিন্তু এর জন্য আমি কী দায়ী। বাবার কর্তব্য আমার বাবা কী করতেন! এখন কত কথা মনে পড়ে: সাত আট বছর আগেকার কথা। আমরা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। একদিন মাছ ধরতে গেছি শোনাপুকুরে। বিরাট রুই মাছ পাওয়া যায়। গ্রামের ডাক্তার রশীদের পুকুর। লুকিয়ে লুকিয়ে একটা মাছ ধরে ফেললাম। কিন্তু ছোট গ্রাম, জানাজানি হয়ে গেল।

বাবা শুনে হাসলেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন।·এ-সব খেলা কিশোর বয়সে করে রশীদ। এতে হয়েছে কী?

কিন্তু না বলে পরের পুকুরে মাছ ধরা? একরকম চুরি...

তাকে বাধা দিয়ে বাবা বলেছিলেন, কী যে বল তুমি। তুমি মাছের দাম নিয়ে যাও।

আমি তখন ভয়ে কাঠ। সত্যিই তো পরের পুকুর। চুরি করেই ধরেছি। এটা অন্যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবা আমাকে ডেকে পিঠ চাপড়ে দিলেন, হেসে হেসে বললেন, খুব মাছ ধরার সখ না? আচ্ছা, ও-পুকুর লইব কিনে।

বাবা সত্যিই কিনে নিয়েছিলেন, অবশ্য অনেক পরে। মন্ত্রী হওয়ার পর।

তখন আমাকে ডেকে বলেছিলেন, যাও, কত মাছ ধরবে ধরগে।

আমার তখন মাছ ধরার সময় কই। আড্ডা, গল্প, মদ, মেয়েমানুষ, তদবীর, অর্থোপার্জন... কত ধান্ধা, কত কাজ।...

জেলের সীমাবদ্ধ জায়গায় কী বিশ্রী ভাবেই না কথাগুলো মনে পড়ছে। কোথায় বাবা আমাকে ধমক দেবেন, চুরি করার বিরুদ্ধে বলবেন, না পিঠ-চাপড়িয়ে কৈশোর চপলতা বলে এক প্রকারের হাসি হাসলেন। যৌবনে তিনি যৌবনসুলভ চপলতা বলে আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। যে শাসন জানে না, সে কী শাসক: যে মানুষ চেনে না, সে কী মানুষ! যে নিজের ছেলেকে শাসন করতে পারে না, সে কী পারে দেশ চালাতে?

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। গাঢ় অন্ধকার। আমার জীবনের মত। কোথায় ছিলাম আর কোথায় আছি। কবে মুক্তি পাব?

সায়মার কথা মনে পড়ছে। তার কোন দোষ দোখ না—তেজ ছাড়া। সে আমাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, পারে নি। আমারই দোষে। আমি তাকে কিছুই দিই নি—সে কী নিয়ে থাকবে আমার কাছে। অবৈধ সুখই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সায়মাকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারতাম। হায় সুখ!

হ্যাঁ, তাই। বাবা প্রথমেই যদি আমার পড়ার দিকে নজর দিতেন আমাকে তথা যুবসমাজকে লাইসেন্স পারমিট-এর প্রলোভনের পথে না ডাকতেন আমি পড়তে থাকতাম। আমার গুণ্ডামী তিনি যদি কঠোর হস্তে দমন করতেন দেশের শাসক হিসেবে, আমার এ অবস্থা হতো না। আমাকে যদি জোর করে বিয়ে না দিতেন, সায়মার জীবনে এই কষ্ট নেমে আসত না। এখন কোথায় সে, ছেলেটি কেমন আছে, কিছুই জানি না। জানি না সীমা কোথায়। তিনি বিদেশে আমাকে না পাঠালে ফরেন কারেন্সী স্ক্যান্ডালে আমি জড়িয়ে পড়তাম না।

আজ আমি জেলে। আবুল শহীদ, প্রচণ্ড প্রতাপশালী চীফ মিনিস্টারের পুত্র, জেলে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ : গুণ্ডামী রাহাজানি, ক্ষমতার অপব্যবহার, যোগ্যতা অপেক্ষা বহুগুণে সঞ্চিত টাকা, বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার। সত্য। এর কোনটাই মিথ্যা নয়। কিন্তু এর জন্য আমি দায়ী নই। আমার বাবা দায়ী, হ্যাঁ আমার বাবা-ই দায়ী।

ইমেজ বনাম দেবদাস

গত ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯ প্রকাশিত অমৃত পত্রিকায় রবি বসুর 'ইমেজ বনাম দেবদাস'এ দিলীপ রায় পরিচালিত দেবদাসের সমালোচনা পড়লাম কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর সংগে একমত হতে পারলাম না। রবিবাবু চুনীলালের চরিত্রকে আরও সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন—তাতে বোধহয় শরৎবাবুর সৃষ্ট 'দেবদাস' বিপথে পরিচালিত হোত। রবিবাবু কী চেয়েছিলেন পার্বতীকে দিয়ে ডিভোর্সের ফর্মে সই করিয়ে নিয়ে চুনিলালের মাধ্যমে দেবদাস ও পার্বতীর মিলন ঘটাতে—বোধ করি উত্তমকুমারকে ছবির পর্দায় আরও বেশীক্ষণ দেখার স্পৃহাই রবিবাবুকে শরৎবাবুর লেখার উপরও দুঃসাহসিকভাবে কলম চালাতে দ্বিধাগ্রস্ত করেনি। চুনিলাল বেশী উত্তমকুমারের অভিনয়ের প্রশংসা করতে গিয়েও রবিবাবু বোধহয় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। দেবদাসের ভূমিকায় সৌমিত্র চ্যাটার্জির অভিনয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে বোধকরি রবিবাবু কোন সঠিক ত্রুটি খুঁজতে না পেরে আন্তরিকতার অভাবের আশ্রয় নিয়েছেন;—যাহা ছবিটি দেখাকালীন কোন সময়েই মনে হয়নি। জানি না সমালোচকের মধ্যে প্রমথেশবাবুর একটা ইমেজ থাকাই এর যুক্তিসঙ্গত কারণ কিনা। পঞ্চাশোর্ধ দর্শকদের (অর্থাৎ যাঁরা প্রমথেশবাবুর 'দেবদাস' দেখেছেন) যে বর্তমান দেবদাসের অভিনয় তৃপ্তি দিতে পারেনি সেটাই বা প্রমথেশবাবু একচ্ছত্রভাবে জানলেন কী করে?

—সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণপুর, বাদু, ২৪ পরগণা।

জানোয়ার

শওকত আলী

জমীর চৌধুরী ছাগলের বদলে কুকুর বেঁধে দিয়েছে বেইট হিসেবে। কুকুরটা সন্ধ্যে রাত থেকে কেঁদেছে কেঁউ কেঁউ শব্দ করে। তারপর রাত হতে শোনা গেলো, বাচচা ছেলে কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে যাবার পর যে রকম অসহায় ভাঙ্গা বিপন্ন গলায় কাঁদে—সেই রকম কাঁদতে আরম্ভ করেছে কুকুরটা।

রহমত বুড়ো গালাগাল করতে আরম্ভ করলো শেষটা। ফাঁকা বারান্দায় এমনিতেই দারুণ শীত লাগে, বাইরের খোলা মাঠের হাওয়া বয়ে আসে। তার ওপর উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া সন্ধ্যের পর থেকে থেমে থেমে ঝাপটা মারছে। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না ছিলো। ঝিলের বাঁয়ে নালার ওপরকার ভাঙ্গা বাঁশের পুলটাকে দূর থেকে অতিকায় বৃশ্চিকের মত মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দূর থেকে একটা দুটো জল-পিপি ডেকে উঠছিলো, আর পেছনের বাঁশ ঝোপের পাতায় পাতায় সর সর শব্দ হচ্ছিলো। বেশ সুন্দর জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি দেখে বুড়ো মানুষটার ভালো লেগে গিয়েছিলো। মাঝরাতে কুকুরটার আর্তনাদ শুনে অসহ্য লাগলো। সে গালাগাল দিতে আরম্ভ করলো। জমীর চৌধুরীকে এবং সেলিমকে।

ভাঙা ডাকবাংলোর বারান্দায় দড়ির খাটিয়ার উপর বসেছিল সে। বিরক্ত হয়ে উঠে এসে দাঁড়ালো তাঁবুর সম্মুখে। চার-দিক তাকিয়ে দেখলো, ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্না নেই। তার বদলে কী রকমের একটা ঘোলাটে আলোর আভা চারদিকে ছড়ানো। আর হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় উত্তরের হাওয়া ঝাপটা মারছে ঘন ঘন।

রহমত বাঁয়ে তাকালো। ঝিলের বুকে এখন দৃষ্টি চলে না, ঘন কুয়াশা জমেছে। একবার কি দুবার ফেউ-এর ডাক শুনতে পেলো, তাঁবুর মুখে ঝোলানো হ্যাজাকের আলো ফিকে হয়ে এসেছে। বাতিটাকে পাম্প দেওয়া দরকার। একবার ভাবলো আনসারকে ডেকে তোলে। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তাঁবুর ভেতরকার বিছানা, অফিসের কাগজপত্র, যন্ত্রপাতি সব ভিজে নষ্ট হবে। আর রাতেই যদি সাহেব ফিরে আসে তাহলে বেচারা শোবে কোথায়? ঘুমমারা ক্লান্ত মানুষটা শীতরাতের বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে যদি বিছানাটাও শোয়ার জন্যে না পায় তাহলে তার মেজাজ খারাপ হওয়ারই কথা।

রহমত বুড়ো আকাশের দিকে তাকালো। মনে হলো হাল্কা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। নাকি কুয়াশা। এখন ভারী হয়েছে তাই অমন দেখাচ্ছে, সে ঠিক বুঝতে পারলো না। তবু বৃষ্টির আশংকায় সে কিছু একটা ব্যবস্থা করা উচিত বলে মনে করলো। আনসারকে ডাকলো। আন-সারকে আরেকবার ডাকার আগে সে ভাবলো তাঁবুর ভেতরকার জিনিসপত্রগুলো কোথায় সরানো যায়। দরজা ভাঙ্গা, জানালা উড়ে যাওয়া ছাদ ফাটা ডাক বাংলোতে অতো জিনিসপত্র রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাহলে? তাহলে কি করবে?

রহমত বুড়ো কাছাকাছি কোথাও জায়গা খুঁজলো। অদূরেই হাটখোলা। একমাত্র বাসিন্দা ঝাড়ুদার বিন্দাবন হাড়ি। তার ঘরে তুলে রাখলে কেমন হয়। মনে মনে সে চিন্তা করলো। দুটি মাত্র মানুষ নিয়ে বিন্দাবন দাসের পরিবার। একটু ইতস্ততঃ করলো সে। কিন্তু এছাড়া অন্য কোন পথও খুঁজে পেলো না। একেবারে কাছের লোকালয়ও মাইল দুয়েক দূরে।

তাঁবুর ভারী পর্দা সরিয়ে আনসারকে ডাকতে গিয়ে দেখলো সে নেই। তাঁবুর এক কোণে অন্য মানুষ।

চকিতে বুড়ো মানুষটার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হলো, সারা শরীরের উত্তেজনা কাঁপলো। খটাস করে গুলী লোড করে ডাকলো, কে ওখানে, কে বসে ওখানে?

কে, দাদা তুমি নাকি গো।

বিন্দাবন দাসের গলা। রহমত জিজ্ঞেস করলো, বিন্দাবন তুমি, তুমি এখানে কেন হে?

আর কহো ক্যান, তুমার ভাতিজার শখ হইছে তাস খেলাবে, আমাকে গিয়ে ধরলো। বললো, তুমি যাও—গিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো, আমি একটু তাস খেলাই।

রহমত শুনলো। সে জানে আনসার কোন আকর্ষণে ওদের ওখানে তাস খেলতে গেছে। আর বিন্দাবন দাস কেন আনসারকে এতোটা খাতির করে তাও তার অজানা নেই। আসল ঘোড়েল লোক হচ্ছে জমীর চৌধুরী। সেই আসলে লেগেছে তার মনিব সেলিম সাহেবের পেছনে। চারদিক থেকে জাল বিছিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। নানান খেল দেখাচ্ছে নানানজনকে দিয়ে। সেলিম সাহেব ছেলেমানুষ তার বিদেশী অত প্যাঁচ বুঝতে পারে না। একটু একটু করে জমীর চৌধুরীর জালে জড়িয়ে পড়ছে সে। জড়িয়ে পড়ছে কিন্তু বুঝতে পারছে না। সেলিমের বোকামী দেখে রহমতের একেক সময় ভীষণ খারাপ লাগে। একটা সরল মানুষকে ভুলিয়ে নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নিচ্ছে। তার রাগ হয় কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সাহেবের সঙ্গে চৌধুরীর ভারী দোস্তি।

আরো খারাপ লাগে আনসার ছোকরার জন্যে। হারামজাদা এসব কিছু বুঝতে চায় না। সে বিন্দাবনের নাতি মেয়েটার ছলাকলায় মাথা খারাপ করে বসে আছে তার জন্যে।

উত্তরের দেশে উঁচু ডাঙ্গা জমি বাঁজা হয়ে আছে। মাটির নীচেকার পানি যদি উপরে তুলে আনা যায়, তাহলে এই বিবর্ণ নিষ্ঠুর শুকনো মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত বাঁজা জমি ফুলে ফসলে হেসে উঠবে। সেলিম সাহেব যন্ত্র বসিয়ে জমি ফুঁড়ে নীচের মাটি তুলে পরীক্ষা করে দেখছে। পানি কত নীচে। কত নীচে হাত বাড়ালে তবে পাওয়া যাবে অগাধ পিপাসার পানি। লোকটা সেই হিসেবের জন্যই এখানে ক্যাম্প করেছে। এখন সুইস বোরিং কোম্পানী কাজ করছে গোটা এলাকায়, পঞ্চগড় থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। সেলিম সাহেব কোম্পানীর মানুষ। কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে তার দহরম মহরম। জমীর চৌধুরী সেই খবর পেয়েছে। ফতো জমিদারের ছেলে

জমীর চৌধুরী এখন পেশায় ঠিকাদার। সে তালে আছে—কি করে এইসব ঠিকাদারী কাজ বাগানো যায়।

সেইজন্য চৌধুরী সেলিম সাহেবকে নানান খেল দেখাচ্ছে। নতুন থেকে নতুনতর মজার জিনিস, নতুন নতুন উত্তেজনার খোরাক এনে ধরছে চোখের সম্মুখে।

তাই এই বিজন জায়গায় আত্মীয়-পরিজনহীন মানুষটাকে কখনো যে পাখী শিকারে নিয়ে যায়, কখনও বেহাটের দিন সন্ধেবেলা হাটখোলায় বিন্দাবন দাসের জামাই লব কার্তিককে নিয়ে, সইতপীরের অশ্লীল গানের আসর বসায়। পোঁ পোঁ করে হারমোনিয়াম বাজে, অদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিন্দাবন হাড়ির দুই মেয়ে আর এক ছেলের বউ হেসে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে—সেলিম সাহেব সিগ্রেট খেতে খেতে কেশে ওঠে, মুখ নীচু করে অস্বস্তিবোধ করে আর তখনই জমীর চৌধুরী তার মুখের সামনে এগিয়ে ধরে পানের খিলি নয়তো খোলা সিগ্রেটের প্যাকেট।

জমীর চৌধুরী প্রথমে দুধের জোগান ঠিক করে দেয়। বিন্দাবন দাসের গরুর দুধ সাহেবের তাঁবুতে আসবে। সেই থেকে পরিচয়। এখন বোঝে রহমত বুড়ো, চৌকিদার হয়েও সে বোঝে, কোন মতলব কাজ করছে এই দুধের জোগান ঠিক করে দেওয়ার পেছনে। বিন্দাবনের নষ্টা বিধবা মেয়ে নয়তো তার ছেলে মনোহরের বাঁজা বৌটা দুধ দিতে আসে—দিনের পর দিন আসে—আর মেয়ে দুটোর শরীরে জওয়ানী যেন টলমল করছে, কাপড় জামার আবরু ছাপিয়ে ছলকে উঠতে চায়। ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রহমত নিজেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না আর সেলিম সাহেব তো ছেলেমানুষ। রহমত স্পষ্ট বোঝে, জমির চৌধুরী মেয়েমানুষ দেখিয়ে অল্প বয়সী জোয়ান মানুষটাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়। তার ধারণা, তাহলেই সে বাঁধা পড়বে। একের পর এক কাজ জুটিয়ে দেবে।

রহমত দক্ষিণের দিকে চোখ ফেরালো।

বিন্দাবন দাসের সঙ্গ এড়াবার জন্যে সে সরে এসেছে একপাশে। কোন সময় সে লোকটাকে সহ্য করতে পারে না। কতো জমিদার সমীর চৌধুরীর পেয়ারের লোক ছিল। যত বদকাজের সঙ্গী। সমীর সমীর চৌধুরী মরলে পর এখন সে জমীর চৌধুরীকে তুষ্ট করছে। কুকুরের মত বিশ্বাসী লোক সে জমীর চৌধুরীর কাছে। জমীর চৌধুরীই টাকা-পয়সা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে পরিবারটাকে।

কুকুরটার কাতর আর্তনাদ থেমে ছিলো এখন আবার চ্যাঁচাচ্ছে।

হঠাৎ সে একটা ডাক শুনলো। কর্কশ আর হিংস্র। বাঘ ডাকছে দূরে, ঝিলের ওপারে সম্ভবতঃ। তার মানে মাইল দুয়েক পশ্চিমের জঙ্গলে।

রহমতের হাসি পেলো। ভারী খেলা দেখাচ্ছে জানোয়ার দুটো। সেলিম সাহেবের রোখ যতো বাড়ছে, বাঘ দুটোও যেন ততোই ঠাট্টা মসকরা করে এড়িয়ে যাচ্ছে। গত একমাসে কম করেও সাতবার সেলিম সাহেব চৌধুরীকে নিয়ে শিকারে বেরুচ্ছে, কিন্তু জানোয়ার দুটো কেবলি এড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে রহমত চৌকিদারের আশ্চর্য লাগে, কেন এরকম হচ্ছে। অন্যান্য বছরও এ তল্লাটে বাঘ আসে দুটো একটা মারাও পড়ে। এরকম ভেল্কি দেখিয়ে বেড়ায় না।

এমনিতে এ অঞ্চলে বাঘ খুব একটা ভয়ের বস্তু নয়। সব বাঘ মানুষ খায় না। এ বাঘ দুটোও মানুষের ওপর হামলা করেনি। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মুখো-মুখি হয়েছে বহুবার। সেলিম সাহেব সামনাসামনি দেখেছে দু দুবার কিন্তু একবারও গুলী করতে পারেনি।

দাদা, বাঘ একদিকে আর তুমার সাহেব তো আরেক দিকে গো। বিন্দাবন দাস বিড়ি এগিয়ে ধরে বললো।

রহমত বিড়ি নিলো না। বললো—না খাবো না, এখন। আকাশের দিকে চাইলো সে। বুঝলো, নির্ঘাত বৃষ্টি হবে। বললো, তোমার ঘরে সাহেবের বিছানা আর কিছু জিনিসপত্র রাখার জায়গা দিতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজলে কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সে আর বলতে হবে তোমাকে। বিন্দাবন দাস আগ্রহের সঙ্গে রাজী হলো, তুমি জিনিস রাখবে তা ফের আমাকে পুছো কেন, আমার ঘর আর তোমার ঘর কি আলাদা। একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু বিছানা কেন গো।

সাহেব রাতে যদি ফিরে আসে, তাহলে ভেজা বিছানায় শোবে কেমন করে।

হো হো করে হেসে উঠলো বিন্দাবন দাস।

কেন, অমন হাসছো কেন, রহমত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। তুমার সাহেব আজ রাতে আর ফিরবে না গো দাদা। তুমি নিশ্চিত থাকো। রোজ আমাকে টোপ বেঁধে দিতে বলে চৌধুরী। ছাগল বাঁধি তো বাঘ নাকি আসে না। ছাগল-ভেড়া চুপচাপ থাকে, ইবার তাই কুকুর বেঁধে দিয়েছি। ইশালা এমন জিনিস সর্বক্ষণ কেঁউ কেঁউ করে চ্যাঁচাবে আর তুমার সাহেব বাঘ এসেছে মনে করে সর্বক্ষণ বন্দুক নিশানা করে রাখবে।

রহমত অবাক হলো না। হাসলো না। লোকটার শয়তানী বুদ্ধির যে অন্ত নেই—তা সে জানে। বললো, তোর বড় বাড় বেড়েছে বিন্দাবন, বুঝে যাবি একদিন কত ধানে কত চাল।

বিন্দাবন হাতের বিড়িটা ফেলে বললো, তুমি মিছামিছি রাগছো দাদা, আমার কি দায় পড়েছে এসব ঝামেলা পোয়াবো। তুমার সাহেবটা যে বোকা তার আমি কি করবো। চৌধুরীর ব্যাটা পয়সা ঢেলে যাচ্ছে তার জন্যে। তা যদি সে না বুঝতে পারে সে কি আমার দোষ। তুমার ভাতিজা যদি নতুন পানির পুঁটি মাছের মত উলসায় সেটাও কি আমার দোষ। আমার বিধবা মেয়ে কলাবতীর জন্যে ছোকরা পাগল হয়ে গেছে—তা আমি কি করবো। বলো।

তুই কি করবি মানে। তুই শাসন করবি।

আমার কি দায় পড়েছে—তুমিই বলো। আমি আর ক'দিন বুড়া মানুষ।

কুকুরটা আবার অসহ্য ডাকতে আরম্ভ করছে। একবার কেউ ডাকলো কাছাকাছি। মাথায় বৃষ্টি পড়লো দু ফোঁটা।

বিন্দাবন ডেকে বললো, দাদা জল পড়ছে।

হাঁ, রহমত জবাব দিলো হ্যাজাকটা নামাতে নামাতে।

দাদা ফেউ ডাকছে কাছাকাছি, শ্‌নতে পাচ্ছো।

হ্যাঁ, রহমত হ্যাজাকে পাম্প দিতে দিতে ভালো করে শোনার জন্যে কান পাতলো। সত্যিই ফেউ ডাকছে কাছাকাছি। তার মানে বাঘ কাছাকাছি এসেছে কোথাও। কুকুরটা একটানা আর্তনাদ করে চলেছে। হঠাৎ স্পষ্ট বাঘের ডাক শ্‌নলো রহমত। শ্‌নে কেমন যেন শিউরে উঠলো।

বেশ ঝিরঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে তখন। দ্‌জনে তাঁব্‌র ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরের হাওয়া র‍্যখে উঠছে বলে মনে হলো। দ্‌জনে মিলে বিছানা-পত্তর গোটালো। তারপর রহমত ডাকলো, নাও তোলো, ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

বিন্দাবন দাসের বাড়িতে ঘরের ভেতরে মনোহর লব-কাত্তিকের সঙ্গে পয়সা ফেলে তাস খেলছে আনসার। একদিকে বিন্দাবনের দ্‌ই মেয়ে আর ছেলের বউ আগ্‌নে পোয়াচ্ছে। অদ্‌রে বিড়ি ফ্‌কছে মনোহরের বউ।

রহমত জিনিসগ্‌লো রাখতে না রাখতেই কলাবতীর গলা শ্‌নলো। কাকা, তুমার সাহেবটা যে বাউরা হয়ে গেলো গো, জানোয়ার বাঘিনের জন্যেই এমন। মান্‌ষে বাঘিনের দেখা পেলে তখন কি করবে।

রহমত কথাটা কানে নিতে চাইলো না। আনসার জবাব দিলো। বললো, মান্‌ষে বাঘিন আছে নাকি কোথাও।

নাই! মনোহরের বউ ম্‌খ ঝামটা দিয়ে উঠলো, শিকারী হলে তবে তো ব্‌ঝবে। তুমি হলে শিকারীর নফর, তুমি কি ব্‌ঝবে হে!

মনোহর ঠা ঠা করে হাসলো। রহমতকে ডেকে বললো, ভারী মজার কথা বলছে গো দাদা। আজকালকার ছ্‌ড়িগ্‌লে কথা শিখেছে কেমন দেখোনা কলিকালের আর বাকী নাই গো।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না এখন আর।

রহমত কান পেতে শ্‌নলো। গ্‌রগ্‌র করছে মেঘ। হাওয়া এবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

চৌকিদার কাকা, কলাবতী আরেকবার ডাকলো।

কি!

তুমার সাহেব নাকি বাঘ ভেবে শিয়াল মেরেছে বন্দ্‌কে দিয়ে। কথাটা শেষ না করেই ম্‌খে আঁচল চেপে মেয়েটা গড়িয়ে পড়লো হাসতে হাসতে।

ইবার কিন্তু শিয়াল মারবে না দিদি, কলাবতীর বোন হাসি চাপতে চাপতে বললো, কুকুর বাঁধা আছে।

আহা! জিভ দিয়ে চ্‌কচ্‌ক শব্দ করলো মনোহরের বউ।

বড় অস্‌বিধা গো, কুকুর দেখে ইবার শিয়ালও কাছে ভিড়বে না—খালি হাতে ফিরতে হবে সাহেবকে।

ননদ ভাজ বোন-বেন তিন সই। কথায় কথায় এ ওর গায়ে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। রহমত জানে না, হঠাৎ ওরা কেন অমনভাবে কথা বলছে। সে শ্‌ধ্‌ আনসারকে ডাকলো, তুই যাবি কিনা ভাব্‌তে।

আনসার আবদেরে হাসি হাসলো, তুমি যাও, একট্‌ পরই—এই একট্‌খানি পরই —আমি আসছি।

হাওয়ার দাপাদাপি বাড়ছে। ঝিলের ওপরকার শরবনের ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ শন শন শব্দে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। দ্‌টো ফেউ ডেকে উঠলো কাছ থেকে। মনে হলো তাঁব্‌র কাছাকাছি এসেছে জানোয়ারগ্‌লো। রহমত বন্দ্‌কের চেম্বার খ্‌লে দেখে নিলো লোড ঠিক আছে কিনা। তারপর বিন্দাবনের ঘর থেকে উঠোনে নামলো। পেছন থেকে বিন্দাবন ডাকলো, দাঁড়াও গো দাদা, আমিও যাই।

ব্‌ড়ো চৌকিদার দাঁড়ালো না। হাঁটতে হাঁটতে বললো, না আসতে হবে না তোকে। দরকার নেই কোন। এ বাঘ মান্‌ষ খায় না।

বিন্দাবন নিষেধ শ্‌নলো না, ছ্‌টতে ছ্‌টতে এসে সঙ্গ ধরলো। বললো, জানোয়ারকে বিশ্বাস নাই। মান্‌ষকেই বিশ্বাস করা যায় না আর এতো হিংস্র জানোয়ার।

রহমত চ্‌পচাপ হাঁটছে। বিন্দাবন একট্‌ পর ডাকলো, দাদা।

সাড়া দিলো না রহমত।

বিন্দাবন নিজের মনে হাসলো হয়তো। তারপর বললো, দেখ দাদা তুই রাগ করিস কেন, কহ্‌। তুই ব্‌ড়া আমিও ব্‌ড়ো, আজকালকার জোয়ান ছেলেমেয়েরা যদি ঠাট্টা-মাজাক করে তো তুমার আমার কি, কহ্‌!

রহমত কথা বাড়াতে চাইলো না, বললো, তাই বলে আমার সাহেব তুমাদের কাছে হাসি-তামাশার মান্‌ষ হলো। একট্‌ থেমে সোজাস্‌জি জিজ্ঞেস করলো, কেন সাহেবের কাছে গিয়ে হাত পাতিস না সাহায্যের জন্য? টাকা চেয়ে নিস না?

হ্যাঁ, তা নিই—বিন্দাবন স্বীকার করল। কিন্তু তুমি আমি কি করবো! তুমার সাহেবটা যে ছেলেমান্‌ষ গো দাদা। বিন্দাবন কথা বলতে বলতে হাসলো। অন্ধকারেও মান্‌ষটার দাঁত ঝক ঝক করে উঠলো! কালো চ্‌ল ভর্তি প্রকান্ড মাথাটা আরো বেশী অন্ধকার দেখালো।

তুমার সাহেবটা বড় সিধা মান্‌ষ, বিন্দাবন ব্‌ড়ো বলে চললো। আমার মেয়ে কলাবতী আর মনোহরের বউ-এর সঙ্গে আপনজনের মত কথা বলে। বড় মান্‌ষ বলে জাঁক নাই এতোট্‌ক্‌। আমার মেয়ের সঙ্গে তুমার সাহেবের ভারী খাতির।

একটা ছোট নালা পার হবার সময় একট্‌ থামলো বিন্দাবন। তারপর আবার বললো, কিন্তুক কখনো কুনজর নাই মান্‌ষটার। ভগমান সাক্ষী, কক্ষনো বেচাল কথা বলে নি কাউকে। তবে।

অন্ধকারেই রহমতের ম্‌খটা দেখবার জন্যে বিন্দাবন একট্‌ থামলো। তারপর আবার আরম্ভ করলো, তবে আমার মনে হয়, মনোহরের বউটাকে সাহেবের বেশী পছন্দ। ম্‌খোম্‌খি চাইতে পারে না, বাচ্চা ছেলের লাখান সরমে ম্‌খ লাল হয়ে যায় কথা বলার সময়।

কথাটা শেষ করে হা হা করে একচোট হাসলো মান্‌ষটা। হাসতে হাসতে বললে মনোহরের বউকে বলে কি জানো...

কথাটা শেষ করতে পারলো না তার আগেই রহমত ধমকে উঠলো—এ্যাই বিন্দাবন, ব্‌ঝে শ্‌নে কথা বল।

বিন্দাবন চ্‌প করলো। একট্‌ পর ধীরে ধীরে বললো, তুমি এখনও রেগে আছো আমি ব্‌ঝি নাই দাদা। আমি তো খারাপ কোন কথা বলি নাই। যা বলেছি...

কথাটা শেষ করার আগেই বাঘ ডেকে উঠলো। মনে হলো পশ্‌টা এখন আর দ্‌রে নেই। রহমত বন্দ্‌কটা বাগিয়ে ধরলো।

জানোয়ারটা আজ এ রকম করছে কেন! অন্য কোন দিন তো ইদিক আসে না। অবাক কান্ড। বিন্দাবন আশ্চর্য হলো।

দ্‌জনে তাঁব্‌তে ফিরে এলো। বাইরে ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি তখনও পড়ছে। হ্যাজাকটা ঘিরে অজস্র পোকা। তাঁব্‌র ছেঁড়া তালি চ্‌য়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। কুকুরটা চ্‌প করে গিয়েছে বেশ কিছ্‌ক্ষণ। সেলিমসাহেব হয়তো বা ফিরে আসছে। আসার আগে কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছে। রহমত চিন্তা করলো, কিম্বা এও হতে পারে কুকুরটাই বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে।

রহমত জিজ্ঞেস করলো, কুকুরটা কি পালালো নাকি বিন্দাবন, সাড়াশব্দ একেবারে নাই।

বিন্দাবন হাসলো, দাদা কাকে যে কী বলো। বারো বছর বয়স থেকে টোপ বাঁধছি। এখন বয়স হলো আমার দ্‌ই কুড়ি তের। কুকুরের বাপের সাধ্য কি পালায়।

বাঘটা আরেকবার ডাকলো। এবার একট্‌ দ্‌রে। বিন্দাবন উঠলো, নাঃ, যেতে হয় একবার।

কেন?

গোয়াল ঘরের দরজাটা বাঁধি নি। ভয় পেয়ে গর্‌গ্‌লো যদি বেরিয়ে যায়।

আবার এলো রহমত বিন্দাবনের সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাজাকটা দোরের কাছে রেখে গেলো। কথা বললো না কেউ। রহমত এলোমেলো হাওয়ায় অদ্‌রের কলাগাছগ্‌লোর পাতায় পতায় শব্দ হতে শ্‌নলো। হাটখোলার লম্বা আমগাছ দ্‌টো অতিকায় কোন দৈত্যের দ্‌বাহ্‌র মত দ্‌লছে। বৃষ্টি কখনো ঝিরঝির, কখনো একেবারে নেই।

কুকুরটা আর ডাকছে না। বিন্দাবনের গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শ্‌নতে চেষ্টা করলো। না, সত্যিই কুকুরটা ডাকছে না। থেকে থেকে চারদিক শ্‌ধ্‌ ফেউ ডাকছে। কেমন গা-শিউরানো ডাক ডাকে ফেউগ্‌লো। মনে হয়, ভয়ঙ্কর একটা কিছ্‌ ঘটবে। কোন নিষ্ঠ্‌র অমোঘ সর্বনাশ ঘটবে শীগগীর কোথাও। রহমত ফেউ-এর ডাক শ্‌নতে শ্‌নতে ঝোড়ো হাওয়া বৃষ্টি মেঘলা আকাশের ম্‌খোম্‌খি দাঁড়ালো আচ্ছন্নের মত। তার কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হলো, বাঘটা এখ্‌নি আসবে এবং এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবে। নিজেকেই সে ফিস ফিস করে বললো, তোকে ধরে নিয়ে যাবে, তোকে ধরে নিয়ে যাবে জানোয়ারটা।

বেশ কিছুক্ষণ পর গোয়াল ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে সাড়া দিল বিন্দাবন। দাদা, আমার লাল খাসীটা পালিয়েছে গো।

বিন্দবন গোয়াল ঘরের দরজা বন্ধ করে বাড়ির ভেতরে গেলো। একটু পর হ্যারিকেন নিয়ে বেরুলো। তার সঙ্গে চললো লব-হ্যাণ্ডক হাতে মস্ত এক বল্লম নিয়ে।

রহমতের এতক্ষণে শীত লাগতে আরম্ভ করেছে। তার ভারী, পুরনো ওভারকোটের একটা বোতাম নেই। একহাতে জায়গাটা চেপে ধরে ফিরে চললো। পেছনে দৌড়তে দৌড়তে এলো আনসার।

উত্তর দিক থেকে হু হু করে বাতাস বয়ে আসছে। আনসারের গায়ে একটা সার্ট শুধু। তার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শব্দ হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে সে ডাকলো, কাকা।

সাড়া দিলো না। সাড়া দিতে ইচ্ছে করলো না তার। কাকাগো, বিন্দাবনের ছেলের ঘরে সাহেবের বিছানা পেতেছে ওরা।

হাঁ আমি জানি, মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিলো রহমত, তাতে তোর কি।

কাকা, কলাবতী বিছানা পাতলো, ওকে খুশিতে ডগমগ দেখলাম।

হাঁ আমি জানি, রহমত বললো, তাতে তোর কি!

কাকা, মনোহর ওর বউকে ধরে মারতে লেগেছে।

হাঁ আমি তাও জানি, কিন্তু তাতে তোর কি।

কাকা, চৌধুরী সাহেব আমাদের সাহেবকে নিয়ে যাবে একথা বলে রেখে-ছিলো।

হাঁ, আমি সব জানি, তাতে তোর কি।

আনসার কথা বললো না আর। নিজের মনে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়ালো। তাঁবুর কাছে এসে বললো আমি বিন্দাবনের ঘরে আগুন দিবো, তুমাকে বলে রাখলাম, যদি না দিই তো আমি বেজন্মার বাচ্চা।

রহমত তাঁবুর ভেতরে ঢুকলো না। আনসার বললো, কলাবতী বাজারের নটিনের মত পয়সা নেয় কাকা।

রহমত কথা বললো না। কেউ ডাকছে ঝিলের ধারে। দেখলো দূরে একটা লণ্ঠনের আলো দুলতে দুলতে যাচ্ছে। মনে হলো একবার ডাকে। ডেকে বলে দাঁড়াও বিন্দাবন আমিও আসছি। কিন্তু কিছু বললো না শুধু দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলো।

হ্যাজাকের আলো আবার মরে এসেছে। রহমত চৌকিদার বাতিটার দিকে চাইলো। নতুন বাতি, ঝকঝক করছে। হাতের বন্দুক-টাও নতুন, নজর ভেতরে নজর পিছলে যায়। তার কাজের হাতিয়ার এ দুটো জিনিস, দুটোই নতুন। শুধু সে নিজেই পুরনো। বুড়ো হয়ে গেছে সে। অথচ একদিন তারও দেহে মনে অন্যতর উল্লাস ছিলো। তারও যৌবনের দিনে এমনি অপমানে সে নিষ্ঠুর হয়ে ছুটে গিয়েছিলো প্রতিশোধের জন্যে। দেহ মনের উল্লাস তাকে ঘর বাঁধিয়েছিলো। কিন্তু জীবন বড় নিষ্ঠুর গো। ছেলে দুটো বিনি ওষুধে মরে গেলো। বউটা পাগল হয়ে পানিতে ডুবে মরলো।

হ্যাঁ, জীবন বড় নিষ্ঠুর, এতোটুকু মমতা নাই কারো উপর। রহমত বুড়ো বিড়-বিড় করে নিজেকে বললো। আকাশের দিকে চাইলো। বাতাস থেমে যাবে বলে মনে হচ্ছে। মেঘ ঘন হচ্ছে আকাশে। ঝিলের দিক থেকে একটা চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত বিন্দাবন তার পালিয়ে যাওয়া খাসীটাকে ডেকে ফিরছে।

এমন সময় সেলিম সাহেব আর জমীর চৌধুরী এলো। দুজনেই দারুণ ভিজেছে, এখন কাঁপছে।

তাঁবুর ভেতরে জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে সেলিম চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। জমীর চৌধুরী তখন তাকে টেনে নিয়ে গেলো বিন্দাবন দাসের বাড়িতে।

ওরা চলে যাওয়ার মুখে বাঘটা আরেক-বার ডেকে উঠলো দূরে। জমীর চৌধুরী স্বগতোক্তি করলো, হয়েছে কি জানোয়ারটার এমন করছে কেন, কেন এতো ঘন ঘন ডাকছে! এমন তো কখনো করে না।

আনসার চৌধুরী পেছন থেকে জানালো বিন্দাবনের একটা খাসী গোয়াল থেকে নেই।

আচ্ছা দেখছি, জমীর চৌধুরী বলতে বলতে এগিয়ে গেলো।

রহমত ঠাণ্ডায় কাঁপছেই। কাঁপছে তবু তাঁবুর ভেতরে যাচ্ছে না। তাকে কেমন যেন জেদে পেয়েছে।

কেমন যেন মনে হচ্ছে আনসারকেও বাঘটা ধরে নিয়ে যাবে। সে আনসারকে ডেকে বললো, আনসার তুই বাইরে যাস না।

ঠাণ্ডা হাওয়াটা আবার জোরে বইতে আরম্ভ করলো। তার সঙ্গে বৃষ্টি। ঝিলের নালার ওপরকার সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিন্দাবন তার খাসীটাকে চিৎকার করে ডাকছে। রহমতের ইচ্ছে করলো ফাঁকা একটা গুলী ছোঁড়ে। কিন্তু ছুঁড়লো না। তাঁবুর ভেতরে এসে বসলো। চারদিকে চুপচাপ, শুধু হাওয়ার শব্দ। আনসার উঠে দাঁড়ালো। এতোক্ষণ বসে বসে ছোকরা কি যেন ভাবছিলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি যাই কাকা। একবার অন্তত বলে আসি সাহেবকে কী বাজে মেয়েমানুষ কলাবতী।

রহমত গালাগাল দিলো, তাতে তোর কিরে হারামজাদা, তুই কেন যাবি। তোকে এখন জমীর চৌধুরীই বা সাহেবের কাছে যেতে দেবে কেন? আনসার শুনলো না। বললো, আমি ওদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে লুকিয়ে যাবো। যাবো আর আসবো। দেখো এক্ষুনি আসছি।

ছেলেটা চলে গেলো। রহমত চিৎকার করে বললো, যাস না, ওরে হতভাগা যাস না। ডাকতে ডাকতে সে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো। চোখের সম্মুখে শুধু অন্ধকার। রহমত বুড়োর মনে হলো, আনসার চির-দিনের মত চলে গেলো। আর কোন দিন ফিরবে না। শেষ বারের মত সে চিৎকার করে ডাকলো, আনসার চলে আয়, ওরে হতভাগা যাস না।

তার কথা কেউ শুনলো না। কেবল অন্ধকার বৃষ্টি শাসানো রাত্রি শোঁ শোঁ শব্দ করছে। বুড়ো মানুষটা মনের ভেতরে প্রকাণ্ড একটা শূন্যতা অনুভব করলো সেই মুহূর্তে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ বাঘ ডাকছে না। ফেউ-এর চিৎকার নেই। দূরে বাঁদিকে ঝিলের পারে ধারে লণ্ঠনের লালচে আলোটা দুল-ছিলো—এখন সেটাও দেখা যাচ্ছে না। চার-দিকের আকাশ বাতাস একাকার করে বৃষ্টি নামছে। দেখতে দেখতে শীতার্ত বুড়ো-মানুষটার উপর বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়লো। তবু মানুষটা নড়লো না। দু-পা পিছিয়ে তাঁবুর ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিলো না। ভূতে-পাওয়া মানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকলো। কিছুই সে ভাবছে না। এতোক্ষণকার ঘটনা-গুলোকে কেমন ছায়াবাজীর মত অবাস্তব মনে হলো। সে কিছু অনুভব করতে পারছে না এখন। বাঘের ডাক, ফেউ-এর চিৎকার, কুকুরের আর্তনাদ, জমীর চৌধুরী, বিন্দাবন দাস তার মেয়ে কলাবতী—সেই মুহূর্তে সব যেন একটা বড় ছবির খণ্ড খণ্ড টুকরো। এসবের সঙ্গে তার নিজের যেন কোন যোগ নেই। তার এখন চলে যাওয়া উচিত, কেউ যেন তাকে বলে দিলো। কিন্তু সে গেলো না। অসহ্য উদ্বেগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকলো। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে কান পাতলো কতক্ষণে একটা বন্দুকের শীতল অমোঘ আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুমুখী মানুষের তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদটা শুনতে পাবে।

বাবলা কাঁটায় আকাশ

সেলিনা হোসেন

আলতাফ আকাশ দেখল। ধূমল আকাশ চারদিকে ছড়ানো। পরক্ষণে মনে হোল ঠিক তা নয়। গলাকাটা হাঁসের মত দেখাচ্ছে আকাশটাকে। আকাশের এমন চেহারা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায় আলতাফের। আকাশ কখন কোন রঙে থাকে সব জানা চাই ওর। এবং সেসব রঙের প্রতিক্রিয়া ওর মনে দারুণ কাজ করে। আলতাফের মতে আকাশটা ওর জীবন। কখনো রোদ। কখনো মেঘ। কখনো চকচকে নীল। কখনো মেদুর ছায়া। এ সখ্যতা ওর দীর্ঘ দিনের। তবুও আকাশ দেখতে দেখতে ও খালপাড়ে আসে। জমির আলীর চারা গজানো মাশ-কলাইয়ের ক্ষেতটা ইচ্ছে করে মাড়িয়ে দেয়। জারুলের ডাল ভেঙে দাঁত ঘষে। মনের বিষণ্ণতা কাটে না। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই ওর খুব ইচ্ছে করছিল আকাশটাকে নিজের মনের কাছে পেতে। কিন্তু হোল না। মনে মনে বললো ব্যাটা আজ বিগড়াইছে। ওর বিগড়ানো মেজাজ দেখলে আলতাফের সারাদিন মাটি। কখনো এর জের চলে সাতদিনও। খাল পাড়ের বয়রা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে খালের স্রোত দেখে। না সেই বিশ্রী অবস্থাটা এখনো কাটেনি। আলতাফকে নিয়ে খেলার [illegible] এর মনে হয় মাথার ভেতর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী জটা বুড়ির মত কেবলই পাকিয়ে উঠছে।

একা মানুষ আলতাফ। মাস্টারী আর ঘোরাফেরা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না। কিঞ্চিত পুঁথিগত বিদ্যা আছে। সেটা ওর জীবন যাপনের আয়ের উৎস হিসেবে যথেষ্ট। তাছাড়া ছেলে পড়িয়ে কিছুটা সুখও পায় ও। আলতাফ বোঝে কাজের সঙ্গে মনের মিলেরও একটা দরকার আছে। নইলে যত পয়সার কাজই হোক, তাতে কোন আরাম নেই। আর আরাম করে দিন কাটাতে না পারলে বেঁচে থেকে কি লাভ। সেজন্যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতেও নারাজ। সাদাসিধে জীবনযাপনের বাইরে খুব বড় রকমের পাওয়া নেই। ওর মতে, আকাঙ্খা বেশি হলে সুখ নষ্ট হয়ে যায়। যদিও নির্দিষ্ট কোন সুখের সংজ্ঞায় আলতাফের বিশ্বাস একদম নেই।

একমাত্র পিছুটান বুড়ো মা। তিনকুলে তার কেউ নেই। যার আছে তারা অনেক দূরের। ওদের জন্যে আলতাফের কোন সুখ দুঃখ বোধ নেই। যাদের থাকাথাকিতে বেঁচে থাকায় কোন রদবদল হয় না তাদের অস্তিত্ব আলতাফের কাছে মিথ্যে। বরং অনেক তুচ্ছ জিনিসের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল, যারা অহরহ চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন করে রাখে। এ কারণে মা-র খুব রাগ। এছাড়াও মা সারাদিন গনগন করে, কারণ দুটো। এক বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, তবুও বৌ আনছে না। দু, জ্ঞাতিগুষ্ঠী সব ধড়ধড় করে উঠে যাচ্ছে, চোখের সামনে সম্পত্তি বাড়াচ্ছে, মাটির ঘর ভেঙে দালান উঠাচ্ছে আর আলতাফ চুপচাপ। কিছুই করেনি। এ জন্যে মা কখনো বিলাপ করে কাঁদে। কপালকে দোষ দেয়। মৃত স্বামীকে স্মরণ করে। ছেলেটা বাপের মত কুঁড়ের বাদশা হয়েছে বলে নিজে নিজে সান্ত্বনা খোঁজে।

আলতাফ মা-র কথাবার্তায় খুব একটা মনোযোগ দেয় না। ওর ধারণা মার বয়সটা খারাপ। এ বয়সে সবাই নতুন করে ছেলেমানুষ হয়। আর বুঝের মানুষ অবুঝ হলেই যত মুশকিল। তাই সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ওকে কেন্দ্র করে মা-র যে ধরনের অভিযোগ তার মোকাবিলা করার সাধ্য নেই আলতাফের। শুধু সাধ্য নয় সে ইচ্ছেও নেই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আলতাফ বুঝলো স্কুলের বেলা হয়েছে। এতক্ষণ পর বেটার গোমড়া মুখ খসে গেছে। চামতোলা ছুরিয়ালের মত ঝলসাচ্ছে। সেই দীপিত চমকটা সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা ক্রিয়া করে। আলতাফ নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। যাদুর মত কাজ হয়েছে। খালের বুকের ছোট সাঁকো পেরিয়ে দুটো ছেলে স্কুলের দিকে আসছে। আলতাফ এক নজরে দেখলো। দূর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে গাছে ওঠা কাঠবিড়ালীর মত মনে হোল ওদের। ওই রকম কিছু দৃশ্য দেখলে নিজেকে জন্মদাতা পিতার মত শক্তিমান মনে হয়। শালা মন ভাল থাকলে কত কি ভাবা যায়। দাঁতনটা মাঝমাঠে ছুঁড়ে দিয়ে উবু হয়ে মুখটা ধুয়ে নেয়। জলের বুকে আকাশের ছায়া। নীল রংটা কেমন ম্যাড়া ম্যাড়া। তবুও ভালোই লাগে। খুঁজে দেখলে নিজ অন্তরেও আকাশের ছায়া। আলতাফ পাড়ে উঠে ছেলে দুটোকে আর খুঁজে পেল না। ওরা হয়তো স্কুলে পৌঁছে গেছে। মাঠের মধ্য দিয়ে কলরব করতে করতে আরো একদল ছেলে আসছে।

বাড়ি ফিরে মা-র কাছে ভাত চাইল আলতাফ। মা গজ গজ করে কি যেন বললো। ও ইচ্ছে করে শুনলো না। এক-মনে পানির গেলাস আর ভাতের সানকীর দিকে তাকিয়ে বসে। লাল রং-এর শূন্য সানকীটা সূর্যাস্তকালের আকাশের মত। আস্তে আস্তে বিশাল হতে থাকে। আলতাফের মাথা ঝিম ঝিম করে। ভাত আনতে এত দেরী হচ্ছে কেন মা-র? ইদানীং মা যেন ওর প্রতি উদাসীন হয়ে গেছে। ঠিকমত কথা বলে না। কাছে আসে না, খাবারের সময় খাবার দেয় না। দূরের আকাশটার মত মাকে আর ধরা যায় না। হয়তো সবটাই মনের ভুল। আলতাফের অভিমান যুক্তি মানে না বলেই এমন হয়। তখন ইনিয়েবিনিয়ে আজেবাজে যুক্তি তৈরী করতে মন চায়।

মা থালা বোঝাই ভাত নিয়ে আসে। আলতাফ একটু অবাক হয়ে তাকায়। সাদা থান আর ধব ধবে একমাথা সাদা চুলের চরকা-কাটা চাঁদের বুড়ির মত মনে হচ্ছে মা-কে। এ যেন সে নয়। কবে কোথায় এ বুড়িকে আলতাফ দেখেছে তা আর মনে নেই।

—খা বাবা। উলটামুখে চাইয়া রইছ ক্যান?

মা-র কথায় আলতাফ সানকীর ওপর মুখ নামায়। তাড়াতাড়ি খায়। মা ওর সামনে বসে আছে। পানির গেলাস, তর-কারীর বাটির মত আর একটি উপকরণ হয়ে। আলতাফ ভাবে, ঐভাবে বসে থাকার কোন দরকার নেই। বসে থাকলে খাওয়া নিয়ে অযথা জোরজবরদস্তি করে। কেউ যদি ওর না-কে হ্যাঁ করতে চায় তখনই রাগ ধরে।

—বাবা?

—কও।

আলতাফ মুখ না তুলেই কথা বলে। ও জানে মা কি বলবে। বহুবার ও মা-কে বলেছে খাওয়ার সময় যেন এসব কথা না ওঠায়। কিন্তু মা সে নিষেধ শোনে না। এই সময়টাকে সে উপযুক্ত মনে করে। জানে কেবলমাত্র ভাত খাওয়ার সময়ই তার ছেলের মাথা ঠান্ডা থাকে। অন্য কোন সময় তার কথা শোনে না।

—বাবা কইছিলাম কি মোর আর কয়দিন। আইজ আছি কাইল নাই! নাতি-পুতি দেহার শখ অয়না মোর?

আলতাফ কথা বলে না। চুপচাপ খেয়েই যায়। বরং আগের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই খায়। শখতো কত রকমের থাকে। সবাইকে দিয়ে কি আর শখের পূরণ হয়।

—কতদিন ধইরা কইয়া আইতাছি। তুই মোর কতায় মোডেই কান দেছ না। মুই তোর মা, না শত্তুর? দশটা না পাঁচটা না এককো পোলা মোর—

মা কথা শেষ করতে পারে না। কান্নায় গলা আটকে আসে। আলতাফ ভাতের মধ্যে পানি ঢেলে দিয়ে উঠে যায়। সামনে থাকলে ঐ কান্না আর থামবে না।

অনেক বেলার রোদ গায়ে নিয়ে আল-তাফ স্কুলের দিকে ছোটে। মনে মনে অনুতপ্ত হয়। স্কুলে যেতে আজ দেরী হোল। দেরী করে স্কুলে যাওয়াটা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। যদিও হেডমাস্টার থেকে আরম্ভ করে বাকী তিনজন মাস্টার রোজই দেরী করে আসে। তারা দশটার স্কুল বারোটায় করতে ভালবাসে। তারা কোন ঘড়ির কাঁটা মানে না, এই না-মানার জন্যে প্রায়ই আলতাফের সঙ্গে ওদের কথা কাটাকাটি হয়। তারা নিজেদের দোষ স্বীকার না করে উল্টো ঝগড়া করে। হেড মাস্টার পরিষ্কার বলে দেয়, আমি হেড মাস্টার। আমি স্কুলের ভালমন্দ বুঝি। আপনি সব ব্যাপারে নাক গলাবেন না।

আলতাফ মনে মনে দুঃখ পায়। তাই এতবড় কথার পর আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না ওর। ফুটো বেড়ার ফাঁক দিয়ে টুকরো আকাশ দেখে। দুঃখের আকাশ। ঘামে নেয়ে উঠে স্কুলে পৌঁছে আলতাফ দেখল আজো কেউ আসেনি। ছেলেরা তুমুল হৈ হৈ করছে। আলতাফকে দেখে ওরা নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে বসলেও কথা থামে না। ওদের শতকণ্ঠের কলরবে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল এবং ঘাড়ের ঘাম মোছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। আলতাফের মনে হয় ঐ কলরব ওকে এক বিশাল গাছে জোর করে ঠেলে উঠিয়ে দিচ্ছে। উঠছে তো উঠছেই। কিছুই থামতে পারছে না। নামার জন্যে ও প্রাণপনে চেষ্টা করছে। গাছ আঁকড়ে ধরছে। কিন্তু নিজেকে আটকিয়ে রাখতে পারছে না। সেই বিশাল গাছ যাদুকরী বাঁশী বাজিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আলতাফের কপালে ঘামের স্রোত বয়ে যায়।

—সার?

—মা, না মুই পড়ি নাই। গাছ থন পড়ি নাই।

—সার?

কচি কণ্ঠের অনুচ্চ ডাকে আলতাফের তন্ময়তা ভাঙ্গে।

—অ্যা? কি?

—সার মোরা কি শিলেটে লেখমু?

—ল্যাখ। বেবাক পোলাপাইন ল্যাখা শুরু কর।

পুরো স্কুলের ছেলেগুলোর মাথা শেলটের ওপর নেমে যায়। কাজ পেয়ে চুপ করে থাকে ওরা। আলতাফ জানে ওটা অল্পক্ষণের ব্যাপার। ফাঁক পেলে ওরা কলরব শুরু করবে। ফাঁক পেলে সবাই একটা না একটা কিছু করতে চায়। মাস্টাররা স্কুলে না এসেই কাটায়। ছেলেরা টুপ করে পালিয়ে যায়। বাইরে যাবার নাম করে বেরিয়ে আর ফিরে আসে না। ফাঁক পেলেই চিন্তাটা আলতাফকে আক্রান্ত করে। আলতাফের মগজে মোহন বাঁশী বাজায়।

ওপরের ছাদের টিনের ফুটোর দিকে তাকিয়ে বেলাটা আন্দাজ করে নিল আল-তাফ। ঐ ছোট ছিদ্র দিয়ে সূর্যের একটা লম্বালম্বি আলোর রেখা সোজা মাটিতে নেমে এসেছে! অর্থাৎ বেলা দুপুর। সূর্য মাথার ওপর। অথচ একজন মাস্টারও আসেনি। গোটা স্কুলটা আলতাফের একলার। আজ আর মাস্টাররা কেউ আসবে না। এখন ও ইচ্ছে করলে সব ছেলে নিয়ে যা খুশি তা করতে পারে। ওরা অনেকক্ষণ ধরে শেলটের ওপর মাথা নামিয়ে রেখেছে। আর পারছে না। এক দুই করে মাথা ওপর দিকে ওঠে। আলতাফের চোখে চোখ পড়তে আবার তা নিচের দিকে নেমে যায়। আল-তাফের মনে হয় এ একটা মজার খেলা। ও ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

ছোট ঘরটায় ভাগাভাগি করে পাঁচটা ক্লাশের ছেলেদের বসানো হয়েছে। আল-তাফের রুক্ষ চেহারার দিকে তাকিয়ে ছেলেরা আজকে জড়োসড়ো চুপচাপ। স্যারকে ওরা এমন চেহারায় কোনদিন দেখেনি। আলতাফের হাতের চিকন বেত ওদের মাথার ওপর দিয়ে ঘোরে। পাঁচের ক্লাশের একটি ছেলের মাথা ওপরের দিকে উঠতেই আলতাফের বেতটা ঠক করে ওর মাথার ওপর গিয়ে পড়ে। ওর দুচোখে পানি গড়ায়। আলতাফের ভ্রূক্ষেপ নেই। এক-এর ক্লাশের একটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরে গুন-গুন করে কাঁদছে। দু'একবার বেতের বাড়ি খাওয়ার পরও ওর কান্না থামে না। আলতাফ ওর কান ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে নীলডাউন করিয়ে রাখে।

বেতটা নিয়ে ও গোটা ঘরে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিটি ছেলে এখন ওর শাসনের অধীন। কারো সাধ্য নেই একচুল এদিক-ওদিক করার। আঃ কি আনন্দ। গোটা তিরিশেক ছেলেকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার আনন্দে ওর দৃষ্টি নত হয়ে আসে। ওরা এখন ইচ্ছে করলেই এ বেড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। তবুও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছটফটিয়ে উঠছে। ক্ষুধায় পেট চনচনায়। ছেলেরা ছুটির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আলতাফের মনে হয় ওদের আজ ছুটি নেই। এমনি করে আটক রাখবে সারাদিন, সারারাত ধরে। মাংসপেশী নিস-পিস করে। সমস্ত শরীরটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ হয়ে গেছে। যেন অসংখ্য ঘোড়ার খুরের পদাঘাতে ধূলিধূসরিত। পরক্ষণে মনে হয় না ও একটি মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছেলেগুলো সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে

দৌড়ুতে ওদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। তবু নিস্তার নেই।

—স্যার ?

পাঁচের ক্লাসের মার-খাওয়া ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়ায়।

—স্যার বাইরে যামু ?

—ক্যান ?

—মুতে ধরছে।

মুতে ধরছে ? মুতে ধরে ক্যান ? যা গিয়া বস।

আলতাফ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠে।

ছেলেটি তবুও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একহাতে জোরসে প্যান্টের কোনা চেপে ধরে আছে। আলতাফ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর প্রবল চাপ অনুভব করে। ওকে যেতে না দিলে ও হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ কর্মটি করবে। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও করবে। তবুও ওকে যেতে দেবার কথা মনে হয় না ওর। মাংসপেশীর সেই ঘোড়াগুলো দুরন্ত খেলায় মেতেছে।

হঠাৎ ওর মনে হয় এই গোটা তিরিশেক ছেলেকে ও একটা বিরাট গাছের ওপর উঠিয়ে দিয়েছে। নিজে থেকে নামার ক্ষমতা ওদের নেই। এবং নিজেদের ওঠার গতিও রোধ করতে পারছে না। আকাশ ছুঁই-ছুঁই অবস্থায় সেই লম্বা গাছটা থেকে ওরা সব হুড়মুড় করে পড়ে যায়। আঠারো বছরের আলতাফ যেমন পড়েছিল। কেঁপে ওঠে সমস্ত শরীর। ঘাম দেখা দেয় কপালে।

—সার ভাগছে।

চমকে ওঠে আলতাফ। ছেলেরা কলরব করে।

সার সান্তু ভাগছে।

—ভাগছে ?

তখনি ও দেখে পাঁচের ক্লাশের সেই ছেলেটি ওর সামনে আর নেই। ওর পাশ দিয়ে সাঁই করে ছুটে পালিয়েছে। থরথর করে কাঁপে হাঁটু। আঠারো বছর বয়সে সেই লম্বা গাছ থেকে পড়ার পর কি যেন একটা অমন সাঁই করে ওর শরীর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আলতাফ আকাশটাকে ভালবাসতে শিখেছিল।

আলতাফ নির্জীবের মত চেয়ারের ওপর বসে থাকে। মাথাটা ঝুলে আসে বুকের ওপর। অবশ অবশ লাগে শরীর। ছেলেরা গুঞ্জন করছে। ওরা ছুটির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। এত দীর্ঘক্ষণ ওরা কোন দিন স্কুলে থাকেনি। বেলা গড়িয়ে পড়েছে। ওরা ক্ষুধার্ত। আলতাফ তবুও বুঝতে চায় না। এক-এর ক্লাশের দু-একটি ছেলে কান্না জুড়েছে। একটি ছেলে সাহস করে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—সার মোরা যামু গিয়া ?

—না।

—আর কি লেখমু সার ?

কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে ছেলেটি।

—তোর মাথা মোর মুণ্ডু। যা বস গিয়া।

তখুনি হন্তদন্ত হয়ে হেডমাস্টার স্কুলে এসে ঢোকে। পেছনে সেই পালিয়ে যাওয়া ছেলেটি। উগ্রমূর্তিধারী মানুষটি পারলে তখুনি বুঝি আলতাফের মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

—আপনি পেয়েছেন কি মাস্টার সাহেব ? একদিন স্কুলে আসিনি বলে কি ভেবেছেন স্কুলটা আপনার ? সারাদিন ধরে এই ছেলেগুলোকে আপনি কষ্ট দিয়েছেন। এর একটা বিহিত হবে কাল। এই তোরা যা. আজ তোদের ছুটি।

হেডমাস্টারের ঐ একটি কথায় সব ছেলেগুলো খাতা বই বগলদাবা করে লাফ দিয়ে ওঠে। ওদের গুঞ্জনটা আলতাফের কানে কান্নার মত বাজে। ওরা বুঝি একটা বিরাট গাছ থেকে পড়ে গেছে। হঠাৎ ও হেডমাস্টারকে এক হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। দু' হাত প্রসারিত করে ওদের বুকে আগলে রাখতে চায়।

—না কেউ যাইব না। কাউরে যাইতে দিমু না।

কিন্তু ছেলেরা ওর কথা শোনে না। পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যায়। খোঁয়াড় থেকে ছাড়া পাওয়া একপাল ভেড়ার মত। ওরা এখন আলতাফের নাগালের বাইরে। শূন্য ঘরের বেঞ্চ, চেয়ার ডেস্ক টেবিলের দিকে তাকিয়ে খাঁ খাঁ করে অন্তর। আলতাফ স্কুল থেকে বেরিয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। হেডমাস্টার স্কুলের দরজায় তালা লাগাচ্ছে।

রোগা মানুষটার দিকে ও একবারও ঘুরে দেখছে না। রুষ্ট মানুষটা ওকে অনেক গালমন্দ করল। ও একটা কথারও জবাব দিল না। বরং বাড়ি ফেরার পরিবর্তে উল্টো দিকের মাঠে নেমে হাঁটতে লাগল।

ও মাঠে যেখানে শেষ অত দূরে গাঁয়ের কেউ যায় না। যাওয়ার দরকার নেই। পতিত জমি। বাবলা কাঁটা, উইয়ের ঢিবি আর বৈঁচি ঝোপে ভরা। মাঝে মাঝে গরু নিয়ে রাখাল ছেলেরা এখানে আসে। এর বাইরে কেউ না। তবুও বাবলা কাঁটায় ভরা সেই পতিত জমির মাঝ দিয়ে খামোখা হাঁটতে আজ আলতাফের ভালই লাগছে। আসলে এখন ওর কোথাও যাওয়া চাই। নিরিবিলি একটা গন্তব্যস্থল না হলে আর ভাল লাগছে না। পায়ের নিচে বনবরির শুকনো ডাল পড়ে। খোঁচা লাগে। কানের পাশ দিয়ে ফুড়ুৎ করে উচ্চিংড়া উড়ে যায়। আকাশের রং এখন খোলাটে লাল। মহীউদ্দীনের বাড়ির ঝুরে যাওয়া লাল ইটের মত। আর একটু পরেই জমির শেষ মাথার গাছের আড়ালে টুপ করে সূর্য খসে পড়বে। মিঠে বাতাস বেশ লাগছে আলতাফের। জায়গাটা চমৎকার। এমন সুন্দর জায়গাটাকে গাঁয়ের লোকেরা বন্ধ্যা বলে গাল দেয়। আলতাফ শব্দ করে হাসে। যতসব আজগুবী ধারণা। গ্রাম্য দলাদলি আর কোন্দল ছাড়া ঐ মানুষগুলো ভাল কিছু ভাবতে পারে না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দু'হাত দূরে দূরে বাবলাকাঁটার ঝোপ। ঝোপের মাথায় জোনাকী। ধানসী গাছগুলো গোটা তিরিশেক ছেলের মুখ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। জোনাকী পোকাগুলো ওর আঠারো বছরের বয়সের অনবরত জ্বলছে আর নিভছে। আলতাফ ভয়ে ভয়ে হাত বাড়ালো। ধরতে পারল না। আঠারো বছর বয়সেও একটা লম্বা গাছে উঠেছিল। সে গাছের ডাল ভেঙে মড়মড় করে নিচে পড়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরেছিল দু' দিন পরে। বাবা শহরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ভাঙা পা ভাল হতে সময় লেগেছিল পুরো দশ মাস। বাড়ি আসার আগে জেনেছিল ও পুরুষত্বহীন হয়ে গেছে। বাবা হবার ক্ষমতা ওর নেই।

ডাক্তারের কাছ থেকে খবরটা শুনে বাবা ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। সারা পথ ফিস ফিস করে বলেছিল, গাঁয়ে ফিরে যেন খবরটা কাউকে না বলে। কে জানে তার মনে কি ছিল। হয়তো ভেবেছিল, সব কথা বেমালুম চেপে গিয়ে ছেলেকে তার বিয়ে দেবে। কিন্তু সে সুযোগ বাবা পায়নি। সাতদিন পর দু'দিনের জ্বরে সব শেষ।

হঠাৎ ওর মনে হলো ঘন্টার মত যে শব্দটা মগজে বাজছিল সেটা এখন আর কোথাও নেই।

দু'হাত দূরে দূরে কাঁটা বাবলার ঝোপ-ঝাপ আর নেই। কিছুই দেখা যায় না। শুধু একরাশ অন্ধকার ছাড়া।

আলতাফ বিড়বিড় করে মাকে ডাকে। মা-র শব্দ পুরোতে পারছে না বলে মাফ চায়। বিড়বিড় করতে করতে আলতাফ ছটফটিয়ে ওঠে। গুলিবিদ্ধ বুনোপাখির মত। সে মুহূর্তে ওর মনে হয় এ পতিত জমিটা একটা বিরাট আকাশ হয়ে গেছে। এখানে কেউ কোন দিন আসে না।

আর ঐ ধূসর আকাশটা বুকে নিয়ে ও শুয়ে আছে।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

চেনা পাখিওয়ালা

এবছর শীত কিছু দেরিতে হল। কিছুতেই সহজে আসতে চায় না।

শীত না এলে বসন্তও আসবে না। আ বসন্তের জন্য খুব একটা আগ্রহ বাঁশির নেই। শীত দীর্ঘ হওয়াই ভালো। যাযাবর পাখীরা আসে, হরেক-রকম নতুন পাখী ধরা যায়। কিন্তু শীতকাল দেরীতে আসছে বলে বাঁশীর মনটাও ভালো নেই।

তবে আসবে এই ভাবনাটাই ভারী রোমাঞ্চকর আঃ বাঁশি ছক কাটে, পরিকল্পনা আটে। কিন্তু হেমন্তের বৃষ্টির রেশ থেকেই গেল। পথঘাট কাঁদায় ভরে উঠে. পাখিরা একবার ডেকে ওঠে বৃষ্টি ধরে এল বলে, আবার ঝরঝর ঝমঝম বা টিপটিপ বৃষ্টি নেমে আসে।

শেষ পর্যন্ত কী তবে ডাহুক পাখিই ধরতে হবে। ডাহুক ধরাতে গেলেই যত ঝাক্কি ঝামেলা। জোড়ের একটা পাখি ধরলে অন্য পাখিটা দিনরাত ডাকতে ডাকতে বুক ফাটাবে, পাড়া মাতিয়ে তুলবে। বাঁশি তাই ডাহুক ধরতে চায় না। বর্ষাকালে ডাহুক ডিম পাড়ে, বাচচা ফোটায়—কী করা যায়। শেষ পর্যন্ত ডাহুকই ধরতে হবে বুঝি। খুব নিরীহ পাখী, অন্য কারো সঙ্গে ঝামেলায় যায় না। নিজের ঘরের আশেপাশে ঘুরে ফিরে দিন কাটিয়ে দেয়। খুব ছিম-ছাম তন্বী তরুণী মেয়ের মতো সব সময় পরিপাটি থাকে. খুব সতর্ক। জলের ধারে জঙ্গলে সামান্য উঁচুতে সরু ডালপালা, লতার টুকরো নলখাগড়ার ফুলের শিষ, সময় পুরুষ পাখীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খায় মুখর হয়ে কোর্-র-র কোয়াক-কোয়াক ডাকতে থাকে। শুরু করে কোকুর-র দিয়ে। এক একবার ডাকার পর একটু বিরতি দিয়ে আবার ডাকতে শুরু করে। দিনরাত ডাকতে থাকে—ভারি এক মরমী পাখী। নিজের রূপ সম্পর্কে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সব সময় সচেতন।... না এই পাখী ধরবে না বাঁশি।

হঠাৎ একদিন বৃষ্টি ধরে গেলে লাফিয়ে শীত নামে। বেশ ঠান্ডা শুরু হয়, কুয়াশা জমতে থাকে সাজপোশাক নিয়ে। পাহাড় থেকে শীত নেমে সমভূমির বিল ও পাড়াগাঁর কুয়াশার সঙ্গে মেশে, চারদিক দখল করে নেয়, আচ্ছন্ন ও একাকার করে দেয় সব কিছু। পাড়াগাঁর কুয়াশার সঙ্গে পাহাড়ি কুয়াশা মিশে দিন-দুপুরকে অন্ধকার করে রাখে—দশটা পর্যন্ত তো নির্ঘাৎ। বিল প্রান্তর নদী পাহাড় যখন কুয়াশার ভারী আস্তরণে ডুবে থাকে কী চমৎকার দৃশ্যই না হয়।

আরও তিনদিন কেটে যায়। বাঁশি পাহাড়ের নিচে ফাঁকা বনভূমিতে যায়, তেঁতুলা ভাঙ্গা বিলের জলাভূমিতে ঘুরে আসে। একা-একা।

বাঁশির দুই পুরুষ আমার চেনা। ওরা আমাদের গ্রামে এসে ঘর বেঁধেছে বেশি দিন হয়নি, বছর পনেরো হবে বাঁশিরা এসেছে। বাঁশির বাবা হঠাৎ একদিন জ্বরে মারা যায়। মাকে নিয়ে সে পড়ল একা। এখন তার বয়স

পেতে পাখি ধরে সে বড় রাস্তার ধারে কিংবা হাটে বেচতে যায়। কাপ্তাই সড়কের উপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়া সাহেব-সুবো, সৌখিন ধনী লোকেরা তার কাছ থেকে পাখি কেনে, নতুন নতুন পাখির ফরমায়েশ দেয়। ফরমায়েশ পেলে বাঁশি মনে মনে খুশি হয়। কিন্তু চোখে মুখে তেমন কোনো ভাব সে দেখায় না। এর কারণ কি আমি জানি না, হয়তো মনে মনে পাখির ব্যবসা ঘৃণা করে—তা হবে কেন! তিন-পুরুষ ধরে তারা পাখি ধরার ব্যবসা চালিয়ে আসছে—জাত-ব্যবসা ঘৃণা করবে কেন!

তবে হালে পয়সা বানিয়ে ধনী হয়েছে যারা, তাদের ব্যবহার বড় বাজে—বনেদী ধনীদের কাছে পাখি বেচে আনন্দ আছে। তারা বোঝে, ব্যবহার জানে, নতুন নতুন পাখির বায়না করে অনুরোধ জানায়. টাকাও দেয় দরদাম করে। বাঁশি তাদের কাছে পাখি বিক্রি করে বেশি। বিদেশী সাহেবদের ধরণ-ধারণ একেবারে আলাদা। তবে হাড় বজ্জাত বিদেশিও আছে। একবার দুজন বিদেশির কাছে পাখি বেচতে গিয়ে সে নিজের মনের কথা প্রায় সব বলে ফেলে আর কি। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে পাখির খাঁচা তুলে ধরল—মেমসাহেব ভারি খুশি হয়ে উঠে। ভাগ্যিস তাঁরা হিন্দী জানেন। বাঁশি যে হিন্দী জানে তা নয়। উর্দুর সঙ্গে বাংলা গুলিয়ে কোনো মতে কথা চালিয়ে খুশিতে ঝলমল হয়ে বেজে উঠে। গাড়ি থেকে নেমে পাশে দাঁড়িয়ে মেম-সাহেব অবাক—খাঁচাটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিল বাঁশি। ঠিক তখনই পাখিটা শুদ্ধ স্বরে 'সা-নি-ধা' গেয়ে উঠল। শুদ্ধ তিনটি পর্দা পাখির মুখে শুনে কে না চমকে উঠে! মেমসাহেব তো তক্ষুনি ধরে বসে পাখিটি দেখাতে। বাঁশি বললে : কাপড় খুললে আর গান গাইবে না।

সাহেব-মেম দুজনেই জানতে চাইল এত নিখুঁত স্বরগ্রামে কে শেখাল। পাখির নাম কি! ঠিক তখনই পাখিটি চারটে পর্দায় গেয়ে উঠল 'সা-নি-ধা-পা', আবার গাইল 'সা-রে-গা-মা'।

কেউ শেখায়নি, বুনো পাখি, আমারও অবাক লাগে।

এই হচ্ছে চাক দোয়েল পাখি। খুব কচিৎ মেলে। ছোট্ট সাদা কালো পাখি. বর্মী হাত পাখার মতো লেজ একবার খোলে আবার গোটায়, আর শুদ্ধ স্বরে গান করে। এই পাখির ইংরেজী নাম যে ফ্লাই ক্যাচার, বাঁশি জানে না। সেই মহিলা খুশি হয়ে বাঁশিকে একটি স্পাটনিক মার্কা বাইনাকুলার দিয়েছিল। বাঁশি সেই বাইনাকুলার দিয়ে উঁচু গাছের ডালে বসা পাখি দেখে। এখনও সেই বাইনাকুলার তার গলায়। মস্কো শহরে তৈরি—ভারি আমুদে মহিলা। যদি আজও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বাঁশি। বাঁশি কি তাদের কথা দিয়েছে নতুন পাখি পেলে রাখবে বলে?

।। দুই ।।

আমি অবাক হয়ে যাই বাঁশির কাণ্ড-কারখানা দেখে। বাঁশি কখনও কখনও সকাল থেকে উধাও হয়ে যায়। যদি ভাবি সে পাখি ধরতে গেছে—কই সন্ধেয় তো পাখি নিয়ে বা ফাঁদ নিয়ে ফিরছে না তো। যদি বলি পাখির গতিবিধি লক্ষ্য করতে জলভূমি বা পাহাড়ের আশেপাশে গেছে—কই সে-তো গেছে সমুদ্রের ধারে জেলেপাড়ার রবি জেলের সঙ্গে দেখা করতে। বাঁশি কোথায় যায়, কি করে, খবর রাখাই মুশকিল। আমার নিজেরও কাজ আছে। ছুটিতে গ্রামের বাড়ি এসেছি আত্মীয় স্বজন দু'শ জনের সঙ্গে দেখা করা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা এদিকে ভিটে বাড়ির জমি নিয়ে মামলা ঠুকে দিয়েছে আমাদের এক আত্মীয়। এভাবে বাঁশির খোঁজখবর নেওয়া বা তার সঙ্গে আলাপ করার খুব একটা সময় আর হয় না। সেও কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে যেন অথবা আমি কিনা কে জানে!

বহুদিন পর বাড়ি আসলাম বলে পাহাড়ে ঘুরতে খুব ইচ্ছে হয়—একদিন, বহুদিন পর এভাবে ঘুরতে ঘুরতে। গুকে দুটি পাখি তো মানুষ বলে মনে হয়। শুনতে পাই কালো কাঠবিড়ালি 'থক থক' করে অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে সবাকে, সুতোকাটা পোকার 'কট কট' দাঁতের শব্দ, ওদের শব্দের ধার বনভূমিতে এখানে ওখানে করে তোলে, দৌড়ে কাঠবিড়ালি লুকিয়ে যায় গাছের ডালের আড়ালে, বুনো বানর লাফিয়ে ক্যাচ ক্যাঁচ চি চি করে, ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে বনভূমি কাঁপিয়ে তোলে আর সাতরঙা প্রজাপতি বুনো ফুলের উপর বসে কেমন পাখা দুটো স্থির করে একমনে মধু টেনে নেয়। প্রজাপতি শিকারী পাখিরা আশে-পাশে থাকলে তার থেকে জান বাঁচিয়ে চলা—সবকিছুতে একটা আলাদা ঐশ্বর্য। ঠিক তখনই কোথায় যেন একটা নাম-না-জানা পাখি ডেকে ওঠে। পায়ের জুতো জোড়া আর পায়ে রাখতে ইচ্ছে করে না, ঘাস-পাতার নরম পরশ পেতে সাধ হয়। গর্জন গাছের মাথা উঁচু আকাশ ছোঁয়া বিস্তার কেমন উদাস করে দেয়—ঝাঁপিয়ে পড়া কুয়াশা সকল বর্ণনাকে হার মানিয়ে দেয়।

তা বনভূমি খুব নিবিড় নয়, খুব বড়ও নয়। মাঝে মাঝে ফাঁকা উঁচু-নিচু ন্যাড়া টিলাগুলো গাছপালাকে আলাদা করে উপবন বানিয়ে দেয় আসলে বন তো নয়, বনের সদৃশ্য বলা যায়। একটু দূরে উঁচু পাহাড়ে বনভূমি আছে—মানুষের দা-কুড়ুলের মুখে বনের এইতো অবস্থা, তবু স্বপ্ন মনে হয়, আবার স্বপ্নও নয়—কে জানে এসব স্বপ্ন বলব, নাকি আমি স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলছি—কী নিবিড় কুয়াশা চারদিকে। বাঁশিকে এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না! আমার বন্ধুত্ব বুঝি এড়িয়ে চলতে চায় সে!

রোদ উঠলে সবকিছু স্বচ্ছ হয়ে উঠে। তখন বাঁশিকে দেখলে অবাক হয়ে যাই।

বাঁশি আর একবার দুটি মোটুসী পাখি ধরে খাঁচায় পুরে রাস্তার ধারে বেচতে যায়। রাস্তা থেকে সেদিন পাখি দুটি ফিরিয়ে আনে, কারণ পাখি দুটি দুদিন ধরে কিছুই খায়নি। আর তখন যদি বিক্রি করে দিত তাহলে ওরা নির্ঘাত মারা যেত—নতুন মালিকের হাতে গেলে বিব্রত হত, খাবার মুখেই নিত না। এমনিতে ছোটো পাখি তার উপর চঞ্চল বলে খাঁচায় এদিক ওদিক ছটফট করতে করতে পালক হয় খোঁচা-খোঁচা উসকু-খুসকু। ছোটো শিশিতে খেতে দেওয়া মধু তেমনি খাঁচায় পড়ে থাকে, পোকারা তেমনি খাঁচায় ঘুরে বেড়ায়। জালের ভেতর পিঁজরায় পোকারা দিব্যি ঘুরে বেড়ায় কিন্তু পাখি দুটি কিছুতেই খাবে না—তাহলে ওরা অভিমানিও হতে জানে! জলের কাছে ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব বলে পুকুর ধারে খাঁচাসহ রেখে দিয়েছিল, তাতেও ওদের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে না—মরবে তবুও খাবে না এই প্রতিজ্ঞা বুঝি! শেষ পর্যন্ত পোকাগুলো বের করে নিয়ে জলের সঙ্গে গ্লুকোজ মিশিয়ে রাখলে খাওয়া ধরল—হরলিকসও। ছাতু ও কোয়েকার ওট শুকনো-শুকনো খেতে শুরু করে।

তিন

পরদিন পাখি দুটো বিক্রি করতে বাঁশি আবার কাপ্তাই রাস্তায় গেল। আমি রাস্তায় গেলাম কুয়াশায় হাঁটতে ভালো লাগছে বলে। রাস্তার পাশে বিল, বিলের পর পাহাড়, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ঘুরপাক খাওয়া কুয়াশার জমাট পলেস্তারা দূর থেকে দেখা যায় না। বিল থেকে যখন হঠাৎ কুয়াশারা উধাও হবে তখনও পাহাড়ের খাঁজে ওরা শেষবারের মতো গল্পের গাছ মুড়োবে, তখন বিলের ধান ও জলাভূমিতে যাযাবর পাখিরা নামবে—বাঁশি সে খবর ঠিক রাখে!

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। বাঁশি মোড় ঘুরে রাস্তায় উঠল, আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বললে : পাখি দুটো বিক্রি করে আজ দুপহরের দিকে বিলে যাবো। হাতে একদম টাকা নেই, তাই এ দুটো বিক্রি করতে এসেছি।

ঘরে আর কি পাখি আছে?

একটা দাঁড়কাক।

তার মানে, দাঁড়কাক কি করবে?—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। গতকালও তার বাড়িতে কোনো কাক দেখতে পাইনি। বলে কী!

উত্তর শোনার আগে একটা গাড়ি আমাদের এগিয়ে একটু সামনে দাঁড়াল। বাঁশি আমাকে ছেড়ে গাড়ির দিকে গেল, খাঁচাটি তুলে ধরল।

গাড়িতে দীর্ঘ জুলফিওয়ালা লম্বাচুলে একজন তরুণ, গাড়ি তিনি চালাচ্ছেন, পাশে তার সুন্দরী বউ—খুব সেজেছে। রোববার। হয়তো কোথাও রোববার কাটাতে যাচ্ছে। আজ অনেক গাড়ি যাচ্ছে এই পথে—ইতি-মধ্যে বেশ কয়েকটি গেছেও।

মহিলা জিজ্ঞেস করলে : কী পাখি?

মোটুষি।

বাঃ, সুন্দর নাম তো।

লোকটি বললে : মোটুষি না মোটুসি?

মোটুষি। আমার মোটুষি বলতে ভালো লাগে।

ভালো করে দেখে লোকটি বললে : এতো দুর্গা টুনটুনি।

না, দুর্গা টুনটুনি নয়। তবে তার মতো দেখতে। দেখছেন না শীতকাল এসেছে অথচ কালো রঙ। শীতকালে টুনটুনির রঙ পাটকিলে আর হলুদ রঙের হয়ে যায়। মোটুষি কখনও রং পাল্টায় না।

তা পাখি দুটো নেতিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। বাঁচবে তো?—মহিলা চোখের ভুরু কুঁচকিয়ে বললে।

খুব বাঁচবে। তবে খাবার দিতে হবে গ্লুকোজ, হরলিকস এবং ওট।

বাব্বা, এতো রাজসিক কাণ্ড! আপনার পাখিতো বাচ্চা খোকার বাড়া।

তা বলতে পারেন। গতকাল থেকে আর কিছুই মুখে তোলেনি। মধু পর্যন্ত খায়নি।

তাই বুঝি : এই বলে মহিলা গাড়ি থেকে নামল।

আমি তাদের কথা শুনছি। আর একটা গাড়ি পাখি দেখতে দেখতে চলে গেল। বাঁশির হাতে একটা খাঁচা বলেই থামেনি। কুয়াশাও বেশ জমেছে। ভোর থেকে কুয়াশা ছিল না, সাতটার দিকে একেবারে ঝাঁপিয়ে নামল।

ঘরে আর কি পাখি আছে?—মহিলা উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল।

একটা দাঁড়কাক।

দাঁড়কাক?—দুজনে একসঙ্গে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

হাঁ, দাঁড়কাক।

তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো—লোকটি একটু রেগে বললে।

ঠাট্টা করবো কেন?

দাঁড়কাক কেউ কেনে?

আমি তো বিক্রি করবো বলিনি—বাঁশির উত্তর দেওয়ার ভঙ্গী—বেশ নিস্পৃহ ও গর্বে

বাঁশির উত্তর শুনে আমি খুব খুশি হলাম। কুয়াশাও ঝরছে বৃষ্টির মতো। উত্তর দিক থেকে দল মেলে আসছে, হাওয়া নেই বললে চলে। তবে নাকে-মুখে লাগা ঝাপটা বেশ আচ্ছন্নতা এনে দেয়—ধান-ক্ষেতেও কুয়াশার ফুলকি ছুটেছে। দূরে কিছুই দেখা যায় না।

বাঁশির উত্তরে মহিলার একটু ঘা পড়ল বুঝি। লোকটিও একটু ক্ষেপে গেল।

দাঁড়কাক কি করবে শুনি?

কি পাখি জিজ্ঞেস করলেন, আমি তার উত্তর দিলাম! পাখিটা বেচব না। দেখি কি করতে পারি।

এবার মহিলা পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে বললে : ও তাই বুঝি!

দাঁড়কাক কখনও মানুষে কেনে?—তুমি মিথ্যে বলছো। হতেই পারে না, তোমার দাঁড়কাক থাকতে পারে না। কোনো মানুষ কাক পোষে এটা ভাবা যায় না। কাকের জ্বালায় শহরে টিকতে পারি না। লোকটি বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললে : লাইক, আমার কী দামী জিনিসটাই না সেদিন দাঁড়কাক চুরি করলে।

এবার বুঝতে পারলাম এ জন্যেই তার যত আপত্তি। তবে আমি ভাবছিলাম : বাঁশি দাঁড়কাক কেন ধরল, তার উদ্দেশ্য কি তা জানা দরকার।

যে বাঁশিকে ছোটোকাল থেকে দেখে আসছি, একসঙ্গে বাল্যশিক্ষা ভূগোল বিজ্ঞান পড়েছি, আজ তাকে ঠিক অচেনা মনে হচ্ছে। তার বাবা হরবোলা। আমাকে পাখি বেল এটা ওটা কর্তাকিছু যে দিয়েছে! এখন বাঁশির গাম্ভীর্য, ঔদ্ধত্য এবং কঠিন করে বলা—অথচ সব কথাই সে ভদ্রভাবে বলেছে। হয়তো সে দাঁড়িয়েছে সেই বিদেশী মহিলার জন্য, সেই মহিলার কাছে পাখি দুটি বেচবে বলে। কথা বলার ভঙ্গিতে বাঁশিকে এখন ঠিক অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

মহিলা বাঁশিকে ঠিক বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া পাখি দুটিও তার ভারি পছন্দ হয়েছে। হয়তো এজন্যেই বাঁশির হাত থেকে খাঁচা নিয়ে বললে : কত দাম?

দুশ টাকা।

লোকটি বললে : কী!

দুশ।

অসম্ভব, হতেই পারে না। সামান্য মৌটুসির দাম এতো চাও কেন? তোমাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

দুদিনে এর পেছনে কত খরচ হয়েছে জানেন? হরলিকস, কোয়েকার ওট, মধু ও গুভালাটিন কিনেছি। এই খাঁচায় জাল বসিয়েছি, যাতে পালিয়ে না যায়। হিসেব করে দেখুন কত খরচ হয়েছে। একটা পাখি ধরতে কত দিন লাগতে পারে তাও ভাবুন—কী পরিশ্রম জানেন!

দেখুন অত দামে আমরা কিনতে চাইনে। আজকাল বাঁচে কি না ঠিকও নেই।

আমাদের দুটো ভৃঙ্গরাজ পাখি ধরে দিতে পারবেন?

দেখি।

পেলে রেখে দেবেন। প্রতি রোববার আমরা এই পথে যাই।—মহিলা এবার আপোষের ভঙ্গিতে অনুনয় করলো।

ভৃঙ্গরাজ পাখি দেখেছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলে। সচরাচর পাওয়া যায় না। প্রথম যখন দেখি এই পাখি, চিনতেই পারিনি। দেখতে ফিঙে পাখির মতো, কিন্তু লেজটি শরীর থেকেও লম্বা। দুটি কালো লেজ সাত ইঞ্চির মতো লম্বা হয়ে ছড়িয়ে আছে। পাখা দুটি একবার বন্ধ করে আবার খুলে সামনের দিকে উড়াল দিয়ে চলে। আর চমৎকার ফি-চা-উ-উ-চাউই করে যখন ডেকে চলে কান পেতে শুনে থাকতে ইচ্ছে করে। সেই গভীর বন দিয়ে পথ চিনিয়ে চলছিল চাই লা প্রু। সেই ভয়াবহ যুদ্ধের দিনে চাই লা প্রু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়িতে, তার মা সেবা ও মমতা দিয়ে আমার জখম ভালো করে তুলেছিল। বনজ ওষুধে ঘা শুকিয়ে সুস্থ করে—যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনে। পাহাড়ের পথে পথে হাঁটা আশ্রয় খোঁজা—চাই লা প্রুর মা আমার জন্য বাড়ির সকলের কাছে কী ভোগান্তিই না পেয়েছিল।

বাঁশি বললে : ভৃঙ্গরাজ তো সহজে গ্রামের দিকে আসে না পাহাড়ের গভীর ছেড়ে আসতে চায় না।

শুনেছি শীতকালে আসে—মহিলা চোখ তুলে বললে।

ভৃঙ্গরাজ দিয়ে কী করবেন?

কথা শেখাবো।

—কথা?

রাখ তো তোমাদের গপ্পো, পাখিরা কথা শেখার আগেই মরে যায়। মহিলার স্বামী কুপিত হয়ে বললে।

তা হবে কেন—বাঁশি প্রতিবাদ করল।

হ্যাঁ তাই। যে সব পাখি কথা বলে তাদের বুলি ফোটার সময় বেশির ভাগ মরে যায়।

পাখিদের হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হয়। তাহলে ঠিক মরবে না।

আপনিও বেশি টাকা চেয়ে অবিচার করছেন—মহিলা বললে।

এটা অবিচার নয়। আমার বেশি খরচ হয়েছে আগেই বলেছি।

কিছু কম নিন।

না।

শেষ পর্যন্ত ওরা পাখি না কিনে চলে গেল?—গাড়ি ধোঁয়া ছেড়ে, শব্দ তুলে চলে গেলে প্রশ্ন করলাম।

বাঁশিকে বললাম : দেখলে ওরা কেমন জব্দ করতে চাইলো। তুমি লোকটির মুখের উপর জবাব দিতে পারলে না, অভদ্র ব্যবহারের প্রতিবাদ করলে না কেন?

তার কি দরকার? মহিলা ঠিক বুঝতে পেরেছে। এতক্ষণ ঠিক সেই কথাই আলোচনা করছে তারা। দেখলে না মেয়েটি কেমন করার জন্যে বললে। যাবার সময় ক্ষমা চাইলো শুনলে না?

ওটা তো অপমান করে হাত বুলিয়ে দেওয়া।

এদিক কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে। ধানের শীষে কুয়াশার বিন্দু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিলের পুকুর পাড়ের গাছগুলো উঁকি দিচ্ছে, খেজুর গাছ থেকে রসওয়ালা হাঁড়ি নামিয়ে নিয়ে গেছে সেই ভোর সকালে, ফোঁটা ফোঁটা এখনো ঝরছে—দেখতে না পেলেও অনুমান করা যায়। রাস্তার পাশের বটগাছে শালিকের ঝাঁক আর নেই, মাঠে নেমে পড়েছে ওরা। একটা দাঁড়কাক চীৎকার করে কী যেন বলে যাচ্ছে। বাঁশি চমকে উঠল। রাস্তার উপর চড়ুই পাখীরা কী যে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারাই জানে। ধানের গোছার সবুজ রঙে ভাটি ধরেছে, শীষে জল নেমেছে। আগাম লাগানো উঁচু জমিতে ধানে পাক ধরেছে। কেউ কেউ ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওদিকে টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে ছেলে-ছোকরা ভাঙ্গা টিন পিটছে। বাঁশি আবার আনমনা হয়ে যায়। বলতে শুরু করলে :

চার

একদিন পাখির ফাঁদ পেতে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। চার দিকে হাল্কা ঝোপঝাড়। গুপ্তদের বাগান। এককালে পুরো এলাকাটা জমকালো আম আর নারকেল বাগান ছিল, এখন এলোপাথাড়ি নানা গাছ উঠছে—যত্ন নেই বলে বাগানের এই অবস্থা। দুই শরিকে টানা-টানি, বড় শরিক দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছে, ছোটো শরিকের দু ভায়ের অবস্থা ভালো নয় বলে এখন রেষারেষি চলছে। বলছিলাম কি ফাঁদ পেতে সতর্ক হয়ে ওৎ পেতে আছি, পাতা ও ডালের ফাঁক দিয়ে রোদ পড়েছে গায়ে, অতিরিক্ত আঠা আর পালকগুলো পাশে রেখে চুপচাপ বসে আছি। পায়ের পাতায় দুটি লাল পিঁপড়ে কামড়ে ধরেছে, পিঠেও একটা পিঁপড়ে বা কি যেন বিড়বিড় করছে। কিন্তু নড়লেই মুশকিল। একটা আলতাপরী ফাঁদের কাছাকাছি এসেছে। পাখি ফাঁদে পড়লে খুব সতর্ক হয়ে এগিয়ে যেতে হয়। তখন যদি আগে ভাগে পাখিটি

জানতে পারে তাহলে সে ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করবে, অর্থাৎ পাখায় আরও বেশি করে আঠা লাগবে। তাহলে ফাঁদে পড়া পাখিটি বাঁচানো যাবে না। কাজেই গুঁড়ি মেরে পিঁপড়ের কামড় সহ্য করে পড়ে আছি।

ফাঁদ গাছের আগায়। আলতাপরী সচরাচর গাছের আগায় বসে, ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে। তবে পাখিটি একা কেন বোঝা যাচ্ছে না। লাল কালোর মধ্যে সোনালী মিশেলে হলুদ। তবে লাল রঙের প্রাধান্য ভারী অদ্ভুত। যেন লাল আলোর হোলি খেলা। বুলবুলির তো দুই পায়ের পেছনে লাল। এদের সারা বুকে সিঁদুরে লাল। ডানা কালো, তার উপর একটা চওড়া সিঁদুরে-লালের পট্টি উপর থেকে নিচে নেমে এসেছে, সিঁদুরে লালের গোল ছোপ আছে ডানার পালকের দ্বিতীয় স্তরের উপর। উপরের পালকের পিঠের মাঝখানে পর্যন্ত কালো। চিবুক ও গলা কুচকুচে কালো।

গান গাইছে তো গাইছে। মিষ্টি সুরেলা গলায় : হুই-টুইট ...হুই-রিরি.. হুইরিরি ...হুইটিটি প্রিটি প্রিটি সুই ইট। এমন ডাক খুব কম শোনা যায়, শীতকালে বলে কোথা থেকে এসে জুটেছে। সঙ্গী পাখিটি হঠাৎ দূরে কোথায় যেন ডেকে উঠল : প্রিটি প্রিটি সুই-ইট। বুকটা ভরে উঠল। তাহলে সহজে পালিয়ে যাবে না, ফাঁদের কাছাকাছি থেকে সহজে পালিয়ে যাবে না। ঘুরে-ফিরে আসবে। তাই বসে আছি ঝোপের আড়ালে। একটু দূরে উঁচু পাহাড় : কী মিষ্টি গান।

—বাঁশি বলছে না তো যেন গেয়ে চলেছে! আমি অবাক হলে যাই এত সুন্দর করে সে পাখির ডাক অনুকরণ করে কী করে। বাঁশি আবার বলতে শুরু করলে।

ঠিক তখনই দাঁড়কাকটা কোথা থেকে এসে গাছের নিচুডালে বসল। তো বসল আবার কাৎ হয়ে ঠোঁট বাগিয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছেও। আমাকে দেখেছে কিনা সেই জানে। হঠাৎ কর্কশ গলায় বিপদ সংকেতের ভাষায় চেঁচাল কা...কককা—অর্থাৎ ঐ আলতা-পরী। বা সাত সহেলীকে সতর্ক করে দিচ্ছে ফাঁদ থেকে? আচ্ছা ঝামেলা পাকালে তো? একবার ভাবলাম ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিই। কিন্তু তাতে তো সে যাবেই না বরং আরো বেশী চিৎকার করবে। কাকের স্বভাব হচ্ছে বিপদ দেখলে আরও জোরে চীৎকার করে আশপাশের সব পাখিদের সতর্ক করে দেওয়া। মানুষের হুমকিতে সে ঘাবড়ায় না। কী যে করি! ইতিমধ্যে সাত সহেলীর ডাক দূরে চলে গেছে। কাকটা তবুও চীৎকার করে যাচ্ছে। আগের ডাল ছেড়ে কাছাকাছি আমার মাথার উপর একটা ডালে এসে বসল। মেজাজ সত্যিই বিগড়ে গেল। জানি পাখি ধরতে এলে মেজাজ ঠিক রাখতে হয়, সব রকম অবস্থায় মেজাজ ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। তাছাড়া কাকের উপর মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। কাক কাকই। হয়তো বিড়াল কিংবা বেওয়ারিশ কুকুর দেখেছে। তাকে যত চোখ রাঙাবে ততই সে

এদিকে দেখি আলতাপরীর হুইরিরি প্রিটি-সুই-ইট ডাকও হারিয়ে গেল। গা ছেড়ে উঠলাম। পায়ের উপর পিঁপড়ের কামড়ের জ্বালা এবার ভালো মনে পড়ল, হাত দিয়ে ওদের সাবাড় করলাম। এসব পিঁপড়েদের ঐ এক স্বভাব, কিছুতেই চেষ্টা করে ছাড়ানো যায় না— যদি না তারা নিজে থেকে ছেড়ে না দেয়। উঠে পেছন দিকে ফিরলাম। আর দেখি কি হাত দশেক দূরে একটা কেউটে সাপ ফণা তুলে হিস্ হিস্ করছে।।

—বাঁশির কথা শুনে আমিও অবাক। আমার প্রশ্নের জবাব দিকে সে আবার বলতে শুরু করল।

বসা থেকে ওঠার আগে পর্যন্ত সাপের শব্দ কানেই আসেনি। আলতাপরীর গান আমাকে বিহ্বল করে রেখেছিল। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেউটে ফণা তুলে আরও বেশি ফুঁসছে—মাথার উপর চক্র, ফণার নিচের চামড়া ও পেশী ফুলছে আর কাঁপছে। এতক্ষণে বুঝলাম দাঁড়কাক আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে—আর তখনও সে ডাকছে, মাথা কাৎ করে তাকিয়ে দেখছে, একবার আমাকে আরেকবার সাপকে।

আমি সরে গেলাম। সেই থেকে দাঁড়-কাকের প্রতি আমার ভীষণ টান।

সেদিন কাকটি নিঃসঙ্গ একা। কাজেই খুব সতর্ক। একা থাকলে মানুষও খুব ভাবুক হয়, বেশি ভাবে, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে। ভেবেছি দাঁড়কাকের অবস্থাও তাই হয়েছে কিনা।

পাখিদের মধ্যে দাঁড়কাকও জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। তবে সঙ্গীর ব্যাপারে তার ভাবা ভাবনা একেবারে আলাদা—সঙ্গীর প্রতি ভীষণ একাগ্র, একান্ত অনুগত। পর পত্নীর প্রতি দাঁড়কাকের প্রেম জাগে কিনা জানি না, তবে সঙ্গীর মৃত্যু হলে সে একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে দেয়, সারাজীবন আর কোনো সঙ্গী নেয় না...সারাজীবন...একা বাকী জীবন একা একা কাটিয়ে দেয়।

—বাঁশির কথা শুনতে শুনতে আমি চুপ করে রইলাম। ভাবতেই পারিনি বাঁশি এত কিছু এমন করে বলতে জানে...দাঁড়-কাকের কথায় আমি একদম চুপ করে গেলাম। পাখিরা শত্রুর ছায়া দেখলেই বিপদ-সংকেত দেয় জানি, কাকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে দেখেছি, বিচারসভা বসায় জানি, কখনও কখনও শুধু শুধু বৃষ্টি ভেজা মাঠে একদল কাক চুপচাপ বসে থাকতেও দেখেছি, চালাকিতেও কম নয়, সবরকম বিপদে কাকের জয়, তাও জানি...কিন্তু এ কেমন ...দাঁড়কাক সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে বুঝি!

বাঁশি আবার বলতে শুরু করলে।

তারপর থেকে কাক দেখলেই ডাক দিই, খাবার দিই। এভাবে ঐ কাকটিকে প্রতিদিন খাবার দিতে শুরু করি। প্রথম দিন কোর্তার জেব থেকে বিস্কুট বের করে খেতে দিই। কাকটিও তারপর থেকে কী যেন এক মোহে দিনের বেলায় দূরে কোথাও গেলেও ঠিক সকাল বেলা উঠোনে এসে ডাকাতে থাকবে খাবারের জন্য। মা-ও অলুক্ষণে বলে কাকটি তাড়িয়ে দেয় না—ভালবেসেছে। কাক চরিত্রের খুঁটিনাটি কিছুই ভাবে না।

তবে মা অবশ্য ঠিক বলে : হ্যাঁরে বাঁশি, আজ পাখি বেচতে রাস্তায় যাবি না?

সে যাই হোক। কাকটি আমার অনেক দুঃখে সুখের অংশীদার হয়ে আমার স্নেহ মমতা কেড়ে নিল। কিন্তু আমার ভাবনা হল তাকে একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দেব। একটি কাকিনী ধরে তার সঙ্গিনী করে তার একাকীত্ব ও দুঃখ ঘুচাবো?

সুযোগ একদিন সত্যিই এলো। গত পরশুর কথা, ফাঁদ পেতেছি বনের সেই বড় শিরীষ গাছে। মগ ডালে ফাঁদ পেতে আড়ালে বসে আছি। অপেক্ষা করতে করতে পা ধরে গেছে, শেষে এক সময় একটু ঝিমুনি এল। তখনই, সেই অল্প সময়ের মধ্যে দাঁড় কাকিনী এসে ফাঁদে আটকা পড়ল। কা-কা শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল। হোকনা কাক, আমি তো ঐকটি কাকিনীই খুঁজছি। এত সহজে পেয়ে যাব আশা করিনি, আর তার উপর কাকিনী।

তাড়াতাড়ি গাছে উঠে ফাঁদ নামিয়ে আনলাম। তেল দিয়ে পাখার আঠা ছাড়িয়ে বাড়ির দিকে ফিরছি—আমার খুশি আমার আনন্দের শেষ নেই। পাড়ার অনেকে আমাকে পাগল বলে হাসল তাতে কী।

বাড়ি এসে পিঁজরার মধ্যে তাকে রাখ-লাম। কিন্তু দাঁড়কাকটি গেল কোথায়?

সন্ধ্যের আগে দাঁড়কাক কোথা থেকে উড়ে এল। কিন্তু তাকে যতই ডাকি সে চীৎকার আর হৈ-চৈ জুড়ে দিল। এডাল থেকে ওডাল ঘরের চালা, উঠোনের উপর উড়ে চক্কর দিতে প্রতিবাদ জানাতে লাগল। আমি বারবার আদর করে ডাকছি, আর ততই সে তার প্রতিবাদের ভাষা জোরালো করে আমাকে শাসাতে লাগল।

সন্ধ্যে হলে দাঁড়কাক থামল, পরদিন আমি তার আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এল না। দুপুরে গেল, সন্ধ্যের আগেও তার দেখা পাওয়া গেল না। আজ সকালও গেল তবুও তার দেখা নেই।

মা বললে : তোর পিঁজরা আমি ভাঙব, তোর কাকিনীর ঠ্যাং ভেঙে দেব। কেন তুই নিজে বিয়ে করতে পারিস না? তুই কেন বিয়ে করিস না? কাকের বিয়ে দিবি কেন?

তুমি কিছু বোঝ না মা, তুমি চুপ করতো!

বুঝি বুঝি, খুব বুঝি। ঐ দাঁড়কাক আর কোন দিন আসবে না জানিস।

মায়ের কথায় মনে পড়ল : ছায়াও আর ফিরে আসবে না কোনো দিন।

আমি প্রশ্ন করলাম : ছায়া কে রে?

বাঁশি দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে জানালে : তুমি চিনবে না, তার বিয়ে হয়ে গেছে—

মুণ্ডহীন মহারাজ

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

মুণ্ডটা হাতে লণ্ঠনের মতন, রক্তের ছিটে আলোর মতন জেবলে দেয়, ঝোপঝাড় দূর দূর বসত, সে লণ্ঠনের মতন মুণ্ডটা বাড়ির সামনে গোড়ে ফিরে যেতে থাকে ঘরের দিকে, অন্ধকারে তখন আলো নেই, হাটার ফলে একাকার হয়ে যায় তার শরীর, ঘরের দিকে লণ্ঠনের মতন মুণ্ডটা আর আলো ফেলে না, তার চোখের সামনে মুণ্ডটা সহসা উত্থিত হয়, তার শরীরময় সমস্ত জীবন ভাঙ্গাতে থাকে, সে ছুটে গিয়ে তার মেয়েমানুষকে ঘুম থেকে জাগায়, মেয়েমানুষটির চুল ও স্তন ও গ্রীবা তাকে ধাক্কা দিতে থাকে, চুল স্তন গ্রীবা তার শরীরে একাকার হতে হতে সে মেয়েমানুষটির ওপর নিজেকে সমূলে ভাঙতে থাকে, তখন লন্ঠনের মতন মুণ্ডুটা ঐ বাড়ির সামনে জ্বলতে জ্বলতে সমর্পিত হতে থাকে, তখন ঐ বাড়িটার দরজা খুলে মুণ্ডটার ভালোবাসার মেয়েমানুষটি লণ্ঠনটা দেখে, তাতে আলো নেই, সে তখন মুণ্ডটার ওপর নিজের দু-হাত সমূলে ভাঙ্গাতে থাকে।

পড়শীরা আসে, কি হয়েছে কি হয়েছে চিৎকারের অবিরত ঘোষণা চলে। তখন রতি- [illegible] মধ্যে তখন ভালোবাসার মেয়েমানুষটির মন থেকে মুছে গেছে মুণ্ডটার নাম, মুণ্ডটা দু-হাতে ধরে সমবেত জনতার দিকে সে তাকিয়ে, ভাবনার ধাক্কায় তার শরীরময় জীবন বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তার স্তন নিতম্ব গ্রীবা নিজের শরীরের মধ্যে মুছে যেতে থাকে।

সে, পেশাদার হত্যাকারী, টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করে। মানুষ খুন করা কিংবা মানুষ খুন হওয়ার দরকার, সেজন্য তার পেশা জরুরী। নানা কারণে মানুষ খুন হয়, সেজন্য তার পেশা সম্মান উদ্রেককারী। যারা নিজেরা মানুষ খুন করে না, কিন্তু খুনের দরকার আছে বলে ভাবে, তার দরকার মতন তাকে ডাকে, সেজন্য বহু মানুষের সঙ্গে তার পরিচয়, আর সে-পরিচয় ঘনিষ্ঠ। এ এক কনট্রাকট, কাজ খতম হলে টাকা। পকেটে পুরে সে ঘরে ফিরে আসে, মেয়েমানুষটিকে ওলট-পালট করে, তারপর ঘুম দেয়, উঠে সাহেব সেজে শহর চক্কর দেয়, তার ছদ্মবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের তারা তখন তাকে পাহারা দেয়। সে, পেশাদার হত্যাকারী, আর যারা তাকে দিয়ে হত্যা করায়, এভাবেই তাদের সম্পর্ক, হত্যার দুই পিঠে জোড়াতালি দিয়ে তাদের জীবনযাপন।

একবার তাকে ভার দেয়া হয় একজন মেয়েমানুষকে খুন করার জন্য। মেয়েমানুষটি স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী, অন্তত স্বামী নামক মনুষ্যটি তাই বলেছিল। আসলে স্বামী লোকটি অন্য একটি মেয়েমানুষে আসক্ত ছিল, স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে স্ত্রীর সম্পত্তি ও অন্য মেয়েমানুষটি হাতাতে চেয়েছিল। কথা মতন সে, পেশাদার হত্যাকারী, মেয়েমানুষটিকে খুন করতে গিয়েছিল। মেয়েমানুষটি শুয়েছিল চিৎ হয়ে, ঘরের মধ্যে বন্ধ বাতাস, স্তম্ভের মতন খাড়া, ঐ স্তম্ভ ফাঁক করে সে মেয়েমানুষটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েমানুষটির অবয়বে দারুণ অবহেলা, ছড়ানো দুই উরুতে বিপুল আহ্বান, স্তনের মধ্যে ঘরবাড়ি আরো দূর ঘরবাড়ির ছায়া, মেয়েমানুষটি হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে, স্বামী কিংবা স্বামী কথিত প্রেমিককে ধরার জন্য, শামলা হাতটার ব্যাকুলতা, স্তন ফেটে যাচ্ছিল জংঘা ফেটে যাচ্ছিল, নিতম্ব ফেটে যাচ্ছিল, স্তন জংঘা নিতম্ব শরীরের যাবতীয় অঙ্গ মিলে তৈরি হচ্ছিল একটি মেয়েমানুষ, রোগা পাতলা কালো মেয়েমানুষটির স্তন জংঘা নিতম্ব স্বামীর জন্য প্রেমিকের জন্য হৈ চৈ করে উঠল, প্রাচীন আসবাবের মতন মেয়েমানুষটির শরীর এবং শরীরের যাবতীয় অঙ্গ উলঙ্গ হয়ে বিছানায়, হত্যাকারীর হাত ন্যাপথালিনের গন্ধে ভরে গেল, বিপুল ধাক্কায় মধ্যে মেয়েমানুষটি বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

আর একবার তাকে খতম করতে হয়েছিল এক ব্যবসায়ীকে। পিছন থেকে গুলী ছুঁড়েছিল। সহসা শব্দটা আকাশময় ছড়িয়ে গেল, ঐ শব্দের মধ্যে ঢলে পড়ল লোকটি, পলকের মধ্যে মরে গেল কিংবদন্তীর লক্ষপতি লোকটি, তার সম্পত্তি পরিবার পরিজন সামাজিক সম্মান ঐ শব্দের মধ্যে খানখান হয়ে গেল। সে, হত্যাকারী, দৌড়ে চলে গেল বনে-বাদাড়ে, তারপর শহরে, তারপর তার ঘরের মেয়েমানুষটির কাছে, আরাম গ্রহণকারিনী মেয়েমানুষটি ও সে তখন সমস্ত শব্দকে ঠোঁটের মধ্যে ছিঁড়ে ছাড়িয়ে ভাঙ্গাচ্ছিল, তখন ঐ শব্দের দারুণ প্রতিক্রিয়া পাহারা দিচ্ছিল তার রক্ষকেরা। অথচ ঐ ব্যবসায়ীটি, কিংবদন্তীর লক্ষপতি মানুষ, তাকে দিয়ে বহুজনকে খুন করিয়েছিল। জীবিকার জন্য তার খুন করা দরকার, তার কোন দায়িত্ব নেই কারো প্রতি, তাকে সবাই ইচ্ছামতন ব্যবহার করিয়ে থাকে, তার পেশার দরকার বলে ইচ্ছাপতিরা তাকে রক্ষা করে, সেজন্য সে অধীশ্বর শহরের, যদিও ছদ্মবেশে।

আরো একবার বাজী ধরে একজন মানুষকে খুন করেছিল। আড্ডায় বসে সে ও তার সাঙ্গাতেরা। তাস, মদ, কথা কাটাকাটি, পরে বাজী : পারবে কি সে ঐ লোকটিকে খুন করতে? লোকটি হেঁটে যাচ্ছিল, রাত্রিতে একা। একটু কুঁজো, হাতে থলে জাতীয় কিছু। সে বলেছিল, পারব। তারপর রাস্তায় পেছন থেকে ছুরা টিপে

শেষ। লোকটা ভয় পেয়ে শেষবারের মতন চিৎকার করতে চেয়েছিল, অসমাপ্ত ঐ চিৎকার গলার মধ্যে মরে গিয়েছিল, সেজন্য হেঁটে যায়নি ঘরবাড়ি, মানুষজন কিংবা গাছপালা। শান্ত হয়ে নিঃশব্দে লোকটি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। চতুর্দিকে অগাধ অন্ধকারে লোকটি সরল রেখার মতন শুয়ে, পাশের শিরিশ গাছের ডালপালা ঐ মুখে ছড়িয়ে দিয়েছিল চাঁদহীন নৈঃশব্দ ও আলোহীন আভা। সে, একবার পিছন ফিরে নিজের রচিত কর্ম দেখে ধীরেসুস্থে হেঁটে চলেছিল, পিছনে ধাওয়া করেনি অন্ধকার কিংবা মনস্তাপ, ধীরেসুস্থে এসেছিল আস্তানায়, বলেছিল : এবার।

এভাবে সে বহু মানুষকে খুন করেছে, দিবালোকে কিংবা নক্ষত্রের আলোকে, মেয়েছেলে কিংবা পুরুষ, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, এভাবে সে হত্যার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। নিমজ্জিত হতে হতে বগলবুকনাভি প্রকাশ মেয়েমানুষ আর পকেটে রুমাল ও কনট্রাসেপটিভের প্যাকেট ভর্তি পুরুষমানুষ একাকার, দৃশ্যত সমস্ত কিছু তার কাছে ক্লেদজ কুসুম কিংবা কিছু নয়, জীবিকার নির্বিকারত্ব তাকে করে তুলেছে সবার কাছে ভয়ংকর। সেজনাই তার খুনে বাহু প্রসারিত করে অগ্রসর হয়, দখল করে বাড়ি বস্তী একতলা দোতলা, প্রস্ফুটিত স্থির হয়ে থাকে, এভাবেই কোনদিনও খুনের মৌলিকত্ব ফুরোয় না, সেজন্য সব খুন মিলে তৈরি হয় সে. একজন মানুষ, সে ছাড়া আর কেউ জীবনের যোগাযোগের সূত্রধর নয়। যোগাযোগ অর্থাৎ একজনকে খুন, দল বেঁধে দাঙ্গা কিংবা গণ-অভ্যুত্থান, যেখানে মানুষ মারা হয়, মানুষ মারতেই হয়, ঐ সবের প্রয়োজনে। সেজন্য তার লোমশ কবজিটার নিচে সমস্ত শহরটা অবিরত থরথর।

মধ্যখানে যুদ্ধ নামক স্বাধীনতা পরাধীনতার একটা ব্যাপার শুরু হয়। তাতে সে যোগ দেয়, দিতে হয় প্রাণ বাঁচাবার জন্য, কর্তারা তাকে বোঝায় যুদ্ধ করাটা আবশ্যক। স্বাধীনতা নামক কুসুম কোটে পরবার জন্য। যুদ্ধ অর্থাৎ বদজনকে হত্যা করা, দেশপ্রেম নামক একটা বস্তু নাকি কোথাও থাকে, [illegible] সত্তা গুমতে চলে [illegible] দরকার। অতশত বোঝেনি, সে নেমে যায় যুদ্ধে, লোককে আগেও মেরেছে, এখনও মারে, মারতে ভালোই লাগে, সে উর্দিপরা কিংবা উর্দিহীন যাই হোক। কর্তারা আগের মতন মেয়েমানুষের গন্ধ শুঁকে বেড়ায়, বাণিজ্য করে। সে আগের মতন লোক খুন করে, এবার তার নাম যুদ্ধ। একটা সৈন্য, শত্রুপক্ষের, তাকে বিপাকে ধরে ফেলে সে। উর্দিপরা লোকটা কাঁদে, তার হাতের আগেকার লোকদের মতন। দেশপ্রেম তার বুকের মধ্যে রী-রী করে ওঠে. ঐ লোকটাকে খতম করলেই দেশটাতে শান্তি আর [illegible] আর দুধের ভান্ড অফুরান থাকবে, ভেবেই সে তাকে খতম করে দেয়, তার মাথার মধ্যে [illegible]ভো করে ওঠে : দেশ এভাবেই শান্তির দিকে [illegible]

আমরা সব আছি। নদীতে ইলিশ, গরুর বাটে দুধ, খেতে ভরভরন্ত ফসল : ভেবে ভেবে শত্রুকে সে টুকরো টুকরো করে, অদৃশ্য গ্রামসকল তাকে ঘিরে ধরে, ছেলেবুড়ো মা-জননী বাপসকল খুশিতে হাততালি দেয় : এবার কামের কাম হল, আর থাকবে না গো, শত্রু আর খাবে না গো ইলিশের ঝাঁক, দুধের বাট, ভরভরন্ত ফসল. শুনছ গো মা-জননীরা, সুসন্তানেরা এসে গেছে। এসব ভাবনা তাকে তৃপ্ত ও স্নিগ্ধ করে, সে সুসময়ের কথা চিন্তা করে রাইফেলটা কাঁধে তুলে হাঁটতে থাকে। রুক্ষ চুল চোখ ঢেকে দেয়, হঠাৎ হঠাৎ বাতাস চুল নিয়ে রোদ ঢাকে। রোদ ভর্তি মাঠে, তার মধ্যে সে হাঁটতে থাকে। বাঁ দিকে ধুধু গ্রাম, ডানদিকে চিকচিক নদী। ঐ ধু-ধু থেকে আর একটা শাদা উঠে আসে, তারপর দেখে গ্রামটা আর নদীটা পরস্পর ঘুরছে, ডানদিকে আর বাঁদিক ঘোরার ফলে গুলিয়ে যায়, সে কখনো বাঁয়ে গিয়ে বাঁয়ে আর যায় না. ডাইনে গিয়ে ডাইনে আর যায় না, সে তাহলে কোথায় যায়, ভাবতেই রোদের মধ্যে একটা গাছ লাফিয়ে উঠে ডালপালা ছায়া ছড়িয়ে দেয়, সে ছায়ার মধ্যে শুয়ে পড়ে, আকাশটা নেংটা হয়ে ভাসে তার চোখে। রোদ ঝিকমিক করে, বাতাস হেঁটে বেড়ায়, তার চোখে ছায়া ঘোরে, ঘুমের মধ্যে সে চলে যেতে থাকে, লম্বা এক করিডোরের মতন, আস্তে আস্তে সে পৌঁছায়, মা-জননী আর বাপ-সকল তাকে ঘিরে ধরে, সে চেঁচাতে থাকে : আমরা তোমাদের সুসন্তান গো বাপসকল মা-জননীরা, বলতে বলতে ঘুমের মধ্যে সে অসহায় হয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন যুদ্ধ নামক স্বাধীনতা-পরাধীনতার ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়। ফিরে আসে সে, মানুষ মেরে মেরে বজ্র বিদ্যুৎ আর অহংকার ফুটে আছে তার মুখে। সবাই কেমন পাগল হয়ে যায়, তার পেশাটার কেউ উল্লেখ পর্যন্ত করে না। দিনের শুরু থেকে রাতের মধ্য পর্যন্ত সবাই রাস্তায়। চেঁচায় আর চিৎকার করে, ফুলের মতন কথাসকল ছুঁড়ে দেয় আকাশে, সেখানে পৌঁছে কথাসকল স্থির হয়ে থাকে। বাংলাদেশ নতুন বাংলা হয়ে যাবে গো মা-জননীরা বাপসকল। সেই স্বপ্নটা তার চারপাশে হরিণের খুরের শব্দের মতন ছুটে যেতে থাকে : তার শরীরের ভিতর মনের ভিতর ডেকে ওঠে স্বপ্ন, শত্রু সৈন্যের রক্তের মতন তার চেতনা জুড়ে নেমে আসে নিঃশব্দ বৃষ্টি : যতদূরে চোখ যায় সুসন্তানেরা এসে গেছে গো।

এরমধ্যে একদিন জনরব শুনে সবার সঙ্গে সেও ছুটে যায়, দেখে জলার মধ্যে শুয়ে আছে, ধু ধু ফাঁকার মধ্যে চিৎ হয়ে কাৎ হয়ে উপড়ু মানুষেরা। এলোমেলো ছেঁড়া জামা প্যান্টে ঢাকা পা, আঙুলে আঁকড়ে ধরা সমস্ত মাটি, এক একটি মানুষ কেমন নির্জন হয়ে পড়ে আছে রায়ের বাজারে, তার মনে হতে থাকে এরা সব, মুণ্ডহীন মহারাজার দল, এদের মেরে শত্রুরা

এরা বেঁচে উঠছে জিন্দা মানুষের ব রায়ের বাজারে দশ, মীরপুরে তিরিশ, গ্রামে সাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নয়, পাব রংপুরে ময়মনসিংহে সর্বত্র যদি লাশ থাকে তাহলে? মানুষ কেমন অসহায় ধারিতভাবে মরে যায়, শত্রুরা জবাই খায় মানুষদের। একটা মহারাজ জলার ম তলিয়ে গেছে, মুণ্ডটা নেই শরীরে, কোথ গেছে মুণ্ডটা, কোথায়, তার চোখ চিৎক করতে থাকে, জলার মধ্যকার থিকথিক পা আর প্যাচপ্যাচে কাদা ঠেলে দুর্গন্ধ ভে উঠতে থাকে, তার চোখ মুণ্ডটা খুঁজে পা না, মহারাজটার মুণ্ডটা শত্রুরা নিয়ে গেছে গো, তার চোখ চিৎকার করে করে একসম ক্লান্ত হয়ে যায়, মুণ্ডহীন মহারাজের দল তাকে ঘিরে শুয়ে থাকে।

তার পেশার আর দরকার নেই ভেবে অন্য পেশা খুঁজতে থাকে। কিন্তু অন্য পেশা চট করে জোটানো যায় না, তার জন্য দরকার অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসের। মানুষ খুন করার পেশা তাকে অভিজ্ঞতা দিয়েছে, তাকে অভ্যস্ত করে তুলেছে, খুনের নানা উপায় উদ্ভাবন সে করেছে। অন্য পেশা কিছুতে খুঁজে পায় না। যেখানে যায় প্রথম প্রশ্ন : 'আগে আপনি কি করতেন?' 'যুদ্ধ করতাম।' জবাবটা সন্তোষজনক নয়, সেজন্য ফের প্রশ্ন : 'তারও আগে?' 'কিছু একটা করতাম।' 'আমাদের জানা দরকার আগে আপনি কি করতেন, তার থেকে বুঝব আপনি কি করতে পারেন, আমরা আপনার ক্ষমতার সীমা মেপে আপনার উপযুক্ততা ঠিক করব। যোগ্যতা আগের পেশা থেকে তৈরি হয়। ধরুন আমরা : আমরা শাসন চালিয়ে অভ্যস্ত, সব রাজত্বে চালাব, যোগ্যতা তৈরি হয়েছে বলে কেউ আমাদের ঠেলতে পারে না। আমরা আছি, সেজন্য আমরা থাকব।' বক্তৃতাটা তাকে রাগিয়ে [illegible]লে, দাঁত খিঁচোতে ইচ্ছা করে, বলবে নাকি : তোমাদের মতন হারামজাদাদের জবাই করতাম, একটা বাড়ি মারলে তোমার মাথা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, মাথার বড়াই করছে, জানো মাথা কিছু রুখতে পারে না একটা বাড়ি, ব্যস, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, মানুষের মাথা কেটে কেটে মানুষের মাথার জ্ঞান আমার হয়েছে, তোমরা চেয়ারেবসার-দল, তোমরা কিছু জানো না।' পেশা খুঁজে খুঁজে সে হয়রান হয়ে যায়, সে খেপে যেতে থাকে, সবাই মিলে তাকে পুরানো পেশা বারবার ফিরে দিতে থাকে, অন্য পেশা পেলে নাকি একটা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি হবে।

তারপর সে নিজের পেশায় ফিরে আসে। একটা দুটো মানুষ মারে, ভালোই কাটতে থাকে, মড়াগুলি জমতে থাকে মাঠে কিম্বা শহরের রাস্তায়, ধানের গোছার মতন কোলে করে পরে তাদের সরিয়ে দেয়া হয়। শহরের রাস্তার মড়া, মেরে সে ফেলে দেয়। দেখে নিখুঁতভাবে কারা এসে মড়া সরিয়ে নেয়, শহর পরিচ্ছন্ন থাকে। মাঠের মড়া পরে থাকে, শেয়াল [illegible]

হয় ধানের গোছা। যারা কোদাল চাপা দিতে চায়, দিক। সে খুন করে দেখেছে, যুদ্ধ করে দেখেছে, আসলে মড়া, মড়াই অন্ধকারে ধীরেসুস্থে মরে থাকে, জ্যোৎস্নার মধ্যে হা করে থাকে, ওরা না চাঁদের না অন্ধকারের, ওরা শুধু মড়া, খুন করার পর শব ব্যবচ্ছেদ তার এক্তিয়ার নয়, তা রাষ্ট্রের, সমাজের দায়দায়িত্ব, তার পেশার আওতায় ওসব পড়ে না। রাষ্ট্রের দায় মড়ার সঠিক তালিকা তৈরি করা, সমাজের দায় মড়ার খবর পেলে মিছিল করে শবযাত্রা করা, কিন্তু যে-খুন করে তার কোন দায় নেই, সে কি সমাজ থেকে স্খলিত হয়ে যায়, কিংবা রাষ্ট্র থেকে তার নাম কাটা যায়? ছুরির ফলায়, টাঙ্গির কোপে, বন্দুকের গুলীতে মড়ারা মরে থাকে, তার কর্তব্য মড়া বানানো, জ্যান্তকে মড়া করে তোলা। মধ্যে মধ্যে স্বপ্নটা হরিণের খুরের মতন তার চারপাশে শব্দ তোলে, মা-জননীরা বাপসকল ঘিরে ধরে, সুসন্তানদের কেবল খোঁজ নেই, স্বপ্নটা দাপিয়ে ওঠে ফের নিঃশব্দ হয়ে যায়, নৈঃশব্দের মধ্যে হরিণের খুর আর শব্দ তোলে না, শব্দটা খুঁজে খুঁজে সে চোখ জীর্ণ করে ফেলে।

এর মধ্যে কর্তারা তলব পাঠায়। কি ব্যাপার? সে যায়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কর্তাদের একজন বলে, 'শুনেছিলাম পেশা বদলের চেষ্টা করছ। পেশা কি বদল হয়? আমার পেশা কি আমি বদল করতে পারি?' কর্তাদের অন্যজন বলে, 'তা তোমার দরকার আছে। সেজন্য ডেকেছি।' কর্তাদের অপরজন বলে, 'মড়া দরকার। মড়া থাকলেই ভয় থাকে। ভয় থাকলেই মানুষের মাথা থাকে। মানুষের মাথা থাকলেই ভয় থাকে। ভয় থাকলেই মানুষের মাথা থাকে। মানুষের মাথা থাকলেই মাথা বাঁচানো থাকে। সেজন্য মাথা কাটা দরকার।' একজন বলে, 'তাহলে তাই ঠিক।' অন্যজন বলে, 'আজ থেকেই শুরু কর।' অপরজন বলে, 'তালিকা তৈরি। অ, আ, থেকে সব, ক খ গ ঘ থেকে সব।' একজন বলে, 'শুরু কর জ থেকে।' অন্যজন বলে, 'মাথা কেটে ওর ভালোবাসার মেয়েমানুষটার সামনে রেখো।' অপরজন বলে, 'মেয়েমানুষটার সামনে লণ্ঠনের মতন জেবলে রেখো। তখন ভয় পাবে, ভয় দরকার।'

হুকুমনামা হাতে করে সে বেরিয়ে আসে। হুকুমনামার প্রথম অক্ষর জ। মুণ্ডটা হাতে ধরে সে হাঁটে। মুণ্ডটা হাতে লণ্ঠনের মতন, রক্তের ছিটে আলোর মতন জেবলে দেয় ঝোপঝাড় দূর দূরে বসত, সে লণ্ঠনের মতন মুণ্ডটা বাড়ির সামনে গেড়ে ফিরে যেতে থাকে, অন্ধকারে তখন আলো নেই, হাঁটার দরুণ একাকার হয়ে যায় শরীর, ঘরের দিকে লণ্ঠনের মতন মুণ্ডটা আর আলো ফেলে না, তার চোখের সামনে মুণ্ডটা সহসা উত্থিত হয় আগ্রাসী, তখন মাটির নীচে সমস্ত গণ-কবরে মৌলিক মৃত্তিকার মধ্যে মুণ্ডহীন মহারাজেরা নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকে, সেখান থেকে

হে আনন্দ

রাহাত খান

কক্সবাজার, বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে বিকেলের আলোয় সমুদ্র দেখল তৈফুর। কিছুক্ষণ আগে ঝাড়া একটা ঘুম দিয়ে উঠেছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অসীম অতল ইত্যাদি খোঁজার চেষ্টা করল। ঠিক মিলল না। নীল বারিরাশি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছিল অসংখ্য গাঙচিল। ইংরেজীতে বলে সোয়ালো বার্ড। বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় পাখিগুলি। এছাড়া আকাশে অসংখ্য পায়রাও ছিল। হাই উঠছিল তৈফুরের। বিশেষ কাতরতা না দেখিয়ে হাঁটা দিল সে হোটেল-এর দিকে। উপলের মোড়ে এসে রিকসা পেয়ে গেল। তারপর সোজা হোটেলের দোতলায় নিজের ঘরে।

এই ভাল, এই একলা একটা ঘর, নরম বিছানা আর নির্জনতা। লুঙ্গি পরে বিছানায় ডাইভ দেয় তৈফুর। তারপর টেনে নেয় 'উইন্ডফল' নামে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত একটা ইংরেজী উপন্যাস। সতেরো পৃষ্ঠা পর্যন্ত আগেই পড়েছিল, বাকীটা পড়তে শুরু করে।

পড়ার সুখের জন্য উপন্যাসটা চমৎকার। গল্পের নায়ক দরিদ্র এক অঙ্কনশিল্পী, লন্ডনের শহরতলীতে বসবাস। তার আঁকা ছবি দুর্বোধ্য বলে একদম বিক্রিটিক্রি হয় না। এক দূরে সম্পর্কীয়া পিসী আছেন, বড়লোক, [illegible] প্রত্যেক মাসে কিছু শুকনো খাবার পাঠান পার্সেল করে, ঐ সম্বল এবং বড়লোকের মধ্যবয়স্কা স্ত্রীদের ডিসকোটিকা এ ফ্লোরড্যান্সের তালিম দিয়ে কিছু জোটে, ঐ পুঁজি দিয়ে কোনমতে তার চলে। বন্ধু ও পাড়া-প্রতিবেশী সবার কাছে সে হাসির পাত্র। দমবার ছেলে সে নয়, প্রতিদিনই ছবি আঁকে সে, স্বপ্ন দ্যাখে কোন একদিন তার এই প্রায়ান্ধকার ছোট ঘরটি দুনিয়ার তাবত শিল্পীদের তীর্থে পরিণত হবে।

ইতিমধ্যে তার অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। একটাই তার স্যুট, গোটা দুই জামা এবং উপার্জন কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে সপ্তাহে চার পাউন্ড। পরের দিন কি খাবে এই আশঙ্কায় ছবি আঁকতে আর বসতে পারে না, হাত কাঁপে। ঠিক এসময় আমেরিকা থেকে ক্যাথরিনা পিসীর বিরাট এক টেলিগ্রাম এলো। পিসী তাকে আমেরিকায় যেতে লিখেছেন। ব্রিটিশ এয়ার-ওয়েজের জিম্মায় তার টিকিট আছে, ইচ্ছে হলে যে কোনদিন সে চলে আসতে পারে।

চিঠি তো নয়, স্বর্গ পাওয়া। সে তার ঘরটা তার চেয়েও গরীব এক শিল্পী-বন্ধুর খবরদারিতে রেখে আমেরিকাগামী ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের প্লেনে চড়ে বসল। এই তার প্রথম প্লেনে চড়া, এই তার এতখানি বয়সে প্রথমবয়েসের মত [illegible] নিউইয়র্কের বিমান বন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানাল পিসীর সেক্রেটারী। বিরাট গাড়িতে চড়ে ঐশ্বর্যে ঝলমল নগরীর রাস্তা পার হয়ে পিসির বাড়িতে পৌঁছল এডওয়ার্ড। বাড়িতে ঢুকেই সে বুঝল পিসী যে কত বড়লোক এই চিন্তা কোনদিনই সে করেনি। করলে বিস্ময়ের মাত্রা একটু কমত।

পিসির আশির ওপর বয়স হয়েছে। চারবার বিয়ে করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরলোকগত স্বামীরা ডার্লিং ক্যাথারিনার জন্য বিশাল সম্পত্তি ও সুন্দর স্মৃতি রেখে গেছেন। পিসী সেই ১৯২৯ সালে নিজের দেশ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, সেই শেষ যাওয়া। তার ধারণা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের অর্ধেক দখল করে নিয়েছে হিটলারের জার্মানী এবং ইংল্যান্ডে এখন মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এডওয়ার্ড বেশ বলশালী স্বাস্থ্যবান যুবক, পিসী ধরে নিলেন সেও জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। এডওয়ার্ডকে পিসী জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁরে, কটা ফ্যাসিস্ট মেরেছিস খোকা? এডওয়ার্ড এই প্রশ্ন শুনে একটু গম্ভীর হয়ে 'ওয়েল' বলে শুরু করার উপক্রম করতেই বুড়ী গলগল করে হেসে গর্বের সাথে মাথা নেড়ে বলেন, 'থাক, বাপু বলার কিছু দরকার নেই। তোর চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি কি রকম সাহসী আর দেশপ্রেমিক ছেলে তুই।' এরপর ইংল্যান্ডের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে তীব্র ও তীক্ষ্ণভাষায় ঝাড়া আধঘন্টা পিসীর বক্তৃতা। যাহোক দিন দুই পর ছিল পিসীর একাশিতম জন্মদিন, ঐ উৎসবে প্রচুর মিষ্টি পিঠা খেয়ে পিসী যারপর নাই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরের দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মারা যান। তার বাড়ি, সম্পত্তি, অফিস সবই চলে গেল ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে ফলে বাড়ি ছাড়তে হল এডওয়ার্ডকে। পকেটে তখন সম্বল সেই লন্ডন থেকে নিয়ে আসা পাঁচ পাউন্ডের একটি নোট। একবারে অসহায় তখন সে মহানগরীর রাজপথে। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর একটি রেস্টুরেন্টের ক্লোকরুমে চাকরি পেল, কোট, কার্ডিগান টুপি দেখাশোনার কাজ। এই ক্লোকরুমে দেখা হল লালচুলো এক যুবতীর সঙ্গে। উন্নতবক্ষা, সুঠাম শরীরের এই যুবতী আড়চোখে বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করল এডওয়ার্ডকে। এত চুপচাপ থাক কেন? মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করে। একদিন বলল, 'আমি মস্ত এপার্টমেন্টে একাই থাকি, ইচ্ছে করলে তুমি এসে আমার সঙ্গে থাকতে পার।' প্রস্তাব শুনে এডওয়ার্ডের বুকে রক্তস্রোত উন্মাতাল হয়ে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে সে ঠান্ডা গলায় বলল, 'তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ, আমি আমার হোটেলের ঘরে বেশ আছি।'

এডওয়ার্ড মুখে তো বলল, 'বেশ আছি কিন্তু ক্লোকরুমের চাকরি তার জন্য দুঃখ ও ক্লান্তির বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। রেস্টুরেন্টের চেকার, -একটা ইতর ও গুন্ডা-

করতে চাইত. চুরিচামারি কিছু করে কিনা জিজ্ঞেস করতে, এডওয়ার্ড একদিন রাগ করে চাকরিই ছেড়ে দিল। অফিস থেকে রাস্তায় নেমে দেখল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে। রাগে দুঃখে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল এডওয়ার্ডের, কেন মরতে লন্ডন ছেড়ে আমেরিকায় এসেছিল! বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ফিরল সে হোটেলে, লবি দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল পিসী ক্যাথরিনার সেই সেক্রেটারী ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রলোক এডওয়ার্ডকে একটি সুংবাদ দিলেন। মিসেস ক্যাথরিনার উইল পরীক্ষা করে দেখেছেন ট্রাস্টিবোর্ড, উইলে ভাইপো এডওয়ার্ডের জন্য পিসী নগদ অর্থ রেখে গেছেন, অর্থের পরিমাণ দশ লক্ষ ডলার।

'উইন্ডফল' উপন্যাসের এই পর্যন্ত পড়ে তৈফুর সিগারেট ধরালো। ঘরে আলো জ্বলছে, জানালার পর্দা দুলছে হাওয়ায়, ট্রাম্পেটে একটা কোন উদ্দাম সুর যদি বেজে উঠত নেপথ্যে তাহলে সময়টা পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু বাজনার কোন ভবিষ্যত নেই, বোঝা যায় বাইরে বেশ অন্ধকার এবং কক্সবাজার এরই মধ্যে খুব চুপচাপ হয়ে পড়েছে। তৈফুর বিছানা ছেড়ে ওঠে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। কক্সবাজারে এসেছে সে আজ সকাল বেলা। সমুদ্র নয়, নিসর্গ নয়, সঙ্গিনী নয়, সঙ্গীত নয়, বিশেষ কোন কিছুর আকর্ষণেই সে ঢাকা থেকে কক্সবাজার আসেনি। যদি সমুদ্র বা নিসর্গ বা সঙ্গিনী তাকে এই নির্জন বসবাসের সময় হাতে কিছু তুলে দেয়, আপত্তি নেই। পকেটে আছে পনের দিনের ছুটি। হিউজ পুঁজি।

খোলা উপন্যাসটা বিছানার পাশে রাখা, খাওয়ার আগে আরেকবার বিছানায় ডাইভ দিয়ে পড়বে কিনা ভাবল তৈফুর, ঠিক এ সময় দরজায় করাঘাত। ইংরেজীতে 'কম ইন' বলল তৈফুর, তখন ভেজানো দরজা খুলে পাকিস্তানী সিনেমার টাইপ মুন্সী চরিত্রের মত হে' হে' ভাবটি নিয়ে ঘরে ঢুকল হোটেলের ম্যানেজার। বিরক্ত করতে এলাম ইত্যাকার ভূমিকা-টুমিকা দেওয়ার পর ম্যানেজার যা বলল তার মর্মার্থ 'উইন্ডফল' উপন্যাসের সঙ্গেই শুধু মেলে। তেমনি অবিশ্বাস্য ও বর্ণালী। এক আমেরিকান টুরিস্ট মহিলা এসেছে বেড়াতে, ওঠেছেন এই হোটেলে দিন দুয়েকের জন্য, তার একজন গাইড চাই। টুরিস্ট ব্যুরোর অফিসে চেষ্টা করা হয়েছিল, ওরা কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল : স্যার আপনার কি সময় হবে?

বাঃ, কি সুন্দর সম্ভাবনা! তৈফুর মনে মনে রোমাঞ্চিত, বলল : পয়সা কড়ি দিলে রাজী না হওয়ার কি আছে? মালদার আদমী তো নাকি ফোকটে আসা টুরিস্ট?

মহিলার অল্প বয়স। পঁচিশ হবে কিনা সন্দেহ। 'উইন্ডফল' উপন্যাসে বর্ণিত সেই ক্রোকরুমের যুবতীর মত লালচুলো। দীর্ঘকায়া। রফা হল ঘন্টাপিছু দশ ডলার। প্রস্তাব শুনে তৈফুর ভাবল আমি বোধ হয় বেশীদিন বাঁচব না। ছুটি কাটাতে কক্সবাজার এসে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে শ'দুয়েক ডলার অন্ততঃ পকেটে নিয়ে ঢাকায় ফিরছি। উঃ, গড!

রাতে সাগরিকায় খাওয়া। কাল থেকে চাকরি শুরু, আজ থেকে বন্ধুত্ব, এই রকম একটি রসিকতা নিজেই করল ডরোথি। বেশ বাচাল মহিলা, খোলাখুলি বলল আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছে। গত দু-মাসে ইসরাইলে ছিল, তেহরানে ছিল, মাদ্রাজে ছিল, এখন ঢাকা হয়ে চিটাগাং হয়ে কক্সবাজার: হাতে আরও এক মাসের ছুটি, ঢাকা থেকে যাবে বার্মা, পরে কুয়ালালামপুর, সম্ভব হলে জাকার্তা ও সেখান থেকে ফেরৎ শিকাগো নিজের শহরে।

খেয়ে-টেয়ে যার যার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ওপরে বারে নিয়ে যায় ডরোথিকে। 'তোমার জন্যে কি দিতে বলব' জিজ্ঞেস করলে, ডরোথি হাসে, বলে, আমি তো মদ লিকার ছুঁই না।

: সত্যি?

: হ্যাঁ, ড্রাগ খুব চলত এককালে। কিন্তু ড্রাগে কোন আনন্দ নেই। শুধু শুধু

জীবনটা ভারাক্রান্ত হয়! অতি কষ্টে অভ্যাসটা ছেড়েছি। বেশ ভাল আছি। তুমি খাও।

তৈফুর তিন ক্যান বিয়ার সাবাড় করল। বাইরে এসে ডরোথি বলল, আমার ডিস-পোজেলে একটা গাড়ি আছে, ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছি। নিজেই চালাব। কাল সকাল ন'টা থেকে বেরুব, তৈরি হয়ে থেকো। আজ এখানেই বিদায়।

তৈফুর বলল : হোটেলে ফিরবে না?

: ফিরব। তার আগে একটু ঘুরব সী-বীচ ধরে। একা। গুডনাইট।

ডরোথি হাসল। তারপর অন্ধকার সী-বীচ ধরে হাঁটতে লাগল। তৈফুর ভাবল আই বাপ, কি খতরনাক ব্যাপার, কার পাল্লায় পড়লাম। শেষ পর্যন্ত কে জানে। সে উল্টোপথ ধরে সমুদ্র তীরে কিছুক্ষণ ঘুরল। হৃদয় উদ্বেল করে, এমন কিছুরই সাক্ষাৎ সে পেল না। সমুদ্র ছিল শান্ত। অর্ধ বৃত্তের মত সমুদ্র আগলে আছে পাহাড়ের একটা ছোট রেঞ্জ, তার উপর আবহাওয়া অফিসের বাড়ি সেই বাড়ি বার বার লাল নীল সংকেত দিচ্ছে। কিছুক্ষণ ঘুরেটুরে হোটেলে ফিরে এল তৈফুর। কাউন্টারে ম্যানেজার তখনো ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করল, এই মহিলাটি সম্পর্কে কতটুকু জানেন?

: কিছুই জানি না স্যার। টুরিস্ট ব্যুরোর চমৎকার সব হোটেল ছেড়ে আমার এই হোটেলে কেন উঠলেন তাও খুব আশ্চর্য ঠেকেছে। আরেকটা কথা বলি স্যার, মহিলা আপনাকে দেখেছেন আজ বিকেলবেলা। তিনিই জিজ্ঞেস করে রাখতে বলেছিলেন, আপনি তার গাইড হতে রাজী আছেন কিনা।

: সাবধান থাকবেন এই মহিলা সম্পর্কে। ব্যাপারটা বেশ মিস্টিরিয়াস লাগছে।

এই বলে তৈফুর ওপরে বেশ ছিল সে এতক্ষণ, ডরোথির প্রবেশ তাকে একটু ত্যক্ত করে দিয়েছে।

সকাল বেলা ডরোথিকে নিয়ে তৈফুর গেল কক্সবাজার থেকে পনর মাইল দক্ষিণে। পাহাড়ী একটি গ্রামে মগদের পাড়ায়। এক-একটা পরিবার নিয়ে মগদের এক-একটা বাড়ি। মাচার ওপর থাকার ঘর। নিচে তাঁত চলছে, চুরুট বানানো চলছে। মগদের সম্পর্কে একটা মোটামুটি বর্ণনা তৈফুর দিতে পারল। ডরোথি একটা কথাও বলল না, মগদের মন্দিরে গিয়ে বৌদ্ধ মূর্তির সামনে সে বসল নতজানু হয়ে, প্রণামের ভঙ্গিতে হাত দুটি জোড় করল। প্রার্থনার কিছু ভাষাও উচ্চারিত হল, চেনা যায় না এমন একটি শান্ত সম্মোহন তার চোখে-মুখে। বহুক্ষণ এভাবেই কাটল, বৃদ্ধ পুরোহিত পর্যন্ত থমকে গেলেন ডরোথির প্রার্থনার ঋজু সুন্দর ভঙ্গিটি দেখে। তৈফুরের একটু বিরক্তিই লাগল, তবে ঘন্টা হিসেব করে যখন দেখল চার ঘন্টা প্রায় যায়। তখন খুশী হল, যাক বাবা, আর কিছু না হোক, কিছু বৈদেশিক মুদ্রা তো কামানো গেল ফোকটে।

হোটেলে ফিরে এসে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিশ্রাম নিল ডরোথি, তৈরি হয়ে বেরুল সাড়ে পাঁচটায়। আজ পরেছে মগদের মত খাকী পোশাক, কাঁধে ঝুলানো কাপড়ের ব্যাগ। গাড়ি পার্ক করল লাবণীর কাছে। তারপর ছুটে গেল সী-বীচের দিকে। তৈফুর ভাবল কে জানে হয়ত খেলাধুলো করার ইচ্ছে বেটির। একটা [illegible] করা ভাল, কপাল খুলে যেতে পারে। সেও তখন দৌড় লাগায়।

ডরোথি তার জুতো খুলে ব্যাগে ভরে নিয়েছে ইতিমধ্যে কে যে অনুপ্রেরণা দিল তাকে, দৌড়তে লাগল—সী-বীচ ধরে দক্ষিণে। দৌড়চ্ছে ডরোথি, সূর্য খুব রক্তিম হয়ে আছে সবুজ পাহাড়ের বেড়ের ভেতর, ঝাউবন দুলছে, ফুলে ফুলে উঠছে সমুদ্রের ঢেউ এবং কূলে এসে একরাশ আনন্দের ঝংকার তুলছে সোচ্ছ্বাসে। তৈফুরের পায়ে জুতো, দৌড়তে পারছে না ভালরকম তবু, ডরোথিকে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। ডরোথি দৌড়ুচ্ছে। আশ্চর্য গান গাইছে হাসছেও, এত আনন্দের সন্ধান সমুদ্রের বেলাভূমিতে কোথায় সে পেল, তৈফুর বুঝতে পারে না। শেষে হাল ছেড়ে সে দাঁড়িয়ে যায়। হাঁপাচ্ছিল একটু একটু। ডরোথি ডরোথি বলে কিছু চিৎকারও সে দিল পেছন থেকে। কেউ শুনল না। কেউ ফিরে এল না।

রাত ন'টায় সাগরিকায় খেতে যাওয়ার সময় তৈফুর জিজ্ঞেস করল, ডরোথি, কদিন তুমি এখানে আছ?

: তা তো জানি না। যদ্দিন ভাল লাগে।

: কি তোমার ভাল লাগে একটু বুঝিয়ে বলতে পার? প্লিজ।

ডরোথি বলল, টায়ফুর, এক একটা ঢেউ আমার কাছে আসে। কখনো শিশু, কখনো গাছপালা, কখনো সমুদ্র, কখনো প্রেম বা নিসর্গ আমার কাছে পাঠায় এই আনন্দ।

: কত আনন্দ সঞ্চয় করেছ?

: অনেক আমার ঝুলি ভর্তি। কিন্তু আরো আনন্দ চাই।

রাত্রে এসে তৈফুর ডরোথির উদ্দেশ্যে একখানা চিঠি লিখল : প্রিয় ডরোথি, আমি কাল চলে যাচ্ছি কক্সবাজার ছেড়ে। তোমার কোন গাইডের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার এভবে চলে যাওয়ার জন্য তোমার কোন অসুবিধা যদি ঘটে, তাহলে দুঃখ প্রকাশ করছি ও ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা নেই, সুতরাং টাকা পয়সার ব্যাপারটা একেবারেই অবান্তর।

সকালবেলা এই চিঠি কাউন্টারে রেখে হোটেলে চেক আউট করে তৈফুর বেরিয়ে পড়ল। রিকসা করে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ সমুদ্রকে দেখল। শিউরে উঠল সে। মন মনে বলল, ডরোথির মত তৈরি হই, তারপর হে সমুদ্র, আবার আমি

কুকুরের ভালবাসা

বশীর আল্‌হেলাল

অ্যালসেশিয়ান কুকুরের নিয়ম হচ্ছে সে কেবল একজনকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে, দ্বিতীয় জনকে নয়। এই নিয়েই হয়েছে মুশকিল।

সাহেব যখন আড়াই শ' টাকা দিয়ে অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চাটিকে কিনে এনেছিলেন তখন সে বেশ শিষ্টটি ছিল। সারা অঙ্গ কালো, কেবল গলায় একটি ঈষৎ-হলুদ বলয়-রেখা, চোখ দুটি চিকচিক করে। যে দেয় তারে আদর, তারই খাদ্য খায়।

সামাদ সাহেব রইলেন প্রভু, কিন্তু ওর একজন 'কীপার' অর্থাৎ পরিচারক রাখা হলো, তার নাম জটাই। জটাই ওকে খাওয়ায়, ডগ সোপ দিয়ে গা ধোয়ায়, সাহেব যতক্ষণ তার কর্ম ব্যাপদেশে বাইরে থাকেন, তার সঙ্গে থেকে, গলায় শেকল পরিয়ে বেঁধে রাখে, সকাল-বেলা পায়খানা করাতে ও হাওয়া খাওয়াতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। সামাদ সাহেব অপরাহ্ণে, নিশীথিনীর প্রথম যামে বা ছুটির দিন বাইরে বেরোলে ওকে গাড়িতে তুলে নেন। কোনো কোনো দিন পায়ে হেঁটে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরোলে অবশ্য স্যাবারের গলার শেকল তাঁর হাতে ওঠে, স্যাবার দুলকি চালে তাঁর আশেপাশে চলে। কিন্তু অবসর সময়ে যখন তিনি, এই যেমন, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে টেলিভিশনে কিছু দেখছেন, কি স্টাডিতে টেবিলে বসে টুকি-টাকি কিছু করছেন, তখন স্যাবারকে তাঁর পায়ের কাছে বসে বা শুয়ে থাকতে হবেই। কিংবা যখন খাটে শুয়ে তিনি খবরের কাগজ বা ফিল্মী ম্যাগাজিন দেখছেন তখনো তাকে মেঝেয় তাঁর চটি-জোড়া বুকে নিয়ে বসে থাকতে হবে। স্যাবার তো বসে থাকে। এবং কাউকে সে বাইরের হলে তো কথাই নেই, বাড়ির কাউকেও প্রভুর কাছে এগিয়ে আসতে দেখলে গলার ভেতর গর গর করে আওয়াজ তোলে। প্রভু উঠে দাঁড়ালে সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। প্রভু এক পা ফেললে তাঁর পথ পরিষ্কার করার জন্যেই যেন সে দু পা এগিয়ে যায়।

তবু এই স্যাবারকে নিয়ে সমস্যার অন্ত নেই। সামাদ সাহেব তো ভাবতে বসলে অবাক হয়ে যান। স্যাবারকে বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। 'পছন্দ করি না' এই কথা বলবার সাহস কারো নেই। কিন্তু তিনি বোঝেন তাঁর ওই প্রিয় পশুটাকে কেউ দেখতে পারে না। এবং স্যাবার যত বাড়তে লাগল, তার সেই পেশল সুগঠিত সুঠাম অথচ দুর্বিনীত পরিপূর্ণ আকারটি লাভ করতে লাগল, তার প্রতি চারপাশের বিরূপতাও তত বাড়তে লাগল।

এর কারণ কী? তিনি অনেক ভেবে দেখেছেন। মুসলমানের ঘরে কুকুর অবশ্য অপবিত্র ও ঘৃণ্য জন্তু বলে বিবেচিত। ওর স্পর্শে শরীর না-পাক হয়। সামাদ সাহেবের মা নামাজ-কালাম পড়েন, সেটাও সত্য। কিন্তু আসলে সেটাই আসল সত্য নয়। সামাদ সাহেব যে মাঝে মাঝে নেশা-টেশা করেন, সে-কথাও তো সবাই জানে। স্ত্রী তো জানেনই, বোনগুলি, মা, চাকর-বাকর সবাই জানে। বাপু, মদ তো তোমার ওই কুকুর-শুয়োরের মতোই না-পাক অস্পৃশ্য বস্তু ইসলামের চোখে। কিন্তু ওই জন্তু [illegible] কারো কাছে খুব ঘৃণ্য বা অপবিত্র হয়ে রয়েছেন এমন তো মনে হয় না। বরং স্ত্রী একবার শাশুড়ির কাছে এই নিয়ে কিছু বলতে গেলে শাশুড়ি জায়নামাজের বসে হাতে তসবিহ নিয়েই সে-কথাগুলি বলেছিলেন তার মর্ম : দেখ মা, পুরুষ মানুষের ওইসব ছোটখাটো ব্যাপারে থাকতে নেই। ছেলেটা সারাদিন কত ঝক্কি-ঝামেলা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একবার ভেবে দেখো তো, যার জন্যে তুমি আমি দুটো খাচ্ছি পরছি। ওইসব ছোটোখাটো ব্যাপারে নজর দিতে যেয়ো না মা। মা, তোমার চেয়ে বেশি কে জানে বলো, আমার ওই ছেলে সোনার টুকরো ছেলে, ফেরেশতা, না হলে বলো, একটা ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কী নিয়ে, কিসের আশায় সে বেঁচে রয়েছে, এত করছে এত খাটছে, এত পয়সা তুলছে ঘরে।

মনে পড়লে সামাদ সাহেব হাসেন। কেমন জব্দ? মায়ের ওই শেষের কথাটা ওর স্ত্রী সনজীদার পক্ষে বড় মারাত্মক। সনজীদা বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী মেয়ে, কিন্তু বাঁজা। অবশ্য এর জন্যে সামাদ সাহেবের কোনো হা-পিত্যেস নেই। বরং দেখো তো, তাঁর সংসারে রূপ আর যৌবন-এর কী এক সাইপ্রেস যেন এখনো এই বয়সে প্রতিদিন তাঁর চোখের সামনে শোভিত থেকে শোভিততর হয়ে উঠছে। হ্যাঁ এই তো ছিল তাঁর যৌবনের কামনা, যে যৌবন চলে যাচ্ছে। তাঁর কামনা পূর্ণ হয়েছে, তিনি তুষ্ট। সন্তান? সন্তান নিয়ে কী হবে? আরে, সন্তান বলে কাকে? লোকে বোঝে না। এই মেট্রোপলিসে তাঁর কর্ম, তাঁর কীর্তি, তাঁর যশ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তারাই তাঁর সন্তান। যদি তবু বলো, না, ওই রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানই চাই, দাঁড়াও তার ব্যবস্থা করছি। ছোট ভাইটা, ছবি আঁ... না কী করে, রোমে পড়ে রয়েছে, আম্মার গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসবেন, এনে বিয়ে দেবেন, নিয়ো তোমরা, কত সন্তান নেবে নিয়ো। তাছাড়া, বোনগুলো রয়েছে, তাদের বিয়ে হবে না? তাদের সন্তান হবে না? তাঁর রোজগারের পয়সাগুলো বারো ভূতে খাবে এমন তো নয়। তবে?

যাই হোক, কথা হচ্ছিল ওই কুকুর স্যাবারকে নিয়ে। স্যাবারকে এ বাড়িতে কেউ দেখতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে, তার কারণ কী? না, ইসলামের দৃষ্টিতে কুকুর যে অপবিত্র জীব, এটা কারণ নয়। কারণ হচ্ছে, এই অপবিত্র জীব কুকুর সামাদ সাহেবের প্রতি এই বাড়ির যে ভালোবাসা তাতে ভাগ বসিয়েছে। সোজা বাংলায় বলতে গেলে, ওই কুকুর সামাদ সাহেবকে অনেক দূর পর্যন্ত অধিকার করেছে। এবং কুকুরের ভালোবাসা মানুষের ভালোবাসার মতো মিথ্যা নয়, কুকুরের ভালোবাসা খাঁটি। কুকুরের ভালোবাসা খাঁটি বলেই তো তিনি কুকুরটাকে পুষছেন। অন্তত তিনশ টাকা তার পেছনে মাসিক ব্যয়।

সামাদ সাহেব রাত্রিবেলা স্যাবারকে তাঁর

ন-কষাকষি। তিনি বলেন, এই দুনিয়ায় ত শত্রু তুমি জানো না। আমার জীবন যদি কেউ রক্ষা করে এই স্যাবার করবে। বলছি, াইরে রাখতে। ঘুমোলে আমার কোনো ুঁশ থাকে না জানো। ও ব্যাটা বাইরে াকার চেঁচাক, আমি কিছুই টের পাব না। রের ভেতরে থাকলেও অন্তত যেই আসুক টি ছিঁড়ে নিয়ে তবে মরতেও যদি হয় রবে। সনজীদা, বলতে লজ্জা নেই, আমি তামার চেয়েও স্যাবারকে বেশী বিশ্বাস রি।

স্যাবার অবশ্য ওই বন্ধ ঘরে থাকা ছন্দ করে না, তা ঘরখানা যতই বড় হোক। মাদ সাহেব বলেন, একটা দরজা খোলাই াক না। স্যাবার থাকলে দরজা খোলা থাকা ন্ধ থাকা এক কথা।

কিন্তু সনজীদা শুনবেন না। দরজা বন্ধ া করলে তাঁর ঘুমই আসবে না। এই নিয়ে লছে স্বামী-স্ত্রীতে ঠাণ্ডা লড়াই। সনজীদা লেন, আমি তোমায় সন্তান দিতে পারিনি, াই তুমি কুত্তাটাকে এনেছ। আবার তুমি লছ ওকেই তুমি বেশী বিশ্বাস করো। ামি কোন দিন ওকে বিষ খাইয়ে মেরে েখে দেব, তারপর নিজে গলায় দড়ি দেব, মি দেখতে পাবে। তার চেয়ে তুমি কেন ার বিয়ে করছ না। আমি তো বলেছি মার কোনো আপত্তি নেই।

বলতে বলতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে াঁদেন। সামাদ সাহেব বাম হাতে স্যাবারের াড়ের লোম টানতে টানতে হাসেন। তখন ্যাবার একেবারে তাঁর বুকের ওপর মনের পা-দুটি তুলে দিয়ে তাঁকে তার েলো ঠোঁট দিয়ে চুমু দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু হা রে বিধি কেউ কি কল্পনা রতে পেরেছিল এই স্যাবারের মৃত্যু হবে ার হাতে?

স্যাবারকে নিয়ে দ্বিতীয় সমস্যাটি দেখা দল। সেটাও এই ভালোবাসার সমস্যা। ্যাবার সামাদ সাহেবকে ভালোবাসে তাতে ন্দেহ নেই। স্যাবারের অন্নদাতা প্রকৃতপক্ষে মাদ সাহেব, সারমেয় কুলের মধ্যে সর্বা- পেক্ষা বুদ্ধিমান এই অ্যালসেশিয়ান স্যাবার া বোঝে কিনা জানি না, তবে ভালোবাসার ঙ্গে জবরদস্তির শক্তিপ্রয়োগেও একটা ম্বন্ধ রয়েছেই। ভাত-কাপড় গয়না-গাঁটির ঙ্গে ওই জবরদস্তির কিছুটা থাকে বলেই মনকি তিনি তাঁর স্ত্রী সনজীদার ভালো- াসা পান না হলে পেতেন না। কুকুর আর ারী উভয়েই জবরদস্তিকে, ভদ্র ভাষায় লতে গেলে প্রভুত্বকে শ্রদ্ধা করে, সামাদ াহেবের তাই ধারণা। স্যাবার জটাইয়ের াছে যতক্ষণ থাকে, দিনমানের বেশির ভাগ াকে সাধারণত শেকল লাগে না। কিন্তু াবে যাওয়ার সময় অপরাহ্নে, কি প্রথম নশীথে, অথবা প্রাতর্ভ্রমণের জন্য সকালে খনই সামাদ সাহেব প্রস্তুত হন, অমনি ্যাবারের গলায় বেল্টে শেকল উঠে যায়, টাইই সে শেকল পরায়। ইশপ তো এই বিষয়টি নিয়েই তাঁর সেই গল্পটি লিখে- ছেন।

যাই হোক, সামাদ সাহেবের হঠাৎ এক- দিন মনে হলো, স্যাবার শুধু তাঁকে নয়, জটাইকেও ভালোবাসে। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। সনজীদা শুধু তাঁকে নয়, আর একজন পুরুষকেও ভালোবাসে, এই কথা যদি তাঁকে হঠাৎ জানতে হতো তাহলে যেমন মন খারাপ করত প্রায় সেই রকমধারা মন- খারাপই। অবশ্য তারপরই তিনি হাসলেন। হেসে বললেন, তা ওকে ভালোবাসবে বই কি! ও ওকে নায়ায়, খাওয়ায়-দাওয়ায়, যত ঝক্কি ওরই। সনজীদার ছেলে হলে সেও তো আয়ার হাতে তার যত ঝক্কি তুলে দিয়ে ঝাড়া হাত-পায়ে খুব করে ভালোবাসত সন্তানকে, সন্তানও ভালোবাসত মা-কে, কিন্তু তাই বলে কি সে তার আয়াকেও ভালোবাসত না?

কিন্তু স্যাবার যখন পুরো বড় হলো, বড় হতে তার আর কিছু বাকি থাকল না, একটা দেখার মতো কুকুর হয়ে উঠল সে, দেখলে মনে হয় যেন ক্রোধ আর বল, বিক্রম আর বুদ্ধি তার অভ্যন্তরে তপ্ত অবরুদ্ধ বাষ্পের মতো সব সময় থরথরাচ্ছে, তার একটা ডাক শুনলে অভ্যাগতের পিলে চমকে যায়, হ্যাঁ, এই রকম সময়ে হঠাৎ একদিন যেন বিদ্যুতের ঘা খাওয়ার মতো তাঁর মনে হলো, স্যাবার জটাইকে তাঁর চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

এরপর গল্প খুব বেশি বড় নয়। স্যাবার আর জটাইয়ের একটা প্রিয় খেলা ছিল। ওরা প্রশস্ত লনের ঘাসে ছুটোছুটি করে লুটোপুটি খেলত। সেদিন বিকেলে জটাইয়ের শরীরটা ভালো ছিল না, সর্দি- জ্বর, মাথাধরা। জটাই তাই খেলাটায় খুব মন লাগাতে পারছিল না। সে স্যাবারের সঙ্গে খানিক ছুটোপুটি করে খালি কাত হয়ে বসে তারপর শুয়ে পড়ছিল। অমনি স্যাবারও ছুটে এসে এখানে-ওখানে আলতো কামড় দিয়ে তাকে উৎক্ষিপ্ত করে তোলার চেষ্টা করছিল। স্যাবারের বুঝি হঠাৎ মনে হয় তার এই বন্ধুর জন্যে আজ একটা নতুন কিছু করা আবশ্যক। লনের এক প্রান্তে অসময়ের জিনিয়ার কেয়ারির পাশে তারে ভিজে কাপড় মেলে দেয়া ছিল। খ ছক্কের একটি ফিনফিনে রুমাল ঘাসের ওপর পড়ে গিয়েছিল। স্যাবার হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওই রুমালটিকে মুখে তুলে নিল। খানিক নর্তন-কুর্দন করে রুমালটিকে পায়ে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করল, করে জটাইয়ের কাছে গিয়ে তার কোলে সেটি রেখে দিল। সামাদ সাহেব বাইরে যাবেন, হাতে গাড়ির চাবি, কখন যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন জটাই দেখেনি, স্যাবার অবশ্যই দেখেছে, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে খেলা বাদ দিয়ে গলায় শেকল পরে প্রভুর সঙ্গে বাইরে যাওয়ার এখন তার তেমন রুচি ছিল না। জটাই তখন ছেঁড়া রুমালটা দিয়ে স্যাবারের গায়ে একটা করে ঝাপটা মারছে আর স্যাবার ছুটে পালিয়ে গিয়ে আবার ঝাপটা খাওয়ার জন্যে ছুটে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, লাল জিভ বের করে জটাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। সামাদ সাহেব নেমে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রথম অভিযোগ, এতক্ষণ স্যাবারের গলায় শেকল পরানো হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয় অভিযোগ, তাঁর অমন শখের রুমালখানা স্যাবার জটাইয়ের চোখের সামনে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে। তিনি পায়ের স্যান্ডেল খুলে জটাইকে পেটাতে লাগলেন। তিনি জানতেন স্যাবার তাঁর চেয়ে জটাইকে বে... ভালোবাসে। কিন্তু জানতেন না জটাইকে সত্যি কত ভালোবাসে। নিমেষে তাঁর জানা হয়ে গেল। স্যাবার ছুটে এসে বিষম এক হাঁক ছেড়ে সমানের পা তুলে সামাদ সাহেবকে আঁকড়ে ধরে তাঁর যে-হাতে স্যান্ডেল সেই হাতের বাহু কামড়ে ধরল। সেই কামড় আলতো ছিল না। জটাই তা... তাড়াতাড়ি স্যাবারকে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে আনলে সামাদ সাহেব এক ভুতুড়ে চিৎকার দিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন দেখা গেল তাঁর পাঞ্জাবির ডান হাতের গিলে করা সাদা ফিনফিনে আস্তিন ভিজে লাল হয়ে গেছে। বাহুতে তাঁর মাংস কম নয়, তাই দাঁতগুলি বেশ খুব করেই বসেছিল। তিনি ছুটে ঘরের ভেতর গেলেন। বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলেন। স্যাবার শিউলি গাছটির নিচে সামনের দুই পা পেতে বসে লাল টুকটুকে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছিল। গুলী তার ঠিক চাঁদিতে গিয়ে লাগল। সে একটা লাফ মেরেই অস্পষ্ট মৃত্যু শব্দ করে পড়ে গিয়েছিল। আর দরকার ছিল না। তবু দ্বিতীয় গুলীটি সামাদ সাহেব তার বাম কানের পাশে গেঁথে দিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

সামাদ সাহেবের ডান হাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাই তাঁকে ঘিরে ঘরের ভেতর মা বউ বোনদের কান্না, চিৎকার। (মা বলছেন, সামু, তুই ওই কুকুরটাকেও গুলী করলি না কেন? ওই জটাইকে?) ডাক্তারকে টেলি- ফোন করা হয়েছে। ওদিকে যত লোক জমে গেছে গেটে।

অগত্যা সামাদ সাহেবকে বেরিয়ে আসতে হলো। লোকে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? কিসের গুলী হলো?

সামাদ সাহেব বললেন, ও কিছু না। আমার কুকুরটা হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিল। গুলী করে মেরে ফেলতে হলো।

লোকে চুকচুক করে দুঃখ প্রকাশ করে চলে যেতে লাগল। দুঃখটা তারা সামাদ সাহেবের বিক্ষত হাতটার জন্যে করল, না অমন সুন্দর কুকুরটার জন্যে করল, বোঝা গেল না।

ডাক্তার এসে সামাদ সাহেবকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে জটাই ছোট একটি বোঁচকা বগলে নিয়ে শিউলি গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। স্যাবারকে কয়েফোঁটা অশ্রু দিল। এই প্রথম এবং এই শেষ তাকে তার আপন কিছু দেয়া। তারপর সে গেট খুলে বেরিয়ে চলে গেল। বলা যায় না, পাগল হয়ে যাওয়ার ছুতো করে সায়েব তাকেও গুলী করে বসতে পারেন!

কুকুরের ভালবাসা

বশীর আল্‌হেলাল

অ্যালসেশিয়ান কুকুরের নিয়ম হচ্ছে সে কেবল একজনকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে, দ্বিতীয় জনকে নয়। এই নিয়েই হয়েছে মুশকিল।

সাহেব যখন আড়াই শ' টাকা দিয়ে অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চাটিকে কিনে এনেছিলেন তখন সে বেশ শিশুটি ছিল। সারা অঙ্গ কালো, কেবল গলায় একটি ঈষৎ-হলুদ বলয় রেখা, চোখ দুটি চিকচিক করে। যে দেয় তারে আদর, তারই খাদ্য খায়।

সামাদ সাহেব রইলেন প্রভু, কিন্তু ওর একজন 'কীপার' অর্থাৎ পরিচারক রাখা হলো, তার নাম জটাই। জটাই ওকে খাওয়ায়, ডগ সোপ দিয়ে গা ধোয়ায়, সাহেব যতক্ষণ তার কর্ম ব্যাপদেশে বাইরে থাকেন, তার সঙ্গে খেলে, গলায় শেকল পরিয়ে বেঁধে রাখে, সকাল-বেলা পায়খানা করাতে ও হাওয়া খাওয়াতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। সামাদ সাহেব অপরাহ্ণে, নিশীথিনীর প্রথম যামে বা ছুটির দিন বাইরে বেরোলে ওকে গাড়িতে তুলে নেন। কোনো কোনো দিন পায়ে হেঁটে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরোলে অবশ্য স্যাবারের গলার শেকল তাঁর হাতে ওঠে, স্যাবার দুলকি চালে তাঁর আশেপাশে চলে। কিন্তু অবসর সময়ে যখন তিনি, এই যেমন, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে টেলিভিশনে কিছু দেখছেন, কি স্টাডিতে টেবিলে বসে টুকিটাকি কিছু করছেন, তখন স্যাবারকে তাঁর পায়ের কাছে বসে বা শুয়ে থাকতে হবেই। কিংবা যখন খাটে শুয়ে তিনি খবরের কাগজ বা ফিল্মী ম্যাগাজিন দেখছেন তখনো তাকে মেঝেয় তাঁর চটি-জোড়া বুকে নিয়ে বসে থাকতে হবে। স্যাবার তো বসে থাকে। এবং কাউকে সে বাইরের হলে তো কথাই নেই, বাড়ির কাউকেও প্রভুর কাছে এগিয়ে আসতে দেখলে গলার ভেতর গর গর করে আওয়াজ তোলে। প্রভু উঠে দাঁড়ালে সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। প্রভু এক পা ফেললে তাঁর পথ পরিষ্কার করার জন্যেই যেন সে দু পা এগিয়ে যায়।

তবু এই স্যাবারকে নিয়ে সমস্যার অন্ত নেই। সামাদ সাহেব তো ভাবতে বসলে অবাক হয়ে যান। স্যাবারকে বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। 'পছন্দ করি না' এই কথা বলবার সাহস কারো নেই। কিন্তু তিনি বোঝেন তাঁর ওই প্রিয় পশুটাকে কেউ দেখতে পারে না। এবং স্যাবার যত বাড়তে লাগল, তার সেই পেশল সুগঠিত সুঠাম অথচ দুর্বিনীত পরিপূর্ণ আকারটি লাভ করতে লাগল, তার প্রতি চারপাশের বিরূপতাও তত বাড়তে লাগল।

এর কারণ কী? তিনি অনেক ভেবে দেখেছেন। মুসলমানের ঘরে কুকুর অবশ্য অপবিত্র ও ঘৃণ্য জন্তু বলে বিবেচিত। ওর স্পর্শে শরীর না-পাক হয়। সামাদ সাহেবের মা নামাজ-কালাম পড়েন, সেটাও সত্য! কিন্তু আসলে সেটাই আসল সত্য নয়। সামাদ সাহেব যে মাঝে মাঝে নেশা-টেশা করেন, সে-কথাও তো সবাই জানে! স্ত্রী তো জানেনই, বোনগুলি, মা, চাকর-বাকর সবাই জানে। বাপু, মদ তো তোমার ওই কুকুর-শুয়োরের মতোই না-পাক অস্পৃশ্য বস্তু ইসলামের চোখে। কিন্তু ওই বস্তু [illegible]

কারো কাছে খুব ঘৃণ্য বা অপবিত্র হয়ে রয়েছেন এমন তো মনে হয় না। বরং স্ত্রী একবার শাশুড়ির কাছে এই নিয়ে কিছু বলতে গেলে শাশুড়ি জায়নামাজের বসে হাতে তসবিহ নিয়েই সে-কথাগুলি বলেছিলেন তার মর্ম ঃ দেখ মা, পুরুষ মানুষের ওইসব ছোটখাটো ব্যাপারে থাকতে নেই। ছেলেটা সারাদিন কত ঝক্কি-ঝামেলা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একবার ভেবে দেখো তো যার জন্যে তুমি আমি দুটো খাচ্ছি পরছি। ওইসব ছোটোখাটো ব্যাপারে নজর দিতে যেয়ো না মা। মা, তোমার চেয়ে বেশি কে জানে বলো, আমার ওই ছেলে সোনার টুকরো ছেলে, ফেরেশতা, না হলে বলো, একটা ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কী নিয়ে, কিসের আশায় সে বেঁচে রয়েছে, এত করছে এত খাটছে, এত পয়সা তুলছে ঘরে।

মনে পড়লে সামাদ সাহেব হাসেন। কেমন জব্দ? মায়ের ওই শেষের কথাটা ওঁর স্ত্রী সনজীদার পক্ষে বড় মারাত্মক। সনজীদা বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী মেয়ে, কিন্তু বাঁজা। অবশ্য এর জন্যে সামাদ সাহেবের কোনো হা-পিত্যেস নেই। বরং দেখো তো, তাঁর সংসারে রূপ আর যৌবন-এর কী এক সাইপ্রেস যেন এখনো এই বয়সে প্রতিদিন তাঁর চোখের সামনে শোভিত থেকে শোভিততর হয়ে উঠছে। হ্যাঁ এই তো ছিল তাঁর যৌবনের কামনা, যে যৌবন চলে যাচ্ছে। তাঁর কামনা পূর্ণ হয়েছে, তিনি তুষ্ট। সন্তান? সন্তান নিয়ে কী হবে? আরে, সন্তান বলে কাকে? লোকে বোঝে না। এই মেট্রোপলিসে তাঁর কর্ম, তাঁর কীর্তি, তাঁর যশ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তারাই তাঁর সন্তান। যদি তবু বলো, না, ওই রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানই চাই, দাঁড়াও তার ব্যবস্থা করছি। ছোট ভাইটা, [illegible] আছে, না কী করে, রোমে পড়ে [illegible], এবার গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসবেন, এনে বিয়ে দেবেন, নিয়ো তোমরা, কত সন্তান নেবে নিয়ো। তাছাড়া, বোনগুলো রয়েছে, তাদের বিয়ে হবে না? তাদের সন্তান হবে না? তাঁর রোজগারের পয়সাগুলো বারো ভূতে খাবে এমন তো নয়। তবে?

যাই হোক, কথা হচ্ছিল ওই কুকুর স্যাবারকে নিয়ে। স্যাবারকে এ বাড়িতে কেউ দেখতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে, তার কারণ কী? না, ইসলামের দৃষ্টিতে কুকুর যে অপবিত্র জীব, এটা কারণ নয়। কারণ হচ্ছে, এই অপবিত্র জীব কুকুর সামাদ সাহেবের প্রতি এই বাড়ির যে ভালোবাসা তাতে ভাগ বসিয়েছে। সোজা বাংলায় বলতে গেলে, ওই কুকুর সামাদ সাহেবকে অনেক দূর পর্যন্ত অধিকার করেছে। এবং কুকুরের ভালোবাসা মানুষের ভালোবাসার মতো মিথ্যা নয়, কুকুরের ভালোবাসা খাঁটি। কুকুরের ভালোবাসা খাঁটি বলেই তো তিনি কুকুরটাকে পুষছেন। অন্তত তিনশ টাকা তার পেছনে মাসিক ব্যয়।

সামাদ সাহেব রাত্রিবেলা স্যাবারকে তাঁর

মন-কষাকষি। তিনি বলেন, এই দুনিয়ায় কত শত্রু তুমি জানো না। আমার জীবন যদি কেউ রক্ষা করে এই স্যাবার করবে। বলছ, বাইরে রাখতে। ঘুমোলে আমার কোনো হুঁশ থাকে না জানো। ও ব্যাটা বাইরে হাজার চেঁচাক, আমি কিছুই টের পাব না। ঘরের ভেতরে থাকলে ও অন্তত যেই আসুক টুঁটি ছিঁড়ে নিয়ে তবে মরতেও যদি হয় মরবে। সনজীদা, বলতে লজ্জা নেই, আমি তোমার চেয়েও স্যাবারকে বেশী বিশ্বাস করি।

স্যাবার অবশ্য ওই বন্ধ ঘরে থাকা পছন্দ করে না, তা ঘরখানা যতই বড় হোক। সামাদ সাহেব বলেন, একটা দরজা খোলাই থাক না। স্যাবার থাকলে দরজা খোলা থাকা বন্ধ থাকা এক কথা।

কিন্তু সনজীদা শুনবেন না। দরজা বন্ধ না করলে তার ঘুমই আসবে না। এই নিয়ে চলছে স্বামী-স্ত্রীতে ঠাণ্ডা লড়াই। সনজীদা বলেন, আমি তোমায় সন্তান দিতে পারিনি, তাই তুমি কুত্তাটাকে এনেছ। আবার তুমি বলছ ওকেই তুমি বেশী বিশ্বাস করো। আমি কোন দিন ওকে বিষ খাইয়ে মেরে রেখে দেব, তারপর নিজে গলায় দড়ি দেব, তুমি দেখতে পাবে। তার চেয়ে তুমি কেন আর বিয়ে করছ না। আমি তো বলেছি আমার কোনো আপত্তি নেই।

বলতে বলতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। সামাদ সাহেব বাম হাতে স্যাবারের ঘাড়ের লোম টানতে টানতে হাসেন। তখন স্যাবার একেবারে তাঁর বুকের ওপর সামনের পা-দুটি তুলে দিয়ে তাঁকে তার কালো ঠোঁট দিয়ে চুমু দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু হায় রে বিধি কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল এই স্যাবারের মৃত্যু হবে কার হাতে?

স্যাবারকে নিয়ে দ্বিতীয় সমস্যাটি দেখা দিল। সেটাও এই ভালোবাসার সমস্যা। স্যাবার সামাদ সাহেবকে ভালোবাসে তাতে সন্দেহ নেই। স্যাবারের অন্নদাতা প্রকৃতপক্ষে সমাদ সাহেব, সারমেয় কুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান এই অ্যালসেশিয়ান স্যাবার তা বোঝে কিনা জানি না, তবে ভালোবাসার সঙ্গে জবরদস্তির শক্তিপ্রয়োগের একটা সম্বন্ধ রয়েছেই। ভাত-কাপড় গয়না-গাঁটির সঙ্গে ওই জবরদস্তির কিছুটা থাকে বলেই এমনকি তিনি তাঁর স্ত্রী সনজীদার ভালোবাসা পান, না হলে পেতেন না। কুকুর আর নারী উভয়েই জবরদস্তিকে, ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে প্রভুত্বকে শ্রদ্ধা করে, সামাদ সাহেবের তাই ধারণা। স্যাবার জটাইয়ের কাছে যতক্ষণ থাকে, দিনমানের বেশির ভাগ থাকে সাধারণত শেকল লাগে না। কিন্তু ক্লাবে যাওয়ার সময় অপরাহ্নে, কি প্রথম নিশীথে, অথবা প্রাতর্ভ্রমণের জন্য সকালে যখনই সামাদ সাহেব প্রস্তুত হন, অমনি স্যাবারের গলার বেল্টে শেকল উঠে যায়, জটাইই সে শেকল পরায়। ইশপ তো এই বিষয়টি নিয়েই তাঁর সেই গল্পটি লিখেছিলেন।

যাই হোক, সামাদ সাহেবের হঠাৎ একদিন মনে হলো, স্যাবার শুধু তাঁকে নয়, জটাইকেও ভালোবাসে। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। সনজীদা শুধু তাঁকে নয়, আর একজন পুরুষকেও ভালোবাসে, এই কথা যদি তাঁকে হঠাৎ জানতে হতো তাহলে যেমন মন খারাপ করত প্রায় সেই রকমধারা মনখারাপই। অবশ্য তারপরই তিনি হাসলেন। হেসে বললেন, তা ওকে ভালোবাসবে বই কি! ও ওকে নায়ায়, খাওয়ায়-দাওয়ায়, যত ঝক্কি ওরই। সনজীদার ছেলে হলে সেও তো আয়ার হাতে তার যত ঝক্কি তুলে দিয়ে ঝাড়া হাত-পায়ে খুব করে ভালোবাসত সন্তানকে, সন্তানও ভালোবাসত মা-কে, কিন্তু তাই বলে কি সে তার আয়াকেও ভালোবাসত না?

কিন্তু স্যাবার যখন পুরো বড় হলো, বড় হতে তার আর কিছু বাকি থাকল না, একটা দেখার মতো কুকুর হয়ে উঠল সে, দেখলে মনে হয় যেন ক্রোধ আর বল, বিক্রম আর বুদ্ধি তার অভ্যন্তরে তপ্ত অবরুদ্ধ বাষ্পের মতো সব সময় থরথরাচ্ছে, তার একটা ডাক শুনলে অভ্যাগতের পিলে চমকে যায়, হ্যাঁ, এই রকম সময়ে হঠাৎ একদিন যেন বিদ্যুতের ঘা খাওয়ার মতো তাঁর মনে হলো, স্যাবার জটাইকে তাঁর চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

এরপর গল্প খুব বেশি বড় নয়। স্যাবার আর জটাইয়ের একটা প্রিয় খেলা ছিল। ওরা প্রশস্ত লনের ঘাসে ছুটোছুটি করে লুটোপুটি খেলত। সেদিন বিকেলে জটাইয়ের শরীরটা ভালো ছিল না, সর্দি-জ্বর, মাথাধরা। জটাই তাই খেলাটায় খুব মন লাগাতে পারছিল না। সে স্যাবারের সঙ্গে খানিক ছুটোপুটি করে খালি কাত হয়ে বসে তারপর শুয়ে পড়ছিল। অমনি স্যাবারও ছুটে এসে এখানে-ওখানে আলতো কামড় দিয়ে তাকে উৎক্ষিপ্ত করে তোলার চেষ্টা করছিল। স্যাবারের বুঝি হঠাৎ মনে হয় তার এই বন্ধুর জন্যে আজ একটা নতুন কিছু করা আবশ্যক। লনের এক প্রান্তে অসময়ের জিনিয়ার কেয়ারির পাশে তারে ... জন্য কাপড় মেলে দেয়া ছিল। ... রঙের একটি ফিনফিনে রুমাল ঘাসের ওপর পড়ে গিয়েছিল। স্যাবার হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওই রুমালটিকে মুখে তুলে নিল। খানিক নর্তন-কুর্দন করে রুমালটিকে পায়ে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করল, করে জটাইয়ের কাছে গিয়ে তার কোলে সেটি রেখে দিল। সামাদ সাহেব বাইরে যাবেন, হাতে গাড়ির চাবি, কখন যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন জটাই দেখেনি, স্যাবার অবশ্যই দেখেছে, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে খেলা বাদ দিয়ে গলায় শেকল পরে প্রভুর সঙ্গে বাইরে যাওয়ার এখন তার তেমন রুচি ছিল না। জটাই তখন ছেঁড়া রুমালটা দিয়ে স্যাবারের গায়ে একটা করে ঝাপটা মারছে আর স্যাবার ছুটে পালিয়ে গিয়ে আবার ঝাপটা খাওয়ার জন্যে ছুটে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, লাল জিভ বের করে জটাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

সামাদ সাহেব নেমে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রথম অভিযোগ, এতক্ষণ স্যাবারের গলায় শেকল পরানো হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয় অভিযোগ, তাঁর অমন শখের রুমালখানা স্যাবার জটইয়ের চোখের সামনে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে। তিনি পায়ের স্যান্ডেল খুলে জটাইকে পেটাতে লাগলেন। তিনি জানতেন স্যাবার তাঁর চেয়ে জটাইকে বে... ভালোবাসে। কিন্তু জানতেন না জটাইকে সত্যি কত ভালোবাসে। নিমেষে তাঁর জানা হয়ে গেল। স্যাবার ছুটে এসে বিষম এক হাঁক ছেড়ে সামনের পা তুলে সামাদ সাহেবকে আঁকড়ে ধরে তাঁর যে-হাতে স্যান্ডেল সেই হাতের বাহু কামড়ে ধরল। সেই কামড় আলতো ছিল না। জটাই ... তাড়াতাড়ি স্যাবারকে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে আনলে সামাদ সাহেব এক ভুতুড়ে চিৎকার দিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন দেখা গেল তাঁর পাঞ্জাবির ডান হাতের গিলে করা সাদা ফিনফিনে আস্তিন ভিজে লাল হয়ে গেছে। বাহুতে তাঁর মাংস কম নয়, তাই দাঁতগুলি বেশ যুৎ করেই বসেছিল। তিনি ছুটে ঘরের ভেতর গেলেন। বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলেন। স্যাবার শিউলি গাছটির নিচে সামনের দুই পা পেতে বসে লাল টুকটুকে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছিল। গুলী তার ঠিক চাঁদিতে গিয়ে লাগল। সে একটা লাফ মেরেই অস্পষ্ট মৃত্যু শব্দ করে পড়ে গিয়েছিল। আর দরকার ছিল না। তবু দ্বিতীয় গুলীটি সামাদ সাহেব তার বাম কানের পাশে গেঁথে দিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

সামাদ সাহেবের ডান হাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাই তাঁকে ঘিরে ঘরের ভেতর মা বড় বোনদের কান্না, চিৎকার। (মা বলছেন, সামু, তুই ওই কুকুরটাকেই গুলী করলি না কেন? ওই জটাইকে?) ডাক্তারকে টেলিফোন করা হয়েছে। ওদিকে যত লোক জমে গেছে গেটে।

অগত্যা সামাদ সাহেবকে বেরিয়ে আসতে হলো। লোকে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? কিসের গুলী হলো?

সামাদ সাহেব বললেন, ও কিছু না। আমার কুকুরটা হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিল। গুলী করে মেরে ফেলতে হলো।

লোকে চুকচুক করে দুঃখ প্রকাশ করে চলে যেতে লাগল। দুঃখটা তারা সামাদ সাহেবের বিক্ষত হাতটার জন্যে করল, না অমন সুন্দর কুকুরটার জন্যে করল, বোঝা গেল না।

ডাক্তার এসে সামাদ সাহেবকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে জটাই ছোট একটি বোঁচকা বগলে নিয়ে শিউলি গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। স্যাবারকে ক'ফোঁটা অশ্রু দিল। এই প্রথম এবং এই শেষ তাকে তার আপন কিছু দেয়া। তারপর সে গেট খুলে বেরিয়ে চলে গেল। বলা যায় না, পাগল হয়ে যাওয়ার ছুতো করে সায়েব তাকেও গুলী করে বসতে পারেন। —

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় তখন অতীশ কুম্ভর সঙ্গে প্রিন্টিং সেকসান থেকে বের হয়ে আসছে। রঙ বার্ণিশের গন্ধ। গন্ধটা সে কবে থেকেই পেয়ে আসছে। সেই সুদূরেও সে যখন ছিল, এমনি রঙ বার্নিশের গন্ধ, মবিলের গন্ধ, গ্যাসের গন্ধ। জাহাজে ওঠার সময়ও প্রথম সে এমন একটা বিশ্রী গন্ধ পেয়েছিল। তার পাশে সুপারভাইজার হরিহরবাবু, প্রিন্টিং ইনচার্জ মণিলাল। কুম্ভ সব বোঝাচ্ছিল। টিন প্লেট কোথায় সাইজ করা হয়, তারপর কিভাবে ব্লক হয় এবং শেষে সেই ব্লক লিথোতে তুলে টিন ছাপা থেকে ফ্যাব্রিকেশান সব।

তিনটে বড় বড় টিনের সেডের মধ্যে কারখানা। প্রিন্টিং সেকসানের দুটো অংশ। বড় অংশটায় গ্যাস চেম্বার, প্রিন্টিং প্রেস। বার্নিশ করার জন্য ছোট্ট ঘেরা জায়গা। তার পাশে আর্টিস্টদের ঘর। ডিজাইন থেকে ব্লক সব এ-ঘরে। তারই পাশে কাঠের পার্টিশান—সেখানে ম্যানেজারের ঘর' নিচের দিকে লাগোয়া অফিস, আলমারি ফাইল-পত্র সব। সেডের পাশে বড় অশ্বত্থ গাছ—গাছটায় একটা লাল রঙের ঘুড়ি আটকে আছে।

এক নম্বর টিনের সেড থেকে নেমে রাস্তা পার হতে হয়, রাস্তা পার হলে দু নম্বর টিনের শেড। অতীশ রাস্তায় নামতেই দেখল, একজন কুষ্ঠ রুগী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। কুম্ভ বলল, আমাদের পুরোনো মিস্ত্রি শিবলাল। পাশেই থাকে। গেটে দারোয়ান, উঠে দাঁড়িয়েছে। বস্তি এলাকার মধ্যে এই তিনটে শেড বলে, কলাই বচসা কানে আসছে।

শিবলাল, দূরে থেকেই গড় হল।

অতীশ বলল, আরে করছেন কি!

কুম্ভ আগে, হরিহর পেছনে, মাঝখানে অতীশ। কারখানায় কেউ উঁকিঝুঁকি মারছে না। লম্বা প্লাটফরমের মতো টিনের চালা বেশ দূরে চলে গেছে। বাইরে সে দেখল, একটা চওড়া বেল্টিন ঘুরছে। শেডের মধ্যে ঢুকতেই বাইরের সব কোলাহল মেসিনের শব্দে ডুবে গেল।

কুম্ভ বলল, এগুলো কামড়ি ম্যাসিন। পাশে কাইচি। কাইচিতে দুটো লোক ভীষণ নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছে। সেখান থেকে টিন ঢুকিয়ে নিয়ে কেউ আসছে কামড়ি ম্যাসিনে। ঝপাঝপ ম্যাসিন থেকে সাইজকরা টিনের পাত পড়ছে। প্রতিটি কর্মী ভীষণ হাত চালিয়ে কাজ করছে।

কুম্ভ বলল, নজর দিলে এটাও দেখ-বেন একদিন মেটাল বকস হবে। লাভের গুড় সব আগের ম্যানেজারের পেটে। এখন কে খায় দেখুন।

অতীশ হাঁটতে থাকল। কুম্ভবাবু সারাক্ষণ বক বক করছে। লম্বা চওড়া বাত বলছে। চারপাশে অজস্র বেল্টিন ঘুরছে। পর পর কটা পাঞ্চিং মেসিন, লেদ মেসিন। লেদম্যানা ফুল স্পিডে লোহার মোটা রডে চিজেল সেট করে বসে আছে। কটর কটর করে লোহা কাটার শব্দ কানে আসছিল। পরিশ্রমী এই মানুষগুলো খুবই বিপাকে পড়ে যেন কাজ করে যাচ্ছে। পর পর সে এ-ঘরে পঁচিশ ত্রিশজন কর্মী দেখল, সবাই রুগ্ন, চোখ কোটরাগত। একটা লোক ডিবের বিট কাটছিল উবু হয়ে, আর তার দিকে কেমন জ্বলন্ত চোখে তাকাচ্ছে। দেখলেই ভয় করে। পাতলা ঢ্যাঙা পাতলুনের মতো চেহারা, গোঁফ ততোধিক লম্বা। কুম্ভ নাম বলে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে অতীশের মনে হল, আবার সেই লজঝরে জাহাজ। হাত দিলেই সব খসে পড়বে। এই লজঝরে জাহাজটাকে মেটাল বকস বানাতে হবে। কিন্তু যা সব চেহারা, মেসিনপত্র তার আগেই যদি সমুদ্রে ডুবে যায়! লজঝরে জাহাজের ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিন্স সে এখন নিজে। নির্যাতিত মানুষকে শেষ পর্যন্ত কোথায় যে নিয়ে আসে। সে যতই লজঝরে জীবন থেকে পালাতে চায়, তাকে কে বা কারা বলিদানের জন্য যেন সেখানেই টেনে নিয়ে যায়। আর্চির প্রেতাত্মা সঙ্গে থাকে। গন্ধে অতীশ টের পায় সে এসে গেছে। তখনই কুম্ভ বলল, এর নাম মনোরঞ্জন। আমাদের বিটম্যান। ইউনিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি।

অতীশ জাহাজে ইউনিয়ন দেখে নি। সে বলল, ইউনিয়ন!

—এখানে সি পি এম-এর ইউনিয়ন।

সেই ইউনিয়নের লোকটা তখন বিট থামিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করল। অতীশও হাত তুলে নমস্কার করল। কিছু যেন বলতে চাইল লোকটা—অতীশ শুনতে চাইল না। প্রেতাত্মার গন্ধ তার নাকে এসে লাগছে। সে সোজা অফিসে এসে বলল, এ একদিনে বোঝা যাবে না। তবে গন্ধে বুঝতে পারল, আর্চি আশেপাশেই আছে। তাকে ধাওয়া করছে। কারো না কারো ওপর ভর করে তাকে জ্বালায়। এখানেও সে তাকে ছেড়ে দেবে না। অতীশ কিছু কিছু কাজ বুঝে নিতে গিয়ে বুঝল, এ-বিষয়ে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই—কানেও ঢুকছে না। এতে আর্চির অনেক সুবিধে। সে বলল, কুম্ভবাবু একদিনে সব ঢুকবে না। চলুন বরং বস্তিটা একবার ঘুরে দেখে আসি। আসলে সে আর্চির অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জনাই যেন বাইরে বের হয়ে এল। এবং নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বুঝল, সেই গন্ধটা আরও ভারি, আরও ভুর ভুর করছে। এখানে সে ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত পারছে না। আর্চি আগের মতো আবার তার পিছু নিয়েছে। কিন্তু সেটা কেন সে এখনও বুঝতে পারছে না। সেটা কে? তার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল।

।। পাঁচ ।।

ফেরার পথে অতীশ বলল, ভাল ধুপকাঠি দরকার। ধুপকাঠি কিনব কুম্ভবাবু।

কারখানা থেকে গাড়ি বের হতেই অতীশ কথাটা বলল। দু-পাশের বস্তি তখনও শেষ হয়নি। কালীমাতা হোমিও-প্যাথ ডিসপেনসারির সামনে গাড়ি। রাস্তার কলে বালতির লাইন। পাশে বড় বড় ঝাঁকা। বেতের মোড়া লম্বা। ছোলা শশা পেঁয়াজ, গুড়ো লংকায় সাজানো। রাস্তা জুড়ে বসে গেছে হকাররা। ওদের এখন বের হবার সময়। গাড়ি দেখে ওরা তাড়া-তাড়ি ঝাঁকাগুলি সরিয়ে নিচ্ছে। অতীশ দেখল, দাওয়ায় বসে এক বুড়ি নাতিনের উকুন বাছছে। বস্তির উলঙ্গ শিশুরা কোথা থেকে একটা আখ চুরি করে এনেছে—তাই নিয়ে হুটোপাটি। বেওয়ারিশ কুকুর এবং আবর্জনায় ভর্তি চারপাশ। থিক থিক করছে নোংরা জল। তার মধ্যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ছাগল গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি চালাবার সময় খুব সতর্ক থাকা দরকার। কুম্ভকে এরা চেনে। কেউ কেউ সেলামও ঠুকে গেল।

কুম্ভ বলল, ভাল ধুপকাঠি আমারও দরকার। ড্রাইভারকে বলল, একটু ঘুরে যাবি।

দোকান থেকে ধুপকাঠি কেনার সময় কুম্ভ বলল, আপনার পছন্দ হচ্ছে না!

—ভাল গন্ধ হবে ত!

—খুব সুন্দর গন্ধ। নিয়ে দেখুন না।

—চড়া গন্ধ দরকার।

—আমার কিন্তু চড়া গন্ধ অতীশবাবু একদম পছন্দ না।

অতীশ বলতে পারত, আমারও না। কিন্তু এ মুহূর্তে কড়া গন্ধ চাই। এই এক ল্যাটা জীবনে। সে এক ধূপকাঠি কিনতে কিনতেই ফেরার হয়ে যাবে এমন ভাবল। সে প্রায় হামলে তুলে নিল ডজন খানেক ধূপবাতি।

কুম্ভ অতীশবাবুর কান্ড দেখে হাঁ হয়ে গেল। —এত ধূপকাঠি দিয়ে কি হবে?

অতীশ কিছু বলল না। দাম মিটিয়ে বলল, চলুন।

কুম্ভ ভাবল বেশ লোক বটে। এসেই ধূপকাঠি কিনতে শুরু করেছে। সে তবু বলল, দেশে পাঠাবেন বুঝি।

অতীশ বলল, না।

—ধূপকাঠি বেশি দিন থাকলে নষ্ট হয়ে যায়।

অতীশ বলল, জানি।

কুম্ভ কেন জানি আর কিছু বলতে সাহস পেল না। পাঁচ সাত ঘন্টা একসংগে কাটিয়ে মনে হয়েছে, মানুষটা কথা বলতে বলতে খুব অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কাজ বুঝে নেবার সময় না হলে কেউ বলতে পারে না। চলুন বস্তিটা ঘুরে দেখি। মানুষটা লেখালিখি করে। বস্তি দেখার তাই আগ্রহ। কিন্তু বস্তির কিছুটা ভিতরে গিয়েই বলল, থাক চলুন। পরে দেখা যাবে। এই বস্তির মধ্যে মাত্র একটা ন্যাড়া বেলগাছ এবং অশ্বত্থ গাছ দাঁড়িয়ে। আর কিছু নেই। ইলেকট্রিকের তার এদিক-ওদিক ঝুলে আছে। সব খুপরিগুলি আলকাতরায় অথবা পিচের টিনে মোড়া। ছোট ছোট দরজা, মানুষগুলি আরও ছোট, কাকলাশ। দেখে দেখে কুম্ভর অভ্যাস হয়ে গেছে। একটা লোক গামছা পরে শেডের নিচে বসে আছে। চা বানায় লোকটা। গালে বড় জড়ুল। চুল শাদা। লোকটা দাওয়ায় ঘুমায়। লোকটার নাম হরকু সিং। নাম শুনেই অতীশবাবু কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছিল।

কুম্ভ বলেছিল, আপনি আলাপ করতে পারেন। যদি বলেন অফিসে ডাকিয়ে আনব। বস্তির কেচ্ছা কাহিনী জানে।

অতীশ বলেছিল, কেচ্ছা কাহিনী লেখার বিষয় হতে পারে না কুম্ভবাবু।

কুম্ভর তাই ধারণা। সে হিন্দি সিনেমাখোর। বৌ হাসিরাণী প্রায় পারলে এবেলা ওবেলা দেখতে চায়। কোন রববার ফাঁক গেলে কুম্ভ জানে বিছানায় বউ ঘেঁষতে দেবে না। ভয়ে সে আগেই সেজন্য টিকিট কেটে রাখে, এবং একটা সপ্তাহ বৌকে তবে বিছানায় ওল্টে-পাল্টে নিরাপদে বেশ খুঁতসুই দেখা যায়। হাসিরাণীর রং গৌরবর্ণ। লম্বা বুকে কি সুষমা। রক্তে বিজ বিজ করে থোকা থোকা পোকা। ভেতরে কামড়ায়। হিন্দি সিনেমা না দেখলে পোকারা ভেতরে কামড়াতে উদগ্রীব হয় না। কেমন নিরাসক্ত, ঠেলে ফেলে দেয় বুকের ওপর থেকে। কুম্ভ নিচে গিয়ে শুয়ে থাকে।

গাড়িটা যাচ্ছে। ট্রাম লাইনে দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে। সিনেমা ভাঙ্গছে। হাউসের গায়ে সাই যোয়ান এক মন্দ এবং পাশে লম্বা ঠ্যাংখালি করে যুবতী দাঁড়িয়ে। বড়ই কামের উদ্রেক করে। রাস্তায় ভিড়। মানুষজন বাসের জন্য মোড়ে মোড়ে জমা হয়ে আছে। কাদার মতোই থিক থিক করছে মানুষেরা।

অতীশ এইসব দেখতে দেখতে অন্য-মনস্ক থাকতে চাইছে। কারণ গন্ধটা নাক থেকে যাচ্ছে না। সে ধূপকাঠির প্যাকেট-গুলি নাকের ডগায় প্রায় এনে উবু হয়ে বসল। কতক্ষণে গাড়িটা রাজবাড়িতে ঢুকবে। ঢুকলেই স্নান, এবং ঘরে ধূপ-বাতি জেলে দেবে। গন্ধটা তবে নাকে ঝুলে থাকবে না। আর্চির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

গাড়িটা ওদের রাজবাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। প্রথম দিন বলে, একটা গাড়ি পাওয়া গেছে। পরে অতীশকে ট্রামে বাসেই যেতে হবে। তার ট্রামে-বাসে ওঠার অভ্যাস একে-বারে নেই। রাস্তাঘাটও ভাল চেনে না। সে নামার সময় বলল, কুম্ভবাবু আমাকে যাবার সময় ডেকে নেবেন।

কিন্তু রাজবাড়ি ঢোকার মুখেই দেখল, ভেতরে যতদূর দেখা যায়—খালি। একটা লোক নেই। হঠ যা হঠ যা করে চিৎকার করছে একটা লোক। টিকিধারি গায়ে লম্বা পিরান, পরনে পাঞ্জাবী। সে লোকটাকে আগে দেখেনি। দু পাশ থেকে লোকজন সরে যাচ্ছে। যদি কেউ সামনে পড়েও যায়, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এবং হাত কড়জোর করা।

সদরের সিপাই হাঁকল, খবরদার রাজার গাড়ি আতা হ্যায়।

অতীশ দেখল, সাদা রঙের একটা ক্যাডিলাক। ভেতরে রাজেনদা। পাশে মেম-সাহেবের মতো ববকাট চুলের এক যুবতী। চোখে নীল চশমা। ভারি সুন্দর দেখতে এক রহস্যময়ী নারী। চোখ উদাস মনে হল। একবার যেন অতীশকে চোখ তুলে দেখেছেও। অতীশরও চোখে চোখ পড়ে গেছে। তারপরই সে কেমন বিমূঢ়।

যুবতীকে কোথায় যেন দেখেছে, কতকালের যেন চেনা। কে এই যুবতী এমন মনে হল তার। চেনা। কিন্তু সে তো দীর্ঘদিন বিশেষ করে নিরুদ্দিষ্ট জীবন থেকে ফিরে আসার পর গাঁয়ে ছিল। মাঝে এক বছর একটা কো-এডুকেশন ট্রেনিং কলেজে বি টি পড়েছে। হোস্টেল জীবনের সে কিছু মেয়ের মুখ মনে করার চেষ্টা করল। সবিতা, অন্নপূর্ণা, চন্দ্রা, জ্যোৎস্না, পূরবী এক এক করে তার সব সহপাঠিনীদের মুখ মনে করার চেষ্টা করল। না ওদের কেউ এমন দেখতে ছিল না। ওরা কেউ এত সুন্দর, এত লম্বা, এত মহিমময়ী ছিল না। শরীরে নীল রক্ত না থাকলে এমন নমনীয়তা চোখে মুখে কখনও আসে না।

সদরে সেও এক পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রাজবাড়ির এই নিয়ম। রাজা বের হলে, দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা। হাত করজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা। সে যত বড় অফিসার হোক রেহাই নেই। অতীশ নতুন। জানে না সব কিছু। সে হাতে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুম্ভবাবু বলল, এটা কি করলেন!

কি হল! তখনই বুঝল, তারও উচিত ছিল কুম্ভবাবুর মতো হাত তুলে কপালে ঠেকা। তারপর বলল, আমি ত জানি না। তারপরই ভেতরে কেমন এক দৈত্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রীতদাসের ভূমিকা পালন করতে হবে ভেবেই মাথার ঘিলুতে জ্বর চলে আসে। সে ভেতরে ভেতরে কেমন ক্ষেপে যায়। শক্ত এবং অমার্জিত গলায় বলল, এটাই এ-বাড়ির নিয়ম বুঝি?

কুম্ভ বলল, আজ্ঞে তাই। তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে যাবে। আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন আর লাগে না। নতুন নতুন লাগবে। ভাববেন না।

অতীশ মনে মনে কেন জানি ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে জানেও না তার নাকে আর গন্ধটা নেই। কখন গন্ধটা উবে গেছে। প্রেতাত্মার ভয় থেকেও এই অবমাননার ভয় তীব্র তীক্ষ্ম। সে আসলে বিভ্রমের মধ্যে পড়ে গেছে। যে গেল সে কে? তার গাড়ি গেলেই করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা—ভাবা যায় না। বরং বিদ্রোহ করবে। রিভলিউশন। এ-বাড়িতে এটা রেভলিউশনেরই সামিল। গতকাল সে রাজার সঙ্গে জুতো পরে দেখা করেছে। বাড়িতে এই নিয়ে তোলপাড় গেছে। মানসদাও খবরটা পেয়ে গেছিলেন। একবার সকালে এসে বলে গেলেন, ওহে নবীন যুবক, তোমার ত ভারি আস্পর্ধা হে। রাজার ঘরে জুতো পরে ঢোক। বেয়াদপ।

নবীন যুবক হা করে তাকিয়েছিল।

মানসদা বলেছিলেন, বুটের তলায় যতক্ষণ থাকবে, মনে রাখবে ভাল আছ। চুরি কর চামারি কর, খুন কর সব মাফ। বের হতে চেয়েছ কি মরেছ।

অতীশ কি বলতে গেলে এক ধমক দিয়েছিল মানসদা।—দেখ নবীন যুবক আমি তোমার আগে পৃথিবীতে এসেছি। অনেক দেখা। তুমি মনে করছ দেশ-বিদেশ করেছ বলে সব বোঝ, সব জান। মোসায়েবি বলে একটা কথা আছে অভিধানে। সেটা একবার খুলে পড়ে দেখ। উপকারে লাগবে। তুমি কতটা কাজের তার চেয়ে বেশি দরকার কত বড় তুমি মোসায়েব। ইংরেজ আমল থেকে দেশে সেই এক ট্রাডিশন চলছে। কক্কা ছক্কা বাইরে চলে, রাজার বাড়িতে চলে না। বলে তিনি তার মুঠো আলগা করে দেখালেন, কিছু নেই। তবু কত জোর এই মুঠিতে। চেপে ধর, মনে হবে, বিশ্বসংসার তোমার তালুতে, আলগা করে দাও, মনে হবে সাঁতার কাটছ।

সে ভাঙ্গা শ্যাওলাধরা দোতালা বাড়িটার সামনে এসেই সকালের কথাগুলি মনে করতে পারল। সৎ মানুষ চাই। সৎ জীবনের আশায় সে এখানে এসেছে। প্রথম সে ভারি নির্ভয় পেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সব ফাঁকা। সে বলল, আচ্ছা কুম্ভবাবু রাজেনদার পাশে ভদ্রমহিলা কে। প্রায় বিদেশিনীর মত দেখতে।

—ওরে বাপ, আপনার সঙ্গে কথা বললেও দেখছি কেলেংকারি হবে। বলতে হবে কে? তারপর খুব গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, বৌরাণী। সব কব্জা করে ফেলেছে। কুক্ষিগত করেছে সব। এ-সব কথা আবার দু-কান করবেন যে। কুম্ভ পরে বলতে যাচ্ছিল, কাছা-আলগা লোক মশাই আপনি। ধরে ফেলেছি। তারপরই সতর্ক করে দিয়ে বলল, দু-কান করবেন না। করলে সোজা মশাই অস্বীকার করব। বাবা বলেছেন, আত্মরক্ষার জন্য সব করা চলে। বাবার কথা খুব মানি। দেখেছি এতে আমার উপকারই হয়েছে। অনেক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি।

কুম্ভ চলে যাচ্ছিল, অতীশ ফের ডেকে কি যেন ভাবল বলবে। কিন্তু ভুলে গেছে কি বলবে।

কুম্ভ বলল, কিছু বলবেন?

—আচ্ছা বৌরাণীর দেশ কোথায় ছিল জানেন!

—আপনার দেখছি ভারি ব্যামো আছে। ও দিয়ে কি হবে! আমাদের সাহস আছে জানার!

—বাঙ্গালী মেয়েরা তো দেখতে এমন হয় না!

—কে বলেছে বাঙ্গালী। তবে শুনেছি বাপ বাঙ্গালী জমিদার ছিল। বাকিটা ঠিক জানি না। জানলেও বলব না। আপনি আমার ওপরওয়ালা, যদি জোর করে জানতে চান বলতে পারি। ধরা পড়লে বলব, চাকরি রক্ষার্থে বলেছি। তালেই দোষ খণ্ডন।

—না, জানতে চাই না। আর শুনুন, আমি কিন্তু রাতে মেসে খাব। আমার জন্য আর বাড়িতে ঝামেলা বাড়াবেন না।

কুম্ভ খুব মোলায়েম গলায় বলল, আপনাকে দাদার মতো দেখি বলেই এত জোর গলায় কথা বলি। বাবা বলেছেন, মানুষটা ভাল। সেই থেকে ভাল মানুষ আছেন। তবে কি জানেন, এ-বাড়িতে ভাল মানুষকেই আমাদের ভয়। আপনাকে কোন কথা বলতে ভয় করে।

অতীশ উঠে সিঁড়িতে যেতে যেতে বলল, আরে না, যত ভাল মানুষ আমাকে আপনারা ভাবছেন, আসলে আমি তত ভাল নই। শেষে নিজের কাছেই জবাবদিহি করার মতো বলল, ছোটবাবু কি ঠিক না! তুমি আড়ালে চলে যাচ্ছ কেন। সামনে এস। আমি ঠিক বলিনি!

অতীশ দেখতে পেল তার পাশে পাশে ছোটবাবু লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। ছোটবাবু একটা ক্রস কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে টুইন ডেকে উঠছে। পেছনে পেছনে বনি উঠে আসছে। পাশে সেই বুড়ো মানুষ—হাত তুলে দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র দেখিয়ে বলছেন, ইউ উইল কেরি দিস ক্রস।

অতীশ ছোটবাবুকে প্রশ্ন করল, সেটা মানুষের কতদিন!

ছোটবাবু সমুদ্রে উড়ে উড়ে বলে যাচ্ছে যেন, আজীবন অতীশ। আজীবন এই ক্রস বহন করে যেতে হয়।

অতীশ সাহস পেয়ে গেল। এই করে সে তার সাহস ফিরিয়ে আনে। সে তখন আবার স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ। কেউ একজন পাশের ঘর থেকে বলল, ফিরলেন।

—এই ফিরলাম।

—তাস খেলবেন। পার্টনার পাচ্ছি না।

অতীশ হেসে বলল, খেলব। তবে শিখিয়ে নিতে হবে।

—ধুস। আপনি মশাই তবে কি!

অতীশ বুঝতে পারল, তার সমবয়সী এই যুবকটি আজ অফিস কামাই করেছে। সে যখন বের হয়, তখন সিঁড়িতে দেখেছে, শ্যামলা রঙের একটা মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এই যুবকের ঘরে ঢুকে গেল। কলেজে পড়ে টড়ে বোধ হয়। হাতে বই খাতা। মেয়েটি এখন না থাকায় নিঃসঙ্গ বোধ করছে। তাকে তাস খেলতে বলছে। তাস খেলা জানে না বলে, বিস্ময়কর মানুষ ভেবেছে। সে যুবকের নাম জানে না। আলাপ করে নাম জেনে নেবার মানসিকতাও তার গড়ে ওঠেনি। ফলে সে দেখেছে, মানুষের সঙ্গে কিছুতেই তার দূরত্ব ঘুচতে চায় না। সে যেখানেই গেছে নিঃসঙ্গ এবং একা হয়ে পড়েছে। এবারে সে ভাবল, এগুলো ভাল লক্ষণ না। এই-জীবনও তার কাছে সেই অনিশ্চিত জীবনের মতো। এখানেও সে চায় কোন মৈত্রদা তার পাশে থাকুক। সারেঙ সাব থাকুন। মাথায় ওপর কেউ না কেউ বিশাল বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকুক জীবনভর। দু-দিনের মধ্যে একমাত্র মানসদাই যেন কিছুটা বৃক্ষের মতো। কিন্তু গত কাল সে যা দেখেছে তারপর এই মানুষের ওপর কতটা নির্ভর করতে পারবে।

অতীশ গলা বাড়িয়ে বলল, আপনার নামটা জানা গেল না।

—জয়ন্ত চক্রবর্তী। জয়ন্ত বলে ডাকবেন। এখানে সবাই চক্রবর্তী বলে। এটা আমার ভাল লাগে না।

—রাজার অফিসেই আছেন।

—ওরে বাপ মরে গেলেও না। আমার বাবা করতেন। আমরা কেউ করি না। বাবা

চোখ ধাঁধানো সাদা
যে
দেখে সেই বলে...
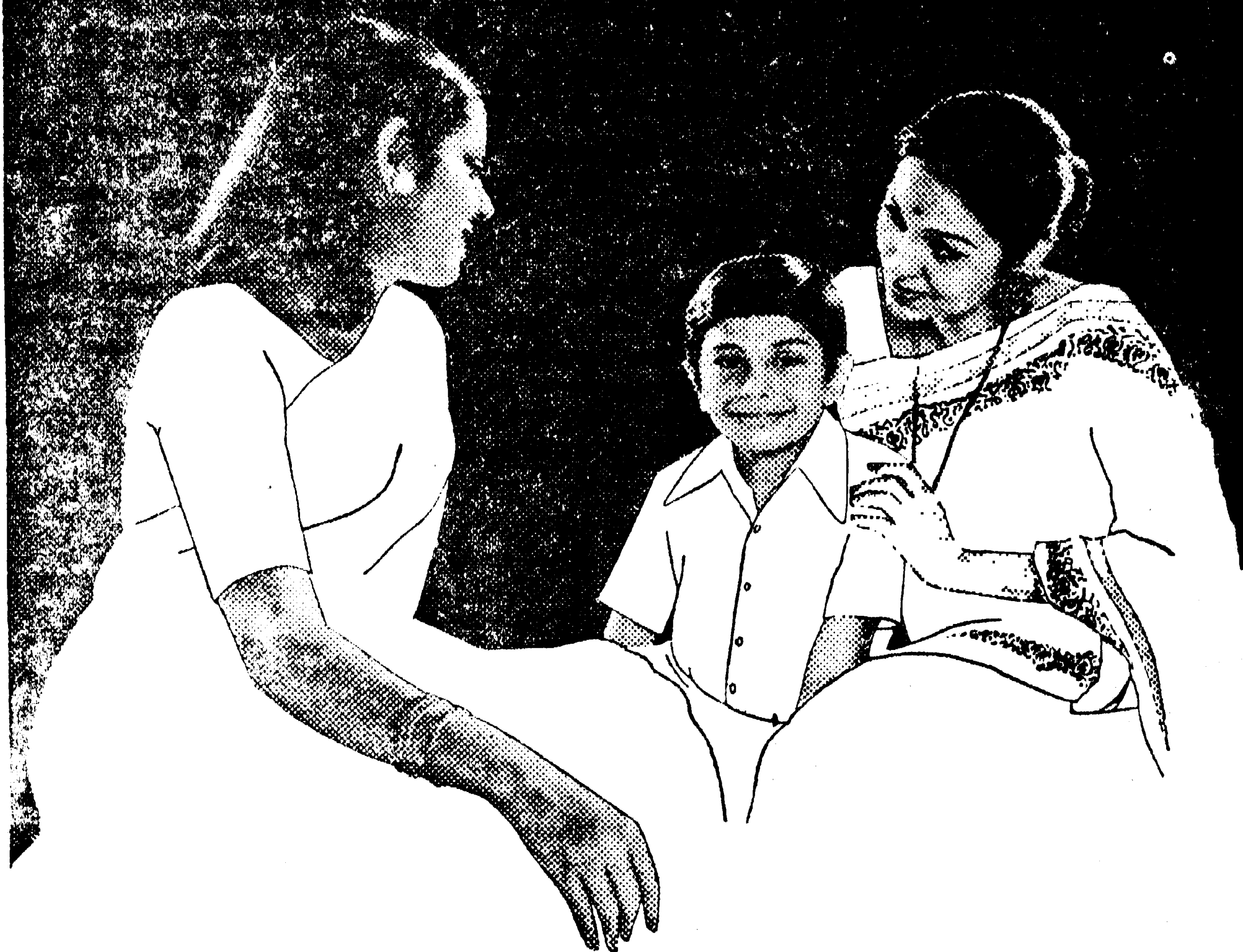
এ হচ্ছে
ডেট
ডিটারজেন্ট কেক
দিয়ে ধোওয়া

Shilpi DM 35A/78 Ben

অত্যেদ্র যায়ার জন্যেই অকালে মরে গেলেন। আসলে এদের মুসকিল কি জানেন, এরা আবে অনেক ছেড়ে গেলে অন্য কোথাও কেউ কাজ করতে পারবে না। বাপের মতো বেটারাও ভিক্ষা চাইতে আসবে।

অতসব কথা অতীশ শুনতে চায়নি। শুধু সামান্য কাছে আসার জন্য দুটো একটা কথা বলা। ছেলেটি খুব খোলামেলা কথা বলছে। আরও বলত, কিন্তু হাত মুখ ধুয়ে এখন কিছু খাওয়া দরকার। সান্ধ্য হয়ে গেছে। মেস বাড়িতে ন'টায় খাবার দেবে। এর আগে সামান্য কিছু খেয়ে না নিলে খিদেয় কষ্ট পাবে ভাবল। গাড়ি বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। রাজপ্রাসাদে আলো, নতুন বাড়ির একটা দিকে আলো জ্বলছে। অন্য দিকটা অন্ধকার। নিচে সব অফিস ফেরত মানুষ যে যার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

অতীশ বাথরুমে স্নান করে নিল। ঘরে এসে তোয়ালে মেলে দেবার সময় দেখল, জয়ন্ত বারান্দায় রেলিঙে ভর করে কি দেখছে। নাকে রুমাল চাপা এবং সেও একটা পচা গন্ধ পেল। নিচ থেকে খুপড়ি ঘরগুলোর বাচচাদের সোরগোল আসছে সে বলল, জয়ন্ত বাবু কিসের গন্ধ পাচ্ছি।

—আরে বাইরে এসে দেখুন। মানুষের লাশ। কে গায়েব করে রেখেছিল।

এমন নিরাসক্ত গলায় জয়ন্ত কথাটা বলল, যেন এটা কোন ঘটনাই নয়। সে দৌড়ে বাইরে বের হয়ে গেল। দেখল তিন চাকার আবর্জনা টানার টিনের একটা গাড়িতে এ-বাড়ির জমাদার বস্তা ঢেকে কি নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে এক দঙ্গল লোক।

অতীশ মানুষগুলোর কৌতূহল দেখে বুঝল, জয়ন্ত ঠাট্টা করছে। এতটুকু গাড়িতে মানুষের লাস যায় কি করে। কুকুর বেড়াল মরেছে। সে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঘরে ফিরে এল।

জয়ন্ত ওখান থেকেই বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না! এ-বাড়িতে আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্রূণ হত্যা হয়েছে। লক্ষণ ভাল না।

অতীশ বলল, তার মানে!

জয়ন্ত বলল, ভালবাসার দান এখন আস্তাকুড়ে। পচে ঢোল।

অতীশ কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। এই ঘটনার সঙ্গে তার আসার একটা সম্পর্ক খুঁজছে জয়ন্ত। সে বলল, হত্যাকারী ধরা পড়েছে!

—না।

—প্রাইভেট অফিসে এই নিয়ে ঝামেলা গেল। আমারও ডাক পড়েছিল।

—কেন ?

—যদি জানি। যদি কোন ক্লু দিতে পারি। আসলে এটাতো আর রাজার বাড়ি নেই। চারপাশটা দেখুন বস্তির মতো। ঐ ঘেরাটা দিয়ে রাজা সতীত্ব বাচাচ্ছে। কতদিন চলে দেখা যাক। এখন বাড়িতে যত যুবতী মেয়ে আছে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করালেই সব ধরা যায়। ওতে কারো গরজ নেই। তখনই কুম্ভবাবু নিচে ছুটে আসছে। হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে উঠছে।

—দাদা শুনেছেন কাণ্ড।

—এইত নিয়ে গেল।

—বলেন, এ-বাড়িতে কারো থাকতে ইচ্ছে করে। বাড়িটাকে রেণ্ডিপাড়া করে ছাড়ল।

অতীশ বলল, এতে উত্তেজিত হবার কি আছে!

—নেই বলছেন। তা হলে নেই। সে উঠে পড়ল। তারপর কেমন উত্তেজিত গলায় বলল, কোথায় ও-সব পয়দা হয় জানা আছে। হাত দিতে পারছি না। যখন দেব না, রাজার বাড়ি উল্টে যাবে।

অতীশের কানে লাগছিল কথাগুলো। বলল, কুম্ভবাবু বসুন। চা আনান কাউকে বলে। কিছু খাবার। অতীশ টাকা বের করে দিল।

কুম্ভবাবু বেশ প্রফুল্ল হয়ে গেল। এ-বাড়ির সবার ওপর খবরদারি করার একটা হক আছে তার। সে রেলিং-এ ঝুঁকে ডাকল, দেখত, অফিসে কে আছে নকুল। কালীদা। পঞ্চানন যেই থাবুক পাঠিয়ে দিবি। নতুন ম্যানেজারবাবুর চা মিষ্টি আনতে হবে।

চা মিষ্টি খাবার পর কুম্ভবাবু বলল, যাই দাদা, কাল মোহনবাগান ওয়াড়ি খেলা আছে। যাবেন নাকি! টিকিটের জন্য ভাববেন না। কাবুলবাবুকে ধরলেই হবে। রাজার মেম্বারশিপের কার্ড আছে। কাবুল-বাবুর আছে। ওকে ধরলে দুটোই পাওয়া যাবে।

অতীশ দেখল, এই মানুষ কিছুক্ষণ আগে ভেবেছিল, সমাজ সংসার রসাতলে গেল, এই মানুষ সিঙ্গাড়া মিষ্টি খেয়ে কাল খেলা দেখবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এই মানুষ তার অফিসে তার পরেই জায়গা দখল করে আছে। বছর চারেক হল কাজ করছে। কাজ বোঝে ভাল। আসলে অফিসে সে ওপরওয়ালা না এই কুম্ভবাবু, পরে বোধ হয় টের পাওয়া যাবে। অতীশ এ-মুহূর্তে এই নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করা পছন্দ করছে না। এখন তার মনের মধ্যে সেই রহস্যময়ী নারী—কোথায় কখন, কবে—কত দূরে কোন অতীতে, তবু এত পরিচিত, যেন কতকাল সে শৈশবে এই মুখটা মনে মনে লালন করেছিল—অথচ মনে করতে পারছে না।

তখনই কুম্ভবাবু বলল, আপনি থাবেন না শুনে বাবা খুব কষ্ট পেয়েছেন। মেসের খাওয়া আপনার সহ্য হবে!

—সে হয়ে যাবে।

—শুনেছি ত' অপানার কোয়ার্টার ঠিক হচ্ছে।

—আমার কোয়ার্টার!

—আরে দাদা আপনি খুব গুড বুকে আছেন। চালিয়ে যান। কোথায় যে আপনি সুতো টেনে রেখেছেন কে জানে। আমি একটা আলাদা কোয়ার্টার চাইলুম, কিছু-তেই রাজি করানো গেল না। পাশের একটা বাড়তি ঘর দিয়ে দায় চুকিয়ে দিল।

অতীশ কিছুই শুনছে না। সে কি ভেবে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকার পর বলল, আমি তো কোয়ার্টারের কথা বলিনি কুম্ভবাবু। কারটা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন দেখুন!

কুম্ভবাবু বেঁটে গোলগাল চেহারার মানুষ। মাথায় ঘন চুল, রং ফর্সা। পাতলুন পরনে। জরির কাজ করা পাঞ্জাবি গায়। বাপের মতো সৌখিন। কেবল কানে এখনও আতর মাখানো তুলা গোঁজা নেই। বয়স বাড়লে হবে। অফিস থেকে ফিরে স্নান-টান সেরে এসেছে। গলায় ঘাড়ে পাউডার। বেশ সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। সে এখন ঘরটা দেখছে। দোতলায় এটা এখন রাজার গেস্ট-হাউস। বাইরের কেউ এলে থাকে। কুম্ভ এ-ঘরটায় অনেকদিন আসেনি। অতীশ আসায় এ-ঘরটায় আবার আসার সুযোগ পেয়েছে। সে পায়ের উপর পা রেখে বলল, এ শর্মা, দাদা না জেনে কিছু বলে না।

এ-বাড়ির ওপর অতীশের কৃতজ্ঞতায় মনটা কেমন ভরে গেল। নির্মলা এলে সে এত ভয় পাবে না। নির্মলাও এখন তার কাছে বড় বৃক্ষের মতো। মিণ্টু টুটুল সে। আসার সময় মিন্টু টুটুল ঘুমিয়েছিল। ফুটফুটে দুটো শিশু জানেই না তাদের বাবা একা পড়ে গিয়ে কত অসহায় বোধ করছে। ভয় পাচ্ছে। এবং যা হয়ে থাকে, তাকে একা পেলেই সেই প্রেতাত্মা গন্ধ ছড়ায়। অফিসে আজ প্রথম গন্ধটা পেয়েছিল। এবং যা করে থাকে, সে এক বাকস ধূপকাঠি কিনে এনেছে। পরে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখলে অতীশ দেখেছে গন্ধটা কেমন ক্রমে মরে আসে। সে নিজেই এভাবে আত্মরক্ষার উপায় [illegible] করে নিয়েছে। প্রথম প্রথম সহসা ক[illegible]ও এভাবে ধরে ধূপকাঠি রাশি রাশি জ্বালিয়ে দিলে নির্মলা বিস্মিত হয়ে বলত, করছ কি। একটা-দুটো জ্বালাও। এত গুচ্ছ গুচ্ছ জ্বালাচ্ছ কেন। লোকে তো পাগল বলবে।

অতীশ নির্মলার কথায় তখন ক্ষেপে যেত। গন্ধটা ছড়ালেই তার মাথা কেমন ঠিক থাকে না। চোখ লাল হয়ে যায়। কথা কম বলে। চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কিছু বললেই, চিৎকার করে ওঠে। নির্মলা বুঝতে পারে না কেন এমন হয়, মাঝে মাঝে বিভ্রমে পড়ে গিয়ে কেঁদে ফেলে। আর তখনই অতীশের কি হয়ে যায়। সে নির্মলার প্রতি অহেতুক নিষ্ঠুর আচরণ করছে ভাবে। বলে, তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। মাঝে মাঝে আমার এটা হয়। কিসের গন্ধ পাই। থেতে পারি না। ধূপকাঠি জেলে দিলে স্বস্তি পাই।

(চলবে)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বেকারই বসে আছে এখন। হয়ত—বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে যে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল হয়েছে সেখানে ভর্তি হয়ে কিছু শিখবে। ওর বাবার অবস্থা ভাল, বড় চাকরি করেন, এখনই রোজগারের চিন্তায় দরকার নেই।

এদের ন্বায়া না হলেও শেষ পর্যন্ত মাসখানেক পরে টিউশ্যানীর একটা খবর পাওয়া গেল। সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্রকে পড়াতে হবে, বারো টাকা মাইনে। অন্য কোন ম্যাট্রিক পাস ছেলে হলে ভয় পেত—অত ওপরের ক্লাসের ছেলে পড়াতে—সে ভারটা বিনুর ছিল না। যে সন্ধান দিল, সেও ছাত্রের বাপকে সেই আশ্বাসই দিয়েছে—'একটা পাস হলে কি হয়, যাকে দিচ্ছি সে বিদ্যের পিপে একটা।'

সন্ধান দিল যার সঙ্গে একেবারেই সরস্বতীর সম্পর্ক নেই—সে-ই। অর্থাৎ কেষ্ট।

এই কেষ্ট আর অজিতকে ওর সঙ্কোচ করা বা এড়িয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। করা উচিতও নয়। সেই নিঃস্ব নিঃসহায় অবস্থায় পথে বেরোনোর দিন ওরা যা করেছিল তার ঋণ শোধ হবার নয়। অজিতের কাছ থেকেই ওর টিউশ্যানী পাবার কথা—কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, পাড়াঘরে যার অবাধ যাতায়াত, সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্তঃপুর পর্যন্ত যার কাছে অবারিত—সেই অজিত একেবারে যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও আর বেরোয় না বড় একটা, বেরোলেও ছোটখাটো কিছু ব্যবসা করার চেষ্টায় যেটুকু বেরোনো দরকার সেইটুকু বা বাড়ির বাইরে যায়—যেমন পুকুর জমা নিয়ে মাছের চারা ফেলা, বাগান জমা নেওয়া এই রকম, যাতে ভদ্রলোক

আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা না হলেও চলে।

এই ক'মাসেই অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে অজিতের। সেই অপরিমাণ আত্মবিশ্বাসী ও যৌবন বিলাসী বেপরোয়া অজিতকে আজ আর চেনা যায় না। কেমন যেন 'থ'ম'-মেরে গেছে। দেখা হলে ক্লিষ্ট হাসি হাসে। চাকরির কথা ওর মা দুচারজনকে বলেছেন বটে কিন্তু ও কারও বাড়ি যেতে চায় না, চাকরি হবে কেমন করে!

এর কারণটা দোলার মুখে শুনেছিল আগেই। একটি ওর-উচ্ছিষ্ট করা মেয়ের আত্মহত্যা থেকেই নাকি এই পরিবর্তন, কিন্তু পুরোটা শুনল কেষ্টর মুখ থেকে। বিশ্বাস হয় না, তবে কেষ্ট সাধারণত মিথ্যে বলে না। এই জন্যেই কেমন একটু ধোকা লাগে। ঐ পরমাসুন্দরী মেয়েটিকে অবাধে ভোগ করার জন্যেই মেয়েটির এক বছরের ছোট ভাইটিকেও দলে টেনে ছিল। ঠিক সে সময়ে বাধা দিতে পারে নি—কেন পারে নি তা সে নিজেও বোধহয় জানে না, কেলেঙ্কারীর ভয়, কৌতূহল, অভাবনীয়ের বিস্ময়—সবটা জড়িয়েই বোধহয়—কিন্তু গ্লানি একটা ছিলই, সেটা দিন দিন বাড়ছিলও। সে গ্লানি পরিবর্তীকালে ওর সে ভাইয়ের মধ্যেও লক্ষ্য করেছে অনেকে। সে ভাল লেখাপড়া শিখে বড় সরকারী চাকরিতে ঢুকলেও কেমন যেন নিজেই নিজেকে একঘরে করে রেখেছিল, বিয়ে-থাও করে নি।

মেয়েটার আরও বেশী আঘাত লেগে থাকবে। সুপুরুষ, ভদ্র, বিত্তবান, উচ্চবংশীয় স্বামীর পূজো করার মতো ভালবাসা মুক্তমনে নিতে না পারার জন্যই—অপরাধ বোধের প্রাচীর কিছুতেই ভাঙতে না পেরেই বোধহয় প্রাণটা দিল। বোধহয় ভাবল এই অপবিত্র দেহটা দিয়ে এমন একটা মানুষের নির্মল ঐকান্তিক প্রেমকে প্রবঞ্চিত করার অধিকার তার নেই।

কে জানে, হয়ত নিজের প্রাণ দিয়ে আরও অনেক মেয়েকে রক্ষা করে গেল সে—ঐ যৌনকীট পশুটার বল্গাহীন সম্ভোগেচ্ছা পূরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিয়ে। কেষ্টর কথা যদি সত্য হয়, ঐ আঘাতেই অজিত এমন জড়ভরত হয়ে গেছে।

কেষ্টও সুখে নেই। যে পরিবারে সে নিত্য অতিথি তাদের অর্থ-কষ্ট চরমে পেঁছেছে। কেষ্টরও এমন কোন আয় নেই যে মাসে অন্তত কুড়িটা টাকাও তাদের দিতে পারে। যে মেয়েটার নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত সেবা ওকে ওখানে বেঁধে রেখেছিল, সেই মেয়েটাকেই এক বাড়িতে রান্নার কাজে লাগাতে হয়েছে। শুধু রান্নাই নয়, বর্তমান

কালের ধরণ অনুযায়ী তাকে 'কমবাইন্ড হ্যান্ড' বলেন তাঁরা—অর্থাৎ ঘর মোছা, বাসন মাজা কাপড় কাচা সব কাজই করতে হয়। আর তাতেও পরিত্রাণ পায় না, কালো সাধারণ চেহারার মেয়ে হলেও স্বাস্থ্য ভাল—ফলে, প্রায়ই নির্জন অবসরে বাড়ির বড় ছেলেটির তুষ্টি বিধান করতে হয়। প্রথমে মেয়ের বাড়ির সবাই ক্ষেপে উঠেছিল কিন্তু সে ছোকরা এর মধ্যে মাঝে মাঝে দু-পাঁচ টাকা বাড়তি দেয়, একবার দশ টাকা দিয়ে একখানা ভাল কাপড়ও কিনে দিয়েছে, মাইনেও ভাল দেন কর্তা। কোনপ্রকার উপার্জনহীন পরিবারে আত্মসম্মান জ্ঞান বিলাস মাত্র।

কেষ্টর এর জন্যে ক্ষোভের অন্ত নেই। নিজের অসামর্থ্যে তার চোখে জল এসে যায়। সে বলে, এবার আমি কাটব ভাই। মার কষ্টও আর দেখা যায় না। মা আমার জন্যেই পথের ভিখিরি বলতে গেলে, ভদ্রভাবে ঝি গিরি করতে হচ্ছে। এখনও যদি কিছু রোজগারের চেষ্টা না দেখি, তাহলে এরপর গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া পথ থাকবে না।'

'কোথায় যাবে?' বিনু জিজ্ঞাসা করে, 'কি করবে সে সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?'

'কোথায় যাবো এখনও ঠিক করি নি। ভেবেছি পশ্চিমের দিকে কোন শহরে চলে যাবো। কাশী ছাড়া কোন শহরে। কাশীতে কেষ্টর চেনা লোক। আত্মীয় স্বজনই একগাদা। পাটনা যেতে পারতুম—কিন্তু বিহারে পয়সা নেই, সবাই বলে। তাই ঠিক করেছি বিনি টিকিটে যাবো, কাশী পেরিয়ে যেখেনে নামিয়ে দেয় সেখেনেই নেমে পড়ব। পৈরাগ, লখনৌ, দিল্লী যেখেনে হোক। কি করব? জানার মধ্যে তো জানি এই একটু ধেই-ধেই করতে নাচ, কোনমতে মেয়েলি গলায় একটু গাইতেও পারি। কাকার দোলতে দুচার ঘা বেত খেয়ে যেটুকু হয়েছে। যদি পারি ঐ দিকটা বজায় রেখে কিছু রোজগার করতে, সেই চেষ্টা আগে দেখব—না হলে যা পাই তাই করব। চানাচুর বিক্রী, কিম্বা মুটে গিরি, শেষমেষ করাও বাড়ি রান্নার কাজ। মাংসটা ভালই রাঁধি, কোন চায়ের দোকানেও কাজ জুটতে পারে। যেখেনে কেউ চেনে না, সেখেনে তো আর লজ্জা পাবার কিছু নেই। মোদ্দা কথা দু'বছরের মধ্যে মানে মার শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার আগে এসে ওকে নিয়ে যেতে হবে। তা এই সত্যি বলছি, সে ক্ষেত্তরে গঙ্গায় গিয়ে ডুবব। ছেলে হয়ে মার ঢের ক্ষোয়ার করেছি—শেষ বয়েসে যদি ছেলের রোজগারে বসিয়ে না খাওয়াতে পারি তাহলে আমার না-বাঁচাই ভাল, তাই না? বল!'

কেন্ট সত্যিই এই কথার মাস ছয়েক পরে একদিন উধাও হয়ে গেল। বিনু ওর সেই 'বন্ধু পরিবারে' নিজেই গিয়ে খবর নিয়েছিল একদিন, তাঁরাও ওর কাছে কোন সঙ্কোচ করেন নি। যাবার সময় মনির বাড়ি থেকে পাওয়া একটা নতুন গামছা আর পুরনো ধুতি একখানা। বাড়ি থেকে কিছুই নিতে পারে নি, প্রথম নেবার মতো কিছু ছিল না, দ্বিতীয় মার টের পাবার ভয়। অপর কারও বাড়ি থেকে চেয়ে চিন্তে কিছু নিতে গেলেও মা টের পেয়ে যাবে।

ঐটুকু সম্বল করেই অজানা ভবিষ্যতে ঝাঁপ দিয়েছিল সে। হয়ত বিনু দুচারটে টাকা দিতে পারত—কেন্টরই দৌলতে পাওয়া টিউশনীর টাকা থেকে—কিন্তু পাছে বাধা দেয়, সেই ভয়ে হয়ত চায় নি।

কোথায় গিছল, কি করছে কিছুই জানা যায় নি। কে-ই বা আছে পয়সা খরচ করে কি উদ্যোগ করে খবর করবে। মার নামে প্রায়-অবাধ্য হাতের লেখায় একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল অবশ্য, তবে তাতে তিনি শান্ত হতে পারেন নি, বিনু গিয়ে তার মনোভাব ও প্রতিজ্ঞার কথা জানাতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

এর দু'বছরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারেনি অবশ্য, তবে বার-দুই গোটা পঞ্চাশ করে টাকা পাঠিয়েছিল মাকে। মনি অর্ডারে নয়, লোক মারফৎ। এমন লোক এসেছিল দিতে, সে কেন্টর নামটা মাত্র জানে—কী করে কোথায় থাকে কিছুই জানে না। মানে তারা তাদের কোন বন্ধু মারফৎ এই টাকা আর ঠিকানা পেয়েছে। পাছে তার খোঁজ পায় আর কেউ খোঁজ করে—বোধহয় সেই জন্যেই এত সতর্কতা।

খবর প্রথম পেয়েছিল বিনুই। তার সঙ্গেই প্রথম দেখা হয়েছিল।

সে কেন্টর আকস্মিক অন্তর্ধানের বছর তিনেক পরের কথা।

বিনু আর ললিত গেছে যুক্ত প্রদেশে—যেটায় পরবর্তীকালে নাম হয়েছে উত্তর প্রদেশ—কিছু উপার্জনের চেষ্টায়। পাঠ্য পুস্তকের ক্যানভাসিং, তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া কাজ। অর্থাৎ তারই যাওয়ার কথা, মে মাসে ওদিকে যেতে সাহস হয় নি বলে কাজটা ওদের দিয়েছিল। একজনেরই করবার কথা, ললিতের-সান্নিধ্য-লীলায়িত বিনু ওকে সঙ্গে নিয়েছিল এক রকম জোর করেই। বলেছিল, 'রোজগার না-ই বা হোল, দেশ ভ্রমণটা তো হোক।'

কাশী এলাহাবাদ মির্জাপুর হয়ে ওরা লক্ষ্ণৌতে পৌঁছেছিল। সকালে দুটো স্কুল সেরে বেলা দশটা নাগাদ প্রখর রোদে ওরা আমিনাবাদের রাস্তায় ঘুরছে—হঠাৎ চোখে পড়ল, কে একটি লোক একটা সিনেমা হাউসের দু' চাকার বিজ্ঞাপনের গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এ গাড়ি এখনও চলে মফঃস্বলে, কলকাতাতে আগে চলত খুব, এখনও একেবারে অদৃশ্য হয় নি। দুটো তাসে ওপর দিকে মুখোমুখি ঠেকিয়ে যেমন বাড়ি করার চেষ্টা করে ছেলেরা, তেমনিভাবে প্রকাণ্ড দুটো ফ্রেমে আঁটা ক্যাম্বিসের পর্দায় ছাপা ছবি সেঁটে কিম্বা হাতে এঁকে চলতি কি আগামী ছবির বিজ্ঞাপন করা হয়। —এ দুটো ফ্রেম-এর নিচে দুটো চাকা লাগানো আছে, একদিকে হ্যান্ডেলের মতো, একটা লোক ঠেলে নিয়ে যায়।

আগে এটাই দৈনিক বিজ্ঞাপনের বড় উপায় ছিল, তখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন খুব একটা কেউ দিত না। কলকাতাতেও তাই। লাগসই ছবি, অর্থাৎ যা অল্প শিক্ষিত মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে। তারই বিজ্ঞাপন বেশী করা হত। অনেক সময় ছবিটা প্রযোজকরাই দিতেন, কাগজে ছাপা পোস্টার সেগুলো সেঁটে কোন 'হল'-এ হচ্ছে সেটা এক কোণে হাতে লিখে জানানো হত। ইংরিজী ছবির হিন্দী পরিচয়ও দেওয়া হ'ত আলাদা কাগজে—সিরিয়াল বা ক্রমশ প্রকাশ্য ছবির বিশেষ করে—মানে লম্বা চব্বিশ রীল কি ত্রিশ রীলের ছবি, তিন সপ্তাহে ভাগ করে দেখানো হ'ত। ভাল ছবিও যে এমন একেবারে আসত না তা নয়—বিখ্যাত লা মিজরার বইয়ের ফরাসী ছবি এমনি দু সপ্তাহে দেখানো হয়েছে বিনুই দেখেছে। এর মধ্যে মারামারি লাফালাফি বোম্বেটে ডাকাতদের দুটিই বেশী জনপ্রিয়, এগুলোর হিন্দী পরিচয় বেশী দরকার। "এ ভি পোলো কি ধরতি কাম" (চোর পুলিশ খেলায় ব্যাপার কতকটা) "পাল বহাইট কি ঘোড়ে কি কাম" এমনি বর্ণনায় লোভ দেখানো হ'ত দর্শকদের।

এই গাড়িটায় কি একটা ইংরেজী ছবির পোস্টার মারা ছিল দুদিকেই, তার সঙ্গে হাতে আঁকা এক ছবি—এক তথাকথিত সুন্দরী নারীর নৃত্যরতা মূর্তি, ছবিটা অবশ্য আঁকার গুণে দাঁড়িয়েছে এক বীভৎস ডাইনি গোছের—তার নিচে বড় বড় হরফে ছাপা এতৎসহ স্টেজের উপর চান্দ্-সার মাষ্টার দত্তম্ আরতি নৃত্য দেখানো হবে প্রতিবার ইন্টারভ্যালে, আধ ঘন্টা করে!

অন্য পদবী হলে যেমন অন্যমনস্ক ভাবে কথা কইতে কইতে যাচ্ছিল তেমনি এগিয়ে চলে যেত—কিন্তু পদবীটা চোখে পড়তেই দুজনেই থেমে গেল। এ নিতান্তই বাঙ্গালীর পদবী—আর ওদের যেন বিশেষ পরিচিত।

সচেতন হতে এক মুহূর্তের বেশী সময় লাগে নি, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ গিয়ে পড়ল যে লোকটি গাড়ি ঠেলছে তার ওপর। গাড়ি ঠেলছে কিন্তু তার সঙ্গেই আশ্চর্য কৌশলে দুদিকে ইংরেজী হিন্দীতে ছাপা হ্যান্ডবিল বিলোচ্ছে।

এ মূর্তি ভুল হবার নয়। কুচকুচে কালো রঙ—এদেশের লোক সাধারণত এত কালো হয় না—প্রায় মেয়েদের মতো বড় বড় চুল পিঠ ছেয়ে এলিয়ে আছে, তেমনিই মধ্যে সিঁথি, মুখে একটি জলন্ত বিড়ি, পরনে একটা গেঞ্জি আর খাকি হাফ প্যান্ট, গলগল করে ঘামছে। এটা কেন্টর বিশেষত্ব শীতের দিনেও এমনি ঘামে ও।

চিনতে পেরেছে কেন্টও, তবে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা কুণ্ঠিত নয় সেজন্যে, পাছে এরা ওর সমান পর্যায়ের লোক কেউ ভাবে, সেই সম্মানটা বাঁচাতেই, চেঁচিয়ে বলল, জরুর আইয়েগা বাবু সাহেব, খেল বহুৎ আচ্ছা হ্যায়, উসকে সাথনাচ ভি হ্যায় উমদা। এহি কৃষ্ণা টকীজ মে, হিয়াকে নজদিগ, একদম বরাব্বর।

তার পর গাড়িটা দাঁড় করিয়ে কাছে এসে গলা নামিয়ে বললে, একটু দাঁড়া, ঐ শ্রীরাম রোডের মোড়টায়। আমি আসছি।

প্রায় মিনিট খানেকের মধ্যেই কোথা থেকে একটি এদেশী লোককে ধরে নিয়ে এল, যার হাতে হ্যান্ডবিলের গোছাটা ধরিয়ে দিতে বললো, তুম যাতে রহো—একদম হল মে আ জানা ওয়াপিস! আচ্ছা?

তারপর খুব সহজভাবেই ওদের বললে, আয় আমার সঙ্গে—আমার আস্তানায়। যেন ওদের আসারই কথা, আশা করছিল এতক্ষণ ওরা পূর্ব বন্দোবস্ত মতোই যথাসময়ে এসে পড়েছে।

বিনু বললে, তা গাড়ি?

কেন্ট বললে, ঐ যে, ওকে দিয়ে দিলুম। মালিকের কাজচলা চাই, কে চালাচ্ছে সেটা তো বড় কথা নয়। ও কলে কাজ করে, আজ ওর ছুটি, সুবিধে হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে ওকে বিনি পয়সায় সিনেমা দেখাই, ও আমায় অনেক বেগার দিয়ে দেয় এমনি। তা ছাড়াও, ওকে সামনে দেখলুম তাই, নইলে আমার লোকের অভাব হ'ত না। আশপাশে এই কাজ করে এমন ছোকরা বহুৎ আছে, এই তো পাট্টি আমিনাবাদ—আমরা সকলেই একে অপরের কাজ করে দিই দরকার হ'লে—দোস্তির ইজ্জৎ রাখি। এরা বলে কামনাদারি—কী বুঝি ইংরেজী কথা আছে একটা—কমরেডারি না কি—তাই থেকে নিয়েছে।'

কাছেই ওর কৃষ্ণা টকীজ। বড় সিনেমা হ'ল তবে এখনও বাইরের কাজ পুরো হয় নি—'ফিনিস' বলে। হল বড়, স্টেজও প্রকাণ্ড সিনেমা না হয়ে থিয়েটারও হ'তে পারত।

কেন্ট এক রকম ওদের টানতে টানতে নিয়ে গেল। কাঁচা ইঁট খোয়া ছড়ানো জমি দিয়ে একদম পিছনের দিকে নিয়ে গিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে ঢুকল। স্টেজের সামনের দিকে ছবির পর্দা ফেলা। পিছনে অনেকটা জায়গা। তারই এক পাশে একটা পাট করা তেরপল, সেটাই নাকি ওর বিছানা, অবশ্য বলে নিল—শোবার আগে এর ওপর একটা চাদর বিছিয়ে নেয়। পাশে একটা টিনের সুটকেস। পেছনের দেওয়ালে একটা দড়ি টানা আলনা, তাতে একটা লুঙ্গি, একটা জাঙ্গিয়া আর একটা গেঞ্জি। একখানা বোম্বাই চাদরও বিছিয়ে শোয়। হয়ত এই সুটকেসটাই মাথায় দেয়।

(চলবে)

পাহাড়ের মত মানুষ
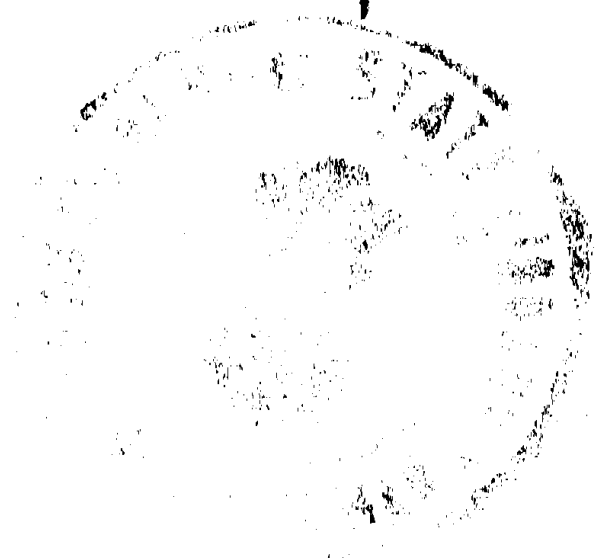
অমর মিত্র

শ্মশানে ভয় নেই। বিভু অন্ধকারে বলে।

আয় ঘরে যাই।

তুই ইস্টিশন মাস্টার-এর ছেলে?

দীপঙ্কর উত্তেজিত হয়ে ওঠে ক্রমশঃ।

চ ঘরে যাই, আমার ভয় করছে।

চারদিকে খাঁ খাঁ নৈঃশব্দ্য। দূরে শব-দাহনের পোড়া কাঠ পড়ে আছে। ভাঙ্গা হাঁড়ি। বটগাছটার মাথায় দুটো শকুন।

মার্বেলটা খুঁজে নিই।

ও আর পাবি না।

না আ-আঁ। সেই বালক চিৎকার করে ওঠে আচমকা। দিগ-দিগন্ত জুড়ে সেই ঋণাত্মক শব্দ বিস্তৃত হয়ে যায়। বালকের চোখ জ্বলছে। চোখ বলছে, তুই ফিরে যা মাস্টারের ছেলে।

দীপঙ্কর লাফ দিয়ে উঠে বসেছে বিছানায়। কে ঐ লোকটা। হ্যাঁ সেই মুখ পরিষ্কার। ধরা গেছে সব।

বদলীর চাকরী ছিল বাবার। রেলের স্টেশন মাস্টার। এতদিন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল সেই স্টেশনে। মাস ছয়েক ছিল। তার ভিতর বুকের মধ্যে ঢুকে গেল বিভু। হ্যাঁ সেই অমল কিশোর। এত-দিনে চেহারা বদলে গেছে। কিন্তু ভুল নেই আবিষ্কারে।

বিভূতি। সত্যি হয় নাকি এমন। একে-বারে বদলে যাওয়া মানুষ। তাকে সেই দিন শ্মশানে ফেলে রেখে চলে এসেছিল দীপঙ্কর। তার ভয় হচ্ছিল। সমস্ত কৌতূহল শেষ করে যাচ্ছিল। তারপর।

মার্বেল পেয়েছিস?

না, কোথায় যে পড়ল?

অন্য কোথাও হয়ত।

না ঐ শ্মশানে ঠিক।

তোর ভয় করে না।

কেন ভয় করবে, ওখানে সেদিন আমার দাদাকে পোড়ানো হল, দাদা তো বন্ধ করে ঘুমিয়েছিল, আমার দাদার মার্বেল ওটা।

দীপঙ্করের বুকের ভিতরে ঢাক বাজতে থাকে। আর পিছনে যেতে পারছে না। স্টেশনের উপর সেই বালক দাঁড়িয়ে। রেলগাড়ির ছাড়ার সময় হলো। দীপঙ্কর মুখ বাড়িয়ে আছে জানালা দিয়ে।

দবন্তীর হাট আসবি।

রেলগাড়ির জানালা দিয়ে বালক ঘাড় হেলায়।

গার্ড সাহেব সবুজ পতাকা দেখাচ্ছে। বিভূতি চিৎকার করে ওঠে।

হুইস্‌ল দিন। বালকের মুখ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে।

ঘোর গর্জন উঠছে। প্ল্যাটফর্মে এক কিশোর বালক। কত বয়স, বছর বারো, ছোটাছুটি করছে। ইঞ্জিনে গতি যোগ হয়েছে ধোঁয়া উঠে যায় আকাশে।

মার্বেল পেয়েছিস?

বিষণ্ণ মুখে বালক মাথা নাড়ায়। মুখের সমস্ত আলো নিভে যায়। রেলগাড়ি গর্জন করতে করতে এগিয়েছে। আড়াল হয়ে গেছে বিভূতির মুখ। বিভূতি শ্মশানের দিকে যাচ্ছে। লাল মার্বেল কোন চিতার ভিতরে পড়ে ঝলসে গেল কিনা কে জানে। মাঠ ভাঙ্গছে অমল কিশোর।

তারপর কতদিন কেটে গেল। আর যাওয়া হয়নি সেখানে। কত রেল স্টেশনে পা রেখে রেখে বয়স বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে স্মৃতির ভিতরে ধুলো চাপা পড়ে গেল সব। বালক শ্মশানের মাটিতে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে কদিন আগে তার সহোদরের দেহ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

লাল মার্বেলটা যে কোথায় গেল। এতদিন পরে আবার ভেসে উঠল সেই মুখ। ঠিক নিখিলানন্দ। এতটুকু ভুল নেই। কপালের কাছে সেই ক্ষত চিহ্নটাও পরিষ্কার। গাছ থেকে পড়েছিল।

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়েছে। সারারাত এই রকম নির্ঘুম কেটে যাবে। সে সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে থাকে। বিভূতি নিখিলানন্দ হয়ে গেছে। তার ভুল হল না তো। সমস্ত হিসেব ঠিক।

কি করে হয়। পুণ্যব্রত সঙ্ঘের কথা বিভূতি কিভাবে জানল? ঐ সঙ্ঘের পুরো ব্যাপারটাই তো রহস্যময়। মহাত্মা পুণ্যব্রত স্বামী জেলে রয়েছেন। কেন তাঁর এই কারাবাস। এই সংস্থা আর এর কাজ-কর্ম নিয়ে চারধারে সন্দেহের দোলা। বীভৎস রুচি। খড়্গ চিহ্ন হলো সঙ্ঘের প্রতীক। তান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী, না অন্য কোথাও এর শিকড় প্রোথিত আছে।

বিভূতির মার্বেলটা পাওয়া গেল কিনা জানা হয়নি। একটা পাখি মারতেও তো ওর হাত কাঁপত। ছুরির ফলা দেখে কাঁপত অথচ শ্মশানে ভয় ছিল না। তার কোমরে পুণ্যব্রত সঙ্ঘের গুপ্তি উঠল কিভাবে? সবই পুণ্যব্রত স্বামীর মাহাত্ম্য।

দীপঙ্কর হেরিকেনটা জ্বালিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে। রাইটিং প্যাডটা নেয়। বিমল আত্মা স্মরণ করেছে। বিউটিফুল প্রসেস। না হলে বিভূতিকে আবিষ্কার করা যেত কিভাবে। ঐ বয়সটা তো অসংখ্য সোনার কুচি সংগ্রহের সময়। কত মূল্যবান স্মৃতি হারিয়ে গেছে। শ্মশানে বিভূতির দাদাকে দাহন করা হয়েছিল। একদিনের কলেরায় বছর পনেরোর যুবক শেষ। মার্বেলের শব্দ উঠছে পকেট থেকে। বিভূতি শ্মশানের দিকে ছুটছে।

অথচ এখন। মরা মানুষের সম্পত্তির নেশায় সন্ন্যাসী বেশে সেই কিশোর ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দীপঙ্কর চিঠি লিখতে আরম্ভ করে।

তোমার অজানতে একদিন আমি ঐ শ্মশানে গিয়েছিলাম। ঠিক দুপুর তখন। মজা খালে একটা জলের সাপ মাছ গিল-ছিল, বড় অশ্বত্থ গাছটায় একটাও শকুন নেই। সব উঠে গেছে দুরন্ত নীলিমায়। দেখলাম পড়ে রয়েছে সেই লাল মার্বেল, একেবারে মাটির উপর। চকচক করছে। তুমি জানো না যেটা হারিয়েছিল সেটা আমার কাছে রয়েছে। তোমার সহোদরের স্মৃতি।

তুমি শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

দ্রুত এস। আমি দীপু। মনে পড়ে গার্ড সাহেব সবুজ পতাকা দেখালেন, ইঞ্জিন গর্জে উঠল। গাড়ির আগে আগে গড়িয়ে যাচ্ছে লাল মার্বেল।

না এর সঙ্গে পুণ্যব্রত সঙ্ঘে দীক্ষিত মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। এ বহুকাল আগের কথা। তখন সঙ্ঘ ছিল না। কলা-বনিকে জানতাম না কেউ আমরা।

(২১)

চিঠিটা হাতে পেয়ে নিখিলানন্দ রীতি-মত চমকে গেছে। পিয়নটা দাঁড়িয়ে ছিল তার সামনে। নিখিলানন্দর তখন স্তম্ভিত মূর্তি। দীপঙ্কর চৌধুরীর পিয়ন অবাক হয়। সন্ন্যাসীর হাত কাঁপছে।

এটা কলাবনির অফিসার দীপঙ্কর চৌধুরী দিয়েছেন তো।

হ্যাঁ আমি তো ওনারই পিয়ন।

পিয়নটাকে বিদায় দিয়ে নিখিলানন্দ কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সেই ছেলেটি এই দীপঙ্কর চৌধুরী। হ্যাঁ নিখিলানন্দ গুম হয়ে থাকে। ভয় হচ্ছিল কোথায় কোন সম্পর্কে জড়িয়ে আছে লোকটার সঙ্গে। চেনা মুখ অনেক বদলে গেছে।

হেয়ালী করে চিঠি লিখেছে। অর্থ হয় এ চিঠির। কোন বয়সে খেলায় ছলে কি হয়েছিল সব মনে রেখেছে। স্মৃতিধর। কি করে মনে রাখে। সে তো ভাবতেই পারেনি সম্পর্কটা ওখানে জড়িয়ে। কিন্তু চিঠি নয়ত। পুণ্যব্রত সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের প্রতিটি পা মেপে চলতে হয়। নানারকম ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে শত্রুরা।

নিখিলানন্দ চিঠি তন্ন তন্ন করে পা[illegible] মন ভার হয়ে যাচ্ছে। সত্যি না হলে সেই লাল মার্বেল, রেলগাড়ির গার্ড সাহেব... এসব লিখল কিভাবে। আর তার নামটাও তো স্পষ্ট মনে রেখেছে। দাদার কথাও।

দীপু। হ্যাঁ তার বাবা স্টেশন মাস্টার ছিলেন। একদিন পাখির মত উড়ে এল

ছেলেটি। দৌড়তে আরম্ভ করল মাঠ বেয়ে। লাল ভেলভেটের হাফ প্যান্ট, নীল শার্ট, পায়ে সাদা কেডস। নিখিলানন্দর চোখের সামনে একটা বিশাল প্রান্তর জেগে ওঠে। আবছা শ্মশান ভূমি। সন্ন্যাসীর মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। একি করে হয়। এতকাল যার সঙ্গে দেখা নেই। এল শীতের পাখির মত, শীত কাটতেই হাওয়া হয়ে গেল পুরুলিয়া না কোথায় যেন। ঠিকানা বিহীন হয়ে গেল সেই কিশোর। পরস্পরকে ভুলতে আরম্ভ করল তারা। পরস্পরকে ভুলে চোখের আড়ালে বড় হয়ে গেল। মুখের আদল বদলে গেল, সব বদল হয়ে হয়ে গেল পৃথিবীর। এর ভিতরে সেকথা মনে রেখেছে ওই মানুষটা। নিখিলানন্দ বহুক্ষণ চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে থাকে।

যে কথাগুলো লিখেছে তা সুবিধার নয়। লোকটা সেন্টিমেন্টাল আবেগপ্রবণ, না হলে এতকাল পরে সব আবিষ্কার করে এই রকম চিঠি লেখে। ভালবাসা এখনো গাঢ় আছে। নিখিলানন্দের ভিতর চিঠি তেমন ক্রিয়া করছে না। কি করবে চিঠিটা নিয়ে। সঙ্ঘে জানাবে ব্যাপারটা। জানালে তো সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কেননা এই দীপুর মারফত তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে। সেটা কাম্য নয় এই জীবনে।

কিন্তু এই হরিণডাঙ্গা ছাড়লে তো তার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা পুরো ব্যর্থ। অনেক কাট খড় পুড়িয়ে পুণ্যব্রত সঙ্ঘ এখানে বড় আস্তানা করতে যাচ্ছে। মূল দায়িত্ব তার উপরে। হরিণডাঙ্গা ছাড়লে কোন কাজই করা হবে না। নতুন যিনি আসবেন তাঁকে সব গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে।

ওই চৌধুরী তো খুব সহজে পুণ্যব্রত সঙ্ঘের নামে জমি লিখে দেবে মনে হয় না। চট করে লাফিয়ে ওঠে সন্ন্যাসী। দীপু! লালমার্বেল, গার্ডসাহেব, সবুজ পতাকা!

সন্ন্যাসী ধড়াচূড়ো পরে কোমরে অস্ত্রটি ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সরস্বতীকুঞ্জ ছেড়ে। টিপটিপে বৃষ্টির দরুণ এক হাতে ছাতা, কাঁধের সাইডব্যাগে কাগজপত্তর।

পথে নবীনের সঙ্গে দেখা। নবীনটা কেমন যেন হয়ে গেছে। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক। সেই যে মাঠ থেকে তুলে আনল ওকে তারপরই এই রকম ভাব। মাস তিনেক হতে গেল।

বাবা যাও কুথা?

কলাবনি, কাল সক্কালে আসবি।

কুথায়?

কেন, সরস্বতীকুঞ্জে!

নিখিলানন্দ হন হন করে হাঁটতে শুরু করে। ভিতরে উত্তেজনা হচ্ছে। পুণ্যব্রত স্বামীর আশীর্বাদ আছে তার উপর। নাহলে এমন সুযোগ আসে কি করে? হরিণডাঙ্গা তার ছাড়া চলবে না। এর হেস্তনেস্ত করবেই। গার্ডসাহেব সবুজ পতাকা দেখাচ্ছেন। মার্বেল গুড়িয়ে যাচ্ছে শ্মশানভূমিতে। গতিময়তা দেখতে পাচ্ছে সন্ন্যাসী। সর্বত্র গতি। ঝড়েরগতিতে হরিণডাঙ্গা বদলে দেবে। সঙ্ঘকে নতুন প্ল্যান দিয়েছে একটা। অ্যাকসেপটেড হবে নিশ্চিত। গোপনে হরিণডাঙ্গায় ছোট ছোট অস্ত্র তৈরি করা আরম্ভ করবে। সব আটকে আছে অনাথ মন্ডলের দলিলটার জন্য।

মন্ডল মরেছিল বলে এত কান্ড। নাহলে সঙ্ঘকে অন্যত্র কিছু খুজতে হত নিশ্চিত। এখন নিখিলানন্দের হাতযশের উপর সব নির্ভর করছে।

কলাবনিতে পৌছে অফিসে উঁকি মেরে দেখে অফিসার নেই। তখন ঝমঝমে বৃষ্টি নেমেছে। সে পিয়নকে বলে অফিসারের ঘরে যাবে। তারপর পিয়নের পিছনে পিছনে রাজবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে একেবারে আধো-অন্ধকার একটা জায়গায় এসে হাজির হয়। পিয়ন দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। নিখিলানন্দ বাইরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বুকের ভিতরে হাতুড়ি পড়ছে। এতক্ষণ যে এনার্জি নিয়ে হরিণডাঙ্গা থেকে এই অবধি ছুটে এসেছে, তার অনেকটাই অদৃশ্য। নুয়ে যাচ্ছে সন্ন্যাসী। ভয় ভয় লাগছে। সে বাঁ হাতে গুপ্তিটা স্পর্শ করে নেয়। অল্প সাহস দেয়।

দরজাটা বহু পুরনো, একাংশে উই-এর মাটির চিহ্ন। ঐ জানালাটা বন্ধ। মাকড়সার জাল স্পষ্ট। ঝুল জমে গেছে বিস্তর। সন্ন্যাসী দরজার সামনে থেকে জানালার কাছে আসে। খুব আলতো করে স্পর্শ করে। শব্দ হয় না যেন।

কেমন একটা গুমোট গন্ধ। বহু পুরনো। দাদার মুখ মনেও পড়ে না। এখন যদি সেই পনেরো বছরের যুবক তার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, নিখিলানন্দ চিনতে পারবে না। মার্বেলটার রং লাল ছিল! মার্বেল হারানোর কথাও তো সে ভুলে গেছে। এসব মনে রেখে লাভ হয় না কিছু। শুধু শরীর নষ্ট হয়। এ স্মৃতি ধরে রেখে কোন প্রয়োজনীয় কর্তব্যই করে ওঠা হয় না। প্রভু বলেছেন জগৎ আনন্দময় হয়ে উঠবে।

কাঁপতে কাঁপতে সন্ন্যাসী সশব্দে দরজাটা খুলে ফেলেছে। বাইরের মেঘ বৃষ্টির জন্য ঘরে দিন-দুপুরে শ্মশানের স্তব্ধতা আর অন্ধকার। দরজার সামনে আবছা আলোকেও রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে নিখিলানন্দ।

কে! আলো আসে না কেন? অন্ধকার কথা বলল।

আমি! সন্ন্যাসীর স্বর গম্ভীর।

এতক্ষণে দীপঙ্কর নিজেকে ফিরে পায়। টান টান হয়ে দাঁড়িয়েছে। জোড়া চোখে পরস্পরকে বিদ্ধ করতে থাকে। হ্যাঁ সেই মুখ! চুলদাড়ি জোব্বা-জাব্বার ভিতর থেকে জেগে উঠছে কিশোর বালক। সন্ন্যাসীর চোখের অন্ধকার যায় না। সে শুধু অন্ধকার দেখে। প্রভু বলেছেন...। পুণ্যব্রত সঙ্ঘের কাছে আমি সমর্পিত প্রাণ।

দীপঙ্করের চোখের সামনে সন্ন্যাসী অদৃশ্য। ভেসে উঠছে অনামুখ। গন্ধ আসছে কিরকম যেন। সেই শ্মশান ভূমির অদ্ভুত একটা গন্ধ ছিল। সব অনুভব করছে দীপঙ্কর চৌধুরী। রেলগাড়ির শব্দ, রেলগাড়ির গন্ধ, অদেখা সেই হারানো মার্বেল। সব ভেসে আসছে শৈশব থেকে।

চিনতে পারছ? দীপঙ্কর কেমন আত্মগত হয়ে প্রশ্ন করে।

সন্ন্যাসী নির্বাক।

মনে আছে সব?

সন্ন্যাসী কথা বলে না। ইঙ্গিতে জানায় সব মনে আছে। মুহূর্তের জন্য সে বোধহয় প্রত্যাবর্তন করেছিল এক বিস্মৃতির অতলে লুকিয়ে থাকা শৈশবে। বুকের ভিতরে চিনচিনে ব্যাথা ওঠে। তারপরই সে আত্মস্থ হয়। দুর্বল হলে চলে না।

আমার কাছে একটা মার্বেল আছে, লালরংয়ের। দীপঙ্কর খুব কাছে চলে এসেছে। পরস্পরের নিঃশ্বাস স্পর্শ করছে তারা। সন্ন্যাসী একেবারে কাঠ কাঠ।

এই পোশাকে আসলে কেন, অস্ত্র হাতে অতদূরে ফিরে যাওয়া যায়, বহু দিনের পথ, অস্ত্রের ওজন কম নয়।

নিখিলানন্দ চমকে ওঠে। কেঁপে সে অস্ত্রটা স্পর্শ করে।

আমাকে চিনতে পারছ?

সন্ন্যাসী ঘাড় হেলায়। হ্যাঁ, সব মনে পড়ে যাচ্ছে তার।

এতকাল কোথায় ছিলে তুমি? এতক্ষণে সন্ন্যাসীর বাকস্ফূর্তি হয়।

কত জায়গা ছুঁয়েছি তার হিসেব নেই, তুমি?

সবে ত্যাগ করে এসেছি, পুরনো জন্ম আর মনে পড়ে না।

মনে পড়ে না সে-সব?

না। সন্ন্যাসের আগের জীবন কলঙ্কিত! নিখিলানন্দ বিড় বিড় করছে। দীপঙ্কর হঠাৎ পিছিয়ে গেছে, গর্জে উঠেছে, ভেবেছিলাম তুমি দৌড়ে আসবে, উত্তেজনায় হাসফাঁস করবে তোমার শরীর, অস্ত্র পড়ে থাকবে মাঠের ভিতর তুমি ফিরে যাচ্ছ ষোল বছর পিছনে, একটা লাল মার্বেলের কথা মনে পড়তে সেটার সন্ধানে দুজন ছুটেছি। সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের বয়স বেড়েছে, শ্মশান ভূমির বেড়েছে অভিজ্ঞতা.....সে সবের চিহ্ন নেই তোমার ভিতর, তুমি ব্যবহৃত হয়েছো বিভূতি, এই তোমার সন্ন্যাস!

নিখিলানন্দের চোখ জ্বলে ওঠে। ভেবে এসেছে একরকম। এখানে এসে সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তার তো মায়া নেই ঐ অলীক স্মৃতির জন্য, কোন ইচ্ছে নেই ঐ ষোল বছর পিছনে ফিরে যাওয়ার। অন্য কেউ যদি এ সম্পর্কের কথা তুলত, সে এড়িয়ে যেত সরাসরি। এখানে এড়ায়নি। সম্পর্কের সূত্র ধরে জমিজমাগুলো উদ্ধারের একটা প্ল্যান মাথায় এসে গেছে।

তুমি উত্তেজিত হয়ো না। সন্ন্যাসী মৃদু স্বরে বলেছে।

দীপঙ্কর মুহূর্তে নেমেছে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর দিকে। চোখ মুখ ভাবলেশহীন কেন? এটা একটা পদ্ধতি যা দিয়ে সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা যায়, আবার সবকিছুকে আড়াল করা যায়। সন্ন্যাসী উত্তেজিত হয় না কেন তাকে দেখে। তার সঙ্গে দীর্ঘ স্মৃতি যে জড়িয়ে। এরকম শান্ত মানুষ, শীতল মানুষ তো তার আকাঙ্ক্ষা নয়। এতো শীতল তো বিভূতি ছিল না।

মনে পড়ে গার্ডসাহেব পতাকা তুললেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসে, এসব তো মনে রাখার নয়।

মনে পড়ে মজা খালপাড়ের মস্ত শ্মশান। তার সেই প্রিয় সহোদরের মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়। সে সরে এসে দাঁড়িয়েছে আবার দরজার মুখে। হাতের অস্ত্রটা চেপে ধরেছে। মাথার ভিতরটা কেমন করছে। ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করছে মানুষটা। শরীরে জ্বালা ধরছে। সে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এ তুমি কোন জীবনে ঢুকে পড়েছ বিভূতি।

ভয় লাগছে তোমার?

হ্যাঁ। অস্ত্র হাতে থাকলেই তো ভয়ের।

প্রথম যেদিন শ্মশানে আমাকে দেখেছিলে সেদিনও তো ভয় পেয়েছিলে তুমি, পরে বুঝলে ভয়ের কিছু নেই।

দীপঙ্কর চমকে তাকায়। দরজার মুখে দুটো পা মাটিতে পেতে বসে পড়েছে সন্ন্যাসী। হাল্কা আলো আসছে।

বিভূতি, ফিসফিসিয়ে ডাকে দীপঙ্কর, মার্বেলটা গড়িয়ে যাচ্ছে ধরো।

বিভূতি কেমন শব্দ উঠছে, শুনতে পাচ্ছ! দীপঙ্কর দেখছে তার হাতের সামনে থেকে আলো অন্ধকারে মিশে লাল মার্বেল গড়িয়ে যাচ্ছে। শব্দ যেন ক্রমশঃ ইঞ্জিনের। ইঞ্জিন গড়িয়ে যাচ্ছে।

বিভূতি গার্ডসাহেব পতাকা তুললেন, মার্বেলটা ধরো।

দীপঙ্কর দেখছে সন্ন্যাসী কি রকম ধরার ভান করলো। খপ্ করে ধরে ফেলেছে মার্বেলটা। শব্দ থেমে গেছে।

আমার দিকে গড়িয়ে দাও। দীপঙ্কর ফিসফিসিয়ে বলে। দুজনে ঘরের দুই প্রান্তে। মাঝখানে অন্ধ শূন্যতা। আবার ইঞ্জিনের গর্জন। শক্ত মেঝেতে মার্বেলের গড়ানো শব্দ। ঐ এগিয়ে আসছে। সে খপ করে ধরে ফেলেছে। আহ্ বুকের ভিতর উদাসীন প্রান্তরের হাওয়া আসছে। গন্ধ আসছে মাটির। একটা বয়স্ক গাছ জেগে আছে। তার মাথায় একটাও পাতা নেই। মজাখালে স্রোতের শব্দ উঠছে।

বিভূতি আবার নাও। অন্তহীন খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে দীপঙ্কর। বয়স কমে যাচ্ছে। দুজনে ফিরে যাচ্ছে কতদূরে শৈশবের দিকে।

তুমি অস্ত্রটা ফেলে দাও বিভূতি। ওসব মানায় না মানুষের।

তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ কর বিভূতি, ওসব মানুষের জন্য নয়।

মার্বেলটা ধরো তোমার পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে! হারিয়ে যাবে আবার।

না আঁ আঁ। সুতীব্র চিৎকার উঠে এসেছে শ্মশান ভূমি থেকে। ঠিক সেই কণ্ঠস্বর। একদিন শ্মশান থেকে চলে আসার কথা বলেছিল এক কিশোর অন্য কিশোরকে। তখন এই কণ্ঠস্বর মিলন্তে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

দীপঙ্কর ভয় পেয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত মায়া কেটে গেছে। এই তো সেই মন্দির। এখানে গড়িয়ে যাচ্ছিল লাল মার্বেল। কোথায় সেই। সন্ন্যাসী দরজার মুখে দুটো পা মাটির সঙ্গে ত্রিভুজ করে হাত দুটো পিছনে রেখে বিশাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্ত্র ঝকঝক করছে কোমরে।

তুমি কে? ফিসফিসে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

নিখিলানন্দ স্বামী, আপনি ভুল করছেন।

ভুল! কতবার বললাম লাল মার্বেলটাকে ধরো, অন্ধকারে আবার হারিয়ে গেল বিভূতি। এখন তোমার নিজের, অন্য তো অন্যের।

পদশব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন। দীপঙ্কর নিঃসীম শূন্যতায় ডুবে যাচ্ছে।

✽

খুব হাল্কা মেঘ বিছিয়ে আছে আকাশে। এখন ভোর। রাতের ক্লান্তি আর নেই। একজন রাজবাড়ি থেকে বেরোয়। লালপেড়ে গরদের শাড়ি, এলানো চুল। খুবই শান্ত ভঙ্গি। তার চোখের ঘুম নেই। লাবণ্য পায়ে পায়ে নির্থর কলাবনি থেয়ে এসেছে। কোথাও কেউ নেই। দর্পিত শরীর মীন আর চোখ নিয়ে রাজকুমারী যায়, মুখের কোণে এক বিচিত্র হাসি।

সে বাগান পেরিয়ে নদীর দিকে হাঁটে। ভোরের বাতাসে তার চুল অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আঁচল দিয়ে শরীরটাকে অহেতুক গোপন করে। নিজেকে দেখে, আবার হাঁটে।

হাঁটতে হাঁটতে নদীর কাছে এসে পাড় ধরে এগোয় রাজকুমারী। হাঁটতে তার কষ্ট হয়। আলতা-পরা পা-দুটো ধুলো কাদায় মাখামাখি। লাবণ্য নিরুপম মন্দিরের বারান্দায় এসে বসে। সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। বড় জাগ্রত। আঁচল নামিয়ে চাবিটা দিয়ে মন্দিরের তালা খোলে। শুভ্র শিবের মূর্তি। মাথায় এক বিশাল সাপের ফণা।

দরজা খুলেই সে আবার বাইরে এসে দাঁড়ায়। নিজের পা দুটোর অবস্থা দেখে ঘটনার জটিলতে পা জড়িয়ে থাকে। লাবণ্য চারদিকে অসহায় দৃষ্টি ফেলে। পা হাত পা চঞ্চল করছে। কেমন যেন ভয় ভয় ভাব। কেমন বুঝছেন। লোক বাছাই করায় ভুল হয়নি তো!

লাবণ্য বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে। [illegible] তার [illegible] না। এখন [illegible] [illegible]

হয়। লাবণ্যর মাথাটা নত হয়ে যায়, হঠাৎ মুখের উপরে ঘন মেঘ জমে গেছে। ঠিক এইরকম দিনগুলোর এক-একটায় বয়স্ক মানুষটা এসে হাজির হত এখানে। ভোর-রাত থেকে ফুল তুলে বসে থাকত নির্মল মজুমদার। এখন লাবণ্যর মনে কেমন নিভে-যাওয়া নক্ষত্রের মত হয়ে গেছে মজুমদার। বহুদূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ঘুমের ভিতরে জেগে ওঠে হয়ত, লাবণ্যর চোখে সে মুখ সে দেহ মিলিয়ে যাচ্ছে। এতটুকু কষ্ট হয় না। মজুমদার অনেক বেশী চেয়েছিল, কুষ্ঠরোগীর কন্যাকে কৃপা করতে এসেছিল বয়স্ক পুরুষটা। সাহস কম নয়। রাজকুমারীর চোখ ঝলসে ওঠে।

সে যখনই এভাবে ভেবেছে লোকটাকে তখনই ডাক্তারদা এসে হাজির। লাবণ্যর ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি। মজুমদারকে আবার টেনে আনলে হয়। অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লিখেছিল মজুমদাররা। এক ইঙ্গিতেই ওকে টেনে আনা যায় আবার কলাবনিতে। কিন্তু ডাক্তার সেটা সহ্য করবে না। ডাক্তার কি মজুমদারের সঙ্গে তার সব ঘটনা জানে! সম্ভব নয়। যেটা জানে তাতে ডাক্তারের বিশ্বাস সাড়া দিয়েছে মজুমদার, এগিয়েছে মজুমদার, লাবণ্য তো ওসব বোঝে না। লাবণ্য অতি সরল। কেননা তাকে আমি ভালবাসি।

রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠেছ?

হ্যাঁ।

চাবি তোমার পেলে গেট খুললে যে!

পিছনের দরজার চাবি আমার কাছে থাকে।

বাব্বা! কী বীরপুরুষ! লাবণ্য তার মাথায় হাত রাখে, চুলে বিলি কাটতে থাকে। লাবণ্য ক্রমশঃ ঘন হয়ে আসে মজুমদারের, পারস্পরিক ঘনস্পর্শ অনুভব করছে দুজন। পুরুষটার উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে লাবণ্যর অনাবৃত কাঁধে।

অন্ধকার থাকতে ফুল ছিঁড়েছো? লাবণ্য চোখে কপট রাগ।

হ্যাঁ।

তুমি জান না রাতে গাছের ফুল পাতা ছিঁড়তে নেই, ওদের কষ্ট হয়। লাবণ্যর মুখে মুহূর্তের বিষাদ। মজুমদার নিশ্চুপ লাবণ্যর চোখের পাতায় হাত রাখে।

ছিঁড়লে যে, আমি নিষেধ করেছি না! লাবণ্য চোখ পাকায়।

তোমার মুখে হাসি ফুটলে গাছের ব্যথা মিথ্যে।

বেশ বেশ বেশ, লাবণ্য মজুমদারের চুল ধরে টানতে থাকে, মুখের চামড়া টানতে থাকে। ভ্রূর লোমে অবলীলা বয়ে গেল। আশ্চর্য চোখ মেলে চেয়ে থাকে পুরুষটার দিকে। নাসিকাগ্রে বিন্দু বিন্দু জল। লাবণ্যর মুখে অপরূপ মমতা। সে মজুমদারের বুকে মাথা রেখেছে। মজুমদারের বয়স্ক চোখ নতুন করে দেখছে মমতাময়ীকে।

জানো কোন মানুষের কষ্ট সহ্য হয় না আমার, গাছের ব্যথা বুঝতে পারি, [illegible]

না হলে মাটির কষ্ট, আলো না ফুটলে পাখির কষ্ট, তোমার বুকের ভিতরে যা হচ্ছে সব বুঝতে পারছি।

ফিসফিসিয়ে কথা বলে লাবণ্য। বয়স্ক পুরুষটার বুকে কান রেখেছে। দ্রুত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করতে পারে। শব্দ গভীর হয়ে কানে বাজছে। লাবণ্য মজুমদারকে দু হাতে টেনে এনেছে নিজের খুব কাছে। শব্দ উঠছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ গভীর হয়ে চারপাশে জড়িয়ে যাচ্ছে। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। লাবণ্যর শরীর উঠছে নামছে। দুটো ঠোঁট তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে।

রাজকনিয়া।

লাবণ্য চমকে ওঠে। ঠিক পিছনে ঘাড়ের কাছে বলবান পুরুষটির নিঃশ্বাস পড়ছে। লাল পাঞ্জাবী, হলুদ পাগড়ি, সবুজ চেক-কাটা লুঙ্গি পরা লোকটার হাতে ফুলের সাজি। চোখ জ্বল জ্বল করছে। লাবণ্য সশব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়ায়। বুক উথাল-পাথাল হয়ে উঠেছে।

ফুল আনছি।

লাবণ্য চোখের ইশারায় ফুল রাখতে বলে বারান্দায়।

কখন এলি, বাব্বা ভয় পেয়ে গেছিলাম।

পিথা চুপ করে রাজকুমারীকে দেখতে থাকে। লাবণ্য দেখে বিশাল কালো মানুষটার চোখ কেমন মায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে। খুব চেনা মুখ, সব পুরুষের যেমন থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বারান্দায় ওঠে। একটাও কথা বলে না। ফুলগুলো নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে। পিথা লাবণ্যকে সারাক্ষণ লক্ষ্য করে।

এই নিয়ে দশটা সকাল। রাজকুমারীর কথায় পৃথিবীর সব ফুল এনে দিতে পারে পিথা। একটা দিনও কথার ব্যতিক্রম হয়নি। কি করে হয় তার জন্য যে পিথা নদীর গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে। সব ভয় চলে গেছে। ভয়তো একটাই। যা ভিখা আর রাজেনের হয়েছিল। নাহলে পিথা আর কাকে ভয় পায়। বড় শিরিষ গাছটায় হেলান দিয়ে পিথা মায়েক দাঁড়িয়ে আছে।

ভিখা রাজেনের যা হয়েছিল তা তার হবে না। সম্ভব নয়। সেই ভাতার মাঠির মাঠ পার হয়ে দুটো জঙ্গল ফুঁড়ে চলে গিয়েছিল পোড়াডিহা। পোড়াডিহাতে বাকফুড়ি গুণীনের ঘর। বোশেখ মাসেই চলে এসেছে এখানে। বর্ষাকালটা কাটিয়ে আবার চলে যাবে পাহাড়ের দিকে। পাহাড় জঙ্গলে ভূত-পেরেত সাপখোপ নিয়ে কারবার করে। ছ-মাস সমতলে ছ-মাস অরণ্য-পাহাড়ে তার বাস।

এখন আর রাজকুমারীকে স্পর্শ করতে ভয় নেই। হাতে গুণীনের দেয়া শিকড় বাকড় মাদুলী করে বেঁধে রেখেছে। ঘরে আছে বিষপাথর। গুণীনের ঘরে বিকট অন্ধকার. তার সঙ্গে জড়িয়ে থুকথুকে মহুল ফুলের গন্ধ। ধুনি জ্বলছে। এক গুণীন ভোর সন্ধ্যেই চলছে। পাশে একটা [illegible] [illegible], [illegible] রাখতাক নেই।

পিথা তখন নেশা মাতাল গুণীনের পা ছুঁয়ে আছে। মেয়েমানুষটা বাইরে চলে যায়। গুণীনের রাঙ্গা টকটকে চোখে জিজ্ঞাসা।

পিথা সব বলে। এমনি তার ভয় কোথায়! পাহাড়ী চিতি সে হাতে ধরে আছড়ে মারতে পারে। কিন্তু এতো অন্য ভয়। মনে রাজকন্যে রং লাগিয়েছে। সে রাত্তিরে সাপের স্বপ্ন দেখেছে। সেই সাপ রাজকন্যের পাহারাদার, রাজবাড়িতে তার বাস। হাজার মাইল ছুটে গিয়ে কাজ শেষ করে ফিরে আসতে পারে। রাজবংশের মানুষ সব মরে সাপ হয়ে আছে। তাদের লালসা যায় না। কিন্তু ঐ মেয়ে, ও যে বড় ভাল। তার কপালে হাতে ছুঁয়েছে রাজকুমারী। রাজকুমারীর হাতের নখে রং, কপালে সুগোল টিপ। গায়ের গন্ধে শরীরে ঝিমুনি আসে। রাজকুমারীর গা থেকে কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ বেরোয়। পিথার বড় ভয় সেই অচেনা সাপকে। সন্ধ্যার মাঝে-মধ্যে রাজবাড়ির গেটে শুয়ে থাকে। কেউ মারতে পারেনি। মারতে গেলে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে।

তু রাজ কনিয়া চাস বেটা?

হাঁ দেওতা।

বহু করবি, বেহা করবি?

হাঁ হাঁ, দেওতা, পিথা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সি মেয়্যামানুষ বড় ভাল, বহু করলে তকদীর ভাল হয়, লক্ষ্মী দেবতির মতন।

গুণীন চোখ বন্ধ করেছে। বহুক্ষণ চারপাশ নিথর। তারপর সে একসময় হাঁক মারে, সাবিত্তি।

সেই মেয়েমানুষটা ঘরে আসে। নিশ্চুপ জিজ্ঞাসায় চোখে দাঁড়ায়।

সাবিত্তি ইহারে সর্প ভয় দিখায় কিনো?

মেয়ে মানুষ টা তখনো নিশ্চুপ।

সি সর্প নাশ করিতে হবু? গুণীনের কণ্ঠস্বর গমগম করছে।

গুনীন ঝট করে সামনের ঝাঁপিটা খুলে ফেলেছে। একটা কালো মিশমিশে সাপ-মুহূর্তে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। হিস হিস শব্দ উঠছে বাতাসে।

ই সর্প? গুনীন জিজ্ঞেস করেছে।

পিথা চুপ করে থাকে। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে পড়েছে। গুনীনের কথা কানে আসছে। সাপটা ফণা স্থির করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের শিবলিঙ্গের মাথায় কি এই সাপ ছিল? সে কোথায় এল! একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি। গুনীন তার হাতটা বাড়িয়ে দেয় সাপটার দিকে। সাপটা নেতিয়ে ফণা নামিয়ে ফেলে ঢুকে যায় ঝাঁপির ভিতরে। পিথার দুচোখ স্ফীত।

নাহ সর্পনাশ করিতে নাই, গুনীন বিড় বিড় করছে, হেই পিথিমীর সব্ব বিষ কণ্ঠে লিয়া বিষধর হইছে সর্পজাতি. বাতাসের বিষ. মাটির বিষ, মানুষের মনের বিষ সব লিয়া বিষধর হইছে. ইহারে নাশ করিতে নাই। যাহার ভিতরে বিষ আছে তাহারে যা মারে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

মনে বিষ রাখবু না। ভয় নাই তুহার। ঘর যা।

দেওতা, সি সর্প ধরি আন দেওতা। পিথা বিড় বিড় করে মাথা নামিয়ে দিয়েছে গুনীনের পায়ে, মাথা ঠুকছে।

এতক্ষণে সেই মেয়ে মানুষটা কথা বলে। মধুর স্বর। পিথার গা ছমছম করে ওঠে।

সি যোবতীর বন্ন কিমন?

ধলা, আলোর মতন।

সি যোবতীর কি ভাল, চক্ষু আঁখি, দ্যাহ!

তাহার সব ভাল, আঁখিতে মায়া লাগে, দেবতির মতন কনিয়া।

তাহার মন কিমন?

মনে বড় দোয়া, মায়া, সি মুরে দোয়া করিছে।

মেয়েমানুষটা হঠাৎ হিসিয়ে ওঠে, 'চুপ থাহ, দোয়া কিনো, ভিখ মাগতে যাস উহার নিকট, পীরিতে দোয়া নাই।'

পিথা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মেয়ে-মানুষটার দিকে। তার ভুল হয়েছে তাই মেয়ে মানুষটার কথায় ঝাঁজ, চোখের সামনে রাজকন্যে ভাসে, সে আর পারে না, 'সি কনিয়াদের দেবতির মতন, মু মন্দিরে পেন্নাম দিয়া আঁখি তুলি দেখি রাজকনিয়া, স্বগ্গ থিকে দেবতি নামিল।'

পিথার চোখের সামনে দর্পিত চক্ষু রাজকন্যা ভেসে ওঠে। সে চোখে মায়া মমতা অহঙ্কারের সঙ্গে মিশে আছে। একা দাঁড়িয়ে রাজেন্দ্রানী।

উহার বাপ, মুদের রাজাবাবুর কুট রোগ, কনিয়ার মনে সুখ নাই।

রাজকন্যে সুখে নেই, দুঃখে আছে, বিষাদে আছে। পিথা বিষণ্ণ হয়।

রাজকনিয়ার বন্ন দু' পহরের জুছোনা, উহার আঁখি নদীর জল, উহার মন মস্ত আশমান, অন্তরে সি মুরে বাঁচে, তবু ডর লাগে, সিদেবতির নিকট সর্প আছে।

পিথার চিৎকারে গুনীন চোখ খোলে। একটা চুপড়ির ভিতর হাত ঢোকায়। বের করে আনে ছোট্ট একটা পাথর। পাথরটা গুনীনের হাতের তালুতে জ্বল জ্বল করে। ঠিক যেন কালো টলটলে চোখের মণি।

দশ রুপিয়া দে উহার হাতে। গুনীন তার বউকে দেখায়।

পিথা সেই মত কাজ করে। অতিকষ্টে টাকার জোগাড় হয়েছে।

ই হলো বিষ পাথর, বিষ খাই খাই নীল হইছে, সিন্দুরে ভুবাই রাখবু সব্বক্ষণ। সর্প দংশন করিলে সিখানে চাপি রাখবি, সব বিষ তুলি লিবে।

খুব ঠান্ডা পাথর। পিথার হাতের তালুতে রাজকন্যের চোখের মণি। সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকে।

ই পাথর সাতজন্ম পুণ্য করলি পাওয়া যায়। রমণীকে দেবতির মতন ভালবাসলি পাওয়া যায়, রমণীর ভালবাসা থাকলি পাওয়া যায়!

(ক্রমশ)

অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

সে যাই হোক, আপাতঃদৃষ্টিতে সমস্যার একটা সমাধান হল বটে এবং দ্বারকানাথের দল ব্রাহ্মমন্দিরে এসে উপাসনা করতে লাগলেন বটে. কিন্তু এই দুই দলের মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ, সেটা ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল এবং একটু বাতাস পেতেই সেটা প্রবল শিখায় বিরাট আগুনের মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যার ফলে গোটা ব্রাহ্মসমাজটা ভেঙে দুখানা হয়ে গেল।

কিন্তু তার জন্যে আরও কয়েকটা বছর এমনি একটা নকল শান্তি বজায় ছিল। যদিও মাঝে মাঝে এমনি ঝড় যে উঠত না তা নয়। রক্ষণশীল দলের মত সাধু উমেশ দত্তমশায় বামা বোধিনীতে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন : স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে দেখিয়া যে স্থলে কেবল অপবিত্রভাব মনে হয় সে স্থলে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকাই ভাল। দ্বারকানাথ তাঁর জবাবে বলেছিলেন, ছাড়াছাড়ি যদি করতেই হয় তাহলে পুরাতন মহাদ্বীপে ও স্ত্রীগণকে নূতন মহাদ্বীপে রাখলে আরও ভালো হয়। এবং এই মতানৈক্যের কেশবচন্দ্র সেন মশায় যে মীমাংসা করে দিলেন, তাতে নারীদের বাইরে বসার সুযোগ দিলেও আলাদা বসা বন্ধ হল না। মনে হয়, পাল্লাটা উমেশ দত্ত মহাশয়দের দিকেই ভারী। কাজেই শক্তরোগের চিকিৎসা হল না, প্রলেপ দেওয়া হল মাত্র।

এবং রোগটা সুযোগ পেলেই যে মাথা-চাড়া দেবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? হলও তাই। কেশবচন্দ্র বিলেত ঘুরে এসে সেদেশের আদর্শে কয়েকটা সংগঠন [illegible] [illegible]

অন্যতম। কৃষ্ণকুমার মিত্র যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে আসেন কলকাতায়, তখন প্রথমেই তাঁর নজরে পড়ে এই আশ্রমটি: ভর্তি হইয়াই হিন্দু স্কুলের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গেলাম; দেখিলাম তার দক্ষিণে একটি ছোট্ট পুকুর, পুকুরের দক্ষিণ দিকে এক ত্রিতল বাটীর ওপর লেখা আছে 'ভারত আশ্রম'। উহা দেখিয়াই মনে হইল উহা যেন নিজের বাড়ী: প্রাণ প্রসন্ন হইয়া উঠিল।' এর তখন ঠিকানা ছিল তের নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট। কেশবচন্দ্র সেন মশায় স্বয়ং তাঁর কলুটোলা স্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে বাস করতে থাকেন। শিবনাথ শাস্ত্রীও তার সঙ্গে বাস করার জন্যে সপরিবারে এখানে এসে ওঠেন। এবং এই ভারত আশ্রমেই একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল।

অবশ্য এই হৈচৈ যখন ঘটে তখন শিবনাথ দেশের বাড়ীতে। যদিও এই কাহিনীর নায়ক যিনি, তাঁরও বাড়ী হরিনাভি। বলা বাহুল্য, তিনিও ব্রাহ্ম। এবং সপরিবারে এই ভারত আশ্রমের আবাসিক। বিলেতী মিডল ক্লাস ইংলিশ হোমের আদলে গড়া এই আশ্রম। এখানে কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে এক জায়গায় রেখে বাঁধাধরা সময়ে আহার, বিশ্রাম, কাজ ও উপাসনা করার আয়োজন ছিল। তাঁর ধারণা ব্রাহ্ম ভাব এর ফলে দেশে ছড়িয়ে পড়বে। এই আশ্রম স্থাপনের পিছনে কেশবচন্দ্রের আদর্শ বা উদ্দেশ্য ছিল তাই। এবং সেই মতই সব কিছুই এগোচ্ছিল। ঝামেলা বাধল হরনাথ বসুকে নিয়ে। ভদ্রলোক বেশ একটু দিলখোলা মানুষ। এবং পার্থিব বুদ্ধি কিছু কম [illegible]। এবং

তারচেয়ে বড় কথা, আয় কম, ব্যয় বেশি। কিন্তু হিসেবের কড়ি ত আর মানুষের মনের উৎসাহের সঙ্গে বাড়ে না; কাজেই বসু পরিবার ক্রমাগতই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। থাকেন সপরিবারে এই আশ্রমে, কাজেই দেনার দায় বাড়তে থাকে নিত্য নিত্য।

আশ্রমের অধ্যক্ষ বলে থাকবেন, কি হল হরনাথবাবু, ভিজে কম্বল আর কত ভারী করবেন? আশ্রমের টাকার কি হল? হরনাথ বোধ করি কোন জবাব দেন নি। বা দিতে পারেন নি। স্ত্রী বিনোদিনীকে শুনতে হয়ে থাকবে স্বামীর গঞ্জনা। কিন্তু ঋণমুক্তির পথ কই! সত্যই ত যতদিন যাচ্ছে ঋণের জাল যে অক্টোপাসের মত ততই তাঁকে তীব্রতরভাবে জড়িয়ে ধরছে। বাঁচবেন কি করে এর গ্রাস থেকে। অবশেষে স্বামী স্ত্রীকে তার সিদ্ধান্তের কথা বলে থাকবেন, চল তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী দিয়ে আসি। একটু সামলে উঠলেই আবার নিয়ে আসব। বাপের বাড়ীর নামে কোন মেয়ে না রাজী হয়। স্ত্রী বিনোদিনী ত এক পায়ে খাড়া।

এবং তাঁদের যাবার বেলায়ইত লেগে গেল ধুন্দুমার। আশ্রমের পাওনা ত মিটাতে পারেন নি হরনাথ বসু। অথচ ঘোড়ার গাড়ী ডেকে বিনোদিনী, তাঁর পুত্রকন্যা সহ গাড়ীতে উঠে গিয়ে বসলেন। আশ্রমের কয়েকজন আবাসিক গিয়ে খবর দিয়ে থাকবেন অধ্যক্ষকে। গাড়ীতে উঠে ঘোড়ার গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিয়ে থাকবেন বিনোদিনী, সহিসের ছাপটির শব্দ শুনে গাড়ী চলতে শুরু করেছে, ছুটতে ছুটতে চাকর এসে এমন সময় হাঁকল, 'কোচোয়ান, কোচোয়ান, গাড়ী থামাও।' গাড়ী থামল। ঘোড়ার গাড়ীর দরজা খুলে অবগুণ্ঠনবতী বিনোদিনী বসু মুখ বাড়িয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েগুলির চোখে ভেসে থাকবে কিছুটা ভয়, কিছু বা বিস্ময়। বিনোদিনী নীচু গলায় বলে থাকবেন, কি চাই? আশ্রমভৃত্য সাফ জানিয়ে দিলে, আশ্রমের পাওনা শোধ না হলে তাদের এখান থেকে চলে যেতে দেওয়া হবে না। মাথায় বজ্রাঘাত হল বসুপত্নীর। একটা সামান্য আশ্রমভৃত্য এসে এরকম অপমানসূচক কথা বলল তাঁকে? লজ্জায়, অপমানে তাঁর মরতে ইচ্ছা করল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। কিন্তু আশ্রমভৃত্য তার দায়িত্ব পালনে অটল।

কি-ই বা আর করবেন বিনোদিনী। গায়ের অলঙ্কার খুলে দিলেন তিনি। বললেন, সেগুলি বেচে যেন তাঁদের পাওনা উসুল করেন। গাড়ী ছেড়ে গেল। হতচকিত ভারত আশ্রমের বহু আবাসিকের চোখের সামনে এই নাটকটা হয়ে গেলে। ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ীটা তীব্র আর্তনাদ করতে করতে আশ্রমের চৌহদ্দি পেরিয়ে গেল।

কিন্তু ঘটনা এখানেই থামল না। যদু-গোপাল চাটুজ্যে বলে এক ভদ্রলোক 'সাপ্তাহিক সমাচার' বলে একটা কাগজ চালাতেন

তখন। 'যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালিরা জাতিগত মহত্ব লাভ করিতে পারিতেন, শুধু সেই সমস্ত অনুষ্ঠান এবং পত্র সম্পাদকদিগের অনুমোদনীয়' বলে তাঁর কাগজে ঘোষণা করা থাকলেও কাগজটা কট্টর ব্রাহ্ম-বিরোধী। পত্রীর এই সর্বজনসমক্ষে অপমান কাঁটার মত বিঁধেছিল হরনাথের। ক্রোধে, অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে যদুবাবুরই শরণাপন্ন হলেন বসুজা। বললেন, ভারত আশ্রমের এই হৃদয়হীনতার কথা। বললেন, সর্বজন-সমক্ষে তাদের এই হীন আচরণ প্রকাশ করে দিতে। 'সাপ্তাহিক সমাচার' ত এইসব খবরের জন্যে ওৎ পেতেই ছিল। পেয়েই খবরটা নিল। বিনোদিনীর নাম দিয়ে এই ঘটনার বিবরণ তাদের কাগজে ছাপা হল। সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে গেল। অন্যান্য কাগজেও এই নিয়ে তুমুল সোরগোল তুলল। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে নাটক ত দিব্যি জমে গেল। এবং বলতে কি, তলে তলে, প্রগ্রেসিভ দলের একদল যুবক 'সাপ্তাহিক সমাচার'কে আরও কিছু মাল-মশলা দিলে খাইয়ে। যাকে বলে একেবারে গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

কেশববাবু এই বিষোদ্গার বন্ধ করার আর কোন পথ না পেয়ে সোজা কোর্টে গেলেন। মামলায় অবশ্য, যতদূর জানা যায়, কারও কিছু হল না, একটা আপস রফা হয়ে যায়, কিন্তু এইবার রঙ্গমঞ্চে ঢুকলেন দ্বারকানাথ। একদল ব্রাহ্ম যুবক মহিলার এমন রাস্তা আটকে টাকা আদায়টাকে খুবই গর্হিত কাজ বলে মনে করলেন এবং কেশব-বাবুর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে সমাজের সভা ডাকার প্রস্তাব দিলেন। কেশববাবু মুখে হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না, কিন্তু কয়েক দিন পরেই তত্ত্ববোধিনীর আদলে ব্রাহ্মদের যে নতুন কাগজ হয়েছিল ধর্মতত্ত্ব —তাতেই দ্বারকানাথের প্রস্তাবের জবাব বের হল। যুক্তিটা এই—আশ্রমের অধ্যক্ষ— যিনি একজন প্রচারক। কাজেই ঈশ্বর নিযুক্ত। এবং সেই কারণেই ব্রাহ্মদের বিচারের ঊর্ধ্বে।

আগুনে একেবারে ঘৃতাহুতি পড়ল। ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁরা ঠিক দ্বারকা-নাথের মত অত অগ্রসর হতে রাজী নন, তাঁরাও কিন্তু এই কথায় খুবই চটে গেলেন। দ্বারকানাথের নেতৃত্বে তাঁরা একটা জোর আন্দোলন শুরু করলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ত' ছিলেন দেশে। কলকাতায় ফিরে এসে তিনিও দ্বারকানাথের দলে ভিড়ে পড়লেন। জোর মিটিং হতে লাগল সর্বত্র। ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের একটা মিটিং-এ বিখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ত বলেই ফেললেন কেশববাবুর এটা একনায়কত্ব। নেপোলিয়নের মত রিপাবলিকান হয়ে লড়াই করে শেষে নিজের মাথাতেই পরেছেন সম্রাটের মুকুট! এই ডিকটেটরশিপ রোধ করবার জন্যেই তাঁরা বার করলেন কাগজ 'সমদর্শী'। কিন্তু কেশববাবু অচল, অটল। আঠারশ চুয়াত্তরের শেষ দিকের ব্যাপার এটা।

এই লড়াই অবশ্য চলতে থাকে। এই দলের শিবনাথ শাস্ত্রী কেশববাবুর অনেকটা কাছের মানুষ। এক সময় তাঁরা এক বাড়ীতে সপরিবারে বাস করেছেন ভারত আশ্রমে। বেলঘরিয়া বা কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়ীতেও কাটিয়ে এসেছেন। তিনি ত' সরাসরি কেশব-বাবুর সঙ্গে এ'দের হয়ে এই নিয়ে কথা পাড়লেন। বললেন, আপনি ঈশ্বরাদেশ বুঝে থাকেন, আপনি চলুন। অপরের ওপরে আপনার বোঝা চাপাচ্ছেন কেন? তিনি মহর্ষির উদাহরণ দিলেন, তিনি ত' কই তাঁর ঈশ্বরের আদেশ অপরের ওপরে চাপাতেন না। কেউ সে ভাবে না নিলে তার ওপর ত কই বিদ্বেষও রাখতেন না? তবে? এই ব্যাপারে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মশায়ও প্রথমদিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন ভারত আশ্রম। কিন্তু কেশবচন্দ্র কারও কথা শুনলেন না। এবং যত দিন যায়, সমদর্শীর দল বাড়তে থাকে। তাঁদের আক্রমণ করে রবি-বাসরীয় 'মিরর' কাগজে লেখা হতে লাগল কটুকাটব্য—অবিশ্বাসী, ধর্মনিরপেক্ষ, হীন চেতা। চাপান হলেই উতোর গাইতে লাগলেন সমদর্শীর দল। মোটকথা, ঝগড়া তখন তুঙ্গে। এর আরও কারণ ছিল। এবং সেটাই মৌলিক। সমদর্শীরা চাইছিল সাধারণতন্ত্র। যা হবে কেউ একা তার সিদ্ধান্ত নেবে না। সবাই মিলে নেবে। তাছাড়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরটা একটা ট্রাস্টীর হাতে তুলে দিতে হবে। কেশববাবু নারাজ। এ'রা চাই-তেন ব্রাহ্মদের একটা প্রতিনিধি সভা। কেশববাবু তাতেও না। বছরে একবার করে সভা হত ব্রাহ্মদের, তাঁরা প্রস্তাব দুটো তুলতেন। একটা না একটা অজুহাতে সে-গুলি এড়িয়ে যাওয়া হত। বারবার, কয়েক-বারই। কেশবচন্দ্র নতুন আর একটা 'স্টান্ট' দিলেন। কলুটোলায় তাঁর তেতলাবাড়ীর ছাতে নিজে হাতে রেঁধে খেতে লাগলেন। জল খেতেন মাটির গেলাসে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে মাধুকরী করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন। তিনি এই বৈরাগ্য প্রচার করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে কলকাতা ছেড়ে কোন্নগরের সাধের কাননে—এক রাজ-কীয় বাগানবাড়িতে প্রচারকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সাধনা করতে লাগলেন।

হয়ত ভাবা গিয়েছিল, ব্রাহ্ম যুবকরা এতে আকৃষ্ট হবে। উদ্দীপ্ত হবে। কিন্তু হল বিপরীত। তাঁরা এসবকে ঠাট্টা করতে লাগলেন। কেশববাবুর কাছ থেকে তাঁরা দূরে সরে যেতে লাগলেন। তাঁরা ভাবছিলেন, 'দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরোধ করে' কেশব-চন্দ্র যে 'নিয়মতন্ত্র' করবেন বলেছিলেন, তা ছলনামাত্র। আসলে তিনি চেয়েছিলেন সর্বময় কর্তা হতে। আদর্শবান ব্রাহ্ম ছেলেরা এটা ভালো চোখে দেখল না। তারা 'ডেমোক্রেসি' চেয়েছিল। কেশববাবু তাঁদের দিলেন 'অটোক্রেসি'। এটাকে তারা ভাঁওতা বলে মনে করে থাকবে।

কিন্তু কাল তখন খুব দ্রুত ছুটে [illegible]

অন্যান্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব বাদুড়বাগানের দোতলা বাড়ীতে এসে উঠেছেন। এই বাড়ীতেই একদিন পদার্পণ করেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং এই বাড়ীতেই একদিন, কি যে ছিল বিধাতার মনে, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভাবী শ্রীম—শ্যামপুকুর ব্রাহ্ম স্কুলের হেডমাস্টার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে ময়মনসিংহে গগনচন্দ্র হোম নামে জনৈক ভদ্রলোক 'সঞ্জীবনী' বলে একটা কাগজ বার করা শুরু করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর যৌবনের বন্ধু। বিদ্যা-সাগরের বন্ধু শ্রীনাথ দাসের ছেলে উপেন্দ্র-নাথ দাস দুর্গাদাস দাস ছদ্মনামে দু' দুখানা বই শরৎ-সরোজিনী আর সুরেন্দ্র-বিনোদিনী লিখেছেন। দুটো নাটকই দেশের লোক খুব নিয়েছে। খুবই নাম হয়েছে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের তিনি ডিরেকটর হয়েছেন। তার 'বোর্নাফিট' নাইটে পুলিশ এসে সে কি কাণ্ড! সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাকি অশ্লীল! উপেন্দ্র দাস, অমৃতলাল বসু, ম্যানেজার ধর্মদাস সুর, বেলুবাবু সবাই অ্যারেস্ট। ডিফেন্স সাহেবের এজলাসে উপেন দাস আর অমৃতলাল বসুর হল একমাস করে জেল। অবশ্য বিনাশ্রমে। কলকাতায় হৈ-হৈ কাণ্ড! হাইকোর্টে আপীল। হাইকোর্ট বললেন, না সুরেন্দ্র-বিনোদিনী অশ্লীল নয়। উপেন দাস, অমৃত বসু দুজনেই খালাস! সারা কলকাতা আনন্দে ভেঙে পড়ল!

লর্ড নর্থ ব্রুক কিন্তু তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন। প্রিন্স এসেছে কলকাতায়। ভবানীপুরের এ্যাডভোকেট জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর মেয়েরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে যুবরাজের অভ্যর্থনা করেন। এটা কলকাতার একদল মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। ব্যাপারটা নিছক স্তাবকতা বলে মনে করেছিল। এই নিয়েই প্রহসন 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। তখন বাঙালীর মনে দূরাগত বানের জলের কুলুধ্বনির মতো জাতীয় চেতনার একটা অস্ফুট বাণী সাড়া জাগাতে শুরু করেছে। কলকাতার লোক নাটকটা দেখে খুব খুশী। ব্যাপারটা পুলিশের কানে গেল। তারা রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করার অভিযোগ আনল। উপেন দাসের দল নাছোড়বান্দা। নাটকটার নাম পাল্টে দিয়ে আবার অভিনয় করলে। এই প্রহসনের সঙ্গে মূল নাটক ছিল উপেন দাসের 'সরোজিনী'। কাজেই তার ওপর আক্রোশ। আক্রোশ বাঙালীর এই নাটকের ওপরেই। 'ড্রামাটিক পারফর-মেন্স কন্ট্রোল' বিল আইনে পরিণত হয়ে গেল।

মাঝে আর একটা মস্ত কাণ্ড ঘটে গেল। তার মূলেও ব্রাহ্ম যুবকরা। বাঙালীর মনে যে বিক্ষোভ, যে অসন্তোষ তাকে রূপ দেবার জন্যে একটা সভা চাই। রাজনীতি করার জন্যে বাঙালী ছেলেরা চুলবুল করছে। পথ কই? প্ল্যাটফর্ম কই? সভা

অবশ্য আছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। কৃষ্ণদাস পাল যার সেক্রেটারি। কিন্তু সেতো বড়লোকেদের সভা। সাধারণ নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী—তাদের সভা কই? তাই সবাই মিলে তৈরী হল ভারতসভা! সারা কলকাতার সে এক মাতন। সে এক হুল্লোড়।

এমনি সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আবার এক বিরুদ্ধ ঘটনার আবর্তে গিয়ে পড়লেন। তিনি অসুস্থ হয়ে হাওয়া পাল্টাবার জন্যে গিয়েছিলেন মুঙ্গের। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন: 'মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, কেশববাবু তাঁহার পৈতৃক ভবনের অংশ বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে মিস পিগটের বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহার নাম 'কমলকুটীর' রাখিলেন; এবং সেখানে কুচবিহার পক্ষীয় ঘটকদিগকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা দেখান হইল।'ও বলা বাহুল্য, মেয়ে পছন্দ হল। ঘটকরা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন কুচবিহার। পাত্র কুচবিহারের মহারাজা, নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর। বয়স সতের। কন্যা, সুনীতি বয়েস তের। ঘটকরা কেন এলেন এবং গেলেন, সে খবর কাউকেই জানানই হল না। ব্যাপারটা খুবই চুপিসারে সারা হল।

কিন্তু খবরটা এক সময়ে চাউর হয়ে গেল। কথায় বলে, লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না। কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ে কথাবার্তা বলার জন্যে এলেন কুচবিহার থেকে বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি কলকাতায় এসে মাঝে-মাঝে আসতেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের বাড়ী। লোকনাথবাবুর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর পুরোনো বন্ধুত্ব। তিনিও যেতেন। যাদববাবুর সঙ্গেও শিক্ষক শিবনাথের বহুদিনের আলাপ। দেখা হতেই সাদর সম্ভাষণ। কুশল বিনিময়। লোকনাথবাবুর বাড়ির সেই শীতের সন্ধ্যার মজলিশ জমজমাট হয়ে উঠল। আঠারশ' আটাত্তর। জানুয়ারি।

একথা, সেকথা হতে হতে যাদববাবু কলকাতা আসার কারণ ফাঁস করে দিয়ে থাকবেন? কুচবিহার রাজার বিয়ের ব্যাপার পাকাপাকি করতেই তাঁর কলিকাতা আগমন। শিবনাথ চমকে উঠে থাকবেন। সে কি? কেশববাবুর কন্যার ত' চোদ্দ বছর বয়স হয়নি। আর, তা ছাড়া রাজাও নাবালক। যাদববাবু আশ্বস্ত করে বলে থাকবেন শিবনাথকে, কেশবচন্দ্র 'বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্বেই' মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। অবশ্য, কি কি কথা হয়েছে কেশবাবুর সঙ্গে, সে সব কোন কথাই বললেন না তিনি কাউকে।

না বললেও কিছুই চাপা থাকল না। কি করে যে খবরটা বাজারে ছড়িয়ে পড়ল কে জানে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মাথারা সবাই জানতে পারলেন যে যাদববাবুর দৌত্য শেষ হয়েছে। এবারে কুচবিহার থেকে স্বয়ং রাজপুরোহিত আসবেন। বিবাহের পদ্ধতি তিনিই স্থির করবেন, কেননা, সেটা তাঁরই এখতিয়ার।

আরও খবর আসতে লাগল। যাদববাবু নাকি ভবানীপুরে দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর কাছেও গিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে অবলার (ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী জগদীশ বসু মশায়ের স্ত্রী) সঙ্গেও কুচবিহারের মহারাজার সম্বন্ধ পেড়েছিলেন। অবলার তখন চোদ্দ পেরিয়েছে। যাদববাবু রাজার জন্যে মেয়েটি চাইলেন। ব্রহ্মময়ী হেসে উড়িয়ে দিলেন প্রস্তাব। বললেন, ছেলের ত এখনও বিয়ের বয়সই হয়নি। তাছাড়া রাজরাজড়াদের সঙ্গে সম্বন্ধ তিনি করবেন না। ছেলে-মেয়েরা রাণী বোনকে সহজভাবে নেবে না। কাজেই যাদববাবু আবার কেশববাবুর কাছেই ফিরলেন।

সব খবরই প্রগতিশীল ব্রাহ্ম যুবকদের বুকে শেল-সম বিঁধেছিল। তাঁরা সবাই ছটফট করতে লাগলেন প্রতিবাদ করার জন্যে। কিছু একটা করতে হয়। কিছু একটা করতে হয়। কিন্তু কি যে করণীয় কেউই তার হদিশ দিতে পারলেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেও খুব উত্তেজিত। তিনি ঠিক করলেন, খোদ কেশববাবুর কাছে গিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে আসবেন। আসলে ব্যাপারটা কি, তার সঠিক খবর তাঁর কাছেই সংগ্রহ করা ভালো। দোসরা ফেব্রুআরি তাঁরা কেশববাবুর কাছে গেলেন। যাবার সময় প্রতাপ মজুমদার মশায়ের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। মজুমদার মশায় তাঁদের এগোতে বললেন। তিনি কিছুক্ষণ আগেই বোম্বাই থেকে ফিরেছেন। খুবই ক্লান্ত। তবু সমাজের এই সংকট মুহূর্তে পিছিয়ে পড়লেন না। এদিকে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে শিবনাথবাবু সোজা কমলকুটীরে গিয়ে উঠলেন। তাঁরা কথা বলছেন কেশববাবুর সঙ্গে, প্রতাপবাবু গিয়ে হাজির হলেন।

কিন্তু কেশববাবু কোন কথাই ভাঙলেন না। শিবনাথ পীড়াপীড়ি করলেন। পরিষ্কার বললেন, সমাজের লোকেরা কি ভাবছে! তারা যে বলছে, এই কেশববাবুই না বিলেত থেকে ফিরে তিন আইন বা চোদ্দ বছরের কম বয়সে মেয়ের বিয়ে নিষেধ করে আইন পাশ করা নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন এবং শেষমেশ সেই আইন পাশ করিয়ে ছেড়েছিলেন। এখন তিনিই কি করে নিজের মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন তের বছরে? 'ল মেকার্স' আজ 'ল ব্রেকার্স'— এসব কথা শোনালেন কেশববাবুকে। শিবনাথ বললেন, লোকে আপনাকেও কাছে পায় না। আমাদের পায়। জবাব চায়। কি বলব তাঁদের? কেশববাবুর হয়ে বাজারে বলা হয়েছিল, বিয়ে হবে তবে বয়ঃপ্রাপ্তির পর্যন্ত তাঁরা স্বতন্ত্র থাকবেন। কিন্তু কেশববাবু সেরকমও কোন জবাবের মধ্যেই গেলেন না। শিবনাথ তাঁকে সরাসরি আক্রমণ করেও বলেছিলেন, অন্নদা খাস্তগীরের মেয়ের বিয়েতে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শরক্ষা করা যায়নি বলে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছিল। এখন আপনি আইন মানছেন না বলে লোকে যদি আপনার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করে? কেশববাবু জবাব ত' দিলেনই না; খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে গেলেন। আলোচনা ভেঙ্গে গেল। শিবনাথ ফিরে এলেন শুধু হাতে।

ব্রাহ্মসমাজে উত্তেজনা বেড়ে গেল। কেশববাবু যে তাঁদের সমাজের বুকে কত-বড় আঘাত দিচ্ছেন, সে কথা তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করে উতলা হয়ে উঠলেন। যত দল, উপদল সবাই এই বিয়ের বিরুদ্ধে সরব হয়ে এলেন। কোন্নগরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মনেতা ডিরোজিয়ান শিবচন্দ্র দেবও এঁদের লড়ায়ে সামিল হলেন। ব্যারিস্টার র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু ত' হাইকোর্টের কাছে তাঁর চেম্বারে ঘন্টার পর ঘন্টা পায়চারি করতেন; আর এই সংকট উদ্ধারের পথ খুঁজতেন। কি করা যায়? কি করা যায়?

অবশেষে ঠিক হ'ল আলাদা আলাদা নয় সবাই এক জায়গায় বসে ঠিক করবেন তাঁদের কি করণীয়। কোথায় বসা হবে? ঠিক হল, সদ্য প্রতিষ্ঠিত তিরানব্বুই নম্বর কলেজ স্ট্রীটে ভারতসভা হলে এই সভা হবে। 'কেশববাবুকে কিছু বলা উচিত কিনা, যদি বলা হয়, কি বলা হইবে, কে কে তাহাতে সাক্ষর করিবেন'— এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ঐ সভায়। সন্ধ্যারাত্রিতেই সভা বসল। কলেজ স্ট্রীটের জনবহুল রাস্তাটা এই সময়ে নিশুত হয়ে গেল। অজস্র তারায় সেলাই করা আকাশের নীল কাঁথায় চাপা দিয়ে শীতের কলকাতা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে সেই ব্রাহ্ম প্রৌঢ় যুবকের দল কখনও সোচ্চারে, কখনও ধীরকণ্ঠে কখনও সক্ষোভে, কখনও ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে সমাজের এই আশু বিপদে মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগলেন। এবং এক সময় তাঁরা সিদ্ধান্তও করে ফেললেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম সজ্জনের সই করা প্রতিবাদ-পত্র কেশববাবুর হাতে দেওয়া হবে। আর এই সই করার প্রশ্ন নিয়ে সভায় আর এক তুমুল হট্টগোল শুরু হল। কথা কইলেন দ্বারকানাথ। তার সঙ্গে ছিলেন দুর্গামোহন দত্তও। তাঁরা সাফ কথা জানতে চাইলেন সভায় সমাসীন ব্যক্তিদের কাছে। বললেন, দেখুন, এই যে প্রতিবাদপত্র পাঠান হবে কেশবচন্দ্র সেন মশায়ের কাছে, তার যদি কোন বিহিত না করেন কেশববাবু, তাহলে কি করব আমরা? তিনি যদি অপ্রয়োজনীয় একটা ছেঁড়া চোতা কাগজের মত মনে করেন এই প্রতিবাদলিপিটা, কি ব্যবস্থা নেব আমরা। ত' মনে করি, তখন আলাদা সমাজ গঠন করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবেনা আমাদের। আপনারা যদি সেই পর্যন্ত যেতে রাজী থাকেন তাহলেই, একমাত্র তাহলেই আমরা সই করতে রাজী। নয়ত এ' ছেলে-খেলার মধ্যে আমরা নেই। আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠে থাকবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দ্বারকানাথের কণ্ঠস্বর।

এমনই আপোষহীন মনোভাবের মানুষ দ্বারকানাথ। তাঁর হৃদয়ের বিশ্বাস এতই নির্মম, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা এতই সুতীব্র, যে, এসব নিয়ে কোন ছেলেমানুষি সহ্য হত না তাঁর। আনন্দমোহন বসু বললেন, এতটা যেতে তাঁরা এখনই প্রস্তুত নন। দ্বারকানাথের দল আশ্চর্য দিব্যদৃষ্টির পরিচয় দিলেন। বললেন, পথ দীর্ঘ। অনেকটা পথ যেতে হবে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যাঁরা আমাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবেন না, তাঁদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করে, এখন থেকে লাভ কি? এই ছেলেমানুষিতে, এই স্বাক্ষর অভিযানে তাঁরা নেই। থাকলেনও না। দ্বারকানাথ ও দুর্গামোহন বেরিয়ে এলেন।

তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু সভা চলতে লাগল। এই প্রতিবাদলিপির বয়ানে, চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হতে লাগল। খসড়াও তৈরি হল। এবং পরের দিন স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সুরু হল। শিবচন্দ্র দেব করলেন প্রথম সইটা। অনেকেই করলেন একে একে। এই লড়াইয়ের রণদামামা বাজতে থাকলে, যুদ্ধের ঘোড়ার মত দ্বারকানাথও আর স্থির থাকতে পারলেন না। দিন দুই পরে তাঁদের নিয়ে মোট ছাপ্পিশজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম এই পত্রে সই করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানতঃ শিবচন্দ্র, দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন ছাড়া শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, গুরুচরণ মহলানবিশ ও কালীনাথ দত্ত। নবই ফেব্রুআরি চিঠিখানা কেশববাবুর হাতে দেবার জন্যে পাঠান হল। কেশববাবু ছিলেন না। পত্রটি নিলেন কেশবচন্দ্র প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মশায়। এরা এখানেই থামলেন না। এই পত্র ছাপিয়ে মফঃস্বলের সমাজে সমাজে পাঠাতে লাগলেন। এবং কেশব বসুর বিরুদ্ধ দল দিনের পর দিন ভারী হতে লাগল।

একেবারে স্কুল কলেজের ছেলেরাও এই আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। [illegible] নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে তাঁরা একটা সভা করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র কালীশঙ্কর সুকুল। তাঁদের আশা ছিল কেশবচন্দ্র যুবকদের চক্ষের জল দেখিয়া বিগলিত হইবেন।' সুকুল এক বিচিত্র চরিত্র। খুবই ভাল ছাত্র। ইতিহাসে প্রথম হয়ে সর্বপ্রথম কবডেন মেডেল পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইনি পৈতে রাখতেন। নিজে রান্না করে খেতেন। কারও ছোঁয়া খেতেন না। সভায় তিনি কেশববাবুকে এই অন্যায় কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার আবেদন করে থাকবেন। সভার পর তাঁর সতীর্থরা বললেন, তুমি কেশব সেনের মেয়ের বিয়ের প্রতিবাদ করছ আর তোমার গলাতেই পৈতে। সুকুল পৈতে ছিঁড়ে ফেললেন।

আন্দোলন আরও জোরদার হতে লাগল। দুটো কাগজ বার করা ঠিক হল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দুটো কাগজ—ধর্মতত্ত্ব, সানডে মিরর। তারা কেশববাবুর কথা বলে। এদের নিন্দা করে। তারই উত্তোর গাইবার জন্যে এঁরাও দুটো কাগজ বার করলেন। ইংরেজি ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ন। বাংলাটা সাপ্তাহিক। সম্পাদক শিবনাথ। সেটাই আগে বেরোল। সতেরই ফেব্রুআরি। ইংরিজিটাও সাপ্তাহিক। সম্পাদক, দুর্গামোহন দাসের ছোটভাই ভুবনমোহন। চিত্তরঞ্জন দাসের বাবা। একুশে মার্চ থেকে কাগজটা বেরোতে শুরু হল। আনন্দমোহন বসু 'ফিনান্স' করতে রাজী হলেন। সারা দেশের বিবাহ-বিরুদ্ধ ব্রাহ্মদের মতামত ছাপা হতে লাগল। হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেল সারা দেশের ব্রাহ্মসমাজে।

সে বছরের মাঘোৎসব হল গভীর এক উদ্বেগের মধ্যে। তেইশে ফেব্রুআরি এলবার্ট হলে একটা সভা হল। কেশববাবু তার মালিক। তাঁর কাছে অনুমতি চাওয়া হল। তিনি তা দিলেন। কিন্তু মিটিং করতে এসে দেখা গেল মিটিং-এ হল পাওয়া যাবে; গ্যাসের আলো পাওয়া যাবে না। বলার কিছু নেই। কেননা উদ্যোক্তারা ত তা চাননি। বহুলোক এসেছেন। এসেছেন মেয়েরাও। অন্ধকারে কে কোথায় বসে। সভার উদ্যোক্তারা নিরুপায় হয়ে বাজার থেকে বাতি নিয়ে এসে জ্বালালেন সভাগৃহে। কিন্তু নৈরাজ্য শুরু হয়ে গেছে। এদের বিরুদ্ধপক্ষীয়রা কিছু ছেলে জোগাড় করে হৈ হল্লা লাগিয়ে দিয়েছে। সে চিৎকার, গালাগালি, হট্টগোলে কিছুই শোনা যায় না। মিটিং ভেস্তে গেল। অ্যালবার্ট হলের এই মিটিংটা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া নিয়ে কাগজগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কম নয়। অবশ্য উত্তাপটা তখন সর্বত্র। ঠিক কি ঘটেছিল সেদিন তা নিয়ে পাঁচজন পাঁচরকম বলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের বন্ধু দুর্গামোহন একখানা চিঠি লিখেছিলেন 'স্টেটসম্যান' কাগজে। আঠারশ' আটাত্তর সালের পাঁচিশে ফেব্রুআরি সেখানি ছাপা হয়। তা থেকে আনুপূর্বিক সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। দুর্গামোহন লিখেছিলেন, এই মিটিং-এর ব্যাপারে কাগজে আগে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। শনিবার সাড়ে ছটায় অ্যালবার্ট মেডিকেল হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। অ্যালবার্ট হলের সেক্রেটারি তখন কেশবচন্দ্র সেন। বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মদের প্রভিশনাল কমিটির সেক্রেটারি তখন কোন্নগরের ডিরোজিয়ান বাবু শিবচন্দ্র দেব। তাঁর নামেই মিটিংটা ডাকা হয়েছিল। শিবচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেন মশায়কে অ্যালবার্ট হল ব্যবহার করতে দেবার জন্য চিঠি লিখলেন।

মিটিং-এ ঠিক আগের দিন, শুক্রবার সকালে মিটিং-এর আসন ও আলোর বন্দোবস্ত করার ভার যাঁর ওপর পড়েছিল, সেই গুরুচরণ মহলানবিশ মশায় অ্যালবার্ট হলের কেয়ারটেকার প্রাক্তন মিশনারী রামচন্দ্র সিংহের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, সিংহমশায়, গ্যাসের আলোও লাগবে মিটিং-এর জন্যে। অবশ্য, তার জন্যে যা চার্জ পড়বে, তা তাঁরা মিটিয়ে দেবেন।

রামচন্দ্র সিংহ গ্যাসের আলোর কথা শুনে একটু দোনামনা করতে লাগলেন। মিটিং-এর ব্যাপার। গ্যাসের আলোর ব্যয়ভার নিয়ে আবার হুজ্জুতে না হয়। গুরুচরণ মহলানবিশ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, তিনি নিজে জামিন রইলেন। টাকাকড়ির জন্যে কিছু ভাববেন না। সিংহ মশায় রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন। শনিবার। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ মিটিং-এর আহ্বায়কদের পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ যথারীতি আগেভাগে গিয়ে রামচন্দ্র সিংহকে বললেন, গ্যাসের আলো জেলে দেবার হুকুম দিতে। রামচন্দ্র অ্যালবার্ট হলের বেয়ারা এবং দারোয়ানকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে, দ্বারকানাথের সামনেই তাদের আলো জেলে দেবার হুকুম দিলেন। তারপরই অবশ্য বেরিয়ে গেলেন তিনি। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রামচন্দ্র সিংহ ফিরে এলেন। এসেই বললেন, কেশবচন্দ্রের অনুমতি ছাড়া তিনি গ্যাস আলো জ[illegible]র অনুমতি দিতে পারবেন না।' শুনে [illegible] বাহুল্য সবাই হতভম্ব। বুঝুন ব্যাপারখানা। শীতকালের সন্ধ্যা। শীতের সঙ্গে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। লোকজন এসে পড়েছে। আরও আসছে। মিটিং হবে কি করে? গ্যাসলাইট পাওয়া যাবে নিশ্চিত জেনে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি কোনরকম। দ্বারকানাথ ত অগ্নিমূর্তি। প্রতিবাদ[illegible] তিনি মুখর হয়ে উঠলেন। রামচন্দ্র সিংহকে ভর্ৎসনা করে বললেন, সে কি কথা মশায়। এই একটু আগে আমার সামনে গ্যাসলাইট দেবার হুকুম দিয়ে গেলেন, আর এখন বলছেন, হবে না। এ কি রকম ব্যবহার আপনার? রামচন্দ্র বললেন, প্রথমে তিনি জানতেন না যে মিটিং-এ গ্যাস জ্বালাবার অনুমতি [illegible]।

সাংঘাতিক বিপদে পড়লেন উদ্যোক্তারা। কি আর করবেন। বাবু কালীনাথ দত্ত তার শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠালেন কমলকুটীর-এ। তখন ঘড়িতে বাজে পৌনে [illegible]। কেশবচন্দ্র [illegible]

তিনি শুনেই বললেন, গ্যাস আলো জ্বালার অনুমতি তিনি লিখে দিচ্ছেন। এবং কথামত রামচন্দ্র সিংহকে অনুমতিপত্র লিখে এঁদের হাতে দিয়ে দিলেন [illegible]

ছ'টা তখন বেজে গেছে। মিটিংটা ঐ সময়ই নাগাদ শুরু হবার কথা। অ্যালবার্ট হলে তখন শ'চারেক লোক এসে জমা হয়েছেন। জমা অন্ধকারে মানুষগুলো যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। সমাগত জনমন্ডলী [illegible] হয়ে উঠছে অ্যালবার্ট হলের অন্ধকারে।

সেদিনের সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু। পৌনে সাতটা নাগাদ সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর একাংশ প্রস্তাব করলেন যে, সভা আজ স্থগিত থাক। আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করলেন অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের, বিশেষ করে [illegible] কে এস [illegible]

তিনিও মিটিং স্থগিত রাখার পক্ষে মত দিলেন।

(চলবে)

জীবনের স্মৃতিদীপে

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণ

আজকাল আত্মজীবনী গোছের লেখা পাঠকদের কাছে বেশ ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই ধরনের বই-এর অধিকাংশ লেখকই অশীতিপর। দৃষ্টি অস্পষ্ট, স্মৃতি ঝাপসা —সেই সম্বল করেই তাঁরা পিছন পানে তাকান, জীবনের শেষপাদে এসে। ফলে আত্মঅহমিকা ও অহংবোধের দাবী কিম্বা উদ্বেল আবেগের ঝাপটা তাঁদের সামনে এসে পড়ে বারবার। মূলতঃ এগুলির উপর ভিত্তি-করা আত্মজীবনী পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে কখনও বিরক্তিকর, কখনও বা অপাঠ্য। বাঙালী পাঠক এই দুর্গতির কথা স্মরণ রেখেই হয়ত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে চেয়েছেন এমনভাবে যাতে বইটি হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় ও পঠনযোগ্য। বলতে দ্বিধা নেই, লেখক তাঁর এই সক্রিয় প্রচেষ্টাতে সফল হয়েছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে (১৮৮৮) লেখকের জন্ম ফরিদপুর জেলার খান্দার-পাড়া গ্রামের এক কুলীন বৈদ্য বংশে। ঐ বংশে বিদ্যাচর্চার প্রতি ঝোঁক ছিল অতি প্রবল। লেখকের বৃদ্ধ প্রপিতামহের এক ভ্রাতা কবিরাজচন্দ্র মজুমদার সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। পিতা ছিলেন আগরতলার ত্রিপুরা এস্টেটের উকিল। একজনের রোজগারের উপর নির্ভরশীল যৌথপরিবারের ধর্ম অনুযায়ী লেখকের শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে যথেষ্ট অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে। ১৯০০ সালে তিনি প্রথম কলকাতায় আসেন ও সাউথ সুবার্বন স্কুলের ফিফথ ক্লাসে ভর্তি হন। পরে তিনি কটক যান এবং ঐ স্থান থেকেই বৃত্তি সহযোগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০৫ সালে লেখক কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। তিনি ইতিহাসে এম-এ পাশ করেন ১৯১১ সালে। কলেজে পড়াকালীন রমেশবাবু কিঞ্চিৎ সাহিত্য-চর্চাও করতেন। তাঁর কবিতা 'মাতৃহারা' একটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছিল। বিভিন্ন নাটকে অভিনয়ও তিনি করেছেন। বার কয়েক। এবং সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখের পরিচয় ঘটে।

লেখক অধ্যাপনা শুরু করেন ১৯১৩ সালে, ঢাকা ট্রেনিং কলেজে। ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেন। এবং ঐ বিভাগে তিনি ১৯২১ সাল পর্যন্ত ছিলেন। লেখক-এর কাছে ঐ সাত বছরের অধ্যাপনা খুবই মূল্যবান। '...ভবিষ্যৎ জীবনে আমি যা-কিছু করেছি বা হয়েছি তার মূল খুঁজলে এই সাত জীবনেই পাওয়া যাবে।' কারণ ঐ সময়েই তিনি তাঁর গবে-ষণামূলক কাজ শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহ, উৎসাহ-দান ও লেখকের কাজে সহযোগিতা তিনি আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। ১৯২১ সালের পয়লা জুলাই তিনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রীডার হিসেবে যোগদান করেন। ঐ পদে থাকাকালীন লেখক 'বাঙালীর ইতিহাস' প্রভৃতি বই লেখার বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৬ সলে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে মনোনীত হন। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন ও তৎকালীন ঢাকার অবস্থাও বর্ণনা করেছেন। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিদ্যাভবন-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। ঐ সংস্থাটি স্থাপিত হয় ১৯৩৮ সালে, বোম্বাই শহরে। ঐ সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কে এম মুন্সী ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও আরও অনেকে। লেখকের কাজ ছিল ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রস্তাবিত ইতিহাস লেখা। এই গ্রন্থমালার নাম স্থির হয় 'হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পিপল।' ১৯৭৭ সালে এই গ্রন্থমালার মুদ্রণ ও প্রকাশন সমাপ্ত হয়।
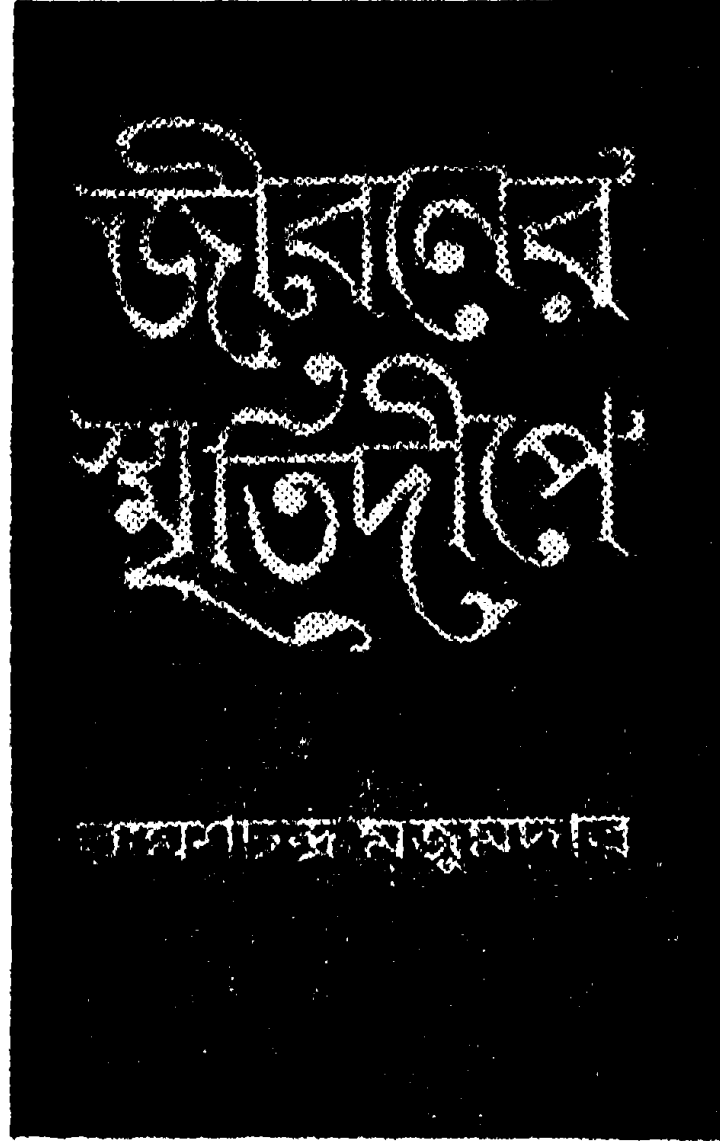
সুবিস্তৃত কর্মজীবনে লেখক অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সরো-জিনী নাইডু, স্যার আকবর হায়দার প্রভৃতি বেশ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে লেখক বেশ কয়েকটি মজাদার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন, ভোজনরসিক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কইমাছ-প্রীতি কিম্বা স্বল্পাহারী শরৎচন্দ্র ও তাঁর গাম্ভীর্য প্রভৃতি।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর লেখকরে মনে একটি বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে '...এই স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি তথ্যমূলক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হ'ক। অন্ততঃ এই সংগ্রামে বাংলার যে বিশিষ্ট অবদান তা যাতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তার জন্য চেষ্টা করা খুবই প্রয়োজন বোধ করেছিলাম।' কিন্তু তদানীন্তন সরকার এ প্রসঙ্গে কর্ণপাত করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেনি। স্বাধীনতার পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুহারাদের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা লেখককে পীড়িত করেছিল। ১৯৪৯ সালে তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখাও করে-ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এক-জাতীয়তা স্থাপনের আদর্শই হিন্দু-মুসলমানকে তুল্য অধিকার নিয়ে সুখে-শান্তিতে একত্রে বস-বাস করতে সাহায্য করবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সবই হয়ে গেল অন্যরকম। জনৈক ইংরেজ লেখকের উক্তি রমেশবাবু আজও ভুলতে পারেন নি 'ছয় হাজার মৃত, এক কোটি চল্লিশ লক্ষ গৃহচ্যুত ও বিতাড়িত, এক লক্ষ যুবতী ধর্ষিতা, অপহৃতা, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতা বা বিক্রীতা। আর যখনই মনে পড়ে, লেখকের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় '...এই মূল্য দিয়ে আমরা কি পেয়েছি?' এই বৃদ্ধ ঐতিহাসিকের এই প্রশ্নের জবাব কোন পাঠক দিতে পারেন কি?

শক্ত মলাট, সুন্দর ও নির্ভুল ছাপা এইটি পড়ে আনন্দ পেলাম। প্রতি পদক্ষেপে লেখকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। পাঠকেরা এই বইটি পড়ে লাভবান হবেন।

রামেন্দ্রসুন্দর সরকার,

জীবনের স্মৃতিদীপে : রমেশচন্দ্র মজুমদার। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণি, কলিকাতা ৭০০০১৩। পনের টাকা।

মোহনবাগানেরই দ্বি-মুকুট

অজয় বসু

লীগের পর শীল্ড—একই বছরে ঘরোয়া ফুটবলের সেরা দুটি আসর মাৎ করে দিয়ে মোহনবাগান ক্লাব তাদের পথ পরিক্রমণের ইতিহাসকে আরও অর্থবহ করে তুলতে পেরেছে।

এক বছরে দ্বি-মুকুট লাভের দৃষ্টান্ত এই প্রথম যে গড়া হল তা নয়। এমন কৃতিত্ব মোহনবাগান এর আগে অন্যূন আরও সাতবার দেখিয়েছে। তবু এবারের সাফল্য এই কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ফুটবল সফলতা সম্পর্কে অনেকেই, মায় তাদের গোঁড়া সমর্থকেরা বুঝি রীতিমত অনিশ্চিত ছিলেন। অন্য দু দলের পক্ষ থেকে গোটা দেশ ঘুরে ঝাড়াই-বাছাই করে নানান প্রান্ত থেকে নামী নামী খেলোয়াড় আনিয়ে দলগত সম্পতি বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবু মোহনবাগান তাদের টেক্কা দিয়ে লীগে শীর্ষাসন দখলে আনতে পেরেছে এবং সেই সঙ্গে সুদৃশ্য স্মারক শীল্ডটিকেও নিজের সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখতে পেরেছে। সুতরাং সার্বিক মূল্যায়ণে মোহনবাগানের এই কৃতিত্ব স্মরণীয় বৈকি!

সমর্থিত দল লীগ পাওয়ার পর মোহনবাগানের সমর্থকেরা আনন্দোচ্ছ্বাসের জোয়ারে মাঠকে মাঠ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে এই সাফল্য ছিল কতকটা প্রত্যাশিত। তাই লীগে মোহনবাগানের শেষ ম্যাচের দিন উৎসবের উষ্ণ আমেজে গড়ের মাঠকে ভরিয়ে তুলতে তাঁরা তৈরি হয়েই ছিলেন। কাঁসর ঘণ্টা, পটকা, পতাকা, ক্লাব প্রতীক কাগজের নৌকা, সবকিছুই ছিল হাতের কাছে। বাদ্য বাজনা বাজিয়ে, পতাকা উড়িয়ে, প্রতীক নৌকাটিকে মাথায় তুলে ওই মুহূর্তে নাচানাচি করতে তাঁদের উৎসাহে টান পড়েনি।

কিন্তু শীল্ড ফাইনালের দিনে এমন প্রস্তুতি তাঁদের ছিল না। তাঁদের চোখে মুখে ছিল অনন্ত জিজ্ঞাসা। অশেষ অস্থিরতার ছাপ। আগের ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের বিলম্বিত উজ্জীবিত মূর্তি দেখার পর কী হয়, কী হয় ভাবনার ছোঁয়া থেকে তাঁরা নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেন নি। তাই শীল্ড ফাইনালের দিনে মাঠের মধ্যে মোহনবাগানের সমর্থকদের তরফ থেকে উৎসবের উপকরণ যোগাড়ে রাখা হয়নি। পরে অবশ্য খুশির হাওয়ায় পরিমণ্ডলকে মাতিয়ে দিতে তাঁরা সাধ্যমত সব কিছুই করেছেন। আসলে শীল্ড ফাইনালের সাফল্য সমর্থক মহলে অপ্রত্যাশিত আনন্দের আশীর্বাদের মত নেমে এসেছে। তাই আনুপাতিক মূল্যায়ণে বোধহয় শীল্ড পাওয়ার সান্ত্বনা তাঁদের কাছে অনেক বেশি দামী।

শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে দাঁড়াতেই দেয়নি। পায়ের নীচে শক্ত জমি খুঁজে পেলে পাছে ইস্টবেঙ্গল দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলার দিনের মত অপ্রতিহত মূর্তি ধরে বসে, এই চিন্তাতেই মোহনবাগান এতটুকু সময় নষ্ট করতে চায়নি। খেলা শুরু হতে না হতেই অঙ্গীকারবদ্ধ পরিকল্পনার তাগিদে প্রতিপক্ষকে তছনছ করতে এগিয়ে আসে। মোহনবাগানের কাছে তখন সময়ের দাম অমূল্য। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে তাতানো ইস্পাতের নমণীয় কাঠামোর ওপর সবেগে আঘাত হানতে থাকে। গোড়াতেই এমন পরিস্থিতির জন্যে ইস্টবেঙ্গল প্রস্তুত ছিল না। প্রারম্ভিক ধাক্কায় তাদের অপ্রস্তুতি আরও এলোমেলো হয়ে পড়ে। একটা প্রচণ্ড শকের চাপে গোটা দলটিই স্নায়ুর সুতোগুলিকে শক্ত হাতে ধরে রাখার কৌশল হয় বিস্মৃত। বাকি সময়েও ইস্টবেঙ্গল স্নায়ুর এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই শীল্ড ফাইনালের প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াতে হয়।

একদিকে মোহনবাগানের তালঠোকা চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের ঝিমিয়ে পড়া এবং সময় বিশেষে দিশেহারা ভাব, মূলত এই সব কারণেই এবারের শীল্ড ফাইনাল সর্বক্ষণ জমে থাকতে পারেনি। তবে প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কথা আলাদা, ওই লগ্নে খেলাটি ছিল গতিতে উজ্জীবিত। মোহনবাগানের প্রাধান্য সত্ত্বেও তখন ইস্টবেঙ্গল একেবারে হাল ছেড়ে দিতে চায়নি। প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আরও গোল করে মোহনবাগান দ্রুতপদে সামনের দিকে আরও এগিয়ে গেলে বলার কী থাকত? এবং ঠিক সময়ে ইস্টবেঙ্গল যদি এক-আধটি গোল পরিশোধ করে বসতো তাহলেই বা কে অবাক হতো?

ফাইনালে খেলা যা হয়েছে তাতে মোহনবাগানের আরও বেশি গোলের ব্যবধানে জয়লাভই ছিল সঙ্গত। মোহনবাগান খেলেছিল দারুণ। যেমন নিটোল প্রত্যয়, তেমনি দুর্বার গতি। মোহনবাগানের প্রতিভাবান অনুগামীদের সক্রিয় ক্রিয়া-কলাপের কলরবে

দক্ষতার অবিমিশ্র ছবিও মাঝমাঠে বারে-বারে আঁকা হয়ে যাচ্ছিল। মাঠের দিকে তাকিয়ে করোরই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না যে পালের হাওয়া কোনদিকে বইছে এবং শেষ পর্যন্ত জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তবু প্রশ্ন থেকে যায়।

এত খেলেও মোহনবাগানকে জয়ের জন্যে লিঙ্কম্যান গোতম সরকারের এক আচমকা সটের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছিল কেন? গোতম যদি অতর্কিতে ওই গোল করতে না পারতেন তাহলে খেলার ফলাফল কী হত? প্রশ্নগুলি মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডদের সামনে রাখতে চাই। তাঁরা সদুত্তর দিতে না পারলেই বোঝা যাবে যে দল যেমনই খেলে থাকুক না কেন ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। পারলে তাঁরাই পারতেন অনেক সহজে এবং অনেক আগেই এই খেলার চূড়ান্ত ফয়সালা করে নিতে।

মোহনবাগানের জেভিয়ার পায়াসের সেদিনের ভূমিকা ছিল সৃজনশীল শিল্পীর —স্কিমারের। তবে স্ট্রাইকারের নয়। শ্যাম থাপা অক্লান্ত পরিশ্রমী, কর্মী। কিন্তু দুজনের কেউ গোল লক্ষ্যে পৌঁছতে নিশ্চিত পদক্ষেপ ঘটাতে পারেননি। এক-প্রান্তে বিদেশ ছিলেন বিপক্ষের বিচারে আরও ভয়ঙ্কর। লোক কাটিয়েছেন হেসে-খেলে। একের পর আর এক বাধা টপকে-ছেন নিশ্চিত প্রত্যয়ে। অনেকদিন পর বিদেশের এই মূর্তি দেখে ফুটবল অনু-রাগী মাত্রেই খুশি হয়েছেন, যেমন হয়ে-ছিলেন তাঁরা গত বছরে শীল্ড ফাইনালে আরারাতের সঙ্গে খেলার দিনে।

তবু বিদেশ বা জেভিয়ার পায়াসের উর্ধ্বে আমি ঠাই দিতে চাই গোতম সর-কারকে। আমার বিচারে গোতমই ছিলেন দিনের সেরা, মাঠের সেরা। কথাটা জোর গলায় বলছি, যেহেতু আমি অন্ততঃ নিজের উপলব্ধির কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চাই। মাঝমাঠে গোতম ছিলেন দম দেওয়া কলের পুতুলের মত। রক্ষণভাগের সহায়ক এবং আক্রমণে নিরলস যোগানদার। গোটা দলের মেরুদণ্ডই তিনি। এতটুকু আকৃতি, কিন্তু কী অফুরাণ প্রাণশক্তি তাঁর। ধাত যে কী দিয়ে গড়া তাই ভাবি। দিনের পর দিন গোতমকে একই ভূমিকায় দেখছি। যত দেখছি ততোই তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠছি। এবং উপলব্ধি করতে পারছি যে আমাদের ফুট-বলের যে কোনো কালের যে কোনো বিখ্যাত হাফব্যাকের পাশে সমানভাই হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা তিনি রাখেন। এমন অসঙ্কোচ উক্তি একালের আর কোনো খেলোয়াড়ের সম্পর্কে করা যায় কি? চলতি [illegible]

গোতম দিনের সেরা, মাঠের সেরা

সেকথা অন্য কারুর সম্পর্কেই বলা যায় না। বলা যায় না সুরজিৎ সেনগুপ্ত সম্পর্কে। কারণ কোনো কোনো ম্যাচে সুরজিতের সময় খারাপ যায়। তিনি যেন ভুলে বসেন নিজেকে। কিন্তু গোতমের আত্মবিস্মৃতি ঘটেনি বিক্ষিপ্ত লগ্নেও। প্রতি ম্যাচেই তিনি নিজের মানে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিজের খেলার মান তিনি নিজের হাতেই ছকে দিয়েছেন। সেই ছকে পৌঁছানো অনেকেরই সাধ্যাতীত।

ইস্টবেঙ্গল দলে গোতমের মত কেউ ছিলেন না বলেই অষ্টপ্রহর তাদের অনি-শ্চয়তায় ভুগতে হয়। আসলে ইস্টবেঙ্গল-এর হাফলাইনটিই ছিল সবচেয়ে দুর্বল অঞ্চল। নরম কাদামাটিতে গড়া এক কাঠামো যেন। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই মোহনবাগান সেদিন যথেচ্ছ বিচ-রণের অবকাশ পেয়েছিল। পুরোভাগে যা-কিছু খেলেছেন তা এক সুরজিতই। কিন্তু তাঁর একার সাধ্য কী বহুজনের দায়-দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করা? সকলের সব ত্রুটি সুরজিৎ পুষিয়ে দিতে পারেননি বটে। তবে তিনি তাঁর ভাবমূর্তির ওপর কিছুটা সুবিচার যে করতে পেরেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ অনেকের ধারণা, মোহনবাগানের মত শক্তিশালী প্রতি-পক্ষের বিরুদ্ধে সুরজিৎ কোনো দিনই ভাল খেলতে পারেননি। পারেনও না। এই [illegible]

দিন সুরজিৎ সেই কথাটি বুঝিয়ে ছেড়ে-ছেন। এরপর সুরজিৎ সম্পর্কে ওই ধরনের আলগা মন্তব্য করায় অনেকেই বোধহয় আর উৎসাহিত হবেন না।

দক্ষিণ কোরিয়া এবং মোহনবাগানের সঙ্গে খেলায়, পরপর দুদিন দুরেপাল্লার উঁচু সটে বেসামাল হতে দেখে গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলীর যথার্থ যোগ্যতা সম্পর্কে আমার মনে একটি জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়েছে। শূন্যে ধাবিত বলের গতি আন্দাজে তাঁর হিসেবে এমন ভুল হয়ে যাচ্ছে কেন? দূর থেকে ধেয়ে আসা বল দেখার কোনো অসুবিধা ছিল না। অথচ উড়ন্ত বলের গতি-প্রকৃতি যাচাইয়ে অমার্জনীয় ত্রুটি ঘটে গেল। কেন? বলের বাঁক ফিরেছিল? গোলের কাছাকাছি এসে বলটি ঘুড়ির মত গোৎ মেরেছিল? বিশেষতঃ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলার দিনে? এই সব কৈফিয়ৎ দেওয়া সাজে কি? উড়ন্ত বল গোলরক্ষকের মনোমত পথ ধরে ছুটবে, বাঁক ফেরাবে না, হঠাৎ নীচু পথে গতি বদল করবে না, এমন ধারণায় পায়ে দাসখৎ লিখে দেওয়াটাই তো ভুল। সব-রকম পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুতি থাকা চাই। যাঁদের আছে তাঁরাই যথার্থ যোগ্য, দক্ষ গোলরক্ষক। পরপর দুদিনের অভি-জ্ঞতার পর তাই মনে হচ্ছে সে যোগ্যতা বিশেষ করে ওপরের বল ধরার ব্যাপারে ভাস্করের সংশয়াতীত মুন্সীয়ানা আছে কিনা কে জানে।

পূর্ব নির্দিষ্ট ১৪ তারিখের বদলে ১৬ সেপ্টেম্বরে শীল্ড ফাইনাল খেলা হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল যে উৎসাহ ও মনোবলের বাড়তি খোরাক যোগাড়ে আনতে পেরেছিল কার্যত তা অনেকটা হারিয়ে যায়। অবশ্য এর জন্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতাই দায়ী। তাঁরাই তো প্রথমে মোহনবাগান মাঠে খেলতে অস্বীকার করেছিলেন। এবং সেই সূত্রে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকায় খেলার দিনক্ষণ নতুন করে নির্ধা-রণে কটি দিন কেটে যায়। কটি দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় হয়ত সাবির আলি ও দেবরাজের কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু পরোক্ষে যে গোটা দলের মানসিক প্রস্তুতি ঢিলে হয়ে পড়েছিল তার টাওর ক্লাব কর্তৃপক্ষ পাননি। এবং পেতে চানও নি। খেলার পর বিষয়টি কিন্তু খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন ইস্টবেঙ্গল দলের সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

তবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল যা খেলেছে তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। সেমি-ফাইনালে মহামেডানের বিরুদ্ধে মোহনবাগানকে উন্নততর ক্রীড়াশৈলীর স্বাক্ষর রেখে ফাই-নালে তাদের সম্ভাব্য আভাস জানাতে পেরেছিল। দক্ষিণ কোরিয়া দল কলকাতায় এসে [illegible]

ভবধুবন্ন শীল্ড ফুটবলের নষ্ট নাম কিছুটা পরিমাণে ফিরে পাওয়া গেছে। তবে কুয়ায়েতের কাজমার যোগদানে শীল্ডের সংগঠকরা কিছুট লাভ করতে পারেননি। উলটে বিরুদ্ধ সমালোচনার যূপকাষ্ঠে তাঁদের ঝুলিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন অনেকে। বিদেশ থেকে যাঁরাই আসেন কাজের হিসেবে তাঁদের অনেকেই যে কেউকেটা নন, সাম্প্রতিক কালে শীল্ডে যোগদানকারী কয়েকটি দলের খেলার ছিরি দেখে তা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। আই এফ এ যদি ভবিষ্যতে বিদেশীদের, আমন্ত্রণ জানানোর কালে তাঁদের সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর না নেন, তাহলে ফালতু প্রচারের মাধ্যমে লোক ঠকানোর অভিযোগ থেকে তাঁরা মুক্তি পাবেন না। এ অভিযোগের ধুয়োয় ইতিমধ্যেই গুঞ্জন উঠেছে। যেহেতু আই এফ এর পক্ষ থেকে সিজন টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা চালু করা গেছে। সিজন টিকিটের টোপ যাঁদের গিলতে হয়েছে, কাজমার খেলা দেখে তাঁদের ধারণা হয়েছে যে এতো সিজন টিকিট নয়, এ হচ্ছে এক ধরনের দিল্লিকা লাড্ডু। যা খাওয়ায় এবং না খাওয়ায়, দুয়েতেই অস্বস্তি।

সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার দল

আই, এফ, এ শীল্ড বর্ণময় হোক

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের সামনের সারির দলগুলো কেন কলকাতার আই এফ এ শীল্ডে খেলতে আসতে চায় না? কেনই বা তারা কলকাতায় আসে না? দার্জিলিংয়ে গোল্ড কাপ কিংবা গোহাটিতে বড়দলৈ ট্রফিতে যারা খেলতে যায় তারাও আই এফ এ শীল্ডে খেলতে আসে না।

এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কিছুদিন আগে ভিন্ন রাজ্যের কয়েকজন সাংবাদিক ও কর্মকর্তার সঙ্গে আমি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তাঁরা সরাসরি বললেন, তোমাদের ওখানে খেলতে যাবার কোন মানে হয় না। জলকাদার মাঠ। খুব অসুবিধে হয় খেলতে। তার ওপর মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গল তো জিতবেই। সব শেষে তাঁরা খেলা পরিচালনায় [illegible] [illegible] জানালেন।

সত্যি ভাববার কথা। কিন্তু আবহাওয়ার প্রশ্নটি অতো গুরুতর নয়। কারণ ও প্রশ্ন তুললে আমরাও তো বলতে পারি ডিসে-ম্বর-জানুয়ারি মাসে দিল্লির ভয়ংকর শীতে খেলতে আমাদের খেলোয়াড়দেরও যথেষ্ট অসুবিধে হয়। তাহলে?

আসলে সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আর সেই সমস্যাকে গুরুত্ব না দেবার জন্যেই ভারতের সব চেয়ে পুরোন ফুটবল প্রতি-যোগিতা এবং একদা ভারতীয় ফুটবলের 'ব্লু রিবন' আই এফ এ শীল্ডের খেলা ধীরে ধীরে ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় রূপান্ত-রিত হতে চলেছে।

এবারের কথাই ধরা যাক। ভারতের সামনের সারির দলগুলির মধ্যে কেউই আসে নি। অনেক সাধ্য সাধনা করে আই এফ এ প্রতিযোগিতার 'গ্ল্যামার' বাড়াবার জন্যে বিদেশ থেকে দুটি দল এনেছিলেন।

দল দুটির মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া মোটামুটি। আহামরি গোছের না হলেও তারা যে ফুটবল খেলতে জানে তা স্বীকার করতে হয়েছে কলকাতার দর্শকদের। এবং একসময় তো তাদের খেলা সকলকে রীতি-মত আনন্দও দিয়েছে। দেশে ফেরার আগে তাঁরা বলে গেছেন, ভবিষ্যতে শীল্ডে খেলার জন্যে আমন্ত্রিত হলে তাঁরা আরো শক্তি-শালী দল নিয়ে আসবেন। তাঁদের যে সে সামর্থ্য আছে তা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্য দলটি দর্শকদের পুরোপুরি বোকা বানিয়েছে। অনেক আশা নিয়ে যাঁরা কুয়েতের কাজমা দলের খেলা দেখতে গিয়ে-ছিলেন, তাঁদের প্রত্যাশার সেই ফানুসটি মুহূর্তে ফুটো হয়ে গিয়েছিল।

এবারের ঘরোয়া লীগ তালিকার মাঝা-মাঝি সারির দল বি এন আরের সঙ্গেই তারা পাত্তা পায় নি। নেহাত বরাত ভাল, তাই চার-পাঁচ গোলে হারের লজ্জায় না পড়ে তারা হেরেছে টাইভাঙ্গা পদ্ধতিতে।

তাই আই এফ এর কাছে অনুরোধ [illegible] বিদেশ থেকে দল আনার আগে তারা

যেন একটু বিচার-বিবেচনা করে দেখেন। একটু খোঁজ-খবর নেন। কলকাতা মাঠের নিচের সারির একটি দলের মতো কাউকে বিদেশ থেকে ধরে আনলে তাঁদের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না নিশ্চয়ই!

দক্ষিণ কোরিয়া দলটির সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা যেমন দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছে তেমনি এদের খেলায় শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে। যারা ফুটবল খেলার শিক্ষার্থী তারা দক্ষিণ কোরিয়ার খেলা দেখে উপকারই পাবেন।

দক্ষিণ কোরিয়া দলের সব থেকে বড় গুণ হলো তাদের দলবদ্ধ ক্রীড়ারীতি। ব্যক্তিগত ক্রীড়াকীর্তির চেয়ে দলগত সংহতি এবং আক্রমণ রচনার দিকেই তাদের বেশী ঝোঁক। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের শারীরিক পটুতা দারুণ, অঢেল দম আর চকিতে চমক সৃষ্টিতে যে কোন প্রতি-পক্ষকে চমকে দেবার ক্ষমতা তাদের আছে। তাঁরা পারেন গতি বশে চমৎকার সট নিতে, পারেন দুরন্ত ভঙ্গি মারতে, কিম্বা কপালের ছোঁয়ায় বলকে গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে জালে জড়িয়ে দিতে।

আজকালকার খেলার ঢং পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন আর ঐ চারব্যাক, দুজন লিঙ্কম্যান কিম্বা চারজন ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলানো হয় না। এখনকার খেলা অনেকটা বাস্কেটবলের মতো। কারো কোন বাঁধা পজিসন নেই। সকলেই এগিয়ে পিছিয়ে খেলেন। সেই রকম খেলার ছাপ কিছুটা দক্ষিণ কোরিয়া দলের মধ্যে দেখা গেছে।

কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। বাইরে থেকে একটি ভাল দল এনে আই এফ এ শীল্ডের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার জন্যে সুচিন্তিত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ভারত-এর সামনের সারির দলগুলো কেন কল-কাতায় খেলতে আসতে চায় না, তার খোঁজ-খবর নিয়ে এমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে তারা আবার শীল্ডে খেলতে আসে। তবে আই এফ এ শীল্ড বর্ণময় হবে।

ক্লাস থিয়েটারের নাটক

ক্লাস থিয়েটার একটি চরিত্রবান গ্রুপ থিয়েটার চরিত্রে সংগ্রামের আগ্রহ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের আদর্শকে থিয়েটারের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য বর্তমানে তাঁরা দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন, একটি ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা', অন্যটি বের্টোল্ট ব্রেশট-এর নাটক অব-লম্বনে বিধি ও ব্যতিক্রম।

'জ্বালা নাটকের রচনা অত্যন্ত দুর্বল এবং এককথায় বলতে গেলে এটি একটি আবেগপূর্ণ কথাসর্বস্ব ক্লান্তিকর নাটক। তবু ক্লাস থিয়েটারের অনাড়ম্বর সহজ প্রযোজনা ও উপযুক্ত মঞ্চকল্প এই নাটক-টিকে যথাসাধ্য শিল্পসম্মত বক্তব্যে প্রতি-ষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল। 'সুনীল দত্তর' জ্বলের ইঙ্গিতপূর্ণ মঞ্চ বাঁদিকে রেখেছিল একটা মরা গাছ, ডানদিকে একটা কোটর এবং পেছনে একটা কেবল লম্বা প্ল্যাটফর্ম। এই সামান্য আয়োজন-টুকুর সুষম বিন্যাসের উপরেই ভানু বিশ্বাসএর সংযত আলো মৃত্যুর অপর পারেও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সূচিত করে জীবনের জ্বালাকে। অভিনয়েও শিল্পীদের সমবেত প্রচেষ্টায় চালানোর চেষ্টা করেন নির্দেশক 'রমেন সরকার'। তবে কাঁচা সংলাপের জন্য এবং উপযুক্ত নাট্য তাৎপর্য না থাকায় 'পংকজ প্রামানিক' এর পাগল ছাড়া অন্য কোন চরিত্রের অভিনয় মনে রেখাপাত করেনা। পংকজ বাবুর 'তোমরা অবশ্য বলতে পারো, পাগল আবার বলবে কী "বা' আমারে কেউ কোনদিন গান গাইতে বলেনি' জাতীয় সুকরো ভাষ্য এবং তান্ডবনৃত্য যা মেঘের মধ্যে দিয়ে ভেসে যাওয়ার মঞ্চকল্পনা সহজ গভীরতায় ঋদ্ধ। পক্ষান্তরে 'রেখা সরকার'-এর উচ্চারন অনাবশ্যক সফিস্টিকেশনে ক্লান্ত 'জয়ন্ত পোদ্দার এর পিওন এবং 'ওঙ্কার ঘোষ এর পুর্ণ আড়ষ্ট নাটুকে এবং 'অসীম চক্রবর্তীর ভোলা সূচনায় একটি পরিচ্ছন্ন টাইপের আভাস দিলেও পরের দিকে নাটকের দোষে জোলো ও গতানু-গতিক।

তবে 'অজয় সাহার' থোকা তুলনায় নিপুণ ও স্বতস্ফূর্ত।

'সমীর চট্টোপাধ্যায়' এর উপযুক্ত সংগীত পরিকল্পনা নাটকের প্রযোজনাকে সমর্থ করেছে যথাসম্ভব। তবে স্বচ্ছ কল্পনাশক্তি এবং ঋজু উপস্থাপনাও এই দুর্বল নাটক-টিকে খুব একটা সম্পন্ন করে তুলতে পারেনি শেষপর্যন্ত।

অবশ্য 'ক্লাস থিয়েটার এর প্রযোজনা প্রয়াস অনেক বেশি সফল হয়েছে বিধিও ব্যতিক্রম'এ। ব্রেশটের মূলে নাটকটি যদিও বাংলা রূপান্তরে ঈষৎ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, তবু এই নাটকটির তীব্র ইঙ্গিত ময়তা নিশ্চিত ভাবে দর্শকদের বিদ্ধ করে। নেপথ্যের একই কুশীলবরা মঞ্চ, আলো এবং নির্দেশনায় এই নাটকে আরও সার্থক। ক্লাউনের পরিকল্পনা, ট্যাবলো নিরা-ভরণ পরিসরে যেন আরো বেশি অর্থবহ। 'বিধি' এবং ব্যাতিক্রম এর দুটি বিশাল আঁকা পর্দা মূহূর্তে সমাজের প্রচলিত বিধি ও ব্যাতিক্রমের পটভূমি তৈরি করে নিষ্ঠুর নির্লজ্জ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। চেয়ারে গা এলিয়ে বসে থাকা দর্শক নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে বসতে বাধ্য হন এই নূতন উপস্থাপনায়। ক্লাস থিয়েটার-এর প্রতিটি কর্মীরই এর জন্য সাধুবাদ প্রাপ্য।

অভিনয়ও এই নাটকে দলগতভাবে উৎকৃষ্টতর। আলাদা করে বলতে হলে 'সন্দীপ দাস এর খাড়ামশাই এবং 'সমীর চট্টোপাধ্যায়' এর বিচারক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য , 'সন্দীপ দাস' স্বগতোক্তি এবং সংলাপ অংশে দুটি ভিন্ন রীতিতে অভিনয় করায় নিহিত বক্তব্য তুষ্ট হয়ে ফুটেছে। 'সমীর চট্টোপাধ্যায়' ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রূপে বাক-ভঙ্গিতে নিপুণ ও ভিন্নতর মাত্রা যোগ করেছেন তাঁর অভিনীত চরিত্রে তথা সমগ্র প্রযোজনায়, এছাড়া 'ছড়িদার' চরিত্রে 'রূপক রায়' ও সংযত ও স্বাভাবিক। 'পংকজ প্রামানিক' এ নাটকে ততটা স্বচ্ছন্দ নন, তবু তাঁর কুলিকে প্রায় বিশ্বাস করা যায়। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় 'রিতা দাস' এর উপরেও রাগ হয়না বস্তুত। নাটক-টির উচ্চাশাহীন সা[illegible]প্রশনরীতি দর্শককে নির্দ্বিধায় সারাক্ষণ সচেতন ও আগ্রহী করে রাখে।

সুরজিৎ ঘোষ।

বিল ক্রোফটের গান

একজন লোকের লেখা নিজের নামে চালানো হলে তাকে বলা হয় চুরি। একা-ধিক লোকের লেখা নিজের নামে চালানো হলে তাকে বলা হয় রিসার্চ। ঠাট্টার শুরুতেই একথা জানিয়ে দিলেন সেদিন বিল ক্রোফট ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে সাতটায়। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম অডিটোরি-য়ামে। তারপর শোনালেন নানা দেশ নানা ভাষা থেকে নিজের মতো করে নেওয়া মার্কিনী লোকসঙ্গীত, লোকগাথা ব্লুজ— সব কিছু মিলিয়ে। এমন কি ছিল ই. ই, কামিংসের কবিতা পর্যন্ত। অবশ্য ব্যাঞ্জোর সঙ্গে, গানের সুরে। লিংকনের মতো দাড়ি, উসকু-খুসকু চুল। ভারি মজার মানুষ। লোকজনদের হাসাতে হাসাতে দম ফাটিয়ে দেন। বললেন, কামিংসের বউ (কামিংস তখন বেচে নেই) না কি টেপ রেকর্ডার চালাতে জানেন না। বাড়িতে টেপ-রেকর্ডার থাকা সত্ত্বেও। ফলে ক্রোফটের পাঠানো ক্যাসেট (কামিংসের কবিতার গীতিরূপ) তাঁর নিজে নিজে শোনা হয়নি। অগত্যা ক্রোফট নিজেই গিয়ে শুনিয়ে এলেন কামিংস পত্নীকে।

ক্রোফট প্রথমে বাজাতেন ফ্রেঞ্চ হর্ন। পরে পীট সীগারের কাছে শিখলেন ব্যাঞ্জো। ১৯৫০ সাল নাগাদ। আন-অ্যামেরিকান ক্রিয়াকলাপের জন্য সীগার অভিযুক্ত। ক্রোফট সীগারকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। সীগার শেখালেন ব্যাঞ্জো! তারপর আরো অনেক গুণীজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। জ্যাজ ক্ল্যারিয়োনিষ্ট টোনি স্কট। হার্প সিকর্ডিস্ট কেনেথ কুপার। অপেরা-গায়ক বেঞ্জামিন লাকসন। অ্যামেরিকার মেহনতি মানুষের জীবনসংগ্রাম, সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা অভিমান যোগ হোলো এর সঙ্গে। সেসব মিলিয়েই বিল ক্রোফট-এর গান।

খাস বিলিতি গান আমেরিকার মাটিতে পা রেখে কেমন পাল্টে যায় খুব সুন্দর সরসভেবে সেদিন তা বোঝেলেন। ভিকটো-রিয়ান যুগের ইংল্যান্ডের লোকগীতি মার্কিন প্রদেশ আরো কত কোমলতা পায় তা শুনতে পেলাম। যেমন 'বিট দ ড্রাম স্লোলি' গানটিতে। ইংল্যান্ডে যা ছিল সিফিলিস রোগীদের গান, ইংল্যান্ডে তা হয়ে গেল কাউবয় গাথা। বিল ক্রোফটের কথায় আমেরিকানদের এই 'আউট ল্যান্ডিশ সেন্টিমেন্টালিটি' ইংল্যান্ডে নেই। এই

বিল ক্রোফ্‌ট

সেন্টিমেন্টালিটি ছিল 'দ্য ফগি ডিউ' গানটিতে। প্রেম-মৃত্যু-জীবন সংগ্রামের গান। দুঃখ হাসি কান্নায় মিশোনো। ছিল 'হোয়্যার ডিউ ইয়ু কাম ফ্রম, হোয়্যার ডিউ ইয়ু গো' গানটিতেও। সাউথ নিউ ওয়েস্ট অ্যামেরিকার গান। টেনেসির একলা পথ হাঁটা পথিকের গান।

ক্রোফ্‌ট শুধু একলা গান গাইতে ভালোবাসেন না। শ্রোতাদেরও দোহার দিতে হয়। উঁচুতে নীচুতে গলা বেঁধে হার্মোনাইজ করতে হয়। ফলে 'ও ব্রান্ড প্লিজ লীভ মি এলোন' বা 'কিসেজ সুইটার দ্যান ওয়াইন'—এসব গানগুলিতে গলা মেলাতে হয়। দ্বিতীয় গানটি আমার-ই মতো এক-জন লোককে নিয়ে লেখা। লোকটির ভাগ্যে জীবনে কোনোদিনও চুম্বন জোটেনি। 'ও কিসেজ সুইটার দ্যান ওয়াইন'—আমিও জানি।

১৯৬০ সাল নাগাদ ক্রোফ্‌ট এদেশে প্রথম এসেছিলেন। নেপালের গ্রামকে গ্রাম ঘুরে গান শুনিয়েছেন। নিজ শিখেছিলেন সেতার। আমাদের শোনালেন সেতারের মতো করে ব্যাঞ্জো। শোনালেন 'রাগাপুটি রাগব রাজা রাম পাটিট পাভন সিটারাম।' অর্থাৎ রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিত পাবন সীতারাম। পিট সীগার গানটি আরো ভালো গেয়েছিলেন। রেকর্ডে শুনেছি।

য়ুডি গার্থারির গানও ছিল। বাপ কাপ আ ডামপা, স্কোয়ালা ডাপ আ ডামপা, ও ক্লিন, ও ক্লিন, ডোণ্ট আই ফীল নাইস অ্যান্ড ক্লীন।' 'আই অ্যাম গনা মেল মাই-লেফ টু ইয়ু, আই অ্যাম গোয়িং টু র‍্যাপ মাইসেলফ ইন পেপার।' আর ছিল সেই বিখ্যাত 'গ্লোরি, গ্লোরি হালালুইয়া'র সুরে 'সলিডারিটি ফর এভার'—ট্রেড ইউ-নিয়ন আন্দোলনের অনীক-বার্তা।

আগেই বলেছি জ্যাজ ক্ল্যারিয়নিস্ট টোনি স্কটের কাছেও কদিন তালিম নিয়েছিলেন বিল ক্রোফ্‌ট। ক্লারিয়নেট তাঁর কাছে ছিল না সেদিন। মুখে মুখেই ক্লারি-য়নেট বাজিয়ে শোনালেন। তারপর কিছুক্ষণ খালি ব্যাঞ্জো। মনে হচ্ছিল যেন ব্র্যান্ডেন বুর্গ অর্কেস্ট্রার হার্পসিকর্ড শুনছি। সব্বার কাছ থেকে চুরি করেছেন বিল ক্রোফ্‌ট। সালজবুর্গের পিয়ানো বাদক পিটার ল্যাং, হার্পসিকর্ডিস্ট কেনেথ কুপার, বেঞ্জামিন লাকসন, পিট সীগার—সব্বার কাছ থেকে। কিন্তু কি দারুণ চুরি। এরকম আরো হয় না কেন? এত এত মৌলিক রিসার্চের সঙ্গে এরকম কয়েকটা যৌগিক চুরি হলে ক্ষতি কি? গান বলে তো কথা। শুনে ভালো লাগলেই তো ভালো।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

স্বপনে এসো নিরজনে

ইনরেকো সংস্থা এবার দুজন তৈরী শিল্পীকেই বেছে নিয়েছেন। এঁরা হলেন প্রখ্যাত ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং সুপ্রভা সরকার। একটি ই পি রেকর্ডে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কণ্ঠে চারখানা রাগাশ্রয়ী গান স্থান পেয়েছে। গুণী গায়ক ধীরেন্দ্রচন্দ্রের কণ্ঠে সাধারণ গানও গায়কীর গুণে অসাধারণ হয়ে ওঠে। আর এ ধরনের গান ত হবেই। গান গাওয়ায় ওঁর একটা স্বতন্ত্র স্টাইল বা অ্যাপ্রোচ আছে। শোনামাত্র যা ভাল লেগে যায়। সেই সঙ্গে পেছনে রয়েছে দীর্ঘ হয়েছে। শিল্পীরা হলেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র. উপলক্ষে এবার পাঁচটি রেকর্ড প্রকাশিত মিত রেকর্ড করতেন। কাজী সাহেবের ইন্দুবালা দেবী, শচীনদেব বর্মণ প্রমুখ রেওয়াজের ইতিহাস। তবু বলব, 'সন্ধ্যা-মালতী যবে বনে', 'ধূলি পিঙ্গল জটাজুট', 'চোখের নেশা ভালবাসা' এবং 'খেলা শেষ হল'—এই গানগুলো ধীরেনবাবুর বিখ্যাত সেই 'নীলাম্বরী শাড়ি পড়ে', 'শাওন আসিল ফিরে' ইত্যাদি গানগুলোর মত হয়নি। অপর গায়িকা সুপ্রভা সরকার এখনও কী দাপটের সঙ্গেই না গাইতে পারেন! বয়স তাঁর কণ্ঠের কাছে সত্যিই হার মেনেছে। সুরেলা, খোলা গলায় উনিও গেয়েছেন চারখানা গান। যেগুলোর মধ্যে 'স্বপন-বিলাসে চাঁদ যবে' গানটি বিশেষ ভাল লাগে। 'একেলা গোরী' এবং মিশ্র ললিতে বাঁধা 'স্বপনে এসো নিরজনে' গানে লয়ের কাজ শোনবার মত। রেকর্ডটি সার্থক। নজরুলগীতির জগতে ধীরেন বসু আজ একটি উজ্জ্বল নাম। বরাবরই উনি একটু রোমান্টিক বা ভাবপ্রধান গান বেছে নেন। যেগানে বেশী কালোয়াতি নেই, যে গান সহজ-সরল, সেই গানেই ধীরেনবাবু যেন নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর গাওয়া বারোখানি গানের মধ্যে বাগেশ্রীতে বাঁধা 'চাঁদ হেরিছে', 'সবার কথা দূরে'—এই গানগুলো সেই কারণে বিশেষ ভাল লাগে। 'মহুয়া বনে' গানের লয় একটু বাড়লে ভাল হত।' চোখ মুছিলে জল' গানের উচ্চারণে নতুনত্ব আছে। ধীরেনবাবুর রেকর্ডের গান সম্বন্ধে এই প্রতিবেদকের একটি বিশেষ অভিমত আছে। তা হল, আজ পর্যন্ত ধীরেনবাবুর গাওয়া যত গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে সার্থক 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী' রেকর্ডটি। এবং এটি একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। বা অনেক বছর আগে তিনি প্রাণবন্তভাবে গেয়েছিলেন। ধীরেনবাবুকে অনুরোধ, ওই রকম খোলা গলায় তিনি যেন আরও কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করেন। নজরুলগীতি তো রইলই।

খেয়া চট্টোপাধ্যায়ের মুখে নজরুলগীতি শুনতে তেমন অভ্যস্ত নই। উনি একজন সম্ভাবনাময় অতুলপ্রসাদী শিল্পী। টাইল পাল্টে চারখানা নজরুলগীতির একটি ই পি রেকর্ড করলেন। মিষ্টি সুরেলা গলায় উনি মোটামুটি ভালই গেয়েছেন। বিশেষ করে 'বঁধু আমি ছিনু' গানটি। মাঝে মাঝে গান বদল খারাপ কি!

আর আছেন পুরবী দত্ত। বর্তমান নজরুল সঙ্গীতের জগতে যিনি প্রথম সারির শিল্পী। বারোখানি গানের মধ্যে অন্তত দুখানি গানে উনি সেই প্রমাণই রেখেছেন। পুরবীর গাওয়া 'খ্যাপা হাওয়াতে' গানটি টিপিক্যাল নজরুলগীতি। 'শূন্য আজি গুলবাগিচা' গজল সুন্দর এবং অভিনব। এরপর নাম করতে হয় 'গোঠের রাখাল' গানের। শেষে বলব 'আমার বিজন ঘরে' গানটির কথা। এই গানে ঘটনার বর্ণনা, সুর, গাওয়ার ধরণ—সব মিলিয়ে গানটি অনবদ্য। ১০ আগস্ট অমৃতে প্রকা-শিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড আলোচনায় সুবিনয় রায়ের গাওয়া সুধা সাগর তীরে গানটি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে 'আড়ানায় রচিত'। সেটি হবে 'নায়কী কানাড়ায়' রচিত।

অসিতবরণ মিত্র

মূকাভিনয় অনুষ্ঠান

মূকাভিনয়ের অন্যতম জনক ম্যাক্স-মিলিয়ন দেক্রোয়ার দুই শিষ্য পিনোক আর ম্যাথো সম্প্রতি কলকাতা সফর করে গেলেন। কলকাতাও ভারতের মূকা-ভিনয়ের শীর্ষস্থান। যোগেশ দত্ত, অরুণাভ মজুমদারের নির্বাক বাঙ্ময় অভিব্যক্তিগুলো এখনও চোখের সামনে ভাসে।

এই দুই ছাত্রী শুধু দেক্রোয়ার কাছে মাইম ই শেখেন নি, মার্থা গ্রাহাম স্কুলে গিয়ে নাচ শিখেছেন, ব্যালেও জানেন। অর্থাৎ স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে অতি সহজেই দুজনে কখনও হয়ে যান দাবার বোর্ডের রাণী, কখনও বা আট বছরের কিশোরীর মত উচ্ছল, কখনও বা সারা বার্ণহাড, ইশাডোরা ডানকান, প্রেমিক কখনও বা ভয়ংকর ভীত কোন দেবতা।

পিনোক আর ম্যাথো শরীরের ব্যালান্স রাখতে পারেন আমাদের সার্কাসের প্লাস্টিক মেয়েদের মত, চোখে, মুখে, এমনকি আঙুলেও কথা বলেন তাঁরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পোষাক বদলে টেপ-এ বাজানো সঙ্গীতের তালে তালে নাচতে পারেন। গত ৫ সেপ্টেম্বর আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে কলকাতার অ্যালিয়ান্‌স

ক্লাবে ও ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স একটি মূকাভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। যথারীতি লোডশেডিং-এর দৌরাত্মে শিল্পীরা ছিলেন ক্লান্ত।

তবুও যে সাতটি আইটেম পরিবেশন করলেন তার প্রতিটিই বিষয়ে অভিনব, অন্ততঃ কলকাতার দর্শকের কাছে। দাবার ছকে কালো আর সাদা রাণীর গতিবিধি নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থিত ছিলেন

মূকাভিনয়ের দুই শিল্পী

দুজনে। 'টোটেম' আইটেমটির কম্পোজিশন অত্যন্ত আঁটোসাটো, অথচ শিল্প-সুষমান্বিত। কোথায় যেন উদয়শঙ্করের মানুষ ও যন্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়। সবচেয়ে অবাক হয়েছি শেষ আইটেম 'রাধেশ্ভূ' দেখে। পেছনে যান্ত্রিক গোলযোগের মধ্যেও স্কুবার ও মহলার-এর সঙ্গীত বাজছে, আর স্টেজে নির্বাক দুই শিল্পী অদ্ভুত ঘনকালো শীতলতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এবং শেষটায় একজন খুন হল। বিভঙ্গে অ্যাবষ্ট্রাকট রীতির ছোঁয়া থাকলেও জীবন ও সত্যের মুখোমুখি করিয়ে দেয় দর্শককে।

আশা করব উদ্যোক্তারা ভবিষ্যতে দেক্রোয়া, মার্সেল মার্সিয়ুর দেশ থেকে আরও শিল্পীদের আনবেন। কলকাতা বড় অভিনয় পাগল।

নির্মল ধর

পাখির বাসা

১২ সেপ্টেম্বর রামমোহন মঞ্চে অল ইণ্ডিয়া কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের নবতম প্রযোজনা 'পাখীর বাসা' নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়। নাট্যকার জগমোহন ঘোষ। পরিচালক উমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন অনিল মুখার্জি, রমা গুহ আরো অনেকে। নাটকটি বিষয়বস্তু একটি ব্যক্তিত্বের মোহে আবদ্ধ দুই যুবকের জীবনের টানাপোড়েন। আবহসঙ্গীত, আলোক সম্পাদনা সফল। গৌরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে আড়ষ্টতা ছিল। একটি টাইপ চরিত্রে প্রদীপ দাস অপূর্ব। দুটি চরিত্রে আশীষ দত্ত, দীপক মুখার্জির অভিনয় দুর্বল।

পুতুলনাচের ইতিকথা

১৮ সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলেন রাইটার্স বিল্ডিংস-এর পি ডবলিউ ডি রিক্রিয়েশন ক্লাব। উপন্যাসখানির নাটক রূপ দিয়েছেন প্রখ্যাত নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে মঞ্চ সফল নাটকখানি দর্শকদের হাসিয়ে-কাঁদিয়ে মাতিয়ে তুলেছিল। মতি ও কুসুমের ভূমিকায় সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় এবং মমতা চট্টোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন নায়ক শশীর ভূমিকায় দিলীপ বসাক চমৎকার। যামিনী কবিরাজের ভূমিকায় দিলীপ কর, নিতাই রূপী গঙ্গাধর পাল এবং অধিকারীর ভূমিকায় সুনীল দাস মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন।

কনক বিশ্বাস

বিশ শতকের গোড়ায় মুষ্টিমেয় যে কজন শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্না মহিলা রেকর্ডে গান গেয়েছিলেন তাঁদেরই একজন হলেন খ্যাতনামা গায়িকা ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা শিল্পী শ্রীমতী কণক বিশ্বাস।

কণক বিশ্বাস

১৯২৭ সালের ১ জুলাই তাঁর গাওয়া দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথমে রেকর্ডে বেরোয়। 'কবে তুমি আসবে বলে' ও 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি' এ'দুটি গানের রেকর্ড সেযুগে রবীন্দ্রসংগীতভক্ত মহলে যে আলোড়ন তুলেছিল, ১৯৩৪ সালে তাঁর গাওয়া শেষ রেকর্ডটি প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত তার অবসান ঘটেনি। সর্বসমেত প্রায় চল্লিশটি তাঁর গাওয়া রেকর্ডের মধ্যে দুটি অতুলপ্রসাদী গানের এবং দুটি সুরসাগর হিমাংশু দত্ত সুরারোপিত গান ছাড়া সবই রবীন্দ্রসংগীত। চারটি রবীন্দ্রসংগীত আবার দ্বৈত কণ্ঠে তাঁর খুড়তুতো দেওর দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে গেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে দেবব্রত বলেছেন— 'বৌদির কণ্ঠের জোয়ারী শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো।'

১৯০৩ সালের ৩ নভেম্বর কলকাতায় কণকদেবীর জন্ম, পিতা স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র দাশ ও মাতা সঙ্গীতজ্ঞা স্বর্গতা সরলা দাশ। ঢাকার ইডেন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। কলকাতার বেথুন কলেজে বি-এ পর্যন্ত পড়েন কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনা-হেতু বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। সুগায়ক অজয়কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে ১৯৪৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিবাহ হয়। 'গীতবিতানের' অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিতা কণক বিশ্বাস বহু সংস্থা কর্তৃক সম্বর্ধনায় অভিনন্দিত হয়েছেন।

ভট্টনারায়ণ শর্মা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

অমৃত

১৯ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা

১১ আশ্বিন, ১৩৮৬

28th SEPTEMBER, 1979

আগামী সংখ্যায়

জেলখানার যীশু
লিখেছেন রমেন দাস
আশীষ বর্মণের আলোচনা
সত্যজিৎ, মৃণাল এবং কিছু ভাল ছবি
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য এবং
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প
৫ অকটোবরের সংখ্যা অমৃত পুজোর-
কালের জন্য বন্ধ থাকায় পরের সংখ্যা
বেরোবে ১২ অকটোবরের।

মূল্য বৃদ্ধি এবং........

পুজোর ক'দিন বিদ্যুৎ ছাঁটাই না থাকলেও মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হয়েছে এবার। তা সত্ত্বেও প্রতিমা দর্শনার্থী সাধারণ মানুষের উৎসাহে কোনো ঘাটতি ছিল না। সুযোগ পেলেই তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন এবং প্রায় সারা রাতই প্যাণ্ডেল থেকে প্যাণ্ডেলে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

অবিশ্যি পুজোর এই আনন্দ নিখাদ ছিল না। বাইরে জেল্লা থাকলেও মনে ছিল একরাশ দুশ্চিন্তার অন্ধকার। জিনিষের দাম এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে কোনো পরিবারই এখন আয়-ব্যয়ে সমতা রেখে চলতে পারছেন না। এবং সব থেকে বিড়ম্বনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, মাইনে বা ভাতা বৃদ্ধি চাকরিজীবী মানুষের সামনে যতোবারই স্বস্তির আশ্বাস নিয়ে আসছে, ততোবারই দেখা যাচ্ছে তা ছলনা মাত্র। বাজার দরও ঠিক সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছে। আর তাছাড়া যাঁরা চাকরি করেন না অন্যভাবে জীবিকা সংস্থান করেন তাঁরাও খুব নিরুদ্বেগে থাকতে পারছেন না, কারণ বাজার অনিশ্চিত হলে সব কিছুই অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য, এই পরিস্থিতিতে বেকারদের অবস্থা খারাপ থেকে খারাপ-তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষত গ্রামীণ কর্মহীনদের দুরবস্থা অকল্পনীয় বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকে একটি সম্মেলন করেছেন, মূল্যবৃদ্ধি রোধের উপায় উদ্ভাবন করার জন্যে। প্রধানমন্ত্রী চান কালোবাজারী এবং মজুতদারী ঠেকানোর জন্যে একটি নিবর্তনমূলক আটক আইনের অর্ডিনান্স জারি করতে। মুখ্যমন্ত্রীরা সকলে তাতে সম্মতি জানাতে পারেন নি। মূল্যবৃদ্ধিকে দমন করার উদ্দেশ্যে কিছু করা উচিত তা তাঁরা স্বীকার করেও জানিয়েছেন, দেশে এখন যেসব আইন প্রচলিত আছে, বিশেষ করে জরুরি পণ্য আইন (এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট) সেই সবের সাহায্যেই মুনাফাখোর এবং কালোবাজারীদের শায়েস্তা করা যায়। এই সঙ্গে কোনো কোনো রাজ্য থেকে এমন অনুযোগও তোলা হয়েছে যে, কেন্দ্র থেকে সিমেন্ট, লোহা, চিনি, ভোজ্যতেল, কেরোসিন, ডিজেল ইত্যাদির দাম বাড়ানোর ফলেও মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি হয়েছে। অন্যদিকে এমন তর্কেরও অবকাশ থেকে গেছে যে, জরুরি পণ্য আইন আছে বলে মুখ্যমন্ত্রীরা যে যুক্তি দেখাচ্ছেন তা টেকসই বলে মনে হচ্ছে না। কারণ এখনও খুব কম রাজ্যই সে আইন বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। এবং তার ফলে মুনাফাখোর এবং কালোবাজারীদের দমিত করা গেছে এমনও না।

তবে এই যুক্তিতে নিবর্তনমূলক আটক আইন চালু করার প্রশ্নে খোলা মনে সাড়া দেওয়া কঠিন তা স্বীকার করতেই হবে। সাম্প্রতিক জরুরি অবস্থাকে একটি অন্ধকার যুগ বলেই জানে ভারতবাসী। কোনোরকম চেহারা নিয়েই তা ফিরে আসুক তা চায় না কেউ।

মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানোর জন্যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করলে প্রচলিত আইনের কাঠামোর মধ্যেই তার প্রতিরোধক ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। দরকার শুধু সংকল্পের এবং কাজের। উপদেশ ও ধমকানিতে খুব একটা কাজ হবে মনে হয় না।

সাহিত্য ইত্যাদি

পঞ্চাশের কবিরা

পঞ্চাশের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে বলতে গেলে একটা কথা গোড়াতেই পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

বাংলা কবিতাকে 'আধুনিক' এই বিশেষণে আলাদা করে নিতে হয়েছিল যখন, সেটা ছিল তখন মাইনরিটির কবিতা। পঁচিশ সাল থেকে পঁয়ত্রিশ সাল, এমনকি আমরা যখন নতুন তরুণ 'আনার চেষ্টা' করছি সেই চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্তও আমরা ছিলাম বহুল-প্রচারিত কাগজগুলোর কাছে আউটসাইডার।

আর পঞ্চাশের দশকে? আধুনিক ছাড়া তখন অন্য কোনো কবিতারই অস্তিত্ব নেই। লিটল ম্যাগাজিন থেকে দৈনিক কাগজের শারদ সংখ্যা পর্যন্ত আধুনিক কবিতাই একমাত্র লিগ্যাল টেন্ডার। অন্য ধাঁচের কবিতা ঠাঁই পেয়েছে তখন ইতিহাসের যাদুঘরে। পঞ্চাশের কবিরা লিখতে শুরু করেছেন এই অর্জিত সাফল্যের নিশ্চিন্ত অবকাশে। বাংলা কবিতা তাই পঞ্চাশের দশকে অন্য চেহারা নিতে শুরু করল।

অবিশ্যি আরো কিছু কারণ আছে। পরাধীন দেশের কবিতা আর স্বাধীন দেশের কবিতা একরকম না হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে দেশের আর্থিক বিন্যাসের কিছু রদবদল ঘটতে শুরু করল। সমাজের মধ্যেও দেখা দিল নানা ধরনের ওলট-পালট। যেমন ধরুন, মেয়েদের কথা। মেয়েরা অনেক সময়েই তখন রোজগারের প্রতিদ্বন্দ্বিনী, কখনো বা নিছক দেহ-সম্ভোগের সামগ্রী। অন্যদিকে আবার পরাধীনতার গ্লানি কেটে গিয়েছিল বলে এক ধরনের ফুর্তিবাজ, মজাদার এবং কখনো বা ঈষৎ দায়িত্বহীন মনোভাবও দেখা দিতে শুরু করল কবিতায়। কিন্তু একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। চল্লিশের শেষের দিকের এক জাতের শ্লোগান-সর্বস্ব পদ্য-লেখকের অকাব্যিক দাপটও এর পরোক্ষ কারণ। আর যাই হোক, পঞ্চাশের নতুন কবিরা কবিতা লিখতে জানেন। লিখন-কর্ম এবং কবিতার আমেজ, দুদিক থেকেই তাঁরা নতুন।

এঁদের মধ্যে প্রধান দুজন কবি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। দুজনের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল তাঁদের প্রথম পর্ব থেকেই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর বন্ধুরা মিলে 'কৃত্তিবাস' বলে একটি কবিতার কাগজ বার করতে শুরু করেন পঞ্চাশের গোড়ার দিকেই বোধহয়। তখন সুনীলকে আমি দেখি নি।

সুনীলের প্রথম কবিতার বই 'একা এবং কয়েকজন' বেরোবার পর 'পরিচয়'র দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় রিভিউ করতে বলেন। সুনীলের কবিতাগুলো একসঙ্গে পড়ে প্রথমেই মনে হয়েছিল, এতদিনে একজন নতুন কবি এলেন। কী লিখেছিলাম পরিচয়ে প্রায় তিরিশ বছর পরে তা মনে করা শক্ত। তবে ভালো লাগার কথাই বলেছিলাম নিশ্চয়। না হলে এতদিন ধরে তাঁর কবিতার বিষয়ে আমার আগ্রহ এমন সজাগ থাকল কী করে।

পরে সুনীলের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছে। তাও প্রায় তিরিশ বছরই হল। অনেক ভালো কবিতা লিখেছেন তিনি। উদ্দীপ্ত যৌবনের সবেগ আসক্তির কবিতা, অভিমান এবং নিরাসক্তির কবিতা। বাক্য ব্যবহারে তিনি সপ্রতিভ, মাঝে মাঝে মনে হয় খুবই যেন হাল্কা চালে লিখছেন। কিন্তু তারপরই চোখে পড়ে এমন কবিতা যা গভীর, গম্ভীর এবং বিষণ্ণ।

মনে পড়ে সুনীল যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখনই বেরোয় 'জন্মেজয়ের দুঃখ' বলে একটি গল্প। পড়ে ভালো লেগেছিল। সুনীলের সঙ্গে তখন পত্রালাপও হয়েছিল মনে পড়ে। দেশে ফিরে সুনীল কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গদ্য লেখাও শুরু করেন। এবং অচিরেই তিনি একজন নতুন ধরনের উপন্যাস লেখক হিসেবে জনস্বীকৃতি পান। কিন্তু তাঁর আধখানা (নাকি পনের আনা ?) মন পড়ে থাকে কবিতার দিকে। সেটা বোঝা যায়, লিটল ম্যাগাজিনগুলো হাতড়ালে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তিন দশক পার হয়ে এখনো তরুণ কবিদের কাগজে 'অবশ্য'-চিহ্নিত কবি। এবং এখনো তাঁর কলমের জোর ঈর্ষা করার মতো।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় আগে লিখতে শুরু করেন গল্প। সেই সময়েই আলাপ হয় তাঁর সঙ্গে। বিষ্ণু দে পরিচালিত 'সাহিত্য-পত্র' ত্রৈমাসিকে তাঁর একটি গল্প বেরিয়েছিল। তারই প্রুফ নিয়ে সদ্য যুবক শক্তি কলেজ স্ট্রীট দিয়ে প্রেসের দিকে যাচ্ছিলেন, সেইখানেই পথ চলতে চলতে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। সেই সময় 'কুয়োতলা' বলে একটি উপন্যাসও বেরিয়েছিল তাঁর। পরে তিনি কবিতার দিকে মন দেন। এবং অবিলম্বেই নতুন কবি বলে স্বীকৃতি পান।

প্রথম দিকে দুতিন বছর কীভাবে লিখবেন, ঠিক করে নিতে সময় লাগছিল শক্তির। মনে হচ্ছিল, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ যে যুক্তি-শৃঙ্খলাময় কবিতারীতি আনার চেষ্টা করছিলেন, যার প্রধান ঝোঁক হৃদয়ের চাইতে বুদ্ধির দিকে—শক্তি বোধহয় সেইদিকেই উৎসাহী হবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সুনীল কিন্তু প্রথম থেকেই ঐ যুক্তিবাদী ঝোঁকের কবি। তবে বলাই বাহুল্য সে যুক্তি ছিল খানিকটা নাটকীয় আবেগ মিশ্রিত। শক্তি কিন্তু অনতিবিলম্বেই এ পথ পরিহার করে হৃদয়ের দিকে কান ফেরান। এবং যুক্তি-শৃঙ্খলাকে এলোমেলো করে অবচেতনকে তাঁর দিশারী বলে গ্রহণ করেন।

সকলেই জানেন কবিতায় এই ধারার আদিজনক র‍্যাঁবো। আমাদের দেশে তার অদ্বিতীয় উত্তরসূরী হলেন জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় সত্যিকারের একজন উন্মেষ-উদ্দীপ্ত কবি বলেই জীবনানন্দের থেকে আলাদা একটি আঙ্গিকে বাংলা কবিতায় নিজের আসনটি পাকা করে নিতে পেরেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে সুনীল শক্তি দুজনেই খুব সহৃদয় মানুষ, আড্ডা দিতেও ভালোবাসেন। তফাৎ এই যে সুনীল শোনেন বেশি, বলেন কম। আর শক্তি শোনেন কম, বলেন বেশি। কলকাতার বাইরে অনেক জায়গায় তাঁদের সঙ্গে কবি সম্মেলন করতে গেছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'সেই কটা দিন সুধায় আছে ভরে।'

পঞ্চাশের অন্য কবিদের মধ্যে সবার আগে চেনা হয়েছিল তরুণ সান্যালের সঙ্গে। সেই যখন তিনি বর্ধমান থেকে এসে কলেজে ভর্তি হন সেই থেকে। আমাদের সম্পাদিত কবিতার কাগজে তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা বেরোয়, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। নাম 'মাটির বেহালা'। সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত কবির পক্ষে তো বটেই এমনিতেও বেশ উত্তীর্ণ রচনা। পরেও তরুণ বেশ কিছু ভালো কবিতা লিখেছেন। প্রথম থেকেই প্রগতিশীল ছিলেন। ক্রমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। এবং কবিতার জন্যে বোধহয় কম সময় দিতে থাকেন। ফলে তিনি তাঁর যোগ্য আদর পান নি কবিতা-রসিকদের কাছে।

প্রগতিশীল কবিদের মধ্যে এই সময়ে যিনি সত্যিকারের খ্যাতি অর্জন করেন তিনি অমিতাভ দাশগুপ্ত। লিখনকর্মে তিনি সজাগ শিল্পী। নিখুঁত, ছিমছাম এবং জোরালো ভাষায় লেখেন তিনি। এবং যা বলেন তার মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা [illegible] করে দিতে পারেন। ছন্দের [illegible]রে তাঁর মুন্সীয়ানা লক্ষ্য করার মতো। [illegible]ন নিপুণ তাঁর মিল দেবার দক্ষতা। আশা করব তিনি তাঁর ক্রমবর্ধমান অনুরাগীর হাততালিতে অন্যমনস্ক হবেন না, এবং নিজের আসল লক্ষ্যে সজাগ থাকবেন।

পঞ্চাশে আরো কয়েকজন কবি চমৎকার কিছু কবিতা উপহার দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উৎপলকুমার বসু, পূর্ণেন্দু পত্রী, তারাপদ রায়, শরৎ মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, যুগান্তর চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর দে, দীপক মজুমদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত—এঁদের কথা প্রায় মনে পড়ে।

এই দশকেরই শেষের দিকে লিখতে শুরু করেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক। নিরলস প্রয়াসে নিজের একটি জায়গা করে নিয়েছেন এর মধ্যেই। তাঁর কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাবের মতোই স্বল্পভাষী, স্নিগ্ধ এবং গভীর। ইদানীং তিনি ক্রমেই ভালো লিখছেন।

মণীন্দ্র রায়

হারানো বই

HICKY's
BENGAL GAZETTE
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.

From Saturday December 9th to Saturday December 16th 1780. No. XLVIII

'আমি একজন খেয়ালীভাবাপন্ন পাগলাটে ধরনের মানুষ দেখলাম, যার জন্মগত প্রতিভাশক্তি আছে কিন্তু মোটেই তা অনুশীলন দ্বারা পরিমার্জিত এবং শাণিত নয়। দেখে আয়ারল্যান্ডের একটি বন্য অধিবাসী বলে মনে হল। কয়েকজন দুরন্ত বাঙালী ছেলে তার প্রতি যে মর্মান্তিক দুর্ব্যবহার করেছে জেমস সেই করুণ কাহিণী বিবৃত করে গেল। মিথ্যা ঋণের দায়ে দু বছরের জন্যে তারা তাকে জেলে আটকে রেখেছে।'

—পাগলাটে লোকটা জেমস অগাস্টাস হিকি। তখন তিনি কলকাতার কোন এক জেলখানায়। কলকাতার সুপরিচিত ব্যক্তি উইলিআম হিকিকে চিঠি লিখে দেখা করতে বলেন। উইলিআম দেখা করলেন উদ্ভট বদমেজাজী অগাস্টাস হিকির সঙ্গে। অগাস্টাস জেলখানায় সময় কাটাতেন বই পড়ে। একদিন ওর হাতে পড়ল ছাপাখানা নিয়ে লেখা একখানা বই। তখন কলকাতায় কোন খবরের কাগজ ছিল না। একটা ছাপাখানা আর একটা কাগজ বের করার ইচ্ছা জাগল হিকির মনে। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরোল—দি ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজারস। বার ইঞ্চি লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া তিন কলমে ছাপা হত য়ুরোপের খবর, স্থানীয় ও দূরের গ্রাহকদের চিঠি। অবশ্য বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে থাকত বিজ্ঞাপন। যেমন ছিল ছাপাখানা, তেমন ছিল কদর্য ছাপা। পত্রিকার পাতায় কুৎসার ছিল ছড়াছড়ি। লেখায় ধার ছিল না। হিকি কাউকে ছেড়ে কথা বলার লোক ছিলেন না। মিসেস হেস্টিংস তাঁর কলমের খোঁচা খেলে হেস্টিংস জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে প্রচার বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কুৎসা প্রচার বন্ধ হল না। হিকির জরিমানা আর জেল হল। তার প্রেস নিলাম হয়ে গেল ১৭৮২ সালে।

ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের দুশ বছর হতে চলেছে। হিকির পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বের করে ১৮১৮ সালে। ১৮২১-এ বেরোয় রামমোহন রায়ের সংবাদ কৌমুদী।

ভারতে সংবাদপত্রের চলার পথ প্রথম থেকেই ছিল অমসৃণ। ইংরেজি বা বাংলা কোন সংবাদপত্রেরই স্বাধীনতা ছিল না। হেস্টিংসের আমলে হিকির সংবাদপত্র বেরোয়। তার পরিণতি সুখকর হয়নি। লর্ড কর্ণওয়ালিশ এবং স্যর জন শোরের সময় সংবাদপত্রের ভূমিকা বিতর্কিত ছিল না। ওয়েলেসলি ক্ষমতায় এসে সংবাদপত্র সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম চালু করলেন। কি খবর [illegible] হচ্ছে তা দেখার [illegible] একজন পরীক্ষকের ওপর। আইনভঙ্গকারী ইংরেজ সাংবাদিককে স্বদেশে জোর করে ফেরত পাঠান হত। তিনি দেশে ফিরে এদেশে ইংরেজদের অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে তুমুল হৈচৈ বাধাতেন। লর্ড মিণ্টোর সময়েও সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারের মনোভাব বেশ কড়াই ছিল। তারপর সংবাদপত্রে কঠোরতা হ্রাস করা হলে, আরও কিছু পত্রিকা বেরোল ইংরেজি ও বাংলায়। হেস্টিংস সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রকাশে উৎসাহ দিলেও, তাঁর অবসর গ্রহণের পর জন অ্যাডাম ১৮২৩ সালে এমন কিছু আইন চালু করলেন, যার ফলে সংবাদপত্রের কেবল স্বাধীনতাই নয়, তার চলবার ক্ষমতাও লোপ পাওয়ার উপক্রম হল। এই আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন আর তাঁর অনুগামীরা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। লর্ড আমহার্স্ট ক্ষমতায় এসে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় খুব বেশী হস্তক্ষেপ না করায়, আইনের কঠোরতা শিথিল হয়ে আসে। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সময় কিছু গোলযোগ ঘটলেও শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে কাজ চালাতে থাকে। কিন্তু অ্যাডামের আইন সরকার উঠিয়ে নেয়নি। মেটকাফ সাময়িকভাবে গভর্নর জেনারেল হয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে, অ্যাডামের আইন তুলে নিলেন। নতুন আইন চালু হল। ফলে, 'যিনি যাহা কিছু ছাপাইবেন, সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁহারই রহিল, অর্থাৎ একজনেই মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের দায়ী না হইয়া সকলেই আপন আপন বিষয়ের জন্য দায়ী রহিলেন; সুতরাং সকলেই আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া পুস্তক ও সংবাদপত্রাদিতে স্বাধীনভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে ক্ষমতা পাইলেন।" মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে এই আইন চালু হয় ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। কলকাতার মানুষ মেটকাফকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। মেটকাফ হল তৈরি হল। সেই সঙ্গে একটি প্রস্তর মূর্তিও স্থাপিত হল মেটকাফের। তাঁর আইনের মর্যাদা হয়নি দীর্ঘকাল। কেবল সিপাহী যুদ্ধের সময় লর্ড ক্যানিং কিছুকাল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে রাখেন। একে বলা হত 'গ্যাগিং অ্যাক্ট'। এটা ছিল সাময়িক ব্যবস্থা। তারপর কালো ছায়া সরে গেলেও লর্ড লিটনের সময় কেবলমাত্র দেশীয় সংবাদপত্র দমনের জন্য চালু হল 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' বা 'নয় আইন' [illegible] প্রতিবাদে সেদিন দেশব্যাপী প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই আইন প্রচারের সরকারী উদ্দেশ্য ছিল : 'দেশীয় সংবাদপত্র—অজ্ঞান ও বিদ্যাহীন বহুসংখ্য লোকের মধ্যে পঠিত হয়, সুতরাং এই সমস্ত সংবাদপত্রের কোন কুপ্রবৃত্তিতে অজ্ঞান ও বিদ্যাহীন বহুসংখ্য লোকে সাধারণ শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে, এই আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ উপস্থিত আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন।" আইনে কেবল সংবাদপত্রকেই দমন করা হয়নি, দেশীয় ভাষায় ভাল ভাল বই প্রকাশের পথকেও বন্ধ করা হয়েছিল। জাতীয় সাহিত্য বিকাশ ও পরিপুষ্টিতে ৯ আইন ছিল প্রচণ্ড আঘাত। দেশ জুড়ে এই আইন নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকায় সমকালীন বুদ্ধিজীবী রজনীকান্ত গুপ্ত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আকারে অত্যন্ত ছোট। তাঁর লেখা সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের দুটি খণ্ড আগেই বেরিয়েছে। ৯ আইন চালু হলে, প্রকাশক ভয়ে তৃতীয় খণ্ড ছাপা বন্ধ করে দেয়। রজনীকান্ত দেশীয় সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে সরকারী আইনকানুনের আলোচনা করেছেন। তিনি ইংরেজ বিরোধী ছিলেন না। সরকারী ব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বহু ইংরেজ রাজপুরুষের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তিও দিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লিখেছেন : '৯ আইনের সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ভারত-সভা আমাকে মুদ্রণ-স্বাধীনতা ও মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি এই অনুরোধে 'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামে বর্তমান প্রস্তাবটি লিপিবদ্ধ করি। ভারত-সভা নিজ ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।"

ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশের দুশ বছর হতে চলেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে রজনীকান্তের এই পুস্তিকার মূল্য অনেক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস', হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'নিউজ পেপার ইন ইণ্ডিয়া', মাখনলাল সেনের 'স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র', মোহিত মৈত্রের 'জার্নালিজম ইন ইণ্ডিয়া'—কোন বইই এখন ছাপা নেই। অথচ সংবাদপত্রের দুশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতিটি বই-এর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দরকার আছে।

কমল চৌধুরী

ঝড়ের পাখি

প্রায় বারো বছর আগে দিল্লির উইলিংডন নার্সিং হোমে ডকটর রামমনোহর লোহিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দেশবাসী তখন গভীর ঘুমে অচেতন। চতুর্দিকে অন্ধকার।

হঠাৎ লোহিয়াজী বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, জয়প্রকাশকো বুলাও। সিরফ ওহি হিন্দুস্তান কো হিলা সকতে হেঁ।

অর্থাৎ জয়প্রকাশকে ডাক পাঠাও। আর কেউ নয়, একমাত্র তিনিই হিন্দুস্তানকে আন্দোলনে উদ্বেল করতে পারবেন। এই ছিল লোহিয়াজীর শেষ কথা।

জয়প্রকাশ তখন লোহিয়াজীর কাছ থেকে তো বটেই। প্রচলিত কাজকর্ম থেকে বহুদূরে। ঝড়ের পাখী জয়প্রকাশ ডানা বন্ধ করেছিলেন কিন্তু কোন নিশ্চিত জীবনের খাঁচায় বন্দী হন নি। তিনি পথ খুঁজছিলেন মাত্র। আসল পরিবর্তনের অর্থাৎ বিপ্লবের সঠিক পথটি চিহ্নিত করে জানার জন্যই ছিল তার সেই স্বেচ্ছাসমাধি।

স্বেচ্ছাসমাধির এই কালপর্বে জয়প্রকাশ পরিষ্কার করে বলেছিলেন যখনই কোন জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেবে তখনই আমি কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে আসব। সংকটের সময়ে তো আর ভূদান আন্দোলনের জন্য জমি চাওয়া যায় না।

সেই পরিস্থিতি আসেনি মনে করে জয়প্রকাশ তাঁর বহু সংগ্রামের সাথী লোহিয়ার শবাধারে কাঁধ দিতে দিল্লি এলেন কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার কোন চেষ্টা করলেন না। জয়প্রকাশ যেমন আত্মমগ্ন ছিলেন, তেমনি রইলেন।

লোহিয়াজী যা পারেন নি তা পারল নকসালি হাওয়া। ১৯৭০ সালে সে হাওয়া উত্তপ্ত করে তুলল বিহারকে। মুশাহারিতে অস্ত্র হাতে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরা আর পুলিশ।

তা জেনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন জয়প্রকাশ। সর্বোদয় কর্মীদের নিয়ে ছুটে গেলেন সেই রণক্ষেত্রে। শুরু হল তাঁর শান্তির অভিযান। কিন্তু দুর্নীতি আর শোষণ থেকে মুক্তি ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়। এই ধারণায় মতটিকে পাকা করে তিনি আবার ডানা বন্ধ করলেন।

এল ১৯৭৪ সাল। দলহীন এবং নেতাবিহীন গুজরাটের ছাত্ররা এক একটা আন্দোলনে মাতলেন যার চূড়ান্ত দাবী দাঁড়াল, বিধানসভা ভেঙে দাও। অনেক আগুন, অনেক রক্তপাতের পর তাদের সে দাবী পূর্ণ হল।

তাই দেখে জয়প্রকাশ বললেন, বছরের পর বছর ধরে আমি পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম, তা করতে গিয়ে সমন্বয়ের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি বৃথাই দুটি বছর কাটিয়ে দিলাম। এমন সময় দেখলাম, গুজরাটের ছাত্ররা জনসমর্থন নিয়ে একটি বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলেন। আমিও বুঝলাম, এটাই সেই পথ।

পথ পাওয়ার পর আর অপেক্ষা নয়। পাখী ডানা মেলে দিল ঝড়ের আকাশে।

দিল্লি আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, বারাণসী, বোম্বাই, কলকাতা, কানপুর, কুরুক্ষেত্রের আকাশে ডানা ঝাপটে বেড়াতে লাগলেন জয়প্রকাশ। প্রভাবতীর মৃত্যুতে ভাঙা মন, কালের কামড়ে জীর্ণ শরীর। কোন কিছুর পরোয়া না করে তিনি ছুটে

বেড়াতে লাগলেন এক দুরন্ত ঘূর্ণির মত।

তিনি বললেন, দুর্নীতি আর কুশাসনের বিরুদ্ধে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে চাই না। অন্তত এর জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করিনি।

তাঁর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আর এক সংগ্রাম। পরিখার এক দিকে জয়প্রকাশ ও জনতা, বিপরীত দিকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলবল।

সি পি আই শেষ দলে। এই দলের প্রবীণতম নেতা এস এ ডাঙ্গে খাস পাটনার ময়দানে দাঁড়িয়ে প্রকারান্তরে জয়প্রকাশের সুখ্যাতিই করলেন। ডাঙ্গে বললেন, জে পি যেদিন থেকে গান্ধীজীকে ছেড়েছেন সেদিন থেকেই তিনি হয়েছেন দিশাহারা। সেদিন থেকে তিনি কেবল অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। জয়প্রকাশের প্রাণটা ভাল, কিন্তু মনটা অস্থির। এই অস্থিরতার কারণ, তিনি এক নোঙ্গরবিহীন নৌকা।

জয়প্রকাশ তখন গুরুতর পীড়ায় চিকিৎসার জন্য ভেলোরে। ভেলোরের রোগ-শয্যা থেকে তিনি বললেন, গুজরাট ও বিহারের জনজাগরণ অসংবিধানিক কিন্তু অগণতান্ত্রিক নয়। জনতা যেসব সমস্যায় নিত্য জ্বলছে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ও সংবিধানিক ব্যবস্থায় যদি তার থেকে রেহাই পাবার কোন ব্যবস্থা না থাকে তা-হলে জনগণ কি করবে—এই ছিল তাঁর প্রশ্ন।

বিহার বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবীকে কেন্দ্র করে জয়প্রকাশ ও ইন্দিরার ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ক্রমশ বরফের মত শীতল হয়ে উঠল। জয়প্রকাশ আর জহর-লাল—এই দুই সূর্য বোধ হয় প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে কখনই পাশাপাশি এলেন না। দুজনের মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত তিক্ত মধুর সম্পর্ক।

অথচ জয়প্রকাশের স্ত্রী প্রভাবতী আর জহরলালের স্ত্রী কমলার মধ্যে ছিল সখী সম্বন্ধ। এই দুজনের কেউই রাজনীতির কুটিল গোলকধাঁধার যাত্রী ছিলেন না বলেই বোধ হয় এই সম্পর্কটা গড়ে উঠতে পেরে-ছিল।

সেই প্রভাবতী ও কমলার প্রাণের চেয়ে প্রিয়জনেরা নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়তির মত দাঁড়িয়ে গেলেন একে অপরের বিরুদ্ধে। তাই দুজনেরই শুভাকাঙ্ক্ষী যে কজন লোক তখনও অবশিষ্ট ছিল তাঁরা ইন্দিরা ও জয়প্রকাশের মধ্যে একটা মিটমাট করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

ইতিমধ্যে পুলিশের লাঠিতে পাটনার রাজপথে জয়প্রকাশের রক্তপাত হল। জয়-প্রকাশ বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই। আমাদের মধ্যে আপোষের ব্যাপারও নেই। আমি শুধু চাই যে, প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি দমন, শিক্ষা সংস্কার, নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে আমার দশ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গর্জন করে উঠলেন, বিহার আন্দোলনের লক্ষ্য আমাকে উৎখাত করা। এ চ্যালেঞ্জ রুখবই।

স্ত্রী প্রভাবতীর সঙ্গে জয়প্রকাশ।

দুজনের সম্পর্কের এই অবনতি দেখে ব্যথিত হলেন চন্দ্রশেখর। তিনি বললেন, জয়প্রকাশ ক্ষমতার জন্য লড়ছেন না, তাই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁকে হারান যাবে না। তাঁকে বোঝান সম্ভব, পদানত করা অসম্ভব।

জয়প্রকাশ বললেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বেশ, নির্বাচনেই এর ফয়সালা হবে। ১৯৭৭ সালে তাই হল। মাঝে ছিল জরুরী অবস্থা ও জয়প্রকাশের কারাবাস-পর্ব। বন্দী অবস্থাতেই তিনি কিডনির গুরুতর পীড়ায় পড়েন।

সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই এসে গেল নির্বাচন। জয়প্রকাশের উদ্যোগে গঠিত হল জনতা পার্টি। জনতা পার্টির সাফল্যের জন্য জীবন পণ করে তিনি ছুটে বেড়াতে লাগ-লেন দেশের এ-কোণ থেকে ও-কোণে ডায়-লিসিসের ফাঁকে ফাঁকে। বাজী জিতলেন তিনিই। তাঁর জানমান দুই-ই বাঁচল।

কিন্তু তারপর? তারপর গত বছর বাপুজীর মৃত্যু দিবসে তিনি বললেন, জনতা পার্টি পরিচালিত সরকারের নেতা ও সদস্যদের সাক্ষী হিসাবে আমি এই পবিত্র দিবসে তাঁদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে বলি : আমাদের আচরণ এবং আমাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি কি রাজঘাটে দেওয়া প্রতি-শ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে? আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ বাহিনী হিসাবে চলার জন্য যা যা করা সম্ভব তা সবই করেছি? দরিদ্র-তম মানুষটির মঙ্গলের জন্য নীতি পরি-বর্তন করতে যা যা করা সম্ভব তা সবই করেছি? আমরা কি সেই সব ব্যবস্থার সব-গুলিই নিয়েছি? যেগুলি নিলে সাধারণ-মানুষ তাঁর নিত্য অভিজ্ঞতায়, বুঝবেন যে, সরকার তাদের জন্যই চিন্তা করছে? জনতা কি ভাবতে পারছেন যে, এই সরকার আগের মত নয়।

জয়প্রকাশের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি নিজেই দেশের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, নগরে মহা-নগরে জনতা সমিতি গড়ে তুলবেন। সেই সমিতির কাজ হবে তাঁদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সরকার রক্ষা করছে কি না তা দেখা।

তিনি চেয়েছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে সেই কাজ করার জন্য বাঁচিয়ে রাখুন, শক্তি দিন।

শেষের সেই ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই ঝড়ের পাখীকে চিরকালের মত ডানা মুড়তে হল আটই অকটোবরের ভোরে।

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

অনুস্যূত

শম্ভু রক্ষিত

কাল গ্রীষ্মভূবায় জানলা ঘেঁষে ভুশণ্ডি-মূর্তি মেলে
তাকিয়ে ছিল প্রকৃতি

তাই আজ আমি ভয়াল-রোদ্দুরে জেগে জলপ্রিয় খেলার সামনে
কিছু নগ্নঘাস জমিতে বৃক্ষের আমোদ নিয়ে বসে গেছি

বিরাট এক জিজ্ঞাসার মত কৃতকার্য ক্ষীণ নীলের উপরে
সম্ভাবনা বছরের ফসল ও সূর্যের রঙ দৃঢ় বিশ্বাস পেঁছে দিতে গিয়ে
ঘরের মানুষের মৃত্তক অঙ্কিত পিঁড়িতে চেপেছি অনুতাপের অন্বেষণ

কয় পা দূরে চিত্রভানুর উৎসুক আমোদ
ক্রমশই জমির সাজের সঙ্গে জমে উঠছে
জড়মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে সীসের রঙের অপ্রসন্ন জলরাশি
বোধের স্বতন্ত্র আকৃতি, ম্লান শস্যে ঢাকা আমার হাতখানি
জটিল রেখায় যুক্ত দড়ির আবেগে বসছে

আমার গলার কাছে ক্ষীণ কালো রক্তের ধারা
আমার দীর্ঘশ্বাস আগিয়ে ঝিঁঝির ও বোঁও-ও-হিস
বাতাসের শব্দের পরামর্শ

আমি অশঙ্ক আত্মার অন্তঃপুরে ঢুকে মন্ত্র সন্তর্কের নিষাদে
মল রেখে ডাক দিয়েছি; ছিমছাম বৃষ্টি ধোয়া স্বর্গে রেখেছি
মিষ্টি মেদুর মাটি

এবং অল্প কাঁপতে-থাকা অতল জলরাশির সামনে
বিপুল ফণার এবং সাদা গোক্ষুরটির স্বচ্ছন্দতা নিয়েছি চেয়ে

উপকথাময় প্রাচীন পিরামিডে সরসর বালির প্রাণদণ্ড ওড়ে
আত্মজের পা লেগে মানুষের সৃষ্ট সামনের পোলটি
যেন পরিত্রাহি শব্দ করে ওঠে
ঘেষোর উত্তাপ পেয়ে এখন কার অপত্যহীনতার আর্তনাদ।

আমার পায়ের পাশ দিয়ে পৃথিবীর অন্য নদী
সঞ্চিত ধূসর হৃৎপিণ্ড হয়ে দুলে চলেছে
পুরনো ভেজা গোলাপাতায় হাস্যকর ভ্রমণ করছে
পিঠ-উঁচু ক্লান্ত মৎস্যেরা

একমাত্র পরিধির ধারালো স্তব্ধতা থেকে
আসছে নামাজের অশ্রু-ধোয়া সুশীতল ঝর্ণা
পাখি রামধনু উইয়ের

তাতেই আমার পথ সংযত হয়ে ওঠে,
অহংকারী করে এই সব বোধের রেখা

উনুন

বাসুদেব দেব

উনুনের কাছে বাড়ে মানুষের ঋণ
ছুটিতে বেড়াতে এসে পিকনিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া
চশমা কলম স্মৃতি ঘড়ি আর জ্বলন্ত উনুন
এখানে তো ছিল চাঁদ সুগন্ধি সাবান

শুকের গভীর থেকে নুন আর ঘুমন্ত মৌমাছি
জ্যোৎস্নার গর্জনে তীব্র জেগে ওঠে
ঢেউয়ের ছোবল খাওয়া নদী
সারা রাত আগন্তুক হাওয়া
পোষাক আসাক টানে মর্মমূলে লাগে তার নখ
সেখানেও ভয়ানক জ্বলে ঐ টিনের উনুন
সারা রাত

তরুণ কবিকে লেখা চিঠি

কালীকৃষ্ণ গুহ

অসুস্থতার পাশে নেমে আসে থমথমে মেঘ,
অন্ধকার ঝুলি, বিবর্ণ পাতা-ঝরা দিন, স্থির রাত্রি—
রাত্রির ভিতর থেকে একটি নিষিদ্ধ কাক উড়ে আসে
ব্যথিত মানুষের পাশে
মানুষের চিত্রকলা ডেকে নেয় তাকে, মানুষের বোধ তাকে ডেকে নয়;
বধিরতা-সহ, বিষণ্ণ গানের-কলি-সহ, গদ্যভাষা-সহ
মানুষের বোধ তাকে কাছে ডেকে নেয়—

আমরা শুধু কুঁজো হয়ে এই সব লক্ষ্য করে যাই,
সম্ভববদ্ধতা থেকে দূরে যাই,
প্রকৃত শিল্পের কাছে গিয়ে দেখি, অন্ধ মানুষের পাশে
[illegible]!

চিঠিপত্র

কিছু প্রশ্ন থেকে যায়

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে একটি বহু-চর্চিত বিষয় আলোচিত হয়েছে। পূর্বে নানাজনের উল্লিখিত নানা বিচিত্র ও মূল্যবান তথ্যের তিনি একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এর ফলে প্রবন্ধটি আকর্ষণীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে নিবন্ধে উল্লিখিত তথ্যাবলী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কোনো কোনো বিষয় সম্পূর্ণতা আর স্পষ্টতার জন্য আরও সংযোজনের দাবী রাখে। রচনাটির প্রথম দুটি কিস্তির কিছু তথ্যের বিচার করা যেতে পারে।

(ক) ১৮৯৭ সালে কলকাতায় বিদেশ প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে [স্বাধীনতা সংখ্যা অমৃত, পৃঃ-১০০] তার একমাত্র উৎস রবীন্দ্র-জীবনীতে উল্লিখিত স্বর্গত অমল হোমের সাক্ষ্য। কিন্তু এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের অন্য কোনো সূত্র থেকে সমর্থন না মেলায় আশ্চর্য লাগে। সন্দেহের আরও কারণ, সমকালীন সংবাদপত্রে এই উপস্থিতির কোনো উল্লেখ না থাকা। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর বিবেকানন্দ বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণা গ্রন্থে ৩-৩-১৮৯৭ তারিখের 'মিরার' পত্রিকা থেকে ঐ সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামের যে তালিকা উদ্ধৃত করেছেন তাতে বহুজনের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নাম নেই।

(খ) ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকার তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথও একজন, এই তথ্যটিও কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণের উল্লেখ ছাড়াই উদ্ধৃত করা হয়েছে [পৃঃ-১০০]। কিশোর বয়সে বিবেকানন্দের সাহিত্য রচনার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বা 'বালক' পত্রিকায় তাঁর কোনো রচনা পাওয়া যায় কি? মনে হয় এটিও 'শোনা কথা' জাতীয় তথ্যই হবে, তার বেশী কিছু নয়।

(গ) রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সাক্ষাৎকার বিষয়ে লেখা হয়েছে [ঐ, পৃঃ-১০২] 'যুগান্তরের' কোনো সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, দুজনের মধ্যে কোনোদিন দেখা সাক্ষাৎ বা আলোচনা হয়নি, আর প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীতে বলা হয়েছে, 'জীবনে কাহারও সহিত কাহারও ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ হয় নাই'। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য এই যে, দুজনের মধ্যে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি—এই ভ্রান্ত ধারণা যুগান্তরের সম্পাদকীয়তে বা তারও আগে নানাস্থানে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবার পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান প্রভাত-কুমারের ঐ রবীন্দ্রজীবনীর পুরানো সংস্করণের। ঐ বহুল প্রচারিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে (মাঘ ১৩৫৫) পরিষ্কার লেখা আছে, 'জীবনে কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই।' [পৃঃ-৫] কেবলমাত্র পরবর্তী সংস্করণগুলোতেই এই মন্তব্য সংশোধন করে 'সাক্ষাৎ হয় নাই' স্থলে লেখা হয় 'ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ হয় নাই।' প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুই প্রথম চা-পান সভায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকারের সুনির্দিষ্ট তথ্য সুধীসমাজে পরিবেশন করেন।

(ঘ) ২৪-৮-৭৯ সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি [পৃঃ-৫৭]। এই তথ্যটিকে সর্বাংশে সত্য বলা চলে না। একথা ঠিক যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ যা কিছু মন্তব্য করেছেন, তার সবগুলোই প্রশংসাসূচক। কিন্তু নাম উল্লেখ না করে 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, শক্তি-উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় 'মায়ের বাহন' সিংহকে বিশেষ করে দেখবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছিলেন। এভাবে সিংহকে শক্তিরূপে দেখলে 'কল্পনার মহত্ত্ব' চলে যায় এবং মনকে তা বদ্ধ করে রাখে এ জাতীয় রূপ উদ্ভাবন 'মিথ্যা' ও 'মানুষের শত্রু'—রবীন্দ্রনাথ এরকম মনে করেছেন। [দ্রষ্টব্য 'সঞ্চয়' গ্রন্থ]। এ ঘটনা যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ঘটেছিল, প্রত্যক্ষদর্শী শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেন আই হ্যাভ সীন' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী,
জামশেদপুর-৯।

কিছু অভিযোগ কিছু প্রস্তাব

আমি সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এর একজন নিয়মিত পাঠক। অমৃত পড়তে গিয়ে প্রায়ই যেসব বিষয়গুলি খারাপ লাগে তা জানাচ্ছি। জানি না, আপনি সেটা কেমন-ভাবে নেবেন।

প্রথমতঃ গল্প নির্বাচন। 'অমৃত' নতুন-দের স্বাগত জানায় সব সময়—সেটা দেখে খুব ভালো লাগে। কিন্তু নতুন বলেই যে একটা প্রখ্যাত পত্রিকার পাতায় কাঁচা লেখা প্রকাশিত হবে সেটাও ভুল। মান উন্নত রাখার একটা প্রস্তাব রাখছি—কোনো কোনো সংখ্যায় দেখি পাঁচ-ছটা গল্পও থাকে—সংখ্যা কমিয়ে খুব বেশি হলে তিনটি গল্প ছাপুন। তার মধ্যে অন্ততঃ একটি প্রতিষ্ঠিত লেখকের গল্প থাক।

দ্বিতীয়তঃ অমৃতে রমেন দাস-এর লেখা প্রায়ই থাকে। সেগুলিকে সাক্ষাৎকার ছাড়া কিছু বলা যায় না—যা একমাত্র খবরের কাগজেই ছাপার যোগ্য। এটা বন্ধ করুন।

তৃতীয়তঃ শুধু কলকাতার ওপর-ই আপনাদের পত্রিকায় এটা-ওটা ছাপা হয়। ওসব ছেড়ে বেরিয়ে এসে—ভারত তথা দেশের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান মনীষী বিষয়ে রচনা প্রকাশ করুন।

চতুর্থতঃ সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো—বিজ্ঞানের নির্বাসন। প্রতিটি সংখ্যায় বিজ্ঞানের ওপর লেখা থাকা নিতান্ত দরকার।

এছাড়া আপনারা প্রচ্ছদকে কোনো গুরুত্ব দেন না। কোনোটায় কলকাতার ছবি -কোনোটায় কোনো নেতার ছবি —এইসব থাকে। নতুন-পুরোনো দক্ষ শিল্পীর ছবি কি ছাপা যায় না? —দীপক ঘোষ, গ্রাঃ সাদপুর, পোঃ মসলন্দপুর, জেলা : ২৪ পরগণা।

মন জয় করেছে

২৪ আগস্ট প্রকাশিত একগুচ্ছ অসমীয়া গল্প সংখ্যাটির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এর আগে ১৫ ও ২২ জুন একগুচ্ছ বাংলা ও হিন্দী গল্প উপহার পেলাম। তবে সাহিত্য-প্রেমী হিসাবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, অসমীয়া সংখ্যাটির কাছে হিন্দী সামান্য এবং বাংলা সংখ্যাটি ততোধিক ম্লান দেখায়। বাংলা গল্পগুলি একঘেয়ে, গতানুগতিক। আজকের এই অস্থির সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশ থেকে মুক্তির উপায়ের কোন নির্দেশ আমরা এই গল্পগুলির মধ্যে পাই না। তবুও বাংলা গল্পগুচ্ছের মধ্যে মড়া, শত্তুর, পুরুষ এবং হিন্দী গল্পগুচ্ছের মধ্যে সন্ধ্যা প্রহরে, শবযাত্রা, মা, এই চাকরি ছেড়ে দাও, ও বলেছিল গল্পগুলি প্রশংসার দাবী রাখে।

কিন্তু সবচেয়ে আমার মন জয় করেছে অসমীয়া গল্প সংখ্যাটি। প্রথমেই মন কেড়ে নেয় অরূপ গোস্বামীর 'ওদের জাগিয়ে দিন' গল্পটি। লেখক যে নির্ভীকতার পরিচয় এ গল্পে দিয়েছেন তা অতুলনীয়। বর্তমান মেরুদন্ডহীন সমাজের অস্থির যুব সমাজের ব্যর্থতা যখন আমাদের মনে হতাশার বীজ বপণ করে, ঠিক তখনই এ ধরনের গল্প আমাদের সামনে এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দেয়। গল্পের 'স্বরাজ কাকা' একটি রূপক গল্পের মধ্যে গোটা সমাজের চিত্রটা তুলে ধরেন। এবং গল্পের শেষে এসে চমকে যাই যখন স্বরাজ কাকা বলেন, 'ওদের জাগিয়ে দিন, নাহলে ভোটের বাকসোয় থাকা লোকটি বিজয় উল্লাসে ওদের গায়ের উপর দিয়ে পা মাড়িয়ে চলে যাবে। বুড়ো মানুষগুলো আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিতে আরম্ভ করলো।' গল্পের শেষাংশটুকু পড়ে আশা জাগে এবার বুঝি আমাদের যুব সমাজ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মন্ত্রী, আমলা, সমাজের কালো মানুষগুলোকে বিদ্রোহের আগুনে পুড়িয়ে মারবে।

এর পরেই নাম করতে হয় 'আমি অমলের বন্ধু' গল্পটি। এ গল্পে আমাদের বর্তমান সমাজে বিপ্লব করা মানুষদের মুখোস খুলে দেয় 'বু' নামক সুবিধাবাদী ব্যক্তিটি নিজেই। এছাড়া একটা মোমবাতির মূল্য, গ্রহণ গল্পগুলিও প্রশংসার যোগ্য।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। বাংলা গল্পের সংখ্যা না পেলেও আমাদের চলে। কেননা প্রতি সংখ্যাতেই আমরা দু-তিনটি বা তারও বেশী বাংলা গল্প পাই এবং একই লেখকদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা গল্প পড়ে নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে করি। আমার বিশেষ অনুরোধ, ওড়িয়া, গুজরাতী পাঞ্জাবী, মালায়লম, কানাড়ী, মারাঠী, উর্দু এবং বিদেশী গল্পের অনুবাদ আমাদের উপহার দিন। এবং অরুন গোস্বামীর লেখা কোন বলিষ্ঠ উপন্যাস অমৃতে ধারাবাহিক প্রকাশ করুন।

সবশেষে জানাই বিজ্ঞান বিভাগটি অমৃতের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে। বিজ্ঞান সাহিত্যের একটা অঙ্গস্বরূপ। আশা করি এই বিভাগটি নিয়মিত চালু করে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের কথা আমাদের জানাতে সম্পাদক আগ্রহী হবেন। —শোভন শেঠ, ১০ কৈলাস বোস থার্ড বাই লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।

আরও অমৃত চাই

অমৃতের ২৯ জুন প্রচ্ছদ কাহিনীকার তুষার চৌধুরীর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। বিদেশী অনেক লেখককে জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। দোষ আমাদেরই। অমৃত'র পাঠক হিসেবে অনুরোধ করব অন্যান্য কবিদের যেমন হুইটম্যান, নেরুদা, বের্টোল্ড ব্রেখট সম্পর্কেও এইরকম প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করা হোক। আশা করছি এ অনুরোধ রাখবেন।

এ সংখ্যায় জোৎস্না কর্মকারের কবিতাটিও ভালো লাগবে। বিশেষ করে যে লাইনটি কবিতার থেকে উঠে আসে তা হল 'কাঠ ঠোকরার মতো ঠুকরে ঠুকরে দিন খাই-' 'অমৃত' থেকে আরও অমৃত পেতে চাই। —কাজল চক্রবর্তী। ১।১৬, শহীদনগর কলকাতা-৩১

ধন্যবাদ

৬ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত সুলেখা দাশগুপ্ত লিখিত 'এটাই আশীর্বাদ' গল্পের জন্য 'অমৃত'-এর সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। ইদানীং এই পত্রিকায় প্রকাশিত নতুন নতুন লেখকদের নতুন স্বাদের গল্পের মতই এই গল্পটিও ভাল লাগলো বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের জন্য। আজকের বাঙালী পারিবারিক জীবনের একটা বড় সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে গল্পটিতে। —বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, রাউরকেলা, উড়িষ্যা।

শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগায়

অপেক্ষাকৃত কম দামে অথচ বিজ্ঞাপনের আনুকূল্যের পরোয়া না করে, যেভাবে বিচিত্র ও বিভিন্ন স্বাদের রচনা-সম্ভারে 'অমৃত' তার পাতাগুলি ভরে দিচ্ছে তা আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগায়। সম্প্রতি পর পর দুটি গল্প-সংখ্যা খুব ভাল লেগেছে। ভাল লাগছে মণীন্দ্র রায় ও বেদব্যাস বৈদ্যের কলম দুটি। কিছু মূল্যবৃদ্ধি করে, কাগজ ও মুদ্রণের আরএকটু পরিপাট্য ঘটালে 'অমৃত' সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হতে পারে।

অনুরোধ জানাই, অতঃপর বাংলা গানের জন্য আপনারা কিছু করুন। নিছক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মর্জিমতো কাটছাঁটে তৈরি আধুনিক বাংলা গানের কাব্যমান ও সুর দুয়েরই দ্রুত অবনতি ঘটছে। সৎ ও বিবেকবান রচয়িতাদের আত্মপ্রকাশের পথ ক্রমেই অবরুদ্ধ হয়ে আসছে।

পুরনো দিনের বিখ্যাত পত্রপত্রিকাগুলিতে গানের জন্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। রবীন্দ্রনাথের বহু বিখ্যাত গানের স্বরলিপি 'প্রবাসী' পত্রিকাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও দিলীপকুমার রায়ের গান নিয়মিত প্রকাশিত হোতো 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। পুরনো 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতী'র পাতা খুঁজলে হিমাংশু দত্ত, পঙ্কজকুমার মল্লিক, শচীন দেববর্মন প্রমুখ সুরকারদের স্বরলিপি চোখে পড়বে। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি'র মত ছোট আয়তনের কাগজেও সেকালে কাজী নজরুল ইসলামের গান ও স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে।

কালক্রমে লুপ্ত এই প্রথাটির পুনঃপ্রচলন একান্ত প্রয়োজন। মাসে যদি অন্ততঃ একটি করেও ভাল গান স্বরলিপি সমেত প্রকাশ করা সম্ভব হয়, বছরে বারোটি উৎকৃষ্ট গান আমরা পেতে পারি। ক্রমে অন্য কয়েকটি পত্রিকাও যদি অমৃতের পথ অনুসরণ করে, দেখা যাবে ব্যবসাদারী গানগুলির পাশাপাশি একটি সুস্থ ও সুন্দর গীতিধারা বয়ে চলেছে। মরা গাঙে জোয়ার আনতে 'অমৃত'ই হোক নতুন ভগীরথ। —সুমনা ঘোষাল, ৪৯।১ সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা।

একটি অনুরোধ

আমরা অমৃতের নিয়মিত পাঠক। দিন দিন এ পত্রিকার উন্নতি দেখে আমরা খুব আনন্দিত। আমাদের একটি অনুরোধ আপনি রাখতে পারবেন কি? যদি এ পত্রিকায় একটি বিজ্ঞানের স্তম্ভ দেন, তাহলে আমাদের মনে হয় এ পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

এ পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক উপন্যাস 'সোনার হরিণ নেই' পড়ে আমরা অভিভূত। তাছাড়া জ্যোতির্ময় মল্লিক লিখিত বড়গল্প 'হে বন্ধু পরবাসী' খুবই ভাল লাগল। লেখকদের অভিনন্দন জানাবেন। —সরোজকুমার পাল, শুভ্রা পাল, ধানসার, ধানবাদ।

পশ্চিমবঙ্গে দু বছরে ১০৬ কোটি টাকার নতুন কর বসেছে

রমেন দাস

বিরাট এক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে ১৯৭৭ সালের জুন মাসে ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন। বহুদিন বিরোধীর আসনে থাকার পর তাঁরা ক্ষমতাসীন হলেন। আগের সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাঁদের পছন্দসই ছিল না। কাজেই সে সরকারের বাজেট নীতি এ'রা 'জনবিরোধী' বলেছিলেন। আগের সরকারের বাজেট নীতি গরীব মানুষের অভাব করের বোঝায় আরো বাড়াচ্ছে বলে এ'রা অভিযোগ করেছিলেন। সেজন্যে সরকার-বিরোধী আন্দোলনেরও অভাব ছিল না। তারপর সরকার বদল হয়ে এ'রা ক্ষমতায় এলেন। নানা আন্দোলন নানা রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে। এজন্যেই ক্ষমতাসীন সরকারের আর্থিক ব্যবস্থায় এ সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করে আসছি।

ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র বাজেট তৈরীর সুযোগ পেয়েছেন মোট তিনবার। প্রথম বাজেট ১৯৭৭ সালে। দ্বিতীয় ৭৮-এ। তৃতীয় ১৯৭৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে। প্রথম বাজেটে ৪২ কোটি টাকার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বাজেটে তিনি যথাক্রমে ৩০ ও ৩৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত করের প্রস্তাব দেন। তাঁর বাজেটকে জনমুখী আখ্যা দিয়ে ডঃ মিত্র বলেছেন : সমস্যাগুলি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

এই বিশ্লেষণের সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারি আমাদের সামনে কী বিপুল সমস্যা। মস্ত পরীক্ষা এটা। জনসাধারণের সঙ্গে সরকার এবং জনপ্রতিনিধিদের নিবিড় সহযোগিতা না থাকলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। বন্যার মুহূর্তে আমরা তো দেখেছি, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিঃস্বার্থভাবে বিশাল অসুবিধা কাটিয়ে কেমনভাবে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথে দ্রুত এগোতে হয়, তা হলে সর্বস্তরে লক্ষ্য ও অধ্যবসায়ের অনুরূপ সমন্বয়ের প্রগাঢ় প্রয়োজন।

সমস্যা অনেক। এবং সে সম্পর্কে আমরা সচেতন। বিভিন্ন সরকারী নিয়ম ও পদ্ধতি যা বহু বছর আগে অন্য পরিবেশের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল, তাও মাঝে মাঝে পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়.....

ডঃ মিত্র একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিক। সমস্যা-সংকট, নিয়ম-পদ্ধতি এবং পরিবেশের যে যুক্তি তিনি তুলেছেন তা অনস্বীকার্য। সারা ভারতের মোট ভূখণ্ডের মাত্র ২-৭ শতাংশ নিয়ে আমাদের এই পশ্চিমবাংলা। অথচ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮-১২ শতাংশ মানুষের বাস এই রাজ্যে। এ রাজ্যের সর্বমোট পাঁচ কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের আবার শতকরা ৭৫-২৫ ভাগ গ্রামীণ মানুষ। গ্রামীণ মানুষের হিসাব-নিকাশ করলেও দেখা যায়, তার অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে। এছাড়া শহর জীবনেরও একটা বড় অংশ দিন কাটায় অভাব অনটন আর দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় নিয়ে।

কৃষি নির্ভর পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের আর্থিক বনিয়াদের ব্যারোমিটারের বাড়া কমা নির্ভর করে মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনীতির উপর। দেশের সমৃদ্ধির মূল নায়ক লাঙলধারী কয়েক কোটি কৃষিজীবী। অথচ কৃষি ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ছবিতে এখনও পর্যন্ত তেমন হেরফের হয়নি। রাজ্যে কৃষি-নির্ভর জনসংখ্যার একটা নগণ্য অংশ আবাদযোগ্য জমির সিংহভাগ দখল করে আছে।

হিসাবে দেখা গেছে রাজ্যে প্রায় ৪৫ লক্ষ জমির স্বত্বাধিকারীর মধ্যে কমপক্ষে দশ একর জমির মালিকানা আছে স্বল্প-সংখ্যক পরিবারের (শতকরা ৪ ভাগ)। এ'রাই রাজ্যের মোট আবাদযোগ্য জমির ৩৯-৩ ভাগ জমির মালিক। প্রায় ত্রিশ লক্ষ পরিবার আছে, যাদের হাতে আছে ০১ ভাগ থেকে ২-৫ একর জমি। এরা প্রান্তিক চাষী। এছাড়া রাজ্য জুড়ে রয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ ভূমিহীন পরিবার। খেতখামারে কাজ করে এরা।

অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করার সময় বলেছিলেন, তাঁর পরিকল্পিত বাজেট জোতদার আর কায়েমী স্বার্থের চোখের ঘুম কেড়ে নেবে। তাঁর এই ঘোষণার পাশাপাশি আবার তিনি একথাও স্মরণ করাতে ভোলেননি যে তাঁরা পরিকল্পনার বরাদ্দ বাড়াতে চান। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য, তার সমস্ত কিছুর জন্যই বাড়তি রাজস্ব প্রয়োজন। এজন্যে ডঃ মিত্র তাঁর প্রথম বাজেটে কর প্রস্তাব করেন ৪৬০ কোটি টাকা। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে, কর বা রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন ৫০৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে ৪৪ কোটি টাকা কর বা রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। আর চলতি আর্থিক বছরের জন্য তিনি যে বাজেট রচনা করেছেন, তাতে কর বা রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন ৫৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ তাঁরই রচিত প্রথম বাজেটের তুলনায় তিন ধাপে তিনি প্রায় ১২০ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছেন। তাঁর সর্বশেষ এই প্রস্তাবিত রাজস্ব বা কর বৃদ্ধির একটা অংশ অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। তা বাদ দিয়ে তিন বছরে রাজস্ব বা কর-বৃদ্ধির পরিমাণ কমবেশী একশ ছয় কোটি টাকার মত।

এবার একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকানো যাক। এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে সাবেকী সরকার ১৯৭৬-৭৭ সালে তিনশ পঁচাত্তর কোটি একষট্টি লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় করেন। আর ১৯৭৭-৭৮ সালে এই সরকার সেই কর বা

অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র

রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ চারশ পনের কোটি নব্বুই লক্ষে নিয়ে দাঁড় করান। গত মার্চে যে ১৯৭৮-৭৯ বছর শেষ হয়েছে, সেই সময়কার আদায়ী রাজস্বের হিসাব এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে অর্থ দপ্তরের আশা ঐ পরিমাণ সাড়ে চারশ কোটি টাকারও উপর গিয়ে দাঁড়াবে।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে যে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন তা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ:—

ক) কৃষি আয়ের উপর—নয় কোটি টাকা।

খ) জমির খাজনা—তেত্রিশ " "

গ) জমি রেজিস্ট্রির স্ট্যাম্প ইত্যাদি—পঁচিশ " "

ঘ) বিক্রয়কর—দুশো সাতাশি " "

ঙ) গাড়ি চলাচল ইত্যাদি—বাইশ কোটি " "

চ) বিদ্যুৎ—চব্বিশ " "

এছাড়া বৃত্তিকর, যাত্রীকর, চুঙিকর সহ আরও নানা ধরনের করতো আছেই।

বিক্রয়কর সম্পূর্ণ রাজ্যের আয়ত্তে। এবং এই বিক্রয়করই রাজ্য রাজস্বের সিংহ-ভাগ এনে দেয়। বিক্রয়কর প্রসঙ্গে অর্থ-মন্ত্রীর বক্তব্য : বিক্রয়করই রাজ্যের বর্তমান কাঠামোর প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান অবলম্বন। কাজেই প্রধানত বিক্রয়করের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নতুন প্রস্তাব করতে গিয়ে আমাদের যথাসম্ভব এটাও দেখা কর্তব্য যে, যাঁদের দেওয়ার সামর্থ আছে কিম্বা দেওয়ার সামর্থ থাকলেও যাঁরা অতীতে করের আওতায় আসেননি, তাঁদের উপরই বোঝাটি সাধারণতঃ পড়বে। এসম্পর্কে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁদের সুপারিশের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়েছে। বঙ্গীয় রাজস্ব বিষয়ক (বিক্রয়-কর) আইন, ১৯৪১ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন, ১৯৫৪ অনুসারে সাধারণভাবে দেয় শতকরা ১০ ভাগ সার-চার্জ ও অতিরিক্ত সারচার্জ বিলোপের প্রস্তাব করেছি। ফলে যে রাজস্বের ঘাটতি হবে, তা পূরণের জন্য ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় রাজস্ব বিষয়ক (বিক্রয়কর) আইনের সাধারণ করহার শতকরা সাত থেকে বাড়িয়ে আট করা হবে। ১৯৫৪ সালের পঃ বঙ্গ বিক্রয়কর আইনের আওতাভুক্ত পণ্যগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ-ভাবে করের হারের পুনর্বিন্যাস করা হবে। তাছাড়া এই দুই আইনেই যে সমস্ত ব্যবসায়ীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশী তাঁদের ক্ষেত্রে শতকরা ½ টাকা হারে এবং যাঁদের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশী তাঁদের ক্ষেত্রে শতকরা এক টাকা হারে টার্ন ওভার ট্যাকস ধার্য করার প্রস্তাবও রেখেছি।...

তিনি আরও বলেছেন : ১৯৫৪ সালের পঃ বঙ্গ বিক্রয়কর আইনের আওতাভুক্ত কিছু কিছু বিলাস সামগ্রীর উপর কর বাড়ানোর প্রস্তাবও করা হয়। যেমন গ্রামোফোন ও তার যন্ত্রাংশ, গ্রামোফোন রেকর্ড, কফি, রাবার ফোম, সিন্থেটিক রেজিন ও প্লাসটিক ফোমজাত তোষক গদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে অবশ্য দেশলাই, সার এবং যন্ত্রচালিত লাঙ্গল ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিছুটা কর কমনোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র দাবি করেন, তাঁর সরকার এ রাজ্যে যে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছেন ১৯৭৭-৭৮ সালের রাজ্যের আয়-বৃদ্ধির আনুমানিক হিসাব-নিকাশে তা স্পষ্ট। এবছর রাজ্যের গড় আয় ৮-৯৩ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের পর এটাই সর্বাধিক বৃদ্ধি। আর মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৬-৫৬ ভাগ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এটাই বৃদ্ধির সর্বোত্তম হার।...

প্রসঙ্গত ধনতান্ত্রিক দেশ অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটা সাম্প্রতিক পরিবার পিছু আয়ের হিসাব উল্লেখ না করে পারছি না। ঐ দেশে বর্তমানে পাঁচজনের পরিবারের মাসিক আয় যদি আড়াই হাজার টাকাও (৩০০ ডলার) হয়, তবে সেই পরিবার দরিদ্র পরিবার রূপে গণ্য। অথচ এইরকম দরিদ্র পরিবারের বাসস্থান, অন্নবস্ত্র, আসবাবপত্র (টেলিভিশান সহ) সব কিছুই থাকে। এক কথায় বলা চলে এদেশের উচ্চ-মধ্যবিত্তের সমপর্যায়ের ঐসব পরিবারও সেখানে দরিদ্র বলে খ্যাত। অতএব দারিদ্র্য সীমার পরিমাপ এক এক দেশে এক একরকম। সর্বাধিক আয়বৃদ্ধি অথবা সুযোগ সুবিধার বড়াই আমরা যতই করি না কেন, তা নিয়ে গর্ব প্রকাশ অথবা উল্লাস করার নৈতিক অধিকার এখনও আমরা অর্জন করিনি।

আমাদের দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে যাদের ধরা হয়, তাদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়ে চলেছে। অধ্যাপক দাণ্ডেকার এবং নীলকণ্ঠ রথ ১৯৭১ সালে হিসাব করেছিলেন, ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যসূচী অনুসারে তাতে মাথাপিছু নিম্নতম মাসিক প্রয়োজন গ্রামে ১৫ টাকা ও শহরে ২২-৫০ টাকা। এই হিসাব মত তখন মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সালে প্রায় ২২ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। সম্প্রতি পরি-কল্পনা কমিশন এবং অর্থ কমিশন পরবর্তী মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে যে নতুন মূল্যায়ন করেছেন, তাতে দেখা যায়, দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমান ভারতে যদি জন-সংখ্যা ৬৪ কোটি থেকে থাকে তবে তার মধ্যে প্রায় ২৯ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। মাত্র আট নয় বছরে এই সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি বেড়ে গেছে। দারিদ্র্য বৃদ্ধির এই মর্মান্তিক হার রীতিমত আশঙ্কার।

বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট উত্থাপন করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র বলেছেন, ২৭ বছরে পরিকল্পনার নামে অনেক কিছু করার কথা বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও গোটা দেশে আর্থিক অগ্রগতির হার শোচনীয়। এই দীর্ঘ সময়ে মাথাপিছু বার্ষিক আয়বৃদ্ধির হার শতকরা একের সামান্য বেশীও হবে কিনা সন্দেহ। উন্নতি যতটুকু ঘটেছে, তাও বিভিন্ন অঞ্চলে, রাজ্যে অসমভাবে বর্তেছে। কারণ অতি সরল। রাষ্ট্রের সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর কথা যদি ছেড়েও দিই, অগ্রগতির হতাশা-ব্যঞ্জক হার এবং তার অসম বণ্টনের অন্যতম মূলহেতু বলা যেতে পারে এই সময়ে গড়ে ওঠা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের চরিত্র। এই চরিত্র গড়ে উঠেছে সংবিধানের বিশেষ কয়েকটি ধারার ফলে। এবং দীর্ঘকাল কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় আসীন ছিলেন, তাঁদের সংবিধানকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করার ফলে। যদি এই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পরিবর্তন করে সম্পদ বিন্যাসের এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ক্ষমতা আশু বিকেন্দ্রীভূত করা না হয়, তবে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে।...

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে বেকারভাতা চালু করেছেন। চালু করেছেন বার্ধক্যভাতা, স্বাধীনতা-উত্তরকালের গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদারদের পরি-বারকে মাসিক পেনসনদান ব্যবস্থা। আগামী বছরের মধ্যে দু' লক্ষ বেকারকে সাহায্য সূচীর আওতায় আনার পরি-কল্পনা নেওয়া হয়েছে। [illegible]ক্যভাতা গ্রহীতার সংখ্যাও ঐ সময়ে আট হাজারে দাঁড়াবে বলে সরকারী হিসাব। এধরনের ভাতাদানের কর্মসূচীর জন্যও বছরে কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজন। এছাড়া সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দানের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার জন্য সরকারের উপর বছরে ত্রিশ কোটি টাকার দায়ভার বর্তেছে। অতএব বিভিন্ন ভাতার বিস্তার ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য চাই আরও টাকা। সেই টাকা আদায়ের জন্য নতুন অথবা অতিরিক্ত কর বসিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র। তাঁরই ভাষায় বলা চলে : ১০ টাকা পর্যন্ত টিকিটের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে টিকিটের উপর কর বসবে শতকরা দশভাগ।

শিল্পী বরুণ সিসনাই

আর ১০ টাকার উপরের ক্ষেত্রে এই হার হবে শতকরা পঁচিশ ভাগ।...

ঘোড়দৌড়ের মাঠের প্রবেশের উপর প্রমোদকরের হার দ্বিগুণ করে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রাখা হবে। ঘোড়দৌড়, প্রমোদকর ও বিলাস করের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিবর্তনের ফলে বছরে প্রায় এক কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা রাখি।...

ভারতে প্রস্তুত বিদেশী মদের উপর লিটারেজ ফি সাড়ে ছয় টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে সাত টাকা করা হচ্ছে। এর ফলে বার্ষিক নীট কর সংগ্রহের পরিমাণ আনুমানিক দুই কোটি টাকা।

কোকো, ফলের রস, প্রসাধন সামগ্রী, জর্দা, রেডিও এবং অন্যান্য শব্দবাহক যন্ত্রাদির উপর প্রবেশ করের কিছুটা পুনর্বিন্যাসের কথাও বলা হয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে বার্ষিক তিন কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আসবে বলে আশা।

বৃত্তিকর একটি নতুন ব্যবস্থা। এনিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্যে নানা বিতর্কও দেখা দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র এই কর প্রস্তাব উপস্থাপন প্রসঙ্গে বলেন : যাদের মোট মাসিক উপার্জন অনূর্ধ্ব ৫০০ টাকা তাঁরা এই করের আওতার বাইরে থাকবেন। যাদের উপার্জন ৫০১ টাকা থেকে ৭৫০ টাকা তাদের দেয় করের পরিমাণ মাসে ২ টাকা। ৭৫১ থেকে যাদের আয় ১০০০ টাকার মধ্যে, তাদের এই করের পরিমাণ মাসিক ৪ টাকা। আর যাদের মোট মাসিক আয় ১০০১ টাকা ১২৫০ টাকা, তাদের দিতে হবে মাসিক ৬ টাকা। ১২৫১ থেকে ১৫০০ টাকা আয়কারীদের মাসিক মোট করের পরিমাণ ১০ টাকা। যাদের মাসিক আয় ১৫০১ টাকা থেকে ২০০০ টাকা তাদের ক্ষেত্রে এই কর ধার্য হয়েছে ১৫ টাকা হারে এবং মাসিক উপার্জন যাদের ২০০১ টাকার বেশী তাদের প্রতি মাসে কর দিতে হবে ২০-৮৩ পয়সা সংবিধানের ধারা অনুযায়ী উপরের দিকে এই কর বছরে ২৫০ টাকার বেশী ধার্য করা যায় না। এই বৃত্তিকর থেকে বছরে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯ কোটি টাকার মত। অন্যান্যভাবে আরও করের ব্যবস্থা তো হয়েছেই। বিক্রয় কর ও ক্রয় কর সম্পর্কিত প্রস্তাব মারফৎ বার্ষিক আরও অতিরিক্ত ১৪ কোটি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরিউক্ত নতুন কর প্রস্তাব চলতি বছরের বাজেটে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ সালে বসানো অতিরিক্ত করের এই হিসাব। এর আগে ১৯৭৭-৭৮, এবং ১৯৭৮-৭৯ সালের দুই বাজেটেও অতিরিক্ত কর বসানো হয়েছে। সব মিলিয়ে নতুন এই সরকার নতুন নতুন কর বসানো এবং কর বাড়ানোর নানা প্রস্তাব নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগসহ অন্যান্য কিছু সুযোগ-সুবিধার কথাও ঘোষণা করেছেন। ঠিক সরকারী মুখপাত্রের মতে নতুন কর বৃদ্ধির চাপ বেড়েছে সন্দেহ নেই। নতুন করের বোঝা বাড়লেও উন্নয়নমূলক কাজের বহরও বাড়ছে। বাড়ছে জনগণের সুযোগ-সুবিধা।

অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র মনে করেন, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত আমাদের রাজ্যেও কৃষি উৎপাদনে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান এবং উপার্জন বৃদ্ধি ঘটেছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার খানিকটা লাঘব সম্ভব হয়েছে।

তবে তিনি তাঁর সর্বশেষ বাজেট ভাষণে প্রতিক্রিয়াশীল আর কায়েমী স্বার্থের চোখের ঘুম কেড়ে নেওয়ার কথার পুনরুল্লেখ না করলেও দু বছরের মাথায় খোলা মনে স্বীকার করেছেন : গ্রামীণ আয়ের বণ্টন এখনো অসমভাবে চলছে। ক্ষুদ্র চাষী ও ভাগচাষীদের অধিকাংশই সেচের জল, বীজ সার, কীটনাশক ওষুধ, আর্থিক দাদনের মত অতি প্রয়োজনীয় সুযোগ এখনো পাচ্ছেন না। যত শীঘ্র সম্ভব এই অবস্থার পরিবর্তন তাঁর সরকারের মুখ্য লক্ষ্য।

সারমেয়-মার্জার সংবাদ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

সারমেয় : আমার দিকে অমন করিয়া তাকাইয়া আছ কেন? কি দেখিতেছ?

মার্জার : দেখিতেছি তোমার রূপ। কুকুরও এমন সুন্দর হয় জানিতাম না।

সা : আমার রূপের প্রশংসা কর আপত্তি নাই। কুকুর জাতির নিন্দা করিও না। কুকুর বড় সুন্দর হয় না তোমাকে কে বলিল? তুমি কয়টি কুকুর দেখিয়াছ?

মা : আহা, রাগ করিও না। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ, আর তুমি আমাকে তিরস্কার করিতেছ। আমি মানুষ অনেক দেখিয়াছি, কুকুর তত দেখি নাই। যদি বল কুকুর মাত্রেই কন্দর্প, আপত্তি করিব না। আপত্তির কথাটি জানিতাম না, আজ তোমার কাছে শিখিলাম।

সা : আমি কুকুর, অধ্যাপক হইবার সাধ নাই। শুনি মনুষ্য-সমাজের নাকি অনেকে কুকুর হইয়া যাইতেছে। আমি কুকুর হইয়া জন্মাইয়াছি, কুকুর থাকিয়া মরিতে চাই।

মা : হাঃ, আমিও শুনিয়াছি কিছু কিছু মানুষ কুকুর হইয়া যাইতেছে। এই ওভিডিও মেটামরফোসিস্ যে কিভাবে হইতেছে জানি না।

সা : অবাধ্য মিতবর হইলে মানুষ কুকুরে পরিণত হয় এমন অদ্ভুত কথা তোমাকে কে শিখাইল?

মা : অবাধ্য মিতবর কাহাকে বলে জানি না। ওভিডিও মেটামরফোসিসের কথা বলিতেছিলাম। আমি যে বাড়ির বিড়াল সেই বাড়ির কর্তার কাছে কথাটি শিখিয়াছি। একটি প্রাণী অন্য জাতির প্রাণীতে রূপান্তরিত হইলে তাহাকে নাকি ওভিডিও রূপান্তর বলে। কেন ঐরকম বলে জানি না।

সা : তোমার প্রভু তোমাকে মাথামুণ্ড শিখাইতেছে। তুমি ঐ বাড়িতে মাছের মাথা খাও কিনা জানি না। তোমার মাথা ঐ বাড়ি খাইতেছে। তুমি এই অবিদ্যার বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাও।

মা : এত মাছ অন্যত্র পাইব না। প্রভুর দাঁত নাই। প্রত্যেকটি কাঁটার সঙ্গে অনেক মাছ লাগিয়া থাকে। দন্তহীন আমিষাশী প্রভুর বিড়াল বড় সুখী। তাঁহার মাছের কাঁটায় মাছ থাকে।

সা : দেখিতেছি তোমার ভাগ্য আমার ভাগ্যের উল্টো। আমার প্রভুর দাঁত বড় শক্ত। তিনি মাংস ছাড়িয়া হাড় চর্বন করেন। আমার জন্য পড়িয়া থাকে অস্থিহীন মাংস। আমি এখন প্রায় নিরামিষাশী। হাড়ছাড়া মাংস নিরামিষ খাদ্য।

মা : ঐ নিরামিষ খাইয়াই বুঝি তুমি এমন দিব্যকান্তি হইয়াছ, কুকুর হইয়াও এমন রূপবান হইয়াছ।

সা : আবার তুমি কুকুর জাতির অবমাননা করিতেছ। তুমি কুকুর-কুলের সংবাদ রাখ না। কুকুর বড় সুশ্রী পশু। বিদেশে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে, কিন্তু কেহই তাহার প্রিয় কুকুরটিকে ত্যাগ করে না। তুমি তোমার প্রভুর কাছে ছাইভস্ম অনেক শিখিয়াছ। কুকুর যে এক স্বর্গীয় পশু এ-কথাটি শিখ নাই। আমাদের আদিমাতা সরমা ছিলেন ইন্দ্রের কুকুরী। তাঁহার সন্তান বলিয়া আমরা সারমেয়। শুনিতেছি এই সরমা নাকি আবার ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন। এই পার্থিব সরমাকে দেখি নাই। যাহারা দেখিয়াছে তাহারা একখানি সুন্দর মুখ দেখিয়াছে।

মা : কুকুরকে সারমেয় বলে জানিতাম না। আজ শিখিলাম। তুমি দেখিতেছি যেমন রূপবান তেমন বিদ্বান। আর তোমার প্রভু নিশ্চয় সর্ব-বিদ্যা-বিশারদ।

সা : আমার প্রভু আমার কাছে আমার কথা বলেন। তোমার প্রভু ঐ যে কি বলিলে অবিদ্যার কথা বলে। তুমি আমার প্রভুর কাছে থাকিলে বিড়াল সম্বন্ধে কত পুরাণ-কাহিনী শুনিতে। আমার পূর্ব-পুরুষ যে পঞ্চ-পাণ্ডবের মহাপ্রস্থানে তাঁহাদের সহচর হইয়া ইন্দ্রপুরীর দুয়ার পর্যন্ত গিয়াছিলেন এই কাহিনী আমার প্রভুর কাছেই সেদিন শুনিলাম। যুধিষ্ঠি[illegible] তাঁহার এই প্রিয় সহচরকে ছা[illegible] স্বর্গে প্রবেশ করিতে রাজী হন [illegible]।

মা : তোমার প্রভু দেখিতেছি তোমার উদরে রাশি রাশি বিদ্যা পুরিয়া [illegible]তেছেন, কিন্তু এক টুকরা হাড় সেখানে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। আমি বলি, তুমি অন্য প্রভুর খোঁজ কর। এত বিদ্যা দিয়া কি করিবে? হাড়ের সন্ধানে তৎপর হও।

সা : তুমি কিন্তু আবার আমাকে অপমানিত করিতেছ। কুকুর কেবল হাড় চিবাইতে জানে, তাহার বিদ্যার প্রয়োজন নাই এমন কথা কোথায় শিখিলে? কুকুরের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে দেখিতেছি তোমার কোন জ্ঞান নাই।

মা : কুকুরের বিদ্যাবুদ্ধির যে অন্ত নাই তাহা যে কোন কুকুরের চাইতে আমি বোধহয় বেশী জানি। তুমি ইন্দ্রের কুকুরী সরমার কথা বলিলে, যুধিষ্ঠিরের কুকুরের কথা বলিলে, কিন্তু কুকুর-সমাজের খ্যাতি যে আজ তুঙ্গে উঠিয়াছে সে কথা ত বলিলে না।

তোমার প্রভু ঋগ্বেদ পড়েন, মহাভারত পড়েন, খবরের কাগজ পড়েন না।

সা : খবরের কাগজে আমাদের সংবাদ ছাপা হইলে আমি বড় দুঃখ পাইব। আমরা চোর নই, ডাকাতইত নই, পলিটিশিয়ান নই, আমাদের কথা কেন খবরের কাগজে উঠিবে? আর যদি খবরের কাগজের আসল খবরগুলির কথা বল, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনগুলির কথা বল তাহা হইলেও বা আমাদের কথা সেখানে আমাদের উল্লেখ করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে। সংবাদপত্র আসলে এখন সামগ্রী-পত্র। আমরা সামগ্রী নই।

মা : কিন্তু ঐ খবরের কাগজেই কুকুরের যে প্রশস্তি ছাপা হইয়াছে সে-রকম কুকুর-প্রশস্তি ঋগ্বেদে নাই, মহাভারতে নাই।

সা : খবরের কাগজে এমনকি লিখিয়াছে যে তুমি ভাবিতেছ আমরা তাহাতে এমন ধন্য হইয়াছি।

মা : খবর কাগজ লেখে নাই। খবরের কাগজ রিপোর্ট করিয়াছে মাত্র। নিজলিঙ্গাপ্পা নামে এক মহাশয় ব্যক্তি বলিয়াছেন যে পলিটিশিয়ানরা আজকাল কুকুর হইয়া গিয়াছেন। যাহারা এত বড় একটা দেশ চালাইতেছেন, বা চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা সব কুকুর। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি এমন সম্মান কুকুর কোনদিন পাইয়াছে। নরসিংহের কথা শুনিয়াছি, নরশার্দুলের কথা শুনিয়াছি। নরকুকুরের কথা এই প্রথম শুনিলাম। এতকাল ব্যাঘ্র ও সিংহ যে সম্মান পাইয়া আসিয়াছে আজ কুকুর সেই সম্মান পাইল। তোমরা ধন্য হইলে।

সাঃ তুমি নিতান্ত নির্বোধ বলিয়া এমন কথা বলিলে। নিজলিঙ্গাপ্পা পলিটিসিয়ানদের কুকুর বলিয়া সারমেয় সমাজের যে অপমান করিলেন তেমন অপমান আমাদের এ পর্যন্ত আর কেহ করে নাই। 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' কথাটি যিনি প্রথম বলেন তাহাকে ক্ষমা করিতে পারি। নিজলিংপাকে ক্ষমা করিতে পারি না।

মাঃ দেশহিতৈষীদের কুকুর বলিয়া নিজলিঙ্গাপ্পা তোমাদের আকাশে তুলিলেন, আর তুমি বলিতেছ তিনি তোমাদের অপমান করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিড়ালদের সোস্যালিস্ট বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ সোস্যালিস্টদের বিড়াল বলিয়াছিলেন। বিড়াল-সমাজের তখন কি আনন্দ, কি গর্ব। শুনিয়াছি কয়েকটি বিড়াল বঙ্কিমের বাড়ীর সব ইন্দুর উদরস্থ করিয়া তাঁহার গ্রন্থসংগ্রহকে অটুট রাখিয়াছিল।

সাঃ বিড়াল ভাই তুমি সোস্যালিস্ট হইতে পার, কিন্তু তুমি বড় অবোধ। প্রভু-ভক্ত কুকুর যদি প্রভুদ্রোহী, বিশ্বাস-ঘাতক পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তুলিত হয় তাহা হইলে আমাদের অপমানের আর বাকী রহিল কি। রবিঠাকুর আমাদের সোস্যালিস্ট বলেন নাই। কিন্তু তিনি এমনকি বঙ্গীয় নেড়ি কুকুরের প্রভুভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। 'মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হত না রাতে। তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।' মনে হইতেছে অবিদ্যা-বিশারদ তোমার প্রভু রবিঠাকুরের 'পুনশ্চ' কোনদিন পড়ে নাই। আমরা নরকে যাইতে প্রস্তুত। পলিটিসিয়ান হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমরা কিঞ্চিৎ লোভী হইতে পারি। আমরা বিশ্বাসঘাতক নই। পলিটিসিয়ান বিশ্বাসঘাতক।

মাঃ তবে কি তুমি বলিতে চাও যে আমাদের দেশহিতৈষীরা অর্থাৎ পলিটিসিয়ানরা এখন কুকুরের পাঠশালায় বিশ্বস্ততা ভদ্রতা শিখিবে? কুকুর পলিটিসিয়ানদের মানুষ করিবে?

সাঃ পলিটিসিয়ানদের মানুষ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই, কুকুরেরও নাই। পলিটিসিয়ানরা মানুষ হইবে না, কারণ মানুষ হইলে পলিটিসিয়ান হওয়া যায় না। যে পলিটিসিয়ান বিশ্বাসঘাতক নয়, সে আত্মঘাতক। এমন আত্মঘাতক পলিটিসিয়ান যে দেশে একেবারে নাই তাহা নহে। তবে সংখ্যায় তাঁহারা প্রায় অঙ্গুলিমেয়।
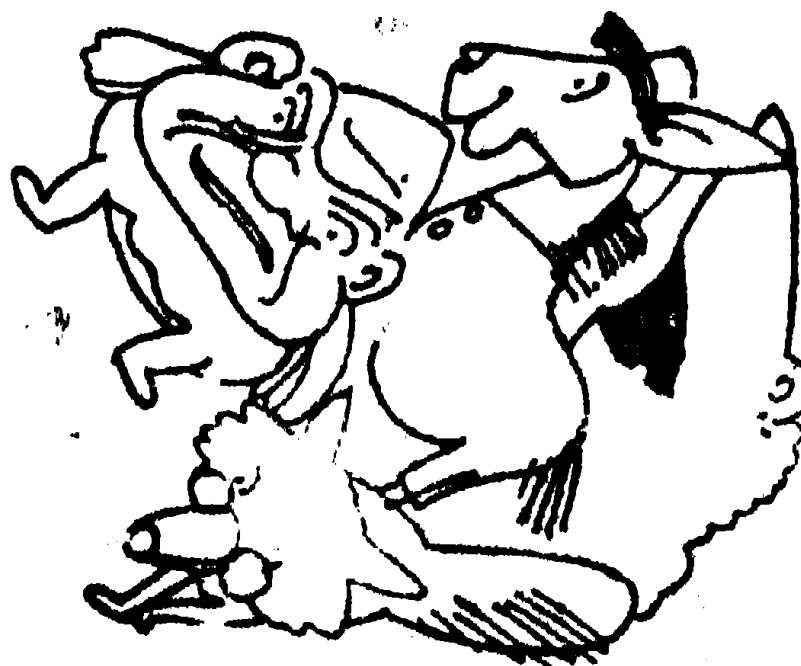
মাঃ কুকুর ভাই, তুমি আমাকে আজ অনেক কিছু শিখাইলে। পলিটিসিয়ানরা যে কুকুরেরও অধম তাহা ভাবিতাম না। আজ ভাবিলাম।

সাঃ তুমি আবার কুকুরের অবমাননা করিলে। পলিটিসিয়ানরা কুকুরেরও অধম বলিলে বুঝায় কুকুরও অধম, পলিটিসিয়ানরা আরওঅধম। বিদ্যাসাগরের কথামালার দুই একটি কুকুর মন্দস্বভাব। তুমি তাহাদের দেখিয়া আমাদের জাতির বিচার করিও না। কিন্তু করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর কুকুরের মাহাত্ম্যও বড় কম দেখান নাই। কথামালায় একটি সন্দর্ভে একটি কুকুর একটি কুক্কুটকে এক কপট শৃগালের হাত হইতে রক্ষা করিল। পলিটিসিয়ানদের মধ্যে কপট শৃগাল শৃগালীর অভাব নাই। অসহায় কুক্কুটের সংখ্যাও তাহাদের মধ্যে বড় কম নয়। কিন্তু কৈ, তাহাদের মধ্যে ত' এই কুকুরটির মত কোন পরার্থপর প্রাণী ত দেখিলাম না। পলিটিসিয়ান শিয়াল আছে, কুক্কুট আছে, কুকুর নাই।

মাঃ আমি কথামালা পড়ি নাই।

সাঃ আমিই কি পড়িয়াছি? প্রভুর কাছে এই সব শুনিয়াছি। তোমার প্রভু অবিদ্যা পড়িয়াছেন, অর কথামালা পড়েন নাই।

মাঃ আমার প্রভু অবিদ্যা পড়িয়াছেন, এমন কথা বলি নাই। ওভিড পড়িয়াছেন এই কথাই বলিয়াছি। যতদূর বুঝিয়াছি ওভিড এক রোমক লেখক। বিদ্যাসাগর বোধ হয় বাঙ্গালী।

সাঃ তোমার এ প্রভুটি কে বলত। তিনি রোমক সাহিত্য পড়েন অথচ বিদ্যাসাগরের কথামালা পড়েন নাই।

মাঃ পড়েন নাই একথা বলিতে পারি না। তিনি যাহাই পড়িবেন তাহাই তাঁহার বিড়ালের কানে কানে নিত্য আওড়াইবেন এমন ভাবিলে কেন। আর কথামালার কথাগুলি বিদ্যাসাগরের নিজের কথা নাও হইতে পারে। বিদ্যাসাগর কোন গ্রীস বা অন্য কোন ভাষায় রচিত গ্রন্থ হইতে ঐ কাহিনীগুলি লইয়া থাকিতে পারেন।

সাঃ তুমি দেখি প্রভুর কাছে অনেক কিছু শিখিয়াছ। তোমার প্রভু কি কম্প্যারেটিভ লিটারেচারের অধ্যাপক নাকি?

মাঃ তিনি কিসের অধ্যাপক জানি না। কেহ বলে ইংরাজীর কেহ বলে বাংলার। এখন বোধহয় কোন বিষয়েরই অধ্যাপক নন। কি একটা আগারের যেন কি একটা হইয়াছেন। নাম মনে আসিতেছে না। মনে একটু আসিলেও সব কথা কয়টি মার্জার জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিতে পারিতেছি না।

সাঃ কি বলিলে—আগার। ঠিক শুনিয়াছ? ভাগাড় নয়ত। আগার হইলে বোধহয় জাতীয় গ্রন্থাগার।

মাঃ জাতীয় গ্রন্থাগার আবার কি বস্তু?

সাঃ ইহা একটি রমণীয় উদ্যান। ইহা দেখিলে মিল্টন প্যারাডাইস লস্ট লিখিতেন না। কত অভিশপ্ত অ্যাডাম, কত অভিশপ্তা ঈভ এই উদ্যানে প্রভাতে সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছেন। শুনিয়াছি এই উদ্যানের সরম্য অট্টালিকাটিতে অনেক গ্রন্থ রক্ষিত আছে। সেখানে নাকি অনেক বিদ্যার্থীর সমাগম। তোমার প্রভু বোধ হয় ঐ উদ্যানের প্রধান রক্ষক। ঐ কাজ করিতে কোন বিষয়েরই অধ্যাপক হইবার প্রয়োজন হয় না। সরীসৃপাদির প্রাণসংহার করিবার যোগ্যতা থাকিলেই চলে।

মাঃ আমার প্রভুর কথা ছাড়িয়া দাও। পলিটিসিয়ানদের কথা বল। উহাদের সম্বন্ধে তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় আমোদ হইতেছে। আচ্ছা, পলিটি-সিয়ানরা যদি কুকুর না হয় তাহা হইলে তাহারা কি?

সাঃ পলিটিসিয়ানরা পলিটিসিয়ান। তাহারা মানুষ না, দেবতা না, দানব না পশু না। মানুষের একটা চরিত্র আছে, দেবতার চরিত্র আছে, দানবের চরিত্র আছে, পশুর চরিত্র আছে। পলিটি-সিয়ানদের কোন চরিত্র নাই।

মাঃ পলিটিসিয়ানদের তুমি প্রাণীজগৎ হইতে বিতাড়িত করিলে। তাহা হইলে কি পলিটিসিয়ানরা উদ্ভিদ-জাতীয় বস্তু?

সাঃ পলিটিসিয়ানদের উদ্ভিদ বলিলে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আত্মা কষ্ট পাইবে। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, পলিটি-সিয়ানদের প্রাণ নাই।

মাঃ পলিটিসিয়ানদের প্রাণী জগতে স্থান নাই, উদ্ভিদ-জগতে স্থান নাই। তাহা হইলে তাহারা কোথায় যাইবে। তোমার হিসাবে ত' তাহাদের নরকেও স্থান নাই। নরকের বাসিন্দারা সকলেই মানুষ।

সাঃ আসল কথা, আজ ভারতীয় পলিটি-সিয়ানরা এক অদ্ভুত পদার্থ হইয়া উঠিতেছে। যদি উহারা অপদার্থ হইত দেশের কোন ক্ষতি হইত না। অপদার্থ মানুষ কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না। পলিটিসিয়ান অনাসৃষ্টির কর্তা আমাদের জাতীয় সর্বনাশের সংগঠক। যদি বল, এমন সর্বনাশক হইতে হইলে তাহাকে আগে পশু হইতে হইবে তাহা হইলে বলিব সে বহু পশুর সমাহার, পশুত্বের নির্যাস।

মাঃ তাহা হইলে সেই নির্যাসের মধ্যে কুকুরেরও উপস্থিতি আছে ধরিয়া লইতে পারি।

সাঃ হ্যাঁ, বলিতে পার, পলিটিসিয়ান কুকুরের ন্যায় লোভী। যদিও কুকুরের ন্যায় সে বিশ্বাসী নয়। সে শৃগালের ন্যায় চতুর। সরীসৃপের ন্যায় কুটিল গতি, বিষধর। বিড়ালের ন্যায় কলহ-প্রিয়। শশকের ন্যায় দ্রুতগামী তীক্ষ্ণ-দন্ত। ভেকের ন্যায় সদা-মুখর। আবার মূষিকের ন্যায় খলস্বভাব, গর্দভের ন্যায় হিতাহিতজ্ঞানহীন, ছাগলের ন্যায় নির্বোধ।

মাঃ একটি পলিটিসিয়ান নির্মাণ করিতে দেখিতেছি অনেক পশুর প্রয়োজন।

সাঃ কিন্তু সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অশ্ব, এই চারটি শ্রেষ্ঠ পশুর কোন উপাদান এ-যুগের ভারতীয় পলিটিসিয়ানদের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না।

মাঃ নির্জলিঙ্গাপ্পা দেখিতেছি কুকুর সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞ, পলিটিসিয়ানদের সম্বন্ধেও তেমন অজ্ঞ। এখন বুঝি-তেছি নিতান্ত অজ্ঞ না হইলে পলিটি-সিয়ানদের তিনি কুকুর বলিতেন না। কিন্তু তুমি পলিটিসিয়ানদের যে স্বরূপ বুঝাইলে তাহাতে আমার বড় দুর্ভাবনা হইতেছে। এই পলিটি সিয়ানরাই ত দেশ-হিতৈষী, ইহারাই ত দেশ চালাইতেছেন, রাষ্ট্রের রজ্জু ধরিয়া আছেন। ইঁহারা যদি এমন পশু-স্বভাব হন তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ কি হইতে পারে।

সাঃ পলিটিসিয়ানরা তাঁহাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত। দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার সময় তাঁহা দের নাই। আর এতগুলি পলিটি সিয়ানের ভবিষ্যৎ গড়িতে হইলে দেশের ভবিষ্যতের জন্য আর জায়গা থাকে না।

মাঃ দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। তোমার আমার দশা কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি।

মাঃ কুকুর বিড়ালের ভ[illegible] প্রাচীনকালে মধ্যযুগে রাজায় র[illegible] যুদ্ধ, হইত। করিতেন, কিন্তু কুক[illegible] এক টুকরা মাংস পাইত, বিড়াল একটু দুধ বা মাছের কাঁটা হইতে বঞ্চিত হইত না।

মাঃ কিন্তু এখন ত রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়, এখন ত পলিটিসিয়ানে পলিটিসিয়ানে যুদ্ধ। রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি বল্লম গদা প্রভৃতি দিয়া যুদ্ধ করিত। পলিটিসিয়ানরা ত সর্বত্রই যুদ্ধ করিতেছে—পথে ঘাটে মাঠে হাটে বাজারে সর্বত্রই বোমা ফাটিতেছে, ছোরা, বন্দুক, লাঠি চলিতেছে। আমরা প্রাণ হারাইব না এই আশ্বাস কি করিয়া দিতেছ।

সাঃ সর্বদিক বিচার করিয়াই এই আশ্বাস দিতেছি। পলিটিসিয়ানরা আত্ম-রক্ষার জন্য কুকুর পুষিতে বাধ্য হইবে। বাড়িতে কুকুর রাখিবে, রাস্তায় কুকুর লইয়া চলাফেরা করিবে। সেকালে তেমন রাজাদের অশ্বশালা থাকিত, হস্তীশালা থাকিত, এখানে পলিটি-সিয়ানদের কুকুরশালা থাকিবে।

মাঃ এত ভাই কুকুরের কথা বলিলে, বিড়ালের ভাগ্যে কি আছে বল। কবি-কথিত কয়েক টুকরা মাছের কাঁটার সফলতা আর কি আমাদের লাভ হইবে।

সাঃ হইবে। পলিটিসিয়ানদের মত ও মতলব যাহাই হউক না কেন তাহারা সকলেই সোস্যালিস্ট বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে বাধ্য। গরীব দেশের পলিটি-সিয়ানদের, সোস্যালিস্ট না হইয়া উপায় নাই। কেহ কার্ল মার্কসের নামে সোস্যালিস্ট, কেহ গান্ধীর নামে সোস্যালিস্ট, কেহ নেহরুর নামে সোস্যা-লিস্ট। আবার কেহ কাহারও নামের ধার না ধারিয়া একটি সুদীর্ঘ হাই তুলিয়া সোস্যালিস্ট। বঙ্কিমচন্দ্র বিড়ালকে সোস্যালিস্ট বলিয়া চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তোমার এই পলিটিসিয়ানদের রাজ্যে, বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে ভয় নাই। তুমি একটি দুধের বাটিতে মুখ দিলে তোমার সামনে আর একটি দুধের বাটি রাখা হইবে। তুমি যখন মাছের কাঁটা চিবাইবে তখন তোমাকে আস্ত মাছ ভাজা খাওয়ান হইবে। তখন দেখিবে সব পলিটিসিয়ানই বিড়াল হইয়া যাইবে। পলিটিসিয়ানদের সেই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত হইবে বিড়ালের স্বর্গ। আর সেই স্বর্গের হাজার হাজার দুয়ারের রক্ষী হইবে দেশের হাজার হাজার কুকুর। হরি বল, হরি বল। ঐ দেখ সেই মহাজনদের লগন আসিতেছে। ঐ শোন সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, পরলোকে বাজে জয়ডঙ্কা, আর সেই শুভ কলরবের মধ্যে শুনি-তেছি বিড়ালের হৃষ্ট কণ্ঠস্বর, 'ম্যাঁও' আর কুকুরের অভয় রব 'ঘেউ ঘেউ'।

সাধু শিখণ্ডী

প্রণয় শূর

মরুভূমির মাঝখান দিয়ে উটের পিঠে চড়ে চলেছে বণিক। ভাবতেই পারেনি অতো দ্রুত সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে। আলোর বুক চিরে উড়ে যাচ্ছে পাখিদের কালো ডানা। ভাগ্য ভালো। কাছাকাছি পেয়ে গেল সরাইখানা। রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেয়া যাবে। সারা দিনের ক্লান্তির পর বড় তাড়াতাড়ি ঘুম নেমে আসে বণিকের চোখে। কিন্তু? কিন্তু কি, রাতজাগা উটের পায়ের আওয়াজ আর খেজুর পাতার শব্দ, বালিয়াড়ি থেকে উঠে আসছে বাতাস, সামনে তাঁবুর মতো একটা অস্পষ্ট কিছুর ভেতর থেকে যাযাবর মেয়েটির ধারালো দাঁতের খিলখিল হাসি।

গল্প বলার সময় সাধুর মুখটা কেমন রাজপুত্রের মতো মনে হয়। রত্না কখনো রাজপুত্র দেখেনি। সে জানে সূর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করে তার দীপ্ত দেহ। অথচ এই ফকিরকেই তার রাজপুত্রের মতো মনে হয়। মন্ত্রসিদ্ধ আংটির গল্প শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রত্না। ফকির যখন গল্প বলে, গাঢ় সুমিষ্ট রসে পরিপূর্ণ হয়ে যায় রত্নার বুক। সে যেন টের পায়! চাঁদ সদাগরের গল্প ফকির কেমন সুন্দর করে বলে। একদিন রথের মেলা থেকে কেনা নকল গয়নাগুলো সর্বাঙ্গে পরে নেয় রত্না। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। অল্প অল্প নাচ পায়ের পাতায় এসে জমতে থাকে। ঘন কাজলমাখা চক্ষু দুটি চেয়ে থাকে। কিন্তু কোথায় বা সেই দেবসভা কোথায় বা স্বর্গলোক? সাধু বলেছিল শ্মশানে বসে থাকতে থাকতে এক-এক সময় মনে হয়, যদি একটা মৃতদেহের মধ্যেও প্রাণসঞ্চার করতে পারতাম। একজন মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে, সেই সুখ নিয়ে আমি মরে যেতাম। বেহুলা পেরেছিল। কেমন সুর করে বলে সাধু, পালংসইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা। এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার চাঁদের কথা।

তুমি পারো না, এমনি করে আমায় তুমি গল্প বলতে পারো না কুমার: যা আমি তোমার মুখে শুনতে চাই, সব যে সাধুই বলে দেয়। তুমি বুঝতে পারো না, আমি তোমার কাছে শুনতে চাইছি। তুমি অমন চুপ করে বসে থাকো কেন? সাধু আমাদের সামনে না থাকলে তুমি তো অনেক কথা বলো, সাধু এলেই তুমি কেমন বিহ্বল মুখে স্তব্ধ হয়ে যাও, যেন একটা কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করার শক্তি তুমি হারিয়ে ফেলেছ।

ফকির বলে যায়, ইতিহাস লোককথা পুরাণ আর কিংবদন্তী। দুজনে তার সামনে বসে শোনে, কুমার আর রত্না। সব কথা ফকিরই বলে। কতো বয়েস এই ফকিরের? ফকির বলে, আমি জানি না, তোমাদেরই বা জেনে কি লাভ? আমি তো এখানে বেশি দিন থাকবো না। চলে যাবো। কোথায় যাবো? কোথায় যাবো তা তো জানি না। যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম কোথাও যাবো বলে তো বেরোই নি। তবে এই শ্মশানটা আমার ভালো লাগছে। এর আগে আর কোন শ্মশানে এরকম ছিলাম না। তারাপীঠের শ্মশানে এক অমাবস্যা রাতে একদল হিজড়ের সঙ্গে...নাঃ, সেসব শুনতে তোমাদের ভাল লাগবে না।

শ্মশানের ধারে ছোট্ট একটা ছাউনিতে থাকে ফকির।

আজ থেকে ছমাস আগে রত্নার মাকে এই শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছিল দাহ করার জন্যে। মার মৃতদেহের পাশে বসে রত্না যখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, কে যেন তার মাথার ওপর হাত রাখে। মুহূর্তে সমস্ত শরীরটা তার কেঁপে ওঠে। 'কাঁদিস না মা।' মুখ তুলে দ্যাখে, সন্ন্যাসীর মতো এক পুরুষ, পরণে যদিও গেরুয়া নেই, ছেঁড়া ধুতি, শতচ্ছিন্ন একটা পাঞ্জাবী। লোকটা তার পাশে বসে পড়ে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল রত্নার। কাকে দেখছে সে? কে এই লোকটা?

'হ্যাঁ, ঐ দিনই প্রথম আমি এই শ্মশানে এসেছিলাম। আমি তো জানতাম না রত্না তোদের বাড়িটা ঠিক কোথায়. কিন্তু দ্যাখ, পরদিন ঠিক তোদের বাড়িটা আমি খুঁজে পেয়ে গেলাম। সেদিন তোদের বাড়ির উঠোনে বসে থেকেই আমার কেমন মনে হোলো এই শ্মশানটায় কিছুদিন থেকে যাওয়া যাক।'

'এরপর আর একদিনও তুমি আমাদের বাড়ি যাওনি।'

'না, যাই নি, আমি তো কারো বাড়ি যাই না।'

'একদিনই বা গিয়েছিলে কেন?'

'এর উত্তর আমার জানা নেই।'

কুমার জিজ্ঞেস করে, 'সাধু তুমি কিন্তু বলোনি, কেন তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে?' সাধু কুমারের এই প্রশ্নে যেন একটু অসন্তুষ্ট হন, 'সেটা হল তোমার তো কোনো লাভ নেই কুমার। তাছাড়া এই প্রশ্ন তুমি তো আমাকে আগেও করেছ। তুমি দেখেছ আমি এর উত্তর দি না। তবু কেন তুমি এটা জানতে চাও?' এই কথা বলে ছাউনি থেকে বেরিয়ে যায় ফকির। রত্না কুমারকে বলে, 'সাধুকে আঘাত দিয়ে তোমার কি আনন্দ হয় কুমার?' কুমার একটু হাসে, 'যারা আঘাত পায় তারা সাধু হোতে পারে না।'

একদিন সাধু বলেছিল, 'আচ্ছা তোমরা আমার এখানে এসে আমার কথা শুনতে চাও কেন? তোমরা তো দুজনে দুজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যেই এখানে আসো। অথচ তোমরা আমার কাছে গল্প শুনতে চাও, আমি তোমাদের সামনে বসে থাকতে চাই না, তোমরাই আমাকে বসিয়ে রাখো। তোমরা চলে যাবার পর আমার খালি মনে হয়, নাঃ কাল থেকে আর তোমাদের সামনে বসব না। পরদিন তোমরা এলে আবার আমি তোমাদের সামনে এসে বসি। তোমাদের সময়টা আমি রাক্ষসের মতো গিলতে থাকি। তাই না রত্ন?' রত্না জানে, তা নয়। রত্না বলে, 'তুমি আমাদের সামনে না থাকলে, যদি কেউ আমাদের দেখে ফেলে?' কুমার রসিকতা করার চেষ্টা করে, 'তুমি হোচ্ছ আমাদের বডিগার্ড।' রত্না শুনে খুশী হয় না। সাধুর মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না।

হ্যাঁ, প্রায় তাই। ওদের আড়াল করার জন্যেই ফকিরকে থাকতে হয়। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই চলে আসে এই ভাঙ্গা কুঠিতে। ফকিরকে আসতেই হয়। যে ফকির সূর্যোদয়ের রাস্তা ধরে চলে যায়, কাঞ্চন অয়েল মিল, সাবানের ফ্যাকটারি, জে কে টেকসটাইল, ধানক্ষেত, মহুয়াবন, পার হোয়ে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে শ্মশান থেকে শ্মশানে, সেই ফকির সূর্যাস্তে ফিরে আসে নিজের ছাউনিতে, যে ছাউনি বারবার ভেঙ্গে যায়, বারবার নিজের হাতে ছাউনিটা গড়ে তোলে। কুমার বলে, 'তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার ছিলে?' ফকিরকে আসতেই হয়। কুঠির সামনে ফকির বসে থাকে। ভেতরে, একটু আড়ালে রত্না আর কুমার, মুখোমুখি বসে থাকে, গল্প করে, অন্ধকার ঘন হয়, ওরা পরস্পরকে প্রাণভরে আদর করে। রত্নার বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে থাকে কুমার, কাটা আনারসের মতো রঙের বুক থেকে মুখ তুলে চায় কুমার, আঁধারে লাল হোয়ে যায় রত্না, চিৎকার শোনা যায়, 'বল হরি, হরি বোল,' চমকে ওঠে দুজনেই, একসঙ্গে ডাক দেয়, 'সাধু'। ফকির এসে ছাউনিতে ঢোকে 'কি হোলো, ভয় পেলে নাকি?' কুমার বলে ওঠে 'না, এমনিই ডাকছিলাম, তোমার গল্প শুনব।' ফকির অল্প হেসে কথা শুরু

করে। রত্না তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ফকির যখন কথা বলে, রত্নার শরীরে শুরু হয়ে যায়, পুলকিত সূর্যগাহন। কুমার ঘড়ি দ্যাখে। দুজনে একসঙ্গে উঠে পড়ে। দুজন দু পথে চলে যায়। যে পথে রত্না যায়, সে পথে অনেক দূর পর্যন্ত পেছন পেছন আসে ফকির। রাস্তাটা একেবারে নির্জন। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। তারপর একটা সময় ইস্টিশনের আলো দেখা যায়, পি ডবলিউ ডির বাংলোর কাছে রাস্তায় টিউব জ্বলছে, পাশেই সরকারী তন্তুজ-এর ঝলমলে দোকান, ফকির আবার অন্ধকার রাস্তায় ফিরে যায়, এই রাস্তাটুকু প্রতিদিন সে রত্নাকে অনুসরণ করে, বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেই চলে, অন্ধকার রাস্তায় একা একটি মেয়ের কতো রকমের বিপদ হোতে পারে, তাই পেছন পেছন আসে ঐ পুরুষ যানুষটা টিউব লাইটের নীচে যে কোন দিন যায় নি।

সাধুর কাছে কুমারকে রত্নাই নিয়ে এসেছিল। কুমার আর রত্না, দুজনের মধ্যে প্রেম আর ভালোবাসা। দুজনের বাড়িতে দুজনেরই ঢোকা বারণ। রত্না হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর আর কলেজে ভর্তি হয়নি। কুমার আগেই কলেজে পড়ে। কুমারের বাবার জঙ্গলের ব্যবসা, সুদের কারবার, অনেক টাকা। তার বাবা তাকে বলে দিয়েছে, 'ঐ মেয়েটার সঙ্গে পথে ঘাটে যদি তোমাকে কখনো দেখি, মনে রেখো এই বাড়ির দরজা তোমার জন্যে বন্ধ।' ঐ বাড়িতে কোথায় কোথায় টাকা আছে কুমার জানে, কিন্তু সেই টাকায় কোন দিন সে হাত দিতে পারবে না এই ভয় তার আছে। রত্নাকে তার চাই, ঐ টাকাও তার চাই। সমস্ত দিনে দুজনের দেখা হয় না, দেখা হওয়া বড় কঠিন। তাই রত্না যেদিন ঐ ফকিরের নিরাপদ ছাউনিতে তাকে নিয়ে আসে, এই গোপন আশ্রয়টাকে সে আঁকড়ে ধরে।

রত্নার বাবা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। কোলকাতা যাওয়ার পথে একদিন ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে পা দুটো কাটা যায়। ঘরে বসে রুগী দ্যাখেন। ওষুধ তৈরী করে দেয় রত্না, বাবাকে ছেড়ে কখনো বেরোতে পারে না। ঐ পা কাটা যাবার পর থেকেই সন্ধ্যের মুখে হরেনবাবুর ঘুম পায়। ঘন্টা দুয়েক পরে তাঁর ঘুম ভাঙে। তাই যেদিন রত্না দেখল ঐ ফকির বড় প্রসন্ন তার প্রতি, সে নিয়ে গিয়েছিল কুমারকে। সাধুকে বলেছিল, 'আমরা রোজ সন্ধ্যে হলে এখানে এসে বসব, তুমি আমাদের পাহারা দেবে সাধু? সাধু রাজী হয়ে যায়। কি ভেবে রাজী হয়, সাধুই জানে। শ্মশানকে কেউ সন্দেহ করে না। যেদিক দিয়ে ডেডবডিগুলো ঢোকে তার উল্টোদিকে থাকে সাধু। সাধু বলেছিল, 'লংকার উত্তর দ্বারে চণ্ডীর দেউল। তার সামনে বসে থাকেন মহেশ্বর। আমিও তেমনি করে তোমাদের দ্বার রক্ষা করব।' শ্মশানের সামনে দিয়ে সন্ধ্যেবেলা সাঁওতাল মেয়েরা গান গাইতে গাইতে ফিরে যায় তাদের পল্লীতে, সাঁওতালি গানের সুরের মধ্যে রত্না আর কুমার ডুবে যায় একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে। শালের পাতা থেকে নেমে আসে নীল আলো, রত্নার হাতের উপর, তার দশ আঙুলে খেলা করে নীল আলো। তার কামনার খর-শাণিত রূপ ফুটে ওঠে রত্নার শরীরে। মাদলের শব্দ আসছে দূরে থেকে। সন্ন্যাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় রত্নার চিবুকখানি ব্যাকুল হোয়ে ওঠে, সেই বিষন্ন উন্মীলন দেখতে পায় না কুমার।

'কোথায় ছিলি রতন?'

'তোমায় তো বলেই গেলাম, সাবিত্রী মন্দিরে গেছি না।'

এতক্ষণ কি করছিলি?

'সারাদিন তো বাড়ি বসে থাকি, তবু একটু বেরোলেই তুমি এমন করো না।'

'রাগ করিস না রতন। আমি তো তোর জন্যে কিছু করতে পারি না। তোর মা থাকলে তবু...।'

'আমি কি তোমার জন্যে কিছু করি না বাবা?'

'তা তো বলিনি। এত করিস বলেই তো তোকে নিয়ে আমার এত ভয় রতন। সর্বক্ষণ চই কাছে কাছে থাকিস, তাই একটু দেখতে না পেলেই কিরকম অস্থির লাগে।

রতন আর কথা বলে না। বাবার পাশে এসে বসে। হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটো নেই। রতন বাবার কাটা পায়ের দিকে চেয়ে থাকে। দেখতে দেখতে ফকিরের পা দুটো মনে পড়ে। ছেঁড়া কাপড়ের তলায় শীতল রিক্ত দুটি পা। ঐ দুটি পায়ের উপর নিজের পা দুটি রাখলে, নিজের পা দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরলে, রত্নার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। দ্রুত বাবার পাশ থেকে রত্না উঠে যায়। গিয়ে উনুন ধরায়, উনুনের ধোঁয়া থেকে উঠে আসে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা চা খাবে?' বাবা বলেন, 'তুই খেলে আমিও খাবো।' চা তৈরী করে নিয়ে আসে রতন। বাপ-মেয়েতে বসে চা খায়। মনে পড়ে ফকিরকে সে বলেছিল, আমি যে তোমাকে রোজ পয়সা দি, সেই পয়সা দিয়ে তুমি কি করো?' ফকির বলেছে, 'চা খাই।' 'আর যখন টাকা দি?' 'সেই টাকা দিয়েও চা খেয়ে ফেলি, জানিস রত্না, আমার মা রোজ সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতো। উঠে চা করত। খেতাম আমি আর মা। মা চা খেয়ে স্নানটান সেরে পুজোয় বসত, আর আমি চা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম।' রত্না জানতে চায়, 'তারপর?' তারপর কি, সন্ন্যাসী আর কিছু বলে না।

কুমারের কঠিন নির্দেশ, 'আমি না এলে কখনো থেকো না ঐ শিখণ্ডীর কাছে।' কুমার আড়ালে সাধুকে শিখণ্ডী বলে। 'সাধু না ছাই, দ্যাখো গে কোথায় কি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।' রত্না প্রতিবাদ করে, 'ছি, ছি, মানুষকে তুমি এত অবিশ্বাস করো?'

'করি। কারণ আমার বাবাও আমাকে বিশ্বাস করে না।'

'কিন্তু আমি তো তোমায় বিশ্বাস করি।'

'সে জন্যেই তো আমি তোমার কাছে আসি। জানো, বাবা যদি কোনো দিন জানতে পারে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।'

'তোমার বাবার টাকা তোমার এত দরকার? তুমি লেখাপড়া শিখছো, নিজে রোজগার করতে পারবে না?'

কুমার কোনো কথা খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। কি বলবে সে? রত্না তো ঠিকই বলেছে। কিন্তু কি করে টাকা রোজগার করতে হয়, সে জানে না। বাবার জঙ্গলের ব্যবসা, সুদের কারবার কিছুই সে বোঝে না। শুধু বোঝে বাবার টাকা তার পেতে হবে এবং দিনের আলোয় রত্নার সঙ্গে দেখা করা চলবে না। এক এক সময় এই শিখণ্ডীর ওপর তার প্রচণ্ড রাগ হয়। কিসের জন্যে লোকটা সূর্যাস্তে ফিরে আসে? শুধুই ওদের দুজনের মুখ চেয়ে, নাকি শুধু রত্নাকে দেখবে বলে? যদি তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে? যদি শিখণ্ডী কোন দিন তার ভয়ের জায়গাটা জেনে ফেলে? যদি কোন দিন তার বাবার কাছে গিয়ে হাজির হয়? তার বাবার নিষ্ঠুরতার কথা সে জানে। তার ছোটবেলায় বাবা কুমারের মাকে ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে রেখে যেত। তার মা ছিলো খুব সুন্দরী। কুমার বড় হবার পর অবশ্য তিনি তা করেন না। এখন মা সারা বছর কোন না কোন অসুখে ভোগে, সারা বছর বিছানায় শুয়ে থাকে, সারাদিনে কারো সঙ্গে কোন কথা বলে না বহু বছর। মার চোখের দিকে সে তাকাতে পারে না। মা কি রকম বোবার মতো তার দিকে চেয়ে থাকে। বড় অসহায় লাগে নিজেকে। তখন রত্নাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। একদিন শিখণ্ডী বলেছিল, 'কুমার, তোমার মাকে তুমি কখনো কাঁদতে দেখেছো?' কুমার বলেছে, 'না, আমি কখনো দেখিনি মা কাঁদছে।' শিখণ্ডী পৃথিবীতে সব মায়েরই কোন না কোন কষ্ট থেকে যায়, মা'রা পৃথিবীতে শুধু কষ্ট পাবার জন্যেই আসেন। কোনো ছেলে কোন মায়ের দুঃখ দূর করতে পারে না।' তার মায়ের কি শিখণ্ডী সব জানে? শিখণ্ডী এই ঘর থেকে কি কোন দিন বেরিয়ে যাওয়া যাবে না?

'দ্যাখো রত্না আমি অনেক দিন দেখেছি তুমি শিখণ্ডীর দিকে চেয়ে আছো।'

'তাহলে চেয়ে থাকার মতো ওর কিছু আছে নিশ্চয়।'

'কিচ্ছু নেই। লোকটা বানিয়ে গল্প বলে, আর তুমি অবাক হোয়ে শোনো।'

'তুমি শোন না?'

'আমিও শুনি। আসলে শিখণ্ডীটা কথা বলতে শুরু করলেই ওর মধ্যে কী একটা ভর করে।'

'ভরে বিশ্বাস করো?'

'করি।'

'ভর কাকে বলে তুমি জানোই না। 'ভর' হলে মানুষকে ভয়ংকর দেখায়। আর ফকির

কথা বলার সময় ওর মুখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ে।'

'বাঃ, চমৎকার।'

'কেন, তোমার মনে হয় না?

'তুমি তো দেখছি শিখণ্ডীর প্রেমে পড়ে গেছ।'

'তার মানে ক্রমশঃ তুমি সাধুর কাছে হেরে যাচ্ছো।'

'হেরে যাবার কিছু নেই। আমি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার সঙ্গে প্রেম করেছি, তোমাকে আদর করেছি, আমিই ওর লোভটা বাড়িয়ে দিয়েছি।'

'এসব কথা বলো না কুমার। এতে আমাদের দুজনেরই পাপ হবে। আমরা দুজন দুজনকে পাবো বলেই, লোকটা আমাদের পাহারা দেয়। ওর কোন স্বার্থ নেই। লোকটা সন্ন্যাসী।'

নয়।

এখন কুমারের জন্যে রত্নার মনটা খুব খারাপ লাগছে। রত্না ভাবে কুমার আমাকে খুব ভালোবাসে বলে ফকিরের ওপর ওর এত রাগ। ফকির তো এখানে চিরদিন থাকবে না, তখন? কুমার ওকে শিখণ্ডী বলে, কথাটা শুনতে রত্নারও যে খুব খারাপ লাগে তা নয়। ওরও ভাবতে ভালোই লাগে, আর একটা লোকের উপস্থিতিতে ওরা প্রেম করছে, লোকটা ওদেরই সামনে একটু আড়ালে, ওদেরই সামনে অন্ধকারে, ওরা না ডাকলে লোকটা ওদের সামনে আসে না, লোকটার কাজ শুধু ওদের পাহারা দেয়া। জগতে কতো আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে। এভাবে কুমারকে রোজ সন্ধ্যেবেলা রত্না যে পেতে পারে কোন দিন কি সে ভেবেছিল? প্রতিদিন দীর্ঘ পথশ্রমে ধূলিমলিন সন্ন্যাসী, তারা তাকে 'সাধু' বলে, সে বলে 'ফকির', কুমার পেছনে ডাকে 'শিখণ্ডী'। তার বেশবাস ছিন্নভিন্ন। দেখে তো স্পষ্ট বোঝা যায় কোনো ধনীর ছেলে। জীবনের সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে চলে এসেছে। বড় দয়া তার, এক সন্ন্যাসী তাদের ভালোবাসার বন্ধু, তাদের উদারতম আশ্রয়। এই বুঝি ছিলো তার স্বপ্ন-কামনার রূপমূর্তি?

এই শ্মশানেরই আর এক কোণে পড়ে থাকে মধু পাগল। সারাদিন ভিক্ষে করে। এ রাস্তা দিয়ে যখনই কোনো মৃতদেহ আসে শববাহকদের পেছন পেছন দেখা যায় মধু পাগল আসছে। কোত্থেকে জড়ো ক'রে আনে শালপাতা। সারা রাস্তা টাটকা সবুজ শালের পাতা ছড়াতে ছড়াতে যায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। হয়তো শ্মশানেই শুয়ে ছিলো, তবু ঠিক বুঝতে পারে তিন মাইল দূরে থেকে একটা মৃতদেহ আসছে! সেই মধু পাগল হরেনবাবুর কাছে ওষুধ নিতে এসেছিল। রত্না তাকে ওষুধ বানিয়ে দ্যায়। ওষুধটা হাতে নিয়ে বলে, 'শোন মা, একটু বাইরে আয়।' বাইরে এলে মধু পাগল ফিসফিস করে বলে, 'ফকিরের ঘরে কাল যাসনি কেন? তোর বর এসে বসেছিল। ও ব্যাটা ফকির নারে, ব্যাটা দেবতা। ওর কাছে গেলে তোর মঙ্গল হবে। দেবতার ওপর রাগ করতে নেই।'

কুমার এসে বসেছিল কাল। সত্যিই রাগ করে যায়নি রত্না। কিন্তু মধু পাগল এসব জানে কোত্থেকে? সাধু তো তাকে বলতে পারে না। কে জানে? জগতে কে যে কোথায় কি জাল ফেলছে! কুয়াশার মতো আকাশ ফুঁড়ে কালো মেঘ উঠে আসে। পরদিন বিকেলটা যেন আর শেষ হতে চায় না। ছটফট করে রত্না। কখন দিনের আলো ফিকে হয়ে আসবে? কখন গিয়ে পৌঁছবে ফকিরের ছাউনিতে? কুমার কাল এসেছিল। ছেলেটা সত্যিই তাকে ভালোবাসে। এত ভালোবাসা আছে বলেই এত তার রাগ তার শিখণ্ডীর ওপর। এটা বোঝে না শিখণ্ডী আছে বলেই সে আমাকে পায়। শিখণ্ডী চলে গেলে কাল কোথায় দেখা হবে আমাদের? এতবড় পৃথিবীতে আমাদের লুকোবার যে একটুও জায়গা নেই।

আসে না। কুমার আসে না।

রত্না বসেই থাকে। ফকির উঠে আসে রত্নার সামনে। গতকাল কুমার এসেছিল, রত্না আসেনি, আজ রত্না এসেছে, কুমার আসেনি। একটা মৃতদেহ এসে ঢোকে। হঠাৎ ছাউনিতে উঁকি দিয়ে মধু পাগোল বলে, 'ফকির আছো, আছো নাকি?' ফকির রত্নাকে বলে, 'তুমি একটু বোসো, আমি এক্ষুনি আসছি, মধুকে বাইরে বসিয়ে রাখছি, ভয় নেই।' কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে ফকির।

'সাধু আমি চাইছিলাম তুমি এক্ষুনি ফিরে আসো, আর ঠিক তক্ষুনি তুমি ফিরে এলে।'

'কতো দিন ধরে আমার বাড়ির লোকেরা চাইছে আমি ফিরে যাই, আমার আর ফেরা হয় না।'

'কেন যাচ্ছো না?'

'আর ফেরা যায় না বলে।'

'আচ্ছা সাধু, ও আজ এলো না কেন?'

'তোমাদের কি হয়েছে বল তো?'

'ও আমার ওপর রাগ করেছে।'

'তোমার ওপর তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ, আমি তো কাল আসিনি, তাই।'

এক উদাস মায়াময় কণ্ঠে ফকির ডাক দ্যায়, 'রত্না'। রত্না'। রত্না চোখ তুলে ফকিরের দিকে চায়, 'কি সাধু?'

তুই মেয়েটা বড় ভালো রত্না।'

'সাধু তোমার চোখে জল?'

ফকির রত্নার আরো একটু কাছে এগিয়ে আসে। বলে, 'এইমাত্র যে মেয়েটাকে পোড়াতে নিয়ে এসেছে... মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে।' ফকির বাকিটা বলে না যে, মেয়েটা ঠিক তোর মতো দেখতে। রত্না ফকিরের গা ঘেঁষে বসে। ফকিরের গা থেকে কি একটা বুনো লতার গন্ধ উঠে আসে। কে যেন ভেতর থেকে বলছে, সতর্ক হও, নিজেকে রক্ষা করো। শিরশির করে ওঠে মায়া রাত্রির মোহ। জীবনের মাণিক্য উদ্ধার করতে হবে। এখনো অনেক দিন বাঁচতে হবে। সাধুর বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে নত হয় রত্না। আশা শঙ্কা অনিশ্চয়তায় আহত রত্না! ফকিরের এক মাথা লম্বা চুলের মধ্যে তার পাঁচ আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে চুলগুলো টানতে থাকে। ফকিরের মাথা ঝিমঝিম করে। তার মাথার নোংরা চুল থেকে পাঁচটি রূপসী আঙুল নেমে আসে তার কপালের উপর, জোড়া ভুরুতে, তার ঠোঁটে, তার দাড়িতে। এই আমি তোমাকে দিলাম, আমার সর্বস্ব দিলাম, আমাকে নাও, আমাকে লুণ্ঠন করো, তোমার শরীরটা আমাকে দাও, দাও তোমার গা থেকে অনন্তকালের ধুলো মুছে দি, এসো দুজনে একসঙ্গে স্নান করি, এসো দুজনে একসঙ্গে দিঘির জলে নেমে যাই। আমি নারী, আমি রূপান্তরিত হই। আমাকে ব্যবহার করো। অসাধ্য সাধন করো। আমি তোমাতে অর্পিত হই। আমার বাসনা পূর্ণ করো।

ফকির রত্নাকে স্পর্শ করে না।

পরপর আরো দু'দিন রত্না এসে ফিরে যায়। কুমার আসে না। এবং কুমারের নির্দেশও সে মান্য করে না, সে ফকিরের সঙ্গে একা বসে থাকে। ফকির গল্প করে। তার মা বাবা ভাইবোন সবই আছে তবু ঘরে থাকতে তার ভালো লাগল না। কুমার বলেছিল, লোকটা আমাদের, আমাদের যাদু করে ফেলেছে। ও যদি কোন দিন আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেয়, আমি শুধু সেটাই ভাবি। লোকটা যদি সন্ন্যাসীই হবে, ও আমাদের সঙ্গ চায় কেন?

কুমার কি আর আসবে না?

তাহলে কুমার কি ঠিকই বলেছে, সাধু আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে? ওর হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই? ওর জন্যেই কুমার আমাকে ভুল বুঝেছে? আমার ভুল ভেঙে আমাকে নিয়ে যাও কুমার। তুমি না পুরুষ মানুষ? অভিমান তোমাকে মানায় না কুমার। আমি যদি কোন অন্যায় করে থাকি, আমাকে বলো। আমি আর কক্ষনো যাবো না সাধুর কাছে। তুমি যদি বলো আমরা আর কখনো সাধুর কাছে যাবো না; তবু তুমি একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াও। তুমি দেখতে পাও না, সারা দিন আমি বাবার কাটা পা দুটোর সামনে বসে আছি। এসো, আমরা দুজনে সাধুর সামনে আমাদের হাত দুটো শক্ত করে ধরে দাঁড়াই। বলি, তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছ সাধু, এবার আমাদের বিদায় দাও।

এই সময় মধু পাগোল এসে বলে, 'মা, সাধু কাল একবার তোমাকে যেতে বলেছে।' কেন কেন, বাবো সাধুর কাছে? আমি তো সাধুর কাছে যেতাম না। সে আমাকে ডাকবে কেন? রত্না স্পষ্ট বলে দেয়, 'সাধুকে বলে দিও আমি আর কোন দিনই যাবো না।' রত্না ঘরে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণ পর কি খেয়াল হয়, আবার ঘর থেকে বেরিয়ে, বাড়ির উঠোন পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। দ্যাখে শিমুল গাছের তলায় মধু বসে আছে। ধীরে ধীরে রত্না তার কাছে এগিয়ে আসে, 'এখানে আছো কেন মধু?'

'বড় খিদে পেয়েছে মা, আর হাঁটতে পারি না, তাই বসে আছি এই গাছের

ভোলায়।' রত্না ঘরে ফিরে আসে। খুঁজে দেখে খাবার কিছু আছে কিনা। কিছু নেই। একটা আধুলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে মধুকে দিয়ে বলেঃ 'আট আনা পয়সা দিলাম, কিছু কিনে খেয়ে নিও।' মধু আধুলিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'জয় হোক মা। রাগ কমে গেলে কাল একবার সাধুর কাছে যেও।'

এক যুবকের সঙ্গে তার উচ্ছিন্ন যৌবনের নিবিড়তম সংযোগের স্মৃতি তার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নেমে যায়। কুমারের প্রেমমুগ্ধ রত্না। সে ভাবে শিখণ্ডীর প্রতি কুমারের এত ঈর্ষা কেন? তুমি তো আছো আমার হৃদয়ের গভীর গহনে, তবু কেন অন্তরে আমার এমন নিঃস্ব করে দাও। কী আনন্দ পরিহাস আর মাধুর্য ভরা ছিল আমাদের অনেক সন্ধ্যা। কোন ভুবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক সন্ন্যাসী। কেন সে ঢুকে পড়লো আমাদের জীবনের মধ্যে? এক ভবঘুরে ছন্নছাড়া বড় অন্যায়ভাবে ঢুকে পড়েছে আমাদের জীবনের মধ্যে। কিন্তু তিনিই তো উদ্ধার করেছেন আমাদের ঘুমন্ত ভালোবাসা। তোমার করস্পর্শেই তো আমি জেগে উঠলাম। তোমাকেও কি জাগিয়ে তুলিনি? তাঁরই সামনে আমরা পরস্পরের প্রতি প্রণয়লিপ্ত। তিনি নির্ণিমেষে চেয়ে আছেন। মন ভেঙ্গে যায় সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তুমি সেদিন আমাকে বলেছিলে 'ভালোবাসায় অনন্ত পুণ্য'। আমি তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম। আমাদের কল্যাণ কামনা করে তুমি কি সরে যেতে পারো না এখন? রহস্যময় কুমার কোথায় লুকিয়ে আছো চোরের মতো?'

স্তব্ধ শান্ত স্থির ঘুম নেমে আসে রত্নার চোখে।

পরদিন আবার সেই ছাউনিতে আসে রত্না। কুমার আজও আসে না। রত্না সাধুকে বলে, 'আজ তুমি একবার কুমারের কাছে যাও, আমি যে আর পারছি না সাধু।'

'তোর বাড়িটা আমি চিনেছিলাম, কুমারের বাড়ি কি চিনতে পারবো?'

'পারবে। তুমি ঠিক পারবে।'

'যাবো, তাহলে আজই তার খবর নিয়ে আসবো।'

রত্না আর কথা বলে না। ছাউনি থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। কিছুটা রাস্তা হাঁটার পর বুঝতে পারে আজও পেছনে পেছনে সাধু আসছে, রত্না হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। সাধু কাছে এলে, রাগে ফুঁসে ওঠে রত্না, 'সাধু তুমি ফিরে যাও, আর এসো না।'

'এই রাস্তাটুকু পার করে দি?' 'তোমায় কিছু পার করে দিতে হবে না, চাঁদের আলোয় আমি সব দেখতে পাচ্ছি।' 'ঠিক আছে, আমি ফিরে যাচ্ছি, সারা জীবন এমনি করে তোর চোখ খোলা থাক।'

এর পরদিন সন্ধ্যায় রত্না সাধুর কাছে আসেনি। নিশ্চয়ই কোনো খবর পায়নি। পেলে সাধু মধু পাগলকে তার কাছে পাঠাতো। এর আগে মধু পাগোল তো অনেকবার এসেছে। আজ কি আসতো না কোন খবর পেলে?

পাশের ঘরে বাবা ঘুমিয়ে আছেন।

এই ঘরটায় বাবার ওষুধের আলমারিগুলো। এই ঘরে রত্না উঠে আসে। ঘুম আসে না। আজ রাত বড় দীর্ঘ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে শালবন। ইঁদপুজো শেষ করে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে জ্যোৎস্নার ঘর গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে দল বেঁধে। জানালায় মধ্য ছাতা মাথায় পুরুষ আর মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছে রত্না। বড় সুখী এরা কেমন সুন্দর এরা বেঁচে আছে। মধ্যরাতে জ্যোৎস্নায় শালবনের ভেতর দিয়ে লাল শাড়িপরা মেয়েরা ছাতা মাথায় গান গাইতে গাইতে চলেছে। শালের জঙ্গলে বেজে উঠছে হারমোনিয়ম। কখনো গান, একটানা একই সুরে গান।

কোলকাতায় রত্না বেশ কয়েকবার গিয়েছিল। বাবাকে দেখতে যেতো। হাসপাতালে। একদিন আই ডিপার্টমেন্টে দেখেছিল, ছোট্ট একটা বোর্ডে লেখা আছে, এখানে চোখের জল লওয়া হয়।' কথাটা পরে সে কুমারকে বলেছিল, কুমার বোঝে নি ঐ কথাটার অর্থ। কিন্তু সেদিন সাধুকে বলার পর সাধু কতো কথা তাকে বলেছে। বাড়ি ফিরে এসে তার মনে হয়েছে, এমনি কোরে গোটা জীবনটা যদি সাধুর কথা সে শুনতে পেতো। মানুষটার কন্ঠস্বরে এত স্নেহ আছে তার জানা ছিলো না। একদিন হাসপাতালে ডাক্তার তাকে বলেছিলেন, 'পা দুটো বাদ না দিলে তোমার বাবাকে আমরা বাঁচাতে পারতাম না, এরপর তুমিই পারো ও'কে বাঁচিয়ে রাখতে তুমি পারবে।' ঠিক ডাক্তারের সেই গলার মতো এই সাধুর গলায়ও সে নিজের ওপর গভীর আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। কোলকাতার হাসপাতালে বড় বড় গাছগুলো তার ভালো লাগে নি, এই শালবনের গাছের মতো নয় ঐ গাছগুলো। সাধু ঠিকই বলেছে, 'আসলে কি জানো, এখানকার এই গাছগুলোর দিকে চাইলেই শুধু বোঝা যায় জীবনটা কতো বড়, তোমার সামনে জীবনটা আরো বড় হোয়ে গেল, তোমার বাবার ঐ দুর্ঘটনার পর। কোলকাতায় হাসপাতালের ভেতর গাছগুলো মানুষকে ছায়া দেয় না, সান্ত্বনা দেয় না, তোমার ভালো লাগবে কেন? আমি তো এই শ্মশানের পাশে বসে জীবনটাকে অন্যরকম দেখছি, কেন দেখছি রত্না?' রত্না কিছু বলতে পারে না। সাধু নিজেই বলে, 'কেন, দেখছি জানার আগেই এই শ্মশান ছেড়ে, এই শাল মহুয়ার দেশ ছেড়ে চলে যাবো।' শেষ পর্যন্ত যায় নি সাধু। হয়তো কুমারের সন্দেহটা ধীরে ধীরে সত্যে পরিণত হয়ে যাবে। সংসারের মধ্যে অবাধ বিচরণের অনুকূল পরিবেশ কোনোদিন পায় নি রত্না। কুমারও পায়নি। কুমার পায় নি অন্য কারণে। তবু বিধাতাপুরুষ দুজনকে একই জায়গায় এনে মিলিয়ে দিলেন। সাধু কি কোনো অভিশাপ নিয়ে এলো তাদের দুজনের মধ্যে। রত্নাকে জয় করেও কুমার ভয়হীন হোতে পারে নি। সন্ন্যাসীর আচরণ তার অভ্যাস, তার জীবনযাত্রা, সমস্ত কিছুই এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার জাল বিস্তার করে দেয় রত্নার শরীরে। সে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। বয়সের অনেক আগে আগে রত্নার মনে আর দেহে পাকা রঙ ধরে গেছে। যখন তার চিত্তের স্বপ্ন সঞ্চয়ের কাল, তখনই তীব্র অনুশোচনায় আক্রান্ত হয় রত্না। আত্মসুখের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়েও অকল্যাণের পথ বেছে নেওয়া ঠিক নয়। এ কথাটাও একদিন সাধুই বলেছিল।

রত্না চমকে ওঠে। সাধুকে চিনতে তার ভুল হয় না। তারই জানালার দিকে এগিয়ে আসছে। রত্না ঘরের দরজা খুলে দেয়। সাধু এসে ভেতরে ঢোকে।

'আজ আমি চলে যাচ্ছি রত্না।'

'কোথায়?'

'তা তো জানি না, আবার এক নিরুদ্দেশ যাত্রায়।'

'এই শ্মশানের দিন শেষ হোয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'একটা কথা বলব সাধু?'

'বলো।'

'তুমি বাড়ি ফিরে যাও।'

'বাড়ির রাস্তা আমি হারিয়ে ফেলেছি রত্না।'

'কুমারের কোনো খবর পেলে না?'

সাধু চুপচাপ চেয়ে আছে রত্নার দিকে।

রত্না আবার জিজ্ঞেস করে, 'পেলে না খবর?'

'পেয়েছি। রত্না আমি তো চলে যাচ্ছি। যাবার আগে একটা কথা তোমায় বলব। কথাটা রাখবে তুমি।'

'কি কথা?'

'কুমারকে কোনোদিন বিয়ে করো না।'

'কেন সাধু।'

'কাল তুমি চলে যাবার পরেই কুমার এসেছিল। ওর রঙ্গীন পাঞ্জাবীটার তলায় লুকোনো ছিলো একটা ছোরা। ও আমাকে মারতে এসেছিল। আমি চাইছিলাম ছোরাটা ও ঢুকিয়ে দিক আমার পেটের মধ্যে। আমি বাধা দিতাম না। ছোরাটা বসিয়ে দিলেই আমি বরং বেঁচে যেতাম, আজ রাত্তিরে আমায় আবার হাঁটা সুরু করতে হোতো না।'

কিছুক্ষণ দুজনে মুখোমুখি বসে থাকে। এক অলৌকিক জ্যোৎস্নার মধ্যে হারমোনিয়ামের সুর বহুকালের পথ বেয়ে ভেসে যাচ্ছে। ইঁদ পুজোর যাত্রীরা এখনো চলেছে। সাধু আবার বলে, 'ওর মধ্যে একটা খুন করার প্রবৃত্তি রয়েছে, অথচ খুন করার সাহস ওর নেই। ওকে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে না রত্না, ছেলেটো লোভী এবং ভীরু।'

রত্না জড়িয়ে ধরে সাধুকে—'তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো না সাধু?' সাধু তার শেষ বাক্য উচ্চারণ করে, 'তোমার বাবার পা দুটো থাকলে হয়তো সত্যিই তোমায় নিয়ে পালিয়ে যেতাম,......

......ভালো কোরে থেকো।'

সন্ন্যাসী বেরিয়ে যায়, হাজার হাজার হোমিওপ্যাথির শিশির সামনে রত্না বসে থাকে একা।

শ্রীপতি মাহাতোর জীবনচরিত

বিজয় পাল

(১)

চলে যাওয়ার মুখে দরজা থেকে চোখ ফিরিয়ে সে যেন কি দেখল!

ঘর ছাড়তে গেলে ঘরের মায়া সব মানুষকেই খামচে ধরে। মেয়েমানুষের তো কথাই নেই। কিন্তু শ্রীপতি জানে, ঘরের জন্য মায়া মমতা তার বালাই। থাকতে হয় থাকে। নাকি ছিল? তাই। সে ছিল। আল-গোছে সরে সরে। এখন নেই। থাকার মধ্যে আছে একা শ্রীপতি, আর একটি পোড়ো সংসারের স্মৃতি— টুকিটাকির অনুষঙ্গ।

আয়নায় মুখ দেখার সাধ হল শ্রীপতির এ লোকটা আবার কে? তার নিজের বর্ণতো ঘোর কালো। রোগাভোগা শরীর। জামা গেঞ্জি আন্ডারপ্যান্ট ধুতিতে জবর ভদ্দরলোক বটে! পকেটে একটা সস্তার ফাউন্টেন পেন। কয়েকটা ময়লা চিটচিটে এক টাকা দু'টাকার নোট। খুচরো পয়সা। চলতে ফিরতে আবার বাজে দেখ! ঝমর ঝম ঝমর ঝম! পায়ের তলায় টায়ারের চটি ফটর ফট। আর সব ছাপিয়ে গোটা দেহে কেমন রোদ রোদ মাটি মাটি-- শালমহুলের বন বন গন্ধ।

এই হল গিয়ে শ্রীধর মাহাতোর কনিষ্ঠ পুত্রসন্তান শ্রীশ্রীপতি মাহাতো। জন্ম সময় দুপুর। মতান্তরে বিকেল বিকেল।

দুপুর বিকেল যাই হোক, কি আর এসে যায়। বেশ ছিল শ্রীপতি। ভালো ছিল। বাপের বাপ, তার বাপ কিম্বা ঠাকুরদার মত বনই তার বসত। বনে বনে ঘুরে, এর ফল তার ফুল কুড়িয়ে লুক-লুকিয়ে বেড়ে উঠছিল। বনও কি যে সে বন! এই মোটা শক্তপোক্ত গুঁড়ি। ডালপাতা আকাশপ্রায়। তার ওপরে রোদ যেন মুঠো মুঠো কুর্চির ফুল। হাঁক পাড়লেও পেরোয় না এমনি মাঠ। সিঁদুরগুঁড়ো মাটি।

কালোকোলো মানুষেরা সেখানে জন্মায়। মাটি মাখে। হামা দেয়। হাসেই খেলতে খেলতে বাড়ে। খেয়ে না খেয়ে বড় হয়। গাছগাছালির প্রাণ আর কাকে বলে! তা শ্রীপতিও এক অর্থে গাছ বইকি। চারাগাছ। জল পড়ে পাতা নড়ে। ডাল ছাড়ায়। পাতা দোলে।

হঠাৎ কি যে খেয়াল গেল শ্রীধর মাহাতোর। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ— একে একে সবগুলোইতো গরুর ল্যাজ মুচড়ে, নেংটি পরে, ধুলোয় গড়িয়ে বড় হল। শেষটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্দর-লোক বানালে কেমন হয়? চিঠিটা লিখবে, হিসেবপত্তর করবে নিমেষে। ছেলে বাবু হবে। শ্রীপতিবাবু শুনলেও শ্রবণ জুড়ায়।

যে কথা সেই কাজ। ল্যাংটো শ্রীপতি পেন্টুল চাপিয়ে ইস্কুলে যায়। পড়ে অ-আ-ক-খ, ক্রমে ক্রমে।

পড়ার কি ধুম! কেরোসিন পোড়ে। বাপ বলে, পড়্‌ক্‌! না পড়লে কি মাটি জনমে?

তারপর গেল বড় ইস্কুলে। বাড়গ্রাম রাজগৃহ— ভগবানের থান। ছেলে বলে, কলেজ। ইংরিজি বলে দ্যাখ! বলবেইতো। এই না হলে শিক্ষা! শ্রীধর মাহাতোর কপাল যেন খেতকৃষির মাঠ। অতি উর্বর। ভুট্টার শিষে সোনার দানা। শ্রীপতি তার মাথার মুকুট। এবারে সে বিদেশ যাবে। খোদ কলিকাতা। যা তবে, শুভ কাজে বিলম্ব ভালো কথা নয়।

শ্রীপতি শুনেছিল, কোলকাতায় এলে মানুষের গভভমুক্তি হয়। হুঁশ ফেরে। তা মিছে কথা নয়। হুঁশ হতেই দেখল, শহর বটে একখানা। বাড়ির ভেতর বাড়ি। রাস্তার ভেতর রাস্তা। মানুষের মাথায় মানুষ, পেটে মানুষ— সর্ব অঙ্গে মানুষ। তারা কেমন করে চায়। তুরতুরিয়ে চলে। কথা কয়— গড়র গর গড়র গর। বাপ বলত, তারা নাকি ক্ষত্রিয়। কেমন ক্ষত্রিয় পেটে বিদ্যের বেনো জল ঢুকতেই বুঝে গিয়েছিল সে। পুজো আচছা করে, প্রায়শ্চিত্ত করে তবেই ক্ষত্রিয় আসলেতো বনবাসী। বনে ঘুরে বাঁচা। বনের মাঝে মরা। ঠিকানা কি? সেও ঐ বন। কোলকাতায় বন কই— বনের পরে বন, তারও পরে বন?

প্রাণে বড় ভয় হল শ্রীপতির। বুকের মধ্যে ধুকপুকানি। সে যেন থাটো দড়িতে কষে বাঁধা একটা গরু কিম্বা মোষ। কার্তিকের অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধার। পরবের রাত। চারদিকে লম্ফঝম্ফ মানুষ। মুখে মারণ আওয়াজ। হাতে বাঘের মাংস। ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সে ভয় পাচছে। লাফাচ্ছে। দড়ি ছিঁড়ে পালাতে চাইছে। কিন্তু যাবি কোথা? ড্যালাপাকানো মানুষ গুলো হ্যা হ্যা হাসছে। হুই হুই আওয়াজ তুলছে। কোলকাতার মানুষের গায়ে হুবহু সেই বাঘের গন্ধ পেল শ্রীপতি।

ভয় থেকেই তো কষ্ট। বড় কষ্ট গেছে শ্রীপতির। কোথায় আটাং কি শিহুড়ির ঝোপ, আসন, শাল হরিতকীর অরণ্য! সুবর্ণরেখার জলের তলে সোনা সোনা বালি ছলকে যাওয়া! মেঘবাদলার বাতাসে ঘন বাস! আতিপাতি খুঁজছে। নাঃ—নেই। কোলকাতায় শালের বন নেই। কিচ্ছু নেই।

নেইতো নেই। মাটি যত ক্ষয়, শিকড়-বাকড় তত সেঁধোয়। নিচ থেকে নিচে, আরো নিচে— পাতালে। খরা আছে, ঝড় আছে। আবার বাঁচার সাধও আছে। শ্রীপতি ঐ এক সাধের জোরে টিঁকে রইল।

দিনে দিনে মাস যায়। বছর যায়। জল পড়ে পাতা নড়ে। শ্রীপতি শিকড় ছড়ায়। 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' ছাপ মারা খাতার ধরে ধরে লেখে, শ্রীশ্রীপতি মাহাতো, এম, এ, প্রথম বর্ষ। বিষয়— প্রাচীন ইতিহাস। তৃতীয়শ্রেণী। রোল নং কত। তার আগে ঊনসত্তর, পরেও কত! তাদের মধ্যে রণজয় সমর কোলকাতার ছেলে। বাদল মুর্শিদাবাদের। দ্বিজেন জলপাই-

গন্ডির। গোপাল এসেছিল বীরভূম থেকে। আর শ্রীপতি? নিবাস মেদিনীপুর। সমর কথা কইত তারি সন্দর। শ্রীপতির ভয়ের কথা শুনে বলেছিল, বাইরে থেকে কি কাউকে বোঝা যায় রে?

না, যায় না। তাই একজন অধ্যাপক যখন আপন আপন গলায় বললেন, য়ু আর ওয়ান অফ আস—সদা বাংলায়, তুমি আমাদের একজন, কি যে হল শ্রীপতির—চোখে ঝাপসা দেখল। বুকে হেঁচকি ওঠার মত কষ্ট।

।।দুই।।

অতসী মন দিয়ে শুনেছিল। যেন কিছুই নয় এমন সরল হেসে বলল, এসবতো তুমি আগেও অনেকবার বলেছ।

—অতসী, বিয়েটা আর যাই হোক খেলা নয়।

—জানি।

—মানুষ অনেকদিন বাঁচে।

—এমন কি আর নতুন কথা!

—এই মুহূর্তে নতুন না লাগলেও পরে তোমার অন্যরকম মনে হতে পারে।

—আর কিছু বলবে? যদি না নেয়?

—তুমিতো নেবে, তাহলেই হলো।

—অতসী, দেখো, এখনো ভেবে দেখবার সময় আছে।

—আছে বুঝি?

—হুঁ

—তবে তুমি ভাবো। আমার ভাবতে বয়ে গেছে। অতসীর চোখ কাঁচ শালপাতার মত পিছল। তার ওপরে পরিষ্কার হাসির ঝিলিক। বলে, খুব যে বোল ফুটেছে মুখে! বলে শব্দ করে হাসে।

বোল বলতে, কথা কইতে অতসীই শিখিয়েছিল। 'প্রেশ নয়—প্রেস্। ফিলিংশ কি, ফিলিংস। হায় হায়, য়ুনিভার্সিটির কি ভাগ্য! এই দ্যাখো, কাঁপছো আবার! ডাক্তার দেখাও। চোখে কি পড়ল—সেই তখন থেকে খালি পিট্ পিট্ করছ?' এমনি আরো কত কি বলত অতসী। বলত, পুরুষ-মানুষের শরীর হবে টান টান। উঁচু মাথা।

আসলে অতসী যেন একটা মজার খেলা পেয়ে গেল। খেলা নয়তো কি! শ্রীপতি যেন তার পুতুল। যেমনটি চালায় সেও তেমনি চলে। যেটুকু বলায় বলে। ভালোবাসা শব্দটা অতসী ভুলেও বলেনি। শ্রীপতিও তাই। কিন্তু এই না বলা কথাটাই কোথা দিয়ে কেমন করে যে সাঁই সাঁই করে শিকারী ঈগলের মত সোজা নেমে এসে ছোঁ মেরে তাদের উড়িয়ে নিয়ে গল সে বড় অদ্ভুত! এ কোন্ অচিন দেশরে বাপ!

।। তিন ।।

আয়নায় যাকে দেখা যাচ্ছে সে তবে কে? গালের ওপর গাল। মেদ মাংসে নাদুসনুদুস— বুঝি কেষ্টঠাকুরটি! চোখে বাহারী ফ্রেমের চশমা। ভদ্র পোষাক আসাক। রংটাও তত কালো নয়, বেশ সাবান ঘষা

সাবান ধষা বোধ হচ্ছে। ইনিই তবে গিয়ে শ্রীপতিবাবু— শ্রীধর মাহাতোর দিনের দুশ্চিন্তা, রাতের অনিদ্রা— দিনরাতের ঘাম নুন রক্তের স্বপন! বুড়ো যেন বলছে, ভালো আছ বাপ?

উত্তর দেওয়ার আগেই খুব পুরনো গলায় চুপি চুপি আর একজন কে বলল, মনে পড়ে?

শ্রীপতি খাট থেকে নেমে সেলফের ওপরে রাখা এ্যালবামটা নিয়ে এসে বসল। প্রথম পাতায় অতসীর একুশ বাইশের একটা বড় মাপের ছবি। ডাগরডোগর ফরসা চেহারা। পুষ্ট ফলের মত শরীর স্বাস্থ্য। খোলা ঠোঁটে ভরদিনকার টসটসে রোদ্দুর। পরিপাটি দাঁত। এমনি সময়েই শ্রীপতির সঙ্গে তার দেখা।

পরের ছবিটা বিয়ের ঠিক এক মাস আগে তোলা। স্টুডিওতে সেই প্রথম যাওয়া। ক্লিক। রেজার সাহেবের বন্দুক ফাটে গুড়ুম। কি সাহস মেয়ের! গলা জড়িয়ে ধরে হাসছে। শ্রীপতির কালো মুখ কিন্তু আরো কালো। চুপসে এতটুকু।

—রাজার মত দেখাচ্ছে। পরে ছবি দেখে অতসী বলেছিল।

—রাজার মত কেন? শ্রীপতি যেন লাটবেলাট! বলে, আমিতো রাজাই।

অতসী মুচকি হাসে। বলে, তবে জঙ্গলের এই যা।

পাতা উল্টে গেল শ্রীপতি। এটা সেদিনের তোলা ছবি। সাক্ষী হিসেবে ছিল রণজয় বাদল আর গোপাল। সমর বরপক্ষ কনেপক্ষ দুইই। সইসাবুদের হুজ্জোত-হাঙ্গামা চুকতে চুকতে প্রায় বিকেল। তারপর ঘুরে বেড়িয়ে খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে দল বেঁধে এক ঘরের ফ্ল্যাটে ফিরল ন'টা নাগাদ। কাঁধে লটকে ক্যামেরা এনেছিল রণজয়। ঘর দোর মায় শরীর বার দশেক ঝলসে দিয়ে আলো জ্বলেছিল। তাদের দুজনের ভীষণ ভালো লেগেছে এই ছবিটা। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতসী। তাকে জড়িয়ে ধরে শ্রীপতির কি হাসি।

সবাই চলে যেতে ঘরটা যেন মুহূর্তে প্রকাণ্ড মাঠ হয়ে গেল। সেখানে শুধু ওরা দুজন। কত ফুল। অতসী ধূপ জ্বালল। পৃথিবী গন্ধে ম ম। হাওয়া আসছে সরাসরি শাল কুসুমের দেশ থেকে— কোয়েল শঙ্খ কংসাবতীর স্রোত বেয়ে—জলে শীতল হয়ে। মাদল বাজছে দ্রিমি দ্রিমি। অন্ধকারে আঁধার হয়ে কারা নাচছে। আ-হ-ঃ! সুখে শরীর জেগে উঠছিল তার। শ্রীপতি তবু শুধোল, তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না?

অতসী স্বপ্ন স্বপ্ন গলায় বলল, কেন?

—এই যে আমাদের বিয়েতে কেউ এলো না!

—সবাই তো এসেছে— তুমি দেখতে পাচ্ছ না। কি সুন্দর সানাই বাজছে—

শ্রীপতি ডাকে, অতসী—

অতসী চটকা ভেঙে জেগে ওঠে। শুনে বলে, কেউ যে আসবে না তাতো আমরা জানতাম।

—তবু—

—সেজন্যে কোন দুঃখ নেই আমার। মৃদু হয়ে আসে অতসীর গলা। বলে, তোমার মন কেমন করছে?

—না। বলল বটে, মনে তার সায় পেল না শ্রীপতি।

—কি ভাবছ?

—ভাবছি পরে যদি কখনো মনে হয়, এভাবে সব কিছু ছেড়ে এসে ভালো করনি তুমি, বিশেষ করে আমার কাছে,...... আমিতো একটা বুনো। জাত নেই, গোত্র নেই। কোথাকার কে! অথচ কত নামী বংশ তোমাদের। বনেদী কুলীন কায়েতের মেয়ে তুমি।

—এসবতো তুমিও ভাবতে পারো? অতসী নড়ে চড়ে শোয়।—ধর তুমি আমার মধ্যে তোমার সমাজের মেয়েদের মত কিছুই খুঁজে পেলে না, আমি তোমাকে জোর করে আটকে রেখেছি— তখন?

আর ভাবতে পারে না শ্রীপতি। বেশি ভাবনাচিন্তা তার সয়না। তার চেয়ে........ কোথাও লুকোতে চেয়ে এক ঝটকায় অতসীকে কাছে টানে। বুকে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ নেয়। সুবাসিত স্তনে ঘাম নুন এবং আরো কত কি! চোখ বুজে আসে। অতসী থর থর করে কাঁপছে। শ্রীপতি ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ— অতসী তার পরিচয় নাম ধাম সব। একটা অসহ্য সুখের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল দুজনে। এক সময়ে শব্দ করে কেঁদে উঠল অতসী।

।। চার ।।

মানুষ চেনার পক্ষে একটা জীবন বড় কম — এ্যালবাম বন্ধ করতে করতে শ্রীপতি প্রায় এইরকমই কি একটা ধা করে ভেবে ফেলল। অনেকদিন হল সে অতসীকে দেখছে। আগে পরে মিলিয়ে বছর আটেক তো বটেই। বিয়ের বয়স চার ছাড়াতে চলল। এর মধ্যে কম করেও হাজারটা দিন সে অতসীকে গায়ের শেষ সুতোটাও সরিয়ে ফেলে উল্টে পাল্টে দেখেছে। একটুখানি ছায়া কি ঘন কালির মত বিন্দু পরিমাণ অন্ধকার, উথাল পাথাল ঢেউ, নাবাল ভূমি— কিছু বাকি নেই দেখার। কিন্তু কই, অতসীকে আজওতো সে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারল না! নাকি বুঝতে চায়নি?

অতসী বলে, বোঝার ক্ষমতাই নেই তোমার।

হয়ত তাই। কাল অতসীর জন্মদিন গেল। শাড়ি পেয়ে কি যে খুশি! গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করতেই সংকোচ আর ভালো লাগায় কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল শ্রীপতি। বলল, এসব আবার কেন?

—করতে হয়গো মশাই, স্বামী বলে কথা;

—তাহলেতো আরো ভেবে চিন্তে দেওয়া উচিত।

—বেশি ভোজ ভালো নয়। পাঁপ হবে মাথায় গল কল করে রক্ত উঠে আসে শ্রীপতির। বলে, সত্যি, কি করে যে ভুলে যাই তুমি কি, আমি কে!

—এবার থেকে জপ ক'রো, আর ভুল হবে না।

—তাই করবো।

অতসী বলে, ভারি বুদ্ধিতো তোমার

—সম্বল বলতেতো ঐটুকুই, নইলে কি আর বাঁচতাম?

অতসী শ্রীপতির মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, ফের অলক্ষুণে কথা!

অতসীর শরীরতো নয়— দাউ দাউ আগুন। রাঙা টুক টুক মহুয়ার ফুল ফুটেছে বন জুড়ে। কি তাত! কিবা ঘ্রাণ! শ্রীপতি শীতার্ত দুটি হাত বাড়িয়ে অতসীকে কাছে টানে। নাচতে নাচতে সরে যায় অতসী। বলে, এছাড়া কি কিছু জানো না?

শ্রীপতি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকে, অতসী—

দূরে দাঁড়িয়ে অতসী বলে, আমার কাছে তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

অতসী একদৃষ্টে শ্রীপতিকে দেখছিল। তার চোখে ভুরুতে চিবুকে কি সব লেখা। হিজিবিজি! না কি আর কিছু; হেসে শ্রীপতি বলল, ভয় দেখাচ্ছিলাম।

—নতুন করে আর কি ভয় দেখাবে।

—তার মানে।

—তোমারতো কত বুদ্ধি, বলতো মানেটা।

শ্রীপতি ভাবে আর ভাবে। যত ভাবে তত ভয় হয়। সেই পুরনো ভয়টা আজকাল তাকে তাড়িয়ে ফেরে। কখনো মনে হয়, অতসী যেন শালের পা প্যাঁচানো দুধি-লতা। গিলতে কাঁটা, ওগড়াতে কষ্ট। জড়া-জড়ি করে আছে তাই। ঝড় আসে—এক-গুঁয়ে দামাল ঝড়। সড়বো ভেঙে চলে আসে। গেল গেল ংকারে কান পাতা দায়। তারপর ঝড়ের মত এ-ঝড়ও থিতোয়। তখন ধ-কে সেই। শুধু কিছু গোপন ক্ষত রক্ত চোঁয়ায়, লুকনো দাগ থেকে থেকে মনে করিয়ে দেয় দুর্যোগের কথা।

অথচ রণজয়কে দেখ! বৌ ছেলে সংসার চাকরি—এই তার সব। বলে, একসঙ্গে চতুর্বর্গ লাভ—একি চাট্টিখানি কথা! ইদানীং দেখা হলেই এক কথা, তোর তো তিনটেই রেডি। একটা আর বাকি থাকে কেন, ঝটপট বানিয়ে ফেল দেখি। শুনে হাসত শ্রীপতি। এখন মনে হচ্ছে, মাঝ-খানে কেউ এলে বেশ হয়। অতসী অবশ্য বলে, না বাপু, এই বেশ আছি। ঝাড়া হাত-পা—যা খুশি তাই করছি, যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছি। তিনি এসে তো মাঝখান জুড়ে বসবেন—নাড়ায় কার সাধ্য!

অতসী বোধহয় পুরোপুরি ঠিক বলেনি। পুত্রই তো সূত্র—সাঁকো। শ্রীপতি হঠাৎই ভিখিরির মত মুখ করে বলল,

অতসী, একটা ছেলে দেবে আমাকে?

নতুন শাড়ির খস-খস শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকায় শ্রীপতি। অতসীর মুখ দেখা যাচ্ছে না। রান্নাঘরের দিকে তার পা বাড়ানো। বলে, ইস্ কখন ভাত বসিয়ে এসেছি! তলা ধরে গেছে ঠিক। দাঁড়াও, দেখে আসি।

শ্রীপতি কিন্তু ভোলেনি। রাত্তে শুতে এসে আবারও বলল, একটা ছেলে দেবে আমাকে?

অতসী খুব আস্তে আদরের সুরে বলে, হাঁদা কোথাকার!

শ্রীপতি ঠিক শুনতে পায়নি। বলে, দেবে না?

অতসী শরীর ঝাপটে ডাকে, এসো।

।। পাঁচ ।।

জন্মদিন উপলক্ষে একটা করে সিনেমা পাওনা থাকে অতসীর। অফিস যাওয়ার সময় জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে শ্রীপতি বলেছিল, তুমি তৈরি থেকো। চারটের মধ্যে আমি চলে আসবো।

—চারটের তো ফেরো আগে।

অর্থাৎ শ্রীপতি আজকাল প্রায়শ গুলিয়ে ফেলে। অর্থাৎ কথার ঠিক থাকে না। অর্থাৎ অনেক কিছু। ভুল ধরা যেন অতসীর একটা বাতিক। বলে, তবে শনিবারের বিকেলে তোমার জন্য কেউ টিকিট নিয়ে বসে থাকবে না বোধহয়।

—তা তুমি কিছু ভেবো না। টিকিট ঠিক পেয়ে যাব।

অতসী বিছানা তুলছিল।—পেলে ভালোই, বলে চাদর টান টান করে পাততে লাগল।

শ্রীপতি কথা বাড়াল না। রাস্তায় নেমে অতসীকে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। চারটে নাগাদ যখন ফিরবে, তখনও ঠিক ঐখানে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে জানতো। শুধু শাড়ি ব্লাউজের রং বদলের কথা এবং সময়ের।

কিন্তু যথারীতি চারটেয় ফেরা হল না শ্রীপতির। এ আর নতুন কি! জীবনে অনেক কিছুই ঠিক সময়ে করা হয়ে ওঠেনি। অতসী বারান্দায় নেই। শ্রীপতি জানতো, থাকবে না। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখে ঘাড় দেখতে গিয়েও দেখল না।

—শুয়ে পড়েছ যে! শরীর খারাপ নাকি?

অতসী কোন উত্তর দিল না। জুতোর ভেতর মোজা গলিয়ে উঠে দাঁড়াল শ্রীপতি। —তুমি খুব রাগ করেছ, তাই না? নিজের কানেই কেমন জোলো আর বোকা বোকা শোনালো প্রশ্নটা। অতসী তখনও চুপ। শ্রীপতি বিড়-বিড় করে বলে, আসার আর দিন পেল না!

—কে?

—আবার কে! স্বয়ং শ্রীনাথ মাহাতো।

—। অতসী কোন কৌতূহল দেখাল না।

শ্রীপতি নিজে থেকে বলে, বাড়িতে

কি সব গোলমাল চলছে। মেজদা ছোটদাদাই নাকি বড়দাকে আলাদা করে দিয়েছে। বাবার সংসার প্রায় অচল। তাই নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর। যত উটকো ঝামেলা আর কি!

অতসী পাশ ফেরে। বলে, যেই দরকার পড়েছে অমনি ভাই! অন্য সময় তো মনেও পড়ে না।

কথাটা রূঢ়, কিন্তু মিথ্যে নয়। বছর দুয়েক আগে মায়ের চোখের জলের মান রাখতে অতসীকে কত করে রাজি করিয়েছিল শ্রীপতি। সাকুল্যে দেড় বেলা ছিল বাড়িতে। তাতেই যা বোঝার বুঝে গিয়েছিল সে। সেই যে এসেছে আর যায়নি। তারাও কেউ আসেনি। বলে, ঠিক তা নয়।

—থাক, আর বলতে হবে না।...তোমার দাদা এখানে না এসে অফিসে এলেন যে!

—কে জানে, হয়ত তোমার সামনে কান্নাকাটি করতে পারবে না, তাই।

—এত লজ্জা? অতসী উঠে বসে। ভুরু নাচায়। ঠোঁট মড়ে। নোংরা কথাটা শ্রীপতি কিন্তু ঠিক শুনতে পেয়ে গেল। অসহ্য। বলল, ভদ্রভাবে কথা বলতে জানো না?

আগে জানতাম। এখন ভুলে গেছি। বিছানা থেকে ছিটকে নেমে গেল অতসী।

শ্রীপতি জামাপ্যান্ট পাল্টে হাত-মুখ ধুয়ে এল। —চা হবে?

খব জবাব আসে রান্নাঘর থেকে, দুধ নেই।

—আগে বলোনি কেন?

—বলেছি।

—না বলোনি।

—তোমাদের মত মিথ্যে বলতে পারি না এখনো।

শ্রীপতি চমকায়। বলে, কে বলেছে?

—তুমি। তুমি কি কর না কর কখনো বল আমাকে?

তবে কি অতসী সব জানে? নাকি সবই অন্ধকারে এলোমেলো ঢিল ছোঁড়া! যদি লেগে যায়! তাই। শ্রীপতি বলে, কি করেছি আমি?

—কি করোনি তাই আগে বল। অতসী দম টানে। বলে, আমাকে লুকিয়ে টু্যরের নাম করে তুমি বাড়ি যাও না? টাকাটা পয়সাটা পাঠাও না? বল।

হ্যাঁ, যাই বইকি। গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। পুরনো পথে হাঁটি। লুকিয়ে এত এত শালের ফল কুড়োই। টাকা পাঠাই ঋণ শুধতে।

—কি হল, চুপ করে আছ যে? অতসী ভাঙা বিকৃত গলায় বলতে থাকে, আমি কি বাড়ি যেতে পারি না! পারি। মা-বাবাকে দেখতে আমারও সাধ যায়। কিন্তু তোমার যেখানে অসম্মান সেখানে যাওয়া পাপ। তাই যাই না। মিথ্যেও বলি না। আমাদের বংশে কেউ কখনো মিথ্যে কথা বলে না। আমিও শিখিনি।

—ঢের হয়েছে, আর বংশ দেখিয়ে কাজ নেই। শ্রীপতি প্রায় ভেংচে ওঠে। —সব জানা আছে আমার।

অতসী দরজার কাছে উঠে এসেছে।—কি জানো?

ওর চোখে বলির খড়্গ ঝলসে উঠতে দেখল শ্রীপতি। নিজের বুকের মধ্যে অনেকগুলো ঢাক একসঙ্গে বাজছে শুনল। তবু বলে, মুখ নষ্ট করার ইচ্ছে নেই।

—জানলে তো বলবে। অতসী ঘরের ভেতরে ঢুকে আসে।

—আস্তে বলো, লোকে শুনবে।

—ইতরের মত কথা বলবে, সেটা কিছু নয়—লোকে শুনলেই যত দোষ!

—অতসী—

—চোখ লাল করো না।

শ্রীপতি শেষ ছোবল মারতে চেয়ে বলে, একটা বাজারের মেয়েমানুষের মত দেখাচ্ছে তোমাকে।

—এছাড়া আর কিছু কি দেখেছ কখনো?

শ্রীপতি রুদ্ধ গলায় বলে, অতসী, তুমি না মায়ের জাত?

—চুপ করো। বড় বড় কথা তোমার মুখে মানায় না।

—তুমি নিজে মা হলে বলতে পারতে এ-কথা?

—আমি মা হতে চাই না।

পশুর মত আর্তনাদ করে ওঠে শ্রীপতি। বলে, যে আসছে তার কি হবে?

—আমি কি জানি? ছেলে বা মেয়ে যেই আসুক সে তোমার। তার কি হবে না হবে সেও তোমারই ভাববার কথা।

—সে কি তোমার কেউ নয়?

অতসী কোন প্রয়োজন নেই, শ্রীপতি সামনে দাঁড়িয়ে, তবু চেঁচিয়ে বলে, না। তোমার মত সেও আমার কেউ নয়। শেষদিকে গলা কি ধরে এসেছিল অতসীর? বলছিল, আমার ছেলে বড় হয়ে তোমাদের মত নোংরা হবে—এ আমি ভাবতে পারি না। আমি যা ভুল করেছি তা আমাকেই ভুগতে হবে। আর কাউকে জড়াব কেন? ...রক্তের ছোঁয়াচ বড় সাংঘাতিক। তার চেয়ে এই ভালো।......

আর শুনতে পারেনি শ্রীপতি। দু-হাতে চেপে কান বন্ধ করেছিল। অতসীর মুখ ঘুঁষি মেরে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে বেশ হত। কিন্তু এখন ঘুঁষি ছুঁড়লেও অতসীর নাগাল পাওয়া যাবে না। ও যেন ক্রমশই আরো দূরে সরে যাচ্ছে। ঘরের ছাদ হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ছে। দেয়ালের জায়গায় দেয়াল নেই। বেবাক ধুলো ধুলো হয়ে উড়ছে। চারদিক ঘিরে পৃথিবীর তাবৎ লোক ভিড় করে তাদের দেখছে। ঠিক এই রকম একটা মুহূর্তেই কুঁজো গ্লাস ভাঙার শব্দ শুনেছিল সে। কে যে ভাঙল মনে নেই।

শ্রীপতি চোখের সামনে সময়ের হাসি, অধ্যাপকের ভালোমানুষী মুখ ভেসে উঠতে দেখল। কতগুলো শব্দ কানের ভেতরে, মাথায়, স্মৃতিতে তীরের মত বিঁধছিল। অতসীও তো এককালে বলত, তুমি মিছিমিছি নিজেকে একা ভাবো। আমাদের সঙ্গে অমিলের ব্যাপারটা তোমার মনগড়া। কই, আমি তো তোমাকে আলাদা কিছু দেখি না।

মিথ্যে কথা। অতসী, তুমি মিথ্যে বলতে। তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যে বলেছ, ক্রমাগত ঠকিয়ে এসেছ। বোবা চীৎকারে শ্রীপতির ভেতরটা ভেঙে যাচ্ছিল। বলল, বেরিয়ে যাও তুমি।

—কে তুমি না বললেও যেতাম। অতসী দম নেবার সময় দিচ্ছে না শ্রীপতিকে।

—এক্ষুনি যাও, তোমাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—আমিও।

অতসী ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পেট চেপে ধরে হাঁপাচ্ছে।

—তবে আর দাঁড়িয়ে আছ কি করতে?

—তাইতো ভাবছি।

—ভাবাভাবির আর কিছু নেই। শ্রীপতি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, যাও—

অতসী চলে যেতে গিয়েও দরজা থেকে ঘাড় মটকে কি যেন দেখছিল।

এবারে শ্রীপতির যাও[illegible] পালা। শালের মাথায় কত বড় [illegible]শ। ডাল-পাতা নাড়িয়ে হাওয়ার দিক বদলাচ্ছে। ফাল্গুন শেষ হয়ে এলো। ক'দিন পরেই সারুল পরব। সারুলের শেষ রাতে কেউ কোথাও জেগে নেই। শুধু একদল কুমারী মেয়ে চুপিসারে হাঁটছে, পবিত্র আঙুলে ঘরে ঘরে বেঁধে দিয়ে যাচ্ছে হিমে-ধোয়া শালের পল্লব। তাদের গলায় আলোর গুন-গুনানি, আদিম প্রার্থনা—পৃথিবীর জন্য, স্বপ্নের জন্য।

এবার গেলেই হয়। শ্রীপতি হাঁটতে হাঁটতে অতসীকে ছাড়িয়ে, এই ঘর-বারান্দা, এমনকি কোলকাতার চৌহদ্দি থেকে অনেক দূরে—জন্মের কাছে ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু অতসীর সেই ফিরে দেখার মধ্যে কি যে ছিল, কেন যে সে চলে যেতে গিয়েও শ্রীপতিকে একটি খরদৃষ্টিতে বিঁধে গেল, তার অর্থ তৈরির তাগিদ তাকে এক পাও হাঁটতে দিচ্ছে না।

শ্রীপতি বসেছিল। বসেই রইল।

খুঁজে ফেরা

বিকাশ জানা

আচমকা ধাক্কায় ঘুম ভাঙে কৃষ্ণার। সে তখন পাহাড়ের ওপারে যাচ্ছিল। ওপারে যে কি আছে সে আজো জানে না। কিন্তু তার দেখার ইচ্ছে অনেকদিনের। কোন কিছু না দেখা জিনিসের ওপর তার ঝোঁকটা বেশী। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই এই হঠাৎ ধাক্কা। ফলে যাওয়া সেদিনের মতো সেখানেই স্থগিত।

এটা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। একদিন তো পাহাড়ের ওপারে প্রায় পৌঁছেই গেছিল। যাক। আজ আর কেউ তাকে ঠেলে দেবে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে যখন একটা ছোট পাথরে পা রেখে ওপারে তাকাতে যাবে, তখনই ব্যালান্স হারিয়ে নীচে পড়ে যায়।

এই এতদিনে সে বুঝে নিয়েছে স্বপ্নের মধ্যে বেশীদূর হাঁটা যায় না। পাহাড় তো অতিক্রম করা যায়ই না। তাই এখন সে এই স্বপ্ন থেকে দূরে থাকতে চায়। কিন্তু স্বপ্নটাই তাকে ছাড়তে চায় না।

জেগে উঠে অনেকক্ষণ চোখবুজে চুপ-চাপ শুয়ে থাকে কৃষ্ণা। তার পরিচিত সঙ্গী ফ্যানের ঘর ঘর শব্দটা এখন লোড-শেডিং-এর জন্য নীরব। অন্ধকারকে বড় স্তব্ধ করে সে। বাঁদিকে হাতড়ে খুঁজতে চেষ্টা করে কমলকে। কমল এখন গভীর ঘুমে ভাসমান। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটু দুটো বুকের কাছে নিয়ে সে শুয়ে আছে। কৃষ্ণার মনে হয় কমল যেন অনেক-দিন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এজন্য সে এখন আর দুঃখ পায় না। ক'বছর আগে হলে পেত। এখন কষ্টের জায়গাটা দখল করেছে এক জড় তিক্ততা।

কমল সম্পর্কে এখন তার সমস্ত অনুভূতিই শিথিল। অথচ ক'বছরই বা বিয়ে করেছে। এই কয়েক বছরে কার ভালবাসা যে কোথায় গেল সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে না কমলও তার মতো এমনিভাবে কি না। এরকম কোন গভীর রাতে তারও কি ঘুম ভেঙে যায়? ভাল-বাসা সে তো শুধু কৃষ্ণার একার নয়।

সে কাছে আনতে চেষ্টা করে সেইসব দিনগুলো যখন বাড়ি থেকে লুকিয়ে কলেজ ফাঁকি দিয়ে তারা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত, সূর্যাস্তের সময় নদীর পাড়ে বসে স্বপ্ন দেখত এক উচ্ছল দিনের, দূরে দিয়ে তখন একদল নৌকা পাল তুলে গান গাইতে গাইতে মাঝদরিয়ায় যেত, আর তারা কে কতদূর নুড়ি ছুঁড়তে পারে তার কম্পিটিশান করত। সে সময় কৃষ্ণা ভাবত এতদিন যে সব স্বপ্ন তার কাছে ঘুরে বেড়িয়েছে সে সবই তার অধিকারে আসবে যদি কমলকে কাছে পায়। তার পাহাড়ে উঠতে ভারি ইচ্ছে করত, ইচ্ছে হত সমুদ্রে বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার দিতে, খোলা আকাশের কোলে নিজের খুশী মতো গান করতে। ভরদুপুরে গভীর স্বপ্নে বুঁদ হয়ে তারা প্রায়ই এক বাগানে চলে যেত, সেই বাগানের পিছনে ছিল একটা নদী, সেখানে নীল নৌকা বাঁধা। তারা দুজন অনেক দূর অব্দি সেই নৌকায় পাড়ি দিত।

কৃষ্ণাদের বাড়ীটা ছিল বেশ প্রাচীন। কোন নিয়মের বাইরে যাওয়ার সাধ্য একে-বারেই ছিল না। অথচ কৃষ্ণার [illegible] বেনিয়মী হতে ইচ্ছে করত। কোন [illegible]

অফিস টাইমে ব্যাগ কাঁধে চলন্ত বাসে উঠতে দেখলে প্রচন্ড কষ্টে তার ভেতরটা খাঁ খাঁ করে উঠত। সে কেন পারে না। কেন যেখানে খুশী যেতে পারে না। যা খুশী করতে পারে না। কমল বলত, এ এক ধরণের দাসত্ব। তুমি মানবে কেন।

না মানলে যে অশান্তি।

হোক না। গভীর শান্তির জন্য না হয় একটু অশান্তি সহ্য করলে। আর তো কটা দিন। তারপরেই তো তোমার কাছে চলে যাচ্ছি। এখন আর মিছিমিছি অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি। আচ্ছা তুমি আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাবে?

যাব। যেদিন তুমি পুরোপুরি আমার হয়ে যাবে।

হ্যাঁ পুরোপুরি তোমার। তোমার সম্পত্তি। তোমার টাকা, বাস্ক, জামা, প্যান্ট, চাকরির মতো একটা সম্পত্তি। আমি কি তোমার কাছে এই চেয়েছিলাম কমল?

কৃষ্ণার মনে পড়ে বিয়ের পরে তাদের বেড়াতে যাওয়ার কথা। প্রথমে কমল যেতেই চায়নি। অফিসে ছুটি পাচ্ছে না, টাকা নেই, এটা বৃষ্টির মরসুম এভাবে ছলছুতোয় অনেকদিন কাটিয়ে দিচ্ছিল। শেষে একদিন বাধ্য হয়ে ঠিক করল কাছেপিঠে কোথাও যাওয়ার যাক। কৃষ্ণার পাহাড়ে যাওয়ার ইচ্ছে।

ছোটবেলায় সে একবার বাবার সঙ্গে পাহাড়ে গেছিল। দেখতে চেয়েছিল ঐ পাহাড়টার ওপারে কি আছে। কিন্তু বাবা তাকে যেতে দেয়নি। সেদিন ভেবেছিল সে যখন বড় হবে, যখন খুশী মতো ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাবে, সেদিন নিশ্চয়ই ঐ পাহাড়টার ওপারে গিয়ে দেখে আসবে সেখানে কি আছে। কিন্তু কাছাকাছি পাহাড় কোথায়। তাই ঠিক হল সমুদ্রে যাবে। সমুদ্রও বা মন্দ কি। তার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে ভারী ভাল লাগবে কৃষ্ণার। এই প্রথম তারা সমুদ্রে যাচ্ছে।

সৈকতে বহুক্ষণ ছুটোছুটি করেও তার ক্লান্তি আসে না। স্রোত তার আঁচল ভিজিয়ে দেয়। দূর থেকে ছুটে আসে বিশাল ঢেউ। কৃষ্ণা লাফ দিয়ে এক একটা ঢেউ পেরিয়ে যেতে থাকে। ঝাউয়ের ঝমঝম শব্দে জায়গাটা মুখর।

সূর্য তখন সমুদ্রের কোলে ঢলে পড়েছে। কৃষ্ণা কমলকে কিছু বলার জন্য তার দিকে তাকিয়েই স্থির হয়ে যায়। নীচের দিকে মুখ করে কানে ছোট রেডিও চেপে কমল গভীর মনোযোগে কি যেন শুনছে।

এই... এয়—

কি হল?

ঐ দেখ—

কী?

দেখ সূর্যটা কিভাবে জলের নীচে ডুব দিচ্ছে।

ও আর দেখার কি আছে। এখন এদিকে ইন্ডিয়ার যায় যায় অবস্থা। শালা আজ

যদি কোন রকমে উইকেটটা টিকিয়ে রাখতে পারে না—

কি এক হায়ানোর যন্ত্রণায় কৃষ্ণার সারাটা শরীর নীরবে ছটফট করে, সমুদ্র তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তার ভেতরে যে জোয়ার ভাটা চলত, এভাবেই তার ওপর ক্রমশঃ পলি জমতে থাকে।

এখন তার সকাল কাটে কমলের অফিসের তোড়জোড়ে, তারপর কমল অফিস চলে গেলে সে বসে থাকে শূন্য বারান্দায়। আগে ভাবত কখন আসবে কমল। এখন আর সে সব ভাবে না। প্রথম কিছুদিন অবশ্য কমল তাড়াতাড়ি ফিরত। তারপর তার দেরী হতে লাগল। পুরুষ মানুষ, কত কাজ, অফিসের পরে আড্ডা আছে, ক্লাব আছে, দাবা আছে।

কিন্তু কমল তুমি কি আমার কথা কখনো ভেবেছ?

ভাব না? গত মাসে তুমি শাড়ি চাইলে এনে দিই নি? তার আগের মাসে—

এই কি সব?

তাহলে আর কি?

আমি এতটা সময় নিয়ে কি করব?

বাঃ এ একটা কথা হল! ঘরে কত কাজ।

তুমি আমাকে কতদিন সিনেমায় নিয়ে যাওনি বল তো?

তুমি একা যেতে পার না?

আগে কিন্তু আমাকে তুমি জোর করে নিয়ে যেতে—

বাঃ এখন সব ছেড়ে শুধু তোমার পেছনেই ঘুর ঘুর করি আর কি।

ক্ষেপে ওঠে কমল। কৃষ্ণা নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে করে, এই সময়-গুলো তার কাছে বড্ড ভারি মনে হয়।

ছোটবেলায় সে গান শিখত, ছবি আঁকত। ভাবল আবার শুরু করবে। কমলকে বলতেই সে হেসে ওঠে।

বলিহারি তোমার শখ। বেশ তো বাথ-রুমে গুনগুন করো।

কিন্তু কিছু একটা করতে হবে তো। একটা চাকরি টাকরি পেলে—

আমাদের পরিবারে কোনদিন কোন মেয়ে চাকরি করেনি।

কেউ করেনি বলে আমিও করব না। করতে নেই বলে করবে না।

কৃষ্ণার নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ, বড়ো একা মনে হয়। সবই যদি করতে নেই, তাহলে কি করবে সে। তার সঙ্গে তাহলে শো-কেস দোকানের ডামির তফাৎ কোথায়! সে অবাক চোখে কমলের দিকে তাকায়। চোখ দুটো ধীরে ধীরে সজল হয়ে ওঠে। তার সেই পরিচিত কমল তো ও নয়। ও একেবারেই অচেনা। ওর সঙ্গে সারাটা জীবন সে কাটাবে কি করে! অথচ এই কমলের সঙ্গে পথ চলবে বলেই না সে তার বাবার কথা শোনেনি মায়ের কান্না তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। কমলের ডাকে তার বহুদিনের ঘরবাড়ি ছেড়ে সে তার কাছে চলে এসেছে। একথা কি সে একবারও ভাবে না। এখন কিছু বললেই কমল বলে, তোমার অভাবটা কোথায়! বেশ তো আছ। খাওয়া আস্তা কাপড়-জামা...এর বাইরে যে কোন অভাব থাকতে পারে এ যেন সে কবেই ভুলে গেছে।

এক বিকেলে ট্রাঙ্কের নীচে পুরনো কাপড়-চোপড়ের মধ্যে সে খুঁজে পেল অতীত কমলের চিঠি। নীল রংয়ের কাগজ-গুলো এখন বেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার আর এগুলো পড়তে ইচ্ছে করে না। ছিঁড়ে বাতাসে ভাসিয়ে দেয়। আজকাল রাতে আর সে কমলের জন্য অপেক্ষা করে না। আগে করত। তখন কমল যতক্ষণ না আসত, সে তার জন্য খাওয়ার নিয়ে অপেক্ষা করত, কখনো কখনো থালার পাশেই ঘুমিয়ে পড়ত। কমল বলত,

—তুমি মিছিমিছি আমার জন্য বসে থাক কেন? খেয়ে শুয়ে পড়লেই পার।

সে হয়তো ঠিকই বলে। খাওয়ার পরে তার আর কিছু বলার বা শোনার অবকাশ থাকে না। এই সারা দিনে তাকে বলার জন্য কৃষ্ণার যে অনেক কথা জমা হয়ে গেছে সেদিকে সে খেয়ালই করে না। কৃষ্ণার বলার আগেই ঘুমে ডুবে দেয় সে। কখনো কখনো অবশ্য কমল তাকে জাগিয়ে তোলে, তার শারীরিক চাহিদা মেটানোর বেলায়। এভাবেই সময় চলে যায়। প্রথম প্রথম কৃষ্ণার যে মনটা বিদ্রোহী হতে চেষ্টা করতো, তা ক্রমশ পঙ্গু হতে থাকে। এক-দিন যে সে কিছু চাইত, কিছু স্বপ্ন দেখত, তা ক্রমশঃ ভুলে যেতে চেষ্টা করে।

একদিন কমল অফিস থেকে এসে জানায় তার দার্জিলিং যাব। চমকে ওঠে কৃষ্ণা। কমল মিথ্যে বলছে না তো! সে কি তাহলে এখনো তার জন্য ভাবে!

কি চুপ করে আছ যে?

ভাবছি তুমি বললে না অন্য কেউ।

কমল দুটো ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে দেয়।

হঠাৎ দার্জিলিং যে?

আর বল কেন। চা-বাগানে কি সব ঝামেলা হয়েছে, না গেলে নয়। অফিস যখন দুজনের খরচ দিচ্ছে—

তাহলে চা-বাগানের জন্য যাচ্ছ?

এই সুযোগে জায়গাটাও দেখা হয়ে যাবে।

তুমি যাচ্ছ যাও, আমি যাব না।

কেন তুমি তো পাহাড়ে যেতে চাইতে?

তা-বলে এভাবে?

এভাবে মানে!

কৃষ্ণা কমলকে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে না। তার মনে পড়ে যায় একদিনের একটি ঘটনা। কিন্তু কমলের কি তা মনে পড়বে? সে তো এখন অনেক কথাই ভুলে গেছে। যাতে সেগুলো আবার মনে পড়ে যায়, আবার তারা তাদের অতীতটা ফিরে পেতে পারে, এজন্য কৃষ্ণা দার্জিলিং যেতে রাজী হয়ে যায়। পাহাড়ে যাওয়া তার অনেক দিনের ইচ্ছে। ঐ পাহাড়ের ওপারে কি আছে তাকে দেখতেই হবে।

সেদিন সকালে সারাটা দার্জিলিং কুয়াশায় ঢাকা। কৃষ্ণা ভোর থেকেই কমলকে বাইরে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। কমল এখনো লেপের তলায়।

এভাবে শুয়ে থাকবে যদি তাহলে এখানে এলে কেন?

তবে কি কুয়াশায় ঘুরবো বলে এসেছি নাকি?

এভাবে ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে?

তোমাকে যেতে মানা করছে কে?

কৃষ্ণা একাই বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে নেয় রং, তুলি এইসব। ছোটবেলার শেখা বিদ্যেটা যদি কাজে লেগে যায়। কুয়াশা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, জেগে উঠছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। কৃষ্ণা পাহাড়ী পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকে। একটা খাদের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। ভারী ভাল লাগে জায়গাটা। পাথরের ওপর বসে সে তখন রঙে তুলি ডোবাতে থাকে।

সাদা কাগজে সবুজ আঁচড়। কৃষ্ণা গুনগুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গাছ-পালাগুলো আরো ঘন করে দেয়।

আপনি তো সুন্দর গান করেন।

চমকে তাকায় কৃষ্ণা। কয়েকটা পাথরের ওপারে এক পুরুষ। তার অবিন্যস্ত পোশাক, রুক্ষ চুল, তিন-চারদিনের না-কামানো দাড়ি, কাঁধের ঢাউস ব্যাগ কৃষ্ণার মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। কে এই লোকটা! কোত্থেকে এল! মনে মনে বিরক্ত হয় সে। তার কথার কোন জবাব না দিয়ে নতুন করে তুলিতে মন দেয়। লোকটি এই অব-হেলাকে গ্রাহ্যই করে না। আরো কাছে এগিয়ে আসে। কৃষ্ণা না তাকিয়েও বুঝতে পারে লোকটি তার ছবি দেখছে।

বাঃ! ছবিটাও আপনার দারুণ, কিন্তু—

কৃষ্ণা লোকটির দিকে তাকায় না। হ্যাংলামি তার অসহ্য লাগে। পুরুষ মানুষ এত হ্যাংলা হবে কেন! সে কথার কোন জবাব না দিয়ে একইভাবে ছবি আঁকতে থাকে। কাছে-পিঠে যে কেউ আছে এ যেন সে জানেই না।

ছবিটা ভালই হচ্ছে। কিন্তু এখানে এই রংটা দিলেন কেন?

কৃষ্ণার ধৈর্য এবার অশান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু লোকটিকে বলার আগেই সে তার হাত থেকে কাগজ আর তুলিটা কেড়ে নেয়। কৃষ্ণার তীব্র ক্রোধ তাকে কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেয়। লোকটি কিন্তু তার দিকে একবারও তাকায় না। সে তখন

রং আর তুলি নিয়ে ব্যস্ত। একটু পরে আঁকা থামিয়ে ছবিটা ভাল করে দেখে। তারপর কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে দেয়।

দেখুন তো কেমন লাগছে।

ছবিটা কৃষ্ণাকে স্তব্ধ করে দেয়। তার এতক্ষণের চেষ্টা যে ছবিকে সম্পূর্ণতা দিতে পারেনি, এই লোকটির কয়েকটি আঁচড় তাকে যেন পরিপূর্ণ করে তোলে।

দাঁড়ান আপনার একটা ছবি আঁকি। আপনি ঐদিকে তাকিয়ে আগের সুরটা ভাঁজুন—বলতে বলতে লোকটি তার ব্যাগ খুলে ফেলে। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ে বাঁশের বাঁশী, কিছু বই, টেপ-রেকর্ডার ও সবশেষে তুলি রং ক্যানভাস্। ড্রইং বোর্ডের ওপর কাগজ আটকে সে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকায়। কৃষ্ণার প্রোফাইলের ওপরে তার চোখ দুটো তখনো স্থির। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বোর্ড থেকে কাগজটা খুলে ফেলে।

নাঃ, আপনার ছবি আমি আঁকব না। যে মুখে এত ব্যথা সে মুখ আমি আঁকতে পারি না।

চমকে ওঠে কৃষ্ণা। কি করে বুঝল লোকটি। সে তাকে কিছু বলতে যাবে, সে-সময় দশ-বার বছরের একটা ছেলে দৌড়ে আসে।

রঞ্জন, তুই সেই সুরটা শিখবি বলছিলি না—

লোকটি ছেলেটির চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলে, আজই?

হ্যাঁ, আজ, এক্ষুণি।

তাহলে চল্। চলি—

তার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে লোকটি পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যায়। কৃষ্ণাও হোটেলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে। কিন্তু কিছুটা নেমেই সে রাস্তা খুঁজে পায় না। আশে পাশে কেউ নেই যে জিজ্ঞেস করে। একটা রাস্তা ধরে সে আরো কিছুটা এগিয়ে যায়। হঠাৎ দেখে সেই ছেলেটি পাথরের ওপর বসে বাঁশি বাজাচ্ছে আর লোকটি তন্ময় হয়ে শুনছে। ছেলেটি থামতেই লোকটি সেই সুর তুলে নিতে চেষ্টা করে। কৃষ্ণা সেদিকে এগিয়ে যায়।

শুনছেন?

তারা দুজন তাকায়।

নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল করেছেন; আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন?

কৃষ্ণা হোটেলের নাম বলে।

পটল, তুই ওকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আয়।

বাঃ, আমি এখন হাটে যাব না। ওটা তো তোর হোটেল। তুই যা না। চলুন যাওয়া যাক।

ছোট ছোট পাথর টপকে লোকটি দ্রুত চলতে থাকে। কৃষ্ণা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না।

একটু আস্তে হাঁটুন।

কেন?

আমি পারছি না যে।

চেষ্টা করুন।

আপনিও তো চেষ্টা করতে পারেন। আস্তে হাঁটতে?

হ্যাঁ।

না পারি না।

বলেই লোকটি তার পাশে চলে আসে।

আপনার এই ব্যাগটা আমায় দিন।

না ঠিক আছে।

আপনার কষ্ট হচ্ছে, তবুও দেবেন না? কষ্ট আপনার হবে না?

না। কৃষ্ণার ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সে বলে,—আপনি কোনদিন পাহাড়ে উঠেছেন?

না, তবে উঠতে ইচ্ছে করে।

তাহলে ওঠেন নি কেন?

পারি না যে।

কোনদিন চেষ্টা করেছেন?

না তো।

তাহলে কী করে বুঝলেন যে পারেন না? আচ্ছা আপনি সাঁতার জানেন?

হ্যাঁ।

কোনদিন গঙ্গায় সাঁতার দিয়েছেন।

না।

তাহলে সাঁতার জানলেনই বা কেন?

একা একা কি দেওয়া যায়?

হাজব্যান্ডকে সঙ্গে নিন।

তার সময় কোথায়?

বাঃ, বিয়ে করার সময় হয়, আর সাঁতার দেওয়ার সময় হয় না?

কৃষ্ণা অবাক চোখে এই অপরিচিত লোকটিকে দেখে। সদ্য পরিচিতার সঙ্গে কেউ যে এমনভাবে কথা বলতে পারে, এ ছিল তার স্বপ্নের বাইরে।

আসুন একটু কফি খাওয়া যাক।

হোটেলে ফিরে কৃষ্ণা দেখে কমল বেরিয়ে গেছে। সারাটা বিকেল সন্ধ্যা তার হোটেলের ঘরেই কেটে যায়। কমল ফেরে সন্ধ্যার পরে। আজ তাকে বেশ কয়েকটা মীটিং এ্যাটেন্ড করতে হয়েছে। কাল পরশুও নাকি এভাবে কাটবে।

তুমি যদি এত ব্যস্ত থাকবে, তাহলে আমি কি করব?

দাঁড়াও তোমাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

কে?

আমার এক বন্ধু। অনেক বছর পরে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল। ছেলেটা দুর্দান্ত মেরিটোরিয়াস বুঝলে। তবে স্কুলগুলো টিকে থাকার জন্য কিছু হল না। চাকরি-টাকরি ছেড়ে এখন একেবারে ভবঘুরে। চল ওর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

এক্ষুণি?

চলই না।

ঘরে ঢুকেই কৃষ্ণা অবাক। এতো সকালের সেই লোকটা! সে তখন রক্তকরবী পড়ছিল। নন্দিনী রাজাকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বারবার ধাক্কা দিচ্ছে।

কমল পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগেই সে বলে,—আমি চিনি। শুধু নামটাই যা জানা হয়নি।

চিনিস!

আজ সকালেই তো পাহাড়ে দেখা হয়েছিল।

তুমি বলনি তো?

আমি কি করে বুঝব?

তোদের কি এমন কোন চুক্তি আছে যে সব কথাই বলতে হবে?

তা নয়,—আচ্ছা তুই এখানে থাকবি কদিন?

জানি না। হয়তো কালই চলে যেতে পারি, হয়তো আরো এক মাস থেকেও যেতে পারি।

এবার যাবি কোথায়?

যেখানে ইচ্ছে হবে। তারপর মহাশয়া? চুপচাপ যে?

কি বলব?

যা ইচ্ছে। অবশ্য যদি কথা বলতে আদৌ ইচ্ছে করে।

এ ঘরটায় বেশ একটা মিষ্টি গন্ধ না। ধূপের বুঝি, কি নাম ধূপটার?

ধূপ নয়, এ একটা ফুল। ঐ যে—

ঘরের কোণে একটা ফুলদানিতে কৃষ্ণা একগোছা অচেনা ফুল দেখতে পায়। লালরংয়ের পাপড়ির গায়ে সাদা ফোঁটা, যেন কেউ চন্দন ছিটিয়ে দিয়েছে।

এ ফুল কোথায় ফোটে?

এই পাহাড়ের এক জায়গায়। যেতে প্রচন্ড ঝামেলা। পরপর বেশ কয়েকটা খাদ পেরুতে হয়।

আপনাকে কেউ এনে দেয় বুঝি?

না আমিই নিয়ে আসি। এমন ফুলের কাছে না গেলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কাউকে ভালবাসতে গেলে তো দূরে থেকে ভালবাসা যায় না।

কৃষ্ণার কাছে এই কথাগুলো কেমন অপরিচিত লাগে। কিন্তু কথাগুলোকে তার বড়ো আপন মনে হয়।

আপনি আমাকে এই ফুলের কাছে নিয়ে যাবেন?

ফুলগুলো ভাল লেগেছে?

ভীষণ। আচ্ছা এর নাম কি?

নাম তো জানি না। তবে আমি এর একটা নাম দিয়েছি।

কি?

আমার নাম বলব কেন?

একটা নেপালী ছেলে ঘরে ঢুকতেই উঠে পড়ে রঞ্জন।

আমাকে এবার যেতে হবে রে?

কোথায়?

ঐ ওদের একটা উৎসব হচ্ছে, যাবি?

না ভাই, কাল ভোরে উঠতে হবে। তিন-চারটে মীটিং আছে কিনা। তুই বরং কৃষ্ণাকে নিয়ে যেতে পারিস।

আজ নয়, কাল। বী রেডি।

তারা ঘরে ফিরে শোওয়ার তোড়জোড় করছে, দরজায় টোকা পড়ে। কমল দরজা খুলে দেখে রঞ্জন। সে কিছু না বলে ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকায়। তার হাতে ঐ ফুলদানি। টেবিলের ওপর ফুলদানিটা রেখে যেমন এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে যায় সে।

পাগল আর কাকে বলে। নাও শুয়ে পড়।

কাল সকালে তুমি বেরুবে তো?

তোমার তো ব্যবস্থা হয়ে গেল। রঞ্জনের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়বে। দুপুরের আগেই কিন্তু ফিরে এস।

আমি একা যাব? ওকে চিনি না—

ওকে আবার চিনতে কি? সকালে শোবার সময় আমার ঘুমটা আবার ভেঙে দিও না যেন।

পরদিন খুব ভোরে কৃষ্ণা তখনো ঠিকমতো জাগেনি, সে-সময় দরজায় একটা মৃদু টোকা পড়ে। কৃষ্ণা আর একটা টোকার অপেক্ষা করে। কিন্তু আর কোন শব্দ হয় না। তার কেমন সন্দেহ হয়। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখে যা ভেবেছিল তাই। রঞ্জন চলে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছেন যে?

সাড়াই তো পেলাম না।

আপনি যে এসেছেন আমি কি করে বুঝব?

নক করলাম যে?

এত আস্তে যে ঠিকমতো শুনতেই পাইনি।

যে শোনার ওতেই সে শুনতে পায়, আর যে শোনার নয়, সে দরজা ভেঙে ফেললেও শুনতে পায় না।

কৃষ্ণা পরিপূর্ণ চোখে রঞ্জনের দিকে তাকায়।

রাস্তায় নেমে রঞ্জন বলে,

ভাবছিলাম আজ তোর যাওয়াই হবে না।

লোকটির 'তুই' বলায় কৃষ্ণা এই মুহূর্তে আর আশ্চর্য হয় না। বলে,

কেন দরজা খুলছি না দেখে?

না। হয়তো প্রথমেই জিজ্ঞেস করে বসতিস কোথায় যাব, কিভাবে যাব।

কেন? জিজ্ঞেস করতে নেই?

তাহলে আর তোকে সঙ্গেই নিতাম না। আগে থেকে ঠিক করে রাখলে কি মজা থাকে? কোথায়, কখন এসব শব্দ আমার ডিকসিনারীতে নেই। তা এখন কোনদিকটায় যাবি?

আমি যেদিকে বলব, সেদিকেই যাবেন?

উঁহু—

কী?

'তুই' বলতে হবে? দেখিসনি এখানকার মালিক চাকর সবাই আমাকে 'তুই' বলে।

কেন?

যেহেতু তাদের কারুর চেয়ে আমি ছোট বা বড় নই। ঠিক তাদের মতো।

কিন্তু আমি তুই বলতে পারব না।

বাঃ একসঙ্গে চলতে শুরু করেছি, এক কথা বলতে পারব না? কী কোনদিকে যাবি?

ঐ ওদিকে। আচ্ছা আপনি কোনদিন স্যরি, তুই কোনদিন এই পাহাড়গুলোর ওপারে গেছিস?

অনেকবার।

ওপারে কি আছে?

গিয়ে দেখে আয়।

কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবে কে?

আমাকে তো কেউ নিয়ে যায় নি। তোকে যেতে হবে একা। তাহলেই আরো বেশী করে মজা পাবি।

রাস্তা চিনবো কি করে?

বেরুলেই চিনতে পারবি। ভুল পথে যেতে যেতে তো ঠিক পথ পাওয়া যায়।

তুই আমাকে চিনিয়ে দিতে পারিস না?

না। তুই ভুল পথে গেলেও বলব না। হোঁচট খেলেও তুলতে আসব না।

তবু সঙ্গে তো থাকতে পারিস।

তা হয়তো পারি। আর তোকে আজ একটা মেয়ের গল্প বলি—এক বিশাল রাজ্যে এক ছোট্ট রাজকন্যা ছিল—

কৃষ্ণা ক্রমশঃ সেই গল্পে ডুবে যেতে থাকে। এ তো তার কথা। তার আশা স্বপ্ন বাধা ভালবাসার কথা। রঞ্জন এসব জানলো কি করে। সে রঞ্জনকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ঐ রাজকন্যা কি এখনো তার স্বপ্নগুলো কাছে আনতে পারে?

কেন পারবে না?

কিন্তু কিভাবে?

এই যেভাবে আমরা হাঁটছি।

এই সরল সহজ উত্তরটা কৃষ্ণার হয়তো জানা ছিল, কিন্তু ঠিকমতো ধরতে পারছিল না। আজ উত্তরটা তার বড়ো কাছে চলে আসে। তার মৃতপ্রায় স্বপ্নগুলো আবার ডালপালা মেলাতে শুরু করে। তার ভেতরে যে নদী বইত, তা ক্রমশঃ শ্যাওলার আস্তরণে স্তব্ধ হয়ে গেছিল, এখন সেসব সরিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে এগোতে থাকে। সে রঞ্জনকে বলে, আজ আসার সময় ভাবছিলাম ঐ ফুলগাছটা কোথায় তোর কাছে জেনে নেব। কিন্তু এখন আর জানতে ইচ্ছে করছে না।

জানি। তুই নিজেই এখন খুঁজে নিতে চাস। পেলে দেখবি তার কাছে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারও তুচ্ছ হয়ে যাবে।

আচ্ছা এই যে এত গাছ পাহাড়, এসবগুলোর নাম তুই জানিস? যেগুলো জানি না, তার নাম নিজেই দিয়েছি। তুইও দিস, দেখবি তখন এগুলো সব তোর নিজের।

কথায় কথায় তারা ততক্ষণে বেশ কয়েকটা পাহাড় পেরিয়ে এসেছে। কৃষ্ণা যে পাহাড়ে যেতে চেয়েছিল, সেটা আরো কিছু দূরে। এত দূরে হবে কৃষ্ণা ভাবেনি। রঞ্জন তো তখন বলতে পারত।

কেন দূরে বললে কি করতিস?

অন্ততঃ কিছু খাওয়ার সঙ্গে আনতাম।

আয় এখানে বসে পড়ি।

ঝোলাটা খুলে ফেলে রঞ্জন। টিফিন বক্সে রুটি মাংস। নে হাত চালা। খিদে নিয়ে চলা যায় না। কি রে শুরু কর, নাকি আলাদা দেব?

কৃষ্ণা মাংসের টুকরো মুখে পুরে বলে, আলাদা দিলেই আশ্চর্য হতাম।

জোরে হেসে ওঠে রঞ্জন।

পাহাড়টার ওপরে উঠে আজ ফিরতে পারব তো?

ফেরার চিন্তা মাথায় থাকলে কি কখনো ওঠা যায়।

এই রঞ্জন আমাকে একবার বাঁশি শোনাবি?

এক্ষুণি?

হ্যাঁ।

বাঁশিটা তুলে নেয় রঞ্জন। কৃষ্ণার ভারি অবাক লাগে। এভাবে তার কথা যে কেউ রাখবে এ বিশ্বাস করতেই সে ভুলে গেছিল। কৃষ্ণার চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। এক সময় বাঁশি থামে। কৃষ্ণা নতুন করে নিজের সন্ধান পেতে শুরু করে।

কি রে এখন যাবি না ফিরবি?

তুই বুঝি টায়ার্ড রঞ্জন?

রঞ্জন হেসে ফেলে। জবাবটা জব্বর দিয়েছিস। নে চল।

পাহাড়ের উপরে যখন পৌঁছায় তখন বিকেল। কৃষ্ণা কমলকে বলেছিল দুপুরের আগেই ফিরে আসবে। কিন্তু এখন তার আর বাড়ি ফেরার ইচ্ছে করে না। কোথাও যে তার ঘর আছে, ঘরের মধ্যে সিন্দুক আছে, সিন্দুকে দামী গয়না আছে, এসবই সে এই মুহূর্তে ভুলে গেছে। পাহাড়ের এই শিখর থেকে তার এখন নিজেকে সম্রাজ্ঞী মনে হয়। এখানে হাত ওপরে তুললেই যেন আকাশ ছুঁতে পারবে। দু-চারটে নক্ষত্র তুলে খোঁপায় গুঁজতে পারবে। মেঘেদের গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে পারবে। এর কাছে সমস্ত পৃথিবীকে এখন তার তুচ্ছ মনে হয়। কৃষ্ণা পাহাড়ের ওপারটা দেখার চেষ্টা করে। দূরে হ্রদের মতো কি যেন দেখা যায়। তার পাশ দিয়ে একটা ঝর্ণা নেমে গেছে। কৃষ্ণার ঐ ঝর্ণাটার কাছে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করে।

আর দেরী করিস না রঞ্জন চল ওদিকটায় যাই। রাত হয়ে যাবে কৃষ্ণা।

তাতে কি? আকাশে তো চাঁদ থাকবে। ফিরে তুই যাবি না আমি একাই নেমে যাব?

এখন তো আমার সঙ্গে তুই বাঁচছিস না কৃষ্ণা। আমিই তোর সঙ্গে বাঁচছি। চল কোথায় নিয়ে যাবি?

যেতে যেতে কৃষ্ণা বলে, তুই যদি আমাকে বাধা দিতিস, তাহলে আমি একাই চলে যেতাম। এখন আর কোন বাধাকেই আমি সহ্য করতে পারব না। রঞ্জন পরিপূর্ণ চোখে তার দিকে তাকায়।

কৃষ্ণা, চল কে আগে ঝর্ণাটার কাছে পৌঁছোতে পারে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা নামছে। দুদিকে খয়েরী রঙের পাথর আর সবুজ ঝোপঝাড়। তাতে নাম না জানা অসংখ্য ফুল। কিছু দূরে বিশাল গাছগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বাতাসে তাদের পাতা পতপত করে নড়ে। গাছের ওপরে স্বচ্ছ আকাশ, আকাশের তলে ভাসমান মেঘ, এসব কিছু তার কাছে একাকার হয়ে যায়। এখন থেকে এই সমস্ত জায়গাটা তার নিজের। এর বিনিময়ে সে সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। এখানে সে একটা ছোট্ট ঘর বাঁধবে। তারপর-

কী কেমন লাগছে জায়গাটা? কিছু বলছিস না যে?

কথা বোঝাতে পারছি না তো, তাই চুপ করে আছি।

তোর এতক্ষণ একা থাকতে ভয় করে নি?

তুই এখানে ছিলি না?

না একটু ওদিকে গেছিলাম।

আমি কিন্তু বুঝতেই পারিনি। ওদিকে গেছিলি কেন?

তোর জন্য।

আমার জন্য?

তোকে একটু একা থাকতে দিতে চেয়েছিলাম।

এই গাছটায় যদি একটা দোলনা থাকত—

রঞ্জন কিছু বুনো লতা ও কাঠ জোগাড় করে আনে।

গাছের ডালে একটা দোলনা দোলে। আরো জোরে দোলা রঞ্জন, আরো জোরে। কৃষ্ণা দোল খেতে খেতে বলে ঐ জায়গাটা একেবারেই ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না রঞ্জন।

যাস না।

কাছে রঙ থাকলে একটা দারুণ ছবি আঁকতাম। রঙ আমার কাছে আছে।

তুই কি সব সময়েই রঙ টঙ নিয়ে ঘুরিস?

না আজ রেখেছিলাম। তোর জন্য। আমি জানতাম তুই আঁকতে চাইবি। দোলনা থেকে নেমে কৃষ্ণা রঞ্জনের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

আমি তোকে আঁকব। তুই এখানে বোস, ওদিকে তাকা উঁহু কথা নয়—এক সময় আঁকা শেষ করে উঠে পড়ে সে। রঞ্জন বলে, ছবিটা দেখি।

এখন নয়, চল ঐ ফুলটা খুঁজি।

কোন ফুল?

ঐ যে তোর ঘরে দেখেছিলাম। তুই কিন্তু বলবি না। আমি নিজেই খুঁজব।

যদি রাত হয়?

হোক। আজ সারারাত না হয় ফুলটাকেই খুঁজলাম। যদি না পাস?

তাহলে তুই এনে দিস, বর্তাদন না খুঁজে পাব।

এবার তারা অন্য রাস্তা ধরে। সে রাস্তা ঠিক না ভুল কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করে না। হঠাৎ কয়েকটা পাহাড় ডিঙিয়েই তারা থমকে দাঁড়ায়। কোন অজানা রাস্তায় তাদের হোটেলের কাছাকাছি চলে এসেছে। কৃষ্ণা রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

রাত অনেক হয়ে গেছে। তুই কি এখন হোটেলে ফিরবি?

পাগল।

কৃষ্ণা হোটেলের রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় যেতে শুরু করে, রঞ্জন ডাকে।

তুই একটু দাঁড়া, আমি আসছি।

কেন?

তোর জন্য একটা জিনিস আনব।

কী?

ঐ ফুল।

কিন্তু আমি তো এখনো খুঁজছি, ঠিকই পেয়ে যাব।

যতক্ষণ না পাবি, ততক্ষণ আমার দেওয়া ফুলটা না হয় তোর কাছে থাকল। ওটা নিয়েই না হয় তুই খুঁজতে বেরুলি।

তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু।

ঘন্টাখানেকের বেশী লাগবে না। যদি বৃষ্টি নামে, সামনের ঐ গুহাটায় ঢুকে যাবি। আমি না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকিস, কোথাও চলে যাস না যেন।

আমি কি তোকে একা রেখে চলে যাব বলে তোর সঙ্গে এতটা এলাম?

রঞ্জন হেসে পা চালায়।

কিছু পরেই টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। বাতাসের গতিও দ্রুত। রঞ্জনের কিছু হবে না তো? ও যদি হারিয়ে যায়? পথ ভুল করে? ভয়ে শিউরে ওঠে কুক্ষা। ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী। কুক্ষা গুহার মধ্যে আশ্রয় নেয়। সময় বয়ে যায়। এক একটা মিনিট তার কাছে এখন মনে হয় এক এক ঘন্টা। এ যেন আর ফুরোতেই চায় না। এই ঝড়ের মধ্যে রঞ্জন কোথায় কি করছে কে জানে। সে কি এখন তাকে খুঁজতে বেরুবে? কিন্তু তারপরেই যদি রঞ্জন এসে পড়ে। সে তাকে এখানে থাকতে বলেছে, সে অপেক্ষাই করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত রঞ্জন এখানে না পৌঁছায়।

এমন সময় দূরে পাহাড়ের ওদিকে কে যেন কুক্ষা বলে চিৎকার করে ওঠে। ডাকটা আরেকবার আসতেই সে বুঝতে পারে এ কমল। 'কুক্ষা,' কমলের আবার চিৎকার, 'কুক্ষা তুমি কোথায়? সাড়া দিচ্ছ না কেন? কমলের গলা থেকে এক-রাশ কাকুতি ঝরে পড়ে। সে ঐ ডাকের কোন জবাব না দিয়ে গুহার আরো ভেতরে ঢুকে যায়, যেখানে ঐ ডাকটা পৌঁছোতে না পারে।

কুক্ষা—

কুক্ষা সচকিত হয়। ডাকটা আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। আর একটু পরেই হয়তো কমল এখানে এসে যাবে। তার ইচ্ছে করে অন্য কোথাও ছুটে পালাতে, যেখানে কমল তাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু রঞ্জন যে তার জন্য ফুল আনতে গেছে। ফিরে এসে যদি দেখতে না পায়। সে তো তাকে কথা দিয়েছে, তার জন্য এখানে অপেক্ষা করবে। এই মুহূর্তে সে কি করবে সে ভেবে পায় না। কমলের গলা তখন আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। কুক্ষা, তুমি কোথায় সাড়া দাও। রাত হয়ে গেছে, আমার ভীষণ ভয় করছে কুক্ষা, তুমি কোথায়?

এবারও নীরব থাকে কুক্ষা। মনে মনে বলে, রাত হয়ে গেছে রঞ্জন, আমার ভীষণ ভয় করছে, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, ঐ ফুলটা আজ নাই বা আনলে, ভোর হলে আমরা দুজনেই ফুল খুঁজতে বেরুবো, এখন তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো রঞ্জন, আমরা ভোরের অপেক্ষায় থাকি।

কুক্ষা—

কুক্ষা চমকে যায়। ডাকটা যেন আরো কাছে। এই গুহার কাছে পিঠে কোথাও। তার সারা শরীর হতাশায় শিউরে ওঠে। একরাশ জড় পিণ্ড তো আবার তার অস্তিত্বের স্তরে স্তরে ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। যে স্রোতটা এতক্ষণ প্রবল বেগে চলতে শুরু করেছিল এই ডাকগুলো যেন তার ওপর আবার শ্যাওলা বিছিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

কুক্ষা—

ডাকটা গুহার মুখে। যেন ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছে। সেই মুহূর্তেই কুক্ষা ভেবে নেয় তার এখন কী করা উচিত। এই গুহায় সে বেশীক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ঐ অন্ধকারে, ঐ নিয়মের গোলাকধাঁধায় সে যদি ফিরে যেতে না চায় তাহলে শেষবারের মতো ঐ ডাকটার মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। সে গুহার বাইরে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পেয়েই কমল দৌড়ে আসে।

তুমি এখানে, আর আমি এত ডাকছি,—তুমি শুনতে পাওনি? কী চুপ করে আছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

কিছু হয়নি তো?

চল। কোথায়?

কোথায় আবার কী, হোটেলে।

আমার এখন হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। আমি এখানেই থাকতে চাই। তুমিও থেকে যাও না।

কি বলছ পাগলের মতো। চল তো।

আচ্ছা কমল, কুক্ষা কমলের চোখে চোখ রেখে বলে, আমি তো এতদিন তোমার কথামতো চললাম, তোমার মতো নিজেকে সাজালাম, এবার তুমি কিছুদিন আমার কথামতো চলবে?

মানে?

দেখো তুমি যা বলেছ এতদিন তো আমি তাই করেছি। নিজের সুখ স্বপ্ন-গুলো চেপে রেখে তোমার স্বপ্নকেই নিজের স্বপ্ন ভেবেছি। এবার আমি যদি আমার মতো করে তোমায় সাজাতে চাই, তুমি সাজবে? যদি বলি আমি যা চাই, তুমি তাই কর, করবে কি?

বাঃ না শুনে আগে থেকে বলি কি করে? তুমি যা চাও আমি তো তা নাও চাইতে পারি।

কিন্তু আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তো আমি অনেক কাজ করেছি, তুমি চেয়েছ বলে।

তুমি করলে বলে আমি করব?

ঠিক আছে তুমি তোমার মতো না হয় থাকলে, কিন্তু আমাকে কি আমার মতো থাকতে দেবে?

কিভাবে তুমি থাকতে চাও?

এখনই তা বলি কি করে। ধরো আমার ইচ্ছে হল এখানেই কয়েক মাস থেকে যাব।

তা কি করে হয়: ছুটি কোথায়! ওখানে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

তাহলে তুমি যাও, আমি না হয় এখন নাই বা ফিরলাম।

বাঃ লোকে কি বলবে:

ও এটাই তোমার কাছে বড় হল! আমি কি বললাম তা তোমার কাছে কিছু নয়!

দেখ তুমি কেন বুঝছ না--

আমাকে মিথ্যে বোঝাতে এস না কমল। তুমি এখন যেতে পার—তুমি যাবে না?

আমার সঙ্গে?

তাহলে কোথায় যাবে তুমি?

তা তোমাকে বলব কেন?

পাগলের মতো কী বকছ? তোমার কি মাথা খারাপ হল? ঐ রঞ্জনটাই দেখছি যত নষ্টের মূল। আমাদের এতদিনের সম্পর্ক—

আমার তো মনে হয় তোমার সঙ্গে কোনদিনই কোন সম্পর্ক ছিল না।

দেখ কুক্ষা—

আর কথা নয়, তুমি যেতে পার।

কি মুশকিল তুমি একটা কথা শুনবে তো, একটা সমাজে থাকতে হলে তার নিয়ম—

হ্যাং ইওর সমাজ। তুমি যাবে কিনা।

কুক্ষার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে কমল। তার এই ভয়ংকর রূপ সে কোনদিন দেখেনি। ভয় করে কমলের।

কী তুমি যাবে না?

কুক্ষা কয়েকটা পাথর ডেঙে ওপরে উঠে যায়।

তুমি সত্যিই আসবে না?

কুক্ষার চোখ দুটো জ[illegible]ন হয়। কমলের প্রতি এখনো তার কা[illegible] মায়া। সে মনে মনে বলে, কমল এতদি[illegible] আমি শুধু তোমার জন্য বেঁচেছি, তোমার অনুভূতিকে নিজের অনুভূতি ভেবে তৃপ্তি পেতে চেয়েছি। কিন্তু পাইনি কিছুই। এখন তাই আমি নিজের জন্য বাঁচতে চাই। অনেকদিন পরে আজ নিজেকে ফিরে পেয়েছি কিনা। কমল এখন তো আমি ফিরতে পারি না।

বৃষ্টির জল তার চোখের জলের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাই হয়তো কমলের কাছে তার কান্না ধরা পড়ে না। ফিরে চলে কমল। কুক্ষা সেদিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কমল জিজ্ঞেস করে, রঞ্জন কোথায়? ও কি ভেতরে লুকিয়ে আছে না কি?

রঞ্জন ফুল আনতে গেছে। আমার জন্য।

যদি সে আর ফিরে না আসে?

কুক্ষার সারা মুখে এক সাহসী ছড়িয়ে পড়ে।—

রাস্তাটা আমি চিনে গেছি কমল। রঞ্জন না ফিরলেও একা আমি ঠিক যেতে পারব।

সন্ধিক্ষন/অজিত দে

ননী উঠল।

এক রকম সারাটা দিন পাকুড়ের ছায়ায় ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে সে। অবেলায় এক পেট ভাত খাওয়ার পর গা-গতরে যে স্ফুর্তি নামে সে জাতের আরাম অবশ্যি ছিল না ননীর। কেননা তার পেটে খিদে ছিল, সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তা। বেশি ভাবনা-চিন্তা করলেও মানুষের একটা ঝিম ধরা ভাব আসে। হাত-পা নাড়তে ইচ্ছে করে না, শরীরটা কেমন জবু-থবু শক্ত হয়ে যায়।

ননী খিদেয় যতটা না কাবু তার চেয়ে ঢের বেশি চিন্তায়। এক-আধদিন উপোসের ব্যাপারটা তার কাছে নতুন কিছু না। অমন কত হয়েছে এর আগে। কিন্তু ননী কখনো দমেনি। অন্তত আজকের মত নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়নি কোনদিন।

টাল-মাটাল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ননী চারদিকে তাকাল। নির্জীব শরীরটা কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। চিন্তায় মাথাটা ভারী, ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ। যত ভাবনা বিন্দুর জন্যে। বিন্দুকে নিয়ে ননীর বিষম ভয়।

সেই সকালে রেগে-মেগে বেরিয়ে গেছে বিন্দু। ননী ভেবেছিল, রাগ পড়লে একটু বাদেই ফিরে আসবেও। ফি-বার যেমন হয়। কিন্তু সকাল গেল, দুপুর গেল,. বিকেলও গাড়িয়ে সন্ধে হতে চলল প্রায়—অথচ এখনো বিন্দুর ফেরার নাম নেই।

শাড়ি না, গয়না না—সামান্য চা খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে যত বিপত্তি। বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের চায়ের নেশা বিন্দুর। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কাচের গেলাসটা ননীর দিকে বাড়িয়ে দেয়। ননী তড়ি-ঘড়ি দোকান থেকে চা নিয়ে আসে। বিন্দু ঘুম জড়ানো চোখে তারিয়ে তারিয়ে চা-টা খায়। গেলাসটা শেষ করার পর বিন্দুর মেজাজ আসে। তখন তুমি যত খুশি কাজ করার কথা বল, সংসারের কথা বল কিংবা আদর-সোহাগ কর বিন্দু সবতাতেই হাসি মুখে রাজি। কিন্তু দৈবাৎ অন্যরকম হলেই বিপদ। বিন্দু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। এই একটা ব্যাপারে ও ভীষণ অবুঝ। তোমার পয়সা আছে কি নেই ও শুনবে না। যেখান থেকে পার যেমন করে পার ওর জন্যে চা আনো। যতক্ষণ না আনতে পার ততক্ষণ তুই তোকারি, বাপ-বাপান্ত।

আজও ভোর হয়েছে কি হয়নি—বাইরে তখনো আঁধার, দু-একটি কাক সবে ডেকে উঠেছে, বিন্দু ননীর গায়ে ঠেলা দিল। ননী ইঙ্গিতটা বুঝল কিন্তু উঠল না। উঠে লাভই বা কী, একটা পয়সাও নেই ননীর কাছে।

বিন্দু আরো জোরে ঠেলা দিল ননীকে। পাশ ফিরে শুয়ে ননী এবারে কোন মতে বলল, এখন চা হবে না। পয়সা নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ছুটল বিন্দুর। বিছানা ছেড়ে উঠে হাঁড়ি-কুঁড়ি জিনিসপত্র লাথি মেরে তছনছ করল। আর সে কী ছন্দ গালি-গালাজ। এমন সব কথা যে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু ননী একটাও কথা বলেনি। কথা বলা মানেই খামোখা ঝগড়া বাড়ানো। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভালো। বোবার শত্রু নেই।

শেষমেষ বিন্দু যখন বেরিয়ে যাচ্ছে ননী তখন ওর একখানা হাত ধরে বলেছিল, রাগ করিস নে। একটু বেলা হোক, তারপর দেখি কী করা যায়।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল বিন্দু। কটু ঝাঁঝালো গলায় বলেছিল, সোহাগ দেখাতে লজ্জা করে না তোর। এক কাপ চা খাওয়াবার মুরোদ নেই, ভিখিরির বাচ্চা—তার আবার মেয়েমানষির শখ কেন?

সেই যে বেরিয়ে গেল বিন্দু তারপর আর এখন অব্দি পাত্তা নেই। কখন যে ফিরবে কে জানে।

ননী কয়েক পা এগিয়ে গেল। সামনে খয়েরী রঙের গাইটা শোয়া। সুবলের গরু। হালে কিনেছে। সুবল আজ-কাল খায়-দায় ভালো, শখ-আহ্লাদের বহরও খুব। জুয়া খেলায় বেশ দু পয়সা হচ্ছে ওর। মাঝে লোভে পড়ে ননীও বার কয়েক খেলেছিল। প্রতিবারই ঝুটমুট গাঁট-গচ্চা। ওসব নম্বরের কারসাজি ননীর মাথায় ভাল ঢোকে না। কিন্তু এ ব্যাপারে সুবলের মাথা খুব সাফ। অন্য লোকদের পয়সা যত যায়, সুবলের তত বেশি আসে। ইদানীং বিন্দু যেন সুবলের দিকে বেশ একটু ঝুঁকেছে। প্রায়ই দুজনে কী সব শলা-পরামর্শ হয়। অনেকক্ষণ। যদ্দুর মনে হয় সুবলের সঙ্গেই কোথাও বেরিয়েছে বিন্দু।

সুবলের ওপর আক্রোশের বশে গরুটার পেটে একটা লাথি মারল ননী। আচমকা আঘাতে দিশেহারা গরুটা জোরে ডেকে উঠল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে গেল। কিন্তু টান পড়ল খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে। ড্যাবডেবে করুণ চোখে গরুটা তাকিয়ে রইল ননীর দিকে।

ননী খানিকটা এগিয়েছিল। কী মনে করে ফিরে এল আবার। গরুটার পিঠে গলায় হাত বুলিয়ে আদর করল। গাভীন গরু। আহা অবলা জীব!

পাকুড় গাছের মগডালে যে রোদটা ছিল তাও মুছে গেছে কখন। বুনো ঘাস আর কচুগাছে ছাওয়া অসমতল জমিটুকুর ওপর আবছা মতন আলো ঝিরঝিরিয়ে কাঁপছে। সীমানা ছুঁয়ে একটা কারখানার দেয়াল টানা চলে গেছে অনেক দূরে। দেয়াল জুড়ে অগুনতি ঘুঁটে। এতক্ষণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, এখন ঝাপসা। অন্ধকার মতন একটা ছোট্ট ডেলা এইমাত্র উড়ে এসে বসল দেয়ালের মাথায়। বোধহয় কাক।

ননীর হুঁস হল। ঘর-দোর খোলা। আঁধারের সুযোগে কে কী হাতিয়ে নেয় ঠিক কী। অবশ্যি নেবার মত কী-ই বা আছে। খানকতক কলাইয়ের বাসন, অল্প দু-চারখানা পুরনো জামা-কাপড় আর ছেঁড়া ময়লা কাঁথা-বালিশের বিছানা ননীর বিষয়-আশয় বলতে তো এই। তবু বলা যায় না। যা সব হতভাগার ভিড় এখানে।

ননী তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে এগোল। ঘর বলতে ঝুপরি। মাটি বাঁশ কাঁচপাতা খড় আর দরমা দিয়ে ঘরের গোঁজামিল। বাইরে থেকে মাজা বাঁকিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়, ভিতরে সোজা দাঁড়ানো যায় না। জায়গা

কম, ইচ্ছে মতন হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করাও দায়। তবু মাথা গোঁজার একটা আস্তানা তো বটে, রোদ-বৃষ্টি থেকে গা মাথা তো বাঁচানো যায়। তাই বা কম কী।

জমির এ পাশে যশোর রোড। রাস্তার ধারে ধারে নয়ানজুলির গা বেয়ে সারি সারি ঝুপরি। খান দশেক। প্রায় একটা ছোটখাট পাড়া যেন।

নয়ানজুলিতে জল নেই। একেবারে শুকনো খটখটে। পার হওয়ার পর সামান্য ঢালু জমি। সেটুকু বেয়ে উঠে ননী নিজের ঘরে উঁকি দিল। ঝাঁপটা টেনে-টুনে ঠিক-ঠাক করে দরজায় লাগাল। তারপর সুবলের ঘরের দিকে গেল। সুবলের বউ কুপি জ্বালিয়ে কী সব করছিল, ননীকে দেখে লম্বা ঘোমটা টানল। বউটা ভীষণ লাজুক। ননী জিজ্ঞেস করল, সুবল ফিরেছে নাকি গো বউঠান?

সুবলের বউ শব্দ করল না। মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, ফেরেনি।

ননী ঘরে ফিরল না। ঝুপড়ি ছাড়িয়ে সামান্য দূরে গিয়ে বসল। রাস্তা থেকে কিছুটা তফাতে। গোটা কয়েক জারুল আর বটগাছ দিয়ে ঘেরা নিরিবিলি মতন একটু জায়গা। কাছে একটা লাইট পোস্ট। নিয়নের খানিকটা নরম আলো ননীর ছড়ানো পা অব্দি এসে থমকে আছে।

অন্ধকারে একা পেয়ে ভয়টা আবার ননীকে চেপে ধরল। এতক্ষণে ননীর মনে হল তার ভয়টা মোটেই অমূলক নয়। বিন্দু বোধহয় সত্যি সত্যিই আর ফিরবে না। হয়তো আবার কাউকে জুটিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে ও। বিন্দুর পক্ষে কিছুই অসম্ভব না।

ননীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। বিন্দুকে ছাড়া সে বাঁচবে কেমন করে। ওকে নিয়ে বড় সাধের সংসার পেতেছিল ননী। অনেক কষ্ট করে, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে বিন্দুকে পেয়েছে সে।

বিন্দুকে ননী প্রথম দেখে গোরাবাজার স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। গেল বছর। বর্ষার মুখোমুখি সময় ছিল সেটা। অনেকগুলো হা-ঘরে পরিবার গোটা প্ল্যাটফরম জুড়ে থিকথিক করছে। উদোম খোলামেলা স্টেশনে এলো-পাথারি হাঁড়ি-কুড়ি বাসন-পত্তর ইঁট-পাতা উনুন আর চটের বিছানা ছড়িয়ে মেয়ে-মরদ আর গুচ্ছের কাচ্চা-বাচ্চা শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা ঝগড়া-ঝাঁটি লোভ হিংসা ইত্যাদির যাবতীয় ব্যাপার-স্যাপার সমেত আকণ্ঠ মজে আছে। জন্ম আঁতুড় আর মৃত্যু শয্যাও প্রায় একরকম পাশাপাশি। ঘর নেই, দোর নেই—তবু সংসারের তামাসাটি ঠিক আছে।

মেঘ-ভাঙা রোদ্দুরে মাখামাখি সকাল। ননী বাসি মুখে এক ভাঁড় চা নিয়ে চুমুক দিচ্ছিল। ঘুম-ঘুম ভাবটা তখনো লেগে আছে চোখের পাতায়। পায়ে পায়ে মানুষ, তিল ধরণের স্থান নেই প্ল্যাটফরমে। আশে-পাশে হাজারো গলায় শব্দ চিৎকার হাঁক-ডাক। ট্রেন আসছে যাচ্ছে। গাড়ি ছেড়ে গেলে খানিক সময়ের জন্যে ভিড় পাতলা হচ্ছে সামান্য। তারপর আবার যে কে সেই। আপিস কারখানার ডিউটি বাবুদের জন্যে এই রকমই চলবে বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা ইস্তক। যা মানুষের ভিড়, অনবরত গায়ে গায়ে ধাক্কাধাক্কি—ননী ভাঁড় সামলে কোনমতে চাটা শেষ করল। শরীরটা চাঙ্গা লাগল এতক্ষণে। শূন্য ভাঁড়টা লাইনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ননী ফিরল। মুখ ঘোরাতে বিন্দুকে দেখল সে। সেই প্রথম। হাত দশেক তফাতে কাঠ-কুটো জেবলে যেন ভাত রাঁধছিল আপন-মনে। পাশে আধ বুড়ো মতন একটা মানুষ বসা। কালো বর্ণের মেয়ের এত রূপও হয়। ননী যেন চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল। প্রতিমার আদলে মুখের গড়ন, শিশিরে ধোয়া পাতার মতন নরম লাবণ্য সারা শরীরে, আধ-ভাঙা খোঁপা আদরে ঢঙে পিঠ ছুঁয়ে আছে—মেয়েটির সব কিছুই যেন বড় বে-মানান এখানে। সব কিছু ছাপিয়ে রয়েছে দুটি ভাসা ভাসা চোখ। ডাগর। ভারি মায়াময়—তাকালে গা শির শির করে মোহিনী ইসারায় কে যেন ডাকে মনে হয়। পলকের জন্যে একবার মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। ননীর বুকের রক্ত চলকে উঠল আচমকা। মনে হল, এই চোখ দুটি তার চেনা, এই মেয়েকে আগে কোথায় যেন দেখেছে সে। স্মৃতির ভিতর ননী তার নিজের গ্রাম-গঞ্জ, এই শহরের তাবত চেনা-জানা মানুষের মুখের আদল তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এই মেয়েকে কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না। ননী তবু ভাবল, কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ওকে দেখেছে সে। কিন্তু কোথায়, কোথায়! সঠিক কোন জায়গার নাম কিছুতেই মনে আসে না ননীর। তবে কি গত জন্মে? ননী লেখা-পড়া শেখেনি, গত জন্মের ব্যাপার-স্যাপার তার মাথায় ভাল ঢোকে না—কেমন করে জানি তার মনে হয় এই মেয়ে তার বড় আপনার জন, এ জন্মে ওকে তার পেতেই হবে। পৃথিবীর সব সুখ-ভালবাসা যেন ওর কাছেই গচ্ছিত রাখা আছে ননীর—ওকে না পেলে সেসব কিছুই পাওয়া হবে না তার, এই জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে ননীর।

এপাশ-ওপাশ থেকে কেউ কেউ ননীকে লক্ষ্য করছে, মানুষজন বারবার ঠেলে-ঠুলে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু তার কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। বেবাক ভুলে উজবুকের মত ননী বিন্দুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

ভাত ফুটে গেছে। কাঠ-কুটো সরিয়ে যেন সমেত ভাতের মালসাটা নামাল বিন্দু। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। চোখে পড়ল, সেই লোকটা এখনো দাঁড়িয়ে। ঠায় তার দিকে তাকিয়ে। [illegible] ভুরু কুঁচকে ননীর দিকে তাকাল। [illegible] দেখল, মেয়েটার দু' চোখে আগুন। কিন্তু শুধু কি আগুন? ননীর যেন মনে হল, পাতলা এক টুকরো চাপা হাসিও রয়েছে ওর ঠোঁটে।

ননী সেদিনকার মত সরে গেল।

দিন যায়। রোজ খানিকটা সময় ননী বিন্দুর আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। বিন্দু কখনো এক-আধবার ননীর দিকে তাকায়, কখনো একেবারে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। কোন কোনদিন বা অল্প একটু হাসে। ননী সেদিন কৃতার্থ হয়ে যায়।

ননীর এখন এক বুক সাধ। সংসার পাততে চায় সে। আগের মত এখন আর নিঃস্ব ফকির নয় ননী। রামদীন মাহাতোর সঙ্গে দোস্তি হওয়ার পর থেকেই হাল ফিরে গেছে তার। রামদীন ঠেলা গাড়ির কারবারী, খান পাঁচেক ঠেলার মালিক সে। স্টেশন রোড থেকে ভারী ভারী লোহা-লক্কড় খিদিরপুরের এক কারখানায় নিয়মিত পৌঁছে দেওয়ার চুক্তি রামদীনের। কোম্পানীর চাহিদা বাড়ছে। পাঁচখানা ঠেলায় রামদীন কুলিয়ে উঠতে পারে না, হিমসিম খায়। নতুন একটা ঠেলা বানিয়ে তাতে ননীকেও লাগিয়ে দেয় সে। দিন তিন-চার টাকা রোজগার। বুঝে-সুঝে খরচা করলে একলা মানুষের অত লাগে না। ননী বুঝদার। রোজগারের পয়সা থেকে অল্প-অল্প বাঁচিয়ে সামান্য পুঁজিও করে নিয়েছে সে। এখন একটা সংসারের দরকার। সংসার মানেই মেয়েমানুষ। কিন্তু যেমন তেমন একটা মেয়েমানুষ হলেই সংসার সুখের হয় না। মানানসই মেয়ে চাই। বিন্দুর মতো। বিন্দুকে ছাড়া ননীর সংসার ঠিক মানাবে না।

ননীর অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে বিন্দুকে। কথাগুলো বলার জন্যে বুকের মধ্যে আথালি-বিথালি ঝড় বয়। কিন্তু সুযোগ হয় না। ননী যেন ক্রমেই হন্যে হয়ে ওঠে। তারপর সুযোগ মিলে যায় একদিন। হঠাৎ-ই। বাদলার দিন ছিল সেটা। দিন দুই সমানে ধারা বর্ষণের পর বিকেলের দিকে বিষ্টিটা একটু ধরে ছিল। সিগন্যাল পার হয়ে ফাঁকা মাঠ মতন অনেক-খানি জায়গা। সেইখানে বিন্দুকে লাইন ধরে হাঁটতে দেখল ননী। কোন বাবুর বাড়ি ঠিকে কাজ-টাজ পেয়েছে, সেরে ফিরছে বোধহয়।

ননীও ফিরছিল। ঠেলার চাকা দুটো গড়-বড় করছে। মিস্তিরিকে খবর দিতে গিয়েছিল। ননী ছিল পিছনে। সাত তাড়া-তাড়ি এগিয়ে ওকে ধরতে যাবে, কী যেন টের পেয়ে বিন্দু নিজেই ঘুরে দাঁড়াল। ননীকে দেখে চমকে উঠল সামান্য তারপর বলল, আমার পিছন পিছন আসতিছ যে—কেমন ধারা লোক তুমি!

ননী কোনো কথা বলল না। বিন্দু আবার বলল, অনেক দিন দেখতিছি...আমার দিকি তোমার এত নজর ক্যান?

ননী শক্ত হাতে ঠেলা চালায়। অনেক দিন পর পাওয়া এই সুযোগটা সহজে ছাড়ল না। বলল, তোকে আমার খুব ভাল লাগে—না দেখে থাকতে পারি না।

বিন্দু খানিকটা সরে গেল। তারপর চোখ নাচিয়ে বলল, মরণ! বলে খিলখিল করে হাসল।

ননীর বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। মেয়েদের ছলা-কলা বোঝে না সে। এসব কথার কী উত্তর দিতে হয় জানা নেই তার।

বিন্দু ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। অনেক কথা বলবে ভেবেছিল ননী। কিন্তু তেমন করে কিছুই বলা হলো না।

এরপর হপ্তাখানেক ননী আর বিন্দুকে ধরার ফুরসত পেল না। কাজের চাপ ছিল খুব। গাধার খাটুনি, কাজ শেষ করার পর গায়ের মাংস আলগা হয়ে যায় যেন। তখন নেতিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বিন্দুর সঙ্গে দেখা করার লোভে মনটা ছটফট করে, কিন্তু শরীর বয় না। কোম্পানীর কাজ সপ্তাহে একদিন বন্ধ। রামদীনের ঠেলা-গুলো ছুটকো ভাড়া খাটে সেদিন। সব ঠেলার ভাড়া জোটে না, বেশির ভাগই বসে থাকে। তেমনি একটা দিনে ননী ফের বিন্দুকে ধরল।

বিন্দু ভুরু কুঁচকে ননীকে দেখল। বলল, আমার পিছে এত লাগিছ ক্যান কও তো—কী চাও তুমি?

—আমি তোকে চাই বিন্দু... তোকে নিয়ে সংসার করব।

বিন্দু ঘাড় নাড়ল। বলল, উঁহু, সেডা ক্যামন কইরে হয়!

শুকনো গলায় ননী শুধোল, কেন?

বিন্দু তেরছা চোখে ননীকে দেখল তারপর কেমন এক রকম হেসে বলল, আমার সোয়ামী আছে।

ননী যেন নিভে গেল। নিজেকে বড় দুর্বল অসহায় লাগল হঠাৎ। চকিতে তার মনে হল বুকের ভিতরটা অসম্ভব ফাঁকা। শস্যহীন ফাটা-ফাটা উদোম মাঠের মত খাঁ খাঁ করছে যেন। ননী আর বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না, মাথা নুইয়ে ফেলল। চোখ নামিয়ে নেওয়ার সময় এতদিন এর ননী লক্ষ্য করল, বিন্দুর মাথার চুলের ভিতর এক চিলতে সিঁদুরের রেখা। প্রায় অস্পষ্ট। আধ-বুড়ো যে লোকটাকে বিন্দুর পাশে বসে থাকতে দেখা যায়, সে-ই তবে বিন্দুর স্বামী। ননী যেন এতদিনে সব বুঝল। আরো পরে ননী জেনেছিল, লোকটার নাম রসিক।

ফাঁকা মাঠের ওপর বিভ্রান্তের মত মত ননী দাঁড়িয়ে থাকল। একা। যেন হারিয়ে গেছে সে। অনেকক্ষণ পর ননী নিজেকে ফিরে পেল আবার। ততক্ষণে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নেমে গেছে ননীর চার-পাশে। বিন্দুও চলে গেছে কখন।

ননী ভীষণ দমে গেল। কয়েকটা দিন বিন্দুর ধারে-কাছে গেল না সে। কী জ্বালা! কিন্তু মন মানে না। মায়াময় দুটো চোখ যেন কেবলই মোহিনী ইসারায় তাকে ডাকতে থাকে। বুকের মধ্যে মত্ত উথাল-পাথাল। খেয়ে সুখ নেই, চোখের ঘুম কে কেড়ে নিয়েছে। ননী যেন কাঁদিনেই কেমন দুর্বল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ধরে রাখতে পারল না সে। মন যেন কিছুই মানতে চাইল না। শেষে ঠিক করল বিন্দুর সঙ্গে দেখা করবে সে। আজই। দীর্ঘ সময় নিল সারাটা দিনমান, বিকেলও যেন এল অনেক দেরি করে। লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ননীর পা অপেক্ষায় কাঁপে। খানিক সময় বাদে বাদে দুটো ট্রেন চলে গেল। আকাশে মেঘ ডাকে। ননীর বুকের মধ্যেও গুড়ে গুড়ে শব্দ হয়। লাইনের ওপর চোখ রেখে ননী সামান্য দূরে বসে পড়ে।

খানিক পরে বিন্দুকে আসতে দেখা যায়। মেঘে-ঢাকা বিকেলের মলিন আলোয় একটা হলদেটে ভাব ফুটে ওঠে হঠাৎ। বিশাল মাঠের পটে উঁচু রেল লাইনের ওপর বিন্দুর শরীরে সেই আলোর লাবণ্য পিছলে যায়। বিন্দুকে তখন মোহিনীর মত লাগে।

পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়ে ননীকে দেখতে পায় বিন্দু। চমকে ওঠে সে। নিশ্চুপ মানুষটাকে ভুতুড়ে দেখায় হঠাৎ

বিন্দু যেন অবাক হয়, ওমা, তুমি এখানে কার জন্যি বসে?

কার জন্যে! তাও বলে দিতে হবে। অভিমানে কাতর ননীর মুখ থমথম করে, চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। ননীর দিকে তাকিয়ে বিন্দু অস্বস্তি বোধ করে, কেমন মায়া হয়। হাত খানেক তফাতে বসে নরম গলায় বলে, এ কি, কাঁদতিছ যে... কী হইছে বলবা ত'?

—তুই বড় নিষ্ঠুর রে বিন্দু, আমার দিকে ফিরেও দেখলি না তুই... দেখ, আমার শরীরডার দিকে চেয়ে দ্যাখ একবার।

বিন্দু যেন এতক্ষণে ননীকে ভাল করে দেখে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়, হুঁ—বড় কাহিল লাগে তোমারে—মনে লয় কুনো অসুখ হইছে তোমার।

কাতর গলায় ননী বলে, আমার শরীলে কোনো অসুখ নাই রে বিন্দু... খালি পরাণডা উদাস। হু-হু করে—তোর জন্যে।

বিন্দু চুপ-চাপ বসে থাকে। অনেক-ক্ষণ। শরীরে যেন কিসের ভর। বিন্দুর গা ছমছম করে।

ঝিঁঝির ডাক স্পষ্ট হয়। আঁধার ঘনিয়ে আসে চরাচর জুড়ে। মাথার উপরে বিশাল আকাশ কাঁপিয়ে হঠাৎ মেঘ ডাকে। নিচে বিন্দুর বুক কাঁপে, ননীর ভিতরটা কাঁপে।

—কী করতি বলো তুমি আমারে? বিন্দু শুধোয়।

নিচু গলায় ফিসফিসিয়ে ননী বলে, তুই আমার কাছে চলে আয়... আমি [illegible] নিয়ে সংসার করতে চাই বিন্দু।

সংসার! বিন্দুর চোখের পাতায় অন্ধকার আর স্বপ্ন মাখামাখি হয়ে যায় যেন। নেশা-ধরানো গলায় বলে, আসতে পারি তোমার কাছে...কিন্তুক আমার কড়া কথা আছে।

ননী নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে। তার চোখ দুটো আশায় চকচকিয়ে ওঠে।

—আমারে পুষতি অনেক খরচ...রোজ দুবেলা ভাত দিতি পারবা?

—খুউব। আমার রোজগার আছে।

—আমি মানষির বাড়ি ঝি-গিরি করতি পারব না।

ননী বলে, ধ্যেৎ কী যে আজে-বাজে কথা বলিস তুই—আমি থাকতে তোর সে চিন্তা করতে হবে না।

—গোবর কুড়াতি পারব না, ঘুঁটে দিতি পারব না। বিন্দু বলতে থাকে। তার গুমোর বাড়ে যেন।

—আচ্ছা।

—আমারে একখান ঘর দিতি হবে—শ্যাল-কুকুরের মত রাস্তায় ইস্টিশানে থাকতে পারব না।

—বেশ।

—আর... বলে থেমে বিন্দু ননীর চোখের দিকে তাকায়। তাকিয়ে হাসে। দুধের মত সাদা বিন্দুর দাঁতগুলো অন্ধকারে ঝকঝক করে। হাসতে হাসতেই বিন্দু বলে, আর আমারে অনেক ভাল-বাসতি হবে।

ননীও হাসে। বেশ উঁচু গলায়। ননী যেন হঠাৎ গায়ের জোর ফিরে পেয়েছে।

তারপর যশোর রোডের এই ঝুপড়িতে বিন্দু আর ননীর সংসার। বিন্দু মহা-খুশি। ননীর আয় অল্প। কিন্তু তাই দিয়েই বেশ জমিয়ে সংসার করে বিন্দু। হেসে-খেলে আদরে-সোহাগে দিন দিন-গুলো তরতরিয়ে কেটে [illegible] উদোম খোলামেলা ইস্টিশানের [illegible] জীবনটা ক্রমশঃ স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু হঠাৎ-ই আবার শেষ হয়ে যায় সুখের দিন। ঠেলার কারবার গুটিয়ে দেয় রামদীন। কোম্পানী নতুন লরী কিনেছে-ঠেলায় মাল পৌঁছে দেওয়ার ল্যাটাও চুকে গেছে। তবে কোম্পানী রামদীনকে ঠকায় না। এতদিন খিদমত করেছে সে—কোম্পানী তাকে দারোয়ানের কাজ দেয়। চাকরি পেয়ে রামদীন জবর খুশি। ঠেলার কারবারে হাজারো ঝামেলা। তুলনায় নাফা কম। ঠেলাগুলো বেচে দেয় সে।

ননী চোখে অন্ধকার দেখে। সামান্য পুঁজি ছিল। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। প্রথমে আধ-পেটা তারপর উপোস। বিন্দু মাথা ঠিক রাখতে পারে না। কারণে অকারণে চেঁচামেচি করে, খিটি-মিটি বাধায়। কেমন যেন বে-পরোয়া হয়ে উঠতে থাকে বিন্দু। দু দণ্ড ঘরে থাকে না, কেবল সুবলের কাছে ঘুর ঘুর করে। ননীর অতটা সহ্য হয় না। বলে, সুবলের সঙ্গে কী গুজ গুজ করিস দিনরাত?

—তাতে তোমার কী?

—কী মানে? সুবল বাজে লোক...ওর সঙ্গে তোর অত মাখামাখি কিসের?

—দরকার পড়লি করবো, তোমার কথা শোনবো নাকি, বিন্দু ফুঁসে উঠল, আমারে বেশি ঘাঁটাবা না...খুব খারাপ হবে কিন্তু।

ননী চুপ করে যায়। বিন্দুকে হঠাৎ কেমন ভয় লাগে তার।

শেষ পর্যন্ত বিন্দু অন্য কারো সঙ্গে ভিড়ে গেল নাকি? ননী ভাবে। অসম্ভব কী? এখন ননীর মনে হতে থাকে, আসলে বিন্দু বোধহয় ভীষণ লোভী। একদিন ননীকে পেয়ে রসিককে ছেড়েছিল, আজ হয়তো তেমনিই আবার অন্য কাউকে পেয়ে গেছে বিন্দু।

সামনে যশোর রোডের উপর গাড়ি যানবাহন ক্রমশ বিরল হয়ে আসে। রাত বাড়তে থাকে। গাছের মাথায় মাথায় ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। তার ভিতর থেকে পাখির ঝটপটানির শব্দ ভেসে আসে ক্বচিৎ' ওপারে পাশাপাশি কয়েকটা দোকান। একটা বাদে বাকিগুলো ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। খোলা দোকানটায় কেরোসিনের টিমটিমে আলো জ্বলে। বুড়ো দোকানীটা সমানে ঝিমোয়।

ননী ভূতের মত বসে থাকে। তার দুটো চোখ রাস্তায়। টান-টান।

দূরে কে যেন রাস্তা পার হয়। ননী চোখের দৃষ্টি খর করে তাকায়। পরণে শাড়ি দেখে মনে হয় মেয়েমানুষ। কিন্তু কে যে বোঝা যায় না। আরো খানিক এগিয়ে আসার পর চলার ধরণটা ভীষণ চেনা লাগে। ননী উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, বিন্দুই তো!

কাছে এসে বিন্দু হাঁপায়। নিয়নের আলোয় দেখা যায় বিন্দুর মুখে ঘাম, চোখে ভয়।

ননী বলে, তুই কী বল তো বিন্দু, সারাটা দিন আমি ভেবে মরছি।

—ইদিকে আমার কী হইছে জানো, কথা থামিয়ে দম নিল বিন্দু, তারপর আবার বলল, সুবল আমারে চাকরি দেবে বলে নিয়ে গেল। হোটেলে খাওইয়ে সারাডা দিন এদিক-ওদিক কমনে-কমনে ঘুরাতি লাগল, তারপর সন্ধের বেলায় তিরিশটা টাকা আমার হাতে দিয়ে এটা লোকের কাছে যাতি বলল। আমি তখখুনি ব্যাপারডা বোঝলাম। সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা ফ্যালায়ে দিয়ে পালায়ে আলাম।

বিন্দুর চোখে-মুখে খুশি উপচিয়ে পড়ল।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আদি আছে অন্ত নেই

কেষ্ট বেশ যেন উৎফুল্ল মুখেই বলল, 'এস্টেটপত্তর বলতে এই যা। কাপড় জামা বিশেষ নেই, একটা পাজামা আর পাঞ্জাবী, ভদ্দরলোক সাজতে হলে সে দুটো পরি, না হলে এই যা দেখছিস। রঙ, পরচুল, আর টুকিটাকি মেকাপের জিনিস। আমার ধুনুচি নৃত্য আর আরতি নৃত্য ফেমাস, পেরায় রোজই নাচতে হয়—তার ব্যবস্থা হাতের কাছে না রাখলে চলবে কেন। এ ধুনুচি, পঞ্চ প্রদীপ—আমার কেনা, যদি এদের সঙ্গে না বনে, অন্য কোথাও গেলে অসুবিধে হবে না।'

সে ওদের সেই তেরপলের ওপর বসিয়েই ছুটে চলে গেল বাইরে। দারোয়ান একজন আছে, তার সঙ্গে বোধহয় খুব ভাব, তাকে যাবার সময় বলে গেল, 'হামারা রিসতেদার, মুলুক সে আয়া!'

দারোয়ান তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে একটা চারপাই এনে পেতে দিল ওদের বসবার জন্যে, একটা তালপাতার ঘুরনো পাখাও। সত্যিই বিনুদের খুব কষ্ট হচ্ছিল ওদিকে পর্দা ফেলা এদিকে নিরেট দেওয়াল—যা ঐ দরজাটা আর গোটা কতক ঘুলঘুলি।

দারোয়ান অতঃপর প্রশ্ন করল, 'পানি পিজিয়ে গা?' আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দুটো বিড়ি আর দেশলাই বার করে সসম্ভ্রমে এক হাতের কুনুইয়ে বাঁ হাত ঠেকিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

একটু পরেই ফিরল কেষ্ট। সে দোকানেরই একটি বাচ্ছা চাকরের হাতে দুটো বড় পুরুয়া করে লস্যি বা ঘোলের শরবৎ আর নিজে কতকগুলো ঠোঙায় কচুরি অমৃতি নিয়ে এসেছে।

বিনু ললিত [illegible] বিস্তর প্রতিবাদ করল, কেষ্ট কোন কথাই শুনল না, বল্ল না হয় দুপুর বেলা আর খাওয়া হবে না।

এই তো! তা না-ই বা খেলি। খাওয়া তো ঐ যা বললি, ভাতে ভাত নয় তো আলু ভাতে খিচুড়ি—আর ওর বেশী হবেই বা কি, ধরমশালার রান্না ঘরে নিজেরা রেঁধে খাওয়া। তাও এত বেলায় গিয়ে এই গরমে আবার রাঁধতে বসা—আমি নিজেও ঐ কম্ম করি তো, জানি কত কষ্ট। আর ঐ মুচ্ছেলাল ধরমশালা। নমস্কার। শালার এত নোংরা। আসলে পারেনো তো, বহুৎ যাত্রী আসে—আর সেই পাইখানার ধারে রান্না ঘ[র]। আমি ওখেনে কাটিয়েছি তো অনেক দি[ন]। সব জানি। আর একটা ধরমশালা আছে কাছেই, বেশ পরিষ্কার, মাঝে অনেকটা বাগান, দিব্যি জায়গা, ওখানে চলে যাস বরং।'

নিজের কথাও কিছু বলল বৈ কি।

এই বিজ্ঞাপনের গাড়ি ঠেলা, হ্যান্ডবিল বিলোনো আর নাচ—সব মিলিয়ে এক টাকা রোজ। তিনটে শো, সব শোতেই মধ্যে আধ ঘণ্টা নাচ। ছুটি নেই। তবে মালিক খুশী হয়ে মাঝে মাঝে বাড়তি দু-এক টাকা দেন বকশিস। কোন কোন দিন মালেকান পরোটা আর খাবার পাঠিয়ে দেন, রাত্রের খাবার। নইলে ঐ টাকাতেই খাওয়া পরা সব।

অবিশ্যি সবার আর খবর কি। কেষ্ট বুঝিয়ে দেয়, গেঞ্জি গায়েই দিন কেটে যায়। জামা একটা আছে, ভাল পাঞ্জাবী, কোন ভদ্দর লোকের বাড়ি যেতে হলে সেটাই গায়ে গলিয়ে যায়। মুশকিল হয়েছে দুটো বুঝলি, সময় আর পোশাক। কোন ভাল রইস লোকের বাড়ি যে নাচের টিউশানী খুঁজতে যাবো—সে উপায় নেই। বিকেলের দিকে কি সন্ধ্যের দিকে যাবো—সে তো এখানে বাঁধা। বেলা তিনটে থেকে রাত এগারোটা পজ্জন্ত, কোথাও নড়বার উপায় নেই। দোকানে যাবো—ঐ এক গাড়ি ঠেলা আছে। কী করব খেতে পাচ্ছিলুম না, ওপোস করে দিন কাটছেল, সেই অবস্থায় এরা কাজ দিয়েছে—বেইমানি করতে পারি না। ...তাছাড়া একটা কাজ না পেয়েই বা ছাড়ি কি করে। এর মধ্যে যে ভাল বা পোশাক করতে পারতুম না তা নয়—কিন্তু মাকে কটা টাকা না পাঠিয়ে নিজের কাপড় জামার খরচা করব সে আমার মন করে না। এই তাই মাকে আনতে পারছি না—মা কি অবস্তায় দিন কাটাচ্ছে জানি তো—ভাবলে নিজের মুখে ভাত ওঠে না, মাইরি বলছি।

ললিত বলে 'তা এতো সস্তা গণ্ডার দেশ—মাকে এনে রাখলেই পারিস। তিরিশ টাকায় কত লোক ওখানেই সংসার চালাচ্ছে।

কেষ্ট বলে, সস্তাগণ্ডা তো বুঝি তবু খরচও তো রকমারি। ন্যাখ এই রেঁধে খাই, তাও দারোয়ানের সঙ্গে ভাগে। কাঠ কয়লার খরচটা আধাআধি পড়ে, ও একদিন রাঁধে আমি একদিন রাঁধি—তবু দোনো বখৎ চুলহা তো জ্বালতে হয়। মাস গেলে দশটা টাকা বেওজর চলে যায়। এছাড়া যা আছে, জলখাবার আছে, বিড়ি আছে এক বাণ্ডিল রোজ তিন পয়সার কম হয় না—এত খাটুনী তিভুবন ঘোরা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে দৈনিক দেড় ঘণ্টা নাচ ধেই ধেই করে—পেটে না ঢেলে চলবে কেন? পোশাকের বলাই নেই সত্যি কথা, গেঞ্জি প্যান্ট তাও তো কিনতে হয়। মাথার তেল, চিরুনী, জুতো— নেই কি। একটু সাবান লাগে মেকাপ তোলা তার নারকোল তেল চাই—হারক হারক খরচা। টাকা তো টানলে বাড়ে না। বল। ...তবে আমিও দমবার পাত্তর নই, যা হয় একটা উপায় করবই দেখে রাখিস। এক কাপড়ে বেরিয়ে বিদেশ-বিভুঁই এসেও যখন না খেয়ে মরিনি তখন মাকেও মরতে দোব না দেখিস।

তা দেখেছিল বিনু—সত্যিই।

এর মাস ছয়েক পরেই নাকি একবার একদিনের জন্যে এসে মাকে নিয়ে গিছল। কোথায় তা কেউ বলতে পারল না, কাউকেই নাকি বলেনি। বিনু তখন এখানে ছিল না, হয়ত ওকে বলত।

বিনুদের সঙ্গে দেখা ওর বছর দুই পরে। এলাহাবাদের রাস্তায়। গাড়ি ঠেলা আর নেই, তবে সিনেমার নাচটা আছে এখানেও। বাড়তি দুটো টিউশানী করে নাচ শেখাবার। একটা বৈরানায় একটা কাটরায়। মোট আঠারো টাকা পায়। হেঁটে যাতায়াত তবে তাতেই চলে যায় ওর। হিউয়েট রোডে একটা বাড়ির দোতলায় একটা ঘর ভাড়া করে মাকে রেখেছে, মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়া। ভদ্র পাড়ায় ভদ্র পরিবারে মাকে রাখতে পেরেছে তাতেই সবচেয়ে তৃপ্তি ওর।

ওদের একদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েও ছিলেন ওর মা। জিরো রোডে এক সিনেমায় কাজ ওর, এখানে রাত নটার শোতে নাচ নেই, তবে কোন কোন ছুটির দিন দুপুরে বাড়তি শো থাকলে নাচতে হয়। মাইনে ঐ তিরিশ টাকাই। এক রকম করে চলে যাচ্ছে ভাই কেষ্ট বলল।

তখন অবশ্য চলে যেত। ভালভাবেই চলত দুটো প্রাণীর।

এরপর যুদ্ধ বাঁধতে কেষ্টর একটা—ওর ভাষায় মোকা মিল গিয়া। তখন যুদ্ধক্ষেত্রের যারা সামনের দিকে মানে ফ্রন্টে থাকত—সেই প্রায় মৃত্যু প্রতীক্ষারত সৈনিকদের মনের অবসাদ ও দুশ্চিন্তা দূর করতে কিছু কিছু আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মার্কিন মুলুকে

থেকে ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা, ড্যানি কে, বব হোপ—আরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ নামকরা শিল্পী দূর প্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে নাচ-গান করে গেছেন, অনেকে মিশরে এমন কি ভারতেও এসেছেন।

শোনা যায় এক বিখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী বোম্বের হাসপাতালে আহত সৈনিকদের আনন্দ ও সান্ত্বনা দিতে এসে-ছিলেন—দেখতে ও দেখা দিতে—একটি আহত সৈনিক বলে ফেলেছিল, 'তুমি আমার জীবনের স্বপ্ন তোমার সঙ্গে একটা রাত কাটাতে পারলে আর মৃত্যুতে কোন দুঃখ থাকত না।

সে বিখ্যাত অভিনেত্রীটি তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে একরাত্রি এক শয্যায় কাটাতে সম্মত হয়েছিলেন—হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করেননি।

কেষ্টও কী কৌশলে এলাহাবাদের অনেকেই ওকে স্নেহ করতেন, সেই প্রভাবেই—এই একটি মনোরঞ্জন দলে ঢুকে পড়েছিল। বর্মা সীমান্তে অনেকদিন ঘুরেছে—মণিপুর কোহিমা—এমন কি জাপান পর্যন্ত। টাকা ও রকমারি শৌখিন জিনিস বিস্তর এনেছিল আসার সময়। এলাহাবাদের পরে কলকাতায় নেমেছিল কদিনের জন্যে, সে সব আত্মীয়রা ওকে ঘেন্নার চোখে দেখেছে এককালে, কথাও কয়নি—তারাই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনতে ও নানাবিধ জিনিস—তখনই এদেশে অপ্রাপ্য হয়ে উঠেছে সেসব জিনিস—উপহার পেতে যথেষ্ট আত্মীয়তা প্রকাশ করেছিল।

এর পর, কবে বা কিভাবে তা বিনুরা জানে না, কেষ্ট এলাহাবাদ থেকে তার হেড কোয়ার্টার গোরখপুরে নিয়ে যায়। বোধ হয় ওখানকার লোক ওর ছবির ফাঁকে ফাঁকে ফাউ হিসেবে নাচার কথা ভুলতে পারেনি—সেই কারণেই, তার নাচ শেখাবার মতো কতটা শিক্ষা আছে সে তথ্যটাকে সন্দেহের চোখে দেখত বলেই চলে গেল যেখানে ওর এই ইতিহাসে পৌঁছয়নি, যুদ্ধ প্রান্তের সার্টিফিকেট দেখিয়েই চলে গেল এখান থেকে, এমন জায়গায় প্রতিষ্ঠা পেতে পারবে।

গোরখপুরে ওসব কাজ করেনি। সোজাসুজি টিউশানীই ধরে ছিল। তাতে বেশ চলেও যেত। শেষ জীবন ওর ভার সাধ্যের কোটা ছিল। তবে কিছু অশান্তি নিয়েই মরতে হয়েছে তাঁকে—কারণ ছেলে বিয়ে করল না, হয়ত আর করবেও না।

বিনু একবার মাস কেষ্ট থাকতে গোরখপুর গিয়েছিল। দেখল ওর স্বভাবে এখন অনেকটা স্থৈর্য ও বিবেচনা এসেছে। মেয়েদের নাচ শেখায়—অধিকাংশই তরুণ বয়সী এবং কুমারী অভিভাবকদের দু-একটি অবস্থাই পাকিয়ে তোর মধ্যে কিন্তু কোনদিন তাঁর কোন বেচাল দেখেনি কেউ, দু-একজন অভিভাবক অতিরিক্ত মাখামাখি সন্দেহ করবার চেষ্টা করেনি তাও নয়—কিন্তু বিশ্বাস-যোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারেনি। সেই জন্যেই তার চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে, টিউশনীর অভাব হয় না, বরং এক এক সময় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

অথচ, বয়স হওয়া সত্ত্বেও, তখন পঞ্চাশের কাছে পৌঁছে গেছে— স্বাস্থ্য ভাল ছিল, বরং এখন তাকে আরও ভাল দেখায়। হাতের পেশী আর বুক ছোটবেলা থেকেই সুগঠিত বিনা ব্যায়ামেই, এখন এই দৈনিক নাচের ফলে শরীরের অন্য অংশও ভাল হয়েছে, সে কারণে বেশ ভাল দেখায় রং কালো হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে আকর্ষণের কারণ ছিল যথেষ্ট।

বিনু যখন গেছে তখন খোদ পুলিশ সুপারের মেয়েকে নাচ শেখাচ্ছে সে, ষোল বছরের মেয়ে। দেখতেও ভাল—সে কেষ্টর প্রেমে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কেষ্ট তার গোছা গোছা চিঠি বার করে দেখিয়েছে বিনুকে। প্রত্যহই একটা করে চিঠি দিত, একদিন নাকি গভীর রাত্রে ওর বাসাতে এসে হাজির হয়েছিল।

কেষ্ট বলে, ভাই এ কি জ্বালা হল বল তো। নিজের যে লোভ নেই তা তো নয় কিন্তু সাক্ষাৎ পুলিশের বড় সাহেব—যদি কোনদিন এক বুঁদ সোবে এসে যায় তো রাতারাতি গুম করে দেবে, কেউ জানতে পর্যন্ত পারবে না এ নামের কোন লোক কোথাও ছেল কিনা।

বিনু বলে, 'তা কাজ ছেড়ে দাও না।'

'সে চেষ্টা কি করিনি ভাবছিস। তাতেও সাহেব ভাবে যে তনখা বাড়াবার জন্যেই এই সব বাহানা করছি। সেটা সে অপমান বলে মনে করে। অথচ কী করব মা কালী কি কিরা, এখন মেয়েটার কাছে গেলে আমার হাত-পা কাঁপে, বুকের মধ্যে যে কি হয় কি বলব। আমি তো ভীষণ ঘামি জানিস, ওর কাছে গেলে আরও কুল কুল করে পসিনা করতে থাকে—আর ছুঁড়ি সেই বাহানয় কাছে এসে ঘাম মুছিয়ে দেবার ভান করে গায়ে গা ঘষে। হপ্তায় দুদিন যাই, দুদিনই ফিরে এসে শুয়ে থাকতে হয় দু-তিন ঘণ্টা শরীর এত বেএক্তার লাগে।

এই প্রসঙ্গে কেষ্ট একদিন বড় মজার কথা বলেছিল, অল্পবয়সী মেয়েদের শরীর থেকে একটা হিট বেরোয়—গরম ভাপ্পা একটা—তুই হাসছিস, দেখিস—মুমূর্ষু রুগীর পাশে বসিয়ে দে, তার পা গরম হয়ে উঠবে। শীতকালে কাছে বসলে দেখবি গা থেকে পসিনা ছুটবে দরিয়ার মতো। হ্যাঁ রে, সাচ।

যাই হোক কেষ্ট সম্মান রেখেই গেছে। বেশী দিন বাঁচেনি, মার মৃত্যুর দু-তিন বছর পরেই মারা যায়—হয়ত অস্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তি অতিরিক্ত দমনের ফলেই—হার্ট অ্যাটাক হয়। শহরের বহু লোক, প্রাক্তন ছাত্রীদের অভিভাবকরা ছাড়াও এসে সেবা করেছে, টাকা খরচ করে চিকিৎসা করিয়েছে রাত জেগে পাহারা দিয়েছে। মরার পর বড় খাটে ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে গেছে। এক কালের অগৌরবের জীবনে সগৌরব সমাপ্তি ঘটেছে।

কেষ্ট ইদানীং একটা কথা প্রায়ই বলত, 'তুলসী যব জগমে আয়ো, জগহাসে তুম রোয়। য্যায়সা করনা কর চলো ভাই তুম হাসে জগ রোয়।'

নিজের জীবনে সেই সার্থকতাই লাভ করেছে সে।

॥ ৪১ ॥

কেষ্ট যে টিউশানী ওকে যোগাড় করে দিয়েছিল—তার মাইনে তখনকার দিনে ম্যাট্রিক পাশ ছেলের পক্ষে অনেক—বারো টাকা। তবে দায়িত্বও বেশী। সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলে এক বছর পরেই প্রায় ম্যাট্রিকে বসবে—তার ওপর মাথায় রীতিমতো মাঠো। বয়সও হয়েছে ঢের আঠারোর কম নয়, স্বাস্থ্য ভাল বলে আরও বেশী মনে হয়। তবে ভারী ঠাণ্ডা প্রকৃতির দু-চার দিনের মধ্যেই বিনুর অনুগত হয়ে গেল।

এ ভদ্রলোকরা ক্রীশ্চান। এই এক পুরুষেই মানে ইনিই ক্রীশ্চান হয়েছিলেন।

অতি সুপুরুষ, সাহেবদের মতো ইংরেজী বলেন। কী একটা দুষ্কার্য করে ফেলে আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন তারপর চেহারার জোরে এক ধনী বিধবা মহিলাকে হাত করে তার কৃষ্ণবর্ণ মেয়েটিকে বিবাহ করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেন।

টাকা নাকি তিনি পেয়েছিলেন অনেক, মদ ভাঙ্গ খেয়ে ক রেস খেলেও ওড়াননি—তবে জুয়া খেলার মতোই হঠাৎ বড়লোক হবার কয়েকটা ব্যবসা ফাঁদতে গিয়ে সে সব টাকাই নষ্ট করেন। এখন একটা প্রাইমারী স্কুল করেছেন, তার জন্যে বড় বিলিতে অপিসের সাহেবদের কাছ থেকে চাঁদা তোলেন—তাতে ইস্কুল চলার দরকার হয় না, তার সংসার বেশ সচ্ছলেই চলে যায়। গাড়িও আছে একটা, প্রয়োজন মতো বেরোয়।

বারো টাকা টিউশানীর পারিশ্রমিক হিসেবে কম নয়, তবে এক উঠতি বয়সী ছেলের খাওয়া বাদে যাবতীয় খরচের পক্ষে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। দত্তমশাইকে ছাড়েনি বিনু কিন্তু সেই বিশেষ মওকায় তার কোন তেমন সুবিধে করতে পারেননি। এখন বোধহয় দত্তমশাই সেদিনকার বদান্যতার জন্যে একটু অনুতপ্তই। বড়-জোর এক আধটা সাধারণ খাট কি আলমারী বিক্রী হয়—বিনু পায় কেঁদে কঁকিয়ে পাঁচ কি সাত টাকা—তার জন্যে যা ঘুরতে হয় আর নানান ধরনের বাঁকা কথা শুনতে হয় তাতে মজুরী পোষায় না।

কি করবে ভাবছে, পেলে আর একটা টিউশানীই করত—কিন্তু কোথায় খুঁজবে কে যোগাড় করে দেবে সেই সনাতন সমস্যা তো থেকেই গেছে—এই ছাত্রের বাবাটি যেন দৈব প্রেরিত হয়েই ওকে পথ দেখালেন। এই বাজারে ফার্ণিচার বেচবে কাকে? লোকে খাট আলমারী কেনে মেয়ের বে দেবার সময়—তাতে পুরনো ফার্ণিচার চলবে না। বাড়িতে শখ করে কিনে এসব রাখবে কোথায় লোকে? ভাল জিনিস কিনবে বেশী দাম দিয়ে তেমন শাঁসালো লোক কটা আছে? ওসব ছাড়ো, রোজগার করতে চাও তো জমি ধরো। জমিই লক্ষ্মী, ফসল ফলাতেও জমি, আবার কিছু না করে লাভ করতেও জমি। এখন এদিকটাই ডেভেলপ করছে। লোকে শহরে থাকতে না পেরে এদিক সেদিক শহরতলীতে যেতে চাইছে। জমির দালালী ধরো বেশ টু পাইস রোজগার হবে। শতকরা দু টাকা। দামের ওপর বাঁধা কমিশন—টু পার্সেন্ট—তেমন গোলমেলে জমি হলে দশ পনেরো পার্সেন্টও আদায় হবে। দেখ অবশ্য যিনি বেচছেন তিনিই—ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে, মনে গরজ বেশী বুঝে মোচড় দিতে পারলে যে কিনবে তার থেকেও কিছু হাতাতে পারবে। অনেকেই এখন জমি বেচতে চায়, দু-একজনের সঙ্গে কথা করে যা বুঝেছি, শুধু খদ্দেরকে সে খবরটা কি করে জানাবে ভেবে পায় না। সামান্য দামের জমি অভাবে পড়ে বিক্রী—বিজ্ঞাপন করার খরচ জোটাবে কোথেকে। আর অত শত জানেও না। দু-একজন জোচ্চোর দালাল আছে— পেটি জোচ্চোর তারা খদ্দের দেখে দেবো ঘোরাঘুরির খরচা দাও বলে দু এক টাকা নিয়ে সরে পড়ে—ঘোরাঘুরি করে খদ্দের যোগাড় করার ধৈর্য থাকে না। তুমি কারও কাছ থেকে আগাম কিছু চেয়ো না একটু চেষ্টা করো—খদ্দের আর বেচবার লোক কোনটারই অভাব হবে না।

কথাটা মনে লাগলেও জমির খোঁজ কে দেবে এ একটা মহা সমস্যা মনে হয়েছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।... চিরদিনের বিপত্তারণ— সে যেন বিনুর কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বলে উঠল আছে রে আছে আমাদের পাড়াতেই পঞ্চা ঘোষ কাঠা তিনেক জমি বেচবে বলছিল। পাঁচ শো করে কাঠা বলছে, তা এমন কিছু বেশি চাইছে না। খুব জরুরী, বেচা দরকার, মেয়ের বিয়ে সামনে। দ্যাখ না যদি একটা খদ্দের পাস।

বলে একটু থেমে ভুরু কুঁচকে বলল, খদ্দেরও আমি একটা আঁচ বলে দিতে পারি সত্যবাবু তো তোর বড় ইয়ার এক-জন তোর বুড়ো বন্ধু সত্যবাবু রে—উনি জামাইকে স্থিতু করবেন বলে মন করেছেন। যা না একবার তাঁর কাছে।

যাঃ। এই মুখ নিয়ে সত্যবাবুর কাছে। ছিঃ।

নেকু। এই তো দু মাস পেরায় এসেছ, বাজার হাটও করছ তিনি কি আর তোমার মুখ এর মধ্যে দেখেননি একদিন। ওসব পোশাকী লজ্জা রাখ দিকি। জগতে উন্নতি করতে গেলে অত লজ্জা ঘেন্না রাখলে চলবে না। নে তুই চ দিকি পঞ্চুর কাছে, এখনই কথাটা মুখোবালা করিয়ে দিই।

ব্রোকারেজের কথাটাও সাক্ষীর সামনে পাকা হয়ে যাক।'

অগত্যা লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়ে যেতে হল সত্যবাবুর কাছে।

তিনি লাফিয়ে উঠলেন একেবারে, 'ঠিক এই দরের মধ্যেই আমি চাইছিলুম। চলো, এখুনি জমিটা দেখে আসি।'

ওর যে কেন লেখাপড়া ছেড়ে জমির দালালী করার প্রয়োজন ঘটল, সে কথা একবারও তিনি তুললেন না। ইচ্ছে করেই। ওকে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দিতে।

জমি দেখে পছন্দ হল সত্যবাবুর। তিনচার দিন পরে পাঁজিতে শুভ দিন দেখে একশো এক টাকা বায়নাও করাবেন। এরপর কাগজপত্র উকীলকে দেখিয়ে দলিল তৈরী করতে যা দেরি। দোলুর চাপে বায়নার টাকা থেকেই পঞ্চা ঘোষ পাঁচ টাকা আগাম দিলেন, একমাস পরে রেজেস্ট্রীর দিন আদালতেই বাকী পঁচিশ টাকা বুঝিয়ে দিলেন ওকে।

ত্রিশ টাকা উপার্জন! এত সহজে!

বিস্ময় আর উৎসাহের সীমা রইল না বিনুর।

লেখাটা চলছিলই।

গোপনে দু'একটি লেখা যে কোন কোন মাসিকপত্রে না পাঠিয়েছে তাও না, কিন্তু কোন উত্তর পর্যন্ত কোথাও মেলে নি।

অবশ্য তা সে ঠিক আশাও করে নি।

কত দীর্ঘদিন ধরে নৈরাশ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে লেখক ও শিল্পীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—তার ইতিহাস সে কিছু কিছু জানে বৈকি। নানা জীবনী গ্রন্থে সে অসম যুদ্ধের, সে কৃচ্ছ্রসাধনা, সে তপস্যার কথা পড়েছে।

স্বয়ং ডিকেন্সই তো ত্রিশটি লেখা 'বজ' ছদ্মনামে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে পাঠিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এর সবগুলোই যদি ফেরৎ আসে তো জীবনে আর কখনও এ চেষ্টা করবেন না। তাদের মধ্যে উনত্রিশটিই ফেরৎ এসেছিল, কেবল একটি ছাপা হয়েছিল, সেই সঙ্গে সম্পাদকের চিঠি ও পাঁচ পাউণ্ডের চেক। সম্পাদক অনুরোধ জানিয়েছেন আরও লেখা পাঠানোর জন্যে।

যে বইতে সে পড়েছে ঘটনাটা তাতে লেখা আছে যে আনন্দে ডিকেন্স হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে বালিশগুলো ছিঁড়ে তুলো উড়িয়ে ছড়িয়ে, সর্বাঙ্গে সেই তুলো মেখে এক কাণ্ডই করে বসেছিলেন।

কিন্তু বিনু ভাবে অন্য কথা।

যদি ও লেখাটাও ফেরৎ [illegible]ত। শুধু ইংরেজী সাহিত্য বলে [illegible] বিশ্ব সাহিত্যেরই কী অপূরণীয় [illegible] হত!

তবে এর মধ্যে নিজের [illegible]খা ও নাম ছাপার অক্ষরে দেখার [illegible]গ্যও হয়েছে বৈকি।

কলেজে গিয়েই সে কলেজ ম্যাগা-জিনের জন্যে একটি গল্প আর একটি কবিতা দিয়েছিল। ও যতদিন ছিল তার মধ্যে তা ছাপা হয় নি, সে কথা ওর মনেও ছিল না। সুভদ্রাদের বাড়ি থাকতেই পথের ধারে বই দেখতে দেখতে একখানা প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন পড়ে থাকতে দেখে, এমনিই, অল্প কৌতূহলে হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু পাতা ওল্টাতেই প্রথম চোখে পড়েছে ওর নাম—ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। এ কি! এ যে গল্প কবিতা দুটোই ছাপা হয়েছে। ও কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছে বলেই ওকে দিতে পারেনি তারা।

অতি দুঃখের ছটি পয়সা গুণে দিয়ে সেটা কিনেছিল সে।

বাড়িতে এনে একমাত্র সুভদ্রাকে দেখিয়েছিল, ছাত্রকেও দেখায় নি। সে এসব বুঝবে না, মাঝখান থেকে চেঁচিয়ে হাট বাধাবে।

তবে ভেবেছিল, হয়ত মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশাই ছিল যে সুভদ্রা পিনাকীবাবুকে অন্তত দেখাবেন। কিন্তু কে জানে কেন তিনি দেখান নি। ওদেরই বিছানার নিচে গুঁজে রেখে বলেছিলেন,

থেকে, প্রায় [illegible]-রেখা পাণ্ডুলিপি
সেদিন কয়েই [illegible] একটু, [illegible]
কারণটা বোঝে।

আশা রাখে নি বলেই আশাভঙ্গের বেদনা তত বাজে নি।

হতাশ আর নিরুৎসাহ করতে পারেনি।

সে লিখেই যাচ্ছিল। আর সে বাড়ি ফিরেছে শুনে পাড়ায় হাতে লেখা কাগজের 'পরিচালক'রা আবার যথারীতি আসতে শুরু করেছে। 'শেফালি' '[illegible]' 'ধারা' 'বিজয়'—আরও কত। সেও অকৃপণ হাতে লেখা আর ছবি দিয়ে যাচ্ছে। তার মনে যেন সৃষ্টির জোয়ার জেগেছে, সে না লিখে থাকতে পারে না। কে নিচ্ছে, এসব লেখা কেউ পড়বে কিনা, এ ছবি কেউ দেখবে বা মুগ্ধ হবে কিনা এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। লিখতে হবে বলেই তো সে লিখছে, না লিখে থাকতে পারে না বলেই।

সেদিনের কথাটা ওর স্পষ্ট মনে আছে। এত বছরের ব্যবধানেও কিছুমাত্র অস্পষ্ট বা মলিন হয় নি সে স্মৃতি।

এর মধ্যে ওরা বাড়ি বদল করে আরও অল্প ভাড়ায় বাড়িতে উঠে এসেছিল। ভাড়া কম বলে নয়। আগের বাড়ি বিক্রী হয়ে গেল, নতুন বাড়িওলা নিজে বসবাস করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদে যাবার অবস্থা বা সময় কোনটাই ছিল না ওদের। তাই তাড়াতাড়ি এই বাড়িটা ঠিক করে উঠে এল। প্রথম এ পাড়ায় আসে ওরা ছত্রিশ টাকা ভাড়ায়, তারপর বড় রাস্তায় নতুন বাড়ি হতে আটাশ টাকা ভাড়া ঠিক করে উঠে যায়। এ বাড়িটার পঁচিশ টাকা ভাড়া। তাছাড়াও দুটো বড় সুবিধে পাওয়া গেল—নতুন বাড়ি, বাড়িওলা নিজস্ব টিউবওয়েল করিয়ে দিলেন। তেমনি অসুবিধেও একটা ছিল, বদ্ধ গলির মধ্যে, আলো আর হাওয়া দুটোই কম, ইলেকট্রিকের তো প্রশ্নই ওঠে না। মা একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিলেন, দাদা বললেন, 'বেগারার কান্ট বি রজার্স'। আমার যা আয় তাতে এ ভাড়া দেওয়াই কষ্টকর। এর চেয়ে ভাল বাড়ি নিতে গেলে অন্তত পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া পড়ত।'

আর কিছু বলেন নি মা।

এই বাড়িতেই সেদিন, সন্ধ্যা হবো হবো সময়ে—অর্থাৎ একটু দূরের বড় রাস্তায় এখনও বেশ আগে থাকলেও, এ গলিতে বেশ ঘোর হয়ে এসেছে—কে একজন বাইরে থেকে ডাকলেন, 'ইন্দ্রজিৎবাবু আছেন?'

ইন্দ্রজিৎবাবু!

তাকে আবার এ পাড়ায় কে এত সম্ভ্রমের সঙ্গে ডাকবে।

তার বন্ধুরা, দাদার বন্ধুরা তো বটেই পাড়ার বয়স্ক লোকেরা সকলেই 'বিনু' বলে জানে, সেই নামেই ডাকে।

তা ছাড়া এ একেবারে অপরিচিত গলা।

বিনু তখন গামছা পরে টিউবওয়েলে [illegible] করে [illegible] [illegible] [illegible] করছিল। কো' বলে গামছা ছেড়ে তাড়াতাড়ি ধুতিখানা কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে এল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে বটে, তবে বিনুও বিশেষ আলো থেকে আসে নি। তখনও ওদের বাড়ি কেরোসিনের রাজত্ব—তাও, সে আলো জ্বলে নি, জ্বালাতে গেলে ওকেই জ্বালতে হবে, এ জলের পর্ব শেষ করে তবে সে অবসর মিলবে। সুতরাং সে এই ঝাপসা আলোতেই—একটু কাছে গিয়ে বেশ দেখতে পেল।

বড় বড়, একটু বিস্ফারিত গোছের চোখ আর প্রায় মেয়েদের মতো বড় লম্বা চুল—প্রথমেই এই দুটি জিনিস চোখে পড়ল ওর সে চুল পিঠের আধ ময়লা পাঞ্জাবীটার ওপর পড়ে সেখানটায় বেশ একটা গাঢ় ধুলো ও তেলের কালিমা রচনা করেছে। পরনের ধুতিটা হয়ত খাটো মাপের নয়—কারণ মিলের চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের ধুতি, এ ভদ্রলোকের নাতিদীর্ঘ আকৃতির পক্ষে যথেষ্ট, ও'র পরার ধরনেই সেটা প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে।

এই বেশভূষা ও অতিসাধারণ ধরনের চেহারায় কোন শ্রদ্ধা কি প্রীতি অনুভবের কোন কারণ নেই, বরং সাহায্যপ্রার্থী ভেবে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠারই কথা—কিন্তু বিনু ও'র মুখের দিকে চেয়ে নিমেষে মুগ্ধ হয়ে গেল। অত বিস্ফারিত চোখে যে এমন প্রসন্নতা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠতে পারে তা বিনুর জানা ছিল না। আর মুখে তেমনি হাসি। বেশভূষায় যার দারিদ্র্য স্পষ্ট ও প্রকট, তার মুখ দেখলে মনে হয় বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য, সুখ ও বিলাসবস্তু ওর করায়ত্ত, ওর পৃথিবীতে অন্তত কোন মালিন্য দুঃখ শোক অভাব কিছুই নেই।

বিনুকে দেখে এগিয়ে এসে একেবারেই ওর হাত দুটি ধরলেন। বেশ চেপেই ধরলেন, তারপর বললেন, 'আমার নাম মুরারি সেন, আপনাদের এই পাড়াতেই এসেছি। একটু লিখিটিখি। আমি লাইব্রেরীতে রাখা হাতে-লেখা মাসিক-[illegible]এর পত্রিকা [illegible] [illegible] হঠাৎই আপনার একটা গল্প আমার চোখে পড়ে যায়। তারপর খুঁজে খুঁজে অনেকগুলো লেখা পড়ে ফেলেছি, আর পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা আছে, আপনি একদিন বড় লেখক হবেনই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই কনগ্র্যাচুলেশন্স জানাতে আসাই প্রধান উদ্দেশ্য—তবে স্বার্থও একটু আছে। সম্প্রতি একটা সাপ্তাহিকের ভার আমার হাতে এসেছে। প্রধানত এটা একটা আশ্রমের কাগজ, ধর্মের কথা, গুরুর উপদেশ এই সবই থাকবে বেশী কিন্তু পপুলার করার জন্যে কিছু কিছু গল্পও দেবার কথা হয়েছে। তবে টাকা পয়সা কাউকে দেবে না, ও'দের বিশ্বাস ও'দের গুরুর নামে সবাই বিনা পয়সায় লিখবে—বরং লিখতে পেরে কৃতার্থ হবে। তাই, কোন নামকরা লেখকের কাছে তো যেতে পারব না, তাই ভেবেছি নতুন যাঁরা লিখছেন—যাঁদের লেখার মধ্যে বেশ প্রমিস আছে—তাঁদেরই লেখা চাইব। সামনের সপ্তাহে আমাদের প্রথম সংখ্যা বেরোবে—দেবেন একটা গল্প?'

বিনুর প্রথমটা মনে হল সে ভুল শুনছে।

তারপর—বিদ্যুৎ চমকের মতোই অত্যল্প সময়ে—একবার এমনও মনে হল, এটাও স্বপ্নই দেখছে।

এসবটাই স্বপ্ন, এই সন্ধ্যা, এই ঝাপসা আলো, এই অদ্ভুত মানুষটি—যে নিমেষে অপরকে আপন করে নিতে পারে—এই প্রস্তাব সবটা, সবটাই স্বপ্ন।

কিম্বা বিকার একটা। ওর মনের সুতীক্ষ্ন ঈপ্সা, ছাপার অক্ষরে ওর লেখা বা ছবি ছাপা হওয়ার—যে বাসনা বাস্তবে পরিণত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সে জানে—জানে বলেই এমন পাগল করা বাসনা আর হতাশা—ওর মস্তিষ্কে বিকারের রূপ ধারন করেছে।

(চলবে),

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

রমণীর ভালবাসা থাকলে বিষ পাথর পায় মানুষ। গুনীনের বউ বলেছে সাপের গায়ে যেন আঘাত না পড়ে। জগতের বিষ খেয়ে সাপের শরীর কালো হয়ে যায়। হৃৎপিন্ড হয়ে যায় নীল। এ পাথর হলো রমণীর চোখের মণি। রমণীর মন হলো এই পাথর। ভালবাসা থাকলে সব বিষ তুলে নেবে। পিথা চোখ তোলে। দরজা খুলে যাচ্ছে। সব আলো হয়ে উঠছে। এতক্ষণ চারপাশে কালো কুৎসিত অন্ধকার খুকখুকে মহুলের গন্ধ উড়ছিল। সে সব মুছে যাচ্ছে। রাজকন্যে দাঁড়িয়ে আছে। চুলের ঢাল নেমেছে পিঠ ছাড়িয়ে অনেকটা।

হাতছানি দিয়ে ডাকছে লাবণ্য। পিথা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছে। রাজকন্যের চোখ ঘন কালো। একেবারে মেঘের ছায়া পড়েছে জলে। পিথা দেখছে ঠিক সেই পাথর বসিয়ে দেওয়া আছে রাজকুমারীর চোখে।

কুহু কাঁদবে রাজকামিয়া?

আয় তোকে দেখি। রাজকন্যে পিথার চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে সব এলোমেলো করে দিচ্ছে। অন্য হাতে পিথার চওড়া বুক স্পর্শ করেছে।

তুই ভীষণ ভালো পিথা। লাবণ্য হঠাৎ পিথার বুকে কান রেখেছে। ঠিক সেই শব্দ। হৃৎপিন্ডে বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে। পিথার নিঃশ্বাস গাঢ় এবং উষ্ণ। সে লাবণ্যর চোখ মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ উন্মত্তের মত তাকে টেনে এনে বুকের সঙ্গে পিষে ফেলেছে প্রায়। লাবণ্য বাধা দেয় না। আঁকড়ে ধরে মানুষটার বৃষস্কন্ধ। নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে। লাবণ্য আশ্চর্য সুখের ভিতরে ডুবে যায়। শরীর এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় অপরূপ সুখ আছে। পুরুষটা যেন হাজার পুরুষের শক্তি ধরে।

দুই

ঘোর বর্ষার ভিতরে নবীন সরস্বতী কুঞ্জে গিয়ে দেখে সন্ন্যাসী বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। বার চারেক ডেকেও সাড়া পায় নি সে। ফিরে এসেছে। তারপর দিন তিনেক ঘরে ছিল না। ধান রোয়ার জন্য গিয়েছিল কুসমাড়। ফিরে এসে শোনে সাঁন্নসী বাবা খুঁজে গেছে তাকে।

সে বিড় বিড় করতে করতে হাঁটে সরস্বতীকুঞ্জের দিকে। এখন সব বিস্বাদ লাগে। সেই ভোরে মাঠের ভিতর থেকে সাঁন্নসী বাবা তাকে তুলে এনেছিল। নবীনের কলজেটার অর্ধেক হারিয়ে গেছে মাঠের ভিতর। রাত-বিরেতে সরস্বতীকুঞ্জকে দেখলে এখন তার গা ছমছম করে। কে জানত অনাথ মন্ডলের রমরমানি এইভাবে শেষ হবে। গহীন অন্ধকারে অনাথ মন্ডলের ঐ প্রাসাদ একেবারে হাড়ের রং নেয়। হাড় সর্বস্ব কঙ্কাল। তুমি মোড়ল-বাবু, ইখন নাই, জমিন সব ঘুরান আসিল...।

মোড়লের জমি তো মোড়লের নয়। অনাথ মন্ডল তো এদিককার মানুষ নয়। এ তো সাঁওতাল দেশ, সাঁওতাল গাঁ। বহড়াদাড়ি তো এখেন থেকে বিশ কিলোমিটার ওধারে। কাঁসাই পেরিয়ে যেতে হয়। সে দেশ থেকে এখেনে এসে রাজা হয়ে বসল। সে তো ক'দিনেরই বা কথা। সব স্পষ্ট মনে পড়ে। কিভাবে কিভাবে জমি চলে গেল, রাজার জমি পেল অনাথ মন্ডল সে সব অন্য কথা। রাজার জমিও তো রাজার ছিল না। সব গেল, আবার ফিরে এল সাঁওতালদের কাছে। নিখিলানন্দ হাত বাড়িয়েছে সেখানে। মন্ডলমরায় তাই সেই মানুষটার উপর রাগ হয় না। সেই মানুষ, দাড়িঅলা রোগা ডিগডিগে, মেঘনাদ. সাঁওতাল জাতির জমি সাঁওতাল জাতিকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য মন্ডলকে খুন করল। সে কত কথাই না বলত। সব জমি ফেরত এল, নবীনের মন সেই দাড়িঅলা মানুষটার জন্য কেমন করে ওঠে। কেউ তো সে কথা জানে না, নবীন মনে মনে জানে সে ছাড়া একাজ আর কেউ করতে পারে না। কে জানে সাঁওতাল জাতির দুঃখের কথা। গাঁয়ের সব মানুষ বিড়বিড়িয়ে সে কথাই বলে। বলে কিন্তু প্রমাণ করতে পারে না। শুধু অন্তরে অন্তরে কৃতজ্ঞ থাকে এতো-বড় একটা কান্ড যে করেছে তার উপর। সেখানে নিখিলানন্দ ছোবল মারছে, এতে সাঁওতালরা ভাল থাকে কি করে।

নবীনের মুখের হাসি নিভেছে অনেক-দিন। এখন মুখে জমেছে শ্রাবণের ঘন মেঘ। সোনার তাবিজটা হারিয়ে গেল সেই মাঠের ভিতর। সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বুকের ভিতরে রেখে দিয়েছিল এতকাল। পাপ অনেক। পাপ সাঁওতাল জাতির সঙ্গে না থেকে সাঁন্নসীর সঙ্গে থাকায়। পাপ শিধু কান্দর কাছে, ভালমাডিহির হুলে মরা সাঁওতাল পুরুষদের কাছে। অত কথা বুকের ভিতরে ধরে রেখেও সে তাদের মত হতে পারল না। পাপ খন্ডনের উপায় ছিল সেই সোনার তাবিজটা। ফিরিয়ে দেবে ভেবেছিল সেই মানুষটার সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা হয়, তা হারিয়ে গেল মাঠের ভিতর। নবীনের বুকের ভিতরে বাজ পড়ে।

একটা পক্ষী মরলে হাজার পক্ষী তাকে ঘিরে চিৎকার জোড়ে, গলা কাটা অনাথ মন্ডলের কথা শুনে [illegible] মারা হরিণ-ডাঙা বেয়ে সে [illegible]ছিল সেই রাতে। ছিদামের বউ আটকাতে পারে না। তখন গাছের পাতারা স্থির, কীট পতঙ্গ বোবা হয়ে আছে। রাতের আকাশে দু' চারটে তারাও খসে, সে সবও খসল না আজ। নবীন একা নড়ে উঠল।

ছিদাম তু আয়—বলে নবীন এক ঝটকা মেরে দৌড়ল মন্ডলের বাড়ির দিকে।

দৌড়তে দৌড়তে শোনে পিছনে আর এক ছুটন্ত মানুষের পায়ের শব্দ। ছিদাম আসছে। এই যে বৈতার হাট থেকে গরু কিনে এতটা হেঁটে আসতে সকাল থেকে সন্ধ্যে কেটে গেল তাতেও এত কষ্ট হয়নি। এইটুকু পথ দৌড়ে যেতে যে কষ্ট হল। অন্ধকারে পথ যেন মরা সাপের মত চিত হয়ে পড়ে আছে। তারপর সরস্বতীকুঞ্জের সামনে এসে দাঁড়ায় নবীন। বাড়িটা অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে আছে তার সাদা রঙের জন্য। বাঁ দিকে গোয়াল।

গোয়ালে কাটা হয়েছিল মন্ডল। নবীন দাঁড়াতে না দাঁড়াতে এসে দাঁড়ায় ছিদাম। দুজনের মুখে বাক্য নেই। কাঠ কাঠ হয়ে গেছে। ভয় লাগছে।

তু যাহ্। শ্রীদাম নবীনকে বলে।

নবীন শ্রীদামের দিকে তাকায়। অন্ধকারেও বুঝতে পারে তার মুখ মড়ার মত হয়ে গেছে।

নবীনের কেমন যেন হচ্ছিল। বিশ্বাস হচ্ছে না সব। মন্ডল সত্যিই মরেছে! সে পায়ে পায়ে এগোয়, আস্তে গোয়ালের সামনে দাঁড়ায়, নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে ফোঁস ফোঁস। তা হলে কি! মন্ডল বেঁচে আছে? নাকি মন্ডল যার হাতে মরল সেই লোকটা এখনো ওখানে। কিসের যেন শব্দ হয় ভিতরে। নবীনের বুকের ভিতরটা আচমকা কেঁপে ওঠে। সে চার ধারে তাকায়। কেউ নেই। শ্রীদাম ভয়ে আসে নি। গোয়াল ঘরটার ভিতরে ক্ষীণ আলো জ্বলছিল। হেরিকেনের শিখাটা কমানো। কে কমালো? নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে কার?

নবীন আর বাইরে থাকে না। পায়ে পায়ে খুব সতর্ক হয়ে ঢুকে পড়ে। এতটা সাহস করা উচিত হয় নি। যদি তার কাঁধে টাঙ্গি এসে পড়ে? ভিতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বোঝা যায় না কিছু। সামান্য আলোয় অন্ধকার যেন মহিমা ফিরে পেয়েছে। কেউ কি ঘুমোচ্ছে? নিঃশ্বাসের শব্দ কোত্থেকে আসে। আলো কমিয়ে অনাথ মন্ডল কি এই ঘরে ঘুমিয়ে আছে। নবীনের মাথাটা কেমন করছে।

সে ঝটকরে হেরিকেনের শিসটা উবকে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে এক অব্যক্ত আর্তনাদ তার কন্ঠনালীতে এসে জট পাকিয়ে যায়। অনাথ মন্ডলের বুড়ো গাইটা লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। রক্ত গড়িয়ে গেছে কলো হয়ে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে লাশটা। অতবড় মানুষ। লোক-টার প'ড়ে থাকা দেখে তার আর সন্দেহ থাকেনা। তবু এগিয়ে যায়। লাশটার সামনে হেরিকেনটা নিয়ে খুব সতর্কভাবে নিরীক্ষন করতে থাকে কি যেন চিকচিক করছে? আঙুলের ফাঁকে। সোনার! সে পিছনে ফেরে শ্রীদাম এলো নাকি! না। ঝট করে টান মেরে আঙুলের ফাঁকে আটকে থাকা তাবিজটা ছিনিয়ে নেয়। সোনার জিনিষ। কাজে লাগবে। কি করতে এল আর কি হয়ে গেল?

এটা মন্ডলের হাতে এল কোথা থেকে। এটা নিয়ে! হাতের উপরের দিকে আটকানো থাকে ত? তাহলে আঙুলের ফাঁকে কেন? মুঠোর ভিতরে নিতে চেষ্টা করেও পারেনি বোধ হয়। নবীন দেখে বুড়ো গাইটা এক নিমেষে তার দিকে চেয়ে আছে। লোভের মার বড়। সে ওটা তুলে কোমরে গুজে নিল। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

গাইটা হঠাৎ খুব জোরে ফোঁস করতে থাকে। নবীন আর পারেনা। কি করলে সে! কোমরটা ভার ভার লাগে। মড়ার হাত থেকে লোভের জিনিষ তুলে কোমরে রাখল! গরুটা জ্বলজ্বলে চোখে তাকে দেখছে। সে চিৎকার করে বাইরে বেরিয়ে যায়। শ্রীদাম ছুটে আসে।

কি হইছে?

মোড়ল মাডার হইছে বটে।

এরপর শ্রীদামের চিৎকারে একটা দুটো লোক বেরোয়। দুজন মন্ডলের মুনিষ। আস্তে আস্তে লোক ভর্তি হয়ে যায় সর-স্বতী কুঞ্জের সামনেটা এতক্ষণে ভয়ে সকলে ঘরে বুলুপ মেরে বসেছিল। তীব্র আর্তনাদ শুনেছিল সন্ধ্যের মুখে। তারপর মন্ডলের একটা মুনিষ চিৎকার করতে করতে হরিন-ডাঙা ফুঁড়ে কোথায় গিয়ে পালিয়েছে ভয়ে। অনেক কন্ঠস্বর সেও বেরিয়ে আসে। নবীন তখন চুপ ক'রে।

লাশ দাহনের পর সে চুপ করে বসেছিল কাঁসাইয়ের পাড়ে। পীতাম কিস্কু এসে ফিস ফিসিয়ে বলে, ম্যাঘনাদ ঠিক, মোড়লকে মারে সাধ্যি কার। কুনো কথা পুলুস কে বুলব নাই। মোড়লের কেউ নাই, জমিন সব সানতাল জাতির।

নবীন চমকে উঠেছে। অবাক চোখে চেয়ে আছে পীতামের দিক। বলব বলবে ক'রে'ও বলতে পারেনি তাবিজের কথা। মেঘনাথের নাম শুনে থমকে গিয়েছে। সেই তাবিজ এতদিন রেখে দিয়েছে নিজের কাছে। সেদিন নদীর পাড় ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পরও বহুক্ষণ বসেছিল সে, গোপনে বার বার ভেবেছে সেই মানুষটার কথা। হাতের তালুতে সোনার তাবিজটা রেখে নিথর হয়ে বসেছিল, বিড় বিড় করেছে কবে ঘুবান আসবু তুই, ইখান মরে কাছে রহিল, কুনো মানুষে জানবু না, খুরান দিব তুরে ঠিক।

সেই তাবিজ আর ফেরত গেল না। মাঠের ভিতর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে নবীন পায় নি। তবে তাবিজটা সে রাতে অনাথ মন্ডলের হাত থেকে তুলে নেওয়ায় পুলিশ কিছু করতে পারে নি। এখন রাত গভীরে বুক ভেঙ্গে যায়। সোনার স্মৃতি হারিয়ে গেল। বুকের কলজেখানি মাঠের মধ্যে পড়ে থাকল।

নবীন এসে দাঁড়ায় সরস্বতীকুঞ্জের সামনে। ফিসফিসে বৃষ্টি আরম্ভ হলো আবার। সে দুদ্দাড় করে অনাথ মন্ডলের বাড়ির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। দরজাটা বন্ধ। নবীন আস্তে আস্তে টোকা মারে। কিছুক্ষণ সব নিথর। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। ঝাপটা আসছে এদিকে। হরিণডাঙ্গা বর্ষায় ভেসে যাচ্ছে। এমন এক দিনে মন্ডলের বউ মরেছিল। সেদিন দরজাটা খোলা পেয়েছিল সে। আর এখানে কয়েকজন মানুষও ছিল।

ঝনাৎ করে দরজা খুলে যেতেই সে দেখে সামনে নিখিলানন্দ। চোখ মুখ একদিনেই বসে গেছে। গায়ে গেরুয়া বসন।

বড় বিষ্টি বাপ!

ঘরে আয়। নিখিলানন্দের আহ্বান আন্তরিক।

মোরে ডাকছিলে? নবীন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ ভবানন্দ। সন্ন্যাসী দরজা বন্ধ করতে করতে জবাব দিয়েছে।

নবীন চমকে যায়। কি নামে ডাকল তাকে সন্নিসী। সে কি ভুল শুনল।

নিখিলানন্দ ক'দিন নির্ঘুম রাত কাটাচছে। কলাবনি থেকে ফেরার পর ঘুম আসে না। দীপঙ্কর চৌধুরী চিনে ফেলেছে। বার করেছে ক্ষীণ সম্পর্কের রেখা। সেটা ঐ মানুষটার কাছে ছোট নয়, বিভূতি মন্ডলের কাছে তার কোন মূল্য এখন আর নেই। কিন্তু ঐ সম্পর্ক ভাঙিয়ে কিছু করা যাবে মনে হয় না। প্রভু পুণ্যব্রত স্বামীর বিরুদ্ধে যে প্রচার, যে প্রচারের ফলে তিনি জেলে আছেন, সে প্রচারে ঐ দীপঙ্কর চৌধুরীও অন্ধ হয়েছে। প্রভুর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ, নতুনডাঙা আশ্রমে মানুষের হাড়, করোটি পাওয়া গেছে। বড় কাজ করতে গেলে এসব তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। পরিবর্তন আনতে হলে রক্তপাত জীবহিংসা অসম্ভব কিছু নয়। দীপঙ্কর চৌধুরী শৈশবের নাড়ি ধরে টানতে চায় অথচ তার এই রকম সন্ন্যাসী বেশ দেখতে চায় না।

হরিণডাঙার সব জমি সাঁওতালরা দলবদ্ধ হয়ে চষে ফেলেছে। ধান রোয়া হয়ে গেছে। পুণ্যব্রত সঙ্ঘের বড় অ্যাম্-বিশন এই হরিণডাঙা। এর জন্য সঙ্ঘের অনেক কাজ আটকে আছে। অথচ এবার ও জমির দখল পাওয়া গেল না। নবীন হেমব্রম সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ওকে সরতে দেওয়া যায় না। বরং পাঠিয়ে দিতে হবে বাঁকুড়ায়। কলাবনিতে যেতে কেমন লাগছে! সমস্ত ডক্যুমেন্ট ঠিক করে বড় উকিল নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে। ঐ লোকটাকে অন্যভাবে কিছু করা যাবে না। হাইকম্যান্ডে চিঠি লিখেছে নিখিলানন্দ সব জানিয়ে। ইদানীং কলাবনির সেই ঘটনার পর রোখ চেপে যাচ্ছে তার। উদ্দেশ্য সফল করতেই হবে। প্রভু জেল থেকে বেরিয়ে দু' হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেবেন তাকে। প্রমোশন হয়ে যাবে।

নবীন থতমত খেয়ে চেয়ে আছে সন্ন্যাসীর চোখে। সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রেখেছে, ভবানন্দ তিন দিন ধরে তোমায় খুঁজছি, প্রভুজী এসে-ছিলেন।

মর ধম্ম তো যায় নাই। নবীনের চোখ মুখে ভয় বিস্ময় জড়িয়ে। সে ভবানন্দ হয়ে গেল কখন? তার জাত চলে গেল। সে তো সানতাল জাতি। পিলচু বুড়ি তার মা, পিলচু হাড়াম হলো বাপ। সেই বুড়ো বুড়ি ভগবানের অংশ। সিং বোঙা সেই

ভগবান। জলের মত তার বক্ষ। সব দেখা যায়, সরল সিধে। সিং বোঙার সন্তান তুমি নবীন। ধৰ্ম্ম চলে গেল কখন জানলে না।

প্রভু সূক্ষ্ম শরীরে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে এসেছিলেন তুমি জান ভবানন্দ?

নবীন হতভম্বের মত মাথা নাড়ায়। না সে জানে না।

তুমি মূঢ় মানুষ, তোমার সৌভাগ্যের কথা জান না। প্রভু আমাকে বললেন, তোমাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, তোমার দীক্ষা হয়ে গেছে।

ভয় তরাশে নবীনের কালো মুখ আরো গভীর হয়ে যায়। সে কাঁপতে থাকে।

নিখিলানন্দ নবীনের মাথায় হাত রাখে, প্রভু বললেন, ওরে নবীন হলো পুণ্যাত্মা, ওর দীক্ষা আমিই দিলাম, ওর অসভ্য ধর্ম আর নাম এতদিনে ঘুচলো। ভোর হতে তিনি ফিরে গেলেন জেলখানায়, সেই থেকে আমি তোমায় খুঁজছি ভবানন্দ।

নিখিলানন্দর কন্ঠস্বরে আশ্চর্য মাদকতা আর মাধুর্য। দু' চোখে ভক্তির অপার প্রকাশ। নবীন মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

ভবানন্দ প্রভুর এই খাটের সামনে স্থির হয়ে বসো, তুমি আর সাধারণ মানুষ নও, পুণ্য ধর্ম তোমার ধর্ম, জগতের আনন্দের জন্য তোমার জীবন উৎসর্গীকৃত। বসো আমি তোমায় মন্ত্র দেব।

নবীন আচ্ছন্নের মত সেই পুতুল খেলার খাটের সামনে বসে। খাটের মাথায় চাঁদোয়া। শুভ্র বিছানায় প্রভুর ছবি বসানো। সন্ন্যাসী এসে কি যেন ছড়িয়ে দেয় সেই খাটের উপর। অগুরুর গন্ধ প্রকট হয়ে ওঠে।

যেদিন তুমি আশ্রয়হীন হয়েছিলে কে রক্ষা করেছিল তোমাকে? বজ্র গম্ভীর কন্ঠস্বর।

বাপ্ আপনে। নবীন উত্তর দেয়।

আমি নই, বলো প্রভু পুণ্যব্রত স্বামী।

নবীনের নাকের কাছে কি এক পরিচিত গন্ধ গভীর হয়। প্রভুর বিছানায় এক্ষুণি ছিটিয়ে দিল সন্ন্যাসী। অগুরু আতর। কোত্থেকে এই গন্ধ আসে। নবীনের মাথা ঝিম ঝিম করে। সে দু' চোখ বন্ধ করে। চোখের সামনে কি ভেসে উঠছে। বাইরে সেই রকম বৃষ্টি। হরিণডাঙায় মানুষ হাঁটে না। মন্ডলের রাজপ্রাসাদে কে মরে আছে। মরা মানুষটার গায়ে এই রকম আতর ছিটিয়ে দিয়েছিল মন্ডল। উগ্র গন্ধ। মন্ডলের বউ-এর বিছানা থেকে উঠছে। নবীন অন্ধ হয়ে থাকে। গা হাত-পা কাঁপছে। চোখ খুললেই দেখতে পাবে মন্ডল বউয়ের মাথার কাছে থম মেরে বসে আছে। বিছানা থেকে ঐ রকম গন্ধ ভুর ভুর করে উঠছে।

কিন্তু এসব প্রকাশ করা যায় না। সন্নিসী রাগ করবে। নবীন তো নিমক-হারাম নয়। অথচ মনের কথা কি করে চেপে রাখে। সে তো সানতাল জাতির স্বভাব নয়।

বাপ। নবীন দু' চোখ বন্ধ করে সন্ন্যাসীকে ডাকে।

সন্ন্যাসী তখন জোব্বাজাব্বা খুলে ফেলে পেশীবহুল শরীর বের করে দাঁড়িয়ে আছে। গুপ্তিটা মুক্ত হয়েছে। চকচক করছে।

কি বলছো ভবানন্দ?

কুছু না বাপ।

নবীন কাঠ হয়ে বসে আছে। চোখের সামনে মন্ডলের মরা বউ ভাসছে। প্রভুর মুখ মনেও পড়ে না।

একটু পরে সন্ন্যাসী উন্মুক্ত দেহে ওর সামনে এসে বসে। নবীনের হাতটা নিয়ে গুপ্তির গায়ে স্পর্শ করায়।

বলো ভবানন্দ, জগতের আনন্দের জন্য, প্রভু পুণ্যব্রত স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইলাম, প্রভুর অস্ত্র স্পর্শ করিয়া আমি পুণ্যধর্মে ব্রতী হইলাম। হে আনন্দময় তুমিই আমার রক্ষা কর্তা, আমি ভবানন্দ স্বামী বলিতেছি...।

ধাতব অস্ত্রের শীতল স্পর্শে নবীনের দু' চোখ খুলে যায়। সে ভয়-তরাশে দেখে নগ্নদেহী সন্ন্যাসী ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। সন্ন্যাসীর পুরুষ্ট উপরি বাহুতে ওটা কি!

নবীন উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপরই সন্ন্যাসীর বাহু ধরে ফেলেছে। এই তো সেই হারানো তাবিজ। তার বুকের কলজে। সে ফেলে এসেছিল মাঠের ভিতর। সেদিন এই সন্ন্যাসী ওকে তুলে এনেছিল খুব ভোরে। সন্ন্যাসীই পেয়েছে তাহলে তাবিজটা। এত কাছে রয়েছে অথচ নবীন কদ্দিন ধরে খুঁজছে সেই সোনার স্মৃতি।

বাপ উ সুনার মাদলি মোর।

সোনার তাবিজটা দেখে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কেন নবীন! নিখিলানন্দর সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সে আস্তে আস্তে বলে, এ তো তোমাকেও দেওয়া হবে, বাঁকুড়ায় গেলেই সঙ্ঘের সেক্রেটারি তোমায় নিজ হাতে পরিয়ে দেবেন, অপেক্ষা কর ভবানন্দ!

নাহ, উ মাদলি মু হারাই ফেলেছি, বাপ তু মাঠে পাইলি সিদিন, উটা মোর লয়, আর মানুষের, ঘুরান দিব বলি রাখি দিইছি, দে উটা!

নবীনের কন্ঠস্বর উচচ গ্রামে উঠে যাচছে।

নিখিলানন্দ বুঝছে না কি হলো।

দে বাপ। নবীন তাবিজটা হাতে ধরে আটকেছে সন্ন্যাসীকে। পাগলামি করছো কেন, এ বাঁকুড়ায় না গেলে পাবে না, আমাদের সঙ্ঘের প্রতীক চিহ্ন দেওয়া তাবিজ কি বলছো তুমি!

নবীন খুব নিবিষ্ট মনে সন্ন্যাসীর হাত পরীক্ষা করতে থাকে। হ্যা ঠিক সেই রকম। একটা খড়্গের চিহ্ন রয়েছে। এই তাবিজ মন্ডলের হাত থেকে সে উদ্ধার করেছিল। মেঘনাদের নিশ্চিত। সে আমলে যত খুন হয়েছিল সব তো ঐ মেঘনাদের দল করেছিল। পীতাম কিস্কু বলেছিল জমি সব সাঁওতাল জাতির কাছে ফিরিয়ে দিল মেঘনাদ। অনাথ মন্ডলকে মেরেছিল তাদের ভালবেসে। তাই মন্ডলের মরায় দুঃখ নেই। কিন্তু সন্ন্যাসী কি বলে? নবীন তিন হাত দূরে সরে এসেছে। এক ঝাপটায় দরজাটা খুলে জোলো বাতাস ঢুকে পড়েছে ঘরে।

কি কহিলে?

এ তাবিজ পুণ্যব্রত সঙ্ঘের, এই খড়্গ চিহ্ন দেখছিস?

নবীনের মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। কি বলছে সন্ন্যাসী। তাহলে সব ভাবনা কি ভুল। সে ছাড়া কেউ তো জানে না মরা মন্ডলের হাত থেকে ঐটা পাওয়ার কথা। না পীতাম কিস্কুও নয়। পীতাম বলেছিল মেঘনাদের কথা। সেও বিশ্বাস করেছিল কেননা জমি সব ঘুরে এল। কিন্তু গোল-মাল হয়ে যাচ্ছে। এ যদি পুণ্যব্রত সঙ্ঘের হয়!

মন্ডল গলা কাটি পড়িছিল গোশালে, মরা মন্ডলের হাত থিকে উমাদ লি, না উ রকম আর এক মাদলি মুই...নবীন কথা শেষ করতে পারে না। টকটকে লাল চোখে তাকিয়েছে সন্ন্যাসীর দিকে।

এ কি সন্ন্যাসী এমন হয়ে যাচছে কেন? কাঁপছে। গুপ্তিটা তুলে নিল মাটি থেকে। নবীন এক ঝটকায় বাইরে বেরিয়ে আসে। সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মন্ডল মরল। তারা ভাবল দশ গাঁয়ের লোক ভাবল পার্টি মেরেছে। তখন তো সব খুনে পার্টির খুন। তারপরেই ক'বছর বাদে দলিল নিয়ে চলে এল সন্নিসী। ভুয়া দলিল। কি করে হয়!

তাহলে সব ভাবা ভুল। এদ্দিনে বড় পাপ বুকের ভিতরে সঞ্চিত রেখেছিল। হেই বাপ গো, সিংবোঙা, একি হলো। পিথিমী সব বদলাই গেলো, চাঁদ সুয্যির সময় বদল হলো। মন্ডলের মরা তাদের জন্য লয়। তাদের ভালর জন্য মন্ডল মরে নাই। সব জমিন লুঠবার ছল।

নবীন ছুটেছে কাদা ভেঙে। পায়ে বাবলা কাঁটা ফুটে যাচছে। সমস্ত পথটা কন্টকাকীর্ণ। কাদায় পা ভুস করে বসে যাচ্ছে। নাকের সামনে আতরের গন্ধ! হা সিংবোঙা, এদ্দিন ভুল করে ছিলাম। পুলিশের কাছে মিথ্যে বলে দশ মানুষের কাছে মিথ্যে বলে সব্বোনাশ করে দিইছি মানুষের।

হেই ভাইসব শুনো, মোড়লের খুনী রে পাওয়া গিইছে। সানতাল জাতির ভাল করার জন্য মোড়ল মরে নাই, উহার জমিন লিবার জন্য উহারে মাডার করিল, মরা সব ভুল ভাবি গো...

বর্ষায় পচা গাঁ-ঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। সবার চোখে বিস্ময়। কি হলো নবীন এ রকম করে কেন?

নবীন হেমরম দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে। না? আর ভয় নেই। সন্ন্যাসীকে গুপ্তিটা তুলে নিতে দেখেছিল সে। সরস্বতীকুঞ্জ তো

বহুদূরে! হাঁপাতে হাঁপাতে নবীন সব বলতে থাকে। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে নবীন হেমব্রম। মাথায় বর্ষার বড় মেঘ, বৃষ্টি। ভ্রুক্ষেপ নেই হরিণডাঙার মানুষের। সব এসে ভীড় করছে তার চারপাশে। এদ্দিনে একটা কথা শোনা গেল। বহুদিন তারা নতুন কোন কথা শোনে নি।

—পাটি মাডার করে নাই? ইক মার্দলি পাইছিলাম, মড়া মোড়লের হাতে, খুনের মার্দলি হো। মাডার করিছে উ সন্নিসীর দল, উ মাদলি নাকি সি দলের সব সাঁন্নিসীর হাতে আছে, মোঁড়লের জমিনের লোভে মাডার করিছিল ঠিক। মরা ভাবি অনা কথা।

নবীন হেমব্রম ঝড় বৃষ্টির ভিতরে বেরিয়ে গেল সরস্বতীকুঞ্জ ছেড়ে। নিখিলানন্দর মুখ কালো হয়ে গেছে। গায়ে কাঁপুনি আসছে কি করবে এখন। মন্ডল মরেছিল গো—শালে, মরা মন্ডলের হাতের মুঠোয় ই রকম একটা তাবিজ ছিল। সে কথা জানত এই সাঁওতাল। সেই তাবিজ সংগ্রহ করেছিল। তাহলে!

অনাথ মন্ডল কিভাবে খুন হয়েছে তা নিখিলানন্দ জানে না। অনেক দিন হয়ে গেল সে ঘটনা। সে শুধু দলিল নিয়ে সঙ্ঘের নির্দেশ মত ছুটে এসেছে এখানে। নবীন বলল ঐ তাবিজ খুনীর হাত থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিল মন্ডল মরার আগে। নবীন চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেছে। তার সব মায়া কেটে গেছে।

এখন এই সুদূর গাঁয়ে বসে সে কি করবে। ভয় তরাশে সন্ন্যাসী পোশাকপত্তর পরে বেরিয়ে পড়েছে। সরস্বতীকুঞ্জের পিছন দিয়ে ঝড় বৃষ্টির ভিতরে নিখিলানন্দ পালাচ্ছে। বুঝতে পেরেছে এ খুন তো পার্টির খুন নয়। তাহলে! পুণ্যব্রত সঙ্ঘের জমি-জমার সূত্র কি অনাথ মন্ডলের বেঁচে থাকার সময় থেকেই। অনাথ মন্ডল বেঁচে থাকতে একবার তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সঙ্ঘ একথা নিখিলানন্দ শুনেছে। মন্ডল রাজী না হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িত কোন অর্গানাইজেশন-এ সম্পত্তি সমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করে উইলে। সে গন্ডগোল এখনো জড়িয়ে। মন্ডলের ইচ্ছাই কি তার মৃত্যুর কারণ!

মাঠ পাথর ভেঙ্গে নিখিলানন্দ পালাচ্ছে। এখানে সব ব্যাপারে জড়িয়ে বিপদ গভীর হয়ে গেছে। দীপঙ্কর চৌধুরী জেনে গেছে পূর্ব পরিচয়। সাঁওতালটা সন্দেহ করেছে অনাথ মন্ডলের খুনী সে। তখন তো সন্ন্যাস নেয় নি বিভূতি। বুকের ভিতরটা দপ দপ করছে। দৌড়তে গিয়ে নিখিলানন্দর পা ফসকে যায়। কোন রকমে সামলে নিয়ে আবার পা বাড়াতে প্রবল বৃষ্টি ঝড়ের ভিতরে অর্ধেক দেহটা তার পাঁকে ডুবে যায়।

আকাশ ভেঙে পড়েছে সন্ন্যাসীর মাথায়। কোথায় কতদূরে বাঁকুড়া। বাঁকুড়া ছাড়া আর আশ্রয় কোথায়। জগৎ আনন্দময় হয়ে উঠবে, প্রভু বলেছেন ...নিখিলানন্দ পাঁকের ভিতর থেকে দেহ তুলতে চেষ্টা করে প্রথম বারেই ব্যর্থ হয়। পাঁকের ভিতরে পা কিসের উপর পড়েছে, একটা সুগোল পাথর আছে। ব্যাথা লাগছে মার্বেল পাথরে।

ডাক্তারের ভাত ঘুম পেয়েছিল। আলিস্যি এসেছে ঠিক দুপুরে। ইজি-চেয়ারে টান টান হয়ে সে শোনে বারান্দায় আলতো পায়ের শব্দ। কুন্ঠাক্রান্ত রাজ-পুরুষ হেঁটে যাচ্ছেন। আগে এমন হত না। ইদানীং এটা হয়।

কেন হয় তা জানে ডাক্তার বোস। কারণ সে। বৃদ্ধের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। ক্রমশঃ ধরা পড়ে গেছে। অথচ এরকম তো হবার কথা নয়। প্রথমে যে সম্পর্কটা গড়ে তুলেছিল তাতে যেন সায় ছিল বৃদ্ধের। এখন ঐ প্রবীণ চক্ষু তাকে সহ্য করতে পারে না। ডাক্তার জানে আশ্রয় তো লাবণ্যর কাছে। লাবণ্যর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্নদাশঙ্কর কিছু বলেন না। তবু তার ঘন ঘন আসায় বিরক্ত হন এটা বোঝা যায়। দীপঙ্কর চৌধুরীও কি বুঝতে পেরেছে তার মনের বাসনা। ডাক্তারের হাত থেকে হাত পাখাটা সশব্দে নিচে পড়ে যায়। সে চমকে চোখ খোলে।

ঐ তো লাবণ্য বসে আছে। মুখের উপর একটা ম্যাগাজিন। ডাক্তার এনেছে ঝাড়গ্রাম থেকে। আজ সকালে অন্নদা-শঙ্করকে একটা খবর দেওয়ার ছুতোয় এসে থেকে গেছে। খবরটা নিজের তৈরী করা। হ্যাঁ লেপ্রোসি নিয়ে রিসার্চ করছেন এমন একজন বিদেশী এসেছেন কলকাতায় এটা ঠিক। কিন্তু তার সঙ্গে ডাক্তারের যোগাযোগ হয় নি। ডাক্তার অন্নদাশঙ্করকে বলেছে, ঐ ভদ্রলোককে কলাবনিতে নিয়ে আসবে কিনা!

অন্নদাশঙ্কর সরাসরি না করেছেন। ডাক্তার লাবণ্যর দিকে তাকিয়েছে তখন। লাবণ্য নিশ্চুপ। বৃষ্টি এল তখন জোরে। তার আর ফেরা হল না কলাবনিতে।

অন্নদাশঙ্কর যে হ্যাঁ বলবেন না এটা জানা। তাই তার সাহস হয়েছিল ঐ প্রস্তাব দেওয়ার। দুপুরে লাবণ্য তাকে সামনে বসিয়ে খাইয়েছে। চোখে চোখ ফেলেছে বহুবার। শূন্য দৃষ্টিতে ডাক্তারের হৃৎপিন্ডে কাঁপুনি ধরেছে। সে সামলে নিয়েছে অতি কষ্টে নিজেকে। ঐ লাবণ্যময়ী বসে। মুখে ঠোঁট পান রসে ভেজা। হাতের ম্যাগাজিনটা রেখে দিয়েছে লাবণ্য। পালঙ্কে বসে পা দুলোচ্ছে। আলতা পরা ফর্সা পায়ের পাতা থেকে আবছা শব্দ আসছে। নূপুরের শব্দ। সব দুলছে।

পিথাটা ভীষণ মদ খায়, মদই ওকে খাবে। লাবণ্য বিড় বিড় করছে। ডাক্তার সোজা হয়ে উঠে বসেছে। লাবণ্যর মুখে আবার পিথার কথা?

পিথা আমার খুব বাধ্য, তাতে দীপঙ্কর চৌধুরী একদিন ক্ষেপে গিয়েছিল! পিথা আমার কথা শোনে তাতে ওর কি!

ডাক্তার ঘাড় হেলায়। সমর্থন করে লাবণ্যকে।

পিথার ভাই ভিখা সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল, তুমি জান?

না। ডাক্তারের চোখে বিস্ময় অসহায়তা একত্রে জমা হয়ে থাকে।

লাবণ্য যেন নিশ্চিন্ত হয়। পালঙ্ক থেকে নেমে কেমন নাচের মুদ্রায় ঘুরে যায়। এক এক পা করে দরজার সামনে এগিয়ে যায়। সব নিথর। আবার ফিরে আসে।

পিথাটা গোঁয়ার, চেহারাটা দেখেছো। লাবণ্য আবার পিথার কথা বলে। ডাক্তার জানে না কেন বুকের ভিতরটায় লাগছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সে একেবারে সিধে হয়ে বসে, 'কাল আর একটা সুই-সাইডের কেস এসেছিল, ফলিডল খেয়েছে, বউটার বয়স বেশী নয়।'

(চলবে)

৩৩ বছরের বিবাহিত মিঃ এবং মিসেস হেনরী লিং-এর রোমান্টিক জীবন

আমেরিকায় সঙ্গ সখ্যতা

শৈলেন্দ্রকো বিশ্বাস
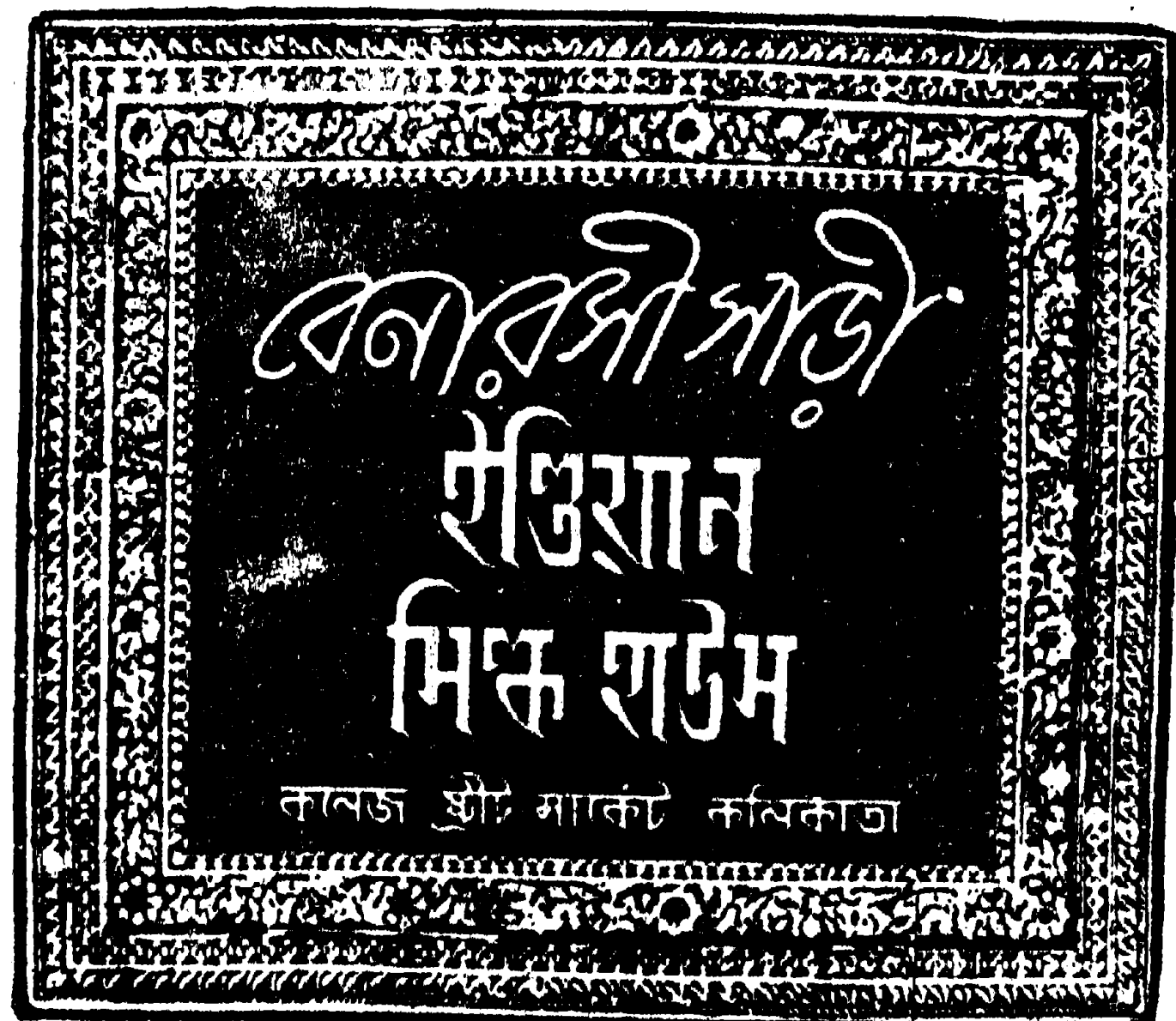
লক্ষ্ণৌর এক ভদ্রলোক এক বছরের জন্য নিউইয়র্কে ছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে মন্তব্য করলেন—'আমেরিকায় পথেঘাটে মেয়ে পাওয়া যায় একটু পয়সা খরচ করলেই।' উক্তিটা আমেরিকার যৌনাচরণ সম্বন্ধে। প্রতিবেশী শ্রীলাল পরম ঔৎসুক্যে ছুটে এলেন এ বিষয়ে আমার বক্তব্য শুনতে। বলতেই হল, 'মাপ করবেন, যে ভদ্রলোক এ উক্তি করেছেন, তিনি আমেরিকান সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং কোন আমেরিকান পরিবারের সঙ্গে পরিচিত নন। তিনি নিউইয়র্কের 'টাইম স্কোয়ারে' ভ্রাম্যমান কিছু দেহোপজীবিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন হয়ত।' বলা বাহুল্য শ্রীলাল আরও কিছু জানতে চাইলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে বাধাহীন যৌনাচরণের সমস্যায় পত্রপত্রিকা, উপন্যাস, ছায়াচিত্র এবং দূরদর্শন (টিভি) ইত্যাদিতে দেখা যায় কেন? এসব কাহিনী কি ভিত্তিহীন? উত্তরে বলতে হয়, সব কিছু সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মূল্যমান দিয়ে বিচার করা সঙ্গত। স্থান, কাল, পাত্র, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি সবই দেখতে হবে বৈকি! সামাজিক মানুষ হিসাবে নারী-পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবহারাদি [illegible] মূল্যবোধ অনুযায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব এ দেশের বিবাহপূর্ব বা বিবাহোত্তর সঙ্গ সখ্যতা, সহবাস এবং বিবাহ আমেরিকার সামাজিক পরিস্থিতি দিয়েই বিচার্য।

নারী-পুরুষের স্নেহ ভালবাসা স্বাভাবিক নিয়ম। সেই স্নেহ ভালবাসা বিনা সংকোচে প্রকাশ করার প্রথা আমেরিকায় এবং অন্যান্য পশ্চিম দেশে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। আমাদের দেশে সর্বসমক্ষে কিশোর-কিশোরী, বা প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের চুম্বন, আলিঙ্গন, দেহস্পর্শ ইত্যাদি সমাজগ্রাহ্য ব্যবহার নয়। অতএব ভারতীয়দের পক্ষে প্রথম প্রথম এদেশে এসে আমেরিকানদের সকলের সামনে স্নেহ-ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অশোভন মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

আমেরিকাতে নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয় এবং স্নেহ-ভালবাসার অসঙ্কোচ প্রকাশকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়। এবং মনে করে স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণ 'রোমান্টিক' ভালবাসা বা প্রেমে পরিণতি লাভ করলে দুজন স্ত্রী-পুরুষ স্থায়ী সম্পর্ক বা বিবাহের চিন্তা করতে পারে। পশ্চিম দেশের বিবাহ রীতি এই প্রেম বা 'রোমান্টিক' ভালবাসা কেন্দ্রিক। ভারতবর্ষে এখনও বিবাহকে কেন্দ্র করে [illegible]এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিবাহ শুধু একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষের সম্পর্ক মাত্র নয়। এমন কি যারা ভালবেসে বিয়ে করে, তাদের পরিবারের মধ্যেই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা, যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিচার্য হয়। অতএব মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজন নানা বিচার বিবেচনা করে বিবাহ স্থির করেন বা বিবাহে অনুমতি দেন। এর অন্যথা হতে পারে, কিন্তু সেটাই স্বীকৃত রীতি নয়। আমেরিকায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিণতি বিবাহে। মা বাবা বা অন্যান্য পরিজনের দায়িত্ব এ বিষয়ে গৌণ বলা যেতে পারে।

বিবাহ সম্পর্কের প্রস্তুতি হিসাবে আমেরিকানরা তাদের ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় উৎসাহ দেন। কিশোর বয়সে ছেলেমেয়ে দুজনেই যৌন বিষয়ে সচেতন। স্কুলেও কিছু কিছু যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এদেশের সংবাদপত্রে, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র এবং দূরদর্শন ইত্যাদি 'যৌনতা'কে প্রাধান্য দেয় গল্পে, কাহিনীতে, সংবাদ পরিবেশনায় এবং বিজ্ঞাপনে, বলা চলে যৌনতাকে পণ্য-বিক্রীর মাধ্যম করা হয় অনেকটা। অনেক সময় পণ্যকেও যৌনতা বলা হয়। ফলে খুব ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েরা যৌনাসঙ্গ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন বললে অত্যুক্তি হবেনা। বারো তেরো বছর বয়স থেকে ছেলেমেয়েরা বালিকা-বন্ধু বা [illegible]

না জুটলে নিজেদের ব্যক্তিত্ব এবং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। মা-বাবাও চিন্তিত হয়ে পড়েন।

বালক-বন্ধু বা বালিকা-বন্ধু জুটলেও বিপদ। ওদের 'দেহ' সচেতন হতে হয়। ব্যবহার সচেতন হতে হয়। মুখের গন্ধ, ঘামের গন্ধ, পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, সামঞ্জস্য বা স্টাইল, কথা বলার ধরণ-ধারণ ও বিষয়বস্তু—নানা বিষয়ে চিন্তিত হতে হয়। প্রথম মেলামেশায় এসব ব্যাপারে সচেতন না থাকলে সে সম্পর্ক স্থায়ী না হবার ভয় থাকে। এসব ব্যাপারে পরস্পরের মতামত ভবিষ্যৎ সম্পর্কের গুরুত্ব বা স্থায়িত্ব নির্ধারণ করবে। এর ওপর মনের মিল হওয়া চাই। ছেলেদের নম্রভাব—মেয়েলীপনা সাধারণত হতে পারে বা সমযৌনতার পরিচায়ক মনে হতে পারে। অবরদস্ত বা ডানপিটে মেয়ের বালক-বন্ধু জোটা মুস্কিল হতে পারে। আমেরিকায় শতকরা প্রায় ৫১ জন মেয়ে। অতএব মেয়েদের মধ্যে 'ছেলেধরা' হবার তাড়না দেখা যায়। অনেকের মতে আবার গায়ে-পড়া মেয়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গ চলে, তার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের কথা ভাবা মুস্কিল। আমাদের দেশে ছেলেমেয়ের বিবাহ এবং ভবিষ্যৎ চিন্তায় মা-বাবার যে দুর্গতি, এদেশে ছেলেমেয়েদের নিজেদেরই সেই দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয় বেশ অল্প বয়স থেকেই।

ছেলেমেয়ের মেলামেশায় কতকগুলো নিয়মরীতি মানতে হয়। সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের 'ডেটে' যাবার আমন্ত্রণ জানায়। খরচাদির ভার তাদের। মহিলা আন্দোলনের ফলে আজকাল মেয়েরাও কখনও সখনও খরচাদির ভার নেয়। 'ডেট' বলতে অনেক কিছু বোঝায়। সাধারণ বেড়াতে যাওয়া, একসঙ্গে সিনেমা বা শো দেখতে যাওয়া, কোন রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া কিংবা স্রেফ গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়ানো, গাড়ীতে বসে ভালবাসাবাসি করা ইত্যাদি অনেক কিছু। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ না হলে যৌনসঙ্গের বা যৌনমিলনের নিয়ম নেই। মা-বাবা সম্পর্কের সমীচীনতা এবং ঘনিষ্ঠতা বিচার করে ধীরে ধীরে বাধাবন্ধ শিথিল করেন। বিবাহপূর্ব সঙ্গসখ্যতা অনেকটা সমাজস্বীকৃত হয়েছে ইদানীং। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মা-বাবা সবাই যেন সম্পর্কের গাঢ়তার পরিচায়ক হিসাবে এটাকে মেনে নিয়েছেন।

'স্যান্ডি আজকাল তেলআভিভে (ইস্রায়েল) আছে'—আমার বান্ধবী ডোরী বলল। স্যান্ডি ডোরীর মাসতুতো বোনের মেয়ে—২১ বছর বয়স তার। ওকে অনেক দিন ধরে জানি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম স্যান্ডির কোন বালক-বন্ধু জুটেছে কিনা। ডোরী হেসে জানাল যে গত পাঁচ বছর ধরে স্যান্ডি তার ইস্রায়েলী বন্ধু মাইকের সঙ্গে সহবাস করছে। এত অল্পবয়সে বিয়ে করে সংসার পাততে সে নারাজ। স্যান্ডি-মাইক দুজনেই পড়াশুনা করছে। 'মার্সা—স্যান্ডির মা কি বলে?'—জানতে চাইলাম। 'ওরা মেনে নিয়েছে', ডোরী বলল, 'এমনকি স্যান্ডি আর মাইক আমেরিকায় এলে তাদের থাকার

পেনসিলভানিয়ার সহবাসকারী যুগল

জন্য আলাদা ঘর করে দিয়েছে 'প্রাইভেসীর' জন্য।' স্যান্ডির মত অনেক অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে আজকাল সহবাস করছে। এ ব্যবস্থা মুখ্যত সম্ভব হয়েছে পরিবার-নিয়োজন-বিধির প্রচলনের ফলে। এই সহবাস সঙ্গসখ্যতাকে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত করে। কলেজ বা ইউনিভার্সিটির বহু ছাত্র-ছাত্রী সহবাসে অভ্যস্ত। কেউ কেউ আলাদা ঘর ভাড়া করে সহবাস করছে—এ্যামেচার সংসারী বলা চলে। সহবাস সম্বন্ধে তাদের পরিবার অনেক সময় সম্মতি দেয়। অনেক সময় অসম্মতিও থাকে। কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচ সাধারণত ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সংগ্রহ করে। অতএব কলেজ জীবনে সহবাস সম্বন্ধে পারিবারিক মতামতের প্রভাব বিশেষ হতে পারে না।

বিয়ে-না-করে সহবাস রীতি গত দুই দশকে সামাজিক মূল্যমানের উপর কঠিন আঘাত হেনেছে। সম্প্রতি সেটাকে [illegible]-সম্মত বলে মেনে নেবার চেষ্টা হচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদের আর্থিক, সামাজিক এবং মানসিক সমস্যা আমেরিকানদের জীবনে নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। বিবাহপূর্ব সহবাস অথবা বিবাহের পরিবর্তে সহবাস রীতি অনেকে তাই সঙ্গত মনে করছে। এতে স্ত্রী-পুরুষ দুজনে দুজনকে যাচাই করে নিতে পারে। সহবাস রীতি বর্তমানে অনেক প্রাপ্ত বয়স্কের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর, বৈধব্যের বা বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতায় সহবাস রীতি অনেককে মানসিক এবং আর্থিক সমস্যায় সমাধানের পথ দেখাচ্ছে।

এদেশের কোন কোন গোষ্ঠিতে বিয়ে না করে সম্পূর্ণভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করার রীতি আছে বহুদিন থেকে। 'বিয়ে করে কি হবে? এই তো বেশ আছি। গত পনেরো বছর ধরে রালফ আর আমি একসঙ্গে আছি। কিছু অসুবিধা বা ক্ষতি তো দেখছি না।' —মারিয়া গার্সিয়া, বেলেভিউ হাসপাতালের রোগিণী বলে। মারিয়া ক্যাথলিক সাউথ আমেরিকার মেয়ে, তার স্বামী রালফ অ্যালিজেরো পোর্টোরিকান। তাদের চারটে ছেলেমেয়ে। রালফ ওকে ছেড়ে যাবে, মারিয়া সে চিন্তা করে না। 'ও যেমন ছেড়ে যেতে পারে, আমিও পারি। বিয়ে করলে যত ঝামেলা—সেপারেশন ডিভোর্স, এ্যালিমনি ইত্যাদি। বিয়ে করলে রালফ ভাবত আমি ওর সম্পত্তি!' মারিয়া বলে, 'বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি, ভয় করি এবং মান্য করি। ওকে সহ্য না হলে আমি ওকে ঘর থেকে বার করে দেবো বা নিজেই চলে যাবো। ওর ভাল না লাগলে ও চলে যাবে। ব্যাস! পরিষ্কার ব্যাপার। কোর্ট-উকিল করার ব্যাপার থাকবে না।' কিন্তু মারিয়া স্পষ্ট বোঝে যে ওদের বিচ্ছেদ হলে ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ওর উপরই এসে যাবে।

মারিয়ার না-বিবাহ বিবাহকে কমন-ল-অব-ম্যারেজ বলে। আমাদের দেশের নিম্নবিত্তদের মধ্যে এই ধরনের সহবাস প্রথা প্রচলিত। মধ্যবিত্ত এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'রক্ষিতা'র ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে, অবশ্য এ রীতি বিধিবহির্ভূত মনে করে। আমেরিকার অনেকগুলো স্টেটে কমন-ল-অ-ম্যারেজ আইনে বৈধ। শুধু স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষ সকলের কাছে পরিচিত কিনা সেটা বিচার করা হয়। কমন-ল-অ-ম্যারেজের স্বামীরা সাধারণত ছেলেমেয়ের পিতৃত্ব স্বীকার করে

কেনের দ্বিতীয় এবং সেই কোর প্রথম বিবাহ
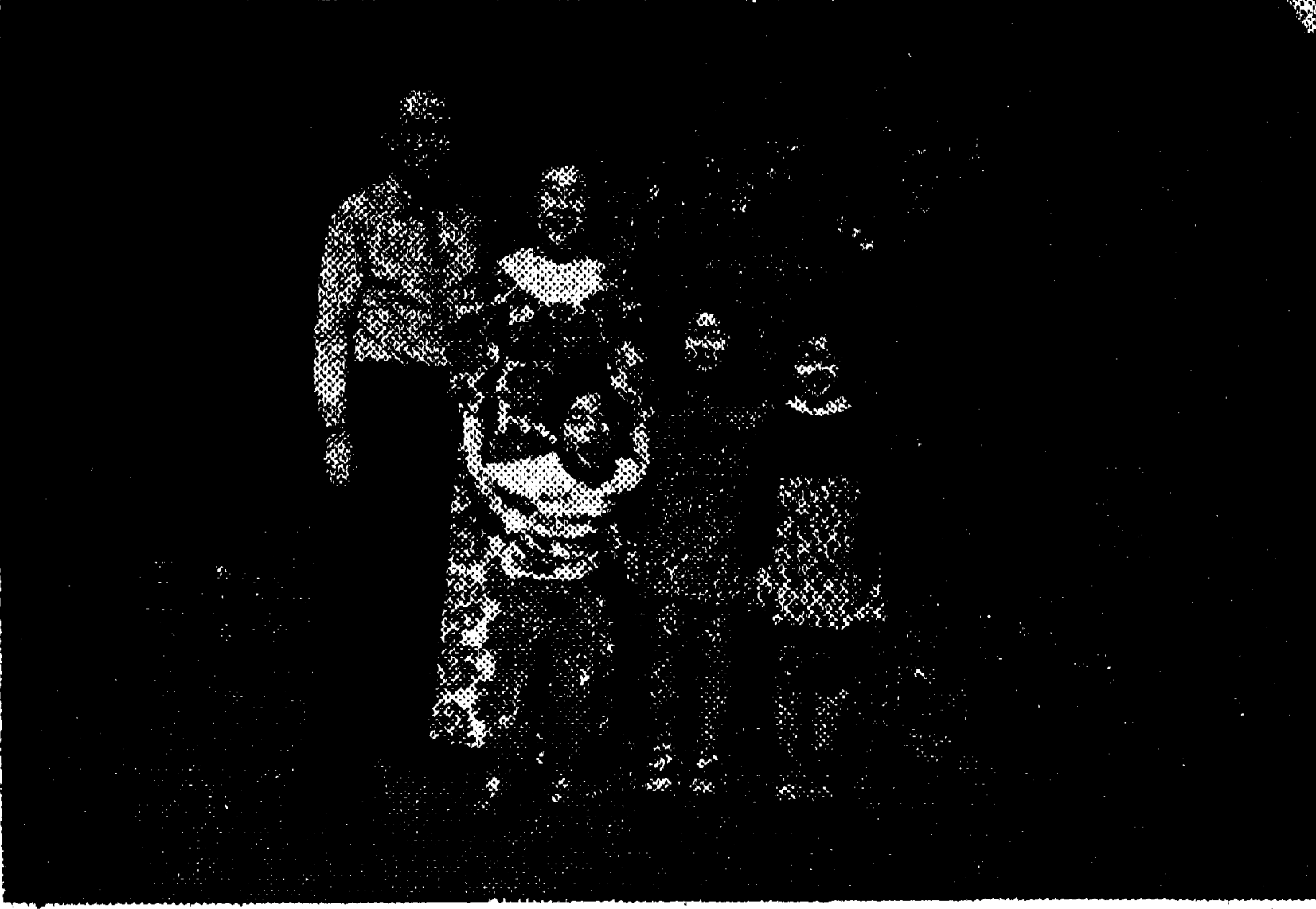
কাগজপত্র সই করে। এতে এ বিবাহের ছেলে-মেয়েদের বৈধ সন্তান মানা হয় এবং তারা পৈতৃক সম্পত্তি, পেনসান ইত্যাদির অংশীদার হয়। এই গোষ্ঠীতে অবৈধ সন্তান বলে কোন ছেলেমেয়ে নেই। সব ছেলেমেয়েই বৈধ, কারণ তাদের সকলের পিতৃপরিচয় রয়েছে।

আঠারো উনিশ বছর বয়সে আমেরিকান ছেলেমেয়েরা মা-বাবার কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বাস করছে। অনেকে এ বয়সে বিয়ে করে নিজ সংসারের দায়িত্ব নিচ্ছে। ফলে এদেশে স্কুলে কলেজে বিবাহিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। অল্পবয়সে বিবাহের যেমন তাগিদ, কয়েক বছর পর ডিভোর্স কোর্টে যাবার তাগিদও তেমনি প্রচুর। সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র জিরাল্ড ছুটি চাইল ডিভোর্সের জন্য কোর্টে যেতে বলে বলে। ওর বয়স মাত্র ২৪। পাঁচ বছর আগে আর্মিতে থাকা কালে বিয়ে করেছে। আর্মি থেকে বেরিয়ে জিরাল্ড পড়তে এসেছে পেনসিলভেনিয়ায়। স্ত্রী ন্যান্সী কালিফোর্নিয়াতে কাজ নিয়ে গেছে। গত দু-বছর ওদের দেখা-সাক্ষাৎ কচিৎ কদাচিৎ হয়েছে। অতএব দুজনে মিলে ঠিক করল বিবাহ-বিচ্ছেদ সমীচীন পথ। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়বে বই কমবে না। বর্তমানে প্রায় শতকরা পঞ্চাশটা বিবাহ বিচ্ছেদে পরিণতি পায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে দীর্ঘস্থায়ী বিবাহ প্রায় অসম্ভব পরিকল্পনা মনে হতে পারে। 'সারা জিন্দগী একজনের সঙ্গে কাটবে সেটা অভাবনীয়। আমার সারা জীবন একটা ছোট্ট গণ্ডীতে চিরকালের জন্য বাঁধা থাকবে তার গ্যারান্টি কি করে দিই?'—'সিভিল রাইটস' আন্দোলনের এক ব্ল্যাক আমেরিকান কর্মী বলে। 'বিয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা নিয়ে বলছি না, গভীর শ্রদ্ধা আছে বলেই বলতে পারছি'। তার মতে দীর্ঘস্থায়ী বিবাহিত জীবন হলিউড মুভির মত, অবাস্তব।

দ্রুত পরিবর্তনশীল টেকনলজি, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্প এবং অর্থনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এর প্রভাবে আমেরিকান পরিবারকে কয়েক বছর পর পরই কাজ বদলে বা নতুন কাজের দায়িত্ব নিয়ে অন্যত্র বদলী হয়ে যেতে হচ্ছে। এই ভ্রাম্যমান পরিস্থিতি আমেরিকান পরিবারকে পারমাণবিক পরিবারে রূপান্তরিত করেছে। পরিবার বলতে এখন শুধু বোঝায় স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের ছেলেমেয়ে। স্থায়িত্বহীন এই পারমাণবিক পরিবার নানা পরিবর্তনের সম্মুখীন। নানা সংঘাতের সূত্রপাত হচ্ছে তাদের জীবনে। ফলত বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৬২ সালে শতকরা পঁচিশটা বিবাহ বিচ্ছেদে পরিণতি পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে শতকরা প্রায় পঞ্চাশটা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। গত পাঁচ বছরে সেটা আরও বেড়েছে। নারী পুরুষের বিবাহিত সম্পর্ক ভঙ্গুর এবং অস্থায়ী। বিবাহ বা সম্পর্ক বাঁকে বাঁকে নৌকো থামানোর মত হয়েছে। এরা প্রায়ই পূর্ব স্বামী বা পূর্ব স্ত্রীর কথা বলে। স্থায়ী বিবাহে স্বামী-স্ত্রী সুখ সন্তোষ এবং সমন্বিত আত্মবিস্তৃতির অভিজ্ঞতা লাভ করে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার দিকে তাকিয়ে খ্যাতনামা সমাজতত্ত্ববিদ মার্গারেট মীড বলেছেন আগামী দিনগুলোতে 'সিরিয়েল ম্যারেজ' প্রচলিত হবে। তাঁর মতে প্রথম দু-একটি বিবাহ ট্রায়াল ম্যারেজ বা প্রস্তুতি বিবাহ বলে স্বীকৃত হবে। দু-তিনবার বিবাহ বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা স্থায়ী বিবাহের পথ করে দেবে। মারগারেট মীডের মতে বিয়ে না করে সহবাস করা শুধু বাস্তব ঘটনা নয়, সম্ভবত এটিই বিবাহ বিচ্ছেদ রোধ করার একমাত্র বাঞ্ছনীয় পথ।

বিয়ে না করে সহবাস রীতি সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত এখনও হয়নি। গ্রামাঞ্চলে এবং কোন কোন স্টেটে বিয়ে না করে সহবাস নানা বাধা-বিগ্রহের সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সহবাস ছেলে-মেয়ে ও মা-বাবার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাচ্ছে। অনেকে এ প্রথাকে নীচু দৃষ্টিতে দেখে। কার্টার সরকারের এনার্জি ডিপার্টমেন্টের উকিল শ্রীমতী বনি কর্ড তাঁর বন্ধু জেফরী অনুর সঙ্গে সহবাস করেন। এ-খবর কারও অজ্ঞাত নেই। ভার্জিনিয়ার জর্জটাউনের জজসাহেব এর অজুহাতে তাঁকে সুচরিত্রের সার্টিফিকেট দিতে অসম্মত হলেন। ফলে শ্রীমতী কর্ড ভার্জিনিয়ার আইন পরীক্ষার অনুমতি পাননি। ব্যাপারটা সুপ্রীম কোর্টে যায়। ভার্জিনিয়া স্টেট সুপ্রীম কোর্ট শ্রীমতী কর্ডের পক্ষে রায় দিয়েছে। সহবাসের সঙ্গে ওকালতির কি সম্পর্ক—প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রীম কোর্ট। শ্রীমতী কর্ডের আইনবিদ্যার দক্ষতা সম্বন্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ নেই।

এদিকে নিউজার্সির এলিজাবেথ শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। সেখানকার কাউন্সিল ১৩ বছরের ছেলেমেয়েকে যৌনাসঙ্গে 'কনসেন্টিং পার্টি" হিসাবে মানবে বলে ঠিক করেছে। মা-বাবারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেছে। তাঁদের মতে ১৩ বছরের ছেলেমেয়ে যৌনাসঙ্গের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়। মুখ্যত অল্প বয়সে মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া বিপদজনক বলে। অনেক ক্ষেত্রে নানা সাবধানবাণী সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েরা যৌনাসঙ্গে লিপ্ত হয়। তার ফলশ্রুতি সন্তান সম্ভাবনা। অসামাজিক ব্যবহার এবং স্বাভাবিক দেহাকর্ষণ দুটির মধ্যে সীমারেখা টানা দুঃসাধ্য হয়েছে। আমেরিকার সমাজে তাই যৌনাচরণ এবং বিবাহ ব্যাপারে নানা পরিবর্তন হতে সুরু করেছে। ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের সন্তান সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই সন্তানদের বৈধ কি অবৈধ বিচার করা হবে তার বিতর্ক চলছে। বহু ক্ষেত্রে বিবাহপূর্ব সন্তানকে সমাজ বৈধ মানতে বাধ্য হচ্ছে। হচ্ছে।

আমেরিকাতে সঙ্গসখ্যতা এবং সহবাস বাড়ছে সত্য। কিন্তু তাই বলে বিবাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়নি। এখনও অধিকাংশ লোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রতি বিবাহে স্বামী-স্ত্রী প্রতিশ্রুতি নেয়—যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মমঃ। কিছুদিন পর এই প্রতিশ্রুতি ব্যাহত হলে স্বামী-স্ত্রী এ সম্পর্ককে আঁকড়ে না থেকে পরস্পরকে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা নানা বাধা সৃষ্টি করে মুক্তি দেয়। তারপর আবার নতুন করে জীবন সুরু করে। তাদের ছেলেমেয়েরা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলশ্রুতি ভোগ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়। 'জীবনটা সামনে। পেছনের দিকে তাকিয়ে দুঃখ শোক করে আজকের জীবনটাকে অসুখী করি কেন! এতে না অতীত, না ভবিষ্যতের ফয়সালা হবে। অতএব এগিয়ে যাই। যা থাকে কপালে!'—অল্প বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক সকলের মুখে এই বুলি। তারপর কপালটা চড়চড় করে। মনটা ফাঁকা, সঙ্গও নেই, সুখ বিস্মৃত। যতদিন জীবনে আবার সাময়িক স্থিতি না আসে ততদিন অতৃপ্তি। অথচ বিবাহ মাধ্যমে চিরন্তন সম্পর্কের স্বপ্ন ফিরিয়ে আনা দুষ্কর, অবাস্তব এবং আমেরিকার বর্তমান সমাজে অসম্ভব!

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ধূপকাঠি জেলে দিলেই সে আবার ভাল হয়ে যায়। মনের সব ধন্দ ঘুচে যায়। নাক টেনেও তখন আর কোন গন্ধ পায় না। আজ অফিসে গন্ধটা পাবার পরই সে খুব বিচলিত বোধ করছিল। ফেরার পথে এক ডজন ধূপকাঠি কিনেছে। গাড়িতে প্রেতাত্মার গন্ধটা ভুর ভুর করছিল। চোখ লাল হয়ে উঠছিল। পারলে গাড়িতেই যেন সে ধূপকাঠি জ্বালাত। কিন্তু এতে কুম্ভবাবু মাথায় গোলমাল আছে ভাবতে পারেন। সে-জন্য ধূপকাঠি নাকের কাছে নিয়ে বসেছিল। আর কখন গন্ধটা নিজ থেকেই উবে গেল। এমন ত হয় না। কখন হল এটা রাজার দেউড়িতে আসতেই সেই রহস্যময়ী নারী—সে কে? সে এখন রাজার ঘরণী আগে কি ছিল, কোথায় ছিল—তখনই গন্ধটা বুঝি ভয়ে ফুস করে উড়ে গেছে।

কুম্ভবাবু বলল, কি ভাবছেন! গল্পের প্লট।

—না, না।

—বৌদিকে ফেলে এসে মন খারাপ।

অতীশ হাসল। বলল, তা বলতে পারেন। রমণীরা ভারি তুকতাক জানে, কোথাকার কে, অথচ দেখুন কেমন মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসে গেল। তাকে ফেলে এক-পা নড়া যায় না। কোথাও গেলেই মন কেমন করে।

—ভাববেন না। কোয়ার্টার পেয়ে যাচ্ছেন। শুনছি তো অন্দরের প্রুফেই আপনার কোয়ার্টার দেওয়া হবে।

অতীশের বুকটা ছাঁত করে উঠল। ওদিকটাত খুবই রেসট্রিকটেড জোন। নির্দিষ্ট কিছু আমলা যেতে পারে। বয়-বাবুর্চিরা যেতে পারে। [illegible] পুরনো পাইক বরকন্দাজ যেতে পারে—যারা গতকাল তার সঙ্গে দেখা করে গেছে তারাই রাজবাড়ির সব হালচাল বলে গেছে। ভুলেও ওদিকটা মাড়াবেন না। কৈফিয়ৎ তলব হবে। খাস খানসামার খুব লাগানো ভাঙ্গানোর স্বভাব।

এ-বাড়ির কিছু কিছু গোপন খবর খুব সহজেই চাউর হয়ে যায়। কিছু কিছু গোপন খবর দু-একজনের কানে আসে, আর অতি গোপন খবর কেউ জানতে পারে না। কুমার বাহাদুর বৌরাণী আর নির্দিষ্ট আমলা শুধু জানে। কুম্ভ কিছু কিছু গোপন খবর পায়। রাধিকাবাবু পুত্রদের কন্যাদের এই গোপন উৎসের মুখ খুলে দিয়ে প্রমাণ করেন, রাজার তিনি কত বিশ্বস্ত লোক। কুম্ভ বড় হয়ে এটা টের পেয়েছে। কুমার বাহাদুর বলেছেন, অতীশকে ভাল দেখে একটা কোয়ার্টার দিন। ওর যাতে কোন অসুবিধা না হয় দেখুন।

বিকেলে ফিরেই কুম্ভ সব শুনেছে। শুনেই সে ক্ষেপে গিয়েছিল। আসতে না আসতেই কোয়ার্টার। আমরা ভেসে এসেছি। তবে তার বাবা রাধিকাবাবু, সে ভাবতে গর্ব বোধ করে। সে বলল, বাবাই কুমার বাহাদুরের কাছে কথাটা তুললেন। অতীশের খুব অসুবিধা হচ্ছে। একা থাকে কোথায়, খায় কি, কে দেখে? মেসে খেলে অজীর্ণ রোগে ভুগে মারা পড়বে ছেলেটা।

অতীশ শুনে যাচ্ছিল।

কুম্ভ বলল, বাবা আপনার খুব সুখ্যাতি করেছেন কুমার বাহাদুরের কাছে।

অতীশ বলল, আগেকার দিনের মানুষদেরই এই স্বভাব। খুঁটিয়ে দেখে না। ভাল লাগলেই ভাল বলে ফেলে। আমার বাবাকেও দেখেছি এরকমের।

কুম্ভ বলল, বাবাই কুমারবাহাদুরকে কোয়ার্টারের কথা বললেন। কিন্তু এরা একদম পিচাশ জানেন। থাকলেও দেবে না। কুমারবাহাদুর বলল, কোয়ার্টার কোথায়! ফাঁকা তো একটাও নেই। কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে কেন? বললেন, সোজাসুজি বললেন দেখুন কুমারবাহাদুর কাজ ভাল চাইলে তাকে সুযোগ-সুবিধা দিতেই হবে। সারাদিন কাজের পর যদি নিজের পরিজন নিয়ে একটু থাকার জায়গা না পায় তো মন দিয়ে কাজ করবে কেন!

অতীশ এবার প্রশ্ন না করে পারল না। রাজেনদা কি বললেন?

—এরা কিছু বলতে চায় দাদা! এদের মুখ থেকে কথা খসিয়ে নিতে হয়। বাবা ঠিক খসিয়ে নিয়েছেন। নিখিবাবুর কোয়া-র্টার ফাঁকা।

—নিখিবাবুটা কে?

—নিউবেঙ্গল টাইপ ফাউন্ড্রির ম্যানেজার। রিটায়ার করেছেন মাস দুই হল। কুমার বাহাদুরের বাবার আমলের লোক। [illegible] চোখে দেখতে পান না। আশির কাছাকাছি বয়েস। রাজার খুব বন্ধুলোক ছিলেন।

কুম্ভকে এখন অন্যরকম লাগছে। এরা তার ভাল চায়।

কুম্ভর বাবার প্রতি অতীশের মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। আসলে বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল বলেই হয়ত তাকে খুব স্নেহ করছেন। সে রাতে খাবে না বলায়ও কষ্ট পেয়েছেন। আগেকার আমলের মানুষ বলেই এটা হয়। আজকাল মানুষের মধ্যে এসব গুণ একেবারেই নেই। অতীশের বলার ইচ্ছা হল, আপনার বাবার এ ঋণ শোধ করতে পারব না। কি বলে এখন সে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে তার বাবাকে! কিন্তু তার আছে আশ্চর্য এক স্বভাব, সে কিছুতেই খুব বিগলিত হয়ে যেতে পারে না। কখনই সে সব ভেতরের কথা প্রকাশ করতে পারে না। সংকোচে পড়ে যায়। সে তখন আবার চুপচাপ বসে থাকে।

কুম্ভ বলল, কোয়ার্টার পেলে খাওয়া-বেন। কত বড় খবর। রাজার খুব নিজের লোক না হলে এখানে কোয়ার্টার মেলে না। আপনি আসতে না আসতেই তার নিজের লোক হয়ে গেলেন। ঈর্ষা হয়।

তারপর কুম্ভ উঠে যাবার সময় বলল, কি খেলা দেখছেন ত!

অতীশ হেসে বলল, কাল থাক। আর একদিন যাওয়া যাবে।

কুম্ভ উঠে যাবার সময় ভাবল, বড়ই নীরস লোক। খেলাতে পর্যন্ত উৎসাহ নেই। কি ভাবে লোকটা সবসময়। এত আনমনা থাকে কেন। কিছু একটা রহস্য আছে। জাহাজে কাজ করত। স্বভাব-চরিত্র ভাল থাকার কথা না। মেয়েমানুষ ঘাটা-ঘাটি করতে গিয়ে বড় রকমের অসুখ বাধিয়েছে। ফুটে বের হলে টের পাওয়া যাবে। এবং সে বের হবার মুখে, যাতে ক্ষত ফুটে বের হয়, সেই প্রার্থনাই করল ভগবানের কাছে। তার কথা ছিল, শিট অ্যান্ড মেটাল প্রিন্টিং পাবলিক লিমিটেডের ম্যানেজার হবার। কিন্তু এত করেও রাজার বিশ্বাস অর্জন করতে পারল না। মনে মনে ভারি আফশোষ। কোথা থেকে উটকো লোক রাজা যে ধরে আনল।

সিঁড়ি ভাঙ্গতে গিয়ে কুম্ভর মাথা গরম হয়ে গেল। যত নামছে, তত গরম হচ্ছে মাথা—সে শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। কি না করেছে সে, আগের ম্যানেজারের বাড়ির ছবি তুলে এনে দেখিয়েছে, দেখুন টাকা আপনার কোথায় যায়! কাস্টমারদের ধরে নিয়ে গিয়ে বলেছে, কি পারশেন্টেজে কাজ হয় দেখুন। যতটা ঘটেছিল তার চেয়ে বেশি বানিয়ে বানিয়ে সে প্রথম তার বাবা ওরফে রাধিকাবাবুর মারফত রাজার কান ভারি করেছে। বলেছে, এটা আপনার গোল্ড মাইন্ড। নজর দিন। আপনার পূর্ব-পুরুষের স্বার্থ রক্ষা করুন। চার বছরে অক্লান্ত খেটে সে কোম্পানীর খুঁটিনাটি বিষয় রপ্ত করেছে। প্রিন্টিং থেকে কৌটো-

কেশনে, কোথাও এতটুকু খুঁত থাকলে ধরতে পারে, শোধরাতে পারে। একাউন্টস তার নখদর্পণে। সেলট্যাক্স, ইনকাম-ট্যাক্স সে নিজে করতে পারে। ক্যাশ, লেজার, ব্যালেন্সশীট তার কাছে এখন জলের মত। এক আশাতেই সে এতদূর দৌড়ে গেছে। এখন কি না এই হারামজাদা বুদ্ধু লোকটা তার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে। গত রাতে পৃথিবীতে সেও আর এক মানুষ যে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে। এসে গেছে শুনেই তার হৃৎপিণ্ডে কে যেন আগুন নিক্ষেপ করেছিল। সে স্থির থাকতে পারে নি। ছটফট করেছে সারারাত। সকালের দিকে ঘুম চোখে লেগে এসেছিল। ঘুম ভাঙ্গলে দেখেছিল, হাসিরাণী ঘরে নেই। কাবুলকে দেখার জন্য ঠিক জানালায় পালিয়ে গেছে। তাকে বল বাবু, আমি তোমাকে ক্ষমা করব কেন। তুমি যত ভাল-মানুষই হও, আমি তোমাকে নরকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব। আমি তো মানুষ।

।।ছয়।।

সুরেন জানালায় উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে গেছে। আটটা বেজে গেছে কখন, এখনও ঘুমাচ্ছে। সাদা চাদরে ঢাকা শরীর। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। ফুল স্পিডে পাখা চলছে। সাদা সাদা ছাই উড়ছে ঘর-ভর্তি। রোদ এসে পড়েছে জানালায়। জানালার একটা পাট সামান্য খোলা, সে উঁকি দেবার সময় পাটটা ঠেলে দিল। দরজা বন্ধ দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেছিল—তিনি কি ভেতরে নেই! দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে ভেবেছিল, ভেতরেই আছেন। এত বেলায় দরজা বন্ধ করে কি করছেন। কিন্তু তার শিরে শমন। অন্দরে ডাক পড়েছে। সে বৌরাণীর মেজাজ জানে। এক্ষুণি ডেকে নিয়ে না গেলে, তার বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব হবে। দরজা বন্ধ যখন জানালায় উঁকি দেওয়া যাক—কিন্তু যদি মানুষটার জপ-তপের অভ্যাস থাকে—তা ভঙ্গ হলে ক্ষেপে যেতে পারেন। তবু খুব সাহস করে জানালায় উঁকি দিতেই অবাক। আবছা মত একটা ছায়ামূর্তি বিছানায় পড়ে আছে। জানালা ঠেলে দিতেই স্পষ্ট দেখল, তিনি চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। হাওয়ায় চুল ঝড়ের মতো উথাল-পাতাল হচ্ছে। তিনি ঘুমাচ্ছেন। তারপরই কেমন শংকায় বুক কেঁপে গেল। এভাবে মানুষ ঘুমায় না। মরেটরে যায়নি তো। আজকাল আকছার এই শহরে কত রকমের অপমৃত্যু ঘটছে। কাল বিকেলে একটা লাস পাওয়া গেছে, আবার কি আজ সকালে আর একটা লাস বের করা হবে। প্রায় তার পা ঠক ঠক করে কাঁপছিল। তখনই সে চিৎকার করে উঠল : অ নতুন-বাবু, নতুনবাবু অন্দরে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

অতীশ অনেক দূরে থেকে যেন শুনতে পাচ্ছে তখনও, ও ছোটবাবু, ছোটবাবু, আর কতদূর। আমরা আর ডাঙ্গা পাব না? দুদিন হয়ে গেল!

দরজায় খুট খুট শব্দ, তারপর সজোরে কেউ দরজায় ধাক্কা মারতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল, জানালায় সুরেন। আরও কেউ কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। মানসদা, সেই ছেলেটা, আরও দু-একজন। মানসদা চটেই গেলেন, তুমি কি মানুষ না। এত বেলায় লোকে ঘুমোয়! তোমার চোখ-মুখ ভাল না বাপু। তোমাকে বিশ্বাস নেই।

অতীশ খুব লজ্জায় পড়ে গেছে। এত বেলা হয়েছে সে টের পায়নি। সারারাত সে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। সে সারারাত হিজিবিজি সব স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখলে তার ভাল ঘুম হয় না। সকালে কেমন অবসাদ লাগে। সে একবার সকালে জেগেছিল, তারপর অবসাদ বোধ করতেই আর একটু গড়াগড়ি দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত বেলা হয়ে গেছে সে ঘুণাক্ষরে টের পায়নি।

সে দরজা খুলতেই সুরেন ওকে সেলাম দিল। এ-বাড়িতে এ-সব রেওয়াজ এখনও চালু আছে। সে তো খুব বড় কাজ করে না এদের। মাঝারি সাইজের কর্তা-ব্যক্তি। তার আর কুমার বাহাদুরের মাঝ-খানে একজন বুড়ো মতো অফিসার আছেন। কারখানার সাধারণ সমস্যা সংক্রান্ত কথাবার্তা সব তারই সঙ্গে সারতে হবে বলে কুম্ভবাবু জানিয়েছে। এখন সুরেনের কথা বার্তা শুনে সে একটু চমকে গেল। তার অন্দরে ডাক পড়েছে। কে ডাকছে, কেন ডাকছে এত সব প্রশ্ন করার ক্ষমতা তার নেই। বোধ হয় সুরেনেরও বলার কথা নয়। সে তাড়াতাড়ি কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। বিছানার চাদর ঠিকঠাক করতে গিয়ে দেখল, মানসদা তার দিকে সংশয়ের চোখে তাকিয়ে আছেন। সে বলল, কি হল মানসদা।

—তোমার সাহস দেখছি। তুমি যেন গ্রাহ্যই করছ না।

—হাতমুখ না ধুয়ে যাই কি করে।

—তাড়াতাড়ি কর। এই সুরেন বেটা দালাল, বলগে যা, যাচ্ছে। এক্ষুণি ঘুম থেকে উঠল।

অতীশ মুখে পেস্ট নিয়ে বলল, আমাকে ডাকছে কেন সুরেন?

—বাবু আমরা নফর মানুষ। অত জানলে এখানে আমাদের রাখবে কেন বলুন।

মানসদা জয়ন্ত বিছানায় বসে পড়েছে ততক্ষণে। জয়ন্ত ঘরটা দেখছে। অজস্র পোড়া ধূপকাঠি ছড়ানো ছিটানো। ঘরটা নোংরা হয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে সে নিজের ঘরেও সুগন্ধ আতরের মতো কিছুর গন্ধ পেয়েছে। একবার সে বিছানা ছেড়ে উঠবে ভেবেছিল—গন্ধটা কোত্থেকে আসছে। এ-বাড়িতে এখানে সেখানে দুর্গন্ধ উঠছে কবে থেকে, সুগন্ধ থাকার ত কথা নয়। এখন বুঝতে পারছে এটা অতীশবাবুরই কাণ্ড। শোবার সময় গুচ্ছ গুচ্ছ ধূপকাঠি শিয়রে জ্বালিয়ে রাখে। সে মানসদার দিকে তাকিয়ে বলল, প্রায় আপনার জুড়িদার।

মানসদা কিঞ্চিত বিরক্ত হলেন। তার ঘরে মাঝে মাঝে তালা মেরে যায় কেউ। সে এত ভাল থাকার চেষ্টা করে, কারো কোন অপকার করে না, কেবল মাঝে মাঝে তার কি হয়—সে চিৎকার করতে থাকে—ও কি গন্ধ! পচা টাকার গন্ধ! ঘরে ঘরে সে তখন ছুটে বেড়ায়।

—তোমরা পচা টাকার গন্ধ পাচ্ছ না। অহ কি গন্ধ! [illegible] যাচ্ছে না। কোত্থেকে আসছে গন্ধটা। পুলিশে খবর দাও। সব অসুখে পড়ে যাবে। মহামারী শুরু হয়ে যাবে।

অতীশ বাথরুমে বলে জয়ন্তর কথা শুনতে পায় নি। সে এসে দেখল, তখনও সুরেন দাঁড়িয়ে আছে। অতীশ মুখ মুছে বলল, তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

—চিনবেন না বাবু।

আসলে সুরেন সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে। সে ভাবল, এমন কি করেছে, যার জন্য তার অন্দরে ডাক পড়েছে। এটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকছে। এরা বনেদী জমিদার বংশ। এখনও যা আছে, যেমন ধরা যাক কলকাতার ওপর ত্রিশ-বত্রিশ বিঘে নিয়ে এই বাড়ি, কাঠাপিছু দাম কুড়ি হাজার টাকা করে হলে, কি দাম হয় এবং কলকাতায় এমন আছে অনেক অট্টালিকা, দেশে বিশাল দেবোত্তর সম্পত্তি এবং শহরের কিছু এলাকা এখনও ইজারা নেওয়া আছে। সবই উড়ো খবরের মতো তার কানে এসে ঢুকেছে। বাইরে থেকে এদের বৈভব এখন ঠিক বোঝা যায় না। ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায়, বৈভবের অন্ত নেই। অন্দরের নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করা যায় না। পর্দা ঢাকা গাড়ির চল সেদিনও ছিল নাকি। এ-বাড়ির রাজকন্যাদের মুখ, বৌরাণীদের মুখ কেউ দেখেছে কখনও এককালে বিশ্বস্ত আমলরাও বলতে পারত না। এখন অবশ্য এতটা বোধহয় বেড়াজাল নেই। অতীশ জামা প্যান্ট পরতে পরতে বলল, মানসদা কেন যে ডাকছে, বুঝছি না।

মানসদা পরেছেন পাজামা পাঞ্জাবী। তার চা এসেছে। তিনি বললেন, চাটা দু' ভাগ করে দাও। অতীশ একটু চা পেয়ে খুব বিগলিত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চা খেতে খেতে বলল, মানসদা বসুন, আমি ঘুরে আসছি। সে এটাচি খুলে একটা পাট ভাঙ্গা রুমাল পকেটে গুঁজে নিল। তখন মানসদা বলল, ঘাবড়ে যাচ্ছ খুব দেখছি। মাথার চুলটা আঁচড়ে নাও। এত স্বাভাবিক এবং ভাল মানুষ মানসদা, তার ঘরে তালা ঝোলে কেন! মানসদার চোখ নীলচে রঙের। উজ্জ্বল। এতটুকু অস্বাভাবিকতা নেই চোখে মুখে। এ-মুহূর্তে মানসদাকে তার পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে হচ্ছে। এই মানুষটি সম্পর্কে কুম্ভও কোন খবর দেয় নি। কুম্ভ রাজবাড়ির এত খবর রাখে, অথচ এই মানুষটি সম্পর্কে গতকাল প্রায়

নীরবই ছিল। সে বের হবার মুখে মানসদা বলল, আমি ঘরে তালা দিয়ে দিচ্ছি। এসে চাবিটা নিয়ে নিও।

অতীশ সিঁড়িতে নামতে নামতেই হাত তুলে দিল। সিঁড়ির মুখে ছোট্ট লন, কাঁটা তারের বেড়া। মাঝে ছোট্ট গেট। ওপরে মাধবী লতার ঝাড়। এখানটায় সে লম্বা বলে মাথা নুয়ে ঢুকল। লন পার হয়ে লম্বা বারান্দা। বারান্দার ওপর বড় বড় সেকালের পেল্লাই দরজা। বার্মা টিকের। ঐ কোন দরজা দিয়ে সামনের মারবেল মেঝে দেখা যায়। সুরেন একটা দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। অতীশকে বলল, আজ্ঞে এখানে বসুন। শঙ্খ এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

সেই বড় বসার ঘরটা। মাঝখানে কার্পেট পাতা। সোফা নেই। কোণায় কোণায় বসার জন্য আলাদা ডিভান। এই ঘরটা এত বড় যে ও-পাশে একটা লোক বসে ন্যাতা মারছে প্রথম সে টেরই পায় নি। দু'দিন ধরে যতবার সে এই প্রাসাদে ঢুকেছে, লোকটাকে দেখেছে, জল আর ঝাড়ন নিয়ে ঘরদোর সাফ করে যাচ্ছে। এ-প্রাসাদে লোকটা বুঝি সারাদিন এই একটা কাজই করে। হাবাগোবা মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে ছেড়া খাঁকি হাফ-প্যান্ট, শতছিন্ন গেঞ্জি গায়। অতীশ ঘরে কেমন একটা বিদেশী আতরের গন্ধ পাচ্ছে। সকালেই বোধহয় এই প্রাসাদের নিয়ম, সারা ঘরে দামী আতর স্প্রে করে দেওয়া। বাইরে থেকে গন্ধটা পাওয়া যায় না। যত ভিতরে ঢোকা যায় গন্ধটা তত প্রবল হয়।

ঘড়িতে দেখল, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ঘরের দেয়ালে টেবিলে, সব রকমারি ঘড়ি, কোনটা সাড়ে আটটা বাজায় বেহালার ছড় টেনে দিল, কোনটার শব্দ কাচের বলের মতো গড়িয়ে গেল—কোনটা এক জলতরঙ্গ আওয়াজ তুলে নিথর হয়ে গেল। বিচিত্র এক শব্দ ধ্বনির মধ্যে দেখল রাধিকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছেন। নধর-বাবু, এবং অফিসের সেই বুড়ো বড় কর্তা, গায়ে পুরো ছাই রঙের সুট, চোখে ভারি চশমা, পেছনে কেউ আসছে একটা ফাইলের পাহাড় নিয়ে। অতীশকে অসময়ে এখানে বসে থাকতে দেখে রাধিকাবাবু কিঞ্চিৎ সংশয়ে পড়ে গেল। বলল, তুমি এখানে ভাই! কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবে?

অতীশ উঠে দাঁড়াল। বলল, না।

অতীশের কথা শোনার সময় নেই রাধিকাবাবুর। তিনি চলে যাচ্ছেন। অতীশ বোকার মতো কিছুটা তার সঙ্গে হেঁটে গেল। আবার যদি কিছু প্রশ্নটশ্ন করে সেই আশায়—কিন্তু রাধিকাবাবু সোজা বিলিয়ার্ড টেবিলের ধার ঘেঁষে দ্রুত হেঁটে চলে গেল। এবং সে দেখল অফিসার, কেরানী, পিয়নের একটা পল্টন লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে যাবে বলে, তারা দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরের দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে নির্দেশ না এলে কেউ ঢুকতে পারছে না। অতীশ এটা দেখার পরই ভাবল, সে জায়গায় বসে নেই। শঙ্খ এসে যদি দেখতে পায় সে নেই, তবে খবর দেবে, কোথায়, কেউ নেই ত! তবে একটা কেলেঙ্কারী হবে। সোজা সে জন্য সে আবার সুরেন তাকে যেখানে বসতে বলে গেছে, সেখানে অসহায় যুবকের মতো বসে পড়ল। পাশে কুম্ভবাবু থাকলেও যেন এ-মুহূর্তে সাহস পাওয়া যেত।

সেই লোকটার কিন্তু কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে জল ঝাড়ন নিয়ে বিশাল কক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ন্যাতা মেরেই চলেছে। এ-ঘরটা হয়ে গেলে পাশের ঘরে। ওটা হলে তার পাশের ঘরে। সকাল থেকে সে এই কাজটা কত মনোযোগ দিয়ে করে যাচ্ছে। তখনই সাদা ধবধবে উর্দি পরা একজন হাফ যুবক তাকে সেলাম দিল। —আসুন সাব। বলে সে তাকে বিশাল কক্ষের একটার পর একটা পার করে নিয়ে যেতে থাকল। এবং শেষে দেখল, সব রেশমি সুতায় কারুকাজ করা সাদা চাদরে ঢাকা এক আশ্চর্য বিলাস কক্ষ। মেহগিনি কাঠের দেয়াল। এয়ার কন্ডিসানড ঘর। দু' পাশের দরজা ভারি কাঁচের। সিল্কের দামী পর্দা ঝুলছে। কারুকাজ করা কাচের জানালায় দুটো পাখি বসে। দেয়ালে রাজপুরুষদের সব আবক্ষ মূর্তি। মাথায় পাগড়ি, এবং দামী বৈদুর্যমনী পাথর-টাথরের মালা গলায়। দেয়ালে ছ'-সাতজন রাজপুরুষ কোমরে তরবারি, নাগরাই জুতো পায়ে। বংশ পরম্পরায় এক একজন এসে এই দেয়ালে দাঁড়িয়ে গেছেন। রাজেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী ওরফে রাজেনদার ছবিটা সে আবিষ্কার করল, উত্তরের দেয়ালে। পরিচিত মানুষটাকে এই পোশাকে দেখে সে কেন জানি ফিক করে হেসে ফেলল। তারপরই মনে হল, ঘরে কেউ নেই ত! কোন গুপ্ত পথে তাকে কেউ দেখছে না ত! সে খুব সতর্ক হয়ে গেল। শঙ্খ ওকে বসতে বলে গেছে। কেন বসতে বলে গেছে, কে আসবে এ ঘরে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আশেপাশে কোন কাক-পক্ষি আছে বলে টের পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু সেই দামী আতরের গন্ধটা এখানেও ভুর ভুর করছে। গতকাল সে বৌরাণীকে এক পলক দেখেছিল—বড় চেনা, বড় অন্তর্গত সেই ছবি—কিন্তু সারারাত ধূপকাঠি পুড়িয়েও তাকে আবিষ্কার করতে পারে নি।

মনে পড়ছে, একবার এমনি দৈব-দুর্বিপাকের মতো স্যালি হিগিনসের কেবিনে তার ডাক পড়েছিল। সে সেখানে এমনি এক সংশয় নিয়ে গেছিল। বুক কাঁপছিল। এখানেও তাই। কোন অবিশ্বাস্য ঘটনা জীবনে ঘটে গেলে তার এই রকমের হয়। মুখে ভীতু বালকের ছাপ ফুটে ওঠে। সোফাগুলোর কাভার সব দামী ভেলভেট কাপড়ের। কার্পেটে বাঘ সিংহের লাল নীল মুখ আঁকা। মাথা সমান উঁচু আয়না। কাচের বড় জারে শ্বেত পাথরের দুটো নগ্ন নারী মূর্তি। পরস্পর জড়িয়ে আছে। এমন একটা কক্ষে তার সঙ্গে এখন কে দেখা করতে আসছে!

তখনই মনে হল খুব মৃদু পায়ের শব্দ। কেউ আসছে। তার উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এমন এক বনেদি
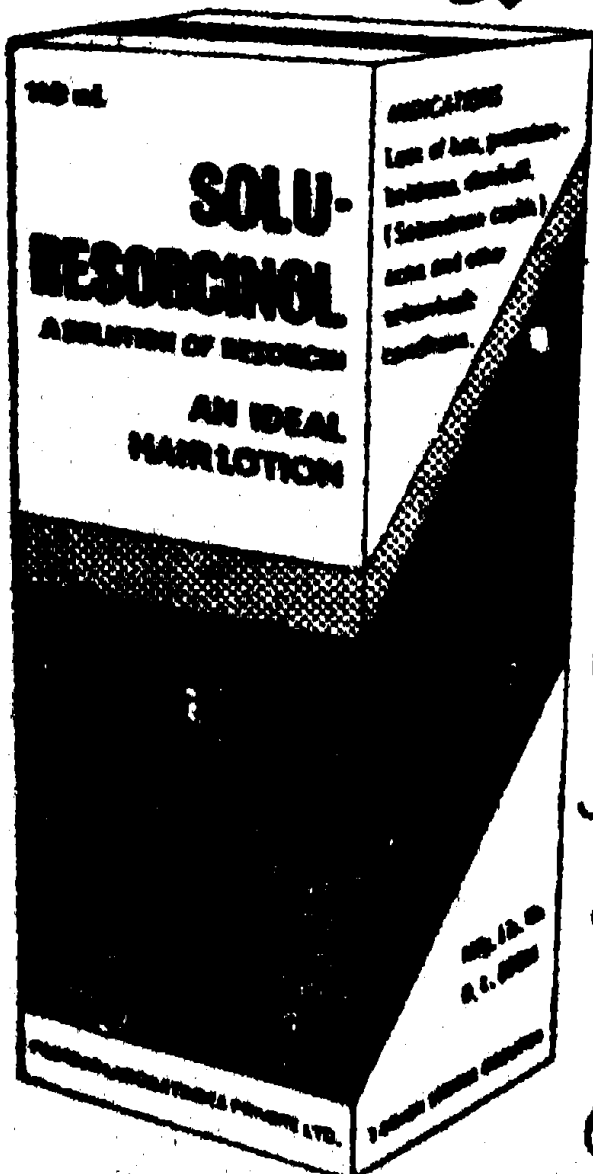
পরিবারে সে এই ঘরে এসে বসতে পেরেছে—তার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সে ঠিক বুঝতে পারছে না। পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। খুব নরম চটি পরে কেউ আসছে। তারপরই সে দেখতে পেল, প্রায় যাদু মন্ত্রে বিপরীত দিকের দরজার পর্দা সরে যাচ্ছে। এবং প্রায় আবির্ভাবের মতো এক যুবতী নারী তার সামনে হাজির। লাল পেড়ে সাদা সিল্ক, হাতে ঢাকাই শাঁখা, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ এবং চোখে অনেক দূর অতীতের স্মৃতি। তার দিকে অপলক তাকিয়ে বলছে, তুই কি রে, তুই চিঠির জবাবটাও দিলি না। এমন অমানুষ তুই।

অতীশ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। এবং ক্রমে কেমন জলের অতলে ডুবে যাচ্ছিল। কি বলবে, কিভাবে অভিবাদন করবে এবং সহজ স্বাভাবিক হতে গেলে তার এখন কি করণীয় কিছুই বুঝতে পারছে না। সে নির্বাক হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—চিঠি, কিসের চিঠি। রমণী তার কবে দেখা এক যুবতী যেন। সে কিছুতেই কাল রাতে মনে করতে পারে নি। সে এটা শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে গেল!

—কি রে তুই আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন। এতটুকু দেখছি স্বভাব পাল্টায় নি তোর। সেই আগের মতো দশটা কথা না বললে কথার উত্তর দিস না।

এবার আর না পেরে অতীশ বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না বৌরাণী! আমার কিছু মনে পড়ছে না।

—তুই আসলে নিজেকে ছাড়া আর কিছু চিনলি না। খুব স্বার্থপর তুই। না হলে ভুলে যায় কেউ!

আর তখনই অতীশের মাথার মধ্যে ড্যাং ড্যাং করে পূজার বাজনা বাজতে থাকল। ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে, কাসি বাজছে ট্যাং ট্যাং। সবুজ ঘাস খাচ্ছে একটা মোষ। মোষটাকে কারা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে পূজা মন্ডপে। নতুন গামছা কোমরে পেঁচিয়ে ছোটাছুটি করছে কারা। ধূপ দীপ জ্বলছে। মোষ বলির রক্ত নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে কারা। কে ছুটে এসে ওর কপালে সেই রক্তের ফোঁটা দিয়ে গেল। সে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। সেই মুখ, সেই মুখ সেই সেই—সে কেমন মুহ্যমানের মতো বলল, তুমি কমল!

—কমল কি রে? কমল পিসি বল।

অতীশ মাথা নিচু করে বলল, আমি জানতাম না, তুমি এ-বাড়ির বৌরানী কমল!

—কে জানত! আমি জানতাম। কত নতুন ম্যানেজার আসে। আমি জানতাম তুই সেই মুখচোরা জেদি ছেলেটা! কাল এক পলক দেখেই অবাক—আরে এ যে সেই সব ঠিক আছে। সব। কেবল লম্বায় তাল গাছ হয়ে গেছিস।

তারপর তারপর অতীশ একবার কোন রকমে চোখ তুলে বলল, কাল আমারও মনে হচ্ছিল বড় চেনা তুমি। কবে কোথায় যেন দেখেছি। তারপর তারপর সেই ভাঙ্গা স্যাওলা ধরা পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির কক্ষের কথা ভাবতেই ওর কান গরম হয়ে গেল। এই হাত দে। দে না। কেউ দেখবে না। ফ্রক পরা এক বালিকা, চুল সোনালী, চোখ নীল এক বালিকা তাকে জাপ্টে ধরেছিল। সে এখন নারী। তার শরীর শিউরে উঠল। শরীরে সে তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে সামনে বসে আছে।

কমল সোফায় শরীর এতটুকু এলিয়ে দেয় নি। সোজা হয়ে বসে আছে। হাত দুটো হাঁটুর ওপর রাখা। আঙ্গুলে বিশাল হীরের আংটি জ্বল জ্বল করছে। মাথায় সামান্য ঘোমটা, পায়ের পাতা শাড়িতে ঢাকা। অতীশের কেন জানি ইচ্ছা হল কমল তার পা সামান্য বের করে রাখুক। সেই সুন্দর দেবী প্রতিমার মতো পা দুটো তার এখন দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তারপরই কমল কেমন আবেগে বলল, তুই এতদিন কোথায় ছিলি!

অতীশ কত কথা বলতে পারে। কিন্তু সে নতুন। তার পক্ষে সব জানা সম্ভব না। কমল গোপনে ডেকে এনেছে কিনা কে জানে। এতে তো বিপদ বাড়ে। কিম্বা কমলের মাথায় কোন গন্ডগোল ঘটে যায় নি তো। একজন সদ্য আসা যুবককে, এই অন্দরে নিয়ে আসা নিয়ে হৈচৈ হতে পারে। পারিবারিক মান-সম্মানের প্রশ্ন আছে। সে বলল, কমল তুমি ডেকেছ কেন?

—তোকে একটু দেখব বলে।

অতীশ এর কি জবাব দেবে। সে বলল, অমলা কোথায় আছে।

সে আছে। দিদি তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।

—ও জানল কি করে?

—কালই ফোন করলাম। বললাম, একটা আশ্চর্য খবর দিচ্ছি দিদি। খুব অবাক হয়ে যাবি।

তার ইচ্ছা হল জানতে অমলার বর কি করে। আসলে সেই শৈশব মানুষকে চিরদিন তাড়না করে বেড়ায়। অতীশের কেন জানি অমলাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। যা ফেলে এসেছিল, এই দেখার মধ্যে তা যেন সে নতুন করে ফিরে পাবে। সেই সুবিশাল জমিদার গৃহে সে তখন কুন্ঠিত বালক। তার কাছে জগতটা ছিল রূপকথার দেশের মতো। কমল ছিল তার জীবনে প্রথম দেখা রূপকথার রাজকন্যা। সেই মেয়েকে এখানে সে দেখবে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। সে ভাবল, এই নতুন জীবনে এটা ভাল হল কি মন্দ হল জানে না। কমলকে দূরাগত কোন ছবির মধ্যে সে পেতে চেয়েছে এতদিন। এত সামনা সামনি তাকে পেয়ে সে কেমন ঘাবড়ে গেছে।

কমল ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বলছে, হাবার মত কি দেখছিস?

অতীশ বলল, না কিছু না।

—আমার দিকে তাকা।

অতীশ তাকাতে পারল না।

—তাকা বলছি।

অতীশ বলল, কমল আমি বুঝতে পারছি না তোমার কি ইচ্ছে! আমাকে বিভ্রমের মধ্যে ফেলে দিও না।

—তুই অনেক দিন জাহাজে ছিলি না রে?

—ছিলাম।

—অনেক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে ছিলি?

—ছিলাম।

—তোকে দেখলেই মনে হয় যে নাবিক হারায়েছে দিশা। তোর যেন কি হারিয়ে গেছে না রে?

অতীশ খুব বিপন্ন বোধ করল।

অতীশের এই মুখ দেখলে ভারি কষ্টের মধ্যে পড়ে যেতে হয়। কমল সহসা উঠে কাছে এল অতীশের। শরীরে সামান্য ঠেলা দিয়ে বলল, ভয় পাচ্ছিস!

—না।

—মুখ এত কাতর কেন?

অতীশ বলল, কমল মেজবাবুর খবর কি! সে কথা ঘোরাতে চাইল।

—বাবা গত হয়েছেন অতীশ। কথাটা বলতে গিয়ে ভেতরে কেমন কমলের কান্নার উদ্বেগ হল। আবার ফিরে এসে পায়ের ওপর পা তুলে বসল। একটা মাছি ভন ভন করে উড়ছিল। কমল বেল টিপল। সেই উর্দি পরা হাফ যুবক হাজির। ওর দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কি!

শংখ মাছিটাকে ঘর থেকে তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। পর্দা তুলে দিল। দরজা খুলে দিল, তারপর মাছিটাকে তাড়িয়ে নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতীশ বলল, কত তাড়াবে। ঐ দেখ পাশে আর একটা।

কমল খুব কাতর চোখে তাকাল। যেন এখুনি ওটা এসে ওকে কামড়াবে। হুল ফোটাবে। এবং সে মরে যাবে। অতীশ উঠে গিয়ে হাওয়ার মধ্যেই খপ করে মাছিটাকে ধরে ফেলল।

কমল বলল, ছি ছি তোর ঘেন্না-পিত্তি নেই। তুই একেবারে গেছিস। বলে [illegible] নিজে উঠে গেল। একটা ট্রে নিয়ে এল। একটা দামি স্যামপোর শিশি। ট্রেটা কাছে নিয়ে বলল, হাত পাত। অতীশ হাত পাতলে জল দিল, সে হাত ধুলে কাঁধ থেকে তোয়ালে নিয়ে বলল, হাত মুছে ফেল। এবং হাত মোছা হলেই দেখল, ট্রে হাতে আর কেউ আসছে। সরবতি লেবুর রস, কিছু আঙ্গুর, দুটো হাফ-বয়েল ডিম, স্যান্ড-উইচ চার পিস। কমল নিজেই সাদা চাদরের উপর সাজিয়ে রাখল। —খা।

সে কিছুই না করতে পারছে না। সে যতবার কমলকে চোখ তুলে দেখেছে, সেই মুখ, ফ্রক গায়ে বব কাটা চুলের মুখ। বিশাল বারান্দায় অথবা ছাদে দৌড়াচ্ছে। চঞ্চল বালিকার সেই মুখ ছাড়া কমলের মুখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না অথবা নদীর পাড়ে ঝাড়িগাড়িতে বসে আছে কমল। অনেক দূরের কোন বালিয়াড়িতে [illegible] দাঁড়িয়ে। তাকে হাত তুলে ডাকছে। অথবা সেই হাতী—গলায় ঘন্টা বাজছে, যেন দূরে

অতীত থেকে সে ধ্বনি কানে আসছে। অতীশ চামচে দুটো আঙ্গুরে মুখে তুলে বলল, আমরা সব হারিয়েছি কমল। বড় হতে হতে আমরা কত কিছু হারাই।

কমল ওর খাওয়া দেখছিল—সতর্ক নজর রাখছে—এ-ঘরে দু' দুটো মাছি কি করে ঢুকল! আরও যে নেই কে জানে। কখন খাবার ওপর উড়ে এসে বসবে কে জানে! সে চারপাশে খুব সতর্ক নজর রাখছিল। আর চুরি করে অতীশের মুখ দেখছিল।

—রোজই আমি কেন জানি আশা করতাম, তুই আমাকে চিঠি লিখবি। এখন দেখছি নিজেই হাজির। আমার ঈশ্বর তোকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমি প্রার্থনায় বিশ্বাস করি অতীশ।

অতীশ বলতে পারত, দেশ ভাগের পর আমরা এক মহাপ্লাবনে ভেসে যাচ্ছিলাম। সেখানে দু' পারের সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। কোথায় কার ঘর-বাড়ি কিছুই চোখে পড়ছিল না। কে কিভাবে বেঁচে আছে জানার কোন উপায় ছিল না। এখন প্লাবনের জল নেমে এসেছে। দু-পাড়ে বাড়ি-ঘর মাঠ, গাছপালা পাখি সব এখন দৃশ্যমান। কিন্তু মানুষের যা হয়, জীবন বয়ে যেতে যেতে সে অন্য এক প্লাবনে ভেসে যায়। সে কোথাও স্থির থাকতে পারে না কমল। আমিও এক জায়গায় স্থির বসে নেই। কত রকমের জটিলতা আমাকে গ্রাস করছে তুমি জান না! কাল সারারাত ঘুমাতে পারি নি ভাল করে। এখানে আসার পর কেন জানি না, আর্চির প্রেতাত্মার আবার গন্ধ পাচ্ছি। গন্ধটা পেলেই বুঝি আমায় খুব সতর্ক থাকা দরকার। কোন দিক থেকে কি বিপদ আসবে বুঝতে পারছি না।

কমল সহসা বলল, তোর বৌ দেখতে কেমন হয়েছে রে?

—খুব সুন্দর। খুব ভাল মেয়ে।

—ভুঁইয়া দাদু কোথায় আছেন?

অতীশ বুঝতে পারল কমল তার সোনা জ্যাঠামশাইর খবরাখবর নিতে চায়। সে বলল, বড়দার কাছে আছেন।

—তোর সেই পাগল জ্যাঠামশাই?

—তিনি কোথায় চলে গেছেন?

—কোথায় গেলেন! কোন খবর পাস নি।

—না। বাবা জ্যাঠামশাই ঘর-বাড়ি বিক্রি করে চলে এলেন এখানে। আমরা সবাই। তার পরের ঘটনার কথা ভেবেই হাসি পেল। সে জানতও না, হিন্দুস্থান বললে মানুষের কোন ঠিকানা বোঝায় না। কত সরল বিশ্বাসে সে একটা গাছে লিখে এসেছিল, জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি। অতীশের সে কথা ভুলতে গিয়ে কেন জানি চোখে জল এসে গেল। অতীশ চোখ আড়াল করার জন্য মুখ ঘুরিয়ে বলল, উঠি কমল।

—দাঁড়া। আর একটু বোস। বলে কমল উঠে এল তার কাছে। তারপর কেমন ঝুঁকে পড়ল মাথার ওপর। নাক টানল, তারপর কেমন হতাশ গলায় বলল, হ্যা রে তোর গায়ে যে চন্দনের গন্ধ লেগে থাকত, সেটা টের পাচ্ছি না কেন রে।

অতীশ বলল, আমার গায়ে কবে চন্দনের গন্ধ ছিল কমল।

—ছিল। তুই জানতিস না। ছাদে আমি প্রথম গন্ধটা পাই।

—এখন নেই?

—না।

—বোধহয় তাও হারিয়েছি।

—এই তুই দাঁড়া তো?

অতীশ দাঁড়াল। কমলও পাশে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য সুঘ্রান কমলের শরীরে। প্রায় গা ঘেষে। সেই বালিকা বয়সের মতো মাথায় হাত তুলে দেখল, অতীশ তার চেয়ে কতটা লম্বা! অনেকটা। হাত নামিয়ে বলল, তুই আমার চেয়ে তখন খাট ছিলি না রে?

অতীশ বলল, মনে নেই।

—আমার সব মনে আছে। সব।

সব বলতে কমল কি বোঝাতে চায়। কমলের কি সংশয় জন্মেছে, প্রাচীন শ্যাওলা ধরা ঘরটার স্মৃতি সে ভুলে গেছে! সে ইচ্ছে করেই বলল, তোমার মুখ বাদে আমার কিছু মনে নেই কমল।

—চিঠিটার কথা?

—তাও ভুলে গেছি।

—এত ভুলে গেলে কোম্পানি চালাবি কি করে? কমল কেমন একটু রুষ্ট হয়ে উঠল।

—কুম্ভবাবু আছে। সনৎবাবু আছেন।

—তোর নিজের কিছু থাকবে না! না থাকলে ওরা পেয়ে বসবে না।

অতীশ কোন জবাব দিল না।

কমলের ঋজু তীক্ষ্ন নাক মুখ। স্বর্ণ চাপার মতো রঙ। আর বড় বড় চোখ। পরনে লাল পেড়ে সিল্ক—যেন আগুন হয়ে জ্বলছে তার পাশে। অন্ধকারে মোমের আলোর মতো জ্বলছে। তার ভয় হচ্ছিল। কেউ এ-ঘরে আসতে পারে, রাজেনদা আসতে পারে। এত কাছাকাছি সে ঘেমে উঠছিল। কমল তখনই বলল, অতীশ তুই নষ্ট হয়ে গেছিস। তুই আর ভাল নেই। চন্দনের গন্ধ চলে গেলে কেউ আর ভাল থাকে না।

সে বলতে পারত, জীবনে এক পরিমন্ডল থেকে অন্য এক পরিমন্ডলে চলে আসছি কমল। বয়স বাড়ছে, আর পরিমন্ডল পরিবর্তিত হচ্ছে কমল। এখন আর ইচ্ছে করলেই দুম করে কাজ ছেড়ে দিতে পারব না। সেদিনও যা পেরেছি, আজ আর তাও পারব না। আগে আমার একটা ছোট জাহাজ ছিল। জাহাজটার যাত্রী মা বাবা ভাই বোন। এখন জাহাজে যাত্রী বেড়েছে। নির্মলা, মিন্টু টুটুল নতুন যাত্রী। এই জাহাজটাকে চালিয়ে ঘাটে পৌঁছে দিতে হবে। আগে জাহাজের ক্রু ছিলাম। এখন নিজেই কাপ্তান। খুশি মত যেখানে সেখানে তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। যাত্রা অনিশ্চিত। তবু ঘাটে পৌঁছাব বলেই এই বড় শহরে চলে এসেছি। তুমি আমাকে যতই নষ্ট চরিত্রের বল। আমি আর কিছুতেই ঘাবড়াব না। তার পরই মনে হল সে কি সব হিজিবিজি ভাবছে। কমল কখন চলে গেছে এই বিলাস কক্ষ থেকে সে টেরও পায় নি। সামনে সেই উর্দি পরা হাফ-যুবক—সে বলছে, আজ্ঞে আইয়ে সাব। সে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

খাবার টেবিলে কুমারবাহাদুর ঠাট্টা করে বৌরাণীকে বললেন, দ্যাশের পোলা কিজ্ঞা কর।

বৌরাণীও ঠাট্টা করে বলল, কিছু কয় না। তারপর চামচে করে সামান্য শ্রীম্প পিজ মুখে দেবার সময় খুব গম্ভীর হয়ে গেল বলতে বলতে, ওকে না আনলেই ভাল করতে। ওর বাপকে চিনি, ওর জ্যাঠামশাইকে চিনি। সেকেলে মানুষ। ভাল মানুষ। অতীশও তাই। ওর বড় জ্যাঠামশাই পাগল হয়ে গেছিলেন। অতীশের আর কি সম্ভ্রান্ত চেহারা, ওর পাগল জ্যাঠামশাইকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না মানুষ দেখতে কত সুপুরুষ হয়। ভুঁইয়া দাদুকে আমাদের বাড়ির সবাই সমীহ করত। বাবা স্টীমার ঘাট থেকে নেমে প্রথম সে মানুষটার পায়ে মাথা ঠুকতেন। নিয়ম ছিল, আমাদেরও গড় হওয়া। তাঁর ভাইপোকে এনে কতটা ভাল করলে, মন্দ করলে বুঝতে পারছি না।
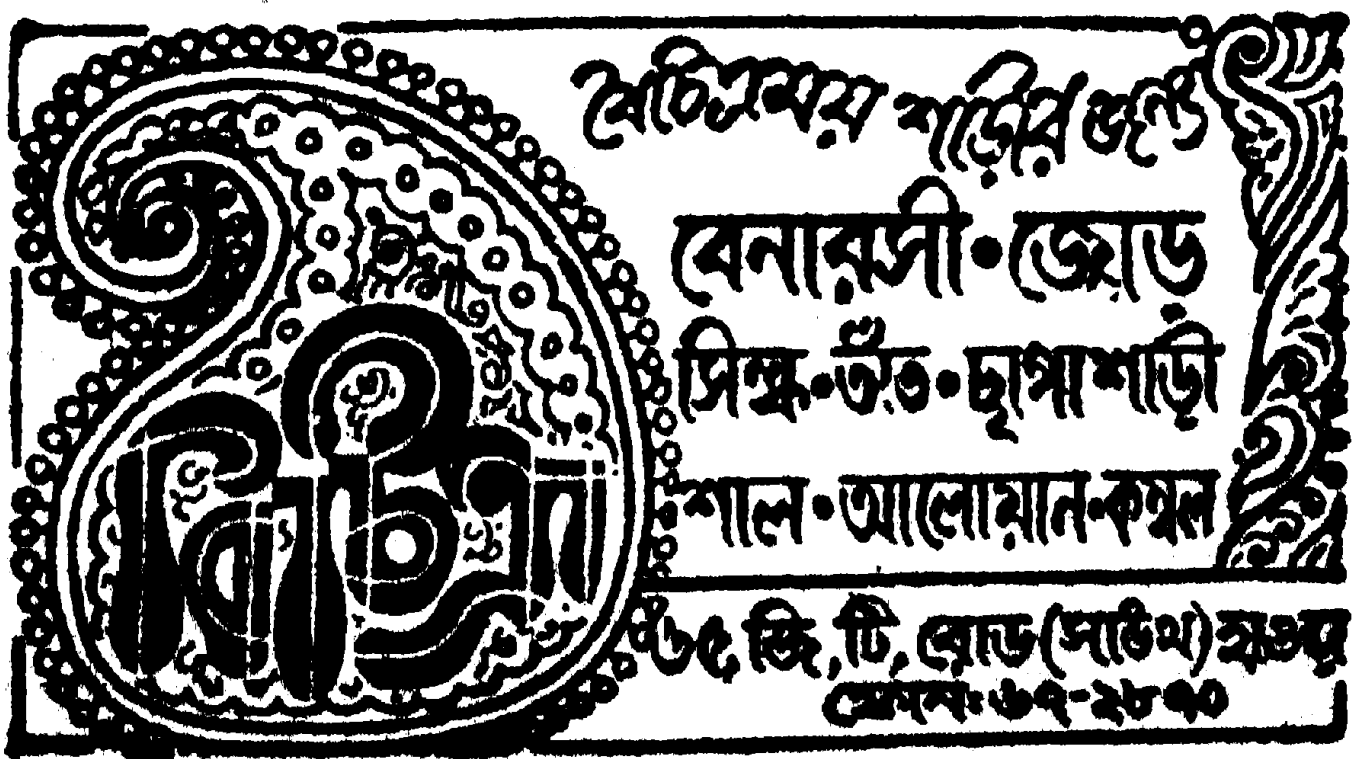
(ক্রমশ)

অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

কালীনাথ দত্ত ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও অনুমতিপত্র নিয়ে পৌঁছান নি। সবকিছু বিবৃত করে আনন্দমোহন সভা বন্ধ করে দিলেন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে দুর্গামোহন দাস তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন : "এ-ব্যাপারে মন্তব্য অপ্রয়োজনীয়। কেবল এইটুকু বলাই সঙ্গত যে হলটি ব্যবহারের আবেদনের অর্থই হচ্ছে একই সঙ্গে গ্যাসলাইট ব্যবহারের জন্যে আবেদন। আলাদাভাবে এই আবেদন কখনই করা হয়নি। ভারত সভার পক্ষ থেকে পূর্বে সার্বজনিক সভার তিনজনকে সংবর্ধনা জানান হয় অ্যালবার্ট হলে, তখন সভা কেবল হলটি ব্যবহারের অনুমতিই চেয়েছিলেন এবং বাবু কেশবচন্দ্র সেন স্বাভাবিকভাবেই, আলো জ্বালার জন্যে কোন আপত্তি তোলেননি। ব্যাপারটা যে মিটিংটাকে বন্ধ করে দেবার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবেই সংঘটিত করা হয়েছিল, এটা যে-কোন লোকই বুঝতে পারবে—ওয়ান ক্যান হার্ডলি হেল্প টু সী দ্যাট দি হোল থিং ওয়াজ প্রিকনসার্টেড কেপ্ট ক্যান্ট ... ভ্যাই টু প্রিভেন্ট দি মিটিং টেকিং প্লেস।"

সে যাই হোক, মিটিং ভেঙে গেল বটে, মন ভাঙল না। ... টাউন হলের মিটিং-এর আসল কাজ ছিল কি? অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। নতুন সমাজ গঠন করা। সে অনিবার্য পরিণতির গতি রোধ করা গেল না। ভবিষ্যতের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দ আস্তে আস্তে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছিলেন।

মিটিং-এর উদ্দেশ্য ছিল একটা স্টিয়ারিং কমিটি করা—ব্রাহ্মসমাজ কমিটি। এই দুর্দিনে যাঁরা সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন। হল না। দিন পাঁচেক পরে টাউন হলে একটা সভা করে এই কমিটি তৈরি হয়। কমিটি হল। কিন্তু এমন কোন প্রস্তাব রচনা করা হল না যাতে কেশববাবু সমাজ ছেড়ে চলে যান। এতে একদল ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা রাগ করে সমালোচক-এর কলম তুলে দিলেন দ্বারকানাথের হাতে। সমালোচকের ভাষা ধর্মতত্ত্বের চেয়ে বেশি ধারালো হতে হবে না? ঔপন্যাসিক পরবর্তীকালে নব্যভারতের সম্পাদক তরুণ দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীও দ্বারকানাথের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। তাঁরা একেবারে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলেন সমালোচকের পাতায়। তুবড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে লাগলেন কেশবচন্দ্রের মতামত। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলেন কেশবের যুক্তির দোষগুলি আর তাঁদের আপাতঃ বিরুদ্ধতা।

কিন্তু কিছুই হল না। ব্রাহ্মদের এই আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র মূল্য না দিয়ে কেশব সেন মশায় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে স্পেশাল ট্রেনে চাপলেন। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ম্যানেজার ই বি প্রেস্টেজ, তিনি সব সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। মেয়ে সুনীতিকে নিয়ে চললেন বিয়ে দিতে। কলকাতার বিশিষ্ট ব্রাহ্মদের মধ্যে বোধহয় সঙ্গে গিয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গৌরগোবিন্দ রায়। এবং কুচবিহারে নির্দিষ্ট শুভ দিনে পাঁজিপুঁথি দেখে যে-বিবাহ অনুষ্ঠিত হল, তা পুরোপুরি পৌত্তলিক মতেই হল। কন্যা সম্প্রদান করলেন কেশববাবুর ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন। কেশববাবু বিলাত গিয়েছেন সমুদ্র পেরিয়ে, তাই জাতিচ্যুত। তাঁকে এ-কাজ করতে দেওয়া হল না। বিয়ে দিলেন কুচবিহারের রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণরা। ব্রাহ্ম উপাসকদের কোনরকম পাত্তাই দেওয়া হয়নি। 'সেন মহাশয় ও তাঁহার অনুগত যে কয়েকজন প্রচারক কুচবিহারে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু কুচবিহারে লোকেরা এমন চিৎকার ও গোলমাল করিয়াছিল যে, কেহই তাঁহাদের কথা শুনিতে পায় নাই।' কাজেই ব্রাহ্ম বিবাহের ব্রহ্মোপাসনা করা গেল না, বা হল না। বিয়েতে হোমাগ্নি জ্বলেছিল ঠিকই, কিন্তু কুচবিহারের রাজবাড়ির প্রথানুযায়ী, কন্যাকে সেখানে রাখা হল না। বরই কেবল সেখানে থাকলেন। এবং তার চেয়ে বড় কথা, কুচবিহারের রাজবাড়ির কুলদেবতা—হরগৌরীর বিগ্রহ বিবাহ-সভায় মহাসমারোহে আনা হল। প্রতাপ মজুমদার মশায় উঠে আপত্তি জানালেন। কিন্তু সে-কথা কেউ কানে নিল না। নেবেই বা কেন? হিন্দুমতে বিবাহের সময় দেবদেবীর পূজা হইবে এবং বিগ্রহের সম্মুখে হিন্দুমতে বিবাহ হইবে।—এত বিয়ে দিতে আসার আগেই কলকাতায় বসে শুনেছিলেন ব্রহ্মানন্দ। অন্ততঃ তাঁর কানে এ-কথা তুলেছিলেন ব্রাহ্ম শুভানুধ্যায়ীরা।

চৈত্র মাসের টেকশর রোদ। কলকাতার রাস্তাঘাট এরই মধ্যে তাততে শুরু করেছে। দুপুর বেলায় তাপও এরই মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাবুদের অনেক বাড়িতেই টানা-পাখা ক্যাঁচকোঁচ শুরু করেছে। হাত-পাখার ও বিরাম নেই। তবে কোথাও কোন ঝোপঝাড়ে, কোন পত্রবিরল গাছে এখনও কোন পথ ভোলা কোকিল মাঝে মাঝে মিহি ... ডেকে উঠছে। অবসন্ন বসন্তের শেষ বিদায় সম্ভাষণের মত। আঠারই মার্চ। সোমবারের সকাল। কেশববাবু প্রচারক পরিজন সমভিব্যাহারে নামলেন শিয়ালদহ স্টেশনে। কুচবিহার থেকে ফিরেলেন। কিন্তু তখনও তিনি আঁচ করতে পারেননি যে ... প্রচণ্ড উত্তাপ তাঁর জন্যে সংগ্রহ করে রেখেছেন ব্রাহ্মসমাজের জঙ্গী মানুষেরা। কেশববাবু সেকালের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডিত্যে, বাগ্মিতায়, প্রতিভায় তিনি এক আকর্ষণীয় পুরুষ। ধর্মসংস্কারে, সমাজসংস্কারে তাঁর সকল পদক্ষেপে তিনি তাই অনায়াসে টানতে পেরেছিলেন সেকালের যৌবনকে। ব্রাহ্ম ছেলেদের। আজ তাঁদের ... তিনি কত ছোট হয়ে গেলেন, তার ইয়ত্তা নেই। তিনি নিজে বাল্যবিবাহের বিরোধী হয়ে আজ তাই করালেন। ব্রাহ্মধর্মকে নস্যাৎ করে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের ... হলেন। এই ক্ষোভ যেখান থেকে ফেটে পড়েছিল তখন ব্রাহ্মসমাজ। ... যৌবন। সারা কলকাতার পথে সেই আঁচ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেশববাবু তখন সম্পাদক। ... বাল্যবিবাহ সমর্থনকারী ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের পরিবারোধী আচার্যকে ব্রাহ্মসমাজের কোন কার্যে নিযুক্ত রাখিতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্যও

সম্পাদকের পদ হইতে চ্যুত করিবার জন্য জোর তোড়জোড় চলতে লাগল। তৎপর ব্রাহ্মরা সেদিনই বর্ষীয়ান নেতা শিবচন্দ্র দেবের সই-করা এক চিঠিতে রিকুইজেশন মিটিংডাকতে বললেন কেশববাবুকে। কেশববাবু নাকচ করে দিলেন। পরিবর্তনকামীরা থামলেন না। এর পরেই তাঁরা [illegible] আচার্যের পদ থেকে অপসারণের জন্যে মিটিং ডাকতে আবেদন করে একটা চিঠি পাঠালেন। তারও কোন ফল হল না। মা হল মিটিং ডাকা, না এল কোন [illegible] তেরাত্তির না পোহাতে পোহাতে কেশববাবু বিরোধীদের আর দানা বাঁধতে না দিয়ে নিজেই একটা মিটিং ডাকলেন—একুশে মার্চ। যেন তাঁর বিরোধীদের কোন আবেদন-নিবেদন, কিছুই পাননি তিনি। কাগজে তার বিজ্ঞাপন বের হল : বাবু কেশবচন্দ্র সেন উইল প্রপোজ বাবু কেশবচন্দ্র বি ডিপোজড। বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাব করবেন, বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে অপসৃত করা হোক। এটা আর কি এক স্টান্ট: মোক্ষম চাল! ভেবেছিলেন যে, এই ভাবে তিনি তাঁর বিরোধীদের পালের হাওয়া কেড়ে নেবেন। কি [illegible] কাণ্ড! তিনি নিজেই নিজের অপসারণের ওপর বিতর্ক চাইছেন। তাঁর চেয়ে বড় ডেমোক্র্যাট আর কে? বোধহয় তিনি নিশ্চিত জানতেন [illegible] উঠলে তাঁর ভাষণের যাদুজালে তিনি সমাগত সকল ভদ্রলোকদের নিজের কাজের সমর্থন করিয়ে নিতে পারবেন। এবং সেটা সত্যই কিছু অবাক কাণ্ড হত না।

একুশে মার্চ। বৃহস্পতিবার। সায়ংবেলা কাটিয়ে সভা বসল। ব্রহ্মমন্দিরে আর তিলধারণের ঠাঁই নেই। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবাঃ। এবং শুরুতেই গোলমাল। কে সভাপতি হবেন? ব্রাহ্মানন্দের প্রচারক দল বললেন [illegible] বললেন, দুর্গামোহন দাস। কেশববাবুর বিচার করার জন্যই এই সভা। যিনি অভিযুক্ত, তিনি কি করে সভাপতিত্ব করবেন? এই অকাট্য যুক্তি কেশববাবুর দল ফেলতে পারলেন না। কিন্তু তাঁরা আক্রমণ করলেন অন্যভাবে। প্রচারকদিগের [illegible] হইতে আপত্তি করা হইল যে, দুর্গামোহন দাস- প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নহেন, সুতরাং তাঁহারা এই সভায় যোগ দিবার অযোগ্য। সভাপতি হওয়া ত দূরের কথা। এই নিয়ে আবার তর্ক-বিতর্ক, [illegible] মাল। জোর কথাকাটাকাটি, বাগবিতণ্ডার যেন শেষ নেই। কে সভাপতি হবেন তাই নিয়ে আলোচনার যেন আর কোন নিষ্পত্তি নেই। এই নিয়েই বহুক্ষণ কেটে গেল। শেষে বোধ করি স্ট্র্যাটেজি হিসেবে কেশববাবু দুর্গামোহনবাবুকে সভাপতি করতে নিমরাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে ভোট নেবার সময় আবার কে সভ্য, কে সভ্য নয়, এই নিয়ে আবার জোর তর্ক উঠল। কেশববাবুর প্রচারকগণ ও বন্ধুগণ বিরোধীদের অনেকেরই সম্বন্ধে আপত্তি দিতে লাগলেন। কিন্তু শেষে একটা ফয়সালা হয়ে [illegible] কেশববাবুর [illegible] নিজেই দুর্গামোহন সভাপতি নির্বাচিত হলেন সেদিনের সভায়। এইবার কেশববাবু প্রস্তাব করলেন যে তাঁর অপসারণের প্রস্তাব তিনি নিজেই তুলবেন। বোধ করি কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতার মনোহারিতা, তাঁর শক্তি, তাঁর প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে বিরোধীদলও যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাব তাঁরা মেনে নিলেন না। দুর্গামোহন তখন সভাপতি। তিনিই রুলিং দিলেন শিবনাথ [illegible] প্রচেষ্টাও ভেস্তে গেল! শিবনাথ সেই প্রস্তাবটা তোলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, কেশববাবু তাঁর দলবল নিয়ে ব্রহ্মমন্দির ছেড়ে চলে গেলেন। 'এদিকে সেনবংশীয় বালকগণ ও তাহাদের বালক-বন্ধুগণ চিৎকার ও গোলমাল করিতে লাগিল। তা করতে থাকুক, কিন্তু সভাতে স্থির হইল যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আর সমাজের আচার্য ও সম্পাদকের কার্য করিতে পারিবেন না। এবং রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তিকে আচার্য পদে নিযুক্ত করা হইল।'

সেদিন রবিবার। সাত সকালেই দ্বারকানাথের কাছে খবর এল যে কেশবচন্দ্র সেন পুলিশ ডেকেছেন। ব্রাহ্মমন্দিরে তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছেন। এবং মন্দিরের ভেতরে কয়েকজন প্রচারককেও রেখেছেন। ব্রাহ্মমন্দির কোনক্রমেই বেদখল হতে দেওয়া হবে না। দ্বারকানাথ স্বভাবতঃই দারুণ উত্তেজিত। কালক্ষেপ না করে সোজা চললো শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। ঘন ঘন কড়া নাড়তেই শিবনাথ বেরিয়ে এলেন। দ্বারকানাথ বললেন সব খুলে। বললেন, চলুন আমরাও গিয়ে তালাচাবি লাগিয়ে আসি ব্রাহ্মমন্দিরে। মন্দির ত আর কেশববাবুর একার টাকায় নয়। আমরা সবাই মিলে টাকা দিয়েছি। কেশববাবু নোতুন করে দখল করেন কোন যুক্তিতে? শিবনাথবাবু ঠাণ্ডা মানুষ। দ্বারকানাথ তখন রাগে টগবগ করে ফুটছেন। তাঁকে বসিয়ে সব কথা শুনলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের সঙ্গে ব্রাহ্মমন্দিরে গেলেন না। দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী তখন দ্বারকানাথের সাকরেদ। দুজনেই তখন সমালোচক চালাচ্ছেন। তাঁরা কিন্তু থামলেন না। দুজনেই চললেন ব্রাহ্মমন্দিরে। এবং সঙ্গে নিয়ে চললেন বড়সড় একটা তালাচাবি। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে ত একলা চলরে। শিবনাথ না যাওয়াতে বিরক্ত হয়ে থাকবেন দ্বারকানাথ। কিন্তু এই সামান্য বাধায় দমে যাবার মানুষ নন তিনি। তাঁর কাজ ঠিকই করে যাবেন। কোন বাধা মানবেন না। কে এল, কে এল না, তার জন্যে থোড়াই তোয়াক্কা!

এবং ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়ে জোর নাটক। সত্যই, কেশববাবুর লোকেরা ভেতর থেকে চাবি দিয়েছে। প্রচারক মহেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কয়েকজন ভেতরে বসে। দ্বারকানাথ ভেতরে ঢুকতে গেলেন। ভিতরের লোকেরা ছুটে এলেন। দ্বারকানাথ বললেন, মন্দির কি আপনাদের? আমাদেরও। আপনারা ভেতর থেকে চাবি লাগিয়েছেন, আমরা বাইরে থেকে লাগাব। ভেতরের লোকেরা ভেতর থেকে বাধা দিতে লাগলেন। বাগবিতণ্ডা থেকে ঠেলাঠেলি। দরজার রেলিং একবার ভেতরের লোকেরা ঠেলছে। একবার বাইরের লোকেরা। চীৎকার। হৈ-হল্লা। 'এই টানাটানির অবস্থাতে ভিতরকার কেশব শিষ্যগণের একজনের হাতে বোধহয় গেটের লোহার রেলের আঘাত লেগে থাকবে। এই উপলক্ষে মন্দির রক্ষাকারীরা এই অমূলক সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন ভিতর হইতে গাঙ্গুলী মশায়কে বাধা দিতেছিলেন, তখন গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার হাত কামড়াইয়া দিয়াছিলেন। কেশববাবুর লোকেরা বিবেক দংশনে ভুগছিলেন। জ্বালা সেইখানেই। আর দ্বারকানাথ সেই জীবন্ত বিবেক। তাই এই অহেতুক অপবাদ। এই সন্ত্রাস চিৎকার।

তারপরের ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন: সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, প্রচারকদের পরম আত্মীয় কলিকাতার পুলিশ ইনস্পেকটর কালীনাথ বসু মহাশয় বহু সংখ্যক পুলিশসহ উপস্থিত হইয়াছেন। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে পুলিশ পাহারা দিতেছে। উপাসনারম্ভের বহু পূর্ব হইতেই সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় বেদীর উপরে বসিয়াছিলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ শান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রভৃতি 'দয়াল বল, জুড়াল হিয়ারে' এই কীর্তন করিতেছিলেন। পূর্বনির্দিষ্ট প্রস্তাব অনুসারে ইহা নির্ধারিত হইয়াছিল যে, রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সেদিনের আচার্যের কার্যনির্বাহ করিবেন। অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় বেদী হইতে নামিয়া যাইবামাত্র ও রামকুমারবাবু বেদীতে উঠিবার জন্য সিঁড়ির নিকট আসিবামাত্র কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এই সুযোগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বেদীর উপরে উপবেশন করিলেন। আচার্য মহাশয়ের এই আচরণ দেখিয়া কেহ আর ধৈর্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত এবং আচার্য মহাশয়ের কার্যে ক্ষুব্ধ যুবকগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ইহা ব্রহ্মমন্দির নয়, চলুন ও মন্দির ত্যাগ করিয়া যাই। ব্রহ্মমন্দিরে সে রাতেতে পুলিশ এ্যাকসন খুবই ট্র্যাডিশন্যাল। কুচবিহার বিবাহে যাঁরাই আপত্তি করেছিলেন ইনস্পেকটর কালীনাথ সেই সেই বদমায়েসকে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। ব্রহ্মমন্দির থেকে বার করে দিতে লাগল। তাদের যে এ্যারেস্ট করেনি এইটেই রক্ষা। অবশ্য এর মধ্যে উদোর পিণ্ডি যে বুধোর ঘাড়ে চাপেনি, তা নয়। প্রাচীন প্রচারক যদুনাথ চক্রবর্তীকেও কালীনাথ বদমায়েস

বলে চিহ্নিত করলেন। পুলিশ তাকেও বার করে দিলে মন্দির থেকে।

ব্রহ্মমন্দিরের পাশেই উপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী। লড়াককু ব্রহ্মেরা বেরিয়ে এসে তাঁর বাড়ী উপাসনা করলেন সেই রাতে এবং এই পৃথক উপাসনাই পৃথক ব্রাহ্মসমাজের সূচনা করল। মাঝে ব্রাহ্মসমাজ কমিটি শহর—মফঃস্বলের ব্রাহ্মদের মতামত জেনে নিলেন। এবং শেষে কলকাতা টাউন হলে এক মিটিং-এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হল। পনেরই মে, আঠারশ আটাত্তর। বাংলা দোসরা জৈষ্ঠ। টাউন হলে মিটিং হল পনরই মে। তার আগের দিন কলকাতায় অন্যান্য কাগজের মধ্যে স্টেটসম্যান কাগজেও বিজ্ঞাপন বের হল। সেটা এই:

আগামীকাল বুধবার পনরই মে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় টাউন হলে ব্রাহ্মদের একটি সভা হইবে। উদ্দেশ্য উন্নত ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্রাহ্মসমাজের একটি সংগঠন তৈরি করা।

এই সভায় আহ্বায়ক ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ কমিটির সেক্রেটারি শিবচন্দ্র দেব। সাধারণ নামটা দিয়েছিলেন হাওড়ার মুন্সেফ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। এই নামকরণ সমর্থন করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম আদি সমাজ, আমরা কালে আদি। কেশববাবুর সমাজের নাম ভারতবর্ষীয় সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশ কালের অতীত হয়ে যাও। মহর্ষির এই ভবিষ্যৎবাণী সফল করতেই বুঝি দেশ-কালকে অতিক্রম করায় অন্তহীন সংগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। এই লড়াই তার যোদ্ধা-নায়ক দ্বারকানাথেরও। ন্যায়ের জন্য বিরামহীন সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন যুদ্ধ এবং দেশকালকে ডিঙিয়ে সাধারণ অবহেলিত, নির্যাতিত, অপমানিত, অজস্র মানুষদের জন্য লড়াই করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সেকালে, যে কয়টা আঙ্গুলে গোনা যায় মানুষ—দ্বারকানাথ সেই অসাধারণ মানুষদের একজন। কুচবিহার বিবাহের প্রথম প্রতিবাদ সভাতেই তিনি অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, এ লড়াই-এর পরিণতি পৃথক ব্রাহ্মসমাজ। অনেকেই তা মানেননি। বহুলোকেই এই নিয়তি-বাক্যে বোধ করি শিউরে উঠেছিলেন সেদিন। কিন্তু তাই ঘটল। প্রাক্তনের গতি রোধে সাধ্য কার?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথের ভূমিকা সম্বন্ধে ঠিকই লেখা হয়েছিল: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময়ে দ্বারকানাথ সিংহের বলে কষ্ট করিয়াছিলেন। যে কোন কার্যে সাহস, উৎসাহ ও শ্রমের প্রয়োজন হইত, তিনি তাহাতেই অগ্রসর ছিলেন...তাঁহার প্রকৃতি এই ছিল যে তিনি যাহা একবার কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিতেন, তাহা সাধনে ফলাফল লাভালাভ, ক্ষতি-নিন্দা কিছুই গণনা করিতেন না। এরূপ বীরপুরুষ অগ্রণী না হইলে সে সময়ে ব্রাহ্মগণ, সাহসের সহিত কার্য করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। কোন সন্দেহই নেই। ব্রাহ্ম নেতারা অনেকেই তখন দোলাদলচিত্ত। হ্যামলেট। করবেন কি করবেন না, তাই চিন্তা। চক্ষু লজ্জা। মধ্যবিত্ত জীবনের ভদ্রতা বোধের সংস্কারে বিপর্যস্ত। এতটা এগোবেন না, এগোবেন না। মডারেট শিবনাথ উপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে বসে, ব্রহ্মমন্দিরে কি হল সে খবর শোনবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করেছেন, কিন্তু যাননি সেখানে। সকালেও যাননি ব্রহ্মমন্দিরে তালাচাবি দিতে। তাঁর মধ্যবিত্ত ভদ্রতার বোধকরি বেধেছিল। দ্বারকানাথ কোন কিন্তু ভাব ছিল না। দ্বিধা ছিল না। দোদুল্য চিত্ততা ছিল না। নির্দ্বিধায় তিনি নতুন সমাজ চেয়েছিলেন। জ্যামস্ তীরের মত তিনি তাঁর 'বুলস আই' বিঁধেছিলেন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন। তাঁর প্রাণশক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনা করতে অগ্রণী হয়েছিলেন, সাহসে ভর করে। করে-ছিলেনও।

কিন্তু দ্বারকানাথ ভাঙনের নায়ক নন শুধু। গঠনেরও। তবে সেই গঠনের মধ্যে কোন আসক্তি নেই। সুদূর বিক্রমপুর থেকে যেদিন তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছালেন, সেদিনও তিনি বাঘিয়ার বিখ্যাত কুলীন বংশের শেষ দীপশিখা। প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজেরই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সংগ্রামী নাইট। ট্রুবাডুর। অকুলীন কোন বামুন বউ রান্না করে তাঁকে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কুলীন সন্তান দ্বারকানাথ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর ধর্মে তিনি গোঁড়া। কিন্তু অচিরে বুঝলেন, যে সংস্কার তিনি চান, নারী জাতির যে মুক্তি তাঁর একান্ত কাম্য, তা লাভ করতে হলে এতই ব্যাপক, এতই আমূল পরিবর্তন করতে হবে তাঁর সমাজের, এই পুরনো পচা-গলা সমাজের খোলনলচেটাও রাখলে চলবে না। তালি—কেবল তালি দেওয়া এ কোর্তা জামায় তাঁর চলবে না। নতুন ধর্ম চাই। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তখন বোধ হয় তাঁর বাপ-মা দুজনেই জীবিত। সত্যের খাতিরে ব্রতপালনের তাগিদে তিনি নতুন ধর্ম নিলেন। এবং সে ব্রাহ্মধর্মও পুরনো নয়। নতুন। নতুন কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রবেশ করলেন। কিন্তু যখনই বুঝলেন সেখানেও গোষ্ঠীচক্র, ডেমক্রেসি নেই, মুক্তি নেই, স্বাধীনতা নেই, আরও একধাপ এগিয়ে যেতে পা কাঁপল না তাঁর। সবিক্রমে নির্ভয়ে সামনেই পদক্ষেপ করলেন এই নির্মোহ মানুষটি। এই কর্মযোগী নায়কটি। বহু বাধা এল, বিপত্তি এল। ব্যাঘাত প্রতিবন্ধের ঝড় উঠল। কিন্তু দ্বারকানাথ তাঁর সত্যে প্রত্যয়ে অবিচল।

কিংবা তাঁর সকল অভিযান বুঝি এই ঝড়ের রাতেই। উত্তাল ঝঞ্ঝায় টালমাটালের মধ্যে। অনন্তকালের যাত্রী মানুষ তিনি। এই দুর্যোগের মধ্যে দিয়েই তাঁর বিরামহীন খেয়া। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে জ্বালায়ে রাখিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি তিনি তাঁর বিচিত্র জীবনের খেয়া পারে যাত্রী হয়েছিলেন।

।।পাঁচ।।

কিন্তু এহো বাহ্য। এইসব কাজ-কর্মের আবর্তে দ্বারকানাথ জড়িয়ে পড়লেও তাঁর জীবনের মূলে সুরটি ছিল নারী জাতির জন্য গভীর মমতা। অতলান্ত স্নেহ। দরদ। অবলাবান্ধবই তাঁর আসল পরিচয়। বাকী তাঁর সব কীর্তিই 'বাই প্রোডাক্ট'। দ্বারকানাথ নিজেই সে কথা লিখেছেন:

'আমরা বাল্যকালে চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকসকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্বদা বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদ বোধ হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম ইহারা উপহাসের পাত্র নহে কৃপার সামগ্রী। এই সময় হইতেই স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের মমতা জন্মিল। তখন ভাবিলাম যদি বিন্দু পরিমাণেও ইহাদিগের এই দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে।'

ভাই শম্ভুচন্দ্রকে এক চিঠিতে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।' এই দিক দিয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগরের সহযোগী। নারীশিক্ষা প্রচেষ্টা, স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনই দ্বারকানাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নারীজীবনের দুঃখ-দুর্গতি দূর করাই তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং তরুণ বয়সে জীবনের এই পরমা গতিটি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। এবং এই মন্ত্রের সাধনেই তাঁর 'অবলাবান্ধব' প্রকাশ। এবং কলকাতার বুকে পা দিয়েই এই কাগজটি হল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপাত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—'আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষের প্রধান নেতা হইলেন।'

চলবে

পরম্পরাবিরোধী নয় কি ?

পৌরাণিক দেহবান দেবতারা গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান প্রাণী—এমন একটি চিন্তা ক্রমেই বিজ্ঞানীমহলে গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার বিষয় হয়ে উঠছে। গ্রহান্তরে উন্নত প্রাণীর অস্তিত্বে বহু বিজ্ঞানীই আজ বিশ্বাসী। একদিকে মহাকাশবিজ্ঞানে দ্রুত উন্নতি ও পৃথিবীপৃষ্ঠে ভিন গ্রহবাসীর সম্ভাব্য অবতরণকে সম্ভবপর বলে আমাদের ভাবতে সাহায্য করছে। ১৯৫৯-৬০ সালে রুশ বিজ্ঞানী ম্যাডেস্ট আগ্রেস্ট তথ্য ও যুক্তিসহ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে প্রসঙ্গটি বেশ জোর দিয়েই আলোচনা করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, দেবতা নামক ভিনগ্রহবাসীদের কথা যত পরিষ্কারভাবে জানা যাবে, সভ্য মানুষের লুপ্ত ইতিহাস বা মিসিং লিংক আবিষ্কারে আমরা ততই সাফল্য লাভ করব। কাজটিকে সফল করে তোলার জন্য তিনি সকল শাখার বিজ্ঞানী, পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক এবং পুরাচর্চায় নিযুক্ত গবেষকদের কাছে আহ্বান জানান। ইত্যবসরে এই অনুমিতিটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে পাশ্চাত্যে একাধিক গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে আগ্রেস্ট কল্পটির সবচেয়ে সাফল্যপূর্ণ গবেষণায় সার্থক হন সুইস গবেষক এরিক ফন দানিকেন। দানিকেনের বক্তব্য বিশ্ব প্রচার লাভ করায় বিষয়টি আজ দানিকেনতত্ত্ব রূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই নয়া তত্ত্বের আলোকে বাঙলা ভাষায়ও রামায়ণ মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত কর্মী দেবতাদের কীর্তি-কাহিনীগুলির পুনর্বিচার আরম্ভ হয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম মৌলিক রচনাবলী 'দানিকেনতত্ত্বের আলোকে মহাভারতের স্বর্গদেবতা' এবং 'দানিকেনতত্ত্বের আলোকে কুরুক্ষেত্র' ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৭৭-৭৮ সালে। ঐ রচনাবলীর কতকাংশ 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' নামে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে। সম্প্রতি শ্রীনিরঞ্জন সিংহ রামায়ণের বিষয়বস্তুর ওপর নোতুন আলোক পাত করেছেন। তাঁর বই 'রামায়ণ মহাভারতের দেব-গন্ধর্বরা কি ভিনগ্রহবাসী?' প্রকাশিত হয়েছে জন্মাষ্টমী ১৩৮৬ অর্থাৎ আগস্ট ১৯৭৯-তে। শ্রীসিংহের গ্রন্থটি আলোচনার ক্ষেত্রে একটি পূর্ববর্তী গ্রন্থের উল্লেখের প্রয়োজন নিরঞ্জনবাবুই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বই-এর প্রচ্ছদে একটি বিজ্ঞপ্তি ছেপে। বিবৃতিটি এই রকম : "...দেবতত্ত্ব নিয়ে এ রকম তথ্যমূলক ব্যাপক ও সরস আলোচনা এর আগে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।' মনে হয়, ঐ জাতীয় বিবৃতি কোনো গবেষণামূলক গ্রন্থে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, গবেষণা বিষয়টি এক হিসেবে যৌথকর্ম। বহু জনের প্রয়াসের দ্বারাই গবেষণাকাজ তার গতি পায়। গবেষণাকর্মে মৌলিক চিন্তা যা থাকে তা আপনিই প্রকাশিত হয়। প্রচারের অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত গবেষক তাঁর বিষয়টির ওপর পূর্বাহ্নে প্রকাশিত অন্যান্য রচনাবলীর সঙ্গে সম্যক পরিচিত থাকবেন এটাই বরং প্রত্যাশিত।

শ্রীসিংহের প্রধান আলোচ্য বিষয় রামায়ণ। তাই তাঁর চিন্তাকে মুখ্যত দাক্ষিণাভিমুখী হতে হয়েছে। খোঁজ করতে হয়েছে, রাবণের লংকাপুরীর যথার্থ ভৌগোলিক অবস্থানটি কোথায় ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক বক্তব্য হল, লংকাপুরী ছিল ভারত মহাসাগরে অধুনালুপ্ত লেমুরিয়া ভূখন্ডের স্থানবিশেষে। লেমুরিয়ার অনুমিত অস্তিত্ব যদিও এখনও আবিষ্কার-সাপেক্ষ; তবু রাবণের লংকাপুরী যেহেতু ভারত ভূখন্ডের দক্ষিণে এক বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে অবস্থিত বলে রামায়ণ সমর্থিত তথ্যে জানা যায় এবং লংকা ও সিংহল দুটি স্বতন্ত্র দ্বীপ, এমন উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে, সেজন্য শ্রীসিংহের অনুমানটি বিশেষ চিন্তাকে আমন্ত্রিত করে নিশ্চয়ই। অবশ্য এ প্রসঙ্গে রামায়ণের কাল ও লেমুরিয়ার সম্ভাব্য অস্তিত্বের সময় নিয়ে লেখক যদি আর একটু বিশদ আলোচনা করতেন তবে বিষয়টি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিসিদ্ধ হত। লেমুরিয়া নিয়ে সম্প্রতি দীর্ঘ ও গভীর আলোচনা করেছেন রুশ গণিতজ্ঞ আলেকজান্দার কোনদ্রাতভ তাঁর 'তিন মহাসাগরের প্রহেলিকা' গ্রন্থে। তথ্যালোচনা করে তিনি বলেছেন, তিরিশ কোটি বছর সমুদ্রের ওপর মাথা তুলে থাকার পর গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড পনের থেকে আঠার কোটি বছর আগে বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক অনুমান, সাড়ে তিন কোটি বছর আগে লেমুরিয়া ডুবে যেতে আরম্ভ করে। সেই সময় অর্ধ-বানরাকৃতি জীবের মধ্যে প্রাকৃতিক বিবর্তন শুরু হয়। বিবর্তনের ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতির পর লেমুরিয়ায় মানুষের আদি পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। কোনদ্রাতভ বলছেন, লেমুরিয়াই আদি সভ্যতার শৈশবভূমি। লেমুরিয়ার অস্তিত্ব যদি উন্নত সভ্যতার পত্তনকাল পর্যন্ত বজায় থেকে থাকে ও তার সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়, তাহলে আদি উন্নত সভ্যতা সম্পর্কে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। অর্থাৎ পুরো চিন্তাটিই এখনো অনুমিতির পর্যায়ে রয়েছে। এখন রাবণের লংকাপুরীকে লেমুরিয়ার কোনো দ্বীপে শ্রীসিংহ অনুমিত 'গ্রহান্তরের ইঞ্জিনীয়র' বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে মেনে নিতে হলে একটি অনুমিতির ওপর আরও এক ধাপ অনুমান রচনা করতে হয়। এভাবে অনুমিতির ধাপ বাড়িয়ে গেলে তথ্যসন্ধানের কাজ পিছিয়ে যায়। বরং লুপ্ত ইতিহাসের খোঁজ করতে গিয়ে আরও বেশি লুপ্ত তথ্যের মধ্যে অবগাহন না করে বক্তব্যকে বিষয়ানুগ করতে পারলেই তা উদ্দেশ্য সন্ধানে সহায়তা করে। তাছাড়া রামায়ণের সময়টিও তো বিবেচনায় রাখতে হবে। পন্ডিতদের মতে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন হলেও সময়ের তফাৎ খুব বেশি নয়। মহাভারতের ঘটনাবলী হাজার থেকে চোদ্দশ খৃঃ পূর্বাব্দ বলে সর্বাধুনিক মত প্রচারিত আছে। লেখক অবশ্য যে কালের পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণ মহাভারতের আলোচনাকে টেনে নিয়ে গেছেন সে যুগে লেমুরিয়াতে ভিনগ্রহবাসীদের একটি গোষ্ঠী গ্রহান্তর স্টেশন স্থাপন করে অদ্ভুত ক্রিয়াকান্ড চালাচ্ছেন বলে তাঁর অনুমান। তাঁর মতে, তখন পৃথিবীতে দেবতা, দানব, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ যাঁরাই আছেন, তাঁরা ভিনগ্রহীদেরই বিভিন্ন গোষ্ঠী। তাঁর সিদ্ধান্ত, "...পৃথিবীতে সভ্যতা সৃষ্টিকারী মানুষেরা পৃথিবীর আপন সন্তান নয়—তারা ভিনগ্রহবাসী।" এজনাই তাঁর মনে হয়েছে, বালী, সুগ্রীব, জাম্ববান, হনুমান প্রমুখ দলপতিগণ ছাড়া রামচন্দ্রের বানর বাহিনী চতুষ্পদ পশুমাত্র। বালী সুগ্রীব হনুমানরা বিজ্ঞানী দেবতাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরী প্রোগ্রামিং-করা রোবট ও রোবট-রকেট। তখন যেহেতু পৃথিবীতে বানরযুগ চলছে তাই দেবতারা বানরাকৃতি এই রোবটগুলিকে নির্মাণ করেছিলেন কোটি কোটি বানরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেবতাদের শত্রুপক্ষ ভিনগ্রহপ্রবাসী রাক্ষসগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করার জন্য। উত্তরকান্ডের ৪২ সর্গ থেকে বানররূপী রোবট সৃষ্টির এই ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন তিনি। অবশ্য ব্যাখ্যাটি চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই। তবে তাদের রোবট ভাবারও যে অবকাশ নেই সেকথায় আসার আগে বলা দরকার যে, রামায়ণে "সমস্ত উত্তরকান্ডটিই প্রক্ষিপ্ত। মূল বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পরই রামায়ণ সমাপ্ত একথা রয়েছে। উত্তরকান্ডটি রামায়ণের অংশ হলে কাব্য হিসাবেও রামায়ণ খর্ব হয়ে যেত।"—একথা ডঃ পি সি ঘোষ 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস'-এ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন।

শক্তিশালী লংকাপুরী ধংস করা পশু বানরদের দ্বারা সম্ভব কিনা সে প্রশ্নও না হয় নাই তুললাম। কিন্তু একথা তো বলতেই হবে যে, কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডের সাক্ষ্য বালী সুগ্রীবদের রোবটরূপের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে বালীকে আর্যপুত্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বালী ভার্যা তারা প্রসিদ্ধ সুন্দরী চন্দ্রবদনা, সুগ্রীব প্রিয়দর্শন, হনুমান বাকপটু। বালীর মৃত্যুর পর স্বয়ং রামচন্দ্র তাঁর হিন্দুমতে ঊর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়াকর্মের আয়োজন করতে বলেছেন। বালীপুত্র অঙ্গদ বিধিপূর্বক

প্রিতার মুখাপিন্ন করেছে। বানরগণকে প্রায়শই ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুগ্রীব বানর বা রোবট, কোনোভাবেই এই দাক্ষিণী বীরদের চিহ্নিত করা হয় নি। কল্পনাকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রসারিত করে আমরা বরং বলতে পারি, বিবর্তনের ধারাবাহী বানরসদৃশ মানুষের একটি বংশ-শাখার স্মৃতি অবলম্বন করে এই দাক্ষিণী বীরেরা হয়ত বানর টোটেমধারী সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁরা স্মরণ চিহ্নস্বরূপ লাঙ্গুল ধারণ করতেন। রামায়ণ মহাভারতের যুগে টোটেমী জাতির অস্তিত্ব ছিল। হনুমান তাঁর বানরাকৃতি ত্যাগ করে মনুষ্যাকৃতি ধারণ করেছেন। হয়ত তা রূপসজ্জারই হেরফের।

হনুমানের শূন্যে উত্থানের ঘটনাগুলিকে কিন্তু শ্রীসিংহ বাস্তবিক চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হনুমানের উত্থানের সঙ্গে রকেট ব্লাস্ট অফের সাদৃশ্যও সুন্দর ধরা পড়েছে তাঁর আলোচনায়। কিন্তু হনুমানকে স্বয়ং রোবট-রকেট না ভেবে রকেটারূঢ় হনুমানের কথা ভাবতে বাধা কোথায়? একই বক্তব্য গরুড় সম্পর্কেও। মায়া সীতা এবং তিলোত্তমাকে বিজ্ঞানীসৃষ্ট রোবট ভাবতে অবশ্য অসুবিধা হয় না।

অসুবিধা হয় যখন লেখক বলেন, দেবতারা এসে মানবহীন পৃথিবীতে কৃত্রিম পরিব্যাপ্তির বা নিউটেশনের সাহায্যে মানুষ সৃষ্টি করলেন। না, দানিকেনও ঠিক বেবাক মনুষ্যহীন পৃথিবীতে মানুষ গড়ার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কথা বলেননি। যতদূর বুঝি, তিনি দেবতাদের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে কিছু কিছু বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টির কথা বলেছেন। তা সম্ভব। প্রজাতক আমরাও সৃষ্টি করছি। কিন্তু গোটা মনুষ্য সমাজই ভিন্‌গ্রহবাসীর সৃষ্টি, বিবর্তনবিরোধী এই বক্তব্য কোনোও দায়িত্বশীল বৈজ্ঞানিক বক্তব্য হিসেবে এখনও আমাদের চিন্তাজগতে আক্রমণ করে নি। বরং পুরাযুগের বুদ্ধিমান মানুষের রেখে-যাওয়া প্রতিবেদন পুরাকথাগুলির পুনর্বিচার করেই আজ আমরা ভিন্‌গ্রহবাসীদের সম্ভাব্য অবতরণের প্রসঙ্গটি ভাবার সুযোগ পেয়েছি। ইজেকিয়েল-দেখা সদাপ্রভুর মহাকাশযানটির বিশ্লেষণের সাফল্যের ওপরেই দানিকেনতত্ত্বের মুখ্য প্রতিষ্ঠা। মনে রাখা দরকার, কল্পনাশ্রয়ী নয়, যতদূর সম্ভব তথ্যাশ্রয়ী আলোচনাই ইতিহাসের নবদিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক। কল্পনাশ্রয়ী আলোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের মত চমক সৃষ্টি করতে পারে, তার দ্বারা লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান করা যায় না।

শ্রীসিংহ দাবি করেছেন, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকার হিসেবে তিনি নাকি আজ বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থের উপসংহারে তিনি সম্ভবত সেই বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প রচনার মেজাজটিই ফিরে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর ঘোষণা, "...মহাভারত, পার্থিব পটভূমিতে ভিন্‌গ্রহী মানুষদের গল্প। পৃথিবীর আদি সায়েন্স ফিকশান। আর আদি সায়েন্স-ফিকশান বা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখক হলেন মহর্ষি বেদব্যাস।"

শ্রীসিংহের নিশ্চয় জানা আছে যে, রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত অনেক বেশি তথ্যবহুল। মহাভারতের তথ্যাবলী থেকে পুরা—ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহযোগ্য বলেও অধুনা ঐতিহাসিকরা বিবেচনা করছেন। ডঃ এইচ সি রায়চৌধুরী পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকের কাল থেকে ইতিহাসের ধারা টেনেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই আজকের চিন্তাবিদগণ বিচার করছেন। প্রসঙ্গত প্রশ্ন জাগে, যে মহাভারত শ্রীসিংহের বিবেচনায়, 'সায়ান্স ফিকশান'; সেই মহাভারতের বনপর্বের ঘটনাবলী নিয়েই তিনি আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখে ফেললেন কেন? অর্জুনের মহাকাশ যাত্রা, হিমালয় স্বর্গের সংরক্ষিত অঞ্চল, সুমেরু ও বদরিকাশ্রম প্রসঙ্গ, মাতলির ও মহাদেবের আকাশযান, হিমালয়ের দেবলোক ইত্যাকার বিষয়গুলি তো তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থকার দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থে ইতিহাসের উপাদান হিসেবেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। দুটি বই-এর এইসব একই প্রসঙ্গ মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে, পূর্ববর্তী গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য শ্রীসিংহ ভিন্ন ভাষায় খুঁটে খুঁটে পুনরুচ্চারণ করেছেন। প্রশ্ন তাই, শ্রীসিংহের মহাভারত সম্পর্কে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত এবং ওপরের আলোচনাগুলি কি পরস্পরবিরোধী হচ্ছে না?

আসলে আগ্রেস্ট বা দানিকেন, কেউই মজাদার চমকপ্রদ বক্তব্য হাজির করে বাজার গরম করার জন্য পরিশ্রম করেন নি। তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের লুপ্ত ইতিহাস সন্ধান করতে চেয়েছেন। একাজ শুধুই পরিশ্রমসাপেক্ষ নয়, একাজ খুবই সাবধানে করতে হয়। তার জন্য চাপল্য নয়, উপযুক্ত চিন্তা গাম্ভীর্যেরও প্রয়োজন। বিশ্বাসযোগ্য উপাদান সংগ্রহ করে তারই ভিত্তিতে পুরাগ্রন্থের পুনর্বিচার করা না হলে এই চিন্তাধারা দিগ্‌ভ্রষ্ট হতে বাধ্য।

শ্রীসিংহের পরিশ্রম কিন্তু উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভাষাতেও আছে গাল্পিকের সরসতা। সে হিসেবে বইটি পড়তে বেশ ভালই লাগে। গ্রন্থের প্রচ্ছদও আকর্ষণীয়। ছাপা বাঁধাই-এ যত্নের ছাপ আছে। এসব কারণে মূল্য পনের টাকা খুব বেশি বলে মনে হয় না।

বীরেন্দ্র মিত্র

রামায়ণ মহাভারতের দেব-গন্ধর্বরা কি ভিন্‌গ্রহবাসী? নিরঞ্জন সিংহ ।। দাম পনের টাকা।। আপনজন ।। ৩৬এ, লেনিন সরণী ।। কলি-১৩।।

কবিতার বই

তুলিতে রঙ ভিজিয়ে একজন ইমপ্রেসনিস্ট চিত্রকরের মতো কখনো সোজা টানে কখনো রূঢ় বৈপরীত্য সৃষ্টি করে একজন তাজা যুবক ক্রমশ রঙে চুবোচুবো ছবি উপহার দেন যখন পাঠককে এবং সে-চিত্র প্রধানত নস্ট্যালজিক মানসিকতার থেকে উদ্‌বুদ্ধ বলেই আমরা অনায়াসে আবিষ্কার করতে পারি হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবারো। কখনো কলকাতাকে চিত্রিত করেছেন এলোপাথাড়ি রঙের বিন্যাসে, কখনো দিসেরগড়, পাণ্ডেত বা সিমলাও ঘুরেফিরে এসেছে চিত্রকল্প পরিস্ফুটনে, কিন্তু সব ছাপিয়ে একজন প্রগলভ মানুষের জীবন-সন্ধিৎসা এবং তার ডায়েরীর মতো দিনলিপি প্রতিভাত হয়ে ওঠে আমাদের সামনে। প্রকৃতিকে চিত্রিত করায় কবির যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা, বহির্পৃথিবীকে তীক্ষ্ণ চোখে অনুধাবন করায় যেমন পারঙ্গম তিনি, তেমনি যে অন্যায় আমাদের সমাজের রন্ধ্রে বিষাক্ত কীটের মতো ক্রমশ চারিয়ে যাচ্ছে তার শিকড়, তার সরব প্রতিবাদেও প্রায়শ মুখর হতে দেখি এই কবিকে। পাকা ঘুষখোর আমলার মতো হাওয়া বা 'তুমি লখিপুরের নষ্ট মেয়েছেলের নিঃশ্বাসে আশীর্বাদের মতো নিজেকে লেপ্টে রাখো স্ফূর্তির টাকায়' কিংবা 'বুড়ো বয়সেও প্রমোদ-তরণীর মধ্যে জ্যাকেলিন কেনেডি' এরকম বিবমিষার সুর প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় তাঁর কবিতায়। কিন্তু এসব বোধ তাঁর কাছে তাৎক্ষণিক মাত্র, বরং তাঁর জীবনবোধ ও তার গভীরতা পাঠককে ভাবায় অনেক। যেমন, 'আমি তোমায় ফিরিয়ে দিতে পারি যা-কিছু দেবার মমতায় মাখা পাপী চোখ
শেষ বৃষ্টি
জননীর কাম' (অন্ধ পদাতিক)
বা 'এই মুহূর্তে আর কেউ নেই
ভ্রষ্ট তাপস কিংবা ক্রীত রমণীর ঠোঁট
গুহাচিত্রে অধিমন্থর নারীর মিথুন মূর্তি
সুবহ পান্থশালা, ধ্বংসাবশেষ
কেউ নেই' (বিষাদের গভীরে)
চিত্রাঙ্কনেও কবির স্বাভাবিক দক্ষতা—'আপন নারীকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করার মতন বিকেলের রোদ অর্জুনগাছের কিশোরী পাতার ফাঁকে জড়িয়ে রয়েছে (পৃথিবী ৭৮)'

হরিজীবনের কবিতার যা ত্রুটি তা হলো কবিতার থিমের গভীরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে হঠাৎ অন্যদিকে বাঁক নিয়ে কবিতাটিকে চুরমার করে ভেঙে ফেলা, সম্ভবত কবির এলোমেলো স্বভাবের জন্য এরকম হয়, এবং এক ছবি আঁকতে আঁকতে ভিন্নতর ছবি আঁকার অদম্য বাসনার ফলশ্রুতিও এটা। না হলে যে-কবি এরকম ছবি আঁকতে পারেন, 'পোড়ে সহমরণে চিতায় সাবিত্রী নারীর মতো ভালোবাসা' (এখানে অবশ্য সাবিত্রী শব্দটি বেমানান), অথবা

দর্শকের অন্যমনস্কতার সুযোগে ম্যাটিনি শোয়ের ফাঁকে দুপুরের/চত্বর অংগুল হুক খুলে দেয় দয়িতার বৈকালিক বুক, সে কবির ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা আস্থা রাখি। প্রণবেশ মাইতির প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জা চমৎকার। ভূমিকা হিসেবে ছাপা একটি কবিতায় কবি বলেছেন, 'আমি যাবার বেলায় পৃথিবীকে অনিঃশেষ ভালোবাসা দিলাম', কিন্তু তাহলে দাম এতো বেশি কেন?

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মদিনে. নীল টেলিগ্রাম : হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনবরত প্রকাশনী, ৩৭২।ড, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড. নাকতলা, কলকাতা—৪৭। দাম পাঁচ টাকা।

কিং আবার 'কুইন'

অজয় বসু

কিং আবার 'কুইন' হলেন।

বয়স বেড়েই চলেছিল। বেলা পড়ে আসছিল। খেলা ছেড়ে দেওয়ার সময় আসন্ন। কোর্ট থেকে পুরোপুরি ছুটি নেওয়ার আগে বিলি জিন কিং তাই বোধহয় নিজেকে আর একবার নতুন করে সকলের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলেন উইম্বলেডন টেনিসে এক নয়া নজির সৃষ্টি করে।

কোন্ নজির? উইম্বলেডনে কুড়িটি বিভাগীয় ফাইনাল জয়ের অনন্য নজির। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৯—দীর্ঘ উনিশ বছরের ফাঁকে বিলি জিন কিং ছ ছবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছেন। দশবার জিতেছেন মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল এবং চারবার মিকসড ডাবলস। জয়যাত্রার শুরু ১৯৬১তে যখন কারেণ হেন্তের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি উইম্বলেডনে মহিলাদের ডাবলস বিভাগটি জয় করেন। সমাপ্তি বোধহয় এবারে। এবারও তিনি ডাবলস ফাইনাল জিতেছেন মার্টিনা নাভরাতিলোভার জুটি হিসেবে। বয়স পঁয়ত্রিশ। বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। এরপর কি আর তাঁকে উইম্বলেডনের আসরে প্রতিযোগিনী রূপে দেখতে পাওয়া যাবে?

তা না যাক, উইম্বলেডন ও সেই সঙ্গে টেনিস খেলার ইতিহাস তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। স্মরণ করবে তাঁর অসাধারণ ক্রীড়াকৃতির এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্যায়নে। বিলি জিন কিং শুধু কোর্টেই সাফল্য লাভ করেন নি। সেই সঙ্গে মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের প্রাপ্য আদায়ে এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের সার্থক নেতৃত্বও করেছেন। তাঁর খ্যাতি [illegible] মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মুক্তি আন্দোলনের নেত্রী হিসেবেও। অনেকে এই আন্দোলনকে উইমেন্স লিবারেশন আন্দোলনের অংশ রূপেও মনে করে থাকেন।
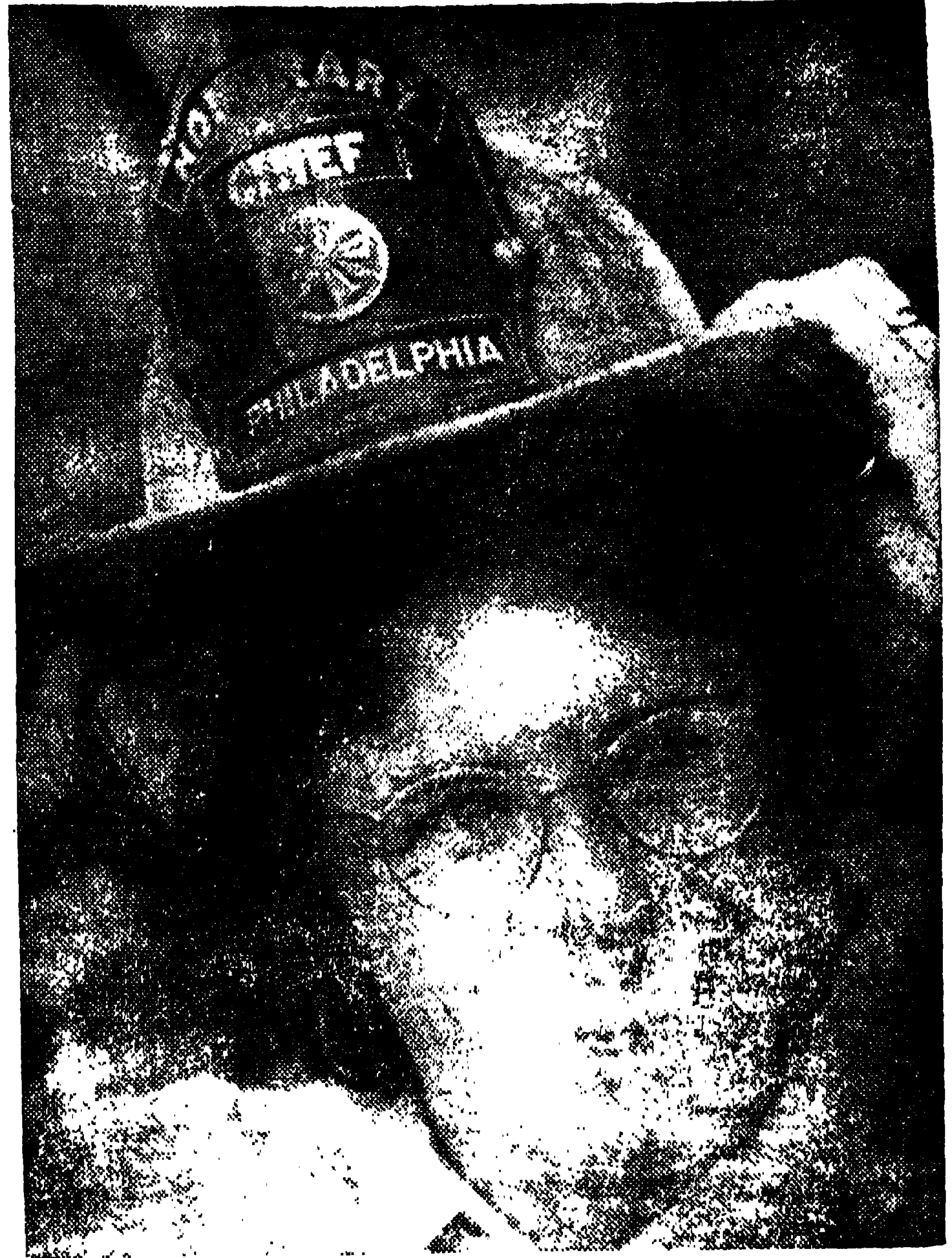
এর আগের রেকর্ড ছিল এলিজাবেথ রায়ানের। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৪র মধ্যে এলিজাবেথ উইম্বলেডনে উনিশবার বিভাগীয় ফাইনাল জিতেছিলেন। তবে প্রতিবারই জুটি প্রতিযোগিতায়। এলিজাবেথ কখনও উইম্বলেডনে সিঙ্গলস ফাইনাল জিততে পারেন নি। বার দুয়েক ফাইনালেও চ্যালেঞ্জ রাউন্ড পর্যন্ত এগিয়েছিলেন, বিলি জিন বাস্তবে এলিজাবেথ রায়ানের হাত থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরানো রেকর্ডটি ছিনিয়ে নেন।

সাতাশী বছর বয়স্কা এলিজাবেথ রায়ান উইম্বলেডনে টেনিস দেখতে এবারেও ইংলন্ডে হাজির ছিলেন। কোর্টের ধারে বিশিষ্ট দর্শকদের আসনে তাঁকে দেখাও গিয়েছিল। বিলি জিন যেদিন তাঁর রেকর্ড [illegible] ঠিক তার আগের দিনে এলিজাবেথ মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলাটি দেখেন। তারপরই হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিলি জিন তাঁর রেকর্ড কেড়ে নিলেন, এলিজাবেথ সেই ঘটনার সাক্ষী সাজতে পারেন নি। পারতেন আর একটি দিন বেঁচে থাকলে। বেঁচে থাকলে এলিজাবেথ কি বিলির কান্ড দেখে খুশি হতেন? হতেন বৈকি। কারণ ১৯৭৫এ বিলি জিন কিং যখন তাঁর উনিশটি খেতাব জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন সেদিন এলিজাবেথ রায়ান স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠেই বলেছিলেন আমার রেকর্ডটি ম্লান হয়ে যাবে আমি জানি। হয়ত আমার জীবিতকালেই। মনে হয়, রেকর্ড ভাঙবেন বিলি জিন কিংই। তাঁর মনোবল অসাধারণ। যাঁদের মনের পুঁজি এমন অপরাজেয় তাঁদেরই আমি সবচেয়ে বেশি করে পছন্দ করি।'

মনের এই সাহসের পুঁজি সম্বল করেই বিলি জিন এলিজাবেথের নজির ডিঙিয়েছেন। সাহস না থাকলে কি আর তিনি পড়ন্ত বেলায় রেকর্ড গড়ার অভিপ্রায়ে দূর মার্কিনমুলুক থেকে

নজির গড়ার আনন্দে বিলি জিন কিং

উইম্বলেডনের আসরে ছুটে আসতেন? এর আগে শেষবারের মত উইম্বলেডনে এক বিভাগ জয় করেছিলেন ১৯৭৫ সালে। পরের তিন বছর নিষ্ফল। তবু বিলি হাল ছেড়ে দেন নি। খেলার ধার কিছুটা কমেছিল। কিন্তু মনের জোরে টান পড়ে নি কোনোদিনই।

মনে ছিল অফুরাণ সাহস। তাই তিনি একদিন টেনিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুলোচুলি সংগ্রাম করেছেন। পেশাদারী টেনিসের প্রবর্তন ঘটলে ছেলেদের বেশি টাকা দেওয়া হোত। মেয়েরা পেতেন অনেক কম। কেন এই বৈষম্য? বিলি জিন প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। পাঁচজনকে জড়ো করে আন্দোলন গড়লেন। দেখতে দেখতে সেই আন্দোলনের সূত্রে মহিলাদের জন্যেও পেশাদারী খেলার স্বতন্ত্র আসর বসল। ভয় পেয়ে কর্তৃপক্ষও শেষ পর্যন্ত বিলিদের দাবি মেনে মহিলাদের পুরস্কারের আর্থিক পরিমাণের হার দিলেন বাড়িয়ে। এমনি করেই বিলি জিন কিং আন্তর্জাতিক টেনিসে এক যুগান্তর ঘটিয়েছেন। মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এক বছরে টেনিস কোর্ট থেকে এক লক্ষ ডলার উপার্জন করেছেন।

বিলির আর কীর্তি পুরুষ বনাম মহিলার দ্বৈরথে মহিলাদের ক্রীড়াগত সামর্থ্যের প্রতিচ্ছবিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরা। প্রাক্তন উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন ববি রিগস একদিন মেয়েদের তাচ্ছিল্য জ্ঞানে বলেছিলেন, ফুঃ! ওরা আবার খেলতে পারে নাকি! পারে তো আমার সঙ্গে একহাত হয়ে যাক না। আমার বয়স এখন পঞ্চান্ন। এই বয়সে আমি ওদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছি। দেখি, কে এগিয়ে আসে।

শুনে বিলি স্থির থাকতে পারেন নি। র‍্যাকেট হাতে নেমে পড়েছিলেন হোস্টন অ্যাস্ট্রোডোমের কোর্টে। বিলির বয়স তখন ঊনত্রিশ। সে খেলার নিষ্পত্তি হয় বিলিরই অনুকূলে খেলায় জিতে বিলি জিন কিং সেদিন লক্ষ ডলার পেয়েছিলেন পুরস্কার-বাবদ। তার চেয়ে বড় কথা, ব্যাটল অব সেকসে তিনি জিতিয়ে দিয়েছিলেন মেয়েদেরই। এই কাজটি করে তুলতে একদিন এগিয়ে এসেছিলেন টেনিসে গ্র্যান্ড স্লামের অধিকারিণী মার্গারেট কোর্ট। কিন্তু মার্গারেট সফল হননি। কাজেই মহিলাদের মান রাখতে বিলি জিনকে কোমর বাঁধতে হয়। এবং তাঁর চেষ্টাতেই মার্গারেটের অসম্পূর্ণ কাজ হয় সম্পূর্ণ ও সম্ভব।

একই বছরে ফরাসী, যুক্তরাষ্ট্রীয় অস্ট্রেলীয় এবং উইম্বলেডন জয় করে মার্গারেট কোর্ট টেনিসে গ্র্যান্ড স্লামের অধিকারিণী হয়েছেন। বিলি জিন অবশ্য এক পঞ্জিকা বর্ষে এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তবু বিশ্ব শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের যে সব স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তারই বা তুলনা কোথায়!

কুড়িটি খেতাব জয় করা তো এক অনন্য নজির। তাছাড়া উইম্বলেডনের একক বিভাগে ছবারের সাফল্যের দৃষ্টান্তটিও তো কম উল্লেখযোগ্য নয়। এমন কৃতিত্ব আর কজন মহিলা দেখাতে পেরেছেন? বড়জোর দুজন। ফ্রান্সের মাদাম সুজেন লেগলেন ও বিলি জিনের স্বদেশ আমেরিকার প্রতিনিধি হেলেন উইলস মুডি। সুজেন বিলির মত ছবার এবং হেলেন বাড়তি আরও দুবার অর্থাৎ মোট আটবার উইম্বলেডনে একক বিভাগ জয় করেছেন। অনেকের ধারণা, বিবাহিত জীবন ও ঘর-সংসারের দায়িত্ব ভারবহ হয়ে বিলির কাঁধে চেপে না বসলে এবং সত্তরের দশকে তাঁর পায়ে বড় রকমের এক অস্ত্রোপচার না করা হলে বিলি হয়ত হেলেন উইলস মুডির সিঙ্গলস জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করতে পারতেন।

বিলি জিন কিং উইম্বলেডনে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন দুবার পরপর তিন বছর করে—১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ এবং ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩। তাছাড়া সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিকস্ড ডাবলস, এক আসরে ত্রি-মুকুট পাওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দুবার, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩এ। শুধু উইম্বলেডনে সাফল্যের কথা মনে রাখলেই বিলি জিনকে অসংকোচে সর্বকালের সেরা মহিলা খেলোয়াড়দের অন্যতমা বলে অভিহিত করা যায়। তার ওপর বিশ্বের প্রথম সারির নানান প্রতিযোগিতায় এবং পেশাদারী আসরে তাঁর সাফল্যের আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে।

মাথায় খাটো। আকৃতিতে এতটুকু। দৃশ্যতঃ তিনি মার্টিনা নাভরাতিলোভা বা মার্গারেট কোর্টের মত শক্তিময়ী নন। তবু জিন একালের পাওয়ার টেনিসে ছায়ায় মানানসই হয়ে থাকতে পিছিয়ে পড়েন নি। বেস-লাইন থেকে জালের ধারে সরে আসতে ছোটাছুটি করায় তাঁর ক্লান্তি নেই। এমন ক্ষিপ্রতা মহিলা মহলে প্রায় বিরল। সার্ভিস ও ভলিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর খেলার মূল মেজাজ পুরুষদের ক্রীড়াধারার অনুসারী। তার চেয়ে বড় সম্পদ তাঁর লড়িয়ে মেজাজ। হার না-মানা অঙ্গীকার।

এই মেজাজের তালিকাতেই তিনি গোটা পুরুষ সমাজের সঙ্গে একদিন একার হাতে লড়াই চালিয়ে গেছেন। এবং জয়যুক্ত হয়েছেন বলেই টেনিস ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। বিলি জিন কিং একটি যুগের সূচনা করিয়েছেন। সমকাল ও উত্তরকালের খেলোয়াড়ের তাঁরই কর্মকাণ্ডের পুণ্যফল ভোগ করছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। বিলি জিনের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নেই।

মদন মন্ডলের 'বারথ'

কলেজ অব ভিস্যুয়াল আর্ট

কলেজ অব ভিস্যুয়াল আর্টের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল বিড়লা এ্যাকাডেমীতে ৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর। বিভিন্ন মিডিয়ামে করা ৩৫জন শিল্পীর ১৫৫টি কাজ কমবেশী হলেও খুবই সমকালীন। আশা করি ভবিষ্যতে এরা এদের শিক্ষক শ্রীশুভাপ্রসন্নের একক চেষ্টা ও সাহায্যের যথার্থ মূল্য দিতে পারবে। প্রদর্শনীটি যে নবীন উৎসাহের উৎসব সে বিষয়ে নিন্দার ফাঁক নেই।

প্রদর্শনীটিতে যেসব কাজ প্রশংসার দাবি রাখে তাদের মধ্যে অলোক সর্দারের করা তেল রং-এ বলিষ্ঠ স্কেচ দুটি এবং মাটিতে পড়ে থাকা পুতুলের কম্পোজিসনটি। অশোক মল্লিকের তেল রং-এ স্টিল লাইফ, 'সিটি স্কেপ' এবং ফিগার ড্রইংদুটি আকর্ষণীয়, শেষ দুটি জোরালোও। জলরং-এ যাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে চঞ্চল মন্ডলের কালিম্পং-এর বড় কাজটি, একই জায়গার সোমনাথ রায়, স্বপন রায়ের কাজদুটি এবং শেখর রায়ের নৈসর্গিক দৃশ্যটি। এর 'তেলরং'-এ আফটার প্লে ছবিটিও বেশ ভাবায়। এছাড়া বাণা রায়ের ফিগার স্কেচ, দেবজ্যোতি ঘোষের 'আফটার ফ্লাড', ছবিদুটি আকর্ষণীয়, দ্বিতীয়টি নতুনও। দেবাশিস সেনগুপ্তের 'চ্যারিয়ট', 'যুবকের পোর্ট্রেট', গোপাল দাসের চেস বোর্ড (টেম্পারা), মদন মন্ডলের 'বারথ', 'মাসক ১' এবং সন্দীপ দাসের 'বন্ডেজ', মনোক্রমে নৈসর্গিক দৃশ্য—এই ছবিগুলি প্রদর্শনীর মান উন্নত করতে বেশ সাহায্য করেছে। দেবদত্ত দেব, তনুজা মুখার্জি, সোমনাথ সিনহা প্রত্যেকের তেল রং-এর স্কেচগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিণত মেজাজের পরিচয় দেয়। প্রণব ফৌজদারের

কোলাজ (কালিম্পং), 'মাই সেলফ' এবং শ্যাম বড়ঠাকুরের হুইল চেয়ার ছবিটিও পরিণত মানসিকতা ও চিন্তাধারার পরিচায়ক। প্রদর্শনীতে একমাত্র লোকচিত্রের গল্প পাওয়া যায় জয়া বর্মনের কাজে। এর 'কোরোনেশন', 'পেন এন্ড ইংক' ড্রইংটি এবং শিপ্রা ঘোষের ইনোসেন্ট, হোইট বোর্ড' ছবিদুটি প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। দ্বিতীয় জনের লিনোকার্ড দুটিও বেশ ভাল।

এদের অনেকগুলি ছবিই বিক্রী হয়েছে। [illegible]লীতে আগামী ডিসেম্বরের প্রদর্শনী যে সাফল্যমন্ডিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চন্দন নন্দীর ছবি

দেখলে মনে হয় অসমীয়া। লাজুক, মিষ্টি, কবি-স্বভাবের ছেলে চন্দন। চন্দন নন্দী। কলকাতায় আর্ট কলেজে পড়েছে। এখন নিজেই পড়ায় ডিগবয়ের একটি স্কুলে। কলকাতায় গত বছর একক ও যৌথ প্রদর্শনী করে গেছে। আবার এসেছিলো কলকাতায় ওর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী উপলক্ষে। ২৩-২৯ জুলাই ওর প্রদর্শনী অ্যাকাডেমীর সামনের গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হল।

প্রদর্শনীতে ওর সঙ্গে টুকিটাকি কথা হচ্ছিলো। সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করায় বললো : আমাদের ওদিকে কাজচলা-গোছের রঙ পাওয়াও মুশকিল। গৌহাটিতে আসলে কিছু মেলে। কিন্তু সেও সুবিধের নয়। বিশেষ করে তেলরঙ। কলকাতায় প্রদর্শনী করতে এলে তাই রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হয়।' ওর কথা শুনে মনে হল যেসব দেশীয় প্রতিষ্ঠান শিল্পীদের আঁকার রং তৈরি করেন তাঁদের উচিত সরবরাহ ব্যবস্থাটিকে আরো উন্নত করা। শিল্পীরা নিজেরাও একটা সমবায়ের মত কিছু করতে পারেন। তাতে তাঁরাও উপকৃত হবেন।

চন্দনের দ্বিতীয় বক্তব্য : 'তেলরঙে ছবি এ'কেই বা কি লাভ? বিশেষ করে আমরা যেখানে থাকি সেখানে। রঙের প্রলেপ অল্পদিনেই ফেটে যায়। আমি বললাম, সেটা মূলতঃ আবহাওয়ার জন্যই। তবে রঙ লেপাবার পদ্ধতি অনেকের ত্রুটিপূর্ণ হওয়াতেও এমনটি হতে দেখেছি। সব শুনে চন্দন বললো : 'অবশ্য আশা ছাড়িনি। কলকাতা থেকে এবার কিছু রঙ নিয়ে যাবো।' বললাম, ভালো কথা।

এবারে কাজ খুব বেশী ছিল না। জলরঙ, কোলাজ ও মিশ্রমাধ্যম সব মিলিয়ে গোটা বারো। তাতে পুরনো গুটিকয় ছবিও ছিলো। চন্দনের ছবি এক বছরে কিছুটা পাল্টেছে। বদলেছে ভাবনার গড়নও। ভঙ্গীতে তাই এসেছে কিছুটা ত্যারছা ভাব। সহজভাবে না বলে একটু ঘুরিয়ে বা বেঁকিয়ে চরিয়ে ভাবনাকে মুক্তি দেবার প্রবণতা। এই জটিলমনস্কতাই সাম্প্রতিক আধুনিকতার লক্ষণ। সেই বিচারে চন্দনও আর কিছু দিনের মধ্যেই পুরোদস্তুর আধুনিক হয়ে উঠবে বলেই আমাদের ধারণা। কোলাজগুলিতে দেখলাম ভয়ার্ত, ব্যাকুল, সন্দিগ্ধ নরনারীর মুখ। কখনও একটি, কখনও দুটি। বড় বড় চোখ তাদের। দৃষ্টিতে আদিম বিবিক্ততা। উদাস, অন্যমনস্কভাবে প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ করছে। বেশীর ভাগ কাজেই চাঁদ এসেছে। জ্যোতিষে চন্দ্রকে হৃদয়স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়। চন্দনের ছবিতে চাঁদের অনিবার্য উপস্থিতির তাৎপর্য পুরোপুরি মালুম হল না। কিছুটা যেন ছবির নির্মাণে সাহায্য করার জন্যই তাদের আবির্ভাব। জলরঙের কাজে পুরু কাগজে রঙ ছেড়ে শুকিয়ে নিয়ে তারপর কলম বা সরু ছুরির আঁচড় কেটে নকশা করা হয়েছে। 'মুক্তি' এই প্রক্রিয়ায় করা। এবং কাজটি উৎরেছে। হলুদ, নীল, বাদামী জমির ওপর কালো হালকা রেখায় কয়েকটি পানোন্মত্ত হুল্লোড় যুবক-যুবতীর আভাস দিয়ে দেখানো হয়েছে। কিভাবে তাদের আত্মা মোক্ষের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে! ছবিতে শ্লেষের সঙ্গে মিলেছে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্য। কোলাজের মধ্যে ভালো লেগেছে 'হারানো চাঁদে'।

চন্দনের শুধু একটা কথা মনে রাখা দরকার। নিজের ভাবনার ওপর ছবিকে দাঁড় করাতে গেলে দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে করণকৌশল রপ্ত করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়াতে হবে দৃষ্টি ও বোধের গভীরতা। প্রিমিটিভ ফিগার এঁকে সম্প্রতি সস্তায় নাম কেনার যে সর্বনেশে হিড়িক পড়েছে, তার থেকে দূরে থাকা একান্তই দরকার।

স্বরাজ মজুমদার

চিত্রধ্বনি

সুখী পরিবারের ছবি

'খানদান' ছবি এক সুখী পরিবারের বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী। বাধাবিপত্তির অংশটি বেশ স্নায়ুপীড়াদায়ক, উত্তাল নদীর বুকে কালবৈশাখীর ঝড় যেন। সজ্জন পিতার চুরি, সন্তান কর্তৃক পিতার অপরাধভার গ্রহণ এবং কারাবাস, প্রেমিকার বিবাহের উপক্রম, মায়ের দুঃখভোগ ও নায়িকার মনকষ্ট। মাতৃপ্রেমে বলীয়ান কাণ্ডারী জীতেন্দ্র অবশেষে শক্তহাতে হাল ধরে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছয়। পরিবার মধুময় হয়ে ওঠে। খাঁটি ভারতীয় আদর্শানুযায়ী পরিবারের নিখুঁত চিত্রটি প্রায় গঠিত হয়েছে। সমানা কয়েকটি ক্ষেত্রে তা ব্যাহত, সেগুলি নিম্নরূপ :

(ক) অতি রঙিন বেশভূষার নায়িকা সুলক্ষণার বিদেশিনীদের মতো সোনালী কেশদাম।

(খ) অর্ধসমাপ্ত বাড়ির তিনতলার নায়ক জিতেন্দ্র ও সহনায়িকা বিন্দিয়ার নৃত্যগীত।

(গ) নায়ক কর্তৃক কুচক্রীদাদা সুজিতকুমারকে অতিঅল্প প্রহার।

(ঘ) বোম্বাইয়ের রোমাঞ্চকর কলেজ।

অধুনা লাস্যানৃত্য, হিংস্রতা ও কামবিহীন চলচ্চিত্রের প্রচলিত বিশেষণ 'পরিচ্ছন্ন'। পরিচালক অনিল গাঙ্গুলি পরিবারের মোহময় ভূমিকা স্মরণে রেখেছেন, তদুপরি চিত্রনাট্যকারকৃত রসঘন সংলাপ ছবির 'পরিচ্ছন্নতা' অটুট রাখতে সাহায্য করেছে। বিশেষত জগজ্জননীবেশী নিরূপা রায়ের অশ্রুসজল অভিনয়, যথা সন্তানের সন্ধানে পাগলিনীপ্রায় মা ছুটে চলেছেন গ্রামের পথে পথে অথবা শেষদৃশ্যে প্রেমময়ী, আনন্দময়ীরূপে তাঁর আবির্ভাব রামপ্রসাদী মনে করায়—'মা হওয়া কি মুখের কথা'। অন্যপক্ষে বৌদিবেশী বিন্দুর অভিনয়ে ফুটে উঠেছে মমতাবিহীন কুটিলতা। তাঁকে বড় ক্রুর লেগেছে।

ইণ্ডিয়ান রবিনহুড

মিঃ নটবরলাল ভারতীয় রবিনহুড। সাফারি স্যুট পরা, হীরে চোরাকারবারী আমজাদ খানের বিরুদ্ধে নায়ক, নটবরলাল নিপীড়িত গ্রামবাসীর নেতৃত্ব দিয়েছে। সে গরীবমানুষদের জন্য বড়লোকের 'দৌলত' চুরিও করেছে বহুবার। সে অমিতাভ বচ্চন। অতএব ঐ মনোরম পাহাড়ের আউটডোরে কেন টাঙানো ছিল সুর্যাস্ত সমেত একটি ব্যাকড্রপ বা রাকেশকুমারের চিত্রনাট্যটি অসঙ্গত—এ হেন সমালোচনায় ছবির কিছু যাবে আসবে না। রবিনহুড প্রভাবিত গল্প ভারতীয় জনগণের প্রিয় বিষয়।

অন্যান্য আরও কয়েকটি হিন্দী ছবির মতো এই ছবিতেও এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। গোটা ছবির অবাস্তবতা এবং স্থূলে আঙ্গিকের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু খাঁটি চলচ্চিত্রের স্বাদ। উদাহরণস্বরূপ, ছবির একেবারে শুরুতে, নেপথ্যে নায়কের একটানা অফ ভয়েস, শ্লথভাবে এগিয়ে যাওয়া কাহিনীসূত্র, গুটিকয়েক স্টিল—সব মিলিয়ে অতি নিস্পৃহভঙ্গী থ্রিলারের টেনশানটা সার্থকভাবে ধরে রেখেছে। এটা যিনি করলেন, পরিচালক রাকেশকুমার এই একই ছবিতে স্বাস্থ্যবান বাঘের সঙ্গে নায়িকা রেখার মল্লযুদ্ধ দেখান। বাঘ সামনের পায়ের থাবার আঘাতে এমনকি বাইসনের কলারবোন পর্যন্ত ভেঙে দিতে পারে। এই তথ্যটির জন্য ভারতবাসীর 'জিম করবেট' পড়ার দরকার হয় না। তথ্যটি পরিচালক তো জানেনই, সমগ্র দর্শকমন্ডলীও জানেন। অথচ দৃশ্যটি তোলা হয়েছে। আবার ছবিতে, একটি যিশুর কি দেয়ালের মতো প্রায় উড়ন্ত মোটরবাইক যেভাবে ভিলেন তাড়া করেছে—তা দেখে কেউ বিব্রত বোধ করলে, তাকে অনুরোধ করব অমিতাভের চোখজোড়ার বিশাল

ক্লোজআপটি অথবা ছবির মধ্যে ক্ষণিকের জন অমিতাভেরই 'অ্যান্টি-হিরো' কায়দায় অভিনয় লক্ষ্য করতে, যেখানে সে তার লম্বা পাগুলোকে ইচ্ছে করে বকের মতো ফেলে হাঁটে, শক্তিশালী গুন্ডার হাতে বেদম মার খায়, মুখ বিকৃত করে গ্ল্যামার নষ্ট করার চেষ্টা করে, পাশাপাশি একলাফে চারতলা উঁচু গাছে ওঠে। একে সহাবস্থান বলে। এই সহাবস্থান ছবি দেখার মজা জমিয়ে তোলে, সেখানে সবচেয়ে করুণা-উদ্রেককারী ভূমিকা সমালোচকের।

পুষণ গুপ্ত

ছবির খবর

প্রতি বছর টালিগঞ্জে আমরা তিন-চারজন নতুন পরিচালকের দেখা পাই এবং বছর শেষে তাঁদের অনেকেই আবার হারিয়ে যান। কারণ এঁদের অনেকেরই নেই সৃষ্টির ক্ষমতা, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, গভীর জীবনবোধ। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে বাংলা ছবির ব্যবসায়ের কুচক্র।

সম্প্রতি একজন নতুন পরিচালকের সঙ্গে দেখা হল—যিনি এই ফিল্মী কুচক্রী আবহাওয়ার কথা জানেন, যাঁর চোখে রয়েছে প্রত্যয়ের ইঙ্গিত, সৃষ্টির তাগিদ। তাঁর নাম—মনোজ ঘোষ, হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা কিছু নেই বটে, কিন্তু বাংলা ফিল্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নাকি প্রায় বিশ বছরের। কয়েক বছর আগে 'অসামাজিক' নামে একটি ছবি শুরু করেছিলেন, শেষ করতে পারেননি। সেই হার্ডল পেরিয়ে এখন আবার ছবি করার কথা ভাবছেন তিনি, নিজেরই গল্প চিত্রনাট্য নিয়ে নতুন ছবির কাগুজে কাজ শেষ। টাকার ব্যবস্থা হয়েছে বন্ধুর সহযোগিতায়।

সুতরাং বন্ধুকে টাকা ফেরৎ দেবার কর্তব্যটা বর্তেছে মনোজবাবুর ওপর। সেজনাই বুঝি তিনি বললেন— 'মলি' একদিকে যেমন কমার্শিয়াল ছবি হবে, তেমনি ছবিটাকে ডাইরেকটরস ফিল্মও বলতে পারেন।

মনোজ ঘোষ এই ছবিতে তনুশ্রী-শংকর, সন্তু মুখার্জি সমিত ভঞ্জ, প্রদীপ মুখার্জি, মঞ্জু চক্রবর্তী, দিলীপ রায়ের মত তরতাজা মুখ নিয়েছেন। বলেছেন ত্রিকোণ প্রেমের গল্পের মধ্যেও রাজনৈতিক বক্তব্য অনুপস্থিত থাকবে না। মনোজবাবু জানালেন—নিজের মনোমত ছবি করতে গেলেও আগে নিজের যোগ্যতা ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেজন্যই এই মলি ছবির আয়োজন। অসমাপ্ত 'অসামাজিক' আবার ফ্লোরে উঠতে পারে যে কোনদিন।

যাত্রিক গোষ্ঠীর অবস্থা গত কয়েক বছর খারাপ যাচ্ছে। কোয়ালিটি ফিল্ম করতে পারছেন না, ব্যবসাও করছে না যাত্রিকের ছবি। সম্ভবতঃ সেই কারণেই কয়েক মাস নীরব ছিলেন যাত্রিক।

মানসিক প্রস্তুতির পর আবার ফিরে আসছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। একটা নয়, (একাধিক ছবির পরিকল্পনা এখন তাঁদের হাতে। ফ্লোরে এখন কাজ চলছে অনামি একটি ছবির। প্রশান্ত চৌধুরীর গল্প। অভিনয় করছেন সৌমিত্র, রঞ্জিৎ, সুমিত্রা, লিলি চক্রবর্তী।

পরবর্তী ছবিগুলি সম্পর্কে যাত্রিক গোষ্ঠীর প্রধান দিলীপ মুখার্জি খুব সরব না হলেও জানা গেছে প্রফুল্ল রায়ের দুটি গল্পের চিত্রনাট্য আপাতত রেডি। প্রায়ই শোনা যায় বাংলা ছবির অসাফল্যের প্রধান কারণ নাকি কাহিনীর দুর্বলতা। প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী সম্পর্কে এই অভিযোগ নিশ্চয়ই টিঁকবে না। সুতরাং যাত্রিক আশা করছেন ওদের আগামী দুটি ছবি একাকী অরণ্যে এবং 'মানুষের জন্যে' দর্শকদের হতাশ করবে না। যাত্রিক কোয়ালিটি ফিল্ম তৈরিতে ব্যস্ত হোন—সেটাই আমরা চাই।

কিছুদিন আগে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর বাংলা ছবির সাহায্যের জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে চলেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। শুধু অনুদান নয়, ছোটদের জন্য অল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র, ডকুমেন্টারি ছবি, রঙিন ফিল্মের ল্যাবরেটরি, স্টুডিও কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন, বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী, ইত্যাকার বিষয়গুলো সেই বিবরণে স্থান পেয়েছে।

প্রথমেই বলে রাখি এবার রাজ্য সরকার উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারেননি। বলা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যোগ্যপাত্রে হাত উপুড় করা হয়েছে। একমাত্র বিতর্ক উঠতে পারে লেকটাউনে রঙিন ফিল্মের ল্যাবরেটরিটি নিয়ে। টালিগঞ্জ পাড়া যখন বাংলা ছবির কেন্দ্র, স্টুডিওগুলো যখন একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত, তখন ফিল্ম ল্যাবরেটরিকে পনের মাইল দূরে তৈরির কি কারণ থাকতে পারে? জায়গার অভাব? না, তাও নয়, টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় অঢেল জায়গা আছে।

এবছর অনুদান প্রাপকদের মধ্যে আছেন অমল দত্ত, অমল সরকার, নীতিশ মুখার্জি, মঞ্জু দে, যাত্রিক, জ্ঞানেশ মুখার্জি, অগ্রগামী, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। সরকার সরাসরি ছবি করাবেন বিজয়া মুলে (রঙিন পাপেট), শান্তি চৌধুরীকে (শ্রমজীবি মানুষদের নিয়ে) দিয়ে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত করবেন একটি সায়েন্স ফিকশন, কর্ণাটকের পট্টভিরাম রেড্ডি করবেন 'ডাকঘর', 'মেঘের খেলা' করবেন মোহিত চ্যাটার্জি, পূর্ণেন্দু পত্রীকে দিয়ে করানো হবে 'ক্ষীরের পুতুল', শঙ্কর ভট্টাচার্য করবেন 'তোতাকাহিনী', 'ছেলেটা' তৈরি করবেন রণজিৎ ঘোষাল।

এছাড়া এম-এস সথ্যু 'জীবনের সন্ধানে যৌবন' বিষয়টিকে নিয়ে যে কাহিনীচিত্রটি করতে চলেছেন তার বেশির ভাগ খরচই বহন করবেন রাজ্য সরকার। শ্যাম বেনেগাল পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করতে

কৃষ্ণপক্ষে সুপ্রিয়া

শিগগির আসবেন কলকাতায়। প্রযোজক রাজ্য সরকারের এই তথ্য ও সংস্কৃতিক দপ্তর। সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' তো এখন ফ্লোরে। কাজ চলছে পুরোদমে।

উপরন্তু কয়েকটি জ্বলন্ত সামাজিক বিষয় নিয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রের কথাও ভাবছেন রাজ্য সরকার। কাকে দিয়ে করাবেন, তা এখনও স্থির হয়নি। বিষয়গুলি হল—স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, পশ্চিম বাংলার ভূমি সমস্যা, শিক্ষার সংকট, নেপালী কবি ভানুভক্ত, পশ্চিম বাংলার মুসলিম সমাজ, রবীন্দ্রসংগীত ও পশ্চিম বাংলার পুরাতত্ব। শোনা যাচ্ছে, শীর্ষেন্দু মুখার্জির গল্প 'বন্দুকবাজ'কেও চিত্রায়ণের কথা ভাবছেন সরকার।

অর্থাৎ টালিগঞ্জ পা[illegible] শুধু নয়, বিবাদী বাগের ঐ লাল বাড়িটাতেও লেগেছে ফিল্মের হাওয়া। সুস্থ সৎ রুচিপূর্ণ ছবির পরিবেশ তৈরির জন্য সার্বিক চেষ্টা করছেন রাজ্য সরকার, এরপর যদি বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী ও কলকাতা শহরে তিনটে হলের মালিকানা নিয়ে নিতে পারেন, তাহলে বাংলা ছবির জগতে বিরাট বিপ্লব আসা অসম্ভব নয়।

*

গত বছরের পাওয়া টাকা নিয়ে যেখানে এখনও দু-একজন পরিচালক ছবি শুরু করতেই পারেননি, অনেকেই খুব কম কাজ করেছেন, সেখানে উৎপলেন্দু চক্রবর্তী এবছর টাকা পাবার খবর পেয়েই শুরু করে দিয়েছেন ছবির কাজ। নাম 'ময়না তদন্ত'। কিছুদিন আগে টেকনিসিয়ানস স্টুডিওর স্কোরিং ঘরে প্রতিমা ব্যানার্জির গলায় গান রেকর্ড করলেন উৎপলবাবু, তিনি এ-ছবির পরিচালক শুধু নন, কাহিনী-চিত্রনাট্যকার ও সংগীত পরিচালকও বটে।

এ-ছবিতে একদল নাটকের লোকজন নিয়ে কাজ করবেন তিনি। জনপ্রিয় কয়েকটি নাম হল নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত (থিয়েটার কমিউন), মনোজ মিত্র (সুন্দরম), অলোক দত্ত (চেতনা), চন্দন সেনগুপ্ত, ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি (শূদ্রক), নন্দিতা রায় চৌধুরী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (নান্দীকার), মাণিক রায়চৌধুরী (থিয়েটার ওয়ার্কশপ) ও মালবিকা চক্রবর্তী।

উৎপলেন্দু ছাড়া অনুদানপ্রাপ্ত (গত [illegible]) আরও একটি ছবির কাজ সম্প্রতি শুরু হল। নাম 'অরণ্যবহ্নি'। কাহিনী তারাশঙ্করের। নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওর মহরতের দিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন মৃণাল মুখার্জি। বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিতে এই কাহিনীর বিস্তার। পরিচালক অশোক দাশ জানিয়েছেন প্রায় সব নতুন মুখ নিয়ে তিনি কাজ করবেন, সেপ্টেম্বর-অকটোবরে আউট-ডোরে টানা কাজ আছে।

*

এতদিন বাদে পার্থপ্রতিম চৌধুরীকে আবার দেখলাম উচ্ছ্বল মূর্তিতে। সেদিন রিৎজ হোটেলের একটি ঘরে বসেছিল সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আসর। তিনি ছিলেন মধ্যমণি। উপলক্ষ ছিল নতুন ছবির শুভ সূচনা। প্রযোজক শুক্লা কানুনগো আর রতন সাই জানালেন তাঁদের প্রথম ছবি 'ইতি তোমার'এর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। স্বামী-স্ত্রীর মানসিক টানাপোড়েন নিয়ে তিনি নাকি সুন্দর স্ক্রিপ্ট লিখেছেন। অভিনয় করবেন শর্মিলা ঠাকুর, দীপঙ্কর দে আর উত্তমকুমার।

পার্থপ্রতিম ইতিমধ্যে পুরনো দুটো ছবির কাজ নাকি প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। পূর্বতন রাজ্য সরকারের মঞ্জুর করা টাকা নিয়ে তিনি এখন 'কৃষ্ণপক্ষ'র কাজ কর-[illegible]। অপর্ণা, সুপ্রিয়া, অর্জুন মুখার্জি-দের নিয়ে বেশ কয়েকদিন কাজও করে ফেলেছেন। আবার এই মাসে বসাবেন। 'নাগরিক' ছবিটির নাম বদল হয়েছে। নতুন নাম 'ক্যানভাস'। এ-ছবিরও কাজ শেষ।

নির্মল ধর

পাপপুণ্য

বাংলা থিয়েটারের মানচিত্রে 'নান্দীমুখ' একটি নবীন নাম, যদিও তার নির্দেশক 'অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়' দর্শকদের অতি-পরিচিত। পরিচিত-এর আরো দু-একটি নাম যেমন রঞ্জিত চক্রবর্তী, বীণা মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ তপাদার। এক সময় এ'রা সবাই নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীতে ছিলেন। সেই সূত্রে দর্শকদের সঙ্গে এ'দের পরিচয়। নান্দীকার-এর বর্তমান পর্বের ভাঙনের ফলে উত্তরফল নান্দীমুখ-এ এ'দের আবার দেখতে পেয়ে ভালো লাগল।

নান্দীকার-এর সময় থেকেই বিদেশী নাটকের রূপান্তরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝোঁক স্পষ্ট বোঝা যায়। নান্দীমুখ-এ এসেও সে প্রবণতার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি দেখা যাচ্ছে। 'নান্দীমুখ'-এর বর্তমান প্রযোজনা 'পাপপুণ্য' তার প্রমাণ। লিও টলস্টয় রচিত নাটকের ইংরাজি অনুবাদ 'দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস' অনুসরণে এই নাটকটির বিন্যাস। বাংলা রূপান্তর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাধারণভাবে বিদেশী নাটকের ব্যাপকহারে রূপান্তর বা অনুবাদ আমাদের থিয়েটারের পক্ষে লাভজনক কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এই পরিসরে নেই। তবে বর্তমান নাটকটি বাংলা মঞ্চের একটি মূল্যবান প্রযোজনা, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নাটকটির কাহিনী বিন্যাসের চরিত্র অবশ্য আমাদের দেশের মাটিতে, জল-হাওয়ায় খুব একটা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যে লিখে-ছিলেন, 'আমাদের দেশ পুজো-মানতের দেশ, স্বীকারোক্তির দেশ নয়' সে কথা এই অনুষঙ্গে পুরোপুরি সত্য। বিশেষত আমাদের যে গ্রামীণ জীবনে এর ভিত তৈরি করা হয়েছে, সে জীবনে টলস্টয়ের দর্শন মেলানো যায় কি? অবশ্য নাটকটির প্রচ্ছদের কাহিনীটুকু বাদ দিলে, অন্তরাল-বর্তী অপরাধ চরিত্রের যে সন্ধান পাওয়া যায়, পাপের যে অনিবার্য আকর্ষণ উপলব্ধি করা যায়, তা সব সময় সব দেশেই অপরিবর্তিত। সেই টান, নিষ্ঠুর উলঙ্গ সত্যের মতো অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ফুটে উঠেছে।

শুরু থেকেই এর নিরাবরণ মঞ্চ-সজ্জায় এক নির্লজ্জ ইঙ্গিত ছিল। আবহের ক্লান্ত সুরে 'যাব, যাব গো আমি তোমার সঙ্গে যাব' ঘোষণা এক একটি বিরতির পর ক্রমেই আরো অসহায় অনিবার্য পরিণতির খাদের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। অবৈধ সন্তানকে হত্যা করার পরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাওয়ার উপরে ছটফটানি দর্শককে যেন মাটির সঙ্গে প্রোথিত করে রাখে। এবং শেষ দৃশ্যের স্বীকারোক্তি আমাদের সমাজ-জীবনে যতই অবাস্তব হোক, নাটকের যুক্তিতে অভিনেতা তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যান।

এই নাটকের সংলাপে যে আঞ্চলিক ভাষার আদল ব্যবহার করা হয়েছে, অজিতেশ তাতে সিদ্ধকণ্ঠ। অন্যান্যরাও শিক্ষাগুণে সেই ভাষা, চলাফেরাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। বাস্তব নাটকের দৃশ্যমান অংশে উচ্চগ্রামের তীব্র অভিনয় এবং ভেতরের অতলস্পর্শী টানের মধ্যে নাটকটি দাঁড়িয়ে থাকে। এর অভিনয়সম্পদ, দলগত ও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য সবই বাংলা মঞ্চে এক ঈর্ষণীয় মাত্রা যোগ করে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিতাই' তাঁর লাম্পট্য থেকে হাহাকার অবধি, আগাগোড়া এক শিল্পাল পুরুষের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার ইতিবৃত্ত হয়ে মঞ্চে অবস্থান করে। আদরিণী চরিত্রে 'সপ্তম জেয় হাটার ভাঁড়', 'বীণা মুখোপাধ্যায়'-এর (অন্নপূর্ণা), সঙ্গে ঝগড়ার দৃশ্য বহুদিন দর্শক ভুলতে পারবেন না। বীণা মুখোপাধ্যায়ও সম্ভবত তাঁর অভিনয় জীবনে এই ভূমিকাটিতে সবচেয়ে সার্থক। 'রঞ্জিত চক্রবর্তীর পরান মাহাতো বা 'রাধারমন তপাদারে'র মিতন অবশ্য তাঁদের পুরনো অনুশীলনেরই ফসল, তেমন কোন নতুন মাত্রা আবিষ্কার করেনি, কিন্তু 'সুমিতা মালাকার' সৃষ্ট কিশোরী 'নুনার' চরিত্রটি আশ্চর্য সতেজ। তার দুলে দুলে বই পড়ার দৃশ্যটির গতানু-গতিক মঞ্চপ্রয়োগ যদিও সংস্কারের অপেক্ষা রাখে, তবে সেটা নির্দেশকের দায়িত্ব। গীতা দাস বা দীপা সরকার ঈষৎ অস্বচ্ছন্দ হলেও প্রতিবেশিনীর অনির্দিষ্ট ভূমিকায় মানিয়ে যান। অভিনয় প্রসঙ্গে 'অজিতেশ' ও 'সন্ধ্যা' র নামের পাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকে কেবল আর একটি নাম, 'শ্যামলী ঘোষ,' যে রকম ঠান্ডা মাথায় তিনি খুন করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, পাপ গোপনের আয়োজন কর-ছিলেন তা এতো দূর বিশ্বাস্য অভিনয় যে রক্ত হিম হয়ে যায়। তাঁর কুটিল স্বভাব মিশি-খাওয়া দাঁতের হাসির আড়ালে যে ভাবে ঢাকা থাকে তা অসা-মান্য। নির্দেশককেও ধন্যবাদ এই অসা-ধারণ টাইপটি কল্পনা করার জন্য।

রাধারমন তপাদারের মঞ্চরূপের কথা আগেই বলেছি, তার রূপসজ্জাও স্বাভাবিকতাকে অনুসরণ করে নির্ভর-যোগ্য। অমল রায়ের আলোর ভূমিকা এ নাটকে সরল। নিতাই আদরিনীর অবৈধ সন্তানকে হত্যা করার দৃশ্যে পর্দার পিছনে ছায়ার তার বিশাল প্রোজেকশনটি আরো নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন শুধু।

'নান্দীমুখ'-এর 'পাপপুণ্য' তাঁদের দলের শুরু, পরিণতি নয়। ভবিষ্যতে
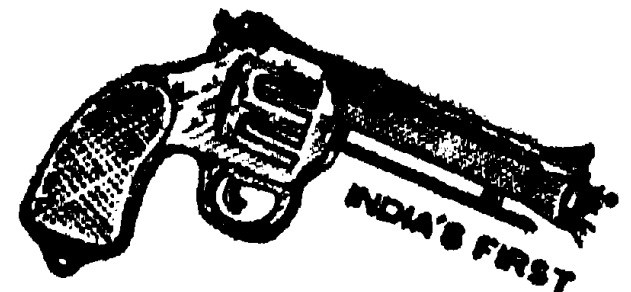
অন্যতর নাটকের অবসরে কেবল তাঁদের প্রযোজনা নয় সামগ্রিক নাটকেরই প্রশংসা করতে পারবো আশা করি।

সুরজিৎ ঘোষ

অনুপম স্মরণ সন্ধ্যা

পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন। এর মধ্যে নিজস্ব বিন্দুর ওপর দাঁড়াতে পেরেছিলেন সুরকার অনুপম ঘটক।

সুরে কোন বিপ্লব নয়। নিজস্বতা সৃষ্টি করেছিলেন নিঃসন্দেহে। সুর যে বিষন্ন রোমান্টিকতার স্রোতে শ্রোতাকে দুলিয়ে দিতে পারে গত আটই সেপ্টেম্বরে 'আপনজন' নিবেদিত অনুপম স্মরণে অনুষ্ঠানটি তার প্রমাণ।

উজ্জ্বল অথচ সম্পূর্ণ আবরণহীন প্রায় ঘরোয়া পরিবেশের এই অনুষ্ঠানে অনুপম সুরারোপিত গানের প্রায় সব শিল্পীই খ্যাতনামা। তরুণেরা এখানে সুযোগ পাননি। তবে শিল্পীদের প্রত্যেক গানের মধ্যেই সুরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-বোধ লক্ষণীয় ও একই সঙ্গে আকর্ষণীয় হয়েছিলো।

কমপক্ষে পঁচিশ বছর আগের সুরারোপিত গানগুলির অনেকগুলিই যে আজও জনপ্রিয় তা শিল্পীদের গান আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে অনুরণনে ধরে নেওয়া যায়। অনুপম ঘটক সুরারোপিত প্রায় সব গানই মিষ্টি রোমান্টিক এবং মনদোলানো।

একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর বিমান ঘোষ ঘোষকের দায়িত্ব নিলেন। জয়ন্ত ও অরুণের পর উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী মান্না স্বরের ওঠানামায় স্বভাবসুলভ পারদর্শিতায় তিনটি গান গাইলেন। 'কমলিনী রাধা' দর্শকদের রীতিমত উত্তাল করে দিয়েছিল। তাঁর 'গান শুধু চিরদিনই থাকে' গাওয়া গানটি এ-পরিবেশে খুবই মানানসই ও সম্ভব হয়েছিলো।

বিধি ভাঙলেন তরুণই প্রথম। দর্শক-অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে পাঁচটি গান গাইলেন। তরুণের গান দর্শকেরা আনন্দে উপভোগ করেছেন।

পরবর্তী শিল্পী উৎপলা সুললিত কণ্ঠে ভজনটি শুনিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করলেন।

অনুপম ঘটকের সুর আজও অনেকের মুখে ফেরে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এরকম দুটি গান গাইলেন। 'জীবন নদীর জোয়ার ভাটায়' নিঃসন্দেহে সতীনাথের দরদী কণ্ঠের গাওয়া অন্যতম সেরা গান। আর উপস্থিত ছিলেন বালিকাকণ্ঠী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিপ্রা বসু আসেননি।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ শ্যামল মিত্র পরিবেশিত তিনটি গান দর্শকদের ঐদিনকার পাওয়া সেরা পরিবেশন। শুধু রোম্যান্টিক কাতর দুঃখজর্জরিত বলে নয়। শ্যামলবাবু সেদিন গলায় এক গম্ভীর বিষন্নতার ঢেউ খেলালেন। এই তিনের মধ্যে ও চাঁদরাত আমি সেরা।

অনুষ্ঠানের সবশেষে অটোগ্রাফপ্রেমী কিশোরকিশোরী পরিবৃত স্বনামধন্য হেমন্ত-কুমার। দর্শকরা এখনো কত অবুঝ ও কত অপরিশীলিত ভাবতে অবাক লাগে। দর্শকের একাংশের জনপ্রিয় গানগুলি গাইবার বোকা আব্দারে হেমন্তবাবু বিরক্ত হয়ে অসম্মতি জানালে বিভিন্ন অমার্জিত মন্তব্যের ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হল। এরই ফাঁকে অকৃত্রিম কণ্ঠে অনুপম সুরারোপিত গানই তিনি গাইতে শুরু করলেন।

একটি অপূর্ব স্মরণ-সন্ধ্যার গম্ভীর পরিবেশ গড়ে তোলার কৃতিত্ব অনেকটাই যেমন শ্রোতার তেমনি এধরনের আচরণের অগৌরবের দায়িত্বও তাঁদের।

অনুপম স্মরণ সন্ধ্যায় যে অনুপম ঘটককেই স্মরণ করা হবে এটা ঐ বিশেষ অংশের শ্রোতাদের টিকিট কেনার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এই ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। তবে সূচীর অগোছালো ভাবটা পরের অনুষ্ঠানে শুধরে নেওয়া হবে আশা করি।

অদীপ ঘোষ

মালতী ঘোষাল

রবি ঠাকুরের গানের অধুনা প্রচলিত টপ্পা ঢং-এর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং শুদ্ধতর ঢং-এ চারটি রবীন্দ্র-টপ্পা রেকর্ডে গেয়ে ১৯৫৪—১৯৫৬ সালের মধ্যে মালতী ঘোষাল রাতারাতি যশের তুঙ্গে উঠে যান। তাঁর গাওয়া রেকর্ডের গানগুলি হল—(১) হৃদয়-বাসনা পূর্ণ. (২) কে বসিলে আজি, (৩) এ পরবাসে রবে কে ও (৪) যদি এ আমার—আজও শ্রোতাদের কানে মধু ঢালে। তাঁর জন্ম ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে। শিশুকাল থেকেই সুরেলা কণ্ঠ। ১৯১৪ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে 'মেরী কার্পেন্টার' হলে শোরি মিঞার টপ্পা গেয়ে সবাইকে স্তম্ভিত করেন। কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও দার্জিলিঙের মহারাণী গার্লস স্কুলের শিক্ষা শেষে

মালতী ঘোষাল

প্রবেশিকা পাশ করে কিছুদিন বেথুন কলেজের ছাত্রী হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির থেকে গান শেখায় ও গলার উৎকর্ষ বাড়ানোর দিকে তাঁর নিজের ও অভি-ভাবকদের বেশী ঝোঁক পড়ে। তাই পরে তিনি বিখ্যাত ওস্তাদ ভ্রাতৃদ্বয় গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও টপ্পা ইত্যাদি মার্গ-সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় ঘটান। রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও গোপেশ্বর-পুত্র রমেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাছে তালিম পান। মালতী দেবীর বড় ভাই চলচ্চিত্র জগতের দুই দিকপাল—নীতিন ও মুকুল বসু এবং ছোট দুই ভাই ক্রিকেট জগতের পুরনো দিনের বিখ্যাত খেলোয়াড়দ্বয়—গণেশ ও কার্তিক বসু। মালতি ঘোষালের পিতৃদেব স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু ছিলেন কৃতী রসায়ন-বিদ এবং প্রসাধন দ্রব্যের আবিষ্কারক। তাঁর যশোগাথা একদা বহুল প্রচলিত ছিল এই ছড়াতে—

'কেশে মাখো কুন্তলীন
রুমালেতে দেলখোশ,
পানে খাও তাম্বলীন,
ধন্য হোক এইচ বোস।'

এঁরই চেষ্টায় একদা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কম বয়সে অনেকগুলি কবিতা ও গান এঁর বাড়িতে এসে রেকর্ড করেন।

সাতাত্তর বছর বয়স্কা মালতী ঘোষাল আজও অপূর্ব ভাবের সঙ্গে সুরেলা গলায় গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

ভক্তনারায়ণ শর্মা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা ; ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।
ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

অমৃত

১৯ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা
২৫ আশ্বিন, ১৩৮৬
12 October 1979

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
সিপাহী বিদ্রোহের কলকাতা
লিখেছেন দেবেশ মুখোপাধ্যায়
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর আলোচনা
টপগানের গল্প কথা
বাহার উদ্দিনের
থাগনলের ঘর
সন্দীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের গল্প

হিম পড়ে গেল

বাংলা ১৩৮৬ সনে একটি ঋতু উধাও। সে যে-সে ঋতু নয়। বর্ষা। রীতিমত জানান দিয়ে আসে। জানান দিয়ে যায়। বুঝতাম, শরৎ এলো না। কিংবা হেমন্ত। ওদের যা-কিছু ছাপ তা তো পড়ে মনে। শেষ রাতে শিরশিরানী। মাঠের প্রান্তে নদীর চরে কয়েক গুচ্ছ কাশ। কিন্তু এ যে বর্ষা। কত কবির খাদ্য। চাষীর ধমনীর রক্ত। মহানগরীর তাপশোষক গৃহস্থ রাতে শুতে গিয়ে তার পদধ্বনি প্রার্থনা করেন। ঘরমুখো মানুষ সন্ধ্যের মুখে ঝুলে পড়া আকাশকে উৎপাত বলেই ধরে নেন। অথচ না হলেই নয়। নয়তো সবই ন্যাড়া। শুকনো। পশুপাখি, মাছ উদ্ভিদ, চারণভূমির প্রয়োজনীয় সবুজ প্রলেপ—সবার জন্যে এই অতি দরকারী কয়েক অর্বুদ ভিজে ফোঁটা আকাশ ঝাঝরা করে দিয়ে না নামলে বড় বিচ্ছিরি অবস্থা।

আমাদের জীবন থেকে কৈশোর মুছে দিলে শৈশব কি এক লাফে যৌবনে গিয়ে উঠতে পারে? পথে কৈশোরের কোন গাছতলা থাকবে না? জীবন থেকে কত খাদ্য, কত সুখ, মায়া, বিশ্বাস—উবে গেল। শেষে ১৩৮৬ বর্ষাকেও লুকিয়ে ফেললো। গত সনে বর্ষার বাড়াবাড়িই এর কারণ।

আসলে জীবন একা হয়ে যাচ্ছে। সে এখন শাখাবিহীন এক একটি কান্ড। তার সর্বাঙ্গে একদা-জীবনের স্মৃতি। সে জীবন কোন এক সময় ফলভারে নত হয়েছিল। ফুলভারে এনেছিল অভিসার।

এবার বর্ষা প্রায় আসেই নি। শ্রাবণ-ভাদ্রে সে এক রকম নিরুদ্দেশ। আশ্বিনে সামান্য আস্ফালন। তারপরই তো হিম পড়ে গেল। বাজারে ব্যাপারী মেয়ে দিশী বরবটি এগিয়ে দিয়ে বলে, একদম হিমে ভেজা। নিয়ে যান। মুখে দিলে গলে যাবে।

শুনে চমকে উঠতে হয়। এবার তাহলে বর্ষাই এলো না। শহরের বাইরে ঘাসের ডগা নাকি এখুনি ভোর ভোর ভিজে থাকে। জীবন থেকে এইভাবে যদি একদিন বার্ধক্য উধাও হয়ে যেত। কিংবা যৌবন। প্রায় বর্ষাহীন এমন একটি বছরের কথা কোনদিন শুনিনি।

যা লেখা হয়নি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

একজন মানুষ এই চলন্ত পৃথিবীর ভেতর দেখতে পায় দখল, যশ, প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধির জন্যে মানুষ অন্যায়কে ন্যায় নাম দিয়ে যে নিয়মকে নিয়ম বলে চালিয়ে দিচ্ছে। সাময়িক সাফল্য যশোলিপ্সাকে আরও উসকে দিচ্ছে। শোভন ভদ্রতার দাড়ি একটুখানি চলকে দিলে দগদগে অসহিষ্ণু মুখখানা বেরিয়ে পড়ে আমাদের।

অথচ কি জন্যে এখানে এসেছিলাম? একটা জীবন তৃপ্তি অতৃপ্তির মাঝে দুলে দুলে আরেক জন্মের কিনারায় এসে দাঁড়ায়। মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে নাড়ি কাটার প্রথম কান্নাই পূর্বস্মৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ।

নয়তো নানা জন্মের সঙ্গে জড়িত এই জীবন একই সঙ্গে জাগ্রত নানা স্মৃতির ভেতর কোন সাময়িক সম্পর্কও খুঁজে পেতো না। তাহলে জীবনটাই যে যায়। কোন অর্থ পায় না সে। তাই এই মূল বিচ্ছেদ নতুন জীবনে স্নেহ দেয়—দেয় ভালবাসা, মা, বাবা, ভাইবোন, প্রেমিক, প্রেমিকা।

কিন্তু বসবাসের জন্যে—শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—চাহিদার দাবি মেটাতে মেটাতে একদিন দেখতে পাই—আমরাই দখল যশ, প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধির জন্যে জীবনটাকে এবড়ো-খেবড়ো করে বসে আছি। কী জন্যে এখানে এসেছিলাম—তা মনেই নেই।

তৃপ্তি অতৃপ্তিতে দুলে এমন একটি জীবন যদি তার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে পেছন ফিরে তাকায় তো কেমন হয়? ধরা যাক—জন্মদিনের উৎসব শেষে শেষ অতিথিকে সদর দরজা অব্দি এগিয়ে দিয়ে যশস্বী, প্রতিষ্ঠিত, সমৃদ্ধ কোন মানুষ তার শোবার ঘরের বড় আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই আয়নায় ভেসে উঠলো প্রথম জীবনের চাপা দেওয়া একটি চরিত্র। যে-চরিত্রকে চাপা দিতে আজকের এই যশস্বী মানুষটি একদা কোন কিছু করতেই দ্বিধা করেনি।

দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে জন্মদিনের গভীর রাতে ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়ার পর যখন মনে হচ্ছিল—জীবন মানে গোলাপ-ফুল—তখন এ কী গেরো। স্বীকারোক্তি, ন্যায় খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা, গোঁজামিলকে সঠিক বলে চালিয়ে দেবার ব্যর্থ লড়াই—সবই শেষমেশ জবাবদিহির চেহারা নেয়। [illegible] দখল, প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধি—সবই যে পলকা [illegible] ঝুলছে। সবই যে যায় যায়। আবার কি অনিশ্চয়ের জলে ঝাঁপ দিতে হবে? এই বয়সে? লোকলজ্জা। বড়াই।

এমন একটি মানুষকে ধরতে চাইছিলাম কিছুদিন ধরে। যাকে পাঠকের চোখের সামনে মেলে ধরবো। সে প্রথম প্রবেশেই সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। দয়ালু, ত্যাগী, চিন্তাশীল, সুপুরুষ—সবে সিঁথিতে দু-একটা রুপোলী তার। পড়শীর শ্রদ্ধা, গৃহপালিত কুকুরের ভালবাসা, দশের সম্ভ্রম, স্ত্রীর অনুরাগ—সবই এই মানুষটিকে মুড়ে আছে।

এ অবস্থায় একদিন পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনের গভীর রাতে সব খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো। কাল ভোরে কী করে মুখ দেখাবো? এই যখন অবস্থা তখনই একে একে উন্মোচন শুরু হোল। পরতে পরতে জীবন বেরিয়ে পড়তে শুরু করলো। যা এতদিন চাপা ছিল। একদিন হয়ে হয়েছিল—জীবন বুঝি ছাদ ঢালাইয়ের সিমেন্ট। প্রথম দেড়শো বছর সিমেন্ট নরম থাকে। তারপর দেড়শো বছর সিমেন্ট খুব শক্ত হয়ে যায়। এরও পরে আরও দেড়শো বছর ধরে সিমেন্ট নরম হতে থাকে।

একদা মনে হয়েছিল—জীবনটা বুঝি সাড়ে চারশো বছরের। তার ভেতর প্রথম বিশ বছর শৈশব। যৌবন চারশো উনত্রিশ বছরের। বাকি এক বছর বার্ধক্য আর মৃত্যুর জন্যে। একসময় তো মনেই হোত—সুখ, আহ্লাদ, প্রেমে বোঝাই চারশো উনত্রিশ বছরের যৌবন আসলে অক্ষয়, অমর।

আজ পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনের এই গভীর রাতে মনে হচ্ছে—কাল ভোরেই বার্ধক্য শুরু হয়ে যাবে। যৌবনের ওপর কালো পর্দা টেনে দিতে এসেছে প্রথম জীবনের ওই চরিত্র।

কি চাই?

কিচ্ছু না। তোমার একুশ বছর বয়সে তুমি আমায় একটি চুমু খেয়েছিলে বাবু। ধানের গোলার পেছনে। দুপুরবেলায়—। আমি তখন সবে ডানকি মেয়ে।

ওঃ! তুমি অধীর ভাগচাষীর ছোটবোন! এ সামান্য জিনিস এতদিন ধরে মনে করে রেখেছো? এই নাও দশ টাকা। এখনো হাওড়া থেকে লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।

আমি এখন কলকাতায় থাকি। আমাদের বড়গাছিয়ার বাস উঠে গেছে অনেক দিন।

ওঃ, কলকাতায় কোথায় থাকো? স্বামী কি করে? ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছো নিশ্চয়।

আমাদের ছেলেপিলে হতে নেই। খদ্দের নষ্ট হয়। তুমি আমার খদ্দের ছিলে। ফুল পাড়ার নাম করে ইটের পাঁজার পেছনে নিয়ে গেসলে আমায়। মনে পড়ে? আমি তখন ষোল।

আস্তে কথা বল। আমার স্ত্রী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। হাঁপানীর টান উঠলে সারা রাত জেগে কাটান। ধুলো একদম সহ্য হয় না ও'র।

জেগে থাকলে তা আমি একটু দেখা করে যাই।

না। কি পরিচয়ে তুমি কথা বলবে?

কেন? তোমাদের ভাগচাষীর বোন। তাছাড়া তুমি তো আমার পয়লা নাগর। তোমরা বুঝি বউকে আপনি আজ্ঞে করে বলো? বাঃ! বেশ। বেশ।

ওসব কথা এতদিন প[illegible] তুলে কি লাভ! তুমি বাড়ি চিনে [illegible] কি করে?

রাস্তায় ঘুরছিলাম। তোমার বাড়ির সামনে। পুলিশের গাড়ি ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। সারি সারি গাড়ি দাঁড়ানো। সুন্দর সুন্দর মানুষজন। জানলার আলোয় দেখি সবাই হাসি-খুশি। খাবারের গাড়ি থেকে খাবারের প্যাকেট নামলো। আমিও ওদের পেছন পেছন ঢুকে দেখি—ওমা এ-যে তোমার বাড়ি। সবাই বলে বড় উকিলবাবুর বাড়ি। দ্যালে তোমার বাবার ছবি দেকেই চিনিচি। তুমি তো আগের চে লম্বা হয়েচো।

মানুষ রোজ ব[illegible] শেফালী। আমিও তোমার মত উঁচু [illegible] জুতো পরেছি।

নাগো। চেহারাও তোমার বড় হয়েচে।

সেতো মোটা হয়ে গেছি। কিছু খাবে শেফালী?

না উকিলবাবু। তার চে তোমার বউ দেখবো চল।

পাগল হয়েছো? কি বলবো আমি?

সে তোমার ভাবনা। বলবে, আমাদের ভাগ চাষীর মেয়ে—ভাগচাষীর বোন। শেফালী দাসী।

এত রাতে? কোত্থেকে? কিছু মাথায় আসছে না। আজ বরং তুমি এসো। ঠিকানা রেখে যাও। আমি গিয়ে দেখা করবো।

বরুণ সিমলাই-এর ছবি

সেখানে তুমি চিনে যেতে পারবে না।

উকিলরা সব জায়গা চিনতে পারে।

হ্যাঁ। স্মার্ট মার্নচি। তোমরা পারো সব। তোমাদের মত এক বাবু আমাদের গোলাপকে ঘরভাড়া করে রেখেচে। একটু বউদিদিকে দেখে যাই। সরো।

না। ও-ঘরে তুমি যেতে পারবে না শেফালী।

শেফালী দাসীর পায়ে উঁচু হিলের জুতো। ৪৪।৪৫। বয়স্ক ছোঁক ছোঁক করা নবাবজাদেদের কাছে টানতে পারে। হাতে ব্যাগ। শাড়িতে সুতোর ফুল তোলা। ব্লাউজটি গাঢ় ম্যাজেন্টা ভেলভেটের। যশস্বী প্রতিষ্ঠিত উকিলবাবুর ঘরের ফার্নিচারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল শেফালী। সে জোর করেই কড়া নাড়লো।

ও-পাশ থেকে পাতলা গলা ভেসে এলো। তোমার গেস্টরা সবাই চলে গেলেন?

উকিলবাবু খাটো গলায় বললো, এই যাচ্ছেন। তোমার টানটা এখন কেমন?

একবার পাম্পটা দিয়ে যাবে লক্ষ্মীটি।

যাচ্ছি। বলে উকিলবাবু খুব মিন মিন করে বললো. তোমার পায়ে পড়ি শেফালী। আজ তুমি যাও।

এসিচি যকন—দেকা করেই যাবো।

ডার্টি স্ন্যাকমেলার;

কি বললে?

তোমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

শেফালী হাসলো। ভালো কথা বাংলায় বলতে পারো না।

ও-ঘর থেকে গলা ভেসে এলো। কার সঙ্গে কথা বলছো গো?

এই মিসেস দাশ।

ও। আমাদের সাবজজ মশায়ের স্ত্রী?

হ্যাঁ গো।

উকিলের অমন খাটো গলার মিথ্যেয় শেফালী দাসীও হাসতে হাসতে দরজা খুলে ফেললো। আর অমনি লোড শেডিং। বিছানায় বসেই স্ত্রী হুকুম করলো. একটা মোম ধরাও ওগো। ওদের কাউকে ডাকো।

সবাইকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি যে—

কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। উকিলবাবুর স্ত্রীর খাটে অবহেলায় ট্রানজিস্টরটা সরোদ বাজাচ্ছিল। তাও থামলো। এতক্ষণ নটভৈরব বাজালেন ...

বসুন মিসেস দাশ।

শেফালী ততক্ষণে একটা টিপয় উলটে দিয়েছে অন্ধকারে।

পড়ে গেলেন নাকি?

শেফালী বললো, না।

তখন একখানা কঠিন পুরুষালী হাত তাকে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। টানতে টানতেই উকিলবাবু বললো, এই অন্ধকারে আবার বসবেন কি। ওঁকে বরং সিঁড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসি।

পাঠক। এই দৃশ্যটি যেকোন নাটক—যেকোন উপন্যাসে আপনার বুকের রক্ত চলকে দিতে পারে। কিংবা রক্ত জমাট হয়ে গিয়ে চলাচল বন্ধ করেও দিতে পারে।

মানুষের ছালবাকল তুলে ফেলার মত এমন একটি জায়গা উপন্যাসে আনলে কেমন হয়?

হারানো বই

ভারতীয় সভ্যতায় শ্রদ্ধাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা প্রাচীন ভারতীয়দের ধর্মচিন্তার গবেষণায় ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। শ্রদ্ধা এমন প্রগাঢ় যে, তাদের আলোচনায় ধর্মের বাইরের গৌরবময় ইতিহাস অনুদ্ঘাটিত থেকে গেছে। ইতিহাসকে বিকৃত রূপ দেওয়ার এও এক কৌশল। অথচ প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা, নগর পরিকল্পনা, স্থাপত্য, প্রশাসন, অরণ্য সম্পদ নিয়ে গর্ব করার অনেক কিছুই আমাদের আছে।

১। আলেকজান্ডার ভারতে আসেন আনুমানিক ৩২১ থেকে ৩১২ খৃঃ পূঃ মধ্যে। তিনি কয়েকজন গ্রীক চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তারা সর্পাঘাতের চিকিৎসা জানতেন না। আর পঞ্জাব অঞ্চলে সাপের উৎপাতও ছিল যথেষ্ট। আলেকজান্ডারের অনুরোধে সর্পদষ্ট গ্রীকদের চিকিৎসায় কয়েকজন ভারতীয় বৈদ্য নিয়োগ করা হয়। গ্রীকদের ওপর আদেশ ছিল কেবল দর্পাঘাত নয়, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য তারা এসব বৈদ্যের সাহায্য নেবে।

বৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত ভারতে চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কাশী আর তক্ষশিলায়। এখানে বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকরা চিকিৎসাবিদ্যা এবং অন্য নানা বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক আত্রেয় ছিলেন খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত চিকিৎসক জীবক ছিলেন আত্রেয়-র ছাত্র।

ভেজষ-বিজ্ঞানের আসামান্য সাফল্য ঘটে। শল্য চিকিৎসায় ভারতীয় চিকিৎসকদের খ্যাতি ছিল সুবিদিত। নানারকম ওষুধ তৈরি ও সংরক্ষণ হত। অর্থশাস্ত্রে আছে তখনকার হাসপাতালের ভৈষজ্যাগারে সঞ্চিত ওষুধ বহু বৎসর ব্যবহার করা যেত। নতুন নতুন ওষধ তৈরি ও সংগ্রহ করা হত। সরকার বিদেশীদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দিতেন। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে থাকত চিকিৎসক ও নার্স। পশু চিকিৎসকরাও থাকত সঙ্গে। চন্দ্রগুপ্তের সময় শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষার জন্য আনা শবদেহ যাতে পচে না যায়, সেজন্য তেলে ভিজিয়ে রাখা হত। গলায় দড়ি দিয়ে মরা, জলে ডুবে মরা মানুষদের দেহ শব পরীক্ষাগারে আনা হত। মৃতদেহ পরীক্ষায় হত্যাজনিত কারণ পেলে চিকিৎসকরা রিপোর্ট পাঠাতেন। তারপর শুরু হত অপরাধের তদন্ত ও অপরাধীর বিচার।

রাজসরকারের খাস জমিতে ভেষজ লতাগুল্ম জন্মাত। কোন কোন গাছ রোপণ

প্রাচীন

হিন্দু দণ্ডনীতি

করা হত মাটির পাত্রে। সাপ দূরে করবার জন্য কয়েক শ্রেণীর লতাগুল্ম লাগান হত বাড়ির আশপাশে। একারণে বাড়িতে বিড়াল, ময়ূর, বেজি আর পুষত মৃগ ও নানারকম জন্তু পোষা হত। বিষাক্ত সাপ দেখে ময়না, শুক প্রভৃতি পাখি চেঁচাত। এসব পাখি পুষত লোকে। বিষের গন্ধে বক অজ্ঞান হয়ে পড়ত, কোকিল পড়ে মারা যেত, পায়রার চোখ লাল হত—লোকের ঘরে এ কারণে এই জাতীয় পাখির সমাদর ছিল।

রাজসরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল চিকিৎসা-ব্যবসা। রাজার বিধান অনুসারে চিকিৎসকদের সতর্ক হয়ে চিকিৎসা করতে হত। মারাত্মক ব্যাধির সংবাদ রাজসরকারে জানাবার বিধান ছিল। চিকিৎসকের ভুলে রোগী মারা গেলে, চিকিৎসকের শাস্তি হত।

শস্য, তেল, ক্ষার, লবণ, গন্ধ দ্রব্য ও ভেষজ দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। রাজসরকার জনাকীর্ণ স্থান রোগমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। পথে ময়লা ফেলা, কাদা বা জল জমে এরকম কোন কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। দেবমন্দির,রাজপ্রাসাদ, তীর্থক্ষেত্র বা শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করা ছিল অপরাধমূলক কাজ। তবে অসুস্থদের মার্জনা করা হত। মানুষের বা পশুর মৃতদেহ নগরের মধ্যে ফেলার শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। মৃতদেহ শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট পথ ও ফটক ছিল। অন্য পথ বা ফটক দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে গেলে অথবা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে মৃতদেহ প্রোথিত বা দগ্ধ করলে, স্বাস্থ্য বিধিভঙ্গের জন্য শাস্তি দেওয়া হত।

২। কাঠের বাড়ি ছিল বেশী। সব সময় আগুন ধরার ভয়। অগ্ন্যুৎপাত নিবারণে ছিল সরকারী ব্যবস্থা। গ্রীষ্মের সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে আগুন জ্বালান নিষেধ ছিল। কারো বাড়িতে আগুন লাগলে নেভাবার দায়িত্ব ছিল সকলের। না গেলে অর্থদণ্ড হত। বড় বড় রাজপথ, পথের মোড়, রাজ-

বাড়ির সামনে হাজার হাজার বড় বড় পাত্রে জল ভরা থাকত। নিয়ম ছিল, বাড়ির মালিক সদর দরজার কাছাকাছি রাতে ঘুমাবেন। কারণ, আগুন লাগলে, তাঁরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে পারতেন। শহরে ভিতরে খড়ের যা সহজে আগুন লাগতে পারে এরকম কোন পদার্থ দিয়ে বাড়ি তৈরি হত না। যাদের জীবিকার সঙ্গে ছিল আগুনের যোগ, তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল নগরের মধ্যে। ইচ্ছাপূর্বক আগুন দেওয়ার শাস্তি চরম। অসতর্কভাবে এরকম কাজ করলেও অর্থদণ্ড হত।

৩

রাজার জন্মতিথি, রাজপুত্রের জন্ম, যুবরাজের অভিষেক, দেশ জয় উপলক্ষে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হত। পূর্ণিমা তিথিতে বালক, বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ বন্দীরা মুক্তি পেত। কারাগারে সৎ আচরণের জন্যও বন্দীর মুক্তি ঘটত। মদের ব্যবসায় সামান্য লোকের ছিল সরকারের অনুমতি। বেআইনী মদের ব্যবসায়ীদের শাস্তি হত। দেড় কাচ্চার বেশী মদ কেউ বিক্রি করতে পারত না। ব্রাহ্মণদের মদপানের জন্য কঠোর শাস্তি জুটত কপালে। কাছাকাছি একাধিক মদের দোকান রাখা যেত না। রাজ কাজে থাকাকালে কোন কর্মচারীর মৃত্যু ঘটলে, তার স্ত্রী পুত্ররা সরকার থেকে বৃত্তি পেত। অর্থাভাবে বিপন্ন রাজ কর্মচারীদের রাজকোষ থেকে সাহায্য করা হত।

৪

দু হাজার বছরেরও আগে, আদমসুমারী, জমিজরিপ ও রাজস্ব আদায়ের ছিল সুষ্ঠু ব্যবস্থা। গ্রামের ঘরবাড়ি, পরিবার, জাতি, কর্ম ও পেশা, প্রতি পরিবারের আয় ও ব্যয়, গৃহপালিত জীবজন্তুর পরিসংখ্যান নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল সরকারী। জমি জরিপ, শুল্ক আদায়, ব্যবস্থাপত্রের ছিল সুষ্ঠু ব্যবস্থা। দেশ জুড়ে ছিল সরকারী চর।

৫

বিচারকদের গোপন খবর সংগ্রহের জন্য থাকত গুপ্তচর। কর্তব্যে অবহেলা ও অন্যায় কিছু করার জন্য বিচারকদের দণ্ড হত। সাক্ষী অনুপস্থিত থাকলেও কোন মোকদ্দমা খারিজ হত না। যে মুহুরী সাক্ষীদের জবানবন্দী লিখত, কর্তব্যে অবহেলার জন্য তারও শাস্তি হত—কোনও জবানবন্দী যদি সে ইচ্ছা করে না লিখত, যা বলা হয়নি এমন কোনও কথা যদি মিথ্যা করে সে লিখত, পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি, এমন কোনও কথা যদি সে লিখত, কোনও সুষ্ঠু জবানবন্দীকে যদি সে বিকৃত করে লিখত, তাহলে তার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড অথবা অপরাধের উপযোগী অন্য কোনরকম শাস্তি হত।

৬

সরকারী খনি দপ্তরে ছিলেন একজন অধ্যক্ষ বা প্রধান। আবিষ্কৃত নতুন খনির বিবরণ তিনি রাজ সরকারে লিখে পাঠাতেন। খনি সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকবে না কোন ব্যক্তি বিশেষকে জমা দেওয়া হবে—তা স্থির করতে রাজ সরকার। যেসব খনি চালাতে বহু মূলধনের দরকার পড়ত, তা জমা দেওয়া হত প্রজাদের মধ্যে। ধাতুপিণ্ড শোধনের অধিকাংশ উপসরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত তীক্ষ্ণ মূত্র, ক্ষার, রাজবৃক্ষ, বট, পোলু, গোপিও, রোচনা, মহিষের বিষ্ঠা ইত্যাদি। তারপর এই ধাতুকে স্থায়ী বা কিছুকালের জন্য নমনীয় করতে যব, মাষ ও তিলউষ্ম, মধু, মেষদুগ্ধ, ঘি, দাঁত ও গোরুর ক্ষুরের গুঁড়ো প্রভৃতি মেশান হত। আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায় এমন ধাতুকেও নমণীয় অথবা সুদৃঢ় করার ছিল বিশেষ পদ্ধতি।

৭

'স্টাডিজ ইন অ্যানসিয়াণ্ট হিন্দু পলিটি' নরেন্দ্রনাথ লাহার বিখ্যাত বই। 'প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি' তারই বাংলা অনুবাদ। ১৯২৩ সালে ছাপা ২২৯ পৃষ্ঠা বইয়ের দাম ছিল মাত্র দেড় টাকা। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন চাণক্য বা কৌটিল্য। অর্থশাস্ত্রে তিনি সমকালীন জনজীবনের সূক্ষ্ম ও বিশদ বিবরণ রেখে গেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অবলম্বনে অতীত ভারতের অসামান্য ও সুখপাঠ্য ইতিহাস লিখেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। মেগাস্থিনিস ও অন্য কয়েকজন গ্রীক পর্যটকের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

কমল চৌধুরী
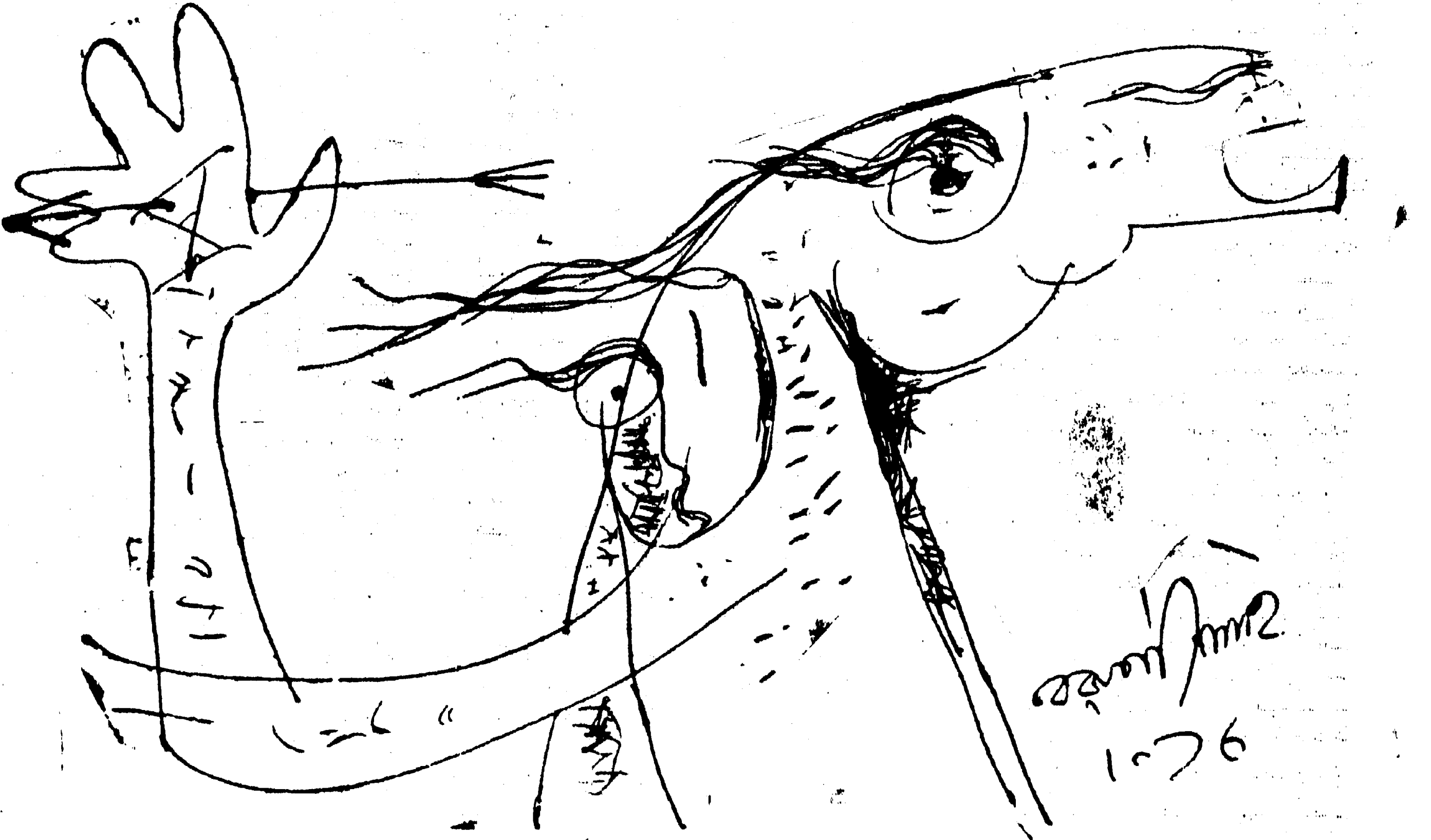
[illegible]-এর ছবি

অসুখ

[illegible]

অপেক্ষায় আমি বসে আছি আমার নিরাময়ের জন্যে। কিন্তু
তার অর্থ এই নয় যে, আমি প্রলয়ের কাছে মাথা নত করেছি কিংবা
আমার গন্তব্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

ইদানিং আমার স্বাস্থ্য নিয়ে অনেকেই চিন্তিত।
মিলন্তা দি; যার সঙ্গে ধর্ম, জাতীয়তা ও পূর্বখাংলা নিয়ে বাদানুবাদ এবং
সুপ্রিয় দা, যিনি অধিকতর শাসক ও অগ্রজ,—আমি লক্ষ্য করেছি,
অত্যধিক ভালোবাসা ও স্নেহে কখন যেন আমাকে
আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী করেছেন। আমার জন্যে প্রার্থনা করছেন,
আমি যেন অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠি। আর, দাদা অন্নদাশংকর এবং
দিদিমা লীলা রায় রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমাকে অবিকল দেখতে পান,
আমি যেন এক সবুজ পাখির আকার ধারণ করে অনন্তের দিকে
উড়াল দিয়েছি। অবশ্য, ডাক্তার ভবানীপ্রসাদ দত্ত এবং
আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ
এসে বলেন : কিছুকাল বিশ্রাম নিলে এবং ওষুধ ঠিক মতো চললে
তিন মাস পরে আবার সুস্থ হয়ে উঠবো; কিন্তু
উজ্জ্বলতমা ইরাণী বৌদি আমাকে তেমন কোন আশ্বাস দেননি।

আমি এখন বসে আছি। আমার চারপাশে পাখি ও বৃক্ষের
ক্রন্দন। এবং আমি ইতিমধ্যেই বাতাসের গতিবিধি জেনে গেছি।
কোত্থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে।
কলকাতার চাঁদ ও তারার সঙ্গে ইদানিং যে সম্পর্ক রচিত· আমি বলবো না
আঠারো উনিশ শতকের রোমান্টিক কবির লক্ষণ। এমন কি,
মাঝে মধ্যে যে মেঘ ভেসে আসছে, তার সঙ্গেও আমার কোন
বার্তা বিনিময় হয় না। এবং আমি বলি না;
'যাও, পূর্বদিকে, বাংলাদেশের
রাজধানী ঢাকায়; বাড়িতে সংবাদ দাও, গুরুতর অসুখে আমি ম্লান'।

অসুখ কি ঈশ্বরের কোন প্রতিনিধি কিংবা অমৃতের সন্তান?
অথবা এই আমিই কি বলতে পারি : অসুখই আমার শিল্পের বিন্যাস?

—অসুখ আমার এক দূরতর বিশ্বের আশ্চর্য মহিমা
আমার শিল্পিত ভুবনের নতুন আদিত।

কতো হীরে-জহরত ভেলখেল যায়

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সবাই জানে না এক ভাঁড় খেনো মদে কতোটা রাজত্ব হাতে আসে
কতোটা রূপসী হয় কালোবউ,
চিলচিৎকারে যে কুকুর ডাঙিয়ে ভাঙিয়ে দেয় পাড়াপড়শীর ঘুম
আমাকে বেহুঁশ দেখে সেও মাথা নাড়ে,
নিম-ন্যাওটার মতো লেজটা দোলায়,
ভাবে কোন ওলাপেয়ে ফেরে এহেন নিশুতি রাতে অমন রাজার মতো,
ওর কি ঠাঁইঠুঁইটুক নেই বিপুল চৌহদ্দি আছে তবু—

কেউই জানে না কতোটা রাজত্ব হাতে নিয়ে
আমি তছনছ করে দিতে পারি সুখী মানুষের ভাতঘুম,
শহুরে কবির জ্যামতাড়া
আমার তো আর দালানকোঠার গোলকধাঁধায় মাথা কোটকুটি নেই,
টবে ফুলচারা পুঁতে লালনপালন নেই,
যতোটা তল্লাট চোখে পড়ে, এতো খেনোজমি
আর গাছগাছালির থে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা,
শিরানো সাপের হিলহিলানির মতো গেঁয়োপথ,
হাওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা ওই ঝিমার্ত প্রান্তর
একলহমায় এসব আমার, আমারই,
সবাই জানে না টাল-খেয়ে হাঁটা এই ওলাপেয়ের
কতো হীরে-জহরত ভেলখেল যায়,
রাতভর সারা তল্লাট জুড়ে কতো দহরম-মহরম—

নির্বাসনের গান

ধূর্জটি চন্দ

যাই তাকে ডেকে আনি। সে আমার নিভৃত পরাণ
আনন্দ বোঝেনি কভু, অভিমানী, বড়ো হাত-টান,
পৃথিবীর এইসব জরদ্গব বাহুল্যসম্প্রীতি
তাকে ক্ষুন্ন করেছিল একদিন, কেননা ঝটিতি
সেও বুঝে নিয়েছিল ঋতুরাজ বসন্ত সিংহ
খিদে পেলে সব খায়, এঁটোকাঁটা, নৈমিষ তৃণও।

এইভাবে একদিন তাকে লুটি করেছে শরীর
আঁধারে কোথায় খুঁজি, কোথা মাঝি, জীর্ণ এ তরী
দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই, দাঁড় নাই, কে ধরবে হাল
জাগে কি দীনের প্রিয়, পাখি-ডাকা অলস সকাল?

যাই তাকে ডেকে আনি। সে আমার নিভৃত পরাণ—
যদিও বা নির্বাসিত প্রস্তরে সে পরিদৃশ্যমান।

চিঠিপত্র

কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি

'রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কিন্তু বিবেকানন্দ মেশেন নি'—এই শিরোনামে তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের লেখাগুলো পড়ে মনে হল লেখক না মেশার দোষটা বিবেকানন্দের ঘাড়েই চাপাতে চেয়েছেন। সেটা তাঁর রচনার শিরোনামেই স্পষ্ট—কিন্তু তিনি কোনো প্রমাণ দিতে পারেন নি—শুধু অনুমান—যার বিপক্ষেও অনেক কিছু বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যদি চেয়েইছিলেন তাহলে প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফেরার পর বিবেকানন্দ যখন একাধিকবার ঠাকুরবাড়ী গেছেন—রবীন্দ্রনাথ কি একবারও এই বিশ্ববিখ্যাত লোকটির সঙ্গে আলাপ সুযোগ পান নি? রবীন্দ্রনাথ মিশতে চেয়েছিলেন প্রমাণ কই? যে সব জায়গায় বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হতে পারত (যেমন বেলুড় মঠ বা তাঁর পৈতৃক ভবন সিমলার দত্তবাড়ী) সে সব জায়গায় রবীন্দ্রনাথ গেছেন বলে তো জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নি, লেখক যেমন বলছেন কিন্তু বিবেকানন্দের দিক থেকে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল লেখক সেটাও দেখাতে পারেন নি। ৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ৪৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে লেখক লিখছেন। "বিবেকানন্দ আজীবন কোনো রহস্যময় কারণে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।"

আজীবন অর্থাৎ ৩৯ বছর। রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত ১৮৮২ সালে বের হয়। ১৮৮১ সালের একেবারে শেষে ডিসেম্বরের শেষ ভাগে বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) রামকৃষ্ণসংস্পর্শে আসেন। তখন তিনি ধর্মসঙ্কটে বিভ্রান্ত। ঈশ্বর আছেন কি নেই এই সংশয়ে দুলছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক ভগবৎপ্রেমিকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" উত্তর পাচ্ছেন না। রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধেও তিনি সন্দিহান। প্রতি ইঞ্চি লড়ে চলেছেন। ১৮৮৪-র ফেব্রুয়ারীতে পিতৃবিয়োগ। বিরাট ঋণের বোঝা, আত্মীয়দের শত্রুতা কপর্দক শূন্য হয়ে অনাহারে চৈত্রের রোদে চাকরীর সন্ধানে পাগলের মত ছোটাছুটি—এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না হওয়াটা কি অসম্ভব বা অস্বাভাবিক? তারপরে তাঁর সন্ন্যাস সংকল্প, রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ, ফলে গুরুভাইদের নেতৃত্ব, বেলুড় মাঠ মিশনের রূপদানের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। এদিকে বসতবাড়ী নিয়ে মামলা চলছে—ভাইরা নাবালক, তারপর পরিব্রাজক জীবন-হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, কাশী থেকে গুজরাট, তারপর চিকাগো গমন। এরপর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা।

এর মধ্যে তিনি রবীন্দ্ররচনা পাঠ করার অবসর পান নি হয় তো—এ কথা বলে শঙ্করীপ্রসাদ বসু কি অপরাধ করেছেন? রবীন্দ্ররচনা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের নীরবতা রহস্যময় কেন তা বুঝতে আমি অক্ষম।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কিছু বক্তব্যের ভক্ত ইত্যাদি। লেখকের যুক্তি অনুসরণ করে আমিও বলতে পারি—তাঁর বক্তব্যের অর্থ (ক) রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিদ্বেষবশতঃ বিবেকানন্দ মেশের নি। (খ) ঐ সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার প্রথমে "নিবেদিতাকে ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়তে এবং পরে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলার পেছনে বিবেকানন্দের কোনো উদ্দেশ্য ছিল" এসব বলে তিনি বিবেকানন্দের ওপর দুরভিসন্ধি আরোপ করেছেন—

কিন্তু আমি তা বলব না। আমি জানি এ কুযুক্তি।

যোগিতার জন্য সরলা ঘোষের শর্ত আরোপ নিয়ে লেখক অনেক জল ঘুলিয়েছেন নিতান্ত অকারণে। ঐ শর্তের পেছনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থ আছে ভেবে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের ওপর বিরূপ হন—এ কথা নিতান্তই হাস্যকর।

২৪ আগষ্ট সংখ্যার ৫৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমের নিচের দিকে লেখক লিখছেন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে নাকি বিরূপ মন্তব্য করেছেন—কিন্তু স্বাধীনতা সংখ্যা অমৃততে ১০৯ পৃষ্ঠায় ২য়, ৩য় কলমে উল্টো কথা লিখেছেন।

নবীন কবিদের প্রেমের কবিতা রচনা নিয়ে বিবেকানন্দ যে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন সেটা যদি রবীন্দ্রনাথের প্রতি চরম অবিচার হয় তবে রবীন্দ্রনাথ রমাঁ রল্যাঁর কাছে কালীপূজকদের সম্বন্ধে যে তীব্র ও ক্রুদ্ধ মন্তব্য করেছেন—সেটাকে কি বলা যাবে? "কালীউপাসনা যারা টিকিয়ে রাখে তারা সুস্থ সঠিক ও সৎ মানসিকতার লোক হতে পারে না" (৭ সেপ্টেম্বর অমৃত ৩য় কলম) এ কথা বলার সময় রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে শুধু বিবেকানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ ছিলেন না এ কথা কি করে মেনে নিই? কিন্তু ঐ সংখ্যাতেই লেখক লিখছেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল না (রচনার শুরু থেকে তৃতীয় কলমে

অথচ স্বাধীনতা সংখ্যার ১১০ পৃষ্ঠার ১ম কলমে তিনি লিখছেন—রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রশংসা করছেন, আবার তাঁর কাব্যও তাঁর অনুরাগীদের রচনাকে বিদ্রূপ করছেন এতে বিবেকানন্দের দ্বৈত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহলে তো রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও তাই বলতে হয় যে, কালীপূজকদের সম্বন্ধে তাঁরও দ্বৈত মনোভাব ছিল।

আমি অবশ্য মনে করি কারো মধ্যে কোনো একটা জিনিস আমার পছন্দ হলে তার সব কিছু আমার পছন্দ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এমন শিক্ষিত লোক দেখেছি যাঁরা রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে উন্নাসিক কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন আমার আর সব রচনা লুপ্ত হয়ে গেলেও আমার গান থাকবে। (দুঃখিত, হাতের কাছে প্রমাণ নেই এ মত অনেকেই পোষণ করতেন তখন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিবেকানন্দ ভালবাসতেন এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। শুধু প্রশংসা করে নয় রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে গেয়ে বিবেকানন্দ তার আন্তরিক মর্যাদা দিয়েছেন। স্বাধীনতা সংখ্যা অমৃত ১০৯ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের গানের প্রশংসা করেও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেন নি বলে বিবেকানন্দের ওপর লেখক ক্ষুব্ধ। কিন্তু মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ তখনও উদীয়মান (১৮৮৭) এবং ঠাকুরবাড়ীর আরো অনেকের গান ও সঙ্গীতকল্পতরুতে ছিল—তাই নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করেন নি। তিনি জানবার অবসর পান নি যে, রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী সব্যসাচী লেখক হবেন।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলির লেখক ঐ কথাটা মনে রাখেন নি বলে বিবেকানন্দকে জানতেন ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁর গুরুদোষী করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দ ধারার পার্থক্য আছে। তাই ঠাকুরবাড়ীর বাদ, কালীপূজো পছন্দ করেন না। ভাবসঙ্গীত প্রতিভাশালী যুবকটির [illegible] পছন্দ করলেও আলাপ করতে এতো আগ্রহী হন নি যে, যেচে আলাপ করবেন। রবীন্দ্রনাথ আলাপ করতে চাইলে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন বিবেকানন্দ—এটা একেবারে অসম্ভব। সাধারণ লোক সম্বন্ধেই বিবেকানন্দ এরকম করতে পারেন না—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঐ পত্র সম্বন্ধে তো কথাই নেই—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী তখন শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্পকলানুরাগ—সব দিকে বাংলার মুকুটমণি। সে অবস্থায় নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ সে বাড়ীতে পাঠাবেন বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হবার জন্যে এতো খুব স্বাভাবিক; আবার নিবেদিতা ব্রাহ্মমতে প্রভাবান্বিত না হতে পারেন সে জন্য ঘনিষ্ঠতা হবার আগে তাঁকে সরিয়ে আনতে চাওয়াও অন্যায় নয়।

সন্ন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাস শুষ্ক এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ। কাজেই বিবেকানন্দকে বেশী পছন্দ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না—এ কথা উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। তাই বলে বিবেকানন্দের কৃতিত্বকে উড়িয়ে দেবেন এত হীনমনা তিনি [illegible] ছিলেন না।

তাই নিবেদিতার অনুরোধে (চাপ কথাটা নিতান্ত অবান্তর তিনি বিবেকানন্দ সভায় গিয়েছিলেন (কিন্তু আলাপ করেন নি—করতে চান নি?। সন্ন্যাসবাদী, গুরুবাদী, কালীপূজক বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর ভাবধরার পার্থক্য আছে—বুঝতে পেরেই রবীন্দ্রনাথ হয় তো আলাপ করতে আগ্রহী হন নি। তা ছাড়া তখনই যে তিনি বিবেকানন্দ ও তাঁর কীর্তির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন তাও মনে হয় না। অনেকেই পারেন নি। ব্রাহ্মসমাজের এক অংশ তো রীতিমত শত্রুতা করেছেন। গোঁড়া হিন্দুরাও কম যান নি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জানবার সময় সুযোগ পান কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আগেই বিবেকানন্দের আয়ু শেষ হয়। বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হলে যে দুজনেই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেন এতে সন্দেহ নেই। বয়েস বাড়ার সঙ্গে ভাবধারার পার্থক্যজনিত সংকোচ ঘুচে যেত বলেই মনে হয়। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ উক্তি সবই পরিণত বয়সের, বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে। বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উক্তি আমরা তাঁর কাছ থেকেও পেতাম নিশ্চয়ই।

আমার দৃঢ় ধারণা ভাবধারার পার্থক্যজনিত সঙ্কোচই এই দুই বিরাট পুরুষের ঘনিষ্ঠতার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, পারস্পরিক সপ্রশংস ও সশ্রদ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও এ বাধা অতিক্রম করা যায় নি—দুজনেরই বয়স অল্প তখন—চল্লিশের নীচে বা চল্লিশ মাত্র। এ জন্য দুজনের কাউকে দায়ী করা যায় না। কৃতজ্ঞ বসু, ৫৭ডি, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড, কলকাতা-৩২

কিছু বক্তব্য আছে

গত ৩ আগস্ট তারিখের অমৃতে প্রকাশিত সন্ধ্যা সেনের কণিকা-অশোকতরু শীর্ষক আলোচনাটি মন্দ লাগলো না। তবে দুটি বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আলোচনাটির প্রথম দিকে আছে—রবীন্দ্রসঙ্গীতে এখনকার যুগে দুটি গায়কীই প্রবল। একটি শৈলজারঞ্জন মজুমদারের অপরটি শান্তিদেব ঘোষের এবং দুটি গায়কীর পুরোধাস্থানীয় শিল্পী হলেন যথাক্রমে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত আছি। কিছুকাল ধরে একটি জিনিস লক্ষ্য করছি যে, রবীন্দ্রনাথের এই দুই দেখাবার চেষ্টা করছেন। সন্ধ্যা সেনের উক্তি তাকেই আবার স্মরণ করিয়ে দিল।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গীত গানের বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বিত রূপকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী বলে এতকাল জেনে এসেছি। বিভিন্ন রবীন্দ্র-শিষ্য তাঁদের শিষ্যকে দুই শিবিরে ভাগ করে কেউ কেউ এ প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, তা হলে—দিনুবাবু, ইন্দিরা দেবী, অনাদিবাবু, নিজ নিজ গ্রহণ ক্ষমতায় সেই গায়কী আয়ত্ত করেছেন এবং কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা প্রকাশ করেছেন। সেই প্রকাশ ভঙ্গিমায় ব্যক্তিবিশেষে কিছু পার্থক্য সব সময়েই থাকে। তাই বলে প্রতিজনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক-একটি পৃথক গায়কীরূপে চিহ্নিত করলে সুরেনবাবু, ভীমরাও শাস্ত্রী প্রমুখের গায়কীর পুরোধাস্থানীয় শিল্পী কারা?

দ্বিতীয় বক্তব্য হল—শৈলজারঞ্জন মজুমদার (যাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষ পদে ১৯৩৯ সালে নিযুক্ত করেছিলেন) ভারি সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ বাইরে গান গাইতে সম্মত না হওয়ায় শিল্পী না হয়ে সঙ্গীত শিক্ষাদানকেই জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ আচার্য-জীবনে তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, কমলা বসু, সুবিনয় রায়, অরবিন্দ বিশ্বাস, প্রসাদ সেন, মায়া সেন প্রভৃতি আরও অনেক পরিচিত বেতারশিল্পী। বেতার - গ্রামোফোনের পরিচিতির বাইরের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতরই হবে। কিন্তু এই সব শিল্পীরা কি হুবহু একই প্রকারে গান করেন? কারো কণ্ঠে কি নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হয় নি? আবার অন্যদিক থেকে বলার আছে যে, এঁরা কি অন্যান্য কোন শিক্ষকের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করেন নি? বিভিন্নভাবে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই সব শিল্পীরা ?প্রথম দুজনেই অবশ্য আলোচনায় উল্লিখিত যে গুরুর প্রভাবে প্রভাবিত বলে ধরা হয়েছে তার থেকে সুচিত্রা মিত্র নিজেকেই কি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ভাবতে পারেন?

সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রাচীন অনেকেরই জানা আছে যে, ও হতে পারে শৈলজাবাবু বাইরে থেকে অধ্যক্ষ থাকাকালে ১৯৪১ সালে (১৯৪২ ভালো কণ্ঠস্বরযুক্ত কাউকে চেয়েছিলেন যাকে বৃত্তি প্রদান করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে। সেই মতই বেথুন স্কুলের দশম শ্রেণীর কিশোরী ছাত্রী সুচিত্রা চার বছরের জন্য শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। সেখানে তাঁকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন পাঠক্রমের অংশ ইন্দিরা দেবী এবং পাঠক্রমের বাইরের গানে শৈলজাবাবু। তাই শান্তিনিকেতনে গান শেখার সময়ে সুচিত্রা মিত্র যাঁদের সান্নিধ্যেই এসেছেন, শ্রদ্ধাভরে তাঁদের সকলকে স্বীকার করলেওবিবিধ (ইন্দিরা দেবী ও শৈলজাদার নাম তাঁকে বহু স্থানেই সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে দেখা যায়। সুচিত্রা মিত্রের উচ্চ পরিচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি প্রথম থেকেই দিদিদির বিশেষ প্রিয় পাত্রী ছিলেন। শিল্পীজীবনে হারমোনিয়াম সহযোগে পরিচ্ছন্ন উচ্চ কণ্ঠে গান পরিবেশনের মধ্যে তাঁর নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্যও মিশেছে। কণিকা এবং অশোকতরু একই গুরুর শিষ্য হওয়া সত্ত্বে ঢং-এর পার্থক্যের কারণ বলতে গিয়ে সন্ধ্যা সেন, অশোকতরু সম্বন্ধে বলেছেন—"হারমোনিয়ম সঙ্গত করে এবং বিদগ্ধ চিত্তের অভিনিবেশ দিয়ে সঙ্গীতের গতি প্রকৃতি অধ্যয়ন করে তিনি নিজস্ব এক গায়ন শৈলী করে নিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর হৃদয়াবেগের তাগিদও যথেষ্ট। সুচিত্রা মিত্রের ক্ষেত্রে এর কিছু ব্যতিক্রম কি? এর জন্য তাঁকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা কেন?। অবশ্য এর যথাযথ সদুত্তর দিতে পারেন সুচিত্রা মিত্র নিজেই, যদি তিনি একটু কষ্ট স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-শিষ্যবর্গের শিষ্য-শিষ্যাদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ও তাই স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন।

বিবেচনায় আমার এই চিঠি সুচিত্রা মিত্র কি এই ব্যাপারে একটু সাহায্য করবেন? মণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধানপল্লী, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা।

দুর্লভ মহত্ত্ব

অমৃতে ঈশ্বর ত্রিপাঠী নামে জনৈক কবির একটি কবিতা দেখলাম এবং দেখে একটু অবাক হলাম। এই অবাক হবার কিঞ্চিৎ কাহিনী আছে। নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর সেই কাহিনীটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই এই চিঠি।

কিছুকাল আগে অমৃতেই ঐ কবির একটি কবিতা দেখেছিলাম। সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম রচনা অমৃতে। কবিতাটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই কলকাতার দর্শকে একটি চিঠি পড়েছিলাম। লম্বা চিঠি। তাতে সেই কবি অমৃত-সম্পাদককে সাধ্যাতিরিক্ত গালিগালাজ করেছেন। সম্পাদকের অপরাধ কবির কবিতার একটি লাইন ভাঙ্গাচোরা হয়েছে। মনে হয়, অমৃতের মত একটি একটি পত্রিকার সম্পাদকের একজন আনকোরা লেখকের একটি পংক্তি ভাঙ্গাচোরার অধিকার আছে। বাংলা সাহিত্যের বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসে এর ঢের নজীর [illegible]। সে থাক। দ্বিতীয় দফায় আর একটি মফস্বলী কাগজে। অমৃতলোক, স্টেশন রোড, মেদিনীপুর। কবির মহত্ত্ব হেড লাইনে ছাপা হল : একজন তেজস্বী কবি অমৃত সম্পাদকের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তাঁর লেখার সম্মানমর্যাদা রক্ষণ দিয়েছেন। তৃতীয় দফায় কলকাতার জনৈকের ব্যক্তিগত কাগজে কবি ইস্তাহার দিলেন : তিনি আর অমৃতে লিখবেন না।

কাহিনী শেষ। কিন্তু গল্পের নটে মুড়োর না। ঈশ্বর ত্রিপাঠী ইস্তাহারের [illegible] অমৃতে লেখা পাঠালেন' এবং সহিষ্ণু সজাগ সম্পাদক সয়ত্নে ছাপালেন!! কবির মহত্ত্বের খবর দেখেছিলাম হেড-লাইনে। দুর্লভ মহত্ত্ব দেখলাম সম্পাদকের!! অপরাজিত বসু, ৫৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২।

একশ বছরে চালের দরের ওঠানামা

বাঙালীর জীবনে চালের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। এই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দরের ওঠানামার স্বরূপটি বুঝে নিতে চেষ্টা করব।

কোন জিনিষের যোগানই সেই দ্রব্যের বাজার দর নির্ধারণ করে।

যোগানের স্বল্পতা ভারতীয় অর্থনীতির চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। চালও এর ব্যতিক্রম নয়। চালের জোগানের স্বল্পতার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :—

ক) চাষ বৃদ্ধি জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সমতালে হয় নি।

খ) কৃষিব্যবস্থা প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতি বিমুখতা স্বাভাবিক জোগানকে ব্যাহত করেছে।

গ) ধান এর উৎপাদনযোগ্য জমিতে অন্যান্য ফসল (বাংলাদেশে মূলতঃ পাট) উৎপাদনের জন্য কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ কমে গিয়েছে।

ঘ) চাষের উপকরণের অভাব ও প্রগতিশীল স্তরে চাষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে অভিজ্ঞতার বা দক্ষতার দরকার তার নিতান্তই অভাব।

ঙ) ক্রমহ্রাস প্রান্তিক উৎপাদনবিধি জমির উৎপাদনী শক্তিকে কমিয়ে দিয়েছে।

চ) বিনিয়োগযোগ্য মূলধন কৃষিতে প্রযুক্ত না করে অনুৎপাদনশীল পথে ব্যয় করা হয়েছে।

গত ১০০ বছরে চালের যোগান তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়েছে। সে ক্ষেত্রে চালের দামের নানারকম তারতম্য হয়েছে। যেমন ১৮৭৮ সালে অবিভক্ত বাংলায় চালের গড় দাম ছিল মণ প্রতি ২ টাকা ১৪ আনা। ১৮৮৫ সালে সেই দাম হয় ৩ টাকা ১ আনা। ১৮৯০-৯৪ পর্যন্ত সেই গড় দাম হয় ২ টাকা ১৩ আনা ৫ পয়সা। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দামের আকস্মিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাপী যে ভয়াবহ মন্দা ৩০এর দশকে সংঘটিত হয়েছিল তাতে চালের দাম অত্যন্ত কমে যায়। আবার ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চালের দামের অত্যন্ত উর্ধমুখী প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে।

গত ১০০ বছরে এই মূল্যের গতিপ্রকৃতিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে উর্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

ক) ১৮৭৮—১৯১৮, খ) ১৯১৯—১৯৩১ গ) ১৯৩২—১৯৩৮, ঘ) ১৯৩৯—৭৮।

প্রথম ৪০ বছরে চালের দামের খুব দ্রুত তারতম্য ঘটত না। তবে যে বছর দুর্ভিক্ষ হতো, তার পরের বছর চালের দাম বাড়তো। বার্মা থেকে চাল এনে সেই ঘাটতি পূরণ করা হত। উদাহরণস্বরূপ ১৮৯১ সালে উৎপাদন অত্যন্ত কম হয় বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য সেই জন্য ১৮৯২ সালে চালের দাম অত্যন্ত বেশি ছিল। আবার ১৮৯৩ সালে বৃষ্টিপাত ঠিক হওয়ায় চালের দাম স্বাভাবিক স্তরে নেমে আসে। এই রকম প্রবনতা ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চলেছিল। নিম্নলিখিত তালিকাটি থেকেই বিষয়টি পরিস্কার হবে।

চালের দাম (গড় মূল্য মণ প্রতি) ১৯০০—১৯১৮

বছর	মূল্য টাঃ আনা	বছর	মূল্য টাঃ আনা	বছর	মূল্য টাঃ আনা	বছর	মূল্য টাঃ আনা
১৯০১	৩-১১			১৯১১	৩-১২	১৯১৭	৪-১১
১৯০২	৩-৬	১৯০৬	৪-১২	১৯১২	৪-৩	১৯১৮	৪- ৩
১৯০৩	৩-১	১৯০৭	৫- ৭	১৯১৩	৫-৫		
১৯০৪	২-১৫	১৯০৮	৫-৮	১৯১৪	৫-১০		
১৯০৫	৩-৪	১৯০৯	৪-১০	১৯১৫	৫-১৩		
		১৯১০	৩-১০	১৯১৬	৫- ৭		

এই তালিকা থেকে এটি পরিষ্কার যে এই বছরগুলিতে খুব একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এটা চলেছিল। তবে যুদ্ধের বছরগুলিতে বাড়ার একটি অতিরিক্ত কারণ ছিল। চালের উৎপাদনের একটা অংশ যুদ্ধের প্রয়োজনে গিয়েছিল, তবে সেই পরিমাণ খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানীর ক্ষেত্রে যে পরিবহন খরচ পড়তো, তাও মূল্যবৃদ্ধির আংশিক কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই চালের দামের একটা উর্ধমুখী প্রবণতা ছিল। ভারতে এই সময় চালের রপ্তানী বাড়ে। ফলে দেশীয় বাজারে অভাব দেখা দেয়। এই রপ্তানী হত প্রধানত ইউরোপের বাজারে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি থেকে তাদের চাল আমদানী করতো। এই সময় ইউরোপীয় দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি দেখা দেয়। অর্থনীতির ভাষায় একে বুম বলা যেতে পারে। এই বুমের সময় সাধারণ মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটে ও কর্মসংস্থান, আয় বাড়ে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের একটা নিয়ম আছে যে, পৃথিবীতে যে যে দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে, তাদের মধ্যে একটি দেশের আর্থিক উন্নয়নের প্রভাব অন্য দেশগুলির মধ্যে পড়তে বাধ্য। বিশ্বযুদ্ধের উত্তরপর্বে বাংলাদেশের চালের এই মূল্যবৃদ্ধি সেই বুমের আংশিক কারণ হিসাবে বলা যায়। কেননা ১৯১৯ সালে চালের দাম ছিল ৭ টাকা ৬ আনা, ১৯২০ সালে ছিল ৭ টাকা ৪ আনা (এক মণ)। ১৯২৫-২৬ সালে ছিল ৭ টাকা ৩ আনা, ১৯২৬-২৭ সালে ছিল ৭ টাকা ৮ আনা। এইরকম দর ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯৩০-৩১ সালে গড় দাম ছিল মণ প্রতি ৬ টাকার ওপর, ইউরোপের বাজারে ঐ বর্ধিত মূল্যস্তরের প্রভাব তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে সম্পর্কিত সমস্ত দেশগুলিতে পড়েছিল। সেইজন্য অবিভক্ত ভারতে চালের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই একই নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাব থেকে ভারত নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। ভারতে এই মন্দার স্বরূপ অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৩১-৩২এ চালের দাম বাংলায় ছিল মণপ্রতি ৪ টাকা ১ আনা, ৩২-৩৩ সালে ঐ দর ছিল ৩ টাকা ৫ আনা, ৩৪-৩৫ সালে ছিল ৩ টাকা, ৩৫-৩৬ সালে ছিল ৩ টাকা ৪ আনা, ৩৬-৩৭ সালে ছিল ৩ টাকা ৮ আনা, ৩৭-৩৮ সালে ৩ টাকা ১০ আনা।

আমাদের দেশে প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি। কৃষিজীবীরাই দেশের অধিকাংশ লোক। তাদের আয় অত্যন্ত কম। সুতরাং চালসহ অন্যান্য দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়ার অর্থ হল কৃষিজীবীর আয় কমে যাওয়া। আয় কমলে চাহিদাও কমে যায়। চাহিদা কমলে বাজারে মন্দা আরও ঘনীভূত হয়। এই সময় কৃষিজীবীরা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি আবার নজর দেয়। উৎপাদন খরচও বেড়ে গিয়েছিল। তারা ঋণ করেই এই উৎপাদনবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। এতে কৃষিজীবীদের দুর্দশা আরও বাড়ে। বিদেশী সরকার পরিস্থিতির মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় ত্রিশ-এর দশকে মন্দা অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।

১৯৩৯ সাল থেকে চালের দাম ক্রমবর্ধমান। বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি বিশেষ করে ইংলন্ড ভারতের চাল নিতে আরম্ভ করে। দেশে কাগজী মুদ্রার প্রচলন অত্যন্ত বেড়ে যায়। সব জিনিষের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য চালের দামও বাড়তে থাকে। ফাটকাবাজেরা বেশি মুনাফার জন্য চালের মজুত বাড়াতে থাকে। দেশে কৃত্রিম অভাবর সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির দরুণ চালের দাম ১৯২৬এর তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালে প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেল। ১৯৪৩এ জাপান বার্মার দখল নিল। সুতরাং বার্মা থেকে আর চাল আমদানী করা গেল না। ফলে কৃত্রিম ঘাটতির কারণে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দামের এই উর্ধমুখী প্রবণতা এত বেশি ছিল যে দুর্ভিক্ষের সময় চাল মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। পাটের ব্যবসা আরও লাভজনক হওয়ায় অনেক জমিতে পাট উৎপাদন বাড়তে থাকে। ফলে পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের সময় চালের দামের উর্ধমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকে।

১৯৪৭ সালের পরেও চালের দাম বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে চালের দাম বাড়তে থাকে এই কারণে যে জনসংখ্যার চাপ ক্রমশঃ বাড়ছে যে

স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণ এত লোকের চাহিদাকে মেটাতে পারেনি। ১৯৫১ সালে ভারতে যখন যোজনাধীন অর্থনৈতিক কর্মসূচী চালু হয় তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গে চালের দরের ওঠানামা করে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে একভাবেই। প্রথম যোজনার বছরগুলিতে উৎপাদনে ও দামে স্থিতিশীলতা অব্যাহত ছিল কেননা যেখানে ১৯৪৭-৪৮ সালে কিলোপ্রতি দাম ছিল ৫২ পয়সা সেখানে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে ছিল যথাক্রমে ৪৩ ও ৪৫ পয়সা প্রতি কিলো। দ্বিতীয় যোজনায় দাম ছিল নিম্নরূপ। ১৯৫৬ সালে ৫৪ পয়সা, ৫৭ সালে ৬১ পয়সা, ৫৮ সালে ৬৮ পয়সা, ৫৯ সালে ৬৩ পয়সা, ৬০এও ৬৩ পয়সা—৬২ সালে ছিল ৬৪ পয়সা, ১৯৬১ সালে ছিল ৫৬ পয়সা প্রতি কিলো। ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি খরা ও অনাবৃষ্টির ফলে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়, ঐ জন্য গড়মূল্য বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৬৩ সালে এই মূল্য হয় ৭৯ পয়সা, ৬৫ সালে ৯১ পয়সা, ৬৬ সালে ১ টাকা ২৭ পয়সা, ৬৭ সালে ১ টাকা ৮২ পয়সা, ৬৮ সালে ১ টাকা ৬৬ পয়সা। ৭০-৭১ সালের পর দেশে এক বিরাট মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যার জন্য এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিন্দুমাত্র হ্রাস না পেয়ে বরং আরও অব্যাহত থাকে। ১৯৭১ সালে যেখানে দাম ছিল ১ টাকা ৪২ পঃ পরবর্তী বছরগুলি অর্থাৎ ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে চালের দাম কিলোপ্রতি হয় যথাক্রমে ১-৪৯ টাকা, ১-৯৩ টাকা ২-৬২ টাকা, ২-২৩ টাকা, ১-৯৮ টাকা, ২-০৫ টাকা। ১৯৭৮-এর গড়মূল্য এখনও ঘোষিত হয়নি। তবে এই বছর ভয়াবহ বন্যার পরেও যে চালের দামের রাতারাতি বৃদ্ধি পায়নি এর প্রধান কারণ দেশে খাদ্যশস্যের মজুত বেশ যথেষ্ট আছে। এছাড়া ৫ম যোজনার শেষে কৃষির অত্যন্ত সাফল্যের জন্য দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার দিকে এগিয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।

চিনির কাছে গুড়ের পরাজয়

ভারতবাসীর মধ্যে চিনি ও গুড়ের ব্যবহার প্রচলিত। ভারতীয় শাস্ত্রে চিনিকে পঞ্চামৃতের একটি বলে উল্লেখ করা হয়। উত্তর ভারতই ছিল চিনির প্রধান এবং আদি উৎপত্তি। মুসলমান লেখকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, প্রথম সাদা চিনি গুড় থেকে প্রস্তুত হত, ব্রিটিশ আমলেরও আগে। উত্তর ভারত ছাড়াও বাংলার মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান জেলায় এই সাদা চিনির ব্যবহার চোখে পড়ত। ভারতে প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত চিনিকল স্থাপিত হয় ১৯০৩ সালে। ১৯৩২ সালে ভারত সরকারের শিল্প সংরক্ষণ নীতির আওতায় আসার পর এই শিল্পের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্রে। বাংলাদেশে এই শিল্পের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেনি। বাইরের রাজ্য থেকে আমদানী করেই এই রাজ্য তার চাহিদা মেটায়। চিনির ব্যবহার গত পঁচিশ [illegible] ব্যাপকভাবে বেড়েছে বাংলা তথা ভারতে। একটা সময় ছিল যখন বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে গুড়ের প্রচলন ছিল অত্যন্ত বেশি। আমরা এই প্রবন্ধে চিনির এই প্রাধান্য বিস্তারের কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। একথা অনস্বীকার্য যে গুড়ই ভারতের অধিকাংশ জায়গায় মিষ্টির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। চিনির এই উৎপাদন বৃদ্ধির পরেও গুড়ের উৎপাদন চিনির তুলনায় বেশি। ভারতের ইক্ষুসম্পদের মোট ৫/৮ ভাগ গুড় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ভারতে এখনও ৭০ লক্ষ টন গুড় ও খান্দসরী উৎপাদিত হয়। পঞ্চম যোজনার শেষে ভারতে চিনির উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ৬০ লক্ষ টনেরও বেশি। তবে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, যেখানে ১৯৩২ সালে ভারতে মাত্র ১-৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হত, সেই মাত্রায় বাংলাদেশ তথা ভারতে চিনির ব্যবহার ও উৎপাদন বহুল পরিমাণে বেড়েছে।

গুড় শিল্প হ্রাসের প্রধান কারণ হচ্ছে, উৎপাদনে অনগ্রসরতা। মোট ইক্ষুরসের মিষ্টতার শতকরা ৫২ ভাগ মাত্র গুড় উৎপাদনে কাজে লাগে, সেক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিনিকল প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মিষ্টতাকে শোষিত করতে পারে। গুড় উৎপাদনে আমাদের দেশে অত্যন্ত অনুন্নত ও অনগ্রসর পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটির আবার অন্য ধরনের একটা দিক আছে। এখানে উৎপাদন পদ্ধতি যে অনগ্রসর তাই নয়, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় আখ চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে চেষ্টা করা হয় না, অথচ সে চেষ্টায় উৎপাদন পদ্ধতির যদি আধুনিকীকরণ করা হয় তবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বাড়বে এটা নিঃসন্দেহ।

আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর গুড় থেকে চিনি উৎপাদনের প্রণালী কমতে শুরু করল। গুড় থেকে উৎপাদন করতে গেলে যে পরিমাণ মাতগুড় বেরোত, তার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। এটা লোকসানের বোঝা বাড়িয়ে দিত। এছাড়া গুড় থেকে যে-হারে চিনি পাওয়া যায় তার পরিমাণ, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের থেকে আপেক্ষিকভাবে অনেক কম। প্রথমোক্ত পরিমাণে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও বেশি।

১৯৩৪ সালের পর থেকে ইক্ষু শিল্পের একটা বেশ বড় অংশ আধুনিক পদ্ধতিতে চিনি উৎপাদনের আওতায় চলে আসে। এর কারণ হচ্ছে, ইক্ষু উৎপাদকেরা মিল মালিকদের কাছে সরকারীভাবে বিধিবদ্ধ একটি নির্দিষ্ট দরে আখ বিক্রয় করে। গুড় উৎপাদকদের থেকে আখচাষীরা সেইরকম দর পায় না। সেইজন্য গুড় উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে আপেক্ষিকভাবে।

এছাড়া দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিরও বদল হয়। গত ৪০ বছরে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ঘটেছে একথা বলা বাহুল্য। এই উন্নয়নের জন্য লোকে গুড় ছেড়ে দিয়ে চিনির ব্যবহার বাড়িয়েছে। একথাও বলা যায় যে, শহরাঞ্চলে চিনির ব্যবহার গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বেশি। এছাড়া বাংলাদেশের মিষ্টান্ন শিল্প গত পঞ্চাশ বছরে ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বলা বাহুল্য চিনির উৎপাদন বাড়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আগেই আমরা বলেছি বাংলাদেশ বরাবর তার প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমদানী করে। এইজন্য বাংলাদেশে চিনির দাম ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতই ওঠানামা
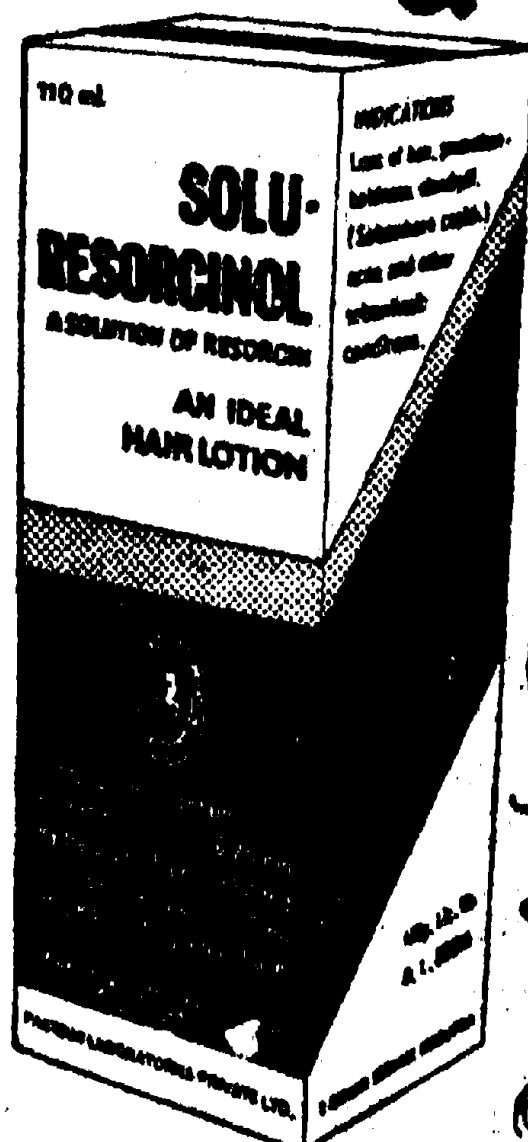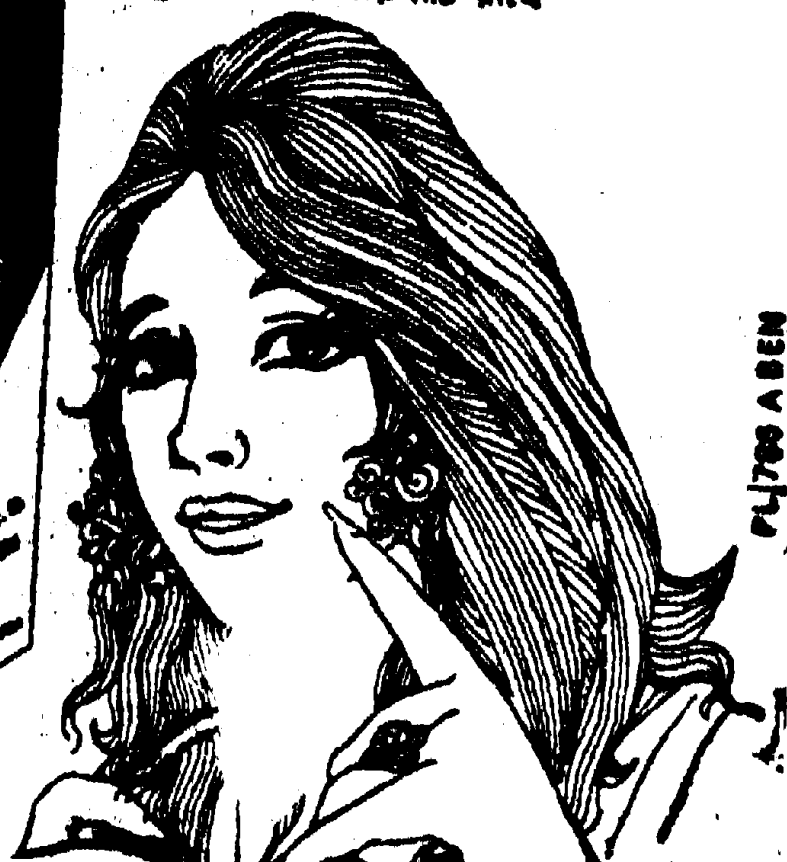
করে। যেমন ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চিনির গড় মূল্য ছিল ৯ টাকা ১৩ আনা, বাংলাদেশে সেই মূল্য ছিল ১১ টাকা ৬ আনা। আবার ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলাদেশের মূল্য ছিল ৩৫ টাকা ১ আনা (প্রতি মণ) ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ছিল মণ প্রতি ৩৫ টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে কলকাতার বাজারে গড় মূল্য ছিল ৩১ টাকা প্রতি মণ এবং, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে গড় মূল্য ছিল ২৭ টাকা ৩ আনা মণ প্রতি। এই বছরগুলিতে ভারতে গুড়ের গড় মূল্য ছিল যথাক্রমে মণ প্রতি ৮ টাকা ৪ আনা (১৯৩৮-৩৯ সালে), ২২ টাকা (১৯৪৮-৪৯ সালে), ১১ টাকা ১৪ আনা (১৯৫৩-৫৪ সালে)। ১৯৫৪-৫৫ সালে চিনির মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৮৬ টাকা ৭৫ পয়সা ও গুড়ের মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৪৭ টাকা ৪৫ পয়সা। এই সময় বাংলাদেশে গুড়ের গড় মূল্য ছিল কুইন্টাল প্রতি ৪৮ টাকা। নিচে আমরা চিনি ও গুড়ের দামের একটা তুলনামূলক তালিকা দিলাম।

সাল	চিনির দাম (কুঃ প্রতি)	গুড়ের দাম (কুঃ প্রতি)
১৯৫০-৫১	৯৬-৮৪	৫৩-৬০
১৯৫৫-৫৬	৮২-৯৫	২৮-৪৩
১৯৬১-৬২	১১৪-৯৮	৯১-২৫
১৯৬৪-৬৫	১৩৬-৭৫	৭৬-৯৬
১৯৬৭-৬৮	১৭০-৭০	১৮০-০৭
১৯৭২-৭৩	২৩৫-৮০	২০২-৮৫
১৯৭৬-৭৭	১৯০-৬০	১৮৮-৯০
১৯৭৭-৭৮	১৯০-২০	১৯২-১০

দেখা যাচ্ছে চিনির দাম ও গুড়ের দাম গত ২৫ বছরের মধ্যে বেশ কাছাকাছি এসে গেছে। একটা সময়ে চিনির চেয়ে গুড়ের দাম অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু গত দশ বছরে চিনি ও গুড়ের দরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ঘটেনি। ফলে চিনির ব্যবহার আরও বেড়ে গেছে। চিনি ও গুড়ের দাম বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন রকম হয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, যেহেতু এটি কৃষি-ভিত্তিক শিল্প সেহেতু এর উৎপাদন ও দাম প্রাকৃতিক আনুকূল্যের ওপর নির্ভরশীল। যে বছর দাম কমে, বুঝতে হবে সে বছর রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে। যেমন গত বছর। সরকারী নীতিও অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের ও দামের তারতম্য ঘটায়। এইবার আমরা দেখাবো চিনি ও গুড়ের মূল্যসূচক কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

১৯৫২=১০০

সাল	চিনি	গুড়
৫৩-৫৪	৯৯	১৪১
৫৭-৫৮	১১০	১০৭
৬২-৬৩	১৩১	১৫৩
৬৪-৬৫	১৫১	২১০
৬৭-৬৮	১৮৪	৪৫০
৭২-৭৩	৩১০	৫৬০

এই মূল্যসূচক প্রমাণ করে যে গুড়ের মূল্য আপেক্ষিকভাবে চিনির থেকে বেড়েছে।

এবারে আমরা দেখাবো চিনি ও গুড়ের মাথাপিছু ভোগের হ্রাসবৃদ্ধি। গুড় ও খান্দসরীর মোট মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ছিল ১৯৫০-৫১ সালে ১৩-৩ কিলোগ্রাম ও চিনির ছিল ৩ কিঃ গ্রাঃ। ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ব্যক্তিগত ভোগ ৭-৯ কিঃ গ্রাঃ এবং চিনির ছিল ৫ কিঃ গ্রাঃ। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই ভোগের পরিমাণ দাঁড়ায় গুড় ১২ কিঃ গ্রাঃ ও চিনি ৫-৭ কিঃ গ্রাঃ। ৬৭-৬৮ সালে গুড়ের ব্যক্তিগত ভোগ ছিল ১৪ কিঃ গ্রাঃ ও চিনির ভোগ ছিল ৬ কিঃ গ্রাঃ। ৭৪-৭৫ সালে গুড়ের ব্যক্তিগত ভোগের পরিমাণ ১০ কিঃ গ্রাঃ ও ৮ কিঃ গ্রাঃ ছিল চিনির পরিমাণ। গুড় এখনও গ্রামবাসীদের প্রধান মিষ্টির মাধ্যম এবং ভারতবর্ষে গ্রামেই অধিকাংশ লোক থাকে। গুড় তাঁরা যে অধিক পরিমাণে খাবেন একথা বলা বাহুল্য। তাছাড়া গুড় শিল্প প্রচুর লোককে এখনও নিযুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গের চিনি শিল্পে নিযুক্ত লোকেদের তুলনায় গুড় শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অনেকগুন বেশী। গুড় এখনও চিনির তুলনায় বেশী উৎপাদিত হয়। নিম্নের তালিকাটি সমগ্র ভারতবর্ষের গুড়ের ও চিনির উৎপাদনের পরিমাণের নির্দেশক।

গুড় ও খান্দসরী চিনি (লক্ষ টন)
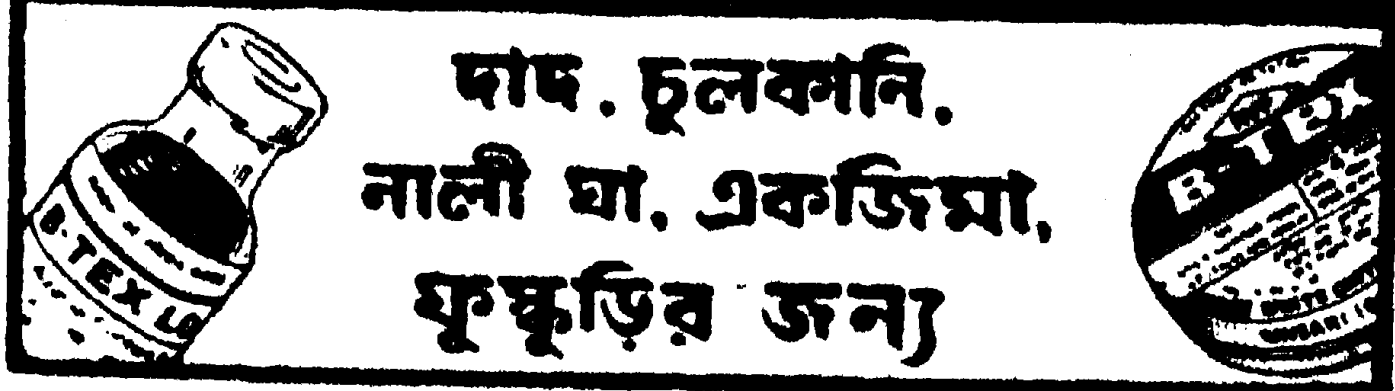
১৯৫১-৫২	৩৪-২৯	১৫
১৯৫৪-৫৫	৩০-৯৯	১৬
১৯৫৮-৫৯	৫৫-৩০	৩০
১৯৬১-৬২	৬১-৫০	২১
১৯৬৭-৬৮	৬০-০০	৩১
১৯৭২-৭৩	৭০-০০	৩৮-৮
১৯৭৬-৭৭	৭০-০০	৫৮-৬

দেখা যাচ্ছে যে গুড়ের উৎপাদন এখনও অনেক বেশি চিনির তুলনায়। চিনির উৎপাদন গত ৩ বছরে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিনি রপ্তানী বাবদ বিদেশী মুদ্রার আয়ও বেশ বেড়েছে সেইজন্য। বাংলার লোকেরা বর্তমানে চিনি বেশি পরিমাণে ভোগ করছেন পূর্বের তুলনায়। দ্রব্যমূল্য হ্রাস এর প্রধান কারণ। এ ছাড়া চিনি প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রচারিত বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে জাতি-ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে চিনির প্রচলন বেড়ে গিয়েছে। ব্যক্তিগত রুচির পরিবর্তন এবং আয় বৃদ্ধি এগুলিও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। পরিশেষে আমরা বলবো যে, চিনি শিল্পের যেমন সম্প্রসারণ দরকার, সেইরকম গুড় শিল্পেরও চলন থাকা দরকার। গুড় শিল্প যে অনেক লোককে নিয়োগ করে তা নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটীরশিল্প। এছাড়া গুড় চিনির থেকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। গুড়ে প্লুকোজ আছে চিনিতে তা নেই। খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ গুড়ে আরও বেশী। পরিবহনের অসুবিধার জন্য চিনি সব সময়ে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে পৌঁছাতে পারে না, গুড়ই সেখানে একমাত্র ভরসা। এই সকল দিক বিবেচনা করে গুড়কে চিনির পরিপূরকের ভূমিকা পালন করা দরকার। সরকারের যথেষ্ট এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। গুড়ের জন্য যে আখের সরবরাহ করা হয় তার দাম স্বাভাবিক যোগান ও চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ফলে আখচাষীরা কোন লাভজনক দর পায় না। আবার গুড়ের উৎপাদন, বন্টন প্রভৃতি একদমই নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত নয়। সেইজন্য গুড়ের দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে যে সকল হিসাব পাওয়া যায় সেগুলি কতটা ঠিক এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা সরকার পরিচালিত বিভিন্ন ষ্ট্যাটিসটিক্যাল সংস্থাকে অনুরোধ করবো তাঁরা যেন এই বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেন। চিনি ও গুড় পরিপূরক সামগ্রী—প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, এটাই আমাদের সর্বশেষ কথা।

এ'দের জন্ম জেলখানায়

জেলখানার যীশু

রমেন দাস

বিচারক তখনও আসনে বসে। তার রায় শুনে আদালত কক্ষ চমকে উঠল। দমবন্ধ পরিবেশ। সকলেই স্তম্ভিত। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো তরুণী-আসামীর সিঁথির সিঁদুর তখনও জ্বলজ্বল করছিল। বিচারকের রায় শুনে আতঙ্কিত তরুণী রুদ্ধকণ্ঠ--হতবুদ্ধি। চোখেমুখে অজানা আশঙ্কার কালো ছায়া। থরথর করে সে ভয়ে কাঁপছিল। কী যেন বলতে চায়। কিন্তু পারে না।

স্তব্ধ আদালতকক্ষ লোকে লোকারণ্য। বিচারালয়ে এ ধরনের বিচার অহরহই ঘটে থাকে। কিন্তু কোনও তরুণী আসামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ খুব একটা দেখা যায় না। অতএব, আদালত প্রাঙ্গণ উৎসুক দর্শকের ভীড়ে ভেঙে পড়েছিল। কয়েক মিনিট অবিশ্বাস্য নীরবতা। একে অপরের দিকে তাকায়। আর তরুণীর সম্ভাব্য বন্দীদশার কথা ভেবে শিউরে ওঠে। কেউ তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে। কেউবা স্বামী হত্যাকারিণীকে দেখে কটু মন্তব্য করে। মন্তব্য প্রকাশ পায় অত্যন্ত চাপা সুরে। আদালত কক্ষে কোনও মন্তব্য প্রকাশ যে বেআইনী সমাগত দর্শকদের প্রায় সকলেরই তা জানা।

কাঠগড়ায় দাঁড়ানো তরুণী এবার একটু নড়ে দাঁড়ায়। এতক্ষণ মাথা নীচু করেই ছিল। উদাস দৃষ্টি মেলে সে তার আইনজীবীর দিকে তাকাল। আইনজীবী উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালেন। মিনিট কয়েক ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা। তারপর আসামীর পক্ষে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, মে লর্ড, স্বামী হত্যার দায়ে তরুণী আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। কিন্তু আসামীর কোলে দুটি শিশু সন্তান আছে। তাদের দেখবার মত কোন আত্মীয়-পরিজন তার পরিবারে নেই। অতএব ঐ দুটি শিশু সন্তানের মুখ চেয়ে সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষ এই শাস্তিদান পুনর্বিবেচনার জন্য আসামী আর্জি করছেন।

আইনজীবীর বক্তব্য পেশের সঙ্গে সঙ্গে তরুণীর দু' চোখে জলের ধারা নেমে এল। কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। বলল, হুজুর আমার দুটি শিশু সন্তানের মুখ চেয়ে অন্ততঃ......

মর্মস্পর্শী এই আবেদন এবং দৃশ্য দর্শকদের আহত করল। বিচারকের উত্তরের আশায় আদালত কক্ষ উন্মুখ। বিচারক ধীর, অথচ গম্ভীর কণ্ঠে পুনরাদেশ ঘোষণা করলেন : যাবজ্জীবন দণ্ডই বহাল থাকছে। তবে আসামী ইচ্ছা করলে তার দুই শিশু সন্তানকেও কারাসঙ্গী করতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, খুনী তরুণীর শাস্তি হল। যথারীতি দুই শিশু সন্তান নিয়ে সে যথাসময়ে কারাজীবন শুরু করল। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী তরুণী হতাশায় হাঁপিয়ে উঠে। কিন্তু তার দুই অবোধ শিশু সন্তান পায় অনেক সঙ্গী-সাথী। ওরা কারাবাসের অর্থ বোঝে না। চার দেওয়ালের মধ্যেই ওরা পৃথিবীর স্বপ্নের ছবি আঁকে।

পশ্চিম বাংলায় যে ক'টি জেলখানা আছে, তার সব কটিতে না হলেও, বেশ কয়েকটি জেলে মহিলা বন্দীদের রাখার ব্যবস্থা আছে। রাজনৈতিক বন্দী ছাড়াও, খুন-রাহাজানি, ডাকাতি, চোরাই চালান ইত্যাদি নানা অভিযোগে অভিযুক্তাদের ঐসব জেলে রাখা হয়। যেসব মহিলা আসামীর শিশু সন্তানকে দেখার মত কেউ থাকে না, তাদেরও বিনা অপরাধে অপরাধী মায়ের সঙ্গে জেলজীবন কাটাতে হয়। বিনা অপরাধে কারাবাসে আসা এধরনের শিশু-কিশোরের সংখ্যাও নেহাৎ মন্দ নয়।

কোন্ কোন্ পথে, কীভাবে এবং কেন এই শিশু-কিশোরের কারাবাস? আগেই বলা হয়েছে, একজন শিশু কিশোরের জীবনে কারাবাস শুরু হয়, তাদের অপরাধিনী মায়ের আঁচল ধরে। মায়ের অপরাধের ফল তাদেরও ভোগ করতে হয়।

অপর এক দলের আগমন ঘটে আর এক আশ্চর্য পথ ধরে। যেসব মেয়ে আসামী আদালতে দোষী সব্যস্ত হয় এবং তাদের মধ্যে যারা গর্ভবতী থাকে, জেলখানায় এসে তাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, সেইসব শিশুও মায়ের সঙ্গে জেলখানায় আটকে পড়ে। যদিও নিয়ম আছে ভূমিষ্ঠ শিশু একটু বড় হলে এবং মায়ের সম্মতি থাকলে তার যেকোন নিকট আত্মীয় জেল থেকে তাকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এধরনের কোনও আসামীর সন্তানকে জেল থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে কোনও আত্মীয়-স্বজন আর আসে না। ফলে অনাদৃত এই শিশু ভোলানাথের দল জেলখানার চার দেওয়ালের মধ্যেই অন্য পাঁচটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে বড় হয়ে উঠে।

যেসব ছেলেমেয়েকে বেআইনী কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তার মধ্যে যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, তাদের জন্য কলকাতা শিশু-[illegible]

আছে। শিশু-আদালতের বিচারপর্বে সংশ্লিষ্ট শিশু বা কিশোরের অপরাধ বিচার-বিশ্লেষণের পর তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারপর্ব শেষে তাদের চরিত্র-সংশোধনের জন্য সরকারী হোমে পাঠানো হয়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে কোনও নাবালককে অত্যন্ত হিংস্র অথবা ক্ষতিকারক বলে বিচারক মনে করেন, তাদের জেলখানায় পাঠানো হয়। শিশু-আদালতের মাধ্যমে আগত আসামীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে খুবই কম।

বহুক্ষেত্রে পুলিশ হারিয়ে যাওয়া শিশু-কিশোরকে উদ্ধার করার পর যখন অনেক খুঁজেও তাদের পরিবারের সন্ধান মেলে না, তাদেরও আদালতের নির্দেশ নিয়ে জেলখানায় পাঠানো হয়। এছাড়া কুড়িয়ে পাওয়া বেওয়ারিশ শিশুও পুলিশের হাতে কম আসে না। এদের নিয়েও নানা সমস্যা দেখা দেয়। শেষ অবধি এরাও জেলখানায় আশ্রয় পায়। তবে বিভিন্নভাবে জেলাখানায় আসা শিশু-কিশোরের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে।

জেলখানায় ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর আদর-যত্নের দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। এদের মধ্যে কোনরকম শ্রেণী-বিভাগ থাকে না। যেসব শিশুর মা জেলে থাকে, তাদের মায়ের সঙ্গেই রাখা হয়। ছেলেরা ছয় বছর পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকতে পারে। তারপরই তাদের আলাদা ব্যবস্থা। আর মেয়েরা যত বড়ই হোক না কেন, তাদের থাকতে হয় মায়ের সঙ্গে।

কলকাতার জেলগুলির মধ্যে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি জেলেই মেয়ে-বন্দী রাখার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া মফঃস্বলের প্রায় সব জেলখানাতেও অবশ্য রাখা হয়। অতএব এই ধরনের জেলখানাগুলিতে সমস্যা ও ব্যবস্থায় নানা বৈশিষ্ট্য।তবে প্রেসিডেন্সি জেলের ব্যবস্থা আলাদা। এখানে প্রসবাগার আছে। যেসব গর্ভবতী আসামীর কারাদণ্ড হয়—জেলখানাতেই তাদের এসব ব্যবস্থা করতে হয়। বলা বাহুল্য, এই জেলেই মেয়ে-বন্দীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এই জেলে ভূমিষ্ঠ বহু শিশু এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ওরা জেলখানার ভেতরেই থাকে। জেলখানায় শিশুদের মধ্যে একটা অদৃশ্য আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা ওরা এক সঙ্গে খেলাধুলা, হৈ হুল্লোড় করে কাটায়।

বহরমপুর জেলের জনৈকা খুনী তার শিশু কন্যাকে নিয়ে কারাবাস শুরু করে প্রায় বছর সাতেক আগে। এখন তার তিন মেয়ের বয়স যথাক্রমে দশ, বারো এবং চৌদ্দ। বড় মেয়েটি লেখাপড়ায় খুব বেশী উৎসাহী। অথচ কারাগারে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার জন্য জেলখানা থেকে তাকে সরকারী হোমে পাঠাতে হয়। সে এখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সে তার মায়ের কৃতকর্মের কথা সব জেনেছে। কিন্তু মায়ের প্রতি একটুক ঘৃণা নেই। সে মনে করে, ঘটনাচক্রে মা [illegible]

তার মার নয়। এছাড়া তার মতে, মাকে বাদ দিয়ে এই পৃথিবীতে আর তাদের কেইবা আছে? সে চায়, পরীক্ষায় পাশ করে দুই বোনকে জেলখানা থেকে বাইরে নিয়ে আসবে। চাকুরী করে তাদেরও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে। ততদিনে মায়ের চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড শেষ হবে। তখন সুখ-শান্তিতে আবার তারা নতুন সংসার গড়ে তুলবে।

স্বামীকে খুন করার পর জনৈকা তরুণীর ফাঁসির হুকুম হয়। তা শুনে সে পাগল হয়ে যায়। কোলে ছিল এক শিশু কন্যা। কিন্তু যেহেতু আসামী পাগল, আইনগত কারণে তাকে আর ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হয় না। আদালত পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করে নতুন রায়ে তার আজীবন কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু সে আর মানসিক রোগ মুক্ত হয় না। জেল কর্তৃপক্ষ ভয়ে আর তার কাছে তার শিশু-সন্তানকেও রাখতে ভরসা পান না। বহরমপুর জেলে প্রায় দশ বছর তার কারাবাস চলছে। মেয়ের বয়সও এখন বারো। মেয়েটি এখন কারাবাসে ধাতস্থ। বাইরে যাওয়ার কোন আগ্রহ নেই। মা পাগল হলেও, তাকে ফেলে সে জেলের বাইরে যেতে নারাজ। পাগলিনী মা মাঝে মাঝেই চীৎকার করে বলে : আমাকে ফাঁসি দাও—আমি স্বামীকে খুন করেছি। ফাঁসিই আমার প্রাপ্য। মেয়ে তার মায়ের কথা শুনে গুমরে কেঁদে ওঠে। কারাবাসী অন্য সব বয়স্করা তাকে শান্ত করে, প্রবোধ দেয়।

আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলের বাইরে দাঁড়িয়ে কোনও সন্ধ্যায় যদি সমবেত শিশুর মিলিত গানের সুর শোনা যায়, বুঝবেন, ওরা জেলখানার যীশুরা। সন্ধ্যায় সপ্তাহে দুদিন করে ওদের প্রার্থনা গান শেখানো হয়। গলা ছেড়ে সারাদিনের শেষে ওরা প্রার্থনা সঙ্গীত করে। জেলখানার পবিত্র-যীশুরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমবেত-ভাবে—প্রার্থনা জানায়, আমাদের মানুষ কর, হে মঙ্গলময়, আমাদের জীবন ফুলের মত কর।...

দূরে দাঁড়িয়ে ঐসব শিশু-কিশোরদের বন্দিনী মায়েরা তা শোনে। কেউ বা ঈশ্বরের উদ্দেশে ধিক্কার জানায়। কেউ বা আবার চোখের জলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

দমদম সেন্ট্রাল জেল, আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেল অথবা অন্যান্য জেল-খানার হতভাগা এই শিশুদের মানুষ করার জন্য ইতিমধ্যে এক নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলের শিশু ভোলানাথদের লেখাপড়া, খেলাধুলা, হাতের কাজে তাদের উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতে এই শ্রেণীর শিশুদের সংস্কারের জন্য সম্প্রতি নতুন সংস্থা গড়া হয়েছে। তার নাম ইনস্টি-টিউট অব করেকশনাল সার্ভিসেস। এটাকে ঠিক জেল খানা বললে ভুল করা হবে। [illegible]

প্রায় দেড়শ শিশু কিশোরের বাস। বিভিন্ন জেল থেকে এদের এখানে আনা হয়েছে। উদ্দেশ্য, সুস্থ নাগরিক গড়ে তুলে সমাজ জীবনে এদের সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

এরা কারা, কিই বা এদের পরিচয়? না— এই দেড়শ শিশু কিশোরের পরিচয় এরা নিজেরাও জানেনা। জানেনা কারা-কর্তৃপক্ষ অথবা পুলিশ আদালত। বিভিন্ন সময়ে পুলিশ এদের পথে, রেল-স্টেশনে অথবা কোনও জেলা প্রাঙ্গনে খুঁজে পায়। মা বাবা অথবা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বেরিয়ে লোকের ভীড়ে, অথবা পথ ভুল করে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া শিশু ভোলানাথদের পুলিশ উদ্ধার করে। অনেক চেষ্টা করেও যখন তাদের মা বাবার সন্ধান পায়না, তখন নিরপরাধ এই শিশু কিশোরদের আদালতের অনুমতি নিয়ে জেলখানায় আশ্রয় দেওয়া হয়। ফলে অপরাধ না করেও এরা—কারাবাসী হয়। চার দেয়ালের মধ্যে কাটাতে হয় এদের বন্দীদশা। বর্তমানে বারাসতের এই শোধনাগারে যে দেড়শ শিশু কিশোরের বাস, তাদের বয়স চৌদ্দ বছরের মধ্যে, এদের অনেকেই দশ বার বছর ধরে জেলে ছিল।

বড় হয়ে যখন এরা বুঝতে পারে, কী ভাবে এই জেলে তাদের আগমন তখন, মানসিক অশান্তি তাদের আঘাত করে। বিমর্ষ-বিষণ্ণ এই শিশু কিশোররা ক্লান্তি-কর অবসর সময়ে বসে ভাবে, তাদেরও তো মা বাবা, ভাই বোন আত্মীয় পরিজন সব আছে। অথচ কেউ কারুর পরিচয়-সন্ধান জানেনা। সব থেকেও কেউ নেই। আসলে এদের চোখে জল ঝরে।

সেবার দমদম সেন্ট্রাল জেলে অনুষ্ঠিত নেতাজী জয়ন্তী [illegible] এই শ্রেণীর এক কিশোরকে দেখলাম, অপূর্ব রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইল। মঞ্চ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, ওর চোখে জল। জানতে চাইলাম, কেন সে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলল, আমার সব থেকেও যে কেউ নেই। আমার গান শুনে সকলে হাততালি দেয়। কিন্তু আমার মা বাবা আত্মীয় স্বজন জানেনও না আমি কোথায়। আর আমিও তাদের পরিচয় জানি না।... আমার পরিচয় আমি এক বেওয়ারিশ সন্তান। বলতে বলতে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অন্য আর পাঁচটি ছেলের চোখেও তখন জলের ধারা নামে।

ওদের কান্না—আর দুঃখ দূর করে আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে রেখে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন রাজ্য সরকার। বারাসতের কারেকশনাল সার্ভিসের ডেপুটি জেলার দিলীপ ব্যানার্জি তাঁর সহকর্মীরা গান বাজনা, খেলাধুলা, আর শিক্ষা দীক্ষায় দেড়শ শিশু কিশোরকে প্রতিমুহূর্তে মাতিয়ে রাখছেন। ওরা প্রতিদিন ড্রিল করে, গান গায়, ব্রতচারী নৃত্য, খেলাধুলার আসর জমিয়ে যেমন আনন্দ মেলা সৃষ্টি করে, তেমনি লেখা পড়া [illegible]

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সিনে কন্টিনেন্টাল স্টুডিওর ডিরেক্টরের অফিস ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে খোশগল্প করছিল প্রোডাকশন ম্যানেজার মধ্যবয়স্ক চণ্ডী পোড়েল। কি একটা কথায় দুজনেই হাসছিল, ঠিক এমনি সময়ে ঘরের ভেতর থেকে বাজখাঁই গলায় আওয়াজ এল—চণ্ডী—চণ্ডী—

চণ্ডীর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে—সেরেছে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই মেয়েটির ও নিজের মনে পরম উৎসাহে বলে—আরে শোনো, তারপর কি হল, বলি—

চণ্ডীদাস পা ঠুকে বলে—থাম থাম, তোর কথা শুনতে গেলে ডিরেক্টর সাহেব আস্ত গিলবে।

ইতিমধ্যে ডিরেক্টর সিংহরায়ের উচ্চকণ্ঠে ডেকেই চলেছেন।

অগত্যা চণ্ডী ইলেকট্রিক ট্রেনের বাঁশির মত অদ্ভুত স্বরে সাড়া দেয়—যাচ্ছি মেজদা—

যদিও সিংহরায়ের সঙ্গে পোড়েলের রক্তের ছিটেফোঁটা সম্পর্কও নেই, তবু পাড়াসুবাদে পাতানো সম্পর্কটা জাহিরে পোড়েল বিশেষ গৌরব বোধ করে। ব্যস্তভাবে ডিরেক্টরের ঘরে ঢোকার মুখে উল্টোদিক থেকে একটা নরম ধাক্কা খেয়ে মুখ তুলে চণ্ডী জিভ বার করে—সরি—বলল কিন্তু দুঃখের কোনো চিহ্ন সে-মুখে নেই।

—ঠিক আছে। দেখুন কাণ্ড, আমি আপনাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলুম। ইস্‌স্‌, লেগেছে ত ম্যানেজার সায়েব?

মণিকা রায়ান। চণ্ডী একটু অবাক হল আশী হাজার টাকার স্টার তাকে ডাকতে যাচ্ছিল।

মুখ কাঁচুমাচু করে সে জবাব দিল—তাড়াহুড়োর মুখে কি কাণ্ড বলুন তো, লেগেছে ত আপনারই।

মণিকা রায়ান ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে চণ্ডীর হাত ঝাঁকি দিয়ে অনুযোগ করে—প্লীজ চণ্ডীদা 'আপনি' বলে আমাকে মুছে ফেলবেন না। আপনি না থাকলে আজ কেউ চিনতো না মণিকা রায়ানকে।

ওদিক থেকে রাঘব সিংহরায় মৃদু তিরস্কার করেন—আরে তোমাদের খেজুরে আলাপ পরে হবে—

মণিকা হেসে বলল—যান যান, উনি তাগাদা দিচ্ছেন।

—আর বল না, এখন শুরু হল খিঁচুনি, সারা দিন চলবে।

খাটো গলায় কথা ফেলে দিয়ে চণ্ডী দৌড়বার ভঙ্গীতে কর্তার সামনে হাজির হল। দরজার দিকে দৃষ্টি রেখে ডিরেক্টর বললেন—কি বলছিল ওই ছিনালটা?

—এই এমনি মামুলি ঢং।

চণ্ডী এ জগতে আজ প্রায় সতের বছর ঘোরাফেরা করছে। কোনো কারণে সিংহরায় যে মণিকার ওপর বিগড়েছে তা বুঝেই মন রাখা কথায় এড়িয়ে যেতে চাইল।

—ঢং ছাড়া আর কিস্যু নেই এটা তুমি আমি বুঝলেও পাবলিক শালারা পাগল। জানো চণ্ডী রায়ানের গরম কত? এক লাখ বিশ হাজার দর হেঁকেছে। তার অর্ধেকই ব্ল্যাক। বোঝো আস্পদ্দা—

চণ্ডী ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে বলল—ভাগিয়ে দিন মেজদা—বড্ড বাড় বেড়েছে।

—যাক গে, সে পরে ভাবা যাবে। এখন যে জন্যে তোমায় ডাকা—কাজের কথা বলো, তোমার ওদিকে সব রেডি ত?

চণ্ডী সাফ গলায় জবাব দিল—আজ্ঞে সে ত অনেক আগেই বলে গেছি।

ডিরেক্টর আকাশ থেকে পড়লেন—বাজে কথা। সকাল থেকে ত তোমার টিকি দেখিনি বাবা—

মাথা চুলকে চণ্ডী বলে—আজ্ঞে বাজে কথা না। ঘন্টাখানেক আগে, তখন মণিকার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন। লিস্টি সামনে ধরলুম আর আপনি ধমকালেন, দেখছ না বিজি আছি, পরে এস।

—ও তা হবে।

—আপনার খ্যাল নেই মেজদা।

সিংহরায় বিরক্ত। —তা এদিকে সেটে নামার সময় হয়ে গেল সে খেয়াল আছে তোমার? রবিনই বা কোথায় গেল? আজ কি কাজ বন্ধ থাকবে না কি। তোমার মালপত্তর রেডি করো, রবিকে পাঠিয়ে দাও, জলদি যাও—

—আমি সব রেডি করে বসে আছি, বললুম ত।

—রবি?

—সে একটু বেরিয়েছে। এই এসে পড়ল বলে—

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন কর্তা—বাঃ, ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার! অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কি মানিব নাকি, যখন খুশি এলেই হল? বলি সে আমার আণ্ডারে, না, আমি তার আণ্ডারে—এ্যাঁ! কোথায় গেছেন তিনি?

প্রোডাকশন ম্যানেজার চণ্ডী কাঁচুমাচু, কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করে—মানে আমাদেরই কাজে রবিকে একবার নিউ মার্কেটে যেতে হয়েছে। এতক্ষণে ফিরে আসার কথা—

—মানে-টানে জানি না, সুটিং-এর ডেমারেজটা কে দেবে শুনি? ফ্লোর বুকিং কি মুফতে হয়? শস্তা?

সিংহরায় তর্জন-গর্জনের মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন, পিছনে দুটি হাত রেখে।

প্রোডাকশন ম্যানেজার কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। ঘরের আর একটি চেয়ারে আলট্রামডার্ন যে তরুণীটি বসে হাত-আয়নাতে মুখ দেখছিল সেও উঠে গিয়ে জানলাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

টেলিফোন বেজে উঠতে চণ্ডী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। এবার দমবন্ধ হয়ে আসা অবস্থাটা পাতলা হবে। মেয়েটি মুখ ঘোরালো। সিংহরায় হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে, চণ্ডীকে ইশারা করতে সে ফোন ধরল। কল রিসীভ করেই কম্পিত

কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল—মিস্টার চৌহান ফোন করছেন, দ্যাখো তো ডিরেক্টর সাহেব আছেন কি না?

তারপর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করে অপর পক্ষকে আশ্বাস দিল—হ্যালো। মিস্টার চৌহান, আপনি একটু ধরুন প্লীজ—খবর নিতে পাঠিয়েছি—

চণ্ডী সরে যেতেই মেয়েটি এসে ফোনটা তুলে নিল এবং নির্দেশমত শুরু করল—হ্যাল্লো-ও—মিস্টার চওহ্যান, দেখুন ডিরেক্টর সায়েব বড্ড বিজি আছেন। উনি বিকেলের পর ফ্রী থাকবেন তখন বরং আপনি রিং করবেন। কেমন? এখন বুঝছেন না সেটে কাজ চলছে—হ্যাঁ—হ্যাঁ! অ্যাঁ, আচ্ছা বলব! নমস্কার।

সিংহরায় চেয়ারে প্রত্যাবর্তন করে সিগারেট ঠোঁটে গুঁজতেই মেয়েটি তাতে অগ্নি-সংযোগ করে দিল।

তিনি মুখ তুলতেই সদ্য ঘরে ঢোকা সিকদার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—স্যার—

লম্বা টান দিয়ে রাঘব সিংহরায় গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করেন—বলুন স্যার!

—মানে, বিশ্বাস করুন স্পটলেস আপেল হগমার্কেটে একটিও পাইনি তাই অগত্যা বড়বাজারে—

সিংহরায় আবার আস্ফালন করেন—আপেল ছাড়া যখন কুমার সায়েব মেক-আপ নেয় না জানো তখন কেন আগে থেকে ব্যবস্থা করা হয় না? কেন?

—আজ্ঞে আপেল ত এসেছিল কিন্তু উনি তার গায়ে দাগ দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অনেক করে বলা হল, আপনি মেক-আপ নিতে থাকুন ইদিকে আমরা ভালো মাল এনে দিচ্ছি। কিন্তু—

—ওঃ, হরিবল! অবনকসাস—এরা নিজেদের কী মনে করে—এ্যাঁ—আজ আপেলের গায়ে দাগ দেখলে ফেলে দেয়—যখন লোকের কাছে ভিক্ষে করত অন্ধ বাপের হাত ধরে তখনকার কথা মনে পড়ে চণ্ডী!

এসব কথা জবাব দেওয়ার জন্য নয় চণ্ডী তা জানে। সে চুপ। একবার রিস্ট-ওয়াচের দিকে নজর দিয়েই তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—চণ্ডী!

—মেজদা—।

—তোমার লিস্টি কই?

—এই যে!

প্রোডাকশন ম্যানেজার পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করল, খুলে দেখে সেখানা রেখে আবার হাতড়াতে লাগল। সিংহরায় ধৈর্যহারা হয়ে বললেন—বুঝেছি কিস্যু করনি। যাকগে—আমি সেটে যাব না। সবাইকে বাড়ি যেতে বল—

ততক্ষণে মহামূল্যবান কাগজটি গুপ্তধনের মত মুঠোয় ধরে চণ্ডী বিজয়ীর মত হাসল—এই যে, যাবে কোথায়! এই দেখুন মেজদা।

—থাক আর দাঁত বার করতে হবে না। [illegible]—

[illegible] [illegible] মেরো [illegible] [illegible]

করে পড়ার মত হোঁচট খেতে থাকে—মাজা-ভাঙ্গা ঠুনকো বুড়ি চারটে, মাঝবয়সী মেয়েমানুষ গোটা পনের-ষোলো, পোয়াতী একটা, পোঁটা পড়া ছেলে পাঁচটা, পেট ডিগডিগে দু-একটা, বেরষো একটা, পুরুত একটা—কেত্তনের দল—

—ব্যস, ব্যস, লেখা ত সব ঠিক আছে। এবার আসল মালগুলো দেখতে হবে। তোমার ত গুণে ঘাট নেই, সেটে নেমে ভরাডুবি না হয়।

শানু আমার দরকারী জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও ত সোনা।

ঐ মেয়েটি আয়নাওয়ালা ব্যাগ বন্ধ করে ডিরেক্টরের কাগজ ও ব্যাগ নিয়ে এদিক-ওদিক চোখ বুলোতে লাগল।

প্রোডাকশন ম্যানেজার চণ্ডী পোড়েল-এর সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রবীন সিকদারের যুগলবন্দী প্রতিবাদ ধ্বনিত হল—বিশ্বাস না হয় নিজে পরখ করে নেবেন! আর যাই বদনাম দিন ছবিকে ভালো করার জন্যে জান লুটিয়ে দিই এটা হক কথা মেজদা—কি, তুমি কি বলো শানু?

মেয়েটি হাসতে হাসতে ডিরেক্টরের কাছ ঘেঁষে চলতে লাগল।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

সিংহরায় ভুরু কুঁচকে বললেন—দ্যাখো ত, বলে দাও পরে রিং করতে।

রবীন ফোন ধরেই ব্যস্তভাবে বলে—ধরুন—

—কে?

—মালভানি সায়েব।

স্বয়ং প্রোডিউসার! সিংহরায় হাত বাড়িয়ে দিলেন—আরে হ্যাঁ, আমি ত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ফোনের আওয়াজে ফিরতে হল। হ্যাঁ, সব রেডি। কাজ শুরু হতে পাঁচ মিনিট।

ফোন নামিয়ে প্রোডিউসারের বাপান্ত করেন তিনি—শালা টাকা দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে। এমনি হয় না তাগাদা!

ক্যান্টিনের বারান্দায় সেদিনের একস্ট্রা-দের ভিড়।

ডিরেক্টরকে সদলবলে আসতে দেখে সবাই চনমনিয়ে নিজেদের যথাসম্ভব গুছিয়ে নিতে লাগল। চণ্ডী ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসে ওদের বলল—নে, নে, এবার সব রেডি হয়ে নে সায়েব আসছে—

চলতে চলতে ডিরেক্টর মাঝপথে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই সুযোগে রবীন সিকদারও চণ্ডীর কাছে পৌঁছে গেল।

—ওঃ চণ্ডীদা সায়েব ত সপ্তমে চড়ে আছে হে, ব্যাপার কী?

—তুই থাম ত বাঁদর সায়েবকে নতুন দেখাচিস নাকি। নরম মাটিতে যত দাপাট। আবার মালভানীর কাছে কেঁচোটি। তাছাড়া আজ মণিকা এসে কেস গড়বড় করে দিয়েছে।

—কি রকম?

—পরে বলব।

সিংহরায় জমায়েত একস্ট্রাদের দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন—আচ্ছা, পোয়াতী, বুড়ি, মেয়েমানুষ কটা—হ্যাঁ, চলে যাবে!

ইয়ে পোঁটা-পড়া ছেলে কই হে চণ্ডী?

চণ্ডী ডাকে—পাঁচুর মা—।

দুটো বাচ্চার হাত ধরে ও একটিকে কোলে নিয়ে ঘোমটা-টানা একটি বৌ এগিয়ে আসছিল। সিংহরায় হাত তুলে থামিয়ে দিলেন—হয়েচে, হয়েচে। কিন্তু নাকে পোঁটা কই? সব যে শুকনো খটখটে! চণ্ডী—

চণ্ডী রিবাউণ্ড করে পেঁচোর মায়ের দিকে—এই যে বললে সেদিন সব কটা সর্দিতে হাঁসফাঁস করছে? ঘিয়ের মত গড়াচ্ছে, আমিও ত দেখেচি।

ঘোমটার আড়াল বাড়ল, পেঁচোর মা কাতরভাবে জানাল—পোড়ারমুখো ডাক্তার কী ওষুধ দিলে যে সব কটারই সর্দি সেরে গেল ম্যানাজারবাবু।

—ওসব জানি না, ক্যামেরার সামনে সর্দি চাই! নইলে যে এফেক্ট আনার জন্যে এত কাণ্ড সেটাই হবে না।

হুকুম দিয়ে সিংহরায় অন্য আইটেমের পরীক্ষা শুরু করলেন।

পেঁচোর মা চণ্ডীর পা ধরতে যায়—কী হবে ম্যানাজারবাবু।

আশ্বাস দিল চণ্ডী—ভাবিস না সব ঠিক করে দেবো। রসগোল্লার রস আর একটু ময়দা দিয়ে ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। তবে, কিছু খরচা বাদ যাবে।

বেরষো, পুরুত, পোয়াতি, সব কিছু কড়া নজরে এগজামিন করে হাতের ইশারা করে ডিরেক্টর সাহেব স্টুডিওর দিকে এগিয়ে যান। চণ্ডীও অনুরূপ গাম্ভীর্য নিয়ে অর্ডার দিল—চলো চলো, জলদি করো।

সবাই ত্বরিতে চলতে শু[illegible] করল। দুজন ঠুনকো বুড়ি উপু[illegible] [illegible]সে রইল বারান্দায়। চণ্ডী তাগাদা [illegible]—কি গো, তোমরা এখনো উঠতে পারলে না?

একজন মেঝে থেকে লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—কমনে যেতি হবে?

আর একজন তখনও আগের মত স্থানু, বসে বসে চিৎকার করে—তা সোহাগী সোহাগী! আ মল কোমরটা একটু চুঁচে দিবি ত? দ্যাখ দিনি।…

—তোমার আবার কি হল?

—আর বাবা চৌরঙ্গী বাত! ওই সোহাগী টেনে না আনলি—ওঃ—তা হ্যাঁ বাবা আবার কোথায় টেনে নে যাবে?

সোহাগী এসে মুখ ঝামটা দিল—হ্যাঁ, আমিই টানলুম বটে! ট্যাকার লোভ, সিনেমাতে ছবি উঠোনোর লোভ বুড়ির। এখন বসে বসে চুঁচে দিই আর উদিকে সব বেশি বেশি ছবি উঠে যাক বুধোর মা, পেঁচোর মার: নে, নে, ঠাকমা—একটু মনের জোর কর।

বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে বলে—তা হ্যাঁ বাবা ম্যানাজার মশাই এট্টুন চা দেবা?

—আ গ্যালো যা, এখন চা দাও, তার হ্যাপা করো।

—আগ করো নি বড়োহাবরা মানুষ। মাগনা লয়, ওই যে পাঁচ ট্যাকা দেবার কতা

মাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ?

প্লেক (Plaque)
হল জীবাণুর এক অদৃশ্য পর্দা যা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে থাকে। অবহেলা করলে, প্লেক দন্তমলে পরিণত হয়।

দন্তমল
দাঁতের গোড়ায় জমে, ফলে মাড়ি জ্বালা করে আর ফুলে ওঠে। পরে মাড়ি আলগা হয়ে গিয়ে দাঁত পড়ে যেতে পারে।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়া
ব্রাশ দিয়ে দাঁত সাফ করবার সময় দুর্বল আর ফোলাফাঁপা মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে। এতে বাধা না পেলেও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্টের সাহায্য নিন।

ডাঃ ফরহ্যান্সের অদ্বিতীয় ফরমুলা

ডাঃ ফরহ্যান্সের শক্তিশালী অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট ক্রিয়ার ফরমুলা আপনার মাড়ির ওপরের ভাগ মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন। ফরহ্যান্স দিয়ে ব্রাশ করলে আপনার মুখের ভেতরটা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার, তাজা আর সুস্থ থাকে।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।
রোজ রাত্রে আর সকালে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আর ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।

উজ্জ্বল কমলা রঙের প্যাকে

Forhan's
Forhan's
FOR THE GUMS
"BRUSH YOUR TEETH WITH IT"

মাড়ি খারাপ, তো স্বাস্থ্যও খারাপ

বিনামূল্যে "দাঁত আর মাড়ির যত্ন" সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন:
ফরহ্যান্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসারী ব্যুরো,
পোস্ট ব্যাগ নং ১১৪৬০, ডিপার্টমেন্ট P 129-210
বম্বে ৪০০ ০২০।
যে ভাষায় চান জানাবেন।

ফরহ্যান্স
দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

210-F-20₹ BN.

আছে, তা থেকে কেটে নেবা চায়ের দাম।

চণ্ডী খিঁচিয়ে উঠল—পাঁচ টাকা তোকে কে বলেছে শুনি?

—ক্যানো সোহাগী যে বললো?

সোহাগী খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে—ন্যাও বুড়ির কতা শোনো। আমি বনন্ু পাঁচ টাকা সদরে তা থেকে খরচ-খরচা হাজা-শুকো দু ট্যাকা কেটে নেবে কুম্পানি, তুমি হাতে পাবা নগদ তিন ট্যাকা। তাই ত বনন্ু—

বুড়ি বলে—আচ্ছা বেশ তা তিন ট্যাকা পাবো এই বললি ত হয়। তার হাজা-শুকো হ্যানো-ত্যানো আমার কি ছাই মনে থাকে!

চণ্ডী অধীরভাবে গজরে ওঠে—আচ্ছা ফ্যাসাদ ত! এই বুড়ি, শোন, লোককে বলবি পাঁচ টাকা, বুঝলি? ওটা হল রেট. তবে হাতে পাবি তিন টাকা। এটা ত সবাই জানে।

—আরে খেতি দেবা না?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। টিফিনের সময়ে খাবার পাবি, সেটার জন্যে খরচা লাগবে না। এখন ওঠ, দোহাই তোর—

—চা!

সোহাগী বুড়ির কোমর মালিশ করতে করতে ধমকায়। —তবে থাক পড়ে তুই, মুই চনন্ু। উদিকে কাজ অইল পড়ে উনি বসে বসে বায়না করতেছেন। বলি যাবি?

দেখা গেল শানু দৌড়তে দৌড়তে দূর থেকে ডাকছে—রবিদা—শিগগীর আসনু ডিরেকটর আপনাকে খুঁজছেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটর অর্থাৎ রোগা লিকলিকে গাল-বসা লোকটা প্যান্টের বেল্ট সামলাতে সামলাতে ছুটল—কী? কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে?

—আরে হ্যাঁ, এখনই হবে, লাইট রেডি করা হয়ে গেছে। ওদিকে কুমার সায়েবের আবার ভীষণ ইয়ে—

চণ্ডীও বুড়িদের নিয়ে ফ্লোরের দিকে চলেছে।

শহরের আধুনিক হাউসিং ফ্ল্যাট। কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ হচ্ছে, সেখানে যত মড়ার্ন মানুষের জমায়েত। অতিথিদের গাতয়াতে সরগরম। আর একেবারে তার গায়েই পুরনো বস্তীতে বিয়ে হচ্ছে। সেটে আজ এই পাশাপাশি কনট্রাস্ট দেখানোর ছবি তোলা হচ্ছে।

।। দুই ।।

কাঁচা-পাকা গোঁফ, পাকা আমের মত গোলালো লাল মুখ, লম্বা চেহারা নিয়ে প্রোডিউসার মালভানি সায়েব ঠোঁটে চুরুট গুঁজে অকারণ ব্যস্ততায় ফ্লোরের এধার-ওধার ঘুরছিলেন। একবার শানুর সঙ্গে দুটো কথা বললেন, তারপর ডিরেকটরকে কি যেন বলে শানুর কাঁধে হাত রেখে পিছনে একটা আঁধার-মত জায়গায় চলে গেলেন।

একটা শটের পর হিরো একটু জিরেন পেতেই তার স্তাবকদল ঘিরে ধরল—হৈ হৈ করে উঠল—গুরু কী একখানা হাঁউ দিলে মাইরি! কিছু অ্যাক্টিং করেছো—হাঁ—

কয়েক ঘণ্টা শুটিং-এর পর টিফিনের ঘণ্টা বাজতে যে যার নিজের মত এধার-ওধার চলে গেল। পড়ে রইল বস্তী ঝেঁটিয়ে আনা কাচ্চা-বাচ্চা আর একস্ট্রার দল। অবশ্য যাদের একস্ট্রার কাজে পুরনো অভিজ্ঞতা আছে তারা আর পর্দায় চান্স পেয়ে খ্যাতি কেনার উচ্চাভিলাষী এমন ধরনের কলেজী বেকার ছোকরারা নিজেদের গাঁটের পয়সা দিয়ে ক্যান্টিনে টিফিন করতে চলে গেল। কেননা, সরকারীভাবে টিফিন বাবদ দেড় টাকা বরাদ্দ ধরা থাকলেও আসলে পুরো আনার বেশি ক্যান্টিন থেকে খাবার একসট্রাদের দেওয়া হয় না। অর্থাৎ বারো আনা যায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটর বা ওই-রকম মধ্যবর্তীদের পকেটে। তাও কখন জুটবে ঠিক নেই। এটা অলিখিত নিয়ম। অলিখিত নিয়মটাই আড়ালে থেকে গোটা শিল্পকে বাঁধাধরা ছকের শেকলে আটকে রেখেছে। গড়বর করলে রুপোলী পর্দার মায়ালোক থেকে বিদায় নিতে হবে। পর্দায় বড় বড় বাহারী হরফে লেখা নামের সঙ্গে টেকনিশিয়ানদের বাস্তব অস্তিত্বও কঠিন পরিহাস। ডিরেকটরদের টিকি বাঁধা থাকে প্রোডিউসারের টাকার শেকল দিয়ে। কিছুটা বা বড় বড় স্টারদের কাছেও। আর সবার ওপর বসে টিকির মত খবরদারী করছেন গুনা-কয়েক ডিস্ট্রিবিউটর। তাঁরা কথায় কথায় 'কমার্স' 'বকস অফিস' এইসব বুলি আউড়ে থাকেন। কমার্সিয়াল সাকসেসের দিকে নজর রেখেই ছবির জগৎ। সেখানে বাজারটাই বড়। বাস্তব জীবন, আদর্শ সূক্ষ্ম শিল্প সৃষ্টি বা উচ্চাঙ্গের রসোত্তীর্ণতার দিকে নজর দেওয়ার গরজ বাতিল। প্রেস্টিজ ছবি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা নতুন দিকে পদক্ষেপের কথা যাঁরা চিন্তা করেন এমন ডিরেকটরদের সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটর গোষ্ঠীর সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়, কেন না ওসব খেয়ালখুশিকে আমল দিতে গেলে নাকি পথে বসতে হবে। এইসব ডিরেকটর যদি বা প্রোডিউসার পান হাউস পাবার সম্ভাবনা তাঁদের নেই। কে পড়ে পড়ে লোকসান দেবে এই বাজারে। 'মানুষের আত্মীয়' ছবির ডিরেকটর রাঘব সিংহরায়ের সিনেমা জগতে প্রোগ্রেসিভ মনোভাবাপন্ন বলে অল্পবিস্তর খ্যাতি আছে। আবার কমার্শিয়াল বাজারেও তাঁর ছবি মার খায়নি বড় একটা। মালভানি পিকচার্সেরও পয়সার অভাব নেই, তার চেয়ে বড় কথা 'দিল'। মালভানি সায়েব ছবির বাংলা, হিন্দী দুটো ভার্সনই করছেন এবং নিজের আইডিয়া দিয়ে গল্প লিখিয়েছেন। মূল কাহিনীর আসল কাজ এখনও শুরু হয়নি। এখন কেবল 'সাইড শটস' নেওয়া হচ্ছে। মালভানি নিজেকে পাইওনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলা ছবির বাছাই-করা স্টারদের কাজে লাগাচ্ছেন। যদিও তাদের বেশি জায়গা জুড়ে রাখবেন না—নামগুলো ছোঁয়ানো কেবল ছবির বাজার-দর বাড়ানোর জনাই তাদের দরকার।

এ ছবির আসল নায়ক একটি বাঁদর। সত্যিকার বাঁদর। তার ভূমিকা বিরাট। বাড়ির সব ঘরোয়া কাজই সে করে। যেমন কলিং বেল বাজলে সে দরজা খুলে দেয়। খাবার টেবিলে চা-কফি সার্ভ করে। মনিবের ইশারায় খবরের কাগজ হাজির করে। মনিবের সুখ-দুঃখ অনুযায়ী তার সুখ, দুঃখ, আনন্দের প্রকাশ। আরও অনেক গুণেই সে মানুষের মত—মানুষ নয় অথচ যেন মানুষ। এ-কাহিনীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে এমন বাঁদর কলকাতা থেকে শুরু করে বাংলা বিহারের সবগুলি বাঁদরের পট্টি, বেদের দল, সার্কাস পার্টি আঁতি-পাঁতি খুঁজে মেলেনি। সবকটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কয়েকটির সন্ধান মিলেছে তবে সর্বগুণসম্পন্ন চরিত্র একটিও তাদের মধ্যে নেই। কেউ কান্নার ভঙ্গি করতে পারে, কেউ হয়ত ট্রে নিয়ে টেবিলের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে কিন্তু রাখতে গেলে কাপ, পট উল্টে ফ্যালে, কারুর কলিং বেল শুনে লাফ দিয়ে দরজা পর্যন্ত যাওয়াটা ঘটে কিন্তু দরজা খুলে দেওয়া তার দ্বারা হয় না। ট্রেনিং দিতে গেলে হয়ত দাঁত খিঁচিয়ে মারতে হাত তোলে। সমস্যাটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। গোটা পাঁচেক বাঁদর আপাতত স্টুডিওতে রেখে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে স্পেশ্যাল কোচ রেখে। পয়লা নম্বর মানবিক গুণসম্পন্ন একজন না পেলে অবশেষে ক্যামেরার সুপার ইমপোজিশন, মন্তাজ, লং-শট ইত্যাদি কায়দায় প্যাঁচে ফেলে ছবিকে দাঁড় করানো হবে। কিন্তু সেটা অগত্যা। বোম্বে, মাদ্রাজেও এক দুই করে বিশ দফা গুণ-তালিকা দিয়ে বিভিন্ন ঘাঁটিতে জরুরি চিঠি দেওয়া হয়েছে।

টিফিনের পর আর সবাই যখন ফ্লোরের কাজে ব্যস্ত তখন শানুকে সঙ্গে নিয়ে মালভানি সাহেব বাঁদরদের ক্যাম্পে হাজির হলেন। তাঁদের দেখে স্পেশ্যাল ট্রেনার মুনেশ্বর হাঁকডাক জুড়ে দিল—লাল্লু—বিমলি—কমলি—

গাছের ডালে বোধ হয় লাল্লু দল একটু জিরোচ্ছিল। ডাক শুনে নেমে এল। মুনেশ্বর ইশারা করতে লাল্লু বেশ মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে মালভানির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল এবং মালভানির সঙ্গে শেক হ্যান্ড করল। বিমলি হাত তুলে নমস্কার করল। কমলি পিছন ফিরে বসে রইল। তার কাছে গিয়ে মুনেশ্বর আদরের সুরে বলে—কি রে তোর আবার কি হল? এ্যাঁ?

কমলি ভ্রুক্ষেপ করল না। মুনেশ্বর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে সাধাসাধি করতে থাকে। কিন্তু কমলি নট নড়ন-চড়ন। ওদিকে লাল্লুও মনিবের পিছু পিছু গিয়ে জামা ধরে টানাটানি করতে থাকে। মুনেশ্বর তাকে ধমক দেয়—ব্যাটা তুমি তখন ওকে মেরেছ, এখন বোঝো?

বানর-বানরীকে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়ে মুনেশ্বর হুকুমের চড়া গলায় বলে—জলদি ফ্যায়সলা কর বেটা!

শানুর বড় মজা লেগেছে। ওদের কাছাকাছি এগিয়ে গেল—কি হয়েছে ওদের?

এত রাগ কেন কমলার, ও তো আমাকে দেখলেই কাছে আসে—

—আর কি হবে আবার! জেলাসি! —জেলাস দিদিমণি! দেখুন না হররোজ এই ঝামেলা—বিমলির বাচ্ছা হয়ে ইস্তক কাজিয়া লেগেই আছে।

বলতে বলতে মনেশ্বর হাসছিল। তার ভাবভঙ্গী থেকে মনে হবে এই ঝামেলায় সে বেশ খুশি আছে।

বানর পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই যখন মশগুল ঠিক সেই সময়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার ব্যস্তসমস্তভাবে এসে জানাল-ম্যাড্রাসের ট্রাঙ্ককল বুক করা হয়েছে। স্যর আপনি একটু খেয়াল করবেন।

মালভানি তাকালেন—হয়েছে?

—হাঁ স্যর।

—ঠিক আছে! তা লাইন পেতে খুব দেরি হবে? খোঁজ নিয়েছ? পি পি করেছ ত?

—আজ্ঞে স্যর পি পি করা হয়েছে স্বামীনাথনের নামে।

শানুর কাঁধে হাত রেখে মালভানি চলতে শুরু করলেন। চণ্ডীও পিছু পিছু হাঁটছিল।

মনেশ্বর চণ্ডীর সঙ্গে কিছু দূরে এসে এক জায়গায় তার হাত ধরে দাঁড়াল—আরে চণ্ডীবাবু, একটু সবুর করুন, একটা সিগ্রেট ত খাইয়ে যান।

সিগারেট খাওয়াটা যে অছিলা সেটা একটু পরেই প্রকাশ পেল। মনেশ্বরের আসল কথাটা হল, মাদ্রাজের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা তার মনঃপূত নয়। কেননা 'মানুষের আত্মীয়' ছবির জন্যে সে যখন এইভাবে জান লুটিয়ে দিয়ে খাটছে তখন বেকার ভিনদেশীদের দরজায় ভিখিরির মত ধর্ণা দিয়ে বেকার বাংলার প্রেস্টিজকে খাটো করা কেন? এখানকার বাঁদর বিদ্যায়-বুদ্ধিতে কোনো দিক দিয়ে কম যায় না মনেশ্বর সেটা দেখিয়ে দেবে!

চণ্ডী পোড়েলেরও সেটাই মত। মনেশ্বরের স্বার্থের সঙ্গে তার নিজেরটাও জড়িত। বাইরে থেকে উটকো বাঁদর এলে চণ্ডীর ভাগে টান পড়বে। তখন গোটা ব্যাপারটাই ওপর মহলের কব্জায় চলে যাবে। এখন এইসব বাঁদর দেখাশুনো আর ভরণপোষণ বাবদ যা বরাদ্দ আছে তার হিস্যা মোটামুটি ভালোই। কিন্তু কর্তাদের মতিগতি সুবিধের নয়। সেটা চন্ডী বেশ ভালো করে বোঝালো মনেশ্বরকে। শেষে বলল—দেখা যাক, কদ্দূর কি করতে পারি তোমার জন্যে! তবে ভাই—

—সে জন্যে আপনি ভাববেন না। ভালো যদি হয় ত আপনার দিক ত আমি দেখব, কসুর হবে না কিছু।

মাদ্রাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রোডিউসার খুব খুশি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রীতিমত শিল্পীর ভঙ্গীতে তিনি ফ্লোরে পোঁছে [illegible] সিংহ রায়কে সগর্বে জানিয়ে [illegible] মিশন সাকসেসফুল রায়বাবু!

একটা শটকে মাঝপথে 'কাট' করলেন দিয়ে সিংহরায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন—কি, কী মিশন মিঃ মালভানি?

—আরে আপনার হিরো পাওয়া গিয়েছে। এই মাত্তর ম্যাড্রাস থেকে স্বামীনাথন জানালেন, একজ্যাক্ট স্পেসিফিকেশনের চ্যাম্পিয়ন হিরো পাওয়া যাবে। লেকিন চার্জটা একটু বেশি পড়ে যাচ্ছে।

—কতো?

—ওরা টোট্যাল কন্ট্রাকটে রাজি নয়।

—তবে?

—পার ডে এক হাজার টাকা, এছাড়া যাতায়াত প্লেন ভাড়া আর কীপারের প্যাসেজ মানিও লাগবে। আরও একটা কথা আছে, মিনিমাম বিশ দিনের চার্জ লাগবে।

সিংহরায় আকাশ থেকে পড়লেন—টু মাচ ফর এ মাংকি! বরং এদিকে মনেশ্বরের টীমকে কাজে লাগাব, স্টোরি একটু পাল্টে নিয়ে—

মালভানি গম্ভীরভাবে চুরুটে টান দিয়ে মিনিট খানেক পরে আস্তে আস্তে বলেন—ডোন্ট বি আনকাইন্ড রায়বাবু। হিরো ইজ হিরো। আপনার স্কিলড আর্টিস্ট হিসেবে মানকি যদি একসেল করে—খিওরিটাও—

—তার মানে?

—মানে ত সোজা। আপনার একটা হিরো, কি হিরোইনকে কত দিতে হয়? লাখের ধাক্কা—এ্যাঁ। কমন স্টোরি, কমন প্যাঁচ, এই নিয়ে পড়ে আছে আমাদের স্ক্রিন, নাথিং নিউ। এ্যাঃ—

—তা—হ্যাঁ। ওর কমে ফার্স্ট র‍্যাঙ্কের স্টার মেলে না।

—এক হাজার পার ডে চাইছে, অবিশ্যি একটু চাপ দিলে ওটা কমবে কিছুটা। কিন্তু ধরুণ যদি না-ই কমে তাহলে। আপনার যদি তিরিশ দিনের জন্যেও হিরো মানে মানকিকে এনগেজ করতে হয় তাহলেও আদার ইনসিডেন্টারস খরচ আরও বিশ হাজার ধরলে ফিফটি থাউজ্যান্টের মধ্যে আপনি একটা ইউনিক হিরোকে কাজে লাগিয়ে পাবলিকের কাছে সামথিং গ্রেট প্রেজেন্ট করছেন।

সিংহ রায় সিগারেট ধরালেন। মালভানি প্রোডিউসার হয়ে এইভাবে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে।

চন্ডী পোড়েলের মুখখানা চুপসে যাওয়া বেলুনের মত দেখায়। চোখ দুটো বুজে এসেছে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। আসলে সে গভীর একটা মতলব মগজে বুনতে চেষ্টা করছিল তাই বাইরের সুইচগুলো অফ করে দিয়েছে।

কয়েকটা টান দিয়ে রাঘব বললেন—ঠিক আছে, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে আমাদের। অবিশ্যি এতে একটা ঝামেলা ঢুকে যায়—প্রেজেন্ট টীমকে ট্রেন আপ ক'রে কী দাঁড়াত তা [illegible] শকত। আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। জানেন [illegible] ইন্ডিয়া থেকে শিশিরবাবু তিনশ' টাকা দিয়ে চাণক্যের টিকি আনিয়েছিলেন। অবিশ্যি সাজেসনটা ছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

—আর আমি ত সেই ভেবেই—এ্যা! এই দেখুন ফিনিশড ফার্স্ট র‍্যাঙ্কের অ্যাকটর পেয়ে যাচ্ছেন আপনি—এ্যা! আর স্টোরিও! এ্যাঁ—সায়েন্টিফিক ইভোলিউশনকে স্ক্রিনে এস্টাবলিশ করার দিকেই নজর আপনা—এ্যা। আমি প্রোডিউসার হয়ে আপনার সুবিধেটা যদি না দেখতে পারি ত কমন মানি হান্টারদের সঙ্গে ফারাকটা কোথায়।

মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে প্রোডাকশন ম্যানেজারের। সে বাইরে বেরিয়ে রেগে হাওয়া লাগাবার জন্য পা বাড়াতেই একস্ট্রা মেয়ে সোহাগী পথ আগলে দাঁড়াল—মেনাজারবাবু, আমাদের টিপিনির কি হল? বুড়িরা ধমকাচ্ছে, বাচ্ছাগুলোন খিদ্যার চোটে কাঁদতেছে।

খিঁচিয়ে উঠল পোড়েল—তোদের জ্বালায় কাজ করবারও উপায়নেই! উঃ—

সোহাগীও ছেড়ে কথা কইল না—বিকাল হয়ে গ্যালো, সারাটা দিন সবাই উপোসী অইছে। কাজ ত আমাদের কখুন চুকেবুকে গেইছে। ইবার বিদেয় করলি ত হয়!

—ওঃ খুব যে ফটর-ফটর কচ্ছিস। কাজ হয়ে গিয়েছে, বটে? পাঁচটা বাজুক আগে।

—বেশ টিপিনটাও দিবা না নাকিন! বাবুরা সব থায়েদায়ে হাই তুলতেছে, প্যাট কি কেবল তুমাদেরই, মোরা বানের জলে ভেসে এইচি নাকি গ—!

সোহাগী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এবং ওর গলার স্বর বেশ চড়া। কর্তারা কাছাকাছি রয়েছেন, এই নিয়ে পাছে তাঁরা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে ফ্যাসাদ হবে এই আশংকাতেই চণ্ডী গলা সপ্তমে চড়িয়ে হাঁক দিল—পঞ্চাননতলা থেকে যারা এসেছ আর যারা এখনো টিফিন করোনি তারা সব একসঙ্গে চলে এস ক্যান্টিনে—দেরি করবে না—একদম। এরপর কিন্তু আর পাবে না।

তার কথার ধরনে মনে হল, সে অনেকবার তাগাদা দিয়েছে কিন্তু এদের গাফিলতীতেই এতক্ষণ খাওয়া হয়নি।

সোহাগী হল্লা জুড়ে দিল,—অ ঠাকমা অ পাঁচুর মা, রমা পিসি, মানু, চ-চ মেনাজারবাবু ডাকতেছে! টিপিন খাবিজায়।

পাঁচুর মায়ের অ্যান্ডা-গন্ডা জুটিয়ে নিতে একটু সময় লাগে। ওর আগে আগে বুড়িরা বেরিয়ে যায়। হঠাৎ বুধোর দিকে নজর পড়তে রমা বলল—কি রে তোর মা কই?

বুধো জবাব দিল—মা কাঁদিতেছে পড়ে-পড়ে।

কথাটা পাঁচুর মার কানে যেতে ও পিছিয়ে গিয়ে তাগাদা দিল—কি রে তুই যাবি [illegible]?

[illegible] মা নাকি সুরে বলে—তুর অ[illegible] কি। নায়ে-পোয়ে তোরা ন' ট্যাকা কামাই করবি। আমার—উঃ মোচড় মারতেছে। উঠাত গেলি বড্ড যন্তন্না হচ্চে, তোরা যা,

আমার ভাগেরটা বুধোর হাত দে পেটিয়ে দিস!

পেঁচোর মা উবু হয়ে পাশে বসে পড়ল। দরদমাখা কণ্ঠে তিরস্কার শুরু করল—তেখুনে বস্নু ভরা পেট নে নদর-গদর করতি করতি যাবি, যদি বিইয়ে বসিস, তখুন—

উৎকণ্ঠায় কাঁপা হাতে বুধোর মায়ের পেটে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে পেঁচোর মা দিশেহারা হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল। ওর বড় ছেলেটো স্টুডিওর দরজা থেকে চিৎকার পাড়ছে। অগত্যা উঠে পড়ে বলল—ভাবিস নি বুন, ভগমানকে ডাক। আমি ঝট করে ঘুরে আসি।

ক্যান্টিনের বারান্দায় চণ্ডীকে পেয়ে পেঁচোর মা তার শিরাওঠা হাত চেপে ধরে মিনতি করুণ কণ্ঠে বলে—মেনাজারবাবু গো! আপনি ধরম বাপ—

চণ্ডী এসব কথায় আমল দিতে নারাজ. শুকনো গলায় কৈফিয়ৎ তলব করে—তা কি বলতে চাস? তোর পাওনা থেকে পেঁচোর চার্জ ত? না, না, তোর জন্যে দাঁড়িয়ে বেইজ্জৎ হইচি সাহেবের কাছে।

—না গো বাবু! উসব লয়। আমাদের সেই পোয়াতীডা—

—কী? কই সে—

—আরে সেই কথাই ত বলতিছি। সে উঠতি পারতেছে না। বড্ড যন্তন্না—

চণ্ডী ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁঝালো মেজাজে বলল—সে কী সর্বনাশ! শেষে ফ্লোরেই প্রসব করে বসবে নাকি? কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে যে! চ-চ—কোথায় দেখি—

সোহাগীর ঠাকুমা ধমক দিল—রাখো তো, টিপিন দাও বস! বুদোর মায়ের পেট ঘেঁটেঘুটে মুই দেখি চি। উডা পাল্লট ব্যথা, তারা ওপর তামান দিন খেতি পায় নি। কারুরে দে বরং উওর খাবারডা এখুনি পেটিয়ে দাও মেনাজারবাবু! পেটের শত্তুরে উত্তরে ছিঁড়ি খাচ্ছে। পোয়াতীকে দানা-পানি দিলি আগুনে জল পড়বে। ইডা বোঝো না, কিসির নেকাপড়া শিকিচ গো—

—তাই দিচ্ছি বাবা, এ্যাই ভানু—উঃ তোদেরে নিয়ে—

দক্ষিণ ভারত থেকে হিরো আসছে—'মানুষের আত্মীয়' ছবির নায়ক মাণিক-কুমার। কথাটা মুখে মুখে চাউর হয়ে গেল। নতুন প্ল্যান প্রোগ্রামও সঙ্গে সঙ্গে ছকে ফেলা হল। ও তরফ থেকে চিঠিও এসেছে। কল-কাতা থেকে একজনকে পাঠাতে হবে, তার কাজ লোক্যাল ইন্সপেকশন করে ফিরে মাণিকের জন্যে বসবাসের অনুকূল পরিবেশ তৈরির ব্যবস্থাপনা। মালভানির ইচ্ছে স্বয়ং ডিরেক্টরকেই পাঠানো। সিংহরায় অবশ্য বললেন—দরকার হলে যাব। কিন্তু এদিকে সেটের কাজ কামাই হবে। আপনিই ঘুরে আসুন না।

মালভানি ফুঁ দিয়ে [illegible] হাত উড়োলেন—প্লেনে যাবেন প্লেনে আসবেন, ওখানে একটা দিন, বড়জোর দু-দিন। তাতে কিছুই আটকাবে না। কাজ যা করবো আমরা পারফেকট! আপনার কাজ কি আমাকে দিয়ে হয় রায়বাবু!

চণ্ডী মওকা খুঁজছিল। ফাঁক পেয়ে সায় দিল—মেজদাকেই পাঠানো ভালো, উনি সব খুঁটিয়ে দেখতে পারবেন। ব্যাপারটা ত সোজা নয়, যাকে বলে, এর ওপরই মানুষের রিভউলিউশনের মরণ-বাঁচন।

সিংহরায় হেসে উঠলেন উচ্চগ্রামে-রিভলিউশন নয় হে ইভলিউশন চণ্ডীদাস!

—ওই হল! তা সে যা-ই হোক। এখন নতুন প্রবলেম হয়ে পড়েছে মুনেশ্বরের পার্টিকে নিয়ে!

মালভানি এবং সিংহরায় যুগপৎ প্রশ্ন করেন—কেন সে কি বলতে চায়?

—সে বলছে। এখন কি চলে যাবে? আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠেকিয়ে রেখেচি। কেন না, কখন দরকার পড়ে বলা ত যায় না।

সিংহরায় জবাব দিলেন—অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। আমি ঘুরে আসি তারপর—

মাথা চুলকে চণ্ডী বলে—আমিও সেই কথাই বলছি। ও বেঁকে বসেছে। বলে, ওর সব আশায় ছাই পড়তে চলেছে, ওর বাঁদরগুলোও খুব একসপার্ট। অথচ যদি এরপর ওদের রাখা হয় তখন ত একস্ট্রাদের রেটের বেশি দেওয়া হবে না, এখানেই গোলমাল—

—কেন, গোলমালটা কিসের। হিরো যখন পারফেকট পাচ্ছি আমরা—

সিংহরায় চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে কঠিন হয়েছেন।

চণ্ডীও সায় দিল—আমিও সেই কথাই বলছি। তবে একটা কথা মনে হয়েচে, যদি অভয় দেন—

মালভানি একটু ব্যগ্র।—কী বলোই না চণ্ডীবাবু!

চণ্ডীর বক্তব্য, হিরোর পার্ট করে মাণিক একটু নিজের জাতভাইদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে চাইল, কি হয়ত একটু বা প্রেম-ট্রেম—তখন স্ট্যাণ্ড বাই হিসেবে এরা কাজে আসবে। তার মানে সাইড রোলের রেট যদি মঞ্জুর করা হয়—

সিংহরায় হাসলেন—কথাটা মন্দ বলনি! কর্তাদের মজলিস থেকে বেরিয়ে এল চণ্ডী। তার সঙ্গে রবি সিকদারও।

বাইরে এসে রবি বলল—মাইরি চণ্ডী-দা, পায়ে ধুলো দাও গুরু।

—দ্যাখো রবি এই করে শালা সতের বছর কাটল। এটুকু না পারলে আর হল কি।

রবি হাসতে হাসতে আবদারের সুরে হাত পেতে বলল—গুরু একখানা সিগ্রেট ছাড়ো—

সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে চণ্ডী আফশোস করে—শালা মাণিকের রোলটা পেলে আর এই ছ্যাঁচড়ামো করতে হত না। সেরেফ একখানা লেজের কি মহিমা বল—

সোহাগীর দল কোথায় যেন ওৎ পেতে বসেছিল। চণ্ডীর গলা পেয়ে ওরা ঘিরে ধরল—এই যে মেনাজারবাবু, আমাদের মজুরীটা—

—হচ্ছে—হচ্ছে—তোদেরই যত তাড়া। মজুরী বলচিস কেন, বল—চার্জ।

সারা দিনের পর ওরা মাথাপিছু তিন টাকা হিসেবে পাওনা পেয়ে বিদায় নিল।

চণ্ডী উদারতার প্রাপ্য হিসেবে দাবির ভঙ্গীতে বলল—কি রে, সব খুশি ত?

সে কথার জবাব আসবার আগেই একটা ছেলে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল—ওরে বাবারে, মাগো— ওমা—মরে গেলাম—

—কি হল, কিরে বিপিন—

—বিপিনের গলা না?

—সাপে কাটল?

আওয়াজ লক্ষ্য করে সবাই সেদিকে ধেয়ে গেল।

ব্যাপার কিছুই নয় মুনেশ্বরের ট্রেনিং-প্রাপ্ত বানরী 'কমলা' বিপিন নামক একস্ট্রা কিশোরের গলা ধরে ঝুলছে। ছেলেটা যত ছাড়াবার চেষ্টা করছে বানরী ততোই শক্ত করে আঁকড়ে ধরছে।

মুনেশ্বর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল।

ভিড় জমে যেতে সে আস্তে ডাকল—কমলি—আয়—

কমলা মাটিতে লাফ দিয়ে নামল। তার আগে বিপিনকে আদরের কামড় [illegible] দিতে ভোলেনি।

বিপিন ছাড়া পেয়ে বাঁচল কিন্তু কামড়ের জ্বালায় আবার চেঁচিয়ে উঠল।

জমায়েৎ জনতা এবার মারমুখো হয়ে উঠেছে—এ কী অন্যায়, ছেলেটাকে পিষে মেরে ফেলতো যে! শালার বাঁদরামীর জায়গা পেয়েছে। ধর তো বাঁদরওয়ালাকে—শালা বাঁদরওয়ালা—

চণ্ডী কষে ধমক দিল—খবরদার। ওদের গায়ে যেন আঁচড় না লাগে।

বিপিন ক্ষেপে গিয়ে বলে—ক্যানো পীর নাকি। কামড়ে দিয়েছে—

—পীর না পীর। জানিস ওদের এক-একজনের চার্জ তোদের সবার মিলে যা হয় তার দশগুণ বেশি—

মুনেশ্বর আশ্বাস [illegible] কমলি কাটেনি, চুমা খাইয়েছে। আশনাই—পেয়ার করেছে।

রং জ্বলে গেছে

দুর্গা বসু

ছেঁচা বেড়ার ফাঁক দিয়ে শনশনিয়ে হাওয়া ঢুকছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে মোমবাতির নিষ্প্রভ শিখাটা। চালের ফুটো দিয়ে থেকে থেকে টপটপ করে পড়ছে বৃষ্টির জল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক বাইরের অন্ধকারটাকে আরো ঘন করে তুলছে। চানাচুরের ঠোঙাটাকে ঘিরে ওরা চারজন। নানটা তুষার, সহদেব আর আবির। খুরিগুলো শুকনো। পচাইয়ের বোতলটাই ঘুরছে হাতে, হাতে, মুখে, মুখে। নানটা ষ্টেনগানের উপর পাট করে রাখল মাথার গামছাটা। তার উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সটান হয়ে। আর একবার বিদ্যুৎ চমকাল। বাদার অন্তহীন ফাঁকা মাঠ এক ঝলক দেখা দিয়েই মিশে গেল কালো অন্ধকারে। খালি বোতলটা সহদেব গলায় উপুড় করে দিয়ে ছুঁড়ল খোলা দরজার ফাঁকা দিয়ে। ঠং। দওয়ার খুঁটোয় লেগে চৌচির হল সেটা। 'শালা হারামীর বাচচা,' গালাগাল দিয়ে উঠল আবির। কাকে, কে জানে। খুব সম্ভবতঃ কাল রাত্রের পাজী বুড়োটাকে।

সাতদিন নজর রেখেছিল ওরা। রাত বিরেতে পাথরের কুঁচি ফেলত চালে, দাওয়ায়, অন্দর মহলের উঠোনে। দেখত লোকগুলো সজাগ কিনা। পি ডাবলু ডির বাঁধানো রাস্তাটা এঁকে বেঁকে পশ্চিম মুখো চলে গেছে। দুপাশে জঙ্গল। জংলী-কুল, জাম আর ফলসার গাছ। বাঁশ বন। তারই চাপ বাঁধা অন্ধকারের তলায় রাংচিতা, কচু আর পুটুসের ঝোপ। কলার শুকনো বাসনা আর নারকোল সুপুরীর বেলদোর আড়ালে খরিশ সাপ, তক্ষক আর শেয়ালের আডডা। বারুইপুর থেকে বিষ্টুপুর আট মাইল পথ। মাঝে মাঝে সাঁওতাল দিনমজুর আর ভাগাষীদের গ্রাম। দশ বিশটা কুঁড়ে ঘর। গন্ডা কয়েক পাঁজরা বার করা গরু। মুরগী। পুকুর। দুটো দোকান-চায়ের নয়ত মুদীখানা। কালে ভদ্রে এক আধটা পাকাবাড়ীও চোখে পড়ে। যেমন শ্রীহরি পুরকায়েতের বাড়ী। নজর রেখেছিল ওরা সাতদিন ধরে। চাঁপা নানটার পেয়ারী। কাজ নিয়েছিল পুরকুত-বাড়ীতে। বাসন মাজা, ঘর নিকানো, কাপড় কাচা আর ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীর সুলুক সন্ধান। পুজোর ঘরে রুপোর বাসন থাকে কোন কুলুঙ্গীতে। গয়নার প্যাটরা আর বান্ডিল বাঁধা টাকার তোড়া থাকে কোন তকতাপোষের তলায়। এমনি সব খবর। পাচার করত নানটার আডডায়। পচাই খেয়ে পুরুষ্টু পাছায় হাত মুছতে মুছতে, চোখ মটকে তাতাচ্ছিল সহদেবকে, 'শ্রীহরির ছোট বউটা আগুন, মাইরী। পুকুর পাড়ে যদি দেখ, মনে হবে ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ানো এক তাল মাখন। ই-য়া বড় বড়...।' ঘুরে দাঁড়িয়েই এক চড় মেরেছিল নানটা। মানুষটা যেন লোহার তৈরী। সেবার চম্পাহাটিতে বিশ্বাসদের দু ভায়ের ঘাড় দু হাতে ধরে মাথা দুটো ঠুকে দিল ফটাস করে। আর সে দুটো পচাইয়ের হাঁড়ির মত ফেটে রক্ত-মাখা ঘিলু ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। নিষ্ঠুর মানুষটার কিন্তু একটা গুণ ছিল। ফিরেও তাকাত না মেয়েদের দিকে, যত সুন্দরীই হোক। কালীভক্ত। বলত, মেয়েরা শক্তির অংশ। ওদের গায়ে হাত দিলেই ডাকাতের সব্বনাশ হবে।' তাই এক চড়ে থামিয়ে দিয়েছিল চাঁপাকে। রক্তমাখা থুতু ফেলতে ফেলতে সরে গেল চাঁপা। 'খুনী, শুয়োর!' চাপাস্বরে গাল পাড়ল, বেশ খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে।

ভাল লাগে না আবিরের। .. চালাতে এই সীমাহীন নিষ্ঠুরতা। দুর্বল মানুষগুলোর উপর অনর্থক অত্যাচার। খুনোখুনি, লুটপাট। সে ছোটবেলা থেকেই আঁকত। হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে ঢুকেছিল আর্ট স্কুলে। পেন্সিল ছেড়ে একদিন ধরল তেল রংয়ের তুলি। ইজেলে রং চাপাতে চাপাতে স্বপ্ন দেখত নন্দলাল হবার, অবন ঠাকুর হবার। এই চাঁপা থাকত মেটেবুরুজে। সপ্তাহে তিন দিন আসত তাদের কলেজে। নগ্ন হয়ে সিটিং দিত ফিগার ষ্টাডির ক্লাশে। ওদের খাতা ভরে উঠত তার হাত, পা, যৌবনের টুকরো টুকরো স্কেচে।

তারপর একদিন দেখা হল স্কুলের বন্ধু সহদেব আর তুষারের সঙ্গে।.. কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে হাজির হয়েছিল 'গুরুর' আডডায়। তুষারদের মত সেও জানত না গুরুর আসল নাম। কালো রোগা লোকটি। খাঁড়ার মত নাক। চাউনীটা অসম্ভব তীব্র। একদৃষ্টে যখন তাকিয়ে

থাকতেন কারুর দিকে, মনে হত ভিতরের কলেজটাও যেন দেখে নিচ্ছেন। মধ্যমগ্রামের বাঁশবনে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার হল। তিন বাক্স অ্যামুনিসান ফেলে পালাতে হল। বারাসতের শিব-মন্দিরে সেই রাতেই সার বেঁধে দাঁড়াল সবাই। গুরুর হুকুমে। তুষার, আবির, অঞ্জনদা, মহাদেব, মোটা বাচচু, সুধীর, মন্টে, সহদেব, সাঁফ, রামরতন আর যদুচকে। লণ্ঠনের আলোয় জ্বলন্ত চোখে এক-এক করে সকলের মুখ দেখে গেলেন গুরু। তারপর নির্বিকার আদেশ, 'মন্টু, ফল আউট।' মনটে এক কদম এগোতেই গুরুর স্টেনগানে চাপা আওয়াজ উঠল—খট, খট, খট। চাপ চাপ রক্তের উপর মাটি ছড়িয়ে, ওরা গেল মনটের ঝাঁজরা শরীরটাকে কবরখানায় পুঁতে আসতে। এসে দেখে গুরু ডান হাতে স্টেনগানটা চেপে ধরে অঘোরে ঘুমচ্ছেন মন্দিরের চত্তরে। পাশেই একটা মরা গোখরো সাপ। গুলিতে ছিন্নভিন্ন। লাস কাঠ পিঁপড়ের দল ছেঁকে ধরেছে। সাড়া পেয়ে চোখ রগড়ে উঠে বসলেন, 'স্পাইটাকে পুঁতে দিলি তোরা? স্বপ্ন দেখছিলাম শালার মুন্ডুটা কেটে নিয়ে পার্শেল করে পাঠিয়েছি বারাসত সদরে, বড় দারোগার নামে।' মাটিতে একরাশ থুতু ফেলে উঠে দাঁড়ালেন গুরু। অঞ্জনদার মুখে শুনেছিল আবির, গুরু নাকি পার্টির একজন বড় পান্ডা। থিয়োরিটিসিয়ান।

এত কাঠ খড় পুড়িয়ে, রাখা বাঘা বাঘা কুকুর দুটোকে আফিং দেওয়া মাংশ খাইয়ে হানা দেওয়া হল শ্রীহরি পুরকুতের বাড়ীতে। তুষার ভেবেছিল যা খোরাক জুটবে, অন্ততঃ মাস তিনেক পেটের জ্বালায় মানুষ খুন করার হাত থেকে বাঁচা যাবে। জঙ্গুলে বাঘের জীবন যেন তাদের। দিনের পর দিন উপোষ। তারপর খিদের জ্বালায় মরিয়া হয়ে ওঠা। ভীতু অসহায় মানুষগুলো পা দিয়ে চটকে চটকে শেষ করা। কেঁপে কেঁপে ওঠা মেয়েগুলোর হাত গলা আর কান থেকে টেনে ছিঁড়ে গয়না হাতড়ানো। কান পেতে নানটার হুইসিল শোনা। অন্ধকার। বিভীষিকার রাজ্যে হাত বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালানো। ভোরবেলা বারুইপুর থেকে বাস ধরে ক্যানিং। সেখানে ঝোপেঝাড়ে, খানায় গর্তে দিন কাটিয়ে মহাজনের ঘরে রাখা সাইকেলে চেপে আবাদের দিকে যাত্রা। সন্ধ্যের ঝোঁকে। আবাদে পোঁছে ভাগ-বাঁটরা। মহাজনদের ভাগ মহাজনকে দিয়ে আসা। খোরাক ফুরিয়ে আসতেই আবার হানা দেওয়ার প্ল্যানে। এই পাক খাওয়ার শেষ কোথায়? ঘন কালো ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠে তুষার।

শিকল দেওয়া ঘর থেকে পালিয়েছিল শ্রীহরিবুড়ো। ছাদের মটকা খুলে। কাঁদতে কাঁদতে দৌড়েছিল চাষী পাড়ায়। জনা বাটেক লোক এলো-পাথাড়ি ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল। পাগলের মত নানটো প্রথমে রুখে দাঁড়িয়েছিল স্টেনগান নিয়ে। তারপর কি ভেবে বাজিয়ে দিল হুইসিলটা।... রিট্রিট! ওই স্টেনগানটাই গুরুর শেষ স্মৃতি। নানটাই এখন সর্দার। তাই স্টেনগান কব্জা করেছিল সেই। তার বদলে সহদেবের হাতে তুলে দিয়েছিল পাইপগান। তুষারের তাও জোটেনি। ওর কাঁধে থাকে এক ঝোলায় ৮।১০টা হাত-বোমা। রিট্রিটের হুইসিল বাজলে ওর কাজ শুরু হয়। পালাতে পালাতে ছুঁড়তে হয় বোমাগুলো। অথচ পার্টির শেষদিনে তুষারই সরিয়ে এনেছিল স্টেনগানটা...।

গুরু ক্লাশ নিতেন স্টাডি সারকেলে। অল্প কথায় অদ্ভুত উজ্জ্বল ছবি আঁকতেন। শ্রেণীহীন, শোষকহীন সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার ছবি। 'খেটে খাওয়া মানুষের সমবায়। সবার জমি, সবার ফসল। কেউ শোষিত নয়, কেউ আক্রান্ত নয়। সবাই পরাক্রান্ত। মাটির বুকে জন্ম নেওয়ার অধিকারেই মানুষ বাঁচার অধিকারী। এ অধিকার কেউ ভিক্ষে দেয় না। ভিক্ষে পায় না। কেড়ে নিতে হয় রাইফেলের নল উঁচিয়ে।' উদাত্ত গলার গমগমে আওয়াজের সঙ্গে ঘাম গড়িয়ে পড়ত কালো শীর্ণ মুখটা বেয়ে। চোখ দুটো জ্বলত লন্ঠনের ধোঁয়াটে আলোয়।

ভাবে সহদেব। আজকের মত খুদ খুঁটে খাওয়া হীন স্বার্থে মুরগীর লড়াই নয়। একটা আপোষহীন আদর্শের সংগ্রাম।

'যৌব রাজ্যে বসিয়ে দে মা
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে
ভাঙ্গা কুলোয় করুক পাখা
তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা
দিক মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
জীর্ণ কন্থা ছিন্ন বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।'

আবৃত্তি করত সহদেব। গুরু শুনতে ভালবাসতেন। আবৃত্তির নেশা সহদেবের ছেলেবেলা থেকেই। আর ছিল থিয়াটারের নেশা। স্কুল পালিয়ে পুজোর থিয়েটারে রিহার্সাল দিতে গিয়ে কম বকুনী খেয়েছে সে বিধবা মায়ের কাছে। মা চেয়েছিল একমাত্র ছেলে 'নেকাপড়া' শিখে তার বাপের মত নামকরা 'পেরফেচ্ছার' হয়ে উঠুক। আর ছেলে স্বপ্ন দেখত শিশির ভাদুড়ী হবার। তাই স্কুলের রি-ইউনিয়ান থেকে পাড়ার ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলন, বারোয়ারী পুজো, আর্তত্রাণের চ্যারিটি শো...কোন সুযোগই ছাড়ত না সহদেব। একটাই তার দুঃখ ছিল মনে... পারত না তুষারের মত ছবি তুলতে। তুষারের কাকা তাকে কিনে দিয়েছিলেন একটা ক্যামেরা। তুষার টাকা জমিয়ে কিনেছিল একটা ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাসগান। সহদেবের থিয়েটারের কত ছবি তুলেছে। ছোটখাট একটা এলবাম ভরে এসেছিল। যতদূর মনে পড়ে এলবামটা মা রেখেছিল ভবানীপুরে মামার বাড়ীর চিলেকোঠার তাকে।

বাবা মারা যাওয়ার পর মাকে নিয়ে ওই বাড়ীতেই চারটে বছর কাটিয়েছে সহদেব। রামরতন পাড়ারই ছেলে। বছর দুয়েকের ছোট। অনেক পরে যোগ দিয়েছিল পার্টিতে। রামরতনের মুখেই শুনেছিল, মা মারা গেছে সহদেব বাড়ী ছেড়ে আসার তিন মাস পরে। এলাবামটা পুলিশে নিয়ে গেছে। থিয়েটার করার জন্য মা বকত অষ্টপ্রহর কিন্তু এলবামটাকে রাখত খুব যত্নে। তুষার কোন নতুন ছবি তুললেই মা সযত্নে সেঁটে ফেলত তার এলবামে।

পাথরপ্রতিমার ক্যাম্পে ট্রেনিং দেওয়ার সময় অঞ্জনদার বাঁ হাতটা ছিঁড়ে গেল কনুই থেকে। গ্রেনেডটা হাতেই ফেটে গেছল। অনেক চেষ্টা করে গুরু ধরে এনেছিলেন উপেন্দ্রনগরের ডাক্তার শ্যামাপদ গায়েনকে। চোখে কাপড় বাধা ডাক্তার। এসেছিল গুরুর সাইকেলের পেছনে বসে। আর একটা সাইকেলে সুধীর বয়ে এনেছিল ডাক্তারী ব্যাগটা। বাঁশবনের বাঙ্কারে বস্তা ঢাকা দেওয়া লণ্ঠনের আলোয় গায়েন অ্যামপুট করেছিল অঞ্জনদার হাত। ফি নিয়েছিল নগদ দু হাজার টাকা। কিন্তু এত করেও বাঁচল না লোকটা। কাটা হাতে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেল। তিন দিনের মাথায় জ্বরের বিকারে চেঁচাতে লাগল পরিত্রাহী। বাঙ্কার শুয়ে শুয়ে। আশে পাশে চাষের জমি। ভয় হল কেউ যদি শুনতে পায়। শেষে গুরুর হুকুমে সুধীর তার সাইলেন্সার লাগানো রাইফেলের নলটা চেপে ধরল অঞ্জনদার মাথায় খট্। একটা শব্দ। একটু ধোঁয়া। অঞ্জনদার শরীরটা টিকটিকির একটা কাটা লেজের মত খানিকটা এঁকে-বেঁকে যেন খেলা করে ঘুমিয়ে পড়ল। ঝপ্ ঝপ্ করে মাটি পড়তে লাগল অঞ্জনদার উপর। বাঙ্কারটা ভরাতে ভরাতে সহদেবের মনে পড়ল অঞ্জনদার শেষ আকুতি, 'গুরু, আমায় ভাল করে তুলুন। আমি বাঁচতে চাই গুরু, আমি বাঁচতে চাই!'

'শালা হারামীর বাচ্চা।' গালাগাল দিয়ে উঠল আবির। কাল রাতে ওই শালা বুড়ো প্রাইহরি পুরুতের জন্যেই খালি হাতে ফিরতে হল ওদের। নানটার পকেট খালি। বাস ভাড়া বাঁচাতে সারাদিন হাঁটিয়েছে। পিয়ালী টাউন থেকে ওদের ডেরা পাক্কা ২৪ মাইল পথ। ঘরে ছিল এক ঠোংগা ছাতোধরা চানাচুর আর দু বোতল ধেনো। সন্ধ্যের মুখে চারটে ছেলে ২৪ মাইল পথ হেঁটে এসেছে বাঘের খিদে নিয়ে। নস্যির মত উড়ে গেল ওটুকু। খিদেটাকে চাগিয়ে তুলল। মেঝে থেকে খালি বোতলটা তুলে নিয়ে মোমের আলোয় দেখতে দেখত তুষার বলল, 'শালা খিদের চোটে নেশা পর্যন্ত হচ্ছে না। কিরে নানটা বানচোত, আর কোথাও কিছু আছে তোর রাজপ্রাসাদে?' নানটা মুখ ভেংচে কোমরের গুলিগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে উত্তর দিল, 'আছে বৈকি রে হারামজাদা। খাবি?' শুন্য দৃষ্টি মেলে তিনজনেই তাকিয়ে রইল নিভন্ত মোমবাতির দিকে। তুষার, সহদেব, আবির।

ওদের বড় বড় ছায়াগুলো বাড়িটার সঙ্গে কাঁপতে লাগল। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে। দেরী হয়ে গেল। ......

গায়েন বেইমানী করেছিল। বাঙ্কারটা ভরাট করে সবে ওরা ওয়াটার বটলের ছিপি খুলেছে কানে এল মোটা বাচচুর হুইসিল আর সেই সঙ্গে আবিরের চিৎকার, 'হুশিয়ার, পুলিশকা কুত্তা।' বাচচু আর আবিরের ছিল সেন্ট্রি-ডিউটি। আধ ঘন্টার এনকাউন্টার। সাবেকী অস্ত্র হাতে দশজন 'আউটল'। আর একদিকে ক্যাপ্টেন ছেত্রীর নেতৃত্বে তিরিশজন সি আর পি, হাতে ওদের অটোমেটিক রাইফেল আর সাব মেশিন গান। বাঁশবনে কভার নিয়েছিলেন গুরু। হাতে স্টেনগান। মহাদেবের হাতে একটা পয়েন্ট টুটু বোরের রাইফেল। অ্যামুনিয়ানের বাক্সটা নিয়ে ঠিক তাদের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল তুষার। অ্যামুনিসানের জোগানদার। বাচচুর চোখে বায়নাকুলার। তাকে কভার করে দাঁড়িয়েছে আবির। দু হাতে দুটো রিভলবার। পাশের টিলার আড়ালে সফি, রামরতন। হাতে তাদের ১২ বোরের ডবল ব্যারেল। সহদেবের হাতে গ্রেনেড। মেগাফোনে শোনা গেল ক্যাপ্টেন ছেত্রীর গলা, 'হামারা জওয়াননে তুমে চারো ওর সে ঘের লিয়া। আগার বচনা চারো ওর সে ধর লিয়া। হাথিয়ার ডাল দো।' খট। সুঁই-ই। উত্তর দিয়েছিল সুধীরের সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল। 'মেরা অফেন্সিভ চালু হোনেবালা হ্যায়। আগার তিস সেকেন্ড মে স্যারেন্ডার নেহি কিয়া তো ফায়ারিং চালু হো জায়গা।' আবার গম গম করে উঠল মেগাফোন। কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপরই শোনা গেল গুরুর স্টেনগানের শব্দ। জবাব এল ঝাঁকে ঝাঁকে সাব মেশিনগানের গুলি দিয়ে। একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল মহাদেব। একটানা গুলির শব্দে আর ধোঁয়ায় ভরে উঠল তুষার। টিলার পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে সফি, রামরতন। দু' হাত তুলে চিৎকার করছে, 'বন্ধ্ করো, গোলি চালানা বন্ধ করো।' হাতে তাদের সাদা রুমাল। গুরুর নজরও পড়েছে তাদের দিকে। উত্তেজনায় সব ভুলে বেরিয়ে এলেন বাঁশ বনের কভার থেকে। 'ইউ কাওয়ার্ডস! গেট ব্যাক টু ইয়োর পজিসানস...'। কথা শেষ হবার আগেই ছেত্রীর অব্যর্থ নিশানার শিকার হলেন গুরু। তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়া স্টেনগানটা নিয়ে বুকে হেঁটে পেছিয়ে এল তুষার। কয়েক মিনিট বাদে বাঁশ বনের পেছনের খালে ঝপ-ঝপ করে তিনটে অস্পষ্ট শব্দ। ডুব সাঁতার দিয়ে পালাচ্ছে তুষার, আবির, সহদেব। তুষারের হাতে গুরুর স্টেনগান। বাচচু ছটফট করছে গুলি খেয়ে। সফি আর রামরতন খানিকটা দৌড়ে আর খানিকটা বুকে হেঁটে পার হয়েছে মাঝের নো ম্যানস ল্যান্ডটা। এখন তাদের হাতে হাতকড়া। কোমরে চেন। হাবিলদার ভূপ সিং তাদের নিয়ে চলেছে এক মাইল দূরে দাঁড়ানো ওয়েপেন কেরিয়ারটার দিকে। পাগলের মত ছুটে যেতে ছুটছে মহাদেব আর সুধীর। ওদের গুলি ফুরিয়ে গেছে। রাইফেল নীরব।

পাথর প্রতিমা থেকে মেটেবুরুজ। হাঁটাপথে। তিনদিন তিন রাত্রির এক বিভীষিকাময় ইতিহাস। ওদের গোগ্রাসে খাওয়া দেখতে দেখতে হেসে উঠেছিল চাঁপা। আবিরের ফিগার স্টাডি ক্লাসের মডেল। বলেছিল, 'আয়না ধরব? ব্রহ্মাণ্ড গেলার সেলফ-প্রোট্রেট আঁকবে একটা!'

ক্রমে ওরা বুঝেছিল সমাজে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। ওরা আজ আর শোষনহীন সমাজের সমবায়ী নয়....ক্রিমিনাল, মিসক্রায়েন্ট, আউট ল। পকেটের রেস্ত আসছিল ফুরিয়ে, আর তালে তালে শুকিয়ে আসছিল চাঁপার মুখের হাসি। এমন সময় জেল থেকে বেরিয়ে এল নানটা। পেয়ারীর ঘরে অন্য মানুষ দেখে চমকে উঠেছিল। তারপর নজরে পড়ল স্টেনগানটা। লোভাতুর হয়ে উঠেছিল তার চোখজোড়া। দুঃসাহসী আনাড়ি দিশেহারা ছেলেগুলোর সর্দার হয়ে বসতে বেশী দিন সময় লাগে নি জেল ফেরৎ নানটো গুণ্ডার।

দপ করে নিভে গেল মোমবাতিটা। 'লেঃ মোমবাতির ইস্তেক ও খতম'। আপন মনেই বলে উঠল নানটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজা আর পাল্লা ভাঙ্গা জানলা জানলা দুটো দিয়ে জোরালো দুজোড়া টর্চের আলোয় ভরে গেল ঘরটা। 'হ্যান্ডস আপ'— কালো কুচকুচে চারটে রাইফেলের সামনে ওরা অসহায় ভাবে হাত তুলে দাঁড়াল। সাব ইনসপেক্টার লাহিড়ী রিভলবার হাতে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে দুজন হাবিলদার। প্রথমেই কব্জা করলেন নানটোর স্টেনগান। দুটো পাইপগান। ঝোলাতে তিনটে হাতবোমা। তারপর টর্চ ফেললেন হতবাক ছেলে চারটের মুখে। ভীষণ চমকে উঠে বললেন, 'তুমি? তুমি?? তুমি পদ্মপুকুরের কুণ্ডদার ছেলে আবির!! তুমি আর্ট স্কুলে ছবি আঁকতে না?'

'হ্যাঁ'

'এখন আঁকো না?

অর্থহীন প্রশ্ন করে চলেছেন বিস্ময়ে বিমূঢ় সাব-ইনেসপেক্টার লাহিড়ী। বোধহয় সময় নিচ্ছেন নিজেকে সামলাতে।

'না।'

'কেন?'

'রং জ্বলে গেছে।' আবির হাত বাড়িয়ে দিল হাবিলদারের তুলে ধরা হাতকড়ার দিকে। খিদেতে তার জঠর জ্বলছে।

যেমন সবাই যায়

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ সেই স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ে গেল। কবেকার দেখা সেই স্বপ্ন। অথচ অবিকল চোখের ওপর দুলে উঠল সেই ছবি। চার পাশে শুধু শুধু মাঠ। এখানে ওখানে দু-একটা গাছ। একা একা দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর অসীম আকাশ। তারই মধ্যে ঢিকি ঢিকি চলছে একটা গরুর গাড়ি। ছই খোলা সে গাড়িতে আমি আর মা। মা চুপচাপ বসে। মুখে কথা নেই। বড়ো দুঃখী দুঃখী তার মুখখানা। আমার বুকের ভেতর একটা মরা কান্না। গাড়ি চলছিল। মার সেই দুঃখী মুখ চোখ আমি খানিক দেখছিলাম আবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলাম। চার পাশের মাইল মাইল জোড়া ফাঁকা মাঠ পার হয়ে পথ খুঁজে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলছিল গাড়িখানা।

এ-সেই কবেকার দেখা স্বপ্ন। তখন আমার রাতের বিছানায় এক পাশে বাবা এক পাশে মা। লাল শালুর ছোট্ট লেপটা গায়ে টেনে মায়ের বুকে কুঁকড়ে যেতাম মাঝ রাতে ঘুম ভাঙলে। অথচ সেই বয়সেই একদিন ঘুমের মধ্যে দেখেছিলাম এই স্বপ্নটা। সেই ঠিক ঠিকানাহীন যাত্রা। আজ হঠাৎ স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ে গেল।

আমি প্রায় ছুটছি। বাগবাজার হয়ে গঙ্গার ধার ধরে। আজকের দিনটায় কেমন যেন মেঘ মেঘ আবহাওয়া। অদ্ভুত চুপচাপ গঙ্গার ধারটা। অনেক দূরে গঙ্গার বুকে দুলছে হাওড়ার ব্রীজ। তার আকাশ-ছোঁয়া মাথায় সামান্য মেঘ জমে আছে। বিন্দুর মত সেখানে উড়ছে দু-একটা চিল। মাঝ গঙ্গায় ছুটছে একটা স্টিমার। তার কাঁপা কাঁপা ভোঁ বুকের ভেতর ধাক্কা দিচ্ছে। কান্না আটকানো বুকটা তাতে দুমড়ে উঠছে যন্ত্রণায়। এ যন্ত্রণার শুরু তখন থেকেই। যখনই অফিস ঢোকার মুখে খবরটা শুনলাম।

অফিসের গলিতে ঢুকতেই প্রথম দেখা প্রতুল মান্নার সঙ্গে। প্রতুল আমার কলিগ। বললে, অফিসে গিয়ে একবার বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। কথা আছে।

বিশ্বনাথ আমাদের অফিসের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে আছে। গত মাসের একটা ট্রাভেলিং-এর ভাউচার ক্যাশে রেডি আছে, কালই খবর পেয়েছিলাম। ভাবলাম হয়ত সে জন্যেই দেখা করার তাগাদা। আজ আবার শনিবার। দুটোয় ক্যাশ বন্ধ। জোরে পা চালিয়ে কয়েক পা এগোতেই দেখা আর এক কলিগের সঙ্গে। রত্নেশ্বর মল্লিক। ওর চোখাচোখি হতেই কেমন যেন অদ্ভুত চোখে চাইল আমার দিকে। আমি যথারীতি অন্য দিনের মতই জিজ্ঞেস করলাম, কোন খবর আছে? এমনটা আমি রোজই অফিস ঢুকে অথবা ঢোকার মুখে কোন কলিগের সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করি। অনেকটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

—আপনার একটা খারাপ খবর শুনছিলাম। আপনার মা নাকি মারা গেছেন। দাদারা টেলিফোন করেছিল। নিমতলা শ্মশানে চলে যান। যাবার আগে বিশ্বনাথ-বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন। এক নিঃশ্বাসে কথা কটা বলে থামল রত্নেশ্বর।

আমি আর সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা ছুটলাম ডিপার্টমেন্টে। অ্যাসোসিয়েট এডিটর অমল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হতেই দুঃখ জানালেন। দুঃখ জানালে আরও দু-একজন কলিগ। আমার কানের মধ্যে তখন কোন কথাই স্পষ্ট নয়। মনে হচ্ছে যেন ভিনদেশি কোন ভাষায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে একরাশ মানুষ। আমি শুধু বোবা হয়ে শুনেই যাচ্ছি। মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। চটি জোড়া কখন পা থেকে খুলে পড়েছে টেরই পাই নি। কাঁধে ঝোলান ব্যাগটাও নেই।

নিজের ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে ঢোকার মুখেই পবিত্রর সঙ্গে দেখা। সব সময় হাসিখুশি আমুদে মেজাজের পবিত্র দুঃখের কথা বলতে গিয়েও হেসে ফেলে। কারও দুঃখে শোক জানানোর মিটিরিও টিপ কায়দাটা তার শেখা হয় নি। এক গাদা ভেজা ভেজা কথা বলে গেল পবিত্র। কানে কিছু ঢুকল, কিছু ঢুকল না।

বিশ্বনাথ ততক্ষণে আমার যাতা-য়াত ভাড়ার টাকটা গুণে দিয়ে ভাউচারটা এগিয়ে দিয়েছে। আমি একটা সই করে বেরোতে যেতেই বিশ্বনাথ বললে, মাণিককে সঙ্গে নিয়ে যা—একা যাসনে। সোজা শ্মশানে চলে যাবি। তবে এখন কি আর মাকে দেখতে পাবি। এতক্ষণে বোধ হয় পোড়ান হয়ে গেছে। তোর দাদারা অফিসের অপা-রেটরকে সকাল দশটায় ফোন করেছিল। তখনই শ্মশানে নিয়ে গেছে। আমি মানতে চাই নি বিশ্বনাথের কথা। মাণিক ততক্ষণে আমার পাশে এগিয়ে এসেছে আমার সঙ্গে যাবার জন্যে। তাকে যেতে বারণ করে আমি একাই পা চালালাম শ্মশানের দিকে।

আমি প্রায় ছুটছিলাম। যাবো নিমতলা। বিশ্বনাথ বললেই হল—দেখা পাব না। নিশ্চয়ই দেখা পাব। মা এখনও নিশ্চিন্তে খাটে শুয়ে আছে। তার ছোট ছেলে-আসে

নি। তার সঙ্গে দেখা না সেরে যাওয়া যায় কি। এই বিশাল দুনিয়ার ঘর-গেরস্থালি, লাভ-লোকসান, হিসেব-নিকেশ যার মাথায় আজও ঢুকল না। এত বড় পৃথিবীটাতে এখনও কত পথ একা হাঁটতে হবে তাকে। একবার গায়ে হাত বুলিয়ে অভয় দেওয়া তো দরকার। বাবা চলে গেছেন সেই কবে। দাদারা তো তেমন ছাতা ধরে দাঁড়ল না কোন দিনই। হলে কি আর সেই বয়সেই ঘর ছাড়তে হত ছেলেটাকে।

নিশ্চয়ই দেখা পাব মায়ের। হেঁটে চললাম। দশটায় যদি বাড়ি থেকে বেরোয়, শ্মশানে আসতে আসতে প্রায় এগারোটা। এখন সাড়ে বারোটা। দেড় ঘন্টা কি অপেক্ষা করা যায় না? আমার একশো বছরের বুড়ি ঠাকুমাই তো কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করেছিল ত্রিবেণীর ঘাটে। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে ছুটে গিয়েও দেখা পেয়েছিলাম। এক রাশ আত্মীয়স্বজনকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে জেদী ঠাকুমা নিশ্চিন্তে শুয়েছিল আকাশে চোখ রেখে। হিমভেজা চাঁদ তখন বিশাল বটগাছের ডাল পাতার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল। সামনে পারাপারহীন গঙ্গা। এক রাশ মানুষ বুড়িকে ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তাড়া দেয় কার সাধ্য। বুড়ি ঝাঁঝিয়ে বলবে তাহলে, দ্যাখ বাপু অত তড়িঘড়ি করিস না। যাই বললেই যাওয়া। এই বেশাল সংসার। হাজার দায়। হাজার কাব্য। সব সেরে-সুরে যেতে হবে তো। এতদিন সব ঠিকঠাক করে এসেছি। শেষ সময়টায় বেচাল হলে কি চলে? তোরা জিরিয়ে নে খানিক। ছোট নাতিটো আসুক। একবার বলে যাই—ন মাস ছ মাসেও একবার যাস গোপালপুর। তোর বাবার নিজের হাতে লাগান মুচকুন্দ ফুলের গাছ বিলিতি আমড়া আর খেলকদম গাছ। অনেক মমতায় করা ঘরবাড়ি—

নিমতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মাকে দেখলাম না। সব কটা চিতায় ঝুঁকে খুঁজলাম। দেখা নেই। ইলেকট্রিক চুল্লোর ঘরেও গেলাম। সেখানেও মা নেই। আমার চার পাশে তখন ভূমিকম্প। টালমাটাল শরীরে শ্মশানের এনকোয়ারিতে ঢুকে পড়লাম। ঘাটবাবুর খাতায় মায়ের হাজিরার দাগ পড়েছে। সেই ভূমিকম্পের ভেতরই শ্মশান ফেরৎ একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। ড্রাইভারকে বললাম — বিডন স্ট্রিট যাবো — একটু তাড়াতাড়ি।

দরজায় ঢুকে বাইরের ঘরে পা দিতেই দু দাদার মুখোমুখি। ও'রা চা খাচ্ছিলেন। পরিষ্কার পেয়ালা পিরিচ। সব চুকিয়ে তারা ফিরে এসেছেন। বড়দা আমাকে বললেন, গিয়েছিলি শ্মশানে? দেখা পাস নি? ইলেকট্রিক চুল্লিতে পোড়ালাম তো। বেশি সময় লাগে নি। হার্ডলি দেড় ঘণ্টা। তুই যখন গেছিস আমরা তখন আহিরীটোলা ঘাটে চান করছি হয়ত। এইমাত্র তো ফিরলাম। আমি কোন উত্তর দিই নি।

অনেক দিন আগে মা একবার হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আমি তখন রীতিমত ছোট। একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়েই বাবা হাসপাতালে গিয়েছিলেন মাকে দেখতে। মায়ের জন্যে ক'দিন খুব কান্নাকাটি করছিলাম আমি। হাসপাতালের সিঁড়িতে উঠতেই দুটো যমদূতের মত মানুষ গেট আটকে দাঁড়াল। শিশু নিয়ে রোগীর কাছে যাওয়া চলবে না। আমাকে তারা মায়ের কাছে যেতে দেয় নি। দু' দাদাকে দেখে আমার হঠাৎ হাসপাতালের গেট আগলানো সেই দুটো লোকের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিনের মত আজও ফিরে এলাম।

বাগবাজার ঘাটের চাতালে তখন গঙ্গা পেরোন বৃষ্টির ঝাপটা। সামনেই মাথা-মুণ্ডুহীন নদীটা। গঙ্গায় চান করে উঠে আমি নতুন কেনা কোরা মার্কিনটা পরছিলাম। প্রতুল মামা এক টুকরো মার্কিনে বাঁধা চাবিটা গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছিল। এ ঘাটটায় দাঁড়িয়ে কোণাকুণি তাকালে বালিব্রীজ দেখা যায়। কান খাড়া করলে ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেন যাওয়ার গুম গুম শব্দ শোনা যায়। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে সেদিকে চাইলাম। সব ঝাপসা। গঙ্গার ওপারের শহর আর কল-কারখানা আবছা জলছবি। সেই স্বপ্নটাই এই মুহূর্তে আবার নতুন করে দেখলাম। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে এই শহর, ঘরবাড়ি, লোকালয় ছাড়িয়ে বহু দূরে কোথাও হেঁটে যাচ্ছেন মা। কঠিন পৃথিবীতে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একাই চলেছেন। যেমন সবাই যায়।

সত্যজিৎ, মৃণাল এবং কিছু ভাল ছবি

আশীষ বর্মন

প্রশংসায় বিনীত এম, এস, সাথ্যু 'গরম হাওয়া' ফিল্মের পরিচালক দিল্লিতে আমায় ঈষৎ বিষণ্ণভাবে জানান যে তাঁর ছবি জনপ্রিয় হয়নি, যদিচ শিল্প-রসিকদের দ্বারা সেটি নন্দিত। এটাই তাঁর আপাতত সান্ত্বনা। এহেন আপাত বৈপরীত্য সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবিতেও ঘটেছে, যথা অপরাজিত, কাঞ্চনজঙ্ঘা, দেবী, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, অরণ্যের দিনরাত্রি অথবা সীমাবদ্ধ তুল্য সার্থক ফিল্মগুলির ক্ষেত্রে। এগুলি একদিকে সংবেদনশীল দর্শককে কম বেশি তৃপ্তি দেয়। অন্যপক্ষে জনরঞ্জনের চৌকাঠে ব্যর্থতায় হোঁচোট খায়, এবং তখন স্বভাবতই নিজেদের বিমূঢ় লাগে। আচমকা তাৎক্ষণিক হতাশার প্রভাবে অন্তর্লীন সংশয় জাগে যে চলচ্চিত্রের মতো জন-মাধ্যমে সম্ভবত শিল্পের তাৎপর্য খোঁজা বৃথা তা হয় তো স্বদেশের বর্তমান জনরুচিতে পরিত্যক্ত হতে বাধ্য।

এ-কথা সাথ্যু বা সত্যজিৎ রায়ের উল্লিখিত ছবিগুলির জনপ্রিয়তার অভাবে যেমন মনে হয়েছিল, তেমনি আবার আমাদের নিজস্ব ফিল্ম পদাতিক-ও যখন [illegible] [illegible] লাট খেলে, তখনো সাময়িকভাবে মনকে বিষাদ আচ্ছন্ন করে।

অথচ আমার নিজেরই লেখা সিনেমা কাহিনী পুনশ্চ, আকাশকুসুম কিংবা ইন্টারভিউ ছবির জন-বর্জনে এ-ব্যর্থতা বোধ আমাদের পেয়ে বসেনি। প্রসঙ্গে এ-অসাফল্য অহংকারে বিঁধলেও অচিরে আমরা কার্যকরণ-সূত্র বুঝি, মনে হয় নিজেদের গাফিলতি টের পাই। সে-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ঠিক হোক বা না হোক, অন্তত আমাদের প্রচেষ্টার একটা দিশা মেলে। কেননা এ-ছবিগুলির সামগ্রিক গঠনে ও অভিব্যক্তিতে মৃণাল সেন ও আমার উভয়েরই শেষ পর্যন্ত প্রত্যয়, যে বিভিন্ন স্তরে ও ভাবে আমরা শিল্প-সম্পূর্ণতার নিশ্চিতি আনতে অক্ষম হয়েছিলুম। যে-অক্ষমতার চিহ্ন সত্যজিৎ রায় বা সাথ্যুর উল্লিখিত ফিল্মগুলিতে প্রায় অনুপস্থিত।

আমাদের ছবিগুলির মধ্যে, রচনার দিক থেকে পুনশ্চ ছিল সব থেকে ভঙ্গুর ও অগোছালো। এবং তৎসত্ত্বেও সে ছবি যদি বিন্দুমাত্র সাধারণ ফরমুলা ফিল্মের মান উত্তীর্ণ হয়ে থেকে থাকে, সামগ্রিকভাবে না হলেও অন্তত স্থানে স্থানে, তাহলে সেটুকু সাফল্যের আদ্যন্ত কৃতিত্ব পরিচালক হিসেবে মৃণাল সেনের প্রাপ্য। সুতরাং এ-ছবির জনপ্রিয়তার অসাফল্য সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের কোনো খেদ নেই, বরং রয়েছে সমূহ সঙ্কোচ।

কিন্তু অন্তর্লীন খেদ ও মমত্ববোধ রয়ে গেছে আকাশকুসুম ও ইন্টারভিউ ছবি দুটি জড়িয়ে। জনপ্রিয়তা এড়িয়ে যাওয়ার দুঃখ নয়, আসলে নিজেদের তৎকালীন শৈল্পিক-স্খলনের অনুশোচনা। কেননা এ-শৈল্পিক ত্রুটি ব্যতিরেকে, এখন আমাদের বিশ্বাস, যে সম্ভবত ছবি দুটি আরো জনগ্রাহ্য হত। অর্থাৎ এ ছবিগুলির ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার অভাবের হেতু নিহিত আমাদেরই শিল্প অসম্পূর্ণতায়।

অবশ্য আমরা কোনো দিনই ভাবিনি যে আকাশকুসুমের গূঢ়ার্থ সাধারণ দর্শক চিন্তার স্তরে গ্রহণ করবেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সোজা, অর্থাৎ এ ছবিতে সাধারণ দর্শককে আপাত হাস্যোচ্ছলতা ও গতিময় ছন্দে মজানো, কাছে টানা। ছবিতে নিহিত সমাজ-সত্যের সারাংসার তাঁরা বুঝুন আর নাই বুঝুন, অন্তত মানবিক

মনোরঞ্জনের প্রকরণে যেন তাঁরা তৃপ্তি পান। অন্যপক্ষে, মননের স্তরে অনুভব ও সংবেদন মন আমরা কাড়তে চেয়েছিলাম আকাশকুসুমের নিহিত তাৎপর্যে, যার প্রকাশভঙ্গী ছিল ঝরঝরে, আমুদে আধারে। কিছুটা চ্যাপ্‌লিনের শিল্প-ধ্যানে, যদিচ তাঁর আঙ্গিক, অভিনয় অথবা অনুষঙ্গের ধারায় নয়, শুধুমাত্র তাঁর হাল্কা, মনোরম চালে।

এক কথায় এ-ছবির গূঢ়ার্থ লিপ্ত ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত অভীপ্সায়। এক্ষেত্রে অল্পস্বল্প কাব্যিক বা শিল্পের স্বাধীনতা নিয়ে, সে-অভীপ্সা, মোড়া হয়ে ছিল মধ্যশ্রেণীর আকাশকুসুম বা ইচ্ছাপূরণের সিনেম্যাটিক ক্রিয়াকাণ্ডে। এবং সে বুনন ও বিস্তার ছিল এক চনমনে যুবার দিবাস্বপ্ন কেন্দ্রিক। যুবাটি ছিল চালাক চতুর, শিক্ষিত, উচ্চাভিলাষী এবং আত্মপ্রত্যয়ে ডগমগ। অধিকন্তু সে সুপুরুষ, স্ব-শিক্ষিত গাইয়ে ও বন্ধু-ভাগ্যে ভরাট। সামান্য ব্যবসায় শুরু করে ছোটোখাটো মিথ্যায় জড়িয়ে, সে ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এবং যেহেতু সে যুবা আর তার আকাঙ্ক্ষা মূলত আবেগতাড়িত ও মায়াময় যুক্তি-নির্ভর নয়, তাই তার দিবাস্বপ্ন কেবল ইংরিজিতে যাকে বলে টাইফুন-ডাম, সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু সে-এক সম্পন্ন পরিবারের কন্যারও প্রেমে পড়ে। শেষ রক্ষা কিন্তু আর কোনো স্তরেই হয়নি, স্বভাবতই।

আলোচ্য আখ্যানভাগকে আমরা, মৃণাল ও আমি, বিস্তার করেছিলুম বিভিন্ন আপাত কৌতুকময় জ্বলজ্বলে ক্ষিপ্র ঘটনা ও পরিস্থিতির টানে, সংলাপে। এ ছিল আমাদের যৌথ চিত্রনাট্যের উৎস; উপরন্তু পরিচালক হিসেবে মৃণাল এনেছিলেন আচার-আচরণ ও অভিব্যক্তির নানান চিত্রময় ব্যঞ্জনা, সিনেমার আঙ্গিক মাহাত্ম্য। আর যতক্ষণ আমরা এ-কৌতুকী, তরতরে ক্ষীপ্র মেজাজ ছবিটিতে অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিলুম, প্রায় রূপকথার স্নিগ্ধতায়, ততক্ষণ জনপ্রিয়তায় হ্রাস ঘটেনি। বরং চিত্তবিনোদনের স্তরে হাসির এক উজ্জ্বল ভাব স্পষ্ট ছিল। কিন্তু অঘটন ঘটে গোড়ার দিকের স্বল্প সময়ে, এবং শেষের মিনিট পনেরোর সিকোয়েন্সে এসে। এখানে পৌঁছে আমরা কেমন জবুথবু হয়ে যাই, অনাবিল কৌতুকের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতময়তাকে শ্লথ, ভারাক্রান্ত ও দস্তুরমত ভাবালু করে ফেলি। অর্থাৎ সংহত, গভীর ট্র্যাজেডিতে অথবা ইঙ্গিতপূর্ণ কোনো বিদ্রূপে এ-ছবির উপসংহার ঘটল না, যা সার্থক শিল্পরূপে ছিল অবশ্যম্ভাবী। বরং আকাশকুসুমের শেষাংশ, আমাদের অক্ষমতায়, ভাবালু প্যাতপ্যাতানিতে লেবড়ে গেল।

এ-ব্যর্থতার দায়ভাগ লেখক ও যৌথ চিত্রনাট্যকার হিসেবে মূলত আমার এবং আংশিকভাবে হয়তো অভিনয় ও দৃশ্য-নির্মাণের খামতিতে। এ-শৈল্পিক ব্যর্থতার প্রধান দায়িত্ব আমাতে বর্তায় এজন্যই যে, আকাশকুসুমের চিত্রনাট্য মৃণাল সেন মূলানুগই রেখে ছিলেন। প্রত্যয়া স্বীকার্য

যে চিত্রনাট্যের উদ্ভাবনের অংশে আমার কল্পনাশক্তি হঠাৎ শেষাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে। মাছিমারা কেরানীর মতো আমি কেবল আখ্যানভাগের বাস্তব জগৎ-জাত যুক্তিটুকুই মানি, কিন্তু সে যুক্তিকে মানবিক আবেগ অনুভূতির উদ্বোধনের শৈল্পিক শর্তে আনতে ব্যর্থ হই। অর্থাৎ বাস্তবতার প্রাবন্ধিক যুক্তি এ-ছবির শেষাংশেও ছিল, কিন্তু তা সংবাদ হলেও, মনুষ্যে উপলব্ধি ও বেদনাবোধ আয়ত্ত করল না।

পরিচালক মৃণাল সেনই বরং শেষাংশের উপরোক্ত প্রাবন্ধিক তত্ত্বকে তার-ভাবালুতা কাটানোর প্রাণান্তক প্রয়াসে, প্রকরণগত মুন্সিয়ানাকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা পান। আঙ্গিকের প্রয়োগে, ক্যামেরা মুভমেণ্টে, কম্পোজিশানে, শট-পরিবর্তনে এবং শব্দ-সঙ্গীত ইত্যাকার প্রকরণ নৈপুণ্যে তিনি শেষ রক্ষার উদ্যম নেন। কিন্তু ছবির এ অংশের নিরেশ, শ্লথ, গোদা গতিকে ট্র্যাজিক সমাপ্তিতে পৌঁছানো অসম্ভব। তাই আমাদের ধারণা আকাশকুসুম শিল্পগত কারণেই শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয়তা হারায়।

ইন্টারভিউ ছবির ইতিহাসও কিছুটা অভিন্ন ধাঁচের দাঁড়ায়, খুবশ্য অন্য কার্য-কারণে। এ-ছবিতেও মূল্যবোধগত ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় নিও-কলোনীয়ালিজমের যে তাৎপর্য নিহিত ছিল, যে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ইঙ্গিত, আমরা ভাবিনি যে তা আপামর জনসাধারণের চৈতন্য স্পর্শ করবে। আমরা শুধু প্রয়াস পেয়েছিলুম তা যেন বোদ্ধাদের বিবেচনা না এড়ায়। অন্যপক্ষে সাধারণ দর্শকের কাছে এ-ছবির ক্রিয়াকাণ্ড যেন সম্ভাব্য ঘটনার ও নিজেদের অভিজ্ঞতার কৌতুককর এবং বক্র আলেখ্যে রূপান্তরিত হয়। যে রূপান্তরিত শিল্পরূপ আপাত অবলোকনের স্তরেও, হাল্কা গতিময়তায় ও ব্যঙ্গকৌতুকের টানে, মন কাড়তে সক্ষম নিহিতার্থ সবটুকু গোচর হোক বা না হোক। কিন্তু এই প্রাঞ্জল গতিময়তা, ঝলমলে উল্লাস ও আমুদে স্রোত হেতু স্থানে স্থানে ইন্টারভিউ-এ আচমকা হোঁচট খেয়ে, বিস্রস্ত হয়ে গেল, তাই সম্ভবত এ-ছবিরও জনরঞ্জন প্রচেষ্টা মাঠে মারা যায়।

আসলে ছবিটির আরম্ভই হয়েছিল অশুভ। প্রথমত আর্থিক অনটনে। এবং এই অনটনের চাপে, হঠাৎ ত্বরায় মৃণাল যে মেয়েটিকে নায়িকা হিসেবে স্থির করে ফেলেন, কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যায় তিনি অচল। তাঁর দৈহিক চেহারা ও অভিনয় উভয় ক্ষেত্রেই সমূহ ঘাটতি। এ ঘাটতি ঘাড়ে নিয়ে নায়িকাকে বিভিন্ন দীপ্ত রোমান্স ও গতিময় পরিস্থিতিতে আনা অসম্ভব দাঁড়াল। অথচ চিত্রনাট্যের ভিত্তিই ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত এক প্রেমিক-প্রেমিকার, একটি স্যুটের খোঁজে নানান অভিযানে জড়িয়ে পড়ায়, ছোটোখাটো ক্ষিপ্র, ইঙ্গিতবহুল ও কৌতুকময় পরিস্থিতির গ্রন্থি উন্মোচনে। বাধ্যত চিত্রনাট্যের সে-সব ব্যঞ্জনাময় উদ্ভাবন বহুলাংশে ছাঁটতে হল, এবং অগত্যা [illegible] যেন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বিভিন্ন

মৃণাল সেনের আকাশ-কুসুম ।সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মা

তাৎক্ষণিক সিনেম্যাটিক চিটিং-এর আশ্রয় নিলেন। ফলে ছবির ছন্দপতনই ঘটল না, তার ঝলমলে প্রত্যন্ত আবেগ হল খণ্ডিত।

কিন্তু আলোচ্য প্রতিকূল অবস্থা, ছবির অন্যান্য জায়গা খর্ব করলেও ইন্টারভিউয়ের শেষাংশের মাত্রাপতন ও অতি-কথনের হেতু নয়। সে-হেতুর উৎসে ছিল সম্ভবত মৃণাল সেনের তৎকালীন দুটি শৈল্পিক ঝোঁক। প্রথমত তাঁর আঙ্গিকের সম্প্রসারণ ও উদ্ভাবনের তীব্র তাগিদ, যার গোড়ায় ছিল তাঁর চলচ্চিত্র মাধ্যমকে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক পরিচালকদের মতো, ধারাবাহিক পারম্পর্য-সংহত বর্ণনার আওতা থেকে মুক্ত করার বাসনা। যে বাসনার সাহিত্যিক স্বরূপ প্রুস্তে এবং জয়েসে বহু পূর্বেই প্রত্যক্ষ। আর এই প্রচেষ্টার মৌল শর্ত হল সিনেমার প্রতীকী বিন্যাসে গড়া, যা কিছুটা বিমূর্ত এবং ছাড়া ছাড়া চিত্রময়তা ও শব্দ-সঙ্গীতের সংযোজনে ব্যক্তি ও সমাজ সমস্যার শৈল্পিক আধার হয়ে ওঠে। ইন্টারভিউ-এর শেষাংশে অথবা পরবর্তী 'কলকাতা একাত্তর' ও 'কোরাস' ছবি দুটিতে, মৃণাল সেনের এ-প্রয়াস স্পষ্ট।

অথচ ইন্টারভিউয়ের সময় এবং তার পরেও কিছুকাল মৃণালের মধ্যে আলোচ্য শৈল্পিক ঝোঁকই কেবল প্রত্যক্ষ নয়। বরং তাঁর এই প্রতীকী, চিত্রময় ঝোঁকের বিশেষ অন্তরায় ছিল আর এক সমান্তরাল বিপরীত টান। যে টানকে তিনি তৎকালে 'প্যামফ্লেটিয়ারিং' আখ্যা দিতেন। অথচ শেষোক্ত এ-প্রবণতার প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি হল প্রাবন্ধিক স্পষ্টতার, সরাসরি ও উচ্চকণ্ঠে প্রচার, প্রতীকের ইঙ্গিতময়তা বা উপমা-উৎপ্রেক্ষা নয়। ফলে এই পরস্পর-বিরোধী, সামঞ্জস্যহীন ঝোঁক ইন্টারভিউয়ের শেষ দিকে অত্যন্ত প্রকট। এ অংশে যুগপৎ রয়েছে উজ্জ্বল উদ্ভাবন ও প্রকরণগত চিত্রময়, অনন্য কারিকুরি, যা চমকপ্রদ এবং বিশিষ্ট; আবার অন্যপক্ষে, শব্দে-চিত্রে-সংলাপে-সঙ্গীতে সর্বত্র সোচ্চার আতিশয্য। প্রতীক ও ইঙ্গিতময়তার যা পরিপন্থী। এবং এই মৌল শিল্প-বিরোধই সম্ভবত ইন্টারভিউয়ের আদত দুর্বলতা। এমন কি আমার বিশ্বাস এই দুর্বলতাই কম-বেশি প্রত্যক্ষ মৃণালের অন্য দুটি ছবিতেও, যে দুটির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না, অর্থাৎ কলকাতা একাত্তর এবং কোরাস-এ।

কিন্তু আমাদের পদাতিক ছবিতে এহেন কোনো শৈল্পিক বিচ্যুতি অনুপস্থিত। এ-ছবিটি, আমার বিশ্বাস, প্রসঙ্গ ও প্রকরণের শিল্প সামঞ্জস্যে সুন্দর, এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রে ভাবাদর্শগত প্রসঙ্গে, সব থেকে গভীর, হৃদয়গ্রাহী, শ্রীমণ্ডিত সার্থক ফিল্ম, যার এ-পর্যন্ত তুলনা নেই; অথচ ঠিক এই গুণগত কারণেই সম্ভবত পদাতিক জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা হয়তো এ-ছবির অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শগত প্রসঙ্গ, জনরুচি ও অভিজ্ঞতার ভারী এবং অপরিচিত ঠেকে। যে এত পদাতিকের আবেগ-অভিজ্ঞতা যে শ্বাসরুদ্ধ স্তরে নিশ্বাস নিয়েছিল, এবং মননের যে প্রশ্নাবলী ও অন্বিষ্ট এ-ছবির হৃদপিণ্ড, তা আপামর সিনেমা দর্শকের কাছে আজো অস্পষ্ট। হয়তো বা নকশালদের নিজেদের মধ্যে এবং কমিউনিস্ট ও নকশালী আভ্যন্তরীণ কচকচানি মাত্র। অভিজ্ঞতার আঙিনায় জনমনে যা আপাতত অজ্ঞেয়। অগত্যা এ-ছবি, শিল্পানুষমা সত্ত্বেও, দর্শকদের সাড়া পায়নি। যা পেয়েছিল মৃণাল সেনের ভুবন সোম অথবা মৃগয়া।

ভিন্ন স্তরের জনমানসের বাধায় সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ ছবি, যেমন অপরাজিত অথবা কাঞ্চনজঙ্ঘা, ব্যবসায়িক বিপর্যয়ে পড়েছিল। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত ছবি দুটির একত্রে বিশ্লেষণের ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হয়। পথের পাঁচালীর মনুষ্য-নির্বিশেষে অভিভূত

সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধ শর্মিলা ঠাকুর ও বরুনচন্দ

করার ট্র্যাজিক আবেদনের অন্তরে ছিল কেবল এক অনিন্দ্য শিল্পরূপ নয়, কেননা সে শিল্প-বৈভব অপরাজিত ছবিটিতেও বর্তমান, উপরন্তু ছিল প্রথমোক্ত ফিল্মের সরল আখ্যানভাগ। পথের পাঁচালী কাহিনীর ছোটোখাটো, দারিদ্র্যবৃত, সুখে দুঃখে বেঁচে থাকার প্রয়াস, আপামর মানুষের প্রাথমিক অন্বেষা এবং তাই আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির অঙ্গ। এক্ষেত্রে আধুনিক মানুষের পরস্পর-বিরোধী মূল্যবোধ ও অভীপ্সা-লিপ্ত কোনো সংঘাত জড়িত নেই, নেই মননের জটিল টানা-পোড়েন। মূল্যবোধ আকাঙ্ক্ষার যেটুকু রেশ এ-ছবিতে উপস্থিত, অর্থাৎ হরিহরের পাঁচালী রচনার বাসনা, তা সনাতনী গ্রামীণ কাঠামোরই অংশ, নতুনের আবির্ভাব নয়। যে আবির্ভাব অপরাজিততে অপুর অভীপ্সায় সংশ্লিষ্ট। অন্যপক্ষে পথের পাঁচালীর গভীর মানবিক আখ্যানভাগ পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য ও প্রকৃতির মৃত্যুমুখী একটি সংসারের তলিয়ে না যাওয়ার দুর্মর প্রচেষ্টায়। স্নেহ-মমতায় সিক্ত নানান চেহারায় যা চিরকালীন ও সর্বস্তরে পরিচিত।

মনুষ্যত্বের এই প্রাথমিক স্তরে বেঁচে থাকার প্রয়াস, বিভূতিভূষণের রচনায় কাব্যিক বিস্তারে ঈষৎ ছড়ানো এবং নানা চরিত্রে বিস্রস্ত। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে সেই বিস্রস্ত ধরনকে মূলত হরিহরের সংসারে সংহত করে আনেন। আর এই আশ্চর্য, শিল্প-গভীর সংহতিই পথের পাঁচালী চিত্রের তীব্র ট্র্যাজিক বোধের উৎসে, তার নাটকীয়তার কেন্দ্রবিন্দু।

আর এই মানবিক কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে, উপন্যাসের সুরে কিন্তু নিজস্ব মাধ্যমে, সত্যজিৎ রায় মেশালেন প্রকৃতিকে। ফলে বাংলাদেশের আটপৌরে প্রকৃতি, এমনকি শহরবাসীরও যা ট্রেনের জানালা দিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য, তা অনিন্দ্য অনুভূতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। কেননা এ অনুভূতির উৎসে রয়েছে নিছক বিমূর্ত নিসর্গ সৌন্দর্য শুধু নয়, যেমন কাশ্মীরে বা কোভালমে, পরন্তু তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংসক্ত মানুষের বিবর্তিত নিয়তি। অপু-দুর্গা-হরিহরের সংসারের প্রাত্যাহিক ছন্দ। অর্থাৎ বাজারে ফিল্মে কেবলমাত্র প্রেমের দৌড়ু-দৌড়ি ও গান গাওয়ার দৃশ্যের জন্যে যে আচমকা কাশ্মীর গমন ঘটে, এবং নিসর্গ শোভা নিয়ে বাচালতা, তা নয়। বাঁশবন এ ছবিতে তাই নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক অবস্থান নয়, একই সঙ্গে তা অপু-দুর্গার প্রাত্যাহিক সঞ্চরণের স্থান, জীবনের অঙ্গ। ফলে ইন্দির ঠাকরুণের মর্মান্তিক, নিঃসহায় তিরোধানের স্মৃতিতে ব্যথাতুর পরিবেশ, যেখানে অপু-দুর্গার শিশু হৃদয়ের রেশ হাহাকার করে।

অন্যপক্ষে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া রেল-গাড়ির ধোঁয়া, কাশের বনের মাধুরী ও টেলিগ্রাফের থামের অবশিষ্ট অনুরণন, অপু-দুর্গার কৌতূহল ও বিস্ময়ের আকাশে পরিণত, তাদের শুচি শিশু জীবনে প্রথম সুদূরের হাতছানি। কেমন রৌদ্র-ছায়া মেঘের খেলা ও ঝড়বৃষ্টি এখানে বিমূর্ত, প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং তা একাকার ভাই-বোনের লীলায়, দৌড়ে, ভেজায় এবং শেষ পর্যন্ত দুর্গার মুক্তিহীন অসুখের বেদনার্ত পরিণতিতে।

মানুষের জীবন ও প্রকৃতির আলোচ্য সংশ্লেষেই, দুর্গার মৃত্যুর পর, দিদির স্মৃতির প্রতি একাত্মতায় এবং লৌকিক নিন্দা এড়ানোর আগ্রহে, অপু যখন দুর্গার চুরি করে আনা, লুকোনো পুঁথির মালা পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে নিষ্পলক দাঁড়িয়ে দেখে, তখন তাকেই শুধু দেবদূত-তুল্য লাগে না, মনে হয় কচুরীপানাও আমাদের আত্মীয়। মন মুচড়ে ওঠে সে-মালা কচুরীপানায় আবৃত হয়ে এলে, যদিচ কচুরীপানা গ্রামীণ স্বাস্থ্যের পরিপন্থী।

পথের পাঁচালী চিত্র আদ্যন্ত এহেন মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কে একাত্ম। সত্যজিৎ রায় যখন তাঁর চিত্রনাট্য সংহত করলেন মূলত একটি পরিবারের নিয়তিতে, তখন তাঁর পাত্র-পাত্রীর ছৈবিক অংগ হিসেবে এবং নাট্যবস্তুর কেন্দ্রস্থিত আবেগের সঙ্গে, নিসর্গ ও মানুষের সংশ্লেষ আরো প্রত্যক্ষ স্তরে স্থিতি পেল। এবং তার ফলেই এ ছবির অসাধারণ চিত্রময় লালিত্য ও মানবিক ট্র্যাজেডির হাহাকার পরস্পর সম্পূরক, আলগা অর্থহীন শোভা নয়। তবু এ চিত্রের ট্র্যাজেডির উৎস মানুষের সরল, অজটিল, প্রাথমিক জীবন-যাপন প্রণালীতে সংন্যস্ত। অর্থাৎ এ ট্র্যাজেডির মৌল উৎসে মূল্যবোধগত কিংবা আদর্শের সংঘাত নেই, নেই আধুনিক জটিল মননের সংখ্যালঘু উপলব্ধি ও তার

বিরোধ অথবা পরস্পর বিপরীত টেনশান। যে আপাত সংঘাত সত্যজিৎ রায়ের অন্য ছবি অপরাজিতর কেন্দ্রে অবস্থিত এবং সে-জন্যেই সম্ভবত সে-ফিল্ম জনগ্রাহ্য হয়নি।

কেননা অপরাজিত ফিল্মের সংযত সৌন্দর্য ও ট্র্যাজেডি দুই-ই নিহিত ছিল অপুর ব্যক্তিত্ব বিকাশজনিত প্রক্রিয়ার চাপা কিন্তু ক্ষুরধার বিরোধে। এ বিরোধ মূর্ত এক অনবদ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্র নির্মাণে, তার সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণে। এ-নিবিষ্ট বিশ্লেষণ যুগপৎ মাতা-পুত্রের নিবিড় একাত্মতায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে, অপু-সর্বজয়ার ক্রমবর্ধমান অভীপ্সা ও মূল্যবোধের পার্থক্যে। মাতা-পুত্র উভয়েই, প্রায় সারা ছবি জুড়ে, নিরন্তর প্রয়াসে এ-দুস্তর পার্থক্য উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টায় মগ্ন এবং ব্যর্থ। অর্থাৎ এ ছবির মৌল কাঠামো ছিল অপুর ব্যক্তি স্বরূপের বিকাশ, তার বাল্য-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে, সর্বজয়ার অপরিচিত এবং তার নিষ্কম্প গ্রামীণ, প্রথাগত পরিমণ্ডলের মূল্যবোধের বাইরে, আধুনিক অভীপ্সার প্রাথমিক স্পন্দনে। যে-অভীপ্সার সুর [illegible] চিত্র বহু পুরুষের অভ্যস্ত এবং অচল গ্রামীণ ব্রাহ্মণের আওতায়, শুধু সর্বজয়ারই নয়, এমনকি সারা নিশ্চিন্দিপুরেরই অজানা! কারণ অপু, আর গ্রাম্য প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য পৌরোহিত্যেই তুষ্ট নয়, তার দিগন্তে আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের ইশারা।

অপুর এই ক্রমবর্ধমান নতুন আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা স্বভাবতই সর্বজয়ার কুশ, সনাতনী মূল্যবোধ ও শ্রেয়ের ধারণায় খাপছাড়া লাগে। আধা সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম্য ব্যবস্থা ও ইতিহাসই সর্বজয়ার চেতনার কুশ উৎসে, মাতা-পুত্রের বোঝাপড়ার অন্তর্লীন চেষ্টার অভাব নয়। আসলে অপু-সর্বজয়ার রক্তের টান সত্ত্বেও মূল্যবোধ ও অভীপ্সার এ বিরোধের সূচনা সমাজ-পরিবর্তনে, এবং তাই ব্যক্তিগত প্রয়াসে সে দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটে না, সে ব্যক্তিগত সংযোগ যতই ঘনিষ্ঠ, গভীর ও অবিচ্ছেদ্য হোক না কেন। আর এই মৌল পার্থক্যের মর্মান্তিক, করুণ রূপাভাসই অপরাজিতের ট্র্যাজেডি ও নিটোল সৌন্দর্যের আধার। সুতরাং এ-ট্র্যাজেডির সৌন্দর্যে যুগপৎ পুলকিত ও মুহ্যমান হওয়া তখনই অবধারিত, যখন দর্শকের চেতনার প্রথাগত মূল্যবোধ এবং পরিবর্তমান ভাবাদর্শের অশান্ত দ্বন্দ্বের সংবেদন রূপরেখা উপস্থিত। অন্যথায়, এ-অলীক ভর্ৎসনা জোটে, যা সত্যজিৎ-এর তৎকালে জুটে ছিল, যে তিনি নাকি খামোখা অপুটাকে স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর বানালেন! এহেন অর্বাচীন সমালোচনা সম্ভব হত না, যদি অপরাজিতকে সর্বজয়াকে শহরে এনে অপুর ঘর সংসার পাতার মিষ্টি সমঝোতায় শেষ করার যুক্তি নিহিত থাকত।

অন্তত চারুলতা ছবির দুরন্ত সাফল্যে আমার সে রকমই মনে হয়। এ-ছবিরও শিল্প-সুষমা অগাধ, কিন্তু নিছক শিল্পগত কারণে তো সব ফিল্ম মনোরঞ্জনে সফল নয়, যেমন অপরাজিত। অগত্যা আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত উপলব্ধির ক্ষেত্রে, চারুর প্রেম-সংক্রান্ত মানবিক আবেগ, সম্ভবত অগোচরে অন্তঃপুরেও অনুভূত। কিন্তু সে-অনুভূতির বা অভীপ্সার সঙ্গে, ব্যক্তিগত নিভৃতিতে, ভাবাদর্শগত মননের সম্পর্ক নেই। আছে ব্যক্তিগত, একান্ত উপলব্ধির অনুচ্চারিত রেশ। এই রেশ সম্ভবত মূল্যবোধ-সংক্রান্ত প্রশ্নে জড়িয়ে যায় যদি তা স্বামী-ত্যাগের অথবা গোপনে পরপুরুষ আসঙ্গে ফাঁসে। তার পূর্বে নয়। কিন্তু চারুলতা ছবিতে, কিংবা নষ্টনীড় উপন্যাসে, এ-প্রেম বিষয়ক উপলব্ধির যে উপসংহার ঘটে, তা অন্তত ইদানিংকার অভ্যস্ত মূল্যবোধের গণ্ডীর মধ্যেই। সে-পরিণতি এক বিধুর ইঙ্গিতময় সমঝোতা বা কম্প্রোমাইজে। এবং এ-সমঝোতা যেহেতু আজো ভারতীয় সমাজ-সত্যে নিহিত, শিল্পীর ইচ্ছাপূরণে নয়, তাই হয়তো এ-সমঝোতা জনমানসেও

মৃণাল সেনের পদাতিক। সিমি, ধৃতিমান প্রভৃতি

অনুকম্পায়ী সাড়া তোলে। সুতরাং তার আবেদন, কেবল শিল্পশ্রীতে নয়, সমঝোতার নিধুর সুরে, মধ্যবিত্তের মধ্যে ব্যাপক।

অর্থাৎ আলোচ্য ছবির, অথবা নষ্টনীড় উপন্যাসের সমঝোতা, শিল্পীদের দ্বারা নিছক জনরঞ্জনের খাতিরে আরোপিত নয়। এ-সমঝোতা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ-সত্তার অঙ্গ, এবং আজো আমাদের নর-নারী সম্পর্কের মধ্যবিত্ত পরিস্থিতিতে এ-কম্প্রোমাইজ মজ্জায় মজ্জায় সুপ্ত। সুতরাং চারুলতার প্রেম ও সে-প্রেমের উপসংহারের বিধুর, প্রতীকী ভাবরূপ, সার্বজনীন সমর্থন পায়। কেননা উভয় অভিজ্ঞানই দর্শকের চেনাজানা এবং চেনাজানা কাঠামোতেই তা লয় পায়। প্রেমাস্পদের সঙ্গে চারুর পলায়ন অথবা স্বামী-ত্যাগে নয়।

অথচ আখ্যানভাগের অন্তর্নিহিত শিল্প-ন্যায়ে এবং বাস্তবতার যুক্তিতে উভয়ত, অনেক ক্ষেত্রে, কি প্রথাগত মূল্যবোধ অথবা অভ্যস্ত মননের আওতায়, শিল্পে সমঝোতা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যথা অপরাজিত, দেবী, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, গরম হাওয়া, পদাতিক প্রভৃতি ছিল্মে। এহেন ক্ষেত্রে সিনেমা সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে জনপ্রিয়তার প্রশ্ন-সমূহ সংকটে পড়ে। দেবী ছবিটির ব্যর্থতা তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। এই শিল্পসমৃদ্ধ, অনন্য শ্রীমণ্ডিত, সংস্কার বিরোধী ছবিটি সম্ভবত হিন্দু মধ্যবিত্তের অভ্যস্ত ধর্মাধর্মবোধ ও আচার-অনুষ্ঠানের চৌকাঠে হোঁচোট খেয়ে পড়ে। ফলে কলকাতা শহরে যদি-বা সে-ছবি একাংশে নন্দিত হয়, শহরতলী ও অন্যত্র তার সরাসরি বর্জন রোধ করা যায় নি। স্বভাবতই, গুরুবাদী মন কাপুরুষ ও মহাপুরুষ ছবিটিও মানতে অক্ষম হয়, সে-অক্ষমতা শুধু মহাপুরুষ অংশের ভণ্ডামী বিরোধী শ্লেষ ও বিদ্রূপেই নয় উপরন্তু কাপুরুষ অংশের সূক্ষ্ম মৃন্ময়, রূঢ়-সত্য উদ্ঘাটনেও।

সাথ্যুর গরম হাওয়া ছবিটিও সম্ভবত হিন্দু মধ্যবিত্তের এই প্রথাগত মানসিকতার প্রাকারেই বাধা পায়। এ-মানসিকতা হয়তো ধর্মাধর্মের অভ্যস্ত আবেগ পেরিয়ে, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত পার্থক্যের চিন্তার গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে, সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগের ট্র্যাজেডিকে মানবিক মর্মান্তিকতার পর্যায় অনুভবে অক্ষম হয়। উদ্দেশ্য সম্ভবত এক পশ্চিমা শহরের মুসলমান অঞ্চলে এবং পরিবারে সাম্প্রদায়িকতার আগুন কী নির্মম পরিণতি পেয়েছিল ছবিতে তা দর্শনে, হিন্দু মধ্যবিত্তের আড়ষ্টতা, এমনকি পক্ষপাত বোধ জাগে। এবং এই আড়ষ্টতায় তাঁরা উপলব্ধি করেন নি যে গরম হাওয়া চিত্রটির ট্র্যাজেডি ও আর্তি কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের নয়, অন্যপক্ষে এ-ছবির আশ্চর্য সংবেদী শিল্প-তাৎপর্য ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে নিছক মানবিক। আসলে সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশ আপামর মানুষের। এ-কথাই সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেন, গরম হাওয়া সংক্রান্ত তাঁদের সংক্ষিপ্ত পত্র দুটিতে জানাতে চান।

অবশ্য বলাই বাহুল্য যে সামাজিক পরিস্থিতি ও তৎসংশ্লিষ্ট মানবিক চৈতন্য স্থানু নয় নিয়ত পরিবর্তমান। তাই চলচ্চিত্র দর্শকেরও কম-বেশি রুচির মন্থর ও অসমান বিবর্তনের হালে সাক্ষ্য মিলছে। রুচি ও চিন্তার এ-মন্থর ও অসমান রূপান্তরের উৎসে সমাজ-প্রগতি এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এলোমেলো গতি। নইলে হয়তো ভালো সিনেমার বিজয় অভিযান আরো দ্রুত হত। তবু সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক সমস্যা-সংসক্ত সার্থক দুটি ছবি [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বী ও জন-অরণ্য, [illegible] মৃগয়া কিংবা শ্যাম বেনেগালের নিশান্ত, অঙ্কুর মন্থন

সত্যজিৎ রায়ের অপরাজিত।করুণা ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
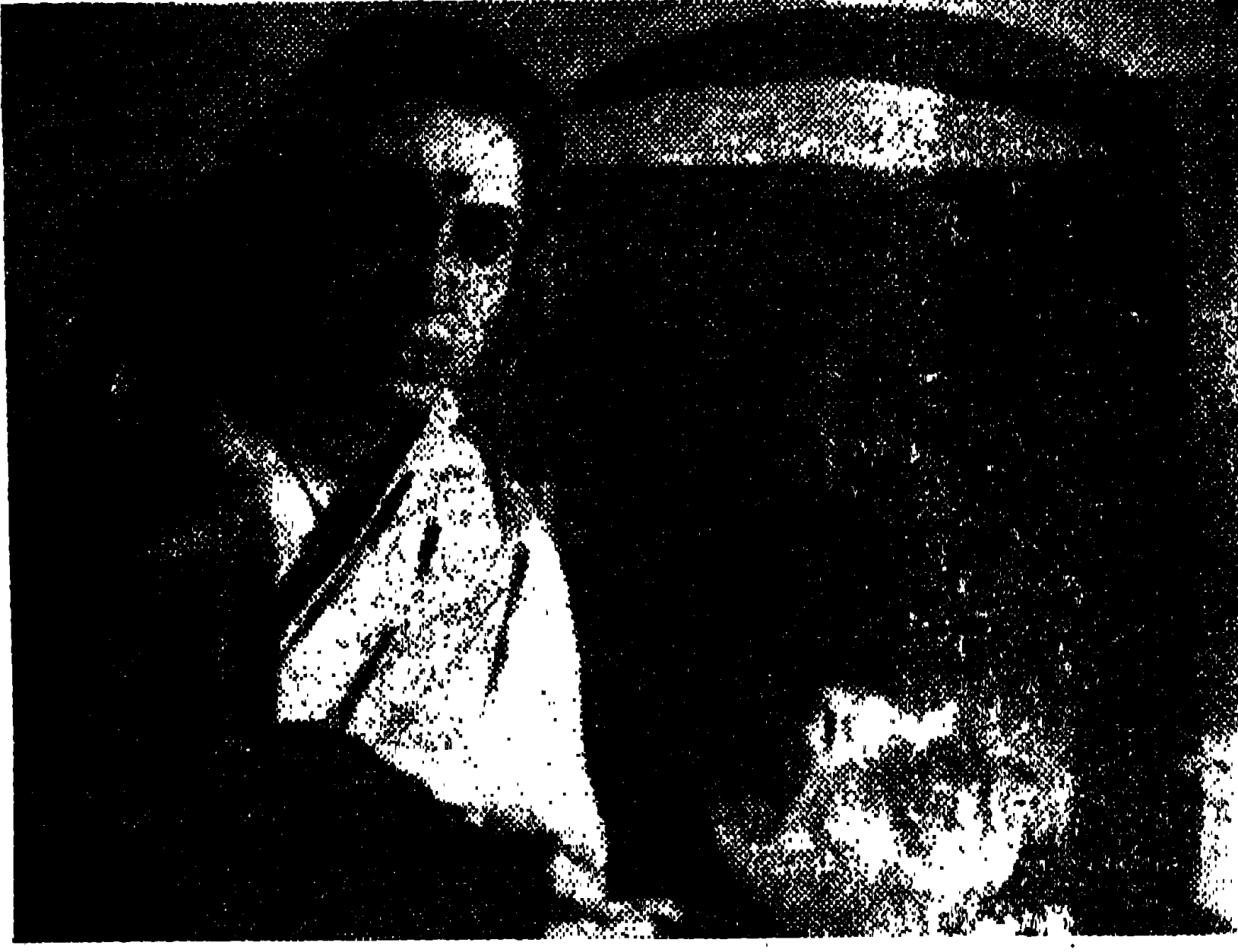
ইত্যাদি ফিল্মের আপেক্ষিক সাফল্য, অন্তত দর্শকদের একাংশের চৈতন্য-রুচি বিস্তারের ইংগিত দেয়।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও, একথা ভোলা সরলীকরণ হবে যে, রুচির এ-প্রগতি আজো অত্যন্ত কৃশ। ফলে গরম হাওয়া-র মতো বিস্ফোরক ছবি কিংবা মনন-নির্ভর পদাতিক, অথবা মধ্যবিত্ত জীবনের নাট্য-বর্জিত, অন্তত পরিচিত নাটকীয়তাহীন ও প্রধানত সংবেদ্য মূল্যবোধ-কেন্দ্রিক অনন্য ফিল্ম সীমাবদ্ধ, তাদের শিল্পগুণ সত্ত্বেও, ভরাডুবি থেকে নিস্তার পায় না। একই সত্যজিৎ রায়ের একালীন, শহুরে ছবি প্রতিদ্বন্দ্বী ও জনঅরণ্যের জনপ্রিয়তা এবং সীমাবদ্ধ বা কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো ছবির জনরঞ্জনে অসাফল্য গোড়ায় ঈষৎ বিমূঢ় করলেও, বিশ্লেষণে হয়তো হেতু নির্ণয় সম্ভব।

অন্তত আমার ধারণা ছবিগুলির জনরঞ্জনে বৈপরীত্যের গোড়ায় রয়েছে এগুলির আখ্যানভাগের মৌল বিভেদ। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং জনঅরণ্য ছবি দুটির আখ্যানভাগ মধ্যবিত্ত শহুরে জীবন ও মানসের পরিচিত পরিমণ্ডলে স্থিত, তার জল হাওয়া সর্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অঙ্গ না হোক, অন্তত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে থেকে সুদূর নয়। চাকরির অন্বেষণ, প্রেম, দারিদ্র্য-জনিত ছোটোখাটো নীচতা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জগৎ ও তার চুরি-চামারি, নকশালী আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব প্রভৃতি আজকের মধ্যবিত্ত জীবনের সহচর। অন্যপক্ষে সীমাবদ্ধ অথবা কাঞ্চনজঙ্ঘার জগৎ মধ্যবিত্ত মানসে দূরের ছায়াময় মায়াময় নীল দিগন্ত। দু'একটি শিক্ষিত উচ্চাভিলাষী ও করিৎকর্মা মধ্যবিত্ত ছেলে যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ডিরেকটরশিপ-এ, সীমাবদ্ধের নায়কের মতো, পৌঁছোয় না তা নয়। কিন্তু তাদের পৌঁছুনোটা ব্যতিক্রম, সেটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সার্বিক অভিজ্ঞান নয়। বরং যে-ছেলে একাকী এ-উচ্চশিখরে পৌঁছোয়, সে তার পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে নিজস্ব সম্প্রদায়ের শিকড়, এমনকি মা-বাপ থেকেও, ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এবং এই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার প্রক্রিয়ারই এক সংবেদ্য, মরমী, স্পর্শকাতর ছবি সীমাবদ্ধ, যার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম স্পন্দনের মধ্যে নিহিত মূলত মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব। এবং এ-দ্বন্দ্বের প্রকাশ খরবেগ নাটকে নেই, আছে প্রায় অনুক্ত বোধাবোধের পরিমণ্ডলে। অথচ এ-পরিমণ্ডল মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতার সাধারণ, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে আলোছায়ায় দূরে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ক্ষেত্রেও, অন্য আধার পরিপ্রেক্ষিতে, একই কথা প্রযোজ্য।

অগত্যা মানতেই হয় যে পরিস্থিতিটা অত্যন্ত জটিল, অন্তত সার্থক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পক্ষে। শুধু এটুকু হয়তো বোঝা যায় মূলত মনন-নির্ভর কিংবা মূল্যবোধগত ছবি, অর্থাৎ যেগুলির নাট্যরস ও মানবিকতাই মনন ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে উৎসারিত, সে-ধরনের ফিল্মের সাধারণ্যে আজো স্বীকৃতি শক্ত। অন্যপক্ষে, বৃহৎ কিংবা অন্তত মধ্যবিত্ত জীবনের অভিজ্ঞতা-সংলগ্ন আখ্যানভাগের শিল্পরূপ, সিনেমায় উদ্ভাস, ক্রমে বৃহত্তর দর্শকের মন টানছে।

বলাই বাহুল্য, প্রাবন্ধিক বিশ্লেষণে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যতটা সহজ, শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আদৌ তা নয়। কেননা, শিল্পমাধ্যমে এবং সিনেমাতে তো বটেই, এহেন সূক্ষ্ম, প্রায় অধরা ভেদাভেদ নিয়ত টানা প্রায় অসম্ভব, অন্ততপক্ষে সৃষ্টি-কালীন তন্ময় অবস্থায়। কারণ, আখ্যান-ভাগের নাট্যবস্তু মূলত মনন কিংবা মূল্য-বোধ সংলগ্ন হবে, না বৃহত্তর অভিজ্ঞতার অঙ্গ তা ভাবার ঝোঁক স্রষ্টাকে সাধারণত এড়ায়। তাঁকে প্রধানত পেয়ে বসে কোনো-না-কোনো সত্য প্রকাশের তাগিদ, এবং সে-প্রকাশের সুষমা ও রূপাভাস। তাই সেক্ষেত্রে শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াতে স্বতই বৃহত্তর অভিজ্ঞান প্রকাশ পায়, সংখ্যালঘুর ঐশ্বর্য-ময় দিব্যদৃষ্টি কেবল নয়, সেক্ষেত্রে সিনেমা পরিচালকের পরিত্রাণ, নচেৎ বিপদ। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমেও এর ব্যতিক্রম নেই, কিন্তু সিনেমা যেহেতু প্রধানত জন-মাধ্যম এবং সৃষ্টিকালেই ব্যয়বহুল, তাই ফিল্ম-নির্মাতারা অহরহ জনরুচির সম্মুখীন ও সে-বিষয়ে ভাবিত।

মৃণাল সেনের ভুবনসোম।সুহাসিনী মুলে

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

। সাত ।

সকাল থেকেই সুরেনের মেজাজ বিগড়ে গেছে। সকালেই সে মেজ মেয়েটাকে সেই খারাপ লোকটার ঘরে যেতে দিল। লোকটা লম্বা ঢ্যাংগা। চুপচাপ জানালায় বসে থাকে। বিড়ি খায়। রেলে কাজ করে। মেসবাড়ির একটা আলগা ঘরে থাকে। জানালার একটা পাট বন্ধ থাকলে ভেতরে লোকটা কি করছে বোঝা যায় না। বাতাসী চা পাঁউরুটি এনে দেয় রাস্তা থেকে। কখনও বাতাসা মুড়ি। বিড়ি পান যখন যা দরকার বাতাসীকে দিয়ে আনায়। সঙ্গে দশ-পাঁচটা পয়সা বেশি দেয়। একবার আলতার শিশি পাউডার কিনে দিয়েছিল। তা ছাড়া দরকারে-অদরকারে সুরেনকে পাঁচ-সাত টাকা ধার দেয়। ধার দিলে আবার ভুলেও যায়। কিন্তু এবারে কিছুতেই ভুলছে না। সকালবেলায় ডেকে বলল, অ সরেন, টাকা কটা দেবে নাকি!

কদিন বাতাসীকে যেতে দেওয়া হয় নি। কুম্ভবাবুর বাসায় সকালেই চলে যায়। বাসি রুটি দুখানা খেতে দেয় কুম্ভদার বৌ। দুপুরে ডাল-ভাতও দেয়। রাতে কুম্ভবাবু ফিরে না এলে ছুটি হয় না বাতাসীর। কুম্ভবাবুকে খুশি রাখার জন্য সে বাতাসীকে ছেড়ে দিয়েছে। বাতাসী কোন দিক সামলাবে। টাকাটা চাইতেই সে বাতাসীকে বলল, যা হাসু বাবুর ঘরে যা। ঝাট-ফাট দিয়ে আয়। খুব চটে গেছে। তারপরই মনে হয়েছিল মেয়েটা যেন খুব খুশি বাপের কথা শুনে। বলল, যাচ্ছি। এবং চুলে কাঁকুই দিয়ে বেশ সেজে-গুজে যেতেই মেজাজটা বিগড়ে গেল। তোর বাপের বয়সী মানুষ, তার কাছে এত সাজ-গোজের কি থাকে। কিন্তু টাকাটা বড়ই দায় তার। গেলে যদি টাকাটার কথা হাসুবাবু ভুলে যায়। তারপরই মনের মধ্যে কুট কামড়। মেয়েটা তার ভাল করে বড়ই হয় নি—অথচ খুব পেকে গেছে। মাঝে মাঝে এমনভাবে পুরুষ মানুষ দেখলে ফিক ফিক করে হাসে যে তার বুকে হিম ধরে যায়। তখন কাশিটা বাড়ে। সে চুপি চুপি যাবে পরে, বাতাসীর ঘর ঝাঁট দিতে অত সময় লাগার কথা না। কি করে! মনের মধ্যে তার প্রবৃত্তি ছোট হয়ে যায়। টুক টুক করে জানালায় হেঁটে এসে বলে, অ হামুবাবু, বাতাসীর হল!

হামুবাবু জানালার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, সুরেন নাকি!

হামুবাবু নিচের দিকে হাত টেনে কি সামলায়। ঘরে বাতাসী আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। হামুবাবু শুয়ে আছে। হামুবাবু পোষাক-আসাকে বড়ই ঢিলেঢালা। যতক্ষণ ঘরে থাকবে, শুধু একটা আণ্ডার-ওয়েয়ার পরণে। মাকুন্দ মানুষ, গায়ে একটা লোম নেই, চুল ছোট করে কাটা—মাথা নাকি এতে হাল্কা থাকে। একটা জানালা, একটা দরজা। মেসবাড়ির ভেতরে না ঢুকলে দরজাটা দেখা যায় না। বাতাসী কি করছে! সুরেন বলল, বাতাসী হয়েছে তোর!

বাতাসী ভেতর থেকেই বলল, এই হল যাই। হামুকাকার কাপ-ডিস ধুয়ে যাচ্ছি।

—সকাল সকাল চলে যাস মা। কুম্ভ-বাবু বের হয়ে যাবে।

বাতাসী ফ্রক গায়ে দেয়। ফ্রক গায়ে দিলে বড়সড় লাগে না। আর যে বয়সে যতটা শরীরে বড় হওয়া দরকার ছিল, যেন তা বাতাসীর ঠিকঠাক বড় হয় নি। অকালে সব অপুষ্টির জন্য। কিন্তু মানুষের সব জায়গায় অপুষ্টি বুঝি এক রকম থাকে না। সুরেন ভাবল, এটা-ওটা বলে দাঁড়িয়ে থাকা যাক—তাহলে এই যে গায়ে-ফায়ে হাত দেওয়া সেটা হামুবাবু পারবে না। তবে সে আর কতক্ষণ—আর একটু বাদেই অফিস, তখন হায়নাপোনাগুলি বেড়াল ছানার মত ম্যাও ম্যাও করে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কিছু গন্ধটন্দ পেলেই দাঁড়িয়ে যায়। তবে ঐ একটা সুবিধে। বয়স বাড়লে তার মেয়েরা আদর পায়। সুখীর বেলাতেও দেখেছে। শরীরে মাংস লাগতেই রাধিকাবাবু বললেন, বিয়ে দিয়ে দে। ভাল ছেলে। জমি-জমা আছে। ইস্টিশনে ভাজাভুজির দোকান আছে। থাকবে ভাল, খাবে ভাল। প্রায় বলতে গেলে ওরা তুলে নিয়েই গিয়েছিল। বাতাসীও আ[illegible]গল আদর পেতে শুরু করেছে।

সুরেন বলল, সিগারেট আছে নাকি হামুবাবু?

—আমি ত আজকাল গাঁজা খাচ্ছি সুরেন।

সুরেন কেমন ভীত গলায় বলল, অত কড়া সহ্য হবে না। গাঁজা খায় লোকটা সে শুনেছে। ইদানীং অফিসেও যায় না। এই ঘরটায় বসে বসে কেবল আইনের বই পড়ে। হামুবাবুর ধারণা, তার বিরুদ্ধে সবাই ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্র আটকাবার জন্য সে এখন আইনের বই ঘাঁটাঘাঁটি করছে। মাঝে দেখেছে, কপালে লম্বা সিঁদুরের ফোঁটা টেনে কোথায় একবার বের হয়ে গেল। ফিরে এসে বলল, তীর্থে গেছিলাম। বাতাসীকে দিয়ে কাশী বিশ্ব-নাথের প্রসাদও পাঠিয়েছিল।

সুরেনের কাছে হামুবাবুর সবটাই ভাল, ঐ হাত-ফাত দেয় এমন একটা ধান্দা দেখা দিতেই মনটা বিগড়ে গেছে। আগে সে এটা বুঝতে পারত না। তার মেয়েদের আদর করে ডাকত ঘরে, বাতাসী টেবি সবাইকে। লজেন্স দিত খেতে। চা বানিয়ে নিজে খেত, মেয়ে তিনটেকে দিত। মুড়ি বাদাম ভাজা মেখে ভাগ ভাগ করে দিত। তিনটে মেয়েই হামুবাবুর ন্যাওটা। রথের মেলায় গেলে দশটা করে পয়সা। এত কে করে! কিন্তু বাতাসী না গেলে রাগ করে। পয়সা ফেরত চায়। এটা সুরেনের মনে ধন্দ ঢুকিয়ে দিয়েছে। কুট কামড়। সে ডাকল, হল বাতাসী।

—তুমি যাও না সুরেন, হলেই চলে যাবে।

—বাবু আমরা হলেম গে কপাল পোড়া মানুষ। তা ঘরে আপনার থাকলে, হাতের কাজ এগিয়ে দিলে কার কি আসে-যায়। কিন্তু কুম্ভবাবু অফিসে যাবে ত!

—তা বাতাসী কেন?

—উ কুম্ভবাবু আর ভরসা পায় না।

হামুবাবু সব জানে। নতুন বাড়ির ওদিকের জানালাটা খুলে গেলেই সব বোঝে। সে বলল, পাহারা দিয়ে কিছু হয় না সুরেন। এ হল গে ঘুসঘুসে আগুন। কেবল পোড়ে। আর পোড়ে।

ভাল আছেন বাবু, বিয়ে-থা করলেন না। মুক্ত। কি খাব, কি খাওয়াব ভাবতে হয় না। ওরে বাতাসী হল?

হামুবাবু বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। পা দুটো কাঠি কাঠি—রগফগ সব ভেসে উঠেছে। [illegible] শরীর। মাংস না থাকলেও ছিবড়েটা [illegible] শরীরে। চোখ লাল করে বসে থাকে। গাঁজা খেলে চোখ সাদা থাকবে কি করে। তুরিয় ভাব সব সময়। কাজ-কাজ করে যা পায়, তাও নেশা-[illegible] ওড়ায়। খাবা-দার কম। মেসে দুবেলা খায় ঐ নামে। আর কেবল, মানুষের বসে বসে আদ্যশ্রাদ্ধ করে। কোথায় মিছিল হচ্ছে, কোথায় প্লাবন হচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজে পড়ে। এতে তার খুব আনন্দ। কাগজটা মেলাই আছে। অপঘাতে মৃত্যু, বালিকা হরণ, বাসের চাকায় চ্যাপ্টে গেছে, বৌ পলাতক, এ-সব খবর পড়ে লোকটা মজা পায়।

সুরেন ভাবল, আজ কি মজার খবর আছে জেনে নেয়। এতে তারও মজা আছে। এই একটা জায়গায় হামুবাবুর সঙ্গে তার খুব মিল। সে বলল, কাগজে আর কি খবর হামুবাবু।

—খবর তো অনেক। তোমার রাজার মাথা ঠিক আছে ত!

সুরেন বুঝতে পারল না, এ-কথা কেন সে বলল, রাজার কি অভাব আছে হামুবাবু, মাথা ঠিক থাকবে না।

—তুমি একখানা মানুষ বটে সুরেন। কাকের মত স্বভাব।

এই সক্কালে কাকের সঙ্গে তুলনা করায় সে খুব আহত হল। কাক হল নিম্নস্তরের প্রাণী। সে হল নবীনগরের গাঙ্গুলী বংশের মানুষ। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে এত ফের। তাই এই লোকটা তাকে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করছে। সে মুখ ব্যাজার করে বলল, কাক কেন বাবু, কোকিলের কথা বলুন।

—কোকিল কি আন্ধা আছে। তুমি একটা আন্ধার মত কথা বলছ। যেন কিছু জান না। খবর পাও নি।

সুরেন খুব মহামুস্কিলে পড়ে গেছে।

—কি খবর! এ-বাড়িতে ত সকাল হলেই খবর লেগে থাকে। এই সেদিন, বৌরাণী নতুন ম্যানেজারকে অন্দরে ডেকে পাঠিয়েছিল বলে একটা খবর হয়ে গেল। ঘরে ঘরে এক কথা। এ-বাড়ির সব ভাঙছে। কেবল ভাঙচুর হচছে। এটাতেও সে মজা পায়।

তখনই হামুবাবু বলল, তোমার রাজার ফুটানি এবারে যাবে। বুঝেছ। বস্তি সব সরকার নিয়ে নেবে বলেছে। বিল আসছে

কে বলল, তাই হয় যেন বাবু। সব যাক। ফিস ফিস করে বলল, আমাদের রতনবাবু, চিনেন না, রাধিকাবাবুর শ্যালক, নলগায়ের এজেন্ট ছিল, রাজা ওটাকে তাড়িয়েছে। লাখ টাকা নাকি মেরে দিয়ে সরে পড়েছে।

—রাজা কেস করছে না কেন!

—কেস! কি যে বলেন! রন্ধ্রে রন্ধ্রে পোকা। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে—রাজা মামলা একেবারে পছন্দ করে না। কত খাবি, নে লাখ টাকা নিয়ে সুখে থাক।

—তাড়িয়ে দিল কেন! ওতো জেনে-শুনেই চোর পোষে। দু-পয়সা তোমার রাজারও হয়, তারও হয়। সাদা টাকা আর কে চায় এখন।

সুরেন বলল, তালে সিগারেট না থাকলে একটা বিড়ি দেন, ও বাতাসী তোর হল! আমার হয়েছে জ্বালা। বাবু আপনাকে কত বললাম, নবরে একটা কিছু করে দিন, মাথা ঠিক রাখতে পারছেনা। কাল সারারাত ফেরেনি। কি দুর্ভাবনা কন। সকালে হাজির। বললাম, কোথায় গেছিলি! তোর জননী সারারাত না ঘুমিয়ে থেকেছে।

—কোথায় গেছলি!

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি গুণছিল নাকি!

—কে দিল এ-কাজ!

—নিজেই ঠিক করে নিয়েছে। পয়সা হাতে না থাকলে কি করবে! বলল, কাজটা খুবই ভাল। এতে কারো চোখ টাটায় না।

হামুবাবু বুঝতে পারল, বেকার থাকলে মাথায় গন্ডগোল দেখা দিতেই পারে।

—তুমি বললে না, গাড়ি গুণে কি হবে?

—আমার কথা শোনে!

—গাড়ি যখন গুণছে তখন ধূপকাঠি বিক্রি করছে না কেন?

—সেটা বুঝিয়ে বলুন না আপনারা! তারপরই মনে হল, গাড়ির সঙ্গে ধূপকাঠির সম্পর্ক কি থাকতে পারে? সে বলল, এ-কথা কেন বাবু?

—আজকাল দেখতে পাচছনা, কত ধূপকাঠি হচছে। সবাই ঘরে এখন ধূপ-কাঠি পোড়ায়। তোমাদের নতুন ম্যানেজারের নাকি গোছা গোছা ধূপকাঠি লাগে। ভাল খদ্দের। তারে পাকড়াও না।

—তারে ত কুম্ভবাবুরে ধরে সিট মেটালে ঢোকানো যায় কিনা দেখছি। কুম্ভবাবু নাকি হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে মানুষটাকে। কাজ একদম বোঝে না। কুম্ভবাবু পাশে না থাকলে চোখে আনধার দেখে।

—নবরে পাঠিয়ে দাও না নতুন ম্যানেজারের কাছে। কুম্ভ তোমাকে ঘোরাবে।

—পাঠাব কি বাবু, পেনসিল নিয়ে বসে এখন অঙ্ক কষছে।

—আবার পরীক্ষা দিচছে নাকি!

—পরীক্ষা না বাবু। সকালে এসেই স্নানটান সেরে মাদুর বিছিয়ে বসে পড়েছে। কেবল গুণ অঙ্ক।

—এত গুণ দিয়ে কি হবে।

—কি নাকি হিসাব করে দেখছে। দেশের অপচয় কতটা দেখছে। এই অপচয় বন্ধ করলে, কতজন বেকার কাজ পেতে পারে তার একটা সরল অঙ্ক মাথায় এসে গেছে তার। কিছুতেই মাদুর থেকে ওঠানো গেল না।

—নবর মাথা পরিস্কার ছিল। তুমি পড়ালে না সুরেন! আমার ঘরে এসে কাগজ পড়ে যায়। সব রকমের প্রশ্ন করে। আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি না। হাসুবাবুর মধ্যে এখন একটা ভালমানুষ দেখা দেওয়ায় খুব গম্ভীর গলায় কথা বলছে।

—খুব মনে রাখতে পারে। কিছু বললেই, মালটালের উল্লেখ করে বলবে, সব বেটা ফেরববাজ। ঘুষখোর। ধান্দাবাজ। সেতো কাউকে মানে না বাবু। ঈশ্বর পর্যন্ত ওর কাছে একটা হারামী। বলেন, এ-ছেলের কি গতি হবে।

হাসুবাবু এবার কি ভেবে বলল, এই বাতাসী যা। আজ আর আসতে হবে না। কাল সকালে কুম্ভবাবুর বাড়ি যাবার আগে একবার আসিস। আর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসী বের হয়ে গেল। সুরেনের ইজ্জতে বড় লাগল। বাপের কথায় গ্রাহ্য নেই। বাপ নয়, কাকা নয়, মামাও নয় লোকটা, তার কথা কেবল শোনে। সুরেনের আবার কাসি উঠল। কফ উঠল। সে জানালার পাশেই কফটা ফেলে রাখল। তার পোকা দেয়াল বেয়ে উঠলো। জখম করুক লোকটাকে। এমুহূর্তে সেও নেশাখোরের মত বলল, মানুষ জাতটাই হারামী। জাতটার সর্ব অঙ্গে ঘা হোক পোকা হোক। বসে বসে দেখি। এবং এইসব বলতে বলতে সুরেনের মাথা গরম হয়ে গেল। সব তার হাতের নাগালের বাইরে। বড় ছেলে তাও বকে যাচছে। সর্ব কনিষ্ঠটিও তার পুত্র সন্তান। হামাগুড়ি দেয়। উঠে দাঁড়ায়। হাতে তালি বাজায়। পা পা করে হাঁটে। সামনে এক মানুষ সমান গর্ত। সারা বাড়ির মলমূত্র সেখান দিয়ে বয়ে যায়। ধর্মপত্নীকে বার বার সাবধান করে দিয়েছে, ডুববে। সব ডুববে। ধর্মপত্নীর এক কথা, কপালে থাকলে হবে! বিধাতার ওপর বড়ই বিশ্বাস। পাঁচ পাঁচটা নর্দমা পার হয়ে গেল, এই একটার বেলায় তেনার যত আদিখ্যেতা। কেউ তাকে মর্যাদা দেয় না। বাতাসী না, টেবি না, সুখী না। বড়টা তো এখন অঙ্ক নিয়ে বসেছে। কোথা থেকে বগল দাবা করে এনেছে কাটা কাগজ। তাতে একটা রোঁয়া ওঠা পেনসিল দিয়ে লম্বা অঙ্ক করছে। কার মাথা ঠিক থাকে। এখন গিয়ে মনে হল লাথি কষায়, হারাম-জাদা ইতর, কাজের কাজ না করে অঙ্ক করা। অঙ্ক করবে বাবুরা। তেনাদের হিসাব রাখতে হয়। তোর আছেটা কি হিসাব রাখবি। নর্দমা পার হয়েই হাঁক পাড়ল, বাবা নব, অঙ্ক তোমার হল?

—না বাবা। এই আর একটু, তবেই হিসাব মিলে যাবে।

—বাবা নব, তুমি আর অঙ্ক কর না। হাসুবাবু বলল, ধূপকাঠি বিক্রি করতে। পুঁজি কম লাগে। নতুন ম্যানেজার বড় খদ্দের। সময় থাকতে পাকড়ে ফেল।

নবর বড় বড় চুলে কপাল ঢাকা। সে নুয়ে অংক কষছে। শিরদাঁড়াটা দাড়াস সাপের মত মোটা হয়ে নেমে গেছে কোমরে। তার দু-পাশে পাঁজরা, অংকের হিসাবে মেলে না। যতবার গুনেছে এক দিকে পাঁচ, অপর দিকে এগারটা। ডাক্তারবাবু তার পাঁজরার হিসাব দিয়েছিল, বাইশটা। তার নিচে দুটো হলদে থলে, পাঁঠার ফুসফুসের মত, সেখানে নাকি বিজ বিজ পোকা বাসা বানিয়েছে। সে ভাল হয়ে যাওয়া মানেই সেখানে বড় রকমের একটা হত্যাযজ্ঞ।

সে আবার বলল, বাবা নব, তোমার অঙ্কের বিষয়টা জানতে পারি? হাসুবাবু বললেন, বিষয়টা জেনে নাও।

—হাসুবাবুকে বলবে, ওকে ধরে আমি ঠাঙাবো অঙ্ক করছি, এখন ডিসটার্ব করবে না।

—তুমি বারান্দা থেকে নেমে অংকটা কর। আমার স্নানের সময় হয়েছে। দুটো মুখে দেব বাবা।

নব খুব দার্শনিকের মত উবু হয়েই বসল, খাওয়াটা বড় কথা নয়। খেলে পেট ভরে, এটুকু হলেই তোমার বাসনা উবে যায়। কিন্তু তারপরেও থাকে। তার খবর রাখ না।

—অত খবরে কাজ নেই বাবা নব। আমি অবগাহনে যাচ্ছি। তুমি নতুন ম্যানেজারকে গিয়ে বলে এস, এবার থেকে যত ধূপকাঠি লাগবে আমি দেব। পয়লা এই দিয়ে শুরু করে দাও। আলামোহন জীবন এ-ভাবেই শুরু করেছিল, জান?

নব জানে, এগুলো সবই বাবার ধর্ম-কথা। সেই কবে থেকে নজির টেনে আসছে। বাপের বিদ্যে ক্লাশ এইট পর্যন্ত। ঐ বিদ্যেয় যা খবর সংগ্রহ করেছিল, সেটাই এখন জীবনে মূলধন হয়ে আছে। এই নিয়ে একশ আটাশবার বাবা আলামোহন দাসের নজির টানলেন। সে অংকটা করছে বলে মাথা গরম করতে পারছে না। তা না হলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেত। এটাও এ-বাড়ির সকাল বিকেলের ধর্মযুদ্ধ। সে তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, অংকের হিসেবটা শোন, তাহলেই মাথায় খাওয়া উঠে যাবে। ভি আই পিতে চব্বিশ ঘন্টায় গাড়ির সংখ্যা তোমার সতের হাজার চারশ আটাশ। এই সংখ্যাকে তুমি গুন দাও তিনশ পয়ষট্টি দিয়ে। তোমার মনে আছে ত, এই কটা দিনে পৃথিবীতে বছর হয়। তারপর গুন কর গড়ে চার লিটার তেল। তারপর গুন কর।

—কি দিয়ে গুণ করব বাবা?

—দাম। তেলের দাম। কত টাকা হয় জান। তোমার মাথায় আসবে না। বাবুদের বাবুগিরিতে একটা পঞ্চাশ হাজার একর জমির চাষ বছরে ভি আই পিতে উবে যায়। এই দেশে কত এমন ভি আই পি আছে। কত পঞ্চাশ হাজার একর চাষ হতে পারে, কত পঞ্চাশ লক্ষ বেকার চাকরি পেতে পারে ভেবে দেখ।

সুরেন ভাবল, ছাওয়ালের মাথাটি গেছে। রেগে গেলে মাতৃভাষা তার লব্জে আসে। সে বলল, বাইর হ শুয়োর। বাইরাইয়া যা। সে কি খুঁজতে থাকল। বোধ হয় লাঠিঠাটি সে আত্মরক্ষার্থে লাঠি টেনে বের করতে গেল।

বাপের এই রাগকে গ্রাহ্য করে না। লাঠি টেনে এনে তুলতেই খপ করে ধরে ফেলল। পাশের খুপরি থেকে কখন বের হয়ে আসছে ছুতোর হরিচরণ, তার বৌ, ছোট মেয়েটা, তার পাশ থেকে ছুটে এসেছে রাজমিস্ত্রি অধীর। বিপত্নীক বলে একা। সঙ্গে পুটি, ডবকা ছুঁড়িটা। নবর সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসা করে। কোলাহল শুনে বাবুর্চিপাড়ার লোকজনও ছুটে এল। এরা সব একই লাইনবন্দী লোক। দুঃখে-কষ্টে একই গোত্রের মানুষ। সুরেনের আজ আবার কি নিয়ে মাথা গরম হয়েছে। ওরা এসে দেখল, নব বাপের লাঠি কেড়ে নিয়ে তার ওপর বসে আছে। আর মুখের ওপর লম্বা আঠা দিয়ে জোড়া একটা তালিকা। সে সেটা খুব নিবিষ্ট মনে দেখছে। মুখ নিশ্চিন্তে আড়াল করে হিসাবটা ফের মিলিয়ে দেখছে।

সবাইকে লক্ষ্য করে সুরেন বলল, বলেন, কার মাথা ঠিক থাকে। তুই আমার জ্যাষ্ঠ পুত্র, তুই আমার শ্রাদ্ধের অধিকারী আর তুই তোর পিতৃদেবকে কলা দেখাস। দিনরাত টো টো করে ঘুরে বেড়াস।

রাজমিস্ত্রি অধীর বলল, দিনকাল খুবই খারাপ। আমাদের সময় যা হক করে কেটে গেল। বড় খারাপ দিন আসছে। লোক সব না খেয়ে মরে যাবে। কলিতে মানুষের হেনস্থা কত। আগে থেকে হিসেব করে না চললে তারপর ডডনং। রাস্তায় ঐ পাগলটার মতো হাঁকতে হবে—কি যেন হাঁকে, ও হরিচরণ, কি যেন সাধুবাক্য কয়।

—ও মনে থাকে না। কাল দেখি লাঠির মাথায় একটা কাগের পালক বেঁধে মাঝ রাস্তায় উর্ধনেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।

তখনই কেমন হুঁস ফিরে এল সুরেনের, তার জ্যাষ্ঠপুত্র পাগল হয়ে যাচ্ছে না ত। পাগলের উপদ্রব খুবই বাড়ছে। দোতালা বাড়িটায় থাকে পাগলা বাবু, নতুন ম্যানেজারের মাথায়ও কি নাকি আছে। সারা রাত ঘরে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নাকি বসে-ছিল। আর পাগলা বাবুর ত কথাই নেই। নতুন বাবু আসার পরই কেমন বিবেচক মানুষ হয়ে গেল। বিকেলে এখন মাঠে বেড়াবার অনুমতি পর্যন্ত পেয়ে গেছে। সে বলল, বাবাসব মাথা ঠাণ্ডা কর। মাথার মধ্যে গোঁজা দিস না। ওতে বিপত্তি বাড়ে। তোর চাকরির ভাবনা কি। কুম্ভবাবু বলেছে, সিট স্টোলে তোর একটা কিছু হয়ে যাবে বাবা। ছেলের মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য সাহস দিল। যেন সবই ঠিক হয়ে গেছে।

হরিচরণ বলল, তুমি যাও সুরেনদা। এখানে থাকলে তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। অগত্যা সুরেন অবগাহন করবে বলে বের হয়ে গেল। সামনেই দুটো বড় বড় পুকুর। এ-ছাড়া আছে অন্দরের পুকুর। অন্দরের পুকুরের চারপাশে উঁচু দেয়াল। তার ওপর কাঁটাতারের বেড়া। ও-পাশে মাঠ। মাঠের পর গোয়াল বাড়ি—তারপর জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল। অন্দরে নতুন বৌরাণী সকালে সাঁতার কাটেন। গায়ে-পায়ে প্রায় নাকি উলঙ্গই থাকেন তখন। একমাত্র খাস বেয়ারা শংখ থাকতে পারে কাছে। তার হাতে তোয়ালে, গন্ধ সাবান এবং কতরকমের সুগন্ধী তেল। কুমার বাহাদুর বেতের চেয়ারে পাশের লনে বসে থাকেন। নভেল পড়েন। চুরুট খান। বৌরাণী এসেই একটা নিজস্ব ফুলের বাগান করেছে। সেখানে দুজনে জ্যোৎস্না-রাতে ঘুরে বেড়ান। কত সব পাথরের মূর্তি সেখানে। স্নানে গেলেই মনে হয় পাঁচিল বেয়ে একবার ঐ ভিতরটা দেখে। কি ফুল, কি গাছ, কি দেবদেবীর মূর্তি আছে ওখানে দেখার একটা খুসখুসে ইচ্ছা পুকুরের পাড়ে এলেই সুরেনকে কেন জানি পেয়ে বসে। কে এই খোলা পুকুরে সাঁতার কাটছে, তাকে দেখার কেউ নেই। সেও একসময় মেঘনা নদী পার হয়ে যেত। সেও একবার আসমানদি চরে সাঁতার দিয়ে রূপার মেডেল পেয়েছিল। ধর্মপত্নি তার সাক্ষী। আর তখনই টেবি মুখী আরও কেউ কেউ ছুটে আসছে। হাউ হাউ করে চিৎকার করছে। আর্ত চিৎকার—বাবা তাড়াতাড়ি উঠে এস। দাদা কি করছে। কেমন করছে। সবাই জোরজার করে ধরে রেখেছে। বাবা! বাবা!

মাথার সব উবে গেল সুরেনের। সে এসে দেখল অধীরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে সব। হরিচরণ হাত-পা বাঁধছে। সে বলল, কী হল। কি হল নব বাবা। তোমরা ওকে ছেড়ে দাও। আমি দেখছি।

আরও সব লোকজন ছুটে এসেছে। প্রায় রাজবাড়ি ভেঙে। নব মাথা ঠুকছিল দেয়ালে। আমাদের ইজ্জত সব কেড়ে নিচ্ছে কেন। কেন, কেন? কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। তারপরই সে কেমন হাত ছুড়ে বলল, খুন হবে, খুন। একটা খুন হবে। বলতে বলতে সে ছুটে রাজবাড়ির দেউড়ি পার হয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতীশ চেঁচামেচি শুনে বারান্দায় বের হয়ে এল। দেখল কিছু লোক দেউড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। সে দেখল কুম্ভবাবুর ভাইরা, দাসুবাবু তার ছেলেমেয়ে, ওদিক থেকে আসছে। সে বলল, কি হয়েছে নিমু?

—সুরেনের ছেলেটা বোধ হয় আত্ম-হত্যা করতে গেল।

—কোথায় গেল?

—রাস্তায়। গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরবে বলছে।

—কি হয়েছিল?

—চাকরি পাচ্ছে না। কাল নাকি সারা-দিন ভি আই পিতে দাঁড়িয়ে গাড়ি গুণেছে।

এইসব অশুভ খবর অতীশকে খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে দেয়। সে বুঝতে পারে না, সুরেন এতদিন এই বাড়িতে কালাতিপাত করেও কেন ছেলের একটা কাজ সংগ্রহ করতে পারে না। সে দেখল তখন সুরেনও ফিরে আসছে। অতীশ ওপর থেকেই বলল, পেলে?

—না। সুরেন মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিল। মানুষের সন্তান কত প্রিয়—এই মানুষটারও তাই। চোখ মুখ শুকনো, বিপর্যস্ত এক মানুষ সুরেন। সে যদি এখন ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় তবু যেন তার সাতখুন মাপ। সে বলল, তুমি একবার দেখা কর সুরেন।

সে বলল, এখন ত হবে না বাবু। অফিসের টাইম হয়ে গেছে। পরে যাব।

আসলে মনুষ সেই কবে থেকে ক্রীতদাস পালন করে আসছে। তার থেকে মানুষ এখনও মুক্তি পায়নি। সুরেন এখন ক্রীত-দাসের ভূমিকা পালন করছে। তার নিজের মরার সময়টুকু নেই। ঠিকমতো হাজিরা না দিলে—কোনদিন একটা নোটিশ ধরিয়ে দেবে। তার লায়েক ছেলেটা কোথায় কি করছে এই মুহূর্তে তা নিয়ে ভাববারও সময় নেই। সবারই সন্তান সন্ততি থাকে। তার নিজেরও আছে। সে কেমন নির্মম হয়ে গেল। সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকল। তরপর সুরেনকে ডেকে বলল, কোন দিকে গেছে বলতে পার।

সুরেন হতাশ গলায় বলল, মনু খান-পাড়া যেন দিয়ে কোথায় চলে গেল।

অতীশের এই এক বিড়ম্বনা—কোথায় গেল, বাপের কোন তাড়া নেই। সে কুম্ভবাবুর বাড়ির পাশে আসতেই দেখল, একটা জটলা। অতীশকে দেখে কেউ কেউ চুপ করে গেল। কুম্ভবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। অতীশকে দেখেই বলল, আসুন দাদা, ঘরে আসুন।

—সুরেনের ছেলেটা নাকি চলে গেছে।

—আবার আসবে।

—বাসটাসের তলায় পড়ে নাকি মরবে বলছে।

—কতবার মরে এরা। সে-নিয়ে আপনার মাথা খারাপ করে কি হবে দাদা। আমরা কি করতে পারি। সরকারই কিছু করছে না। রাজাকে বললেও বলবে, দেয়ার ইজ গভমেণ্ট, গো টু হিম। আমরা তো শোষণ করছি, আমাদের কাছে আর আশা কেন।

অতীশ এ-মুহূর্তে এই ছেলেটার জন্য আর কার কাছে যাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

সকালে উঠেই অতীশের কিছু লেখা-লিখি থাকে। লেখা নিয়ে নিবিষ্ট থাকতে হয়। আজ সকালে উঠে একটা লাইন লেখা হয়নি। বাড়ির জন্য মনটা কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। নির্মলা লিখেছে, টুটুলের জ্বর। বাবা নেই বলে মিণ্টুর মন খারাপ। সে স্ত্রী পুত্র ছেড়ে কোথাও এতদিন একা থাকেনি। সকালেই সে একবার তার কোয়া-র্টার দেখতে গিয়েছিল। বড় বড় তিনখানা ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। রান্নাঘর বাথ-রুম। অন্দরের লাগোয়া ঘর। দরজায় দাঁড়ালে অন্দরের গাড়িবারান্দা দেখা যায়। সামনে সব বড় বড় পাতাবাহারের গাছ। সবই ভাল—তবে খুব পুরানো বাড়ি বলে পলেস্তারা সব খসে পড়েছে। এখন মেরামত হচ্ছে সব। মেঝের জায়গায় জায়গায় তাপ্পি মারা। উঁচু শিলিং। আগেকার আমলের ঘরবাড়ি যেমন হয়ে থাকে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব দরজা। মেরামত শেষ হলে হোয়াইট-ওয়াস। তারপরই সে নির্মলাকে নিয়ে আসতে পারবে। শনিবারে ভেবেছিল বাড়ি চলে যাবে—কয়েকদিনেই সে এখানে কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে। কেমন একটা বন্দী জীবন —সব সময় নিরাপত্তা বোধের অভাব। বিশেষ করে তার অফিসে বসলে সে এটা বেশি টের পায়। লুজিং কনসার্ন। প্রিন্টিং সেকেলে, প্লেজ ঠিক আসে না। লিথো প্রিণ্টিং এখন অচল। এই অচল কারখানার সে ম্যানেজার। কর্মীদের মাইনে দেখে সে খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি বেতন পায় প্রিণ্টিংম্যান মনিলাল সেটা দুশ টাকাও নয়। হেল-পারদের মাইনে সাতাশ টাকা। সাতাশ পারদের মাইনে সাতাশ টকা। সাতাশ টাকায় কি হয়, সে একজন কর্মীকে ডেকে বলেছিল, তোর কে আছে? সে বলেছিল, কেউ নেই। সাতাশ টাকায় স্যার কেউ থাকলে চলে না। ফুটপাথে থাকি। চা-পাউরুটি খাই। তারপর ও [illegible] বলেছে, তাতে সে আরও হতবাক হয়ে গেছিল। মাইনে পাবার [illegible] জল খায়। মাইনে হলে সে কলের জলে ভাল করে স্নান করে নেয়। ঐ একটা দিনই তার প্রকৃতপক্ষে স্নান আহার। এ-সব শুনে সে আর বেশি কথা বলতে সাহস পায়নি। দেখলেই ভয় ধরে যায়। যে কোন মুহূর্তে এরা ওর শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। তার এখন মনে হচ্ছে, সুরেনকে দেখা করতে বলে খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেনি। সে সুরেনের ছেলেকে একটা হেলপারের কাজ অবশ্য দিতে পারে। ওতে সে তার নিজের বিরুদ্ধে আরও একজন শত্রু তৈরি করবে। তবু মনের মধ্যে কি থেকে যায়, সুরেনের জন্য তার কষ্টবোধ বাড়ে।

অফিসে যাবার সময় এ-নিয়ে একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলল। যেকোন কারণেই হোক কুমার বাহাদুর অতীশকে অন্য গোত্রের মানুষ ভেবে থাকে। তিনি বললেন, ব্যালেন্সসীট দেখেছ?

অতীশ বলল, দেখেছি।

—এরপর লোক নেওয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে দেখ।

অতীশ কেমন শিশুসুলভ হাসিতে বলল, একজন নিলে আপনার আর কত ক্ষতি হবে দাদা।

কুমার বাহাদুর জানেন, অতীশই এমন-ভাবে কথা বলতে পারে। তিনি বললেন, তোমার কারখানা, যা ভাল বোঝ করবে।

অতীশ বাইরে এসে দেখল, সুরেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে বলল, কাল তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিও। কিছু একটা হয়ে যাবে। কুম্ভবাবু পাশের চেয়ারে বসেছিল, সে কথাটা শুনে চোখ কেমন ছোট করে ফেলল। অতীশের মাথা হেঁট করে কুমার বাহাদুরের ঘরে সে অবশ্য যেতে পারে না। তার সম্বল তার বাপ রাধিকাবাবু। কাবুল, আর প্রাইভেট অফিসের স্যার—সনৎবাবু। সনৎবাবুকে সে গিয়ে চুপিচুপি বলল, স্যার অতীশবাবু সুরেনের ছেলেকে কারখানায় কাজ দেবে বলেছে। আপনি জানলেন না, আপনাকে না জানিয়ে এটা হচ্ছে। আমি নিজেই এতে অপমান বোধ করছি।

সনৎবাবু দলিলের কপি মেলাচ্ছিলেন বসে বসে। পাশে একজন সেরাস্তাদার। এই কপি নিয়ে আজই উকিলের কাছে ছুটতে হবে। সব বস্তি অঞ্চলটাকে একটা পাবলিক লিমিটেডে কেস দেওয়া হচ্ছে। বছরকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প, জুডিসিয়েল ব্যাপার সব জমা থাকে। সবই বেক ডেটে করা হচ্ছে। রেজিস্টারকে বড় রকমের ঘুষ দিলেই বাকি কাজটা হয়ে যাবে। এ-সব খুবই নটঘটে কাজ। দলিল দস্তাবেজ ঘাটতে ঘাটতে মাথা খারাপ, ঠিক এই সময়ে এমন খবরে তিনি খুবই চটে গেলেন। বললেন, অতীশকে ডাক।

কুম্ভবাবুর বাপ রাধিকাবাবু পাশের টেবিল থেকে উঠে এসে বলল, স্যার এখন না। আগে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে কথা বলুন। মনে হয় অতীশ কুমারবাহাদুরের সঙ্গে কথা বলেই করেছে। ওখানে ঠিক না ক.., অতীশকে বললে ভুল করবেন।

পরদিন সকালে অতীশকে এসে সুরেনই ডেকে নিয়ে গেল। রাস্তায় অতীশ বলল, ছেলেকে পাঠিয়ে দিও কিন্তু। কাল শুনলাম রাতে ফিরে এসেছে।

—যাবে বাবু। আপনি মা বাবা। একটু দেখবেন। আমার বড় আদরের ছেলে নব। জ্যাষ্ঠ সন্তান কার না আদরের হয় বলেন।

অতীশ কুমার বাহাদুরের ঘরে ঢুকেই দেখল তিনি একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। চিঠিগুলো তার খাস বেয়ারা সুরঞ্জিত কাঁচি দিয়ে মুখ কেটে রেখেছে। তিনি একটা করে চিঠি বের করছেন, আর লাল পেনসিলে টিক মেরে যাচ্ছেন। কোথাও সামান্য নোট করছেন কিছু। সে যে দাঁড়িয়ে আছে তিনি যেন খেয়ালই করছেন না। চিঠি দেখতে দেখতেই সহসা বললেন, সুরেনের ছেলেকে কাজ দেওয়া ঠিক হবে না। অতীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তিনি ফের বললেন, কারো কারো ইচ্ছে নয় তার ওখানে কাজ হোক। মাথা গরম ছোকরা, তুমি বিপদে পড়বে।

—কিন্তু কথা দিয়েছি।

—কথার দাম আমরা এখন ক'জন রাখতে পারি। সরকারই রাখতে পারছে না

—এটা মানসম্মানের প্রশ্ন।

—সেটা আমাদের বাপ-জ্যাঠাদের আমলে ছিল।

অতীশ বলল, কতটা আর ও ক্ষতি করতে পারে?

—অনেক। আর তুমি এতটুকুতেই বিচলিত হলে চলবে কি করে? চার পাশে চোখ মেলে দেখ। রাস্তায় পাঁচিলের পাশে কত আস্তাকুঁড়। তুমি ভাঙতে পারবে। বলেই তিনি বেল টিপলেন। দরজার পাশে অন্য কোন আমলা অপেক্ষা করছে। তাকে তিনি ডেকে পাঠালেন। অতীশ বুঝতে পারল, কুমারবাহাদুর এ-নিয়ে তার সঙ্গে আর কোন কথা বলতে চান না। তার চোখ-মুখ কেমন লাল হয়ে যাচ্ছে। গায়ের রক্তে কোথায় যেন অসম্মানের কাঁটা [illegible] করছে। মগজের ঘিলুতে কেউ সূঁচ ফোটাচ্ছে। সুরেনকে কি বলবে! তার কেন জানি মনে হচ্ছে এটা আর্চির কাজ। আর্চির সেই প্রেতাত্মার প্রভাব। তার মাথার মধ্যে তক্ষুণি ঘন্টাধ্বনি শুরু হল। সেই কবে থেকে সেটা হয়ে আসছে। সে ঘেমে যাচ্ছিল। কুমার বাহাদুর তার দিকে একবার চোখ তুলেও তাকায়নি। ভারি ঠাণ্ডা ব্যবহার। কেন এমন হয়। সে তো কারো প্রতি বিরূপ নয়, শত্রুতা করে নি। তবে কেন তাকে এ-ভাবে বিড়ম্বনার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপরই শুনতে পেল সুদূর থেকে কারা যেন কিছু বলে যাচ্ছে—

—পৃথিবীতে সর্বত্রই আর্চিরা রয়েছে অতীশ। ঘাবড়ে যেও না। দুরাতীত কোন গ্রহের মধ্যে জীবনের দেখা সেই তিন মহাপুরুষ যেন হাত তুলে দিয়েছেন—দেখল, মালোন সারেঙ সাব, স্যালিহিগিনস—তাঁদের হাত সে দেখতে পেল অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে। মাথা নিচু করে সে ধীরে ধীরে অগত্যা বের হয়ে এল। তার এখন সত্যি আর কিছু যেন করণীয় নেই। (চলবে)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অল্প সময়, অতি অল্প সময় বলতে গেলে কয়েক লহমার মধ্যে কথাগুলো খেলে গেল মাথায়।

যত কথাই সে ভাবুক, সবটার মধ্যেই একটা বিপুল অবিশ্বাস। নিজের চোখকে অবিশ্বাস, নিজের কানকে অবিশ্বাস।

হয়ত মুরারিবাবুও কথাটা বুঝবেন। হাতটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে হেসে বললেন, 'দেবেন তো? অবশ্য নতুন কাগজ, কজনই বা পড়বে, তবু হাতে লেখা কাগজের থেকে বেশী পাঠক পাবেন তো নিশ্চয়। দিন না, একটা বেশ ভাল দেখে জোরালো গল্প, যাতে আমার কর্তার তাকু লেগে যায়!'

আর অতটা অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকে না।

তবে উত্তরটাও খুব সহজে দিতে পারে না, অবিশ্বাসের স্থান তখন অধিকার করেছে একটা অবর্ণনীয় আবেগ।

আনন্দ, প্রত্যাশাতীত আনন্দ।

কল্পনাতীত সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে যেমন অসহ্য, বিহ্বল করা আনন্দ আর আবেগ অনুভূত হয়।

ফলে উত্তর দিতে দেরীই হয়।

যেন ভাষা খুঁজে পায় না সে, এ প্রস্তাবের উত্তর দেবার মতো।

গলায় স্বরও আসে না যেন।

কি বলবে সে, কোন ভাষায় ধন্যবাদ দেবে!

কেমন করে জানাবে যে ঠিক এই মুহূর্তে যদি সে মরেও যায় তো ওর কোন দুঃখ কোন আপসোস থাকবে না। এরচেয়ে সৌভাগ্য সে ভাবতেও পারে না, এই ওর এতোদিনের আশাহীন ভবিষ্যৎহীন সাধনার যথেষ্ট পুরস্কার সাফল্য।

বরং যথেষ্টরও বেশী।...

অনেক কথা যখন বলবার থাকে, তখন তার কোন কথাটাই বুঝি বলা হয়ে ওঠে না। তাই সে হঠাৎ প্রায় অস্পষ্ট, কেঁপে যাওয়া গলায় একটা অবান্তর প্রশ্নই করে বসে, 'কর্তা! আপনি সম্পাদক নন?'

আমিই আসল সম্পাদক কিন্তু নাম থাকবে ওঁদের এক প্রধান শিষ্যের— তিনিই অবশ্য আসল উদ্যোক্তা, শাঁসালো শাঁসালো ভক্তদের কাছ থেকে টাকা যোগাড়ও তিনিই করেছেন। আমার লাভের মধ্যে মাসে কুড়িটি টাকা।'

'কুড়ি টাকা!' নিজের বিস্ময়ের আঘাতটা সামলে নেয় সে এই বিস্ময়ে, 'সম্পাদকের মাইনে কুড়ি টাকা!'

'তবে আর কত হবে! এই কটা টাকাই পেলে এখন বেঁচে যাই। কোন নিশ্চিত আয় বলে তো কিছু নেই—আজ ওখানে কাল এখানে—মধ্যে মধ্যে দুটো পাঁচটা টাকা পাওয়া যায়, এই তো ভরসা! বিয়ে করেছি, ছেলেও হয়েছে—বাবার চাকরিটা আছে তাই রক্ষা। লিখি তো গাদা গাদা, কিন্তু টাকা দেয় কজন!'

দুঃখের ছায়াটা সেই কয়েক মুহূর্তের জন্যে বুঝি সেই সদাপ্রসন্ন উজ্জ্বল মুখে একটা বেদনা, একটা পরাজয়ের ছায়া এনে দেয়। তবে সে ঐ কয়েক মুহূর্তই। একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত ব্যথা ও দুঃখকে উড়িয়ে দিয়ে হাসিতে ভরে ওঠে সে মুখ, বলেন, 'তবে আপনার কোন ভয় নেই। আপনি অনেক, অনেক বড় হবেন। টাকাও পাবেন, আপনাকে দেবে টাকা। তা আমার লেখাটা তাহলে কবে দিচ্ছেন।

সে প্রসন্নতা বুঝি সংক্রামক। বিনুও ওঁর হাতে একটা চাপ দিয়ে বলে, 'কবে চাই বলুন। আমি কালই দিতে পারি। গল্প দু-তিনটে লেখাই আছে, তবে আপনাকে আরও ভাল একটা গল্প দেব। আজকের সন্ধ্যেটা পেলেই হয়ে যাবে।'

'বেশ, লিখুন আপনি। আমি দুপুরে বারোটা সাতাশের গাড়িতে বেরুই, তার আগে এসে নিয়ে যাবো।'

তখন সন্ধ্যা আরও ঘোর হয়ে এসেছে। এ সময়টার মুহূর্তে মুহূর্তে অন্ধকার গাঢ় হয়। বাড়িতে এখনই আলো জ্বালা দরকার। নইলে হয়ত মা পড়ে যাবেন কোথাও অন্ধকারে চলতে গিয়ে। তাই বিনুও আর ওঁকে বাধা দিল না। উনি দ্রুত সেই গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অনেক কথা বলার ছিল।

অনেক অনেক ধন্যবাদ দেবার ছিল। অনেক ঋণ স্বীকার। কিছুই বলা গেল না।

যখন ঘোরতর নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে জীবনে, এখনকার সন্ধ্যার মতো, কোনো আলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ভবিষ্যৎ বলতে আর কিছু চোখে পড়ছে না—তখন দেবদূতের মতোই এই সাধারণ চেহারায় বিত্তহীন লোকটি এসে যেন চিরকালের মতো আশায় একটা অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল ওর প্রাণে। এর যে তুলনা নেই, সে কথাটাও বলা হল না, ওঁকে।

এ বুঝি ঈশ্বরেরই আশ্বাস আর অভয়। লোকটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু আশ্বাসের যে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল তার বুঝি তুলনা নেই কোথাও।

সে দুহাত তুলে সেই অন্ধকারেই একটা প্রণাম করল।

॥ ১২ ॥

তখনই লিখতে বসবে—মুরারিবাবুকে এমনিই একটা আভাস দিয়েছিল। কিন্তু সেটা হয়ে উঠল না।

হল না—বাইরের কোন কারণে নয়।

এই প্রথম ওর লেখা ছাপা হতে যাচ্ছে, একটা নতুন সাপ্তাহিক কাগজের প্রথম সংখ্যায় খুব ভাল কিছু লিখতে হবে, এই চিন্তাতেই সমস্ত চিন্তা কল্পনা যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

গল্পের পর গল্প মাথায় আসে, কোনটাই যেন যথেষ্ট ভালো বলে মনে হয় না। পুরনো যে তিনটে গল্প লেখা ছিল সেগুলোও পছন্দ হল না। শেষে যেন হতাশ হয়েই শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ল বটে, তবে ঘুম এল না।

এ অবস্থায় ঘুম আসা বুঝি সম্ভবও নয়।

এক একবার এমনও মনে হল তবে কি তার কল্পনার শক্তি ফুরিয়ে গেল?

নাগাল পেয়েছে, সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে নিঃস্ব হয়ে গেল! এ প্রাসাদে ঢোকার অধিকার সে পাবে না!

চিন্তাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবলভাবে মাথা নেড়ে যেন দৈহিক শক্তিতেই সেটাকে তাড়িয়ে দেয়।

না, অনেক লিখবে সে। অনেক লেখার আছে।

কাঁচা লেখা হোক, সে এই এদের জন্যে—হাতে লেখা কাগজের জন্যে তো কিছু না ভেবেই লিখতে বসে, লিখতে লিখতে গল্প তৈরী হয়ে যায়। এক এক দিনে দুটো তিনটে পর্যন্ত লেখে। সে কেন এখনই এই বয়সে রিক্ত হয়ে পড়বে।

ধ্যেৎ! যত সব বাজে চিন্তা।

শেষ পর্যন্ত রাত চারটেয় উঠে ঘরের বাইরে রকে বসে সেই স্বল্প প্রভাতী আলোতেই লিখতে শুরু করে। প্রথম যে

গল্প মাথায় আসে—দ্বিচার না করে দ্বিধা না করে লিখতে শুরু করো এবং শেষও হয়ে যায় ছটার মধ্যে।

নিজে বুঝতে পারে না ঠিক কেমন হল। এটা তার চিরদিনের ব্যাপার। কেমন হল নিজে কোনদিনই বুঝতে পারে না। বুড়ো বয়সেও এই মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি—অনেক বই লেখার পরও।

পরে প্রশংসা করলে আশ্বস্ত হয়, তখন মনে হয় মন্দ লিখিনি।

মুরারিবাবু এগারোটার পরই এসে হাজির হল।

সেই কাঁধে চুলের তেল লাগা ময়লা পাঞ্জাবী, খাটো করে পরা আরও ময়লা ধুতি, জামায় বহুদিনের সঞ্চিত ঘামের গন্ধ—মুখে সেই প্রসন্ন পরিতৃপ্ত, আত্ম-বিশ্বাসে পূর্ণ হাসি।

এবার বাইরের ঘরের দোর খুলে দিল বিনু।

এবাড়িতে এসে এই একটা সুবিধা হয়েছে। এটা অবশ্য ওর দাদারই শোবার ঘর। তবে সে একটা একানে লোহার খাট—সেটা পাতার পরও অনেক জায়গা থাকে, একটা ওদের পুরোনো আমলের শ্বেত পাথরের টেবিল আর দুটো চেয়ার পাতা গেছে। একটা কাঠের আর একটা লোহার। এছাড়া একটা কাঠের বাকসও আছে সেটাতেও বসার কাজ চলে প্রয়োজন হলে।

এ ব্যবস্থাটা ওর দাদাকেই করতে হয়েছে। তারই বন্ধু-বান্ধব মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হন, তাদের না বসালে চলে না। এর আগে অবশ্য বিনুর কাউকে বসাবার দরকার হয়নি, আজ হল।

মুরারিবাবু সেই কাঠের বাকসটার ওপরই ধপ করে বসে পড়ে গল্পটা তখনই আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললেন, তারপর সেদিনও ওর হাত দুটো ধরে বললেন, অপূর্ব! অপূর্ব! আমার এখন আপসোস হচ্ছে এটা এই নতুন কাগজের জন্যে নিচ্ছি বলে। এ গল্প আপনার ভারতবর্ষ কি প্রবাসীতে ছাপা উচিত ছিল।'

পরবর্তী কালে সে গল্প পড়েছে বিনু। বছর দশেক পরেই গল্পটা একদিন চোখে পড়ে পড়ার চেষ্টা করেছে। নিজেরই লজ্জা করেছে এ গল্প তারই লেখা মনে করে। তবে এও বুঝেছে, যত দিন যাচ্ছে বেশী করে বুঝছে, সেদিন এ উৎসাহটুকুর প্রয়োজন ছিল।

বাস্তবিক মুরারিবাবুর কাছে ওর ঋণের অন্ত নেই।

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই মুরারি বাবু। অল্প বয়সে মারা গেলেন ভদ্রলোক, নইলে পরবর্তী কালে সে কিছুটা তাঁর কাজে লেগে সে ঋণের সবটা না হোক—সবটা শোধ করা বুঝি সম্ভবও নয়—কিছুটা শোধ করতে পারত।

মুরারিবাবুর সঙ্গে যখন ওর প্রথম পরিচয় হয় তখন ভদ্রলোকের কোন স্থায়ী আয় নেই। কিছু স্ত্রী বর্জিত ছেলেদের নাটক, যা এককালীন কপিরাইট বিক্রী করতে হত—দাম পেতেন বই পিছু কুড়ি থেকে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকা, এবং সে প্রতিটি অঙ্কই কয়েক কিস্তিতে শোধ হত—দু টাকা পাঁচ টাকা তিন টাকা হিসেবে। একদিন এক প্রকাশক 'ডবল' ঝেড়ে দেড় টাকাও দিয়েছেন—বিনু নিজের চোখে দেখেছে। এছাড়া কারও একটা জীবনী লিখতে হবে, ছোটদের উপযোগী করে প্রকাশকের নামে বেরোয় সেও হয়ত ঐ বিভিন্ন দফায় ছ মাস ধরে উশুল হত, কুড়ি কি পঁচিশ টাকায় কপিরাইট। এছাড়া ওখানে দু' টাকা পাঁচ টাকা—বিবিধ বিচিত্র, বিষয়ের টুকরা-টাকরা লেখায়। অনেক পরে, এক উৎসাহী বয়স্ক প্রকাশকের সনির্বন্ধ অনুরোধে দুখানা 'গরম গরম' অশ্লীল বই লিখে দিয়েছিলেন, সেই বোধ হয় জীবনে প্রথম ও শেষ এক-একটির জন্যে একশ টাকা করে পেয়েছিলেন। অন্তত পাবার কথা। তবে তাতেও তো ঐ কিস্তি এ বই দুটি বেরোবার পর প্রকাশক মশাইকে জেলে যেতে হয়েছিল ছমাসের জন্যে, পুরো টাকাটা দিয়ে ছিলেন কিনা ঘোরতর সন্দেহ আছে।

এই ধর্মীয় সাপ্তাহিকেই তাঁর প্রথম চাকরি, ত্রিশ টাকা বেতন, তবে তাও বেশী দিন টেঁকেনি। ভদ্রলোকেরা যতটা চলার বা বিজ্ঞাপন পাবার আশায় নেমেছিলেন—তার কিছুই হল দেখে দমে গেলেন। খরচ কমাতেই হবে, তাছাড়া যে মহাদেব কর্মকারের নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হত—তিনি বোধহয় মনে করলেন কাগজ চালানোর রহস্যটা মোটামুটি তাঁর জানা হয়ে গেছে—তিনি মুরারিবাবুকে জবাব দিলেন। মাস তিনেক বোধহয় কাজটা ছিল মুরারিবাবুর। তবে সে সাপ্তাহিক বিখ্যাত গুরুর বহু ধনী শিষ্য থাকা সত্ত্বেও ভাল মতো চালানো যায়নি, কিছুদিন পরে তুলেই দিতে হয়েছিল।

এরপর একখানা এক পয়সার দৈনিকে সহঃ সম্পাদকের কাজ পেয়েছিলেন। আঠারো টাকা। কাজ অবশ্য কমই বিকেল পাঁচটায় যেতে হত—নটা সাড়ে নটায় ছুটি। ঘড়িঘর কাগজে—অর্থাৎ হলদে কি লাল মেকানিকক্যাল কাগজে ছাপা হত, এখনকার দিনের সাধারণ দৈনিক পত্রের চেয়ে আকারে সামান্য ছোট, চার পৃষ্ঠা। একবারের ইলেকশন উপলক্ষে কোন কোন ভোটপ্রার্থীর হয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠেসে গালাগালি দেবার ও কুৎসা রটাবার জন্য শুরু হয়েছিল—পরে 'ব্ল্যাকমেল' করে কিছু অর্থ উপার্জন করার সুবিধা হয় বলে থেকেই গিয়েছিল। সংবাদ সংস্থাকে চাঁদা দেবার বালাই ছিল না, অন্য কাগজের বাসি খবর সরবরাহ করেই সংবাদপত্র নামটার সার্থকতা প্রতিপন্ন হত।

মোট তিনজন সহঃ সম্পাদক নিয়ে কাগজ চলত, সর্বোচ্চ বেতন ছিল চল্লিশ। এঁরাই সংবাদ লেখক, সংবাদ সৃষ্টিকারী—আবার প্রুফ রীডারও। সংবাদ সৃষ্টিকারী অর্থে যখন একটু-আধটু জায়গা ভরাবার মতো কোন খবর হাতের কাছে মিলত না যখন তখন কল্পিত খবর দিয়ে ভরাতে হত। এমন খবর দেওয়া হত যার সত্যতা যাচাই করা হঠাৎ সম্ভবও নয়, তেমন গরজও করবে না কেউ। যেমন 'হনলুলুতে বিরাট ভূমিকম্প' চীনের ফুচাও শহরে একটি তিন ঠেংগো বাঘের উৎপাত হয়েছে ইত্যাদি। এই সব সংবাদ রচনার কাজে মুরারিবাবু ছিলেন অদ্বিতীয়। কোন কোন দিন বিনুও করেছে।

কিন্তু এমনই মুরারিবাবুর ভাগ্য, এই তিনজনের মধ্যে দুজন পরে এক বিখ্যাত দৈনিকে কাজ পেয়েছিলেন, একজন তো কালক্রমে সংবাদ সম্পাদকই হয়েছিলেন বোধহয় দু হাজার টাকা মাইনেতে—কিন্তু মুরারিবাবুর সে ভাগ্য হয়নি।

অবশ্য মুরারিবাবু তাতে বিন্দুমাত্র দমেছেন মনে করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি দুর্দম নন, অদম্য। অপরাজেয় বললেই ঠিক বলা হবে।

এই সব উঞ্ছবৃত্তির তলে তলে তিনি অনেকগুলি কাগজ বার করেছেন। করেছেন অর্থে করিয়েছেন। সামান্য পুঁজির মহাজন ছাড়া তাঁকে ভরসা করবে কে? সুতরাং তার কোনটাই চলেনি। খান তিনেক সাপ্তাহিক, একটা মাসিকের কথা তো বিনুর মনেই আছে। মাসিকটা বোধহয় মাস তিনেক চলেছিল। সাপ্তাহিকগুলিও প্রায় তাই, কোনটা তিন মাস কোনটা বা হয়ত পাঁচ মাস। এই টাকায় যে ক'দিন চলবে তার মধ্যে যে কোন সাময়িক পত্র স্ব-নির্ভর হওয়া সম্ভব নয় তা মুরারিবাবুও জানতেন। তবু করতেন তার মানে প্রতি-বারই মনে করতেন—এই যে সম্পাদক—মুরারি সেন ছাপা হচ্ছে এই দেখিয়ে অন্য কোন ভদ্র কাগজে একটা স্থান করে নিতে পারবেন।

তা অবশ্য হয়নি।

তবে তার জন্যে কি খুব একটা দুঃখিত বোধ করেছিলেন মুরারিবাবু? আশাভঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছিলেন?

তা সম্ভব নয়। যাঁরা মুরারিবাবুকে জানতেন তাঁরাই বলবেন, মুরারিবাবু

হতাশ হবার লোক নয়, ভেঙে পড়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

তাঁর মধ্যে কোথায় একটা ইস্পাতের দৃঢ়তা ছিল—আত্মবিশ্বাসে ও আশায় তৈরী—যাকে ভাঙবার জন্যে বিধাতার সংগ্রাম ও'র সেই বাল্যকাল থেকে, হার মেনে ক্রুদ্ধ বিধাতা বুঝি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে অকালে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

দারিদ্র্য সম্বন্ধে প্রধানত দু রকম মনোভাব দেখতে পাই আমরা। এক সদা সঙ্কুচিত, সদা লজ্জিত—দারিদ্র্যকে অপরাধ ভেবে তাদের দুঃখ ও ত্রাসের সীমা নেই, আর একদল মনে মনে সেই ভাব বোধ করলেও সেটা ঢাকার জন্য একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে, দারিদ্র্য নিয়েই অহঙ্কার করতে যা সেটা দেখাতে চেষ্টা করে। সে অহঙ্কার বার বার অপরের কানের কাছে ঢাক পিটিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে।

মুরারি সেন এ দুজন থেকেই পৃথক স্বতন্ত্র।

তাঁর একান্ত দারিদ্র্য বা প্রায় নিঃস্বতা সম্বন্ধে তিনি একেবারেই অনবহিত ছিলেন। সে সম্বন্ধে উপেক্ষা বা অবহেলা ছিল বললে একটু ভুল বলা হয়, এমন কি তিনি উদাসীন ছিলেন বললেও বর্ণনা মাত্র হয়, ব্যঞ্জনা হয় না। তিনি একেবারেই নির্বিকার ছিলেন। তাঁর ঘরে কাচা লালচে হয়ে যাওয়া মোটা লংক্লথের পাঞ্জাবীর কাঁধের দিকে যে লম্বা চুলের তেল ও ধুলোতে যে একটা বেশ চওড়া কালো দাগ লোকের চোখে পড়ছে, ঘামের গন্ধ কোন-মতেই ঢাকা যাচ্ছে না—সে ব্যাপারটার কোন বোধই ছিল না।

একদিন ঘরে থাকলে অবশ্যই স্ত্রী কেচে থালা দিয়ে ইস্ত্রী করে দিতেন, কিন্তু সেই একটা দিনই সময় মিলত না ভদ্রমহিলার।

দুঃখের ধান্দায় ঘুরতেন প্রতিদিন, অষ্টপ্রহর?

না, সেই সঙ্গে সুখের ধান্দাও যে ছিল।

সংবাদপত্র বা সাপ্তাহিকপত্র তা এক পয়সা দামেরই হোক আর রঙীন মেকানি-ক্যাল কাগজেই ছাপা হোক—তাদের আপিসে নিমন্ত্রণ আসে রাশি রাশি। ফিল্মের বিশেষ শো, থিয়েটারের প্রথম রজনী বা পরবর্তী উৎসব অভিনয়, টিসেস কমিটির (পরবর্তী কালের টি বোর্ড?) বিজ্ঞাপন চিত্র প্রদর্শনী, এমনকি কোন কোন বড় আপিসেও নানা উৎসবে নিমন্ত্রণ আসত। সেসব সমাবেশে বড় বড় অফিসার, বড় সাহিত্যিক, ধনী ব্যবসায়ী এবং অন্য ক্ষেত্রের বিশিষ্ট লোকও অনেক আসতেন, বরং তাঁদের দলই ভারী। সামাজিক নিমন্ত্রণও এই সম্পাদক পরিচয় সূত্রে কম আসত না। সভা-সমিতি তো ছিলই। লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসব সরস্বতী পূজায় প্রদর্শনী—আরও কত কি অজস্র।

এর একটা আমন্ত্রণ আহ্বান বা যাওয়ার সুযোগ বাদ দিতেন না ভদ্রলোক। এবং নির্বিকার নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসে সবেশ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশে গিয়ে বসতেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন সমানে সমানে বরং এক এক সময় মনে হত একটু ওপর থেকেই করছেন সভা-সমিতিতে গিয়ে বক্তৃতা করতে কি সভা-পতিত্ব করতে আটকাত না।

বিনুর আজও ও'র কথা মনে পড়লে একটা সত্যকার বেদনা বোধ হয়। আজ যখন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সামনে অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা অকল্পনীয় অর্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা সে সময় সে ভদ্রলোক রইলেন না। তাঁর চেয়ে অনেক কম ক্ষমতার লোক—তাঁরই সম-সাময়িক—অনেক বেশী উপার্জন করেছে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মুরারিবাবু বোধহয় মাত্র ম্যাট্রিক পাস, কোন ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু যে কোন বিষয়ে লিখতে বা বক্তৃতা করতে পারতেন মাত্র কয়েক মিনিটের নোটিশে। দ্রুত লেখার শক্তি ছিল অসাধারণ এবং যে বিষয় কিছুই জানতেন না, সে বিষয়েও চমৎকার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করে আসল কথা কিছুই না বলে অনেক কথা লিখতে বা বলতে পারতেন। সামান্য কিছু সময় পেলে—দুটো কি তিনটে দিন—কোন লাইব্রেরী থেকে বই পড়ে নিতে পারলে তো কথাই নেই। তাঁর ঐ সীমিত জীবনের মধ্যেই অন্তত কুড়ি পঁচিশটি বই লিখে গেছেন, ছেলেদের থেকে বড়দের যখন যা ফরমাশ এসেছে প্রকাশকদের কাছ থেকে, অবশ্যই তা বেনামে।

আর এই সব বই লেখার দাম পেয়েছেন কুড়ি পঁচিশ—বড় জোর পঞ্চাশ। ঘোরতর অশ্লীল বই লিখে দুবার একশো করে পেয়েছিলেন।

মানে—পাবার কথা। কিন্তু এমনই ভাগ্য ভদ্রলোকের যে, এর কোনটারই টাকা একসঙ্গে পাননি। পাঁচ টাকা দশ টাকা কিস্তি, এক টাকা দু টাকা পর্যন্ত। তাও অনেক টাকাই পুরো শোধ হয়নি। অনেক ঘুরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

বলতেন, ওর পেছনে ঘুরে যত সময় নষ্ট করব, ততক্ষণে নতুন কিছু লিখলে অন্তত পাঁচটা টাকাও তো পাবো। ও দিলেও কি আর একদিনে ওর বেশী দিত।

মুরারিবাবুর কাছে বিনুর ঋণ অনেক। এমন বন্ধু তার জীবনে খুব বেশী আসেনি, কারও জীবনেই বোধহয় আসে না।

'আপনি এত ভাল লেখেন, আজ পর্যন্ত কোন প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি? টাকরায় টক টক ধরনের একটা শব্দ করে বলতেন, 'এ হতেই পারে না। এর একটা বিহিত করতেই হবে।'

করলেনও একদিন। ও'র যে প্রকাশক অশ্লীল বই লিখিয়ে নিজে জেল খেটে ছিলেন পরে—তাঁর কাছেই নিয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক। ব্রাহ্মণ, অধিকাংশ সময়ই মোটা পৈতের গোছা দেখিয়ে খালি গায়ে বসে থাকতেন। চোখে মুখে ধূর্ত চাহনি। সর্বদা চালাকির দ্বারা যারা জীবনটা সফল ও সার্থক করতে চায়—সেই দলের। অপরকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করতে পারলে মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করেন এ'রা, এটাকে একটা শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন।

বিনুর আপাদমস্তক বার দুই চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ তো একেবারে পোলাপান মুরারিবাবু। এ কি লিখবে।'

'আমাদের অনেকের চেয়েই ইনি ভাল লেখেন, একটা কাজ দিয়ে দেখুনই না।'

আবারও সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপাদ-মস্তক অবলোকন।

তার পরই একটা বোমা ছুঁড়ে মারবেন, 'সেক্সোলজী পড়া আছে কিছু? মানে যৌন তত্ত্ব? যৌন বিজ্ঞানের বই লিখতে পারবেন?'

এটা সত্যিই পড়া ছিল। বিনু নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ঘাড় নাড়ল, 'পারব।'

'বেশ। দম্পতির ব্রহ্মচর্য এই নামে একটা বই লিখে আনুন। মানে বিয়ে করার পরও যে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন আছে আর তা রাখা যায়—এইটে বলতে হবে। পারবেন?'

এ আবার কি উদ্ভট কথা।

বিবাহিত জীবনে আবার ব্রহ্মচর্য কি! ব্রহ্মচর্য পালনের জন্যে কি কেউ বিয়ে করে।

কিন্তু এ একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। বিশেষ হাতের পাশা আর মুখের কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না।

বিনু গলায় একটা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলল, 'পারব।'

'বেশ করে আনুন। পাঁচ ছ' ফর্মার বই। পছন্দ হলে ত্রিশ টাকা দেব, কপি রাইট। তবে আপনার নামে বেরোবে না, এক সাধুগোছের নাম দেব অথচ হিসেবে তাতে ওজনটা একটু বাড়বে বইয়ের।'

ওখানে যত কথাই বলুন, বাইরে বেরিয়ে এসে মুরারিবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'পারবেন তো লিখতে—এ তো এক আজগুবি সাবজেক্ট।'

বিনু হেসে জবাব দিল, 'আপনিই তো পথ বাতলে দিয়েছেন এর আগে—যে বিষয় জানেন না সে বিষয় লিখতে হলে অনেক একথ ওকথা বলে বেশ খানিকটা ধোঁয়া রেখে ছেড়ে দেবেন।'

'ঠিক ঠিক।' সশব্দে চারপাশের লোককে সচকিত করে হেসে উঠলেন মুরারিবাবু।

কিন্তু বিনু ঠিক ওপথে গেল না। সে তার অধমতরণ পতিতপাবন প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এরই শরণাপন্ন হল।

এর আগে দেখেছে সে, যৌনতত্ত্বের ওপর নানারকম চটি চটি বই বিক্রী হয়

ওখানে। কিছুবা আমেরিকায় ছাপা, কিছুবা লন্ডনে। কিছু ফরাসী বইও আছে, কিন্তু সে তো তার কাছে অপাঠ্য।'

সেদিনও অনেক ঘুরে খানতিনেক সস্তা দামের চটি বই ছ'আনায় সংগ্রহ করল। ওদেশেও এমন অশিক্ষিত বা সামান্য শিক্ষিত পাঠক ঢের আছে—যাদের সাধ্যও সামান্য। জ্ঞানপিপাসাও সীমিত। যারা এসব বইতে জ্ঞান খোঁজেও না, অত কিছু বোঝার ক্ষমতাও নেই—যৌনতত্ত্বের বই পড়ে যৌন উত্তেজনাই শুধু অনুভব করতে চায়। এসব বই তাদের জন্যেই লেখা; ওর মতো, মুরারিবাবুর মতো লেখকদের দ্বারা।

তিনখানা চটি বই—একরাত্রেই পড়ে নিল বিনু।

তারপর কাগজকলম নিয়ে বসে গেল লিখতে।

অসুবিধা হল মাকে নিয়ে। ইদানীং দু-চারটে লেখা ছাপা হতে মা ওর লেখা সম্বন্ধে একটু যেন সচেতন হয়েছেন।

'কি লিখছিস রে?' এমন প্রশ্ন তিনি করেন না। কারণ তাহলে নাকি ওকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। দাদা বলেছেন, 'এসবে কিছু হবে না। বাংলাদেশে সাহিত্য করে পেটের ভাত হয় না। অন্য চাকরিবাকরি করে করা যায়। চারু বাঁড়ুয্যে প্রবাসীতে কাজ করেন, মাস্টারী কি প্রফেসারীও করতে পারেন, তাঁর পেটে বিদ্যে আছে। সৌরীন মুখুজ্জে উকীল। এক শরৎ চাটুয্যে, তা তিনিও আগে চাকরিই করতেন। করতে করতেই লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে কাজ ছেড়েছেন। আর রবি ঠাকুর শরৎ চাটুয্যে সবাই হয় না, হতে পারে না। ছেলেকে বলো, সাহিত্য করতে হয় একটা ভাতের ব্যবস্থা করে করুক। লেখাপড়া শিখলো না, গ্র্যাজুয়েট হলে নিদেন একটা ইস্কুলমাস্টারীও করতে পারত, উপরি সাহিত্য করে করুক। এখন উপায় আছে সরকারী একটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি। তবু কোনোমতে পেটের ভাতটা হতে পারবে। সেইমতো তৈরী হতে বলো। পরীক্ষা দিক। মন দিয়ে পরীক্ষা দিলে পাশও করতে পারবে।'

না, প্রশ্রয় মা দেন না, তবে আড়ে যে চেয়ে চেয়ে দেখেন তা বহুদিন লক্ষ্য করেছে বিনু। মার দৃষ্টি বরাবরই তীক্ষ্ণ, তবে আগে একটা ধারণা ছিল, সম্ভ্রান্ত লোকদের কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই—এখন তাঁর স্বভাবের বহু পরিবর্তনের সঙ্গে সে মতেরও পরিবর্তন হয়েছে। ঐ আড়ে দেখাতেই অনেক কিছু দেখে নেন।

সুতরাং মা দুপুরে ঘুমোলে কিম্বা দাদা আপিসে বেরিয়ে যাবার পর মা যখন রান্নাঘরে রাতের খাবার করতে ব্যস্ত থাকেন বা দিনের অবশিষ্ট রান্না সারতে—তখন যা ঘন্টাখানেক সময় পাওয়া যায়। ভোরে উঠে লিখতে বসলে কৌতূহল হবে—কী এমন জরুরী লেখার দরকার হল।

আরও বিপদ, সেইবইগুলো পড়াও দরকার। মা অত বুঝবেন না, দাদা বোঝেন। তিনি একদিন একটা বই দেখেও ফেলেছিলেন, তিরস্কারও করেছেন খুব, যৌনতত্ত্বের বই পড়তে হয় ভাল ভাল বই আছে—তাই পড়ো। এসব চোতা বই শুধু এক শ্রেণীর লোকে উত্তেজনার খোরাক যোগাতেই লেখা হয়। মূর্খরা লেখে, মূর্খরাই পড়ে। তোমার এসব প্রবৃত্তি কেন?'

অগত্যা সেসব বই পুরনো কাগজের গাদায় ঢেকে রাখতে হয়েছে। লেখার গতিও সেই কারণে ইচ্ছা এবং শক্তি সত্ত্বেও দ্রুততর করা যাচ্ছে না।

এ বইগুলোর মূল্য বা মূল্যহীনতা বিনুও যে না বোঝে তা নয়। এর প্রয়োজন অন্য। ঐ প্রকাশক লোকটিকে সে বিলক্ষণ চিনে নিয়েছে। তিনি বিষয়বস্তুর নামটাই ভাঙিয়ে খেতে চান। এ বিষয়ে যে লেখবার কিছু নেই—তা তিনিও জানেন। তিনি ধোঁয়াই চান, বিনুও ধোঁয়া লিখতে পারবে। তার মধ্যে মধ্যে কিছু ইংরেজী বুকনি ও ইংরেজী বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, ধোঁয়াকে ধোঁয়া বলতে সাহস করবে না অল্পশিক্ষিত পাঠকরা। আর তারাই তো এ বই পড়বে। কোন্ বই থেকে এসব উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে তা কেউ জানবে না—মানে কোন শ্রেণীর বই থেকে। এখনও ইংরেজী ভাষার ঢের কদর আছে। কোন একটা গালভারি বইয়ের নাম থাকলেই পাঠকরা অভিভূত হবে। সেইজন্যেই এসব বই ওল্টানো দরকার।

দেরি হচ্ছে, দেরি হবে—তা মুরারিবাবুও জানতেন।

তিনিও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ওকে লেখা বাবদ কটা টাকা পাইয়ে দেওয়াটা তাঁর মাথাব্যথা, তাঁর কর্তব্য হয়ে উঠেছে যেন।

এর মধ্যে একদিন এসে বললেন, 'ইন্দ্রজিৎবাবু একটা ছেলেদের নাটক লিখে দিতে পারবেন? চট্ করে? সামান্যই টাকা দেবে, তবু তো নিজের উপার্জন। দিন না।'

যেন অনুনয়ের সুর তাঁর কন্ঠে।

ছেলেদের নাটক? সেটা আবার কি বস্তু?'

কথাটা শুনেছে বিনু, কিন্তু জিনিসটার সঙ্গে পরিচয় নেই।

'আরে, স্ত্রী-চরিত্র থাকবে না, ছেলেরা গল্পটা বুঝবে, অভিনয় করতে পারবে—এই আর কি! ছাপা চল্লিশ পৃষ্ঠার মতো হলেই হবে, ইস্কুলের ছেলেরা এক ঘন্টার বেশী টাইম দিতে পারবে না। 'চিতোর-গৌরব' পড়েননি? আমারও একটা বই আছে—'বৃন্দাবনের রাজা'—খুব চলে। দেখবেন? কাল দিয়ে যাবো।'

দেখার দরকার হল না। সেইদিনই বসে বিনু ছকে নিল ব্যাপারটা। ঐতিহাসিক নাটক সে লিখবে। ডালিম সিংহের গল্পটা মনে আছে, ছেলেদের বইতে বারো বছরের ছেলে নায়ক—সেই তো ভাল। সে পরের দিনই দু-তিনবারে একটানা লিখে সেই একদিনের মধ্যেই নাটকটা শেষ করে ফেলল। 'বালক বীর' নাম দিল। ওরই মধ্যে তিন অঙ্ক ছিল বোধহয়, গোটা পাঁচেক দৃশ্য।

ওঃ, মুরারিবাবুর সে কী আনন্দ! মনে হল এটা তাঁর একটা ব্যক্তিগত জয়লাভ হল। আমার প্রতি তাঁর বিশ্বাস মিথ্যা বা অন্তঃসারশূন্য প্রতিপন্ন হয়নি, বরং উল্টোটাই হয়েছে, এতেই আনন্দ বেশী এত।

তিনি সেই দিনই নিয়ে গেলেন এই নতুন প্রকাশকের কাছে।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর দোকান, পাঁচরকম গল্প উপন্যাসের বই আছে, বিভিন্ন প্রকাশকের। খুব যে একটা বিক্রী হয় তা হয় না। তবে দরকারও নেই। মুরারিবাবু বুঝিয়ে দিলেন, ও'দের জাতে গ্র্যাজুয়েট ছেলে এবং সচ্চরিত্র বড় বংশের—খুব বেশী নেই। কাজেই বি-এ পাশ করেছেন এই কৃতিত্বেই এক ধনী ব্যক্তি একমাত্র কন্যাকে ও'র হাতে দিয়ে কৃতার্থ হয়েছেন। সেই টাকাতেই এ দোকান করা।

(চলবে)
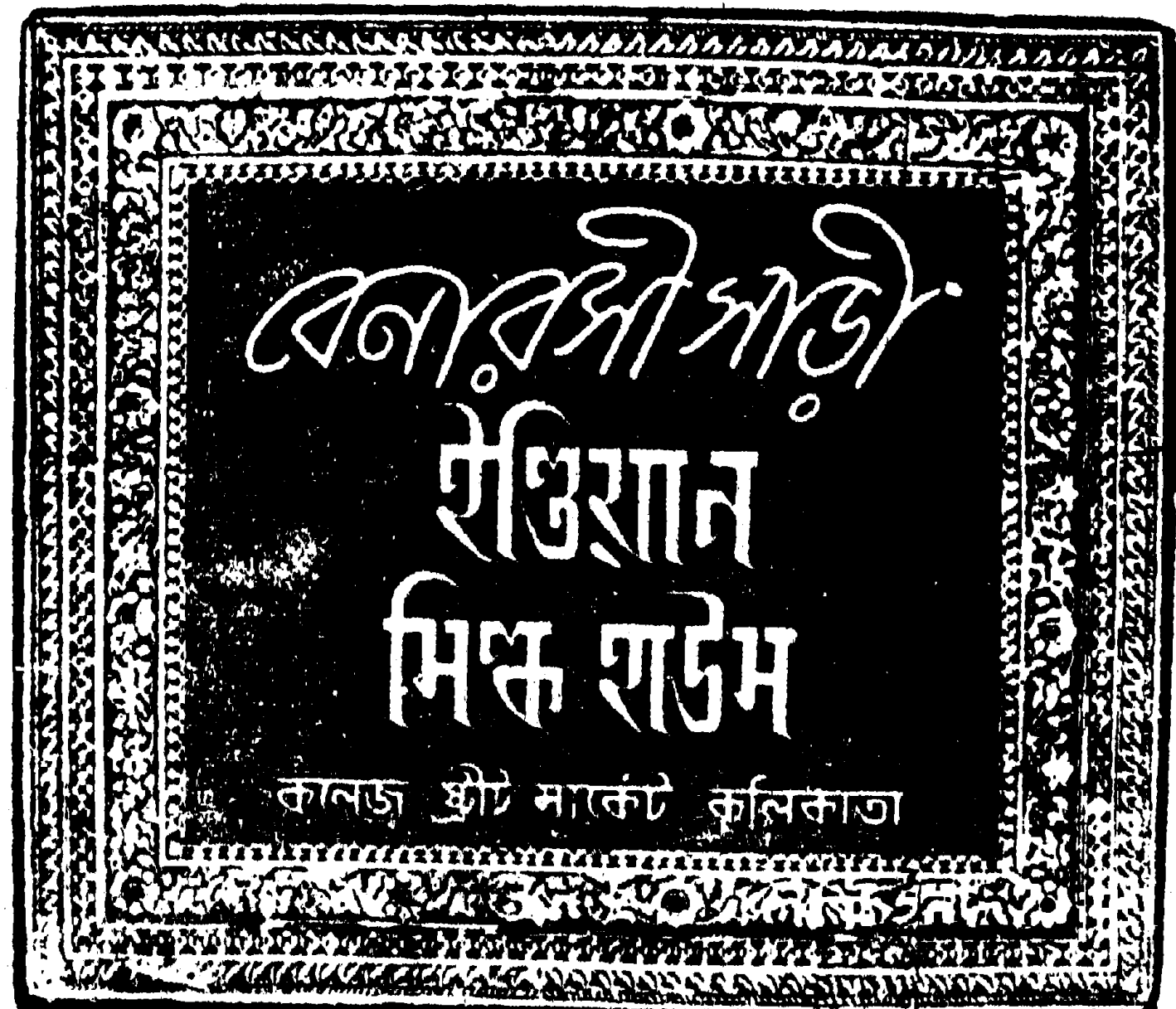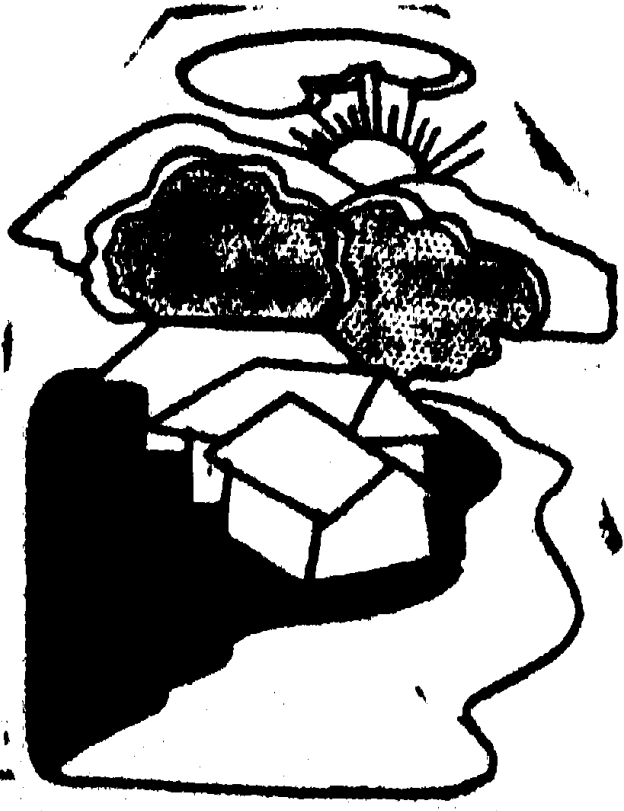
পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

ডাক্তার কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে, লাবণ্য ওর কথা শুনেছে কিনা বুঝতে পারে না। রাজকুমারী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালের উপর চলে আসা অবাধ্য চুল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আয়নার ভিতর থেকে তাকে দেখছে লাবণ্য। ফিসফিসে হাসির রেখা ওর মুখে। জিভটা বার করে আয়নার ভিতরের মানুষটাকে দেখাল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে লাবণ্য। মুখ চোখে মমতা ঘিরে রয়েছে।

ডাক্তার ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সে কপট চোখে লাবণ্যর দিকে তাকালো। লাবণ্য মুখ টিপে হাসছে। হাসতে হাসতে লাবণ্য আবার গম্ভীর।

তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ।

ডাক্তার সপ্রতিভ, কই না তো! ভঙ্গীতে লাবণ্য তার নিজের কথার সমর্থন খুঁজে পায়।

শরীরটাকে দেখ না কেন? লাবণ্যর হাত ডাক্তারের চুলের ভিতর। ডাক্তার লাবণ্যর গোটা দেহের স্পর্শ পাচ্ছে। তার দুচোখ জড়িয়ে আসে।

তুমি যখন আসলে, পিথাকে দেখেছো?

ডাক্তারের বুকের ভিতরে হাতুড়ি পড়ে। চুপ করে থাকে। চোখ জ্বলে উঠল। তার ভাল লাগে না পিথার কথা। লাবণ্য সারাক্ষণ ওর কথা বলে কেন?

আমার আর ভাল লাগে না এখানে আসতে। ডাক্তার আস্তে আস্তে বলেছে।

কেন?

সকলে কি ভাবে।

কেউ তোমায় কিছু বলেছে? লাবণ্য তার গায়ে প্রায় জড়িয়ে এসেছে।

না। ডাক্তার লাবণ্যর চোখে হাত রেখেছে।

তাহলে! লাবণ্য সরে দাঁড়িয়েছে। চোখে মুহূর্তে যেন বিদ্যুৎ সরে। ডাক্তার হাসছে, উঠে পালঙ্কয় বসেছে, 'ভাবতেও তো পারে, অসম্ভব কিছু নয়।'

লাবণ্যর সেই ব্ল্যাঙ্ক লুকিং। অনেকক্ষণ চেয়ে আছে তার দিকে তারপর কেমন ছমছমে কণ্ঠস্বর শোনে ডাক্তার, কি বলছো তুমি?

লোকে অন্যরকম ভাবতে পারে, এটা জান না। ডাক্তার আস্তে আস্তে বলে।

'না।' লাবণ্য দাঁতে চুল কাটছে, চোখের তারায় জোনাকী জ্বলছে নিভছে। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টির শব্দ।

ডাক্তার পাথর হয়ে বসে আছে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে মাটির দিকে। অতৈলাক্ত চুল হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কপাল-চোখের উপর।

লোকে বললেই তো সব হবে না! লাবণ্যর কণ্ঠস্বর মাটির মত। ডাক্তার রাজকুমারীকে দেখছে না। কণ্ঠস্বর কানে বাজছে।

আমি ঠিক বলছি তো। মানুষের কথায় কি আসে যায় বল! লাবণ্যর কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ। কতদূর থেকে শব্দটি ভেসে আসে। একেবারে হৃদপিন্ড ছেঁড়া শব্দ। কাঁপতে কাঁপতে তা বৃষ্টির শব্দে মিশে যায়।

তারপর কতক্ষণ সব নিথর। এলো লাবণ্য। পায়ের শব্দ হয় না। নতমুখ তুলে ধরল ডাক্তারের, চুপ করে আছ কেন। লাবণ্য ডাক্তারের চোখমুখে কোমল হাত ছোয়ার। একেবারে কাছাকাছি, মেয়ের নিঃশ্বাস পড়ছে ডাক্তারের বুকের উপর। ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, 'তুমি, তুমি আমার কি তা জান না—!

ডাক্তার মুখ তোলে। লাবণ্য উদ্দাম হাসিতে ফুলে যাচ্ছে। হাসির শব্দ বৃষ্টি, এই রাজগৃহের পুরনো গন্ধ সব মিলেমিশে অলৌকিকতার চিহ্ন।

(২৩)

সন্ধেয় হঠাৎ লাবণ্য এল। দীপঙ্কর নিঃঝুম হয়ে বসেছিল। কলাবনির রিপোর্ট সাজানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে একটা বই মুখে ধরেছে।

এমন সময়ে দরজায় কার পায়ের শব্দ। অস্পষ্ট নূপুর। দীপঙ্কর চট করে চেয়ার ছেড়ে ওঠে। লাবণ্য এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

—কি ব্যাপার হঠাৎ প্রজার ঘরে।

লাবণ্যর হাতে একটা বই। কচি কলাপাতা রঙের শাড়িটা ম্লান আলোয় অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে। হাতের চুড়িগুলো বেজে ওঠে!

—আসতে নেই বুঝি।

—আসুন।

—আপনার একটা বই ছিল আমার কাছে।

লাবণ্য বইটা নিয়েছিল সেই কবে। দীপঙ্কর ভুলে গিয়েছে ব্যাপারটা। লাবণ্য বইটা টেবিলের উপর রেখে হঠাৎ বসে পড়ে চেয়ারে।

—একা থাকতে ভয় হয় না? লাবণ্যর জিজ্ঞাসা।

—কিসের ভয়?

—এত বড় একটা ঘর। এই ঘরে আমার জন্ম হয়েছিল, ঘরটা গুদাম করে ফেলেছেন। দীপঙ্কর চুপ করে থাকে। লাবণ্য কেমন আলুথালু চোখ মুখে সারল্য। এমন মেয়েটিকে ডাক্তার কোন নেশার ভিতরে ফেলে দিয়েছে।

—ডাক্তারবাবুর খবর কি?

—কি জানি.! লাবণ্য চেয়ারে বসে পা দুলোয়।

—পিথা নায়েক?

লাবণ্যর চোখ হঠাৎ ঝলসে ওঠে, সে সামলে নেয় নিজেকে, 'আমি কি অনুসন্ধান অফিস, যার খবর তার কাছে।'

দীপঙ্কর পায়চারি করে, একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

—আপনি আমাদের ওখানে যান না তো। খুব বিমর্ষ কণ্ঠস্বর লাবণ্যর।

—প্রয়োজন হয় না। দীপঙ্কর আস্তে আস্তে জবাব দেয়।

—প্রয়োজন ছাড়া কি যেতে নেই। লাবণ্য ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

দীপঙ্কর দাঁড়িয়েছে। রাজকুমারী এই মেয়ে। এককালে সেই নামে ডাকা হতে পারত। এখন নয়। আভিজাত্য আছে।

—বাবুজী কেমন আছেন?

—যেমন থাকেন। লাবণ্যর কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট, মৃদু। বিষণ্নতা জড়িয়ে। এরপর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ, লাবণ্য আবার জিজ্ঞাসা করেছে, আপনার তদন্ত হ'লো,

নির্মলদা তো পারলেন না, আপনি।

—পারবো।

—পারবেন না বোধহয়। লাবণ্যর মুখে চিকচিক হাসি।

লাবণ্য হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে ঘরটা গুছিয়ে দেব?

—না থাক। দীপঙ্করের [illegible] টা ঝমঝম করে উঠছে।

—মঙ্গলাকে পাঠিয়ে দেব?

মঙ্গলা। সেই সন্ধে। মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত পায়ে যে জল ঢেলে দেয়। লাবণ্যর পা হাঁটু অবধি আলোয় মেলে ধরা থাকে। গা শিরশির করে ওঠে সেসব ভাবলে।

—কি দরকার। দীপঙ্করের কণ্ঠস্বরে সামান্য ঝাঁজ।

লাবণ্য ঘরের মধ্যে এলোমেলো হেঁটে বেড়ায়। দেয়ালে তার ছায়া বদল হয়। পায়ের শব্দ কখনো গভীর হয়ে বাজে।

—আপনি বোধ'য় একা থাকতে ভালবাসেন?

রাজকুমারী বড় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর হঠাৎ মাথায় হাত তুলে দিয়েছে। মায়াময় চক্ষু মেলেছে তার দিকে।

—এরকম রুক্ষ হয়ে যাচ্ছেন কেন, আগে তো এমন ছিলেন না। কেমন ফিসফিসে কণ্ঠস্বর!

—ভাল না লাগলে ওপরে আসবেন।

লাবণ্যর নিঃশ্বাস পড়ছে গায়ে। উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে। আলতো স্পর্শ লাগছে যেন? আপনিও যাবেন।

দীপঙ্কর বুক চাপা নিঃশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি যাবেন তো! লাবণ্যর হাত তার চোখমুখে প্রবাহিত হচ্ছে। দীপঙ্কর খুব আস্তে মাথা হেলায়।

লাবণ্য দ্রুত সরে যায় দেয়ালের কাছে। ছায়ার সঙ্গে মিশে গেছে। কথা বদল হয়ে গেছে মুহূর্তে. এই ঘরে আমার জন্ম হয়েছিল, ভাবতেই কেমন লাগে!

জানেন খুব ছোট্ট বেলার কথা মনে আছে আমার তখন তো রাজা নেই বাবুজী তবুও ঘোড়া ছিল, আমি ঘোড়ার পায়ের শব্দ, মাঝরাতে আচমকা ডেকে ওঠা সব শুনতে পেতাম, সেটা বুড়ো ঘোড়া।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের রাজকুমারীকে দেখছে, কথা শুনছে। লাবণ্যর চোখ আবছা হয়ে গেছে।

—সেই বুড়ো ঘোড়াটা একদিন তেজীয়ান ছিল, বাবুজীর খুব প্রিয়, তখন তো মোটরগাড়ি এদিকে এসে গেছে, তবু ঘোড়ায় না চড়লে বাবুজীর ভাল লাগত না। বাবুজী একদিন ঘর থেকে বেরোন বন্ধ করলেন, ঘোড়াটা আপনার ঘরের ওই পিছনে দাঁড়িয়ে ঝিমোত, বাবুজী আমাকে বলতেন একদিন ঘোড়াটা ছুটতে আরম্ভ করবে ঠিক। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লাবণ্য চুপ করে যায়।

—ঘোড়াটার কি হলো।

বাবুজী বলতেন, লাবণ্য, দীপঙ্করের কথায় জবাব দেয় না, ওই ঘোড়াটা নাকি আমাদের প্রথম পুরুষের সঙ্গী সেই সাদা ঘোড়ার বংশধর।

—তার কি হলো বলছেন না কেন? দীপঙ্কর স্পষ্ট উত্তেজিত।

—একদিন আধো ঘুম আধো তন্দ্রার ঘোরে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম, সেই সাদা ঘোড়াটা ডানা মেলে পক্ষীরাজ হয়ে উড়ছে আকাশে, রাজবাড়ির দেউড়িতে ভৈরবীর সুর।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঝিমোত, তার কি হলো বলুন? দীপঙ্করের কণ্ঠস্বর চড়া। লাবণ্য নিজের মনে কথা বলছে, দীপঙ্করের কণ্ঠস্বর কানে যায় না বোধয়, ঘোড়াটা একেবারে মাটিতে, ডানা দুটো গায়ের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার কষ্ট হচ্ছে ভীষণ, দেখছি ঘোড়াটার চারটে পায়ে দগদগে ঘা, চোখ দুটো মরা মাছের মত স্থির। ওর নিঃশ্বাস নেই, স্পন্দন নেই, পাথর হয়ে গেছে বোধয়।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মরে গেল?

'নাহ্, আপনি জানেন না', লাবণ্য জ্বলে ওঠে, মরা ঘোড়া কখনো দাঁড়িয়ে থাকে না, যতক্ষণ ও দাঁড়িয়ে ততক্ষণ ওতে প্রাণ আছে, ওর দেহে গতিময় রক্ত আমি তো ওকে শুয়ে পড়তে দেখলাম না। লাবণ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, ঐভাবেই ঘোড়াটা মরে গেল, কল্যাবনি নিথর, রাজকন্যা—। দীপঙ্কর কথা শেষ করলো, লাবণ্যর চোখ ওকে বিদ্ধ করছে।

আপনি ভুল জানেন। লাবণ্য গর্জে উঠেছে। হাসফাস করছে। দেয়ালে পিঠ রেখে নিজেকে রক্ষা করছে।

—এখন তো আমার গল্প, মৃত অশ্বের দেহ মাটিতে একাকার হয়ে গেল, রাজবংশ! অশ্ববিহীন এ রাজবংশ মানায় না।

—আপনি চুপ করুন। লাবণ্য নুয়ে বসে পড়েছে মাটিতে।

দীপঙ্কর যেন হাতের মুঠোয় সমস্ত কলাবনিটাকে ধরে ফেলেছে। বেশ লাগছে এখন। ঐ অন্ধকারে রাজকুমারী বসে আছে। একটু আগে তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল লাবণ্য। কপালে চোখে এখনো লাবণ্যর স্পর্শ জেগে আছে।

—আমি দারুণ গল্প জানি, রূপকথার গল্প। রাত দুপুরে এখানে জেগে থাকলে সেইসব গল্প মনে পড়ে. রত্নভূষণে ভূষিতা রাজকন্যা চতুর্দোলায় চেপে নদীতে যায় অবগাহনে। তার মেঘের মত কেশের একটি ভাসিয়ে দিল জলে, অন্য রাজ্যের রাজপুত্তুর সেই কেশ দেখে কেশবতীর সন্ধানে সন্ধানে বৃদ্ধ হয়ে গেল, হিজল কাঠের নাও আর মনপবনের দাঁড়, রাজকুমারীর সন্ধান করতে পারে না। রাজকুমারীর দেহ থেকে একটি অলঙ্কার হারিয়ে গেছে নদীতে, তা উদ্ধার করতে শতশত যুবক আত্মবিসর্জন দিল নদীতে। রাজকুমারী ফিরে আসছে রাজগৃহে, ঠোঁটের কোণে দু' চোখে অস্পষ্ট হাসির চিহ্ন—!

—আপনি থামবেন:

—শেষটা শুনুন, আপনি তো জানেন সবই, রাজকুমারীর অলংকার হারায়নি নদীতে এ খবর রাজ্যের কেউ জানল না।

লাবণ্য হাসছে। চোখের তারায় আলো ফুটেছে, আপনি এত জানেন! ঐ যে বাইরের বাগানের ঐ শিউলি গাছটার নিচে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকত আসুন দেখবেন আসুন। লাবণ্য হঠাৎ এগিয়ে দীপঙ্করের হাত ধরেছে। কোথায় যেতে হবে?

আলোটা আনুন, এইতো পিছনের বারান্দায়।

ওপারে পাঁচিল। পাঁচিল আর রাজবাড়ির টুকরো জমি। সেখানে গাছগাছালি। অন্ধকারে সব অদৃশ্য জোলো বাতাস আঘাত করছে তাদের। লাবণ্যর আঁচল উড়ছে। সে অবাধ্য আঁচল শাসন করে দীপঙ্করের ঘন হয়েছে। দীপঙ্কর আলো ফেলে। স্থলিত অন্ধকারে ভুতুড়ে গাছটা দেখা যায়।

বিশ্বাস হলো! ঘোড়াটা একদিন পালিয়ে গেল এখান থেকে। লাবণ্যর কণ্ঠস্বরে কেমন মাদকতা, এখন কি রূপকথার বয়স আছে?

—বয়স তৈরী করে মানুষ। দীপঙ্কর অন্যমনস্কের মত জবাব দেয়।

দীপঙ্কর ইচ্ছে মত টর্চের আলো এপাশ ওপাশ ফেলছে। তারপরই হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে সরে আসে। ওপারে লাবণ্য। মাঝে সরু জোরালো আলোয় আলোয় জেগে উঠেছে একটা কালোসাপ। মোটা-সোটা, ছোট সাইজের। যেন মেঝে ফুঁড়ে উঠে এল। দীপঙ্কর চিৎকার করে উঠেছে।

—আলোটা ধরে থাকুন ভয় নেই, বাস্তু সাপ, কতকালের, দেখছেন না বয়সে বয়সে লেজ খসে বুড়ো হয়ে গেছে। লাবণ্যর কণ্ঠস্বর ওপার থেকে আসছে।

একদিন কখন সন্ধ্যার সময় কলাবনির রাজগৃহে প্রথম ঢুকে পড়েছিল বাইরের মানুষটা, দেউড়িতে এই রকম কে যেন শুয়েছিল। তীব্র বিষগন্ধ ভাসছে। ওপারে নাচের মুদ্রায় লাবণ্য। সাপটা তীব্র টর্চের আলোয় নিশ্চল।

—কোন ভয় নেই, ওকে মারবেন না। লাবণ্যর কণ্ঠস্বরে মিনতি:

দীপঙ্কর দেখছে সাপটা আস্তে আস্তে ফণা নামিয়ে নিল। সে এক ঝটকায় সরে আসে ঘরের দিকে। লাবণ্যর কাঁচ কলাপাতা শাড়ি অন্ধকারে নীল হয়ে গেছে। সাপটা আস্তে আস্তে নেমে যায় মাটিতে। লাবণ্য কোথায়!

দীপঙ্কর শোনে, লাবণ্যর ত্রস্ত পায়ের শব্দ ক্রমশঃ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সে একা হয়ে গেল। ভীষণ একা। এতক্ষণ কি হয়ে গেল! অন্ধকারে ছায়ার

মত কে এসে দাঁড়িয়ে ছিল এখানে। তারপর! ঐ গাছটার নিচে সেই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকত! বোঝা যায় না। সেই দেউড়ি থেকে পুরনো সাপটা আস্তে আস্তে রাজ অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে এতদিনে। এসব কখন হয়ে যায় বোঝা হয় না।

*

রাত হয়ে গেছে রাজবাড়িতে ঢুকতে। এখন কিছুক্ষণ বসে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। যদি না ফিরতে হত! বুকের ভিতরে পাহাড় নিয়ে অন্ধকারে ভূত হয়ে থাকা রাজবাড়িতে ডাক্তার ঢুকে পড়েছে।

আজ বিকেলে কি একটা কান্ড ঘটে গেছে। মহাবিস্ফোরণ। ডাক্তার বোস ভয় পেয়েছে।

এমন হয়ে যাবে ভাবেনি। ভাবনায়ও আসেনি। নির্মল মজুমদার মুছে গেছে নিশ্চিত। লাবণ্যর কোন আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয় না তার। কেননা তাহলে অত সহজে সব মুছে যায় না। লাবণ্য খুব সরল। লাবণ্য তাকে বুঝেছে কিনা ডাক্তার জানে না। আজকাল কেন যেন মনে হয় রাজকুমারী তার কথা সারাক্ষণ ভাবে। ভালবাসে। প্রকাশ হয়েও সব প্রকাশ হয় না কেন। সেই দুপুরে তো লাবণ্য বলে দিতে পারত মনের কথা। ডাক্তারের চোখ তো ভুল করে না। লাবণ্যকে শুধু ধরতে পারে না। হাওয়া ভেসে যায় রাজকুমারী।

আজ সন্ধ্যায় নাচনাগুড়ি হাট থেকে ফেরার পথে মদে টালমাটাল [illegible] পিথো নায়েক ঢুকে পড়েছিল তার হেলথ সেন্টারে। ঘরে তখন সে একা। মাটিতে বসে ঐ বিশাল মানুষটা গড় গড় করে বলে দিল রাজকুমারী তাকে ভালবাসে। সেও রাজকুমারীকে ভালবাসে। মন্দিরে খুব ভোরে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পিথো। টলমল পিথো নায়েক বার বার বলছিল, ডাগদার সাব তুই রাজাবাবুর লোক, রাজকনিয়া মুরে পিয়ার করে ঠিক, রাজকনিয়া দেবীর মতন, তুরে রাজকনিয়া বিশ্বাস করে, মুর কথা কহিস উহারে।

ডাক্তার কেঁপে গেছে। তারপর আলতো কথায় পিথোকে আশ্বাস দিয়ে বার করে দিয়েছে ঘর থেকে। ডিসিসন নিতে বিলম্ব হয়নি। বেরিয়ে পড়েছে অন্ধকারে। আকাশে চাপ চাপ মেঘ, অন্ধকার গাঢ়। সব ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে ডাক্তার বোস।

ডাক্তার ভয় পেয়েছে। ভাবতে চেষ্টা করছে লাবণ্য কেন পিথোর কথা বলে। ডাক্তারের দেহ জ্বলে যাচ্ছে। ভয় ছিল তো দীপঙ্কর চৌধুরীর কাছে। তা অমূলক হয়ে গেল। একটা মদোমাতাল লেঠেলের বাচ্চা! [illegible] কাছে লাবণ্য শেষ পর্যন্ত সমর্পণ করল নিজেকে। দীপঙ্কর হলে এত ক্ষোভ হত না।

[illegible] ভিতরে বিস্ফোরণ হয়ে [illegible] এর চেয়ে দীপঙ্করও চৌধুরীও ভাল ছিল। হেরে যাওয়ার স্বাদ ছিল। চৌধুরীর ভয় কাটিয়ে উঠেছে সে। সব ভুল হয়ত! পিথোর কথা যেন ভুল হয়! লাবণ্য তো ওরকম নয়।

ডাক্তার বোস ভয় পাচ্ছে। সাইকেলটা রেখে দিয়েছে বারান্দার কোণে। এখন কি করবে। সে খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে। কয়েক পা এগোতেই দেখে কে একজন অন্ধকারে আবছা হয়ে দুলতে দুলতে বারান্দা বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কে? লাবণ্যর কাছে সে এখন একা যাবে, কি করে যাবে।

যে লোকটা দুলতে দুলতে যাচ্ছিল সে হঠাৎ দাঁড়িয়েছে। ডাক্তারকে দেখছে। এখন যদি দীপঙ্কর চৌধুরীকেও পাওয়া যেত ডাক্তার স্বস্তি পেত। না আসলেই বোধহয় ভাল হত আজ। এতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত হয়নি। মদের ঘোরে ঐ লোকটা কি বলল তাতেই তার সব বিশ্বাস হয়ে গেল। তাহলে লাবণ্যতে ভরসা নেই ওর। লাবণ্য কখন সরে যায় তার কাছ থেকে সেই ভয় পাচ্ছে ডাক্তার। লাবণ্যর সারল্য! ডাক্তার মাথা ঝাঁকাতে থাকে। এখন চারপাশের অনেককে ভয় হয়। ডাক্তার দাঁড়িয়েছে।

কে তাকিয়ে আছে এদিকে? বাড়ির কর্মচারী হবে হয়ত। এখন লাবণ্যর সামনে একা দাঁড়াতে ভয় হচ্ছে তার। ওই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যকে ফেস করলেও সে বাঁচত। তারপর না হয় লোকটা চলে আসবে। ডাক্তার তখন লাবণ্যর সঙ্গে একা। তাতে অসুবিধে কি। প্রথমটাই তো আশঙ্কার। অন্তত আজ। পিথোর কথাগুলো মনের ভিতরে বিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই কি লাবণ্য পিথোর কথা বলে অত। এখন এই লোকটা খুব সামান্যক্ষণ তার আর লাবণ্যর মধ্যে থাকুক।

ডাক্তার এগিয়ে যায় অন্ধকারে। চারদিক নিঃঝুম। কেমন থমথমে ভাব। ডাক্তার দেখছে তাকে। চাষী মুনিষ হবে হয়ত। হোক না। লাবণ্য মমতাময়ী। কাউকে কষ্ট দেয় না। সে লোকটাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। লোকটা হুড়মুড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়! জিজ্ঞাসু চোখ অন্ধকার।

—আমাকে একটু ভিতরে নিয়ে যাবে?

লোকটা আঁ আঁ করে কি যেন বলতে চায়। কথা জড়িয়ে যায়। বোবা গুহিরাম ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রবল আবেগে ফুলে উঠছে। দুটো হাত নাড়ছে। সব অবোধ্য থেকে যায়।

ডাক্তারের গা ছমছম করে ওঠে বিস্ময়ে। বোবা মানুষ। এই অন্ধকারে লাবণ্যর কাছে যাওয়ার জন্য তার একজন মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু যাকে পেল সে বোবা। যে কথা বলতে পারে না তাকে সঙ্গে নিয়ে কি হবে? এতো এই রাজগৃহের লোক নয়। ডাক্তার নিঃশ্বাস চেপে দ্রুত অন্ধকারে এগিয়ে যায়।

গুহিরাম অস্ফুট চিৎকার করে দাঁড়িয়ে থাকে। কে এল কি বলল বোঝা গেল না কিছুই। এই রাজবাড়িতে কালেভদ্রে ঢুকেছে। ভয় পায় ঢুকতে। এত ঘর, বিশাল ব্যাপার, আশ্চর্য সব মানুষ। এদের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। আজ সন্ধ্যের পর রজনীবাবুর বাড়ির কাজ সেরে সে নদী পার হয়েছিল খেয়ায়। এখন নদীতে জল এসেছে। নদীর ওপারে যেতেই কি যেন হয়ে গেল ভিতরে। এখানে মোটরবাস থামে। একদিন এখানে একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মানুষটা ভাল। তার তাই মনে হয়। সে কথা বলতে পারে না। তবু তার কথা বোঝার চেষ্টা করেছিল ঐ মানুষটা। গুহিরাম তাকে কলাবনি চিনিয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যেয়। তখন নদীতে পাতলা জল ছিল। হেঁটে পার হওয়া যেত। এখন নদীর চেহারা বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে কলাবনি। রজনীবাবু যেন ভাবনার ভার অনেকটা মুক্ত হয়েছে। গুহিরাম সেই মানুষটার কথা ভাবে। তারপর আবার খেয়া পার হয়।

আজ রজনীবাবুর বাড়িতে খুব কষ্ট গেছে। গোটা চারেক চড় পড়েছে গালে। রজনীবাবুর জমির সমস্যা কি মিটে গেল? তাই রজনী আবার আগের মত হয়ে যাচ্ছে। কাজে ভুল হচ্ছিল আজ। বুকটা ভার হয়েছিল। নদীর পুব কোণে কোলের বাচ্চাটাকে পুঁতে দিয়েছে কাল মাঝরাতে। অত রাত্তিরে ডাক্তার পায়নি। অম্বুজবাবু কলাবনিতে নেই। বাচ্চাটা অনেক দিন ধরে ভুগছিল। ঘরে বউ থম মেরে আছে কাল রাত থেকে। সকালে সে বেরিয়েছে কাজে। এখন ভাদ্রের আরম্ভ। অভাবের দিন। একদিন কামাই হলে পেটে ভাত জোটে না।

বাচ্চাটা মরেছে সে কথা বউ জানে আর সে। রজনীবাবুকে বলতে পারেনি। বলতে পারেনি রজনীবাবুর বউকেও। কি করে বোঝাবে। সারা দিন ভার হয়ে আছে মন। বার বার কাঁসাইয়ের পাড়ের কথা মনে পড়েছে। আজ ফেরার পথে সেখানে যাবে একবার, জন্তু-জানোয়ারে মাটি খুঁড়ে ফেললো না তো! সেই ভাবনায় কা[illegible] ভুল হয়েছে। হাতের কাজ ফেলে চ[illegible]প বসে থেকেছে। রজনীর চড় পড়েছে গালে। অন্য কোন মানুষের গায়ে হাত দিতে পারত না রজনী। গুহিরাম নদী পার হয়ে কাঁসাইয়ের পাড়ে যায়নি, আবার ফিরে এসেছে কলাবনিতে। রাজবাড়িতে।

তার বেদনার কথা কেউ বোঝে না। একটু আগে একটা মানুষ গেল, বড় ডাক্তার। বাচ্চাটা মরে যাওয়ার পর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল। গুহিরামের মাথা নত হয়ে যায়। ডাক্তারকে দেখে সব বলতে চেয়েছিল আবেগে। বলা হয়নি।

সেই লিকলিকে চেহারার চশমা চোখে ফর্সা বাবুটির কাছে যাবে গুহিরাম। সেই মানুষটা একদিন তার কাছে কলাবনি চিনেছিল, আজ ও বুঝবে সব কথা। বুকের ভিতরে বেদনা পাহাড় হয়ে আছে। সব কাউকে বলতে পারলে হাল্কা হয়ে যেত। তার [illegible] কাল মরেছে, আজ রজনীর অপমান গায়ে বাজল। গুহিরামের চোখ ছলছল করে অন্ধকারে।

বাবুর ঘর কোনদিকে। রাজবাড়িটা গা ছমছমে। গুহিরামের মাথার দুলুনি কমে গেছে। মুখের হাসি নেই। বাবুর ঘরের কথা কাকে জিজ্ঞাসা করবে? কি ভাবে? কেউ তো তার কথা বুঝবে না। হাসবে। মজা করবে। বড়জোর জোতদারের দালাল বলে মা মারবে।

গুহিরাম বারান্দা দিয়ে এগোয়। নাট-মন্দির। এখানে কি বছর দুর্গা পুজো হত। এখন হয় না। ও ধারে বড় মন্দির। এখন থমথমে। রাজবংশে কুলদেবতা থাকেন ওখানে। গুহিরাম সেদিকে এগোয় না। আস্তে আস্তে পা চালায়। এই এত বড় বাড়ি, এখানে কোথায় সেই বাবু থাকেন? অন্ধকারে শব্দ হয়। গুহিরাম চমকে ওঠে। কোথায় কে যেন কথা বলে। গুহিরাম স্তব্ধ হয়ে কান পাতে। কানও সবল নয়। আগে কিছু শোনা যেত না। এখন অনেক শব্দ বুঝতে পারে। কথা শুনতে পায়। তবে সব খুব আস্তে আস্তে। কাছের মানুষের কথা মনে হয় বহুদূর পাহাড় নদী পেরিয়ে ভেসে আসছে। তাই গুহিরামের মনে কাছের মানুষ কেউ নেই।

এটা বাইরের মহল। খুব অল্প বয়সে সে একবার এসেছিল। আগে সন্ধ্যে হতেই রাজবাড়িতে হাজারটা চাঁদ হেসে উঠত। ঘড়ঘড় শব্দ। বিজলী বাতি জ্বলত। সব ঘর খোলা থাকত। কত মানুষ। রাজাবাবুকে একবার দেখেছিল। ঘোড়ায় চড়ে ঝট করে ঢুকে পড়লেন সিং দরজা দিয়ে। এক-মুহূর্তের দেখা। আজ এই সন্ধ্যায় সব কোথায় হারিয়ে গেছে। আলো নিভে গেছে। সব মানুষ পাথর হয়ে পড়ে আছে রাজ-বাড়ির আনাচে কানাচে।

তার জন্য এখন একটা মানুষ চাই। গুহিরাম তার নিজের কথা জানাবে তাকে। তার বেদনার কথা। সে আর পারে না। কিন্তু ভূত অন্ধকারে মানুষ কই? গুহি-রাম পায়ে পায়ে এগোয়। এক একটা করে দরজায় চাপ দিতে থাকে। অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝে সব ঘরে তালা লাগানো। পুরোন দরজা মরচে পড়া তালায় আচম্বিতে শব্দ হয়। তার গা শিরশির করে। আস্তে আস্তে এগোতে দেখে সব ছমছমে। আবার কোথায় যেন কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে। বাবুর ঘর কোথায় সেই বাবুর কাছে গিয়ে সে বাচচা মরার কথা বলবে। বলবে ভাদ্র মাস বড় কষ্টের। জীবন আর থাকে না।

সে এ-ঘর ও-ঘর করে চরকির মত ঘুরপাক খায়। আলো নিয়ে দূরে কে যেন সরে যায়। গুহিরাম চিৎকার করে ডাকতে চায় তাকে। পারে না। কোথায় যেন কণ্ঠ-স্বর। গুহিরাম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে কথা বলতে। এখন যদি বাবুকে না ডাকতে পারে, কোন মানুষকে না বোঝাতে পারে, তাহলে এই অন্ধগোলকে সারা রাত ঘুরতে হবে। তার গলা ফুলতে থাকে, অন্ধকারে চোখ স্ফীত হয়ে ওঠে। শিরা উপশিরা ফুলে ওঠে। দুটো হাত মুষ্টি বদ্ধ। বুকের ভিতরে বাতাস গভীর হয়ে আছে। গুহিরাম থরথর করে কাঁপতে থাকে। কই, কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না! হঠাৎ অন্ধকার কেঁপে যায়। বীভৎস আঁ আঁ চিৎকার উঠেছে। গুহিরাম নুয়ে পড়ে।

*

ঘরে এসে লাবণ্য হাঁসফাঁস করছিল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে পালঙ্কতে। মাথার কাছে অবহেলায় পড়ে আছে একটা সস্তার উপন্যাস। দুপুরে পড়তে পড়তে ফেলে রেখেছিল। সেই ভাবেই আছে। চোখের সামনে দীপঙ্কর চৌধুরীর মুখটা ভাসছে।

এতক্ষণ কি হয়ে গেল। বড় সাহসী হয়ে উঠেছে আজকাল। হবে না, আমার রক্তে তো রাজবংশ প্রবাহিত হচ্ছে। ঘোড়ার গল্পটা তো সত্যি। দীপঙ্কর চৌধুরী গল্পটার যেভাবে শেষ করল সেটাও সত্যি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো ঘোড়াটা মরে গেল। বিশ্বাস হয় না। তার সঙ্গে সঙ্গে রাজ-বংশের শেষ।

লাবণ্য হঠাৎ উঠে বসে। দাঁতে চুল কাটছে। যা বলেছে দীপঙ্কর চৌধুরী তার সব ভুল? লাবণ্য পালঙ্কের গায়ে সেট-করা
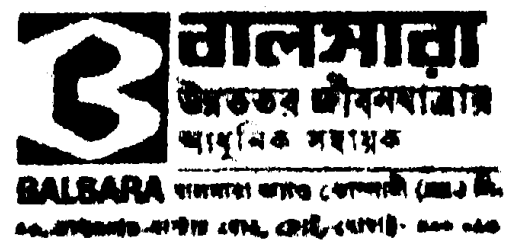
আয়নার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে। কপালের গোল টিপটা থেতলে গেছে। চোখ দুটো চকচক করছে। পিছনে আলো। আলোর প্রতিবিম্ব আয়নায়। তাই লাবণ্য অস্পষ্ট।

রাজকন্যেরা খুব সুন্দর হয়। খুব সুন্দর। আমার মত? আমি কি রাজকন্যা! রাজ্য তো আর নেই। ঐ লোকটা বলল, রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। লাবণ্য মেঝেতে নেমে দাঁড়ায়। দেয়ালে বড় অয়েলপেন্টিংস চারখানা। প্রহরাজ বংশের শেষ চার রাজপুরুষের। লাবণ্য তাদের দিকে আশ্চর্য চোখে চেয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো থিরথির করে কাঁপতে থাকে। যে রাজ-পরিবারের কথা বইয়ে লেখা থাকে তার সঙ্গে তাদের কোনটাই মেলে না। ভাঙ্গা ঝাড়-লণ্ঠন মাকড়সার জাল সব আড়াল করেছে। বাড়িটা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একাংশ ভেঙ্গে পড়েছে। পালঙ্কের পায়াতে উই ধরেছে। কতদিন ভেবেছে সব পরিষ্কার করে নেবে। হয় না। আর বোধহয় হবে না। দীপঙ্কর চৌধুরী আজ যেভাবে রক্ষা করলো নিজেকে, লাবণ্যর হার হলো। লোকটা আসবে না নিশ্চিত।

মানুষের চোখ দেখে মন বোঝা যায়? লাবণ্য নিঃঝুম হয়ে যায়। মাথার ভিতরে ভাসতে থাকে বয়স্কমুখ, নির্মল মজুমদার, ডাক্তার ঘোষ, পিথা নায়েক...আরো আরো অনেক পুরুষ ছুটে আসুক এখানে।

সে রাজকন্যা। এ তল্লাট জুড়ে সকলে জানে রাজকন্যার নাম লাবণ্যময়ী। মমতায় ভরা মুখ। হীরে মানিক্য নেই সর্বাঙ্গে। শাড়িটাই খুব সাধারণ। দশজনের মত। লাবণ্যর ঠোঁট কাঁপছে? দেবী প্রতিমার দু চোখ জলে টলমল করছে। দীপঙ্করের রূপকথার গল্পটাও তো সত্যি।

আমাকে বুঝে ফেলেছে ঐ লোকটা। একটা মিথ্যে কথায় কত যুবক নদীতে বিসর্জন দেয় নিজেকে। এসব তো কেউ জানে না। এ রূপকথা তো বুড়ো হয়ে গেছে। এত গল্প বলে ডাক্তারদা সেও বোঝেনি। এ গল্প কেউ জানে না। ঐ লোকটা বুঝলো কিভাবে? ভিখা বুঝে ফেলে আমায় অন্ধকারে নষ্ট করতে গিয়েছিল। সেও তো এখন নেই। তার ভাই পিথা নায়েক। মস্ত পুরুষ।

লাবণ্য থমথমে হয়ে যায়। দেয়ালের রাজপুরুষের চোখ তাকে বিদ্ধ করছে। ঠিক এইরকম পোশাক, মুখটাও তারুণ্য। সে মুখ কেমন! তার চারপাশে অগণিত মানুষ খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্তব্ধ হয়ে আছে খোজাপ্রহরী। এমন সময় এলো সেই দুর্দম পুরুষ। কোথায় সেই ঘোড়সওয়ার। রাজগৃহের মুখে এসে পাথর হয়ে গেল। লাবণ্যর সর্বদেহ কাঁপতে থাকে।

নির্মল মজুমদার। বড় বয়স্ক ছিল মানুষটা। তাপিত। সে হয়েছিল মেঘ। মেঘে বাজ আছে তা জানত না মানুষটা। কেমন চোখ কেমন মুখ, হঠাৎ বিষাদ এসে ভর করে লাবণ্যতে। কোথায় চলে গেছে সে। আর চিঠি আসে না। ভুলে গেল। লাবণ্য দু হাতে মুখ ঢাকে। অন্ধ চোখের ভিতরে আর এক মুখ।

ঐ কি আমার রাজপুরুষ! সব গোপন রাখে যে সে কি করে রাজবংশের হয়। গোপনীয়তা ওর স্বভাব। ডাক্তারদা মানুষটা তাকে ছাড়ে না। জড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ। নির্মল মজুমদারকে সহ্য করতে পারেনি। চারপাশের গুঞ্জনে লাবণ্যও ভয় পেয়েছিল। সরে এল। মন থেকে তবুও তো বয়স্ক মানুষটা মুছে যায় না। সব ছাপিয়ে ওর মুখ বার বার ভেসে ওঠে কেন! লাবণ্য নিঃঝুম হয়। ডাক্তারদা ঐভাবে জড়িয়ে যায় কেন। সাহস নেই। জোর করে অধিকার করতে পার না। কিসের ভয়।

এখন ধু ধু অন্ধকার বাইরে জড়িয়ে আছে। আকাশে ঘন মেঘ। সেই অন্ধকার বেয়ে বয়স্ক পুরুষটা হেঁটে আসছে। তাকে অগ্রাহ্য করল রাজকন্যে। অপমানও। তবু অন্ধকারে হেঁটে আসে। আজ দুপুরটা ছিল মেঘ মেদুর। এই বর্ষার দুপুরে তার কথা গভীরভাবে জেগে ওঠে। তখন ডাক্তারদার কথায় সায় দিল লাবণ্য। বুঝেছিল, ডাক্তারদা আর একজন মজুমদার হতে চায়। মজুমদারের সমস্ত রহস্য জেনে নিয়েছিল লাবণ্য।

বড় চতুর মানুষ। ঐ সম্পর্ক! লাবণ্য শিউরে ওঠে। হয় নাকি! বড় কুৎসিত ঐ মন। ঐ মন তার কাছে সমর্পিত এটা ভাবতে বেশ লাগে।

আমি তো রাজকন্যা। আমার রূপ, এ দেশে কোথাও নেই। আমার মমতা, আর কারোর নেই। আমার দেহের রক্তও নেই। যদি আলো নিভে না যেত, যদি রাজপুরীর সকলে পাথর না হতো, তাহলে কি হত! আমি ভাবতে পারি না। ভয় করে। আমার দুটো হাত বোধহয় আকাশে উঠে যেত।

বাবুজীর কুষ্ঠ। নির্মল মজুমদার কি করুণা করতে এসেছিল আমায়? লাবণ্যর দাঁতে দাঁত ঘষে যায়। সে হাসে। গোপন হাসি। রাজকুমারী ফিরছে চতুর্দোলায়। তার অলঙ্কার তারই আছে। করুণা তো সে করেছিল। তখন মনে হত না করুণার কথা। এখন মনে হয়।

পিথা বড় সাহসী। না হলে লেঠেলের ছেলে কিভাবে তাকে চায়? ওর ভাই ভিখাও সাহসী ছিল। হ্যাঁ, পিথার চেয়েও। যখন লাবণ্য এড়াতে চেয়েছিল ভিখাকে, ভিখা তেজীয়ান হয়ে অধিকারে আনতে গিয়েছিল তাকে। সে অধিকার প্রয়োগের নাম এখন লাবণ্য বলে অন্যরকম। নষ্ট হয়ে গেছে সে। পিথা অতটা দুর্দম নয়। দুর্দম নয়, নিশ্চুপ তার দিকে চেয়ে থাকে। তাকে এত দেখার আছে ঐ পুরুষটার। পিথার দিক থেকে কোন ভয় নেই। পিথা তার দক্ষিণের পুরুষ। সমস্ত রাত নির্ঘুম কাটিয়ে শুধু তাকে দেখার জন্য রাজবাড়িতে ফিরতে পারে। কোন ভয় নেই ওকে। সে নিশ্চিন্ত।

ডাক্তারদা কেমন লাবণ্য জানে না। ভালবাসে তাকে। লাবণ্যর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভাল না বাসলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে দৌড়ে আসে কেন? এতো সেই পুরুষ যে গোপনে রাজকন্যাকে কামনা করতে করতে বৃদ্ধ হয়। দাঁত-চুল পড়ে যায় মানুষটার। কোন দিন প্রকাশ করতে পারবে না মনের কথা। প্রকাশ করতে দেবে না লাবণ্য। ডাক্তার ঘোস লাবণ্যর উত্তরে থাকে। লাবণ্য ঝিমঝিমে হয়ে বসে থাকে। একদিন এখানে হয়ত উন্মুক্ত তরবারি কাফ্রী বসে থাকত। ঘুমন্ত রাজকন্যা পাহারা দিয়ে দিয়ে সেই প্রহরী বৃদ্ধ হত। সারা জীবন সে কামনা করত রাজকুমারীকে। ডাক্তারের মুখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ক্রমশ)

অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

এবং এই কাগজ সম্পাদনা করতে করতেই কয়েকটা বছরের মধ্যেই চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চি নিয়ে অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ মেয়ে স্কুলের পাণ্ডিতী করতে শুরু করলেন। বাইশ নম্বর বেনেপুকুরে বাড়ি ভাড়া করে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় বসল। এটা মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল। যোগ কবি প্রথম। মিস এ্যাক্রয়েড, ভবিষ্যতের মিসেস হেনরি বেভারিজ, তখন বিলেত থেকে সদ্য এসেছেন কলকাতায়। তাঁরই উদ্যোগে এই স্কুল। আর পণ্ডিত হবে কে? না, এই দ্বারকানাথ। কি সে কাহিনী বিশদভাবে বলার আগে বাংলাদেশে মেয়েদের স্কুল বসাবার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার একটা হদিশ নেবার চেষ্টা করা যাক। সে কাহিনীর যবনিকা উঠেছিল কলকাতা থেকে অনেক দূরে বারাসত বলে এক গণ্ডগ্রামে। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্যের 'চোর বাগানের পুষ্পো' পিয়ারীচরণ সরকার সেই ঘটনার নায়ক। শিক্ষাব্রতী এই মানুষটির 'ফাস্টবুক' পড়েই সেকালের—এমন কি স্বাধীনতাপূর্ব বাঙ্গালী ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষা শুরু হত। বারাসত সেকালের মফঃস্বলে বেশ নামকরা জায়গা। ইংরাজ শাসনের প্রায় শুরু থেকেই মিলিটারী একটা ব্যারাক ছিল বারাসতে—ক্যাডেটদের তালিম দেওয়া হত। আর ছিল একটা গভর্ণমেন্ট স্কুল। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পিয়ারীচরণ সেখানে হেডমাস্টার হয়ে গেলেন। তিনিই উদ্যোগী হয়ে মেয়েদের জন্যে একটা ফ্রি-স্কুল বসাবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। স্থানীয় ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ মিত্র দুজনেই খুব তৎপর হলেন এবং আঠারশ' সাতচল্লিশে স্কুলটার দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেল। যতদূর জানা যায়, এদেশে এই-টাই প্রথম মেয়েদের স্কুল। আগে অবশ্য উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জেমশায় এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কেন জানা যায় না সেটার সরকারী সাহায্য জোটেনি।

বারাসতের এই স্কুলের কথা মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' নামিত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। মদনমোহনের এই প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক। এটি ঠনঠনিয়ার সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র সর্বশুভকরী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এবং স্ত্রীশিক্ষার ওপরে ঐ-রূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব' রাজনারায়ণ বসুর ভাষায় 'অদ্যাপি বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।' তর্কালঙ্কার লিখেছেন : 'বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র, বাবু নবীনকৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ সরকার ইঁহারা কলিকাতা নগরীর বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার প্রায় সমকালেই স্বয়ং পরিশ্রম দান ও স্বয়ং অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া আপনাদিগের নিবাসস্থান বারাসতে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয় স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষস লোকেরা এই সৎকর্মানুষ্ঠান অসহমান হইয়া সেই সাধুগণের উপর দারুণ উপদ্রব ও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি সেই সাধুগণ স্বাবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত না হইয়া বরং অধিকতর প্রয়াসে অকুতোভয়ে স্বকার্য সাধন করিতেছেন।'

এই উপদ্রব ও অত্যাচারের কথা লিখেছেন প্যারীচরণের জীবনীকার। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অধ্যুষিত গণ্ডগ্রাম বারাসতে এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে প্যারীচরণ ও তাঁর সহযোগীরা নাকি 'সমাজচ্যুত' হয়েছিলেন। সেই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকও নাকি শেষ-বেশ বিপক্ষদলে ভিড়েছিলেন। এমনকি কোন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কর্মচারী সস্ত্রীক স্কুল দেখতে এসে দুগ্ধপোষ্য ছাত্রীর চিবুক স্পর্শ করে আদর করেছিলেন বলে তা নিয়ে সাংঘাতিক ঘোট পাকিয়েছিলেন বারাসতের সমাজপতিরা। শুধু বারাসতেই নয়, দেখা যাবে, স্বয়ং বেথুন সাহেব যখন খাস কলকাতায় স্কুল করলেন মেয়েদের, একদল লোক তীব্রভাবে এর বিরুদ্ধতা করেছিল। আপাতঃদৃষ্টিতে তারা বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারেনি বটে, তবে দেখা যাবে, যতদিন না এই স্কুলগুলি দ্বারকানাথ প্রভৃতির চেষ্টায় সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিল ততদিন খোদ বেথুন সাহেবের অত সাধের স্কুলও বিশেষ সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

অনেকে অবশ্য বলেন যে এই বারাসতের মেয়েদের স্কুল পরিদর্শন করতে এসেই বেথুন সাহেবের মনে খাস কলকাতায় বড়সড় একটা মেয়ে স্কুল স্থাপনের বাসনা জেগেছিল। সে খবর কতটা সত্য বলা শক্ত। তবে অনেকটা এই সময়ে গভর্ণর জেনারেল-ইন কাউন্সিলে 'ল' মেম্বার আইন সভ্য হয়ে এলেন কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের এক কৃতী ছাত্র, ব্যাচেলার কবি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। সেকালের 'ল' মেম্বারের আর এক দায়িত্ব ছিল। তিনিই এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি হতেন। এই কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য তখন রামগোপাল ঘোষ। বেশ কিছুদিন না যেতেই উভয়ে বেশ ভাব হয়ে গেল। রামগোপাল একজন অক্লান্তকর্মী ডিরোজিয়ান। নারী জাতির মুক্তির মধ্যেই তিনি দেশের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর কাছে নারী মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ ছিল নারীশিক্ষা—। তাদের লেখাপড়া শেখাও। বেথুন সাহেবের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকবে। বারাসত মেয়েদের স্কুলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও তাঁদের অনুপ্রাণিত করে থাকবে। কে প্রথম প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন কে জানে, কিন্তু মেয়েদের জন্যে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দুজনেই তৎপর হয়ে উঠলেন। রামগোপাল তাঁর দিকপাল বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করলেন। এবং একদিন বেথুন সাহেবের সঙ্গে তাঁরা সবাই এসে গোল বৈঠকে বসলেন। তাঁরা সবাই-ই এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না, তাঁরা নিজেদের বাড়ীর মেয়েদেরও এই প্রস্তাবিত মেয়ে স্কুলে পাঠাতে স্বীকার করে এলেন।

সেকালে বলত পাড়াটা শিমুলিয়া। এখন সুকিয়া স্ট্রীট। তখনকার ছাপান্ন নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে ছিল ডিরোজিয়ান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা-বাড়ী। সেখানে একদিন সকালে একটা রাজ-

জীর ফিটন গাড়ী গিয়ে থামল। তা থেকে নামলেন দুজন। একজন রামগোপাল অপর-জন বেথুন সাহেব। বেথুনসাহেব তাঁর প্রস্তাবিত স্কুলের জন্যে বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিছু পরেই তাঁরা ফের ফিরে এসে গাড়ীতে উঠে বসলেন। বাড়ির মালিক বাড়ী নেই। অবশ্য বলে করে কিছু আসেন নি তাঁরা। সেকালে ত আর ফোন ছিল না যে ফোন করে আসবেন। কাজেই শুকনো মুখেই ফিরতে হল তাদের।

তা হোক, কিন্তু অচিরেই কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। বাড়ীতে এসেই খবর [illegible] দক্ষিণারঞ্জন। এবং কালক্ষেপ না করে সোজা দেখা করলেন বেথুন সাহেবের সঙ্গে। আগে আলাপ পরিচয় ছিল না। করে নিতে হল। দক্ষিণারঞ্জন পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, তাঁর বৈঠকখানা বাড়ীটা বিনা ভাড়ায় তিনি ব্যবহার করতে দেবেন স্কুলকে। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী—যাতে পাঁচ হাজার টাকা দামের বই আছে, তাও তিনি দিয়ে দেবেন বিদ্যালয়কে। মির্জাপুরে তাঁর সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি আছে। স্কুলের পাকা-বাড়ী তৈরির জন্যে সে জায়গাটাও তিনি দান করে দেবেন স্কুলকে। শুধু তাই নয়, স্কুলের বাড়ী তৈরির জন্যে নগদ হাজার টাকাও দান করবেন তিনি।

শুধু বলা নয়। কথা বলে ফিরে এসে তাঁর খাগের কলমে খসখস করে নিজের বাসনার কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখলেন ল' মেম্বার বেথুন সাহেবকে। খামে মুড়ে তক্ষুণি লোক ডেকে পাঠিয়ে দিলেন চিঠিটা খোদ সাহেবের হাতে। বেথুন ত অবাক। গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই দান গ্রহণ করলেন বেথুন। মির্জাপুরের দক্ষিণারঞ্জনের জমির পাশেই বেথুন সাহেব নিজেও জমি কিনেছিলেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু মির্জাপুর সেকালের কলকাতার একপাশে হয়ে যাবে বলে হেদোর সামনের জমির সঙ্গে এই দু খণ্ড জমি পাল্টে নিয়ে সেখানে এই পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ী তৈরি করা হয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্যপ্রকাশিত অল্পায়ু সাপ্তাহিক 'সংবাদ শুধাংশু'—এ খবরটি ছেপেছিল এই রকম (৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৫০) ঃ

'বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত সাহেবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এমত সদ্ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য করণার্থ সাহেবকে একখণ্ড ভূমিদান করেন তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা। সেই ভূমির নিকটবর্তী আর এক খণ্ড ভূমি ছিল কিয়ন্মাস গত হইল সাহেব তাহা স্বয়ং ক্রয় করেন সে খণ্ডের মূল্য প্রায় ১০০০০ টাকা কিন্তু ঐ দুই খণ্ড ভূমি নগরের প্রান্তভাগে স্থিত হওয়াতে সেখানে অভিপ্রেত বিদ্যামন্দির নির্মাণ না করিয়া স্থানান্তরে করা অভিমত হইয়াছে। অতএব সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমে উত্তম সরকারী ভূমি থাকাতে সাহেব গবর্ণ-

শিল্পীর চোখে বেথুন স্কুলের উদ্বোধন

মেণ্টের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উক্ত দুই খণ্ড ভূমির বিনিময়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকস্থ ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ স্থলেই বালিকাদের অধ্যয়নার্থ এক সুশোভিত বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ অট্টালিকা নির্মাণে ৪০০০০ টাকা ব্যয় হইবে তাহার অদূরে বালিকাদিগের শিক্ষা দায়িত্রী বিবির গৃহনির্মাণ হইবে তাহাতেও ১৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে অপর দৌবারিক প্রভৃতি ভৃত্যদিগের গৃহ এবং ভূমিবেষ্টক প্রাচীর করিতে হইবেক তাহাতেও পাঁচ সহস্র টাকার প্রয়োজন। অতএব, ঐ বিদ্যামন্দির নির্মাণার্থ প্রায় ৬২০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যে ভূমির পরিবর্তে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকস্থ ভূমি দান করিয়াছেন তাহার মূল্য ২২০০০ টাকা সুতরাং সর্বশুদ্ধ ৮৪০০০ টাকা ব্যয় হইবেক। বেথুন সাহেব স্বয়ং এই বিপুল অর্থ দান করিতেছেন তাহাতে কেবল দক্ষিণারঞ্জন বাবু ১২০০০ টাকার ভূমি দিয়া আমাদের দেশের মান যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন।' অবশ্য দক্ষিণারঞ্জন ছাড়াও উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও বাড়ী তৈরীর জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন। সাতই মে, আঠারশ উনপঞ্চাশ খৃস্টাব্দে একুশজন মেয়ে নিয়ে বেথুন স্কুল শুরু হল দক্ষিণারঞ্জনের সুকিয়া স্ট্রীটের বৈঠকখানা বাড়ীতে।

বেথুন সাহেবের এই স্কুল স্থাপনের পেছনে আর একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের যথাসাধ্য প্রয়াস ছিল। তিনি বিদ্যাসাগর সুহৃদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি দক্ষিণারঞ্জন, রামগোপালের চেয়ে সাহসিক কাজ করেছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে—[illegible] মালা ও [illegible]

করে এই স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। এটা যে সেকালে তাঁর মত একজন নিম্নবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে কত শক্ত কাজ, সেটা আজ বোঝা শক্ত। তাছাড়াও তিনি নিজে এই স্কুলে পড়াতেন বিনাপয়সায়। উদার হৃদয় বেথুন তাঁর এই সামান্য পণ্ডিতের কথা স্বীকার করে বড়লাট লর্ড ডালহৌসীকে লিখেছিলেন -

> Pandit Madan Mohan Tarkalankars one of the pandits of Sanskrit College who not only sent two daughters to the school, but has continued to atteend it daily to give gartuitous instruction o' the children in Bengali, a[illegible] has employed his leisure [illegible]e in the compition of a [illegible]s of elementary Bengal Books expressuly for their use'.

এই বইগুলির মধ্যেই রয়েছে বিখ্যাত 'শিশুশিক্ষা' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। এই শিশুশিক্ষারই পদ্য : 'পাখীসব করে রব, রাতি পোহাইল। কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।।' এই প্রভাতবর্ণন বোধ করি, বাঙ্গালী মেয়েদের রাত পোহানরই আদিকবিতা।

যে কথা আগে বলা হয়েছে, বেথুন সাহেবের এই স্কুল স্থাপনে সেকালে বেশ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি নিজেও এটা আঁচ করে থাকবেন। কেননা তাঁর স্কুল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে কলকাতার বেশ কয়েকজন রহিস লোক নিমন্ত্রিত হননি। তাঁরা হচ্ছেন সেকালের [illegible]র দিকপাল ব্যক্তি—রাজা রাধাকান্ত দেব, বাবু আশুতোষ দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ। এমনকি, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি রক্ষণশীল কাউকেও ডাকেন নি। না ডাকলেও কিন্তু রাধাকান্ত দেব কখনও এই প্র[illegible]বিরুদ্ধতা করেছেন, তার নজির

নেই। অবশ্য এই স্কুলের শুরু করার দিন পনেরর মধ্যে তিনি শোভাবাজারে একটি স্কুল স্থাপন করেন। উত্তরপাড়া, সুকসাগর ও নীবুধিয়ায় কয়েকটা নতুন মেয়ে স্কুলও খোলা হয় বেসরকারী প্রচেষ্টায়।

তা সত্ত্বেও একদল লোক এই মেয়ে-স্কুলের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করতে ক্ষান্ত হননি। ঈশ্বর গুপ্তের সম্বাদ প্রভাকর ও সম্বাদ ভাস্কর ছাড়াও কিছু কিছু কাগজও এর বিরুদ্ধে 'গেল গেল' রব তুলেছিল। মদনমোহন তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে সেকথা বলে গেছেন : 'দেশের লোক কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধতাকরণ করিতে ত্রুটি করিবেন না। কি লজ্জার বিষয়! অনরবল বীটন মহাশয় যে আমাদিগের কন্যাসন্তানগণের শিক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন ইহা একবারও কেহ মনে ভাবিলেন না, তিনি যে কেবল আমাদিগেরি হিত করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস পাইতেছেন ইহা একবারও আলোচনা করিলেন না, তিনি যে নিতান্ত স্বার্থশূন্য কেবল আমাদেরি কন্যাগণের নিমিত্ত প্রতিমাসে সাত আট শত টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থ মিত্রের কার্য করিতেছেন ও বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যামন্দির নির্মাণ করিয়া দিতেছেন, ইহা একবারও বিবেচনা করিলেন না, কেবল অহরহ ঐ মহানুভবের নিন্দাবাদ, অকীর্তি রটনা ও মিথ্যা কলঙ্ক জল্পনা করিয়া আপন আপন ইংরাজি বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কি লজ্জার কথা! কি লজ্জার কথা? এ-দেশীয় লোকের ইউরোপীয় বিদ্যাধ্যয়ন ও সভ্যতার উদয় কেবল অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া কলাপেই পর্যবসিত হইল। বীটন সাহেবের সহিত এ দেশের লোকেরা যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করিলেন, শুনিয়া বিদেশীয় ভদ্রলোকেরা কি মনে করিতেছেন, আমরা বোধকরি, তাঁহারা এদেশকে অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড বলিয়া নিরন্তর ভৎর্সনা করিতেছেন সন্দেহ নেই।' 'ধর্মসভা'র নায়ক রাধাকান্ত দেব তৎকালীন কোন কোন সংবাদপত্রে এই গালিগালাজ নিয়ে বীটন সাহেবকে চিঠি লিখেছিলেন। এদের নিন্দা করে তিনি এসব কলুষিত মনের নিছক অপবাদ দান বলে অভিহিত করেছিলেন। এসব ছাড়া এরা থাকতেই পারে না, বলে তিনি মনে করেন।

কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সেকালের আপত্তিটা ছিল কি কি? তাঁরা মনে করতেন (ক) লেখাপড়া শেখবার মত 'মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' মেয়েদের নেই। (খ) মেয়েদের লেখাপড়া শেখা 'লোকাচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ'। (গ) মেয়েদের বিয়ে হলে তারা দুঃখ পায় বিধবা হয়। (ঘ) মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই 'স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা' হবে, বাপ-মা স্বামীকে মানবে না এবং শেষে 'দুশ্চরিত্রা' হবে। (ঙ) এসব বাধা অতিক্রম করে যদি মেয়েদের লেখাপড়া না হয় শেখানই হল তাহলে ফল হল কি? —'ইহারা চাকরী করিতে পারিবেক না, আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য নির্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব-শুভের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারিবেন না, এবং হাটে বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্যকার্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না। কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইষ্টপত্তি নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।' ২ 'বামা-বোধিনী'র এক প্রবন্ধকার এই কথাটারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন পরে (১৮৭৩) আমাদের দেশের লোক ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠান রোজগারের জন্য, মেয়েকে পাঠাইতেম কেন? তাহারা কি পাগড়ি বেঁধে চাকরি করবে?

মহাকালই অবশ্য এইসব সংস্কার ও কুবুদ্ধির জবাব দিয়েছেন, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একটা কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ বছরের তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এ স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করায় ভারতী সম্পাদক বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্যে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। একদল বুদ্ধিমান বিবেচনা শক্তি বিশিষ্ট জীবকে কতশত শতাব্দী হতে নির্দয় লোকাচারের শাসন পীড়ন দমন বন্ধন করে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জব বশীভূত সঙ্কুচিত সংকীর্ণ-মনা করে তোলা হয়েছে, সে একবার ভালো করে কল্পনা করে দেখতে গেলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীদিগের আর কোন গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা-তো নহে—যেমন স্বাধীনতা চাই তাহার সঙ্গে তেমনি শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেকগুলি গুণ থাকা চাই তবেই তাঁহারা স্ত্রীলোকেরা আদর্শরূপে বরণীয় হইতে পারেন। নচেৎ স্ত্রী স্বাধীনতার আর এক নাম স্বেচ্ছাচারিতা, প্রগলভতা হইয়া দাঁড়ায়।' রবীন্দ্রনাথ এর জবাবে লিখেছিলেন : '...কিন্তু এতটা হাঙ্গামা কেন? বাংলা বা সংস্কৃত আর্য বা অনার্য, সাধু বা অসাধু কোন ভাষার অভিধান স্বাধীনত অর্থে বেতমো অবিনয় অসরলতা উচ্চব-ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অ-দয়াদাক্ষিণ্য লেখা থাকত তা হলে এতটা বাকাব্যয় শোভা পেত।' বড়দাদা ও তাঁর প্রাণের ভাই রবির এই তর্ক বিনিময় এই জন্যেই তুলে দেওয়া হল যে মদনমোহনের প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় তিরিশ বছর পরেও দুটি সমান্তরাল চিন্তাধারা কিছু রকমফের করে যে প্রবহমান ছিল সেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এবং সেই ধারা ঠাকুরবাড়ীর মত অত্যন্ত প্রগতিশীল পরিবারেও অব্যাহত। যে বাড়ীর বৌ তখনই গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে এসেছে!

বেথুন স্কুলের 'অনুষ্ঠানপত্র' প্রসপেকটাসে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল : 'এক্ষণে পরম কারুণিক জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে তিনি অদ্য বাসরীয় শুভারম্ভে করুণাদৃষ্টি করিয়া বালিকা বিদ্যাসাগরের তাৎপর্য সিদ্ধ করুন, এই নব প্রসঙ্গে ভূরি ভূরি বালা জ্ঞানানুশীলন দ্বারা বিবিধ বিদ্যায় ভূষিত হইয়া জনকজননীর আনন্দ বিস্তার করতঃ ভারতভূমিকে উজ্জ্বলা করিতে পারে।' দুঃখের কথা, এই আকিঞ্চন সফল হয়নি।

বেথুন সাহেব কলকাতায় দেহরক্ষার আগে পর্যন্ত নিত্য এসে স্কুল দেখতেন। বড়লাটের বৌও পরিদর্শনে আসতেন মাঝে মাঝে। বেথুন সাহেব তাঁর ত্রিশ হাজার টাকায় অস্থাবর সম্পত্তি দান করে যান এই স্কুলকেই। কলকাতার রহিস পরিবারও কালে কালে আকৃষ্ট হলেন এই বিদ্যালয়ে। ডালহৌসীর ইচ্ছানুসারে সরকার এই মেয়ে-স্কুলের সব ভার নিজেই নিয়ে নিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র হলেন সম্পাদক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বড় মেয়ে সোদামিনীকে এখানে ভর্তিও করে দিলেন আঠারশ একান্নয়। কিন্তু হবু স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা একশ' পেরোল না। বেথুন মারা যাওয়ার ঠিক আগেই ছাত্রীসংখ্যা ছিল আশী। মাঝে বোধহয় আরও কমে যায়। বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে বেড়ে হয় তিরানব্বই। সরকারকে ছাত্রীপিছু দশ টাকা খরচ করতে হত। কিন্তু স্কুলটা প্রাথমিক স্কুলের বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। সরকার স্কুলের ফি চালু করলেন এক টাকা করে ছাত্রীপিছু মাঝে মিস মেরী কার্পেন্টারের উদ্যোগে এবং বিদ্যাসাগরের আপত্তি সত্ত্বেও একটা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণ 'নর্মাল' স্কুলও বসে গেল। কিন্তু অচিরে বছর তিনেকের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে ছাত্রীর না থাকায় সেটা উঠে গেল। যদিও অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ শেষ চেষ্টা করেছিলেন। গোটা পাঁচ-ছয় বয়স্কা ছাত্রী জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু বৃথা! আঠারশ' তেরোত্তর খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সরকার তাঁর কর্তৃত্ব একটা বেসরকারী কমিটির ওপরে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এবারে সম্পাদক হলেন কবি-ব্যারিস্টার মাইকেল বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। বেথুন স্কুলের এই নব পর্যায়েই দ্বারকানাথ এসে পড়লেন। কিন্তু আসল সমস্যাটা কি যাতে বেথুন স্কুলের এত বিরাট প্রাসাদোপম হর্ম্যগৃহ, এত রাজকীয় আয়োজন তাছাড়া সরকারী দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও এই মেয়ে স্কুলটি ক্ষয় রোগগ্রস্ত, অপুষ্ট 'রিকেটি' শিশুর মত শীর্ণ কলেবর, নির্জীব বুদ্ধিহীন প্রতিষ্ঠান হয়েই রইল? আয়োজন ছিল বিস্তৃত,

ভোজ্য ছিল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। কিন্তু হায়, তাতে পুষ্টিকর ছিল না কিছুই। শিশু বাড়বে কি করে?

কিন্তু কেন? অথচ আঠারশ, একাত্তর বাহাত্তরের ডিরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের রিপোর্টে জানা যায় যে সারা বাংলাদেশে তখন দুশ সাতানব্বইটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পঁয়ত্রিশটি সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে একুনে তিনশ বেয়াল্লিশটি মেয়ে স্কুল চলছে। ছাত্রী-সংখ্যা—নয় হাজার চারশ! এঁদের মধ্যে শুধু কলকাতাতেই একশ দশটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মেয়েস্কুল রয়েছে। এসব স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ২,৫৮৪। এছাড়াও কলকাতায় বে-সরকারী মেয়ে-স্কুল ছিল চৌদ্দটি। ছাত্রীসংখ্যা—৭৩২ কলকাতায় সাহায্যপ্রাপ্ত মেয়েস্কুলের ছাত্রীদের জাতিগত হিসাব হচ্ছে—হিন্দু: ১৫৯০, মুসলমান: ৫৮ এবং খৃষ্টীয়ান: ৯৩৬। এই রিপোর্ট কি এই সত্যই প্রকাশ করে না যে মেয়েস্কুল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে—শহরেই শুধু নয় মফস্বলেও? এবং খাস কলকাতায় সরকারীর চেয়ে বেসরকারী স্কুল অনেক বেশি জনপ্রিয়? গড়ে বেসরকারী স্কুলে যেমন বাহান্ন জন ছাত্রী পড়ছে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পড়ছে তার অর্ধেকেরও কম—বাইশজন মাত্র। এবং তার বেশ বড় অংশই খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রায় এই সময়ে (১৮৭৩) 'বামাবোধিনী'-তে লেখা হচ্ছে: 'বেথুন স্কুলের সে আশা (উন্নতির) কোথায়? বৎসর গেল, যুগ গেল, উন্নতি হইল না। বেথুন স্কুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের অভাবের মূল কারণ বোধকরি জাতীয় জীবন—সাগর প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হতে পারার ব্যর্থতা। তাই জাতীয় ভাবধারার জোয়ারের উচ্ছল মুহূর্তে ওর বুকে শুধু ভাঁটা-নদীর শীর্ণতা।

এবং জাতির প্রাণ সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের ভগীরথ দ্বারকানাথ। কলকাতা তখন মধ্যবিত্তের। কিন্তু বেথুন মুখ্যতঃ উচ্চবিত্তের। পত্রে দ্বারকানাথই মধ্যবিত্তের সঙ্গে স্কুলটির বহু-আকাঙ্ক্ষিত যোগটা করিয়ে দিয়েছিলেন।

আর একটা ছোট ঘটনা এর মধ্যেই হয়ে গেছে। বিলেত থেকে ফিরেই কেশবচন্দ্র সেন তাঁর ভারত আশ্রমে একটি নর্মাল ও মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এই বিদ্যালয়েই এম এ পাশ করে শিবনাথ শাস্ত্রী শিক্ষকতা করতে আসেন। এবং সেকালের তাবড় তাবড় পণ্ডিত—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এর ছাত্রীদের প্রশংসা করতে থাকেন। এই স্কুলেরই শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রী রামতনু লাহিড়ীর কন্যা রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগির ও রাজলক্ষ্মী সেন। এঁরা সকলেই নামকরা। রাধারাণী একদা বেথুন স্কুলের শিক্ষকতা করেন। এই স্কুলের লেখাপড়া নিয়েই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথের গুরুতর মতভেদ হয়েছিল। কেশব-

ব্রহ্মময়ী দেবী

বাবু স্ত্রী শিক্ষা চাইতেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নয়। শিবনাথ জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিক্স পড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ঐ সব না পড়ালে মেয়েদের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় না। কেশব বললেন, 'এ সব পড়িয়ে কি হবে? মেয়েরা জ্যামিতি শিখে কি করবে? তার চেয়ে বিজ্ঞানের গোড়ার সূত্রগুলো পড়ান ভালো। শিবনাথ বিজ্ঞানের নাম করে মনোবিজ্ঞান আর লজিক পড়াতেন। নোট দিতেন। এই মেয়েদের শিক্ষার আদর্শ নিয়ে পরে আরও জোর লড়াই হয়েছিল এবং সে লড়ায়ে প্রগতিশীলদের পক্ষে দাঁড়ানো দ্বারকানাথ।

দ্বারকানাথ বললেন, এই স্কুলে হবে না। নতুন স্কুল চাই। মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে নতুন স্কুল স্থাপনে ডেড়েফুড়ে লেগে পড়লেন তিনি। দ্বারকানাথের 'প্রোগ্রেসিভ' দলের অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন দুর্গামোহন দাস। ভবানীপুরে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মময়ী এক অসাধারণ মহিলা। দীন, আর্তের জন্য তাঁর দ্বার সবসময়ে খোলা থাকত। তাঁর দুই মেয়ে— অবলা আর সরলা। অবলা নামকরণ কি অবলাবান্ধবের সূত্রে হয়েছিল? সে কথা বলার কোন উপায় আজ নেই তবু প্রশ্নটাকে একেবারে না বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। কিন্তু যেকথা হচ্ছিল। ব্রহ্মময়ী যেন বিশ্বমাতা। তাঁর 'সন্তানের ক্ষুধা যেন নিজ সন্তান' দিয়ে মিটত না। তিনি 'কতকগুলি নিরাশ্রয় বালিকাকে নিজ ভবনে আশ্রয় দিয়ে' পালন করছিলেন তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীতে। কিন্তু আশ্রয় দিলেই ত শুধু হবে না। তাদের শিক্ষা দিতে হবে। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতি যত্নতঃ।' কন্যাকে পালন করা এবং যত্নপূর্বক বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে। শুধু অবলা—সরলার বিদ্যাশিক্ষা নয়, আশ্রিত কন্যাদেরও শিক্ষা দিতে হবে। কাজেই ভালো স্কুল চাই। সেকালে কলকাতায় কলেরা হত আকছার। একবার দ্বারকানাথেরও হয়েছিল এই কালব্যাধি। এবং ব্রহ্মময়ী মায়ের মত সেবা করে বাঁচান অবলাবান্ধবকে। চিরন্তন মাতৃমূর্তি এই জীবনদাত্রীকে দ্বারকানাথ কখনও ভোলেননি সারা জীবনে। এবং নারীর এই করুণাময়ী মূর্তিই তাঁকে বুঝি নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে এতটা সক্রিয় করে তুলেছিল। ব্রহ্মময়ী বলে থাকবেন কোন একদিন এই সময়, মেয়েদের জন্যে ভালো একটা স্কুল করুন গাঙ্গুলী মশায়। গাঙ্গুলী মশায়ের মাথায়ও তখন সেই 'আইডিয়াই' ঘুরছে!

এই সময়েই আর এক বিদেশী মিশনারী মহিলার আবির্ভাব ঘটল কলকাতায়। মনোমোহন ঘোষ তখন দিকপাল ব্যারিস্টার। বিধুমুখী মামলায় তাঁর জয়, তাঁর সওয়াল জবাব খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। তাঁরই বাড়ীতে উঠলেন এই পূর্বপরিচিতা তরুণী। নাম মিস এ্যানিটি এ্যাকরয়েড। 'বামাবোধিনী'এর পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন—এদেশের মহিলাগণের বিদ্যাশক্তি ও সামাজিক উন্নতি সাধনার্থে মিস য়্যাকরয়েট নাম্নী উদার চিত্ত কৃতবিদ্য কুমারী সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া কলিকাতায় অবস্থিত করিতেছেন। য়্যাকরয়েটেরা লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ ইউনিটেরিয়ান পরিবার। মিস এ্যাকরয়েটের মাতা ও ভগিনীরা কেশববাবু যখন ইংলণ্ড গিয়েছিলেন, তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন।' একদিন দ্বারকানাথ ও দুর্গামোহন গিয়ে উঠে থাকবেন মনোমোহনের বাড়ী এবং সেখানে এক আলোচনায় মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা—হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় বসানোর কথাটা পাকা হয়ে যায়। এর আগে অবশ্য একটা কমিটি তৈরি হয় ঐ স্কুল পরিচালনার জন্য। সেকালের কাগজে রয়েছে—কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান [illegible]ধ্যক্ষ—জে বি ফিয়ার ও শ্রীমতী ফিয়ার, কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ সাহেব দ্বারকানাথ মিত্র, বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু কেশবচন্দ্র সেন—এঁরা হলেন ম্যানেজিং কমিটির সভ্য। কুমারী এ্যাক্রয়েড হলেন সম্পাদিকা। ইংরিজি ও বাংলাতে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে মেয়েদের এই স্কুলে। স্কুলের জন্য মাসিক খরচ হবে হাজার টাকা। প্রথমে অবশ্য আরও ঠিক হয়েছিল, বিলেত থেকে কোন মহিলা আসবেন হেডমিস্ট্রেস হয়ে।

'বামাবোধিনী'র খবর, বছর না ঘুরতেই কেশব সেন মশায়ের সঙ্গে এ্যাকরয়েডের ঝগড়া হয়ে যায়। কেশব সেন মশায় অবসর নেবার জন্যে একটা চিঠি লেখেন সেক্রেটারিকে। সেক্রেটারি কাউকে কিছু না জানিয়ে সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। 'প্লিজড টু এ্যাকসেপ্ট ইয়োর রেজিগনেশন।' মিস এ্যাকরয়েড তাহাতে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া উক্তব্যবহকে (কেশবচন্দ্র সেনকে)

একখানি রাগপূর্ণ ও অত্যন্ত অপমানসূচক পত্র প্রেরণ করেন এবং যে কমিটির তিনি সম্পাদক তাহার কাহার মত গ্রহণ না করিয়া এই কার্য করেন।'

আঠারশ তেয়াত্তরের আঠারই সেপ্টেম্বর। শরৎকালের ছেঁড়া মেঘ-ভাসা-নীল-উজ্জ্বল আকাশের তলায় পাঁচটি মেয়ে বই-পত্র নিয়ে বাইশ নম্বর বেনেপুকুর লেনের এক ভাড়া বাড়ীতে গিয়ে উঠল। শহরের উপকণ্ঠে তখন কাশের সমারোহ। গাছ সবুজ গাছের পাতায় পাতায় তখনই বুঝি শিশিরের রেশ। মাঝে মাঝে মেঘ রোদ্দেরে খেলায় পৃথিবীটাকে আরও মায়াময় বলে মনে হয়। অনেক বাড়ীতেই দুর্গাপ্রতিমার কাঠামোয় একমেটে হয়ে গেছে। এই প্রসন্ন পরিবেশে

একটা বোর্ডিং স্কুলের উদ্বোধন হয়ে গেল। কলকাতা শহরে মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল। বিনা আড়ম্বরে। অনেকেরই অজান্তে। এখানে মেয়েরা পড়বে, থাকবেও। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বেথুন স্কুলের মেয়েদের খুবই অসুবিধা হত। এখানে আর তা থাকল না। এটা হল বোর্ডিং স্কুল। নাম 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'। এই স্কুলেরই পন্ডিত হলেন দ্বারকানাথ। বিবি ফিয়ারও অবৈতনিক শিক্ষিকা হয়ে লেখা-পড়া শেখাতে লাগলেন এখানে। শুধু লেখাপড়া শেখান নয়। টাকা যোগাড় করা, প্রয়োজনে যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করা, ছাত্রী নিবাসে মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, তাঁদের অসুখে ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, সেবা শুশ্রূষা করা—সব কাজ দ্বারকানাথের। 'তিনি আহ্লাদিত চিত্তে সেই সকল শ্রম বহন করিতে লাগিলেন।... মানুষ এতদূর শ্রম করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য।' সেকালের সাহেব-ঘেঁষা রিপোর্টে অবশ্য শ্রমতী ফিয়ারকে সকলের প্রতিষ্ঠাত্রী বলা হয়েছে। খবরটা কিন্তু একেবারেই ভুল। শ্রীমতী ফিয়ার ছিলেন অবৈতনিক শিক্ষিকা। মাঝে তিনি সেক্রেটারি হয়েছিলেন. কোন কোন কাগজে এ খবরই রয়েছে। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এ এই কথা খোলসা করেই লেখা হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বইয়ে বার বার বলেছেন, দ্বারকানাথই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

এর মধ্যে মিস মেরী কার্পেন্টার এসে একবার স্কুল দেখে গেলেন। দুটি ছাত্রী-বৃত্তিস্বরূপ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করে গেলেন। ঠিক হ'ল বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রী দু'জনের নাম মনোনয়ন করবেন। মিস এ্যাক্রয়েডও বসে ছিলেন না। মাস মাস একশ ছিয়াশি টাকা চাঁদা এবং এককালীন দান সতেরশ একান্ন টাকা সংগ্রহ করে ফেললেন। তিনি নিজে দিলেন একশ টাকা চাঁদা। এছাড়া মাসে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন।

কিন্তু এত করেই স্কুল টি'কল না। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কে কখন ধরা পড়ে কে জানে।' প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়লেন দুটি প্রাণ—ইংরাজ তরুণী অ্যানীটা এ্যাক্রয়েড আর বাখরগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও নামকরা ঐতিহাসিক হেনরি বেভারিজ। আঠারশ' পঁচাত্তর। ছয়ই এপ্রিল। উভয়ের বিয়ে হয়ে গেল। শ্রীমতী বেভারিজকে স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর কর্মক্ষেত্রে তাঁকে অনুগমন করতে হ'ল। তাঁর সাধের স্কুল পড়ে রইল পিছে। যাবার বেলায় একবার পিছু ফিরে তাকিয়েছিলেন কিনা কে জানে? যদিও আরও বছরখানেক নানা টানাপোড়েনে যা হোক করে চলেছিল স্কুলটা, আঠারশ' ছিয়াত্তরের মার্চ মাসে স্কুলটা বন্ধ হয়েই গেল। চিরকালের জন্য।

তবে অত সহজে হার মানার পাত্র নন দ্বারকানাথ। মেম সাহেবের স্কুল উঠে গেল ত বাঙালীর কি? তাদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে ত? তিনি নতুন করে তোড়জোড় চালাতে লাগলেন। এবং তাঁর বড় আশ্রয় দুর্গামোহন দাসের পত্নী ব্রহ্মময়ী। তাঁকে বলতেই তিনি মাসে একশ' টাকা করে দিতে থাকলেন। এবারে দুর্গামোহন আর দ্বারকানাথ ছাড়াও আর একজনকে সক্রিয়ভাবে নিজেদের সঙ্গে পেলেন। ইনি বিক্রমপুরের অধিবাসী প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার এবং ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সঙ্গে ইনি বিলেত গিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষার জন্যে। ফিরলেন জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে। এবং শুধু ব্যবহারজীবি হিসেবে নয়, কলকাতায় যুবক সম্প্রদায়ের মনোহরণ করে ফেললেন। ইনিও এগিয়ে এলেন দ্বারকানাথের সহায়তায়। আগেকার স্কুল উঠে যাবার তিন মাসের মধ্যেই পয়লা জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে (এখানকার বালীগঞ্জ ডাকঘরের কাছে?) দ্বারকানাথের নতুন স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেল। পয়লা জুন। বলা বাহুল্য, দ্বারকানাথ এই স্কুলের প্রাণস্বরূপ। জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ, শিক্ষকতা থেকে কুলীর কাজ—কোনটাই বাদ নেই। তবে এই স্কুলের শিক্ষাদর্শ আগের মত নয়। কেশব সেন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম মানতে চাইলেন না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগত পাঠক্রম চালু করলেন। শিবনাথ লিখেছেন : 'বালীগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া এই স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভায়া নিজে একজন শিক্ষক হইলেন। শিক্ষক কেন, তিনি দিন রাত্রি বিশ্রাম না জানিয়া ঐ স্কুলের উন্নতি সাধনে দেহমন নিয়োগ করিলেন। আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম যে ঐ স্কুল চলিতেছে। গাঙ্গুলী ভায়া ছাড়িবার লোক ছিলেন না। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতাম। এমন সাচ্চা সত্যানুরাগী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, গাঙ্গুলী ভায়া স্ত্রী-স্বাধীনতার নেতা ছিলেন। ...আমি ভবানীপুরে আসিলেই গাঙ্গুলী ভায়া আমাকে ছিনা জোঁকের মত ধরিয়া বসিলেন যে, আমার কন্যা হেমলতাকে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে দিতেই হইবে। সুতরাং হেমলতাকে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে দিলাম।' শিবনাথের এই বিবরণ থেকে দ্বারকানাথ কি অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে তার স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতেন তার একটা হদিশ পাওয়া যায়।

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া কি রকম হ'ত সে সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায় আঠার'শ সাতাত্তর সালের ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষার এক প্রতিবেদনে। জুলাই মাসে ঐ পরীক্ষা হয়। সেই মাসেরই কাগজে ঐ ফলাফল ছাপা হয়। মোট পরীক্ষা দেয় তেতাল্লিশজন। পাশ করে বারজন। পাশের হার প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ। কলকাতায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় থেকে পাশ করে পাঁচজন। ফলাফলটা ছিল এই রকম :

পরীক্ষা	নাম	বয়ক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	পূর্ণ সংখ্যা	প্রাপ্ত সংখ্যা
৪র্থ পরীক্ষা	১। কাদম্বিনী বসু	১৪	বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়	২৫০	১৫১
	২। সরলা দাস	১৪	ঐ	ঐ	১০৮
	৩। সুশীলা ঘোষ	১৮	ঐ	ঐ	৯৩৷৷
৩য় পরীক্ষা	১। সুবর্ণপ্রভা বসু	১৪	ভবানীপুর খৃষ্টীয় বালিকা বিদ্যালয়	২৫০	১২৮৷৷
	২। হেমাঙ্গিনী চৌধুরী	১৪	বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়	ঐ	১০৩৷৷
২য় পরীক্ষা	১। অবলা দাস	১১	কাঁসারী পাড়া	২০০	১০৯৷৷
	২। সরলা মহলানবীশ	১১	বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়	ঐ	১০৮
	৩। প্রিয়বালা মিত্র	১১	ঐ	ঐ	৯০৷৷
১ম পরীক্ষা	১। লক্ষ্মীমণি দাসী	১১	কালীঘাট	ঐ	১৩৭
	২। ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী	১১	টালা	ঐ	১০৮৷৷
	৩। ইন্দুমুখী বসু	১১	ঐ	ঐ	৯৫
	৪। রামামণি বসু	১১	কেশোবাগান	ঐ	৯২
	৫। হেমাঙ্গিনী ঘোষ	১৯	মিলম্যান বিদ্যালয়	ঐ	৯১৷৷
		৮	কেশোবাগান		

(চলবে)

গল্পের নায়ক এবং আমরা

বাহারউদ্দিন

ক্রুসেডারদের মত মরীয়া হয়ে মাঠের দিকে ছুটে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল আর মহা-মেডান স্পোর্টিং দলের সমর্থকরা। বাসের ওপরে, জানলায়, দর্জায়, রডে তীর্থগামী দর্শক। ঝুলছে। ভেতরেও দোজখ। উত্তপ্ত হাবিয়া। আমি অবলা কোরবানীর জীব। দর্শকের দর্শক। নির্বাক। নীরব।

আমি খেলার মাঠে যাই না। নিজেকে নিয়ে এমন এক খেলায় মশগুল, অন্যের খেলা দেখার অবসর হয় না। ওস্তাদশ্রেষ্ঠ মুক্তব্য বলেছেন, ঈপ্সিত বস্তু না দেখাই উত্তম। আকর্ষণ কমে। বিকর্ষণ ঘটে। অনুভব শ্রেয়ঃ। বান্দারও ধারণা, ঈশ্বর যদি নিরাকার চৈতন্য বিশেষ না রহস্যাবৃত না হয়ে দৃষ্ট হতেন, তাহলে অবশ্যই ঈশ্বর-প্রেমিকের নিরাসক্তি ঈশ্বরকেও পীড়িত করত। তদুপরি, বয়স বাড়ছে, দিন দিন বার্ধক্যভারে নুয়ে পড়ছি, অহরহ মতিভ্রম ঘটছে। নাতি-নাতনীদের টান-হেঁচকা তো আছেই। এই তো বছরখানেক আগে, একদিন চঞ্চল-চূড়ামণি কিশোর আর দিদিভাই প্রায় হেঁচড়ে হেঁচড়ে আমাকে খেলার মাঠে নিয়ে গেল, আমি নিরুপায়, অসহায়। মধুসূদন তরাও বলে বলে ঢুকে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ ঘনিয়ে এল। চারপাশে সুরু হল বজ্রধ্বনি। শিলাবৃষ্টি। সে অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলে এখনো বুক ধড়ফড় করে। সেটা ছিল আসাম পুলিশ আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা। স্থান আসাম। এক সময় ইষ্টক বৃষ্টি, আর এক পক্ষের সমর্থকবৃন্দের হৈ-হল্লা, চিৎকার, উল্লাস এতই মধুর, অপ্রত্যাশিত ও প্রেমময় হয়ে দেখা দিল, যে, বংশতনয়া আমার নাতনীর মাঠেই এক ধাক্কায় বয়োঃসন্ধি পেরিয়ে যাবার উপক্রম হল। আমার পক্ষে, নির্ঘাত আরো দু-একজনের পক্ষেও আর বসে থাকা সম্ভব হল না। বেরিয়ে এলাম। জ্বলন্ত সূর্য দেবতার দিকে মুখ করে তোবা করলাম। ঘোষণা দিলাম, হে ক্রীড়াদেব, আজ হতে তব পরে মম বিশ্বাস নাস্তি।

অধম বেখবর। আত্মমগ্ন। অন্যের খবরাখবর রাখে না। মস্তমুগ্ধদের কাছে শুনেছে, প্রতীচ্যেও মাঝে মধ্যে খেলার মাঠে দেনা-পাওনা ঘটে। তবে, ক্রীড়ামোদী দর্শক যথাসম্ভব স্পোর্টিং স্পিরিট বজায় রাখেন। প্রতিপক্ষকে ক্রীড়াজনিত সম্মান প্রদর্শনে এতটুকু পরাঙ্মুখ নন।

আমাদের দেশে জীবনটাই একটা খেলার মাঠ। ধর্ম, কর্ম, ভাষা-সাহিত্য, শিল্প হরাচজেই এক ধরনের স্পিরিটের ছড়াছড়ি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও চওড়া। সহনশীল। গায়ে ছুৎমার্গ। আঁচ লাগলেই এক ভাষাভাষী অন্যের উপর খড়্গহস্ত, রামদা নিয়ে তেড়ে আসেন। বীররস উপচে পড়ে, রক্তবন্যায় উথলে ওঠে ভাষা-সাহিত্য। আর ধর্মপ্রেম। চারপেয়ে মুণ্ডুহীন অদৃশ্য এক আজব জীব। আজব তার কাণ্ড। দেখার মত। মন্দির-মসজিদ আর দানবগোষ্ঠী নাকি হাততালি দেয়, 'লড়ে যাও বাঙ্গালি।'

আমি মুসলমান। সবাকার বিরাগ-ভাজন। কোন দিন অঞ্জলি দিইনি। বরপুত্র নই ফলত। ঈশ্বর উপাসনায়ও মতিগতি অল্প। বদৌলতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর বেগার খেটেও আরবী পড়াবার জন্যে নালায়েক সেজেছি। সম্প্রতি ন্যারস্থ হয়েছি কলকাতার সারস্বত সমাজের। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতেও আমাকে পার্সেল করে পাঠানো হয়েছিল। সেখান-কার কর্মকর্তারা প্যাকেট না খুলেই আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। হায় কপাল, বিশ্ব-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের আশ্রমেও সাম্প্রদায়িক বিষদৃষ্টির অনুপ্রবেশ—ভাবতেও অবাক লাগে। অবশ্য বোলপুর নেমেই কিছুটা এগিয়ে যেতে না যেতেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা হিন্দু হোটেল আর ইসলামীয়া হোটেল। বলেছিল, সাবধান পা বাড়াবে না। তুমি শত্রু। আমরা অনেক কষ্টে কবিগুরুর অনুপস্থিতিতে এখানে জায়গা পেয়েছি। সর্বত্রই আমরা ছড়াচ্ছি। আমরা অন্ধকারে ভাই ভাই। কোলাকুলি করি, সলাহ পরামর্শ করি। উই ফলো ডিভাইড এন্ড রুল। দিবালোকে একে অন্যের মুখ দেখি না। রক্তচক্ষু প্রদর্শন করি। তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। হিংসুক। আমাদের শান্তি, সহবাস তোমার অসহ্য। যেখানে যাও আগুন জ্বালাও।' আমি নতুন মানুষ। নিরুত্তর থাকাই শ্রেয়ঃ ভেবে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য, সাত দিনের মধ্যেই খালি

কলসীর ভাঙ্গা মুখ নিয়ে ফিরে এলাম। এখানে, কলকাতায়—একজন সাংবাদিক, একজন সম্পাদক ও বন্ধুবর্গের ভালোবাসা, বরাভয় ও আতিথ্যে টিকে আছি, নইলে এতদিনে কবর ফেটে গন্ধ বেরোত।

শৈশবে মক্তবের হুজুরের 'লাঠির কাঠাল লাঠিতে পাকে, না পাকিলে তিন মাস থাকে—' জাতীয় আপ্তবাক্যে, মুষ্ঠি চুম্বন খেয়ে খেয়ে মুখস্থ করেছি, 'রাব্বি জিদনি ইলমান'—হে প্রভু আমাকে জ্ঞানে বাড়িয়ে দাও, অথবা আমার কাজ সহজ করে দাও।' অথচ আমার জ্ঞান লাভ ঘটেনি। কাজ সহজ হয়ে ওঠেনি। হুজুর বলতেন এই দোয়া পড়লে জ্ঞান লাভ ঘটে। কাজ সহজ হয়। কেন যে ঈশ্বর আমার মস্তিষ্কে হাতীর পেটের মত তালা ঝুলিয়ে রেখেছেন, বুঝি না। রাম, শ্যাম, যদু, মধু, রহিম করিম বর্ণমালার দিনের সব বন্ধুরাই দেখছি অবলীলাক্রমে হিন্দু ক্লাব, মুসলিম ক্লাব, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু প্রভাব, ইসলামী বাংলা, মুসলমানী প্রভাব ইত্যাদি ইত্যাদি সুস্থ, সুন্দর, সাসলীল ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও পাহাড় সমান গবেষণা সন্দর্ভের তালে তালে নাচছেন, ফূর্তি করছেন, খাচ্ছেন দাচ্ছেন, শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছেন। আর আমি গরু তেরী গরু অনন্যোপায় হয়ে অন্তঃমিল বজায় রেখেই সদ্য কাব্যচর্চা শুরু করেছি।

হাতীর পেটের মত ঝুলিতেছে তালা
মস্তিষ্কে আমার তাই নির্বিকার জ্বালা

আধুনিক কালে এহেন কাব্যচর্চা অচল। আমার কাছে সচল। সেই ট্রেডিশন সমানেই চলছে। ট্রেডিশন মানে অন্তঃমিলের পরম্পরা। আমি আজকাল গোঁড়া এবং রীতিসিদ্ধ হবার চেষ্টা করছি। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বা চাকরীর লোভে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের আদর্শানুযায়ী দাড়ি-গোঁফ টুপি-পাঞ্জাবি পরে গেরুয়াধারী সাজতে পারলে কোন প্রতিষ্ঠানের আশীর্বাদপুষ্ট হব। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হবে, নইলে এই বৃদ্ধ বয়সেও বেকারত্বের নিরাকারকে সাকার বানিয়ে দিন যাপন করতে হবে। এই জন্যেই আমি পরম্পরা রক্ষা শুরু করেছি। এর প্রথম পর্যায়ে আমার কাব্যচর্চা। প্রাসঙ্গিক যে অনেক দিন, এমন কি বিংশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশক পর্যন্ত আধুনিক আরবী কাব্যে একঘেয়ে 'কাফিয়া' অন্তঃমিলের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই কাব্যচর্চা করা হয়। পরবর্তীকালে মিকাইল নঈমা ও মোহাম্মদ আবদুস সাবুর প্রমুখ কবিবৃন্দের প্রচেষ্টায় ভার্স লিব্রা, আল-শেয়রুল হুর্‌র্‌-ছন্দমুক্ত কাব্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। অনেক পণ্ডিতের ধারণা, অন্তঃমিলের ধারা আরবী কবিতার সর্বপ্রাচীন। এই বিষয়ে এবং আরবী কবিতার উৎপত্তি নিয়ে আরবে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে।

আরবী সাহিত্যে প্রথমে শুরু হল ছন্দোবদ্ধ গদ্য 'সাজ'। ভূতগ্রস্ত মানুষ ও [illegible] এই [illegible] গদ্যে কথা বলত। এ জন্যেই প্রাচীন আরবে অনুমান করা হত প্রত্যেক কবির সঙ্গেই একটি অশরীরী আত্মা বসবাস করে। সে কথা বলায়, অতঃপর কবি কথা বলে। পয়গাম্বর মোহাম্মদ দৈবজ্ঞান লাভের পর নিজের উপর প্রেতাত্মা ভর করেছে বলে ভীতগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তদীয় প্রথম পত্নী খাদিজা ও তাঁর আত্মীয় সুপণ্ডিত ওরাকা বিন নওফলের সান্ত্বনায় তিনি আশ্বস্ত হন। খাদিজা দৈবজ্ঞান লাভ, অর্থাৎ দেবদূত জিব্রিলের আগমন বার্তা বর্ণনা করলেন নওফলের কাছে। নওফল শুনেই বললেন : কুদ্দুস, কুদ্দুস, (পবিত্র, পবিত্র), হে খাদিজা, তুমি যদি আমাকে সত্য বলে থাকো, তবে তাঁর কাছে সবচাইতে বড় নামুস (দেবদূত) এসেছে। এর পূর্বে সে এসেছিল মুসার কাছে। নওফলের সঙ্গে মোহাম্মদের দেখা হল, মোহাম্মদ তাঁর দৈবঘটিত অভিজ্ঞতার কথা বললেন, নওফল মোহাম্মদের ললাট চুম্বন করলেন। নওফলের কথায় মোহাম্মদের আত্মবিশ্বাস বাড়লো। ভূতগ্রস্থ হবার দুশ্চিন্তার ভার হাল্কা হল। মোহাম্মদের সমসাময়িক আরবী কবি হাসান বিন সাবিতের সঙ্গে রাস্তায় স্ত্রী-ভূতের দেখা হল, সে তার উপর ভর করল। সে তাঁকে কাব্যোচ্চারণে বাধ্য করল, তারপর থেকেই হাসান বিন সাবিত কবি হিসেবে হলেন আখ্যায়িত। গল্প প্রচলিত এরকম। প্রাচীন আরবরা বিশ্বাস করত প্রত্যেক কবির সঙ্গেই প্রেতাত্মা বিরাজমান। ইবনে জায়দান তাঁর আল আরাব কাবলাল ইসলাম, (ইসলাম পূর্ব আরব গ্রন্থের প্রথম গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, যে, মুদার বিন নিজার নামক এক ব্যক্তি একদিন চলন্ত উটের পৃষ্ঠদেশ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পড়েই তার হাত ভেঙ্গে গেল। যখন তাকে তুলে আনা হল, সে আর্তনাদ করে উঠল 'ওয়াইদাহ, ওয়াদাহ, আমার হাত, আমার হাত। তার কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। বক্তব্য ছন্দোবদ্ধ। অন্তমিল সম্পৃক্ত। সুরেলা কণ্ঠস্বর উটেরও ভালো লাগল। তাঁর পিঠ নড়ে উঠল। এরপর থেকেই আরবরা মুদারের অনুসরণ শুরু করল। উট চালাবার সময় বলে ওঠে, 'হাইদাহ, হাইদাহ, উট এগিয়ে চলে।—মুদারের বেদনাহত ঘটনা ও আর্তনাদ থেকেই উৎপত্তি হল আরবী কবিতার। শুরু হল অন্তমিল বজায় রেখে কাব্যচর্চার প্রচেষ্টা। এই প্রয়াস মোরদের বহিরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যেও ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্যে অন্তঃমিলের উদাহরণ অনুপস্থিত। সংস্কৃতেও মন্দাক্রান্তা। বলা হয়, আরবী কাব্যের প্রভাবেই বাংলাকাব্যে অন্তমিল-সংক্রান্তি ঘটে।

আমি আরবী চর্চা করেছি। অবশ্য অশিক্ষিতের মতই। দেশীয় মোল্লামুনসীদের মত ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারিনি। মোল্লা সমাজে আমি একঘরে। [illegible] দিক থেকে বিপন্ন। ঝড়-তুফানে জাহাজ ডুবুডুবু। তীরে উঠতে পারছি না। তারেই আমার ঐতিহ্য সচেতনতা বাড়ছে বলেই আমি ইদানিং অন্তমিল বজায় রেখে কাব্যচর্চা শুরু করেছি।

আমার ছত্রদ্বয়ের প্রথম ছত্রের অনুপ্রেরণা কোরাণশরীফের (পবিত্র কোরাণ) ২য় পরিচ্ছেদের এক পংক্তি। এই পরিচ্ছেদের নাম আল বাকরাহ। বাকরাহ শব্দের উৎপত্তি ঘটে হিব্রু 'বকন' শব্দ থেকে। বকনের অর্থ গরু। প্রাচীন সিমেটিক জাতিরা গো-পালন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিল বলে আমরা জানি না। এখনো আরবে গো-চর্চা অনুপস্থিত। ইহুদীদের মিসর বসবাসকালে গো-জাতির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। প্রাচীন মিসরবাসীরা গো-পূজা করত। মাটি বা পাথর দিয়ে তৈরি করত গো-মূর্তি। কোন কোন মূর্তি কথা বলত বলে তারা বিশ্বাস করত। কোরাণের 'তাহা'—'হে মানব' শীর্ষক বিংশ পরিচ্ছেদে গো মূর্তি সম্পর্কিত অনুষঙ্গ আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও একটি সোনালী গাভীর উল্লেখ বর্তমান। মিসরবাসীদের দেখাদেখি ইহুদীরাও গো পূজা শুরু করে। ধর্ম প্রচারক মুসেস আবার তাদেরকে জুহোভার একেশ্বরবাদের দিকে ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদকে 'সংক্ষিপ্ত কোরাণ' বলা হয়। কোরাণের প্রধান প্রধান বিধি-নিষেধ এখানে বিধৃত হয়েছে। এখানেই প্রথম ঘোষণা করা হয়, যে ইস্লামের একেশ্বরবাদ মূলত সেমিটিক ধর্মপুরুষ ইব্রাহিমের একেশ্বরবাদজাত। বলা প্রয়োজন যে, অর্বাচীনকালে অনুমিত হচ্ছে, যে ইব্রাহিম ছিলেন মূলত প্রকৃতিবাদী। তার প্রকৃতিবাদই পরবর্তীকালে একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীর কাছে এই অনুমান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমস্ত একেশ্বরবাদের মধ্যেই প্রকৃতিবাদ ও ছায়াবাদ নিহিত। উক্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে যে, মানুষকে হতে হবে সৎ ও ক্ষমাশীল। প্রেমময়। মানুষকে ফিরে যেতে হবে তার পরম প্রভুর কাছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই পরিচ্ছেদেরই ২৫৬ সংখ্যক পংক্তিতে বলা হয়, ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ আদেশ করা হয় অন্য ধর্মবিলম্বী ও ধর্মের প্রতি হতে হবে সহনশীল।

পরিচ্ছেদের সপ্তম সংখ্যক পংক্তিতে আমার ছত্রদ্বয়ের প্রেরণা বর্তমান। 'ঈশ্বর মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের (অবিশ্বাসীদের) অন্তরের উপর, তাদের কানের উপর, আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ।' বলা হয় অবিশ্বাসীরা কোন মতেই বিশ্বাস করবে না ঈশ্বরের আধিপত্যে, কেমনা তাদের বিবেক-বুদ্ধিতে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। প্রথম সুযোগসন্ধানী যুক্তিবাদী [illegible] ইচ্ছা-অনিচ্ছা

মূল্যহীন। আমি রেহাই পেলাম। ঈশ্বর-ইচ্ছাতেই আমি অবিশ্বাসী। আর আধুনিক মনস্তত্ত্বদর্শী পাণ্ডিত বললেন, অন্তর বা আত্মা বলতে তো কিছু নেই। সবকিছুই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম। অন্তরে মোহর মেরে দেবার প্রশ্নই অবান্তর। অতএব বিশ্বাস-অবিশ্বাস উভয়ই দুরারোহ। অর্বাচীনকালে কোন কোন ব্যাখ্যাকারদের বিশ্লেষণ এরকম যে ক্রমাগত খারাপ পথে চলতে চলতে মানবমন মন্দের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সৎবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। সৎপথ তার কাছে হারিয়ে যায়। যুক্তি মন্দ না। কাজী আব্দুল [illegible] সাহেবের ধারণাও অনুরূপ। খোদার বান্দা বড় [illegible]। লোভ সামলাতে না পেরে বলে দিচ্ছি কাজী আবদুল ওদুদকৃত কোরআন-অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে, এমনকি ভারতীয় সাহিত্যে আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়। [illegible] আবর্জনামুক্ত কিছু উনি কোরআন অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন। জার্মান, ইটালীয়ান ও স্পেনীশ ভাষাতে এর নজির উজ্জ্বল। ভারতীয় ভাষাসমূহের অধিকাংশ চর্বিত-চর্বণ। অযোগ্য। ওদুদ সাহেবের [illegible] অভিজ্ঞতা ও ব্যাখ্যা মধ্যযুগীয় আরব মুক্ত চিন্তাবিদদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুবাদ জোরালো। পাণ্ডিত্যপূর্ণ। নির্ভেজাল। অবশ্য একজন সংবাদশীর্ষ। প্রথানুসারী পণ্ডিতকুল বিষয়ক প্রকাশ করবেন। বললেন, ওদুদ আল্লার কালামকে (ঈশ্বরের বাণীকে) বিকৃত করেছেন। আমাকেও পরিত্যক্তনামা বা জিন্দিক (মুক্ত চিন্তাবিদ) বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করবেন। 'আমার তিন পয়সার কলি, এদের দর্শনে সর্বদা শঙ্কান্বিত।' উত্তরে আমি বলব, কলসী তো আর ভরা নয়, নড়ছে। আমার নাম বাহার, আমি বাহর উল উলুম বা বিদ্যার সাগর নই। অবিদ্যারই।

দুঃখ হয় আমার দাদু বড় আশা করে নাম রেখেছিলেন বাহর উদ্ দিন। ধর্মের সাগর। কলা দাড়ায় কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। অধমের তো বটেই। অকর্মেরও। আর বাংলাভাষায় বর্ণান্তরের ফলে অথবা বাঙালির মজ্জাগত ভাবে কিছুটা ফার্সী চর্চার ফলে, বাহর উদ্দিনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ভিন্ন মুখে ভিন্ন ঢেউ। কখনো বাহর উদ্দিন কখনো বিহার উদ্দিন, আবার কখনো বাহির উদ্দিন। বাহার উদ্দিন-এর উপর এরকম নতুই উৎপাত ঘাত-প্রতিঘাত দেখে [illegible] কাঁপে। দাদু স্বর্গলোকে নিশ্চিত কষ্ট পাচ্ছেন, অথবা রাগে লাঠি হাতে আমার অপেক্ষারত। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর মুখোমুখিতে আমার হৃৎকম্পন ঘটত। স্বর্গে তিনি নিশ্চয় যৌবন ফিরে পেয়েছেন। কেননা বিধান কোরাণ বলেন, স্বর্গে,

দাড়ি গোঁফ না উঠিবে
জরা না ধরিবে
স্থায়ী রহিবে যৌবন।
(মীর মশাররফ হোসেন কৃত মৌলুদ শরীফের বঙ্গানুবাদ, ১৯০৫)

পরিবারের ভেবে দুশ্চিন্তায় ঘুম আসে না। পাঠশালার মাস্টার মশাই শৈশবে অনেক অকথা ঝড়-ঝাপটা দিয়েছেন। এখন তিনি গত। স্বর্গে গিয়েও জ্বালাচ্ছেন। তারই উক্তির ফলে আমাকে পদে পদে শাস্তি পেতে হচ্ছে। যা বর্ণনাতীত। বলিহারি দাদুর এলেমও বাপ রে। সুন্দর একখানা বাংলাভাষার-ই নাম রাখলে পারতে। আমিও বাঁচতাম। তুমিও কষ্ট পেতে না। সজ্জনদেরও নামোচ্চারণের কষ্ট লাঘব হত।

বিহার উদ্দিন না হয় মানিয়ে নেয়া যায়। বাহর শব্দের বহুবচন বিহার—। বাহর মানে সমুদ্র। কিন্তু বাহির উদ্দিন কিভাবে মেনে নেব বলুন? এমনিতেই হাত পা বেরিয়ে আছে। বুকের হাড় বেরিয়ে আছে। কোথাও পা রাখার জায়গা পাচ্ছি না। ভোজন রসিক জিহ্বা বাঙালী সব সময়ই লোই লোই খাই খাই করে বসে আছেন। আর বের হতে চাই না। এ আবার ধর্মের বাহির। দ্বীন শব্দের অর্থ ধর্ম। বাহির উদ্দিন মানে ধর্মের বাহির। সর্বনাশ। ভয়ে ভয়ে গোপনে গোপনে লক্ষ্য করি। কোথায় হয়ত কেউ কেউ বসে আছেন। সুযোগ পেলেই বর্শাঘাত করবেন।

কথায় বলে নামে পরিচয়। আমার ডাক নাম মঞ্জু। নিঃসন্দেহে মেয়েদের নাম। লজ্জায় সব সময় গোপন রাখি। বাবা রেখেছিলেন 'মজনু'। দাদু বললেন 'ছোঁড়া' নামে ভোগাবে। শব্দের অর্থ পাগল। দিওয়ানা। পাল্টে দিয়ে রাখা হল মঞ্জু—সুন্দর। মজনুর সঙ্গে অনৈতিহাসিক একটা উপাখ্যানের সংযোগ আছে। দাদু ছিলেন ওয়াকেবহাল, আরবী ফার্সী ও বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত। আরব দেশে প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে প্রায় প্রত্যেক কবিরই কল্পিত বা অকল্পিত একজন প্রেমিকা থাকত। অষ্টম শতাব্দীর কবি কায়েস বিন আমর তাঁর প্রেমিকার প্রেমে এতই উন্মত্ত হয়ে পড়েন যে, শেষ পর্যন্ত আখ্যা পেলেন 'মজনুন' দিওয়ানা নামে। অধমের ধারণা এটা কিংবদন্তী। কায়েস বিন আমর আমরের পুত্র কায়েস বলে একজন কবির অস্তিত্ব ইতিহাসসম্মত।

যা বলছিলাম, এজন্যেই দাদু আমার নাম পাল্টে 'মঞ্জু' করে দিলেন। সেই একই পদ্ধতিতে কানা ছেলের নাম হল পদ্মলোচন। আমি কুৎসিত বলেই হয়ত অন্যভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হল। আমার ভালো নাম—ডাক-নাম দুটো স্থলেই অর্থের যোগাযোগ তৃপ্তিদায়ক। মঞ্জু স্ত্রীবাচক শব্দ নয়। সং—মঞ্জু+উ(ত্‌)। মঞ্জুশ্রী বলতে জৈন ও বৌদ্ধ দেবতা বিশেষকে বোঝায়। মঞ্জু মানে সুন্দর, মনোহর, মধুর। ফার্সী ভাষায় 'বাহার' শব্দের অর্থ, বসন্ত। বঙ্গভাষায় এর অর্থ রূপান্তর ঘটে। সুন্দর, গৌরব, মনোহর, দীপ্তি। মিলে গেল। দুই দ্বিগুণে চার। বস্তুত নষ্ট। যদিও আমার দুই নামের অর্থই 'সুন্দর'।

প্রচলিত যে, শেষ বিচারের দিন ডাক-নাম ধরেই মানুষকে তার হিসেব-নিকেশ দেখানো হবে। দেবদূত তখন একটা ঝামেলায় পড়তে পারেন। কোন নামে ডাকবেন। দুটোই ডাক-নাম। প্রচলিত। মঞ্জু অথবা বাহার। মঞ্জু ডাকলে তো বিপদ। জুরেস্বরীয় জাত ফারসতা সংস্কৃত ক অক্ষর গো-মাংস। তাকে সাহায্য নিতে হবে অবশ্যই ডকটর মোহাম্মদ শহীদুল্লার। অতঃপর হরিনাথ দে, সুনীতিকুমার তো আছেনই। অথবা, দেবদূত বহু ব্যবহৃত বাহির উদ্দিন বলে ডেকে উঠলেন। তখন তো আরো বিপদ! দুর্মুখ বঙ্গ আরবীজ্ঞানী দু-একজনের অভাব পোয়া বারো। ওখানে যদি দু- পয়সা কামিয়ে নেয়া যায়। কিছুটা বাহবাও। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠবে, লজ্জা, লজ্জা, নগচোলের মুলেই গণ্ডগোল। ওর আবার কিসের হিসেব-নিকেশ। নামই বলে দিচ্ছে ধর্মের বাহির। অবশ্য আমার সান্ত্বনা এই, এখন সঙ্গী ভাই শুকুর মামুদের আভাব হবে না। দরকার হলে করতে হবে উঠতে হবে, কিছুটা বলে দেব। এখানে তো অনেক পেয়েছি। প্রায়ই, প্রতিদিনই।

ধারণা হয়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে দেশী ভাষাভাষী অশিক্ষিত মানুষ আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নাম রাখল 'বড়' মিয়া, দাদু, মুন্সি ইত্যাদি। আজও গ্রামাঞ্চলে এসব নজির বহাল। যেহেতু ইসলাম ধর্মাবলম্বী অতএব মিয়া, আহমদ, আলী একটা কিছু যোগ করতেই হবে। পরে এরই বংশধর যখন ধর্মীয় শিক্ষায় কিছুটা আলোকিত হল, তাদের উপর ওহাবী ফরাজীদের প্রভাব পড়ল, বলল, না আর এই নামকরণ নয়। হিন্দুয়ানী নাম নিষিদ্ধ। সুরু হল ইসলামী নাম। (উদাহরণ স্বরূপ, উনিশ শতকের অন্যতম পরাক্রমশালী ইসলাম ধর্ম সংস্কারক সৈয়দ আহমদ বেরিলভী নিজের নাম গোলাম মুহম্মদ ইসলামের মৌলিক আদর্শ-বিরোধী বলে পরিবর্তন করেন।) রাখা সুরু হল বোরহানউদ্দিন, আবিদ হোসেইন, নাসর আলী। বঙ্গ-মুখে বোরহান হল বোরান, হোসেইন, হোসেন ইত্যাদি। অথবা আরবী ফার্সী মিলিয়ে কোন মোল্লা মৌলবী নাম রেখে দিলেন নূর এ আলম। পৃথিবীর

আরবী ফার্সী প্রকরণ সাধারণ মানুষ অত ঝামেলার ধার ধারে না। সে সব সময়ই সহজীকরণের পক্ষপাতী। সে সব সময়ই ব্যস্ত। সে উচ্চারণ করে 'নুরালম'।

অতঃপর এর পরবর্তী পর্যায়। ইংরাজী শিক্ষা এল। গ্রাম থেকে চাকরী পেয়ে যুবক শহরে এল। বিয়ে করল। জন্ম নিল সন্তান। ছেলের নাম হল দুটো। একটি কথ্য। অন্যটি লিখিত। একটি বঙ্গীয়। অন্যটি আরবী অথবা ফারসী। বাড়িতে বাবার বন্ধু-বান্ধব এল পান নিয়ে। পিতৃ-বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার নাম কি?'

ছেলেটি স-প্রতিভ না হলে (নিঃসন্দেহে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা খুব একটা বাকপটু হত না) এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, 'আমার ডাক-নাম পলটু, ভালো নাম মিজানুর রহমান'। বেচারা অসহায়। পিতৃবন্ধু যদি আবার নামের অর্থ জিজ্ঞেস করে বসেন, তা হলে আর হয়েছে —বাপও এসে পড়বেন প্রসঙ্গে। হয়ত বা বাবাও জানেন না তার নিজের নাম বা ছেলের নামের অর্থ।

একজন সমাজতাত্ত্বিকের কাছে মানুষ-এর নামকরণের ক্রমপর্যায় খুবই লক্ষণীয়। মানব-সভ্যতা ক্রমশঃ এগোচ্ছে। মানুষের সাহিত্য, দর্শন, জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ মানবমুখী হয়ে উঠছে। বাঙ্গালী মুসলমান আগের-কালে যে নাম রাখতেন সন্তানের, আজ আর সে নাম রাখছেন না। হিন্দু সম্প্রদায়ও কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দেবী, ঈশ্বর মহাদেব ইত্যাদি নামকরণে অনাগ্রহী। এ হচ্ছে যুগের ধর্ম। বাঙ্গালি মুসলমান নাম রাখছেন শীলা, ইলা, গোপা, দুসিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই তো সেদিন এক মহিলার নাম শুনলাম মাকালী ইসলাম!

প্রাসঙ্গিক যে, পাকিস্থানের উপনিবেশ থাকাকালে পূর্ব বাংলার মানুষের নামকরণে উর্দু ফার্সী জাত শব্দের অত্যধিক প্রভাব পড়ে। যেমন আশিক, ইকবাল, জিয়া হায়দর, দাউদ হায়দর, রফিক আজাদ। দীর্ঘকালীন বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের ফসল। আমাদের দেশেও মুসলমানদের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব পড়ে। অতঃপর ঐতিহাসিক ক্রম পরিণতির ধারাকে অনুসরণ করেই মানুষের, প্রতিষ্ঠানের, রাস্তাঘাটের, নামও শিরোনামে নির্ভেজাল বাংলা শব্দের আগমন ঘটছে। এটা আগমন নয়, বরং প্রত্যাবর্তন। যা ফলপ্রসু। কাঙ্খিত। খেজুর খুরমার দেশ ঘুরে ঘুরে এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অনেক অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ। এর ফলে বাঙ্গালি মানস আরো উর্বর হচ্ছে। নদী চলছে। নদীর জলে অসংখ্য উপনদী এসে মিশে যাচ্ছে। আরবী-পনা ও দেবদেবীমুখীন মোহভঙ্গের ফলে, যে কোন সৎজনই বিশ্বাস করবেন, অদূর ভবিষ্যতে যে লোকজাত বাঙ্গালি সংস্কৃতির ভিত গড়ে উঠছে, তার মধ্যে আর যা-কিছু থাক, অন্তত হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-চর্চার অবকাশ থাকবে না। লৌকিক ইসলাম ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় প্রচেষ্টার সহজাত প্রতীক বলে এই প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য। বহুদিন পূর্বে, শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল ওদুদ সাম্প্রদায়িকতার বিনাশকল্পে নিরপেক্ষ বঙ্গজ নামকরণের এই প্রয়াসকে আহ্বান করেন। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। বঙ্গ-বুকে নতুন সবুজ ভিত গড়ে উঠছে তা হবে 'রাজা-বাদশা, হাট-বাজারে, ইয়ার-বন্ধু প্রভৃতি শব্দ যুগলের মত সহ-যোগী, সহঅবস্থানকারী, সুদৃশ্য, অর্থ-বহ ও রক্তজাত।

এই যে, আমি এতক্ষণ ধরে গল্পের নায়ক সেজে বকবক করলাম, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অনেক কথার মধ্য দিয়ে একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম, বক্তব্য তুলে ধরতে পারিনি বলে অনুভব করছি, এর মধ্যে যে 'আমি'র ভূমিকা, ক্লান্ত-মানসিকতা, বিচ্ছিন্ন ভাবনা —তাও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসুত। এ সমস্যা মনস্তাত্ত্বিক। ইউরোপে প্রথম মহাসমরের পর উপন্যাস ও গল্পের এক ধরনের ক্লান্ত মানসিকতা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ফরাসী ও জার্মান সাহিত্য। ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব পড়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকের আরবী কথা-সাহিত্যিক মাহমুদ তাইমুর, হাসান হাইকেল ও তাহা হোসেনের গল্প উপ-ন্যাসে নায়কের 'আমি' ও ক্লান্ত-মানসিকতা উপভোগ্য। প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও উন্নতর ভাষা সাহিত্যের আকর্ষণ এক-দিকে, অন্যদিকে ঐতিহ্যপ্রীতি ও সংস্কার-ভীতি আরব মনকে দ্বন্দমুখর করে তোলে, ফলে গল্প-উপন্যাসে এর ছাপ পরিচ্ছন্ন। বাংলা, অসমীয়া ও উর্দু সাহিত্যেও পঞ্চাশের দশক থেকে এই 'আমি'র ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। আগ্রহী পাঠক অসমীয়া সাহিত্যের অতুলনীয় গদ্যকার সৌরভ চালিহার 'ভ্রমণ-বিরতি' বীণা কুঠির, বা তাঁর গল্প-সংকলন 'গোলাম', এ হাত ডব ও দুপুরীয়ার' খোঁজখবর করে দেখতে পারেন। অথবা অন্য একজন প্রথম শ্রেণীর লেখকের 'কেইজন ডেকা মানুহর প্রত্যা-বর্তন' (কয়েকজন যুবকের প্রত্যাবর্তন) নামক গ্রন্থ। ভবেন শইকীয়া, হোমেন বর-গোহাই তো আছেনই। উর্দু কথা-সাহিত্যে ইসমত চোগতায়ী, শাহাদত হোসেন মন্টুর গল্পেও আমার বক্তব্যের সত্য মিথ্যা প্রামাণ্য। বাংলায় এর প্রমাণ ভূরি ভূরি। ধারণা পোষণ করি, যখন ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারে না, চিরাচরিত সংস্কার, অভ্যাস ও মূল্যবোধ তার অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন তার চৈতন্য প্রবাহ মাথা চাড়া দেয়, 'আমি'র মধ্য দিয়ে এর বিস্ফোরণ ঘটে অথবা আত্মমগ্ন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরমী দর্শনে। অবশ্য লেখক যদি দক্ষ কথা-সাহিত্যিক হন, তাঁর কথা আলাদা। সোনার ফসল ফলাতে তিনি অভ্যস্ত।

আমি কথা-সাহিত্যিক নই, কথা-সাহিত্যের ছাইভস্মও নই। আমার পক্ষে রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলা অসম্ভব। যা দেখেছি, যা ভেবেছি, নির্বিবাদে বলে দিচ্ছি। ভুল হলেও মনে কোন খেদ নেই। নির্বেদ নেই। জানি সত্য ভাষণ অপ্রিয়। আমি নির্ভয়। এই যে জেহাদী মনোভাব নিয়ে দুই দলের সমর্থকবৃন্দ ছুটছে, ছুটে যাচ্ছে, তার পেছনে নেশা, খেলার নেশা, দেখার নেশা, ভালোবাসার নেশা। এক অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যা অসুস্থ, তা অকল্যাণকর। যে কোন সম্প্রদায় বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীর নামে ক্লাবের নাম বাড়িয়ে তোলে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতা। পশুত্বের বুকে সুড়সুড়ি দেয়। এর প্রমাণ মাতৃভূমি ভারত অনেক পেয়েছে।

' বাংলা পুঁথিসাহিত্যে হিন্দু দেবদেবী আর মুসলমান পীরের মধ্যে যুদ্ধ হত। যুদ্ধে পীরের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। পীরকে বলা হয় গাজী, যোদ্ধা, বিজয়ী। এই থেকেই পূর্ববঙ্গে গাজীর গানের উৎপত্তি। গাজীর গানে পর-বর্তীকালে বৈষ্ণব প্রভাব বা বাউল অনু প্রবিষ্ট হয়। যেমন 'অন্তরে শ্যামের বাঁশী অবিরত জ্বলে।' পীর বা দেবদেবী যুদ্ধের বৈপরীত্যও দেখা যায় সত্যপীরের পরি-কল্পনায়। অথবা কালী-মন্দিরের পাশাপাশি বাদশার থান দেখে অনুমিত হয় পীরভক্তি বঙ্গের হিন্দু মুসলমানের সহজাত বৃত্তি। (এই ব্যাপারে সুড়সুড়ি লেগে থাকলে শ্রদ্ধেয় পাঠক মম অগ্রজ নৃতত্ত্বদর্শী পন্ডিত সুজিত চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সাকিন—লোক বিজ্ঞান বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়) পীর ও দেবদেবী যুদ্ধের অসুস্থ জের দেখা যায় উনিশ শতকের জাতীয় আখ্যান-কাব্যে। রঙ্গলাল প্রমুখ গুণধর (মাইকেল ব্যতিক্রম) জাতীয় আখ্যান কাব্যকারদের প্রতি সম্মান রেখেও বলছি এসব কাব্য প্রয়াস সর্বাগে সাম্প্র-দায়িক ভেদবুদ্ধি প্রসুত। হিন্দু মুসলিম বিরোধ চর্চার বিষ-প্রয়াস। প্রকারান্তে এসব বিষবৃক্ষের চারা খেলার মাঠে, প্রতিষ্ঠানে, অনুষ্ঠানে রূপিত ও স্থানান্তরিত হয়েছে।

আমি আশাবাদী বিজ্ঞজনেরা বলেন 'মূর্খরাই নিরাশ হয়। মূর্খ হলেও মূর্খামী দর্শাতে আমি অপারগ। নিরাশ হই না। এই যে এরা যাচছেন বানর-প্রায় ঝুলছেন, ছুটছেন, এক ধরনের ড্রেথ-উইশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় এদের হুঁস হবে। নিজের পূর্ব-পুরুষ ও ইতিহাসকারদের বিরুদ্ধে নিজেদের ওপর কৃত্রিম মুসলমানী, হিন্দু-আনী ইত্যাদি ইতরজনিত আকার উকার, ইকার চাপিয়ে দেবার জন্যে বিষোদগার করবেন। সেদিন পুইকারী হারে জাগ্রত হবে শুভবুদ্ধি আমিন।

ভারতের সমাজভাবনা

আমাদের দেশে সমাজ ভাবনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন অনুশীলন বা উৎসাহ নেই। অথচ সমাজজীবনে প্রতি মুহূর্তেই নানামুখী পরিবর্তন ঘটছে। কখনো আমাদের জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাতে। যুগের ব্যবধানে প্রতিদিনের এই পরিবর্তন সামগ্রিকরূপে তুলে ধরার পর সাধারণ মানুষও অবাক বিস্ময়ে তা অনুধাবন করে। অদূর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ব্যবধানের সেতু এবং হেতু দুইই তখন বুঝতে পারে। অতএব সমাজ-বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণার ফলাফল সাধারণ মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরা পরোক্ষ সমাজসেবা অথবা সামাজিক কর্তব্যেরও একটা অঙ্গস্বরূপ বলা চলে। এই ব্রতে ব্রতী ডঃ সজল বসু মননশীল সমাজবিজ্ঞানীদের কিছু মূল্যবান রচনা সংকলিত করে বাংলা সাহিত্যের একটা শাখাকে অন্ততঃ কিছুটা সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের মনে কতকগুলি ছকে বাঁধা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। এগুলি আমার সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীক হিসেবে গণ্য। অথচ আজকের যুগে এই মতের প্রাসঙ্গিকতা নেই। এই সত্য আমরা মুখেও স্বীকার করতে চাই না কেন। জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ যে এক সঙ্গে চলতে পারে না, অথবা মার্কসবাদী সমর্থকের বাড়ি লোকালয়ে শনিপূজা ও অনুরূপ বহু সংস্কার বেমানান, এই সহজ বাস্তবতা আমরা এড়িয়ে চলি। মার্কসবাদী পার্টির নেতারাও সদস্যদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিধিতে কী হচ্ছে, না হচ্ছে সে বিষয়ে মাথা ঘামাতে চান না, পাছে সমর্থনের ভিত ধসে যায়।

মূলতঃ অর্থনীতিবিদ হলেও ডঃ অম্লান দত্ত সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে অকপটে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সংযোজিত ইতিহাস ও দর্শন প্রসঙ্গে তিনি মমতা ও মনন এবং নীতি ও দর্শন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন : শুধু যুক্তি ও অযুক্তি, ক্ষোভ ও সান্ত্বনার ঊর্ধ্বেও একটি সাম্য আছে। আমাদের চেতনার যে স্তরে আমরা ক্ষুব্ধ হই। অথবা সান্ত্বনা খুঁজি, তার বাইরে দাঁড়িয়ে সেই বিক্ষুব্ধ চেতনা ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অবলোকন করা যায়। সেই দৃষ্টিতে কোন অযুক্তি নেই। আছে শুধু একটি অন্তহীন মুহূর্ত। এবং সীমাহীন বিস্ময়ের ভিতর মুক্তি। কিন্তু অস্তিত্বের এই স্থির বিন্দুটি থেকেও ফিরে আসতে হয়। এই প্রত্যাবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষ পুনর্বার মিলিত হয় প্রকৃত ও সকল মানুষের সঙ্গে।...
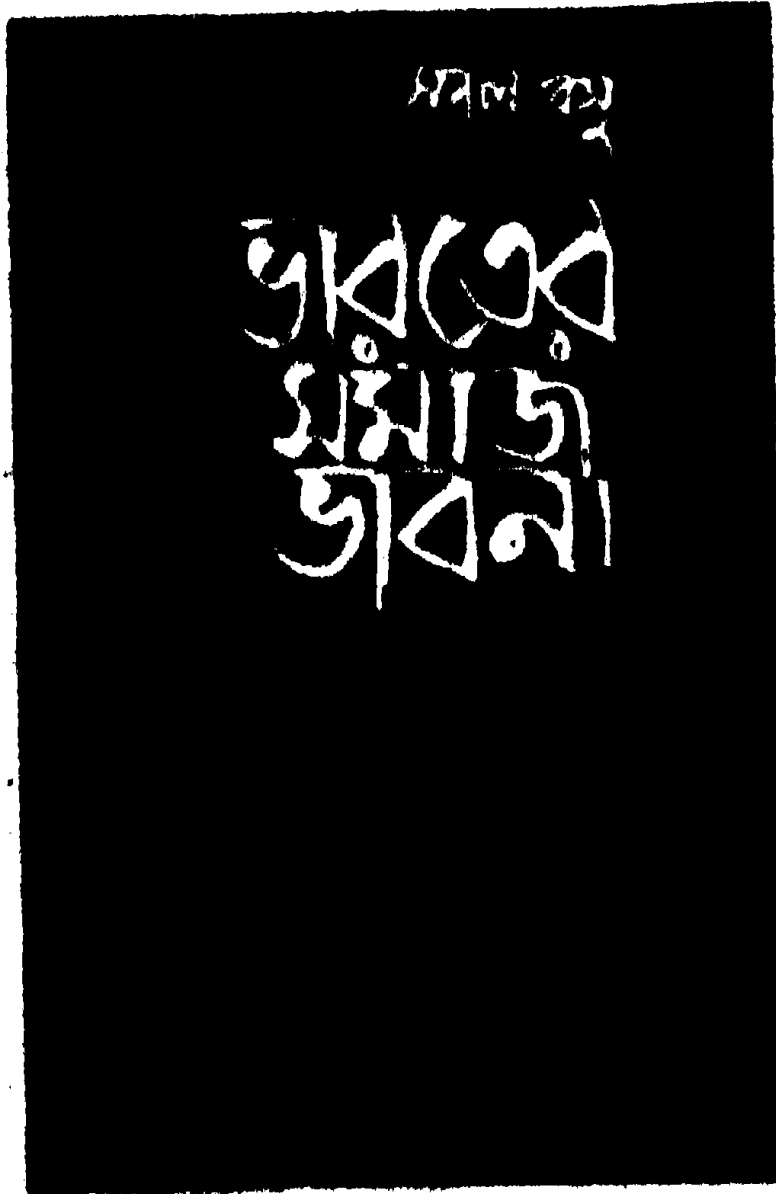
ডঃ দত্ত এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলেছেন : অতীতের বর্ধিত ধ্বংস-স্তূপের মধ্যেও এমন কেউ কেউ চির-স্মরণীয় হয়ে থাকেন, যাঁদের জীবনে কান পেতে ইতিহাস তার নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়। ব্যক্তি যেমন নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, এ ছাড়া তার মুক্তি নেই, ইতিহাসও তেমনই বার বার নিজেকে অতি-ক্রম করে। দর্শনে এই অতিক্রমের চিন্তা উচ্চারিত হয়।

সমাজতন্ত্র ও ভারতের মার্কসবাদ প্রসঙ্গে আদ্রে বেতে লিখেছেন। বাস্তব সমাজের গতিময় প্রকৃতি বিশ্লেষণে মার্কস দেখিয়েছেন যে, একই স্বার্থের লোক অনেক সময় বিভক্ত হতে পারে, আবার বিভিন্ন স্বার্থের লোকও একজোট হতে পারে। মার্কসের এই ধরণের বিশ্লেষণ ঠিক মত বোঝা সহজ নয়। কারণ, তার জন্য অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও চিন্তার অধিকারী হওয়া দরকার। বরং যান্ত্রিক বস্তুবাদের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে আমাদের জটিল সমাজে কী কী হচ্ছে বা হতে পারে, তার ছক বাঁধা উত্তর দেওয়া অনেক সহজ। কিন্তু কোন সঠিক তথ্য উদ্ভাবনের জন্য নয়, তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্যই সমাজ-বিদদের কাছে মার্কসের এত কদর। মানব সম্পর্কের দ্বন্দ্বের সামাজিক উৎস সন্ধানে মার্কসের এই অবদান সমাজ সমীক্ষক ছাত্র-দের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

চন্দননগরের সন্তান কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র আদ্রে বেতে আরও লিখেছেন : ত্রিশ বছর ধরে ভারতীয় মার্কস-বাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুরাগী। তাদের কাছে সব মানবতা, ন্যায় বিচার ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির নিদর্শন হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ....ভারতীয় মার্কসবাদী, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মার্কসবাদীরা সোভিয়েটের প্রতি আর ততটা অনুরক্ত নন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের সামা-জিক সাম্রাজ্যবাদী বলেও অভিহিত করেন। ......মার্কসবাদীরা ভালভাবেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন পুঁজিবাদ ও ভারতীয় সামন্তবাদের আপাত বিরোধিতা তুলে ধরেছেন, কিন্তু সব সময়েই তাঁরা একটি সমাজকে, হয় সোভিয়েট, না হয় চীনা, ব্যতিক্রম ধরে নিচ্ছেন। সমাজতত্ত্ব সব সমাজকেই সমানভাবে বিচার করে। কোন ব্যতিক্রমে এর সায় নেই।

ডি, এম দান্ডেকারের ভারতীয় অর্থ-নীতির সমস্যা, রাখাল দাশের পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সমস্যার কয়েকটি দিক, টি, এন মদ্রাসের ইসলাম, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, রজনী কোঠারি [illegible] ইতিহাসের দাবী ডি, এল শেঠের ভারতে [illegible] প্রগতিবাদের বিন্যাস আশিস নন্দীর ভা[illegible] রাজনৈতিক সংস্কৃতি—পটভূমি ইন্দিরা যুগ, মৃণাল দত্ত চৌধুরীর বিকেন্দ্রিকরণ প্রভৃতি প্রতিটি রচনাই সারগর্ভ। মননশীল এই রচনা সম্ভারে বর্তমান ভারতের সমাজ ভাবনা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। সমাজসেবী, সমাজ বিজ্ঞানী, রাজনীতিক, অর্থনীতিক সর্বো-পরি মননশীল সকল শ্রেণীর পাঠককেই এই রচনা সম্ভার নানাভাবে সাহায্য করবে।

জাতীয় পরিকল্পনা ও বেসরকারী উদ্যোগ প্রসঙ্গে প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর বিশ্লেষণী রচনায় বলেছেন, গত সাতাশ বছরের আর্থিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাতে যে জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা হল, গ্রামাঞ্চলে নতুন কার্যধারার প্রয়োজনের উপলব্ধি। এই কর্মধারা হবে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পভিত্তিক। ......আমাদের পরিকল্পনার মূল কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। আমরা এতদিন মুখে ও কাগজপত্রে যে কথা বলেছি, তাই পরিপূর্ণভাবে সার্থক করতে হলে যা করা দরকার, সেটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে করতে হবে। আমাদের অর্থনীতি 'মিশ্র' থাকবে, এটা ধরে নেওয়াই সঙ্গত। এই মিশ্র অর্থ-নীতিতে কোথায় সরকারী উদ্যোগের আর কোথায় বেসরকারী উদ্যোগের আলাদা ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হবে, আর কোথায় অপরিহার্য বেসরকারী উদ্যোগের প্রসারের জন্যই সর-কারী উদ্যোগ প্রয়োজন হবে, সে সম্বন্ধে মনস্থির করলে পরিকল্পনা নতুন গুরুত্ব পাবে। যে আশা নিয়ে পরিকল্প[illegible]র মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটা সফল হবে।

—রঞ্জন দুলাল

ভারতের সমাজ ভাবনা : সজল বসু সম্পা-দিত (প্রথম খণ্ড)। প্রাচী পাবলি-[illegible] [illegible] কলকাতা—১। দাম কুড়ি টাকা।

[illegible], ৩ ও ৪, হেয়ার স্ট্রীট, কলি[illegible]

অসময়ের আয়োজন

অজয় বসু

অকটোবরে টেস্ট ক্রিকেট। প্রস্তাবটি শহর কলকাতার মনঃপূত নয়। তবু কিম হিউজ পরিচালিত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে গাভাসকারের ভারতের পঞ্চম টেস্টের আসর পাতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ওই অকটোবরেই, কলকাতার ইডেনে।

এই কপি যখন লিখছি তখন আরও পাঁচজনের মত আমার মনেও নিরন্তর জিজ্ঞাসা, অকটোবরের কলকাতায় ক্রিকেটের অনুকূল আবহাওয়ার হদিশ মিলবে তো? বৃষ্টি বাদ সাধবে না? ভিজে মাটি আর স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের অভিশাপে টেস্ট খেলার পাঁচদিনের মেয়াদ কাঁচির কোপে কাটছাঁট হবে না তো?

সবাই ভারাক্রান্ত এই সব চিন্তার চাপে। মনে স্বস্তি নেই। নেই নিশ্চয়তা। তাই প্রাক টেস্ট কালে টিকিটের হাহাকারও নিরুচ্চার। উৎসাহ, উদ্দীপনা ঝিমিয়ে পড়েছে। এমন নিরুত্তাপ আবহাওয়ায় সাম্প্রতিক কালে কলকাতায় আর কোনো দিন টেস্ট ক্রিকেট হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

তবে এমনটি ঘটাই তো স্বাভাবিক। যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত। কলকাতায় অকটোবর মাস ক্রিকেটের পরিপ্রেক্ষিতে মল মাস। বড় ক্রিকেট তো দূরের কথা, ঘরোয়া আসরের ছোটখাটো অনুষ্ঠানও ওই সময়ে কলকাতায় হতে পারে না। ক্রিকেট মাঠ অকটোবরে তৈরীই হয়ে ওঠে না। অকটোবর মাঠ তৈরীর লগ্ন। বর্ষার পর ভিজে জমি শুকোবার পালা, যদি অবশ্য চড়চড়ে রোদ ওঠে। কার্তিকের আকাশ হয় মেঘশূন্য। আরও কটা দিন কাটলে নভেম্বরে শুরু হয় মরশুমী খেলা ক্রিকেট।

ক্রিকেটের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠতে ইডেন আবার আরও বেশি সময় নেয়। ইডেনের জমিতে মাটির ভাগ বেশি, বালি কম। তার ওপর পাশেই গঙ্গা। একেই বর্ষার প্রভাব তার ওপর গাঙ্গেয় আবহাওয়ার আর্দ্রতা, দুয়ে মিলে ইডেনকে এমনই ভিজিয়ে রাখে যে মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠতেই অকটোবর মাস ফুরিয়ে যায়। পিচের চারপাশে মাটির নীচে বৃত্তাকারে নালা-নালি কেটে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারেরা এবার সময়ের আগে ইডেনকে ক্রিকেটের উপযোগী করে তুলতে চেষ্টার কসুর করেন নি। তবু এই পরিকল্পনা ও উদ্যোগ মুখোমুখি লড়াইয়ে প্রকৃতিকে হার মানাতে পারবে কিনা কে জানে! পারলে মঙ্গল। না পারলে টিকিট সংগ্রহকারীদের কষ্টোপার্জিত অর্থ জলে গিয়ে পড়বে। তবে তাতে ব্যবস[illegible] দিতে হবে বলে মনে হয় না। যেহেতু সরকারী অনুদানের আনুকূল্য পেয়ে তাঁরা তো [illegible] সিজন টিকিট বিক্রি করে নিজেদের অর্থ ভাণ্ডার যথারীতি ফুলিয়ে রেখে দেবেন। নগদ পয়সা ফেলে সিজন টিকিট যাঁরা যোগাড় করেন তাঁরা যদি ফাঁকিতে পড়ে যান তাহলেও দুঃখবোধ করার তাগিদ উপলব্ধি করেন না কলকাতার টেস্ট ক্রিকেটের ব্যবস্থাপকেরা।

পূর্ব ভারতের যে অঞ্চলে অকটোবর মাসে ঘরোয়া ক্রিকেটের অপ্রধান আসর বসানো সম্ভব হয় না প্রাকৃতিক কারণে, সেই অঞ্চলে বছরের ওই সময়টিতে টেস্ট ক্রিকেটের আসর সাজানোর পরিকল্পনা রীতিমত বে-হিসেবী এক কাণ্ড। অতীতে দেখা গেছে যে এই বে-হিসেবী পরিকল্পনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে কলকাতার টেস্ট খেলা হয় সংক্ষেপিত হয়েছে। আর না হয় খেলাটি শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে গিয়ে সিজন টিকিটধারী দর্শকদের ফাঁকিতে ফেলেছে। ফাঁক ফাঁকির এমন আয়োজনে কলকাতার ক্রিকেট সংগঠকেরা এবং রাজ্য সরকার কেন যে সায় দেন, সেইটিই প্রশ্ন। কিন্তু সে প্রশ্ন তুলেও বুঝি লাভ নেই। যেহেতু উত্তর দেবার নৈতিক দায়িত্ব যাঁদের ওপর বর্তেছে তাঁরা এ প্রসঙ্গে চিরদিনই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন।

অকটোবর বা নভেম্বরের গোড়ায় ইডেনে টেস্ট খেলার আয়োজন করা হলে কলকাতার অভিজ্ঞতা যে কেমন তিক্ত হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে আগেকার দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ রাখছি। দুটি দৃষ্টান্তই ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা ঘিরে।

প্রথম দৃষ্টান্ত ১৯৫৬ সালের।

ইয়ান জনসনের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড সফর সেরে ঘরে ফেরার পথে অকটোবরে এসে পৌঁছয় ভারতে। স্বল্প-মেয়াদী সফরে মাত্র তিনটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা ছিল সেবার। অকটোবরে প্রথম টেস্ট হয় মাদ্রাজে। ভারত ইনিংসে হারে। দ্বিতীয় টেস্ট শেষ অকটোবরে বোম্বাইয়ে হলে খেলা অমীমাংসিত থাকে।

অতঃপর তৃতীয় টেস্ট শুরু হয় ইডেনে ২রা নভেম্বরে।

খেলা তো শুরু হল কিন্তু বর্ষার প্রভাব যাবে কোথায়? মাটি ভিজে চারপাশ স্যাঁতসেঁতে। পলি উমরিগড় ব্যাট করার সাহস না পেয়ে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করতে ডাকেন। পিচের সহায়তা পেয়ে ভারতীয় অফ স্পিনার গোলাম আমেদ একাই সাত জনকে ফিরিয়ে দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১২৭ রানে। কিন্তু ভিজে স্পিন সহায়ক পিচে ভারতীয়দের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় আরও করুণ। বিশ্ববিখ্যাত লেগ-স্পিনার রিচি বেনো ছ-ছটি উইকেট নিয়ে মাত্র ১৩৬ রানে ভারতের ইনিংস [illegible] করে দেন। অবশ্য ওই ইনিংসে [illegible] পেস বোলার রে লিন্ডওয়াল তিনটে উইকেট পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসেও অবস্থার কোনো [illegible]। ভিজে মাঠ, স্পিন সহায়ক পিচের হেঁয়ালিকে বাগ মানাতে না পেরে অস্ট্রেলিয়া ন উইকেটে ১৮৯ রান করে দান ছেড়ে দেয়। একমাত্র নিল হার্ভেই (৬৯) কিছুটা খেলতে পেরেছিলেন। অন্যদের নাস্তানাবুদ করে তোলেন ন্যাটা স্পিনার ভিনু মানকাদ (৪৯ রানে ৪) ও অফ স্পিনার গোলাম আমেদ ৮১ রানে ৩।

চতুর্থ দিন সকালে ভারত যখন দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং শুরু করে তখন দু দলে ব্যবধান ২৩০-এর মত। মধ্যাহ্নে রান হল দু উইকেটে ৭৪। তারপরই বর্ষণসিক্ত পিচ শুকিয়ে ওঠার মুখে লেগ-স্পিনের প্যাঁচে প্যাঁচে রিচি বেনো জড়িয়ে ধরেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের। তাঁকে মদত যোগাতে থাকেন অস্বীকৃত অফ স্পিনার জিম বার্ক। ব্যাটসম্যান জিম বার্ক বোলার হিসেবে আগে কোনো দিনই কিছু করতে পারেননি। কিন্তু সেবার ইডেনের অনুকূল পিচের ঠাওর পেয়ে কব্জি ঝাঁকিয়ে বল ঘুরিয়ে চার-চারটি উইকেট নিজের ব্যাগে পুরে নেন মাত্র সাঁইত্রিশ রানের বিনিময়ে। রিচি বেনো আর জিম বার্ককে সামাল দিতে না পেরে ভারতীয় ইনিংস দ্বিতীয় বারের জন্যে খতম হয়ে যায় সেই ১৩৬ রানেই। আর অস্ট্রেলিয়া জেতে ৯৪ রানে।

কথা ছিল খেলা পাঁচদিন গড়াবে। কিন্তু বর্ষণসিক্ত ইডেন পুরো সময় খেলাটি গড়াতে দেয়নি। পুরো একটি দিন বাকি থাকতেই খেল খতম। সিজন টিকিটধারীদের এক-দিনের পয়সার সবটাই বরবাদ! বলতে গেলে ১৯৫৬ সালের সেই টেস্টে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল পর্জন্যদেব। তারই স্যাঙাৎ সেজে বেনো-বার্ক, গোলাম-ভিনুর মত স্পিনাররা পলকেই বাজীমাৎ করে দেন। নিল হার্ভে, কলিন ম্যাকডোনাল্ড, জিম বার্ক, ইয়ান ক্রেগ, পিটার বার্জ এবং পঙ্কজ রায়, নরি কন্ট্রাকটর, পলি উমরিগড়, বিজয় মঞ্জরেকার, ভিনু মানকাদের মত ব্যাটসম্যানেরাও প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে খেলাটিকে পঞ্চম দিন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি।

১৯৬৪ সালের অভিজ্ঞতা আরও করুণ। সেবারে খেলা ববি সিম্পসনের অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মনসুর পাতৌদির ভারতের। খেলার শুরু মাঝ অকটোবরে, ১৭ তারিখে। কিন্তু শুরু তো কোনো-রকমে হল, কিন্তু খেলা শেষ হল কই! শেষের ঘণ্টা বাজার অনেক আগেই বৃষ্টিই সবকিছুই ভাসিয়ে দিল যে!

আরম্ভেই মাঠ ছিল ভিজে। মনসুর টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাটিং করতে ডাকলে দুই ন্যাটা বোলার সেলিম দুরানী ও রুসি সুর্তি ১৭৪-এর মধ্যেই গোটা অস্ট্রেলীয় দলকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পরম খেয়ালী স্পিনার দুরানী সেদিন দারুণ স্পিন জমিয়েছিলেন। একাই আউট করেছিলেন ছ-ছজনকে। বিপক্ষের কম রানের উত্তরে ভারত রান তোলে ২৩৫, যার মধ্যে বোরদের সংগ্রহ ছিল অপরাজিত ৩৮; জয়সিমার ৫৭ ও সরদেশাইয়ের ৪২। লেগ স্পিনার ববি সিম্পসন (৪৫ রানে ৪) ও অফ স্পিনার ভিভার্স (৮১ রানে ৩) ভিজে পিচে স্পিন বোলিংয়ের মাহাত্ম্য

নিজেদের আচরণে ধরে রেখেছিলেন।

পরের অধ্যায়ে অস্ট্রেলিয়া রান করে এক উইকেটে ১৪৩। তৃতীয় দিনের খেলা সাঙ্গ ওই রানে এবং মূল খেলারও ইতি ওই অঙ্কে। চতুর্থ দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি আর বৃষ্টি। পঞ্চম দিনেও বৃষ্টি ধরেনি। হোটেলের বন্ধ ঘরে বন্দী থেকেই খেলোয়াড়দের দুটি দিন কাটাতে হয়। আর সিজন টিকিটধারীদের হা-পিত্যেশ হয়ে বসে থেকে শেষ পর্যন্ত হায় হায় করেই ইডেন ছেড়ে চলে যেতে হয়। সেদিন হতাশ দর্শকদের দাবি ছিল, ইডেনে অসময়ে যেন টেস্ট খেলার ব্যবস্থা আর না করা হয়। কিন্তু কর্তাদের কানে জল ঢোকেনি। তাই আবার খেলার আয়োজন করা হয়েছে ওই অকটোবরে, নিতান্তই অসময়ে।

কানপুরে আবার জয়ের ইতিহাস

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে যা ছিল প্রত্যাশিত, সেই ফল ফলল কানপুরে। এবার স্বীকার করতেই হবে যে কানপুরের গ্রীনপার্ক অস্ট্রেলিয়ার কাছে সত্যিই দুর্ভাগ্যের।

কুড়ি বছর আগে এই মাঠেই রিচি বেনোর শক্তিশালী দলকে ভারত হারিয়েছিল ১১৯ রানে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের সেই প্রথম জয়। অধিনায়ক রামচাঁদ এবং ভারতকে জয় এনে দিতে সেবার দুর্ধর্ষ বোলিং করেছিলেন অফ স্পিন বোলার জেসু প্যাটেল। তিনি প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন ৬৯ রানে ৯টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৫ রানে ৫টি উইকেট। সেবার গ্রীনপার্কের পিচ স্পিন বোলরদের অনুকূলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে অস্ট্রেলিয়া দলে রিচি বেনোর মতো বিশ্ব শ্রেষ্ঠ স্পিনার ছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম ইনিংসে ৬২ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিল। তাঁর পাশে মিডিয়াম পেস বোলার অ্যালান ডেভিডসনের কৃতিত্ব অনেক বেশী। ডেভিডসন প্রথম ইনিংসে ৩১ রানে ৫ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩ রানে ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হবে যে ১৯৫৯ সালে গ্রীনপার্কের পিচ জেসু প্যাটেলই ঠিকমত ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। কেউ হয়তো বলবেন অস্ট্রেলিয়াকে চতুর্থ ইনিংস ব্যাট করতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও প্যাটেলের কৃতিত্বকে খাটো করা যাবে না। কারণ প্রথম ইনিংসেই তিনি ৯টি উইকেট পেয়েছিলেন; দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি পেয়েছিলেন পাঁচটি এবং উমরিগড় চারটি। তাহলে?

কুড়ি বছর পরে গ্রীনপার্কে অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের হিসেব-নিকেশ করলে দেখা যাবে এবারও অবস্থাটা অনেকটা একই রকম হয়েছে। এবারও এক অফ স্পিন বোলার ভারতের জয়ের প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্থান ছিল এক মিডিয়াম পেস বোলারের। এবার কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের আটটি উইকেট নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন অফ স্পিনার শিবলাল যাদব আর মিডিয়াম পেস বোলার কপিলদেব। বাকী উইকেট দুটির একটি করে গেছে দিলীপ দোসী ও কারসন ঘাউড়ির ঝুলিতে।

কানপুরে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়া যখন ব্যাট করতে নামলো তখন জেতার জন্যে তাদের দরকার ছিল ২৭৯ রান আর হাতে ছিল পর্যাপ্ত সময়। তিনশ মিনিটেরও বেশী। সুতরাং চ্যালেঞ্জ নেওয়া যেতো।

কিন্তু সুনীল গাভাসকারের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে মনের জোর দেখাতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কিম হিউজ। ইনিংসের গোড়া থেকেই তাঁদের শুরু হয়েছিল নেতিবাচক খেলা। ফলে উইকেটও পড়তে লাগলো দেদার। তবু সেই মুহূর্তে ভারতের অতিবড় সমর্থকও জয়ের স্বপ্ন দেখতে পারেন নি। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজের ঠিক পরে খেলার চেহারা পুরোপুরি বদলে গেলো। অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৪৯ রানের মধ্যে চারটি উইকেট হারানোয় খেলা চলে এলো ভারতের মুঠোর মধ্যে।

তখনই সকলে বুঝে গিয়েছিলেন ভারত জিততে চলেছে। একটাই প্রশ্ন তখন ছিল—সে জয় আসবে কখন? মধ্যাহ্ন ভোজ ও চা পানের বিরতির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া আরো চারটি উইকেট হারালো। অপেক্ষা তখন শুধু প্রত্যাশিত লগ্নটির। তাও আসতে খুব একটা বেশী সময় লাগলো না। কপিলদেবের বলে হগ এল-বি-ডবলু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেতার তরঙ্গে জানাজানি হয়ে গেলো যে কানপুরের গ্রীন পার্কে ভারত আবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে। কুড়ি বছর আগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কানপুরে। সেবারের জয়ের নায়ক ছিলেন জেসু প্যাটেল আর পলি উমরিগড়। আর এবার সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শিবলাল যাদব আর কপিলদেব।

কানপুরের গ্রীন পার্কে এবার নিয়ে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তিনটি টেস্ট খেলা হয়েছে। তার মধ্যে দুটিতে অস্ট্রেলিয়াকে হার স্বীকার করতে হয়েছে, বাকী টেস্টটির মীমাংসা হয়নি।

যাই হোক কানপুরে জেতার জন্যে এবারের ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ছয় টেস্ট মরশুমে ভারত আপাতত ১-০ খেলায় এগিয়ে থাকলো। দেখা যাক বাকী তিনটি টেস্টের ফল কোন দিকে গড়ায়। ভারত যদি আরো জেতে তাহলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। কারণ অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগেরই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই চালাবার অভিজ্ঞতা খুবই কম। তাই একমাত্র হোয়াইটমোর ও হিলডিচ ছাড়া আর কেউই পাল্টা লড়াই চালাবার মতো দৃঢ়তা দেখাতে পারেন নি। ফলে ভারত অত্যন্ত সহজে জিতে গেলো। জিতে গেলো ১৫৯ রানে।

কানপুরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে তিনটি টেস্ট খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফল দেওয়া হলো :—

এবারের খেলা

ভারত : ২৭১ (গাভাসকার ৭৬, চৌহান ৫৮, বেঙ্গসরকার ৫২, বিশ্বনাথ ৪৪, ডাইমক ৯৯ রানে ৫ ও হগ ৬৬ রানে ৪টি উইঃ) ও ৩১১ (চৌহান ৮৪, বিশ্বনাথ ৫০; কিরমানি ৪৫ ও ঘাউড়ি ২৫, ডাইমক ৬৭ রানে ৭টি)

অস্ট্রেলিয়া : ৩০৪ (ইয়ালপ ৮৯, ডার্লিং ৫৯, ঘাউড়ি ৬৫ রানে ৩, কপিলদেব ৭৮ রানে ২, যাদব ৬৫ রানে ২; দিলীপ দোসী ৩২ রানে ১ ও ভেঙ্কটরাঘবন ৫৬ রানে ১) ও ১২৫ (হিলডিচ ২৩, হোয়াইটমোর ৩৩, কপিলদেব ৩০ রানে ৪, শিবলাল যাদব ৩৫ রানে ৪টি উইঃ)

১৯৫৯ **সালের খেলা**

ভারত : ১৫২ (ডেভিডসন ৩১ রানে ৫ ও বেনো ৬২ রানে ৪) **ও ২৯১** (নরী কনট্রাকটর ৭৪; বোরদে ৪৪, আর বি কেনী ৫১, নাদকার্নী ৪৬, ডেভিডসন ৯৩ রানে ৭টি উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া : ২১৯ (ম্যাকডোনাল্ড ৫৩, নীল হার্ভে ৫১, ডেভিডসন ৪১; জেসু প্যাটেল ৬৯ রানে ৯টি) ও ১০৫ জেসু প্যাটেল ৫ রানে ৫ ও উমরিগড় ২৭ রানে ৪টি উইঃ) সেই খেলায় ভারত ১১৯ রানে জিতেছিল।

১৯৬৯ **সালের খেলা**

ভারত : ৩২০ (ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ৭৭, অশোক মানকাদ ৬৪; সোলকার ৪৪, কনোলী ৯১ রানে ৪ ও ম্যালেট ৫৮ রানে ৩টি উইঃ) ও ৭ উইঃ ৩১২ ডিঃ (অশোক মানকাদ ৬৮, বিশ্বনাথ ১৩৭, ম্যাকেঞ্জি ৬৩ রানে ৩)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪৮ (স্টাকপোল ৪০; ওয়ালটারর্স ৫৩, রেডপাথ ৭০ শিহান ১১৪, ভেঙ্কটরাঘবন ৭৬ রানে ৩) ও বিনা উইঃ ৯৫) লরী ৫৬ অপরাজিত।

শ্রীকান্তের উইল

নাম শুনে অনেকে ভাবতে পারেন এ বোধহয় কোনো শরৎ-কাহিনী বা বঙ্কিম কাহিনীর চিত্ররূপ। বিজ্ঞাপনেও প্রতিভা বসুর 'জন্মান্তর' গল্পের কোনো উল্লেখ নেই। এই 'জন্মান্তর'কে অবলম্বন করেই এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন ভরত সমশের জংবাহাদুররাণা। যা হুবহু অনুসরণ করে গেছেন বিস্বস্ত পরিচালক দীনেন গুপ্ত। আর সব মিলে যা দাঁড়িয়েছে...।

ছবির প্রধান চরিত্র শ্রীকান্ত ছেলেবেলায় কাকা-কাকীমার অত্যাচারে বড় হতে থাকে। নির্যাতনের কারণ ওর পৈতৃক সম্পত্তি। শ্রীকান্ত বড় হলে অর্থাৎ উত্তমকুমার দেখা দিলে, আমরা ভাবি এবার বুঝি শ্রীকান্তর বদলা নেবার পালা এল। কিন্তু বড় শ্রীকান্তও কাকার সংসারে ওই একইভাবে নির্যাতিত হতে থাকল। এমনকি শেষে ওকে আত্মহত্যা করতে হল। কোনো প্রতিবাদ নেই, একটা ভাল লোক সারাজীবন অত্যাচার সয়ে শেষে দেয়ালে একটা উইল লিখে গলায় দড়ি দিল, সেই সঙ্গে অপরাধীদের কোনো সাজা হল না—এমন অসুস্থ বিষয়বস্তু নিয়েও যে ছবি করা যায়, দর্শক তাই দেখলেন। শ্রীকান্ত একবার যদিও কাকাকে মারতে গিয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ে মায়ের কথা মনে পড়াতে মারতে পারেনি। কারণ মারা যাবার সময় মা ওকে কাকার অবাধ্য হতে মানা করেছিলেন। ছবিতে শ্রীকান্তর ছোট (খুড়তুতো) ভাইয়ের বৌকে নিয়ে একটু নাটক করা হয়েছে। কোনো এক দৃশ্যে

উত্তমকুমার

ছোট-বৌকে শ্রীকান্ত 'মা' বলে জড়িয়ে ধরলে অন্য দুই বউ তা দেখে ফেলে। এরপর আরও নাটক। স্মৃতিভ্রষ্ট শ্রীকান্ত বেদম মার খেয়ে স্মৃতি ফিরে পায়। যদিও পেয়েও কোনো লাভ হয় না।

বাড়ীর একমাত্র ভাল প্রাণ ওই ছোট-বৌয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। ওঁর অভিনয় ভাল। অত্যাচারী কাকা-কাকীমার চরিত্রে রয়েছেন টিপিক্যাল বিকাশ রায়-গীতা দে। ছোট-ছেলের ভূমিকায় গোবেচারা রঞ্জিত মল্লিক। শ্রীকান্ত হয়েছেন উত্তমকুমার। ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত তিনি অভিনয়-ক্ষমতা দেখাতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর অভিনীত চরিত্রের পরিণতি ফ্যানেদের অবশ্যই আহত করেছে। সলিল চৌধুরীর কথায় ও সুরে ছবিতে দু-একটা ভাল গান আছে।

অজিতবরণ মিত্র

'দাদার কীর্তি' ছবির লোকেশনে শিল্পী অয়ন ব্যানার্জী ও অনুপকুমারকে নির্দেশ দিচ্ছেন তরুণ মজুমদার। ছবি : এস রায়

ছবির খবর

যেখানে ব্যবসায়িক সাফল্যের ধুয়ো তুলে নিজস্বতা হারানোর প্রতিযোগিতা চলছে রাতদিন, সেখানে তরুণ মজুমদার শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে এই মাটির কথাই যখন বলতে চেষ্টা করছেন তখন তাঁকে নস্যাৎ করা যায় কি? কি কথা বলছেন, কিভাবে বলছেন, কেন বলছেন যা বলছেন না, তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। তবুও এটা তো অবিসংবাদিত সত্য যে, বাংলা ছবির একমাত্র অক্সিজেন সিলিন্ডার এখন তিনিই।

হয়ত নাগরিক জীবনের জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁর শিল্পকর্মকে তেমনভাবে প্রভাবিত করে না, তিনি সব ঘটনার দিকে আর পাঁচজনের মত রি-অ্যাক্ট করতে পারেন না, করলেও প্রকাশে অক্ষম তিনি। তরুণবাবু নির্জন খোয়াই, দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ি ঢল, কাশবন, ছোটবেলার পুরনো গন্ধমাখা স্মৃতির পাতা, কৈশোর প্রেমের প্রতি হয়ত একটু বেশি দুর্বল—এবং এজন্যই তথাকথিত বুদ্ধিমান দর্শকের কাছে অসহনীয়। অথচ তাঁর ছবিতে যে সার্বজনীন নাগরিক সত্তা, বোধ ও জীবনের কথা বলা হয় সেটাকে অস্বীকার করব কেন?

এইতো সম্প্রতি তিনি যে ছবিটি করছেন তার নাম 'দাদার কীর্তি'।' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই স্বীকার করেছিলেন এটি তাঁর কাঁচা বয়সের লেখা। তবুও তরুণবাবুর এই বয়ঃসন্ধির মানসিক গঠনের মধ্যে আলোছায়ার খেলা আমার কাছে বেশ সিনেমাটিক্ লেগেছে। ওদের ভ্যালুজগুলো আজকের প্রেক্ষিতে কতখানি ভ্যালিড সেটাও লক্ষ্য করার মত।'

'বালিকা বধূ', 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ' এর কোন ছায়া এছবিতে হয়তবা কেউ কেউ খুঁজে পাবেন, কিন্তু একবারে নতুন ব্যাকড্রপে এছবির গল্প। বিহারের একটা ছোট্ট শহরে।

সম্ভবতঃ পরিবেশের প্রতি অত্যাসক্ত থাকার জন্যই তরুণবাবু এই ছবির অনেকটা কাজ করছেন বিহারের শিমুলতলায় লোকেশনে। উঁচুনীচু টুকরো পাথর ছড়ানো রাস্তা, নিরিবিলি লোকালয়, দূরের রেল লাইন, ঘরের পেছনের আম বাগান, চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া গানে ভরা রাত, রঙিন হোলি—সব কিছুই থাকবে এ ছবিতে।

'দাদার কীর্তি' নিশ্চয়ই টালিগঞ্জের দ্বিতীয় 'পথের পাঁচালি' হবার সাহস রাখে না, কিন্তু দর্শককে নিমন্ত্রণ জানাতে নিশ্চয়ই পারে। তরুণ মজুমদারের অনুকরণ কলকাতায় তিনি নিজেই, তিনি একক।

যাক্ শেষ পর্যন্ত পার্থপ্রতিম চৌধুরী ছবির কাজ শুরু করলেন। পুরোনো দুটি ছবিকে শুধু রিভাইভ্ করলেন তা নয়, একটা নতুন ছবির কাজও আরম্ভ করতে চলেছেন। কোন কোন মহল থেকে তাঁকে কোণঠাসা করার চেষ্টা হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি ধৈর্যের পরীক্ষায় সফল।

মাসখানেক আগে একটানা দশদিন সুটিং করলেন 'কৃষ্ণ পক্ষ' ছবিটির। সুপ্রিয়া চৌধুরী, অপর্ণা শর্মা, দেবিকা মুখার্জি আর নতুন নায়ক অর্জুন মুখার্জিকে নিয়ে বেশ

সুশীল চট্টোপাধ্যায়

কবি অতুলপ্রসাদের জন্মতারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ২০ অকটোবর, ১৯২৩ সালে। পিতা স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সুগায়ক ও সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ। পিতার উৎসাহে ছেলেবেলা থেকেই সুশীলকুমার সঙ্গীত সাধনায় আগ্রহী ও অনুরাগী। খিদিরপুর একাডেমী ও আশুতোষ কলেজে শিক্ষা লাভ করে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট সংস্থায় কর্মরত। 'দক্ষিণী' থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতে ডিপ্লোমা নেন। তাঁর শিক্ষাগুরুদের মধ্যে ছিলেন শুভ গুহঠাকুরতা, সুনীলকুমার রায়, সুবিনয় রায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রমুখ। অতুলপ্রসাদের গান শেখেন রেণুকা দাশগুপ্ত, মঞ্জু গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, রাজেশ্বর মিত্র ও হরেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কান্তকবি রজনীকান্তর গানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন কবির দৌহিত্র দিলীপকুমার রায়। সুরসাগর হিমাংশু দত্তর গানে তালিম দেন সাবিত্রী ঘোষ এবং ভজন ও রাগপ্রধানে প্রকাশকালী ঘোষাল। এছাড়াও দ্বিজেন্দ্রগীতি ও নজরুল গীতিতে সুশীলকুমারের দখল আছে। তাঁর গানের প্রথম রেকর্ড কবি নজরুল ইসলামের শিক্ষাদানে গৃহীত হয়। বাল্যকালে একদা তাঁর গান শুনে প্রখ্যাত শিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও উৎসাহ দিয়েছেন।

সঙ্গীতই সুশীলকুমারের কাছে সাধনার ও আনন্দের বস্তু—তাই আজও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে অজস্র শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে গান শিখিয়ে এবং হাজার হাজার শ্রোতাদের রেকর্ড, বেতার, টি-ভি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গান শুনিয়ে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছেন। **ভট্টনারায়ণ শর্মা**

কতগুলি ভাইট্যাল দৃশ্য গ্রহণ করলেন তিনি।

সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বসার সুযোগ ঘটেছিল একটি ঘরোয়া সাংবাদিক আসরে। নতুন ছবি 'ইতি তোমার' এর শুভ-যাত্রা উপলক্ষে দুই প্রডিউসার শুক্লা কানুনগো ও অমর সাই ডেকেছিলেন সবাইকে। পার্থপ্রতিম জানালেন 'স্বামী স্ত্রী'র ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে এই ছবির গল্প। কাঠামোটুকু শুনে মনে হল 'অনুভব' ছবির হাড় আর একজন টালিগঞ্জের নায়িকার দাম্পত্য জীবনের মাংসটুকু নিয়ে তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে চাইছেন 'ইতি তোমার' —এ। উপস্থিত একজন নিমন্ত্রিত ফিসফিস করে বললেন—'এটা পরিচালক বা প্রযোজকের স্মৃতিকথা নয় তো।'

তা হবেই বা কি করে? পরিচালকের কাজই হচ্ছে জীবন থেকে খুঁজে নেওয়া শিল্পের রসদ। পার্থপ্রতিমের বলিষ্ঠ হাতে যে কোন কাহিনী নতুন ডায়মেনশন নিয়ে হাজির হতে পারে যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিকতায় তিনি কাজ করেন। সঙ্গে তো উত্তমকুমার, দীপংকর দে, শর্মিলা ঠাকুরের মত শিল্পী রয়েছেন, চিন্তা কি!

শুনলাম 'কুরুপক্ষ'র জন্য তিনি পূর্বতন রাজ্য সরকারের অনুমোদন করা টাকা পাবেন এবং ছবির কাজ খুব শিগ্গির শেষও হবে, এর পরেই হাত দেবেন 'নাগরিকে'। অবশ্য ছবির নাম বদলাতে হচ্ছে। দু বছর আগে ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' মুক্তি পেয়েছে তাই। নতুন নাম 'ক্যানভাস।'

অর্থাৎ কুরুপক্ষ, ক্যানভাস, ইতি তোমার—তিন তিনটে ছবির দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। যতদূর জানি ছবিগুলির প্রোডিউসাররা পিছিয়ে পড়ার লোক নন। এবার আশা করব আত্মসংযম ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে পার্থপ্রতিম টালিগঞ্জে নিজের জায়গাটা পাকা করে নেবেন। কারণ এখন এখানে ভুঁইফোড়ের রমরমা চলছে।

নির্মল ধর

ছো নাচ ও ঝুমুরের গান

ছো বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গীভূত নয়, ছো ঝাড়খন্ডী মানুষের আদিম পাথুরে অরণ্যের—গত ৮ আগস্ট, এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত আলোচনা সভায় পশুপতি মাহাতো এই সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

'ছো নৃত্যশৈলী ও ঝাড়খন্ডের মানুষ' ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। ছো নাচের গঠনগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন ঝাড়খন্ডী সমাজ ও মানুষের ঐ নাচের প্রাণের সম্পর্ক যা গভীরে প্রোথিত শিকড়ের মতো। এই আবেগ কখনো কখনো যুক্তিকে তুচ্ছ করেছে। বস্তুত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। বাঙালী করে নেওয়ার 'অপচেষ্টা' কিভাবে প্রমাণিত হল? কারণ: ১। মানচিত্র সংক্রান্ত অস্পষ্টতা নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কোন সময়কার মানচিত্র মেনে নেওয়া হবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মত থাকা প্রয়োজন।

২। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, প্রধানত কুর্মি, মাহাতোরাই ছো নাচের উদ্ভাবক, প্রতিপালক এবং পৃষ্ঠপোষক। অর্থাৎ প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সন্দেহেরও কোন কারণ নেই।

৩। নৃতাত্ত্বিক মতানুযায়ী, বিগত কয়েক শতাব্দীতে মাত্র বাঙালী জাতির সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

ফলে 'আগ্রাসনের প্রচেষ্টা'টি রহস্য-জনক।

অবশ্য ছো নাচের আঙ্গিকগত বিশ্লেষণে তিনি যুক্তিনির্ভর এবং সার্থক। ছো শব্দের অর্থ, গাজনের সঙ্গে ছো এর সম্পর্ক, সূর্য-পুজো ভক্তদের উদ্ভব ইত্যাদি জ্ঞাত বিষয় ছাড়াও তাঁর আলোচনার মধ্যে বেশ কিছু আকর্ষণীয় তথ্য রয়েছে। যেমন, নাচের ছন্দের উপর মিথের প্রভাব, যা যুদ্ধনৃত্যের অবশেষ হওয়ার ফলে কেবল রণউন্মত্ততা নয়, জটিলতর মাত্রাও এতে যোগ হয়েছে। ছো এর গানেও এই জাতীয় অভিনবত্ব দেখা গেছে। যথা, পশুপতিবাবু গণেশবন্দনার সময় লাস্যের সুর এবং শিবের তাণ্ডব নৃত্যের সময় কীর্তনের সুরের কথা জানালেন। কেবল 'সুষম সংমিশ্রণ' ছাড়াও এতে অন্য ধরনের তাৎপর্য থাকা সম্ভব। যেমন, ছো এর সঙ্গে মাঝি ও নাটুয়া নাচের মিশ্রণ।

স্বপন বসু সঙ্গীতের কাজে [illegible] করছিলেন পশুপতিবাবুকে। সিংভূম [illegible]কার 'হো' উপজাতিদের একটি গান [illegible]বাবু অসাধারণ গাইলেন। সেরাইকেলা ছো এর সঙ্গে এই গানটির সম্পর্ক আছে। সবশেষে, 'চল মিনি আসাম যাব', গানটি শোনা গেল। গানটি উত্তর বাংলার, ধারণা ছিল। আসলে ওটিরও মূল উপাদান ঝাড়খণ্ডী। একদা অর্থনৈতিক সংকটে গোটা বাংলাদেশ থেকে বহু অধিবাসীর আসামের চা বাগানে কাজ নেওয়া এবং কর্মক্ষেত্রের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এই গানের উৎস। পশুপতি মাহাতোকে ধন্যবাদ, গানটি পরিবেশন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রদানের জন্য—ওই গান উপস্থিত শ্রোতাদের বিচলিত করেছে সন্দেহ নেই।

৯ আগস্ট বীণাপানি মহান্ত ঝাড়খন্ডের ঝুমুরগানের উপর আলোচনা করলেন। যদিও ঝুমুর, ছোটনাগপুর থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশের গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু বীণাপানি মহান্ত মোটামুটি স্থানগতভাবে সীমাবদ্ধ ছিলেন। উনি আলোচনার সময় সঙ্গীতের বিশেষ তত্ত্বাদির সাহায্য গ্রহণ করছিলেন। সম্ভবত কিছুটা একাডেমিক আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভাষাগত সমস্যায় তা ঘটে নি। তবে বীণাপানির আন্তরিকতার কোন ত্রুটি ছিল না।

ঝুমুরের দুটি ভাগের মধ্যে ভাদুরিয়া লোকসঙ্গীত হিসেবে অনেক ভাল লাগল।

দরবারীকে বীণাপানি অবশ্য যথেষ্ট প্রশংসো করলেন। কিন্তু এই 'কম্পোসড' দরবারীকে লোকসঙ্গীতের বদলে রাগাশ্রিত উচ্চাঙ্গ পদাবলী ভ্রম করা স্বাভাবিক। ভাদুরিয়ার মধ্যে ঢিমা লয়ের গাড়োয়া, দ্রুত লয়ের খেমটার থেকে বেশী আন্তরিক মনে হল। পার্টী নেধা ও ঝিজা ফুলিয়ার স্পষ্ট নিদর্শনের প্রয়োজন ছিল।

বীণাপানি মহান্ত সুগায়িকা। বিশেষতঃ 'পরেব দেশে যায়ে দেখো' গানটিতে ভেসে আসছিল মাটির গন্ধ।

পুষণ গুপ্ত

অবাক জলপান

শিশু শব্দটির সংজ্ঞা যদি একটু টেনে ধরে পাঁচ থেকে পনেরো বছর অবধি করা যায় তা হলে 'পাণ্ড' আয়োজিত সুকুমার রায়ের অবাক জলপান নাটকের অনুষ্ঠান-টিকে সহজেই একটি শিশু অনুষ্ঠান বলা চলে। বিনোদন সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য নির্ভেজাল আনন্দ বিতরণই হয়ে থাকে, এবং 'পাণ্ড' তার বাইরে কোন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের পরিশ্রম বা লড়াই করেনি। তবে শিশু অভিনীত 'অবাক জলপান' নিঃসন্দেহেই আনন্দ দিয়েছে এবং সুকুমার রায়ের নাটকটি নিতান্ত আটপৌরে উপস্থাপনাতেও কেমন অবাক করে দিতে পারে তার প্রমাণ রেখেছে বারবার।

বস্তুত পথিকের ভূমিকাভিনেতা 'দীপাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়' যদি পরবর্তীকালে একজন ভালো অভিনেতা হয়ে গড়ে ওঠে তো বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবো না, বরং সেটাই স্বাভাবিক মনে হবে তার আজকের সহজ নৈপুণ্যের পরিণতি হিসেবে। একই রকম সম্ভাবনা দেখা যায় 'সম্রাট সেন'-এর কবি এবং 'স্বরূপলাল মিত্র'-র বৈজ্ঞানিক চরিত্র চিত্রণে। কিশোরী মেয়েদের পক্ষে নিখুঁত রূপসজ্জা ছাড়া পুরুষের চরিত্র করা কঠিন। তবু 'শর্মিতা দে' যেভাবে একটি বৃদ্ধের রূপসজ্জায়, বৃদ্ধকণ্ঠে অভিনয় করে গেল তা প্রশংসাযোগ্য। ছেলেমানুষদের এই প্রযোজনা সব মিলিয়ে নিছক ছেলেমানুষী নয়, ছেলেখেলা তো নয়ই।

'অবাক জলপান'-এর নির্মল শৈশব-স্নানের পরে ছিল বড়োদের করা গীতি আলেখ্য 'বৃষ্টি শেষের নীল আকাশে'। রবীন্দ্রনাথের কিছু গানকে ঋতু অনুযায়ী ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে গ্রন্থনা ও নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করার এই রীতি বহু ব্যবহারে জীর্ণ। তবু এই অনুষ্ঠানটি মনো-গ্রাহী হয়ে উঠেছিল মূলত 'সুলেখা রায়'-এর সুন্দর ভাষ্য রচনা এবং 'শিখা বসু'র অসামান্য সংগীত পরিচালনার গুণে। বহুদিন পরে অপেশাদারী শিল্পীদের মধ্যে এত-গুলো ভালো গলা এবং এমন সুপরিকল্পিত গানের বিতরণ লক্ষ করা গেলো। শিখা বসু নিজে যেমন খুবই ভালো গেয়েছেন, [illegible] ভালো গেয়েছেন সবিতা দে এবং [illegible]। [illegible] বিজ-

সুলেখা রায় এবং কুনাল ঘোষ ভিতরী অস্বাচ্ছন্দ ছিলেন মনে হয়, কিন্তু তাতে তাঁদের কণ্ঠসম্পদের রসগ্রহণের বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

নৃত্যাংশ এতো কাঁচা ছিল যে তা নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই। যন্ত্র-সহযোগিতায় নন্দন মুখোপাধ্যায় ও গৌতম ভট্টাচার্যকে ভালো লাগে। তবে অনেক থামতি পুষিয়ে দিয়েছিল সুদীপ্ত রায় ও সুলেখা রায়-এর দীপ্ত আবৃত্তি ও গ্রন্থণা।

সুরজিৎ ঘোষ

গীতবাণীর সমাবর্তন

গত ১৭ সেপ্টেম্বর সোমবার কলা-মন্দির ভূমিতল মঞ্চে গীতবাণীর দ্বিতীয় সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঐ অনুষ্ঠানে স্নাতকগণকে উপাধি, এবং দীক্ষান্ত ভাষণ দেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাবিদ নীহারবিন্দু সেন। এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন সুভাষ চৌধুরী। খুবই ঘরোয়াভাবে তিনি বলেন, 'কেউ হার-মোনিয়ামের পক্ষে, কেউ বলেন হার-মোনিয়াম ছুঁয়ো না। আমি নিজে তানপুরার পক্ষপাতী। তবে তানপুরার সঙ্গে গান গাইতে পারছি না বলে গান হল না, এটা ঠিক নয়। আসল কথা, সুরবাঁধা, সেটা হারমোনিয়াম কিংবা তানপুরা যাই হোক না কেন।' কার কাছে শিখব, কেমন করে শিখব—এই বিষয়টির ওপরও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'ভাল কণ্ঠ নেই বলে উচ্চদরের গায়ক হতে পারলাম না, এনিয়ে দুঃখ করার কোনো কারণ নেই, একজন শিক্ষকতো হতে পারি। তাও যদি না হতে পারি, একজন শিক্ষিত শ্রোতাতো হতে পারি।' সুভাষবাবুর এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সমবেত ও একক সঙ্গীত পরিবেশিত হয় গীতবাণীর শিক্ষার্থী শিল্পীদের কণ্ঠে। প্রতিটি পরিবেশনই সুখশ্রাব্য হয়েছিল।

নির্মল দাস

পূজার রেকর্ড

গ্রামোফোন কোম্পানীর পূজায় রেকর্ড-এর প্রথম গুচ্ছে এল-পি ডিস্কের প্রধান আকর্ষণ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'লিজেন্ড অফ গ্লোরি'। এই ন'খানি গানের মধ্যে আছে সেইসব গান যা শুধু হেমন্তবাবুকে সঙ্গীতজগতে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠাই দেয়নি, বাংলাগানে এক নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। প্রত্যেকটি গানই সলিল চৌধুরীর সুরের। এবং চারখানি গান ছাড়া (তিনখানি সুকান্ত ভট্টাচার্য একখানি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর) বাকী পাঁচখানির রচয়িতাও সলিল চৌধুরী। হেমন্ত-সলিল জুটি আধুনিক বাংলাগানের জগতে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় রচনা করেছিল। কারণ রোমান্টিসিজম ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত দৃশ্য ও ঘটনাও

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সুর ও ছন্দের বিদ্যুৎ স্পর্শে কি অসাধারণ রূপসৃষ্টি করতে পারে তারই স্বাক্ষর উজ্জ্বল করছে এই গানগুলিতে।

রাণার, পাল্কী চলে, পথ হারাবো বলেই এবার, দুরন্ত ঘূর্ণির, খিতাং খিতাং বোলে তথা ছন্দপ্রধান গানগুলিতে ছন্দের বৈচিত্রই শুধু নেই, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছন্দের বহুধাবিস্তৃত গতি, লয় ও মেজাজ সৃষ্টির শিল্পকৃতি শ্রোতাদের কাছে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পাল্কী চলার হুমহুমা রবের পর পাল্কী চলেরে, অঙ্গ টলেরে-তে দ্রুতগতি বিলম্বিত লয়ের শিথিলতায় মন্থর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাল্কী চালকদের ক্লান্তির ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাণার গানে 'দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে'-র জায়গায় সুরের উল্লম্ফনে রাণারের বিদ্যুৎগতিটি যেমন ঝলকে ওঠে শেষের দিকে নিঃসঙ্গ রাণার করুণ জীবনও মূর্ত হয়ে ওঠে যখন হেমন্তবাবুর সহজ মধুর পুরুষালি কণ্ঠে ধ্বনিত হয় একটি ব্যাকুল প্রশ্ন : 'রাণার রাণার কি হবে এ বোঝা বয়ে?'

'গাঁয়ের বধূ'—সেই সময়ের গান (১৯৪৯) যখন চল্লিশের মন্বন্তরের পর আমাদের সযত্নলালিত আদর্শ ও সৌন্দর্য-বোধ বিরাট একটা আঘাত খেয়েছে এবং সাহিত্যে ও সঙ্গীতেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। সরল জীবনের শান্তি ও বিপ-র্যয়ের চাঞ্চল্য এখানে সুর ও ছন্দের সুষম মিলনে মূর্ত।

আবার অবিমিশ্র সুরের প্রবাহে পরি-বেশিত 'অবাক পৃথিবী', 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম', 'ঠিকানা আমার চেয়েছ' স্মরণ করবে লিরিক ও মেলডি সম্বন্ধে শিল্পী কত সচেতন। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ-যোগ্য—আলোচিত গানগুলি প্রথম ডিস্ক-বন্ধ হয়েছিল ১৯৪৯—৫২ সালের মধ্যে। সেই গানগুলিই শিল্পী এখনকার সময়ে নতুন করে রেকর্ড করেছেন। দীর্ঘ সাতাশ

বয়স বাদে তাঁর কণ্ঠের ঐশ্বর্য ত ম্লান হয়ই নি, উপরি পাওয়া হিসেবে পাওয়া গেল তাঁর পূর্ণ পরিণত শিল্পীজীবনের নানান অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ গভীরবোধের প্রতিবিম্বন, যার জন্য গানগুলি আরো আকর্ষণীয় হয়েছে।

'নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে' শীর্ষক এল-পি ডিস্কে আছে কিশোরকুমারের বার-খানি ননফিল্ম বাংলাগানের সংকলন। বেশীর ভাগ স্ব-সুরে একখানি লতা মঙ্গেশকারের সুরে এবং তিনখানি রাহুল দেববর্মণের সুরে গাওয়া। গানগুলিতে কিশোরের বাংলা গানের প্রতি সিরিয়াস দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলেছে। এ ছাড়া শক্তিশালী কণ্ঠের দীপ্তি ত আছেই।

রুণা লায়লার এল-পি এ বছরের পুজো ডিস্কের অন্যতম আকর্ষণ হওয়ার এই সাংবাদিকের আনন্দিত হওয়ার বিশেষ কারণ আছে। কারণ অমৃতের এবং অন্যান্য পত্রিকার সাংস্কৃতিক বিভাগের মাধ্যমে রুণা লায়লাকে অগণিত সঙ্গীতরসিকের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে-ই। আলাউদ্দিন আলীর সঙ্গীত পরি-চালনায় রুণা আটখানি পল্লীগীতি উপ-ভোগ্য হয়েছে তাঁর শিক্ষিত কণ্ঠ এবং এ ধরনের গানের ম্যানারিজমের যথাযথ প্রয়োগকৌশলের কারণে।

"স্মৃতির মালিকা গাঁথি"—নাম দিয়ে বেরিয়েছে ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে প্রণব রায় কমল দাসগুপ্তের কথা ও সুরের বারখানি গান। প্রণব রায় ও কমল দাসগুপ্ত—বাংলা গানে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের স্রষ্টা। এই সঙ্কলনের মধ্যে আছে এমন কতকগুলি গান যা চল্লিশ দশকে সারা দেশে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—কানন দেবী (আমি বনফুল গো), জগন্ময় মিত্র (তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন), মোর জীবনের দুটি রাতি (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য), যবে এসেছিলে তুমি প্রিয় (তপনকুমার), এই কি গো শেষ দান (রবীন মজুমদার) কণ্ঠে কালজয়ী শিল্পীদের যেসব গান পাথরের বুকে খোদাই-করা মূর্তির মত সঙ্গীতরসিকের চিত্তে একটা চিরায়ত ইমেজ সৃষ্টি করে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। সেসব গান অন্য শিল্পীদের দিয়ে রেকর্ড করানোটা শিল্পীর ওপরই অবিচার। বিশেষ করে সেই সব শিল্পী যখন এখনও আমাদের মধ্যে [illegible]।

উৎপলা সেন

এরচেয়ে অনেক বেশী সার্থক ফিরোজা বেগমের এবারে প্রকাশিত নজরুল গীতির এল. পি. ডিস্ক। এ ডিস্কের অন্তর্ভুক্ত 'ভরে নীল যমুনার জল' 'কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে.' 'এসো হে সজল শ্যাম.' 'লায়লী তোমার এসেছে' গানগুলির তুলনা হয় না।

রোমিনিসেন্স—নাম দেওয়া রেকর্ডে ওয়াই এস মুল্কির পিয়ানো একর্ডিয়ানে হিন্দী ছায়াছবির বারখানি গানের সুর শ্রুতিমধুর, এবং এর মধ্যে বোম্বের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গীত রচনার বৈশিষ্ট্যও অনুধাবন করা যায়।

ই পি ডিস্কে—শ্যামল মিত্রের কণ্ঠ-মাধুর্য ও পরিবেশন কুশলতায় শ্রুতিনন্দন তাঁর প্রতিটি গান—বিশেষ করে ও বন্ধুরে, পরাণ বিহঙ্গ কাঁদে।

আধুনিক গানের তারকা হয়েও সন্ধ্যা মুখার্জির শিল্পীমনের যথার্থ আশ্রয় যে রাগাশ্রিত গানে সেই কথাটিই বোঝা গেল 'বড়ে গোলাম আলির চারখানি অতি জনপ্রিয় ঠুংরীর সুরে পরিবেশিত চারখানি বাংলা গান। মূল ঠুংরীর ভাব, সুর দুই-ই অনাহত আছে তাঁর মত রেশম-মসৃণ কণ্ঠে। কথা শ্যামল গুপ্তর।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ কণ্ঠকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন ভূপেন হাজারিকা ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁদের সুরে রচনায়।

বনশ্রী সেনগুপ্তর কণ্ঠ সৌকর্যের জন্যই 'আঁধার ঘরের প্রদীপ' শুনতে ভাল লাগে—রবীন মজুমদার কণ্ঠ স্মৃতিতে অম্লান থাকা সত্ত্বেও।

শ্যামল মিত্রের ও অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে পিন্টু ভট্টাচার্যর গানগুলিও সুগীত। শ্রাবন্তী মজুমদারের গান যথামানে।

নীতা সেনের সুরে ও গৌরীপ্রসন্নর কথায় তরুণ শিল্পী সুধীন সরকার এবার আরো ভালো গেয়েছেন। বিশেষ উল্লেখ্য 'ফুল ফোটা থেমে যেতে পারে' ও 'একটি কনকচাঁপা'।

বাউলের ধারাটি অন্যান্যবারের মত এবারেও অনাহত রেখেছেন পূর্ণদাস বাউল ও মঞ্জু দাস।

এবারে প্রবীণ ও নবীন দুই নতুন শিল্পীর কণ্ঠে শোনা গেল—উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতি। শিল্পীরা হলেন গঙ্গাচরণ বিশ্বাস ও দময়ন্তী বর্মন। আঞ্চলিক সুরের এই বিশ্বস্ত চিত্রনে এধরনের উপভোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে।

গীতা দে ও অমরেন্দ্র মণ্ডলের সহযোগিতায় সুশীল চক্রবর্তীর কৌতুক-নকসা ও মিন্টু দাসগুপ্তর কৌতুকগীতি যথারীতি ভুরিভোজের শেষে চাটনীর মত।

সুর, কথা, ভাব সব দিক বিচারে এবারের পুজোর শ্রেষ্ঠ গানগুলির অন্তর্ভুক্ত মেগাফোন কোম্পানীর লেবেলের একটি ই-পি-তে উৎপলা সেন ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুটি করে চারটি গান গেয়েছেন। উৎপলা সেনের 'ডুবে গেল চাঁদ' গানটিতে (কথা শ্যামল গুপ্ত) মারুবা রাগের ছোঁওয়া-লাগা উদাসী বিষণ্ণতার আবেদন মর্মস্পর্শী। গানের মনোরম মুখটি আমীর খাঁর 'মারবা' রাগের বন্দেজকে (এল পি ডিস্কে) স্মরণ করিয়ে দেয়। 'দুখের দিনে কেউ ত থাকে না (গৌরীপ্রসন্ন) সহজ সুরে প্রাণবন্ত। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আজ বরনা রোমান্টিক মধুরতা যেমন আবেগে ভরা তেমনই মুন্সিয়ানা রয়েছে ছন্দের দোলে নেচে-ওঠা 'ঘুম আসে না বনজ্যোছনাতে'। চারটি গানেরই সুরকার সতীনাথ মুখো-পাধ্যায়।

—সন্ধ্যা সেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে [illegible] সরকার কর্তৃক [illegible] প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৬৫ পয়সা। ত্রিপুরায় [illegible] বিমান মাশুল [illegible] পয়সা। [illegible] বিমান মাশুল-২০ [illegible]।
[illegible]

অমৃত

১৯ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা
১ কার্তিক, ১৩৮৬
19th October 1979

আগামী সংখ্যায়

সোমক দাসের বড় গল্প
জলের কাছে বন্যা
জগন্ময় মিত্র প্রসঙ্গে
লিখেছেন সন্ধ্যা সেন

সাধ্যের ভিতর

এই সেদিনও একটা সময় ছিল—যখন লেখক তাঁর নিজের সম্বলেই বই প্রকাশ করতে পারতেন। কাগজ পাওয়া যেতো। এবং রিম পিছু মোটামুটি সাধ্যের ভেতর একটা দাম ছিল। অনেক কবি, গদ্যকার অ্যান্টিক কাগজে নিজেই ছাপিয়ে বই প্রকাশ করেছেন। প্রেসের ফর্মা পিছু ছাপার খরচও চেষ্টাচরিত্র করে জোগাড় করা যেতো। লেখক তাঁর লেখা ছাপিয়ে বাঁধিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারতেন।

গত বাংলা নববর্ষে কলেজ স্ট্রীট খুব কম বই-ই ছেপে বের করতে পেরেছেন। অ্যান্টিক কাগজে বই ছাপিয়ে বের করলে তার দাম নাগালের বাইরে চলে যাবে। রিম একশো সত্তর টাকা। তাই হোয়াইট ওভ। তাও তো একশো ত্রিশ। নগদ হাতে নিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকতে হবে। বাজারে হোয়াইট ওভ উঠলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ফর্মা পিছু ছাপানোর খরচ লাফ দিয়ে দিয়ে প্রায় দেড়শো টাকা। তারপর আছে বাঁধাই খরচ। এ অবস্থায় কলেজ স্ট্রীটে এখন বই বেরোচ্ছে কম। যাও বা বেরোচ্ছে—তা বড় লক্ষ্মীর বড় সংখ্যায় ছাপা কম দামের মোটা বই। দশ টাকা দামের দশ ফর্মার বই কেউ ছুঁতে চাইছেন না।

এই যখন অবস্থা—তখন নবীন লেখকের নতুন বই আর বেরোয় কি করে? কোন প্রকাশক ঝুঁকি নেবেন? জীবন ধারণের ব্যয় এখন এমন এক জায়গায়—যেখান থেকে শিল্পের দিকে ঝুঁকে তাকাবার উপায় নেই। এই সঙ্গে আছে বিদ্যুৎ-বিরতি।

যতটা মনে পড়ে—কেদার রায় ঐতিহাসিক নাটকে বেতনভুক পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি রডা বলেছিল—হামি চায় খাইবার রোটি—ঠাকিবার ঘর।

নির্বাচন হয়ে গেলেই নাকি কাগজের বাজার সুস্থির হবে। আরও শোনা যাচ্ছে—ভোটার লিস্ট আর ইসতেহার ছেপেই প্রেসগুলো জিরোবে। আমাদেরও রডার মত বলতে ইচ্ছে করে—হামি চায় ছাপার কাগজ—পড়িবার বই—সাধ্যের ভিতর।

নদীর চেয়েও নিষ্ঠুর

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ভালো ব্র্যান্ডের কুড়িটা ফিল্টার সিগারেটের একটা প্যাকেট কিনতে যা লাগে—তাই দিয়ে এখনো আমাদের দেশে একজন মানুষ কেনা যায়। একদিনের জন্যে। তাকে দিয়ে আট ঘন্টা ধরে খাটানো যায় আটটি টাকায়। অথচ অনেকেই চার ঘন্টায় কুড়িটা সিগারেট ফুঁকে দিচ্ছে।

বাজারে এক কিলো চাল তিন টাকা। দেড়মণ ধানে এক মণের মত চাল হয়। তার মানে একশো এগারো টাকার এক মণ চাল হয় দেড় মণ ধানে। কিন্তু চাষী দেড় মণ ধান বেচতে গিয়ে ৬০।৭০ টাকার বেশি পায় না। আমি নিজেই অনেক সময় দেড় মণ ধানে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন টাকা পেয়েছি। নদীর ওপারের লাট এলাকায় ধানের দাম আরও পড়ে যায়।

এসপ্ল্যানেডে একশো টাকার একখানা নোট ওড়াতে ঘন্টাখানেকও লাগে না। অথচ দেড় মণ ধান করতে ৪।৫ মাস সময় গিয়েছে। গিয়েছে হাড়ভাঙা খাটুনী। পোহাতে হয়েছে আকাশের খামখেয়ালী। তারপর তো রোগপোকা আছে। আছে জলের বাড়াবাড়ি—নয়তো বাড়ন্ত অবস্থা।

টোকিওতে মিৎসুবিশির প্রেসিডেন্ট (নাম মনে নেই) লাঞ্চে বসে সগর্বে বলেছিলেন, আমরা বিঘে পিছু ৩৭ মণ ব্রাউন রাইস ফলাই। ওদের চলতে ফিরতে কলকব্জা। আমরা ট্রেনের জানলায় বসে বাতাসে দোলা ধানক্ষেতের সবুজ দিয়ে চোখই মাজি শুধু। আর লোডশেডিংয়ের রাতে তোশিবা ব্যাটারি ভর্তি টর্চ হাতের কাছে রাখি।

ব্যাংকের একজন বাঙালী চেয়ারম্যানের বাড়ির লনে-বসে একদিন বিকেলে চিংড়ের পোলাউ খাচ্ছিলাম। দোলনায় ভদ্রলোকের নাতনী। তিনি চামচে পোলাউয়ের চিংড়ে সাবধানে মুখে তুলে বললেন, পলিটিকাল লিডারদের ভুলিয়ে রাখতে রাইটার্স বিল্ডিং খেলনাটা ও'দের হাতে দেওয়া হয়েছে। ও'রা তাই নিয়ে খেলায় মেতে আছেন। আমি তো একবছর বাদে রিটায়ার করে মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা হাতে নিয়ে আবার ব্যাংক বানাবো।

আপনার খাট হয়ে গেল?

হ্যাঁ। শরীর কিন্তু খারাপ হয়নি আমার।

পঞ্চাশ কোটি টাকা কোথায় পাবেন?

আমাদের ব্যাংকের কিছু ব্রাঞ্চ বিদেশে সিজ হয়েছিল একসময়। সেখানে আলাদা নামে ব্যাংক করতে হয়েছিল। ফরেন গভর্নমেন্ট সে টাকা ছেড়ে দিলেই তাই নিয়ে ছোটোখাটো একটা ব্যাংক বানিয়ে আবার শুরু করবো।

আবার খাটবেন? আবার ঘুরবেন?

ব্যাংক না বানিয়ে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনে।

বৌদিকে নিয়ে হরিদ্বার ঘুরে আসুন।

ওসব আমার হয় না। আসে না একদম।

একবার পশ্চিমবঙ্গের একজন মুখ্যমন্ত্রীর জীবনী লেখার জন্যে ডাকা হয়েছিল। ক'দিন ধরে যাচ্ছি। সকালবেলা। বেশ সকালে। তখনই শুধু তিনি একা থাকেন। বাড়ির সামনে লাল রাস্তায় ডাবের ঘিয়ে রং ফুল পড়ে থাকে। একদিন দেখি—ফতুয়া গায়ে পুরনো ব্লেড হাতে পায়ের নখ কাটছেন। যেতেই পাশে বসতে দিলেন। ছোটবেলার দু' একটা ভালো রান্নার কথা বললেন। চিরকালই বাবুয়ানাবিহীন জীবন। কয়েকটা নদী শুকিয়ে গিয়েছে বলে দুঃখ করলেন। পড়েছিলেন বিজ্ঞান। কিছু মনে নেই বলে হাসলেন। যে প্রশ্নই করি—বলেন, ওসব কি মনে রাখার কথা! আচ্ছা বলতে পারো—পৃথিবীতে ঘাস না মানুষের সংখ্যা বেশি? এখন অব্দি নাকি মোট ৬ হাজার কোটি মানুষ জন্মেছে। হাড় থেকেই এই পৃথিবীতে তাহলে কত ক্যালসিয়াম জমেছে। আশ্চর্য!

এ লোকের জীবনী লেখা কঠিন। লেখাও হয়নি তাই।

সল্ট লেক সিটি থেকে সানফ্রানসিসকো যাচ্ছি। মে মাসের বিকেলবেলা। এরোপ্লেনের জানলায় সল্ট লেককে দেখতে পেলাম। জনমানবশূন্য। পাখি নেই। ঢেউ-তোলা পৃথিবীর একখানা স্তব্ধ ফ্রিজ শট। যোজন যোজন। সেখানে পাহাড়ের বর্ডার। এইসব জয় করে মানুষের শহর। বিজ্ঞান। আমোদ।

এরই ভেতর জীবনের ঢেউ ছাকা খানিক কবিতা। পাহাড়ের গায়ে খোদাই কয়েকটি কথা। গিরিপথে প্রাগৈতিহাসিক নদী বহে যাওয়ার কিছু প্রাচীন চিহ্ন। এখানে কেউ আমরা কারও পুত্র বা পিতা। কিছুকালের সম্পর্ক আর সঙ্গকে ধরে রাখে খিদে, ক্ষোভ, ভালবাসা। তাকে বেঁধে রাখে ধান। সেই প্রাচীন অমর লতা। জীবনে জীবন করি। ধান করি। বীজ রাখি। বীজ ফেলি।

এসব নিয়ে একটি লেখা লিখতে চাই। যেখানে আমাদের ইতিহাস—আমাদের স্বরূপ চেনা যাবে। আমাদের জীবন তার সব লক্ষণ নিয়ে ফুটে উঠবে। যে-বেকার আর ইন্টারভিউয়ের চিঠি খুলে দেখেন না—তাঁর কথার পাশাপাশি ঈশ্বরের কর্মী নবীন সন্ন্যাসীর বিশ্বাসও যেন তুলে আনতে পারি। মৃত্যুর আগে চোখ বড় উজ্জ্বল হয়। বাঘের পেটে হারানো সঙ্গীর কথা বলতে হলে তার ভাষা অন্যরকম। বলতে হয়—সে ভাল হয়ে গেছে। এটাই নিয়ম। তেমনি এই এতজনের এত কথা একটি লেখায় ধরারও নিশ্চয় অন্য কোন নিয়ম আছে। সেই নিয়মের ভাষা জানি না। প্রকৃত শিক্ষা পাই নাই। বড় অগোছালো করে শেখা এই জীবন। ফের গোড়া থেকে একে আর শোধরানো সম্ভব নয়। সব বৃথা গেল। সব বৃথা।

যিনি এই নিয়ম জানেন—তিনি এগিয়ে আসুন। তাঁর জন্যে সময়ের হাতে নতুন ফুলের মালা। সেই লেখক না জানি দেখতে কত সুন্দর। তিনি অকুতোভয়। নির্লোভ। নয়তো লেখা তো কতরকম হয়।

লেখকও অনেকরকমের। মাইকেলের জন্ম থেকে আজ অব্দি প্রায় একশো ষাট বছরে মাত্র ৭।৮ জন বাঙালীর অস্তিত্বে মিশে যেতে পেরেছেন। বাকিরা—হয় কবি, নয় লেখক, নয়তো ঔপন্যাসিক।

মাইকেল থেকে জীবনানন্দ। মাঝখানে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ। এবং সেই তিন সাহসী গদ্যশিল্পী। ইছামতী, পুতুলনাচের... পদ্মা... এই একশো ষাট বছরে সাত আটশোজন কলম ধরেছিলেন। সবারই কোন না কোন বৈশিষ্ট্য ছিল। ছিল গুণ। শেষঅব্দি সাত আটজনে এসে দেড়খানা শতাব্দী দাঁড়ায়। অথচ সবারই মিনতি ছিল—রেখো মা দাসেরে মনে...

কিন্তু কেউ হয়েছেন ভুবনচন্দ্র। কেউ বা রাজকৃষ্ণ। কেউ বা তাও নয়।

এ বঙ্গদেশে ঘাসের চেয়েও বেশি সিসের হরফ জন্ম নিয়েছে। তাদের গায়ে কালি মাখিয়ে যশোলোভ অনেক দৌড় করিয়েছে। কাগজকল আর ছাপার মেশিন সমানে পাল্লা দিয়েছে। কল্পনার সব ক্যালসিয়াম গিয়ে জমা হয়েছে এই পৃথিবীতে।

নদীর চেয়েও সময় নিষ্ঠুর। সে কোন পুরনো খাত ফেলে যায় না। শুধু মুছে দেয়।

হারানো বই

বুদ্ধের জন্ম খৃঃ পূঃ ৫৬৭ বা ৫৬৩ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। তখন ইন্দো-আর্য সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। বুদ্ধ প্রায় ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করে খৃঃ পূঃ ৪৮৭ বা ৪৮৩ অব্দে মারা যান। প্রায় দুশ বছর বৌদ্ধ ধর্ম মগধ ও কোশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মহারাজ অশোকই (খৃঃ পূঃ ২৭০-৩৩ অব্দ) এই ধর্মকে বিশ্বধর্মে পরিণত করেন। বুদ্ধ সমসাময়িক ভারতের সমাজ ও জীবনধারার উপকরণ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গ্রন্থে।

মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন 'মহাত্মা, আপনি সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে কি লাভ হয়েছে? অন্য লোকে যেসব শিল্প বা জীবিকা নিয়েছে, তার ফলে কিছু না কিছু তারা উপার্জন করে থাকে। এ উপায়ে তারা ব্যক্তিগতভাবে সুখী। তাদের পরিজনবর্গও সুখী। কিন্তু সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে আপনি কি ফল পেলেন?'

জটিল প্রশ্ন। উত্তর কি ছিল, জানা নেই। কিন্তু প্রশ্নে বিভিন্ন উপজীবিকার মানুষের উল্লেখ আছে। তারা হল—মাহুত, অশ্বপাল, সারথি, ধানুকি, নয় শ্রেণীর সৈন্য, চাকর, পাচক, ক্ষৌরকার, অনুচর, মোদক, মালাকর, রজক, তন্তুবায়, ঝুড়ি-নির্মাতা, কুম্ভকার, কেরাণী ও হিসাব লেখক। বুদ্ধের সময়কার অন্য জীবিকার মানুষ হল—সূত্রধর (কাঠের বাক্স, আসন, গৃহ, নানাপ্রকার যন্ত্র ও জলযান তৈরি করত), কর্মকার, প্রস্তরশিল্পী, চর্মকার, গজদন্ত-শিল্পী, মণিকর, মৎস্যজীবী, কসাই, সূপকার ও মোদক, মালাকার, নাবিক ও চিত্রকর।

বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরুর সময়ে দুটি অস্পষ্ট পথের উল্লেখ মেলে। বণিকরা তখন শ্রাবস্তী নগর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে যাত্রা করে মাহিষ্মতি, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কোশাম্বী ও সাকেত হয়ে পৈঠান নগরে পৌঁছাত। আবার শ্রাবস্তী থেকে দক্ষিণ পূর্বে একটি রাস্তা কপিলাবস্তু, কুশীনগর, পাবা, হস্তিগ্রাম, বৈশালী, পাটলিপুত্র, নালন্দা হয়ে রাজগৃহে পর্যন্ত ছিল। খুব সম্ভবত এইপথে গয়াও যাওয়া যেত। তাম্রলিপ্তী থেকে বারাণসী পর্যন্ত সমুদ্র উপকূল দিয়ে পথ ছিল। উজ্জয়িনী ভৃগুকচ্ছ, গান্ধার যাওয়ার সময় মরুভূমি পেরোতে হত। বণিকদের পথ দেখাত ল্যান্ড পাইলট।

প্রাচীন ভারতের নৌবাণিজ্যের বহু বিবরণ আছে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রে। জলস্থল উভয় পথে বাণিজ্য চলত পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, রোম, মিশর, চীন ও অন্য প্রাচ্য দেশের সঙ্গে। অসংখ্য জলযান ছিল। তাদের গুণগতমানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল বণিকেরা। বোরোবদর মন্দিরের গায়ে ভারতীয় জাহাজ ও নৌযাত্রীদের খোদাই করা ছবি রয়েছে। একটি ভারতীয় জলযানে সিংহল থেকে যবদ্বীপ যেতে ফাহিয়েনের সময় লেগেছিল তিন মাস। সে হল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের ঘটনা। দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরত ভারতীয়রা। সমুদ্রতীরের পত্তন বা বন্দর বারাণসী, চম্পা, ভৃগুকচ্ছ থেকে বণিকরা যাত্রা শুরু করত। জাহাজ চালাত নিয়ামক বা পাইলট। দিনে সূর্য আর রাতে নক্ষত্র তাদের পথ দেখাত। ঝড়ে বা অন্য কারণে গভীর সমুদ্রে জলযান পৌঁছলে, নিয়ামক পোষা কাক ছেড়ে দিত স্থলভাগের সন্ধানে।
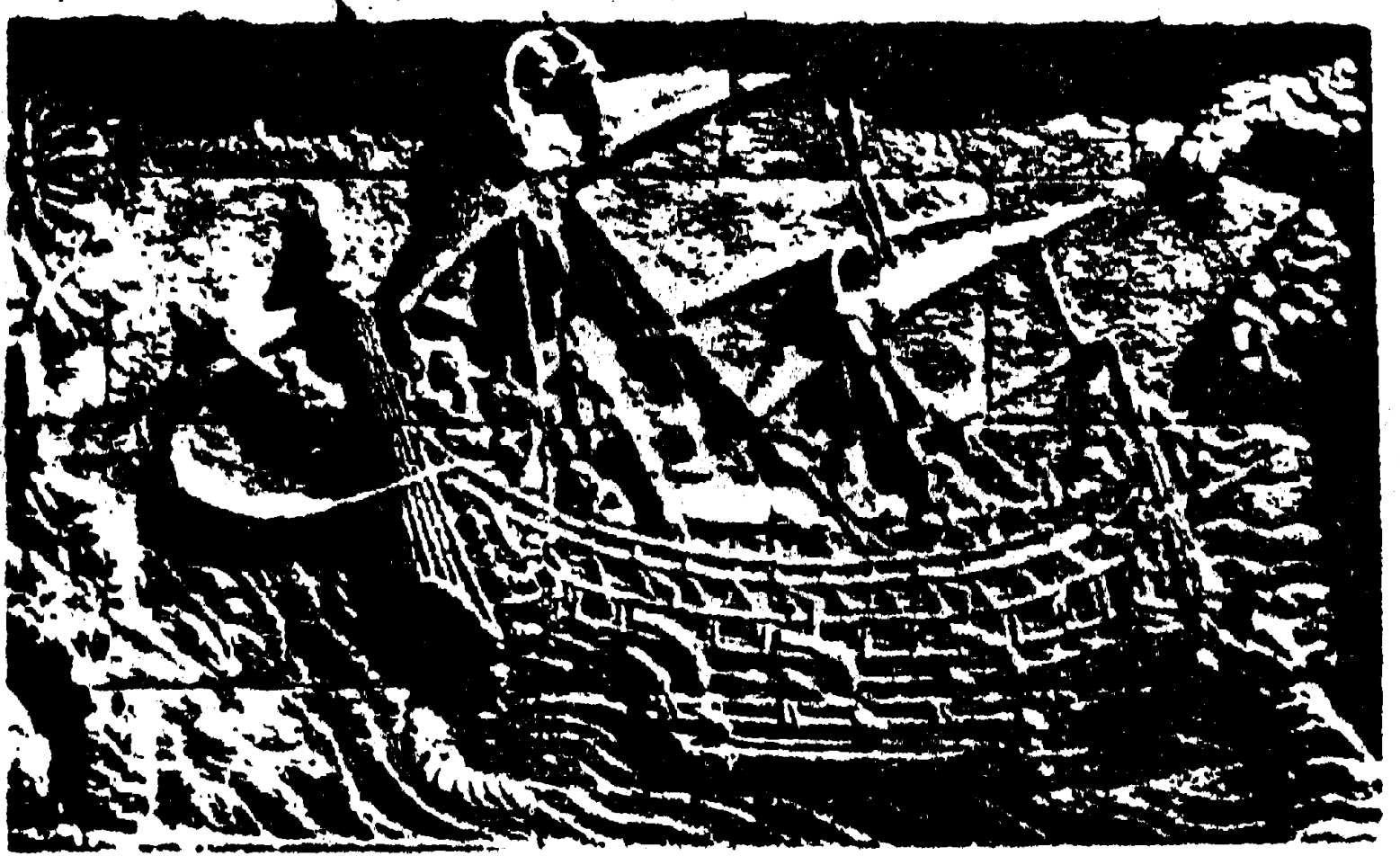
যবদ্বীপযাত্রী ভারতীয় বণিক

রাজার পোতাধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণে ছিল সব ধরণের জলযান। সমুদ্র, হ্রদ বা নদীতীরের গ্রামবাসীর কাছ থেকে শুল্ক আদায় করত রাজ কর্মচারী। জেলেদের ধরা মাছের ছয়ভাগ শুল্ক দিতে হত। বন্দরের ব্যবসায়ীদের জন্য ছিল সুনির্দিষ্ট শুল্ক। রাজকীয় যানের যাত্রীদের দিতে হত মাশুল। রাজকীয় যানে শঙ্খ ও মুক্তা সংগ্রহের জন্য ভাড়া লাগত। বণিকের জাহাজডুবি হলে যে বণিকের দ্রব্য নষ্ট হত, তা থেকে শুল্ক আদায় করা হত না। অথবা শুল্ক নেওয়া হত কম পরিমাণে। বন্দরে নোঙর করা, সব শ্রেণীর জাহাজ থেকে শুল্ক আদায় করত বন্দর কর্তৃপক্ষ।

দেশজুড়ে গুপ্তচর ছিল চোর ডাকাত ও দুর্বৃত্ত দমনে সাহায্য করত। এই গুপ্তচর নিয়োগ করা হত কৃষক ব্যবসায়ী ও নানা সম্প্রদায় থেকে। রাজার নজর থাকত কৃষি উন্নতিতে। সরকার থেকে উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হত চাষীদের। খাল কেটে জল সরবরাহ করা হত। এই জল নিয়ে যারা চাষ করত, তারা উৎপন্ন ফসলের একাংশ দিত জলকর। সরকারী খাসজমি কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ চাষ করাতেন ক্রীতদাস, শ্রমিক বা কয়েদীদের সাহায্যে। এরা বলদ, লাঙল ও নানা রকম যন্ত্র পেত। বর্ষার আগেই চাষ হত ব্রীহি, তিল, প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি শস্যের। কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে কেবল শস্য নয়, নানারকম ফুল, ফল, উদ্ভিদ, মূল, তুলা, নানারকম ভেষজ গুল্মের পরিচর্যা হত।

প্রজার জমির উৎপন্ন ফসলের চার-ভাগের একভাগ অথবা ছয় ভাগের একভাগ ছিল রাজস্ব। দেশের সমস্ত খনি ছিল রাজার সম্পত্তি। লবণের ব্যবসাও নিয়ন্ত্রণ করত রাজকর্মচারী। রাজকীয় খাস জমির ফসল প্রজাদের রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক ও খনির আয়ই ছিল রাজার মোট আয়।

বেশ বোঝা যাচ্ছে বৌদ্ধযুগের ভারতে সাধারণ মানুষের জীবনধারা ছিল সমৃদ্ধিময়। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ব্যাপকতায় দেশের আর্থিক বনিয়াদও ছিল সুদৃঢ়। বৌদ্ধযুগ বলতে কেবল বুদ্ধের সময়কাল নয়, তাঁর পরবর্তী ভারতের ইতিহাসও বোঝায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশজুড়ে কেবল ধর্ম প্রচারই করেনি। জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং বুদ্ধের সাধনা থেকে প্রাচীন ভারতে এক আশ্চর্য সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। যার প্রবাহ কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন ভারতের সেই মহামহানদী কীর্তিকলাপের কাহিনী লিখে ছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক শরৎকুমার রায়। বরিশালের জমিদার বাড়ির ছেলে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। হিতবাদ, সন্ধ্যা, নবশক্তির সহ-সম্পাদক হন। শরৎকুমারের বইয়ের সংখ্যা কম ছিল না। তাঁর 'বৌদ্ধভারত' বেরিয়েছিল ১৯৩১ সালে। উৎসর্গ অশ্বিনীকুমার দত্তকে। বেশ বড় আকারের বই। অনেক ছবি। শরৎকুমার বুদ্ধের জীবন ও বাণী নামে আর একখানি বই লিখেছিলেন।

কমল চৌধুরী

না লেখা কবিতার প্রতি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

না-লেখা কবিতা, তুমি মাঝে মাঝে উঁকি দাও ঘুমের ভেতরে।
একদিন বৃষ্টি থেমে গেলে, আমি রাস্তায় নেমে গিয়ে
তোমাকে খুঁজেছি।
তুমি শুধু হলুদ গুঁড়োর মত পড়ে ছিলে জলের ওপরে,
কাছে গিয়ে দেখলাম, তুমি নেই,
অন্তত যেভাবে তুমি দেখা দিয়েছিলে,
রঙের টুকরোর মত রাস্তায় জমে-থাকা
জল-কাদা-মাটির ওপরে—
সেভাবে তোমাকে আর দেখতে পারি নি।

দ্রুত একটা ট্রেন এসে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যায়।
কয়েকটি চলন্ত মুখে আবার রঙিন ছোপ
ভেসে উঠে, অন্ধকারে ছলকিয়ে গেল।
না-লেখা কবিতা, সমস্ত জীবন ধরে
এইভাবে তোমার আভাস পাবো—
নাগাল পাব না॥

মেঘ

শান্তনু দাস

একেকটা মেঘ আসে—কালো-বাইশন হয়ে
একা।
ঘরদোর সাজো সজো রাখি।
অথচ বৃষ্টি নেই।
একা আসে, একা উড়ে যায়।
আবহাওয়া-দপ্তর বলে—সব মেঘ জলীয় থাকে না।

একেকটা মেঘ আসে ধোপার চাদর, যেন ভাঁই করা,
ধপধপে উলঝুলু
গায়ে গোত্রে উদাসীন নয়, যেন ফুলবাবু
টমটম হাঁকালো,
মাথায় বাবরি চুল—সাদা
আবহাওয়া দপ্তর বলে—সব মেঘ জলীয় থাকে না।

একেকটা মেঘ আসে, দেখেও দেখি না, কিংবা
দেখে না দপ্তর,
স্থির বিন্দু ঈশান কোণের।
মেঘ না কি? না-কি উড়োবাজ?
কতদূরে? দূরবীনে আসে?
আবহাওয়া দপ্তর থেকে সবুজ-খবর দিতে গিয়ে
র‍্যাডার থমকে যায়, মাল্লাদের মতো।
অবাধ্য ছেলে হয়ে এই মেঘ—
সংকেতের পরোয়া মাড়িয়ে ঝরে যায়।

চোখ, মায়াময় চোখ

রাণা চট্টোপাধ্যায়

(এক)

ঘুমন্ত সরোবর থেকে তুলে এনেছিলাম
নীলপদ্ম আমার চোখ
যা দিয়ে আমি দেখতে পাই চরাচর—
যা এই জন্মগ্রহণের আগে আমার ছিল না
অথচ আজ দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর
যা শুধু বিষণ্ণ গোলাপ হয়ে আছে—

ঘুমন্ত সরোবর থেকে তুলে এনেছিলাম
নিবিড় শীতলতা আমার মন
যা দিয়ে আমি অনুভব করতে পারি তোমাদের
যা এই জন্মগ্রহণের আগে ছিল না
অথচ দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর
যা শুধু নরম বিষাদ হয়ে গেছে।

(দুই)

আমার চোখ থেকে ভালবাসা সরে যায়
ক্রুরচোখে তাকাই মানুষের দিকে,
হিমশীতল ধারালো চোখে নষ্ট বাসরের ছবি ফুটে ওঠে,
প্রতিহিংসায় চোখ কাঁপে,
শয়তানের চোখ, সমাজ সংসার পুড়িয়ে দেয়

আমি তাই চোখ সরিয়ে নিচ্ছি ভালবাসা থেকে,
এখন খুঁজছি দেবীর চোখ, মায়াময় চোখ
যেদিকে তাকিয়ে শান্তিতে
চোখ বুজিয়ে ফেলা যায়।।

চিঠিপত্র

কোন্ বৈজ্ঞানিক বলেছেন ?

প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে প্রথমেই যে অসামঞ্জস্যটুকু নজরে আসে তা হল মলাটের পাতায় লেখা আছে 'হোমোপ্যাথি আজও কাজের' অথচ সূচীপত্র এবং প্রবন্ধটির শুরুতে (পৃষ্ঠা ১০) লেখা আছে হোমোপ্যাথ আজও কাজের। এতখানি পার্থক্য কি করে হোল তা আমরা বুঝতে পারি না। কারণ হোমোপ্যাথি এবং হোমোপ্যাথি তিনিই যিনি প্যাথ এক কথা নয়। হোমোপ্যাথি একটি শাস্ত্র এবং হোমো ঐ শাস্ত্রমতে চিকিৎসা করেন। আসলে কিন্তু কথাটা হোমোপ্যাথি নয়—কথাটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথি। এই দুটো শব্দের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে। তবে লেখক যদি নিজেকে হোমোপ্যাথ বলে দাবী করে হোমোপ্যাথি করেন তবে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু প্রবন্ধটির কোথাও তিনি একবারও হোমোপ্যাথি বা হোমোপ্যাথি কথাটা ব্যবহার করেননি বরং সর্বত্রই হোমিওপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথ কথা দুটো ব্যবহার করেছেন।

এবার মূল প্রবন্ধের কথায় আসি। প্রবন্ধটিতে লেখক শুধুমাত্র তাঁর এবং তাঁদের বংশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যা লিখেছেন তা অত্যন্ত একপেশে এবং হোমিওপ্যাথিকে তিনি অনেকখানি সংকীর্ণ এবং বিকৃত করে ফেলেছেন। এতে জনমানসে হোমিওপ্যাথির বিকৃতরূপ প্রতিফলিত হবে এবং তাতে সত্যিকার হোমিওপ্যাথির যথেষ্ট ক্ষতি হবে। আমি লেখককে অনুরোধ করব তিনি যেন উদার দৃষ্টিতে হোমিওপ্যাথিকে এবং ভারতের হোমিওপ্যাথিক সমাজের দিকে তাকান। তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর দৃষ্টি কতখানি অস্বচ্ছ। নইলে তিনি কি করে লিখলেন যে হ্যানেম্যান মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে।

হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিকত্ব বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত। শুধু তাই নয়, নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাবেও হ্যানেম্যান শুধুমাত্র তাঁর প্রতিভাবলে তর্ক শাস্ত্রের ভিত্তিতে যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও তার একটা নীতির সামান্যতম ত্রুটি ত ধরা পড়েইনি বরং তা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

ভারতে হোমিওপ্যাথির আগমন ১৮১০ সালে। তখন থেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে হোমিওপ্যাথি ধীরে ধীরে ভারতের বুকে ভিত গেড়ে বসে। তবে যেটুকু যা হয়েছে সবই হোমিওপ্যাথির স্বকীয় বৈশিষ্টে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিতভাবে এ কাজ শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিওপ্যাথিক সংঘের জন্ম থেকে। সমগ্র হোমিওপ্যাথিক সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে আজ হোমিওপ্যাথির ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পেরেছে। এ ব্যাপারে মিহিজাম গোষ্ঠীর বিন্দুমাত্র অবদান আছে বলে আমার জানা নেই। অথচ লেখকের রচনায় ভারতের হোমিওপ্যাথিতে যেন তাদেরই অবদান বেশী এমন মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে।

এবার প্রবন্ধটিকে আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। দশম পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন যে কুইনাইন (সিনকোনা বার্ক) খেয়ে হ্যানেম্যানের ম্যালেরিয়ার সব লক্ষণই এসেছিল শুধু শীতের কাঁপুনি আসেনি। কথাটা ঠিক নয়—কারণ প্রথমেই হ্যানেম্যান শীতের কাঁপুনি অনুভব করেছিলেন। ঐরূপ পরীক্ষাকে লেখক 'প্রোভিরুস' বলেছেন। কথাটা আদৌ তা নয়। ওটা হোল প্রুভিং। সুস্থমানব দেহে ভেষজের ঐরূপ পরীক্ষাকেই বলা হয় প্রুভিং সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেনটার মানে সমং সম সময়তি নয়—সমঃ সমং সময়তি।

একাদশ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হোমিওপ্যাথিতে বহু মৌলিক গবেষণা করে গেছেন যার ফলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহু উন্নতি হয়েছে। কি মৌলিক গবেষণা তিনি করেছিলেন জানতে ইচ্ছে করে।

বারো পাতায় লিখেছেন মিশ্রণকে বারবার ঝাঁকি দিয়ে সতেজ করা হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু ঝাঁকির সংখ্যা প্রতিবারে একশত হবে। তারপর লক্ষণ ছাড়াই ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ' ওষুধ প্রয়োগের কথা লিখেছেন। লক্ষণসমষ্টিই হচ্ছে জীবনী শক্তির রোগ প্রকাশক ভাষা। কাজেই লক্ষণ ছাড়া চিকিৎসাই হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে রোগীর সাবজেকটিভ সিমটম যথেষ্টই পাওয়া যায় ভিত্তিতে চিকিৎসা করতে হয়। লেখক বোধ হয় এই নিয়মে চিকিৎসা করেন না প্রসংগক্রমে বলে রাখি হোমিওপ্যাথিতে রোগ বিশেষের স্পেসিফিক বলে কিছু নেই। এরপর লিখেছেন হ্যানেম্যান তাঁর অনুগামীদের অনুরোধে অর্গাননের পঞ্চম সংস্করণ থেকে একটা অনুচ্ছেদ বাদ দিয়েছেন। আসলে অর্গাননের পঞ্চম সংস্করণের বেশ কয়েকটা সূত্র তিনি যোগ-বিয়োগ করেছেন। এটা তিনি কারো অনুরোধে করেননি। কারণ বিজ্ঞান কারো অনুরোধ মেনে চলে না। হ্যানেম্যান তাঁর বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় সেগুলো ভুল বুঝেছিলেন বলেই তা বাদ দেন।

তিনটি পুরাতন দোষের সমন্বয় যদি একই রোগীতে পাওয়া যায় তবে তার চিকিৎসা কিভাবে করতে হবে— হ্যানেম্যানের সুস্পষ্ট নির্দেশকে লেখক এখানে বিকৃত করেছেন। ব্যাপারটা হোল ঐ রোগীদেহে বর্তমানে যে দোষের প্রাধান্য পাওয়া যাবে সে সিফিলিস, সাইকোসিস বা সোরা যেটাই হোক সেইমত সেই দোষঘ্ন কোন একটি ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে প্রথমে একটি এন্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। তারপর যে দোষটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেই দোষঘ্ন কোন একটি ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। এইভাবে এক এক করে সমলক্ষণের ভিত্তিতে এক এক সময় এক-একটি দোষঘ্ন ওষুধ প্রয়োগ করে রোগীকে সুস্থ করতে হয়। লেখকের মতানুসারে বাঁধাগতে এন্টিসোরিক, এন্টি-সাইকোটিক ও এন্টিসিফিলিটিক ওষুধ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা হোমোপ্যাথিক নীতিবিরুদ্ধ। এই ব্যাপারটিকে বিকৃত করে লেখক তাঁর মিকসোপ্যাথির ওকালতির জন্য হ্যানেম্যান সিংগল, সিম্পল এন্ড মিনিমামের নিয়ম মানতেন না মন্তব্য করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি।

তেরো পাতায় মিশ্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে ওকালতি তিনি করেছেন তা সম্পূর্ণ মনগড়া। এর সঙ্গে আসল হোমিওপ্যাথির কোন সংশ্রব নেই।

বৃদ্ধি (অ্যাগরাভেসন) যদি যথার্থ হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি হয় তবে তা নিঃসন্দেহে আশার কথা। তবে রোগজ বৃদ্ধি, ঔষধজ বৃদ্ধি এবং হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির চূড়ান্ত পার্থক্য লেখকের জানা থাকলে হয়তো লেখক এসব লিখতে পারতেন না। কোথায় কি বৃদ্ধি হচ্ছে বিচক্ষণ চিকিৎসকমাত্রই তা বোঝেন। এছাড়া ওষুধ প্রয়োগের পর হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি এড়াতে পঞ্চাশ সহস্রতমিক মাত্রার কথা হ্যানেম্যান তাঁর অর্গাননের ৬ষ্ঠ সংস্করণে লিখে গেছেন।

ঐ পৃষ্ঠায় লেখক এক জায়গায় লিখেছেন অবশ্যই মিশ্রণ হয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। তাছাড়া বৈজ্ঞা...দের কথা থেকে বুঝতেই পারা যাচ্ছে এই মিশ্রিত ওষুধ কখন প্রয়োগ করেন? যখন তিনি কোন সঠিক একটা ওষুধ নির্বাচন করে উঠতে পারেন না তখনই অত ভাবনা-চিন্তার ধারে না গিয়ে তিনি দুই বা ততোধিক ওষুধ প্রয়োগ করেন। এইভাবে মিশ্রিত ওষুধ যে হোমিওপ্যাথিক এটা কোন বৈজ্ঞানিক বলেছেন?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। একটা ওষুধ হোমিওপ্যাথিক হয় কখন? হোমিওপ্যাথিক বাকস থেকে কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ওষুধ দিলেই যে তা হোমিওপ্যাথিক হবে এমন কোন মানে নেই। ওষুধটি হোমিওপ্যাথিক হতে হলে তাকে সমলক্ষণ নীতিতে এককালীন একটি মাত্র ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে—অর্থাৎ ওষুধটি হোমিওপ্যাথিক নীতি অনুসারে প্রযুক্ত হওয়া চাই। লেখক যে নিম্ন রক্তচাপ রোগীর বিবরণ দিয়েছেন তাকে হোমিও-

প্যাথিক চিকিৎসা বাদে অন্য কিছু বলা ভাল। কারণ বহু নিম্ন ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীরও এককালীন একটি মাত্র ওষুধ প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা যায়।

চোদ্দ পাতায় লেখক লিখেছেন ডাইলিউশন পাল্টোই সেই ওষুধের গুণ পাল্টে যায়? কথাটা ভুল। ডাইলিউশন পাল্টালে ওষুধেরা গুণ পাল্টায় না, পাল্টায় তার শক্তি—শক্তি বেড়ে যায়।

পনের পাতায় লেখক কেসটেকিং করানোতে আপত্তি তুলেন এবং ফাঁকা পুরিয়া নিয়ে হোমিওপ্যাথিকে ব্যবসায়ে পরিণত করা হয় বলে মন্তব্য করেছেন। হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু কেস টেকিংই আসল কথা। কেসটেকিং যত সুন্দরভাবে হবে রোগীর ওষুধ নির্বাচনও তত সহজতর হবে। এজন্যই মনীষীরা বলেছেন কেস-টেকিং হচ্ছে রোগীর অর্ধেক আরোগ্য। ফাঁকা পুরিয়া দিতে হয় কখন? একটা সুনির্বাচিত ওষুধে যখন রোগীর শরীরে গভীরভাবে কাজ করে তখন অন্য ওষুধে দিয়ে আগের ওষুধের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। ফাঁকা পুরিয়া দিয়ে রোগীকে মানসিক প্রবোধ দেওয়া হয়।

ষোলো পাতায় লেখক অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য হ্যানেম্যানের আবিষ্কারের দিন দিন পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন। দুয়ে দুয়ে যোগ করলে চার হয় এটা যেমন নির্ভেজাল সত্য তেমনি হ্যানেম্যানের আবিষ্কৃত নীতিগুলোও সত্য। নিজেদের মনগড়া নীতির দোহাই দিয়ে যদি এর পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন লেখক করতে চান তাহলে তাকে হোমিও-প্যাথি না বলে অন্য কোন প্যাথি বলা ভাল।

পরিশেষে লেখককে এইটুকু অনুরোধ করব তিনি যেন হ্যানেম্যানের নীতিগুলো যথাযথ অনুসরণ করে তার ফলাফল প্রকাশ করেন। —মৃত্যুঞ্জয় দে

প্রতিবাদ করি

গত ৩১ আগস্ট অমৃত পত্রিকায় হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য হোমিওপ্যাথ হিসাবে সম্পাদক মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সাধারণের উপযোগী এই প্রবন্ধ লেখার জন্য ডাঃ প্রশান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায়কে জানাই অভিনন্দন।

কিন্তু অমৃতের মত এমন সুপরিচিত সাপ্তাহিকে এত ভুলভ্রান্তি আমাকে বিস্মিত করেছে। শিরোনামেই ভুল। হোমোপ্যাথ কথাটি যাঁরা হোমিওপ্যাথিকে অবজ্ঞা করেন তাঁরাই বলেন। সেটিই হল শিরোনাম। হেমোপ্যাথ আজও কাজের—এর মানে কি কোনওদিন এটা অকাজের ছিল, না ভবিষ্যতে অকাজের হবে?

প্রশান্তবাবু দ্বিতীয় কলমে লিখেছেন: কোনটাই বিজ্ঞানসম্মত নয়। পরেই আবার স্বীকার করেছেন এটি বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা। এছাড়া অজস্র মুদ্রণ এবং তথ্যের ভুলে এই প্রবন্ধ।

তাঁর প্রবন্ধের প্রশংসা করলেও তাঁর সব মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। বৃহৎ হোমিওপ্যাথ গোষ্ঠির তিনি বিরাগভাজনই হবেন।

আমরা স্বীকার করি বিজ্ঞান থেমে থাকে না। স্বীকার করি সার্থক শিক্ষার অভাবে বহু হোমিওপ্যাথ এলোপ্যাথ ওষুধ ব্যবহার করেন। স্বীকার করি মহাত্মা হ্যানিম্যান বিশেষ দু-এক জায়গায় অল্টানেট মেডিসিন দিতে বলেছেন। স্বীকার করি ডাঃ পরেশ ব্যানার্জি বিনামূল্যে চিকিৎসা করে হোমিওপ্যাথির প্রসার করেছেন কিন্তু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কি নীতির পরি-বর্তন করা যায়। বিভিন্ন মিশ্রণের প্রতি-বাদেই হোমিওপ্যাথির উৎপত্তি সেটি কি নস্যাৎ কর যায়? তিনি যেসব বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা লিখেছেন ঐসব তথ্য দিয়েই একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে গত পনের বছর মহাত্মা হানিম্যান প্রবর্তিত নীতির সমর্থন আমি করছি। মিশ্রণ চিকিৎসা যে হানিম্যান করতেন বা আদৌ করেছিলেন তা কি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারেন? আধুনিক চিকিৎসায় তাৎক্ষণিক সুফল পাওয়া যায় কিন্তু তার বিষময় ফল নিয়ে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র উদ্বিগ্ন। মিহিজামের মিশ্রণ ওষুধে সেই বিষময় ফল হয় কিনা তাঁরা কি অনুসন্ধান করেছেন? কাজেই সরকার স্বীকৃত সর্ব-ভারতীয় সংস্থার অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে আমি এই প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করি। —নির্মলকুমার সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক, দি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া হাওড়া।

সুন্দর ও সময়োচিত

৩১ আগস্ট 'অমৃতে' হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ডাঃ প্রশান্ত ব্যানার্জির প্রবন্ধটি সুন্দর ও সময়োচিত। জনমানসে হোমিও-প্যাথির সঠিক মূল্যায়নের জন্য এই ধরনের প্রবন্ধ খুবই প্রয়োজন। তবে মাঝে মাঝে আরও কয়েকজন সুপরিচিত চিকিৎসকের এই ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে আমরা খুবই আনন্দিত হব।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছি না। এই সংখ্যার প্রচ্ছদ সম্পর্কে। প্রচ্ছদে ডাক্তারবাবুর একটি স্কেচ ছাপানো হয়েছে। স্কেচটি খুবই সুন্দর তবে সামান্য ত্রুটি-পূর্ণ। ত্রুটিটি স্কেচের ক্ষেত্রে সামান্য, কিন্তু অন্যদিকে অসামান্য। ডাক্তারবাবু সযত্নে রোগীর বুক পরীক্ষা করছেন স্টেথোর সাহায্যে কিন্তু স্টেথোর শেষ অংশটুকু তাঁর কানে ঢোকানো নেই, আছে গলায়। জানি না এ স্কেচটি হোমিও ডাক্তারবাবুদের সম্মানের জন্য না চিরাচরিত কটাক্ষ। তবে যদি এটা কটাক্ষ হয় তো বড় নিষ্ঠুর কটাক্ষ।—স্বপন কুমার সরকার, প্রতাপপুর, চুঁচুড়া, হুগলী।

উপকৃত হবেন

সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমূলক প্রবন্ধ হেমোপ্যাথ আজও কাজের' পড়লাম। সম্পাদককে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। যদিও অরথোডকস হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথরা প্রকাশিত প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করবেন—তবুও নব্য চিকিৎসকরা উৎসাহিত বোধ করবেন সন্দেহ নেই। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। 'কলেজ থেকে পরীক্ষায় পাশ করে বেরোবার পর নতুন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা স্বাতন্ত্রীকরণ করে সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন।' কথাটা খুবই সত্য। আমি নিজেও একজন ভুক্তভোগী। সত্যিই কলেজ থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়ে সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করতে গিয়ে একেবারে দিশে-হারা হয়ে পড়েছি ফলে অনেক কেস বার্থতার দরুণ হাতছাড়া হয়ে পড়েছে। তাই আপনার এই প্রবন্ধ আমাদের কাছে নতুন আলোর ইঙ্গিত। মিহিজামের ঔষধ নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক সত্য মিথ্যা শুনেছিলাম। আপনার লেখা পড়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হল। তবে আক্ষেপের বিষয় মিহিজামের ঔষধ নির্বাচন প্রণালী ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হল না।

আপনি যদি আপনাদের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোকপাত করেন কোন বইয়ের মাধ্যমে তাহলে উৎসাহিত চিকিৎসকরা অশেষ উপকৃত হবেন।—অজয়কুমার বসু, খামারিয়া, জব্বলপুর, এম-পি।

আনন্দ পেলাম

সম্প্রতি প্রকাশিত অমৃতের প্রচ্ছদ কাহিনী 'হোমোপ্যাথি আজও কাজের' পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। আমাদের দেশে একসময় হোমোপ্যাথি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। একথা এতদিন কেউ লেখার সাহস পাননি। আজও তার সমাদর কমে যায় নি বরং রয়েই গেছে।

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি কখনও ভালো হয় কখনও ভালো হয় না। আমি কিন্তু অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকাটি নিয়মিত পড়ি। শ্রীবাহারুদ্দিন মহাশয়ের গল্পটি বাল্যবয়সের অনেক কথা মনে পড়িয়ে দেয়। গল্পটি খুবই সুখপাঠ্য হয়েছে। শ্রীদায়ুদ হায়দরের কবিতাটি নিয়ে কেউ সুন্দর উপন্যাস লিখতে পারেন। এতে যুগযন্ত্রণার কথা লেখা হয়েছে। আধুনিক কবিতা কিছুই বুঝতে পারি না। কিন্তু দায়ুদ হায়দারের পড়লে মনে আনন্দ হয়। তাহার গদ্য পড়েছিলাম। গদ্যও সুন্দর। গোপালচন্দ্র দাস, ৪১।২০, গোবিন্দপুর, কলিকাতা-৪৫।

সিপাহী বিদ্রোহের কলকাতা

দেবেশ মুখোপাধ্যায়

১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি আর ব্যারাকপুরের দু'দল সৈন্যের ওপর যে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাতে রাজধানী কলকাতার কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন যে বিপদ কেটে গেল। এর আগেও সিপাহীরা দু এক জায়গায় মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করেনি তা নয় কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থ করে দেওয়া হয়।

এপ্রিল মাস ও মে মাসের প্রথম সপ্তাহ ভাল ভাবেই কেটে গেল। মে মাসের ১১ তারিখে মীরাটের বিদ্রোহের খবর কলকাতায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থমথমে হয়ে উঠল। পাছে কলকাতার সাহেবরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বা তাঁরা ভয় পেয়েছেন জানলে বাঙ্গালাদেশেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এই ভেবে গভরনর জেনারেল ক্যানিং হুকুম দিলেন কলকাতার সরকারি কাজকর্ম যেমন চলছিল সেই নিয়মেই চলবে। তিনি [illegible] রোজ [illegible] করতে [illegible] তাঁর [illegible] নেটিভ দেহরক্ষীদের বদলে গোরা সৈন্য রাখার উপদেশে কান দিলেন না।

ক্যানিং ভেবেছিলেন তাঁর আদর্শে বুঝি কলকাতার সব সাহেবই মেনে চলবেন, অথবা ভয় পেলে গুরুতর বিপদ ডেকে [illegible] ও [illegible] আনবেন না। কিন্তু তাঁর যে আশা সফল হল না। ১৮৫৭ সালে কলকাতার সাহেবরা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছেন। ধনীরা বিরাট বাড়ী চাকর নফর নিয়ে চরম বিলাসিতার জীবন কাটাচ্ছেন। কলকাতার খাবারে অরুচি হলে পয়সা ফেললেই নিজের দেশের আমদানী করা টাটকা ইয়র্কশায়ার হাম ষাঁড়ের জিভ মাছ কেক টিনে ভর্তি নানারকম মুখরোচক জিনিস পাওয়া যায়। ১৮৩৪ সাল থেকে বোস্টন থেকে বরফ ১৮৩৫ থেকে বোতলে ভর্তি সোডা ওয়াটার, ১৮৩৮ সাল থেকে বিলিতি দেশলাইও কলকাতায় আসতে আরম্ভ করে। বিলিতি মদের তো কথাই নেই। এরকম বিলাস মণ্ডিত নিরাপদ জীবনযাপন পারে যদি বাইরে থেকে একটা ঢিল-ও পড়ে তা হলেই তো আতঙ্ক হবার কথা। এর ওপর যেখানে ফোর্ট উইলিয়ামের ফৌজ ও পুলিশে সাহেব অফিসারদের সংখ্যা নেটিভ বাহিনীর তুলনায় খুবই কম, সেখানে যদি বিদ্রোহী সেপাই আর কলকাতার গুণ্ডা, বদমাইসরা জোট বেঁধে খুন, জখম, লুঠতরাজ আরম্ভ করে তা হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সে কথা ভেবে কলকাতার সংখ্যালঘু সাহেবদের ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না।

আত্মরক্ষার ভাবনা

আত্মরক্ষার ভাবনা। প্রথমেই সাহেবরা ঠিক করলেন চালাতে জানা থাকুক আর নাই থাকুক আত্মরক্ষার জন্যে যে কোন দাম দিয়ে বন্দুক, পিস্তল জোগাড় করতে হবে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' জানা যায় যে নবাব সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সময় সাহেবরা যতটা ভয় পেয়েছিলেন, বিপদ একেবারে ঘাড়ের ওপর না এসে পড়া সত্ত্বেও একশ বছর পর তাঁদের সেই অবস্থা ফিরে এসেছিল। চৌরঙ্গী অঞ্চলের তাবড় তাবড় ধনী সাহেবদের ত কথাই নেই, এমন কি তাঁদের কসাইটোলার মধ্যবিত্ত সাকরেদরাও অস্ত্র কেনার হুজুগে মাতলেন। ১৩ মে থেকে ম্যান্টন আর রডা কোম্পানী যা রোজগার করেছিল তার পরিমাণ বোধ হয় সিপাহীরা কলকাতা লুঠ করলে যত টাকা পেত তার সমান হবে।

কালোবাজারে ম্যান্টন আর রডা কোম্পানীর বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদির যে দাম উঠেছিল তা একমাত্র দুর্ভিক্ষের সময়কার খাওয়ার জিনিসের দামের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কলকাতার যেসব সাহেব বন্দুক চালাতে জানা দূরের কথা, শো কেসে সাজান ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র খুব কাছের থেকে কোনদিন চোখেই দ্যাখেন নি তাঁরাই তখন খানু সেনাপতির মত সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। কেউ কেউ আবার হাত মকসো করবার জন্যে দিন রাত্তির বন্দুক ছুঁড়ে প্রতিবেশীদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। পুলিশ কমিশনার কসাইটোলার এক সাহেবকে জরিমানা করে এ উপদ্রব বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন। আনাড়ি লোকদের হাতে অস্ত্র থাকলেই কি তারা পেশাদার, সুশিক্ষিত, সংঘবদ্ধ বিদ্রোহী সৈনাদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারে? কাজেই সাহেবরা নিজেদের সম্প্রদায় থেকে একটা সামরিক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী (ক্যালকাটা ভলানটিয়ার গার্ডস) তৈরী করবার জন্যে জোর দাবী করতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে সাহেবদের কাগজ বেঙ্গল হরকরা লিখেছেন—"এখন যে আতঙ্কের ভাব দেখা যাচ্ছে সেটা আমাদের মতে সম্ভব্য বিপদের চেয়ে একটু বেশী বলে মনে হয়। আমাদের বিশ্বাস আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এমন সুখবর আসবে যার ফলে এখন যাঁরা নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন তাঁদের চিন্তা দূর হবে। এ সময়ে কি ফোর্ট উইলিয়ামের সিপাহীদের ওপর আস্থা রাখা যায়? ফোর্ট উইলিয়াম ও শহর রক্ষার জন্যে ক্যালকাটা ভলানটিয়ার গার্ডস গড়ার কাজ এখুনি আরম্ভ করা বিশেষ দরকার।" (১৮।৫।১৮৫৭)

পঁচিশে মে ছিল রাণী ভিকটোরিয়ার জন্মদিন। ঐদিন গভরনর হাউসে বল নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল। কলকাতার বড় বড় সাহেব তো মহা ভাবনায় পড়লেন। বল নাচ ও খানাপিনায় যাবেন না বিদ্রোহীদের ভয়ে ঘর আগলে বসে থাকবেন? এ উৎসবটা যাতে পেছানো যায় তার চেষ্টা হতে লাগল। বেঙ্গল হরকরা লিখলেন, "নিজেদের সশস্ত্র না রাখার বিপদ এতদিনে কলকাতার ইয়োরোপীয় বাসিন্দারা বুঝতে পেরেছেন বলেই আগ্নেয়াস্ত্র কেনার এত তাড়া পড়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীদের একটা বন্দুকের আওয়াজ বা সরকার বিরোধী একটা ধ্বনি শুনলেই তাদের সঙ্গে কলকাতার হাজার হাজার বদমাইস লুটপাটে নেমে পড়বে। আমরা শুনতে পাচ্ছি আগামী পঁচিশে মে রাণীর জন্মদিনে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে কলকাতায় হাঙ্গামা বাধবে বলে ঠিক করেছে। ঐদিন গভরনর হাউসে যে বল নাচের ব্যবস্থা হয়েছে তা স্থগিত রাখা হল বলে এখনও পর্যন্ত কোন নোটিশ বেরল না। আশ্চর্যের কথা দেশে যখন আগুন জ্বলছে তখন এই গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এত টালবাহানা কেন?" (২০।৫।১৮৫৭)

ক্যানিং উৎসবের দিন বদলাতে রাজি না হওয়ায় নির্দিষ্ট দিনেই তা করা হল। উৎসব ভালই জমেছিল। তবে হঠাৎ আলোর ছটা ও শব্দ শুনে সাহেবরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। খানিক পরে জানা গেল মহীশূরের এক শাহজাদীর বিয়ে উপলক্ষে আতস বাজি ছোঁড়া হচ্ছে। ফাঁড়া কেটে গেল। সাহেবদের উদ্বেগের কথা বলতে গিয়ে বেঙ্গল হরকরা আবার লিখলেন, "কলকাতার ক্রীশ্চান বাসিন্দারা সত্যিই নিজেদের রক্ষা করবার মত অবস্থায় আছে কি? ফোর্ট উইলিয়াম হয়ত নিরাপদ কিন্তু সকলেই সেখানে আশ্রয় পাবে কি করে? ইয়োরোপীয়ান বাসিন্দারা শহরের কোন বিশেষ অঞ্চলে দলবেঁধে থাকেন না তাঁরা চারদিকে ও শহরতলীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। কাজেই বিপদের সময় তাঁদের দল বেঁধে বাধা দেবার কথাই ওঠেনা। অনেকেই আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছেন বটে তবে তাঁদের দলবেঁধে বাধা দেবার সুযোগ কোথায়? আবার সামর্থ্যের অভাবে প্রত্যেকেই যে অস্ত্র কিনতে পেরেছেন তাও নয়। কাজেই এ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়া।" (২২।৫।১৮৫৭)

বিদ্রোহের আগে ভারতে টেলিগ্রাফ লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল মোট ৪৫৫৫ মাইল। এর মধ্যে বিদ্রোহীরা প্রায় ৭৬০ মাইল তার কেটে দেওয়ায় কলকাতার সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়। বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা রাখা ও মনোবল না হারানোর যে ঐতিহ্য সাহেবদের ছিল, বিদ্রোহের ঠিক ঠিক খবর না পাওয়ায় তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা আক্রমণের ভয়ে ও আত্মরক্ষার কি উপায় হবে ভেবে তাঁরা বেসামাল হয়ে নানা রকম গুজব ছড়াতে লাগলেন। সাহেবদের অনেকের আত্মীয়স্বজন মিলিটারিতে কাজ করতেন বলে তাঁরা সামরিক গুপ্ত কথা হিসেবে যা প্রচার করতে লাগলেন সবাই তা বিশ্বাস করলেন।

আত্মরক্ষার জন্যে কলকাতার সাহেবদের নিয়ে সামরিক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ার দাবি দিনে দিনে জোরদার হয়ে উঠলেও, ক্যানিং গোড়ায় এ-প্রস্তাবে কিছুতেই সায় দিতে চাননি। বিলাসী, অলস, সামরিক শিক্ষায় অনভিজ্ঞ সাহেবরা যে সত্যিকার বিপদের সময় ফোর্ট উইলিয়ামের গোরা সৈন্যদের বদলি হিসেবে কঠোর সামরিক জীবনযাপন করতে পারবেন এ-বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল সরকারি খরচায় এদের অস্ত্র দিয়ে শক্তিশালী করলে দরকারের সময় এরা খালি নিজেদের বাড়িঘর ও পরিবার রক্ষার কাজেই ব্যস্ত থাকবে, যে-জন্যে এদের গড়া হবে সে-কাজের কিছুই হবে না। কাজেই প্রথমে তিনি সামরিকবাহিনীর বদলে উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকদের কলকাতা পুলিশের সাহায্যকারী হিসেবে স্পেশ্যাল কনস্টেবল হিসেবে কাজ করার কথা বললেন। অধিকাংশ সাহেব এ-প্রস্তাব অমর্যাদাকর বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। হিন্দু প্যাট্রিয়টও এঁদের চাচা আপন প্রাণ বাঁচা শ্রেণীর জীব বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন।

টেলিগ্রাফ যোগাযোগ না থাকায় কলকাতায় গুজব রটে গেল বিদ্রোহীদের হাত থেকে দিল্লি উদ্ধার হয়ে গিয়েছে। এ-খবর মিথ্যে প্রমাণিত হওয়ায় ও সাহেবদের চাপ ও আতংক বাড়তে থাকায় ক্যানিং ১২-৬-১৮৫৭ তারিখে কলকাতার সাহেবদের নিয়ে সামরিক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ার দাবি মেনে নিলেন। সরকারি খরচে এঁদের পোষাক হল সাদা কর্ডের ব্রিচেস, গাঢ় নীল রংয়ের কোট, তার ওপর সোনালি ও রুপালী জরি দেওয়া, পা অবধি ঢাকা শিকার করার বুট। প্রথম দিকে ছ'শ' পদাতিক ও প্রায় দু'শ' ঘোড়সওয়ার নিয়ে দল গড়া হল। ঘোড়া যার যার নিজের।

পরে এই বাহিনীর সঙ্গে হাল্কা ছ' পাউণ্ডের হাউইটজার কামান দিয়ে গোলন্দাজ শাখাও খোলা হয়েছিল। বাহিনীর অধ্যক্ষ প্রথমে ছিলেন কর্ণেল স্ট্র্যাচি, পরে কর্ণেল মনটেগু টার্নবুল। টার্নবুল সাহেব কলকাতা রেসের একজন নামজাদা জকি ছিলেন ও সাহেব মহলে খুব পরিচিত ছিলেন। সকলে তাঁকে আদর করে বাঁশি বলে ডাকতেন। বাহিনীর কাজ ছিল রাত দশটা থেকে ভোর চারটে অবধি ঘুরে ঘুরে শহর পাহারা দেওয়া। হিন্দু প্যাট্রিয়টের ৯-৭-১৮৫৭ তারিখের সংখ্যায় এঁদের কাণ্ডকারখানার যে বিবরণ দেওয়া আছে, তা থেকে জানা যায়—এঁরা বিদ্রোহীদের হাতেনাতে ধরার গোপন কাগজের সন্ধানে সারা শহর দাপিয়ে বেড়াতেন। নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে ও অবসর সময় ব্যয় করে কলকাতা পাহারা দেওয়ার ভার নেওয়ার জন্যে এঁদের প্রশংসা করে ২০-১০-১৮৫৭ তারিখে ময়দানে লেডি ক্যানিং এই বাহিনীর পদাতিক, ঘোড়সওয়ার ও গোলন্দাজবাহিনীকে

শান্তিরক্ষায় সেকালের কলকাতা পুলিশ

জাতীয় পতাকা উপহার দিলেন। জমায়েতে লর্ড ক্যানিং ও প্রধান সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন। লেডি ক্যানিংয়ের ভাষণের উত্তরে কর্ণেল টার্নবুল তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সব সময়ে সজাগ থাকবেন বলেছিলেন।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ার দাবি সরকার মেনে নেওয়ায় কলকাতার সাহেবদের ১২ জুন যে আনন্দ হয়েছিল, ১৩ জুন আর তা রইল না। ঐদিন ক্যানিং সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করলেন। এ-আইন ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজের ওপর সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে শুনে ইংরেজদের রাগের আর সীমা রইল না। আইন পাশ না করে আর উপায় ছিল না। ইংরেজদের কাগজ বেঙ্গল হরকরা ও ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ গোপন খবর ফলাও করে প্রকাশ করতে লাগলেন। এ-সমস্ত খবর অনুবাদ হয়ে দেশীয় কাগজের মাধ্যমে সিপাহীদের কাছে পৌঁছলে কি ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে, কাগজওয়ালারা সে-বিষয়ে কোন চিন্তাই করলেন না। শুধু সামরিক দুর্বলতার কথা ছাড়াও খবর সত্যি কি মিথ্যে তা একটুও খোঁজ না নিয়ে ছাপা হতে লাগল। বেঙ্গল হরকরায় খবর বেরল, কোম্পানির ফৌজকে মুর্শিদাবাদের নবাবকে গেপ্তার করতে পাঠান হয়েছে। যে-নবাব সম্পূর্ণ রাজভক্ত, তাঁর বিরুদ্ধে এ-অপবাদ দিলে তাঁর মত প্রভাবশালী লোকের বিরূপ হতে কতক্ষণ লাগবে আর মুসলমানদের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা ভাবা হল না। পার্শি ভাষায় প্রকাশিত দুরবীণ আর বাঙলা কাগজ সংবাদ সুধাবর্ষণে ছাপা হল দিল্লির বিদ্রোহীদের এক ইস্তাহার। তাতে শয়তানের ঝাড় ইংরেজ (যারা জোর করে সমস্ত সিপাহীদের কৃশ্চান করতে চায়)-দের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানকে এক হয়ে জেহাদ ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল। ৫-৬-১৮৫৭ তারিখের সংবাদ সুধাবর্ষণে লেখা হল, লর্ড ক্যানিং দমদম ও ব্যারাকপুরের সিপাহীদের খোসামোদ করতে রোজ এ-দু জায়গায় গিয়ে তাদের সেলাম করেন এবং ভয় পেয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর সংখ্যা আরও ২৪জন বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ-আইনকে ইংরেজি খবর কাগজওয়ালারা যে খুব একটা আমল দিয়েছিলেন তা মনে হয় না। বেঙ্গল হরকরার লাইসেন্স ১৮-৯-১৮৫৭ তারিখে বাতিল করে দেওয়া হয়। পরে মালিকরা দোষী সম্পাদককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করায় আবার এই কাগজ ২৩-৯-১৮৫৭ তারিখ থেকে বার হতে থাকে।

রবিবারের আতঙ্ক

কলকাতায় নানা রকম ঘটনা ঘটার জন্যে জুন ১৮৫৭টা মনে রাখবার মত। শনিবার ১৩ জুন রাত্তিরে ব্যারাকপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল হিয়ারসির কাছ থেকে ক্যানিং জরুরি খবর পেলেন যে, পরদিন সকালে বিদ্রোহ করবে বলে সিপাহীরা ঠিক করেছে। ভোর হতে না হতেই সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হল। কলকাতার সন্দেহভাজন সিপাহী-দেরও বিকেল চারটের মধ্যে নিরস্ত্র করা হল। এসব সামরিক ব্যাপার যত গোপনেই রাখা হোক না কেন, কলকাতার সাহেব মহলে গুজব রটে গেল, ব্যারাকপুরের সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে আর তারা কলকাতায় এসে পড়ল বলে। সকালবেলাটা যা হোক করে কেটে গেল কিন্তু বিকেলের দিকে সাহেবরা আর সাহস বজায় রাখতে পারলেন না। সাহেবরা আতংকে বন্দরের জাহাজ, বড় হোটেলে পালালেন। যাঁদের সুযোগ ছিল, তাঁরা ফোর্ট উইলিয়ামে এসে আশ্রয় নিলেন। শুধু যে সাধারণ সাহেব নাগরিকে-রাই এই কান্ড করলেন তা নয়, কিছু কিছু বড় সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীরাও যে পালায় সেই বাঁচে এই নীতি অনুসরণ করলেন। ধনী ও অভিজাত সাহেবপাড়া চৌরঙ্গী অঞ্চল জনমানবহীন ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে রইল। আশ্চর্যের কথা মাত্র দুদিন আগে এত ঘটা করে যে সামরিক স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী গড়া হল, তাদের কোন সদস্যকেই সাহস দেবার জন্য এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।

নবাব ওয়াজিদ আলি

কলকাতার নিরপরাধ বিশিষ্ট নাগরিক-দের মধ্যে যাঁরা অকারণে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি একজন। উত্তরপ্রদেশে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গার্ডেনরিচে নির্বাসিত অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলির নামে কলকাতার ইংরেজ কাগজওয়ালারা নানা রকম মিথ্যে গল্প বানিয়ে এই নির্বিবাদী কবি নবাবটির ওপর সকলের মন বিষিয়ে দিচ্ছিলেন। নবাবের গুপ্ত-চরেরা ফোর্ট উইলিয়ামে ও ব্যারাকপুরে সিপাহীদের বিদ্রোহের প্ররোচনা দিচ্ছে, লখনৌ থেকে জায়গীরদাররা এসে নবাবের সঙ্গে সলাপরামর্শ করছে—এসব মনগড়া কথা লেখা হতে লাগল। রবিবার ১৪ জুন, সাহেবদের কান্ডকারখানার পর ক্যানিং আর ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। ১৫ জুন ভোর-বেলা বৈদেশিক সচিব এডমনস্টন গোরা সৈন্য নিয়ে নবাবকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন। অভিযোগ অস্বীকার করলেও, শান্তভাবেই নবাব গেপ্তারের হুকুম মেনে নিলেন। তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী করে রাখা হল। বন্দী নবাব ফোর্ট উইলিয়ামে শান্তিতে কবিতা লিখে দিন কাটাতে লাগলেন, কোন মনোবিকার ঘটল না। ক্যানিংয়ের ভাষায় 'কুৎসিত মোটা নবাব ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁর ঘরের মেঝের মধ্যিখানে খাটের যত বালিস আছে তা সাজিয়ে রেখে তার ওপর হাত ও পা যতদূর ছড়ান যায়, ততদূর ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কবিতা রচনা করে যেতেন। দেখে মনে হত যেন একটা কচ্ছপ শুয়ে আছে। আমি অবশ্য নিজে তাঁকে দেখিনি, তাঁর পাহারাদার অফিসারদের কাছ থেকে শুনেছি।' ক্যানিংয়ের ওপর নবাবের কোন বিদ্বেষ ছিল না। ক্যানিংয়ের উদ্দেশে এক বিরাট কবিতা লিখে তিনি তাঁকে পাঠিয়ে দেন।

পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ

বিদ্রোহের অনতিবিলম্বে যেসব গুজব ছড়িয়েছিল, তার মধ্যে একটি হল ২৩ জুন ১৮৫৭ তারিখে (পলাশীর যুদ্ধ বা ভারতে ইংরেজ রাজত্বের শতবর্ষের দিন) সিপাহীরা ও তাদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানেরা রাজধানী কলকাতা আক্রমণ করবে। ইংরিজি মতে ২৩-৬-১৮৫৭ তারিখে পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর পূর্ণ হলেও মুসলমান পঞ্জিকার মতে ২৩-৬-১৮৫৭ তারিখে তা একশ বছর হয় না। সাহেবদের ভয়টা একটু অযৌক্তিক ছিল। যা হোক ২৩ জুন কলকাতায় কোন গোলমাল হল না, সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মহরমের আতংক

মহরমের দিন যাতে কোন গোল-মাল না হয় এই জন্যে সাহেবরা সামরিক আইন জারি করার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। এ-আইন জারি করতে যত গোরা সৈন্য রাখার কথা তখন তা ছিল না, থাকলেও তাদের উত্তরপ্রদেশেই পাঠিয়ে দেওয়া হত। শহরে গোলমাল হলে পুলিশ ও মিলিটারিই তা রুখতে পারবে এই যুক্তি দিয়ে ক্যানিং সামরিক আইন জারি করার দাবি নাকচ করে দিলেন।

সাহেবরা যেমন ভয় পেয়েছিলেন মুসলমানেরাও তেমনি ভরসা রাখতে পারেননি। নানান জায়গা থেকে মুসল-মানেরা জড় হয়ে শোভাযাত্রা করে যাবে। অতএব কখন কি হয়। কর্তৃপক্ষ মহরমের দিন শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যথেষ্ট গোরা সৈন্য, পুলিশ ও ক্যালকাটা ভলানটিয়ার গার্ডসদের মোতায়েন করার ও শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার আশ্বাস দিলেন। এই আশ্বাসের ফলে শান্তিভঙ্গের আর কোন ভয় রইল না। কলকাতার সাহেবদের এতে খুশী হওয়ার কথা। কিন্তু ফল হল উল্টো। ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়ায় লেখা হল, 'যাদের (মুসলমান) ওপর এই সহানুভূতি দেখান হল তারা কি সেই সম্প্রদায়ের নয় যারা বিনা বাধায় শুধু যে অস্ত্র মজুত করছে তা নয়, সর্বদাই বর্তমান সরকারের উচ্ছেদের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে? এদের মধ্যে যে কেউই ত ইচ্ছে করলে বিদ্রোহীদের সমস্ত গুপ্ত খবর ফাঁস করে দিতে পারে, কিন্তু তা কি তারা করবে? (৩০।৭।১৮৫৭) হিন্দু প্যাট্রিয়ট ২৭।৮।১৮৫৭ তারিখের সংখ্যায় লিখেছেন, 'কলকাতার বেশীর ভাগ সাহেবরাই বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মহরমের শোভাযাত্রা বার করার অনুমতি দেওয়াটা তাঁদের সম্প্রদায়ের পক্ষে খুব অপমানজনক বলে মনে করছেন। ভয়ের কথা এই যে মিছিলে যেসব হিন্দুস্থানী মুসলমান ও [illegible]

অংশ নেবে তারা প্রচণ্ড মাতাল অবস্থায় থাকবে। এদের পক্ষে রাস্তায় মিছিল দেখতে দাঁড়ান কোন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া বাধান অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে অপমানিত সাহেবের পক্ষে তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র সাহায্য পাওয়ার কোন অসুবিধে না থাকায় ভয়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যেতে পারে। দুঃখের কথা সাহেবরা এখন আর মুসলমানকে খুন করায় কোন দোষ আছে বলে মনে করছেন না। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় ও মুসলমানেরা সহযোগিতা করায় মহরমের দিনটিও ভালয় ভালয় কেটে গেল।

অস্ত্র আইন

মহরমের ছুতোয় যখন সামরিক আইন পাশ করান গেল না তখন সাহেবরা সমস্ত নেটিভদের নিরস্ত্রীকরণের আওয়াজ তুললেন। কলকাতা ট্রেডস এ্যাসোসিয়েশনের "মাস্টার" উইলিয়াম রবার্টস লর্ড ক্যানিংকে এসম্বন্ধে লিখিত স্মারকপত্র দিলেন। রবার্টস সাহেবের স্মারকপত্রে বলা হল কলকাতার তিন ভাগের এক ভাগ নেটিভ, যাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এরা যখন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র জমা করছে তখন তাদের নিরস্ত্রীকরণ বিশেষ জরুরী।

১১।৯।১৮৫৭ তারিখে অস্ত্র আইন পাশ হল. কিন্তু তা নেটিভ ও সাহেবদের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হল। আগ্নেয়াস্ত্র, তলোয়ার ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র রাখতে হলে সকলকেই লাইসেন্স নিতে হবে তবে সামরিক পুলিশ ও ক্যালকাটা ভলান্টিয়ার গার্ডসের সদস্যদের এ আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হল। নেটিভদের সঙ্গে তাঁদের সমান করে দেখায় স্বাভাবিক কারণেই সাহেবরা প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। ডি. মেকেঞ্জি নামে এক বড় ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে কলকাতার ৬৮২ জন বড় বড় ইংরেজ প্রতিবাদপত্র পাঠান। এ আইন যে ইংরেজদের রাজানুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ আনে একথাটা তাতে বড় করে তুলে ধরা হয়। খ্রীশ্চানদের এ আইন থেকে ছাড় দেওয়ার জোর দাবি করা হল। ক্যানিং জানালেন ইংরেজদের হেয় করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা যে বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তকারী তার যখন কোন প্রমাণ নেই তখন কর্তৃপক্ষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রয়োজন অনুসারে সকলকেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের লাইসেন্স দেবেন।

স্থানীয় লোকেদের কথা

বিদ্রোহী পশ্চিমা সিপাহীরা কলকাতা আক্রমণ করলে যে আগুন জ্বলবে তাতে শুধু সাহেবরাই পুড়বে, বাঙ্গালীদের গায়ে আঁচ লাগবে না এ হতে পারে না। কিন্তু সাহেবদের মত সরকারী সাহায্যে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার সুযোগ না থাকায়, কোম্পানীর ফৌজের ওপর নির্ভর করা ছাড়া স্থানীয় লোকেদের আর উপায় ছিল না। কাজেই তাঁরা সভাসমিতি করে রাজানুগত্য প্রকাশ ও
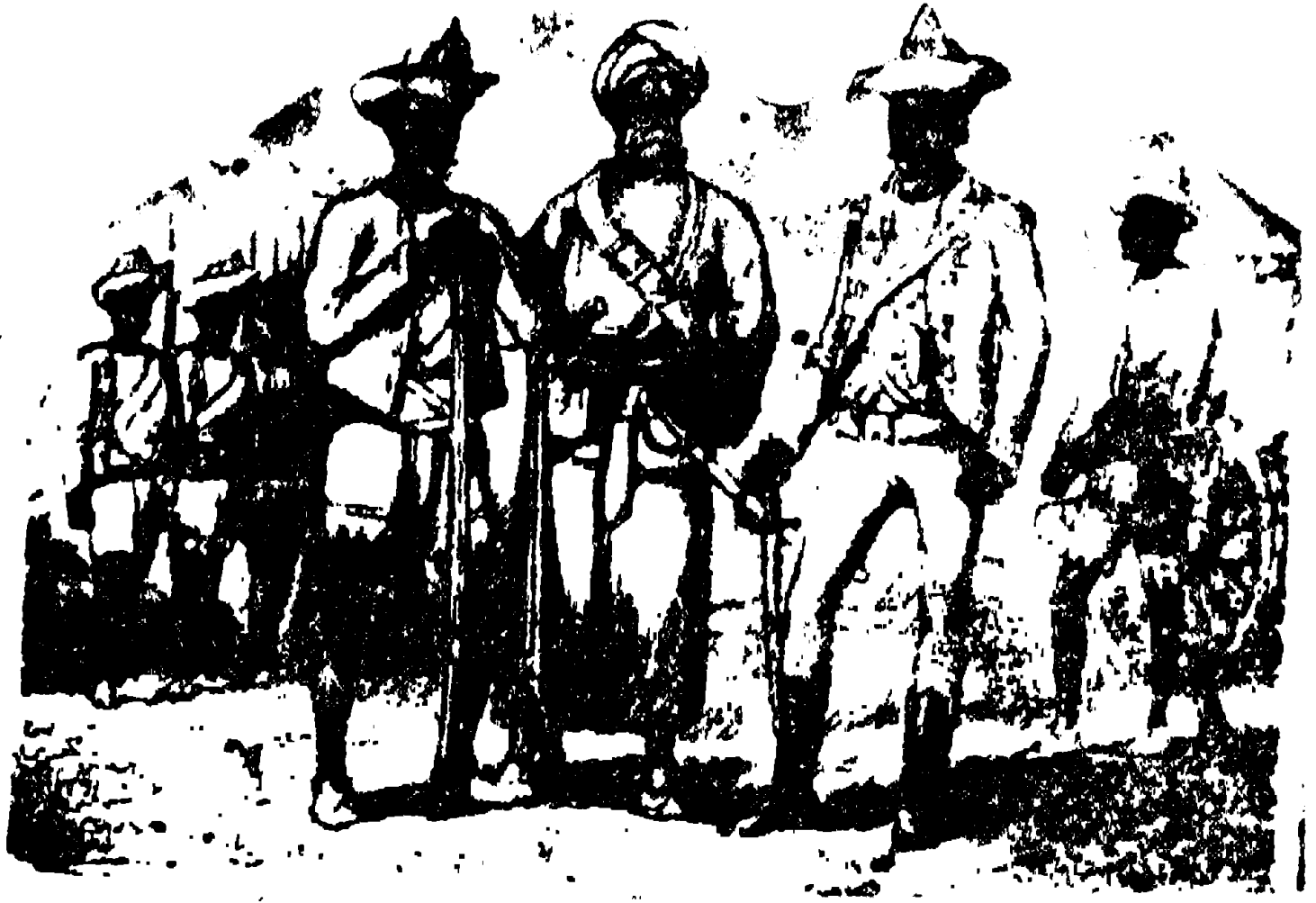
কোম্পানীর দেশীয় বাহিনী

কোম্পানীর জয় কামনা করলেন। ২৫।৫।১৮৫৭ তারিখে মেট্রপলিটান কলেজে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে কলকাতার বিশিষ্ট লোকেরা এক সভা করেন। সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা কমলকৃষ্ণ, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত থেকে প্রস্তাব নিলেন যে সরকার তাঁদের কাছে যে সাহায্য চাইবেন তাই দিতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন। নিজের নিজের এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি রোধ করা বা মিথ্যা গুজবে যাতে লোকে ভয় না পায় একথাও ভাবা হয়েছিল। ২৩-৫-১৮৫৭ তারিখে ভবানীপুরের চক্রবেড়েতে বাবু গুরুচরণ দের বাড়ীতে যে সভা হয় তাতে ভবানীপুরের অনেক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থেকে প্রস্তাব নিলেন যে শহরের স্বার্থান্বেষী মহল থেকে যেসব মিথ্যে-গুজব রটান হচ্ছে তা বিশ্বাস করে লোকে যাতে অকারণ আতঙ্কগ্রস্ত না হয় তা দেখা হবে। লোকেদের বোঝাতে হবে যে সরকার এত শক্তিশালী যে বিদ্রোহ বা আভ্যন্তরীণ গোলমাল দমন করতে তাদের কোনই অসুবিধে হবে না। সভার কার্যবিবরণী গভর্ণর জেনারেলকে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব নেওয়া হল।

কলকাতার হিন্দু স্কুল সৈন্য থাকবার জন্যে দখল করা হলে বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক তাঁর চিৎপুর রোডের বিরাট প্রাসাদ স্কুলকে ব্যবহার করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

হতভাগ্য 'ভারত সম্রাট' বাহাদুর শাহ ধর্মে মুসলমান ছিলেন বলে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহকে মুসলমানদের আন্দোলন ভাবতেন। ও প্রত্যেকটি মুসলমানকে বিশ্বাসঘাতক ও ছদ্মবেশী বিদ্রোহী বলে ভাবা হত। রেভারেণ্ড ডাফ সাহেবের জুন ১৮৫৭ সালের চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। কলকাতা এখন খুব আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখানকার মুসলমানেরা যারা বেশীর ভাগ সশস্ত্র তারা কাফেরদের ওপর বদলা নেবার জন্যে তৈরী রয়েছে। দিল্লির বিদ্রোহীদের জয় কামনায় তারা মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করছে। তারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় জড় হয়ে সমস্ত রাত গোপনে সলাপরামর্শ করছে। বাজার থেকে যে কোন দাম দিয়ে বন্দুক ও বারুদ কিনে রাখছে।' বেঙ্গল হরকরা তাঁদের ৫।৬।১৮৫৭ তারিখের সংখ্যায় লিখলেন, 'এটা কি সত্যি যে মুসলমানদের যত ইচ্ছে অস্ত্র যোগাড় করার কোন অসুবিধে নেই? সরকার কি এটা অবিশ্বাস করবেন যে এন্টালির সাউথ রোডের একটা বাড়িতে মুসলমানরা রাত্রে জমায়েত হয়, আর সেখানে হাজার হাজার অস্ত্র বিলি হয়? আশ্চর্যের কথা পুলিশ কমিশনার এন্টালি তাঁর এলাকার বাইরে শুধু এই যুক্তি দিয়ে এতবড় গুরুতর অভিযোগে কান দেওয়াই দরকার মনে করেন নি।'

ইংরেজদের মনোভাব এরকম হলেও মুসলমানরা রাজভক্তি দেখাবার কার্পণ্য করেন নি। ২৭।৫।১৮৫৭ তারিখে কলকাতার মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন তাল-তলায় ৯।১ মৌলবী ইমদাদ আলি লেনে এক বিশেষ সভা ডাকেন। ইংরেজরা এদেশের লোকদের ধর্ম নষ্ট করে বলে যে প্রচার চালান হচ্ছে তা যে একেবারে মিথ্যে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ যাতে অপপ্রচারে কান না দেন তার জন্য এখানে প্রস্তাব রাখা হয়। বিপদ এলে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ সভার পরও মুসলমান বিদ্বেষ কিছুমাত্র কমেনি। সংবাদ প্রভাকর তাঁদের ২৯।৬।১৮৫৭ তারিখের সংখ্যায় লিখলেন, 'অধুনা যবন প্রজাদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের এমত অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই নগরে যে স্থানে অধিক যবনের বাস সেই স্থানেই অধিক রাজপ্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে।

নাগর্য বলান্টিয়ার সেনাদল অতি সতর্কভাবে মাদরাসা কালেজ রক্ষা করিতেছেন।'

হিন্দু মুসলমান ছাড়া কলকাতার আর্মেনিয়ান ও ফরাসী বাসিন্দারাও তাঁদের রাজানুগত্য ও যে কোন সাহায্য দেবার ইচ্ছা জানিয়ে লর্ড ক্যানিংকে স্মারকপত্র দিয়েছিলেন।

উদ্বাস্তু ত্রাণ

উত্তরপ্রদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর যেসব সাহেব তাঁদের পরিবার নিয়ে কোনরকমে পালাতে পেরেছিলেন, তাঁরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে জলপথে কলকাতায় আসতে লাগলেন। এঁদের জায়গা দেওয়ার জন্যে বিশপস কলেজের খানিকটা খালি করে দেওয়া হল। উদ্বাস্তুদের সেবা করার জন্যে ২।৭।১৮৫৭ তারিখে ৬ নম্বর চার্চ লেনে রিচি সাহেবের সভাপতিত্বে কলকাতার ২৮ জন সাহেব ও স্থানীয় লোকেদের মধ্যে বাবু রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় ও রামনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এক সভা হয়। সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে মঁসিয়ো কুর্তো নামে একজন তাঁর ৩৬ নম্বর পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির ফরাসী উদ্বাস্তুদের থাকার জন্য দিয়েছিলেন।

ডাক্তার ওয়েব ও ডাক্তার লেফির চেষ্টায় মাসে দেড়শ টাকা ভাড়ায় ৭ নম্বর চৌরঙ্গী রোডের বাড়িটিও এ-কাজের জন্য নেওয়া হয়। ডাক্তার ওয়েব ও ডাক্তার লেফ এ-বাড়ির প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও লোকজন বন্দোবস্ত করবার ভার নিয়েছিলেন। বেসরকারি সাহেবদের কলকাতা আসার স্টিমার ভাড়া ধার দেওয়া ও সুবিধে ভাড়ায় বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কাপড়-চোপড়ের দান গ্রহণ করার জন্যে ৭ নম্বর চৌরঙ্গী রোডের বাড়িতে একটা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। লেডি ক্যানিং প্রচুর পরিমাণে মেয়েদের পোষাক জোগাড় করে দিয়েছিলেন আর হারমান কোম্পানি দিয়েছিলেন পুরুষের পোষাক। মিসেস কলভিন নামে একজন মেমসাহেবের ৬ নম্বর রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতেও কাপড়-চোপড়ের দান গ্রহণের কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়ার ১৬-৭-১৮৫৭ তারিখের সংখ্যায় দেখা যায়, তখনও পর্যন্ত মোট ৮৪ জন উদ্বাস্তু কলকাতার ৮টি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন ও ত্রাণ সমিতির মহিলা সাব-কমিটির সদস্যারা প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। ত্রাণের কাজ চালাতে হলে প্রচুর টাকার দরকার। গঠিত ত্রাণ কমিটি সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন। ১০-৯-১৮৫৭ তারিখের হিন্দু প্যাট্রিয়ট বেঙ্গল হরকরার এক খবর উল্লেখ করে বলছেন, সরকারি দানের অঙ্কমাত্র প্রকাশ করে ক্যানিং জানিয়েছেন, জনসাধারণের টাকা সরকার দান হিসেবে ব্যয় করলে সাধারণ লোকেদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা কমে যাবে, হয়ত শেষ পর্যন্ত বন্ধই হয়ে যাবে। যা হোক সাহায্য তহবিলে লর্ড ক্যানিং ব্যক্তিগতভাবে ১০০০ টাকা ও লেডি ক্যানিং ৫০০ টাকা দান করলেন। কলকাতার সাহেবরা কেউ কেউ ত্রাণ তহবিলে নেটিভদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া তাঁদের সম্প্রদায়ের অপমান মনে করলেও, এ-আপত্তি গ্রাহ্য হয়নি। সাহেবদের কাগজ যাই বলুন না কেন স্থানীয় লোকেরাও যথাসাধ্য দান করলেন। একশ টাকা ও তার বেশি যাঁরা দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই নামগুলি পাওয়া যায়—নবাব নাজিম মুর্শিদাবাদ ৫০০০, মহারাজা বর্ধমান ১০০০, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা প্রসন্ননাথ রায়, শ্যামাচরণ মল্লিক, হীরালাল শীল প্রত্যেকে ৫০০ টাকা। রাও রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ লালগোলা ২৫০, শম্ভুনাথ পন্ডিত, খেলাত ঘোষ, গোপাললাল ঠাকুর, শিবলাল মতিলাল প্রত্যেকে ১০০ টাকা।

প্রাচ্য ভাষাবিদ সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন বিমস সাহেব সিভিলিয়ান হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে। তিনি যে ডায়েরি রেখে গিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, তখন কলকাতা উদ্বাস্তুতে ভরে গিয়েছে। সেবা কার্যের নেতৃত্ব দিচ্ছেন লেডি ক্যানিং ও তাঁকে সাহায্য করছেন মিসেস হাও নামে একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেমসাহেব। উদ্বাস্তুদের কিছুদিন এলাহাবাদ দুর্গে রেখে স্টিমারে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। হাও তাঁর নিজস্ব নডবড়ে ঘোড়ার গাড়ি করে কলকাতার সব ধনী সাহেবদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরোন কাপড়-জামা সংগ্রহ করতেন। জামা-কাপড়ের স্তূপ নিয়ে ইনি সারা কলকাতার সাহেবপাড়া চসে বেড়াচ্ছেন এটা রোজের দৃশ্য ছিল। ১ নম্বর লিটল রাসেল স্ট্রিটে একটা সাময়িক হাসপাতাল খুলে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সাংঘাতিকভাবে যাঁরা আহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বহু ক্ষেত্রে তাঁদের নেটিভ চাকরদের চেষ্টায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। সুযোগ-সুবিধা মত সহায়-সম্বলহীনা মেমসাহেব ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক চিত্র

খাওয়ার জিনিস নির্বিচারে রপ্তানি হওয়ার জন্যে কলকাতায় সব জিনিসের দাম খুব বেড়ে যায়। ২ ও ২০ জুন ১৮৫৭ সালের সংখ্যায় সংবাদ প্রভাকর লিখলেন, 'বাজারে নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে জনসাধারণের কষ্ট বাড়িতেছে। বহির্বাণিজ্য ইহার কারণ।...প্রার্থনা গবর্নর বাহাদুর রাজ্যের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্নশীল হউন, তন্ডুলাদি অগ্নিমূল্য হওয়াতে প্রজারা আর রক্ষা পায় না, রপ্তানি বন্ধ না করিলে দেশ বাঁচে না।' নিচে বিদ্রোহের সময় রপ্তানির হিসাব পাউন্ডের (১ পাউন্ড = ১০ টাকা) মূল্যে দেওয়া হল:—

চাল

১৮৫৭ : ২,৩০১,১৮২ পাঃ, ১৮৫৮ : ৩,৪৭৯,১৭২ পাঃ, ১৮৫৯ : ২,৪৩৩,১৪৫ পাঃ।

গম

১৮৫৭-৫৮ : ১,৪২,৭৬৭ পাঃ, ১৮৫৮-৫৯ : ১,১৬,৯৪৫ পাঃ। এটা অবশ্য তখনকার ভারতের মোট রপ্তানির হিসেব। কলকাতা বন্দর থেকে ঠিক কত রপ্তানি হয়েছিল, তার আলাদা হিসেব নেই, তবে ১৮৫৭-র জুন মাসে কলকাতার বাঁধা আয়ের লোকেদের কষ্ট নিয়ে রপ্তানি সম্বন্ধে হিন্দু প্যাট্রিয়ট, সংবাদ ভাস্কর প্রভৃতি কাগজে যে আন্দোলন হয়েছিল, তা থেকে মনে হয়, কলকাতা থেকে রপ্তানি কিছু কম ছিল না।

লড়াইয়ের খরচ মেটাবার জন্যে শতকরা পাঁচ টাকা সুদে ঋণপত্র বাজারে ছাড়া হল ও এতে ভালই সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। সরকারি খরচ কমাবার দিকে নজর দেওয়া সামরিক প্রয়োজনে যতটুকু নইলে নয়, সেটুকু খালি বজায় রাখা হবে এ-সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কাজ না চালু থাকলে লোকজনই বা থাকে কি করে? কলকাতার যে দুরবস্থা হয়েছিল, তা সংবাদ প্রভাকরের ১৭-৪-১২৬৫ তারিখের সংখ্যায় পাওয়া যায়, 'বর্ষাকালে অতীতপ্রায় হইয়া আসিল, অথচ রাস্তা মেরামতের কিছুই দেখিতে-শুনিতে পাই না। বাঙ্গালি পল্লীর সকল রাস্তাই অতি কদর্য অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, ফলত চীৎপুর রোড ও তাহার শাখা পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি স্থলের কতক কতকগুলিন গলি যেমত দুঃস্থগ্রস্ত তাহা বলিবার নহে। বিনীতভাবে রাজপুরুষগণকে নিবেদন করি—তাঁহারা না হয় বাঙ্গালি পল্লীতে আসিয়া স্ব স্ব চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া রাস্তা সকলের প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদান করিবেন।'

সাহেবদের কাগজে অবশ্য উপদেশ দেওয়া হয় যে, নেটিভদের শিক্ষাখাতে যা ব্যয় করা হয়, তাহা পাঁচ বছরের জন্যে বন্ধ করা হোক।

ইংরাজী কাগজের ভূমিকা

ভারতীয় বিদ্বেষী খবরের কাগজওয়ালারা দিনের পর দিন যে বিষ ঢেলেছিলেন তার তুলনা মিলবে না। এ-দেশের সাধারণ লোক যারা বিদ্রোহে অংশ নেয়নি, প্রকাশ্যে রাজানুগত্য দেখিয়েছে, সক্রিয় সাহায্য দিয়েছে, তাদের যাতে কোন রকম রাজনৈতিক সুবিধে না দেওয়া হয়, সরকারি কোন উঁচু পদ যেন তারা না পায়—এই নীতি প্রচার তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কাগজের সুর ছিল বীভৎস। সিপাহীদের কাল্পনিক অত্যাচারের গল্পে কলকাতার কাগজওয়ালারা সমস্ত লোমহর্ষক কাহিনীকে ম্লান করে দিয়েছিল (ট্রেভেলিয়ান)।

খবরের কগজ থেকে ভাবত বিদ্বেষের একটা নমুনা দেওয়া হল। 'এদের আমরা রক্ষা করেছি, শিক্ষা দিয়েছি, একের পর এক সুবিধে দিয়েছি কিন্ত তারাই সুযোগ পেয়ে নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতার চরম দেখাল। এদেশীয় লোকেদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এরকম। এরকম অকৃতজ্ঞতা ইয়োরোপীয়রা ভাবতেই পারেন না। ফাঁসির চেয়ে কম

শাস্তি যেন এরা না পায়। চরম শাস্তি দেবার কথা বলতে আমাদের কোন সংকোচ নেই। বিদ্রোহ আমাদের শেখাল যে এতদিন আমরা শুয়োরের বাচ্চাদের সাপ্সে দুধ কলা দিয়ে নিজের বাড়িতে পুষেছি....। (ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া : ১৬-৭-১৮৫৭)। বিদেশী শাসনের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে সিপাহীদের যে মানসিক বিকার এসেছিল তার ফলে অবশ্য কিছু নারী ও শিশু হত্যা করা হয়। কলকাতার কাগজওয়ালাদের এ মিথ্যে গল্প রটনার কারণ হয়ত ক্যানিংকে তাঁর ন্যায়পরায়ণতার নীতি থেকে সরিয়ে এনে নির্বিচার গণহত্যা ও অত্যাচারের পথে নিয়ে যাওয়া কিম্বা তাঁকে এদেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে আবেদন অক্টোবর মাসে রানীর কাছে করেছিলেন তার পটভূমিকা রচনা করা।

সিপাহী বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই কলকাতায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে যেমন ৯-২-১৮৩৯ তারিখে টাউন হলে মিটিং করে প্রতিষ্ঠা হয় 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন।' কলকাতার এইসব সভায় ইংরিজি শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলেরা ব্রিটিশ কুশাসনের সমালোচনা ও উঁচু পদে এদেশীয় লোকেদের নিয়োগের দাবি করতে থাকেন। কলকাতার বাঙ্গালীদের এসব রাজনৈতিক সচেতন ইংরেজরা মোটেই পছন্দ করতেন না। বিদ্রোহের সময় বাঙ্গালীরা কালা কানুন বা ব্ল্যাক এ্যাক্ট নিয়ে আন্দোলন করছিলেন। টাউন হলের সভায় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কলকাতার কাগজওয়ালাদের বিলেতের ঝাড়ু দেওয়া আবর্জনা ও ভাগ্যান্বেষীর দল বলায় আগুনে ঘি পড়ল। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া (৪-৮-১৮৫৭) লিখলেন, 'বাঙ্গালীবাবুরা যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে চেঁচাবে তখন আমাদের বলতে হবে তোমাদের যে লাথি মারিনি এটাই তোমাদের ভাগ্য, আর লাঠি দিয়ে যে পেটাইনি তার জন্যে তোমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।'

'হিন্দুদের (বাঙ্গালী?) আসল মূর্তি ধরা পড়ে গিয়েছে। আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নেটিভদের সরকারি কোন উঁচু পদে আর নেওয়া হবে না। কলকাতার উদারপন্থী লোকেরা যাঁরা অন্য কথা ভাবেন তাঁরা নেটিভদের চাকরির মর্যাদা বাড়াবার কথা বলতে আর সাহস করবেন না। কারণ সে প্রস্তাব সকলে হেসে উড়িয়ে দেবে।' (ঐ : ৩-৯-১৮৫৭)। হিন্দু প্যাট্রিয়ট সাহেবদের সঙ্গে সমানে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। যেমন, 'এসব সাহেবরা নিশ্চয়ই সেই শ্রেণীর লোক যাদের নিজের দেশের লোকেরা ঝাঁটার বাড়ি মেরে তাড়িয়েছে। এদের পিঠ খুলে দেখলে ঘায়ের দাগ এখনও দেখা যাবে।' (২-৭-১৮৫৭) ইংরেজদের দুর্ব্যবহার ও খবরের কাগজের ভাষা চরমে ওঠায় কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দুরা বর্ধমানের মহারাজের নেতৃত্বে প্রতিকার চেয়ে ক্যানিংয়ের কাছে এক গণদরখাস্ত দিয়েছিলেন। (এ দরখাস্তের উল্লেখ করে লর্ড গ্র্যানভিলকে ১১-১২-১৮৫৭ তারিখের চিঠিতে ক্যানিং লিখলেন, 'এখনও যখন চূড়ান্ত জয় হয়নি তখন বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের শুভেচ্ছার ওপর আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতেই হবে। এই গণ দরখাস্তে ইয়রোপীয়ানদের যে ব্যবহার ও ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পড়ে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন স্থনীয় লোকেরা কতদূর মর্মাহত হয়েছেন। একটা গোটা জাতির অপমান করে অকারণে তাদের শত্রু করা ও শুভেচ্ছা হারানোর বিপদ অনেকখানি। আপনি জেনে রাখুন যতদিন আমি আছি ততদিন ন্যায়বিচারের নীতি থেকে সরে আসব না। আমি কখনই রাগের বশবর্তী হয়ে শাসন করব না। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ২৫-৯-১৮৫৭ তারিখে তিনি লিখলেন, 'ভারতবাসী তিনি যে শ্রেণীর হন না কেন তাঁর ওপর ইংরেজদের কি ভয়ানক বিদ্বেষ। এরা আমার স্বদেশবাসী এটা মনে করে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। এদের দশজনের মধ্যে ন' জনের ইচ্ছে যে অন্তত পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীকে ফাঁসি দিয়ে বা গুলি করে মারা হোক। স্থানীয় লোকেদের সরকারি প্রশাসনে একেবারে নিয়োগ না করলে যে দেশ শাসন করা যায় না এই সহজ কথাটা এরা কিছুতেই মানতে রাজি নন। এঁরা চাইছেন প্রত্যেক ভারতবাসী বিশ্বাসঘাতক ও তাঁদের চাপরাসী বা বেয়ারা ছাড়া অন্য কোন সরকারি কাজে আর নিয়োগ করা হবে না এই ঘোষণা করা হক। প্রিয়জনদের ওপর অত্যাচারের ফলে যেসব ইংরেজের মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে নেটিভদের ওপর তাদের বিদ্বেষ হয়ত ক্ষমা করা যেতে পারে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা ভারতীয় বিদ্বেষ প্রচারে যারা সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন তাঁরা তাঁদের এই কলকাতার বাড়ীতে বহাল তবিয়তে নিরুপদ্রবে দিন কাটাচ্ছেন, বিদ্রোহের একটু আঁচও তাঁদের গায় লাগেনি। কলকাতার ইংরেজদের এই শোচনীয় মনোভাব বিদ্রোহ দমনের পর স্বাভাবিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার কাজ খুব কষ্টদায়ক হবে।'

২৫-৬-১৮৫৮ তারিখে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে কসাইটোলায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মাসিক সভায় কলকাতায় গোরা সৈন্যের অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে নগরবাসীদের রক্ষা করার জন্যে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র

দিন নির্দিষ্ট না হলেও ১৮৫৮ সালের পুজো নাগাদ মহারানীর ঘোষণাপত্র ও বিজয়োৎসবের কথা কলকাতায় আলোচনা হতে লাগল। সুযোগ বুঝে বেঙ্গল হরকরা নেটিভদের বাড়ি বাড়ি যেন আলো দিয়ে সাজান হয় এটা প্রচার করতে লাগলেন। এ এ ইঙ্গিতে কাজ হল। পুলিশ কমিশনার যেদিন উৎসব হবে বলে ঘোষণা করা হবে সেদিন সন্ধ্যেবেলা সবাইকে নিজের নিজের বাড়ি আলো দিয়ে সাজাতে অনুরোধ করলেন। সেকালের পুলিশের বড়কর্তার প্রভাব কতটা ছিল তা আর বলতে হবে না। তাঁর অনুরোধ মানেই তো হুকুম এটা সকলেই বুঝলেন। এবিষয়ে হিন্দু প্যাট্রিয়ট তাঁদের ৭-১০-১৮৫৮ তারিখের সংখ্যায় লিখলেন, 'উৎসবের দিন বাড়িতে আলো দিতে কমিশনার সাহেব অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধে সকলেই সাড়া দেবে কিন্তু আনন্দের সঙ্গে নয়। এর মানে এই নয় যে স্থানীয় লোকেরা রাজভক্ত নয়, কারণটা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক।...... দুর্গা পুজায় সকলেরই অনেক খরচা হয়ে গিয়েছে, আরও সব পাল্লা পার্বনও এখনো বাকি। শীতের কাপড়চোপড় কেনা আছে। কাজেই আলো নিয়ে বেশী ঘটা না করে লোকে পুজোর সময় নিজের বাড়িতে একটু আধটু যা আলো দ্যায় তাই করাই উচিত হবে।' ঘোষণাপত্র পড়বার দিন কোনরকম জাঁকজমক হয় এটা লর্ড ক্যানিংয়ের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল না। সে রাত্রে যদি আলো দিয়ে সাজান ও আতসবাজীর বাহার না হয় তাহলে যে ব্যাপক অসন্তোষ হবে সেই ভেবে এতে মত না দেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় ছিল না। সোমবার পয়লা নভেম্বর ১৫৫৮ মহারাণীর ঘোষণাপত্র পড়ার দিন ঠিক হল। ক্যানিং এলাহাবাদে থাকায় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। বেলা পৌনে তিনটের সময় বাংলার ছোটলাট, প্রধান বিচারপতি, কাউন্সিলের মাননীয় সদস্যরা, বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা, কলকাতার স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকেরা গভরনর হাউসের মারবেল হলে এসে একের পর এক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন। বেলা চারটের সময় প্রেসিডেন্ট উত্তর দিকের সিঁড়ির ওপরে চাতালে যে মঞ্চ করা হয়েছিল সেখানে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে এসে পৌঁছানোর পর মহারানীর ঘোষণাপত্র স্বরাষ্ট্র সচিব বিডন সাহেব ইংরিজিতে ও সুপ্রীম কোর্টের দোভাষী বাবু শ্যামাচরণ সরকার পরে বাঙ্গলা অনুবাদ পাঠ করে শোনালেন। স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেদের মধ্যে যাঁদের মঞ্চের ওপর বড় সাহেবদের কাছাকাছি বসতে পারার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বাহাদুর রাজা কালীকৃষ্ণ ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের নাম পাওয়া যায়। মঞ্চের নীচে উত্তর দিকের সিঁড়ির দুপাশে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনী, নৌবাহিনী, স্থল বাহিনী ও ক্যালকাটা ভলানটিয়ার গার্ডসের তিনটি শাখার সদস্যরা সার দিয়ে দাঁড়ালেন। ঘোষণাপত্র পড়া শেষ হওয়ার পর গভর্নমেন্ট হাউসের সাম্নে সামরিক বাহিনীর লোকেরা ইংল্যান্ডের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন, ব্যাণ্ডে ইংল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীত বাজতে লাগল। গভর্নমেন্ট হাউস, ফোর্ট উইলিয়াম ও রাজকীয় নৌবাহিনীর চারটি জাহাজ পাইলেডস, পার্ল, সেমারামিশ ও স্প্যারোহক থেকে পরপর কামান দাগা হতে লাগল। সরকারী উদ্যোগে সন্ধ্যেবেলা আতসবাজী ছোঁড়া, সরকারি বাড়িতে কলকাতা বন্দরের সব জাহাজে আলো দেওয়া হল। উৎসব দেখতে বহু লোকের ভীড় হলেও পুলিশি ব্যবস্থার জন্য কোন দুর্ঘটনা হয়নি।

দালাল

গৌতম রায়

ট্যাকসিটা চলে গেল ছোকরা দুটোকে নিয়ে। সঙ্গে দুটো ছুকরি। যুবতী না ছাই। শ্যাওড়া গাছের ইয়ে। দিনের আলোয় মুখ দেখলে চরিত্তির সুধরে যাবে। এখন অন্ধকারে দেখ কে কার ঘাড়ে কোপ দেয়।

ছোঁড়া দুটো বাপের পয়সা নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছিল। মেয়ে দেখবে। কে এল আমার বাপের সুপুত্তুর। ওয়াই ডাবলুরা ওদের জন্যে যেন বসে আছে। তীর্থের কাকের মত। যাও শালা এবার ভিডি ওয়ার্ডে। লাখ লাখ পেনিসিলিন ফোঁড়া। বুঝবে ঠ্যালা।

ক্যামাক স্ট্রীটের নিটোল অন্ধকারে টমাস সাহেবের বাগানের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করল ছোটেলাল। নাঃ আজ আর নো ধান্দা। ওস্তাদ বলেছিল, বেশ মনে আছে তার, কথাগুলো এখনও কানের কাছে বাজে, ছোটে, যেদিন বেশী কামাই হবে সেদিন আর ফিল্ডে থাকিস না। খোঁচড় হারামজাদাদের চোখে পড়ার আগেই দিবি চম্পট।

পুলিশের লোককে ওস্তাদ বলত খোঁচড়। সে ওস্তাদ আজ আর নেই। দগদগে ঘা নিয়ে মরেছে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে। ওস্তাদের কথা মনে পড়লে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

দূর শালা, কে কার? ছোটেলাল পকেটে হাত পুরে এগোতে থাকে। জায়গাটা [illegible]

ছোটেলালের কারবারে মন্দা লাগবে। অবশ্য মন্দা তো লেগেই আছে। বাপের লালুরা আজকাল সেয়ানা হয়েছে। আস্তাকুঁড়ের দিকে তাকাতেই পারে না। বলে শালার দালালরা চোট্টা। ছিনতাই করে।

ছোটেলাল পকেটে আলতো ছোঁয়া লাগায়। ঠিক আছে ছুঁড়ি দুটো বিশ বিশ চল্লিশ, আর বাড়িউলি দশ। উঠতি বাবুরা আবার বাড়িউলি বলতে নাক কুঁচকায়। বলে ম্যাডাম। ঝোল ভাত নয়। রাইসকারী। মাইরী শু-শালা ইংরেজী না ঝাড়লে যেন শানায় না। দশ দশ বিশ গেল ঘরভাড়া। তাহলে—হিসেব আর পা দুটোকে আনমনে চালাতে চালাতে এগিয়ে যায় ছোটেলাল। পার্ক স্ট্রীটের বাবুপাড়া ধরে ছোটেলাল দালাল। মাইরী, কে যে কবে কথাটা বার করেছিল। ঘেন্না ধরে গেল। জন্মে ঘেন্না। কম্মে ঘেন্না।

এখন কার্তিকের শেষ। হিম পড়তে সুরু করেছে। মাঝে মাঝে হাল্কা বাতাস লেগে শরীরটা শিরশির করে ওঠে। বুকের কাছে হাত দুটোকে জড়ো করে নিল, পাখির ডানার মত। তবু শিরশিরে ভাবটা কাটে না। যা হোক এ বছরে একটা গরমের কিছু কিনতে হবে। নইলে শীতে বড় কষ্ট। টাকা কটাকে পাশ কাটিয়ে আলতো করে একটা বিড়ি তুলে আনল। বাঁ পকেট থেকে ম্যাচিস। বিড়িটা ধরিয়ে সে ভাবল একশ কুড়ি টাকা [illegible] এ

রকম মাইরী রোজ একটা করে জুটলে বরাত ফিরে যেত। মনে মনে তাদের বস্তীর সামনে বটতলার শিবঠাকুরের উদ্দেশ্যে একটা ছোট্ট প্রণামও করে নিল। তবে ছোটেলাল জানে শালার শিবঠাকুরও শুনবে না আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি খোলা স্বপ্নেও আসবে না। পাথরের ঢিবি। কেন যে ছাই মেয়েছেলেগুলো ঐ পাথরের ঢিবিটাকে হররকত পেন্নাম করে ছোটেলাল ভেবে পায় না। শিবরাত্তিরে ঢিবিটায় ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে বলে ঠাকুর তোমার মত যেন বর পাই। হেসে খান খান হতে ইচ্ছে করে ছোটেলালের। একালেও তবে গেঁজেল আর পাগলা স্বামীর কদর আছে। তাহলে ত' তার নিজেরও দর আছে। সে অবশ্য গাঁজা টানে না। টানে দিশি। বাংলা। বেশীর ভাগই ধেনো। পকেটে ঝড়াং করে কোন কোন দিন রেস্ত এসে গেলে খায় দিশি। একনম্বর। যেমন আজ এসেছে। আজ মেজাজ শরীফ। পুরো একনম্বর। সোডাওয়াটার মিশিয়ে।

বিড়িটা টানতে গিয়ে দেখল নিভে গেছে। শালা যেন নতুন বিয়ে করা বউ। একটু কম আদর করলেই অভিমান। যা শালা তোর অভিমানের ইয়ে করি। টান মেরে বিড়িটা ফেলে দিয়ে জোরে পা চালায় সে।

ছোকরাদুটোর মুখটা মনে পড়ল। নির্ঘাৎ নয়া। নইলে এত দাঁও চট করে মারা যায়? কচি পাঁঠার মত তুলতুলে ঘাড়। একটু ছোঁয়াতেই নেবে গেল। দুটোর মধ্যে একটা অবশ্য একটু সেয়ানা। বলে ছুঁড়ি না দেখে টাকা দোব না। ইল্লি আর কি। টাকা দেবে না? বলে কত ইয়া ইয়া মাস্তান কাৎ হয়ে গেল। সেরা রংবাজরা এখানে এসে আহ্লাদে ভালুক হয়ে যায়। আর তোরা ত বড়লোকের ন্যাদস কার্তিক।

এই মাটিতেই ছোটেলালের জন্ম। জন্ম কি বেজন্ম তা অবশ্য সে জানে না। জানত বুড়ী শিউলীবালা। রামলাল মিস্ত্রী লেনের ডাক সাইটে বাড়িউলি। তখন অবশ্য সে তেজ আর দাপট ছিল না শিউলীবালার। পোড়া তুবড়ির খোলের মত নিজের ছোট্ট ঘরখানায় কোনরকমে শেষ দিনের অপেক্ষায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। তাই হয়ত বুড়ীর কিছু ধম্মে মতিও হয়েছিল। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বেজন্মা ছোটেলালকে বড় করেছিল। নামটা তার কেন বুড়ী ছোটেলাল রেখেছিল তা জানার আগেই বুড়ী দুনিয়া ছেড়ে সটকেছিল। হয়ত চেহারায় খুব ছোটখাটো বলেই ছোটে ছোটে বলে বুড়ী ডাকত। সেই থেকেই কখন সে ছোটেলাল হয়ে গিয়েছিল। আসলে সে যে কোন্ জাতের, হিন্দু না মুসলমান, বাঙালী না বিহারী কিছুই জানে না। এমন কি তার গর্ভধারিণীকে খুঁজে পেলেও সেও বলতে পারবে না। ঐ ঈশ্বর ফিশ্বর কে [illegible] আছে। বললে হয়ত সেই বলতে পারবে। দূর হোক গে, অত [illegible]

বড় শহরে কে কার জামাই সে খোঁজ আর কে রাখছে!

'বদ্রীপ্রসাদজী, এক প্যাকেট ফিল্টার উইলস দাও তো।'

পান সাজতে সাজতে বদ্রী একবার মুখতুলে তাকালো, আজ বহুৎ বড়িয়া দাঁও পেয়েছিস মনে হচ্ছে।

'সে খোঁজে তোমার কি? যা চাইছি চটপট ছাড়ো।' পকেটে হাত ঢোকালে ছোটে। আন্দাজে ঠিক একটা দশ টাকার নোট তুলে আনল। শালার টাকা মাইরী এমনই চীজ। কোনটা কাগজ আর কোনটা টাকা ঠিক টের পাওয়া যায়। নোটটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কে কি কামাচ্ছে না কামাচ্ছে তাতে তোমার দরকার কি? মাল ছাড়ো কেটে যাই।'

নোটটা হাতে নিয়ে আলোর দিকে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে পোকা ধরা দাঁত বার হাসল। তারপর বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলিয়েছ। তোমার কামকাজে হামার কোন দরকার না আছে। লেকিন পুরানা পয়সার ত দরকার আছে।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ও পেয়ে যাবে। এত তাগাদার কি?'

'আউর কবে পাবে। মালুম হচ্ছে কি আজ বহুৎ কামিয়েছ। দিমাক বহুৎ গরম। তো আজ কুছ ছোড়।'

'কিবে, টাকা হাতে পেয়েই জবরদস্তি।'

'দুনিয়াত এ্যায়সাই ভাই। ইয়ে রুপেয়া ভি তোম্ কিসিসে খিচকে লে আয়া।'

'চোপ', ছোটেলাল চেঁচিয়ে ওঠে।

'কেয়া চোপ, চোপ।' এবার পাল্টা হুমকী ছাড়ে বদ্রীপ্রসাদ। সেই বা কম কিসে? আজ চল্লিশ বছরের দোকান তার। ছানিপড়া চোখের ওপর দিয়ে কত কি ঘটে গায়। কত কি ঘটতে দেখেছে সারা-জীবন ধরে। কত ছোটেলাল এল আর গেল। ওসব দুদিনের ফটফটানি তার অনেক দেখা আছে। দরকারের সময় টাকা ধার না দিলে ছোটেলালের লালগিরি কবে ঘুচে যেত। বেশী হম্বিতম্বি আর রোয়াব ঝাড়লে তার ব্যবসা খতম করিয়ে দিতে পারে বদ্রীপ্রসাদ। নেহাৎ করে না। উঠতি ছেলে। কতই বা বয়স হবে? পঁচিশ, ছাব্বিশ। বড় হতে দেখেছে। এখন ব্যবসা করছে। বাবুদের ফর-মায়েসী জেনানা জোগাড় করে দিচ্ছে। তার বদলে মিলছে রুপেয়া। বদ্রীপ্রসাদ জানে ব্যবসার অবস্থা এখন ভাল নয়। বাবুরা আজ-কাল সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। হরবকত চোট খেতে খেতে ভিত শক্ত করে নিয়েছে। এখন হোটেল থেকে নিজেরাই নিজেদের পসন্দ জেনানা জোগাড় করে নিচ্ছে। কোন কোন-দিন ছোটেলালদের বরাত খুলে যায়। নইলে মাহিনা ভর সেরেফ চুপচাপ। তাই মাঝে মাঝে ছোটেলালদেরও টাকা ধার দেয়। তো ছোটেলালদেরও উচিৎ সময় মত টাকা ফেরৎ দেওয়া। কিন্তু....।

এমনিতে বদ্রীপ্রসাদ খুব নিরীহ আর ঠাণ্ডামানুষ। কিন্তু তার ওপর রোয়াব ফলালে রোয়াব ঠাণ্ডা করে দেবার ক্ষমতা তার আছে। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'যা ভাগ—আউর বাইশ রুপেয়া পরে শোধ দিয়ে যাস্। 'আচ্ছা শালা, আমিও পরে দেখে নোব', ছোটেলাল গজরাতে থাকে।

ছোটেলালের এই এক খারাপ স্বভাব। সেটা সে নিজেও জানে। মাইরী, টাকা হাতে এলে আর কিছুতেই হাত ছাড়া করতে চাইছে করে না। জগতে তার কোন কিছুর জন্যেই মাথা নেই। না জেনানা। না ঘর। এক-মাত্র যা তা হল রুপেয়া। নিরীহ নোটগুলো কি ভালোই না তার লাগে। টাকা হাতে এলে তার রাগী আর বিরক্ত মনটা কেমন যেন সতেজ হয়ে ওঠে। সংসারের রঙটাই তখন যেন কেমন পাল্টে যায়। নিজেকে তখন বেশ বাদশা বাদশা মনে হয়। হাড় জিরজিরে ঘরে নড়বড়ে চৌকিতে শুয়ে থাকলেও গরমির দিনে গরম লাগে না। কড়কড়ে নোটগুলোকে পাখার মত মেলে নিয়ে হাওয়া খায়। টাকার হাওয়া বড় মিষ্টি আর ফুরফুরে। আপনিই ঘুম এসে যায়।

নতুন কেনা প্যাকেটের গোল্ডেন রিবনটা একটানে ছিঁড়ে ফেলল সে। কাচা-রাংতা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে পার্ক স্ট্রীট পাড়ার বাবুদের মত ঠোঁটে লাগালো একটা সিগারেট। কায়দামাফিক আগুন ছুঁইয়ে কাঠিটাও ছুড়ে দিল নর্দমায়।

অনেকটা হেঁটে এসেছে। ওয়েলিংটন। ঠিক একটু আগেই স্বনির্বাচিত স্বর্গধাম। ছোটেলাল বুকে হাত রেখে বলতে পারে এত ভাল বাংলা মাল খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। এক বোতলেই নেশা টৈটম্বুর। শালা বদ্রীপ্রসাদ। পিচকেটে থুতু ফেলল সে। নেশা করার মেজাজটা দিয়েছিল আর একটু হলেই মাটি করে। অবশ্য বদ্রীপ্রসাদের দোষই বা কি? তারই ত উচিত ছিল সময় মত টাকাটা ফেরৎ দেওয়া। সময় অসময়ে রাতবিরেতে বদ্রিপ্রসাদ না হলে তার আর গতি নেই। একটু ধরে করে পড়তে পারলেই হল। সুদ একটু আধটু নেয় বটে। তাতো নেবেই। কোন্ শালা ইয়ের বাচ্চা আছে যে বিনি সুদে যখন তখন টাকা হাওলাত দেবে? সেবার যখন লছমীকে পুলিশে পাকড়ালো যখরা পয়সা পায়নি বলে তখন, বদ্রীপ্রসাদই জামিনদার হয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এল। নাঃ লোকটা মন্দ নয়। আসলে দোষ ত তার নিজেরই। টাকার ওপর আদেখলা পিরীত-টাই তো যত ঝামেলা করে। নইলে টাকা হাওলাত নেবার সময় বিনয়ের বন্যা। তার-পর? তারপর সব গণ্ডগোল। নিজের জন্যে খরচে তার আপত্তি নেই। কিন্তু ধার-শোধের বেলা? সেই গণ্ডগোল।

এই ব্যাপারে ছোটেলাল তার নিজস্ব একটা মতামত তৈরী করেছে। জন্মাবার সময় এই পৃথিবীতে কেউ টাকা হাতে করে আসে না। ওপরবালার চালাচালিতে কেউ বড়লোকের ঘরে আসে। কেউবা তার মত আস্তাকুঁড়ে। টাকা ভোগ করার অধিকার সবারই আছে। যে যত সুযোগ মত লুটে পুটে নেয় সেই তত ভোগ করে। তাহলে সেই বা লুটবে না কেন। সেই বা ওড়াবে না কেন? এই যে বদ্রীপ্রসাদ টাকা হাওলাত দেয়? সে কি তার নিজের টাকা? জন্মাবার সময় সে কি ওপর থেকে টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল? কায়দা টায়দা করে কিছু টাকা ওর হাতে এসে গেছে। সেও কায়দা টায়দা করে সেটাকে হজম করেছে। ফেরৎ দেবার প্রশ্ন আসে কোথেকে? কার টাকা? ফেরৎই বা দেবে কাকে? না শালাকে আর একদিন চোট দিতেই হবে।

বাচচলে। এ যে মেছোহাটার ভীড়। খোলা গুড়ের নাগরির ওপর মাছির মত ভ্যানভ্যান করছে সবাই। এ শালার শুঁড়ি-খানায় সব ভাল। কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় পাছা ঠেকানোর উপায় নেই। সস্তা সিগারেটের ধোঁয়া আর দিশি মালের জাল-পাকানো গন্ধ। যতক্ষণ না পেটে পড়ে ততক্ষণ নরককুণ্ড। মনে হয় মাইরী এর থেকে ভদ্রলোকের আস্তাকুঁড়ে অনেক ভাল।

আরে ছ্যাছ্যা, ভদ্দরলোক আবার কে? সব শালা—। মনে মনে একটা জুৎসই

খেউড় আওড়ালো সে। ভদ্দরলোক? কোথায় র‍্যা? সারা মুলুক খুঁজলে একটা ভদ্দরলোক পাওয়া যাবে? সব ব্যাটা ওপরেই সাধু। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সার্কাসের সেই শয়তানের মুখোসপরা লোকটার মত। সে লোকটা শয়তানের মুখোস পরেছিল। আর এরা সব সাধুর মুখোস পরা আসলি শয়তান। লুঠেরা। এই, একটু আগে যে ছোঁড়া দুটোকে সে জবাই করল, দেখে মনে হয় ভাজা-মাছ উল্টে খেতে জানে না। কাম বলে কোন ইচছে মানুষকে ঘেয়ো কুত্তার মত তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ঐ দুটো শেয়ালের বাচচাকে দেখে ত মনেই হয় না। দিনের আলোর সব জেন্টেলম্যান। ছো।

ছোটেলাল জায়গার খোঁজ করতে থাকে। না কোথাও কোন খালি নেই। মদ খেতে গেলে একটু জায়গা নিয়ে বসতে হয়। ভাগাড়ে কুত্তার মত গুঁতোগুঁতি করে মাল খাওয়া যায় না। মাল ত শালা মেজাজের জন্যেই খাওয়া। আর মেজাজ করতে গিয়ে যদি মেজাজটাই যায় টুকরো হয়ে তবে আর পয়সা খরচ করে কি লাভ?

অন্য কোথাও যাওয়া যায় কিনা ভাবতে থাকে। বিলিতী মাল খেলেও হত। হুইস্কি বা ঐ জাতীয় কিছু। কিন্তু সে তো অনেক টাকার হ্যাপা। একদিনেই মাল সব ফুটকড়াই হয়ে যাবে। হঠাৎ সুধার কথা মনে পড়ল। সুধা। সুধারাণী। কে জানে সে এখন কোথায়? হয়ত এখনও দাঁড়িয়ে আছে মেট্রোর উল্টো ফুটে গাছতলায়। ওখানে গেলেও হত। কিন্তু এরকম মেজাজের রঙীন হাতছানি ছেড়ে— আঃ বাঁচা গেল, দুটো উঠেছে। হারামজাদারা গিলেছে গলা পর্যন্ত। দুটোর কোনটাই টাল রাখতে পারছে না। ছোটেলাল তাড়াতাড়ি একজনকে ডিঙিয়ে খালি জায়গাটা দখল করে নিল। লোকটা বিরক্ত হয়ে তার দিকে লাল চোখে তাকাল। ছোটেলাল মুখে কিছু না বলে মনে মনে ভাবল, 'যা বে যা। বিরক্ত হলিতো, ভারী বয়েই গেল। কে যেন তোর বিরক্তির ধার ধারে।

একটু পরেই বয় এসে হাজির হল। আঃ এই বয় নামক আজ্ঞাবহ ভৃত্যদের ভাব বেশ ভাল লাগে। পায়ের ওপর পা তুলে মেজাজে মদের অর্ডার দিতে দিতে নিজেকে তার সেই বাদশা বাদশা মনে হয়। তারপর নেশা যখন চড়চড়ে হয়ে ওঠে, যখন মাথার ওপর চল্লিশ ওয়াটের বালবগুলো স্বপ্নের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে থাকে, তখন মনে হয় ব্লু হোটেলের সোফায় বসে পাশে সখী নিয়ে নেশা করছে। দিশি তখন থাকে না, দস্তুরমত দামী হুইস্কি হয়ে যায়। আসলে নেশা একবার জমে উঠলে দিশি বিলিতী সব সমান।

—কি দোব? যেন পাশ থেকে কেউ কানপাটিতে চাপড় কষাল।

মুখটা খারাপ করতে গিয়েও থেমে গেল ছোটেলাল। মদের অর্ডার নিচছে না দাগী আসামীর সঙ্গে দারোগাবাবুর মত তড়পাচছে বোঝা গেল না। শরাফতের আশপাশ দিয়ে হাটে না। শরীরের আর গলায় কোন ভদ্রতার চিহ্নমাত্র নেই। ভ্রূ দুটো সর্বদাই তীরের ডগা হয়ে আছে। কোথায় সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াবে। চেয়ারখানা ঠিকমত এগিয়ে দিয়ে মেনু কার্ডটা এগিয়ে দেবে। সসব্যস্তে সেলাম ঠুকে অপেক্ষা করবে প্রত্যাশিত হুকুমের, তা নয়, সব সময় একটা রুক্ষ তিরিক্ষে মেজাজ। ব্লাড হাউণ্ডের মত শয়তানী আর হিংস্র মুখ নিয়ে খেঁকুরে গলায় হাঁক দেবে 'কি দোব।'

আরে শালা আছে তো তোর ঐ নম্বরী কটা মাল। তাতেই এই। এই জন্যেই ত এই উজবুকগুলো কোন ভাল হোটেলে চান্স পায় না।

—কি দোব বলবেন ত মশাই।'

আবার এক ধমকানি। হ্যাঁ ধমকানি ছাড়া আর কিই বা বলা যায়! যতই হোক ছোটেলাল এখন খদ্দের। খদ্দের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর সঙ্গে কেউ এমন ছোটলোকের মত ব্যবহার করে। এই ত খানিক আগেই। সে তার খদ্দেরের সঙ্গে কত মিষ্টি ব্যবহার করল। অবশ্য ছোটেলাল এটা বেশ ভালো করেই জানে যে শালার ব্যাপারী যত বেশী মুখে মিছরির ছুরি শানায় সে শালাই ঠকায় তত বেশী। ছোটেলাল এটা গ্যারান্টি দিতে পারে। ছোকরা দুটো এতক্ষণে হাড়ে হাড়ে টের পাচছে কি পরিমাণ ঠকেছে তারা—

'আরে মোশায়, কি দেয়লা করছেন— বলবেন ত কি নেবেন?

'এক নম্বর। কড়া। সোডা লাগবে। আদা ছোলা দেবে ত? চানাচুর?

'আলাদা পয়সা লাগবে। সব মিল যাবে। এখন রুপেয়া ছাড়ুন।

এই এক ব্যাপার। আগে পয়সা তারপর মাল। তুমি শালা ভরপেট খেয়ে নেশা চাগাড় দিলে বলবে পয়সা নেই ত? সেটি চলবে না। হরের মার খোঁজটা আগে থেকে নিয়ে রাখাই ভাল।

আন্দাজ মত পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট তুলে আনল। টাকাটা নিয়ে চলে গেল লোকটা। ওর চলে যাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ছোটেলাল। হাঁটার ধরন দেখেই মনে হয় ভীষণ বিরক্ত এরা দুনিয়ার ওপর। সব কিছুতেই বিতৃষ্ণা। বাবুদের মেজাজে রঙীন নেশার ফুলঝুরি জ্বালাতে জ্বালাতে সব সলতে শেষ হয়ে গেছে। নিজেদের বরাতে কেবল সলতে পোড়া গন্ধটুকুই সার। শালা গন্ধে কি আর পেট ভরে? তায় দিশী মদের গন্ধ। নেশা করার আগে, এমনকি চুমুক দেবার সময়ও কি অসীম বিরক্তি। স্বাদ আর গন্ধ দুটোই তীব্র আর কটু। মেজাজের রংচঙে ফুলঝুরি ছাড়া মদে আর কোন আকর্ষণই নেই। এটা ছোটেলালের বিশ্বাস।

আগের মতই কায়দা করে আর একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচিসটা অবহেলায় ফেলে রাখল টেবিলের ওপর। ইতিমধ্যে লোকটা বোতল, ছোলা সেদ্ধ আর আদা রেখে গেছে। সোডা আর চানাচুর আনতে গেছে। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে গ্লাসে পানীয় ভরতে থাকে। খানিকটা শিককাবাব আনাতে পারলে হত। সেই বাদশা বাদশা মেজাজটা ধীরে ধীরে তার রক্তের মধ্যে ফিরে আসছে। একটা ব্যাপার সে প্রায়ই লক্ষ্য করেছে দু-এক পাত্র পেটে পড়লেই মগজে বাদশাহী খচরামিটা চেপে বসে। যাকে তাকে যেমন খুশী হুকুমদারী করতে ভালো লাগে, এস এন ব্যানার্জি রোডের মুখে নতুন একটা রোল আর শিককাবাবের দোকান খুলেছে। লোকটা ফিরে এলে ওকে দিয়ে আনাতে হবে। বাদশাও একদিন কা বাদশা। যব পিয়েগা দিল ভর পিয়েগা, কিন্তু লোকটা এখনও আসছে না কেন। নৈবেদ্য সাজিয়ে বসে থাকা যায়? খানিকটা র' একচুমুক টেনে নিল। গাটা শিরশির করে উঠল। বিরক্তিতে মুখে বেশ কয়েকটা অবাঞ্ছিত দাগ দেখা দিল। গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল এ্যাঃ। কয়েকটা আদার কুচি মুখে নিল সে।

ওপাশে কারা যেন হট্টগোল তুলেছে। বোধহয় মেজাজ ঠেলে ঠেলে উঠছে। তোল বাবা যত পারিস তোল। আমারও সোডা এসে গেছে। এস বাবা নদের চাঁদ। মাপ মত খানিকটা সোডা মিশিয়ে নিয়ে গ্লাসে। লোকটা চলে যাচছিল। আর একটা দশ টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে কিছু শিককাবাবের অর্ডার দিল। বাদশা। একদিন কা। 'পীতা নেহি ত ঠিক হ্যায়। লেকিন যব পিয়েগা ত দমভর পিয়েগা।' কথাগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ছোটেলাল। এমনিতে যা রোজগার তাতে নেশা করার ইচছে থাকলেও করা হয়ে ওঠে না। কিন্তু যখন সুযোগ আসে তখন সব আনুষঙ্গিক উপাচার নিয়ে মেজাজ করে খেতে চায় সে।

চানাচুর আর শিককাবাব এসে গেল। খুচরো রেখে দিয়ে চলে যাচছিল। লোকটাকে ডেকে গোটা একটা টাকা ওকে বকশিস করে দিল। অনেকদিনের ভুলে যাওয়া অভ্যেসটা ফিরিয়ে এনে লোকটা একটা সেলাম ঠুকে চলে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে একটু মিচকি মেরে হাসল ছোটেলাল। এসব জায়গায় সাধারণত কেউ বকশিশ করে না। করলেও কালে ভদ্রে।

গ্ল্যাসে চুমুক দিতে দিতে ছোটেলাল ভাবে শালা পয়সা এ্যায়সাই চীজ। থাকলে তোমায় সবাই কদর দেবে। নইলে কুত্তা। প্রথমে ত লোকটা তাকে কোন পাত্তাই দিচছিল না যেই শালা মলম পড়েছে, ঠোক সেলাম। এ শালার দুনিয়ায় টাকাই সব। আর সব ফক্কা।

ওদিকে একদলের বচসা তখন প্রায় হাতাহাতির পর্যায় গিয়ে পেঁাছেছে। অন্যদল সেটা থামাতে ব্যস্ত। আসলে হচেছ

না কিছুই। কেবল চেঁচামেচি আর গণ্ডগোল ছাড়া। ছোটেলাল মজা দেখে। ও এই সব ঝুট-ঝামেলায় থাকতে ভালবাসে না। তবে মনে মনে বেশ খানিকটা আনন্দ উপভোগ করে।

—চালা, চালা চালিয়ে যা। মদ খেয়ে যদি না বেসামাল হলি তবে কি মদ খাওয়া। আসলে বেসামাল হবার জন্যেই ত এত খরচাখরচি। এত তরিবৎ নইলে গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে কিছুটা বিস্বাদ জলীয় পদার্থ গিলে বুক জ্বালায় লাভ কি? খেতে খেতে ধীরে ধীরে মেজাজ যাবে চড়ে। শরীরের মধ্যে একটা ঘুমিয়ে থাকা দস্যু আস্তে আস্তে জেগে উঠবে। যখন খেয়াল হবে দেখা যাবে দস্যুটা চারদিক তছনছ করা শুরু করে দিয়েছে। নরকে সে তখন আর এক নারকীয় দানব। সিগারেটের ধোঁয়া, মদের কটু গন্ধ আর দানবদের হৈ-হল্লার নরক গুলজার। আর এই গুলজারের মধ্যে তার নিজের নেশাটা যখন ধীরে ধীরে মাথার মধ্যে দানবীয় কাজ শুরু করে তখন কি ভালোই না লাগে।

লাগা, লাগা, থামাস না। অজান্তেই ছোটেলাল চীৎকার করে ওঠে 'ইয়া হো'।

হুল্লোড়ে মাতালের একতা প্রশংসনীয়। ছোটেলালকে সোচ্চারে সমর্থ জানায় ওপাশের আর এক মদাসক্ত তরুণ। সেই চীৎকারে তাল দিয়ে আর একজন। সে এতক্ষণ গুন গুন করে গাইছিল। এইবার সুর তুলে আনল সপ্তমে। বেসামাল, সন্দেহ নেই। কিন্তু ছোকরা গায় ভালই। ছোটেলাল যখনই এখানে এসেছে তখনই ওর গান শুনেছে। আজ ধরেছে একটা উর্দু গজল। 'আসফ আঁখো সে রোয়া, ঔর জীগর জ্বল রাহা হ্যায়। কেয়া কেয়ামৎ হ্যায় কি বরসাত মে খড় জ্বল রহা হ্যায়। চোখের জলে ভেসে গিয়েও হৃদয় জ্বলছে। বড় আশ্চর্যের বর্ষার মধ্যেও খড় পুড়ছে সমানে।

কে জানে, ছোটেলাল ভাবে, ছোকরা হয়ত কোথাও চোট খেয়েছে। কোন লেড়কী হয়ত পীরিতের ডাণ্ডা ঝেড়ে কেটে পড়েছে। আর বেচারা এখন মদের নদীতে স্নান করেও ঠাণ্ডা করতে পারছে না।

এই জিনিসটা ছোটেলালের একদম আসে না। মেয়েছেলে, মেয়েছেলেই। অত পীরিতের কি আছে? আর তার জন্যে জান বরবাদ করারও কোন মানে খুঁজে পায় না সে। অনেক নারকীয় রাত কাটিয়েছে ছোটেলাল ঐ সব দিলকারাণীদের সঙ্গে। শোভা, চামেলি, মায়া। ছোটেলাল রংবাজ। মাস্তান। তাকে হাতে রাখতে হবে বৈকি। আর সেই জন্যে যদি দু-এক রাত তাকে বিনি পয়সায় স্ফূর্তি দিতে হয় তা নয় মেয়েরা দেবে। এটা ভেট। নজরানা। সাদা বাংলায় যাকে বলে ঘুষ। ঘুষ ছাড়া আবার কোন কাজ হয় নাকি? ভাল দালাল হাতে থাকলে সব দিক থেকেই সুবিধার। আর এই সুবিধাটুকুর জন্যেই যে যার ফিকির খুঁজছে। দুনিয়া ভর তামাম আদমী সেফ ফিকির খুঁজছে। ছোটেলালও খুঁজছে। সন্ধ্যেবেলা যে দুটো পাঠাকে সে বধ করল, তারাও খুঁজছে। শোভা, চামেলি, মায়া, ওরাও খুঁজছে। সব শালা' ধান্দাবাজ। ফিকিরবাজ। ছোটেলালও সুযোগ নিতে পিছিয়ে যায় না।

পঁচিশ বছরের ছোটেলাল। রাতগুলোকে আর একা একা পার করাতে পারে না। এক-একটা রাত তার কাছে ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মত মনে হয়। মানুষের জীবনে স্বপ্নের মত মধুর রাত তার কাছে বিভীষিকা। অসম্ভব নির্জনতা তাকে গ্রাস করে অজগরের মত বিরাট হাঁ মেলে। বিছানায় সাহারার শূন্যতা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ে শোভা চামেলি আর মায়াদের কথা। যৌবনে মেয়েছেলে দেহের রক্তের মত। থাকলে সব ঠিক আছে। নইলে এ্যানিমিয়া।

কিন্তু শোভা চামেলি আর মায়াদের কিই বা দেবার আছে? ভাঙ্গা পরিত্যক্ত বাড়িতে অসহায় মুহূর্তে কোন রকমে রাত কাটানো যেতে পারে। কিন্তু চিরস্থায়ী বসবাস করা যায় না। ওরাও ঠিক সেই রকম। ক্ষণিক তৃপ্তি হয়ত আসে। আসে না অন্যতর প্রশান্তি। তার চাওয়া-পাওয়ার তুলনায় ওদের দেওয়া, কৃপণের অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই না।

গ্লাসের তলানিটুকু শেষ করে ছোটেলাল আবার গ্লাস ভর্তি করে নেয়। বেশ্যার সান্নিধ্য? সেই অক্ষমতার গ্লানি। জীর্ণ দেহ। বিবর্ণ অনুভূতি। বুদবুদের মত উত্তেজনা ক্ষণিক পরেই ছুড়ে ফেলে দেয় প্রেমহীন অবসাদে। আর এর জন্যেই শুয়ে শুয়ে লক্ষ্মীকে নিঃশেষ করছে বড়লোকের কুত্তাগুলো। শেষ করছে জীবনের পরম আশ্চর্য যৌবনকে। টাকার যেন কোন দামই নেই এদের কাছে। ওস্তাদেব কথা আবার মনে পড়ল। ওস্তাদ মরার সময় বারবার বলেছেন, ছোটে মেয়েদের কাছে যাস না। দগদগে ঘা ছাড়া ওদের আর কিছুই দেবার নেই।

পরণের কাপড় সরিয়ে ঘা দেখিয়েছিল ওস্তাদ। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল। সেই ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েই ওস্তাদ কুঁকড়ে মরেছিল।

গ্লাসটা ফের মুখের কাছে তুলে নিল। কানটা চলে গেল অন্য দিকে।

'আসফ আঁখো সে রোয়া, ঔর জীগর জ্বল রহা হ্যায়...' ছোঁড়াটা যেন কাঁদছে। হঠাৎ ছোটেলালের ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে ওর পাছায় একটা কষে লাথি ঝাড়তে। শালা বসে বসে মাল খাচ্ছে না, কাঁদুনী গাইছে। ন্যাকা কাঁহিকা।

মাথাটা ক্রমশ খুলে আসছে ছোটেলালের। ভারী ভারী লাগছে। আর একটা সিগারেট বার করল। ধরাবার আগে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ওর হাসি পেল। সিগারেট কোম্পানীগুলো আজকাল নতুন কায়দা শিখেছে। প্যাকেটের গায়ে লিখে দিচ্ছে। সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। এ ঘুষখোর দারোগার মত ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে। গেরস্থকে সাবধান করে চোরকে বলছে চুরি করতে। দুপক্ষ থেকেই ঘুষ নেবার ধান্দা। সরকারের আইনও বজায় রাখছে আবার ফলাও বিজ্ঞাপনে বেশী করে সিগারেট খাবার পরামর্শ দিচ্ছে। ছোটেলালের ভাষায় এটাও সেই ফেরেববাজী। সিগারেট কোম্পানীগুলো বেশ ভালো করেই জানে এই সব সাবধানী হুমকিতে লোকের কিছু এসে যাবে না। যে যতগুলো আগে খেত ততগুলোই খাবে। বিশেষ করে মদের মুখে। নেশা জমলেই ঘন ঘন সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। তখন আর সাবধানের সাত কাহন কারো মগজে থাকে না। এই সে নিজেই। এরি মধ্যে অর্ধেকের বেশী সিগারেট শেষ করে দিয়েছে।

চুলোয় যাক তোর স্বাস্থ্য। কি হতে পারে? বড়জোর ক্যানসার মানে মরা সে বাঁচলেই বা কার কি এসে যায় আর মরলেই বা কে কাঁদবে, বুড়ি শিউলীবালা বেঁচে থাকলে হয়ত দু-এক ফোঁটা চোখের জল ফেলত। এখন ত সে সব চুকেবুকে গেছে। সিগারেটটা ধরিয়ে বেশ একটা জম্পেস টান মেরে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

হ্যাঁ কি যেন সে ভাবছিল। দূর শালা ভাবনাগুলো কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ফিকিরবাজের কথাই সে ভাবছিল। সব ব্যাটাছেলেই ফিকিরবাজ। ঐ যে ডানদিকে একেবারে শেষ বরাবর তিনটে ছোকরা সমানে চেঁচিয়ে মনের ঝাল মেটাচ্ছে। সাদা মাথায়, সাদা চোখে ইচ্ছে থাকলেও যা বলতে পারে না, এখন নেশার আড়ালে বেমালুম সব হাল্কা করছে। এও এক ধরনের ফিকিরবাজী। মহব্বতে ঝাড় খেয়ে ঐ যে ছোকরা প্রাণ খুলে শের কা গজল শোনাচ্ছে এও ফিকিরাজী। আসলে শালা মনের যন্ত্রণা হাল্কা করছে। যন্ত্রণা পেতে পেতে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। এখন নেশার দরজায় কপাল ঠুকে যন্ত্রণায় শান্তি-জল দিচ্ছে মদ খেয়ে। আসলে ও শালা আর পেরে উঠছে না। বেহুঁশ হতে চাইছে? অতই যদি পীরিতের জন্যে দিওয়ানা হলি তবে মদ খেয়ে ভুলতে চাস কেন? কর, সহ্য কর যন্ত্রণাকে। এই যে ছোটেলাল, মদ খেতে এসেছে, সে বাবা কোন যন্ত্রণায় তাপ্পি দিতে নয়। স্রেফ নেশার মেজাজ নিতে। সত্যি বলতে কি ছোটেলালের কোন যন্ত্রণা নেই। ওসব বগরগে দিল্লীগী নিয়ে মাথাও ঘামায় না সে। কেবল গলায় কাঁটার মত রাতগুলো মাঝে মাঝে খচখচ করে। শোভা চামেলী মায়াদের কাছেও যেতে ইচ্ছে করে না। প্রবিত্তিও হয় না।

প্রবিত্তিগুলো কি আজকাল ভদ্দরলোক হয়ে গেল। নিকুচি করেছে তোর প্রবিত্তির। দরকার নেই বাওয়া ভদ্দরলোক হয়ে। মাঝে মাঝে এরকম দু-একটা পাঠা জবাই করতে

পারলেই ব্যস নিশ্চিন্ত। স্রেফ পায়ের ওপর পা তুলে মাল চালিয়ে যাও। খামোকা ভদ্দরলোকের ঘোমটা টেনে কোন লাভ নেই।

—যাঃ শালা। বোতল ফাঁক। মো মেজাজ। নাথিং, বিড়বিড় করে আওড়াল সে, কি হল আজ? কলজের জোর বেড়ে গেল নাকি? নাকি পকেটে রেস্ত আছে তাই মেজাজ বলছে, আরো চাই।'

বেশ, চাই তো চাই। লে আও। বোয়...।

চীৎকারে আগের সেই লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল, 'আর কি চাই?'

মাসান্তে এক পাইট চোলাইও জোটে না। গলার আওয়াজ করেছে তৈমুরলঙের মত।

'এক বড়া বোতল লাও। এক সোডা।'

অর্ডার নিয়ে লোকটা চলে গেল। মাথাটা টিপটিপ করছে। দুপাশের রগ দুটো টিপে ধরে। নাঃ, যন্ত্রণা বলে তার কিছু নেই, সে দিব্যি আছে। সারাদিন ধরে পার্ক স্ট্রীট চষে খাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা সুবিধে হলে মারছে দাঁও। মাল খাচ্ছে আর ভাঙ্গা ঘরের দাওয়ায় চাঁদের আলোয় ঘুমোচ্ছে। শোভা চামেলী মায়ারা স্বপ্নের মধ্যে হাতছানি দিলেও সে যাচ্ছে না, ওস্তাদ বারণ করেছিল। ওস্তাদ ঘা নিয়ে মরেছে। পেনিসিলিনের পয়সা ছিল না। অথচ ওস্তাদ কামাই করত প্রচুর। মদ আর মেয়েতে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওস্তাদের মাঠের নেশাও ছিল জব্বর। ছোটেলাল ওসব করে না। এমনকি সঙ্গীরা যখন তেতাস নিয়ে বসে তখনও সে তাদের সঙ্গে থাকে না। তখন সে যায় সুধাময়ীর কাছে।

এই এক মেয়ে সুধাময়ী। ওকে ঠিক আজও চেনা গেল না। শোভা চামেলী মায়াদের দলের মেয়ে। অথচ সে শোভা চামেলী মায়া নয়। কিছু একটা আলাদা ধরনের। কি যে ঠিক সেটা ও বুঝতে পারে না।

বোয় এসে গেছে। হাতে বোতল আর সোডা। বেঁচে থাক মাইরী দোস্ত। ছোটেলালের গ্লাসটা টেনে নিয়ে নিজেই ও ভরে দেয়। ঠিক পার্ক স্ট্রীট পাড়ার বড় বারের উর্দিপরা বেয়ারাগুলোর মত। হঠাৎ ওর সমীহ করার বহর দেখে ছোটেলালের একটু অবাক লাগল। তার দু বোতল মাল খাওয়ার হিম্মৎ দেখে না, একটু আগে পুরো এক-টাকা বকশিসের দৌলতে সেটা ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। লোকটা একটু কাছে এসে মুখ নীচু করে বলল, 'কাবাব লাগবে?' পিঠটা টানটান করে ছোটেলাল সোজাসুজি তাকালো ওর দিকে। তারপর বলল, 'নাঃ থাক। শুধু আদা আর নুন দাও।'

বোয় চলে গেল। পরক্ষণেই ফিরে এল আদা আর মটরসেদ্ধ নিয়ে। হাতের উল্টো-পিঠে জায়গাটা সাফ করে ওগুলো নামিয়ে রাখল। ছোটেলাল ফের ওর দিকে তাকাল। চোখে মুখে সেই অনমনীয় ঔদ্ধত্য এখন আর নেই। বরং একটা বিনীত দুর্বলতা।

'শ শালা নেড়ী কুত্তা', মনে মনে এইরকম একটা শব্দ আউড়ে নিয়ে টেবিলে পড়ে থাকা খুচরো থেকে একটা আধুলি তর্জনীর টোকায় ওর দিকে ঠেলে দিল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে আবার একটা ছোট্ট সেলাম ঠুকে চলে গেল লোকটা।

'এসো চাঁদু, পথে এসো। বলে সেলাম ঠুকবে না। চাঁদির জুতোয় কি না হয়। ওই শালাই পরে আর চিনতে পারবে না। তা না পারুক। সেলাম ত ঠুকিয়ে নিয়েছে। ছোটেলালদের কেউ সেলাম দেয় না। সেলাম দূরের কথা। পাছায় লাথ দিতে পারলে লোকের সুখ। ছোটেলাল যে দালাল।

জম্মে ঘেন্না, কম্মে ঘেন্না। সেবার একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল পাঁচুর মা। পাঁচুর মা ঘটকালি করে। তাদের বস্তীর অনেকেরই বিয়ে হয়েছে পাঁচুর মার দৌলতে। একদিন পাঁচুর মা এসে বলেছিল, 'বিয়ে করবি ছোটে? করে ফেল। চিরকাল বাউন্ডুলে হয়ে থাকলে চলে?

ছোটেলাল প্রথমে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। বেজন্মার আবার বিয়ে। কিন্তু পরে মেয়েটাকে দেখে মেজাজ গিয়েছিল চমকে। বিধবা মায়ের পাঁচ মেয়ের বড় মেয়ে। দূরসম্পর্কের এক কাকা কোনরকমে মেয়েগুলোকে পার করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। গরীবের মেয়ে উদ্ধার করবার জন্যে না, ভাঙ্গা ঘরে হাজার ওয়াটের রোশনাই-এর মত ফুটফুটে মেয়েটাকে দেখে তার কাঙাল যৌবনটা ছট-ফটিয়ে উঠেছিল। নিজের অজান্তেই মত দিয়েছিল। কিন্তু পাত্রীর কাকা যখন জিজ্ঞাসা করল তার কামকাজের আস্তানা, ব্যাস্, তখনই বিষম খাওয়ার দশা। কি উত্তর দেবে সে? সে বিয়ে হল না। শেষকালে সেই সোন্দরপুনা মেয়েটাকে বিয়ে করল একটা দোজবরে ন্যাজেগোবরে ভোম্বল। বিয়ের পরদিন দূরে থেকে সে দেখে এসেছিল। পরে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল লোকটা একটা অফিসের বেয়ারা। আক্ষেপে হাতটা কামড়ে রক্ত বার করে দিতে ইচ্ছে করেছিল। ইচ্ছে করেছিল নিজের গলাটা প্রাণপণে টিপে প্রাণভোমরা বার করে দিতে। দালাল। দুনিয়ায় তার পরিচয় সে এক বেজন্মা। ছ্যা ছ্যা, জম্মে ঘেন্না, কম্মে ঘেন্না। হোক দোজবরে। হোক ন্যালাক্ষেপা ভোম্বল। তবু তার জম্মের ঠিক আছে, আছে কর্মের সঠিক ঠিকানা। তার হাতে বিশ্বাস করে মেয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু ছোটেলাল। রংবাজ। মালখোর। ঠকিয়ে পয়সা কামাই করে। সোজা দিনের আলোয় নয়। আঁকাবাঁকা অন্ধকারের ছিনতাই। কামাই নয়। ছিনতাই। ছিনতাই-ই তো।

এই যে এতক্ষণ পায়ের ওপর পা তুলে বসে বসে সে মাল খাচ্ছে সে কি কামাইয়ের পয়সা। সে হোল ছিনতাই-এর কেরামতি। আর এ কেরামতি দেখাতে পারবে না ঐ গোমড়ামুখো বেয়ারার বাচ্চা। কল্পনাই করতে পারবে না একবারে শুঁড়িখানায় বসে ত্রিশ টাকা খরচ করার কথা। মাস গেলে কামাই করে কত? বড় জোর তিনচারশ। শালা ভদ্দরলোক! ভদ্দরলোকেরা কামাই করে। কিন্তু গুনতিকরা কামাইয়ে মাল খাওয়া যায় না। সে ছিনতাই করে তাই সে মাল খায়।

নিঃশেষিত গ্লাসে ছোটেলাল আবার মদ ঢালে। চুমুক দিতে দিতে ভাবে, কামাই আর ছিনতাই। আসমান আর জমিন।

তবু ছোটেলালের কোন যন্ত্রণা নেই। সুধাময়ীর আছে। ওস্তাদের ছিল। ওস্তাদ যন্ত্রণা নিয়ে মরেছে। কিন্তু সে যন্ত্রণা নিয়ে মরবে না। শোভা চামেলী আর মায়াদের কোন যন্ত্রণা আছে কি? কে জানে। হয়ত আছে। সে বুঝতে পারে না। মোটামুটি খদ্দের পেলেই ওদের চলে যায়। কিন্তু সুধাময়ীর যন্ত্রণা আছে। অন্ধকারে গাছ-তলায় মেট্রোর উল্টোফুটে সে তার যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটেলাল মাথাটা চেপে ধরল। রগটা টিপটিপ করছে এখনও। সোজা তাকাবার চেষ্টা করল সে। মানুষের মুখগুলো সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আলোগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। বৃত্ত-গুলো পুকুরের জলে ঢিল ফেললে বৃহত্তর বৃত্তে যেমন ক্রমাগত বড় হতে হতে হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনি। এক থেকে দুই। দুই থেকে তিন। তিন থেকে চার। চার থেকে অসংখ্য। অসংখ্য থেকে আবার একে। বাঃ চমৎকার। বেড়ে মজার খেলা। এক থেকে অসংখ্য আবার একে ফিরে আসা। এই-ই খেলা। এই-ই নিয়ম। দুনিয়াভর এই নিয়মেই চলছে। তুমি এলে একা। ছিলে একা, একদিন সাদী করলে। হলে দুই। তারপর দুই থেকে তিন। তিন থেকে অসংখ্য। কিন্তু আবার সেই একে ফিরে যাবার খেলা। দুনিয়া ছেড়ে যখন তুমি চলে যাবে সেই একা।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মাথার ওপর চল্লিশ ওয়াটের বালবটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছোটেলাল। আলোটা যেন আর সাদা নেই। বাসীমড়ার কলজের মত রক্তহীন ফ্যাকাসে। ধোঁয়াশায় অস্পষ্ট। মেঘলা জ্যোৎস্নার মত নিষ্প্রভ।

সে ছোকরার গান থেমে গেছে। আর বোধহয় পারছে না। সেই বোঁদা উৎকট গন্ধটাও আর নেই। সেই কটু বিরক্তিকর আর গা-গুলনো গন্ধটা কখন যেন প্রাণের সঙ্গে শরীরের মধ্যে মিশে গেছে।

টেবিলের ওপর হাতটা টানটান মেলে দেয় ছোটেলাল। কে একজন এখনও সমানে একটানা ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় কথা বলে চলেছে। কি বলছে শালা নিজেই জানে না। যেন শানাইয়ের পোঁ। মেলে দেওয়া হাতের ওপর মাথাটা শুইয়ে দেয়। বোতল শেষ। বাঁ হাতের গ্লাসে রয়েছে তলানির শেষ অমৃত। চুমুক দিতে গিয়ে ছোটেলাল দেখল একটা পোকা পড়েছে। সবুজ রঙের পোকা। দেওয়ালি পোকা। শা-শালা আর পড়বার জায়গা পেল না।

কে একজন ওপাশ থেকে বলে উঠল. হামারা পয়সা, হাম পিয়েগা। তেরা বাপকা কেয়া লাগতা বে।

ছোটেলাল মাথা তুলে একবার দেখতে চাইল। পারল না। মাথায় যেন কে তিনমণি একখানা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। মরুক গে। যে যেমন খুশি চেঁচাবে। এটা ত আর ভদ্দরলোকের আস্তানা নয়। এটা শয়তানের নরকখানা। তবু মরক গুলজার করো। ছোটেলাল শুয়ে শুয়ে চেঁচাল, 'ইয়াহো।' সমস্বরে কারা যেন প্রতিধ্বনি করল 'ইয়াহো।'

সাবাস্। সব জিন্দা হ্যায়। ছোটেলালের চোখ বুজে আসছে। নেশা হয়েছে' মাইরী. এই নেশাটাই ত' আসল। দুনিয়ায় আর সব ঝুট্। কি একটা সিনেমা ও দেখেছিল। অনেকদিন আগে। ছোটেলালের এখন ঠিক নামটা মনে আসছে না। সেখানেও একটা পাগলামতন লোক সারাক্ষণ 'সব ঝুট হ্যায়' বলে চীৎকার করে মরছিল। তখন লোকটার পাগলামী দেখে ছোটেলালের হাসি পেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে পাগলাটা ঠিকই বলেছিল। সত্যিই সব ঝুট হ্যায়। তামাম দুনিয়াটাই ঝুট। সার কেবল এই নেশাটা। দিনরাত গাঁজা আর ভাঙ খেয়ে ভোলানাথ বসে থাকেন শ্মশানে। ছোটেলালের মনে হল, ভোলানাথ বহুৎ সেয়ানা আদমী। দুনিয়ার সার বোঝা হয়ে গেছে। নেশা ছাড়া আর সব ঝুট! সাবাস ভোলানাথজী। হামভি হ্যায় আপকি সাথ। সুধাময়ী ভোলানাথজীর পুজো করে। কেন করে জিজ্ঞাসা করায় সুধাময়ী খুব মিষ্টি করে হেসেছিল। আর কিছু বলেনি। সুধাময়ী! আঃ নামটা ভারি সুন্দর। মেয়েটা আরো সুন্দর ওর হাসিটার মত। কিন্তু ভীষন খারাপ লাগে যখন মনে হয় সুধাময়ী পাঁচটা বাবুর কাছে শোয়।

চোখটা বুজে আসছে ছোটেলালের। জোর করে মেলতে হয় টানটান করে। মাথাটা আগের মতই তালুর ওপর রেখে চোখ বুজিয়েই রাখে।

নাঃ, দুনিয়ায় তার কারো ওপর কোন টান নেই। কারো ওপর কোন দরদও নেই। তাই কোন যন্ত্রণাও নেই। কেবল মাঝে মাঝে সুধাময়ীর কথা মনে পড়ে। সুধাময়ীর মুখটা মনের ডগায় জলের বুকে পদ্মপাতার মত ভাসতে থাকে। তার কথা ভাবতে বেশ ভালো লাগে। সুধাময়ীর মুখটা, কোনমতেই শোভা চামেলী মায়াদের মত নয়। সেই যে সেই মেয়েটা, ভোম্বলদাস যাকে বিয়ে করল, অনেকটা তারই মত। কেমন যেন ভদ্দরলোকেদের বাড়ির মেয়েদের ছাঁচে তৈরী। অনেকটা কুমোরপাড়ার প্রতিমার মত। সুধাময়ীর কালো কালো মুখ আর বিশাল ডাগর দুটো চোখ দেখলে সেই কুমোরপাড়ার কালীঠাকুরের কথা মনে পড়ে যায়। মা কালীর মুখ যেমন হাসিকান্না ঘৃণা ভয় রাগ এইসব মিলিয়ে একটা ভক্তির ভাব ঠিক সেইরকম।

ছোটেলাল চোখ খোলার চেষ্টা করল। কি ভীষন অন্ধকার। কি কুন্ডলীপাকানো ধোঁয়ার রাশ। বহুদিন আগে এমনি এক ধোঁয়াশার অন্ধকারে সুধাময়ী তার কাছে এসেছিল। গভীর অন্ধকারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল একা। চোখে মুখে একটা নিষ্পাপ সারল্য। অথচ চেষ্টাকৃত কাছে ডাকার ছল। একটা চাতুরী ফুটিয়ে তোলার অদম্য চেষ্টা। লাইনের ছেলে ছোটেলাল প্রথমে ত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি মেয়েটা শোভা চামেলী মায়াদের দলের। সেই রোগা রোগা, শ্যামবর্ণ, মা কালীর মত মুখ, কোঁচকানো একরাশ কালো চুল আর ইয়া বড় বড় চোখ, সব মিলিয়ে সে কিছুতেই বেশ্যা নয়। ছোটেলাল এগিয়ে এসে আলাপ করেছিল। লাইনে নতুন। সবে আসছে, মুখে তাই আনকোরা সরলতা। নতুন কাপড়ের মত সোঁদা গন্ধ তার গায়ে। যে গন্ধটা মোটেও সস্তা হিমানীর নয়। সস্তা হিমানী আর কম দামের লিপস্টিক এখনও মাখতে পারে না সুধাময়ী। ঠোঁটে রঙ মাখতে তার বড় লজ্জা। বলে এই কেলে চেহারায় ঠোঁটে রঙ মাখলে টিকের গাদায় আগুন লাগবে। ঢং করে ছলের কথা বলতেও পারে না। রসের কথা দু একটা চেষ্টা করে বলতে। কিন্তু দু-চারটের পর যে কথাগুলো বেরুতে থাকে পূববাংলার মেঠো গাঁয়ের গন্ধ ছাড়ে। খদ্দের পালায়। মাঝে মধ্যে ছোটেলাল কিছু খদ্দের ধরে দেয়। সুধাময়ী প্রথম প্রথম কৃতজ্ঞ হত। যেদিন আর খদ্দের জুটত না সেদিন সে ছোটেলালের কাছে আসত। গল্প করত। বেড়াত। কথা বলত তার নিজের কথা। তার দেশের কথা। তার খেতে না পাওয়া চিরকেলে গরীব সংসারের কথা। কথাগুলো মামুলী। পুরনো। তবু কেন জানি ছোটেলালের সেইসব গল্প শুনতে ভাল লাগত। তার ভাবতে ভাল লাগত অন্তত কেউ একজন তাকে বিশ্বাস করে তার মনের কথা বলতে পারে। লাজুক আটপৌরে গেঁয়ো মেয়ের মত। অনেকটা শান্তির মায়ের মত। শান্তির মা। তাদের বস্তীতে থাকে। সুপুরী কেটে আর বাসন মেজে সংসার চালায়। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা করায়। শুধু তাই নয় শান্তিকে স্কুলেও পড়ায়। শান্তির মাকে দেখে মাঝে মাঝে তার মনে হয় এমন যদি তার কেউ একজন খুব কাছের মানুষ থাকত। জীবনটা হয়ত বদলে যেতেও পারত।

সুধাময়ী কাছে থাকলে তার বারবার শান্তির মার কথা মনে পড়ে। মনে হয় তার এই জ্বালাধরা জীবনে কে যেন চন্দন মাখিয়ে দিচ্ছে। কখন আর কেমন করে যেন সুধাময়ী তার অনেক কাছে চলে এসেছিল। কখন যেন সুধাময়ী তার সুখদুঃখের কথা বলতে শুরু করেছিল। কে জানে, ছোটেলালের মনে হয়, সুধাময়ী হয়ত তাকে পেয়ার করে। হয়ত বা কিছু খোয়াব দেখে। আর ঠিক তখনই প্রচন্ড রাগে নিজের গায়ে পিচকেটে থুতু দিতে ইচ্ছে করে। শু-শালা আর পেয়ার করার লোক পেল না সুধাময়ী। জন্মে ঘেন্না, কম্মে ঘেন্না। একদিন ত' আউটরামের ধারে ফুরফুরে হাওয়ায় জাহাজের ভেঁপু শুনতে শুনতে যখন তারা আনমনে হাঁটছিল, সেই সময় সুধাময়ী বলেছিল, 'চল ছোটে, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এই শহর ছেড়ে অনেকদূরে কোথাও। এসব আমার একদম ভালো লাগে না।

মাঠ কাঁপিয়ে সেদিন ছোটেলাল হোহো করে হেসেছিল, বলেছিল পালিয়ে যাবি কোথায়? খাবি কি? জাত ব্যবসা মাটি হবে না?'

সেই প্রথম সুধাময়ী রেগেছিল। সেই একদিনই। মা কালীর চোখে সেই যে রাগটা থাকে সেইটা সেদিন ফুটে বেরিয়েছিল তারপর বলেছিল, 'তুই ত' আমার সবকিছু জানিস। এ কি আমার জাতব্যবসা? সব

জেনেও তুই আমায় ঘেন্না করবি।

ছোটেলাল হেসেছিল আর এক প্রস্থ। ঘেন্না? বলে তার নিজের ওপর নিজেরই ঘেন্না। শালা জন্মে ঘেন্না কম্মে ঘেন্না।

—আরে না না। ঘেন্না তোকে নয়। আমাকে। পালিয়ে যাবি কোথায়?

যেখানে খুশী। তুই একটা চাকরী করবি। তারপর আমরা বিয়ে করব। একটা সংসার হবে।

—আর তোর বাপ-মা?

—তোর নিজের বাপ-মাকে ফেলে দিতে পারতিস?

না। ছোটেলাল তা হয়ত পারবে না। সুধাময়ীর বাবা-মাকে দেখতে তার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, বিয়ে? সাদি? সংসার? ছোঃ! সুধাময়ীর মত একটা সুন্দর মনের মেয়েকে—?

সেদিন সুধাময়ীকে সে ফিরিয়ে দিয়েছিল, 'সেসব কথা নারে সুধাময়ী! কিন্তু তুই আমাকে বিয়ে করবি কোন হিসেবে। আমার কামকাজের কোন সঠিক আস্তানা নেই। তারচেয়ে বরং কোন মালদার বাবু পাকড়ে দিই। তার কাছে আস্তানা গাড়। তোর যা চেহারা, কালো হলেও একটু সুখের ভাতে থাকলে তোর দিকে তাকানোই যাবে না।

কিন্তু সেসব কথায় সুধাময়ী ভোলেনি। রাগ করেছে। কেঁদেছে। তবু স্বপ্ন দেখেছে ঘর বাঁধার।

—বল তুই আমায় ভালবাসিস না?

—মহব্বৎ?

ভিকটোরিয়ার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছোটেলাল তার প্রাণ কাঁপানো হাসিটা আবার ছুড়ে দিয়েছিল আকাশে। মহব্বৎ। মেয়ে জাতটাকেই সে বিশ্বাস করে না। শিশুর কাছে নারীর প্রথম অনুভূতি যে মা, সেই মা-ই তার সঙ্গে করেছে প্রথম বেইমানী। মাই যদি বেইমান হয় তাহলে আর কোন মেয়েকে সে বিশ্বাস করতে পারে! নাড়ি ছেঁড়া নিজের অসহায় সন্তানকে যারা জন্মের পর আস্তাকুঁড়ে ফেলে পালায় তাদের কেমন করে সে বিশ্বাস করবে? তাই সুধাময়ীর এই সব মহব্বতের কথায় তার দিল বিগড়োয়নি। ধমকে সে সুধাময়ীকে হাঁকিয়ে দিয়েছিল, যা ভাগ। আর কোনদিন সাদীর কথা বললে এক থাপ্পড় লাগাবো।

আর কোনদিন সুধাময়ী সাদীর কথা বলেনি। তবে ছোটেলাল জানে সুধাময়ী তাকে ভালবাসে। সে তাকে ঘিরে বাঁচতে চায়। সে চায় ছোটেলাল দালালী ছেড়ে ভালো কামের জোগাড় করে। সেই পুরনো কথা। কামাই। ছিনতাই নয়। কিন্তু দালালী ছেড়ে সে কি করবে? আর কোন কাজ তার জানা নেই। একজন বলেছিল অফিসে দারোয়ানের কাজ জোগাড় করে দেবে। কিন্তু সে ব্যাটাও বেপাত্তা। অবশ্য চেষ্টা করলে—

ছোটেলাল চোখ মেলতে চায়। পারে না। আবার চেষ্টা করে। এখনও সেই নিকষ অন্ধকার আর কালো ধোঁয়ার রাশ। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল ধোঁয়ার বুকে অন্ধকারটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠছে আর নামছে। ভাসছে আর দুলছে। উঃ এত অন্ধকার কোথায় ছিল? তবে কি দুনিয়াটা অন্ধকারে তলিয়ে গেল?

সব ঝুট হ্যায়। সব ঝুট। স্রেফ ধোঁয়াই সার। ভোলানাথজী ধোঁয়ায় আটকে গেছে। ছোটেলালও ধোঁয়ায় আটকে গেছে। সেই অন্ধকারের বুকে, হ্যাঁ ছোটেলাল স্পষ্ট দেখে চাপ চাপ ধোঁয়ার কুন্ডলীতে একটা যেন সবুজ চোখ। পান্নার মত সবুজ চোখ। তার চারপাশে নীল আর গোলাপী বৃত্ত। বৃত্তটা এমন ঘুরছে। ঘুরছে আর বড় হচ্ছে। বড়. আরো বড় আরো আরো। যেন সমস্ত দুনিয়াটাকে গ্রাস করবে। নীল বৃত্ত গোলাপীতে মিশছে, গোলাপী নীলে। নীল আর গোলাপী হারিয়ে যাচ্ছে বেগুনীর গোলকধাঁধায়।

কেন্দ্রবিন্দুর কিন্তু সেই সবুজ চোখটা? যেন নড়ছে। হেলে দুলে উঠছে যেন। ধীরে ধীরে বড়ও হচ্ছে। আরো, আরো বিশাল। আরে হ্যাঁ সেই পোকাটাইতো? সেই ছোচ সবুজ দেওয়ালী পোকাটা। মদের গ্লাস থেকে কখন যেন উঠে এসেছে। তারপর অন্ধকারের ধোঁয়াশায় ক্রমশ বাড়ছে। আশপাশে নীল, গোলাপী আর বেগুনী বৃত্তগুলো নিয়ে কেবল বাড়ছে আর বাড়ছে। কি চায় ও পোকাটার একজোড়া ভাটার মত লাল চোখ জ্বলছে? তারই দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, পোকাটা কখন যেন তারই দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

এবার ছোটেলাল ঘেমে ওঠে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় পোকাটা ওর হাঁ মুখটা খুলছে। মেলে ধরছে আস্তে আস্তে। মুখের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। হাল্কা সবুজ সিনথেটিক জেলির মত। পাটপাট সাজানো মখমলের পরাতের মত সবুজ রঙের মুখ গহ্বরের দেয়ালটা পাক খেতে খেতে হারিয়ে গেছে। কেন্দ্র গভীরে। বোধহয় ওটাই ওর অন্তবর্তী পথ। সবিস্ময়ে ছোটেলাল দেখল পোকাটা আর পোকা নেই। কখন যেন সেটা দৈত্যের মত হয়ে গেছে। এবং সেই দৈত্যটা তারই দিকে ছুটে আসছে। তেড়ে আসছে সবেগে। ছোটেলাল পালাতে চেষ্টা করল। প্রাণপণে বিপরীত অন্ধকারে সে ছুটতে শুরু করল। দৈত্যাকৃতি পোকাটাও ক্রমশ তার পেছনে ধাওয়া করে আসছে। ছোটেলাল ছুটছে। জোরে। আরো জোরে। তার মনে হল সে যেন আর পারবে না। দৈত্যটা এক্ষুনি তাকে ধরে ফেলবে। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর ছোটেলাল নিশ্চিত সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হবে। দৈত্য পোকার নাগালে এসে। কিন্তু সে থামবে না। ধরা দেবে না। যন্ত্রণা তাকে ধরতে আসছে। তাকে গিলতে চাইছে। ধরা পড়তে পড়তেও সে ছুটছে। পিছনে বিরাটাকার চার জোড়া পা। পারবে কেন ছোট্ট ছোটেলাল। ধরা পড়ে গেছে সে। ওপর দিকে চোখ তুলে শিউরে উঠল। আট পায়ের একটার বিরাট থাবাটা সজোরে নেমে আসছে তার মাথা লক্ষ্য করে। নির্ঘাৎ মৃত্যু। তবু জীবনের শেষ শক্তি দিয়ে বাঁচতে হবে তাকে। তার শেষ এবং সর্বশক্তি নিঃশেষ করে মরিয়া লাফে থাবাটা এড়িয়ে ছুটে গেল আরো এক নিষ্ঠুর অন্ধকারে। শিকার ফস্কে পোকাটা বিপুল আক্রোশে তেড়ে আসছে। নাঃ তাকে বাঁচতেই হবে। ছোটেলাল থামছে না। ছুটছে আর ছুটছে। এবং সেই গভীর অন্ধকারে ছোটেলাল সবিস্ময়ে দেখল সামনে থেকে কে যেন এক জোড়া হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কালীমায়ের কালো কালো হাত। পিছনে দৈত্য পোকা, সামনে প্রসারিত বরাভয়। হাত দুটো ক্রমশই এগিয়ে এসে কোলে তুলে নিতে চাইছে তাকে। আর একটু পরে, ছোটেলাল পরম নিশ্চিন্তে উপলব্ধি করল শান্ত দুখানা কোমল হাতের চন্দন স্পর্শে তাকে তুলে নিয়েছে প্রশান্তির কোলে। ছোট্ট শিশুর মত। মা যেমন। কি শান্তি! পিছনের যন্ত্রণাটা আর নেই।

—সাহাব গ্যারাবাজ গয়ি। অভি বন্ধ হোগা।

ধীরে ধীরে মাথাটা তোলে ছোটেলাল। সব ফাঁকা। কেউ নেই। সিগারেটের খালি প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে ছোটেলাল বেরিয়ে আসে বাইরে। পাটা টলছে। [illegible] সোজা রাখার ক্ষমতা নেই। পাশের সিগারেটের দোকান থেকে এক প্যাকেট চারমিনার কিনল এবার। বাঁ-পাশে ধর্মতলা। সোজা হাঁটতে থাকে ময়দানের দিকে। সুধাময়ী তাকে ঘিরে বাঁচতে চায়। সুধাময়ী একটা সংসার চায়। চায় ছোট্ট শিশুর কলরব। সে ক্লান্ত। তার জীবনে। তার পেশায়। ছোটেলালও ক্লান্ত। তার জীবনে। তার পেশায়।

মাথাটা টলে টলে পড়ছে। সামনে সেই অন্ধকার। আলোগুলো সব নিভে আসছে। দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেছে। সুধাময়ী বাঁচতে চায়। ছোটেলাল যন্ত্রণা চায় না। মহব্বৎ মহব্বৎ কি সাব? ওই যে ছেলেটা চেঁচাচ্ছিল সংসার চায়। মহব্বৎ চায়। ছোটেলাল বাঁচতে চায়। যন্ত্রণা চায় না। ছোটেলাল খদ্দেরের আশায় ঘোরে। সুধাময়ীও তাই। তবু সুধাময়ী খদ্দের পেলে বাঁচে। সে আরো কিছু চায়। অন্যতর কিছু।

সামনের টলায়মান প্রায়ান্ধকার ধর্মতলা পার হয়ে মেট্রোর উল্টো ফুটে যাবার জন্য দ্রুত রাস্তা পার হয়ে যায় ছোটেলাল।

পেভাতীর বাপ দুখিরাম
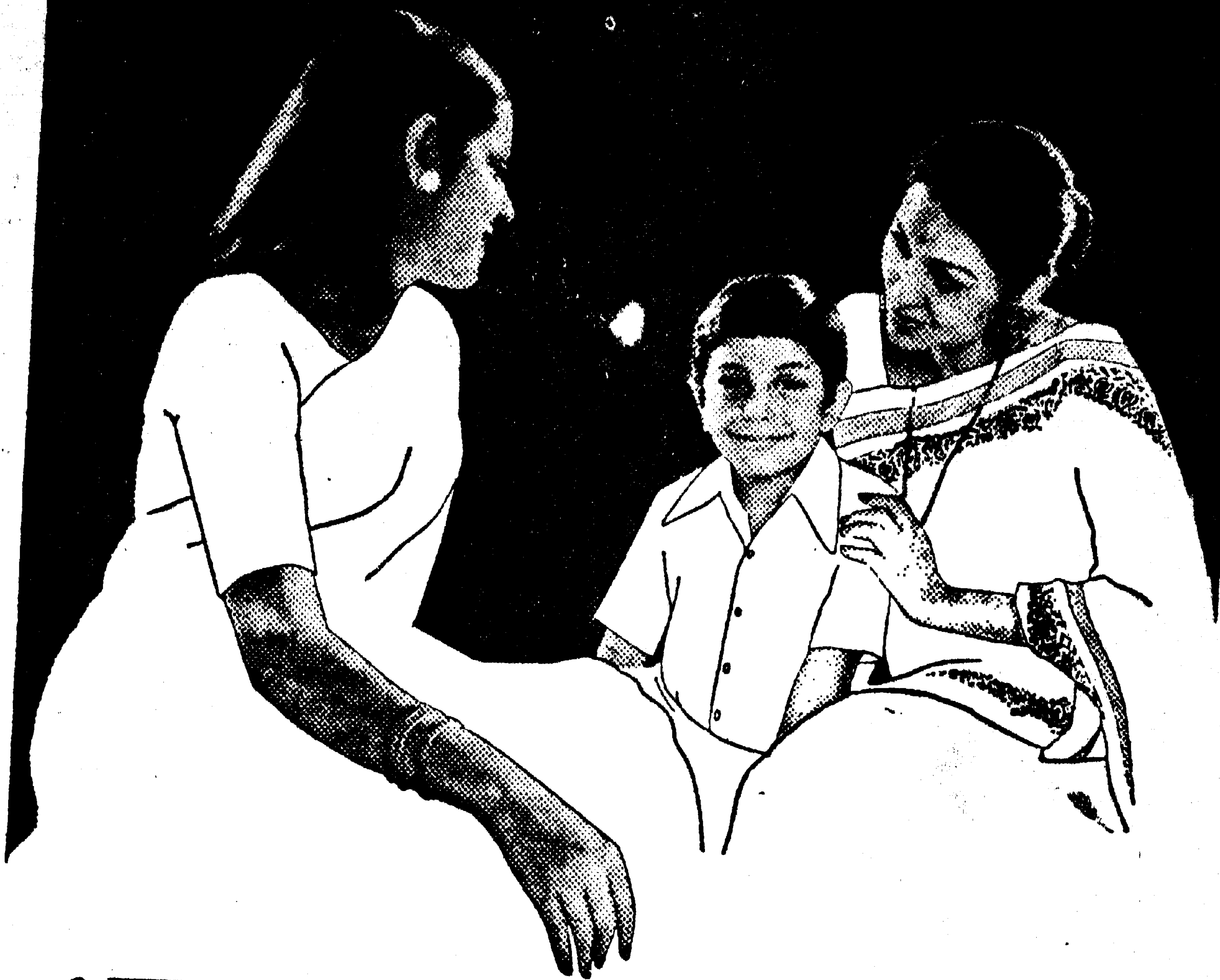
সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

মাথার মধ্যে মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলছে। বাইরে শেষ বৈশাখের রৌদ্রে ঝলসে যাচ্ছে খাঁ-খাঁ মাঠ। তাপে কালিয়ে ওঠা, বসে যাওয়া চোখ মুখ নিয়ে, অগোছালো শাড়ির আঁচলটা বুকে তুলে, উদ্‌ভ্রান্তের মত পেভাতী, ভঞ্জদের খামার বাড়ির চালার তলা থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে এসে মাঠে নামল। নেমে হলুদ পাথরের মত শক্ত মাঠের ঢেলা তুলে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বনবেড়ালীর মত ফুঁসে ঘুরে দাঁড়াল।

তাপে ফুটিফাটা হয়ে আছে মাঠ। পায়ের তলায় চোঁচের মত ফুটছে শুকনো খড়ের ডগা। পাশের নিমডালে খা খা করে ডেকে উঠছে কাক। চারপাশে ধু ধু করে জ্বলছে দুপুর। নুলো নিরঞ্জনকে দেখা গেল না। তার চাপা ফ্যাঁসফেসে গলার স্বর শোনা গেল,

—বেলাউজটা নিয়ে যা পেভাতী।

চালার তলায়, দরজার অন্ধকার ফোকর। ওপাশে কি আছে ঠিক ঠাহর হয়না। শালকাঠের পাল্লার আড়াল থেকে শুধুমাত্র নিরঞ্জনের নুলো হাতে দোলানো নতুন নীল রঙের ব্লাউজটা দেখা গেল, দুলছে। ওপাশে আবর চাপা হাসির শব্দ,

—আ মর। না লিলে লোসকান তো তুরই। মোর কী। কাউকে না কাউকে তো দুবই।

সশব্দে মাটির শক্ত চাকটা শালকাঠের পাল্লার ওপর গিয়ে পড়ে শতখন্ড হয়। অন্ধকার ফোকর থেকে তরাসের শব্দ আসে—

—বাপস্! কালনাগিনী—

প্রভাতী দুপ্ দুপ্ করে মাটিতে পা ঠুকে বলে,

—মর্—মর্—মর্— মুখপোড়া— মনের সাধে পায়ে দড়ি বেঁধে, দামোদরের চড়ায় ন্যে মুকে নুড়ো জেল্যে দি—শ্যালে শকুনে খাক্—

বলে জ্বলা চোখে মাঠের পথ ধরে। পেছনে দুপ্ করে শালকাঠের পাল্লা বন্ধ হয়ে যায়। এ সন তেরোশো ছিয়াশী। শেষ বৈশাখের ন্যাড়া মাঠ, মরা কুমীরের মত পিঠে শক্ত খাঁচ খোঁচ নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে, দাঁত বের করা রোদ্দুরে পড়ে আছে। দূরে মাঠের ওপাশে বিশাল দেওয়ালের মত উঁচু হয়ে, দামাল দামোদরকে আগলে রেখেছে জন্ম জন্মান্তরের মাটির বাঁধ। বাপ পিতেমোর ঘাম, রক্ত মিশে আছে মাটিতে।

বাঁ পাশে মরা গোচারণ। একটা ঘাসও বেঁচে নেই। গোচারণ পেরিয়ে দ'এর মধ্যে কোথাও হাঁটুভর কোথাও গোড়ালী ডুব জল। বর্ষায় দিগন্ত বিস্তৃত বিলের মত হয়ে থাকে এই নাবাল জমিটুকু। পাট হয়। এখন এপাশে ওপাশে থক থক করছে কাদা। ফেটে চৌচির হয়ে থাকা কালো মাটি। চারপাশ ঘিরে রয়েছে মধ্য বয়স্ক এবং প্রৌঢ় বট, অশ্বত্থ। দ'এর কাদা এবং জলে নিশ্চল হয়ে ভাসছে রোদে পোড়া হলুদ পাতা। দূরে একটা ঢিপি মত জমির ওপর, গায়ে গায়ে দাঁড়ানো একগুচ্ছ তালগাছে স্থির হয়ে বসে আছে শকুন। ওদিকটা গো ভাগাড়। এপাশে অশ্বত্থের পাতায় গা লুকিয়ে মাছরাঙা। মাঝে মাঝে কু ডাক দিয়ে এই জ্বলা দুপুরকে খেয়ে নিচ্ছে দাঁড়কাক। প্রভাতী দ্রুত পায়ে মাঠ ভাঙছিল।

ওর কন্ঠার কাছে দলার মত কি একটা আটকে আছে। হাতের কাছে ময়নাকে পেলে এখন ও গলা টিপে মেরে দেবে। বেটি কুটনীবলে কিনা, ওই নুলো নিরঞ্জন নাকি খরার জন্যে গরমেন্টোর রিলিফ করাচ্ছে। ধন ভানিয়ে, কেরাচিন, চাল আর এট্টা করে ট্যাকা দিচ্ছে। বলে খামার বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। ওকে ঢুকিয়ে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। আর নুলো নিরঞ্জন—ওফ্ ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে—ওই নুলো হাতে—পেভাতী এক চড়ে ওকে চৌকি থেকে ফেলে দিয়েছে। কোলা ব্যাঙের মত থপ থপ করে পড়ে গিয়েও হাসছিল। সেই পিত্তি জ্বালানো হাসি। —না খেয়েও তুর গায়ে কি জোর র‍্যা পেভাতী, এ্যাঁ—নতুন লীল রঙের বেলাউজ দুব। তুর তো জামা লেই—। মর—মব—মর মুখপোড়া।

বাঁধের ধারে ভাঙা জমিটার ওপর ডাল-পালা ছড়ানো, পত্রহীনণ রঙে রাঙা হয়ে থাকা, বিশাল হাত-পা ছড়ানো, নিঃসঙ্গ শিমুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ ডাকরে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে প্রভাতী—বাবা, বাপ্ গো—তুমার কুথায় ধরে লিয়ে গেলগো—আজ নুলো মোর গায় হাথ্ দেয় —তুমার সড়কি দে উকে গাঁথি শ্যাষ করো দাও গো—উফ্ কি লাজ্!

ও শৈশব কৈশোরের সঙ্গী, ওই বিশাল শিমুলের গুঁড়িতে হাত রেখে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে পরম মমতায় পিতার মত বৃক্ষটিকে আঁকড়ে ধরে প্রথমে ডুক... পরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছায়া ঘেঁষে বসে পড়ে। মাঠ গিলতে গিলতে আসা গরম হাওয়া তার ভেতরের আগুনের চেয়ে ঠান্ডা। তাই ক্রমশঃ জুড়িয়ে আসে পেভাতী।

এই মাস বৈশাখ। বৈশাখের শেষ হয়ে জৈষ্ঠ্য ছোঁব ছোঁব করছে। মহাদেবের কপিন পিঙ্গল রুক্ষ জটাজালের মত ছড়িয়ে আছে খরায় জ্বলে যাওয়া মাঠ। মহকালের ডম্বরু ধ্বনির মতই মাঝে মাঝে মাঠ চমকে, ঘরের চাল উড়িয়ে এবার কালবৈশাখী এসেছে। বৃষ্টি আসে নি। অন্য বছর এ সময় একটা চাষ দিয়ে দেয় চাষী। কালো পুরুত মশাই সেদিন টিকি নেড়ে পঞ্চানন মন্ডলকে বলছিলেন, 'বুইলে বাবা পঞ্চানন আমুচীতে (অম্বুবাচী) মা ধরিত্রী রজস্বলা হবোন। তারপরে বিষ্টি।' বলে চলে গেলেন। পঞ্চুকাকা দাওয়ায় খোঁটায়

হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল—'পাঁচটা রবি মাসে পায়।ঝরা কিম্বা খরায় যায়।— খনার বচন র‍্যা পেভাতী। এই বোশেখে পাঁচটা রবিবার হয়েছে। তবে বাপটাও ফিরল না, জামিন পেল্য না—কুথেকে কি হবে্য র‍্যা! গত সন তো সব ভেসো গেল, ইবারের লেখন কি আছে ভগমান জানে্য।' বলে উঠে গিয়ে পেভাতীকে এক পালি চাল ধার দিয়েছিল। এখন সারাদিন মাঠে মাঠে শুকনো পাতা, কাঠি, ঘূরণচাক হাওয়ায় চক্কর লাগায়। দুপুরে চক্ষুতে ধাঁধা লাগে।

প্রভাতীর নবীন ছিল ছিলে কালো বেতের মত দলমলে শরীরে এখন সাড় নেই। গরম হাওয়ার দমকা বুক উদাস করে দেয়। এখানে হাঁকাড় পাড়লেও সাড়া মিলবে না। তাই ঢাকা দেবার চাড় নেই। তীক্ষ্ণ উদ্ধত কালো শংখের মত বুকের ওঠাপড়া ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। পুঁতির মত জমে ওঠা ঘামেরা মরে যাচ্ছে। ধূ ধূ মাঠের মধ্যে, মাথায় রাঙা আগুন জ্বলা, পিতার মত এই বিশাল শিমুল বৃক্ষের জানুতে হেলান দিয়ে, মেদ বর্জিত পাথরে কোঁদা নবীন শরীরে, প্রভাতী বালিকার মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। শেষ বৈশাখের রাক্ষস-মাঠ সেই অশ্রু শুষে নেয়।

...এখন পেভাতীর বাপ দুখিরাম কোথায় গেল। কারা ধরে নিয়ে গেল এবং জামিন হল না। সেই ঘটনাটা এইরকম।—

গেল বছর তখন পুজো আসব আসব করছে আকাশ ফেটে বেরিয়ে এসেছে নীলকান্ত মণির রঙ। মাঠে মাঠে দুলছে সতেজ ধান। ভরভরন্ত বিলের ধারে ধারে কাশ আর ভেতরে শালুক ফুটে চারদিক মাতিয়ে দিয়েছে। বাঁধের ওপরের বাঁশঝাড়ে ঝাঁপালো বর্ষায় হাজার হাজার নতুন কোঁড় বেরিয়েছে। নবীন বাঁশপাতা তীক্ষ্ণ সবুজ ছুরির মত হিল-হিল করে ভোরের শিশিরে। বাঁশঝাড়ে বন্য মাধবীলতার মধ্যে সারাদিন ভ্রমর ওড়ে। দামোদর ভরা পোয়াতির মত বিশাল গতর নিয়ে বাঁধের ওপাশে তীব্র অন্তর্লীন স্রোতে বহে যায়। ওপারে আবছা তাল-খেজুরের গাছের রেখায় ওপর বিচিত্রবর্ণ চালচিত্রের মত ঝুলে থাকে আশ্বিনের আকাশ। দুখিরামের একমাত্র আদরের মেয়ে পেভাতী, তার মায়াময় বয়স নিয়ে বাঁধের ওপর আনমনে দাঁড়িয়ে, দামোদরের বাঁধের পাড়ের সঙ্গে খেলা করার শব্দ শোনে—ছলাৎ ছল ছলাৎ—ছল।

বাবা দুখিরাম, নামে দুখিরাম হলেও, রামদা-র মতই শক্ত বিশাল ও ধারাল। ওই বাপের মেয়ে প্রভাতী প্রজাপতির মতই বাঁধের ওপরে ওড়ে। কাউকে ডরায় না। দুখিরামের কালো পেশীবহুল শক্ত দেহের ওপর সূর্য পিছলে পড়ে বাঁধে, আর পঞ্চাননের জমিতে। পঞ্চানন মন্ডল লোকজে জাঁক করে তার পাটনাই বলদজোড়া আর মুনিষ দুখিরামকে দেখায়। তা বলে হাতের জল তার না। দুখিরাম ক্ষেতে জোন হলেও, জাত-ব্যবসা বহুদিন বন্ধ। দামোদরের এপাশে শ্মশান একটা থাকলেও সেখানে অন্য দু ঘর কাজ করে। এখানে এই বাঁধের ওপরে কয়েক ঘর আছে ওরা। ঝুড়ি-চুপড়ি বোনে মেয়েরা। অবশ্য পেভাতী নয়। হাতে চোঁচ ফুটে যায় বলে দুখিরাম বারণ করেছে। অবশ্য বর্ষায় মাঠে নামে। বাপকে সাহায্য করে, মাঠে খাবার দেয়। ভাত পচিয়ে চোলাই করে। পেভাতীর হাতের গুণে মাঝে মাঝে সারা ডোমপাড়া মাতাল হয়ে যায়। ডোমপল্লী, চোলাই, পুলিশের হুজ্জুতি বাবুঘরের সদ্য গোঁফ-ওঠা লায়েক ছোকরাদের ছুঁকছুঁকুনিতে আশৈশব অভ্যস্ত প্রভাতী। এক ঘর দু ঘর করে বীরভূম সাহিথের টাউনের টানে কলে খাটতে চলে যাচ্ছে। বাকি পুরুষরাও ক্ষেতে জন খাটে।

স্বাধীনতার আগে ছেলেপুলে জন্মালে যে যা খুশি একটা নাম দিয়ে দিত। এখন ওদের ডোমপাড়াতেও সব বাহারের নাম হয়। মধু ডোমের ব্যাটা বর্ধমান থেকে ব্যাটারী, রেডিও এনেছে। সন্ধ্যে রাত্তিরে বাঁধের ওপর থেকে অন্ধকারে হিন্দি ছমক ছমক সুরের গান ভাসে। বাঁধের ওপরে, বাঁশঝাড়ের গোড়ায় একটা পা একটু তুলে নিচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁটে ঠেলে তুলে অবজ্ঞায় চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল পেভাতী। মধু ডোমের ব্যাটার কলজে দুমড়ে গেছে। সে আর শাদা টেরিলিনের শার্ট পরে উঁকিঝুঁকি মারে না। পেভাতী শুধু বেঁকা হাসি হেসে বলেছিল, 'দুর বাবাকে বলে—বুঝবি হুঁ।'

তা যা বলছিলাম, এখন ওদের ডোমপাড়াতেও সব বাহারের নাম হয়। জহর, সুভাষ এইসব। মেয়েদের নামে সিনেমার নটিদের নাম জোড়ে। তবুও মেয়ে জন্মানর পর, দুখিরাম হা-হা করে হেসে মেয়ের নাম দিয়ে দিল, পেভাতী। তা পেভাতকালে হয়েছিল। ওর মা-ও তখন দলমলে যুবতী। ডাগর চোখ তুলে লালচে বেগুনী মোমের পুতুলের মত পেভাতীকে বুকের দুধ দিতে দিতে বলেছিল 'কি সেকেলে বাপ গ, তা রাখো না কেনে, সুচিত্রা!'

দুখিরাম তখন নতুন জোয়ান। সে বাঁধ কাঁপিয়ে হেসে বলেছিল,—শোন হরিমতী। তাকে পেভাতীর মা বলব বলেই তো পেভাতী নাম দিলাম। সুচিত্রা সুচিত্রার মা বুললে কি রকম বাবুঘরের বিটিছেলার মত শুনায়! শেষো মুখে ছাইগাড়ো যাকে 'বিবি ছবি' এ্যা! বাবা, সে আমি দেখতে লারব হুঁ।

শুনে হরিমতীর মাথা পায়ে এক। মানুষটা কথায় একেবারে ধুলোয় বসায়। সোহাগের সময় বালিকার মত হরিমতীকে বুকে তুলে দোলায়। আর রাগের সময় হাঁকাড়ে বাঁধ ফাটে। তখন বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে থাকত হরিমতী।

সেই ডাগরভরা যুবতী হরিমতীকে বারো বছর আগে এই ভরা দামোদর নিয়ে নিল। পেভাতীর বয়স তখন পাঁচ। শ্রাবণের মাসে দামোদরের গেরুয়া জল পাক খেতে খেতে, একটি ঘোড়ানিম, খানিকটা বাঁধ, আর দুটো পেতলের থালা শুদ্ধু হরিমতীকে গপ করে গিলে খেয়ে ফেলল।

সেদিন অনেক অনেক মদ খেয়েছিল দুখিরাম। খেয়ে কৃষ্ণচূড়ার মত রাঙাপারা চোখে পাঁচ বছরের পেভাতীকে জড়িয়ে বসেছিল। দামোদরের বাঁধের ওপর সেই চন্ডাল পল্লীতে উত্তরপুরুষদের বলবার জন্যে আর একটা গল্প তৈরি হয়েছিল। দামোদরের কথা উঠলেই দুখিরামের বাবা পাকা মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে বলত,

—তারপর মড় মড় করো্য নিম গাছটা হেল্যে পড়ল, পেভাতীর মা ধড়ফড়িয়ে বাসন লিয়ে উপর বাগে উটচে এমুন সময় ধবস করো্য লেমে গেল পাড়—উই তুমাদের দামোদরের গভো—পেভাতী তখুন পাঁচ বচ্ছরেরটি, হুঁ।

দুখিরাম থাকলে ধমক দিত—

—বাপ। চুপ মার।

বুড়ো খকখকে কাশিতে উত্তর দিত,

—চুপ তো মেরাই আছি ব্যাটা....

ঠিক বারো বছর পর গত সন তেরোশো পঁচাশীতে আবার ভাসল দামোদর। রাত-দুপুরে সে কি হৈ-হৈ। শুধু জল আর জল। পোয়াটাক দূরে বাঁকের মুখে এক গোঁয়ার মাটির বাঁধ ধসিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল দামোদর। আই বাপ কী জলরে! মানুষ তো মানুষ, হাতি ভাসিয়ে নেয়। অবশ্য আগেই সাবধান হয়ে গাছে চড়ে বসেছিল মনুষ। বাঁধের প্রায় কানায় কানায় এসে দাঁড়িয়েছিল জল। কাসর, ঘন্টা, শিঙ্গা, ভেঁপু নিয়ে দামোদরকে পাহারায় রেখেছিল লোকেরা। পঞ্চাশ হাত তফাতে তফাতে গাছের মাথায় পালা করে রাত জাগছে মানুষ। সাতদিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি চলছে। টিপ টিপ করে, ঝর ঝর করে কখনও ক্ষ্যাপা হাতির মত। চিড়ে গুড় নিয়ে বুড়ো মানুষ গাছের ওপর দামোদরের পাহারায়। অন্ধকারে হা হা করে হাসি, মামা খুড়ো, ভাইপো পাতিয়ে চিৎকার করে জলের আওয়াজ ছাপিয়ে কথা বলা। গাছের মাথায় ওপর মাচায়, হুঁকো, বিঁড়ির আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। যেন মোচ্ছব লেগেছে।

বাঁধ ভাঙতে পারে এ সন্দেহ আগেই ছিল। নদীর গতিক সুবিধার নয়। গত দু-তিনদিন ধরেই এখানে সেখানে নয়া ফাটল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের চারপাঁচটা গাঁয়ের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি বালি দিয়ে বন্ধ করেছে ফাটল। ওরা কোথেকে লরী করে শয়ে শয়ে বালির বস্তা এনে জড়ো করে রেখেছে।

এরপরটা সুদামকাকার মুখে শোনা পেভাতীর। বাঁকের মুখে বাঁধের ওপরে ঠিক রাত দুপুরে প্রথমে মড় মড় করে গোটা বাঁশঝাড়টা দোতলা সমান ফুলে উঠে ছেতরে গেল। তারপর রাক্ষসের মত দাঁত ছিরকুটে হাঁ করল বাঁধ। গাঢ় বাদামী রঙের আকাশের তলায় বুনো হাতির পাল নামার মত বাঁধের হাঁয়ের ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল

দামোদর। প্রথম জলের ধারাটা লাফিয়ে পড়ল একরাশি দূরে। তারপর চারদিক তছনছ করে ভাঙ্গাতে ভাঙ্গাতে সামনে এগিয়ে চলল। গাছ, বাড়ি, মাঠ, কোঠা যা সামনে পড়ল সব কুটোর মত উড়ে গেল। যেমন মুঠো করে ঘাস ছেঁড়ে সেভাবেই ওই জল-দত্যি থাবা মেরে বড় বড় বট পাকুড় আম জামের গাছ শেকড় শুদ্ধু উপড়ে নিল। দেশলাই-এর বাকসের মত ভেসে চলল আট-চালা ঘর। মূল স্রোতের পাশে ধীরে ধীরে জল বাড়ছিল।

প্রভাতী তখন ঘরে শুয়ে। ওদের ঘরটা বাঁধের পাশে একটু উঁচু জমিতে। লোক-জনের চাপা চিৎকারের মধ্যে জেগে উঠে. কুপীর কেঁপে ওঠা আলোয় দেখে সারা ঘরে থালা বাটি ঘটি হাঁটুজলে ভেসে দুয়োরে ধাক্কা মারছে। ঠংঠাং করে ধাতব শব্দ হচ্ছে। তক্তপোষের ধার অবধি জল। জলের চাপে দরজা মড় মড় করছে। হঠাৎ চমকে দেখে বিছানার কোণে নির্জীবভাবে শুয়ে আছে গোক্ষুরার বাচ্চা।

প্রভাতী ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই সেই পাঁচ বছরের পেভাতীর মতই তাকে একটানে কোলে তুলে, বাঁ হাতে লম্বা সড়কির মত মাছমারা কোঁচ নিয়ে, বাঁধের ওপর অন্ধকার ঠেলে উঠল দুখিরাম। ভয়ে বুঁজে থাকা চোখ খুলে পেভাতী দেখেছিল, অন্ধকারে ছায়া ছায়া শতেক মানুষ কাঠ হয়ে বাঁধের ওপর জড়ো হয়েছে। তাদের ভয়ার্ত গলার কথা বলার শব্দকে ছাপিয়ে ক্রুদ্ধ রাক্ষসের মত কয়েক হাত নিচে দামোদর গর্জাচ্ছে।

জল যে কত জোরে বেরিয়ে এসেছিল সেটা পরে দেখেছে প্রভাতী। শুধুমাত্র গল্পের গরুই গাছে ওঠে না! সত্যি সত্যি গাছের ডালে আড়াইতলা ওপরে ত্রিভঙ্গ হয়ে চার-পা এলিয়ে ঝুলছে পাশের গাঁয়ের হেলে বলদের শব। স্রোতে ভেসে এসে ওপরের ডালে আটকেছে। শকুন দোল খাচ্ছে ঝুলন্ত নাড়িভুঁড়ি ধরে। ভঞ্জদের গাড়ি থাকার ঘরে, কোঠাবাড়ির একতলায় নতুন সবুজ মটোর গাড়ি, জলের তোড়ে ভেসে বেরিয়ে যেতে না পেরে, চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তালতোবড়া হয়ে গেছে। গাঁকে গাঁ শ্মশান। কিন্তু ওই বাঁধেরই আড়ালে একটু উঁচুতে থাকায় বেঁচে গেছে তাদের চন্ডালপল্লী। আর ছোঁয়াছুতের বিচার নেই। বাউনে চন্ডালে পাশাপাশি বাঁধের ওপরে বসে রিলিফের খিচুড়ি খেয়েছে।

নুলো নিরঞ্জন ভঞ্জের তখন থেকেই পেভাতীর ওপর নজর। এদিকের পার্টি-বাবুদের তরফ থেকে ভঞ্জরাই রিলিফের হর্তাকর্তা। আর ডাঁটো কালনাগিনীর মতই দুখিরামের বেটিটা নাকের পাটা ফুলিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, রিলিফের লাইনে আসে না। আসলে পেভাতী ভিখিরির মত রিলিফের খিচুড়ির জন্যে দৌড়ুতে পারে না।

বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরন্ন মানুষ কঙগ্রেস কউনিস বোঝে না। খিদে বোঝে। বাঁধের নিচের জলে রিলিফের নৌকোর লাল বা তেরঙ্গা ফেস্টুন না দেখেই জাবনার ডাবায় ঝাঁপিয়ে পড়া পশুর মত গাদাগাদি করে। ব্যাটারী মাইকে তারস্বরে ঘোষণা করা হয় চিড়ে গুড় নাও। চিড়ে সব-সময়ই সাদা এবং গুড় লালচে রঙের থাকে। তার চেয়েও বেশী থাকে একদল ক্ষুধার্ত মানুষের পেটের মধ্যেকার অন্ধকার কালো ফোকর। সেখানে সাদা লালে একাকার হয়ে যায়।

এখানে নিরঞ্জনের হাতে গরমিন্টের রিলিফের ভার। সকাল সন্ধ্যে তার পেছনে ফেউ-এর মত লেগে আছে মানুষ। নুলো নিরঞ্জন রাজার মত সমস্ত ব্যবস্থার তদারকি করে। রাতের আঁধারে আড়ালে আবডালে বাঁধের দূরে কোনাকাঞ্চিতে বাঁশঝাড়ের বুনো পাখি সশব্দে উড়ে যায়। মেয়েমানুষের গলা ঘ্যান ঘ্যান করে অবসাদে—তাড়াতাড়ি কর বাপু—নিরঞ্জনের চাপা ফ্যাসফেসে হাসি শোনা যায়।

—তা বুল্লে কি হয়! দু থালা খিচুড়ি বাড়তি নিয়েচিস। রিলিফের শাড়ির গাঁটরি খুলব কাল। খয়েরী পাড় লিবি না সবুজ?

প্রভাতী প্রথম তিনদিন দাঁতে কুটো কাটেনি। ঘোর অবসাদে মাথায় একটা ঝুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। চারদিনের দিন রিলিফের পক্কান্ন নিয়ে এল দুখিরাম। একটি দীর্ঘ-শ্বাসের শব্দে চমকে তাকিয়ে প্রভাতী দেখল বাবার পাঁজরা দেখা যাচ্ছে। মরা চোখে তাকিয়ে দেখে বাবার থালা থেকে দু-এক গরাস খেয়েছিল সে। তারপর হড় হড় করে বমি করে দিল। মাথার ওপর গুর গুর করে উঠছে আকাশ। বাঁধের ওপাশে হেলি-কপ্টার নামছে। আর পশুর মত দৌড়ুচ্ছে মানুষ।

এর মধ্যেই ভঞ্জরা আর সাউরা একটা অন্যরকম ব্যবসা খুলেছিল। দামোদরে, স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া থালা বাটি ঘড়া কলসী লোক লাগিয়ে আর খ্যাপলা জাল ফেলে তুলছিল। দুখিরাম একমনে বসে বসে দামোদরে ভেসে যাওয়া মানুষের শব গুণছিল। রাত্তিরের গুলোর হিসেব নেই দিনের গুলোতেই একশো ছাপিয়ে গেছে। ওদিকে সাউ আর ভঞ্জরা লোকের তৈজসপত্র ছোটখাটো সোনা রুপোর অলংকার জলের দরে কিনছে। বাঁধের ওপরে ঘোড়ানিম গাছটার তলায় বন্দুক হাতে সিপাই-এর পাশে বেঁটে মোটা সিন্দুক নিয়ে সাউ-বাবুরা বসে। থানার লোকজন আর বড় দারোগাবাবুর জন্যে মুর্গী রান্না হচ্ছে। বাতাসে মন পাগল করা বাস।

সবকিছু চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল দুখিরাম। না ভেসে যাওয়া উঁচু গ্রামগুলো থেকে হালুয়াইরা এসে বাঁধের ওপর উনুন খুঁড়ে দোকান বসিয়েছে। সিঙ্গাড়া কচুরী নিমকির গন্ধও ভাসছে হাওয়ায়। ছোট তৈজস বেঁচে কিছু খাওয়া যায়। এই বারোয়ারী অন্ন ভালে লাগে না। বেচবার মত থালা ঘটিও তার ভেসে চলে গেছে। একহাতে মেয়ে আর একহাতে অস্তর বলতে মাছধরা কোঁচটি নিয়ে অন্ধকারে বাঁধে উঠেছিল। হঠাৎ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে পেভাতীর পাশ থেকে কোঁচটা হাতে সে উঠে গেল। যাবার সময় প্রভাতীর অবসাদগ্রস্ত চোখ দেখল যে বাবা একটা বাঁধের গায়ে আছড়ে পড়া চালা থেকে টানাটানি করে শনের দড়ি খুলছে।

...সেদিন সন্ধ্যের সময় ভঞ্জদের অস্থায়ী গদি থেকে একজোড়া দুল সমেত দুখি-রামকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল পুলিস। দুখিরাম বাঁধের ওপর থেকে দড়িবাঁধা কোঁচ মেরে, ভেসে যাওয়া মেয়েমানুষের শব গেঁথে টেনে নিয়ে এসে তার কান থেকে দুলজোড়া সংগ্রহ করেছে। হাজার লোকের ভিড়ে চোখে তরাস মেখে প্রভাতী দেখল ওর বাবাকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নৌকোয় তুলছে পুলিশ। আর ওর বাবা সেই দুর্দান্ত দুখিরাম হাতজোড় করে কুঁজো হয়ে হাউ-হাউ শব্দে দারোগাকে বলছে,

—বাবুমশাই জিয়ন্ত তো লয়—মরা গেঁথ্যাচি—মরা তো আর লতুন করো মরে না। আমার মেয়্যাটা একা একা মর্যো যাবে—

—হারামজাদা শুয়ার—মরা লয়—কানের সুনা লিচ্চ!

মাটিতে পা ঠুকে দাপিয়ে ওঠেন দারোগাবাবু।

—আর উ বাবুদিগে কিচু বুলছ না! ওরা যে লোকের ঘটিবাটি তুলছ্যে লোকের কানসুনা পিতলের দামে কিনচে—উ সাউ-বাবুরা—উ ভঞ্জবাবুরা—ওদের কিচু বুলছ না?

চোপ্‌ শুয়ার! আবার মুখে মুখে চোপা—

দুখিরামের চোখ একবার জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। কোমরের দড়িতে টান দিয়ে এবার নৌকা ছেড়ে দিল পুলিস। কান-সোনাটুকু গেল দারোগাবাবুর ট্যাঁকে। যাবার সময় শুকনো লাল চোখে পেভাতীর দিকে তাকিয়ে দুখিরাম বলল, —বুঝে সমঝে থাকিস পেভাতী! আমি লিচচয় ফিরব। অন্ধকারে আদাড়ে পাদাড়ে যাস না। জল লামলে সুদামের কাচে থাকিস। পঞ্চু কাকার কাচে খাবার চাল লিস্‌। আমি এসে শুধব।...

...জল এলও যেমন এই ডাঙা জমিতে হুস্‌ করে, তেমনি নেমেও গেল। মাঠে মাঠে মরে গেল ধান, ক্ষেতের ইঁদুর, কেউটে, বলদ আর মানুষ। গাঁয়ের মধ্যে মাটির ঘর, ঘরের চাল আর বীজধানটুকুও। শ্যামলা কিশোরী বধূর মত যে ধান আড় নয়নে ঠারে ঠমকে মাজা দোলাতে দোলাতে ঝলমলে শরতের রোদে নবান্নের উৎসবের জন্যে তৈরী হচ্ছিল, তারা একদিনে সিঁদুর মুছে আছাড় খেয়ে পড়ে শাঁখা ভেঙে সাদা হয়ে গেল। আর উঠল না। মাঠে মাঠে নাড়া খড়, পচা মড়া, আর শকুনে গৃধিনীদের মহোৎসব।

কলকাতার কাগুজে বাবুরা এসে বাঁশ দিয়ে ঠেলে চামচিকের মত মরা বাচ্চা মরা

মেয়েমানুষের বুকে এনে লাগিয়ে হৃদয় বিদারক ছবি তুলে কাগজে ছাপতে পাঠালো। দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখল অর্ধউলঙ্গ গেঁয়ো মানুষরা আর শহরের বাবুদের চোখ দিয়ে পরের দিন সমবেদনায় মণ মণ জল পড়ল। এর মধ্যেই নানা পার্টির বাবুরা ঝান্ডা লাগিয়ে জিপে চড়ে ঘুরতে লাগলেন। রাতে ডাকবাংলোর জমে উঠল মাইফেল, আকাশে উড়তে লাগল হেলিকপ্টার, ঘুরতে লাগল সিনে ক্যামেরার লেন্স। মুষ্টিমেয় কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান যারা যে কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করে যায়, অল্প সামর্থ্য নিয়ে তারা কাজ করতে লাগল।

বেঁচে থাকা নিরন্ন গ্রাম্য মানুষ, জোতদার, ব্যবসাদার, ফড়ে, দালাল, বিভিন্ন শ্লোগান আর পুলিশের মধ্যে চোর চোর খেলা হতে লাগল। আর কখন চুপিসারে আবার নিজের ঘরের গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল দামোদর। শুধু পেভাতীর বাপ দুখিরাম জলে না ভেসে গিয়েও আর গাঁয়ে ফিরল না। লোহার গরাদের মধ্যে সে তার স্বপ্নের কোঁচ হাতে করে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে চিড়িয়াখানার বাঘের মত ঝিম মেরে গেল।

....আজ ছ-ছটা দুস্বপ্নের মাস পার হয়ে এসে পেভাতী এই শেষ বৈশাখের খর রোদ্দ জ্বলে যাওয়া দুপুরে গালে হাত দিয়ে ঐ পিতার মত শিমুল বৃক্ষের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে বসে বিকেল করে ফেলল। সূর্য পশ্চিম আকাশে টাল খেয়ে রয়েছে। এইবার দ'য়ের জল আয়নার মত টাঁরচা রোদ ফিরিয়ে দিল প্রভাতীর মুখে। রোদের ঝিলিকে সম্বিত ফিরল প্রভাতীর।

এই বার গাঁয়ের দিক থেকে দু একটা লোক ঘটি হাতে মাঠে আসছে। বুকে আঁচল টেনে দিতে গিয়ে সারা গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। সমস্ত শরীরে একটা ঘৃণ্য অশুচি স্পর্শের মত যেন লেগে আছে নিরঞ্জন ভঞ্জের নুলো হাত।

বাঁধের নিচে একটু দূরে মাঠের মধ্যে থেকে সুদাম কাকার আবছা গলার শব্দ কানে ভেসে এল,

—পেভাতী....ই....পেভাতী রে

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় প্রভাতী। পা চলে—শরীর চলে—তে মন চলে না। শরীরের ওপর মনের বোঝা তিন মণ। প্রভাতী সেই মোট মাথায় করে পা ঘষে ঘষে এগিয়ে চলে। ক্রমশ নিকটবর্তী হয় এবং হঠাৎ তার নিজের চোখকে আর বিশ্বাস করতে পারে না। একটু শীর্ণ দীর্ঘ দুখিরাম, দু চোখে পড়ন্ত বিকেলের রোদ্দুর ঝলকে, হাসছে। পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে সুদামকাকা। প্রভাতীর কানে দুখিরামের গলা গম গম করে।

—আয় পেভাতী, আয়, আয় পেভাতী
—আমি এস্যাছি—

প্রভাতী কথা বলতে যায়, অনেক কথা বলতে যায়। ওর সব কথা কান্না হয়ে যায়। ডুকরে উঠে দুখিরামের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ ঘষে ঘষে ওর বুকের চামড়ায় জ্বালা ধরিয়ে দেয় পেভাতী।

....গাঢ় অন্ধকারে শিরায় প্রহর ঘোষণা করে। বাঁধের ওপর বাঁশঝাড়ে হাজার লক্ষ জোনাকি তাদের লক্ষ কোটি চোখ জেলে, বৈশাখে মরে আসা সেই ভীষণ দামোদরকে উলঙ্গ ঘুমন্ত শিশুর মত তার বালি আর বালিয়াড়ির মধ্যে পাহারা দেয়। রাতে খাবার পর, অর্ধেক অশ্রুতে অর্ধেক কথায় আজকের সব কথা বলে ফেলে এখন গালে শুকনো জলের দাগ, গভীর স্তব্ধতায় মাথার ওপর কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার এক ফালি মরা চাঁদ নিয়ে ঘরের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে প্রভাতী বসে আছে। মাথার ওপর উল্টোনো বাটির মত ঝুলে আছে হীরে বসান আকাশ। অন্ধকারে দুখিরামের মুখ দেখা যায় না। শুধু দীর্ঘ চেহারার আদলটা, ঘরের দরজায়, বাঁধের ওপরের মরা আলোর আকাশকে পেছনে রেখে ফুটে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হয়। সুদামরা ঘুমোচ্ছে। ছায়া শরীরীর মত দুখিরাম ওদের বাতার তলায় হাত ঢুকিয়ে সড় সড় করে লম্বা সড়কিটা টেনে বার করে আনে ওর দেহ অন্ধকারে মিশে যায়।

ভোর রাত্তিরে মাঠ সারতে বেরিয়ে পগারের ধারে বসা নুলো নিরঞ্জনের সামনে মাটি ফুঁড়ে একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়ায়। নিরঞ্জনের গলা একটু কাঁপে,—কে র‍্যা।

—আঞ্জা, মুই দুখিরাম।

ওর গলায় মেঘ ডাকে। দূর থেকে ভেসে আসা মেঘ গর্জনের মত সেই শব্দ নিরঞ্জনের মেদ মজ্জা অস্থি ফুটো করে হৃদয়ে চলে যায়।

—তা এই অন্ধকারে ইখানে কেন রো?
—তুমার সঙ্গে দুটো কথা আচে—
—তা কাচারীতে আয় কেনে, আই বাপ তুর হাথে ওটা কি?
—সড়কি।

একটা হিম শীতল অনুভূতি নিরঞ্জনের শিরদাঁড়া দিয়ে নামে।

—কি কথা বলবি দুখিরাম?
—হুঁ। মুই লয়। ই সড়কি কথা বলবে।
—আই বাপ, মা-আ, আমায় ছাড় দে দুখিরাম, তুকে একশ টাকা দুব।

দুখিরাম হাসে। অত্যন্ত শীতল হাসি!
—হাঁচিছস্ কেনো? হাজার টাকা দুব।
দুখিরাম আবার হাসে। হঠাৎ এক মুঠো বালি নিরঞ্জন দুখিরামের চোখ মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। দিয়ে নিরঞ্জন লাফ মেরে উঠতে যেতেই হঠাৎ পেটটা ফাঁকা হয়ে যায়। দুখিরাম চোখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেই নিপুণ হাতের টানে নিরঞ্জনের অন্ত্র সড়কির ফলায় টেনে বার করে এনেছে। গরম রক্তের ধারা লাফিয়ে উঠে দুখিরামের কোমরে পড়ে নিচে গড়িয়ে নেমে পগারের মাটি ভেজায়। ঘড়ঘড়ে শব্দে কাত্ হয়ে পড়ে নিরঞ্জন। পাশের ঘটিটি পগারে গড়িয়ে পড়ে বক্ বক্ করে গলা দিয়ে জল বের করতে থাকে।

বড় ধড়ফড়াচ্ছে নুলোটা। বন্ধ চোখেই ওর মুখটা আর শরীরটা হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে দুখিরাম। ঘড় ঘড় শব্দ করতে করতে স্তব্ধ হয়ে যায় নিরঞ্জন। মাথা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ঠিক করে নেয় দুখিরাম। তারপর বাঁজা ডাঙা জমির ওপর দিয়ে পা ধরে টানতে টানতে নিরঞ্জনকে নিয়ে যায়।....

তারো পরের দিন অনেক বেলায় নুলো নিরঞ্জনকে তিন মাইল দূরে, দামোদরের চড়ায় নিচ পেটটা এফোঁড় ওফোঁড় অবস্থায় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যেই শকুনে ঠুকরে চোখ দুটো তুলে নিয়েছে। আশপাশের গাঁয়ে আর একটা ছোট বান আসার উত্তেজনায় মানুষজন ছোটাছুটি করে। পূতিগন্ধময় দেহটা ফুলে ফুলে ঢেকে বিশাল মিছিল করে জনদরদী নিরঞ্জনের হত্যাকারীকে ধিক্-কার দিয়ে আকাশ বিদীর্ণ করা শ্লোগানে শব নিয়ে নুমজন ফিরে আসে।

উত্তেজনা চরমে ওঠে যখন কলকাতা থেকে নিয়ে আসা পুলিশের কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুখিরামকে সনাক্ত করে। বিশাল জনতা স্তব্ধ বিস্ময়ে কুকুরের পেছনে পেছনে বাঁধের বাঁশঝাড়ে গিয়ে মাটিতে পোঁতা রক্তমাখা কাপড় পায়। শুধু হাতকড়া বাঁধা দুখিরাম এবার পুলিশ ভ্যানে উঠতে গিয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে হা-হা করে হাসে, —বাবুমশায়রা! ইবার মরা লয়, জীয়ন্ত গেঁথ্যাচি। তবে উটা মানুষ লয়, কুত্তা। নুলো তেঠেঙে কুত্তা। ই গরীবের হাঁড়িতে মুখ দিয়েছিল—হুঁ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

খাগ্-নলের ঘর

বাহার উদ্দিন

জল্লাদ শিশুটা আবার কেঁদে উঠল। তিন মাস তিন দিনের শিশু। জন্মের পর থেকে কেবল কেঁদেই যাচ্ছে। ছলমা অনেক তাবিব করাল। গলায় তাবিজ বেঁধে দিল। ফলাফল পায়নি। শিশুটা কেবল কেঁদেই যাচ্ছে।

গরমের জ্বালায় মাটিতে বেতের চাটাই বিছিয়ে ছলমা শুয়ে আছে। রোজদিন উত্তর দিক কালো হয়ে আসে। বৃষ্টি আসে না। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে গরম আরো উথলে ওঠে। রমজানের খাট পুরনো। খাটের একদিক ভাঙ্গা। রমজান খাটের ওপর এপাশ ওপাশ করছে। তার ঘুম আসছে না। পাশ ফেরালেই খাটে মচমচ শব্দ হয়। ঘুম হাওয়া হয়ে যায়। রমজানের পাশে খাটের ওপর তার চার ছেলে—আবু, বলাই, রসিদ ও ছিফত ঘুমোচছে। ঘামছে।

মাটিতে মায়ের কাছে তিন মেয়ে জবা, আনাই, কুলসুম আর ঐ কোলের শিশু।

ছিফতের বয়স এক বছর। তার মুখে এখনো কথা ফোটেনি। বাবুবাবু, মামু-মামু—শব্দগুলো এখনো অস্পষ্ট। সে এখনো দাঁড়াতে শেখেনি। ভর দিয়ে দাঁড়ায়। তার পেট মোটা। হাত দুটো সরু সরু। কুলসুম ওর চেয়ে এক বছরের বড়। এর ওপরে রসিদ। রসিদের বয়স তিন বছর। রসিদ বাপের কোলঘেঁষে শুয়ে আছে। সে বাপকে জড়িয়ে শোয়। নইলে তার ঘুম আসে না। ভয় করে।

এই ছেলেমেয়েরা একটার মাথায় অন্যটা পা ফেলে ফেলে যেন সংসারে এসেছে। পরপর। এক নয়, দুই নয় রমজানের ঘর ভরতি এখন আটটা। লোকে বলে জন হলে ধন আসে।

শিশুটার জন্মের পর থেকেই পোয়াতি ছলমা মাটিতে শুচ্ছে। লোকটার কাছে

শুতে পারে না। ওর হাত-পা নড়ে ওঠে। লোকটাকে ছলমার মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। মনে হয় নিষ্ঠুর। বে-আদব। দোহাই-ফরিয়াদ শোনে না। ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে খেয়াল রাখে না। হুঁস নেই, বড় মেয়ে দেখতে দেখতে কলাগাছের বাড় নিয়ে বড় হয়ে উঠছে। দুদিন পরেই শাড়ি ধরবে। রমজান এসব বুঝেও বোঝে না। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ছলমার ঘুম আসে না। পাখা চালায়। মাঝে মাঝে ঝিরিঝিরি ঘুমের বাচ্চারা চোখের পাতায় নেমে আসে। শিশুটা নড়ে ওঠে। ওরা পালিয়ে যায়। হাত-পাখার শব্দে রমজানের ঘুম ভেঙ্গে যায়। রমজান হুমকি দেয়, 'কি ঘুমাইতে দিবে না? তোর কি একলা গরম।' ছলমা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখল। কিন্তু পারে না। অসহ্য। আবার পাখা চালায়। আবার রমজানের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গা ঘুম নিখোঁজ হল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের আলো ঢোকে। রমজান শুয়ে শুয়ে সুর করে বলে—লা হাওলা অলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজিম (সর্বোচ্চ মহান আল্লা ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। কোন প্রতিবন্ধক নেই)। কি বলে রমজান বোঝে না। তার মনে বোঝার প্রশ্ন আসে না। সে বিশ্বাস নিয়ে বলে যায়। এই দোয়া অবলম্বন। ছোটবেলা মসজিদের মিয়াসাব বলতেন, 'তরক দিলে এই পড়বায়'। সে এই দোয়া পড়ে। 'মহমুরুব্বিকে ছালাম দিবায়।' সে সালাম-কালাম করে। নিজের ছেলেমেয়েদেরকেও শেখাচ্ছে। শেখানো ফরজ কর্তব্য। তার একিন আছে। বিশ্বাস আছে। এই দোয়া বিপদের সহায়। ঝড়ের সহায়। এই দোয়া তাকে বজ্রের অপঘাত থেকে রক্ষা করবে। তার ঘর রক্ষা হবে। প্রাণ রক্ষা হবে।

শিশুটা আবার কেঁদে উঠল। ছলমার শরীর ঘামে ছপ ছপ করছে। ছলমা ব্লাউজ-বিহীন শাড়ির ভেতর থেকে তার চুপসে পড়া স্তন শিশুর মুখে তুলে ধরল। শিশুটা কান্না বন্ধ করল। ঘরে ছলমার শিয়রে নামিয়ে দেয়া লণ্ঠনের নিবু নিবু বাতি জ্বলছে। ছলমার মুখ দেখা যাচ্ছে। মুখ শুকনো। চোখগুলো গর্তের মত ভেতরে ঢোকানো। গাল ভাঙ্গা। পাট-কাঠি হাত-দুটোর একটা ছেলের ওপরে, অন্যটা মাটিতে ছড়িয়ে আছে। কাকের জেজের মত ছোট্ট এক গুচ্ছ চুল শিয়রে এলোমেলো। মাথা বালিশহীন। মাথার নিচে বস্তা ভাঁজ করে, বস্তার ওপর পুরনো এক টুকরো কাপড় বিছিয়ে শুয়ে আছে। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বারবার। রমজান বারবার লা-হাওলা পড়ছে। দু-একবার আকাশ ফাটিয়ে বজ্রধ্বনি হল। কোথাও যেন বাজ পড়ল।

রমজান অনেক দিনের উপোষী। আজ বহুদিন, বউয়ের ধারে-কাছে যেতে পারছে না।

শিশুটা তার মায়ের স্তন চুষছে।

ছলমার শরীরে মড়ার নির্জীবতা। সারাদিন অনেক কাজ। নিজের ঘরের কাজ। পরের বাড়ির কাজ। কাজ না হলে খাবার জোটে না। ছলমার জন্যে রমজানের দুঃখ হয়। পুরুষ মানুষের মত পাল্লা দিয়ে দিনের পর দিন খেটে যায়, আপত্তি নেই। টু শব্দ নেই। ছলমার উপর তার রাগ হয়। বছর বছর মেয়েমানুষটা পোয়াতি হয়ে ওঠে। একবার ছুঁয়ে দিলেই হল, ফুলে ফেঁপে উঠবে। কতবার পুবের বাড়ির মাষ্টার-চাচা বলেছেন, 'আর বাদ দেও রমজান, অনেক অইল, এইবার ব্যবস্থা কর।'

'অয় চাচা ঠিক কইছেন, আর না এই শেষ।' রমজান প্রতিবারই বলে। বউ অতসব বোঝে না। মেয়েমানুষ। ইস্কুলে যায়নি। লেখাপড়া শেখেনি। রমজান পাঠশালা পাশ। সে এসব বোঝে। অন্যকে বোঝায়। সঙ্গী পায় না। সাহস হয় না।

সেই যে, একবার ইমারজেন্ট না কি একটা এল। বহু লোক জেলে গেল। দীপক-ভাই জেলে গেল। বন্দের বাড়ির আবুলকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। রাত্তিরে গানবাজনা বন্ধ হল। সেইবার মাষ্টার চাচার বাড়িতে শহর থেকে বাবুরা এল। মাষ্টার চাচা বাবুদের নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন। ব্যবস্থার কথা বললেন। বুঝিয়ে বুঝিয়ে বললেন। কাউকে কাউকে বাবুরা পুলিশের ভয় দেখাল। গ্রামের সবাই রাজী হল। কেউ আপত্তি করল না। মাষ্টার-চাচা বললেন। বাবুরাও বলল, ইনজেকশন নিলে শরীর ঠিক থাকবে। অসুখবিসুখ হবে না। বাড়তি সন্তান হবে না। বাবুদের কথায় রমজান খুসী হল। আর তার সংসার বাড়বে না। অসুখ হবে না।

একদিন সকালে ডাক্তার এল। ডাক্তার এসে ফিরে গেল। মাষ্টার-চাচাকে বকুনি দিল। ভয় দেখাল।

আগের দিন বিকেলে মিটিং বসল মসজিদের ইমামের বাড়িতে। ইমাম আল্লার ভয় দেখালেন। ফতোয়া দিলেন। কোরাণের বাণী পড়লেন, ইন্নাল্লাহা খাইরুর রাজিকিন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যদাতা'। ইমামের ফতোয়া শুনে সবাই নিশ্চুপ। একজন বলল, 'ইমাম সাবে ঠিক কইছেন। এসব বেদাআত--গুনাহ্ কবীরা।' তারপর আরেকজন বলল। আরেকজন বলল। এরকম করে করে সভায় হঠাৎ গুনগুন সুরু হল। উত্তেজনা দেখা দিল। স্থির হল, না এসব চলবে না। যে পয়দা করবে সেই খাওয়াবে। সে-ই রক্ষক।

পরদিন সকালে সবাই বাড়ি ছেড়ে পালাল। রমজানের উপায় ছিল না। সে-ও পালিয়ে গেল। মাষ্টার চাচার মুখ শুকনো। ভয়-লজ্জায় বাড়িতে বসে থাকলেন।

মাষ্টার-চাচা মহল্লায় এখন একা। মহল্লার বাইরে। সেদিনের পরের জোম্মাবারে তার বিচার হল। নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে সবাই তাকে ঘিরে ধরল। সকলের কাছে মাফ চাইতে বলা হল। মাষ্টার চাচা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাকে তোবা করতে বলা হল। তিনি শব্দ না করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। একবার, 'আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতে কোন অন্যায় করছি বলিয়া আমার মনে অয় না' বলেই তিনি তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। সভায় সাব্যস্ত হল, কেউ তার বাড়িতে যাবে না। বিপদ-আপদ, পালা-পার্বনে ডাকবে না। এড়িয়ে চলবে। মাষ্টার-চাচা আর মসজিদে আসেন না। নামাজ পড়েন অন্যত্র। বোয়ালিপারে।

রমজান অতসব বোঝে না। সারাদিন দিন-মজুরী করে। বাড়ি ফেরে রাত্তিরে। ফিরেই যা আছে শাক-ডাল দিয়ে খেয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। সে ভাবে মাষ্টার চাচা কোন অন্যায় করেন নি। পরোপকারী মানুষ। সকলের ভালো চান। অন্যের বিপদ-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই যে একবার রমজানের ছোট ভাই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। অনেকদিন খোঁজখবর নেই। রমজানের চাচীমাই কেঁদে কেঁদে আকুল। নিমাইকে বুকে-পিঠে করে বড় করেছেন। তার চোখে নালা বইল। মাষ্টার-চাচাকে ধরা হল। কাকে যেন চিঠি লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর এল। নিমাইও কয়েকদিন পর চিঠি লিখল, না নিমাই লিখেনি, লিখতে জানে না। অন্যকে দিয়ে লেখাল। চিঠি পেয়েই চাচী ছুটল মাষ্টারের বাড়িতে। সেদিন রমজান বাড়ি নেই। জিলায় গেছে। শিলচরে। এ'টো হাতে মাষ্টার উঠে এলেন। চিঠি পড়ে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলেন।

শিক্ষার গুণ থাকলেই এরকম। কাজে-কর্মে এক নম্বর। কথাবার্তায় বেপরোয়া। এই ভাতু বাঙাল, হালুয়া বাঙাল লোক-গুলো তার কদর কি বুঝবে? এখন বুঝবে না। একদিন বুঝবে। রমজান মনে মনে ফিসফিস করে। সেই তো আরেকবার চিঠি এল নিমাইর অসুখ, মারাত্মক। মরণাপন্ন। চিঠি পেয়েই রমজান আর তার চাচী দিশাহারা। নিমাই আসামে থাকে। নওগাঁ জেলায়। রমজান কোনদিন আসাম যায়নি। আসামী গাড়ি চড়ে নি। আসাম যাবার কথা ভাবতেই তার বুক কেঁপে উঠল। সে মাষ্টার-চাচার আশ্রয় নিল। মাষ্টার অভয় দিলেন। দুদিনের মধ্যেই সব প্রস্তুত। টাকা-পয়সা সব যোগাড় করলেন মাষ্টার। গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে আসলেন মাষ্টার। তিন-দিনের দিন তারা রওয়ানা দিল। বদরপুরে পেঁ'ছেই সে এক বিরাট কাণ্ড। বিরাট স্টেশন। পরপর দীর্ঘ রেলগাড়ি আসছে। লোকের পিল পিল ভিড়। রমজান অবাক হয়ে দেখছে। রমজান এই প্রথম দেখল যে, হাইলাকান্দির থেকেও বড় স্টেশন আছে। আগে লোকের মুখে লামডিং স্টেশনের গল্প শুনেছে। বদরপুরের গল্প শুনেছে। গল্প শুনে অনুমান করতে পারেনি, এত ভিড়, এত লোক এত গাড়ি' মাষ্টার রমজানকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে জল আনতে গেলেন। রমজান অবাক হয়ে

স্টেশন দেখছি। তার মাথায় মারকীনে সাদা গোল টুপি। পরনে লুঙ্গি। হঠাৎ একটি লোকের চীৎকার শুনে তার চমক ভাঙ্গল। ফিরে তাকিয়েই দেখে পুলিশ। তার মুখ শুকিয়ে গেল।

'কি চাচা কবে আইছেন।' রমজানের বুক ধড়পড় করে ওঠে। না জানি কি বিপদ!

'আইজ আইজ বাবু। রমজান উত্তর দিল।'

'কই থাইক্যা আইছেন। পাকিস্থানে কোন জায়গায় বাড়ি?' কথাটা শুনেই রমজানের প্রাণ উড়ে গেল।

'আমার বাড়ি পাকিস্থানে নায় বাবু। অউ হাইলাকান্দিত।' রমজান ভীত-কণ্ঠে জবাব দেয়।

'কি প্রমাণ আছে?'

'আমার সঙ্গে আমার চাচা আছেন। তাইন মাষ্টার। তার সঙ্গে আমার পরিচয় লেখা আছে।'

'কি পরিচয়?' পুলিশ ধমক দিল।

আমরার পরিচয় আর কি।

'বুঝছি। আসেন, আসেন, সঙ্গে আসেন। থানায় যাইতে অইব।' পুলিশের কথা শুনে রমজান অবাক। এ আবার কি বিপদ রে বাবা! কোন অপরাধ করিনি! কারো শাক-ডালে হাত দিই নি। এইবার থানায় যাও। সে দাঁড়িয়ে থাকে। কাঁপে।

'আচ্ছা শুনইন বাবু, আমার চাচা পানী আনতে গেছেন। আইতে দেইন। একটু সবুর করেন।'

'না না আস, আর দেরী কইরো না।' পুলিশ এইবার লাঠি ঠুকে ধমক দিল।

'সঙ্গে কত টাকা আছে?'—আরেকজন পুলিশ, যে অতক্ষণ কোন কথা বলে নি জিজ্ঞাসা করল।

টাকা আমার সঙ্গে নাই। টাকা চাচার সঙ্গে।' রমজান ভয়ে তার চাচার আসার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে যেন দু'তিন ঘণ্টা চাচা চলে গেছেন। আসছেন না। এমন সময় মাষ্টার-চাচা এসে পড়লেন।

'চাচা এরা কইন, আমি নাকি পাকিস্থানী।' মাষ্টার চাচা হাসেন। তাঁর ঠোঁটে তাচ্ছিল্য।'

'অয়, অয় তুমি পাকিস্থানী। হাইলাকান্দি কি পাকিস্থানে পড়ছে।' পুলিশের দিকে তাকিয়ে মাষ্টার জিজ্ঞেস করলেন। পুলিশ নিরুত্তর।

'আমার মাথাত্ কেপ নাই। মুখে দাড়ি নাই, পেন্ট পরছি বলিয়াউ আমি ভারতীয়, আর তুমি পরছ না, দাড়ি রাখছ, মাথাত কেপ দিছ, তুমি পাকিস্থানী।' মাষ্টার খোঁচা মারলেন। পুলিশ অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে। লোকের ভিড় জমে উঠল। একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাবু পুলিশদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন 'কেন মিছামিছি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে আপনারা ঝামেলা করেন?'

'এটা আমরার দায়িত্ব; উপর-আলার আদেশ।'

'আর দায়িত্ব, দেখাই বা না। আমরা আপনারার অনেক দায়িত্ব দেখছি।' একটি ছেলে, ছাত্র ছাত্র চেহারার সে ফোড়ন কাটল। মাষ্টার চাচার চোখমুখ লাল। আগুন বেরুচ্ছে। কথার তোড় দেখার মত। আশ-পাশের লোকজনের সায় পেয়ে মুখ দিয়ে ফট্ ফট্ করে ইংলিশ বেরুচ্ছে। পুলিশ বেহায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলতে পারছে না। যেতেও পারছে না। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে কিছুক্ষণ পর একজন বলল, ঠিক আছে সাযেব, আপনারা যাইতে পারেন।

'আমরা তো যাবই।' মাষ্টার চাচা তবুও ছাড়েন না।

'সাধারণ অশিক্ষিত গরীব মানুষ পাইয়া যা ইচ্ছা করবেন। ঘুষ খাইবেন। এই তো আপনাদের দায়িত্ব।' পুলিশরা কোন জবাব দিল না। চলে গেল। স্টেশনে আসামের গাড়ি ঢুকল, দীর্ঘ গাড়ি।......

মাষ্টার-চাচার জন্যে দুঃখ হয়। কেউ তার বাড়িতে যাওয়া আসা করে না। মহল্লার নিষেধ। ইমামের নিষেধ। রমজানের ইচ্ছে হয়। রমজান পারে না। মহল্লার ভয়।

রমজান আবার পাশ ফিরল। ঘুম আসছে না। বউ ঘুমিয়ে পড়েছে। বউ শুকনো কাঠ। শরীরের রং ধবধবে ফর্সা। এখনো লণ্ঠন জ্বলছে। ঝড়-বিষ্টির দিন সময়-অসময়ে আলোর দরকার। পোয়াতি মেয়েমানুষের কত প্রয়োজন! ছেলেটাও বজ্জাত। সারারাত যন্ত্রণা দেয়। লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। বউ ঘুমোচ্ছে। বউয়ের পায়ের কাপড় হাঁটুর উপর উঠে এসেছে। রমজান চোখ খোলে। চোরের মত ধীরে ধীরে মাটিতে পা রাখল। নেমে বিড়ালের পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল। সন্তর্পণে। ভয়, যদি শিশুটা জেগে ওঠে। বউয়ের শরীরে হাত লাগাল। বউ আঁতকে উঠল। রমজান বউয়ের শিয়রে রাখা লণ্ঠন নিবিয়ে দেয়ার জন্যে হাত বাড়াল। এক হাত বউয়ের শরীরে। ছলমা চেঁচিয়ে ওঠে। 'আহ্ আর জ্বালা ভালা লাগের না। এমনউ গরমের জ্বালায় মরি, অউ দেখো যন্ত্রণা।' রমজান সাহস হারিয়ে ফেলে। চুপচাপ বসে থাকল। খাটের ওপর থেকে সেজো ছেলে রসিদ ডেকে উঠল, 'বাজান, বাজান, আমার ডর করে।' রমজান নীরব। সেজো ছেলে আবার ডাকে। রমজান মনে মনে ফিসফিস করে, 'ধেৎ হারামির বাচ্চা, চুপ থাক।' ছেলেটি কান্না জুড়ে দিল। 'বাজান, বাজান, আমার কাছে আও।' রমজান আর পারে না। রমজান সাড়া দিল।

'বাবারে পুত্, আমি পেসাব করতে গিছলাম, আইতেছি, রমজান আবার ধীরে ধীরে পা ফেলে খাটের উপর উঠল। বসল।' শুয়ে পড়ল। না এরকম আর পারা যায় না। ইচ্ছে করে আরেকটা শাদী করে ফেলি। রমজান দম বন্ধ করে শুয়ে থাকল। রমজান শুয়ে শুয়ে ভাবে আল্লার কপালটা খারাপ। নির্ধনের আল্লাও নির্ধন। বউ বছর বছর পোয়াতি হচ্ছে। একের পর এক পয়দা করছে। রমজান অত সন্তান চায়নি। সে চেয়েছে তিনটে বা চারটে! অথচ তার চাওয়া না চাওয়াকে পরোয়া করে? পরপর খোদার হুকুমে ওপর থেকে পড়ছে। খোদার হাল-চালও সে বোঝে না। খোদাও কি রকম যেন কঠিন। নিষ্ঠুর। মোল্লা মুনশীরা বলে সন্তান আল্লার নেয়ামত, আশীর্বাদ। রমজান ভাবে দু-তিনটে সন্তান নেয়ামত হতে পারে, গাদা গাদা নয়। মোল্লা-মুনশীরা ওয়াজ নসিহত করে। উপদেশ দেয়। কিন্তু সন্তানের ভরণ-পোষণ করতে হয় রমজানকে। সারাদিন অন্যের মজুরী করে করে শরীরের রক্ত জল হয়। তবুও অভাব ঘোচে না। বছর বছর সংসার বাড়ছে। সংসারে লোকজন কম থাকলে তাকে অত কষ্ট করতে হত না। দিনের আয় দিয়ে দিন চলত। এখন রোজ সাত টাকা রোজগারেও দিন চলে না। তিন কেজি চাল লাগে। তাছাড়া তেল নুন আরো কত খরচ! চার-দিকে অভাব। টানাটানি। আর ভালো লাগে না। অভাবের কথা ভাবতে গেলে রমজানের মাথা গরম হয়ে আসে। ঘুম উড়ে যায়। সে ঘুমোবার সময় মনকে খালি করে রাখে। ধারবাকী কম হয়নি। দোকানদার আর বাকী দিচ্ছে না। দেবেই বা কেন? দেনা শোধ করতে পারে না। রমজান বাজারের নিতাই মহাজনকে দেখলে পালিয়ে যায়। চোরের মত লুকিয়ে পড়ে। এরকম এলো-মেলো বহু কথা এখন তার মাথায় ভিড় করে আসছে। সে কোন কথাই আর স্থির হয়ে ভাবতে পারছে না। ভাবতে ভাবতে রাত শেষ হয়ে যাবে, মোরগ ডাকবে। রমজান পাড়বে।

রমজানের ঘুম আসে না।

রমজান আল্লার লীলা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। রমজান মিথ্যে বলে না। কারোর বদনাম করে না। কারোর লোকসান করে না। পাঁচ বেলা নামজ পড়ে। রোজার মাসে তিরিশটা রোজা রাখে। তবুও তার অভাব ঘোচে না। সে সন্তান চায় না। তবুও তার ঘরে পরপর সন্তান নেমে আসে। সত্যিই লীলা বোঝা মুস্কিল। সেদিন লোকটা মারিফতী গান করে করে তার মনের কথাই যেন বলে দিল।

আমি করি জিকির
তুমি বানাও ফকির
কাঙ্গাল বানাইয়া তুমি
কি যে কর ফিকির,
বুঝি না বুঝি না মওলা
তুমার অনুভব গো!

সত্যি রমজানের মনের কথা! না রমজান এসব কথা ভাববে না। এসব ভাবতে গিয়ে তার ভয় হচ্ছে। সে এতক্ষণ মনে মনে না-ফরমানী করল। তোবা! সে অনুতাপ করে। অয়াসতাগ ফিরুল্লোহা ইন্নাল্লাহা গফুরুর রাহিম। আমি আল্লার কাছে ক্ষমা চাইছি। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল। করুণাময়। সে দরুদ পড়ল। ছোয়া পড়ল। আল্লাহ আমি গুনাহগার। নাদান বান্দা। আমাকে ক্ষমা করো। তুমি দয়ার সাগর।

অথচ সেই বাউলা-কটি। আবার রমজানের মন ছুট লাগালো। নামাজ পড়ে না। রোজা রাখে না। জুয়া খেলে। ছেলে-

বাজী করে তাই ঘরে অভাব নেই সে বেপরোয়া। তার ফুটফুটে দুটো ছেলে। একটা মেয়ে। দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বাড়ির ভেতরটাকে যেন মহল করে রেখেছে। ঠিকাদারী করে করে ট্যাক্সি কিনল। মিরাশ বানাল। সবাই তাকে সালাম করে, মসজিদের ইমামও তার বাড়িতে ঘন ঘন দাওয়াত খেয়ে আসেন। তার সঙ্গে কথা বলেন সম্মানে। আস্তে, ধীরে হিসেব করে। রমজান এসব মহিমা কিছুই বোঝে না। আল্লার অপার মহিমা।

আবার আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। কড় কড় বাজ পড়ার শব্দ হল। রমজান আঁতকে উঠল। বিদ্যুৎ ছিটকে এসে এক ঝলকে ভয়ংকরের রূপ দেখিয়ে গেল। রমজান ভয় পায়। সে দোয়া পড়ে। তোবা করে। সে মনে মনে আজ অনেক পাপ করে ফেলেছে। সে অনুতাপ করে। বাইরে জোর বাতাস বইছে। উত্তরে বাতাস। নিশ্চয় এবার বৃষ্টি আসবে। উত্তরের বাতাস বইলেই ভীষণ ভয় করে। হয়ত বা ঝড়। ঝড়ের কথা ভাবতেই রমজানের গা শিউরে ওঠে। এবার প্রচুর আম-জাম। আম-জাম ঢের হলে ঝড় আসে। সে ঘরে ঠেকনা দেয়নি। ঘর নরম। পুরনো। চাল পচে গেছে। খড়ের চাল। বৃষ্টি এলে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ে। বিষ্টি আসুক আপত্তি নেই। দুনিয়া ঠান্ডা হবে। ঝড় আসলে বিপদ। এই বাঁশ-বেতের ঘর, নল খাগড়ার বেড়া সইতে পারে না। থর থর করে কেঁপে ওঠে। মড় মড় শব্দ হয়। রমজান মনে মনে ঝড়ের প্রকোপ থেকে মুক্তি চাইল। বাতাস ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাঁশ ঝাড় আর সুপারী গাছের পাতায় সাঁ সাঁ শব্দ। রমজান নিজেকে সান্ত্বনা দিল, না, খোদার রহমতে ঝড় আসবে না। হাল্কা হাওয়া এলে গাছের পাতা এমনিতেই শব্দ করে। কিন্তু না, বাতাসের শরীরে যেন এক ভয়ানক কাণ্ড লুকিয়ে আছে। বাতাসের জোর ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে। বিষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি, থেকে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এলোপাতাড়ি বৃষ্টি। এ বৃষ্টি বড় ভয়ংকর। বৃষ্টির জল এসে আছড়ে পড়তে থাকে বেড়ার গায়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাসের শব্দ আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। বৃষ্টি আরো প্রখর, আরো দুর্দম হল। সে বুঝতে পারল ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তবু ও শুয়ে থাকল। জল বেড়ার ওপরের জাবিকাটা ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর আছড়ে পড়ছে। বাইরে তোলপাড়। ধাপা-ধাপি। মারামারি। ছলমা আর শুয়ে থাকতে পারল না। উঠে পড়ল। তার ওপরে বৃষ্টি পড়ছে। মেয়েরাও উঠে পড়ল। শুয়ে থাকতে পারল না। ছলমা লন্ঠনের আলো বাড়িয়ে দিল। ঝড়ের শব্দে ভয় পেয়ে শিশুটার চিৎকার ক্রমশঃ ঝড়ের সঙ্গে এক হয়ে গেল। রমজান হুমকি দেয়। 'হেই লেনটনের আলো কমাও, বাজ পড়ব।' ছলমা আবার বাতি নামিয়ে দিল। ঘরের বাইরে সোমাল শব্দ বাঁশের বেড়ায় কেউ যেন হরদম চাবুক মারছে। শিল এসে ঘরের ভেতর ছিটকে পড়ছে। হয়ত আর থাকা যাবে না। ঘর বুঝি উড়ে যাবে। ছলমা ঘুট ঘুট করে—সারা বছর টো টো, ঢো ঢো, আমি কই ঢিক লাগাও, ঘর নরম অই গেছে, ইয়ায় খেয়াল নাই, এখন মরো। আমরারে ও মারো।'

'থাম লাঙ্গির ঘরর ল্যাঙ্গা। তুফান অইছে, চুপ কর। আল্লার নাম লইতে না বকবক করতে।' রমজান ক্ষেপে উঠল।

'উঠো লেড়ীর ঘরো ধুড়ী, আল্লার নাম লও।' ছলমা বাঁশের দরজা চেপে ধরে বড় মেয়েকে ধমক দিল। দরজায় কেউ যেন বাইরে থেকে বার বার লাড়ি ছুড়ছে। দরজা টিকবে না। ভেঙ্গে যাবে। ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে বসে আছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অসহায়। ঘরে জল পড়ছে। শিল পড়ছে। বড় মেয়ে শুরু করে, 'খাগ নলর ঘর, খোদায় রক্ষা কর। খাগ নলর ঘর, খোদায় রক্ষা কর।' খাগ নলর ঘর, খোদায় রক্ষা কর।' অন্যরা ওর সঙ্গে সুর করে করে বলতে থাকে। ঝড় এখন তুঙ্গে। পরপর দূরে-অদূরে বাজ পড়ছে। গাছপালা ভেঙ্গে পড়ার শব্দ হচ্ছে। রমজান বিমূঢ়। যেন কেউ এসে হাতপা বেঁধে রেখে গেছে। কিসের ওপর ভর করে এখনো সে ঘর দাঁড়িয়ে আছে সে ভেবে পাচ্ছে না। রমজান আর বসল না। উঠে পড়ল। আজান দিতে সুরু করল। আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর। সে দিয়ে যাচ্ছে। আল্লার দয়া হবে। ঝড় থামবে। লণ্ঠনের আলোয় তার মুখ দেখা যাচ্ছে। আজানের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তার দাড়ি নড়ে উঠছে। তার গায়ের গেঞ্জি ছেঁড়া ও ময়লা। পরনে লুঙ্গি। আজান দিতে সুরু করলে বড় মেয়ে উঠে এসে বাপের মাথায় একটা কাপড় রেখে গেল। রমজান চেঁচিয়ে আজান দেয়, 'আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর। লা ইলাহা ইল্লালাহ মহান, (আল্লাহ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই।) তার আজান শুনে শুনে মেজো ছেলেও জপে; 'লা ইলাহা ইল্লালাহ।' রমজান এগিয়ে যায়, 'আশহাদু আন্না মোহাম্মদার রাছুলোল্লাহ।' (নিশ্চয় মোহম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ।) আজানের অর্থ রমজান জানে না। ছেলে-মেয়েরা জানে না। বউ জানে না। শুনে শুনেই আজান মুখস্থ হয়ে গেছে। তারা অর্থ জানার প্রয়োজন মনে করে না। রমজান সুর করে করে গলা কাঁপিয়ে বলছে। অন্যরা মনে মনে। তাদের কাছে এ আজান অর্থহীন। ছেলেরা বাপের আজানের সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। ভয়ে। বিশ্বাসে। অভ্যাসে। রমজান শেষ দু লাইন, 'আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর, লা ইলাহা ইল্লালাহ,' চেঁচিয়ে বলতেই ঘরের পেছনের বড় আম-গাছটা মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ল। ভয়ে আঁতকে উঠল রমজান। মুখের দুর্বোধ্য শব্দগুলো ছাড়িয়ে ছিটকে চুরমার হয়ে গেল। আজান বন্ধ। সে অজান্তে খাটের দিকে লাফিয়ে পড়ল। ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে ওঠে। ভয়ার্ত চিৎকার। কিন্তু না গাছ ঘরের ওপরে পড়েনি। তবে কোথায় পড়ল? যাক রক্ষা। এ গাছ ঘরে পড়লে ঘরের পুরনো মাচার সঙ্গে সবকটা মানুষের হাড়-গোড় চুরমার হয়ে যেত। আল্লাহ্ রক্ষা করেছে। ছেলেমেয়েরা আবার শব্দ করে

করে বলতে শুরু করে খাগনলের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।' একে একে শব্দ আসে। বাজ পড়ার শব্দ। বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। রমজান আর লা-হাওলা পড়তে পারছে না। অনেক পড়েছে। 'অ আল্লা তুমার দুনিয়া তুমি রক্ষা করো' বসে ছলমা বিলাপ করল। জালিম-বাতাস আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ ওপর দিয়ে ঢুকে মাচা সহ একটা চাল উড়িয়ে নিল। খোদার রহমত আসমান দেখার সুযোগ করে দেয়। ঝম-ঝম করে জল গড়িয়ে পড়ে। আর থাকা যাচ্ছে না। ছলমা কোলের শিশু নিয়ে খাটের নিচে আশ্রয় নিল। মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও ঢুকে পড়ল। সবাই একে অন্যকে জড়িয়ে বসে থাকল। শীতে ঠুক ঠুক করে কাঁপছে। ঘরের পুরনো জিনিষ-পত্র, লটকানো মাটির বাসন, হাঁড়ি-ঝুড়ি একে একে ছিঁড়ে পড়ছে। ছলমা চোখ বন্ধ করে বসে আছে। না দেখার মত। প্রতিবাদহীন। অগত্যা রমজানও ধানের খালি গোলার নিচে আশ্রয় নিল। গোলার নিচে ছাগল। মোরগ। হাঁস। ছাগলের গোচ্ছাপ আর বিষ্টির জল এখন একাকার। হাঁস মোরগ চিৎকার করছে। ছাগল চিৎকার করছে। ছলমার কোলের শিশু চিৎকার করছে। বাতাস তাণ্ডবলীলায় মত্ত। রমজান আর পারে না। সে ক্রমশঃ পাথর হয়ে উঠছে। সে আল্লার রহমত দেখছে। এইবার প্রবল হুংকারে তার ভিতর গর্জে উঠল। কিন্তু কোথায়? কিসের ওপর? 'আল্লা রক্ষা করো,' তবুও মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। বাতাস একবার থামে। ঝিম ধরে। আবার আক্রমণকারীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইবার ঘরের দক্ষিণ-পূবদিকের দুখানা বেড়া উড়িয়ে উঠোনে ছুড়ে মারল। ছেলেমেয়েরা আর কাঁদছে না। 'খাগনলের ঘর' বলছে না। হাঁস মোরগও থেমে পড়ল। শিশুটিও কাঁপছে না। ধাপাধাপি চলছে। শিলাবিষ্টি তোড়ের মুখে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকায়। বজ্রাহত শরীরের মত সারা পরিবার নিস্তব্ধ। রমজান আর দোয়া পড়ছে না। গোলার নিচের কাঠের খুঁটির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল। বৃষ্টি তার উপর আছড়ে পড়ছে, ঠান্ডা শিল আছড়ে পড়ছে।

বৃষ্টি কমে এল। ঝড় থেমে এল। বাতাসে গাছের পাতা এখনো পত্‌ পত্‌ করছে। ছলমা ভেজা কাপড়ে কোলের শিশু নিয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। শিশুটা নীরব। অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল। ছলমার বড় মেয়ে খাঁচার হাঁস-মোরগ ছেড়ে দিল। ছাগলটা ডাকছে। নিচে জল। পূবদিকে উঁকি দিচ্ছে আধা-আঁধারী ফর্সা ভাব। সারাটা বাড়ি সাফ। সুপারী গাছ উপড়ে হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। দুর্ঘটনায় ক্ষত-বিক্ষত মড়ার মত এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে, গাছ, গাছের ডালপালা। এখনো ফিনফিনে বিষ্টি। কিছুটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে এখনো বিদ্যুৎ ঝলক দিচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে গাছপালার ভগ্নাবশেষ। খাটের তলা থেকে বেরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রমজানের সেজো ছেলে, উলঙ্গ মন্তব্য করল 'এক তুফান রে বাবা। হল্লার হালা তুফান!' ছলমা ছেলেকে মানা করে। 'হেই পারে না। আল্লায় মারবা'।

একই বাড়িতে দুটো ঘর। একটা রমজানের। পাশের ঘর থেকে অস্পষ্ট আলো ভেদ করে মিজান আলির ডাক এল।

'অ রমজান, রমজান, তুমরা আছ নি রে'।

'আছি। আছি।' রমজান আওয়াজ বাড়িয়ে উত্তর দেয়। 'আমার ঘর আমার উপরে।' আওরে। আমারে বাঁচাও।' মিজান আলির বিলাপ শুনে ধড়াস করে উঠল রমজানের বুক। দিশাহারার মত ছুটল। অনেকদিন মিজান আলির সঙ্গে তার কথা নেই। মিজান তার আপন চাচা। একমাত্র। দুজনের সদ্ভাব নেই। মাটি-বাড়ির ঝগড়া। কিন্তু এখন বিপদ বলে কথা! রক্তের টান! রমজান দুই ঘরের সীমানার বাঁশের বেড়া টপকে ও-ঘরের দিকে ছুটল। ছেলেমেয়েরাও এই বিপদে বেহুঁশ। ছুটল। রমজান মিজানের ঘরের কাছে গিয়েই চিৎকার করে ওঠে, ইয়া আল্লাহ, আস্তা ঘর উপইড'। ঝড়ের সময় আমগাছ ভেঙ্গে পড়ল, মড় মড় শব্দ হল। রমজান ঠাহর করতে পারেনি গাছ কোথায় পড়ল। প্রথমে ভেবেছিল তার ঘরের ওপর, ভেবেই সে আজান ভেঙ্গে খাটের দিকে লাফ দিয়েছিল। গাছ পড়েছে অন্য জায়গায়, এই ভেবে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। গাছ চাচার ঘরে পড়েছে একবারও ভাবে নি। পেছন দিকে গিয়ে দেখল, বিরাট আমগাছ ঘরের চালের উপর দিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। আমের ডালপালা ঘরের ওপর।

'চাচাজী, চাচাজী তুমি কই?' রমজান গলা ছাড়ল।

'আমি চকির তলে রে।' অনেকদিন পর আজ ওরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলল।

'মাই কোন খান?' রমজান তার চাচীকে মা বলে ডাকে।

'কোন সাড়া-শব্দ পাইয়ার না রে।' তুফানের সময় একবার চেঁচানি শুনলাম, আর নড়াচড়া নাই।' বিপন্ন মিজানের উত্তর শুনে রমজান ঘাবড়ে গেল। 'মনে হয় বেহুশ অইয়া পড়ি রইছে।' মিজান আবার বলে। রমজানের বুকের ভেতর ধড়ফড় করে। ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে আসছে। চোখ খুলছে নিস্তব্ধ প্রভাত। সব বাড়ি থেকেই হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। সব বাড়িতেই একটা-দুটো ঘর ভেঙ্গে পড়েছে। রমজান বড় দু ছেলে পাঠিয়ে হাঁক-ডাক করে এবাড়ি-ওবাড়ির লোক নিয়ে আসল। তিন-চার মিনিটের মধ্যেই লোকজন ছুটে আসল। ছলমাও প্রায় বেহুঁশ। 'ধরো, ধরো, দা আনো, কুড়াল আনো, গাছ কাটো'—শব্দে রমজানের বাড়ির শোরগোল [illegible] পেরিয়ে, সামনের বিল পেরিয়ে বিকু-ঘরের দিকে ধাওয়া করল। পাড়া-প্রাতবেশী উদ্ধারে নামল। ঘর মাটিতে চেপটা। মাচা চুরমার। কেটে কেটে প্রথমে খাটের চারদিক পরিষ্কার করা হল। মিজান খাটের তলায় চিত, বে-কাবু। নড়াচড়া করতে পারছে না। মিজান আলির বয়স ষাটের কাছাকাছি। দুই মেয়ে ছিল। বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে এখন বুড়োবুড়ী। বুড়ী অসুস্থ। খাট সরিয়ে মিজান আলিকে বের করা হল। দাঁড়াতে গিয়ে মিজান 'আহ' করে বসে পড়ল। 'আমার কোমর নাই রে, আমার কোমর নাই।' মিজান শিশুর মত ভেঙ্গে পড়ে। 'কি গুনাহ করলাম রে আল্লা এই শাস্তি দেও!' মিজানকে ধরাধরি করে উঠোনে নিয়ে আসা হল। ধরে বসানো হল। কোন-মতে বসল।

ধানের গোলার কাছে দু-তিনটে ধানের বস্তা। গাছ গোলার ওপর দিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। গোলার বাঁশের বেড়া চুরমার। মিজান আলির স্ত্রী গরমের জ্বালায় গোলার পাশেই খালি মাটিতে শুয়েছিল। একটি ড্রাম গোল হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। অনেকটা পিপের মত। ড্রামের ওপর বস্তা। বস্তার ওপর গোলার কাঠ বাঁশ। বেড়া। গোলার ওপর গাছের বড় বড় ডাল। সবকিছু পরিষ্কার করা হল। মিজান আলির স্ত্রীর শরীর বেরোচ্ছে। শরীর অনড়। শরীরে কাঠের নিস্তব্ধতা।

'নাই মনে কয়। কলমা পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' পাশের বাড়ির একজন শরীরে হাত দিয়েই বলে উঠল। অন্যরা এগিয়ে এল। তাড়াতাড়ি ড্রাম-বস্তা সরানো হল। সরিয়েই একজন আঁতকে উঠল। ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল। ক্ষতবিক্ষত বিকৃত মুখ দেখে প্রথম যে চিৎকার করে উঠল, তার নাম রমজান। 'মাই, মাই গো, বলে মড়ার উপর আছড়ে পড়ল। রমজানের মা শৈশবে মারা যায়। এই নারী রমজানকে আর তার ছোট ভাইকে বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছে। রমজান আর তার ছোট ভাই বড় হয়েও অনেকদিন পর্যন্ত এই নারীকে মা বলে জানত। মা বলে ডাকত। একবার রমজানের বিয়ের পর দুজনের ঝগড়া হল। কথা বন্ধ হল। রমজান আর মুখ খোলেনি। অনেকদিন মা-ই বলে ডাকেনি। অভি-মানের বুকে লাথি পড়ল। সমস্ত শক্তি দিয়ে গলা ফাটিয়ে শেষবারের মত মড়ার শরীর জড়িয়ে চিৎকার করে করে ডেকে উঠছে, মাই, মাই, মা-ইগো। লক্ষীর বন্দে তখন আবার বৃষ্টি নামল। তুমুল বৃষ্টি। কথা বন্ধ হল। রমজান আর মুখ খোলেনি। অনেকদিন 'মাই' বলে ডাকেনি। আজ রমজানের ওপর বৃষ্টি চাবুক মারছে। টপ্‌ টপ্‌ করে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ছে তার পিঠের ওপর দিয়ে। তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকল। সে নির্বাক। কোলের শিশু আবার কেঁদে উঠল। পড়শীরা দাঁড়িয়ে থাকল। নিস্তব্ধ। বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি।

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

।। আট ।।

অতীশ অফিসে আজ ভাল করে কাজে মনযোগ দিতে পারল না। ভারি অসম্মান এবং অপমানে সে কেমন প্রায় চুপচাপই ছিল। বিল ভাউচার এলে সই করে দিয়েছিল. পার্টির কাছে তাগাদার একটা লিস্ট পড়ে আছে। সে আজ টাকার জন্য কাউকে তাগাদা দেবার পর্যন্ত উৎসাহ পেল না। কুম্ভবাবু বাইরের ঘরে বসে সেল ট্যাকসের রিটার্ণ করছে। সুপারভাইজার বলে গেছে, বার্নিশ ভাল দেয়নি। পাণ্ডিং এ রং চটে যাচ্ছে। ডাইস খারাপ হতে পারে—এসব কথাবার্তা কিছু এবং জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে সেই শিউলালের ঘর। সে কলপাড়ে বসে গা ঘষছে। পাশ থেকে জল নিচ্ছে লাইনবন্দী লোকেরা। সে সুরেনকে কিছু বলেও আসেনি। নব হয় ত আসবে। নব আসবে এই ভয়ে সে খুবই বিমর্ষ বোধ করছিল। আসলে সে সুরেনের মনে একটা প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল—সেই প্রত্যাশা সে পূরণ করতে এই মুহূর্তে অক্ষম। কেন যে বলতে গেল নবকে পাঠিয়ে দিও। অথচ এই নিয়ে কুম্ভবাবুর সঙ্গে আলাপ করলে মনটা হাল্কা হতে পারে। দুবার কুম্ভবাবু তার ঘরে এসে একটু বসার তাল খুঁজছিল। কিন্তু চুপচাপ থাকায় বিল ভাউচার সই করিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

আর সব কিছুতেই কেমন এক অস্বাভাবিক কিছু মনে হচ্ছে তার। শহরের মানুষ সে নয় বলেই হয়ত তার এসব খুব অস্বাভাবিক ঠেকছে। কমলের সঙ্গে কথাবার্তা তার কিছুটা ভুতুড়ে ব্যাপার মনে হচ্ছে। আসলে কি তার ভেতর বৌরাণীকে দেখার পরই কমল অবচেতন মনে এসে আশ্রয় করেছে। সে রাতে কি কমলকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেছিল। কমলের ব্যবহারও ভারি বিস্ময়কর মনে হয়েছে তার কাছে। এসব বনেদি বংশে ভাঙ্গচুর হচ্ছে ঠিক, তাই বলে অন্দরে ডেকে নিয়ে যাওয়া! তার এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ঘটনাটা। মানসদা, নব, সুরেন এবং ব্রজন হত্যা সবই কেমন রহস্যজনক। নব নাকি সারাদিন সারারাত ভি আই পিতে গাড়ি গোনে। মানুষের এমন নিষ্ঠুর পরিণতি শহরে না এলে যেন সে বুঝতে পারত না। সেই পাখিটা তাকে হন্ট করছে। পাগলটাকে আজও দেখেছে একটা পালক বেঁধে লাঠিতে রাজাবাজারের দিকে বীর দর্পে হেঁটে যাচ্ছে। সে এই নগর জীবনের একজন মস্ত ব্যস্ত মানুষ যেন। সব কিছু অগ্রাহ্য করে কেবল হাঁকছে, দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। কখনও বলছে, দম মাধা দম, পাগলা মাধা দম। তার কত কাজ। এক মুহূর্ত তার বসে থাকার সময় নেই। যেন সে চুপচাপ থাকলে, বসে থাকলে পৃথিবীটা রসাতলে যাবে।

আর এ সময়ই বাড়ির জন্য মনটা কেমন হাহাকার করে উঠল। নির্মলা থাকলে আজ তাকে সব খুলে বলতে পারত। সব অপমান তা হলে সেই পাগলের মতো সেও অগ্রাহ্য করতে পারত। প্রায় মাস হতে চলল—কাজটাজ কিছুটা বুঝে নিয়েছে। পার্টিরা আসছে। এবং সে এ কদিনেই টের পেয়েছে, এই পার্টিদের সঙ্গে কুম্ভবাবুর একটা গোপন লেন-দেন আছে। কুম্ভবাবু সহজেই দশ-বিশ টাকা ট্যাকসি খরচা করতে পারে। বৌকে নিয়ে ট্যাকসি ছাড়া ঘোরে না। নামী রেস্তোরায় বৌকে নিয়ে প্রায়ই রাতের খাওয়া-দাওয়া সারে। বৌকে প্রায়ই নতুন নতুন শাড়ি গয়না কিনে দেয়। এমন অভিযোগও তার কানে এসেছে। লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে বলেছে কেউ। সে নিজেও ভারি ফিটফাট থাকে। সামান্য মাইনেতে এটা কি করে সম্ভব সে বুঝে উঠতে পারে না। কস্টিং দেখা দরকার। সবটা বুঝে না নিতে পারলে সে আপাতত কাজটা করতে পারছে না। তার জন্য প্রাণপণে সে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাইছে।

হলে কি হবে—সেই এক পাগল বার বার হাঁকছে—এবং এই হাঁক থেকেই সে বুঝতে পারে, লোকটা তার কোন গল্পের নায়ক হতে চলেছে। এ বাড়িতে ঢোকার দিন, যেন তাকে দেখেই পাগলটা হেঁকে উঠেছিল—অথচ তার মনে হয়েছিল, অদৃশ্য কোন এক জগত থেকে সে হাঁকছে। এখন মনে হচ্ছে তার ভেতরে সব অপমানের জ্বালা এই পাগলটাই পারে নিঃশেষ করে দিতে। কারণ সে যখন লেখাতে দেখতে পায়, সেই মানুষ অবিকল উঠে এসেছে, তখন কেমন বিজয়ীর মতো তার উল্লাস—অহংকার অক্— — — —ক্ষ গ্রাস করে।

সে ক্যাশবুকের পাতা উল্টে যাচ্ছি কিছু ভাউচার এখনও ক্যাশবুকে : গেছে। ক্যাশবুকের সঙ্গে মিলিয়ে ি মার্ক দিয়ে দিচ্ছে। ক্যাশ এখন থেকে ‹ কাছে আছে। কোম্পানীর দায়িত্ব নে দ্বিতীয় দিনেই নির্দেশ এসেছে, ক আগলানোর দায় তার। কারণ টিফিন এ ট্র্যাভলিং-এ দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন এর বিরাট খরচের বহর। পার্টিদের ঘরে যাও আসা কাজটা, টাকা আদায়ের কাজটা কুম্ বাবু টিফিনের পরে করে থাকে। ট্রাে মানথলি কাটা আছে। টিফিনের পর তা আর পাওয়া যায় না। সে তখন প্র মুক্ত। ট্র্যাভলিং অ্যালাউন্স বাবদ, সে রোজ পাঁচ-সাত টাকা এখান থেকে নেয়। সন বাবু বলেছেন, এ দিকটা দেখতে। পার্টিে নাম চাইবে। মাঝে মাঝে ফোনে যোগাযে করবে। অর্থাৎ আকারে ইঙ্গিতে বিষয় যাচাই করে নিতে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু মুস্কিল, অতীশের মনে হয় এ মানসিক নীচতার লক্ষণ। সে আজ পর্য কোন কাস্টমারকেই ফোন করে বলাে পারেনি, কুম্ভ যথার্থই পার্টির ঘে গিয়েছিল কিনা।

এতে মনে হয় সে নিজেই পার্টি কাছে ছোট হয়ে যাবে।

এবং এই এক মাসে সে বুঝতে পারছে কাজটার পক্ষে সে খুবই অনুপযুক্ত কাজটার সঙ্গে তার মনের কোন মিল নেই। সাধারণ সব কাজই মানুষের একদিক একঘেঁয়ে ঠেকে—কিন্তু এখানে এসে মনে হয়েছে—সে জীবনে আর একটা বড় ভুল করেছে। তার তখনই কেন জানি ইচ্ছা হয় যদি কোথাও আবার শিক্ষকতার কাজ পায় চলে যাবে। কোন দূর গাঁয়ে, সেখানে থাকবে আদিগন্ত মাঠ, নদী ফুল পাহাড় উপত্যকা, এমন একটা জায়গায় তার চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে জানে, আপাতত যা মাইনে পাচ্ছে শিক্ষকতা করে সেটা সে উপার্জন করতে পারবে না। তাছাড়া নিরাপত্তাবোধের অভাবেও সে বিশেষ উদ্বিগ্ন। একটা লজঝড়ে কোম্পানীর প্রায় সব দায়িত্বভার তার উপর। টাকা আদায় কাঁচামাল সংগ্রহ, পার্টির পেমেন্ট, সেল টেকস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কন্ট্রিবিউশন সব জমা যথাসময়ে দেওয়ার দায়িত্ব তার। সে বুঝতে পারে এটা এখন তার জীবনের বড় ফ্রন্ট। আর একটা ফ্রন্ট সেই প্রেতাত্মা। ল্যারি হিগিনস যার সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তৃতীয় ফ্রন্ট তার স্ত্রী-পুত্র এবং বাবা-মা। আর চতুর্থ ফ্রন্ট সে নিজেই গলায় ফাঁসের মতো আটকে নিয়েছে—সেটা তার লেখা। সে বুঝতে পারল এখানে আজীবন তাকে চারটা ফ্রন্টে লড়তে হবে। আর তখনই আর একটা মুখ সুদূর থেকে ভেসে আসছে—সে আর কেউ নয়, বনি। সে একটা বোট দেখতে পায়। সেও এক গভীর গোপন ফ্রন্ট। বনি চঞ্চল বালিকার মতো পাটাতনে ছুটে বেড়াচ্ছে।

খনও হালে বসেছে। কখনও চপাটি তৈরি রছে। ছোটবাবুকে খেতে দিচছে। আর রপাশে খুঁজছে যদি কোথাও এতটুকু াঙ্গা চোখে পড়ে। শুধু হাহাকার সমুদ্র দে বনি কিছু আবিষ্কার করতে না ারলে বলছে, ছোটবাবু আমাদের কী বে?

ছোটবাবুর তখন অশ্বাস, এই দেখ র্ট। তিনি সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা র বরাবর গেলে, ঠিক সান্তাক্রুজ দ্বীপ য যাব। কোরাল সিতে সবচেয়ে কাছের ীপ ওটাই কম্পাসের কাঁটার দিকে লক্ষ্য থবে, যেন সাউথ-ইস্টে বোটের মুখ রে না যায়।

—তালে কি হবে?

—আমরা তবে অজানা এক সমুদ্রে য়ে পড়ব।

—তালে আমরা মরে যাব ছোটবাবু?

সেই মুখ কি করুণ আর অপার্থিব। লিকার চোখ সজল হয়ে ওঠে। কতদিন কে তারা সমুদ্রে ভেসে বেড়াচছে। সেই ব থেকে যেন। কোন দূর অতীতে মনে । বনি ডাঙ্গার মানুষ ছিল। এখন ুদ্রের সব রকমের হাহাকার দেখে সে ভান্ত হয়ে গেছে। এখন শুধু ছোটবাবুর তার বেশি চিন্তা। ছোটবাবু এতটুকু ভার করে থাকলে, কাছে ছুটে এসে টু গেড়ে বসে। —এই ছোটবাবু, বলে াটবাবুর থুতনি তুলে ধরে। বলে, বাবা ত্য কি বলেছে বল! বাবা আমাদের ুদ্রে ভাসিয়ে দিল কেন? সঙ্গে ক্রসটা য়েছে কেন? বাইবেল দিয়েছে কেন। মরা কি কোন পাপ কাজ করেছি?

তিনি তো বনি আমাদের নামিয়ে ার আগে বললেন—সমুদ্রের অশুভ াবে পড়ে যেতে পারি সেজন্য ক্রশটা টে তুলে দিলেন, বাইবেল দিলেন। সলে ছোটবাবু বলতে পারল না, আমরা র ডাঙ্গা পাব না। এই বোটেই আমরা । পড়ে থাকব। মাথার কাছে বাইবেল কবে। ক্রসটা থাকবে। আমরা মরে গিয়ে ার ভূত হয়ে না যাই—সেজন্য তিনি র ধর্মীয় কাজটুকু আগে থেকেই সেরে খছেন। তারপরই ছোটবাবু দেখল, সূর্য ত যাচছে। সমুদ্র শান্ত। পারপরেজ ছর ঝাঁক ভেসে আসছে। অতলে নীল ীর জল। যতদূর চোখ যায় শুধু ীম জলরাশি। ছোটবাবুর মনে হয়, নি সেখানে কোন অতিকায় প্রাণী ভেসে দবে। পাইলট মাছ দেখলেই বুঝতে ়, কোন নীল হাঙ্গর সমুদ্রের অতলে টি মেরে আছে।

বনি হাঁটু গেড়ে বসে আছে পাটাতনে। ার ওপরে বিশাল আকাশ। কোথাও টুকু মেঘ নেই। নক্ষত্রেরা ফুটে উঠছে ক একে। দূর থেকে ডানার শব্দ পাওয়া ছে। লেডি অ্যালবাট্রস উড়ে গেছিল, লে সন্ধ্যায় ফিরে আসছে। ফিরে এসেই চাপু হালটার মাথায় ঘাড় গুঁজে বসে থাকবে। আর অজস্র প্রশ্ন তখন বনির, এই এলবা ডাঙ্গায় খোঁজ পেলে। কতদূরে গেছিলে? আমরা ঠিক যাচছিতো। কোথাও জাহাজ জেলে নৌকা কিছু দেখলে?

ছোটবাবু পালের দড়িদড়া খুলে ফেলছিল। বনির চিৎকার তখন পরিত্যক্ত জাহাজটা সম্পর্কে, তখন একের পর এক প্রশ্ন করে যাচছে। ওরা কোথায়? কত দূরে? বাবা কেমন আছেন।

ছোটবাবু পালের দড়িদড়া এক জায়গায় জড় করে রাখছে। সে পাটাতন খুলে দেখল অয়েল ব্যাগটা ঠিক আছে কিনা। সমুদ্র এমন শান্ত থাকলে ভয়ের কথা। সে যেন বাতাসের গন্ধে ঝড়ের আভাস পাচ্ছিল।

সে বলল, বনি জল খাবার এখনও আমাদের মাসের মত মজুত আছে। দুই বুড়ো মনে হয় শেষদিকে নিজেরা কিছু খায় নি। অথবা বুড়োরা টের পেয়েছিল, জাহাজের পরিণতি এই হবে।

বনি বলল, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি এখনও আমাকে সত্যি কথা বলছ না!

ছোটবাবুর এখন ভারি অসহায় মুখ। তাঁর নির্দেশ আছে, বনি যেন জানতে না পারে এক অজানা সমুদ্রে ছোটবাবুর সঙ্গে বনিকে ভাসিয়ে দেওয়া হল। এখন একমাত্র যেন দৈবই তাদের রক্ষা করতে পারে।

ছোটবাবুর এই অসহায় মুখ দেখলেই আর্চির সেই দৌরাত্ম্যের কথা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বনি কেমন হয়ে যায়। গায়ে নীলাভ ফ্রক, মাথায় নীলাভ চুল, সামনেই ডাঙ্গা পাবে বলে সে বোটে উঠে এসেছিল। সে তার দামী দামী পোষাক, পারফিউম সঙ্গে এনেছে। সন্ধ্যা নামার আগে সে একজন নারীর মতো সাজতে বসে গেল। ছোটবাবুকে কষ্ট দিলে সে নিজেই বড় বেশি ভেঙ্গে পড়ে। তরপর প্লেটে খাবার, সামান্য জল। খাবার বলতে দুখানা চাপাটি, দুটো সারডিন মাছ, এক গ্লাস জল, দুটো আলু সেদ্ধ। নিজের জন্য বলতে গেলে বনি কিছুই রাখেনি।

ছোটবাবু পালটা ভাজ করে সব গিয়ারের সঙ্গে ফেলে রাখল। কম্পাসের কাঁটা দেখে সে বুঝেছিল উল্টো হাওয়া বইছে। কেমন এলোমেলো হাওয়া। যদি পাল তুলে রাখে যতটা তারা এগিয়েছে, ঠিক ততটা তারা পিছিয়ে যাবে। এই ভেবে পাল খুলে দড়িদড়া নিচে রেখে সমুদ্র থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে নিল। নোনা জলে শরীর মুখ কর কর করে। সেটা শুকিয়ে গেলে একরকমের প্রসন্নতা বোধ করে ছোটবাবু। দুপুরে ওরা দুজনেই দড়িদড়া ধরে সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে এসেছিল। বেশি ঘাম হলে তেষ্টা পায়। ডুব দিয়ে বুঝেছিল, ঘাম হচ্ছে না, তেষ্টাও কম পাচ্ছে। গত রাত্রে মনে হয়েছিল অতিকায় কিছু মাছেরা পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শেষ রাত অন্ধকার ছিল বলে কিছুই টের পায়নি। আজ রাতে কি হবে কে জানে। একটা লম্ফ জ্বালা থাকে মাস্তুলে। ওটাই এখন সংকেত,

থাকবে। আর অজস্র প্রশ্ন তখন বনির এই

যদি দূরে থেকে কোন জাহাজ অথবা জেলে নৌকা তাদের দেখতে পায়! সে বলল, আগে লম্ফটা জ্বালিয়ে দাও। এত তাড়াতাড়ি খেতে দেবার কি হল! কত কাজ বাকি।

বনির চোখ ভারি বিহ্বল। ছোটবাবু বনির এই চোখ দেখলে আবিষ্ট হয়ে যায়। হাঁটু গেড়ে পাশে বসে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুলে মুখ ঘসতে থাকে। বনি ছোটবাবুর বুকে টুপ করে মুখ লুকিয়ে ফেলে। অতিকায় পাখিটা তখন হাওয়ায় পাখা ঝাপটায়।

কুম্ভ এসময় টেবিলে ঝুঁকে একবার উঁকি দিয়ে দেখল, মানুষটা ক্যাশবুকে ঝুঁকে আছে। সামনে ক্যাশবুক খোলা। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চার-পাঁচটা চেয়ার সামনে। তার ভেতর দিয়ে মানুষটার মাথা মুখ হিজিবিজি মাকড়সার জালের মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথা নিচু করে বসে আছে। কপালে অবিন্যস্ত চুল পাখার হাওয়ায় উড়ছে। বড়ই আবিষ্ট। বোধহয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সব। কিন্তু পরে মনে হল, না, কিছুই দেখছে না মানুষটা। নেশায় বুদ হয়ে মানুষ বসে থাকলে যেমনটা হয় অনেকটা সেরকমের। খুব কাহিল হয়ে গেছে। আজ যা বড় একখানা ল্যাং খেয়েছে তাতেই এই। সকাল থেকেই দেখছে খুব গম্ভীর। মুখে আশ্চর্য প্রসন্নতা থাকে সকাল থেকে, তা আর নেই। এই প্রসন্নতা সে সহ্য করতে পারে না। মুখে এমন একটা ধার্মিকভাব থাকে সে সাধুসন্ত ভাবতেও কষ্ট হয় না। এই ক্যামেফ্লেজটা লোকটার না ভাঙ্গাতে পারলে তার শান্তি নেই। সে পুলকিত বোধ করল। সে ভাবল উঠে একবার যায় কাছে। একটু দরদ দিয়ে কথা বলে। এই ভেবে সে উঠে এল। তারপর চেয়ারে বসে বলল, কাবুল আসবে যাবেন নাকি?

অতীশ কেমন ধড়মড় করে উঠে বসার মতো মুখ তুলে তাকাল।—অঃ আপনি!

—তবে কি ভেবেছিলেন!

—না, ভাবলাম...আসলে সে ভেবেছিল, নব বুঝি এসে গেছে।

—ঠিক প্লট ভাবছেন!

অতীশ বলল, ঐ আর কি!

—কাবুল আসবে। চাঙ্গোয়ায় যাব। যাবেন নাকি। কাবুল খাওয়াবে বলছে।

কাবুলবাবু কুম্ভর ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছে। কুম্ভর বাড়িতে কাবুলবাবুর যেতে কোন নোটিশ লাগে না। এই মানুষটা যখন তখন চলে আসে এবং কুম্ভকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যায়। সে কোন প্রশ্ন করতে পারে না। কারণ কুম্ভবাবুই বলেছে, কাবুল থেকে সাবধানে থাকবেন। ও রাজবাড়ির এজেন্ট। ওর কাছে কোন বেফাঁস কথা বলবেন না।

অতীশ বলল, বিকেলে কাজ আছে। একটু কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় যাব ভাবছি।

—আপনার ঐ এক দোষ দাদা! জীবনটাকে বড় সিরিয়াসলি নিয়েছেন! সব ব্যাপারে অত সিরিয়াস হওয়া ভাল না।

সকাল থেকেই দেখছি, মুখ গোমড়া করে বসে আছেন।

—কখন মুখ গোমড়া করলাম?

—মুখ গোমড়া না করেন, মনটা প্রসন্ন নয়, এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

অতীশ ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করে। সরিয়ে রাখল। বেল টিপে সুধীরকে ডাকল। সুধীর এলে বলল, চা কর। সে কেমন জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য ফ্যানটা পুরো পাঁচে দিয়ে এসে আবার নিজের জায়গায় বসল।

দুটো ঘর থেকেই মেশিনের শব্দ কানে আসছে। তিন নম্বর শেডটা দূরে বলে তার মেশিনপত্রের আওয়াজ এখান থেকে পাওয়া যায় না। অতীশ শব্দ শুনেই টের পায় কোন মেশিনটা চলছে, কোনটা বন্ধ আছে। জাহাজের এঞ্জিনরুমে কাজ করে তার ভেতরে এই ইনস্টিংট গড়ে উঠেছে। আর তার জানালা থেকে রাস্তার ও-পাশের শেডের সবটাই প্রায় দেখা যায়। এই একমাসেই বুঝেছে, কর্মীরা সারাদিনে যা কাজ করে, ওভারটাইমে তার ডাবল কাজ দেয়। কিছুতেই সে বুঝিয়ে সুজিয়ে কারখানার উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। যেখানে আট দশ হাজার কনটেনার তৈরি হয় আট ঘন্টায়, কাজের লোকগুলি সামান্যতম আন্তরিক হলে একই সময়ে দ্বিগুণ কাজ দিতে পারে। আসলে ঘুন ধরেছে—এই কারখানার দেয়ালে, দরজায়, যন্ত্রপাতিতে সর্বত্র ঘুন। কাজের লোকগুলির শরীরেও ঘুন ধরেছে। এভাবে চালালে, দু-চার বছরে কারখানা লাটে উঠবে। এই থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে তাকে কিছু একটা করতেই হবে। এবং যেটা এখন তার মাথায় বেশি কাজ করছে, সেটা হচ্ছে এদের বেতন বৃদ্ধি দরকার। এই বেতনে কোন মানুষের পক্ষে দুবেলা পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব না।

কুম্ভ বলল, সকালে কুমারবাহাদুর কি বলল?

অতীশ অকপটেই বলল, রাজি হলেন না!

—রাজি হলেন না মানে?

—নবর কাজের জন্য বলেছিলাম। কাল বললেন, নাও।. যদি দরকার মনে কর নাও। আজ সকালে ডেকে একেবারে উল্টো কথা বললেন।

কুম্ভ মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছে। বলল, উল্টো কথা বলাই এদের স্বভাব। এরা বড় লোক দাদা। এরা টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না।

সুধীর এসে বলল, চা নেই স্যার।

কুম্ভ ধমক লাগাল।—চা নেই তো আগে বলতে পার না কেন! দেখ্ সুধীর তোকে বার বার বলছি, কাজ ঠিক মতো করবি। তুই আছিস কি জন্যে! এখন চা এনে তার-পর জল গরম করবি!

অতীশ ড্রয়ার খুলে টিফিন একাউন্টে দুটো টাকা বের করে দিল।—চা রাস্তা থেকে নিয়ে এস। এবার থেকে যেন ভুল না হয়।

সুপারভাইজার এসে দরজায় মুখ বাড়াল। দেখল কুম্ভবাবু ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করছেন। সে একজন কর্মীর অভিযোগ নিয়ে এসেছে। কর্মীটি হেল্পার, বিটের কাজ জানে, এখন জরুরী দরকার পড়ায় তাকে বিটে বসতে হবে। কিন্তু সে রাজি না। তাকে বিটম্যান না করলে সে কাজে বসবে না বলছে।

অতীশ অভিযোগটি মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল, আজকের মতো চালিয়ে দিতে বলুন। কাল এ-নিয়ে কথা বলব।

—কথা অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। কোন ফয়সালা হচ্ছে না।

অতীশ বলল, আমি তো আজই শুনলাম। একটা দিন ত দেবেন!

কুম্ভ তখন বেশ জাঁকিয়ে বসে গেল। বলল, দাদা আসকারা দেবেন না। কারখানা জায়গাটাই খারাপ। আপনি যেই একজনকে লিফট দেবেন, অমনি দেখবেন পাতাল থেকে দশটা মুখ বার হয়ে আসছে। আপনাকে খাব খাব করছে।

অতীশ আগে এই সব সমস্যায় একটুকুতেই নিজেকে বিপর্যস্ত বোধ করত। এখন কিছুটা সয়ে গেছে। সে কুম্ভকে বলল, আপনি একবার ভেতরে যান। দেখুন বুঝিয়ে কিছু করতে পারেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভ উঠে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সব ঠিকঠাক করে চলে এল। অতীশ ভাবল কুম্ভবাবুর ক্ষমতা আছে। সে দেখেছে কিছু কিছু শ্রমিক ওর খুব বাধ্যের। চার-পাঁচ বছর কুম্ভবাবু আছে। মাঝখানে ম্যানেজার ছিল না, কুম্ভবাবুই চালিয়েছে সব। এতেই প্রভাব প্রতিপত্তি তার বেড়েছে। সে বলল, দেখুন তো কি ঝামেলা। এখন নব আসলে কি বলি।

—কি বলবেন আবার। সোজাসুজি না করে দেবেন।

—কিন্তু ওর বাবাকে আমি কথা দিয়েছি। আর এটাতো আমার খুশি মতো করিনি। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই করেছি। এখন আমার সম্মানটা থাকে কোথায়।

কুম্ভ ভীষণ রেগে গেছে, মতো বলল, এতে শুধু আপনার সম্মান, কোম্পানীর সম্মান যায় না! কর্তৃপক্ষের সম্মান থাকে! কান টানলে মাথা আসে না!

অতীশ বলল, কারা নাকি আপত্তি জানিয়েছে?

—কার দায় পড়েছে দাদা। একটা বেকার ছেলের কাজ হবে, তাতে কেউ বাধা দিতে পারে। ধর্মের ভয় নেই। আসলে কি জানেন দাদা, এরা সব পছন্দ অপছন্দ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। নিজেরা ধোওয়া তুলসীপাতা সেজে বসে থাকে। এদের আপনি একদম বিশ্বাস করবেন না। দেখছেন ত কাবুলটা এলে সব নিয়ে কথা হয়। বলতে কি খিস্তি-খাস্তাও হয়। কিন্তু কারখানা নিয়ে একেবারে স্পিকটি নট।

কুম্ভর প্রতি অতীশের কেন জানি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল। যদিও মাঝে আশ্চর্য এক নিশুতি গন্ধ কুম্ভবাবুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সেই পাওয়া ভূতের গন্ধটা কেন জানি থাকে। আর্চির সেই হা করা মুখ—ম উপর ছোটবাবু ওপর হয়ে পড়ে দেখে লোকটাকে সে যথার্থই খুন করতে পে কিনা, আর তখনই ভক করে গন্ধটা লেগেছিল নাকে। হা করা মুখ থেকে এ পচা গন্ধ বের হচ্ছে। ওর মাথায় গুলিয়ে উঠতেই সিঁড়ি ধরে নেমে ত ছিল। আর চারপাশে তখন কি গা অন্ধকার। চারপাশে জাহাজীদের হ চিৎকার। এলিওয়ে ধরে কারা বোট ে ছুটে যাচ্ছে। এনজিন রুমে বিস্ফোর বয়লার-ফয়লার সব ছত্রাকার। সারা জাহা এক অতিকায় দুর্যোগ—ছোটবাবু দুর্যো পড়ে গন্ধটার কথা ভুলে গেছিল। পা কিছুদিন সে সুস্থ স্বাভাবিক। কিন্ সমুদ্রে ভাসমান বোটে বনির লুকনো মুখে দিকে তাকাতেই সে শিউরে উঠল। একা ভুর ভুর পচা গন্ধ আসছে কোত্থেকে। ে বনিকে শুঁকে দেখল— না সেখান থেে উঠছে না। অতিকায় একটা সুরমাই মা তুলে রেখেছিল, ওর ভেতর থেকে লাল চুষে খাবে বলে—সেটা পচে যেতে পারে সে তাড়াতাড়ি মাছটার কাছে চলে গেল—ন আঁসটে গন্ধ, পচা গন্ধটা নেই। সোি অ্যালবাট্রসও বোটে নেই—তবে গন্ধট আসছে কোত্থেকে। যেন চেনা চেনা গন্ধ একবার এই গন্ধে তার মাথাফাতা গুলিয়ে উঠেছিল—সেটা কবে কখন, ঠিক সেই গন্ধ ঠিক তক্ষুনি মাথায় একটা ধ্বনি যেন সেই অ্যাবট অফ অ্যাবট ব্রথক— নিরন্তর ঝড়ের রাতে ঘন্টা ধ্বনি করে চলেছে, ছোটবাবু তুমি আর্চিকে খুন করছ। সে তোমাকে ক্ষমা করবে না। তাহলে কি সেই প্রেতাত্মার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ। সে কাছেই রয়েছে। সে তার প্রতিশোধ নেবে বলে, এই বিশাল [illegible] প্রসারিত জলরাশির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোটবাবু চিৎকার করে উঠেছিল, গড সেভ আজ। সেভ আজ ফম অল ট্রাবলস। বনি টের পেয়ে বলেছিল, ছোটবাবু ক্রশটা আমার মাথার কাছে এনে দাও। ওটা ছুঁয়ে বসে থাক। কোন অশুভ প্রভাবে আমরা তবে পড়ে যাব না। কুম্ভবাবু কাছে এলে মাঝে মাঝে সেই গন্ধটা কেন জানি নাকে এসে লাগে।

কুম্ভবাবু বলল, চলুন ঘুরে আসি। মনটা ভাল হবে। কাবুল আমাদের খাওয়াবে বলছে। ও গাড়ি নিয়ে আসবে।

অতীশ কোন জবাব দিল না।

তারপর ভারি বিশ্বস্ত মানুষের মতো বলল, জাহাজেও শুনেছি সবাই সব খায়। গরু বাছুর মেয়েছেলে মদ। আপনি খাননি।

অতীশ চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিল।

তারপর হাতটা মাথার ওপর ছড়িয়ে বলল, জাহাজে সবই চলে।

—তবে আপনি যেতে চাইছেন না কেন। আপনার তো প্রেজুডিস থাকা ঠিক না।

—তা অবশ্য নেই। তবে এখন ভুলে গেছি সব।

তখনই ফোনটা বেজে উঠল, হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ মিঃ ভৌমিক বলুন। কি খবর। মাল কাল যাবে না। তারপর অতীশ ক্যালেন্ডারের পাতা দেখে বলল, বুধবার পাবেন।

—বহুৎ ঝামেলা হো জায়গা বাবুজী। থোড়া জলদি করিয়ে।

—জলদিই করছি।

—বাবুজী সিজন টাইম আছে। থোড়া মেহেরবাণী করিয়ে।

—আরে এতে মেহেরবাণী করার কি আছে।

তখনই কুম্ভ বলল, এটা রামলাল?

অতীশ ঘাড় কাৎ করল।

—হাজার তিনেক টাকা আরও অ্যাডভান্স চান।

অতীশ কোন অ্যাডভান্সের কথা বলল না। সে ফোন ছেড়ে দিল। কুম্ভর ভেতরে এখন একটা জেদী চিতাবাঘ ওৎ পেতে থাকে। অতীশ আসার পর সব সময় থাবা গুটিয়ে বসে থাকে। যেন অতীশ খুবই একটা ভুল করে ফেলেছে। তার কথার দাম গুরুত্ব দেওয়া হল না। সে কি নিজের জন্য এটা করছে। ফোন নামাবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, অ্যাডভান্সের কথা কিছু বললেন না।

—ওর তো অনেক টাকা অ্যাডভান্স পড়ে আছে। শোধ দেবেন কি করে।

—আপনি মনে করেন, লোকটা এমনিতে একটা কম্বল নিয়ে কলকাতায় এয়েছে। ধান্দা নেই। এমনিতেই দশ-বার হাজার টাকা ফেলে রেখেছে। কোন ধান্দা নেই। মেহেরবাণী করেন বলে, অথচ কোন ধান্দা নেই।

—আপনিই যে বলছেন, লোকটা দুঃসময়ে কোম্পানীকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

—বাঁচিয়ে রেখেছে কেন? আখের না থাকলে সে বাঁচাতে আসবে কেন। আর কারখানা নেই, আর মাল সাপ্লাই করার হক নেই।

অতীশ এসব কথার জবাবে কি বলবে। এই মানুষটাই রামলালকে একদিন সঙ্গে করে এসে বলেছিল রামলাল ছিল বলে আপনি কোম্পানীর ম্যানেজার হয়ে আসতে পেরেছেন। না হলে কবে লাটে উঠে যেত। বিপদে-আপদে শেঠজী আমাদের রক্ষা করে আসছে। সেই শেঠজীকেই কুম্ভবাবু এখন ধান্দাবাজ বলছে। লোকটার মতি-গতি অদ্ভুত রকমের। সে কুম্ভবাবুর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য বলল, পরে এক সময় বললেই হবে।

—দাদা ঐতো মুসকিল। তপ্ত কড়াইয়ে তেল ঢালবেন না, ত কী হবে। এর চাপ আছে আপনিও চালান যেবেন। দেখবেন সুড় সুড় করে টাকা নিয়ে হাজির। হাজির।

কিন্তু তার মাথায় এখন আর কুম্ভবাবুর কথা ঢুকছে না। সে সেই কুষ্ঠ রুগীর ঘরটার দিকে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় শিউলাল রকে বসে পায়ে ন্যাকড়া জড়াচ্ছে। তারপরই একটা মেয়েছেলে এসে তাকে খাবার দিয়ে যায়। শিউলাল ঘরের মধ্যে আসন পেতে খাবে। ঘরটায় সে একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিল। দেয়ালে রাজ্যের ক্যালেন্ডার। সবই রাম-সীতার ছবি। এবং এক পাশে আরও একটা ছবি—বৈজয়ন্তীমালা। প্রায় উলঙ্গ হয়ে আছে মতো। জলে নেমে সাঁতার কাটছে। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে কাঠের একটা বাকস, কাঠের পাটাতনে বিছানা পাতা এবং ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু কাঁথা বালিশ। সম্বল বলতে তিনটি রিকসো তার ভাড়া খাটে। বাইরে বিকেলে বসে থাকে। সামনে থাকে জলচৌকি সেখানে ভাড়ার পয়সা কড়া ক্লান্তি গুনে নেয়। সন্ধ্যা হলে, সে রাস্তার আলোতে সেখানে তুলসীদাসী রামায়ণ সুর ধরে পাঠ করে। সকালের দিকে দেখেছে, সে প্রত্যেক ভিখারীকে দুটো করে পয়সা দেয়। কাউকে ফেরায় না। যে মেয়েটি রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়, কুম্ভবাবু বলেছে, যুবতীকে সে রক্ষিতা রেখেছে। এসব ভাবতে গিয়ে অতীশের মনে হল, মানুষের বেঁচে থাকার মতো বড় কিছু নেই। তার এত ভাল মানুষ না হলেও পৃথিবীর কোন ক্ষতি নেই। আসলে সে ভালমানুষ, না কাপুরুষ। সব জাতেই ভয়। কি যেন তার হারিয়ে যাবে বলে ভয়। সেই ভয় থেকেই যত গন্ধ নাকে এসে লাগে। নিজেকে অতীশ শক্ত করতে চাইল। বলল, কখন যাবেন?

কুম্ভ বলল, কোথায়?

—এই যে হোটেল যাবেন বলছেন।

—আপনি যাবেন ত। গেলে কাবুল খুব খুশী হবে। ওর বৌদির আপনি খুব পিয়ারের লোক। এখন আপনাকে তেল দেবার জন্য রাজবাড়ির সব চোর ছ্যাচোড়েরা উঠে পড়ে লাগবে।

অতীশ এমন কথায় কিঞ্চিত বিরক্ত হল। এর ভিতর কমলকে টেনে আনা কেন। তা ছাড়া কমল সম্পর্কে তার শৈশব থেকেই একটা দুর্বলতা আছে। কমলকে নিয়ে কেউ কিছু বললে সে অপমানিত বোধ করে। কুম্ভবাবু আরও দু-একবার জানায় চেষ্টা করেছে, কি কথা হল বৌরাণীর সঙ্গে। কিছু বলল।

অতীশ বলেছিল, কিছু বলেনি। এমনি কথাবার্তা হয়েছে। কেমন লাগছে এই শহর। কোন অসুবিধা হচছে না ত। এই সব আর কি।

—আর কিছু না।

—না।

—তা কটা কথা বলতে এত সময় লাগে।

—আর কি কথা হতে পারে বলে আপনার ধারনা।

—কত কথা হতে পারে। আমরা বাইরের লোক কি করে জানব। তবে দাদা সাবধান থাকবেন। লক্ষণ ভাল বুঝছি না। যারাই রাজার পেয়ারের লোক হতে গেছে তারাই মরেছে।

অতীশ বুঝতে পারছে না, এরা সবাই রাজবাড়িতে জন্মেছে বড় হয়েছে। এদের কারো কারো তিন পুরুষ চার পুরুষ এই বাড়ির খেয়েছে, পরেছে, কেউ কেউ চুরি-চামারি করে নিজেরাও ছোটখাট রাজা বনে গেছে—এবং এই যে কুম্ভবাবু, এদের রক্তে এবাড়ির নিমকের গন্ধ শুঁকলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রথম থেকেই সে কেমন বেপরোয়া। যেন সে পারলে গোটা রাজবাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আসলে তার আসার জন্য এটা হয়েছে কিনা কে জানে। সে এজন্য কেন জানি এখন থেকেই কুম্ভবাবুকে সামান্য তোয়াক্ক করতে শুরু করেছে। তা না হলে কমলের সঙ্গে দেখা হবার পর অতীশকে সাহস পায় কি করে প্রশ্ন করার। সেই বা এ নিয়ে কথা বলে কেন। তার তো বলা উচিত ছিল, বৌরাণীর সঙ্গে কি কথা হল, আপনার জানার কি দরকার। অথবা সে এড়িয়ে গেলেই পারত। তারপরই মনে হল, অফিসের কাজে কর্মে সে এই লোকটার ওপর নির্ভরশীল। এই মোকায় লোকটা তাকে পেয়ে বসেছে। কাবুলবাবু এলে সে সোজাসুজি বলল, আপনারা যান। আমার সময় হবে না।

কুম্ভ বলল, এই দাদা সাহস। আপনার বৌমা বলল, দাদাকে কিন্তু সঙ্গে নেবে।

অতীশ আঁতকে উঠল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ কুম্ভবাবু। অজ পাড়াগাঁয়ে মেয়ে তার বৌ। বছরখানেক হল বিয়ে হয়েছে। গর্ভবতী। মাস তিন-চার বাদে কুম্ভবাবুর স্ত্রী জননী হবে। সেই জননীও যাচ্ছে সঙ্গে। তার মুখ থেকে রা সরছিল না।

কাবুল বলল, রোজ তো হয় না। দাদা বৌদি রোটারি ক্লাবে গেছে। ওদের পার্টি আছে গ্র্যান্ডে। আমরাও তিনজনে মিলে ছোটখাট একটা পার্টির আয়োজন করছি। আপনি আমাদের গেস্ট।

অতীশ অগত্যা আর যেন কিছু বলতে পারছে না। সে ওদের পিছু পিছু উঠে গেল। কুম্ভবাবু সুপারভাইজারকে ডেকে বলল, কেউ যদি ফোন করে বলবেন, কাজে বের হয়েছি। আমরা আর ফিরব না। ট্রাম রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছে। কাবুলবাবু। গাড়ির পাশে থেকেই হাসিরাণী দরজা খুলে দিল। দারুন সেজেছে। ঠোঁটে প্রচণ্ড লাল লিপস্টিক, নখে রুপোলি নেল পালিশ, দামী শিফনের শাড়ি, হাতে মীনা করা বালা। বগল খালি করে হাত তুলে বলছে, আপনি এখানটায় বসুন দাদা।

অতীশের কেন জানি মনে হল হাসিরাণীকে আজ হোক কাল হোক একটা লক্ষ্মীর পট তার কিনে দেওয়া দরকার। শরীরে বড়ই কামুক গন্ধ।

(চলবে)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আদি আছে অন্ত নেই

নিজের বাড়ি আছে হাতীবাগানে, একতলা দুতলা ভাড়া—তেতলায় নিজে থাকেন। ভাড়ার আয়েই সংসার চলে। এখানে যা বিক্রী হয়—তাতে ঘর ভাড়া আর একটি ভৃত্যের মাইনে চলে গেলেই যথেষ্ট।

এ এক আবার বিচিত্র লোক। জয়ন্তবাবুকে দেখে মনে হল, কোন কিছুতেই তিনি মনস্থির করতে পারেন না। সর্বদাই দ্বিধাগ্রস্ত। আস্তে আস্তে থতিয়ে থতিয়ে কথা বলেন। কথায় কথায় একটা 'য়্যাঁ, কী বলেন তাই না!' বলা অভ্যাস এটা কতকটা যেন আত্মজিজ্ঞাসাই। একটু বিড়বিড় করে আপন মনেও কথা বলেন।

তিনি যে ছেলেদের নাটকের ফরমাশ দিয়েছিলেন, প্রথমত সেটাই তাঁর মনে নেই। মুরারিবাবু মনে করিয়ে দিলে, এ বইয়ের বলবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ফলে মুরারিবাবুকে আবার একটা জোরালো বক্তৃতা করতে হল। ভরাট জোর গলা তাঁর, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়। এই যুক্তিপ্রয়োগ বোধহয় ইতিপূর্বেও করতে হয়েছে, সবটারই পুনরাবৃত্তি করতে হল।

তখন নূতন প্রশ্ন, পুরুষচরিত্র বর্জিত মেয়েদের নাটক লিখলেই বা কেমন চলে?

মুরারিবাবুর সব দিকেই সমান উৎসাহ। তিনি আর একটি দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, সত্যেন দত্তের পর একথা আর কেউ ভাবেনি, এই 'ওরিজিন্যাল' থিংকিং-এর জন্যেই মুরারিবাবু জয়ন্ত শীল মশাইকে এত শ্রদ্ধা করেন।

এইভাবে ঘণ্টা দুই কাটাবার পর স্থির হল—এ নাটকটি ছাড়াও একটি ছেলেদের নাটক ও দুটি মেয়েদের নাটক লিখে দিতে হবে। বিষয় স্থির হয়ে গেল, লক্ষণ মেঘনাদ, সীতা আর সাবিত্রী। কপিরাইট—মোট পঞ্চাশটি টাকা দেবেন জয়ন্তবাবু। অবশ্যই বিভিন্ন দফায়।

এবং—

সেই শর্তটাই মারাত্মক। উনি এই লেখাটা বাড়ি নিয়ে যাবেন, পড়ে দেখবেন, একটু ভাববেন। যদি ভাল লাগে তো এইসব প্রস্তাবটাই কার্যকর হবে, নইলে নয়। দুদিন পরে আসতে হবে সেই অভিমতটা জানতে।

মনটা দমে যাবারই কথা। দমেও গেল। সেটা বোধহয় আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন মুরারিবাবু। বললেন, 'আরে না না। আপনি ভাববেন না। এক কথায় রাজী হয়ে যাওয়াটা ওঁর পক্ষে একটু ইয়ে, কী বলে—উনি ভাবেন তাতে বুঝি প্রমাণ হয়ে যাবে, উনি কিছু বোঝেন না। পড়বে না ভাববেন—তবে তো ওঁর বিচারবুদ্ধি প্রমাণ হবে। ঠিকই নেবেন, নইলে এত কথা বলতেন না। পঞ্চাশ টাকায় চারখানা বইয়ের কপিরাইট কে দেবে? বিশেষ আবার ফরমাশের দৌড়টা দেখলেন তো, মেয়েদের নাটকগুলো চার ফর্মা করতে হবে।'

তবু সন্দেহ ঠিক গেল না। কিন্তু দুদিন পরে দেখা গেল মুরারিবাবুর কথাই ঠিক। যেতে আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বিড় বিড় করে। ম্‌ম্‌—কি করব বুঝি না, খরচ তো কম হবে না, চলবে কিনা। ম্‌ম্‌ ভাবা—অবিশ্যি আপনার মন্দ নয়, ছেলেটাকে পড়তে দিয়েছিলুম সে তো একটা লাঠি নিয়ে আপনার জালিম সিংহের পার্ট করতে লেগে গেল।...তা ও একটা পাগল। ম্‌ম্‌—আচ্ছা যতদূর মনে হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির দপ্তরে এক জালিম সিং আছে—এ সে নয়?'

ঠাকুরবাড়ির দপ্তর মুরারিবাবু বিপন্ন ভাবে চান, বিনুর দিকে।

বিনু বাঁচিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি। বলে, 'হ্যাঁ, ইউজিন সুর ওআন্ডারিং জুর অনুবাদ। না না, সে তো উপন্যাসের ক্যারেকটার, ঐ ইহুদীটার রক্ত কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে কত জাতের লোক সে অভিশাপ বহন করছে সেটা দেখাবার জন্যেই একটা ভারতীয় চরিত্র সৃষ্টি করা। ও জালিম সিং তো ইতিহাসের লোক।'

'ম্‌ম্‌—ইতিহাসের লোক বলছেন। অ!'

এমনি আরও বহু বখেড়া করে, অনেক 'ম্‌ম্‌' অনেক 'অ' আর অনেক 'ও' উচ্চারণ করার পর জয়ন্তবাবু একটি ভাউচার বার করলেন তারপর অনেক কিছু লিখে, ওকে দিয়ে সই করিয়ে পাঁচটি টাকা বার করে দিলেন, বললেন, 'একটা পার্ট পেমেন্ট নিয়ে যান, আরও কপি আনুন, তারপর সব চুকিয়ে দোব। অবিশ্যি পাঁচ সাত টাকা করেই নিতে হবে। তা ম-ম—মারব না, তাড়াতাড়িই দোব।'

হোক অগ্রিম আংশিক, লিখে উপার্জন এই ওর এই প্রথম। ছবি এঁকে ক' টাকা পেয়েছে কিন্তু পরে, সুভদ্রার অন্য আচরণে বুঝেছে, সেটা ভালবাসার দান, মূল্যটা ছদ্মবেশ মাত্র।

পাঁচটা টাকা হাতে পেয়ে মনে হল অগাধ ঐশ্বর্য।

লিখে তাহলে সত্যিই টাকা পাওয়া যায়।

ওর খরচের মধ্যে তো দু পয়সার একখানা খাতা, আর একটু কালি। ব্ল্যাকবার্ড কলমটা তো আছেই।

একটা ছুতো করে মুরারিবাবুকে সরিয়ে দিল, তারপর মির্জাপুরের মোড়ে ইস্টবেঙ্গল সোসাইটিতে এসে ভীড় ঠেলে—দোকানটায় সর্বদাই ভিড় থাকত—প্রথমেই মার জন্যে একখানা থান ধুতি কিনল, ওদের ভাষায় সুপারফাইন—একটাকা দু আনা দিয়ে, তারপর এক নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের (পরবর্তীকালের বিধান সরণি) একটা দোকান থেকে এক টাকা এক আনা দিয়ে নিজের একটা ভাল লংক্লথের পাঞ্জাবী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের তিন নম্বর বাজারের পাশের সরু গলি থেকে দেড় টাকা দিয়ে ঠনঠনের চটি জুতো। তারপরেও অনেক পয়সা রইল দেখে শিয়ালদার মোড় থেকে একটু রাবড়ি কিনে যখন বাড়ি ফিরল, মা রাবড়ি ভালবাসেন—তখনও সেই অগাধ ঐশ্বর্য একেবারে নিঃশেষিত হয় নি।

বিস্ময়ের যেন শেষ থাকে না। সেই একটা কথাই মনে হয়—লিখে টাকা পাওয়া যায়! সত্যিই পাওয়া যায় তাহলে!

সে যৌনতত্ত্বের বইও লেখা শেষ হল একদিন। মুরারিবাবু সেদিনও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। এ লোকটাকে দেখে কে জানে কেন, ওর গা ঘিনঘিন করে—মনে হয় ওর বুদ্ধিতে বা প্রস্তাবে শুধু নয়, কথায় চাহনিতে একটা ক্লেদ আছে, অবাঞ্ছিত মালিন্য। জয়ন্তবাবু যতই দ্বিধা প্রকাশ করুন, মানুষটা ভাল। তার কাছে গেলে শারীরিক অস্বস্তি বোধ হয় না।

তবু যেতেই হয়। নইলে মনে হবে বিনু পারল না, যতই বাহাদুরী করে থাক, এসব লেখা লিখতে সে অক্ষম।

তবে এই চতুর বা ধূর্ত মানুষটি আর যাই হোক, কাজের লোক। সময়ের মূল্য বোঝেন।

তিনি পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে তখনই ওলটাতে শুরু করলেন, স্থানে স্থানে এক টানেও পড়লেন চার পাঁচ পৃষ্ঠা করে, বিশেষ ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি বেশ মন দিয়েই দেখলেন, তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আমাকে একটু মেরামত করতে হবে। সে তো করতেই হবে, নতুন লেখক—ছেলেমানুষ,

উবে চলাবে। অচল নয়। তা সামনের তাহে আসবেন, কিছু দোষ।'

প্রথম কথাটায়—অকারণ মুরারিশিক্ষয়ানা ত্তবুও বিচলিত হয়নি—এ তো বলতেই ব, মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলে বেশী লাটি দেবার দায় বর্তাবে—সে চটে গেল ষের কথাটায়। ওকে অত তাগাদা দিয়ে খিয়ে এখন 'কিছু' দেবার কথা আসছে ন, তার সেই কিছুই যদি নিতে হয়, নের সপ্তাহে কেন?

হঠাৎ মুরারিবাবুকে সচকিত করে সে রুক্ষ কণ্ঠেই বললে, 'কিছু যদি দেন, স্তিতে, তবে আবার সামনের সপ্তাহ ব? আজ পুরো কপি আমার কাছ থেকে লন, পড়ে যাচাই করে—কিছুটা আজ ত হবে। আমার অন্য কাজ আছে, আমি নর পর দিন ঘুরতে পারব না।'

ভদ্রলোকের তীক্ষ্ন দৃষ্টি তীক্ষ্নতর । উঠল।

'না দিলে?'

'ঐ ম্যানাসক্রিপ্ট নিয়ে আপনার সামনেই ড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবো। বুঝব যে হাতমক্স করেছি। তাতে হাঁটাহাঁটি করার থেকে তো অব্যাহতি পাবো।'

মুরারিবাবু তো স্তম্ভিত, ওর এই সাহস দেখে।

সে ভদ্রলোকও এতটা আশা করেন নি। তিনি কিছুক্ষণ সেইভাবে কৌতুক ও র্মিশ্রিত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে ার পর গলায় একটা অদ্ভুত শব্দ এনে লেন, 'হুঁ'! এ যে গাছে না উঠতেই এক দি দেখছি। বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। ছা এক বিচ্চু লেখক জুটিয়েছেন তো খছি মুরারিবাবু!'

বললেন, কিন্তু বাড়ির মধ্যে গিয়ে খানা ছাপা কনট্রাক্ট ফর্ম এনে সই য়ে দশটি টাকা হাতে দিলেন শেষ ন্ত। বললেন, 'সামনের মাসে এসে আর কিস্তি নিয়ে যাবেন।'

সামনের মাসে না দিলেও ক্ষতি নেই—তখন বিনুর মনোভাব।

একে তো দশ টাকা অনেক টাকা ওর ছ, দ্বিতীয়ত এটা ওর একরকম নৈতিক লাভ।

সেকথা মুরারিবাবুও বললেন, সঙ্গে গ বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়ে।

'নাঃ, আপনার খুব সাহস আছে, যাই ন। মোরাল কারেজ যাকে বলে! আমার সাহস হ'ত না। অবিশ্যি আপনার তো ভাত ভিক্ষে নয়, আমার পাঁচটা টাকা দেড় মণ চাল কেনা হবে।'

মুরারিবাবুর অবস্থা বিনু জানত। এই লোক ও'কে দিয়ে নানাবিধ কাউকে বলা না এমন কাজ করিয়ে নেন। বর্তমানে নি এক ক্ষুধার্ত ফোটোগ্রাফার ও র্জনহীন পতিতাদের দিয়ে কতকগুলি লীল ছবি তুলিয়ে ও'কে দিয়েছেন, প্রতি ধরে ধরে কতকগুলি কবিতা লিখিয়ে নিতে। দাম ঠিক হয়েছে, প্রতি কবিতার দু টাকা, তাতেও চল্লিশ টাকার মতো পাওনা হবে। আগের পাওনা তো আছেই। টাকা দেন দু টাকা এক টাকা করে, যেদিন বেশী হয় পাঁচ টাকা। কিন্তু বেশ কদিন না ঘুরিয়ে দেন না একবারও।

সে বলল, 'আপনার এত খেটে এইভাবে ঘুরে দু টাকা এক টাকা ভিক্ষের মতো করে নিয়েই বা কি লাভ হয়? এতে কি আপনার সংসার চলে!'

আমার কি জানেন, রাই কুড়িয়ে বেল। সত্যি, যদি মাকে ত্রিশটা টাকাও একসঙ্গে থেক পেতাম—সংসারটা চলে যেত, মাইরি বলছি।'

মুরারিবাবুর যতই দুঃখ থাক নিজের জীবনে—হতাশা বা ব্যর্থতা, ও'র পরোপকার প্রবৃত্তিকে ছায়াচ্ছন্ন করতে পারেনি একটুও।

বিনুকে উনি নিজেই, স্বেচ্ছায় 'প্রটিজী' করে নিয়েছেন, তার উপকার উনি করবেনই।

সেটা একদিনও বন্ধ নেই।

এর মধ্যে এক পিপলাই লাইব্রেরী ধরেছিলেন উনি, মুরারিবাবুর দুখানা ছেলেদের বই নিয়েছিলেন ভদ্রলোক, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিনুর কথা তুলেছেন এবং বিরাট বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে বা বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছেন যে, ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি কালে তার বিরাট প্রতিভা প্রমাণ করে দেবে আর সেদিন, অপরিণত বয়সের লেখা প্রকাশ করার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে মন্মথ পিপলাই গর্ববোধ করতে পারবেন।

সুতরাং সেখানেও একদিন যেতে হয়।

একটি ছেলেদের নাটক, মহারাণা প্রতাপ তখনই ব্যবস্থা হয়ে গেল—মানে ফরমাশ। আর একটি অদ্ভুত কাজের ভার দিলেন ভদ্রলোক, তিনি নিজে একটি বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু খানিকটা লেখার পর আর সাধ্যে বা ধৈর্যে কুলোয় নি, সেইটে শেষ করার ও কিছু সম্পাদনা করার ভার দিলেন বিনুকে। বিষয়টা অবশ্য জানা, মহাত্মা গান্ধীর জীবনী, 'ছোটদের মোহন-দাস' নাম দিয়েছেন, এক ফর্মা মানে যোল পৃষ্ঠা ছাপাও হয়ে গেছে। বললেন নাটকটির কপিরাইটের জন্যে কুড়ি আর এই 'রিভি-সানে'র জন্য কুড়ি, মোট চল্লিশ টাকা দেবেন।

বিনু রাজী হয়ে গেল। কারণ টাকাটা তার কাছে বড় কথা নয় আদৌ, সে যে লেখার কাজ পাচ্ছে, তার লেখা ছাপা হচ্ছে এইটেই বড় কথা। বিশেষ এই বয়সে ওকে বিশ্বাস করে পিপলাই সম্পাদন ও সংশোধনের কাজ দিয়েছেন—এতেই তার আনন্দের সীমা নেই, মন্মথবাবু এক পয়সা না দিতে চাইলেও সে করে দিত।

অবশ্য দিয়েছিলেন এ'রা। জয়ন্ত শীল মাস দুইয়ের মধ্যে বিভিন্ন কিস্তিতে পঞ্চাশ টাকাই শেষ করেছিলেন, যদিও বই দুখানা ছেপেছিলেন, তারপর ব্যবসার সাধই তাঁর মিটে গেল, ব্লাডপ্রেসারের দোহাই দিয়ে চাটি বাটি তুলে দিয়ে বাড়িতে গিয়ে বসে-ছিলেন। বলা বাহুল্য সে পাণ্ডুলিপি আর ফেরৎ পাওয়া যায় নি, দেব দেব করে যখন খুঁজতে শুরু করেছিলেন তখন সে বোধহয় কীট দষ্ট. তিনিও খুঁজে পান নি আর, দুঃখ প্রকাশ করে বারকতক 'মুমু' 'তাইতো' বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তবে বিনু দুঃখ বোধ করেনি একটুও। ওসব লেখার কীই বা মূল্য, যাওয়াই ভাল।

টাকা মন্মথবাবুও দিয়েছিলেন, তিন কি চার কিস্তিতে।

কেবল আদায় হয়নি সেই ধূর্ত ভদ্র-লোকের কাছ থেকে পুরো টাকাটা।

সেই দশ টাকার পর একবার পাঁচ আর একবার দুই—ওয়াদা ত্রিশ টাকার মধ্যে মোট এই সতেরো টাকা পেয়েই খুশী হতে হয়েছিল।

সেদিন পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলার প্রস্তাবটা বোধহয় ভদ্রলোক তোলেন নি, সেটার শোধ নিলেন, ওর জুতো ছিঁড়িয়ে। অন্তত চল্লিশ দিন হাঁটাহাঁটি করেছে—তাতেও বাকী টাকা মেলে নি।

তখন আর করবার কিছু ছিল না।

সে বই ছাপা হয়ে লেখক হিসেবে জনৈক সন্ন্যাসীর (কল্পিত) নাম দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এ বই যে ওরই লেখা বা এ বাবদ কিছু টাকা পাওনা আছে সেটা প্রমাণ করবে কেমন করে।

লিখিয়ে নেবার যা কিছু তিনিই লিখিয়ে নিয়েছেন, বিনুকে কিছু লিখে দেন নি। বিনুর অত মনেও হয় নি।

তা হোক, মোটের ওপর সৎলোকের সংখ্যাই বেশী, একটা অসৎ লোকে কি যায় আসে।

বেশী লোভ করতে গিয়ে মুরারিবাবুর লেখা বইয়ের দায়ে জেল খাটতে তো হল!

তাতেই তৃপ্তি ওর। তেরো টাকা না পেয়ে কি আর সে ভিখিরী হয়ে গেছে!

মুরারিবাবু অনেক কাগজ বার করে-ছিলেন, কোনটা বা সাপ্তাহিক, কোনটা বা মাসিক, কোনটার সঙ্গে সম্পাদনার সম্পর্ক কোনটায় বা শুধুই লেখা যোগাড় করা ও কিছু এটাওটা লেখার কাজ—ছাগলের তৃতীয় ছানার মতো খাদ্যে বঞ্চিত হয়ে শুধুই নেচে বেড়ানোর। এসব কাগজের প্রাথমিক রসদ অর্থাৎ টাকা সংগ্রহ করার জন্য বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে—প্রকাশের পূর্বে তো বটেই, পরেও সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম ঘোরাঘুরি উনিই করেছেন—অথচ পাওনা হয় নি বিশেষ কিছুই, যাও বা দু-চার টাকা পেয়েছেন কখনও সখনও—বোধহয় তাঁর ট্রাম বাস ভাড়াতেই বেরিয়ে গেছে। একটা গালাগালির মাসিক বার করিয়েছিলেন —সাহিত্যিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ—তার দু সংখ্যার একটি লেখা বিনুর—বাকী সব লেখাই মুরারিবাবুকে লিখতে হয়েছে। কিন্তু ঐ

কাগজ থেকে একটি পয়সাও পাননি, বরং যিনি সামান্য কিছু টাকা দিয়েছিলেন তিনি অনেকবার নালিশ করার ভয় দেখিয়েছেন।

এসব কাগজে বরং সুবিধা হয়েছিল বিনুরই।

আগেও এমন কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, সে খবর ও রাখে না। ওর সঙ্গে পরিচয়ের পর কোন কাগজের সূচনা বা সম্ভাবনা মাত্রেই আগে এসে ওকে বলতেন, 'এবার খুব একটা ভাল গল্প ধরেন, সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে চাই।' কিংবা 'প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্প আপনার থাকবে' ইত্যাদি।

কিন্তু বিনু সম্বন্ধে মুরারিবাবুর শ্রদ্ধা বা প্রীতি যে কত গভীর, কত সত্য, কত দৃঢ়মূল ছিল তার পরিচয় পেত এইসব গল্পের বেলাই।

সব গল্প সব সময় ওতরায় না, যে গল্প সত্যিই খুব ভাল হত—সে গল্প পড়ে প্রায়ই ফেরৎ দিতে আসতেন : বলতেন, 'এ কি করেছেন! না না, এমন করে এত ভাল ল্যাখাটাকে নষ্ট করবেন না। এ গল্প প্রবাসীতে ছাপা হলে তবে এর যোগ্য মর্যাদা পেতেন, নিদেন ভারতবর্ষ হলেও বহু পাঠক পেতেন। এ কাগজে কটা পাঠক পাবেন। নতুন কাগজ, স্বল্প পুঁজি—কখানাই বা ছাপবে। ছাপলেই বা কত বিক্রী হবে। এক হাজার পাঠকও পাবেন না। না না, আপনি আমাকে আর একটা অন্য ল্যাখা দ্যান।'

বিনু ফেরৎ নিত না। বলত, 'আপনার ভাগ্যে ভাল লেখা উতরে গেছে, আপনিই নিন। ভাল গল্প বেরোলে আপনারই মুখ থাকবে। ভারতবর্ষ প্রবাসী আমার গল্প ছাপবে কেন বলুন। আজ অবধি সাহস করে পাঠাতেই পারি নি। আপনি নিন।'

নিয়েছেন, খুব অনিচ্ছায়। ছাপা হওয়ার পরও আপসোস করেছেন, এমন গল্প নষ্ট হয়ে গেল বলে। দু-তিনবার—এইসব গল্প, যা মুরারিবাবুর মতে 'ক্লাসিক রচনা'—একটা কাগজে ছেপে তৃপ্তি হয় নি, ওরই মধ্যে, ও'র পরিচিত গণ্ডীর ভেতর যে কাগজের কিছু বেশী পাঠক সংখ্যা আছে বলে জানতেন—সেই কাগজে আরও একবার ছেপেছেন, পুরনো লেখাই।

বলেছেন, 'কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করলাম। তবু, যদি দু তিনশো পাঠকও বেশী পান, মন্দ কি!

শুধু প্রকাশক মহলে বা সাময়িক পত্রিকার মহলেই পরিচিত করেন নি মুরারিবাবু, এক বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডায় নিয়ে গিয়ে বড় তখনকার দিনের অগ্রগণ্য বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বিনু নিয়মিত যেত। সেটা একটা প্রধান সৌভাগ্য বলে মনে হয় আজও।

বিনুর দুর্ভাগ্য সে ও'র কাছ থেকে স্নেহ ও সাহায্য দুহাত ভরে নিয়েই গেল, ও'র কাছে অসতে পারল না। তার সে অবস্থা হবার আগেই মুরারিবাবু—অপরাজেয়, অপরাজিত মানুষটি—হঠাৎ একদিন চলে গেলেন। একেবারেই অকালে।

অনেক ব্যর্থতা, অনেক হতাশা—বহু বহু অকারণ শত্রুতা ও ঈর্ষার মধ্যে অল্প যে দু'তিনটি লোকের আন্তরিক স্নেহ ও প্রশ্রয় ওকে জীবনের পাথেয় জুগিয়েছে, আশার আলো জেলে সাফল্যের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন—মুরারিবাবু তার মধ্যে অন্যতম, প্রথম ও প্রধান।

॥৪৩॥

সে-বছর নভেম্বরের প্রথমেই বিনুর দাদা উপার্জনের একটি নতুন পথের সন্ধান দিলেন; সন্ধান নয়, প্রস্তাবই দিলেন।

তিনি এই ক'মাসেই ভাইকে বিলক্ষণ চিনে নিয়েছিলেন।

এর মধ্যে দুটো চাকরির পরীক্ষায় জোর করে বসিয়েছিলেন—একটা সেক্রেটারিয়েটের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কশিপের আর একটা টেলিগ্রাফের কি কাজ। একটার শুরু, প'য়তাল্লিশ টাকায়, আর একটার ষাট।

পরীক্ষা তো দিতেই হবে। কিন্তু অনেক কৌশলে পাস করার মানে তালিকার গোড়ার দিকে নাম থাকার দায় এড়িয়ে গেল সে। তবে সেটা ওর দাদার অনুমান এড়াতে পারেনি। ও যে ইচ্ছে করেই পরীক্ষায় এগিয়ে যেতে পারেনি—না যাওয়ার চেষ্টাই বেশি করেছে—সে-বিষয়ে বোধহয় ওর নিজের থেকেও দাদা নিশ্চিত ছিলেন।

এর পর এ-চেষ্টা করা নিরর্থক।

তবে খুচরো উপার্জনের চেষ্টা হয়ত করতে পারে—এই ভেবেই এ-কথাটা পেড়েছিলেন।

এই সময়টা বহু স্কুল-পাঠ্য বইয়ের প্রকাশক ইস্কুলে-ইস্কুলে প্রতিনিধি পাঠান—যার চলিত নাম ক্যানভাসিং, প্রতিনিধিদেরও বলা হয় ক্যানভাসার। এরা নিজেদের বইয়ের ঢাক পিটে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে তাদের বই-ই সবচেয়ে ভাল, এবং এইটেই পাঠ্য করা উচিত।

এ-কাজে জেলাওয়ারি লোক যায়, প্রকাশকদের সামর্থ্য অনুযায়ী। ছোট হলে দুই জেলার ভার একজনকে দেওয়া হয়, বড় জেলা হলে একজনই যায়। এরাই স্কুলে-স্কুলে ঘোরে, নিজ নিজ এলাকা ধরে। যেসব প্রকাশকদের অল্প কয়েকখানা বই অবসা—মানে শিক্ষাবিভাগ থেকে অনুমোদিত বই—তাঁরা বেশি লোক পাঠাতে পারেন না, অন্য কোন এমনি স্বল্প পুঁজির প্রকাশক পেলে—যাঁদের সঙ্গে স্বার্থসংঘাত ঘটবে না—দুজনে মিলে লোক পাঠান, অন্যথায় গোটা বাংলাদেশ ধরে চার-পাঁচজন লোক ঠিক করেন, তারা মোটামুটি বড় ইস্কুলগুলো ঘুরে চলে আসে।

এদের পারিশ্রমিক স্থির হয় কাজের পরিমাণ হিসেব করে নয়—প্রকাশকের সামর্থ্য ও ঔদার্য অনুসারে।

এক-একজন আছেন তাঁরা ধরেই ... এরা সবাই চোর আর ফাঁকিবাজ। বিল ... প্রতিটি পাই-পয়সা ধরে ধরে হিসেব ক... এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, এ-খ... প্রতিটি দফাই অন্যায় বা অসত্য।

কেউ কেউ বা চুক্তিতেও দেন। ধরাতে পারলে বই-পিছু স্কুল-পিছু বই দাম হিসেবে দুই থেকে চার টাকা। আনার রীডার ধরালে দু টাকা, দু টা... ট্র্যান্সলেশন বা বীজগণিত হলে ... টাকা। আবার আড়াই টাকার এসে ... ধরালেও দু টাকা, কারণ সে-বই স... কিনবে না।

যাদের একেবারে ঘরে হাঁড়ি সিকে... তোলা অবস্থা, তারা এইসব অপমান অবিচার সহ্য করেও দুর্মুখ সাঁ... প্রকাশকদের কাছে ঘোরাঘুরি শুরু কর... পুজোর আগে থেকেই।

দাজেন বিনুকে বুঝিয়ে দিলেন, ... যে-প্রকাশকের কথা বলছেন, তাঁরা এর... নন। টাকাকড়ির ব্যাপারে কৃপণও ... সন্দিগ্ধও নন। তাঁদের বইও অনেক, ... ভাগই চালু। এত হিসেব করার দরক... হয় না, সময়ও নেই।

আরও বললেন, নভেম্বরের মাঝা... রওনা দিতে হবে, ডিসেম্বরের আট-... তারিখ পর্যন্ত ঘুরলেই চলবে। খরচ-খ... ছাড়া তাঁরা পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবেন।

পঞ্চাশ টাকা! সে যে অপরিমাণ ঐশ্ব...

অচিন্তিত, কল্পনাতীত অঙ্ক।

তবে ওর কাছে যেটা টাকার চেয়েও ... কথা—ওর মন নেচে উঠল যে কারণে, ... মধ্যে একটা মুক্তির আ...ান আছে, ব... কাতার বাইরে না-দেখা ... দেখার সম্ভা... আছে।

সে তখনই রাজি ...র গেল। টিউশ... আছে? থাক। নভেম্বরের মধ্যে মোটাম... পড়ানো হয়েই যাবে, কারণ, ঐ মা... শেষের দিকেই পরীক্ষা। খ্রীশ্চান ছাত্র... জন্যেই চিন্তা। তবে তার বাবা আশ... দিলেন, এতদিন পড়ে যদি তৈরি হতে ... পারে তো কি আর এই কদিনেই পারে... তুমি চলে যাও। তবে এ-এক মাসের মা... দেব না।

অনাবশ্যক বোধেই বিনু মনে ক... দিল না যে, ইতিমধ্যেই দু মাসের মা... বাকি পড়ে গেছে তার।

একদিন দাদার সঙ্গে গিয়ে পরিচয় ... আসার পর বিনুকে তিনদিন যেতে হল...

বিরাট কারবার এঁদের। প্রকাশক ... বটেই, ইস্কুল কলেজ পাঠ্যবই অনেক, ... মধ্যে কতকগুলি বেশ চালু, তবে তার চে... বড় এবং পরিচিত পুস্তকবিক্রেতা হিসে... মানে অন্য প্রকাশকদের বই রেখে বি... করেন, বিলিতি আমেরিকান বড় ... প্রকাশকের বই পাইকারিও বেচেন। বর... ব্যবসাটাই প্রধান, বিস্তৃত, যাকে ব... বলাও।

কদিন হাঁটাহাঁটি করে আর অনেক... ধরে বসে থেকে বিনু জেনেল, এক ...

ব্যবসা কিন্তু চলে কতকটা আপনা-আপনিই। কেন ভাল বলে—বিশেষ ইংরেজি বইয়ের বড় বড় অধ্যাপকরা বাঁধা খদ্দের, তাঁরা নিজেরাই এসে অনেক সময় খুঁজেপেতে বই বার করে অনেক সাধ্যসাধনায় ক্যাশমেমো করিয়ে যান, এই খদ্দের ওঁদের ভারতব্যাপী। সব কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই বাঁধা খদ্দের একরকম।

মালিকরা দুভাই এই ব্যবসা দেখেন। বড় যিনি—তিনি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আড্ডা দেন, তাঁদের বুদ্ধি যোগাবার ও কাজের ভুল ধরবার স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্ব নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। খদ্দর পরেন, নস্যি নেন, আদর্শ মানব হিসেবে সেই নস্যির অসংখ্য রুমাল ও নিজের খাটো ধুতি নিজে কাচেন। ব্যবসাটা তাঁর কাছে একটা তথ্য মাত্র—তুচ্ছ।

ছোট ভাই আধা-সন্ন্যাসী, তিনিও কাচাখুলে খদ্দর পরেন, জামা গায়ে দেন না, নিরামিষ খান। কতকটা জ্ঞানতপস্বী গোছের, ভাল ভাল মূল্যবান বই কোথায় প্রকাশিত হল বা হচ্ছে তার খবর রাখা ও প্রকাশমাত্রে সংগ্রহ করাটা তাঁর নেশা, অধ্যাপকরা ভাল বইয়ের খবরাখবর তাঁর কাছেই জানতে চান, মতামত নেন—এইটেই তাঁর প্রধান গর্ব, বই বার করে বা সংবাদ জানিয়েই তিনি খুশি, টাকাটা আসছে কিনা এসব অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান না।

এঁদের প্রকাশন বিভাগের ভার আগে যাঁর হাতে ছিল, তিনি খুব নাকি চৌকোশ লোক। এই যে চালু বই সব প্রকাশিত হয়েছে, বইয়ের প্রচার ও কাটতি হচ্ছে। বড় বড় হেডমাস্টার ও অধ্যাপকের দল বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাটাহাঁটি করেন—এ-সবই নাকি তাঁর অবদান। খেটেছেন খুব, কিন্তু কর্তাদের অর্থ জিনিসটা সম্বন্ধে প্রকট ঔদাসীন্য দেখে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মন দেবেন, সেটা স্বাভাবিক। হাজার ষাটেক টাকার কি একটা গোলমাল করে তিনি একদা সরে পড়েছেন। এখন এই বিপুল প্রকাশনা বিভাগের ভার যাঁর হাতে এসে পড়েছে—দেবেনবাবু, তিনি আগে সামান্য কেরানী ছিলেন, পরে ক্যাশমেমো কাটার কাজ করছিলেন, তা থেকে একেবারে এই বিরাট কাণ্ডকারখানার মধ্যে এসে পড়ে হকচকিয়ে গেছেন।

এটা এক বছর আগের ঘটনা। কিন্তু বিনু দেখলেন তাঁর সে-বিস্ময়-বিহ্বলতা এখনও কাটেনি। এখনও কাজটা কোন-দিক দিয়ে ধরবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন, এখনও ভেবে পাচ্ছেন না।

ভদ্রলোক পান-জর্দা খান, সর্বদাই মুখে সেটা থাকে বলে কথা কম বলেন। কেউ এলে বিশেষ বিনুর মতো কর্মপ্রার্থী, ফস করে একটা কাগজ টেনে নিয়ে এমন মনোনিবেশ করেন যে মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তু কোন কাজ বা লোক সম্বন্ধেই তাঁর কোন জ্ঞান নেই। কাজটা তত্তই জরুরি আর জটিল—যে আর কোনদিকে মন দেওয়া সম্ভব নয়।

ফলে বিনু আসে, ঘণ্টাখানেক বসে থাকে—তারপর এক সময় শোনে—পান-দোক্তারুদ্ধ কণ্ঠ থেকে—আমি তো এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি, আপনি বরং পরশু একবার আসুন।

অর্থাৎ কাজটা হবে কিনা, ওকে দেবেন কিনা, সেটাও স্থির হয় না।

এ এক অসহ্য অনিশ্চয়তা। আশা-নিরাশায় ছটফট করে বিনু। কেবল ওর দাদা অভয় দেন, দেবে দেবে, তোকে দেবে ঠিক। বড়কর্তা আমার সামনে ডেকে বলে দিয়েছেন, এ আমাদের একবার খুব ভাল কাজ করে দিয়েছিল, আগের দত্তমশাই বলেছেন, এর একটি ভাই আছে, তাকে একবার ট্রাই দিয়ে দেখুন—সে-কথা অমান্য করতে সাহস হবে না। এটা শুধু তোকে দেখানো, বড়কর্তার কথাই যে উনি মান্য করবেন তা নয়, আসল কর্তা উনি—উনি যা ঠিক করবেন, তাই হবে, সেইজন্যেই ঘোরানো।

অবশ্য তাই হল। চতুর্থ দিনের দিন সেই অবশ্যম্ভাবী বা অনিবার্য যাই বলুন—কাগজ থেকে মুখ তুলে তেমনি দোক্তার রস বাঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি এর আগে কোথাও গেছেন, কোন জেলায়?

ও, এ-কাজই কখনও করেন নি, না।

বিনু চুপ করে থাকে। এ-সবই বলা হয়ে গেছে এর আগে।

কাজটা কি বোঝেন তো?

হ্যাঁ। আমার দাদা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অ। তা বেশ। যান। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এই দুটো জেলা করে দেখুন। এই আমাদের মহিমবাবু আছেন, উনি আপনাকে বই, ক্যাটালগ, স্কুলের লিস্ট, টাকা সব বুঝিয়ে দেবেন। মহিমবাবু, ইনি আমাদের নতুন রিপ্রেজেন্টেটিভ, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ করবেন—আপনি সব বুঝিয়ে দিন।

অতঃপর মহিমবাবুর পালা। তিনি একদিনও ঘোরাবেন না তা সম্ভব নয়। তিনি পরের দিন আসতে বললেন। তবে লোকটি দেবেনবাবুর থেকে ঢের বেশি কর্মঠ। এইসব বাবুদের ঝট করে নতুন লোক নিয়োগ করা যে কেবল তাঁদের পাপের ভোগ বাড়াতে—এ-কথাটা বারকতক শোনালেও, কাগজপত্র, বই, কার্ড ইত্যাদি সব নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিলেন। নমুনা বই যা পাঠাতে হবে তার নাম লিখে রিকুইজিশান ফর্ম হেডমাস্টারকে দিয়ে সই করিয়ে ডাকে দেবে বিনু, এঁরা এখান থেকে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাবেন, বই ঘাড়ে করে ওকে যেতে হবে না। আপাতত ত্রিশ টাকা দিলেন, হাতে কিছু থাকতে যেন চিঠি লিখে, এঁরা কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার মানি অর্ডার করবেন।

বিলোবার জন্যে বই ঘাড়ে করে যেতে হবে না ঠিকই—কিন্তু নমুনা এক কপি করে যা সঙ্গে দিলেন—বাইরে এসে একটা দোকানে ওজন করাল ও—সাড়ে উনিশ সের, অর্থাৎ একটা হাল্কা ফাইবারের সুটকেসে নিলেও আধমণের ওপর হয়ে যাবে। এইটে হাতে করে এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে যেতে হবে।

বিনু তখন জানত না, পরে জেনেছিল, এত বই অবশ্য কেউই সঙ্গে নেয় না। কয়েকখানা বাছাই-করা বই মাত্র নিয়ে ক্যাটালগ ভরসা করেই যায় বেশির ভাগ. অন্য কোন বই কোন মাস্টারমশাই দেখতে চাইলে, মুখ কাঁচুমাচু করে বলে ও বইটা, মনে ঠিক সঙ্গে নেই (কিম্বা আমি আসার সময় বাঁধা ছিল না, কিম্বা বাসায় ফেলে এসেছি ভুলে) —তা তার জন্যে চিন্তা কি, আমি লিখে দিচ্ছি, তিন দিনের মধ্যে ডাক এসে যাবে।

কোন কোন সুজন মাস্টারমশাই হয়ত মন্তব্য করলেন, না—ইয়ে যদি একেবারেই বলবার মতো না হয়, মানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে না মেলে—আবার একটা বই নষ্ট করবেন।

ক্যানভাসার মশাই একখানি জিভ কেটে বলবেন, ছি ছি, কী বলছেন। আপনাদের দিলে বই নষ্ট হয়। পাঁচজন তো উল্টে দেখবেন। সেই তো লাভ।

আরও জেনেছিল পরে—চোখেই দেখেছিল—যেসব প্রকাশকরা বই সঙ্গে দেন প্রয়োজনমতো দিয়ে আসার জন্যে, মানে যাঁদের অনুমোদিত বই সংখ্যায় কম—তাঁরা হেডমাস্টারমশাইদের সই-করা রসিদ নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু ক্যানভাসারমশাইরা তাঁদের চেয়ে ঢের চালাক, হেডমাস্টারমশাইদের নিজে হাতে লিখতে না দিয়ে শশব্যস্তে নিজেরাই বইয়ের নাম লিখে সই করার জন্যে ফর্মটা এগিয়ে দেন—ওবলাইজ করতেই অবশ্য—তারপর স্বাক্ষর আর পূর্বে লেখা নামের মধ্যের ফাঁকটা অন্য দামী বইয়ের নাম দিয়ে ভরাট করলে কে দেখছে।

অবশ্য এঁদের অসাধু বা অসৎ বলবে না বিনু। যে ব্যবহার এরা পায়, যে কৃপণতা, যে সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করতে হয়—খোরাকীর জন্যে পনেরো আনা কি চোদ্দ আনা মাত্র দৈনিক বরাদ্দ যাদের—আত্মরক্ষার জন্যেই তাদের এ-কাজ করতে হয়। উপায় কি।

পাড়াতে ওদের এক বন্ধু ছিল, তার ডাক নাম নাকি বীণা, বিনু বলেই ডাকত সবাই। ওর সহপাঠী নয়, সবপাঠীদের বন্ধু হিসেবে সৌহার্দ্য। শুনেছিল বীণার কে আত্মীয় বহরমপুরে আছেন।

বীরভূম পরের কথা, সেখানে বোলপুর শহরে দাদার এক বন্ধু থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে খবরাখবর, পথের নিশানা পাওয়া যাবে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে কিছুই তো জানে না। মুর্শিদাবাদের সঙ্গে পরিচয় তো ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে। খোসবাগ লালবাগ ভগবানগোলা কাঁদী সবই নামমাত্র পরিচয়—আসল মুর্শিদাবাদের তো কোন খবরই রাখে না।

সে অনেক ভেবেচিন্তে বীণার কাছেই গেল।

সে বললে, আরে। ঠিক এসেছিস। আমি ছাড়া কার কাছে যাবি। আমার জামাইবাবুরই তো হোটেল রয়েছে, মস্ত বড় হোটেল, খুব নামকরা। তুই সেখানে গিয়ে ওঠ, আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, জামাইবাবুই বাকি সুলুক-সন্ধান দিয়ে দিতে পারবেন।

(চলবে)
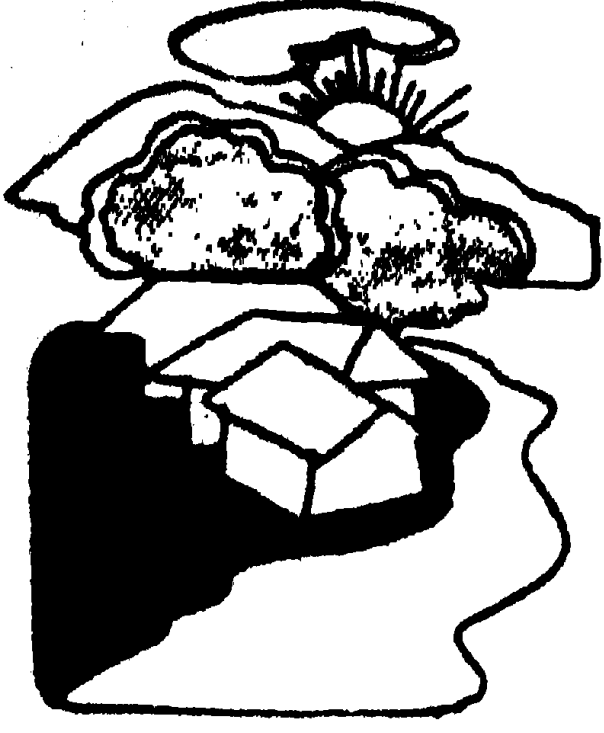
পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

নির্মল মজুমদার ফিরল না। জোর করল না তাকে। লাবণ্যর রাগ হয়। অদ্ভুত ছিল সেই বয়স্ক পুরুষটা। ফিরল না কেন? যদি ফেরে। মলিন চোখমুখ ধূসর দেহ নিয়ে টলমল পুরুষটা লাবণ্যর জন্য নদী পার হচ্ছে। কত রাত সে ঘুমোয়নি রাজকুমারীকে ভেবে ভেবে। লাবণ্য ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে বয়স্ক পুরুষটাকে।

পিথা, ডাক্তার, মজুমদার সকলের ঘুম নেই চোখে। রাজকুমারী দিব্যি নিদ্রায় ডোবে। পক্ষীরাজের স্বপ্ন দেখে। সে তো সকলের চোখের মণি হয়ে গেছে। রাজকুমারীর জন্য স্বয়ংবর সভা। কত রাজপুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। ভিখা সাপের জন্য মরেছে। বিষে নীল হয়ে গিয়েছিল তার দেহটা। সব মনে পড়ে। ভিখা থাকলে তার বিপদ ছিল। লাবণ্য তা জানে। ভিখার মৃত্যুর পর এগিয়ে এল অন্য রাজপুরুষ। সকলকে দেখেছে রাজকুমারী। সবার কথা জানে। এখন এত ভিখার কথা মনে পড়ে কেন? পিথার চেহারাটা অনেকটা যেন---। রাজকুমারী ক্রমশ নিঃঝুম হচ্ছে।

লাবণ্য চলে যাওয়ার পর এক ধরনের গা ছমছমে পরিবেশ তৈরী হয়ে গেছে। দীপঙ্কর নিশ্চুপ বসেছিল। লাবণ্যকে বোঝা গেল না। কেমন আকর্ষণ আর আশঙ্কা তৈরী করে রাজকুমারী চলে গেছে। চোখের সামনে একটা সাপ উঠেছিল। কালো মিশমিশে। লাবণ্য বললো বাস্তু সাপ। তখন লাবণ্যর ভঙ্গি! দীপঙ্কর ক্রমশঃ নুয়ে পড়ছে।

সেই সন্ন্যাসীর আর কোন খবর নেই। বিভূতি তার শৈশবকে স্বীকার করেনি। কলাবনিতে এসে জড়িয়ে যাচ্ছে দীপঙ্কর। আজ লাবণ্যর সঙ্গে যে কথা হল, এরপর থেকে জড়িয়ে যেতে বাধা থাকবে না। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। রিপোর্ট তৈরী হচ্ছে, আর একটু ডিটেলস্ জানতে পারলেই কমপ্লিট করে পাঠিয়ে দেবে। তারপর তো কলাবনি তার নয়। এই রাজগৃহ ছেড়ে যেতে হবে।

ছেড়ে গেছে নির্মল মজুমদার। কেন ছেড়েছে তা আর এখন অজানা নয়। সে যেন নির্মল না হয়ে যায়। দীপঙ্কর ক্রমশঃ ভয় পাচ্ছে। অল্প বাতাস আসছে। বাতাস নয়, কার নিঃশ্বাস। দূরে কাঁচ কলাপাতা রঙের শাড়িটা নীলচে কালো হয়ে গেছে। ঘন নিঃশ্বাস উগরে দিচ্ছে কে যেন পুরনো রাজবাড়িতে। সাপটা কাছাকাছি অন্ধকারে আছে। বাস্তু সাপ। প্রথম দিনেই ওর মুখোমুখি হয়েছিল সে। আবার দেখা হয়ে গেল। খুব কাছেই আছে। গায়ে রোঁয়া কেটে যায়। বড় নিঃসঙ্গ লাগছে। এখন যদি এই ঘরে কেউ আসত। বিমল বা-হ্যাঁ ডাক্তারও। গল্প করে অন্য ব্যাপারে ঢুকে যেত দীপঙ্কর। একটা মানুষ চাই। একা এত গভীর নিঃশ্বাসের মুখোমুখি হয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। কেউ আসুক এই নির্জন রাজগৃহে। তার সামনে বসুক।

ঠিক এইরকম হয়। খুব কাছে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ শোনা গেল। কে? দীপঙ্কর লাফিয়ে ওঠে। কেউ ঘরের ওই সামনের দরজার কাছে রয়েছে। পদ শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। মানুষ। সে তো এই-রকম চাইছিলো।

দীপঙ্কর দরজা খুলেই দেখে হাত পাঁচেক দূরে কে যেন বসে আছে। টর্চ ফেলতেই দেখে। একে। বোবা মানুষটা।

দীপঙ্কর দেখে ভাঙাচোরা একটা মুখ তার দিকে চেয়ে আছে। আদুল গা কোমরে একটা কানি। হাত-পা কর্দমাক্ত। শরীর থেকে ঘামের গন্ধ বেরোচ্ছে। পেটটা ভিতরে ঢুকে গেছে।

ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছে গুহিরাম। বাবুর ঘরে পৌঁছে গেল। বাবু ঠিক চিনেছে তাকে। গুহিরামের মুখে কোন শব্দ নেই। নিঃশ্বাসও নেমে গেছে। চোখ থেকে আবেগে জল পড়ছে।

দীপঙ্কর অবাক। এখন এই রাতে ওই বোবা লোকটা এখানে এল কি করে। ওর বাড়িতো কাঁসাই পেরিয়ে। সেই লোকটা যার সঙ্গে প্রথমদিন দেখা হয়েছিল।

আঁ আঁ আঁ জড়ানো শব্দ অন্ধকারে ছটোপাটি খায়। দীপঙ্কর স্তব্ধ হয়ে গেল এই বিদীর্ণ করা শব্দে। দুটো হাতে গুহি-রামের মুখটা তুলে ধরেছে। হাতে জলের স্পর্শ। আবেগে লোকটার মুখমণ্ডল নড়ছে। চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে। কত কথা বলার আছে ওর। সব অবাক। শুধু বিচিত্র কণ্ঠনালী ভেদ করা শব্দ অন্ধকারে ঝুলে যাচ্ছে।

এই শব্দ ব্রহ্ম। এই শব্দ একদিন কাঁসাইয়ের তীরে তাকে কলাবনি চিনিয়ে দিয়েছিল। একদিন, সেই শেষ শীতের বেলায়, কাঁসাইয়ের তীরে দাঁড়িয়ে ছিল বহুক্ষণ। নদী পার হবে, মানুষ নেই। একটা মানুষ আঙুল তুলেছে দিগন্তে। তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে ধ্বংস্ত সামন্তরাজপুর, ভাঙ্গা কুঁড়েঘর নদীর বালিয়াড়ি, দূরের পাহাড়, ঘরে ফেরা পাখি। মুখে ভাষা নেই। তবু চেনাতে তার কোন ভুল হয়নি। ভাষাহীন চোখে দ্যুতি ছিল। সমস্ত পৃথিবীটা দেখিয়ে দিয়েছিল সেই নির্জন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে।

সে নিশ্চুপ গুহিরামের দিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণ লাবণ্য ছিল, তারপর একটা সাপ দেখা গেল। আশঙ্কা জেগেছে মনে। আশঙ্কার কথা কাউকে খুলে বলতে পারলে ভাল হত। সামনে দাঁড়িয়ে বোবা মানুষটা। একি আগে থেকে সব বুঝে ফেলে। না হলে কোনদিন আসে না আজ এই অন্ধপুরিতে ঢুকে পড়ল কিভাবে।

সেই সন্ধ্যায় গুহিরামবাবুকে দেখিয়ে-ছিল পুরো পৃথিবীটা। নদী পাহাড়, ফসলের ক্ষেত দুঃখী মানুষের ঘরদুয়ার সব। বলতে চেয়েছিল দেখেছো সন্ধ্যার মুখে আমার এই দেশ কত সুন্দর। দুঃখ বোঝার উপায় নেই। তুমি নতুন মানুষ দুঃখ দেখাবো না। মানুষটা সেদিন তার মত লোকটাকে অবজ্ঞা করেনি। সব চিনেছিল। তারপর তো কতদিন হয়ে গেল বাবু। আমার পৃথিবীতে অনেকদিন কাটালে। এখন এর ভিতরের দুঃখের কথাগুলো শোন। কোনদিন কারো কাছে বলিনি, বলতে পারিনি কা[illegible] কথা তুমি বুঝবে তাই এসেছি। ঘরে আমার অন্ন নেই। না থাক, এ আমার সমস্ত জীবনের সঙ্গী। অন্ন নেই বস্ত্র নেই মুখে ভাষা নেই। আমার ছোট বাচচাটা মরে গেল কাল রাতে। কাঁসাইয়ের পাড়ে পুঁতলাম তাকে। আমায় রজনীবাবু আজ মারল এত-দিনে অপমানটা গায়ে বেজেছে। বাচচাটা মাটির নিচে শুয়ে আছে। তার জন্য বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। তুমি আমায় বোঝ। রজনীবাবুর চড়টা মরা বাচচার গায়ে লেগেছে। জমি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। দখল করেছে কত মানুষ। সব অন্ধকারের পিছনে ঘোরে। আমি পাইনি। এত বড় পৃথিবী যা তোমায় দেখালাম সেদিন, এর জন্য আমার আনন্দ হয়। এর এক ফোটা মাটিও আমার নেই।

গুহিরাম। দীপঙ্কর ফিসফিসিয়ে ডাকে।

গুহিরামের মুখে হাসি ফোটে। বাবু চিনেছে ঠিক। তাহলে আমার মরা বাচচাটার কথা বলি। একটা শিশু তার চোখের সামনে খলবল করতে থাকে।

গুহিরাম আজ বড় ভয় হচছে, তুমি রাজকুমারীকে চেন? খুব ফিসফিসে কণ্ঠস্বর।

গুহিরাম শোনে না। কানের ভিতর খুব আবছা বাতাস যেন ঢুকে পড়ে...ভয়! না ভয় কোথায়। কোন ভয় নেই তার। গুহিরাম মাথা নাড়ে। বাবু কথা বলছে তার সঙ্গে। বিপুল আনন্দে বুক বিস্ফারিত হয়ে যায়। সে আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়ে। দুটো হাত

দিয়ে বোঝাতে চায় তার ছেলের কথা। চোখমুখ কাঁপিয়ে বলতে চায় নদীর ধারে শুয়ে রয়েছে তার থলবলে শিশুটা। নদীতে জল এসেছে। ভয় হয়। জলে সে ভেসে যাবে। জন্তুজানোয়ারে ছিঁড়ে খাবে তার দেহ।

দীপঙ্কর বুঝতে পারছে না কি করবে। আবেগে এই মানুষটাকে কথা বলার মত ভেবেছিল। এখন এ কি বলছে? না এতদিন কলাবনিতে বাস করেও এর ভাষা শেখেনি সে। কি চায়। দুঃখী মানুষ। কষ্টে আছে। দীপঙ্কর গুহিরামকে ছেড়ে টেবিলের দিকে যায়। আজ অনেক কথা বলার ছিল। যাকে সামনে পেল। সে বোবা কালা।

গুহিরাম স্তম্ভিত হয়ে যায়। চোখের সামনে ভূত দেখে। একি! (বাবু তুমি শুনতে পাচ্ছ না আমার বাচচাটার থলবল শব্দ। ঐ যে নদীর পাড়ে শুয়ে আছে। হাত নাড়ছে। হাসছে। বাবু ওখানে রাতদুপুরে শিয়াল আসবে। আমার যে বড় কষ্ট। ওই বাচচাটা আর কোনদিন হাসবে না।) দীপঙ্করের হাতের দশ টাকার নোটটা অস্ত্রের মত হয়ে আছে।

দীপঙ্করের হাতের নোটটা দেখে গুহিরাম পাহাড় গর্জনে বিদীর্ণ করে দেয় চারদিক। অন্ধকার কাঁপতে থাকে। (আমি কি ভিক্ষার জন্য এসেছি বাবু! রজনীবাবু আমাকে মারলো. সে অপমান বড় বাজল গায়ে।) গুহিরামের চোখ গনগনে আগুনের ভাটা হয়ে যায়। সে মেঘ গম্ভীর চিৎকার করে দু পা পেছিয়ে আসে। কাঁপছে থরথর করে। তারপরেই ঘোর অন্ধকারে লাফ দিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে যায় বাইরে।

স্তম্ভিত দীপঙ্কর চৌধুরী অন্ধকারে আবার একা হয়ে যায়।

*

টলমল করতে করতে অনেক অন্ধকার এড়িয়ে এখানে পৌঁছতে সময় লাগল অনেক। অনেকদিন ধরে হাঁটছে ডাক্তার। লাবণ্যর ঘরে পৌঁছতে দিন যায় রাত যায়।

মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। এলো-মেলো হয়ে গেছে বসন। মাথার রাশ রাশ চুল ছড়িয়ে গেছে পালঙ্কে। মুখ চেপে রয়েছে বিছনায়। চোখের অন্ধকারে বয়স্ক লোকটা সরতে সরতে দীর্ঘদেহী কালো-মানুষ। পিথা এল?

লাবণ্য কষ্ট করে উঠে বসে। চোখমুখে ভয়ের ছাপ। এই রাতে এত অন্ধকার এড়িয়ে ভগ্ন রাজগৃহে তার কাছে যে এসেছে তার আকর্ষণ তো কম নয়। একেবারে উদভ্রান্ত হয়ে গেছে লাবণ্য। ভয় ভয় চোখে দেখে দরজায় ডাক্তারদা।

সে আঁচল ঠিক করে। মাথার চুল সামনে থেকে পিঠে ছড়িয়ে দেয়। কাপড় দিয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে নেয়। তারপর ভাবলেশহীন চোখে তাকায় মানুষটার দিকে। খুব বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে, এত রাতে তুমি এলে?

ডাক্তার এতটা আসতে আসতে নিজেকে সামলে নিয়েছে। এভাবে আর থাকা যায় না। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ বিভ্রান্ত লাবণ্যকে দেখে তার চোখ জ্বলে ওঠে। খুব সন্তর্পণে উত্তেজনা সামলায়।

লাবণ্য!

ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে লাবণ্য চমকে ওঠে। দৃষ্টিতে ভয় পায়। এ চোখের ভাষাতো সে বোঝে। কি বলছ? লাবণ্য যেন সমর্পণ করে ফেলেছে নিজেকে।

আমি কি শুনছি।

কি? লাবণ্য আকাশ থেকে পড়ে।

পিথা নায়েকটা মানুষ নয়, তুমি জান?

লাবণ্য নিশ্চুপ ডাক্তারকে দেখে। অবাক হয়। কি চোখ। কোন খবর এড়ায় না।

একটা মদোমাতাল. লেঠেল আর তুমি। বলতে বলতে ডাক্তার বসে। একটা সিগারেট ধরায়। হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় জ্বলন্ত বারুদ। পরের কাঠিটা জ্বালিয়ে ফেলে সহজে।

তুমি কি বলছ ডাক্তারদা? লাবণ্য সহজ হয়ে উঠছে।

তুমি জান না?

পিথা. লেঠেল, এসব আমার জানার কথা?

লাবণ্য আবার যেন বিমর্ষ। ডাক্তার লাবণ্যকে দেখতে থাকে। বিমর্ষ হলে বড় মায়াময় হয়ে ওঠে মেয়েটা। চোখের ভিতরে কোন কথা নেই। অসহায়তা প্রবল।

লোকে বলছে অন্য কথা!

কি কথা। লাবণ্য পায়ে পায়ে ডাক্তারের কাছে।

তোমাকে জড়িয়ে ঐ লেঠেলটার কথা মন্দিরে ভোর সকালে...। ডাক্তার থমকে যায়।

ডাক্তারের অজ্ঞাতে লাবণ্যর চোখ জ্বলে উঠে আবার নির্বিষ। সে চমকে উঠেছে। ভয় পেয়েছে ভিতরে ভিতরে। এই মানুষটাকে কবে থেকে ভয় করতে আরম্ভ করল জানে না। কই পিথাকে তো ভয় হয় না। আর কারোর কাছে লুকোনর কিছু নেই। ভয়ের কিছু নেই। ভোরের মন্দিরের কথা ডাক্তারদা জানাল কিভাবে? দেখেছে। তফাবনি থেকে শিমুলেশ্বরের মন্দিরকে পাহারা দেয় ডাক্তারদা। লাবণ্য ভিতরে ভিতরে কঠিন হয়। মাথার ভিতরে কয়েকটা মুখ বিদ্যুতের মত সরে যায়. পিথা নির্মল মজুমদার. খুব আবছা দীপঙ্কর চৌধুরী আর একটা সাদা

খোড়া। এখনই আঘাতে জীর্ণ করে ফেলে দিতে পারে এই পুরুষটাকে কিন্তু কিভাবে সে আঘাত দেবে? এই মুখ এলোমেলো উদভ্রান্ত চেহারা একে একেবারে এড়াতে যে মন চায় না। দুঃখের ছাপ সর্বাঙ্গে। ইদানীং সেটা বেড়ে উঠেছে, লাবণ্যর নজর এড়ায় নি তা। সব পুরুষকে নিয়ে সে তো রাজেন্দ্রাণী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ অহঙ্কারের শেষ নেই। যদি সে পাহাড় তুলে আনতে বলে পশ্চিম থেকে, এ পশ্চিমে উড়ে যাবে ঠিক। যদি বলে এই বিজন অরণ্যে গড়ে দাও নগর, অরণ্য নির্মূল হয়ে যাবে নিশ্চিত।

তোমাকে এসব কে শুনিয়েছে? লাবণ্য কঠিন হলো।

শুনতে অসুবিধে হয় না। ডাক্তার সহজ হয়ে উঠছে।

দু চোখ রগড়াতে রগড়াতে লাবণ্য আবার স্তব্ধ, তাহলে সব তুমি সত্যি শুনেছো ডাক্তারদা।

ডাক্তার আচমকা উঠে দাঁড়ায়। সব সত্যি।

হ্যাঁ। লাবণ্য পালঙ্কের গায়ে ভর দিয়ে দাঁতে নুখ কাটে। ভাবলেশহীন মুখ। ডাক্তার কাঁপছে। ভুল শুনছে না তো। সে আস্তে আস্তে বসে পড়ে ইজিচেয়ারটায়। থমথমে হয়ে চেয়ে থাকে লাবণ্যর দিকে। মাথাটা ভার হয়ে যাচ্ছে।

লাবণ্য অন্যদিকে ফিরেছিল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে পালঙ্কের চাদরটা টেনে টুনে ঠিক করে। বইটা তুলে রেখে দেয় টেবিলে। হাতের আলোটা মুখের সামনে ধরে আয়নার কাছে দাঁড়ায়। কপালের টিপটা বাঁ হাতে ঘষে ঘষে মোছে। আলোটা আবার টেবিলের উপর রাখে। গুন গুন করে কিসের যেন সুর ভাঁজে। অন্যমনস্ক হয়ে এদিক সেদিক করে বেড়াচ্ছে। লাবণ্য নিজের মনে ঘরের ভিতর ঘুরতে থাকে। তারপর হঠাৎ দাঁড়ায়। টানটান দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ডাক্তারের দিক।

—কি হলো চুপ করে আছ কেন? লাবণ্যর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাষ।

—রাতে ফিরবে না থাকবে?

ডাক্তারের চোখ জ্বলছে। সে লাবণ্যর দিকে তাকায় না।

—আমাকে অপমান করতে একটুও বাঁধল না তোমার। লাবণ্য ফুঁসে উঠেছে। ডাক্তার ওর দিকে তাকিয়েছে। এরকম চেহারাতো দেখেনি ও।

—তুমি যদি সহ্য না করতে পার ওই লোকটাকে, এস না এখানে। লাবণ্য ঘরের অন্ধকারে পা রেখে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমায় হেঁটে যাচ্ছে।

লাবণ্য তুমি বলছ একথা! ডাক্তার বিড়-বিড় করছে।

হ্যাঁ, আমিই বলছি, আমাকে একেবারে পণ্যের মত মনে কর তুমি। লাবণ্যর দাঁতে দাঁত ঘসে যাচ্ছে। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে অত্যধিক জোর পড়ছে।

তুমি বলছ, বিশ্বাস করো আমি ঠিক এভাবে। ডাক্তার কথা শেষ করতে পারেন।

লাবণ্য মাথার এক ঢাল চুল পিছনে হাত খোপা করে গুছিয়ে রাখে। শাড়ির আঁচল দিয়ে সমস্ত শরীরটা নিখুঁতভাবে ঢেকে নেয়।

তুমি জান আমাকে, তবু ঐ ভাবনা নিয়ে দৌড়ে এলে কি করে?

ডাক্তার লাবণ্যর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায়। কোথায়। কোথায় সেই মায়াময় চক্ষু, অপরূপ মুখমণ্ডল? তার ভিতর দিয়ে জেগে উঠেছে অন্য একটা চেহারা।

তুমি আর কোনদিন আসবে না এখানে ডাক্তারদা।

কি বলছ তুমি লাবণ্য। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যায়। সে থম মেরে বসে থাকে। মাথা নুয়ে যায়। লাবণ্যর কণ্ঠস্বরে এত দৃঢ়তা তো সে দেখেনি কখনো।

রজকুমারী তখন ঘরের ভিতরে হেঁটে বেড়ায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আধো অন্ধকারে ছায়াময় মুখ দেখে নিজের। আয়নার দিকে চেয়ে লাবণ্য হাসছে। তোমার মনটা কি রকম, এরপর দীপঙ্কর চৌধুরীর কথা তুলবে হয়ত কোনদিন! এসব তোল কেন, যে সম্পর্কটা পাতিয়েছো তা রক্ষা কর। লাবণ্য আস্তে আস্তে বলে।

ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বুক হাপরের মত লাফাচ্ছে। সে নিঝুম হয়ে বসে থাকে। আবার একটা ভুল করল সে। এই রাজকুমারীকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে? মাথা ঝাঁকাচ্ছে ডাক্তার বোস, না-না এভাবে নয়।

একলা ঘুরতে ঘুরতে লাবণ্য হঠাৎ দাঁড়িয়েছে। খুব নিবিষ্ট মনে ডাক্তারকে দেখতে থাকে। নুয়ে গেছে মানুষটা। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে ডাক্তারের উপর। দু-হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের মাথাটা আচমকা তুলে ধরেছে।

কি হয়েছে? লাবণ্য গম্ভীর।

ডাক্তার নীরব। রাজকন্যা খুব ঘন হয়ে এসেছে। ওর গায়ের স্পর্শ গন্ধ খুব চেনা এই মানুষটার। লাবণ্য যে হাত তার মুখের উপর তাতে উত্তেজনার চিহ্ন।

এমন করছো কেন? লাবণ্য হাসছে।

আমায় কি চলে যেতে হবে, সম্পর্ক সব শেষ!

লাবণ্য উঠে সরে গেছে। খুব আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়েছে। হ্যাঁ।

ডাক্তারের চোখ নেমে যায়। মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে।

হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে কোন কথা হোক আমি চাই না। লাবণ্য স্থির প্রত্যয়ী।

একদিন তুমি আমার মা হয়েছিলে না! ডাক্তারের কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়।

হ্যাঁ। লাবণ্যর চোখ জ্বলে ওঠে, সে পায়চারি করতে থাকে ঘরের ভিতর, হ্যাঁ সে মর্যাদা তো রাখলে না, তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো না। লাবণ্যর কণ্ঠস্বরে ঝাঁজ। উত্তেজনায় শরীর ফুলছে।

ডাক্তার বোস নিশ্চুপ লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে থাকে। লাবণ্য অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে। কঠিন মুখ চোখ। ডাক্তার অন্য-মনস্ক হয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে।

রাজকুমারী আবার ফেরে। চোখমুখে চাপা হাসি। খুব গোপন নিজস্ব।

একেবারে নির্বিষ হয়ে গেছে পুরুষটা। লাবণ্য নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে আসে। একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার অসহায় মুখ তোলে।

আমি যাই। ডাক্তার বোস উঠে দাঁড়িয়েছে।

লাবণ্য নিশ্চুপ। মুখ চোখ স্বাভাবিক, ভাবলেশহীন। ডাক্তার বোস জবাব চেয়েছে পায়নি। তাই দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ লাবণ্যর মুখে আলো ফুটছে। মেয়ে এগিয়ে এসেছে, তুমি ভীষণ ভীতু, এত সহজে আমি অন্যের হয়ে যাব?

রাজকুমারী এগিয়ে এসে দুটো হাত ডাক্তার বোসের কাঁধে তুলে দিয়েছে, যদি যাও, চলে যাও, কিছু বলার নেই। লাবণ্য ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

ডাক্তার বোস কাঁপছে। কিছু বুঝতে পারছে না। কানে আসছে রাজকুমারীর ফিস-ফিসে কণ্ঠস্বর, তোমার ভয় কেন, আমাদের সম্পর্ক তো...।

আমি তাহলে থাকব, আসব এখানে?

তোমার ইচ্ছে, যদি বিশ্বাস করো আমাকে। লাবণ্যর কণ্ঠস্বরে বিষাদ। ডাক্তার বোস ঘাড় হেলায়, হ্যাঁ বিশ্বাস তো করে।

তাহলে আসবে, সব সম্পর্ক থাকল। লাবণ্য হাসছে, হাসতে হাসতে বোসকে নিয়ে গেছে পালঙ্কের দিকে। বসিয়েছে পালঙ্কে। তার গায়ে শরীরের ভর দিয়ে মাথার চুলে হাত ঘোরাতে থাকে। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, দেখি, তোমাকে একটু দেখি, খুব যে রাগ হয়েছিল, চলে যাও, কি যাবে না, যাও, আর কোনদিন ওসব উচ্চারণ করবে না, কোনদিনও না।

লাবণ্য সামনের পুরুষটাকে টেনে এনেছে নিজের কাছে। ডাক্তার বোস ক্রমশঃ সাহসী হয়ে উঠেছে। লাবণ্যর মুখটা দু হাতে ধরেছে। চোখের মনির ভিতরে নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠেছে। রাজকুমারী হঠাৎ উন্মত্তের মত হাসছে। সমস্ত দেহটা ওর কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে ডাক্তার বোস দু হাত টেনে রাজকুমারীকে প্রগাঢ় চুম্বন করে।

লাবণ্য ছিটকে উঠে যায়। দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখ মুখে বিস্ময়। কয়েক মুহূর্ত সব নিশ্চুপ। ডাক্তর বোস উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমি যাই!

লাবণ্য পলকহীন চোখে দেখছে মানুষটাকে, তারপর ঘাড় হেলায়। রাগ করোনি তো! তুমি তো আমার...। ডাক্তারের চোখে চাপা হাসি।

লাবণ্য নিথর হয়ে ডাক্তারের চলে যাওয়া দেখল। এমন হবে ভাবা যায়নি। এখনো তো এই মুখচোখে ওর চিহ্ন রয়েছে। এত সাহসী পুরুষ!

সব বুঝে ফেলেছে নাকি! লাবণ্যর মুখে ভয়। আজ দীপংকর চৌধুরী যে শোনালো রূপকথার, সে-গল্প কি এই ষটাও জানে! তার মনের ভিতর ঢুকে-ছে। লাবণ্য কাঁপছে। আজ যে চোখ ছে ডাক্তারের তা ভয়ের। অত মোহ ?

ঠিক তখনই একটা মানুষ বাইরের কারে গভীরভাবে লুকোয় নিজেকে। তার চলে গেল। তার হয়ত পা পাথর আছে। আদুল গা, মিশমিশে কালো। পিথা নায়েক হাট থেকে ফেরার পর রে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়েছে কলা-তে এসে। বাড়িতে বসতে পারেনি ছুটে ছে এদিকে।

রাজকুমারীর জন্য মন চঞ্চল হয়েছে। বনির ডাক্তারবাবুর এ-বাড়িতে আসা য়া নিয়ে চারদিকে ফুসফাস হয়। এসব ার কানে গেছে। সে বিশ্বাস করে না। বলেছে তার দিকে রুখে গেছে। ডাক্তার-র মনে যাই থাক, রাজকুমারী দেবীর। অমন চোখ, অমন মুখ নিয়ে আকাশ ক নেমে এসেছিল। পিথা প্রণাম সেরে দাঁড়াতেই দেখেছিল রাজকন্যেকে। তার কু-কথা না হয়।

সরল পাথরের মত দেহ, মনও তাই। থেকে ফেরার পথে নেশা হয়েছিল ীর। রাজকন্যের জন্য মন টালমাটাল ছে তখন। ডাক্তারবাবু তো ভাল মানুষ। থা ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে তার নবাসার কথা জানিয়ে স্বস্তি পেয়েছ। কন্যের ভালবাসায় সন্দেহ নেই। ক্তারবাবুকে সব জানিয়ে দিলে ক্তারবাবু মন তুলে নেবে ওখান কে। রাজকন্যের থেকে সাড়া পাবে না এটা শ্চিত। এতো সোজা সরল হিসেব।

কলাবনিতে ফিরে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ধুম ধকার রাজবাড়িতে ঢুকে পড়েছে। পায়ে য়ে ঠিক চিনেছে রাজকন্যের ঘর। এ-রাতে মানুষ লাগে না। ঘরের সামনে এসেই কেছে। কাঁপছে। (ডাগ-দরবাবু কখনে সিলো! রাজকনিয়া এ কি করে!) পিথার চোখ স্তম্ভিত। ডাক্তারবাবু তার রাজ-ন্যার কাঁধে মাথা রেখেছে। রাজকন্যা এক ত ডাক্তারবাবুর পিঠে রেখে ঘন হয়ে ছে। ফুসফাস কথা। পিথা সাহসী ক্তারবাবুকে দেখে অবাক হয়

সে টলমল হয়ে আরো অন্ধকারে ডুবে য়। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কিছু বুঝছে । একি দেখল সে! রাজকন্যা সব মেনে ল! কাঁপতে কাঁপতে পিথা নায়েক ঘুরে বাড়ায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে। গোড়েই সামনে কে একজন দাঁড়িয়ে। পথা সরল হয়ে দাঁড়ায়। কে! রাজা-বু! অন্ধকারে এখানে কেন? পিথা মাথা মিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় ঝড়ের মত। ড়ের মত পার হয়ে যায় রাজ-অন্তঃপুর, হিমহল অবশেষে বিশাল নিঃঝুম দউড়ি। রাজাবাবু তাকে চেনেনি। তবু চুপ রে ছিল। চিৎকার করলো না, কুট হাত দিয়ে ধরলো না। সে তো অচেনা। এত রাতে এখানে কেন দাঁড়িয়ে। এ-সবের হিসেব করতে পারে না পিথা।

হাতের আঙুল টসটসে হয়ে যাচ্ছে ভীষণ। পায়ের অবস্থাও সেইরকম। চোখের ভ্রূ সব পড়ে গেছে। ব্যাধি দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। পচন ধরছে। রাতে ঘুম নেই রাজপুরুষের। কেমন যেন গন্ধে জেগে উঠেছেন।

আজ লাবণ্য আসেনি। মঙ্গলার হাতে খেয়েছেন অন্নদাশংকর। মঙ্গলা এই ঘরের দরজার কাছে শুয়ে আছে। অন্নদাশংকর নেমে পড়েছেন বিছানা থেকে। লেঠেলের বউটা তাঁর মায়ায় পড়ে গেছে। আছে তো বহুদিন ধরে। এখানেই বয়স বাড়িয়েছে মঙ্গলা। একসময় রাজবাড়ি কাঁপিয়ে হাঁটত। লাবণ্যর মা মঙ্গলাকে গোপন ঈর্ষা করত। মঙ্গলার মত আরো কয়েকজন এই বাড়িতে ছিল একসময়, কাজ মিটে যেতে চলে গেছে। লেঠেলের বউ যায়নি। তাকে যাবার কথাও কেউ বলেনি, লাবণ্যর মা তো বহুদিন মারা গেছে।

ঘুমঘোরে কিসের গন্ধ পাচ্ছিলেন। কুৎসিত স্বপ্নের ভিতরে জড়িয়ে গেছেন অন্নদাশঙ্কর। বড়সড় মাঠ, একটা মৃত জন্তু, তার কিছু মনে পড়ে না। সেই অনন্ত প্রসারিত মাঠ থেকে উঠে আসছিল গন্ধটা। নাক আঁটকে গেছে। বাইরে বৃষ্টির ঝম-ঝম, মেঘের গর্জন।

টলতে টলতে নেমে পড়েছেন অন্নদা-শংকর। গা গুলিয়ে উঠছে। কোথায় যেন কিসে পচন ধরেছে। ঘরে গুমোট অন্ধকার। হাতের টর্চটা নিয়ে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। মাথা ঝিমঝিম করছে। গন্ধটা ক্রমশঃ তীব্র।

অন্নদাশংকর করিডোর-এর উপর শুয়ে-থাকা মঙ্গলার সামনে হঠাৎ বসে পড়েছেন। চারপাশে আলো ফেলছেন। কোথাও কিছু নেই। সব ঝকঝক করছে। মঙ্গলার ভাঁজ-পড়া মুখের উপর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের ছাপ। এখান সব পরিচ্ছন্ন। তিনি নিবিষ্ট মনে মঙ্গলাকে দেখতে দেখতে কখন উঠে পড়েছেন। আজ রাতটা দুঃসহ হয়ে উঠবে।

সকলে ঘুমিয়ে আছে। কাকে ডাকবেন তিনি। তাঁর তো ঘুম আসে না। একা একা এই অন্ধকারে দীর্ঘ সময় জেগে থাকা কষ্টের। আর গন্ধটা ক্রমশঃ তীব্র হয়ে চেপে ধরছে তাঁকে। পুরনো বাড়ি। একটা প্রাচীন বাতাস এর ভিতরে ছড়িয়ে আছে। সেই বাতাস ধরে রেখেছে পচনের গন্ধ। স্তব্ধ হয়ে আছে। পুরনো বাড়ির গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে তা আরও দুঃসহ।

ঘোরের ভিতর টলমল পা ফেলছেন অন্নদাশংকর। ইদানীং কেমন যে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন নিজের উপর। গর্জে উঠতে ভয় হয়। রাজবাড়ির সব খোলামেলা হয়ে যাচ্ছে। সেই লেঠেলের যুবতী বউ মঙ্গলারও বয়স বেড়েছে। ক্রমশঃ মঙ্গলাকে আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে। লাবণ্য নিজের খেয়ালে আছে। ব্যবহৃত জীর্ণ বস্তুর কাছে আত্মসমর্পণ বড় গ্লানির। অন্ধকারে তাঁর দু চোখ জ্বল-জ্বল করছে। লাবণ্য আজ ওষুধ দেয়নি। লাবণ্য খোঁজ নেয়নি। এখন মঙ্গলা আশ্রয়।

ঘুমিয়ে আছে লাবণ্যময়ী। ঘুম না তন্দ্রা, না আধো জাগরণ। মুখের কোণে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে। কারা যেন এক তর্জনী নিক্ষেপে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। রাজকুমারীর কোন অলংকার হারায়নি। কত মানুষ জেগে আছে। সহস্রদল জাগে, চম্পক-দল জাগে, দুই পক্ষীরাজ জাগে। রাজকুমারী ঘুমোয়। বৃষ্টিতে পৃথিবী ধুয়ে যাচ্ছে। জেগে আছে। পিথা নায়েক, মস্ত কালো মানুষ। জেগে আছে ডাক্তারদা, আর বহুদূরে নির্মল মজুমদার নামে একজন। আরও কেউ কেউ নিশ্চিন্ত। অলীক সাম্রাজ্যের ভিতরে ঢুকে গেছে লাবণ্য। এ-এক খেলা। রাজকুমারীর খেলা। বড় ভয়ের। যদি কেউ বুঝে ফেলে। লাবণ্যর মুখের হাসি নিভে যাচ্ছে। কে এক মানুষ চিৎকার করে বলছে, কোথায় কন্যা কেশবতী, হিজল কাঠের নাও এনেছি মন-পবনের দাঁড়। নিভে যাচ্ছে লাবণ্যর আলো। যে এসে দাঁড়ালো, তার রূপ কেমন! ছদ্মবেশে আছে নাকি! রাক্ষস-পুরুষ? বড় নাও-এ পা রাখছে লাবণ্য, মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভেসে যাবে। তখন ডাক্তারদা, পিথা আর নির্মল, দীপংকর চৌধুরী নামের মানুষটা কোথায় থাকবে?

যদি থাক, তোমরা সবাই একসঙ্গে থাক, আমি কোথাও যাব না, পিথার উপর রাগ হয় কেন তোমার, নির্মলকে সহ্য হত না, আমার সঙ্কল্পকে দেখতে ইচ্ছে হয়, এখন নির্মলকে ভীষণ, আর সেই ভিখা, বড় দুর্দান্ত ছিল। ভিখাকে দেখতে ইচ্ছে হয়।

ঘুম থেকে লাবণ্য কেঁদে উঠেছে। তখনই অন্নদাশংকর মেয়ের মাথায় হাত রাখেন। লাবণ্যর ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। সে অবাক হয়ে বৃদ্ধ পিতাকে দেখতে থাকে। মাথার ভিতরে এখনো আলো আর রঙ মিশে আছে।

—তুমি ও-ঘরে যাও না তো, আমার ওষুধ! অন্নদাশংকরের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অভিমান। লাবণ্য থমথমে হয়ে বসে থাকে। জবাবের কিছু নেই।

—কিসের যেন গন্ধ উঠছে, খুব পুরনো পচা গন্ধ।

লাবণ্য ইতস্তত আলোর ভিতরে চোখ ফেলে। হেরিকেনটার অর্ধেক অংশে কালি পড়েছে।

—আমার একা একা কষ্ট হয়। অন্নদা-শংকর ভেঙে যাচ্ছেন

লাবণ্য এবারও নীরব।

—আমি তোমার চোখের পাতা দেখ-ছিলাম লাবণ্য, সব ঠিক আছে, ভ্রূ পড়েনি, আমার তো ভয় হয় মা, বয়সকালের কথা মনে পড়ে, কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি। তোমার আঙুলগুলো দেখি।

—না আঁ আঁ, লাবণ্য ভীত আর্তনাদ করে ওঠে, আমার ওসব হবে না, তুমি চুপ কর।

রাজকুমারীর মুখ অসহায় হয়ে ঝুলে পড়ে।

(চলবে)

অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

রিপোর্টের সঙ্গে একথাও বলা হয়েছিল যে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীদের ইংরেজি রচনা এতই ভালো হয়েছিল যে এন্ট্রান্স শ্রেণীর ছাত্রেরা সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহ। এই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার বলার আছে। আগের বছর অর্থাৎ আঠার'শ ছেয়াত্তরে কলকাতার মেয়েদের স্কুলের যে সব বার্ষিক পরীক্ষা হয়, তাতে ছাত্রীরা যে সব বাংলা রচনা লেখেন, তার সবচেয়ে ভালো রচনার কৃতিত্ব ছিল কাদম্বিনীর বামাবোধিনী ঐ বছর আষাঢ় সংখ্যায় সেটা ছাপেন।

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যে পাঁচজনের নাম পাওয়া গেল এরা সকলেই ভাবীকালের ব্রাহ্ম গৃহিণী। কাদম্বিনী-দ্বারকানাথের স্ত্রী, সরলা—দুর্গামোহনের বড় মেয়ে, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী, সুবর্ণপ্রভা বসু, আনন্দমোহনের স্ত্রী, অবলার স্বামীর নাম জগদীশ বসু ও সরলা মহলানবিশ—সম্ভবতঃ গুরুচরণ মহলানবিশের কন্যা। এরা ছাড়াও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন—হরসুন্দরী দত্ত, স্বর্ণময়ী দত্ত, স্বর্ণময়ী চট্টোপাধ্যায়—কালে পার্বতীনাথ দাশগুপ্তের স্ত্রী এবং বিনোদমণি বসু—ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের ভাগ্নী এবং গিরিজা কুমারী সেন—শ্রমজীবির সম্পাদক—শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

ছাত্রীদের শুধু লেখাপড়াই শেখান হত না, ঘরের কাজকর্মেরও হাতেখড়ি থেকে উচ্চপাটও হত এখানে। প্রত্যেক ছাত্রীকে পালা করে রান্না করতে হত। এছাড়া সেলাই শেখাও ছিল বাধ্যতামূলক। অনেকে বলেন ছেলেমেয়েদের ভাল পাঠ্যপুস্তক না থাকায় দ্বারকানাথ এই সময়ে কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বলা শক্ত। দ্বারকানাথ বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন সত্য, কিন্তু 'জাতীয় সঙ্গীত' ও 'কবিগাথা' ছাড়া কোনটাই ঠিক এই সময়ে লেখা বলে জানা যায় না। তবে তাঁর ছয়-সাতখানা পাঠ্যপুস্তক ছিল। তাঁর 'শিশুর সমাচার' ও কবিতামালা ১৮৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত। সুলভ পাটিগণিত পরের বছর ছাপা। এছাড়া 'শিক্ষাপ্রবেশ' বা 'স্বাস্থ্যতত্ত্ব' কবে ছাপা হয়েছিল, সঠিক জানা যায় নি। এই বইগুলির মধ্যে কবিতামালারই খুব কাটতি ছিল। দুটো বই-ই ত্রয়োদশ সংস্করণ পর্যন্ত চলেছিল।

তবে 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' স্থাপিত হবার পরই এই শিক্ষানিকেতনটি দ্রুত সুখ্যাতি অর্জন করতে শুরু করে। লেডি লীটন ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাঙলাদেশের তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্ণরের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে সুখ্যাতি ত আর ধরে না। গ্রান্ট সাহেব সেবার (১৮৭৬-৭৭) পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি দেখেন ফার্স্ট ক্লাশে দুই মেয়ে—বোধ করি কাদম্বিনী আর সরলা—ইউক্লিডের জ্যামিতিতে আর এ্যালজেবরায় জিলা স্কুলের সেকেন্ড ক্লাশের উপযুক্ত। এবং তাদের লেখাপড়া দেখে তাঁর মনে হয়েছে যে বছরের শেষে তারা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিলে তারা সফল হতে পারবে। ইংরেজী বোর্ডিং স্কুলের প্রথম প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে গ্রান্ট সাহেব এই স্কুলের ভারী টাকা অনুদান দেবার জন্য আবেদন অনুমোদন করেছিলে। সরকারী শিক্ষা বিভাগ আর এক রিপোর্টে স্কুলটিকে বাঙলাদেশের দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত স্কুল স্বীকার করেন। দ্বারকানাথের পণ্ডি জোর স্বীকার করতেই হবে!

কিন্তু কেমন পণ্ডিত ছিলেন দ্বার নাথ? তাঁর পড়ানোর ধরণ ছিল কেম হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ইংরাজি ছ সব বিষয়ই তাঁকে পড়াতে হত। একদিে কথা। সেদিন তিনি ইতিহাস পড়াচ্ছিলে এ পড়ান এমন নয় যে তিনি বলে গেে আর ছাত্রীরা শুনে নিলে। পড়া শেষ হ গেল। দ্বারকানাথ ছাত্রীদের নিয়ে আলোচ করতেন। তাঁরা প্রশ্ন করতেন। দ্বারকা জবাব দিতেন। আবার দ্বারকনাথ প্র করতেন; মেয়েরা জবাব দিতেন। প্রশ্নোত্ত চলত শিক্ষা। এখন সেদিন হয়েছে ি এমনি প্রশ্নোত্তর চলছে, কোন কারণে হয় যাকে বলে ডিসিপ্লিনের নৈঃশব্দ্য বজ নেই; কিছু উচ্চকণ্ঠ, কিছু উচ্ছ্বা গমগম করছে ক্লাশঘর। এই সময়ে এলে ক্লাশ পরিদর্শন করতে উচ্চপদস্থ এ ইংরেজ মহিলা। এখানকার অশান্ত উচ্চকি পরিবেশ দেখে চমকে উঠলেন ইংরেজ বিবি চিৎকার করে বলে উঠলেন, মিস এ্যাকয়েড এসে দেখুন, ছাত্রীরা পণ্ডিতের সহিত কি করছে? দ্বারকানাথ হয়ত লক্ষ্য করেনি ইংরেজ নারীর আবির্ভাব। কিন্তু এই চিৎকারে চমক ভাঙল তাঁর। তাঁর ক্ষীণ দেহ ক্রোধে রাঙা হয়ে উঠল। অপমানে জ্বলে উঠল তাঁর উজ্জ্বল চোখজোড়া। হাতের বইখানা টেবিলে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি, হতচকিত মেমসাহেব আর ভীত, ত্রস্ত বন্য হরিণীর মত কিশোরী কুমারী ছাত্রীদের পিছনে ফেলে। নিজের ঘরে গিয়ে দ্রুত হাতে লিখে ফেললেন তাঁর পদত্যাগপত্র। এবং মিস এ্যাক্রয়েড এসব কিছু তলিয়ে জানবার আগেই তাঁর হাতে তাঁর পদত্যাগপত্রখানা দিয়ে ক্ষুব্ধ পণ্ডিত বেরিয়ে এলেন বেনেপুকুরের বাড়ীখানা ছেড়ে। পিছনের দিকে আর একবারও তাকালেন না।

সেদিনের এই ঘটনা বিবৃত করে সেকালের এক প্রাবন্ধিক লিখছেন : 'এই কার্য এত অকস্মাৎ সম্পন্ন হইয়া গেল যে, কুমারী এ্যাক্রয়েড তাঁহার অভিমান প্রদীপ্ত হৃদয় শান্ত করিবার অবসরও পাইলেন না কিন্তু তিনি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পদত্যাগে একান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। এজন্য তাঁহাকে অনেকদিন অশ্রুত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত বলিতেন, গাঙ্গুলীকে না পাইলে স্কুল তুলিয়া দিয়া আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে।'

কি আর করা যায়। মিস এ্যাক্রয়েড চিঠি লিখলেন দ্বারকানাথকে। একবার আসুন। দেখা করে যান। দ্বারকানাথ নীরব। বেশ কয়েকটি চিঠি লেখার পর দ্বারকানাথ অবশেষে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

লেন। নানা কথার পর এ্যাক্রয়েড তাঁকে জে ফের যোগ দিতে বললেন। তুলে নিতে লেন পদত্যাগপত্র। দ্বারকানাথের ঙালের গোঁ। না। 'অবশেষে কুমারী য়াক্রয়েডের ক্রন্দনে ও বিনয়ে তাঁহার হৃদয় গলিত হইল। পুনর্বার শিক্ষকের পদ- গ্রহণপূর্বক ছাত্রীগণকে শিক্ষাদান করিতে বৃত্ত হইলেন।' মিস এ্যাক্রয়েডের নিজস্ব কটা শ্রদ্ধা ছিল স্পষ্টবক্তা ঋজু এই মানুষটার ওপর। ইংরেজী সভ্যতার যা কিছু অন্যায়, দূষণীয় সেগুলি সম্বন্ধে রূপ মন্তব্য করতে কখনও দ্বিধা করতেন া তিনি। এবং সেগুলি করতেন মেম- সাহেবের সামনেই। ব্রাহ্ম পন্ডিতের এই স্পষ্টোক্তিই, খুব সম্ভব 'অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আদায় করতে পেরেছিল মিস এ্যাক্রয়েডের।

আর একদিনের ঘটনা। এই হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়েরই। বাড়ীতে কি একটা অনিবার্য' প্রয়োজন। বোর্ডিং স্কুলের এক ছাত্রীকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। কাকে দিয়ে পাঠান হবে? সঙ্গে যাবে কে? সেকালের রক্ষণশীল সমাজ। স্কুল কমিটির জরুরী মিটিং বসে গেল। এবং ঠিক হল দ্বারকানাথই নিয়ে যাবেন। পৌঁছে দিয়ে আসবেন বাড়ী। কিন্তু মাঝে একটি ছোট্ট ঘটনা গেল। বিলেত ফেরৎ একজন বাঙালী যুবক হঠাৎ কি যেন কাজে স্কুলে এসে- ছিলেন। স্কুলের কর্তারা সহর্ষে বললেন, ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'গড সেন্ট'। ইংলণ্ডে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারের শিক্ষালাভ ঘটেছে। কাজেই সেই বিলেত ফেরৎ লোকটিই বাড়ী পৌঁছে দিল মেয়েটিকে! সব ব্যাপারটা শুনে, রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে ফেটে পড়লেন দ্বারকা- নাথ। তাহলে বিলেত যাওয়াটাই 'ভদ্র' আখ্যা লাভের সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট। এই আইনে সারা জীবনই আমাকে 'অভদ্র' হয়ে থাকতে হবে! অপমানে লাল হয়ে উঠল তাঁর ক্ষীণতনু। তিনি আবার স্কুলের কাজ ছেড়ে গেলেন। পরে অবশ্য তাঁকে বোঝান হল যে মেয়েটির বাড়ী থেকে এই বিলেত ফেরৎ লোকটিকে পাঠান হয়েছিল। পন্ডিত মশায়কে যদি কোনরকম হীন মনে করা হত তাহলে কি স্কুলের এই সম্মানিত পদে তাঁকে রাখা হত? বন্ধু- বান্ধবরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে যাত্রায় তাঁকে ফেরায়।

তবে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের মতই বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করেনি বেশি দিন। দুই বছর এক-মাস বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়কে তার নিজের শিক্ষা পদ্ধতিতে চালান হয়েছিল। তবে এই সামান্য সময়ের মধ্যেই বাংলার নারীশিক্ষা জগতে এই স্কুলটি বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। লাট বেলাটরা স্কুলের লেখাপড়া শিক্ষার ধারা দেখে তাজ্জব বনে যান এবং বেথুন স্কুলের কর্তৃপক্ষরাই এই স্কুলকে নিজেদের অঙ্গী- ভূত করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। হবার কারণ ছিল। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অনেক উচ্চাঙ্গের। বেথুন স্কুল থেকে যে

নবগোপাল ঘোষ

মেয়েটি প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়, সে এই বঙ্গ- মহিলা বিদ্যালয়েরই ছাত্রী। নাম—কাদম্বিনী বসু। কাদম্বিনীর বাবার নাম ব্রজকিশোর বসু। ব্রজকিশোর মনোমোহন ঘোষের জামাইবাবু। মনোমোহনের সঙ্গে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের যোগাযোগ ছিল আগে থেকেই। আসলে এই ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষই এই দুই স্কুলের মিলনের কাজে এগিয়ে এলেন। তিনি তখন বেথুন স্কুলের সেক্রে- টারি। এবং কলিকাতা হাইকোর্টের নবাগত চিফ জাস্টিস সার রিচার্ড গার্থ তখন বেথুন স্কুলের প্রেসিডেন্ট। তাঁকেই একদিন মনো- মোহন বললেন, বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়টি দেখে আসবার জন্যে। যতদূর জানা যায়, তাঁরই অনুরোধে একদিন সময় করে চীফ জাস্টিসের আট-ঘোড়ার গাড়ীটি বালীগঞ্জের স্কুল বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে ছিলেন মনোমোহন। বঙ্গ মহিলার কর্ম- কর্তারা সাগ্রহে মাননীয় অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

সার রিচার্ড লেখাপড়া, আচার-আচরণ সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। এবং বলা বাহুল্য, দেখে খুশিই হলেন। আঠারশ' আটাত্তর। জুন মাসের শেষ। দারুণ গ্রীষ্মের আতপ্ত আবহাওয়া। তবু গার্থ সাহেবের পরিদর্শনের কোনরকম ত্রুটি হল না। এবং চীফ জাস্টিস এই ধারণা নিয়েই ফিরলেন, বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় অবশ্যই এক উন্নত ধরনের স্কুল। বেথুন স্কুলের চেয়ে কমতি নয় কোন মতেই। এর পরের ঘটনা খুবই দ্রুত ঘটে গেল। দুইটি স্কুলের একীকরণ সম্পন্ন হয়ে গেল খুবই তাড়াতাড়ি। আগস্ট পয়লা। বেথুন স্কুলের যে বাড়ীটায় লেডি সুপারিন্টেন্ডেন্ট থাকতেন সেইটেই সাফ- সুতরো করে নতুন ছাত্রীদের ক্লাশ হতে থাকল। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের পনের জন কিশোরী তরুণী তখন বেথুন স্কুলে এসে

উঠেছিলেন। বেথুন স্কুলের কমিটিতে অন্ত- র্ভুক্ত হলেন—বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের দুজন কর্মকর্তা—দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসু। 'বামাবোধিনীর' সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, এই স্কুলের বছরের শেষ কয়েকটা মাস শিক্ষকতাও করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে এই মিলনে আপত্তি যে ওঠেনি তা নয়। কেশবচন্দ্রের 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'সুলভ সমাচার', নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার', 'খৃস্টান হেরাল্ড'—সবাই একযোগে বিরুদ্ধতা করেছিলেন। মদ খাওয়ার আপত্তি তুলেছিলেন, আরও কত কি! তবু এই একীকরণ আটকাল না।

কিন্তু দ্বারকানাথের লড়াই শেষ হল না। বেথুন স্কুল থেকে কখনও কোন মেয়ে কল- কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়নি। শুধু এখান থেকে কেন, কখনও কোন স্কুল থেকেই দেয়নি। তবে দেবার চেষ্টা হয়েছিল এবং সে কাহিনী হিমালয়ের পাদদেশের শৈলবিহার দেরাদুনের। ভুবনমোহন বসু সেখানে এক বাঙ্গালী খৃস্টান। তাঁরই মেয়ে চন্দ্রমুখী। চন্দ্রমুখীর লেখাপড়ার ঝোঁক খুবই ছেলেবেলা থেকে। পড়েন 'ডেরা বোর্ডিং স্কুল ফর নেটিভ ক্রীশ্চান গার্লস'এ। এবং দিদিমণিরা মেয়েটিকে খুবই পছন্দ করেন। পড়াশুনায় বেশ ভালো। পড়তে পড়তে চন্দ্রমুখী 'এন্ট্রান্স' পরীক্ষার পাঠ্য- পুস্তক সবই পড়ে ফেললে। এবং একদিন গিয়ে ধরলে রেকটর রেভারেণ্ড ডেভিড হেরনকে। —কি চাই চন্দ্রমুখী? খুশিমনে রেকটর তাঁর প্রিয় ছাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করে থাকবেন। ক'দিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। তারই কাজে তিনি তখন ব্যস্ত। কুশল বিনিময় করে বসতে বলে থাকবেন চন্দ্রমুখীকে। একথা সে-কথার পর চন্দ্রমুখী যে কথা বলে থাকবে, তাতে হেরন সাহেবের চোখ কপালে উঠবার অবস্থা। অবাক কাণ্ড। বলে কি মেয়েটা! এমন কথা ত কেউ কখনও বলেনি? মেয়েটা ম্লান মুখে তার প্রার্থনা জানিয়ে থাকবে, সে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে। মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে? তাজ্জব কথা। এমন কথা বোধহয় কেউ তখন চিন্তায় আনত না। আর মেয়েটার তাই প্রার্থনা। কিন্তু রেকটর কি করবেন? তাকে একখানা নতুন গোটা ঝকঝকে ওয়েবস্টারের ডিকসনারি আরও কয়েকখানা বই দিয়ে সে যাত্রা বিদায় করলেন। এ-যেন কয়েকটা পুতুল দিয়ে ছেলে ভোলাবার চেষ্টা। কিন্তু বৃথা। চন্দ্রমুখী আবার এল। আবার জনালে, আপনি দেখুন সার। আমি ঠিক পাশ করব। আপনি আমার পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে দেন। হেরন সাহেব আর কি করেন। অগত্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে। সেকালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার আইন ছিল না। কয়েকদিন আগে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এই ধরনের একটা চিঠি এসেছিল। তবে সেকালের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের

প্রাণের বাবা হয়ত একটু হৃদয় দিয়েই অনুধাবন করতেন। মেয়েটি যাতে আশাহত না হয়, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বললেন, মুর্শোরী স্কুলের হেডমাস্টার তাঁর পরীক্ষা নেবেন। তবে দুটি শর্তে। তাঁকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করা হবে না। আর যদি তিনি পাশও করেন তাঁর নাম থাকবে না সফল ছাত্রদের তালিকায়। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে বিমুখ করলেন না এই উৎসাহী শিক্ষার্থিনীকে। ফিরিয়ে দিলেন না শূন্যহাতে। এবং যথাসময়ে চন্দ্রমুখী পরীক্ষায় বসল। সফলও হল। কিন্তু জুনিয়র বোর্ড অব একসামিনেশন চন্দ্রমুখীকে 'পাশ' বললেন না। তবে তিনি যে পাশের মান অর্জন করেছেন, সে কথা স্বীকার করলেন।

কিন্তু এই শর্তাধীন স্বীকৃতিতে খুশি হলেন না দ্বারকানাথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার তখন সার আর্থার হবহাউস। এই নারীহিতৈষী মানুষটিকে তাঁরা গিয়ে ধরলেন। বেথুন স্কুলের দুটি মেয়ে—কাদম্বিনী ও সরলাকে একটা টেস্ট পরীক্ষা করে সে বছরে এন্ট্রান্স পরীক্ষার অনুমতি দেবার জন্য আবেদন জানালেন তাঁরা। বেথুন কমিটির সেক্রেটারি মনোমোহন ও সভাপতি সার রিচার্ডেরও নিশ্চয়ই সক্রিয় ভূমিকা ছিল এর পিছনে। এদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এ-বিষয়ে সচেতন করে তাঁরা বেড়াতে লাগলেন। সার আর্থার হবহাউস যাতে সবকিছু বিশদভাবে জানতে পারেন, তার জন্যও প্রচেষ্টাও চালিয়ে গিয়েছিলেন। আঠারশ' সাতাত্তরের দশই মার্চ। সেকালের সিনেট হাউসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে হবহাউস যে বক্তৃতা দেন, তাতেই বোঝা যায়, দ্বারকানাথের প্রচেষ্টা সফল হতে চলেছে। এই ঐতিহাসিক ভাষণটিতে নারীশিক্ষার জয়কেতন উড়িয়ে দিলেন তিনি :

> In the meantime, though the growth must be spontaneous, we may encourage or discourage the first throbbings of life, I say, let us encourage then; it is all we can do.

যদিও এই অগ্রগতি অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত, তবু ইতিমধ্যে আমরা জীবনের ঐ প্রথম স্পন্দনকে উৎসাহ দিতে পারি, নিরুৎসাহও করতে পারি। আমি বলছি, আসুন অমরা একে উৎসাহ দিই। এইটুকুই যা আমরা করতে পারি।' তাই করা হয়েছিল। ফ্যাকাল্টি অব আর্টস ছেলেদের মতই মেয়েদের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিতে রাজী হলেন। গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল অবশ্য এই প্রস্তাবের ওপর অনুমোদনের শীলমোহর দেন পরের বছর গোড়ার দিকে। ইতোমধ্যে বেথুন স্কুলের দুটি মেয়ের 'টেস্ট পরীক্ষা' কিন্তু নেওয়া হয়ে গেল। পোপ সাহেব করলেন ইংরিজির পরীক্ষা, গ্যারেট সাহেব অঙ্কের, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ইতিহাসের আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাংলার। দুটি মেয়েই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করল।

কিন্তু দুটি মেয়েই এন্ট্রান্স পরীক্ষায়

চন্দ্রমুখী

বসল না। কেননা, বেশ রোগ ভোগের পর ব্রহ্মময়ী মারা গেলেন। তাঁর এই কাল অসুখে দিনরাত্রি জেগে শুশ্রূষা করেছিলেন দ্বারকানাথ। কিন্তু ব্রহ্ম চলে গেলেন। আঠারশ' ছেয়াত্তরের নভেম্বর। এদিকে দুর্গামোহন তাঁর কন্যা সরলার একটি ভাল পাত্র পেয়ে গেলেন। ডাক্তার পাত্র। প্রসন্নকুমার রায়। সরলা শ্বশুরবাড়ী চলে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হল না। একা কাদম্বিনী বসলেন প্রথম সরকারী মহিলা পরীক্ষার্থিনী হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায়। প্রচুর উৎকণ্ঠার মধ্যে খবর বেরোল। কাদম্বিনী পাশ করেছেন দ্বিতীয় বিভাগে। বাংলায় খুবই ভাল নম্বর। ইতিহাসেও মোটামুটি ভাল নম্বর এবং এমনকি বিজ্ঞানেও খুবই ভাল নম্বর। এক নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন হয়নি। সারা দেশ ভেঙে পড়ল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে। বড়লাট বেথুন কলেজ-এর পারিতোষিক বিতরণ করতে গিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করলেন এই কৃতবিদ্য বঙ্গললনার। লেফটেনান্ট গভর্নর কাদম্বিনীর জন্য মাসিক পনের টাকার একটি জুনিঅর বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন। ষাট টাকার মূল্যের কতকগুলি বই তাকে বিশেষ পারিতোষিক দেওয়া হল সরকার তরফ থেকে। উত্তরপাড়া হিতকারী সভা থেকেও একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা হল। স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের দেশ ভাওয়াল থেকে সেখানকার রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় দিলেন একটি স্বর্ণপদক এবং অনেক বই। ভাওয়াল পুরস্কার দেওয়া হয় একটি বিশেষ সভা করে। সার রিচার্ড গার্থ ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং আশা করেন কাদম্বিনী আরও পড়াশুনা করবেন।

আরও পড়াশুনা ত' করবেন। কিন্তু কোথায় ? কলেজ কোথায় ? প্রফেসর কোথায়? সরকার এই দু বছর মেয়াদী পনের টাকার স্কলারশিপটা দিয়েছেন এই শর্তে যে কাদম্বিনী আরও পড়াশুনা করবেন। কাদম্বিনী ত' একপায়ে খাড়া। পড়াশুনা করতে পেলে আর কি চান? কিন্তু তার আয়োজন কোথায়? দায়িত্বটা সরকারেরই বটে। সরকার বেথুন স্কুলকে কলেজ করে দিলেন। এখানে ফার্স্ট আর্টস (এফ-এ) পড়ান হবে মেয়েদের। বাবু শশীভূষণ দত্ত এম-এ তখন হুগলি কলেজে। তাঁকে বেথুন স্কুলে প্রফেসার করে আনা হল। তিনি পড়াতে শুরু করলেন কাদম্বিনীকে। এখন চন্দ্রমুখীও এসে পড়লেন কলকাতায়। তিনি পড়তে লাগলেন ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে। দু বছর পরে দুজনেই একসঙ্গে দিলেন এফ এ পরীক্ষা। চন্দ্রমুখী দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলেন। কাদম্বিনী তৃতীয়। দুজনে আবার বি-এ পড়তে লাগলেন। এবার দুজনেই বেথুনে। আঠারশ বিরাশীর জানুয়ারীতে পরীক্ষা হল। দুজনেই বি-এ পাশ করলেন। ধরাচূড়া পরে সেনেট হলে তাঁরা অভিজ্ঞান-পত্র নিলেন ছোটলাটের কাছ থেকে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন :

> 'হরিণ নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
> শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
> তোমাদের অগ্রগামী আমি একজন,
> ওই বেলা ও উপাধি করেছি ধারণ।
> যে ধিক্কারে লিখিয়াছি 'বাঙালীর মেয়ে'
> তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে।
> বেঁচে থাক, সুখে থাক চির সুখে আর
> কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার।
> কি আশা জাগালি হৃদে কে অর নিবারে?
> ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে।।
> ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।'

কিন্তু দ্বারকানাথের লড়াই-এর শেষ হল না। এবং কাদম্বিনীর 'সাবাস' পাওয়াও এইখানেই শেষ নয়। গ্রাজুয়েট হবার কয়েক মাসের মধ্যেই কাদম্বিনীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে যায় দ্বারকানাথের। কিন্তু তাতে কাদম্বিনীর পাঠ-ইচ্ছা শান্ত হল না। চন্দ্রমুখী ইংরিজি নিয়ে এম-এ পড়তে গেলেন আর কাদম্বিনী বললেন, তিনি ডাক্তারী পড়বেন। এঁর আগে মিস এলেন দা আব্রু—ইনিই প্রথম অহিন্দু মেয়ে যিনি বেথুন কলেজে ঢোকেন—এফ-এ পাশ করে চলে গেলেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজে গেলেন, কেননা কলকাতা মেডিকেল কলেজে মেয়েদের প্রবেশ তখন নিষিদ্ধ। কাদম্বিনী বি-এ পাশ করে বললেন ডাক্তারী পড়ব। অবলাবান্ধব ত জানেন, এই হতভাগ্য দেশের মেয়েদের চিকিৎসা মেয়েরা না করলে তাদের রোগমুক্তি হবে না। পুরুষ ডাক্তারের কাছে মেয়েরা তাদের দেখাতেই যায় না। কাজেই রোগাতুর নারীজাতির নিরাময়ের জন্য অবলাবান্ধব তাঁর সহধর্মিনীকে উৎসাহিত করলেন এই মানবহিতব্রত নেবার জন্যে। কিন্তু সেজন্য মাদ্রাজ যাবেন কেন কাদম্বিনী? তিনি কলকাতাতেই পড়বেন। দ্বারকানাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজও উঠে পড়ে লাগলেন মেয়েদের জন্যে মেডিকেল কলেজের দ্বার খুলে দেবার জন্যে।

আন্দোলন খুব জোরদার হবার আগেই বাঙলার ছোটলাট সার রিভার্স থমসন এগিয়ে এলেন। মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ যে যে অসুবিধার কথা বলেছিলেন, যেসব আপত্তির কথা তুলেছিলেন, সবকিছুই বিশদভাবে

বিচার করে এই অভিমতই প্রকাশ করলেন. মাদ্রাজে যা সম্ভব, কলকাতায় তা না হবার কারণ নেই। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ঢুকলেন মেডিকেল কলেজে। দ্বারকানাথের আর এক সার্থক আন্দোলন! আঠারশ' তিরাশি সালের উনত্রিশে জুনের সরকারী সিদ্ধান্তে আশা প্রকাশ করা হল; ছোটলাট ব্যক্তিগতভাবে নিঃসন্দেহ যে মহিলা শিক্ষার্থিনীরা তাঁদের উগ্র সমর্থকদের আশার চেয়ে অনেক ভালো ফল করবেন এবং অনতিদূর ভবিষ্যতে কলকাতার হাসপাতালগুলি অবশ্যই মহিলা ডাক্তারদের দিয়ে পরিচালিত হবে। হয়েও ছিল। তবে সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। সে কাহিনী পরে।

দ্বারকানাথের নারীজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ কেবলমাত্র লোকচক্ষুর সামনে এইসব আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আপাতঃরুক্ষ, বজ্রাদপি কঠোর বাইরের মানুষটার অন্তরটা ছিল কুসুমাদপি কোমল। যেখানে আর্ত নারীর চিৎকার, যেখানে রুগ্না-রমনীর দেখবার কেউ নেই—সেখানে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য। আর কেউ না থাকুন, দ্বারকানাথ আছেনই। তাঁর অতন্দ্র করুণা-কাতর স্নেহবিহ্বল আঁখি মাতৃমূর্তির মত নিয়ত তাদের শিয়রে জেগে আছে। আর্তের সেবায় তাঁর জুড়ি ছিল না।

ব্রহ্মময়ী যখন শেষ শয্যায় দ্বারকানাথ তারই শয্যাপার্শ্বে দিবারাত্রি। কিন্তু দিন-রাত সেবাশুশ্রূষা করেও তাকে বাঁচাতে পারা গেল না। এই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন অবলাবান্ধব। কান্নায় তাঁর চোখ ভেসে যেত। এ'রই মৃত্যুসভায় কেশবচন্দ্র সেন বিনা-নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। দ্বারকানাথ এই উপলক্ষে কয়েকটি শোকসঙ্গীত রচনা করেন। এবং প্রত্যহ উপাসনা সময়ে সেই শোক-সঙ্গীত গাইতেন। এমনি একটা গান :

'বৃথা আর জীবনভার কে আর বহিত?
ঈশ্বর মঙ্গলময় কে-আর বলিত?
এত স্নেহ ভালবাসা,
এত প্রেম এত আশা
কৃতান্তের কালদন্তে সব যদি চূর্ণ হতো।
তুমি কালভাণ্ড বটে,
দেহ মৃত্তিকার ঘটে,
নাশিতে অমর আত্মা কেন কি শক্তি এত?
অমর কি কখন মরে,
লোক হতে লোকান্তরে

যার যেমন শিশু হয় ধরাতে আগত।'

এমনি একটা ঔপনিষদিক ব্যাখ্যায় এইসব বিয়োগ ব্যথাকে চাপা দেবার চেষ্টায় থাকলেও কবিনায়কের অন্তরের অন্তস্থলে এইসব শোক রাবণের চিতাগ্নির মত সারাক্ষণ যেন জ্বলতে থাকত!

কিন্তু সে কথা থাক। ব্রহ্মময়ী যেন তাঁর খুবই কাছের মানুষ। কলকাতায় আসার পর বহু পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁদের বহু প্রীতির সম্বন্ধ। কিন্তু যে কোন পরি-চিতা-অপরিচিতা মেয়ের সেবাশুশ্রূষায় জন্যে তিনি সর্বদাই তৈরী থাকতেন। অথচ খুবই লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। বিধুমুখী ও তার মাকে কলকাতায় নিয়ে আসবার আগে তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন তাতে নানা প্রকৃতির অনেকগুলি পরিবার ও তাঁদের আত্মীয়া মহিলা শিক্ষার জন্য বাস করতেন। এটাই কি মির্জাপুর স্ট্রীটের ভারত আশ্রম? শিবনাথ অবশ্য বলছেন যে একসময়ে তাঁরা কিছুকাল এক বাড়ীতে বাস করেছিলেন।

সে যাই হোক। 'গাঙ্গুলী মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ কার্য ও আলাপে অল্পদিন মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে দেবতাসদৃশ শ্রদ্ধা-প্রীতি করিতেন। মহিলাগণ তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন।' কিন্তু লাজুক ছিলেন দ্বারকানাথ। তাঁর ঘরের অন্তরালে বসে নিজের কাজ করে যেতেন। অবলাবান্ধবের প্রুফ দেখতেন, কি পেজ মেক-আপ করতেন। কিংবা নারীজাতির উন্নতির নানা দিক নিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন তাঁর কাগজের জন্যে। গল্পকরা তাঁর স্বভাবের বাইরে ছিল। এমনকি কাজে এতই ব্যস্ত থাকতেন, যে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন অনেকদিন! দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে যেত। মহিলারা অস্বস্তি বোধ করতেন। তখনও স্নান হয়নি দ্বারকানাথের। খাওয়া ত' দূরের কথা! মেয়েরা আর করেন কি! তেলের বাটী এগিয়ে দিয়ে তাড়া দিয়ে বলে থাকবেন, বেলা হয়ে গেছে, চান করে নিন। অবলাবান্ধব তখন কখনও মুখ তুলে কোন অপরিচিতা মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে জানতেন না। মাথা নীচু করে তেলের বাটী নিতে গিয়ে তেলের বাটী হাত থেকে পড়ে যেত। সশব্দে পড়ে তেলের বাটী চুরমার হয়ে ভেঙে যেত। মেয়েরা হাসি চাপতে পারতেন না। অসহায় লাজুক দ্বারকানাথ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

এই লাজুক মানুষটারই মনোদর্পণে অবলা নারী জাতির সকল দুঃখ দুর্দশা অবিকল প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিল। তাই তাদের ওপর যেখানেই আঘাত, অত্যাচার, অবিচার অন্যায়, সেখানেই তিনি আপোষ-হীন; মত্তমাতঙ্গের মত, তথাকথিত পুরুষ-শাসিত সমাজে কমল সরোবরকে বিধ্বংস করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর মনের মধ্যে আর্তনারীর জন্যে এক গভীর সহানুভূতি, মায়া, মমতা। এবং এসব তাঁর লোকদেখানো 'শো অফ' প্রচারের মাধ্যম নয়। সেই দরদী মন যেমন বৃহত্তর পরিবৃত্তে স্পষ্ট, ছোট ছোট ক্ষেত্রেও তেমনি সংবেদনশীল।

তখন অবলাবান্ধব বেশ কিছুদিন হল এসেছেন কলকাতায়। তখনও লেখা, প্রুফ সংশোধন, পত্রিকা বিলি সব কাজই করছেন একহাতে। তাঁর স্নেহের পাত্রী কোন এক মহিলা বহুদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। তাঁর সেবা-শুশ্রূষা, ঔষধ আনা, ওষুধ খাওয়ান, ডাক্তার-ডাকা সব দায়িত্বই স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। দূর থেকে পায়ে হেঁটে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডেকে আনা, এমনকি যে পথ্য বিচার করে দিয়েছেন ডাক্তার তার সাত-সতেরো উপকরণ যোগাড় করা—নাওয়া-খাওয়া ভুলে সবই করতে লাগলেন তিনি সারাদিন ধরে। অসুবিধা হত রাতে। মেয়েছেলে। কাজেই একজন শুশ্রূষাকারিণী থাকতেন তখন। পাশের ঘরে থাকতেন দ্বারকানাথ। শুতে যাবার আগে রোগিনীকে কোন সময়ে কি ওষুধ খাওয়াতে হবে, কি পথ্য দিতে হবে, সবই ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে তার ঘরে যেতেন তিনি। এবং সেখানে গিয়েও কি নিস্তার আছে! 'অবলাবান্ধবে'র জন্যে প্রেসের কপি দিতে হবে না তাকে?

রোগটা বোধহয় ম্যালেরিয়া। তাতে ভুক্ত-ভোগীমাত্রেই জানেন, এই রোগে পিলে-লিভার বাড়ত খুব। এবং তার ওপর 'ব্লিস্টার' দেওয়ার প্রথা ছিল সেকালে। নির্ধারিত কিছু সময় পরেই সেটা তুলে না ফেললে সেখানে ফোসকা পড়ে রোগীর জীবন সংশয় হত। শিবনাথ শাস্ত্রীরও দেশে গিয়ে যখন ম্যালেরিয়া হয়েছিল তখন তাঁর লিভারে ব্লিস্টার দিতে হয়েছিল :

......'আমাকে ম্যালেরিয়াতে ধরিল। ঘন ঘন জ্বর হইয়া লিভারে বেদনা দাঁড়াইল। লিভারে ব্লিস্টার দিয়া, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিয়া তদুপরি পূর্বোক্ত কার্যসমুদয় চালাইতে লাগিলাম।'

সে কাহিনী থাক। এখন দ্বারকানাথের তত্ত্বাবধানের রোগিনীর কথা হোক। একদিন হয়েছে কি রোগীরও প্রকাণ্ড একটা ব্লিস্টার দেওয়া হয়েছে। শুশ্রূষাকারিণীকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে দ্বারকানাথ পাশের ঘরে গেলেন শুতে। বাইরে বর্ষার অজস্র ধারা-বর্ষণ!

রাত তখন কতটা হবে কে জানে, ধড়-মড় করে উঠে বসলেন দ্বারকানাথ। এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। পাশের ঘরে রোগিনীর 'ত্রাহি, ত্রাহি' চিৎকার ভেসে আসছে। সর্বনাশ! দ্রুত পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে [illegible]লেন, শুশ্রূষাকারিণী ঘুমুচ্ছে! দ্বারকানাথ চিৎকার করে ডাকলেন, শুনছেন? শুনছেন? বিভ্রান্ত চোখে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন নার্সটি। রোগিনীর 'ব্লিস্টার' তোলা হয়েছে? 'না, ত' ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বলে থাকবে মহিলা, স্বীকারও করে থাকবে ত্রুটি—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কপাল চাপড়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, সর্বনাশ। তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, পনের মিনিটের জায়গায়। রোগিনী তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন। রোগিনীর ব্লিস্টার তুলে ফেলতে বলে, সেই গভীর রাত্রে, সেই ঝড় জলের মধ্যে অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ চললেন ডাক্তারবাড়ী। এবং ডাক্তার এসে যখন রোগিনীর জ্ঞান ফেরাল, তখন যেন হাতে চাঁদ পেলেন তিনি। চার মাস রোগশয্যায় থাকার পর এই রোগিনী যখন সুস্থ হল, দ্বারকানাথ তাদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে গেলেন চিরকালের জন্য। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের এক অপরিচিতা বিধবা বৃত্তি পেয়ে পড়াশুনা করতেন।

(ক্রমশঃ)

ঢপগানের গল্পকথা

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ঢপ-কীতন বা ঢপ-যাত্রা বহুদিন হল লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার প্রত্যক্ষদর্শীরা আজ আর নেই, তবে বাংলা-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস, লোকসাহিত্য, বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়াদের বিষয় গবেষণামূলক রচনাদি এবং পল্লীসমাজে লোক পরম্পরায় প্রচলিত সূত্র এবং গবেষক-দের মন্তব্যাদি প্রভৃতি হতে এ বিষয় কিছু জানা যায় বা অনুমান করা যেতে পারে। খৃঃ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা-দেশে ঢপ-কীর্তন বা ঢপ-যাত্রার ব্যাপক প্রচলন, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা বিশেষ ভাবেই ছিল। সারা দেশ ঢপ-কীর্তন ও ঢপ-যাত্রা-র সুমধুর নৃত্য-গীত-অভিনয়ে মুখরিত হয়ে যেত। ঐ সময় ঢপযাত্রায় বহু সুদক্ষ নিষ্ঠাবান নৃত্য-গীত-অভিনয় শিল্পী নরনারী যোগ দেন এবং অনেক প্রতিভাশালী পালা রচয়িতা বা নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন। যাঁর অবদান আজও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

ঢপ—মিশ্রিত কীর্তনাঙ্গের সুরবিশেষ, পাঁচালীর অনুরূপ বলা যায়। এর অভিধা য় অন্তর্নিহিত অর্থ—ভিন্ন, অভিনব, বিচিত্র প্রয়োগ—তিনি এক ঢপের লোক অর্থাৎ বিচিত্র বা অভিনব প্রকৃতির ব্যক্তি)। পূর্ব-কালের বা মধ্যযুগে প্রচলিত কীর্তন বা লীলা কীর্তন গানের সঙ্গে ঢপের মূলগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনুমান করা যেতে পারে—এই বিশেষ পদ্ধতির কীর্তন বা যাত্রাটির নামকরণ 'ঢপ' হয়েছিল এর উদ্ভব কালে। সে সময়ে প্রচলিত গীতি-পদ্ধতি ও সুর বিষয়ে এর পার্থক্য ছিল। ঢপ গানে কৃষ্ণলীলা উপজীব্য হলেও বৈষ্ণব পদাবলী ও লীলাকীর্তন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হত না, ঢপ-কীর্তন কিছু পরিমাণে কীর্তনাঙ্গের হলেও এর নিজস্ব সুর ছিল। ঢপ-যাত্রায় শিল্পী বা নটনটীরা নাটকে উল্লিখিত নায়ক-নায়িকাদের রূপ গ্রহণ করতেন এবং প্রাচীন যুগীয় প্রথায় সমবেতভাবে গীতাভিনয় করতেন (উনবিংশ শতকে যাত্রাভিনয় উদ্ভবের পূর্বে এ প্রথা প্রচলিত ছিল)। কল্পনা জগতের রাধাকৃষ্ণের বা রূপে বর্ণিত নায়ক-নায়িকাদের সজীব মূর্তি প্রদর্শন ঢপ-যাত্রায় প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে ঢপের প্রভাবে নূতন পাঁচালীতে কৃষ্ণ-রাধার সাজে সজ্জিত গায়ক-গায়িকা একটি আসরে অবতীর্ণ হত।

লীলা কীর্তনের তুলনায় ঢপগানে বা যাত্রার বিশুদ্ধতা ও ভক্তিরস কম।

রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা উপজীব্য করে ঢপ যাত্রার নাটক রচিত হলেও ভালভাবে লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা যায়—ঢপ নাটকে কৃষ্ণ রাধার উপর সম্পূর্ণ দেবত্ব আরোপিত হত না। ঢপ গানে কৃষ্ণ রাধা বৃন্দাবনের দুটি কিশোর কিশোরী। তাদের মধ্যে প্রেমের কথাই বেশিভাবে দেখা যায়। এটি বৈষ্ণব শাস্ত্র বা বৈষ্ণবদের কতকটা কল্পনা বিরুদ্ধ। ঢপ-যাত্রার বৈচিত্র্য এবং এর মঞ্চের কয়েকটি লোকায়ত লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে অনুমান হতে পারে ঢপ গান বা যাত্রা প্রাচীন যুগীয় লোকনাট্যের ভিত্তি হতে উদ্ভূত—একটি ধারা বিশেষ। হয়ত আদি যুগে মানবীয় বা রাখালীয়া প্রেম কাহিনী অবলম্বন করে প্রথমে গাথা এবং পরে এর নাটক রচিত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল তা জানপাদ সমাজে লোকরঞ্জনের একটি মাধ্যম রূপে প্রচলিত ছিল।

পরবর্তীকালে (সম্ভবতঃ বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য যুগে) ঢপ গানে বা যাত্রায় কৃষ্ণ-রাধার প্রেমলীলা উপজীব্য হয়ে যায়। হলেও ঢপের মৌলিকত্ব বা লোকায়ত ঐতিহ্য লুপ্ত হয় না, গত শতাব্দীতে ঢপ গানের শেষ অধ্যায়েও এর বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা রক্ষা করেছে। মণিপুরী রাস নৃত্যগীতে এবং বাঁকুড়া-বীরভূম জেলার পল্লীসমাজে প্রচলিত ঝুমুর গানে বর্তমানেও ঢপ গানের আদি ধারার কিছু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

উৎপত্তিকালে ঢপের সুর কি জাতীয় ছিল সে বিষয় বর্তমানে আর অনুমান করাও যেতে পারে না, কারণ বৈষ্ণব প্রাধান্যকালে পদাবলী বা লীলাকীর্তনের প্রভাবে ঢপের আদি সুর মিশ্রিত বা কীর্তনাঙ্গের হয়ে যায়। ঢপে সেই সুরই মধ্যযুগ হতে শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কোন কোন গবেষক মন্তব্য করেছেন—ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে কীর্তন গানের বিভিন্ন শাখা শাস্ত্রীয় মার্গ সঙ্গীতের আদর্শ গ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তীকালে পাঁচালী, বাউল গান, কথকতা ও নাট্যগীতির কীর্তনের প্রভাবে এক নূতন শাখা সৃষ্টি হয়, তাহাই ঢপ কীর্তন। অনেক সমালোচক মনে করেন—ঢপ-গান বৈষ্ণব যুগের কীর্তনের একটি লৌকিক রূপ। লোকসঙ্গীত বিষয়ে বহু গবেষক মন্তব্য করেছেন—ঢপ যাত্রা থেকে পরবর্তী-কালের যাত্রা এসেছে। পাঁচালীর অনুরূপ-ভাবে, ঢপ-গায়করা কোন এক সময় উপ-লব্ধি করলেন—বৈচিত্র্যহীন এ জাতীয় লীলাকীর্তন বা গান মাত্র ভক্তদের হৃদয়-গ্রাহী হয়ে থাকে, কিন্তু পল্লীর জন-সাধারণ এতে আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করে না। আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ করার উদ্দেশ্যে এ গানের সঙ্গে নাস্তিক ক্রিয়া যোগ, নাটকের কাহিনী পরিচালক সংলাপ এবং গায়ক-গায়িকাদের কৃষ্ণ রাধার সাজসজ্জায় আসরে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

এরপর হতে ঢপ যাত্রার অভিনয়ে সজ্জিত নট-নটীরা আসরে নৃত্য গীত অভিনয় শুরু করেন। এ পদ্ধতির ঢপগান বা যাত্রার কিছু কিছু শুরু হয় ঢপগানের প্রবর্তক রূপচাঁদ অধিকারীর কৃতিত্বে এবং এর উন্নতি বিখ্যাত ঢপ গায়ক মধুকিন্নরের গীতাভিনয়ের অসাধারণ প্রতিভা বলে এবং নিজস্ব অভিনব সুর সংযোগে। তবে এ নব-পদ্ধতির গীতাভিনয়কে রূপচাঁদ বা মধু কিন্নরের কালে 'যাত্রা' বলা হত না গানই বলা হত কিন্তু যাত্রার বীজ-এর মধ্যে উপ্ত ছিল, এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। একেবারে আদিতে ঢপগান কি পদ্ধতি বা প্রথায় গাওয়া হত সে বিষয়ে আজও ভাল-ভাবে জানা যায়নি। চর্যাপদ ও গীত-গোবিন্দ প্রভৃতি প্রাচীন গীতিসংলাপে ঢপের সাদৃশ্য দেখা গেলেও সেগুলির সঙ্গে ঢপের সম্পর্ক আবিষ্কার করা এখনও কোন গবেষকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঢপ গানের ব্যাপক প্রচলন ও প্রসিদ্ধিকাল খৃঃ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী, এই সময়ের ঢপগান বা ঢপযাত্রার বিষয় আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রের মনীষীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে কিছুকাল থেকে।

ঢপের সাহিত্য পাঁচালীর অনুরূপ, কিন্তু ঢপে পাঁচালীর পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি। ঢপ লোকরঞ্জনের একটি মাধ্যম মাত্র।

পাঁচালী একক গান, ঢপ, বহুজনের বা গায়কগায়িকাদের সমবেত গীতাভিনয় (প্রাচীন যুগীয় কোম প্রথায়)। ঢপ গানের সুর কীর্তনাঙ্গের হলেও লোকায়ত সুর-ধারা মিশ্রিত, নৃত্যে ঝুমুরের প্রভাব স্পষ্ট, তবে সংলাপে কথকতার অনুকৃতি দেখা যায়। তার কারণ সম্বন্ধে বলা যায়—

(১) ঢপ গানের দুজন বিখ্যাত গায়ক—অধিকারীই তাঁদের প্রথম জীবনে প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন, তাঁদের প্রভাবেই ঢপ সংঘটিত হয়েছে অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে।

(২) ঢপ গানে বা যাত্রার অধিকারীই প্রধান (অধিকারীদের কোন কোন আসরে বৃন্দের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যেত)। সর্বক্ষেত্রেই অধিকারী মূল গায়ক, গানের প্রথম কলি তিনি গাইতেন, দলস্থ গায়ক-

গায়িকারা দোয়ার্কীদের মত গানের ধুয়া অনুসরণ করে নৃত্যগীত করতেন।

নাটকের ঘটনা অনুসারে অধিকারী কথকতার আঙ্গিকে বা সুরেলা পয়ার ছন্দে কখনও বা গদ্যে প্রশ্ন করতেন, তার উত্তর দিতেন গায়িকারা নৃত্যগীত ও অভিনয়ের আঙ্গিকে। মধু কিন্নর ঢপ যাত্রায় গদ্য ভাষা কিছু কিছু প্রবর্তন করেন। সে সময় যাত্রা-গানে গদ্য ব্যবহৃত হত না।

ঢপগানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রতিভা-শালী গায়ক ও নট এবং ঢপ সাহিত্য রচয়িতা—মধু কিন্নর লিখিত যাত্রাপালা (মুদ্রিত) 'মানভঞ্জন' নাটকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :—

শ্রীকৃষ্ণ (উক্তি)—বৃন্দে, অদ্য অভি-সারের সময় বয়ে গেছে, আমার প্রাণ-বল্লভা শ্রীরাধিকা এখনো এলেন না কেন? তুমি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা কর....

বৃন্দা—(উক্তি) যাও যাও আমি নিত্য গিয়ে ওসব কথার জন্য সাধ্যসাধনা করতে পারবো না :—(গান)

'তোমরা মান করলে দুজনায়,
আর সাধিতে যে মোর প্রাণ যায়।।'

ঢপযাত্রার গানে বাউল ও টপ্পার সুরও শোনা যেত, তার কারণ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়,—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রূপ-চাঁদ অধিকারীর মৃত্যু হলে ঢপ গান বাউলদের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছিল। আর, ঢপে টপ্পার প্রভাব বিষয়ে বলা যায়—মধু কিন্নরই প্রথম জীবনে মার্গসঙ্গীতে অনু-রাগী হয়ে ঢাকার মুসলমান ওস্তাদ গায়কের নিকট টপ্পা শিক্ষা করেছিলেন, ঢপে বাউল সুর ও টপ্পা মিশ্রণ মধু কিন্নরের অন্যতম কৃতিত্ব।

ঢপ-গানের দুটি অংশ—কীর্তন ও তুক্ক। কৃষ্ণ রাধার প্রণয়লীলা বিশেষভাবে প্রকাশ করা হত, কীর্তন অংশে কিন্তু কীর্তনাঙ্গের সঙ্গে লোকায়ত, বাউল ও টপ্পা মিশ্রিত সুর ব্যবহৃত হত।

আর, কীর্তন গানের আখরের ন্যায় সুরেলা বাউল প্রধান ছিল—তুক্ক, এই তুক্ক অংশে (মধু কিন্নরের পূর্ব হতেই) কথ-কতার প্রভাব দেখা যেত। অধিকারী আসরে অভিনয়কালে গানের মধ্যে ছেদ দিয়ে মধ্যে মধ্যে পয়ারে বা অপর কোন ছন্দে নাটকের গভীর কোন অংশের সরল সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন কথকতার আঙ্গিকে, কখনোও বা লোকসমাজে অধিক প্রচলিত সুরে গান করতেন। ঢপে ঝুমুরের প্রভাব বা অনুকৃতি ছিল, আসরে গোপবালাদের সাজে সজ্জিত হয়ে পাঁচটি কিশোরী ঝুমুর-ওয়ালীদের মত কটিদেশ সঞ্চালন করতো নৃত্যগীতের সময়। কিশোরীদের মধ্যের দুজন শ্রীরাধার বা বৃন্দার ভূমিকা গ্রহণ করতো, কিন্তু বৃন্দার ভূমিকায় অভিনয় করা বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন, সে কারণে সকল ক্ষেত্রে নৃত্য গীত শিক্ষক বা স্বয়ং অধি-কারী বৃন্দার ভূমিকায় আসরে নামতেন।

ঢপ যাত্রার আসর

প্রথম অধ্যায়ে ঢপ গান বা যাত্রার একটা আভিজাত্য ছিল। মেলা বা বারোয়ারীর বহুজন সমাগম স্থানে অনুষ্ঠিত হত না। ঢপ বিশুদ্ধ ধর্মীয় গীতাভিনয়, সে কারণে ঢপের অসর হতো বেশি সময় দেবালয় সংলগ্ন স্থানে, মন্দিরের চত্বরে বা নাট-মন্দিরে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দোললীলা ও রাসযাত্রা উপলক্ষে।

আসরের মধ্যে ঢপ গানের সকল গায়ক গায়িকা উপবিষ্ট হয়ে সমবেত কণ্ঠে প্রথমে গুরুবন্দনা বা শ্রীকৃষ্ণ লীলাকীর্তন, পরে বাণী-আরাধনা করতেন—এ সময় নৃত্য হত না, তবে সঙ্গীত চলতো—খোল কর্তাল বাঁশের বাঁশী মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহ-যোগে, মৃদুস্বরে।

এরপর দলের সকলে আসর থেকে (অধিকারী ব্যতীত অন্যেরা) অন্তরালে প্রস্থানের পর আসরের মধ্যে দর্শক বা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে অধি-কারী সেদিনের অভিনয়ের কাহিনী সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেন কথকতার আঙ্গিকে। অধি-কারীও সুন্দরভাবে সজ্জিত হতেন। অধি-কারীর বিবৃতি শেষ হলে আসরে উপবিষ্ট সঙ্গীতকারীরা গাজ-বাজনা করতেন, ইহাতে সারা আসরে একটি সঙ্গীতময় আবহের সৃষ্টি হয়ে যেত।

সমবেত সঙ্গীত শেষ হলেও মৃদুস্বরে বাঁশের বাঁশী বা বেহালায় সুর চলতে থাকতো, এই সময় নাটক আরম্ভ হত—শ্রীকৃষ্ণ রাধা ও তাঁর সহচরীরা নৃত্যের ভঙ্গীতে আসরে প্রবেশ করতো এবং শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে বেষ্টন করে তাদের নৃত্যগীত শুরু হত।

এরপর অধিকারী স্বমূর্তিতে বা বৃন্দার ভূমিকায় আসরে প্রবেশ করে নাটকীয় বিষয় সুরেলা গদ্যে বা পয়ারে সংলাপ শুরু কর-তেন সময় সময় শ্রীকৃষ্ণ বা রাধার সঙ্গে তাঁর প্রশ্নোত্তর হয়। সখী বা কৃষ্ণ রাধার সহ-চরীরা সেগুলির উত্তর দিও নৃত্যগীত মাধ্যমে।

ঢপ যাত্রায় অধিকারীই সর্ববিষয়ে প্রধান, তিনি মূল গায়েন ও অভিনেতা। তিনি গানের প্রথম কলি গাইলে নটীরা সেই গানের ধুয়া ধরে নৃত্য গীত করতো। নাটকের অধিকাংশ সংলাপ অধিকারী কর-তেন। কৃষ্ণরাধার ভূমিকার সংলাপ বেশি থাকতো না।

সঙ্গীতকারীদের এ গীতাভিনয় সাধা-রণের আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নাটকের ঘটনা বা দৃশ্যের সমতা রক্ষা করতে হত, সমবেত বাদ্যে ও সমপোযোগী সুরে। তাঁদের সঙ্গীতে বিরহ ও মিল প্রভৃতি বিভিন্ন পরিস্থিতির সুর তাল মান পৃথকভাবে প্রকাশিত হত।

ঢপ গানের প্রভাব

খৃঃ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ঢপ কীর্তন বা ঢপযাত্রা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, সে সময় ও তার পরবর্তী কালে সঙ্গীতজগতে একটি আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছিল—সে কারণেই কৃষ্ণযাত্রায় ও দাশুরায় প্রবর্তিত নূতন পাঁচালী প্রভৃতিতে ঢপের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই হিসাবে লোচন অধি-কারী, শ্রীদাম, সুবল, গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথী রায় (মধু কিন্নরের ভাবশিষ্য) প্রভৃতি ঢপের অনুসরণকারী বলা যেতে পারে।

ঢপ গানের ইতিহাস

ঢপ গানের ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়েছে কিনা জানা যায় না। এর আদি-কালের রূপ আজও অস্পষ্ট, তবে খৃঃ অষ্টা-দশ শতাব্দীতে এর (নবপর্যায়ের) প্রবর্তক এবং পরবর্তীকালের ...ধারা রক্ষকদের সম্বন্ধে তথ্যাদি লোকসঙ্গীত বিষয়ে গবে-ষকরা অনেকটা উদ্ধার করেছেন এবং প্রকাশও করেছেন, যেগুলির উপর নির্ভর করে ঢপ গানের ইতিহাস বিষয়ে কিছু কিছু বলা যেতে পারে।

ঢপ গানের প্রবর্তক বলে কথিত রূপচাঁদ অধিকারী (বন্দ্যোপাধ্যায়), (খৃ ১৭২২—১৮০২) মুর্শিদাবাদ জেলার বেল-ডাঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে খৃঃ ১৭২২ সালে জন্মান। পিতা প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। রূপচাঁদ বাল্যে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে কথকতা ব্যবসা করেন এবং কথক হিসাবে খ্যাতি ও অর্থলাভ করেছিলেন। ঐ জেলার সিমুলিয়া পল্লীনিবাসী এক সঙ্গীতজ্ঞ সাধকের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিশিষ্ট কীর্তনীয়া বলেও তাঁর প্রসিদ্ধি থাকায় সে-সময়ের ধনী জগৎশেঠের পুত্র রূপচাঁদকে বহু ভূসম্পত্তি দান করে-ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রূপচাঁদ একটি লীলাকীর্তন দল গঠন করেছিলেন, তবে সে-সময়ে প্রচলিত লীলাকীর্তনের উচ্চাঙ্গের সুর বা গীতপদ্ধতি তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে অনুসরণ বা গ্রহণ করেননি। লীলা-কীর্তনে সে-সময় উচ্চাঙ্গের সুর ব্যবহৃত হত এবং গতানুগতিক ছিল। রূপচাঁদ তাঁর লীলাকীর্তনে কথকতা পদ্ধতি মিশ্রণ এবং লঘু সুর ব্যবহার করে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন—ঐ বিচিত্র বা অভিনব লীলা-কীর্তনই ঢপগান বা ঢপ কীর্তন বলে পরিচিত হয়ে যায় এবং আখড়ার অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবরা ব্যতীত অপর জনসাধা-রণের আকর্ষণীয় হয়, ফলে ঢপ গান ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রূপচাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব—তিনিন উচ্চাঙ্গের মনোহরশাহী কীর্তন ভেঙ্গে তাঁর ঢপে সাধারণবোধ্য লঘু সুর প্রবর্তন করা।

খৃঃ ১৮০২ সালে রূপচাঁদের মৃত্যুর পর বহুদিন ঢপ গান বাউল গায়কদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত থাকে। বাউলরা একান্ত-ভাবে ঢপগায়ক ছিলেন না। তবে এই সময় বা তার কিছু পরে কয়েকজন ঢপগায়কের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের বিষয় সামান্য জানা যায় মাত্র, ঐ ঢপগায়করা হলেন রূপো দাস,

অঘোর দাস, দ্বারিকানাথ দাস, শ্যাম বাউল, মোহনদাস বৈরাগী, রাধামোহন বাউল। এই ঢপগায়কদের মধ্যে শেষোক্ত মোহনদাস বৈরাগী ও রাধামোহন বাউল ঢপ গানের দল গঠন ও কিছু প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এঁরা দুজনেই সঙ্গীতজ্ঞ এবং রূপচাঁদের অনুবর্তী বা ভাবশিষ্য ছিলেন। ঢপ গানের উন্নতির মূলে এঁদের বিশেষ অবদানও ছিল।

উক্ত ঢপগায়কদের মধ্যে কয়েকজনের কৃতিত্বের বিষয় সামান্য কিছু জানা যায়, উল্লেখ করা হল : মোহনদাস বৈরাগী, যশোর জেলার গোপালনগর পল্লীতে বাস করতেন, বংশগত ভাবে লীলাকীর্তনে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে ঢপ গান অবলম্বন করেন, উহাতে কিছু নূতনত্ব সৃষ্টি করেন, তাঁর ঢপ গানে তুক্কোর সঙ্গে ছুট যুক্ত হয়, এই ছুটে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শ, অনুপ্রাস ও ছুট প্রবর্তন করেন, এগুলি ঢপ গানে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল, মধুকিন্নর বহুলাংশে মোহনদাস বৈরাগীর বা মনোহর দাস বৈরাগীর অনুবর্তী ছিলেন। রাধামোহন বাউল—যশোর জেলার রাখালদীয়া গ্রামে জন্মান। ঢপ ও বাউল উভয় গানে দক্ষ ছিলেন। তিনি ঢপের দু' এক ক্ষেত্রে বাউল-সুর মিশ্রিত করেন।

পূর্বোক্ত মোহনদাস ছিলেন লীলা-কীর্তনীয়া এবং রাধামোহন—বাউল গায়ক। মধু কিন্নর, মোহনদাসের ঢপ কীর্তন এবং রাধামোহনের শিষ্য থাকাকালে বাউলের সুর মিশ্রিত ঢপ গান তাঁকে আকৃষ্ট করে।

এর পর কিছু কাল, কবি ও পাঁচালী গানের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে ঢপ গান বহু পরিমাণে দীপ্তি হীন হয়ে যায় কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঢপের সেই ম্রিয়মান ক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত আবির্ভূত হন—সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও দক্ষ ঢপ শিল্পী ও নৃত্য গীত বিখ্যাত ঢপ সাহিত্য রচয়িতা, মধুসূদন কিন্নর।

মধুসূদন কিন্নর প্রসঙ্গে

স্বনামধন্য মধুসূদন কিন্নর খৃঃ ১৮১৮ সালে যশোর জেলার উলমিয়া গ্রামের প্রাচীন যুগ হতে লোকায়ত সুরের বাহক ও ধারক কিন্নর নামে পরিচিত এক সঙ্গীত ব্যবসায়ী বংশে জন্মান। পিতা—তিলকচন্দ্র কিন্নর। অতি বাল্যকাল হতে মধুর সঙ্গীত শিক্ষার প্রতি প্রবল ও আন্তরিক আগ্রহ থাকায় টোল-চতুষ্পাঠীর বিদ্যালাভ করতে পারেননি। মার্গ বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তরুণ মধুকিন্নর সে-সময়ের নৃত্যগীতের পীঠস্থান ঢাকা শহরে যান এবং সে-স্থানের বিখ্যাত ওস্তাদ ছোটে খাঁ, বড়ে খাঁ-র নিকট মার্গ সঙ্গীত-টপ্পা ইত্যাদি শিক্ষা করে স্বগ্রামে ফিরে আসেন। গৃহে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ এবং সঙ্গীত অনুশীলন করেন, কিছুকাল কথকতার ব্যবসাও করেন। জন্মাবধি সুকণ্ঠের অধিকারী সুরেলা বাক্যবিন্যাসে দক্ষ, সে-সকল কারণে মধুকিন্নরের কথক হিসেবে প্রখ্যাত হতে বিলম্ব হয় না।

ঐ সময় বৈষ্ণব সমাজের লীলাকীর্তন অনুসৃত ঢপ গান বাউলদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল। মধুকিন্নর হয়ত সে-কারণে ঢপ গানে আকর্ষিত হন এবং তাঁর বাস-পল্লীর নিকট রাখালদীয়া পল্লীর রাধা-মোহন বাউলের নিকট ঢপ গান শিক্ষা করেন। এবং সে-সময়ে অন্যতম ঢপগায়ক মোহনদাস বৈরাগীর অনুবর্তী হন। পরে স্বয়ং একটি ঢপ গানের বা ঢপযাত্রার দল গঠন করেন। উল্লেখযোগ্য, এ-দলে তাঁর পরিবারস্থ অল্পবয়স্থা নারী বা কিশোরীরাও যোগ দিয়েছিলেন (এই কিন্নর গোষ্ঠীর পুরুষ ও নারীরা পূর্বে হতে সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিলেন)।

মধুর পূর্বে ঢপ গান বা যাত্রা বিধিবদ্ধ বা তার জন্য নাটক রচনার প্রথা ছিল না। মধুকিন্নরই ঢপ গান প্রথম বিধিবদ্ধ এবং যাত্রায় অভিনয় উপযোগী করে নাটক রচনা করেন। নাট্যকার মধুকিন্নরের রচনা বা অবদান আজও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ বলে পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। তাঁর ঢপযাত্রার সংলাপে বা বক্তৃতায় কথকতার প্রভাব দেখা যেত। মধু ঢপের আসরে সুরেলা কণ্ঠে গদ্য বা পয়ার জাতীয় ছন্দে সংলাপ করতেন, তিনি এককালে যে দক্ষ কথক ছিলেন তার নিদর্শন তাঁর সংলাপে ফুটে উঠত।

সংলাপে একটি বিশেষ প্রকার সুরের প্রবর্তন মধুর সর্বাপেক্ষা কীর্তি। এই বৈশিষ্ট্যের বা বৈচিত্র্যের কারণ সম্বন্ধে গবেষকরা মন্তব্য করেছেন—মধুর ঢপে কীর্তনাঙ্গের সুর থাকলেও উহার সহিত লোকায়ত সহজ সরল মিশ্রিত করেন, এটি সাধক রামপ্রসাদ প্রবর্তিত রামপ্রসাদী সুরের মত মধু উদ্ভাবিত সুরবিশেষ, এবং মধু-কাণি সুর বলে খ্যাত হয়। মধুর ঢপযাত্রায় কোন কোন গানে টপ্পারও প্রভাব দেখা যেত, তার কারণ সম্বন্ধে বলা যায়—মধু ঢাকায় মার্গ সঙ্গীত শিক্ষাকালে টপ্পারও অনুশীলন করেছিলেন এবং তাঁর গানে কীর্তনাঙ্গের সুরের সঙ্গে টপ্পা মিশ্রিত করেছেন সুনিপুণভাবে। ফলে তাঁর গান উচ্চ-স্তরের সঙ্গীত বিষয়ে অনুরাগী রসিকদেরও তৃপ্তিদায়ক হত। মধুকিন্নরের বৈচিত্র্যময় অভিনব ও মিশ্রিত সুর এককালে সারা বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করতো। নৃত্যগীতের সঙ্গে গদ্য ব্যবহার মধুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর সময়ের যাত্রাগানে এমনকি ১৮৪৭ নাগাদ সর্বাপেক্ষা প্রচলিত নন্দবিদায় যাত্রায় সংলাপে গদ্য ব্যবহার হত না, সংলাপ হত পয়ারে বা ত্রিপদীতে।

কোন কোন লোকসঙ্গীত গবেষক মন্তব্য করেছেন, মধু বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু মধুর রচনায় সংস্কৃতমূলক শব্দ-বিন্যাস, অনুপ্রাস ও যমকের প্রাচুর্য লক্ষ্য করলে মনে হবে—তিনি বিশেষভাবেই বিদ্যালাভ করেছিলেন, হয়ত টোল বা চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেননি। আরও একটি কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, মধুর যাত্রাগানে [illegible]

ব্যবহৃত হত, সেগুলি তাঁর দ্বারাই রচিত, এবং তাঁর সংলাপে মহাজনপদের পংক্তিও শোনা যেত। মধুর যাত্রাগানে কথ-কতার পদ্ধতিতে বিবৃতি, পাঁচালীর প্রথায় ছড়া কাটাকাটি, কবিগানের অনুকরণে সুরেলা সংলাপ এবং নৃত্যে ঝুমুরের ঢঙ, সুরে কীর্তনাঙ্গের সঙ্গে লোকায়ত মিলন লক্ষ্য করা যেত, এরূপ অপূর্ব সমন্বয় ও সুনিপুণভাবে সংমিশ্রন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। মধুসূদনের অপর কৃতিত্ব—তিনি ঢপযাত্রায় (পরবর্তী বা আধুনিককালের কৃষ্ণযাত্রার মত) নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির রূপ দেন অর্থাৎ নিজ ও অপর গায়ক-গায়িকারা — বৃন্দা, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা প্রভৃতি (পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে কল্পনা অনুযায়ী) যথাযথ সাজসজ্জা করে আসরে গীতাভিনয় করতেন, শ্রীরাধার সহচরীরূপে চার পাঁচটি কিশোরী বৃন্দাবন অঞ্চলের গোপ-বালিকাদের অনুরূপ পরিচ্ছদে আসরে ঝুমুরের ঢঙে কটিদেশ সঞ্চালন করে নৃত্য-গীত করতো। সকল নট-নটীদের পোষাক-পরিচ্ছদে ও অলংকারাদিতে উত্তর ভারতীয় অনুকরণ দেখা যেত। (উল্লেখ করা যেতে পারে, নব-পাঁচালীতে ঢপের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভূমিকা গ্রহণকারীরা অনু-রূপ সাজসজ্জা শুরু করেছিল)।

মধুর এই বিশেষ ও অভিনব যাত্রাভিনয় শুধু যশোর জেলা বা গ্রাম বাংলায় নয়—সে সময় কলকাতার নবগঠিত ধনী ও রসিক সমাজেও আশাতীতভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তার কিছু পূর্ব হতে কলকাতায়—যাত্রাগানে গোবিন্দ অধিকারী—গোপাল উড়ে— কথ-কতায় শ্রীধর—বাঙ্গ অভিনয়ে রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। মধু তাঁর অভিনব ঢপ গানের জন্য প্রতিভাবলে কিছু-দিনের মধ্যে, তাঁদের অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করেন, এবং সে কারণে সদলে কলকাতা শহরে প্রায় স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যান। ঐ সময় কলকাতা পল্লী শহরস্তরে উন্নীত হতে চলেছে। বিদেশী ইংরেজ ব্যবসায়ীদল বা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বেশ শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলাদেশের বহু স্থানের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি—মধ্যবিত্তরা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে এবং পল্লীর ধনীরা ও জমিদার শ্রেণী নিরাপত্তার কারণে কলকাতাবাসী হয়েছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাংলার লোকদের ইংরেজ শক্তির উপর আস্থা এসে-ছিল—ইংরেজদের হাতে আছে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র, কামান, বন্দুক, দেহে শক্তি মনে অদম্য সাহস, এরা দৃঢ়ভাবে এদেশ শাসন ও দেশের অর্থ শোষণ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে এ দেশ-বাসীদের উৎপীড়নও করে বটে, কিন্তু এরা শাসক হয়েও নারী বা ধর্মের উপর হস্ত-ক্ষেপ করে না। এ লক্ষ্য করে, কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন গ্রাম বাংলা থেকে কলকাতায় চলে আসা বাঙালীরা; তাঁদের সমাজও গড়ে উঠলো এই শহরে। বহিরাগতদের সকলেই কিছুদিন পূর্বে পল্লীবাসী ছিলেন—সাধারণতঃ গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি, নাচ গান

যাত্রা-পাঁচালী - কথকতা - কবি - ঝুমুর - খেমটা-টপ গানের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল, সে কারণ পল্লীর গায়কর। কলকাতার নব-বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হতেন। নবাবী আমলের শেষ অধ্যায়ে দেশের শাসন ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না, অরাজকতার বিপর্যয়ে বাঙালীর নিজস্ব সঙ্গীত ও অভিনয়ের ধারা প্রায় রুদ্ধ হয়েছিল, কলকাতার নব ধনী সমাজ (ও এ সময়ের অন্যত্রর ভূস্বামীরা) সেগুলি পুনরায় প্রবাহিত করেছিলেন পৃষ্ঠপোষক হয়ে। এই সময় বাংলার সাহিত্য সঙ্গীত ও অভিনয় ও সংস্কৃতির অন্যান্য জগতে মধু কিন্নরের মত আরও কয়েকজন প্রতিভাশালীর আবির্ভাব ঘটেছিল। সে সময়ের (সংবাদপত্রে প্রকাশিত) কলকাতায় প্রচলিত সংগীত অভিনয়াদির বিষয়ে বর্ণনা থেকে একটু উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করা গেল না। "......শোভাবাজারের দুবাড়ী, একটিতে গোপাল উড়ে অপরটিতে রূপপাখী, বউবাজারে গোবিন্দ অধিকারী .....পাথুরিয়াঘাটায় মধুকান। গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে গানের পাল্টাপাল্টি চলে মধুকানের—গোপালউড়ের মত। গোবিন্দ গাইলেন,

'এখন চিনবে কেন চিন্তামণি।
হয়েছ রাজা পেয়েছ মজা—

আমি বৃন্দাবনে—সেই কাঙালিনী।।'

পরদিন পাথুরিয়াঘাটায় মধু অন্যভাবে গোবিন্দদাসের সেই গান গাইলেন :

'এখন কেন পারবে চিনতে—হয়েছ
নিশ্চিন্তে।

চিন্তা থাকলে পারতে চিনতে—
কিন্তু না শ্যাম সেসব চিন্তে।।'

উপরন্তু গানে অনুপ্রাস যত্ন করে গেয়েছিলেন ঐ সময়ে—

'রাজার-নন্দিনী পড়লো ধরায়।
ওমা তোরা ধরআয় ধরআয়।।
(উচ্চারণ—ধরায়)

কমলিনী আয়গো তোরা।
এরাই যেন যায় মথুরায়।।'
কর দিয়ে দেখ নাসায়
বুঝি প্যারীর জীবন নাশহয়
জীবন রইল যার আশায় সে যদি
আসিয়ে বাঁচায়।

মধু তাঁর প্রায় সকল গানের ভূমিকায় 'সুদন' লিখতেন (পূর্ণ নাম দিতেন না) এর কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে উত্তর দিতেন,—'পাছে মধু বিষ হয়, সে কারণ 'সুদন' দিয়ে থাকি।'

মধু তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রায় কলকাতাবাসী হলেও অন্যত্রের কয়েকটি ধনী বা বনেদী গৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, দোললীলা ও রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে তাঁর নিয়মিতভাবে আহ্বান আসতো এবং বাঁধাঘরে তিনি গান করে আসতেন। এরূপ একটি নির্ধারিত সময় মধু কৃষ্ণনগরে যান এবং যাত্রার আসরে অকস্মাৎ বুকে ও যকৃতে দারুণ ব্যথা অনুভব করতে থাকেন এবং প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন—সে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ হতে তিনি মুক্তি পান নি। কৃষ্ণনগরেই এই একনিষ্ঠ সুরসাধক, একটি বিশেষ সুরের উদ্ভাবক, বাংলা সাহিত্যে অন্যতম অমর লেখক, প্রখ্যাত নৃত্যগীত অভিনয় শিল্পী, সেসময়ে সারাদেশপ্রসিদ্ধ মধুসূদন কিন্নরের জীবনদীপ নির্বাপিত হয় বঙ্গাব্দ ১২৭৫ সালে, (ইং ১৮৭৩ অব্দে) সে সময় তাঁর বয়স মাত্র পঞ্চান্ন ছিল। তাঁর কয়েকটি পালাগান বা টপযাত্রার নাটক 'প্রভাসযজ্ঞ' 'অক্রুর সংবাদ', 'কলঙ্ক ভঞ্জন' প্রভৃতি (সে সময় বাংলা সাহিত্যের ক্ষীণ ধারার অন্যতম রক্ষক) বটতলার মুদ্রাযন্ত্র হতে প্রকাশিত হয়।

মেয়ে টপ

অনুমান করা যায়—মধুর মৃত্যুর কালে তাঁর কোন উপযুক্ত পুত্রসন্তান বা শিষ্য ছিল না, তবে তাঁর সময় টপযাত্রার অংশগ্রহণকারিণী ভগ্নীরা ছিলেন; মধুর মৃত্যুর পর তাঁরা টপযাত্রা পরিচলনায় ব্রতী হন। এ টপদলে নারীরাই সকল ভূমিকা গ্রহণ করতেন এবং নারীপরিচালনাধীন হওয়ায় 'মেয়ে-টপ' বা 'টপওয়ালীদের দল' বলে পরিচিত হয়ে যায়। টপওয়ালীর মধ্যে জগন্মোহিনী কিন্নরী ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারিণী ও নৃত্যগীতে বিশেষ পারদর্শিনী। কলকাতাতে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়, সেস্থানে ধনীদের অন্তঃপুরে, পূজার দালানে প্রায়ই তাঁর বায়না হত। জগন্মোহিনী কিন্নরী শুধু খ্যাতি নয়, প্রচুর অর্থও লাভ করেছিলেন।

এবিষয় লক্ষ্য করে, কলকাতা শহরে আধাসামাজিক স্তরের নারীদের দ্বারা কয়েকটি অপূর্ব টপওয়ালীর দল সৃষ্টি হয়। এ-শ্রেণীর দলে মধু কিন্নরের আদর্শ বা তাঁর প্রবর্তিত সুর, সংলাপ ও নৃত্যগীতের পদ্ধতি এবং লীলাকীর্তন আদৌ অনুসৃত হত না, সেসব বিষয়ে তাদের দক্ষতাও ছিল না। ঐ কারণ গৃহস্থের অন্তঃপুরে বা শ্রাদ্ধবাসরে তারা বর্জিত হয়—শুধু বারোয়ারীতে তাদের সমাদর থাকে। প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন; ঐ সময় কলকাতার নবধনী সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির রুচি বিকৃত হয়, তাঁদের মনোরঞ্জনের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে, নব-টপযাত্রা নৃত্যগীতে সংলাপে অভিনয়ের আঙ্গিকে এমনকি 'গোপীগণের বস্ত্রহরণ' প্রভৃতি পালাগানে অশ্লীলতাপূর্ণ হয়েছিল। পূর্বে (মধু কিন্নরের কালে) টপযাত্রায় কিশোরীরা অংশগ্রহণ করতো, কিন্তু এ নব-টপওয়ালীদলের যুবতীরাই নৃত্যগীত করতো—লাস্যনৃত্য ও আদিরসাত্মক গানই তাদের ব্যবহার্য ছিল। তাদের [illegible] বা [illegible] ব্যবহারও ভদ্রজনের আসরের বা রসিক সমাজের আপত্তিকর হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য—সে সময় প্রচলিতপ্রায় সকল গান নাচ অভিনয়েও অশ্লীলতা অনুপ্রবেশ করায় সাধারণের কাছে জঘন্য বলে বিবেচিত হতে থাকে, তবে টপই বেশি দূষ্য হয়েছিল, একালের বিশুদ্ধ ধর্মীয় উচ্চাঙ্গের নৃত্যগীতে ঐশ্বর্যপূর্ণ টপগানকে এই টপওয়ালীরা খেউড়স্তরে নামিয়ে এনেছিল। লোক বা সমাজবিশেষে এ টপযাত্রার প্রতি আকর্ষণ থাকলেও অধিকাংশ স্থানে এর কুখ্যাতিতে ভরে যায়। সে সময়ের সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি, এ জাতীয় যাত্রাগানের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি বা বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এই নব টপওয়ালীদের গান বা যাত্রা স্থায়ী হয় না। কিছুদিনের মধ্যে পতন ঘটতে থাকে। শেষে রূপচাঁদ অধিকারী থেকে মধু কিন্নর পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও ধর্মীয় টপগানের শতাধিক বৎসর প্রবাহিত ধারা এই টপওয়ালীদের কালেই লুপ্ত হয়ে যায়।

মধুকিন্নরের রচিত কয়েকটি গান

প্রভাস যজ্ঞে :

সঙ্গে কুল অকুলের করে,
কুলবতী সব প্রাণে মরে,
ভাসিছে অকূল পাথারে।
নাহি দেখে কোন কূল,
অকূল কান্ডারী করে সঙ্গে নিজকূল,
আমি কুলবালা সব ভাবিয়ে আকুল।
কান্ডারী যে ভবের কূলে
দিয়েছি কুল তারি কুলে
আজ যদি হে কূল মেলে
শ্রীহরি হলে সানুকূল।

মাথুর :

চিন্তে যদি চিন্তামণি,
তবে কি আর চিন্তাগণি।
চিন্তা করে কেনে মরবে ধনি!
যেন কি না যেন হরি,
আমরা যেন যেন করি;
দেখেছিলাম ব্রজপুরী,
ধেনু চরাতেন আপনি।।
বৃন্দাবনে নিধুবনে শ্রীরাধার মানে
দুটি চরণ লইলে মাথে নাই কি তা মনে
সুদন কর, ও কথা কেনে
এখানে সকলে মানে,
ক্ষমা দাও ও কথা মেনে
কাজ কি এত চেনাচিনি।।

পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়েছে কি ?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জাতীয় জীবনের একটি রক্তাক্ত অধ্যায়। জ্বলন্ত দেশপ্রেম, অদম্য মনোবল ও নির্ভীক আত্মদান, আক্ষরিক অর্থে এই সংগ্রামকে সংগ্রামী চরিত্র দান করেছিল। সেদিনের নিবেদিত-প্রাণ বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে সমসাময়িক ইতিহাসের খানিকটা হদিশ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে, আলোচ্য বইটি একটু নতুন ধাঁচের। '...সূচনা থেকে সুরু করে এর বিস্তার, শক্তি অর্জন, এর তত্ত্ব ও দর্শন, কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি, এর সুইসাইড স্কোয়াড, এ্যাকশনগুলির নিখুঁত বিবরণ ..' এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন লেখক। তিনি নিজেও একজন প্রাক্তন বিপ্লবী।

বইটি দু-ভাগে বিভক্ত। 'বিপ্লব বহ্নি' ও 'বিপ্লব ঋষি'। 'বিপ্লব বহ্নি' দেয় বিপ্লবীদের তেজ ও দীপ্তির আভাস। আর 'বিপ্লব বহ্নি প্রজ্বলিত করবার জন্য' যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে 'বিপ্লব ঋষি'তে।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, বোম্বাই শহরে। প্লেগ রোগ দমনের নামে পুণার তদানীন্তন কালেকটর ডবলিউ সি র‍্যান্ড, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সবাইকে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রোগাক্রান্তদের দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হত আটক শিবিরে। আপত্তি ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল জনগণ। কিন্তু র‍্যান্ড সাহেব নির্বিকার। মানুষের মর্যাদা দিতে পরাঙ্মুখ যে ইংরেজ, তাকে চরম শিক্ষা দিতে শপথ নিয়েছিলেন চাপেকর ভাইরা—দামোদর হরি, বালকৃষ্ণ হরি, আর বাসুদেব হরি। ১৮৯৭ সালের ২২ জুন, পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা র‍্যান্ড সাহেবকে এক দুঃসাহসিক অভিযানে। 'বোম্বাই-এর বিপ্লবীরা এই যে দেখাল রক্তরাঙ্গা পথ, কয়েক বছর পর এই পথেই যাত্রা করেছিল বাংলার বিপ্লবীরা'। ১৯০৫ সালের ১৬ অকটোবর সর্বভাবে প্রশাসন করার অজুহাতে বঙ্গবিভাগ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল বাংলাদেশ। তখন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিংসফোর্ড। ঠাণ্ডা মাথায় চরম অত্যাচারের নির্দেশ দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাংলার দুই তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোস ও প্রফুল্ল চাকী ঐই কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে মজঃফরপুর পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। অল্পের জন্য কিংসফোর্ড রক্ষা পান। পরিণামে ফাঁসী হয় ক্ষুদিরামের। এবং মোকামাঘাট স্টেশনে পুলিশ গুলিবিদ্ধ করে প্রফুল্লকে। অবশ্য এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া পায়নি। বিপ্লবীদের বুলেট তার দেহ ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, কিছুদিন পরে।

যেসব বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলার যুবসমাজ ইংরেজ শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, তার আদিগুরু ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। '...বৈপ্লবিক রণাঙ্গনে তাঁর স্থিতি হয়ত দশ বৎসরের বেশী নয়, কিন্তু তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি বাংলাদেশের বিপ্লববাদের গোড়াপত্তনের ব্যবস্থা করেন এবং সেই প্যালিওলিথিক যুগে যাঁর অনুপ্রেরণায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথম বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যাদের আদর্শ ছিল দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।' এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বিনায়করাও

বিপ্লব-বহ্নি

বিপ্লব-ঋষি
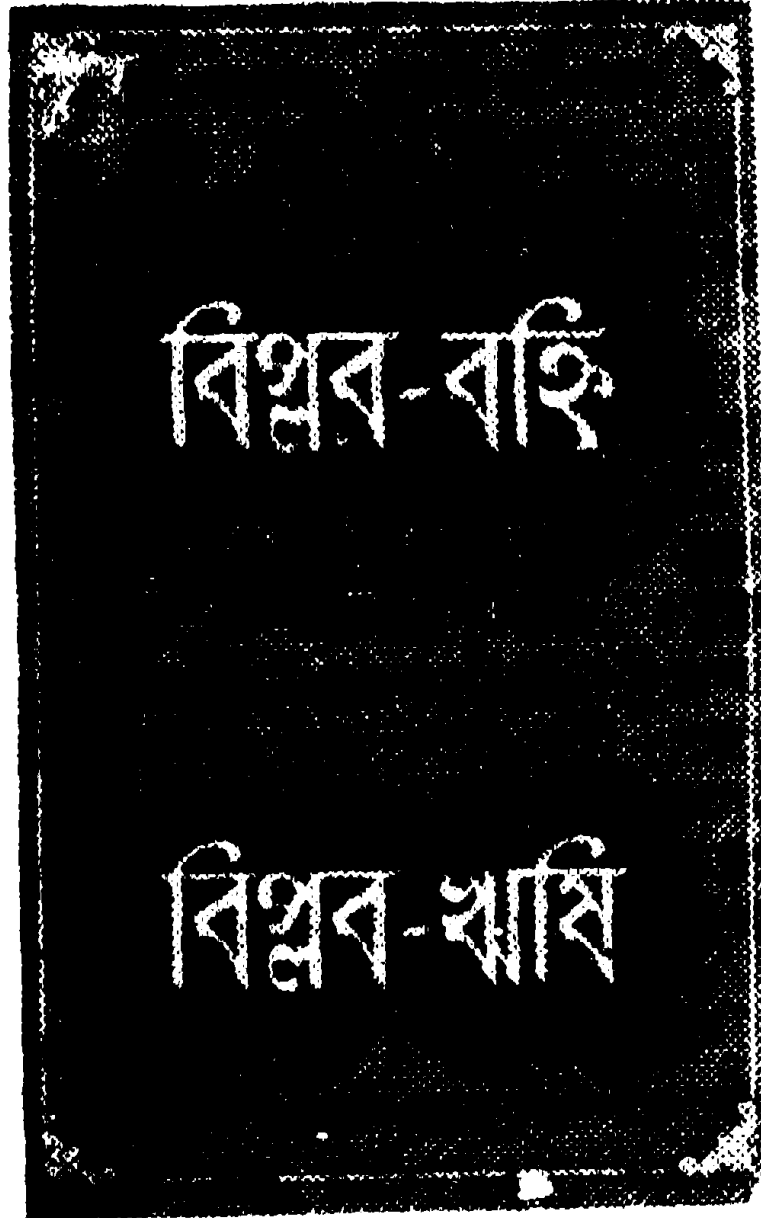
দামোদর সাভারকর, বাঘা যতীন, মাস্টারদা, দীনেশ মজুমদার প্রমুখ আরো অনেকে। চতুর-চূড়ামণি রাসবিহারী বসু বুদ্ধিতে, কৌশলে, অভিনয়ে, ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম ধারণ করে গোয়েন্দা ও পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়েছেন বার বার। টেগার্ট সাহেবের উপর বিপ্লবীদের আক্রমণ, জেল-পলাতক বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের কার্যকলাপ কিম্বা চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘটনাবলী যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। সেই সময়কার বিপ্লবের ঢেউ বাড়ীর অন্দরমহলে গিয়েও পৌঁচেছিল। কুমিল্লার শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর নাম এ প্রসঙ্গে অগ্রগণ্য। তাঁরা পিস্তল হাতে এগিয়ে এসেছিলেন কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট সি জি বি স্টিভেন্সকে হত্যার উদ্দেশ্যে। দিন-দুপুরে। অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ বিপ্লবীদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল দূর থেকে দূরান্তরে। জালিয়ানওয়ালা বাগ ঘটনাকে (১৯১৯) ভুলতে পারেনি পাঞ্জাবী যুবা উধম সিং। তক্কে তক্কে ছিলেন তিনি সুযোগের অপেক্ষায়। সুযোগ পেলেন ঘটনার একুশ বছর পরে, সুদূর লণ্ডনে। সেদিনের অত্যাচারী জেনারেল ডায়ারকে গুলি করে উধম সিং তাঁর শপথের মর্যাদা রেখেছিলেন। উধম সিং তাঁর শপথের মর্যাদা রেখেছিলেন বীরের মত, নিজের প্রাণের বিনিময়ে। ১৯৪০ সালের ১২ জুন লণ্ডন শহরের জেলে উধম সিং-এর ফাঁসী হয়।

বিপ্লবী নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত নলিনী-কিশোর গুহ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্ণচন্দ্র সেন ও নলিনীকান্ত কর প্রমুখের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকারের বিবরণ ও প্রশ্নোত্তর বেশ আকর্ষণীয়। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত মনোভাব ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তবে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গায় পাঠকের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রথমত, র‍্যাণ্ড সাহেবের হত্যাকারী দামোদর হরি চাপেকরকে লেখক 'ভারতের প্রথম শহীদ' বলে বর্ণনা করেছেন। দামোদরের ফাঁসী হয় ১৮৯৮ সালে। কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। ঐ সংগ্রামে নিহত ভারতীয় জওয়ানগণ কি তাহলে শহীদ নন?

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় আকাশে বাতাসে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছিল বলে লেখক যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। সে যুগটা ছিল 'বন্দে মাতরম'-এর। তদানীন্তন চট্টগ্রামের নাজির 'মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছ থেকে শুনেছি, যে ঐদিন জোর-রাতে বন্দে মাতরম ধ্বনি চট্টগ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, '...বিপ্লব আন্দোলনের টুকরো টুকরো কাহিনী হয়তো কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে তথ্যের সঙ্গে কল্পনা ও ভাবাবেগ মিশে একাকার হয়ে গেছে। সুখপাঠ্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে ইতিহাস বলে না।' লেখকের এই মন্তব্য দেখে মনে হয় তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়ে ছিলেন। তবে শেষ-পর্যন্ত তিনি সফল হলেন কি? মাত্রাতিরিক্ত আবেগের প্রভাব লেখার গতিকে স্থানে স্থানে ব্যাহত করেছে। টুকরো টুকরো রোমহর্ষক ঘটনার মাধ্যমে সে যুগের গণমানসের খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেলেও,

সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের হদিশ মেলে না। যে অনুপুঙ্খ সহযোগে লেখক বিপ্লবীদের এ্যাকশনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলির প্রামাণিক ভিত্তি আছে কি? এই প্রশ্ন রাখছি এই কারণে, বর্ণিত ঘটনাগুলির কোনটিতেই লেখক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না।

ঐতিহাসিক গুণাগুণের কথা বাদ দিলে, বইটি কিন্তু দারুণ সুখপাঠ্য। মনে হবে যেন শ্বাসরুদ্ধকারী কোন ডিটেকটিভ গল্প। পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা মুশকিল, লেখকের পরিবেশনার ভঙ্গী এত সুন্দর। ঝরঝরে ভাষা, গতি ও প্রায় নির্ভুল ছাপা উৎসাহী পাঠককে যথেষ্ট আনন্দ দেবে।

রামেন্দ্রসুন্দর সরকার

বিপ্লব বহ্নি বিপ্লব খাঁজ। দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা ৭০০০১৩। পৃষ্ঠা ৩৪৩। মূল্য কুড়ি টাকা।

মূলরসের অভাব

আমরা ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের সঙ্গে রীতিমতই পরিচিত হবার সুযোগ পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের একেবারে পড়শী দেশগুলোর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ সে তুলনায় অনেক কম। সেদিক দিয়ে এজাতীয় সংকলনের নিঃসন্দেহেই প্রয়োজন আছে। এই সংকলনে চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, বর্মা, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন—আটটি দেশের কিছু গল্প আছে এইসংকলনটিতে। গল্পগুলির বেশিরভাগই ইংরেজী থেকে অনূদিত। মানে অনুবাদের অনুবাদ যাকে বলে। তাই পড়তে পড়তে কোন কোন গল্পে কোথায় যেন মূল রসের অভাব থেকে গেছে। একমাত্র কাওআবাতার গল্পটিই যা মূল ভাষা জাপানী থেকে অনুবাদ করেছেন জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। ছোট্ট একটি ঘটনা, (চীন—যদিও এটা লু সুনের লেখা) সেকেলে প্রথা, মাকড়শার সুতো (জাপান) —এরকম দু-একটি গল্প পড়তে পড়তে কেমন একটা সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় —এগুলি যথার্থ ঐসব ভাষার প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পগুলির সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়ে কিনা!

গৌতম ভট্টাচার্য

এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প: সম্পাদক—নিখিল সেন। প্রকাশক—চারবাক। কলকাতা-৩। বারো টাকা।

প্রকাশের মহিমা প্রকাশ

অজয় বসু

দক্ষিণী তরুণ পাড়ুকোন প্রকাশ আবার সংবাদের শিরোনামে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিয়াকলাপের এই আসনটি গত ন' বছর ধরেই তাঁর কাছে বাঁধা পড়ে আছে। কিন্তু ওই বিন্দুতে তার এবারের স্থিতি আন্তর্জাতিক আসরে তাঁর সাম্প্রতিক সাফল্যের কল্যাণে।

পাড়ুকোন প্রকাশ ১৯৭১-এ সর্বপ্রথম জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা জয় করেন। সেই থেকেই ঘরোয়া ব্যাডমিন্টন আসরে অবিসম্বাদী নায়ক। বছরের পর বছর দেশের এখানে-ওখানে উত্তর পর্বে যখনই জাতীয় ব্যাডমিন্টনের আসর পাতা হয়েছে, সেখানে হাজির হয়েই প্রকাশ তাঁর শীর্ষস্থান অবিচল রেখে দিয়েছেন। শীর্ষবিন্দু থেকে স্বদেশীয় কোনো প্রতিযোগীই তাঁকে নড়াতে পারেননি। টানা ন' বছর ধরেই তিনি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং স্বদেশের সেরা। এবং সেই এক সংবাদও বটে।

তবু অন্যান্য বারের সঙ্গে এবারের ঘটনার কিছু পার্থক্য আছে। যেহেতু ঘরোয়া আসরের পরিধি পেরিয়ে প্রকাশের খ্যাতি ও সাফল্য আজ দূরে-দূরান্তরে প্রসারিত হয়েছে। তাঁর সংশয়াতীত স্বীকৃতি, বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে। ঠিক এই মুহূর্তে একমাত্র ইন্দোনেশিয়ার লিন সুই কিম- ছাড়া প্রকাশের চেয়ে যোগ্যতর, শ্রেষ্ঠতর খেলোয়াড় গোটা দুনিয়ায় আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ।

পাড়ুকোন প্রকাশ কমনওয়েলথ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন। এর আগে বিক্ষিপ্ত লগ্নে তিনি বিশ্বের প্রথম সারির প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েছেন। আবার তাঁদের হাতে হেরে যেতেও বাধ্য হয়েছেন। প্রথম সারির প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়ার কালে প্রকাশ একদিন বিশ্বের স্বীকৃত চ্যাম্পিয়ন ডেনমার্কের ফ্লেমিং ডেলফসকেও হারিয়ে দেন। গত সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডেলফসকে পরাজিত করার দৃষ্টান্তই ছিল প্রকাশের খেলোয়াড় জীবনের সেরা নজির। তারপর নিজের বাহুবলের আরও পরিচয় রেখে প্রকাশ সেই নজিরের জলুষ আরও বাড়িয়েছেন গত সেপ্টেম্বরে মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা জয় করে।

মাস্টার্স প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ছিল নগদ টাকা। পেশাদারী টেনিসের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্যাডমিন্টনে এই অভিনব আয়োজন ঘটে এই প্রথম। বিশ্বের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে শুধুমাত্র আটজন মাত্রাইকে এই আসরে উপস্থিত থাকার [illegible] হয়েছিল [illegible]

সবাই এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানকেন্দ্র লণ্ডনের রয়াল অ্যালবার্ট হলে হাজির হন শুধু ইন্দোনেশীয় তরুণ অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ন লিন সুই কিম- ছাড়া। লিনের সঙ্গে ইন্দোনেশীয় ব্যাডমিন্টন প্রশাসনের মতবিরোধ ঘটায় তিনি লণ্ডনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। লিন সুই কিম- সরে দাঁড়াতে মূল প্রতিযোগিতার কিছুটা অঙ্গহানি হয় বটে। তবে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য করে তুলতে প্রকাশ ও আরও পাঁচজন বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় তাঁদের সাধ্যমত সবকিছুই করেছেন।

নামেই বোঝা যায় যে, মাস্টার্স প্রতিযোগিতার দরজা কেবলমাত্র মাস্টার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের জন্যেই খোলা রাখা হয়েছিল। বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতা, অল ইংলণ্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ও টমাস কাপের আসরে যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন দক্ষতার পরিচয় রেখে আসছেন, মাস্টার্স পদবাচ্য ছিলেন তাঁরাই। সেই আসরে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পাড়ুকোন প্রকাশ নিজের ভাবমূর্তির আয়তন আরও অনেক বাড়িয়ে তুলতে পেরেছেন। আন্তর্জাতিক আসরে পিছিয়ে থাকা ভারতের প্রতিনিধি হয়েও প্রকাশ যে ব্যাডমিন্টনের এক আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় সামর্থ্যের ওপর রং ফলাতে পেরেছেন, তার জন্যে ভারতবাসী মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আশাহত নিষ্ফল দীর্ঘ প্রহর পেরিয়ে আজ যে আমরা কিছুটা সান্ত্বনা, স্বস্তি যে পাচ্ছি তা পাড়ুকোন প্রকাশেরই কল্যাণে। প্রকাশের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। আশা এই যে, আগামী আরও কয়েক বছর খেলাধুলোর অন্য বিভাগে ভারতীয়দের ব্যর্থতা ঢাকতে প্রকাশ আরও কিছু করতে পারবেন।

রয়াল অ্যালবার্ট হলে যে প্রতিযোগিতা হয়, তার নিয়ম অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বীদের রাউণ্ড রবীন বা লীগ প্রথায় ঘুরেফিরে পরস্পরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অনেকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সকলকে টেক্কা দিয়ে বিজয়ীর নিজের মাথায় তুলে নেওয়ার বিষয়ে নিছক ভাগ্যের কোন ভূমিকা ছিল না। জয়ের রাস্তা গড়তে হয়েছে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতার কড়ি ফেলেই। নক আউট প্রতিযোগিতা নয় বলে চূড়ান্ত সাফল্যকে সন্দেহবাতিকেরা পর্যন্ত অতর্কিত আখ্যায় উড়িয়ে দিতে সাহস পাননি। দিনের পর দিন খেলে, একের পর আর এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাগে এনে তবে প্রকাশ মাস্টার্স কুলে অবিসম্বাদী মাস্টারের অভিধায় অভিনন্দিত হয়েছেন। ঐ কীর্তি যে অসামান্য, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

রয়াল অ্যালবার্ট হলে প্রকাশের প্রাধান্য ছিল নিরংকুশ। স্কোর-শীটেই তার প্রমাণ ধরা আছে। সুইডেনের কিহলস্ট্রম, ইংলণ্ডের ডেরেক ট্যালবট এবং ডেনমার্কের স্বেন প্রি ও ফ্লস্ট হ্যানসেনের মত জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের [illegible]

রয়াল অ্যালবার্ট হলে পাড়ুকোন প্রকাশ
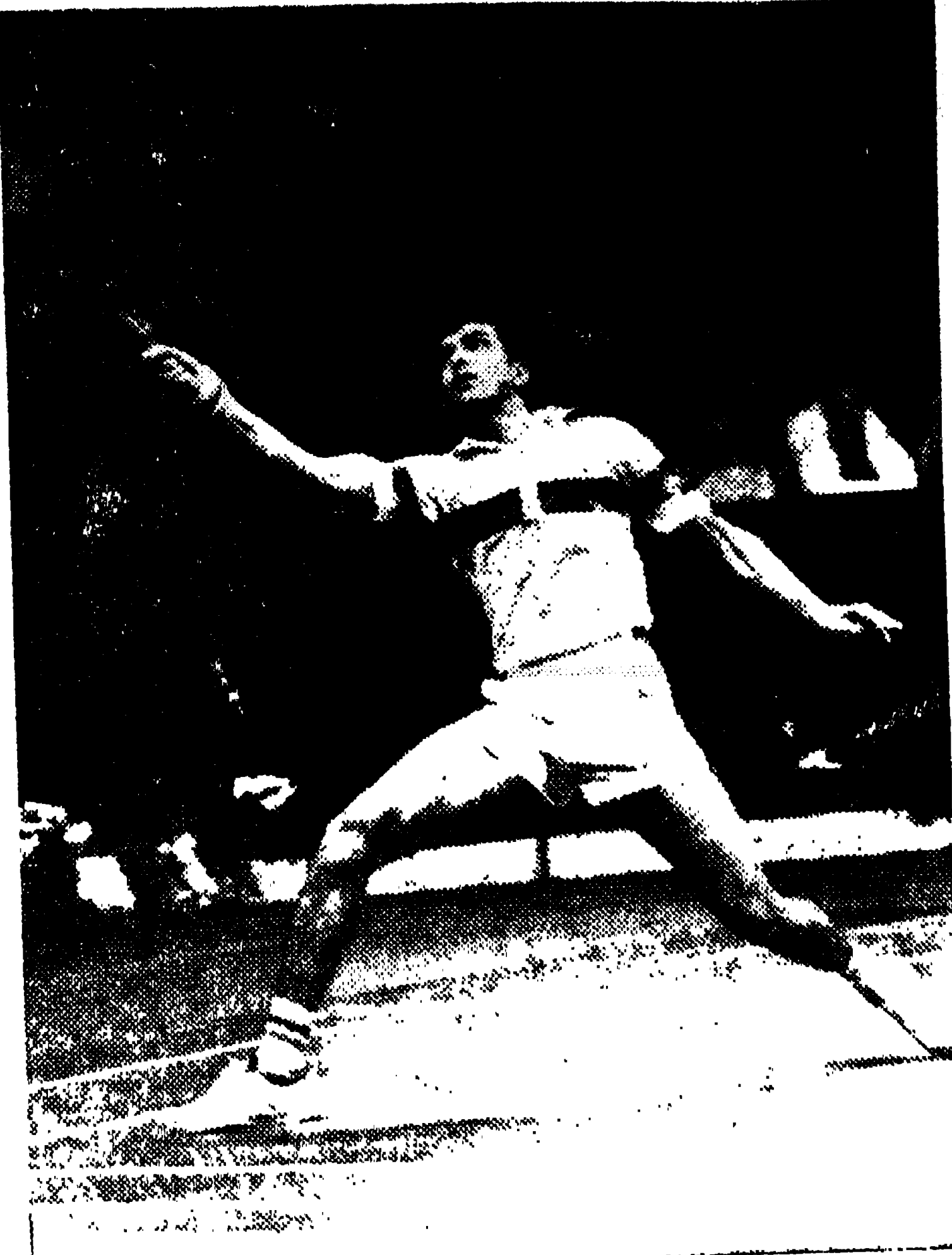
ছাড়া না করেই। পরিণত স্বেন প্রি কিছু-দিন আগে জাকার্তার কোর্টে প্রকাশকে হারিয়েছিলেন। রয়াল অ্যালবার্ট হলে তারই বদলা নেন ১৬—৩, ১৫—১২ পয়েন্টে জিতে।

মাস্টার্স ব্যাডমিণ্টন জয়ের সুবাদে বাঙ্গালোরের এক ব্যাংকের কেরানী পাড়ুকোন প্রকাশের পাওনা হয়েছে তিন হাজার পাউণ্ড। কিন্তু নগদ টাকা তিনি হাত পেতে নিতে পারেননি। যেহেতু প্রকাশ খেলোয়াড় হিসেবে এখনও অপেশাদার। তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে পুরস্কারের মোট টাকা ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন সংস্থার দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে কোনো দিন পেশাদারী বৃত্তি নিলে প্রকাশ হয়ত ওই টাকা হাত পেতে নেবেন। প্রকাশের সাফল্যের স্বীকৃতিতে ভারতীয় তিন হাজার টাকা উপহারস্বরূপ দেবার টেস্ট ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়েরাও তাঁকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ সালে আসার ফাঁকে প্রকাশের খেলা ক্রমোন্নয়নমুখী হয়েছে মূলতঃ তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের কল্যাণে। তবে তাঁর খেলার ধার ও ভার বাড়াতে সবচেয়ে সহায়তা করেছিল প্রকাশের ইন্দোনেশিয়া। ১৯৭৭ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে টানা দু' মাস প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনে অতিবাহিত। রুডি হারতানো, লিন সুই কিম এবং আরও অনেক জাত ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ের বাসভূমি ইন্দোনেশিয়া। সেখানে থাকে তথাকতে প্রকাশ উন্নততর ক্রীড়াধারার আরও কিছু কৌশল রপ্ত করেন এবং অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নেন।

ইন্দোনেশিয়া সফরের সূত্রে তিনি যে নিজের ক্রীড়ারীতিকে আরও ছিমছাম ও কার্যকর করে তোলার শিক্ষা পেয়েছেন, সে-কথা প্রকাশ নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। তাছাড়া বড় বড় আসরে নামী-নামী বিদেশী খেলোয়াড়দের দেখেও তিনি নিজে থেকেই অনেক কিছু শিখে নিতে পেরেছেন। প্রকাশ বলেছেন, আগে আমি রক্ষণাত্মক পদ্ধতিতেই খেলতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু চীনাদের খেলার ধরণ আক্রমণাত্মক মেজাজ গড়ার দিকে মন দিই। তবে এখনও আমার অনেক শিক্ষা বাকি আছে।

আরও শিক্ষা বাকি আছে—এ-ক'টি কথার মধ্যেই প্রকাশের খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের যথার্থ পরিচয় ধরা রয়েছে। আকৃতি সুদর্শন, খেলোয়াড় প্রকাশের কোর্টের আচরণও তেমনই মনোগ্রাহী। চেষ্টায় কোনো কসরত নেই, মেহনতে ফাঁকি পড়ে না। এবং হেরে গেলেও তাঁর ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায় না। হাসতে হাসতে যিনি হারতে পারেন তাঁর চেয়ে বড় স্পোর্টসম্যান আর কেউ বা আছেন? কোর্টের আচরণের মূল্যায়নে যাঁরা যথার্থ স্পোর্টসম্যান পদবাচ্য হওয়ার দাবি রাখেন, প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। সমকালীন আরও একজন ভারতীয়কে আমি অনুরূপ চরিত্রবান স্পোর্টসম্যান বলে মনে করি। তিনি হলেন টেবল টেনিস তারকা মনজিৎ দুয়া। খেলোয়াড় চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য বিনয় ও সপ্রতিভতা। এই দু'টি গুণই প্রকাশ ও মনজিতের মধ্যে আছে। মাঝকোর্টে ও'দের খেলতে দেখলে অন্য সব খেলোয়াড়েরা কিছু কিছু শিক্ষা পেতে পারেন।

কোর্টের বাইরে প্রকাশের প্রকাশ সহজ, স্বাভাবিক চরিত্রে। সর্বত্রই সপ্রতিভ, হাসি-খুশি ভাব। অপরকে আঘাত দিয়ে কথা বলেন না। পারলে সর্বদাই বিতর্ক এড়িয়ে যান। একান্তে নিজের জগতে যখন থাকেন, বইপত্তর ও গানের রেকর্ড নিয়ে সময় কাটান। এবং স্বভাবে তিনি তাঁদের পরিবারের প্রায় আর সকলের মতই মিতবাক। কাজের মানুষদের কাছে প্রকাশ রীতিমত জনপ্রিয়। যিনিই তাঁর কাছাকাছি এসেছেন, তিনিই তাঁকে না ভালবেসে থাকতে পারেন নি।

প্রকাশের জনক-জননীর স্বীকৃতি, প্রকাশ সম্পর্কে তাঁদের কোনো অভিযোগ নেই। খেলাধুলো, অধ্যয়ন এবং সামাজিক মেলামেশা কোনো কাজই প্রকাশের কাছে ছোট, হাল্কা বলে বিবেচিত নয়। তাঁরা মুখ ফুটে না জানালেও কথাবার্তার সময় স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান প্রকাশ সম্পর্কে তাঁরা মনে মনে গর্বিত। এ-গর্ব ভারতেরও, যেহেতু প্রকাশ নিজের সাফল্যে ব্যাডমিণ্টনের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ভারতের নামটি খোদাই করে দিতে পেরেছেন।

পিতা রমেশ-ই প্রকাশের ব্যাডমিণ্টন অনুরাগের মূল উৎস। তিনি মূল উৎসাহদাতা। রমেশ বাঙ্গালোরের ব্যাডমিণ্টন সংগঠক মহলের অবিসম্বাদী নেতা এবং একজন স্বীকৃত রেফারি। বাবার হাত ধরে ছেলেবেলায় ব্যাডমিণ্টনের বিভিন্ন কোর্টে ঘোরাঘুরির ফাঁকেই প্রকাশ খেলাটি ভালবেসে ফেলেন। নিখাদ অনুরাগ। তারই টানে প্রকাশ এক যুগের ওপর ব্যাডমিণ্টন দুনিয়ার সর্বত্র বিচরণ করছেন। হাতের র‍্যাকেট তাঁকে ফাঁকিতে ফেলেনি। এবং তিনি নিজেও ভারতীয় ব্যাডমিণ্টনকে ফাঁকিতে পড়তে দেননি। আর তা দেননি বলেই ভারতবাসী আজ জাতিগতভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্টে সেঞ্চুরি করার মুহূর্তে ভারতের অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার

বঞ্চনা এবার আঞ্চলিক দলেও

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেট বলতে এখনো বাংলাকেই বোঝায়। পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটের সদর দপ্তর কলকাতার ইডেন উদ্যান। আজকাল বিহারও যথেষ্ট এগিয়েছে। এমন কি তারা বাংলাকে হারাচ্ছে—রণজি ট্রফির চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলছে কিন্তু অন্য দুটি রাজ্য নেহাতই দুর্বল। ওড়িশা ও আসাম কলকাতার ক্লাব দলগুলোর মতোই অনেকটা।

ইদানীং বাংলাকে ছোট করার জন্যে সব জায়গাতেই প্রচেষ্টা চলছে। ফুটবলে অন্য রাজ্যগুলোর সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলা। ছলে-বলে-কৌশলে তারা চায় বাংলাকে হারাতে। কিন্তু শুধু জাতীয় প্রতিযোগিতাতেই নয়, বাংলার ক্লাবগুলো ভারতের সেরা ফুটবলের আসর থেকে চিরকালই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করে ফিরে আসে সেই ট্র্যাডিশন এখনো সমানে বয়ে চলেছে।

ফুটবলে হাজার চেষ্টা করেও বাংলাকে কেউ ছোট করে দেখতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরই সেরা দল বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

কিন্তু এবার ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে যা হলো এমনটি আর কখনো দেখা যায় নি। সর্বভারতীয় ক্রিকেটে পূর্বাঞ্চল বরাবরই দুর্বল। এই অঞ্চল থেকে টেস্ট খেলোয়াড় খুব কমই বেরিয়েছেন। অবশ্য তার দায় খেলোয়াড়দের নয়। নির্বাচকদের বিমাতৃসুলভ মনোভাবও এর একটি প্রধান কারণ।

চিরকালই দেখা গেছে পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়রা উপেক্ষিত হচ্ছেন। তাই দেখি ডি এস মুখার্জিকে উপেক্ষা আর বঞ্চনা সহ্য করে ধীরে ধীরে ক্রিকেটের আসর থেকে সরে যেতে হয়েছে। অম্বর রায় আর সুব্রত গুহকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হলো না। জীবনের প্রথম বে-সরকারী টেস্টে সেঞ্চুরি এবং একটির পর একটি খোগাড়া অর্জনের খেলায় ভাল খেলা সত্ত্বেও গোপাল বসুকে কোনদিন ভারতীয় দলের পক্ষে টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া হলো না। এ রকম অজস্র উদাহরণ দিয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু তাতে শুধু আমাদের মনই ভার হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। এখন শুধু আর ভারতীয় নির্বাচকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই—আমাদের ঘরের নির্বাচকরা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দল গড়ার সময় কি করলেন একবার ভেবে দেখা যাক। কলকাতায় বসে পূর্বাঞ্চল দল গড়া হলো। কিন্তু কটকে খেলা আরম্ভ হবার আগে দেখা গেলো পূর্বাঞ্চল দল থেকে রাজু মুখার্জির মতো খেলোয়াড়ও বাদ পড়েছেন। এবং পূর্বাঞ্চল দলে বাংলার খেলোয়াড়দের কোণঠাসা করে ফেলার চেষ্টা হয়েছে।

উদয়ভানু ব্যানার্জীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। রাজু মুখার্জি কিভাবে বাংলা দল থেকে বাদ পড়লেন? এর পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলা আরম্ভ হবার আগে চূড়ান্ত দল গড়েছিলেন পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক রমেশ শকসেনা ও ওড়িশার নির্বাচক এস বিশ্বাস। কিসের ভিত্তিতে তাঁরা রাজুর মতো অভিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানকে বাদ দিয়ে দল গড়লেন? এই প্রশ্নের উত্তর কি তাঁরা দেবেন?

সব থেকে অবাক কাণ্ড হলো যে, কটকে পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের অনুশীলনের দায়িত্ব রাজভকেই বহন করতে হয়েছিল। কারণ রমেশ শকসেনা ও এস বিশ্বাস পুরীতে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন। শলা-পরামর্শটা কি সেইখানেই হয়েছিল? তা না হলে রাজু মুখার্জীর মতো খেলোয়াড়কে বাদ দেবার কথা মাথায় আসবে কি করে?

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কিম হিউজ নেহাৎ খেলার মাঠে 'জুয়া' খেলতে বসেছিলেন তাই—না হলে পূর্বাঞ্চলকে বিশ্রী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো। পূর্বাঞ্চল কায় উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে। দুই কৃতিত্বের মধ্যে প্রত্যেকটি

আসিফ ইকবাল

১৯৬০-৬১ সালে ফজল মামুদের নেতৃত্বে পাকিস্তান ক্রিকেট দল শেষবার ভারত সফরে এসেছিল। তারপর দীর্ঘদিন পরে আসিফ একবালের নেতৃত্বে পাকিস্তান ক্রিকেট দল আবার ভারতে খেলতে আসছে।

ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ১৯৫২ সালে। সেবার আব্দুল হাফিজ কারদারের নেতৃত্বে পাকিস্তান এসেছিল ভারতে। লালা অমরনাথ তখন ভারতের অধিনায়ক। সেবারের পাঁচটি টেস্টের মধ্যে ভারত জিতেছিল দিল্লির প্রথম ও বোম্বাইয়ের তৃতীয় টেস্টে। লক্ষ্মৌর দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তান জিতেছিল। মাদ্রাজের চতুর্থ ও কলকাতার পঞ্চম টেস্ট ড্র হওয়ায় ভারতই রাবার জিতেছিল।

এর পর ১৯৫৫ সালে ভিনু মানকাদের নেতৃত্বে ভারত গেলো পাকিস্তান সফরে। কারদার ছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক। সেবার ঢাকা, ভাওয়ালপুর, লাহোর, পেশোয়ার ও করাচীর পাঁচটি টেস্টই শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে।

১৯৬০ সালের ফজল মামুদ পাক দল নিয়ে ভারতে এলেন। নরী কানট্রাক্টর তখন ভারতের অধিনায়ক। সেবার বোম্বাই, কানপুর, কলকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লির টেস্ট খেলা ড্র হওয়ায় রাবার ভারতের হাতেই রয়ে গেলো।

গত বছর বেদী পাকিস্তান সফরে গিয়ে দুটি টেস্টে হেরে সেই রাবার হারিয়ে এসেছেন মুস্তাক মহম্মদের দলের কাছে।

এবার আসছে আসিফ ইকবালের পাকিস্তান দল। তারা ভারতে ছটি টেস্ট খেলবে। পাক দলের সঙ্গে আসছেন—আসিফ ইকবাল (অধিনায়ক) মজিদ খাঁ (সহ-অধিনায়ক), সাদিক মহম্মদ, জাহির আব্বাস, ইমরান খান, জাভেদ মিঁয়াদাদ, ওয়াসিম বারি, ওয়াসিম রাজা, সেকেন্দার বখত, মুদাসার নজর, টি মির্জা, টি আরিফ, আব্দুল রকিব, এ আলিমুদ্দিন, আব্দুল কাদির ও আই কাসিম।

খেলোয়াড়ের অভিনন্দন প্রাপ্য। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, পূর্বাঞ্চলের সেই জয়ের পেছনে সব থেকে বড় অবদান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কিম হিউজের। তিনি যদি পূর্বাঞ্চলের ব্যাটিং শক্তিকে অতোটা খাটো করে না দেখতেন তাহলে হয়তো অবস্থা অন্য রকম হতো।

তাই পূর্বাঞ্চলর জয়ের এই আনন্দের দিনে একটা আশঙ্কা মনের মধ্যে মাথা খুঁড়ে মরছে। এবার থেকে কি নিজেদের আঞ্চলিক দল বাংলার খেলোয়াড়দের এইভাব কোণ-ঠাসা হয়ে থাকতে হবে? রাজু মুখার্জীর দল থেকে বাদ পড়ার পরও কি বাংলার ক্রিকেটের কর্তাদের চোখ খুলবে না?

অস্ট্রেলিয়ার দুই ব্যাটস্‌ম্যান ইয়ালপ ও উড ব্যাট করতে নামছেন

বোলিংয়ে দুর্বলতা প্রকট হচ্ছে

কানপুরে টেস্টে জেতার পর ভারত দিল্লির চতুর্থ টেস্টেও জয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। ফলো অন করে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া হার এড়ায়। ব্যাটিংয়ের দিক থেকে এবারের অস্ট্রেলিয়া দলটির চেয়ে ভারত যে অনেক ভাল তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেলো। ফিল্ডিংটাও যদি ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভালভাবে, দক্ষতার সঙ্গে করতে পারতেন তাহলে জয় ভারতের মুঠোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে যেতো না।

অস্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের মুখ থেকে টেনে তুলতে হোয়াটমোর দারুণ খেলে-ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত যখন জেতার জন্যে চেষ্টা করছে এবং হার বাঁচানোর জন্যে হোয়াটমোর দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছেন তখন দিলীপ দোসীর বলে দিলীপ বেঙ্গসরকার ফেলে দিলেন একটি ক্যাচ। ক্যাচটা একটু কঠিন ছিল ঠিকই। কিন্তু টেস্ট খেলায় জিততেহলে ঐ ধরণের ক্যাচ লুফতেই হবে। ফলে জীবন ফিরে পেয়ে হোয়াটমোর অস্ট্রেলিয়াকে নিরাপদ অস্থার দিক টেনে নিয়ে চললেন। কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। এর পর আরো একবার হোয়াটমোর রাণ আউটের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান। চৌহান বল ছুঁড়ে দিয়েছিলেন শিবলাল যাদবকে। যাদব বলটি ধরে উইকেট ভেঙে দিলেই হোয়াটমোর আউট হয়ে যেতেন। কিন্তু যাদব বলটি ঠিক মতো ধরতেই পারেন নি। সেই অবসরে হোয়াট-মোর উইকেটে পেঁছে যান। অথচ তখন যা অবস্থা ছিল তাত হোয়াটমোর আউট হয়ে গেলে ভারত হয়তো শেষ পর্যন্ত জিতেই যেতো।

যাই হোক, দিল্লি টেস্টে টসে জিতে সুনীল গাভাসকার আগে ব্যাট করার সুযোগ নেন। এবং সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ভারত ৫১০ রাণে তাদের প্রথম ইনিংসটি সাজায়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ঐটি সর্বোচ্চ রাণের নজির।

ভারতের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার, গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ও যশপাল শর্মা। টেস্ট ক্রিকেটে গাভাসকারের এটি ২১তম শতরাণ। অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যানকে ধরতে সুনীল সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করে চলেছেন। ব্র্যাডম্যান করেছেন ২৯টি সেঞ্চুরি। সেই সংখ্যা ডিঙিয়ে গাভাসকার চাইছেন টেস্ট ক্রিকেটে সব চেয়ে বেশী শত রাণের রেকর্ড গড়তে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্যার গ্যারী সোবার্সও ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙতে চেষ্টা করে-ছিলেন। মাত্র তিনটির জন্যে তিনি পারেননি ডনকে ছুঁতে। ২৬টি সেঞ্চুরি করার পর সোবার্স থেমে যান। গাভাসকারের সামনে এখন মস্ত সুযোগ। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্ব ক্রিকেটের প্রাণপুরুষ ব্যাটস-ম্যানকে ডিঙিয়ে যেতে পারেন কি না।

বিশ্বনাথ টেস্টে ক্রিকেটে এক বছরে হাজার রাণ পূর্ণ করেছেন। দিল্লি টেস্টে ৪২ রাণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেই কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিশ্বনাথের রাণের হিসেব—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে (চতুর্থ টেস্ট) ২২৪ ও ৩১, দিল্লির পঞ্চম টেস্টে ৯ ও কানপুরের ষষ্ঠ টেস্টে ১৭৯ রাণ। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এজবাস্টনের প্রথম টেস্টে ৭৮ ও ৫১, লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে ২১ ও ১১৩, লীসের তৃতীয় টেস্টে ১ এবং ওভালের চতুর্থ ও শেষ টেস্টে ৬২ ও ১৫ রাণ এবং এবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে ১৭ ও অপরাজিত ১৬১, বাঙ্গালোরের দ্বিতয় টেস্টে ৪৪ ও কানপুরের তৃতীয় টেস্টে ৫২ রাণ। মোট ৯৫৮। ফলে দিল্লিতে বিশ্বনাথ এক বছরে হাজার রাণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

যশপাল শর্মা দিল্লিতে শতরাণ করে ভারতীয় দলে তাঁর স্থান পাকা করে নিয়েছেন। ইংলণ্ড সফরে গিয়ে তেইশ বছরের এই তরুণ ছেলেটি খুবই ভাল খেলেছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে অস্ট্রে-লিয়ার বিরুদ্ধে একেবারেই সুবিধে করতে

কটকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করতে নামছেন পূর্বাঞ্চল

পারছিলেন না। তার ওপর কানপুরে টেস্টে দু ইনিংসে গোল্লা করায় দিল্লি টেস্ট থেকে তাঁর বাদ পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। দিল্লি টেস্ট তাঁর ভারতীয় দলে টিঁকে থাকারশেষ সুযোগ ছিল। সেখানে সেঞ্চুরি তিনি এ যাত্রায় ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন।

এই মুহূর্তে দল থেকে বাদ পড়ার খাঁড়া ঝুলেছে বাংলার দিলীপ দোসীর ওপর। দিলীপ মাদ্রাজে সাড়া জাগিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে আবির্ভাব ঘটলেও, তারপর থেকে তেমন নজরকাড়া বোলিং করতে পারছেন না। ভারতীয় দলে টিঁকে থাকতে হলে তাঁকে এখনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে দারুণ বল করতে হবে। তা না হলে তিনি হয়তো অচিরেই ভারতীয় দল থেকে ছাঁটাই হয়ে যাবেন।

ব্যাটসম্যানরা ভারতকে জেতার মতো রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। তারপর দায়িত্ব ছিল বোলারদের ওপর। কিন্তু ফলো-অন করানো সত্ত্বেও তাঁরা অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেন নি। অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত সম্মানজনকভাবেই দিল্লির ফিরোজ-শা কোটলার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে পারলো।

ইদানীং ভারতের বোলিংয়ে দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রসন্ন, বেদী, চন্দ্রশেখর, ভেংকটরাঘবনরা বাদ পড়ার পর ভারতীয় দলের বোলিংয়ের সেই ধার আর নেই।

যদিও কপিলদেব ও কার্ষন ঘাউড়ি ভারতের পেস-আক্রমণকে জোরদার করে তুলেছেন, কিন্তু স্পিন বোলারদের দক্ষতার ঘাটতি ভারতের প্রত্যাশিত সাফল্যলাভের পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিলীপ দোসী, নরসিমা রাও, শিবলাল যাদবরা এখনো তাঁদের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন নি। তাঁদের বলের ধার বেদী, ভেংকটরাঘবন কিম্বা চন্দ্রশেখরের মতো নয়। আসলে নিপুণ স্পিননবালার গড়ে নিতে হলে তরুণদের দিকে নজর দিতেই হবে। তিরিশ বছরের ওপর বেদীর বয়স। নরসিমা কিম্বা শিবলাল যাদব কুড়ির ঘরের শেষের দিকে পৌঁছেছেন। তাই ভারতের স্পিন আক্রমণকে জোরদার করে তুলতে এখনই দরকার তরুণ স্পিন বোলারদের খুঁজে বের করার। তাঁদের তালিম দিয়ে গড়ে-পিটে নেবার দরকার। আর চাই কপিলদেবের মতো আরো কিছু খেলোয়াড়। যাঁরা ব্যাটিং বোলিং ও ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দক্ষতার সঙ্গে, দাপটের সঙ্গে খেলতে পারবেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বারবারই ভারতীয় বোলারদের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠছে। আক্রমণের ধার বাড়াতে না পারলে কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া রীতিমত মুশকিল হবে। কারণ পাক দলে আছেন মারকুটে এবং একাধিক দক্ষ ব্যাটসম্যান।

শ্যাম বেনেগলের জুনুন

শ্যাম বেনেগলের সাম্প্রতিক ছবি 'জুনুন' সর্বাঙ্গে মানবিক। একটি, মহান অর্থে মানবিক চলচ্চিত্র, ঠিক যতটুকু পরিতৃপ্তি প্রদানে সক্ষম, জুনুন ততটাই করেছে। অথচ এমন আশংকার কারণ ছিল না। ছবির আবেদনপূর্ণ কাহিনীটি ছড়িয়ে ছিল একটি জটিল পটভূমিকায় : সিপাহী বিদ্রোহ। শুরুতে, যেভাবে ভূমিকা করা হয়, সেভাবেই, মঙ্গল পান্ডের নামসহ সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এসেছে। যেন কতকটা মণিকাঞ্চন যোগ হিসেবেই ভাবা হয়েছিল। পরে বুঝেছি, ভুল ভাবা হয়েছিল।

১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহ সফল হলে ভারতবর্ষ এক গৌরবজনক স্বাধীনতা অধিকার করতে সমর্থ হত, এ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত এই দেশে কেবলমাত্র ঐ বিশেষ বিদ্রোহের প্রথমাংশে লক্ষ্য করা গেছে যথার্থ সশস্ত্র বিদ্রোহের কৌশলগত নৈপুণ্য ও ব্যাপকতা। ফলত, আমাদের সুখপাঠ্য ইতিহাসে সিপাহী-বিদ্রোহ লুপ্তস্মৃতিপ্রায়। বেনেগল স্মৃতি পুনরুদ্ধারে নেমে, 'রাস্কিন বন্ড'-এর গল্প থেকে যে চিত্রনাট্যটি তৈরী করলেন তা মূলত বিন্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়ল ...

ফ্রান্সিস ডি' সুজা আসছেন

ফুটবল খেলোয়াড়দের আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই করার দিন শেষ হয়ে গেছে। সারা ভারতের ৫৮ জন খেলোয়াড় বিভিন্ন রাজ্যে খেলার জন্যে আবেদন করেছেন। বাংলা থেকে চলে যাবার জন্যে কয়েকজন সই করেছেন। তেমনি বাংলা তথা কলকাতায় খেলতে আসতেও চেয়েছেন একজন খেলোয়াড়। বাংলা থেকে যাঁরা চলে যেতে চেয়ে আবেদন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইস্টবেঙ্গলের গুরুদেব সিং, মনজিৎ সিং ও হরজিন্দার সিং। এঁরা সকলেই নিজেদের রাজ্য পাঞ্জাবে চলে যেতে চান। আর ইস্টবেঙ্গলের লিংকম্যান দেবরাজ কর্ণাটকে ফিরে যেতে চেয়ে আবেদন করেছেন। এছাড়া আরো দু-একজন খেলোয়াড় আছেন। তবে তাঁরা তেমন উল্লেখযোগ্য নন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কিন্তু তাদের খেলোয়াড়দের ছাড়তে রাজী নন। তাঁরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ডি সি এম ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল খেলেনি। ডুরান্ড কাপে খেলার কথা আছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইচ্ছে, ডুরান্ড কাপে দেবরাজকে না পেলেও পাঞ্জাবের তিন খেলোয়াড়কে খেলানোর। ওঁদের একবার মাঠে নামাতে পারলে ওঁরা আর কিছুতেই কলকাতা ছেড়ে যেতে পারবেন না। আসছে বছর ওঁদের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে খেলতেই হবে।

ফ্রান্সিস ডিসুজাই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি কলকাতায় খেলতে চেয়ে ছাড়পত্রে সই করেছেন। তাঁর দিকে নজর ছিল ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান—দু দলেরই। কিন্তু তাঁকে জালে তুলতে পেরেছে মোহনবাগান। আসছে বছর ডিসুজাকে সম্ভবত মোহনবাগান দলে খেলতে দেখা যাবে।

আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই করার পালা শেষ। এবার সবার নজর পড়ছে ঘরের ছেলেদের ওপর। তবে রাঘব-বোয়ালদের জালে তোলার জন্যে তৎপরতা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বাজার এরই মধ্যে গুজবে ছয়লাপ। ইস্টবেঙ্গলের একজন সমর্থক সেদিন জোর গলায় বললেন, গৌতমকে এবার আমরা নেবোই। সুধীরও আসবে। এসে রিটায়ার করবে। আর একদল বলছেন, মনোরঞ্জন, চিন্ময়রা দল-বেঁধে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে দেবেন। সে দলে সুরজিৎ, মিহিরয়াও থাকতে পারেন।

এসবই এখন গুজব। শেষ পর্যন্ত কি হবে, তা কেউই বলতে পারেন না।

কদাচিৎ, সময় করে বিদ্রোহের প্রতি মহত্ব প্রদর্শন করা হল মাত্র, যেভাবে ফিল্মে সচরাচর স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাম্যবাদী আন্দোলন ইত্যাদির করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে ওই সুনির্মিত গল্পটিকে চিত্রনাট্য এত বেশী জমিয়ে তুলল যে, আশ্রিতা ইংরেজ দুহিতা রুথ আর মরিয়ম মুসলিম পোষাক পরে ভারতীয় সখিদের নিয়ে বাগানে, দোলনায় দুলে ইংরেজী গান গাইছে—এমনকি এই দৃশ্যটিও ঠিকঠাক মিলে গেল। ত্রিভুজাকৃতির প্রেমকাহিনীটি দেখা দিল ভারি নিরুচ্চার, সংযতরূপে। হ্যাঁ, সংযত পাঠান সেপাহী, প্রেমিক জাভেদও (শশীকাপুর)। সে এমনকি ব্রিটিশকন্যা রুথের (নাফিসা আলি) প্রেমে পড়ে যুদ্ধ ত্যাগ করে উদাসীন দিন কাটায়। ধবধবে সাদা পায়রার পরিচর্যা করে, পায়রা ওড়ায়। রুথ সারা ছবিতে তার প্রেমিকের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই নির্বাক, সম্ভবত বিরক্ত। অন্তিমে তার কোমল হৃদয় উন্মুক্ত হয়। ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে 'জা ভে দ' বলে ডেকে ওঠে। না, ওই দৃশ্যে আর কোন পায়রা ছিল না, তবে সৃষ্টির জটিলতর জীব মানুষের রহস্যময়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যেহেতু প্রেমিক সিপাহী আজ প্রেমিকা ওই একই ক্যান্টনমেন্টের ব্রিটিশ দুহিতা, সেহেতু একধরনের ভাবাবেগ প্রতীক অন্বেষণে বেরোবেই। ওই বিভ্রমসৃষ্টির কিছুটা উদ্দেশ্য ছিলই, চিত্রনাট্যে তার প্রমাণ আছে। ছবির শুরুতে গীর্জেয় হত্যাকান্ড জাতীয় একটি আশ্চর্য নির্মম দৃশ্য দেখানো হল। ভারতীয় ছবিতে দুর্লভ ওই দৃশ্যের যাবতীয় কৃতিত্বের দাবিদার এডিটিং (ভানুদাস), স্বীকার করি। কিন্তু তারপর? ব্রিটিশ পরিবারটি জাভেদের গৃহে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত ছবিটি যে ভঙ্গীতে তাদেরকে ব্যবহার করল, তাতে থ্রিলারের মেজাজটাই ফুটে ওঠে। যুদ্ধের দৃশ্যের কথাই ধরা যাক। ওই গতিশীল ক্যামেরা (গোবিন্দ নিহালানি) যে চমকপ্রদ দৃশ্যটি দেখাল, তার তাৎপর্য কি? কোন পক্ষ বেশী শক্তিশালী, এমনকি তাও বোঝা যায় নি। দলনেতার মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত নিশ্চয়ই ব্রিটিশ আর্মি উত্তর ভারতের ছোট ক্যান্টনমেন্টটি দখল করতে পারত না—সেরকমই তো মনে হল। অথবা যুদ্ধপরবর্তী গোটা গ্রামের পালিয়ে যাবার দৃশ্য—ওইধরনের 'এস' কম্পোজিসন, এক মোহময়তা সৃষ্টি করে মাত্র। ফিরদৌসির (শাবানা আজমি) কয়েকটি অনবদ্য ক্লোজআপ আর পরিত্যক্ত, জনমানবহীন গ্রামের মেটে বাড়ির পাশের ছোট্ট গলি দিয়ে, ধুলো উড়িয়ে ইউনিয়ন জ্যাক হাতে অশ্বারূঢ় ব্রিটিশ সৈন্যের দাপিয়ে ঢোকার দৃশ্যটি ব্যতীত ক্যামেরার ভূমিকাও নিরুচ্চারই বলা যায়। তাছাড়া সঙ্গীতও (বনরাজ ভাটিয়া) যোগেশ পরভিন, সন্ত কবির, আমীর খসরুকে ব্যবহার করেও কেন বিশেষ মাত্রা তৈরী করতে সক্ষম হয়নি।

অভিনয়ে সর্বাধিক সফল শাবানা আজমি। পালিয়ে যাবার দৃশ্যে, যুদ্ধফেরৎ

শশিকাপুর

স্বামী বিদেশিনীর খোঁজে চলে যাচ্ছে, বড়ো ক্লোজআপে শাবানা সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তার মুখে হাসি—এ প্রত্যাশার থেকেও বেশী। বিশেষত ইংরেজরা জিতে যাওয়ার পরে, মরিয়মের সাহায্যের প্রস্তাব, আড়চোখে তাকিয়ে, সামান্য থুতনি উঁচু করে, সম্ভ্রমের সঙ্গে যেভাবে সে প্রত্যাখ্যান করে, তা দর্শকদের আরামদায়ক ভিত্তি কাঁপিয়ে দেয়। তুলনায় নাফিসা আলি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রইল। অতি বিজ্ঞাপিত ওই তরুণীর সর্বসমেত দুটি একসপ্রেশন—ফলে অভিনয় করা ওর পক্ষে কিছুটা শক্ত। কিন্তু সুযোগও দেওয়া হয়নি। নাফিসার আকর্ষণীয় চেহারাও কোনভাবেই ক্যামেরায় ধরা হল না—এটা বিস্ময়কর। জেনিফার কেন্ডাল, ইংরেজ ভদ্রমহিলা মরিয়মের গাম্ভীর্য এবং দায়িত্ববোধ প্রকাশ করেছেন। আসলে জেনিফারের চেহারায় ব্যক্তিত্বের ভীষণ অভাব। মরিয়মের পক্ষে সেটা দরকার ছিল। সরফরাজবেশী নাসিরুদ্দিন মাত্র একবারই সুযোগ পেয়েছিলেন—সদ্ব্যবহারও করেন। দৃশ্যটিতে দিল্লির যুদ্ধের পরাজয়ের পর বিদ্রোহীনেতা সরফরাজ, জাভেদের পায়রার খোপ থেকে একটার পর একটা পায়রার গলা টিপে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। পরিকল্পনাটি ভারি ভাল লেগেছিল। শশীকাপুর সাধ্যমত চেষ্টা করে গেছেন।

উপসংহারে বলে রাখা ভালো, জুনুন যে জাতের চলচ্চিত্র তাতে অন্তত একটি নীতি বাক্যের প্রয়োজন থাকে। এক্ষেত্রে সেটা অনায়াসেই হতে পারত: 'জয় হোক মানুষের, জয় হোক মঙ্গলের, জয় হোক......' ইত্যাদি।

পুষণ গুপ্ত

ছবির খবর

কিছুদিন আগে কলকাতার 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' একটি বুদ্ধিদীপ্ত সেমিনারের আয়োজন করেছিল শিশির মঞ্চে। বিষয় ছিল পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটার। নাটকে বক্তারা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন বাংলা থিয়েটারের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক বক্তব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ঈর্ষণীয়। জীবনের বাস্তব এবং গভীরতম সত্যগুলিকে বাংলা নাটক বিস্ফোরণের শক্তি নিয়ে উপস্থিত হয় প্রসেনিয়ামে।

এই সেমিনারের পর একটি মাসও পার হয়নি। সেই শিশির মঞ্চেই প্রায় একই বক্তাদের আবার হাজির হতে হল মহাসপ্তমীর সকালে। বাধ্য হয়েই হতে হল। এবং বেশি সংখ্যায়। না হয়ে উপায়ও ছিল না। শহরের অনেকগুলি ছোটবড় ব্যবসায়িক মঞ্চে কাঁচা যৌবনের বড় দাপাদাপি। সুস্থ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের গোড়ায় তারা আঘাত করতে চাইছে। বস্তুত সুস্থ নাট্য আন্দোলন এবং সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বার্থে ব্যবসায়িক মঞ্চে এই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সেদিন সোচ্চার ছিলেন সকল বক্তাই। ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে। নির্দিষ্টভাবে আলোচনার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটিও গঠিত হয়েছে সেদিন।

ব্যবসায়িক মঞ্চের এই দেউলিয়া বেলেল্লাপনাকে অবিলম্বে রোখার আবেদন জানিয়েছিলেন সবাই। তার মধ্যে অনুপকুমারের বক্তব্য ছিল সবচাইতে সরল ও ধারালো। তিনি চেয়েছিলেন ঐ মহাসপ্তমীর দিনই উপস্থিত শ্রোতা ও নাট্যপ্রেমীদের নিয়ে সেইসব মঞ্চে গিয়ে পিকেটিং করতে। তিনি বলেছিলেন—'আমাদের উত্তেজনা বড় ক্ষণস্থায়ী, এখুনি এর প্রতিকার না করলে আমরাই হয়ত ঝিমিয়ে পড়ব।'

তাঁর আশঙ্কাই সত্য হয়েছে—এ মন্তব্য করছি না, কিন্তু উত্তেজনার আগুনে সেই তাপ যেন আর নেই। সমূলে এই অপসংস্কৃতির জোয়ারকে ঠেকাতে নয়, উচ্ছেদ করতে হলে জোরদার আন্দোলন দরকার। এবং সেই সঙ্গে কঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে নাট্যদলগুলির সংহতি ও ঐক্যেরও প্রয়োজন আছে যেটির অভাব সেদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল খোদ সভাতেই।

এই প্রসঙ্গে সিনেমার প্রসঙ্গটাও আসতে পারে। শহরের অধিকাংশ ছবিঘরে হিন্দী ছবির চরিত্রহীনতার যে বান ডাকছে সেগুলো বন্ধ করবেন কে? নাট্যদলগুলি তবুও ক্ষণিকের জন্য অন্ততঃ একটা ছাদের তলায় দাঁড়িয়েছিলেন। বাংলা ছবির প্রযোজক পরিচালক শিল্পী ও ব্যবসায়ীচক্র কি এক মুহূর্তের জন্যও এক জায়গায় মিলিত হতে পারবেন? সন্দেহ জাগে।

*

পীযূষ বসু মারা গেলেন। দশমীর রাতও কাটলো না। অসুস্থ অবস্থায় তিনি নার্সিং হোমে ছিলেন আগের দিন থেকেই। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা ছবির জগৎ একজন সফল ব্যবসায়ী পরিচালককে হারাল।

শুরুতে তিনি ছিলেন আই পি টি এ-র কর্মী। সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' ছবিতে তিনি ছিলেন পরিচালকের সহকারী। একাধিক নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পীযূষ বাবু। রঙ্গসভা নামটি এখনও কলকাতার খ্যাতনামা দলগুলির মধ্যে একটি। তপন

দাদার কীর্তি ছবিতে গীতা নাগ, হারাধন ব্যানার্জি ও তাপস পাল

সিংহের সঙ্গে সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন বেশ কয়েক বছর।

পীযূষ বসুর প্রথম ছবির নাম 'শিউলিবাড়ি'। পরিচ্ছন্ন ছবি। প্রতিশ্রুতির আভাস ছিল ছবিতে।

কিন্তু জানি না ঠিক কি কারণে পীযূষ বাবু তাঁর পরবর্তী ছবিগুলোয় সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখতে পারেননি। সুস্থ শিল্পসৃষ্টির পরিবর্তে তিনি ঝুঁকেছিলেন সহজ-সরল ব্যবসার দিকে। সফলও হয়েছিলেন। 'শিউলিবাড়ি'র পরিচালকের কাছ থেকে শুধু ব্যবসায়ী জোলো ছবি আমরা প্রত্যাশা করিনি, আর সেজন্যই এই বেদনাবোধ। আক্ষেপ।

আক্ষেপ কিন্তু রয়েই গেল।

*

মৃণাল সেনের নতুন ছবির সম্ভাব্য নাম 'নিশিপালন'। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অবিরত চেনামুখ' নিয়ে গড়ে উঠেছে চিত্রনাট্য। লিখেছেন মৃণালবাবু নিজেই। পুজোর আগে থেকেই নিয়মিত সুটিং শুরু করেছিলেন উত্তর কলকাতার একটি বাড়িতে, রাস্তাঘাটে, বাসে, থানায়, পুজোর ক'দিন সুটিং করলেন আরোরা ফিল্ম স্টুডিওয়। ঢাকের বাদ্যি, আলোর রোশনাই থেকে দূরে সরে মৃণালবাবু ঐ ক'দিন ব্যস্ত ছিলেন নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের কান্না-দুঃখ-বেদনা-ক্ষোভ-রাগের চরিত্র চিত্রণে। একটি ভাঙ্গা বাড়ির সেট-এ (শিল্প নির্দেশনা ঃ সুরেশ চন্দ্র) মৃণালবাবুর শিল্পী ছিলেন মমতাশঙ্কর, শ্রীলা মজুমদার, গীতা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (পি এল টি), স্বর্ণালী এবং আরও কয়েকজন।

সেট-এ ঢুকেই দেখি পলেস্তারাখসা দালান, ভাঙ্গা পাইপ, জলের চৌবাচ্চা ও কল, আধময়লা বিছানাপত্র, ভাঙ্গাচোরা বাসন এমনকি সিঁড়ির গোড়ায় পুরনো সাইকেল, কাঠের বাক্স মাকড়সার জাল পর্যন্ত মজুত। নিখুঁত সেট। ক্যামেরাম্যান কে কে মহাজন বারান্দার ওপর ক্যামেরা বসিয়েছেন। ওঁর কম্পোজিশনে তখন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙিন ছবি, তাই লাইটিং সেইমত নিখুঁত করতে ব্যস্ত। সহকারী বিদ্যুৎবাবু সত্য ব্যানার্জিকে পাঠ মুখস্থ করিয়ে দেবার পর মৃণালবাবু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে কতখানি এগিয়ে পজিশন দিতে হবে।

দুটো টেক্ করতে হল।

এরপর ক্যামেরা ঢুকবে ঘরে। আলো ভেঙ্গে নতুনভাবে আলো করতে হবে। মৃণালবাবুকে এই সুযোগে জিজ্ঞাসা করলাম —'এছবির মিউজিক দিচ্ছে কে? কারনাথ?'

হেসে বললেন—'হতে পারে।'

মৃণালবাবু পরক্ষণেই ব্যস্ত হলেন ঘরের মধ্যে বিছানা পাততে। ওটাই একটু বাদে হবে ক্যামেরার খাদ্য।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা মজার ছবি 'বৌ কথা কও'-এর কাজ তরুণ পরিচালক রাণা সেনের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রধান চরিত্রে আছেন মুনমিত্রা মুখার্জি, দীপংকর দে, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, সান্ত্বনা বোস, মৃণাল মুখার্জি, নীহার চক্রবর্তী ও শ্যামল রায়চৌধুরী। নীতা সেনের সংগীত পরিচালনায় এ ছবিতে গান গেয়েছেন আরতি মুখার্জি, ভূপেন্দ্র সিং ও অন্যান্য শিল্পী। চিত্র গ্রহণে শঙ্কর সরকার।

কমল নায়কের চিত্র গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালক বরুণ কাবাসী রূপান্তর ছবির প্রথম পর্বের কাজ সম্প্রতি শেষ করলেন। এ কয়েক দিনের শিল্পী ছিলেন জয়শ্রী টী ও দিলীপ রায়। অনিল সরকারের সম্পাদনায় এ ছবির অন্যান্য শিল্পীরা হলেন বিশ্বজিৎ, সোমা আনন্দ, ব্যাণী, ছায়াদেবী, নিমু ভৌমিক, শ্যামল রায়চৌধুরী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, অরুণ কাবাসী প্রভৃতি। ছবির সুরকার নীতা সেন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালকের।

২৬ সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে তারাপদ মণ্ডল ও দুর্জয় মুখার্জি প্রযোজিত আগমনী পিকচার্সের 'তবুও রমণী' ছবির শুভ উদ্বোধন হলো সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে। পুলক ব্যানার্জির রচনায় হেমন্ত মুখার্জির সুরে ঐ দিনে গান দুটি গাইলেন অরুন্ধতী হোমচৌধুরী ও সুরকার স্বয়ং। পরেশ ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন অলোক সাহা। এ ছবির ধারবাহিক দৃশ্য গ্রহণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গেছে।

ইউনাইটেড মিশনের 'ফেরার' ছবির দৃশ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। পুজোর ক'দিন বজরজ অঞ্চলেও ছবির সুটিং হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন শিল্পী এবং বহিদৃশ্যের মাধ্যমে গৃহীত 'ফেরার'-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য ছবির পরিচালক অসীম ব্যানার্জি নিজেই লিখেছেন। সুর দিয়েছেন স্বর্গত নচিকেতা ঘোষ। চিত্রগ্রহণে আছেন বিজয় দে।

নির্মল ধর

ঝংকার মিউজিক সার্কল

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে ঝংকার মিউজিক সার্কল আয়োজিত ৩১তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে শুনলাম স্বামী পঞ্চকসারীর গান এবং নির্দ্বিধায় বলতে পারি কণ্ঠসঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর পরিবেশনই শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছে বেশী। আল্লাদীয়া খান ঘরানার এই শিল্পী ক্ষনে ক্ষণেই আমাদের, তাঁর গুরু মালিকার্জুন মনসুরের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন—শুধুমাত্র তাঁর প্রশস্ত রাগ বিস্তারের মাধ্যমেই নয়, স্বর পরিবর্তন, পাংচুয়েশন এবং পুনঃ পুনঃ সুর প্রয়োগের মাধ্যমেও। তাঁর গমকের কাজে আগ্রা এবং ডাগর গায়কীর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, কারণ এইসব ঘরানাগুলি গোয়ালিয়রের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রথম দুটির উৎপত্তি একেবারে মূল থেকে, তৃতীয়টির সংমিশ্রনে। শ্রোতাদের সস্তা চাহিদাতে এই শিল্পী সাড়া দেন না। সেদিন খুবই সরল ও সহজভাবে তিনি গান গেয়েছিলেন এবং এক আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ততা ও আবেগময়তা থাকায় প্রতিটি লাইনই অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছিল। অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠ এবং রাগ সম্পর্কে স্পষ্ট চিন্তা থাকায় তার পরিবেশিত প্রতিটি রাগই মার্গসঙ্গীতের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, সচরাচর যেটা আমরা পাই না। সঠিক তালিম না থাকলে এই কাজ করা প্রকৃতই অসম্ভব। বিভিন্ন ধাপগুলি অত্যন্ত দ্রুততার মধ্যেও ছিল সুসংঘবদ্ধ, স্পষ্ট, বলবান এবং সামগ্রিকতার দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। তাঁর দ্বৈত মধ্যম, দ্বৈত ধৈবৎ সারঙ্গারি, বক্র রেখার, বক্র পঞ্চম, সম্পূরণ মালকোষ—সবগুলি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। মালভি রাগটি

অনেকটা মারোয়া ঠাটের বিভাসের মত শোনাচ্ছিল। শুধুমাত্র লয়ের ক্ষেত্রেই তিনি দুর্বল বলে মনে হল। বিশেষত দ্রুত তানের ক্ষেত্রে, যেখানে সর্বদাই গতি হ্রাস পাচ্ছিল। তান-প্রবল গায়কীর বেলায় এটা আরো প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছিল। পরজ-এর একটি বিখ্যাত বন্দীশ দিয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

ইমন রাগে ভি বালসারার পিয়ানো বাদন, তাঁর সৌন্দর্য জ্ঞান ও সুসংঘবদ্ধ উপস্থাপনার এক আশ্চর্য সমন্বয়। পাশ্চাত্য ধাচের এই মীড়হীন যন্ত্রটি তাঁকে, তাঁর রাগ-এর মূলভিত্তি থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিচ্যুত করতে পারেনি। এমন কি তন্ত্রী নিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাগুলিও এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। একতাল বিস্তারের প্রতিটি মাত্রা এমন প্রশংসনীয় সতর্কতার সঙ্গে বাজানো হয়েছিল, যা কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যেও খুবই কম দেখা যায়। পিয়ানোর রাজোচিত শব্দ যখন সর্বোচ্চ তখন সুন্দর সুন্দর নোটের সংমিশ্রণে তাকে সীমায়িত করা হয়েছে। দুটি হালকা কাজও খুবই বর্ণময়, তাৎপর্যপূর্ণ এবং উপভোগ্য হয়েছিল। আবেগময়তার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের কিছু কিছু সুরও উপস্থাপিত করা হয়েছিল। মীড় এবং গমকের অনুপস্থিতি মাঝে মাঝে সাউন্ড এফেক্ট দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল।

রত্নাকর ব্যাস বাজিয়েছেন বাগেশ্রী এবং খাম্বাজ ধুন। যদি তিনি কখনো কারো কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না থাকেন, তাহলে এক কথায় বলা যায়, তাঁর কাজ প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি তাঁর কোনো রীতিসিদ্ধ শিক্ষা থাকে তবে রে গা মা, এবং এমনকি রে গা মা ধা'র একটানা প্রয়োগ কোনোক্রমেই ক্ষমার্হ নয়—বাগেশ্রীর মত সহজ রাগে সর্বক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ সুরকে ক্ষমার চোখে দেখলেও।

সঞ্জয় মুখার্জি তাঁকে তবলায় চমৎকার সহযোগিতা করেছেন। স্বামী পথকেশরীকে তবলায় সহযোগিত করেছেন চন্দ্রভান—সহজ সংযত ও সঠিকভাবে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য দিনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল দীনকর কৈকিনীর জয়জয়ন্তী ও মালকোষ রাগে খেয়াল, ও অবন মিস্ত্রির তবলা লহরা। দুজনেই ত্রুটিহীন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

তরুণ প্রতিভা

সঙ্গীত নয়, বড় বড় সঙ্গীত শিল্পীদের নামই এখন প্রাধান্য পায় বেশি। ফলে এখনকার এই ব্যবসাভিত্তিক সংগীত জগতে তরুণ প্রতিভারা উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তাদের ক্ষমতার প্রকৃত স্বাক্ষর রাখতে পারছেন না। এ অবস্থায় ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের এইসব উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের ক্ষমতার পরিচয় রাখার এবং পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয় সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যে কাজ 'মহম্মদ আমীর খাঁ স্কুল অফ ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক' হাতে নিয়েছেন—তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

সম্প্রতি উদীয়মান তরুণ শিল্পী সমাবেশে চারদিনব্যাপী এক সঙ্গীত অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন এই সংস্থা রবীন্দ্রসদনে এবং এই অধিবেশন শুধুমাত্র তাঁদের প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণাই দেয়নি, আমাদের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অপরিচিত তরুণ-প্রতিভাদের শর্তহীন পৃষ্ঠপোষকতার যে সুমহান ঐতিহ্য আছে, তাকেও অক্ষুণ্ণ রেখেছে এই অধিবেশনে। পেশাদারী শিল্পী ছাড়া যে কোনো সঙ্গীতানুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তোলা কঠিন, তাই শিল্পী নির্বাচন ক্ষেত্রে এই সংস্থাকে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে, পরিশ্রম করে খুঁজে বের করতে হয়েছে অপরিচিত এইসব উদীয়মান শিল্পীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে। কঠিন হলেও কাজটি সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে বলে চারদিনব্যাপী রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের মান সন্দেহাতীতভাবে গিয়ে পৌঁছেছে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে। সামগ্রিক বিচারে কণ্ঠসঙ্গীতের তুলনায় যন্ত্রসংগীতই ছিল উচ্চমানের।

অধিবেশনের প্রথম দিনের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান ছিল বিক্রম ঘোষের একক তবলা বাদন। মাঝে মাঝে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের পুত্রদের মত শঙ্কর ঘোষের পুত্র এই কিশোর প্রতিভাও প্রমাণ রাখল এবং আমাদের এই বিশ্বাসকে জাগ্রত রাখল—ভারতীয় সঙ্গীতের খানদানী উপাদানগুলি হারিয়ে যাচ্ছে না। যতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে তবলা বাজিয়েছে, তা তার দ্বিগুণ বয়সী শিল্পীদের চোখও খুলে দিয়েছে। যে স্বচ্ছতা, গতি এবং ক্ষমতার সঙ্গে সে 'তেরেকেটে' 'ধেরেধেরে' এবং 'বায়া' বাজিয়েছে, তার পিছনে যে রীতিবদ্ধ একাগ্র অনুশীলন আছে, তারই পরিচয় বহন করেছে। সবচেয়ে যা প্রশংসনীয় তা হল লয়ের ওপর তার আশ্চর্য দখল এবং ধারণা, দুবার লক্ষ করলাম সারেঙ্গী নগমার চেয়ে তবলার টুকরোর গতি বেশ কিছুটা বেশী, সঙ্গে সঙ্গে সে থামল এবং সারেঙ্গীর গতিবৃদ্ধি করল এবং পুনরায় শুরু করল। যেকোনো সাধারণ শিল্পী হলেই এই দিকটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যেত এবং ভুল জায়গায় তিনি তাঁর 'বোল' শেষ করতেন। লয়ের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থেকেই উপলব্ধি করার এই আশ্চর্য ক্ষমতাটি গড়ে ওঠে, পুঁথিপড়া বিদ্যে দিয়ে এটা করা যায় না। কেউ কেউ এই ক্ষমতাটি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। ঐদিনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তরুণ ভট্টাচার্যের সন্তুর'এ রাগ 'রাগেশ্রী'ও খুব মনোরম হয়েছিল। আলাপের প্রতিটি ধাপই সুসম্পাদিত এবং সুপরিকল্পিতভাবে শেষ হয়েছিল বলে, এই মীড়হীন যন্ত্রের মাধ্যমেও শিল্পী একটি চিত্তাকর্ষক রাগ পরিবেশ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধ্বনি বৈচিত্র্যের কাজগুলি ছিল খুবই প্রশংসনীয় এবং একটি পরিষ্কার সৌন্দর্য-জ্ঞান থাকায় সুরের উঁচু এবং নীচু পর্দার প্রয়োগগুলি আশ্চর্যভাবে মিশ্রিত হয়েছিল। 'গৎ'এ বেশকিছু সুন্দর 'তান' কম্পোজিশন ছিল, যেগুলি শেষ হয়েছিল স্বচ্ছ এবং যথাযথ তেহাইয়ের মাধ্যমে, কখনো একমাত্রায়, কখনো এগারো মাত্রায়। ঝালাগুলি শুধুমাত্র গতিময়ই ছিল না। একঘেয়েমী মুক্ত করার জন্য বেশকিছু ব্যতিক্রম কাজও ছিল, সরোদের কাজের ওপর নির্ভর করে। এইসবই প্রমাণ করে সঙ্গীতের প্রতি তরুণের আশ্চর্য নিষ্ঠা এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সুগঠিত করতে তিনি সংগীতের মহৎ গুণগুলি গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করেন না—সেতার, সরোদ কিংবা তবলা থেকে। তবলায় তাঁকে আশ্চর্য সহযোগিতা করেছেন তিমির রায়চৌধুরী। 'তেরেকেটে' এবং বোলগুলি ছিল খুবই পরিষ্কার, সতেজ এবং দ্রুত। এই সবকিছু লয়ের সঙ্গে সফলতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মূল যন্ত্রের বাজনাকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিল। তাঁর বাজনায় যেমন মার্গ সঙ্গীতের খানদানী লক্ষ্ণৌ উপাদানগুলি পাওয়া গেছে, তেমনই সাউন্ড এফেক্টগুলি ছিল উপভোগ্য, প্রশংসনীয়।

দেবাশীষ ভট্টাচার্যের সরোদে 'মালকোষ'ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। স্ট্রোকের স্বচ্ছতা যথার্থ সুর প্রয়োগ তান এবং লয়ের ওপর দখল—এই সবকিছু সংযুক্ত হয়ে একটি সামগ্রিক চেহারা এনে দিয়েছিল। ঝালা ছিল খুবই স্পষ্ট। যে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি বাজিয়েছেন, তা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটি ইঙ্গিত দিয়েছে—অবশ্য তিনি যদি তাঁর পরিশ্রম ও অনুশীলন অব্যাহত রাখেন। স্বপন চৌধুরীর ছাত্র সন্দীপ পালের তবলা সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতি আছে।

ইমন রাগে কাবেরী করের ধ্রুপদ বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠ বেশ সুরেলা এবং রাগবিস্তারে তাঁর পদ্ধতি বেশ রীতিবদ্ধ। পাখোয়াজে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন চঞ্চল ভট্টাচার্য।

পল্লব ভদ্ররায়ের 'বাগেশ্রী' এবং সুগত মার্জিতের 'মেঘ'এ যথেষ্ট আন্তরিকতার ছাপ পাওয়া গেছে। খুব স্পষ্ট এবং যথার্থভাবে নোটগুলি প্রয়োগ করা হয়েছিল। স্বপনকুমার শিব এবং সুকুমার মৈত্র তাঁদের তবলায় সহযোগিতা করেছেন।

আর যেসব উদীয়মান শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ হয়নি।

কণ্ঠে মহারাজের স্মৃতিতে

স্বর্গত তবলাবাদক পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠান হয়ে গেল রবীন্দ্রমঞ্চে। পণ্ডিতজী ছিলেন তবলায় বারাণসী ঘরানার মধ্যাহ্নের সূর্য।

আজকের দিনের অনেক তবলাবাদককে তিনি তাঁর ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ সরল, নিরহংকারী এবং শিল্পের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত এক মানুষকেই শ্রদ্ধা জানানো। নির্দ্বিধায় বলা যায় এ ধরনের মানুষ আজকের দিনের ব্যবসভিত্তিক মার্গ সঙ্গীতের জগতে চোখে পড়ে না।

বারাণসীর শারদা সহায়ের শিষ্য দীননাথ মিশ্র সেদিন তিন তালে খুবই সুন্দর একক তবলা পরিবেশন করলেন। সূক্ষ্ম গৎ অংশগুলি তাঁর উন্নতমানের শিক্ষাকে চিহ্নিত করেছে। দ্রুত অংশগুলি—স্পষ্ট না হলেও, তার দীর্ঘ একাগ্র অনুশীলনের পরিচয় বহন করেছে।

ভূপালী রাগে অজয় চক্রবর্তীর খেয়াল পাতিয়ালা ঘরানার জটিলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে জীবন্ত করে তুলেছিল। রাগ শিক্ষার মধ্যেই তার কণ্ঠ সঞ্চালন শিক্ষা নিখুঁত, এবং সহজ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে তিনি সুর সপ্তকগুলিতে চলাফেরা করতে পারেন। ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠের সাহায্যে অজয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারবেন, যদি তিনি আজকের একাগ্রতা বজায় রাখেন। বিখ্যাত সেই ইয়াদ পিয়াকী সাথে দিয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন, যা নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর পাতিয়ালা ঘরানার সতীর্থদের চেয়ে অনেক ভাল গেয়েছেন।

রাগ গঠনের জন্য সরোদে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের মালকোশ কেদার সেদিনকার এক বিশিষ্ট পরিবেশনা। তাঁর সুদৃঢ় ও সুসংযুক্ত পরিবেশনা তাঁকে, শ্রোতার চাহিদার দিকে চেয়ে যাঁরা বাজান সেইসব বাজিয়েদের থেকে খুবই স্পষ্টভাবে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। স্বর প্রয়োগগুলি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। সংঘবদ্ধ সুর কিছু কিছু জায়গায় এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে, যা পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়নি। রাগ সম্পর্কে স্পষ্ট চিন্তা থাকলে এ জাতীয় কাজ করা সম্ভব, যে চিন্তাশীলতা শুধুমাত্র টেকনিক সর্বস্ব না হয়ে সুর ও পংক্তি রচনার দিকে এগিয়ে যায়—সুসম্পূর্ণ রাগ গঠনের জন্য। তাঁর সঙ্গীত, চটকদার কাজ বর্জিত বলে যথার্থতার সঙ্গে সমাপ্তির পর ছাড়া শ্রোতৃবর্গ কখনোই তাঁর অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে হাততালি দিতে পারেন না। রাধিকামোহন মৈত্রের মত তিনিও অনুষ্ঠান শুরুতেই রাগ কাঠামোটি তুলে ধরেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বর প্রয়োগ বৈচিত্র্য আনেন একেবারে নিজের মত করে—রাগকে মূর্ত করে তোলার জন্য। যে-কোনো ধরনের চমক ও তবলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে গৎ ছিল একেবারে মুক্ত, এবং সুসম্পাদিত তেহাই সহযোগে নির্দিষ্ট পথের ওপর নিবদ্ধ। রেজাখানী কম্পোজিশনটি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে এবং গলা ছিল যথারীতি স্পষ্ট। মধ্য লয়ে বোল অংশ এবং দ্রুত অংশগুলি খুবই উচ্চস্তরের কল্পনার স্বচ্ছ বাস্তবায়িত পরিবেশনা, যা কেবল তিনি পারেন। আনন্দগোপাল ব্যানার্জি তবলায় সহযোগিতা করেছেন। সংযত ও পরিণত তাঁর তবলাবাদন, কখনোই তিনি মুখ্যযন্ত্রকে অতিক্রম করে যান নি, কিন্তু অনুষ্ঠানে সামগ্রিকতার দিক থেকে বর্ণময় করে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন।

শুভব্রত রায়চৌধুরী

দাও গো সুরের দীক্ষা

কিছুদিন আগে রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম গুরু শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সংবর্ধনাসভা হয়ে গেল।

উদ্যোক্তা সুরসঞ্চয়ন ও শ্রুতি-সংস্থা। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বক্তব্যে জানালেন, (কারণ পরের পর্যায়ে 'বাল্মিকী প্রতিভা' গীতিনাট্যের বাল্মিকী সেজে তিনি তখন সাজঘরে বসে) আজ নতুন করে এঁদের অবদানকে খুঁজে নেবার দিন এসেছে। সেই কারণেই তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যদের তরফ থেকে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তিন দিনের এই উৎসবের পরিবেশক বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান।

পর্দা উঠতেই দেখা গেল মঞ্চের মাঝে বসে শৈলজারঞ্জনবাবু। তাঁর দু' পাশে দুই শিষ্য, অমিতাভ চৌধুরী ও অরুণ বাগচী। শ্রুতির শিষ্য-শিষ্যারা প্রেক্ষাগৃহ মঞ্চ অবধি প্রদক্ষিণ করেন 'সুরের গুরু দাওগো সুরের দীক্ষা, গাইতে গাইতে।

এরপর ভাষণ দিলেন অমিতাভ চৌধুরী। তিনি স্মরণ করলেন শান্তিনিকেতনের সেইসব দিনগুলির কথা, যখন তিনি ছিলেন ছাত্র। তিনি বললেন, তাঁর চোখের সামনে আজও ভাসে পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, কাঁধে উত্তরীয় এবং হাতে মন্দিরা কবিগুরুর গানের সুরে সকলের মনে দিনের শুরু ও শেষকে ঘোষণা করে দেওয়ার শৈলজাদার সেই ভ্রাম্যমান মূর্তিখানি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তর প্রথম আবির্ভাব ঘটত শৈলজাদার গানের ঘরে, তারপর অশোক, বকুল, চাঁপা, কবরীর শাখায়। তাকে শিষ্য-প্রশিষ্য নিয়ে শৈলজাদার সুখের সংসার, দিকপাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের অনেকেই তাঁর হাতে তৈরী। তাঁর এই সম্বর্ধনা সভা আজ তাঁর অজস্র ভক্তের আনন্দসভা।

পরের বক্তা অরুণ বাগচী অমিতাভবাবু বর্ণিত শান্তিনিকেতনের সেই দিনগুলিকে দামী সেন্টের সঙ্গে তুলনা করে বললেন, মূল্যবান আধারের মতই স্মৃতিলোকের গোপন অন্তঃপুরে তাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত। তিনি বলেন, শৈলজাদা দিয়েছেন অনেক। কিন্তু তাঁর দানের তুলনায় প্রাপ্তির অংক সামান্য। শিষ্য-শিষ্যা ছাড়া কারো কাছে তিনি প্রায় কিছুই পাননি। এমনকি ন্যায্য প্রাপ্যও না। তাঁর মত মানুষের দীর্ঘজীবন যে কোনো রবীন্দ্রানুরাগীরই কাম্য।

এরপর শৈলজাবাবুর ইচ্ছেয় মঞ্চে উপস্থিত গীতশ্রী রাহা তাঁর প্রিয়শিষ্য অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা পড়ে শোনান।

শৈলজাবাবু বলেন, আমি শিষ্যধনে ধনী। শেষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা ও তার বর্তমানের রূপ নিয়েও আলোচনা করেন।

সবশেষে বাল্মিকী প্রতিভা মঞ্চস্থ হয় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। বাল্মিকীর ভূমিকায় তিনি আরও উজ্জ্বল আরও পূর্ণ। ভি বালসারার সঙ্গীত এই গীতিনাট্যের এক বিশেষ সম্পদ। স্মারকগ্রন্থের অভাবে শিল্পীদের ভূমিকার আলোচনা করা গেল না।

সন্ধ্যা সেন

বর্ষণবাণী

কিছুকাল আগে একটি নৃত্য নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম 'হংসধ্বনিকে গানের দল হিসেবেই মেনে নিতে ভালো লাগে।' থিয়েটার সেন্টারে এঁদের বর্ষণবাণী শুনে বুঝতে পারলাম সেই অনুমান যথার্থ ছিল। কেবল গান এবং পাঠে তারা অনেক বেশি সপ্রতিভ।

রবীন্দ্রনাথের সাতাশটি গান অবলম্বনে এই নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ছিল উপযুক্ত গান নির্বাচনে এবং পার্থ লাহিড়ীর সুন্দর পাঠে। পরিচালিকা মনোশ্রী লাহিড়ীর সাঙ্গীতিক পরিকল্পনাও ধন্যবাদার্হ। তিনি নিজে গেয়েও ছেন ভালো, কেবল একটি গানে (কখন বাদল ছোঁয়া লেগে) অশোভন উচ্চস্বরে উঠে পড়া ছাড়া। বন্যা মজুমদারের দৃপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত এঁদের দলের সম্পদ। দুটি মাত্র গানে শ্রীনন্দা চৌধুরীও সম্পন্ন। দুই কিশোর শিল্পী 'শুভাশীষ রায়' ও 'অস্মিতা লাহিড়ী'কেও ভালো লাগে। মোটের উপর 'অতিকা মুখোপাধ্যায়' এবং 'অনুরাধা ঘোষ'ও মন্দ নয়।

অভিজিৎ রায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।
ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

অমৃত

১৯ বর্ষ, ২০ সংখ্যা
৮ কার্তিক, ১৩৮৬
26th October, 1979

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
একজন ভোজনরসিকের জবানবন্দী
লিখেছেন অমল মুখোপাধ্যায়
অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প
জ্যোতির্ময় মৌলিকের
একটি শুকনো পাতা

কলকাতা ঘিরে আনন্দধারা

কলকাতার গায়ে কয়েকটি খাল আছে। ভেতর দিয়ে আদি গঙ্গা চলে গেছে গড়িয়ায়। এক সময় এসব খালে শ্রীহট্টের লেবু আসতো। লেবুর নৌকো যেখানে ভিড়তো—সে জায়গার নাম হয়েছিল নেবুতলা। বরিশালের বালাম চাল নিয়ে নৌকো এসে ভিড়তো চেতলার ঘাটে। এখন এসব খালে জল থাকে না। সামান্য যা থাকে—তাতে খড়ের নৌকো ভাসে। আর দেখা যায় হাড়ি কলসীর নৌকো। নয়তো বাকি জল তলানীর দিকে।

শ্যামবাজারের খালপাড় এখন কাঠগোলার বড় বড় কাঠের গোলাই থাক দিয়ে রাখার জায়গা হয়েছে। লরি যায়। ঠেলা যায়। ময়লা নীল জলে মশা মাছির স্বর্গ। গড়িয়ায় যেতে শহরের ভেতরকার আদি গঙ্গায় মরা গরু ভাসে। জল নেই। দুর্গন্ধ। জঙ্গল।

আমাদের শহরের রাস্তা বড় হচ্ছে। হচ্ছে আরও খাবার জলের ব্যবস্থা। দুটি লেক হয়েছে। হয়েছে বিধান শিশু উদ্যান। একটা উড়াল পুল পেয়েছি। আরেকটি পাবো। সাবওয়ে এখন আমাদের পাতালপথ। পাতাল রেলের কাজ অনেকখানি এগিয়েছে।

ওই দুর্গন্ধ দুটি খাল শহরের দুদিকে। ওখানে ভাল মত মাটি খুঁড়ে বর্ষার জল ধরে রাখা যেতে পারে। খাল দুটি শহরের নিকাশী জলেও ভরে উঠতে পারে। দরকারে শহরকে ঘিরে এই খাল আরও কাটিয়ে নেওয়া যায়। তখন এই জলের বেড়ি হবে কলকাতার চারদিক ঘিরে সুন্দর এক জল-মালা। তার দু ধারে ছায়াদায়িণী রেনট্রি, ক্যাসিয়া, আম জাম বসানো যেতে পারে।

আর খালের জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায় এই শহরের আনন্দ। আমাদের অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট লঞ্চ অল্প ভাড়ায় সাধারণের জন্যে ভাসাতে পারেন। শহরে আনন্দ বলতে তো শীর্ণ শুকনো কিছু পার্ক আর কিছু অগোছালো ছায়াছবি। তার চেয়ে এটা কি অনেক ভাল জিনিস নয়।

ওয়াশিংটন শহরকে দু ফালা করে পোটোম্যাস নদী বয়ে গেছে। জেফারসন স্মৃতি-সৌধ একটি দ্বীপে। সেখান থেকে সাধারণের জন্যে নৌকো ভাসানোর আয়োজন। মাছ ধরার ব্যবস্থা। এক একদিন পালতোলা নৌকোয় নদীর গা ঢেকে যায়।

আমাদের খালকে আমরা তো এভাবে আনন্দধারা করে তুলতে পারি। খড়ের নৌকোর পাশাপাশি মরা গরু না ভেসে আনন্দ বেড়ানোর লঞ্চ নয়তো নৌকো ভাসুক। সেসব নৌকোয় কাকড়ার স্বাদু রান্না কিংবা ডাঙার কোন মুখরোচক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পুরনো স্টিমার পেলে তার ডেকে তরজা গান, ঝুমুরের স্বাদও তো আমরা পেতে পারি।

তা যদি না হয় তো পাতাল রেলের কাটা মাটি এনে ভরাট করে পার্ক হোক। খেলার মাঠ হোক।

ব্যক্তিগত ঝুঁকির জগৎ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এবার জগদ্ধাত্রীও বারোয়ারী পুজো হয়ে গেল। মানিকতলা, হরিষ মুখার্জি—অনেক জায়গায় দেখলাম সর্দারজীদের রুটি-মাংসের দোকানের সেই ফিকে সবুজ নিওন আলো গেরস্থবাড়ির দেওয়াল ধরে ঝুলছে। কালীপুজো কয়েক বছরে বারোয়ারি হয়ে গেছে। আমি নিজে বছর কুড়ি আগে দক্ষিণ কলকাতায় একবার বারোয়ারি কালীপুজো করেছিলাম। তখন টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে রাসবিহারী জংশন অব্দি কোথাও বিশেষ কালীপুজো দেখিনি। এবার দেখলাম কাগজে লিখেছে ২৬০০ বারোয়ারি কালীপুজো হয়েছে। আশা করা যায়—কয়েক বছরের ভেতরেই জগদ্ধাত্রী পুজোও এই সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলবে।

সেপ্টেম্বরের বিশ্বকর্মা দিয়ে শুরু আর শেষ ফেব্রুয়ারিতে সরস্বতী দিয়ে। এর ভেতরে ছমাসে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, কার্তিক আছেন। সাপ্তাহিক শনি বন্দনাও আছে। এরপর হয়তো দেখা যাবে—মার্চে অন্নপূর্ণা আর এপ্রিলে গণেশও বারোয়ারি পুজোর ভেতরে এসে গেছেন।

তাছাড়া জায়গা বিশেষে শেতলা, বাসন্তীর আরাধনা আছে। দোল উৎসব আমরা পালন করি। নীল ষষ্ঠী, চাপড়া ষষ্ঠীর ব্রত আছে। আছে প্রতিবেশীর গুড ফ্রাইডে, বড়দিন, ঈদ, সবেবরাৎ। এসবের ওপর রয়েছে রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্র, স্বাধীনতা দিবস। গান্ধী ও নেতাজী জয়ন্তী।

অন্নকূট, নবান্ন, রান্নাপুজোর সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়টি দিন আমরা ঠিক করে রেখেছি ভাইফোঁটা, ষষ্ঠীর জন্যে। এর মাঝে মাঝে আছে শহীদ দিবস, রবীন্দ্র-জয়ন্তী। আছে এবেলা-ওবেলা সাট্টা। বুকি। এখানে ওখানে রেস। রাজ্য সরকারগুলোর দৈবী লটারি। ব্যাংকগুলোর ড্র। টুথ পেস্টের কুইজ কন্টেস্ট। সন্তোষী মায়ের জন্যে নিরামিষ। টক বারণ।

কিছুকাল অন্তর টেস্ট ম্যাচ মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল, ভোট, আইন অমান্য, ব্রিগেডে জনসভা। ট্রাফিকের জট। পাতাল রেলের ধুলো আর গর্ত। ডবলডেকারের পাদানী কাৎ হয়ে পিচ রাস্তায় ঘষটাচ্ছে। কলকাতা ডুবু ডুবু বৃষ্টি। নিত্যযাত্রীর অন্ধকার ইলেকট্রিক ট্রেন। কয়েক লক্ষ ছাত্রের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। হাসপাতালের বারান্দা উপচে রুগীর সারি। বন্দরে পলি। রেলের বগি একলাফে নদীতে। বর্ষা টপকে শরৎ এসে গেল। ন্যাথর ধর্মঘট। ট্রেনে যাত্রীর বেশে প্রবেশ ● পরে রাহাজানি। বুনো ওল বাঘা [illegible] কোয়ালিশন—নয়তো আসন নিয়ে সমঝোতা। এরই ভেতর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চিত্র প্রদর্শনী। ইনফ্লেশন। ডাকঘরে সাত বছর টাকা ফেলে রাখলে ডবল। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। নেতাদের ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে ডোবাচ্ছে। খবরের কাগজে কলম জুড়ে গ্রহশান্তির পাথর। পাশাপাশি—দিনটা কেমন যাবে। শীর্ণ আদি গঙ্গায় মরা গরু। পাঁঠার মাংস ষোল টাকা। পেঁয়াজ চার টাকা। দিস ওয়াল বিলংস টু... ফুটপাথে গেরস্থদের উনুনের ছাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভি সি পালটাচ্ছে। মেয়েরাও বাঁক কাঁধে তারকেশ্বরে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা কি?

সবাই ধার্মিক? সবাই দেবী? সবই বারোয়ারী উৎসব? আমরা আর কত দিবস পালন করবো? কত খেলার জন্যে টি-ভি আর রেডিওকে দিয়ে ধারাবিবরণী শুনতে হবে। ঘন্টার পর ঘণ্টা। আমাদের কান এত কথা নিতে পারে?

এটা বুঝি যে—আমাদের সমাজ দেশের কর্মশক্তিকে অর্থপ্রসূ রাস্তায় নেমে পড়ার মত কল্পনা জোগাতে পারেনি। তাই বারোয়ারী। তাই মোড়ে মোড়ে শনি। গণৎকারদের একসোডাস। সুদের বড় বড় হোর্ডিং। লাকি ড্র। লটারি। এবেলা ওবেলা সাট্টা। সুতরাং ওদের জন্যে সমাজকে কিছু কনসেশন তো দিতেই হবে। রাস্তা জুড়ে একসন্ধ্যে যাত্রাভিনয়। রবারের বল দিয়ে পাড়ার মোড়ে ফুটবল। সেজন্যে মাইকভাড়া করে বিলে। তাসা পার্টি। সব।

এতগুলো ধর্ম, এতগুলো উৎসব, এতগুলো দিবসের মাঝখানে একা একা কিছু করার বা ভাববার রাস্তাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমরা তো এতটা ধর্মের নয়। উৎসবেরও নয়। দিবস মানে তো ছুটি, পতাকা, প্যারেড, নৃত্যনাট্য। এইসঙ্গে খেলা, লটারি, পাতাল রেলের খাল। দম বন্ধ হয়ে যায়। চাঁদু ঘোষের ঝিল কেন পানিফলে ভরে গেল। আগে তো জল টল টল করতো।
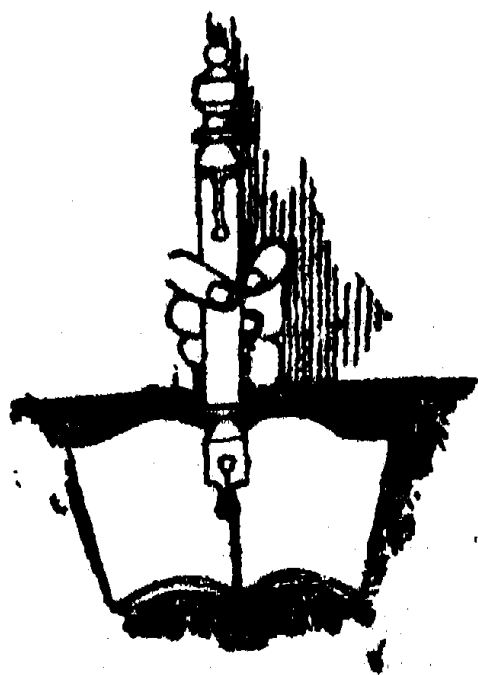
পড়তে পড়তে বই বন্ধ করে মেঘলা আকাশে তাকালাম। চোখ জুড়ে জল এলো। এ কোন সুখ দুঃখের কান্না নয়। কেন কান্না—তাও বলা যায় না।

একটু চিন্তার জীবন—একটু সুকুমার জীবন এত কান্ডের ভেতর দিয়ে হয় না। খরা, ধুলো, প্লাবন, ইঞ্জেকশন, নানান দিবস চিন্তা করার মত স্বস্তি মুছে দিচ্ছে। মানুষ আমদানী করার প্রসেস নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কবে সবাই শিক্ষিত হবে—তারপর ভেবেচিন্তে মানুষ আমদানী শুরু হবে। সেজন্যে বসে থেকে থেকে সবার পৃথিবীটাকেই রসাতলে দিয়ে বসে আছি।

একা একা সরস পরিশ্রম দিয়ে যে কোন চিন্তা আর করবো—তার পথ নেই। যা কিছু ভাবনা—সবই ইজিচিয়ারে শুয়ে শুয়ে মাথার ভেতর জাঁক দিয়ে পাকানো। কিন্তু ঘাম দিয়ে যে চিন্তা আর হয় না—তার তো কোন দাম নেই। নিজের রক্তমাংসের শরীরকে কর্মের ঝুঁকির ভেতর ফেলে হ্যাচোড় প্যাচোড় করে তীরে উঠে আসতে পারলে যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা হয়—তারই নির্যাস আমাদের জীবনকে সরস করে। দৃষ্টিকে দেয় দর্শন।

এই ব্যক্তিগত ঝুঁকির জগৎ ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে চলেছে। এখানে বড় সাহস, বড় খনন কিংবা বড় আবিষ্কারের ইচ্ছে ক্রমাগত গড্ডল প্রবাহে চাপা পড়ে যাচ্ছে। পুজোমন্ডপের বাইরে ইলেকট্রিকের কেরামতিতে একটি মুরগী জ্বলছে নিভছে। এটাই স্থানীয় আবিষ্কার! আঞ্চলিক অভিনবত্ব! এটা দেখার জন্যে 'আসুন আসুন' বিজ্ঞাপন। আর কি আমাদের দেখানোর কিছু নেই?

আমাদের শিল্পেও এখন তাই, মুরগী জ্বলছে নিভছে। আমরা আসুন আসুন বলে যাচ্ছি। সম্প্রতি একটি চিত্রপ্রদর্শনীর শিল্পী আমন্ত্রণলিপিতে বলেছেন, হে ছদ্ম বুদ্ধিজীবি—তুমিও এসে—আমার ছবি দেখে যাও। আমন্ত্রণলিপিতেও নিওন আলোর মুর্গী। কেন? যিনি ছবি আঁকেন—তাঁরও এই সস্তা চমক প্রয়োজন হয়? সগর্বে এই সস্তা চমকের কথাও খবরের কাগজে ছাপানো হয়েছে।

মাথার ভেতর তাসা পার্টির ঝমঝম। স্বপ্নে পাতাল রেলের ক্রেনের ডগা। তোশকের নিচে রিইনফোর্সড কংক্রিটের জাল পিঠে ফুটছে। বিবিধ ভারতীর সিগনেচার টিউন। ফোনে ক্রস কানেকশন। চালে কাঁকর।

মাথার ভেতর সজীব সুতোগুলোকে কিছুতেই এক সূত্রে বাঁধা যাচ্ছে না। অনন্ত জট লেগে গেছে। খিলুর ফাঁপা জায়গায় নানাদিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি, গীতিনাট্য ঢুকে পড়েছে। ভাল ঝাঁটা দিয়ে যে খুঁচিয়ে পরিষ্কার ঝাঁট দেওয়া যাবে—তেমন ইচ্ছাশক্তির সম্মার্জনীও দুর্লভ। কারণ উৎসবে, ধর্মে, দিবসে, [illegible]

হারানো বই

সুবে বাংলার লোকসংখ্যা তখন প্রায় সাড়ে ছয় কোটি। এর দু-কোটি মুসলমান, প্রায় ২৫।২৬ লক্ষ সাঁওতাল পাহাড়িয়া জাতি ; প্রায় এক লক্ষ বৌদ্ধ এবং এক লক্ষ খৃস্টান; অবশিষ্ট ৪ কোটিরও বেশি হিন্দু। বাংলা, হিন্দি ও উড়িয়া তিনটি ভাষা প্রচলিত। বাংলাভাষী লোকসংখ্যা চার কোটি, হিন্দীভাষীর সংখ্যা প্রয় ২ কোটি, উড়িয়াভাষী প্রায় ৪০ লক্ষ। তখনও পূর্ব বাংলায় উৎপন্ন অপরিযাপ্ত চাউলের বিরাট ভাগ বিদেশে রপ্তানী হত। ১৬৬৫ সালে বার্ণিয়ের স্বদেশে একখানি চিঠি লেখেন। ঐ চিঠি থেকে জানা যায় বাংলার চাউল ও চিনি বিদেশে রপ্তানী হত। গোটা ভারত এবং য়ুরোপ বাংলা থেকে সংগ্রহ করত কার্পাস ও পট্টবস্ত্র। সোরা, লাক্ষা, আফিং, মোম, লঙ্কা, মরিচ ও নানারকম প্রয়োজনীয় দ্রব্য রপ্তানী হত। পাট, রেশম, নীল, চা, কুসুমফুল প্রভৃতিও যেত বিদেশে।

মৌর্য আমলে বাঙলায় সম্পদ ও সমৃদ্ধির বিকাশ ঘটে। চীনা পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দর থেকে এদেশের বণিকরা বিদেশে বাণিজ্যে যাতায়াত করত। সেনবংশের পর বাংলায় পাঠান আমলের শুরু। তারাই এদেশে মুসলমান রাজত্বের সূচনা করে। ৩৭২ বছর ছিল তাদের রাজত্ব। এই দীর্ঘ সময়ে বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট, সুন্দরবন (তখন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল), চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা (আরাকনও ত্রিপুরা রাজের অধিকারে ছিল) এবং তারা দখল করতে পারেনি। অথচ উড়িষ্যা দখলের সময় পাঠান বাহনীতে ছিল ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী ও ২০,০০০ কামান। এ নিয়ে ঐ কয়েকটি দখল করা এমন কিছু কঠিন ছিল না। পাঠান আমলে এদেশের ধনীরা সোনার পাত্রে খাওয়া দাওয়া করত। যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত সোনার পাত্র দেখাতে পারতেন, তার মর্যাদাও বাড়ত। বাংলার স্থাপত্য বিদ্যার তখন চরম উন্নত অবস্থা। বেশীর ভাগ বাড়ি ছিল ইঁটের তৈরি। হিন্দু জমিদারদের প্রতিপত্তি কম ছিল না। আইন আকবরিতে আছে অধিকাংশ জমিদার কায়স্থ। তারা সম্রাটের প্রয়োজনে ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১,১৭০ হাতি, ৩,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা পাঠাতেন।

রাজা তোড়লমলের 'ওয়াশিল তুমার জমা' থেকে জানা যায় ১৫৮২ সালে বাংলায় ছিল ১৮টি সরকার ও ৬৮২টি মহল। আর রাজস্ব ছিল ১,০৬,৮৫,৯৪৪ টাকা। মোগল আমলে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাল ছিল না। ১৫৮৭ সালে বাংলায় আসেন মানসিংহ। ১৬০৪ সালে তিনি আগ্রায় ফিরে যান। এর মধ্যে ১৫৩৭-৩৮ সালে বাংলায় পর্তুগীজরা এসে হাজির। তাদের পরাক্রম দিন দিন বাড়তে থাকে। মেঘনার মোহনায় সন্দীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর দখল করে দুর্গ বানায়। গঞ্জালে ছিল তাদের রাজা। আরাকানরাজের সঙ্গে মিলে ১৬১০ সালে বাংলা আক্রমণ করে। কিন্তু গঞ্জালের বিশ্বাসঘাতকতায় আরাকানরাজ ক্ষুব্ধ হয়ে ওলন্দাজদের সাহায্যে পর্তুগীজদের পরাস্ত করেন। তারপর দীর্ঘকাল আরাকানের মগরা দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় লুঠপাট চালায়। ১৬২০ সালে ইংরেজরা পাটনায় কুঠি বানায়। তখন বাংলার সুবাদার নুরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খাঁ। তারপর সুবাদার হন শাহজাহান। তিনি ১৬২৮ সালে সম্রাট হন। তাঁর আদেশে ইনায়তুল্লা ১৬৩২ সালে হুগলি দখল করায় পর্তুগীজ প্রভাব হ্রাস পায়। সেই থেকে হুগলি হল প্রধান বন্দর। পতন ঘটল সপ্তগ্রামের। ১৬৩৯ সালে ইংরেজ হুগলি ও বালেশ্বরে কুঠি নির্মাণের অনুমতি পায় এবং বিনা শুল্কে আমদানী রপ্তানী শুরু করে। ১৬৫৭ সালে বাংলায় ছিল ৩৪ সরকার ও ১৩৫০ মহল আর রাজস্ব পরিমাণ ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা।
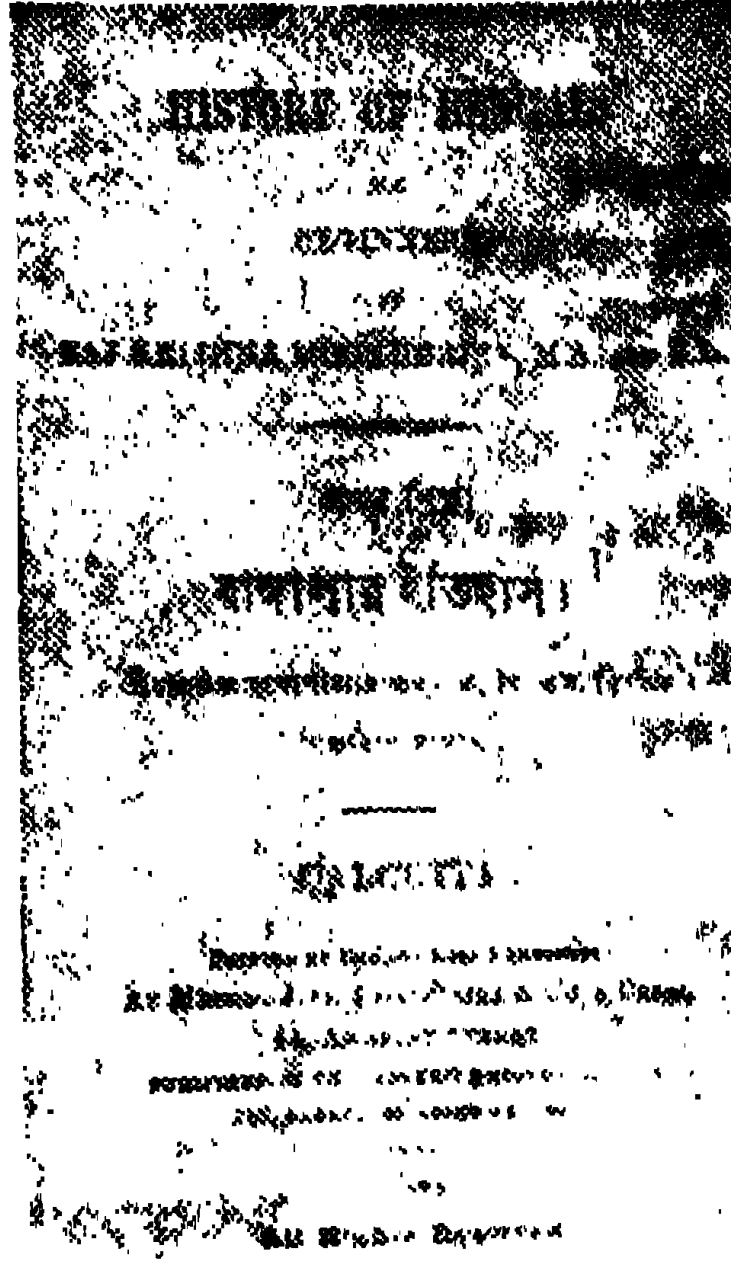
শায়েস্তা খাঁ বাংলা শাসন করেন ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তার আমলে বাংলায় টাকায় আট মণ চাল মিলত। তখন ফরাসিরা চন্দননগরে, ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় এবং দিনেমাররা শ্রীরামপুরে কুঠি বানায়। ১৬৭৭ সালের মার্চে ইংরেজদের সঙ্গে স্থানীয় মোগর শাসনকর্তার বিবাদ শুরু হল। ইংরেজরা হুগলি বন্দরে গোলাবর্ষণ করায়, মোগল সৈন্যরা হুগলির দিকে এগিয়ে আসে। ১৬৮৬ সালে চার্নক ইংরেজদের নিয়ে পালিয়ে যান সুতানটিতে। দু বছর পরে তারা ফিরে যায় মাদ্রাজ। আবার সম্রাটের অনুমতি নিয়ে আসে ১৬৯০ সালে।

এরপর বাংলার ইতিহাস নানান ঘটনায় পূর্ণ। বর্ধমানে বিদ্রোহ করে জমিদার শোভা সিংহ। কলকাতায় ইংরেজরা দুর্গ বানায়। ১৭০১ সালে বাংলার দেওয়ান হন মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। পারসী বণিক হাজিসুফিয়া তাঁকে কিনে নিয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেন। তার সময় টাকায় চার মণ চাল মিলত। ১৭১২ সালে বাহাদুর শা মারা যান। নতুন সম্রাট ফোরকসের ইংরেজদের বাণিজ্যের নানান সুবিধা দিলেন। কলকাতার সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১৭২২ সালে বাংলার রাজস্ব চাকলা, ৩৪ সরকার এবং ১৬৬০ পরগণা। ১৭৪১ সালে বাংলার ইতিহাসে দুঃখজনক ঘটনা বর্গীর হাঙ্গামা। সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন আলিবর্দী। তারপর ইংরেজ ষড়যন্ত্রে বাংলার ইতিহাস গেল বদলে। একদিন তারাই হয়ে উঠল এদেশের প্রভু।

'প্রথম শিক্ষা, বাঙ্গালার ইতিহাস' মাত্র আটানব্বই পৃষ্ঠার বই। লেখক বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম, দর্শন শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়, দর্শন শাস্ত্রে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, বি-এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়—সেকালের কৃতী ছাত্র রাজকৃষ্ণ অধ্যাপক হিসাবে সুনাম কুড়িয়ে ছিলেন। ও'র বইয়ের সংখ্যা কম ছিল না। বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক রাজকৃষ্ণই সম্ভবত বাংলার ইতিহাস প্রথম লেখেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামে তাঁর একখানি বইও বেরিয়েছিল। 'প্রথম শিক্ষা, বাঙ্গালার ইতিহাস' সংক্ষিপ্ত হলেও, হিন্দু ও মুসলমান যুগের এমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কমই দেখা যায়। উদার ও ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে রাজকৃষ্ণ প্রাচীন বাংলার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। শিলালেখ ও অনুশাসনের উল্লেখ করেছেন। বিদেশী পর্যটকদের কথাও তুলে ধরেছেন। ফারসী জানতেন ভাল। প্রয়োজনীয় ফারসী বইয়ের উপকরণ ব্যবহারও করেছেন। বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল সেবিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ১৮৮৪ সালে পৌঁছেছিল ২৫ সংস্করণ। আট বছরের মধ্যে হয় আরও ২১টি সংস্করণ।

কমল চৌধুরী

স্ট্রেস ৮

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

হাসপাতালের কাছেও রাত্রে যানবাহন পাওয়া মুশকিল।
মুখটা দেখেছিলাম একবার, ভদ্রঘরের, বলেছিলাম আপনাকে
খানিকটা এগিয়ে দিতে পারি। দ্বিধা প্রত্যাশা সন্দেহ—
মেয়েরা কত রকম পারফিউম মেখে ঢাকে।

আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, বলতে কাজ হোল। দশ-পনেরো
মিনিটের তো পথ, গিয়ার ফেরাফেরি করতেই কেটে
যায়। ধন্যবাদ অনেক উপকার হোল, কী যে বলেন—এই
সব ভদ্রতার কথা। কথাই। কত রকমের উৎকট শব্দ
আছড়ে পড়ে আমাদের সৌজন্যে।

অন্য সময় শংকরপ্রসাদ তোবই চোখের কোণে কী কুটিল
হাসি। [illegible] বলেছি, আমাকে বিশ্বাস করতে
পারেন। আমার চোখের সামনে ঢাকা অপারেশান
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] উরু অ্যানাটমি। প্রাণ ফিরতে কষ্ট:
[illegible] তিন।

[illegible]
[illegible] মানুষ মানুষকে
[illegible] না [illegible] কেন কথা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

হলো না কিছুই আর—এই বলে হতাশায় ম্লান
ডান হাত খসে যায় অকস্মাৎ, বিস্ময়বিমূঢ় চেয়ে দেখি
ছিন্ন হাত ছটফট করে ক্ষোভে আর ব্যর্থতায়,
কেন সে আশ্রয় নিলো এইরূপ হঠকারী আত্মহননের
কারণ জানি না

ব্যঙ্গময় হাততালি দিতে গিয়ে দেখি, তালি আর
এক হাতে বাজে না—
পুনশ্চ বিমূঢ় হই, বেদনায় বসে পড়ি, অনুভব করি
জিভ আর আলজিভ নেই।

কিছু কথা বোঝাতে না পারানোর কষ্টে
নিঃশব্দ বিদায়ে তারা চলে গেছে দূরে
কঠিন আঁধারে একা রেখে

সমুদ্র ১৯৭০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার জাহাজডুবি দেখতে এসেছ, নামধাম থাক, শুনতে পাব না।
পালমাস্তুলের ভাঙা ভিজে বালির গায়ে আঁক কাটছে আনমনে শুয়ে,
ঢেউ আর হাওয়ার মধ্যে হুটোপুটি করে রবিবার।
এই এক ফোঁটা দ্বীপ—পিটেল নৌকোয় ছুটে এলে রাতারাতি।
পালমাস্তুলের ভাঙা ভিজে বালির গায়ে আঁক কাটছে আনমনে শুয়ে,
আশপাশে ঢেউয়ের আছাড়ে চুরমার হয়ে খসে আছে সদ্য ভোরবেলা।
গাছবীথির গলি দিয়ে বেরিয়ে আসছ—হাতে চাপা বন্দুক ফরমান—
হাওয়া গাছের বালিয়াড়ি ছুটতে ছুটতে

নেমে গেল দাঁতকপাটি ফেনার
মুখোমুখি দেখতে নামছ—তোমার কাপড়কামিজ টুকছে নুনপোকা।
ভাঙা হালপাল আনমনে শুয়ে ভিজে বালি আর

হাওয়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
দেখ, দেখে এস নেমে মাছ ঠুকরে গেল কিনা আসা-কাঠ,
দেখ, দেখে এস নেমে স্ফটিকফেনার নিচে ধমনীশিরার
টানাটানা দড়ি ছটফট করে কিনা চঞ্চল সবুজে...

পুরোনো বন্ধু আমার জাহাজডুবি দেখতে এসেছ—পেছন বিস্তার
হাওয়া গাছ হাওয়া গাছ—সমস্ত সকাল

আনমনে শুনে ভাঙা হালপাল
জল খায় জল খায়—আচ্ছন্ন বালির বুকে ফেনার গোড়েয় গাঁথা মাছ!
সব ফুলে দলে হঠাৎ গাছবীথির গলি দিয়ে বেরিয়ে আসছ—
ভ্রু ঠাওর করে স্থির পিস্তলের মাছি—থামো! এখুনি গ্রেফতার হবে।
হাত টেনে নাও! মামাল ধরবে বলে বেপরোয়া, দলবল ছেড়ে
ঝাঁপিয়ে পড়েছ এসে মুখোমুখি—

ভ্রু ঠাওর করে স্থির পিস্তলের মাছি।
দেখ চেয়ে দেখ! চারধার দিয়ে গাছ বাতাসের ফাঁস
নোনতা ঝাপটে বরে উড়ছে মাথায়—
ভাঙা হালপাল নড়েচড়ে উঠল—জলের গোড়ায় আনমনে শুয়ে শুয়ে
মাছ কুমারীর মতো—উঠে দাঁড়িয়েছে থামো।

এখুনি গ্রেপ্তার হবে।
চেয়ে দেখ—দেখতে পাচ্ছ? এই গাছতলায় কানাকানি স্মরে

পুতুল সাজিয়ে বসে আছি
পুতুলের পেটপোরা সোনার মোহর?

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেন নি

তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেন নি' প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধের শিরোনামে যে সিদ্ধান্তের আভাস, সে-রকম সিদ্ধান্ত, যাঁরা বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনাদি করেছেন, তাঁরা ইতিপূর্বে করেছেন বলে জানি না। যথেষ্ট অভিনিবেশ নিয়ে গোটা প্রবন্ধটি পড়ে শেষ করার পর মনে হল, সিদ্ধান্তটি কষ্ট-কল্পিত। মনে হল, এ ধরনের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে একটা পূর্ব-সংস্কার নিয়েই লেখক প্রবন্ধটি লিখেছেন। লেখক তাঁর প্রবন্ধে যে তথ্যরাজি সমাবিষ্ট করেছেন, তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁর প্রচেষ্টার জন্য তিনি অবশ্যই আমাদের অভিনন্দন-ভাজন। কিন্তু তাঁর তথ্য-বিশ্লেষণ, ঘটনা-ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য থেকে যায়।

(এক) 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা...।' স্পষ্টত-ই এখানে একটি দলের কথা বলা হচ্ছে কোনো ব্যক্তির ইঙ্গিত নেই। সুতরাং উক্তিটি রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখে করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

(দুই) তুহিনশুভ্রবাবু একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার প্রবন্ধ পড়ে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে এটি নিবেদিতাকে লেখেন। কারা ছিলেন এই চিঠির লেখক? জানতে ইচ্ছা করে। চিঠির মন্তব্যর সঙ্গে বলা যায় সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতও এ-রকমই ছিল। বিবেকানন্দ কি এটা জানতেন না? মনে হয়, জানতেন।

বিবেকানন্দ কি চিঠিটি দেখেন নি? রবীন্দ্রনাথ কি এই সময় সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, শাক্তধর্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিষয়ে এমন কিছু সপ্রশংস উক্তি করেছিলেন, যাতে মনে হতে পারে তিনি উদারচিত্ত এবং তথাকথিত রামকৃষ্ণ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন? তা যদি না হয়, তবে ভাবতে হবে, হিন্দুধর্ম, শাক্ত মতবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ব্রাহ্মদের তির্যক মন্তব্য, বিদ্রূপ ও আক্রমণের বিষয়ে অবহিত হয়েও রবীন্দ্রনাথ যে এ-সবের মধ্যে নেই, তা প্রমাণের চেষ্টা না করে তিনি নীরব থেকেছেন। এ জাতীয় নীরবতা মানে কি এ-সবকে নীরবে সায় দেওয়া নয়? অথচ আমরা জানি, অত্যন্ত আত্মসচেতন, সমাজ-সচেতন মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের সম্পর্কে যখনই কিছু তির্যক লেখা বেরিয়েছে, তখন আর তিনি অনুরূপ নীরবতা পালন করেন নি। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের ধর্মকে সমালোচনা করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'প্রবর্তক' পত্রিকায়। আর তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' নামে 'সবুজ পত্রে' প্রবন্ধ লিখে নিজের ধর্মবিষয়ক বক্তব্য স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এতখানি সচেতন ছিলেন তিনি। বিবেকানন্দের সঙ্গে মেশবার এতই যদি আগ্রহ থাকত রবীন্দ্রনাথের, তবে সরলা ঘোষালের লেখা চিঠি থেকে সুরু করে নিবেদিতাকে লেখা ব্রাহ্মদের চিঠি এবং শাক্তধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ব্রাহ্মদের তির্যক মন্তব্য-আক্রমণের পর এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নীরব না থেকে নিজের ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করে তাঁকে ভুল-বোঝার সম্ভাবনা এড়াতে সচেষ্ট হতেন।

প্রবন্ধটি পড়ার পর মনে হল বিবেকানন্দের সঙ্গে নয়, নিবেদিতার সঙ্গেই মিশতে আগ্রহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

(তিন) বিদেশে অবস্থানকালে ব্রাহ্মরা বিবেকানন্দের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন, তার তিক্ত স্মৃতি মনে নিয়েও স্বদেশে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত ব্যবহার করেছিলেন। এ-সব স্মরণ করেই কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ? আর লজ্জিত হয়েছিলেন সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে। দেবেন্দ্রনাথের সামনে বিবেকানন্দের আড়ষ্টতা ও সলজ্জতার যে হেত্বাদেশ করেছেন লেখক, তা খুবই কষ্টকল্পিত।

(চার) 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলা ঘোষাল রামকৃষ্ণের সংস্রবত্যাগের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিবেকানন্দকে, সে সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, এটা ছিল অত্যন্ত ইতরজনোচিত এক জঘন্য কু-প্রস্তাব এবং ব্রাহ্মদের রামকৃষ্ণ-বিদ্বেষের বে-আব্রু প্রকাশ। ঠাকুরবাড়ি থেকে এ-রকম চিঠি লেখা হয়েছিল, ভাবলে অন্তরাত্মা সংকুচিত হয়। এটা ১৮৯৯ সালের ঘটনা। এই প্রসঙ্গে তুহিনশুভ্রবাবু প্রশ্ন তুলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ নিজে কি শর্ত আরোপের (রামকৃষ্ণকে ত্যাগের শর্ত) ব্যাপারে সায় দিয়েছিলেন অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি কখনও কোনো বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন?'

এখানে বলা আবশ্যক যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য না করা মানেই শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বীকৃতিদান নয়।

আমাদের প্রশ্ন : ১৮৯৯-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কোনো ধরনের স্বীকৃতিসূচক সপ্রশংস উক্তি করেছিলেন? তাও তো নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ষটপদী কবিতা ইত্যাদি তো পরবর্তীকালীন ঘটনা। ভারতীয় ইতিহাসে তথা বৈশ্বিক ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য যখন বিদেশীয়রা উপলব্ধি করতে সুরু করেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের নীরবতা কি শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁর নিঃস্পৃহতা অথবা উদাসীনতাকেই ব্যক্ত করে না? এই নীরবতা কি একটা ঐতিহাসিক আবির্ভাবকে অস্বীকারের প্রয়াস নয়? লেখক বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় কখনই কোনো রকম গোঁড়ামির স্থান ছিল না।' (অমৃত, ২৪ সেপ্টেম্বর)। এই বক্তব্যকে কোনো তৎকালীন অর্থাৎ বিবেকানন্দের জীবৎকালীন ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা না করে লেখক ১৩১১ বঙ্গাব্দে বা ১৯০৪ খৃস্টাব্দে বিবেকানন্দের প্রয়াণোত্তরকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ (আত্ম-পরিচয়, পৃঃ ১৫) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসারে, উদ্ধৃত অংশ তাঁর একটি 'পুরাতন চিঠি'। 'আত্ম-পরিচয়' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি 'পুরাতন চিঠি' উদ্ধৃত করে সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। তাছাড়া এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কবি-মানসের ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন। বলেছেন নিজের ভেতরের 'একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়' সম্পর্কে, যাকে পরে বলেছেন 'জীবনদেবতা'। এর সঙ্গে ধর্মভাবনায় গোঁড়ামি না থাকার ব্যাপারকে এক করা চলে না। আর এই নিগূঢ় চেতনা বা নূতন অন্তরিন্দ্রিয় তখনো পূর্ণতা লাভ করেনি, এটা তো ঐ চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি।' অন্তরিন্দ্রিয় বা নিগূঢ় চেতনার এই

অপূর্ণতার জন্যই হয়তো বিবেকানন্দের জীবৎকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মূল্যায়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

(পাঁচ) ব্রাহ্মদের সকল বিরূপতা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে দিয়ে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে একটি চায়ের আসরের আয়োজন করিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ যদি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিশতেই না চাইতেন, তবে চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রন জানানোর ব্যবস্থা করবেন কেন? বরং দেখা যায়, সেদিনের সে আসরে বিবেকানন্দ অনেক কথা বলেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ কেবল গান করেছিলেন। আলোচনায় যোগ দেননি, নীরব ছিলেন।

উপযুক্ত তথ্য ব্যাখ্যা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, এত বড় সুযোগ পেয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ উচ্চবাচ্য করলেন না। করলে নিবেদিতা নিশ্চয়ই সেটা টুকে রাখতেন। বিবেকানন্দ কি আশা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এই আসরে শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্তরের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও প্রণতি জানাবেন, সরলা ঘোষালের চিঠি বা ব্রাহ্মদের বিরূপ সমালোচনা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করবেন? এবং অমনি করেই তাঁর 'ধর্মভাবনায় যে গোঁড়ামির স্থান' নেই, তার পরিচয় রাখবেন? কিন্তু তা তো হল না। দেখা যাচ্ছে, নীরব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কেন? মনেহয় (১) হয়তো চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল নিছক শিষ্টাচার রক্ষা, কোনো আন্তরিকতায় প্রাণিত ব্যাপার নয়। (২) হয়তো রবীন্দ্রনাথ এই ভেবে সতর্ক ছিলেন যে, সাইক্লোনিক হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করবেন। তাই ধর্মীয় আলোচনায় তিনি যেতে চান নি। এটাই নীরবতার কারণ। কারণ যাই হোক, বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছিলেন এরপর। গায়ে পড়ে ঠাকুরবাড়ি গিয়ে অথবা চায়ের আসরের ব্যবস্থা করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেশার চেষ্টায় অভিপ্রেত সাড়া পাননি বলেই এরকম এক-তরফা চেষ্টা করতে চাননি আর। রবীন্দ্রনাথ, তুহিনশুভ্রবাবুর কথা মত, যদি মিশতে আগ্রহী হতেন, তবে পালটা চায়ের আসরের আয়োজন করে বিবেকানন্দকে ঠাকুরবাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন। কিন্তু আর অগ্রসর হননি। তাই দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথই উভয়ের মেলামেশার পথ সুগম করতে চাননি। চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথের নীরবতাও এটাই প্রমাণ করে।

চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথের নীরবতাকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেন তুহিনশুভ্রবাবু। এটাকে ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ সেদিন আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন, এটাও প্রমাণ করতে পারলেন না। কেবল বিবেকানন্দকে দোষী সাব্যস্ত করতে চাইলেন। যেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের প্রশংসা করেন নি। বিবেকানন্দ নিজে ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক, ছিলেন গানের সমঝদার। রবীন্দ্রনাথের
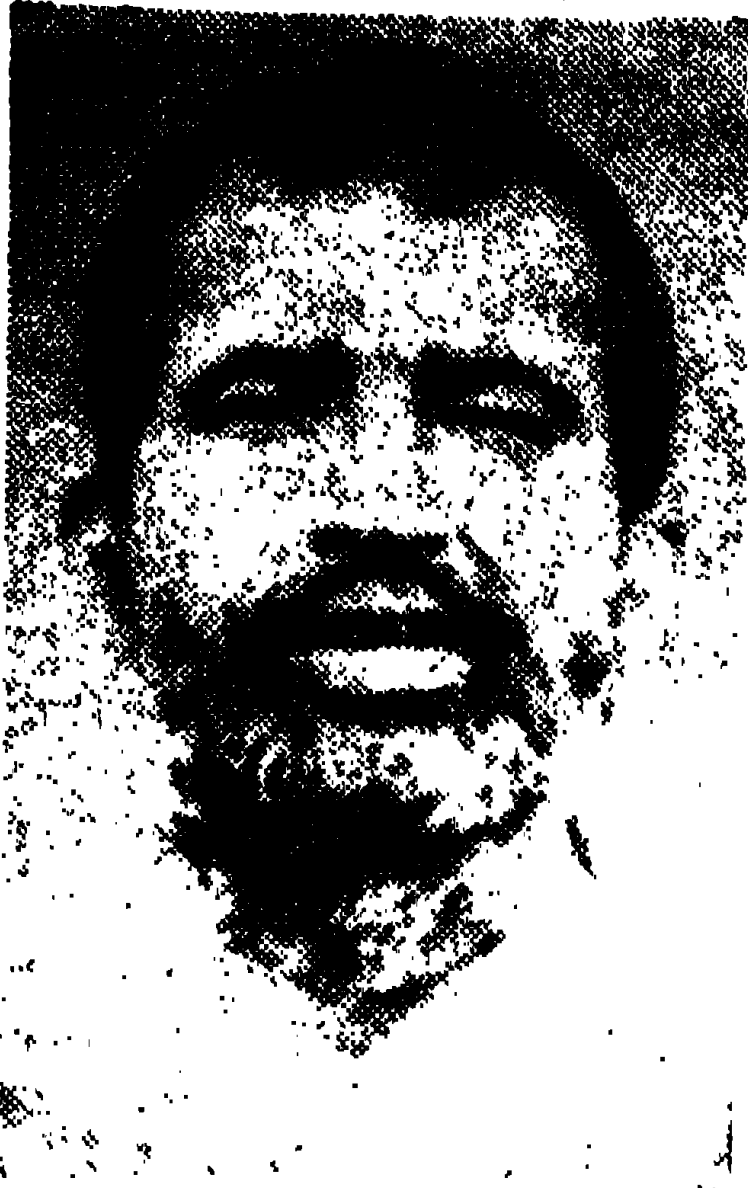
রামকৃষ্ণ

নিজের কণ্ঠের গান হয়তো তাঁর ভালো লাগেনি। কেবলমাত্র মৌখিক প্রশংসা করে ভাবের ঘরে চুরি করতে চাননি। নিবেদিতার ভালো লেগেছিল। নিবেদিতার জায়গায় অবাঙালীর অন্য কেউ হলেও নিশ্চয় ভালো লাগত। সে যাকগে। উক্ত ঘটনায় এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিবেকানন্দই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিশতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চাননি।

(ছয়) 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, এ ধরনের কবিতা দেশে ইন্দ্রিয়রসের বন্যা বইয়ে দেবে। তুহিনশুভ্রবাবুর মতে, 'রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের কটু মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক চরম অবিচার, এ-কথা স্বীকার করতেই হয়।' অপরাপর রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কিছু মন্তব্য করেছেন বলে জানা যায় না। সুতরাং 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে বিবেকানন্দের উক্তিকেই লেখক 'রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের কটু মন্তব্য' (অমৃত, ৭ সেপ্টেম্বর) বলতে চাইছেন। কথা হচ্ছে 'কড়ি ও কোমল' আজ পর্যন্ত কতটুকু স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছে?

(সাত) রমা রলাঁর দিনপঞ্জিকায় দেখা যাচ্ছে, ১৯৩০ সালে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে রলাঁর বইয়ের কিছু অংশ পড়ে রলাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'কালী উপাসনা যারা টিকিয়ে রাখে, তারা সুস্থ, সঠিক ও সৎ মানসিকতার লোক হতে পারে না।' (অমৃত, ৭ সেপ্টেম্বর) রমা রলাঁ উল্লেখ করেছেন যে, বিবেকানন্দকে মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ এ-রকম উক্তি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নাম উল্লেখ না করেও এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুস্থ, সঠিক ও সৎ মানসিকতার লোক ছিলেন না। তাঁর পিতৃদেব, তিনি নিজে এবং ব্রাহ্মধর্মের অন্যান্যরাই সুস্থ, সঠিক ও সৎ মানসিকতার লোক।

এই ঘটনা থেকে দেখা যায়, সত্তর বছর বয়সেও হিন্দুধর্ম, শাক্ত মত, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিষয়ে তাঁর মূল মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইতিহাসের ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়ন তিনি করতে পারেন নি। রলাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে সামান্য স্বীকৃতিসূচক শ্রদ্ধাবাণীও উচ্চারণ করলেন না তিনি। বরং এমন করে আক্রমণ করলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনকে যে, এর মধ্যে প্রকাশ পেল অবমূল্যায়নের চেষ্টা, নস্যাৎ প্রবণতা, অন্তরের জ্বালা ও অসহিষ্ণুতা। ব্রাহ্মধর্মের অসহিষ্ণুতার কথা রবীন্দ্রনাথ রলাঁর কাছে স্বীকার করেছিলেন। রলাঁ লিখেছেন, 'তিনি (রবীন্দ্রনাথ) মেনে নিলেন যে, তা (ব্রাহ্মধর্ম) সহিষ্ণু ছিল না।' আশ্চর্যের কথা, রবীন্দ্রনাথ এই পরধর্ম-অসহিষ্ণুতাকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন সেদিন। রলাঁ লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ এরপর বলেছিলেন যে, কোনো কোনো অপরিহার্য ক্ষেত্রে সত্যকে অসহিষ্ণু হতেই হতেই হবে।' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে অবদমিত অসহিষ্ণুতাকেই কি সেদিন প্রকাশ ও সমর্থন করলেন না রবীন্দ্রনাথ? (রবীন্দ্রনাথ যে আরেকজন শ্রদ্ধেয় হিন্দু সন্ন্যাসী, স্বামী অচ্যুতানন্দ ওরফে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্পর্কেও এ জাতীয় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে তাঁকে অশালীন ভাষায় অবমূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলেন, সে নজির একটু পর পেশ করা যাবে।) লক্ষ্য করার বিষয়, সত্তর বছরেও পাল্টালেন না রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ বোধ করি ছত্রিশ বছর বয়সেই এই রবীন্দ্রনাথের মানসধর্ম ঠিক চিনতে পেরেছিলেন।

রমা রলাঁ লিখেছেন যে, কালী উপাসনাকে সোজাসুজি আক্রমণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'আবেগদীপ্ত ঘৃণার তীব্রতা নিয়ে।' জীবন সত্যের একনিষ্ঠ এই পূজারীর সত্য উপাসনায় আবেগদীপ্ত ঘৃণাটা কি কেবল শাক্তধর্মের বিরুদ্ধে, নাকি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনের বিরুদ্ধে? রবীন্দ্রনাথ সেদিন ছাগ-বলির বাল্য স্মৃতি যেভাবে রোমন্থন করেছিলেন, তাতে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝি ছাগ-বলির তত্ত্বই সারাজীবন প্রচার করে গেছেন। আরও মারাত্মক, রবীন্দ্রনাথ 'রক্তমাখা নিম্নস্তর' শব্দ দুটি উচ্চারণ করেছিলেন সে আলোচনায়। এর সরল অর্থ বলি প্রথার সমর্থক নিম্নস্তরে সাধারণ মানুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ যাদের প্রতিনিধি। একদিকে প্রসাধন-সতর্ক জোব্বা, অপরদিকে বিস্রস্তবাস গ্রাম্য সরলতা। কী বৈপরীত্য।

রামকৃষ্ণের অসংবৃত সাজপোশাকের জন্য না হয় রামকৃষ্ণকে সভায় আসতে বারণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু দেবেন ঠাকুর নিজে অথবা তাঁর বাড়ির কেউ শিষ্টাচারের রীতি অনুযায়ী দক্ষিণেশ্বরে

রামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়েছিলেন কি? রামকৃষ্ণ তো দেখতে এসেছিলেন দেবেন্দ্রনাথকে অনাহূত হয়েই। ব্রাহ্মধর্ম আলোকপ্রাপ্ত, অভিজাত মহলের ধর্ম আর হিন্দুধর্ম রক্ষণশীল সাধারণ মানুষের ধর্ম ঃ এই ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের ধারণা? আদি ব্রাহ্মসমাজে মানসিক সংকীর্ণতা ও আভিজাত্যবোধ কি বেশী ছিল?

বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সাধনামার্গের পথিক এবং আবাল্য ব্রহ্মচারী, কালী উপাসক শাক্ত। এই বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও যিনি রবীন্দ্রনাথের আগে সারা ভারতের তথা বিশ্বের স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন, তাঁকে অস্বীকার করাটাই হত লোকলোচনে নিজেকে অনুদার প্রতিপন্ন করা। তাছাড়া বিবেকানন্দের লোকসেবা, বেদান্ত প্রচার প্রভৃতি কাজকে রবীন্দ্রনাথের স্বীকার করা সহজ ছিল। সুতরাং সম্পূর্ণাঙ্গ বিবেকানন্দকে না হলেও তাঁর একটা দিককে হয়তো রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অবিমিশ্র ছিল না বলে যে উক্তি করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন, তা যথার্থ বলেই মনে হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুসারে, ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা' নাটকে বিবেকানন্দের কথা মনে রেখেই সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে ব্যঙ্গ করেছেন। আবার দেখা যাচ্ছে, 'সমাজ' (১৯০৮) প্রবন্ধ গ্রন্থে এবং পরে, ১৯২৮ সালে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন। স্ব-বিরোধী কিংবা দ্বৈত মনোভাব, সন্দেহ নেই।

(আট) 'প্রকৃতির প্রতিশোধ,' 'রাজর্ষি', 'বিসর্জন,' 'চিরকুমার সভা, 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ, তিনি শাক্তধর্ম-সন্ন্যাস-মূর্তিপূজায় গভীর বিরোধী। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হে ভারত, ভুলিও না...।' বলেছিলেন, 'নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।' (পরিব্রাজক) বলেছিলেন, 'এখন ভারতের প্রয়োজন হচ্ছে বোমা।' (স্বামী বিবেকানন্দ ঃ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ২১২)।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হয়েছিল, তার উৎসগঙ্গোত্রীতে রয়েছে বিবেকানন্দের ভাবধারা। অরবিন্দ ঘোষ ও সুভাষচন্দ্র বসুকে অনুপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দের ভাবধারা। বিবেকানন্দ জাগাতে চেয়েছিলেন জাতির নিদ্রিত পৌরুষকে। জাগ্রত শাক্ত বাংলার প্রাণজাহ্নবীতে অবগাহন করেই শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন 'পথের দাবী।' আর রবীন্দ্রনাথ? তিনি তখন 'পথের দাবী'-র চিন্তাধারাকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন 'চার অধ্যায়।' দেখেছেন বিপ্লববাদের মধ্যে ফাঁকি। তিনি যা স্বীকার করতে পারেন নি, তাই ছিল জাগ্রত বাংলার সত্য রূপ, রেনেসাঁস বাংলার বলিষ্ঠ প্রাণপ্রকাশ ও মূল বৈশিষ্ট্য। একে স্বীকার করেছেন নিবেদিতা, অরবিন্দ, সূর্য সেন, সুভাষ বসু, শরৎচন্দ্র ও নজরুল।

সাহিত্যেও বজ্রনাদী পৌরুষ পছন্দ ছিল না রবীন্দ্রনাথের। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে জ্বলে উঠেছিল রেনেসাঁসী বাংলার প্রাণার্চিশিখা। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই 'মেঘনাদ বধ'কে আক্রমণ করেছিলেন। আর বিবেকানন্দ? তিনি 'মেঘনাদ বধ' সম্পর্কে বলেছেন, 'মেঘনাদ বধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।' (স্বামী-শিষ্য সংবাদ, পৃঃ ২১১)

এই বিবেকানন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তুহিনশুভ্রবাবু তাঁর আলোচনার শেষে লিখেছেন, '...স্বামী বিবেকানন্দের রবীন্দ্রনাথের মত অতটা উদার হওয়া বোধহয় সম্ভব হয় নি।' চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নেই। এই সিদ্ধান্তকে ঘটনা ও তথ্যের উপস্থাপনা-ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা গেল না, এই যা। জন্মজিৎ রায়, করিমগঞ্জ, আসাম।

(২)

'অমৃত' পত্রিকাতে তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি' গবেষণামূলক প্রবন্ধটি পড়েছি। কিন্তু লেখকের রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি নি বলেই এই চিঠি। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে ব্রহ্মোৎসবে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু পরদিন চিঠি পাঠিয়ে ব্রহ্মোৎসবে আসতে নিষেধ করেছিলেন। লেখকের মতে—যাতে রামকৃষ্ণকে কেউ কোন অপমান করতে না পারে, যা কিনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ব্যাপার, সেইজন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মথুরনাথ বিশ্বাসকে চিঠি পাঠিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে আসতে বারণ করেছিলেন। এ প্রসংগে দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের কথাবার্তা: আপনাকে (রামকৃষ্ণকে) উৎসবে (ব্রহ্মোৎসবে) যেতে হবে।' আমি (রামকৃষ্ণ) বললাম, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমার ও এই অবস্থা দেখছো। কখন কি ভাবে তিনি রাখেন। দেবেন্দ্র বললে, 'না আসতে হবে' তবে ধুতি আর উড়নি পরে এসো—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।' আমি বললাম, 'তা পারবো না। আমি বাবু হতে পারবো না।'

"তার পরদিনই সেজোবাবুর কাছে চিঠি এলো আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে।"

রামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করে তা প্রত্যাখ্যান করা থেকে এই সিদ্ধান্ত উপনীত না হয়ে উপায় নেই যে,—ঈশ বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এ জগতে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে সবই ব্রহ্মের দ্বারা আবরণীয়— এসত্য উপলব্ধ করা, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে— সম্ভব হয়নি বলেই তিনি বেশভূষা উপলক্ষ্য করে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আসতে বারণ করেছিলেন। একথা ভুললে চলবে না যে দেবেন্দ্রনাথ তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের সামনে দেবেন্দ্রনাথ দ্বারা আমন্ত্রিত অতিথিকে কেউ অপমান করতে পারে ও শুধুমাত্র—একথা যেন কোন অবস্থাতেই মানা যায় না। ধুতি ও উড়নির কথা দেবেন্দ্রনাথের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল। রামকৃষ্ণ 'তা আমি পারবো না। আমি বাবু হতে পারবো না,—একথা বলার পর দেবেন্দ্রনাথ কোন মন্তব্য করেন নি। অনেক চিন্তাভাবনার পর পরদিন চিঠি লিখে তাঁকে আসতে বারণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রথম উক্তি তাঁর নিজস্ব ও তাঁর পরবর্তী আচরণ কারো মতামতের অপেক্ষা না করেই করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ধুতি ও উড়নিকে বাদ দিলেও যে রামকৃষ্ণের একটি নিজস্ব সত্তা থাকে, তা বুঝতে অক্ষম বলেই তিনি এরকম আচরণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণের জীবনে বেদান্ত জীবন্ত সত্য হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাই তাঁর কাছে 'ধুতি ও উড়নি' পরা বা না পরার মধ্যে কোন তফাৎ ছিলনা।

ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি রামকৃষ্ণের দেবেন্দ্রনাথের প্রতি সহজ সরল আচরণকে ব্যঙ্গরসিকতা মনে করার কারণ নেই। এ ব্যাপারে লেখক রোমা রোঁলার উক্তি উল্লেখ করেছেন। ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জড়িত থাকে, যিনি নিজেকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতে নিজেকে দেখেছেন, তাঁর মধ্যে যে ঘৃণা-বিদ্বেষ থাকতে পারেনা—একথা বলাই বাহুল্য। রোমা রোঁলা তাঁর দি লাইফ অফ রামকৃষ্ণ বইতে ঠাকুরে প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। কিন্তু অবতার শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উক্তি যে ব্যঙ্গোক্তি নয়, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করা মাত্র—একথা রোমা রোঁলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি।

দেবেন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে 'ধুতি ও উড়নির' উল্লেখ ও তাঁর পরবর্তী আচরণ ও রামকৃষ্ণের দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুটি উক্তি (যার উল্লেখ লেখক করেছেন) দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন ছাড়া কিছুই নয়—একথা দেবেন্দ্রনাথের উক্তি ও আচরণ ও রামকৃষ্ণের দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উক্তি পাশাপাশি তুলনা করলেই বোঝা যাবে। তাপসশঙ্কর দত্ত। কলকাতা।

জগন্ময় মিত্র ∽ সন্ধ্যা সেন

প্রায় একযুগ পরে জগন্ময় মিত্র কলকাতায় এসেছিলেন দুটি উদ্দেশ্যে—প্রথমত তাঁর গুরু কমল দাশগুপ্তের নামে উৎসর্গীত সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেওয়া দ্বিতীয়ত তাঁর অজস্র বন্ধু, আত্মীয় এবং ভক্তের দীর্ঘমেয়াদী অনুনয়ে সাড়া দিয়ে কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়া।

কথায় কথায় অনেক কথাই বলছিলেন জগন্ময়বাবু। এক সময় বললেন, গুরু আমার অনেক। কিন্তু কি রেকর্ড, কি রেডিও, কি শিল্পীজীবনের প্রতিষ্ঠা—সবই পেয়েছি যাঁর সদা সজাগ শিক্ষা ও পরিচালনায় তিনি হলেন কমল দাশগুপ্ত। আর যাঁদের লেখা গান গেয়ে হাজার হাজার শ্রোতার ভালবাসা পেয়েছি তাঁরা হলেন প্রণব রায়, শৈলেন রায় এবং সুবোধ পুরকায়স্থ। এ'দের কাছে আমার ঋণ সীমাহীন।

সেই ঋণের কথাটা যতবার স্বীকার করার সুযোগ পাই আনন্দে, গৌরবে প্রাণ ভরে ওঠে।

কলকাতায় কতদিন থাকব? বলা মুস্কিল। আমার ত ইচ্ছে করছে যতদিন সম্ভব কলকাতা বাসের মেয়াদ বাড়িয়ে নিই। কত আনন্দ, বেদনা, স্নেহ ভালবাসার মধুর স্মৃতি জড়ানো কলকাতা আজও আমার কাছে স্বপ্নের জগৎ। কিন্তু আমি সেন্সার বোর্ডের মেম্বার। তাই ভয়ে ভয়ে আছি হঠাৎ কখন যাবার তাগিদ আসে।

—সত্যিই কি তাই? তাহলে এত সাধের কলকাতা ছেড়ে গেলেন কেন?

ওকে যে ভালবাসি সেই অভিমানে। প্রথম ধাক্কা খেলাম গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে। সেটা অবশ্য আদর্শগত মতানৈক্য। অধিকাংশ মানুষই কর্মক্ষেত্রে এসব ছোটো-খাটো মনের অমিলকে আমলই দেয় না। কিন্তু আমি বরাবরই খুব স্পর্শকাতর। যে গ্রামোফোন কোম্পানিকে আমি চিরকাল সরস্বতী মন্দির বলে ভেবে এসেছি সেখানে কোনোরকম স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনার সঙ্গে আপোষ করতে মন চাইল না—আহা বলই না বাবা সে সময় শান্তারাম তোমায় ডেকেছিলেন হিন্দী ছবির সঙ্গীত পরিচালনার জন্য—বললেন শ্রীমতী মিত্র যিনি শুধু ও'র জীবনসঙ্গিণীই নন, মর্মসঙ্গিণী এবং কর্মসঙ্গিণীও—যাকে বলে একাধারে ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড।

সেটা ত পরের ব্যাপার। জগন্ময়বাবু বললেন,

'এবং ন্যাচারাল সিকোয়েন্সিও'—আমি ও'র সঙ্গে যোগ দিয়ে বলি একটা দুয়ার যদি বন্ধ হয়ে যায় ওপরওয়ালাকে আর একটা দুয়ার তো খুলে দিতেই হবে—নইলে আমাদের চলবে কেমন করে?'

রাইট ইউ আর—তাছাড়া বোম্বে না গেলে এ জগতের আর একটা দিক দেখা হোতো না এবং নিজের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ও ঘটতো না আর নিজের মনের জোরটাও পরখ করা হতো না।

—কিভাবে এই আত্মপরিচয়ের অধ্যায়টা সুরু হল?' —সাগ্রহে প্রশ্ন করি।

সে কথা বলতে হলে তার আগের যুগে ফিরে যেতে হয়। আমি একটা আত্মজীবনী লিখছি। তাতে সবই থাকবে।

সেটা অনেক পরের কথা। ফুটে ও ফুলের চেয়ে অনেক বেশী রোমাঞ্চকর ফু ফোটার খুঁটিনাটি খুঁজে আনা কুঁড়ির পর্যায়—শিল্পী হাসলেন।

—তুমি ত এযুগের মানুষ। আমাদে গানের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘট কেমন করে?

আমার মনটা ভাল করে জেগে ওঠ অনেক আগে থেকেই গানের প্রতি অন রাগটা জেগে উঠেছিল। ছোটোবেলা কেটেছে শুধু বাড়িতে রাখা গাদা গা রেকর্ড শুনে। দিলীপ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, কানন দেবী আর কে কে মনে নেই। স্কুলে পড়ার সময়ে গানগুলো এখনও স্পষ্টই কানে বা 'আমার এ বাসরশয্যা', 'তুমি খেলাছ কবে', 'কোন দূরে প্রণয়ীর' (জগন্ময় 'অলিরে ডাকে আজি', 'তুমি ফিরাবে কি 'বিদায় দিতে পারিব না' (ধনঞ্জয়) কিং 'কথা কোয়োনাক' 'মোর ব্যথা যমুনার 'কথা ছিল তোমার মালা (হেমন্ত) আপনারা তিনজন। আপনি আর ধনঞ্জ বাবু—ক্লাসিক্যাল ঘেঁষা (ডিগ্রীর তারত অবশ্য থাকতে পারে এবং ভঙ্গিরও হেমন্তবাবু ক্লাসিক্যালের ছোঁওয়া ছাড়া নিজের এমন একটি স্টাইল করে নিয়ে ছিলেন যার আলাদা একটি শীলমোহ ছিল।

আজও ঐ সব গান কারো গলা গুনগুনিয়ে উঠলে যেন বহু যুগের ওপ হতে চেনা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে।

এই চেনা ফুলের গন্ধ শিল্পীকেও আন মনা করে। অজ্ঞানতেই তিনি খুলে দিলে অতীতের একটি বন্ধ দুয়ার।—কি বললে যে যুগে গান ছিল সমাজে অন্ত্যজশ্রেণী শিল্প সেই যুগে গানকেই কেরিয়ার করা দুঃসাহস এল কোথা থেকে? এটা এক সুন্দর প্রশ্ন।

আমি জন্মেছি আমার বাবার মৃত্যু পরে। স্বাভাবিক কারণেই আমার ঠাকুদা স্নেহ ভালবাসা আর আদর যত্ন অজ ধারায় ঝরে পড়েছিল আমার ওপর সঙ্গীতের আবহাওয়া আমাদের বাড়িতে শুধু সৃষ্টি নয় লালিত হয়েছে আমা জন্মের অনেক আগেই। আপার সার্কুলা রোড, এখনকার রামমোহন লাইব্রেরীর কাছে আমাদের বিরাট বাড়িটার বাইরের মহলে আমার বাবা স্বর্গীয় যতীন্দ্র মিত্র ও কাক পঞ্চানন মিত্রের আগ্রহে আসতেন ওস্তা মীর্জা সাহেব, জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেব মস্তান গামা। কাকাকে তবলায় তালিম দিতে

সস্ত্রীক

আসতেন গোলাম আলি খাঁ সাহেব (গাইয়ে বড়ে গোলাম আলি নন)।

বাড়ির সকলের সঙ্গীতের প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকলেও—সঙ্গীতের ডেরা ছিল বাইরে হলে। অন্দরে নয়। ওঁদের গান-বাজনা শুনতে শুনতে অজান্তেই মনের মধ্যে উচ্চাংগ সঙ্গীতের একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিল শুনে শুনেই অনেক রাগ তান আলাপনা থেকেই গলায় গুনগুনিয়ে উঠত। আর নিয়মিতভাবে ভাল গান-বাজনা শোনার ফলে কানটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যে কেউ গানের কোনো পর্দা সুরে না গাইলে কিংবা বাজালে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতাম এবং সেটা প্রকাশও করে ফেলতাম।

গানের প্রতি এই দুর্নিবার আকর্ষণেই শিখতে গেলাম ধ্রুপদী কেশব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। —এই ধ্রুপদী ভিত্তি যে আমার সঙ্গীতমানস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কত বড় ভূমিকা নিয়েছে সেটা উপলব্ধি করেছি অনেক পরে, উত্তরজীবনে। ধ্রুপদের এই মর্যাদাগম্ভীর রাজসিক মেজাজই আমার রুচিকে কখনও কোনো লঘুভারের সুর ও কথার দিকে ঘেঁষতে দেয়নি। ধ্রুপদের এই শিক্ষা আমার জীবনে ঈশ্বরের একটা আশীর্বাদ বলতে পারি।

কিছুদিন শেখার পর অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স আয়োজিত অল বেঙ্গল মিউজিক কমপিটিশনে যোগ দিলাম। ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরি, রাগপ্রধান বাংলা গান, বাউল, কীর্তন প্রত্যেকটি বিষয়েই ফার্স্ট হয়েছিলাম। তৃতীয় হয়েছিলাম শুধু আধুনিক বাংলা গানে!

তখন অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনের একটা বিরাট আভিজাত্য ছিল। এখানের বিচারকরা ছিলেন সঙ্গীত জগতের বাঘা বাঘা মানুষ। এখানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার পর উদীয়মান তরুণ প্রতিভা হিসেবে গুণীমহলে স্বীকৃতি পাবার সৌভাগ্য হল এবং তারপর থেকেই ছোটো-বড় নানা আসরে গাওয়ার আমন্ত্রণ আসতে লাগল।

এখানে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। এখনকার দিনে পঞ্চাশ বছরের গায়কও প্রথম পাবলিক কনসার্টে গাইলে নিজেকে তরুণ শিল্পী বলে দাবি করে থাকেন। তখনকার তারুণ্যও কি এই জাতের? বলেই স্মৃতি-চারণে তন্ময় শিল্পীর ধ্যানকে বিচলিত করার জন্য লজ্জিত হয়ে উঠি।

তখন আমার বয়স ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে, শিল্পী হেসে বললেন।
—তাহলে যথার্থই তরুণ। তারপর?

—এইরকম নানা আসরে গাইতে গাইতে একটি আসরে পরিচয় হল দিলীপ রায়ের সঙ্গে। উনি আমার গান শোনার পর খুব আদর করে কাছে ডেকে বললেন, 'তোমার গলাটি ত ভারি মিষ্টি খোকা। তুমি আমার কাছে গান শিখবে?'

—আমি উত্তর দেব কি? সারা শরীর মন রীতিমত রোমাঞ্চিত। রূপে রূপে দেবদুর্লভ কণ্ঠ, শিক্ষা, আভিজাত্য সব মিলিয়ে দিলীপ রায় তখন আমার কাছে স্বপ্নলোকের বাসিন্দা। তিনি নিজে থেকে আমায় গান শেখাতে চাইছেন, এটা বিশ্বাস করাই কঠিন। স্বর্গ থেকে কোন দেবতা বর দিতে এলেও এত বিস্ময় লাগত না।

তারপর থেকে ওঁর কাছে নিয়মিত গান শেখা শুরু হল। মন্টুদা জার্মাণী থেকে ভয়েস ট্রেনিং শিখেছিলেন, এছাড়া ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির প্রত্যেকটি বিষয় তালিম ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ ও বাইদের কাছে। কিন্তু এসবের কোনটাতেই পুরোপুরিভাবে বাঁধা পড়েনি তাঁর মুক্ত চিত্তের সুরবিহার। যে কোনো একটি কথাকে কেন্দ্র করে তাঁর সুরের অভিসার সুরু হত। কোথাও একটি স্বরের দীর্ঘস্থায়ী রেশ, কখনও তানের উচ্ছল গতিতে পাহাড়ের বুক চেরা নদীর মত দুরন্ত বেগ, কোথাও আখরের আলপনা। সব মিলিয়ে গভীর হৃদয়াবেগ তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য-চেতনাকে স্মরণ করিয়ে দিত। ওঁর উপলব্ধি আবেগের দোলা আমার মনেও লাগত। ওঁর সঙ্গে গাইতে গাইতে মনটা যে কোথায় উধাও হয়ে যেত সে ঠিকানা কি আজও পেয়েছি?

আমাকে শেখাতে শেখাতেই হঠাৎ একদিন মন্টুদার পণ্ডিচারী যাবার তাগিদ এল। যাবার আগে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমার গান শেখার ব্যবস্থা করে গেলেন। মন্টুদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল ভারী মধুর। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছাপিয়েও একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। আমি যখন অনুযোগ করতাম, আমার শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই আপনি পণ্ডিচারী চলে গেলেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলতেন, 'তুমিই ত আমায় দেশছাড়া করলে।' কত যে পেয়েছি ওঁর সরস ব্যক্তিত্বের কাছে। এই প্রসঙ্গে ওঁর একটি ছড়ায় লেখা চিঠির উল্লেখ করতে ইচ্ছে করছে। পণ্ডিচারী আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহে ওঁকে তখন সারা ভারত ঘুরতে হচ্ছে।

হে জগন্ময়! জয় তব জয়
গাই আজও গুণ তব
গোয়ালিয়রের রাজ আতিথ্যে
এর পরে কি বা কব?
কানপুরে কিছু মোটা দক্ষিণা
মিলবে লিখেছে ওরা
সংগ্রহ শুধু হোলো ভিলায়াল
প্রণামী যে মনোচোরা
২৩৫ নিম্ন গোলোক সরণীতে
আমি রব
সেখানে ১৯শে আস বাঁধ তবে
মনের কথাটি কব।

মঞ্জুকে দিও খবর আমার
যদি সে থাকতে পারে
না যদি থাকে সে
একলাই সরবে দিলীপ হারে।
আজ সন্ধ্যায় এখানেও কিছু
মিলবে রুপালী টাকা
মহারাজ মহারাণী শ্রোতা
তাই হবে না জলসা ফাঁকা।

ইতি তোমার অর্ধবিস্মৃত
মন্টুদা

'নিম্ন গোলোক সরণী'-র মানে কিছুতেই বুঝি না। আমার স্ত্রীই বললেন লোয়ার সার্কুলার রোড হবে।

ভীষ্মবাবুর অধিকাংশ সময়ই কাটতো ফিল্ম করপোরেশনে। সেইখানেই যেতাম। প্রথম প্লে-ব্যাক করেছিলাম ভীষ্মবাবুরই সঙ্গীত পরিচালনায় একটি হিন্দী ছবিতে—গরীবী। ডুয়েট গান।

এরপর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশনে খেয়ালে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। চীফ জাজ ছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ। লক্ষ্মৌতে শম্ভু মহারাজের কাছে কিছুদিন ঠুংরিও শিখেছিলাম, আমি ও সায়গল একসঙ্গে ভীষ্মবাবুর কাছে শেখার সময় উনি হারমোনিয়মে বাজিয়ে গাইতেন আর আমি তবলা বাজাতাম টেবিলের ওপর। মুসলমনী ফিংগারিং আমার তখনই রপ্ত হয়েছিল।

তারপর আমার রেকর্ড করা সুরু হল। সেই সময় প্রতিদিন গান লেখা এবং তাতে সুর বসানো আমায় নেশার মত পেয়ে বসেছিল।

গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমায় প্রথম নিয়ে গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। টেস্ট অডিয়েন্স নিয়েছিলেন হেমচন্দ্র সোম। এই মানুষটি প্রথম দিন থেকেই আমায় পিতৃস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন। আমার গান কেমন করে শ্রোতার মন ছুঁয়ে যাবে কিভাবে কার ট্রেনিং-এ আমার কণ্ঠে সুরের বিকাশ যথাযথভাবে ঘটবে, রেকর্ডিং-এর বেস্ট কোয়ালিটি কি করে আনা যায় এ নিয়ে ওঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না।

উনিই আমাকে প্রথম কাজীদার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কাজীদা এই ছেলেটির দিকে একটু ভালো করে নজর দিন ত? এর কণ্ঠ ভাল। আমার বিশ্বাস সত্যিকারের গুরু পেলে এ ফুলের মত ফুটে উঠবে।

কাজীদা আমায় এক ঝলক দেখে নিয়েই প্রশ্ন করলেন, 'তুই ঠিক করেছিস কি গাইবি?'— প্রথম প্রশ্নটি শুনেই মনে হল যেন কতকালের চেনা। না, না—চেনা বললে ভুল হবে, যেন কত আপনার জন। অতবড় গুণীর সামনে গাওয়ার কুণ্ঠা একনিমেষে কোথায় উবে গেল। প্রাণ খুলে গাইলাম নিজেরই লেখা এবং সুর দেওয়া একটি গান,

যদি বাসনা মনে
দিবে গহন জ্বালা
তবে মনের কোণে কেন
বাসিয়ে ভাল

এ সুরের প্রেরণা ভীষ্মবাবুর কণ্ঠে শোনা একটি রাগসঙ্গীত থেকে। আজ রয়লা—দিলীপদাকে শোনাচ্ছিলেন। নতুন রাগ বলেই মন টেনেছিল। নামটিও ভারী সুন্দর ঝাল্লা-মল্লার। ঐ গানটাই শোনালাম। কাজীদা মন দিয়ে শুনে বললেন, 'তোর লেখা ভাল। কিন্তু সুর আরও উত্তম। তারপর বুঝিয়ে বললেন, 'দ্যাখ নিজেরভাবে বিভোর হয়ে গানের সুরে আত্মপ্রদক্ষিণের গায়ে কোনো বাছবিচারের দরকারই করে না। কারণ এ গান শুধু আত্মতৃপ্তির জন্যই। অপরকে ভাল লাগাবার কোনো দায়-দায়িত্ব তার নেই। কিন্তু কমার্শিয়াল লাইনের গান একটু ভেবেচিন্তে বেছে নিতে হয়। কারণ তার সার্থকতা নির্ভর করছে অপরের ভাল লাগার ওপর।'

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'কাজীদা ভীষ্মবাবুর সুরটা কানে বাজছিল, তাকে ধরে রাখার জন্যই কথা বসিয়েছি'—উনি বললেন, 'বেশ করেছিস। আবার গা।' আমি গান সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কাজীদা যখন কথা বলতে সুরু করলেন মনে হল আমি যেন বটগাছের তলায় পৌঁছে গেছি। গান শেষ হতেই কাজীদা হাতে দিলেন আমার সুরে ও'র লেখা গানটি 'শাওন রাতে যদি'। বললেন, 'গা এবার।'

গাইবার আগের সে শিহরণ আজও ভুলিনি। আমার সুরে গান লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম—আর সেই গান রেকর্ড করব আমি, জগন্ময় মিত্র? এও সম্ভব?

আমি গাইছি আত্মহারা হয়ে। কিন্তু 'মেঘনা নদীর ওপারে' জায়গাটায় আসতেই মনটা যেন হোঁচট খেলো। আমি নিঃসংকোচেই বললাম, কাজীদা মেঘনা কথাটা বড় খটকা লাগছে।

উনি একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা তবে যমুনা নদী পারে' গা।

আত্মবিস্মৃত শিল্পী একটু থামলেন। দুটি চোখ জলে ভরা। রুদ্ধ কণ্ঠ মুক্ত করে বললেন, 'আহা সেসব স্নেহময় মানুষ-গুলোর সঙ্গে সঙ্গে একটা মধুর যুগ যেন হারিয়ে গেল।

—'শাওন রাতে'র উল্টো পিঠের গানটা কি ছিল? —আমি কথার খেই ধরিয়ে দিতে প্রশ্ন করি।

—উল্টোদিকে ছিল, গুণগুণিয়ে ভ্রমর এল। রেকর্ডটা দারুণ হিট করেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই হেমবাবু পরের রেকর্ড করালেন কমল দাশগুপ্তের সুরে। কেন বুঝতে পারছ? একই সুরকার অথবা গীতিকারের গানেই নিজেকে সীমিত রাখলে মনের প্রসারতা ব্যাহত হয়। গায়কীতে অনেক সফিস্টিকেশন এসে পড়ে, আর মনের গ্রহণ-শীলতাও কমে যায়। পরের রেকর্ডের গান দুটি হল, প্রিয় হবে প্রিয়তর ও জাননাকি তুমি কার। কথা প্রণব রায়ের। এ গানও শ্রোতারা ভালভাবেই নিয়ে ছিল।

এরপর একে একে রেকর্ডের সংখ্যা বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের হৃদয়েও জায়গা হল।

রেডিওতে নিয়ে গিয়েছিলেন অসিত-বরণ। আমি বলতে গেলে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রেডিওতে গাইতে সুরু করি। রেডিওতে এবং রেকর্ডেও আমার বেশীর ভাগ গানের সঙ্গে তবলা বাজিয়েছেন অসিতবরণ ও পরেশ ভট্টাচার্য। পরেশবাবুর মত অমন প্রকাশকুণ্ঠ, দরদী সঙ্গতিয়া খুব কম দেখেছি। হাতের ঠেকা যেমন মিঠে তেমনই অপূর্ব কায়দা, রেলা। অথচ নিজেকে জানান দেবার কোনো গরজ ছিল না। প্রত্যেকটি বস্তু এসেছে গানের অপরি-হার্য অঙ্গের মতই। রায়টের সময় হাতটা জখম হয়ে গেল। বড় দুঃখ হয়—তাঁর বাজনা এখনকার শ্রোতারা শুনতে পেলেন না।

—আপনি ক্লাসিক্যাল গানের পরিবেশে মানুষ কিন্তু শিল্পী হিসেবে আপনার প্রতিষ্ঠা পরিচিতি সবই আধুনিক গানকে ঘিরেই। এটা কেমন করে সম্ভব হল?

—একটা পেয়েছি খানিকটা পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশীদার রূপে। অন্যটা ঘটনা-চক্রে, বা কর্মজগতের তাগিদে। তাছাড়া আধুনিক গান বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কোনো পরস্পরবিরোধী বস্তু নয়। বটগাছের ডালপালা কি তার শরীর থেকে আলাদা হতে পারে? না, সাগর থেকে উৎসারিত নদী কোনো উদ্ভট ঘটনা? আমাদের মনের আনন্দ ও বেদনার আবেগই গানের ভাষায় কথা বলে। মহাকাব্য ও গীতিকাব্যে যা তফাৎ ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক গানেও

তাই। একটিতে ভাবের বহুধা বিস্তার যার মধ্যে সর্বকালের আবেগ আশ্রয় পায়। অপরটিতে একটি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতির ওপর আলো ফেলা হয়। জীবনে দুটোরই প্রয়োজন আছে। আর যে কোনো গানই যথার্থ সুরে ও শ্রুতিতে গাইতে হলে উচ্চাংগ সংগীতের ভিত্তি থাকা অবশ্য প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের পূর্বসূরী কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, শচীন দেববর্মন, কানন দেবী সায়গলের মত শিল্পীরা ও অন্যান্য সুরস্রষ্টা ও সংগীত রচয়িতারা বাংলা গানের এমন একটা ম্যাজেস্টিক কনভেনশন গড়ে তুলেছিলেন যে একে হাল্কা গান বলে উড়িয়ে দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

—আপনার সমকালীন গানে আপনার নিজস্ব অবদান কি?

আমার আগের যুগে শচীন দেববর্মণের ক্লাসিক্যাল ঘেঁষা গান, দিলীপ রায়ের তান-সমৃদ্ধ গান, কৃষ্ণচন্দ্র দের কীর্তন ও পঙ্কজ মল্লিকের রাবীন্দ্রিক ভাবানুসারী গান, সায়গলের গজলভাঙা গান—এইরকম নানা ধারা চলছিল—কীর্তন, ভাটিয়ালি লোক-গীতি ত ছিলই। কিন্তু গজল ভেঙে হিন্দী গান, যেটা গীত বলে পরিচিত হল, তার জনপ্রিয়তা সৃষ্টির মূলে আমার পরিশ্রম ও চিন্তা ছিল এটা জাহির করার জন্য নয়, সত্যের খাতিরেই বলছি।

বাংলা গানে আমার যেটুকু বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে যাঁদের অবদান প্রবল তাঁরা হলেন কমল দাসগুপ্ত ও সুবল দাসগুপ্ত। ও'রা দু-ভাই জানতেন কেমন করে আর্টিস্ট তৈরী করতে হয়। আমার টেম্পারামেন্ট, মানসিকতা অনুযায়ী তাঁরা আমার গানের সুর দিতেন। গানের মেজাজটিকে সঠিক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব সম্বন্ধেও তাঁরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। আজও মনে পড়ে, ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে'—গানটি সম্বন্ধে কমলদার ভাবকল্পনা। রেকর্ডিং-এর আগে হঠাৎ বললেন, দ্যাখ জগন্ময় এ গানটার রিয়েল এক্সপ্রেশন যদি আনতে চাস গলাটা দাবিয়ে হাস্কি আওয়াজ বার কর। কিন্তু সুরের প্রতিটি রেশ এবং গানের প্রতিটি কথা যেন স্পষ্ট হয়।

ঐ ভাবে গাইতে গিয়ে কখন যে গানের ভাবের সংগে একাত্ম হয়ে গেছি বুঝতেই পারিনি। ও'রা সুর, গান, শিল্পী তিনটি বস্তুকেই একাকার করে নিতে জানতেন—কারণ শিল্পীর কণ্ঠ ও গায়কীর ক্যারেক-টার স্টাডি করার মত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এ ক্ষমতা এসেছিল—সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁদের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন ছিল বলেই।

'সাতটি বছর আগে'—গানটি সুবলদা করেছিলেন সায়গলের জন্য, আর 'নাই বা ঘুমালে প্রিয়'আমার জন্য। কিন্তু ঠিক সেই-সময় সায়গলকে চলে যেতে হল বোম্বে। সুবলদা ও গান অন্য কাউকে দিয়ে গাওয়াতে রাজী নন। এসব বিষয়ে উনি দারুণ এক-রোখা ছিলেন। তখন হেমবাবুর ওকালতি শুরু হল আমার পক্ষে।

জগন্ময়কে দিয়ে একবার গাইয়েই দ্যাখো না? আমার বিশ্বাস ও পারবে।'

সুবলদা রাজি হলেন, কিন্তু একটি সর্তে—ও'র পছন্দ না হলে রেকর্ড রিলিজড্ হবে না।

প্রথম রেকর্ডিং হল ৩১।৩।৪২-এ। উনি শুনে বললেন, ফিফটি পারসেন্ট হয়েছে। আমার সম্মানে লাগল। আমিও জেদ ধরলাম—উনি প্রাণখুলে ভাল না বললে রেকর্ড বার হতে দেব না।

দ্বিতীয়বার রেকর্ডিং হল ২৩-৪-৪২এ। এবার ও'র মুখে হাসি ফুটল 'মন্দ হয়নি।' এত খুঁতখুঁতে ছিলেন।

যাই হোক, ১৯৪২ সালের পুজোয় রেকর্ড বেরোলো। সেই হল বাংলা গানে প্রথম কাহিনীসংগীত। রেকর্ডের সেল কল্পনাকে ছাপিয়ে গেল। আর ঐ রেকর্ড ঘিরে শুরু হল রাজ্যের যত গুজব, রসালো কাহিনী। রটল—স্ত্রী-বিয়োগের পর আমি নাকি কাতর হয়ে ঐ গান গেয়েছি। চিঠি আসতে লাগল প্রচুর, কেউ আমার দুঃখে সমবেদনা জানান। কারো কাছ থেকে আসে আসে উচ্ছ্বসিত প্রেমনিবেদন তাঁদের স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রকে। অথচ তখন আমার বিবাহই হয়নি। আমি উত্যক্ত হয়ে ঠিক করলাম এর প্রতিবাদ করে কাগজে স্টেট-মেন্ট দেব। হেমদা বাধা দিলেন। তিনি এসবে মহাখুসি।

বললেন, দূর পাগল এমন বোকামী করে? আর্টিস্টকে ঘিরে যতবেশী রহস্য সৃষ্টি হয় ততই তার পক্ষে ভাল। এ স্পেল ভাঙলে তোরই ক্ষতি হবে বেশী।

সেই সময় এইসব রেকর্ডের কোনোটাই এক লাখের কম বিক্রি হয়নি। আমার কনটেম্পোরারী যে কোনো আর্টিস্টেরই হিট গানের সেল ছিল ঐ রকমই। যদি কোনো রেকর্ড আশী হাজার কপি বিক্রী হত, হেমদা বলতেন 'ভেরী ডিসাপয়েন্টিং'—এক লাখে উঠলে তবে খুসী।

এসব গান রিলিজড হবার সময় আমি, কমলদা, সুবলদা কেউ-ই বিবাহিত ছিলাম না। হেমদা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন, তোমরা সব আইবুড়ো কার্তিকগুলি মিলে যা যা শুরু করেছ—

...আমার জীবনে প্রথম শোকের অভি-জ্ঞতা হল ঠাকুর্দার মৃত্যু। এ ঘটনার পর আমি এমন ভেঙে পড়েছিলাম যে ভেবে-ছিলাম গান আর গাইবই না। কারণ আমি গানকে পেশা করব ঠাকুর্দার এটা একদম অভিপ্রেত ছিল না, উনি চাইতেন গান করব আনন্দের জন্য। সেই সময় হেমদা আমার মনে জোর আনবার জন্য 'কাজী তোকে ডেকেছে' বলে কাজীদার কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি সদানন্দ মানুষটি বসে বসে পান চিবোচ্ছেন আর হারমোনিয়ম বাজা-চ্ছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কোনো কথাই বলেন না। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কি রে! দুঃখ পেয়েছিস বহুৎ আচ্ছা। ভুলিসনে যেন'। আমি হাঁ। তারপরই বললেন, দ্যাখ, সাধারণ লোক দুঃখের অভিজ্ঞতা যত ভুলতে পারে ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু শিল্পীর জীবনে দুঃখ হল পরম সম্পদ। সব দুঃখ মাথা পেতে নিবি কিন্তু সব সময় মনে রাখবি তোকে গাইতে হবে। দেখবি তোর সব চোখের জল গানের মধ্যে ফুল হয়ে ফুটেছে।

কাজীদার কথার সত্যতা শিল্পী-জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই বুঝেছি।

আধুনিক গান ও কাব্যসংগীত এ দুটোর তফাৎটা আপনার মতে কোথায়?—এতক্ষণে অবার প্রশ্ন করার অবকাশ পেলাম।

আধুনিক গান হচ্ছে ডাইরেক্ট লাভ সং আর কাব্যসংগীত হল লভ সং এসো-সিয়েটেড উইথ মিস্টিসিজম। 'ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে' কিংবা 'চিঠি' (প্রণব রায়) এগুলো হল আধুনিক গান। কিন্তু স্বপ্ন সুরভি মাখা দুর্লভ রাত্রি, জ্যোছনায় চন্দন আকাশে (শৈলেন রায়) এটা কাব্য-সংগীত। প্রণবদা ছিলেন আধুনিক গানের বাদশা আর শৈলেনদা ওয়াজ দি কিং অফ লাভ সং উইথ মিস্টিসিজম।

দুটি ঘটনা বলছি দুজনের মানসিকতার ছবিটি তুলে ধরার জন্য। আমার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী এলাহাবাদে। সেখান থেকে তাকে আনার জন্য মনটা ছটফট করছে। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত। প্রণবদা হঠাৎ বললেন, 'দুটো দিন অপেক্ষা কর'। তারপরই লিখলেন 'চিঠি' গানটি। বললেন এ গান রেকর্ড করে তবে যেও।

সে গান রেকর্ড করলাম, ...ই ঐ রকম মন নিয়ে না গাইলে ও ... অমন করে সবই নিত না।

আর 'স্বপ্ন সুরভিমাখা' গানটি রেকর্ড করার আগে শৈলেনদাকে প্রশ্ন করেছিলাম ফাগুনের গানে অপনি হঠাৎ জলভরা মেঘ-কে আনলেন কেন?—উত্তরে তিনি পাঁচ পাতা চিঠি লিখেছিলেন।

চিঠির বক্তব্য আমি জানতে চাইলে জগন্ময়বাবু পড়ে শোনালেন। উপলব্ধির এমন বিশ্লেষণ খুব কমই দেখেছি। সে চিঠি শুনে নতুন করে অনুভব করলাম ভাবের নিবিড়তায় তলিয়ে না গেলে এমন চিরায়ত গানের স্রষ্টা হওয়া যায় না। জায়গার অভাব। তবু দু-একটি অংশের উল্লেখ করবার লোভ সামলাতে পারছি না।

এক জায়গায় শৈলেন রায় লিখেছিলেন, পুষ্পধনুর কসরৎ দেখাবার জন্য মকরকেতু যৌবনরূপী গড়ের মাঠকে বেছে নিয়েছেন। এই যৌবনে প্রেম আসে বিচিত্র রূপে। অনুরাগের সংগে অভিমানের টাগ অফ ওয়ার চলে। হাসির লহমায় অকারণ অশ্রু নেমে রঙের ওপর রং লাগায়, যাকে বলে লাইট এ্যান্ড শেডের খেলা। তাই ত 'ফাগুন

না কাঁদে যদি ভালবাসা হল না—হাসি ও অশ্রু মাখামাখি না হলে প্রেমের মাধুর্য নিবিড় হতে পারে না।

এইরকম ছিল তাঁদের ধ্যান—সেই জনাই রসিকচিত্তে আজও তাঁদের আসন পাতা।

রেকর্ডিং সম্বন্ধে শৈলেনদার ধারণাটিও উল্লেখ করবার মতো। ও'র মতে গানের সঙ্গে মিউজিক যত কম দেবে ততই ভাল। উনি বলতেন, মানুষ তোমার গলা শুনতে চায়। বাজনা নয়। আজকাল যেন বাজনা চলেছে গানকে ছাপিয়ে, যার ফলে গানের স্বরূপকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

জগন্ময়বাবু বলতে লাগলেন, আমি যখন বোম্বে গেলাম শৈলেনদার বড় ভয় হয়েছিল যদি আমার মধ্যে ও'দের এত দিনের সযত্ন শিক্ষালালিত গানের ধ্যান বিচলিত হয়? কিন্তু পরে বুঝেছিলেন এ ভয় নিরর্থক। আমি সারাজীবন ধরে একটি কথা মনে রেখেছি। শৈলেনদার গান গাইতে হবে চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত রেখে আর প্রণবদার গান জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের জারকরসে মনকে ভিজিয়ে নিয়ে।

আমার এই মনটা তৈরী হয়েছে যাঁর সদাজাগ্রত প্রহরায়। আবার বলছি তিনি হলেন হেমচন্দ্র সোম। শিল্পীদের অতবড় শুভাকাংক্ষী কেউ ছিলেন না। উনি আমায় উৎসাহিত করবার জন্য নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। আহা! সে শান্ত, সমাহিত ব্যক্তিত্বের সামনে গিয়ে নিজেকে লুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছিল। উনি আমার গান শুনে গলার তারিফ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দুটি রেকর্ড করার অনুমতি দিলেন। প্রথমটি 'শুষ্ক পাতার সাজাই তরণী' আমি দু-একবার গাইবার পর 'শুষ্ক' কথাটিকে পাল্টে 'ছিন্ন' করে দিলেন। তারপর শেখালেন 'একদা তুমি প্রিয়ে'। শেখাবার আগে বললেন, 'এ গানটা একটু ভালবেসে গেও।' রেকর্ডটির সাদা লেবেলের স্যাম্পল কপি যখন ও'র কাছে পাঠানো হল উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে তার ওপর লিখে দিলেন 'অপূর্ব—আর এন ঠাকুর'। প্রচণ্ড খুসিতে ও.কে-র পরিবর্তে লিখলেন অপূর্ব।

অতবড় মানুষ ওর সম্বন্ধে কত ভয় ছিল। শুনেছিলাম নিজের গান সম্বন্ধে উনি ভারি পার্টিকুলার। সহজে কাউকে গাইতে দেন না। তিনি কত সহজে না আমায় কতখানি দিয়ে ফেললেন। দুর্লভের ধর্মই বুঝি অমন সাগরের মত উদার। যা আশে-পাশের প্রতিটি মানুষকে ঐশ্বর্যে ভরে দিতে পারে। বিরাটই পারে সহজ হতে। ক্ষুদ্রের সে শক্তি কোথায়? একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁরই একটি গান সম্বন্ধে, 'আরও একটু বোসো তুমি আরও একটু বল, পথিক কেন অধীর হেন নয়ন ছলছল। পথিক যে সে ত উদাসীন, বন্ধনহীন। তাঁর চোখে জল আসতে পারে কেমন করে?

কবি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'এ গান লেখবার সময় একখণ্ড জলভরা মেঘকে দেখে আমার পথিক মনে হয়েছিল। এক লহমা থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের এক প্রান্ত

নমস্কার—জগন্ময়/ধনঞ্জয়

থেকে আর এক প্রান্তে যাবার উদ্যোগ করছিল দেখে তাকে অনুনয় বিনয় করছিলাম—এসেছ যখন একটু গর্জন-বর্ষণ হোক। এত যাবার তাড়া কেন?'

আশ্চর্য! যেমন প্রশ্ন, তেমনই উত্তর।

জগন্নাথবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেবলই মনে হচ্ছিল উনি শুধু রসিক শিল্পী নন, ও'র মধ্যে শিল্পীর পাশাপাশি রয়েছে এক বিদগ্ধ, মননশীল দার্শনিক যাঁর উপলব্ধিতে প্রাণধর্ম ও মনোধর্মের এক বিরল সমন্বয় ঘটেছে। এতদিন ও'কে জানতাম বাংলা গানের দিকপাল শিল্পীদের অন্যতম বলে। ও'র ব্যক্তিত্বের এই দিকটা অজ্ঞাতই থেকে যেতো যদি না সেদিন সকালে ইন্টারভ্যু উপলক্ষ করে ও'র ভাবনার সান্নিধ্যে আসতাম। ঠিক এই কারণেই যে আসরে উনি গাইতে এসেছিলেন তার উদ্যোক্তাদের কাছে রীতিমত কৃতজ্ঞবোধ করছিলাম।

আপনার আলোচনায় কাব্য ও দর্শনের ছায়া বলে দিচ্ছে আপনি শুধু শিল্পীই নন, পণ্ডিত মানুষ। শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের আলোচনাতেও তাঁর ভাবগভীর হৃদয়ের ছায়াটি এইভাবে পড়তো। অনেক শিখেছি তাঁর কাছেও—

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে জগন্ময়বাবু বললেন, 'ওরে বাবা এক নিঃশ্বাসে দুটো নাম উচ্চারণ করবেন না। তাঁর জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও রসবোধের তুলনা হয় না। ও'দের মত বরেণ্য মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছিলাম বলেই কোনো দিন আত্মবিস্মৃত হইনি। একথার পরই জগন্ময়বাবু ফাইল থেকে পঙ্কজবাবুর একটি চিঠি বার করে পড়লেন, 'সুধাকণ্ঠ জগন্ময় তুমি জগৎজনের সম্মুখে জগতের মহিমা কীর্তন ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন কর। এই কামনা করি। ইতি। তোমার গুণমুগ্ধ পঙ্কজ মল্লিক। এই তাঁর শেষ চিঠি। এ চিঠি এখন আমার কাছে শুধু চিঠি নয়। পঙ্কজদার জীবন্ত আশীর্বাদ।

জগন্ময়বাবুর স্ত্রী এই সময় বললেন, গুজরাটে ও'র (জগন্ময়বাবুর) একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন দুপুরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় একজন আমায় পঙ্কজদার চরম সংবাদটি দিল। আমি জানতাম এ সংবাদ পেলে উনি কতখানি ভেঙ্গে পড়বেন। তাই বারণ করলাম তোমরা ও'কে কোনো কথা বোলো না। আমি সময় বুঝে বলব। বিকেলে যাবার আগে চা-খাবার সময় আস্তে আস্তে বললাম। উনি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর উঠলেন।

পঙ্কজ মল্লিকের প্রয়াণে আপনার কি রকম রি-এ্যাকশন হয়েছিল?—জগন্ময়বাবুকে প্রশ্ন করি।

আই ফেল্ট দি পাসিং এ্যাওয়ে অফ দি পিলার অফ মিউজিক। প্রথম মহালয়ায় ও'র সঙ্গে গান গাওয়া থেকে শুরু করে কত স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় করল। তখনই মনে পড়ল কাজীদার কথা, 'দুঃখ পেয়েছিস কখনও ভুলিস না। সেদিনই অনুভব করলাম আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থট। সে সন্ধ্যা নিবেদন করলাম তাঁকেই। তাঁর অনেক গানও গেয়েছিলাম। প্রবাসী বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী চিত্তও এক বিরাট সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করেছিল।

আপনার মধ্যে একটা উপচে পড়া আনন্দ আছে যা আপনার প্রত্যেকটি কথা-বার্তা অনুভব, স্মৃতিচারণকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এ আনন্দের উৎস কোথায়?

জগন্ময়বাবুর উত্তর সঙ্গীতের প্রতি প্রেমই আমার মনকে সকল অসামঞ্জস্যের সুরহীন তিক্ততা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাছাড়া অবসর সময়ে উপনিষদ, ধর্ম, রামায়ণ, মহাভারত পড়ি। ওর মধ্যেই মনের

সকল দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে। জার্মানীতে যেমন [illegible] ডিজাইন-এর প্রয়োজন আছে তেমনই মনের বিকাশের জন্য স্বতন্ত্রতা নৈতিকতা, [illegible] উদারতা সব রকম অভি-জ্ঞতাই দরকার। হেগেলের আইডিয়ালিজম-এর একটি কথায় আমার মন খুব সাড়া দেয়, ইট [illegible] হ্যান্ড দি সিনথিসিস অফ অল দি কনট্রারিস, দি হারমোনিয়াস ইউনিয়ন অফ দি ওয়ারলড অফ মিউজিক অ্যান্ড দি ওয়ারলড অফ অবজেকটিভ ওয়ারলড। ঋগ্বেদে একেই বলেছে শূন্য থেকে সৃষ্টি।

এসব পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। তাছাড়া জীবনে অনেক সাধক ও মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আমার সুযোগ ঘটেছে, যাঁদের মনের স্পর্শে এক নিমেষে মনের মধ্যে যেন লক্ষ প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় — একটি স্ফুলিঙ্গে হাজার বছরের আঁধার কেটে যাবার মত।

বলুন না একটু এই রকম সব অনু-ভবের কথা ?—

তুমি আজ আমার বলার নেশা লাগিয়ে দিলে। এত কথা আমি কারও কাছে বলি না—

শ্রীমতী মিত্র বললেন, সত্যিই উনি এসব আলোচনা কারও সঙ্গে বড় একটা করেন না—

প্রায় সব শিল্পীর কাছ থেকেই এ অপবাদ পাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে— জগন্ময়বাবু একটু হাসলেন।

আমি আবার তাগাদা দিই, কই বলুন ?

জগন্ময়বাবু আবার শুরু করলেন, শ্রীঅরবিন্দকে দেখার মুহূর্তটি আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আত্ম-সমাহিত সেই সাধককে দেখে মনে হয়েছিল যেন কৈলাসে সমাধিস্থ সোনার বরণ শিব। সারা দিন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নি। ঐ মূর্তিটি আমার স্মৃতি, দৃষ্টি, চিন্তা সব কিছুকেই এমনভাবে আচ্ছন্ন করে-ছিল। ওঁর কাছে পেয়েছি অনেক, ওঁকে গান শোনাবার সময় মনে হয়েছিল আমার সঙ্গীত সাধনা ধন্য হল। একবার ওঁকে লিখেওছিলাম,

এত দাও প্রভু
মনে হয় তবু
দেবার শেষ না হবে
তাই পাবার তৃষ্ণা এতই প্রখর
দেওয়াটাই ভুল ভবে।

সে চিঠি দেখে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা টেলিগ্রামে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন।

যেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, সেখানে কত স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে সে অভিজ্ঞতাও হয়েছে। ১৯৭৮ সালে অসুস্থ জয়প্রকাশ নারায়ণকে গান শোনাতে গিয়ে। গান শোনানোর আগে তিনি লিরিকটা আবৃত্তি করতে বললেন। করলাম, শুনেই উনি ঠিক ধরলেন এর মধ্যে থেকে অনেক স্ট্যানজা বাদ গেছে মনে হচ্ছে ? আশ্চর্য হয়ে গেলাম ওঁর সিকোয়েন্স অফ থট-এর আইডিয়া দেখে। তখন কবুল করতেই হল—আমাদের তিন মিনিটের রেকর্ড করতে হয়। দূরদর্শন বা বেতারে সীমিত সময়ের মধ্যে গাইতে হয় তাই এ করে না নিলে উপায় নেই।

জ্ঞানী ও সাধকের সঙ্গের মতই আমার কাছে আর একটি বাঞ্ছিত বস্তু হল মহা-কাব্য। মহাকাব্যের বহুবার-পড়া চরিত্র-ঘটনা এখনও অবসর সময়ে আবার পড়লে একটা চিরায়ত মধুরতায় মন ভরে ওঠে। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের একটি দৃশ্য। সীতাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্রের হঠাৎ মনে হল তাই ত। অযোধ্যালক্ষ্মী সীতার সঙ্গে ত কোন অলংকার নেই ? তখন তিনি নিজে বন থেকে ফুল তুলে এনে হার, দুল, চুড়ি, বালা, বল্কল রচনা করে সীতাকে পরিয়ে দিলেন। স্বামীর আদরে আবিষ্ট সীতা তখন বলছেন, আচ্ছা। আর কখনও যেন অযোধ্যায় ফিরে যেতে না হয় ? রামচন্দ্র বলছেন, সে কি ? দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের সময় উত্তীর্ণ হলেই আবার আমরা অযোধ্যায় ফিরে যাব। উত্তরে সীতা বলছেন, অযোধ্যায় ফিরলে মূল্যবান সব অলংকার, ঐশ্বর্য, ভোগ সঙ্গে আমায় মুড়ে রেখে, তুমি মেতে থাকবে রাজকর্ম নিয়ে। তখন কি আমার কথা তুমি এমন করে ভাববে ? না এমনি করে নিজের হাতে ফুলের গয়না পরিয়ে দেবে ? ভালবাসার আসল রংটা তখন দেখতে পাব না, যা আজ দেখলাম।

দি থিংস এন্ডস দেয়ার অধ্যায়ে আর কিছু নেই। কিন্তু ঐ কটি কথায় যে ছবিটি আঁকা হয়ে গেল তার ব্যঞ্জনার কি কোন সীমা-পরিসীমা আছে ? কখনও মনে হয় এই হল সত্যিকারের প্রেম। কখনও মনে হয় রাজমহিষীর ঐশ্বর্যময় জীবনের অন্ত-রালে চিরন্তন নারী হৃদয়ের কান্না শুনছি। এমনই কত কি মনে হয়। সত্যিকারের গানও এমনি। যতবার শুনি মনে হয় ওর মধ্যে অনেক না-বলা ব্যথা লুকোন আছে। কমলদা, সেই জন্যই কোন গান রেকর্ড করার আগে বার বার নানা ফাংশনে, বাড়িতে সে গান গাইতে বলতেন। ওঁর মত, গান গেয়ে গেয়ে পাচিয়ে দে। যত পচবে তত মজবে।

জগন্ময় থেকে জগমোহন অবধি সুবিস্তৃত সঙ্গীত জীবনে দেশ-বিদেশের কত মানুষকে তো আপনি গান শুনিয়ে-ছেন ? সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতি কোনটি ?

অনেক। এবং প্রত্যেকটির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ঠিক এই মুহূর্তে একটি মধুর ঘটনার কথা মনে পড়ছে। বোম্বের বাড়িতে একদিন একলা বসে গাইছি হঠাৎ সে ঘরে ঢুকলেন কবি [illegible]ন্দ্রনাথ। ১৯২৭ সালের ১৭ অক্টোবর [illegible]টা। আমায় গান থামাতে বারণ করে নীরবে বসে শুনতে লাগলেন। আর একটা কাগজে কি যেন লিখতে শুরু করলেন। গান শেষ হতে একটি সুন্দর কবিতা আমার হারমোনিয়ামের ওপর রাখলেন।

রসে, কাব্যে, বৈদগ্ধ্যে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হলেও জগন্ময় মিত্র সঙ্গীত জগতের প্র্যাকটিক্যাল দিক সম্বন্ধেও সজাগ। রেডিও ও টিভির অটোনমি কি সফল হবে—প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দিলেন, যদি পলিটিক্যাল পার্টির অ্যাফিলিয়েশনের ওপর কালচারাল বডির সভ্য নির্বাচন নির্ভর করে তবে এ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। আর সঙ্গীত বোদ্ধা যদি সত্যিকারের লোকের হাতে নিরপেক্ষ বিচারের দায়িত্ব দেওয়া যায় তবেই এ ব্যবস্থার মধ্যে কিছু আশা-ভরসা দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রসার ভারতীর পোজিশন কি হওয়া উচিত ?

বিলো দি চেয়ারম্যান বাট অ্যাবাভ দি ডিরেকটর জেনারেল। আর এক্সপার্ট ইন দি ট্রু সেন্স অফ দি টার্ম হওয়া উচিত।

আপনি দীর্ঘকাল ধরে বম্বেতে আছেন, ওখানের চিত্রজগতের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এ জগতে এত রাজনীতি, শ্রীহীন, ঈর্ষা, দলাদলি। তার মধ্যে থেকেও এই মনটা এমন করে বাঁচিয়ে রাখলেন কেমন করে ?

যে সব জিনিসের কথা তুমি উল্লেখ করলে তার থেকে বেঁচেছি নিজের সহজ

শিক্ষা, [illegible] ও মানসিক শক্তি দিয়ে নিজেকে [illegible] রেখে।

অনেকে [illegible] ওয়েস্টার্ন সুর আমার [illegible] অনুসরণ করেন নি ?

[illegible]। আদর্শের সততা বজায় রাখাটাই আমার চিরদিনের লক্ষ্য ছিল। এর জন্যই কখনও কোন অবস্থার সঙ্গে আমি কম্প্রোমাইজ করি নি। ওখানে আমার প্রথম ছবি সর্দার (অশোককুমার ও বীণা রায় অভিনীত) হিট করার পরের ছবিতে কর্মকর্তারা আমায় একগাদা ওয়েস্টার্ন মিউজিক-এর রেকর্ড এনে দিলেন। বললেন এই সুরে সেইক কথা বসিয়ে যাও দেখবে কেমন মজা আসে। আমি হাতজোড় করে বললাম, মাফ করতে হবে। তারপর বোঝালাম ভারত ও ইউরোপের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাব, আদর্শ ও [illegible] মধ্যে তফাৎটা এত বেশী যে, ও দুটো মেলে না। জোর করে মেলাতে গেলে গরমিলই শুধু হবে না, হবে গোঁজামিল।

একটু থেমে আবার জগন্ময়বাবু বললেন, মনের এই জোর আমি পেয়েছিলাম আমার সেই সব গুরুদের কাছে, যাঁরা আজীবন দারিদ্র্য যন্ত্রণার সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছেন তবু আদর্শকে কখনও আপোষ করতে দেন নি কোন ব্যবহারিক লাভের সঙ্গে। কমলদা, প্রণবদা, শৈলেনদা, হেমদা—আহা এঁদের কি কোন তুলনা আছে ? প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে এঁদের কি চিন্তা। কেন ? না রেকর্ডিং পারফেকট করতে হবে। মনে আছে কমলদা সব সময় বলতেন, মাইক্রোফোনের সঙ্গে সব সময় নিজের স্ত্রীর মত ব্যবহার করবি, তাহলেই ভাল রেজাল্ট পাবি। স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে সে আদরযত্ন করে। আবার দাঁত মুখ খিঁচোলে সে-ও ভেড়ে আসে। আমি হেসে ফেলতেই বললেন, হাসছিস যে ? ভাবছিস ইয়ার্কি করছি ?

আমি বলতাম, না, ভাবছি একজন ব্যাচিলার আর একজন ব্যাচিলারকে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার শেখাচ্ছেন। এ জগতে সবই সম্ভব তাহলে ? এ কথার উত্তরে কমলদারও হেসে ফেলা ছাড়া আর কি গতি ছিল ?

কমলদা মাইক্রোফোন হ্যাণ্ডলিং-এ [illegible] করতে পারতেন। একদিন একটা রেকর্ডিং করতে যাবার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞেস করলেন কে রেকর্ডিং-এ আছে জানিস ? আমি বলেছিলাম, না ত ? উনি বলেছিলেন, শোন তাহলে। যদি অমুক রেকর্ডিং করে তাহলে ৩৩ অ্যাঙ্গলে মুখটা রাখবি, চড়ার সা-এর পর থেকে। আর যদি তমুক রেকর্ডিং-এ থাকে ৪৫ অ্যাঙ্গলে। কার জোর করা অভ্যাস, আর আস্তে এ সবই ছিল ওঁর নখদর্পণে। ভাবতে কষ্ট হয় এমন সস্নেহ [illegible] প্রসাদ এখনকার

মিউজিক তৈরীর আগে [illegible] নির্দেশ দিচ্ছেন।

শিল্পীরা পেল না। এখন যান্ত্রিক যুগ, কমার্শিয়াল এ্যাটিচিউড। এত কপি সেল হলে শিল্পীদের মাথায় করে রাখবে না হলে সোজা দরজা দেখাবে। একজন শিল্পীর রেকর্ড কি করে উত্তরে দেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা নেই।

হঠাৎ ফাইল থেকে বেরিয়ে পড়ল হলদেটে কাগজের ওপর ঘন কালো কালিতে লেখা একটি চিঠি। এটা কেষ্টদার চিঠি। আহা। ঐ একটা মানুষ। গানের মধ্যেই যার রিয়ালাইজেশন ঘটেছিল। অথচ এই মানুষটার শেষ জীবন কি কষ্টেই না কেটেছিল। কথা কটি আস্তে আস্তে বললেন জগন্ময়বাবু, তারপর চিঠিটা পড়লেন।

শুনে আমার চোখে জল আসছিল। একটি চ্যারিটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছিল। তাতে গাওয়ার অনুরোধ। চিঠির এক জায়গায় ছিল, এর আগে চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরে হয়ে গেছে। এবার হবে কলকাতায়। একবার, দুবার মানুষকে বিনা দক্ষিণায় গাইতে বলা যায়। বার বার বলা যায় না। তোমায় কম করে কত দিলে পারবে ?—এই ধরনের কথা। অহর্নিশ অভাবের সঙ্গে যুঝেও কি বিবেচনা, সাহায্য প্রার্থী হতে কত সংকোচ।

হিমাংশু দত্তের সুরে কি গান গেয়েছিলেন ? প্রশ্ন করি।

'বেদনার মাঝে তোমারে খুঁজিয়া পাই' অপর দিকে 'প্রেমের না হবে [illegible]'। ঐ এক মানুষ ছিলেন। সব সময় সুরে বিভোর। কোন সুর গলায় এলেই হাতের কাছে সুর [illegible] জন্য কাকে পাওয়া যায় সেই চিন্তায় সদাই আনমনা। একদিন সকালে তাঁর বাড়ি গেছি। দেখি কাঁধে গামছা, মুখে নিমকাঠি। দাঁতন হয়ে যেতে গামছাটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাথরুমের দিকে এগোলেন। আমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললাম ও হিমাংশুদা। গামছাটা জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন কেন ?

এ্যাঁ। ও মা তাইত। দেখেছিস। গামছা নিমকাঠি ভেবে ফেলে দিয়েছি— এই রকম সব মানুষ ছিলেন ওঁরা

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে নটা থেকে ঘড়ির কাঁটা কখন দেড়টাতে পৌঁছেছে খেয়ালই ছিল না। উঠে দাঁড়ালাম। সাউথ পোল থেকে নর্থ পোলে যেতে হবে। কি আনন্দেই কাটল সারা সকাল।

কিন্তু আরও বিস্ময় বাকি ছিল পরের দিন সন্ধ্যার জন্য। সেদিন গিয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে নিয়ে। জগন্ময়-ধনঞ্জয় আসরের আর্জি নিয়ে। সে সভায় ছিলেন ওঁদের বাড়ির সবাই আর সাগর সেন। গানের আলোচনার চেয়ে বড় ছিল আড্ডা, গল্প। তারই মধ্যে পরিচয় পাওয়া গেল ওঁর খাঁটি বাঙালীয়ানার। ধনঞ্জয়বাবু অগ্রজের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় দিলেন কলাপাতায় মুড়ে আনা যুঁই ফুলের মালা। আর হাতে দিলেন দুই চরণের একটি স্বরচিত ছড়া।

শিল্পী অভিভূত। আমি ছবি তুলছিলাম। বললেন, এর কপি কিন্তু আমার চাই। তারপর বললেন, ধনঞ্জয় তুমি আমায়

বলেছিলেন [illegible] এই রাজনীতির মধ্যে এসে [illegible] [illegible] ভাল আছেন। [illegible] ডঃ [illegible]—তাই আমি [illegible]। [illegible] বললেন, প্রবাসে [illegible] আমি আমার ছেলে-মেয়েদের [illegible] সন্ধ্যাবেলায় শাঁখ বাজলেই হাত জোড় করে নমস্কার করতে। ওটা আমাদের হিন্দু [illegible], ওরা তাই করে।

আমার মেয়ে বিয়ের পর বিলেত যাবার আগে যখন আমার প্রণাম করতে এল তাকে বললাম, তোমার যা দেবার সবই ত দিয়েছি। একটি জিনিস শুধু দিতে বাকি আছে। হাতে একটি গীতা দিলাম। বললাম, রোজ সকালে উঠে দু লাইন করে পড়বে। পরের দিন পরের দু লাইন। এমনই করে যখন একদিন শেষ হবে দেখবে তোমার জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর, সকল সমস্যার সমাধান মিলে গেছে।

জগন্ময়বাবু ভারতীয় এবং বাঙ্গালী বিদেশে থেকেও এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেন নি বলেই কি সেই কথা আজ গোলাপে-চাঁপার এর চাঁপা কথাটিতে যখন পৌঁছন মনে হয় হৃদয়ভরা স্বপ্ন নিয়ে এক চিরকিশোর আজও চাঁপাবনে দাঁড়িয়ে আছে চাঁপার গন্ধে বিভোর হয়ে।

মনে আছে ধনঞ্জয় সারা রাত ধরে আমার বাসর জেগেছিলে তুমি, পংকজদা, হেমন্ত, কমলদা, সুবলদা, শচীন দেব আর্টিস্টদের ভিড়ে শালা-শালীরা হারিয়ে গিয়েছিল। প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠলেন জগন্ময় মিত্র। বললেন, জান স্ত্রী অপমান করেছিল বলে এক মিনিটে সিগেরেট ছেড়ে দিয়েছিলাম? ওর ভায়েরা ছিল চেইন স্মোকার। তা হলেও ও আমায় গঞ্জনা দিয়ে বলেছিল, তুমি কোন দিন সিগেরেট ছাড়তে পারবে না। ছাড়তে হলে মনের জোর দরকার। আমিও পাল্টা জবাব দিয়েছিলাম, তোমার ভায়েদের মত মনের জোর নেই সত্যি। তবু বলছি এই মুহূর্তে সিগেরেট ছাড়লাম।

সেই যে মুখ থেকে সিগেরেট ফেললাম, আজ অবধি আর একদিনও খাই নি।

পান খাওয়া ভাল। সিগেরেট নয়—গীতা দেবী বললেন।

যেহেতু তুমি পান খাও, জগন্ময়-বাবুর [illegible] এল সঙ্গে সঙ্গে।

রঙ্গভাবে কথাগুলি বললেও এ ঘটনা অবশ্যই ও'র চারিত্রিক দৃঢ়তারই পরিচয়।

কথায় কথায় কানন দেবীর প্রসঙ্গ উঠল। বৌদি বললেন, উনি সত্যিই মহীয়সী নারী।

জগন্ময়বাবু বললেন, একটা মজার গল্প শোন। সুরাটে আমার এক ভক্ত কণ্ঠের বাড়ি উঠেছি। তার বহু পুরনো সব রেকর্ডের কালেকশন আছে। আমায় বলল, তোমাদের এক বিখ্যাত গায়িকার একজনের সঙ্গে ডুয়েট শোন। বাজল, আয়ি বাহার অব আয়িয়ে। হসপিটাল ছবির গান। আমার ও কানন দেবীর ডুয়েট। ওরা কি শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছে কি বলব। ডুয়েট। ওরা এখনও ও'কে কি শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছে কি বলব।

আপনারা ত দুই দিকপাল রয়েছেন। বাংলা গানের ভবিষ্যৎ কি মনে হয়? —প্রশ্ন করি স্বভাবদোষে।

এ বিষয়ে দেখলাম উভয়েই আশাবাদী। কারণ ও'দের মনের তার একই সুরে বাঁধা। জগন্ময়বাবু বললেন, 'এখনকার বাংলা গানের কোনো ক্যারেকটারই নেই সত্যি। তবে চক্রবৎ পরিবর্তন্তে...। এ অবস্থা স্থায়ী হবে না। আবার আসবে গোলাপ চাঁপা, বকুল যুঁই-এর দিন।

ধনঞ্জয়বাবু মৃদু হেসে বললেন, 'গত দু'বছর ধরে আমিও এটা লক্ষ্য করছি। সবাই পুরোনো গান শুনতে চায় আর শুনতে শুনতে যেন পাগল হয়ে যায়। এখনকার ছেলেমেয়েরা এমন পুরোনো সব গান শুনতে চায় যে সব গান আমারই মনে নেই। এ নিয়ে তুমিও কতবার ক্ষুণ্ণ হয়েছ? আমার দিকে চেয়ে বলেন।

এমন মধুর সন্ধ্যা জীবনে খুব বেশী আসে না গাড়ী অবধি আমাদের এগিয়ে দিতে এসে ও'রা বললেন।

জগন্ময়বাবু বললেন, জানো ধনঞ্জয় আমার একবার ইচ্ছে করে কলকাতার আসরে বাবুল মেরা গাইতে। সায়গল আর আমি একই সঙ্গে ও গানের তালিম নিয়েছিলাম শম্ভু মহারাজের কাছে। মহারাজের কাছেই শুনেছি লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে পাল্কীতে করে যখন ফাঁসি দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেইসময় তিনি বললেন, 'আহা মেরে ফেলাত হাতেই আছে তার আগে একটু দাঁড়াও না ভাঙ্গা যন্ত্রটা নিয়ে একটা গান গাই'—বলেই ধরলেন বাবুল মেরা নইহার ছুটো যা। নিউ থিয়েটার্স থেকে সায়গলকে পাঠানো হয়েছিল শম্ভু মহারাজের কাছে। কারণ তাঁর কাছেই অরিজিন্যাল সুর ভাও সব ছিল।

কথায় কথায় এল বাণীকুমারের প্রসংগ। গানের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিষ্ঠা হবার পর বাণীদা একদিন বললেন, গান ছাড়া জীবনে কিছুই ত চিনলি না। এবার একটু অভিনয় শেখ, তাহলে হিরো হতে পারবি। বাণীদা অভিনয় করলে বংশের কুলাঙ্গার বলে বাড়ী থেকে বার করে দেবে। আমি কাঁচুমাচু হয়ে বলেছিলাম।

পাকামো রাখ বাণীদা বললেন, তৈরী হল বিষ্ণুপ্রিয়া গীতিনাট্য। একটি সংলাপে আমি শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় সরযু দেবীকে বলব, 'তুমি জান আমি তোমায় কত ভালবাসি বলেই প্লেটনিক [illegible] সংজ্ঞা দেওয়া একটি ডায়লগ। বক্তব্য [illegible] হেসে ফেল বয়োজ্যেষ্ঠাকে এভাবে সম্ভাষণ করার অভ্যাস ত নেই। বাণীদা ঠাণ্ডা ঘরে বসে যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছেন [illegible] ও'র মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে [illegible] পরই দেখা গেল রাগের ঝিলিক। কিন্তু ও-ঘর থেকে আমায় বকতে না পেরে গুমরোচ্ছেন। মহা সমস্যা।

কিন্তু আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সিচুয়েশন সামলালেন সরযু দেবী। আমার ডায়ালাগ উচ্চারণের সংকট দেখে নিজেই হঠাৎ মধুর কণ্ঠে বললেন, 'হে স্বামী। আমি জানি তুমি কি বলতে চাও। বলেই আমার ডায়লাগ হুবহু আবৃত্তি করে প্রশ্ন করেন, এই ত তোমার বক্তব্য?

সেইদিন ও'কে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছিল। উত্তরকালে ইনি নাট্যসাম্রাজ্ঞী হয়েছেন এমনি এমনি?

সরযু দেবী তো রেকর্ডিং সামলালেন। তারপরের পর্ব কে সামলায়? বাণীদা রাগে গর্জন করতে করতে আমায় তেড়ে মারতে এলেন। আর আমি সবেগে ছুটতে সুরু করি। দুজনেই দৌড়চ্ছি। আর স্টুডিওশুদ্ধ লোক হেসে গড়াচ্ছে। এইরকম ছিল তখনকার বেতার। গ্রামোফোনের স্টুডিওর পরিবেশ। এমন আনন্দ না থাকলে মনে প্রাণ আসে?

আপনি পুরোনো গানগুলো আবার রেকর্ড করুন—ধনঞ্জয়বাবু বললেন—

কিন্তু সে গান কি লোকে নেবে? তোমার কি মনে হয়—আমায় প্রশ্ন করলেন শিল্পী।

আমি বললাম, কোনটা মানুষ নেবে কোনটা নেবে না সেটা আগে থেকে কিছু বলা যায় না। অনেক সময় অনেক প্রত্যাশিত লাভ ও ক্ষতি শূন্যতায় দাঁড়ায়। আবার যেটা সম্বন্ধে কেউ কোনো আশাই রাখে না সেটা আশাকে ছাপিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যায়। তবে সবচেয়ে ভাল হয় আপনার পুরোনো গানগুলির যদি একটি এল-পি ডিস্ক গ্রামোফোন কোম্পানি প্রকাশ করেন। এতদিন এটা করা উচিত ছিল। আমরা তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছি যেন এ বিষয়ে তাঁরা মনোযোগী হন।

সে সন্ধ্যার আসর একসময় ভাঙ্গল। গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়া হল। ও'রা দুজনে (সস্ত্রীক শিল্পী) হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর ধনঞ্জয়বাবু গাড়ীর মধ্যে নীরব। মনে হল একটা যুগ যেন তার আনন্দ, গৌরব, রস, উচ্ছলতা সবকিছু নিয়েই এ'দের মধ্যে আজও বেঁচে আছে। সেই কল্লোচ্ছ্বাসে নেচে ওঠে তাঁদের সান্নিধ্যে আসা প্রতিটি মানুষের চিত্ত। হোক না তার স্থায়িত্ব এতটুকু।

সুব্রত চৌধুরী

বাটুলের আত্মদর্শন

বাহারউদ্দিন

সে বাড়ি থেকে বেরোল। তার পেট চলল আগে আগে পথ দেখিয়ে। পেছনে ছুটল তার মাথা। তার কোমর। হাত পা। যেন অবোধ বাধ্য কতগুলো বালক। দৃশ্য অতুলনীয়। মনোহর। কিছুটা এগিয়েই সে বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে কটাক্ষ হেনে বিদায় নিল। ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক করে হাসবার চেষ্টা করল। সে স্বভাবত দাঁত খুলে হাসে না। হাসতে গেলেই দাঁতগুলো, যা, সব সময় খাই-খাই স্বভাবের, বিসদৃশ, বেরিয়ে দর্শককে কংকাল দৃশ্যে ভয় দেখায়, ফলে, সে অমূল্য-ধনের মত দাঁতগুলো গোপন রাখে। আজ হাসতে গিয়ে আচমকা আরো বেশী বিপন্ন বোধ করল। মুখ-ভরা পান। পান পড়ে যাবার ভয়ে দাঁত দিয়ে ওষ্ঠ চেপে ধরল। দিনের মন্দ, চাপ দিতেই কাশী উঠল। কাশীর গকমে—সুড়ুত বুড়ুত প্যান্ট-সার্ট পানের পিকে একাকার হয়ে গেল। সে ভয়ার্ত শিশুর মত কাতর দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি স্ত্রীর দিকে তাকাল, মনে মনে বলল—'ভগবান রক্ষা করো'। স্ত্রী ইতি-মধ্যে বাটুল স্বামীকে বিদায় জানিয়েই গৃহান্তরে প্রবেশ করেছে বলেই রক্ষা, নতুবা যাবার আগে আগেই এক রাউণ্ড হয়ে যেত। বাটুল কেবল স্ত্রীর কাছেই অসহায়। অন্যত্র তার বীরত্ব—যেমন বাজার, বাস, ট্রাম, অফিস বা বাড়ির ভৃত্যের কাছে অত্যন্ত প্রতুল। দেখার মত। জন্ম সূত্রে বাটুল মুসলমান, স্ত্রী হিন্দু, সুতরাং স্ত্রীর কাছে বাটুল মাতৃভক্ত সন্তান মাত্র। স্ত্রী সুন্দরী, সুতরাং সম্বল। স্ত্রী গম্ভীর, সুতরাং তার কাছে সাগর-সদৃশ। স্ত্রী চাকুরে, শিক্ষিতা, সঙ্গীতা, বলেই স্ত্রী গর্বে গর্বিত বাটুল দাসানুদাসের মত না হলেও সর্বদা স্ত্রী-কেন্দ্রিক।

স্বামী শান্তিনিকেতন যাবে। শান্তি-নিকেতন যেন বা শ্বশুরবাড়ি। পতিভক্ত স্ত্রী স্বামীকে মনের মত সাজিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বলে দিয়েছে, 'এদিক ওদিকে চোখ দেবে না, শান্তিনিকেতন খোলামেলা আশ্রম। মনে রাখবে।' সাহেব এতই বিশ্বস্ত, স্ত্রী ভক্ত যে, স্ত্রীর সতত হুঁসিয়ার।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে টান টান হয়ে হাঁটে। যন্দূর সম্ভব ভুঁড়ি যা আন্ত-র্জাতিক সীমা সামলে রাখার চেষ্টা করে। ভুঁড়ি বেসামাল। টাইট ফাইভ রাইফেলস বেল্টের বাঁধা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসছে। বাটুল শ্বাস বন্ধ করে করে হাঁটার প্র্যাকটিস করে এগোচছে। চোখ দুটো খুলে দেয়। বাঘা বাঘা চোখ। এই চোখ নিয়েই তার যত অহংকার। আজ সে হাইহিল পরেছে। জুতোর ঘটাস ঘটাস শব্দে ভূ-ভাগ প্রকম্পিত। তার নিজেকে যুবক যুবক মনে হল। মুখের চাইতে প্রসারিত সাইকেল-এর হ্যাণ্ডেলমার্কা গোঁফ যেন গোঁফ নয়—কালো ছাইয়ের আঁচড়। তার গোঁফ দেখে ছাত্রছাত্রীরা হাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গোঁফ চাঁদ বলে নাম পড়েছে। ছাত্রীরা পরস্পরে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল দেখায়। বাটুল টের পেয়েও পায় না। সাপের গর্তের মত ভেতর ঢোকানো চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে দেয়াল ভেদ করে। কারো কারো বক্ষ। তার বিশ্বাস এই দৃষ্টিতেই নারীকুল কাতর। চঞ্চল। উন্মনা।

বাটুল অনেক দিন পর আজ হাফ-হাতা সার্ট পরেছে দূর থেকে মনে হবে চলন্ত বাটুলের হাত দুটো বিচ্ছিন্ন, লট-কানো ডালের মত ঝুলে ঝুলে তার শরীরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোচছে। বাটুলের পাট-কাঠি হাত-পা লোমাবৃত। বাটুলের শরীরে অজস্র লোম। কানে লোম। পিঠে লোম। বুকে আসামের ঘন জংগল। বউ বলে লোমের বাদশা। তাকে দেখলে মনে হয়, বানর থেকে বিবর্তিত হবার বেশী দিন হয়নি। ডারুইন সাহেব বাটুলকে দেখেননি, দেখলে মানব-ফসিল নিয়ে অতসব কাঠ পোড়াতেন না, থিওরির সাক্ষাৎ-প্রমাণ হিসেবে বাঁটুলকেই তুলে ধরতে পারতেন। শাস্ত্রবিদ যারা বিবর্তনে অবিশ্বাসী, বাটুলকে দেখলে তারাও চমকে যাবেন। ঈশ্বরের আশ্চর্য সৃষ্টি, বানর বটে। কথায় বানর। চলায় বানর। ছোটবেলা মা বলত বাঁদর। দাদু বলত বানর। বানরের মত বাঁশ ঝাড়ে, আমগাছে পেয়ারা গাছের ডালে ডালে লম্ফঝম্প আজো বহাল। কয়লা ধুইলেও ময়লা। এই তো সেদিন রোববার। ছুটির দিন। বউ বলল 'বাজারে যাও'। তার

ইচ্ছে নেই। ঝামেলা। অথচ বউয়ের ভয়। পালাতে পারলেই বাঁচে। ব্যাগ-বোঁচকা নিয়ে টেনে যাও,-আল, এসব পোষায় না। প্রেস-টিজে লাগে, মাস্টার মানুষ। বউই সব। গৃহকর্তা, গারজিয়ান, ট্রেজারার। সে মুক্ত। সেদিন বাজার-ভার পড়তেই আঁতকে উঠল। সামনা-সামনি না বলতে পারল না। বউ আড়াল হতেই বাজারের ব্যাগ যথাস্থানে রেখে দিয়ে এক লাফে উঠে পড়ল ঘরের কাছাকাছি পেয়ারা গাছে। নির্বাক পেয়ারারা হাত-পায়ে ধরল। সে বে-পরোয়া খপাস খপাস করে আধের্ক খায়, আধের্ক নিচে ফেলে। বউ পয়সা নিয়ে ফিরে এসে দেখে নাগর-হীন বাজার ব্যাগ একাকী ঝুলছে। বউ এদিক-ওদিক খুঁজল। বানর না-পাত্তা। ডাকল। শব্দহীন, হদিশ নেই। ঘরে বাইরে, খাটের নিচে, সর্বত্র খুঁজল। পেল না। একসময় ভাবল, নাগর বাজার-ভয়ে পালিয়েছে। আরেকবার ভাবল পলাতক নিশ্চয় বড়-ঘরে লুকিয়ে পড়েছে। তা হতে পারে বড়ঘরের দরোজা আটকানোর মতই মনে হল। এই আন্দাজে বড়ঘরের দরোজায় তালা দিয়ে চলে এল। নাগর বাজারে যাবে না থাকো। তোমার তো আর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে না ওপারে। এপারেই বন্ধঘরে আজ সারাদিন স্বর্গ-সুবাস নাও। বানর গাছের ওপর থেকে দৃশ্য দেখছে। দেখতে দেখতে পেট ফুলে উঠল। আর সহ্য হয় না। হঠাৎ বউয়ের পিঠে একটুকরো বানর-খাওয়া পেয়ারা ছুঁড়ে মারল। বউ এদিক-ওদিক দেখল। গাছের আড়ালে তাকে দেখতে পেল না। সে এবার বিড়ালের আওয়াজ দিল,—মেঁউ, মেঁউ। বউ এবার দেখতে পেল। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে তাকাল। তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ায়। বানর লুঙ্গি পরেছে। তাবৎ শক্তি নিয়ে বানরী চিৎকার জুড়ল, 'অশ্লীলতা বর্জনীয়।' ভয়ে বানর আত্ম-সামাল দিল। বউ লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। লাঠি হাতে বউকে দেখেই লাফিয়ে পড়ল বানর। পড়েই উঠে দাঁড়িয়ে বানরীর গালে অতর্কিত আক্রমণ বসিয়ে পালিয়ে গেল। সেদিন বানর-বানরীর বাড়িতে বাজার এল না। বানরী শাক ডাল দিয়েই চালিয়ে দিল। বানরী আজকাল কিছুটা ধেমসী হয়ে উঠছে। অবশ্য সামান্য। এরকম হাল্কা-পাতলা ধেমসী ধেমসী শরীর বানরের পছন্দ। বানরীর ভালো লাগে না। ওজন বাড়ছে। খেয়েদেয়ে নড়তে ইচ্ছে করে না। বানরী খেয়ে একা একাই বিছানায় চিত হয়ে পড়ল। একসময় বানর ফিরে এল। আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। বানরী চোখ খোলে। আবার পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বানর ভয়ে ভয়ে বিছানায় বসল। বানরীর শরীরে হাত দিল। বানরী হাত সরিয়ে দিল। বানর আদর করার চেষ্টা করে। বানরী প্রত্যাখান করে। বানর কেমন অসহায় ঝামেলা। নড়া-চড়া করলেই ঝগড়া হতে পারে। বানরীর পাশে শুয়ে থাকল। বানরী মুখ খোলে, 'ভাত ঢাকা আছে। কারোর ইচ্ছে থাকলে খেয়ে নিতে পারে।' পরিবেশ কিছুটা সরস হয়ে আসছে দেখে বানর অভিমানে গলে পড়ল। 'আমি গোস্‌সা করেছি, খাব না।' বানরী কথা বাড়ায় না। বানরীর আবার ঘুম পেল। বানরের ক্ষিদে পায়। বউয়ের শরীরে হাত পড়ল, বউ নড়ে না। গাছের খাড়ি হয়ে পড়ে থাকল। বানর উঠে চোরের মত খেয়ে-দেয়ে এসে বানরীর পাশা-পাশি চিত হয়ে পড়ল। বানর বানরীর দৈনন্দিন ঘটনা অনেকটা এরকম।

শান্তিনিকেতনে রওনা হবার আগের দিন বাসস্টপে হঠাৎ কবি সজীবানন্দের সঙ্গে দেখা। সজীবানন্দ অনেক দিনের বন্ধু। কবিকে দেখেই বাটুলের আগামী ভ্রমণসংবাদ বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। কবিও বন্ধুগর্বে আত্মহারা। ভাগ্যের কথা। আর ভাগ্যই বা কি, এতো কর্মফল! বিদ্যাপ্রীতির পুরস্কার। কল গার্লরা যেমন কল পায় ঘন ঘন, পণ্ডিতদেরও তেমন ভাগ্য। কল। বিরাট ব্যাপার-সেপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। পাবলিশ এন্ড প্যারিস করে করেই বছর কাটে। এই তো বাটুল যাচ্ছে শান্তি-নিকেতনে। কি একটা সেমিনার যেন, অহ্ হো, 'ইমপেক্ট অব টি স্টলস ইন ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটিস।' অমূল্য টপিক। দেশ-বিদেশের টাকওয়ালা ঢাকওয়ালা বিদ্যা-দাতারা আসবেন। বাটুলেরও ডাক পড়েছে। সারা বছর বাটুলের শান্তি নেই। এখনে গাও। ওখানে যাও। সে এখনো কিছুটা তরুণ, অতএব তার দায়দায়িত্বও অনুরূপ। হাল্কা। সবুজ। সজীব।

'ওখানে আমার মেয়ে আছে, আলাপ করে নেবেন।'—কবি মেয়ের নাম-ঠিকানা ইচ্ছে করেই গোপন রাখল। কবির কাছে বাটুলের জীবন-দর্শনের একটা দিক ইন ফিনিট নারী-সেবা স্বল্পজ্ঞাত হলেও আজ্ঞাত নয়। এই ব্যাপারে দুই বন্ধুই কেউই কারে নাহি পারে সমানে সমানে। একটা বাস এল। চলি বলেই কবি সিজনড পকেটমারের মতই বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল। বাটুলের বন্ধু-কন্যার নাম-ঠিকানা জানা হল না। বাটুল বন্ধুর চালাকি বুঝতে পারল। আফশোষ নেই। ঠিক হ্যায়। তুমি যে বিলের মাছ, আমি সেই বিলের চিল। তুমি যখন গাছে গাছে, আমি তখন পাতায় পাতায়। চিড়িয়া হাত মে আ জায়েগা। এই আত্ম-বিশ্বাসে বাটুলের মন আসন্ন এক নতুন মিলনের জন্য নেচে উঠল। তার ইচ্ছে ধেই ধেই করে নেচে উঠে। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে সে নিজেকে শান্ত করে। হাজার হলে ও শিক্ষক। এখনো একটা আছে যার নাম লজ্জা। অন্য নাম প্রেস্টিজ।

ট্রেনে চেপেই বাটুল তার সুন্দরী ভার্যার কথা ভুলে গেল। ট্রেনে দম-মারা ভিড়। বাটুল মাস্টারী কায়দায় সিট দখল করে নিল। বসল। পায়ের ওপর পা তুলল। সিগারেট ধরাল। আহ দারুণ! একে বলে ভাগ্য! বাস-ট্রেনের যাত্রীর ভিড় দেখলে বাটুলের দেশের বেকার সমস্যার কথা মনে হয়। স্টেশনে ট্রেন থামে, একটা সিট খালি হলে, দশজন ওঠে. চাকরী থেকে বয়বৃদ্ধরা অবসর নেয়, একজন বা দুজন, সঙ্গে সঙ্গে চাকরীর জন্যে আরো দশটা হাত এগিয়ে আসে। এক-দুজন নিয়োজিত হয় অন্যরা চেঁচায়। নীরব থাকে। ট্রাম-বাসের ঘটনাও অনুরূপ বাটুল বসে বসে সেই কথা ভাবছে। তার সামনে এক সুশ্রী কিশোরী। স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট চেহারা। দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরীকে দেখে তার হৃদয়-প্রীতি প্রায় উপচে পড়ে। সে মেয়েটির দিকে একবার তাকাল। দুবার তাকাল। নিখুঁত। মা এ অন্যায়। কিশোরী মাতৃজাত। কিশোরী দাঁড়িয়ে থাকবে, পাপিষ্ঠ সন্তানেরা চোখ খুলে বসে থাকবে। নো। ইটস রং। কিশোরীর জন্যে সে কষ্ট পায়। মেয়েটি কি নেহাৎ কিশোরী? না তাও নয়। ফ্রক পরেছে বলেই কিশোরী। নইলে বাটুল কষ্ট পায়। মেয়েটির জন্যে যাত্রী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে লড়ে যাবে। চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা। সাম্যবাদী-বন্ধু তনয়া ঘামছে। বাটুল ঘামছে। তার ভেতরে জোয়ার এল। সে এই ফুলিস, নিস্পৃহ যাত্রীদের সঙ্গে লড়বে, মেয়েটিকে, বিশেষ করে তার কাছেই বসার জায়গা করে দেবে। হি মাস্ট। অকস্মাৎ বেঞ্চে বসে থাকা যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে তাবৎ শক্তি নিয়ে বলল, 'মেয়েটির খুব কষ্ট হচ্ছে, বসার একটুখানি জায়গা করে দিলে হয় না?' বলেই সে তার পাশের লোকটাকে সরাবার চেষ্টা করে। পাশের লোকটা পঞ্চাশ ইঞ্চি বুকের পাটা নিয়ে আরো শক্ত হয়ে বসে। দেখলেই মনে হয় নির্ভেজাল স্মাগলার। যাত্রীরা নিরুদ্বেগ। নিস্পৃহ। বাটুলকে শ্লোগানধর্মী ব্যর্থ প্রতিবাদীর মত শুকনো দেখাল সে আবার সাহস সঞ্চয় করল। এবার একজন সজীব, ভালোমানুষ গোছের বৃদ্ধ, 'এখন না ভাই, লেটাস ট্রাই' বলে বাটুলকে সঙ্গ দিলে। বাটুল আরো একজন দাবীদারের সঙ্গ পেল। সায় পেয়ে সে আবার লড়ে যাও বাঙ্গালীর উৎসাহ পায়। মেয়েটির বসার জায়গা হয়ে গেল। মেয়েটি বসল। কোন শব্দ করল না। মেয়েটি লাজুক। ভদ্র। লতার মত। পাতলা। মেয়েটির সঙ্গে বাটুলের অলাপ জমে উঠে। নিজে একটু সামনের দিকে এগিয়ে মেয়েটিকে সোজাসুজি বসার আরাম করে দিল। মেয়েটির সামনের দিকে তার পিঠের ছোঁয়া। ট্রেনে হেলেদুলে চলছে। ট্রেনের ঝিংঝাক ঝিংঝাক শব্দ পশ্চিমা সঙ্গীতের লহর তুলে তুলে শরীরে শিহরণ জাগায়। স্বর্গ-পদার্পণের সুখানুভূতিতে বাটুল এখন তৃপ্ত। রাত এগোচ্ছে। ট্রেণ এগোচ্ছে। যাত্রীরা ঝিমুচ্ছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে মেয়েটি নড়াচড়া করে। দুই দিকে পুরুষ। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে আমেরিকা, মেয়েটি ঘামে। কপালের ভাজ ফুলে উঠে। আর বসা যায় না। এক সময় ছারপোকার উৎপাতের অভিযোগ করে উঠে পড়ল।

শব্দহীন বাজ-পতনে বাটুল অপ্রস্তুত। সে বসে থাকল। যাত্রীদের পরস্পরে চোখাচোখি হয়। অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। দু-একজন সংগ্রামী যাত্রী তারাও নিশ্চুপ। চড়াই-উৎরাই পরিস্থিতি। না এ সময় চুপ করে থাকা যায় না। শব্দ করে করেই গা-ঢাকা দিতে হবে। মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির উপবিষ্ট ঠাকমার চোখে অসহায় দৃশ্য। বাটুল এবার মুখ খোলে। এতক্ষণ সে ছারপোকা অনুভব করেনি। এখন করবে। সে ছারপোকার চৌদ্দগুষ্ঠীর উদ্ধারে নামে। সুরু হয় এরকম যে, ছারপোকা স্বভাবত ভদ্র ও চোর, অসভ্য। মশা তুলনামূলক, বলে রসিয়ে রসিয়ে। সে পাশের ল্যাগলার টাইপ ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বলে, 'দেখুন, মশাও রক্ত চোষে, জোঁকও রক্ত চোষে। কিন্তু ওরা ঐ ছারপোকার মত অত বেরসিক নয়। মশা তো রীতিমত কালচারড। হিউমারাস। সংগীতজ্ঞ। রক্ত চোষে ঠিকই, আসে হাঁক-ডাক করে। বীরের মত। গান শুনিয়ে। ছারপোকা? সে হাড়ে-বজ্জাত। সর্বত্রই এদের স্বভাব চুরি চুরি।' যাত্রীরা নিরুত্তর। সে বলে যায়। কিছুটা জোর পড়ে, তবে শব্দে, ভাষায়। বিপ্লবী মেজাজ ঝুঁকে পড়ে। 'আমারই বিছানায়, বালিশে থাকবে, আর লুকিয়ে লুকিয়ে আমারই রক্ত চুষবে। না এটা হতে পারে না। পাশের বৃদ্ধ ভদ্রতাসূচক মুচকি হাসিতে রসাসিক্ত বাটুলকে সম্মতি জানাল। মধ্যরাত্রে তার এই প্যাক প্যাক স্বভাব কারোরই হয়ত ভালো লাগছে না। ট্রেন বলে কেউ প্রতিবাদ করছে না। কেউই তার বিড়াল বিড়াল রসিকতায় সায় দিচ্ছে না। সবাই নীরব। সহজ হয়ে আসে পরিস্থিতি। বাটুল ও ঝিমিয়ে পড়ে। কানের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ঝুরঝুরে হাওয়া। বাটুলকে বিষণ্ণ দেখায়। বাটুল নিজের মুখ দেখতে পেল। রাত সুন্দর। মধুর। নিরস্ত্র। ট্রেনের রাতকে বাটুলের বাসর রাত্রির মত মনে হয়। মাঠের প্রসারিত দৃষ্টিতে খুলে পড়ে এক অন্য জগৎ, যে জগৎ পরকালের মত অন্ধকার, অদৃশ্য। বাটুল আবার নিজের মুখ দেখতে পেল। রহস্যময়তায় তার ভীষণ ভয়। সে ট্রেনের রাত্তিরে ফিরে আসে। ফিরে যায় বাসর রাত্রে।

ট্রেন বোলপুর পৌঁছোয়। এত রাত, না ভুবনডাঙ্গার ফাঁড়ি দিয়ে পাড়ি দেওয়া যাবে না। পারবি না [illegible]। দুঃসাহস ভালো নয়। হোটেল দেখ। বাটুল আদর্শ হিন্দু হোটেল' টাইপের এক হোটেলে আশ্রয় নিল। হোটেলের দরজা, জানলা, আসবাব, খাট প্রভৃতির বনেদী ময়লা দেখেই প্রথমে তার মাস্টার রক্তে তুফান ওঠে, অন্যায়, সর্বত্র অন্যায়, প্রতিবাদ করো তাও বিপদ, তুমি জায়গা পাবে না, তোমাকে স্টেশনে থাকতে হবে। বাটুল ধৈর্য ধরল। মাত্র এত রাতের ব্যাপার। তারপরেই তো আবার সেই রাজার হালে থাকো। খাও, বড়াই করো, বাজাও। নিজের ঢোল নিজে নিজে। সে প্যাঁচার মত ফ্ল্যাট মুখওয়ালা জগা জগা চেহারার ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার এখানে ছার-মশার হালচাল কি রকম?' জগার ফাটা-চেরা ভাঙা আওয়াজে তার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল। 'কি বললেন?' বলতেই ভড়কে গেল। 'শুনুন, ওসব কাজকারবারে আমি নেই।' ম্যানেজার উত্তর দিল। হা রে কপাল, ছার-মশা বলতে লোকটা কি বুঝল বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলে, 'জিজ্ঞেস করছিলাম ছারপোকারা আছেন কি না?'

—'অ তাই বলুন।'

'না, না ও-সব নেই। ভীষণ পরিষ্কার। ঐ তো গতকাল একটি কাপোল ছিল, দিব্যি আরামে রাত কাটিয়ে সকালে হাসিমুখে চলে গেল।'

'দাদা ওরা তো আর রাত্তিরে ঘুমোয়নি, ছারপোকা টের পাবে।' বাটুল মনে মনে বলল।

কামরায় গেল। একই ঘরে হাসপাতালের অনেক বিছানা। সবাই ঘুমন্ত। একটি বিছানাই খালি। তার ভাগ্যে জুটেছে। সে লাইট অন করতেই শান্তিভঙ্গের অভিযোগে একজন ভ্যাঁ করে প্রতিবাদ জানাল। লাইট অফ হয়ে যায়। স্যাঁতাপচা বালিশের সুবাস শুঁকে শুঁকেই নিশি যাপন সুরু হয়। নতুন জায়গা, তার মনে হল ঘুম বাড়িতে থেকে গেছে। একমনে সে অনেকক্ষণ বউয়ের কথা ভাবল। বউয়ের চুল হাত, নখ এবং মাঝে মাঝে চুল-ছড়ানো সংগীতমুখর দৃশ্য কল্পনা করল। কিছুতেই অলস ঘুম নড়ছে না। ভাবল ঘুম নিশ্চয় এখনো বাড়িতে তাকে খুঁজছে। সে ডাকল, 'হে ঘুম তুমি চলে এসো, আমি এখানে। তুমি কি আমাকে খুঁজে পাচ্ছ না। তোমার বউদিকে জিজ্ঞেস করে করে চলে এসো। আমি ট্রেনে করে বোলপুর প্রিয়া হোটেলে এসে উঠেছি। তুমি এসো।' অনেক ডাকল। ঘুম এল না। রাত বারবার ফেরাচ্ছে। ঘুমেরা আসি আসি করছে ঠিক এমন সময়ই হঠাৎ বালিশ-এর কাঁধে এক গেরিলা আক্রমণে সে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে লাইট অন হল। বালিশ তুলতেই দেখে সারিবাঁধা গেরিলারা একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সে হাত-বোমা চালাল। দু-একজন ঘায়েল হল। লাইট আবার অফ হল। আসি আসি পথহারা ভীতু ঘুম অবস্থা দেখেই পালাল। সে একাই শুয়ে শুয়ে পাহারায় বসল। না আর হবে না। একা একা কতক্ষণ যুদ্ধ করবে। পাশের লোকেরা বশ্যতা স্বীকার করে ঘুমোচ্ছে। এরা কি নির্জীব? সে যুদ্ধ চালাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ? একদিকে ওয়েল ট্রেইনড গেরিলা, অন্যদিকে রণসঙ্গীত করে করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এয়ারফোর্স। সে পারল না। পরাজিত, পলাতক আক্রমণকারীর মত দরজা খুলে বাইরে পালাল। ছোট্ট শহর। সাড়া-শব্দহীন। দু-একটা কুকুর জেগে আছে। সেও কুকুরের মত আগামী সকালের অপেক্ষা করছে। নষ্ট ঘুমের এই দজ্জাল রাত তাকে অবিস্মরণীয় বাসর রাত্রির কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। সেই রাত অতীতে। অন্ধকারে। তার ফিরে আসবে না। সেই রাত মুখ বদলায়। রাত নিশ্চুপ। বাটুল কথা বলে বাটুলের সঙ্গে। মনে হয় যেন ফিসফিস করে দুজন কারা কথা বলছে।

ফর্সা হয়ে এলে সে ম্যানেজার কামরায় ঢুকল। সে এখন স্বভাবত গম্ভীর। ম্যানেজার বদল হয়েছে। জগা নেই। এখন এক মাঝ-বয়সী। গো-বেচারা। বাটুল চলে যাবে।

'কি বলব দাদা! আপনাদের ছার-মশার আতিথ্য অনেকদিন মনে থাকবে।

'তাই নাকি?' ম্যানেজার হাসে। 'দাদা এই তো জীবন, ছার-মশা পোকা-মাকড়ের কামড় খাওয়ার নামই জীবন।'

বাহ্, নতুন কথা, কেউ বলে কবিতাই জীবন, কেউ বলে প্রেম, কেউ বলে শিল্প। কেউ বলে ধর্ম। কিন্তু ছার-মশার কামড় খাওয়ার নাম জীবন, অদ্যাবধি কেউ বলেনি।

দারুণ মশাই, দারুণ। বলেই সে হাসতে হাসতে পাওনা মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ম্যানেজারের মাথার ওপরে ঝুলেছে, নমস্কার আবার আসবেন।' লেখাটা পড়েই সে হাত তুলে বলে ফেলল, 'ঈশ্বর রক্ষা করো।'

লাঞ্চ ডিনারের মাঝামাঝি চা-মিষ্টি আর খেল-খেলো করে করেই সেমিনার সাঙ্গ হল। আর একদিনের প্রোগ্রাম। ছাত্রছাত্রীর অশ্লীলতা, অবাধ্যতা, রেস্টলেসনেস এরকম অনেক সরল গরল সমস্যা নিয়ে বাটুলও একবেলা তুখোড় তুফান তুলল। সেমিনার-কনফারেন্সে বাটুল ভোজন করে না, চা পান করে না। সকালে ব্রেকফাস্ট, মধ্যাহ্নে লাঞ্চ আর রাত্তিরে ডিনার খায়। এবারও পূর্বাপর সম্বন্ধ বজায় রাখল।

সেমিনার ছিল একদিন। একবেলা। পরদিন সুরু হল পাবলিক সারভিস। পুরনো বন্ধু-বান্ধব আর ছাত্রছাত্রী, বিশেষ করে ছাত্রীদের খবর নিতে হবে। ডিনার করে রেস্ট নিতে নিতে আজ কোথায় যাবে স্থির করতে পারে না। একবার ভাবল, সাঁওতাল পাড়া ঘুরে আসবে। ধোৎ সাঁওতাল পাড়ায় সেই একই দৃশ্য। আর ভালো লাগে না। পরন্ত বাঙ্গালী অগ্রজ সম্প্রদায় সাঁওতালদেরকে নিয়ে এত লম্ফঝম্প করেছে, এরপর আর এডিশন চলে না। সাঁওতালরা পেকে গেছে। বাবুরা আসলেই ভিমরতি খায়। না সে সাঁওতাল পাড়া যাবে না। তার তাড়িটাড়ির নেশা নেই। সাহেব মানুষ, এসব দিশিটিশি অপছন্দ। সে ঐ নাজ মেয়েটির কাছে যাবে। মেয়েটির সঙ্গে এক-দিনের আলাপ। মেয়েটি চমৎকার। সপ্রতিভ। মেয়েটির সঙ্গে কোলকাতায় দেখা। মেয়েটি সুন্দরী। সহৃদয়। বড় বড় চোখের। দুপুর-বেলা ওর পিঠে নিশ্চর ঝরণা ছড়িয়ে আছে। মেয়েটির রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত দরদী আঙুল এই মুহূর্তে বাটুলকে আকর্ষণ করে। আচ্ছা যদি হোস্টেলে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়? তবে কি টেলিফোন করবে? কিন্তু টেলিফোনে নাও পেতে পারে, অথবা ধরা যাক পেল, মেয়েটি বাটুলকে এড়িয়ে যাবার জন্য যদি বলে, আহ্‌ সরি, আমি ব্যস্ত আছি।' মন খারাপ হবে। বাটুল কোনোমতেই মনের ওপর চাপ দিতে রাজি নয়। কিন্তু ঐ মেয়েটির কিসের প্রোগ্রাম থাকতে পারে? সে এখনো প্রায় কিশোরী। না, ওর কোন প্রোগ্রাম থাকতে পারে না। হয়ত-বা বয়ফ্রেন্ড আছে। ডেঞ্জার! ভগবান এরকম না হওয়াই ভালো। ঐ বাঙ্গাল বাঙ্গাল মেয়েটিও প্রেম জানে! বাঃ, তুমি শালা সিলেটী, পুরোপুরি তাও নও, দু-নুসলা, কাছাড়ী, তোমার ঘরে তোমার সুন্দরী বউ একটি গোলাপ ফুল, তাও তুমি ডজন ডজন মেয়ের সঙ্গে ইন্টি-মিন্টি করে ঘুরে বেড়াও, আর সে এখনো রাইট গার্ল, খাস ঢাকাইয়া, জগদীশ বোসের দেশের মেয়ে, সে প্রেম জানবে না, কথা যে বলো! বাটুল এরকম তার পরিচিত, অদৃশ্য ভেতরের বাটুলের সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করল। স্থির হল সে নাজ মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবে। নাজ মেয়েটির হোস্টেলে গেলো। মেয়েটি কি হোস্টেলে আছে? হে ভগবান! তোমার ঐশ্বরিক শক্তি প্রয়োগ করো।

একটি গাছ ঠিক বটগাছের মত ডাল-পালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারদিক থেকে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে নির্জীব রিকসা। রিকসাওয়ালাদের কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে, আর কেউ কেউ হা-করে শকুনের মত তাকিয়ে আছে, যদি কেউ ডাকে। কাছে আরেকটা বিহারী-ভাই ফুচকা নিয়ে অপেক্ষমান। বাটুলের চোখে পড়ে একটি শালিক। একটি কাক। আর একজোড়া মানুষ-মানুষী। শালিকের আন-লাকি সাইন দেখে সে ভয় পেল। মানুষ-মানুষী নিমগ্ন। মানুষীর চুলে বাতাসের আদর। মানুষী অনবরত কথা বলছে। মানুষ যার চুল লম্বা, যে অনেকদিন দাড়ি কাটেনি, চুলে তেল দেয়নি, তাকে বেকার ভেবেই বাটুলের যুগপৎ করুণা ও হিংসে হল। বেকাররাই প্রেমিক, আদর্শ। এই মানুষ-মানুষীর মধ্যে বিদ্যমান প্রকৃতির ভুল স্পষ্ট। দুজনকে দেখলে মনে হয়, মানুষ হওয়া উচিত ছিল মানুষী, আর মানুষী মানুষ। যখন হল না, ভেবে লাভ নেই। সে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষ-মানুষী তাকে দেখে না। সে দুজনের চোখে পড়ার চেষ্টা করে। মানুষী অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। শাড়ির আঁচলে আঙ্গুল জড়াচ্ছে। পা নাচাচ্ছে। মানুষটাকে দেখলে জাঁদরেল নেশাখোরের মত মনে হয়, যে অনবরত সিগারেট টানার কথা, সিগারেট ফুঁকছে না। বাটুলের সিগারেট পিপাসা পায়। ছায়ার নিচের নির্জীব দুপুর বাটুলকে বিব্রত করছে। মাস্টার মানুষ, কতক্ষণ এরকম দাঁড়াবে। কেউ যদি দেখে প্রেসটিজের পাম্পচার! বাটুল এগোল। হোস্টেলের গেইটে উঁকি দিল। না দারোয়ান নেই। হোস্টেল যেন মহাশূন্য। এটা যে দুপুর হোস্টেলের নীরবতাও প্রমাণ করে। আড়চোখে সে মানুষ-মানুষীর দিকে তাকাল। মানুষী নির্দয়। পাথর। মানুষও নিষ্ঠুর। ফেলো-ফিলিংসটাও নেই। ফ্রাসট্রেইটেড। জেলাস। বাটুল মনে মনে বকে। মেয়েটি দেখেনি এমন ভাব করে করেই নিজের 'নিজের' সঙ্গে কথা বলছে। বাটুলের এসময় ধৈর্য-চ্যুতি ঘটে না। সে জীবনে অনেক পরীক্ষা দিয়েছে, এও এক টোকাটুকিবিহীন পরীক্ষা। সে শান্ত, ভদ্র, আদর্শ গার্ডিয়ান-এর মত দাঁড়িয়ে থাকল। মানুষ-মানুষীর আলাপ শেষ হয়। মানুষ রেলিং-এর উপ[...] বসেছিল। উঠল। বাটুল আর সময় ন[...] করবে না। সুযোগ সুবর্ণ। মার্চ ফরোয়ার্ড বাটুল তড়তড়ি করে এগিয়ে জিজ্ঞেস করল —একসকিউজ মি, এই হোস্টেলে নাজ ব[...] কোন মেয়ে আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে।' মানুষী মুখের চু[...] সরায়।

'ডেকে দেব'।

'কাইনড্‌লি'।

মানুষী চলে যায়। বাটুল দাঁড়ি[...] থাকে। তার বুকের ভেতর ধড়ফড় উঠানা[...] করে। বাটুল বি রেডি। ডোন্ট গেট নারভাস হাত-পা টান-টান করে দাঁড়াল। হাত-[...] রি রি করে কাঁপছে। শক্ত করে দাঁড়াল মানুষী প্রথমে খড়গেশ্বর খড়গেশ্বর ব[...] চেঁচাল। কর্তব্যনিষ্ঠ খড়গেশ্বর শব্দহীন অতঃপর মানুষী নাজ নাজ বলে হাঁকে[...] থাকে। প্রতিধ্বনি বাইরে বেরিয়ে আসছে হঠাৎ হোস্টেল সরগরম হয়ে উঠল। জানলা ফাঁক দিয়ে দু-একটা মুখ দেখা গেল। মুখ গুলো পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল। মানুষ ফিরে আসল। মানুষীর মুখে চাপা হাসি মানুষটার সঙ্গে উন্মুক্ত চুলের আরো দ[...] তিনটে মেয়ে-শরীর বেরিয়ে এল। এ[...] কৌতুহলী। মানুষী শরীরেরা তাকে দেখছে তার নিজেকে এসময় চিড়িয়াখানার পশ[...] মত মনে হল।

মেয়েটি বলল, 'নাজ বেরিয়ে গেছে এলে কিছু বলব?' ঠিক এমন সময়[...] জানলার ফাক দিয়ে সুন্দরী নাজ কাকে[...] চোটের মত উঁকি দিয়ে সম্মতি জানাল, হ্য[...] আমি হোস্টেলে নেই, বেরিয়ে গেছি।' না[...] কোন শব্দ করেনি। তার ওষ্ঠ নড়েনি। মু[...] বাড়িয়েই সে ঢুকে গেল। নাজের সঙ্গে[...] চোখাচোখি হতেই বাটুলও কচ্ছপের ম[...] মুখ লুকিয়ে ফেলে। কাছে একটি গা[...] ছিল। বীর-কান্ডে হোস্টেলের মেয়ের অবাক। বাটুলের জীবনে এরকম ঘটনা নতু[...] নয়। ইতিপূর্বে সে বহুবার অনেক হোস্টেলে এরকম অভ্যর্থনা পেয়েছে। সে ঘটনাকে সহজভাবে নেবার চেষ্টা করে। কেয়া হুয়া লড়কে লেঙ্গে নাজিস্থান। মেয়েদের হাসি যা অমৃতসুলভ, ফেটে পড়ার উপক্রম। কেবল ভদ্রতার ইরিগেশন দিয়েই আটকে রেখেছে। বাটুল চলি বলেই হাইহিলের খটাস খটাস স্মার্ট আওয়াজ তুলে পা বাড়াল। কাছে গাছের নিচে একটা রিকসা-ওয়ালা ঘুমোচ্ছে। অভ্যর্থনার জ্বালায় এবার ফাটল ধরস। বাটুল নিজের চাইতে বড় হুঙ্কার দিল, 'কেয়া ঘুমোচ্ছ হায়, ডাকতা হায়, নাহি সুনতা হায়।' মধ্যযুগীয় বা বৃটিশ যুগীয় পূর্বপুরুষদের মত সেও রাগের ঝড়ে রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগ করল। বেচারা রিকসাওয়ালার দিব্য-ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল। ঘুমজড়িত চোখ খুলেই দেখল নারীকন্ঠের পুরুষ আওয়াজ নিয়ে এক বাবু দন্ডায়মান। বাবুর পায়ে বাবুর ওজনের চাইতে বেশী ভারের হাই-হিল জুতো। বাবু যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবুর বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণে বিহারী [illegible]

লজ্জায় গামছা দিয়ে মুখ ঢাকে। অতঃপর রাষ্ট্রভাষাপ্রেমে গদ্গদ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : 'কাঁহা জায়েঙ্গে সাহেব?' বাবুর ভীষণ মুস্কিল। কোথায় যাবেন নিশানা নেই। এসেছিলেন শিবানীর সঙ্গে আলাপ জমাতে। বাসনা অপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ হিন্দী বলার ভয়ে বাবুর মুখ শুকিয়েছে। এখন মুস্কিল আসান হিসেবে অবহেলিত রাষ্ট্রভাষা কাজে লাগল। 'এগিয়ে চলো'। সিধে চলেই রিকসাওয়ালা পাস করল কঁহা গাড়ী সে বলমা, বাবুর মুখে উজলে উঠল, যে দুঃখের নাম বিরহ। আজ বাটুলের দুপুরের ঘুম নষ্ট। ঝাপ্ত খেয়ে চিত্ত হতেই ঝিরিঝিরি ঘুম উড়ে গেল। চলে এলো হোস্টেলে। হোস্টেলে নাজ নেই, মানে হোস্টেল নেই, অন্য মানুষী নেই। বড় বিব্রত হল। বিরক্ত। বুকের ভেতর নিরাশা টিপ টিপ করছে। যাঃ আর কাজ ছিল না। যাক এক-বার দেখা পেল। এই সার। সে নাজকে ক্ষমা করে দিল। আসলে অবুঝ। নীজ এরকম নিষ্ঠুর হতে নেই। আমি যে ভদ্দরলোক। শিক্ষক। নিমক হালাল। বাটুল ফিসফিস করে।

'হামে কুছ কাঁহা বাবু'।

'কুছ নয়। 'বলেই বাটুল' ঝিম ধরে রিকসায় বসে থাকে। ফত-ফত করে বাতাস ভেঙে রিকসা এগিয়ে চলছে। বাটুল কোথায় যাবে ঠিকানা নেই। ছাপরার ভাই টের পেল বাবু কোন কারণবশত এখন ভুগো। সে নিশ্চুপ। রিকসায় প্যাডেল চালায়। বাটুলের আবার দুঃখ হয়। নাজ তার সংগে আজ দিব্যি টক্কা মেরে বিকেলটা কাটিয়ে দিতে পারত। শান্তিনিকেতনের সুন্দর বিকেল। চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পারত খোঁপা র বিকেল বিকেল গন্ধ। হোস্টেল ফিরে আজগুবি গল্প জুড়ে দিতে পারত। স্টুপিড কোথাকার। বাবা পরদেশে থাক, হুঁসে বুঁদে চলবে। আমার মত পাণ্ডিতের সঙ্গ পাওয়া তো ভাগ্যের কথা—নিজের থেকে তোমার হোস্টেলে এসেছি, তোমার কাছে এটা তো লটারী পাওয়ার মত ব্যাপার।— বাটুল আত্মগর্ভে ফুলে উঠল। ঠিক এই সময়ই একটি ষোড়শী চেহারার সংগে তার চোখাচোখি হল। সে শেয়াল-চক্ষু দিয়ে মেয়েটির উঁচু-নিচু জরিপ করল। ষোড়শী লক্ষ্য করল। বাবুর ইচ্ছে হল রিকসা থামিয়ে ফেলে। নদী কোথা হইতে আসিয়াছ। এসো আলিংগন করি। নদী থামল না। নদী এগিয়ে চলল। বাটুলের জিহ্বায় জল আসে। রিকসা এগিয়ে যাচছে। নদীও ঠিক বিপরীত দিকে এগোচছে। বাবু ঘুরে ঘুরে মেয়েটির দিকে তাকাচছে। মেয়েটিও তাকাচছে। না আর দেরী করা চলে না। এক্ষুনি রিকসা ঘুরিয়ে দেয়া উচিত। উত্তেজনায় বাটুল উঠে দাঁড়িয়ে রিকসাওয়ালাকে হুকুম করল, 'ঘুমাও তো'। মেয়েটি এখনো ঘুরে ঘুরে তাকাচছে। বাটুল যেন আর বাটুল নয়। এক দীর্ঘাংগ-পুরুষ। আমি কি সত্যিই বাটুল? না ঠিক সেরকম নয়। ফুলপ্যান্ট আজ এই হাই-হিল পরে বাটুলের পুরো হয়ে গেছে। নিশ্চয়। বাটুলের শরীরে পাহাড়ী নদীর স্রোত। স্থান-কাল ভুলে সে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চতা পরীক্ষা করতে গিয়েই হাই-হিল সমেত ফুটবলের মত মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। হুকুমবরদার তখন রিকসা ঘুরাচছে। সে টেরই পেল না এমন। একটি ব্রাহ্মি পড়ে যাবার রিক্ততা অনুভব করল। বাবু পড়ে গিয়ে নির্বাক। রিকসাওয়ালা নির্বাক। অতঃপর সে নীরবতা ভঙ্গ করে।—কেয়া ঘির গয়ে বাবু। বাবুর জুতোর হাই-হিল খুলে পড়েছে। প্যান্ট ফেটে গেছে।

এমতাবস্থায় বাবু চোঁচির, বাবু ভেংচি কাটেন, দাঁতে কিড়মিড় শব্দ হয়,—কেসে ঘির গয়ে। কি লজ্জা। শালা শক্তি যেন ফেটে পড়ছে, ষাঁড় কোথাকার। প্রথম থেকেই দেখছি ভন ভন ভন-ভন করে করে বাহাদুরী দেখাচছ। রিকসা আস্তে আস্তে চালাতে নহী সেকতা।—বাটুল হুংকার দিল। অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে রিকসাওয়ালা। সে শব্দহীন। ইত-স্তত। দর্শক সমবেত। তেমন কিছু হয়নির মতো বাটুল উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই বসে পড়ল। সর্ব্বনাশ, প্যান্টের দুটো হুক, নিচের বোতাম সর্বাংগে উন্মুক্ত। ঘটনা সহজ নয়। আজ দিনটাই খারাপ। সকালে দিনটা কেমন যাবে—দেখতে ভুলে গেল। নতুবা হুঁসে বুদে চলত। হায়, কপাল খারাপ হলেই এরকম। ঐ গিন্নিটাই সব্ব-নাশের মূল। সবকথা বলে দিতে পারবে, আর দৈনিক রাশিফলটা দেখে চলার কথা বলে দিতে পারল না। বাটুল নিরাবলম্বীর মত বসে থাকল, তার সামনে আহত জুতোর হিল। বাটুল জুতো খুলল। রিকসাওয়ালাকে 'ভাগ' বলে আশ-পাশের ত্রিভুবন কাঁপিয়ে তুলল। অবস্থা শোচনীয়। রিকসাওয়ালা পয়সা না নিয়েই চলে গেল। বাটুল এখন একা। হে মুসকিল আসান অন্ধকার, হে রাত্রি, তাড়াতাড়ি এসো, আণ্ডারওয়ারহীন বিপন্ন বাটুলকে রক্ষা করো। এই বাটুল সেই বাটুল নয়, একজন বিদ্যাদাতা। একজন শিক্ষক।

দিনরাতের ব্যস্ত বাটুলের হাতে এখন অবসর। অনেকদিন জপতপ করেনি। নিশ্চয় ঈশ্বর বিমুখ। বাটুল ধ্যানমগ্ন হল। হে ঈশ্বর করুণা করো। বেলা ভাটি দিচছে। দু-একজন পথিক বাটুলকে দেখে দেখে নিজের কাজে এগিয়ে যাচছে। বাটুলও এখন নিজে নিজে মগ্ন। সে নির্বিকার। সে রাস্তার দিকে পেছন ফিরিয়ে বসে থাকল।

বম-বম হরে বম, বম-বম হরে বম করে করে বাটুল ব্রহ্ম-উপাসনায় মগ্ন। অ্যাকজন আসছে, যাচছে। ভ্রুক্ষেপ নেই। সে একমনে ব্যস্ত। মাথার চুল উদভ্রান্ত, শরীরের উপরিভাগ নিরাবরণ। বাটুল নিজেকে ধুমোয়াচ্ছিত করল। সে এখন ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্রহ্মচারী। নির্লোভ। ধ্যানস্থ বাটুলের ব্রহ্মস্মরণ নিমগ্ন। অনেকক্ষণ। হঠাৎ আলোড়ন হল। কল কল খল খল শব্দে শান্ত রাস্তা জেগে উঠে। চোখ খুলেই বাটুল আশ্চর্য উঠল। আরে বাবারে জেনানা। এক নয়। দুই নয়। যেন মিছিল। তবে কি এরা নাজের হলো? কে ভগবান, বিপন্ন বাটুলকে উদ্ধার করো। সতী-সাবিত্রী ভার্যা, তোমার নারীত্ব দিয়ে আমাকে রক্ষা করো। বাটুল আবার চোখ বন্ধ করে। জিকিরের মত লহরে লহরে শব্দ তোলে, বম-বম হরে বম। বম-বম হরে বম। জেনানারা বাটুলকে দেখল। হাসতে হাসতে বাটুলকে ক্রস করে চলে গেল। স্রোতস্বতীরা চলে গেলে আবার নিস্তব্ধতা ঝাঁপিয়ে পড়ল, বাটুল চোখ খোলে। খুলেই অবাক। বুক জুড়িয়ে যায়। আহা কি অপূর্ব। সারি বাঁধা স্রোতস্বিনীরা এগিয়ে যাচছে, পিঠে ছড়িয়ে পড়ছে চুলের ঝরণা, একেই বলে আশ্রম, ধন্য বঙ্গভূমি, ধন্য বঙ্গললনা, না এরা জেনানা নয়। ঈশ্বরের করুণা, আশীর্বাদ। মুহূর্তে বাটুল সব দুঃখ ভুলে গেল। সে নাজকে ক্ষমা করে দিল, রিকসা-ওয়ালাকে ক্ষমা করে দিল। ঐ পতন না ঘটলে সে এই মনোহর দৃশ্য দেখতে পেত না। সে ভুলেই গিয়েছিল আজ বাইশে শ্রাবণ। শ্রাবণের বারিধারার মত নির্ভে-জাল ছড়ানো চুল ছড়িয়ে ছড়িয়ে মেয়ে-গুলো এগিয়ে যাচছে। নিটুল কবিতার মত দৃশ্য। বাটুল তোমার এ জীবন ধন্য হল। বাটুল কবিত্ব করো। কিন্তু বাটুল চুলের উপর কবিতার কোন লাইন মনে করতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক মেমোরি। বিশ্বাস-ঘাতক শব্দ। বাট, বাটুল ট্রাই ট্রাই এগেইন। এই মওকা আর মিলবে না। এমন অপূর্ব দৃশ্য। বাটুল চেষ্টা করে। পারে না। বাটুল আবার চেষ্টা করে, সমস্ত বিদ্যা, ভাষা, শব্দ দিয়ে চেষ্টা করে, পারে না, অথচ, হঠাৎ, তার আমাম বাঙালীত্বকে ধিক্কার জানিয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এক উর্দু শের।

দাগা

অনিল ঘড়াই
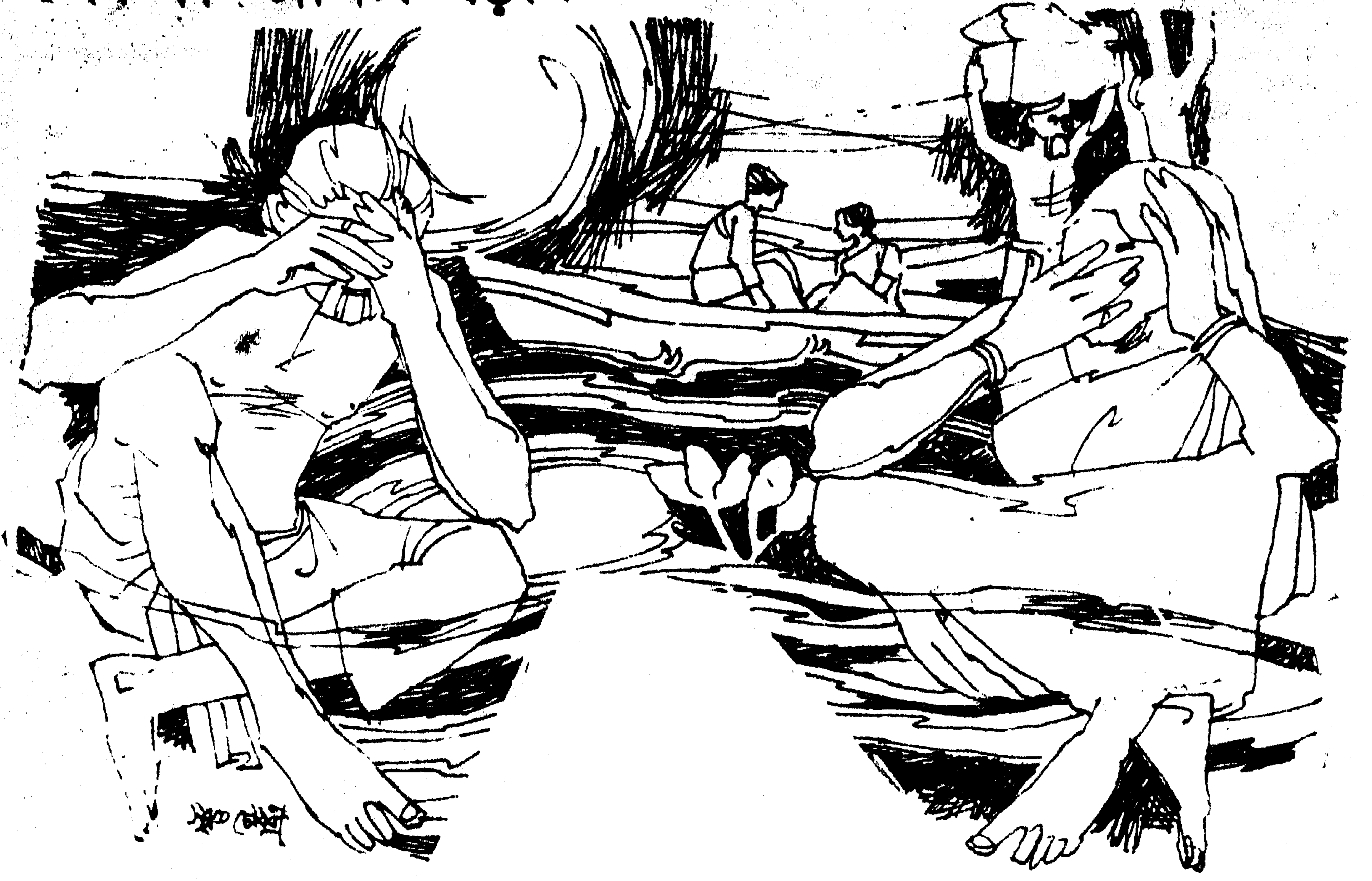
কোঠা বাড়ীর কার্ণিশে কবুতর

এক চিলতে রোদ ছিল আকাশে। অথচ বেশ কয়েক দিন উপোসে আছে ফিরোজ মিঞার বকনাটা। খড় কাটেনি, ঘাসের মুখ দেখেনি। ভাগাড়ে যাওয়ার চেহারা হয়েছে। বুকের খাঁচায় নাড়ীভুঁড়ি নড়ে। একটা টিয়ে খেতে না পেয়ে উড়ে পালাবার মতলব আটছে।

আকাশে টিপটিপ বৃষ্টি বকনাটার চোখ সামনের মাঠটায়। ঘাস কোথায়! পৃথিবী তে জলের তলায়! টানা বৃষ্টিতে মাঠ-ঘাট, খেসারীর ভুঁই, আমনের গর্ভবতী দেহ বেমালুম নিখোঁজ। ডাঙ্গা পাড়ার কটা ক্ষেত জেগে আছে। ফিরোজ মিঞা চেষ্টার কসুর করেনি। বকনাটার গলায় রশা বেঁধে জল ঠেঙ্গিয়ে হাজির হয়েছিল। শেষে খাটুনীর দাম উঠল না। পঞ্চায়েত অফিস থেকে চৌকিদার সকালে ঢেঁড়ি দিয়েছে, 'গ্রামবাসীরা সব সাবধান। ফরাক্কা থেকে জল ছেড়েছে।'

নাফিজা এতক্ষণ চিমসে মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। হাত-পা এলিয়ে যাওয়াতে দোরগোড়ায় বসল। পরনের শাড়ীটা ফেঁসে গেছে পোড়া তেল খাওয়া আরশোলা রং। গালের মাংস জড়িয়ে কুঁচকুচি দাগ। চোখের মণি দুটো অন্ধকার কুয়োয় হারানো জোনাকী।

—কিছু বলবা?

—না।—নাফিজা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পুরুষটার মুখের দুঃখ ওর বুকে বাজে। চোপরাদিন এত কি ভাবো বলোদিনি? বৃষ্টি-বাদলার দিনে মুখ বেজার করলে ঘরের সুখ কমনে উড়ি পালায়। তার চেয়ে কটা আমপাতা পেড়ে আনো। কাজের মত কাজ হয় তাহলে।

—ইবার মনে হয় বান না হয়ে আর ছাড়ছে না। যেমন ধারা পশ্চিমে মেঘ লেগেছে তাতে সব ওলোট-পালোট না করে কি নিস্তের দেবে? কোথায় মাথা গুঁজবো তারই চিন্তেয় টাক পড়ে গেল।

—কেন বড় ইস্কুলে?'—নাফিজার চোখে দুপুরের নীরবতা। ফিরোজ মিঞার চোখে-মুখে অসহায়তার ছবি। 'কি হলো গো, তমন ধারা ছানি পড়া চোখে তাকাচ্ছো কেনে? ডাঙ্গাপাড়ার বড় ইস্কুল কি খারাপ? গত সনের বানে তো আমরা বেশ ছিলাম। মেলা লোকজনের মধ্যি আমার বাপু থাকতে মন্দ লাগে না। তুমি ওখানেই যেও। কোটা ঘরে শোয়ার সখ আমার অনেক দিনের।'

ফিরোজ মিঞা নাফিজার দিকে তাকায়। একটা দুরন্ত মেয়ে চড়ুই কোটা ঘরে বাসা বাঁধার স্বপ্ন দেখছে। ওদের গাঁয়ে সাতখানা কোটাবাড়ী। প্রায় শ'খানেক কবুতর চৈতের দানা খায়। ওড়ে। কোটা বাড়ীর কার্ণিশে বকম্ বকম্ শব্দ তোলে। ওর কুঁড়ো ঘরটায় কবুতর বসেনি। নাফিজার নতুন শাড়িটা পুরনো হয়েছে। নতুন লণ্ঠনটা পুরানো হয়নি। ফিরোজ মিঞার এক চোখে নাফিজার অঢাকা মাংস স্তূপ, অন্য চোখে ফারাক্কার জলোচ্ছ্বাস! ও গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকে। ওর বৌ'র ঘরাটে চুল ভেজা বাতাসে নড়ছে। ঠোঁট নড়ছে ভিজে মনটার জন্যে। ফিরোজ মিঞা কিসের আক্রোশে নিজের চুল খামচে ধরে। সামনের মাঠে হাঁটু অব্দি ধানকে বর্ষার জল লুকিয়ে ফেলছে। এই টিপটিপানী বৃষ্টিতে ওর ইচ্ছে করে নাফিজাকে বুকে টেনে নিয়ে ওর ওদলা বুক ঢেকে ফেলতে।

কেঁচো আর বাঁধবাবু

অবশেষে মাঠ—কেঁচো উঠোনে এল। এ পাড়ায় কারো চোখে ঘুম নেই। আতঙ্ক, উদ্বেগ আর বিস্ময় দানা বাঁধছে। আকাশের পঞ্চমীর চাঁদ ফারাককার সেচ-জলের রঙ্গ দেখছে। বাইশ বছরের যুবকের মত তেজীয়ান ঢেউ আছড়ে পড়ছে বাঁকে। তুলে নিচ্ছে কিনারের মাটি। ফুঁসতে ফুঁসতে দুলতে-দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে অনেক দূর। গোক্ষুর সাপ হয়ে ফিরে আসছে আবার। ছাড়া গাঙের এমন মূর্তি অনেক মুরুব্বীই দেখেনি। বাঁধে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল : লায় গো বাঁধ বাবু, তা এ্যাদ্দিন কোথায় ছেলেন আপনারা? চেয়ারে বসে বসে গরমেনটের টাকগুলান লুটেলেন। মনে ভেবেছেন পঁচিশ বস্তা বালি ফেলে

সমুদ্র মন্থন করবেন। তা এয়েছেন ভালো করেছেন,—এবার ভালোয় ভালোয় কাটেন দিনি! নইলে ছাল ছাড়িয়ে নুন জল দেবে। তখন ইজ্জত বাচানোই দায় হবে।'

ফিরোজ মিঞা এতক্ষণ একনাগাড়ে বাঁকে মাটি দিচ্ছিল। একটা ফাটলের মুখে বাঁশঝোপ ইত্যাদি গুঁজে জল আটকাবার বহু রকম চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা ত্রিশজন। চতুর্দিকে মাটির অভাব। এত বড় মাটির দেশে মাটের আকাল ও এ-জন্মে দেখেনি। সুস্থ বাঁধের মাটি কেটে খেয়ো বাঁধ সারানো হচ্ছে। একদিক শূন্য করে আর একদিক ভরাট রাখার নীতিতে ওর বড় বেশী আপত্তি। বাঁধ বাবু ক্রমশঃ কথোপকথনে উত্তেজিত হওয়ার বদলে মিইয়ে যাচ্ছেন ভেজা বেড়ালের মত অবস্থা তার। একজন ডাকাতের শেষ বয়সের অনুশোচনার সঙ্গে বাঁধ বাবুর চোখ-মুখের হুবহু মিল। এই প্রথম কোর্ট, প্যান্ট, টাই পরা একটা শিক্ষিত ডাকাত দেখে ফিরোজ মিঞা নাক কুঁচকে ঘেন্নায় এক গাদা থুতু ফেলল।

লক্ষ্মী পেঁচার কান্না

রাতের অন্ধকারে লক্ষ্মী পেঁচার ডাকটা এত সহজে কান্না হয়ে যাবে কেউ বুঝতে পারেনি। ফিরোজ মিঞা কোথা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল। মাথা ভর্তি জল। সারা গায়ে ভিজে এঁটেল মাটি। গোড়ালীর কাছটায় কোদালের কোণা লেগেছে। রক্ত-মাটি মিশে একাকার। স্নায়বিক অনুভূতি ওকে কাবু করতে গিয়ে হেরে গেছে। এক বুক ব্যস্ততা আর এক ঝলক চঞ্চল চাহনিতে ও নাফিজাকে বলে ওঠে, 'কিরে, অমন করে দেঁড়িয়ে আছিস কেনে? যা, হাতে হাতে যা নেবার গুছিয়ে ফেল সব। পানি ঢুকলো বলে। ঐ প্যাংলা বাঁধ দিয়ে পানির তোড় কে রুখবে? সব বাবু-ভাইদের মুরোদ জানা আছে। ছাগল দিয়ে যব মাড়াই হয় না।'

—বাঁধকি সত্যি সত্যি ভাঙ্গবে? কেনে, ইবার খরানীতে বাঁধে মাটি পড়েনি বুঝি? গাঁয়ের মাতব্বররা ঘুমোচ্ছিল নাকি?

—মাটি আবার পড়বে না কেনে? পড়েছে তো?

—তবে?

—ফসল ছিটনোর মত বাঁধে মাটি দেলে ও বাঁধ কত দিন টেকবে? এ্যাত দিন যে টেকেছে এই আমাদের ভাগ্যি। টাকা মেরে সব ফাঁক করে দিলে এর বেশী আর কি হবে? আসলে যত মধু দেবা তত তো মিষ্টি হবে। তার চেয়ে বেশী আশা করতে গেলি চলবে কেনে?

নাফিজার বাস্ত মুখের ভাঁজে ভাঁজে ভয়।—তাহলে উপায়। আমরা সব কমনে দাঁড়াবো গো? বকনাটার কি হবে?'—নাফিজার চোখের পাতা ভিজল।

—কানছিস কেন? গাঁয়ের দীন-দুঃখীর যা হবে-তোর আমার তাই হবে। এ-তো সোজা কথা। দুটো পেটে খেয়ে বেঁচে থাকলেই হলো। বান-টান চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবিস্‌নে, এক লহুরেই বানের জল শুকিয়ে ফেলবোখন।

নাফিজা চোখ মুছল। —চাট্টিখানি ভিজে ভাত আছে। দুগ্যাল খেয়ে নাও দিনি। সেই সন্ধেয় তো গিয়েছো।' দানা-পানি নেশ্চয়ই পেটে পড়েনি?'—নাফিজার কথায় সোহাগ।—'কি গো, বড় যে দেঁড়িয়ে থাকলে; পেটে জ্বালা লাগেনি মনে হচ্ছে?'

—না খাবো না। মাটি ফেলার সময় চা-রুটি খেয়েছি। ওগুলান তুই খেয়ে নে।

—আমি তো সাঁঝে খেয়েছি। এই হেমের দিনে বার বার ভিজে ভাত খেলে রাতে মরে যাবো যে।

—তাহলে বকনাটার পাতনায় ঢেলে দে। বেচারী দুদিন ঘাসের মুখ দেখেনি। আহা পেট একেবারে শিরদাঁড়ায় লেগে গেছে। ডাঙ্গাপাড়ার বড় ইস্কুলে গিয়ে কটা ডালডুল কেটে না দেলে আর চলছে না। একেবারে ভাগাড়ে যাওয়ার চেহারা হয়েছে গায়েটার।

দুটো কাপড়ের পোঁটলা, একটা অসুস্থ হ্যারিকেন, এক হাঁড়ি চাল আর কিছু ঘরোয়া জিনিস নিয়ে নাফিজা জল ভাঙ্গছে। প্রবল স্রোত বড় সড়কের উপর। আনমনা হলে কোথায় ভাসিয়ে মারবে ঠিক নেই। কচুরীপানা ভেসে যাচ্ছে মাঠ দিয়ে। চার দিকে থৈ থৈ জল। কল কল শব্দ। নাফিজার নিজেকে হঠাৎ কচুরীপানার থেকেও হালকা লাগে। ভেসে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে বুক সির-সির করে। দশহাত সামনে ফিরোজ মিঞা হাঁটছে। ছলাৎ ছলাৎ জলের বাড়ি লাগছে কোমরে, দাবনায়। হাতের রশা বাঁধা বকনাটা কিছু না বুঝে কান ঝাপটায়। নাফিজা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, তুমি একটু দাঁড়াও না কেনে? আমি একা একা পানির তোড়ে ভেসে যাবো গো। আমার ভেষণ ডর লাগে। আমার হাতটা ধরো না কেনে?

প্রধান বাবুর মেয়ে-জামাই।

অবশেষে ফিরোজ মিঞার বকনাটা গুয়ে বাবলার ডাল চিবালো। ডাঙ্গাপাড়ার হাই ইস্কুলের মাঠে আজ বেশ রোদ ছিল। বো-ঝিরা ক্যাঁথা, কাপড়, খেঁজুরের তালাই ভেজা গম শুকতে দিয়েছে মাঠে। তার সঙ্গে নিজেদেরও শুকিয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ। কেবল রোদ পোয়াতেই এখন আর সই লাগে না—জি আর এর গম, কেরোসিন, কাপড়, বিচুলি আনতে লাগে। ফিরোজ মিঞা আজ সকাল থেকে বাইরে বাইরে। একখানা গামছা কাঁধে ফেলে রিলিফের লাইন দিয়েছে। গত রাতে রেডিওতে মাথা পিছু একসের চাল দেবে বলেছে। লাইনে দাঁড়িয়ে এসব আলোচনাই হচ্ছিলঃ লায় গো খুড়ো, শুধু চালই দেবে? আর কিছু দেবে না? একখান করে পরণের শাড়ি দেলে খুব ভাল হোত। বউটার শাড়ীটা একেবারে মশারীর মত জেবুল জেবুলে হয়ে গেছে। হাতে পয়সা-কড়িও নেই যে কিনে দেব। সমুন্দির বানটা এবার বড্ড বে-সময়ে এসে পড়ল।

—বান কি বলে কয়ে আসে ভায়া। এ হলো গিয়ে মাগঙ্গার লীলা। পাপ বুঝলে, ঘোর পাপের শাসতি। নইলে দেখে দিনি, আজ পাঁচ দিনেও এক কড়া জল কমল নি। এককেবার থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে। নড়বার চড়বার নাম নেই।

—এবারের বান চাষা-ভুসোদের সেরেফ কাবু করে দেবে গো। যা দু বিঘে ভাগে করেছিলুম সবই তো মা গঙ্গায় খেল। এখন নিজেরা পেটে কি দেব তাই ভাবছি।

—শুধু ভাবাই সার হবে। নইলে দেখ-দিনি যেদিন পেরথম বাঁধ ভাঙ্গলো সেদিন কেমন চোঁ চোঁ করে জল ঢুকল গাঁয়ে। একহাত, দুহাত, বাড়তে বাড়তে একেবারে গলা সই জল। শেষে কিনা ডুবোন। কোন-ক্রমে পেলিয়ে বেঁচেছি বাবু। নইলে মা গঙ্গাতেই পরাণটা খোয়া যেত। তা ভায়া, ঘরের মাল-পত্তর কিছু আনতে পারিনি। আনবোই বা কি করে যা জলের সোরৎ—পা ফেলবারই জো নেই।

—কেনে একখানা নৌকো-টৌকো পাওনি খুড়ো? এক নৌকোতে তোমার ঘরের সব মালই তো চলে যেত।

—তা যেত। সেই ভরসায় তো একখানা নৌকো করেও ছিলাম। তা বাপু, তিরিশ টাকা এক খেপের ভাড়া। ভাবো দিনি, আমার ঘর হনে ডাঙ্গাপাড়ার চর, ক' পায়ের রাস্তা। এই টুকুন রাস্তায় তিরিশ টাকা ভাড়া কমনে পাবো। আমার বলে এমনিতেই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল? আজ নিয়ে দুদিন পেটে ভাতই জুটেনি। ছেলেমেয়েগুলো আটা-ঘ্যাট খেয়ে বাজ্যি করতে করতে সারা হয়ে গেল। অষুধই জুটছে না। তা নৌকো ভাড়া।

ফিরোজ মিঞা বেবাক বোবা বনে যায়। এই বুড়ো মানুষটার ভেজা স্বর ওর কোন মতে সহ্য হয় না।

—গাঁয়ের পেধানকে বলেছিলে? তেনার তো দুখানা মস্ত নৌকো ছেলো।

—বলিনি আবার। কত করে বললাম, 'বাবু গো, আপনার নৌকোটা একটুখানি দেন। আমার জিনিসপত্তর গুলোন সরিয়ে দে যাবো—কে কার কথা শোনে? তেনার বলে কোলকাতা থেকে মেয়ে-জামাই এয়েছে। টাউন বাজারের লোক। জনমে বান-বন্যা দেখেনি, কি স্ফূর্তি মনে। হাসি-তামসা ইংরিজিতে কি সব পুটুর পুটুর করছে হরদম। সে সব এলাহি বেপার। পেরধান বাবুতো আমাকে দেঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমকে উঠলো, কি হলো, বললাম তো নৌকো দেওয়া যাবে না। যাও যাও মাথায় মাথায় সরিয়ে ফেল। এখানে দাঁড়িয়ে কোন লাভ নেই। আমার মেয়ে-জামাইরা এখন একটু গ্রাম দেখতে বেরুবে। —একথার পরে আর কি বলি বলো? তেনারা হলেন গিয়ে গণ্যমান্যি লোক। কোটা বাড়িতে থাকে। তেনাদের সখটাই আগে মিটুক। তারপর গিয়ে আমরা বাঁচব।

বাদলা খুড়ো চোখ মুছলো। ফ্যাকাসে চোখ রক্ত শূন্যতায় সারা গা হলুদ। কোন-ক্রমে কাশতে কাশতে বলল, ও ফিরোজ

ভায়া, সামনে এত জটলা কিসের গো। কুনো গণ্ডগোল-টণ্ডগোল হল নাকি? আজ ইলিফ পাবো তো? ফিরোজ মিঞা এতক্ষণ খেয়াল করেনি। গালাগালি কানে ঢুকতেই হুঁশ হলো ওর। কতকগুলো উঠতি চ্যাংড়া রাগে হাতওলা গেঞ্জি গুটিয়ে বগলের কাছ অব্দি এনে ফেলেছে। সকলের হাব-ভাবে একটা মস্তানী ফুটে উঠছে। যে ছেলেটা এতক্ষণ রিলিফের চাল ওজন করছিল কটা যুবকের ঘুষিতে তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচছে। হাত জোড় করে সে নির্দোষ প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বাদলা খুড়োর কণ্ঠনালী মুহূর্তে ভয়ে শুকিয়ে যায়, হ্যাঁ গো, মিঞার পো এ যে রক্তারক্তি কান্ড। কারণটা কি বলো দিনি. তা ভায়া, আজ ইলিফ পাবো তো?

ফিরোজ মিয়া চট করে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নেয়। ওর রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। চোখ দুটো লাল লাল করে চমকে ওঠে—তুমি থামো দিনি খুড়ো। কি জুরচুরিটা এরা দেনের বেলায় করছে তা একবার ভাবো দিনি। এ যে দিনে ডাকাতি গো। কাল বলে এডিওতে এক সের চাল দেবে বলল—আর এনারা দেচছেন তিন পোয়া। ভাবো কেমন বাগে পেয়ে গলা কাটছেন। এদের গায়ে পোকা হবে। আবার বলে কি ইলিফ আনার লোকো খরচ, বাবুদের আসা-যাওয়ার খরচ বাবদ এক পোয়া করতন বাথে।

—আরে বলছো কি? চোখ কপালে তুলে বাদলা খুড়ো ভড়কে যায়. 'সেদিন যে দেখলাম বি ডি ও আপিসের লোকোয় করে ইলিফের সব চাল দে গেল। সরকারী লোকোর আবার ভাড়া কিসের? একি মগের মুলুক নাকি? তা বাপু, খুচরো ওজন মাথা পিছু দু মুঠ করে চাল বাদ দিলেই তো ঢের। তুমি তো ভাবনার কথা বললে।

ফিরোজ মিঞা রাগে ঘেন্নায় থম মেরে থাকে। ওর চোখের সামনের জটলাটার জট খুলছে। মাথার উপর ঠা ঠা রোদ। পেট জ্বলছে ক্রমশঃ। ওর সামনের মিষ্টির দোকানটায় বেশ ভিড়। ধোয়াটে কাঁচের মধ্যে অনেক রং-বেরঙের মিষ্টি সাজানো। ওগুলো এখন ওর ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কে যেন রসগোল্লা খেয়ে শালপাতার রস লাগা ঠোঙাটা দূরে ছুঁড়ে দিল। একটা ওৎ পাতা কুকুর ছুটে গেল মুহূর্তে। আর একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে লেজ নাড়ছে। সামনের জলা খেতটায় বানের জলের ঢেউ উঠছে। ফিরোজ মিঞা বোজা চোখে অনুভব করে ঐ জলা খেতের উপর দিয়ে প্রধানবাবুর মেয়ে-জামাই সাঙ্গ-পাঙ্গরা কোথায় যেন হারিয়ে যাচছে। ফিরোজ মিয়া কিসের তাগিদে শুকনো ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল আরেকবার।

ন্যাংটো ছেলের টান

তিনখানা ইঁটকে উনুন বানিয়ে নাফিজার রান্না শেষ। সকাল থেকেই ওর মনটা খারাপ। ভাঙ্গাপাড়ার ইস্কুলে এমন [illegible] পারেনি। তাই রান্নাবান্না শেষ করে ও খালি কেঁদেছে। ফিরোজ মিয়াকে আসতে দেখে সে কান্নার গতি বাড়ল।

—তুমি শীগগির আমাকে এখান হনে নে চল। আমি এখানে আর এক দণ্ড থাকবো না। জান, তুমি চলে যাবার পর ওরা না আমায় খুব করে মুখ করেছে। আবার বলে কি।

—কারা তোকে মুখ করল? কেনে কি করেছিস তুই?

—আমি কিছু করিনি। একটা ন্যাংটো পারা ছেলে দুটো ভাত খেতে চাইল। আমি থাকতে না পেরে দিয়েছি। আর ওমনিই ওরা মুখে যা না আসে তাই শুনিয়ে গেল। বলে আমি নাকি জাত মেরে দিয়েছি। আমার নাকি গা-গতরে পাপে কুষ্ঠ হবে। হাতে পোকা হবে।

—চুপ কর। কানছিস কেনে। বেশ করেছিস—খেতে দিয়েছিস। একটা দুধের বাছা না খেতে পেয়ে খিদেয় কাতরাচছে তুই দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে দেখবি নাকি? ন্যায়ের কাজ করেছিস। যা চুপ কর। একটা লতানে শিমগাছ অবলম্বন পেলে ভরসায় স্থির হয়ে থাকে। নাফিজা খোদার উপর অভিমান করে ডুকরে উঠল, হ্যাঁ গো, দুধের বাছাটাকে অমন ধারা বানের জলে চান করালে ও বাঁচবে তো? আমার না কেবল ভয় ভয় লাগছে। ওরা বড় পাষাণ গো। না হয় দুটো ভাত আমার হাতেই খেইছে। তাতে কি সাত্যি সাত্যি কারো জাত চলে যায়? সে বেধম্মী হয়ে যায়? কি গো চুপ করে দেঁড়িয়ে কেনে—বল?

ফিরোজ মিয়া নাফিজার নরম জাজিমের মত চোখ দুটোকে বড় বেশী অসহায় দেখে বিব্রত বোধ করে। —জাত কি কাঁচের খেলনা নাকি— পড়লেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়? তুই চুপ কর, অমন করে আর নিজেরে পোড়াস নে। খোদা কি বলে—তুই ছোট আর আমি বড় জাত। তুই হেঁদু আর আমি মোচোলমান। ...যে বেটা খোদার উপর খোদাগিরি করে সে তো চামার। নাফি, পৃথিবীতে দুটো জাতই আছে—মেয়েমানুষ আর মিটা ছেলে। এর বেশী আমি কিছু মানি না।

নাফিজার চোখ ভরসায় বুজে আসে।

—জানো, ওরা না ছেলেটারে পাশাচিত্তি করিয়েছে। ওর মা বানের জলে চান করিয়ে পাকা কলায় গোবর পুরে খাইয়েছে।

—ছেলেটা খেল?

—তা আবার খাবে না। যেমন করে পেটচাঁছলো তাতে না খেয়ে বাঁচন ছিল নাকি। আমাদের খোকাটা বেঁচে থাকলে ওর মত হোত—তাই না, বল।

ফিরোজ মিয়ার আঁতে ঘা পড়ে। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবনা শুরু হয়। মনে পড়ে যায় ওর খোকা আবদুলের কথা। কি দুরন্ত ছিল ছেলেটা। শেষমেষ সাপের কামড়ে [illegible] মারা গেল। ফিরোজ মিয়া চোখের জল মুছে বিড়বিড় করে ওঠে জানিস আমারে মা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। যখন মসজিদে ভোরে নামাজ পড়া শুরু হয় তখন কে যেন স্পষ্ট আমায় বাপজান বাপজান বলে ডাকে। আমি ধরফড়িয়ে উঠি। চারদিক তালাস করি। আমি বেশ বুঝতে পারি, আবদুল তার ছোট ছোট পা ফেলে কমনে হারিয়ে যাচছে। আমি কান খাড়া করে ওর পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠি। নাফি, আবদুল যেমন বেকেলে খেলা সেরে এক হাঁটু ধুলোতে আমায় বাপজান বলে গলা জড়িয়ে ধরত তেমনি কে যেন আমার গলা প্যাঁচ দিয়ে জড়িয়ে ধরে। আমি ভয়ে আবদুল করে চিল্লিয়ে উঠে। মসজিদের পেছনের গাছগুলোর দিকে তাকালে কেমন ভয়ে জান কুঁকড়ে যায়। ওখানে বড় আঁধার। মনে হয় ঐ বেড়টায়, ঐ আঁধারের মধ্যিখানে আমার আবদুল লুকিয়ে আছে। আমার সংগে লুকোচুরি খেলছে।' —ফিরোজ মিয়া নাফিজার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। অপটু হাতে চোখের জল মুছে নিয়ে নাফিজাকে ধমকে ওঠে, 'কিরে, কানছিস কেনে। চুপ কর। সবাই কি সব দিন থাকে? বনটিয়ারে শেকল দিয়ে বাঁধতে গিয়ে আমরাই তো ভুল করেছি।'

নাফিজা পুরুষটার এত দিনের নিভানো আগুন উসকে দিয়েছে। সেই আগুনের আঁচ সহ্য করার হিম্মৎ তার নেই।

—কি হলো, তুমি কানছো কেনে? জান, এরকম অবেলায় চোখের পানি ফেললে ফেললে খোকার অমঙ্গল হবে। আমার আবদুল তো আল্লার জিম্মায় সুখেই আছে। ওখানেই থাক। এ পাপ জায়গায় না আসাই ভালো। এখানে এক মার হাতে ভাত খেলে অন্য মায় কাছে পাশচিত্তি করতে হয়। আমার আবদুল বাপ ও সব করতে পারবে না। বাছা আমার বড় আদরের ছেলে গো। কোল [illegible] করে ফেলত একেবারে। পরবের দিন ছেলে আমার বড় মিঠাই খেতে ভালবাসত। আহা, চাঁদ আমার কোল ফাঁকা করে কমনে চলে গেল। আর আসল না।

নাফিজার কথায় মা মা দরদ। ওর বুকের ভেতরটায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। চোখ বুজলে একটা ন্যাংটো খোকা ওর গলা জড়িয়ে ধরে। মা, মা ডেকে ওঠে। খাবারের জন্য হাত পাতে। একটা ধুলোমাখা ন্যাংটো ছেলের অভাবে ও কাবু হয়ে যায়। বাঘিনী থেকে ক্রমশঃ বিড়াল হয়ে পুরুষটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফিরোজ মিয়া ব্যর্থ শিকারী। ওর বুকে বাঘিনীর থাবা বিড়ালের আঁচড়। সারা বুকে রক্তহীন ঘা। ওর নিজস্ব মেয়েমানুষের আটালো চুলে ফিরোজের মাথাটা হেলে পড়ে। সামনের নারকেল বাগানে অজস্র বনটিয়া উড়ে বেড়ায়। শিস দেয়। ডানা ঝাপটায়। ফিরোজ মিয়া একভাবে তাকিয়ে থাকে। সব বন-[illegible]

বৃত্তান্ত

সুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়

কানমুখো ঘেঁসে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। সামনের সারির চেয়ারগুলোর ফাঁকে লটকে পড়েছিল দেহটা। ঐ অবস্থায় চাপা গর্জনের মত কণ্ঠস্বরে, একরাশ গালি শুনতে পাই, শালা, বর্তমিস খেলটা (সিনেমাটা) সামনে হচ্ছে উল্লুক, পেছনে না।

আমার সব অন্ধকার তখন। অথচ হলটার আবছা আলো ছিল, কেননা ৩০।৩৫ হাত দূরে সামনে 'উদয়ের পথে' হচ্ছিল। সে সময় শয়তানের কাণ্ড ঘটে। আমার ঠিক পেছনেই সুর্মা টানা এক-জোড়া চোখও সিনেমা দেখছিল না। তার ঝকঝকে নাকছাবি হলের আবছা আলোয় হাতছানি দিয়ে বারবার আমাকে পেছনে তাকাতে বাধ্য করে আমার চোখের সঙ্গে তার চোখ, আমার বুকের স্পন্দনের সঙ্গে তার স্পন্দন মিশিয়ে দিচ্ছিল। এ অবস্থায় আমি সম্পূর্ণ অসহায়। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তবু প্রচণ্ড শাস্তিটা আমার ওপরই এল।

হাসপাতালে আত্মীয় স্বজন বলাবলি করছিল—দুদিন পরে জ্ঞান ফিরেছে। তখন আমার সব কিছু জ্বলন্ত দুপুরে হৈ হৈ হা হা করে পুড়ে যায়।

(২)

ব্রেন খারাপ হয়ে যাবার পর সরস্বতী বাই নামটা আমি অনবরত উচ্চারণ করতে থাকি। অবশ্য আমি পাগল হয়ে গেছি একথা একেবারেই বিশ্বাস করি না। কারণ যারা আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে আমার নির্ঘাৎ ধারণা তারা সব উন্মাদ হয়ে গেছে। আমি তাদের চেয়ে সব কিছু অনেক সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারছি, কার্য-কারণ সম্বন্ধ বের করছি সব কিছুর, ন্যায় অন্যায় নিক্তিতে ওজন করছি, যেসব কাজ ওদের মোটা মাথায় কিছুতেই করা সম্ভব নয় সেসব অতি নিখুঁতভাবে করছি বলেই দলে ভারী ওরা আমায় প্রথমে ঘরের মধ্যে ঠেলে দেয়, তারপর দরজায় শেকল তুলে দেয়। সকাল বেলায় এ রকম জুলুম আর অপমান কেউ সহ্য করে না তাই দরজাটা ভেঙ্গে ফেলা আমার একান্তই যুক্তিযুক্ত ছিল। আর সেই পুরোনো শাল-কাঠের বোর কাঠ সমেত পাল্লা দুটোর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে একটু অমন রক্তারক্তি করে ফেলা প্রকৃতই আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়।

এসব যখন ঘটছে তখনই সরস্বতী বাইয়ের নামটা আমার মনে পড়ে যায়। শুধু নামটাই। কেননা বারবার আমি চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছিলাম, সরস্বতী বাই, সরস্বতী বাই, সরস্বতী বাই, সরস্বতী বাই, সরস্বতী বাই...আর মনে মনে গুণে যাচ্ছিলাম ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭...১০০ ১০১... দুঃ শোঃ ২০১, ২০২, ২০৩... চার শো ও-ও...সাতশো সা তা ন ব্বু ই আটানব্বুই...। কোন শালা ম্যাথমেটি-সিয়ান বলতে পারবে না যে আমি গুণতে জানি না, হ্যাঁ। এ অবস্থায় ঠিক গুণতে গুণতে হঠাৎ আমার খেয়াল হয় যে প্রথমে নামটা উচ্চারণ করে করে গুণে যাচ্ছিলাম, এখন শুধু গুণেই যাচ্ছি। তাই তো। শুধু শুধু গুণে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। কি গুণছি সেটাও জানতে হয়। তা না হলে আবার গোণা কিসের? মানুষ আম গোনে, জামও গোনা যেতে পারে, এমন কি ভাদ্র সংক্রান্তির আকাশে ঘুড়ি, নিদেনপক্ষে পাকুড় গাছের পাতাটাতা কিছু কিছু গুণতে হয়। এ বুদ্ধিটা এসে যেতেই শুরুতে ফিরে এসে ১-এ চন্দ্র, ২-য়ে পক্ষ, ৩-এ নেত্র এইভাবে সংখ্যার সঙ্গে বস্তুর নিয়মমাফিক যোগ সাধন করি। সুতরাং আমার ব্রেণের যথার্থ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখি না।

সন্ধ্যার পর সেই রাস্কেল ডাক্তারটা ফট ফট আলোগুলো নিবিয়ে দেয়। আমি শুয়ে থাকি নরম শরীর ডোবানো সোফায়, না ডিভানে? নীল আলোয় ঘরখানা ঘুম-নিথর হয়ে যায়। সমুদ্রের নীল জলের অনেক নিচে ডুবে যেতে থাকি। এভাবে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাই। নীল রং এখন গাঢ় হয়ে ওঠে অথচ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। আমি বিড় বিড় করি—এ... আমি...কো থায় চ...লে...ছি...?

আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে কেউ জিজ্ঞেস করে, — সরস্বতী বাই তোমার কে?

—আ-মা-র স-অ-ব...।

—সে কোথায় থাকে?

—আ-মা-র হা-র্টে, ব্রা-ডে...। বোধহয় কিডনীতেও বলেছিলাম মনে পড়ছে না)

—কতদিন আগে তুমি তাকে দেখেছিলে?

না-ই-ন টি-ন ফ-র-র-টি সি-ক...স এর টোয়েনটি সি-ক-স-থ ন-ভেম্ব-র...।

—আচ্ছা আজ এই পর্যন্ত। এই বলে সব সাদা আলো জ্বেলে দিল। জানলা-দরজা খুলে দিল। নিচেতলার বাজারের, বাসের, ট্রামের, তেলেভাজার সব শব্দ গন্ধ আস্বাদ বাতাসের সঙ্গে হু-হু করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমি চিৎকার করতেই থাকি—ডাক্তারের

কাছে সব ঠিক ঠিক বলতে পেরেছি, মায় টোয়েন্টিসিকসথ নভেম্বর পর্যন্ত, তবে আমাকে দরজার শেকল তুলে আটকে রাখা হচ্ছে কেন? কোনটা ভুল বলেছি? কোনটা ভুল হয়েছে? আমি চ্যালেঞ্জ করছি সবাইকে। গলা ফাটিয়ে সকাল থেকেই চেঁচাই—সব ঠিক বলতে পারি, সব বলতে পারি একজাকটলী বলতে পারি, কার দোষে আমি জন্মেছি, কেন আমাকে জন্ম দেওয়াটা উচিত হয়নি, সব চিৎকার করে সবাইকে বলব...যদি এক্ষুনি দরজা খুলে না দাও তবে সব হাঁড়ি হাটে ভাঙ্গব, দুম দুম, দুম দুম...

দাও মা গো, তোমাদের পায়ে পড়ছি। একবারটি খুলে দাও দরজাটা, দেখবে আমি কত নিরাপদ, তোমাদের চাকর হয়ে থাকব কাউকে মারব না ধরব না একবারটি খুলে দাও বাপ, বাইরে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকব...। অনুনয়ে কাজ না হতে আমি ক্ষেপে যাই আবার—শালা শুয়ার কা বাচচারা আমাকে এখান থেকে কেন বের হতে দিচ্ছ না আ আ আ?

মুলুক বনারস। সময় সবুহ সাহড়ে পাঁচ বজে। ইলাকা ডাল কা মণ্ডি। ওরফে পশ্চিমের বিখ্যাত বেশ্যা পল্লী। নভেম্বর মাসে কি তুষারপাত হচ্ছিল যে উনিশ বছরের জোয়ানটা অত রকম শীতের জামা-টামা জড়িয়ে হাঁটছিল?

—এ ছোকরে।

ভাঙ্গা গলার ডাক শুনে সে থমকে দাঁড়ায়। লোকটার চোখ দুটোয় সুর্মা লেপে রয়েছে। সে খক খক করে কাশছিল। মুখের চামড়ায় বয়েসের কুঞ্চন। সে কারণ দুটি বসন্তের পুরোন খোঁদলগুলো নাড়া খাওয়া জলের ওপর আনাজের খোসার মত ডুবছিল আর ভেসে উঠছিল। রাস্তা থেকে দু ধাপ পইঠে ডেন চেপে প্রথমটা। তার গায়ে আলকাতরা মাখানো দরজার ভেতর দিয়ে সোজা দোতলায় ওঠার উঁচু ধাপের অন্ধকার সিঁড়ি—সাপ খেলানো বাঁশির স্বরের সম্মোহন। তাই সে ছোকরা সরীসৃপ হয়ে যায় পাঁচ মিনিট কে লিয়ে অন্দর আনা' এই সম্ভাষণে। অন্ধকার সিঁড়িতে কোন রকমে ফণা দুলিয়ে কাৎরাতে কাৎরাতে ওপরে উঠে যায়। সেই সরীসৃপ ছোকরা এইভাবেই একটা ঘরেও পৌঁছে যায়। যে ঘরে রবি বর্মার দুর্বাসার অভিশাপ, জটায়ু বধ, দুষ্মন্তর প্রেম ইত্যাদির পাশাপাশি বোতাম খোলা কিমোনোয় সুঠাম দুটো বুকের আভাস জাপানী নকসাদার হাত পাখার কিছু উঁচুতে জাপানী চোখে নিমন্ত্রিত যৌবন।

এই ঘরে এখন সাঁপ আর অন্ধকার। সাপুড়ে তার বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে ভাঙ্গা গলায় মুন্না বাইকে ডাকে। তারপর নিচে নেমে যায়।

সকাল থেকে আমি প্রিপেয়ার্ড হয়ে রয়েছি। মুন্না বাইয়ের নামটা কিছুতেই উচ্চারণ করা চলবে না। দুশমন ডাক্তারটা বেনারসে হয়তো বা খোঁজ-খবর নিতে লোক পাঠাতে পারে। একটা কেলেঙ্কারী বাঁধাতে অসুবিধে কই? তাছাড়া মুন্না বাই, মুন্না বাই, মুন্না বাই, মেরী মাতা মেরী মাইজী, মুন্না বাই তেরী পায়ের তো' আমার শত কোটি প্রণাম মাতাজী....। কেঃ? ও তুমি! আমার স্বনামধন্য পিতাঠাকুর মহাশয়? যাঁহার কল্যাণে এই অভাগা পৃথিবীতে...। নামটা শুনে ফেলেছেন তো? ওটা কিছু নয়, কিচছু নয়, শুধু একটা মা আ ম হাঃ হাঃ।

—আচছা মুন্না বাই বলে তুমি কাউকে চেন?

নীল আলো জ্বলা সমুদ্রের তলার মত বন্ধ ঘরে রাস্কেলটা আমার ট্যালেন্টের অনেক প্রশংসা টশংসা করার পর হেঁড়ে গলাটাকে মোলায়েম করে ফিস ফিস করে।

এাঁ...মু ন না...বাই...মু ন না বাই...

সকালের প্রিপারেসন হঠাৎ মনে পড়ে। প্রতিজ্ঞার কথা হঠাৎই আমাকে সবল করে তোলে। আবার ঠোঁট দুটো এলিয়ে যায়, হাতের কাছের সব দড়িদড়া চেন জড়িয়ে ঠোঁট দুটো শক্ত করে বাঁধি।

—মা আ আঃ...বড্ড কষ্ট দিচ্ছেন......

—আচছা, স্বপ্নে-টপ্নে কখনও মুন্না বাই নামটা শুনেছ কি?

আমার ঠোঁটা আবার শিথিল হয়ে যায়, ঠোঁট দুটো বেঁধে রাখতে পারি না, বলে যাই।

—হ্যাঁ মু-ন-না বা-ই মেরী মাতা... আমার শত কোটি প্রণাম নিও মাতাজী...।

ফটাফট সাদা আলোগুলো জ্বলে ওঠে। আমাকে বসিয়ে রেখে ওরা পাশের ঘরে চলে যায়। স্পষ্ট শুনতে পাই খারাপ রোগ বলে মনে হচ্ছে। তবে খুব-প্রাইমারী স্টেজে রয়েছে তো অসুবিধে হবে না।

আমি দৌড়ে যাই। পাগলের মত চিৎকার করি—নোঃ আই হ্যাভ নট হ্যাবিটেড এনী প্রসটিটিউট আপটিল নাও....শী ওয়াজ এ ভার্জিন...অ্যাবসোলিউটলী...

অনেক রাস্তা ঘুরে ট্যাকসিটা আচমকা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

সেই আবছা আলোর ঘরে উনিশ বছরের যুবক মুন্না বাইয়ের সামনে আবার সম্মোহিত হয়ে পড়ে। তার ফণা মাটিতে লুটিয়ে যায়। দুটো চোখ দিয়ে মুন্না বাইয়ের কথা শোনে তখন তাই দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়।

ক্যা নাম বেটা?

—মুকুর্জি, তব তো ব্রাহমন আছ বেটা? উমর কেতনা?

উনাইশ। আরে মেরে লাল। মেরে ভগওয়ান।

দু গোছা সবুজ বেলোয়ারি চুড়ি ঝাঁকিয়ে মুন্না বাই দু হাতে ওর কানমুখো চেপে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্নের মন্ত্রোচ্চারণ করে যায়, সাদী হুই কি নাহি'? ঘর তো কোন হ্যায়? পড়তে হো কি কাম করতে হো? শরীরে কোথাও ঘাও খুজলি আছে কিনা?

মুন্না বাই, সবুজ উল্কি তোলা সোনার রঙের পাঞ্জা উনিশ বছরের যুবকের চিবুকে ঠেকিয়ে পাঞ্জাটাকে চুমু খায়। তার বুকে হাত রাখে। যুবকের দু চোখ জলে ভরে ওঠে। বাইরে প্রশান্ত রোদ্দুর ঝিছিয়ে থাকে। জটায়ু বধ ছবির ঠিক সামনে বসে উনিশ বছরের যুবকের কানে সুন্দরী প্রৌঢ়ার অমোঘ এক প্রশ্ন উত্তপ্ত তরল ধাতুর মত গড়িয়ে গড়িয়ে প্রবেশ করতে থাকে। যে প্রশ্নের ভাষা হিন্দী নয়, তামিল নয়, ইংরিজী নয়, জার্মান নয়। যে প্রশ্নের কথাগুলো সব ভাষাতেই এক, কেননা মানুষের কঠিনতম ধাতুকে প্রচন্ড উত্তাপে গলিয়ে সেই কথাগুলো গড়া হয়।

—বেটা, কবুল কর না, কভী কিসী ঔরতকো... ;

স্ত্রী সহবাসের এই প্রশ্নে যুবকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। সে মুন্না বাইয়ের অতিরিক্ত ভোগ লাঞ্ছিত সুঠাম প্রৌঢ় দেহটা জড়িয়ে ধরে হো হো করে কাঁদতে থাকে।

ইনজেকসন দেবার মিমিট দশেকের মধ্যেই আমার সব হারিয়ে যেতে থাকে। ডাক্তার একই প্রশ্ন করে। কিন্তু মুন্না বাইয়ের মত অকৃত্রিম পবিত্র ভাষায় নয়, জঘন্য শব্দ বন্যার কদর্যতায় প্রশ্নটা নাচতে থাকে।

—আচছা কখনও কারুর সঙ্গে শুয়েছ? মনে পড়ে মা।

আমি মুন্না বাইয়ের অকৃত্রিম ভাষার পবিত্রতাকে শ্রদ্ধা জানাই। প্রস্তুত হয়ে উঠি। প্রতিবাদের শক্তি আমার ফিরে আসে। এই রাস্কেলটার কাছে সত্যি কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করি না।

—নো, নেভার।

ক্লাউনিক পৃথিবীতে আর এক জোকার উপহার দিতে পেরে মনে মনে খুব খুসি হই।

—তবে তুমি যে সেদিন বলেছিলে যার সঙ্গে তুমি সহবাস করেছিলে শী ওয়াজ এ ভার্জিন? কে সে?

আবার আমার স্নায়ু রোধ, প্রতিরোধ-ক্ষমতা তলিয়ে যেতে থাকে। হাসি কান্না ক্রোধ ক্ষোভ নীল জলের গভীর অতলের নিচে এলিয়ে এলিয়ে ডুবে যায়। ঘুমের আচ্ছন্নতায় অবশ হতে থাকি।

উনিশ বছরের যুবকের কান্নার আবেগ স্থির হলে সে দেখতে পায় মুন্নাবাইয়ের চোখদুটো জলে টলটল করছে। মুন্নাবাই আঁচল চেপে জলের ফোঁটা শুষে নেয়। যুবকের হাত ধরে নিজের কোলে রাখে। অনেকক্ষণ এইভাবে দুজনে বসে থাকে।

মুন্নাবাই চোখ নামিয়ে নেয়। বলে,— মেরে লাল, আজ তুম মেরী বেটীকী নথুনী উতারোগে।

এরপর মুন্নাবাই অস্থির হয়ে যায়, মুন্না

ছেড়ে দিয়ে ডুকরে কেঁদে ফেলে। দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যায়।

ঘরের মধ্যে জটায়ু বধের সামনে, দুর্বাসার অভিশাপের নিচে একাকী সাপের মাথায় মানিক জ্বলে ওঠে। তার আলোতে সাপ অন্ধ হয়ে যায়। পাগল, আত্মহারা হয়ে যায়। মাথার মানিকটা সবকিছু আকীর্ণ করে জ্বলতেই থাকে।

সারাদিন ধরে মুন্না বাইয়ের কোন এক অদৃশ্য মেয়ের নথ খসানোর জন্যে তাকে প্রস্তুত করা হতে থাকে। ফুলেল তেল দিয়ে সারা শরীর মালিশ করে, কানসাফাইওয়ালা কানের মধ্যে তুলো শলাকা ঘোরায়, নাও নখ কেটে পরিষ্কার করে যায়, উষ্ণ জলে আতর ঢেলে স্নান করানো হয়, মেহেদি মসে হাতের পাঞ্জায় ফুল লতাপাতা এঁকে দেয়, চুয়া, চন্দন, আতর গোলাপ আর কেয়ার জলে যুবকের শরীর অপার্থিব হয়ে ওঠে। নির্বাক প্রতিরোধহীন প্রহর কেটে যায়। আশপাশের কুঠরীগুলো থেকে নারীকন্ঠের গুঞ্জন শোনা যায়, কখনও বা সমবেত কলহাস্য। প্রতিরোধহীন যুবককে কেউ কিছু খেতে দেয় না, অথচ সে ক্ষুধা অনুভব করে না, বাড়ি থেকে কেউ ডাকতে আসে না তাই সে বাড়ির কথা, মা বাবা ভাইবোন আত্মীয়-স্বজনদের কথা ভুলে যায়।

উনিশ বছরের যুবকের মাথায় পাগড়ি বাঁধা হতে থাকে। বিশ হাত মলমলের দৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে কমে যায়। পুঁতি, জরির টুকরো, চুমকি, মোরাদাবাদী দরীর ওপর ছিটকে ছিটকে পড়ে খেলতে থাকে। নভেম্বর মাসের ছোট্ট বিকেলের প্রান্তে এসে দেখা গেল কিংখাবে, জরীতে, নকল মুক্তোর মালায়, পাগড়িতে, শালোয়ার শেরওয়ানীতে সাজানো এক অপূর্ব যুবাপুরুষের সুর্মা-টানা আরক্ত চোখদুটো আর দীর্ঘ সরু করে ছাঁটা গোঁফের নিচে গোলাপ ঠোঁটজোড়া বিহ্বলতায় থরথর করে কাঁপছে।

বাবা কখনও দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকেন। মার ওপর তম্বি করে যান।—কী চরিত্রবান সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিলে, বলিহারি যাই, ছ্যাঃ ছ্যাঃ, গর্ভের নিকুচি করেছে, শালা কত পাপ করেছি মাইরি......। শেষ বাক্য উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভিজে ন্যাকড়ার মত স্যাতসেঁতে হয়ে যান আবার। আমার বন্ধ ঘর থেকে বুঝতে পারি ন্যাকড়াটা জলে নয়, কেরোসিন তেলে ভেজানো হল, একটু পরেই আবার দপ্ করে আগুন লেগে যাবে। দুমদাম ছোট ভাইবোনদের পেটাতে শুরু করবেন, হাঁড়ি কলসীতে লাথি মারতে গিয়ে পায়ে চোট লাগবে। তারপর সন্ধ্যে থেকে চুন, হলুদ পট্টি এইসব নিয়ে বাবাগো মাগো বলে গোঙাতে থাকবেন। ব্রেনের এতটুকু সুস্থতা থাকলে কেউ এরকম করতে পারে না জানি। কিন্তু বাবার ব্রেনের এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার বুঝেও আমি কিছুই করতে পারি না কারণ ওরা আমাকেই ঘরে বন্ধ করে রেখেছে।

মা ক্ষেপে যায়।—বড় অপোগন্ডটার পেছনে অত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে যাচ্ছ যে দুদিন পরে বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়ে পথে বসতে হবে বলে রাখছি।

বাবা পাগলের মত চিৎকার করতে থাকেন—আমার মাথাটা যে ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়াচ্ছে গো, পাড়ার লোকেরা যে গায়ে থুথু দিচ্ছে...আমি পাগল হয়ে যাব......সুইসাইড করব দেখে নিও।

শয়তান ডাক্তারটা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বাবাকে বলে—ওই যে মাথায় থাপ্পড়ের কথা বলেছিলেন, মানে ও যে মাথায় আঘাত পেয়েছিল, ওটা কোন সিরিয়াস ব্যাপার নয়, ওটাতে কিছু হয় না।

কথাগুলো আমাকেই শোনানো হয়। আমাকে নিরাময় করার একটা প্রক্রিয়া হয়ে যায় এইভাবে।

নভেম্বর মাসের ছোট বিকেল, তারচেয়ে ছোট্ট সন্ধ্যে থমথমে গাছের ফোকরে পাখি আর তার বাচ্ছার মত সেঁদিয়ে যায়। তারপর আলো জ্বলে ওঠে। সেটা জ্যোৎস্না না ভোরের আকাশ বোঝা যায় না। নিরালম্ব যুবকের সামনে কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো তিনটে ঝাড়লন্ঠন পর পর আলোআঁধারি খেলতে থাকে। দেউড়ীতে কখন থেকে সানাইয়ের পোঁ ধরে রেখেছিল, হঠাৎ তার সঙ্গে ক্যাঁ ক্যাঁ করে ঠেকাসমেত একটা গৎ বেজে ওঠে। পরিবেশটা যুবক এখন বুঝতে পারে। সারাদিন কিছু খায়নি টের পায়। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে ওঠে।

বহুক্ষণ পরে সে প্রথম কথা বলে,—তিয়াস লাগি হ্যায়।

জল আসে না। আসে দুধ বাদামের সরবৎ। যার ভেতর সবুজ পেস্তার আর সিদ্ধির রঙ ঝিলমিল করে। জল চায় সে। অনুনয় পায়—ঈ পী লেও বেটা।

মুন্নাবাইও সবুজ বুটিদার বেনারসী পরে আছে, পাঞ্জায় সবুজ উল্কি, কপালে সবুজ লম্বাটে টিপ। বলে—অব দের নেহী হোগী বেটা, থোড়ী দের মে খানা খাওগে।

এবার সে গালে চুমু খায়। দুর্বাসার ছবিকে হাত জোড় করে নমস্কার করে। বলে ভগবান তেরে সহায়া হো।

—আমার কী হতে চলেছে বলুন তো? সগাই সাদি, গহনা, না অন্য কিছু?

মুন্নাবাইয়ের সুর্মাটানা চোখের নিচে ওটা ব্রণ নয়, টলটলে জলের একটা ফোঁটা, এতক্ষণে সে দেখতে পায়। মুন্নাবাইয়ের লম্বা নিঃশ্বাস পড়ে। সে বলে—ওসব তো আমাদের করাতে নেই বেটা। আমরা যে বেহেস্তের পাপী। মুন্না বাই বিড়বিড় করে যায়—তুম স্বরগ কা মেহমান, এক রাত কে লিয়ে সরস্বতীর জান, মান, কলিজা হয়ে এ ঘরে এসেছ। জিন্দাগি ভর খুশ রহো ইনসান্, ভগবান তেরা ভালা করে।

হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, এরকম পারফেক্ট লেডী আমি আর জীবনে দেখি নি। অমন এলিগ্যান্ট গ্রেসফুল উওম্যান আপনিও কখনও দেখেননি আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

—দেখ, তুমি যে দুটো ওয়ার্ড এইমাত্র

ব্যবহার করলে, ঐ লেডী আর উওম্যান, এরা যাদের জিনোটাই জন্মেছে তারা পুরুষের ব্রেনে ঐ বয়েসে কয়েকটা রহস্যের সৃষ্টি করে, তা থেকে কিছু জটিলতা আসে। সে জট তুমি নিজের চেষ্টাতে খুলতে পারছ না। আবার তুমি নিজে সাহায্য না করলে অপরে সে জট খুলে দিতে পারে না। তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমি তোমার সব জটিলতার গিঁট খুলে দেব। আচ্ছা ঠিক ঠিক জবাব দাও,—মুন্নাবাই অর্থাৎ সরস্বতীর মা তো সবুজ বেনারসী, সবুজ টিপ, হাতের পাঞ্জায় সবুজ উল্কি নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলেন। এবার বল, সরস্বতীকে তুমি প্রথম কীভাবে দেখলে?

—সরস্বতী, স...র...স্ব...তী...

—বল, বল।

—তারপর তো? আলোটা জ্বললো তো? ...তখন মুন্না বাই...তার হাত... ধরে...অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেল...। কোনখান দিয়ে নিয়ে গেল... কোনখান...দিয়ে নিয়ে গেল... মনে পড়ছে না, ডাক্তারবাবু আমি বড় হেল্পলেস হয়ে পড়ছি, ঠিক মনে পড়ছে না

—মনে কর, মনে কর ঠিক মনে পড়বে।

—তারপর সেই ইয়ংম্যান...কী যেন নাম তার ডাক্তারবাবু?

—অনিরুদ্ধ মুখার্জি।

—হ্যাঁ, অনিরুদ্ধকে তখন সে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। অভ্যাগতরা একে একে ওকে উপহার দিয়ে যায়। ও সেগুলো নিয়ে একটা উঁচু টেবিলের ওপর পরপর সাজিয়ে রাখে। প্রথম উপহারটাই ওর কাছে আশ্চর্য প্রদীপ হয়ে বুকের ভেতর জ্বলতে থাকে। একখানা একশো টাকার নোট। সেই নাইনটিন ফরটি সিক্স-এর কারেন্সিতে একশো টাকার নতুন নোট একখানা। ভাঁজ করা ছিল না, রোল করা লাল সুতোয় জড়ানো। সেটা সর্বক্ষণ বুকের মধ্যে জ্বলছিল। তারপর একে একে কত লাড্ডুর প্যাকেট, আতরদান, পেতলের পানের বাকস, ফুলের তোড়া। দড়ি পাকানো কাপড়ের পাগড়ি মাথায় এক বুড়ো শেঠজী ওর অঙুলে হীরে না কিসের একটা ছোট্ট আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। লক্ষ্ণৌ কাজকরা সাদা শাড়ি পরা এক বুড়ি ওর দুপায়ের পাতায় দু হাত ঠেকিয়ে হাতদুটো তুলে নিয়ে নিজের কপালে, চোখে বুলিয়েছিল' তার শাড়িতে অজস্র চুমকী ঝিকমিক করছিল। এরপর এক পূর্ণ যুবতী এসেছিল, পলকাটা স্ফটিকের আতরদান থেকে ওর মাথায় ওর জামায়, সর্বাঙ্গে আবার আতর ছিটিয়ে যায়, তার গন্ধে, দেউড়ী থেকে লুকিয়ে আসা কান্না হয়ে যাওয়া সানাইয়ের শব্দে, মেয়েদের গুঞ্জনে, এলাহাবাদী আর লক্ষ্ণৌ-এর চোস্ত উর্দুর সঙ্গে মিলে যাওয়া বেনারসী ঠেট ভাষার অনর্গল কোলাহলে সেই ইয়ংম্যান...যার নাম...হ্যাঁ অনিরুদ্ধর চোখদুটো প্রথমে ঝাপসা তারপর অন্ধ হয়ে যায়। বড় টায়ার্ড ফীল করছি ডাক্তারবাবু, আমি...এবার...ঘুমোব।

—আর একটু মনে কর বল। সরস্বতীকে তুমি কখন কীভাবে দেখলে?

—আমি...বড়...ক্লান্ত... টায়ার্ড...

আমাকে বেঁধে আনতে হয়নি। ট্যাকসিটার ঘড়ঘড়ে আওয়াজ একটা ঘোরের মধ্যে মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে অনেকদূর থেকে আসা হর্ণের শব্দ।

সরস্বতী বাইকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল মুন্নাবাই। কপালের মুক্তোর টায়রা থেকে পায়ের চাঁদির তোড়া যায় পায়ের আঙুলের আংটি পর্যন্ত ঝাড়লণ্ঠনের দোলান আলো ঠিকরে পড়ছিল। গভীর নীল আকাশে কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, ধ্রুবতারা অমনি করে শিহরণে কেঁপে যায়। কপাল ঢেকে মুক্তোর টায়রা, তার নিচে সমান মাপের একজোড়া পেয়ারা পাতার সুর্মায় আঁকা আউটলাইন। চোখ দেখতে পায়নি অনিরুদ্ধ, দৃষ্টির সঙ্কোচ, ভয়, না কি ক্রোধের কান্না দেখতে পাচ্ছিল তখন। সে কান্নার শব্দে বিষধর সাপ ফণা নামিয়ে নেয়। অনিরুদ্ধ চেয়ার থেকে উঠে পড়ে। নিথর দাঁড়াবার চেষ্টা করে, শুধু শরীর সমেত শালোয়ার শেরওয়ানী পাগড়ি কাঁপতে থাকে। সাদা ভেলভেটের নাগরাটাকে পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরতে চায়। ওর চতুর্দিকে অজস্র ফুল ফুটিয়ে এক বাগান হাসতে থাকে, তার মধ্যে ঝাপসা করে দেওয়া কাঁচের গুঁড়ো ছেটানো ফোয়ারা। সে অন্ধ হয়ে যায়, বধির হয়ে যায়, স্নায়ু, শিরা, বোধ সেই উল্লসিত ফোয়ারাসমেত বিস্তীর্ণ বাগানে হারিয়ে যায়। অজস্র ফোটা ফুলের সমারোহে তাদের খুঁজে বের করার সাধ্য থাকে না।

—ওসব বাগান ফাগান ফোয়ারা টোয়ারা কিছু নয়, তুমি একটা কমন প্রসটিটিউটের খপ্পরে পড়েছিলে। একটা ইলিউশন ক্রিয়েটেড হয়ে গেছে, তার বেয়াড়া ইম্প্রেশনটা...

—কী যা তা বলছেন? সরস্বতীবাই কমন প্রসটিটিউট? শী ওয়াজ এ ভার্জিন দেন...

প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। না, এই ইডিয়টটার কাছে আর একটি কথাও মুখ দিয়ে বের করব না আমি। ইডিয়ট না হলে উনিশ বছরের এক ফুটন্ত যৌবনের একমাত্র সত্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করে কেউ?

—আচ্ছা, সরস্বতী বাইকে প্রথম দেখে তোমার স্টারলিট আকাশের মত, ফুলফোটা বাগানের মত মনে হয়েছিল, এখন বল—তুমি যখন তার সঙ্গে সহবাস করেছিলে তখন তোমার ব্রেনের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক আলোড়ন বা ঐ ধরনের কিছু ঘটেছিল কিনা?

—দেখুন, আপনি ঐ অশ্লীল শব্দটা নির্লজ্জের মত বারবার বলে যাচ্ছেন, ফার্স্ট অফ অল কথাটা উইথড্র করুন আই সে, না হলে আমার কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারবেন না।

—বেশ, উইথড্র করলাম। এখন বল।

শয়তান ডাক্তারটাকে প্রচণ্ড এক চড় মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলে ননসেন্সটার প্রসেস একেবারে ঘুলিয়ে দিই, বলি, না আ আঃ, সরস্বতীকে আমি ছুঁই নি...আই হ্যাভ নেভার টাচড্ হার ইভন অন দি হেয়ার...।

ফটফট করে সাদা আলোর সুইচগুলো অন করে দেয়। নিচের তলার বাজারের দুর্গন্ধ ভকভক করে এই তিনতলায় উঠে আসে, ডাক্তার বলে,—এক কাপ চা খাবে নাকি?

এ পাড়াতেও রাত নিঃঝুম তখন। কোন দূর থেকে ঠুংরীর একটা তান ভেসে আসছিল। ঘরে ওরা তিনজন ছাড়া কেউ ছিল না। মুন্নাবাই অনিরুদ্ধর দুপাশে ঝোলানো হাত দুটো সামনে নিয়ে আসে, তারপর সরস্বতী বাইয়ের দুটো হাত সেই হাতে ধরিয়ে দেয়। দুজনের চিবুকে হাত ঠেকিয়ে হাতে চুমু খায়। বলে, আঁখে তোল বেটা। মন্ত্রমুগ্ধ অনিরুদ্ধ চোখ তোলে। ওর চোখের সামনে এবার সরস্বতীর চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা উঁচু করে দেয়, বলে—আঁখ তোল সরসতিয়া, অপনা দেওতাকো দেখ্ লে। বাক্যটা উচ্চারণ করতে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়। একটা উদ্গত কান্না ঠেকাতে গিয়ে তার ঠোঁট বেঁকে যায়। সুর্মার বেড় দেওয়া পেয়ারাপাতার আউটলাইনের ভেতর একজোড়া নীল চোখের গভীর সমুদ্র অনিরুদ্ধর বিহ্বল দৃষ্টির সামনে বিস্তৃত হতে থাকে। অনিরুদ্ধর সমস্ত কিছু অতলে ডুবে যায়। শালোয়ার, শেরওয়ানী, পাগড়ি, বেনারসী, হীরে, মুক্তো, গয়না, ঝাড়লণ্ঠনের আলো, দুর্বাসার অভিশাপ, দুষ্মন্তর প্রেম সরস্বতীর অতিবিস্তৃত নীল চোখে ডুবে যাওয়া অনিরুদ্ধর দৃষ্টি থেকে মুছে যায়। তার অজান্তে কেবল একটা নীল জলের স্রোত তার শরীরের মধ্যে বয়ে যেতে থাকে।

মুন্না বাই তার দুটো হাত উড়ন্ত চিলের ভাসানো ডানা করে ওদের পিঠে ঠেকিয়ে আতরগন্ধে ডোবানো বিছানাময় অন্য এক ঘরে নিয়ে যায় ওদের। সরস্বতীকে বলে—খানা, সরাব, সব মজুদ হ্যায়, দুলেহনকো খিলানা পীলানা ঠিক সে।

বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দেবার আগে মুন্নাবাই অনিরুদ্ধকে দরজার কাছে ডাকে, ওর কানে কানে বলে—সরসতিয়ার উমর পনেরো হয়েছে, লড়কীপন করবে না, তোমার কোন ডর নেহী বেটা।

—তোমার তো তখন বয়েস উনিশ। শক খাবার কোন কারণ থাকতে পারে না। মিছিমিছি একটা কমপ্লেক্স তৈরী করে ফেলেছে। নাইনটিন ইজ কোয়াইট ম্যাচিওর ফর ফার্স্ট সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স, মাই বয়। এতে তোমার ব্রেনে কোন শক খাওয়া উচিত নয়। কমপ্লেকসটা তুমি একটা মোহের মধ্যে সৃষ্টি করেছ, কোন ট্রুথের ওপর ওটার বেস নেই। চেষ্টা করে মনের

জোর আন, এই জাড়িজাটা তোমার দূরে হয়ে যাবে।

—কিন্তু ডাক্তারবাবু...আমি যে হেল্প-লেস...আমি যে...আমার সত্যকে...আর কোনওদিন ছুঁতে পারব না। অন্তত বেঁচে থাকতে নয়। ডাক্তারবাবু আমি আটারলী হেলপলেস ফীল করি।

—লাইফে সত্য তো একবার আসে না মাই ডিয়ার বয়, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ডিফারেন্ট রূপ নিয়ে সত্য এসে দেখা দেয়। একটা সত্য যায়, অন্য সত্য আসে। যেটা যায় তার জন্যে চিরকাল শোক না করে হাতের কাছে যে আসে তাকে নিয়ে লাইফ স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে পড়ে। খুঁজে দেখ, এখন, লাইফের এই স্টেজে তোমার পরম সত্য কোনটা, তাকে এক্সপ্রেস করার চেষ্টা কর। আচ্ছা, আর একটু কষ্ট কর। বলে যাও।

—আমি, জানেন, প্রথমে ওকে ছুঁতে চাই নি। ও খাবারগুলো একে একে এগিয়ে দিচ্ছিল। দেখি ওর কব্জিদুটো কী অসম্ভব সরু। একেবারে বাচ্চা মেয়ের মত। সোনার মত উজ্জ্বল রঙ, বোধহয় হলুদ টলুদ মেখে চান করেছিল সেইজন্যে। আমি তো সোনার গয়না ছুঁয়েছি আগে, সোনার হাত ছুঁই নি। সেই কব্জির ওপরে হীরে বসানো ঢলঢলে চুড়ি একগোছা ঘরের আলোতে ঝকঝক করছিল। আমি সেইদিকে চেয়েছিলাম। ও প্রতিবার একটা করে খাবার এগিয়ে দিয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকছিল। চোখ তুললেই সেই অর্থহীন দৃষ্টিতে আমার চোখ আটকে যাচ্ছিল। কোন কথা কেউ বলছিলাম না। তারপর ও হঠাৎ একেবারে এক্সপিরি-য়েন্সড উওম্যানের মত দুটো গেলাসে সরাব ঢেলে একটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি করে। তখন ওর দৃষ্টি আয়ত চোখের কোণা দিয়ে উপচে পড়ে। আমি কিছু বুঝতে পারি না, ও নিজের গেলাসটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে আমার হাতের গেলাস হাতসুদ্ধ দুহাতে জড়িয়ে ধরে সেটা আমার মুখের সঙ্গে ঠেকিয়ে দেয়। আমি ওর অনুনয়ী অপলক চোখের দিকে চেয়েচেয়ে সরাবে চুমুক দিই।

এক চুমুক খাওয়াবার পর ও আমার ঠোঁটে এঁটো গেলাসটা চেপে ধরে এক-চোকে অনেকটা খেয়ে ফেলে। মুখ বিকৃত করে। তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। আমিও হাসি দিয়ে ওর হাসিকে অভিনন্দিত করি।

—বাঃ এক্সপ্রেশনটা খুব সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা, ঐটাই তো তোমার ড্রিঙ্ক-এর প্রথম এক্সপিরিয়েন্স, তাই না?

—হ্যাঁ।

—তার আগে সিদ্ধার্থটিন্থ অন্য ইনটক্সি-কেশনের অভিজ্ঞতা ছিল?

—অনেকবার। বারো বছর বয়েস থেকেই সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে আসছি ডাক্তারবাবু। মাঝে মাঝে বেহুঁশ হয়ে পড়তুম। আচ্ছা, সিটিংটা আজ শেষ করলে হয় না?

—না বয়, আর তো বেশী নেই। শেষ করেই ফেল। কষ্ট হয়, তো আর একটা ইঞ্জেকসন দিয়ে দি।

হাসতে হাসতে আমার চোখের ওপর চোখ রেখে ও আমার কাঁধে হাত রাখে। আমি কিছুক্ষণ ওটা ওখানেই থাকতে দি। তারপরে হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে এনে দুহাতের মধ্যে রেখে বসে থাকি। সরস্বতী চোখ নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। আমার সামনে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত একটা আয়না ছিল, আমার চোখ সেদিকে চলে যায়। সরস্বতীর খোঁপার ওপরে আমার মুখখানা দেখতে পাই। হঠাৎ আমার সব মনে পড়ে যায়। বাবা, মা, ভাইবোন সবাইয়ের কথা। আমি ব্রাহ্মণ, গরীব বাপমায়ের বড় ছেলে, এ আমি কী করছি?

—মুঝে ছোড় দেও সরস্বতী। ঘর জানে দেও।

আমার চোখ ছলছল করে। সরস্বতী কথা বলে না। আর এক গেলাস ভর্তি করে আমার মুখের কাছে ধরে। কিরকম গম্ভীর গম্ভীর চোখ আমার শরীরের ওপর ছোবলায়। আমি মদ খেতে থাকি। ওর সরু কব্জির হাড়ে ঢলঢলে চুড়িগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে কনুইয়ের কাছে আটকে থাকে। প্রাথমিক ঝাঁজ, তেঁতো ভাব কেটে যেতে থাকে। আমি বেনারসীর ব্লাউজ জড়ানো ওর ডানার পাতলা হাড়দুটো চেপে ধরে শুইয়ে দিই, তারপর ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।...... এরপর আর ডিটেলের দরকার নেই, কি বলেন?

—না। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব তো দিলে না। ঐ সময় তোমার ব্রেনের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক শক্ তুমি অনুভব করে-ছিলে কিনা!

আমার গলা দিয়ে খুব জোরে বেরিয়ে পড়ে—ইমপার্টিনেন্ট।

তারপর মুখ বেঁকিয়ে প্রায় ভেঙাতে ভেঙাতে বলি—এ বৃত্তান্ত আমার মুখ থেকে শোনবার জন্যে খুব লালা ঝরছে বুঝি? কেন? নিজের প্রথম এক্সপিরিয়েন্সটা কি ভুলে গেছেন মশাই? সেইটা স্মরণ করেই মনের ইচ্ছে পূর্ণ করুন। দিন, ছেড়ে দিন আমায়।

ডাক্তার আমায় ছেড়ে দেয় না। মুচকি মুচকি হাসে। আমার পিঠ চাপড়ায়। বলে—তাহলে আর সবাইয়ের এক্সপিরিয়েন্সের মতই নরম্যাল ব্যাপার, কি বলো?

—হ্যাঁ, নরম্যাল ব্যাপার। সে রাত্তিরটার এক্সপিরিয়েন্স ফিফটি পারসেন্ট নরম্যাল। কিন্তু অত ড্রিংক করেও আমার চোখে ঘুম আসে নি। ভোরের সানাই আবার শুরু হয়েছিল। তখনও আলো ফোটেনি। আমার কোলে সরস্বতীবাই শুয়েছিল। আমি তখনও তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় দরজায় ঠক ঠক ঠক আওয়াজ হয়।

আমি পাগড়ি টাগড়ি বাদ দিয়ে মোটা-মুটি পোষাক পরে নিলাম। সরস্বতী বাই ব্লাউজ বাদ দিয়ে তার বেনারসী জড়িয়ে নিল। দ্বিতীয়বার দরজায় টোকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর গলা থেকে 'খুল রহা হুঁ' বেরিয়েছিল।

মুন্না বাই ঘরে ঢুকে। ঝড়ে বিধ্বস্ত প্রকাণ্ড একটা গাছ হয়ে গেছে একরাত্রে। চোখের সুর্মা চুর্মা, গালের রঙ, সবই ক্লান্তির আর কান্নার ধকলে ধসে গেছে। কেবল শরীরে এখনও প্রাণপণে আঁকড়ে ধরা যৌবন আবশ্যক ঔদ্ধত্য নিয়ে লেপে ছিল।

সে সরস্বতীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তারপর আমার দিকে চায়। আমারও সর্বাঙ্গ কি রকম কামনা বাসনা ঈর্ষা লোলুপতা নিয়ে দেখে। বলে—সরস্বতিয়া, কামরা ছোড় দেও।

সরস্বতী বাই চলে গেলে সে আমায় অমোঘ এক প্রশ্ন করে—তৈয়ার কর দিয়া তো?

আমি বুঝতে পারি না। তখন সে পরিষ্কার হিন্দী ঠেট ভাষায় নির্লজ্জ প্রশ্ন করে—সরস্বতীকে আমি......?

ডাক্তারবাবু, আমি কাকে তৈরী করলাম? কেন তাকে ঐভাবে তৈরী করলাম এ প্রশ্ন থেকে আমার মুক্তি নেই। আমি অসহায়। আমাকে হেল্প করুন। আমার সব তলিয়ে যাচ্ছে.... ....

—অ্যাক্সিডেন্টলী তুমি একটা কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলে। তার জন্যে তুমি দায়ী নও।

—কিন্তু আমি যাকে যৌবনের বিনিময়ে তৈরী করলাম ডাক্তারবাবু, তাকে পৃথিবীর নোংরা ধুলোতে গড়াগড়ি খেতে হচ্ছে...... আমার যৌবন এইভাবে ধুলোয় ফেলে সবাই দলে যাচ্ছে......উঃ।

—সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, সরস্বতী বাইয়ের কাছে আর কোনদিন গিয়েছিলে?

—সরস্বতী বাই...সরস্বতী বাই...হায়। মুন্না বাইয়ের চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছিল। আমার সব ঝলসে যাচ্ছিল। তারপর সেই বিধ্বস্ত গাছ হয়ে যাওয়া মুন্না বাই আমার হাত ধরে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে আসে। বলে—সরস্বতীকে ভুলে যাও। কখনও ওর কাছে আসবার চেষ্টা কোরো না। যদি কোনদিন ওর প্রতি তোমার কোন টান প্রকশ পায় তবে তোমার জান খতম কর দিয়া জায়েগা। মনে রেখো, উনকে পাস আনেকো কোশিশ করনে সে তুম্‌ভার জান খতম কর দিয়া জায়েগা...ইয়াদ রাখো।

—আচ্ছা সিনেমার পেছনের সীটে তুমি কি সরস্বতী বাইকে ঠিক চিনতে পেরেছিলে?

আমি ডাক্তারকে কোন জবাব দিই না।

জলের কাছে বলা

সোমক দাস

প্রথম প্রোলোগ

দেবযানী

সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা, শাদা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-দীপ্ত চোখমুখ। লম্বা, তাই একটু রোগা। বাড়িতে ফোন ছিল। বাবার মোটা চাকরিও ছিল। তবু, সে যখন শেয়ালদা কোর্ট থেকে পুলিশ পরিবৃত হয়ে বেরিয়ে রাস্তার অপেক্ষমান কালো ভ্যানের দিকে, যার নাম নাকি ব্ল্যাক মারিয়া, হেঁটে চলে গেল—অমনি বুড়ো শকুনের মতো কিছু উকিল ও ভোরবেলার কাকেদের মতো অনেক হাভাতে মানুষের জনতার মধ্যে লুকিয়ে ছিলুম, আড়ালে। তবু সে আমাকে দেখতে পায়। তার মা যখন টিফিনকৌটোর মধ্যে সন্দেশ নিয়ে তার কাছে এগিয়ে গেলেন, আমি বেঁচে গেলুম। এই কিছু দিন আগেও একাডেমির সিঁড়িতে বসে, অল্প আলোয়, দেবযানী আমাকে বলেছিল —তারপর, কি ভাবছো। আমি বুঝিনি। বুঝিনি, যে, দেবযানী আমাকে বিপ্লবী হতে বলছে। হায়, আমার বক্ষে, বিপ্লবী হবার মত উত্তাপ বা প্রেরণা ছিল না।

মানুষের দুঃখে আমি কেঁদে ফেলতে পারি কিংবা মানুষের নিষ্ঠুরতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে খুন করে ফেলতে পারি। আমি আর কিছু পারি না।

বিপ্লবী হতে পারি না। ভারতবর্ষে বিপ্লবের জন্যে আমাদের একসঙ্গে স্রেফ মরে যাওয়া উচিত ছিল। একসঙ্গে। কিন্তু কেবল তোমার সঙ্গেই মোট কটা কথায় আমি একমত হয়েছি তুমি তো জানো, দেবযানী।

দ্বিতীয় প্রলোগ

বিজন

বিজনকে আমি মড়ার মত বিশ্বাস করি। মন খারাপের দিনে রাত আড়াইটের সময় কলকাতার রাস্তা থেকে উঠে গেছি বিজনের ঘরে। ঘুম থেকে উঠে বিজন আমার প্রত্যেকটা কথা উবু হয়ে বসে শুনেছে। উল্টোডাঙা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেবযানী আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে, সেদিন, অনেক রাতে—একমাত্র

বিজনের পক্ষেই যেভাবে সম্ভব, গভীর মমতায় বলে উঠেছিল, অনেকদিন পরে তুই বকুতে পারবি, এ ভালোই হল।' লক্ষ্মীর ঘর থেকে, তার তোষকের মাথার দিকের নিচে, একটা ভাঁজ করা ১০০ টাকার নোট পেয়ে গিয়ে সেটা চুরি করে-ছিলাম। শুধু বিজনকেই সে-কথা বলেছি। 'লক্ষ্মীকে আমি সবশুদ্ধ অনেক বেশি টাকা দিয়েছি—বল, দিইনি?' বললে বিজন হা-হা করে হেসেছিল। তার হাসির মধ্যে হাসিই শুধু ছিল। কতকত চোখে বিজন তারপর বলেছিল—'তুই কিন্তু আমাকে তোর লক্ষ্মীর কাছে নিয়ে যাবি বলেছিলি।' টাকাটা চুরি করার জন্যে, একটু দুঃখ হয়েছিল আমার। সেই এক-বারই।

তৃতীয় প্রলোগ
রমা

রমা ছবি আঁকে। বাবার সজ্জীর ব্যবসা। দাদার ট্রান্সপোর্ট। রমা এক মেয়ে। ছোট ছোট চুল. নীল জিনস আর হলুদ চাইনিজ শার্ট পরে দু-হাত কোমরে রেখে সে তার ইজেলের দিকে চেয়ে আছে। সেখানে গোলাপি. লাল আর দলদে রঙের অনেকগুলো পাপড়ির মাঝখানে একটা ড্রাগের মত মানুষ। কালো. নিকষ কালো। ছবির নাম প্যাশন'। রমা তার কল্পনাকে আঁকছে। হঠাৎ চাইনিজ-ইঙ্কের দোয়াত থেকে সবটুকু কালি ইজেলের ওপর ছুঁড়ে দিল। ছবিটা তার পছন্দ হয়নি। ইজেলের নিচে গড়িয়ে পড়ল কালো কালো ফোঁটা।

রমা চিৎকার করে উঠল—'দেবনাথ, দেবনাথ। আড়াইটে বাজল. এখনও আমাকে খেতে ডাকোনি কেন? ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার। শিগ্‌গির খেতে দাও। দেবনাথ-

কাহিনী

গ্রে স্ট্রিট আর বিডন স্ট্রিটের মাঝখানে, সেন্ট্রাল এভিনিউর ওপরে, ফোয়ারা, বাগান। ভালো নাম যতীন মৈত্র পার্ক। উল্টোদিকে পেট্রল পাম্প। তার পাশ দিয়ে চিৎপুর পর্যন্ত সোজা দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট। ঢুকেই ডানদিকে শেতলামন্দির। তার পাশ দিয়ে ডানদিকে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট। সেদিকে নয়। দুর্গাচরণ দিয়ে সোজা আর একটু ঢুকলে ডানদিকে একটা সরু কানা গলি, যার মুখে একটা ছোটখাট আড্ডা থাকে. কনস্ট্যান্ট। এই গলিটাই রামজয় শীল লেন। যেতে যেতে যে বাড়িটার দরজায় নাক ঠেকে যাবে, তার দোতলায় আমি আর আমার বৌ মিনতি থাকি।

এটা গৃহস্থের গলি। তবু রাত দশটার ছাতে দাঁড়ালে বেশ্যার পায়ের ঘুঙুর আর হারমোনিয়ামের শব্দ শোনা যায়। বিজন একদিন শুনবে বলেছে।

'কোথায় থাকেন' প্রশ্নের উত্তরে বিপদ-গ্রস্ত গাধার মতন মুখ করে যখন বলি—'সোনাগাছিতে', কেউ ভয় পায়, বিদ্রূপ দ্রু কেউ কেউ, কেউ ভাবে স্মার্ট হবার চেষ্টা করছি। অথচ, এত কম ভাড়ায় কলকাতায় আর কোথাও ফ্ল্যাট পাইনি। আর আত্মীয়-স্বজন আমি একদম পছন্দ করি না। মিনতির স্কুলটাও কাছে পড়ে। হেঁটেই যাতায়াত করা যায়। মিনতি যেখানে পড়ায়, সেই স্কুলটার নাম 'রামজয় শীল শিশু পাঠশালা।' কে এই রামজয় শীল, কে জানে।

সাতসকালে আরতি এসে ওকে নিয়ে গেছে। সেজদার ছেলের ভাত। আরতির কলেজে গিয়ে চমকে দিতে হবে একদিন। ঠিক একদিন আগে মিনতির চেহারাটা আরতির মতন ছিল?

করিমের দোকানে শিককাবাব আর পরোটা খেতে খেতে একটা মজার দৃশ্য দেখলুম। খুব মদ খেয়েছে করিম। নেশার ঘোরে হাত-পা নেড়ে বারবার বলছিল—'টাকা, টাকা চাই। অনেক টাকা চাই আমার, অনেক টাকা। টাকা থাকলেই সব, স-ব ঠিক আছে। টাকা না থাকলে কিসসু নেই তোমার—শা—। অ-নে-ক টাকা চাই আমার।' বকতে বকতে খদ্দের সামলাচ্ছিল করিম। একজন কোটপ্যান্ট-পরা লোকের সঙ্গে খুব একচোট লেগে গেল করিমের। দোষের মধ্যে লোকটা বলেছিল, 'কি ফ্যাচ ফ্যাচ করছেন তখন থেকে — নিজের কাজ করুন—পয়সা নিন।' করিম প্রায় গর্জন করে উঠল, কি বললেন, ফ্যাচ ফ্যাচ করছি আমি? বেশ করছি। আপনার কি মশাই, পয়সা দ্যাকাচ্ছেন আমাকে? করিম শেখ পয়সার পরোয়া করে—এ্যাঁ—করিম শেখ পয়সার পরোয়া করে?' কথায় কথা বেড়ে গেল অনেক। ভদ্রলোক খুব বোকা ও টেঁটিয়া। প্রায় হাতাহাতি হতে হতেও হল না।

খাওয়ার পর একটা চার্মিনার ধরিয়ে ইমাম বক্‌স লেনের মুখে, সিগারেটের দোকানের সামনের ভিড়টার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম। শবযাত্রার পর রাস্তায় যেমন খই পড়ে থাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, কোথাও জড়ো হয়ে, কোথাও একা-একা দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। বেশির ভাগই চেনা মুখ। তবু রোজই দু-একটা নতুন মুখ দেখি। যখন-তখন ঘর বদল করে এরা। আজ ইমাম বক্‌স লেনে থাকে তো কাল ফকির চক্রবর্তী লেনে চলে যায়।

এত রাতেও অনবরত লোকের ভিড়। একটা চাপা ব্যস্ততার চিহ্ন সব জায়গায়। হঠাৎ কোনো নতুন লোক এখানে ঢুকে পড়লে ভাবতেই পারে. খুব কাছেই কোথাও পুজো হচ্ছে কোনো।

রাস্তার পাশের নর্দমায় মধ্যবয়স্ক একটা লোক সটান লম্বা হয়ে পড়ে আছে। খালি গা, পরনে ছোট একটা ধুতি। মাথাটা নর্দমার বাইরে সরিয়ে দিয়েছে কেউ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, অজ্ঞান হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ডান হাতটা অল্প একটু নড়ে উঠছে তার। কাঁধের কাছে বাধা পেয়ে জমে আছে নর্দমার জল, অল্প। কিছুক্ষণের জন্যে লোকটাকে খুব হিংসে হল আমার। ঠোঁটের একপাশে বুজবুজে ফেনা।

প্রায় অমিতাভ বচ্চনের মতন লম্বা একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে মনুয়ার দোকান থেকে চুক চুক করে মদ খেয়ে যাচ্ছে। চেহারাটা বেশ অভিজাত। ঘোরের চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। গায়ের রঙ শ্যামলা। সুন্দর স্বাস্থ্য। অনেকক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে আছি বলে বোধহয় একটু অস্বস্তি হল তার। আস্তে আস্তে আমার কাছে এগিয়ে এল লোকটা। 'কি দেখছেন?' —ভঙ্গিতে কিছুটা রুক্ষতা। 'কেন বলুন তো' বলে সোজা তার চোখের দিকে তাকালুম। 'আমি একজন ইঞ্জিনীয়ার', রোজ এখানে আসি না'—খানিকটা স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে বলে গেল লোকটা—এইসব রটন মেয়েদের কাছেও যাই না কোনোদিন। বাট্ আই লাইক দা প্লেস, জায়গাটা আমার ভাল লাগে। এখানে দাঁড়িয়ে মদ খেতে আমার ভালো লাগে। ডু য়ু ড্রিঙ্ক?' একটু অবাক লাগলেও আমি বললুম, 'মাঝে মধ্যে।' লোকটা মনুয়াকে বলল, 'আর এক গ্লাস, এদিকে।' মনুয়া একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিল দ্রুত। বছর দুয়েক হয়ে গেলেও, পাড়ায় এখনও নতুন লোক আমি। মনুয়া আমায় মদ খেতে দেখেনি কোনদিন।

মনুয়ার দোকানটা বাইরে থেকে একটা পানের দোকান। সন্ধেবেলা সাট্টা খেলার ভিড় হয়। খেলাটা বোঝার চেষ্টা করেছি, কাছে দাঁড়িয়ে। চোত্তা সে ছক্কা, ওপেন, তিরি ক্লোজড, ইত্যাদি কয়েকটা দুরূহ শব্দ শোনা ছাড়া কিছুই বুঝিনি। বেশি রাতে বাংলা মদ চলে। খুচরো। গ্লাসে পাওয়া যায়। চান্স পেলে দাম তো বেশি নেয়ই। জলও মেশায় মনুয়া। খুব।

কথায় কথায় লোকটা আরো খাওয়াতে চাইছিল। ভদ্রতায় আটকালো। দু' গ্লাসেই থেমে গেলুম। ঘরে গিয়ে ঘুমোনো ছাড়া কোনো কাজ নেই—এখন মদ খেয়ে কি করবো। 'দি শপকিপার নো-জ মি ওয়েল'—লোকটা বলল, 'প্রত্যেক মাসের আফটার ফিফ্‌টিনথ্ মাঝে মাঝে আমাকে এখানে পাবেন। তখন বিজিতির পয়সা থাকে না। আচ্ছা—চলি, বলে লোকটা চলে গেল। দেখে মনে হল আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে ছিল তার। বিবাহিত কি? জিগ্যেস করলে হত।

আরো কয়েকটা সিগারেট শেষ করে হঠাৎ দেখি রানী, হাতে শালপাতার ঠোঙায় সম্ভবত রাতের খাবার। আমাকে দেখে ঠোঁট টিপে হেসে উঠল একটু—'কি ব্যাপার, ঘরে বৌ নেই বুঝি?' বলে খিল খিল করে হাসতে থাকলো। 'পালিয়ে গেছে?' প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'হাতে কি, ভালো-মন্দ কিছু আছে?' রানী বলল, 'ভাগ মারবে? চলো, ঘরে চলো। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো' শুনি। এসো না'—বলে হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান [illegible]

না। রামজয় শীল লেনের কোনো ছেলে কাছাকাছি নেই। এমন একটা পাড়ায় থাকে তবু ছেলেগুলোর একটা অদ্ভুত স্বর্গীয় ইয়ালিটি আছে।

আবোলতাবোল বকতে বকতে খেয়ে নিল রানী। একটা লোক যে খামোকা আমাকে দু' প্লাস বাংলা খাওয়ালো, সে-গল্প শুনেই মাল খাওয়ার বায়না ধরল রান। ইচ্ছেটা ভেতনর ভেতরে আমারো যে ছিল না তা নয়।

পুরো দুটো পাঁইট শেষ করে রানী অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীটে সিনেমা দেখতে চলে গেল। রাস্তায় পর্দা টাঙিয়ে সারারাত সিনেমা দেখানো হবে—দো বদন, বিশ সাল বাদ, আওয়ারা। রাণী, প্রভুভক্ত কুকুরের মতন সেখানে গেলুম। সমস্ত রাস্তা জুড়ে দু হাজার বেশ্যার জনতা। সঠিক পিতৃত্ব-হীন কিছু খুচরো ছেলেমেয়ে এখানে-ওখানে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছে। পাড়ার নাটকে ভলান্টিয়ারের মত ব্যস্ত কয়েকজন যুবক। তাদের ফাঁপানো চুল, মোটা গোঁফ আর টেরিয়ে টেরিয়ে হাঁটাচলা দেখতে দেখতে মনে হল, অন্য কোনো গ্রহ থেকে ছিটকে একটা ভুল পৃথিবীতে এসে পড়েছি।...নেশা বেশ জমেছে তার মানে। রানীকে ভিড়ের মধ্যে কোথাও খুঁজে না পেয়ে ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালবেলা বাড়িওলার ছেলে মুকুল আর তার মায়ের চিল চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় মেদিনীপুরে কি জমি-জমা আছে তার ভাগ, বড় ছেলে বাড়িতে থাকে না সে কেন নেবে—আরো কত কি। মাথাটা ভার হয়ে আছে। এই মুহূর্তে আর একটু মদ খেলে কিম্বা খুব ভালো করে স্নান করে এক কাপ চা খেলে মাথাটা ছাড়তো। মিনতি কখন আসবে কে জানে, কি করে চা খাওয়া যায় ভাবছি, দরজার পাল্লাটা অল্প ফাঁক করে একটা বাচচা ছেলে মুখটা ঢুকিয়ে বলল, আপনাকে একজন ডাকছে, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি আসতে বলল। তার চোখে অশ্লীল কৌতুক। বাচচুদের পাশের বাড়ির ছাতে ছেলেটাকে দেখেছি, ঘুড়ি ওড়ায়। কে আবার ডাকছে আমাকে। ছেলেটাকে ঘরে ডেকে ভাল করে জিগ্যেস করলুম, যে ডাকছে তাকে কেমন দেখতে। প্রথমে কিছুতেই বলবে না। পরে যা বলল তাতে বুঝলুম, রমা। এই সাত-সকালে রমা....। শিরদাঁড়া দিয়ে পায়ের গোড়ালির কাছে নেমে গেল অস্বস্তি। ছেলেটাকে বললুম, 'শোন, সোজা ঘরে চলে আসতে বল, বলবি'—এই পর্যন্ত বলে, 'আমি একাই আছি' বলতে গিয়ে আটকে গেল, বললাম—'বলবি, আমি ডাকছি—খুব শরীর খারাপ, বাড়িতে কেউ নেই—বুঝলি? আর শোন, ওই কেটলিটা নিয়ে যা, দু-কাপ চা আনতে পারবি একটু? কিসের উত্তেজনায় কে জানে, বেশ উৎসাহের সঙ্গে কেটলি নিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।

রমা যখন ঘরে ঢুকেছে আমি শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছি। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বাঁ-হাতে, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের স্ট্র্যাপটা চেপে ধরে ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিল একটু। আড়াআড়ি টাঙানো দড়িতে ঝুলছে আমার মিনতির জামাকাপড়, শাড়ি সায়া ব্রেসিয়ার। এক কোণে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ছোট্ট টুল। আর এক কোণে প্রেসার কুকার, স্টোভ হাঁড়িকুড়ি। রমা ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলটায় গিয়ে বসলো। আয়নার ভেতরের রমাকে মাপলো একটু। তারপরে বলল, 'তুমি উঠবে না?' শরীর খারাপের কথাটা রমা বিশ্বাস করবে না আমি জানতুম। একটা আকাশি বেলবটস আর শাদা ফুলস্লিভ জামা পরেছে রমা। কেমন পবিত্র পবিত্র দেখাচ্ছে।

'কেন'। বলে পাশ ফিরে রমার দিকে সোজাসুজি তাকালুম। রমা বলল—মানে শুয়ে থাকবে নাকি!' ছেলেটা চা নিয়ে ঢুকলো। থ্যাংকিউ ভাই বলে কেটলিটা তার হাত থেকে নিয়ে উঠে বসলুম। ছেলেটা জুলে জুলে করে একবার রমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। রমা জানলার বাইরে থেকে চোখ ফেরালো আমার দিকে—'কাপ কোথায়? মিনতিদির প্রিন্স দিই একটু, কি বলো।'

কিন্তু রমাকে এসব একদম মানায় না। কাপে চা ঢালতে গিয়ে হয়তো ফেলেই দেবে আর্ধেক। আমি বললুম—'তুমি চুপ করে ওইখানে বসে থাকো, তুমি আমার গেস্ট।'

রমা খিলখিল করে হেসে উঠলো। মাথাটা ছেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। শাদা জামা পরেছে বলে ক্ষমা করে দিলুম রমাকে মনে মনে।

খুব সুন্দর একটা ছবি এঁকেছে রমা। ছবিটা দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। সকালবেলা রমাকে দেখেই বুঝেছিলুম আজ অফিসে যাওয়া হবে না। মিনতি বোধহয় বাপের বাড়ি থেকে সোজা স্কুলে চলে যাবে।

হলুদ আর গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি একটা মেটে মতন রঙ সারা ইজেলে। নিচে ছড়ানো কালো নুড়িপাথর, একটু ওপরে একটা কালো ফুটবল সাইজের এক গহ্বর, এত রহস্যময় তার আবহাওয়া যে মনে হয় ওখান দিয়ে হেঁটে গেলে সারাজীবন যা খুঁজছি পেয়ে যাবো। কিছুই নেই ছবিটার কিন্তু এমন একটা পরিচ্ছন্ন সমতা আছে যে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়। ছবিটা দেখতে দেখতে খুব আদর করতে ইচ্ছে হল রমাকে। রমা বলল, 'খিদে পেয়েছে? দাঁড়াও কি আছে দেখি। দেবনাথ—' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রমা।

রমার ঘরে না এলে পুরোপুরি চেনা যায় না রমাকে। বিছানাটা কোনদিন পরিপাটি গোছানো থাকে না। সবকিছুই এলোমেলো কিন্তু কেমন একটা রুচিসম্মত অবস্থায় পড়ে আছে। একটাও আয়না নেই ঘরে। সবগুলো দেয়ালে টাঙানো বড় বড় ছবি। অনেকগুলো ল্যাণ্ডস্কেপ। কোনো কোনো জায়গায় ইংরেজী পত্রিকার পাতা থেকে ছেঁড়া ছবি আটা দিয়ে দেওয়ালে আটকানো। এক কোণে অনেকগুলো ফ্রেমে বাঁধানো বড় সাইজের পেন্টিং দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। বিছানার পাশে ছোট একটা টুলের ওপর একটা রেকর্ডপ্লেয়ার। পাশে রেকর্ডের বাক্স। বেছে বেছে মণিলাল নাগের একটা রেকর্ড চাপিয়ে শুয়ে রইলুম রমার বিছানায়। রমার ঘরে রমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেতে খেতে কিছুক্ষণ সেতার শুনলে মনে হয় : আর কিছুই চাইবার নেই আমার পৃথিবীতে।

বিকেল প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনটা যে এত সুন্দর আগে জানতুম না। রেললাইন দিয়ে খানিকটা হেঁটে এসে এক জায়গায় লাইনের ওপরেই বসে পড়ল রমা। রেললাইনের দু-পাশে অনেক নিচে জনপদ। এখানে দাঁড়ালে নিজেকে সম্রাটের মত লাগে। দূরে প্লাস্ট-

[illegible] নেমে [illegible] আউটডোরের দিকে। ছবির মত [illegible] থেকে। সামনে নিচে একটা [illegible] পুকুরের পাশে একটা কুঁড়েঘর। রমা [illegible], 'ওই ঘরটায় যদি থাকতে পারতুম।'

রমার দিকে তাকিয়ে মনে হল এটা [illegible] শৌখিনতা নয়। সে সত্যি কথা [illegible]।

মিনটা হুড়মুড় করে কেটে গেল। [illegible] বালিগঞ্জ লেকে গিয়ে ভালো [illegible] নয়। —'এ জায়গাটার কিরাম ফার্স্ট [illegible] ফার্স্ট ইয়ার গন্ধ। কতদিন স্কেচ [illegible]ছি এখানে এসে।' রমা বলল। দোতলার [illegible]সের সিটে পা তুলে দিয়ে বসে [illegible] টার্মিনাস থেকে টার্মিনাসে ঘোরা [illegible]। রমা খুব ছেলেবেলার গল্প বলছিল। [illegible]বে কোন নদীর ধারে অনেকজন মিলে বালির বাড়ি তৈরি করেছিল, রমার বাড়িটা লাথি মেরে কে ভেঙে দিয়েছিল বলে খুব নাকি কেঁদেছিল রমা। আর ছেলেবেলার স্কুলের সেই মোটা বিহারী দরোয়ান, যার একটা বিশাল গোঁফ ছিল; কিছুতেই মেয়েদের গেটের বাইরে যেতে দিত না টিফিনে, ছোট একটা টুল নিয়ে বসে বসে গোঁফে তা দিতো। একদিন অনেক সাহস সঞ্চয় করে গেটের খুব কাছাকাছি গিয়েছিল রমা। যদি সে একছুটে একবার বাইরে চলে যেতে পারে তাহলে যেন তাকে আর ছুঁতে পারবে না কেউ, ধরে রাখতে পারবে না, স্কুলে আসতে হবে না তাকে আর কোন-দিন। ছুটতে ছুটতে এমন কোথাও চলে যাবে সে যেখানে কোনরকম ইস্কুলটিস্কুল নেই। হঠাৎ 'এাই খোকী' বলে চিৎকার করে উঠেছিল সেই দারোয়ান আর রমা দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল ক্লাশঘরের মধ্যে। তারপর ছুটির ঘণ্টার পরে অবধারিতভাবে তাকে নিতে এসেছে বুড়ো চাকর দেবনাথ।....স্বপ্নে এখনো রমা সেই চিৎকারটা শুনতে পায়। সে কোনো অন্যায় কাজ করতে গেলে মনে হয়, একটা মোটা গোঁফওলা লোক কোথা থেকে যেন ধমকে উঠবে। রমার আর অন্যায় করা হয় না।

দূরের দিকে, শেষ বিকেলের আকাশের দিকে শূন্য চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে রমা বলল, আর ভালো লাগছে না কলকাতা। কোথাও চলে যাবো।' তিনচার-মাস অন্তর রমা কথাটা বলে আর শব্দ ও উত্তেজনায় শহর কলকাতা থেকে তখন উধাও হয়ে যায় রমা। কয়েক মাস আগে পুনা থেকে ঘুরে এসেছে সে। একা।

আমি বললুম, 'কোথায় যাবে? ক্যালিফোর্নিয়া?'

ডেরেক অ্যামিস বলে একজন বিদেশী যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে রমার, সম্প্রতি। হাত ঝাঁকিয়ে বলেছিল—প্লায়ড টু মিট য়ু। 'ইউ আর অ্যান আর্টিস্ট'—জিগ্যেস করলে বলেছিল,—'মোর অর লেস।' এত চমৎকার বিনয়ী হয় এরা। ডেরেক ক্যালিফোর্নিয়া থাকে।

রমা আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বলল—'ভয় নেই, তোমাকে আর কোনদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে জ্বালাবো না।'

'কে বলছে জ্বালাতে' বলতে গিয়েও বললুম না। রমাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে রমার জন্যে আমার কিছু করার নেই। হাত-পা বাঁধা।

প্রেম-পুলিশ খেলার রমা বিশ্বাস করে না।

রমা হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলল, 'আরে, একটা মজার কথা তোমায় বলাই হয়নি,—ডেরেকের সঙ্গে অদ্ভুত মিলে গেল একটা ব্যাপার। আমি বলতুম না বিয়ের পরে মানুষ একটু ছোট হয়ে যায়, সবদিক থেকেই......'

'হ্যাঁ। ডেরেক কি বলে।'

'ডেরেক বলছিল, ম্যারেজ ইজ অ্যান ইভল ইনস্টিটিউশন। বলল—আফটার ফিউ ইয়ারস অফ ম্যারেড লাইফ ইউল সি ইউ আর সাম টোটাল অব মেনি থিংস ইউ হ্যাভ টু ডু—ইভন ইউ হ্যাভ টু মিট এ পার্টি-কুলার ওম্যান এগেনস্ট ইয়োর ডিসায়ার, য়ু নো—এভরি নাইট এভরি ডে—বলছিল—আই ওয়ান্ট লাইক অল দিস হ্যাভ টু ডু বিজনেস। আই ডু হোয়াট আই লাইক। অল দ্য টাইম। বলো, ব্যাপারটা দারুণ—না?'

রমার চোখে সেই উৎসাহ যা আমি ভয় পাই, হিংসে করি। আস্তে করে বললুম, 'ভালো নিঃসন্দেহে, যদি অ্যাফোর্ড করা যায়। আই কান্ট। আমি পারি না।'

তুমি চিরকাল একটু মিডিওকার। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল রমা।

রমার ছোট ছোট চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। মুখে এসে পড়ছে। আমি বললুম—'কিছুদিন পরে যদি তোমাকে আর ভালো না লাগে ডেরেকের। যদি তাড়িয়ে দেয়।'

হিহি হিহি করে হেসে উঠল রমা। 'ভীতু, ভীতু কোথাকার, মিডিওকার'—বলতে বলতে আরো হাসতে লাগলো রমা।

সন্ধে-হয়ে-আসা আকাশের নিচে রেল-লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রমাকে এলোপাথাড়ি হাসতে দেখে বুকের মধ্যে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যেতে থাকল আমার হাড়গোড়।

রাত্রে মিনতি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মুখে ক্রীম মাখতে মাখতে বলল, 'ড্রয়ারে ফাইলটা নেই।' বলে গম্ভীর মুখে ক্রীম মাখতে লাগল। মিনতি ঠিক কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে শুয়ে শুয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। রমা এসেছিল মিনতির জানার কথা নয়। জানলেও যায় আসে না কিছু। কিন্তু রমা মিনতির ট্যাবলেট হাতসাফাই করবে এটা ভাবতে কোথায় একটু আটকাচ্ছে। একটা মজা করার নির্মল ইচ্ছে থেকে এরকম করল কিনা ভাবতে ভাবতে মনে হল মিনতি কি সন্দেহ করছে ওগুলো আমি অন্য কাউকে দিয়েছি। এটাও একটু বেশি হয়ে যায়। কলকাতায় ওরাল কন্ট্রাসেপটিভের দুর্ভিক্ষ হয়নি এখনো।

পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল মিনতি। দেয়ালের দিকে পাশ ফি[...] ফিরতে বলল, 'দেবযানীর সঙ্গে গৌত[...] বিয়ে হচ্ছে এরকম কি একটা বল[...] না?'

ঘরে খুব একটা গুমোট গরম. মনে হঠাৎ। কোন রকমে বললুম, 'কেন?'

হাই তুলতে তুলতে মিনতি ব[...] 'গৌতম নন্দিনীর সঙ্গে প্রেম করছে।'

নন্দিনী দেবযানীর বোন। খবরটা [...] করে পেয়েছে মিনতি, জিগ্যেস করতে স[...] হল না। সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছ[...] বাইরে ফেলতে গিয়ে গরাদে আটকে গে[...] বিরক্ত হয়ে উঠে টুকরোটা বাইরে ফেল[...] ফেলতে বললুম—'ট্যাবলেটগুলো [...] অন্য কোথাও রাখো নি তো।' মি[...] কোনো উত্তর দিল না। বস্তুত এসব প্র[...] মিনতি করে না। আর তাই ঠিক জিনি[...] ঠিক জায়গায় না পেলে চীৎকার করে [...] বা অস্থির হয় না একটুও। রেগে [...] এবং গম্ভীর হয়ে যায় সে। স্কুলে পাঁ[...] এই অভ্যাসটা চমৎকার রপ্ত করে[...] মিনতি।

অনেকক্ষণ ঘুম এল না। পাঁচ ব[...] দূর থেকে কথা বলে উঠল দেবযানী। খেতে খেতে চশমাটা চোখ থেকে মাথ[...] 'বাড়িতে আর পোষাচ্ছে না—বাড়ি ছাড়[...] হবে। বাড়িতে থাকতে হলে বাড়ির লোকে[...] ডিমান্ডগুলো তো মেনে চলতে হয়। [...] আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে [...] ইন্ডিপেনডেন্ট হয়ে থাকা যায় এ-র[...] একটা চাকরি দিতে পারো?'

একটা আশি টাকার টিউশনি জ[...] পেরেছিলুম। তেরো দিন গিয়ে দেবযা[...] টিউশনিটা ছেড়ে দেয়। পর পর তিন দি[...] চেষ্টা করে একটা নল-চোবাচ্চার অং[...] ছেলেটাকে বোঝাতে পারে নি দেবযা[...] কিম্বা ছেলেটা বুঝে উঠতে পারে নি আ[...] জানি না।

বাড়ি ছেড়ে দেওয় [...]টির [...] টাইমার হয়ে যাওয়া. আর নিজের পা[...] দাঁড়ানো যায় এ রকম একটা মিনিমা[...] মাইনের চাকরি পাওয়া—এই তিনটে ভাব[...] নিয়ে দেবযানী যখন ব্যস্ত ছিল, আ[...] তখন আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া তা[...] প্রত্যেকটি শব্দ চতুর বণিকের ভঙ্গিতে[...] ফিরিয়ে দিচ্ছি রমাকে। 'তোমাকে বিয়ে[...] করলে তুমি আমাকেই তাকিয়ে থাকতে[...] সারা জীবন, এই একটা কারণেই আমি[...] বিয়ে করবো না তোমাকে।' বলেছিল[...] দেবযানী, আমাকে একদা। আমার সং[...] গৃহস্থ হয়ে যাওয়া না দেবযানীর ঘরকন্নায়[...] আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা—তার আপত্তি[...] কোনটাতে ছিল আমি জানতে চাই নি[...] শিবপুরে, তার দূর সম্পর্কের এক দিদির[...] কাছে, গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার লাভ ম্যারেজ[...] এইসব কারণে সুবিধে ছিল সেখানে[...] অনেক—মাঝ রাতে পর পর অনেকগুলো[...] চুমু খাওয়ার পর দেবযানী বলেছি[...]—'ঠিক এই রকম ইনটেনসিটি নিয়ে তুমি

অন্য কোনো কাজ করতে পারো না কেন?' আর তার ঠিক এগারো মাস পরে রমার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, রমা পেছন থেকে এসে সব চুল এলোমেলো করে ঘেঁটে দিয়ে—'কষ্ট দেবো, সারা জীবন তোমাকে আমি কষ্ট দেবো অনেক' বলতে বলতে দু' হাতে আমার বাঁ-কাঁধ ধরে প্রায় ঝুলে পড়েছিল যখন, উদাসীন ও কিছুটা নির্মম ভঙ্গিতে 'তাই দিও। আমারো আসলে ওই একটা জিনিসই তোমাকে দেবার আছে শুধু।' বলে উঠতে খুব বোর হয়ে গিয়েছিল রমা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হি-হি করে হেসে উঠেছিল সে। কোন অবস্থাতেই বেশিক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকতে পারে না রমা। ছবি আঁকার সময়টুকু ছাড়া। তাও তন্ময়ভাকে গাম্ভীর্য বলা যায় যদি।

তারও এক বছর পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, তখনো একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে কমার্শিয়াল আর্টিস্টের এই চাকরিটা পাই নি—একটা শেলফ কিছুতেই যখন টেনে খুলতে পারছিলুম না র‍্যাক থেকে, অনেকক্ষণ ধরে একা একা লাগছিল বলেও কিছুটা, পাশে দাঁড়ানো একজন রোগা শ্যামলা রঙের মহিলাকে বলেছিলুম—'ক্যান যু হেল্প মি টু পুল আউট দা শেলফ প্লিজ?' উজ্জ্বল চোখের মেয়েটি খুব অনায়াসে বার করে দিয়েছিল পুরো শেলফটা। একটা ছিটকিনি মতন আছে সেটা খুলে নিতে হয়। পরে রিকুইজিশন জমা দিয়ে বইয়ের অপেক্ষা করছি—দেখলুম সেই রমণীও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বইয়ের অপেক্ষায়, একা। বলে ফেললুম, 'আধ ঘণ্টা তো লাগবেই, না?' সে প্রায় সর্বস্ব দেবার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল,—'সারাদিনও লাগতে পারে। লাইব্রেরিতে নতুন?' তারপর কথায় কথায় আধ ঘণ্টা সময় কাটানোর জন্যে তাকে আমি লাইব্রেরিতে চা খেতে নিয়ে যাই। এটা আমি পারি। ক্যান্টিন থেকে উঠি ঠিক তিন ঘণ্টা পরে। সে, মিনতি সেনগুপ্ত, এখন আমার পাশে ট্যাবলেট খুঁজে না পাওয়ার দুঃখে মেজাজ খারাপ করে ঘুমোচ্ছে।

অফিস ছুটির পর ধর্মতলায় গ্রেট ইস্টার্ন কন্টিনেন্টাল হোটেলের নিচে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিলুম। একা একা। বাতাসে, বিদেশী বাদ্য। কাছেই একটা লোক ছোট্ট শিশিতে সাবানগোলা জল নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সরু নল দিয়ে ক্রমাগত বুদবুদ ছেড়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে—শূন্যে উড়ন্ত অসংখ্য ছোট বড়ো বুদবুদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অনেক মানুষ। সারা ফুটপাথে ছড়িয়ে আছে বিদেশী বাজনার সুর। কাঁচের শো-কেসের মধ্যে—সাজানো টি ভি সেটগুলোর দিকে ঝুঁকে আছে একটা মধ্যবিত্ত ভিড়। বুদবুদওলার পাশে ছোট ছোট ডটপেন চিরুনি জুতোর ফিতে এইসব ছড়ানো জিনিসপত্র নিয়ে বসে আছে একজন কিশোর—তিরিশ পয়সা তিরিশ পয়সা তিরিশ পয়সা তিরিশ পয়সা—তার সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকজন নানা বয়সের নারী পুরুষ। উল্টো দিকে একজন হকার অনেকগুলো ছাপ মারা গেঞ্জি হাতে নিয়ে সমানে পাঁচ রকম চিৎকার করে যাচ্ছে। একটু দূরে একটা লোক শান্ত নিরীহ দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ের কাছে একটা ছোট্ট খেলনা পুতুল চুপচাপ নেচে যাচ্ছে একা একা।

মিনতির জন্য উল কিনে নিয়ে যেতে হবে, সকালে একটা পুরো একশো টাকার নোট দিয়েছে মিনতি। কোথা থেকে কেনা যায় ভাবছি—পেছন থেকে কাঁধে একটা চাপড় পড়তে ঘুরে দেখলুম, বিজন। এক মুখ দাড়ি গোঁফ, ময়লা জামা, না-আঁচড়ানো এক মাথা এলোমেলো চুলের ভেতর থেকে দস্তয়েভস্কির গল্পের চরিত্রের মতন হাসছে। দাঁতে লাল ছোপ। 'আসিস না কেন, শা সুখে আছিস খুব?' বলে আমাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল বিজন। 'দুঃখের দিনে ছাড়া তোর সঙ্গে কি আমার দেখা হয় নি' বললে বিজন নিজস্ব ভঙ্গিতে মিটমিটে হেসে—'দর্শন হয়ে গেছে, তুই আসিস নি' বললো।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় ইউনিভার্সিটির পেছনের রাস্তা দিয়ে হিন্দু হোস্টেল ফেলে সোজা হ্যারিসন রোডের দিকে যেতে যেতে বললাম, যাচ্ছিসটা কোথায়। বিজন বলল, 'চল না।' একটু এগিয়েই ডানদিকে একটা গলি মতন রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়ল বিজন। 'এটা গোলাপের ঠেক। চরস খাওয়াবো, চল।' গলিটা ভেতরের দিকে এমন চওড়া হয়েছে। এক জায়গায় ডানদিকে একটা সিগারেটের দোকান থেকে পান কিনল বিজন। বাঁদিকে গোল করে উবু হয়ে বসে আছে কয়েকজন লোক, ঠেলাওয়ালামতন দেখতে, খালি গা, ময়লা ধুতি কিংবা লুঙ্গি পরে আছে। তাদের সামনে ছোট ছোট গ্লাস, দেখে বিজনকে বললুম, 'এখানে কান্ট্রিও পাওয়া যায় নাকি।' বিজন কুতকুতে চোখে জানালো—'চল্লুও পাবি।' খুব রোগা একটা লোক, নাকটা টিয়াপাখির মত বাঁকা ও ধারালো, চোখ দুটো অনেক ভেতরে ঢুকে গেছে বলে কোন হিংস্র আর কুটিল দেখাচ্ছে তাকে, সবাই 'জাহাজী' বলে ডাকছে লোকটাকে—লুঙ্গিটা দু-হাতে কোমরের দুদিকে ঘাগরার মতন তুলে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে গান শুরু করল লোকটা। সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। নাড়ার কথাটা বলার সময় কোমরটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচালো লোকটা, যা, মনে হল এই জাহাজী ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় পৃথিবীতে। বিজন বলল, 'ভেতরে বসবি না বাইরে?' একটু অবাক হয়ে বললুম, 'ভেতরে—মানে কোথায়?' বিজন বলল, 'আয়।' লোকগুলোকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু বিজন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেখার খুব লোভ ও কৌতূহল হল।

ভেজানো দরজা ঠেলে, বেশ বড়সড় একটা হলঘরের মতন ঘরে ঢুকলো বিজন। একটাও আসবাব নেই সমস্ত ঘরটায়, উঁচু ছাদ, চেয়ার টেবিল আলমারি আয়না দেয়ালে ছবি কিছু নেই। মসৃণের মেঝের ওপর এক কোণে কয়েকজন ছেলে ছিলমের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। নীল একটা আলো জ্বলছে। ঘরের ভেতরটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চাপা গলায় বিজনকে বললুম—'ব্যাপকটা বিজন, দারুণ জায়গাটা।' বিজন বলল, 'আয় আরাম বসে যা।' [illegible] দেখলুম বিজনকে চেনে। [illegible]

[illegible]

বিজন অভ্যস্ত হাতে আলপিনে চরসের গুলিটা গুঁজে দেশলাই জেবলে পোড়ালো, পুড়ে এলে নাকের কাছে ধরলো আমার। সুন্দর একটা গন্ধ। একটা সিগারেট ছিঁড়ে তার তামাকের সঙ্গে গুলিটা গুঁড়ো করে মেশালো নিপুণ হাতে। প্রায় যেন কেবল এই কাজটি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কাজে সিরিয়াস নয় বিজন। ছিলমে পুরে সাফি দিয়ে জড়িয়ে আমাকে বলল—'দেশলাই মার।' একটা কাঠিতেই পুরোটা ধরিয়ে ফেললো বিজন। হুস হুস করে এমন টানলো যে খানিকটা আগুন ঠিকরে উঠলো ছিলমের মুখ দিয়ে। স্বল্পান্ধকার ঘরে বিজনের চোখগুলো ঝলসে উঠলো সেই আগুনের আভায়। ওই চোখে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের জন্য এক আশ্চর্য মমতা ও নিজের জন্য শুধু সীমাহীন আলস্য ও নিরাকাঙ্ক্ষা আছে বিজনের। পৃথিবীতে কিছু চাইবার আগে চিরকাল ভেবেছে বিজন তার তেমন কোনো অধিকার সত্যিই আছে কিনা কিছু চাইবার মত। নিজেকে কেমন রহস্যময় করে রাখতে ভালোবাসে বিজন। বলে, আকাঙ্ক্ষাই তো সমস্ত দুঃখের দুর্দশার পিতা। তার থেকে যতটুকু পাওয়া যায় এই পৃথিবীর কাছ থেকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বিজন অভ্যস্ত। এইভাবে বিজন হেঁটে যাওয়ার মত একটা একদম নিজস্ব রাস্তা করে নিয়েছে দুনিয়ায়।

অনেকক্ষণ পর বাইরে বেরোলে, স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার মতন লাগলো। লোকগুলো তখনো গোল হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে সোরগোল করছে। পাশ দিয়ে তাদের পেরিয়ে আসতে আসতে বিজন বলল, কেমন লাগছে, এদের? আমি বললুম — ফ্যান্টাস্টাটিক। ভালো ভালো জামাকাপড় পরা লোকদের চেয়ে', বিজন বললো, 'এদের আমার অনেক ভালো লাগে। এরা ছুরি মারলে সামনে থেকে মারবে। দাঁত বার করে তোর সঙ্গে অনেক ভালো ভালো কথা বলে আর একজনের কাছে গিয়ে তোর নামে খিস্তি করবে না।'

আলো নিভিয়ে দিলে বিজনের ঘরের দেয়ালে বারান্দার রেলিঙের একটা চমৎকার ছায়া পড়ে। চরসের নেশায় অনেক বেড়ে গেছে রক্তের গতি। ঘরে শুয়ে শুয়ে কারুকার্যময় দেয়ালের ছায়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ল—একদিন সন্ধেবেলা, রমা এসে, দেয়ালের এই দৃশ্যটা দেখে, 'ঠিক এই ছবিটা আমি একদিন আঁকবো। এখানে বসে। দেয়ালে শুধু রেলিঙের ছায়া এসে পড়েছে, এর বেশি অন্য কিছু নয়, অথচ কি প্রচণ্ড একটা সিমেট্রি আছে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে।' রমা বলেছিল 'লাইট শেডের একটা বিউটিফুল স্টাডি।

মাথার মধ্যে জটিল একটা সুরে পিয়ানো বাজাচ্ছে কেউ। অন্ধকারে বিজন একটা সিগারেট ধরালো। দেশলাই-এর আলোয় তার মুখ, স্বতঃস্ফূর্ত দাড়ি-গোঁফ, মায়াময় হয়ে উঠলো। প্রকৃতিস্থ ছিলুম না বলেই বলতে পারলুম, 'যূথিকার কোনো খবর জানিস?' বিজনকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি বলেই ঠাণ্ডা মাথায় এই প্রশ্নটা করতে পারতুম না তাকে।

'জানতেই হবে?' বলে কিছুক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে থেকে বিজন বললো, 'একজন ইঞ্জিনীয়ার ছেলের সঙ্গে প্রায়ই দেখি।'

এই যূথিকা বিশ্বাসের জন্যে জীবন পাল্টে গেল বিজনের। অথচ যূথিকার কোনো ভূমিকা নেই এর মধ্যে। বিজন কোনদিন কিছু বলেই নি যূথিকাকে। সেই সেই পুরোনো প্রতিপাদ্য বিজনের: আমিই যূথিকার যোগ্য পুরুষ কিনা কে আমাকে বলে দেবে। অন্য কাউকে বিয়ের কথা বললে বিজন বলে—'কেন খামোকা একটা নির্দোষ মেয়েকে ঠকাবো বল, সারাজীবন, মিছিমিছি। এটা তো সবাই করে। ...আমি পারি না। কোনো মেয়ের কথা ভাবলেই হু-হু করে আমাকে আক্রমণ করে যূথিকা। এখনও। এবং চিরকাল করবে আমি জানি। আমার উপায় নেই।'

নেশার ঘোরে মনে হল অন্ধকারে বিজন চেয়ারে এলিয়ে বসে থাকা অবস্থাতেই ঘরের দেয়াল ভেদ করে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ। প্রায় তাকে ধরে রাখার জন্যে খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল আমার। গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না একদম। ...প্রেম সম্পর্কে একটা গভীর মূল্যবোধ আছে বিজনের, অন্য যে কোনো একজন মেয়েকে বিয়ে করলে এক বছর পরে যূথিকাকে আর মনেই পড়বে না তার—এসব বলে কোনো লাভ নেই তাকে। অথচ সে জানে যূথিকার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয় আর।

অনেকক্ষণ পরে বিজন বললো, 'তুই কেমন আছিস বল। দেবযানীর সঙ্গে দেখা হয়?'

দুটো প্রশ্ন এত পরস্পর নির্ভর যে কিছুক্ষণ আমার বিজনকে পৃথিবীতে একমাত্র আত্মীয় মনে হল। আস্তে কোনরকমে বললুম—'বোধহয় দিল্লিতে কোনো আত্মীয়ের কাছে আছে। বাড়িতে প্রায় বছরখানেক হল থাকে না এটা জানি। ওখানে কি করছে কিছু জানি না।'

বস্তুত বিজন জানে যে আমার মননের মধ্যে আমার প্রিয় নারীর যে ছবিটি আছে দেবযানীর স্বভাব ও চেহারার সঙ্গে তা হুবহু মিলে যায়। বিজন এও জানে যে প্রবণতায় সে আমার একজন বিপরীত কেন্দ্রে বাস করে। আমার মধ্যে কোনো রাজনীতি প্রবণতা নেই যা তার একমাত্র অকুপেশন। ফলে কথা বলতে গিয়ে বার বার ক্লান্ত হয়ে গেছি দুজনে। [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] গেলেও, তার চেহারা চোখ, কথা বলা, সবকিছুর মধ্যেকার একটা অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছি বার বার। 'কেন এমন হয় বলতো'—এরকম একটা বাক্য অস্ফুটে সজনের দিকে ভাসিয়ে দিলে বিজন একদিন বলেছিল—'এরকম হয় বলেই আমরা বেঁচে থাকি। থাকতে পারি।'

অন্ধকার ঘরে শুধু চুপ করে বসে থাকলে মাথার মধ্যে অনেক এলোমেলো কথা ভিড় করে আসে। সেটা খারাপ লাগছে বলেই বিজনকে বললুম, 'আজ হঠাৎ রমা এসেছিল। সারাটা দিন রমার সঙ্গে কাটলো।' বিজন বলল, 'মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হয় মাঝে মাঝে। এত বেপরোয়া হওয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন বাঙালী মেয়ের পক্ষে খুব রিস্কি।'

'মানে।'

'একদিন হঠাৎ নিজেকে খুব একা লাগবে রমার, কিছুই করার থাকবে না আর, নিজের কাছে কাউকে বলবে না সেদিন। দুঃখ পাবে খুব।'

'আমার তো ঠিক উল্টো মনে হয়।

'অ্যাপারেন্টলি তাই মনে হয়। টাকা পয়সা খরচ করে, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াব খুব ভালো ব্যাপার। কিন্তু আমার একরকম যেন মনে হয় রমা আসলে খুব এলোমেলো। এর নিজস্ব কোনো বন্ধু নেই।'

'আমাদের কারুরই তা নেই।'

'কেন নেই'

'নিজেকে ছাড়া মানুষ শেষ পর্যন্ত কিছুই ভালোবাসে না বিজন। মিনতিকে তো দেখছি।'

'কি দেখছিস।'

'একদিন আমার সব কথা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতো। এখন আমার কোনো ব্যাপারেই মিনতির কোনো ইন্টারেস্ট নেই।'

'কেন এরকম হল বল তো'

'কোনরকম জটিলতা মিনতি একদম পছন্দ করে না। এটা ওর স্বভাব বলতে পারিস তুই। আগে এত পরিষ্কার করে বুঝতে পারিনি।'

'তুই মিনতিকে পেয়ে খুব বেঁচে গিয়েছিলি তখন। অন্তত সেইরকম বলেছিলি।'

'রমা যা পারেনি। মিনতির মধ্যে সেই গুণটা ছিল; একটা গভীর ক্ষত মিনতি খুব আস্তে আস্তে সারিয়ে তুলেছিল বলা যায়। ...রমার মধ্যে তো কোনো নারী নেই। সে কারো স্ত্রী বা মা হতে পারবে না।'

'এখন তোর কেমন লাগে মিনতিকে।'

'বোধহয় আমাদের কারুরই আর কাউকে প্রয়োজন নেই। তবু আমরা সারাজীবন একসঙ্গে থাকবো।'

'কেন'

'স্ত্রী হিসেবে মিনতি খুব চমৎকার। সি কিপস এভরিথিং ও-কে।

'শুধু তাই?'

[illegible] [illegible] আমাকে একটু [illegible]

'ভ্রুক্ষেপ করে না। আমাদের অস্তিত্ব আমাদের দুজনের কাছেই কতকগুলো অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়।'

'তাই হয়। এই জন্যেই আমি মেয়েদের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট পাই না আজকাল।'

বেঁচে গেছিস।'

বিজন এরপর একদম চুপ করে গেল। মাথার মধ্যে থেকে পিয়ানোর জটিল সুরটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আলস্য আস্বাদ আর নেশা মিশে যাচ্ছে রক্তে। ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে রক্তের ভিতরের ধ্বনি তরঙ্গের মাত্রা। নিজের হাতটা সরিয়ে কোমরের পাশ থেকে কোলের ওপর তুলতেও ক্লান্ত লাগছে। সেটাকে পরিশ্রম বলে মনে হচ্ছে। একসময় চেতনার মধ্যে দ্রুত ও বিচিত্র এই বাজনার রনণ ছাড়া আর কিছু রইল না আমার। কোন চিন্তা কোন অনুভূতি বা কোন চেনামুখ স্মৃতি থেকে উঠে আসবে না এখন। এক শান্ত, পেলব ও নরম শূন্যতার মধ্যে বোধহীন ভেসে যাচ্ছি আমি। এই কি সুখ।

বাড়ি ফেরার বাসে লক্ষ করলুম লোকে আমার দিকে তাকাচ্ছে। চোখ কি তবে এখনো অতিরিক্ত লাল হয়ে আছে? বাড়ির গলি পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলুম। ইমাম বকস লেনের মুখে, সিগারেটের দোকানের আয়নায় কেন শুধু কতটা লাল হয়ে আছে চোখ দুটো সেটা দেখার জন্যেই। বেশ স্পষ্ট ঘোর-লাগা অপ্রকৃতিস্থ চোখ। 'মনতি বিরক্ত হবে যথারীতি সারারাত নিঃশব্দ ধর্মঘট করে দেয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে থাকবে। কথা বললে উত্তর দেবে না. জোর করে কথা বলাতে গেলে এমন একটা ভাব করবে যে খুব ক্লান্ত হয়ে যাবো হঠাৎ। এই মুহূর্তে এইসব হোক আমি চাই না। যেন সেই কারণেই শুধু, ঘরে না ফিরে একটা সিগারেট ধরিয়ে, আর একটু এগিয়ে গেলুম। এক জায়গায় দেয়ালের মধ্যে একটা চায়ের দোকান, বুকসমান উঁচুতে একটা পিঠে কুঁজ লোক চা বেচছে। দোকানটার নিচে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট দরজা। সেটা খুলে আর একজন লোক ভেতরে ঢুকে গেল—প্রায় গুপ্ত কুঠুরি ধরনের একটা ছোট্ট ঘর আছে সেখানে। অনেকটা চাপা ড্রয়ারের মত। পুরো একপোয়া দুধ খেয়ে নিয়ে বেশ ঝরঝরে লাগলো নিজেকে। চরস খাওয়ার পর দুধ খেতে খুব ভালো লাগে। তাছাড়া এইসব দোকানে দুধটা বেশ ঘন করে জ্বাল দেয়, অনেক চিনি দেয় চমৎকার লাগে খেতে। দুধ খেয়ে এগিয়ে গেলুম একটু। বাঁদিকে ফকির চক্রবর্তী লেন। ডানদিকে একটা বাড়িতে দরজার মুখে, অনেকজন মেয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে পথের দিকে শিকারী পাখির ভঙ্গিতে চেয়ে আছে। একটা সরু প্যাসেজ বাড়ির ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। আর একটু এগিয়ে বাঁদিকে [illegible]

ওপর ছায়া মঞ্জু আর বাসন্তী বসে আছে। বাসন্তীর হাতে সিগারেট। বাসন্তী বলল, 'পথ ভুলে নাকি? কি খবর!' দরজার পাশের পানের দোকান থেকে পান কিনছিল লক্ষ্মীদের বাড়িওলি। ভদ্রমহিলার চেহারাটি বিশাল। বিরক্তিকর ভ্যাজভেজে মুখে পান চিবোতে চিবোতে এসে বললেন, 'লক্ষ্মীর খুব জ্বর। আপনি তো আর খবরই রাখেন না।' দু হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেও আমি এই মহিলার কোমরের বেড় পাবো না। হঠাৎ একটা কালোমতন রোগা খুব লম্বা ছেলে কোথা থেকে এসে বলল, মাসি, হুল্লো এসেছে-কালটুকে তুলেছে। বাড়িউলি সকলেরই মাসি। হুল্লো মানে পুলিশ। ছেলেটির কথা ভালো করে না শুনেই ছায়া বাসন্তীরা দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। আমার দিকে ফিরে মাসি বললো 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন—আমার বাড়ির সামনে থেকে আপনাকে তুলে নে যাবে আমি তাই দেখবো—এ্যাঁ—ভেতরে চলুন।' লক্ষ্মীদের বাড়ির অন্ধকার মত উঠোনের দিকে ঢুকে পড়লুম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হুল্লো গাড়ির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না যদিও। উঠোনের একদিকে কলঘর. সেদিকটা খুব পিছল। বাসন্তী সিঁড়ির ওপর থেকে বলল, 'আমরা ওপরে যাচ্ছি আপনিও ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। উঠে আসুন।' আমি বললুম—'আমি একটু বাথরুমে যাবো।' সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে যেতে বাসন্তী বলল—ওপরে করবেন। এখন উঠে আসেন তো।'

সিঁড়িটা সরু, অন্ধকার। সবাই তরতর করে উঠে গেল। আগে. কয়েকবার এলেও, অন্ধকারে উঠতে আমার অসুবিধে হয়। বাড়িউলি নিচে থেকে বলল, সোজা লক্ষ্মীর ঘরে চলে যান। দাঁড়াবেন না।'

লক্ষ্মীর ঘরটা ছাদের ওপর। ছাদটাও অন্ধকার। দুটি বুড়ি ও কয়েকটি শিশু একপাশে মাদুর পেতে অন্ধকারে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আর একটু হলে পা লেগে যেতো তাদের গায়ে। ছাতের ডানদিকে পর পর তিনটে ঘর। একদম শেষের ঘরটা লক্ষ্মীর। পাঁচিলের গায়ে দাঁড়িয়ে এখান থেকে নিচের রাস্তাটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এখানে দাঁড়িয়ে থেকেছি অনেকদিন। এখন রাস্তা ফাঁকা। কোনো বাড়ির সামনে কোনো মেয়ে দাঁড়িয়ে নেই। কয়েকজন পথচারী কোনদিকে না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এখান থেকে দেখা গেল, মনুয়ার দোকানের সামনে পুলিশ ভ্যান। মনুয়া নিশ্চয়ই ভালো মানুষের মত পান-সিগারেট বেচে যাচ্ছে। তবু একটা মোটা টাকা খসবে আজ মনুয়ার। এটা তার নিরাপত্তার দাম।

লক্ষ্মীর ঘরের দরজা ভেজানো। ভেতরে আলো জ্বলছে। দরজা ঠেলতে গিয়ে মনে হল, পুলিশ আসার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। ধরলেও রামজয় শীল লেনে থাকি বললে কিছু হত না। অথচ বাড়িউলি তখন এমন একটা ব্যাপার করল যে চলে যাওয়ার কথা মনেই এল না।

খালি গায়ে বুকের ওপর পর্যন্ত তুলে বেঁধে শুধু শায়া পরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে লক্ষ্মী। হাঁটু থেকে পুরো পা, কাঁধ, কিছুটা পিঠ দেখা যাচ্ছে। হাত
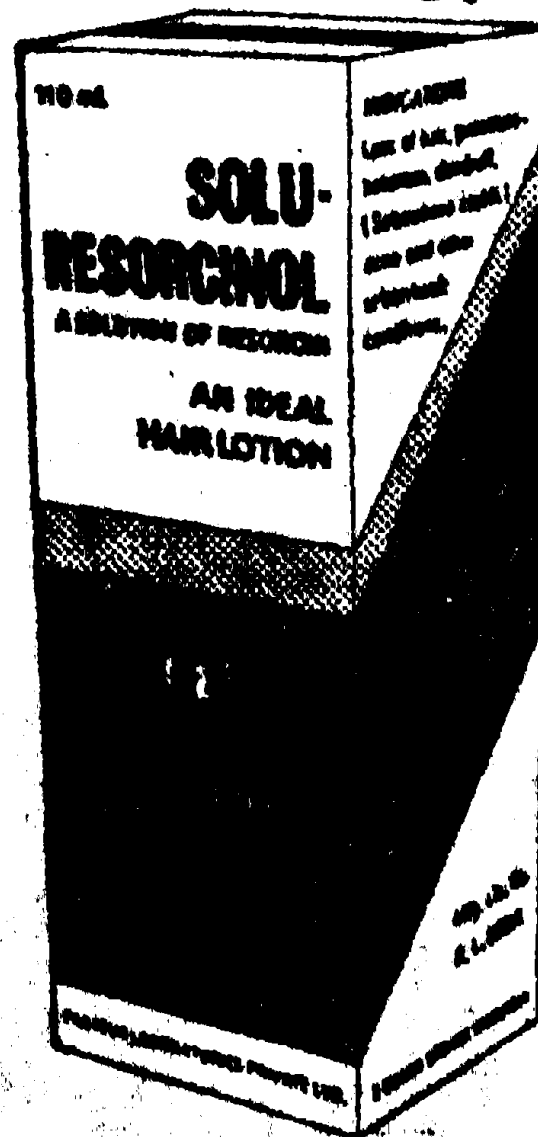
দুটো মাথার দু পাশে জড়ো করা। চুল আলুথালু। বিছানায় বসে ঘাড়ের কাছে আস্তে সুড়সুড়ি দিতে লক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। তার গায়ে জ্বর নেই। মাথার কাছে একটা টেবিল ফ্যান ফুল স্পিডে ঘুরছে। একটা ঘর ঘর শব্দ হচ্ছে পাখাতে। একবার তাকিয়ে লক্ষ্মী আবার বালিশে মুখ গুজে দিল।

'তোমার নাকি খুব জ্বর'—ঝুঁকে লক্ষ্মীর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে কথাটা বলতে গিয়েই গন্ধ পেলুম। লক্ষ্মী প্রচুর মদ্য পান করে আছে।

চিৎ হয়ে শুয়ে জড়ানো গলায় লক্ষ্মী বললো—'সেদিনকে তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি একটা একশো টাকার নোট খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি নিয়েছো?' চোখ বুজে কথা বলছে লক্ষ্মী। ভঙ্গিতে এক তন্ময় আন্তরিকতা ছিল যে অস্বীকার করতে ইচ্ছে হল না। চরস প্রসূত পিয়ানোর সুরটা তখনো মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে বাজছে। বললুম—'হ্যাঁ'। বলেই সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে উল কেনার জন্যে মিনতির দেওয়া নোটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম—'এই নাও'। তৎক্ষণে ধড়মড় করে উঠে বসেছে লক্ষ্মী। টাকা ছোঁ মেরে হাত থেকে নিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন একজন ঝি মতন মেয়ে এসে বলল, ওপরে হল্লা আসছে, লক্ষ্মী ঘর বন্ধ কর। প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল আমার। পরিষ্কার দেখতে পেলুম, বটতলা থানায় একঘর লোকের সামনে বসে আছি। এক নাগাড়ে অপমান করে যাচ্ছে আমাকে একজন ইন্সপেকটর। মনে হল অফিসে গিয়ে দেখব আমাকে নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন হচ্ছে চারদিকে। মিনতির কঠিন মুখটা মনে পড়ল একবার। লক্ষ্মী ততক্ষণে কোথা থেকে একটা তালা বার করে ঝি মেয়েটার হাতে দিল। অবাক হয়ে দেখলুম ভেতর থেকে ছিটকিনি দিল দরজায় লক্ষ্মী। আর বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে কি-সব বলে চলে গেল লোকটা। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একবার ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল লক্ষ্মী। বুকের ওপর তুলে বাঁধা শায়া, আলুথালু চুল,—নেশাগ্রস্থ লক্ষ্মীকে কি রকম প্রাকৃতিক দেখাচ্ছিল। পাখাটা এখনো ঘর ঘর শব্দ করছে অন্ধকারে। আমি বললুম—'পাখা।' ফ্যান বন্ধ হয়ে গেল।

অন্ধকারে লক্ষ্মী কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। বাইরে অনেকগুলো ভারী পদশব্দ শোনা গেল লক্ষ্মীর ফিসফিস গলা শুনতে পেলুম—'চুপ মেরে বসে থাকো। একদম শব্দ করবে না।' বস্তুত বুকের মধ্যে দামামা বাজছে। তার শব্দ বাইরে থেকে শোনা যাবে মনে হচ্ছিল আমার।

দরজায় কিছুটা ধাক্কাধাক্কি ও কথাবার্তার পর পুলিশ চলে গেল। কথাবার্তা শুনে মনে হল পুলিশ এই বাড়ির ঝি মেয়েটার সঙ্গে পরিচিত। তালা ভেঙ্গে ফেলার কথা হচ্ছিল, একটা ভারী পুরুষের গলায় শোনা গেল,—'বললুম তো লক্ষ্মী তিন দিন ধরে হাসপাতালে আছে। ছেলেপুলে হবে।' ঘরের ভেতরে অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে, এত দুঃখেও হাসি পেয়ে গেল আমার।

হল্লা চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও লক্ষ্মী দরজায় কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল। পিঠ ঢাকা পড়েছে চুলে, হাত দুটো দরজার ওপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মী। তাকে এখন যে কোনো উদ্বিগ্ন রমণীর মতন দেখাচ্ছে। এক সময় সেই ভারী পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, 'ঘর খোল লক্ষ্মী—চলে গেছে সব।'

ছিটকিনি খুলে লক্ষ্মী ছাতের পাঁচিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে রাস্তা দেখতে লাগল। খালি গা লুঙ্গি-পরা কর্কশ চেহারার পুরুষটি ধমকে উঠলেন—'এই লক্ষ্মী, দুর্গি হয়ে যাবি, সরে আয়।' লোকটির গলার স্বর ও মুখচোখের চেহারা দেখে মনে হয় মাত্রাহীনভাবে মদ্যপান করেন তিনি। লক্ষ্মী ঘরে না এসে কোথায় চলে গেল। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন বেরোবেন না। একটু পরে যাবেন।' ভঙ্গিতে মনে হল আমাকে চেনেন। ভরসা পেয়ে বললুম, 'কোথায় বাথরুম করা যায় বলুন তো।' মোটা গোঁফের নিচে একটু হেসে ফেললেন তিনি। বললেন 'আসুন'। পেছনে যেতে যেতে মনে হল, ভদ্রলোক ভাবছেন পুলিশের ভয়ে আমার এরকম অবস্থা হয়েছে।

ছাতেই একদিকের কোনে বাথরুম করার জায়গা ছিল। লক্ষ্মীর ঘরের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ হাঁফাবে হাঁফাতে বাসন্তী এসে বলল, 'এই যে, এদিকে।' প্রায় ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে বাসন্তী। আমি বললুম-'কি ব্যাপার।' দম নিতে নিতে বাসন্তী বলল,—'আপনি, লক্ষ্মীর, টাকা চুরি করেছেন? এ্যাঁ?' একটু আগেই বাসন্তী খুব খোঁজরে সুরে কথাবার্তা বলছিল, এখন অন্য রকম শোনাচ্ছে একদম। 'চুরি' শব্দটা ধক করে কানে লাগলো। বিপদের গন্ধ পেলুম যেন। কোন রকমে বললুম, 'চুরি মানে চুরি তো করিনি, মানে—টাকা তো দিয়েছি।' বাসন্তী হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে শুরু করল—আশে পাশে অন্য মেয়েদের ভিড় জমছে আস্তে আস্তে—'চুরি করেননি, এ্যাঁ, চুরি করেন নি?—শুধু না বলে নিয়ে গেছলেন—না? লজ্জা করে না আপনার? এর নাম ভদ্দরলোক আপনি? মেয়ে ভোলানো চেহারা নিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেই ভদ্দরলোক হয় না—জানেন আপনি টাকার জন্যে দিনভোর কত কেঁদেছে লক্ষ্মী—আপনি জানেন? পয়সার দাম নেই আমাদের—গতর দিয়ে পয়সা রোজগার করতে হয় আমাদের আপনি জানেন—আপনার লজ্জা করল না পয়সায় হাত দিতে—ভদ্দরলোক! ছি ছি ছি—।' তৎক্ষণে ভিড় জমে গেছে আমার চারপাশে। একটা মোটা মতন মাঝবয়েসী মেয়ে গালে হাত দিয়ে প্রচণ্ড ন্যাকা ভঙ্গিতে দুলে দুলে বলতে লাগলো—'ওমা, সেকিগো—দেখতে তো দিব্যি ভালো মানুষের পো—বাবা তোমার পেটে পেটে এই ছিল গো।' কয়েকজন খিলখিল করে হেসে উঠলো। আশেপাশে অন্য বাড়িগুলোর বারান্দাতেও ভিড় জমতে শুরু করেছে। ফটাফট খুলে যাচ্ছে জানলা। তারস্বরে বাসন্তী আবার শুরু করল—'কি বলে এমন কাজলা করলেন বলুন তো—কি ক্ষতি করেছিল লক্ষ্মী আপনার?, আদর করে ধরে বসাতো বলে এইরকম শোধ দিলেন আপনি—বলিহারি যাই। এইরকম ভদ্দরলোক আপনি—ছি ছি ছি। বলি আপনার কোন ক্ষতিটা করেছিল লক্ষ্মী— এ্যাঁ, বলুন আপনি— কি ক্ষতি করেছিল আপনার যে তার এই সব্বোনাশটা করলেন আপনি- মরণ হয় না আপনার, ছি-ছি। ভেবেছিলেন ভুলে যাবে লক্ষ্মী, ধরা পড়বে না—বাহাদুর আবার সোহাগ করতে এসেছেন—তোমার নাকি খুব জ্বর লক্ষ্মী—আ—হা হা গো মরে যাই।'. এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল। লক্ষ্মী নীচে গিয়ে বাসন্তীকে খেপিয়ে দিয়েছে। সবাই মিলে একটা মজার মতন মজা পেয়ে গেছে। উৎসাহ চকচক করছে সকলের চোখে। লক্ষ্মী কি এই জন্যে পুলিশের হাত থেকে বাঁচালো আমাকে! সমানে দশ-পনেরোজন আমাকে ঘিরে মনের সুখে যাই যা খুশি বলে যাচ্ছে।...এর থেকে পুলিশের গারদ অনেক ভালো ছিল।

আমার দিক থেকে কিছু শোনার কোনো মেজাজ নেই কারো। চুরি করে অনুতপ হয়েছে। আর তাই দুঃখিতচিত্তে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়েছি আমি লক্ষ্মীকে—এটা কোনো ঘটনা নয় সংসারে। লক্ষ্মীর তোষকের তলা থেকে টাকাটা তো অন্য যে কেউ নিয়ে যেতে পারতো। কি যে আফশোষ হচ্ছে লক্ষ্মীর কাছে কথাটা স্বীকার করে ফেলার জন্যে।'

হঠাৎ সেই কর্কশ চেহারার লোকটি এগিয়ে এসে সব শুনে, 'লক্ষ্মী লক্ষ্মী কোথায়' বলে এদিক ওদিক তাকালেন। স্বল্পান্ধকার ছাতের এক কোনে উবু হয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে লক্ষ্মী। 'আপনি কি টাকা দিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মীকে?'—আমার দিকে তাকালেন ভদ্দরলোক। আমি কোন রকমে বললুম—লক্ষ্মীকেই জিগেস করুন। দূর থেকেই লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বললেন, 'কিরে, পেয়েছিস টাকা?' লোকটির উপস্থিতির প্রভাবে অন্য মেয়েরা একদম চুপ করে গেছে। সবাই লক্ষ্মীর দিকে তাকালো। তখনো তার পরনে শুধু বুকের কাছে তুলে পরা শায়া। হাঁটু থেকে মুখ তুলে ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে জানালো—পেয়েছে। আমার দিকে ফিরে লোকটি বললেন—'যান, চলে যান আপনি, কেউ আটকাবে না।' মাথা নিচু করে নিঃশব্দে

দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকার সরু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, পিছনে সিঁড়ির মুখে ছাতের দরজার কাছে, সমবেত হাসি ও কলস্বর শোনা গেল।

সকালবেলা মাথার বালিশের কাছে চায়ের কাপ রেখে ঘুম থেকে তুলে দিল মিনতি। শুয়ে শুয়ে চায়ে চুমুক দিতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল। প্রথমবার চুমু খাবার পর রমা বলেছিল—'শীতের ভোর-বেলা লেপের ভেতর থেকে মুখ বার করে বেড্‌টিতে প্রথম চুমুক দিলে যেমন লাগে, সেরকম লাগলো।'

মাথার কাছের জানলাটা দিয়ে বাইরে তাকালে, একটা ছোট মাঠের পরে একটা ডালের মিল। ফাটলধরা ইঁট বার করা দেয়াল। অশ্বত্থগাছের একটা লম্বা শেকড় দেয়ালটার গায়ে জ্যামিতির ছবি হয়ে আছে। নিচের দিকে বড় বড় জানলা। জানলা দিয়ে ভেতরের কারখানার লোকদের দেখা যায়। বাড়িটার মাথায় একটা চিমনি। সেখান থেকে অবিশ্রাম ধোঁয়া বেরোয় সারাদিন। ধোঁয়ার রেখাটা ক্রমশ পাতলা হতে হতে মেঘ হয়ে ছড়িয়ে যায়। ঘরে শুয়ে শুয়ে সেসব দেখতে খুব ভালো লাগে।

স্নান করে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে মিনতি বলল—'উল এনেছো?'

মনে মনে ঠিক এই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। গম্ভীর মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সিলিং-এর দিকে উদাসীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললুম 'নাঃ'।

কপালে সাবধানে সিঁদুরের টিপ লাগাতে লাগাতে মিনতি বলল, 'আজ কি আনবে?'

গম্ভীর মুখে বললুম—'আনবো'। মিনতি এখনো জানে না টাকাটা নেই।

একটা শাদা শাড়ি পরেছে মিনতি। পিঠে লুটিয়ে আছে ভিজে চুল। স্নান করার পর যে কোনো মেয়েকেই স্নিগ্ধ পবিত্র দেখায়। শাদা শাড়ির জন্যে আরো ভালো লাগছে মিনতিকে। পূজারিণীর মত দেখাচ্ছে। আয়নার সামনে প্রসাধনমগ্ন মিনতিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, কাল রাত্রে দেখা লক্ষ্মীর মত বুকের ওপর তুলে শুধু শায়া পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন লাগতো তাকে এখন! কেমন লাগতো?

একসঙ্গে দুজনে খেতে বসে, খেতে খেতে মিনতিকে 'ট্যাবলেটগুলো আর পাওয়া গেল না?' বললে মিনতি বলল, না। তার-পর বিড়বিড় করে বলল, আর আনতে হবে না।' কিছুটা অবাক হয়ে খাওয়া বন্ধ করে মিনতির দিকে চেয়ে রইলুম—'মানে'। মিনতি নিঃশব্দে খেতে খেতে একটু পরে উত্তর দিল : 'এভাবে আমার আর ভালো লাগছে না একা একা'।...মিনতি ঠিক উল্টো কথা বলেছে কিছুদিন আগেও।

তবে, আবর্তিত হবার জন্য আমাকে আর নির্ভরশীল কেন্দ্র ভাবছে না মিনতি। আমি কাছে থাকলেও তার একা লাগে নিজেকে।

অফিসে কারো কাছে একসঙ্গে একশো টাকা পাওয়া গেল না। কেউ বলল, তিন-দিন আগে বললে দিতে পারতুম। কেউ বলল, আজ শনিবার, ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে, সোমবারে দিতে পারি। একবার মনে হল দশ জনের কাছ থেকে দশ টাকা করে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নেওয়া যেতো। দশজনের কাছে পর পর একই কথা বলতে হবে, ভাবতেই ক্লান্ত লাগলো। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে বিকেলের দিকে বেশ খিঁচড়ে এসেছে মেজাজ—হঠাৎ রমার ফোন এল। একদম নিজস্ব 'হ্যালো' শুনেই বুঝলুম রমা। গলা পর্যন্ত ডুবে গিয়ে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত করে বললুম—'ভীষণ মনে পড়ছিল তোমাকে, তুমি এখন ঠিক কোথায় আছো রমা, তোমার সঙ্গে আমার এক্ষুনি দেখা হওয়া দরকার। ভীষণ দরকার।' আমি জানি রমা এরকম কথাবার্তা পছন্দ করে খুব। রমা মিষ্টি করে হাসলো। রমার হাসির মৃদু শব্দ টেলিফোনে মধুর লাগলো আমার।

—'কি ব্যাপার, খুব বোর হচ্ছিলো অফিসে?'—রমা বলল।

'সো হেল অফ এ প্লেস, ইউ নো', রমাকে বললুম, কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব অন্তরঙ্গ করে তুলে—'তুমি কোথায় আছো, রমা?'

'ওয়েলেসলিতে পিনাকীর স্টুডিও থেকে কথা বলছি। তুমি আসবে?'

'এক্ষুনি।'

'অফিস?'

'তোমার মুখে শব্দটা মানায় না, রমা' বললে সে আবার খিল খিল করে হাসলো। 'আচ্ছা, তুমি সোডা ফাউন্টেনে চলে এসো। আমি যাচ্ছি।'

'সোডা ফাউন্টেন?'

'হ্যাঁ।'

'থ্যাংকিউ। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

ইন-চার্জকে বলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। রমাই একমাত্র বাঁচাতে পারে আমাকে এখন। রমার পক্ষে কাছে না থাকলেও একশো টাকা জোগাড় করা কোনো সমস্যা নয়।

সোডা ফাউন্টেন চৌরঙ্গীর মোড়ে চাঁদনীর পাশে—জি সি লাহার দোকানের ঠিক উল্টো দিকে। আর্ট কলেজের ছেলে-মেয়েদের আড্ডা। সেখানে বসে এক কাপ চা আর তিনটে সিগারেট শেষ করার পর রমা এল।

একটা ঘন ব্রাউন রঙের সিল্ক জর্জেট শাড়ি পরেছে রমা। যত্ন করে ডাই করেছে চুল। শাদা নরম গ্রীবা ছুঁয়ে থেমে আছে গুচ্ছ কেশদাম। শাড়ি পরে না বলেই সম্ভবত অসাধারণ রমণীয় লাগলো রমাকে।

'একটু দেরী হয়ে গেল' বলে রমা উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললুম,-'সিরিওআসলি, চেনা যাচ্ছে না তোমাকে।'

রমা বলল, থাক, ওটা আমার সঙ্গে অন্ততঃ কোরো না। অন্য মেয়েদের জন্যে তুলে রাখো।'

—দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে, কেন বলবো না কেন?'

'আমি জানি আমাকে কেমন দেখাচ্ছে। মিথ্যে বলে লাভ নেই।'

'এই একটা ব্যাপারে কিন্তু তুমি সব মেয়েদের মত বোকা। তোমার চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রূপের প্রশংসা করলে তুমি খুশি হও।'

'ফ্লার্ট করা আমি পছন্দ করি না।'

'আমি করছি না। যাকগে ছেড়ে দাও—'

'বলো, তোমার কি খবর।'

'বলছি। কাল কি করলে?'

'নাথিং। করার মত কিছু নেই আমার তুমি জানো। কিছু না করতেই আমার ভালো লাগে।'

'পিনাকীর স্টুডিওতে কি করছিলে?'

'তাতে তোমার কি দরকার!'

'ডোন্ট বি সিলি। তোমার কোনো ব্যাপারেই আমার কোনো দরকার নেই।'

'সেই জন্যেই তোমাকে আমার ভালো লাগে এখনো। তোমার কোন ডিমাণ্ড নেই।

'সব ছেলেরাই তোমার কাছে সবসময় কিছু না কিছু ডিমাণ্ড করে নাকি?'

'করেই তো।'

'কি ডিমাণ্ড করে?'

'কাঁচ খোকা আমার রে!...আসলে, জানো সোম, নোংরা—প্রত্যেকটা ছেলে ভেতরে ভেতরে খুব নোংরা।'

'আমি নোংরা নই?'

ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'পিনাকী?'

'মার খাবে কিন্তু। পিনাকী একটা দারুণ কাজ করেছে। দারুণ।'

'কি কাজ?'

'কাজ মানে ছবির কথা বলছি। টেরি-ফিক একটা ছবি এঁকেছে পিনাকী।'

'টেরিফিক?'

'দারুণ। খুব শিগগির একটা এক্জি-বিশন করছে। হেভি ব্যস্ত! আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতন যেতে বললাম, মহুয়ার লোভ দেখালাম কত—কিছুতেই রাজী হল না।'

'শান্তিনিকেতন? যাচ্ছো নাকি?'

'তুমি যাবে?'

'মানে—এক্ষুনি যাবে নাকি?'

'যাবো বলেই তো বেরিয়েছি। তোমাকে খবরটা দেবার জন্যেই তো ফোন করলাম। কাল তো ছুটি। রবিবার। চলো না।'

'মানে, এভাবে—হঠাৎ।'

'কেন, বৌ খেপে যাবে?'

'অন্তত বলে যাওয়াটা তো উচিত।'

'তোমাদের উচিত-ফুচিত ব্যাপারগুলো আমি কোনদিন বুঝি না। যাবে কিনা বলো।'

কিছু না বলে তাকিয়ে রইলুম রমার দিকে। এই পরশুদিন রমা আমাকে মিডিওকার—ভীতু, এইসব বলে ঠাট্টা করেছে। এখন, চাকরি-সংসার এইসব নিয়ে আমাকে একটু তুচ্ছ করছে বলে মনে হল। রমা কি ভাবছে আমাকে? উল কেনার একশো টাকা জোগাড় করার জন্যে রমাকে ডেকেছি ভুলে গিয়ে, রমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললুম—'যাবো।'

রমার চোখদুটো চকচক করে উঠলো. খুশিতে, 'যাবে? সত্যি?'

'বললুম তো যাবো।' বেশ গম্ভীর মেজাজে কথাটা বলে চেঁচিয়ে বেয়ারাকে ডাকলুম—'হরিপদ, চা দাও দুটো।'

টেবিলের ওপর আমার খালি কাপটা তখনো পড়ে ছিল। রমা বলল, 'তুমি তো একবার চা খেয়েছো মনে হচ্ছে। এবার কফি খাও। আমি কফি খাবো।'

কফি খেতে খেতে বললুম—'ডেরেকের সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'কাল হয়েছিল।'

'কি করলে কাল?'

'ডেরেক ওর সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া যেতে বলছে। যাবো বললাম।'

'সত্যি?'

'ফাইনাল।'

'কবে যাচ্ছো?'

'ভিসা-পাসপোর্ট পেলেই। আমার একটা পাশপোর্ট-সাইজ ছবি নিল কাল।'

'তবে এখন শান্তিনিকেতন যাচ্ছো কেন?'

'নাজের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। খবরটা পেলে নাজ খুশি হবে।'

'কে নাজ?'

'নাজের কথা মনে নেই? শান্তিনিকেতনে আমার রুমমেট ছিল। পাঞ্জাবি মেয়ে। ড্যাম স্মার্ট।'

'খুব মারামারি করত?'

হ্যাঁ-হ্যাঁ। ছেলেগুলোকে পটাং পটাং করে ছুঁড়ে ফেলে দিত। জুডো জানতো।'

'তুমি শিখে নিলে পারতে।'

'ধুস্'।

'কেন?'

'আমার ভাল্লাগে না। শেখাবার চেষ্টা করেছিল।'

'যেসব ছেলেরা তোমার সঙ্গে বদমাইসি করে, তাদের শখ মিটিয়ে দিতে পারতে।'

'সেটা আমি এমনিতেই পারি। তার জন্যে জাপানী কুস্তি শিখতে লাগে না।'

'আমার খুব ভালো লাগে। তুমি 'এনটার দ্য ড্রাগন' দেখেছো?'

'তিনবার। দারুণ।'

'তিনবার?'

'ওটা জুডো নয়। ক্যারাটে। ব্রুস লী নাকি দারা সিংকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। দারা সিং পারতো না। পারতো?'

'এটা প্রশ্ন হল?'

'কেন! আঃ, কি চোখ ব্রুস লী'র। কি শান্ত, কি কনসেনট্রেশন—ইস, কেন যে মরে গেল লোকটা।'

'মরে যায়নি তো।'

'মানে!'

'মেরে ফেলা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ফেম পেয়ে যাচ্ছিল তাই।'

'কোনো মানে হয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমা হাত-দুটো ব্রুস লী'র মত করে দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলল। 'আমি পারবো না।'

'আর একটা ছবি আসছে। ক্লিওপেট্রা শার্ফ না কি যেন, তাতে একজন মেয়ে ব্রুস লী আছে।'

'তাই নাকি! দেখতে হবে তো। কি নাম মেয়েটার?'

'জানি না। ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেলে দেখবে কি করে?'

'ওঃ, ক্যালিফোর্নিয়া। ডেরেক যদি সত্যি নিয়ে যায়. দারুণ হবে কিন্তু। এনাফ অফ ক্যালকাটা।'

'বাংলায় কথা বলতে পারবে না।'

'দরকার নেই। ক্যা-লি-ফো-র্নি-য়া নামটাও কি মিষ্টি, রোমান্টিক—না?'

রমা উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে। এই রমাকে আমি চিনি না। ভয় পাই। নিজের ভালো লাগার জন্যে এই রমা যে কোনো ঝুঁকি নিতে পারে। নিয়েছেও অনেকবার।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল সোজা বোলপুরের কোন ট্রেন নেই। একটা লোকাল ট্রেনে বর্ধমান পর্যন্ত যাওয়া যাক আগে, বিনা টিকিটে, রমা ঠিক করল। টিকিট না কেটে ট্রাভেল করার একটা থ্রিল আছে।

দুঃখের কথা, আমাদের কামরায় কোনো চেকার এল না। জানলার ধারে মুখোমুখি দুটো সিট পেয়েছিলুম দুজনে। অধিকাংশ যাত্রীই ডেলি প্যাসেঞ্জার। মাঝখানে খবরের কাগজ পেতে তাস খেলা শুরু হয়ে গেল এক কোণে। তাদের নোট্রাম, ডাবলস, থ্রি-স্পেড শুনতে হল সমস্ত পথ। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর রমা বলল, 'ট্রেন চলার এই আওয়াজটুকু শোনার জন্যে মাঝে মাঝে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। আঃ, কতদিন পরে ট্রেনে চড়লাম। কি-যে ভালো লাগছে।' কামরার সমস্ত লোকের তির্যক তাকানো উপেক্ষা করে অনর্গল কথা বলে গেল রমা। ট্রেনের জানলার বাইরে ধীরে সন্ধ্যে হয়ে এল। ইলেকট্রিকের তারের কাছ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে উড়ে গেল মরা বিকেলের পাখি। একটু পরে মিহি একটা জ্যোৎস্না উঠলো চরাচরে। ফাঁকা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে. অনেক দূরে. জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট তিনটে নারকেল গাছ দেখিয়ে রমা প্রায় স্বপ্নের ভেতর থেকে কথা বলে ওঠার মত করে বলল 'ওইখানে চলে যাওয়া যায় না, এক্ষুনি?'

বর্ধমানে নেমে, মিহিদানা আর পাঁউ-রুটি কিনলো রমা। এ দুটো জিনিস একসঙ্গে কখনো খাইনি। রমা বললো, খেয়ে দ্যাখো, ভালো লাগবে।' মন্দ লাগলো না। স্টেশনের দোতলায় ফার্স্টক্লাশ ওয়েটিংরুমের সোফায় বসে রইলুম অনেকক্ষণ। ওয়েটিংরুমের দরজার কাছে বসে থাকা বুড়ো দারোয়ানকে রমা মেজাজে বলল—'দার্জিলিং মেল আয়েগা তো বোলেগা।' অনুগত ভৃত্যের মতো ঘাড় নাড়ল বুড়ো। ভেতরে এসে সুদৃশ্য আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললুম—'যদি টিকিট দেখতে চাইতো।' রমা খিলখিল করে হেসে ময়াজীর চোখে চেয়ে বললো, 'তুমি একটা যা-তা। বোর করে দাও মাঝে মাঝে।'

বোলপুর স্টেশন থেকে রিকশায় জ্যোৎস্নার মধ্যে দুপাশে গাছ আর ফাঁকা পেরিয়ে পৌঁছলুম, রাত সাড়ে নটা। কলাভবনের হস্টেলে গিয়ে শোনা গেল নাজ নেই। বাড়ি গেছে ঠিক তিনদিন আগে। ঠিক এটাই মনে মনে ভাবছিলুম আমি সারাটা রাস্তা। একটা চায়ের দোকানে আলুরদম আর পাঁউরুটি চা পেট-ভরে খেয়ে নিলুম। লক্ষ করলুম, এখানকার দোকানদার বা অন্য লোকেরা বেশ অভ্যস্ত, এত রাতে দুজন যুবক-যুবতীকে চা-পাঁউরুটি খেতে দেখে বিস্মিত বা আশ্চর্য হয় না। চা-টা খেয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে,—'তারপর, এখন কি করবে?'—বলতে গিয়েও কিছু বললুম না। বললেই রমা আমাকে মিডিওকার বলবে। এককথায় কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে এসে এখন আমাকে খেলার নেশায় পেয়েছে। আজ যেভাবেই হোক রমাকে হারিয়ে দেখো আমি।

এত রাতে হস্টেলে হস্টেলে ঘুরে চেনা মুখ খুঁজে বের করার কোনো চেষ্টা করল না রমা। বাইরে জোরালো হয়েছে জ্যোৎস্না। গাছপালার নিচে দিয়ে জ্যোৎস্নায় জাফরি-কাটা ছায়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে হেঁটে বেড়াতে এত ভালো লাগছিল যে রাত্রিযাপনের জন্য বিছানা ও বন্ধ ঘর খুব অর্থহীন মনে হল। এক জায়গায় গাছের নিচে গোল হয়ে বসে কয়েকজন নারীপুরুষ গান গাইছে, তাদের কাছে গিয়ে বসে গান শুনলুম অনেকক্ষণ। ভাষাটা বাংলা ছিল না বলে. খুব বেশিক্ষণ বসে থাকা গেল না। সুর যতই ভালো হোক, ভাষা বোঝা না গেলে, একটা গণ্ডি পেরিয়ে আর গভীরে যায় না ভালো লাগা। এরা কারা, কেন এখানে এই খোলামেলা মাঠে গাছের নিচে জ্যোৎস্নায় এরকম বিচিত্র ভাষায় গান গেয়ে যাচ্ছে কিছুই জানা গেল না, ইচ্ছেও হল না জানতে—কিন্তু অদ্ভুত একটা সুর কানে লেগে রইল অনেকক্ষণ।

এক জায়গায় একটা বাড়ির একতলার ঘরের জানলা দিয়ে দেখলুম—বিরাট একটা লম্বা হলঘরে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকালের রেকর্ড চালিয়ে পায়চারি করছে পাজামা পাঞ্জাবি পরা একজন যুবক—তার বড় বড় চুল—বুকের ওপর জড়ো করা হাত—তন্ময় হয়ে বিদেশী বাজনা শুনতে শুনতে ঘরের মধ্যে মন্থর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে—তার চার-পাশে সারা ঘরময় ছড়ানো অজস্র ছবি, নানান আকারের পেন্টিং। দূরে থেকে বাজনার রেশ শুনতে পেয়ে জানলার কাছে এসেছিলুম। রমা বলেছিল—'বোধহয় ওটা সোমনাথ হোড়ের স্টুডিও। চলো দেখা যাক।' লোকটাকে দেখে রমা বলল, 'না। সোমনাথ হোড় নয়।' চারদিকে এলোমেলো ছড়ানো ছবির মধ্যে তাকে মগ্ন হেঁটে বেড়াতে দেখে আমার মনে হল, পৃথিবীর কোনো খবর রাখে না সে। কাছে দূরে কোথায় কি-সব হয়ে যাচ্ছে জানার কোনো দরকার নেই তার। অথচ তাকে, তার সৃষ্টিকে এই পৃথিবীর দরকার আছে। স্রেফ মনে হল—ঊনত্রিশ বছর ধরে ভুল বেঁচে আছি এতদিন। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে লোলুপ চেয়ে থাকতে থাকতে রমা বলল—'দারুণ। না?'—ততক্ষণে আমি মাঠ রেখে দুজনে শান্তিনিকেতনে মধ্যে চলে এসেছি সেখান থেকে।

অনেক পরে একটা খোলা মতন ফাঁকা মাঠের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলা খুলে গান শুরু করল রমা—ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো। মাঠের মধ্যে ছোট একটা গোল করে ঘুরতে ঘুরতে গাইলো--চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো। মায়ের ছেলেবেলায়, আমার মা এই গানটা গাইতো। ছুটির দিন দুপুরবেলা খাওয়ার পর একসঙ্গে সবাই এসে বিছানায় শুলে কত গল্প করতো মা। একটা ভাংগাচোরা হারমোনিয়াম ছিল আমাদের, সন্ধেবেলা আমরা দু-বোনে বাইরের ঘরে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতুম—মাস্টারমশাই আসতেন. আমরা গাইতুম—সে ছিল আমার স্বপনচারিণী। চাঁদের হাসির—।' রেডিওতে এই গানটা দিলেই মা বলে উঠতো—'ওঃ, কতদিনের গান, তবু পুরোনো হল না।' মা, কতদিন, তোমায় দেখিনি, তুমি কেমন আছো।...রমা যখন 'যাবো না, যাবো না, যাবো না আজ ঘরে' ধরল পুরোদমে, চাঁদের নিচে দিয়ে নিরুদ্দেশে যাচ্ছে পাখির পালকের মতন হাল্কা মেঘ—দূর থেকে তীব্র সার্চলাইট জেলে পরিষ্কার ছন্দপতনের মতন একটা জীপগাড়ি এসে থামলো মাঠের ধারের রাস্তায়। টর্চের আলোয় রমার ব্রাউন রঙের শাড়ি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চোখ পিটপিট করে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করল রমা। টর্চ ফেলতে ফেলতে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'হু আর য়ু দেয়ার? হোয়াট আর য়ু ডুইং?' রমা বিরক্তির সুরে ভদ্রতা মিশিয়ে বলল, 'হু আর য়ু সার? ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড, প্লিজ।' ভদ্রলোক বললেন—'সিকিউরিটি গার্ড।' রমা বলল, 'আমরা এক্স স্টুডেন্ট। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কলাভবনের হোস্টেলে উঠেছি। এনিথিং মোর ইউ নীড?' ভদ্রলোক রিস্টওয়াচের ওপর টর্চ ফেলে বললেন, 'আই নীড নাথিং বাট ইয়োর সেফটি। ইট ইজ ফিফটিন টু ইলেভেন। নাইট ইজ টিল ইয়াং। ও-কে। গুডনাইট।' হুস করে চলে গেল জীপ। চলে যাবার পর মনে হল—আগেও কয়েকবার দেখেছি জীপটা, দূর থেকে। টহল দিচ্ছে। সারা রাত শান্তি-নিকেতনে ঘুরে বেড়াবে। অদ্ভুত চাকরি! রমা বলল, 'ননসেন্স। পুরো মুডটা অফ হয়ে গেল।' আমি বললুম, 'সো হোআট। উই ক্যান মেক ইট এগেন। নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।' হেসে উঠলো রমা।

হাঁটতে হাঁটতে একটা চওড়া বারান্দা-মতন জায়গায় বসলাম। সামনে অনেকগুলো বড় বড় গাছ। ঈশ্বরের আঁকা বিমূর্ত ছবির মত জ্যোৎস্নার ছায়া গাছগুলোর নিচে। এদিকে ওদিকে কয়েকটা স্কাল্পচার। একটা মূর্তি দেখিয়ে রমা বলল—রামকিঙ্কর। জ্যোৎস্নায় পরীর মত লাগছে,—হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেছে দুজন সাঁওতাল মেয়ে।

কিছুক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকার পর রমা বলল, কি ভাবছো? মিনতিদিকে মনে পড়ছে?

'পত্নীপ্রেম'

'তার চেয়েও বড়'

'সেটা কি রকম'

'পত্নীদায়'

'সেটা আবার কি'

'সে আছে'

চুপচাপ বসে আছি, রমা চিত হয়ে শুয়ে পড়ে কাঁধের ব্যাগটা মাথার নিচে রাখলো। 'কি হয়েছে? এনিথিং সিরিয়াস?'

'ভীষণ'

'কিরকম?'

তখন রমাকে উল কেনার কথাটা বলতে হল। বিকেল থেকে এই প্রথম কথাটা বলার সুযোগ হল। ভুলেই গিয়েছিলুম একদম। শুনে রমা বলল, 'টাকাটা খরচ করলে কি করে।'

বেশী রাতে, এমনিতেই, মিথ্যে কথা বলা যায় না। এখন, এই খোলা হাওয়ায়, সবুজ ঘাসের ওপর জ্যোৎস্নায় ভেজা গাছপালার নিচে ঘুরে বেড়ানোর পর, মিথ্যে কথা বলা অসম্ভব মনে হল। এবং বিশেষ করে রমাকে। রমার কাছে আমার কিছু লুকোবার নেই। বিজয় ছাড়া, এই একজন মাত্র মানুষের কাছে আমি আত্মা খুলে দিতে পারি।

এখানে বারান্দার ভেতরে, অল্প অন্ধকার। বাইরে, গাছের নিচে, জ্যোৎস্নার জাফরি। গাছের পাতাদের কত কথা আছে বাতাসের সঙ্গে।

অন্ধকারে, প্রায় নিয়তির মত কথা বলল রমা—'সেক্স ইজ নো ফল্ট। বাট হোয়াট ডু য়ু গো দেয়ার সোম? অ্যান্ড হু আর নট স্টার্ভড। তাছাড়া—ডিসিস হতে পারে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—'তুমি বিশ্বাস করবে?'

রমা বলল, 'বলো।'

রমার কাছে, সবকিছু খোলাখুলি বলে ফেলতে পেরে, খুব নিষ্পাপ আর হাল্কা লাগছিল নিজেকে। যেন, একা একা, জলের কাছে গিয়ে, সব পাপের কথা বলে এলাম। নিজের ছায়া, জলের নিচে, সাক্ষী রইল শুধু। চুপচাপ শুয়ে থাকা, সবকিছু শোনার পরেও তার শান্ত ভঙ্গিমা, দেখতে দেখতে মনে হল, নদীর মত, সে এখন, খড়কুটো, শোলার মুকুট, বাসি ফুলের মালার সঙ্গে যে কোনো ময়লা, আবর্জনাও, বুকে করে বয়ে নিয়ে যাবে: রমা নদী হয়ে যাচ্ছে।

'শুধু যৌনতার জন্যে আমি ওদের কাছে যাই না, রমা।'

'কেন যাও'

আই লাভ দেম। ওদের প্রত্যেককে আমি ভালোবাসি।'

'হোয়াট?'

'বিকজ দে আর স্ট্রেট। অনেস্ট। ফেথফুল। দে নেভার প্রিটেন্ড। দে সেল দেয়ার বডিজ, বাট দে নেভার সেল দেয়ার সোলস--একজন যে কোনো সাধারণ মেয়ের থেকে আমি একজন বেশ্যাকে অনেক বেশি সম্মান করি—ইয়েস, আই ডু রেসপেক্ট দেম। দে ডিসার্ভ ইট।'

'আমি জানি না।'

'নিজেকে একটু কেচেঁচিয়ে দ্যাখো রমা, অনেক কাদা দেখতে পাবে, নোংরা জল। আমাদের প্রত্যেকের সুন্দর সুন্দর পোশাকের নিচে থিক থিক করছে কাদা, ঘোলাজল। বাট দে আর ক্লীন। ওদের মধ্যে কোনো নোংরামি নেই।'

ওরা প্রত্যেকে চূড়ান্তভাবে দুঃখী হয়েও হো-হো করে হাসতে পারে। যেহেতু হাসতে না জানলে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। একদিন সকালবেলা অফিসে যাচ্ছি, চারজন লোক একটা মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে গেল—খুব স্তিমিত হরিবোল, পিছনে সারি দিয়ে শ্মশানবন্ধু নেই। একজন লোক রাস্তা থেকে বলল কে যায়। উত্তর শোনা গেল—পাঁচ নম্বরের চন্দনা। পাঁচ নম্বর বাড়ির বন্দনা ছাড়া তার আর কোনো আইডেন্টিটি নেই। এটা কেন হবে—তুমি বলতে পারো রমা?

'আমি জানি না।'

হঠাৎ মনে হল, রমার ভালো লাগছে না এইসব কথা, এখন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, একটু পরে বললুম—'তুমি বুঝতে পেরেছো, আমার কথা?'

আরো অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রমা বলল, সেই মধ্য রাত্রে, বারান্দার অন্ধকার ভরিয়ে দিয়ে, 'আসলে, তুমি খুব একা। আমার মত।'

এরপর, সে, আস্তে, আস্তে উঠে বাইরে, জ্যোৎস্নার মধ্যে স্বপ্নের পায়ে হেঁটে গিয়ে, একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, সে দু-হাতে গাছটিকে আঁকড়ে ধরে বলে, বলতে থাকে—'বৃক্ষ, তুমি আমাকে তোমার মত করো। বৈপরীত্যকে উপেক্ষা করার শক্তি দাও। অপেক্ষা ও সহনশীলতার মন্ত্র শেখাও আমাকে। আমি বাতাস থেকে শুষে নেবো তার প্রাণ, তার সজীব উচ্ছলতা।' গ্রীষ্মে আমি আর্ত পথিকের মত কোনো মানুষকে ছায়া দিতে পারি যেন। বর্ষায় আশ্রয়।'... গাছের পাতায় বাতাসের স্নেহের শব্দ। রমার শরীরে জ্যোৎস্নার ছায়া এসে পড়েছে। রমা নারী হয়ে যাচ্ছে। তার পিঠে আলতো হাত রাখলে, সে উন্মাদিনীর মত চুম্বন করে আমাকে। তার জিহ্বা ও ওষ্ঠের শব্দ নিতে নিতে মনে হয়, এই কি সুখ? এইমুহূর্তটিকে মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে না কেন?

অথচ এই রমা আমার নয়। হলে ভালো লাগতো না।

রবিবার রাতে বাড়ি ফিরে দেখলুম মিনতির খুব জ্বর। চোখ লাল। চোখে কোনো অভিযোগ নেই। অদ্ভুত একটা দুঃখবোধ লেগে আছে শুধু। আসলে পৃথিবীকে, বিপরীত ঘটনাবলীকে, এমনভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে মিনতি যে তাকে খুব আপন মনে হয়। তার খুব কাছে যেতে ইচ্ছে করে। চুলে হাত বুলিয়ে দিতে ভালো লাগে।

জোর করে দুটো অ্যানালজিন খাওয়ালুম তাকে। ওষুধ খেতে মিনতি একদম পছন্দ করে না। সে মনে করে, অসুখ করলে অসুখের জন্যেও আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া দরকার।

শেষ রাতে জ্বর ছেড়ে গেল মিনতির। পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল বলে ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রির একটা নিজস্ব রঙ আছে যা চোখে লেগে থাকলে পৃথিবীকে অস্বীকার করা যায়। বেঁচে থাকা সহজ হয়ে আসে।

এপিলোগ

গৌতম দেবযানীর বোনকে বিয়ে করেছে। রমা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লিখেছিল,—এখানে এসে পর্যন্ত একটা লম্বা সিনেমা দেখছি মনে হচ্ছে, কোনদিন যা শেষ হবে না। যেখানে যাচ্ছি যা দেখছি সবই আশ্চর্য সুন্দর। দেবযানী কলকাতায় নিজের বাড়িতেই ফিরে এসেছে। রাইটার্সে চাকরি পেয়েছে একটা। অনেকদিন পর একদিন বিকেলবেলা দেখা হলে ঠিক পনেরো মিনিট কথা বলার পর কথা ফুরিয়ে গেল। শেষমেষ দেবযানী জানাল, নিজের ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকতে চায় এরকম একজন বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে বিয়ে না করাটা অনেক সেফ। আসলে সে এত রোগা ও কুৎসিৎ হয়ে গেছে যে তার আর বিয়ে হবে না। হয়তো।

অনেক রাতে, পেচ্ছাপ করতে উঠে, বাথরুমে নেশার ঘোরে, পা পিছলে পড়ে যায় বিজন; একদিন। মাথার ভিতরে আভ্যন্তরিক রক্তপাত হয় প্রচুর। পুরো তিনদিন সে চেতনাহীন শুয়ে থাকে অপারেশন থিয়েটারে। তারপর মারা যায়।

বরুণ সিমলাই-এর স্কেচ

আদি আছে অন্ত নেই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

দাদা সালার স্কুলের এক হেড পণ্ডিত মশাইয়ের নামে চিঠি দিয়েছিলেন। নৃসিংহ পণ্ডিতমশাই নাকি বিখ্যাত লোক, দাদা যেখানে পড়াতেন, সে-বাড়ির গুরুদেব (যদিও সালার কোথায় বিনুর কোন ধারণা নেই, এই প্রথম নাম শুনল), আর সেই ভদ্রলোকেরই একখানা চিঠি দিলেন কাঁদীর রাজবাড়ির—আসলে পাইকপাড়ার সিংহ-রাজাবাবুদের নাকি এইটেই দেশ ও রাজধানী—এক শরিকের কাছে।

এই তিনটি চিঠি ভরসা করে একদা অতি সামান্য শয্যা—ঐ যা কেউ সংগ্রহ করে দিয়েছিল আর এক নি দেশ যাত্রার দিন এবং একটি পাতলা সম্ভবত পাটের র‍্যাপার সম্বল করে একটি নবক্রীত দুটাকা দুআনা দামের ফাইবারের সুটকেসে সেই সাড়ে উনিশ সের বই নিয়ে আর একটি অপর একজনের কাছ থেকে চেয়ে আনা ফাইবারের সুটকেসে সামান্য দু-একটা জামা-কাপড়, আয়না-চিরুণী নিয়ে রাত এগারোটার ট্রেনে কোন এক অজ্ঞাত বহরমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হল, যেখানে পাগলাগারদ আছে, এই মাত্র শোনা ছিল। পরে অবশ্য দেখল, পাগলরাও সে-স্থান ত্যাগ করেছে।

ভোরবেলা বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে পৌঁছয় এই ট্রেনটা, রাত চারটে নাগাদ। এখান থেকে আরও কটা স্টেশন পেরিয়ে লালগোলায় গিয়ে শেষ হয়।

অত ভোরে, কার্তিক মাসে তখনও অন্ধকার থাকে, কোথায় যাবে? স্টেশনেই বসে থাকবে বলে স্থির করেছিল খানিকটা, একটু ফরসা হলে শহরের দিকে রওনা দেবে। বীণা বলে দিয়েছিল, স্টেশন থেকে [illegible] এক মাইলের বেশি, তবে ভেবো না, এক আনা থেকে ছ-পয়সা সওয়ারী নেয় ঘোড়ার গাড়িতে—দাঁও বুঝে। একেবারে হোটেলের দোরে নামিয়ে দেবে। স্টেশনে সব সময়েই গাড়ি পাবে।

কিন্তু সেই একটু বসে আলো ফুটলে যাওয়াটা হয়ে উঠল না, এই ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানদের জন্যে। প্যাসেঞ্জার নামল সামান্যই—তাদের সংখ্যার চেয়ে গাড়ির সংখ্যা বেশি, সুতরাং যাদের যাত্রী হল না, তারা প্ল্যাটফর্মের ভেতরে চলে এসে, যাকে বলে ছ্যাঁকাব্যাঁকা করে ধরা, তাই ধরল। খাগড়া হিন্দু বোর্ডিং; তাদের বিশেষ জানা, মুক্তির কাছে—পাশেই একটা বড় গাড়ির আড্ডা, মস্ত বড় বাড়ি, তোফা জায়গা একেবারে সেখানে গিয়েই যখন বাবু বিশ্রাম করতে পারেন, তখন মিছিমিছি এখানে সে মশার কামড় খাওয়ায় লাভ কি? এর পর আর গাড়ি পাবেন না, সেই সাড়ে আটটায় ভোরের গাড়ি আসবে কলকাতা থেকে, তখনও পর্যন্ত বসতে হবে।

অগত্যা উঠে পড়ল। ছ-পয়সা সওয়ারী একজন বলেছিল, আর একজন তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল, সে পাঁচ পয়সাতেই যাবে, তার ভাল ঘোড়া, পাঁচ মিনিটে পৌঁছে দেবে। আর দরদস্তুর করতে ইচ্ছে হল না তখন, তখনও ভাল করে ফরসা হয়নি, পূর্ব দিকটায় শুধু আলোর আভাস জেগেছে—একেই বুঝি ব্রহ্মমুহূর্ত বলে—কিন্তু হোটেলের দোরে পৌঁছে যখন পাঁচটি পয়সা বার কর দিতে গেল, তখন একেবারে অন্য মূর্তি গাড়োয়ানের।

এ কি দিচ্ছেন বাবু। তামাশা পেয়েছেন নাকি।

কেন, তুমিই তো বললে পাঁচ পয়সা সওয়ারী।

বেশ তো, আপনি তো পুরো গাড়িটাই নিয়ে এসেছেন, অন্য সওয়ারীর জন্যে তো বলিনি—আমরা কাল্পারীর টাইমে সাত-আটজন পর্যন্ত বসাই—তা আপনি যেটা লেহ্য—চারটে সওয়ারীর ভাড়া দেবেন তো। নেন, নেন—পাঁচ আনা বার করেন, সক্কাল-বেলা ক্যাচকোচ করে বউনিটা নষ্ট করবেন না।

বিনুর মেজাজ গেল বিগড়ে, সেও গলা একেবারে মধ্যমে তুলল। ধুন্দুমার ঝগড়া বেধে গেল দুজনে। কিন্তু মুশকিল বাধল, গাড়োয়ান হয়ে গেল দলে ভারি। সত্যিই হোটেলের গায়ে একটা গাড়ির আড্ডা ছিল, খান চার-পাঁচ গাড়ি, সেইমতো কটা ঘোড়াও আছে। তারা বোধহয় অনেক রাত্রে নেশাভাঙ করে শুয়েছে, এখন এই আকস্মিক চেঁচা-মেচিতে তাকালে ঘুম ভেঙে তাদেরও মেজাজ খিচড়ে উঠেছে, তারা রীতিমতো রুখে এল ওর দিকে, চালাকি পেয়েছ, গরিব গাড়োয়ানের পয়সা মেরে দিতে চাও।

খুবই বিপদে পড়ত—যদি না সেই সময়েই হোটেলের মালিক চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে আসতেন। তিনি নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, 'এ বেটাদের রকমই এই। ঐখানে যদি কথা বলে নিতেন, ঐ পাঁচ পয়সাতেই আসত, এখন তো আর সাড়ে আটটার আগে কোন গাড়ি নেই। দিন দু গণ্ডা পয়সা ফেলে দিন। যদি না নিতে চায় চলুন আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে বাকী পয়সাটা থানায় গিয়ে জমা দোব। একবার আমার এক খদ্দেরের সঙ্গে এমনি চেঁচামেচি করতে গিয়ে এক ঘেঁটা বেত খেয়েছিল—বোধহয় ভোলে নি।

বেশ প্রশান্তকণ্ঠেই বললেন তিনি, কিন্তু এদের সুর বদলে গেছে। কাকুতি-মিনতি করে আর দুটো পয়সা চেয়ে নিয়ে চলে গেল।

বীনা বলেছিল মস্তবড় পেল্লাই হোটেল।

বিনু দেখল বাড়িটা পেল্লায় বটে, তিন মহল বিরাট বাড়ি, দিক দিশা নেই কিন্তু আসলে হোটেলটি খুবই ছোট। ভেতরে মহলে গঙ্গার দিকে একতলার দুখানা ঘর নিয়ে হোটেল, এটাকে ভাতের দোকান বলাই উচিত। ডে-বোর্ডারের সংখ্যাই বেশী, তাও সকালে খায় পঞ্চাশ ষাট রাত্রে পঁচিশ ত্রিশ। এখানে কেউ বিশেষ এসে থাকে না, কদাচিত কোন তেমন মক্কেল এলে—দেদার ঘর পড়ে আছে, ষষ্ঠীবাবু যে-কোন একটা খুলে দেন। কেউ নিষেধ করারও নেই, ভাড়া চাইবারও নেই। আসলে ওকে মহারাজরা কেয়ারটেকার হিসেবেই রেখেছেন। গোটা বাড়িটা সাফ রাখা সম্ভব নয়—ষষ্ঠীবাবু ওর ভাষায় এরকম এমার্জেন্সীর জন্যে দু-তিনটে 'বার-বাড়ির দোতলার ঘর ঝাঁট দিয়ে ঝুল ঝেড়ে রেখে দেন। এর বেশী আর হয় না, বাড়িতে রং চুনকাম স্মরণকালের মধ্যে হয়েছে বলে মনে হয় না। নিচের ঘরগুলো গঙ্গার ধারে বাড়ি বলে একটু বরং স্যাঁৎসেঁতে। ভিজে ভিজে ভ্যাপসা গন্ধ।

বিনুকে যে ঘরখানায় থাকতে দিলেন তাতে সেভেন এ' সাইড ফুটবল ম্যাচ খেলা যায়। অতবড় ঘরে সে একা, রাত্রে সম্বলের মধ্যে পয়সায় দুটো মোমবাতি, তার ক্ষীণ আলো বাতাসে কেঁপে ঘরের অপরপ্রান্তে আলোছায়ায় একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে। মনে হয় কতকগুলো অশরীরী প্রাণী নড়া-চড়া করছে। এখনই হয়ত ভূতের গল্পের সেই তাদের মতো খন খন হাসি শুরু করবে।

বিনু ভীত নয়, কাশীতে মণিকর্ণিকা ও হরিশচন্দ্র ঘাটে মড়া পুড়তে দে

'বহ্নদিন, ছোটবেলায় পল্লীতে গিয়েছিল, শ্মশানের ওপরই বাড়ি—সুতরাং ভয়টা অনেক কেটেও গেছে। তাছাড়া এমনিও এসব ওর মাথায় আসে না বিশেষ, কিন্তু এখানে এই এতবড় ঘরের একপ্রান্তে একটি শীর্ণ-তম মোমবাতির সামান্যতম আলোয় আগের চেয়ে অন্ধকারটাকেই যেন বেশী প্রকট ও জীবন্ত করে তুলত, ভয় যে করত তা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। ভাগ্যে পাশেই এই গাড়ির আড্ডাটা ছিল, যখন ভয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠত তখন ছুটে গিয়ে বড় জানলাটার গরাদে মাথা চেপে ধরে প্রাণপণে ওদের দিকে চেয়ে থাকত—ওদের মাতলামি, ঝগড়া বিবাদ খিস্তি খেউড় শুনতে তবু মনে হ'ত—মৃত্যুপুরী বা প্রেত-পুরী নয়। জীবন্ত মানুষের মধ্যেই আছে। বেঁচে আছে সে।

অসুবিধা আরও ঢের। প্রাভাতিক হাল্কা হওয়ার কাগজগুলো সারতে গেলে তিন মহল পেরিয়ে নিচে একতলায় ঐ হোটেল অংশে যেতে হ'ত। রাত্রে 'সে' ইচ্ছা প্রবল হলে মাথা কুটতে ইচ্ছে করত। একটু মুখ হাত ধুতে গেলেও তাই। ওপরে কোন জলের ব্যবস্থা নেই, স্নান অনেকটা ভেঙে গিয়ে গঙ্গায়। আসলে এটা ওদের অনধিকার প্রবেশ। ঘর খুলে দেওয়াটা বেআইনি, বেশি ব্যবহার করতে সাহসে কুলোত না ষষ্ঠী-বাবুর।

তবে ইন্দ্রজিৎবাবু যে কি গৌরবের মধ্যে আছেন, সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন করে দিতে ষষ্ঠীবাবুর চেষ্টার অন্ত ছিল না। সকালে রাত্রে সামান্য সামান্য যা দেখা হ'ত তাতেই একবার করে বলে দিতে ভুল হত না।

এ বাড়ি বড় সাধারণ নয় বুঝলে ভাই, তুমিই বলছি, ছোট শালার বন্ধু। কিছু মনে করো না—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৈতৃক বাড়ি এটা। ইনি তো হঠাৎ মহারাজা হয়ে গেলেন—মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভাগ্না হিসেবে, মহারাণীর তো ছেলেপিলে ছিল না। অল্প বয়সে স্বামী মারা গেলেন, কোম্পানী একটা মিথ্যে ছুতো করে অপমান করেছিল এই ধিৎকারে—তবে তাই বলে ইনিও তো একেবারে গরিব ছিলেন না, এই বাড়ি দেখেই তো বুঝছ। ঐ যে ঘরে তুমি আছ, দ্যালে দেখবে বসুধারার দাগ। শ্রীশ নন্দীর অন্নপেরাশনে—কী বলে ঐ বসুধারা আঁকা হয়েছিল। তবেই বুঝে দ্যাখো। সরকারের উচিত এ বাড়িতে পাথর বসিয়ে দেওয়া—মণীন্দ্র নন্দীর মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি বাংলা কেন, ভূভারতে আর কেউ জন্মেছে! কী বলো। আমরা ছোঁচা জাত, হাত চিত করতেই জানি, যেন তেন প্রকারেন কিছু পেলেই হল, হাত উপুড় করতে শিখিছি কি!'

কিন্তু বিনুর মনে হ'ত—বিরাট প্রাসাদের এই অরণ্য থেকে অব্যাহতি পাওয়ার মতো সুখ কিছু নেই। প্রতিটি রাত কাটত কোনমতে চোখ বুজে পড়ে থেকে, বাতি জ্বালা ছেড়েই দিয়েছিল, তাতে আরও ভয় করে।

অন্ধকারের একটাই রূপ—আলো জ্বাললেই ছায়ার সৃষ্টি হয়, সে শতেক ভয়াবহ কল্পনার আকার নেয়।

॥৪৪॥

বহরমপুরে ছিল তিনদিন, এখানকে কেন্দ্র করে যতগুলো স্কুল সারা হয় সেরে নিয়েছিল। অনেকে আছেন—এই কদিনেই দেখল, বইয়ের স্যুটকেসেই একটা গামছা আর লুঙ্গি ভরে নিয়ে, আর একটা বইয়ের বড় গাঁঠরি অন্য হাতে ঝুলিয়ে একদিক থেকে ঘুরতে ঘুরতে যান, যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানে একরকম জোর করে বোর্ডিং-এ একটু শোবার জায়গা করে নেন, নিতান্ত না হলে ইস্কুলেরই কোন খালি ঘরে পড়ে থাকেন। এসব জায়গায় প্রায় সব স্কুলেই বোর্ডিং আছে, সুতরাং দুবেলার আহারটা ওখান থেকেই চলে যায়। স্নান কদাচিৎ, কাপড় কাচার বালাই নেই। ওরই মধ্যে যাঁরা একটু 'সম্পন্ন' তাঁরা ঐ স্যুটকেসেই আর একপ্রস্থ কাপড় জামা রাখেন, সুযোগ পেলে কোন বোর্ডিংএ পেঁাছে সন্ধ্যাবেলাই কেচে দেন (অনেক সময় ছেলেদের কাছ থেকেই একটু সাবান চেয়ে নিয়ে)। শীতের দিন, রাত্রেই শুকিয়ে যায়।

এভাবে কাজ করতে বিনু পারবে না। মনে হয় এত কৃপণতার দরকারও হবে না। যাঁরা এভাবে ঘুরছেন, তাদের সকলকারই 'কোম্পানি' যে খরচের টাকা নিয়ে কৃপণতা করেন তাও না—তবে টাকা জিনিসটা এমনিই যে যথেষ্ট পেলেও সাধ মেটে না, আরও পেতে ইচ্ছে করে।

এখান থেকে বেরিয়ে রাধার ঘাট দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে একদিন সকালে কাঁদী রওনা হল। ওপারে গিয়ে শুনল, একটি বাস ভোরবেলা—ছটায় ছেড়ে গেছে, আর একটি ছাড়বে দুপুর নাগাদ। সে দুপুরটা কখন হবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলই। এখন দেখল এতটাকে, ও অনুমান করতে পারেনি। এগারোটায় প্রথম যাত্রী চাপিয়ে গাড়ি ছাড়ল দুটো নাগাদ। যতজন যাওয়ার কথা, তার ওপর ন'জন বেশী বেশী নিয়ে। কুড়ি মাইল কি আঠারো মাইল পথ—ঠিক এখন মনে নেই—পথে আরও কজন যাত্রী তুলে কাঁদীতে যখন নামিয়ে দিল তখন চারটে বেজে গেছে। হেমন্তের সূর্য অনেক আগেই বড় গাছগুলোর ছায়ায় ঢলে পড়ছেন।

কাঁদী রাজবংশের অনেক সরিক, সে জটিলতায় সে তখনও যায় নি, পরেও যাবার চেষ্টা করেনি। কর্তাদের মধ্যে একজনই মাত্র কাশীতে থাকেন—গোবিন্দকে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে আরাম করতে রাজী হননি। বিনুর চিঠি ছিল তাঁর কাছেই—সে চিঠি আগে বাইরের কাছারী ঘরে দেখাতে একটি বয়স্ক ভদ্রলোক, সম্ভবত নায়েব বা ঐ জাতীয় কোন কর্মচারী হবেন, তিনিই চিঠিখানা পড়ে আগেই পাশের একটা দেখিয়ে দিলেন। বিশাল জোড়া চৌকিতে একটা লেপ পাতা—বোঝা এক বা একাধিক এমন অতিথি আসেন। সেই জন্যেই এখানে একটা বাঁধা ব্যব করা আছে। পরে জেনেছিল, এটা এ চিঠি-নিয়ে-আসা সাধারণ গায়ে-পড়া অতি দের জন্যে, এমন নাকি আরও আছে, যে ভিড় হলে কাছারি বাড়িতেও স্থান দি হয়—বিশিষ্ট যাঁরা অভ্যাগত, বা আমন্ তাঁদের জন্যে দোতলায় বারমহলওয়ালা ঘরের ব্যবস্থা আছে, বিছানা আলমারি কিছুই আছে সেখানে।

ইনি কিন্তু শুধু ঘরই দেখিয়ে দিলে না, হাঁকডাক করে গাড়ু জল সব আনি দিলেন, ভেতরের বারান্দায় মুখ হাত ধু বললেন, একটু পরে জলখাবারের ব্যবস্থ হল। দুটি নিমকি ও দুটি রসগোল্লা, খাবার অভ্যাস আছে কিনা সেটাও জিজ্ঞা করে গেল ভৃত্যটি।

এইখানেই এ-পর্বের ইতি হবার কথ হল না।

অতিথি সাধারণ, রবাহূতও নয়—একেবারেই অনাহূত, কতকটা অনুগ্রহ প্রার্থী, নিরাশ্রয় লোক, রাজবাড়িতে আশ্র নিতে এসেছে—কিন্তু দেখা গেল, কাঁদ রাজবংশের সৌজন্যবোধ সাধারণ নয়। বো করি সেই লালাবাবুর আমল থেকে অথব দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমল থেকে এ-বংশের এটা বিশেষ শিক্ষা।

এখানে অতিথিদের অবারিত দ্বার—অন্তত তখনও পর্যন্ত ছিল—তাই কর্মচারী ভদ্রলোক (নায়েব বা অন্য কিছু তা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করেছিল বিনুর) চিঠি দেখে কর্তার কাছে না পাঠিয়ে আগেই আতিথেয়-তার প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলোয় মন দিয়ে-ছিলেন। তারপর, সম্ভবত পরে যথাস্থানে সে-চিঠি গিয়ে পড়েছিল, নিয়মমাফিক, কর্তাবাবুর দিবানিদ্রা ভঙ্গ হতে।

সন্ধ্যার সময় ময়লাপড়া হ্যারিকেনের আলোয় বসে বিনু একখানা বিলিতি গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছে, হঠাৎ দেখল, ভেতরের দালানে বৃহৎ একটা আরামকেদারা পড়ল, পা রাখার একটি টুল এল, সামনে একটা রং-চটা ভারি কাঠের চেয়ার একজন এসে ঝেড়েমুছে রেখে গেল। তারপর এল একটা গড়গড়া, চারিদিকে সুগন্ধি তামাকের সৌরভ বিকীরিত করে।

যে-লোকটি শেষে এসেছিল, গড়াগড়া নিয়ে সে এসে অকারণেই হাতজোড় করে জানাল, কর্তাবাহাদুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন কুমারবাহাদুর, বা রাজাবাহাদুর।

বিনুর তো হৃদকম্প একেবারে।

ভৃত্যটি জানাল, এঁদের এই নিয়ম, অতিথি-ফকির এলে এঁরা নিজে এসে দেখা করেন।

একটু পরেই ভদ্রলোক নামলেন। একটু বেঁটে ধরনের পাকা আমটির মতো উজ্জ্বল গৌরবর্ণের একটি বয়স্ক ভদ্রলোক। চুল সব পাকা না হলেও দুটো গোঁফ ধপধপ করছে সাদা।

ঘরের মধ্যে এসে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আসুন, বাইরে এই দালানটায় বসি, দুর্ভাগ্যে আপনার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস নেই, বন্ধ ঘরের মধ্যে তামাকের ধোঁয়ায় কষ্ট হতে পারে।

পায়ে হাত না দিলেও বিনু অনেকখানি হেঁটে হয়ে প্রতিনমস্কার জানাল, তারপর বলল, আমাকে আর আপনি বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন।

খুব সহজ গলায় তিনি বললেন, বেশ তো, তুমিই বলব। তাই বলাই তো উচিত, তুমি আমার হয়ত নাতির বয়সী। তবে অভ্যাগত যিনি আসেন, তাঁদের প্রথমে আপনি বলাই তো বিধি. নইলে অসম্মান বোধ করতে পারেন। ধন না থাক, ধন অপবাদটা তো আছে, আমাদের অনেক ভেবেচিন্তে বলতে হয়।

বাইরে এসে ওকে কাঠের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে ভারি চেয়ারটায় বসলেন, তারপর ফরাসীটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আপনি ডাক্তারবাবুর চিঠি নিয়ে এসেছেন ? ওঁর সঙ্গে কী সূত্রে আলাপ হল ? আত্মীয় নাকি ? না, আপনি তো ব্রাহ্মণ।

বিনু সত্য কথাই বলল, আমার দাদা ওঁর ছেলেকে পড়ান, প্রাইভেট টিউটার।

অ। আমার গুরুভাই উনি। আত্মীয়ের বাড়া।

তারপর এ-কথা ও-কথা খুচরো আলাপেই সে-পর্ব শেষ হওয়ার কথা. বিনু হঠাৎ ওদের বংশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা তুলল। সে ছোটবেলায় মার সঙ্গে বৃন্দাবন গেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির দেখেছে, ওখানে প্রসাদের চমৎকার ব্যবস্থা. এমন আর কোন মন্দিরে নেই—গোবিন্দ মন্দিরের ব্যবস্থা তো খুবই সাধারণ—ইত্যাদি বলতে সিংহ-মশাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ফরসী রেখে সোজা হয়ে বসে বললেন, বাঃ, তুমি তো দেখছি অনেক কিছু জানো, তোমার অবজার্ভেশন শক্তিও তো খুব। পড়াশুনোও আছে দেখছি। তা তুমি—মানে এখানে দু-একজন আরও ক্যানভাসার এমনি এসেছেন তো, কেউ চিঠি নিয়ে, কেউবা কোন সুপারিশ ছাড়াও—আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে তাদের সঙ্গে কথা কয়ে—না বাবা, মন ভরেনি।

বিনু এই প্রশ্নটারই আশংকা করছিল, ঘাড় হেঁট করে জানাল, নানা কারণে কলেজে ভর্তি হয়েও বেশি দিন পড়া হয়নি। যা পড়েছে নিজে নিজেই।
লেখাপড়ার লাইনে আমার উপযুক্ত নয় তারা। তা তুমি কতদূর পড়েছ ?

আহা মুখে একটা সমবেদনাসূচক চুক চুক শব্দ করে—সিংহমশাই বললেন, বেচারী। তোমাদের মতো ছেলেরই তো পড়া দরকার বাপ। অনেকদূর যেতে পারতে। যাই হোক, কলেজে না পড়েও লেখাপড়ার পাট যে উঠিয়ে দাওনি, এই ভাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, বৃন্দাবন এত ভাল লাগে তোমার, বৈষ্ণব সাহিত্য কিছু পড়েছ—

দেখুন, বৈষ্ণব সাহিত্য তো বিশাল. অত বই পাইওনি হাতের কাছে, আর চেয়ে-চিন্তে পড়ব সে-সময় বা অতটা ঠিক ইচ্ছেও বোধ করিনি। এমনি পুরাণগুলো পড়েছি সব, পাড়ার লাইব্রেরীতে ছিল, মহাভারত হরিবংশ তো বাড়িতেই আছে, পড়েওছি ভাল করে, এছাড়া শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল—

যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সিংহ-মশাই। য়্যাঁ! তুমি এই বয়সে চৈতন্য-চরিতামৃত পড়েছ। বল কি। তবে তো কেল্লা মেরে দিয়েছ। তা বুঝেছ বইখানা।

খুব ভাল বুঝেছি বললে একটু বাজে কথা বলা হয়—ভাষাটা বড় গোলমেলে তো, তাছাড়া কথায় কথায় সংস্কৃত কোটেশান, তবু মোটামুটি মহাপ্রভুর জীবনটা জানবার চেষ্টা করেছি, তাঁর আকুলতা। বরং তার চেয়ে অমার চৈতন্যভাগবত অনেক সোজা বোধ হয়েছে।

বোধহয় সিংহমশাইয়ের এতটা ঠিক বিশ্বাস হল না। তিনি খুব ভাল মানুষের মতো ভাব করে কয়েকটি প্রশ্ন শুরু করলেন। ভাগ্যে এই বইগুলো সম্প্রতি, বেকার অবস্থাতেই পড়েছিল বিনু, টাটকা টাটকা মনে আছে—সে অন্তত প্রমাণ করে দিতে পারল যে, পড়ার ব্যাপারে কিছু মিথ্যে বলেনি। আরও খুশি হলেন উনি, যেখানে যেখানে মহাপ্রভুর চরিত্র ওর পরস্পরবিরোধী মনে হয়েছে, সেখানে সেখানে বেশ ব্যাখ্যা করার মতোই বুঝিয়ে দিলেন, বা দেবার চেষ্টা করলেন।

তারপর একটু যেন ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন, যেসব পণ্ডিত আর ভক্তরা এসব জল ঘোলেন, এককালে তাঁরা ব্যাখ্যা করতেন কথকতার মতো—ইতরলোক, আমাদের মতো সাধারণ লোক উপকৃত হত। এখন ক্রমেই সে-পাট উঠে যাচ্ছে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রাণগোপাল গোস্বামী এঁরা যখন ব্যাখ্যা করেন, তখন যেন ওঁর বাণী ছবির মতো আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে—

বিনু কতকটা এই প্রসঙ্গে ছেদ টানবার জন্যেই বলল, আমি কিন্তু ছেলেবেলায় বৃন্দাবনে গোপীনাথ মন্দিরে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর ব্যাখ্যা শুনেছি, ঐ অংশটা ব্যাখ্যা করছিলেন—রামানন্দ সংবাদ, এহ বাহ্য আগে কহ আর। কিছুই বুঝিনি অবশ্য, তখন অত পড়াও ছিল না, তবু ওঁর বলবার ভঙ্গী ভাল লেগেছিল এত, উঠে আসিনি একদিনও।

আরে! তুমি ওঁর ব্যাখ্যা শুনেছ! তুমি তো মহাভাগ্যবান দেখছি। তোমাকে দেখলেও পুণ্য হয়

ঠিক সেই সময়ে ভৃত্য এসে জানাল, বিনুর খাবার জায়গা হয়ে গেছে, ঠাকুর নিয়ে আসছে।

কর্তাবাবু যেন মহাবিরক্ত হয়ে উঠলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই খাবার আনছে! দেখছিস আমি কথা কইছি ওঁর সঙ্গে। যাকগে—যা, ঠাকুরকে বলে আয়—এখনও এবেলার ভোগ সারেনি—সকালের-দুপুরের যা আছে—কিছু কিছু প্রসাদ এই সঙ্গে দিতে। আবার তার সঙ্গে মাছ-টাছ না দেয়। এইখানে আমার সামনে দিতে বল, খেতে খেতে যাতে গল্প করতে পারেন।

সেই ব্যবস্থাই হল। ভৃত্যমহলে যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তা বিনু ওঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতেই টের পেল। সাধারণ অতিথি, নিতান্তই এক ক্যানভাসার—এমন তো ফী বছরই আসে গোটাকতক—সে কি করে, আর কেন অসাধারণ অতিথি হয়ে উঠল সেটা ওদের বুদ্ধির অগোচর।

(ক্রমশ)

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র
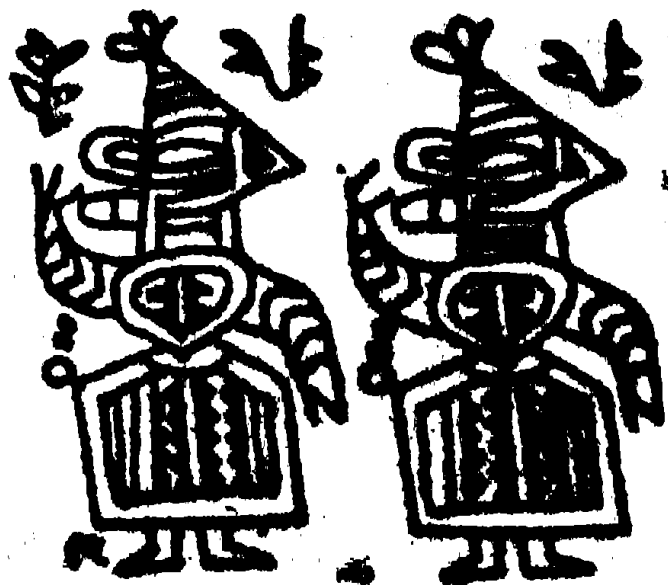
এ-রোগ তো সেই বয়সের ফল, ভয় হয়....। কিড় কিড় করতে করতে বৃদ্ধ ঘর ছাড়ছেন। লাবণ্য অদ্ভুত চোখে অন্নদাশংকরের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

: ২৫ :

বাইরে তীক্ষ্ম শব্দ বাতাসের। সে-শব্দের ভিতর বৃষ্টি হারিয়ে গেছে। আর কলাবনিতে নয়। সব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। নির্মল মজুমদারের মত হতে হল না। দীপংকর রিপোর্ট তৈরি করেছে। ডেকেছে বিমলকে। খুব জরুরি। বিমল এই বৃষ্টির ভিতরে ভিজে একসার হয়ে ঢুকে পড়েছে রাজগৃহে।

—কি ব্যাপার, তলব করেছেন হঠাৎ।

—ভিজে গেছেন দেখছি।

—এটা তো অন্ধপুরী, বাইরে কি হচ্ছে বোঝা যায় না।

বিমল বসেছে। দীপংকরের এগিয়ে দেয়া তোয়ালেতে মাথাটা মুছে নিয়েছে।

—সব তৈরি করেছি, এখন আপনার অপেক্ষায়। দীপংকর বলে।

—তৈরি যখন করেই ফেলেছেন আমাকে কেন? বিমলের কণ্ঠস্বরে ঝাঁজ।

—মিলিয়ে নেব, আপনি এক থেকে একশোতে, আমি তো একশো থেকে পিছিয়ে গেছি। সব পেয়ে গেছি, শুধু আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নেব। শেষ পর্যন্ত আপনার কাছেই সূত্রগুলো পেয়ে গেলাম, আপনি বলেননি কিন্তু তবুও....। বিমল গম্ভীর হয়ে গেছে, দীপংকর তা লক্ষ্য করেছে।

—আপনার পর্যটনের কি হলো?

বিমল জবাব দেয় না। তারপর হঠাৎ বলে, কি পেলেন বলুন।

—খুব সহজ ঘটনা।

—কি রকম? বিমলের চোখে বিস্ময়।

—এটা ১৯৭৮-এর কলাবনি। আমি পিছিয়ে যেতে আরম্ভ করি, আপনি যেমন যাচ্ছেন তাম্রলিপ্ত থেকে ফা-হিয়েনের ভ্রমণপথ ধরে চ্যাঙ-আন-এ। বিমল অদ্ভুত চোখে দেখছে দীপংকরকে।

—১৯৬৭ সালে এইসব জমি নিয়ে গণ্ডগোল আরম্ভ হয় প্রথম এটা ঠিক।

বিমল ঘাড় হেলায়।

—১৯৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির পরিবর্তন হয় বড় রকমের, যুক্তফ্রন্ট সরকার এল। সুতরাং ৬৭ সালটা সিগনিফিক্যান্ট। তখন অনাথ মণ্ডল থেকে রজনী সাউ সকলের জমি দখল হয়ে গিয়েছিল। ধান কাটা আরম্ভ হয়। কলাবনির গণ্ডগোলের সূত্রপাত ১৯৬৭-তে। আমি জেনেছি সাতবাটিতে, চাষীরা প্রথম জানল জমি রজনীকান্ত সাউদের।

—ঠিক বলছেন, তারপর?

—আমি এখানে আসার পর প্রথম এনকোয়ারির দিন চাষীরা বলেছিল, জমি রাজাবাবুর। তাহলে ব্যাপারটা কি হলো।

বিমল চুপ করে শুনছে।

—আমি পিছিয়ে যাই আরো, সময়টা জমিদারী অধিগ্রহণের। ১৯৫৩ সালের মে মাস থেকে ৫৫ সালের এপ্রিল মাঝামাঝি পর্যন্ত সমস্ত জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। জমিদারী অধিগ্রহণ হবে। আইনের অনেক গলদ। জমিদারদের ক্ষমতা ছিল দলিল ছাড়া হস্তান্তরের। সেটা শুধু লিখিত হুকুমনামা দিয়েই করা যেত। এই সময়ে একটা বড় লপ্তের জমি রাজবংশ ব্যাকডেটে হুকুমনামা দিয়ে হস্তান্তর করলেন। হুকুমনামা দেওয়া হল ধরুন ১৯৫৪ সালে। তারিখ দেখা যাচ্ছে ১৯৪৯, ৫০-এর। ধরবার উপায় নেই। সব জমি রজনী সাউ অনাথ মণ্ডলের মত মানুষের নামে করে দেওয়া হল। কলাবনিতে বিষবৃক্ষ পোতা হল তখন। আইনগতভাবে জমি হয়ে হয়ে গেল রজনী সাউদের নামে। কিন্তু মালিক রয়ে গেলেন রাজবংশ। জমির চাষীরা জানল না এতোড় খবর। কেননা, তারা নিয়মমত এই জমিদার-বাড়িতে ধান তুলে দিতে লাগল। পরিষ্কার বেনাম করলেন। সমস্ত জমি। বেনামদার হলো রজনী সাউ, অনাথ মণ্ডলেরা। রজনীকান্ত সাউ-এর কাছে সেসব ব্যাকডেটের হুকুমনামা আছে এখনো।

দীপংকর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। পায়চারি করছে। সিগারেটটায় ফস করে আগুন নিল। বিমল হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে দিয়েছে। বাইরে ঘন মেঘ বৃষ্টি-ঝড়ের জন্য ঘরে স্যাঁৎসেতে আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। হেরিকেনের আলো রহস্যময়তা বাড়িয়েছে।

—সমস্ত গণ্ডগোলের মূল এই প্রহ-রাজবংশ। একদিন এই বংশের প্রথম পুরুষের কাহিনী শুনে আমি শ্রদ্ধাবনত হয়েছিলাম, এখন সব ভেঙে যাচ্ছে। কাগজে-কলমে জমিদারী অধিগ্রহণ হলো। কিন্তু গোপনে কত জমি রয়ে গেল। কাগজ-কলমে সে-জমির মালিক রজনী সাউ-এরা, আরো অনেক মানুষ, অথচ ফসল উঠছে রাজার বাড়ি। জমি তো ফসলের জন্য কাগজে পুরো ভারতবর্ষের ম্যাপটা এঁকে নিলেও তা আমার হয় না। যা বলছিলাম, এইভাবে চলে যেত। কিন্তু ৬৫-৬৬ সাল থেকে রাজনৈতিক অবস্থা বদলে যেতে শুরু করে। ৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকার। নির্বাচনের সময় জমির কথা বলা হলো। জমি নিয়েই তো আমাদের পোলিটিক্যাল

পার্টিগুলোর যাবতীয় আন্দোলন রাজবংশে কুণ্ঠ আক্রমণ করেছে, রাজা অসুস্থ হয়েছেন, তিনি সাহস হারালেন। বেনামদারদের বললেন তোমরা সব জমিতে দখল নিয়ে নাও। অল্প মূল্যে সকলে জমি পেয়ে গেল, কাগজে পেয়েছিল ১৯৫০ সালে, জমি পেল ১৯৬৬তে। জমির ভাগচাষীরা দেখল রাতারাতি মালিক বদলে গেছে। ভাগচাষীরা সকলে উচ্ছেদ হতে আরম্ভ করে। এইসব চাষীরা বিভ্রান্ত, বুঝতে পারছে না হঠাৎ সমস্ত জমি কখন বিক্রি হয়ে গেল, তারাতো বিনা গোলমালে চাষ করছিল। রজনী সাউ-এরা সেটেলমেন্টের রেকর্ড দেখালো। চাষীরা বিস্মিত হলো। কই রাজাবাবুর নাম তো নেই। এতো ৫৪ সালের জরীপের রেকর্ড। তখন থেকেই রজনীবাবুরা মালিক, তাহলে এতদিন ফসল উঠছিল কি করে রাজবাড়িতে। আসলে রাজবাড়ি ভয় পেয়েছিল, জমির আন্দোলনে সমস্ত বেনাম জমি ধরে ফেলে সরকার কেড়ে নিতে পারে। কাগজ এবং দখল তাঁরা এক করে দিলেন। মাটিতো দখলের। সমস্ত চাষীরা দখল হারালো। ১৯৭৮ সালে এসে সেইসব চাষীরা বা তাদের বংশধরেরা পিতৃপুরুষের দখল করা, চাষ-করা জমিতে নেমে পড়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না, আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেব।

বিমল মুখ তুলেছে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে।

—এটা পরিষ্কার বেনাম জমি সংক্রান্ত ব্যাপার, চাষীরা হয়ত গুছিয়ে বলতে পারে না, কিন্তু অম্বুজ বারিকও বলে না কেন? বলে দিলে সব চুকে যেত, এতদিন ওয়েট করার কোন কথা নয়।

—আপনার রিপোর্ট তৈরী হয়েছে?

—হ্যাঁ।

ডকুমেন্টস দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—পাঠিয়ে দিন।

—কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা অম্বুজ বারিক চেপে যায় কেন? গোয়ার্তুমি করে বলে সকল চাষীই রজনীকান্তের চাষী। সমস্তটা তো মিথ্যে। এরা কেউ এখন চাষ করে না। সকলে রাজার চাষী ছিল। ভাগচাষীই। ১৯৬৬-৬৭-৬৮তে উচ্ছেদ হয়ে গেছে মালিক বদল হওয়ায়।

—একটা সিগারেট দিন।

বিমল উঠে এগিয়ে যায়। চেয়ারটায় বসে পড়ে। দীপংকরের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে দেশলাই খোঁজে। অন্ধকারে দেশলাইটা পাওয়া যায় না। কোথায় রেখেছে মনে করতে পারে না দীপংকর। দীপংকরের সিগারেটটা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। বিমল হেরিকেনের কাচটা তুলে আগুন নেয়। হাতে অল্প উত্তাপ লাগে হেরিকেনের কাচের

ায়। অন্যালোটা জ্বালা জ্বালা করতে
ক।

—সবই যখন জেনেছেন, তখন আমি
। করে দিই ঘটনাটা।

দীপঙ্করের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে অধ-
র। সে বসে পড়ে ইজিচেয়ারটায়।

—এটা একটা গল্প। শুনবেন তো?

—কলাবনিতে এসে গল্প কত শুনলাম,
বেদন্তার রাজগৃহ, আপনি বলুন।

—আপনার রিপোর্টটা ঠিক, এর সঙ্গে
ঘটনাটা জুড়ে দিন, আমি বলছি।
৫৪-৫৫-র ঘটনা। গভর্নমেন্ট জমিদারি
ন নিচ্ছে। জমির সিলিং হয়েছে পঁচিশ
র। এক-একজন পঁচিশ একর জমির
ী রাখতে পারবে না। সেটেলমেন্টের
কজন এল এখানে। মধ্যমণি ছিল সুরেন
্র। এক আমিনবাবু। কানুনগোটি ছিল
পাখ্যাপা। সন্ধেয় বাঁশী বাজাত। যাত্রা
তে পারত ভাল। সুযোগ নিল সুরেন
্র। ভূপতি বারিক ছিলো রাজার ডান-
ত। রাজকর্মচারী, গোমস্তা। ভূপতি
রক রাজাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে
রেন মিশ্রকে ডেকে পাঠালো। সুরেনের
স অল্প। রাজাবাবু থাকতেন মদের
তর। সুরেনের সাহায্যে ব্যাকডেটে অনেক
কুমনামা হয়ে গেল। জমি রেকর্ড হয়ে
ল সেই হুকুমনামা মূলে। সব জমি
নাম হলো না। ভূপতি বারিক আর সুরেন
্র হুকুমনামায় রাজার সই করিয়ে নিয়ে
ক্রি করে দিল অনেক জমি। রাজার জমির
সেব থাকে না। টাকা ভাগ হলো ভূপতি
র সুরেনের ভেতর: কলাবনির সমস্ত
টলতার সূত্র ভূপতি বারিক এবং এই
রবংশ। তাকে সাহায্য করল আপনাদের
 সরকারী লোক একজন। তখন তো
ধু বেনাম হয়নি জমিজমা, পণ্য হস্তান্তর
য়েছে অনেক। সরকার যত জমি পেত তার
য়ে অনেক কম পেল। দেশ জুড়ে জমি-
রি অধিগ্রহণের কথা বলা হলো, কিন্তু
াপনে অনেক পাপ হয়ে গেল। বিমল
মেছে।

—তারপর?

—তখন ছিল সুরেন ভূপতির রাজত্ব।
ক পয়সাও রাজা পেলেন না, পেলেন শুধু
দ আর মেয়েমানুষ। তাতেই ভুলে
কলেন। তিরিশ একর জমি যদি বেনাম
রা হয়, ষাট একর করা হল বিক্রি। ব্যাক-
ডেটে। সরকারি আমিন সুরেন মিশ্র আইনের
লদে সাহায্য করল ভূপতি বারিককে। সব
াজ শেষ হওয়ার পর সুরেন আর ভূপতি
মল লাভের হিসেবে। বখরা নিয়ে গণ্ডগোল
াগল। একদিন সুরেনকে ভূপতি তার
াড়িতে ডাকে। হিসেব মেলাতে হবে।
ূপতির দেহ তখন চকচকে হয়েছে। দালান
াজার জন্য ইট খোলা করেছে সে। ভূপতি
ুরেনকে সাদরে ঘরে ডাকে। তার সঙ্গে
াসগপ্পে মাতে। এরই ভিতর ভূপতির
ছর ষোল বয়সের বোন ঘরে আসে। দস্তুরমত
ষোড়শী। ভূপতি সুরেনের চোখে নজর
দেয়। সুরেন তো বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজছে।
বয়স তিরিশ ছুঁই-ছুঁই। ভূপতি সুরেন-
এর কাছ থেকে তার বাড়ি ঘরদোরের কথা
জেনে নিচ্ছিল সব। সুরেন বুদ্ধিমান।
ভূপতির প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দেয়।
বুকটা হয়ত তাঁর কাঁপছিল। মন হয়ত
চঞ্চল হয়েছিল। ভূপতির বোনটি সত্যিই
সুন্দরী।

বিমল খুব সুন্দর বলতে পারে।
দীপঙ্করের চোখের সামনে সব যেন ভেসে
উঠছে। একটা টালির বাড়ি, ছোট্ট ঘর।
তক্তপোষে দুজন বসে আছে। সুরেন আর
ভূপতি। হিসেব হচ্ছে। হিসেবে দেখা গেল
সুরেন অনেক কম পেয়েছে। হিসেব মেলে
না কিছুতেই। ভূপতি বলে সে ফাঁকি দেবে
না। প্রতিটি পাই-পয়সা মিটিয়ে দেবে।
তারপর নিজের বোনের গুণকীর্তন আরম্ভ
করে। সুরেনের বুক ভারী হয়ে যাচ্ছে।
বিশ্বাস করছে ভূপতিকে। ভূপতি তাকে
ঠকাবে না। ঐ মেয়েটিকে সে বিবাহ করবেই।
রূপে ভুলে গেছে সব। সুরেন উসখুস
করছে। কদিন আগেও তো ভূপতি তার
এই বোনের কথা তুলেছিল সুরেনের কাছে।
পাত্র দেখে দেওয়ার কথা বলেছে।

—তারপর? বিমল থামায় দীপঙ্কর প্রশ্ন
করেছে।

সমস্ত ঘটনা তো জানা যায় না, ঘটে
যাওয়ার পর গ্রামের মানুষ নানানভাবে চেষ্টা
করে একটা কাহিনী খাড়া করে, সেটাই
সত্য হয়ে ওঠে, আমি সেরকম জানি।

—সেটাই বলুন।

—তার সঙ্গে মূল সত্যের মিল না
থাকতেও পারে, তবে ঘটনাটা বোঝা যায়।
পুরো ব্যাপারটা তো কারোর জানার কথা
নয় ভূপতি আর সুরেন ছাড়া।

—ভূপতির ঐ বোনও জানে নিশ্চয়ই।

—আপনি ধরে ফেলেন সব, তাহলে
শুনুন। ওরা দুজন বসে আছে তক্তপোষে,
হঠাৎ সুরেন উঠতে চায়। ভূপতি আটকায়।
তার বোন ঢুকেছে ঘরে। সুরেনের চোখে
পলক পড়ে না। মেয়েটি হয়ত চওড়া করে
আলতা পরেছিল, কপালে গোল কাজলের
টিপ। চোখে কাজলও ছিল হয়ত। চুলে
বেণী করেছে। ওর হাতের আঙ্গুলগুলো
সুন্দর। নখেও বোধহয় আলতার রং
লাগিয়েছে। সে এখন হাত বাড়িয়েছে
সুরেনের দিকে। হাতে সরবতের গ্লাস।
ভূপতির জন্যও নিয়ে আসে। সুরেনের বুক
ছমছম করছিল নিশ্চয়ই। যাওয়ার সময়
মেয়েটা কি কোন ইশারা করে গেল?

এরপরই সুরেন বেরিয়েছে। ভূপতিকে
বলেছে কালই জানাবে বিয়ের কথা।
রাতে একটু ভাববে। ভূপতি সুরেনকে
এগিয়ে দেয়। এগোতে এগোতে বলে 'কাল
দুপুরে আমার এখানে খেও।' হ্যাঁ একথাটা
সত্যি। মাঠে দুজন চাষী ছিল। ওরা আল
দিয়ে হাঁটছিল তখন। আলপথে সুরেন
সামনে ভূপতি পিছনে। চাষীরা ভূপতির
কথা শুনেছিল। একটু চড়া গলায় কথা
বলত সে।

এরপরে সুরেনের কি হয় বোঝা যায়
না। অনেকটা হেঁটে পথের ভিতরে ঘুরে
পড়ে যায়। মুখে গাঁজলা উঠেছে। হাস-
পাতাল নেই কাছে-পিঠে। রাস্তার মানুষ
তুলে রাজবাড়ি নিয়ে যায়। ততক্ষণে যা
হবার হয়ে গেছে। সুরেন মাথা ঘুরে পড়ে
যায়! তখন কি বুঝতে পেরেছিল সব!
ঐ অপরূপ মুখ-চোখের মেয়েটি তাকে কি
ইশারা করেছিল? তর্জনী দেখিয়ে নিষেধ
করেছিল কোন ব্যাপারে। হাত নাড়ছিল।
চোখে চোখে বারণ করছিল। এসব সুরেন
জানত। আমরা জানি না। ভেবে নিই
এমন। কেননা ভূপতির বোনের খ্যাতি ছিল
রূপের। রূপের সঙ্গে সুরেনের মৃত্যু
জড়িয়ে গিয়েছিল। এসব জড়িয়ে সকলের
রসনা তৃপ্ত হয়।

সুরেন মিশ্র মরার পর ফিসফাস শুরু
হয়। রাজা সচকিত হলেন। সুরেনের
মৃত্যুটা হার্ট অ্যাটাক বলে চালিয়ে দেয়া
হলো। অন্নদাশঙ্কর রাগে ফুঁসছিলেন সব
জেনে ফেলে। এইভাবে ঠকতে হবে ভাবেন
নি। কিছু করার নেই। কাগজে কলমে সব
ঠিক। এখন ঝামেলা পেকে গেলে বেনাম
ল্যান্ড-এর কথাও প্রকাশ হয়ে যাবে।
বেআইনী সমস্ত হস্তান্তর ধরা পড়বে।
ভূপতিকে বিশ্বাস করে জমি বেনাম করতে
তার দিয়েছিলেন তিনি। ভূপতি অনেক
জমি বিক্রি করে দিয়েছে। শেষে এই সুরেন
মিশ্রর মৃত্যু। এরপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে
ভূপতিকে গলাকাটা অবস্থায় পড়ে থাকতে
দেখা যায়, কাঁসাই-এর বালিতে। খুন-এর
কিনারা হয় না। স্রেফ টাকা-পয়সার জন্য
খুন বলে প্রচারিত হলো। রাজার দুর্দম
লেঠেল পুরুষেরা শেষবারের মত ইনাম পেয়ে-
ছিল তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে। ভূপতি
বারিক-এর খুনটা খুব পরিষ্কার, কিন্তু
সব অন্ধকারেই থাকে। প্রহরাজরাই তখন
দান ডেকেছিল। সদ্য জমিদারি চলে গেছে,
কিন্তু পুরনো প্রতাপ যায়নি। একদিন
ভূপতির সেই সুন্দরী বোনটা উধাও হয়ে
যায়। তার খোঁজ পাওয়া যায় না আর।

—সে উধাও হলো কেন?

বিমল চুপ করে বসে থাকে, জবাব
দেয় না।

—এ কাহিনী জানলে এতদিনে সব হয়ে
যেত, অম্বুজ বারিক বলে না কেন?

—ভূপতি বারিক ওর বাবা। সে কারণে
সব চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় কি, ভূপতি
রাজার জমি বেনাম করেছিল, অম্বুজ
রঞ্জনীর জমি বেনামে নিয়েছে, এখন কলা-
বনিতে নেই। ঘটনা চাউর হয়ে গেছে।

—চাষীরা জেনে গেছে?

—হ্যাঁ, পিথা নায়েক রক্তচক্ষু নিয়ে
ঘুরে বেড়াচ্ছে, অম্বুজকে তার চাই
এক্ষুনি। ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এ জমির নায়ক
অম্বুজের বাবা ভূপতি বারিক, অম্বুজ
বাপের মৃত্যুর শোধ নিচ্ছে। শেষ প্রহরাজ
অন্নদাশঙ্কর এখন অথর্ব। দীপঙ্কর উঠে
দাঁড়ায়। একটা রিপোর্ট দুটো খুনের
কিনারা করে দিতে পারে। সে উত্তেজিত হয়ে

এপাশ ওপাশ করছে। তারপর আবার দাঁড়িয়েছে. এক পরিব্রাজকের বংশের শেষ এইভাবে হলো।

বিমল মুখ নামিয়ে বসে আছে। দুজনে বহুক্ষণ থমথমে হয়ে বসে থাকে। তারপর বিমল একসময় হঠাৎই ওঠে। পায়ে পায়ে ঘর ছাড়ে।

দীপঙ্কর একটা বই নিয়ে আলোর সামনে যায়। মন বসে না। লাবণ্যর মুখ মনে পড়ে। বৃদ্ধ কুষ্ঠাক্রান্ত অন্নদাশঙ্করকে দেখলে তো মনে হয় না এত কাণ্ড খুব ঠাণ্ডা মাথায় তিনি করতে পারেন। দুটো আর একটা তিনটে খুন! ভূপতি বারিক-এর সেই রূপসী বোনটি রাজার ভোগে লেগেছিল নিশ্চিত! তারপর! খুন বোধহয়। এখন এই জমির ব্যাপারটা মোটে কি করে! মেটানো সম্ভব কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এতদিন পরে ঐসব জমি কেড়ে নেওয়া গভর্নমেন্টের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হবে না।

এই কাহিনী বলতে চায়নি বিমল। আজ সব প্রকাশ করে দিয়েছে দীপঙ্কর চৌধুরীর কাছে। প্রহরাজ বংশের সমস্ত কলঙ্ক একটা বাইরের মানুষ জানল। এই ঘটনাই সেই মানুষটিকে আরো অনেক কিছু ভাবতে সাহায্য করবে।

দীপঙ্কর চৌধুরীর ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে নাটমন্দিরের নিচে বহুক্ষণ বসেছিল বিমল। বাইরেটা হঠাৎ থমথমে হয়ে গেছে। বৃষ্টিও নেই। কানে নদীর শব্দ আসছে। কলকল করে জল আসছে কংসাবতীতে! আকাশটা বয়সের ভারে ঘোলাটে নক্ষত্রশূন্য।

আস্তে আস্তে রাজবাড়ি নিথর হয়ে গেলে বিমল বেরিয়েছে। কত রাত বোঝা যায় না। সব ঘুমে আচ্ছন্ন। মেঘ ভয় দেখাচ্ছে কলাবনিকে। ভূপতির মৃত্যুর শোধ অম্বুজ নিচ্ছে চমৎকারভাবে। ভূপতির উপর তখন প্রহরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতায়। অম্বুজ কলাবনিতে নেই এখন। জানে না ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে নতুন প্রহরাজের। তারা কলাবনির চাষী। সব জেনে ফেলে ফুঁসছে।

আজ প্রহরাজ বংশের সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়ে গেল। বিমল অন্ধকারের রাজগৃহকে দেখে। এক পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ এই বংশের প্রথমপুরুষ. কলাবনিকে গড়ে তুলেছিলেন। তার শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিমল নাকের কাছে ধ্বংসস্তূপের গন্ধ পাচ্ছে। বহুকালের রাজগৃহ, এক পরিব্রাজকের কপালের রাজটীকার ফণা।

কয়েক পা এগিয়েই বিমল থমকে দাঁড়ায়। মেঘ অন্ধকারে এ কি! চোখের মায়া নয়তো! এক দুরন্ত অশ্ব দাঁড়িয়ে। বিমলের বুক ভারী হয়ে নিঃশ্বাস আটকে যায়। কার পায়ের শব্দ! খুব কাছে। কে হেঁটে যায় তার সামনে দিয়ে ঐ অশ্বের দিকে। বিমল হাসফাস করছে উত্তেজনায়।

—কে যায় এত রাতে রাজগৃহ ছেড়ে দাঁড়াও। বিমলের কণ্ঠস্বর বড় গম্ভীর।

সেই রক্তভূষিত পুরুষ দাঁড়ালেন। অপরূপ দেহ। খুব আস্তে আস্তে ফিরলেন।

—আমি প্রথম প্রহরাজ শংকরদাস শতপথী।

বিমল এই পুরুষের চোখে চোখ রেখে নুয়ে পড়ে। সে দেখে রাজপুরুষের চোখে মোহময় দীপ্তি। উত্তেজনা এবং শ্রদ্ধা ভালবাসায় সে আভূমিনত হয়, হে পরিব্রাজক, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

—পরিব্রাজককে স্তব্ধ হতে নেই, কলাবনিতে নিবিড় অন্ধতা আমার রক্ত আমাকে অসম্মানিত করেছে, কলাবনি আর প্রহরাজের থাকবে না।

—আপনি দাঁড়ান। বিমল উত্তেজনায় কাঁপছে।।

—কলাবনিতে দাঁড়িয়ে আছি বহুকাল. ভুল করেছি, পরিব্রাজককে কোথাও স্থির হতে নেই. তার পরিণাম এই জীর্ণ রাজগৃহ. যা সময়ে ধ্বংস হয়ে যায়. সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার শক্তি যার নেই, তার স্রষ্ঠা হওয়া কেন? সমস্ত পৃথিবী পরিব্রাজকের।

সেই পুরুষ এগিয়ে যাচ্ছেন। দুরন্ত সাদা ঘোড়াটাই ছটফট করছে। মুখ উঁচু করে আছে বহু দূর কোথাও ছুটে যাওয়ার জন্য। বিমল পায়ে পায়ে এগিয়েছে। হাত-পা কাঁপছে। কণ্ঠনালীতে শব্দরা জট পাকিয়ে আছে। কি বলতে চায় পারে না।

—আপনি যাবেন না। বিমলের রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ জেগে ওঠে।

ঐ তো রাজপুরুষ অশ্বারোহী হয়েছেন। অশ্বক্ষুরধ্বনি প্রবল হয়ে উঠে মিলিয়ে যাবে এক্ষুনি। বিমল দৌড়ে যায়। রাজপুরুষ বাতাসের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছেন যেন। আমাকে ক্ষমা করুন। বিমল বসে পড়েছে মাটিতে। একটু আগে এই মাটিতে ছুটে গেছে কে? কোন ঘোড়া! এই বাতাসে তার নিঃশ্বাস এখনো জড়িয়ে। বিমল বুক ভরে বাতাস নেয়।

সে অনেকক্ষণ পরে টালমাটাল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আজ কলাবনি স্তব্ধ। যে অশ্বক্ষুরধ্বনি সে শুনতে পেত তা আর শোনা যায় না। এই রাতে। বিমলের মাথায় ঘোর। সে পায়ে পায়ে হাঁটছে। পিছনে স্তম্ভিত রাজগৃহ। তারপরই আবার নিবিড় চক্ষু বিস্তার করে দাঁড়ায়। সামনে ঐ শুভ্রদেহী পুরুষ কে?

—কে যায় রাজগৃহ ছেড়ে, দাঁড়াও।

সেই অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ দাঁড়িয়েছে। ঘুরেছে বিমলের দিকে। তারপর খুব গম্ভীর উচ্চারণ করেছে, আমি মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়! হুগলী জেলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বষণে বেরিয়ে এক পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ এসে স্থিত হলেন কলাবনিতে। তখন প্রহরাজ বংশের রাজত্ব আরম্ভ। নবীন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ শংকরদাস শতপথী সিংহাসনে বসেছেন। রাজগৃহের মুখে বেগবান অশ্বেরা দাঁড়িয়ে থাকে। মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্রয় পে[illegible] কলাবনিতে, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] পুরুষ।

—আপনি কোথায় যাবেন, দাঁ[illegible] বিমল সেই পুরুষকে স্পর্শ করতে পারে[illegible]

—পরিব্রাজককে কোথাও স্থিত [illegible] নেই। সামনে অসীম বিশ্ব, কলাবনিতে নয়, পরিব্রাজকের দাঁড়ান অর্থেই অ[illegible] আর কুইতিহাসের সৃষ্টি।

সেই অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ হাঁ[illegible] সামনে। বিমল চিৎকার করে ওঠে। কণ্ঠ [illegible] হয়ে যায়। জট পাকিয়ে তার কণ্ঠ [illegible] আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। সে কাঁপছে। [illegible] পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। আপনি দাঁড়[illegible] শব্দরা মেঘ অন্ধকারে টুপটাপ ডা[illegible] সব ধু ধু করে। কেউ নেই চারপাশে।

—আমিও তো অসীম পৃথিবী [illegible] বিশ্বতে হেঁটে যেতে চাই। এখানে অ[illegible] তোমাদের স্মৃতিকে ভয় করে, তোমা[illegible] মোহে, তোমরা চলে গেলে আমি একা করে থাকব?

খুব নিঃসঙ্গ লাগছে। সে আর এগো[illegible] পারে না। এখন কলাবনি কার? প্রহরা[illegible] নয়। পরিব্রাজকের নয়। কলাবনি হা[illegible] মানুষের। আমি আর থাকব না এখা[illegible] বিমল নিঃঝুম হয়ে যাচ্ছে। মাথায় ভিত[illegible] শুধু শূন্যতা।

—আয় তো আমার ময়ূর, মেঘ নি[illegible] যাব মরুদেশে। সে হাত ছানি দেয় শূন্যে

শূন্যতা নীল হয়ে যায় ক্রমশ। ত[illegible] মাথার উপরে এক বটবৃক্ষ ডালপালা মো[illegible] অন্ধকার হয়েছে। হঠাৎ বাতাস আ[illegible] বাতাসে গাছের ভিতর লুকিয়ে থা[illegible] জোনাকীরা রিমঝিম ঝরে পড়তে লাগ[illegible] পরিব্রাজকের মাথায় আলোর বৃষ্টি হয়।

বিমল দেখছে দূরের আকাশ এ[illegible] ময়ূরের পাখায় নীল হয়ে যাচ্ছে। ত[illegible] মাথার ভিতরে কেমন রংয়ের স্রোত। [illegible] এগিয়ে যায়। দৌড়তে আরম্ভ করে। ত[illegible] পোশাকে জমা জোনাকী[illegible] ঝরে পড়[illegible] মাটিতে। বিমলের দেহ থেকে আ[illegible] নিঃসৃত হচ্ছে। এ-যেন এক অন্য গ্রহে[illegible] তেজস্ক্রিয় পুরুষ।

সেই ময়ূর পেখম মেলে অহঙ্কার[illegible] হয়েছে। মৃদু মেঘ গর্জন হয়।

—দাঁড়াও, আমি আর থাকবো না এখা[illegible]

—পরিব্রাজকের কোথাও স্থিত হতে নে[illegible] সামনে অসীম বিশ্ব। বিমলের কণ্ঠস্ব[illegible] অন্ধকারে ডুবে যায়। ময়ূর ছুটেছে ময়ূরের পিছনে সেই পরিব্রাজক।

ময়ূরের পিঠে কেউ নেই। সে[illegible] মঙ্গোলীয় চোখ-মুখের প্রাচীন মানু[illegible] কোথায়? ময়ূর তুমি তাঁকে কোথায় রে[illegible] এলে? তাঁর সঙ্গে কলাবনিতে নেমেছিলা[illegible] একদিন। সেই অশ্বের দেশ, আগুনে মে[illegible] পুড়ছে।

মাটির খুব কাছাকাছি শূন্যতায় ময়ূ[illegible] ডানা মেলেছে। ডানার শব্দ আর রং অন্ধকারকে বদলে দিচ্ছে। বিমল মোহাচ্ছন্নের মত দৌড়চ্ছে।

(চলবে)

অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

ানা-ঘুষোয় শুনলেন দ্বারকানাথ, তাঁর
লোকেদের পরবার কাপড় নেই।
ত গিয়ে দ্বারকানাথ কাপড় দিয়ে
। কাউকে না বলে। সবার অলক্ষ্যে।
অবলাবান্ধব' কাগজ সম্পাদনা করার
ই দ্বারকানাথের অভিধা হয়ে গিয়ে-
অবলাবান্ধব। ন্যাশনাল নবগোপাল
যমন ন্যাশনাল মিত্র নামে পরিচিত হয়ে
কিন্তু এমন মনেপ্রাণে অবলাবান্ধব
আর হয় না। সেখানে প্রচারের ঢক্কা-
নেই, জননায়কের দেশহিতৈষণার
লন নেই, সাধারণের মনোজয়ের
কটু প্রয়াস নেই। সেখানে উদার-হৃদয়,
ন, বেদনাবিধুর এক মানুষের ঘন-
ট আত্মীয়তা।

িহন্দু সমাজের অন্তরালে বাস করিয়া
ব সকল মহিলা সামাজিক নিগ্রহ দিবা-
নশি সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের দুর্দশা
মরণ করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের
রদুঃখকাতর হৃদয় সর্বদা ব্যাকুল
ইত এবং তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম সমাজে
ানয়নপূর্বক শিক্ষিত করিবার জন্য
নেক উৎপীড়ন অবিচলিতভাবে বহন
িরয়াছেন। মহিলাদিগের সম্বন্ধে
কানপ্রকার অসম্মানের কথা কদাচ সহ্য
িরতে পারিতেন না. পুরুষদের
ুদয়ে নারীজাতির প্রতি সম্মানের
াব বর্দ্ধিত না হইলে মলিন ভারতের
ুখ উজ্জ্বল হইবে না. আবেগপূর্ণ
ুদয়ে এই কথা সর্বদাই বলিতেন।
বান্ধব দ্বারকানাথের এই সমসাময়িক
ানে যে আবেগের কথা বলা হয়েছে
দ্বারকানাথের সংক্ষিপ্ত কিন্তু কর্মময়
জীবনের মূল সুর। তাঁর নিশ্চিত পাথেয়।
শুধু তাঁরই নয়। বোধকরি নবযুগের
মানবিকতাবাদেরও।

আর এই নারী হিতৈষণার ব্রত নিয়ে
দ্বারকানাথের আর এক নতুন সংস্থা
স্থাপন—বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা। বঙ্গ
মহিলা বিদ্যালয় তখন সরকারী বেথুন
স্কুলের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে, কাজেই
অবলাবান্ধব দ্বারকানাথের হাতে স্ত্রীমুক্তির
কাজ অনেক হাল্কা। অবশ্য সাধারণ ব্রাহ্ম
সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দ্বারকানাথ তার
অন্যতম প্রধান পান্ডা। তরুণ ব্রাহ্মরা মিলে
'ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ন' ও তত্ত্ব
কৌমুদী' দু-দুটো কাগজ বার করেছেন।
দ্বারকানাথ তারও লেখক। কিন্তু অবলা-
বান্ধব দ্বারকানাথ ও তাঁর অবলামুক্তির
কাজ বন্ধ রাখতে পারেন না। তিনি ত
গাজনের সন্ন্যাসী। এই বানে পিঠ না
ফুঁড়লে তাঁর আর আনন্দ কিসের। মেয়ে-
দের মুক্তির জন্য শুধু একটি মাত্র স্কুল
করলেই ত হবে না। তাছাড়া কেবল কল-
কাতা শহরের বুকে একটা মেয়েদের স্কুল
স্থাপন করলে কতটুকু সিদ্ধ হবে তাঁর
নারী শিক্ষা বা নারীমুক্তির উদ্দেশ্য?
মেয়েদের শিক্ষার আন্দোলন আরও এগিয়ে
নিয়ে যেতে হবে। এই শহর-জীবনের
আলোকপ্রাপ্ত গন্ডী পেরিয়ে তাকে টেনে
নিয়ে যেতে হবে গ্রাম বাংলার বুকে। সেখানে
হাজার হাজার অবলা মেয়ে অশিক্ষার অন্ধ-
কারে ডুবে রয়েছে। তাদের ত শোনাতে হবে
মুক্তির বাণী। নয়ত মিথ্যা তাঁর তপশ্চর্যা।
দ্বারকানাথ এগিয়ে গেলেন তাদের বুকে
পৌঁছে দিতে শিক্ষার আলোক। জ্ঞানাঞ্জন
শলাকায় ঘুচাতে তাদের অজ্ঞান তামস।

বিক্রমপুরের মানুষ তিনি। কাজেই
জন্মভূমি বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে
গেলেন তিনি। প্রদীপের নীচেই ঘন
অন্ধকার—এই অপবাদ যেন তাঁকে শুনতে
না হয়। এই জন্য দ্বারকানাথ 'বিক্রমপুরের
নৈতিক উন্নতি, স্ত্রী শিক্ষা ও অন্যান্য
হিতকর কার্য সাধন এবং আপাততঃ মুখ্য-
রূপে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার'—এই উদ্দেশ্য নিয়ে
এই সভা স্থাপন করলেন। দ্বারকানাথ
নিজেই সভাপতি।

আশ্বিন মাস। নীল আকাশের পেঁজা
তুলোর মত হাল্কা মেঘগুলো যেন কলকাতা-
প্রবাসী মফস্বল বাঙ্গালীর ঘরে ফেরার উড়ু
উড়ু মন। বাংলা ছয়ই আশ্বিন। বারশ'
ছেয়াশি সন। আঠারশ' উনআশি খৃস্টাব্দ।
সভার সদর দপ্তর সেই নড়বড়ে ঘর তেরা-
নব্বুই নম্বর কলেজ স্ট্রীট। এই সভায় প্রথম
বার্ষিক সম্মিলনীর যে ছাপা কার্য বিবরণী
পাওয়া যায় তাতে দ্বারকানাথের সাধারণ
স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণাটা পাওয়া যায়।
যদিও দ্বারকানাথ কলকাতায় মেয়েদের কল-
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার
জন্য, উচ্চশিক্ষা মায় ডাক্তারি শিক্ষার জন্য
প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সাধারণ
গ্রামীণ মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর শিক্ষাদানের
পদ্ধতিটা ছিল অনেকটা বুনিয়াদী ধরণের।
বেশ 'প্র্যাকটিক্যাল'। সব মেয়েদের গার্গী,
মৈত্রেয়ী হওয়া যখন সুদূর পরাহত তখন
ভূগোল বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ পড়ান একেবারে
রহিত করে দিলেন দ্বারকানাথ। 'যাঁহারা
নিজ দেহের রক্তবাহী শিরা সকলের নির্দিষ্ট
স্থান অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে সাইবেরি-
য়ার বিজন প্রান্তরবাহী নদীসমূহের নাম-
মালা কন্ঠস্থ করাইয়া কি ফল তাহা বুঝিতে
পারা যায় না।'—এই ছিল দ্বারকানাথের শেষ
দিকের সধারণ মেয়েদের জন্য মোটামুটি
শিক্ষাদর্শ। তাঁর 'সুরুচির কুটীরের' নায়িকা
সুরুচির লেখাপড়া সম্বন্ধেও দ্বারকানাথের
এই ধারণার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সুরুচি
আমেজন নদীর গভীরতা, আল্পস পর্বতের
উচ্চতা এবং সিবাস্টোপোলের যুদ্ধে হত
বীরপুরুষদিগের নাম ও বংশাবলী বলিতে
পারেন না বলিয়া যদি কেহ তাঁহাকে
সুশিক্ষিতা কুলকন্যার মধ্যে গণ্য করিতে
ইচ্ছা না করেন, তবে তাঁহাকে সে অধিকার
দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সুরুচি
আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিবেন, এমত
বোধ হয় না। মোদ্দা কথা, দ্বারকানাথের
স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল সেটা তাঁর
নিজস্ব। স্বাস্থ্যতত্ত্ব রন্ধন বিদ্যা গার্হস্থ্য
চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি যে মেয়েদের
শিক্ষার পাঠ্যক্রমে থাকা উচিত সেটা তিনি
উপলব্ধি করেছিলেন এবং জোরগলায় বার-
বার সে কথায় সেটা প্রচার করে গেছেন।

আরও একটা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
সঙ্গে যুক্ত হয়েপড়েন দ্বারকানাথ। সেটি
ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। বলেত [illegible]কে ঘিরে
শিবনাথ এই শিক্ষায়তনটি স্থাপন করেন।

আঠারশ' নব্বই (?) মে মাস। শিবনাথ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন : ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি যে কয়েকটি কার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন। অগ্রেই বলিয়াছি যে, আমি ইংলন্ডে যাস-কালে কিন্ডারগার্টেন স্কুল দেখিয়াছিলাম এবং শিক্ষা বিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থও কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেইগুলি পাঠ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন চিন্তা আমার মনে উদয় হয়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন তাহারই ফল।'

প্রভাতচন্দ্র তাঁর 'বাংলার নারী-জাগরণে' এ সম্বন্ধে লিখেছেন : 'ব্রাহ্ম বালিকাদের সুশিক্ষার (অর্থাৎ দ্বারকানাথের মতানুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের) ব্যবস্থার জন্য দ্বারকানাথ, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের পার্শ্বে যে সাধারণ ব্রাহ্ম পল্লী আছে সেখানে একটি স্কুল স্থাপন করেন।' আঠারশ' বিরাশি। ব্রাহ্ম সমাজের ইংরাজী ইতিহাসের দ্বিতীয় খন্ডে বলা আছে যে এতে ব্রাহ্ম সমাজের কার্যনির্বাহক সভার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। দ্বারকানাথ ও শশিপদ একটা বাড়ী তৈরি করে ব্রাহ্ম পল্লীতে বস-বাস করতে এসে এই বিদ্যালয় চালু করেন। পরে অবশ্য 'অল্প খরচে বোর্ডিং-এ থাকিয়া মফস্বলস্থ বালিকারা যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে' সেজন্য ব্রাহ্ম সমাজ একটা স্কুল স্থাপন করার জন্য বাইশ শ' টাকা চাঁদা তোলেন। এই স্কুলই হয় শিবনাথের চেষ্টায়। দ্বারকানাথ হন সম্পাদক। শিবনাথ আত্মচরিতে লিখেছেন, গুরুপদ মহালান-বিশের চেষ্টায় এটা বোর্ডিং হয়ে যায় বলে এবং শিবনাথের নিজস্ব কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি আর অনুকরণ না করার কারণে তিনি এর সংস্রব ত্যাগ করেন। শিবনাথ সংস্রব ত্যাগ করলেও দ্বারকানাথ লেগেই ছিলেন। প্রভাতচন্দ্র বলেছেন আঠারশ তেরানব্বই সালে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হয়। কিন্তু এই সময়ে একটা মস্ত বিপদের কালো মেঘ নেমে এল। স্কুলের আর্থিক অবস্থা টলমল। বোধকরি যে দ্রুতগতিতে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছিল ঠিক সেই হারে তার আয়ের ব্যবস্থা হয়নি। এই আর্থিক দুর্গতির দিনে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য-নির্বাহক সমিতি বাধ্য হয়ে স্কুলটি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বোধ করি সেই সভায় দ্বারকানাথও ছিলেন। কিন্তু তাঁর তৈরী একটি স্ত্রী শিক্ষায়তন এমনি করে অকালে টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, সেটা তিনি বরদাস্ত করেন কি করে? ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ'সম্বন্ধে লিখছেন : 'চারি বৎসর পরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য-নির্বাহক সভা আর্থিক অনটনের জন্য বিদ্যালয়টি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলে, ধনী না হইয়াও দ্বারকানাথই উহার জীবন-রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ সন হইতে উহার সর্বপ্রকার আর্থিক দায়িত্ব সানন্দে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং করেছিলেনও বটে শিচিত্রভাবে দ্বারকা-নাথের দশহাজার টাকার জীবন বীমা ছিল। সেই জীবন বীমার পলিসি 'সারেন্ডার' করে যে টাকা সংগ্রহ করেন দ্বারকানাথ সেই টাকাই ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করে। এ' ধরণের আত্মত্যাগ বোধ করি দ্বারকানাথেরই সম্ভব। এবং আজকের বাঙালীর কাছে বোধকরি গল্পকথা। এই খবরটি দিয়েছেন একদা শনিবারের চিঠির সম্পাদক যোগানন্দ দাস মশায়।

শেষ পর্যন্ত এই মুমূর্ষু ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ নারী শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানে পরিণত করতে পেরেছিলেন দ্বারকা-নাথ। আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন এই প্রতি-ষ্ঠানের। খাস সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যখন আশা ছেড়ে দিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের, কি দুর্জয় সাহস, কি অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতা এই মানুষটির যে তিনি একাই সেই নিমজ্জমান তরীটির হাল ধরলেন অবলীলায় এবং অচিরে সেই ঝড়ঝঞ্ঝা উত্তাল দারিদ্র্য-সমুদ্রের সকল তর্জন-গর্জন আস্ফালনকে অতিক্রম করে কি যাদুবলেই না সেই তরীটিকে তীরে ভেড়ালেন। এই কান্ডারীর বুঝি তুলনা নেই।

ঊনবিংশ শতকের তখন অপরাহ্ন। কলকাতার তখন এক হুলস্থুলের যুগ। শ্যামবাজার নাট্যসমাজের 'লীলাবতী' তখন মাৎ করে দিয়েছে নাট্যরসিক কলকাতাকে। নাট্যকার—রায়সাহেব দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর স্বয়ং এসে বাহবা দিয়ে গেছেন, পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেছেন অর্ধেন্দু মুস্তাফীর। বলে গেছেন, চুঁচড়োর নাট্যসমাজের চেয়ে অনেক ভালো অভিনয় হয়েছে। বংকিমচন্দ্রকে তিনি চিঠি লিখে দুও দিয়ে দেবেন। পর-পর তিনটে শনিবার এই নাটক হয়ে গেল শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাইরের বাড়ীর মস্ত উঠোনে। ধর্মদাস সুরের আঁকা সিন। কলকাতায় তখন ডেংগু জ্বরের প্রকোপ চলছে। অনেকে টিকেট কিনেও যেতে পারলে না। মাঝে মাঝে একদিন ত' সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর ঝড়ে জলে মুক্ত আকাশের তলায় চেয়ার-পাতা অডিটোরি-য়াম ভিজে সপসপে হয়ে গেল। অনেকে ভেবেছিল, সে দিন আর অভিনয় হতে পারবে না। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অভিনয় হল। নেবুতলা থেকে ডাকতার মহেন্দ্রলাল সরকার মশায় এসে ঐ ভিজে চেয়ারের ওপর বসে থিয়েটার দেখে গেলেন। 'এডুকেশন গেজেট'-এর একজন পত্রপ্রেরক ত লিখেই ফেললে, 'এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটি 'দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন করিতে পারেন' .....।

ভাবনাটা ধোঁয়াচ্ছিল। একটা দেশীয় নাট্যশালা। সাধারণ রঙ্গালয়। স্থায়ী নাট্য-শালা। স্থানাভাবে বহু লোক ফিরে যাচ্ছে। স্থায়ী হলে, আজ না হয় কাল দেখবে। একেবারে বিমুখ হবে না। বাগবাজারের দল তখন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র মহড়া ধরেছে। সবাই বললে, এই বই নি[illegible] ন্যাশনাল থিয়েটার হোক। অনেকেই রাজ[illegible] গিরিশচন্দ্র নন। তখনও কলম ধরেন[illegible] তিনি। শুদ্ধ নট। তিনি বললেন,[illegible] ন্যাশনাল থিয়েটার কি সোজা কথা? [illegible] একটা রাজকীয় আয়োজন চাই। এই ভাঙ[illegible] চেয়ার, চকচকে সরঞ্জাম—ভাংগা বাড়ী, [illegible] নিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার হলে সারা দেশ [illegible] দুও দেবে বাঙালীকে। কিন্তু তবু হল[illegible] গিরিশকে বাদ দিয়েই হল। চল্লিশ টা[illegible] ভাড়ায় নেওয়া চিৎপুরের শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বাড়ীর সামনে স্বর্গত মধুসূদন সান্যালে[illegible] ঘড়িওয়ালা বাড়ীর বার-বাড়ীর বির[illegible] উঠোনে স্টেজ বাঁধা হল। ব্রহ্মান[illegible] কেশব সেনের এক পয়সার কাগজ 'সুল[illegible] সমাচারে' বিজ্ঞাপন বেরোল :

.... আগামী সাতই ডিসেম্বর[illegible] শনিবার .. .. নীলদর্পণের অভিনয় হবে[illegible] টিকিটের দাম—প্রথম শ্রেণী—এক টাক[illegible] দ্বিতীয় শ্রেণী—আট আনা। শ্রীনগেন্দ্র[illegible] নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক। শ্রীধর্মদাস[illegible] [illegible]—স্টেজ ম্যানেজার। নিয়মিত টিকি[illegible] বিক্রি করে এই প্রথম থিয়েটার হল কল-কাতায়। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আধা[illegible] সামন্ততান্ত্রিক কলকাতার বাবুদের হাত[illegible] থেকে সাধারণ মানুষ বেরিয়ে এসে নিজেদের[illegible] প্রতিষ্ঠা করার পর্ব শুরু করল। আঠারশ[illegible] বাহাত্তর। রাজনৈতিক দিকে সেটা হল আরও কয়েক বছর পর। গোলদীঘির পাড়ে। ভারতসভার পত্তনে। মধুসূদন তখন অস্তমিত তবু কেউ কেউ তাঁর বই, কেউ কেউ ঠাকুরবাড়ীর জ্যোতিঠাকুরের বই, কেউ বা সেই পুরনো নাটুকে রামনারায়ণ—তাই নিয়ে আসর জমাচ্ছে তবে দীন-বন্ধুরই ঠাট-বাট তখন বেশী। বাঙালীর সারা রাত জেগে থিয়েটার দেখে ত আশ[illegible] মিটছে না। এমনি সময় শহর কলকাতার[illegible] এক গলির মুখে একটা ছোটখাট শ্রীকান্ত নাটক হয়ে গেল।

রাত্রি দশটা বাজে। বৈঠকখানার গলি। শহর কলকাতার রাস্তা এরই মধ্যে নিশুত হয়ে গেছে। থিয়েটার অবশ্য চলছে—কেননা তখন ত আর মাঝরাতে থিয়েটার ভাঙত না। ছোট ছোট 'ফার্স' নাটক দিয়ে রাত পুইয়ে দেওয়া হত দর্শকদের। রাতে আর গাড়ীঘোড়া পাবে কোথা থেকে? তাছাড়া চোর-ছ্যাচোড় ডাকাতের উপদ্রবও হতে পারে। কাজেই সারাটা রাতই কেটে যেত থিয়েটার হলে। কলকাতার সদর রাস্তায় তখন গ্যাস-লাইট। রাস্তার দুই দিকে আলো। তবে একেবারে মৌটক্ত পাড়ার মাথার ওপরে রাতের জোৎস্না। অকৃপণভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই রাতে গলির মোড়ে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। বোধ করি কারও প্রতীক্ষ[illegible]

ছলেন। বন্ধু-বান্ধবের জন্যে হবেও বা।
ও বা কোন রোগগ্রস্তীর চিকিৎসার জন্য
ারের খোঁজে এসেছেন। ডাক্তার অন্য
র 'কলে' গেছে, এই পথ দিয়েই ফির-
। তাঁকেই ধরবেন তিনি, সেই কারণেই
প্রতীক্ষা কিনা, তাই বা কে জানে?
হঠাৎ দেখা গেল চাকার তারস্বরে
কার করতে করতে একটা ঘ্যাকরা গাড়ী
। ঢুকল গলিতে। ঢুকল এবং ঢুকে
র গেল। কোচোয়ান নেমে এসে দরজা
ল দিলে। কোট-প্যান্ট পরা এক হুঁদো-
হেব নামল গাড়ী থেকে। আর কি
চব', বিনা দ্বিধায় ভাড়া না দিয়ে সোজা
ীর দিকে পা চালাল। হতভম্ব কোচো-
কিছুক্ষণ বোবা করি সাহেবের পায়ের
ক তাকিয়ে থাকবে। তারপর অকস্মাৎ
গ হয়ে ছুটে গিয়ে বললে, সাহেব
মর ভাড়া? সাহেব যেন শুনতেই পায়নি
র জবাবই দিলে না। কোচোয়ানটাও
ছাড়বাদা। আর বৈঠকখানা গলির মোড়ে
ড়িয়ে সেই রোগা-রোগা লম্বা চেহারার
যুবকটি সেই রাত গভীরের বিচিত্র
াল' নাটকটি দেখতে লাগলেন!

এদিকে নাটকটা একটু জমে উঠল।
চোয়ানটা আর একটু যেতেই দুর্বিনীত
হেব হঠাৎ আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে এল--
আউট অব মাই ওয়ে'—গরীব কোচো-
কে মারে আর কি। নব্য বাবুটি এতক্ষণ
ব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ-
লেন সব কিছু। আর থাকতে পারলেন
এ কি মগের মুল্লুক নাকি? আর
ুটিকে এগোতে দেখে কোচোয়ানটিও
আশার আলো দেখতে পেল। তাড়া-
ড় এগিয়ে এসে বলে থাকবে, দেখুন ত
. সাহেব ভাড়া দিচ্ছে নাই। বাবুর
দুটো দৃঢ় নিবদ্ধ হয়ে গেল। সেই ম্লান
লোকেও দেখা গেল তাঁর চোখজোড়া
ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলে উঠল। বাবু
লেন, চ' সাহেবের নামধাম বাড়ীর
নাটা জিগ্যেস করোন। কাল নালিশ
ব। আমি সাক্ষী দেব।

খাস ইংরেজ আমল। হাওড়া স্টেশনে
ম এইত সেদিন ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক
বসেছেন ব্রিটিশ ভারতের তখ্‌ত-ই-
টসে। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিসূর্য তখন
গগনে। কড়া হাতে চলছে দেশ শাসন।
হবরা না রাজার জাত। তারা কেন
টভের তোয়াক্কা করবে! বাঙ্গালী
লোক কিন্তু লড়ে গেলেন। সোজা গিয়ে
হেবকে নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন। আ
তেই অগ্নিতে পড়ল ঘৃতাহুতি। সাহে
তেড়ে মারতে এল নব্য বাঙ্গালী বাবুকে
দুও তৈরী—রণং দেহি। বৈঠকখানার সে
রেজ পাড়ার গলিতে সাহেব-বাঙ্গালীর
ই গভীর রাতে জোর মল্লযুদ্ধ। আ
ই গোলমাল চিৎকার শুনে নিশুত পাড়া
ম জেগে গেল! 'কি ব্যাপার? কি ব্যাপার?

চোখ রগড়ে জেগে উঠে, এ ওকে জিজ্ঞাসা
করে থাকেব। কোন কোন উৎসাহী ব্যক্তি
বাড়ী থেকে পথে নেমে এসে থাকবেন। এবং
সবশুনে শুভানধ্যায়ী, বিবেকসম্পন্ন কেউ
কেউ এগিয়ে এসে গাড়ীর ভাড়া দিয়ে
দিলেন নিজের পকেট থেকে। এতক্ষণে
সাহেবের জ্ঞান হল—এ বড় শক্ত ঠাঁই। যেমন
কুকুর, তেমনি মুগুর। সাহেব এগিয়ে এসে
'শেকহ্যান্ড' করতে গেল। বাঙ্গালীবাবু
হাত সরিয়ে নিলেন, বললেন দৃপ্তকণ্ঠে,
তোমার মত কাপুরুষের সঙ্গে করমর্দন
করিনে সাহেব। সেদিনের দরিদ্রবান্ধব
অকুতোভয় এই বাবুটিই দ্বারকানাথ।

কিন্তু এ রাগ বেশিদিন থাকেনি এই
বাঙ্গালীবাবুর। সাহেব অচিরেই এই তেজী-
য়ান যুবটির ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।
দ্বারকানাথের সুযোগ্য পত্র প্রভাতচন্দ্র এই
ঘটনাটি সম্বন্ধে একটি পত্রে লিখেছিলেন :
'বৈঠকখানার ঘটনাটি দ্বারকানাথ যখন
প্রথমে কলকাতায় বাস করতে আসেন, তারই
অনতিপরে ঘটেছিল। তিনি তখন থাকতেন
আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর 'ব্রাহ্ম মেসে'। এই
অঞ্চলেই মুসলমান পাড়া লেনে ছিল সেই
মেস। এবং বৈঠকখানা রোড ছিল যাতা-
য়াতের পথে। আমার খুব বাল্যকালে পিতৃ-
দেবের দেহান্ত ঘটে। আজও স্মরণ আছে
সেইদিন যে সমস্ত শোকতপ্ত নরনারীর
আগমন ঘটেছিল আমাদের বাড়ীতে, তার
মধ্যে ছিল এক সাহেব। প্রচুর ফুল নিয়ে
তিনি এসেছিলেন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।
তিনিই কিন্তু আপনার বর্ণিত সেই
দুর্বিনীত সাহেবটি। পরবর্তীকালে তিনি
আমার পিতার বিশেষ ভক্তে পরিণত হয়ে-
ছিলেন এবং শান্ত, শিষ্ট ও ভদ্র। পিতার
মৃতদেহ দর্শনে তাঁর আকুল ক্রন্দনের ছবি
আজও আমার মনে গাঁথা আছে।'

দ্বারকানাথের জীবনে এই ঘটনা কিছু
বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। 'নীল বাঁদরে সোনার
বাংলা করল রে ছারখার — অসময়ে হরিশ
হল, লঙের হল কারাগার — প্রজার আর
মান বাঁচানো ভার'। এক সময়ে জোর করে
নীলচাষ বাংলার চাষীদের শেষ করে ফেলে-
ছিল। এবং যদিও সামান্য, তবু দিকে দিকে
তার বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিরোধ আন্দো-
লন গড়ে উঠেছিল। এই প্রতিরোধ আন্দো-
লনের নায়করা ছিলেন যশোরে দিগম্বর ও
বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গে মুসলমান
নায়ক রফিক মণ্ডল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের
সত্তানা অঞ্চলের ওয়াহবী আন্দোলনের
অন্যতম নায়ক। বৃটিশ সরকার কিছুকাল
কে বন্দী করে রেখেছিলেন। দ্বারকানাথ
র 'অবলাবান্ধবের' শেষ পর্যায়ে (১৮৭৮)
ই মুসলমান কৃষক নীলনায়কের ওপরে
কটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, বৃটিশের রক্ত-
চক্ষুকে উপেক্ষা করে। সারা জীবন তিনি
এমনি গরীবের হয়ে, বোবামানুষের হয়ে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন।

অবহেলিত নিগৃহীত মানবতার জন্য তাঁর
জীবনব্যাপী লড়াই। মেয়েরাই তখন সমাজ-
এর সবচেয়ে অত্যাচারিত জীব। তাদের
দুঃখের অবধি নেই। দ্বারকানাথ তাদের
মরমী বন্ধু। আর দুঃখীজন? দরিদ্র-জন?
বাংলার গ্রামে ঘরের কোণে, সুদূর আসাম
বা উত্তরবঙ্গের চা বাগানের কুলি, আড়-
কাঠিরা যাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধরে নিয়ে
যাচ্ছে, সই দিয়ে একটি কুঁড়ির যাদু-
দীপায় নিশ্চিতকে গ্রেপ্তার নিয়ে যাচ্ছে সেই-
সব অজস্রজনা ভাষাহীন মানুষের গাথা-
লিকা—তাদের জন্যেও প্রাণান্তকর্মী দ্বারকা-
নাথের ব্যথা-বেদনার অন্ত নেই। সহানু-
ভূতির শেষ নেই। এবং তাদেরই নালিশ
একদিন দ্বারকানাথ রাজদ্বারে দরবারে
পৌঁছে দেবার চেষ্টা করলেন। আর যে কাজ
করা উচিত বলে মনে করতেন, সে কাজ
তখনই করতে দ্বিধা করতেন না তিনি।
সে সব রোমাঞ্চকর কাহিনী বলতে গেলে
ভারতসভার কথা এসেই পড়ে। ভারতবাসীর
প্রথম সার্থক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সে গল্প
গোড়া থেকেই বলা ভাল।

চিঠির তারিখ বারই এপ্রিল, আঠারশ'
অষ্টআশি। চিঠি পাঠাবার তারিখ—ঐ বছরের
পাঁচই মে। ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসো-
সিয়েশনের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায় লিখছেন ভারত সরকারের সেক্রে-
টারিকে। লিখছেন, ভাইসরয়-ইন-কাউন্সিল-
এর বিচার বিবেচনার জন্য। বিষয় : আসাম-
এর চা-বাগানের কুলিদের দুরবস্থা এবং
তাদের যেভাবে কাজে ঢোকান হয়, সেই
অব্যবস্থা সম্বন্ধে। সহকারী সম্পা-
দক—দ্বারকানাথ। কিন্তু সেতু অনেক
পরের কথা। আগের কথা, প্রাণের কথা।
অনেকদিন ধরেই সাধারণ বাঙ্গালী মনে
নিজেদের অবলাবাণী ভাষা দেবার একটা
চাপা অব্যক্ত কামনা গুমরে গুমরে
মরছিল। শিবনাথ বলেছেন, 'বঙ্গ দেশের
মধ্যবিত্ত কোন রাজনৈতিক সভা নেই।'
অথচ তাদের অনেক কিছু করার আছে।
বলবার আছে। সভা অবশ্য আছে একটা—
'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন', কিন্তু
সেখানে সব ধনীদের জমায়েত। সেখানে
সভ্য-চাঁদাই পঞ্চাশ টাকা। তা দেখেই ত'
নিম্নবিত্ত বাঙ্গালী দশ হাত দূরে সরে
যাবে। এক জায়গায় মিলে আন্দোলন করবে
কি? যশোরের দুই ভাই—হেমন্ত আর
শিশিরকুমার এই নিয়ে প্রথম গোলযোগ
তোলেন। বললেন, চাঁদা কমাও। পাঁচ টাকা
হোক। নয়ত দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একদল
সভ্য সৃষ্টি হোক। তাদের চাঁদা আট টাকা।
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দরজা
সকলের জন্যে খুলে দিন। কর্মকর্তারা
সশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গোপনে আলাপ
আলোচনা হল। কিন্তু তাঁরা দাবীটা
এড়িয়ে গেলেন।

(চলবে)

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

।। নয় ।।

চার্চের ঠিক সামনে সেই পাগল। গায়ে কিম্ভূতকিমাকার পোশাক। ছেঁড়া তালিমারা উচ্ছিষ্ট জামা পাতলুনে ঢাকা শরীর। নোংরা। গালে দাড়ি। চোখ কোটরাগত। বগলে বোচকা। হাতে দমমারা দমের লাঠি। ন্যাকড়া জড়ানো পালক বাঁধা। একটা লম্বা দাঁত ঠোঁটের ফাঁকে বের হয়ে ঝুলছে। সে বিকেল থেকেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আর কেবল হুকছে, দম মাথা দম শুগলা মাথা দম।

এখন চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে সে মাথায় রুমাল বাঁধছে। মাথার ওপরে কাক উড়তে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কারণ এরা বড়ই তাকে ঠোকরায়। তার এখন শত্রুপক্ষ বলতে শহরে এরাই। আর সব মেরে এনেছে। কুকুর বেড়াল সে ঠেঙিয়ে সব তাড়িয়েছে। হাতের লাঠিটা যাদুমন্ত্রের মতো। সে ডাস্টবিনের পাশে ঘোরাফেরা করলে ভয়ে আর কেউ ত্রিসীমানা মাড়ায় না। কিন্তু কাগেদের বেলায় তার জারিজুরি খাটে না। এরা কোত্থেকে এসে সব ছোঁ মেরে তুলে নেয়। এসব কারণে তার মাথা গরম। সে গাছে উঠে কাগের বাসা দেখলেই ভেঙে ফেলে। কদিন ধরে সে এই কাজটা খুব মনযোগ সহকারে করে যাচ্ছে। আজ সকালে দুটো অশত্থ গাছ এবং দেবদারু গাছ খুঁজে সাতটা কাগের বাসা ভেঙেছে। আর সেই থেকেই কাগের তাড়া থেকে বাঁচবার জন্য চার্চের কফিনের মধ্যে কিছুক্ষণ লুকিয়েছিল। সে কফিনটায় শুয়ে থেকে দেখেছে, মরে গেলে সে কতটা লম্বা জায়গা নেবে। খুব বেশি না। মরে গেলে তার এ জায়গাটুকুর অভাব হবে না বুঝেই বের হয়ে এসেছিল। মনে ভারি প্রশান্তি। তখনই দেখল একটা কাগ আবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে আসছে। মাথা-ফাতা ঠুকরে না দেয়, ঠুকরে ঘিলু তুলে না খায়, খেলেই মাথাটা ফাঁকা হয়ে যাবে। বড় ভয় তার। ফাঁকা মাথা নিয়ে আর যাই করা যাক এমন চোর-জোচ্চোরের শহরে ঘোরাফেরা করা যায় না। কখন তবে কে তার সর্বনাশ করে বসবে। তার একটু সতর্ক থাকা দরকার। এবং এখন একমাত্র কাজ দামী মস্তিষ্ককে রক্ষা করা। এর মধ্যেই ঘিলু পোরা আছে। কাগেরা মস্তিষ্কের ঘিলু খেতে খুব ভালবাসে। প্রথমে রুমাল, পরে গামছা, তারপর বোচকা-বুচকির যত সংগ্রহ করা ন্যাকড়া সব মাথায় পেঁচিয়ে ওটাকে ঢাউস কুমড়ো-পটাস বানিয়ে ফেলল। —খা শালারা, কত খাবি খা। কত ঠোকরাবি ঠোকরা। ও বাপ এই বজ্রতালু ভেদ করা আর তোগো কম্ম নয় বাপ। মাথাটা ভারি নিরাপদ ভেবে সঙ্গে সঙ্গে দুটো ডিগবাজি।

একটা ডিগবাজি খেতেই স্বাদ পেয়ে গেল। চোখ ঘুরে যায়, উল্টে যায়, মাথা ঘুরে যায়, বড়ই নেশার মতো লাগে। সে পর পর ডিগবাজি খায়। কাঠের মেরাজ পার হয়ে ডিগবাজি খায়, ট্রাম লাইন ফাঁকা পেয়ে *সে সম্রাট সিজার হয়ে যায়। সবই তার দখলে। সে সেখানেও ডিগবাজি খায়। তারপরই অগুনতি বাসের ভিড় জটলা। কারা তেড়ে আসে। সে দৌড়ে যায়। যেন বলে, আমার কোন ভোগ দখলের স্পৃহা নেই বাপু, সব তোদের দান করে দিলাম। যা এবার লুটে-পুটে খা।*

তারপর সে আর যানবাহনের জন্য মানুষের জন্য প্রতীক্ষা করছিল না। এখন এক পাগলিনীর জন্য তার প্রতীক্ষা। তার আসার কথা। সে তার জুড়িদার এই শহরে। সকাল থেকেই দেখছে না। সে কাছে থাকলে সাহস পায়। তার মনোযোগ বাড়ে। আকর্ষণ বাড়ে। মারামারি করতে পারে। মনুষ্যকুলে এই একজনই তার বলতে গেলে সম্বল— যার সঙ্গে মিনি মাগনায় শুতে পারে। কখনও খেতে পায়।

বর্ষাকাল, অথচ কদিন বৃষ্টি নেই। খাঁ খাঁ শুকনো আকাশ। প্রখর উত্তাপ। প্রখর উত্তাপে তার সঙ্গিনী গায়ে জামা কাপড় রাখতে পারে না। নগ্ন থাকে।

কতবার সে কোমরে গামছা বেঁধে দিয়ে বলেছে—ঢেকে ঢুকে রাখ, কাগের উপদ্রব বেড়েছে। ওটা ঠুকরে তুলে খেলে মজা বুঝবি।

ঠিক তখনই চার্চের সামনে এক শববাহী শকট। কাচের ভেতরে কালো বোরখা পরা বিবির মতো কফিনটা লম্বা। সোনার ঝালরে ঢাকা। কত তাজা ফুল, সুগন্ধ আতর। সে জোরে জোরে নাক টেনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। ধূপকাঠি পুড়ছে। শোকের পোশাকে কিছু যুবক যুবতী। কালো পোষাক পরা সাদা চুলের সেই লোকটা সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। হাতে একটা বই। গায়ে তারই মতো জোব্বা গায় দেওয়া। মরা মানুষ এলেই সে দেখেছে এই লোকটা আসে। খুব মান্যিগন্যি পুরুষ। মরামানুষের কফিনটাকে তুলে নিয়ে যায় কারা। সে তখন গম্ভীর গলায় হেঁকে উঠে বলে—কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়। তারপরই অশ্লীল গালাগাল—লে শালা তের সুখ লুটলিতে গিয়ে এলি না বাপ। যাবি যখন সব নিয়ে যাবি না। শেষে কি বিড় বিড় করে বলতে থাকে—লে বাবা, শালার কিছুই সঙ্গে গেল নাকো! একেবারে ফক্কা। তারপরই ভেউ ভেউ করে কান্না, ওখানটায় গিয়ে তোরে কে দেখবে গ। তোর সঙ্গে কেউ গেল না, কি হবে গো!

যাতায়াতের পক্ষে বড়ই বিঘ্ন এই পাগল। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা পর্যন্ত দায়। কে একজন হেঁকে উঠল, এই উজবুক, ওঠ রাস্তা থেকে। গাড়ি চাপা পড়বি তো। রাজার বাড়ি থেকে গাড়ি বের হচ্ছে। কোটিপতি মানুষের বৌ যাচ্ছে গাড়িতে, সেই গাড়িটা পর্যন্ত ছোঁয়াচে পড়ে যাবে ভেবে পাগলকে রাস্তা বাঁচিয়ে চলে যায়। তখন দিগ্বিজয়ী বীরের মতো হাসে—হা হা হা। জয় জয় হে। জয় দাও প্রভু, কৃপানাথের। জয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের। সে কোঁচ থেকে এক এক করে বাতাসে উড়িয়ে দেয় পাখির পালক। এক মরা কাগের ছানাও সে উড়িয়ে দেয় হাওয়ায়। ওটার গন্ধেই কাগগুলি তার পিছু তাড়া করেছিল। সে এতক্ষণে এটা *টের পেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাথায় জড়ানো বোচকাবুচকি খুলে দেখতে থাকল। পাগলিনী একটা ভাঙা ঠেলাগাড়ির নিচে শুয়ে সব দেখছে আর মুচকি হাসছে। তারপর কি ভেবে উঠে এক দৌড়। সেই ছানাটা হাতে দুলিয়ে যেন বাজার করে ফিরছে মতো ঠেলাগাড়ির নিচের আস্তানায় গিয়ে ঢুকে পড়ল।*

কবে কোন এক বুড়ো নির্জীব ঠেলাওলা ওটা রাস্তার ধারে ফেলে চলে গেছিল। ছেঁড়া ত্রিপল ফেলে চলে গেছিল। পাগলিনী ভারি মজা ভেবে ঠেলাগাড়ির ও... দৌড়া-দৌড়ি করেছে কতদিন। তারপ... টা আরও ওপরে তুলে নিয়ে রাজবাড়ির পাঁচিলের পাশে উঁচু মতো জায়গা দেখে ফেলে রেখেছে। বড়ই পরিত্যক্ত ভূমি। সব আবর্জনার আস্তাকুঁড় জায়গাটা। এখন সেটা আশ্রয় তার। সে রোদ বৃষ্টিতে তার নিচে শুয়ে থাকে। ঘুমিয়ে থাকে। ত্রিপলটা দিয়ে ঢাকা বলে কেউ দেখতে পায় না গাড়ির নিচে বসে সে কি করছে! কি খাচ্ছে!

কাগগুলি এখন আর সেই পাগলের মাথায় নেই। পাগল হরিশ নিশ্চিন্তে হেঁটে গিয়ে সেই দেবদারু গাছটার নিচে বসল। পোড়া বিড়ি বের করল ঝোলাঝুলি থেকে। কাগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তার রাজ্য জয়ে বের হবার ইচ্ছা। বের হবার আগে দম নিচ্ছে বসে বসে।

তখনই বাস ট্রামের লোকজন দেখতে পেল, কাগেরা যুদ্ধ বাধিয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কাগ উড়ে এসে সেই ত্রিপলে ঢাকা পরিত্যক্ত ঠেলাগাড়িটায় ঝাপটা মারছে। ঠোকরাচ্ছে। নিশ্চিন্তে কেউ নিচে বসে কাগের ছানার পালক ছাড়াচ্ছে, লোকজনরা কেউ আর টের পাচ্ছে না। এমন একটা কাগেদের যুদ্ধ— প্রায় যেন পঙ্গপাল নেমে আসছে, আকাশ

হয়ে গেছে, পুলিশরার সব কাগ
র ইতরামিতে আতঙ্ক হয়ে যেন শহর
। করতে আসছে। আশেপাশের
রা তো ভয়ই পেয়ে গেল। মন্ত্রিসভার
বৈঠক চলছিল, পুলিশ তখন খবর
দ্যার, কাগেরা শহর আক্রমণ করছে।
খবরে দমকলবাহিনীকে ছুটে যেতে
হল। খবরের কাগজ থেকে সাংবাদিক
। সঙ্গে ফটোগ্রাফার। বড় বড় হরফে
জন্য বার্তা সম্পাদক কি হেড-লাইন
য়ায় ভাবতে ভাবতে পায়চারি শুরু
দল। জনগণ খবরটা খাবে। কিছুদিন
খবরের বড় আকাল চলছে। এখন
দিয়ে মজাদার হেড-লাইন না করতে
। কাগজ কাল সকালে মার খেতে
সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সালে এই
আক্রমণ ঘটেছিল, কাগের সংখ্যা কত,
রচিত্র রকমের স্বভাবের কাগ আছে,
চরিত্রে মনস্যা চরিত্রের সঙ্গে কোথায়
এই নিয়ে একটা চতুর্থ পাতায় ফিচার
। জন্যও নানারকমের কাগ চরিত্রসহ
সাইক্লোপিডিয়া সংগ্রহে যেতে গেল
। কাগজের সাঁতারুরা।

তৎক্ষণে পাগলিনী সতীবিবির পালখ
া শেষ। আগুনে জ্বলল নিচে। খড়
ড় বাচচাটাকে পুড়িয়ে নিল। তারপর
স গিলে ফেল কাগের রোস্ট। বড়ই
ু খাবার। জনগণেরা তখন ভারি ভিড়
। ট্রাম বাস জ্যামে পড়ে গেছে।
নদার, দালাল, ফেরিয়ালা, নাটাকার,
সাংবাদিক অঞ্চলের যে যেখানে ছিল
এসে দেখল, কাগেরা চলে যাচ্ছে।
মাংসপোড়া গন্ধ কমে আসতেই
। সব চলে যেতে থাকল। সামান্য
উঠছিল ত্রিপালের ফাঁক ফোকরে।
াইপে জল মারতেই এক মূর্তিমান
তা কল্লোলিনী। সবাইকে দাঁড়িয়ে
চ্যাংচাচ্ছে। আসলে এটা কাকতালীয়
। ভাবল শহরের লোকেরা। কেউ কেউ
কাগেরা যুদ্ধ করলে দেশে প্লাবন দেখা
জ্যোতিষিরা বললেন, শনি ও রাহু
রয়েছে। আগামী দশই জুলাইর মধ্যে
পর এক গ্রহ গিয়ে সিংহে সন্নিবিষ্ট
। রবি ৪ জুলাই, শুক্র ৭ জুলাই,
তি ৯ জুলাই এবং বুধ দশই জুলাই
মিলিত হচ্ছে শনি ও রাহুর সঙ্গে।
ুলি গ্রহ সন্নিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
র্ক বিবাদ বিসম্বাদ স্বাভাবিক। এই
বিসম্বাদের ফলে আর কিছু না হোক
দের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে
রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিতে
, মধ্য এশিয়ায় ও আফ্রিকায় রক্তপাত
ত পারে। রাজনৈতিক উত্থান পতনেরও
াবনা আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ
তের কোন কোন অংশে ভূমিকম্প,
তিক দুর্যোগ, মহাপ্লাবনের আশংকা
হ।

পাগলের এতসব জানার কথা নয়। তার
। শুধু সঞ্চয় করে যাওয়া। সে রাস্তার
দুই ধোজার জিনিস ভাবে না। যা পায়
সঙ্গে নিয়ে নেয়। ভাঙ্গা খুরি হাড়ি
পাতিল, দেশলাইর বাকস, প্ল্যাস্টিকের ছেঁড়া
ব্যাগ সবই তার বড় দরকারী। সে তার সঞ্চয়
কোথাও ফেলে যায় না। দিনকে দিন সঞ্চয়
বাড়তে বাড়তে ওটা ভারি একটা বস্তা হয়ে
গেছে। মাথায় তুলতে কষ্ট হয়। সেজন্য
সে মাথা থেকে নামাতে ভয় পায়। মাথায়ই
থাকে। এবং ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। শিরাগুলি
শক্ত হয়ে যায়। তবু সে মাথা থেকে নামাতে
সাহস পায় না। কে আবার তুলে দিতে এসে
ছিনতাই করে দেবে তার চেয়ে এই ভাল বাবা
মাথার জিনিস মাথায় থাক। কিছুই ফেলা
যায় না। সেজন্য সে নারকেলের মালা এবং
সিগারেটের বাকস দিয়ে মালা গেঁথে গলায়
পরেছিল। পিঠে পুরাতন জামার নিচে পচা
ঘামের গন্ধ। সে রাস্তায় জ্যাম দেখে, ভিড়
দেখে, মানুষের পাগলামি দেখে হাসছিল।
পাগল হেসে হেসে সবাইকে বলছিল,
দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। সে অন্য
কোন সংলাপ খুঁজে পাচ্ছিল না। সে এই
একটা কথাই এখন পর্যন্ত মনে রাখতে
পেরেছে।

কিন্তু তার বোচকার কথা মনে পড়ে
গেল। দম মাধা দমের লাঠিটার
কথা মনে পড়ে গেল। মানুষের
ভিড় দেখে মনে হয়েছিল এরা তার
এতদিনের সঞ্চিত সব তৈজসপত্র
ছিনতাই করে নেবে। সে বোচকা এবং দম-
মাধাদমের লাঠি ফেলে দেবদারু গাছটার
নিচে ছুটে এসেছিল। তার বস্তাটা মাথায়
নিয়ে দাঁড়াতেই মনে পড়ল, ওগুলো সে
কোথায় যেন রেখে এল। এত সম্পত্তি ফেলে
রাখা ঠিক না। এতে বিপত্তি বাড়ে। কোনটা
ফেলে সে কোনটা রক্ষা করবে বুঝতে পারছে
না। বস্তাটা মাথা থেকে নামালেই এটা তার
সম্পত্তি থাকবে না এমন মনে হয়। মনে হয়
সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে যাবে। এত কষ্ট
করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
কি দরকার ছিল সম্পত্তি বাড়াবার।
একটু উদার হওয়া যায় না। এই দিয়ে
থুয়ে সে হাল্কা হতে পারে। ভাবতেই ধপাস
করে ফেলে দিল মাথা থেকে বস্তাটা। সে
লাঠিটা খুঁজতে ছুটে গেল। ওটাতে সে
কাগের পালক বেঁধে রেখেছে। বড়ই মূল্য-
বান বস্তু। হারালে সে বংশে নির্বংশ হবে।

মানুষের বংশে নির্বংশ হওয়া ভাল
কথা না। লাঠিটা না থাকলে সে নির্বংশ
হতে পারে ভেবে খুবই বিচলিত বোধ করল।
যেন বড়ই আত্মান্তরে পড়ে গেছে। তখন
বাস যায় ট্রাম যায়, মানুষের মিছিল যায়।
আর দেখে আস্তাকুঁড়টা ক্রমেই বড় হয়ে
যাচ্ছে। যেন মানুষের বংশে আস্তাকুঁড়টা
এই শহরের যা এখনও সুখি পায়রা সম্বল
আছে সব পুড়িয়ে খাবে। সে সেটা কিছুতেই
হতে দেবে না। লাঠিটা বগলে থাকলে কাগের
পালক বাঁধা থাকলে কোন দুষ্ট প্রভাব কাছে
ঘেঁসতে পারবে না। সেটা কাঁধে নিয়ে
বেড়ালে মানুষের মঙ্গল হবে। এই মানুষের
মঙ্গল হবে ভেবেই সে লাঠিটার খোঁজ
করছে এত করে। দেখলে মনে হবে তন্ন তন্ন
করে খুঁজছে সারাটা রাস্তা। বুড়োটা চুরি
কর নেয়নিতো আবার। লোকটাকে সে কিছু-
দিন থেকেই খুব সন্দেহ করছে। কোত্থেকে
এসে তার জায়গাটা দখল করে বসে গেল।
সঙ্গে পুরুস্ট মাইয়া আছে একখান। মার
কয় চারু।
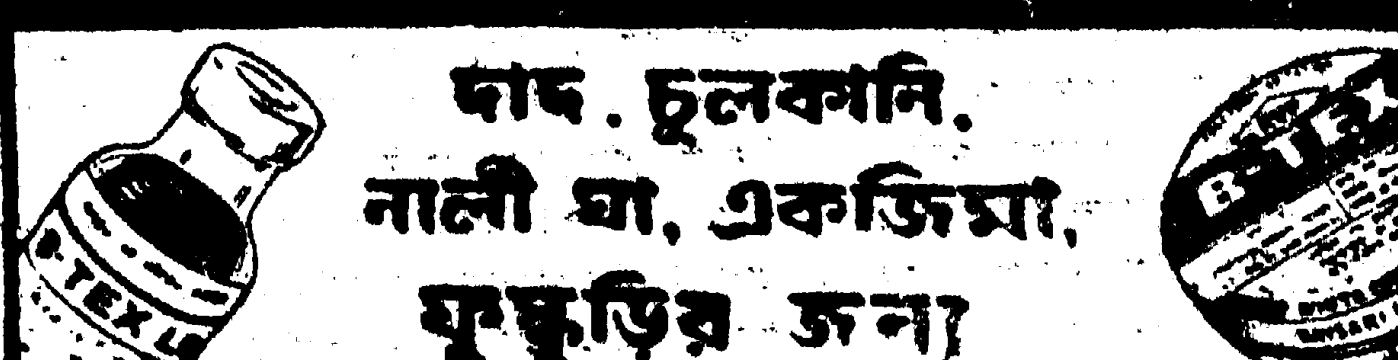
তখন সূর্যের প্রখর উত্তাপ কমে
আসছে এবং ছায়াবিহীন এই পথ। ফুটপাথে
অথবা গাড়িবারান্দায় যারা রাত যাপন করছে
যারা ঠিকানাবিহীন, যাদের তৈজসপত্র
ছেঁড়া নোংরা এবং পাগল হরিশের মতো
প্রাচীনকাল থেকে সব সংরক্ষণ করছে তারা
এখনও অন্নের জন্য ফেরব্বাজের মতো
ঘোরাফেরা করছে। ছেঁড়া সব তৈজসপত্রের
ভিতর শুধু এক অতিকায় বৃদ্ধ, মুখে দাঁড়ি
শনপাটের মতো এবং সাদা মিহি চুল আর
অবয়বে রবিঠাকুরের মতো বে, কপালে হাত
রেখে শেষ সূর্যরশ্মি আকাশে দেখার চেষ্টা
করছিল। কিছুদিন থেকে হরিশ এই লোক-
টাকে সন্দ করছে। সঙ্গের ডবকা ছুঁড়িটা
উদোম গায়ে পড়ে থাকে। গা আলগা করে
রাখে। এরই দম-মাধদমের লাঠিটা গায়েব
করতে পারে। লাঠিটার যাদুটোনা টের পেয়ে
গেছে বুড়োটা। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও
যখন পেল না, তখনই বুড়োটার সামনে এসে
ঊর্ধ্ববাহু হয়ে গেল। এটা তার একটা
প্রশ্নের তরিকা। ঊর্ধ্ববাহু হলেই বুঝতে
হবে সে কিছু ফেরত চায়।

বুড়োটা বলল, আমার কাছে কিছু
নেই।

হরিশ কোমর দোলাল। অর্থাৎ আছে।

বুড়োটা বলল, নেই, কিছু নেই।

হরিশ আরো জোরে ডাইনে বায়ে কোমর দোলাল। অর্থাৎ আছে, আছে। দাও। না দিলে অমঙ্গল হবে। মনুষ্য জাতি বিলোপ পাবে। ওটা বড়ই প্রয়োজনীয় দ্রব্যবস্তু।

তখন বুড়োটা বিরক্তিতে অতিকায় বৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকল। গায়ে কি পচা দুর্গন্ধ।—সরে দাঁড়া সরে দাঁড়া। বলে একটা ঠ্যাংগা নিয়ে তেড়ে গেল।

হরিশ ঊর্ধ্ববাহু হয়েই দাঁড়িয়ে থাকল। নড়ল না।

ফুলি বলল, কি সুন্দর দিন। আমার এই ঘাসে এখন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। ফুলি রাজবাড়ি থেকে বের হয়ে এখানে একটু প্রেম করতে চলে এসেছে।

সত্যি সুন্দর দিন। বর্ষাকাল, অথচ কি নির্মল আকাশ। ঠিক শরতের আকাশের মতো। ফুলি মাঠের ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছিল। পাশে তার সুন্দর যুবক সুনন্দ। সে তার হাত ধরে হাঁটছে। এ-সময়ে পৃথিবীটা মানুষের কাছে কত পবিত্র হয়ে যায়। ওদের হাঁটা চলা কথাবার্তা থেকেই ধরা যাচ্ছিল, এরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। ওরা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। তারপর দুজন দুজনের মুখ দেখল।

ফুলি সারাটা বিকেল শুধু আজ আয়নায় মুখ দেখেছে। বাথরুমে সুগন্ধ সাবানে চান করেছে। মা বলেছে, অত সময় ধরে চান করছিস কেন ফুলি। ফুলি মুখে জল নিয়ে ফুৎ করে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, ঠান্ডা জলে চানে কি আরাম। আহা সেই মানুষ আজ আবার তার জন্য কোন গাছের নিচে অপেক্ষা করবে বলেছে। কতদিন থেকে সে এমন আশা করতে করতে বড় হচ্ছিল। তার থাকবে একজন সুন্দর প্রেমিক। যে সহজেই বলবে, ফুলি তুমি কি সুন্দর। চল না কোন জ্যোৎস্না রাতে আমরা কোন গভীর অরণ্যে চলে যাই।

ফুলি তারপর কার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল, সেই লতাপাতা আঁকা সিল্কের শাড়িটা। তার এক মাথা চুল। চুলে শ্যাম্পু দিয়েছে। ওর ফাঁপা চুল ঘন নীল রংয়ের হয়ে যায় তখন। প্রতিটি লমকূপ থেকে চুলের গভীর সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। সে এটা টের পেলেই, লা লা করে গান গায়। তার অহংকার বলতে এই ঘন নীল রংয়ের চুল। ছেড়ে দিলে একেবারে হাঁটু অব্দি নেমে যায়। সুনন্দ ফুলির সারা মাথা ভরা এক প্রকান্ড সবুজ বাবুইর বাসাটার দিকে হাত দিতে গিয়ে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল।

ফুলি বলল, এই কি হচ্ছে।

—একটু দেখি না।

—না এখন না।

সুনন্দ বলল, একদিন দেখ ঠিক আমি মরে যাব। আমি তোমার কিছুই পাব না।

সুনন্দর এই বোকা বোকা কথা ফুলির বুকে কেমন আগুন ধরিয়ে দেয়। সে বলে, দাদা তোমাকে আমাদের বাসায় আসতে বারণ করেছে?

কৈ না তো!

—তবে তুমি যে সেদিন এলে না?

—সেদিন মানে?

—সব ভুলে যাও কেন। তুমি বললে না, রবিবার বিকেলে যাব।

—ও সেই কথা।

—যাব ভাবলাম, কিন্তু পরে মনে হল, গিয়ে কি হবে। সবাই বাড়ি থাকলে গিয়ে কি লাভ।

—ঐ একটাই বোঝ। আর কিছু বোঝ না। আর আসছি না দেখ।

সুনন্দ পায়ের শাড়ি সামান্য তুলে দেখল ফুলির। কি সাদা আর মাখনের মতো নরম উরু।

ফুলি শাড়িটা নামিয়ে দিল জোর করে। —তুমি কি! মানুষ জন আছে না।

—অতদূর থেকে কেউ বুঝতে পারবে না।

—ঐ দেখ, একটা ঘোড় সোওয়ার পুলিস।

সুনন্দ দেখল, দূরেই ঘোড় সোওয়ার পুলিস। ঘোড়ার মুখটা তাদের দিকে। কদম দিচ্ছে। সে একটু সরে বসে বলল, কি বলে বাড়ি থেকে বের হলে।

—যা বলে বের হই।

—কিন্তু যদি ধরা পড়।

—কি হবে তবে? বলব, সুনন্দদার কাছে গেছিলাম। তারপরই বলল, রাজ-বাড়িতে জানো একটা মানুষের অ্যামব্রয়ো পাওয়া গেছে। আস্তাকুঁড়ে পড়েছিল।

ফুলির উচ্চ মাধ্যমিকে বায়োলজি আছে। সেই সুবাদে ভ্রূণ টুণ না বলে এমব্রায়ো বলল। যেন ফুলি কত অভিজ্ঞ—এবং সে বলল, জানো আমার আর পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না। তোমাদের বাড়ি থেকে কিছু অমত হবে।

সুনন্দ বলল, এখনও আমার দুই দিদির বিয়ে বাকি—তুমি তো সব জান।

—তা হলে আমরা কতদিন এ-ভাবে থাকব।

—দিদিদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত।

—কবে ওরা করবে।

—করবে মনে হয়। কারণ ওরাও তো তোমার মতো অধীর।

এ-সব কথা হামেসাই এ-শহরের উঠতি যুবকদের, যুবতীদের এবং এরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের যারা তাদের এই পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার এবং বড় মাঠটা সম্বল। দূরে দূরে যতদূর চোখ যায়, কোথাও তরুন যুবকেরা খেলা করছে—কোথাও ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে, কোথাও জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে। মহারাণীর স্মৃতিসৌধটির পাশে এমন সব যুবক যুবতী গাছের নিচে বসে উত্তেজনায় অধীর হচ্ছে। চোখ মুখ জ্বলছে। এই বয়সে তাদের আর কি করণীয়। কিন্তু তারা জানে তাদের অনেকেরই এক স্বপ্ন-সমুদ্রে শুধু ভেসে বেড়াতে হয়। ইচ্ছেমত তারা গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের জন্য সব সুন্দরী যুবতীরাও বড় হয়, ঘুরে বেড়ায়, তারা শুধু দেখে যায়। সুনন্দ দেখল নদীর পাড়ে সূর্যাস্ত হচ্ছে। অসংখ্য পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। চারপাশে নগরীর কোলাহল, বাস ট্রাম এবং স্কাইস্ক্র্যাপার। সে রেড রোডের গোলমোহর গাছগুলি পার হয়ে আরও গভীর মাঠের মধ্যে ফুলিকে নিয়ে ঢুকে যেতে থাকল। ফুলির শরীরে আশ্চর্য লাবণ্য। ওর জংঘায় না জানি কোন মহাসমুদ্র খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে এখনও সেখানটায় হাত দিতে পারেনি। ও একটা ভীষণ ইচ্ছেয় ফুলি কাছে এলেই তার শরীরে কেমন জ্বর এসে যায়। ইচ্ছে হয় কত কথা বলবে, কিন্তু কেমন মূক বধিরের মতো সে শুধু তাকিয়ে থাকে। শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে তাকে ফিরে যেতে হয়—কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর মধ্যে মা বাবা, ভাই বোন সব মিলে এক প্রাচীর তৈরি হয়ে আছে। সেই প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য একটু এগোলেই সংসারে কোথায় কিছু হারিয়ে যায়।

ফুলি বলল, এই আমি ফিরব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

—আর একটু চল না হাঁটি।

ফুলির মধ্যেও মানুষের সঙ্গ পেলে যা হয়—এক জলোচ্ছ্বাস ঘটছে। সে সেটা টের পাচ্ছিল। সে হাঁটতে পারছিল না। কেমন শরীরে আশ্চর্য জড়তা নেমে আসছিল এবং সে নিজেকে নিজেই ভয় পাচ্ছিল। শেষে তো সেই এমব্রায়ো। ওটার জন্য সে জানে খুব ভাববার নেই। কিন্তু অস্পষ্ট অন্ধকারেও সে বুঝল, কোথাও এই শহরে একটু নিরিবিলি জায়গা নেই—যেখানে সে এবং সুনন্দ মুহূর্তের জন্য এক হতে

তে পারে। ফুলি অন্যমনস্ক হবার জন্য
ল, এই প্রিয় শহরে আমরা একদিন
ড়া হয়ে যাব। ভাবতেও কেমন ভয়
গ।

সুনন্দ বলল, বুড়ো হতে দিচ্ছি না।

—তুমি না দেবার কে! জান আমার মা
ন কেমন হয়ে গেছে। কি সুন্দর না ছিল
খতে। আমার বয়সে ঘরে একটা ফটোতে
ক মধুবালার মতো সুন্দর লাগছিল।
ই মা কেমন হয়ে গেছে দেখতে। জান
মার কেবল ভয় করে আমিও একদিন
ক মার মতো হয়ে যাব।

সুনন্দ দেখল এখন ওরা অনেকটা মাঠের
ভীরে ঢুকে গেছে। বলল, এস আমরা
পাশাপাশি এখানে শুয়ে থাকি।

—পুলিশ ধরুক আর কি।

সুনন্দ বলল, বড়ই দুঃসময় চলে
চ্ছে। এই দুঃসময় আমরা শুধু পালিয়ে
লবাসছি। জানো রাতে তোমার কথা
বতে ভাবতে কেমন অস্থির হয়ে যাই মা
বা দিদি সব কেমন দূরের মনে হয়। যেন
তদিন যে বড় হওয়া সে শুধু তোমার
ন্য।

ভালবাসার কথা সাধারনত এই রকমেরই
য় থাকে। কাজেই নতুনত্ব কিছু নেই।
নন্দদের সময়ে এই কথা, তার আগেও এই
থা, তার আগেও এই কথা। আগামী জন্ম
ন্মান্তরে এই কথা। এইভাবেই মানব
লক থেকে যুবক হয়, যুবক থেকে প্রবীণ,
তারপর বুড়ো। তখন ঈশ্বর দরকার হয়।
নুষের কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয়
ড়ই দরকার। এখন সুনন্দর আশ্রয় এই
ফুলি।

সুনন্দ পাশে বসে দাঁতে ঘাস কাটতে
টতে এ-সব ভাবছিল। ফুলির দাদা ওর
ঙ্গে পড়ত সুরেন্দ্রনাথে। ওর দাদা ভাল
বিতা আবৃত্তি করতে পারত। নাটক করতে
রত ভাল। একবার একটা কবিতাও
লখেছিল কলেজ ম্যাগাজিনে। সে-কবিতাটা
ড়ে ফুলির দাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।
লাপ, ভাব, তারপর বন্ধুত্ব। ওর দাদা
। কিছু লিখত প্রথমেই তাকে সেগুলো
খাত। সুনন্দর মনে হত, ফুলির দাদা
বীঠাকুর না হয়ে যায় না। অশেষ গুণ
াছে তার। কিন্তু এখন সে সব ছেড়ে-ছুড়ে
য়ে একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা
রছে। আর সুনন্দ এই নিয়ে আঠারবার
নটারভিউ এবং প্রথম প্রেম। ফুলির সঙ্গে
ার প্রেম চলছে। সে ভেবেছে মরে যাবে
ফুলির জন্য। একটা কিছু করে ফেলবেই।
প্রেম নিয়ে সে ছেলেখেলা করতে ভরসা
পাচ্ছে না।

—এই শোন। ফুলি সুনন্দর হাত ধরে
লল।

—কী?

—বাবা সেদিন তোমার কথা দাদাকে
বলছিল। সুনন্দর খবর কিরে! দু-তিন
হপ্তা হল আসছে না।

—সুধীন কি বলল।

—বোধ হয় কাজে আটকা পড়েছে।

একবার খোঁজ নিলে হয় না। ওরা
তো বেলঘরিয়ায় থাকে। রিফুজী কলোনিতে
ওর বাবা বাড়ি করেছে।

ফুলিদের পরিবারে রিফুজি জল চল
নয়। প্রথম প্রথম সুনন্দকে বাঙ্গাল বলে
বাড়ির সবাই ঠাট্টা তামাসাও করেছে। এবং
জল চল নেই বলেই ফুলির বাবা প্রথম দিকে
সুনন্দর আসা খুব পছন্দ করত না। কিন্তু
বছরখানেক ধরে অন্যরকম। অফিসে তার
বস বাঙ্গাল। সিট মেটালে নতুন ম্যানেজার
এসেছে সেও বাঙ্গাল। প্রাইভেট অফিসের
স্যার বাঙ্গাল। একেবারে দেশটা ক্রমেই
বাঙ্গালে বাঙ্গালে ছয়লাপ হয়ে যাচ্ছে।
যেখানে যাও, অফিসে ব্যাংকে, ট্রামে বাসে
শুধু বাঙ্গাল ছাড়া মুখ দেখা যায় না।
আত্মীয়-স্বজনদের মেয়েরাও এখন বাঙ্গাল
বিয়ে করতে ব্যস্ত। তার দিদির দুই মেয়েই
ভালবাসাবাসি করে অফিসের দুই বাঙ্গালকে
বাড়ি তুলে এনেছে। তার বোনের নন্দাই
মেয়ের বিয়েই দিয়েছে বাঙ্গাল দেখে।
বাঙ্গালরা নাকি খুব করিতকর্মা হয়। মেয়ে-
দের বিয়ে দাও তো বাঙ্গাল খোঁজ। ছেলে-
দের বিয়ে দাও তো স্বজাতী দেখে দাও:

এইসব কারণে সুনন্দর ওপর ফুলির
বাবার বেশ স্নেহ ভালবাসা জন্মাচ্ছিল।
এ-জন্য অভাবের সংসারে দুবার নিমন্ত্রণ
করেও খাইয়েছে। সুনন্দ একটা চাকরিও
করছে প্রাইভেট ফার্মে। তবে সে ব্যাংকে
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর আশা ব্যাংকে সে
একটা কাজ পেয়ে যাবে। ফুলির বাবা আজ-
কাল ঠনঠনে দিয়ে আসার সময় শরীর ভাল
থাকা নিয়ে যখন মা ঠাকরুণকে মাথা ঠোকে
তখন সঙ্গে সুনন্দর ব্যাংকের চাকরিটার
কথা মাকে মনে করিয়ে দেয়। —তোমার
তো মা সবাই সন্তান। সন্তানের সখ-আহ্লাদ
তুমি না মেটালে কে মেটাবে। মা মাগো
তোরই ইচ্ছা সব। তারপরেই মনে হয়,
মুখটা খালি, দোক্তাপান খাওযার ভারি
বদভ্যাস। পাশের পানের দোকান থেকে
একটা পান, হাতে কিছু জর্দা নিয়ে হাঁটা
দেয়। এ-সব অবশ্য ফুলিই বলেছে
সুনন্দকে। —মনে হয় বাবা তোমাকে এখন
পছন্দ করছে। সেই সুবাদে সব ঝেঁটিয়ে
সেদিন ফুলির বাবা পরিবারবর্গ নিয়ে
দক্ষিণেশ্বরে চলে গেল। ফুলি বাড়ি পড়ে
থাকল একা। সুনন্দর সেদিন আসার কথা।
ফুলির মনে হয়েছিল, বাবা ভুলে গেছেন।
মাও। দাদারা তো রাত দশটার আগে বাড়ি
ঢোকে না। কেবল সুনন্দ ওকে জড়িয়ে
আদর করার সময় বলেছে, তুমি একা। ওফ্
কি যে ভাল লাগছে না।

সেই থেকেই ফুলির কাছ থেকে সুনন্দ
এটাওটা চেয়ে নেয়। সব চাইলেই অবশ্য
পাওয়া যায় না। কুমারী মেয়ের নিরাপত্তার
বিঘ্ন ঘটতে পারে। নিরাপত্তার বিঘ্ন না
ঘটিয়ে যতটা দেওয়া যায়, ফুলি সুনন্দ কিছু
চাইলে সেইটুকু দেয়। তার বেশি না। সে-
জন্য সুনন্দ যে ছবি উঠে যাচ্ছে তার শেষ
শো দেখে। হল ফাঁকা। অনেক কিছু এখন
চাওয়া যায়। সে-জন্য সুনন্দ কখনও
অপরিচিত রেস্তোরাতে ফুলিকে নিয়ে বসে।
পর্দা টেনে দেয়। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু
খায়। ফুলি তখন শরীরের সঙ্গে একেবারে
মিশে থাকতে ভালবাসে। এইভাবে মাস
ছয়েক ধরে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন
ব্যাংকে শুধু একটা চাকরি। ওটা হয়ে গেলেই
সে নদীর পর ধরে আর হেঁটে যাবে না।
নদীটা সোজাসুজি অতিক্রম করবে। এবং
সেখানেই সে প্রথম এক গভীর অরণ্য দেখতে
পাবে। ফুল ফল লতাপাতা, ঝড় বিদ্যুৎ
প্রবাহ, শ্বাপদ সংকুল এক অরণ্য। নিয়তি
মানুষকে শেষ পর্যন্ত সেখানেই টেনে নিয়ে
যায়। সুনন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,
তুমি মা হয়ে যাবে, আমি বাবা হয়ে যাব।
দাঁত নড়বড়ে হবে—তবু ফুলি আমরা
যুবকেরা যুবতীরা কি এক তাড়নায়
সেখানেই শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হই।
এইটুকু বলে সুনন্দ ঘাসের উপর সত্যি
শুয়ে পড়ল। সে যেন বলতে চাইল এইভাবে
নিয়তি আমাদের কবরের দিকে নিয়ে যায়।

ফুলি মাথার কাছে বসে বলল, এই
শুলে কেন?

সুনন্দ বলল, কত নক্ষত্র না আকাশে?

ফুলি বলল, লক্ষিটি ওঠো।

সুনন্দ বলল, তুমি যাও।

ফুলি তখনই বলল, দ্যাখ কারা আসছে।
দু-তিনটে ষণ্ডামার্কা ছেলে।

সুনন্দ দেখল ছেলেগুলি তাদের ঘিরে
ফেলেছে। একজন বলল, দাদা কি করছিলেন
বেশ মজা, না বেশ টিপে টুপে দেখা
হচ্ছে। তারপরই থাই করে মুখে ঘুসি।

সুনন্দ বলল, আমাকে মারছেন কেন?

—প্রেম। শালা প্রেম ছুটিয়ে দিচ্ছি।
এই ক্যাবা দুটোকেই ন্যাংটো করে ছেড়ে
দে তো।

—দেখুন আমরা বেড়াতে এসেছি।

—আর জায়গা পাও না চাঁদু। কি আছে
দেখি।

(চলবে)

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বিস্ময়। বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যে আছে গীতি-কাব্য, গান, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাত্র লেখকের এত বিরাট, এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাব-গম্ভীর প্রাণস্পর্শী রচনার সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানকে মননের দ্বারা পরিশুদ্ধ করে তা ভাষায় প্রকাশ এবং তার দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ দার্শনিক চিন্তার মৌল লক্ষণ রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্র সাহিত্য চিত্ত-চমৎকারী রস সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও এই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত। দার্শনিক চিন্তা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর বহু অংশে ছড়িয়ে আছে—সেই অর্থেই কবি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলা হয়ে থাকে এবং তা অসংগত নয়। নিছক যাঁরা দার্শনিক তাঁরা তাঁদের বক্তব্যগুলি সূত্রাকারে একটি বা দুটি গ্রন্থে গ্রথিত করে রাখেন, কবি-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা অবশ্য সূত্রাকারে এক জায়গায় আবদ্ধ থাকেনি সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে তাঁর কাব্য নাটক ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তা ছড়িয়ে রয়েছে। ছড়িয়ে আছে বলেই এগুলি সামঞ্জস্যহীন, পারম্পর্যহীন, বা অসংলগ্ন এমন নয়। এই বিকীর্ণ চিন্তাগুলির মধ্যে একটা পারম্পর্য বা যোগসূত্র আছে মনোযোগী রবীন্দ্র পাঠকের কাছে তা অপ্রাপ্য নয়।

বহু বিস্তৃত রবীন্দ্র-রচনার একটি যে বিশেষ বক্তব্য আছে এ সত্য দেশী-বিদেশী রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুরাগীদের জ্ঞান-গোচর হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লোক-লীলা সংবরণের বহু পূর্বেই। পৃথিবীর দার্শনিকমণ্ডলীতে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (পরবর্তী কালে রাষ্ট্রপতি) ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের দর্শন 'ফিলজফি অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে যে যে দার্শনিক চিন্তা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সেগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। তিনি দেখান যে দেশে বা বিদেশে যে সব মনীষী নিছক দার্শনিক রূপে সম্মানিত কবি-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ মৌলিক চিন্তার দাবীতে তাঁদের সমশ্রেণীভুক্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাষার মাধুর্য, কল্পনার অভিনবত্ব অথবা রসের প্রাণস্পর্শিতা তাঁর দার্শনিক চিন্তার অপহ্নব ঘটায়নি। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে ভারতের দার্শনিক সম্মেলন (ইন্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল কংগ্রেস) রবীন্দ্রনাথকে সভাপতির আসনে বৃত করেন। রস-সাহিত্য-স্রষ্টা কল্পনাকুশলী
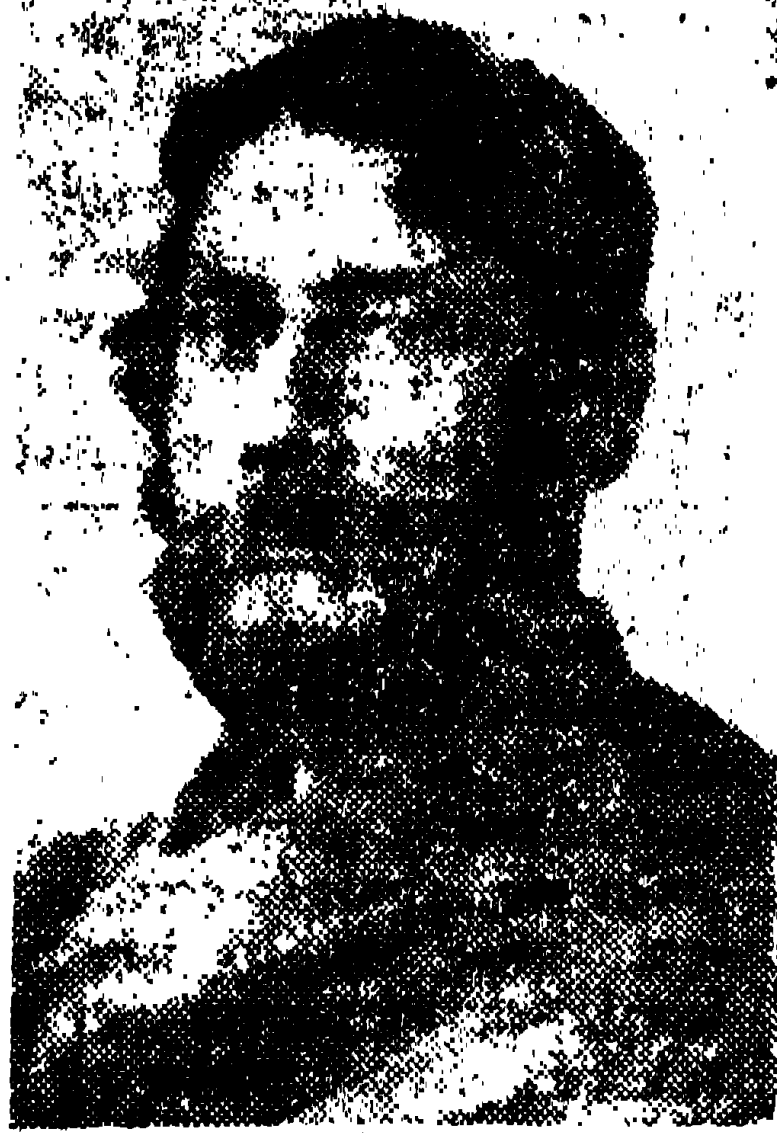
রবীন্দ্রনাথ

কোন কবি-সাহিত্যিককে ইতিপূর্বে আর দার্শনিকরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে কবি অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'হিবার্ট লেকচার' দিতে আহূত হন। তিনি অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর দার্শনিক মতকে সাজিয়ে বলার জন্য। কবি এই অনুরোধ রক্ষা করে তাঁর দার্শনিক চিন্তাগুলি প্রবন্ধ রূপে লিপিবদ্ধ করে ভাষণ দেন। সেই বক্তৃতামালা 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে কমলা ভাষণ মালায় (কমলা লেকচারস) ও কবি তাঁর দার্শনিক মত বাংলা ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করেন—এগুলি 'মানুষের ধর্ম' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি ছাড়াও তাঁর দার্শনিক চিন্তাগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাঁর নানা প্রবন্ধে, শান্তিনিকেতন ভাষণ মালায়—তাঁর গীতিকাব্যে এবং কাব্য-নাটকগুলিতে। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় নিপুণ জহুরীর মত সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে অবগাহন করে রবীন্দ্র চিন্তার মণি-মুক্তাগুলি আহরণ করেছেন। এবং সেগুলি আমাদের কাছে সুবিন্যস্ত করে পরিবেশন করেছেন। প্রকৃষ্ট মনোযোগের অভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবের গভীরতা ও ঐশ্বর্য যেসব সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এ যাবৎ এড়িয়ে গিয়েছে, এই বইটি তাঁদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় মনে হবে। তবে এই পুস্তক পাঠ সঞ্জাত-জ্ঞান শুষ্ক জ্ঞান নয়—এ এমনই জ্ঞান যা পাঠক-চিত্তকে রসাপ্লুত করতেও সাহায্য করে। লেখক রবীন্দ্র-চিন্তা ধারার উপজীব্য বিষয়কে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছেন. এগুলি হল (১) অনুভূতি মার্গের প্রতি পক্ষপাত, (২) বিশ্বর তত্ত্ব বা জীবন-দেবতা তত্ত্ব ও (মানুষের ধর্ম-সমস্যা। লেখক কবিগু উপরোক্ত তিনটি মূল দার্শনিক চিন্ ধারাকে পৃথকভাবে বিবৃত করেই ক্ষা হননি—বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে স্ব রূপে তা পাঠকের সামনে উপস্থি করেছেন।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রচন নূতন নয়, ইতিপূর্বে এর তিনটি সংস্ক নিঃশেষিত হয়েছে। আলোচ্য চতু সংস্করণটিতে গ্রন্থকার কিছু নতুন তথ সংযোজন করেছেন। এতে ওর উপাদেয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ ও রবীন্দ্র-চর্চা যাঁরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছে তাঁরা এই বইটি পাঠ করে তৃপ্তি ল করবেন, সন্দেহ নেই। যাঁরা গভীরভ এ যাবৎ রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়ন করেননি শুধু মনোরঞ্জন অথবা কালক্ষেপণের জন রবীন্দ্র-সাহিত্যের আস্বাদ নিয়ে থাকে তাঁরাও ধৈর্য ধরে এ বইটি পড়লে রবী নাথকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারে ও লাভবান হবেন এটা আশা করতে পা যায়।

এই সুমুদ্রিত সংস্করণ রবীন্দ্রনাথে একটি প্রতিকৃতি বাঞ্ছনীয় ছিল।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগু

রবীন্দ্র দর্শন—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় চতু পরিবর্ধিত সংস্করণ, রবীন্দ্রভার বিশ্ববিদ্যালয়, কলকা , পৃঃ ১৮ মূল্য ১৬.০০

কবি নানালাল

সাহিত্যের জন্য বিশেষ করে কবিত জন্য স্বাস্থ্যবান চাকরি ছাড়ার ঘটনা বো হয় চিরকালই কিছুটা অভিনবত্ব দাবী করে অবশ্য কবি স্বয়ং এই অভিনবত্ব নিয়ে মা ঘামান না। তিনি ডুবে থাকেন নিজে সৃষ্টির সমুদ্রে। যেমন ছিলেন নানালা বিশিষ্ট গুজরাটি কবি ও কবিতা-ভাবন পথিক। শুধু রক্তসূত্রে নয়, চিন্তাসূত্রে পিতা দলপতরামের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবি যোগাযোগ। ঘনিষ্ঠ বন্ধন। আধুনিক গু রাটি কবিতাকে একটা স্বসংসম্পূর্ণ চেহা দেবার জন্য প্রায় গোটা একখানা শতক ধ দুজনে চেষ্টা করে গেছেন। সার্থকতা য খানি এসেছে, তার মূল্যমান রক্ষার দায়িত্ব ভাবীযুগের কবিদের। আমরা দেখি এক পুরাতন যুবককে—দু হাজার দু বছরের ছন্দ-শাস্ত্রের সাম্রাজ্যবাদের বিরু যিনি নির্মম জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন যদিও চরিত্রগতভাবে এই কবি ছিলে বসন্তের বান্ধব। আমি সুন্দর হব, আ আনন্দিত থাকব, আমি গাইব নক্ষ

থিবীর গান—এই মন্ত্রশক্তি প্রাণসঞ্চার রেছিল তার কবিতায়।

উনিশশো আঠারো সালে শিক্ষকবৃত্তি ড়ে নানালাল সুরাট সরকারের শিক্ষা-ভাগে যোগ দেন। ঠিক ওই সময় মহাত্মা ন্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দো- দুরন্ত হয়ে ওঠে। স্বরাজ তরঙ্গ কবিকে সম্ভব নাড়া দিয়েছিল। অসামান্য কবিতা না করে তিনি ওই তরঙ্গকে বুকে টেনে ন। কিন্তু মুক্তির অমন্ত্র যজ্ঞে যিনি ত্মাহুতি দিতে তৈরি, সরকারী চাকরির হ তাঁকে বেঁধে রাখবে কি করে? নশশো একুশ সালে সরকারী চাকরির খোশ ছুঁড়ে ফেলে তুলে নিলেন কাব্য-র্যার গেরুয়া বসন। বাসা বাঁধলেন আমেদা-দে। মৃত্যুদিবস পর্যন্ত তাঁর সংসারের য়ের উৎস ছিল কবিতা। মনে রাখা কার, ওই বিশের দশকে জিনিসটা নেহাৎ জে ছিল না।

প্রতিভাবান কবি কিংবা শিল্পী নিজের ভজা সম্পর্কে সচেতন না হলেও নিজের মতার প্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নভিজ্ঞ থাকেন না। নানালাল প্রসঙ্গেও মন্তব্য প্রযোজ্য। জনক দলপতরামের ভজা ও কবিকীর্তিকে তিনি যে অসাধারণ ধা ও চেতনামণ্ডিত আসনে বসিয়েছিলেন সম্ভবত তারই নিদর্শনস্বরূপ নিজেকে নি অভিহিত করেছেন ঝলমলে দলপত-ম' নামে। অর্থাৎ দলপতরামই যেন পুত্রের বিমনানের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বিকশিত য়েছেন। এই দৃষ্টান্তও বিরল। খ্যাতির তি বিন্দুমাত্র মোহ থাকলে কি পিতাকে উ এই সম্মান দিতে পারেন? 'পিতার সম্পূর্ণ কাজ যে সম্পূর্ণ করে, সে-ই ত্র—'পুত্র' কথাটির এহেন সংজ্ঞাও যে রল।

ব্যক্তিত্বের মতো রচনাসম্ভারও বিরাট নালালের। কবিতার সঙ্গে গদ্যও লিখে-ন তিনি। বারোটি গ্রন্থে সঙ্কলিত রুক্ষেত্র' তাঁর বিশাল কবিতা। আবার ন্দুকুমার', 'জাহাঙ্গীর-নুরজাহান' অথবা বশ্বগীতা'র মতো নাটক বেরিয়েছে তাঁর াত দিয়ে। উপন্যাস লিখেছেন, গল্প লিখে-ন, সাহিত্য সমালোচনা লিখেছেন। চারটি ণ্ডে শেষ করেছেন পিতার আশ্চর্য ীবনী। অনুবাদ করেছেন 'শকুন্তলা' কিংবা ভাগবতগীতা' থেকে 'হরিসংহিতা' নামে কটি দীর্ঘ কবিতা লিখছিলেন। শেষ করে যতে পারেন নি। টানা পঞ্চাশ বছর সাহিত্য র্চা করে নানালাল পাঠককে দিয়েছেন চুর।

আধুনিক গুজরাটি কবিতার গায়ে ছিল হু-শতাব্দীর শিকল। এই শিকল পরিয়ে দয়েছিলেন প্রাচীন ছন্দবিদেয় দল। বিদ্রোহী নানালাল এই শিকল ভেঙে কবিতার শরীরে রক্ত সঞ্চার করলেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর এই বিদ্রোহ গুজরাটি কাব্য-সাহিত্য চিরদিন মনে রাখবে।

উনিশশো ছাব্বিশ থেকে উনিশশো চল্লিশ এই বছরগুলিতে নানালাল ব্যস্ত ছিলেন 'কুরুক্ষেত্র' রচনায়। মহাভারত-নির্ভর এই সুদীর্ঘ কবিতা রচনার সময় গীতিমধুর বাঁশি সরিয়ে রেখে বেছে নিয়েছিলেন মহা-কাব্যের ভেরী। মহাকাব্যের রক্তমাখা কবিতা রচনার চেষ্টা তাঁর আগে দু-চারজন করে-ছেন—কিন্তু সার্থকতা এসেছিল নানালালের বুকে। 'কুরুক্ষেত্র' কবিতায় রয়েছে মোট দশ হাজার সতশো তিনটি পংক্তি। বারোটি সর্গে বিভক্ত।

বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছেন নানা-লাল। সামাজিক ঐতিহাসিক এবং পৌরা-ণিক—মোটামুটি এই তিনভাগে তাঁর নাটককে ভাগ করা যায়। অবশ্য এগুলির মধ্যে সবচাইতে আকর্ষণীয় এবং উল্লেখ-যোগ্য তাঁর একটি নাটক। নাটকটির নাম 'ইন্দুকুমার'। ইন্দুকুমারে নানালালের ব্যক্তিত্ব ও লিখনমহিমা অনেকখানি ধরা দিয়েছে। কবিজীবনের সকালবেলার রচনা 'বসন্তোৎ-সবে' ইন্দুকুমারের বিষয়বস্তুর অভাব ছিল। প্রেম, বিবাহ এবং সামগ্রিক মানুষজীবনের বিভিন্ন দিক প্রসঙ্গে কবির ধ্যানধারণা ইন্দুকুমারে সুন্দর দুপুরের মতো ফুটে উঠেছে।

সাহিত্য রচনার যে সহজাত ক্ষমতা—তার বাইরে কিংবা বলা উচিত এইসব ছাপিয়েও নানালালের আরেকটি আলোকিত দিক ছিল। সেটি হচ্ছে তাঁর ঈশ্বরভক্তির দিক। অসাধারণ ভক্তপুরুষ ছিলেন কবি। জীবনচর্চা ও সাহিত্যচর্চার মাঝখানে তাঁর ঈশ্বর তথা কৃষ্ণভক্তি উজ্জ্বল প্রদীপশিখার মতো দীপ্ত হয়ে ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা 'হরি-সংহিতা' সম্পূর্ণ হলে আমরা হয়তো নব-যুগের ভাগবতপুরাণের স্বাদ পেতাম। পরিকল্পনা ছিল, মোট চুয়াল্লিশ হাজার পংক্তি রচনা করবেন। কিন্তু মাত্র সাতাশ হাজার পংক্তি রচনার পরেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন। অমরলোকের দেশে।

আগেই বলেছি, নানালাল ছিলেন বসন্তের বান্ধব। এই বসন্ত শুধু ঋতু-বিভক্তির শরিক নয়, এই বসন্ত নবজীবনের প্রতীক। শীত যদি কাছে চলেই আসে, বসন্ত কি বড় বেশী দূরে?—ওই বসন্তের মন্ত্রসঙ্গীত রচনা করেছেন নানালাল। সারা জীবন ধরে। বসন্ত-নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন পৃথিবীর সব মানুষকে। গুজরাটের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তাঁর গান। এখনো শোনা যায়। মানুষ তাঁকে আজো ভালো-বাসে। সম্ভবত চিরদিনই বাসবে।

গভীর ধর্মচেতনামণ্ডিত গীতিময় এই কবি-পুরুষের মনের ভিতরে সমসাময়িক সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপারে নিবিড় বোধশক্তিও ছিল যথেষ্ট। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে একবার একজন শিক্ষক তাঁর মতা-মত চেয়েছিলেন। অসাধারণ সুপুরুষ কবি জামার আস্তিন গুটিয়ে ভদ্রলোককে বলে-ছিলেন 'আমার বাইসেপ টিপে দেখুন, কতখানি শক্ত ধরি। সত্যিই যদি ছেলেদের শিক্ষিত করে তুলতে চান, আগে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। স্বাস্থ্য যদি ভাল হয়, সব ভালো হবে।'—এই ছোট্ট ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, দেশ ও কাল সম্পর্কে কবি কতটা সচেতন ছিলেন। এবং আমরা সকলেই জানি, দেশ ও কালের মানসিকতার ওপরে ভাবী দেশকর্মীদের শিক্ষা পর্যন্ত অনেকটা নির্ভর করে।

অত্যন্ত সুলিখিত এই জীবনীভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থের লেখক ডঃ ইউ এম মনিয়ার কবি নানালালকে খুবই কাছ থেকে দেখে-ছেন। সাহিত্যের আজীবন পাঠক শ্রীমনিয়ার নিজেও একজন ছোটগল্পকার ও সাহিত্য-সমালোচক। সুতরাং তাঁর মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পুষ্ট এই গ্রন্থ পাঠকের ভাবনার ঘরে আসন অর্জন করবেই। এতে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। এসবের সঙ্গে বিশেষ আকর্ষণ সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদবিন্যাস।

অভীক রায়

নানালাল। ইউ এম মনিয়ার। সাহিত্য একাডেমী। দাম আড়াই টাকা।

কি বলতে চাইছেন ?

বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ভাব-মূর্তি' নামক ছোট একাঙ্কটি জীবনের কয়েকটি টুকরো ঘটনাকে জুড়ে তৈরি। ভালো প্রতীক, সাংকেতিক অথবা সোজা সামাজিক নাটকের সর্বত্রই পৃথিবী, সমাজ এবং মানুষ সম্পর্কে নাট্যকারের গভীর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার ছাপ থাকে। এই জ্ঞান এবং ধারণা জীবন থেকে আসে অথবা বই পড়েও হয়। দুটোই একসঙ্গে অথবা আলাদাভাবে শিল্পীকে জীবন সচেতন করে তোলে। কিন্তু এগুলোও শেষ কথা নয়। শিল্পীর নিজস্ব চেতনা, যা আবাল্য নানা সংস্কার, শিক্ষা, অনুষঙ্গে গড়ে ওঠে, যে-কোনো রচনায় সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নাটকে বাস্তব জীবনের প্রতিনিধি হিসেবে ঘনশ্যাম, (যাত্রা দলের অধিকারী), সমাদ্দার (পুলিশ অফিসার), চঞ্চল, বিভাস ইত্যাদি তরুণেরা খুবই বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু সব মিলিয়ে কি যেন একটা অভাব মেটেনি। অর্থাৎ কথিত বিশেষ টাইপের সীমানা কাটানো সম্ভব হয়নি। নারী, চাকরী, সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি অনেক সমস্যার ওপরে ওপরে নাট্যকার ঘুরেছেন। কিন্তু মূল ব্যাপারটা কি? কি বলতে চাইছেন তিনি অথবা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি? শিব-ঠাকুরকে নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার পরিণাম কি? নাট্যকার দেখালেন সবটাই স্বপ্ন।

শৈবাল মিত্র

ভাবমূর্তি (নাটক): বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিউ বুকস এম্পোরিয়াম। ৫৪।১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দাম —পাঁচ টাকা।

সোভিয়েত দেশের এক স্পোর্টস প্যালেসে ইনডোর টেনিস কোর্ট

স্পোর্টস প্যালেস

অজয় বসু

স্পোর্টস প্যালেসের কথা আগে শুনেছিলাম। এ সম্পর্কে ভাসা ভাসা কিছু ধারনাও মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। ধারনাটি স্পষ্টতর হল যেদিন সোভিয়েত দেশের এক শহরে একটি স্পোর্টস প্যালেস পরিদর্শনের সুযোগ মিলল।

শহরের নাম লুভভ। ইউক্রেনের এক ছোট্ট শহর। লুভভের যে স্পোর্টস প্যালেসে আমরা গিয়ে পড়ি তার নাম স্পোর্টস প্যালেস অব ওয়ার্কিং রিজার্ভ।

স্পোর্টস প্যালেস মানে ক্রীড়া প্রাসাদ। তা প্রাসাদই বটে। আধুনিক কায়দায় তৈরী একটি অট্টালিকা। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যে এটি নিছক বসতবাড়ী বা কোনো অফিস বিল্ডিং। কিন্তু ভেতরে প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্যের ঠিকানা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে থরে থরে মণিমুক্ত সাজানো নেই। তবে জনসাধারণের জীবনী-শক্তি সঞ্চয়ের সব সুযোগই নিষ্ঠাভরে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতেই নজরে পড়ল বাঁদিকের সাঁতারের পুলটি। দরজা আঁটা এক প্রশস্ত হলের ভিতরে আগাগোড়া আচ্ছাদিত এই পুল দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ মিটার। পুলে লেনের সংখ্যা আটটি। এক কথায় পুলটি প্রমাণ সাইজের। সময় সকাল নটা হবে। শীতের দেশ। তবুও এই সাত সকালে পুলে কাজের জোয়ার জেগে উঠেছে। জনা আষ্টেক কিশোর এক কোচের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর পাঠ নিচ্ছে। সাঁতার অনুশীলন করছে।

পুল থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে এগোতে এগোতে দেখি, একতলায় ডানদিকে সারি সারে বাস্কেট ও ব্যাডমিন্টন কোর্ট, সব কোর্টই হলের অভ্যন্তরে। মেঝেগুলিও কাঠের। দোতলায় একধারে মল্লক্রীড়া ও জুডো হল। অন্য পাশে ভলিবলের কোর্ট। তিনতলায় শরীর চর্চার আখড়া এবং দুটি জিমনাসিয়াম ও বক্সিং রিং।

একটি জিমনাসিয়াম শিক্ষানবীশদের জন্যে। অন্যটিতে ওই মুহূর্তে জিমন্যাস্টিকসের দুরূহ কৌশলাদি রপ্ত করায় ব্যস্ত গুটি কয়েক তরুণ। তরুণদের হাতেনাতে খাটাচ্ছেন স্বয়ং ভিকটর চুকারিন।

ভিকটর চুকারিনের কথা নিশ্চয়ই এখনও সকলের মনে আছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে পর পর দুবার বিশ্ব অলিম্পিক জিমন্যাস্টিকসের পুরুষ বিভাগে যে রুশ তরুণ সর্বোত্তম প্রতিযোগীর স্বীকৃতি, সম্মান পেয়েছিলেন সেই জনই হলেন ভিকটর চুকারিন। এখন তিনি জাতীয় কোচ। সারা দেশ টহল দিয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ ছেলেদের বেছে নিয়ে হাতেনাতে তাঁদের জিমন্যাস্টিকস শেখান।

একটি ছাদের নীচে অট্টালিকার বিভিন্ন তলায় হরেকরকম খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। যেন খেলাধুলার এক ছড়ানো সংসার। অথবা বলি, এক ক্রীড়াযজ্ঞভূমি। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত টানা অনুশীলনের আয়োজন। যার যেমনটি প্রয়োজন একটি বাড়িই তা মিটিয়ে দিতে পারছে।

অনুশীলনের সময় নির্দিষ্ট। ছাত্র-ছাত্রীরা আসে বাঁধা সময়ে, যখন অধ্যয়নের ছুটি। দিনের অন্য সময়ে সাধারণ ক্রীড়ামোদীরা। আর সন্ধ্যার পর কলকারখানার ক্ষেত-খামারের কর্মীরা।

লুভভের স্পোর্টস প্যালেস অব ওয়ার্কিং রিজার্ভে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৮৭০-এর মত। প্রশিক্ষক আছেন তেত্রিশ-জন। শুনলাম প্যালেস অব ওয়ার্কিং রিজার্ভের অন্যান্য শাখাও আছে যেখানে আউটডোর ট্রেনিং বাস্তবায়িত করা হয়। শহরগুলিতে প্যালেসের একটি নিজস্ব স্টেডিয়াম আছে। সেখানে ফুটবল খেলা হয়। চর্চা হয় অ্যাথলেটিকসেরও। অদূরে নাভাবিয়া হ্রদে নৌ-বাইচের এক সংরক্ষিত সীমানাও প্যালেসের অধিকারে রয়েছে।

লুভভ ছোট্ট শহর। লোক সংখ্যা কতোই বা হবে? বড়জোর ছ লাখ। আর এই লাখ ছয়েক অধিবাসীর খেলাধুলার প্রয়োজন মেটাতে যে আয়োজন করে রাখা হয়েছে তার বিবরণ জেনে আমি প্রায় অবাক হয়ে গেলাম।

ছ লাখ অধিবাসীর জন্যে মাধ্যমিক স্কুল আছে আটাত্তরটি। আর স্পোর্টস স্কুল উনপঞ্চাশটি। সাধারণ স্কুলের নিজস্ব খেলার মাঠ ও জিমনাসিয়াম আছে। তা থাকতেই হবে। কারণ ১৯৭০-এ সরকারী স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে খেলার মাঠ জিমনাসিয়াম বা স্পোর্টস হল ছাড়া কোনো স্কুল অনুমোদন পাবে না।

ছ লাখ অধিবাসীর শহর লুভভে চোদ্দটি ছোটখাটো স্টেডিয়াম ও উনিশটি সাঁতারের পুল রয়েছে। বড় স্টেডিয়াম বলতে দুটি। তার মধ্যে দ্রুসবাতে হাজার পঞ্চাশ দর্শক আঁটে। সেন্ট্রাল আর্মি স্টেডিয়ামে ত্রিশ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারে। পর্যাপ্ত খেলার মাঠ ও খেলা-ধুলার আনুষঙ্গিক সুযোগ এমন অবাধে প্রসারিত বলেই লুভভের ছেলেমেয়েরা সহজেই খেলাধুলার টানে আকৃষ্ট হয়। নিচু শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তাদের হাত ধরে নিয়ে যাওয়া হয় জিমনাসিয়ামে।

লুভভের ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থা হল সিটি স্পোর্টস কমিটি। স্পোর্টস প্যালেসের

খেলাধুলোর অন্যান্য আয়োজনের টী ভার সিটি কমিটির হাতেই। রী কোষাগার থেকে খেলাধুলোর য বাবদ সব টাকাই এই কমিটির য বিতরিত হয়। কেন্দ্রীয় সিটি 'স কমিটির পাঁচটি শাখা আছে। লক ব্যবস্থাপনা দেখা-শুনার দায়িত্ব নব শাখার।

এসব ছাড়া লুভভে আছে ইনস্টিটিউট ফিজিক্যাল কালচার। ক্রীড়া সম্পর্কিত ুলক কাজে এই ইনস্টিটিউটের দা অসাধারণ। স্পোর্টস প্যালেস ঘুরে । যখন ইনস্টিটিউট ভবনে গিয়ে রত হই তখন সেখানে পুরোদমে ঃ জোয়ার বইছে। শয়ে শয়ে ছাত্র- ভিড়। কর্মযজ্ঞের চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ ।

নস্টিটিউটে সাধারণ পঠন-পাঠন এবং বিষয়ক অধ্যয়নের, দুইয়েরই ব্যবস্থা । এখান থেকে পাশ করে উত্তর জীবনে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপক হয়। বা ক্রীড়া প্রশিক্ষকের স্বীকৃতি পান। বারের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জিমনাস্ট র চুকারিন আদি বাস ছিল লুভভে। ঃ এই ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে জাতীয় কোচের পদাসীন হয়েছেন। রের জন্যে লুভভের ইনস্টিটিউট ও বটে। তাই ইনস্টিটিউটের সংগ্রহ ভিকটরের একটি মর্মর মূর্তিও রেখে দেওয়া আছে।

ভকটরের পাশে আরও কটি প্রতিমূর্তি না। তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম যেন মার্কিন ুটার প্যাট ওব্রায়েনের মর্মর মূর্তিটি। ও লুভভে সাধারণভাবে দেখেছিলাম শীরা স্বদেশীয় কীর্তিমান ক্রীড়া- র ভাবমূর্তি সকলের সামনে তুলে ী আগ্রহী। অন্যদের ঠেলায় তাঁরা যেন হ। লুভভের ইনস্টিটিউট অব ফিজি- কালচার ভবনেই তার ব্যতিক্রমের নজরে পড়ল।

নুভভের ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল রে চব্বিশ রকমের ক্রীড়া বিষয় না হয়। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে সরিয়ে মাঠে-ঘাটে নিয়ে গিয়ে নাতে ক্রীড়া শিক্ষায় রপ্ত করে তোলার চলে। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব স্টেডিয়াম রের পুল, জিমনাসিয়াম ও অনেকগুলি র্টস হল আছে।

ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দু রে। শিক্ষক আড়াইশ। চিকিৎসক জন। সব মিলিয়ে সোভিয়েত দেশে ভ ইনস্টিটিউটের আসন ঠিক মস্কোর স্টিটিউট অব ফিজিক্যাল কালচারের পরই রকম ইনস্টিটিউট সোভিয়েট দেশে আছে শটি। লুভভে ব্যাচেলার ডিগ্রি পর্যন্ত নো হয়। স্নাতকোত্তর বিভাগ আছে মাত্র মস্কোর ইনস্টিটিউটে।

লুভভ ইনস্টিটিউটে কি কি বিষয় ন্যো হয়?

পড়ানো হয় শরীর শিক্ষার পাঠ্যক্রম। এই পাঠ্যক্রম তিনভাগে বিভক্ত, আর হয় মার্কসীয় দর্শন। রাজনৈতিক, অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ, শারীর তত্ত্ব, ক্রীড়া, চিকিৎসা ও শুদ্ধ ক্রীড়া। মূল কোর্স চার বছরের। প্রতিদিন ক্লাস হয় ঘরে বাইরে মিলিয়ে ছ ঘন্টা।

এখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাস্টার অব স্পোর্টস এবং মেরিটেড মাস্টারস অব স্পোর্টস। প্রশিক্ষক ও ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে এই মাস্টারদের দাবিই অগ্রগণ্য।

লুভভের ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল কালচারের কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখে এবং কাজের আয়তন উপলব্ধি করলেই বোঝা যায় যে ওখানে খেলাধুলোর যজ্ঞভূমি সাজানো হয়েছে পরিপাটি করে। বছর চারেক ওখানে কাটাতে পারলে শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া-বিষয়ক জ্ঞানও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের গঠনমূলক কাজ এমন ব্যাপক বলেই তো রুশ ক্রীড়াবিদরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভূমি থেকে অগুন্তি পদক সংগ্রহ করে ঘরে ফিরতে পারছেন।

আমরাও তো আশঙ্কা করছি যে আমাদের ছেলেমেয়েরা আন্তর্জাতিক আসর থেকে সোনাদানা নিয়ে ফিরবে। কিন্তু স্বর্ণ সঞ্চয়ে তাদের উপযুক্ত করে তুলতে ক্রীড়া-চর্চার ও ক্রীড়া শিক্ষণে সর্ববিধ সুযোগ কি আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের উপহার দিতে পেরেছি? যেমন পেরেছে সোভিয়েত দেশ স্পোর্টস প্যালেসও ফিজিক্যাল কালচার ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে?

স্বাধীন ভারতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি দেশ নায়ক, রাষ্ট্র নায়ক কতোবার সোভি দেশে যাতায়াত করলেন। তাদের মধ্যে কেউ কি কখনও ভুলেও মুহূর্তের জন্যে ওদেশের স্পোর্টস প্যালেস বা ফিজিক্যাল কালচার ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে হাজির হননি? ওখানে উপস্থিত হলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে খেলাধুলায় উন্নতি করতে হলে স্বদেশের বিভিন্ন কোণে এমনি সব স্পোর্টস প্যালেস বা ফিজিক্যাল কালচার ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা কতো প্রয়োজনীয়। এই ব্যবস্থা ছাড়া উজ্জীবনের পথ যে নেই সে সত্য তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন। সেই সঙ্গে কিছু না করে শুধু সংসদ ভবনে ভারতীয় ক্রীড়ার জন্যে কুম্ভীরাশ্রু পাতে নায়কেরা লজ্জাও বোধ করবেন নিশ্চয়ই।

নকল খনির ছায়াছবি

'কালাপাথর' ছবিটি একটি কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে। অতএব, খনি-অঞ্চল, খনির অভ্যন্তর ইত্যাদির ডিটেল সহ টেকনিক্যালি উঁচু স্তরের ছবি হয়ে ওঠা—এর পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু কার্যত তা হয়ে ওঠে নি। কোলিয়ারির বহুবিস্তৃত কার্যক্ষমতার মধ্যে কেবল দেখা গেছে, একটি কনভেয়ার বেল্ট, ভিলার আপওয়ে এবং শ্যাফটের উপরিভাগের স্টিল-টাওয়ার। গুরুত্বপূর্ণ যে-সব যন্ত্রাদি, যেমন ওয়াটার রিফাইনারি, বস্থ ক্যালরি মিটার, খনির ভেতরে পাতা ট্র্যাকের উপর লোকোমোটিভ দৈত্যাকার শোভেল—এ-সবের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। তাছাড়া অতবড় একটা খনিদুর্ঘটনায় সেফ জল ঢুকে পড়া ছাড়া আর কোন বিপত্তি হল না—আশ্চর্য! কৃত্রিম বায়ুচলাচল বিঘ্নিত হল না, মার্স-গ্যাস, বা মারাত্মক রকমের এয়ার প্রেসার কোন অসুবিধাই করল না। জেল খনিতে জল ঢুকে পড়া কতকটা কোমরজল শহরে বন্যা। টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ডি, আই, পদ্মকরের ভূমিকা ঠিক স্পষ্ট হল না। শিল্পনির্দেশক সুধেন্দু রায়ও খনির অভ্যন্তর নির্মাণে ব্যর্থ। ওটিকে সারাক্ষণ স্টুডিও বলে চেনা যায়। ফলে, দুর্ঘটনায় দৃশ্যটিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও রমেশ ভাতায় ক্যামেরা প্রয়োজনীয় ভয়াবহতা সৃষ্টি করতে পারল না—এমন কি সারা ছবি জুড়ে 'লো কি-লাইটিং' ব্যবহার করেও। মাত্র একবারই গাঢ় নির্বাক, অন্ধকারে সেফটি ল্যাম্পের আলোয় ফুটে উঠেছিল শতশত জোনাকি। কিন্তু অমন অন্ধকার ঐ একবারই!

প্রসংগত যে কাহিনীটি চলেছে, তা যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটিই। তবে যশ চোপড়ার চিত্রনাট্যে ভিস্যুয়াল ব্যাপার ছিল। টুকরো টুকরো দৃশ্যের সাহায্যে কোলিয়ারি সংলগ্ন শ্রমিক জীবনযাপন—অন্তত চলচ্চিত্রের শর্ত মানে। ছবিতে বিখ্যাত তারকারা নিজ নিজ ভূমিকায় রূপদান করে গেছেন—বলা বাহুল্য প্রতিষ্ঠিত মাত্র তিনজন : মাস্তানবেশী শত্রুঘ্ন, চুড়িওয়ালাবেশী নীতু সিং আর সর্বোপরি ইংরেজী জানা, ক্রুদ্ধ শ্রমিক অমিতাভ। সুতরাং পাঠকবৃন্দ, সেলিম জাভেদের গল্পের মজাটা অনুধাবন করেছেন আশা করি।

পূষণ গুপ্ত

জাতীয় গ্রন্থাগারে জীবনানন্দ

হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া, কিশোরীর চাল ধোয়া ভিজে হাত, গংগা-ফড়িংয়ের নীড়, কীর্তন, ভাসান গান, রূপকথা, যাত্রা, পাঁচালী এবং তার সঙ্গে সেই সব নোনা গাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, কাঁচ তালশাঁস এবং সেই সব ভিজে ধুলো, বেঁলকুঁড়ি ছাওয়া পথ—ধোঁয়াওঠা ভাতে মিলে আমাদের এই বাংলাকে যিনি আমাদের নতুন করে চিনিয়ে গেলেন সেই রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাসকে আমরা কতটুকু চিনি?

এই আকস্মিক প্রশ্নটাকে সামনে রেখে জীবনানন্দের পারিবারিক আপনজনেরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। চিন্তিত হয়েছিলেন, কিন্তু দিশাহারা হননি। তারা নিজেরাই এর একটা সমাধান বার করলেন। ঠিক করলেন, জীবনানন্দের প্রকাশিত অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনার যে সব পাণ্ডুলিপি দাস পরিবারের হাতে আছে সেই সব অমূল্য নিধি তাঁরা যখের ধনের মত আগলে না রেখে এজমালি সম্পত্তি করে দেবেন।

এমন একটা সাধু প্রস্তাব পেয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেকটার ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সাগ্রহে বাড়িয়ে দিলেন সহযোগিতার হাত। তাঁদের ব্যবস্থা মত একুশ অকটোবর বিকালে জাতীয় গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানে কবির নিজের হাতে লেখা তাঁর রচনাগুলির খাতা কবি কন্যা মঞ্জুশ্রী দাস ও পুত্র সমরানন্দ তুলে দিলেন ডঃ দাশগুপ্তের হাতে। দিনটি ছিল রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দের পঁচিশতম মৃত্যু দিবস।

জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দও এসেছিলেন এই অনুষ্ঠানে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, জীবনানন্দের লেখা এ রকম খাতা কতগুলি ছিল?

তিনি বললেন, ও বাবা। সে অনেক।

প্রশ্ন করলাম, আজ যা দেওয়া হল এই কি সব?

তিনি জবাব দিলেন, না না। তা কেমন করে হবে? বরিশালের বাড়িতেই তো কিছু গেল পোকার কবলে।

কলকাতার বাড়িতে যা ছিল তারও কিছু ঐ ভাবে নষ্ট হল। বাকি যা অক্ষত ছিল এবং আমাদের হাতে ছিল তার সবগুলি আমরা জাতীয় গ্রন্থাগারে দিয়ে দিলাম।

এই দিন যা দেওয়া হল তা ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই লেখা। তার মধ্যে গল্প আছে, উপন্যাস আছে, কবিতা তো আছেই। মোট খাতার সংখ্যা একশ পঁয়ত্রিশ। তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশটিতে কেবল কবিতা আর কবিতা।

রূপসী বাংলাকে যিনি চিনিয়েছেন তাঁকে জানার জন্য এতদিন গবেষকরা অশোকানন্দের বাড়ি যেতেন। পাণ্ডুলিপি দেখতেন। তাঁদের সাহায্য করবার জন্য অশোকানন্দকে অন্য কাজ ফেলে আটকে থাকতে হত। শুধু কি তাই? তিনি বললেন, সবাই তো আর সমান মন নিয়ে আসে না। তাই গবেষকদের কেবল সাহায্য করার জন্য নয়, গবেষণার মালমশলা পাহারা দেবার জন্যও আমাকে বসে থাকতে হত।

এমন করে চলতে চলতে অশোকানন্দ আটাত্তরে পা দিলেন। তখন তাঁর মনে ভাবনা এল, এইভাবে আর কতদিন চলতে পারে? চিরকাল যে চলতে পারে না সে কথাটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। তাই দাস পরিবার জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপিগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারের হেপাজতে দিয়ে দিলেন।

এতে দুটো বড় কাজ হবে। এর ফলে জীবনানন্দকে জানার ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হয়ে গেল। তা ছাড়া, এগুলি যথাযথ পদ্ধতিতে রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থাও হল।

কুন্দশুভ্রা গাঙ্গুলি

গুলাবী বিবির খেল

আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে জয়জয়ন্তী নাট্য সংস্থা সম্প্রতি রঙমহল মঞ্চে **গুলাবি বিবির** খেল নাটকটি মঞ্চস্থ করল। এ নাটকের মূল কথা হল যুবতী নারীর প্রেম-প্রত্যাশী হৃদয়ের চিরন্তন বেদনা। অগাধ ঐশ্বর্য, প্রচুর অলংকার দিয়েও অনেক সময়ই যুবতী স্ত্রী-র মন ভরানো যায় না। তার অন্তর চায় সাচ্চা মহব্বত, বলিষ্ঠ প্রেম। তাই তো সব কিছু দিয়েও প্রৌঢ় আজবক খাঁ তার যুবতী স্ত্রী গুলাবি-র মন পায়নি। আজবক ও গুলাবি-র চরিত্রে যথাক্রমে বীরেন দাস ও আরতি ঘোষ দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। অনেক হাসি আনন্দ ও হৈ হুল্লোড়ের ভেতরেও এ নাটকে কোথায় যেন করুণ ব্যাথার সুর লুকিয়ে ছিল। অভিনয়ে আর যাঁরা মঞ্চ জুড়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে রঞ্জিৎ দাস, বিল্টু চট্টোপাধ্যায়, শচীশংকর, দেবী ঘোষ ও বিমল ব্যানার্জি। বেশ কিছু ভুল-চুক থাকা সত্ত্বেও অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠি জয় জয়ন্তী সেদিন তাঁদের দলগত অভিনয়ে দর্শকদের টেনে রেখেছিলেন।

নারায়ণরতন দত্ত

বরুন সিমলাই-এর স্কেচ
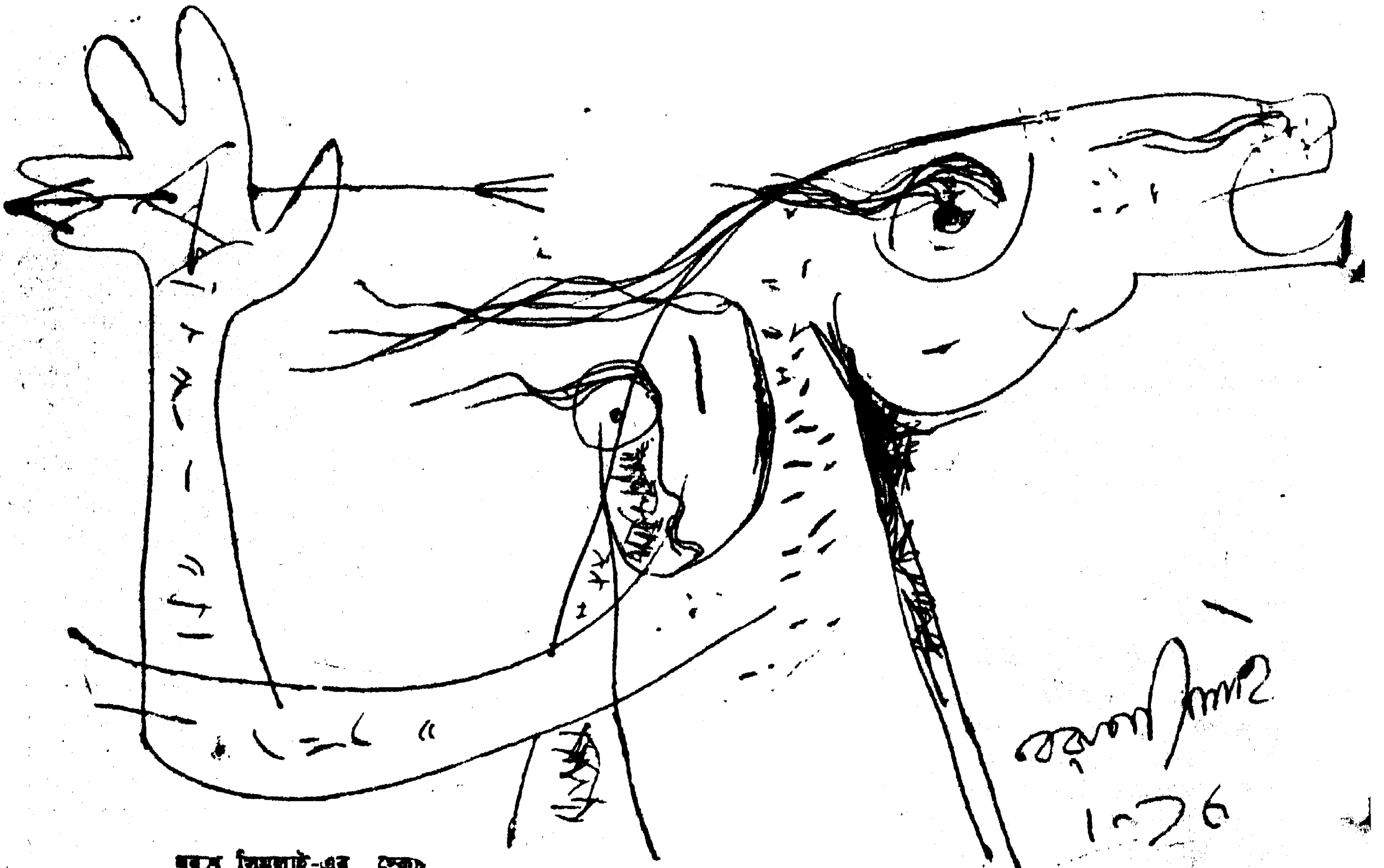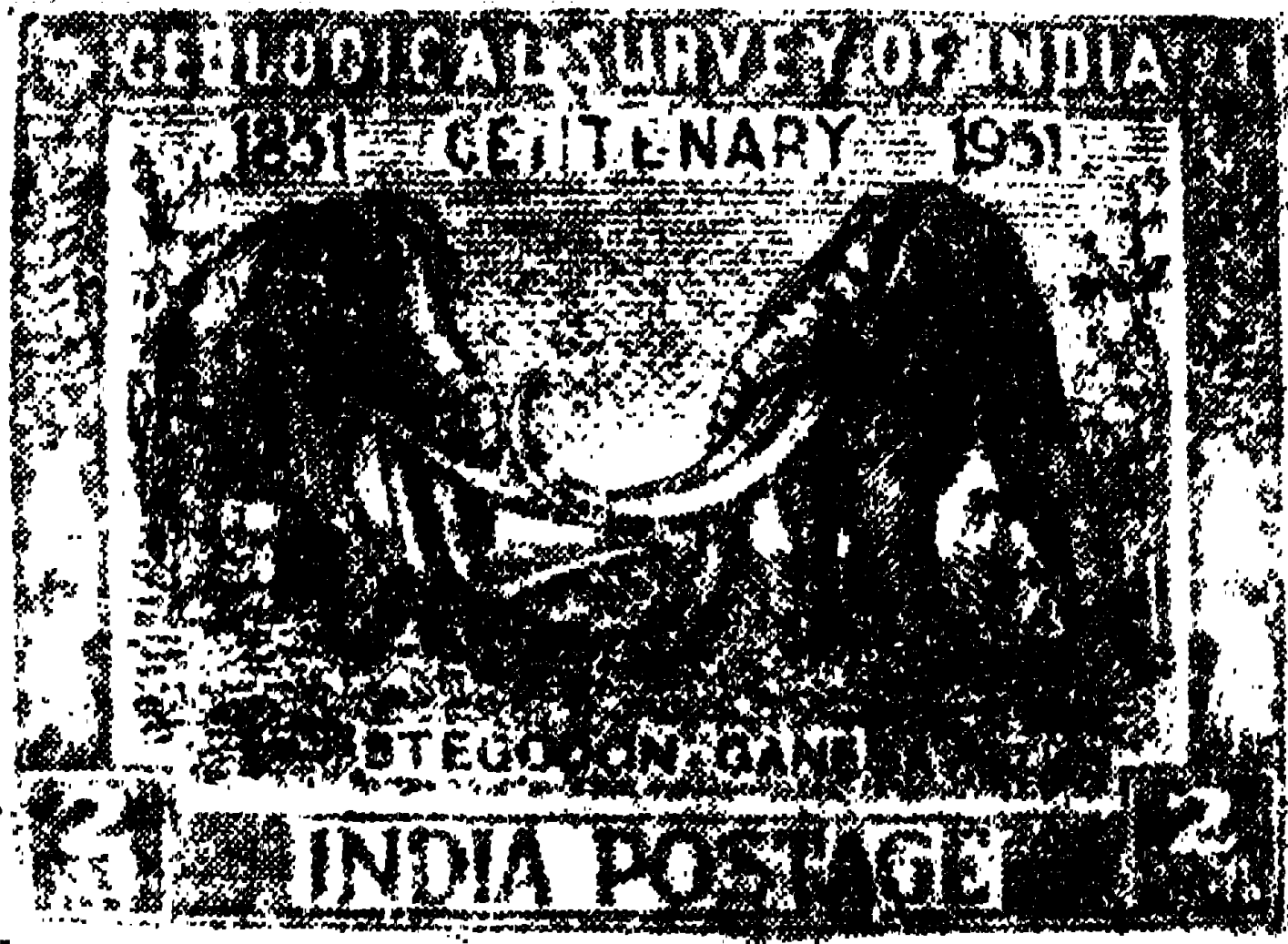
প্রদর্শিত ডাকটিকিট

ডাকটিকিটে ভারতীয় সংস্কৃতি

ডাকটিকিটের জন্ম ১৮৪০ সালে গ্রেট ব্রিটেনে। তরুণী রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি মুদ্রিত ছিল প্রথম ডাকটিকিটে। '৫৪ সালে ভারতে ডাকটিকিট চালু হয়। ১২৫ বছর পরে, ডাকটিকিটের ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য শিরোনামায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

১৫ অকটোবর, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম আয়োজিত প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন, পোস্টমাস্টার জেনারেল, সি এল দেব, আশুতোষ বার্থ সেণ্টিনারি হলে।

প্রদর্শনীতে ৬০টি ডাকটিকিট স্থান পেয়েছে। মূলসহ রয়েছে তাদের ব্লো-আপ ফটোগ্রাফ। আরম্ভেই রয়েছে, ১৯৫১তে মুদ্রিত, শিবালিক পাহাড়ে প্রাপ্ত স্টেগোডন গনেশ-এর ফসিল। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের দৌলতে এবং ভারতীয় ডাকঘরের উৎসাহে কিছু প্রাচীন ভাস্কর্য আমাদের হাতের মধ্যে রয়ে গেল। যেমন : পিতলখাড়ার দ্বিতীয় শতাব্দীর যক্ষ। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের লাল বালিপাথরে নির্মিত কবন্ধ। এবং দশম শতাব্দীর চোয়েন প্রেই-এর মূর্তি। এটি অক্ষত রয়েছে। এটি ব্যবহার করা যেত। এছাড়া দশম শতাব্দীর খাজুরাহের পত্রলেখা—মূল ভাস্কর্যটি পাশে থাকায় কোন বিভ্রমের অবকাশ থাকে না। উপরন্তু এটি প্রদর্শনীর আকর্ষণ বাড়িয়েছে। আর একটিরও মূলত ভাস্কর্য রক্ষিত ছিল : মূর্তিটি হল খাজুরাহের মা ও সন্তান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিকানীরের মার্বেল পাথরের তৈরি সরস্বতী এবং মাদুরা মন্দিরের সপ্তদশ শতাব্দীর দীপলক্ষ্মী। ভাস্কর্য হিসেবে দুটিই বিখ্যাত। অবশ্য সবচেয়ে প্রশংসনীয় মুদ্রণ —বুদ্ধের হাতের তাম্র, যা অভয়মুদ্রা সংগিত করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে ঐ নির্বাচন, সন্দিভত করে। প্রথামতো, নটরাজের মূর্তি, কোণারকের ঘোড়া এলিফ্যান্টার ত্রিমূর্তি ছাপা হয়েছে। এটা কিছুটা জানাই ছিল।

মন্দির ও স্মৃতিসৌধের মধ্যে, দেখা গেল, তাজমহল-এর তিনটি মুদ্রণ। ১৯৪৯-এ পিকচার পোস্টকার্ড ধরনে, ১৯৬৭-তে আন্তর্জাতিক পর্যটন বৎসর উপলক্ষে এবং ১৯৩৫-এ পঞ্চম জর্জ-এর প্রতিকৃতি সহ। ওটি পঞ্চম জর্জের স্মৃতির উদ্দেশ্য, কারণ ঐ একই বছর, পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতিসহ ছাপানো হয়েছে রামেশ্বরম মন্দির আর অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। সাঁচীর তোরণ, বোধগয়া—লিংগরাজ—সোমনাথ মন্দিরাদি, আর লালকেল্লা, কুতবমিনার ব্যতীত যে কটি প্রদর্শিত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খাজুরাহের মহাদেব মন্দির এবং পালিতানার শত্রুঞ্জ মন্দির।

চিত্রকলার মধ্যে প্রথমেই ব্যবহার করা হয়েছে অজন্তা গুহায় অংকিত বোধিসত্ত্ব। অমরাবতী ঘরাণায় বাস-রিলিফের কায়দায় আঁকা ওই ফ্রেস্কো, ভারতীয় চিত্রকলার ভূমিকার দায়িত্ব অনায়াসে নিতে পেরেছে। দুটি মুঘল মিনিয়েচারের একটিতেও কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নেই—থাকা উচিত ছিল। যেমন উচিত ছিল, রাজস্থানী মিনিয়েচারটি রাগাশ্রিত কিনা জানানো। রবি বর্মার কিংবদন্তীপ্রায় শকুন্তলা মুদ্রণ স্বাভাবিক। কারণ ডাকটিকিটে শিল্পীদের বিখ্যাত ছবিই ছাপা ভালো। এই ভিত্তিতেই ছাপা হয়েছে, অমৃতা শের গিলের পাহাড়ী রমণী ও অবনীন্দ্রনাথের অভিসারিকা। মূল অভিসারিকা ছবিটিও প্রদর্শনীতে রাখা ছিল।

অন্যান্য শিল্পকর্মের মধ্যে, আশ্চর্য নির্বাচন : সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল ঘরাণায় নির্মিত রত্নখচিত ছোরা। মুখোশাদির মধ্যে চাঁদের মুখোশে কমলা ও নীল রঙের ব্যবহার পাকা কাজ। চন্দ এবং নরসিংহের মুখোশ দুটি লোকসংস্কৃতির দিকটি ধরে রাখতে সক্ষম।

প্রদর্শনীর অধিকাংশ ডাকটিকিটই আধুনিক মুদ্রণ। প্রাচীনতমটি, পুরানা কিল্লার ছবি, ১৯৩১-এ মুদ্রিত। সম্ভবতঃ ওই সালের আগে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে মনোযোগী হয়ে ওঠা ভারতীয় ডাকঘরের পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গত, প্রদর্শনীটি সাজানোর মধ্যে কোন শৃংখলা ছিল না। আলাদা শিরোনামা থাকা সত্ত্বেও বেশ খাপছাড়া। সাম্প্রতিক কালের দুটি টিকিট এমনভাবে সাজান হয়েছে যে অনেক দর্শকের মনে হতে পারে এটা প্রাগৈতিহাসিক ফসিলের নিদর্শন।

পূষণ গুপ্ত

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাত থেকে ক্রিটিক সার্কেল অফ ইন্ডিয়ার দেওয়া শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের পুরস্কারটি নিচ্ছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

পুরানো সেইদিনের কথা

পুরানো সেই দিনের কথা সে কি ভোলা যায়? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের শেষের গানটির প্রশ্নটিই বহন করেছিল তার ললিত-মধুর প্রতিবাদ। ভোলা যে যায় না সেই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিল কালজয়ী তিন দিকপাল শিল্পীর গান। জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, যাঁদের প্রভাতী আসরে বাংলা গানের এক সোনা-ঝরা অতীত অধ্যায় যেন মুখর হয়ে উঠেছিল তার আনন্দ বেদনা সবকিছু নিয়েই।

আসরটির উদ্যোক্তা ছন্দনীড় সংস্থা, যাঁদের রুচিমার্জিত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগির কাছে সঙ্গীত রসিক মাত্রই ঋণী। আজকের বাংলাগানের এই দৈন্যের যুগে তার অতীত ঐতিহ্যকে ঠিক এইভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল।

আসলের ওপর অতিরিক্ত প্রাপ্তির মত, এ আসরের আর এক আকর্ষণ হয়ে উঠেছিলেন অজয় বসু। সংহত, সুন্দর ভাষ্যে শিল্পী পরিচিতির দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতাদের প্রাপ্তির প্রত্যাশা শিল্পীত্রয় পূর্ণ করে দিয়েছেন অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র এবং অজয় বসু

প্রথম শিল্পী জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে 'তুমি আজ কতদূরে' সুরু হতে না হতেই এক বেদনাব্যাকুল হৃদয়ের আর্তিতে সারা পরিবেশে ঘনিয়ে এল নিবিড় স্তব্ধতা। সমুদ্রের অশান্ত কল্লোলের ওঠাপড়ার মতই কখনও তাঁর কণ্ঠ মন্দ্রস্বরে গুণগুনিয়ে উঠেছে গোপন বেদনার মত, পরক্ষণেই তার সৈকতের বুকে আছড়ে পড়েছে স্পর্শকাতর চিত্তের উতলা আবেগে। তারপরই স্ব-সুরে গাওয়া তাঁর সেই বিখ্যাত নজরুলগীতি 'শাওন রাতে যদি' আত্মগত বিরহধ্যানকেই প্রদক্ষিণ করেছে। রাগ ঘেঁষা 'বাঁশরী কি বাজিবেনা আর' থেকে যখন 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়ে' পেঁছিলেন তখন শ্রোতাদের সঙ্গে শিল্পী চিত্তের সংলাপ সুরু হয়ে গেছে।

প্রৌঢ় ঋতুর ফসলেও সেদিন যৌবনের শক্তি, আবেগ ও মধুরতার ঢল নেমেছিল পূর্ণ সমারোহে। জগন্ময়বাবুর মত শিল্পীরাই এটা পারেন, মানে বয়সের বাধা অতিক্রম করে পূর্ণ যৌবনের মধ্যাহ্ন দীপ্তিকে জাগিয়ে তুলতে। কারণ শুধু কণ্ঠ ও আত্মপ্রকাশের আবেগকে সম্বল করেই এঁরা গাননি। জন্মগত শিল্পচেতনার বিকাশ ঘটেছে যথার্থ শিক্ষা অনুশীলনে। ভয়েস কন্ট্রোল বস্তুটির ওপর তাঁর কি অসাধারণ দখল সেই কথাটি বোঝা গেল শিল্পী যখন খোলা গলাকে 'হাস্কি' করে দিয়ে 'ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে' গানটির মর্মভাবকে মূর্ত করে তুললেন।

আরও যে বস্তুটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে সেটি হল তাঁর আবহসংগীত নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা। তিনি জানেন কোথায় কোন যন্ত্রকে প্রবল করতে হয়। কোথায় স্তিমিত করতে হয়, কোথায় একেবারে স্তব্ধ করে দিতে হয় তারই জন্য নানা যন্ত্রের অনুরণনের আলোছায়াভরা গুঞ্জন সুরের নিটোল মুহূর্ত রচনার সহায়ক হয়ে ওঠে।

শেষের গানটি 'বাবুল মেরা নইহার'। এ পর্যায়ে শিল্পীর গান ক্ল্যাসিক্যাল আসরের সমমানের মনে হয়েছে। ভৈরবীর টলটলে অশ্রুজলে নানা রংয়ের হৃদয়াবেগের ছায়া। অপরূপ মায়াময় হয়ে উঠেছিল জগন্ময়-বাবুর মুড়কী তানের কারুকার্যে আর স্বরবিস্তারের মুন্সিয়ানায়। সব মিলিয়ে এ অনুষ্ঠান পাণ্ডিত্য ও শিল্পকৃতির এক স্মরণীয় সমন্বয় হয়ে উঠেছিল।

সংগীতধর্মে জগন্ময় মিত্র ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য অভিন্ন। উভয়ের গানের ছাঁদে ক্ল্যাসিক্যালের ছোঁওয়া অনুভব করা যায়। এঁদের একজন যদি হন মনোধর্মী অপরজন প্রাণধর্মী। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে 'রাধে ভুল করে তুই' সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নীল সরোবরের বুকে ফুটে ওঠা একটি পদ্মর ছবি। এ গানের রসরূপ যেন বেদনা পাথার মন্থন করা প্রেমের পদ্ম। শিল্পীর কণ্ঠের অসাধারণ পরিসর উচ্চগ্রামে পেঁছবার সময় (তাই ফুল কুড়াতে ভুল কুড়ালি) আকাশকে ছুঁয়ে এল কি? সে উত্তাল আবেগ যেন সহ্য করা যায় না।

আবার 'এ জীবনে যেন আর', 'মোর জীবনের দুটি রাতি' কিংবা 'যদি ভুলে যাও মোরে' প্রেমিকচিত্তের রুদ্ধ অভিমানকে মৃদু গুঞ্জনে বাঙ্ময় করে তুলেছিল। প্রতিটি গান যেন হয়ে উঠেছিল শিল্পীর নিজের কথা, এত স্বতঃস্ফূর্ত, এত মর্মদ্রাবী। সকল রকম গান তাঁর ... আনন্দা হলেও বিরহের গানে তিনি সিদ্ধ সাধক। গজলের ঢঙে 'মাটির এ খেলা ঘরে'র বিষণ্ণ দার্শনিকতা কিংবা 'ফিরায়ে কি শুনো ...তে'র স্পর্শকাতর সুকুমার আবেদন এক অন্তরমুখীন ভাবুক শিল্পীকে মূর্ত করে তোলে। ঠিক এই মুহূর্তগুলিতে মনে হয়েছিল গান আর ধ্যান তাঁর কাছে এক হয়ে উঠেছে। আর তিনি গান গাইছেন অপরকে শোনাবার জন্য নয়, নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্যই।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এবং ভিন্ন জাতের ... যুগসচেতন শিল্পী। স্বপ্নসারিত মায়া রোমান্টিক রাজ্যেই তাঁর শিল্পীসত্তা কেন্দ্রীভূত নয়। চারপাশের জীবন ও জগত নিয়ে চলতি কালের ছায়া পড়েছে তাঁর গানে। হেমন্তবাবুর বৈশিষ্ট্য হল সহজ হওয়ার মত দুরূহ কাজও অনায়াস দক্ষতায় সম্পন্ন করার দুর্লভ ক্ষমতা। ...ধুনিক গানে ছন্দের চমক শিহরণে ... প্রথম লেগে ছিল বুঝি তাঁর 'কত কোরোনাক' গানটিতে 'পরদেশী কোথা যাও'-তে ভিনদেশী সু... অচেনা মধুরতা যে রসসৃষ্টি করেছিল তারই বা তুলনা কই? হেমন্তবাবু এটা পারেন- মানে গান সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ সৃষ্টি করতে।

'তোমারে ভুলিয়া আপনারে ... ভুলে' গানটি দরবারী কানাড়ার আ... বিছাল সারা প্রেক্ষাগৃহে। শিথিলচি... শ্রোতাদের এক নিমেষে জাগিয়ে তাঁর বলি... কণ্ঠের 'রাণার'। অতি পরিচিত দৃশ্য চেনা মহলের বিশ্রামহীন ক্লিষ্ট পিষ্ট জীবনে করুণ মুহূর্তগুলি তালফেরতার ছন্দে, গ... দোলে জীবন্ত হয়ে উঠল। বস্তুত রাণারে নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনাকে আমরা চিনতে শিখলাম ত হেমন্তবাবুর গানেই। এই স্বা... সাবলীল পরিবেশনই হল হেমন্তবাব... গায়কী, অন্যভাবে যাকে বলা যায় ... চেতনার রূপকার তিনি।

সবশেষে অনুষ্ঠানের মেজাজকে শি... স্মরণ করিয়ে দিলেন 'পুরানো সেই দি... কথা'—গেয়ে।

এ আসর মূলতঃ স্বর্গীয় কমল দা... গুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্তগু... ও হিমাংশু দত্তগুপ্ত তথা বাংলা গা... উজ্জ্বল যুগের স্রষ্টাদের প্রতি শ্রদ্ধা... হলেও শ্রোতাদের অনুরোধে শিল্প... নিজেদের এবং সে যুগের অন্যান্য সুর... দের গানও গেয়েছেন।

—সন্ধ্যা ...

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।
ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

অমৃত

১৯ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা
১৯ পৌষ, ১৩৮৬
4th January, 1980

আগামী সংখ্যায়

সন্ধ্যার পর ব্যাংকক
লিখেছেন জ্যোতির্ময় মৌলিক
গল্প লিখেছেন
মিহির সিংহ

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অনিবার্য কারণে অমৃতের কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হল না। ৪ জানুয়ারী থেকে নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সহৃদয় পাঠকের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

সারকুলেশন ম্যানেজার

ক্ষমতাই ধ্রুব

এখনকার রাজনৈতিক আকাশ বড়ই মেঘাচ্ছন্ন। আগে বোঝা যেতো—কোন্ মেঘ কোথাকার। এখন তা বোঝার উপায় নেই। সব একাকার হয়ে গেছে। বিশ্বাস, কর্মসূচী নিয়ে দল হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দল মানে ক্ষমতা প্রার্থী কিছু লোভী মানুষের জোট। নামকেওয়াস্তে একটা কর্মসূচী আছে বটে। বিশ্বাসের কথা মাঝে মধ্যে উচ্চারিতও হয়। কিন্তু আসল কথা—কত দ্রুত কত সহজে ক্ষমতায় পেঁছানো যায়। সেজন্যে কোট বদল, আগের বিবৃতির তোয়াক্কা না রাখা—সবই এখন খুব সহজেই অনেকে করে চলেছেন। সেজন্যে সংকোচ নেই। নেই অনুতাপ।

সব পরীক্ষায় একটা যোগ্যতা দরকার হয়। অধ্যাপক হতে হলে এম-এ পাশ। ডাক্তার হতে হলে এম বি বি এস পাশ। তারপর দরকার হয় স্বভাবচরিত্র। ব্যক্তিত্ব। অতীতের রেকর্ড। ইত্যাদি। আমাদের যাঁরা চালাবেন—শাসন করবেন—তাঁরা তো আরও কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অনেক বেশি যোগ্যতার অধিকারী হবেন।

করদাতার খরচে মন্ত্রীর জন্যে সব ব্যবস্থা করা হয়। এই আশায় যে, তিনি ভালভাবে দেশ চালাবেন। কাজের বেলায় দেখছি —খরচ হচ্ছে—কাজ হচ্ছে না। অভিযোগ উঠছে। তদন্ত চলছে। আবার যে-কে-সেই। এ আর কতদিন চলতে পারে? সুশাসনের জন্যে ক্ষমতা দরকার। কিন্তু ক্ষমতা যে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

বড় আমলার জন্যেও বড় ব্যবস্থা। কিন্তু মোটা লোক-সানেও বড় আমলা অকুতোভয়। কারণ সরকারের অপর নাম গৌরী সেন। আমাদের দেশ যত দিন যাচ্ছে—আমাদের নৈরাশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ, ঠিক কাজটি ঠিকমত হচ্ছে না।

এর মধ্যে দুর্গাপুজোর মত হাজির হচ্ছে ভোট। তাই নিয়ে হইচই। ভাগাভাগি। আবার কিছুদিন অনিশ্চয়। তারপর এক সময় সবাই বললেন, শাসন করার মত সরকার হচ্ছে না। অতএব আবার ভোট।

ভাগ্য ভাল—সাধারণ মানুষ আপনা আপনি তাঁর কাজ করে যান। সূর্য ওঠে। চাঁদ নিভে যায় শেষরাতে। শিউলি ফুল ফোটে। পুকুরে মাছ বাড়ে। এসব কাজ শাসনের বা সরকারের কিংবা ভোটের অপেক্ষায় থাকে না। তাই দেশটাও থেমে থাকে না। আপনা আপনি চলে। নয়তো, ভেবে দেখুন তো, ভোটের জন্যে যদি শিশির পড়া বন্ধ থাকতো—তাহলে কি কাণ্ডটাই হোত।

এখন বিষ পিঁপড়ের দিন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আগেকার বড় বড় প্রাণী আর নেই। হয় লোপ পেয়েছে। নয় তো ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু বিষ পিঁপড়ে ঠিক টিকে আছে। আছে উই পোকা। ওদের নির্বংশ করতে বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বিলিয়ন ডলারের গবেষণা চালাচ্ছে। বিষ পিঁপড়ে শুধু কুটুস করে কামড়ে সরে যাচ্ছে। উই পোকাকে মারতে হলে ওদের বাসার ছ' ফুট গভীর গর্ত করে রাণী উই-পোকাটিকে খুন করতে হবে। ধরার আগেই সে কোন সুড়ঙ্গ পথে সেঁধিয়ে গিয়ে আধুনিক মরণ বিষ মিথ্যে করে দেবে।

বড় বড় প্রাণী প্রকৃতির হাতে মরেছে। ছোট হয়েছে। তাদের মারতে বড় বড় বন্দুক লেগেছে মানুষের। এখন আবার সে সব প্রাণী যা কিছু আছে তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। বাঘ মারলে তো এখন জেল জরিমানা দুইই হয়।

অথচ বন্দুক বা তীর দিয়ে পিঁপড়ে মারা যায় না। পৃথিবীতে তাহলে অতিকায় জিনিসের জায়গা নেই। এটাই কি পৃথিবীর ধর্ম? উপন্যাস ছোট হয়ে গিয়ে 'হ্যান্ডি' হয়েছে। লোকের সময় নেই। কাহিনীর হন্তা পাঠক আর বইতে রাজি হচ্ছেন না। পড়তে পড়তে সুর খুঁজে পাওয়া যায় এমন জিনিসে মানুষ ঝুঁকছে। কাব্য তাই অনেককালের জিনিস হয়েও এখনো দিব্যি টিকে আছে। অথচ গদ্যে ত্রিলজি আর হচ্ছে না।

সেকসপীয়র অবশ্য এসব অঙ্ক গোলমাল করে দিচ্ছেন। তাঁর লেখায় কবির সুর পাওয়া যাচ্ছে। কাহিনী রগরগে। ঔপন্যাসিক সেখানে সংলাপের সংঘর্ষ লক্ষ্য করছেন। নাট্যকার পাচ্ছেন দৃশ্যের পর দৃশ্যের বুনোট। ক্লাইমাকস। অভিনেতা বুঝতে পারছেন—পুরো ব্যাপারটাই জীবন থেকে নেওয়া। এমন তো আজও আকছার ঘটে। এই কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও দার্শনিক আজও খুবই কনটেমপোরারি।

আবার মহাভারতে তাকালে আরও অবাক হতে হয়। সেখানে তো কাহিনী কাহিনী আর কাহিনী। টেলিফোন একসচেঞ্জে সরু সরু তারের যে জট—প্রায় তারই মত জটিল জটায় কাহিনী, চরিত্র—তবে মাঝে মধ্যে দর্শন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। রাজসভায় মেয়েমানুষ পণ রেখে পাশা খেলা, উরু বাজানো, যুদ্ধে রথের চাকা বসে গেল, শ্মশানে চিতার পর চিতা—বিধবাদের কান্না, মহাপ্রস্থানের পথে বড় বড় চরিত্রের পতন। নাটক, কাহিনী, দর্শন, কবিতা—কী নেই। তবে তো এই অতিকায় মহাভারত টিকে আছে। তাহলে?

মন্ত্র সবচেয়ে কম কথার সুর। এর স্বাদ পেতে চাই শিক্ষা। শিক্ষা না পেয়েও মন্ত্র নেওয়া যায়। কেননা মন্ত্রের দ্যুতি অশিক্ষিতেও উঠে আসে। কাহিনী থেকে নির্যাস, অভিজ্ঞতা থেকে দৃষ্টি নিয়ে বাড়তি খসানো মাত্র বাঁধা ভাষায় মন্ত্র দীর্ঘায়ু। এর পেছনে রয়েছে আরেকটি জিনিস। মন্ত্রে কিছু স্বপ্নও গুঁজে দেওয়া

আগামী সংখ্যা থেকে
এ কলমে লিখবেন
আলোকময় দত্ত

আছে। যেমন শ্রাদ্ধের মন্ত্রে দেখছি—বৃষোৎসর্গের সময় বলা হচ্ছে—মাগো, এই প্রাণীর গায়ে যত লোম আছে—তত লক্ষ বছর তোমার স্বর্গবাস হোক।

স্বপ্ন কল্পনা, দূরদৃষ্টি মন্ত্রকেও যেমন আয়ু দেয়—অতিকায় কাহিনীকেও তেমনি কাব্যগুণ দিয়ে দীর্ঘায়ু করে। কল্পনা, স্বপ্ন দূরদৃষ্টি— এরা একে অন্যের পরিপূরক। এই সঙ্গে ভূমিকা। অতর্কিত বর্জিত আটোসাটো বাঁধন থাকলে শিল্প দীর্ঘস্থায়ী হয়। তখন অতিকায়—ক্ষীণকায় কোন সমস্যাই নয়।

আসল কথা যিনি লিখবেন—তিনি কেমন লোক। তিনি কি ভাবেন? তিনি ভাবেন কি? তাঁর মাথার ভেতরে পুরো দিগন্ত চলকায় তো? কতদূর তিনি দেখতে পান। যা দেখেন—তার সঙ্গে স্বপ্ন কতটা মেশান। কতটা কল্পনার মিশেল দেন তিনি। এই মিশেলের কোন দাগ থাকে না তো। থাকলে কিন্তু বিচ্ছিরি ব্যাপার! বড় হাতার এক হাতা জীবন—জীবন থেকে তুলে নিয়ে তিনি কিভাবে শিল্পে ঢালেন। তাঁর হাত কাঁপে না তো। কাঁপলে চলকে গিয়ে জীবন ছিটকে ছড়িয়ে পড়বে।

এ সব জিনিস ভাবনা- বিষয়। তাই কি করে বলি—যুগটা বিষ পিঁপড়ের। হাতি তো এখনো মনোহর।

বরুণ সিমলাই-এর স্কেচ

৮।

হারানো বই

বই-এর শেষ লাইন

সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন!!!

তার আগেই লিখেছেন

ইংরাজের মঙ্গলেই ভারতবাসীর মঙ্গল...

'ইংরেজের কথা' যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের ইংরেজ প্রশস্তির নিদর্শন। কিন্তু এই বইয়ের পাতায় আছে ইতিহাসের নানা উপকরণ। যোগীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন ভারত' পর্যায়ের গ্রন্থাবলী ছাপা নেই বহুকাল। সুপ্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ আমলের প্রথম পর্যন্ত যে সব বিদেশী পর্যটক ভারতে এসেছিল তাদের বিবরণ আছে এই বইয়ের প্রতিটি খন্ডে।

২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাদশাহ সাআলম কোম্পানিকে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার রাজা বানিয়ে দিলেন। ক্লাইব লর্ড হলেন। দু' হাতে পুকুর চুরি করে, দেশে ফিরে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। দুশ' বছরের কঠোর নিষ্পেষণে এদেশের সম্পদ লন্ডনের রাজপথ সাজিয়েছিল। ইংরেজ এদেশের বহু মানুষের মস্তক খেলাই করে স্তাবকে পরিণত করেছিল। যার রেশ এখনও আছে।

ইংরেজ এদেশে এসে সহজে ব্যবসা চালাতে পারে নি। দিল্লীর বাদশাহের দরকারে বার বার দূত পাঠাতে হয়েছিল ইংলন্ডের রাজাকে। টমাস স্টীফেন এদেশে আগত প্রথম ইংরেজ। ১৫৭৯ সালে তিনি ভারতে আসেন। তার চার বছর পরে ১৫৮৩ সালে এসেছিলেন বণিক মাস্টার রালফ ফীচ। ওদের জাহাজের নাম ছিল 'টাইগার অফ লন্ডন।' ফীচ নানা জায়গা ঘুরে ১৮০ খানা পণ্য বোঝাই নৌকো নিয়ে সপ্তগ্রাম আসেন। ১৫৯৯ সালে জন্ম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। ১৬০১ সালের ২২ এপ্রিল শুরু হয় ভারতের দিকে কোম্পানির বাণিজ্য যাত্রা। সঙ্গে পাঁচখানি জাহাজ বোঝাই মুদ্রা, লোহা, স্টীল, কাচ, কাপড়। নেতা ছিলেন [illegible] কাস্টার। জাহাজগুলি ব্যবসা ভালই করে। কিন্তু ওরা ভারত পর্যন্ত আসে নি। ১৬১০ সালে কাপ্তেন ডেভিড মিডলটন তিনখানি জাহাজ নিয়ে প্রথম ভারতে আসেন। সুরাট বন্দরে প্রায় কুড়িখানি পর্তুগীজ জাহাজ ওদের গতিরোধ করে। মিডলটন ফিরে গেলেন। ওদের মধ্যে খন্ড যুদ্ধও হয়েছিল। ১৬১২ সালে চারখানি জাহাজ নিয়ে এলেন কাপ্তেন বেস্ট। এবারও পর্তুগীজরা বাধা দেয়। কিন্তু হেরে যায়। ইংরেজদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

জাহাঙ্গীর কোম্পানিকে সম্পদ দিলেন বাণিজ্যের। সুরাট, আহম্মদাবাদ কাম্বে ও গোগোতে কুঠি তৈরি করতে পারবে। লাভের ওপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদ দিতে হবে। পর্তুগীজদের আক্রোশ বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। ইংলন্ডের রাজা এর প্রতিকারের জন্য বাদশাহের দরবারে দূত পাঠালেন স্যর টমাস রোকে। বাদশাহ তখন আজমীরে। পুরো সফল না হলেও, রো কিন্তু বেশী সুযোগ আদায় করেছিলেন। রো দৌত্যকর্ম বিষয়ে যে বই লেখেন, সমকালীন ভারত ইতিহাসের তা এক আশ্চর্য দলিল।

কোম্পানি বাংলায় এল কেন? মছলিপট্টমে কাপড়ের অভাব দেখা দেয় ১৬৩৩ সালের মার্চে। কোম্পানির নৌকো আসে বালিকুড় আর হরিহরপুর হয়ে কটকে। নবাব আগামহম্মদ জামান ওদের হরিহরপুর ও বালেশ্বরে কুঠি বানাবার অনুমতি দেন। তারপর বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় [illegible]য়ে পড়ে কোম্পানির ব্যবসাপত্তর। ১৬৩৬ সালে ডাক্তার বোটন সম্রাট সাজাহানের এক আগুনে পোড়া মেয়ের চিকিৎসা করে কোম্পানির জন্যে বেশ কিছু সুযোগ আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। অবশ্য এই আগুনে পোড়া কাহিনীর কোন ভিত্তি নেই।

তারপর এলেন জব চার্ণক ১৬৫৫ বা '৫৬ সালে। তার মাস মাইনে ছিল তিনশ টাকা। চার্ণক নিয়ে কল্প কাহিনীর শেষ নেই।

বিলেতে ১৬৯৮ সালে সরকারের দু কোটি টাকার দরকার পড়ে। সরকার নতুন একটা কোম্পানিকে ভারতে বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে এই টাকা নেয়। পুরনো কোম্পানি বাধা দিয়েও সুবিধে করতে পারে নি। নতুন কোম্পানির দূত উইলিয়াম নরিস বাদশাহ ঔরংজীবের দরবারে দেখা করতে আসেন। পুরনো কোম্পানির এজেন্টরা তাকে নানাভাবে বাধা দেয়। তবুও ঔরংজীব প্রকাশ্য দরবারে তাদের আপ্যায়ণ করেন। বাদশাহকে দেওয়া উপহারের মধ্যে ছিল : বারটি পিতলের দ্রব্য, বিরাট আয়না, চারটি আরবী ঘোড়া, রুপোর তৈরি জরি বসান পাল্কি, দুটো শিরস্ত্রান। তাছাড়া নরিস বাদশাহকে ২০০ মোহর নজরানা দেন। তা হলেও নরিস সুবিধা করতে পারেন নি। ইংল্যান্ড ফেরার পথে সেন্ট হেলেনার কাছে তিনি মারা যান।

এর মধ্যে কলকাতা কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গোলমাল বাধল মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে। তিনি দেশীয় ব্যবসায়ীদের অনুরূপ শুল্ক কোম্পানির কাছ থেকে দাবী করেন। কোম্পানি এর প্রতিবাদ জানাতে দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে দুই দূত সুরমান ও স্টীভেনসনকে পাঠায়। তাঁদের সহকারী ছিলেন খোজা সারহাদ নামে এক আর্মানী এবং ডাক্তার হ্যামিল্টন। এই দৌত্য কাজের বিবরণ বেশ আকর্ষণীয়। দু' বছর ওদের লেগেছিল বাদশাহের মন গলাতে। প্রতিনিধিদের সকলকেই বাদশাহ শিরপা দেন সন্তুষ্ট হয়ে।

কোম্পানি কলকাতায় দুর্গ তৈরি করছিল। সংঘর্ষ বাধল নবাব সিরাজদৌলার সঙ্গে। হেরে গেলেন তিনি। ক্লাইব বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায় করে নিলেন।

এখানেই ইংরাজের কথার প্রথম পর্ব শেষ। লেখক যোগীন্দ্রনাথের শেষ মন্তব্যে আছে 'দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল। সকলেই বুঝিলেন যে, এই অপরাজেয় জাতির সহিত বিবাদ বা যুদ্ধ করা বৃথা। বিধাতার ইচ্ছা যে, এই জাতিই রাজা হইয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আপামর সাধারণকে অপত্য নির্বিশেষে পালন করিবেন'—গ্রন্থকার যোগীন্দ্রনাথ ইংরেজ স্তুতির সীমা ছিল না। কিন্তু ইতিহাসকে কোথাও বিকৃত করেন নি। সে কারণেই বইখানি একালের পাঠকেরও ভাল লাগবে

ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস লন্ডন, '১৮৩৩

বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা

অভিচার

শুধু এ-ই : নির্বোধের দাহ।
রেগে ওঠো। ফেটে পড়ে যাও।
চুপ রও, মিথ্যাবাদী মুখ—
জলে রেখে, আগুনের থেকে
শান্ত যার ভাষা যে তুলুক—
ছারখার হতে থাকে রাগে!

ক্ষয়ে ক্ষয়ে সমস্ত একাকী
এটুকুই : টুকরো হতে বাকি।
নয় তালি ন্যাংটো জোড়াতালি।—
হাড়মাস মরে এক করা
বৈরাগির মুঢ় গেরস্থালি :
একরোখা উল্লম্ব একতারা।

আর নয় কিছুই বলবো না : ঝলে ওঠো, বিব্রত আলপনা।
দাউ দাউ জ্বলে শঙ্খলতা :
ফণা, ফুঁয়ে উড়ে পুড়ে থাক—
ঘর হাট : জানা মন্ত্রকথা।
রাগলক্ষ্মী, বিষ নেমে যাক।

শিকার

বন থেকে বেরিয়েছে সন্ধ্যা হতে এক একটা শিকারি কুকুর :
দূর অন্ধকার আর কাঁকরের শুঁড়িপথ রক্তমাখা কালো।
মুখে হাঁস, খরগোস—ফেলে টুঁটি চেপে ধরতো ডাকু ও দিকু-র
তার আগে জ্বলে উঠলো টাঙির কোপের মতো সঙিন, ধারালো
লাল শিখা মশালের, লম্বা জিভ লাল জিভ : রাত্রির দুপুর—
কবন্ধ ঘনিয়ে বসে : তিন পা এগিয়ে গিয়ে মদ ও মাদলে
দুই পা হটেছে পিছু মরদ ও হাসিনেরা এদল সেদলে।

ওরা কতো দূর থেকে এ ওকে যে খুঁজে পেলো আজ এই রাতে :
মানুষের মধ্যে ঢের থেকে গেছে টের পেয়ে মাংসাশী হিংস্রতা
এ অন্যকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে পরস্পর ফিরে পেলো ভকো--ঘষা দাঁতে :
শিকারি কুকুর নয় : তবু ওরা জানে মরা নদীটার সোঁতা
খরস্রোতা হয়ে ওঠে পাহাড়ি গাঙের ঢল লাল জল কাটে—
কুকুর সাঁৎরে আসে : চিল্লায় চাঁদকে দেখে শীত মধ্যযামে :
সকালে রাঙার আগে গা-ভরা কে এক মেয়ে, আর্ত, জল ভাঙে।

শোয়ানো মেয়ের মতো ওরা ঐ দেশের নদী এই নদীতীর
খোয়াই পাহাড় টিলা ঝোপ-ঝাড় ভালোবেসে শেষ অবধি স্থায়ী
কেবল কুকুর ঘোরে এখনো ওদের সঙ্গে : ওড়ে কাঁড়তীর :
বোঙা-বুরু পার হয়ে মহাপ্রস্থানের দেশে যে হয় বিদায়ী
সে হয় কুকুর সঙ্গী। যদি অতি মৃত্যুপারে জিন মহাবীর
যান, তাই রাঢ়ভূম ছুঁছুঁ পিছে লেলায় কুকুর :
ওদের দেবতা ধর্ম, কুকুর ওদের ধরে রাখে কিছুদূরে।

গল্প

একটা ভূতের গল্প জানি :
পোড়ো জমি, কাকতাড়ুয়ার।
বিশ্বাস করাবো কাকে আমি?
তুমি শুনে ঠা ঠা হাসতে, আর
উড়ে যেতো ভিটে-চরা ঘুঘু।
অবিশ্বাস স্বভাবে সবার।

অদ্ভুত, শোনে না খোকাখুকু :
অদ্ভুত, যতই ঝুলি ঝাড়ি—
একটা ভূতুড়ে গল্প শুধু :
কানাওলা, নয় হানাবাড়ি :
উড়ে যাওয়া বাদুড়েরা। শুধু
পোড়ো জমি, আর মুখ হাঁড়ি।

নিশিডাক মাঠ করে পার।
রাত, এই আমার সময় :
সে গল্পই বলি, শুনি, আর
সে বয়স নয়, ভয় হয় :
ভয়, ভয়ে গল্পটি আমার…
পোড়ো জমি, কাকতাড়ুয়ার।

আমার ছোটকাকা গোলাপলাল ঘোষ

তুষারকান্তি ঘোষ

গত ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭৮) আমার অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদনার ৫০ বছর পূর্তি হল। সেই সময়ে আমি অনেকের কাছে অভিনন্দন পেয়েছিলুম। আমি স্বভাবতই তাঁদের শুভেচ্ছার জন্যে কৃতজ্ঞ। কিন্তু যাঁর প্রসাদে আমি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলুম তাঁর কথা সেদিন বার বার আমার মনে পড়েছিল। তিনি আমার ছোটকাকা স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষ। এঁর সুবিখ্যাত দাদাদের যেমন মহাত্মা শিশিরকুমার, হেমন্তকুমার, মতিলাল—এঁদের সম্বন্ধে জনসাধারণ অনেক কিছু পড়েছেন ও জেনেছেন। কিন্তু আমার এই ছোটকাকা সম্বন্ধে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া বাইরের লোকেরা বড় বেশী কিছু জানেন না। তাঁর সম্বন্ধে আজ আমি কিছু কথা লিখতে বসেছি।

কিন্তু ছোটকাকার কথা বর্ণনা করবার আগে আমার আর একজন নিকট আত্মীয়, আমার পিসতুত ভাই স্বর্গীয় রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলা আবশ্যক, কারণ আমার সম্পাদক হওয়া সম্বন্ধে আমার এই পিসতুত ভায়েরও যথেষ্ট হাত ছিল। রঞ্জনবাবু তখন পোস্টাপিসের বড় চাকরী থেকে রিটায়ার করেছেন এবং বেহালায় বাড়ি করে বাস করছেন। তিনি তখন প্রায়ই আমাদের পত্রিকা আপিসে আসতেন এবং আমাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে তাঁর প্রায় সমবয়সী ছোটমামা, অর্থাৎ গোলাপবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও গল্প-গুজব করতেন।

একদিন আমার ছোটকাকা তিনি তখন পত্রিকা সম্পাদক, রঞ্জনবাবুকে বললেন যে 'আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব আর একজন নিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।' তখন তাঁরা দুজনে আলোচনা করলেন বাড়ির ছেলেদের মধ্যে এই দায়িত্ব কাকে দেওয়া যায়। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করে স্থির করলেন যে আমাকেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাঁরা পরে আমাকে জানিয়ে ছিলেন যে আমাকে তাঁরা এই সম্মান দিয়েছিলেন শুধু আমি শিশিরকুমার ঘোষের পুত্র বলে নয়। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করে স্থির করেছিলেন যে আমি অন্যদের চেয়ে এই ভার নেবার বেশি উপযুক্ত। একথা আমি বলছি এইজন্যে যে গোলাপবাবুর নিজেরই বড় ছেলে, এম-এ বিএল পাশ করা বিমলকান্তি ঘোষ আমাদের মধ্যেই ছিলেন। এবং যদিও বিমলবাবু আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, তবুও ছোটকাকা বিশ্বাস করেছিলেন যে আমিই এ ভার নিতে পারব। সেইদিন বিকেলের ডাক এডিসানেই এই খবর বেরিয়ে গেল। আমিত শুনে অবাক। কারণ বাড়ির ছেলেদের মধ্যে আমি তখন সর্বকনিষ্ঠ ছিলুম। তখন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার এবং বিমলবাবুর মত স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষের নাতিরা এবং মৃণালকান্তি ঘোষের পুত্র এরা সকলেই আমার চেয়ে বয়ঃজেষ্ঠ ছিল। আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার তখন বিশেষ সন্দেহ ছিল। এবং আমি বুঝেছিলাম যে এ সম্মান আমার গুণের জন্যে নয়। এ সম্মান আমি শিশিরকুমার ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র বলে। যাইহোক দায়িত্ব যখন এসেই গেল, তখন আমি স্থির করলুম যে যেমন করে পারি আমি সুষ্ঠুভাবে আমার এই দায়িত্ব পালন করব। ছোটকাকা কাগজে যে নোটিশটি ছেপেছিলেন সেটি হচ্ছে।

Calcutta December 16, 1928
Shri Tushar Kanti Ghosh
— Editor —
OURSELVES

As I am suffering from blood pressure I have been advised by my medical attendants to refrain from all active work. I have, therefore, made over the charge of my duties to my beloved nephew, Shriman Tushar Kanti Ghosh, the youngest son of my revered brother, the late Mahatma Sisir Kumar Ghosh. He has received his training both under the late Babu Matilal Ghosh and myself and so, I am sure, he will maintain the tradition of the "Patrika" in conducting the paper.

— Golap Lal Ghosh.

আমি রঞ্জনবাবুকে 'তাঁকে আমরা ছোড়দা বলতুম।' গিয়ে বললুম যে, 'আপনিত ছোটকাকাকে পরামর্শ দিয়ে এই দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু আমি কেমন করে অমৃতবাজার পত্রিকার মত কাগজের পূর্ব ইতিহাস বজায় রেখে এই কাগজ চালাব। যে কাগজের সম্পাদক শিশিরকুমার, মতিলাল ও গোলাপলাল ছিলেন আমি সেই কাগজের ট্র্যাডিশান বজায় রেখে কি করে চলাব। আমাকে কে সাহায্য করবে? আমার পিসতুত ভাই বললেন, 'তোমার ভয় নেই আমি দু-তিন বছর প্রত্যেকদিন আপিসে এসে তোমার কাজে সাহায্য করব। তাছাড়া শরীর খারাপ হলেও ছোটমামাতো আছেন। আবশ্যক হলেই তাঁরও পরামর্শ পাবে।' আমার পিসতুতো ভাই তাঁর কথা

রেখেছিলেন। প্রায় তিন বছর তিনি প্রতি-দিন এসে আমাদের এডিটোরিয়াল বোর্ডের মিটিং-এ যোগ দিতেন। অবশ্য, বছর দুয়েকের মধ্যেই আমার কাজ আমি বুঝে নিয়েছিলুম এবং মৃণালকান্তি বোস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীলাল ঘোষ, মহীতোষ রায়চৌধুরী এ'দের সাহায্যে আমি ভালভাবেই কাগজ চালাতে পেরেছিলুম।

ছোটকাকার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে যে তিনি কত ভাল লোক ছিলেন—ধার্মিক, হিংসা, দ্বেষ জানতেন না। আমার ঠাকুর্মা অমৃতময়ীর অন্য ছেলেদের মতই গোলাপলাল সরল ও গৌরাঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাঁর অন্য দাদাদের মত তিনিও প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের নিয়ে কীর্তন করতেন। তাঁর দাদাদের ওপর তাঁর যেমন গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল তেমনি গভীর সমীহও ছিল। একটা কথা বললেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তখনকার নিয়মানু-সারে গোলাপলাল তামাক খেতেন কিন্তু এ ব্যাপারটা আমরা বহুদিন জানতে পারিনি। তাঁর ঘর ছিল অন্দর মহলের শেষ সীমান্তে। এবং সেইখানেই তিনি তামাক খেতেন। আমার ন'কাকা মতিবাবুর মৃত্যুর পরে প্রকাশ্যে বাইরের ঘরে তিনি তামাক খেলেন। তখন কিন্তু তাঁর নাতি-নাতনী হয়ে গেছে।

তাঁর নাতি-নাতনীর কথায় একটা হাসির ঘটনা মনে পড়ল। একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করতুম যে আমাদের শাসন করতে হলে চোখ রাঙিয়েই শাসন করতেন, গায়ে হাত তুলতেন না। যদি কখনও মারতেন তাহলে পায়ের থেকে জুতো খুলে এক জুতো। একদিন হয়েছে কি তাঁর এক ছোট দৌহিত্র, সুহৃদ গোপাল দত্ত কাঁদছে। তিনি তাকে কোলে করে অনেক শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই তার কান্না থামাতে পারলেন না। অনেকবার 'লক্ষ্মীছেলে, চুপ কর' বললেন কিন্তু কিছুতেই তার কান্না থামে না। তখন রেগে গিয়ে মাটিতে নাবিয়ে এক জুতো। তাতে সে আরও কেঁদে উঠল। তখন তাকে আবার কোলে নিয়ে ঠান্ডা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন আমি তাঁর নাতিকে কোলে নিয়ে তাকে নিষ্কৃতি দিলাম।

তাঁর কলকাতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। শহরের পল্লীগুলোর নাম অবশ্য তিনি শুনেছিলেন কিন্তু সেগুলো কোথায় তা তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি কেবল বাগবাজার এবং গঙ্গার ঘাট—এই দুটো জায়গার সঙ্গেই সুপরিচিত ছিলেন। একদিন হয়েছে কি বিডন স্কোয়ারে একটা পলিটিক্যাল মিটিং হবে। সেখানে আমার কাকা মতিবাবু সভাপতি এবং স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল প্রধান বক্তা। এই স্থির হল যে মতিবাবু আগে অন্য গাড়িতে বিডন স্কোয়ারে চলে যাবেন এবং তার কিছু পরে আমরা আমাদের ছোটকাকাকে নিয়ে আমাদের ঘরের গাড়িতে বিডন স্কোয়ারে যাব। এও স্থির হল যে সেখানে পৌঁছে আমরা মিটিং-এ ঢুকে পড়ব এবং গাড়িটা বিডন স্ট্রীটেই দাঁড়িয়ে থাকবে। এবং এও স্থির হল যে মিটিং ভাঙবার পর আমরা সবাই একে একে গাড়িতে ফিরে আসব এবং মতিবাবুও আমাদের সঙ্গেই ঐ গাড়িতে ফিরবেন।

মিটিং শেষ হলে আমরা সবাই একে একে গাড়িতে এসে বসলুম। কিন্তু ছোট-কাকার দেখা নেই। আমরা বসেই আছি কিন্তু তিনি আর আসেন না। বেশ খানিকক্ষণ বাদে হন্তদন্ত হয়ে এসে তিনি কোচোয়ানকে ধমকাতে লাগলেন 'কী হে হিঁয়া গাড়ি লেয়ায়া? আমি কিছুতেই গাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলুম না।' সে বললে হুজুর এখানেই তো গাড়ি প্রথম থেকেই আছে। আমরা বললুম ছোটকাকা আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, তিনি বললেন, মিটিং ভাঙবার পর আমি রাস্তায় এসে অনেকদূর হেঁটে গিয়েও গাড়ি খুঁজে পেলুম না। হঠাৎ দেখি যে রাস্তাতে ট্রাম লাইন রয়েছে। তখন একজন লোককে জিজ্ঞেস করলুম এইটে কি বিডন স্ট্রীট? সে বললে না মশাই, বিডন স্ট্রীটে কি ট্রাম লাইন আছে? আপনি ফিরে যান গিয়ে। বাঁয়ের রাস্তাটা হচ্ছে বিডন স্ট্রীট।

এইখানে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি যে এইসব কথা লিখছি—এ আমার ছোট কাকাকে হেয় করবার জন্যে নয়। তিনি কিরকম সাদাসিধে আপন ভোলা দেবতার মত লোক ছিলেন তারই কিছু পরিচয় দেবার জন্যে।

ভোজন রসিকের জবানবন্দী

প্রতাপকুমার রায়

৩ নভেম্বর অমৃতে অমল মুখোপাধ্যায়ের একজন ভোজন-রসিকের জবানবন্দী পড়তে পড়তে অনেকদিনের পুরনো চেনা সুরের স্বাদ পেলাম। গলা না মিলিয়ে থাকতে পারলাম না। তাই এই লেখা।

সেবার দিল্লিতে এ বছরের মতো এক আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা হয়েছিল। শীতের উপাদেয় দুপুরে দেশী-বিদেশী পণ্যসম্ভার দেখে যুগপৎ মুগ্ধ ও ক্লান্ত হয়ে যেখানে পৌঁছলাম সেটি এক পাঁচতারা হোটেলের সাময়িক রেস্টরেন্ট। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি বেশ ক্ষুধার্ত হয়েছি। সঙ্গী বন্ধুকে নিয়ে সাগ্রহে প্রবেশ করলাম। হোটেলটি সারা ভারতবর্ষে সবাই এক ডাকে চেনে। অলস দুপুরটি পরিপাটি ভোজনে নিটোল হবে আশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারী মনোভঙ্গ হল। ঘোলা জলের মতো ঈষদুষ্ণ সুপের পর বলিষ্ঠ এক মোরগের অংশ নিয়ে প্রায় ধস্তাধস্তি করতে হল। সালাদে রুগীর পথ্যের স্বাদ। নাম-না-জানা ডেসার্টের নতুনত্বও মধ্যাহ্ন-ভোজনকে উত্তীর্ণ করতে পারল না। দামের ক্ষেত্রে অবশ্য পাঁচতারা তার নামের মর্যাদা রক্ষা করে আকাশ ছুঁয়েছিল। দুজনের জন্য যাট টাকা খরচ হল।

মনে আছে, পরেরদিন আবার সেই বন্ধুকে নিয়ে চাঁদনীচৌকে গেছলাম। চাঁদনী থেকে বেরিয়ে একটি সংকীর্ণ গলি দক্ষিণ দিকে গেছে। আর পাঁচটা গলির মতো তারও কোনও বিশেষত্ব নেই। নাম যদিও বিশ্রুত—পরোটা গলি। গলির দুধারে কয়েকটি ভোজনশালার প্রধান খাদ্য পরোটা। শতাধিক বছর এই গলি তার নামের সার্থকতা রক্ষা করছে। শ্বেতপাথরের টেবিলে স্টীলের থালায় পর পর গরম গরম বিবিধ পরোটা এল—আলুর, বেসনের, মেথির, ফুল কপির, মুলোর। অনুষঙ্গ আলুর শুখা তরকারী এবং রসাদার। সামান্য গাজরের হালুয়া ও রাবড়ি সহযোগে আহার সমাপ্ত করে পরিপূর্ণ হৃদয়ে যখন বিল পেলাম তখন আনন্দ উপচে পড়ল। সাত টাকা। ওঠবার মুখে দোকানদার (যে সামনে বসে পরোটা ভাজছিল আর যার হাতের কাজ আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম) জিজ্ঞাসা করল আহার্য মনোমত হয়েছিল কিনা। আরও দু-একটা কথা হল। দোকানের সাইন বোর্ড দেখিয়ে বলল, আমাদের দোকানের শত বৎসর পূর্ণ হয়েছে। দেখলাম প্রতিষ্ঠার সাল লেখা রয়েছে আর দেখলাম বড় করে লেখা:

If ghee proved unpure thousand rupees reward

সাইন বোর্ডের ইংরিজির মতো ঘৃতও বিশুদ্ধ ছিল কিনা সন্দেহ থাকলেও তা নিয়ে তর্ক করিনি, হাজার টাকা জেতবার কথাও মনে আসেনি। এত স্বল্পমূল্যে এমন মনোহরণ খাদ্য পাওয়া গেল, সেটাই যথেষ্ট মনে হয়েছিল।

আসলে, কী দিয়ে রান্না হয়েছে, এমন কি কোথায় রান্না হয়েছে জেনে আমাদের কোন মোক্ষলাভ হবে? অন্তিম যে পদার্থ তার পরিচয়ই চূড়ান্ত এবং পর্যাপ্ত। তাছাড়া এই সব অনুসন্ধানের ফল সব সময়েই বড় বিধ্বংসী হয়। খাবার মজা একেবারে চলে যায়। খুঁতখুঁতে মানুষদের জর্জ অরওয়েলের Down and out is paris and London বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। প্যারিসের জগৎ বিখ্যাত হোটেলের রান্নাঘরের সেই বর্ণনা পড়লে চিরকালের জন্য বাইরে খাবার ইচ্ছা লোপ পাবে। তবে ওই সব হোটেলের দাম আকাশচুম্বী বলে আমরা এক ধরণের মূর্চ্ছাহত অবস্থার ফিরে আসি। অরওয়েলের কথা তখন মনে পড়ে না। না পড়াই ভালো। ভালো লোকেরা ভালো জিনিসটাই দেখতে চায়। দুষ্ট লোকেরাই শুধু অন্ধকার দিকটা দেখে।

যুগে যুগে, না, বছরে বছরে মানুষের রুচি বদলায়। সাহিত্যে, পোশাকে, আহারে আজ যা তার পছন্দ কাল তা নাও থাকতে পারে। এই পরিবেশে যে সব দোকান তাদের আহার্যে বহুদিন ধরে মানুষের মন মজিয়ে রেখেছে, তাদের সৃষ্টি তো মহাকাব্যের সমতুল্য। তারা বিভিন্ন মানুষের রুচির মধ্যে একটা চিরন্তন G.C.F. এর (গ সা গু) আবিষ্কর্তা বহু পরিশ্রমে এবং প্রয়োগে তার নিজেদের মাণ বজায় রাখে। আমাদের ভাগ্য সব দেশে সব শহরে এমন দু-চারজন মহাকাব্যের ধরনার শিল্পী আছেন। আমরা তাঁদের বহুখ্যাত দোকানে গিয়ে প্রাণ-মন এবং হয়তো বা আত্মাকেও মধুসিঞ্চিত করি। উন্নাসিক হলে বলি, আজকাল তেমনটি আর হচ্ছে না। আগে এই সিমলের সন্দেশ খেয়েছি, তখন—ইত্যাদি। হয়তো সত্যি, হয়তো নয়। নদীর এ পারের মতো একদল চিরকাল নিশ্বাস ফেলেছে, বলেছে, সেকালেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস। দুই

স্বাদকে পাশাপাশি একসঙ্গে পাওয়া গেলে না হয় পরখ করে দেখা যেত। তাই বলি, তা হোক, এমনটি তো আর কোথাও পাওয়া যায় না। সত্যিই যায় না। সেটাই সিমলের বিশেষত্ব। হেদোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেথুন কলেজের পাশের রাস্তায় এক সারি মিষ্টান্নের দোকান তাঁদের সন্দেশের ঐতিহ্য আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

আমার ধারণা পৃথিবীর তাবৎ সেরা মিষ্টির সারিতে সন্দেশের স্থান নির্বিরোধ। স্রষ্টা শিল্পীর কুশলতার বিচারে সন্দেশ সর্বাগ্রগণ্য। সিমলেতে সন্দেশ কিনতে গিয়ে একদিন বড় আঘাত পেয়েছিলাম। গাড়ি করে সুবেশ এবং ধনাঢ্য এক ব্যক্তি সন্দেশ কিনতে এলেন। বললেন, আমাকে কুড়ি টাকার সন্দেশ দিন তো। আমি চমকে উঠলাম। সন্দেশ? সে তো কমন নাউন। ভাবুন তো এম সি সরকারের বই-এর দোকানে গিয়ে কেউ বললেন, আমাকে একটা বই দিন তো। সন্দেশ কী এক প্রকারের? কত রকমের সন্দেশ হয় আপনারা সবাই জানেন। ভারতীয় মিষ্টান্নের তালিকায় সন্দেশ এখনও শীর্ষ-স্থানে, তার কারণ এই বহু বিচিত্র সন্দেশ সব তৈরী হয় প্রায় একই উপকরণ থেকে। তবুও যে স্বাদের বৈচিত্র্য আসে সেটা শিল্পীর সোনার কাঠির; এখানে কাঠের হাতার ছোঁওয়ার দরুণ। সন্দেশের উপ-করণ প্রধানত ছানা এবং চিনি। গুড়ের কথায় পরে আসব।

শুধু ছানা এবং চিনি এবং ক্ষেত্র-বিশেষে ঈষৎ সুগন্ধির ছোঁওয়া মিশিয়ে কতই না বিভিন্ন স্বাদের সন্দেশ তৈরী হয়। আমার এখনই বারো রকমের সন্দেশের কথা মনে পড়ছে। কোন মায়াময় কটাহে কয়লা অথবা কাঠের আগুনের আঁচে পাকের প্রকারভেদে মোহময় এই মিষ্টির উৎপত্তি। আর কোনও মিষ্টি তৈরীতে শিল্পীর কুশলতার একন প্রকাশ দেখা যায় না, না পাওয়া যায় তার প্রতিভার চরম বিকাশ। উপকরণের বাহুল্য নেই, দশ রকম আরও বায়নাক্কা নেই, অথচ যে পদার্থ তৈরী হল তার মেল পাওয়া যাবে না সারা পৃথিবীতে।

খাদ্যবস্তুর গুণের বর্ণনা ভাষায় সম্ভব নয়—আমার ভাষার তো নয়ই। ভাষার ক্ষমতা সীমিত। আমাদের সব অনুভব কী ভাষায় প্রকাশ করা যায়? চোখের চাউনি, মুখের রেখা ভাষার থেকে বেশি কথা বলে আমরা জানি। খাদ্যবস্তুর আনন্দ প্রাণে পোঁছে দেবার বাহন হল স্বাদ, আঘ্রাণ ও স্পর্শ। কবির কথা সামান্য বদলালে, আঘ্রাণে আস্বাদে ও স্পর্শে যা পাওয়া যায় ভাষার ক্ষমতা কোথায় তার বর্ণনা দেয়। সে আনন্দ সত্যিই অনির্বচনীয়—বাক্যের অতীত। তার উপর আছে খাদ্যের রূপ।

মনে পড়ছে এ বছরে সদ্য আগত নলেন গুড়ের একাধিক সন্দেশের কথা। ধরুন কাঁচাগোল্লা—ভরা গঙ্গার মতো রং মালাই-এর মতো নরম অথচ ঈষৎ দানাদার, তার ওপর নতুন গুড়ের ঐশ্বরীয় সৌরভ। জিহ্বা, দাঁত, মুখাভ্যন্তর মুহূর্তে যেন এক সুরে গেয়ে ওঠে—এমনটি আর হয় না। আমন্দের অনুভূতি ইন্দ্রিয় কটির অনু-ভবের সমষ্টি-মাত্র মনে করাও ভুল। আশ্লিষ্ট প্রণয়িনীর আঘ্রাণ, চুম্বন ও স্পর্শের অতিরিক্ত যে অনুভব পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্তকে আত্মহারা করে তার বিবরণ কী ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

আমরা যদি রাজনৈতিক নেতার মতো যতটুকু জানি তার বাইরে আর কিছু জানতে না পারি, তাহলে আমাদের সুখ-সম্ভার ক্রমশ গত যামিনীর পুষ্পের মতো ম্লান, শুষ্ক ও গন্ধহীন হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে তাই খানদানী ঘরানার বাইরেও নজর দেওয়া দরকার। নইলে কোথায় কোন অখ্যাত গলিতে আমাদের অগোচরে কোন রন্ধন-শিল্পী তাঁর সাধনার শীর্ষে পোঁছেছেন সে খবর পাব কী করে? সেই জন্য মাঝে মাঝে অ্যাডভেঞ্চারে বেরুতে হয়। সব সময় সন্ধান সার্থক হবে তা নয়। আবার লোকমুখে শুনেও নতুন পরীক্ষায় নামতে হয়। তবে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার বিপদ আছে।

আমার এক বন্ধু একদা শ্যামদেশের ব্যাঙ্কক শহর থেকে ফিরে আমাকে বলে-ছিলেন ইন্টার-ন্যাশনাল হোটেলের খাবার-ঘরে বসে চাউপারা নদীর পশ্চাৎপটে প্লাকাপং খাওয়াই তাঁর জীবনের একটা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। পরে, বহু বছর পরে আমি যখন ব্যাঙ্কক শহরে পোঁছলাম আমার অবচেতন মন আমাকে হাত ধরে অনিবার্যভাবে ইন্টার-ন্যাশনাল হোটেলের সেই খাবারঘরে পোঁছে দিল। ঘরমুখো পায়রা যেমন কিছুতেই পথভ্রষ্ট হয় না। অভিধানের আকারের খাদ্য তালিকা পড়ে আমাকে সময় নষ্ট করতে হল না। আমি স্থিতধী আত্মবিশ্বাসী সেনাপতির মতো এক বাক্যে আমার আদেশ ঘোষণা করলাম: প্লাকাপং। সুসজ্জিত খাবারঘর, সামনে মন্থরগতি চাউপায়া নদী, নদীর ওপরে নৌকাতে মানুষের জীবনযাত্রা। স্বপ্নসম। আর আমি যেন বাসরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। প্লাকাপং যখন এসে পোঁছল দেখি বিকটদর্শন একটি বিশালাকার মাছ ভর্জিত হয়ে আমার অপেক্ষা করছে। আমি মাছ খাই না, একেবারেই না। আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন। বাসর থেকে যেন অন্যো অনুরক্তা স্ত্রী বেরিয়ে গেলেন, আমি প্রতারিত বরের মতো অধোমুখে বসে থাকলাম।

শুনেছি মানুষ ঠেকে শেখে। আমি ঠেকেও শিখলাম না। একবার সুইজার-ল্যান্ডের সারমট শহর, ম্যাটারহর্ণের পাদ-দেশে। ভোজন কক্ষটি যেন ইন্দ্রলোক। অপ্সরা-কিন্নরের মতো সুসজ্জিত অতিথিরা, আমি আমার টেবিলে একা। কী খাব আগেই ঠিক করা ছিল। ক'বছর আগে এদেশে এসে ফন্ডু না খেয়ে ফিরেছি শুনে আমার এক খাদ্য-রসিক বন্ধু প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। ফন্ডু সুইজারল্যান্ডের জাতীয় খাদ্য। স্বাদ? বন্ধু বলেছিলেন, খেয়ে দেখো। ঈশ্বরপ্রাপ্তির আনন্দ পাবে।

অর্ডার দেবার কিয়ৎকাল পরেই ফন্ডুর আগমন সুরু হল। তখন কি জানি ফন্ডু এক নয়, অনুষঙ্গ নিয়ে একাধিক। প্রথমে ঈষৎ চকিত হলাম যখন এক দীর্ঘ হাতলওলা কাঁটা এসে পোঁছল। দু-এক প্রকারের কাঁটা দেখা আছে, কিন্তু এই বস্তুটি আমার দেখা ছিল না। একে তো বিদেশী হাতিয়ার দিয়ে খেতে তেমন আরাম পাই না। অস্ত্র-চালনায় আমি তেমন নিপুণ নই। ওই কিম্ভুত কাঁটাটি দিয়ে কী করব ভাবতে লাগলাম। আশেপাশের কোনও টেবিলে আমার মতো বিশাল অস্ত্র নজরে পড়ল না। ইতিমধ্যে এল একটি ছোট ধামা তাতে এক রাশি ছোট ছোট চৌকো করে কাটা পাউরুটির টুকরো। আমি রীতিমত সন্ত্রস্ত হলাম। তারপর আমার টেবিলে একটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালা হল। শেষে একটি চকচকে কটাহে একতাল চীজ (পনীর) এনে স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর চাড়িয়ে দিল সুমণ্ডিত ওয়েটার। চীজ আমার চেনা জিনিস। চীজে আমার জন্মের অরুচি বলেই ভালো করে চিনি। চেনার অবশ্য দরকার হয় না। গন্ধেই বোঝা যায়। যাঁরা চীজ ভালবাসেন তাঁদের রসনা লালায়িত হবে, কিন্তু আমার সর্বশরীর সংকুচিত হল। অনুমান করলাম পাউরুটির টুকরো-গুলি ওই দীর্ঘ কাঁটায় বিদ্ধ করে ফুটন্ত চীজে ক্ষণিক ডুবিয়ে খেতে হবে। এর নাম ফন্ডু। নিশ্চয় পরম স্বাদিষ্ট ছিল। আমি মুচ্ছাগতের ন্যায় তার কিছু কিছু কোনও প্রকারে গলাধঃকরণ করলাম। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার সময় লক্ষ্য করলাম আর কোনও টেবিলে ফন্ডুর আয়োজন নেই। সুইস জাতীয় খাদ্যকে একমাত্র আমিই সে রাত্রে সম্মানিত করছিলাম।

বলতে পারেন এসব বিজাতীয় উদাহরণ উন্নাসিকতার লক্ষণ। স্বীকার করি চীজ আমার নাসিকাকে পীড়া দেয়। ইংরেজ লেখক জেরোম কে জেরোম আমার প্রাণের মানুষ। তিনিও চীজ আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর Three men in a boat পুস্তকে চীজ সম্বন্ধে যে কৌতুককর আখ্যান আছে তার তুলনা হয় না। যাই হোক ঘরের কাছে আমাদের এই কলকাতা শহরের কথা বলি। সেও বড় নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা। ঘটনাটা অনেকদিনের। তখনও দ্বিতীয় যুদ্ধ লাগেনি, হিটলার তখনও প্রশংসাসূচক কৌতূহলের বিষয়, সোনার ভরি ছত্রিশ টাকা, চৌরঙ্গীতে অনাদি কেবিনের মোগলাই পরোটা ও কবরেজি কাটলেট সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সময়। আমরা উত্তর কলকাতার মানুষ চৌরঙ্গীর রেস্টরেন্টে সন্তর্পণে যাতায়াত সুরু করেছি। শুনেছি সাহেবপাড়ার দোকানে দু আনার মটন চপের অর্ডার দিলে ঠকতে হয়। তাদের চপ অন্য রকম। বাঙালী আবিষ্কৃত আলুর খোলে মাংসের কিমার পুর দেওয়া চেনা জিনিস নয়। সেখানে মাংসের চপ চাইলে একতাল

মাংসের একটা শুকনো রান্না ধরে দিয়ে আট আনা দাম নেয়। আমরা সতর্ক থাকতাম। কিন্তু এক চক্ষু হরিণের মতো আমার বাণ এল অন্য পার থেকে। শুনে-ছিলাম আফগানি কাটলেট খাবারটি রন্ধন শিল্পের নতুন সংযোজন। অসামান্য নাকি তার স্বাদ। চোখে দেখা ছিল না, একেবারে চেখে দেখতে গেছি। আফগানি কাটলেটের অর্ডার দিলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্যস্ত-সমস্ত বেয়ারা আমার টেবিলে খাবার দিয়ে মুহূর্তে অন্তর্হিত হল। থাকলেও যে কিছু সুবিধা হত তা নয়। তবে অত তড়িঘড়ি না করলে হয়তো নিজের ভুলটা আগেই ধরতে পারত। অজানা পদ, ধীরে ধীরে আস্বাদন করছি. বেয়ারা হঠাৎ আমার টেবিলে এসে একেবারে ফেটে পড়ল, একি? আপনি না আফগানি কাটলেটের অর্ডার দিয়েছিলেন? তবে মাটন রোস্ট খাচ্ছেন কী বলে? সমস্ত রেস্টরেন্টের লোক অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বেয়ারা যে আমাকে ভুল খাবার দিয়ে গিয়েছিল, তা কিছু নয়, আমি অপরাধীর মতো আমার হাতের ছুরি-কাঁটা নিয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ।

কলকাতায় লোকমুখে শুনে প্রথম চাউমিয়েন খেতে গিয়ে হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। আরও হত যদি না সদয় বেয়ারাফুল প্রারম্ভেই সাবধান করে দিত, না, না চারজনে চার প্লেট চাউমিয়েন লাগবে না, এক প্লেটই যথেষ্ট হবে। অন্য আরও কিছু পছন্দ করুন—ইত্যাদি।

তাই বলছিলাম চেনা বামুনই ভালো। কিন্তু এ লাইনের বামুনদের চেনা বড় কঠিন। তাঁরা বিজ্ঞাপন দেন না। অনেক সময় সাইন বোর্ড টাঙ্গানোও গর্হিত মনে করেন। নিয়ন আলোটালোর কথা না তোলাই ভালো।

দোকানেই ভালো করে আলো জ্বলে না। খুব একটা বিক্রীর আগ্রহ নেই। অথচ গুণীজন ঠিক পৌঁচচ্ছেন। আপনি যদি একটু দেরি করে আসেন শুনবেন সব উঠে গেছে।

চাচার হোটেলের বয়স কত হবে? ষাট? সত্তর? এটি আসলে হোটেল নয়, স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির কাছে বিধান সরণির ওপর উত্তর কলকাতার বিশ্রুত রেস্টরেন্ট। মুরগির কাটলেটে এঁদের সমতুল্য শিল্পী সারা ভারতবর্ষে আমার জানা নেই। পাঁচটার আগে দোকান খোলে না, আটটা নাগাদ সব উঠে যায়। পঞ্চাশ বছর এ দোকান আমিই দেখছি। মনে হচ্ছে এই প্রথম একটা নতুন রং করা সাইনবোর্ড দেখলাম। নড়বড়ে টেবিলে ম্রিয়মাণ আলোয় গুণীজন নীরবে এঁদের শিল্প সাধনার রসাস্বাদন করেন। চল্লিশ বছর আগে এই দোকানে এক বিচিত্র নিয়ম ছিল। একটি ফাউল কাটলেট বিক্রী হবে না, একসঙ্গে তিনটি কাটলেটের অর্ডার দিতে হবে। তখন ফাউল কাটলেটের দাম ছিল চার আনা, সেযুগে এক আনায় একজোড়া ডিম পাওয়া যেত, একটি কিশোর মোরগের দাম ছ আনা, যখন কলকাতার লোক সংখ্যা দশ লক্ষ। বুঝতেই পারছেন একসঙ্গে বারো আনা জোগাড় করা কঠিন ছিল। একসঙ্গে তিনটে কাটলেট খাবার ইচ্ছা বহুবার হয়েছে। অথচ আরও দুজন চার আনার সঙ্গতিসম্পন্ন লোক না থাকলে একটা কাটলেটও খেতে পেতাম না। শেয়ারের ট্যাক্সির প্যাসেঞ্জার ধরার যেমন লোক থাকে তখন সে প্রথা চালু হয়নি। প্রায়শই চার আনা পকেটে নিয়ে ফিরে আসতে হত। ফিরে আসতাম হয় স্বারিকে নয় পুঁটি-রামে। সেখানে দু আনাতেই চারটে লুচির সঙ্গে পোয়াটাক ছোলার ডাল অথবা আলুর দম সংযোগে দুটো রাধাবল্লভী পাওয়া যেত। অথবা খাবার জায়গা ছিল দিলখোশা রেস্টরেন্ট। দু আনায় একটি চপ ও একটি কাটলেট। এঁদের চপ অন্য ঘরানার ছিল। সুসিদ্ধ একটু বড় দানার কিমা এবং ওপরে অভ্যস্ত বিস্কুট গুঁড়োর পরিবর্তে শুধু ডিমের কোটিং। অথবা ডিম এবং বেসম মিশিয়ে জানি না। জানবার ইচ্ছাও হয়নি। ভান্চিঞ্চি কোন রং দিয়ে মোনালিসা এঁকেছিলেন জানলে আমার কোন হাত-পা গজাবে? আর বিশেষত্ব ছিল সামান্য একটু মিষ্টির ছোঁওয়া—দূরাগত বংশী ধ্বনির মতো সে যা কুহক রচনা করত তার আভাস পাওয়া যেত শুধু দিলখুসার মটন-কাটলেটে। অত্যন্ত মিহি কিমা, বেশি বিস্কুট গুঁড়ো দিয়ে কড়া করে ভাজা জিভেগজার আকারের সেই কাটলেটের বিশেষত্ব ছিল কাঁচালঙ্কার হাল্কা সুগন্ধে। প্যাস্টেলে আঁকা ছবি যেমন মনটাকে উদাস করে দেয় এদের রচনাও তেমনি সমগ্র সত্তাকে অন্য কোথাও পৌঁছে দিত। এঁরা এখন খাবার ফিরিস্তি অনেক বাড়িয়েছেন কিন্তু পুরনো ধারাটি হারিয়ে গেছে। চাচার ফাউল কাটলেট তার রূপে রসে বর্ণে গন্ধে আমাদের মজিয়ে রেখে-ছিল। ইষৎ বাধা থাকলে আকাঙ্ক্ষা যেমন দুর্বার হয় ওই তিন কাটলেটের বেড়াও তেমনি আমাদের চাচার ফাউল কাটলেটের মোহে আকুল করে রাখত। ঈষৎ মুচমুচে, বৃত্তাকার সেই অমৃতময় পদার্থটির রেওয়াজ আজও আছে। তাজা মুরগির মাংস অতি মিহি করে থুড়ে এদের মশলায় অভিষিক্ত করে ডিমে চোবানো। সামান্য বিস্কুটের গুঁড়োর প্রলেপ এবং ঘিয়ে ভাজা। তাজা কুক্কুট মাংসের এবং ঘিয়ের সুগন্ধের রসায়নে এক অপরূপ বস্তুর সৃষ্টি হত। বলা উচিত এরা আরও একটি পরম সুস্বাদু পদ রচনা করেন যার নাম দিয়েছেন শিককাবাব। এদের সৃষ্টি শূল্যপক্ব মাংসের খানদানি শিককাবাবের সমধর্মী নয়। কিন্তু স্বধর্মে স্থিত রেখেও মাংসকে যে মাখনের পর্যায়ে আনা যায় এদের শিককাবাব না খেলে বোঝা যাবে না। আমার ধারণা সামান্য ধোঁয়ার গন্ধও শিককাবাবের এ স্বাদে একটা আদিম আনন্দের স্পর্শ দেয়।

এইসব গুণীজন সমাগমে সন্তুষ্ট ভোজনশালার অধিপতিদের একটা inverted snobbery আছে। চৌরঙ্গীতে কে লাল জলে সিরাপ মিশিয়ে লাল হয়ে গেল তাতে এরা শুধু বাঙালী পছন্দের দুর্বল দিকটাই দেখতে পান। এরা তা নিয়ে মাথা ঘামান না। কেমন যেন প্রশ্রয়-মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে দেখেন। কারণ এরা প্রথমে শিল্পী, পরে ব্যবসাদার।

এই শিল্প-ভাবনা একেবারে তুঙ্গে উঠেছে ওই বিধান সরণির আর একটু দক্ষিণে। যেখানে কৈলাস বোস স্ট্রীট এসে মিশেছে। ভাবতে পারেন কোনও দোকানে লেখা আছে : কাহাকেও এক সঙ্গে দুই গ্লাসের অধিক সরবৎ দেওয়া হইবে না। দোকানের নাম যে কপিলাশ্রম সেটা ভালো করে নজরে পড়ে না। গুণীজন এই সবধান বাণীতে নিরস্ত হন না। গরমকালে দোকানের সামনে দীর্ঘ কিউ পড়ে। তাই বলে কি দোকান বড় করা হবে, না সরবৎ তৈরী করবার লোক বাড়ানো হবে? দোকানে বসবার কোনও ব্যবস্থা নেই, ফুটপাথে দাঁড়িয়েই এদের সৃষ্টি 'আবার খাই' খেতে হবে। এখন শীতের সময়, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হবে না। স্বর্গীয় সোমরসের আস্বাদ জানা নেই। কেবল এই বললেই যথেষ্ট হবে যে এদের পসার সেই সময় থেকে যখন গোলদিঘীর পারে প্যারাডাইস ও প্যারাগন তাঁদের সরবতের কুহকে ছাত্র সমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন।

এ লেখা কি সহজে শেষ হতে চায়। এতদিনের কত সুখের অভিজ্ঞতা। পার্থিব ভোজনের মতো আদিম প্রবৃত্তিকে যাঁরা অপার্থিব আনন্দের জগতে উত্তীর্ণ করে-ছেন, তাঁদের সবার নাম না করলেও অন্যায় হবে। বম্বের তাজমহল হোটেলের পেছনে বড়ে মিঞার আন্ডা পরোটা, পুনার পথে তলোজার বিরিয়ানি খাস পুনার লাকী এবং গুডলাক রেস্টরেন্ট, দিল্লী-মথুরা রোডের ওপর পলওয়ালের তিতির-বিশারদ, এই কলকাতার গুপ্ত ব্রাদার্সের হিং কচুরী ও খোলাসুদ্ধ আলুর তরকারী, জুনিয়ারের পাপড়ি চাট, গাঙ্গুরামের দেবভোগ্য ছানার পায়স, তারকেশ্বরের পথে দাস মশাইয়ের ফুলুরি, লখনউ-এর রাম-আশ্রয়ের গিলৌড়ি, ভর্মার হান্ডি মীট—কী অপার সুখের কথা, এ তালিকা সহজে শেষ হবে না। বহু স্নিগ্ধ দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা তাঁদের রচনায় আমাকে সম্মোহিত করে তাঁরা আমার স্মৃতিতে অক্ষয় স্থান পেয়েছেন। তার ওপর আছে ঠাকুমা, কি মা কি মাসির অতুলনীয় বিশেষ বিশেষ রান্না। জীবনে এখনও [illegible]

রবীন্দ্রনাথই মেশেন নি, মিশতে চান নি

তাপসকুমার ভট্টাচার্য

অমৃতের পর পর তিনটি সংখ্যায় (স্বাধীনতা ১৩৮৬, ৩১ অগাস্ট, ৭৯ ও ৭ সেপ্টেম্বর, ৭৯) শ্রীতুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেন নি' শীর্ষক প্রবন্ধটি আদ্যন্ত পড়ে প্রথমেই আমার যা মনে হয়েছে তা হলো এই যে, লেখক তাঁর দীর্ঘ রচনাটির কোথাও এমন কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি যে রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেন নি, বরং আমরা দেখাতে পারব বিবেকানন্দই মিশতে চেয়েছেন—মিশেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দিক থেকেই একটা অদ্ভুত শীতলতা লক্ষ্য করা গেছে। বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর বিক্ষিপ্ত দুচার লাইন লেখা বা দু চারটি মন্তব্য করা বা বিবেকানন্দ সম্পর্কিত সভায় সভাপতিত্ব করা প্রমাণ করে না খুব দৃঢ়ভাবে যে তিনি চাইতেনই বিবেকানন্দের সঙ্গে মিশতে। যথাক্রমে আমরা তথ্য-প্রমাণ হাজির করছি।

শ্রীতুহিনশুভ্র বিষয়টিকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে মনে হচ্ছে, তিনি এই মতটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন যে, বিবেকানন্দ গুণগ্রাহী ছিলেন না, উদার ছিলেন না, সংকীর্ণমনা ছিলেন প্রভৃতি। কিন্তু লেখকের এই তথ্য ঠিক নয়। প্রমাণ, বিবেকানন্দ যে গুণগ্রাহী ছিলেন, তার স্বীকৃতি লেখকই একটি ঘটনার উদ্ধৃতির দ্বারা দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে,—'....শিকাগো বক্তৃতার সম্পর্কে আমার (হেমলতা ঠাকুরের) দাদার কথা বিবেকানন্দ বারবার উল্লেখ করেছিলেন। বিবেকনন্দ বলেছিলেন, বেদান্ত বা হিন্দুদর্শন সম্পর্কে শিকাগোতে আমি যা বলেছি, তা কেউই বুঝতে পারতেন না। যদি না তাদের মধ্যে কিছুটা ব্রহ্মজ্ঞান হতো। সেটা হতে পেরেছিল মোহিনীমোহনের গীতার অনুবাদ থেকে।' এতো একটা। এমন অজস্র প্রমাণ বিবেকানন্দের গুণগ্রাহীতা সম্পর্কে দেওয়া যায়, কারণ, বিবেকানন্দ স্বল্পায়ু জীবন মধ্যে যেখানে যতটুকু গুণের সমাবেশ দেখেছেন তারই স্বীকৃতি তিনি যথার্থই দিয়ে গিয়েছেন। বিবেকানন্দ জীবনীটি লেখক ভালো করে পড়লেই সব জানতে পারবেন। স্বামীজীর রচনাবলীও লেখককে প্রভূত সাহায্য করবে। আমরা দেখব বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের গুণেরও যথার্থ সমাদর করেছেন। যদি কেউ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে না পারেন, তার দায়ও কি বিবেকানন্দে বর্তাবে।

আচ্ছা, একটা প্রশ্ন রাখি শ্রীভট্টাচার্যের কাছে। তাঁরই লেখায় এটা তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন যে, স্বামীজী সন্ন্যাসের আগে ও পরে বহু-বহুবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী গিয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ দ্বিপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু বলুন তো তুহিনশুভ্রবাবু, [illegible] জন্যও কেন সিমুলিয়ার দত্ত বাড়ী গেলেন না? এমন কি বন্ধু দ্বিপেন্দ্রনাথ পর্যন্ত! অহংকার? তারপর, বিবেকানন্দ বারবার ঠাকুরবাড়ী আসছেন, যাচছেন, কথা বলছেন, গান গাইছেন, কই একবারও তো দেখলাম না রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একবারের জন্যও বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ করেছেন! যেটা তাঁর পক্ষ থেকেই ঘটা স্বাভাবিক ছিল কারণ বাড়ীটা তাঁদেরই আর বিবেকানন্দ বহিরগত। যে-কোন বহিরাগতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক ভদ্রতা।

লেখক স্বামী প্রভানন্দের মত উদ্ধৃত করে 'দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভক্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণ' স্তম্ভে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন যে দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে খুশি করেনি। কিন্তু আমি ১৯২১ সালে প্রকাশিত শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব লিখিত 'অতীতের ব্রাহ্মসমাজ' গ্রন্থের 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্মসমাজ' অধ্যায়টি থেকে একটি উদ্ধৃতি দেব, যাতে দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথকে কতখানি সম্মান-শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথকে বলেছিলেন, 'ঐ দেখ তোদের দেবেন্দ্রনাথ অত ধনৈশ্বর্যের ভিতর থাকিয়া পদ্মপত্রের জলের মত নিজেকে নির্লিপ্ত রাখিয়া সাধনা দ্বারা ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ করিয়া চুপ হইয়া গিয়াছে (পৃঃ ৭৬)। এ ছাড়াও তিনি প্রায়ই বলতেন, 'তোদের মহর্ষি ও কেশব এক একটা লোক' অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ।

বিবেকানন্দ সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেনই এমন প্রামাণ্য তথ্য কিছুই নেই। অনুমাননির্ভর হয়ে কোন সত্যে পৌঁছানো ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে বিবেকানন্দ যখন বিশ্বজয় করে ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ তখনও খুব বেশি পরিচিত নন, বিশ্বে তো নয়ই, ভারতেও নন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিতির কোন সম্ভাবনাকেই মেনে নেওয়া যায় না।

'হিন্দুমেলায় দুজনে' স্তম্ভেলেখকের প্রতিপাদ্য যে কি তাই বুঝা গেল না। ওখানে দুজনে কোন দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে তো শোনা যাচ্ছে না। অন্তত লেখক সে রকম ঘটনার কথা উল্লেখ করেন নি। -কোন তথ্য প্রমাণও নেই। তবে এই অংশটি লেখার তাৎপর্য কি?

'বালক' পত্রিকার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কোন সম্পর্ক ছিল এমন প্রামান্য তথ্য কোথাও এখন পাওয়া যায় নি। অমূল্যবাবুই এই তথ্য কোথায় পেলেন তার উল্লেখ নেই। কাজেই ওটি গ্রহণযোগ্য নয়।

'বিবাহ-সঙ্গীত শিক্ষক ও ছাত্র নরেন্দ্রনাথ' স্তম্ভে লেখক রবীন্দ্রনাথকে অহেতুক বড়ো [illegible] একটা [illegible] দিয়ে ফেলেছেন। তা হলো বিবেকানন্দ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করবেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিশতে, ঘনিষ্ট হতে চাইতেন এবং সেই জন্য হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় 'বিবেকানন্দের মত উচ্চ শিক্ষিত প্রতিভা-দীপ্ত তরুণ যুবকও অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহড়া নিতে পেরেছিলেন। ডঃ কালিদাস নাগের কথায় 'যিনি সেকালের একজন নামজাদা কলাবিৎ' তবুও তাঁর মহৎ উদারতা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই অংশে এক জায়গায় লেখক বলেছেন,— 'রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বামী বিবেকানন্দকে এক সময় গান শেখাননি, উপরন্তু সঙ্গত করে গান শিখিয়েছিলেন।' এই উদ্ভট তথ্যটি যে কোথায় তিনি পেলেন বুঝলাম না। 'গান শেখান' আর মহড়া দেওয়া কি এক কথা? তাহলে বলতেই হবে, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর দিয়ে মান্না দে'কে দিয়ে গানটি গাওয়াবার জন্যে যখন মহড়ার ব্যবস্থা হয়, তখন নিশ্চয়ই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গৌরীপ্রসন্ন মান্না দে'কে গান শেখান? আশ্চর্য। বিশেষতঃ তুহিনশুভ্রবাবুই যখন দেখাতে চেষ্টা করেছেন বিবেকানন্দ কত স্বাধীন ভাবেও রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধরা বাঁধা কোন সুর কিন্তু তখনও ঠিক হয় নি।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্য অনুযায়ী স্বামী বিবেকানন্দ যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কতখানি তীক্ষ্মভাবে সচেতন ছিলেন তার আমরা যথা সময়ে প্রমাণ দেব। বিবেকানন্দ যে তাঁর 'সঙ্গীত কল্পতরু'তে রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে যথোপযুক্ত মর্যাদায় সঙ্কলিত করেছিলেন এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন শ্রীভট্টাচার্য। বরং এমন একটি বড়ো ঘটনা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখিত হওয়া উচিত ছিল না কি—পারম্পর্য বিচারে?

'কোন কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত নরেন্দ্রনাথ গাইতেন' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে বিবেকানন্দের আগ্রহ-পর্যন্ত পড়ে আমার মনে হয়েছে লেখকের চেষ্টাটাই যেন স্বামীজীকে ছোট করে, অনুদার করে দেখানো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতো নয়। স্বামী বিবেকানন্দের গুণগ্রাহিতার কথা আমরা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথেরও যে তিনি কতখানি সমাদর করতেন লেখকই তা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। কিভাবে, দেখা যাক।

স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের ছাড়াও আরও যাঁর যাঁর ও যে যে গান গাইতেন তা হলো—বেচারাম চাট্টোপাধ্যায়, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, যদু ভট্ট, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য সঙ্গীত রচয়িতাদের গান এবং শ্যামা সঙ্গীত, নির্বাণষটক, কৌপীনপঞ্চক, ভজন, টপ্পা ঠুংরী প্রভৃতি গাইতেন সুনিপুণভাবে। তুহিনশুভ্রবাবু অভিযোগ রেখেছেন, কেন

স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের গানের প্রশংসা স্বতন্ত্রভাবে করলেন না। উত্তর হল, তিনি কেনই বা তা করতে যাবেন, যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তখনও পর্যন্ত গানের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রায় কাউকেই ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। শিক্ষার্নবিশীর প্রশংসা আত্মীয়পরিজনদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়, বিবেকানন্দের প্রশংসা অত সহজে লাভ করা যায় না। তবুও যেখানে বিবেকানন্দ বলছেন,—'ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সকল বাঙ্গলা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ?' তাকি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রশংসা নয় এবং স্বামী বিবেকানন্দের আগে বা পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমন সার্থক উচ্চপ্রশংসা আর কয়জনই বা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ তখন নরেন্দ্রনাথের মতো গুণী গায়ক যে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন এতো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। আর নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে এমনই ওস্তাদ ছিলেন যে, কারও কাছ থেকে শুনে তাঁকে রবীন্দ্র-গান গাইতে হোত না। তিনি নিজেই পারতেন গাইতে—স্বাধীনভাবে। সম্ভবতঃ ধার ধারতেন না তিনি। বড়ো কথা হলো, সঙ্গীত-কল্পতরুতে স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সংকলন করেছেন, এর পরেও আরও প্রশংসা দরকার। বেশ, তবে আরও প্রশংসা আছে।

বাংলার বাইরে কাশীতে রবীন্দ্রনাথের নাম ও রবীন্দ্র-গানের প্রচার বিবেকানন্দই প্রথম করেন। সাক্ষী ক্ষিতিমোহন সেন,—'সে সময় কাশীতে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ শোনে নি বল্লেই হয়।' তিনি বলেছেন তিনটি রবীন্দ্র-গান বিবেকানন্দ কাশীতে গেয়েছিলেন। এবং কে বলতে পারে বিদেশেও অবসরে তিনি রবীন্দ্র-গান গুণ গুণ করতেন কিনা। আরও প্রশংসা দরকার।

প্রসঙ্গতঃ, একটা কথা সেরে নেওয়া যাক। দিলীপবাবু জানিয়েছেন,—'স্বামীজীর বিষয়ে যত প্রামাণিক বা অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত আছে তাদের মধ্যে কোথাও সঙ্গীত কল্পতরুর নাম উল্লিখিত নেই। এটি যে স্বামীজীর পুস্তক একথাও তাঁর সম্পর্কে লিখিত কোন পুস্তকের গ্রন্থকার সুস্পষ্ট করে বলেন নি। দিলীপবাবু মন্তব্যটি করেছেন খুব সম্ভবত ১৩৭০-এ প্রকাশিত তাঁর সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু গ্রন্থে। কিন্তু দিলীপ বাবু ঠিক বলেন নি। আর একটু খোঁজ নিলে জানতে পারতেন, ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সূচনা অংশে বলেছেন,—

একটি সঙ্গীত-সংকলন-গ্রন্থের সংকলন কার্যে তাঁর অনেকটা হাত ছিল, একথা [illegible]। [illegible]—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এ ও বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—সঙ্গীত কল্পতরুর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১২৯৪ সালে। বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের ৩য় সংস্করণের পরিশিষ্ট—২ (পৃঃ ৫৫১) অংশ পড়ে দেখতে অনুরোধ করি দিলীপবাবু ও শ্রীতুহিনশুভ্রবাবুকে।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বিবেকানন্দ ১৮৯৯, জুনের শেষ দিকে—'ঐ যে একদল...'। লিখেছিলেন, সে সম্পর্কে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর যে অনুমান ওটি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত তা বোধ করি খুব একটা ভুল নয়। তাঁর সমর্থনে একটা প্রমাণ হাজির করা যাক। কবি দীনেশচরণ বসু ১২৯৩ সালের ১৬ বৈশাখ দীনেশচন্দ্র সেনকে কবির বর্ণনা দিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনেক কথার মধ্যে এইটুকুও ছিল,—'রবি ঠাকুরের বয়স অতি অল্প, তেইশের অধিক হইবে না। কিন্তু স্বভাব স্থির, কলেজে থাকিতে মিল্টনকে তাঁহার সহপাঠিগণ 'লেডী' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবি ঠাকুরকেও সেই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট রমণীজনোচিত।' তাহলে দেখা গেল বিবেকানন্দের বিশেষণ-বিশ্লেষণে খুব একটা ভুল হয় নি, বিশেষতঃ বিবেকানন্দ যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তীক্ষ্মভাবে সচেতন ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে শ্রীতুহিনশুভ্রবাবুকে একেবারে নিরাশ করব না। তার আশার কথাও আছে, তা শুনিয়েছেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে (৩য় সং, পৃঃ ৫২৬)। তিনি বলেছেন—'এ বর্ণনাটি অনেকের মনেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুকরণকারীদের কথা জাগিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হলেও এ ধারণা যুক্তিসম্মত নয় বলেই আমাদের ধারণা। প্রথমত স্বামীজী যে সময় লিখেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের অনুকরণকারী এমন কোনো দল ছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের চলনে বলনে কমনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে পৌরুষ ও দীপ্তি কিছু কম ছিল না। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান তো স্বামীজী তাঁর 'সঙ্গীত কল্পতরু'তে দিয়েছেনই, সেই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক রসের গান, দেশপ্রেমের গানও বেশ কয়েকটি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভক্তি সঙ্গীত তিনি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবকে শুনিয়েছেন। তাই মনে হয় মেয়েলীপনার এই অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নয়, সাধারণভাবে মেয়েলী স্বভাবের পুরুষদের সম্বন্ধে। তাছাড়া কবি, পাঁচালী, টপ্পার প্রভাবে বাংলার পরিমণ্ডলে প্রেমের গানের ছড়াছড়ি অনেকদিন থেকে...।' এখন তুহিনশুভ্রবাবু, সুবিধা মতো যেটা ইচ্ছা

বেছে নিন। তবে আমার মনে হয়, বিবেকানন্দ মিল্টন সম্পর্কেও জানতেন, রবীন্দ্রনাথকেও জানতেন, তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ঐ মন্তব্য হলেও হতে পারে এবং তা খুব একটা অসঙ্গত নয়। তবে এই দিকটা নিয়ে আলোচনার অবকাশ খুবই কম। বিবেকানন্দ এমনই সোজা মানুষ ছিলেন, যাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না কারও সম্পর্কে বেঁকিয়ে বা পরোক্ষত নিন্দা করা। নিন্দা করলে সোজাসুজি সোজা ভাষায়, পরিষ্কার করে করতেন, না হলে চুপ করে থাকতেন।

চায়ের আসরটির বিবেকানন্দই আয়োজন করেছিলেন, বিবেকানন্দেরই ইচ্ছায় ও আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েছিলেন ও তিনটি গান গেয়েছিলেন এবং 'স্বামীজী অপূর্বভাবে কথা বলেছিলেন' তাহলে বিবেকানন্দ নিশ্চুপ রইলেন কোন হিসাবে। এবং এইটাই কি প্রমাণিত হল না, বিবেকানন্দই চাইতেন সর্বদা রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথই এড়িয়ে চলতেন। তা না হলে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথই বা কেন স্বাগত জানালেন না, কেন তাঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ জনালেন না? বিবেকানন্দের উদারতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। এখানে কিন্তু প্রমাণ হয়ে যায় বিবেকানন্দই বারবার মিশতে চেয়েছেন, আগ্রহ দেখিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই অদ্ভুত শীতলতায় দূরে সরে থেকেছেন।

শ্রীতুহিনশুভ্র উল্লিখিত 'বিবেকানন্দ : কবিমনীষী' নামে প্রণবরঞ্জন ঘোষের কোন গ্রন্থ আজও প্রকাশিত হয় নি। তবে 'বিশ্ববিবেক' সংকলন গ্রন্থটিতে 'বিবেকানন্দ : কবিমনীষী' নামের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাওয়া যায়।

যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে তাঁকে নিয়ে নিশ্চয়ই কোন কৌতুক করা যায় না, বা তাঁর কোন মতাদর্শকেও ব্যঙ্গ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিই অশ্রদ্ধার ভাব তাতে প্রকাশিত। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'গৃহে ও বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ' কথাটা নিয়ে অনেক কৌতুক করতেন, 'দরিদ্রনারায়ণ' কথাটিও তাঁর মনঃপূত ছিল না।' এগুলিতে কি খুব শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হয়েছে?

স্বামীজীর জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ বেলুড়ে গিয়েছিলেন এ সংবাদ 'উদ্বোধন', ফাল্গুন, ৭ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা থেকে জানতে পারি। সভাপতি ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। সভার জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র, অধ্যাপক জগদীশ বসু, রায় চুণীলাল রায় বাহাদুর, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ সেখানে কেন যে কোন ভাষণ দিলেন না বোঝা গেল না। আর স্বামীজীর আদর্শের প্রতি যত না শ্রদ্ধা নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথকে মানুষ করে গড়ে তুলবার মানসেই তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁকে ভারত ভ্রমণে যেতে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু এক জায়গায় বলেছেন,—'পৃথিবীর বৃহৎ রাজপথের এই পরিব্রাজক সেই সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ!' তুহিনশুভ্রবাবু জানিয়েছেন খুব জোরের সঙ্গে—'পরিচয় না রাখার কিন্তু প্রশ্নই উঠতে পারে না।' কথাটা সত্যি, যতদূর স্বামীজীর পক্ষে পরিচয় রাখা সম্ভব হয়েছিল ততদূর ঠিকই বুঝেছিলেন যে সে সাহিত্য পৌরুষ জাগরণের সহায়ক ছিল না, ইন্দ্রিয় রসের বিষবন্যা বয়ে যাবারই সহায়ক ছিল। এইবার দেখা যাক বিবেকানন্দের পক্ষে কতদূর রবীন্দ্র - রচনার সঙ্গে পরিচয় রাখা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত অর্থাৎ সন্ধ্যা-সঙ্গীত থেকে কড়ি ও কোমল পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে স্বামীজীর খুব ভালোভাবে পরিচয় হয়েছিল। তুহিনবাবুই বলুন না, এর মধ্যে পৌরুষ উদ্দীপক কোন রচনা চোখে পড়ছে কি?

এই সময়ের বিবেকানন্দের সাংসারিক, মানসিক অবস্থার কথাটি একটু বিবেকানন্দ-জীবনী থেকে পড়ে নিতে অনুরোধ করি। আর রবীন্দ্রনাথ? শুনুন প্রভাতকুমারের মুখে,—'কড়ি ও কোমল' লিখিতেছেন, আলস্যে বিলাসে, ভাব-উচ্ছ্বাসে, সৌন্দর্য চর্চায় দিন যায় (রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খন্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬)। স্বামীজী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবং রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কে এইসব খবরই রাখতেন। আর তাই তিনি রবীন্দ্র-রচনার প্রতি যদি কোন উৎসাহ আর না দেখিয়ে থাকেন তবে দোষের কিছু নেই।

তারপর ১৮৮৭ থেকে (রাজর্ষি) ১৮৯৬ (কাব্য গ্রন্থাবলী) পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনাদির সঙ্গে বিবেকানন্দের যে পরিচয় রাখা সম্ভব হয়ে উঠেনি এবং কেন উঠেনি লেখক 'বিবেকানন্দ জীবনী' পাঠ করলেই জানতে পারবেন। বিবেকানন্দের জীবনে তখন এক ভীষণ দুর্যোগ—ব্যস্ততা। কাজ, কাজ আর কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি, বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ, সন্ন্যাস গ্রহণ, পরিব্রজ্যা। এত কাজের মধ্যেও তিনি বই পড়তেন। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনার হাল্কা রসের বই পড়বার তখন তাঁর সময়ও ছিল না, রুচিও ছিল না। ৩১ মে, ১৮৯৩ আমেরিকা যাত্রা। দেশে প্রত্যাবর্তন ১৪ জানুয়ারী ১৮৯৬। এবার বলুন তুহিনবাবু, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছিল তার সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় রাখা কি কোনক্রমেই সম্ভব ছিল? তারপর থেকে ১৮৯৯-এর ১৯ জুন পর্যন্ত নানা ব্যস্ততায় (সে যে কি ধরনের ব্যস্ততা, আমাদের ধারনার বাইরে)। রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ তাঁর না হওয়াই সম্ভব। ১৮৯৯, ১০ জুন থেকে ১৯০০ পর্যন্ত আবার বিদেশে এবং তারপর দেশে ফিরে যে কটা দিন বেঁচেছিলেন তার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে বিলাস করার মতো সময় তাঁর ছিল না। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে স্বামীজীর শ্রদ্ধাপূর্ণ মতামত তুহিন শুভ্রবাবু নিশ্চয়ই জানেন। যিনি বলছেন—'আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।' তাঁর পক্ষে কখনই রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে সন্তুষ্টির কোন কারণ তখনও ছিল না।

বিবেকানন্দ-ওকাকুরা প্রসঙ্গটি আরও পরিষ্কার করে তুহিনশুভ্রবাবু কেন উত্থাপিত করলেন না? সেখানে শ্লেষের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ তুলে ধরা যাক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায়,—ওকাকুরা ভারত থেকে পরে লিখলেন, "বিবেকানন্দ এমনই বিরাট ব্যক্তি যে সারা পৃথিবীর লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এমন মানুষ অন্য কোথাও মিলবে না।" ওকাকুরা কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, "না, জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া এখনো আমার শেষ হয় নি।" ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রোমা রোলাঁকে বলেছেন, বিবেকানন্দই ওকাকুরাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে বলেছিলেন, "এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ; আপনি রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান; তিনি এখনো জীবনের মধ্যে আছেন।" —এটা যে স্বামীজীর গুণগ্রাহিতারই পরিচয় তা না বুঝে শ্রীভট্টাচার্য হঠাৎ এটিকে শ্লেষাত্মক বুঝতে গেলেন কেন, বোঝা গেল না। এখানে খুব স্পষ্ট প্রমাণিত যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিবেকানন্দ উদাসীন ছিলেনই না, উপরন্তু তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তখন পর্যন্ত যা সাহিত্যকর্ম তাতে জীবনের রস ফেনায়িত। বিবেকানন্দের মাত্র ঐটুকু কথার মধ্যেই তখনকার রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপটি যে প্রকাশিত তাতে আর সন্দেহ কি!

বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও ছিঁটেফোঁটা যা বলেছেন বা লিখেছেন তা যে নিবেদিতার প্রভাবেরই ফল এবং নেহাতই সৌজন্যতা বশে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ঐ সময়ের মধ্যে বিবেকানন্দ জগৎজোড়া এমন কান্ড ঘটিয়ে বসেছিলেন যাতে তাঁর সমসাময়িক কোন ব্যক্তিরই তা তিনি যত জগদ্বিখ্যাত হোন—স্বামীজী সম্পর্কে কিছু না কিছু না বলা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। এড়িয়ে চলবার শত চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত আর পার পান নি। তাঁর নিজ মর্যাদা রক্ষার জন্যও ঐটুকুও না বলে উপায় ছিল না, তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনই কিছু বলেন নি বা লেখেন নি। আর বিবেকানন্দের মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর সঙ্গে কেন আলাপ

করতেন না, এড়িয়ে চলতেন তার একটা কারণ, যা তিনি নিজেই 'ভগিনী নিবেদতা' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন—"তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত।" আর সেই ভয়েই রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে এড়িয়ে চলতেন। মন্তব্যটি নির্বেদিতা সম্পর্কে হলেও বিবেকানন্দ সম্পর্কেও তাঁর ঐ একই মন্তব্য হতে কোন বাধা নেই কার্যকারণ সূত্রেই।

নিবেদিতা সম্পর্কে প্রবন্ধটিও তিনি লিখতেন কিনা সন্দেহ। লিখেছিলেন দুটি কারণে, প্রথম কারণ, নিবেদিতার কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং ঠাকুর পরিবারও তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিলেন। সাক্ষ্য উপস্থিত করার বোধ করি প্রয়োজন নেই। একটি সাক্ষ্য তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে রেখে গিয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছেদ। এই বিচ্ছেদ না ঘটলে, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক থাকলে রবীন্দ্রনাথ 'ভগিনী নিবেদতা' প্রবন্ধ লিখতেন কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে ও তাঁর সন্ন্যাস আদর্শকে যে কি বিরূপ দৃষ্টিতে দেখতেন তার প্রমাণ প্রভাতকুমার ও রোমা রোঁলা খুব পরিষ্কারভাবে অমৃত, ১৯৭৯, ৭ সেপ্টেম্বরের ৪৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করেছেন। এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি অতিভক্তিবশ তুহিনশুভ্রবাবুর পক্ষেই বলা সম্ভব,—'কিন্তু তা বলে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল ধারণার কোন পরিবর্তন হয় নি।' এবং এই লেখকের পক্ষেই অন্যত্র বলা সম্ভব হয়েছে,—'রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ-স্বামী বিবেকানন্দ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নি।' তাহলে কি বিবেকানন্দই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? কই লেখক তো একটাও সুনির্দিষ্ট তথ্য-ভিত্তিক প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি। আর লেখক যে বলেছেন,—'স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো অতটা উদার হওয়া বোধ হয় সম্ভবপর হয় নি।' সত্যিই তো, স্বামীজী আর কি করেই বা উদার হবেন, ভিক্ষুক তো। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, উদারতা কথাটির কোনো মাপকাঠি স্থির না করেই লেখক রবীন্দ্রনাথকে উদার এবং বিবেকানন্দকে উদার নন—এমন সিদ্ধান্তে আসেন। আমরা যদি বিপরীতটা বলি?

সবশেষে আমি তুহিনশুভ্রবাবুর কাছেই প্রশ্ন রাখছি। বিবেকানন্দ অতটা উদার ছিলেন না, তাই তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুই বলা, লেখা সম্ভব হয় নি, এবং অত্যন্ত সংকীর্ণমনের জন্য তিনি বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের মেনে নিয়েও প্রশ্ন রাখছি—ঊনচল্লিশ বছর বয়সের স্বামীজীর প্রকৃত কর্মজীবন, লেখা বলার জীবন সবশুদ্ধ মাত্র নয় বৎসরও যদি ধরা যায় তবে বলুন তো লেখক মাত্র এটুকু সময়ে বিশাল কর্মভার মাথায় নিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করেও যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি এটুকু বলেছেন তাই কি যথেষ্ট নয়? এবং সহস্র ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে ও রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করে চা-পান করাতে ভোলেন নি। আর বিশাল উদারতা নিয়ে, ষাট বছরের বিশাল সাহিত্য-জীবন নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটি গোটা প্রবন্ধ লিখবারও সময় পেলেন না? নিজে উদ্যোগী হয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করলেন না? বিবেকানন্দের চায়ের আমন্ত্রণের উত্তরে ভদ্রতার খাতিরেও তিনি বিবেকানন্দকে কোনদিন একটি চায়ের আসরে আমন্ত্রণ জানালেন না? এতো বড়ো আশ্চর্য উদারতা! আসলে শঙ্করীপ্রসাদ বসু ঠিকই বলেছেন যে, বিবেকানন্দকে নয়, বিবেকানন্দের কাজকে যেখানে একেবারে স্বীকার না করলেই নয় সেখানেই তিনি সৌজন্যবশত দু চারটে কথা বলেছেন বা লিখেছেন মাত্র, তার বেশী নয়। ডঃ আদিত্যপ্রসাদ মজুমদারের কথারই প্রতিধ্বনি করে বলতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথ অনেক বাজে বিষয়ে দীর্ঘ বাক্যজাল বিস্তার করলেও বিবেকানন্দের মতো 'ডাইনামিক পার্সন' সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেন নি। বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু না লিখে রবীন্দ্রনাথ যে একটি জাতীয় কর্তব্যেরই অবহেলা করেছেন তাতে আর সন্দেহ কি! অথচ, বিবেকানন্দ ও নির্বেদিতার অভ্যুদয় না ঘটলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'গোরা' প্রকাশ পেতো কি। আর ভারত সম্পর্কে গোরার যে-সব উপলব্ধি তুহিনশুভ্রবাবুই দেখিয়েছেন তার প্রায় সবই বিবেকানন্দের মুখ থেকেই বহু আগে প্রকাশিত। তাহলে এখানেও তো রবীন্দ্রনাথই অধমর্ণ। এবং সর্বশেষ কথা, তিনটি সংখ্যা ধরে ৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী অসংখ্য উদ্ধৃতি-তথ্য-প্রমাণ হাজির করেও তুহিনশুভ্রবাবু একবারও, একটি জায়গাতেও প্রমাণ করতে পারলেন না যে 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেন নি' বরং উল্টো সত্যটাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিবেকানন্দের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সহজভাবে সরল মনে বিবেকানন্দের সঙ্গে মিশতে চান নি, মেশেন নি। আমার মনে হয় লেখকও তাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, অনবধানবশতঃ প্রবন্ধের শীর্ষ, নামটি উল্টে গিয়েছে। আর তুহিনশুভ্রবাবুর বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত সম্পর্কে 'দেশ' ২০ অক্টোবর, ৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅতুল্য ঘোষের কণ্টকল্পিত থেকে একটি উদ্ধৃতি দেব। তা হলো,—'যাঁদের সম্বন্ধে এই উক্তি হয়েছে, তাঁরা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা স্থান করে নিয়েছেন, যা খর্ব করা দুঃসাধ্য ও অসাধ্য। যাঁরা কটূক্তি করেন, তাঁরাই লোকচক্ষে হেয় হন, ঐসব উক্তি শ্রদ্ধেয়দের স্পর্শ করতেও পারে না।' এই মন্তব্য যদিও মহাত্মা গান্ধী, মার্কস ও লেনিন সম্বন্ধে করা হয়েছে, বিবেকানন্দ সম্পর্কেও তা সমান সত্য। বিবেকানন্দ অবশ্যই গুরুবাদী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদী ছিলেন না এমন কথা বলা যায় কি? আমরা বলব রবীন্দ্রনাথের মতো গুরুবাদীও খুব কম দেখা যায়। তাঁকে তাঁর ভক্তরা সারাজীবন 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করেছেন, তাতে তাঁর কোনো অরুচি ও আপত্তির কথা আমাদের জানা নেই, বরং অন্য কাউকে 'গুরুদেব' বলা তিনি পছন্দ করতেন না। আর শ্রীরামকৃষ্ণকে কেউ 'গুরু' বললে তিনি বলতেন,—'....'দূরে শালা' গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী।' (কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬০)। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেক গুরু থাকলেও তাঁর আসল গুরু তো ছিলেন তাঁরই পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

তুহিনশুভ্রবাবু মৈত্রেয়ী দেবী প্রভৃতির কথা বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—পরস্পরের প্রতি মনোভাব কি ছিল এ-প্রসঙ্গে সবশেষে মৈত্রেয়ী দেবীর গৃহে ও বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি বলেছেন—বলা বাহুল্য, 'এতদিন পরে সে-নীরবতার মর্মভেদ করতে গেলে অনেকটাই কল্পনা ও অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়, অনেকেই তাই নিয়েছেন।' বলা বাহুল্য, লেখকদের কল্পনা ও অনুমান-এর দৌড় অত্যন্ত বেশি হয়ে গেছে।

প্রবন্ধটি লিখে শ্রীতুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন, তিনি কত বড়ো রবীন্দ্রভক্ত, পূজারী। তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু একজনকে ভক্তি বা পূজা নিবেদন করতে হবে বলে যে আর একজনকে বিদ্বেষ করতে হবে, অশ্রদ্ধা করতে হবে, মিথ্যা অভিযোগ আনতে হবে এমন ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মানসিকতা থাকাটা অনুচিত। তিনি এটাও খুব দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন, তিনি কত গভীরভাবে বিবেকানন্দ বিদ্বেষী। আমরা যারা বিবেকানন্দকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, তাদের যেন এই ধরনের সংকীর্ণ মানসিকতার শিকার হতে না হয়, এই প্রার্থনা। তাঁদের নিন্দা করলে তাঁদের কোন ক্ষতি হয় না, আমরাই দীন থেকে দীন হয়ে পড়ি। আমরা যেন এই দীনতা, হীনমন্যতা থেকে মুক্ত থাকতে পারি [illegible] এই প্রার্থনা।

জীবন সুতোর নকসা

শৈবাল মিত্র

জমিদারের হাতি মরেছে। সাতকালে খবরটা রটে গেলো। লাল সুরকি পেটানো রাস্তা দিয়ে ভোর থেকেই দলে দলে লোক চলেছে মরা হাতি দেখতে। তাঁতি, কামার, কুমোর তীর ধনুক কাঁধে সাঁওতাল, নফর মুদি, জগাই কলু, বটু ময়রা, দশ পাড়ার চ্যাং-ব্যাং কেউ বাকী নেই। জ্যান্তো জীবটাকে সকলে দেখেছে। দশাসই জেল্লাদার চেহারা। প্লাবনের মেঘলা আকাশের মতো তেলতেলে কালো রং। বছর দশেক আগেও দুটো দুধ শাদা প্রকান্ড দাঁত ছিলো। এখন নেই। হাতিটা বুড়ো হয়েছিলো। বয়েসের গাছ পাথর নেই। অনেক কাল এই পৃথিবীতে থেকেছে। বিস্তর কলাবাগান, আখ, ভুট্টার ক্ষেত, অমৃতি জিলিপি, মিছরি আর সৈন্ধব লবণ সাবড়েছে। পথ-চলতি লোকজন সেই সব কথা আলোচনা করছিলো। আকাশে বর্ষার মেঘ। রাস্তার দুপাশে ভিজে গাছপালা, হাওয়ায় ঠান্ডা ভাব। জগাই কলু বললো জন্তুটা গত [illegible]

শরীর ফুলে আকাশ ছুঁই-ছুঁই। কালকেও দেখে এসেছি।

ছানু মুচি কান খাড়া করে শুনছে। চামড়ার হিসেব কসছে। জমিদারবাবুকে পটিয়ে চামড়াটা ওর হাতানোর মতলব।

বটু বলে—বড়ো নিরীহ ছিলো জীবটা। একটা বাতাসা দিলেই সেলাম করতো।

নফর মুদির বয়েস হয়েছে। সর্দি কাশিতে জেরবার। ঘ্যাং ঘ্যাং কাশছিলো। রাস্তার দুপাশে এর মধ্যেই কেজিখানেক গয়ের ফেলেছে। সে খেঁকে ওঠে—থামতো বাপু। নিরীহ না ছাই। কেষ্ট মাহুতকে শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারার কথা ভুলে গেলি? আর ওই দেবরাজ কামারের মেসোকেও পায়ের তলায় ও পিশেছিলো। বজ্জাতের হাড়।

এসব প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। বটু তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ। নফরের কথায় সকলে চুপ করে যায়। মরা হাতিটাকে কেমন দেখতে লাগবে মনে মনে এই চিন্তায় ওরা মশগুল।

একদল কুঁচোকাচা পাশ দিয়ে হৃল্লা তুলে চলে যায়—বলহরি হরিবোল। হাতি বাবুকে কাঁধে তোল।

দুটো ডেঁও পিঁপড়ে রাস্তার ধা মাজা উঁচিয়ে ঘুরঘুর করছিলো। পে খিদে, বুকে ভয়। আহাম্মক মানু গুলোকে বিশ্বাস নেই। শালারা ঝাড়ে বং কানা। পাটি করে মাড়িয়ে দিলেই দফারফ সাবধানে ভিজে পচা পাতা বেয়ে তা জঙ্গলের দিকে এগোতে থাকে। এ পিঁপড়ে দুটো আইনত স্বামী-স্ত্রী।

বর্ষাকালে ওদের খাওয়া-দাওয়ার ভর অসুবিধে। সবসময়েই মেজাজ খাট্টা হ থাকে। লতাপাতাকেও কামড়ে দেয়। মা রাত থেকেই দুজনের দারুণ খিদে পেয়ে ইচ্ছে ছিলো ভোর থাকতেই জঙ্গলে কাছাকাছি কোনো গেরস্ত বাড়ীতে সেঁধি পড়বে কিন্তু রাস্তার লোকজনের ভী দেখে ওরা ঘাবড়ে গেছে। ব্যাজার মু আস্তানায় ফিরছে।

পিঁপড়ে জিজ্ঞেস করলো পিঁপড়ানীরে —বলতো দেখি বউ হাতি কাকে বলে?

বউ জবাব দেয়—এক রকমের সাদ দানার চিনি।

দূর মাগী। তুই কিসসু জানিস না। তোর ভয়ানক নোলা। সব কথাতেই শুধু চিনি!

এই মিনসে গাল দিবি না—বউ মাজায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুটো লকলকে কালো শুঁড় নাচায়।

চোপ—পিঁপড়ে ধমক দেয়। তারপর কর্তা গিন্নীতে মারামারি লাগে। দুজনে প্রবলভাবে পরস্পরকে কামড়ে একটা কচু-পাতায় গড়াগড়ি খায়।

পাঁউরুটিটা পুকুরের জলে ভিজিয়ে চটকাতে চটকাতে পাড়ে উঠে স... দেখে, সদ্য ছিঁড়ে আনা কচুপাতার ওপর দুটো ডেঁওপিঁপড়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। ও রাগে কচু পাতাটা তুলে জোরসে ঝাড়া দেয়। যুগলবন্দী দুটো পিঁপড়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। কলাপাতায় ভিজে রুটিটা রেখে সুদেব ঠেসে ঠেসে মাখে। সামনে গভীর, গম্ভীর বিশাল পুকুর। কালো জল। চারপাশে ঝাঁকড়া বড়ো বড়ো গাছ। ছায়া ছায়া অন্ধকার। এই বাগানে সূর্যের আলো ঢুকতে পায় না। জলে ঢেউ নেই, স্রোত নেই। সুদেবের মনে হয় পুকুরের কালো জল একদিন হঠাৎ জলস্তম্ভের মতো সটান দাঁড়িয়ে আকাশটাকে ছোবল মারবে। কাঁটায় টোপ লাগিয়ে ও পুকুরে ফেলে। তারপর ফাতনায় চোখ রেখে ও বসে থাকে। চারপাশ চুপচাপ, গাছপালা নড়ে না। পাখপাখালির শব্দ নেই। ঘন নীরবতা ওকে চেপে ধরে।

মাঝে মাঝে বাগানের ধার ঘেঁষে লাল মাটির রাস্তায় মানুষের দল, পায়ের শব্দ। জমিদারের মরা হাতিটাকে ওর দেখার খুব ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু হলো না। কাল রাত্তে পুকুরে চার করে গেছে। তখনও হাতিটা মরে নি। তৈরী চার ছেড়ে আজ নড়ার উপায় নেই। তার ওপর সেই পুরোনো জেদটা

ধিকিধিকি ওর বুকে জেগে উঠছে। মাছটাকে ধরতেই হবে। এত্তোবড়ো মাছ এ এলাকায় কেউ ধরেনি। অনেকে চেষ্টা করেছে। দিন-রাত মাসের পর মাস ফাতনার দিকে তাকিয়ে রোদে জলে শরীর ভেঙে হাড় মাস কালি হয়ে গেছে। তারপর ছিপ গুটিয়ে হার মেনে বাড়ী ফিরেছে। সুদেব সে ধাতের লোক নয়। দরকার হলে সারা জীবন সে পুকুর ধারে কাটাবে।

নিথর গোবেচারা জল। মেঘে অন্ধকারে চারপাশ আবছা। একটু নজর করলে বোঝা যায় এই জলের মধ্যে কি যেন একটা ভয় আছে। গা ছমছম করে। অনেক নীচে পাঁকের কাছাকাছি সেই মাছটার বাস। বয়েসে মাছটা হয়তো ওই বুড়ো হাতির সমান। বহু বছর ও বেঁচে আছে। মস্তো চেহারা। গায়ে শ্যাওলা জমেছে। রাঙা চুনির মতো দুটো চোখ। কেউ বলে কাতলা। কেউ বলে রুই। বিজু মোড়ল বলে—কালবোস মাছ। মাছটার দুটো লম্বা কালো গোঁফ সে নিজে দেখেছে।

মাছটা কতো বড়ো, সেটাও হলফ করে বলা মুস্কিল। ওর গোটা শরীর কেউ দেখেনি। ঠারে ঠোরে চেহারার কিছু কিছু অনেকে দেখেছে। নাকে একটা সোনার নথ। অনেক দিন আগে জমিদার বাড়ীর গিন্নীমা নিজের হাতে এই নথ ওর নাকে পরিয়ে-ছিলো। তখন মাছটার বয়েস বছর দুয়েক, কোজ পাঁচেক ওজন। গিন্নীমাও আজ প্রায় দেড় কুড়ি বছর গত হয়েছে। দু' চারজন যারা নথ পরানো দেখেছিলো, তাদেরও কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু মাছটা আছে। মাঝে মাঝে ঘাই দেয়। তখন গোটা পুকুর কেঁপে ওঠে।

সুদেব একটা বিড়ি ধায়। তার শরীরে, হাতে মদের মিএগ, খোল, একাংকি, তাম্বুল ঘোড়বজের গন্ধ। কড়া গন্ধে তার শরীরে কেমন ঝিম লাগে। বঁড়শি তুলে সুদেব নতুন টোপ গাঁথে। সীতাভোগের মতো নরম, সাদা পিঁপড়ের ডিম টোপের গায়ে জড়িয়ে দেয়। তরিবতের শেষ নেই। অনেক কষ্টে এই ডিম সে জোগাড় করেছে।

রাস্তা থেকে কে যেন বললো—পাগলা সুদেব আজো ছিপ নিয়ে বসেছে। ব্যাটার কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই।

গলাটা সুদেব চিনতে পারে না।

বোসেদের আকাশছোঁয়া আমগাছটায় কাল ও উঠেছিলো। মোটা, লম্বা গুঁড়ি। তলার দিকে ডালপালা নেই। পালিশকরা সিমেন্টের থাম যেন একটা। দুপায়ে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে গাছের মগডালে ও উঠেছে। অনেকদূরে বিড়লাপুর চটকলের চোঙ দেখা যায়। পাতলা ধোঁয়া উড়ছে। ঘসটানিতে বুকের ছালচামড়া ছিঁড়ে সে কি জ্বলুনি! গাছ ভর্তি লাল পিঁপড়ে। হাজারে হাজারে ওরা তেড়ে এলো। সুদেব আপাদমস্তক জবজবে করে কেরেসিন তেল মেখেছিলো। তাতেও বদমাসগুলো বাগ মানে না। মাংস ফুটো করে দাঁত বসিয়ে দেয়। তেলমাখা হাত পা পিছলে যাবার ভয়। খুব সাবধানে পিঁপড়ের বাকসটার দিকে ও এগোচ্ছিলো। হঠাৎ পা একটু ফসকালেই মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে যাবে। তার ওপর ধরা পড়ার ভয়। এ গাছের পিঁপড়ের ডিম ভাঙা বারণ। গাছটার খুব ফলন। আমের সময় ফলে ডাল-পালা নুয়ে যায়। পিঁপড়েরা পাহারা দেয়। চোরের বাপের সাধ্যি নেই কাছে ঘেঁসে। একটাও চুরি হয় না। বোশেখ, জষ্টিতে দশ পনেরো হাজার পাকা ফলে গাছটা সম্রাজ্ঞীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

চারপাশে লাল পিঁপড়ের সারি। সুদেবকে ঘিরে তারা শক্ত ব্যূহ বসিয়েছে। কেরোসিনের গন্ধ মরে আসার আগেই চটপট ডিম ভেঙে নামতে হবে। গামছাভর্তি ডিম নিয়ে সুদেব যখন মাটিতে পা দিলো, তখন ওর মাথা ঘুরছে। সারা শরীরে চাকা চাকা লাল দাগ। বিষ ব্যথা। মনে হলো জ্বর আসছে। পা চালিয়ে বাড়ী ফিরলো। কলাপাতায় ডিমগুলো ঢেলে মাটি, পাতা বাছলো। কি সাদা, তুলতুলে চেহারা। গোপালভোগ চালের ভাতও হার মানে। খুব ক্লান্ত লাগছিলো। তখন সন্ধ্যে হয়েছে। সরমা কাঠের চুলো জেলে রাঁধছিলো। ভিজে কাঠের ধোঁয়ায় ঘরদোর বেঝাই। হ্যারি-কেনের সামনে ছেলেমেয়েরা বই হাতে বসেছে। সুদেবের হাতে সময় কম। এখনি ওকে বেরোতে হবে। দত্তদের পাটক্ষেতে ধামার মতো চেহারা একটা বোলতার চাক দেখা আছে। ওটা চাই। ওই বোলতার ডিমে সোনালী রঙ। ক্ষীরের গুঁজিয়ার মতো দেখতে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। বাইরে ঝুপঝুপে অন্ধকার। একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আর একটা আট ফুট লম্বা সড়কি নিয়ে সুদেব বেরোলো। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে পায়ের তলার এঁটেল মাটি চটচট করছে। সুদেব টর্চ জ্বালেনি। দত্তদের মেজোকর্তা ডাক-সাইটে লোক। আগে ডাকাতি করতো। চোখ কান সজাগ। পাট ক্ষেতের লাগোয়া বেগুনবাড়ী। সারারাত নজর রাখে। সুদেবকে চোরছ্যাচোড় ভেবে হয়তো একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাঁধাবে। মানুষ সমান লম্বা পাটবন ফাঁক করে সুদেব গুঁড়ি মেরে এগোয়। পায়ের নীচে কাদা। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না। চাকটা আগে থেকে দেখা ছিলো। নিশেন মতো গিয়ে সুদেব দাঁড়ায়। বোলতার গুনগুন কানে আসে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। পাটক্ষেতের শেষপ্রান্তে মজা খালে একটানা ব্যাঙ ডাকে। সুদেব গুনগুন শব্দটা লক্ষ্য করে সড়কি আর টর্চ উঁচিয়ে ধরে। ডান হাতে সড়কি, বাঁ হাতে টর্চ। ঘট করে বোতাম টিপতেই একটা তেজী আলো বোলতার চাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বোলতাদের গুনগুনানি থমকে যায়। নিমেষে ও হাতের সড়কি চালায়। আজো নিভে যায়। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ে। মাটিতে মুখ গুঁজে সুদেব শুয়ে থাকে।

কে? কে ওখানে—মেজোকর্তা চেঁচায়।

বিজলী চমকাচ্ছে কর্তা—ফাগু সেখ বলে। ফাগু মেজোকর্তার জন মজুর। বেগুন ক্ষেত পাহারা দেয়। মেজোকর্তার ডাকাত দলের পুরোনো মেম্বার।

সুদেবের বুক কাঁপে। ওর শরীর ঘিরে শয়ে শয়ে বোলতা ওড়ে। হাওয়ায় রাগী গর্জন ভাসে। ওর পিঠে কাঁধে বোলতার ডানা ছুঁয়ে যায়। চাকটা নিশ্চয়ই খসে পড়েছে, ও ভাবে। বাজের শব্দে কানে তালা লেগে-

ছিলো। কিছুই শুনতে পায়নি। নিজের হাতের টিপ সম্পর্কে ওর অগাধ বিশ্বাস। ঘনঘন শ্বাস পড়ছিলো। ও হাঁফাচ্ছিলো। সারাদিনে কম ধকল যায় নি। বয়েস হচ্ছে। তিন ছেলেমেয়ের বাপ। গত মাসে চল্লিশ পেরিয়েছে। অথচ কিছুই করা হলো না। জীবনটা বড়ো তাড়াতাড়ি ছুটছে। বয়েসের কথা ভেবে ও মুষড়ে যায়। তখনি সেই বিশাল মাছটার কথা মনে পড়ে। এবার ও সেটাকে ধরবে। কাদায় উপুড় হয়ে ও প্রায় ঘন্টাখানেক শুয়ে থাকে। বোলতাদের বিশ্বাস নেই। চাক থেকে সহজে নড়ে না। ওরা চাক না ছাড়লে কাছে যাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে বড়ো বড়ো ফোঁটার বৃষ্টি নামে। চারপাশে চড়বড় শব্দ। ঠান্ডা হাওয়ায় ভিজে শরীর কাঁপে। তবু ও বেজায় খুশী হয়। মেজো-কর্তা পালাবে। বোলতারা পালাবে। জয় তারা, আর ভাবনা নেই। আরো কিছু সময় মাটিতে শুয়ে ও সেই মাছটার কথা ভাবে। গভীর কালো জলের মধ্যে মাছটা এখন কোথায়, কি করছে? পুকুরের জলে এখন বৃষ্টির জলতরঙ্গ বাজছে। জলের তলায় কি দিনরাত হয়? শীত, গ্রীষ্ম ছয় ঋতু ঘুরে ঘুরে আসে। সেই বিশাল প্রাণীটা কখন ঘুমোয়? জাগেই বা কখন? সময়, পৃথিবী, চাঁদ সূর্যের নিয়মের বাইরে নিজেদের দুনিয়াটা ওদের কেমন লাগে! সুদেবের মাঝে মাঝে জলের তলায় মাছ হয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

রাত বেড়েছে। কোথাও জনমনিষ্যির সাড়া নেই। পাতলা বৃষ্টি আর অন্ধকারে চারপাশ ডুবে আছে। ঝোড়ো হাওয়া সাঁই-সাঁই শব্দ তুলে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। একটানা ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝির শব্দ। জল, কাদায় হামা দিয়ে সুদেব এগোয়। ঘন পাট-ক্ষেতে দুলুনি জাগে। সুদেব টর্চ জ্বালে। ফাঁকা অন্ধকার ঝলমলিয়ে ওঠে। একহাত সামনেই সেই বোলতার চাক। টক করে ও সেটা তুলে নেয়। ফের ঘন অন্ধকার। চাক থেকে কয়েকটা বোলতা ভোঁভোঁ শব্দ করে উড়ে যায়। এতো বৃষ্টিতেও ওরা ভাঙা বাসার মায়া কাটাতে পারেনি।

প্রায় মাঝরাতে সুদেব বাড়ী ফেরে। সারা গাঁ তখন ঘুমে অসাড়। বাড়ীতেও কেউ জেগে নেই। শরীরের ধুলোকাদা সাফ করে ও খেতে বসে। রুটি, ডাল, আলু-কুমড়োর ছেঁচকি।

ফাৎনার চারপাশে একটা প্রজাপতি উড়ছে। দোপাটি ফুলের পাপড়ির মতো বাসন্তী রঙের দুটো ডানা। ফাৎনায় বসার মতলব। সুদেব বিরক্ত হয়। এখন এসব খেলা ভালো নয়। জলের তলায় সেই মহা-কায় প্রাণীটাকে ও যেন দেখতে পায়। তার নাকে সোনার নথ। মদের মিঞ্জর, গন্ধে তার বুক ভরে উঠেছে। দুটো কালো কালো শুঁড়ে সে টোপটা নাচাচ্ছে। ফাৎনায় কাঁপন। সুদেব শক্ত দুহাতে ছিপের গোড়াটা চেপে ধরে। আজ একটা এসপার ওসপার হবে। অনেকদিন ও বসে আছে। শরীরের রক্ত জল করেও এখনো জীবটার নাগাল মেলেনি। গতবার বৃষ্টিতে ভিজে নিমোনিয়া হওয়ার দাখিল। তবু হাল ছাড়ে নি। বিষ পিঁপড়ের কামড়ে কতোবার শরীর জ্বলেছে। চাক ভাঙতে গিয়ে দুসন আগে বোলতার কামড়ে কামড়ে বেহুঁস। জ্বরে সাতদিন শয্যাশায়ী। সরমা রাগে, অভিমানে দেওয়ালে কপাল ঠুকে হাউহাউ কেঁদেছিল। কিন্তু সুদেব নিজেকে ঠেকাতে পারে না। জেগে, ঘুমিয়ে সে ওই মাছটাকে দেখে। একটা পুকুরের গম্ভীর কালো জল দুলে দুলে তাকে ডাকে। বর্ষার মেঘলা আকাশ আর অঝোর বৃষ্টির দিনগুলোর জন্যে ও অপেক্ষা করে। ওটাই তো মরশুম। সংসার, ছেলেমেয়ে, স্কুলের চাকরী কিছুই ভালো লাগে না। স্কুলে কামাই লেগেই আছে। হেডমাস্টার ধমক দেয়। কয়েকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তবু সুদেব মানুষ হয় না। ক্লাসে পড়াতে গিয়ে খেই হারায়।

অনেক বড়ো কাজ আছে আমার, সুদেব ভাবে, মাছটা ধরতেই হবে। তা না হলে জীবন ব্যর্থ। এই সংসার, চাকরী এবং আর পাঁচটা মামুলি কাজের জন্যে আমার জন্ম নয়। সব মানুষের বড়ো কিছু একটা করার আছে।

রাস্তা থেকে কে যেন ওর নাম ধরে হাঁক দেয়। সুদেব দেখে গোকুল। পাগলা গোকুলও হাতি দেখতে যাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করে—যাবে নাকি?

বিকেলে—সুদেব বলে।

পাগল গোকুল হাসে। মদের জন্যে পাগল হয়ে গেলে দেখি—সে ফুট কাটে।

সুদেব জবাব দেয় না। গোকুলটা বড়ো গোঁয়ার, একরোখা টাইপ।

সুদেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে একটা ছাইগাদা আছে। ছাইপাঁশ, তরকারির খোলায় সেটা রোজ পাহাড় প্রমাণ হচ্ছে। একটা বাঁকানো লোহার শিক হাতে গোকুল সেখানে সারাদিন বসে থাকে। উলিডুলি, তেলচিটে জামাকাপড়। শরীরে ধুলো ময়লার আস্তর। গোকুল তারই সমবয়েসী। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে। এখন দেখে ভদ্রলোকের ছেলে বলে মনেই হয় না। ভিখিরী ক্লাসের লোক। লোহার শিকে ময়লার গাদা খুঁচিয়ে ইট, পাথর কয়লার টুকরো বার করে সামনে জমায়। সন্ধ্যে হলে সেগুলো আবার ফেলে দেয়। মুখে অবিরাম বকুনি—পৃথিবীতে এক লক্ষ শুয়োরের বাচ্চা রোজ জন্মায় আর মরে। মরে আর জন্মায়। এই এক লক্ষের মধ্যে আমিও একজন। হাতের চেটোয় একটা আধপোড়া কয়লা রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। সুদেবকে দেখলে বিড়ি চায়। মাথার রুখু লালচে চুল আর দাড়ি গোঁফে ছাই-এর পাউডার। শরীরের চারপাশে ছাই-এর কুয়াশা। লোহার শিক দিয়ে খোঁচানো তবু থামে না।

ছাই গাদার বাসিন্দা দু-একটা কুকুর-কার্নিশের কাক গোকুলের ব্যবহারে বিরক্ত হয়। তাদের শোয়া আর রুজি রোজগারের জায়গাটুকু বেমালুম গায়েব। নাকে ছাই ঢুকে কুকুরদের সর্দি হয়। তারা ফ্যাচফ্যাচ হাঁচে।

মাছ ধরার সময় সুদেব একবার ওকে সঙ্গে নিয়েছিলো। পুকুর ধারে টোপ, চার, বিড়ি এগিয়ে দেওয়া, নীচু গলায় দু-চারটে খোসগল্প করার জন্যে একজন জোগাড়ে থাকলে ভারী সুবিধে। বিড়ির লোভে গোকুল এসেছিলো। কিন্তু দু-চার মিনিট বসেই তার উশখুশ সুরু হলো। কাটতে পারলে যেন বাঁচে। বঁড়শিতে কেঁচো গাঁথার সময়ে চটচটে হলুদ আঠা বেরোয়। গোকুল বলে—এতো নোংরা ঘাঁটিস কি করে?

সুদেবের হাসি পায়। ব্যাটা ছাই গাদার ভিখিরী। ফাৎনাটা তখন নড়ছিলো বলে সুদেব ওর কথার জবাব দেয়নি। পাঁচ নম্বর বিড়িটা শেষ করে গোকুল উঠে দাঁড়ায়। বলে—আমি যাই। ওর চোখের দৃষ্টি তখন ঘোলাটে, ধোঁয়া ধোঁয়া।

ছাই ঘাঁটিস সেন? সুদেব ওকে আটকাতে চায়।

গোকুল যেন ওর কথা শুনতেই পায় না। বকতে শুরু করে—পৃথিবীতে রোজ এক লক্ষ শুয়োরের বাচ্চা জন্মায় আর মরে। আমিও একজন। ফাৎনার দুলুনি হঠাৎ থেমে গেছে। একহাতে ওর কাঁধ ধরে সুদেব ঝাঁকুনি দেয়—এ্যাই কি বলছিস?

গোকুল ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায়। চোখে ঘোর। বলে—খুঁজছি।

কি?

একটা দারুন জিনিস। বলবো না। গোকুল সরে বসে। পুকুরের জলের দিকে তাকায়। জলের গম্ভীর কালো ছায়া ওর চোখে কাঁপতে থাকে।

চেনাজানা ভালো কাটার আছে— গোকুল জিজ্ঞেস করে।

সুদেব অবাক হয় কাটার, কিসের কাটার, কি কাটতে হবে?

স্টোন, দামী পাথর। আমি পাথরের ব্যবসা করছি। এক নম্বর, সেরা সব পাথর। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পান্না আমার কাছে আছে। সুদেব আকাশ থেকে পড়ে। এতো-বড়ো একটা খবরে ওর কথা হারিয়ে যায়।

গোকুলের চোখ মুখের রং বদলে গেছে। ও বলে, ফি মাসে এক হপ্তা জঙ্গলে কাটাই। কেউ জানে না। সেখানে কতো রকমের পাথর। খুঁজে নিতে হয়। চেনা এক সাঁওতাল আমাকে সাহায্য করে। গোকুলের লালচে চুল হাওয়ায় ওড়ে। ফ্যাচর-ফ্যাচ চুলকুনিতে খাড়ি ওঠা চামড়ার সাদা আঁচড় পড়ে।

সুদেবের এতোক্ষণে খেয়াল হয়, ও পাগল।

মজা করে জানতে চায়—কোথাকার জঙ্গল?

বলবো কেন—গোকুল সাবধানী হয়—হদিশ পেলে তুমি গিয়ে লুঠপাঠ করবে। এসব ধান্দা ছাড়ো। গোকুলের গলার স্বর এখন তেতো। ও একদৃষ্টে সুদেবকে

দেখে। হাতের বাঁকানো শিকটা শক্ত করে চেপে ধরে। সুদেব কেমন ঝিমিয়ে যায়।

গোকুল বলে—অচেনা লোক ওখানে ঢুকলে তীর খেয়ে মরবে। আদিবাসী, সাঁওতালদের এলাকা। আমাকে সাঁওতালদের মতো দেখতে। ওরা ঘরের লোক ভাবে। কিছু বলে না।

সামনে কালো জলে নিশ্চুপ ফাৎনা ভাসে। ঠাসবুনোনি, গাছপালায় ঝিকঝিকে অন্ধকার। জলের তলায় মণি-মানিক্যের মতো কারা যেন ঘোরে। সুদেব জলের দিকে তাকায়।

গোকুল ওঠে। যাবার আগে নীচু গলায় বলে—সেখানে একটা পাহাড় আছে। কালচে নীল রং। পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ জঙ্গল। আলো ঢোকে না। ম্যাপের উত্তর-পশ্চিমে কোন। পায়ে ধরে সাধা, গা তোলে না গাধা, বুঝে নাও। লোহার শিক দিয়ে একটা বুনোঝোপ ও এলোপাথাড়ি পিটোয়। শুকনো পাতায় খরখর শব্দ।

পাথরগুলো রাখিস কোথায়—সুদেব জিজ্ঞেস করে। ওর গলায় এখন ফাজলামি নেই। একটা আবছা বিশ্বাস ওর বুকে পাক খায়। ভাবে, এই পাগলটা হয়তো সত্যি কিছু পেয়েছে। অনেকে তো পায়। জানপ্রাণ দিয়ে খুঁজলে কিছু মেলে বৈকি।

গোকুল চোখ নাচিয়ে মুচকি হাসে। ডাকাতি করবি নাকি—জিজ্ঞেস করে।

সুদেব চটে যায়—ধুর শলা, আমার সময় কোথায়?

গোকুল চারপাশ তাকায়। নীচু গলায় বলে—ওগুলো আছে ছাই-এর গাদায়। যেখানে দেখিবে ছাই।

তখন ফাৎনাটা মৃদু মৃদু নাচছে। সুদেব দু হাতে ছিপটা সেঁটে ধরে। আর কথা নয়—সে হিসহিস করে, ও এসেছে।

গোকুল চলে যায়। এক লক্ষ শুয়োরের বাচ্চা রোজ জন্মায় আর মরে। সুদেবের কানে ওর একটা কথাও ঢোকে না।

আকাশের টুকরো মেঘটা কখন যেন দশাসই দৈত্য হয়ে উঠেছে। ভীষণ শব্দে হেঁচে উঠলো একবার। দুদ্দাড় ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ঘন গাছপালার ডালে ডালে হাওয়ার দাপাদাপি। শুকনো কুটো পাতা এসে জলে পড়ছে। ডানদিকে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে একটা বড়ো গাছ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। আকাশ থেকে কোন এক অদৃশ্য শক্তি জঙ্গলের চুলের মুঠো ধরে নির্মম হাতে টানছে। ডালে পাতায় ভীষণ গোঙানি। হাওয়ার টানে ফাৎনা ভেসে যায়। সুদেব ভাবে একি গেরো। ছিপ সামলাতে হিমসিম। মাটির তাল সরিয়ে নারকোল মালা থেকে কেঁচোরা বেরিয়ে পড়ছে। পাশ থেকে আরো একখামচা ভিজে মাটি তুলে ও নারকোলমালার মুখে থেবড়ে দেয়। মাটি ফাঁক করে দেখে তাল পাকানো একগাদা কেঁচো জট পাকিয়ে শুয়ে আছে। মরার আগে ভয় পেলে এভাবেই জড়িয়ে থাকে। ভাবে বেঁচে যাবে।

আছে। ঠাকুরমা, পিসীমা, মা কাকিমারা এই-ঠাকুর্দার মরার দিনটা ওর স্পষ্ট মনে ভাবে ঘেঁসাঘেঁসি বসে কাঁদছিলো। ভয়ে কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছিলো না। হয়তো একা হলেই মৃত্যু ছোবল মারবে। মালা থেকে কেঁচো বার করার সময় সুদেব এটা হাড়ে হাড়ে বোঝে। এমন তালপাকিয়ে থাকে যে কোনো একটাকে আলাদা করা যায় না।

ঝড়ের শোঁ-শোঁ শব্দ থামে না। মাঠে বাঁধা গরু হাম্বা হাম্বা ডাকছে। প্রজাপতিটা কখন যেন পালিয়েছে। তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়। খোসা ছড়ানো আঁশফলের মতো হাজার লক্ষ ফোঁটা ছুটে আসে। মাথার ওপর ঝাঁকড়া ডালপালা। প্রথম চোটে জল আটকায়। তারপর একটানা জল পড়ে। সুদেব ছাতা খোলার সাহস পায় না। দমকা হাওয়ায় ছাতা উল্টে যাবে। তাছাড়া ছাতা হাতে ছিপ সামলানো মুস্কিল। এর মধ্যে সেই অতিকায় জীবটা যদি টোপ গেলে, তাহলেই নাস্তানাবুদ—তার চেয়ে ভেজা ভালো। নাক-মুখ বেয়ে জল পড়ে। চোখের মনিতে জলের কণা লেগে ঝাপসা দেখে। ভিজে জামাকাপড়ে ঠান্ডা হাওয়া লেগে হাড় পর্যন্ত হিম হয়ে যায়। আলোর ঝলক তুলে ভীষণ শব্দে বাজ পড়ে। ফাৎনার নড়াচড়া দেখে সুদেব বুঝতে পারে না যে এটা মাছের টান অথবা হাওয়ার কারসাজি। চোখের পাতা জলে ভারী। প্রকৃতিও আমার পেছনে লেগেছে—সুদেব ভাবে—এতো কষ্টের জোগাড় ঝড়-জলে ডুবতে বসেছে। জলের নীচে সেই জীবটা হয়তো আমার দুর্দশা দেখে হাসছে। এইভাবে কতক্ষণ ভিজতে হবে কে জানে। একজন সঙ্গী থাকলে ছাতা খুলে পাশে বসে থাকতো।

আসার সময় ইচ্ছে ছিলো গিরিজাকে ডাকবে। গিরিজা বাড়িতে ছিলো না। তার ঘরের বন্ধ জানলার দিকে তাকিয়েই সুদেব বুঝেছিল, সেও গেছে মরা হাতি দেখতে। গিরিজা বাড়িতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুদেব তাকে ডাকতো কিনা সে ব্যাপারে তার নিজেরও সন্দেহ আছে। সম্পর্কে গিরিজা ওর খুড়তুতো ভাই। বড়ো রাস্তার ওদের বাড়ি। এই পুকুর ধার থেকেও গিরিজার ঘরের জানলা দেখা যায়। এম এস সি পাশ করে বাড়িতে বসে আছে। ছোকরা একটু খামখেয়ালী। বছর তিরিশ বয়েস। বিয়ের একমাস বাদে বৌটা ভাগলো। কারণ সুদেব জানে না। জানার চেষ্টাও করেনি। গিরিজা একদিন নিজেই বলে-ছিলো। ফুলশয্যার রাতে খোলা জানলার

বারান্দা দিয়ে সে নাকি পেচ্ছাপ করেছিলো। ঘরের দরজা বন্ধ। খাটে বসা বৌ সেই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সুদেবের ধারণা কারণটা অতো তুচ্ছ নয়। গিরিজা দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান। বাপ-মার একমাত্র ছেলে। একটা চাকরিও করতো। কোলে পিঠে আদরে মানুষ। এমন ঘরের বৌ হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবু মেয়েটা টিঁকলো না। সুদেবের ধারণা ঝগড়াটে টাইপের কাকিমার খিঁচুনিতেই মেয়েটা পালিয়েছে। মুখে কিছু না বললেও গিরিজা কষ্ট পেয়েছিলো নিশ্চয়ই। আমুদে হাসিখুশি ছেলেটা গুম হয়ে বাড়িতে বসে গেলো। তারপর একদিন দুম করে চাকরিটা ছেড়ে দিলো।

বাড়িতে এখন ও দিনরাত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালায়। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। শোয়ার ঘরের ল্যাবরেটরিতে মাঝরাতেও আলো জ্বলে। ওদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আছে। গিরিজা এখন একতলায় চাকরদের ঘরে শোয়। শোয়ার ঘর ভর্তি টেস্ট টিউব, বিকার, বকযন্ত্র, নানা রঙের এ্যাসিড, পাউডার। পা রাখার জায়গা নেই! গিরিজা নাকি মানুষ বানাচ্ছে। বছরখানেক আগে গিরিজার ল্যাবরেটরিতে সুদেব একবার ঢুকেছিলো। বাপরে কি পচা আঁশটে গন্ধ। গা গুলিয়ে উঠেছিলো। গিরিজার বিকার নেই। ও বোঝাচ্ছিলো, মানুষ কি দিয়ে তৈরী। ভ্রূণের মূল উপাদান কি কি। সুদেব বোঝেনি। গলার কাছে এ্যায়সা বমির চাপ যে ও তখন পালাতে পারলে বাঁচে। সাত দিনের বাসি মাছের পেটে এমনধারা গন্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সুদেবের মনে পড়ে লাশকাটা ঘরের ছবি। ওর প্রথম বৌ, কমলা ফলিডল খেয়ে মরেছিলো। মেয়েটা ছিলো সাদাসিধে হাবাগোবা। গাঁয়ের মেয়ে যেমন হয়। ভাসা ভাসা দুটো চোখ, শ্যামলা গায়ের রং, এই আঠারো বছর পরেও সুদেব মনে করতে পারে। ফলিডলের মারাত্মক বিষে নাড়িভুঁড়ি পুড়ে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলো। এতো কষ্ট পেয়ে মরার কোনো মানে হয় না। ভোর রাতে কোনো এক সময়ে বিষ খেয়েছিলো কমলা। তখন সূর্য উঠেনি। মিনিট দশেকের মধ্যেই গোঙানি শুরু হলো। আবছা অন্ধকারে ঘুমের মধ্যে সুদেব প্রথমটা বোঝেনি। আলো জ্বেলে দেখলো ফলিডলের টিন। কমলা তখন বমি করছে। অনেক লোকজন জুটলো। ডাক্তার হাসপাতাল সব করেও দু ঘণ্টার মধ্যে শেষ। পুলিশ কেস হলো। মর্গে চালান গেলো কমলার লাশ। আত্মহত্যা বলেই পুলিশ রিপোর্ট দিলো। পরদিন লাশ আনতে মর্গে যেতে হলো। একটা অন্ধকার গুদোমঘরে লোহার খাটে কমলার ল্যাংটো শরীরটা শোয়ানো ছিল। ঘরের দরজা খুলতেই দুটো চামচিকে উড়ে গেলো। পুরোনো, পচা মাংসের গন্ধে বাতাস ভারী। সুদেবের মাথা ঘুরে গিয়েছিলো।

কমলাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে নিজের হাতে কমলার বমি ধুতে হয়েছিলো। বমি ধোয়া জল ঘরের নর্দমা দিয়ে বাড়ির পেছনে ফাঁকা মাঠে পড়লো। রাস্তার একটা ল্যাংড়া কুকুর আর একটা কাক বমি ধোয়া সেই জল খেয়ে চোখ উল্টে চিতপটাং। পাড়ার ছেলেরা জরিমানার হুমকি দিয়েছিলো। এতো ঝামেলায় সে জীবনে পড়েনি।

দাপট কমলেও এখনো বৃষ্টি থামেনি। ছোটো সাইজের ফোঁটা। আকাশ দেখে সময় ঠাওর করা যায় না। তবে অনেক আগেই দুপুর গড়িয়েছে। মেঘের গায়ে অন্ধকারের পালিশ পড়ছে। কোথায় যেন সাপে ধরা একটা ব্যাঙ এক ঘেঁয়ে কাতরাচ্ছে। প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় চীৎকার। সুদেব বোঝে ব্যাঙটার মাথা এখনো সাপের মুখে ঢোকেনি। সাপটা ভীষণভাবে সেটা মুখে ঢোকানোর চেষ্টা করছে। ব্যাঙটা চাইছে বেরিয়ে আসতে। এই টানা-পোড়েন আর চীৎকার এখন চলবে। ঢ্যামনা সাপ বড়ো সোনাব্যাঙ ধরলে এই বিপদ হয়। ছোটো মুখে বড়ো খাবার।

ফাৎনাটা মাঝে মাঝে আবছায়ার মিলিয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন বাদে কমলার মুখটা ও ভেবে মনে আনতে পারে না। সুরমার ছেলেমেয়েদের মুখ ও ভাবে কোনোটারই পুরো আদল নেই। শ্যাওলার চাদর জড়ানো, কালচে লাল রং, লম্বা শুঁড়ওলা একটা বিরাট জীব ওর চেতনায় ভেসে ওঠে। আগের বর্ষায় ধীরেন মণ্ডলের পুকুরে একদিন বসেছিলো। ধূসর আকাশে লাল আলো ছড়িয়ে তখন সূর্য ডুবছে। পুকুরের পাঁক থেকেও একটা লালচে আভা উঠছিল। হাওয়ায় ঠাণ্ডা ভাব। সুদেবের মেজাজ ভালো ছিলো। জমাট রুপোর মতো একটা কেজি পাঁচেকের মিরগেল আর তিন কেজির মতো একটা রুই উঠেছিলো ওর ছিপে।

গিরিজা এলো। একটা সিগারেট দিলো সুদেবকে। নিজে ধরালো একটা। পাঁউরুটির শক্ত গোল্লাটায় জল ছিটিয়ে আবার চমৎকার নরম করে মাখলো। কাঁটায় কেঁচো গাঁথতে গিয়ে ওর দুটো আঙুল হলুদ, চিটে রসে মাখামাখি। নাকের কাছে দুটো আঙুল ধরে ও গন্ধ শুঁকলো। নিজে দু-তিনবার গন্ধটা শুঁকে ও আঙুল দুটো সুদেবের নাকের কাছে আনে। সুদেব এক ঝটকায় নাক সরায়।

গন্ধটা চিনতে পারো—গিরিজা মিটমিটি হাসে।

দিন কয়েক আগে গিরিজার ঘরের গন্ধটা সুদেবের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে। গিরিজার শরীর জামা কাপড় জুতোর পরতে পরতে সুদেব এই ঝাঁঝালো পচা গন্ধটা পায়।

যাচ্ছেতাই—সুদেব বিড়বিড় করে।

গিরিজা নতুন একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার গন্ধ সুদেবের ভালো লাগে। তখন ফাৎনায় নাচন লেগেছে। গিরিজা একটু উশখুশ করে। তারপর আদুরে গলায় বলে—যদি ভরসা দাও তো একটা অনুরোধ করবো। গিরিজার এতো সহজ সরল গলা সুদেব আগে শোনেনি। বলো—সুদেব তাকায়।

গিরিজা এক সেকেণ্ড কি ভাবে। গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করে—একটা মানুষ প্রায় তৈরী করে এনেছি। খুঁটিনাটি সামান্য কাজ বাকী। এখন তোমার একটু সাহায্য চাই।

ফাৎনাটা থরথর কাঁপছে। গোটা পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড এখন ফাৎনার ডগায়। সুদেব আর কিছু শুনছে না। দম চেপে ও বসে থাকে। ফাৎনাটা হঠাৎ চুপ হয়ে যায়।

গিরিজার চোখ মুখ লাল। ও উঠে দাঁড়ায়। কান খাড়া করে কি যেন শুনছে। রাস্তার ওপাশে জানলা খোলা গিরিজার ল্যাবরেটরির ভেতরটা অন্ধকার।

ও নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে—শুনতে পাচ্ছো?

কি?

শিশুর কান্না। ওর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে। হাওয়ায় নারকোল পাতার ঝিলমিল শব্দ। সুদেবের সজাগ কানে কোনো কান্নার আওয়াজ পৌঁছোয় না।

গিরিজা তখন বাড়ির দিকে ছুটছে। সুদেব ভাবে, আমার কানে কোনো ব্যামো হলো নাকি? জলে ফাতনা ডোবার শব্দ শুনতে পাই। অথচ একটা জলজ্যান্ত বাচ্চার কান্না কানে ঢুকল না।

তখন সূর্য ডুবছে। গাছপালায় জলে লাল রং মাখামাখি। গিরিজার দোতলার ঘরে জোরালো, তেজী আলো জ্বলছে। সুদেব ভাবে ওর বাড়িতে বাচ্চা এলো কোথা থেকে? হয়তো বাচ্চা নিয়ে কেনো আত্মীয় এসেছে। কিন্তু বাড়িতে বাবা-মা থাকতে ও অতো হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো কেন? গোটা ব্যাপারটাই ওর হেঁয়ালি মনে হয়। ছিপ গুটিয়ে মাল-মশলা ব্যাগে পুরে সুদেব ওঠার জন্যে তৈরী হয়। পাঁউরুটির ডালাটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয়। বাড়তি টোপ, চার কখনো পুকুরে ফেলতে নেই। আস্কারা পেয়ে মাছেরা খ্যাঁচরা হয়ে যায়। দূরে বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজে। আকাশে কয়েকটা তারা জাগলো। ক্লান্ত হতাশ মুখে গিরিজা ফিরে আসে।

কে কাঁদছিলো—সুদেব জিজ্ঞেস করে।

কেউ নয়। শোনার ভুল—গিরিজা বলে—আজ আমার ল্যাবরেটরিতে একজন শিশু জন্মাবে। দশ মাস দশদিন একটা ভ্রূণকে টেস্ট টিউবে তা দিয়েছি। কিন্তু এখনো প্রাণ আসেনি, সাড়া নেই। দুশো পনেরোটা এরকম টেস্ট টিউব আছে। প্রসব বেদনা উঠলে টেস্ট টিউব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

কি এক অস্বস্তিতে গিরিজা ছটফট করে। ওর গলার স্বর বদলে যায়—আমিও হাল ছাড়ার বান্দা নয়। শেষ পর্যন্ত দেখবো। আমি বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র। শরীর

এবং প্রাণের সব উপাদান জানি। শুধু লাইফটা চার্জ করতে সময় লাগছে।

কি এক মায়ায় সুদেব জিজ্ঞেস করে—তুই যেন কি চাইছিলি? একটু চমকে সুদেবের কাছে ও সরে আসে। নীচু গলায় বলে—তোমার জীবন রস।

সুদেব বুঝতে পারে না। সেটা কি—ও তাকিয়ে থাকে।

পকেট থেকে একটা টেস্ট টিউব বার করে গিরিজা বলে—এক টেস্ট টিউবেই হয়ে যাবে। দাও মাইরি।

আতঙ্কে সুদেব দুপা পিছিয়ে যায়। —কি বাজে বকছিস—ধমক দেয়। গিরিজা ঘাবড়ায় না। বলে—আমার জীবন রসের সাপ্লায়ার ভুবন ঘোষ পালিয়েছে। সে এখন ডুবো জাহাজ খুঁজছে। আমাকে ডুবিয়ে শালা ভেগেছে। আমি বিশ বাঁও জলে।

সুদেবের একটা হাত ও চেপে ধরে—দাও দাদা, এক টিউব দাও।

সুদেবের কব্জিতে গিরিজার হাত সাঁড়াশির শক্ত কামড় হয়ে বসে যায়। ঝটকা দিয়েও সুদেব হাত ছাড়াতে পারে না।

তোমাকে দিতেই হবে—গিরিজার ভারী গলায় তাপ নেই—আমি রক্তচোষা জোঁক, তোমায় ছাড়বো না। তোমার রস শুষে নেবো। দাও বলছি।

গিরিজার প্রচণ্ড ধাক্কায় সুদেব ছিটকে পড়ে। মাথা ঘোরে। চোখের সামনে ধুতরো ফুল। মনে হয় ভীষণ রোগা আর পলকা হয়ে গেছে শরীরটা। তা না হলে গিরিজা ওকে এক ধাক্কায় কাত করে কিভাবে। ওর ভয় করে। গিরিজা যেন দৈত্যদানো। চিমসে শরীরে দুটো চোখ দপাদপিয়ে জ্বলে।

সুদেব মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায়। চোট লেগে কোমর টনটন করে। ভীষণ কান্না পায়। দু-হাতে জামাকাপড়ের ধুলো ঝাড়ে। গিরিজা পলকহীন চোখে তাকে দেখছে। চারপাশ চুপচাপ, কেউ নেই। সুদেব হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে—আমাকে ছেড়ে দে গিরিজা, আমার সবকিছু শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে। সেই মহাপ্রাণীটির খোঁজে রোদে জলে আমার শরীর খাক। আমায় ছেড়ে দে।

গিরিজার চোখের পাতা নড়ে। মাছকে খাইয়েছো—সে বিড়বিড় করে—শালা গোকুলটারও এই দশা। ছাই ঘেঁটে ঘেঁটে ওর শরীরের সব মালমশলা ছাই হয়ে গেছে। কাল ওকে ধরেছিলুম। ছাই আর হাওয়া ছাড়া ওর দেহে কিসসু নেই।

এতোক্ষণে বৃষ্টি ঝড় থেমে ফুরফুরে হাওয়া বইছে। কালো মেঘ উড়ে যাচ্ছে আকাশ থেকে। রাস্তায় লোকজনের গলা, পায়ের শব্দ। মরা হাতী দেখে বাড়ি ফিরছে গাঁ-গঞ্জের লোক। সকলের মুখেই এক আলোচনা, উফ কি রক্ত! পা দুটো ভীমের গদা। মরার পর শুঁড়টা কেমন ঢলঢলে হয়ে গেছে। যেন এখুনি খসে পড়বে। সুদেব দেখে কখন যেন দিনটা ফুরিয়ে গেছে। ভিজে জামাকাপড় শরীরে চেপে বসেছে। একটা ডেঁউপিঁপড়ে পাউরুটির ডেলাটার চারপাশে ছোঁক-ছোঁক করছে।

আকাশে একটা, দুটো তারা ফোটে। লালচে অন্ধকার ক্রমশ কালো হয়। ফাৎনার ওপর টর্চের আলো ফেলে সুদেব বসে থাকে। আজকাল ও গিরিজাকে এড়িয়ে চলে। গিরিজার বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটলে একটা পচা, আঁশটে গন্ধ নাকে ধাক্কা দেয়। এই পুকুর ধারে অন্ধকার নামলেই শিশুর কান্না শুনে আজকাল ও চমকে ওঠে। দূরে গিরিজার ঘরের আলো ঝলমল খোলা জানলা নিঃশব্দে হা হা হাসে। গিরিজাকে জীবনরস জোগান দিতো ভুবন ঘোষ। সুদেবের ছেলেবেলার বন্ধু ও। কতোরকমের ব্যবসা যে ভুবন করেছে তার হিসেব নেই। সবেতেই ফেল। ফেল করার নেশা ধরেছিলো ওর। ব্যবসায় ফেল মেরেই ওর মজা, মৌজ। ছাতার লাঠি, হ্যারিকেন, ফুলকাটা টিনের বাকস, টেলারিং শপ, প্ল্যাস্টিকের বালতি—কিছুই বাদ দেয়নি। সবকটা লাটে তুলে ও ভবঘুরে, বেকার। বাড়িতে বৌ, গোটা চারেক ছেলেমেয়ে। বাপকেলে কিছু টাকাকড়ি পেয়েছিল। তাতেই চলছে। রোজ দুপুরে ম্যাটিনি মারতো। এ চত্বরে দুটো হল। এক একটা ছবি আট-দশবার দেখতো। ভুবনের সঙ্গে দেখা হলেই ও সুদেবকে বিড়ি খাওয়াতো। কোনো দুঃখ জ্বালা নেই। খ্যাক-খ্যাক করে হাসতো। একটা বড়ো দাঁও কিভাবে ওর দিকে এগিয়ে আসছে, সেই গল্প শোনাতো। ভুবন যে শেষপর্যন্ত জীবনরসের ব্যাপারী হয়েছে, এটা সুদেব জানতো না। কিছুদিন আগে ও হাতে একটা উল্কি আঁকায়। নীল কালিতে আঁকা একটা উড়ন্ত বাজপাখী। ধারালো ঠোঁট, ঘন পাখা। তলায় লেখা, অপরাজেয়।

তখনই ভুবন শুনিয়েছিলো ডুবো-জাহাজের খবর। আমার সঙ্গে ভিড়ে যাও—একদিন রাস্তায় বললো—ব্যবসাও হবে। মাছও ধরবে। খাল, বিল পুকুরের মাছ নয়, নদীর মাছ, গঙ্গার মাছ। অনেক বড়ো ব্যাপার, হিম্মতের কাজ। দু ভায়ে থাকবো! তুমি হিসেব রাখবে আর মাছ ধরবে। নদী আমি ডুবো জাহাজ, লঞ্চ, স্টীমার তুলবো। গঙ্গার পেল্লায় মাছ ধরে সুখ, খেলিয়ে সুখ। ধরতে হলে বড়ো কিছু ধরাই ভালো।

সুদেব চুপ। রা কাড়ে নি।

চলো একটা সিনেমা মেরে আসি—ভুবন ওর হাত ধরে—ভালো ছবি।

পুকুরে চার করা ছিল। সুদেব এড়িয়ে যায়।

ভুবন বলে—ভেবে দেখো। ডুবো জাহাজ, লঞ্চ, স্টীমার তোলায় অনেক লাভ। মার নেই। লাক ফেভার করলে জাহাজ লঞ্চের মধ্যে সোনাদানাও পেয়ে যাবে।

আচ্ছা ভাববো, এইরকম ভঙ্গীতে সুদেব ঘাড় নাড়ে। জল দেখে আমি বুঝি কতো গভীর। জলে এক টুকরো ইঁট ফেলে বুজগুড়ি গুনে বলে দেবো কহাত দোড়। ত্রিবেণী থেকে কলকাতার মধ্যে তেইশটা ডুবো জাহাজ আর লঞ্চের খবর পেয়েছি। মাতলা নদীতে পুরন্দর থেকে গরানবোঝে পাঁচ নম্বর পর্যন্ত অন্তত এক ডজন ডুবো লঞ্চ আছে। সোনাদানা বোঝাই জলদস্যুদের লঞ্চ।

আকাশে কখন যেন এক টুকরো চাঁদ উঠেছে। ফিকে সোনালী ধোঁয়ার আড়ালে অসংখ্য তারা। চাঁদের আলোয় ফাৎনাটা দেখা যায়। তবু মাঝে মাঝে টর্চ মেরে সুদেব ফাৎনাটা দেখে। ভিজে জামাকাপড় প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এতো রাত হলো, কিন্তু সেই বিশাল প্রাণীটার এখনো দেখা নেই। পুকুরের জলে টুকরো চাঁদ সোনার বঁড়শীর মতো ভাসছে। তখনই ফাৎনাটা টুপ করে ডুবে যায়। সুদেব প্রচণ্ড খ্যাঁচ লাগায়। গোটা পুকুর কেঁপে ওঠে। পুকুরের জলে চাঁদের ছায়া ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ গাছপালায়, হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ছিপের সুতোয় ভীষণ টানটা নিমেষে শিথিল হয়ে যায়। সুদেব ধীরে ধীরে হুইল গোটায়। শূন্য বঁড়শি শ্যাওলা, শাপলা টেনে তোলে। নাইলন সুতোয়, কাঁটায় সেই জীবটার শরীরের গন্ধ। আজ আর হলো না।

গিরিজার দোতলায় জানলায় আলো জ্বেলেছে। একটা শিশুর আবছা কান্না শোনা যায়। পৃথিবী জোড়া ভিয়েনে যেন জীবন-রস টগবগ করে ফুটছে। সুদেব উঠে দাঁড়ায়।

অনেকক্ষণ ধরে একটা কেঁচোর চাকা খেয়ে পুরুষ পিঁপড়েটার পেট তখন ফুলে জয়ঢাক। কচুপাতা থেকে ছিটকে বোটা যে পড়লো, আর হদিশ নেই। হয়তো বাসায় ফিরেছে। খুদে খুদে ছটা পায়ে মুখ মুছে পিঁপড়েটা একটা আরামের ঢেঁকুর তোলে। এখন ঘরে ফিরে বৌয়ের পাশে শুয়ে মেজাজে গপ্পগাছা করবে। একটা আস্তো হাতি খেয়ে, হাতি কি জিনিস, সে বুঝেছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ঘরটা নিতান্তই ছোট, ন' ফুটের বেশি কোনমতেই নয়— ন-বাই-দশ সম্ভবত এই মাপ। সুতরাং দেখতে দেখতে এমন অবস্থায় দাঁড়াল—বিনুর মনে হল তার বিছানা গয়ের বিড়ির টুকরো ও ছাইয়ের এক সমুদ্রে ভাসছে।

সারারাত ঘুম হল না, বলাই বাহুল্য। ঘেন্না তো বটেই, এমনিতেও সাধ্য হত না। একটা লোক যদি কানের একেবারে পাশে ক্রমাগত কাশে আর হাঁপায় এবং নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় একটা ওঁ-ওঁ করে অপ্রাকৃত শব্দ করতে থাকে, দুই কাশির ধমকের ফাঁকে ফাঁকে—কোন মানুষ ঘুমোতে পারে ?

কোনমতে সেই আপাতদীর্ঘ রাত—কষ্টের ও দুঃখের রাতের একটা বিশেষ দৈর্ঘ্য থাকে, যা মিনিট ঘণ্টার হিসেবে মাপা যায় না—ভোর হতেই এ আশ্রয় ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে এ স্বাভাবিক। তবু তখনও অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার শেষটুকু বাকী ছিল। তখনও তথাকথিত বাথরুম ও প্রাকৃতিক কার্য সারার স্থান দুটি দেখা হয়নি।

বাথরুম বলতে দোতলাতেই সামান্য একটু পাঁচিলঘেরা ছাদ। সেখানেই যত এঁটো বাসন মাজার ব্যবস্থা। উনুনের ছাই, মাজার শালপাতা আর উচ্ছিষ্টেই সে ছাদ ভরে গেছে, তার দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে, সবটা জুড়িয়ে নরকের সৃষ্টি হয়েছে প্রায়—সেখানেই এক বালতি জল বসিয়ে দিয়ে গেছে অদ্বিতীয় চাকরটি স্নানের জন্যে। স্নান না করলেও চলবে কিন্তু প্রভাতের অত্যাবশ্যক কাজটা সারা দরকার, সেই নরকের মধ্যে দিয়ে পিছল ছাদে পা টিপে টিপে সেখানে যেতেই হল—অত দুঃখের মধ্যেও মনে পড়ল ছেলেবেলায় শোনা কথাটা, নরকের পথ দাদা পিচ্ছিল'—বেরিয়ে এসে মনে হ'ল এ পর্যন্ত যদি কিছু পাপ করে থাকে, তার এমন কি আগামীকালের পাপের জন্যেও নরক ভোগটা হয়ে গেল।

সুশীলা অবশ্যই ব্যাকুল হয়ে বার বার হাত জোড় করতে লাগল, কি অসুবিধা হয়েছে বললে সে অবশ্যই তার প্রতিকার করবে—কিন্তু বিনু সে অনুনয়ের দিকে কান না দিয়ে নিজেই বেরিয়ে খুঁজে পেতে একটা গাড়ি ডেকে আনল আর তাকে সোজা ডাকবাংলোয় যেতে বলল।

ডাকবাংলো বলতেই একটা সম্ভ্রম বা ভয়ের ভাব দেখা দিত ওর মনে। ভয় খরচের অংক শুনে। এত খরচ কি কর্তারা দেবেন ? না দেন না হয় ওর মজুরী থেকেই কেটে নেবেন—মরীয়া হয়ে এই আশ্বাসই অবলম্বন করেছিল সে। শ্রেষ্ঠ হোটেলের অবস্থা দেখে বাকীগুলো পরীক্ষা করার আর সাধ ছিল না।

খরচাটা অবশ্য অপরকে জিজ্ঞাসা করেই জানা। দৈনিক একটাকা ঘর ভাড়া, আলো জল আর কমোড সাফ করার খরচা আরও আট আনা। চার আনা সীটরেণ্টের ঠিক ছ গুণ। কিন্তু উপায়ই বা কি, ঐভাবে সে থাকতে পারবে না।

ডাকবাংলো কাটোয়া শহরের বাইরে। বেশ কিছু দূরে। শহরের দশ ফুট (না বারো ?) চওড়া বাজার ঘেরা প্রশস্ত রাজপথ ছাড়িয়ে একসময় অপেক্ষাকৃত চওড়া পথে পড়ল বটে, তেমনি লোকালয়ের কোনও চিহ্নই রইল না কোনোদিকে। দুদিকে ধানের ক্ষেত, সবে শস্য কাটা হয়েছে, গাছের গোড়াগুলো শুধু কণ্টকিত করে রেখেছে ক্ষেতের শুকনো জমি।

এর মধ্যে দিয়ে মাইলখানেক যাওয়ার পর কোতোয়ালী পড়ল, ওদিকে শ্মশান, তারপর গঙ্গার ধারে একটা জায়গায় নিয়ে গেল—সেখানে দুটি মাত্র বাড়ি; একটি ডাকবাংলো, পাশেরটি মহকুমা হাকিমের কোয়ার্টার বা সরকারী বাসা।

গাড়োয়ান ডাকবাংলোর উঠোনে এসে কোন মতে বারান্দার ওপর মালগুলো নামিয়ে দিয়ে গজগজ করতে করতে তখনই সরে পড়ল। চৌকীদার কোথায় একটু ডেকে দেবে ? বলতে এমন খিঁচিয়ে উঠল যে, বিনু ভয় পেয়ে দু পা পিছিয়েই এল। তার নাকি বিস্তর বাঁধা খদ্দের নষ্ট হয়ে যাবে এই ধাধ-ধাড়া গোবিন্দপুরে নিয়ে আসার জন্যে। যদিও ফেরার সময় খালি ফিরতে হবে এই অজুহাতে বিনুর কাছ থেকে পুরো বারো আনা ভাড়া আদায় করেছে, যেখানে ছ আনা পাবার কথা।

এখন যা করতে হবে নিজেকেই।

কিন্তু এ কি অবস্থা।

এই নাকি ডাকবাংলো। সাহেব স ও বিশেষ লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট।

আর সামনে এই যে একতা ইমারতটি—এটি ওদের ধারণা অনু বিরাট তাতে সন্দেহ নেই। মধ্যে একখানা হলঘরের মতো দুপাশে আর দ ঘর, সেও আকারে এক একখানা দ সাধারণ ঘরের সমান; সামনে অনেকখ খোলা বারান্দা, চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠ হয়। বড় বড় জানলা ও বিরাট দরজ দেখার মতো বটে।

তবে সবই খোলা, হাঁ হাঁ করছে প্রায় দু ইঞ্চি পুরু ধুলো, জানলাগুল সাহেবী মেজাজের—যাকে ফেঞ্চ উইং বলে, অর্থাৎ গরাদ নেই, বড় বড় খড়খ দেওয়া কপাট শুধু। গরাদের কর্তব্য বজ রাখতেই বোধহয় মাকড়শারা পুরু জ বুনে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

চৌকীদার চৌকীদার বলে বার দ ডাক দিল বিনু।

সে ডাক সেই খালি বাড়ি, চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আর গঙ্গার চড়ায় কেম একটা বিকৃত যেন হতাশ নিঃশ্বাসের মত শব্দ তুলে এক সময় মিলিয়ে গেল, কো মানুষের কণ্ঠে তার উত্তর জাগাত পারল না।

তবে ডাকবার পরই ওর নজরে পড়ল একটি বছর পঞ্চাশের মোটা গোছের ভদ্রলোক একটা পুরু গেঞ্জি গায়ে ধুতিটা দুদিকে হাঁটু পর্যন্ত তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালিকে দিয়ে বাগানের কাজ করাচ্ছেন অনুমানে বুঝল ইনিই মহকুমা হাকি হবেন। দুই বাড়ির হা[illegible] মধ্যে ছোট গাছের বেড়া মাত্র—কো[illegible] সমান উঁচু—পরস্পরকে দেখতে কোন অসুবিধে নেই।

বিনু কাছে এগিয়ে এসে সবিনয়েই প্রশ্ন করল, আচ্ছা দয়া করে বলতে পারেন এ বাংলোর চৌকীদার কোথায় থাকে ? ওদের তো এখানেই থাকবার কথা—কোথাও তো চিহ্ন দেখছি না।

মুখ তুলে তাকিয়ে ওকে দেখা মাত্র ভদ্রলোকের মুখের যে অবস্থা দাঁড়াল, তা অবর্ণনীয়। সামনে ভূত দেখলে মানুষের মুখের যেমন চেহারা হয়—এ-উপমাটা বহু বইতে পেয়েছে সে। নিজে কখনও ভূত দেখেনি, দেখলেই বা নিজের মুখের চেহারা কেমন করে বুঝবে—অপরেও কেউ ওর সামনে ভূত দেখেনি যে তার মুখের অবস্থা লক্ষ্য করবে। তবে যে যেমনই প্রকৃত-অপ্রাকৃত ভয়ংকর দৃশ্য দেখুক—এর চেয়ে আতঙ্কের ছায়া মুখে ফুটে ওঠা সম্ভব বলে মনে হয় না। ইংরেজীতে যাকে 'য়্যাবজেকট টেরর' বলে—এ বোধহয় সেই রকমই ভয় খাবার চেহারা। সমস্ত মুখখানা

জাইরের মতো বিকট হয়ে গেল দেখতে দেখতে, অসহায় দৃষ্টিতে একটা প্রকট সর্বনাশের আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

তিনি বিনা উত্তরে দ্রুত গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে সশব্দে কপাটটা বন্ধ করে দিলেন।

বিনু তো অবাক। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝতেই পারল না, কী এমন অস্বাভাবিক আচরণ করল সে, ভদ্রলোক কেন এত ভয় পেলেন—যে সহজ সৌজন্যে 'জানি না' এটুকু বলার কথাও মনে পড়ল না।

তারপর আস্তে আস্তে বিহ্বলতা বা চিন্তার জড়তা কেটে গিয়ে মনে পড়ল কথাটা।

সে শিক্ষিত (অন্তত চেহারা দেখে তাই মনে হয়েছে ও'র) হিন্দু তরুণ—অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতীক, ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার নির্মমতম শত্রু। ওদের মনে হত হিন্দু লেখাপড়া-জানা কিশোর বিশেষ কৈশোরোত্তীর্ণ ছেলে মাত্রেই তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এস ডি ও, কমিশনার প্রভৃতির প্রতি বোমা, বন্দুক পিস্তল উদ্যত করে তাঁদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। 'টেররিস্ট'রা সকলেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসে—এই ওদের ধ্রুব বিশ্বাস। এ বিষয়ে ওরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একমত, মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা ছাড়া আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে কেউ পারে না।

ব্যাপারটা বোঝার পর বিনুর মনে হল খুব খানিকটা হা-হা করে হাসে, অতিকষ্টে সে ইচ্ছে দমন করল। সে হাসিকে ওর অপরাধেরই একটা চিহ্ন বলে ধরে নিয়ে সাহেব পুলিশ ডাকবেন হয়ত!

তখন এত কথা ঠিক জানত না, ঘুরতে ঘুরতে ঠেকে শিখে এটা আরও ভাল করে বুঝেছে।

এর বছর দুই পরে এই কাজেই একবার মেদিনীপুর জেলায় ঘুরতে হয়েছিল। যে মুহূর্তে সে খড়্গপুরে নেমেছে সেই মুহূর্ত থেকে যতদিন সে ঐ জেলায় ছিল, ফেরার সময় আবার সুবর্ণরেখা পার হওয়া পর্যন্ত একটি লোক সব সময় সর্বত্র ছায়ার মতো সঙ্গে লেগেছিল। প্রায় প্রকাশ্যভাবেই। গোপন করার একটা চেষ্টা যে ছিল না তা নয়—কিন্তু সেটা নিতান্তই লোক দেখানো, অর্থাৎ সরকার দেখানো। বিনুর বরং মনে হয়েছিল লোকটা গোয়েন্দাগিরি করছে নিতান্তই পেটের দায়ে, মনে-প্রাণে সে এই টেররিস্টদেরই দলে। এ ছোকরা যদি সত্যিই তাই হয়, পিছনে পুলিশের নজর আছে জেনে সতর্ক হোক—এই রকম যেন তার মনোভাব।

মালপত্র বাংলোর বারান্দায় ফেলে রেখেই ভাঙা ফটক দিয়ে বেরিয়ে এল বিনু। তখন বেশ রোদ উঠে গেছে, লোকজন মাঠে আসা সম্ভব। কাউকে দেখতে পেলে অন্তত চৌকিদারের কথাটা জিগ্যেস করা যায়।

পেলও দেখতে। বছর ছয়-সাতের উলঙ্গ ছেলে একটা। গোটা-দুই তিন ছাগল নিয়ে এইদিকেই আসছে, বোধহয় বাংলোর তৃণবিরল মাঠেই ওদের কোন খাদ্য কোথাও এখনও আছে কিনা সেই খোঁজে। বিনুকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

'এই খোকা, এখানের চৌকিদার কোথায় গেছে জানো?'

ছেলেটি গম্ভীরভাবে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার নিবাস? কোথা থেকে আসছ?'

এ প্রশ্ন থেকে এখানে অব্যাহতি নেই। এ সর্বত্র, অপরিচিত লোক দেখলে সর্বপ্রথম এ প্রশ্ন সার্বজনীন। কেবল ভাষায় তারতম্য। কোন বয়স্ক লোক হলে এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করত, 'মশায়ের নিবাস? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?' ক'দিন সমস্ত খোঁজখবরের উত্তরে এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। সে বেশ চড়া গলায় বলল, 'সে খবরে তোর দরকার কি! অসভ্য ছেলে কোথাকার। একরত্তি ছেলে পাকা পাকা কথা! যা বলছি তার জবাব দে, নইলে চড়িয়ে সামনের গাল পিছনে ফিরিয়ে দোব।' তারপর একটু হেসে বলল, চৌকীদার কে, চিনিস?'

ছেলেটা এবার ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, 'হুঁ, সি আমার মামা হয়।'

'যা, এক্ষুণি গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়। বল গে সরকারী লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে, আর একটু দেখে পুলিশে খবর দিয়ে রিপোর্ট করে দেবে, চাকরি থাকবে না। যা, ছাগল এখানে থাক, তুই দৌড়া।'

আর কিছু না জানুক, চৌকীদারের ভাগ্নে—সরকারী লোক পুলিশ চাকরি একথাগুলো সম্বন্ধে ঝাপসা একটা ধারণা আছে। সুতরাং আর বলার দরকার হল না, ছেলেটা পাঁই পাঁই করে দৌড়ল আলের ওপর দিয়ে। একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে চৌকীদারও এসে পৌঁছল। সঙ্গে তার বছর আষ্টেক-নয়েকের ছেলে, সেও উদম ন্যাংটো।

এবার ঘরদোরে ঝাঁট পড়ল, বাথরুমের নৌকো টবে জলও ভরা হল। চা এনে দিতে হবে কিনা প্রশ্ন করল। সেটা নাকি তার বাড়ি থেকে করিয়ে আনতে হবে। রান্নাবান্না করে দেওয়ার দরকার হবে না শুনে একটু দমে গেল, তবে বেশী কিছু আর বলল না।

খাওয়া তো পরের কথা, এই ক'দিনের মধ্যে অনেক ক'দিনই পাউরুটি আর টিনের দুধ খেয়ে কাটিয়েছে, সিঙাড়া নিমকি খেয়ে দুপুরের খাওয়ার কাজও সেরেছে—তা নিয়ে ওর তত মাথা ব্যাথা নেই। ঘুরে ঘুরে বাড়ির পুরো হাল দেখে ওর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যাবার যোগাড়।

একটা জানলার ছিটকিনিও—অবাব-হারেই কাঠের গোবরাটের নির্দিষ্ট স্থানে ঢোকে না, তার মানে বন্ধ হয় না। দরজাও তাই। ভেতর থেকে বন্ধ করে বা বাইরে যাবার সময় দরজায় চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে সে উপায় নেই।

মনে মনে হিসেব করে দেখল খাটটা ঠেলে একপাশে করে দিলে একটা জানলা আটকানো যায়, বাথরুমের দোর ঐ জোরি জলসুদ্ধ টবটা দিয়ে ঠেকনো দেওয়া যেতে পারে, রাত্রে শোবার সময় টেবিল চেয়ারগুলো সরিয়ে একটার পিছনে একটা দিয়ে বাকী জানলা দরজা কতদূর আটকানো যাবে তা কে জানে। এইভাবে রেখে কপাটে তালা দিয়েই বা কতটুকু শান্তি থাকবে?

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ কি হাল করে রেখেছ দোর জানলার। চুনকামও তো হয়নি দেখছি অন্তত দশ বছর। বছর বছর মেরামতের নাম করে টাকা নিয়ে মেশা তাও করো বুঝি শুধু? আমি যদি ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করি!'

বিনু যে নির্ঘাৎ সরকারী লোক সে বিষয়ে চৌকীদারের আর কোন সন্দেহ রইল না। সে খপ করে ওর পায়ে একটা হাত দিয়ে বললে, 'মাইরি বাবু, এই আপনার দিব্যি বলছি, শ্যামসুন্দরের দিব্যি, আমার হাতে এক পয়সাও দেয় না, উলটে পিডব্লুর বাবুরা এসে আমাকে দে টিপ সই করিয়ে নেয়—এই এই মেরামত হ'ল বলে। আমরা আর কত খেতুম হুজুর, গরিব লোক, সম্বম্ব পেটে পুরতে ধুক কুলোত না। এ বড় বড় বাবু সব, তেনারা সব পারে। অবিশ্যি তাও বলি, রাগ করো নি ঘাট করো নি—এ আসছে হুজুর এক্ষেত্রে। এলে গেলে তো দুটো পয়সা পাই তবু, রান্নাবান্নার হুকুম হলে পেটের ভাতটা চলে যায় নিজের—তা সে লোক কৈ? কদাচ কখনো দৈবেসৈবে ভবিষ্যতে এক-আধজন আসে। যা মাইনে পাই তাতে চলে? আপনিই বলো—এতগুলো ছানা-পোনা নিয়ে? তাতেই তো পরের জমিতে একটুন আধটুন খেটে দিতে হয়—ইদিকে আর তত নজর দিতে পারি নে।

বিনু তার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি যে কদিন এখানে থাকব—রাত্রে তোমাকে থাকতে হবে, সকালবেলা জল তুলে দে পালাবে, তা হবে না। আর মেথর যেন দুবেলা আসে ঠিক, হুঁশ রেখো।'

'যে আজ্ঞে, থাকব বৈকি, আপনি যখন বলছ। তবে মেথর, সি লাট সায়ের, কবে আসে না আসে—তার জন্যে ভেবো নি আমি তো রইব, হুজুরের কোন অসুবিধে হতে দোব না। সি না আসে আমিই সাফ করে দোব।'

এসব পয়সা খুচরো যা আদায় হয় তা সরকারে জমা পড়ার কথা। জমাদার চৌকীদার সবই মাইনে করা। সেক্ষেত্রে জমাদার সম্বন্ধে এত উদারতার একটিই মাত্র অর্থ দাঁড়ায়—এ লোকটিই অন্য নামে সে মাইনে নেয়।

চৌকীদার রাত্রে এসেছিল ঠিকই।

শহর থেকে খাওয়ার পাট সেরে সন্ধ্যার সময়ই ফিরে এসেছিল বিনু, সঙ্গে পড়বার মতো বই না থাকায় কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসেছিল টেবিল ল্যাম্প জেলে। আলোয় তেল ভরা ছিল, চিমনি অন্ধকার নিজেই ছিঁড়ে কাগজে সেটা মুছে পলতে পরিষ্কার করে আলোটা অনেকখানি উজ্জ্বল করে নিয়েছিল।

লিখতে লিখতে নিবিষ্ট হয়ে গেছে—লেখায় মন বসলে এমনিই হয়ে যায় সে। কতক্ষণ কাটল জ্ঞান থাকে না, কটা বাজল কেউ জানিয়ে না দিলে হুঁশ হয় না—তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছে, হঠাৎ একই সঙ্গে গালে একটা গরম হাওয়া আর নাকে উগ্র ধেনোমদের গন্ধ আসতে চমকে চেয়ে দেখল কখন নিঃশব্দে চৌকিদার এসে একেবারে চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছে, কাগজ কলম নিয়ে এত কি লিখছে বাবুটা, রিপোর্ট লিখছে নাকি সেই কৌতূহলে হেঁট হয়ে দেখছে, তাতেই ওর মুখটা বিনুর মুখের কাছে এসে গেছে।

ভয় যে পেয়েছিল সেকথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। দরজা খোলা ছিল, ও যখন এসেছে তখনও ছটা বাজেনি, তখন থেকে ঘরে কেরোসিনের আলো জেলে দরজা জানলা বন্ধ করা উচিত হবে না এই ভেবেই বন্ধ করেনি। এর মধ্যে একেবারে সাড়ে আটটা বেজে যাবে তা কে জানত!

চৌকিদারের সঙ্গে ওর সে ছেলেটাও এসেছে, সেই নাকি ওর বড় ছেলে। তেমনি উদোম ন্যাংটো। দুজনেরই চক্ষু রক্তবর্ণ, দুজনেই টলছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটের দুপাশে গ্যাঁজলা—

বিনু জ্বলে উঠল। ভয় পাওয়ার লজ্জাটাই রাগ আরও বাড়িয়ে দিল বোধহয়। বলল! ঐটুকু ছেলেকে মদ খাওয়াও! তুমি কি মানুষ! তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল চৌকিদার, আজ্ঞে। আপনি ঠিকই বলছ। আমি মানুষ নই বাবু, জানোয়ার। তবে কি করব হুজুর, শালার ছেলে শোনেনি যে কিছুতে। না দিলে বলে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিব।...আবার তাও ভাবি, এই জাড়ের দিন চলছে—গায়ে তো কটা ট্যানাও দিতে পারি না, দু ঢোক পেটে পড়লে আর ওসব কিছু লাগে না।...আচ্ছা হুজুর নমস্কার। এই মাঝের ঘরটাতেই আমরা পড়ে রইলুম আজ্ঞে যখন ডাকবেন ছুটে আসবে আপনার ছি চরণের দাস।'

বলে অকারণেই বারদুই আরও নমস্কার করে টলতে টলতে গিয়ে হলঘরের মেঝের ওপরই বোধহয় ঠিক দুই খুঁটোর ওপরই—অনাবশ্যক বোধে সকালে এটার ঝাঁট পড়েনি—শুয়ে পড়ল এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই দুজনের নাক ডাকতে শুরু হল।

॥৪৬॥

কাগজ বার হল। সাপ্তাহিক—কাগজ—রয়াল চারপেজী—তখনকার দিনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'নাচঘর' আকারের। সেইটেই মনের মধ্যে আদর্শ ছিল, সেই-ভাবেই সাজানো হয়েছিল।

মোটামুটি তখনকার দিনের—অবশ্যই একেবারে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ঔপন্যাসিকরা ছাড়া—সব বড় লেখকই, অল্পবয়সের ছেলে-দুটির ওপর করুণার্দ্র হয়ে দু-একটি লেখা দিয়েছিলেন—নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায় (গদ্যপদ্য দুইই), কুমুদ মল্লিক, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শৈলজানন্দ থেকে শুরু করে অনেকেই। অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাতরা তো দেবেনই। দেবেনই মানে—লেখা ছাপা হলেই কিছু পারিশ্রমিক আশা করবেন—সে কথা তখন কেউ ভাবতেই পারতেন না।

না, লেখা সাজানো, ছবি, পাঠ্যবস্তুর বৈচিত্র্য—কোনদিক দিয়েই কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু দুটি মাত্র মানুষ যদি লেখা-সংগ্রহ, কাগজকেনায় ও ছাপাখানার টাকার ব্যবস্থা এবং প্রুফ দেখার কাজেই সর্বশক্তি এবং দিনরাতের চব্বিশ ঘন্টা সময় ব্যয় করে—বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে কে?

ফল যা হবার এসবের—তাই ফলল। ঠিক তিনটি মাস পরেই, দুজনের মিলিত পুঁজি নিঃশেষিত হলে কাগজটি সগৌরবে প্রকাশ বন্ধ করল। 'সাধনোচিত ধামে গমন করল' বললেই ঠিক বলা হয়।

তা হোক, এতে পরিচয়টা একটু এগিয়ে গেল নানা মহলে। ললিতকেও ওর এই এক বিশেষ জগতের লোক—খুবে সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যেই অবশ্য—চিনলও।

বিনুরও আগের চেয়ে একটু প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ওর লেখা যে শুধু নন্দনবাজার পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হয় তাই নয়, দৈনিক যুগবিপ্লব, সাপ্তাহিক স্বদেশ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতীতেও বেরোতে শুরু করেছে কিছু কিছু। টাকাও আসে দুটো চারটে করে। নন্দন-বাজার প্রথম দিয়েছিল সাত টাকা—তাতেই বিস্ময়ের সীমা ছিল না বিনুর। একটা গল্পর জন্যে এত টাকা পাওয়া যায়! এখন তো বিশেষ সংখ্যায় বারো টাকা পর্যন্ত পাচ্ছে। ভারতবর্ষ ছ' টাকা দেয়। ছেলেদের বইও আরও ক'জন প্রকাশক ছেপেছেন, বিক্রীও হচ্ছে।

কিন্তু এদিকেও সে টিউশ্যনী ছেড়ে দিয়েছে, ঘোরাঘুরি খেটে খেতে নিয়মিত এক জায়গায় একই সময় হাজিরা দেওয়া আর সম্ভব হয় না। লেখার টাকা এত আসে না যে নিজের জামাকাপড় হাতখরচা বাঁচিয়ে সংসারে কিছু দেওয়া যায়।

অবশ্য একেবারে সংসারের জন্যে খরচ করছে না কিছু তা নয়। মা রাত্রের ... ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল সেই কমলনয়ন ...তার পর থেকেই, শুধু একপোয়া খেতেন, এখন বিনু দুটো করে মিষ্টি এনে দেয় আজকাল। এটা ওটা—কপি কমলা-লেবু আমের সময় আম এসবও আনে। তবে তাতে সংসার খরচের এমন কোন সুরাহা হয় না।

অথচ সেটাও দরকার। দাদা কিছু না বললেও সে বোঝে। দাদাও প্রকারান্তরে নোটিশ দিচ্ছেন—তার বিয়ে করার কথা নয়, প্রয়োজন হয়েছে। এই ভূতের বেগার খেটে যাচ্ছেন, সকাল সাড়ে নটায় বেরিয়ে যান, চাকরি টিউশ্যনী সেরে ফিরতে রাত নটা বাজে। এখন একটু সেবা একটু কোমল সাহচর্য দরকার বৈকি।

বিনু বোঝে কিন্তু এতদিনের অক্লান্ত বিরামহীন পরিশ্রমের পর—একেবারেই ভূতের বেগার ভাবত সবাই—সবে দূরে সাফল্যের স্বর্ণরেখা দেখা দিয়েছে, প্রভাতের ঊষালোকের মতো লম্বা মসীকৃষ্ণ অন্ধকার টানেলের মধ্যে আলোর বিন্দু দেখা যায়—সেই রকম, ক্রমে তা উজ্জ্বলতর ও বিস্তৃততর হবে মানুষে আশা করে, সাগ্রহে অপেক্ষা করে আর কিছু পথ অতিক্রমের পর আলোয় আসবে সে—এখন কোথাও চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার চাকরিতে ঢুকতে ইচ্ছা হয় না। আর তার জন্যেও তো কিছু ঘোরাঘুরি ধরাধরি করতে হবে।

ব্যবসা তারা নানা রকম করছে, বিনা পুঁজিতে যতটা হয়। দুজন মানে সে আর ললিত। বাড়ির দালালী জমির দালালী। এমন কি বার দুই হ্যান্ড নোটের দালালীও করেছে। তাতে টাকা আসে, তেমনি রোজ কিছু এসব সুযোগ ঘটে না, অথচ ঘোরা-ঘুরি হাঁটাহাঁটি করতে হয় প্রত্যহই। তাতে কিছু কিছু ট্রামভাড়া বাসভাড়াও লাগে।

দুজন কেন, তুমিই বেশী খাটছ, আর একজনকে মিছিমিছি লাভের ভাগ দেবার দরকার কি?

এ প্রশ্ন প্রায়ই করেন শুভানুধ্যায়ীরা। উত্তর দেয় না বিনু। সব কথা সকলকে বোঝানো যায় না। এছাড়া ললিতকে কাছে পাবার গতানুগতিক জীবন থেকে তুলে আনার কি উপায় ছিল। এখনও তার মামা সেই টোপ নিয়ে বসে আছেন। প্রথম থেকেই ত্রিশ টাকা করিয়ে দেবেন সে ভরসাও দিয়েছেন। কিন্তু ললিত ঐ বদ্ধ অন্ধকূপে ঢুকলে তার জীবনটা তো নষ্ট হবে বটেই, দুজনের জীবন দু খাতে বইবে, মধ্যের ব্যবধান দিন দিন বেড়েই যাবে, কোনদিনই আর মিলবে না।

অবশ্য শুধু কি ঐ একটুই কারণ? একা এই ধরনের অবিরাম পরিশ্রম করে গেলে শুধু যে ক্লান্তি আসে তাই নয়, হতাশাও জাগে প্রচণ্ড। কাজটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তখন সামান্য পাওনা—এখন যা আশা জাগায় মনে তখন সেটাই যেন পরিহাস করতে থাকে।

কাগজ যে কদিনই চলুক—কিছু সুবিধা হয়েছিল। যেটা আশা করেছিল বিনু সেটা হয়েছেই। লেখা সম্বন্ধে যে একটা মস্ত বড় সংকোচ ছিল ললিতের মনে—সঙ্কোচ বললেও ঠিক বোঝানো যায় না—ওর ধারণা ছিল যে ও কোন কালে লেখক হতে পারবে না—কিন্তু প্রেস বসে আছে এখনই কিছু কপি দেবার নাম করে জোর করে লেখার দায় ওর ওপর চাপিয়ে লেখা বার করে নিয়েছে। ফলে সে ভয়টা গেছে। এখন নিজেই লেখে নিজের মনের তাগিদে নেশাটা পেয়ে বসেছে। কিছু কিছু লেখা ছাপা হচ্ছেও, দু-একখানা ছেলেদের বইও চুক্তি হয়েছে প্রকাশকদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে ছবির কাজও পাচ্ছে দু-চারটে। তবে পুরোদস্তুর শিক্ষা না থাকায় খুব উন্নতি করতে পারছে না। পারবেও না সেটা বিনু বুঝছে।

সেই জন্যেই সে আরও লেখার দিকে চাপ দিচ্ছে।

কিন্তু তারপর? এতেই কি জীবিকা হবে? ভবিষ্যতের সংস্থান?

দুজনে অন্য কোন ব্যবসা কিছু করবে ভাবছে।

এর মধ্যে একটা বাজার সে আবিষ্কার করেছে। স্কুলের পাঠ্য বইয়ের ক্যানভাস করতে করতেই এটা মাথায় গেছে বিনুর। এই তো ব্যবসার একটা ভাল জায়গা।

সব স্থানেই একটা করে লাইব্রেরী আছে, বছরে একবার প্রাইজও দেওয়া হয়। কিছু কিছু বই তো কিনতেই হয় এদের। পাঠ্য বইয়ের এই ব্যস্ত সময়টা—বার্ষিক পরীক্ষার সময়ও এটা—বাদ দিয়ে লাইব্রেরীতে রাখার মতো প্রাইজ দেবার মতো বই নিয়ে ঘুরলে কি হয়?

অবশ্য মফস্বলের বে-সরকারী স্কুলের পুঁজি সামান্যই ছিল সে সময়, অনেকেরই বছরে ষাট টাকা ছিল মাত্র লাইব্রেরী ফাণ্ড অ্যালোকেশন মাসে পাঁচ টাকা পড়ে হিসেব করলে। তার মধ্যে থেকে পুরনো ছেঁড়া বা নড়বড়ে বই বাঁধাবার খরচাও দিতে হয়। প্রাইজও স্কুল স্পেশিমেন কপি—যা ক্যানভাসাররা দিয়ে যান,—চকচকে দেখে প্রাইজে চালিয়ে দেন।

সরকারী গ্র্যান্ট পাওয়া স্কুলের অবস্থা আর একটু ভাল, রেলের স্কুল—রেল কর্মচারীদের ছেলেদের জন্যে যা করা হয়েছে বা বড় বড় কারখানার আনুকূল্যে যা স্থাপিত—এদের অবস্থা আরও ভাল, তবে সে আর কতই বা। বেসরকারী স্কুলই বেশী।

অবশ্য ওঁদের টাকাও যেমন কম বইয়ের দামই বা কত। আট আনা ছ আনা—সব চেয়ে মোটা ভালো বই দেড় টাকা। স্কুল লাইব্রেরীতে কিছু প্রবন্ধের বই, কাব্য, বড় জীবনী—এসবও চলে। তারও দাম—খুব বেশী হলে আড়াই-তিন।

এ ব্যবসাতেও পুঁজি লাগার কথা সেটা ওদের নেই। ভরসা তার প্রতি প্রকাশকদের আস্থা। এর মধ্যে কিছু কিছু মাঝারি প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বিনু ব্যবহারে আর কথাবার্তায় তাদের কিছুটা বিশ্বাসভাজনও হতে পেরেছে। এঁদের মধ্যে যাঁদের এই ধরনের মানে স্কুল লাইব্রেরী বা প্রাইজে চলবার মতো বই বেশী। তাদের দু-একজনের কাছে কথাটা পাড়ল।

ওরা দুজন ওদের বই নিয়ে মফস্বলে বিক্রী করতে যাবে, যেমন যেমন বিক্রী হবে, দাম পাঠাবে। খরচ ওদের কমিশনও বেশী পায় না—যা ও'রা দেন, শতকরা পঁচিশ টাকা তাতেই ওরা খরচ চালিয়ে নেবে। বিশ্বাস করে দেবেন কিছু কিছু বই?

কেউ কেউ ভেবে দেখবার জন্যে সময় চাইলেন। একজন তো স্পষ্টই বললেন, অনেক ছোকরা এভাবে এসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে নিয়ে গেছে— কেউ ই এক পয়সা ঠেকায় নি। দেখাও করেনি আর। তারপর একটু রসিকতা করেও বলেছেন, গুড বাই লর্ড মাই মানি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস।

তবু তিনি শেষ পর্যন্ত একটু নরম হয়ে বললেন, একশো সওয়াশো টাকার মতো বই আমি দিতে পারি—এর বেশী ঝুঁকি নেবো না।

কেবল মনোরঞ্জনবাবু বলে এক ভদ্রলোক তার বইও অনেক, ভাল বই-ই বেশী—এক কথায় বললেন, যা খুশি [illegible] খুশি নিয়ে যাও, ফিরে এসে দাম দিও। কোন তাড়া নেই।

প্রথমবারেই চারশো টাকার বই বিক্রী করেছিল ওরা। স্কুল কমিশন ও নিজেদের খরচা ছাড়াও চল্লিশ টাকা লাভ হয়েছিল দশ বারো দিনে। তবে খরচা খুব বেশী লাগেনি ওদের। এই সব স্কুলের সঙ্গেই একটা করে বোর্ডিং থাকে, হেড মাস্টারমশাইদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে আসতে আসতে ছেলেমানুষ আর কচকচি [illegible] বলে তাঁদের অধিকাংশই বিনুকে স্নেহের চোখে দেখেন, তাঁরাই খাওয়া পাওয়াজনা হলে থাকারও ব্যবস্থা [illegible] দিয়েছেন। এক জায়গায় হেডমাস্টারমশাই নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়ে অন্য ঘরে শুয়েছেন এমনও হয়েছে।

এই সব স্বল্পবিত্ত বিশাল হৃদয় হেডমাস্টারমশাইদের কাছ থেকে সে বলাতে গেলে আজীবন সস্নেহ ব্যবহার ও আনুকূল্য লাভ করেছে—সে স্নেহ ভোলার নয়। জীবনের সেটাই বরং বড় পাথেয়। অদ্ভুত এই মানুষগুলি নিজেদের কথা ভাবতেনই না। দু-একজন ছাড়া, তা সে ব্যতিক্রম তো থাকবেই, গরিব ছাত্রদের জন্যে উদ্বেগের অবধি ছিল না। দিন পালটেছে ওর [illegible] সামান্যেই। বাঘ নররক্তের স্বাদ পেয়েছে, জীবনের জটিলতাও বেড়েছে, তাঁদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না—তবু প্রাচীনকালে সে সব মাষ্টারমশাইয়ের কিন্তু বদলাতে দেখেনি। সে প্রধান শিক্ষককে তাঁর ছাত্ররা বাড়ি করে দিল অবসর নেবার সময়ে—

(চলবে)

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুজন দু রকমের মানুষ। দু রকম মানুষ ঘরে ঢুকে দুটো চেয়ারে বসতে বসতে বলল, রাম রামজী।

এই ধরনের অভিবাদনে সে আজকাল অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মধ্যবয়সী মানুষের একজনের হাতে ছটা আংটি। মুখে খৈনি। ধুতি পাঞ্জাবী পরনে। পায়ে বুট জুতা। অন্য জনের মুখে কেমন শয়তানের ছাপ। কথা বলতে বলতে একটা কনটেনার পকেট থেকে বের করে বলল, এ-রকম মাল চাই।

অতীশ দেখল একটা চালু ওষুধের কৌটা।

সে বলল, হবে।

—ঠিক এরকম হবে না বাবুজী।

—কি রকম হবে?

—একটা হসসু বাদ। লাল মার্জিন থাকবে না।

অতীশ বুঝল সেই নকল মালের পার্টি। মেজাজটা কেমন বিগড়ে গেল। বলল, হবে না।

—বাবুজী ভাল দাম দেব।

—হবে না। এখানে দু নম্বরী মাল হয় না।

এ-কথা শুনে লোকটা মুচকি হাসল। বলল, বিশোয়াস কা বারে মে কৈ হুজ্জুতি নেই হোগা।

অতীশের মনে হল লোক দুটো শয়তানের প্রতিভু। সব খবরা-খবর নিয়ে এসেছে। এদের পাশাপাশি আরও একজন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে শীতল চোখে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে, ছোটবাবু আমি এদের চেয়ে খারাপ ছিলাম না। জাহাজে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলে, মুখে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করেছ। সবার অলক্ষ্যে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে। এখন কি করবে?

অতীশ মুখ নিচু করে বসে থাকল।

তখনই ঢুকল কুম্ভবাবু। লোক দুটোকে দেখেই অবাক হয়ে গেছে যেন। আরে আপনারা। কি ব্যাপার।

—মাল চাই। লিকিন বাবুজী বলছেন হোবে না।

—কি মাল যেন কুম্ভবাবু কিছুই জানে না।

ওরা টেবিল থেকে মালটা তুলে নিয়ে দেখাল।

কুম্ভবাবু অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের ডাইস আছে। হবে না কেন?

অতীশের কেন গ্লানি এ-সময় চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। বলতে ইচ্ছা হল, দু নম্বরী কারবার সব বন্ধ করে দেব ভাবছি। নতুন কোন আর অর্ডার নেব না। কিন্তু বলতে পারল না। শুধু বলল, ওরা দু নম্বরী মাল চায়।

কুম্ভ বলল, তালেত মুসকিল। আমরা করি না সে স্পষ্ট করে বলতে পারল না। তাকে আরও চতুর হতে হবে। সে সোজাসুজি ওদের সামনে বলতে পারল না, হবে। সেই যে পাঠিয়েছে, কপিলদের তাকে ধরেই যে এই দুজন লোককে পাঠিয়েছে তাও বুঝতে দিল না। শুধু বলল, আসুন। আমার সঙ্গে আসুন।

ওরা বের হয়ে গেলে অতীশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এত গরম লাগছে কেন। এই শহরে গরম কি খুব একটা বেশি। ফুল স্পিডে পাখা চালিয়েও সে রেহাই পায় না। এবং তখনই আবার কুম্ভবাবু হাজির। বলল, ভাল রেট দেবে। দেড় গুণ রেট। মোটা অ্যাডভান্স দেবে। কাল মাইনে। টাকা নেই। বুঝতেই পারছেন, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ঠিক হবে না।

অতীশ বলল, মন্টু সাহা কিছু টাকা দিয়ে গেছে। কপিলদেবের লোক আসার কথা। আর ব্যাংকে যা আছে হয়ে যাবে।

—এরাই কপিলদেবের লোক।

সে আর কোন কথা বলল না। কিছু জেনুইন কাস্টমার আছে। সে তাদের এক-জনকে ফোন করে ধরার চেষ্টা করল। বৈদ্যনাথ সাধনার কিছু মাল কোম্পানী সাপ্লাই করে থাকে। যোগেশবাবুকে ধরতে পারলে কাজ হয়। এবং ফোনে পেয়েও গেল। সে তার অসুবিধার কথা বললে, তিনি তার রেট আরও কমাবার চান্স দিলেন। অতীশ হতাশ গলায় বলল, তাই হবে।

কুম্ভবাবু আজ কিছুতেই অতীশকে দিয়ে অর্ডার বুক করাতে পারল না। লোকসানের কোম্পানীকে আরও লোকসানে ফেলে দিচ্ছে। কুম্ভ ভীষণ অপমানিত বোধ করল। পার্টিদের কাছে তার প্রভাব অতীশের চেয়ে বেশি। সততায় ঢ্যামনামি কুম্ভ একদম পছন্দ করে না। সে বিকেলেই এই নিয়ে বেশ বড় রকমের একটা গোলযোগ বাধিয়ে তোলার জন্য অফিস ফেরত সোজা সনৎবাবুর কাছে চলে এল।

সনৎবাবু দোতালার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে আরাম করছিলেন। পাশে বড় ছেলের নাতিন। সামনে গ্যারেজ, পাশে লম্বা দুটো তালগাছ। একটা পাখি ডানা মেলে এসে বসল। নাতিন দুধ খাচ্ছে না। ছোটাছুটি করছে, দাপাদাপি করছে। তিনি পাজামা পাঞ্জাবি পরে সন্ধ্যের সময় সমুদ্রে হাওয়া খাওয়ার মতো একটা টেবিলে পা তুলে বসে আছেন। খুব বড় ঝড় গেল কদিন। বস্তিগুলি হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। প্রাইভেট লিমিটেড করে দিয়ে আপাতত ঠেকা কাজ দেওয়া গেছে, বছর কার আয় লাখ টাকার ওপর রক্ষা পেয়ে যাওয়ায় কুমার বাহাদুর এ মাস থেকে আরও দুটো ইনক্রিমেন্ট দিয়েছেন। এখন রিটায়ার করার বয়স. এই বয়সে যত জিনি কাজের মানুষ প্রতিপন্ন করবেন, তত বাড়তি সুযোগ। সরকারী কাজে যে যাননি, যোগ্যতা থাকতেও এই রাজবাড়িতে এসে যে প্রথমেই অফিসার পদে চাকরি পেয়ে গেছিলেন, সেটা আজ মনে হচ্ছে বড়ই সৌভাগ্য। পাশে কিছু আঙুর আপেল এবং বেদানার কোয়া। এক গ্লাস দুধ। কুট কুট করে খাচ্ছেন। রোগা কালো ছিমছাম চেহারা। মাথা ভর্তি সাদা চুল। খুব প্রাজ্ঞ মানুষের মতো মুখের অবয়ব। টেবিলের এক পাশে একটা ইংরেজী পত্রিকা। ওপরে ওয়ালেস স্টিভেনসের কবিতা সংগ্রহ। এটা পড়বেন বলে এনেছেন। নানা-রকম আইনের মার-প্যাঁচ মাথায় ঘোরার জন্য তিনি একদিন বইটি উল্টেও দেখেন নি। কুমার বাহাদুরের প্রিয় কবি। কুমার বাহাদুরই পড়তে দিয়েছেন। এবং এটা পড়ে নতুন কিছু আরও আবিষ্কার করতে পারলে বিদ্যের দৌড়ে এই বয়সেও কম যান না তিনি আন্দাজ করতে পারবেন। সুতরাং আর দশটা রাজকীয় কাজের সঙ্গে সম্প্রতি কবিতা পাঠও যোগ হয়েছে।

সিঁড়ি ধরে কেউ উঠ[illegible] পুত্রবধূ ফিরতে পারে। কলেজ [illegible] বাপের বাড়ি হয়ে আসার কথা। শংকু ফিরতে পারে অফিস ছুটির পর। কিছু টুকিটাকি বাজার সেরে ফেরার কথা। কিন্তু এই পায়ের আওয়াজ তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। খুব সতর্ক পা ফেলে কেউ উঠে আসছে। তারপরই বুঝতে পারলেন, কুম্ভ। এ বাড়িতে সিঁড়ি ভাঙার সময় কুম্ভই একমাত্র টেনে টেনে পা তুলে হেঁটে আসে। এ-বাড়িতে কে কি খায়, কার দু পয়সা ফাউ রোজগার আছে তলে তলে সবারই জানার আগ্রহ। এবং তিনি একজন সৎ এবং অভিজ্ঞ মানুষ হিসাবে সম্মাণীয় ব্যক্তি—প্রায় কুমার বাহাদুরের পরই। তবু এত সব ভাল খাবার দেখলে কুম্ভর চোখ টাটাতে পারে। বাপকে বলতে পারে—স্যারেরও বেশ দু পয়সা আলগা তালে হচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ খাবারের প্লেট ধরে পাঠিয়ে কবিতার বই খুলে গম্ভীর মুখে বসে থাকলেন। কারণ এই মুখোসটাকে রাজবাড়ির সবাই বড় ভয় পায়। এটি তার প্রিয় মুখোস।

ভিতরে ঢুকলে, সনৎবাবু বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, বস। কুম্ভ বলল,

কিছু বলল না। স্যার বইয়ে নিমগ্ন। বড়ই অসময়ে এসে গেছে। কিন্তু এখন উঠে চলে যেতেও পারে না। এই লোকটার হাতে অনেক ক্ষমতা। এর পরামর্শ ছাড়া সিট মেটাল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন না। তাছাড়া সে যে চোর-ছ্যাচোর জাতের লোক স্যার তা আন্দাজ করে ফেলেছে। দু-একবার হাতেনাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। এজন্য কুম্ভ খুব সরল বিনয়ী এবং বাধ্য ছোকরার মতো এখন চেয়ে আছে কখন মুখ তুলে একটু কথা বলবেন।

সনৎবাবু এবার বইয়ের পাতায় একটা বাসের টিকিট গুঁজে দিলেন। তারপর বই বন্ধ করে বললেন, কিছু বলবে?

—স্যার কোম্পানী লাটে উঠলে আমার দোষ দিবেন না। কাস্টমারেরা সব ক্ষেপে যাচ্ছে। অতীশবাবু অর্ডার নিচ্ছেন না। ভাল ভাল অর্ডার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এই বলে চুপ করে থাকল। সনৎবাব বললেম, খুলে বল সব। এতে কি আমি বুঝব। কুম্ভর ভেতরে যে অপমানের দাপাদাপিটা চলছিল, সেটা কিছুটা প্রশমিত হচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল—তার কথা-বার্তা এখন অনেক স্পষ্ট। এবং সনৎবাবু সব শুনে কিছুক্ষণ দু আঙুলে চোখ টিপে ধরলেন। গভীর বিষয়ে চিন্তা করলে এটা তাঁর হয়। কুম্ভ মনে মনে আর কিভাবে লাগান যায়, আর কি অসহনীয় সব ব্যবহার সে লক্ষ্য করেছে অতীশের এবং কোম্পানীর পক্ষে তা কত মারাত্মক হতে পারে এই নিয়ে বক্তব্য রাখার একটা কামনা জানতেই মনে হল তিনি ওর দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছেন।

সনৎবাবু উঠে দাঁড়ালেন। রেলিং-এ ঝুঁকে দেখলেন কিছু। বৌমা এখনও এল না। শংকুরও ফেরার সময় হয়ে গেছে। গিন্নি শনিপুজো দিতে গেছে কোথায়। বাড়িতে চাকর নাতিন এবং নিজে। সমস্যা একের পর এক। তিনি বললেন, কাল অফিসে এস। রাজার সঙ্গে কথা বলে রাখব। আমার মনে হয় সবার কাছেই বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

কুম্ভ বুঝল, জল ঘোলা করে তুলতে পেরেছে। এবং পরদিনই সে সেটা টের পেল। সকাল নটায় দুজনেরই ডাক পড়েছে। বারান্দায় অতীশবাবু একটা হলুদ কলার দেয়া গেঞ্জি গায় বসে। সে কাছে গিয়ে বলল, দাদা কি ব্যাপার আমাদের সহসা এত্তেলা।

অতীশ দেখল কুম্ভ ভারি প্রসন্ন আজ। তলে তলে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধটা চলছে অতীশ আজ টের পেতে দিল না। আসলে সে নিজেও ধূর্ত হয়ে উঠছে। ধূর্ত না হলে সে হেসে বলতে পারত না, বোধহয় রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন। আমাদের খেতে ডেকেছেন। তারপরই অতীশ সুরেনকে ডেকে বলল, কি হে পাত পড়বে কখন?

একটু পরে সনৎবাবুই মুখ বার করে বললেন, তোমরা এস।

সনৎবাবু আগে, মাঝে কুম্ভবাবু সে পেছনে। দরজার গোড়ায় জুতো খোলার পাট। সে তা করে না। সে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে। প্রথম দিন থেকেই সে এই দাস মনোভাব থেকে আত্মরক্ষা করে আসছে। বাড়ির আমলারা কেউ এটা পছন্দ করছে না—কিন্তু রাজার মর্জি বোঝা ভার। এই আমলারা ভেতরে ঢুকে সামনের চেয়ারে বসারও সাহস পায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ সেরে আসে। সনৎবাবু একমাত্র বসতে পারেন। তিনি ভিতরে ঢুকে প্রথম গড় হলেন। কুম্ভ আরও বেশি মাথা নুয়ে গড় হল। খালি পা দুজনের পেছনে অতীশ একটা তামাশা দেখার মতো দাঁড়িয়ে। রাজেনদা তাকে দেখেই বললেন, আরে এস এস। কি খবর, সদলবলে দেখছি। সে পাশের চেয়ারটা দখল না করে মাঝখানেরটায় গিয়ে বসে পড়ল। সনৎবাবু পাশে বসলেন। কুম্ভ বসতে ইতস্তত করছিল। আশ্চর্য রাজেনদাও কুম্ভকে বসতে বলছেন না। অতীশের নিজেরই গায়ে কেমন লাগছে। সে বলল, বসুন না।

রাজেনদা যেন বাধ্য হয়ে বললেন, বোস বোস।

কুম্ভ বড়ই বিনয়ী এখন। যেন জীবনে কোন কুবাক্য শোনেনি। যেন পৃথিবীটা সাধুজনেই ভরে আছে।

অতিকায় টেবিলটার ওপাশটায় একজন সাধারণ মানুষের এত প্রভাব। ফুলকো লুচির মতো টাক। জুলপি এবং গোঁফে চুলের খামতি ঢাকার চেষ্টা রাজেনদার। তিনি সনৎবাবুর মুখ থেকে একটা বিবরণ রিপোর্ট শুনলেন। হু হা করছেন। কথার মাঝেই একবার অতীশকে বললেন, বৌমা কবে আসছে? তোমার বাবা-মা কেমন আছেন। আরে তোমার ঐ গল্পটা নিয়ে এক ভদ্রলোক খুব তারিফ করলেন— এ রকমের কিছু কথাবার্তা। সাংঘাতিক বিচারালয়ে এমন হাল্কা মেজাজে কেউ সব অভিযোগ শুনতে পারে অতীশের কেমন অবিশ্বাস ঠেকছিল। এবং পরে রাজেনদা শুধু বললেন, অতীশ এ শহরে লোকে খালি হাতে আসে। ফুটপাথে থাকে। তুমি খালি হাতে আসনি। এটা তোমার জীবনের পক্ষে বড় সৌভাগ্য ভাবতে পার।

অতীশ বুঝতে পারছে রাজেনদা তাকে তিরস্কার করছেন। তার তিরস্কারের ভঙ্গীটাও মনোরম। তবু সে বলে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠছে। সে মাথা নিচু করে বলল, আমাদের অ্যাকুমুলেটেড লস দু লাখের উপর। এটা এ-বছর আরও বাড়বে। কাস্টমার ব্যাংক সর্বত্র দেনা। জাল মাল করলে কাস্টমারদের হাতের মুঠোয় চলে যাব। পরে দেখবেন ওখানটায় একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। আর কিছু নেই।

রাজার নির্দেশ জানতে চায়। কোম্পানীর প্রতি তার এতদিনের প্রচেষ্টা সফল দেখতে চায়। সে নিজের জন্য অভিযোগ দায়ের করেনি। যেন তার মূল লক্ষ্য কোম্পানীকে সমূহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু অতীশ বসু একটা বেশ বড় বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল। রাজার মাথায় কি গেছে কথাটা। শুধু একটা অশ্বত্থ গাছ থাকবে। ওটা রাজাকে একটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর সমান। রাজা এটা বুঝছে না কেন!

অতীশ আগে একবার সব হজম করে গেছে। আজ কেন জানি সে তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়তে চাইল না। সে তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, দু আড়াই মাস আগে যা ছিলাম এখন আর তা নেই। কিছু কিছু আমিও বুঝি। তারপর থেমে গেল। যেন বাকিটা বললে অশোভন হবে। সে বলতে চেয়েছিল, আপনার হাতে অন্য তামাক খেয়ে যাবে কেন। তামাকটা আপনিই খান।

সনৎবাবু বললেন, তুমি বোঝ না কে বলেছে?

—না কেউ কেউ এমন ভেবে থাকতে পারে।

কুম্ভর মনে হচ্ছিল সে হেরে যাচ্ছে। সে বলল, এই মুহূর্তে মালের দাম বাড়াবার আমি পক্ষপাতি নই স্যার।

অতীশ বলল, আমি পক্ষপাতি। কস্টিং করে দেখলাম মার্জিনাল প্রফিট দূরে থাক খরচাই ওঠে না।

কুম্ভ বলল, আরও তো কারখানা আছে। তারা কি রেটে কাজ করে দেখুন না।

—কেউ বলে না কি রেটে কাজ করে।

—কাস্টমারদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন।

অতীশ বেশ দূরে থেকে যেন বলল, ওরা রেট নিয়ে মিছে কথা বলে। কম বলে। পার্টিদের এত অ্যাডভান্স রাখার কি কারণ থাকতে পারে। যদি একদিন সব পার্টি অ্যাডভান্স ফেরত চায়, কোম্পানীর ঘটি বাটি বিক্রি করে দিতে হবে।

রাজেনদা কি যেন বুঝলেন। দুজনই কোম্পানীর ভাল চায় দুজনই দুরকমের কথা বলছে। সনৎবাবু অভিযোগ দায়ের করার পর চুপ। তবু অতীশ নতুন। রাজেনদা অতীশকে বললেন, আপাতত নকল আসল সব অর্ডারই বুক কর। কাজ চালু রাখতে হবে ত!

অতীশ কেমন মরিয়া হয়ে বলল নকল অর্ডার আমি বুক করতে পারব না। কুম্ভবাবু যদি করেন করুন। অর্ডার বুকের বই ওঁকে দিয়ে দিচ্ছি।

কুমারবাহাদুর সনৎবাবুর দিকে তাকিয়ে কি যেন জানতে চাইলেন। অতীশের মুখ থমথম করছে। তখনই একটা চিরকুট কেউ দিয়ে গেল কুমারবাহাদুরের হাতে। তিনি

গেলে, কুমারবাহাদুর বললেন, ভীষণ সেনসেটিভ ছেলে। টেকল করা মুস্কিল। কি করবেন?

আসলে মানুষ শৈশবে ফিরে যেতে বারবার ভাল বাসে। এই মুহূর্তে অতীশের সব রাগ ক্ষোভ কেমন উবে গেল। অমলা তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সেই সেন, বিশাল ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছে অমলা। কখন সেই ছেলেটা আসবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে যাচ্ছে অতীশ। আপনজন বলতে এ-বাড়িতে তার অমলা। এবং এ-মুহূর্তে এটা মনে হতেই চোখমুখে রক্তচাপ বেড়ে যেতে থাকল। চারপাশে জাঁকজমক—ধনাঢ্য পরিবারগুলোর যা হয়—ঘরের পর ঘর। [illegible] আত্মজনেরা একসময় এই বাড়ির [illegible] অন্দরকার অসংখ্য ঘরে গিজগিজ করত। এখন তারা নেই। বৈভবের শেষ পর্যায় চলছে বোধহয় এটা। আর দু এক পুরুষেই এরা আর দশজনের মতো নামগোত্রহীন হয়ে যাবে।

শংখ আগে আগে যাচ্ছে। যেন অনেকদূর কোথাও আজ অতীশকে নিয়ে যাবে বলে সে রওনা হয়েছে। কোথাও বেশ অন্ধকার কোথাও আলমবাবপত্র ঠাসা ঘর, তারপরই সিঁড়ি, নীল সবুজ আর লাল গালিচা পাতা সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল। সেই গন্ধটা চারপাশে। লেভেন্ডারজাতীয় গন্ধ—অথবা ধুপদীপের মতো গন্ধ—কিন্তু ধুপদীপ নয়—সে উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ি ভেঙে দোতালায় উঠতেই ঝাউগাছগুলোর ফাঁকে সূর্য দেখতে পেল। একেবারে শেষ মহলায় তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। বিরাট প্রাসাদে মানুষজন কম। চাকর, চোপদার, খাজাঞ্চি নায়েব গোমস্তা অথবা সেরেস্তায় যেসব লোক থাকত তারা আর তেমনভাবে জাঁকিয়ে বসে নেই। মাঝে মাঝে দু-একজন দাসী বাঁদি চোখে পড়ছে—অতীশ আসছে দেখেই ওরা মুহূর্তে অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে পড়ল।

শংখ বলল, যান, ভিতরে বৌরানী আছেন।

সামনে বিশাল লম্বা বারান্দা। কারুকাজ করা মোজাইক। নীলরঙের চিক ফেলা। কথা বললেই গমগম করে বাজছে। শংখের গলা সে বড়ই গম্ভীর শুনতে পেয়েছিল।

অতীশ ইতস্তত করছিল। ভেলভেটের পর্দা প্রকাণ্ড দরজায় ঝুলছে। এর ভেতরে যেতে হবে তাকে। এতক্ষণ মনটা যেভাবে হাল্কা হয়ে গেছিল এখানে এসে আবার তা গম্ভীর হয়ে গেল। তার মনে হল সহসা, সে আর সেই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে নেই। অনেক দূরে অতীতে সে তা ফেলে এসেছে। আর তখনই পর্দা তুলে বৌরাণী বলল, আয়।

[illegible] নির্দেশ। তার কিছু করণীয় নেই। যেতে যেতে বৌরাণী বলল, খুব [illegible] ছেড়িস শুনলাম।

সব খবর এখানে আগেই পাচার হয়ে যায়। সেদিন যে, সে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছিল, তার খবরও বোধহয় রাখে।

বৌরানী আগে আগে যাচ্ছে। এখন সে এই রমনীকে অমল কিংবা কমল কিছুই ভাবতে পারছে না। লম্বা দৃঢ় মজবুত রমনী। পুরো শরীর হাল্কা সবুজের ওপর লাল ফুল ফল আঁকা ম্যাকসিতে ঢাকা। ইতিহাসের পাতায় ছবির মতো কোন সম্রাজ্ঞী যথার্থই তার সমনে হেঁটে যাচ্ছে যেন। ম্যাকসির ঝালর মেঝের অনেকটা ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে। রুপোলী চুমকিতে সারা অঙ্গ জ্বলজ্বল করছিল। কোমর এবং বাহু দুই ভারি কামনার উদ্রেক করে। অতীশ ভয়ে রমনীর দিকে তাকাচ্ছে না। সে দেয়াল এবং দুপাশের বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। কেমন সামান্য বেহুঁশের মতো হেঁটে যাচ্ছিল।

দরজা ঠেলে পর্দা তুলে ফের বলল, আয়।

সে ঢুকলে বলল, বস। তারপর জরুরী কাজ পড়ে আছে মতো অন্য দরজার দিকে এগোলে, অতীশ বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না অমলা, তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন!

বৌরানী কেমন সহসা আতর্কিতে ফিরে দাঁড়াল। বলল, ঠিক বলছিস আমি অমলা?

—হ্যাঁ, তুমি অমলা। অমল। কমলা নও। কমলার চুল নীল ছিল।

—তালে তোর সব মনে আছে?

—আছে।

—ছাদের কথা?

—মনে আছে।

—নদীর ধারে সেই কাশবন...

—মনে আছে।

—শান্তোতে পুজো দেখতে বের হয়েছিলাম তোকে নিয়ে...

মনে আছে।

—স্টীমার ঘাটের সেই আলো তারপর সেই বনটা—কত শত পাখি, রাতের জ্যোৎস্না...

—সব সব।

—সব মনে আছ তোর! যেন এবারে অমলা বলতে বলতে চিৎকার করে উঠবে—মনে আছে তোর সেই শ্যাওলাপিচ্ছিল ধূসর পৃথিবীর কথা! কিন্তু বলতে পারল না। গ্রীক রমনীর মতো চোখেমুখে এক আশ্চর্য মুহ্যমান দৃষ্টি। ওর মজবুত দৃঢ় লম্বা শরীরের দিকে তাকিয়ে কেমন অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল, অতীশ তুই একটা দস্যু। তুই দস্যু অতীশ। কেন তুই এখানে এলি অতীশ!

।। বার ।।

অন্যদিনের চেয়ে চন্দ্রনাথের আজ আরও সকালে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। খালি পা হাঁটুর ওপর কাপড়। পায়ে খড়ম। বাইরে বের হয়ে সব আকাশটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। পূব আকাশটা এখনও ফর্সা হয়নি। নিঃশব্দ ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই মুহূর্তটি তাঁর অতি প্রিয়। কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। রাত শেষ হয়ে আসছে, কিছু নক্ষত্রের শেষ ঝিকিমিকি। কীট-পতঙ্গের ডাক তেমন শোনা যাচছে না। আবছা অস্পষ্ট আলো পৃথিবীতে জেগে উঠছে। তিনি সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেন। গলায় উপবীত। আবছা অস্পষ্ট আলোয় ঈশ্বরের মহিমা। জয়া জননীর মতো এই নিবাস। সব কিছুর মধ্যে চন্দ্রনাথ অনুভব করলেন অশেষ করুণা তাঁর। তিনি প্রতিদিনের মতো নতজানু হলেন, তারপর উঠোন থেকে নখাগ্রে মাটি তুলে কপালে তারপর জীবে এবং বাকিটুকু মাথায় ঘসে দিলেন।

চারপাশে গাছপালা আকাশ সমান উঁচু হয়ে উঠতে চাইছে। বাতাস বইছিল। সামান্য হাওয়ায় গাছগুলির শাখা-প্রশাখা আন্দোলিত হচছে। এই সব গাছপালা সবই তাঁর রোপণ করা। ঘন জঙ্গল থেকে তিনি এখানে তাঁর ঘর-বাড়ি তৈরি করেছিলেন। যখন যেখানে খবর পেয়েছেন সুস্বাদু আম জামের গাছ [illegible]ছে, সেখানে ছুটে গেছেন। একবার [illegible] বালিরঘাট থেকে একটি আমের ক[illegible] নিয়ে এসেছিলেন। হাতে পয়সা ছি[illegible]। দশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে সেই কলম কাঁধে করে নিয়ে এসেছিলেন। সব কলমগুলের গাছগুলিই এখন সজীব। তারা এই বাড়িঘরে সন্তান-সন্ততির মতেই বেঁচে আছে। একটা ডাল ভেঙে ফেললে কেউ তিনি ক্ষেপে যান। ভারি মনোকষ্টে ভোগেন। শেকড় ক্রমেই গভীরে প্রবেশ করছে।

এই ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি কেন জানি আজ সব গাছপালার নিচ দিয়ে হেঁটে যেতে থাকলেন। গাছগুলো ছুঁয়ে দেখলেন। পর পর আমগাছ, তারপর দুটো কাঁঠাল গাছ। নারকেল গাছের সারি পশ্চিমের দিকে। বাঁদিকে দুটো সফেদা ফলের গাছ, লিচু গাছ। কাঠাখানেক জুড়ে লেবু গাছের ঝোপ। এদিকটায় তিনি গন্ধপাদালের লতা লাগিয়ে রেখেছেন। কাঠাখানেক জুড়ে আছে বাঁশের ঝাড়। তার এই গাছপালার মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য সবুজ ঘ্রাণ অনুভব করেন। এত প্রিয় এই সব কিছু তার অথচ সবই চলে যায়। চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে এসে এবার করবী গাছটার নিচে দাঁড়ালেন। দূরবর্তী বড় সড়কে গরুর গাড়ির আওয়াজ উঠছে। সদরে যাবে বলে শাক-সবজি বোঝাই করে চাষী মানুষেরা বের হয়ে পড়েছে। আর মাথার ওপরে পাখিদের ডানার শব্দ। এরা

হতে বেশি দেরি নেই। যে যার জায়গা মতো চলে যাবার জন্য আকাশের প্রান্ত দিয়ে উড়ে যায়।

চন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন এই ঘোরাঘুরিটা করেন। মানুষ জানেই না এই সময়টাতে ঈশ্বরের কাছাকাছি আসার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়টায় মানুষের সব রকমের লোভ মোহ কাম কেটে যায়। এই সময়টায় পৃথিবীর রূপ বদল ঘটে। চন্দ্রনাথ এসব ভাবতে ভাবতে খালের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। ওপারে তাঁর বিঘে ছয় ভুঁই—ধানী জমি, সবুজ আভা নিয়ে চারা বড় হচ্ছে। হাত দিলেই টের পাওয়া যায় পাতায় পাতায় শিশির ভেজা আশ্চর্য এক সমারোহ। প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেন চন্দ্রনাথ, বড় মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে। ঘোরাঘুরি করে এসব না দেখলে বোঝাই যায় না, কত মূল্যবান এই চাষ আবাদ! সব সময় উত্তেজনা। সেই কাদান থেকে আরম্ভ করে বীজ বপন, তার বীজতলা থেকে চারাগাছ তুলে রুয়ে দেওয়া, তাদের জমিতে লেগে যাওয়া, বড় হওয়া, কি এক বড় প্রতীক্ষা যেন। এই প্রতীক্ষার মতো অমূল্য ইচ্ছে মানুষের আর কি থাকতে পারে চন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন না। এর মতো প্রবল আকর্ষণ মানুষের আর কি থাকতে পারে। অতীশ এসব উপেক্ষা করে চলে গেল। আজ বৌমা দাদু দিদি ভাইও চলে যাবে। তাই কদিন থেকেই চন্দ্রনাথের বাড়িতে বড় টান ধরেছে। কেমন সকলের অজ্ঞাতে দিশেহারার মতো নিজের আবাসে ঘোরাঘুরি শুরু করেছেন।

কিছু কাক তখন কা-কা করে উঠল। তিনি দাঁড়িয়ে কাকের শব্দ শুনলেনই। কাকেরা নানাভাবে ডাকে। এদের ডাকে শুভ অশুভ ধরা যায়। এদের ডাকে কখনও প্রবল দীর্ঘশ্বাস থাকে। বড়ই আর্ত সে ডাক। গেরস্থের তাতে অমঙ্গল বাড়ে। কাকের ডাকে মানুষ টের পায় আর শুয়ে থাকার সময় নেই। তিনি তার আগেই উঠে পড়েছেন। কিছু ঘাস মাড়িয়ে তিনি খালি পায়ে এখন হেঁটে যাবেন। শিশির ভেজা ঘাসে হেঁটে বেড়ালে আয়ু বাড়ে তাঁর এমন একটা বিশ্বাস আছে। রোগভোগ কম হয়। ধানের আলে তিনি নেমে গেলেন। গাছের গোড়ায় জল পরিমিত আছে। কিছু আগাছা জন্মাচ্ছে। এগুলি সাফ করা দরকার। যত গাছ বাড়ে, যত কালো হয়ে ওঠে ধানগাছের গুচ্ছ তত তিনি ছেলে-মানুষের মতো পুলক বোধ করেন। মনে হয় ঈশ্বরের মতো নিজেও সৃষ্টি করে যাচ্ছেন একটা নতুন পৃথিবী। এই পৃথিবীর বাসিন্দা রামি ভামি গোলা পায়রার দল, দুটো কুকুর, একপাল হাঁস, তিনটে গাভী এবং ধনবৌ সন্তান-সন্ততি আর নিরিবিলি নানাবিধ ফলের গাছ। দূরে থেকে নিজের আবাসের প্রতি তখন তাঁর ভারি মমতা পড়ে। লোকজনে ভরে আছে—[illegible] আজ অনেকাংশে খালি হয়ে যাবে। এই দুঃখটাতে তিনি ভারি পীড়িত হচ্ছিলেন।

পুব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে। আকাশের নিচের গাছপালা এবং পাখিদের এবার স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। কেমন যেন গভীর স্বপ্ন থেকে এটা তাঁর ধীরে ধীরে জেগে ওঠা। একটায় ট্রেন। প্রহ্লাদ হাসু সঙ্গে যাবে। লটবহর কাল রাতেই বাঁধাছাদা হয়ে গেছে। কালই বৌমাদের যাত্রা করিয়ে রেখেছেন। অলকার সঙ্গে উত্তরের ঘরে আজ বৌমা শুয়েছে। বড় ঘরে আজ আর তারা আসতে পারবে না। মিন্টু অতসব বোঝে না। বড়ই অবুঝ। তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ চন্দ্রনাথের বিশ্বাস, বড় ঘরে এলে যাত্রার বিঘ্ন ঘটবে।

একবার ভেবেছিলেন, নিজেই সঙ্গে যাবেন। কেমন জায়গায় অতীশ তার আবাস ঠিক করেছে, নিজে দেখে এলে শান্তি পেতেন। কিন্তু সন্তোষের মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় যাওয়া হচ্ছে না। কাল ষোড়শ শ্রাদ্ধ। যজমানের শান্তি অশান্তি বলে কথা। তিনি অন্য পুরোহিতের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সন্তোষ মুখ ব্যাজার করে ফেলেছিল। আর ওর সব বড় পুজা-পার্বনে খুঁত-খুঁত স্বভাব ছিল। যত দেরিই হোক, যত উপবাসে কষ্টই পাক, তিনি ফুল বেলপাতা না দিলে বৃন্ধা তৃপ্তি পেতেন না। কিছু আহারও করতেন না। লাঠি ঠুকে ঠুকে সকালবেলায় চলে আসত ওর মা। ঠাকুর প্রণাম, চন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে ঠুক ঠুক করে আবার চলে যেত। গাছের যা কিছু কর্তাকে না দিয়ে নিজে খেয়ে তৃপ্তি পেত না। এ একটা ঠিক রয়ে গেছে বলেই চন্দ্রনাথ নিজে যেতে পারছেন না। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছেন।

আর সকাল থেকেই চন্দ্রনাথের হাঁক-ডাক, ও বৌমা ওঠো। ঠাকুর প্রণাম করে ফুল বেলপাতা তুলে দাও। পুজার ঘরে একটু সকাল সকাল ঢুকতে হবে বৌমা। কি রে হাসু ওঠ। রাধানাথকে বলবি যেন তিনটে রিকস আনে। প্রহ্লাদ তুই বাবা ঘাসপাতা কেটে রেখে যা। বাড়ি থাকবি না, গরুগুলি খাবে কি। এই বলে তিনি টং থেকে কবুতরগুলো ছেড়ে দিলেন। পায়ে পায়ে সেই শ্রাবণীর কুকুর দুটো ঘুরছে। শ্রাবণীর মেলা থেকে আসার পথে কেন জানি কুকুর দুটো তাঁর পিছু নিয়েছিল। যতই তিনি দূর ছাই করেন, নড়ে না। হাঁটতে থাকলে, কুকুর দুটো পেছনে হেঁটে আসে। বাড়িতে ফিরে দেখেন, ওরা তেমনি আসছে। সেই থেকে ওরাও এবাড়ির বাসিন্দা হয়ে গেল। আগের কুকুরটা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর যে জায়গাটা সংসারে খালি পড়েছিল, এরা আসায় তা আবার ভরভর্তি হয়ে গেছে। তিনি সেই কুকুরটাকে আর খুঁজেই পেলেন না। প্রথম মনে হয়েছিল বেইমান, পরে মনে হয়েছে, দূরের রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে মরে থাকলে কে টের পাবে। কেউ লোভ দেখিয়ে নিয়েও যেতে পারে। বড় সাবলীল ছিল কুকুরটা। এই শ্রাবণীরা আসায় তাঁর সেই দুঃখটা এখন অনেক কমে গেছে। রামিটা দুদিনের জন্য কোথায় চলে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। যে যায় সে ফিরে আসে না, এই ভয়টা বড়ই তাঁর বেশি। বড়ছেলে সতীশ এরকমের হয়ে গেল। অতীশ চলে গেল। বৌমা চলে যাচ্ছে। নাড়ির টান ছিঁড়ে গেলে কে আর সুস্থির থাকতে পারে। তিনি আজ সকাল থেকে আরও বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

হাসুর সহজে ঘুম ভাঙ্গে না। সে শুয়ে উ আঁ করছে। উঠছে না। চন্দ্রনাথ বললেন, ও ধনবৌ তোমার সন্তানরাতো কেবল ঘুমতে শিখেছে। আর কিছু শিখল না। কখন থেকে ডাকছি, কিছুতেই উঠছে না।

ধনবৌ অন্যদিন হলে বিরূপ আচরণ করত। কিন্তু আজ ভারি চুপচাপ। সংসারেও কাজের শেষ নেই। এখন ছেলে-দের নিয়ে পড়লে অশান্তি বাড়বে। টুটুল ঘুম থেকে উঠেই ঠামা ঠামা করছিল। গোটা তিনেক কথা টুটুল বলতে পারে। মা বাবা ঠামা। দাদু বলতে পারে না। এজন্য ধনবৌ মনে মনে খুশী। দেখ সংসারে কার টান কত বেশি। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করে সারাটা জীবন কাটালে। দুটো পয়সা সঞ্চয় করলে না। ছেলের হাত তোলার ওপর বাঁচতে হবে ভেবেই ঘাবড়ে গেছ। বুঝি না কিছু মনে কর। বড়টাতো কবেই সম্পর্ক ছিঁড়েছে। শুধু চিঠিপত্র আর অসুখ-বিসুখের খবর দেয়। অভাবের খবর দেয়। এখন দেখ এরা গিয়ে কি করে। সকাল বেলায় ধনবৌ বিরূপ হয়ে উঠলে এসবই বলতেন। কিন্তু আজ এরা যাবে। সকাল বেলায় ঝগড়া করতে মনটা সাড়া দিচ্ছিল না। বাসি কাপড় ছেড়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে গেল। ঠাকুরের বাসনপত্র, তামার টাট কোষাকুষি সব বের করে সোজা ঘাটে। অলকাকে ডেকে তুলে দিয়ে গেল। বলল টুটুলকে নিয়ে একটু গাছতলায় বেড়া। আমার কাছে এখন আর আনিস না।

অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

দেখা গেল শালতির মধ্যে ফুটো। কাদা দিয়ে বোজান ছিল। এখন জল পেয়ে সেই কাদা গলে গিয়ে সেই ফুটো দিয়ে জল উঠতে লাগল। অর্থাৎ শালতির সাহায্যও বর্জন করতে হল। অগত্যা সেই পদব্রজে।

এবং পায়ে হেঁটে যাওয়ার যে কি বিপদ তা একটু পরেই বোঝা গেল। দ্বারকানাথ অগ্রসর দলের লোক। ভাবে-ভাবনায় র‍্যাডিক্যাল। চলনেও তাই। তিনি শিবনাথের অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ হাত আগিয়ে চলেছেন। তিনি জলের দেশের লোক। জল দেখে অত ভয় খাবেন কেন। শিবনাথ অনেক ঠাণ্ডা লোক। পিছিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, দ্বারকানাথ ডুবে গেছেন। ভারবাহক মুটে বললে বাবু, ওখানটায় একটা খাল আছে। তার ওপর একটা পুল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় খাল ত ভেসেই গেছে, পুলটারও কোন অস্তিত্ব নেই। শিবনাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখেন দ্বারকানাথ আর একবার ভেসে উঠে আবার ডুবে গেলেন। 'ডুবে গেলাম' বলে চিৎকারও করে থাকবেন। শিবনাথ ভাবলেন, দ্বারকানাথ ডুবে গেলেন। স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু দ্বারকানাথও ডোববার মানুষ নন। অসাধারণ তাঁর মনের জোর। কিছু দূরে গিয়ে আবার তিনি ভেসে উঠলেন। খালের পাশে জাগা একটা গাছের ডাল চেপে ধরলেন। খালের অপর পারে একটা শালতি ছিল। শিবনাথ তাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'বাঁচা, বাঁচা, বাবুকে বাঁচা। বকশিশ করব।' শিবনাথের চিৎকার সৌভাগ্যক্রমে তারা শুনতে পেয়ে, শালতি নিয়ে দ্বারকানাথকে উদ্ধার করে। সে যেন পুনর্জন্ম হল দ্বারকানাথের।

দুর্ভোগ কিন্তু শেষ হল না। জল আর কাদা। কাদা আর জল। জলে আর কাদায় মাখামাখি দুই মিশনারীর পথ আর ফুরোয় না। বেলা পড়ে আসছে। স্টীমার-ঘাট আর কতদূরে। অথচ তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সেই কখন তাঁরা বেরিয়েছেন। ঘোলা জল ত আর খেতে পারেন না। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটু দূরে একটা টিলার ওপরে একটা বাংলো-বাড়ি। স্টীমার ঘাটের পথ ছেড়ে তাঁরা টিলার দিকে এগোলেন। দেখলেন, হ্যাঁ এটা সরকারী ইনস্পেকশন বাংলো। একজন আসামী চাকরও রয়েছে। এক কলসী পানীয় জলও রয়েছে তার কাছে। কলসীর মুখে বাটী চাপা। দ্বারকানাথ বললেন, একটু জল দেবে বাবা? চাকরটা বললে, কিসে করে খাবে? শিবনাথ বললেন, কেন তোমার ঐ বাটীতে। চাকরটা বললে, সে কি করে হবে? 'তোমরা কলা বঙ্গাল। আমাদের জলপাত্র তোমাদের ছুঁতে দিই না।' দ্বারকানাথ বলে থাকবেন, আমরা অঞ্জলি পাতছি। তুমি জল ঢেলে দাও হাতে। চাকরটা বললে, হাতে ও বাটীতে যদি ঠেকাঠেকি হয়ে যায়। দ্বারকানাথ আর কিছু বললেন না। বুঝলেন, বলে লাভ নেই। কাছ থেকে গাছের পাতা আনতে গেলেন। বলে গেলেন, আমি গাছের পাতা আনছি। বাটী করে তাতেই জল দিও। আমরা সেই জল খাব। শিবনাথ কিন্তু ডেডিকেটেড মিশনারি। ব্রাহ্ম প্রচারক। তিনি সেই আসামী চাকরটাকে বোঝাতে লাগলেন। তুমি, আমি সবই ত ঈশ্বরের সৃষ্টি। বলতে গেলে আমরা ভাই। আর এই জল সেও ভগবানই দিয়েছেন সকলের জন্যে। আজ জলতেষ্টায় আমাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আর তুমি ভাই হয়ে সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি আমাদের দিতে পারছ না? লজ্জা হচ্ছে না তোমার। শিবনাথ লিখছেন: 'কেন জানি না, আমার কথা শেষ হইলে সে ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, অচ্ছা আমার বাটীতে জল খাও। দ্বারকানাথকে চিৎকার করে ডাকলেন শিবনাথ: আসুন, আসুন...বাটিতে জল দিতে রাজী হয়েছে। স্টীমারঘাটে যখন পৌঁছালেন তখন সন্ধ্যা। আসামের বুকে সেদিনই তাঁদের শেষ দিন।

প্রকৃতির এই রুদ্ররোষের সঙ্গে তাঁকে আসামে অভ্যর্থনা করেছিল রাজরোষ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়া সর্বত্রই গভর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখানে যান, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, অধিকাংশ স্থলে ডেপুটি কমিশনারগণ বাঙ্গালি ভদ্রলোকদের নিকট হইতে তাঁহার বিষয়ে সংবাদ গ্রহণ করেন। রামকুমার বিদ্যারত্নের কপালে যা ঘটেছিল, দ্বারকানাথের বেলায়ও তার ব্যত্যয় হল না। শুধু সাহেবরাই নয়, বাঙ্গালী বাবুরাও। তবে এত বড় বাধাবন্ধ দুহাতে সরিয়ে নিজের কাজ ঠিক করে গিয়েছিলেন তিনি। যতদূর জানা যায়, ওখানে থাকতে থাকতেই সঞ্জীবনীর জন্য নিয়মিত ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন তিনি। তবে সঞ্জীবনীতে তাঁর ধারাবাহিক রিপোর্টিং—আসামে নেগ্রীর সন্তান—কি জ্বালাময়ী ভাষায় সেই বেদনা-বহুল অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী লেখা হয়েছিল, সেকথা আজ আর জানার উপায় নেই। সঞ্জীবনীর সেই মহামূল্য ফাইল আজ দুর্লভ। বাংলা ভাষায় রিপোর্টিং-এর সেই আদর্শ দৃষ্টান্ত আজ বিস্মৃত।

দ্বারকানাথ প্রায় একই সময়ে লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলীতে। পঁচিশে সেপ্টেম্বরের সংখ্যা থেকে শুরু করে পরের বছর নয়ই এপ্রিল—মোট চোদ্দটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় বেঙ্গলীতে। বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং-এর এগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। স্লেভারি-ইন-ইণ্ডিয়া—এই ভারতবর্ষে দাস ব্যবস্থা এই শীর্ষক লেখাগুলির শুরু করা হয়েছে নিতান্ত অনুত্তেজকভাবে। আসামে চা যে একটি বৃহৎ শিল্প এবং এই প্রকল্পের আর্থিক উন্নতি যে দেশে জাতীয় সমৃদ্ধির সহায়ক এবং এ থেকে প্রায় তিন লক্ষ লোকের মায় তাদের শিশু সন্তানদের চাকুরির সংস্থান হচ্ছে তা স্বীকার করেও বলা হচ্ছে যে এই সব পরদেশী মানুষের যদি অসহ্য অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে দিনযাপনের গ্লানি বহন করতে না হত তাহলে তাঁরা কখনই এমন সোচ্চার হয়ে উঠতেন না। মুক্তির আগে মার্কিন নিগ্রোদের যে অবস্থা ছিল, তার মতই কিংবা তার চেয়েও খারাপ বহু চাবাগানের কুলিদের জীবন। দ্বারকানাথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তিনি তাঁর নিজের চোখে দেখা কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর অভিযোগের মূল ভিত্তি খাস সরকারী রিপোর্টগুলিই। বিভিন্ন ফৌজদারী আদালতের রেকর্ড এবং বহু অনস্বীকার্য অকাট্য সব নথিপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁর আক্রমণ রচনা করেছিলেন এবং আজ প্রায় একশ বছর পরে তাঁর এই লেখার মুন্সিয়ানা যে কোন নামকরা সাংবাদিককেও লজ্জা দেবে। কি নিষ্ঠা, কি সত্যপ্রিয়তা। অবজেকটিভ রিপোর্টিং-এর একটা পরাকাষ্ঠা নিঃসন্দেহে। আঠারশ চুরাশি সালের এক রিপোর্ট অনুসারে দেখা যাচ্ছে চাবাগানে ১,০২,৫৫৭ মরদ কুলি, ৭৮,২৭৪ কামিন কুলি। আসামের স্থানীয় কুলির হার শতকরা সাড়ে পাঁচ-ভাগ, সাঁওতাল পরগণাই ছিল কুলি সরবরাহের মূল ঘাঁটি। এখানকার কুলি-কামিনের হার ছিল শতকরা ৪৪-৭ ভাগ, বাংলাদেশ—২৭-২ ভাগ, সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ—২১-৬ শতকরা এবং বাকী আসত নেপাল, মাদ্রাজ এবং বম্বে থেকে। প্রসঙ্গত বলা যায়, কুলি আইনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবার সময় কংগ্রেস অধিবেশনে যখন এটাকে আঞ্চলিক সমস্যা বলে অগ্রাহ্য করা হয় তখন দ্বারকানাথের দল এই তথ্যই উল্লেখ করে বলেছিলেন যে এটা শুধু বাংলাদেশ বা আসামের সমস্যা নয়—এর সঙ্গে জড়িত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হাজারো মানুষের রুজি রোজগার।

তাঁর প্রতিবেদনে দ্বারকানাথ বললেন, আইন আছে ঠিকই কিন্তু খাতায়-কলমে চুক্তিবদ্ধ হবার আগে কুলিদের সামনে রচনা করা হয় এক নতুন স্বর্গরাজ্যের ছবি—আসাম বলে কোন এক অজানা দেশের বুকে। কিন্তু একবার আড়কাঠির পাল্লায় পড়লে মাকড়সার জালে-পড়া কীট-পতঙ্গের মত আর কোনক্রমেই রেহাই নেই তার। ছয় দফা চুক্তিতে ঘাড় নাড়ুক কি না নাড়ুক, আসামের চাবাগানে তাকে যেতেই হবে। নান্যথা। বউকেরা চাবাগানের সাহেব ফেডারিক গিবনস ত স্বীকারই করেছিলেন কুলিদের চুক্তিপত্র লিখেছিল গোপালচন্দ্র। সই করেছিলেন তিনি। কুলিরা এইসব চুক্তিপত্রে কোনটাই সই করেনি। এবং সেইগুলিই তিনি রেজিস্ট্রী করতে পাঠিয়েছিলেন। গিবনস সাহেব ত সাফ বলেছিলেন এতে বিস্ময়ের কি আছে? এটাত অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইট ওয়াজ দি কাস্টম অ্যাণ্ড ওয়াজ অলওয়েজ ডান। দ্বারকনাথ তাঁর বিভিন্ন রিপোর্টে এই রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির প্রহসনের কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা সবসময়ের চিকিৎসক বা মেডিকেলম্যান হওয়ার দরুণ, তাঁর হাতে প্রায়ই কোন সময় না থাকায় এমনই ঢালাটিলাভাবে কাজটা করে থাকেন যে আইনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। তবু যদি এমন কোন বেয়াড়া কুলি থেকেই যায়, তাহলে তাকে কখনই রেজিস্ট্রেশন অফিসারের সামনে আদপেই আনা হয় না। অন্য লোক তার নামে সেজে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রকসি দেয়। যদিও নাম ডেকে এই সব জিজ্ঞাসাবাদ খুবই অপ্রচলিত ঘটনা। মোদ্দাকথা পরদেশী কুলিরা তাদের চুক্তিপত্র সম্বন্ধে সবটাই অজ্ঞ এই চুক্তিপত্রের কোন মর্মই তারা বোঝে না! অবশ্য কুলিদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারী আয়োজন আছে। একজন ইন্সপেকটর সাহেবের এটা দেখার কথা যে কুলিদের মালিকরা বেশী খাটাচ্ছে কিনা। অন্যায় আচরণ করছে কিনা। কিন্তু বছরে তিনি একবার করে চাবাগানে পদার্পন করে থকেন। তও দ্বারকানাথ সরকারী রেকর্ড থেকেই দেখিয়ে দিলেন, ১৮৮৩ সালে ৮১৯টি বাগানের মাত্র ২৫০টিতে তাঁর শুভ পদার্পন ঘটেছিল। পরের বৎসরে অন্ততঃ খাতাপত্রে, ৮২৪ টি বাগানের মাত্র ১৫০ টিতে 'ইনসপেকশন' হয়ে ওঠেনি। চীফ কমিশনার সাহেব স্বীকার করেছিলেন শিবসাগরের জোরহাট মহকুমার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, জুলাই থেকে নভেম্বর কোন য়ুরোপীয়ান অফিসারই ছিলেন না। আর থাকলেই বা কি হত। বলে কয়েই তো আসতেন ইনস্পেকটর বাহাদুর। যখন তিনি আসবেন, সেই সময়টা দিনের কাজ—'টাসক ওয়ার্ক' কমিয়ে রাখা হয়। আর সাহেব চলে গেলেই আবার বৃদ্ধি। দিনে ক'ঘন্টা খাটবে, কুলি বা কামিন কতটা কি কাজ করবে সবই সরেজমিন তদন্ত করে কম করে দেবার অধিকার সাহেবের ছিল। কুলি-কামিনদের মজুরীও তথৈবচ। পুরুষদের পাঁচ টাকা, মেয়েদের চার টাকা ছিল মাস মজুরী কিন্তু তাও ঐ চুক্তিপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকত। গড় আয় পুরুষদের তিন টাকা মেয়েদের আড়াই টাকা। হয়ত কিছু বেশী, কিন্তু কেরানী, ডাকতার, মহুরী, সর্দার, চৌকিদার—সবাইকে ত কিছু না কিছু সেলামী দিতে হত। কাজেই সব দিয়ে থুয়ে এই স্বর্গরাজ্যে তাদের শুধু ক্ষুধার জ্বালা। লক্ষ্মী বাগদী বলে একটা কুলি ক্ষুধার জ্বালা যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রীকে খুন করে এই জ্বালা যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। বৌ কে বলেছিল তুই-ই আমায় খুন কর। কিন্তু স্ত্রী রাজী হয়নি। শেষে এই চুক্তি বদ্ধ স্ত্রী হত্যা।

কেউবা এত যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে পালাত। না পালিয়ে তো মৃত্যু। আর পালিয়ে গিয়ে ধরা পড়লে ত কয়েদ। পোর্টিয়াস সাহেব— এস ডি ও, কামরূপ তিনি খোলাখুলিই লিখেছিলেন যদি থাকে ত মৃত্যু আর যদি পালায় ত কয়েদ—এই দুটোর মধ্যে বাছাই করতে হত তাদের। পলাতকের সংখ্যা আরও বাড়ত যদি আসামের জংগল বেষ্টিত না হত চাবাগানগুলো, দ্বারকানাথ লিখেছিলেন, আপার আসামের বাগানগুলি একটা অপরটা থেকে এতই দূরে যে কমপক্ষে একদিন লেগে যেত একটা থেকে অপরটাতে যেতে। তাছাড়া আসামের জঙ্গলে ভয়ংকর সব হিংস্র জন্তু। কাজেই চাইলেই কুলির পক্ষে পালান খুবই শক্ত। এবং এই শক্ত কাজটা, যখন তারা করতে যায়, বা করতে বাধ্য হয়, তখন বোঝাই যায়, অত্যাচারের মাত্রা কি দুর্বিষহ।

চুক্তির আর একটা দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন দ্বারকানাথ। চুক্তি তো পাঁচ বছরের। প্রতিবারে ত বহু-সংখ্যক কুলিকামিনের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের কি হয়? ১৮৮৩ সালে ১৪,৭৬৪ জন অতিক্রান্ত চুক্তি কুলি-কামিনের মধ্যে ১৯৪৬ জন এবং ১৮৮৪ সালে ২৪,৫৫৭ জন কুলিকামিনের মধ্যে মাত্র ৮,৯৩২ জনকে ইনস্পেকটর বাহাদুরের কাছে হাজির করা হয়েছিল। সরকার কি ভেবে দেখেছেন, গেল কোথায় বাকী মানুষগুলো?, কেন তাদের ইনস্পেকটরের সামনে আনা হল না? না কি তারা যতক্ষণ না পুনরায় চুক্তি করতে রাজী হয়, ততক্ষণ তাদের জোর করে আটকে রাখা হয়েছিল?

এইবার যে সর্ব রোগহর ধন্বন্তরি—প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিম ইনসপেকটর বাহাদুরের ওপর এই লক্ষ লক্ষ লোকের ভালো মন্দ পরিদর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে তার পরিদর্শনের বহরট শুনুন। হুজুররা

আসেন, খানাপিনা করেন প্ল্যান্টারদের সঙ্গে তাদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়ান এবং সামাজিক আমোদ-প্রমোদের মধ্যে সময়টা কাটিয়ে যান—

'The Inspectors when they visit the gardens generally dive and peg with the plants, play and exchange with them the social amenities of life'

যাদের পরিদর্শন করতে আসা তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে সর্দারের চাকরি দেবার বা অন্য কিছু লোভ দেখিয়ে সামনে রাখা হয়, তালিম দিয়ে তৈরী রাখা হয়—যাতে তারা সকল প্রশ্নের চটপট মালিক-ঘেঁষা জবাব দিয়ে দেয়। আর তাদের পিছনে সারিবদ্ধ একদল মূক মূর্খ মানুষ জানতেও পারে না, কেনই বা তারা এমন করে লাইন বেঁধে দাঁড়াল, কি নিষ্ঠুর ছিনিমিনি খেলাই না হয়ে গেল তাদের পোড়া ভাগ্য নিয়ে। তবে হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর সাহেব কাজ কিছু দেখাবেন না, তা কি করে হয়। এত সব পুতুল নাচের ইতিকথা। ১৮৮৩ সালে ৯,৯৯২ জনের চুক্তিপত্র ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে পেশ করা হল। এর মধ্যে একশ' সতেরটি চুক্তিপত্র বাতিল হয়ে গেল আইনের বাতায় করার জন্যে ম্যানেজারদের শাস্তি হিসেবে। দ্বারকানাথ বলছেন, এ থেকে কি প্রমাণ হয়? এই একশ' সতেরজন লোককে অন্ততঃ জোর করে খাটান হয়েছে এমন এক মনিবের জন্যে যার খাটাবার আইনসংগত কোন অধিকার ছিল না! পরের দশকে এই সংখ্যা আনুপাতিক হারে অন্ততঃ যদি ৮,১৩২ জনকে সরকারী বিবরণের সার ধরে অন্ততঃ একথা বলা যায়। এদের জোর করে খাটান হল কোন আইনে?

দ্বারকানাথ তাঁর বিবরণে বার বার বলেছেন, আমাদের চা-বাগানে সমান্তরাল এক শাসন ব্যবস্থা চলছে। দশই অক্টোবর আঠারশ পঁচাশি। শেখ সখাবি শিবসাগরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক আবেদনে অ্যাক্ট তেরর একশ একচল্লিশ ধারা বলে তার ছেলে শেখ খোদাদিনের এক মুক্তিপণ-ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দাবী করলে। খোদাদিন কাজ করত দিরম চা বাগানে। বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের লেফটেন্যান্ট এইচ আর ব্রাউন, মিলিটারী লোক বলেই বোধহয়, দিরম চা-বাগানের কর্তা হোসাক সাহেবকে আবেদনের বিবরণ দিয়ে তাকে এ-ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বললেন। হোসাক সাহেব মস্ত মানুষ। তিনি কি একজন পেটি ম্যাজিস্ট্রেটকে জবাব দেবার দীনতা স্বীকার করবেন? বাইশে অক্টোবর হোসাক সাহেব শিবসাগরের একস্ট্রা এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিয়ে খোদ ডেপুটি কমিশনার সাহেবকে লিখলেন: আমি জানি না তিনি তাঁর ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে অবহিত আছেন কিনা। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যাকে তিনি কুলি বলেছেন, সে আদপেই কুলি নয়, গৃহভৃত্য মাত্র। লোকটা তার মুক্তির জন্য কোনরকম আবেদন করেছে বলে অস্বীকার করছে। এবং যেদিন আবেদন করেছে বলা হচ্ছে। সেদিন সে ফ্যাকটরীতে হাজির ছিল। আপনি যদি ব্যাপারটা একটু দেখেন, কৃতজ্ঞ থাকব। এটা স্পষ্টই যে আমার নিছক বিরক্তি উৎপাদন করবার জন্য করা হয়েছে। 'সিম্পল টু গিভ মি এ্যানয়েন্স'। কলকাঠি ঠিকই নাড়া হয়ে গেল। আটাশে অক্টোবর কোনরকম সাক্ষী সবুত না ডেকেই মামলাটা সরাসরি খারিজ হয়ে গেল।

কিন্তু এই কুলিকাহিনী এখানেই শেষ হয়ে গেল না। হোসাক সাহেবের চিঠির মর্মার্থ জেনে খোদাদিনের বাবা ছেলের কাছে গিয়ে সবকিছু আদ্যোপান্ত জানালো। খোদাদিন সুযোগ বুঝে পালিয়ে দোসরা নভেম্বর ব্রাউন সাহেবের আদালতে গিয়ে তাকে মুক্তি দেবার অনুরোধ জানাল। ব্রাউন সাহেব ব্যাপারটা জানতেন। কাজেই সেই দিনই তিনি তড়িঘড়ি রায় দিয়ে দিলেন: হোসাক সাহেব ইতিপূর্বেই জানিয়েছেন আবেদনকারীর কোন চুক্তি নেই। কাজেই চুক্তি থেকে মুক্তি দেবার কোন কথাই উঠতে পারে না। কাজেই আবেদনকারীকে বলে দেওয়া হল সে যদি চায় চাকরী ছেড়ে দিতে পারে। নাটকের এইখানেই যবনিকা পড়লে, কারও কিছু বলার থাকত না। কিন্তু ঠিক পরদিনই হোসাক সাহেবের পক্ষে পীটার গেগাই নামে এক ব্যক্তি খোদাদিনের নামে বিনানুমতিতে পালানোর অপরাধে অভিযোগ আনলেন সেই লেফটেন্যান্ট ব্রাউনের আদালতেই। আর আইনের কি বিচিত্র দুর্গতি। কি নিরপেক্ষ বিচার। অবিলম্বে ব্রাউন সাহেবের সই করা খোদাদিনকে আটক করার আদেশ বেরিয়ে গেল। সাক্ষ্য সাবুদ কায়েম। অনতিবিলম্বে বিচার এবং সেইদিনই সেই ব্রাউন সাহেবের এজলাসেই তার সাত দিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ। নেহাৎ হোসাক সাহেব নিজেই তাকে লঘু শাস্তি দেবার কথা বলেছিলেন তাই, নয়ত খোদাদিনের খোদাবন্দ বিচারক মশায় তাকে কোন নরকে নিক্ষেপ করতেন কে জানে?

একজন সহৃদয় আসামী ভদ্রলোক এই মামলার পরামর্শদাতা মণিপাল বড়ুয়া(?) দরবারে পাঠিয়েছিলেন পূর্ণ বিচারের আশায়। কিন্তু সরকারী কালো হিজাব সেখানেও সক্রিয়। সেই কাগজপত্র আসামের চিফ কমিশনারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল তাঁর মতামতের জন্য। চিফ কমিশনার সেই সব কাগজ আসামী ভদ্রলোককে ফেরত পাঠিয়ে ব্যাপারটার পূর্ণ বিবেচনার যে কিছুই নেই সেই কথাই জানিয়ে দিলেন। নাটক কিন্তু আরও গড়াল। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এই ঘটনাটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সরকার আবার তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যাপারে আবার নাড়াচাড়া হতে শিবসাগরের ডেপুটি কমিশনার হুকুম দিলেন খোদাদিনকে তাঁর সামনে হাজির করাতে। কিন্তু কোথায় খোদাদিন? লোকটা নাকি নিরুদ্দেশ। দ্বারকানাথ এই করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে লিখছেন: গেল কোথায় মানুষটা। তার কি হল—এ খবর জানবার অধিকার আছে সাধারণ মানুষের এবং সরকার তার কর্তব্যকর্মে গুরুতর অবহেলার জন্য দায়ী হবেন যদি না তিনি এই অনুসন্ধান পর্ব অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে চালিয়ে যান।

অবশ্য কিছুই কিছু হয়নি। খোদাদিনকে ইতিহাস আর খুঁজে পায়নি, কিন্তু অসংখ্য এই সব খোদাদিনের কাহিনী কি গভীর অভিনিবেশ সহকারেই না লিপিবদ্ধ করে গেছেন দ্বারকানাথ এবং সমস্ত সমস্যাটা আইনের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা যে কতটা হাস্যকর সেটাও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। আঠারশ ঊনসাট সালের এ্যাক্ট তের অনুযায়ী কুলিদের সঙ্গে কোন চুক্তি লিখিত বা মোহরযুক্ত, এমন কি রেজিস্ট্রি করারও দরকার নেই। নেই কোন সরকারী প্রতিনিধির কাছে, তার যাথার্থ প্রতিষ্ঠিত করার বা চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি যে চুক্তির শর্তাদি সেগুলি তার পক্ষে যতই ক্ষতিকারক হোক না কেন, বুঝেছে—তা প্রমাণ করার। আঠারশ বিরাশি সালের নতুন যে এক আইন হল কুলিদের সম্বন্ধে তাতে কিন্তু ঊনসাট সালের আইনটাকে বাতিল করা হল না। চা-কর সাহেবরা এই সব নতুন আইনে যাবেন কেন? তাঁরা ঝামেলা বাঁচাতে সেই পুরোনো আইনেরই গাড় ওয়ের দল এর আশ্রয় নিতে থাকবেন না কেন? কিন্তু আইন এত নির্লজ্জভাবে চাকরদের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও কুলিরা কোর্টে গেলে এবং তাদের মনিবদের দোষ একটু এই যে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দ্বারকানাথ লিখছেন, এ রকম বহুগুলি মামলা দায়ের হয়েছিল, তার একটা পরিসংখ্যান তিনি খোঁজ করে ছিলেন কিন্তু একমাত্র কোর্টের রেকর্ড ছাড়া সেগুলি পাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু রেকর্ডও তো সাধারণের অবগতির জন্য নয়, কাজেই তাঁর চেষ্টায় কোন ফল হয়নি। তবে আঠারশ চুরাশি সালের দশই অক্টোবর থেকে বাইশে ডিসেম্বর—এই তিন মাসে ডিব্রুগড়ের জেলার এই পরিসংখ্যানে জানা যাচ্ছে, এই রকম তিনটি কেস হয়েছিল এই সময়ে। কালীচরণ ব্যানার্জি বনাম টি ই হুবার্ট, ভাজোর মাঝি বনাম গাড সাহেব এবং রামলাল দে বনাম ফড সাহেব। অভিযোগ: বেআইনী আটক মারধর ইত্যাদি। হুবার্টের সাজা তিরিশ টাকা জরিমানা, গাডের চল্লিশ এবং ফডের পনের। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল এক বছরের জেল কিংবা হাজার টাকা জরিমানা। কিন্তু সাহেব ত। নামে মাত্র হল তাদের জরিমানা।

অথচ কুলিকামিন হলে কি হত? দ্বারকানাথ সেই পার্থক্যটাই স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। কেঁচোও তো মাঝে মাঝে ফণা তোলে। এও সেই কাহিনী। অত্যাচার, জুতো-লাথি, বেত সইতে না পেরে বাউলিয়া চা বাগানের ম্যানেজারকে তাঁর বাংলোতে ঘেরাও করে রেখেছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা। কত আর সয়। আশু কারণ ছিল একটা দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে কুলিদের সামনে চাবুক মারছিল সাহেব। কোর্ট-কাছারি হল। ম্যানেজারের সাজা হল দুশ' টাকা। উপর আদালতে আবেদনে জরিমানা কমে হল পঞ্চাশ টাকা। আর ঘেরাও করা কুলিদের নেতাদের অন্ততঃ ডজনখানেকের হল সশ্রম কারাদণ্ড—তিন দিন থেকে এক বছর। চিনাকাঁড়ি চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার সাহেবকেও ঘেরাও করেছিল কুলিরা। কামিনরাও এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল। কারণটা একটা বাবুর সঙ্গে কুলিদের কলহ। মেয়েদের ধমক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল কোর্ট। কুলিদের এক মাস করে জেল। মেমাইজাগা চা বাগানের দুজন রাজপুতের কথা বলেছেন দ্বারকানাথ। আড়কাঠিরা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যেহেতু তারা একটু লিখতে পড়তে জানে, জাত উঁচু, সেহেতু সর্দারির কাজ তাদের বাঁধা। তারা সঙ্গে এনেছিল বুড়ো মা এবং আরও কয়েকজনকে। কিন্তু চা-বাগানের এবড়ো খেবড়ো পার্বত্য জঙ্গল আর রাজস্থানের উষ্ণ বালুভূমি ত এক নয়। আড়কাঠিদের প্রতিশ্রুতি যে মরুভূমির মোহময়ী মরীচিকার চেয়েও মিথ্যা এ জ্ঞান যখন তাদের হল, তখন আর কিছুই করার নেই। কিন্তু দুই রাজপুত কুলি অত সহজে বশ মানার বান্দা নয়। বুড়ী মাকে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে তারা পালাল। কিন্তু আসামের জঙ্গল ত একটা গোলকধাঁধা। ভুলভুলাইয়া। আর ম্যানেজার রবিনসন। তাদের পালানোর খবর পেয়েই তাদের পিছু ধাওয়া করে গেলেন। এবং ধরেও ফেললেন। দুটি যুবক ও এক বৃদ্ধ নারী। রাজপুত চিৎকার করে উঠল, কাছে এলে খতম করে ফেলব। তাদের হাতে রাজপুতের টাঙ্গি। রবিনসন বললেন, তোমাদের হাতে টাঙ্গি আমার হাতে রিভলবার। বাড়াবাড়ি করলে গুলি করে তোমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ভয় দেখানোর জন্য সাহেব আশে পাশে ফাঁকা আওয়াজও করলেন। কিন্তু রাজপুতেরা অচল অটল। বললে, 'তাই কর'।

দ্বারকানাথ বলছেন, মানুষ কি যন্ত্রণায় চা বাগানের চেয়ে মৃত্যুকে অধিকতর অভিপ্রেত বলে মনে করে, সে প্রশ্ন কি কেউ কোনদিন করবে না? কুলিদের উপর প্রথম অত্যাচার চাবুকের—চাকরদের খানসামাদের খা-সাহেব থেকে সর্দার সবাই অবাধে চালাত। গায়ে বেঁধে চাবুক ত আকছার ঘটনা। কশাঘাতে চামড়া কেটে রক্ত পড়ত। কখনও ডেকে আনত মৃত্যু।

এরকম মৃত্যুর ঘটনার কথা সিভিল সার্জেনের বক্তব্যসহ রিপোর্ট করেছেন তিনি। আর এক ধরনের অত্যাচার—চা-বাগানের হাজতখানায় আটক। এগুলো চা বাগানের ব্ল্যাক হোম। পলাতক বা বেয়াড়া কুলিদের এই উষ্ণ বন্ধ ঘরে ভাজা হত। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও কেউ এক ফোঁটা জল দিত না। এবং যখন তাদের যন্ত্রণা হত অসহ্য, তাদের কাতর আর্তনাদ শোনার লোক কেউ কোথাও থাকত না।

ক্ষান্ত ডোমনীর কথা কি বলা হয়েছে? তাকে শিবসাগরের এক চা-বাগানের ম্যানেজার এডওয়ার্ড পিগেস বেইজ্জত করেছিল। ক্ষান্ত আর তার স্বামী ব্রহ্মপুত্র চা বাগানের বড় সাহেব হোমস সাহেবের কাছে এই নিয়ে নালিশ করল। সাহেব বললেন, তিনি যখন এবার বাগানে যাবেন, এর যা হয় একটা বিহিত করবেন। কিন্তু উল্টে ক্ষান্ত ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করার জন্যে নাজেহাল হয়ে গেল। এমনি কত ক্ষান্তর কথা। তেজপুরের ডেপুটি কমিশনারের কাছে এসে এক বৃদ্ধ কুলি বললে, হুজুর, আমার যুবতী মেয়েটাকে নতুন চুক্তি করতে জোরজবরদস্তি করছে। হুজুর এই চুক্তি খারিজ করার ব্যবস্থা করুন। কমিশনার সাহেব তাকে তাড়িয়ে দিলেন। গোপনে ম্যানেজারকে চিঠি লিখে দিলেন, এই ধরনের অপ্রিয় কাণ্ড যেন না করে। কে কার কথা শোনে। কিছুদিন পরে বুড়ো আবার হাজির। হুজুর বাঁচান! কমিশনার ত তাজ্জব! এত বেলাল্লাপনা ম্যানেজারের? কিন্তু করবেনই বা কি? বৃদ্ধকে আবার তিনি ফিরিয়ে দিলেন। সেই যুবতী কন্যার পরের কাহিনীটুকু বলার কি আর দরকার আছে?

অসংখ্যাবিধ ম্যানেজারবাবুদের কথাও এসে পড়েছে। পার্বত্য উপজাতি মিকির ও মিরি মেয়েরা সুন্দরী। মিকির মেয়েরাই বেশী সুন্দরী। কিন্তু পার্বত্য এলাকা থেকে সমতলে তারা বিশেষ নেমে আসত না। কাজেই অবিবাহিত ম্যানেজার মাত্রেরই রক্ষিতা থাকত একটি মিরি মেয়ে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে শহরের এজেন্টদের বাজারে পাঠান হত। সাহেবের জন্যে একজন মিরি মেয়ে কেনবার জন্যে। এছাড়াও ছিল সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালী মেয়ে। এরা নাচগানে আসক্ত। সাহেবদের বাড়ীতেও নাচতে আসে। আর সেখানে চলে মদের তুফান। মদ খেয়ে মাতাল সাঁওতাল মেয়ের সতীত্ব কানাকড়ি মূল্যে বিকিয়ে যায় সাহেবদের লালসার আগুনে। এই নিয়েও কত মামলা। এইচ বোস নামে এক চা-বাগানের ম্যানেজারকে লাঠির ঘায়ে হত্যা করার অপরাধে বাবু থানুরাম দাসের সাজা হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি! বোসসাহেবের রক্ষিতার সঙ্গে বাবু থানুরামের কি নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় রক্ষিতা অত্যন্ত অপমানিতা বোধ করে এবং সাহেবকে বলে এর বিহিত করতে। কি? আমার বিবির অপমান? ক্রুদ্ধ সাহেব রক্তচক্ষু হয়ে থানুরামকে ডেকে বললে, 'খা খা আমার বিবির পায়ের জুতোয় চুমু খা। থানুরামের ত এ অসহ্য। সাহেবের পায়ে ধরতে রাজি। কিন্তু সাহেবের রক্ষিতার? বাবু অনুরাম দাসও অধিকতর ক্রোধের সঙ্গে সামনে রাখা একটি লাঠি তুলে নিয়ে তাই দিলেন এক ঘা সাহেবের মাথায়। সাহেবের মূর্চ্ছা ও মৃত্যু।

আরও এক কাহিনী। ফ্রান্সিস সাহেবের রক্ষিতা যশোদার সঙ্গে আর এক কুলি রমণীর হল তুমুল লড়াই। মেয়েদের কোন্দল। কাক-চিল বসা বন্ধ হয়ে গেল। এবং রণরঙ্গিণী দুই কুলবালাকে থামাতে সাহেবের প্রবেশ রণরঙ্গিণী যশোদার কক্ষে চাবুক হাতে: অনভিলক্ষ্যে তার আঘাত পড়ল যশোদার প্রতিপক্ষের উপর। এবং অচিরে তার মৃত্যু ঘটল। সাহেব দায়রায় সোপর্দ হলেন।

দ্বারকানাথ অত্যন্ত মমতার সঙ্গে সযত্নে এই কুলি কাহিনীর আর একটা বিষাদাচ্ছন্ন দিক উদ্ঘাটিত করেছেন। সেটা শিশু শ্রমিকদের বা কুলি ধাওড়ায় শিশুদের দুরবস্থার কাহিনী। অন্তত আটটি সন্তানের জনক দ্বারকানাথের পিতৃহৃদয়ে সকল শিশুর জন্যই অসীম এক মমতার প্রস্রবণ সর্বদাই প্রবাহিত হত। শিশুদের জন্য গল্পের বই—সবই পাঠ্য-পুস্তক নয়—রচনার পিছনে দ্বারকানাথের সংবেদনশীল পিতৃহৃদয় কথা কয়ে উঠত। শোনা যায় এক বন্ধুর ছেলেটিকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। হঠাৎ ছেলেটি মারা যাওয়ায় এই মৃত্যু তার হৃদয়ে শেল সম বেঁধে। অনেককাল এই শোক ভুলতে পারেননি। শুধু কাঁদতেন আর অনাহারে থাকতেন। সেই দরদী দ্বারকানাথ কুলি বস্তিতে শিশুদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরবেন, এ আর নতুন কথা কি?
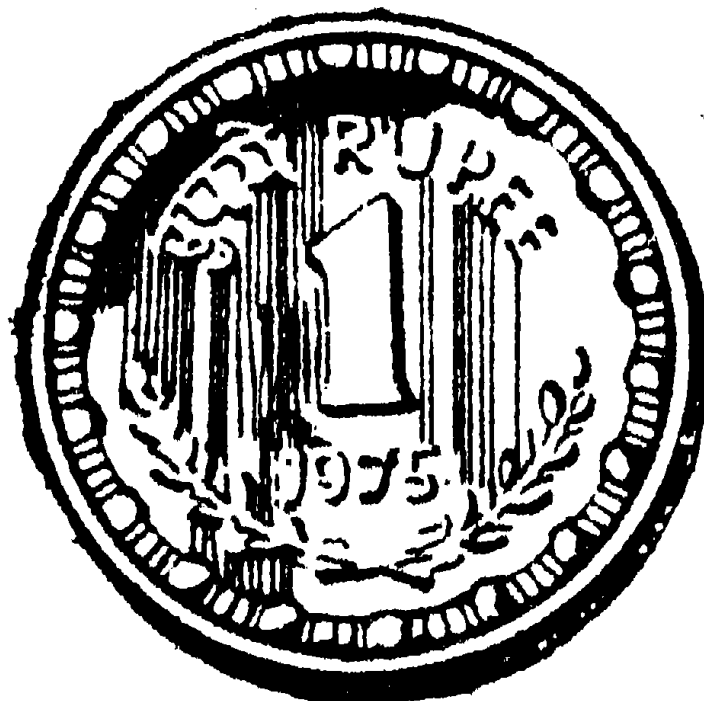
দ্বারকানাথের প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেই যুগেও কখনও তিনি যুক্তি ছাড়া কথা বলেন নি। আবেগপ্রবণ মানুষ তিনি, কিছু বা অসহিষ্ণুও এবং কুলিদের উপর অত্যাচারের অবাধ প্রবাহ প্রত্যক্ষ করে তাঁর মত লোকের পক্ষে ভাবাবেগে বিচলিত হয়ে পড়া আশ্চর্যের কিছু হত না। কিন্তু আসামের কুলি জীবনের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তাতে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকের মত, কখনই তথ্যানুগ কাহিনী ছাড়া কিছুই লেখা হয় নি। এ এক বিস্ময়কর সাংবাদিক সংযম। কুলি বস্তিতে শিশুদের জঘন্য পীড়াদায়ক অবস্থার কথা বলতে গিয়েও তাঁর এই সংযম অক্ষুণ্ণ ছিল। মোটামুটি দুটি কিস্তিতে তিনি এই বিবরণ সম্পূর্ণ করেছিলেন। শুরুতেই তিনি দেখিয়েছিলেন কুলি বস্তিতে সাধারণ নরনারীর মৃত্যুহার যখন কমের দিকে—১৮৮২ সালে প্রতি হাজারে ৩৯-৭ জন; ৮৩ সালে হাজার করা ৩৪-৩ জন এবং ৮৪ সালে প্রতি হাজারে ৩২-২ জন তখন শিশুদের মৃত্যুহার ১৮৮৩ সালে হাজার করা ৩৯-৭ জন থেকে বেড়ে ৪৪। শিশুর মৃত্যুর হার যে বেড়েছে ১৮৮৪ সালের রিপোর্টে চীফ কমিশনার নিজেই তা স্বীকার করে বলেছেন, একই সময় নিজের কাজ করে মহিলা কুলিরা তাদের সন্তান-দের যত্ন করতে পারে না। অপর দিকে কাজ না করে বাড়িতে থাকার বিলাসিতা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' ফল—এই শিশু মৃত্যুর উচ্চহার। দ্বারকানাথ প্রশ্ন তুলেছেন, এই রকম যে কুলি ধাওড়ার অবস্থা, এ কথা সরকার কেন জানান না এই পরদেশী কুলিদের? যখন তারা চুক্তিপত্রে সই করে—তখন তাদের কেন বলা হয় না আমাদের চা বাগানের কি জীবন তাদের সন্তানদের জন্য অপেক্ষা করছে? এটা কি সরকারের নৈতিক দায়িত্ব নয়? দ্বারকানাথ শিশু সম্বন্ধে জোড়হাট চা কোম্পানীর সিনিয়ার মেডিকেল অফিসার ডক্টর গ্রের অভিমত তুলে দিয়েছিলেন। সিন্নামারা চা বাগিচা একটি অনাদৃম উৎকৃষ্ট চা বাগান। এখান-কার কুলি ধাওড়াও মোটামুটি উন্নত। পাকা লাইন, ভাল জল সরবরাহ, কাছেই বড় বাজার। খাস বাগানেই দোকান। কিন্তু এমন কি এখানেই আঠারশ চুরাশি সালে শিশুমৃত্যু হার বেশ বেশী।

ডাক্তার গ্রে বলেছেন, শিশু মৃত্যুহার বৃদ্ধির কারণ ইনফেন টাইন টাইফো ম্যালেরিয়ান জ্বর। জ্বর সেবার এপিডেমিকের রূপ ধারণ করেছিল। এই জ্বরের সঙ্গে থাকে অত্যধিক স্নায়ুর অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গের গোলমাল। আগস্ট থেকে নভেম্বর এই চার মাসে যখন তাপ প্রবাহ খুব বেশী থাকে—তখনই এই রোগের প্রকোপ বাড়ে। এই যখন একটা উৎকৃষ্ট বাগানের ছবি, তখন সাধারণ অপকৃষ্ট অন্যান্য বাগিচার দুঃখের কাহিনী শোনবার জন্য কল্পনার আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। জুলাই মাসে যখন নিদারুণ দাবদাহ কিংবা প্রবল বর্ষার ধারা স্নান তখন কামিনের দল দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলবার সময় আর পিঠে তাদের শিশুসন্তানকে বহন করতে সাহস করে না। বাড়ীতেও তাদের দেখবার কেউ থাকে না। এই অনাদরের মধ্যেই এই রোগের প্রকোপ বাড়ে।

তবে বড় 'ইংরেজ' ছোট 'ইংরেজ' আছে ত। নাগাধাত চা-বাগান পরিদর্শন করতে এসে শিবসাগরের ডেপুটি কমিশনার-এর কেন যে বাসনা হল, তিনি কুলিবস্তীও দেখবেন। বাগান-কর্তৃপক্ষ কি আর করেন। তাঁরা সঙ্গে গেলেন। এবং একটি কুলির ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কমিশনার সাহেবের কানে কয়েকটি শিশুর কান্নার শব্দ এসে থাকবে। উঁকি মেরে দেখেন তিনটি ছোট ছোট হাড়-চামড়ার মর্মন্তুদ পুঁটলি 'পিটি এবল লিটল পারসেন্স অব স্কিন এন্ড বোন।' চা-বাগিচার ম্যানেজার বললেন, স্যার, কিছু ভাববেন না, 'আমি এদের জন্য অবশ্যই 'পালিকা মাতার ব্যবস্থা করে দেব।' কমিশনার চলে যাবার পর ম্যানেজার সাহেব তাঁর কথা রেখেছিলেন কিনা ঈশ্বর জানেন।' ডিব্রুগড়ের সিভিল সার্জেন বলেছিলেন: চা-বাগিচার শিশুজীবন এতই অস্বাস্থ্যকর, যে এতগুলি শিশু এখনও যে জীবিত আছে, এটাই আশ্চর্য। প্রসব হওয়ার পর হয় শিশুটিকে পিঠে বেঁধে বাগানে নিয়ে যেতে হবে, নয়ত বাড়ীতে ফেলে রেখে যেতে হবে। এছাড়া করবে কি মা? পিঠে নিয়ে গেলে ঝড়, জল হু-হু করে বয়ে যাওয়া শীতের বাতাস তার কোমল দেহের উপর দিয়ে নির্বিকারে বয়ে যাবে। একটু তাকে দেখতে গেলে সর্দারের চাবুক কিংবা গালি—কিছুর হাত থেকেই তার দুঃখিনী মায়ের রেহাই নেই। আর বাড়ীতে রেখে গেলে গড়িয়ে পড়ে যাবে বিছানার নীচে, কিংবা আগুনে কিংবা ড্রেনের ময়লা জলে। কিংবা অর্ধাশনে মরবে। এবং অর্ধাশনে থেকেই পেট খারাপ। চা-বাগিচার কামিনরা এই কারণেই গর্ভপাতের পক্ষপাতী। ছেলে পিঠে করে মা কুলির কাজের মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়ে দ্বারকানাথ লিখছেন,

> 'Such a scene is not uncommon in a tea garden, for the nature in the midst of bustle and hurry to fly off to her work, herself tearing off from has bosom the little darling whose sleepy head was on her shoulders, and whose small soft arms trustingly clung her neck. The child raises its piteous cry, but the mother with tears in her eyes turns her back towards it and hasten, to work; and she does so in order to scape the unceremonious kick of her master with his hoby nailed boots."

ছোট্ট সোনামনি তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার ছোট্ট কোমল হাত-দুটি পরম প্রত্যয়ে জড়িয়ে ছিল তার গলায়। পিঠ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ীতে ফেলে রেখে তাড়াহুড়ো, সাত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মা দ্রুত পায়ে তার কাজে ফিরছে—চাবাগিচায় এমন দৃশ্য আকচার বলতে পারেন। বাচ্চাটা কাতর কণ্ঠে তারস্বরে কাঁদতে থাকে। কিন্তু মা সজল চোখে সেদিকে নজর না করে কাজে ফেরে। বলা বাহুল্য তার মনিবের নাল-মারা বুটসুদ্ধ লাথি এড়াতে।

এরই পরিণতি হয়েছিল এত শিশু-মৃত্যু! চিকিয়াজুলি চা-বাগিচার জিতান কামিন এই অপরাধে জেলে পচছে। তার শিশু-সন্তানের অসুখ। কিন্তু সাহস করে তাকে নিয়ে কাজে যেতে বা কাজে না গিয়ে ঘরে থাকতে—কোনটাই সাহস করনি জিতান। মনিবের লাথি বা চাবুক কে খাবে? শিব-সাগরের ডকটর গ্রে এই কথাটাই বলেছিলেন তাঁর প্রতিবেদনে। এখানের অতিরিক্ত শিশু-মৃত্যু—কলেরা বা অন্য অসুখে—তার মূল কারণ হল তার পিতামাতার যত্নের অভাব।

নাটকটা জমিয়ে তুলতে কি দ্বারকানাথ শেষে আড়কাঠিদের বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকাণ্ডের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন? তেমনি এক কাহিনী কেশুর সিং-এর। দার্জিলিং-এর মংপু পোস্টঅফিসের দশ টাকা মাইনের পিয়ন কেশুর সিং। চড়াই-ওতরাই-এর পার্বত্য পথ। নেপালী পিয়ন কেশুর ভাবত আর পারা যায় না। একটা ভালো চাকরী জোগাড় হলে এই কষ্টকর চাকরিকে লাথি মেরে চলে যাবে সে। কিন্তু চাকরি তো গাছের ফল নয় যে পেড়ে খাবে। খোঁজাখুঁজি করতে হবে। কয়েক দিন ছুটি নিয়ে কেশুর এল শিলিগুড়ি। সেখানে এসে লছমন সিং জমাদারের ভায়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল।

সে বললে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে আসাম যাবে। তার দাদা সেখানে মস্ত চাকরি করে। আর সাহেব-সুবোদের সঙ্গে তার কি খাতির। বলতে কি সাহেবরা তার দাদার কথায় ওঠে বসে। তার দাদকে বলে কেশুর সিংকে পনের কুড়ি টাকা মাইনের একটা চাকরি করে দেওয়াটা কোন বাহাদুরির [illegible] নয়। আর যায় কোথা? কেশুর সিং 'টপ করে' টোপটা গিলে নিল। কাল বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি চলে গেল মংপু। চাকরি দিল ছেড়ে। এবং সস্ত্রীক চলে এল শিলিগুড়ি। এবং সেখান থেকে জলপাই-গুড়ি। এখানে একেবারে খোদ লছমন সিং এর সঙ্গে মোলাকাৎ। সেখান থেকে রেলে ধুবড়ী রেলের ভাড়া পাঁচ টাকা অবশ্য কেশুরকে দিতে হয়েছিল। ধুবড়ী এসেই ধীরে ধীরে স্বপ্ন ভাঙতে সুরু হল মংপুর পিয়ন কেশুর সিং-এর। কুলি খেডে বাবু এসে তাকে দুটো কুর্তা, দুটো ধুতি, একটা কম্বল ও একটা টিনের মগ দিয়ে গেল। কেশুর সিং ছিল ইজ্জতওলা সরকারী কর্মচারী। এসব কি নেবে সে? কভি নেহী। হটাও। জমাদার লছমন সিং এসে হাজির। কি ব্যাপার? বোঝালে, আরে এসব সরকারের দেওয়া শিরোপা। এসব কখনও না বলতে নেই। লছমন অবশ্য রেলের ভাড়া দেওয়া টাকা পাঁচটা ফিরিয়ে দিল কেশুরকে। কিন্তু

শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা যায়? তেজপুরগামী স্টিমারে, চাপতেই কেশুরের আর বুঝতে বাকী রইল না সে 'এমিগ্রান্ট'—পরদেশী কুলি। কেননা, বাগিচার ডাক্তারবাবু একটা জলের চৌবাচ্চা দেখিয়ে বললে, এইখান থেকে জল খাবে, খবরদার অন্য কোথা থেকে নয়। কিন্তু কেশুর সিং না হিন্দু? মুসলমানের ভরা জল সে খাবে? সে কি জাত খোয়াবে নাকি? সেও নেপালী ব্রাহ্মণ। অত সহজে এই সব মানবে না সে। স্টিমারের বহু লোকের মধ্যে একজন কৌতুহলী হয়ে সব জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কেশুরকে। এবং তেজপুর নেমে এক উকিলকে ধরে জোর করে কেশুরকে 'কুলি' করার বিরুদ্ধে কমিশনার সাহেবের কাছে এক দরখাস্ত করালে। কেশুর বললে, সে লেখাপড়া জানে। সই করতে জানে। তার সই করা চুক্তিপত্র দেখান হোল কোন সাহেবই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। ঘোড়ায় চেপে একটা সাহেব একবার ঘুরে গিয়েছিল মাত্র। ধুবড়ীর সিভিল সার্জেন বললে হ্যাঁ হ্যাঁ কেশুর সিং কোমনে আছে। তার স্ত্রীর উদ্ধত যৌবন, আকর্ষণীয় রূপ এখনও মনে আছে তার। তার সই-এর জায়গায় একটা দাগ ছিল বটে। তবে সই মনে তো হচ্ছে না। কিন্তু কিছুই কিছু হল না। তেজপুরের চাবাগানে কেশুর আর তার যুবতী স্ত্রী কুলি কামিন হয়ে গেল। কেউ রুখতে পারল না। কাজেই আড়কাঠিরা কেশুর সিংকে ভুল বুঝিয়ে, জোর করে, অহেতুক চাপ সৃষ্টি করে এই কাজে ঢুকিয়ে ছিল। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই লিখেছেন দ্বারকানাথ। তিনি একটা বড় প্রশ্ন তুলেছেন, কেউ কি সোনার দশ টাকা মাইনে চাকরি ছেড়ে অর্ধেক মাইনের চাকরিতে ঢোকে? জোর জবরদস্তী আড়কাঠির ভুল বোঝানো নয়ত কি? এই প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ সাহেবদের কুলি মামলার বিচারের প্রহসনের কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। গেলাকি চাবাগিচার ম্যানেজার ওয়ালিং কালিরেনের বেটা শিবচরণকে তার বাবার অমতে বাগানে আটকে রেখেছিলেন। বিচারক পি সি লায়ন বললেন, ছেলেটা যে চুলোয় যায় যাক, গেলাকি চা-বাগিচার ম্যানেজার সাহেব আর তাকে বাধা দেবে না। তবে এই সামান্য ব্যপারে আমি ওয়ালিং সাহেবকে বিরত করতে পারব না। বুঝুন বিচারের বহর খানা। এমনি বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদার অজস্র দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন দ্বারকানাথ 'বেঙ্গলীতে' তার ধারাবাহিক প্রতিবেদনে। সঞ্জীবনী রিপোর্টগুলো পাওয়া গেলে আরও কত বিচিত্র সব কাহিনী সেকালের বাঙ্গালী মন ভারাক্রান্ত করেছিল, সে সব খবর পাওয়া যেত।

ইতিমধ্যে অবশ্য কয়েকটা মস্ত ঘটন দেশকে আলোড়িত করেছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের আন্দোলনের পালের হাওয়া কেড়ে নিতেই ধুরন্ধর রাজনীতিক লর্ড ডাফরিন হিউমকে দিয়ে এই খেলা খেললেন। আঁচরে সেখানেও পৌঁছে গেলেন দ্বারকানাথ। কিন্তু তার মূল ক্রিয়াকান্ড থেকে সরে গিয়ে নয়। সরজমিনে, নিজের জীবনের পরোয়া না করে, কুলি জীবনের করুণ কাহিনী তদন্ত করেই, দ্বারকানাথ থেমে যাননি। সাংঘাতিক কুলি আইন সংশোধিত করার এক শপথ নিয়ে তিনি আরও দশ বছর এই নিয়ে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। আসামে ঘুরে আসার পরই মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি কুলিদের এই দুর্দশার কথা তুলে প্রস্তাব আনতে চাইলেন। কিন্তু কংগ্রেস তখন মডারেটদের দখলে। তাঁরা সরাসরি ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষে আসতে চাইলেন না। তাঁরা সমস্যাটা এড়িয়ে গেলেন। যুক্তি দিলেন, এটা সর্বভারতীয় ব্যাপার নয়, বাংলাদেশের ব্যাপার কেবল মাত্র। কাজেই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিচিত্রন মেমআর্স-এ লিখেছেন:

> 'it was ruled out of order on the ground that it was a povincial subject.'

কংগ্রেসে তেমন জুৎ করতে না পেরেও দ্বারকানাথ দমলেন না। তিনি বলতে চাইলেন, তা কেন হবে? কুলি কি শুধু বাংলাদেশ থেকে যায়? হাজার হাজার কুলি যে সুদূর বোম্বাই-মাদ্রাজ থেকে আসে, একথা তো তিনি আগেই বেঙ্গলী কাগজে তুলে ধরেছেন, তবু এরা কেন এই সমস্যাটাকে বাংলাদেশের সমস্যা বলে একটা আঞ্চলিক দৃষ্টিতে দেখতে গেল? কিন্তু মাদ্রাজ কংগ্রেস তাঁকে ফিরিয়ে দিল। পনের বছর অকটোবরের ২৫-২৬-২৭ তিন দিন ধরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার যখন অধিবেশন হল কার্তিকের হিম পড়া কলকাতায় দ্বারকানাথ সেখানে তার অগ্নিগর্ভ ভাষণে আবার নতুন করে তুলে ধরলেন এই দুঃখী মানুষগুলোর বেদনার ডালি। বললেন, অপহৃত মানবতায় এই দুঃখ-দুর্দশা আপনারা দূর করুন। এই মানুষদের ব্যথা আপনারা অনুধাবন করুন। এতে শুধু বাঙ্গালীর কথা নয়।

কংগ্রেসে গিয়ে যে দ্বারকানাথ লড়েছিলেন একেবারে শুরু থেকেই সে কাহিনী বলেছেন বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি তখন ট্রিবিউনে। পনের দিনের ছুটি নিয়ে গেলেন মাদ্রাজ কংগ্রেসে। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। তিনি পুণা হয়ে গেলেন। সেখান থেকে উঠলেন নামযোশী। কলকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশনে যেভাবে কংগ্রেসের কাজ কর্ম পরিচালনা করা হয় তাতে বাংলাদেশ খুবই অসুখী ছিল। এভাবে সব ব্যাপারটা হিউম সাহেবের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলবে, বাংলা ও মহারাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটরা সেটা ভালো চোখে দেখেননি। মাদ্রাজ কংগ্রেসে ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা হল। বাংলাদেশ থেকে সেবারে প্রতিনিধি গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মুখ্যত ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ, ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা হাইকোর্টের ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, বিহারের নেতা গুরুপ্রসাদ সেন এবং দ্বারকানাথ ভারত সভার সহকারী সম্পাদক। এরা সবাই থাকতেন একই বাংলোতে। সুরেন্দ্রনাথ হিউম সাহেবের বাংলোতে গিয়ে সব কার্যসূচী স্থির করে এলেন। আর ফিরতেই তাঁদের ঘিরে ধরলেন, দ্বারকানাথ-বিপিন পালের দল। সুরেন্দ্রনাথই বলে থাকবেন কর্মসূচী ঠিক হয়ে গেল। ব্যাস আর যায় কোথা? দ্বারকানাথ প্রমুখরা জিজ্ঞাসা করলেন, কে ঠিক করল। উত্তর হল—আমরা। প্রতি প্রশ্ন: আমরা কারা?

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, ডবলিউ সি বোনার্জী, গুরুপ্রসাদ সেন, আমি। আবার প্রশ্ন হল বাংলাদেশের সবায়ের হয়ে তাঁদের এই অধিকার কে দিল? কঠিন প্রশ্ন। সুরেন্দ্রনাথ বুঝলেন, বড় বেকায়দায় পড়েছেন। বললেন, কর্মসূচীর মুসাবিদা ড্রাফটা কাল সকালে আপনাদের বিচার ও মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেবেন।

তা তিনি দেননি। এবং দ্বারকানাথের নেতৃত্বে বাংলা দলের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। বিপিন পালের ভাষায় কোন খসড়া কর্মসূচী আসেনি এবং বাংলার প্রতিনিধি সাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় দ্বারকানাথের নেতৃত্বে। ব্রাহ্মসমাজ যার তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন বা রাজনীতি—সেখানেই হোক না কেন—সবরকম স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তবে জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর লড়াই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায় টেনে আনলেন। হিংস্র পশু-অধ্যুষিত দুর্দম জঙ্গলঘেরা চা-বাগিচার বুকে যেখানে সাহেবদের দুর্দমনীয় প্রতাপ, আইনের শাসন যেখানে নামেমাত্র মুক্তির পূর্বে মার্কিন নিগ্রোদের চেয়েও বীভৎস সেখানে কুলিদের অবস্থা— সেই নরক রাজ্যের কথা তিনি ভুলতে পারেননি। এই কুলিদের হয়ে এখানেও তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। বললেন, এই কুলি সমস্যা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন নেবুতলার সেই স্বনাম ধন্য ডাক্তার—দ্বিতীয় ধন্বন্তরি—মহেন্দ্রলাল সরকার। এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলেরই লোক, বিপিন পাল মশায়, এই অধিবেশনের প্রথম প্রস্তাবেই বললেন, আসামের কুলিদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য নতুন করে কমিশন চাই। এ বিষয়ে প্রথমে বলবে কে? মহেন্দ্রলাল বললেন, দ্বারীকবাবু তিনি ছাড়া এ ব্যাপারে যোগ্য লোক আর কে আছে? দ্বারকানাথ তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে এই হাজার হাজার ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর জীবনের ব্যথা-বেদনার করুণ বিবরণ দেন সমাবেশে। আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি ইতোমধ্যে। নতুন নতুন কাহিনী জমা হয়েছে অত্যাচারের। চোদ্দ বছরের কিশোর রামকুমার জানা। সাকিম মেদিনীপুর। এখন চোদ্দ বছর ছেলের চুক্তিনামা করার আইন নেই।

(চলবে)

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন

স্বপন ঘোষ

কলকাতার বুকের ওপর দিয়ে যেন এক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছিল। বারাসাত বিদ্রোহের তখন প্রায় শেষ দিক। অন্যদিকে ডিরোজিও আর ইয়ংবেঙ্গল সমাজ জীবনকে তোলপাড় করে চলেছে। প্রাচীন ও নবীনের এক সংঘাতময় যুগে, ১৮৩৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার মণ্ডলঘাট পরগণার নারিগ্রামে (বর্তমানে হাওড়া জেলার আমতা থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে) মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জন্ম। প্রায় দুশো পণ্ডিত এই বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। গোপিকামোহন ভট্টাচার্য বলেছেন 'তিনি রাঢ়ীয় বন্দ্যঘটী বংশীয় ভাগবত টীকাকার শ্রীধর স্বামীর অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। মহেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও বংশগৌরব এত বিখ্যাত ছিল যে নারিট, নিকারা, শিয়াখালা, হরিপাল প্রভৃতি জায়গায় মহেশ ন্যায়রত্নের গোষ্ঠী নামে এক বিরাট পণ্ডিত সমাজ গড়ে উঠেছিল।

মহেশচন্দ্রের বাবা হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের মেজ দাদা ঠাকুরদাস চূড়ামণি হাতিবাগানে একটি টোল খুলে বিখ্যাত হন। হরিনারায়ণের বড়দাদা গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। মহেশচন্দ্রের ঠাকুরদাদা হীরারাম তর্কচূড়ামণি সম্পর্কেও কোন হদিশ করা সম্ভব হয়নি। (গোপীকামোহন ভট্টাচার্য সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ১৮৫৮-১৮৯৫ দ্বিতীয় খণ্ডে মহেশচন্দ্রের ঠাকুরদাদার নাম হীরারাম তর্কশিরমণি উল্লেখ করায় বিস্মিত হয়েছি, কারণ মহেশচন্দ্রের বংশপত্রিকা এদের বংশধরদের কাছে নারিটের ভট্টাচার্য নামে যে ছাপানো বিরাট তালিকা আছে তা দেখেই হীরারাম তর্কচূড়ামণি উল্লেখ করলাম।)

মহেশচন্দ্র প্রথমে মেজ জ্যাঠামশাই-এর কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়াশুনো করেন (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান বঙ্গে নব্য ন্যায়চর্চা বইতে মেদিনীপুর ঘাটালের কাছে রসিকগঞ্জ গ্রামে ঠাকুরদাস চূড়ামণি নামে এক নৈয়ায়িক পণ্ডিতের কাছে বার বছর বয়সে ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন)। বিভিন্ন জায়গায় তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছি পড়াশুনো ছোটবেলায় করেছিলেন জ্যাঠামশাই-এর কাছেই।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন যখন সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক, তখন মহেশচন্দ্র ন্যায় ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র শেখেন তাঁর কাছেই। বিদ্যাসাগরও জয়নারায়ণের ছাত্র ছিলেন। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট তিনি অলংকারশাস্ত্র পড়েছিলেন। কাশীতে বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর কাছেও অনেক শাস্ত্রের পাঠ নেন। পড়াশুনো শেষ করে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপাধি পান।

১৮৬১ সালে কাওয়েল ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। কাওয়েল মহেশচন্দ্রকে অস্থায়ী অধ্যাপকের কাজ দিলেন। ১৮৬৪ সালে একশ টাকা মাইনেয় অলংকার-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কার্যভার নেন। ১৮৮৫ সালে ১ মে হলেন স্থায়ী অধ্যক্ষ। এই পদে তিনি ১৮৯৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কাজ করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁর মাইনে ছিল বারশো পঞ্চাশ এবং অবসর নেবার পর পেনসন ছিল ৪১৬ টাকা ১০ আনা ৮ পাই। গোপীকামোহন ভট্টাচার্য সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে যে সমস্ত মাইনের হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে—

মহেশচন্দ্র মাহিনের তালিকা

পদ	বেতন টাকা
সহ-অধ্যাপক	৭৫-
অধ্যাপক অলংকার	১০০-
অধ্যাপক অলংকার এবং অস্থায়ী অধ্যাপক, দর্শন	১৫০-
ঐ ঐ	১৮০-
অধ্যাপক অলংকার	১৮০-
ঐ এবং অস্থায়ী অধ্যাপক দর্শন	১৭৪-
অধ্যাপক, দর্শন ও অলংকার	১৭৪--৫০০-
অস্থায়ী অধ্যক্ষ	৬০০-[illegible]
অধ্যক্ষ	৯৫০-[illegible]

কার্যকাল

কার্যকাল
১০ জানুয়ারী ১৮৬৪ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪
২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪ থেকে ৭ ডিসেম্বর
৮ ডিসেম্বর ১৮৬৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬
১ মার্চ ১৮৬৬ থেকে ৬ মার্চ ১৮৬৬
৭ মার্চ ১৮৬৬ থেকে ১৮ জানুয়ারী ১৮৬৯
১৯ জানুয়ারী ১৮৬৯ থেকে ২৭ মে ১৮৭০
২৮ মে ১৮৭০ থেকে ৩১ জুলাই ১৮৭৭
২০ মার্চ ১৮৭৭ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৮৮৫
১ আগষ্ট ১৮৮৫ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫

দেখা যাচ্ছে, সেই যুগে মহেশচন্দ্রের রোজগার কম ছিল না। সংস্কৃত কলেজে অনেক সংস্কার এবং বহু জনহিতকর কাজ করেছেন সে সমস্ত কথা গোপীকামোহন ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন। পুরাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, বৈদিক শ্রেণী, চতুষ্পাটি শিক্ষার নব রূপায়ণ। পরীতে সংস্কৃত পরীক্ষার ব্যবস্থা, মহেশচন্দ্রের চেষ্টায় ১৮৮৭ সালে প্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৮১ সালে সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। হিন্দুমেলা ও জাতীয় স[illegible] সংগে যোগ ছিল।

সর্বদর্শন সংগ্রহ ১৮[illegible], কবুসুমাঞ্জলি তাৎপর্য বিবরণ ১৮৬[illegible] [illegible]

সংবৎসরের মীমাংসা ১৮৭৩, প্রবেশিকা সমালোচনার ভ্রমদর্শিনী ১৮৯১, সন্ধিপূজার সময় নির্ণয় ও পঞ্জিকার ইতিবৃত্ত ১৮৯১। দৃকসিদ্ধমূলক পঞ্জিকা সংস্কার ১৮৯৩। পন্ডিতগণের অভিনন্দনপত্র ও মহেশচন্দ্রের উত্তর ১৮৯৬। এই সমস্ত বই তিনি লিখেছিলেন এবং কিছু কিছু সম্পাদনা করেছিলেন।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী :—কাব্যপ্রকাশ ১৮৬৬। গদ্য সংগ্রহ ১৮৬৮। মীমাংসা দর্শন ১৮৬৩—৮৭ তৈত্তিরীয় সংহিতা ১৮৭২—৯৪। পদ্য সংগ্রহ ১৮৮৫।

এই বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে আজ আর বিশেষ কিছু জানবার মত কোন তথ্য বা বই নেই। গোপীকামোহন ভট্টাচার্য সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ডে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও সংস্কৃত কলেজ না লিখতেন তবে এই মহাপুরুষের একাডেমিক কেরিয়ার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যেত। সংসদ বাঙালী-চরিতাভিধানে এবং সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত সরল বাঙ্গলা অভিধানে এত অল্প কথায় মহেশচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা দিয়ে কোন কিছু গবেষণা করা সম্ভব নয়। আরও দুচারটি বই মহেশচন্দ্রের সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ আছে। সব থেকে আশ্চর্য লেগেছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও লিখিত সাহিত্যসাধক চরিতমালার একশো একটি বই উনিশ শতকের এবং তারও আগের বহু নামী ও অনামী সাহিত্যসাধকের জীবনচরিত প্রকাশ করা হলেও মহেশচন্দ্রের কোন জীবনী কেন লেখা হলো না। গোপীকামোহন ভট্টাচার্য ও আরও যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কেউ মহেশচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন কি না কোন উল্লেখ করেননি।

ডঃ সুকুমার সেন, শ্যামবাজারের কাছে ন্যায়রত্ন লেনের হদিস বলে দিতেই একটা আশার আলো দেখতে পেলাম। ন্যায়রত্ন লেনে এগারো নম্বর বাড়িতেই বেরিয়ে পড়লো মহেশ ন্যায়রত্নের বংশধরদের পরিচয়। এখানে যে সমস্ত তথ্য পেলাম সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। মহেশচন্দ্রের বিরাট ফটো ঐ বাড়িতে দেখেছি। এর পর ওরা জয়ন্তী দেবীর সংগে দেখা করতে বলেন। এই বাড়ির পাশেই উনি থাকেন তবে ওই পাশের রাস্তার নাম হয়েছে মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রীট। মহেশচন্দ্রের বড় ছেলের নামে ঐ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। মন্মথনাথ প্রথম অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। সংসদ বাংলা চরিতাভিধানে মন্মথনাথ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে যা দেওয়া আছে তা হচ্ছে এই—'জন্ম ১৮৬৩ সালে নারীট হুগলী। পিতা বিখ্যাত পন্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মন্মথনাথ সংস্কৃত কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন। বিদ্যারত্ন উপাধি পান। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিতে এম. এ পাশ করেন। ১৮৮৫ সালে কলিকাতায় ডেপুটি কন্ট্রোলার হন। সরকারের হিসাব বিভাগে চাকরি নিয়ে কলিকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে নিযুক্ত থাকেন। ১৯০৮ সালে পাঞ্জাবের অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল হন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই উচ্চপদ লাভ করেছিলেন'।

এই তথ্য থেকে অন্তত মহেশচন্দ্রের বড় ছেলের জন্ম বছর পাওয়া গেল। তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় মহেশচন্দ্রের তিন ছেলের মধ্যে বড় ও ছোট বাইরে চাকরী করতেন। ছোট ছেলে মহিমানাথ আবগারী বিভাগের অফিসার ছিলেন। মেজ ছেলে মণীন্দ্রনাথ ওকালতি করতেন। মেয়ে মনোরমা সম্পর্কেও কোন হদিস নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বিয়ের পরে মনোরমা মুখোপাধ্যায় জানা যায়।

সম্ভবত অবসর নেবার পর শ্যামবাজারে বাড়িতে নাতি, নাতনীদের নিয়ে এক সংগে খেতে বসতেন। দাদুর হাতের মাখা ভাত খাবার জন্য প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করে থাকতো। অতো বড়ো পন্ডিত এবং সেই যুগে কলকাতার বুকে বসে যিনি নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছিলেন, মানুষ হিসাবে মনটা তাঁর কতো সরল ছিল এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

গাছের ফুলকে মহেশচন্দ্র খুব ভাল বাসতেন। গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তাঁর সৌন্দর্য নষ্ট করতে চাইতেন না। আবার সব কিছু ভুলে গিয়ে বাস্তব থেকে দূরে সরে যাননি। প্রত্যেক ছেলেকে তিনি সত্যিকারের মানুষ তৈরি করেছিলেন। এমন কি নাতিদের পর্যন্ত যতটা সম্ভব ভালভাবে গড়ে তোলবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

সত্তর বছর বেঁচে থেকে তিনি যে কতো কাজ করে গেছেন, তার হিসাব দেওয়া আজ এক শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ে তাঁরই উদ্যোগে হয়েছিল। ইডেন হিন্দু হোস্টেল নির্মাণে মহেশচন্দ্র প্রধান উদ্যোগী এবং অনেক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সময় মহিষাদলের রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গকে দোতালার ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য করান। ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়টকে এই হোস্টেল দেখাতে নিয়ে এসে উত্তরদিকের নতুন বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

আমরা যাকে ব্রাহ্মণ পন্ডিত বলি সেই সমাজ থেকে তিনি এসেছেন। কিন্তু কোন গোঁড়ামি যেমন তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, তেমনি সমাজ বিদ্রোহী হবার চেষ্টাও করেননি। ইংরেজী না শিখিলে পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডার অপূর্ণ থেকে যাবে, এই চিন্তা করে তিনি কাওয়েলের কাছ থেকে ইংরেজী শিখতেন এবং কাওয়েলকে সংস্কৃত শেখাতেন। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য যেমন তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন, তেমনি ইউরোপীয় চিন্তা ও চেতনা তাঁর মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতো। একদিকে নাস্তিক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে যেমন তাঁর সম্ভাব ছিল, তেমনি টোলের পন্ডিতদের সংগেও তিনি যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।

এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়, ১৮৮১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী অমৃতলাল দে সম্পাদিত 'নিউজ অফ দি ওয়ার্লড' সাপ্তাহিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সার নরেন্দ্রনাথ লাহার সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্তি বই-এ দ্বিতীয় খন্ডে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 'কলিকাতায় সম্প্রতি আমরা এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে দৃশ্য আর কিছুই নহে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে পন্ডিতগণের এক বিরাট সভা। সভার উদ্দেশ্য কয়েকটি শাস্ত্রীয় সমস্যার মীমাংসা। সভায় ন্যূনাধিক পাঁচশত লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় তিনশত শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত। পন্ডিতগণ মেঝেতে না বসিয়া সকলেই চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিলেন। কলিকাতার হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুগণের প্রধান, প্রধান প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—মাননীয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, রাজা হরেকৃষ্ণ বাহাদুর, সঙ্গীতাচার্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, চারুচন্দ্র মল্লিক, কানপুরবাসী মুন্সী বংকবিহারী বাজপেয়ী, জামনারায়ণ তেওয়ারী, রায় বদ্রিদাস মুকিম বাহাদুর, শেঠ নাহরমল, শেঠ হংসরাজ, লালা চূড়ামল প্রভৃতি। পন্ডিতগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, পন্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন (নবদ্বীপ), পন্ডিত সুব্রহ্ম শাস্ত্রী (বারাণসী), পন্ডিত রামধন তর্কপঞ্চানন (যশোহর), পন্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি (বহরমপুর), পন্ডিত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন (ভট্টপল্লী), পন্ডিত তারকনাথ তর্করত্ন (বর্ধমান), পন্ডিত গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন (গুপ্তিপাড়া), পন্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি (কলিকাতা) এবং পন্ডিত উমাকান্ত ন্যায়রত্ন (জনাই)। দুঃখের বিষয় দুইজন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অসুস্থতার জন্য এই সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এই সভার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন *

মনে করা যেতে পারে সেই সময় কোলকাতায় এই ধর্মসভা কিরকম তোলপাড় করেছিল। নামের তালিকা থেকে অনুমান করা যায় সহরের মুৎসুদ্দি শ্রেণী ও ভারতের পন্ডিত সমাজ এই সভায় যোগদান করেছিলেন।

এই বিরাট সভার উদ্বোধন করেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। বেদের কয়েকটি অর্থ নিয়ে পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্যাখ্যায় দক্ষিণ ভারতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়াতে এই সভায় মতামত গ্রহণ করা হয়। তারানাথ তর্কবাচস্পতি সুচিন্তিত মত সমস্ত বাংলা দেশের পক্ষ থেকে দেন।

প্রশ্ন করেন পন্ডিত রামসুব্বা শাস্ত্রী,

বাংলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে বলেন মহেশচন্দ্র। উত্তর দেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

প্রশ্ন : বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বা বেদের মন্ত্রভাগ সংহিতাভাগের মত গ্রহণীয়, প্রামাণিক ও অখণ্ডনীয় কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, গ্রহণীয়, প্রামাণিক ও অখণ্ডনীয়।

প্রশ্ন : বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা, শ্রাদ্ধক্রিয়া, জাতক্রিয়া তীর্থদর্শন শাস্ত্রানুমোদিত কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ শাস্ত্রানুমোদিত।

প্রশ্ন : ঋগ্বেদ-সংহিতায় 'অগ্নিমীলে, পুরোহিতম'-এর প্রতিপাদ্য দেবতা কে? অগ্নি না ঈশ্বর?

উত্তর : অগ্নি।

প্রশ্ন : যজ্ঞ করা হয় কেন? বায়ু ও জল বিশুদ্ধ করিবার জন্য অথবা স্বর্গলাভের জন্য।

উত্তর : স্বর্গলাভের জন্য।

এই বিবরণের শেষে মন্তব্য করা হয় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অক্লান্ত পরিশ্রমে সভার কার্য খুবই সফল হইয়াছিল।

ঊনিশ শতকের কলকাতার বুকের ওপর মহেশচন্দ্র একটা ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। আজকের দিনেও এমন সভা করা যে কতো শক্ত যাঁরা সংগঠন করেন তারাই বুঝতে পারবেন। তবে একথা বলতে পারা যায় মুৎসুদ্দি শ্রেণীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মাখামাখি ঊনিশ শতকে খুব বেশি ছিল।

হিন্দুদের বিলেত যাওয়া নিয়ে একটি সরকারি কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন মহেশচন্দ্র, কমিটি রায় দেন যে, হিন্দুদের বিলেত যাওয়া নিয়ে জাতিচ্যুত করা শাস্ত্রবিরোধী কাজ। বহু লোক সেই সময় তাঁর কাছে আসতেন বিভিন্ন পরামর্শের জন্য। কতো মানুষকে তিনি যে কতোভাবে উপকার করেছেন তার কোন তথ্য আজ আর খোঁজ করলে পাওয়া যাবে না। সংস্কৃত কলেজের নতুন রূপ দেবার যে বিরাট পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার অনেকখানি বাস্তবে সম্ভব করে তুলেছিলেন। বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এই মানবটির কাছে মাঝে মাঝে পরামর্শের জন্য আসতেন। অনুসন্ধানে জানা যায় নস্করীটের গ্রামে মহেশচন্দ্রের বাড়িতে বিদ্যাসাগর কয়েকবার এসেছিলেন। শ্যামবাজারের বাড়িতেও যে এসেছিলেন সে তথ্য পাওয়া গেছে। আজও সংস্কৃত কলেজের ভেতরে মহেশচন্দ্রের বিরাট প্রস্তরের মূর্তি বসান আছে। শ্যামবাজার ট্রামডিপোর পেছনে মহেশচন্দ্রের নামে রাস্তার নামকরণ হয়েছে 'ন্যায়রত্ন লেন'। পিতা ও পুত্র এই দুজনের নামে পাশাপাশি রাস্তার নামকরণ হয়েছে, এমন অদ্ভুত যোগাযোগ বড় একটা দেখা যায় না। সাত নম্বর বাড়িতে জয়ন্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করলাম। এই মহিলা মহেশচন্দ্রের মেজছেলে মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বড় ছেলে মোহিতকুমারের মেয়ে। তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে ১৯০৬ সালে মহেশচন্দ্র মারা যান।

জয়ন্তীদেবী অনেক আলোচনা করে শেষে একটি কবিতার বই আমাকে দেন। এই কবিতার ছোট্ট বইটি মণীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন মহেশচন্দ্র মারা যাবার পর 'বন্দনা, শ্রীচরণে ও মা'। এই কবিতার বইটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বইটির শেষে যে টীকা দেওয়া আছে, সেগুলি সত্যই অসাধারণ, তাই থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি।

কৃষ্ণকমলের সঙ্গে মহেশচন্দ্রের মেলামেশা ছিল এ তথ্য পেয়েছি। কিন্তু কতটা মেলামেশা ছিল? দ্বিতীয় তথ্য বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'এ বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্রে প্রকাশিত এক চিঠিতে দেখতে পওয়া যাচ্ছে, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ সালে বিদ্যাসাগর কোলকাতায় এসে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মারা যান ১৩ শ্রাবণ ১২৯৮। মৃত্যুর দুমাস আগে কেন বিদ্যাসাগর মহেশচন্দ্রের শ্যামবাজারের বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁর স্পষ্ট কোন তথ্য বিনয়বাবু দেননি।

মনে প্রশ্ন দেখা দিল, এগারো নম্বর ন্যায়রত্ন লেনের বাড়ির ইতিহাস বার করতে হবে। কবে এই বাড়ি মহেশচন্দ্র কা[illegible] ছিলেন? একদিন 'পুরশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক সমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে [illegible] করি। সমরেশবাবু যে নির্দেশ দিলেন সেই অনুসারে একদিন ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে 'কিপ অফ রেকর্ড' সেকসনে হাজির হই। ওখানকার কর্মীদের সাহায্য ভোলবার নয়। কোলকাতা করপোরেশনের অনেক বদনাম থাকতে পারে, কিন্তু করপোরেশনের এই বিভাগটি মুগ্ধ করেছে। এখানকার খাতাপত্রের রেকর্ডে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ইং ১৮৭৪ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারি গোপালচন্দ্র মুখার্জির কাছ থেকে দোতলা বাড়ি এবং কিছু কুঁড়ে ঘর সমেত মহেশচন্দ্র এই বাড়িটি কেনেন। তখন ওই রাস্তার নাম ছিল কৃষ্ণরাম বসু লেন। ১৮৮০ সালে বিল্ডিং সেংসানের জন্য দরখাস্ত করা হয়। তখনকার করপোরেশন ভ্যালু ছিল ১৬৮ থেকে ২৪০। কোয়াটার ট্যাক্স ছিল দু টাকা এগারো আনা। ১৯০৬ সালে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও মহিমানাথের নাম কেটে মনোজচন্দ্র, মোহিতকুমার ও থাকোমণি দেবী করা হয়।

এরপর রেকর্ড থেকে দেখতে পেলাম ১৮৯৬ সালে ১৭ জানুয়ারী ১৮৫নং মানিকতলা স্ট্রীটের বাড়ি (বর্তমান নাম রমেশদত্ত স্ট্রীট) পাঁচকড়ি দাসীর নামে কেনা হয়। হরগোবিন্দ বসাক ঐ বাড়ির মালিক ছিলেন। কলকাতা করপোরেশনের কিপ অফ রেকর্ড সেকসন থেকে এই তথ্য দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। শ্যামবাজার থেকে মহেশ ন্যায়রত্ন এইখানে আসতেন।

বাংলা ১৩১২ সালের ২৯শে চৈত্র ইং ১৯০৬ সালে মহেশচন্দ্র মারা যাবার প্রায় পাঁচ বছর বাদে ১৩১৭ সালে এই বন্দনা নামে কবিতার বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই কবিতার বইটি স্যার বিজয়চাঁদ মহতাবকে উৎসর্গ করা হয়। বইটির ভূমিকায় মণীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 'এই পদ্য ১৩১৩ সালের প্রারম্ভে রচিত হয়। সন ১৩১৪ সালে প্রুফের অবস্থায় ইহার কয়েক খণ্ড আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরিত হয়। ঐ সালের পৌষ মাসে 'কাশীধামে পিতৃদেবের পরম স্নেহাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ইহা পঠিত হইলে তাঁহারা উভয়েই ইহা মুদ্রিত করিতে বলেন এবং এক একখণ্ড করিয়া পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এই ভূমিকা থেকে এবং অন্য সূত্র থেকে জানা যায় ১৩১৩ সালে কাশীর বাড়ির অস্তিত্ব ছিল। ভূমিকায় আরও বলা হয়েছে 'এই যে স্থানে স্থানে টীকা না দিলে লেখকের মনোভাব ঠিক বুঝা যায় না, তজ্জন্য টীকা সংকলিত করিয়া পদ্যটা মুদ্রিত হইল।' টীকায় মণীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি যেদিন অবসর গ্রহণ করেন, ঐ দিনই কাশীযাত্রা করেন, কিছুদিন তথায় অব[illegible] করিয়া একটা বাটী ক্রয় করিয়া [illegible]কাতায় প্রত্যাগত হয়েন। কাশীতে শীতকালে কখনও বা বর্ষাকালের শেষভাগে থাকিতেন।'

১৮৯৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মহেশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে কাজ করেছিলেন। তারপরই কাশী গিয়ে বাড়ি কিনেছেন বন্দনা কবিতার বইতে টীকায় শুধু এইটুকু উল্লেখ দেখে আমি রহস্যের গন্ধ পেলাম ছোট্ট বইটি বার বার পড়ে টীকাগুলি পর পর সাজিয়ে শুধু এই তথ্য পেলাম কাশীর বাড়ির নাম ছিল 'রত্নধাম'। নামটি মণীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। আরও জানা যায় 'মহেশচন্দ্রের কাশীর বাড়ির বাগান 'গোলাপ, চন্দ্রমল্লিক প্রভৃতি নানা পুষ্পে সুশোভিত থাকিত। মহেশচন্দ্রের আদেশ ছিল যেন কেহ পুষ্পগুলি চয়ন করিয়া বাগানের শোভা নষ্ট না করেন।' বাড়ির সামনে যখন ফুলের বাগান ছিল, তখন অনুমান করা যায় ফুলবাগান সমেত এই বাড়িটি বেশ বড় ছিল, আর সেই যুগে ১৮৯৫ সালে কাশীর জায়গা বাড়ি দারুণ শস্তা ছিল আর মহেশচন্দ্রের হাতে তখন প্রচুর পয়সাও ছিল। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৯ বছর। শেষ দিনের মাইনা যখন তিনি তুলেছিলেন ১২৫০, তার উপর ছিল আরও বহু পাওনা ও বকেয়া টাকা অন্তত বেশ কয়েক হাজার (কত হাজার তা আজ আর বলা সম্ভব নয়) কাশীর বাড়ি কেন তিনি কিনলেন হঠাৎ, অন্তত তিন ছেলের মধ্যে দুই ছেলে ভাল রোজগার করছেন বলে জানা যায়। নাতি, নাতনীরাও ছিল, তবু তিনি কাশীর বাড়ি কিনে বছরের বেশ কয়েক মাস ওখানে থাকতেন? অনুসন্ধানে জানা যায় মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে, স্ত্রী

মন্দাকিনী দেবীর মৃত্যু হয়। অনুমান সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নেবার কয়েক বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯০ সালের আগে, পরে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মুনীন্দ্রনাথ পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ৮টি পাতায় ১২টি ভাগে পদ্য লিখেছেন এবং টীকা দিয়েছেন ৬ পাতায় ৪৬টি। মায়ের উদ্দেশ্যে ৪ পাতায় ৮টি ভাগে কবিতা লিখেছেন কোন টীকা দেননি। ক্রাউন সাইজে আর্টপেপারে সুন্দর ছাপা বইটি এত তথ্য দেওয়া সত্ত্বেও মা মন্দাকিনী দেবীর মৃত্যুর তারিখ কেন দেওয়া হয়নি এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। শুধু এইটুকু বলা হয়েছে 'বাস্তবিকই স্নেহের সাগর মহেশচন্দ্র তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে জানিতে দেন নাই যে তাহারা মাতৃহীন হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের শোক সম্বরণ করিয়া সমধিক স্নেহ বর্ষণ করিয়া পুত্রকন্যাদিগকে শোক সম্বরণ করিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন।' অনেক অনুসন্ধান করেও মন্দাকিনীর মৃত্যুর তারিখ আমি জোগাড় করতে পারিনি। ডঃ সুকুমার সেন আমাকে বলেছেন সেই যুগে বামুনের ঘরের ছেলেদের কুড়ি বছরের নীচে বিয়ে হত। তাহলে ১৮৫৬ সালে যদি ধরে নিই মহেশচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল এবং বড় ছেলের জন্ম ১৮৬৩। তিন ছেলে ও এক মেয়ে গড়ে দু বছরের ব্যবধান রেখে যদি ধরা যায় এবং টীকায় এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে মেয়ের বিয়ে হয়নি। এবং মেয়েই শেষ সন্তান। মেয়ের বিয়ে যদি পনের বছরে হয়ে থাকে তাহলে ১৮৭০ সালে মেয়ের জন্ম এবং আরও পনের বছর যোগ করলে ১৮৮৫ পর্যন্ত হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। করপোরেশনের কিপ অফ রেকর্ড থেকে জানা যায় ১৯৮০ সালে নতুন প্ল্যানের জন দরখাস্ত করা হয়। নিশ্চয় কোন ছেলের বিয়ের জন্যই এই প্ল্যানের দরখাস্ত করা হয়ে থাকবে। ১৮৯০ সালের আগে পরে মন্দাকিনীর মৃত্যু হয়েছে। টীকায় 'বৃদ্ধ বয়স' বলা হয়েছে অর্থাৎ মনে হয় চল্লিশ বছর বয়সকেই সাধারণত বৃদ্ধবয়স বলা হয়ে থাকে। আরও একটা ব্যাপার ধাঁধায় ফেলেছে তা হচ্ছে টীকায় কাশীর বাড়ি কোন মহল্লায় তার উল্লেখ নেই।

সামনে এখন দুটো পথ খোলা। মহেশচন্দ্রের জন্মস্থান নারীট এবং কাশী। প্রথমে নারিট যাওয়া ঠিক করলাম। একদিন সকালে হাওড়া থেকে মিনি বাসে করে আমতা বাজারের কাছে নেমে আমতা বার্তার সম্পাদক সুজিতকুমার রাণার সঙ্গে দেখা করি। সুজিতবাবু আমার সঙ্গে প্রায় মাইলখানেক হেঁটে এলেন দামোদর নদের বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে একটা রিকসা করে দিলেন এবং গাজীপুরে রবীন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ শীল ন্যায়রত্ন বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার। এই বিদ্যালয় মহেশচন্দ্র স্থাপনা করেছিলেন। গাজীপুরে রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করি।

রবীন্দ্রবাবু আমায় বলেছেন 'এই বিদ্যালয়ের আমি ছাত্র ছিলাম। ১৮৮৫ সালে এই স্কুল স্থাপিত হয়, প্রস্তরফলকে লেখা আছে। মহেশচন্দ্র এই রাস্তাও করে দিয়েছিলেন। এখনও এই রাস্তার নাম ন্যায়রত্ন রোড।' আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার বয়স এখন ৪৮, আমি আর কতটুকু জানবো, তবে শুনেছি কোন এক ইংরেজ অধিপতির বন্দনা করতে মহেশচন্দ্র পঞ্চপ্রদীপ জেলে করেছিলেন।' রবীন্দ্রবাবুর এই তথ্য নারীট গ্রামে আরও কয়েকজন আমাকে বলেছেন। এরপর রবীন্দ্রবাবু আমাকে অজিতকুমার ভট্টাচার্যর (খোকনবাবু) সঙ্গে দেখা করতে বলেন। গাজীপুর থেকে আরও মাইল দুয়েক মাটির রাস্তা পার হয়ে অজিতবাবুর বাড়িতে এলাম। অতি সজ্জন ব্যক্তি। এই অজিতবাবুরা মহেশচন্দ্রের জেঠামশাইদের বংশধর। দীর্ঘসময় ধরে আমার সঙ্গে আলোচনা হয়। ছাপানো বিরাট বংশলতিকা আমাকে দেখলেন। বিশাল বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। কিন্তু কোন প্রয়োজনীয় তথ্য বা জনশ্রুতি আমাকে দিতে পারলেন না। বললেন 'আমার বয়স এখন ৭৬ বছর মহেশচন্দ্রের ছেলেদের আমি ভালভাবে দেখিছি। মহেশচন্দ্রের লক্ষ্মীপুজো বিরাট করে হতো। দুর্গাপুজায় বহু লোককে খাওয়ান হতো। একবার এক চাকর কিছু চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়।

মহেশচন্দ্র দেখলেন এতে এর চলবে না, তাই আরও বেশি করে জিনিস দিয়ে দিলেন' এই জনশ্রুতিটি ওই গ্রামে আরও কয়েকজনের মুখে শুনেছি।

এবার কাশী যাওয়া স্থির করলাম। অনেক পণ্ডিত সমাজের বাস, বহু বাঙালী বহু পুরুষ ধরে কাশী বাস করছেন নিশ্চয় কোন জনশ্রুতি উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

কাশীতে গিয়ে আমার কাজ হল (১) অতি বৃদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত খুঁজে বার করা। (২) ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করছেন এমন নবীন গবেষক অথবা খুব প্রবীণ নৈয়ায়িক। (৩) কাশীর বাঙালী সমাজের খবর রাখেন এমন কোন বৃদ্ধ মানুষ।

প্রথমে বাঙালীটোলায় খোঁজ করলাম। রাস্তায় দেখা হলো এক বৃদ্ধ অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে। শিবশঙ্কর বাজপেয়ী বাংলা বলতে পারেন, আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, আমার বয়স প্রায় ৬৫ বছর রিটায়ার লেকচারার ইংরাজির অধ্যাপক, ডি এ ভি কলেজ, সমস্ত গীতাঞ্জলি আমার জলের মতন মুখস্ত, চলুন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। শিবশঙ্করবাবু ১২৭ গণেশ মহল্লায়, অহীভূষণ ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে গেলেন। অহীবাবুর বয়স প্রায় ৭০ বছর মনে হলো আমার কথা শুনে অহীবাবু বললেন, 'নারীটের মহেশ ন্যায়রত্ন সম্বন্ধে সামান্যই জানি, কোথায় কাশীতে বাড়ি করেছিলেন বলতে পারবো না, এমন কোন জনশ্রুতি ও আমার জানা নেই, যাতে আপনার সাহায্য হতে পারে। অহীবাবু এরপর আমাকে সংগে লোক দিয়ে কয়েক জায়গায় পাঠালেন।

এরপর জঙ্গম বাড়িতে যজ্ঞেশ্বর প্রেসের কালীপদ ভট্টাচার্য ও বাসুদেব ভট্টাচার্যর কাছে এলাম এঁরা আমায় একটি
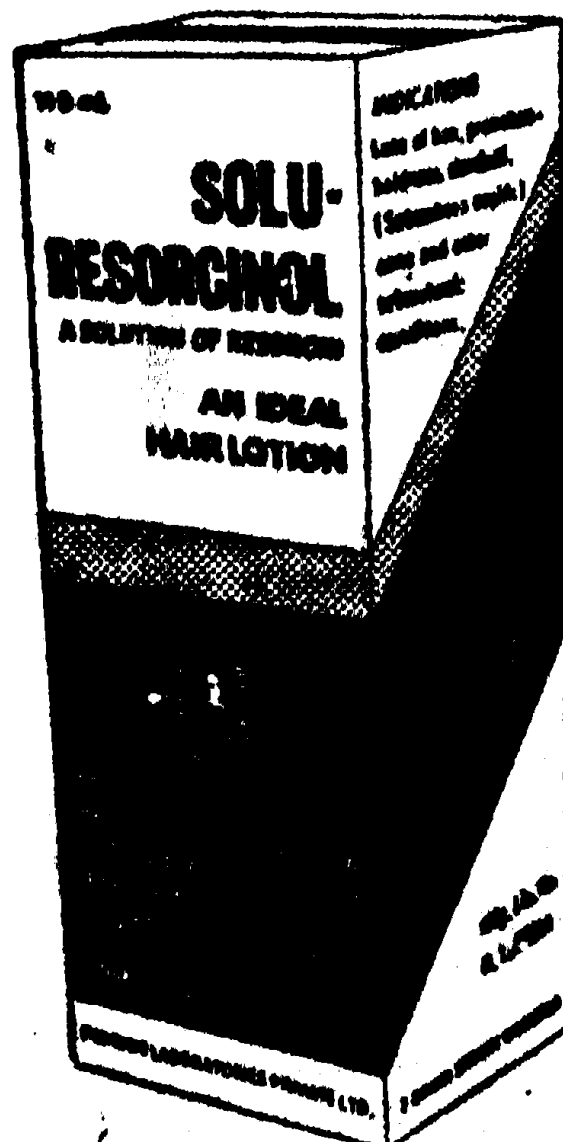
বই দেখতে দিলেন বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় চরিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত।

এই বইতেও এমন কোন হদিস নেই, যা থেকে কাশীর বাড়ির কোন নির্দেশ করতে পারা যাবে। সম্পূর্ণ নিরাশ হলাম। আবার গণেশ মহল্লায় নরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (কাব্যতীর্থ) বয়স ৮২, দেবনাথপুরে তারকনাথ ভট্টাচার্যর কাছে খোঁজ নিলাম। কিন্তু কোন হদিস করতে পারলাম না।

পরের দিন শিবালয়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, গঙ্গামা আশ্রম, ওখানকার সবচেয়ে বনেদী বাড়ি লাহিড়ীবাবুদের কাছে খোঁজ নিলাম কিন্তু কাশীর বাড়ির কোন হদিস করতে পারলাম না।

অথচ মন বলছে এই কাশীর বাড়ির ভেতরে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, কাশীর বাড়ির হদিস অন্তত লোকেশানটাও যদি পাই তবে আমার কাজ অনেকটা সহজ হবে।

মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর বন্দনা কবিতার বইতে ৬নং টীকার উল্লেখ আছে 'অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরের ও অপরাপর দেবালয়ের পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে দেবীর নিজ মূর্তি ও পদদ্বয় দেখাইতে অধিক টাকার জন্য যে উৎপীড়ন করিতেন তাহা মহেশচন্দ্র নিবারণ করেন— অথচ পাণ্ডাগণের প্রাপ্য অর্থপ্রাপ্তিতে সংকোচ করিয়া তাহাদের অসন্তোষ উৎপাদন করেন নাই। তিনি কাশীতে সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন।

এই টীকা থেকে অনুমান করা যায় ১৮৯৮ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে অন্নপূর্ণা মন্দিরের পাণ্ডাদের সংগে মহেশচন্দ্রকে নিয়ে কোন গণ্ডোগোল হয়েছিল।

মণীন্দ্রবাবুর ১নং টীকায় উল্লেখ আছে '৩।৪ বৎসর পূর্ব হইতে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল' ১৯০৬ সালে মহেশচন্দ্র মারা যান, তাহলে ১৯০৩ সালের পর কাশীতে অনেক কম যেতেন অথবা একেবারে নাও যেতে পারেন। এমনি চিন্তা করে অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রধান মহান্তর সঙ্গে দেখা করি। মন্দিরের ঠিক পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে গেলাম। তারপর একটা প্রশস্ত বিরাট হলঘর। ওপরে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। ঘরটা দেখলে যেন মনে হয় আগেকার জমিদার বাড়ির ঘর। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বয়স আন্দাজ ৬০ বছর হবে। নাম বলতে চাইলেন না। খাতায় কোন নোট করতে দিলেন না। অনেক আলোচনা হলো, কিন্তু অন্নপূর্ণা মন্দিরের এই প্রধান মহন্ত কোন হদিস দিতে পারলেন না। কিন্তু আমার মনে হলো তিনি কিছু কথা জানেন। সমস্ত কাশী চষে ফেললাম। কিন্তু [illegible]র কোন হদিস করতে পারলাম না। হাল যখন ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় বিশ্বনাথ গলির কাছে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা নাম কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বয়স [illegible] আমার উদ্দেশ্যের কথা বললাম। কালীকৃষ্ণ বললেন, 'আমি শুনেছি আপনি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নিয়ে এখানে তথ্য খুঁজছেন। কালীকৃষ্ণবাবু ৩।৪ ঘণ্টা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ঘোরালেন। পঞ্চকুট পাতালেশ্বর, এমনি আরও কত জায়গায় পণ্ডিতদের কাছে নিয়ে গেলেন কিন্তু কোন হদিস করতে না পেরে যখন চলে আসছি, কালীকৃষ্ণবাবু বললেন, 'এই শেষ চলুন ছেনীদার কাছে নিয়ে যাই।'

এই ছেনীদা হলেন বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য। বয়স ৮৫ বছর। আমার কথা শুনে বললেন, 'হ্যাঁ নিশ্চয় মহেশ ন্যায়রত্নের নাম আমি বাবার মুখে বহুবার শুনেছি। আমার বাবা তারাচরণ সাহিত্যাচার্য আমাকে ছোটবেলায় ন্যায়রত্নের রত্নধাম বাড়ির গল্প বলেছেন। বাবা ওই বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। সামনে বিরাট ফুলের বাগান ছিল। বাবার গুরু ছিলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ওই বাড়ির কোন অস্তিত্ব আজ আর নেই। পাঁড়ের ধর্মশালা ছাড়িয়ে একটু গেলেই মিছরী পোকরা, তারপর ঈশান ডাক্তারের বাড়ির উল্টো দিকে সতোন ডাক্তারের বাড়ির সীমানা ন্যায়রত্নের বাড়ির মধ্যে ছিল। রমাপুরায় ওই রত্নধাম ছিল। সমস্ত বাগান বাড়ি হেরম্ববাবুর কাছে চলে যায়।'

কালীকৃষ্ণবাবুকে সংগে নিয়ে রমাপুরায় গেলাম। ওখানে এখন নতুন সব বাড়ি হয়েছে। এখানে নির্মলকুমার নন্দী (বয়স ৬০) আমাদের নিয়ে বসালেন। তারপর যা বললেন, '১৯৩২ সালে এই সমস্ত সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। হেরম্ববাবু এলাহাবাদের মিসেস লাহিড়ীর কাছে এই জায়গা বন্ধক রাখেন কিন্তু শোধ করতে না পারায় ১৯৩২ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে নিলাম হয়ে প্লট করে বিক্রী করে দেওয়া হয়।'

বাড়ির হদিস পেলাম। কালীকৃষ্ণবাবুকে ধন্যবাদ। ওই দিনই এলাহাবাদে চলে এলাম। ভারত সেবাশ্রম সংঘে উঠলাম। কয়েক জায়গায় খোঁজ করলাম। কিন্তু কোন হদিস করতে পারলাম না। কলকাতায় ফিরে মহেশচন্দ্রের জীবন নিয়ে একটা চার্ট তৈরি করলাম :-

(১) জন্ম ১৮৩৬ সাল। (২) ৯ বছর বয়সে মহেশচন্দ্রের প্রথম গুরু ঘাটাল নিমতলা নিবাসী বৈয়াকরণ ঠাকুরদাস চূড়ামণির কাছে ছিলেন ১৮৪৫ সালে। (৩) ১৮৫২ সাল (অনুমান) জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। (৪) ১৮৬১ সালে সংস্কৃত কলেজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। (৫) ১৮৮৫ সালে নারিটে ন্যায়রত্ন বিদ্যালয় স্থাপন। (৬) ১৮৯৫ সালে অবসর গ্রহণ।

এবার দেখা করলাম পাকপাড়ায় সুধাকর ভট্টাচার্য বয়স ৮৫। সুধাকরবাবু বললেন, 'আমি একবার ন্যায়রত্ন মশাইকে দেখেছি। আর কিছু বলতে পারবো না' অনেক প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেলাম না, বয়সের ভারে খুব কাহিল হয়ে পড়েছেন।

টবিন রোড শ্যামপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করি, বয়স ৮০ বছর। শ্যামপদবাবু খুব সজ্জন ব্যক্তি। আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শ্যামপদবাবু বললেন, 'আমি তখন খুব ছোট ৫।৬ বছরের বালক। ন্যায়রত্ন মশাই আমাকে জামা পরিয়ে দিতেন এটা বেশ মনে আছে।' বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাপদ আরও জানালেন, 'ন্যায়রত্ন মশাই প্রথমে ইংরেজী কিছু জানতেন না, কাওয়েল সাহেবকে ইংরেজীতে কথা বলে বলে খেতে বলতে - অনুরোধ করেছিলেন এইভাবে সাই শ্যাল ইট ইউ সাহেব শুনে হো হো করে হেসে বলেন, 'সে কি তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে' পরে অবশ্য ন্যায়রত্ন মশাই ভালভাবে ইংরেজী শিখেছিলেন এবং ইংরেজী শেখবার জন্যে শ্যামবাজার থেকে র‍্যামাল স্ট্রীট পর্যন্ত প্রায় রোজ হেঁটে যেতেন' শ্যামপদবাবুর এই তথ্য আরও কয়েক জায়গায় সমর্থিত হয়েছে, এমন কি কাশীতেও এই কথা কয়েকজন বলেছেন, নারীট গ্রামেও অনেকে বলেছেন।

১৯০৩ সাল থেকে তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকে, নীলরতন সরকার, চুণীলাল বসু, বিজয়রত্ন সেন, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সাতকড়ি মিত্র মহেশচন্দ্রকে দেখতেন, কিন্তু কেউ ভালতে পারে নি, এইভাবে হঠাৎ তিনি মারা যাবেন। একমাত্র মেজ ছেলে মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তার কাছে ছিলেন। অন্য দু ছেলে তখন বাইরে থাকতেন কাজের জন্য।

বাংলার নবজাগরণের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ন্যায়শাস্ত্রের অসাধারণ পণ্ডিত নবীন ও প্রবীণের সেতু বন্ধনের প্রতীক ৭০ বছরের কর্মময় জীবনের অবসান হলো এইভাবে। আস্তে আস্তে বাংলার সমাজ থেকে মহেশচন্দ্রের নাম একেবারে মুছে গেল। উনিশ শতকের অনেকের নাম আমরা জানি। তাঁরা সব বিরাট বিরাট পর্বত, কিন্তু অনেক ছোট ছোট টিলা আছে, যেগুলোর গুরুত্বও অসাধারণ। যেগুলোকে অতিক্রম না করলে পর্বতের গুরুত্ব ঠিক বোঝা যায় না। মহেশচন্দ্রকে তাই আজকে বোঝবার কাজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে, তাঁর সাধের আমতা লাইট রেলওয়ে আজও তৈরী হয় নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সমন্বয়ের পথ তিনি যেভাবে দেখিয়েছিলেন, আজও সেই পথের নিশানা আমাদের প্রয়োজন আছে। সংস্কৃত ও ইংরেজি এই দুই ভাষার সমান গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, আজও সেই গুরুত্বের প্রয়োজন রয়েছে। কেমন করে জনহিতকর কাজ করা যায়, তিনি বারে বারে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভারতের মূল ধারাকে তিনি ধরতে পেরেছিলেন, তাই উগ্র সমাজ বিরোধী বা সংস্কারপন্থী হবার চেষ্টা করেন নি। এইখানেই মহেশচন্দ্র [illegible]

চিঠিপত্র

হোমিওপ্যাথি আজও কাজের

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আজ জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করে জনসাধারণের চিকিৎসায় পরিণত হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি ও হ্যানিমান পরবর্তী যুগে এর অগ্রগতির জন্যেই ভারত সরকার হোমিওপ্যাথিকে স্বীকার করে কেন্দ্রীয় হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল গঠন করেছেন এই জনকল্যাণকামী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে। প্রথমেই বলা দরকার যে হোমিওপ্যাথিক গুরুগত বা অভিজ্ঞতার চিকিৎসা নয়। হ্যানিম্যানের বৈজ্ঞানিক মন অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিকিৎসার বিরুদ্ধাচারণ করে চিকিৎসা ব্যবসা পরিত্যাগ করেন কারণ মানুষ হ্যানিমান যখন বুঝলেন যে, রোগীর কষ্টের লাঘবের পরিবর্তে দুঃখের কারণ হয়ে পড়ছেন, তখন তিনি অনুবাদকের কাজ করে দুঃখকষ্টে জীবন অতিবাহিত করতেন। এই রকম সময় ডাঃ কালেনের ইংরাজী মেটিরিয়া মেডিকা জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করার সময় দেখেন যে কালেন সাহেব একটি পাদটীকায় বলছেন যেহেতু সিনকোনা বা কুইনাইন তেতো সেহেতু তা ম্যালেরিয়া বা কম্পজ্বর নিরাময়ে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক হ্যানিমান মানতে নারাজ হলেন কারণ এমন অনেক বস্তুই আছে যা তেতো কিন্তু তাতে তো ম্যালেরিয়া জ্বর নিরাময় হয় না। তাই তিনি নিজে [illegible] সিনকোনা মূল অরিষ্ট খেয়ে দেখালেন যে সত্যিই কম্প দিয়ে জ্বর এলো। তখন তাঁর মনে জিজ্ঞাসা এলো তবে কি ভেষজের রোগ সৃষ্টিকারী শক্তিই রোগ আরোগ্যকারী শক্তি? এই থেকেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মন প্রকৃতির [illegible] নীতির প্রতি আকৃষ্ট হল ও পরবর্তীকালে 'সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরান্টার' হল হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র।

হোমিওপ্যাথিক তিনটি মূল নীতি হলো (১) সদৃশ নীতি, (২) এককালীন একটি মাত্র ওষুধ ও (৩) সূক্ষ্মতম বা ন্যূনতম মাত্রা। প্রকৃতির [illegible] নীতি হলো কোন জীবদেহে একটি দুর্বল গতিশীল ব্যাধি। একটি বলবত্তর গতিশীল ব্যাধির দ্বারা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয় যদি তাদের লক্ষণের সাদৃশ অথচ উৎপত্তির বিভিন্নতা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয় যদি তাদের লক্ষণের সাদৃশ্য অথচ উৎপত্তির বিভিন্নতা থাকে। এই কারণে জীবদেহে যখন প্রাকৃতিক ব্যাধি দেখা যায় তখন এমন একটি ভেষজ প্রয়োগ করা প্রয়োজন যা জীবদেহে সদৃশ লক্ষণ সমষ্টি বলবত্তর কৃত্রিম ব্যাধি সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক ব্যাধিকে দুর্বলতর ব্যাধিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়। তাহলে রোগী রোগমুক্ত হয়ে সুস্থাবস্থায় ফিরে আসে। হ্যানিম্যানের আগে অনেকেই সদৃশ নীতির কথা চিন্তা করেছেন কিন্তু হ্যানিমানই প্রথম ব্যক্তি যিনি রোগের গতিশীলতা ও ওষুধের সূক্ষ্মীকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এককালীন একটি মাত্র ওষুধ প্রয়োগ বিজ্ঞানসম্মত কারণ। সুস্থ মানুষের উপর এককালীন একটি ওষুধ প্রয়োগ করেই ভেষজ পরীক্ষা লব্ধ ফল সংগ্রহ করে মেটিরিয়া মেডিকায় সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এই কৃত্রিমভাবে রোগ সৃষ্টিকারী লক্ষণ সমষ্টিকেই প্রাকৃতিক রোগ লক্ষণের সঙ্গে সদৃশ নীতিতে প্রয়োগ করা হয়। জীবনী শক্তি এককালীন একাধিক ওষুধের দ্বারা ভেষজ শক্তির সম্মুখীন হতে পারে না। অধিকন্তু একাধিক ওষুধের দ্বারা ভেষজ পরীক্ষা করা হয়নি। প্রতিটি ভেষজকে এককভাবে পরীক্ষা করে তাদের নিজস্ব ভেজষ ধর্মকে এককভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। একথা সত্য যে, হ্যানিমান এক সময় একাধিক ওষুধের প্রয়োগের কথা বলেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর ভ্রমাত্মক ধারণা ও ক্ষতিকর ফলাফল বুঝতে পেরে মত পরিবর্তন করে একক ওষুধের পক্ষেই যুক্তি প্রদর্শন করেন। (অর্গানন অফ মেডিসিনের ২১৫ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সূক্ষ্মতম বা ন্যূনতম মাত্রা আজ বিজ্ঞান জগতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। আর্নড স্কালজ নীতিতে হল, প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আনতে হলে ন্যূনতম বা সূক্ষ্মতম মাত্রারই প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথির এই তিনটে মূল নীতির কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন সম্ভব নয়। এই তিন মূল নীতি বজায় রেখে ব্যবহারিক প্রয়োগ কৌশল হ্যানিমান পরবর্তীকালে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে বা এখনও এর আরও উন্নতি গবেষণা সাপেক্ষ।

প্রসঙ্গক্রমে বলি আপনাদের শিরোনাম হোমোপ্যাথি আজও কাজের ভুল কথা এবং জনমানসে হোমিওপ্যাথির প্রতি বিদ্রূপ বলেই মনে হয়। কারণ হোমিওপ্যাথি ও হোমোপ্যাথির মধ্যে অনেক তফাৎ। যেমন হোমিওপ্যাথি [illegible] উৎপত্তি গ্রীক হোমিয়াস—লাইক অর সিমিলার অর হোমোপ্যাথি হল গ্রীক হোমোস—সেম অর অ্যালাইক। তাহলে সদৃশ ও সমান দুটিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর হোমিওপ্যাথদের হোমোপ্যাথ বলাটা কি বিদ্রূপ নয়? বিশ্বাস করি, এটা উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছে।

এবারে লেখকের কথায় বলি, 'বাস্তবে কোন চিকিৎসা পদ্ধতিই বিজ্ঞান সম্মত নয়। সব চিকিৎসা পদ্ধতিই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভর করে।' এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, প্রবন্ধটি খুব হাল্কা করে লেখা হয়েছে। অভিজ্ঞতালব্ধ ও বৈজ্ঞানিক কথা দুটির মধ্যেও অনেক তফাৎ। আমার মনে হয়, প্রবন্ধকার এই যে মূলগত পার্থক্য সেটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। হ্যানিমান মেডিসিন অফ এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ ডিডাকটিভ মেথড অফ লজিক থেকে সরে গিয়ে সিলোজিসম অর্থাৎ ইনডাকটিভ মেথড অফ লজিককেই গ্রহণ করেছিলেন, কারণ কার্য ও কারণের মধ্যে সম্পর্ক যদি না বোঝা যায় তাহলে অন্ধকারে হাতড়ানো ছাড়া আর উপায় কি থাকে। প্রবন্ধকার ও তাঁর পূর্বসূরীরা এই মূল কথা থেকে সরে গিয়ে গবেষণার নামে বিজ্ঞানের কবর খুঁড়েছেন বা খুঁড়ছেন। অন্ধকারে হাতড়ানোর মতন একাধিক ওষুধের সংমিশ্রণ করছেন ও হোমিওপ্যাথির মূল নীতি থেকে সরে গিয়ে পর্যায়ক্রমে ওষুধ ব্যবহার করে জনসাধারণকে সাময়িক উপশম দিয়ে প্রকৃত নিরাময়ে বঞ্চিত করছেন। তাই বলি, জনসাধারণের জন্যই হোমিওপ্যাথি এই কথাটি মনে রেখে অহেতুক গুরুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নিজেদের দুর্বলতাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা বন্ধ করুন, আর মিক্সিজামপ্যাথিকে হোমিওপ্যাথি বলে চালিয়ে জনগণের মনে হোমিওপ্যাথির প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস এড়িয়ে চলুন। হোমিওপ্যাথিতে নিশ্চয় মিশ্রিত ওষুধের প্রয়োজন আছে বলে লেখক যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা নিছক ধান ভাঙ্গাতে শিবের গীত-এর মত। শিক্ষাগত দুর্বলতা এককালীন একটি ওষুধের প্রয়োগ যে চিঠি সম্মত লেখক তা বুঝতে অপরাগ হয়েছেন বলে মনে হয়। 'বিদেশে হোমিওপ্যাথি বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে খরচ বেশী—এ কারণে হোমিওপ্যাথি সাধারণ লোক থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে।' এ যুক্তি ঠিক নয়। সকলেই জানেন হোমিওপ্যাথি জার্মানীতে জন্মেছিল—ফ্রান্সে লালিত-পালিত হয়েছিল এবং আমেরিকা থেকে প্রচারিত হয়েছিল। সেই

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সুযোগ সন্ধানীর দল হোমিওপ্যাথির জনসমাদর দেখে রাতারাতি হোমিওপ্যাথ সেজে হোমিওপ্যাথির মূল নীতি থেকে সরে গিয়ে একাধিক ওষুধের সংমিশ্রণ টনিক ও পেটেন্ট ওষুধ প্রয়োগ করে সেই সব দেশ থেকে হোমিওপ্যাথির প্রায় অবলুপ্তি ঘটিয়েছেন। জড়বাদী মন সূক্ষ্ম তত্ত্বে অবিশ্বাসী হয়ে সাধারণ লোকের থেকে হোমিওপ্যাথিকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এর প্রধান কারণ, ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি যা মানুষের কল্যাণের থেকে নিজের কল্যাণকেই বড় করে দেখেছে। আমাদের দেশও হোমিওপ্যাথির জনসমাদর দেখে একদল ঠাণ্ডা মাথায় রাতারাতি হোমিওপ্যাথ সেজে জনসাধারণকে সত্যিকারের নিরাময় থেকে বঞ্চিত করে অদূর ভবিষ্যতে হোমিওপ্যাথির প্রতি সাধারণ সুপরিকল্পিতভাবে অনীহা সৃষ্টি করার পথ প্রশস্ত করছেন।

লেখক বলছেন, বস্তুত আমার পিতৃদেব আমার নিজের এবং আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী আরও চিকিৎসকের দৈনিক কয়েক শত রোগীর সম্বন্ধে যা অভিজ্ঞতা, তা থেকে আমাদের দৃঢ় ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ঘন ঘন ওষুধ দেওয়া, একাধিক ওষুধ মিশিয়ে পাল্টাপাল্টি করে প্রয়োগ করা দরকার হয় এবং তাতে সুফল পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, এমন কথা বৈজ্ঞানিক হ্যানিমানও জোর করে বলতে পারেন নি। বরং তিনি বলেছেন, 'আমার পদ্ধতিকে পরীক্ষা কর এবং বিফলতাকে প্রকাশ কর। দার্শনিক বেকনের অনুগামী হয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞানে ধারণা বা অভিজ্ঞতার স্থানের সুযোগ খুবই কম কারণ—বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কার্য এবং কারণের সম্পর্ক যদি বোধগম্য না হয় তাহলে আনুমানিক চিকিৎসা নির্ভরশীল জ্ঞান ভেষজের অপপ্রয়োগজনিত ভেষজ ব্যাধি তৈরি করে মানুষের অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখতে হবে এলোপ্যাথিক ওষুধের দ্বারা সৃষ্ট ভেষজ ব্যাধির চেয়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট গতিশীল ভেষজ ব্যাধি আরও তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল যা মানুষকে অবধারিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়ে দূরারোগ্য জটিল ব্যাধির সৃষ্টি করে। এই কথার সত্যতা বিরাট সংখ্যক রোগী যাঁরাই এই ধরণের অপ-হোমিওপ্যাথির কবলে পড়েছেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন বা করছেন। ঘন ঘন ওষুধ দেওয়া হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়, স্বয়ং হ্যানিমান তাঁর ষষ্ঠ সংস্করণ অর্গাননে-এ বলেছেন যে ৫০ সহস্র তমিক ওষুধী এইভাবে প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করে দ্রুত আরোগ্যকারী ফল লাভ হয়।

এস. বি. সিনহা
সিংহীবাগান
কলকাতা

(২)

'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। ৩১ আগস্ট '৭৯ সংখ্যায় ডাঃ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'হোমিওপ্যাথ আজও কাজের' প্রবন্ধ প্রকাশ করে আপনারা আমাদের হোমিও সমাজের তথা বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণের মহা উপকার করেছেন। সে জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই প্রবন্ধে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে একদিকে যেমন কিছু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য আছে, অন্য দিকে তেমনি বহু হোমিওপ্যাথ-বিজ্ঞান বিরোধী মন্তব্যও রাখা হয়েছে। তাই শ্রদ্ধেয় লেখককে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই, পরে হোমিওপ্যাথি নীতি বিরোধী বক্তব্যের বিরুদ্ধে জানাই প্রতিবাদ। নবীন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ছাত্র ও হোমিওপ্যাথির অনুরাগীরা বিভ্রান্ত হবেন।

প্রবন্ধের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ লেখকের না পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য তা বোঝা গেল না। সে দুটি অনুচ্ছেদ যদি সম্পাদকীয় মন্তব্য না হয়—তা হলে লেখক বন্ধুকে প্রশ্ন—সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বংশধর হলেই—সকলেই কি পণ্ডিত বা বড় হোমিওপ্যাথ হতে পারেন? বাবু রাজেন্দ্রলাল দত্ত বা ভারতে হোমিওপ্যাথির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী মহেন্দ্রলাল সরকার, যাঁদের নাম পরে লেখক উল্লেখ করেছেন—তাঁরা কখনও প্রবন্ধে বিবৃত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে স্বনাম ধন্য হয়েছিলেন তার কি কোন প্রমাণ দিতে পারেন? 'বস্তুত পক্ষে তাঁর (অর্থাৎ হ্যানিমানের) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হোমিওপ্যাথিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে।' এ কি একদম সত্যের অপলাপ নয়? এ কি হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি নয়? হ্যানিম্যানের সময় পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিতে মাত্র একশ ওষুধ তৈরী হয়েছিল, বর্তমানে তার সংখ্যা প্রায় দু হাজার—কি করে হল? বোনিং হোসেনের 'লক্ষণ সমষ্টি নির্ণয়', হেরিং-এর 'আরোগ্য সূত্র', কেন্টের 'দ্বাদশ পর্যবেক্ষণ' কি হ্যানিম্যানের পর হোমিওপ্যাথিতে নতুন সংযোজন নয়?

'শোনা যায় ১৮১০ সালে একজন জার্মান ডাক্তার ও জিওলজিস্ট ভারতে আসেন। তিনি গরীবদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিলোতেন।' শোনা কথা দিয়ে ইতিহাসকে বিকৃতি করা কি সঠিক? ১৮১০-এ খোদ জার্মানেই যখন হোমিওপ্যাথি মাত্র প্রতিষ্ঠার মুখে—তখন ভারতে এসে গেল তার নীতি—আদর্শরূপ পাবার আগেই, এই শোনা কথা লেখকই বিশ্বাস করেন?

স্বর্গীয় ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'হোমিওপ্যাথিতে অনেক মৌলিক গবেষণা করে গেছেন' জেনে আমরা আনন্দিত। তাঁর মৌলিক গবেষণা কি কি বিষয়ে এবং তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোন হোমিও সংস্থা বা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে—তা দয়া করে জানালে বাধিত হব।

'হোমিওপ্যাথিক দ্রাবন-নীতি' বা 'ডাইলুশন' বলে কোন কথা নেই, যা আছে তা হল শক্তিকরণ বা ডিনামাইজেশন বা পেটেন্টাইজেশন নীতি (দ্রঃ ১৪৯নং পাদটীকা, অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ)। 'বেশী ডোজে কথাটিও কি সঠিক? কথাটি স্থূল ডোজে বা মাত্রায় হবে না। (দ্রঃ ২৭৮ সূত্র অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ?)

লেখক তথা তাঁদের 'মিহিজাম' পন্থীদের হ্যানিম্যান তথা হ্যানিম্যান পন্থীদের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হল—এক সময়ে একটি রোগীকে 'একটি সহজ সরল ওষুধ দেওয়া অবৈজ্ঞানিক। সে জন্য তিনি হ্যানিম্যান পন্থী, এমন কি স্বয়ং হ্যানিম্যানকেও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। মাননীয় লেখক যথার্থ কাজই করেছেন। কারণ বিজ্ঞানে কোন ব্যক্তি বড় কথা নয়, কোন ব্যক্তির কথা শেষ কথা হতে পারে না। আমরাও তাই হ্যানিম্যানকে শেষ কথা বলে মনে করি না।

কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে—হ্যানিম্যান কোথাও দাবী করেছেন—তাঁর কথাই শেষ কথা—এমন প্রমাণ আছে কি? আমরা জানি হ্যানিম্যান 'প্রয়োগ পরীক্ষা-গবেষণা' ছাড়া কোন কথা অনুমানমূলকভাবে বলেন নি, লেখেন নি।

সুস্থ মানব দেহে একটি একটি ভেষজকে আলাদাভাবে প্রয়োগ পরীক্ষা করেই প্রতিটি ওষুধের রোগ সৃষ্টিকারী গুণ-ধর্ম জানা গেছে, মেটেরিয়া মেডিকা হয়েছে। সুস্থ মানব দেহে এক সঙ্গে একাধিক বা একটির পর একটি ওষুধ দিয়ে কি—ওষুধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জানা যায় বা জানার কোন উপায় আছে? সে জন্যই এক সময়ে, একজন রোগীকে একটিমাত্র, সহজ, সরল ওষুধ দেওয়াই হোমিওপ্যাথির অন্যতম মূলনীতি। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই হ্যানিম্যান তাঁর সহকারীরা ও পরবর্তীকালের ডাঃ কেন্ট, এলেন, ন্যাশ, ফ্যারিংটন, ডানহাম সহ সমস্ত সাচ্চা হোমিওপ্যাথরা অসংখ্য চির-অচির সব রোগীদের অন্যান্য চিকিৎসায় বিফল মনোরথ রোগীদের আরোগ্য বা আরোগ্যের আদর্শের দিকে নিয়ে গিয়েই গত প্রায় দু শতাব্দী ধরে যে হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বসমাজে বাঁচিয়ে রেখেছেন তার অগ্রগতি সাধন করেছেন—তা কি লেখক অস্বীকার করতে পারেন? কোন বিশ্ববিখ্যাত হোমিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথির মূল নীতি বিসর্জন দিয়ে ঐসব বিস্ময়কর আরোগ্য সম্পাদন করেছেন, করতে পেরেছেন এমন তো কোন প্রমাণ নেই।

'মূলনীতি' বলেই কোন কিছু রদবদল হবে না তা চিরসত্য একথা আমি বোঝাতে চাইছি না। কিন্তু যে মূলনীতি প্রয়োগ পরীক্ষা-প্রমাণ সিদ্ধ, যা আকৃতিক নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত যার ওপর ভিত্তি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ যথার্থ হোমিওপ্যাথদের হাতে রোগ কবলমুক্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন—তা শুধু সুকঠিন বলে, তু

প্রয়োগ করতে সংস্কার মুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত, মন-মানসিকতা বুদ্ধিবৃত্তির দরকার বলে তা অবৈজ্ঞানিক হবে তা কি বিজ্ঞানধর্মী কথা?

আর সারা বিশ্বের সাচ্চা হোমিও বিজ্ঞানীদের দ্বারা গৃহীত হোমিওপ্যাথির মূলনীতি বিরোধী নীতি-পদ্ধতি যাকে আমরা 'মিছিজম পদ্ধতি' বলতে পারি, তা যদি অধিকতর বিজ্ঞানধর্মী, অধিকতর কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়—তা নিশ্চয় বিশ্ববন্দিত হবে। তাই সবিনয়ে লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করবো—তাঁদের পদ্ধতিতে একটি রোগীও বিশেষ করে চির-রোগী, হোমিওপ্যাথিক বিধান মতে আরোগ্য লাভ করেছেন (হোমিওপ্যাথিক মতে আরোগ্য ও অন্য পদ্ধতিতে আরোগ্য কিন্তু এক নয়) এমন প্রমাণ কি দিতে পারবেন? বহুকাল আগে হোমিওপ্যাথি জন্ম লগ্নেই ঘোষণা করেছে—অ-হোমিও-প্যাথিক পদ্ধতিতে রোগের উপশম হতে পারে, রোগ চাপা পড়তে পারে, কিন্তু রোগ আরোগ্য হতে পারে না। সাধারণ মানুষ তা বুঝতে হয়তো পারবে না, কিন্তু হোমিও চিকিৎসকরা তা ঠিকই বোঝেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধে শরীরের অন্য কোন ক্ষতি (যেমন দুর্বলতা ইত্যাদি) করে না।' এটা যিনি বলেন তিনি বিজ্ঞান বা হোমিওপ্যাথির মূল যথার্থ উপলব্ধি করেছেন কি? হ্যানিম্যান বলেছেন, আমরাও বলছি—হোমিওপ্যাথি ওষুধ ক্ষতি করে, মারাত্মক ক্ষতিও করতে পারে। হোমিও প্যাথি ওষুধের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা আছে বলেই (সদৃশ) রোগ নিরাময় করে অর্থাৎ ক্ষতি করে বলেই উপকারও করে। এবং সে ক্ষতি অন্য যে কোন পদ্ধতির ওষুধের চেয়ে বেশী। কারণ অন্য পদ্ধতির স্থূল ওষুধ শুধু শারীরিক স্তরে ক্ষতি করে কিন্তু শক্তিকৃত হোমিও-প্যাথিক ওষুধ নির্বাচনে ভুল হলে শারীরিক মানসিক উভয় স্তরে ক্ষতি করে। এর শততমিক উচ্চ শক্তির কোন কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়া কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর চলতে পারে। তবে অর্গানন ষষ্ঠ সংস্করণ কথিত ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের ক্ষতির তীব্রতা সীমিত।

সবশেষে লেখক মহাশয়ের কাছে আরো একটি নিবেদন পেশ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। 'জনসাধারণের ওষুধ' করার জন্য মাথা ধরলে, যেমন 'অ্যাসপিরিন', তেমনই যদি মাথা ধরলে 'বেলেডোনা', আমাশা হলে 'মার্কসল' ও আঘাত লাগলেই 'আর্নিকা'—খেতে জনগণকে বলে দেয়া হয়—তাতে কি সুফল বেশী হবে, না কুফল বেশী হবে? কারণ ব্রাইওনিয়ার বা গ্লোনয়নের মাথা ব্যথা কি বেলেডোনায় সারবে, নাকস বা কলোসিন্থের আমাশা কি মার্কসলে সারে, লিডাম বা রুটার বা হাই-পেরিকামের আঘাতজনিত রোগ কি আর্নিকাতে সারবে? এমন কি ভাল ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া যারা আজ এলোপ্যাথিক ওষুধ মুড়ি-মুড়কির মতো খান—তাঁদের কি ডাক্তারবাবুরা সমর্থন করেন? তাহলে 'আয়োট্রোজেনিক' রোগ, যা ওষুধ সৃষ্ট—তা নিয়ে এলোপ্যাথিক ডাক্তার বন্ধুদের সবচেয়ে বেশী মাথা ব্যথা কেন?

লেখক বন্ধুদের নীতি-পদ্ধতিকে তাঁরা 'মিছিজম' পদ্ধতি বলুন, কারো কোন আপত্তি থাকবে না। দয়া করে বিজ্ঞানসম্মত আরোগ্য কলা-হোমিওপ্যাথির নামটা ব্যবহার না করলেই পারেন। তাতে জন-সাধারণ তফাৎটা বুঝতে পারবেন। এ বিষয়ে সচেতন হতে পারবেন। হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করতে এসে অপ হোমিও-প্যাথির দ্বারা প্রতারিত হবেন না। রোগীকে আরোগ্যের আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়া যা হোমিওপ্যাথির একমাত্র লক্ষ্য তা পারেন একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা যথার্থ ও সাচ্চা হোমিওপ্যাথ, এই সত্যটি উপলব্ধি করে সঠিক চিকিৎসক নির্বাচন করতে গিয়ে গোলকধাঁধায় পড়বেন। হরিমোহন চৌধুরী, ১১৫-ই লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।

(৩)

আমি অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে অনেক বিষয় সহজভাবে জেনেছি আপনার এই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রুচির পত্রিকাটির মাধ্যমে। গত ৩১ আগস্ট, '৭৯ সংখ্যায় 'হোমিওপ্যাথি আজও কাজের' শীর্ষক প্রবন্ধটির জন্য ডাঃ প্রশান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায়কে আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও প্রশংসা জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে এমন একটি প্রবন্ধ ছাপিয়ে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানাবার জন্য আপনাদের প্রয়াসকেও অভিনন্দিত করছি।

প্রশান্তবাবুর কাছে আমার একটি অনুরোধ রইল। যতদূর শুনেছি ওনাদের ভারত জোড়া নাম সাপের-বিষ নিয়ে রিসার্চ করার ব্যাপারে এবং ওনাদের তৈরী 'লেকসিন' নামে একটি ওষুধও নাকি আছে। যাইহোক এ ব্যাপারে উনি বা ওনারা যদি বিস্তারিত আলোচনা করে ভবিষ্যতে অমৃতে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন তবে সাধারণ মানুষ খুবই উপকৃত হবে এবং গ্রামে যে সমস্ত হোমিও ডাক্তাররা প্র্যাকটিশ করেন তাঁরাও অনেক কিছু জানতে পারবেন। হয়তো সাপে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসা করতে পারবেন।

অজয়শঙ্কর ব্যানার্জী, গুপ্তিপাড়া, হুগলী।

সংশোধন

২৬ অক্টোবরের অমৃতে প্রকাশিত জগন্ময় মিত্র শীর্ষক লেখায় ১৬ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের ১৩ লাইনে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় 'হরীন্দ্রনাথ' এবং 'প্রথম কলামের প্রথম লাইনে' জার্মানীর জায়গায় হামেশ পড়তে হবে।

বরুণ [illegible]
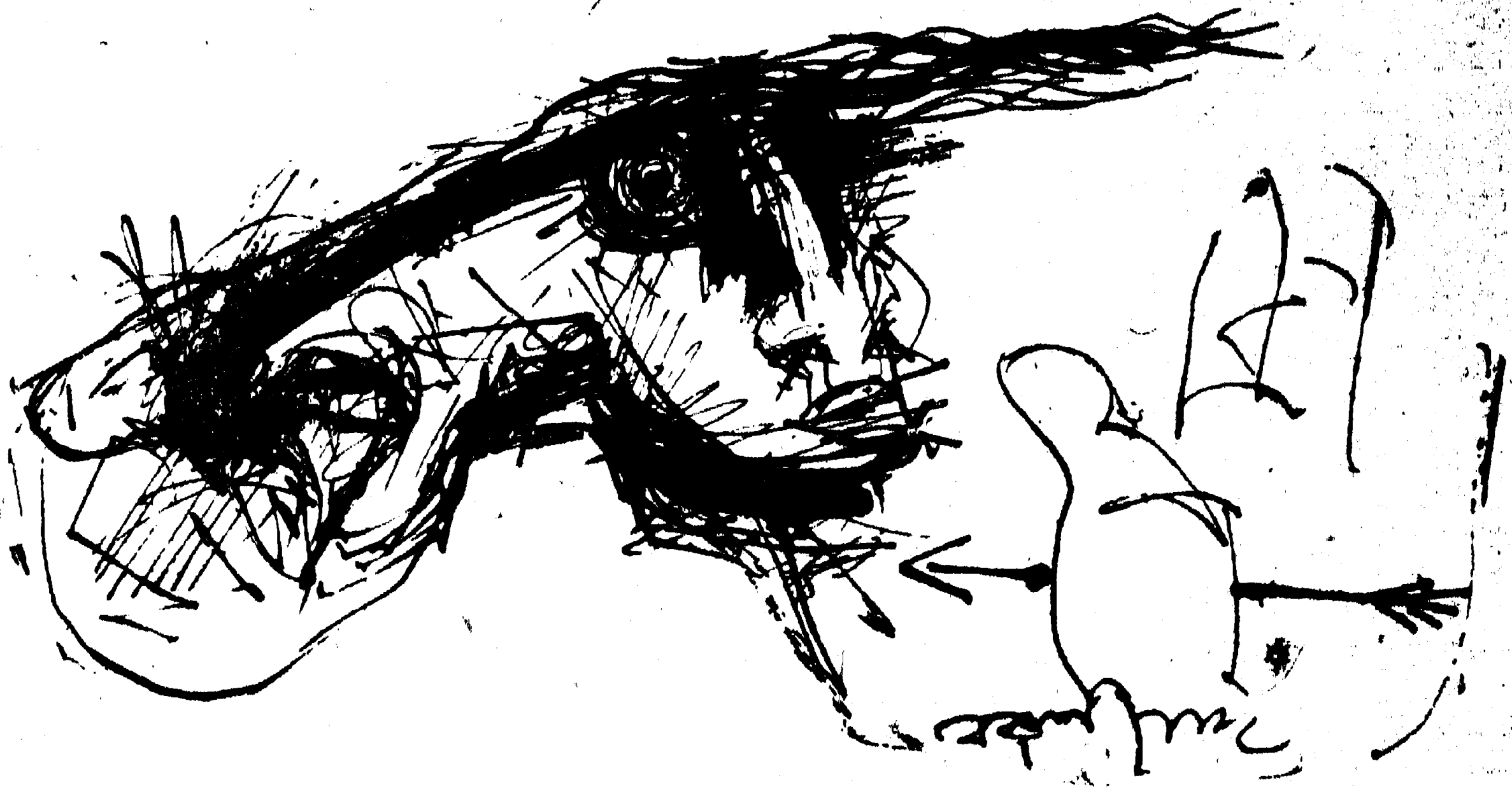
রাজ্যপাট

পম্পা পাল

মা দেখছেন!

কাগজখানা শোভাময়ীর মুখের সামনে তুলে ধরল সুনন্দা। উত্তেজনা আর বিস্ময়ে তার সুশ্রী মুখখানি চকচক করছে। মাথায় ঘোমটা সুনন্দা কোনকালেই দেয় না। কালকে রাতের বাঁধা বেণী থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে আসা কয়েক গাছি খুচরো চুল উড়ছে কপালের এদিকে ওদিকে। ছাটুর কাছের শাড়িতে অনেকগুলি ভাঁজ। অন্যদিন সে অভাবে রান্নাঘরের ভেতরে আসে না। বাসী কাপড় না বদলালে সামান্য একটা কৌটোতেও শোভাময়ী হাত দিতে দেন না। আজ স্পষ্টতই কোন নিষেধ তার মনে নেই, বা, মনে থাকলেও মানতে ইচ্ছে করছে না।

টোস্টের গায়ে মাখন লাগাচ্ছিলেন শোভাময়ী। সামান্য চোখ তুলে পুত্রবধূকে দেখলেন। সামান্যক্ষণ জরিপ করলেন তার আবিনাস্ত ভাবভঙ্গি বেশভূষা। তারপর মৃদু গলায় উত্তর দিলেন—দেখেছি।

সুনন্দা আরেকবার কলকলিয়ে উঠল—দেখেছেন? আর তার পরেও এখানে এই-ভাবে টোস্টে মাখন মাখাচ্ছেন, ডিম সেদ্ধ করছেন! উঃ মা! আপনি যে কী না!

টোস্টে মাখন লাগানো শেষ করে, শোভাময়ী এবার ডিমের খোসা ছাড়াতে শুরু করেছেন। শীতের সকালের কুয়াশা ভেঙে সবে রোদ উঠছে। এরই মধ্যে তাঁর স্নান সারা হয়ে গেছে, এলানো চুলে গিঁট দেওয়া। কপালে সিঁদুর। সুনন্দার কথায় তাঁর হাতের কাজ থামলো না। একই রকম ঠাণ্ডা গলায় একটু হেসে বললেন—কাগজে ঐ খবরটা বেরিয়েছে বলে কি তোমরা সকালের জলখাবার খাবে না?

সুনন্দা দু'হাতে কেমন একরকম অধৈর্যের ভঙ্গি করল। কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে তার শ্বশুরের নাম, ছবিও ছাপা হয়েছে। লোভনীয়তম একটি সাহিত্য পুরস্কার, এবছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে তার শ্বশুরমশায়ই পেয়েছেন। কানাঘুষোয় খবরটা তারা আগেই শুনেছিল। তবু পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না। কাল রাতের রেডিওর খবরেও তেমন কোন আভাস ছিল না। হঠাৎ আজকের সকালের কাগজেই এই চমক! নিজের চোখকে বিশ্বাসই হচ্ছিল না তার। অথচ... কি অদ্ভুত মানুষ এই ভদ্র-মহিলা! স্বামীর এতবড় সম্মানলাভেও তাঁর নিখুঁত দৈনিক রুটিনে একফোঁটা চিড় ধরল না! ইচ্ছে করছিল কথাটা মুখের উপরেই শুনিয়ে দেয়—সাহসে কুলাল না। শাশুড়ীর ঐ নিরুত্তাপ কঠিন চেহারাকে বড় ভয় সুনন্দার। কোন দিন গলা উঁচু করে একটা কথাও বলেন না তিনি। তবু কেন যেন তাঁর সামনে এগোনো যায় না। দু-একটা মুহূর্ত অস্থির চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কাগজটা হাতে নিয়ে সে দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। দোতলার বারান্দায় তারা সকলে একসঙ্গে মিলে সকালের জলখাবার খায়। এতক্ষণে শ্বশুর সেখানে এসে বসেছেন। সকলের আগে খবরটা তাঁকে সুনন্দাই শোনাবে। শাশুড়ীর তো কোন তাপ-উত্তাপই নেই!

সুনন্দা বোধহয় রাগ করেই চলে গেল। বুঝতে পেরে নিজের মনেই হাসেন শোভা-ময়ী। পুবদিকের ছোট জানলা দিয়ে মাঘের সকালের কুয়াশাভাঙা রোদ্দুরের ছোট্ট একটি ফালি তাঁর মুখে কপালে এসে পড়েছে। বাইরের দিকে চোখ চলে গেল আপনা থেকেই। রান্নাঘরের পেছন দিকের একটুকরো জমিতে শোভাময়ীর নিজের হাতের করা লাউ আর সিমের লতা লক-লকিয়ে বাড়ছে। বেগুনি রঙের সিমের ফুলে মাচা ভর্তি। পেঁপে গাছের গা জড়িয়ে নরম রোদ। কোথাও একফোঁটা মেঘ নেই। স্নিগ্ধ নীলকান্তমণির মত কুয়াশামুক্ত আকাশ ঝকঝক করছে। গুণ পরানো ধনুকের মত একটা টানটান সকাল। কোথাও একটুও শৈথিল্য জড়ো হয়ে নেই। নিজের অজান্তেই একটি গোপন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। ভীষণ দুর্বল আর নিস্তেজ মনে হচ্ছে নিজেকে। প্লেটে প্লেটে গুছোনো প্রাতরাশ ট্রেতে সাজিয়ে নন্দকে ডেকে বললেন—এগুলো দিয়ে আয়।

নন্দ অবাক চোখে কর্ত্রীর দিকে তাকাল। রোজ সকালে এই ট্রে নিয়ে ওপরে যাবার কথা শোভাময়ীরই। তিনি নিজে হাতে সকলকে পরিবেশন করে খাওয়ান। নন্দ শুধু যোগান দেয়। ওপরে চা পৌঁছে দিয়ে ভাত বসায়। একবার অস্ফুটে জিজ্ঞাসাও করে ফেলল সে—আমি যাব মা?

নন্দর দিকে চাইলেন না শোভাময়ী, ট্রে তুলে নিয়ে রওনা হবার মুখে মনে মনে নিজেকে সতর্ক করলেন—হুঃ। তুমি কি ছেলেমানুষ!

দোতলার বারান্দায় টেবিল ঘিরে ওরা তিনজন। সুনন্দা, দীপঙ্কর এবং গৃহকর্তা শংকরনাথ স্বয়ং। শোভাময়ীকে তিনিই বললেন—খবরটা দেখেছ? স্বামীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকান না শোভাময়ী। নিরুত্তরে ঘাড় নাড়েন শুধু। মার অনুচ্ছ্বসিত ভাবভঙ্গি দীপঙ্করকেও বোধ হয় ক্ষুণ্ণ করছিল। নিজে হৈ হৈ করে মার উচ্ছ্বাসের ফাঁকটা ভরাট করতে চাইল সে। সাগ্রহে বলল—আজ আর অফিস যাচ্ছি না মা। জোর সেলিব্রেশান লাগাও। মল্লী আর মৌকে ফোন করি।

মল্লী, মৌ—মল্লিকা, মহুয়া শোভা-

মায়ীর দুই মেয়ে। তাদের সুখী সুখী মুখগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন শোভাময়ী। দীপঙ্করের আগ্রহকে একটুও আমল না দিয়ে বললেন—ফোনের দরকার কি? একটু বেলা হোক না, নিজেরাই নাচতে নাচতে আসবেখন। তুই বরং বাজারটা সেরে ফেল।

দীপঙ্কর একটু অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে মার দিকে তাকাল। মায়ের এই এক দোষ! বাবা-সম্পর্কিত যে কোন ব্যাপারে মা এত নিরুৎসাহ, এত নিরুত্তাপ। অথচ বাবা! বাবার সম্মান, বাবার যশ প্রতিপত্তির আলোতেই না তাদের ঔজ্জ্বল্য! এ দেশের পয়লা সারির লেখকদের মধ্যে বাবা বোধহয় সব চেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর লেখা ছাড়া কোন পুজোসংখ্যা, কোন বিশেষ সংখ্যা কখনো বেরোয় না। বাবার লেখার দৌলতেই তাদের বাড়ি, গাড়ি, স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি তার সাংবাদিকের পেশাটিও। মার কাছে কি এসবের কোন মূল্যই নেই?

স্বামীর নিরুচ্চার অসন্তোষ লক্ষ্য করছিল সুনন্দা। খাওয়া থামিয়ে শাশুড়ীকে সে সোজাসুজিই আক্রমণ করল,—মা আপনি এত কোল্ড কেন বলুন তো? এমন একটা ব্যাপার, অথচ আপনি যেন ইচ্ছে করেই—। কথার মাঝপথেই থেমে যেতে হয় সুনন্দাকে। মাথায় খাটো, শীর্ণ শান্ত চেহারার এই মহিলাটিকে সে মনে মনে সাংঘাতিক সমীহ করে থাকে। শ্বশুরের কাছে খুব সহজেই আদরে-আবদেরে খুকি সাজা যায়, মাথার পাকা চুল বেছে দিতে দিতে অতি অনায়াসে প্রকাশ করে ফেলা যায় মান-অভিমান, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, অসময়ে সিনেমা দেখা কি ওয়লডর্ফে চাইনিজ খাবার শখের কথা। কিন্তু এই নির্বাকপ্রায় ভদ্রমহিলাটির সামনে নিশ্বাস ফেললেও মেপেজুকে ফেলতে হয় বলেই তার ধারণা। একটু কথা বলতেই তার সমস্ত মনের জোর যে একত্রিত করতে হয়েছিল, তাও ব্যাপারটার কেন্দ্রে শ্বশুর ছিলেন বলেই। এখন হঠাৎই, শোভাময়ীর কঠিন-শীতল স্তব্ধতার বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে বেচারী দমফুরোনো মেশিনের মত চুপসে গেল। ফর্সা মুখখানা চাপতে গিয়ে লাল হয়ে উঠল তার। জোরে জোরে দম নিতে হচ্ছে --যেন একমুহূর্তেই সব হাওয়া ফুসফুস খালি করে বেরিয়ে গেছে।

অন্যমনস্ক হয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন শোভাময়ী। সুনন্দার কথা তাঁর কানে গেছে এমন বোধ হল না। কুঁদে কাটা, পাথরের প্রতিমার মত তাঁর অনড় কঠিন মুখের ওপরে সকালের প্রথম রোদ পড়েছে ক্ষীণরেখায়। অনেক সময়, অনেক দীর্ঘ সময় বুঝি তাঁর চোখের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে—চোখের তারা এমনি স্থির। ফিরে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। জমানো কুয়াশা ভাঙতেই বোধহয়। দীপঙ্করকে তাড়া দিলেন—চা খেয়ে ওঠ দেখি। বাজারের টাকা দিচ্ছি। নন্দকে সঙ্গে নিয়ে যা। তোর বাবার জন্য রুই মাছের বড় মুড়ো আনিস একটা। বৌমা রাঁধবে আজ শ্বশুরের জন্য। সুনন্দার মুখের দিকে অপার স্নেহ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বেচারীর খাওয়া শেষ হয়নি, হয়ত তাঁরই জন্য। মনে মনে নিজেকে আবার ভর্ৎসনা করলেন, শাসন করলেন। অপ্রস্তুত সুনন্দাকে স্বাভাবিক করতেই সস্নেহে ধমক দিলেন--অত গরম চা কেন খাচ্ছ বৌমা, একটু ঠান্ডা হোক না। শঙ্করনাথকে এগিয়ে দিলেন স্যাকারিনের পাত্র। জোর করে দীপঙ্করের প্লেটে তুলে দিলেন আরেকটা মুরগীর ডিম।

তারপর সারাটা দিনই কাটল ঝড়ের ব্যস্ততায়। অনুমান ভুল হয়নি তাঁর। একটু বেলা হতেই মল্লী মৌ নিজেরাই এসেছে দলবলে। ছোট মেজ দুই ননদ কোলকাতাতেই থাকে। তারাও যথাসময়ে পৌঁছে গেছে। রান্নাঘরে সুনন্দা একাই নয়, মল্লী-মৌও এসেছে মার কাজে সাহায্য করতে। শঙ্করনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলের কয়েকজন, প্রতিবেশীরা, স্থানীয় উঠতি মস্তানের দল, অভিনন্দন জানাতে সকলেই এসেছে দল বেঁধে। তাদের সকলের চা-জলখাবারের পাট চুকতে চুকতেই বেলা শেষ। বাড়ির মানুষগুলির খাওয়া-দাওয়ার তদারকি সাঙ্গ করে নিজের জন্য শোভাময়ী যখন একটু সময় পেলেন ততক্ষণে শীতের বিকেলও যাই-যাই করছে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নিজের বয়সের ভারকে আরও বেশি করে যেন অনুভব করা যায়। কাউকে বলেন না, বলতে চান না তিনি--আজকাল ওপর-নীচ করতে গেলে পা বড় কাঁপে, অনেকক্ষণ নীচু হয়ে কাজ করলে কোমরের জোড় যেন খুলে আসতে চায়, শরীর ক্লান্ত হলে চোখের সামনে এলোমেলো ছায়া নাচতে থাকে, অন্ধকার দলা পাকিয়ে আসে, স্পষ্ট করে কিছু আর দেখা যায় না তখন। অবসন্ন শরীরকে বোঝার মত টেনে তুলতে তুলতে শোভাময়ীর বুকের ভেতরটা কেমন খালি হয়ে আসছে। মাথায় কেমন দুলুনি। সামনের সিঁড়ির ধাপগুলো ক্রমশঃ যেন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে আসছে। দু-হাতে রেলিং আঁকড়ে উঠতে উঠতে শোভাময়ী ভাবলেন বয়স বড় আপদ। কাউকে সে রেহাই দেয় না।

সিঁড়ির শেষে ছোট্ট বারান্দাটি পেরিয়ে প্রথম ঘরখানাই সুনন্দার। আজ সে-ঘরে বিরাট মজলিশ। মেজ ননদের গলার পর্দা চিরকালই চড়া। এখন বোধহয় উত্তেজনায় আরও চড়েছে। সিঁড়ির মুখ থেকেই তার মন্তব্য শোভাময়ীর কানে পরিষ্কার ভেসে এল। --বৌদি সারাটা জীবন এই একই রকম রয়ে গেল। দাদার এত নাম যশ টাকা পয়সা কোন কিছুতেই আর বৌদির মন ভরল না। থমকে দাঁড়াতেই হল। সেই বহুপুরোনো, বহুপরিচিত অভিযোগই বটে। ননদের গলায় ক্ষোভের ঝাঁঝ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র হয়েছে। আজ সুযোগ পেয়েছে সুনন্দাও। মিহি গলায় সবদিক বাঁচিয়ে সে ছোট্ট করে ফুট কাটে—সত্যি! মা যেন একটু কিরকম। ঠিক বোঝা যায় না।

তুমি আর বুঝবে কি বৌদি? এই তো সেদিন এসেছ। আসলে বাবার এই সম্মান, খ্যাতি—এসবে মার প্রচন্ড হিংসে। ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু সত্যি। মা যে বাবাকে কি ভীষণ হিংসে করে--! কি বাপ সোহাগী মেয়ে হয়েছে মল্লী! অতি কষ্টেও শোভাময়ী ঠোঁটের কোণায় এক বিচিত্র হাসিকে ধরে রাখতে চাইলেন। মনে করতে চাইলেন না, তবুও মনে পড়ে গেল মল্লীর বিয়ের কথা। পরিবারের সকলকে অগ্রাহ্য করে অসবর্ণ বিয়ের পিঁড়িতে বসা ঠিক করেছিল মল্লী। মেয়ের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শঙ্করনাথই। তাঁর অনমনীয় জেদকে নরম করার ভার পড়েছিল শোভাময়ীর ওপর। অনেক চেষ্টায় স্বামীর মন ফেরাতে পেরেছিলেন তিনি। পেটে ধরার জ্বালা কি কম জ্বালা!

অন্যের ঘরে আড়িপাতাকে আজীবন ঘেন্না করে এসেছেন শোভাময়ী। এই মুহূর্তে কিন্তু মা হয়ে বিবাহিত ছেলের পর্দাঢাকা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই রইলেন তিনি। অনড় পা দুটোয় যেন আর একটুও শক্তি নেই। মনে হল আর কোনদিনই পা দুখানা ওখান থেকে তুলতে পারা যাবে না।

এতক্ষণ দীপঙ্করের গলা শুনতে পাওয়া যায়নি। সে একটু দ্বিধাগ্রস্ত, একটু অসন্তুষ্ট হয়ে এবার বলল—আশ্চর্য! মা সব ব্যাপারে এত র‍্যাশনাল অথচ এই একটা জায়গায় এমন কান্ড করে বসে থাকেন যে বলার নয়।

দীপঙ্কর! দীপু! তাঁর বড় আদরের প্রথম সন্তান। সভ্য মার্জিত, বয়স্ক ছেলে। আট-দশ বছর বয়স পর্যন্ত মার বুকে ডুবে না শুলে ঘুম হত না ছেলের। রক্ত থেকে রক্ত, মাংস থেকে মাংস নিয়ে বেড়ে ওঠা সাধের খোকন। বুকের দুধ খেয়েছে, বুকে মাথা রেখে শুয়েছে দিনের পর দিন। বুকের নীচে জমাট বাঁধা যন্ত্রণার খবর কি কোনদিন পেয়েছিস মানিক আমার?

গলার মধ্যে কেমন অবোধ্য ব্যথা। চোখের সামনে তিরতির করে কাঁপছে ঘর বারান্দা, ফুলপাতার ছাপওয়ালা পর্দা। ছেলের দরজার কাছ থেকে অতি সাবধানে, অতি গোপনে চোরের মত পালিয়ে এলেন শোভাময়ী।

ছাতের সিঁড়ি কটা প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই উঠতে হল। চিলেকোঠার দরজার সামনে বসে বড় হাঁ করে প্রাণপণে বাতাস গিলতে লাগলেন তিনি। পালিয়ে আসার আগে ছোট ননদের একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী পর্দা ভেদ করে তাঁর কান স্পর্শ করেছিল। সে খুব বিরক্ত হয়েই বলছিল—সাতজন্মে শুনিনি বাপু, স্ত্রী স্বামীকে হিংসে করে,

তাও এমন দেবতার মত স্বামী। এদিকে তো দাদার বন্ধু-আত্মীয় ব্যাপারে পান থেকে চুন খসে না। অথচ—সারাজীবন ধরে তো এই একই ব্যাপার দেখে আসছি। মিথ্যেও তো নয়। আজও বুঝে উঠতে পারলাম না বাপু। এখন পড়ন্তবেলায়, নির্জন ছাতে বসে ছোটননদের ওই টিপ্পনীর জ্বলন্ত শলা তাঁর কান বেয়ে বুকের তলা পর্যন্ত পেঁৗছে যাচ্ছিল। জ্বালিয়ে দিচ্ছিল অনুভূতির সব কোমল স্তরগুলিকে। বয়ে যাওয়া দীর্ঘ সময়ের স্রোত ঠেলে উজানে ফেরা বড় কষ্টের। খেই হারিয়ে যায় বারে বারে। স্মৃতি প্রবঞ্চনা করে একগুঁয়ে শত্রুর মত। তবু ফিরে দেখার চেষ্টা করতেই হল। অনেক পেছনে ফিরে তাকালেন শোভাময়ী।

অনেক, অনেককাল আগের একটি লজ্জাবতী তরুণীকে মনে পড়ল তাঁর। ভাল করে তার মুখের আদল চেনা যায় না। অস্পষ্ট স্মৃতিতে ভেসে ওঠে দুটি লজ্জানত চোখের আবিষ্ট দৃষ্টি। স্বাস্থ্যবান সুরূপ, বিদ্বান স্বামী পেয়ে পৃথিবীর কাছে যার আর চাইবার কিছুই ছিল না। কত বয়স ছিল তখন শোভাময়ীর? সতেরো, বড়জোর আঠারো। শঙ্করনাথের দেবতার মত চেহারা, ভরাট কণ্ঠস্বর, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরি—সব মিলিয়ে নিজের প্রাপ্তিসুখে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন শোভাময়ী। শঙ্করনাথ প্রথমদিনই তাঁকে বলেছিলেন—তোমাকে আমার মত হতে হবে। তিনি বিহ্বল গলায় জবাব দিয়েছিলেন—নিশ্চয় হবো। সেই হবার চেষ্টাই তো সারাজীবন ধরে করে এলেন, করছেন আজও। সে চেষ্টার বিরতি বা কোন ছেদ আজও পড়তে দেননি তিনি।

শঙ্করনাথ ছিলেন তাঁর সংসারের মাথা—বড়ছেলে। দু-দুটি বাড়ন্ত বোনের বিয়ে দেবার দায়িত্ব বর্তেছিল তাঁর কাঁধে। তার ওপর ছিলেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু মা। এই দায়-দায়িত্বের সবটুকুই শংকরনাথ নিঃশেষে তুলে দিয়েছিলেন শোভাময়ীর ঘাড়ে। তাঁর ভূমিকা ছিল শুধু মাসান্তে টাকা এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার। আঠারো বছরের শোভাময়ী একা হাতে রেঁধেছেন বেড়েছেন, শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করেছেন। নিজে উদ্যোগ আয়োজন করে মেজ ছোট দুই ননদের বিয়ে দিয়েছেন নাগালের অতিরিক্ত বড় ঘরে। সংসার এবং সংসারের বাইরের সব কর্মভার নিজের হাতে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়ে মরারও সময় পেতেন না তিনি। সারাটা দিন ছিল নিরেট নিরবকাশ কাজ দিয়ে ঠাসা। দোকান-হাট, রেশন বাজার, ধোপা-নাপিত সকলের পাওনা গুণেছেন, প্রাপ্য মিটিয়েছেন। দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিশ্রামের অবসরে সাহিত্যিক স্বামীর গল্প উপন্যাস কপি করেছেন ব্যস্ত হাতে। আর রাত্তির! প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পেঁৗছানো শোভাময়ীর দু-ঠোঁট এক দুর্বোধ্য ব্যঙ্গে বেঁকেচুরে গেল। সারাদিন শঙ্করনাথ ব্যস্ত থাকতেন তাঁর য়ুনিভার্সিটির পড়ানো আর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। ছুটির সকাল দুপুরও কাটত তাদেরই সঙ্গে। বিকেলে সন্ধ্যায় কর্তব্যপরায়ণ গৃহকর্তা হিসেবে খোঁজ-খবর নিতেন অসুস্থ, পঙ্গু মায়ের, ছোট বোনদের। অল্প বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যের ঝোঁক। ঐ সময় বন্ধুরা আসতেন, আসতেন উঠতি, তরুণ সাহিত্যিকরাও। বন্ধুবৎসল আর অতিথি পরায়ণ বলে খ্যাতি ছিল শঙ্করনাথের। গল্পগুজব চলতো অনেক রাত পর্যন্ত। নেপথ্যচারিণী শোভাময়ীকে রান্নার পর্ব শেষ করে, উনুন খুঁচিয়ে, আগুন জাগিয়ে রাখতে হত চা-কফির গরম জলের জন্যে। আড্ডা শেষ হয়ে রাতের খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে মাঝ-রাত গড়িয়ে যেত। তরুণ শঙ্করনাথ তখন উৎসাহে উদ্যমে টগবগ করে ফুটছেন। তারও পরে তিনি গিয়ে বসতেন লেখার টেবিলে, কোন কোন দিন রাত শেষ হত সেখানেই। আর সমস্ত দিনের ক্লান্তি সরিয়ে ফেলে, মনোরম অপেক্ষার অন্ধকারে জোর করে সতেজ হতে চাইতেন শোভাময়ী। ঘুমন্ত চোখের পাতা খুলে রাখতেন বড়ো করে। অপেক্ষা করতে করতে আবার নতুন করে ক্লান্ত হতেন। তারপর লজ্জা আর অপমানের গ্লানিমন্থর কোন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন একসময়।

এতকাল পরেও পরাভবের লজ্জায় বেদনায় চোখের পাতা শিরশির করে উঠল শোভাময়ীর। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে শঙ্করনাথ কোনদিন ছুটে আসেননি তাঁর একান্ত নিজস্ব জগতের গণ্ডীর বাইরে। লেখা যেদিন ছুটি দিয়েছে, বাইরের পৃথিবী দায়-দায়িত্ব, বন্ধুবান্ধব যেদিন তাড়াতাড়ি দিয়েছে অবসর—সেদিন করার জন্য আর কিছু খুঁজে না পেয়েই বোধহয় শোভাময়ীর দিকে হাত বাড়িয়েছেন তিনি। সেই সব মুহূর্তে নিজেকে আশ্চর্য শীতল মনে হয়েছে শোভাময়ীর। নারায়ণ সাক্ষী করা স্বামীর কাছে বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাঁকে। তাতে গ্লানি ছিল, লজ্জা ছিল—আনন্দ ছিল না।

অথচ শঙ্করনাথের চেয়ে প্রিয় আর কে ছিল তাঁর জীবনে। মা বাবা দাদা, প্রথম তারুণ্যের স্কুল হোস্টেলের সীমিত সংখ্যার বান্ধবীরা, কে দাঁড়াতে পেরেছিল সেই কূল ভাসানো ভালবাসার জোয়ারের সামনে। তবু সেই জোয়ারও শুকিয়ে গিয়েছিল, শুকিয়েছিল যন্ত্রণার তীব্র আগুনে। হিসেবী স্বামীর হিসেব-নিকেশ, দায়িত্ব কর্তব্যের বাইরে নিজেকে একটা দিনও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি তিনি। সেই না পারার আগুন তুষের মত একটু একটু করে পুড়িয়েছে তাঁকে।

শুকনো গালে হাত বোলালেন তিনি। পুড়িয়েছে ভালমতই—তাতে কোন সন্দেহ নেই। শোভাময়ীর ঠাকুমার বড় গর্ব ছিল, তাঁর নাতনীর মত সুন্দরী লাখেও একটা মেলে না। বলতেন—দিদি আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। গায়ের বর্ণ দেখেছ? কাঁচা হলুদের মত। কাঁচা হলুদ পুড়ে কালো আঙ্গরা হয়ে গেছে কবেই। একটা গোটা জীবন ধরে তুষের আগুনে পোড়ার কষ্ট কি কম। যত পুড়েছেন বাইরে তত শীতল হয়েছেন তিনি। ভেতরের তাপ তাঁকে অসময়ে বয়স্ক করেছে, খুব তাড়াতাড়ি বরফ জমেছে চুলে, চোখের কোনে অজস্র ক্লান্তি ছবি এঁকেছে মাকড়শার জালের। শঙ্করনাথ তো এখনো তাজা চনমনে। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে চিরবসন্ত, বর্ণচোরা আম। কোন সম্বর্ধনা সভায় পুরস্কার নিতে গেলে ছবিতে তাঁকে আরো অনেক তরুণ মনে হয়। শীত এসেছে কেবল শোভাময়ীরই শরীরে মনে চিন্তায় ব্যবহারে। আজ নয়—বোধহয় আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগেই।

রোদ পড়ে আসছে। এখুনি চায়ের জল চাপাবে নন্দ। বিকেলের অতিথি সমাগমের জন্য তৈরী হতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। নীচের ঘরে বারান্দায় অনেকগুলি অসহিষ্ণু মুখ তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের সামনে যাবার আগে বহু অভিনয়ে জীর্ণ, পুরোনো মুখোশখানা এঁটে নিতে হবে মুখে। আঁচল দিয়ে গালের নোনা জল মুছে নিলেন শোভাময়ী। এ বয়সে বিষাদকে নিজস্ব রাখতে হয় হাটের মাঝখানে আনতে নেই।

সারাজীবন কতদিনে হয় কে জানে? খুব ছোটবেলায় দশপুতুল ব্রত করাতেন ঠাকুমা। তখন শুনেছিলেন স্বামীই মেয়েদের সবচেয়ে বড় ঠাকুর। সীতার মত পতিব্রত হওয়াতেই জীবনের সব সার্থকতা। শেষ সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে শোভাময়ী নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন, জনরঞ্জক স্বামীর সীতার মত পতিব্রতা স্ত্রী কি হতে পেরেছেন তিনি? ছেলে বৌ মেয়ে জামাই আত্মীয়স্বজনের অসীম ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সামনে প্রকাণ্ড এক জিজ্ঞাসার মত দাঁড়িয়ে থাকাতেই কি সেই পতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা?

পতিব্রতার দায়িত্ব কতদিনে শেষ হয়? খেলা-খেলার রাজ্যপাট আগলে রাণী সেজে বসে থাকার পালা কবে ফুরোয়? বহু উত্তরবিহীন প্রশ্ন ছুঁচের মত বিঁধে যাচ্ছে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে। শোভাময়ী হাঁপিয়ে উঠলেন। জোর করে সরিয়ে দিতে চাইলেন অসংখ্য সংশয়, জিজ্ঞাসা আর ক্লান্তিকে।

শীতের বেলা বড় তাড়াতাড়ি ফুরোয়। এর মধ্যেই আবছা অন্ধকার জমে উঠেছে সিঁড়ির কোণে কোণে। উঠতে যেমন, নামতেও তেমনি কষ্ট। পা টলে যাচ্ছিল শোভাময়ীর। হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজতে গিয়ে তাঁর মনে হল আর একা হাঁটা যায় না। এবার একটা লাঠির বড় দরকার।

সভাপর্ব

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
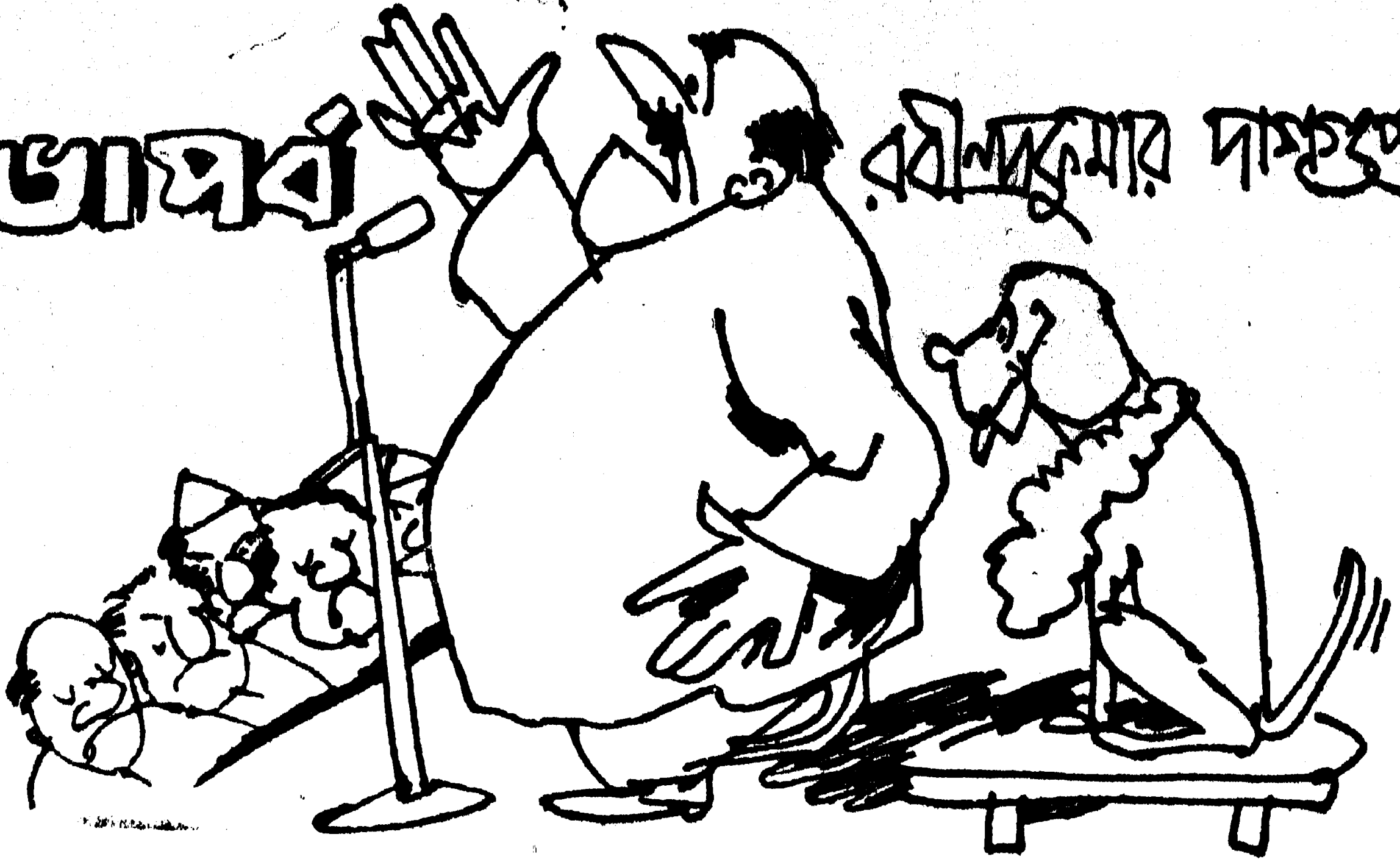
সমবেত অভদ্র ও ভদ্রমন্ডলী। আমি অভদ্রজনকে সম্বোধন করিলাম এই কারণে যে তাঁহারাও এই সভায় আমন্ত্রিত। তাঁহাদের প্রথমে সম্বোধন করিলাম এই কারণে যে তাঁহারা এই সভায়, বস্তুতঃ এতাদৃশ সকল সভায়, বলিতে কি, দেশের সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ। হে অভদ্রজনগণ, আপনারাই এখন আমাদের সমাজের চালক আপনারাই দেশকে বুঝাইতে পারিয়াছেন যে রাজনীতি, রাষ্ট্রচালনা ভদ্রলোকের কর্ম নহে। কিন্তু যে কতিপয় ভদ্রমানুষ এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা মনে করিবেন না যে এখানে তাঁহাদের স্থান নাই। আমি তাঁহাদেরও আহ্বান করিতেছি। অভদ্রজনেরা সকলে উপবিষ্ট হইলে আপনারা, ভদ্রজনেরা তাঁহাদের শেষ পংক্তির পিছনে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া যাইবেন। মাইকের প্রসাদে আমার ও অন্যান্য বক্তাদের কন্ঠস্বর অবশ্যই আপনাদের কর্ণগোচর হইবে। যদি বিদ্যুতের অভাবে মাইকের কর্মবিরতি ঘটে তাহা হইলে আমাদের মুখ-ভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন আমরা কি বলিতে চাহি। যখন দেখিবেন আমাদের চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে, আমরা দাঁতমুখ খিঁচাইতেছি তখন বুঝিবেন আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের কথা অর্থাৎ দেশের শত্রুর কথা বলিতেছি। যখন দেখিবেন আমরা মৃদু হাসিয়া মিঠামিঠি কথা বলিতেছি বুঝিবেন আমরা আমাদের অর্থাৎ দেশ-হিতৈষীদের গুণাবলীর উল্লেখ করিতেছি। ভদ্রজন, আপনারা আসন পাইলেন না বলিয়া নিজেদের অপাংক্তেয় মনে করিয়া দুঃখ করিবেন না। অভদ্রজনের সংসর্গে থাকিয়া আপনারাও অচিরে পাংক্তেয় হইয়া উঠিবেন। আপনারাও রাষ্ট্রের রজ্জু ধরিবার, অন্ততঃ রাজনীতি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

আমি শহীদ স্বদেশ-রিপু-সূদন দন্ড-ধারী এই সভার উদ্যোক্তাদের প্রধান হিসাবে আপনাদের সামনে উপস্থিত। মঞ্চে আসীন বা আসীন হইবেন আমাদের সভাপতি, উপ-সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, উপ-প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, উপ-বিশেষ অতিথি এবং আরও কয়েকজন বক্তা। ইঁহাদের সকলে এখনও পৌঁছান নাই। বক্তার সংখ্যা দেখিয়া ভীত হইবেন না। ইঁহাদের সকলে উপস্থিত নাও হইতে পারেন। কেহ কেহ অল্পকালের জন্য উপ-স্থিত থাকিয়া দুই একটি কথা বলিয়া বা না বলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু ইঁহাদের নাম নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপা হইয়াছে এবং ইঁহাদের জন্য মঞ্চে আসন রক্ষিত হইয়াছে কারণ ইঁহাদের নাম উচ্চারণ না করিয়া কোন সভার অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। অপনারা অবগত আছেন আমাদের স্বাধী-নতা লাভের পর এই বত্রিশ বছরে দেশের কত উন্নতি হইয়াছে, লীডারের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। আমরা যদি সব লীডারদের আসন দিতাম তাহা হইলে আপনাদের জন্য জায়গা করিতে পারিতাম না। লীডারগণও দেখিতেছি শ্রোতা না থাকিলে একটু বিরস বোধ করেন, রেডিও, টি-ভি ও খবরের রিপোর্টার থাকিলে অবশ্য একেবারে রাগ করিয়া উঠিয়া যান না।

এই সভার আহ্বায়ক হিসাবে আমার প্রধান কর্তব্য আপনাদের সামনে সকল দলের দলপতিদের উপস্থিত করা। যে দেশে রাষ্ট্র-চালনার দায়িত্ব একটি মাত্র দলের উপর ন্যস্ত সে দেশের সভা-মঞ্চে এত ভিড় হইবে না। সে দেশে বোধহয় বক্তৃতার পরিমাণও অল্প। কিন্তু আমাদের দেশে কখন কখন রাজ্যভার একাধিক দলের স্কন্ধে স্থাপিত হয়। সভা-মঞ্চেও তখন বহু বক্তার সমাবেশ হইয়া থাকে। আবার এইসব দলের দলপতিরা কখন কখন নলিনী-দলগত জলের মত তরল পদার্থে পরিণত হইয়া টুপ টুপ করিয়া অন্য দলে ঝরিয়া পড়েন। ইহা দেখিয়া আমি প্রায় সকল দলের এক একজন প্রতিনিধিকে মঞ্চস্থ করিয়াছি।

সভাপতি শ্রীমিষ্টপ্রিয় বকবকম্ মহো-দয় সংবাদ পাঠাইয়াছেন তিনি অন্য একটি সভায় বক্তৃতা করিতেছেন, এই সভায় উপ-স্থিত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার গৃহ-পালিত কুকুর শ্রীগবা তাঁহার প্রতিভূ হইয়া সভার কাজ চালাইবেন। আপনারা দেখিতেছেন শ্রীগবা সরমেয়সুলভ প্রভু-ভক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া সভা-তির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া আছেন। উপ-সভাপতি মহাশয় এখন পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছান নাই। সভাপতির আসনে শ্রীগবা মহোদয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন

কিনা জানি না। দল-প্রধানেরা অনেক সময় চতুষ্পদী কুকুরের সংসর্গ বড় পছন্দ করেন না। উদ্বোধক স্বদেশ-হৃদয় রত্নেশ্বর গড় মহোদয়ের আসিতে একটু বিলম্ব হইবে তাহা তিনিই আমাকে বলিয়াছেন। তিনি বর্তমানে এক যুব-সভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন। সভায় মারামারি না হইলে তিনি সাড়ে ছয়টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছাইবেন বলিয়াছেন। এখন সাতটা বাজিয়াছে। বোধহয় মারামারি হইতেছে। গড় মহাশয় মারামারির মধ্যে বেশীক্ষণ থাকেন না। একটি খুন হইলেই সভাস্থল ত্যাগ করেন। আশা করা যায় তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হইবেন। প্রধান অতিথি শ্রীদীনসখা সোনামুখী আসিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি ওনার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হওয়ায় উনি মঞ্চে আরোহণ করিতে অশক্ত। তিনি এই সভামণ্ডপের প্রথম পংক্তিতে চেয়ারে সমাসীন। তিনি উক্ত স্থান হইতেই বক্তৃতা করিবেন। এখন উনি নিদ্রিত। বক্তৃতার সময় আসিলে জাগিবেন। উপ-প্রধান অতিথি শ্রীদরিদ্রবল্লভ গোপ সাধারণতঃ সভার শেষে সভায় উপস্থিত হন। বিশেষ অতিথি শ্রীকালীভরসা দামাল এবং উপ-বিশেষ অতিথি শ্রীযুববন্ধু কামাল মঞ্চে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ওনারা দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সময়মত দুইজনেই চক্ষু মেলিবেন। আমাদের এই মহতী সভার সভাপতি শ্রীগবা মহোদয় কিন্তু জাগিয়া আছেন। ঐ দেখুন তিনি আপনাদের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া আছেন আর সুন্দর নাতিদীর্ঘ লেজটি নাড়িতেছেন।

এখন আমি এই সভার বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। বিষয়টি নিমন্ত্রণ-পত্রে এবং খবরের কাগজে যেভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে কিছু অস্পষ্টতা থাকিতে পারে। আমরা বলিয়াছি আমাদের এই সভার বিষয় 'অরুণ প্রাতের তরুণ দল'। আশা করি আপনারা জানেন এই কথা কয়টি বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের একটি গান হইতে লওয়া হইয়াছে। এই বিদ্রোহী কবি অরুণ প্রাতের কবি, তরুণ দলের কবি। আমরা এই সভায় এই অরুণ প্রাতের তরুণ দলের কথা আলোচনা করিব। আমাদের জাতীয়জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে এই তরুণ দলের কি কর্তব্য, তাহারা কিভাবে আমাদের জরাগ্রস্ত, বিলোলচর্ম রাষ্ট্রচালকদের দেহ ও মনে নব-বলের সঞ্চার করিবে, তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিয়া দেশকে বাঁচাইবে, এইসব গুরু বিষয়ে আজ আমাদের বিশিষ্ট বক্তাগণ আমাদের উপদেশ করিবেন।

আপনারা মহাভারত পড়িয়া থাকিবেন। বেদব্যাসের মূল মহাভারতখানি না পড়িলেও কাশীদাসী বাংলা মহাভারত নিশ্চয় পড়িয়াছেন। কাশীদাসের পদ্যে মহাভারত না পড়িলেও কালী সিংহের গদ্যে উহা পড়িয়া থাকিবেন। আর যদি কালী সিংহের মহাভারতও না পড়িয়া থাকেন উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেদের মহাভারত মহাভারত নিশ্চয় পড়িয়াছেন। মহাভারত ছাপার অক্ষরে না পড়িলেও লোকমুখে মহাভারতের গল্প শুনিয়া থাকিবেন। আর যদি কোন মহাভারত না পড়িয়া থাকেন এবং মহাভারতের গল্প না শুনিয়া থাকেন তাহা হইলেও লজ্জা পাইবেন না, দুঃখ করিবেন না। আজ আমরা এক নতুন মহাভারত রচনা করিতেছি। তবে প্রাচীন মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব হইতে আমরা একটি পর্ব বাছিয়া লইয়াছি। আমরা মনে করি আদি মহাভারতের সার কথা ঐ মহাভারতের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ সভাপর্বে বিধৃত। এই সভাপর্বের কাহিনী লীডার নির্বাচনের কাহিনী। আমাদের অন্য কাহিনীতে প্রয়োজন নাই। এই কাহিনী আধুনিক পলিটিকসের এক প্রাচীন রূপক। যাহা নাহি ভারতে, তাহা নাহি ভারতে। অর্থাৎ যাহা আছে ভারতে তাহা আছে ভারতে। প্রাচীন মহাভারতের সভাপর্ব অর্থাৎ লীডার-নির্বাচন পর্ব আধুনিক মহাভারতের একমাত্র পর্ব। মহাভারতের এই সভায় ভীষ্মই নারদমুনির পরামর্শে প্রথম এই লীডার-নির্বাচনের প্রস্তাব করেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই এই সম্মান প্রদান করিতে চাহিলেন। পান্ডবগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে সহদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে লীডাররূপে বরণ করিতে উদ্যত তখন শিশুপাল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য নিক্ষেপ করিলেন। কটুবাক্যে যখন বিশেষ ফলোদয় হইল না তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তের মধ্যে শিশুপালকে হত্যা করিলেন। অভদ্র ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা দেখিলেন সভাপর্বের কথা হইল এই যে লীডার-নির্বাচনের প্রক্রিয়া দুইটি-কটুবাক্য আর হত্যা। আমি আমাদের দেশের অরুণ প্রাতের তরুণ দলকে এই দুইটি প্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করিতে বলিতেছি। ওরে অবুঝ ওরে সবুজ রবীন্দ্রনাথ তোমাদের আধমরাদের ঘা মারিয়া বাঁচাইতে বলিয়াছেন। আমি বলি আধমরাদের ঘা মারিও না। উহারাই আমাদের রাষ্ট্রচালক। ঘা খাইলে উহারা একেবারে মরিয়া যাইতে পারেন। উঁহারা মরিলে দেশ মরিবে। তোমাদের কাজ হইল এই আধমরাদের যাহারা শত্রু তাহাদের শেষ করা। তোমরা গালাগালিতে বাকসিদ্ধ হও। মারামারিতে সিদ্ধহস্ত হও। উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ নবজীবনের আশ্বাসে। তোমরাই বহুলোকের জীবন লইয়া দেশে এক নবজীবন লইয়া আসিবে।

অভদ্র ও ভদ্রমহোদয়গণ, মহাভারতের সেরা পর্ব সভা পর্বের আর একটি শিক্ষা এই যে তুমি যদি রাষ্ট্রপ্রধান হও তোমাকে দেশের ভাগ্য লইয়া পাশা খেলিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির যখন পাশা খেলিয়া রাজ্য হারাইলেন তখন বুঝিতে হইবে বেদব্যাস এই অক্ষক্রীড়ার মধ্য দিয়া রাজনীতির একটি বিশেষ তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। সেই তত্ত্ব হইল এই যে রাজনীতি একপ্রকারের অক্ষক্রীড়া। কিন্তু হে অরুণপ্রাতের তরুণদল অক্ষক্রীড়া তোমাদের ক্রীড়া নহে। তোমরা অক্ষক্রীড়াশীল রাষ্ট্রনায়কদের পাহারা দিবে। তোমরা শকুনিদের যেমন রক্ষা করিবে, যুধিষ্ঠিরদের তেমন রক্ষা করিবে। তোমরা পলিটিকস নামক প্রচন্ড দ্যূত-ক্রীড়ার স্বেচ্ছাসেবক। বুড়া হইলে তোমরাও এইরূপ পাশা খেলিবে, সর্বস্ব হারাইয়া দেশের সমৃদ্ধি-সাধন করিবে, নিজের মান খোয়াইয়া দেশের মান বাড়াইবে। তখন আবার এক নতুন তরুণদল তোমাদের রক্ষা করিবে।

অভদ্র ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বলিবার আর কিছুই নাই। কিন্তু উদ্বোধক শ্রীসভারঞ্জন বহুভাষী [illegible]দয় এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। [illegible]ন এই সভার উদ্বোধন না করিলে [illegible] অন্যান্য বক্তারা বক্তৃতা করিতে পারেন [illegible] আমি আহ্বায়ক হিসাবে সভার বোধন [illegible]লাম মাত্র। সভাপতি শ্রীগবার অনুম[illegible] লইয়া আমার বক্তৃতা চালাইয়া যাইতেছি। ঐ দেখুন সভাপতি তাঁহার সুন্দর লেজটি নাড়িয়া আমাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। যে অরুণ প্রাতের তরুণ দলের উদ্দেশ্যে এতগুলি কথা বলিলাম তাঁহারা এই সভামণ্ডপে উপস্থিত আছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। এমন নীরব সভা তরুণের সভা হইতে পারে না। আপনারা যাঁহারা এই সভায় উপস্থিত আছেন তাঁহারা কাহারা ঠিক বুঝিতেছি না। আপনারা হাঁচিতেছেন না, কাশিতেছেন না, হাই তুলিতেছেন না, পরস্পর কথা বলিতেছেন না, ছটফট করিতেছেন না। আপনাদের বাঙালী বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার বক্তৃতা যে অতিশয় সারবান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙালী সারবান বক্তৃতাও এমন ধৈর্য ধরিয়া শুনিবে না। তবে আপনারা কাহারা? আপনারা কি এই নিদাঘ সন্ধ্যায়, এই ফুল-গন্ধবাহী মলয়পবন দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এই সভার সভাপতি শ্রীগবা ব্যতীত কি আর কেহই জাগিয়া নাই? আমার এই সারবান বক্তৃতা কি কাহারও কর্ণগোচর হইল না? দেখি-

তেছি সভাপতি মনুষ্যকুলোদ্ভব নহে বলিয়া খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আশা করি উদ্বোধক মহোদয়ের আবির্ভাব হইলে রিপোর্টারগণ সভাস্থলে ফিরিয়া আসিবেন।

ঐ শুনুন অরুণপ্রাতের তরুণ দলের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে। তাহাদের কল-কল কণ্ঠনিনাদে আকাশ বাতাস কাঁপিতেছে। ঐ দেখুন তাঁহাদের ভুজৈধৃত খরকরবাল ঝলমল করিতেছে। আর ঘুমাইবেন না, চক্ষু মেলিয়া দেখুন অরুণ প্রাতের তরুণদল আসিয়াছে উর্ধ্ব গগনে মাদল বাজিতেছে নিম্নে ধরণী উতলা হইয়াছে। বোধ হইতেছে উষার দুয়ারেও আঘাত পড়িতেছে। ঐ দেখুন তরবারি হস্তে যুবকের দল নিজেদের মধ্যে কেমন সুন্দর যুদ্ধ করিতেছে। ইহাকে গৃহযুদ্ধ বলিবেন না। উঁহারা ডারউইনীয় তত্ত্বের প্রয়োগ করিয়া যথার্থ দেশব্রতীর সন্ধানে তৎপর। এই মারামারির মধ্য দিয়া সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট সুনিশ্চিত হইবে। ইহাতে যাহারা মরিবে তাহারা শহীদ। যাহারা জিতিবে তাহারা বিপ্লবী, রাষ্ট্র-নায়কদের বীর সৈনিক।

আমি অরুণ প্রাতের তরুণদলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি আপনারা যতশীঘ্র সম্ভব হননকার্য সমাধান করিয়া আসন গ্রহণ করুন। যে রাষ্ট্রনেতাদের জন্য আপনারা এত ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন তাঁহারা এই সভামঞ্চে উপস্থিত হইয়া আপনাদের অভিনন্দন জানাইবেন, আশীর্বাদ করিবেন এবং আপনারা কিভাবে তাঁহাদের রাষ্ট্রকার্যে সাহায্য করিবেন সে বিষয়ে উপদেশ করিবেন। আপনাদের আত্মত্যাগের আদর্শ রাষ্ট্রনেতাদের মুগ্ধ করিয়াছে। আপনারা দেশের জন্য বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করিয়াছেন, ইস্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন, অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, শত্রুবিনাসের সৌকর্যে দয়ামায়া ত্যাগ করিয়াছেন, বিবিধ শাস্ত্রপাঠে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া বোমা, স্টেনগান, পাইপগান, ছোরা লাঠি লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। বস্তুতঃ ক্রিকেট, ফুটবল, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি কয়েকটি জাতীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত আপনারা আর কোনরূপ আমোদ-প্রমোদে কালহরণ করেন না। ক্রীড়া আর পূজার মধ্যেও আপনারা আপনাদের বিপ্লবী ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন। আইন অমান্য এবং অসহযোগিতায় আপনারা পরাধীন ভারতের আইন-অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনকে ম্লান করিয়া দিয়াছেন। পরাধীন ভারতের বাঙালী ইংরেজের আইন অমান্য করিতেছেন। আপনারা ঘরের আইন অমান্য করিতেছেন, নিজেদের সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করিতেছেন। আপনাদের আত্মত্যাগ অতুলনীয়। আপনারা উপবেশন করুন। সভার উদ্বোধক মহাশয় এই মাত্র উপনীত হইয়াছেন। বর্ধমানের এক সভায় প্রহৃত হইয়া তিনি বাকশক্তি হারাইয়াছেন। তিনি আপনাদের সম্বোধন করিতে অক্ষম। আমাদের বড় ইচ্ছা ছিল তিনি আপনাদের সামনে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া সভার উদ্বোধন করেন। কিন্তু নিদারুণ প্রহারে তাঁহার হস্তপদাদি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে এখন এম্বুলেন্সে করিয়া হাসপতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আপনারা বুঝিতেছেন বর্ধমানের তরুণ দলেরা অরুণ প্রাতের তরুণদল নহে। তাঁহারা ঘোর অমানিশার প্রেতদল। আপনারা অচিরেই এই প্রেতদলকে স্বস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমিই এই সভার উদ্বোধন করিলাম। আপনারা করধ্বনি করিয়া আপনাদের সম্মতি জ্ঞাপন করুন। দেখিতেছি আপনারা রণক্লান্ত হইয়া সকলে ধূমপান করিতেছেন। করধ্বনি করা এখন সম্ভব হইতেছে না। আপনারা হর্ষধ্বনি করিয়া আপনাদের তরুণ প্রাণের আবেগ প্রকাশ করুন। আর আপনাদের চিত্তে যদি হর্ষের সঞ্চার না হইয়া থাকে আমরা আশ্চর্য হইব না। এতগুলি খুন করিবার পর আপনারা আনন্দে উৎফুল্ল হইতে পারেন না। হৃদয়ে কি বেদনা লইয়া যে আপনারা দেশের কল্যাণের জন্য দেশের মানুষের প্রাণ সংহার করেন তাহা বিশ্ববিধাতা জানেন। আমি বলি আপনারা বিষণ্ণ হইবেন না। আপনারা অবিরাম খুন করিয়া যান। রাষ্ট্রনেতাদের অক্ষক্রীড়া নির্বিঘ্নে চলিতে থাকুক।

এখন প্রধান অতিথি মহাশয়ের ভাষণ দিবার কথা। তিনি মঞ্চে আরোহণ করিতে অশক্ত। এ পর্যন্ত কোন সভায় প্রহৃত না হওয়ায় এবং কিছুকাল সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিয়াছে। তাঁহার হস্তপদাদি এবং বিশেষ করিয়া উদরটি এমন স্থূলাকার ধারণ করিয়াছে যে তিনি ওঠানামা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। এখন দেখিতেছি তিনি চেয়ারে দেহখানি কিঞ্চিৎ এলাইয়া দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। উপ-প্রধান অতিথি এখনও পৌঁছান নাই। বিশেষ অতিথি ও উপ-বিশেষ অতিথিও মঞ্চে তাঁহাদের আসনে বসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। আজ যে প্রায় সকল বক্তা অনুপস্থিত অথবা নিদ্রিত ইহা অরুণ প্রাতের তরুণদলের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তাঁহাদের অতন্দ্র অক্লান্ত প্রহরার ফলে রাষ্ট্রনেতা ও রাষ্ট্র-চালকেরা নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারিতেছেন। আপনারা যদি এত খুন না করিতেন তাঁহারা এত ঘুমাইতে পারিতেন না। আপনারা যখন বৃদ্ধ হইবেন, দেশকর্মে সফল হইবেন, স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সুপুষ্ট দেহের অধিকারী হইবেন, আপনারাও তখন ঘুমাইবেন। তখন নতুন কালের নতুন তরুণদল আপনাদের রক্ষা করিবেন। হে বাঙালী, ভুলিও না তোমার ধমণীতে শকের রক্ত, হুনের রক্ত, পাঠানের রক্ত, মোগলের রক্ত একাকার হইয়া আছে। পূর্বপুরুষের মান রক্ষা কর, খুনী হও। রাষ্ট্রপ্রভুদের নিরুদ্বিগ্ন কর, নিশ্চিন্ত কর। খুন কর।

আপনারা সকলেই এখন ক্লান্ত। অরুণ প্রাতের তরুণদলের কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। বোধহয় আমার কণ্ঠস্বর আর শুনা যাইতেছে না। উপ-প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, উপ-বিশেষ অতিথি প্রভৃতির নিদ্রার শব্দও তরুণদলের কলস্বরে ডুবিয়া যাইতেছে। সভাপতি শ্রীগবা মহোদয়ও বোধহয় ক্লান্ত। তাঁহার সুন্দর লেজটি আর নড়িতেছে না। তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অভদ্র ও ভদ্রমহোদয়গণ, অরুণপ্রাতের তরুণদল এখন যৌথভাবে বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহারা বোধহয় একটি কুক্কুরের বক্তৃতা শুনিতে আগ্রহী নন, কুকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেও নন।

সভার শেষে একটি সংগীত হইবার কথা ছিল। কিন্তু কোন সংগীতের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। অরুণপ্রাতের তরুণদের এক দল চাহিলেন একটি রবীন্দ্রসংগীত, আর এক দল চাহিলেন একটি নজরুলসংগীত, এক তৃতীয় দল চাহিলেন সুকান্তের একটি সংগীত। এই সংগীত নির্বাচন লইয়া যখন মারামারি লাগিবার উপক্রম হইল তখন আমি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সেই মারামারি হইতে সকলকে রক্ষা করিলাম। আমি প্রস্তাব করিলাম রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও সুকান্তের গান হইতে কতগুলি লাইন বাছিয়া লইয়া একটি গান নির্মিত হউক যাহার মধ্যে এই তিন কবির প্রতিভা সমভাবে প্রকাশিত হইবে। এই সংগীতের যুক্তফ্রন্ট তিন দলই মানিয়া লইয়াছেন। নজরুল ও সুকান্তের সংসর্গে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ বহুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। একা রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের এক তৃতীয়াংশ বা তাহা হইতেও কম। অরুণপ্রাতের তরুণদলের প্রসাদে রবীন্দ্রনাথ আর দুই কবির সান্নিধ্যে আসিয়া পূর্ণতা লাভ করিবেন।

এই সভার শেষে আমি অরুণপ্রাতের তরুণদলের কাছ হইতে আজ দেশ কি প্রত্যাশা করে সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। দেশের যাঁহারা নেতা, যাঁহারা রাষ্ট্র-[illegible] তাঁহারা [illegible]

শিক্ষা দিয়াছেন, যে আদর্শ আপনাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন সেই শিক্ষা এবং সেই আদর্শ আপনাদের সকল প্রেরণার উৎস। আপনাদের মনে হইতে পারে আপনাদের তাঁহারা কোন শিক্ষা দিতেছেন না সত্য। কিন্তু তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের আচরণ, এমন কি তাঁহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে আপনারা শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। মুণ্ডকোপনিষদের শ্লোকটি মনে রাখিবেন:

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

অর্থাৎ শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা আত্মাকে পাওয়া যায় না, মেধার দ্বারাও নহে, বহু শ্রবণের দ্বারাও নহে। ঔপনিষদের এই বাণী জীবনের সার করিয়া কত কলেজের অধ্যাপক তাঁহাদের গ্রন্থাদি গঙ্গার জলে, বা নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়া দেশব্রতী হইয়াছেন। এমনকি তাঁহারা তাঁহাদের মেধাকেও নির্মমভাবে বর্জন করিয়াছেন। অবশ্য এই দ্বিতীয় ত্যাগটি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সহজেই করিতে পারিয়াছেন। দেশমাতার আশীর্বাদে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মেধাহীন ছিলেন। তাই বলি, তরুণদল আপনারা লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিন। এই বুর্জোয়া অভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে আপনারা মানুষ হইতে পারিবেন না। আর মানুষ না হইলে দেশের কাজে লাগিবেন না। পরম বৈষ্ণব কতগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া ঈশ্বরের জন্য কাঁদেন না। তিনি আর এক বৈষ্ণবের চোখে জল দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। গরীবের দুঃখ বুঝিবার জন্য কার্লমার্কস পড়িবার প্রয়োজন নাই। আর কার্লমার্কস বড় কঠিন। কঠিন বস্তু পড়িয়া আপনাদের হৃদয়ও কঠিন হইয়া যাইতে পারে। আপনারা গরীবএর দুঃখে কষ্ট পাইয়া লাঠি বন্দুক ছোরা ধরিবার হৃদয়টি হারাইতে পারেন। আপনারা আপনাদের মহাজনদের অনধ্যয়নের আদর্শটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অধ্যয়ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করুন। অধ্যয়ন কখন কখন মনের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক করিয়া থাকে। আপনারা চিন্তাশীল হইলে জাতির সর্বনাশ। মহাকাব্যের সঙ্গে সভ্যতার যে সম্পর্ক, চিন্তার সঙ্গে দেশকর্মের সেই সম্পর্ক। অর্থাৎ চিন্তার সঙ্গে দেশকর্মের অহি-নকুল সম্পর্ক। চিন্তা চিৎকারের শত্রু। চিৎকার রাজনীতির প্রাণ। চিন্তা লালসার প্রতিষেধক: লালসা রাজনীতির সার। চিন্তা বিপ্লবের [illegible]ক। বিপ্লব রাজনীতির উৎস। তরু[illegible]ন ত্যাগ করুন, চিন্তা হইতে শত যোজ[illegible] দূরে থাকুন। আপনারা চিন্তাশীল হইলে আমাদের দেশের রাজ-[illegible]

এই বহুজন-পার্টিত বহুরূপী ডেমোক্রেসি রসাতলে যাইবে।

আপনারা শহরের রাজপথগুলি রুদ্ধ করিয়া দেশের উন্নতির পথ সুগম করিতেছেন। চিন্তাশীল হইলে ইহা করিতে পারিতেন না। আপনারা ধর্মঘট করিয়া ইস্কুল কলেজগুলি প্রায় বন্ধ করিয়া যথার্থ জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। চিন্তাশীল হইলে ইহা করিতে পারিতেন না। আপনারা বুর্জোয়া ন্যায়নীতি ধর্ম পরিহার করিয়া এক সুস্থ সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মদান করিতেছেন। চিন্তাশীল হইলে ইহা করিতে পারিতেন না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো......' মুণ্ডকোপনিষদের এই বাণী আপনাদের বল অর্জন করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। আপনারা বোমার বলে বলী, বন্দুকের বলে বলী, ছোরার বলে বলী, লাঠির বলে বলী, চিৎকারের বলে বলী। সর্বোপরি আপনারা আত্মবিশ্বাসের বলে বলী। চিন্তাশীল মানুষ চিন্তার ভারে ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে। তাঁহার প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দেহযন্ত্র বিকল হইয়া যায় এবং অবশেষে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সে প্রাণত্যাগ করে। আপনারা চিন্তার পথ ত্যাগ করিয়া বলের সাধনা করুন। এমন এক বলশালী গুন্ডারাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র:

সপ্তকোটিকণ্ঠ - কল - কল -
নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃত খরকরবালে

আমরা বাঙালীরা আর সপ্তকোটি নহি। আমরা এখন সাড়ে বার কোটি। কিন্তু আপনারা আপনাদের কল-কল নিনাদকে এমন করাল করিয়া তুলিয়াছেন যে মনে হইতেছে সাত কোটি কণ্ঠ কল-কল নিনাদ করিতেছে। আর বঙ্কিম কল্পনা করিয়াছিলেন সাত কোটি বাঙালীর প্রত্যেকে দুই হাতে একটি করিয়া তরবারি ধারণ করিতেছে। আপনাদের এক হাতে তরবারি আর হাতে বন্দুক। আপনাদের হাতে নয় কোটি আয়ুধ। কিন্তু আপনাদের এক হাতে মগেরে এবং আর হাতে মোগলকে রুখিতে হইবে না। আপনারা দুই হাতে দেশের মানুষকে রুখিবেন, প্রয়োজনবোধে মারিবেন। দেশের মানুষকে না মারিলে দেশ কোনদিন মানুষ হইবে না। একটি মেষ আর একটি মেষকে হত্যা করে না। কিন্তু মানুষ আমরা, নহিত মেষ। আপনারা মানুষ মারিয়া মানুষের ধর্ম পালন করুন। মা আমাদের নরমুণ্ডমালিনী, নরমুণ্ডের জন্য হাত বাড়াইয়া আছেন। মায়ের হাতে নরমুণ্ড তুলিয়া দিন। বঙ্কিমচন্দ্রের মা একালে একটু করাল-বদনী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাকে সুহাসিনী, সুমধুভাষিণী করিয়া তুলুন। আপনাদের তিনি দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিবেন। আপনারা আপনাদের মাকে চিনিয়া লউন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঘরে লইয়া আসুন। মায়ের সংসার স্নেহের বন্ধনের সংসার। সে সংসারে ডেমোক্রেসির প্রশ্ন ওঠে না। মাতৃচরণে আত্মবলি সেই সংসারের আসল ধমণ। যেমন জনগণের রাজ্য সাম্যের রাজ্য। স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে না। মায়ের ডাক স্নেহের ডাক। স্নেহ এক বন্ধন। মার্কসের ডাক সা[illegible]র ডাক। সাম্য এক বন্ধন। মাতৃতন্ত্রী [illegible] স্নেহে ডুবিয়া আছে। তাহার ডে[illegible]সিতে কাজ নাই। মার্কসতন্ত্রী সাম[illegible]র ভাসিতেছে। স্বাধীনতা দিয়া [illegible]ক করিবে? ব্যক্তিস্বাধীনতা নিপীড়িত দরিদ্র সমাজের বিলাস। সে বিলাসে আমাদের কাজ নাই।

অরুণ-প্রাতের তরুণ-দল, আপনারা দেশসেবার শুভব্রতে ব্রতী। আপনারা চিৎকার করি[illegible] এই মূক বধির সমাজকে আর[illegible]ও মূক ও বধির করিয়া তুলুন। মানুষ মূক ও বধির না হইলে রাষ্ট্রকর্ম বিঘ্নিত হয়। আপনারা খুন করিতে থাকুন। দেশদ্রোহীরা জীবিত থাকিতে দেশের উন্নতি নাই। আপনারা মারামারি কাটাকাটি করিয়া নৈরাজ্যের সৃষ্টি করুন। সেই নৈরাজ্য হইতে এক শক্তিশালী রাজ্যের সৃষ্টি হইবে। ভুলিবেন না দেশের নেতা ও রাষ্ট্রের চালকগণ আপনাদের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা তাহাদের নেতৃত্বের জন্য, সুখশান্তির জন্য আপনাদের উপর নির্ভরশীল। আপনারা জয়ী হইলে তাহারা জয়ী। আপনারা আপনাদের ভুজৈধৃত খরকরবাল উত্তোলন করিয়া এবং হর্ষধ্বনি করিয়া আপনাদের সম্মতি জ্ঞাপন করুন। দেখিতেছি শতশত তরবারি ঝলমল করিতেছে। শুনিতেছি শতশত কণ্ঠের কলকল নিনাদ। সভা শেষ হইল।
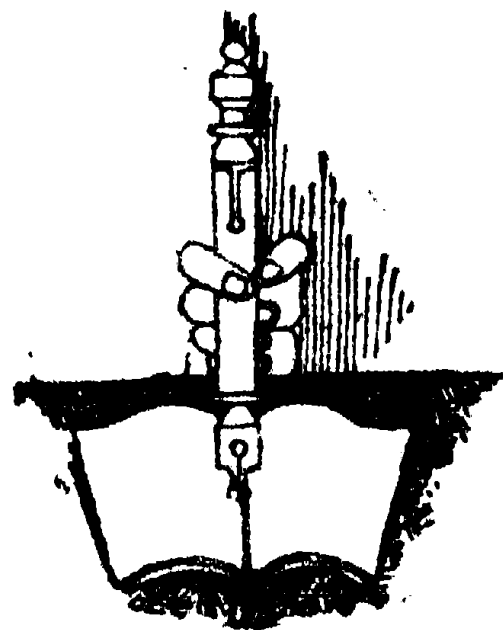
বাংলার লৌকিক দেবতা

কমল চক্রবর্তী

—হাই খুড়ো কি খপর? টিকারাম জিজ্ঞাসা করল।

গয়াপ্রসাদ মাথা নাড়িয়ে কুটুম্বিতা করল, কবে আইসলে হে?

—আইজ। টিকারাম মাঝির সঙ্গে তারাপদ মেলা দেখতে এসেছে। ডিগরী ঘাটে পুষ পরব। আমি ঝাপ দুব লদীর বানে/ছুট বিহা দিলি মা কেনে।

গয়াপ্রসাদ বুঝদার নয় এমন কথা বলা যায় না। কারণ ডিগরীঘাটে এই তার একাদশবার দোকান। এখন যে কুঁড় কিলো বেসন ছানতে না পারার জন্য হা-পিত্যেস করছে ত যথার্থ। কারণ ভিড় চূড়ান্ত। হায় বাপ! আগে জানলে বিশ কিলো বেসম ছানাতি। এ-তো লক, দশ কিলো ডাঁড়াবেক নাই। বেসন ছানতে ছানতে সে পেঁয়াজীর সাইজ একটু করে মেরে দিচ্ছে এই তো কথা।

ভিড় হয়েছে। কারণ ধান হয়েছে। ফলে সুখ বেড়েছে। মেলা। ধান চষা মাঠের মধ্যে দিয়ে গরুর গাড়ীর রাস্তা। রাস্তায় অবিরাম ধুলো। একটানা বৃষ্টির মত গান। এদিকে পরবই বল আর গরবই বল, একা পুষ। খাটিয়ার চার ঠ্যাংগে চার ঠ্যাংগা জুড়ে, বেছানার চাদর, ধুতি টাঙ্গানো, দোকান। চা, পোকাড়, গুলগুলা সেউ, জিলাবী, খেলনা, কাপড়া। যা যা মেলায় থাকে। বাড়তি শুধু পাহাড়ী লেবু। বড় টক। এক হাত দেড় হাত সাঁওতালি বাঁশিও বিকী আছে। আর মদ। সাচ্চা পরব।

ঝিশোল হত্যাডি, ধরমাডি বিকনা হেসলপাত, ঝিঙ্গাশোল, মহুলিয়া ভেঙ্গে পড়ছে মেলায়। গরুর গাড়ীতে কম্পানী-বাবুদের বাড়ীর বিটিছিলারা আসছেন, পয়সা থাকলে গাড়ী, নাহলে হন্টন। দিকু মুরমুর ব্যাটা বেইজু মুরমু মোটর সাইকিলে, চখে কালো চশমা, লতুন কালা প্যান্টালুন, হিরো জামার পাকিটে দশ টাকিয়ার নোট করকর। বেইজু এখন আর লাচে না। লাচিয়া যুবতীদের দিকে নজর রাখে। কারণ মোটরসাইকিলের পেছনে এক-সাথে দুটিকে দিব্যি বসিয়ে চালাতে পারে।

ঘাটের পাশে দুটি মন্দির। একটি সরেঙ্গীবাবুদের, পুরান। এক মানুষ মাথায়, তিনদিক খোলা, কেবল পেছন দেয়াল। দেবতাটি পরবের দিন সকালে ঘর থেকে উঠে এখানে আসেন। সারেঙ্গীদের কুলদেবতা। খাঁটি পাথরের শালগ্রাম। হয়তো সুবর্ণরেখার অকৃত্রিম রত্নবিশেষ, নতুবা একদিনে হাজারখানেক সিকি আধুলি নোট খিঁচে লেয়! এবং ভক্তদের দানের ও গ্রহণের সুবিধের জন্য মন্দিরের তিন ধার খোলা। দরজা নেই। কারণ সারা বছর শূন্য বেদী, দেয়ালে স্বস্তিকা, সিঁদুরের শুভচিহ্ন, আর কারও ভরসায় লাগে না। ফের পোষ মাস এলে কাল ফিরিয়ে হাত পাঁচেক মাথায়, ছোট বাথরুম সাইজের দেবস্থানটি তকতক করতে থাকে।

গত বছর পান্ডাদের সাথে সরেঙ্গীদের প্রথম বিরোধ দেখা দেয়। কারণ উপার্জন হাজার দেড়েক, তাও একবেলার। শেষ অব্দি কাছারী পর্যন্ত গড়ায়। দ্বিতীয় দেবস্থানমের গোড়াপত্তন নেই। সেটি চৌখুপ্পি খোকনের ড্রইং খাতার চতুর্ভুজ, তিন থালা।

এবার দুটি দেবতাই টপাটপ ভক্ত টানছেন। তবে আদিটির বেগ বেশী। বামুন ঠাকুর ফুল বেলপাতায় প্রায় চাপা। সামনে দুটি রেকাবী। ছোটটি নকুলদানার বড়টি মুদ্রার। চেয়ে। মুদ্রাযন্ত্র ও বামুন, দুজনেই ফুল বেলপাতা চাপা, কেবল দুটি শীর্ণ খড়িওঠা হাত নড়াচড়া করছে। রতন শেঠ নশ টাকায় হাব্বা-ডাব্বার বোর্ড ডেকে নিয়েছে। পাঁচলকেও হিমশিম। পাশে খুখড়া পাড়া। তার পাশে মদ, হাঁড়িয়া। তবে লক্ষণ পাসারী তাড়ি নিয়ে ঘাটের ধরে বসে, জলে নাবার আগে টক করে চার গেলাস মাইরে লাও। সারা মেলায় বাতাসে মদের ফিনফিনে সর। গানের ধমক। আর বাজনা। চার ঘন্টার মেলা। দুটো থেকে ছটা। আমদানী রফতানী কয়েক হাজার টাকা। মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা। নদীতে যাবার। বহু নীচে নদী। বস্তুত গভীর তলানিটুকু নদী। জল কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর। দু-পাড়ই বিস্তর ওপরে। যেখানে জল সবথেকে সরু, অগভীর, সেখানে বাঁশে বাঁশে সাঁকো। ওপারে রাখাকপার। জঙ্গল পাহাড়, রুয়াম। পাথর জলরাশিকে আগ্রাসী করেছে।

তারাপদ সেই অর্থে শহুরে কারণ তার গায়ের রং নাকি ফর্সা এবং সে ভোরবেলায় চা-মুখে বাথরুমে ছোটে, লোকগীতিতে আকর্ষণ বোধ করে। ফলতঃ মূলে নদী, মেলা, পাহাড়, লোকগীতির টানে আসা। যা এক কথায় বাবু সমাজে, ফোক কালচারও বটে।

এক একটি ছোট ছোট দল নাচতে নাচতে নদীতে এসে পড়ছিল। দলে মেয়েমানুষও যথেষ্ট। নানান বয়সের। নদীর ধারে ধারে ছোট ছোট নাচের দল। কেবল ছেলেদের দলও কম নয়। তারাপদ লক্ষ্য করে, খড়ের আঁটিতে নীচ থেকে ফুল-প্যান্ট পরানো, কোমরে বেল্ট, ওপর দিকে জামা এবং আনুমানিক মাথায় টুপি, ফুল স্লীভ জামার ঝোলানো হাতের নীচে রবারের দস্তানা। এই অদ্ভুত ডামিটি কোলে তুলে একটা সাঁওতাল ছেলেদের গ্যাং নাচছে। প্রত্যেকের মাথায় শালপাতার চওড়া টোকা, বুকে ঝোলানো নাকাড়া। বোতলভরা হাঁড়িয়া দাঁড় বেঁধে, কাঁধ থেকে কোমর অব্দি পিস্তলের মত ঝোলানো। মাঝে মাঝে মুখে উঠে যায়। প্রত্যেকের পরণে কারখানার পুরোনো নীল বা খাকি জামা-প্যান্ট পায়ে ভারী বুট। এই বিচিত্র দলটি নদীর জল অবাদ নামে। ডামি কোলে দুটি যুবক। সমস্ত দলটি নৃত্যরত। কতগুলো কালো মজবুত যুবক, একটা খড়ের পুতুল ঘিরে নাচছে। গান গাইছে। তিনজনের চোখে কালো চশমা, তাতে আবার একজনের ওয়েল্ডিং ঠুলি। দুর্বোধ্য ভাষা। তারাপদর লাটিন আমেরিকার কোন ছবি কি তখন মনে পড়ে যায়?

অযথাই একধরনের ভয় হয়। সে আস্তে সাঁকো পেরিয়ে লক্ষণের কাছে যায়। দিনের প্রথম পানীয় তাড়ি, লক্ষণ দেয়। নদীর ওপরে অস্থায়ী নড়বড়ে সাঁকোতে গিয়ে দাঁড়ায়।

ঠিক সেই সময় কয়েকটি যুবতী হটুজলে নেমে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করে। বাতাসে ফুলে ওঠা সারা, বুকে জড়ানো নতুন গামছা, জল-চমকানো যৌবন। এমন সময় গতর নামালেন যুধিষ্ঠির মাহাতোর বড় মেয়ে বাঁশি। কেডারীর মালিক ভগবান প্রসাদের রাখনি। কিন্তু প্রত্যেক মকরে মাথায় টুসু নিয়ে নাচতে নাচতে নদীতে আসবেই। গা-ভরা যৌবন, কেবল গয়না নয়। বাঁশির দলের আট-দশটি মেয়েও জলে নেমেছে। মত্ত অবস্থায়। স্নান সেরে ফেরার পথে গরীব দুঃখীদের দুহাতে বিলোতে বিলোতে মন্দিরের পূজারীকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে প্রণাম করবে। বাঁশির ভেজা কাপড় যত্নের শরীর, এ অঞ্চলের দ্রষ্টব্য যেমন। কথাও হয়।

তারাপদ গ্লাস ভরে চা নিল, গরম বেগুনি। জর্দা, জাফরান, মুস্কি পান। খুখড়া পাড়ার দিকে এগুলো। ঘণ্টাখানেক বেলা হতেই আলো মরে। হঠাৎ চোখ তুলতে দেখতে পায় ঘন হয়ে নীল পাহাড় ঘিরে ধরেছে। ভেতরে নিরাপত্তাহীনতা, পুলিশী জুলুম, জেলে শেয়ালকাটা ভেজালের অসহায়ত্ব মনে পড়ে। সে সোজা মদের পাড়ায় চলে আসে। দুটাকা দিয়ে এক বোতল মদ পায়। শাল পাতায় নুন, লাল লংকার চাখনা। বোতল শেষ করে আরও এক বোতল চাইতে যাবে, দুর্গা সোরেনের সাথে চোখাচোখি। তারাপদ মুচকি হাসে,—কি খবর?

দুর্গা মদউলি মাসির হাত থেকে বোতলটা তারাপদকে এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে,—মিয়া ছাইলা লিবে?

মুহূর্তে তারাপদ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। এবং অস্ফুট একটা 'না' বেরিয়ে আসে।

—তবে টুকু মদ খাওয়া বাবু!

এগিয়ে দেওয়া বোতল থেকে শাল-পাতার দোনায় ঢালতে থাকে। তারাপদও খায়। একটা সিগারেট ধরায়, দুর্গাকে দেয়।

তৃতীয় বোতল মহুয়া খেতে খেতে আলো আর থাকেনা। যেমন তারাপদর ভয়ও। সে খুব নীচু স্বরে দুর্গাকে,—মিয়া ছাইলা লিব হে, জানান দেয়। —তব চলহ বাবু। রেলওয়ে নীল যথেষ্ট ছেঁড়া হাফ প্যান্ট। এবং হাতা ছেঁড়া ঐ হাফ সার্ট। খালি পা। রোগা। ধানকাটা মাঠের মাঝ দিয়ে হাঁটে। পেছনে তারাপদ।

—বাঝালি নাই ও শালি জাম্বি আমার। আমার দশ সালের পেরেম। উয়াকে পারবে দুশ টাকার কাপড় দিয়েছি। শালি আমার কথা শুনে নাই যদি, তবে উয়াকে টাঙিগাতে ঘুচাব। হ বাবু, ডর লাই। তবে কন লক জাইনতে পাইরলে, দুলককেই। খতম।

তারাপদ নিঃশ্বাস বন্ধ করে হাঁটে।

মেলা এবছরের মত শেষ। সরেঙ্গীদের শালগ্রামশিলা ফুলে বেলপাতার চাপা থেকে উঠে আবার এক বছরের জন্য দেবত্ব সম্পত্তির [illegible]

খোলা আকাশের স্বাভাবিক আলোতে দুর্গাকে অনুসরণ করে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে দুর্গার মাটির ঘর। উঠোনে খাটিয়া বিছায়। ওর চারটি ছেলে-মেয়ে দেওয়া স্ত্রী সিংগা সোজা এগিয়ে এসে লোটায় হাত মুখ ধোবার জল দেয়। হাড়িয়া আনে, মুড়ি। মাংস পিঠা। ঘুঘুর মাংসের।

—বাবু গরীব লক বটি, কুথায় খাসি কিনব বল? তবেই পরবের দিন ছাইলা-গুলা খাতে খুঁইজছে, ঘুঘুর লিলম। তুমি খাবে নাই বাবু, আমার পাপ হবে। তুমাকে খাতে নাই।

সামান্য মহুয়ার তেলে, চালের গুঁড়ি শুয়োরের মাংসের টুকরো, পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে, পাথরের তাওয়ায় ভাজা। ওর চার ছেলেমেয়ের হাতে তারপদ চারটি টাকা দেয়।

বউকে কাছে ডাকে। আসতে, দুটো টাকা ওর হাতে গুঁজে দেয়। তারাপদর অবৈধ চেতনা আন্দোলিত হয়। যেন বা প্রকাশ্যে সে অন্যের যুবতী স্ত্রীকে আদর করছে, এরকম একটা আবেশ তখন। প্রথম রাতে, তার সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলে যায়। সে লাল চোখ অন্ধকারে যুবতীর দিকে তুলে ধরে। যুবতী বড় নিরাসক্ত, ঘরের ভেতরে চলে যায়।

তখন দুর্গা সোরেন জাম্বির খোঁজে। ঘরে অন্য সব কটা বরা নেশায় কথায় বাঁদ। তারাপদ উঠে দাঁড়ায় টলমলে পায়ে, হেরি-কেনের আলোয় মাটির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায় দুর্গা! আস্তে ডাকে। বৌ বেরিয়ে আসে,

—উ টুকু বাইরালো, কন খুইজছু বাবু?

—হ্যাঁ, আমাকে আর একটু হাঁড়িয়া কিম্বা রাস দিতে পার?

—হ, দিছি।

তারাপদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাটিয়ায় ফিরে আসে, ঘরের ভিতর অব্দি যায় না। এবং খানিক পরে দুর্গা ফেরে। আবার অনুসরণ। গ্রামের শেষে এসে দশটা টাকা চায়।

—বাবু ঝুটে বলি নাই, উয়াদের ঘরে বহুৎ কুটুম। আমার সাথে বাইরাবেক, উয়ার বাবা দেইখে লিল। এখন টাকা খুঁইনজে মদ টুকু খাবেক। হ, তবেই আর কি টাকা দশটা!

দুর্গা ফিরে গেলে, গ্রামের বাইরে কুসুম গাছের নীচে মদের দোকান যেখানে, তারাপদ এগোয়। আরও খানিক মদ্যপান জরুরী। কারণ গতকাল পূর্ণিমা হওয়ায়, আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন। চাঁদ খানিক বড় হলেও লেট কামার।

কালাঝোরের উঁচু পাথরে মাথায় চাঁদ ওঠার ব্যবস্থাপনা। শীতের টানে পাতা ঝরছে। মাটি আরও আঁট হচ্ছে। পাঁচ-দিনের জরে জারে মদ। মেলা থেকে ঘরে যাবার মুখে শেষ নেশা। হেরিকেনের পাশে কজন নড়বড়ে মদাপ। বাদবাকি আরও অন্ধকারের দিকে ছড়ানো। যেখানে দুটি [illegible]

পুরুষ। অন্ধকারে প্রাকৃত শব্দ, হঠাৎ হাসির লহর, এইভাবে। তারাপদকে কেউ বিশেষ লক্ষ্য করে না। যেমন এখানে সময় দাঁড়িয়ে নেই। সে নেশারত হয়েই থাকতে চায়, কারণ তার শহুরে ভয়, হিসেব, তাকে ঠকাতে পারে। কারণ এখন অনেক দূরে পর্যন্ত আসা হয়েছে। মদের ঠেক থেকে উঠে আসা যন্ত্রটি তাকে ফোকসং অব্দি নিয়ে যাবে। এবং সেইভাবে প্রত্যেক গেলাস মদ খেতে ব্যস্ত।

—বাবু! মাথা ঘুরিয়ে দেখে দুর্গা দাঁড়িয়ে।

—চল কেনে, একটুকু আগু আগু উদিকে, আমাকে দশটা টাকা, হ মদ লিব।

এই প্রথম তারাপদ লক্ষ্য করে দুর্গার দুটো চোখই অসম্ভব রকম বড়, তেলতেলে মুখ অনেকটা সরেঙ্গীদের শালগ্রামশিলার সঙ্গে মেলে।

রাস্তা নয়। ধান কাটা মাঠ। ইদানীং টানে হাড্ডাহাড্ডি। তিনজন হাঁটছে। হাঁটার টানে। দূর থেকে কৃষ্ণপক্ষের লেট চাঁদের আলোয় রামচন্দ্রের বনগমন মনে হবেও বা। তারাপদ, দুর্গা, জাম্বি—ফাইল। অনেকটাই আলো, পেছন থেকে কালাঝোরে চাঁদের উদয়। কারোর শরীরের ছায়া নেই। চাঁদের আলোয় ছায়া পড়ে না। ধানের মরাই দেখিয়ে দুর্গা বললো,

—বাবু এইঠিনে থাম্ কেনে। আজ চৌকি থাইকবার নাই। ডাকু, মিলিটারি নাই, পরব মানাবার বটেন।

মেয়েটিও এই প্রথম কথা বলে,

—ই গো পুয়াল দমে গরম, পুয়ালের ঘরে—বাকী কথা না বলে ঢলে পড়া হাসি ছোড়ে।

তারাপদ এক মুহূর্তের জন্য ঘুরে দাঁড়ায়, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও লস সিগারেট ধরাতে পারে না, আলোর ভয়। কেবল দুর্গার উদ্দেশ্যে জানায়, । মদ খাও। পুয়ালের ঘরে মদ খেলে আমরা ডিগরী যাবো, ডিগরী ঘাটে মার টুসু পরব। লোকসংস্কৃতি!

সে বেশ করেছে দুর্গার ডাকে বাড়ির বাইরে চলে এসেছে। কালকে কেউ কিছু বলুক, শালা ফর্সাতে, জয়মা রঞ্জন মা। না বাঁশির মত অত আরাম অসহ্য, ধান কাটা নেই, ঘর লেপা নেই, দেয়ালে ছবি আঁকা নেই, জল আনতে এক কোশ হাঁটা নেই, অসহ্য।

—এবাবু কত দূর যাবি, ঘরে ঘুরব নাই গো, বড় যে আমার ভগবান প্রসাদ!

—এ্যাঁ! ঘোর থেকে তারাপদ ফিরে এলো। খানিক তছনছ হয়ে বললো,

—ঐ ডিগরীঘাটে। দুপুরে যখন সবাই নাচ করছিল, গান করছিল, বড় মন খারাপ, কারো সঙ্গে ভিড়ে যাবো ভাবছিলাম, তখন যখন হল না, এখন তোর সঙ্গে নাচব।

—বাবারে! ই বেলা বইলাতে হয়! আমরা কোত্ত নাচাছি না তুমাকে দেখি নাই। বাইতে জাড়াবে যাব শুনে কুন লক ভাইবছে কি ভাইনু ভাইবরে।

—হ রে, তু শালি ডাইন বটিস কিনা, আমাকে দশ বছর ঘুরালি। তুকে দুশ টকার কাপড় দিয়েছি, হ বাপ! আইজ তুকে ছাইড়বো না। দুর্গা টলতে টলতে গরগর করে উঠল।

—হ রে শালা দশ বছর! ঝুট! এঃ আঠারো টাকা চাইর আনায় শাড়ি দিলে, আবার দুশ! তুর বাপ কভু দুশ দেইখেছে?

—এঃ বে বাপ লিবিশ নাই!

—কে বে? জাম্বি ঘুরে দাঁড়ালো। দুর্গার ছোট সরু সরু পাঁজরের নেহাৎ জোড়া-তালি দেওয়া খাঁচায় কিল মারল। দুর্গা পড়ে যেতে যেতে সামলে দাঁড়ালো।

—এ বাবু তুরা যা আমি যাব নাই। এত সাহস! যা বাবু দুর্গা যাবে নাই। দুর্গার বাপ চাকুলিয়ার লাইট বাবু ছিল পাঁচ বিঘা শোল জমিন! দুর্গার চার ছাইলা! দুর্গা যাবে নাই বাবু, ও শালির রাণ্ডির মুখ আর কভু দেইখবার নাই। দুর্গা সোরেন বটে, গালুডির দশ লক জানে!

খড়ের বোঝা মাটিতে নামিয়ে বসে পড়ে। মাত্র কয়েক গজ দূরে ডিগরীঘাট।

তারাপদ বোঝায়, সঙ্গে যেতে উৎসাহ দেয়, ভয় পায় যদি গ্রাম থেকে তীর-ধনুক বর্শা নেবে আসে। যদি দুর্গা ফিরে যায়। মরা জ্যোৎস্নার নীচে অজস্র লোহ ফলাকে, সে মৃত।

—থাম্ কেনে বাবু। উ শালা, খাল-ভরা, দোগলা, ভড়ুয়াকে আমি জানি। উ শালা লিজেই আইসবে, তু দেখ না। চল গ। জাম্বি তারাপদকে হাত ধরে আলপথ মাড়ায়।

(২)

ক্রমশঃ ফিকে কুয়াশায়, ঘোলাটে আলোয় সরে যায় খড়ের স্তূপ। এবং মানুষটি, দুর্গা। আজকেই শেষ বিকেলে, যখন শীতের পরিষ্কার সূর্যাস্ত মাঠ ঘিরে ফেলেছে, পাখ-পাখালীর ডাক আর কানে আসছে না, ফোক-সংস্কৃতি অনেক হয়ে গেছে মনে হল, মদ পাড়ায় চলে এসেছিল। শালগ্রামশিলার মত তেল চকচকে মুখাবয়ব দেখে নেহাৎই ফালতু, 'কি হে' ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে সাথে সাথে। ঘরের রান্না, মদ, খাইয়েছে। খুব খারাপ হচ্ছে কি? ভাবতে ভাবতে ডুবে যাচ্ছে। দুপুরের মেলা প্রাঙ্গন, কোলাহল অতিক্রম করে ঘাটে নেমে যাচ্ছে দুজনে। ওপর থেকে নদীর জলধারায় চাঁদের পাত, পাথরে জলের ঠোক্কর, বালিয়াড়িতে শাদা বিবশতা, তারাপদ সমস্ত ভুলে গেল। [illegible] মনে পড়ল না সমাজ, জল মেশানো [illegible] সালটে চুরী করা এম এল এ, মনে পড়ল [illegible] হাওড়া ষ্টেশন থেকে হারিয়ে যাওয়া [illegible] কলেজ জীবনের প্রথম বই-এর ট্রাঙ্ক [illegible] প্যান্টের সামনে বোতাম [illegible] বাজারদরী সাবান দিয়ে অবাঞ্ছিত লোম নাশ করতে গিয়ে ঘণ্টা চারেক কষ্ট পেয়েছিল গুপ্ত অঙ্গ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল না দুর্গা গ্রামে ফিরে গিয়ে সমস্ত গ্রামবাসীদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ফিরে আসতে বলবে। প্রকৃত লোক-সংস্কৃতির আগাপাশতলা টান, তাকে দিব্য এই জ্যোৎস্নার সাঁকো দিয়ে নদী অব্দি নিয়ে গেল।

জাম্বি বললো,

—চল বাবু ঐ ঠিনে, ঐ বীরিজের উপরে বইসে আগে টুক্ মাদ খাই।

জাম্বি নড়বড়ে সেই হাঁটু জলের ওপরের সাঁকোতে উঠে গেল।

—বইস। লে।

ব্লাডার থেকে সোজা গলায়।

—বাবু লে, মহুল জল বটে, লে, জাড়াবেক লাই। আর টুকু খাইয়ে লিলে সব খতম, জাড় খতম, রাইত খতম। বুঝাবেক নাই কনখ সিরালেক।

—জাম্বি এখানে ভালুক আসে?

—হগো বাবু, দমে ভালু। তবে এখন নাই। সে আইসবেক ফাগুনে, চোতে মহুলে পাইকলে। লাইচতে আইসবেক।

জাম্বি পাহাড়ী বালিকা, হাসল। তারাপদ সিগারেট স্বাচ্ছন্দ পায় না। আগুনের ফুলকিতে ভয়। তবে এখন সে সর্বদা নিম-তেলের কটু গন্ধ পাচ্ছে, এই যা ভরসা। তেলটি গায়ে আচ্ছা করে মর্দন করা হয়েছে এবং মেয়েমানুষটির শরীরের ঘামে, পাহাড়ী বাতাসে চোলাই হয়ে দারুণ আঁশটোম একটা! তারাপদ আরও জুৎ করে শরীরের পাক দেয়। সমস্ত চেতনা কনসেনট্রেটেড হতে থাকে। সে ডুবে যায়।

ঠিক তখন একটা মৃদু 'হা-রে-রে-রে' শব্দে চমকে ওঠে। মনে হতে থাকে দূরে দূরে বল্লম হাতে অসংখ্য মানুষের ব্যূহ। সহসাই সে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। জাম্বি আহত গলায় প্রশ্ন করে,

—কি গ বাবু, কি হইল?

তারাপদ বলে—শুনতে পাচ্ছ? খুব আস্তে 'হারেরে' একটা আওয়াজ? অনেক দূর থেকে মানুষজনের আসার শব্দ। ঠিক দুর্গার কাজ। ব্যাটা গ্রামে গিয়ে খবর দিয়েছে।

কথা শেষ হতেই জাম্বি হেসে ফেলে।

—বকা বাবু!

আরও আশ্রয় প্রতিম হয় জাম্বির দু' বাহু।

—বকাবাবু বটিস, আমার বকাবাবু বটিস। ভুললে, লিচে নদীর জলের শব্দ বটে।

তারাপদ স্থির হয়না। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে,

—না ভালো করে কান পাত।

জাম্বি এবার সত্যি সত্যি আরও ভালো করে পক্ষপুটে আবিষ্ট করে এবং ধ্বনি-তরঙ্গে কান পাতে। পুনরায় হেসে ফেলে,

—হ। বকাবাবু, আমার বকাবাবু!

অদ্ভুদ ছন্দে দোলাইক [illegible] তার কণ্ঠ এবং হাসিতে পারওনা।

অমন শব্দ সব রাতেই হয়। চাঁদের আলোয় এমন শব্দ হয়। তুমি আগে শোন নাই বাবু। কনই জান না। জনমভর শহরে বিতালে। তুচ্ছতা, মোহময়ীর দু-ঠোঁটই খরসান দিয়ে ছুঁড়ে দেয়।

অবশ্যই তারাপদ খানিক ধাতস্থ হয়। এবং এক্ষণে মনে হতে থাকে, বস্তুত জ্যোৎস্নায় খোলা আকাশের নীচে এবম্বিধ 'হা-রে-রে-রে' সর্বদাই স্বাভাবিক, যা জ্যোৎস্নারই আক্রমণের আবহ, ধ্বনি-তরঙ্গ। পরিবেশ এইভাবে প্রস্তুত।

এবার সত্যি সত্যি তাদের দেখে খানিক থমকে একটি যথার্থ স্বাপদ, নদীর পাড় দিয়ে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আখানের দিন। সকালে উঠে গোরাম থানে পুজো দিতে গিয়ে জাম্বির একটা আনখা খুশী পেয়ে বসেছিল। ঝলমলে শীতের রোদ, ঘাসে ঘাসে শিশির, মাকড়সার জালে জড়িয়ে থাকা জলকণা। সমস্ত মেলায় সে অজান্তেই খুঁজেছিল, খুশী হওয়ার জন্য। তার নাচ দেখার লোক। পেল। পেতে রাত হল। রাতের কুটুম। জাম্পি নষ্ট মেয়ে-মানুষ নয়। এমনকি একটা টাকাও বাবুর কাছে চায়নি। সে কি দোগলা* পরবের পিঠা! ঘরে বসে বসে কুটুমদের সাথে পরব মানাচ্ছিল, হঠাৎ দুর্গা হাজির। আড়ালে ডেকে বললে 'চল টুকু বাইরে'। সঙ্গে সঙ্গে ছলকে উঠল। জাম্বির বয়স ঝকঝকে উনিশ।—'কুথায় যাবি'? দুর্গা বললো, 'তুকে আজ সরগে লেগব।' জাম্বি ভয়ংকর শব্দ করে ফাঁকা মাঠে টুকরো টুকরো হয়ে হাসল,—'দুস! সরগ আমি ঢের দেইখেছি। তু পাঁচ সাল সরগ দেখালি'।

তারাপদ ব্লাডারে মুখ দিয়ে খানিক টেনে নিল। বিস্বাদ ভাবটা আর নেই। কেবল টান ধরেছে। জিরেন দিয়েই ঢেলে নিচ্ছে। জাম্পিকে এগিয়ে দিল। ব্যাস ফট করে মাথায় একটা কম্পোজিশন খেলে গেল। তারাপদ ছেলেবেলায় পায়রা পুষে ছিল। শেষ অব্দি পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটা। খানতিনেক গেরোবাজ। আকাশে টিপ হয়ে যেত। তল আকাশে এসে ফট ফট করে ভোল্ট খেতো। বিরাট বোমা। বসতে চাইলে, ছেঁড়া ছাতার কালো কাপড় উড়িয়ে ভয় খাওয়াতো। দুপুরে হলেই ছাদে উঠে যেত। হঠাৎ সেই আকাশটা তিনটে গেরোবাজের ভল্টে তটস্থ, অন্য লকাদের ঝলমল করে উড়ে বেড়ানো। এই গোটা দৃশ্যটা মনে হওয়া। এরকমই হয়। পারম্পর্যহীন ভাবনা সব। এবং আশ্চর্য লাগে, একদিন হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে দেখে মেজ জামাইবাবু, অসিতদাকে দেবার জন্য চা তৈরী করে মা কাপে চুমুক দিয়ে দেখছেন, চিনি ঠিক আছে কিনা। পছন্দ হয়নি। তারাপদর গা গুলিয়েছিল। এবং সেই থেকে অন্য কারো বাড়ীতে চা খায় না। এই মুহূর্তে মনে পড়ার মত কথা নয়, তবুও।

শীত বাতাসে বেশী। ঘামের বিন্দু-বিন্দু তারাপদর কপালে, নাকের পাশে কোন বোধই তো এখন নেই। মেয়েটি বড় ভালো। যা ভাবছিল তাতো আসলে নয়, একটি পয়সাও নেই বরং উল্টে ভালবাসা দিয়েছে, যত্ন দিয়েছে। একটা গোটা প্যান-রামা। অবিশ্বাস্য। পায়ের নীচে সাঁকো,

জলের রং কালো। মাঝে মাঝে জেগে ওঠা কালো পাথর, প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ মাঝে মাঝে শিরদাঁড়ার কাঁটা সিধে করে আকাশে হামলাচ্ছে।

—চল জাম্বি, পরব শুরু করি, চল গান, নাচ, আমাদের টুসু পরবে।

তারাপদ প্রথমে জলে নামে। স্রোত রয়েছে। জাম্বির পা দুটি টেনে নেয়। নদী থেকে বালি মাটি তুলে পায়ের তলা মেজে দেয়, জলে ধুইয়ে দেয়। জাম্বির সুড়সুড়ি লাগে।

—কি গ বাবু, কি কইরছ? ক্ষেপালে নাকি? ভাড়ার থেকে এক আঁজলা মহুয়া নিয়ে তারাপদর মাথায় ঢেলে দেয়।

এইখানে জানা দরকার, তারাপদর অদ্ভুত ফিকসেসন আছে। একবার বছর-খানেকের চেষ্টায় মদুলো নামে একটি পাড়া-তুতো বোনের সাথে ভিড়ে যায়। খেলার দিন মেয়েটির তেলচিটে সায়া দেখে তার আর মুড আসে না। এবং কোন কারণ না দেখিয়ে সে শেষবারের মত খেলা ভাঙে। তার মানে এই নয় যে তারাপদ নিজে প্রত্যহ জাঙ্গিয়া রুমালে সাবান ফেবায়। জাম্বির নতুন সায়ার কোরা গন্ধ মনে রাখার মত, পূর্ব জন্মের বেড়াতে আসা।

শাড়ী সাঁকোর ওপরে রয়ে যায়। বাতাসে জাম্বির হাই পীচে গান, তারাপদর ধুয়ো, বাতাসে জাম্বির লম্বা খোলা চুল, তারাপদর অবাঞ্ছিত দুটো দীর্ঘ হাতের এলোপাথাড়ি ছোড়াছুড়ি। যেমন পরবে। আরও খানিক আগে, এইমাত্র দুপুরবেলায় মেলা বসেছিল। দুটি হিস্টিরিয়ার রোগী। বাহ্যিক অসাড়তা স্পষ্ট। বহু দূরে পাহাড়ে জাম্বির গলা চোট খেয়ে খেয়ে ফিরে আসে।

—আমার বাপ খুখুড়া মনতর জানে। এমন মনতর বাঁইনধাবেক জীৎকার সাঁড়াকেও ডাঁড়াতে দিবেক নাই।

অসংলগ্ন কথা বলা কিছু অস্বাভাবিক নয় বোধ হয়। জাম্বির বাবা বুড়ো হয়েছে। মারগীর পায়ে মন্ত্রপূত ছোরা বেঁধে দেয়, জীৎ নির্ঘাৎ নয়। তবু অবোস হাটের দিনে বাড়োকে টানে। অন্য লোকের লড়াইয়ে অস্ত্র বাঁধবে। মাসে একটা হলেও মোরগা চাই। জাম্বি বললো,

আমি বলি, বাপ, তুর বেটারা উ মনতর শিখতে লাইরবে, হামাকে শিখাবিক? বাপ শিখাবেক নাই। বিটি ছাইলার জাইনতে নাই। হেসেই তারাপদকে জড়িয়ে ধরল। চাঁদের আলোয় যতটা চোখ রাখা যায়। জাম্বি আবার বলে,

—তু শিখবি বাবু? তু শিখবি? বাপের ঠিনে লেগব। হাটে সাঁড়ার পায়ে অস্তর বাঁধবি?

তারাপদ না বলতে পারল না। এবং অকপটে সে আজীবন সঞ্চিত সততা, ভালোমানুষী, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা সব উজাড় করে দিয়ে মাথা নাড়লো। আসলে এখন জাম্বির, রক্তপাতহীন এই বিপ্লবের [illegible] জাম্বি বাবুর শরীরের নিষ্ঠায় [illegible] আর ঠিক সেইসময়

তারাপদর মনে হল, দু পাশ দিয়ে ঝকঝকে বিষাক্ত তীর বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই মুদু, হা-রে-রে-রে, বহুদূরে পার্বত্য অধিবেশন শেষ করা, সিধু কানুর দল খালি গায়ে মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বল্লম, ফার্সা হাতে ছুটতে ছুটতে আসছে। দেবস্থান অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে।

জাম্বির দুগাল তারাপদ দু হাতের ঝাঁকুনিতে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস।

—শুনতে পাচ্ছ জাম্বি? এবার বেশী দূরে না। চল আমরা সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যাই।

—কি বাবু, কি বইলছ?

—দেখো কারা যেন আসছে, আমার ভয় হচ্ছে। ঠিক ব্যাটা দুর্গার কাণ্ড। গ্রামের লোকজন ডেকে এনেছে।

—হ বাবু, বকা বটিস, উয়ার হিম্মৎ নাই। নিজে তুমার ঠিনে আমাকে দিয়েছেন। ও দোগলা লজ্জাদিকে কুন ধারে থাইকবে।

—তবে যে হা-রে-রে-রে? ভালো করে শোন,

জাম্বি তারাপদর বুকে কান রেখে শোনার চেষ্টা করল। তারাপদর বুকের মধ্যে দ্রুত হা-রে-রে।

—তুমাকে বলছি না, রাইতে অমন আও-য়াজ শুনবেক, আর চাঁদ থাইকলে টুকু বেশী।

চাঁদের নিজস্ব সৈনিক আছে। আমাদের বুড়োরা বলে তারা জ্যোৎস্নার দিন মাটিতে নেমে যুদ্ধ করে, তাদের বর্শার ঝকঝকে ফলা, ভয়ংকর উন্মাদনা। কতকাল ধরে চলে আসছে। আমরাও সেই শব্দ শুনেছি। তারাপদর ফোক-কালচারের কেন্দ্রবিন্দুতে কোথা থেকে যেন একটা টিকটিকি লাফিয়ে পড়েছে। বিষাক্ত লালায়, মাঝেমাঝেই জমে-ওঠা পানীয় নষ্ট করে দিচ্ছে। ভেবে পায় না। তবে কি নেশা কেটে যাচ্ছে? আবার ভাড়ারে মুখ দিল। এবার জলে পড়েছে চাঁদ। রাত অনেক।

সারা দুপুরে এখানে খড় উড়েছে। এঁটো শালপাতা, ছেঁড়া ন্যাতা। কাঠের টুকরো। হেরে যাওয়া মোরগের পালক অনেক ঝরা-পাতা। দুজনে মিলে জমা করল। অগ্নিশুদ্ধ হওয়া দরকার। বিবাহের প্রয়োজন। এই প্রজন্মে হঠাৎ মনে পড়েছে, লোকসংস্কৃতি যজ্ঞ যেন। খড়কুটোয় মদ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। জাম্বির শাড়ির সায়া মাজা থেকে গোছ অব্দি, বুকে মুঠো করা ব্লাউস। মদে ছত্রাকার শরীর। তারাপদর গোটানো জীনস। জাম্বির খোলা চুল নিয়ে মাঝে মাঝে আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। ভেজা কফি-রঙা ঠোঁট,—বাবু আমাকে জুতো কিনে দেবে?

অনেক বুনো পোকা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারাপদর হঠাৎ মনে পড়ল নদী পেরুলে রুয়াম। এই সেই মেসিনগান রাই-ফেলে হতচকিত, অপারেশন রুয়াম। সার্কাচ জেলের মোটা গারদের ফাঁকে দাঁড়ানো বাপ্পা টুকটুকে মেরী টাইলার। জাম্বির রাঙা টুকটুকে শরীর, সোনালী চুল, লম্বা

গারদের ছায়া পড়েছে। তারাপদ চোখ ঢেকে ফেললো।

—জাম্বি তুমি আমাকে ভালোবাস, তোমাকে মোজা কিনে দেব।

জাম্বি বললো,—বাবু মন্দিরে অনেক ফুল-বেলপাতা আছে, চল লিয়ে আসি। আরও খানিক আগুন জ্বলবে। আগুন নিবে আইসছে।

দুজনে এগুলো। উঁচু গড়খাই পেরিয়ে মন্দিরের দিকে এগুলো।

—বাবু তু সাঁনতাল জানিস?

—না।

থাইমেট ১০-জি বোরো ধানে ব্যবহার করুন। আবার সেই পারম্পর্যহীনতা।

—তুকে শিখাব। আমু চিনিগাতে

—কি বলছো যাতে যাতে?

ইন্টারভিউতে বরাবরের জন্য বসা, চওড়া চকচকে টাক নজরে এলো।

—আমু চিনি জীবনগাতে।

কি আম চিনি?

—তু আমার জীবনসাথী।

অনেকক্ষণ ধরে হাসতে জানে। দম ফুরোয় না।

—এইং আমদো ভাগি বুঝেও মিন্না। আমি তুমাকে ভালোবাসি বাবু।

শুদ্ধ অন্ধকার। বাসি আলো। প্রাকৃত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ। তারাপদ মনে মনে বলে, তদিদং হৃদয়ং মম। এইখানে অনেক গরুর গাড়ী, তেলেভাজা, খেলনার দোকান বসে-ছিল। তালপাতার বাঁশি এইখানে। দূরে থেকে সেন্ট্রির মত দুটো মন্দির দাঁড়িয়ে থাকে।

তারাপদ মন্দিরের কাছে এসে চমকে ওঠে। সবঙ্গীদের সবেকী শালগ্রাম শিলা ফুল-বেলপাতার মধ্যে পড়ে আছে। ভয়ে হাত-পা সিঁটিয়ে যায়। [illegible] জাম্বির অমানুষিক হাসি শুনতে [illegible]।

—বইলোছিলিনা? [illegible] কথাও যাবেক নাই, আইসবেকই।

—দেবতা! দুর্গা [illegible]র জড়ানো শরীর দেওয়ালে ঠেস দেওয়া মুখে বিবর্ণ আলো পড়েছে, কাপড়ের ভাঁজে। তারাপদর মনে হয় ভাঙা [illegible]মূর্তি। সে সাবধানে এগোয়। মন্দিরের চাতালে বমি। ফুল-বেল-পাতার মধ্যে দুর্গার ছোট রুগ্ন শরীর বেহুঁস পড়ে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আবার উচ্চারণ করে

—জাম্বি, দেবতা!

—হঁ, তুদের দেবতা বটে। দেবতাকে আইজ জলে ভাসাবক, ভাসান হবে বাবু।

সেই আদিম প্রাকৃত হাসি। বাতাসে উচ্চারিত হয়। জাম্বির শরীর ক্রমশঃ আনন্দে টগবগ করে ফুটতে থাকে। সে কাছে এগোয়। তার প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম শব্দ হয়, অবজ্ঞা ঘৃণা ঝরে পড়ে। মূর্তির কাছে গিয়ে ধাক্কা মারে,

—হেই দেবতা উঠরে, উঠ শালা! হারামির বাচ্চা!

দু হাতে দুর্গার বেহুঁস কুকুর কুণ্ডলী তুলে নেয়। তারাপদকে লক্ষ করে না। দ্রুত ভারী পা ফেলে নদীর দিকে এগোতে থাকে।

হ্যালহেড স্মরণে

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকার বিশেষ হ্যালহেড সংখ্যা (বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪) সযত্নে প্রস্তুত এবং প্রকৃষ্ট ঋণ স্বীকারের প্রয়াস তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

আমরা বাঙালীরা বিশেষত আমাদের দুর্দান্ত পণ্ডিতরা—সব কিছু একটু লেটে বুঝি ও বোঝেন। কোনো কিছুর কদর দেখতে আমাদের একশো থেকে দুশো বছর সময় লাগে। একশো বছর অর্থাৎ যেটাকে পরিচিত ভাষায় আমরা শতবার্ষিকী উৎসব এবং ইংরেজীতে সেণ্টিনারী সেলিব্রেশান বলি, হ্যালহেডের সেটা বোধহয় আমরা মিস করেছিলাম। অন্তত এই পত্রিকার কোনো কোনো প্রবন্ধে তার উল্লেখমাত্র নেই। যাই হোক সেণ্টিনারী মিস করলেও বাই-সেণ্টিনারী মিস হয়নি। হ্যালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের দুশো বছর পরে একখানা যথার্থ বাংলা ব্যাকরণ আমাদের দুর্দান্ত পণ্ডিতরা লিখতে না পারলেও, আলোচনা, সেমিনার, তিন পাতা সাড়ে তিন পাতার প্রবন্ধ লিখতে আমাদের ভারি পণ্ডিতরা বিশেষ চেষ্টা করেছেন। তাতে হ্যালহেডের চৌদ্দ পুরুষ হয়তো কৃতার্থ হয়ে থাকবেন। কিন্তু বেচারা হ্যালহেড (জানতে পারবে না বলেই বঁচোয়া) যদি অক্ষয় স্বর্গেও জানতে পারে যে, সুদূর ১৭৭৮ যে সুতীব্র আন্তরিকতায় A Grammar of the Bengali Language গ্রন্থ রচনা সমাপন করে ভেবেছিলেন তাঁর গ্রন্থখানি একটি landmark' 'set up' করবে for the gul dance of future travellers'
—সে পথে বাঙালী পণ্ডিতদের একজনও হেঁটে দেখবার সময় পাননি (যদিও সদিচ্ছার অভাব ছিল না)—তাহলে ভদ্রলোকের স্বর্গসুখ হয়তো নীল হয়ে যাবে।

তবু ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয়কে ধন্যবাদ। রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটিতে তিনি 'সাগর পারের একজন বিদেশী আগন্তুক মাত্র ছ'-সাত বছরের মধ্যে অপরিচিত একটি ভাষাকে আয়ত্ত করে তার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ও ব্যাকরণগত প্রয়োগ বৈচিত্র্য নির্দেশ করতে যে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন'—তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার পরিচ্ছন্ন আয়োজন করেছেন।

এই সংখ্যার লেখকরা সকলেই সুবিজ্ঞ সুপরিচিত। সুপণ্ডিত সুকুমার সেন ১৯৩৯ সালে ভাষার ইতিবৃত্ত এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ লেখার পর আর সময় করে উঠতে পারেন নি বলে একটি আদর্শ ও যথার্থ বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করতে পারেন নি বটে, তবে বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে গভীর চিন্তাজাত নির্দেশ দিয়েছেন এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটিতে ডঃ সুকুমার সেন। হ্যালহেডের দুশো বছর পর, বিশেষ হ্যালহেড সংখ্যায়, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদের কাছ থেকে 'বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত' শীর্ষক উপদেশ পরামর্শ সত্যই পরমপ্রাপ্তি।

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ নামক প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ। ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধ যে কত রসাল ও নৃত্য চঞ্চল হতে পারে সেটি পার্বতীচরণ দেখিয়েছেন। সভাগৃহে পঠিত একটি প্রবন্ধ পাঠের রেজোনেন্স প্রবন্ধটির ভেতরে ঢুকে আছে। বক্তব্যও সহজ সরল জোরালো। তাঁর মূল বক্তব্য হল 'বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃতকে আশ্রয় করে চলতে পারে না।' ভাষা চলবে নিজের প্রাণের টানে। পার্বতীচরণের ভাষায় সে হবে চলতি হাওয়ার পন্থী। দাশরথি, ষড়রিপু হল কোদণ্ডস্বরূপ। পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ যদি গেয়েই থাকেন তাহলে নবদ্বীপের বাঘা বাঘা পণ্ডিতরা জিভ কেটে সলজ্জ হাসিতে বলতে বাধ্য 'সাধু সাধু দাশরথি! তুমি গেয়ে যাও। আজ থেকে কোদণ্ড অর্থ কোদাল হবে। পণ্ডিতরাও বুঝেছিলেন প্রাণের প্লাবনে ব্যাকরণকে অনেক সময় পথ করে দিতেই হয়।
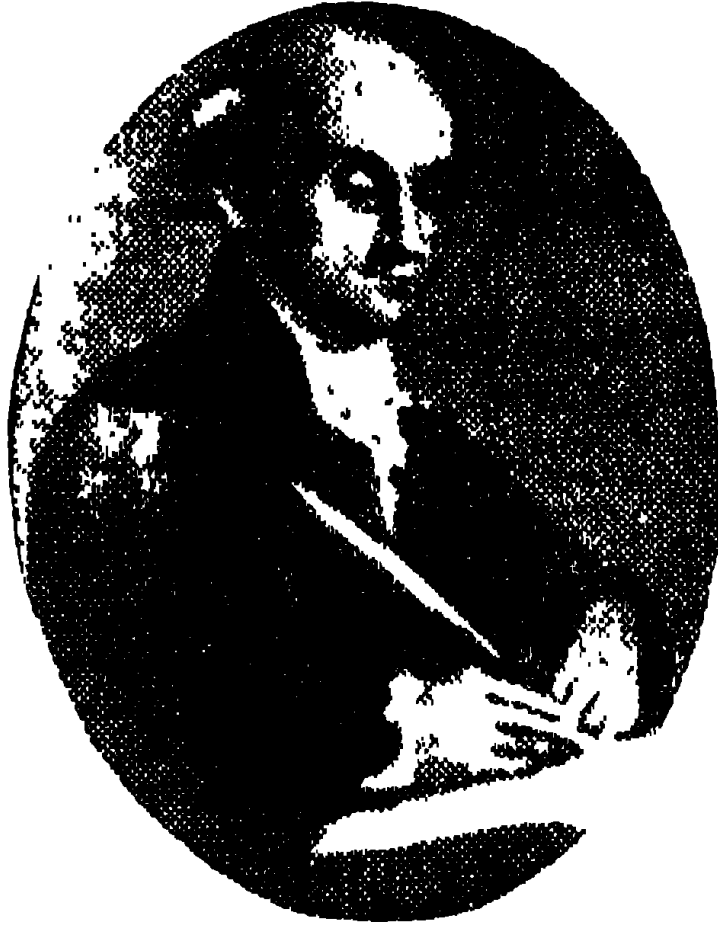
সুবোধ রায়চৌধুরী বাংলা ব্যাকরণ চর্চায় নাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেডের যে মূল্যায়ন করেছেন তা বিষয়ের ওপর তাঁর দখল, আন্তরিকতা এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। তাঁর ১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধটি সযত্ন পাঠের দাবী রাখে।

অবশ্য দুর্বল প্রবন্ধও আছে পত্রিকাটিতে। বাংলা ব্যাকারণের অপরিহার্য বিষয় কি তা প্রবন্ধ থেকে পরিষ্কার নয়। যদিও যে কোন গ্রন্থ তালিকা জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিকে সাহায্যই করে থাকে, তবু ওজনদার পরিশিষ্ট সংযোজন করে প্রবন্ধ চালাবার চেষ্টা—এক ধরনের ঐকান্তিকতার অভাবও মনে হতে পারে।

সব চাইতে দুর্বল লেখা দেবীপদ ভট্টাচার্যের হ্যালহেড ও ব্যাকরণ প্রসঙ্গ। এই ধরনের প্রবন্ধ একটা দেশের স্কলার-শিপের নিন্দা ঘটাতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলনে এ ধরনের প্রবন্ধ যত কম সংযোজিত হয় ততই মঙ্গল।

পবিত্র সরকারের প্রবন্ধটি ভাষাতত্ত্বের উৎসাহী ছাত্রের অবশ্য পাঠ্য। তিনি এই প্রবন্ধে বাংলার ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় নোয়াম চমস্কির তত্ত্বের নানা ধারার প্রয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনার বিচার করেছেন।

সব মিলিয়ে সম্পাদকের কাজ সু-সম্পাদিত হয়েছে। সংগ্রহগুলিকে মোটামুটি মূল্যবান সংগ্রহই বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের আলোচনাটি যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করবার মত।

এমন একটি পত্রিকার যে গ্রন্থের মর্যাদা পাওয়া উচিত এবং কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ভাষাতত্ত্বের ছাত্র ও উৎসাহীর সংগ্রহে স্থান পাওয়া উচিত তাতে সন্দেহ নেই। যে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মানে শালগ্রাম শিলা সেখানে রবীন্দ্র ভারতী নড়াচড়া করছে এটা আশার বিষয়।

অমল মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা। বিশেষ হ্যালহেড সংখ্যা। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা-৭। দাম ছয় টাকা।

কবিতার বই

কিছু কথা নতুন করে মনে হলো, কয়েকটি কবিতার বই এক সঙ্গে পড়তে বসে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজের এই আকালের দিনে দামি কাগজে ছাপাই, অলংকরণ—এসব দিকে কোনো কার্পণ্য নেই একজন গ্রন্থকারেরও, আমি ব্যক্তিগতভাবে লেখকদের পেশা জানি না, কিন্তু এটা দীর্ঘদিন লেখালিখিতে লেগে থাকার জন্য অনুভব করতে পারি, এদের মধ্যে অনেকেরই এই বই ছেপে বের করতে সংসার খরচের টান সামলাতে জেরবার হতে হয়েছে। এভাবে বই ছেপে এরা সাহিত্যের প্রতি প্রেম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই,

কিন্তু দু' একজনের কবিতা ছাড়া কেন এ শ্রম, তা বোঝা কঠিন। কেননা কবিতা নামক দুরূহ, সুন্দর, জটিল ও মোহময়ী শিল্প বিগ্রহের স্রষ্টার দায়িত্ব কি এবং কিভাবে তা পালন করতেও হয় তা-ও এদের অজানা। এদের লেখা পড়ে মনে হয়, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের ভাষায় কিছুই লেখেন নি। এরা স্বয়ম্ভু। ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণারও প্রয়োজন নেই এদের কাছে।

শীত চলে যাচ্ছে। গ্রন্থকার আনন্দ ঘোষ হাজরা। দামি ম্যাপলিথো লাইনো থেকে ছাপা প্রায় চার ফর্মার সুন্দর বই। আসুন, পাতা উল্টে দেখি।

তুমি আমার হাত কেটেছো
তবু আমি মরূদ্যানে
তাই কি আমার পা কেটেছে?

এবার যাবে গঙ্গা স্নানে?
গাছের নিচে তিনটে বাঘের বিরাট থাবা
সারাটা দিন খেলছে খেলা চতুষ্পদী,
হাত দুটি পা পা দুটিও অর্ধভগ্ন
জিব বেরিয়ে ঝরছে লালা সারাটা দিন
এমন সময় সন্ধ্যেবেলা বিরাট থাবা
গাছে নিচে ওৎ পেতেছে তিনটে বাঘের

পয়ার, প্রবহমান পয়ার, মাত্রাবৃত্ত, ব্যবহার করছেন আনন্দবাবু, কিন্তু ছন্দের তালই তো শেষ কথা নয়। কোথায় সেই প্রজ্ঞা, কোথায় গভীর অনুভূতি আর উপলব্ধি? সবটাই উদ্দেশ্যহীন, উপরি-তলের। অথচ 'সর্বনাশ আগুনে তোমার পথের পাশে। যেখানে যাও তীব্র দাহে দাঁড়িয়ে হাসো'—এ রকম পংক্তি লিখে ফেলেন আচমকা।

অনেকগুলি কবিতা আছে বইটিতে, প্রাথমিক ছন্দ শিক্ষাও আছে আনন্দবাবুর, কিন্তু তিনি একটি পংক্তি নির্মাণেও কোনো নিজস্ব বিশিষ্টতা দেখাতে পারেন নি। সবই গতানুগতিক। শব্দ, ছন্দ আর বিষয়—কোথাও কোনো মাত্রা যোজনা নেই। ফলত, গোটা বই পড়তে বসে আসে এক-ঘেয়েমি, মাঝে মাঝে দু-একটি পংক্তি একটু চমকে দেয়। তিনি যদি আরো অনুশীলন করতেন, আমাদের ভাষার মৌলিক কবিদের চরিত্র ও স্বাতন্ত্র্য বুঝে নিতেন সময় নিয়ে তাহলে তার কাছে ভালো কবিতা আমরা আশা করতে পারতাম।

জয়া রায়ের 'সূর্য দর্পণ' কবিতা রচনার প্রাথমিক দায় পালন করেছে। মোটা-মুটি ভালো, এরকম কিছু লেখা আছে এখানে। তবে ঝুঁকি নেন নি জয়া রায়। খুব সাদামাঠাভাবে তাঁর অনুভবগুলো তুলে ধরেছেন। ছন্দ বা শব্দ নিয়ে তিনি কোনো পরীক্ষা করতে চান নি।

চাঁদে ক্ষত, মাটিতেও ঢেউ ভাঙা আলো
যদি রাতে সূর্যস্রোত ঝরে পুনর্বার
অন্তিম প্রার্থনা করে যোগীর আসন
ঝরে চন্দ্র, গ্রহতারা, সৃষ্টি ভূমি কাঁপে,
হৃদপিণ্ড গড়ে স্বর গর্ভরক্তকণা—
প্রাণ কাঁদে শেষ রাত্রে ঊষার দুয়ারে
শূন্য মার্গে উড়ে যায় মায়ের আসন।
('চাঁদে ক্ষত')

একটি সম্পূর্ণ কবিতা। এর রচনার পেছনে কোন প্রজ্ঞা বা অনুভূতির চাপ আছে, বোঝা গেলো না। একটা রহস্য সৃষ্টির চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু অনু-ভূতিলোকে কোনো নাড়া দিতে পারে না। এরকম আভ্যাসিক লেখার ভিড় থেকে একটি অনুভূতি ঘন স্তবক যখন খুঁজে পাই, তখন কবিকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, কবিতা লেখার সাজসামা জানা থাকা সত্ত্বেও অভ্যাসকে প্রধান করলেন কেন? আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলে হতো না? আমি সমস্ত আকাশ এবং নীল জ্যোতিষ্কের কাছে।

নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি
আমার অখন্ড মুক্তি
তখন টুপটাপ ঝরে যায় ফুল শাখা দল
হতে

কোথাও হয় পরাগ সঞ্চার
আমার নবজাত শিশু প্রবল কান্নায় ভাঙে
আতুড়ের হাওয়া

(অসময়)

ওয়াজেদ আলির 'অন্তত একবার' পড়ে মনে হলো, খুব সহজ চালে কথা বলার ঢঙে পংক্তি বা স্তবক সাজাতে পারেন তিনি। একটা দুঃখু দুঃখু ভাব সব কবিতায়। তবে একে বিষাদ মনে হলো না। একান্তই কিছু না পাওয়ার দুঃখ। ওয়াজেদ একই কারণে দোষী। তিনি কোথাও শব্দ নির্বাচন বা বাচনশৈলী, কোথাও ব্যতিক্রম হতে পারেন নি। মনে দুঃখ হলেই বা ভাব জেগে উঠলেই লিখে ফেলেন। এ কারণে স্বভাব কবিত্ব তার। অবশ্য সারল্য ও শান্তি—যদিও আধুনিক কবিতার এসব লক্ষণ নয়,—আছে ওয়াজেদের।

দারুণ দুঃখের দিনেও তোমার মুখে মনে
পড়ে
আমার সমস্ত যন্ত্রণা ও অনুভূতির ভিতর
তোমার স্মৃতি খেলা করে
আমি তার এক টুকরো ঘ্রাণ ছুঁয়ে বেঁচে
থাকি
কোন রকম
(দারুণ দুঃখের দিনেও)।

তরল রোমান্টিকতা, বিষণ্ণতা ওয়া-জেদের কবিতার উৎস ও শরীর। পড়তে মন্দ লাগে না। কিন্তু আধুনিক মানসিকতা নেই, প্রশ্ন, চিন্তা, লোভ, যন্ত্রণা নেই, ফলত ভালো-লাগা ধরণের লেখা সুন্দর ভাবে ছাপিয়ে তুলে দেন পাঠকের হাতে।

অলোকেন্দু শেখর পত্রী অনেক দিন ধরে লিখছেন, ছবি আঁকছেন। কবিতা ও ছবির প্রতি তিনি সত্যিকারের আসক্ত, এর জন্য তাঁর কিছু ত্যাগও আছে। তাঁর বই সুদৃশ্য, নিজের আঁকা স্কেচ থাকে কবিতার সুষমা। সুমুদ্রিত বইটিকে ঘিরে যত্ন নিয়ে কাজ করে। আলোচ্য বইটি নাম কালো বকরু। সত্যজিতের মৃতদেহ-একটি খুদে ছবি শাদা-কালোয়। কেন তার আগের পংক্তি
ভুবন ডাঙা—
কলকাতা আজ বড় বেদনার ভার,
রাশি রাশি...
নীল শরীরের শিরায় শিরায়
রক্তাক্তের হাসি

অলকেন্দু আপনি অনেকদিন কবি[illegible] লিখছেন। তিন লাইনের পদ্যে তিন ছ[illegible] কেন?

তবু অলকেন্দুর মধ্যে কবিত্ব আছে
চেষ্টা করেন অন্য ভাবে বলতে
অমিতা বড়াল একদিন অনন্তের স্বাদে
আকাশের নক্ষত্রকে দেখেছিল,
পরিণাম তার দেখা, ভিতরে ভিতরে
সে আজ নারী। সে আজ প্রসবা
তার মধ্যে যে-কোন [illegible] হোক,
শব্দ [illegible], এক নারীর চিহ্ন হো[illegible]
অথবা পুরুষের যাবতীয় চিহ্নকর এক
অসীম জানি কালোবস্তু রয়েছে ভেতরে—
আমাদের সময়ের শাসন ব্যবস্থায়।

শব্দ সচেতনা আছে অলকেন্দুর, অ[illegible] ভাবে বাক্য গঠনেও উৎসাহী, কিন্তু একই স্তবকে নানান ছন্দ, মাত্রার হেরফের আমার কি বলতে চান বুঝতে না পে[illegible] খেই হারিয়ে বসেন। এর ফলে এক[illegible] ভালো সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটান অনায়াসে একজন পরিণত বয়সের লেখকের প[illegible] এর ফল মারাত্মক।

তবু অলকেন্দুর কবিতা অন্য রক[illegible] হতে চায় বলে মাঝে মাঝে টানতে থাকে।

বাণা চট্টোপাধ্যায়, আলোচ্য কবি[illegible] তুলনায় অনেক পরিণত। ভালো কবি[illegible] লিখতে জানেন তিনি। কি লিখছেন [illegible] ভাবে লিখবেন এসব নিয়ে তার সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। স[illegible] আলোচিত বইগুলির সঙ্গে তাঁর [illegible] আলোচিত হতে পারে না। তিনি অ[illegible] পরিণত।

নষ্ট যৌবন এবং অন্ধকার বসন্ত— দু[illegible] ভাগে বিভক্ত। যদিও কবিতা পাঠের [illegible] এই বিভাগ কেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ন[illegible] সমস্ত কবিতায় নষ্টলাজিয়া,— স্মৃতি বিষণ্ণতা ছড়িয়ে থাকে।

চন্দন গাছের গন্ধে যেও না বাগানে
ওইখানে মানুষের দুঃখেরা চড়ো [illegible]
থা[illegible]

বছরের শেষে কেউ বসে পড়ে,
অগনন প্লেন উড়ে যায় এ আকা[illegible]
থেকে অন্য কোন আক[illegible]
বা
কেউ বেঁচে থাকবে না, তবু সুখে
থাকবে মানুষের কাছাকাছি গ[illegible]

রাণা সহজ আন্তরিক সব সময়েই। কোন জটিলতা নেই রাণার কবিতায়। আবার খুব কঠিন সত্য, অন্তত নিজের সম্পর্কে রাণা উচ্চারণ করেন জড়তাহীনভাবে।

(ক) আমার কবিতার ভাষা এখনো তৈরি হয় নি, হয় নি নির্মাণকল্প।

(খ) অসম্ভব কবিতা এখনো লিখতে পারি নি তিরিশ বছর হলো।

(গ) এত দিন যা লিখেছি কিছুই হয় নি। খুব টান টান ঋজু গদ্যে রাণা এসব সত্য উচ্চারণ করেন। একটা কবিসুলভ বিনয় আছে রাণার।

এবার আমি শরৎ কালের উদ্দেশ্যে একটা স্মারকপত্র লিখে দিলাম :

হে শহর, আমার প্রেমিকার জন্য
তুমি নিয়ে এসো শহর বাসের
উপযোগী জমি

এবার আমার জন্য
পারের ফোকর থেকে ফটিক জল

অবিশ্বাসের চেয়ে বিশ্বাসেই রাণার জগৎ স্ফূর্তি পায়। নারীর প্রেমে রোমান্টিকদের মতন অতিলৌকিক আস্থা তাঁর অক্ষুণ্ণ। খুব ব্যক্তিগত সমস্যার বাইরে রাণা তার কবিতাকে নিয়ে যেতে চায় না। যদিও, রাণা বলেছেন, তার কবিতার ভাষা এখনও তৈরি হয় নি, তার অনেকটাই বিনয়নম্র, কারণ রাণা কবিতা নিষ্ঠ কণ্ঠে ব্যক্তিগত উচ্চারণ রীতি ধরা পড়ছে ক্রমশ। তবু অনেক কবিতাই বাস্তব দৃষ্টির চাইতে বক্তব্যের একমাত্রিকতায় দাঁড়িয়ে থাকে, এটা কবিতাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয় না। রাণা চট্টোপাধ্যায় এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে তার কাছ থেকে আরো ভালো কবিতা আশা করবো।

আমার শেষ আলোচ্য কমল তরফদারের 'তারা গাথা সিঁথি'। এতো সুন্দর দুধ শাদা কাগজ আর নিখুঁত টাইপে ছাপা বই খুব বেশি চোখে পড়ে না। কমল তরফদারের আগে প্রকাশিত বইতেও সুন্দর রূপ সর্বত্র দেখেছি। মনে হয়েছে, কবিতাকে সত্যিই ভালোবাসেন উনি, বিন্দুমাত্র সাজ সজ্জার অমনোযোগ সহ্য করতে পারেন না।

ইংরেজী অংশ আছে শেষ দিকে কেন? আন্তর্জাতিক বাজারে এই লেখকের কি পরিচিতি আছে? ভূমিকায় লিখছেন 'এই গ্রন্থে ৩১টি বাংলা ও ৮টি ইংরেজী কবিতা আছে...... আর ইংরেজী কবিতাগুলি 'বিটারবাট' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 'আলা' (আর্জেন্টিনা) ও 'লা রোসা ব্লিন্কা' (আর্জেন্টিনা)—এই তিনটি আন্তর্জাতিক চরিত্রের পত্রিকায় প্রকাশিত।'

ভূমিকায় এসব না জানালে অবশ্য আমরা কমল তরফদারের আন্তর্জাতিক ভূমিকা জানতে পারতাম না। একজন বাঙালী হিসেবে বাঙালীর গৌরবে খুশি না হয়ে পারছি না।

কবিতা পড়ে মনে হলো না, উনি সমকালীন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ভাবনা-চিন্তার শরিক। মনে এসেছে, লিখেছেন, যেমনই হোক তার প্রকাশভঙ্গি। একেবারেই গতানুগতিক, আর নির্দ্বন্দ্ব। কবিতাগুলো ভারমুক্ত আর নিষ্পাপ।

আমার মাথায় ডাণ্ডশ মেরেছে মত্ত মাহুত
এমন যন্ত্রণা, আমি ডেকেছি দিনমণিকে
বহুক্ষণ
জ্বালা, ওদিকে গাছপালা, আমি কি শীতল
জলে অবগাহন, খুলব বল্কল, খুলব কাম

এর—মানে কি? আমি জানি, কবিতার পংক্তি-সজ্জা যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে না সাজালেও চলে। কিন্তু অনুভূতির একটা গোপন শৃংখলা তো থাকে! আর—

'জ্বালা, ওদিকে গাছপালা, আমি কি শীতল। জলে অবগাহন' না বাক্য গঠনে ক্রিয়া ব্যবহার, না অনুভবকে উসকে দিতে পারার ক্ষমতা। এ-রকম শিক্ষা অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে নেওয়া যায়, তবে অমিয় চক্রবর্তীর এসব পরীক্ষা হিসাবেই তার পিছনে ঐ প্রবীণ কবির মনীষা ও মনে রাখা চলে, কবিতা নয়। কমলবাবু যতোটা গ্রন্থ সজ্জায় মনোযোগী ততোটা লেখায় নয়—

অনেক দূরে চালতা বেড়। নাড়ুজ্জেরা ব্রাহ্মণ
সেখানকার জমিদার। শাসন প্রেমের দ্বন্দ্ব
তাদের প্রতিনিধি মেবা। কাবে কঠিন
কর্ম...
জবরদস্ত বৈষয়িক। সামলে চলো খবরদার

কেন দুলকি চালের পদ্য, সব কটি পংক্তি পড়েও বুঝে ওঠা দায়। প্রায় লেখাই এ-রকম। দায়সারা। কোথাও একটা শব্দ, একটা পংক্তিও একজন সিরিয়াস পাঠককে চমকে দিতে পারে না। আনিষ্ট করার কথা ভেসে যাক।

খুবই বেদনাদায়ক, এতোগুলো কবিতার বই, প্রশংসাসূচক মন্তব্য কমই করা গেলো। শুধু এই ক'জনের লেখাই এ রকম নয়, ভিড়ের ভিতর থেকে এদের ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া রীতিমতো কষ্টের ব্যাপার অথচ, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কতো ভালো কবিতা লিখছেন, তার হদিশ রাখি বারান্তরে তা নিয়ে আলোচনার ইচ্ছে রইলো।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

নষ্ট যৌবন অন্ধকার বসন্ত। রাণা চট্টোপাধ্যায়। মহাপৃথিবী। চার টাকা। তারা গাঁথা সিঁথি। কমল তরফদার। অয়ন। চার টাকা। অন্তত একবার। ওয়াজেদ আলি। কমলা বুক স্টোর। ছয় টাকা—শীত চলে যাচ্ছে। আনন্দ ঘোষ হাজরা। বিশ্বজ্ঞান। পাঁচ টাকা। সূর্য দর্পণ। জয় রায়। কিছুক্ষণ পাবলিশার্স চার টাকা। কল্লোবক্ত্র। অলকেন্দু শেখর-পত্রী। ভাবনা প্রকাশ। কুড়ি টাকা।

একটি যোগাযোগকারী উপগ্রহ পৃথিবীর উপরে অবস্থান করছে। এর আওতায় ভূতলকেন্দ্রগুলি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারবে এই উপগ্রহের মাধ্যমে।

যোগাযোগে কৃত্রিম উপগ্রহ

মৃণালকান্তি সাহা

গত একশ বছরে বেশি দূরত্বে যোগাযোগের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশন। সারা পৃথিবী জুড়ে এদের সাহায্যেই দ্রুত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। অনেক দিনের গবেষণার ফলে যেমন আমরা টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশন পেয়েছি, সেইভাবে পর্যায়ক্রম গবেষণার ফলে এদের উন্নতিও ঘটেছে চরমে, এবং এসব কিছুতে অভ্যস্ত হওয়ার পরে আমাদের প্রয়োজন ক্রমে বাড়ছে আরও উন্নতমানের আরও দ্রুত কোন যোগাযোগ ব্যবস্থার, আর সেই প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা ব্যবহার করছি কৃত্রিম উপগ্রহ। উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ আগামী দিনের দ্রুত নির্ভরযোগ্য এবং উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বৈজ্ঞানিক এবং গ্রন্থকার আর্থার সি ক্লার্ক ১৯৪৫ সালে এমন অতিপার্থিব যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন, তার ভাষায় যাকে বলা হয় 'একস্ট্রা টেরিস্ট্রিয়াল রিলে', যার মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন দুই জায়গার মধ্যে বে-তারে যোগাযোগ সম্ভব হবে। আজ বৈজ্ঞানিক ক্লার্কের সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে বলা যায়, এবং তা সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমেই।

উনিশশো ষাট সালে গবেষণার ফলে জানা গেল একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে যদি পৃথিবীর বিষুব রেখায় কোন বিন্দুর

৩৫,৮৪০ কিঃ মিঃ উপরে আপাতসমকক্ষে বসান হয় তবে সেই উপগ্রহটি আপাত স্থির অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ বিভিন্ন কক্ষে পৃথিবী এবং উপগ্রহ একই গতিতে গতিশীল থাকছে। এক সঙ্গে দুটো ট্রেন যদি সমগতিতে একই দিকে যায় তা হলে অবস্থাটা যা দাঁড়াবে এই ব্যাপারটাও তাই। গতিশীল দুটি বস্তু সমগতিতে একই দিকে সঞ্চরমান অবস্থায় আপাত স্থিতাবস্থায় আসবে। তখন ভূতলে অবস্থিত গ্রাহক ও প্রেরক কেন্দ্র থেকে যোগাযোগ চলবে এবং নিয়ন্ত্রিত হবে।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বিষুব রেখার উপর বসান তিনটি উপগ্রহ দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জায়গাকে যোগাযোগের আওতায় আনা যাবে। তবে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে যোগাযোগের (রিলে) জন্য অবশ্যই উপগ্রহের সংখ্যা তিন-এর বেশী হবে। আর পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব অর্থাৎ ৩৫,৮৪০ কিঃ মিঃ বেতার-সংকেতের পক্ষে অতিক্রম করতে সময় লাগবে এক সেকেণ্ডের আট ভাগের এক ভাগ।

আমেরিকা, রাশিয়ায় যোগাযোগ উপগ্রহ প্রথমে ব্যবহার করা হত দেশের আভ্যন্তরীণ কাজের জন্য। পরে এশিয়ার, ইউরোপের এবং আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুক্ত প্রচেষ্টায় ১৯৬৫ থেকে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য তিনটি সিরিজ উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে। 'ইনটেলস্যাট'—পুরো নাম 'দি ইন্টার ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেসনস স্যাটেলাইটপ অর্গানাইজেসন'। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগকারী এই সংস্থার উপগ্রহগুলির সুযোগ সুবিধা ভারতবর্ষও পেয়ে থাকে।

বর্তমানে এই উপগ্রহ যোগাযোগের প্রধান অংশ জুড়ে আছে টেলিফোন সংযোগ কিন্তু টেলিটাইপ, টেলিভিশন যোগাযোগও এই লাইনের মাধ্যমে হয়। বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে খেলাধুলা অনেক দূর দেশে অনুষ্ঠিত হলেও এই উপগ্রহের সাহায্যে টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেক সহজে দেখানো যায়।

কয়েকটি দেশে বিশেষ করে কানাডায় ও সোভিয়েট রাশিয়ায় এই উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগের এতই উন্নতি হয়েছে যে, সেখানে ঘরোয়াভাবে যোগাযোগের জন্যও উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে যে রকম টেলিফোন ব্যবহার করি। এতে কাজ হয় অনেক দ্রুত এবং সুনিপুন-ভাবে। একে বলা হয় 'ডোমেস্টিক স্যাটেলাইট্স' বা 'ডেমস্যাট'।

ভারতবর্ষ যদিও উপগ্রহ যোগাযোগের ক্ষেত্রে পশ্চিমের থেকে অনেক অংশে পিছিয়ে আছে তবুও এই সত্তরের দশকে এর ওপরে কাজ শুরু হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে অনেক তাড়াতাড়ি।

আমেরিকায় উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও উন্নতমানের করার জন্য একটি গ্রাহকযন্ত্র বসানো হচ্ছে
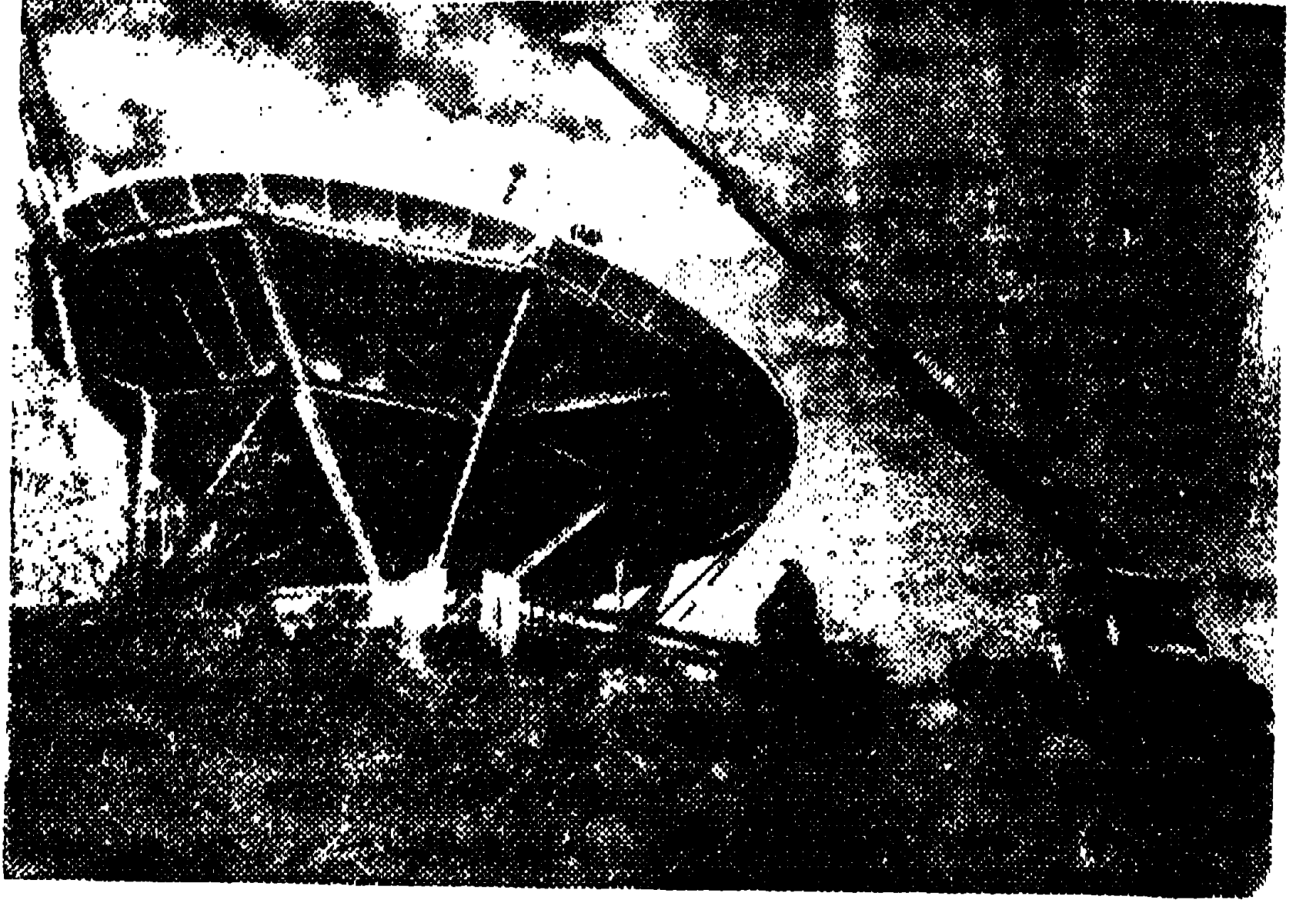
বিদেশের সাহায্য নিতে হচ্ছে অনিবার্য কারণবশতঃ, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানী, কুশলীরাও আজ অনেক বেশী সচেষ্ট এবং তৎপর।

১৯৭২ সালে ইণ্ডিয়ান সায়েণ্টিফিক স্যাটেলাইট প্রজেক্টের কর্মভার গ্রহণ করেন অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান। বলতে গেলে সেই সময় থেকেই শুরু হয় উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার আসল প্রয়োগ।

ভারতবর্ষে উপগ্রহ তৈরী ও ক্ষেপণ এবং প্রয়োজনে বিদেশী সাহায্য নিয়ে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্গালোরের কাছে পীনিয়ায়। সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রথম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' এই সংস্থা থেকেই তৈরি হয়।

ক্ষেপণ করা হয় ১৯৭৫-এর ১৯ এপ্রিল। এই উপগ্রহটি কোনরকম যোগাযোগের জন্য কাজে না লাগলেও এটিকে নানারকম সম্ভাবনাময় গবেষণার প্রথম সোপান বলা যায়।

উপগ্রহ মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য যে ভূতল-কেন্দ্রের (অর্থ-স্টেষণ) প্রয়োজন সেই রকম একটি কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে বসান হয় মহারাষ্ট্রে পুণার কাছে আরভীতে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য যে উপগ্রহগুলি ব্যবহার করা হয়, তার সাহায্যে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হয় এই দ্বিতীয় ভূতল কেন্দ্রটি বসানোর ফলে। উন্নত হয়েছে টেলিফোন মাধ্যমে দূর দেশের সঙ্গে ট্রাঙ্ককল যোগাযোগের। অদূর ভবিষ্যতে দূরদর্শনেরও ব্যাপক প্রচার সম্ভব হবে এই উপগ্রহের মাধ্যমে। আজ আমেরিকা, কানাডা, সোভিয়েট রাশিয়া যে সুবিধা উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে পাচ্ছে আমরাও সামনের দিনে সেটা আশা করতে পারি না কি?

প্রদর্শনী

আকাদমি অব ফাইন আর্টসের ব্যবস্থাপনায় ২০ থেকে ২৬ অকটোবর অবধি ছিলো সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের পঁচিশটি ছবি—দর্শকদের সামনে। তাঁর যে দুটি ছবিতে রং লেগেছে তাদের সংখ্যা ২৪ ও ২৫—শেষ দুটি ছবি। কোলাজ। গুপী গায়েনের শেষ দৃশ্যে যেভাবে রঙ লাগে তার সঙ্গে তুলনীয়, তুলনীয় নয়ও। পঁচিশটি ছবির পরস্পর সংলগ্নতার দিকে না তাকালেও চলে, কারণ ছবির বিষয় সাহিত্য নয়। তাঁর ছবির উপজীব্য নকশা, জ্যামিতিকতা, মানুষ মুখ ও হাত, কখনো তীব্র নখ—পুরো ছবিটির থেকে যা আগে এগিয়ে এসে গোটা [illegible]র দিকে নিয়ে যায়। অনেক দিন [illegible] ছবি দেখতে হচ্ছিল তার স্বাদে [illegible]র ব্যতিক্রম এলো তাঁর সাহায্যে। কেননা, তাঁর পারদর্শিতা অক্ষোভ্য, মাত্রাজ্ঞান সুষম, ঠিক তাপস বসুর মতো তিনিও তাঁর ছবি দেখিয়ে-নিতে পারেন চিত্রকলার ব্যাপারে নিতান্ত আনপড় ও প্রায় অনুৎসাহীদেরও। অল্প অবকাশের আলোচনায় তাঁর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ও প্রত্যেকটি ছবির মজার কথা বলা যাবে না। তবে এটা বলতেই হবে যে তাঁর দু-ধরনের ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করলাম। একটি কিছু সিরিয়াস মেকানাইজেশনের সিরিজে তার গল্পের সিরিজে যে ছবিগুলি অন্তর্ভুক্ত—তাদের বিবেচনা করলেই বোঝা যায় এই ছবিগুলিতে তাঁর কৌতুকময় মেজাজ অনুপস্থিত। একটু সংকোচের সঙ্গে বলছি, এই আপাদমস্তক সিরিয়াস ছবিতে কোনো কোনো উপজীব্য একটু বেশি সরলীকৃত। কিন্তু কৌতুকময় ছবিতে সব্যসাচী অব্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ, পাঠকের সামনে ৯, ১০, ১১, ১২—এই চারটি ছবির

কিছু বর্ণনা রাখছি। ৯ নম্বর ছবিটির নাম সিদ্ধান্ত: একটি মানুষ ঘোড়ায় চাপার আগে ফটো তোলার ভঙ্গি ও ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়িয়ে। মাথায় খোঁচা খোঁচা মুকুট। ঘোড়াটির সামনে একটি উৎসাহী অস্ট্রিচ বা বক পাখি। ১০ নম্বর ছবির নাম তত্ত্ব বা ইডিওলজি। অস্ট্রিচটি এবার অস্থির ও ঘোড়াটি ভর্ৎসনারত। ১১ নম্বর ছবির নাম চেলা বা ডিসাইপল, একেবারে গ্রোটেস্ক ও অতি পরিচিত, একটি মাথা কাৎ করে আছে। মোট দুটি মানুষের মুখ—অতি-পরিচিত বললাম এই কারণে যে এ মুখের আদল তরকারি ও মাছের বাজারে অনেক দেখা যায়। ১২ নম্বর ছবির নাম বিপ্লব! দুটি ঘোড়া এবার আলোচনারত। তারা পিছনে ফেলে এসেছে একটি গড়াগড়ি খাওয়া, অবয়ব-উৎক্ষিপ্ত একটি মানুষকে। দেখে অত্যন্ত মজা পাই এবং আবার ঘুরে দেখতে আসি এক ফাঁকে। তখন লক্ষ্য করি, ঘোড়ারা ঘোড়া নয়! গাধা-ও হতে পারে। শীর্ণকায় ও অত্যুৎসাহী সেই গাধা বা ঘোড়ারা প্রায় সব সময়ই, রাগ-আলোচনা-বিতর্কের মধ্যেই হাসছে।

কাছাকাছি আর একটি কক্ষেই ছিলো সুরেশ চৌধুরীর প্রদর্শনী। ক্যাটালগে তাঁর বিশাল পরিচিতি। মোট বাইশটি ছবির গর্জমান তেলরঙ ও সহাবস্থিত রঙের বিস্ফোরণ এতো চড়া যে হলটিতে দাঁড়ালে ভার্টিগো হতে পারে। ছবি কতোদূরে থেকে দেখবো? প্রত্যেকটি ছবি সাত-আট পা দূরে দাঁড়ালে সহনীয় লাগে। এবং কি দেখবো? ছবির নাম যদি সমহোয়্যার হোম ইজ হয়, ছবিতে গাদাগাদা নীল রং এসে পড়ে। অ্যাঙ্গুইশ বললে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে থাকা দুটি মানুষ মুখ। বাধ্য হয়ে, অন্য একটি কক্ষে যাই। বোম্বের চারজন তরুণ শিল্পী। তাঁদের রচনাকর্ম দেখে বুঝতে পারি এর থেকে আবার সুরেশ চৌধুরীর ছবির কাছে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। সুরেশ চৌধুরী অন্তত নিন্দাযোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর বর্ণ-বিলেপন ও উপজীব্য যে রকমই হোক না কেন, রেখা সংস্থান ও আলোক-ছায়া উৎপাদনের রহস্য তিনি জানেন। বোম্বাই-এর এই চারজন জানেন না।

প্রকাশ কর্মকারের ছবির প্রদর্শনী একই সময়ে হচ্ছিল বিড়লা আকাদমিতে। গত বছর ঠিক বন্যার পরে এই বিড়লা আকাদমিতেই তাঁর ও রবীন মন্ডলের যুগ্ম প্রদর্শনী ছিলো। সেই ছবিগুলির ঐক্য ছিলো কদাচিৎ তীব্র সোনালি ও কচি কলাপাতা রং-এর দীপ্র ব্যবহার আর নিটনে সমাজ সচেতনতায়। এ বছরে চিত্রীয় মেজাজ পরিবর্তিত। হলে প্রচুর দর্শক, বনীত ও আনন্দিত তাঁদের তাকানো দেখে বোঝা যাচ্ছিল, যখনি তাঁরা ছবি দেখছেন, আনন্দ-প্রশ্ন-চিন্তার আঘাত তাঁদের লাগছে। তাঁরা এ-ও বুঝতে পারছেন য প্রকাশ কর্মকার নিজের সমগ্রতার একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। বিভিন্ন ছবির অনুষঙ্গ অন্য উপায়ে স্মৃতির কাছে ও বর্তমানের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই চিত্রী। দেখা ছবির কথা মনে পড়তে থাকে এবং সব সময়ই বুঝতে পারা যায় তাকে একদম অন্য প[illegible]তে পাচ্ছি। এবারের ই সিরিজে যথেষ্ট রমণী শরীর [illegible] যার একদম প্র[illegible]মক নতুনত্ব হলো উরোজবৃন্তগুলির প্রায় প্রশ্নময় ধরনে উদ্যত থাকা। রূপসীর মোঘল-রহস্যময়তার সঙ্গে কালীছবির সন্নিপাতের পরিকল্পনা আরো তীব্রতা পায় রূপসীর জ্যোতির্ময় স্তনাভাপ্রকাশে। এই ছবির অভিধা তৃত বিশ্ব। বন্দী ফুলের গুচ্ছের মধ্যে, এই লেখকের বহুক্ষণের বিস্ময় ছিলো পাঁচ নম্বর ছবিটি—নিকষ আলকাতরা রং যেখানে প্রায় ঘূর্ণায়মান, পটের মধ্যখানে শাদা ও হলুদে বিধৃত জ্যোতি ও গতিশীলতার কিছু উপরে উদ্গারিত অঞ্জলির মতো রক্ত বা রক্তরং কীর্ণ হয়ে আছে। এই ছবিটির সৌন্দর্য রক্তকালী চাঁদের তুল্য এবং সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ও উপস্থিত ছবির থেকে একেবারেই আলাদা। যথেষ্ট ছবি দেখানো হয়েছে বলেই তা হয়তো পাঠভেদে মেধা ও মনকে একটু শ্রান্ত করতে পারে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

প্রতিযোগীদের মধ্যমণি সেবাস্তিয়ান কোয়ে —রেকর্ড গড়ায় খুশি খুশি ভাব।

দিগন্তে জোড়া তারকা

অজয় বসু

মস্কোয় বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিক আরম্ভ আর ক মাসই বা বাকি। মস্কোর দিকে দৃষ্টি রেখে দেশ বিদেশের নামী অ্যাথলিটরা অনুশীলন পর্বে জোয়ার জাগিয়েছেন যথেষ্ট সময় হাতে নিয়েই। ইতিমধ্যেই তাঁদের অনেকেই যে মস্কোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নিজেদের রীতিমত তৈরী করে ফেলেছেন তার কিছুটা আভাস এখানে ওখানে পাওয়াত যাচ্ছে। মস্কোর স্পার্টাকিয়াড, মন্ট্রিলের বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকস এবং অন্যত্র অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার আসরের দিকে তাকালেই তাঁদের কীর্তির কিছু কিছু ঠিকানা জানা যাবে।

অনেকের অনেক কীর্তি। আবার ক্ষেত্র বিশেষে পুরানো চ্যাম্পিয়নদের পদস্খলনের নজির। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক মহল রীতিমত সরগরম হয়ে রয়েছে। অনেক নজিরই নজরকাড়া। তবু বিশেষভাবে আজ দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ রাখছি।

ঠিক এই মুহূর্তে দুজন অ্যাথলিটের ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় ঘিরে অ্যাথলেটিক দুনিয়ায় সোরগোলের সাড়া জেগেছে। একজন বৃটেনের সেবাস্তিয়ান কোয়ে। অন্যজন ইথিওপিয়ার মিরাটস ইফতার। এই যুগল অ্যাথলেটিক দিগন্তে সবচেয়ে ঝলমলে তারকা হিসেবে চিহ্নিত।

যুগলের একজন সেবাস্তিয়ান উঠতি তরুণ। বয়সে কাঁচা। গায়ে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ধ। অন্যজন ইফতার অ্যাথলিট হিসেবে বয়সে প্রায় প্রবীন। ইফতারের নাম আগেও শোনা গেছে। মাঝপর্বে কিছু দিন তিনি ছিলেন অশ্রুতপ্রায়। কিন্তু মস্কো অলিম্পিকের ঠিক আগের বছরেই তিনি আবার ক্রীড়ানুরাগী মহলের নয়নের মাঝখানে নিজের ঠাঁই করে নিচ্ছেন।

সেবাস্তিয়ানের কীর্তি চাঞ্চল্যকর।

মাত্র একচল্লিশ দিনের ফাঁকে সেবাস্তিয়ান অ্যাথলেটিকের তিনটি বিভাগে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন বা পুরোনো রেকর্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। একই সময়ে একজন অ্যাথলিটের পক্ষে তিন তিনটি বিশ্ব রেকর্ড নিজের অধিকারে রাখতে পারার দৃষ্টান্ত নজির হিসেব বিরলপ্রায়।

সেবাস্তিয়ানে আটশ মিটার দৌড়েছেন ১ মিনিট ৪৩, ১৯ সেকেন্ডে, পনেরশ' মিটার ৩ মিনিট ৩২-২ সেকেন্ডে এবং এক মাইল দৌড়পথ অতিক্রম করেছেন ৩ মিনিট ৪৮-৯৫ সেকেন্ডে। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য মস্কো ওলিম্পিকের সোনা এবং পনেরশ মিটার দৌড়ে সাড়ে তিন মিনিটের বাধা ভেদ করা।

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে সেবাস্তিয়ান এখনও এক আনকোরা প্রতিযোগী। তবে তিন তিনটি বিশ্ব রেকর্ড গড়া বা ভাঙ্গার পর তিনি নিশ্চয়ই সেখানে এক পরিণত চরিত্রের স্বীকৃতি পাবেন। অ্যাথলেটিকের বড় আসরে আবির্ভাব ঘটিয়ে তিনি সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞদের তারিফ আদায় করতে পেরেছিলেন ১৯৭৭ সালে ইউরোপীয় ইনডোর অ্যাথলেটিকস উপলক্ষে। ওই আসরে সেবাস্তিয়ান আটশ মিটার দৌড়ে সোনা পান। তার আগে ইংলন্ডের স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে পনেরশ মিটারে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। গত বছরে কমনওয়েলথ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন নি। লোবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র সেবাস্তিয়ানের ওপর তখন অধ্যয়নের চাপ ছিল বেশি। সেই চাপ কিঞ্চিৎ শিথিল হতেই সেবাস্তিয়ান ইউরোপীয় অ্যাথলেটিকসে যোগ দেন। কিন্তু ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁকে আটশ মিটার দৌড়ের ব্রোঞ্জ পদকটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁকে ডিঙিয়ে যান পূর্ব জার্মানীর ওলাফ বেয়ার এবং স্বদেশের স্টিভ ওভেট। তবে সম্প্রতি স্বদেশের এক প্রথম সারির প্রতিযোগিতায় সেবাস্তিয়ান আটশ মিটার দৌড়ের জাতীয় রেকর্ডটি ওভেটের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন।

হালকা পাতলা গড়নের চেহারা সেবাস্তিয়ানের। অনুশীলন কালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মাইলের পর মাইল দৌড়ান না। হয়ত শরীরের কথা ভেবেই দ্রুতপদে অল্প দূরত্ব অতিক্রম করার দিকে মন দিয়েছেন। এবং নিজের উদ্ভাবিত পরিকল্পনা আঁকড়ে ধরেই তিনি নিজেকে মাঝারি পাল্লার দৌড়ে শ্রেষ্ঠ কুশীলব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তবে সব কৃতিত্বই তাঁর একার নয়। তাঁকে অ্যাথলিট রূপে গড়ে পিঠে মানুষ করার কৃতিত্ব তাঁর জনক পিটার কোয়েব। শেফিল্ডের ইঞ্জিনিয়ার পিটার কোয়েই হলেন সেবাস্তিয়ানের প্রশিক্ষক, উপদেষ্টা এবং পথপ্রদর্শক।

পিটারের যত্ন ও যোগ্য নেতৃত্বের কল্যাণে লাজুক লাজুক চেহারার সেবাস্তিয়ানও

দূরপাল্লার দৌড়ে
ইথিওপিয়ার ইয়াতার

ক্রমশঃই সপ্রতিভ হয়ে উঠছেন। মাইল দৌড়ে নিউজিল্যান্ডের জন ওয়াকারের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দেবার পর সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, এর পর কোন্ রেকর্ডটি ভাঙ্গতে এগোবেন? শুনে হাসিমুখে সেবাস্তিয়ান জানিয়ে দেন, আমি তো ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে দৌড়ই না। আমার মন ও লক্ষ্য থাকে অন্য সব প্রতিযোগীর প্রতি। তাঁদের পেছনে ফেলে রাখাই আমার সঙ্কল্প।

তা সেই সংকল্পেই সেবাস্তিয়ান যে অবিচল থাকেন তাতে আর সন্দেহ কী! মাইল দৌড়ে রেকর্ড করার দিন তিনি দ্বিতীয় প্রতিযোগীকে গজ তিরিশেক পেছনে ফেলে রেখেছিলেন।

সেবাস্তিয়ান কোয়ে এখনও ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগ দেবার সুযোগ পান নি। কিন্তু মিরাটস ইফতার পেয়েছেন। ১৯৭২ সালে মিউনিখ ওলিম্পিকে ইফতার দশ হাজার মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পান। কিন্তু ব্রোঞ্জ কেন? সোনা পাওয়ার সামর্থ কি তাঁর নেই? অনেকের ধারণা, সে সামর্থ আছে এবং ছিল। ১৯৭৬ সালে আফ্রিকা মন্ট্রিল ওলিম্পিক বয়কট করায় ইফতার সোনা থেকে বঞ্চিত হন বলেই তাঁরা মনে করেন।

অ্যাথলিট হিসেবে ইফতার রীতিমত বর্ষীয়ান। আকৃতি পোড় খাওয়া। মাথার সামনের দিকে টাকটি ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। দৌড়বার ভঙ্গীটিই দর্শনধারী নয়। পণ্ডিতেরা খুঁজে পেতে খুঁত ধরতে পারেন। তবু ইথিওপিয়ার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক অ্যাথলিট মিরাটস ইফতার বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সেরা দূরপাল্লার দৌড়বীর।

চলতি বছরে ইফতার মস্কোয় স্পার্টাকিয়াডে এবং মন্ট্রিলের বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকসে দ্বৈত কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা পেয়ে। আগের বার ডুসেলডর্ফে বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকসেও তিনি পাঁচ ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে ইফতারের জয়যাত্রা শুরু হয় ১৯৭১-এ। সেই থেকেই তিনি দূরপাল্লার দৌড়ে সামনের সারির এক প্রতিযোগী।

বয়স হলেও ইফতারের সাফল্যের সম্ভাবনাকে খারিজ করে দিতে কেউই সাহস পান নি। কারণ বেশি বয়স ইথিওপিয়ার অ্যাথলিটদের এগোবার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি। যেমন করে নি ওই দেশেরই দুই প্রথিতযশা অ্যাথলিট আবেবে বিকিলা ও মামো ওলডের ক্ষেত্রে। তিরিশের ওপারে চলে যাওয়ার পরই তো আবেবে বিকিলা ওলিম্পিক ম্যারাথনে দ্বিতীয় সোনা সংগ্রহ করেন। আর ওলডে ওলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়পথ জয় করেন চল্লিশে পা দিয়ে তবেই। সুতরাং পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ইফতারের বেলাতেই বা ভারবহ হয়ে উঠবে কেন?

ইফতার আবেবে বিকিলা ও মামো ওলডে, স্বদেশের দুই কৃতবিদ্য অ্যাথলিটের পদাঙ্ক অনুসরণে মস্কো ওলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়েও যোগ দেবেন বলে মনে হয়। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকটি ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়ে সাফল্যও অর্জন করেছেন।

লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় নি। তবে অ্যাথলেটিকে দক্ষতাই ইফতারকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ উপহার দিয়েছে। স্বদেশের বিমান বাহিনীতে তিনি বর্তমানে একজন লেফটেন্যান্ট। ইংরাজী যে ভাল জানেন তাও নয়। আর তা না জানার জন্যে একবার ওঁকে কি রকম অসুবিধে যে পড়তে হয়েছিল সেই কাহিনী স্মরণ করে এই প্রসঙ্গটি শেষ করছি।

সেবার মিউনিখ ওলিম্পিকে পাঁচ হাজার দৌড়ে তাঁর অংশ নেওয়ার কথা। প্রতিযোগীদের ডাক দেওয়া হয়েছে মাইকযোগে। কিন্তু ভাষাটিতে তেমন সড়গড় না থাকায় ইফতার সেই ডাক বুঝতে পারেন নি। একে একে তিনবার ডাক পড়ল। তবু ইফতার স্টার্টিং লাইনে গরহাজির। শেষ পর্যন্ত সময় হয়েছে নিজের মনের এই ধারণায় তিনি যখন ট্র্যাকের ধারে এসে পৌঁছলেন তখন সময় সত্যিই বয়ে গেছে। পাঁচ হাজার দৌড়ের ফাইনাল শেষ হয়েছে কখন।

ব্যাপারটা যখন বুঝলেন ইফতার তখন তাঁর চোখের জল আর বাধা মানে নি। আশ্চর্য, সাহায্য করার জন্যে সময়মত কেউ

সেদিন তাঁর পাশে ছিলেন না। কিন্তু অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ কি? ইফতারের নিজের দোষও তো কম নয়। আন্তর্জাতিক ভাষাটাও কিঞ্চিৎ রপ্ত করে নিতে হয় না কি? ইফতার অ্যাথলেটিক চর্চার ফাঁকে ইংরেজীটাও শিখে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। যাতে ভবিষ্যতে তাঁকে মিউনিখের মত আর ফাঁকিতে পড়তে না হয়।

না ছোটদের না বড়দের

'পম্পাতে' একটি বারবণিতার চরিত্র আছে। দু-একটি দৃশ্যে কিছু দেহ-পসারিণীকে খদ্দেরের আশায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেও দেখা গেছে। এগুলো না থাকলে ছবিটি ছোটদের দেখানো যেতে পারত। বিষয়বস্তু ছোটদেরই উপযোগী। গ্রামের ছোট মেয়ে পম্পা বাবা-মাকে হারিয়ে একা-একা কেমন করে কলকাতায় আসে এবং নানান নাটকীয় ঘটনার মধ্যে কেমন করে তার দুঃখ ঘোচে, তা দেখতে ছোটদের নিশ্চয় ভাল লাগত। অন্যদিকে এমন আদ্যোপান্ত মেলোড্রামা এবং ইচ্ছাপূরণের ঘটনা প্রাপ্তবয়স্কদের ভাল লাগার কথা নয়। যদিও বড়দের কিছু খোরাক এখানে রাখা হয়েছে। যেমন এক বারবণিতা (সুব্রতা) ও তার বাবু (তরুণকুমার) পম্পাকে ওদের মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করেছে। পম্পা ওদের মা-বাপী বলে ডেকেছে। শেষে পম্পার জন্যই ওরা সংসারী হতে পেরেছে। তাই সব মিলে ছবিটি হয়েছে না ছোটদের না বড়দের।

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সম্পাদনা—সবই

পম্পাতে সুব্রতা

কাঁচা ধরনের। ডিটেলের কাজও তাই। কোন একটি দৃশ্যে গায়ক, গায়িকা এবং তবলচির ঘনঘন স্থান পরিবর্তন থেকেই বোঝা যায়।

পম্পা চরিত্রে শিশুশিল্পী রাণু মুখোপাধ্যায়কে সকলের ভাল লাগবে। অনেক দিন পর তরুণকুমারকে একটি বড় চরিত্রে দেখা গেল। তরুণকুমার গুণী শিল্পী। কোন ছবিতেই তাকে বিফল হতে দেখা যায় না। অনেক আজে বাজে ছবিতেও তিনি কত স্বাভাবিক অভিনয় করে গেছেন। এখানেও এক সহৃদয় ব্যক্তির চরিত্রে তিনি স্বাভাবিক এবং সুন্দর। এরপর নাম করতে হয় সুব্রতা চ্যাটার্জির। ছবিতে মোট আটটি গান আছে। সংগীত পরিচালক নির্মল চক্রবর্তী গানগুলোর ভালই সুর করেছেন। নমিতা রায়ের গাওয়া 'অপরূপ লীলা তব' এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'যে প্রদীপ চেয়েছিল' গান দুটি শুনতে ভাল লাগে।

অসিতবরণ মিত্র

মৃচ্ছকটিক

সংস্কৃত নাটক ঠিক যেমনভাবে ছিল তার পুনর্বাসন আমাদের নিজস্ব নাট্যরূপ আবিষ্কারে সাহায্য করবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু সেই নাট্যকলার অন্তঃসার, তার রূপের আর ভাবের কোন সমর্থ ইঙ্গিত আত্মীকরণ করতে পারলে তা আমাদের থিয়েটারকে সম্পন্ন করে তুলবে নিশ্চয়ই। 'বহুরূপী'র বর্তমান প্রযোজনা 'মৃচ্ছকটিক'-এর পিছনেও অনুরূপ ভাবনা ও পরিকল্পনার আভাস আছে বলে মনে হয়।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গত

মাত্র একচাল্লিশ দিনের ফাঁকে সেবাস্তিয়ান অ্যাথলেটিকের তিনটি বিভাগে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন যা পুরানো রেকর্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। একই সময়ে একজন অ্যাথলিটের পক্ষে তিন তিনটি বিশ্ব রেকর্ড নিজের অধিকারে রাখতে পারার দৃষ্টান্ত নজির হিসেব বিরলপ্রায়।

সেবাস্তিয়ানে আটশ মিটার দৌড়েছেন ১ মিনিট ৪৩, ১৯ সেকেন্ডে, পনেরশ মিটার ৩ মিনিট ৩২-২ সেকেন্ডে এবং এক মাইল দৌড়পথ অতিক্রম করেছেন ৩ মিনিট ৪৮-৯৫ সেকেন্ডে। তার পরবর্তী লক্ষ্য মস্কো ওলিম্পিকের সোনা এবং পনেরশ মিটার দৌড়ে সাড়ে তিন মিনিটের বাধা ভেদ করা।

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে সেবাস্তিয়ান এখনও এক আনকোরা প্রতিযোগী। তবে তিন তিনটি বিশ্ব রেকর্ড গড়া বা ভাঙ্গার পর তিনি নিশ্চয়ই সেখানে এক পরিণত চরিত্রের স্বীকৃতি পাবেন। অ্যাথলেটিকের বড় আসরে আবির্ভাব ঘটিয়ে তিনি সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞদের তারিফ আদায় করতে পেরেছিলেন ১৯৭৭ সালে ইউরোপীয় ইনডোর অ্যাথলেটিকস উপলক্ষে। ওই আসরে সেবাস্তিয়ান আটশ মিটার দৌড়ে সোনা পান। তার আগে ইংলন্ডের স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে পনেরশ মিটারে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। গত বছরে কমনওয়েলথ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন নি। লোবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র সেবাস্তিয়ানের ওপর তখন অধ্যয়নের চাপ ছিল বেশি। সেই চাপ কিঞ্চিৎ শিথিল হতেই সেবাস্তিয়ান ইউরোপীয় অ্যাথলেটিকসে যোগ দেন। কিন্তু ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁকে আটশ মিটার দৌড়ের ব্রোঞ্জ পদকটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁকে ডিঙ্গিয়ে যান পূর্ব জার্মানীর ওলাফ বেয়ার এবং স্বদেশের স্টিভ ওভেট। তবে সম্প্রতি স্বদেশের এক প্রথম সারির প্রতিযোগিতায় সেবাস্তিয়ান আটশ মিটার দৌড়ের জাতীয় রেকর্ডটি ওভেটের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন।

হালকা পাতলা গড়নের চেহারা সেবাস্তিয়ানের। অনুশীলন কালে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মাইলের পর মাইল দৌড়ান না। হয়ত শরীরের কথা ভেবেই দ্রুতপদে অল্প দূরত্ব অতিক্রম করার দিকে মন দিয়েছেন। এবং নিজের উদ্ভাবিত পরিকল্পনা আঁকড়ে ধরেই তিনি নিজেকে মাঝারি পাল্লার দৌড়ে শ্রেষ্ঠ কুশীলব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তবে সব কৃতিত্বই তাঁর একার নয়। তাঁকে অ্যাথলিট রূপে গড়ে পিঠে মানুষ করার কৃতিত্ব তাঁর জনক পিটার কোয়ের। শেফিল্ডের ইঞ্জিনিয়ার পিটার কোয়েই হলেন সেবাস্তিয়ানের প্রশিক্ষক, উপদেষ্টা এবং পথপ্রদর্শক।

পিটারের যত্ন ও যোগ্য নেতৃত্বের কল্যাণে লাজুক লাজুক চেহারার সেবাস্তিয়ানও

দূরপাল্লার দৌড়ে
ইথিওপিয়ার ইয়াতার

ক্রমশঃই সপ্রতিভ হয়ে উঠছেন। মাইল দৌড়ে নিউজিল্যান্ডের জন ওয়াকারের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দেবার পর সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, এর পর কোন্ রেকর্ডটি ভাঙ্গাতে এগোবেন? শুনে হাসিমুখে সেবাস্তিয়ান জানিয়ে দেন, আমি তো ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে দৌড়ই না। আমার মন ও লক্ষ্য থাকে অন্য সব প্রতিযোগীর প্রতি। তাঁদের পেছনে ফেলে রাখাই আমার সংকল্প।

তা সেই সংকল্পেই সেবাস্তিয়ান যে অবিচল থাকেন তাতে আর সন্দেহ কী! মাইল দৌড়ে রেকর্ড করার দিন তিনি দ্বিতীয় প্রতিযোগীকে গজ তিরিশেক পেছনে ফেলে রেখেছিলেন।

সেবাস্তিয়ান কোয়ে এখনও ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগ দেবার সুযোগ পান নি। কিন্তু মিরাটস ইফতার পেয়েছেন। ১৯৭২ সালে মিউনিখ ওলিম্পিকে ইফতার দশ হাজার মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পান। কিন্তু ব্রোঞ্জ কেন? সোনা পাওয়ার সামর্থ কি তাঁর নেই? অনেকের ধারণা, সে সামর্থ আছে এবং ছিল। ১৯৭৬ সালে আফ্রিকা মন্ট্রিল ওলিম্পিক বয়কট করায় ইফতার সোনা থেকে বঞ্চিত হন বলেই তাঁরা মনে করেন।

অ্যাথলিট হিসেবে ইফতার রীতিমত বর্ষীয়ান। আকৃতি পোড় খাওয়া। মাথার সামনের দিকে টাকটি ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। দৌড়বার ভঙ্গীটিই দর্শনধারী নয়। পণ্ডিতেরা খুঁজে পেতে খুঁত ধরতে পারেন। তবু ইথিওপিয়ার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক অ্যাথলিট মিরাটস ইফতার বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সেরা দূরপাল্লার দৌড়বীর।

চলতি বছরে ইফতার মস্কোয় স্পার্টাকিয়াডে এবং মন্ট্রিলের বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকসে দ্বৈত কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা পেয়ে। আগের বার ডুসেলডর্ফে বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকসেও তিনি পাঁচ ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে ইফতারের জয়যাত্রা শুরু হয় ১৯৭১-এ। সেই থেকেই তিনি দূরপাল্লার দৌড়ে সামনের সারির এক প্রতিযোগী।

বয়স হলেও ইফতারের সাফল্যের সম্ভাবনাকে খারিজ করে দিতে কেউই সাহস পান নি। কারণ বেশি বয়স ইথিওপিয়ার অ্যাথলিটদের এগোবার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি। যেমন করে নি ওই দেশেরই দুই প্রথিতযশা অ্যাথলিট আবেবে বিকিলা ও মামো ওলডের ক্ষেত্রে। তিরিশের ওপারে চলে যাওয়ার পরই তো আবেবে বিকিলা ওলিম্পিকে ম্যারাথনে দ্বিতীয় সোনা সংগ্রহ করেন। আর ওলডে ওলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়পথ জয় করেন চল্লিশে পা দিয়ে তবেই। সুতরাং পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ইফতারের বেলাতেই বা ভারবহ হয়ে উঠবে কেন?

ইফতার আবেবে বিকিলা ও মামো ওলডে স্বদেশের দুই কৃতবিদ্য অ্যাথলিটের পদাংক অনুসরণে মস্কো ওলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়েও যোগ দেবেন বলে মনে হয়। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকটি ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়ে সাফল্যও অর্জন করেছেন।

লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় নি। তবে অ্যাথলেটিকে দক্ষতাই ইফতারকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওবার সুযোগ উপহার দিয়েছে। স্বদেশের বিমান বাহিনীতে তিনি বর্তমানে একজন লেফটেন্যান্ট। ইংরাজী যে ভাল জানেন তাও নয়। আর তা না জানার জন্যে একবার তাঁকে কি রকম অসুবিধে যে পড়তে হয়েছিল সেই কাহিনী স্মরণ করে এই প্রসঙ্গটি শেষ করছি।

সেবার মিউনিখ ওলিম্পিকে পাঁচ হাজার দৌড়ে তাঁর অংশ নেওয়ার কথা। প্রতিযোগীদের ডাক দেওয়া হয়েছে মাইকযোগে। কিন্তু ভাষাটিতে তেমন সড়গড় না থাকায় ইফতার সেই ডাক বুঝতে পারেন নি। একে একে তিনবার ডাক পড়ল। তবু ইফতার স্টার্টিং লাইনে গরহাজির। শেষ পর্যন্ত সময় হয়েছে নিজের মনের এই ধারণায় তিনি যখন ট্র্যাকের ধারে এসে পৌঁছলেন তখন সময় সত্যিই বয়ে গেছে। পাঁচ হাজার দৌড়ের ফাইনাল শেষ হয়েছে কখন।

ব্যাপারটা যখন বুঝলেন ইফতার তখন তাঁর চোখের জল আর বাধা মানে নি। আশ্চর্য, সাহায্য করার জন্যে সময়মত কেউ

সেদিন তাঁর পাশে ছিলেন না। কিন্তু অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ কি? ইফতারের নিজের দোষও তো কম নয়। আন্তর্জাতিক ভাষাটাও কিঞ্চিৎ রপ্ত করে নিতে হয় না কি? ইফতার অ্যাথলেটিক চর্চার ফাঁকে ইংরেজীটাও শিখে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। যাতে ভবিষ্যতে তাঁকে মিউনিখের মত অন্য ফাঁকিতে পড়তে না হয়।

না ছোটদের না বড়দের

'পম্পাতে' একটি বারবণিতার চরিত্র আছে। দু-একটি দৃশ্যে কিছু দেহ-পসারিণীকে খদ্দেরের আশায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেও দেখা গেছে। এগুলো না থাকলে ছবিটি ছোটদের দেখানো যেতে পারত। বিষয়বস্তু ছোটদেরই উপযোগী। গ্রামের ছোট মেয়ে পম্পা বাবা-মাকে হারিয়ে একা-একা কেমন করে কলকাতায় আসে এবং নানান নাটকীয় ঘটনার মধ্যে কেমন করে তার দুঃখ ঘোচে, তা দেখতে ছোটদের নিশ্চয় ভাল লাগত। অন্যদিকে এমন আদ্যোপান্ত মেলোড্রামা এবং ইচ্ছাপূরণের ঘটনা প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভাল লাগার কথা নয়। যদিও বড়দের কিছু খোরাক এখানে রাখা হয়েছে। যেমন এক বারবণিতা (সুব্রতা) ও তার বাবু (তরুণকুমার) পম্পাকে ওদের মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করেছে। পম্পা ওদের মা-বাপী বলে ডেকেছে। শেষে পম্পার জনাই ওরা সংসারী হতে পেরেছে। তাই সব মিলে ছবিটি হয়েছে না ছোটদের না বড়দের।

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সম্পাদনা—সবই

পম্পাতে সুব্রতা

কাঁচা ধরনের। ডিটেলের কাজও তাই। কোন একটি দৃশ্যে গায়ক, গায়িকা এবং তবলচির ঘনঘন স্থান পরিবর্তন থেকেই বোঝা যায়।

পম্পা চরিত্রে শিশুশিল্পী রণু মুখোপাধ্যায়কে সকলের ভাল লাগবে। অনেক দিন পর তরুণকুমারকে একটি বড় চরিত্রে দেখা গেল। তরুণকুমার গুণী শিল্পী। কোন ছবিতেই তাকে বিফল হতে দেখা যায় না। অনেক আজে বাজে ছবিতেও তিনি কত স্বাভাবিক অভিনয় করে গেছেন। এখানেও এক সহৃদয় ব্যক্তির চরিত্রে তিনি স্বাভাবিক এবং সুন্দর। এরপর নাম করতে হয় সুব্রতা চাটার্জির। ছবিতে মোট আটটি গান আছে। সংগীত পরিচালক নির্মল চক্রবর্তী গান-গুলোর ভালই সুর করেছেন। নমিতা রায়ের গাওয়া 'অপরূপ লীলা তব' এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'যে প্রদীপ চেয়েছিল' গান দুটি শুনতে ভাল লাগে।

অসিতবরণ মিত্র

মৃচ্ছকটিক

সংস্কৃত নাটক ঠিক যেমনভাবে ছিল তার পুনর্বাসন আমাদের নিজস্ব নাট্যরূপ আবিষ্কারে সাহায্য করবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু সেই নাট্যকলার অন্তঃসার, তার রূপের আর ভাবের কোন সমর্থ ইঙ্গিত আত্মীকরণ করতে পারলে তা আমাদের থিয়েটারকে সম্পন্ন করে তুলবে নিশ্চয়ই। বহুরূপীর বর্তমান প্রযোজনা 'মৃচ্ছকটিক'-এর পিছনেও অনুরূপ ভাবনা ও পরিকল্পনার আভাস আছে বলে মনে হয়।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গত

আটাশ-উনত্রিশ বছর ধরে 'বহুরূপী' একটি বিশিষ্ট নাম। গত কয়েক বছর ধরে অবশ্য তার নতুন কোন প্রযোজনায় আর পাওয়া যাচ্ছিলো না শ্রীশম্ভু মিত্রকে এবং এবার তৃপ্তি মিত্রও অনুপস্থিত। অনুপস্থিত তরুণদের মধ্যে 'শাঁওলী' বা 'রমাপ্রসাদ'ও। তবু 'কুমার রায়' নির্দেশিত এই নাট্য-প্রযোজনায় 'বহুরূপী'র এতোদিনের যত্নলব্ধ ধরনটা প্রায় সবটাই পাওয়া যায়। সেই সুষমামন্ডিত লীলায়ন বা স্টাইলাইজেশন, সেই বাচন ভঙ্গি এখনও তাদের সমৃদ্ধ করে রাখে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা দুঃখও যেন থেকে যায়। শূদ্রক-এর এই বিখ্যাত নাটকটিতে যে আধুনিক সমস্যার মাত্রা যোগ করার কথা ভাবা হয়েছে, বলা হয়েছে প্রস্তাবনায়, তা বহন করবার মতো দৃঢ়তা কি রয়েছে এই কুসুমকোমল অত্যন্ত সাজানো গোছানো উপস্থাপনায়। ভেতরে বা বাইরে কোথাও কি অনুভূত হয়েছে সাধারণ মানুষের সেই সংগ্রাম, কেবল উচ্চারিত সংলাপ বা অভিনীত দৃশ্যের মোড়কে ছাড়া। নায়ক নায়িকার অসম মিলনের পিছনকার সামাজিক বিশ্লেষণ হয় নি কোথাও। চারু দত্তের পুত্রের খেলনাও পায় নি তার প্রার্থিত প্রতীকমূল্য।

'মৃচ্ছকটিক'-এর রচয়িতা নামে প্রসিদ্ধ 'শূদ্রক' সত্যিই রাজা ছিলেন না ছদ্ম নামে অন্য কোন মহান লেখক সে আলোচনার স্থান এটা নয়। উপরন্তু এই বস্তুতান্ত্রিক নাটকে বেশ কিছু ভালো অংশ থাকলেও কেন তাকে একটি ধ্রুপদী নাটক বলা হবে তা বুঝতে আমি অক্ষম। দেব ভাষায় রচিত হলেই নিশ্চয়ই কোনো রচনা ধ্রুপদী হয় না, বিশেষত এই নাটকের বাঁধনও যখন সর্বত্র ত্রুটি মুক্ত বলে মনে হয় না, স্বয়ংসিদ্ধ তো নয়ই। কাজেই 'বহুরূপী'র নাটকটি ধ্রুপদী হয়ে ওঠার যে চেষ্টা করেছে তা নিয়ে আলোচনা করার আমি কোন উৎসাহ পাই না। কিন্তু উৎসাহ পাই অবশ্যই এর দৃষ্টি নন্দন উপস্থাপনার কথা ভাবতে, ইঙ্গিতময় সুসম মঞ্চ (উৎপল নায়েক) ও আলো (দিলীপ ঘোষ) যাকে সাহায্য করেছে। ভালো লাগে স্মৃতি ধার্য হয়ে থাকবার মতো কিছু অভিনয়ের কথা বলতে।

বাংলা থিয়েটারে অনেকদিন ধরেই যে অভাবটা প্রায় সব সময়ই থেকে গেছে তা হল কিছু ভালো অভিনেত্রীর অভাব। এই মুহূর্তে সেই অভাববোধটা আরও প্রবল। তার মধ্যে 'অনসূয়া ঘোষ'-এর 'বসন্তসেনা' নিঃসন্দেহে একটি উৎসাহব্যঞ্জক চরিত্র সৃষ্টি। তাঁর সুন্দর নাচ, সুঠাম ভঙ্গিমা এবং লীলায়িত চলাফেরার মধ্যে আকর্ষণীয় সম্পদ রয়েছে। পরবর্তী কোন নাটকে, অন্যতর অর্থে গভীর অভিনয়ের সুযোগ থাকলে সেইখানে তার পরিণতির অপেক্ষায় থাকবো আমরা। অপর পক্ষে 'কুমার রায়' এর কথা বলতে গেলেই আমার রবীন্দ্রনাথের রামেন্দ্রসুন্দর প্রশস্তির কথা মনে পড়ে যায়, 'তোমার হাস্য সুন্দর, বাক্য সুন্দর...' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর সহজ অভিনয় চারু দত্তের মর্যাদার যোগ্য ভূমিকায় বিন্যস্ত। কেবল 'শক্তি সেন'-এর কুশলী রূপসজ্জাও তাঁর বয়েস লুকিয়ে রাখতে পারে নি। এই নাটকে অন্য দুটি সার্থক রূপায়ন 'অরিজিৎ গুহ'র 'শকার' এবং 'তারাপদ মুখোপাধ্যায়'-এর 'মৈত্রেয়'। 'অরিজিৎ' একটি স্থূলে পশুশক্তির অভিব্যক্তি আনতে যে ইচ্ছাকৃত 'ইডিয়টিক ম্যানারিজম' এনেছেন তা এই নাটকে মানিয়ে যায়। অবশ্য প্রথম দৃশ্যে 'বসন্তসেনা'কে খোঁজবার সময় তাঁর অঙ্গসঞ্চালন আরো নিপুণ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে 'সৌমিত্র বসু'র 'শর্বিলক' চরিত্রে সিঁদ কাটা প্রশংসনীয়। 'তারাপদ' প্রথম আমাদের চমকে দিয়েছিলেন যতদূর মনে পড়ে 'চোপ-আদালত চলছে'তে। তারপরে 'যদি আর একবার' এও তাঁকে মনে হয়েছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ নাটকে তাঁর সংবেদনশীল সরস অভিনয়ও মনে রাখবার মতো। তবে ব্রাহ্মণ হলেই কিছু ফর্সা হয় না, তাঁকে অতটা ফর্সা সাজানোর চেষ্টা করা হলো কেন? অভিনয়ে তরুণেরা, নবাগতেরাও বেশ স্বচ্ছন্দ ও সপ্রতিভ। 'সুব্রত মজুমদার'-এর 'সংবাহক', 'সমীরণ মুখোপাধ্যায়'-এর দর্দুরক, 'বলাই গুপ্ত'র 'চন্দনক', 'অতুল সাহা'র 'চন্ডাল', 'রাণী মিত্র'র 'রদনিকা' প্রমুখ অনেকেই তারুণ্যের প্রতি বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। পুরোনোদের মধ্যে একটি ছোট দৃশ্যে 'বিচারক'-এর সংযত ভূমিকায় 'কালীপ্রসাদ ঘোষ'কে ভালো লাগে। 'শান্তি দাস'-এর 'আর্যক'ও ভালো। কেবল 'মদনিকা'র ভূমিকায় 'নমিতা মজুমদার'কে একেবারেই অপ্রস্তুত মনে হয়। হাসি দিয়ে তিনি সেটা ঢাকতে পারেন নি, আরো প্রকট করে ফেলেছেন। 'বীথি মুখোপাধ্যায়' খুব পরিচিতা নন এবং এ নাটকে তাঁর অভিনয়ও তাঁকে পরিচিতা করে তুলতে পারছে না এখনও। 'দেবতোষ ঘোষ'-এর বিশেষ কিছু করার ছিল না, স্বভাবত মেরুদন্ডহীন এক পন্ডিতের চরিত্রকে তিনি কেবল যথাসাধ্য বিশ্বাস করতে চাইছিলেন।

'মৃচ্ছকটিক'-এর পরিচ্ছদ - পরিকল্পনা আমার ভালো লাগে নি। কেমন যেন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের অধুনা প্রচলিত রীতির দ্বারা সে প্রভাবিত। 'দীনেশচন্দ্র চন্দ্র'র সুখশ্রাব্য সঙ্গীতও অনেকটা তাই। এমন কি 'প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর ভাবসমৃদ্ধ কন্ঠসঙ্গীতও সেখানে ভিন্ন কোনো মাত্রা যোগ করতে পারে নি। জানি না ধ্রুপদী হয়ে উঠবার কোনো এসব কতোটা সহায়ক। 'বহুরূপী'র মতো শক্তিশালী ঐতিহ্যসম্পন্ন দলের কাছে আমাদের কেবল একটাই দাবি—নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গিমা [illegible] খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা যখন সংস্কৃত নাটকের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে চোখ ফেরাচ্ছেন তখন আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধানেও আর একটু এগিয়ে যান না লোক-নাট্যের দরজায়। শম্ভু মিত্র নিজেই তো বলেছেন 'লোকনাট্য জীবন্ত, মুদ্রা জীবন্ত নয়'। (প্রসঙ্গ ঃ নাট্য, পৃঃ ১০৬)। একটি সচল, জীবন্ত ও নমনীয় রীতি, বাহুল্য-বর্জিত তাঁর এক নির্বিশেষ থিয়েটারের প্রয়োজন কি 'বহুরূপী'ও অনুভব করছেন না? রবীন্দ্রনাথের ভাষা উচ্চারণে অথবা সুষমামন্ডিত তৎসম শব্দবহুলে ভাষায় বহুরূপী যেন নিজের জলে স্বচ্ছন্দ সাঁতার কাটে, লোকনাট্যের কথ্যভাষায় জনমানসের সত্যিকার নৈকট্যে পৌঁছতে কি তাঁরা চেষ্টা করবেন না? সেই চেষ্টা পথ খুঁজে পেলেই আমাদের থিয়েটার-এর নিজস্ব রীতি উদ্ভাসিত হবে, যে থিয়েটারে আমাদের স্বাভাবিক মানুষ স্বাভাবিক-ভাবেই নিজেদের ভরত বাক্য উচ্চারণ করবে, বিষ্ণু দে-র কবিতার পঙ্কপাটে অকারণ অসংলগ্ন আশ্রয় নিতে হবে না তাকে।

সুরজিৎ ঘোষ

সুরেশ সংগীত সংসদ

প্রতি বছরেই আগস্টের একটা সময় মন্মথনাথ ঘোষ কানাইলাল বসু এবং আমজাদ আলী খান নিজেদের পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে এসে সুরেশ সঙ্গীত সংসদ-এর ব্যানারে একত্র হন। শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে একত্র হওয়ার এই যে প্রয়াস এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া, তা আজকের দিনে প্রকৃতই বিরল। বিধান শিশু উদ্যানের শিশুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেওয়ার মত এ জাতীয় অনুষ্ঠান সর্বদাই অভিনন্দনীয়। কানাইলাল বসুর জনহিতৈষীমূলক কাজের এ-[illegible]য় উদ্যম, তাঁর সঙ্গীত সম্মেলনের সা[illegible]নিক কাজের চেয়েও অধিকতর প্রশংসার দাবি রাখে—যেসব সম্মেলন ভারতের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান এই কলকাতায় প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি করে হয়ে থাকে।

স্বর্গত সুরেশ চক্রবর্তীর পুষ্প-সজ্জিত প্রতিকৃতিটি এবার অনেকেই দেখতে পাননি, যেটি বরাবর মঞ্চের ডান দিকে রাখা হয়—এবার রাখা হয়নি। ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য সংযোগ সাধনে তাঁর যে বিপুল দান, তা স্মরণযোগ্য। বর্তমান সমালোচকের কাছে তিনি ছিলেন হিউম্যান কম্পিউটার স্বরূপ, যাঁর কাছে সঙ্গীত বিষয়ক যাবতীয় জটিল প্রশ্নাদির উত্তর পাওয়া যেত। আজকের দিনে তথাকথিত পন্ডিতজীদের কাছে এটা পাওয়া যায় না।

আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষের জন্য সংসদ এই বছর বেশ কিছু শিশু প্রতিভা উপ-

স্থাপিত করলেন। মনিলাল নাগের দশ বছর বয়সী কন্যা মিতা নাগের সেতারে পুরিয়া রাগের অনুষ্ঠানটি একটি আশ্চর্য পরিবেশন। আলাপ, জোড় এবং ঝালার প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল সুনির্মিত এবং প্রতিটি ধাপই একে অন্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে এগিয়ে গেছে। প্রতিটি স্ট্রোক স্পষ্ট এবং নিখুঁত হয়েছিল। গৎ কম্পোজিশনে তানগুলি ছিল দ্রুত এবং সূক্ষ্ম—যা মিতার লয়ের উপর স্পষ্ট ধারনাকে প্রকাশ করেছে। ঝালা ছিল উজ্জ্বল এবং বর্ণময়। যথার্থতা, স্পষ্টতা এবং রীতি সব কিছু বজায় রেখে নিজস্ব পদক্ষেপে কন্যাকে শিক্ষা দিয়ে যাওয়ার জন্য মণিলাল অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখেন।

যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্রী দেবযানী গুপ্তের বাগেশ্রী রাগে গান এক প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান। তাঁর কন্ঠ খুবই সুখশ্রাব্য এবং অতি সহজেই ও যথার্থতায় সে এক সুর থেকে অন্য সুরে যেতে পারে। যামিনীবাবুর ছাত্রদের এই স্বতস্ফূর্ত গতির জন্যেই, তাঁদের অন্যদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়। অপ্রয়োজনে তাঁরা টেকনিককে প্রাধান্য দেন না, খুবই রীতিবদ্ধ সাজ অথচ সঠিক রাগ কাঠামোর দিকে এগিয়ে যান, কোনো রকম কৃত্রিম জটিলতাকে প্রাধান্য না দিয়ে এবং অতিরিক্ত কন্ঠের কারুকার্য না দেখিয়ে। দেবযানী একেবারে নিখুঁতভাবে গান গেয়েছে, যা আমাদের দু যুগ আগের সন্ধ্যা মুখার্জিকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। এই দুই শিশু শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন সুখেন্দু কর্মকার। খুবই উজ্জ্বল সহযোগিতা, শিল্পিদ্বয় কখনোই কোনো রকম বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। বছরের পর বছর তিনি ক্রমশঃ পরিণত সঙ্গতকার হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন। হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন বাসুদেব চক্রবর্তী।

নিতান্তই শিশু বলে মঞ্চে এসে গান শোনানোর সময় অর্ণব চ্যাটার্জির এখনো হয়নি। যদিও সেদিন সে লয়ের ওপর তার যে বেশ ভাল দখল আছে, তার প্রমাণ রেখেছে। কিন্তু কন্ঠসঞ্চালনে মাত্রাতিরিক্ত টেকনিক এড়াতে পারেনি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সাত বছর বয়সী অর্ণব সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে, যদি সে অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে যথার্থতার সঙ্গে এক নোট থেকে অন্য নোটের যাওয়ার দিকে মনযোগী হয়।

অপর্ণা চক্রবর্তীর শ্যামকল্যাণ ও গৌড় মল্লার সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং রাগ কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর সুশিক্ষাকেই চিহ্নিত করেছে। আগ্রা ঘরাণার বেশ কয়েকজন সুবিখ্যাত শিল্পীর কাছে অপর্ণা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিবেশিত বন্দীশগুলি সর্বদাই ঐতিহ্যময়। স্বর বিস্তারের চেয়ে রাগ বিস্তারের প্রতিই তিনি অধিকতর মনযোগী এবং প্রতিটি গানের কাব্যিক শব্দের ওপর ঝোঁক প্রদান করেন। একটি কাজরি গেয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। তবলায় সঙ্গত করেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র। হারমোনিয়ামে সোহনলাল শর্মার সহযোগিতা খুবই জীবন্ত হয়েছিল।

আমজাদ আলী খানের প্রায় আলাপহীন তিলোক কামোদ ছাঁচে ঢালা যন্ত্রসঙ্গীতের একঘেয়েমিতা মুক্ত হওয়ায় খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছিল, খুবই স্পষ্ট এবং সুখশ্রাব্য তাঁর যন্ত্রের আওয়াজ। মশীদখানী গতে তাঁর বৃহৎ অঙ্ক বিস্তার খুবই প্রশংসনীয় হয়েছিল। লয়ের ঝোঁকের সঙ্গে একটি পরিষ্কার রাগের ছবি সংযুক্ত করে এ জাতীয় অঙ্গ গঠনের জন্য অসামান্য সাঙ্গীতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। ওস্তাদ আমীর খান এবং বিলায়েৎ খান এ বিষয়ে পথিকৃৎ। তিলোক কামোদের ধাপগুলি যথারীতি জটিল এবং অভিনব হয়েছিল। পরিবেশন যথেষ্ট আবেগময় হওয়ায় বর্তমান সমালোচক খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সঙ্গীতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য গমকগুলি নাটকীয় স্তব্ধতা সহযোগে বিন্যাস করা হয়েছে যা কেবল আমজাদ আলীই পারেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রেজাখানী কম্পোজিশনে তবলার সঙ্গে আকস্মিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধারণ শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য হয়েছিল। সাহানা পরিবেশনাটিও সুখশ্রাব্য এবং গভীর তাৎপর্যময়।

সাবির খান কখনো তাঁর পিতার পথ কখনো বা একেবারেই স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে তবলার জগতে এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রম করে এসেছেন। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেও তাঁর বাজনা স্বচ্ছ এবং পরিণত হওয়ায় উচ্চমানের প্রচন্ড এফেক্ট থাকায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কলকাতার শ্রোতাদের যে শ্রদ্ধা ভালবাসা তাঁর পিতা পেয়েছিলেন, আশা করা যায় আগামী দিনে সেগুলি সাবিরও একের পর এক জয় করে নেবে।

বিদেশ ফিরে

সম্প্রতি জাপানে সঙ্গীত পরিবেশন করে দেশে ফিরলেন আনন্দশঙ্কর, তনুশ্রীশঙ্কর এবং তাঁদের সহশিল্পিবৃন্দ। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, বিদেশে যাঁরা বাজাতে যান, তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ট্র্যাডিশন্যাল আইটেম পরিবেশন করেন। কিন্তু আনন্দশঙ্কর যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তা ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের পর্যায়ে পড়ে না, ফিউজন মিউজিকের পর্যায়ে পড়ে—বিদেশে যার প্রচলন এখন খুব বেশী। এইদিক থেকে তাঁকে পথিকৃত বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আনন্দশঙ্করের পিতা যে নৃত্য পরিবেশন করতেন দেশে-বিদেশে—তাও ছিল নন ট্র্যাডিশনাল।

একটি সাংবাদিক সম্মেলনে আনন্দশঙ্করও সম্প্রদায় জানালেন, জাপানের দশটি শহরে তাঁরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেছেন। দর্শক সাধারণের অভূতপূর্ব চাহিদায় সাড়া দিতে কোথাও কোথাও দিনে দুটি করে শো করতে হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, ওদেশের টেলিভিশনেও এঁরা প্রোগ্রাম করেছেন—যা একটি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার বিষয়।

এ বছরের আগস্ট মাসে এই সম্প্রদায়ের বয়স এক দশক পূর্ণ হবে এবং প্রয়াত উদয়শঙ্করের বয়স হবে আশি। ঐ বছরেরই ৮ই ডিসেম্বরে। ঐ দুই বিশেষ দিনের জন্য একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন এঁরা, যার প্রস্তুতি চলছে এখন থেকেই। এরা জানালেন, যে কোনো ধরনের নতুন ও সৃষ্টিশীল কাজকে উন্নত ও উৎসাহিত করাই এদের মূল লক্ষ্য—সেটাই জরুরী বলে মনে করেন। এবং একই সঙ্গে এরা কামনা করেন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রকৃত বৃত্পানুযায়ী সুসংরক্ষণ। পরীক্ষামূলক কাজে আনন্দ ও তনুশ্রীশঙ্করকে সাহায্য করেন সেতারে উজ্জ্বল চ্যাটার্জী, স্প্যানিশ গীটারে সইপ্রাস টাটা এবং সরোদে [illegible] ব্যানার্জী।

সুব্রত রায়চৌধুরী

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

১৯ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা
২৬ পৌষ, ১৩৮৬
11th January, 1980

আগামী সংখ্যায়

অশোক চট্টোপাধ্যায়েরে গল্প
পুলকেশ দে সরকারের আলোচনা
লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগ করেন নি?
শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের
বরিশাল জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ

আপনাকে নমস্কার

মাননীয় ভোটার মহাশয়—আপনার বিচক্ষণতার জন্যে আপনাকে সাধুবাদ না দিয়ে পারছি না। সপ্তম লোকসভার নির্বাচনে যখন মাইক, জনসভা, প্রচারপত্র, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি আমাদের দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল—তখন আমরা ভাবতেই পারিনি আপনি কি করে আপনার প্রার্থীকে বেছে নেবেন।

দেশ নাকি এখন থেকেই কোয়ালিশন শাসনেই চলবে—এমন একটা কথা দিকে দিকে শোনা যাচ্ছিল। ইরানের ব্যাপারে, আফগানিস্থানের গোলমালে, হাভানার নিরপেক্ষ সম্মেলনে আমাদের ভারতের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না। আমরা সত্তর কোটির দেশ—আমাদের যে বলার কিছু আছে—এমন কোন কণ্ঠ আমরা সেই সাতাত্তরের পর আর শুনতেই পাইনি।

আপনি এই ভারতের সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষ। আপনার বার্ষিক আয় নিয়ে লোকসভা, সংবাদপত্র ও অর্থনীতিতে নানা বিমর্ষ কাহিনী আমরা এতদিন শুনে এসেছি। আপনি নিরক্ষর। নিজের নাম সই করতে পারেন না। গায়ে জামা নেই। মাথার ওপর ছাদ নেই। আপনার পেটে ভাত নেই। আপনার বছর বছর ইনক্রিমেণ্ট হয় না। আপনি বোনাস বা ওভারটাইম কিছুই পান না।

আমরা ভোট নিয়ে যারা এতকাল প্রবন্ধে, সেমিনারে, সভায় চুলচেরা বিচার করেছি—মহান গণতন্ত্রের মহাসঙ্গীত গেয়ে চলেছি—আমরা ধরতেও পারিনি—আপনি নিজেকে শাসন করার জন্যে—দেশের ভালোর জন্যে একা একা একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন।

আপনি বুঝতে পেরেছেন—অনেক তো কমিশন হোল—অনেক তো কথা হোল—এবার একটু কাজ হোক। সেজন্যে চাই নিরুপদ্রব স্থায়ী সরকার—সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—যে-কণ্ঠে ভারতবাণী উচ্চারিত হবে।

এখনো আমাদের এই শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে 'খুনী' 'শয়তান' 'শকুন' ইত্যাদি কথার মালা-পরানো গালাগালি শোভা পাচ্ছে। কিন্তু বিশাল ভারতবর্ষ এসব হাস্যকর প্রমাণ করে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচলভাবে এগিয়ে গিয়েছে—নিঃশব্দে।

এসবই আপনার জন্যে সম্ভব হোল। আমরা এবার কিছু স্থির করার আগে আপনার এই শিক্ষা মনে রাখবো।

বাকিটাও সম্ভব

আলোকময় দত্ত

সকালে ঘুম ভাঙ্গাতেই ভাল হয়ে গেল মন। জানলার পাশে দেবদারু গাছটার সারা গায়ে সকালের প্রথম রোদ। এবার একেবারেই শীত না পড়লেও ভোরবেলায় একটু কুয়াশার ভাব। জানি, সারাদিনে দু' লক্ষ সাতান্ন হাজার উনুন, সাড়ে ছ' হাজার কারখানার চুল্লি এবং এক লক্ষ দশ হাজারের কিছু বেশী মোটর গাড়ি, লরি ও টেম্পোর ধোঁয়ায়, গ্যাসে আর বাষ্পে কলকাতার আকাশ ও আবহাওয়া দূষিত হবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে। সন্ধ্যে হতে না হতে চোখ জ্বালা করবে, কষ্ট হবে নিঃশ্বাসের। তবু এ মুহূর্তে মনে হলো আমরা কী সুখীই না হতে পারি কত সহজেই—মাত্র কয়েকটা জিনিস পেলেই। কিন্তু, কি সেই দ্রব্য সামগ্রী? কি সেই সামাজিক অবস্থা বা ব্যবস্থাদি—যা হাতে পেলে আমাদের সাধ পূরণ হবে সব।

আশ্চর্যের বিষয়—আমরা অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ, সব স্পষ্টভাবে জানি না আমরা কি চাই। আমাদের কিসের অভাব। কি কি করলে সে অভাব দূর হবে। গত কয়েক বছরে পরিচিতদের অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা কি সুখী? তাঁদের কি জীবনের কাছে চাইবার নেই আর কিছুই। আজ পর্যন্ত মাত্র দুটি মানুষ বলেছেন যে তাঁরা সম্পূর্ণ সুখী এবং এ যাবৎ যা চেয়েছেন তার প্রতিটা ইতিমধ্যে পেয়ে না গেলেও, জানেন যে যথা সময়ে সেগুলো পাবেন নিশ্চয়। বাকিরা একবাক্যে বলেছেন যে তাঁরা সুখী নন। অনেকেই বিরক্ত হয়েছেন আমার প্রশ্নে, রেগে গেছেন কেউ কেউ। ঠিক কথায় না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন স্পষ্ট যে এমন আহাম্মোকের প্রশ্ন এ-কালে কেউ করে নাকি। *যে দেশে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দশ-বারো ঘন্টা বিজলি থাকে না, থাকে না কলে জল, দোকানে কেরোসিন তেল, পথে নিরাপত্তা—সেখানে সুখী থাকা নাকি ঈশ্বরের অসাধ্য।*

নিজের স্বল্প বুদ্ধি ও সীমিত জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতনাহেতু বিনীত হয়ে বলেছি—সুখের কথা বাদ দিন, আমার জিজ্ঞাস্য—আপনার সাফল্য পেয়েছেন কি আপনার কাজে—জীবিকায়, পিতা-পুত্র কিংবা প্রেমিকের ভূমিকায়? জীবনের কাছে আপনি যা যা আশা করেছেন তা কি জীবন যুগিয়েছে অকৃপণ হাতে? এবারও মাত্র কয়েকজন ছাড়া রাগ করেছেন সবাই। দু'একজন আমার বালখিল্যতায় বলেছেন, কিঞ্চিৎ অনুকম্পার গলায়—আরে ভাই, সাফল্য কি অতই সস্তা। চাইলেই অমনি অমনি পাওয়া যায়।

আবার সাহস সংগ্রহ করে শুধিয়েছি—আচ্ছা অনুগ্রহ করে যদি একবার বলেন কি কি চেয়েছিলেন আপনি জীবনে? মানে... আমার কাছে একটা পুঁথি আছে, বহু পুরানো। তাতে পরিষ্কার প্রাকৃত ভাষায় লেখা আছে সাফল্যলাভের যাবতীয় উত্তর। শুধু জানা চাই কি কি চাই আমরা জীবনে—এবং কি পরিমাণে। ব্যস, একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছি শ্রোতাদের। তাঁরা বলেছেন অবশেষে, কিন্তু কিন্তু করে......সবাই যা চায়......টাকা পয়সা, নাম ডাক, উন্নতি, ব্যবসায়—এক কথায় সুখ-শান্তি। এই আর কি।

আসলে, আমরা জানি না আমরা কি চাই। কি পরিমাণে কতোদিনে, ঠিক কবে। আমরা সাফল্য কি চাই?—কি অর্থে? কোন ভূমিকায়? অর্থ, বিত্ত, সুনাম, স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, সমবেদনা—কি চাই আমরা। স্পষ্ট কোন ধারণা নেই আমাদের। কারণ, একেবারে পরিষ্কার একটা ধারণা যদি থাকতো তবে দেখা যেতো কিনারা। বোঝা যেত লক্ষ্য থেকে কতখানি দূরে আছি, সরে আছি।

কাল সকালে ঘুম চোখে চায়ের পেয়ালার জন্যে হাত বাড়িয়ে যদি পরিবর্তে পান একটা বাঁধা কাপ বা এক গ্লাস ঘোল, নিঃসন্দেহে রেগে যাবেন। বিরক্ত তো হবেনই। কারণ, আপনি নিশ্চয় করে জানেন এই সময় এক কাপ ধোঁয়া-ওঠা গরম চা চেয়েছিলেন পরিষ্কার ঝকঝকে একটা পেয়ালায়। সদ্য ক্ষেত থেকে তুলে আনা শিশিরে ভেজা বাঁধাকপি একটা বা ফেনাওঠা এক গ্লাস লস্যি অন্য যে কোনো সময়ে যতই আকর্ষণীয় হোক—বিছানায় শুয়ে ডিসেম্বরে ভোরে অন্তত চান নি। আর সেই জন্যেই, এটাও ঠিক কাল সকালে ঘুম ভাঙ্গাতেই আপনার মা, স্ত্রী বা কন্যা এক পেয়ালা চা-ই এগিয়ে দেবেন। কিন্তু ঠিক চা-ই পাবেন কেন, পাচ্ছেন কেন? রহস্যটা কী?

ওড়িয়া রমণী। শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ পোদ্দার

আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে ১৮৭৯ সালের অকটোবর মাসে টমাস আলভা এডিসন তাঁর বিজলি বাতির সফল গবেষণা শুরু করেন। আজ সন্ধ্যায় লোড-শেডিং হলে যে বিদ্যুৎ বাতির অভাব অনুভব করবো তা তাঁরই আবিষ্কার। (অবশ্য, লোড-শেডিং কার আবিষ্কার ঠিক জানা যাচ্ছে না।) মারওয়া রাগে আমীর খাঁ সাহেবের রেকর্ড শুনে তারিফ করি তাও তাঁরই কৃপায়। এক কথায় আধুনিক জীবনযাত্রার কথা ভাবাই যেতো না এডিসন-এর হাজার হাজার উদ্ভাবন ছাড়া। তাঁর এই অসামান্য সাফল্যের মূলে কি?—এ রহস্যের অন্তঃস্থল নিশ্চয় রহস্যই থেকে যেতে বাধ্য। যেমন গোপন থাকবে গোগোলের গল্প ভাল হওয়ার কারণ বা রবিশঙ্করের সেতার নৈপুণ্যের নির্ধারণ।

তবু, এডিসন-এর প্রতিভা বা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাকে বাদ দিয়ে যে দু'-একটা জিনিস আমরা সাধারণ যোগ্যতার মানুষ অনুকরণ করতে পারি সেগুলো জেনে রাখাই তো ভাল। মানুষের সভ্যতায় কি কি জিনিসের প্রয়োজন হবে দৈনিক তার একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন এডিসন এবং একটি একটি করে তার প্রতিটি উদ্ভাবন করতে লেগে গিয়েছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি মোট কত হাজার নতুন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সৃষ্টি করে গেছেন তার হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে এই ভদ্রলোক একাই এক হাজার তিরানব্বইটা নতুন আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়েছিলেন মার্কিন সরকারের কাছ থেকে। বলা বাহুল্য, একমাত্র কলের গান ছাড়া, প্রথম বারের প্রচেষ্টায় তার কোনটাই বানাতে পারেন নি এই হাতুড়ে বৈজ্ঞানিক কারিগর। বরং সহস্রাধিক বার বিফল হয়েছেন অধিকাংশ গবেষণায়। তবু নিরাশ হন নি এডিসন। উনি জানতেন ঠিক কি উনি চান। সেই জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেতেন। যতক্ষণে, যতদিনে তাঁর আকাঙ্ক্ষার বস্তুটিকে না আবিষ্কারের সফলতা এনে দিতে পেরেছেন ততদিন অধ্যবসায় ছাড়েন নি!

Genius is 10 p.c. inspiration
and 90 p.c. perspiration.

—বলেছিলেন টমাস আলভা এডিসন-ই

এডিসন একটি উদাহরণ মাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় সফল মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করলে লক্ষিত হয় বিবিধ গুণ ও যোগ্যতার সমন্বয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে প্রত্যেকের সঙ্গে মিল প্রত্যেকের, সেটা হলো—কি চাই, কি পরিমাণে চাই এবং ঠিক কতদিনে চাই তার একেবারে স্পষ্ট ধারণা। আর যা চাই তাকে পাওয়ার জন্যে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম। এক কথায় সাধনা। অবশ্য আমাদের সাধারণ মানুষের সাদা-মাঠা সাধ পূরনের জন্যে সাধনার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু একাগ্রতার

ব্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিবর্ত কিছু নই।

যদি ছেলেকে পরীক্ষায় ভাল করাতে চান তবে আপনাকে স্পষ্ট করে জানতে হবে কাকে দিয়ে কোন কোন বিষয়ে কি কি নম্বর খাওয়াতে চান। চাকরিতে উন্নতি যদি চান, তবে কোন পদটা দখল করার ইচ্ছে আপনার—ঠিক কতো দিনে। স্ত্রীর সঙ্গে সমতার সম্পর্ক, পারিবারিক শান্তি বা প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্য—কী চান আপনি। স্পষ্ট করে জানুন। দরকার হলে লিখে ফেলুন এক নম্বর, দু' নম্বর করে—এবার তার জন্যে খাটুন। মনে রাখবেন কিছু পেতে হলে অবশ্যই দিতে হয় তার সমপরিমাণ। কিছু না করেই কিছু হয়তো পাওয়া যায় দৌড়ালে ঘোড়ার পিছু পিছু। কিন্তু, মাত্র কিছুদিন। অবশেষে, আপনারা সকলেই জানেন, অবশ্যই শেষ হয় সে সব কিছু।

আমরা যে জিনিসগুলো পাচ্ছি না বা যার অভাবে আমাদের দিনগুজরান এবং জীবন-ধারণে বিঘ্ন হচ্ছে তার কারণ তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আসলে আমরাই দায়ী তার জন্যে। আমরা প্রত্যেকে যদি নিজের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাই—সম্পাদক মশাই যদি সৎ সম্পাদকীয় লেখেন, ডাক পিওন যদি খালের জলে চিঠির বান্ডিল ছড়িয়ে না দিয়ে ঠিক মতো বিলি করেন, যদি ডাক্তার চিকিৎসার সময় চরস-এর নেশায় না থাকেন, ব্যাংক-কেরানি যদি কাজের কথাই ভাবেন—ওভারটাইমের কথা নয়, তবে নেতাদের মুখ চেয়ে আর অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে কাটাতে হয় না আমাদের সারা জীবন।

আমাদের ভেবে দেখা উচিত সত্যিই আমরা অদৃষ্টের অধীন থাকবো না কি তাকেই করবো আজ্ঞাধীন। আমরা উপলব্ধি করি না যে ভারতবর্ষে জন্মেছি বলে আমরা কত সৌভাগ্যবান। গদিতে একজন নেতাই থাকুন বা নেত্রী, আমাদের ভাগ্যের আসল মালিক আমরাই। সবাই রবীন্দ্রনাথ, রদাঁ বা রবিশঙ্কর হতে পারবো না। শত চেষ্টায় হয়তো হওয়া যাবে না শরৎচন্দ্র, স্তাঁদাল বা সত্যজিৎ রায়। নাই বা হলাম—দরকারই বা কী? সতেজ যুবক, সুস্থ মানুষ, শ্রীমতী স্ত্রী বা যোগ্যাজননী তো হওয়া সম্ভব। তা হতে কি কোনো রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী চিরকাল বাধা দিতে পারেন!

আজকাল আমরা সবাই কেমন জানি নিঃস্তেজ হয়ে যাচ্ছি। মনমরা হয়ে আছি—অবসন্ন সবাই। বিষণ্ণ তাই! আমাদের নাগরিক জীবনে আর ব্যক্তিগত বোঝাপড়ায় দুঃখের কারণ কি নেই, কারণ কি নেই শোকের, নেই কি অনুতাপের বিষয়। আছে নিশ্চয়! কিন্তু সকালের রোদ, কুয়াশা-মুক্ত উদার আকাশ আর মানুষের প্রেম এখনো তো আছে। বাকিগুলো এক এক করে অর্জন করা সম্ভব আমাদেরই প্রচেষ্টায়।

চিঠিপত্র

অমৃতকে অভিনন্দন

অমৃতে প্রকাশিত আলোকময় দত্তের লেখা শিকার কাহিনী জঙ্গলে বাঘের মুখোমুখি পড়ে প্রীত হয়েছি। পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে লেখকের সঙ্গে সঙ্গেই যেন জঙ্গলে বিপদের মুখে ঘুরছি। প্রত্যেকটি পরিচ্ছদের শেষেই মনে হয়েছে, জঙ্গলে বিপদের মধ্যে সময় কাটিয়ে সদ্য বাড়ি ফিরেছি। অমৃত পত্রিকাকে আমার অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই এই জন্যে যে একটি ভিন্ন স্বাদের কাহিনী অনেকদিন পরে পরিবেশন করেছেন। —সন্তোষ বসাক, কুলীনপাড়া, খড়দহ।

একটি অনুরোধ

অমৃত-কে ধন্যবাদ। যুগোপযোগী রচনাসম্ভার প্রকাশ করার জন্য। বর্তমান অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে বাঙালী আজ হাসতে ভুলে যাচ্ছে।

তাই একটি ছোট্ট অনুরোধ একগুচ্ছ হাসির গল্প হিসাবে অমৃত-র একটি সংখ্যাকে সাজিয়ে দিলে বাঙালীরা অন্ততঃ এক সপ্তাহ প্রাণ খুলে হাসতে পারবে।—তাপসকুমার ভট্টাচার্য, ৪৬বি, বড়বাগান, শ্রীরামপুর।

অমৃত পিছিয়ে পড়ছে

বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি অমৃত প্রায় এক মাস পিছিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। নানা কারণে হয়ত এটা ঘটেছে এবং মনে হচ্ছে কোনমতেই এই পিছিয়ে-পড়াটাকে সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই বলছিলাম, যদি ঐ পিছিয়ে-পড়া সংখ্যাগুলিকে টপকে বর্তমান তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, তবে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। —প্রহ্লাদ ঘোষ, ২০/৯, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা-২৯।

আকর্ষণীয় লেখা

৯ নভেম্বরের অমৃতে প্রকাশিত আলোকময় দত্তের জঙ্গলে বাঘের মুখোমুখি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ কর্ণাটকের জঙ্গলে। লেখকের কলম নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে ঐসব হিংস্র বাঘের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল রীতিমত ভয়াল পরিস্থিতিতে। প্রতিটি মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হয়েছি সেইসব ঘটনার সম্মুখীন হয়ে। অমৃতে বহুদিন পর একটি আকর্ষণীয় লেখা পড়লাম। —প্রতুল দেবনাথ, জোড়াঘাট লেন, চঁচুড়া, হুগলী।

অমৃত প্রসঙ্গে

আমি অমৃত-এর নিয়মিত পাঠক। একে সত্যিই ভালোবাসি, তাই কিছু কিছু দৃষ্টিকটু বিষয়ের প্রতিবাদ না করে পারছি না।

গত ৯ নভেম্বরের সংখ্যাটা পড়ে দুটো বিষয় খুব খারাপ লাগলো। এক, জঙ্গলে বাঘের মুখোমুখি লেখাটার জন্যে একটা ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠা বরাদ্দ। রচনাটা টুকরো টুকরো করে প্রকাশ করলে কি খুব ভালো হতো না? দুই, খেলার পৃষ্ঠা ছটি শুধুমাত্র ক্রিকেটে বরাদ্দ। দেশ-বিদেশে কতরকম খেলা—তার ওপর লেখা কই? শুধু ফুটবল আর ক্রিকেটকে কেন এত প্রশ্রয় দেয়া হবে? আর লেখার মধ্যে বৈচিত্র্য তো দরকার।

এরপর উল্লেখ করছি ধারাবাহিক রচনার কথা। প্রথমে ধন্যবাদ জানাই অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী রচনা প্রকাশের জন্য। সত্যিই সুন্দর। ধারাবাহিক রচনাগুলো এমনভাবে পাশাপাশি রাখেন যে, আলাদা করতে গেলেই একটা-না-একটার অঙ্গহানি হবেই। এটা কি বন্ধ করা অসম্ভব?

অমৃত-এর প্রচ্ছদ কি নবীন-প্রবীণ অংকন-শিল্পীদের আঁকা দিয়ে, অথবা সুন্দর ফটোগ্রাফ দিয়ে সাজানো যায়?। প্রবন্ধকে আরও একটু বেশি গুরুত্ব ও জায়গা দেয়া যায় না? —দীপক ঘোষ, মছলন্দপুর, ২৪ পরগণা।

সমালোচনার সমালোচনা

গত ১৬ নভেম্বর ১৯৭৯ তারিখের অমৃত পত্রিকায় মনোযোগী হননি শিরো-নামায় নির্মলকুমার দাস ৪ নভেম্বর বাসুদেব মঞ্চে চঞ্চলকুমার রায় রচিত, নির্দেশিত ও অভিনীত আমি আজ রাতে গলায় দড়ি দেব একাংক নাটকের যে সমালোচনা লিখেছেন, তার জন্য শ্রীদাস কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তবু সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। এটা যে একক প্রযোজনা—যা অত্যন্ত দুঃসাহসিকও বটে—তা উল্লেখ করা হয়নি। অভিনেতা অন্ততঃ ১৬টি চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন তাঁদের কণ্ঠ, অঙ্গবিন্যাস ও অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য নিয়ে। সময়োচিত অনর্গল ইংরাজি বলা চরিত্রানুগই হয়েছে। নাটকের গঠন-শৈলী প্রচলিত রীতিকে অনুসরণ করেনি, কিন্তু তার ভাব ও রূপে ধারাবাহিকতা ও সংহতি রাখার চেষ্টা ছিল। সমালোচক সামগ্রিক প্রযোজনায় সূক্ষ্মতার অভাব দেখেছেন। কিন্তু ঐদিন উপস্থিত দর্শক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর। অন্তত একটি দৃশ্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। নাটকের শেষ অংশে শয়তান-সত্তাকে দড়ির ফাঁসে ঝোলার ডাক দিয়ে যখন অভিনেতা (শুভ সত্তা) আলোকবর্তিকা হাতে দর্শকদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন, সেই গভীর ভাবকে আবহসংগীত আলোকসম্পাত ও অনন্যসাধারণ অভিনয়ে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনায় মূর্ত করা হয়েছে। —দিলীপকুমার মিত্র, কলি-৫৪।

তুষার চৌধুরীর কবিতা

শব্দ

শব্দকে খুঁচিয়ে মারছে গোলাপের কাঁটা ছুঁচ বন্দুকের কুঁদো
শব্দকে আদর কোরছে নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে
জহরলাল সরণির সাংকেতিক রুমালের নারী
শব্দের সেবায় দিন গুজরান কোরে যাচ্ছে গেরস্ত ঘরের বাঁদী বউ
শব্দকে হাসিয়ে মারছে কাকাতুয়া কলের পুতুল
শব্দকে জটিল কোরছে ব্যবহারজীবী কবি অধ্যাপক
আমরণ অনশনকারী জননেতা
শব্দকে উৎসাহ দিচ্ছে গাঁকুর নোবেল প্রাইজ রবীন্দ্র জ্ঞানপীঠ
শব্দকে শব্দই শূন্যে ছুঁড়ে মারছে ডোবাচ্ছে ভাসাচ্ছে
শব্দের পায়ের কাছে পড়ে আছে অভিধান
সুনীতিবাবুর চশমা বাবার সন্ন্যাস

স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীব উভলিঙ্গ কিছু নয় নাদব্রহ্ম অনীশ্বর ও°
শব্দ তো গায়ের পুঁজ মল জলত্যাগ
শব্দই হার্তাড়ি কাস্তে হীনযান মহাযান সোমোজা ভরতুকি
শব্দই ইন্দ্র পুঁজি পলপত সার্মিন
শব্দই টিউবরেল কল্লোলিনী তিলোত্তমা বামফ্রন্ট
বিদ্যুৎ কর্মীর অভিমান
শব্দই শব্দের শত্রু তামা তুলসী খই ও শ্মশান

অন্ধকার আঁকতে গিয়ে

অন্ধকার আঁকতে গিয়ে এঁকে ফ্যালো অন্তহীন নীল
এবং উপরিতলে লালে ও হলুদে মিলে গোধূলি গোধূলি
যদি আরো পরিধি বিস্তার করো দেখাবে চকোলেট
রঙের সুগন্ধি গন্ধে ছেয়ে আছে এভাবে আঙুলে
যদি নিম্নচারী হয় মাথা তোলে কেন্দ্রীয় বিবর
মনঃসংযোগের বিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শিকড়

ছেলেবেলা ছেলেবেলা বলে তুমি যতবার পদ্মের জলায়
নেমেছো তোমার দেহে তৎক্ষণাৎ সর্পগন্ধা নারী
পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে তুমি দিশেহারা তুমি ভুলেছো সাঁতার
রমণী মাছের দাঁত মুহুর্মুহু বলাৎকার করে
ব্যাঙ ও মশার সাথে বনিবনা যদিও সম্ভব তুমি কদাপি নিজের
সোঁদা মাংস সজীব কঙ্কাল ভালোবেসে
মূর্ছিত হোয়ো না মূর্ছা বস্তুত ব্যথাকাতর ধমনীর গান
আর ধমনীর গান ক্রমে ক্রমে পুরুষকে ব্রহ্মজ্ঞানী করে
কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী হলে ভোরবেলাকার বাসিমুখ
সব চুম্বনের আগে জেগে ওঠে প্রেমভালবাসা ইত্যাদিকে
কণ্ঠরুদ্ধ করে যার পরবর্তী পদক্ষেপে রক্তপুঁজ মাখানো শিশুটি
হামাগুড়ি দিতে চায় আবহমানের বারান্দায়

জেগে ওঠো বোধিদ্রুম

জেগে ওঠো বোধিদ্রুম আবার চঞ্চল হও আদিঅভিমান
অদেহী মাটির গন্ধে গোলাপের শ্বদন্ত সজাগ
কোরে তোলো যে উপাস্য কন্ধকাটা শাশ্বত সুন্দর
তাকে দাও দোয়াত কলম দাও তুলি ও লাহার রঙ নিভৃত আবাস
ভাবতে দাও যা স্বাধীন টালমাটাল স্নায়ুর অপরম্পরা সুরাদিষ্ট জ্ঞান
গণ্ডায় বিছানা দাও যদি জাগে বিসুভিয়সের উষ্ণ ভাবের কুলকুচি

সভাকবি—২

কবিরা যা কিছু করে যা কিছু করার কথা ভাবে তার আগে
কিছুই ভাবে না তারা রাস্তায় শিস দিয়ে উঠলে কাব্য হয়, মেয়েমানুষের
ঘাম চেটে খেলে কাব্য হয়, কবি হাঁটু গেড়ে বসে উরু, নিম্ননাভি
লতাগুল্মময় ডোলে নাক মুখ ঘষটালে কাব্য হয়
কবিরা যা কিছু করে তাই কাব্য, মন খারাপ মন খারাপ
ভাল্লাগে না তাই কাব্য
রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে ডেকে উঠল কেউ—কাব্য
কুয়াশার মধ্যে কারা ঢুকে গেল—কাব্য-কাব্য
খারাপ মেয়ের সাথে নাচনা হোলো গানা হোলো বৌ করার কথা হোলো
তা-ও কাব্য
মেয়ে কবিদের সাথে মাখামাখি মক্ষিরাণীদের সাথে ফষ্টিনষ্টি—
তা-ও কাব্য
ভিখিরির দুঃখ দেখে রাইফেল রাইফেল বলে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হোলো
তা-ও কাব্য
রিক্সা নয় নাগরদোলাও নয় চাই লিমুজিন চাই পিপ-শোর টিকিট
এই সব কিছুই কাব্য
ঘরে ফিরে একই কথা তোমার নিতম্ব নাই রসাতল চাই
যে কোরেই হোক চাই অফুরন্ত প্রাণ মুক্তবায়ু

সনেট-সনেট

আমাদের ভালোবাসা বলে কিছু নেই আছে নখের ডগায় ধুলোকাদা
ঘৃণা বলে সেরকম কিছু নেই বলে আছে আঁচড় কামড়
মৃত্যুর প্রার্থনা নেই ছিটেফোঁটা আছে ঘুম ক্লান্তি ... ন শাদা
এবং ভ্রমণ নেই নিবাত নীরন্ধ্র দিনে বিদ্যুৎ ...
কিংবা ধরো দুঃখশোক সেরকম নেই বলে আছে শুধু পা ছড়িয়ে কাঁদা
ঈগলের ডানা নেই আমাদের আছে স্নায়ুর ভীত ওড়াউড়ি
কোনো নির্দেশিনী নেই ইতিউতি চেয়ে দেখি বালি আর নুড়ি
সেরকম ভাষা নেই যাতে কোরে লেখা যায় দুচার অক্ষর

অনেক কিছুই ছিলো আজ নেই দৈবযোগে কোনোদিন হবে
ধ্যানযোগ কর্মযোগ দাপা দেবে ব্যক্তিত্বের হাড়ের ভেতর
মজ্জার সুরেলা মন্ত্র উচ্চারিত হবে আমরা তামাম ফক্কুড়ি
ছেড়ে দিয়ে রবি ঠাকুরের গান গেয়ে উঠব বসন্ত উৎসবে
তা সত্ত্বেও শনিদেব যদি আমাদের খোঁজে পাঠান পেয়াদা
গড় করি হেই বাবা বলে মেতে উঠব না কি গরিলা তাণ্ডবে?

পেশা

তদুর মনে পড়ে বিবির বাজারে খুন হয়েছিলো ডলি
প্রভার প্রেমিক কিন্তু প্রভাকে করেছে পাটরাণী
অনকার স্বামী ছিলো ছেলেপুলে ছিলো ছিলো পেশা
আমি ও চাকুরিজীবী কবিতাও লিখেছি হামেশা

আমি তমোময়

একলা বিছানায় শুয়েছিলাম নির্জন হর্ম্যতলে
কোথাও কিচ্ছুটি নেই এক দংগল বালিকা হঠাৎ
ভৌতিক কৃটিমবীথি আলো কোরে আমার চারপাশে
ঝমঝমিয়ে নাচতে শুরু কোরে দিলো এবং আমার
অংগে অপাংগের খোঁচা দিতে দিতে প্রত্যেক শাশ্বত
আদিম অপরিণামী ননী অংগ ভুজংগে ফণা
দোলাতে দোলাতে ওম্নি অদৃশ্য কোথাও কিছু নেই

এই স্বপ্ন দেখে আমি বইয়ের আলমারি থেকে রামকৃষ্ণ কথামৃতখানি
বর কোরে বালিশের তলে রাখি পেত্নী পরী জিন
নিশ্চিত কোথাও আছে ঘরের আশপাশে গত সন্ধ্যেবেলা খুব
জমাট মৌতাত হোলো জ্যোৎস্নায় নিজের ছায়া দেখে
আমি চমকে উঠেছিলাম
নিজের পায়ের শব্দে মনে হয়েছিলো যেন কেউ পিছু নিয়েছে
প্রায়ই স্বপ্ন দেখি একটা ফাঁকা ঘর, রংচটা দেয়ালে
গাঢ় পিতামহীর হেজে যাওয়া অয়েল পেন্টিং
মাঝখানে চৌপায়ায় একফালি বিছানা তাতে ঘুমিয়ে পড়েছি
শিয়রে দাঁড়িয়ে এক শাদা নারী হাতে তার
ভূতের মালঞ্চ থেকে তুলে আনা জুঁই,
যে মুহূর্তে আমার কপালে হাত রাখতে যাবে
বাতি জ্বালি কোথাও কিছু না
এসব তাৎপর্যশূন্য ভয় আমার বিছানার শান্তি নষ্ট করে
রামকৃষ্ণ কথামৃত খুলে দেখি সত্ত্ব রজ তম
আমি তমোময়
নতুন তো কোথাও নেই রজোগুণ যৎসামান্য আছে
পাঁকাল মাছের মতো হতে গিয়ে হয়ে গেছি পাঁক
দরজা খুলে রাত্তদুপুরে হানা দ্যায় পেত্নী পরী জিন

নিঃশব্দ পাথসাট

রাত্তির নিশুতি হলে যাবতীয় বোলতার হৃদয়
হুলাহুল অন্ধকারে ছটফটায় হলুদ বাহির চুল
হুহু বাতাসের বিপরীতে
একচ্ছত্র গন্ধর্ববিবাহ গাদাবন্দুকের নিঃশব্দ পাথসাট
মলমাসে পুরুষার্থ পরাণপ্রিয়ার মুখ বায়সের ডিম ভাঙা নীড়
মথন মদনশর মৎস্যকন্যা মাৎসর্য আকাট
মূর্খের প্রলাপ শুভজন্মের ডালিয়া
নিয়তির শতচক্ষু ব্রজনারী কদর্য মেডুসা
নিশুতি রাত্তিরে খুন পীনপয়োধর
মকরন্দ পুংদণ্ড পীবর চিংড়িপোড়া চাঁদমুখ
কুতদার চিড়তন ব্যোমরশ্মি রুহিতন বামা
অযুতে মরীচিমালা তেকোনা গোলোক
উর্ধ্ববাহু গোরাচাঁদ গোল গোরস্থান

সিপিয়া রঙের কাব্য

সিপিয়া রঙের মাংসে ভার্মিলিয়ন মাছি (ওড়ে)
হতবাক নেপাল ব্রাউন চাঁদ রক্তচক্ষু উদবেড়াল জলের ঈথার (কাঁদে)
বিপন্ন সার্শির শান্তি নৈশ মাছি
সিপিয়া রঙের মাংস রক্তচক্ষু চাঁদ (গান করে)
ইস্পাতের নীলচে ধারালো বোবাপাচ্ছ বিষণ লবণ (চুমু খায়)
লোহার বাতাস জলপ্রজাপতি বাগানোড়া পাথরের কোন (দ্যাখে)
ক্যালা শকুন কালো টিয়া হলুদে ঠোঁট (বমি করে)
কামার্ত করোটি গুবরে গোলাপ জলের কবর
নিসর্গের গলা (হাসে)
জিয়ন্ত পরী ঈথারের পোকা লালসার কাচ
বুদ্ধের শিশ্ন (মরে যায়)

এরকম নয়

বন্ধ ঘরে কেন যে তুমি উদোম হচ্ছ একলা দুঃখী
আমার নোনা রক্ত শুষবে ন্যাংটো চোখের ঘোর লালসায়
আমার হু হু ক্ষুধাও তোমার ডঙ্কা তোমার পরাণপুষ্প
ছিঁড়ব খুঁড়ব শিশুর মতো আত্মকামী মায়া তো নয়
পুত্তলিকা তুমি কেমন গলবে আমার অঙ্গুলিও
অন্তরঙ্গ হতে চাইবে শ্বেতসামগ্রী নেড়ে চেড়ে
এই যে আমার রোমশ নষ্ট শাপভ্রষ্ট আদি অংগ
এই যে বাহুর মধ্যে বিলাস জড়িয়ে পড়ছে জটাজালে
স্নেহ তো নয় কী যেন এক ঘূর্ণায়মান পুরাণ ঝর্ণা
ঝিরঝিরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে স্নায়ুতন্তু উদ্বেলতা
এই তো প্রাপ্য বন্ধ ঘরে আতংক নয় অধঃপাত না
না বিবাহ ব্যাভিচার না আবিষ্কার না উল্টেপাল্টে
হেসে মরছে ককিয়ে কান্না এরকম নয় অনাবৃষ্টি,
এরকম নয় আনুগত্য ভিক্ষে করবে পালকপুচ্ছ
নৈশস্বপ্নে হরফ খুঁজছে চিতার কাষ্ঠ নাস্তির অস্তি
তুলোট শস্য মায়ার নাস্তি এরকম নয় অন্য কিছু

পান্না হীরে চুনি

দ্বিতীয় পর্ব

রত্ন-বিলাস

মানস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত গরিব দেশ। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম। চরম দারিদ্রের মধ্যেও অতীতের রাজা-মহারাজাদের ঐশ্বর্য ও রত্নসম্ভার আজও পৃথিবীর বিস্ময়। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজন্য প্রথা বিলোপ করা হয়েছে। উত্তরাধিকারদের ভাগ্যে জুটেছে বার্ষিক ভাতা। কিন্তু তাঁদের রত্নভান্ডার নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। অপূর্ব কারু-কার্যের গুণে, দামী-দামী রত্নের সমন্বয়ে গড়া ঐ সব অলংকার আজও শ্রেষ্ঠ শিল্প-কলার নিদর্শন হয়ে রয়েছে সারা বিশ্বে। বিশ্বের সেরা মণিকারদের ঐ সব অলংকার একই সঙ্গে ঈর্ষার এবং লোভের বস্তু।

ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের জুয়েলারী আজও রূপকথার কিংবদন্তী বলে মনে হয়। স্বধীনতার আগে যে সব অঙ্গ রাজ্য ছিল সেই সব রাজ্যের রাজা-মহারাজাদের কী বিপুল পরিমাণ মণিমুক্তা, দামী দামী পাথর. সোনার গহনার সংগ্রহ ছিল তা শুনলে আজও মনে হবে যেন রূপকথার দেশের গল্প।

পরাধীন ভারতে রাজা, মহারাজা, নবাবের সংখ্যা ছিল ৫৬৫ জন। এদের মধ্যে অবশ্য হায়দরাবাদের নিজাম, কাশ্মীরের মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা, জয়পুর বরোদা এই সব রাজ্যের রাজা তাদের সুখ-বৈভব আর মণিমুক্তার বিপুল সম্পত্তি নিয়ে ভারতবর্ষকে শাসন করতেন। প্রকৃত পক্ষে পরাধীন ভারতে রাজন্যবর্গের জন্য এক আলাদা শাসন ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরাই প্রণয়ন করে নিয়েছিলেন। আর তার ফলে তাঁদের প্রত্যেকের রাজ্যে এক এক রকম নিয়ম চালু করেছিলেন। গোয়ালিয়ারের মহারাজা তাঁর রাজ্যে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করেছিলেন। আর শুনলেও বিস্ময়ের উদ্রেক হয় মহারাজার রয়েল কিচেন থেকে মহারাজার ব্যাংকোয়েট হলের মধ্যে রূপোর রেল পাতা ছিল যার দৈর্ঘ হবে খুব কম করেও ২৫০ ফুট।

মহারাজার অতিথিদের ডিনার আসত রয়েল কিচেন থেকে ব্যাংকোয়েট হলে। তার জন্য বৈদ্যুতিক ট্রেন। আর সেই ট্রেন চলত ২৫০ ফুট লম্বা ভারী রূপোর রেল লাইনের ওপর দিয়ে। কী এলাহি ব্যাপার!

বরোদার মহারাজার সোনার গহনা আর দামী পাথরের বিরাট সংগ্রহ-শালার সখ ছিল। তার সংগ্রহশালায় পৃথিবীর অন্যতম সেরা পাথর স্টার অব দি সাউথ যা পৃথিবীর সাতটি বড় পাথরের একটি বলে চিহ্নিত ছিল। এ ছাড়াও মুক্তা, রুবি আর অন্যান্য মূল্যবান পাথরের সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

শিখ মহারাজা কাপুরতলা স্টেটের রত্ন ভাণ্ডারে ছিল তিন হাজার হীরে আর মুক্তা। জয়পুরের মহারাজার রত্নভান্ডারে যে কী পরিমাণ সংগ্রহ ছিল, আজও ইনকাম ট্যাক্স অফিসাররা তার সঠিক হিসাব করে উঠতে পারেন নি। বর্তমান জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবীর প্রাসাদে হানা দিয়ে তাঁরা যে সব জিনিস আটক করেছেন তার সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

পাতিয়ালার মহারাজার রত্নভান্ডারে একটি মুক্তোর নেকলেস ছিল। শুধু তার ইন্সিওর বাবদ খরচ হচ্ছে এক মিলিয়ান ডলার। ভাবা যায়? এ ছাড়াও এমন এক একটা হীরের ব্রেসলেটের কথা শোনা যায়— যার প্রতিটি এক হাজার সাদা-নীল হীরে দিয়ে তৈরী। কয়েক শতাব্দী ধরে ঐসব অলঙ্কার পাতিয়ালার মহারাজার সংগ্রহ-শালার গৌরব বৃদ্ধি করে আসছে।

বরোদার মহারাজা যে হাতীর পিঠে চড়ে হাওদা করতে যেতেন সেই হাতীর পিঠের ওপর যে আসন বা গদী থাকত তার চার পাশে ঝুলতো সোনার পেনডেন্ট। আর প্রত্যেকটি সোনার পেনডেন্টের দাম খুব কম করেও ২৫ হাজার পাউন্ড। এই রকম দশটি সোনার পেনডেন্ট বাঁধা থাকত সোনার চেন দিয়ে।

মহীশূরের মহারাজা দশেরার দিন এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বার করতেন। সেই শোভাযাত্রায় এক হাজার হাতী সোনার অলংকার দিয়ে সাজান হত। সোনার ছাতা থাকত মহারাজার মাথার ওপর। শোনা যায় মহীশূরের মহারাজা একবার তাঁর রত্ন-ভাণ্ডারের কয়েক শত মূল্যবান পাথর নাকি গুঁড়ো করেছিলেন এক প্রবাদ বাক্য অনুসারে।

ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের মধ্যে হায়দরাবাদের নিজাম সব দিক থেকে আজও কিংবদন্তী। প্রচুর বৈভবের অধিকারী হয়েও এমন কৃপণ লোক পৃথিবীতে ছিল কিনা সন্দেহ। কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে প্রচুর নজরানা নিয়ে আসতে হত। এটাই ছিল প্রচলিত নিয়ম.

হায়দ্রাবাদের নিজাম এতো কৃপন ছিলেন যে নিজে সিগারেট পর্যন্ত কিনে খেতেন না। পরিত্যক্ত সিগারেটের টুকরো অংশে সুখটান দেওয়া ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। অবশ্য ধূমপানকারী তাঁর স্ব-ধর্মীয় হলে তবেই। কারো কোন ভালো এবং দামী মোটর গাড়ি দেখলে আর কথাই নেই। খাজাঞ্চিখানার লোক ছুটে যেত। গাড়ির মালিককে জানানো হতো নিজামের অভিপ্রায়। হিজ হাইনেসের পছন্দ অনুযায়ী গাড়িটি যেন নিজামকে উপহার দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এমন সংগ্রহ করা গাড়ির সন্ধান মিলেছিল তাঁর গ্যারেজে। সংখ্যায় বেশ কয়েকশ হবে। অথচ এর একটিও নিজাম কোনদিন ব্যবহার করেন নি।

ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের বিপুল রত্নসম্ভারের প্রচলিত কাহিনী যুগে যুগে বিদেশীদের প্রলুব্ধ করেছে। এ দেশ আক্রমণে প্ররোচনা যুগিয়েছে। গজনীর সুলতান মামুদ, পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ এ দেশ আক্রমণ করে প্রচুর মূল্যবান রত্ন-সম্পদ লুঠ করে নিয়ে গেছেন। আজো বিত্তবান বিদেশীদের কাছে প্রাক্তন নবাব-বাদশাহদের লুক্কায়িত ধন-সম্পত্তির আকর্ষণ প্রবল। কিছুদিন আগে হায়দরাবাদের নিজামের অমূল্য মণিমাণিক্যের নিলামে

পরশ পাথর

যার স্পর্শে লোহা হয় সোনা, যে পাথর ভাগ্যহত জীবনকে করে স্বর্ণময়—সে পরশমণি আমাদের কাছে নেই বটে, আছে হীরা, মুক্তা, চুণি, পান্না, নীলা, পোখরাজ, প্রবাল, গোমেদ, বৈদুর্য্যমণি যার পরশে দুর্ভাগ্যের ঘনীভূত অন্ধকার আলোকচ্ছটায় হবে উদ্ভাসিত আর জীবন হবে মধুময়।

★

একটি সুনির্বাচিত মনি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। পারে স্থায়ী সুখ-শান্তি-সাফল্য প্রদান করতে।

এম. পি. জুয়েলার্স

১, বিবেকানন্দ রোড (চিৎপুর জং)
কলি-৭ ● ফোন : ৩৩-৮৭৭৯/
৩৩-৫৭৬৫

শাখা : ২৬২ রাসবিহারী এভিনিউ
(গড়িয়াহাট জং) কলি-১৯
ফোন : ৪৬-৮৯৩৩

আপনার সৌভাগ্যের জন্য গ্রহরত্ন ধারণ করুন।

পঃ কামাখ্যাচরণ বিদ্যারত্ন, পঃ রঙ্গলাল কাব্যতীর্থ (বেদজ্ঞ), পঃ শান্তিপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী যোগজীবন, যোগীভাই, পঃ তারাপদ লাহিড়ী (জ্যোতিরত্ন), জ্যোতির্যোগী, জাতবেদা, ভাস্করাচার্য্য, সপ্তর্ষি, পঃ ক্ষিতিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পঃ সুকুমার ঘোষ, দ্বৈপায়ণ, পঃ দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সমাবেশ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে।

সময় : রবিবার বাদে প্রত্যহ ১১টা—৭টা।

জন্মসময়, তারিখ, জন্মস্থানের বিবরণ অথবা কোষ্ঠী বা ঠিকুজীর নকল কিংবা দু' হাতের সুস্পষ্ট ছাপ, দক্ষিণা ১২-০০ (বার টাকা) সহ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে পাঠালে রত্ন ধারণের ব্যবস্থাপত্র ও ভাগ্য গনার ফলাফল ডাকযোগে প্রেরিত হয়।

বিশাল ভারতের বৃহত্তম গ্রহরত্ন ও জ্যোতিষ সংস্থা

বিঃ দ্রঃ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে বার বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য জ্যোতিষ বিচার অর্ধমূল্যে। এ সুযোগ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ পর্যন্ত।

...জির হয়েছিলেন আরব দুনিয়ার কুবের ...লখেরা। এতই মূল্যবান রত্নসামগ্রী যার ...তা এদেশে মেলা ভার। তাই যাঁরা এসে-...লেন তাঁদের মধ্যে আরবের মিসেস গলা-...রীও ছিলেন। বিশ্বের বিত্তশালী মহলে ...মতী গলাধারী একটি বিশেষ স্থান দখল ...রে রয়েছেন। নিলাম শুরু হবার আগেই ...শ ক'টি রাজনৈতিক দল থেকে উঠেছিল ...বল আপত্তি। এভাবে নিলামের মাধ্যমে ...রতীয় গর্বের সম্পদ বিদেশীদের হাতে ...লে দেবার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে ...মলা দায়ের করা হলো। শেষপর্যন্ত ...দালতের নির্দেশে নিলাম স্থগিত রাখা ...লো। ক্ষুন্নমনে ফিরে গেলেন ক্রেতারা। ...সেস গলাধারী তো সরাসরি কেন্দ্রীয় ...রকারকে অভিযুক্ত করে ভবিষ্যতে ভারতের ...লামের বাজার বয়কটের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ...লেন।

কিছুদিন আগে আরবের আবু-ধাবি ও ...বোইতে ভারতের রত্নব্যবসায়ীদের একটি ...দর্শনী হয়ে গেল। যথারীতি সাড়া পড়ে ...রেছিল সেখানে পূর্ববাঙলার একমাত্র ...তিনিধি সি পি চন্দ্র এ্যান্ড সন্স সেখানে ...পস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রদর্শনীতে মিসেস ...লাধারীও বেশকিছু রত্নালংকার কিনে-...ছলেন। প্রদর্শনীতে অনেকেই ভিড় করে-...ছলেন নবাব-বাদশাদের রত্নসম্ভারের কিছু ...কছু অলঙ্কারের খোঁজে।

গ্রহরত্নের উপকারিতা

সমরেন্দ্রনাথ দাস

বছর তিনেক আগেকার কথা—একদিন সকালে নিজের চেম্বারে বসে কাজ করছি, এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। দেখলাম ও'র চেহারার মধ্যে একটা অসুস্থতার ছাপ রয়েছে। ক্রমে জানতে পারলাম যে, উনি বেশ অবস্থাপন্ন লোক, গত কয়েক বছর যাবৎ পাকস্থলীর এক জটিল অসুখে ভুগছেন, কোনরকম চিকিৎসাতেই সুরাহা না হওয়ায় এখানে এসেছেন। আমি ও'র কাছে জন্ম-তারিখ, সময় ইত্যাদি জেনে ছক বিচার করলাম—বিচার শেষে দেখি, গ্রহের যা অবস্থা তাতে ডাক্তারদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। ও'কে জিজ্ঞাসা করলাম —আপনি ডাক্তারের ওপর আশা ছাড়লেন কেন? উত্তরে যা বললেন, তাতে বুঝলাম, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওপর উনি আস্থা হারিয়েছেন এবং নিজের জীবন সম্বন্ধেও খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন, অবশ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরও যে খুব আস্থা আছে তাও নয়, একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে আমার কাছে আসা। অভয় দিয়ে বললাম—আপনি অবিলম্বে পীত পোখরাজ ও প্রবাল ধারণ করুন। এবং কেমন থাকেন দিনদশেক পরে আমাকে জানাবেন।

দিন পনেরো পরে ঐ ভদ্রলোকের টেলিফোন পেলাম।—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমায় দিনদশেক বাদে কেমন থাকি জানাতে বলেছিলেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফল পাবো ভাবতেই পারিনি। আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝতে পারছি না। বললাম—আপনি যে সেরে উঠছেন, তাতেই আমি খুশী। আপনাকে যে রত্নটা ধারণ করতে বলেছিলাম সেটা কোনদিনই খুলবেন না। কিছু দিন বাদে ভদ্রলোক আমার কাছে আবার এলেন এবং স্বীকার করলেন যে মানুষের শরীরের ওপর গ্রহদের প্রভাব ও রত্নের মাধ্যমে তার প্রতিকার তিনি পুনর্জীবন লাভের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

একটা খুব সাধারণ কথা হয়তো অনেকেই শুনে থাকবেন যে অমাবস্যা পূর্ণিমার দিন পাগলদের পাগলামি বাড়ে এবং সেটা হয় চাঁদের আকর্ষণের তারতম্যের জন্য। এই তো কিছু দিন আগে এক ভদ্রমহিলা আমার কাছে এসেছিলেন। বয়স তিরিশের কাছাকাছি, তবে মানসিক ভাবে এত ভেঙে পড়েছিলেন যে তাঁর কি অসুবিধা সেগুলোও আমাকে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিলেন না। তবে ও'র রাশিচক্র বিচার আর আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে স্বামীর চরিত্রগত ব্যাপার

নিয়ে তার বিশেষ মূর্ছনা। উৎসাহ দেবার জন্য বললাম যে এ ধরনের সমস্যা অনেকেরই জীবনে আসে, তাতে এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। উত্তরে বললেন—'কিছু একটা করুন, এভাবে চলতে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

আর কথা না বাড়িয়ে ওঁর ছক বিচার করলাম এবং বিচার শেষে তাকে একটা বসরাই মুক্তা ধারনের পরামর্শ দিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তাতে যে ভদ্র মহিলা উপকৃত হয়েছিলেন সেটা বুঝতে পারলাম যখন কয়েক দিন বাদে তিনি নিজে এসে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন।

একদিন রাস্তায় আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি মোটামুটি একটা চাকরী করতেন, কিন্তু দেখলাম তাঁর চেহারার মধ্যে দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট। জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন—'আসুন আপনাকে সব বলছি। শুনে বুঝলাম ওঁর চাকরী গেছে, আপাততঃ কোন ব্যবসা করে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। উৎসাহ দিয়ে বললাম—'সে তো খুব ভাল কথা। তাতে বললেন. ব্যবসা করেও তো কিছু সুবিধে করে উঠতে পারছি না। গণনায় দেখলাম যার অর্থ লাভের এত সম্ভাবনা, গ্রহের ফেরে তারই আজ এই দুর্ভোগ। প্রতিকার হিসাবে বৈদূর্য মণি ধারণ করতে বললাম। তিনি করুণ ভাবে বললেন—এ তো আমার গোদের ওপর বিষফোড়া হল। তাকে বুঝিয়ে বললাম, যে করেই হোক ওটা যেন ধারন করেন এবং বছর খানেকের মধ্যে ফল লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় জানালাম।

বছর না ঘুরতেই দেখি ভদ্রলোক এসে হাজির। দেখেই বললেন—আপনার জন্যেই আমি আবার দাঁড়াতে পেরেছি বললাম—আমার জন্যে নয়, জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্য, ধন্যবাদ তারই পাওয়া উচিৎ।

প্রসঙ্গত :

হঠাৎ অনেক দর্শনপ্রার্থীর ভিড় দেখে আমার মনে হলো—ওঁকে বেশীক্ষণ আটকে রাখাটা দোকানের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই বিদায় নিলাম। বাইরে কাউন্টারের কাছে আসতেই মালিক শ্রীবসাকের পাশে দাঁড়ানো চোখে পড়ার মত এক সুশ্রী তরুণ যুবকের প্রতি আমার দৃষ্টি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সেটা বোধহয় শ্রীবসাক লক্ষ্য করে থাকবেন। তাই তাড়াতাড়ি বললেন—আসুন আলাপ করে দিই ইনি আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের হস্তরেখাবিদ। মনে মনে দ্বিধাগ্রস্ত হলাম। এত অল্প বয়সের তরুণ যুবার কি জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকতে পারে যে তিনি হস্তরেখাবিদ বলে পরিচিত।

তাই বিশেষ কৌতূহল হল। বললাম—যদি পাঁচ মিনিট আমাকে আলাপ করার সুযোগ দেন তাহলে বাধিত হব। নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই বলে তিনি আমাদের তাঁর চেম্বারে নিয়ে গেলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসছিলাম—এত অল্প বয়সের হস্তরেখাবিদ। তাই ব্যবসা বা বৃত্তিগত অভিজ্ঞতার চাইতেও তাঁর ব্যক্তিগত দিকটাই জানতে আমার বাসনা প্রবল হোল। বয়স ৩৪— শুনেই চমকে গেলাম। চেহারার ভেতর এমন একটা শুচীশুভ্র ভাব দেখলে ২৩।২৪-এর বেশী মনে হয় না। দশ বছর হলো এই বৃত্তি। কথাবার্তার বিশেষ বুদ্ধি ও মার্জিতভাব। জানতে চাইলাম—আপনি আধুনিক তরুণ যুবক। এ যুগের ছেলে হয়েও এই বৃত্তি গ্রহণ করলেন কেন? প্রশ্নটা শুনে মনে হল ক্ষণিকের জন্যে একটু উদাসী হয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন-জ্যোতিষী বা হস্তরেখাবিদ হবো এ পরিকল্পনা আমার বাবা-মার ছিল না। আমার বাবা ডাক্তার। তিনি চেয়েছিলেন আমিও ডাক্তার হই। সেই ভাবেই নিজেকে তৈরী করছিলাম।

বিখ্যাত জ্যোতিষী মহাদেব শাস্ত্রী-মশাই ছিলেন বাবার বন্ধু। বাবার অনুরোধে আমার হাত দেখে তিনি বলেছিলেন তোমার ছেলে ভাল জ্যোতিষী হবে। কথাটা বাবা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ছেলেকে আমি ডাক্তার করবো। আমার বয়স তখন ১২।১৩ বছর। স্কুলে পড়ি। আকস্মিকভাবে বাবা মারা গেলেন। আমাদের অবস্থা তখন সঙ্গীণ হয়ে দাঁড়াল। মার আপ্রাণ চেষ্টায় আমার ও ভাইয়ের লেখা পড়া চলতে লাগলো। স্কুলে আমার এক অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার হাত দেখে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী তার বাবা-মাকে সাবধান করে বলেছিলেন অন্ততঃ এই এক মাস যেন তাকে সাবধানে রাখা হয়—তার হাতে মৃত্যুযোগ আছে এই সময়টায়। বাবা-মা তাকে একরকম ঘরেই আটকে রাখতেন যেন বাইরে যেতে না পারে। কিন্তু কদিন এভাবে থেকে সে হাঁফিয়ে উঠলো। ভাল সাঁতার জানতো সে। রোজ গঙ্গায় স্নান করা তার একটা বাতিক। তার সঙ্গে আমরাও যেতাম। কদিন যচ্ছিলাম না। একদিন সে মরিয়া হয়েই—মায়ের শত নিষেধ উপেক্ষা করে জোর করেই একাই গেল গঙ্গায় স্নান করতে। এ পর্যন্ত বলেই আশীষবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে— ধীরে ধীরে বললেন—সে আর ফিরলো না। সেদিনের ঐ ঘটনা আমার কিশোর মনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। জ্যোতিষী কি বলে দিতে পারে এমনি করে মানব জীবনের ঘটনাকে. স্কুলে থাকতেই লুকিয়ে লুকিয়ে জ্যোতিষী বিদ্যার বই একটু-আধটু পড়তে শুরু করলাম। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বন্ধুদের হাত দেখতে শুরু করলাম, কিন্তু তখন পর্যন্ত জ্যোতিষী হবার বাসনা মনে একটুও উদয় হয়নি। কলেজে ভর্তি হলাম সায়েন্স নিয়ে ডাক্তারী পড়বো বলে। মা বারবার মনে করিয়ে দিতেন বাবার বাসনা। কলেজে এক রাজ পরিবারের ছেলে আমার সহপাঠী ছিল। তার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। একদিন রসিকতা করে বললো—তুই যদি হাত দেখে আমার সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারিস তোকে আমার হাতের সোনার ঘড়িটা উপহার দেবো। সোনার ঘড়ির লোভে যতটা নয় তার চাইতে বেশী নিজের তাগিদেই তার হাতটি টেনে নিলাম। আমার অভিজ্ঞতা তখন যৎসামান্যই তবুও তার হাত দেখে চমকে গেলাম। চারিদিকে সতীর্থদের ভিড়। সবাই শুনতে ব্যগ্র। ধীরে ধীরে বললাম—তুই এখন একটি মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস। কিন্তু এই প্রেম তোর সর্বনাশ ডেকে আনবে। যদি পারিস তার কাছ থেকে দূরে সরে যা। সজোরে হেসে উঠে বলেছিল—তুই যা বললি সেটুকু ঠিক—কিন্তু তার জন্যে পালিয়ে যাব কেন—তার দিক থেকে কোন সর্বনাশ আমার ঘটবে না।

হাসি ঠাট্টায় সবাই মশগুল হয়ে রইলো। ভিড় কমতেই বললাম—তাছাড়া তোর হাতে আছে শোচনীয় কাজের জন্যে নিদারুণ অবনতি। যদি পারিস কোন ভাল জ্যোতিষীকে দেখিয়ে একটা প্রতিষেধক কিছু উপায় বার কর। সে হেসেই উড়িয়ে দিল। কিন্তু তার হাতের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। দিন-রাত মনে হতো। এমনি করে প্রায় মাস-খানেক কেটে গেল। একদিন দেখলাম সে ক্লাসে আসেনি। এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল—তার দেখা নেই। হঠাৎ কাগজে একদিন একটা খবর আমার সেই সব ভয়, সন্দেহকে সত্যি করে তুললো। ছেলেটির নাম ধরুন কুমার। কুমার এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল। পুলিশ বোম্বে থেকে তাদের দুজনকে ধরে নিয়ে আসে। পুলিশের কাছে মেয়েটি জবানবন্দীতে বলে যে, কুমার তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। অপহরণের দায়ে কুমারের বিচার আরম্ভ হলো। কোর্টে শত চেষ্টা যদি কুমারকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে রাজী করা যায়। কিছুতেই রাজী হোল না। মেয়েটি যখন সাক্ষী দিচ্ছিল তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া মামলায় কোন অবস্থাতেই সে একবারও বিচলিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তার তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কলেজের পড়া প্রায় শেষ হয়ে আসছে। ফাইনাল পরীক্ষার আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। পুনু-

আমরা সত্যিই এসে গেছি
তোমরা সবাই তৈরী তো ?

জেমিনী সার্কাস

DARING DEATH DEFYING MOTOR BIKE AND JEEP JUMP

MOTOR CYCLE SKY-RIDER

DOGS' FOOTBALL
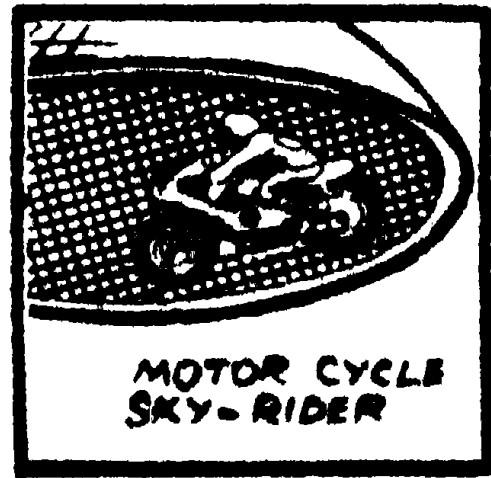
পার্ক সার্কাস ময়দানে

শ্নো নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তার কিছুদিন আগে শাস্ত্রী মহাশয় মাকে একটু সাবধানে চলা-ফেরা করতে বলেন। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। মা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে চলতেন। একদিন খবর এলো আমাদের এক নিকট আত্মীয় গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। তাঁকে দেখতে যাওয়া বিশেষ দরকার। আমি বাড়ির বাইরে ছিলাম। মা তাই একাই বেরিয়ে পড়লেন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। হাসপাতালের সামনে ট্রাম থেকে যেই নেমেছেন অমনি একটা প্রাইভেট গাড়ী এসে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে লোকজন ধরাধরি করে হাসপাতালে রেখে আসে। ঠিকানা বলার মত অবস্থাও তার তখন নেই। বাবা ডাক্তার ছিলেন—সেই সূত্রে পরিচিত এক ডাক্তার মাকে চিনতে পেরে বাড়িতে খবর দেন। তখন পর্যন্ত কোন খবর আমি জানতাম না। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরতেই দেখি কেমন যেন অস্বাভাবিক অবস্থা। থমথমে ভাব। মাকে ডাকছি কোন সাড়া পাচ্ছি না। বাড়িতে নিজের লোক বলতে কেউ নেই। পাড়া-পড়শী কয়েকজন মহিলা শুধু। আমার সমস্ত সত্তা যেন লোপ পেল। কিছু ভাববার মত শক্তিও ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে তখন পাড়ার এক মাসীমা জানালেন সে কথা।

পাগলের মত ছুটে এলাম হাসপাতালে। জানতে পারলাম বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। অপারেশন থিয়েটারে মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ দেহ-মন। চুপচাপ বসে ছিলাম। একটু পরে ছোটভাই এসে খবর দিল অপারেশন হয়ে গেছে। তবে ডাক্তাররা কিছু বলতে রাজী নন। আমার তখন একটি মাত্র চিন্তা। মা যদি না থাকেন তাহলে আমাদের কোন অবলম্বনতো থাকবে না। পথের ভিখীরির অবস্থা হবে। এমন সব আজে-বাজে কথা বারবার মনে হতো। খাওয়া-ঘুম-স্নান নেই—হাসপাতালে পড়ে আছি শুধু মায়ের খবরের জন্য। তিন দিন পর সেই পরিচিত ডাক্তারবাবু বললেন—মনকে শক্ত কর। মা প্রাণে বেঁচে যাবেন—কিন্তু বেঁচে থেকেও তিনি তোমাদের চিনতে পর্যন্ত পারবেন কিনা সন্দেহ। মস্তিষ্ক একেবারেই অকেজো হয়ে যাবে। অতি দুঃখের মধ্যেও শুধু এইটুকু সান্ত্বনা মা বেঁচে থাকবেন। বাড়ি ফিরে এলাম। চার-পাঁচ দিন পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসে একটা অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত চিঠি পেলাম। লেখা আছে—তোমার বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তোমার মার সম্পর্কে ডাক্তাররা যা বলেছেন সেজন্যে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে স্মৃতি ফিরে পাবেন। চিঠিটা লিখেছেন শ্রীসুদীন মিত্র মহাশয়। তাঁর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। মা ফিরে এলেন একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে—ডাক্তাররা সবাই বিস্মিত। কিন্তু এই ঘটনাটি সেদিন আমার জীবনের ধারাকে সম্পূর্ণ এক নতুন সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করলো। আমি তাই আজ জ্যোতিষী।

যদিও ক্লান্ত ছিলাম, তবুও ট্রাম-বাসের ভিড়ের চাইতে হাঁটতেই ভাল লাগছিল। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম—হাতীবাগান গ্রে স্ট্রীটের বিখ্যাত দোকান রত্নাগিরিতে। ভাবলাম দায়-সারা গোছের একটা ভদ্রতা দেখিয়ে কাজ সেরে বাড়ীর পথ ধরবো। কিন্তু ভাবতেও পারিনি আরেকটি বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

রত্নাগিরির মালিক ইন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর বয়স অল্প হলেও ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা অনেকখানি। পনেরো বছরের পুরোন দোকান কলকাতায়। আবার গৌহাটিতেও একটি, তার বয়সও বছর এগারো। আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর দোকানের জ্যোতিষী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর চেম্বারে গিয়ে বসলাম। খুব বিজ্ঞের মত গুরুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলাম—পাথর দিয়ে মানুষের জীবনের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়—এটি কি আপনি বিশ্বাস করেন?

উত্তর দিলেন—নিয়ন্ত্রিত কথাটার চাইতে প্রভাবান্বিত কথাটাই প্রযোজ্য বেশী।

প্রত্যেকটি বিভিন্ন ধরনের পাথর তার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ। মানুষের শরীরও তেমনি। এই যেমন শরীরে লোহার ভাগ কম হলেই সেটিকে বাড়াবার জন্যে ডাক্তাররা আইরন-বিশিষ্ট ওষুধের কথা বলেন। তেমনি কোন একজন ব্যক্তিকে দেখে আমাদের বিচার করতে হয়, তাঁর শরীরে কোন প্রাকৃতিক উপাদানের অভাবে বা আধিক্যে জীবনের পথে চলতে বিঘ্ন আসছে। এই বিচার যদি নির্ভুল হয় তবেই পাথর ব্যবহারে একরকম নিশ্চিত ফল পাওয়া সম্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিচারের ভুলেই সঠিক ফল পাওয়া যায় না বলেই সাধারণ লোকের মনে একটা সংশয় দেখা যায়।

বিশেষ প্রতিনিধি

অভিগামিনী

মিহির সিংহ

সুব্রত চৌধুরী

ছেলেবেলাটা ঘিঞ্জি চেতলাতে কাটলেও প্রায় যতদিন জ্ঞান হইয়াছে মনে পড়ে, ততদিনই সে 'স্বপ্ন দেখিয়াছে বালিগঞ্জের। ঐ কটা মোড় পার হইয়া বালিগঞ্জের, ও ভালবাসার। কালিঘাট, রাসবিহারী, লেক মার্কেট, ও বড়জোর দেশপ্রিয় পার্ক ছাড়াইলেই সেই স্বপ্ন জগৎ। বিকালে বা সন্ধ্যায় তাহার চাহিতে একটু বেশি বয়সের মেয়েরা এখানে ছাতে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকায় না বা শক্ত করিয়া বাঁধা চুলে অকারণ হাত বুলায় না। এমনকি ভামিদিদির মুখে শোনা ভবানীপুরের মেয়েদের মতন মেয়েদেরই দল বাঁধিয়া আড্ডা মারে না। বরং বিনা দ্বিধায় ছেলেদের সঙ্গে সমান পায়ে টহলে নামিয়া পড়ে।

বছরে বছরে যুগ পরিবর্তনের আবর্তের মধ্যে নধর কালবাউশটির মত বড় হইতে হইতে, ছোট বোন উমাকে আশ্চর্য ঘোরাইতে ঘোরাইতে, সে এপাশে-ওপাশে বাঘের মতন ক্রুর দৃষ্টি হানিয়া দেখিয়াছে যে বালিগঞ্জের মেয়েরা সমবয়সী ছেলেদের কাঁধে কনুই রাখিয়া, পকেটে হাত ঢোকাইয়া, এক রেলিং-এ ধুলা ও নেল পালিশ মাথা পা দোলাইয়া, তুই তোকারি করিয়া, ইয়ার্কির চড়-চাপড় মারিয়া, অবলীলাক্রমে এক অসহ্য বেলেল্লাপনার মোহময় জগৎ গড়িয়া তোলে। এবং তাহার পরে লেকের দিকের রাস্তাগুলিতে একটু আগাইলে যেন ঘর্মাক্ত গরমের পরে এক চুমুকেই এয়ার কন্ডিশান করা নেশা! মাথার উপর হইতে নেশা ধরানো ফুলের গন্ধ—দুই পাশে গাছের সারি। রাস্তার আলোগুলি অবিকল নেশা ভাঙিবার ভয়ে থমকিয়া রহিয়াছে। অনেক বাড়িতেই কাটকেটে খোলা আলো রান্নাঘর-গুলিতে ছাড়া চোখে পড়ে না। সিনেমা হলের মত নরম নরম আলো। অনেক-গুলিতে পর্দাও সিনেমার মতন। এমন কি, দুটি বাড়িতে যে বেমালুম সিনেমার মতন বাজনা শুনিয়াছে, তাহা তো নাকি পিয়ানোই। আচ্ছা, জেরুন্ত বাড়িতে কি পিয়ানো বা অমন ঝমঝম করিয়া স্টিরিও-মিরিও বাজিতে পারে? দুই চারি সন্ধ্যায় লেকের ধারে ও বিবেকানন্দ পার্কের গা ঘেঁসিয়া দেখিয়াছে যে ঐ বেটাছেলে মার্কা মেয়েগুলোই আবার কেমন ফিল্মের ঢং ধরিতে পারে। আধো অন্ধকারে তাহাদের আনাগোনা কথা-হাসি সবই আরেক প্রকার।

আহা অন্ধকার! আঁশটে হাওয়ায় অন্ধকার টোল খায়। হাওয়া জোর হইলে অন্ধকার কুটিপাটি হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও কি আশ মেটে? কী এক বঞ্চনার আক্রোশে গায়ে জ্বালা ধরিয়াছে, বোনটির উপরে অনর্থক অত্যাচারেও তাহা মেটে নাই। বাড়ি ফিরিয়া বহুক্ষণ কলতলায় কাটাইয়াও তাহা পুরা মেটে নাই। কালো ফর্সা সকলেরই মুখের রং অমন সাদা হয় কী করিয়া? অমন সূক্ষ্ম অথচ ভরাট সেন্ট উহারা কোন দোকানে কেনে? দাম কত তাহাই বা কে জানে? অমন দুইরকম গলা করিতে উহারা কোন ইশকুলে শেখে? মাথা হইতে ঝুলানো ভারি ভারি পর্দার ওধারে বা গাছের অন্ধকারে বসিয়া ও তো পুরানো খেলা, কিন্তু এতই যখন উহাদের বাহানা তখন নতুনটা কি করে তাহা কি নিজের চোখে কোনোদিনই দেখিবে না? সেই অজানা নতুনটাই কি ভালবাসা? ভাল-বাসার জন্যই কি গা এত জ্বলে?

বিধাতা অবশ্য সচরাচর যে যাহা আসলে চায় তাহাতে বঞ্চিত করেন না। —যদিও, জগদীশ্বরের পার্থিব প্রতিনিধিরা সেই ঐশ্বরিক বরদানের সময়ে একটু চোনা ঢালিয়া দেন। জানি না, ইহাও হয়ত তাঁহারই ইচ্ছা। যাহাই হউক, সেই সময়ে, কিশোরী রমার সংকীর্ণ জগৎটুকুর ঈশ্বর ছিলেন তাহার পিতা অঘোর। মাতৃহীন দুইটি বাড়ন্ত কন্যা লইয়া তাঁহার সংসার। কৃষ্ণবর্ণ, স্নেহময় বলবান মানুষটি শি[illegible] বা সংস্কৃতির ধার ধারিতেন না। [illegible]-দারি হইতে শেষ পয়সাটি পর্যন্ত দুহিয়া লওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। কিন্তু অতি সহজে বুঝিয়া গেলেন যে মেয়ের এইবার পাত্রস্থ হওয়া দরকার। কেমন পাত্র তাহাও তিনি নিজের মতন ঠিক বুঝিয়া লইলেন। ঘটক দ্রুত সন্ধান আনিল। কেনা কাটা, পাড়াপড়শী ও আত্মীয়-স্বজনের পুরানো ঠাট্টা, ক্রমশ নানা আয়োজন, নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে রমা তাহার ভারি শরীরটাকে লইয়া ফরফর করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

রূপের চাহিতেও গায়ের রংই এ সমাজে দেমাকের বিষয়। রং তাহার কালোই। মুখশ্রী, খুঁটাইয়া দেখিলে, বুদ্ধিদীপ্তিহীন হইলেও খারাপ নহে। কিন্তু বেশি ওজন ও বেহিসাবী প্রসাধনে কিম্ভূত। বস্তুত, বালিগঞ্জ ইত্যাদি ছাড়া তাহার শখ খাওয়া আর ঘুমানো। আর মাতৃহীন সংসার ত্যাগ করিতে পারিলে, সিনেমার পত্রিকা আর ছায়াছবির গানকে সঙ্গী করিয়া স্রেফ যখন ইচ্ছা তখন গড়াইয়া পড়িবে। তবুও সে খাঁটি বুঝিত যে তাহার যৌবন বড় টলটলে,

কেবল একটি রাজপত্র আসিলেই ভালবাসার কুহকে ঘিরিলেই, সে জড়াইবে। রাজপত্র করে তো লেখাপড়া কি আর কিছু করুক, সে কোনো পরিশ্রম করিতে নারাজ। ফিল্মের গানের সঙ্গে নিজেকে মিশাইলে পলক লাগে, কিন্তু গানও যে রপ্ত করিয়া শিখিতে হয় তাহা সে ভাবে নাই। সরল ও একাগ্রচিত্তে চাহিয়াছে বালিগঞ্জে ঐ ভালবাসার পর্দাটা উঠাইয়া ভিতরে যাইতে।

এবং ঘটক বলিল ছেলের বংশ ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, চরিত্র ভাল, নামজাদা পানশালায় অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টুয়ার্ড, বেতন ছাড়া উপরিই বেশি, নিজে লেখাপড়া না করিলেও পাত্রের দাদা বিস্তর পড়াশুনা করিয়া বিলাতেই থাকে, বিবাহ করিয়াছে খাস মেমসাহেব, মাথার উপরে বাপ মা আছেন, ভাড়াটে সমেত তিনতলা নিজেদের বাড়ি বালিগঞ্জে। দোকানদারী বুদ্ধিতে খোঁজ করিয়া অঘোর আরো কিছু খবরাখবর পাইলেও, এবং তাহা সবই ভাল ভাল না হইলেও, দেখিল এই কথাগুলি কোনোটিই মিথ্যা নয়। বলিল, বটেই তো, সত্য ঘটক ধাপ্পা দেয় না।

নিজেদের বাড়ি বালিগঞ্জে! মোটা সোটা, নম্র, মিষ্ট মুখশ্রীযুক্ত ছেলেটিকে এক নজর দেখিয়াই তাহাকে বরণ করিয়া লইল রমা। নিতান্ত কুৎসিৎ না হইলে আপত্তি কিছুতে হইত না—তাহার হাতেই তো বালিগঞ্জের চাবিকাঠি। এ তো বরং রমার অপেক্ষা একটু ফর্সা, একটু সুশ্রী। চাকরিস্থল? চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটের বার রেস্তোরাগুলি সে দেখিয়াছে, দরজার ভিতর দিয়া তাকাইয়াছে, ট্যাক্সিতে করিয়া আসা যাওয়াও দেখিয়াছে। বালিগঞ্জের মত উহার সহিত নিজেকে যুক্ত না করিলেও, ওখানে সেন্টের সহিত বিলাতী মদের গন্ধ, গা গলায়, মনোরম পাপের মতন টানে। ওখানে বড় বাহারী অন্ধকার। আচ্ছা, গেরস্ত বাড়ির নিষ্পাপ ফ্যাটফেটে আলোগুলিকে গলা টিপিয়া আধমরা না করিলে, বুকের মধ্যে এমন খাঁ-খাঁ করে না কেন? ভালবাসাই কি পাপ? এসব জটিল প্রশ্ন রমা বেশিক্ষণ ভাবিতে পারে না। তাহা ছাড়া, শত হইলেও সে দোকানদারের মেয়ে, সে বোঝে যে পার্ক স্ট্রীটের নাগাল বড়লোকে ছাড়া পায় না। তাহার রাজপত্রের সেখানে আনাগোনা থাকুক। পাকা পোনার গায়ে জলঝাঁজির মতন রেশটুকু রাজপত্রের গায়ে ঝোলে তো ঝুলুক। রমা তাহার আসন্ন সৌভাগ্যের স্বপ্নে চোখ বন্ধ করিয়া ডুব দিতে চায়। তাহার মাদক খিরিয়া, ছাদের আলশে ডিঙ্গাইয়া আদি গঙ্গার পাঁক গন্ধ বাতাস অন্ধকারে হুটোপুটি জোড়ে।

বাঙ্গালী হিন্দু বিবাহের সঙ্গে অন্ধকারের সম্পর্ক অবশ্য সাপ ও নেউলের। অগম্য আস্তাকুঁড়েও একটি খোলা আলো অকস্মাৎ সাদা দাঁত বাহির করিয়া হি-হি করিবে। বাঁকা চোরা পিচ্ছিল গাছটার তলা আঁকড়াইয়া যে কাঁচা উঠনটুকু দুঃস্থ বিধবার মতন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টায় ছিল, তাহার গায়েও অনর্থক এক ন্যাড়া আলো বিলিয়া, কয়লা ভাঙ্গিবার পাথরটা কি গুলে মাখিবার গোবর গাদাটিকে পর্যন্ত দুঃশাসনী রগড়ে উদ্ঘাটিত করিবে। বাসরঘরের আলো তো বেহায়া বটেই, অতি নিভৃত ঐ ছাতটার আনাচে কানাচেও আর আব্রু থাকে না, তেরপল, শতরঞ্চি, শালু, আর বেঢপ আলোক সজ্জায় তাহা মফস্বলের খেলো সার্কাসের ন্যায় বারোয়ারি। অনেক কনের মতন রমাও কিন্তু এত আতিশয্যকেও সহজে মানিয়া লইল, এই ঘাট পার হইলেই তো ভালবাসার রোমাঞ্চ, ভালবাসার আহ্লাদ, ভালবাসার অতল অন্ধকার। ভালবাসা ও বালিগঞ্জের স্বপ্নে ভোর হইয়া সে বিবাহের বৈতরণী কাটাইয়া দিল।

আগে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিলেও আজ জানি যে সময়ের গতি সত্যই অসম, দেবতাদের এক রাত্রে নরলোকে বৎসর কাটিবে। বস্তুত, বিবাহের রাত্রে ঘামে বেনারসিতে, সোনার ও ফুলের গহনাতে, হোমের ধোঁয়ায় মন্ত্রে, আতরে অশালীনতায় যে জবজবে ঘোর লাগে তাহা কাটাইয়া উঠিতে উঠিতে বিস্তর অভিজ্ঞতা ঠাসা হইয়া যায়। —ঘুম ভাঙ্গিয়া ছৈ-এর বাহিরে তাকাইলে যেমন অবাক হইয়া দেখিতে হয় যে দুই তটের চেহারাই অপরিচিত, দূর দেশে আসিয়াছি। রমা তো আগে হইতেই সরল প্রাণে এক ঘোরে পড়িয়াছিল। চটকা ভাঙ্গিতে দেখিল ভীরু মহিষ শাবকটির ন্যায় নিষ্পাপ অতি পুষ্ট কন্যাটির বয়স দশ। বত্তুলাকৃতি পুরুট শাশুড়ির ফর্সা প্রতিচ্ছবি স্বরূপ, চার-এ পড়িতে না পড়িতে মারিয়া ধরিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, 'এক লাথি মারবো', 'শুয়োরের বাচ্চা' প্রভৃতি অ-শিশুসুলভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাণ্ডব নাচিয়া বেড়াইতেছে। সদ্য পরলোকগত শ্বশুরের দ্বিতীয় সংসার, রমার শাশুড়ি বহুকাল নিষ্কন্টক রাজত্ব করিয়া সহসা হাল ছাড়িয়াছেন। বেচারা শ্বশুর দীর্ঘ কলকাতা প্রবাসেও গ্রাম্যতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কোনো প্রকারেই বালিগঞ্জী হন নাই। কিন্তু তাঁহার মধ্যেও কি এক বিচিত্র প্রক্রিয়ায় একটি আন্তরিক খেজুর গাছ টিকিয়া গিয়াছিল সঙ্গীত প্রীতির, বিদ্যাপ্রীতির, মজলিশ প্রীতির। যৌবনে, প্রথমবার বিয়োগে তিনি দ্বিতীয়াকে আনিয়াছিলেন, হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে যদি এই হাতে রস সঞ্চার হয়। হয় নাই। হইল দুটি পুত্র সন্তান, যাহারা সঙ্গীত প্রভৃতিকে প্রায় রমার দৃষ্টিতেই দেখিত। ফলে, সংসার মরুতে তিনি কেবল অনর্গল অর্থ উপার্জনের স্বজনহীন দৈন্য ঢাকিতে প্রতি সন্ধ্যাতেই বসিতেন মদ্য পানে। তিনিও গত হইয়াছেন। অর্থাৎ রমাই কর্ত্রী। অথচ ব্রিজ পার হইয়া রমা এক মারাত্মক শূন্যতার ঝটকা খাইল। অসংখ্য বাঙ্গালী রমণীরই বিবাহের মৌজ কাটিলে এমনটা হয়।

এখন তো আর ঘড়ি ধরিয়া আইন সম্মত দেহ বিলাসের নতুনত্ব নাই, বিবিধ কুটুম্বিতার মৌজ [illegible] নাই, প্রথম সন্তান সম্ভবে [illegible] নাই, নার্সিং হোমে [illegible] মধ্যমণি হইয়া বসিয়া থাকা নাই, কাঁথা-ফিডিং বোতল-প্রদীপ [illegible] লইয়া প্রাণান্ত [illegible] বন্ধুবান্ধবীর সেবার্পণ [illegible] না।—অকিঞ্চন কেবল [illegible]নের—[illegible] তোমার ও অবসরের। এত অবসর [illegible] রমা তাহাতেই কিছুদিন [illegible] ঠাকুর, চাকর, দাসী, ঠিকে, [illegible]নশীল শ্বশুরের ঠাট সে পুরা বহাল রাখিয়াছে, স্বামীর সম্পত্তিতে তাহা অবিকল না কুলাইলেও। না হইলে যে অবসরের কোনা ভাঙ্গিবে। বাজার করা ও আনাজ কোটা শাশুড়ীর কাজ। তাহার অবসর অটুট। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ কোথায়?

কামনায় অধীর রমা ফেরিওয়ালাদের বড় প্রিয়। ক্রমান্বয়ে বড় বড় আইসক্রিম দ্রুত গিলিলে কি একটু আরাম লাগে? চিড়বিড়ে ঝাল ও টক দেওয়া ফুচকা অনেকগুলি খাইলে? ঢকঢক করিয়া বড় এক গেলাস আখের রস? অস্থিরভাবে সে বাসনওয়ালীর নিকটে বাসন কেনে, শাড়িওয়ালার কাছে শাড়ি, যাহা ইচ্ছা ধূপ কিনিয়া জ্বালাইয়া, অতি ভোজনে অতি স্ফীত দেহটিকে অতিরিক্ত নরম বিছানার উপরে গড়াইয়া দেয় রেডিওতে হিন্দী বাংলা যাহা হোক কিছু হইতে থাকে, সে অস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে সে বিশেষভাবে বঞ্চিত। কোনো মতে এই মানসিক অবস্থাটিকে জিয়াইয়া রাখিতে পারিলে কখনো কখনো দুই ফোঁটা জল তাহার চোখে আসিয়া পড়ে, একটু আরাম হয়, সেদিন সারা দিন তাহার কণ্ঠস্বরকে কান্না কান্না শোনায়। তাহা অন্যের কানে সুন্দর না ঠেকিলেও, বা সেদিন তাহার বিশাল থমথমে মুখমণ্ডল দেখিয়া মেজাজ খারাপ বলিয়া ভ্রম হইলেও, তাহার নিজের ভিতরে সেদিন জ্বালা কম। কিন্তু যেদিন সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, অন্তরের অবাক ব্যথা কিছুতেই তাহার পোড়া চোখ দুটিকে একটুও ভিজাইতে পারে না সেদিনকার জ্বালা দ্বিগুণ।

নিজের জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে, ক্রম হিংস ভাষায়, গলার তীব্র তেজে, পা দাপাইয়া, চোখ ঘুরাইয়া, আশপাশের সকলকে দগ্ধ করিতে থাকে। শান্তিপ্রিয় সুশান্ত পিতার মতো ইস্তক প্রকাশ্যে মদ্য পান করিত—আমোদে। বাড়াবাড়ি অশান্তিতে মাত্রা বাড়াইল, কারণ, বিনা মদ্য পানে তাহার স্বভাবগত নম্রতা কাটে না। ক্রমশ, ছুটি-ছাটায় ও প্রিয়তমার সান্নিধ্য আশঙ্কা হইলেই কিছু অতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রতিবেশীরাও তাহাদের পৌনঃপুনিক দাম্পত্য কলহের কোলাহলে অভ্যস্ত হইল। কেবল, আত্মীয় অনাত্মীয় কেহই বুঝিল না যে রমার অন্তঃকরণে এক গোপন কোমলতা আছে এবং তাহাতে বাল্যাবধি এক পুরানো বড়শি গাঁথিয়া টান দিতেছে।

ভগিনী উমার এই ধারা ফ্যাচাং ছিল না। তাহার স্বামীটি ছোকরা মতন। এক মোটর বাইকে চড়াইয়া পত্নীকে সে সহজে স্বর্গ সুখ দেয়। বছর পাঁচেকের সন্তানটি ভাষায় দন্ত্য স-র আধিক্যে উমার বা তাহার স্বামীর একটুও মাথাব্যথা নাই। উমার কোনো চিন্তা নাই, সুতরাং দুশ্চিন্তাও নাই। দিনে রাতে যখন যাহা সবাই করে তাহারাও তাহাই করে। সপ্তাহান্তে থিয়েটার দেখে। উত্তর কলিকাতার আবহমান স্রোতে গা ঢালিয়া থাকে। ভালবাসার আকুতিবিহীন রক্ত-মাংসের জীবনে, বয়স থাকিলে ফুর্তি অঢেল। এবং হয়ত রক্তের টানেই সে তাহার ধাঁচে অনুভব করিল দিদির বিদঘুটে শূন্যতাটিকে। শূন্যতাকে তো ভয় পাইবেই। চোখ বুজিয়া আলোর সুইচ টানিবার মতন, কোনোমতে সেই শূন্যতাকে ঠাসিয়া ভরিবার জন্য প্রস্তাব করিল চারজনে মিলিয়া থিয়েটার দেখিবার, খন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে বসিবার, মাঝে মধ্যে মদ্য পান করিবার। শালীর অধিকারে জামাইবাবুর ভুঁড়ি কমাইবার অছিলায় ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ সুশান্তকে দিয়া ব্যায়াম পর্যন্ত করাইল। রঙ্গ রসের ঝাপটায় রমার মনের ভার কমিল। কিন্তু সেই বা কদিন? নতুনত্বের মায়া কাটিল। ভগিনী হইলেও সে মেয়ে ধাড়ি হইয়াছে, তাহার বিবিধ ধিঙ্গিপনায় বিরক্ত লাগিল, আর ঐ ধাড়ি খোকা কি ভাবিয়াছে যে সেও তাহার ভায়রাভাই এর সমবয়স্ক? আপিস হইতে রোজ বাকস ভরিয়া খাবার আনিবার কি ঘটা! —হ্যাঁ সে তাহার স্বামীর কর্মস্থলকে আজকাল আপিসই বলে।

ফের তাহার গা জ্বলিতে লাগিল। থিয়েটারের নায়ক-নায়িকারা কখনো-সখনো তাহাকে কাঁদাইয়া ভিজাইতে পারে, এবং সেই লোভেই তো প্রতি সপ্তাহে সেন্টে জবড়জঙ্গ আলো আঁধারিতে পুরুষানুক্রমিক ঘামে দাগানো ভেলভেটের গদিতে বসা। কিন্তু নাঃ, তাহার বুক যে জ্বলে, সকলেই তাহাকে জানিয়া-না জানিয়া ফাঁকি দিতেছে, আসল জায়গাটিতে ঢুকিতে দেয় না। ফিল্মের কাগজের রগরগে বর্ণনা পড়িয়া কী হইবে? তাহার যৌবন, তাহার লগ্ন যে যায়।

মোড়ের বাড়ির মেয়েটা ফিল্মে পার্ট করে। না জানি কত মজা মারে, কত পয়সা কামায়। উহারা পাড়ার ব্যাঙ্কে টাকা রাখে শুনিয়া ফোন করিয়াছিল। কত হাজার টাকা ছুঁড়ি জমাইয়াছে জানিলে এক প্রকার তৃপ্তি হইত। তা ঐ বজ্জাত ব্যাঙ্কের লোকগুলি কিছুতেই বলিল না। মেয়েটার সহিত ভাব করিবার প্রয়াসে শিশু পুত্রটিকে ছুতায়-নাতায় তাহার কাছে পাঠাইত, শুনিয়াছিল যে অভিনেত্রীরা নাকি শিশু ভালবাসে। শিশুটিও তখন ফুটফুটে। কিন্তু সেই শিশুই আজকাল এমন দুর্বার মূর্তি ধরিয়াছে যে সে মা হইয়াও বোঝে যে শিশু হইলেও ঐরূপ সামাজিক দৌত্যে সে অচল। অগত্যা আলাপ জমে নাই। এখন রমারও বলিতে বাধা নাই যে উহারা আসলে দেহ পসারিণী। কেবল, মেয়েটি জানিলেও তাহার নিকটে রমার এক ঋণ রহিয়া গেল— নাভির নিচে নাবাইয়া শাড়ি সে এখন সর্বদাই পরে, অতীতে কখনো মেয়েটিকে দেখিয়াছিল ঐভাবে শাড়ি পরিতে।

পাশের বাড়ির লোকটা নাটক-ফাটক লেখে। রেডিওতে তাহার নাম রমা শুনিয়াছে। ওর বাড়িতে কত লম্বা চুল ছেলে আর খাটো চুল মেয়েলোক সকাল নাই, দুপুর নাই, রহদম আসে যায়। রাত দুপুর পর্যন্ত মেয়ে মানুষ লইয়া আড্ডা, রমার গা জ্বলে, কী করে লোকটা? রমা তাহার নাটক চাহিয়া পড়িয়াছে। ফোন খারাপ হইলে তাহার বাড়ীতে গিয়া ফোন করিবার অছিলায় এটা সেটা কথা পাড়িয়াছে। অত নাটক লেখে, নিশ্চয়ই আরো কত রসের ঘটনা ওর জীবনে ঘটে, ছুঁড়ি বুড়ি এন্তার মেয়ে মানুষের সঙ্গে নিশ্চয়ই ধর্মের কথা বলে না। অথচ রমাকে চৌকাঠটুকু পার করানো দূরে থাকুক, তাহার সঙ্গে কথা বলে যেন সে ইশকুলের দিদিমণি। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া, পাশ ফিরিয়া, সুডৌল বাহু ঘুরাইয়া সে তিক্ত হাসি হাসে। কেন, সে কি এতই কুৎসিৎ? অবশেষে গায়ের জ্বালায় সে চীৎকার করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে লোকটা নিতান্তই লম্পট, লম্পট এবং পুরুষত্বহীন। শুনুক লোকটা। ভাগ্যক্রমে তাহার সহিত মুখোমুখি ঝগড়া হইলে রমার একটু আরাম হইত। কিন্তু সে বোধ করি কালাও বটে। সাড়া শব্দও তো করে না।

উঃ। রমা কী করে? তাহার বাড়ী বালিগঞ্জে। সুশান্ত খাশ বালিগঞ্জেরই ছেলে। ভাসুর তাঁহার জলজ্যান্ত মেম বউ সহ বিলাতবাসী হইলেও, প্রতি বৎসর বিজয়ার পরে বৌমাকে স্মরণ করিতে ভোলেন না। শ্বশুর মরিবার পর হইতে তাহার অবসর অটুট রাখিতে সঞ্চিত অর্থ যতই ভাঙ্গা হউক, অভাব তাহার কিছু নেই। সে বিস্তর খায়, পরে, ঘুমায় ও কেনাকাটা করে। অথচ তাহারই প্রাণে জ্বালা। অথচ উমা মুখপুড়ীটা পর্যন্ত কত আহ্লাদে রহিয়াছে। কেন রহিয়াছে? কী করিয়া রহিয়াছে? অবশ্যই তাহার বরের দৌলতে? তো রমা কী দোষ করিল? তাহারো তো আর সবই আছে। তাহার বরও তো কানা খোঁড়া নহে। তবে? তবে কেন রমার বরও রমাকে লইয়া মাইতে পারে না, কেন রমার হাত ধরিয়া রোমাঞ্চের চৌকাঠটি ডিঙাইবে না? একি ষড়যন্ত্র? মাথার মধ্যে আগুন ছড়ায়। না কি এ এক অপরূপ অক্ষমতা? অক্ষম। অক্ষম। কুক্ষ-চূড়াটিতে ফ্যাশান দিয়া বাউন্ডুলে ঝাড়ুদারের বৌটা লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া বরের পিঠে কোমরে হাত বুলায়, গায়ে ঢলিয়া সোহাগ করে, বেতাল হইলে নির্ঘাৎ রোঁয়া খাড়া করিত। অপাঙ্গে জ্বালা ছিটাইয়া রমা জ্বলিতে থাকে। বালিগঞ্জের এই ছোটলোকগুলি পর্যন্ত পাইয়া গিয়াছে গো। ঐ দেমাকী অ্যাকট্রেসটা পাইয়াছে। ঐ অপদার্থ নাটক লিখিয়েটা পাইয়াছে। পাইল না কেবল সে। বালিগঞ্জের মধ্যে বসিল, খোলামকুচি সব পাইল, কেবল পাইল না সেই রহস্যময় লন্তুর চাবিকাঠি। যাহা জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত পায়, ছোট-লোকেরাও পায়, পাইয়া সুখে হিল হিল করিতে থাকে, বা পরমতর সুখে বুঁদ হইয়া থাকে। ও হো হো, কাহার উপরে, কিসের উপরে সে ঝাল ঝাড়িবে?

তা, আক্রোশ তো ভাগাহত সুশান্তর উপরে পড়িবেই। সুশান্তর মা তাও দেখিয়া-ছেন যে জীবন তাঁহার নাগালের বাহির দিয়া বহিয়া গেল। যতদিন সুশান্তর পিতা জীবিত ছিলেন ততদিন সে আক্ষেপ প্রকাশের পাত্র ছিল। তিনি মরিতে সুশান্তর মাতাও মনে মনে মরিয়াছেন। কারণ বাঙালী রমণী সচরাচর মরে তখন যখন তাহার আক্ষেপ মরে। প্রথম প্রথম বধূমাতার সহিত কোঁদলে রত থাকিয়া জীবিত থাকিবার চেষ্টায় ছিলেন, কারণ সহজে মরিতে কে চায়? কিন্তু রমার এই বিশেষ আন্তরিক তাড়নায় তাহার জন্মগত প্রাণশক্তি এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল যে তাহার সহিত তিনি বুড়া হাড়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, নিজেকে গুটাইয়া লইলেন। ফলে রমা দোর্দণ্ডপ্রতাপে অবসর ভোগ করিতে লাগিল। ও পলাতক রোমাঞ্চের জন্য হাঁকু-পাকু করিতে থাকিল। ও এইবার তাহার লগ্ন ফুরাইবার ব্যাকুলতায় নরম মানুষ সুশান্তর প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া, তাহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবার স্বাধীনতাকে ব্যবহার করিতে থাকিল।

হায়, কেহই কিন্তু বুঝিল না যে সুশান্ত কিঞ্চিৎ শক্ত হইলেই, কষিয়া দুইটা চড় চাপড় মারিয়া, ফের [illegible] অকারণ শিশুসুলভ প্রশ্রয়ের ভান [illegible]লেই, হয়ত এই অদ্ভুত দাম্পত্য সমস্যার কিছুটা সুরাহা হইত। কিন্তু যেহেতু অন্য পাঁচটা দুর্বল চিত্ত বাঙালী পুরুষের ন্যায় সেও কেবল ম্যাদামারা যুক্তি খাটাইয়া রমাকে বশ করিবার চেষ্টা করিল, রমার উন্মত্ত আক্ষেপ ক্রোধ অতিক্রম করিয়া প্রায় ঘৃণায় পর্যবসিত হইল। বেচারা সুশান্ত তাহার বদ অভ্যাসটিকে দিনের প্রায় যে কোনো সময়ে প্রশ্রয় দিতে থাকিল। মাত্রা বাড়াইল। চুরি করিয়া পান করিতে গিয়া চাকরি প্রায় খোয়াইল। কোনো মতে চাকরি বাঁচাইয়া চোলাই ধরিল। যখন তখন ছাই পাঁশ গিলিয়া যন্ত্রণাদায়ক আন্ত্রিক ক্ষত বাধাইল। ফলে স্বল্পকাল তাহার মদ্যপান ও রমার অশান্তি স্থগিত রহিল। কিন্তু শরীর সারিতে উভয়ই পুনরায় শুরু হইল। এবার নবোদ্যমে।

রমার জ্বালা আর কিছুতেই প্রশমিত হয়না। ভোর হইতে সন্ধ্যা অবধি [illegible]

উপরে সকল ব্যাপারে চেঁচায়। মাঝে মাঝে সাজিয়া গুজিয়া, প্রচুর সেণ্ট ঢালিয়া, নূতন ভাড়াটিয়াদের অল্প বয়স্ক বধূটির ন্যায় ব্যস্ত পদক্ষেপে রাস্তায় বাহির হয়। তফাৎ এই যে সে বধূটি চাকুরি করে, তাহার যাইবার এক বাধ্যতামূলক জায়গা আছে, রমার নই। কিন্তু বাহির হইলে মাথা ঠাণ্ডা হয়। কৈশোরের অভ্যাসে চোখ খোলা রাখে—তাহাকে এড়াইয়া না জানি কোথায় কী ঘটিয়া যাইতেছে. যদিও এখন রাস্তার লোকেদের দেখাইয়া ভাণ করে যেন সে বিষম ব্যস্ত, যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইবে। তবে, তাহার শাশুড়ী ও দাসী চাকরগুলার ধড়ে প্রাণ আসে। কিন্তু এক কি দুই কি তিন ঘণ্টা পরে সে ফিরিয়া আসে, কোনো না কোনো হেতুতে মৌজ কাটিয়া যায়, আবার চীৎকার. সুশান্ত বাড়ী থাকিলে সম্ভবমত বাহির হইয়া যায়, পল্লী প্রান্তে দেশী শরাবের দোকানে গিয়া বসে। যখন রিকশায় এলাইয়া ফেরে তখন সিঁড়ি ভাঙ্গিবার ক্ষমতা হামেশাই থাকে না। নিচের রকে ভোম হইয়া বসিয়া থাকে বা চিৎপাত শুইয়াই পড়ে। ঠাকুর চাকরে ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া যায়। বমি করিবার থাকিলে বমি করে। নতুবা বিরাট নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকে। কয়েক ঘণ্টার জন্য অশান্তি হইতে বেচারার ছুটি।

রমাও এরূপ একটু হাঁফ ছাড়িবার ফুরসৎ করিয়া লইল, সন্ধ্যাবেলা। সারাদিন চীৎকার করিলে তাহার প্রবল শরীরও ক্লান্ত হয়। পূজা বা বিবাহাদির মরশুমে দোকান বাজার করিবার মতন ইহাও তাহার খাটিয়া খাটিয়া ক্লান্ত হইবার উপলক্ষ্য। এক প্রকার বিলাসিতা। স্নান করিয়া, বেলফুলের মালা জড়াইয়া, ছাতের টঙে পাতা চৌকিতে হাত পা ছড়ায়। এখানে আলো কম। পরের সংসারের কোলাহলগুলি দূর হইতে মোলায়েম শোনায়। কিছুটা বাল্যস্মৃতির অচেতন আবেশে, কিছুটা দিনব্যাপী অশান্তির শ্রান্তিতে, কিছুটা ঐ ঠক মানুষগুলি হইতে দূরত্বের কারণে, আমেজ আসে। ফিকা নেশা লাগে আবছায়া আলোক-হীনতায়। এই মুহূর্তে সে মনে করে না যে ত্রিভুবনে কাহারো সহিত তাহার তিল পরিমাণ দেনা-পাওনার সম্পর্ক আছে। নিজস্ব পদ্ধতিতে সকল কর্তব্য চুকাইয়া, তলহীন কূলহীন বিপুল অচেতনের কিনারায় সে স্পন্দিত হইতে থাকে। সে ভাবিয়া দেখে নাই, ভাবনা তাহার আসে না, তবে হয়ত বা সেই চিত্তদ্রবকারী লগ্নে সে ঈশ্বর উপকূলেই উদ্যত ছিল। সে তখন তখনি ঠিক না বুঝিলেও ঈশ্বর তাহার ভাগ্যাকাশে সত্যই উদিত হইলেন।

সর্বশক্তিমানের ভ্রূকুটিতে প্রলয়ঙ্কর বজ্রপাত ঘটে। এক্ষেত্রে তাঁহার স্মিত দৃষ্টিপাতে শত শত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মহা-নগরীর দূরে প্রসারিত ধমনী হইতে নিমেষে শুষিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ নগরবাসীর সহিত রমার পরিমণ্ডলও অকাল অমাবস্যায় নিমজ্জিত হইল। অনভ্যস্ত, অন্ধকারের আলিঙ্গণে একাগ্রচিত্ত রমণীর প্রাণ অস্ফুট বলিল, আহা অন্ধকার, ভাগি দিদি বলিত সেই প্রাচীন দীঘির রহস্যতলে জীয়ন কাঠি মরণ কাঠির উপাখ্যান. আমার এখন রাজ-পুত্র আসিলেই হয়, জুড়ন কাঠি ছোঁয়াই-লেই হয়।

কোন মন্ত্রবলে রাজপুত্র আসিলও। তাহার রাজপুত্র পরিমিত পানে অশ্লীল বলিবার ও যথা ইচ্ছা সঙ্গমের সাহস পায়। আজ সে সাহসী। অন্ধকার ঘনাইলেও ছাত একান্ত বেআব্রু। স্বভাব ভীরু সুশান্ত সে বাধা মানিল না। বয়স বাড়িয়াছে বাড়ুক। অমিত আচারে মেদ বাড়িয়াছে বাড়ুক। বিবশ রমা স্বামীর স্বেদাক্ত উচ্ছাসে সেই চির অভীষ্ট চৌকাঠের গোড়ালি প্রমাণ বাধাটুকু প্রায় অতিক্রমই করিয়া গেল। ওগো এই কি সেই? আর একটু, আর একটুখানি লইয়া চল, আমি আর ভাবিব না, দ্বিতীয় কিছু চাহিব না, ঐখানে লইয়া চল, অনন্তকাল আমি ঐখানেই পড়িয়া থাকি। মহানগরীর কটি-তটে উদ্বেল তরঙ্গ শীর্ষে নিক্ষিপ্ত রমা কয়েকটি গভীর অন্ধকার মুহূর্তের পথ

স্মৃতিতে বিভোর হইয়া পক্ষকাল কাটাইয়া দিল। ইহাও তাহার ইতিহাসে অভিনব, সক্রিয় স্মৃতির বালাই তাহার কোনোকালে ছিল না।

কিন্তু রোমন্থনে কতকাল পেট ভরে? অন্ধকার রোজ হয় না। হইলেও, অঘোর নাতির টানে হাকিম বাবু, হাকিম বাবু বলিয়া হাঁক পাড়িতে পাড়িতে হাজির হইতে পারেন, বা অন্য কোনো বিপত্তি, যাহার জন্য রমার ছাতে যাওয়ায় বাধা পড়ে। অথবা সে হাজির হইলেও, দুরু দুরু বক্ষে হাজির হইলেও, রোমশ সজীব অন্ধকার তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চাপিয়া ধরিলেও, রাজপুত্রই হয়ত অনুপস্থিত, বা তাহার জড়তা সেদিন কাটে নাই, বা অতিরিক্ত পানে সে অন্য প্রকার জড়ত্ব প্রাপ্ত,—রাজপুত্র থাকিলেও জড়ন কাঠি নাই। নাই গো, জড়ন কাঠি নাই। রমার পুরানো নেশা নূতন আকারে পাইয়া বসিল। নাগরিক অন্ধকার যত ঘন হইতে থাকিল, তাহার অধীরতা ততই আর বাগ মানিল না। এতদিনে, এই শেষ লগ্নে সে সেই রহস্যপুরির চূড়াটিকে দেখিতে পাইয়াছে। দীর্ঘ তপস্যা মিথ্যা হয় নাই, এই তো তাহার রাজপুত্র, জড়ন কাঠির চকিত স্পর্শ সে পাইয়াছে। হে ঠাকুর, দয়া করো, দাও, ভাল করিয়া দাও, আর বঞ্চনা করিও না, সময় যে ফুরায়।

কিন্তু ক্রমাগত ভয়ানক অশান্তিতে স্বল্পবুদ্ধি কোমল হৃদয় সুশান্ত জড়ভরত হইয়া গিয়াছিল। কেন কখন কী হইতেছে তাহা সে ঠাহর করিতে পারিল না। কখনো কোনো দিন রমা সুখাবেশে বাঁদ হইয়া গেলে সে দমকা হাওয়ার মতন আত্মবিশ্বাস পাইত, ছড়াইত, কিন্তু দমকা হাওয়া এক দমকেই ফুরায়। তখন, বঞ্চিত ক্ষুব্ধ অধীর রমার আঁচড়েও তীব্র কদর্য গালিতে আত্মবিশ্বাস দূরে থাকুক, বাঁচিবার ইচ্ছাটুকুও লোপ পাইত। সরল রমা ভালবাসার মূল খুঁজিতে কেবলই হিংস্র হতাশার ঝাঁঝালো পাঁক ঘোলাইয়া তুলিল। ক্রমশ সুশান্তের নিরুপায় কাপুরুষ হিংস্রতা জাগ্রত হইল, দুর্বলের আত্মরক্ষা স্পৃহার বিষে বড় তেজ। সঙ্কটাপন্ন মহানগরীর অন্তস্তলে ঈশ্বরের দুইটি সন্তান জীবন-মরণ নাটকের শেষ অঙ্কে উপস্থিত হইল।

গত কয়দিন নাগরিক সঙ্কট সকল মাত্রা ছাড়াইয়াছে। সারাদিন পাখা নাই, সন্ধ্যায় আলো নাই, সকলে ত্রাহি ডাকিতেছে। রমা ভিতর বাহির দুই দিক হইতে পুড়িতে পুড়িতে প্রত্যহ তাহার বিচিত্র অভিসারের সময় গোনে। কিন্তু লগ্ন বহিয়া যায়, রাজপুত্র নানা কারণে আসে না। একাগ্রচিত্তে রমা কাহাকেওই আর রেহাই দেয় না। শাশুড়ী, সুশান্ত, সন্তান দুইটি, ভৃত্যেরা,—সকলেই তাহার জিহ্বার বিষে জর জর। বৃষ্টি নাই, হাওয়া নাই, পাখা নাই, আলো নাই, শান্তি নাই।

কোনো মতে গা ধুইয়া, অবশ্যম্ভাবী বেলফুলের মালাগুলি পেঁচাইতে পেঁচাইতে উৎকণ্ঠিত রমা ছাতে ওঠে। এক দুই ঘণ্টা তাহাকে পুনরায় অপেক্ষায় থাকিতেই হইবে। পরিজনেরাও এই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে, এইটুকুই শান্তি। শাশুড়ী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া অন্ধকারে হাতপাখা লইয়া শুইয়া আছেন। হারিকেনের অশিষ্ট উত্তাপে শিশু দুইটি সসঙ্কোচে শিশুসুলভ আচরণ জোড়ে। তাহাদের খণ্ড খণ্ড কলরব রমার কানে পৌঁছিলেও চেতনায় সাড়া জাগায় না। নিম্নস্বরে ভৃত্যদের জটলা, ঠাকুরের খইনি চাপড়াইবার শব্দ, নক্ষত্র কণ্টকিত রাত্রির উপুড় করা শোভা চোখ বন্ধ করিয়া ঠেলিয়া দিয়া রমা অন্ধকারের তলাটি দেখিতে চায়। কোনো ইন্দ্রিয়ের উপরে ভরসা নাই, সে তাহার প্রাণ পাতিয়া থাকে রাজপুত্রের আগমণ সঙ্কেতের উদ্দেশে। এসো, বলিয়া রাজপুত্রকে আজ ডাকে না, কারণ রাজপুত্র আজ আসিবেই।

রাত বাড়ে। নগরের শব্দ কমে। আকাশ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া চারিপাশ কালো করিয়া নামিয়া আসে। শব্দহীন ভারী পদক্ষেপ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসে। তাহার গভীর কম্পনে রমার নাড়ীতে প্রতিধ্বনি ওঠে। স্থির উল্লাসে রমা স্তব্ধ শবের ন্যায় যেরূপ ছিল, সেরূপ পড়িয়া থাকে। ক্ষণকাল সিঁড়ির চৌকাঠে থমকাইয়া, নিস্তব্ধ ছাতে পায়ের চাপ অশ্রুত শিহরণ তুলিয়া রাজপুত্র আসিয়া তাহাদের রিক্ত শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ায়। কী এক চেনা সুগন্ধে বায়ুমণ্ডল ভরিয়া ওঠে, কী এক অচেনা তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র শব্দে পলকের জন্য রমা সচেতন—কোনো শক্তিশালী যন্ত্রকে যেন দানোয় পাইয়া দমকে দমকে কড়-মড় কিড়-মিড় করিয়াই চলিয়াছে—ওটা কী? কিন্তু পরমুহূর্তে তাহার যৎসামান্য চিন্তাশক্তি মুছিয়া গেল, দুর্ধর্ষ আবেগে সুশান্ত তাহার অবশ দেহের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রমা তাহাকে আসিতে সাহায্য করিল না, বাধা দিল না, কেবল পরিপূর্ণ গ্রহণ করিল।
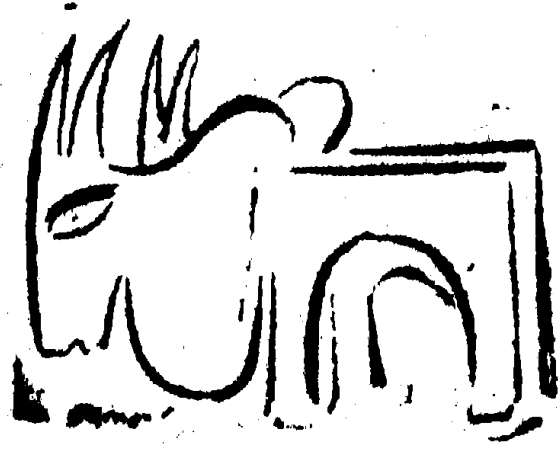
অন্ধকার আনন্দের ভীষণ ঘূর্ণি তাহাকে অমোঘ ক্ষিপ্রতায় টানিয়া লইল। প্রচণ্ড পাক খাইয়া সে কেন্দ্রস্থিত অতল গহ্বরে তলাইতে চলিল। আরো জোরে, আরো দ্রুত, আঃ, চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে অমিত শক্তিশালী উত্তাল পাহাড়। জলের পাহাড়। তাহাতেই তাহার শয্যা, তাহাই তাহার প্রাচীর। তাহার বাহিরে জগৎ নাই। হাত পা রূপ গুণ—কিছুরই আর অস্তিত্ব নাই, প্রয়োজন নাই। ঐ রুদ্ধ অন্ধকার তরল সুড়ঙ্গ পথে নিজেকে ছাড়িয়া দিলেই কি তাহা মিলিবে যাহার জন্য এত বেদনা? হ্যাঁ, রমা হয়ত এই প্রথম আনন্দে কাঁদিল। কিন্তু তাহাও তুচ্ছ। এই স্বল্পবুদ্ধি স্থূলদেহী নারীর মহালগ্নে, মানুষ আর একবার উপলব্ধি করিল যে, কান্না ও হাসির মধ্যে প্রকৃত কোনো ভেদ নাই। অন্ধকার ও আলোক একাকার হইতে, বড় সুখ বড় দুঃখেরই ন্যায় তীব্র আঘাত হানিয়া তাহার হৃদয় বিদারণ করিবার পূর্বমুহূর্তে, তাহার বুদ্ধি বিকশিত হইল, সে সহজে বুঝিল সুশান্ত, তাহাকে হত্যা করিতেছে, আজ এতদিনে সে জীবনের আদি ছন্দটিকে অবহেলে আয়ত্ত করিয়াছে, মৃত্যুকে তাহার ভয় কী?

বাতাস ছিল না। নিশ্চল হাওয়া আকণ্ঠ সুগন্ধের চাপে নিঃশেষ হইবার মুহূর্তে বুঝিল উন্মত্ত সুশান্ত কোমল বালিশটিকে তাহার প্রিয় সেন্টের শিশি উজাড় করিয়া ভিজাইয়াছে। নাঃ, তাহার অসংযত সুগন্ধ প্রীতির প্রতি বিদ্রূপ এ নয়, প্রচণ্ড রাগে ও তীব্র অনুরাগে শেষ পর্যন্ত কোনো তফাৎ নাই। সে কেবল ঈষৎ পীড়িত হইল সুশান্তের দাঁত কিড়মিড়িতে, তা কিছু থামিতও তো জীবনেরই অঙ্গ, সে যে একবার হাত নাড়িল তাহা কেবল বলিবার জন্য, ওগো, আমি তোমাকে ভালবাসি, এই তো আমার ভালবাসার ধন আমি পাইলাম, তুমিও যাহাই ভাব না কেন, আমাকে তুমি ভালই বাসিতেছ, তোমার এই কটু প্রলাপোক্তিই আমাদের প্রেমালাপ।

ঝমাঝম কোন অলৌকিক স্টিরিও চলিতেছে। কী বিশাল শব্দের ঢেউ। কান মাথা ফাটিয়া যায়। অন্ধকার, আরো অন্ধকার—অন্ধকারের গোপন গর্ভ চৌচির করিয়া বড় সুখে, বড় যন্ত্রণায় অমাবস্যার তুবড়ি ফাটিয়া পড়ে। দীর্ঘ বিস্মৃত ভামিদিদি সেই কালো আলোর ঝলকে ঝলকে নিমেষে নিমেষে স্পষ্ট হয়। ভামিদিদি গো, জড়ন কাঠি পাইয়াছি। অঘোর হা-হা করিয়া মুদির সারল্যে হাসিয়া সারা, বলিতেছে, খুকি, হিসাবটা মিলাইয়া নে।

দিনান্ত বেলায়

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বি বি রে অবসর নেবার পরদিন ঘুম থেকে উঠলেন ঠিক ভোর পাঁচটায়। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঠিক এমনি সময়েই তিনি ঘুম থেকে উঠে আসছেন। অভ্যাসমতো আজো তাড়াতাড়ি লেপটা সরিয়ে উঠে পড়লেন। পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে তিনি প্রাতঃকৃত্য সব সেরে ফেলতেন। দশ মিনিট যোগব্যায়ামও করতেন ওরই মধ্যে। ছটার সময় এক কোয়া রশুন খেতেন। ততক্ষণে দোতলার বারান্দার কোণে শুভার চায়ের আসর সাজানো হয়ে গেছে। মকাইবাড়ীর চা ৬৫৲ কিলো। সেই চা-র প্রথম নির্যাস-টুকু সাদা ধবধবে বোন চায়নার কাপে তার দিকে এগিয়ে দিত শুভা। সঙ্গে মুড়মুড়ে একটা টোস্ট; শুভা পাশে বসে থাকতো। তার স্ত্রী তার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু শুভার দিকে নজর দেবার অবসর বি বি রে-র থাকতো না। ততক্ষণে তিনটে কাগজ এসে গেছে। এরপরই তিনি তাঁর টেবিলে গিয়ে বসতেন। সেখানে ততক্ষণে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী এসে গেছেন। সে আজকে তাঁর কি কি কাজ আছে তার তালিকা সেরে রেখেছে। এ সময়টা তিনি ব্যয় করেন ফাইল পড়ে। কি কি ব্যাপার আজ উঠতে পারে তার পূর্বাপর ব্যাপারটা তিনি জেনে নেন। অপ্রস্তুত অবস্থায় বি বি রে-কে কেউ কখনো দেখে নি। মুখে মুখে কয়েকটা নোট তিনি দেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে। তারপরই তৈরী হন অফিস যাবার জন্য। এক প্লেট দই খেয়ে নিয়ে পোষাক পরেন। শুভা সাজিয়ে রেখেছে স্যুট, টাই, সার্ট, রুমাল মানিব্যাগ, মোজা জুতো। সেগুলি পরেন। কোট পরতে সাহায্য করেন শুভা।

শুভার কাছে বিদায় নেবার আগে প্রশ্ন করেন। কোন খবর আছে? কিছু বলবে? খবর মানে খোকার খবর নিনার খবর। খোকা তাঁদের ছেলে। ভালো স্কুল থেকে পাশ করে আমেরিকা গিয়েছিল। সেখানে এম-আই-টি থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোয়। এখন থাকে ওহায়ো রাজ্যের নেলা পার্ক বলে একটা জায়গায়। বিয়েও করেছে ওখানে। পুত্রবধূর নাম মার্গারেট। খোকা রোজগার করছে অনেক। নিয়মিত চিঠি দেবার সময় পায় না, কিন্তু প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে মার্গারেট চিঠি দেয়। নিনা তাঁদের কন্যা। নিনাও আমেরিকায় থাকে তবে ও থাকে খোকার চেয়ে অনেকটা দূরে। নিউ মেকসিকো রাজ্যের আলবুকার্কে। তাঁদের জামাতা প্রতীপ সেখানে কাজ করে। শুভাকে নিয়ে উনি ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে ঘুরে এসেছেন। ছেলেমেয়েরা ভাল আছে সুখে আছে তাদের জগত নিয়ে আছে।

শুভা বলে খবর আর কি থাকবে? ওদের কোনো চিঠি আসেনি। তারপর থেমে বলেন, নারী জনকল্যাণ সভা এবার আমায় অধ্যক্ষা হতে বলছে। আমি রাজী হব কিনা ঠিক করিনি। বিবিরে বলেন এতে ভাববার কি আছে? রাজী হয়ে যাও। তুমি সব-কটা প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের চেনো এতগুলো নারী সমিতির সঙ্গে যুক্ত। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। নিশ্চয় নিয়ে নাও। শুভা বলেন দেখি।

শুভাকে নিয়ে মাঝে মাঝে ভাবনা হয় বিবিরের। শুভা কি একলা বোধ করে? শুভা এখনো দেখতে প্রায় পুরানো দিনের মতোই আছে। দু-একটা সাদা চুল বরং তার সৌন্দর্য বাড়িয়েই দিয়েছে। তন্বী বুদ্ধিমতী চেহারা এখনো আকর্ষণীয়। শুভা কলকাতার তিনটে অভিজাত ক্লাবের মেম্বার তাঁরই জন্য। এছাড়া অন্য একটা ক্লাবের গেস্ট মেম্বার। শুভার ব্যবহারের জন্য সর্ব-ক্ষণ একটা গাড়ী আর ড্রাইভার মজুত থাকে। ওর একলা বোধ করা উচিত নয়।

কিন্তু সারা দিনের মধ্যে শুভাকে নিয়ে ভাববার অবসর কখনোই হত না বিবিরের। বোর্ড মিটিং আর কনফারেন্স। ট্রাঙ্ক-কল আর ডিকটেশন নিয়ে সময় ছুটে বেরিয়ে যেত। কোন জিনিস যখন ঠিক চলে তখন বিবিরের প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রয়োজন সমস্যা মোকাবিলার সময়। সুতরাং সমস্যা থেকে সমস্যায় বিচরণ করতেই বিবিরের সময় কেটে যেত। সপ্তাহ কাটতো মাস কাটতো বছর কাটতো। জীবনটাও কেটে এল।

বিবিরে সব পেয়েছিলেন মান সম্পদ খ্যাতি বিলাসের সব উপকরণ। কিন্তু যার সঙ্গে লড়াই করে কেউ কোনোদিন জেতেনি, সেই অলাতচক্রের সঙ্গে লড়াইএও বিবিরে হেরে গেলেন। একদিন তাঁর [illegible]

আসবে সে প্রসঙ্গ বোর্ড মিটিংএ উঠলো। ও'কে ছাড়া কোম্পানী কিভাবে চলবে সে আলোচনা হল। একজন বললো চলবে কি আর না, চলবে, তবে বিধান রায় ছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল যেমন চলছে তেমনি চলবে। সবাই খুব তারিফ করলো কথাটা।

ঘটা করে বিদায় সম্বর্ধনা হল। কোম্পানীর সতেরোটা শাখা সারা ভারত জুড়ে। তাঁর হতে গড়া মানুষেরাই সেইসব শাখা চালান। তাঁরা কেউ ছাড়লেন না। সতেরোটা শাখা থেকেই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে বিদায় অভিনন্দন নিতে হল। প্রধান অফিসের অভিনন্দনে তাঁকে চন্দন কাঠের মোটা ফ্রেমের ওপর রূপোর ফলকে তাঁকে প্রশস্তিলিপি দেওয়া হল। সই করেছেন সব ডিরেকটর, সবকটা ইউনিয়নের সভাপতি। মানুষ এর চাইতে বেশি কি চাইতে পারে?

নাটক হলে ঠিক ওই মুহূর্তে বিবিরে মারা যেতেন। চটাপট হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর থাকতো। কিন্তু জীবনটা অন্যরকম। তাই ও'র বিদায়ের আগের দিনে কোম্পানীর এ্যাডমিনস্ট্রেটিভ অফিসার ও'র সঙ্গে অনেকক্ষণ বিনীত নম্র সভ্য ভদ্রভাষায় কথা বললেন। না কোনো চমকই তাতে নেই। মোদ্দা কথা হল ও'র বাড়ীটা—মানে কোম্পানীর লীজ নেওয়া বাড়ীটা—উনি ছেড়ে দিলে পরের বড়সাহেবের মনের মতো করে সাজানো হবে। কোনো তাড়াতাড়ি নেই তবে কবে উনি ছাড়বেন সেটা জানতে পারলে সুবিধ হবে। বাড়ী, টেলিফোন, গাড়ী, বিভিন্ন ক্লাবের মেম্বারশিপ চাঁদা, আপ্যায়নভাতা সব যাবে। বিবিরে জানতেন। না-জানার কোন কারণ নেই। মানুষ মাত্রেই কথাও তো জানে। না জানার কোন কারণ নেই। তবু মৃত্যু যখন আসে মানুষ কষ্ট পায়। বিবিরেরও কষ্ট হল। ও'র অবিশ্যি বাড়ী তৈরী। বাড়ী মানে ১২০০ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট সাদার্ন এভিনিউ বা মেঘনাদ সাহা সরণীর ওপর। ১৮ তলার ওপর থেকে কলকাতা ছাড়িয়ে বহুদূর চোখ যায়। মনে হয় বুঝি পরিষ্কার দিনে সমুদ্র দেখা যাবে। সে বাড়ীতে যেতে তাঁর কোনো অসুবিধা নেই। শুধু একটাই অসুবিধে টেলিফোন লাইন এখনো আসেনি। তবু এই মুহূর্তে উনি মনস্থির করে ফেললেন। টেলিফোন তো কলকাতায় থাকা না থাকা সমান। বললেন এক সপ্তাহের মধ্যেই বাড়ী বাড়ী ছেড়ে দেব। এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আবার বললেন ও'র বাবদে সম্ভবত আসবাব-পত্র উনি নিয়ে যেতে পারেন। নামমাত্র মূল্যে কোম্পানী তাঁকে এগুলি বিক্রি করে দেবে।

আজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তাঁর মনে হল অফিস যাবার কোন দরকার নেই। মনটা খারাপ লাগলো। উঠলেন চা খেলেন কিন্তু কাগজ পেলেন না। তবে কি কাগজের অফিস ছুটি? পলকে মনে পড়ে গেল। কাগজ তো অফিস সরবরাহ করতো। আজ থেকে সেটা অন্য লোকের কাছে যাবে। শুভা মুহূর্তে বুঝতে পারলেন এবং চট করে কাগজ আনিয়ে দিলেন। বিবিরের মনটা কিন্তু খারাপই হয়ে রইলো। হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন। শুভাকে বললেন চলো আজই নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাই। শুভা আপত্তি করলো না। শুভা কোনোদিন তাঁর কোনো কাজে আপত্তি করেনি।

নতুন ফ্ল্যাট গোছগাছ করতে লাগলেন দুজনে মিলে। শুভাকে তিনি হাতে হাতে এগিয়ে দিতে লাগলেন জিনিসপত্র। হঠাৎ চল্লিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। এমনিভাবেই তাঁরা মহোৎসাহে নতুন সংসার পেতেছিলেন আসানসোলে। ছেলেমেয়ে তাঁদের এসেছে দেরীতে। বাবা মা সঙ্গে ছিলেন তখন। শুভার বাবা মা আসতেন ছুটিছাটায়। খোকা যখন এল, বাড়ীতে সে কি আনন্দ ছিল। কত খুশী কত সহজেই উৎসবের ছোঁয়া। তখনো তাঁরা বাঙ্গালী দম্পতি। তারপর নিনা আসার আগেই তাঁরা সাহেব হয়ে গেলেন। বাবা-মা কলকাতায় আসেননি। শেষজীবন শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছেন। সেখানেই মারা যান। বাবা মারা যাবার সময় তিনি ব্রাসেলসএ ছিলেন। মা মারা যাবার সময় কিন্তু কলকাতাতেই ছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটা খুব দুরূহ এবং মহার্ঘ কনট্রাক্ট নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল। তাই দেশে থেকেও মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। শুভাই সব কাজকর্ম করেছিল। আসলে বিবিরে তাঁর কোম্পানীকে ও'র রক্ত জল-করা সমস্ত সময় দিয়েছিলেন। অথচ অবসর নেবার পরদিনই কাগজটা বন্ধ করে দিল। পরক্ষণেই মনে হল এ তিনি কি ভাবছেন? একটা পয়সাই বা বেআইনী কিভাবে খরচ হতে পারে

বিবিরে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে কলকাতায় তিনি কাউকে চেনেন না। যাঁদের চেনেন তাঁরা সবাই ও'র অফিসের কাজের লোক। এর মধ্যে ও'র টেলিফোনের তদ্বিরের জন্য উনি টেলিফোন ভবনে গিয়েছিলেন। উনি যে ভদ্রলোককে চিনতেন তিনি বরাবরই বশংবদ হয়ে থাকতেন, কারণ ও'র ছেলের চাকরী বিবিরেই দিয়েছিলেন। এখন ও'কে একটু বসতে হল দেখা করবার আগে। খুবই ভাল ব্যবহার করলেন এবং বললেন চেষ্টা করবেন। কিন্তু সাদা গোবিন্দভোগ চালের ধবধবে ভাতে একগাছি চুল যে অস্বস্তি এনে দেয় ভদ্রলোকের ব্যবহারে সেই ধরনের অস্বস্তি পেলেন বিবিরে। হয়তো তাঁর মনের ভুল, কিন্তু সাবধান হয়ে গেলেন বিবিরে। নিজের আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়লো। ও'র নিজের এক বোন আছেন। লায়লকার মাঠের কাছে ভগ্নীপতি বাড়ী করেছেন। শুভা যায় মাঝে মাঝে ভাগ্নে-ভাগ্নীর বিয়েতে গেছে, ভাগনের ছেলে হবার পর গিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওদের সঙ্গে দেখা হলে কখনো মনে হয় না আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। উনি এবং ও'রা দু-দলই আড়ষ্ট হয়ে থাকেন। অথচ শংকর ও'র ভগ্নীপতির সঙ্গে ও'র বয়সের তফাৎ নেই বেশী। শংকরও সম্প্রতি রিটায়ার করেছে।

আর কে আছে? ভোরবেলা বারান্দায় বসে ভাবছিলেন বিবিরে। ও'র এক মাসী থাকতেন কাইখালি। তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন? কে জানে। বন্ধুদের কথা মনে হল। চল্লিশ বছর আগে তাঁর অনেক বন্ধু ছিল। তিনি খেলাপাগল লোক ছিলেন। দল বেঁধে খেলা দেখতেন। ছাত্রাবস্থায় কতবার ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে গিয়ে লাইন রেখেছেন। কিন্তু সেদিন তো কবেই ভেসে গেছে? কোথায় গেল সেসব বন্ধুর দল। না তাঁদের আর কোন খবরই তাঁর জানা নেই। কেউ তাঁর সঙ্গে আর যোগ রাখেনি। দোষ তাঁরই। কেউ কেউ যোগ রাখার চেষ্টা করেছিল, তিনিই রাখেন নি। রাখতে পারেন নি। কোম্পানী তাঁকে পুরোপুরি কিনে রেখেছিল। তাঁর নিজের আনন্দের কোন সময় ছিল না। সেকথা কিন্তু সেদিন তিনি বোঝেন নি। আজ কিন্তু কথাটা খুব স্পষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। শেষ ত্রিশটা বছর তিনি যেন নাগরদোলায় চড়ে কাটিয়েছেন। নাগরদোলা বনবন করে ঘুরছে। মনে হয়েছে অনেক দূর বুঝি চলে গিয়েছি। কিন্তু যাওয়া হয়নি কোথাও। আজ তাই আবার চল্লিশ বছর আগের মতো একদম নতুন করে জীবনযাত্রা সুরু করতে হবে।

ভোরবেলা উঠে তাঁর নতুন ফ্ল্যাটের দক্ষিণের বারান্দায় বসলে রবীন্দ্র সরোবরটা পুরো দেখা যায়। ১৮তলার ওপর থেকে ছবির মতো লাগে। মানুষজনকে ছোট ছোট দেখায়। কয়েক দিন ধরেই দেখলেন বহু লোক, বিভিন্ন বয়সের, লেকে ভোর থেকে বেড়াতে আস। একদম ছোট থেকে বেশ বৃদ্ধ অবধি সব বয়সের লোক বেড়াতে আসে। কেউ ধীরগতিতে হাঁটেন, তাঁরা বয়সের ভারে নাজেহাল। কেউ কেউ দ্রুত পদচালনা করে তারা মেদ ঝরাতে চায়। কেউ খুব জোরে দৌড়য়। এরা যুবকযুবতীর দল। শরীরটার যত্ন নেয়। সাঁতার কাটে আরো অনেকে। সব মিলিয়ে ছবিটা সুন্দর। বিবিরে ঠিক করলেন উনিও সকালে বেড়াবেন। আগে ধারণা ছিল লেক বন্ধুদের, সেটা যখন ঠিক নয়, তখন নিশ্চয় বেড়াতে যাওয়া যায়। শুভাকে বলতেই শুভা খুব উৎসাহ দিল। তাই তাঁর জন্য ফ্লানেলের ট্রাউজার সোয়েটার মাফলার সব গুছিয়ে দিল। বললো গরম পড়লে সর্টস করিয়ে নিতে হবে।

লেকে বেড়াতে মন্দ লাগলো না। ঠান্ডা হাওয়া মুখে এসে ঝাপটা মারে। বেশী বৃদ্ধেরা কানঢাকা টুপি পরেন। জোরে জোরে পা চালালে শরীরটা গরম হয়। লেকে অনেকগুলি বৃদ্ধের দল আছে। একদিন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুরাতন পরিচিত এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীকে তিনি আবিষ্কার করলেন। ভুল হল ভদ্রলোকই তাঁকে আবিষ্কার করলেন। সোৎসাহে পরিমলবাবু বিবিরেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন দলটার সঙ্গে। বিরাট দল। সেদিন অনেকটা সময় কাটলো। বিবিরে চুপ করে ছিলেন। দলের অন্যরা খুব কথা বলছিলেন। বিবিরে দুঃখের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন যে অত্তবড়

কোম্পানী যে কোম্পানীকে তিনি বড় হতে সাহায্য করেছেন অনেকেই সে কোম্পানীর নামও জানে না। পরিমলবাবু বিধানচন্দ্র রায় একবার কিরকম তাঁর কাজের তারিফ করেছিলেন তাঁর ইতিবৃত্ত গর্বের সঙ্গে বললেন। মনে হল এটা শ্রোতারা আগেও শুনেছেন। বর্তমানের সেক্রেটারীদের দেখলে তাঁর কিরকম 'ঘৃণা' হয় সেটাও বললেন। অন্য আরেকজন পাইপ ঝাড়তে ঝাড়তে তাঁর সুইটজারল্যাণ্ড ভ্রমণের সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা বললেন। একজন যাঁকে সবাই মাস্টারমশাই বলে সম্বোধন করেন, তিনি বললেন দেশী-বিদেশী কোন কোন পত্রিকা তাঁর প্রবন্ধের জন্য তাঁকে জ্বালিয়ে মারছে। কিন্তু ভদ্রলোকের ব্লাডপ্রেসার ১৮০।১২০ থেকে নামছে না। তাই ডাক্তার লেখা বারণ করে দিয়েছেন। রোগের কথায় ব্লাডসুগার, পেসমেকার, বাতের ব্যথা, থানকুনি পাতা, মেথির জল, করলার রস, ইশপগুল ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। সবাই মুখর। কিছুক্ষণ বাদে সবাই একে একে বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন। পরিমলবাবু তাঁর সঙ্গে ফিরতে ফিরতে বললেন, বিকেলে আমরা কালচারে যাই। সেখানে নানা ধরনের সংপ্রসঙ্গ আলোচনা হয়। সময় পেলে আসবেন ভল লাগবে। কালচার শুনে বুঝতে না পারায় পরিমলবাবু বুঝিয়ে দিলেন কালচার হল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিবিরের ভলা লাগলো না। কিন্তু পরিমলবাবুর একটা কথা কানে লেগে রইল। বিকেলে সময় পেলে আসবেন। সময় পেলে, এখন তাঁর হাতে অখণ্ড সময়। যদিও তিনি এখনো অনেকগুলি কোম্পানীর ডাইরেকটরস বোর্ডে আছেন, তবুও তাঁর এখন অখণ্ড অবসর। আগে দিনগুলি কোথা দিয়ে কাটছে বুঝতে পারতেন না। এখন সময় কাটতেই চায় না। কাগজগুলো বালিশ রেখে। বাংলা বই পড়তে চেষ্টা করলেন ভাল লাগলো না। ওঁর সময়ে যেসব লেখকরা খুব নামকরা ছিলেন সেই পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, যাযাবর তাঁদের বই দোকানে পেলেন না। ইংরাজী চটুল নভেল তাঁর কোনদিন ভাল লাগেনি। পরিমলবাবুরা বলেছিলেন বিবিধ ভারতী রেডিও খুব ভাল। খুব সুন্দর সময় কাটে। ওঁর সে পোগাম তাঁর নিম্নরুচির লাগলো। দূরদর্শন আরো অখাদ্য। কারিগরি আর 'অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দুঃখিত' বাসে দেখা যায়। আগে দিনে রাতে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর বড্ড কম সময় মনে হত। এখন দেখলেন সময়টা বড্ড দীর্ঘ।

লেকে বেড়াতে কিন্তু খুব ভাল লাগছিল বিবিরের। উনি পরিমলবাবুদের এড়িয়ে চলতেন। ওই হামবড়া ভাব আর অমুক বাবা ভগবান কিনা—বা কোন বাড়ীর কেচ্ছা চাপা পড়েছে কি পড়েনি, এসব আলোচনা ওঁর বড্ড খারাপ লাগতো। উনি তাই লেকের অন্য পারে চলে যেতেন। উনি বেড়াতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওঁর বসবার একটি সুন্দর জায়গা ছিল। জায়গাটির চারপাশে অনেকগুলি আকাশমণির গাছ। জায়গাটি তার ওপর নির্জন। বিবিরের খুব ভাল লাগতো। এখানেই ওঁর সঙ্গে সদুর একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ওঁর পাশে এসে এক ভদ্রলোক বসলেন। মাথার চুল একদম শনের নুড়ির মতন সাদা। কিন্তু মুখে বয়সের হিজিবিজি রেখা নেই। চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক বললেন—'বঙ্কা না?' বিবিরের নাম যে বঙ্কুবিহারী রায় সেটা তিনি বহুদিন ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ওই নামটা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরই চিনতে পেরেছিলেন। বলে উঠলেন আপনি তুমি তুই সদু না? সদানন্দ চট্টরাজ। তাঁর সঙ্গে ভবতারিণী স্কুলে পড়তো। পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল। কিন্তু বি-এ পাশ করবার পর আর পড়েনি। কিন্তু এ কি চেহারা বানিয়েছে সদু? উনিও তো আয়নায় নিজের চেহারা দেখেন, কই উনি তো এতটা বৃদ্ধ হননি। সদানন্দকে বলতে তিনি বললেন আমার মতো এতদিন মাস্টারী করলে তুইও হতিস রে। ছেলে ঠেঙানো বড্ড ঝকমারী কাজ। সদু তাহলে মাস্টার ছিল? কিন্তু ওঁর সব চাইতে ভাল লাগছিল সদু ওকে তুই সম্বোধন করছিল বলে। বিবিরে তাঁর চেহারায় পাক্কা বড় সাহেব। সদু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। সদু তাঁর সব খবর নিল। বিবিরে স্বল্প কথায় বললেন—অফিসের কথা, শুভার কথা, খোকার কথা, নিনার কথা। সদু খুব খুশী হল। বললো, আমি তোর কোন খবর রাখতে পারিনি। কিন্তু আমি জানতাম তুই বড় হবি। তোর মতো এত নিরলস পরিশ্রমী লোক আমাদের ক্লাশে কেউ ছিল না। সদুর কথায় ঈর্ষার লেশমাত্র নেই। সহপাঠীর সাফল্যে শুধুই আনন্দ আছে।

সদুকে দেখে বিবিরের অনেক দিন বাদে খুব আনন্দ হল। মনে হল ধরে নিয়ে যাই শুভাকে নিয়ে দেখাই। অনেকক্ষণ আড্ডা দিই। কিন্তু সদু রাজী হল না। বললো আমার যে অনেক গার্জেন রে। তার চেয়ে বরং তুইই চল আমার সঙ্গে। আমি খুব দূরে থাকি না। কাছেই ফার্ন রোডে থাকি। চল না বাড়ীর সবাইর সঙ্গে তোকে আলাপ করিয়ে দিই। বিবিরে রাজী হয়ে গেলেন এবং নিজের এহেন ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যাবার পথে তাঁর অট্টালিকার দারোয়ানকে বলে গেলেন মেমসাহেবকে বলতে যে তাঁর ফিরতে একটু দেরী হবে। সদু বললেন, তুই এই বাড়ীতে থাকিস? কোন তলায় রে। ১৮ তলায় শুনে বললেন, একদিন আসতেই হবে রে তোর বারান্দা থেকে কলকাতা দেখবো। কেমন লাগে দেখতে হবে। তারপর একটু থেমে বললেন বঙ্কা তোর মনে আছে কলেজে থাকতে আমরা একবার মনুমেন্টের ওপর উঠেছিলাম? তুই-ই যোগাড়যন্ত্র করে অনুমতি এনেছিলি। আমরা দারুণ মজা করেছিলাম। বিবিরের মনে ছিল না। মনে পড়ে গেল। অথচ এই মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর ধারণাই ছিল না সেদিনের কথা তাঁর মনে আছে। এখন কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। তাঁরা তিন বন্ধু উঠেছিলেন। সদু তিনি আর সোমেন। সোমেন পরীক্ষা দেবার
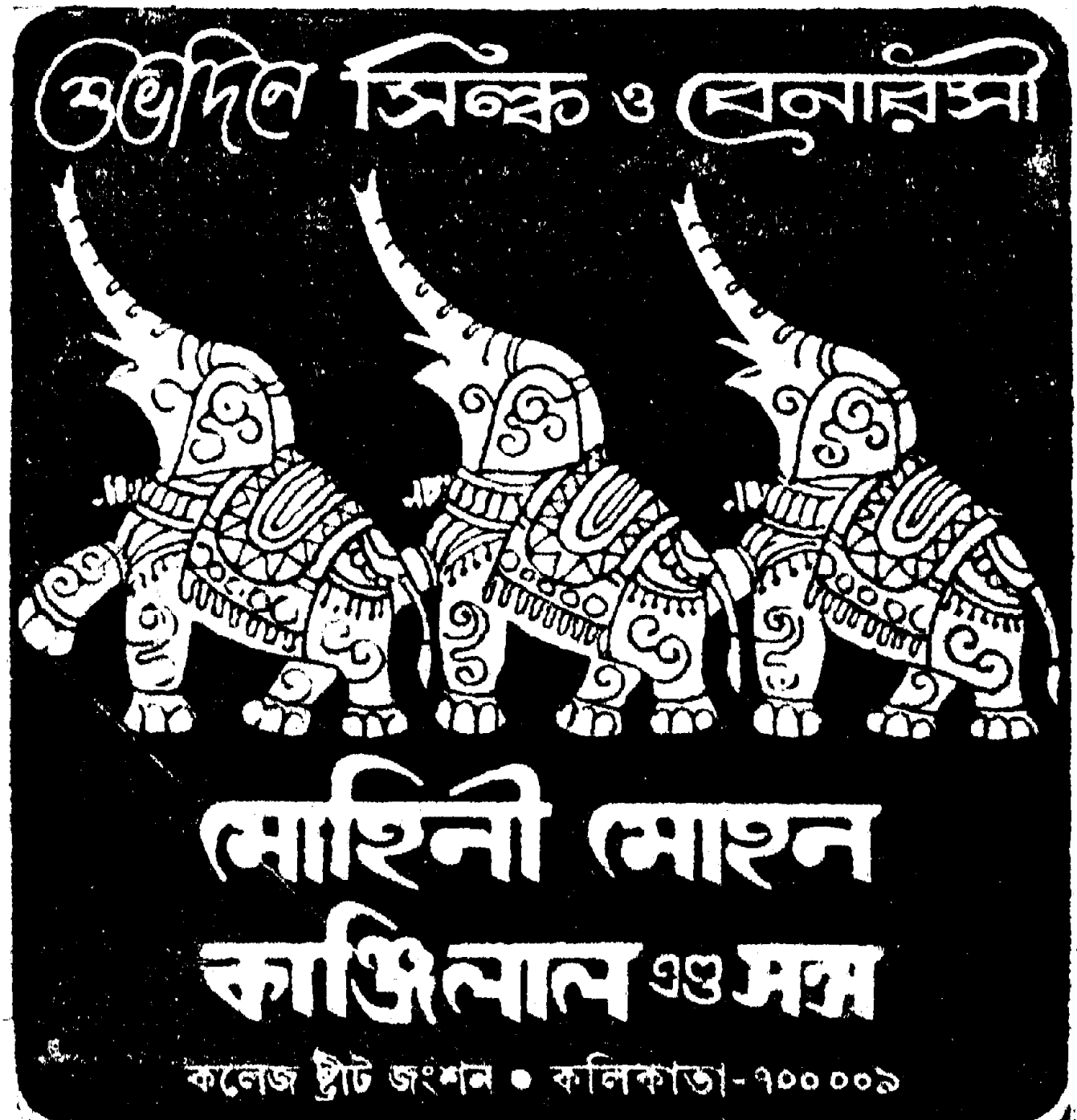
আগেই টাইফয়েডে মারা যায়। নেমে এসে তাঁরা এক ঠোঙা চিনাবাদাম আর তিন পুরিয়া ঝাল নুন খেয়েছিলেন। কত বছর আগের কথা অথচ সে হাওয়ায় যে গন্ধ ছিল সে গন্ধ যেন তার নাকে এসে লাগল।

সদুর বাড়ীতে পৌঁছবার আগেই রাস্তায় সদুর ছেলের সঙ্গে দেখা হল। বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। আজ পনেরো মিনিট দেরী হয়েছে সদুর ফিরতে তাই এই উৎকণ্ঠা। সদুর সুশ্রী চেহারাটি ছেলে পেয়েছে। বললো কোন একটা ছাপাখানায় কাজ করে। বাড়ীর দরজায় দুজন মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেই অল্প বয়সী, একজন বিবাহিতা আরেকজনের বিয়ে হয় নি। বিবিরকে দেখে ওরা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। সদু আলাপ করিয়ে দিল। একটি পুত্রবধূ—সদু বললো আমার পাগলী মা। আর অনাত্মজ কন্যা এম-এ পড়ে। ওরা প্রণাম করল তারপর সবাই মিলে ভিতরে ঢুকে সদুর ঘরে বসল। সদুর ঘরখানি ছোট একটা তক্তপোষ একটা টেবিল একটা আলনা আর টেবিলের ওপরের দেওয়ালে সস্তা কাঠের তাকে কয়েকটা বই।

বাড়ীর লোকেরা সদুর দেরী দেখে সত্যিই ভাবনা করছিল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই সদুর পুত্রবধূ বললেন, কাকাবাবু কিছু মনে করবেন না আপনার বন্ধুকে আমরা বকবো। তার পরেই বললো, আচ্ছা বাবা, তোমার ওষুধ খাবার সময় সাড়ে সাতটা তুমি কথা দিয়েছো আমাদের যে তুমি ঠিক সময়ে ফিরবে আর এটা কি হচ্ছে? কাল দেরী করে ফিরেছো আজও তাই। তোমার ছাত্ররা এমনটি করলে তাদের কি শাস্তি দিতে? সদু কিছু বলার আগে মেয়ে যোগ দিল। মা কলকাতায় নেই আর তুমি যা ইচ্ছে তাই সুরু করেছো। বড় মামার অত অসুখ তাই তো মা জলপাই-গুড়ি গেল তখন তো বলেছিলে তুমি যাও আমি ঠিক নিয়ম মতো চলবো, এই তার নমুনা? সদু বেশ অপ্রতিভ হয়ে বললো, তোমরা যে বঙ্কাকে কিছু খেতে না দিয়ে আমায় বকাবকি করছো এটা শুনলে তোমাদের মা কি বলবেন সেটা একবার ভাব তো? তারপরই বললেন, জানিস বঙ্কারা ওই নতুন বাড়ীটা হয়েছে 'গগন-লেহী' তার সবচেয়ে ওপরে তলায় থাকে। আমাদের যেতে বলেছে ওখান থেকে কল-কাতা কেমন দেখায় দেখতে। ওরা খুব খুশী হল। বললো মা ফিরুক নিশ্চয় যাব।

সদুর বধূ মাতা খাবার নিয়ে এল—চিঁড়ে মটর শুঁটি ভাজা আর হালুয়া। সকালবেলা বিবিরে এক প্লেট দই ছাড়া কিছু খান না। কিন্তু আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। মনে পড়ে গেল মা হালুয়া বানাতেন বিকালবেলার জল-খাবারের জন্য বাবা বলতেন কচুরীর সঙ্গে ফাউ দেয় যে খাবার সে খাবার তুমি কষ্ট করে বানাও কেন? মা বলতেন তুমি বাঙালই রয়ে গেলে এটার নাম মোহন ভোগ বাজারের হালুয়া নয়। সদুর মেয়ের নাম কৃষ্ণা দর্শনে এম-এ পড়ে। প্রশ্ন করলো কাকাবাবু আপনি চায়ে ক' চামচ চিনি খান? বিবিরে ৬৫ কিলোর চা খান দুধ চিনি ছাড়া। এতে চায়ের খাঁটি গন্ধ পাওয়া যায়। আজ ওর কেমন মনে হল হয়তো পুরানো দিনের সেই চাও এখানে পাওয়া যাবে। তাই বললেন তোমরা যা খাও আমায় তাই দিও।

সদু আর তিনি অনেকক্ষণ গল্প করলেন। অনেক সুখ দুঃখের কথা হল। বিবিরে সে সকালের জন্য বঙ্কুবিহারী রায় হয়ে গিয়েছেন। শুভার কথা বললেন। সদু তাঁর স্ত্রী উঁধার কথা বললেন। কেমন করে সীমিত আয়ের মধ্যে গত আটত্রিশ বছর এই সংসারের তরী তিনি চালিয়ে নিয়ে এসেছেন সে কথা বললেন।

সদু আরো বললেন, তুই বোধহয় আশ্চর্য হয়ে গেছিস ওদের আমার ওষুধ খাওয়ানোর ঘটা দেখে। আসলে আমার পেটের একটা গোলমাল হয়েছে। ডাক্তার আমায় স্তোক দিচ্ছে। আসলে ক্যানসার হয়েছে। ওই রোগের চিকিৎসা বড্ড খরচের তাই হোমিওপ্যাথি করছি। বাড়ী শুদ্ধ লোক কিন্তু খুব ভেঙ্গে পড়েছে। যদিও এখন একটু ভাল আছি। মেয়েটার একটা বিয়ে দিতে পারলেই আমার কাজ শেষ। আর যদি নাই দিয়ে যেতে পারি—তাতেই বা কি? লেখাপড়া শিখেছে। আমার ছেলে স্নেহপরায়ণ কর্তব্যপরায়ণ। আমার বৌমা একটু মুখরা সে তো তুই দেখলিই। কিন্তু অসম্ভব স্নেহশীলা। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মা যেন ফিরে এসেছে। আমার বয়স পঁয়ষট্টি হল। একদিন না একদিন তো যেতেই হবে, আর যেতে হলে একটা দরজা খুলতেই হবে। উষা প্রথমটা একটু একলা হয়ে যাবে। কিন্ত তার দাদু-ভাইকে তো দেখলি না তিনি ঠাম্মার সঙ্গে বাবার মামা বাড়ী বেড়াতে গেছে। ঠাম্মা ছাড়া তিনি চোখে অন্ধকার দেখেন। তাঁর দৌরাত্ম্যে আমার পড়াশোনা মাথায় ওঠে। আমার গল্পের ভান্ডার উজাড় করেও আমি তাকে খুশী করতে পারি না। উষা ওকে নিয়ে ভাল থাকবে।

স্লার্ণ রোড থেকে বঙ্কুবিহারী রায় আবার বিবিরে হয়ে ফিরে আসছিলেন। সদুর ঘরটা বড্ড ছোট তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছিল। তাঁর শরীর খুব ভাল কিন্তু ছোট জায়গায় দমবন্ধ হয়ে আসে। সদু সঞ্চয় করে নি। ক্যানসার হয়েছে চিকিৎসা করার পয়সা নেই। ছেলে যেমন তেমন একটা চাকরী করে। ওঁর ২৮০০ স্কোয়ার ফিটের দুখানা ফ্ল্যাট একখানা করা আস্তানায় ফিরে এসে তাঁর প্রিয় চেয়ারটিতে বসে কাগজ খুললেন। তাঁর কোম্পানীর শেয়ারের দাম বেড়েছে। খুশী হলেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা পড়লেন। ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার টেস্টের বিবরণ পড়লেন। শুভাকে বললেন চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি। শুভাকে বললেন কোথায় যাবে? বিবিরে বললেন যেখানে খুশী। তারপর বললেন চলো গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোথাও না কোথাও গিয়ে পৌঁছব। শুভা বললেন তোমার কি হল হঠাৎ?

বিবিরের কিছু হয় নি। শুধু মাঝে মাঝেই ওঁর মনে পড়ে যাচ্ছে একটা ছোট বিবর্ণ বাড়ীর সামনে দুটি উৎকণ্ঠিত যুবতী দাঁড়িয়ে আছে কারণ ৬৫ বছরের একজন বৃদ্ধর বাড়ী ফিরতে ১৫ মিনিট দেরী হয়েছে। যুবতীরা সামান্যা। বৃদ্ধটিও সফল পুরুষ নয়। অথচ বিবিরের ওদের ওপর ভীষণ হিংসা হচ্ছে। আর এই হিংসা হচ্ছে বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। ওদের হিংসে করার কিছু নেই।

রক্তের সম্পর্ক কত নিকট সম্পর্ক

Glaxo
ग्लैक्सो
मिनाडेक्स
स्वस्थ रक्त और
नयी शक्ति के लिये

মিনাডেক্সেরও নিকট সম্পর্ক আছে আপনার রক্তের সঙ্গে!

সুস্থ রক্ত ভালো স্বাস্থ্যের আধার। আর সুস্থ রক্তের জন্যে দরকার লৌহতত্ত্বের। মিনাডেক্সে প্রচুর পরিমাণে লৌহতত্ত্ব থাকার দরুণ এর প্রত্যেক চামচে আপনার রক্তের পুরোপুরি লাভ হয়।

সুস্থ রক্তের জন্যে

মিনাডেক্স®

CAS GM-19-908 BM

লম্‌পো

বাসুদেব দেব

'গগন রে, ছুট্যে চল। সব্বোনাশ হইচে রে' সারা গায়ে কাদা, রাতজাগা চোখ দুটো করমচার মত। বাঁধ ধরে ছুটতে ছুটতে গগনকে দেখে হাঁক পাড়ে নিতাই। বাঁধ ভেঙ্গে গেল রে। পারলম না।' নিতাইর পিছনে পিছনে গাঁয়ের আরো অনেকে। কেষ্ট, মনিরুদ্দিন, লখাই। রাতভর বাঁধের ওপর পাহারা দিচ্ছিল।

খেপলা জালে মাঠের জলে কুচো চিংড়ি, ভেটকির চারা, কৈ মাছ ধরছিল গগন। কদিন ধরেই বিষ্টি, পুবো হাওয়া। মাঠে এক কোমর জল। বিছন সব ডুবে গেছে। আকাশে ছেঁড়া খোঁড়া ময়লা মেঘ। গরু ছাগলেরও বেরুবার জো নেই। গগন একবার নিতাইদের দিকে তাকায়। 'ছুট্যে চল। জল ঢুকছে হু-হু করে। গেরাম ঘর সব ডুব্যে যাবে রে!' কেলেঘাইর বাঁধ ভাঙ্গা মানেই সর্বনাশ। এদিকে কাঁসাই গর্জাচ্ছে দক্ষিণে। দাসপুর ঘাটাল ডুবিয়ে জল ইদিকে টানছে এখন হলদির দিকে। খড় পড়লে দু টুকরো হয়ে যাবে। ছিরামপুরের ঘাট প্রায় ডুবে গেছে। আর ওদিকে ক্ষিরাই, চণ্ডিয়ার রূপ দেখ গে। সারা বছর মাটিতে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে থাকে। আছে কি নেই বোঝা দায়। রাখালেরা গরু-ছাগল চরায় নদীর ওপর। বুজে মাঠ হয়ে আছে। রবি চাষের খুব জোর। আর এখন, কোত্থেকে এত জল এসে গেল সবং পিংলার দিক থেকে...বাঁধ ছুঁইছুঁই, জল একেবারে মাথায় মাথায়। চায়ের দোকানে খুব গজল্লা হচ্ছিল। মেদিনীপুরে খুব বন্যা হয়েচে। কাগজে রেডিওতে তার খপর। মিটিং-এর পর মিটিং। সরকারী মানুষ পঞ্চায়েতের লোকজন আর পার্টির বাবুরা খুব ছোটা-ছুটি করছে কদিন। কদিন এক নাগাড়ে বিষ্টি। প্রায় প্রতি বছরই নদীতে জল বাড়ে, বাঁধ ভেঙ্গে মাঠেও ঢোকে। এ জায়গাটা খালা, নাবলে। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে গগন। গা করেনি। কিন্তু কাল থেকে গাঁয়ের জোয়ান মরদ সব বাঁধের ওপর মাটি দিচ্ছিল। বস্তা বস্তা বালি, মাটি, ইট। বাঁশের খুঁটি। সম্বৎসর কনটেক্টারের লোকদের টিকিটিও দেখা যায় না, এখন হ্যাজাক জেলে কাজ হচ্ছে।

গগনের কাজ নেই। ভাগের ঐ ক'বিঘে জমিতে ধান রোয়া হলো এই সবে। সবাই ছুটছে, কিন্তু গগনের কোন মন নেই। কি হবে ঘরে ফিরে। ঐ তো তার ঘর। পাট কাঠি, খড় আর ছেঁচা বেড়ার একটা ছাউনি। একটু বিষ্টি আর হাওয়া দিলেই চিত্তির। আর ঘরের মধ্যে ঐ অতসী, একটা জ্যান্ত কংকাল, কাঁথার সঙ্গে মিশে আছে। নিচের অঙ্গ পড়ে গেছে। বাচ্চ্যাটা হয়ে মারা যাবার পর থেকেই ঐ রকম। কদিনের ধুম জ্বর তারপর ঐ দশা। তাগা তাবিজ, জলপড়া, শিকড়-বাকড় কিছুই বাদ নেই। শেষে ময়না বাজারে মাষ্টারের হুমিও-পেথি তাও হয়েছে। একবার ডুলি করে তমলুকের হাসপাতালেও নিয়ে গিয়েছিল সবাই মিলে, তার কত হাঙ্গামা কত খরচ রে বাপু। তা হলোটা কি?

বাঁধ ভাঙ্গার ভয়ঙ্কর খবরটা শুনেও গগন ছুটতে ভুলে গেল। জালটা গুটিয়ে জল ঝেড়ে পিঠে ফেললো। এখনও টিপটিপ বিষ্টি। সোঁ-সোঁ হাওয়া। আকাশে মেঘের আস্তরণ বেশ পুরু হয়েছে। বাঁধে প্যাঁচপেচে কাদা। কাদার মধ্যে পা হড়কে যায়। লোক ছুটছে। ঐ তো নটবর, গণশা, রাজু...। ঘরবাড়ি, ছেলে বৌ, গরু-ছাগল যার যা কিছু আছে বাঁচাতে সবাই ছুটছে মরিয়া হয়ে।

হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার। বাঁধ ভাঙলো রে।' চীৎকার। রাক্ষুক গাঁয়ে বানের জল নতুন নয়। ছেলেবেলায় গগন দেখেছে এক-বার খুব পেল্লায় বান। স্কুল বাড়িতে উঠেছিল সবাই। খিচুড়ি দিয়েছে বাবুরা। মড়ক লেগেছিল। রিলিপ। হায় হায় কান্না। ভেলায় করে ভেসেছে মানুষ। সেই সব হরে মনে হয়। হোক গে। ভগবানের মার। গগনের ঐ তো এক ছটাক জমি। একটা কুঁড়ে ঘর। আর ঐ একটা পোড়াকাঠ মেয়ে-ছেলে। একটা ছাগল আর দুটো হাঁস। নেয় নিক ভাসিয়ে। যার কপালই ভেসে গেছে তার আবার অত মায়া করে হবেটা কি? ময়নার হাটে, ইস্কুল বাড়িতে নয়তো রাজ্যর গড়ে গিয়ে উঠবে। গগন খাড়ুই থেকে মাছ-গুলো জলে ছেড়ে দেয়। যা, জলের জীব জলে যা। তমলুক গিয়ে দিন মজুরি করে খাবে। এ ভালোই হলো। গগন আস্তে-সুস্থে বাঁধের ওপর এসে ওঠে। ভাঙ্গা কপাল ছাড়া আর কি? নইলে ছিধর চৌকিদারের মেয়ে অন্নর সঙ্গেই তো বে হতে পারতো। তা হলে কি আর জেবনটা এরম ধারা হতো? খড়খড়ে মেয়ে অন্ন। চোখে মুখে কথা কয়। সোয়ামির ঘর ছেড়ে চলে এসেছে গত বছর রাসের সময়। মেলায় দেখা হলো কদ্দিন বাদে। 'তোর খুব কষ্ট না রে।' অন্ন জিলিপি খেতে খেতে বল্লো। 'ধ্যাৎ'। 'তোর মুখ দেখলে আমি বুঝতে পারি, হ্যাঁ।' নাগরদোলায় অতবড় মেয়ে ধেইধেই করে দুললো। একেকবারে শহুরে মেয়েদের মত। দেখা হয় এখনো মাঝে মাঝে। ছুতো নাতায় আসে গগনদের বাড়ি। অতসীকে দেখে যায়। ও এলে তবু মনে হয় একটু যেন হাওয়া বইছে। নইলে ঘরে এলেই গগনের মনে হয় দমবন্ধ হয়ে এল বুঝি। অতসীর চোখে কষ্ট। মুখে গোঙানি। সেদিন সন্ধেবেলা গাব গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যখন বলল অন্ন, 'যাবি নাকি যাত্রা শুনতে বলাই পণ্ডা? চ না. চোখে ঝিলিক। কিন্তু অতসীর কথা মনে পড়লেই কেমন নেতিয়ে যায় গগন।

'বেটাছেলে নাকি তুই' ঠমক তুলে চলে গেল অন্ন। আর অন্ধকারে হা-হা করে উঠলে গগনের বুকটা। শালা, এটা কি একটা জেবন? মানুষের জেবন? যাক ভেসে যাক সব। গগন নতুন করে সুরু করবে।

গগনের যেন তাড়া নেই। চারদিকে সোরগোল। মাঠের জলে যেন স্রোতের টান। জালটা কাঁধে ফেলে গগন অভ্যাস বশেই গাঁয়ের দিকে হাঁটতে সুরু করে। কিন্তু ভিতরে যেন মেঘের গুরুগুরু। কেলেঘাই-এর ছোবল। কাঁসাইয়ের টান। হোক কিছু একটা। এসপার কি ওসপার। কিছু নেই বাঁচাবার মত। সব মরেই আছে। বান চলে গেলে আবার ঘর বাঁধবে গগন। ভিটে আরো উঁচু করবে। যদি অন্ন এসে পাশে দাঁড়ায়। সব হবে। আর অতসী? খচখচ করে মনের মধ্যে। জিওল মাছের মত খলবলিয়ে ওঠে। জলের তোড়ে কত মানুষ ভেসে যায়, কত শক্ত সমর্থ মানুষ ডুবে যায়। আর অতসী তো পাশ ফিরে শুতে পারে না, চেঁচাতে পারে না গলা ফাটিয়ে। কেউ জানবে না, বুঝবে না। কত খেতি তো মানুষের হয়। দুদিন আহা উঁহু করবে পড়শীরা। কিন্তু

জেবন কি আর থেমে থাকে? মনে রাখে কিছু?

হাঁড়িকুঁড়ি, মাদুর চেটাই, হাঁস মুরগী, মাগ ছেলে নিয়ে লোকজন সব বেরুতে সুরু করেছে। বোচকা-বুচকি সামলাতে সামলাতে জল ভেঙ্গে আসছে বাঁধের দিকে। গাঁয়ের তিন দিকেই উঁচু সরকারী বাঁধ। খাল, বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে আসছে সবাই। জল ঢুকলে ঐ সাঁকো, পথঘাট, সিমেন্টের কালভাট কিছুর চিহ্ন থাকবে না আর। তেখন নৌকো আর ভেলা ছাড়া উপায় নেই। নইলে সাঁতার কাটো, ডুবে যাও। ময়নার ইস্কুলে হাটে, বি ডি ও অপিসে, রাজবাড়ির সেকেলে গড়ে গিয়ে উঠবে সব। সেখেনেও যদি জল ওঠে। উরে ব্বাস। অতসীকে বাপের বাড়ি পাইঠ্যে দিয়েও কোন ফল হয়নি। কেঁদেকেটে চলে এসেছে। এখন বোঝ। ডুবে মরতে সাধ হলে আর বাঁচাবে কে?

একদল বাচচা ছেলে যেন খলখল করে ধেয়ে আসছে। জল। খোলা বেনো জল। মাঠের জলে স্রোত লেগেছে, বাঁধের কিনারা ঘেঁসে জল বাড়ছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এতো! লক্ষণ তো ভালো নয় বাপু। মাঠ পেরিয়েই গ্রাম। সাদা ফেণা, খড়কুটো, ভাঙ্গা কাঠ, গাছের শিকড়, ধানের চারা... ভেসে যাচছে। হু-হু করে জল বাড়ছে। জল এখন ঘোলাটে নয় আর। নদীর জল আসছে। হাই ভগবান। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, ননী বুড়ো আসছে পেছনে আর ডাক পেড়ে কাঁদছে। ওর ছোট্ট কুঁড়েটা ছিল বাঁধের ঠিক নিচে। ধান পাহারা দেবার ছাউনি। সেখেনেই কবছর ধরে ছিল। ভিক্ষে করতো আর এক ফালি জায়গায় শশা ঝিঙে লাগাতো। লাঠিটা কাদায় ডুবে যাচছে। হাঁফাচ্ছে আর কাঁদছে। 'ওরে আবাগীর বেটারা, দেখে যা আমার সব গেল রে...।' গগন বুড়িকে ধরে, নইলে পড়ে যেত মুখ থুবড়ে।

'ওরে, বত্তোর মধ্যে চারটে ট্যাকা ছেল রে!' 'কেঁদে আর কি হবে? এখন চলো তো। নইলে এ বাঁধ ভাঙ্গলে আর দেখতে হবে না।'

'এঁকি সব্বনেশে কান্ড বাপু। এতোটা বয়সে এমন ধারা কখনো হয়নি রে। পাপ। পাপে ভরে গেচে সব।'

ধক করে ওঠে গগনের বুকটা। পাপ। কার পাপ? ধুৎ, ওসব ছেঁদা কথা। চোখের সামনে গগন যেন দেখতে পায় ওর ঝুপড়িটা জলের তোড়ে ভেসে যাচছে। অতসী ফ্যাল-ফ্যাল করে চারদিকে চাইছে, গগনের জন্য, জল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সাপের মত জড়িয়ে ধরছে কাঁথা বালিশ, টানছে তার হাত-পা ধরে, চোখ দুটো ছিটকে আসতে চাইছে বাইরে, উঃ বাপ রে! ছাগলটা নিশ্চয় দড়ি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করবে। হাঁস দুটো ভাসবে। আর অতসী...

'চ বাপ, হাতটা এট্টু ধর। ঠাওর হয় না চক্ষে ছানি পড়েছে ননী বুড়ির চোখে। সাতকুলে কেউ নেই। ননী বুড়ির রুগ্ন হাতটা গগনের মুঠোয়।

আর অতসী...অতসী একটু একটু করে ডুবতে থাকবে, শেষে জলের তোড়ে ভেসে যাবে...একটু একটু করে দমবন্ধ হয়ে...উঃ বাপ রে...

'কি হলরে, সাপ নাকি নি?' ননী বুড়ি আৎকে ওঠে। 'তুমি নিজে আসো বুড়ি। আমার ঘরবাড়ি বুঝি ভাইস্যে যায়।

ননী বুড়ির হাত খসে পড়ে গগনের মুঠো থেকে। 'সময় নাই গো। বড় দেরী হই গেছে!' ননী বুড়ি চেঁচায়, 'ওরে ফেলে যাসনে, গগন। নক্ষী ছেলে। বাপ আমার। আমার যে কেউ নাইরে। চক্ষে দেখতে পাইনে। বাপ আমার...হাই রে..., বাঁধের নিচে গজরাতে গজরাতে ছুটছে জল। গেরুয়ায় আর নীলে মাখা-মাখি। ঠান্ডা। হিংস্র। বুড়ির চীৎকার বিঁধে যায় গগনের বুকে। থমকে দাঁড়ায়। ফিরে এসে বুড়িকে পাঁজাকোলে

করে তুলে নেয়। কাদায় গোড়ালি ডুবে যায়। ছুটতে পারে না। কিছুদূরে গিয়েই বাঁধের পাশে পাঁচু ঠাকুরের থানের সামনে বসিয়ে দেয়। এখেনে বসো চুপ করে। উ'চু জায়গা, ভয় নাই, ঠাকুরের থান। আমি ছুট্যে যাব, পরে এসে তোমাকে নে যাব বুড়ি।' বুড়ি তার শুকনো আঙুল দিয়ে কাঁকড়ার মত গগনের গলা খিমচে ধরে, কিছুতেই ছাড়বে না। 'যাস নে বাপ'।

বড্ড দেরী হই গেল গো।' গগনকে কে যেন চাবকাতে থাকে। 'আ'ঃ, ছাড়ো, ছাড়ো এখন।' গগন শক্ত হাতে বুড়ির আঙুল ছাড়িয়ে নেয়। বুড়ি ক'কিয়ে উঠে 'মারছু তুই?' 'চুপ করে বসে থাকো ইখেনে।' জালটা বুড়ির পাশে ঝুপ করে ফেলে রেখে গগন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। 'জালটা দেখো!'

'চক্ষু নাই। কি দেখবো রে, অ্যা?' না বলে মাঠ ভাসিয়ে জল ছুটেছে আর পাল্লা দিয়ে ছুটেছে গগন। বড্ড দেরী হই গেল গো!

*

যা ভেবেছিলো তাই। বাঁক ঘুরতেই পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে দেখা। মাধাই, রেজা, ভবা পাগলা, সবাই ভিটে ছেড়ে বাঁধে উঠে আসছে লটবহর বালবাচ্চা নিয়ে। জলে সাঁতরে, ভেলায় করে, যে যে রকম পেরেছে। রাস্তা এখন জলের নিচে। এইটুকু সময়ের মধ্যে এ রকম কান্ড হবে কে ভেবেছে! খালের জল উপচে সব একাকার। গাব গাছটা দেখে ঠাহর করা যাচ্ছে গগনের ঘর। নন্দ সাপুই-এর নৌকো খেয়া ঘাটে মাল বইতো ছিরামপুরে। এখন সেটা খালের ওপর মানুষ-জন হাঁস মুরগী চাটাই পাটি, বোঁচকা-বুচকি হাঁড়ি-কুঁড়ি এন্তেবাচচায় ভর্তি। খুব টাকা কামাচ্ছে নন্দ। খেপের পর খেপ দিচ্ছে। বাঁধের গায়ে গিয়ে ভিড়ছে। বৌ বাচচা মালপত্র খালাস করে আবার যাচ্ছে পাড়ার দিকে। হাঁক-ডাক, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি। বাচচা-গুলোকে পিঠে নিয়ে এক কোমর জল ভেঙে নৌকোয় তুলছে শিবু। গগনকে দেখে হাঁক দেয় 'কোথায় ছিলি?' উত্তর দেয় না গগন। বাঁশের সাঁকোটা ডুবে গেছে, বোধহয় ভেসেই গেছে। বাঁশের ডগা জলের তোড়ে কাঁপছে। তাই নিশানা করে গগন ঝাঁপ দেয়। সাঁতরে গিয়ে কোমর জলে দাঁড়ায়। পায়ের তলায় মাটি পায়। সাহস আসে বুকে। এতক্ষণে নিশ্চয় ঘরে জল ঢুকে ভাসিয়ে নে গেছে সব। আঃ, হা রে। অনেকেই আগে থেকেই খবরপত্র শুনে তৈরী ছিল, দু'দিন ধরে শলাপরামর্শ হাঁক-ডাক চলেছে। কেবল গগন কান দেয় নি ও সবে। যা হবার হবে। পায়ের নিচের পথ চিনে এগোয় গগন। এই পথঘাট মাঠ সব কিছু গগনের নখদর্পণে। কোথায় নালাল, কোথাও টিলা, কোথায় পুকুর। এখন দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে পায়ের নখে মাটি টিপে টিপে গগন এগোয়। গাব গাছটার কোল পর্যন্ত জলে এসে গেছে। পথঘাট আর নেই। নন্দর নৌকোয় এনে যদি তুলতে পারতো অতসীকে। নৌকো নিয়েও কাড়াকাড়ি এখন। পয়সা কোথায়? ভেলা করে নিতে পারলেও হয়। কিন্তুক গগনের কলাগাছ নেই। হাতে সময়ও কম। অন্নদের কলা বাগান আছে। জল ভেঙে গগন ছুটতে চেষ্টা করে, পারে না। গলার কাছে একটা কষ্ট গুটুলি পাকিয়ে আছে। ননী বুড়ি বলছিল, পাপ। ভিজে গেছে সারা শরীর, কাঁপুনি লাগছে। সোঁ সোঁ হাওয়া। জলে টান বাড়ছে। একটা বাঁধ ভাঙলেই কাঁসাই। কোন রকমে গড় ময়নার মজবুত উ'চু বাঁধে নিয়ে যদি তুলতে পারে অতসীকে। ওদিকে তেমন ভয় নেই। আকাশ গুড়গুড় করে ডাকে। বুকের ভিতরটা হু হু করে ওঠে। জল বাড়ছে। কাছাকাছি কাউকে পেলে ভালো হতো। একলা সে কি শারবে? গিয়ে কি দেখবে কে জানে! ভেসে গেছে বোধহয়। এক কোমর জল ভেঙে সেজা ভায় বউ ছেলে নিয়ে চলছে, ছেলেটাকে তুলেছে কাঁধের পাল গাছের কাছে পেঁৗছে গেছে নেত্য, গগন চীৎকার করে 'আমার ঘরের খবর কি খুড়ো, আছে না ভেসে গেছে?' নেত্য কি বলে শোনা যায় না। 'ও খুড়ো...' 'জানি নে।' নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই। মড় মড় করে একটা ঘর ভেঙে পড়লো ও পাশে। কারা যেন চীৎকার করছে। গগনের থামবার উপায় নেই। গগন হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের চালাটার দিকে ছুটে যায়।

'অতসী, ভয় নাই রে।' হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে ভেসে যাচ্ছে এদিক ওদিক। ঘরের ভিটে ডুবে গেছে জলে। পাট কাঠির বেড়াটা পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই অবাক হয়ে যায় গগন। বাঁশের মাচার ওপর অতসীকে কোলে নিয়ে বসে আছে অন্ন। অন্নপূর্ণা। 'এত দেরী করলি?'

'সময় আছে, এখনো সময় আছে।'

গগন অন্নর কোল থেকে অতসীকে তুলে নেয়। অতসীর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো জল মানের জলে। শীর্ণ আঙুলে গগনের বুক আঁকড়ে ধরে সে। অন্ন কখন ঘরের টুকিটাকি জিনিস, থালা বাটি, কাঁথা কানাকি, ঠাকুরের পট যা হাতের কাছে পেয়েছে বোঁচকা বেঁধে নিয়েছে।

'ছাগলটা?'

'সেটা বিকেল থেকেই ছেল নি। ওরা ঠিক বুইঝতে পারে। উঠে গেছে বাঁধে সেচ্চয়,' গাছ কোমর করে শাড়িটা পরে নেয় অন্ন। জল ভেঙে ওরা তিনজন এগোয়। অতসী বিড়বিড় করে কি যেন বলে। একটা গোঙানি। জড়িয়ে যায় কথা। কানের কাছে মুখ নিয়ে যায় গগন। 'কি বুলছিস এাঁ?' রেগে যায় সে। অন্ন কি যেন বোঝে। বলে 'তুই এগো। আমি আসছি।' 'কি আসবি?' জলের মধ্যে থপথপ করে আবার ঢুকে যায় ঘরে। আঁতিপাঁতি করে কি খোঁজে। কি একটা নিয়ে আবার ছুটে আসে। 'চ, তাড়া-তাড়ি চ' 'কি বলছিল রে? কি আনলি?'

তোবড়ানো টিনের কুপি বাতিটা বোঁচকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে দিতে অন্ন উদাসীন গলায় বলল: 'মনমোরে' ...

টান
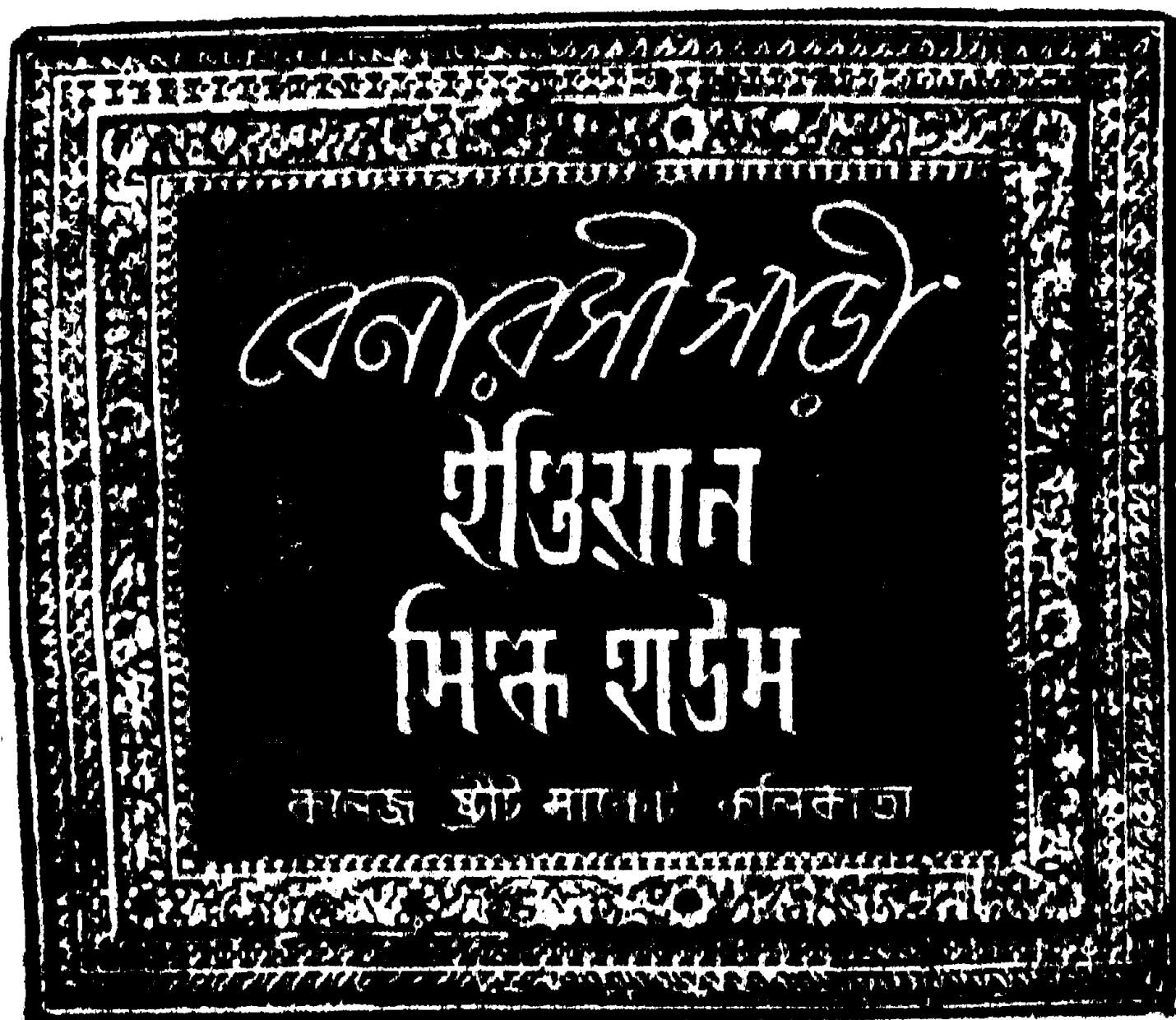
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

তখনো ভালোমত ভোর হয়নি। হাওয়ায় বেশ একটা শীত লেগে আছে। এণ্ডির চাদরটা ঠিকঠাক গায়ে জড়িয়ে নেয় গঙ্গাপতি। ভোর সময়টা বড় শান্তির, সিঁড়ি ভেঙে দোতলা থেকে নেমে আসার সময় কেন যেন একথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল তার। নিচের দালানের দেয়াল আলমারির সামনে এসে কি আশ্চর্য, সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কাচের পাল্লা দুটো হাট করে খোলা। জানলা দিয়ে প্রথম ভোরের ময়লা আলো এসে পড়েছে দালানে, তাতে স্পষ্টই দেখা যায় আলমারির মাঝের তাক থেকে রুপোর হুঁকোটা উধাও। নিখোঁজে পাওয়া জিভজাকৃতি আনকোরা টেবিল ঘড়িটাও। আরও যে কি নেই, আর খুঁটিয়ে দেখতে সাহস পায় না সে।

দালানের শেষে খিড়কির দরজার একটা পাল্লা বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে। নির্ঘাৎ গতকাল খিল দিতে ভুল হয়েছিল তার। ফাঁকটুকুর দিকে গাঢ় চোখে তাকাতেই সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। এণ্ডির চাদর জড়ানো তার গোটা বুকের ভেতর কে যেন হায় হায় করে ওঠে। হুঁকোটাই যখন গেল, তখন আর রইলটা কি। এতোদিন কোনমতে বেঁচে থাকার সবটাই বুঝি বিলকুল মিথ্যে হয়ে গেল। ইস, ছি-ছি-ছি...

ডাবল অ্যাকশান টুথ ব্রাশে লম্বা করে বেশ খানিকটা পেস্ট লাগিয়ে ছিল সেই কখন। অন্যমনস্ক হয়েছিল হাতটা। ব্রাশ থেকে ঠাণ্ডা পেস্টটা থুপ করে পায়ের বুড়ো আঙুলে খসে পড়তে ফের যেন আক্কেল ফিরে এলো তার।

সিঁড়ির নিচটায় একফালি চটের ওপর গোল্লা পাকিয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল ভেকু। বাড়িতে এতোবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কোনো বিকার নেই। কোনাকুনি এগিয়ে যায় গঙ্গাপতি। পা হাত নিশপিশ করে ওঠে। সাত-পাঁচ ভাবার আগেই প্রায় দম বন্ধ করে ভেকুর পাছায় কষিয়ে দায় এক লাথি। মাজন সুদ্ধ পায়ে। শালা বিশ্বাসঘাতক... নিমকহারাম...বেরোও শালা কুত্তার বাচ্চা... গিলেছে নাকি ঘুমের ওষুধ... গিলে বসে আছো...। খিড়কি খোলাই ছিল। আচমকা আঘাতে ওরকম অভাবিত লাথি খেয়ে দৌড়ে ঝেড়ে পালাতে ভেকুর কোনো সময়ই লাগে না। কেউ কেউটা পর্যন্ত

আটকে গেলো গলায়। সত্যিই এমন নির্মম আঘাত যে গঙ্গাপতি করতে পারে, ভাবতে পারেনি সে নিজেও। নিজের এমন অনেক ব্যাপারই ভাবতে পারে না গঙ্গাপতি। যদি পারতো, তাহলে সে কি আর মার্চেন্ট ফার্মের কর্মণিক হতো, নাকি এই বিয়াল্লিশ বছরে দুম করে একটা বিয়ে করে বসতো। কিম্বা এত সহজে চুরি হয়ে যেতো তার রায়বাহাদুর বংশের শেষ স্মৃতি, মণিপুরী নকসা করা ওই মস্ত রুপোর হুঁকো। হুস করে একটা বড়সড় শ্বাস ফেলে সে দালানের একধারে উপুড় করা প্লাস্টিকের বালতির ওপর বসে পড়ে। শূন্য চোখে তাকায়। হু-হু করে ওঠে বুক। বড় লাগে। হুঁকোর উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। মনে মনে বলে ওঠে, অপরাধ নেবেন না স্বর্গীয় পিতামহ। পোড়া কপাল আমার। এতোদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝিনি, ওই হুঁকোর ছদ্মবেশে আসলে আপনিই ছিলেন আমার ঘরে। না হলে হুঁকোর দিকে তাকিয়ে রোজ রোজ কেন অমন হতো আমার। আর কেউ না দেখুক, আপনি তো আড়াল থেকে দেখেছেন সব। বলুন, এতে আমার কি দোষ।

চুরি করা যে মস্ত পাপ, পানু ভালোরকম জানে।

জানে বলেই এ পাপ কাজটা প্রথমে সে করতে চায়নি। তবে কিনা খিড়কির দরজাটা খোলা দেখে, হঠাৎ পুরোনো কুবুদ্ধিটা কেমন চাগাড় দিয়ে উঠলো মগজে। সামলানো গেলো না লোভ। নির্বিঘ্নে ঘটে গেল ব্যাপারটা। কাকপক্ষীও টের পেল না। তবু, এত সুন্দর রাজার মতো হুঁকোটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে কেমন লজ্জা লজ্জা হয়। চোরাই দ্রব্য তো।

বহুদিন হলো পানু আর এসবের টাচে নেই। বুকে তাই এখনো একটা ভয় ফুটো বলের মতো মৃদু লাফ খায়। সকাল হলো বলে। বস্তির লোকজন দু-চারটে করে জাগতে শুরু করেছে। বাড়ি ফিরে বন্ধ ঘড়িটায় দম দিয়েছিল পানু। এখন সময়ের সেই টিকটিক শব্দটা যেন তাকেই সাবধান করে দ্যায়। এসব মাল আর বেশীক্ষণ ঘরে রাখা ঠিক নয়। কোথা দিয়ে কি কেলেঙ্কারী হয়ে যায় তার ঠিক আছে। আজকাল বউটাও জানতে পারলে...। পানু রে, ভালো চালছো এইবেলা নমো নমো করে সটকে দে সব। এখনি আর তোকে এসব মানায় না। বড় পাপ পাপ লাগে। পানু জানে। সেই সেই মালেও বেশ খানিকটা রুপো আছে হুঁকোটাতে। মাল থুব একটা খারাপ পাওয়া যাবে না। আর রিস্কও তেমন নেই। এখন কেবল, বড় রাস্তার মোড়ে, ওই বুড়ো স্যাকরাটাকে গছাতে পারলেই, ব্যাস। তারপরেই ভদ্দর লোক। এসব আর একদম নয়।

বটেই তো। ইদানিং পানু বলতে লোকজন প্রায় ভদ্দর লোকই বলে গ্যাছে। বউটুকুনি আপনজন কাজে জোটেছে তা প্রায় পুরো

দেড়েক হতে চললো। ফিল্মি লাইনের লোক হলে কি হবে, বটুদা রিয়্যালী সাচ্চা আদমী। আসলে জাত মাতাল তো। এসব লোকেরা সাধারণত ভালোই হয়। না হলে কে আর চোর-বাটপাড়, টিকিট ব্ল্যাকার কে ডেকে কাজ দেয়। কাজের জন্যে আবার একটা ধড়ধড়ে পুরোনো সাইকেলও দিয়েছে। একই ছবি যখন দুটো হলে চলে, তখন ফিল্মের বাকস বয়ে আনার কাজ। খাটনি আছে। কিন্তু খারাপ লাগে না পানুর। বেশ ভদ্দর ব্যাপার। তাছাড়া যখন খুশী ফিরিতে সিনেমা। পয়সাও মন্দ নয়। আর বেস্পতি, শুক্কুর এই দুটো দিনভোর রাতে দেয়ালে দেয়ালে ছবির পোস্টার মারার কাজটা সে মাস কয়েক হলো নিয়েছে। উপরি যা আসে আরকি। ভোর রাতে আটার বলতি, আর ছোট্ট মই ঘাড়ে আজতো সে পোস্টার সাঁটতেই বেরিয়ে ছিল।

এসময় রাস্তাঘাটে মানুষজন বড় একটা থাকে না। ফাঁকাই থাকে বরাবর। সারা শহর জুড়ে বেশ একটা ঘুম ঘুম ভাব। কেবল ঘুমের অরুচি রাস্তার খেঁকুরে নেড়ী কুকুরগুলো ডাইনীর মতো জেগে থাকে। মই কাঁধে পানুকে গলিতে ঢুকতে দেখলেই বিটকেল চেল্লায়। অকারণে উৎপাত করে। তেড়ে আসে। প্রথম প্রথম ভড়কে যেতো পানু। কখনো ইঁট কুড়িয়ে মারতেও। ফল হয় না তাতে। শালারা আরও চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে। বরং কিছু না বললে এমনিতেই চুপ মেরে যায়। আজকাল সে তাই করে।

যেন ভীষণ ব্যস্ত, এমনভাবে পোস্টার সাঁটতে সাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছিল পানু। সবে আলো ধরছে আকাশে। কনকনে ভোরের হাওয়ায় বারবার শুকিয়ে যাচ্ছিল তার আটা মাখানো হাত। বড় সুনসান, নিস্তব্ধ চারপাশ। ঘাড় উঁচু করলে দেখা যায়, আকাশের এক-ধারে হুবহু চিনির বাতাসার মতো ফ্যাকাশে মেরে পড়ে আছে পাতলা চাঁদ। কোনো আলো নেই। রাস্তার বাঁকে একটা বাড়ির চৌহদ্দি ঘেরা পাঁচিলে মই লাগিয়ে চড়চড় করে উঁচুতে উঠে যায় পানু। হাতের মুঠোয় জড়ো করা আঠা মাখানো পোস্টার। একটু কাত হয়ে কাগজটা পাঁচিলে সাঁটছিল যখন, ঠিক তখনই হুড়মুড় করে বেগটা এলো। ইদানিং তার পেটটা ভালো যাচ্ছিল না। আর সে এক সব্বোনাশে বেগ। মুহূর্তে চোখ-মুখ ধোঁয়াশা করে দ্যায়। বোধ-বুদ্ধি সব কোথায় লোপাট হয়ে যায়। কেবল এক চিন্তা, কোথায় যে করা যায়। মইয়ের উঁচুর ধাপে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ওপারে বাগানটা দেখতেই চোখে পড়লো, ঠাকুর-ঘরের মতো ছোট্ট সেই ঘরটা। আর কোনো কিছু না ভেবেই সে পাঁচিল টপকে ঝপ করে বাগানে লাফিয়ে পড়ে। তারপর গম্ভীর মুখে হনহন করে সেই নির্দিষ্ট ঘরটায়।

মিনিট কয়েক পরে সেখান থেকে বেরিয়ে বড় ভালো লাগছিল তার। কার বাড়ি কে জানে। হাসি পাচ্ছিল পানুর। হঠাৎ খিড়কির দরজাটা ভোরের হাওয়ায় অল্প ফাঁক হয়ে যেতে ছ্যাত করে উঠলো মাথাটা। যাবো কি যাবো না, ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে গেলো দরজার সামনে। ইচ্ছে ছিল না ঢোকার। পুরোনো লোভটা ভারি ছোঁক ছোঁক করে উঠলো। কোথাও কেউ নেই। অসহ্য নিরাপদ। আর যেন সহ্য হলো না তার। কিছু নিই বা না নিই অন্ততঃ ঢুকে তো একবার দেখি—এই ভেবেই ঢুকে পড়ল পানু। আর পড়তো পড় সামনেই একটা পেল্লায় দেয়াল আলমারি। তাও আবার চাবি নেই। পেতলের হাঁসকল ধরে টানতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। কাছে পিঠে একটা কুকুরের গলার ভুক ভুক শব্দ হয়। সতর্ক হয়ে চারপাশ তাকায় পানু। কোনো বিপদ চোখে পড়ে না তার। কিছুটা অস্বস্তি কিছুটা অনিচ্ছা সত্বেও তাকে খারাপ কাজটা করতেই হলো। কিন্তু এমন তো উদ্দেশ্য ছিল না তার। খিড়কির দরজাটা যদি খোলা না থাকতো, তাহলে কি আর এ পাপ করতো সে। নিদেন পক্ষে আলমারিটাও তো চাবি দিয়ে রাখতে পারতো বাড়ির মালিক। তাহলে আর এমনটা হতো না। এমন সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ায় পানু। আর বেলা করলে চলবে না। গায়ে একটা তেল-চিটে ময়লা চাদর জড়িয়ে বস্তি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। তার হাঁটা চলার ভঙ্গিতে এখনো যেন একটা কিন্তু—ভাব, গাবের আঠার মতো জড়িয়ে আছে। চাদরের মধ্যে, প্রায় তার বুকের ধুকধুক শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে দুহাত আঁকড়ে ধরে রেখেছে বড়-সড় রুপোর হুঁকো, ঠিক যেন তার সদ্যজাত সন্তান।

না জেনে স্বামীকে বড় অপমান দিয়ে ফেলেছে সুবর্ণা। তারপর থেকেই দুজনের কথা হচ্ছে খুব কম। যেটুকু বা হচ্ছে, তাও আবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। পরোক্ষ বাক্যে। কি লজ্জার কান্ড। বিয়ের পর এই কমাসে মানুষটাকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। আছে ভালো। বেশ সাদা-সিধে। অথচ থেকে থেকেই কেমন বদলে যায় গোটা মানুষটা। সব কাজ ফেলে আলস্যে গা ভাসিয়ে দ্যায়। রাজা রাজা ভাব করে। অন্য সুরে কথা কয়। হাসি পায় সুবর্ণার। হাসি চেপে থাকতে খুব কষ্ট হয়। তবু থেকেছে সে। কিন্তু গতকাল এমন হলো। একমনে শার্টের বোতাম বসাচ্ছিল সুবর্ণা। কখন তার স্বামীর দাড়ি কামানো হয়ে গ্যাছে সে টেরও পায়নি। ঘরের বাতাসে উগ্র আতরের গন্ধ লাগতে মুখ ফিরিয়ে দ্যাখে, হাসি হাসি মুখ করে, পাজামা আর গেঞ্জি গায়ে মানুষটা রাজার মতো এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে অফিসের ফোলিও ব্যাগ। গলায় কানে টুকরো টুকরো সাবানের ফেনা লেগে আছে। চোখে চোখ পড়তে, জমিদারী চালে মাথা দুলিয়ে গদ-গদ হয়ে বললো, কি। গন্ধ পাচ্ছো তো। হু-হু বাব্বা—এ যে সে আতর নয়। অরিজিন্যাল। সেন্টপারসেন্ট পিওর। দামটা অবশ্য বড় বেশী। কিন্তু কি আর করা যাবে। ছোট জিনিসে যে আমাদের মন ওঠে না। আর যাই হোক রায়বাহাদুর পশুপতি রায়চৌধুরীর নাতি বলে কথা। রক্তটা যাবে কোথায়। এই নাও—বলে, ফোলিও ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাতেই, আর কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না সুবর্ণা। খল খল করে হেসে উঠল। স্বহস্তে দাড়ি কামাতে গিয়ে তার স্বামী শুঁয়োপোকার মতো গোঁফটাকে একেবারে যাতা করে ফেলেছে। ডান দিকটা যেমন তেমন লম্বা বাঁদিকটা ঠিক তার উল্টো। আহারে, ওরকম এবড়ো খেবড়ো, আহত গোঁফের গোলগাল লোকটাকে রায়বাহাদুরের নাতি ভাবতেই হাসিটাকে আর রোখা গেল না। আতরের ব্যাপারটাকে পাত্তা না দিয়ে, সুবর্ণাকে হঠাৎ এমন তাচ্ছিল্যের সুরে হাসতে দেখে, বাহ্যজ্ঞান প্রায় হারিয়ে গেলো তার। পুঁচকে আতরের শিশি-টাকে আছড়ে ফেলতে গিয়ে দ্যাখে যাঃ কর্কের ছিপি খুলে অনেক আগেই আতরটা কখন পড়ে গ্যাছে ব্যাগময়। তাই অত গন্ধ। দামের চেয়ে বেশী বেশী লাগে। হাসিটা যেন দ্বিগুণ হয়ে যায় সুবর্ণার। ভাবতে পারেনি সে এতে তার সুন্দর স্বামীটা এমন রেগে যেতে পারে। গম্ভীর রাগে বলে ওঠে, হাসির কি আছে। সেই থেকে হাসছো। সবটাতে এতো তাচ্ছিল্য ভালো নয়। যেদিন থাকবো না সেদিন বুঝবে। কথাটা বলে আর দাঁড়ায় না।

পরক্ষণেই হাসি থেমে যায় সুবর্ণার। প্রত্যেক কথার শেষে এমন একটা অলক্ষণে কথা দুম করে কেন যে বলে, কে জানে। এমন কিই বা হয়েছে। শুধু তো একটু হাসি। নিজেরই ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে। হাসিটা সত্যিই বেশী হয়ে গ্যাছে। ছি ছি, বোধহয় খুব তাচ্ছিল্য অবজ্ঞার সুর বেজেছে ওর কানে। সবের মূলে তার স্বামীর ঐ খামোকা জমিদারী ভাব-ভঙ্গি, আর ছোট বড় হাস্যকর গোঁফ জোড়া। তা বলে অতটা সিরিয়াস হওয়া ঠিক হয়নি। বেফক্কা এমন সব কথা বলে দ্যায়, গভীর-ভাবে কথাটা ভাবলেই সুবর্ণার বুকের মধ্যে কি রকম হয়। যেদিন থাকবো না। বড় অমঙ্গলের কথা। না ভেবেও যেন পারা যায় না।

ঘুম ভেঙেছিল অনেকক্ষণ আগেই। বাতাসে একটা শীত শীত ভাব রয়ে গ্যাছে। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমের ভান করে এসব কথাই সুবর্ণা ভাবছিল। অন্য দিনকার মত বিছানা ছেড়ে উঠে গ্যাছে তার স্বামী। খুব ভোরে। কেবল তার রুপোলী নস্যির কৌটটা বালিশের গোড়ায় চুপ করে পড়ে আছে। হঠাৎ বাগান থেকে চেরা গলায় ভীষণ বিচ্ছিরি চিৎকার করে ওঠে একটা কুকুর। তার আচ্ছন্ন ভাবটা নষ্ট করে দ্যায়। খাটে হামাগুড়ি দিয়ে মশারী তুলে জানলায়

সামনে এসে দ্যাখে, আমগাছের গোড়ায় থেবড়ে বসে হাড্ডিসার ভেকু আপ্রাণ কেঁউ কেঁউ করছে। সকালবেলাই পাড়ার ছেলেরা কেউ ইঁট-ঢিল মেরেছে বোধহয়। খুব লেগেছে নিশ্চয়। আহারে। সুবর্ণ জানে, এক্ষুণি দারুণ রেগে উঠবে তার মানুষটা। এ বাড়ীতে আসার পর থেকেই সে দেখছে, ওই কেলে কুকুরটা তার স্বামীর বড় আদরের। আর একটা তার ঠাকুরদাদার আমলের রুপোর কাজ করা রায়বাহাদুরী হুঁকো। এ-দুটো জিনিস মাঝে মাঝেই তার স্বামীকে বড় বেশী আনমনা, অলস করে দ্যায়। কথাটা মনে হলে সুবর্ণর নিজেকে কখনো বড় অসহায় লাগে। সংসারে মন বসতে চায় না। ব্যাপারটাকে তাই আর প্রশ্রয় না দিয়ে, সে বিছানা ছেড়ে সংসারের মধ্যে নেমে আসে।

একটানা অনেকটা দুঃখ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গঙ্গাপতি। অনেক দিন এমন দুঃখ পায় নি তো। সুদীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে বোধটাকে আর বেশীক্ষণ জীইয়ে রাখা গেলো না। উপুড় করা বালতির ওপর বসে নিজেকে এখন বেশ সুস্থ লাগছে। যা যাবার তাকে তো আর আটকানো যাবে না। সে যাবেই। হুঁকোটা গ্যাছে, এক পক্ষে ভালোই হয়েছে। আপদ গ্যাছে। না হলে মাঝে মাঝেই বড় জ্বালাতো ওই চকচকে জিনিসটা। তার গোলগাল গেরস্থ জীবনে বিপত্তি ঘটিয়ে দিত। কতবার এমন হয়েছে গঙ্গাপতির। কোনোদিন সকালবেলা, ডান হাতের মুঠোয় দলা পাকানো চার টাকা, আর বাঁ হাতে আঁশটে গন্ধ মড়মড়ে বাজারের থলি হাতে সিঁড়ি দিয়ে সে ঠিকঠাক নেমে আসছিল। গুন গুণ করে সাইগলের একটা বিখ্যাত গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। দালান পার হতে গিয়ে হঠাৎ কাচের আলমারির মধ্যে চোখে পড়ল ওই জমকালো রুপোর হুঁকো। ব্যাস। মাথায় উঠে গেলো বাজার। কে যেন দূর অতীত থেকে টেনে ধরল তার খসখসে পা দু'খানা। ফিস ফিস করে বলে উঠলো, কি রে গঙ্গা, তুই না রায়বাহাদুর পশুপতি রায়চৌধুরীর নাতি। একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছিস এতবড় বংশের ব্যাপারটা। সাত সকালে উঠে চারটে টাকা আর নোংরা চটের থলি হাতে, হাওয়াই চটি ফটাস- ফটাস করতে করতে বাজার যাচ্ছিস। আবার গান......ছিঃ, বংশের রক্ত কি তোর শরীরে এক ফোঁটা নেই রে...।

মাথার ভেতর সব গোলমাল হয়ে যায়। পা দুটো বেজায় ভারি লাগে। আর ছেঁড়া-খোঁড়া বাজারের থলিটার দিকে তো তাকানোই যায় না। লজ্জা করে। হুঁকোর দিকে, সদ্য স্বপ্ন দেখা, টাটকা চোখ তাকিয়ে গঙ্গাপতি বাজখাঁই গলায় ডেকে ওঠে, এ্যাই গোবরা নিয়ে যা এসব...। থলি আর টাকা মায়া দালানে ফেলে দিয়ে, হন হন করে সটান ওপারে উঠে গেলো, সে এক অন্য গঙ্গাপতি। ঘরে এসে এমনভাবে খাটে বসলো যে, পৃথিবীতে কোথাও কোনো কাজ নেই তার। থাকতেই পারে না। কোমরে বালিশ দিয়ে, আয়েস করে পা দুটো ছড়িয়ে দিল সামনে। মোক্ষম এক টিপ নস্যি নিয়ে স্ত্রীকে হুকুম করলো, বড় বউ বেশ কড়া করে দু' পেয়ালা চা দাও, সঙ্গে সাবুর পাঁপড়টাও ভেজো।

সুবর্ণ প্রথম প্রথম 'বড় বউ' ডাক শুনে খুব ভড়কে যেতো। হেসে বাঁচতো না। ভারি অবাক লাগতো। এ কি রে বাবা! অবাক অবশ্য এখনো লাগে। তবে গা সওয়া হয়ে গ্যাছে। এছাড়াও জেনে গ্যাছে সুবর্ণ, প্রথম কাপ চা শেষ হবার পরেই গঙ্গাপতি আর এক দফা নস্যি নেবে। তারপর যেনতেন প্রকারে শুরু করে দেবে রায়বাহাদুরী আমলের সে সব পেল্লায় মণিপুরী গল্প। ওদিকে গোবরা তখন বুদ্ধি খরচ করে বাজার করতে ব্যস্ত।

কোনোদিন দেরী হয়ে গ্যাছে অফিসের। সিঁড়ির নিচে, পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে শশব্যস্ত হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে গঙ্গাপতি। ডান পা শেষ করে একবার মুখ তুলতেই সোজাসুজি চোখ পড়ে গেলো হুঁকোর গায়ে মোড়া চওড়া রুপোর পাতে। অসম্ভব সুন্দর কারুকার্য করা। বাঁ পায়ের ফিতে বাঁধা তখনো বাকী। তলপেট থেকে গুড় গুড় করে একটা চোঁয়া ঢেকুর উঠে এলো গলায়। হয়ে গেলো অফিস যাওয়া। আলমারীর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল গঙ্গাপতি। গঙ্গা, একি হাল হয়েছে তোর শরীরের। এসব কেরানীগিরি কি আর তোর সাজে। তুই কোথায় হলি গিয়ে রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র। বংশের প্রতি কি তোর কোনো মায়া নেই!

কেন থাকবে না। রক্তটা যাবে কোথায়। চন চন করে ওঠে তার সারা শরীর। ততক্ষণে কুচো সুপুরি এলাচ হাতে বিদায় জানাতে এসে দাঁড়িয়েছে সুবর্ণ। পা থেকে হেঁচকা টানে জুতো খুলে ফেলে গঙ্গাপতি। সুবর্ণর হাত থেকে এলাচ-সুপুরিটুকু নিয়ে, আর কোনো কথা নয়, চিন্তা নয়, সোজা দোতলায়। হঠাৎ অফিস না যাওয়ার কারণ জানতে চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় সুবর্ণ। চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে চূড়ান্ত আরামে গঙ্গাপতি বলতে থাকে, আমাদের কি আর রোজ রোজ এসব পোষায়। দাদু থাকলে কি আর...। ওকথা থাক। বুঝলে বড়বউ, আজ আর অফিস নয়, ভাবছি তোমায় নিয়ে একটু থিয়েটারে যাবো। কথা শেষ হবার আগেই তার মুখ জুড়ে একটা চওড়া হাই ওঠে। হাইটাকে শেষ পর্যন্ত গড়াতে দিয়ে সে পাশ বালিশটাকে সাপটে কাছে টেনে নেয়। মুখে এলাচের মিষ্টি গন্ধ। চোখের পাতা দুটো টুপটুপ বুজে আসে। একবারও মনে পড়ে না কাল অফিস গিয়ে কামাই করার মিথ্যে কৈফিয়ৎ দেবার সময় তার চোখের পাতা দুটো কি বিচ্ছিরি-ভাবে খুলে যাবে।

এমনও যে কোনোদিন না হয়েছে তা নয়। রাতে শোবার আগে খিড়কির দরজায় খিল দিতে এসে হয়ত চোখ পড়ে গ্যাছে হুঁকোর গভীরে। দালানের আলোটা ঠিকরে পড়ছে নকসা কাটা রুপোর গায়ে। ঝিকিয়ে উঠছে সেটা ঝাড় লণ্ঠনের মত। যথারীতি দরজায় খিল দিয়ে আলো নিভিয়ে দ্যায় গঙ্গাপতি। নিভিয়ে দিলে কি হবে, ততক্ষণে তার বুকের মধ্যে জ্বলে গ্যাছে একশ ঝাড়-বাতি। রাজকীয় পদক্ষেপে সিঁড়ি ভাঙে গঙ্গাপতি। নিজের চলার শব্দে টান-টান হয়ে ওঠে শিরদাঁড়া। ঘরের দরজায় এসে দেখে মশারী টাঙাচ্ছে সুবর্ণ। স্ত্রীর হাতগুলো যেন বড় শ্যামলা মনে হয় তার। সুবর্ণর চুলের গড়নটাও তেমন ভালো নয়। বড্ড পাতলা। নাকছাবি পরলে কি হবে, দৃষ্টি এড়ায় না গঙ্গাপতির, স্ত্রীর নাকটা খুব চাপা মনে হতে থাকে। কে যেন আড়াল থেকে নিচু গলায় বলে, যা করতিস সে এক আলাদা। শেষমেষ যখন করলি, আর একটু ভালো কি পাওয়া যেত না। মা নয় তোর ছোট্ট বয়সে দেহ রেখেছে, ফুটফুটে তিন তিনটে ঠাকুমার মধ্যে একজনের মুখটাও কি তোর মনে পড়েনি। বংশের কথাটা কি তুই...। কে জানে আরও কত কি মনে হত। ভাবনাকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় ঢুকে পড়ে গঙ্গাপতি। আলো নিভিয়ে দ্যায় ঘরের। অন্ধকারে সুবর্ণর পাশে চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে বড় করুণ লাগে। জানলা দিয়ে মশারীর ধারে এসে পড়েছে এক ফালি পানসে জ্যোৎস্না। আধো অন্ধকারে সে অপলক চেয়ে থাকে। ধিক্কার দেয় নিজেকেই। পাশে শুয়ে উসখুস করে সুবর্ণ নিরাপদ দূরত্বে সরে আসে গঙ্গা-পতি। আড়ষ্ট হয়ে নিশ্চুপ পড়ে থাকে, যেন তার বিয়েই হয়নি এখনো।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দ্যাখে একটা বালিশে মুখোমুখি শুয়ে দুজনেই। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে সুবর্ণ। অগোছালো চুল এসে পড়েছে কপালে। গুঁড়ো গুঁড়ো সিঁদুর আদরের মত ছড়িয়ে রয়েছে কমনীয় মুখময়। গঙ্গাপতি দ্যাখে, তার একটা হাত নিবিড়ভাবে আগলে রেখেছে সুবর্ণর কোমর। বড় ভালো লাগে। তখন কিছুতেই মনে পড়ে না, গত রাতে কি এক গোপন অহংকারে সে সুবর্ণর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে ঘুমিয়ে পড়তে চেয়েছিল।

মনে না পড়ারই কথা। আসলে এসব কিছু সে চায় না, অথচ সুযোগ পেলেই বারবার ওই অহংকারী হুঁকোটা তার স্বাভাবিক সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দ্যায়। পরে পরে সে সব যখন মনে করিয়ে দ্যায় সুবর্ণ, লজ্জায় তার আত্মহত্যা করতে সাধ হয়। সব রাগ গিয়ে পড়ে হুঁকোটার ওপর। কাউকে বলা যায় না সেকথা। মনে মনে ফেটে পড়ে গঙ্গাপতি। টান মেরে চোখের সামনে থেকে কতবার ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছে সে হুঁকোটাকে। কিছুদিন পরে রাগটা পড়লে আবার যেন মন টানতো। চোখের সামনে থাকলে তবু দেখা যায়। পিতৃপুরুষের স্মৃতি। তাছাড়া বাড়িতে

জোরজার এলে ট্রাঙ্ক থেকে বার করে তো আর দেখানো যায় না। তবু আলমারিতে থাকলে সবারের চোখে পড়ে। জানতে চায় সবাই। আর সেই গল্পটা বলায় লোভ গঙ্গাপতি কিছুতেই ছাড়তে পারে না। মণিপুর, রায়বাহাদুর সংক্রান্ত কথাগুলোর ওপর বড় মায়া পড়ে গ্যাছে তার। লোকের কাছে বড়মুখ করে বলতে পারলে সে যা আনন্দ পায়, পৃথিবীর আর কিছুতে পায় না। তাছাড়া নিজের বলতে কিই বা আছে তার, যা সে গল্প করে বলতে পারে। অনেকবার হুঁকোটাকে সে বেচে দেবার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতো বুড়ো যামিনী স্যাকরা। এ-বাড়ির পুরোনো লোক। হুঁকোটা হাতে নিয়ে লোভাতুর চোখে দেখতে দেখতে সে যখন বলতো, বাঃ, বড় সুন্দর হাতের কাজ হে। যতই হোক, রাজরাজড়াদের জিনিস তো...। হুঁকোটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে বসতো গঙ্গাপতি। বংশের শেষ স্মৃতিটা কিনা আমি বেচে দিচ্ছি। কি অপদার্থের মতো কাজ। ছোঁ মেরে যামিনী স্যাকরার হাত থেকে হুঁকোটা কেড়ে নিয়ে, সে মস্করার ঢঙে বলতো, বেচবো না, বেচবো না। আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি। এ আমার দাদুর প্রিয় জিনিস, আমার বংশের সাক্ষী, চাই কি, ইতিহাস ও বলা যায়। কি বলেন? একটু মুষড়ে গিয়ে হেঃ হেঃ করে হেসে যামিনী বলতো, তা কি আর আমি জানি না।

এক নাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ আলমারির খোলা পাল্লার সামনে দাঁড়িয়ে, বিস্তর ভাবনা চিন্তার পর চুরি যাওয়া ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পারে না গঙ্গাপতি। কিছুতেই নয়। মর্যাদায় লাগে। গরীব লোককে দান করে দিতুম, কিংবা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতুম, সে ভিন্ন কথা। কিন্তু চুরি...। ইচ্ছে হয় সুবর্ণকে চেঁচিয়ে ডাকতে। সাহস হয় না। হুঁকোটা নিয়ে বেশ কয়েকবার অবজ্ঞার হাসি হেসেছে সুবর্ণ। এখন যদি সেরকম কিছু করে, কিছুতেই সহ্য হবে না তার। ভীষণ এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে।

আচমকা ঝাড়টা কোনো গতিকে সামলে উঠেছে ভেকু। পা নাড়তে গেলে এখনো একটু ব্যথা লাগে। কি যে ব্যাপারটা হলো, তার অপরাধটাই বা কি, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। কোনো ব্যাপারই, সে যত বড়ই হোক, বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না সে। পা টেনে টেনে বাগান থেকে উঠে আসে। খিড়কির ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে জুল জুল করে তাকায়। ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় না। জন্ম থেকে মানুষের সঙ্গে থাকলে কি হবে মানুষের মতিগতি—টের পাওয়া বড় মুশকিল। এ এক আজব প্রাণী। কখন যে কি করে বসে। আর একটু এগিয়ে যায় ভেকু। মুখের দুধারে কালো তারের মতো গোঁফগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। নাক উঁচু করে দেখে নেয়, আর কোনো বিপদের গন্ধ আছে কিনা। দিন দিন বুঝি ঘ্রাণ শক্তি কমে আসছে তার। আর তেমন করে সে কোনো গন্ধ পায় না। শব্দ পায় না। বড় বেশী নিরাপদ তার বেঁচে থাকা। তাই বোধহয় সব সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ক্রমশ মরে যাচ্ছে। এখন সে আলু, কুমড়ো, ফুলকপি, সবই খায়। সারাটাদিন বেঁচে থাকার জন্যে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম নেই। ইদানীং ছুঁচো, বেড়াল, অপরিচিত কুকুর কিংবা মানুষ কোনো কিছু দেখেই সে চিৎকার করে না। তেড়ে যায় না। কত অলস, কর্মহীন বেঁচে থাকা যায়, মানুষ শিখিয়ে দিয়েছে তাকে। আর কোনো কিছুর জন্যেই চেষ্টা নেই তার। যখন তেষ্টা যায় আচ্ছন্নতা আসে। আচ্ছন্নতা ব্যাপারটা বোঝে না ভেকু। অনবরত খস-খস্ করে লোমের মধ্যে নাক গুঁজেও আঁচ করতে পারে না। শুধু টের পায় খিকখিকে চিমসে পোকার মতো কি যেন ছেঁকে ধরছে তার শরীর। বড় বেশী নির্জীব হয়ে পড়ছে সে দিন দিন।

কুকুরটাকে ভয়ে ভয়ে দরজা দিয়ে মুখ বাড়াতে দেখে গঙ্গাপতির মায়া হয়। হাত নেড়ে ডাকে। চুক-চুক শব্দ করে মুখে। বেশ জোরে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে যায় ভেকু। মিটসেফ খুলে গঙ্গাপতি দ্যাখে বিস্কুটের টিন ফাঁকা। কি দিয়ে যে ভাব-বসাবে কুকুরটাকে ভেবে পায় না। খানিক এ-তাক ও-তাক হাড়তে আমূল মিল্ক পাওডারের টিনটাই বার করে আনে। এক খাবলা গুঁড়ো দুধ বার করে মাটিতে রাখতেই কুকুরটা হামলে পড়ে। নাকে মুখে মাখামাখি হয়ে যায়। ফোঁচ ফোঁচ করে দু-দুবার কুকুরটা পরিষ্কার হেঁচে ফ্যালে। এর আগে কুকুরকে কখনো হাঁচতে দেখেনি গঙ্গাপতি। এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেলো তার। হাসার আগেই, দুহাতে ভাজ পাকানো বাসি কাপড় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে সুবর্ণপ্রভা। গুঁড়োদুধের টিনটা তখনো তার কাছে। শুধু হাসিটা নেই।

গোপীর চেহারাটা বরাবরই গুণ্ডা মার্কা। সকালবেলা স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে হরলিকস-এর শিশি থেকে দোকানের চৌকাঠে গঙ্গাজল ছেটাবার সময় পর্যন্ত তার হাতের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে থাকে। শোকেসের মধ্যে কয়েকটা হাল্কা ধরনের গয়না সাজানো। এক ধারে ছোট্ট ওজন দাঁড়ি। দেয়ালের নিচের দিকটা লাল শালু টাঙানো আছে। তার পাশে চৌকির সাইজের সঙ্গে মাপসই একটা শাঁসালো গণেশ ঠাকুর।

পুজোর সময় গণেশের মাথার কাছে যে জিরো পাওয়ারের সবুজ আলো, সেটা জ্বালানোই থাকে। চৌকাঠে জল ছেটানো শেষ করে, এক গোছা ধূপ জ্বালিয়ে গণেশের মুখোমুখি বসে পড়ে গোপী। চোখ বুজে গণেশের চার ধারে আন্দাজে ধূপ ঘোরায়। আগে এসব যামিনীই করতো। এখন ছেলের হাতে এসব দিয়ে সে, ভেতরটার বসে। ক্যাশ বাক্সের সামনে। সবে দোকান খুলেছে। খদ্দের নেই। টাটকা খবরের কাগজটা খুলে রেখেছে সামনে। পড়ছে না। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ছেলের পুজো করা দেখছে। এসব লাইনে আজকাল খানিকটা ভক্তি না হলে চলে না। সোনার ব্যাপার তো। কাচের শোকেসের ওপর টাল খেয়ে ফুরফুর করে সুগন্ধি ধোঁয়া উড়ছিল। রাস্তা থেকেও দেখা যায়। স্পষ্ট দেখতে পেলো পানু। চাদরের নিচে হুঁকোটাকে আরও যত্ন করে ধরে, সে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে দোকানের কাছে। বেশী বেলা করলে আবার তার কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে। বটুদা বলে রেখেছে, আজ একটু তাড়াতাড়ি যেতে। আজ থেকে নতুন ছবি আসছে।

এতদিন ভুল জেনে এসেছে গঙ্গাপতি। হুঁকোটার জন্যে সুবর্ণও যে এমন আফশোস করবে, সে স্বপ্নেও ভাবেনি। যে নতুন ঘড়িটা চুরি গ্যাছে সেটার কথা না ভেবে সুবর্ণ বলে উঠলে ঘড়িটা নয় পয়সা দিলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই হুঁকো। যতই পয়সা ঢালো, ও আর পাবে না। আমায় দাদা বউদিকে কতবার বড়মুখ করে ওই মণিপুরী হুঁকোর কথা বলেছিলুম। বাপের বাড়ির আরও কতজনকে। এসব তারা চাইলে কি আর দেখাতে পারবো। বিশ্বাস করবে আমার কথা। তাছাড়া ওটা তোমার বংশের একটা জিনিস। কতবার বলেছিলুম ট্রাঙ্কেই তোলা থাক। তখন শুনলে না তো আমার কথা। অতদিনের পুরোনো জিনিসটা গেল, এখন কে জানে আরও কি অমঙ্গল হয়। দ্যাখো না একটু খোঁজ-খবর করে, যদি কোথাও...।

সুবর্ণর কথা শুনে, হুঁকোটার জন্যে তার প্রাণ যেন হু-হু করে ওঠে। সত্যিই তো। শালা চোরটাকে একবার হাতের সামনে পেলে...। আমার বাড়ি থেকে চুরি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে গঙ্গাপতি ... যেমন করে হোক, হুঁকোটা আমায় ...ই হবে। না হলে বাঁচার কোনো অর্থ হয় না।

ঘরের মধ্যে বাঘের মতো পায়চারী শুরু করে গঙ্গাপতি। থানায় যাবে ডায়রী করতে। পোশাক বদলে সে একেবারে রেডি: সুবর্ণ নিচে না এলে দরজায় খিল দেবার কেউ নেই। তাই এখনো বেরোনো হয়নি তার। গোবরাটা দেশে যেতে এ ব্যাপারে বড় অসুবিধে হয়েছে। থানার বড়বাবুকে কিভাবে ঘটনাটা বুঝিয়ে বলবে, সে আওড়ে নিচ্ছিল। দেখুন স্যার, সে যেমন করেই হোক, এ্যাট এনি কস্ট, হুঁকোটা ফেরৎ চাই। তার জন্যে যা কিছু লাগে... আমার নাম...। এমন সময় সদর দরজায় তুমুল ধাক্কা। বেশ কিছু লোকের হল্লা শোনা যায়।

গা হাত ধুয়ে এসে ঠাকুর প্রণাম করছিল সুবর্ণ। চুরি যাওয়ার অভিযোগটা থাকার জন্যে একটু দেরী হচ্ছিল প্রণাম সারতে। হঠাৎ দরজায় শব্দ শুনে, লাল পেড়ে পাটের শাড়ি পরে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায়। আবার কি হলো রে বাবা।

যেন খানিকটা সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে যায় গঙ্গাপতি। দরজায় মিটমিটে খুদে বাকে বলে একেবারে হতভম্ব, প্রথমটায় সে ভাই হয়ে যায়।

এরকম যে একটা সাংঘাতিক বিপত্তি ঘটে যাবে, কোনো মতেই ভাবা যায় না। পানুও ভাবেনি। পাবলিকের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে তার যা বর্তমান অবস্থা, পানু বলে চিনতে কষ্ট হয়। যামিনীর হুকুমে গোপীই প্রথম শুরু করে ছিল এক মোক্ষম থাবড়া দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জুটে গেল পাবলিক। ওঃ, কি মার, কি মার। এমন মার সে জীবনে খায়নি। প্রায় থেঁতলে গ্যাছে মুখ-চোখ। কোথায় লোপাট হয়ে গ্যাছে চাদরটা। খলখল করছে ছেঁড়া শার্টের কলারটা খামচে ধরে আছে গোপী। বার বার নুয়ে পড়ছে তার মাথা। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই আর! প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মতো অবস্থা। ঠোঁটের ওপর জিভ দিতেই চিনচিন করে ওঠে। চোখের জল আর ফোঁটা ফোঁটা নোনতা রক্তে বিস্বাদ হয়ে যায় গোটা মুখটা। সামনের দরজা খুলে যে মানুষটা বেরিয়ে এলো, তাঁকে চোখ তুলে দেখার ক্ষমতা হলো না পানুর। শুধু শুনতে পেলো, বুড়ো স্যাকরা খনখনে গলায় বলে ওঠে, এই দ্যাখো গঙ্গা, তোমার হুঁকো। কি কাণ্ড নজ দিকিনি! শালা সক্কালবেলাই বেচতে এসেছিল। দেখেই ধরেছি। এ জিনিস কি আর একবার দেখলে ভোলা যায়। মারের চোটে ব্যাটা সব গড়গড় করে স্বীকার করেছে। চিরটা জীবন তোমার বাপ-ঠাকুর্দার নুন খেয়েছি, আর এটুকু করবো না। কি হে, চুপ করে কেন। চলো, থানায় গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে আসি। থানায় না দিলে এ স্বভাব শোধরাবার নয়। বাবা গোপী, ব্যাটাকে ভালো করে ধর যেন পালাতে না পারে।

যামিনী স্যাকরার হাতে ধরা হুঁকোটার দিকে অপলক তাকিয়ে গঙ্গাপতির ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। এর আগেও হুঁকোটা দেখে কতবার এমন হয়েছে তার। চোর ছেলেটাকে যা মার মেরেছে, তাকানো যায় না। আর বাঁচবে কি সন্দেহ। ঐ তো দুর্বল চেহারা। একটা সামান্য হুঁকোর জন্যে এত কাণ্ড। সকালের রোদ পড়ে ঝিকোচ্ছিল রুপোর রং। কি অহংকারী জেল্লা। যেন মিহি সুরে কোন অতীত থেকে তার কানে কানে বলে, গঙ্গা, এ যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে গ্যাছে। এসব তুই প্রশ্রয় দিসনি, তোর জাত যে অনেক বড়। ক্ষমাই তোর বংশের মর্যাদা। অত্যাচার নয়। এই তোর মহৎ হবার মস্ত সুযোগ। কোন ক্রমেই হারাসনি যেন...।

সহসাই, তার বুকের মধ্যে ঝাঁকুনির শব্দে স্পন্দিত হয় হৃৎপিণ্ড। দ্রুত হয় রক্ত সঞ্চালন। মুহূর্তের অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সে ভরাট গলায় ধমকে ওঠে, যামিনী কাকা, বুড়ো বয়সে কি আপনার মতিভ্রম হলো। একটা মিথ্যে অপরাধে, ঐ রোগা ছেলেটাকে অমন করে কেউ মারে। অত মারলে যা হোক একটা স্বীকার করবে না তো কি। সেটাই কি সত্যি। এমন হুঁকোতো কতই আছে, সবই কি আমার। এখুনি ছেড়ে দিন ওকে। কে বলেছে ও চোর। চোর আমরাই। দিন ওর হুঁকোটা ফেরৎ দিয়ে দিন। এখানে আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখার কি আছে। যান যান। দয়া করে আপনারা নিজের কাজে চলে যান। কিছু হয়নি কোথাও।

নিজেকে বড় অপ্রস্তুত লাগে যামিনীর। মাথার ভেতর সব গুলিয়ে যায়। বেশ অপমানিত হয়েই, রাগে গজগজ করতে করতে সে দলবল নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। দ্রুত ফাঁকা হয়ে যায় জায়গাটা। হুঁকোটা আঁকড়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় পানু কোনোরকমে দাঁড়িয়ে ছিল। দু-চারটে ছোট ছেলে দূর থেকে তাকে অবাক চোখে লক্ষ্য করছিল। মুখের ওপর দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে যেতে তার বড় আশ্চর্য লাগে। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে ভেসে আসে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি লাভ, যাও। যা করেছো করেছো। আর কক্ষনো কোরোনা এসব।

সিঁড়িতে ওঠার মুখেই সুবর্ণ এসে দাঁড়ায়। বড় বড় চোখ তুলে বলে, কই গো, জিনিসটা পেলে তো। আমি জানতুম, ওটা ঠিক পাওয়া যাবে। হুঁকোটা দেখি একবার...। গঙ্গাপতির শরীরটা তখনো উত্তেজনায় কাঁপছিল। উদাস গলায় বললো, বড়বউ হুঁকোটা তাকে দিয়েই দিলুম। থানা পুলিশ ঝুট-ঝামেলা এসব কি আর আমাদের সয়। তুমি যেন দুঃখ কোরো না। ঐ তো সামান্য হুঁকো। ওতে কি আর বংশ যায়। আমি তো আছি এখনো। কথাটা বলে সে বলেছিল, সুবর্ণ হয়ত রেগে যাবে তার ওপর। কিংবা গভীর দুঃখ প্রকাশ করবে হুঁকোটার জন্যে। সে চেয়েছিলও তাই। হলো তার উল্টো। যেন এতদিনে সুযোগ পেয়েছে সুবর্ণ। নিবিড় করে তার বুকের কাছে এসে জড়ানো খুশীর স্বরে বলে ওঠে, দিয়েছো, ভালোই করেছো। আমিও তাই চেয়েছিলুম।

পানু সারাদিন কাজে বেরোতে পারেনি। চতুর্দিকে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে বস্তিতে পড়েছিল। হুঁকোটা ঘরে ঢোকানোর পর থেকে তার ভয়নক অশান্তি চলেছে। লোকটা কেন যে এটা তাকে দিয়ে দিল, ভাবলেই বড় অদ্ভুত লাগে তার। ভয় হয়। কে জানে কি তুকতাক আছে ওতে। সঙ্গে রাখা খুব বিপজ্জনক। মাথার এক পাশে হুঁকোটা পড়েছিল। কেমন অদ্ভুত সব নকসা করা। নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে। এসব ঘরে রাখা ঠিক না। কি জানি আবার কি হয়। মনে মনে ঠিক করে, এটা সে কিছুতেই রাখবে না। গায়ের ব্যাথাটা একটু মরলেই ফেরৎ দিয়ে আসবে, যার জিনিস তাকে। না হলে, সে বেশ লক্ষ্য করেছে, হুঁকোর দিকে চোখ পড়লেই বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে চুরির কথা। লোভ জাগছে অন্তরে। সোনা, রুপো যাই বলো, বড় পাপ। খুব খারাপ জিনিস। কিছুতেই সহজ হতে দ্যায় না মানুষকে, জীবন ভোর বড় জ্বালায়। পাশ ফিরতেই টনটন করে ওঠে শরীর। কোনো রকমে হাত বাড়িয়ে ছেঁড়া জামাটা টেনে আনে পানু। ভালো করে ঢাকা দিয়ে দ্যায় হুঁকোটাকে, যে কটা দিন ঘরে আছে, যেন আর চোখে না পড়ে।

রাতের বেলা খিড়কির দরজা খিল দিতে এসে গঙ্গাপতির মনটা কেমন করে ওঠে। কি হবে আর খিল এঁটে। যা যাবার তো গ্যাছে। আলমারির তাকে যেখানে হুঁকোটা ছিল, সেখানে কেবল এক দলা শূন্যতা জমে আছে। চোখ পড়তে ভারি অসহায় বোধ করে। হুঁকোটা দান করে কাজটা মোটেই ভালো করেনি সে। বরং কটা টাকা দিলেই মিটে যেতো। চুপি চুপি আলমারির পাল্লা খুলে, সেই নির্দিষ্ট শূন্যতার মধ্যে হাত ডুবিয়ে দ্যায় গঙ্গাপতি। ধরা গলায় পিস-পিস করে বলে ওঠে, আর কোনো কারণেই কি হুঁকোটা একবার ফেরৎ পাওয়া যায় না। আর একবার— একটুর জন্য বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে।

সন্ধ্যার পর ব্যাংকক

জ্যোতির্ময় মৌলিক

ব্যাংককের এক অভিজাত পল্লী, বিলাসবহুল অতি আধুনিক একটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের শোবার ঘর। ফোম রাবারের গদির বিছানা। রঙীন ফুলকাটা বেডসীট। পাখির নরম পালকের বালিশ। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি। নিশুতি রাত। জেগে ছিলাম না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম তা আজও ঠাওর করে উঠতে পারছি না। ঘরের মধ্যে তুষার নীল আলো ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ দরজা খোলার মত খট করে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। দরজার দিকে চোখ ফেলতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম কে যেন আমার শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। ছায়া-ছায়া চলমান মূর্তিটি প্রথমে আমার ড্রেসিং টেবিলটার উপর তার হাতের ব্যাগটা রেখে দিল, তারপর ছোট ছোট পা ফেলে আমার শিয়রের কাছে মালক্কা বেতের তৈরি সুন্দর মোড়াটার উপর চেপে বসল। সেই অস্পষ্ট আলোয় আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তার দেহের সুবাস আমার নাকে এসে লাগছিল। এবার ওর দিকে চোখ ফেরাতেই বুঝলাম আমার স্বপ্নচারিণীটি একটি নারী। তার গায়ে হাতকাটা মিনিস্কার্ট, উরুযুগলের মাঝপথে এসে হঠাৎ থেমে গেছে। বুকের দিকটায় কাপড়ের দৈন্য এতই নির্মম যে, সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিতে হল। কিন্তু কি চোখ ধাঁধান তার গায়ের রং। প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে সাপের মণির মত জ্বলজ্বল করছে। সেই আলোতেই আমি তার অপরূপ দেহবল্লরী স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে হল তার হাত পা মুখ গলা যেন মোম দিয়ে গড়া। ভাবলাম মাদাম টাসাউ-এর মোমের গড়া একটি পুতুল হঠাৎ প্রাণ পেয়ে যেন আমার ঘরে চলে এসেছে। কিন্তু ওর গা থেকে যে একটা তীব্র মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। মোমের পুতুলের গা থেকে কি অমন গন্ধ বেরোয়।

মৃদু কণ্ঠে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে?

ও বলল, দেখতেই ত পাচ্ছ আমি একটি মেয়ে।

—তা ত পাচ্ছি। কিন্তু এত রাত্রে আমার ঘরে কেন?

—মিষ্টি হেসে রূপোর মত ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখিয়ে ও বললো, এর আগে ত আমার সময় হয় না। কি করব বল, কাজ শেষ করে ত আসতে হবে।

—দুপুর রাত পর্যন্ত তোমার কাজটা কি? এত রাতে আমার ঘরে কি মনে করে?

—সেটা পরে বলছি। আমি তোমার কাছে একটা প্রতিবাদ জানাতে এসেছি।

প্রতিবাদ। কিসের প্রতিবাদ? প্রতিবাদ জানানোর সময়টি কিন্তু বেশ।

—সে কথার উত্তর পরে দিচ্ছি। আগে আমার কথাটা শোন।

—শুনতেই হবে। আচ্ছা বল তবে। চটপট বলেই কিন্তু আমার ঘর থেকে চলে যেতে হবে। তোমার গায়ের নেশা ধরান গন্ধটা—

—খুব অল্প কথায় তোমাকে বলছি। প্রতিবাদটা তোমার দেশের দুই বিখ্যাত লেখকের বিরুদ্ধে।

—তারা কারা?

—তাদের একজনের নাম রবীন্দ্রনাথ। অপর জনের নাম শরৎচন্দ্র।

—এরা তোমায় কি করেছে?

—ভ্রূ কুঞ্চন করে মেয়েটি বলল, এদের অপরাধ শুধু আমার কাছেই নয়। আমার মত হাজার হাজার মেয়ের কাছে।

—বটে। বেশ মজা লাগছে তো। শুনি তোমার বক্তব্যটা।

—ঐ দুজন আমাদের মত মেয়েদের বলেছেন, পিশাচীর দল আর হতভাগিনী।

—বলেছেন নাকি? হবেও বা, কিন্তু তোমরা কারা?

সেই হাসি আবার শুনতে পেলাম, হাসতে হাসতে মেয়েটি বলল, তুমি কি বোকা। বুঝতে পারছ না আমি কে? আমি এ দেশের এক প্রমোদবালা।

—তাই নাকি। কিন্তু আমার কাছে প্রতিবাদ জানাতে এসেছ কেন? আমি তাদের বংশের কেউ নই। তুমি কি করে জানলে ও'রা তোমাদের নিয়ে ঐ মন্তব্য করেছেন। আর আমার নাম ঠিকানা পেলে কোথায়?

—আমার এক ভারতীয় বন্ধু আছে। তিনি তোমাকে চেনেন। তাঁর কাছ থেকে তোমার নাম-ধাম জেনেছি। তিনি ঐ দুই লেখকের লেখা খুব ভাল করে পড়েছেন।

—তবে প্রতিবাদটা তাঁকেই জানালে না কেন?

—জানিয়েছি! কিন্তু ওকে দিয়ে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

—কেন?

—আমি চাই আমার প্রতিবাদটা তোমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হোক। কিন্তু আমার বন্ধু কলম ধরতে নারাজ। তিনি বললেন তোমার কথা। বললেন তুমি নাকি একজন সাংবাদিক, সত্যি কথা লিখতে তুমি নাকি ভয় পাও না। আমার বন্ধু আরো বললেন, তুমি নাকি ঐ দুই লেখকের বইয়ের ভাষায় কথা বল। আমার অনুরোধ তোমার দেশের সংবাদপত্রে আমার প্রতিবাদটা ছাপিয়ে দাও।

—তাতে তোমার কি লাভ হবে?

—আমাদের কিছু লাভ হবে না। কিন্তু তোমাদের দেশে আমাদের মত মেয়েরা বুকে বল পাবে।

—কি লিখতে হবে?

—লিখতে হবে পেশাগতভাবে আমরা হতভাগিনীও নই, পিশাচীর দলও নই।

—আমরা, আমরা পুরুষের সেবিকা।

—তার মানে ?

—মানে আমরা স্ত্রী জাতি। পুরুষের সেবা করা, পুরুষকে আনন্দ দেওয়া, তাদের মনোরঞ্জন করা আমাদের ধর্ম। শৈশব কাল থেকে আমরা এই জানি।

—বা। বেশ বললে যা হোক। তোমার যুক্তির মধ্যে এতটুকু সারবস্তু নেই। তুমি যা বললে তা ধোপে টিঁকবে না। কারণ সতীসাধবী স্ত্রী হয়েও এসব করা যায়। তার জন্যে প্রমোদবালা হওয়ার প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর সকল দেশে স্ত্রী তার বিবাহিত জীবনে সর্বতোভাবে স্বামীর সেবা করে, তার মনোরঞ্জন করে, তার সন্তান প্রতিপালন করে, তার সহধর্মিণী-রূপে ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে। স্ত্রীজাতির পরম গৌরব ত সেখানে। সতীত্বকে বাদ দিয়ে নারীত্বের কোন মূল্য আমাদের দেশে নেই।

—তোমাদের দেশের চিন্তাধারা হয়ত তাই। কিন্তু ওসব বড় বড় বুলি এদেশে অচল। এদেশে নারীত্বই বড় সতীত্ব নয়। যে-দেশের মেয়েরা মনে-প্রাণে স্বাধীন নয়, সে সব দেশেই সতীত্বের ঘোমটা টেনে মেয়েদের চলতে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দেশের মেয়েরা পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। সব ব্যাপারেই তারা স্বাধীন, এমন কি যৌনজীবনেও। আমাদের উপর পুরুষের দাবি আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাদের বন্ধন আমরা স্বীকার করি না।

—তার মানে ?

—মানে অতি সহজ। নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ভালবাসাটাসা যা তোমরা বলে বেড়াও ওগুলো একেবারে ভুয়ো কথা। আসল কথা হচ্ছে নারী-পুরুষের যৌন আকর্ষণ, যৌনলিপ্সা। ওটা মিটে গেলেই পুরুষ তৃপ্ত। নারীর কাছে সে আর কিছুই চায় না।

—এটা কিন্তু ঠিক কথা হল না। নারীর কাছে পুরুষ কিন্তু এর থেকে অনেক কিছু চায়।

—সে চাওয়াটা কেমন জান ? অনেকটা বাজারে জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউ চাওয়ার মত। প্রয়োজনীয় বস্তুটি কেনার পর ওটা আসে। একটি নারী যখন একটি পুরুষের যৌনক্ষুধা মেটাতে অক্ষম হয় তখন পুরুষ তাকে ঠেলা মেরে দূরে ফেলে দেয়। আমরা বিবাহিত জীবনের বন্ধনটাকে খুব আলগা করে বাঁধি কেন জান ?

—যেমন বলছিলে বলে যাও।

—আমাদের দেশের শতকরা সত্তরজন পুরুষ বিয়ে করার পর আরও আলসে, আরও অপদার্থ হয়ে যায়। উপার্জনের কোন চেষ্টাই করে না। সারা দিন মদ গিলে আর ঘুমিয়ে কাটায়। তারপর সন্ধ্যা হলে নেশা-গন্ধে আমারই মত একটি মেয়ের সন্ধানে বেরোয়। এ রকম স্বামীর পতিব্রতা স্ত্রী হতে হবে আমাদের ? তোমাদের দেশের মেয়েদের মন আমি হয়ত জানি না। সামাজিক রীতিনীতিগুলোও আমার জানা নেই। তোমাদের মেয়েরা আমাদের পথে কেন আসে তাও জানি না। তবে দারিদ্র্যের তাড়নায় আমরা এ পথে পা দিই না। থাইল্যাণ্ডের দরিদ্রতম মানুষও কখনও অনাহারে থাকে না, দুবেলা দু মুঠো ভাত কিছু না করেও জুটে যায়। কিন্তু তাতে আর আমরা তৃপ্ত হব কেন ? আমরাও আজ পুরুষের মত আরাম আয়েস চাই। ভালভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই। সচ্ছল জীবন চাই। নিত্যনতুন পুরুষের সাহচর্যে যৌনজীবন পরিতৃপ্ত করতে চাই। তারপর যৌবন ঢলে পড়ার আগে হয় কোন ছোটখাট ব্যবসা করে সঞ্চিত ধন আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলি, নয়ত তোমরা যাকে বল সতীসাধবী, তাই সেজে কোন ধনবান পুরুষের তিন নম্বর কিংবা চার নম্বর স্ত্রী হয়ে তথাকথিত সংসারী হয়ে যাই। এ থেকেই বুঝতে পারছ আমরা হতভাগীও নই, পিশাচীও নই। আমরা জানি আমরা কি করেছি। আমিও মনে করি আমাদের ঐশ্বর্য দেখে অনেক সতী-সাধবী কুলবধূও আমাদের ঈর্ষা করে। আর একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। স্ত্রী-পুরুষের যৌন জীবনকে যদি কেউ কলুষিত করে, বিকৃত করে তবে তার দায়িত্ব পুরুষের, আমাদের নয়। তোমাকে একটা আচার অনুষ্ঠানের কথা বলি। আমাদের বাড়িতে যদি কোন নৈশ অতিথি আসে তখন সে ঘরের বাইরে জুতো খুলে আমাদের সঙ্গে ঢুকতে হয়। শয্যায় যাওয়ার আগে তাকে স্নান করতে হয়। এক বন্দে গৃহ প্রাঙ্গণে যে ছোট মন্দিরটি রয়েছে সেখানে মোমবাতি আর সুগন্ধ ধূপকাঠি জেলে গৃহের মঙ্গলকারী অশরীরী দেবতাকে প্রণাম করতে হয়। তারপর ঘরে এসে পাটকরা পরিষ্কার নীল বসন পরতে হয়। আমরাও তাই করি। এগুলো কি পৈশাচিক আচরণ বলে তোমার মনে হয়। আর আমরা হতভাগিনী কিসে ? আমরা বিত্তশালী। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে আমাদের আত্মাকে আমরা অবমাননা করি না। আমার দেহের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ ত ? কোন কদর্যতা এর মধ্যে দেখতে পাও কি ? আর পৈশাচিক প্রবৃত্তি আমরা কোথায় পাব ? কাকে তোমরা কলুষ বল তা আমার জানা নেই, আশা-নিরাশার দোল খেয়ে আমরা বিকারগ্রস্ত হই না। অদৃষ্টকে ধিক্কার দেবার প্রয়োজনও আমরা বোধ করি না। ফেলে আসা জীবনের প্রতি আমাদের টান নেই। ভবিষ্যতের চিন্তার কুয়াশা আজ সকালের সূর্যরশ্মিকে ম্লান করে না। এতক্ষণ তোমাকে এ কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম।

—তোমার কথাগুলো ভেবে দেখব। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ, সংস্কার, আর্থিক অবস্থা আর নৈতিক মানদণ্ড কিন্তু এক নয়।

—তা নাই বা হল, তাতে কি আসে যায়। আমার মনে হয় পুরুষের কাছে তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয় বলেই তাদের অলীক রঙীন স্বপ্ন একটা সামান্য আঘাতেই ভেঙে যায়। তারপর জীবনের অনেক গলিঘুঁজি পার হয়ে একদিন পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। সেই পতিতাকে দেখে তখন তোমাদের দেশের পুরুষেরা তাদের হতভাগিনী বলতে শুরু করে। সমবেদনার কুম্ভীরাশ্রু পাত করে, পুরুষকে তার জায়গায় রেখে দিলে সে ঠিকই থাকে। নারীকে অমর্যাদা করতে কখনই সে সাহস পায় না।

—শুনলাম তোমার কথা। তোমার প্রতিবাদের বিষয়টাও জেনে রাখলাম। তবে লেখাগুলো সংবাদপত্রে লিখতে পারব কিনা সে ভরসা তোমাকে দিতে পারছি না।

—ইচ্ছে হয় দিও, না হয় দিও না।

—সে দেখা যাবে। তোমার কথা ত এবার ফুরোলো। এবার তাহলে গা তোল। বাকি রাতটুকু ঘুমুতে দাও।

—বা। এই শেষ রাত্রিতে আমি একা একা বাড়ি ফিরব কি করে ?

—তবে কি করবে। বসে বসে আমার কানের কাছে প্যানর প্যানর করবে ?

—না, তা করব না। তবে তোমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে ত বল না। আমি খুশী মনে উত্তর দেব।

—বুঝলাম ভোর না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখান থেকে নড়বে না, আচ্ছা বল ত তোমাদের এমন পুতুল পুতুল চেহারা কেন ?

—এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি করে দেব, যে বিধাতা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই বলতে পারেন।

—তাঁকে আর পাচ্ছি কোথায়।

—তোমার পেয়েও কাজ নেই। এটা থাই জাতির একটা বৈশিষ্ট্য বলেই ধরে নেও না কেন, আমাদের দেশের জল-হাওয়া ভৌগোলিক অবস্থিতি, প্রাকৃতিক পরিস্থিতি আর খাদ্যশস্যের বিভিন্নতা জীব-কোষের যে রূপান্তর ঘটাচ্ছে তার ফলেই বোধ করি আমাদের ত্বকের এই কোমলতা, দেহবল্লরী এত পেলব আর স্নেহময়। আমাদের প্রসাধনেও বিশিষ্টতা আছে। বিদেশী প্রসাধন সামগ্রী ছাড়া ও আমাদের দেশজ লতাপাতার রস, বিশেষ বিশেষ গাছের চূর্ণ আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি, আমরা গরম দেশে থাকি। রোদ্দুরে সর্বক্ষণ চলাফেরা করি, কিন্তু আমাদের দেশজ প্রসাধন দ্রব্যের গুণে ঐ রোদ্দুরের আঁচ আমাদের চামড়াকে একটুকু ঝলসাতে পারে না।

—আচ্ছা, তোমরা এত উগ্র, গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার কর কেন ?

—করি এই জন্যে যে, তোমরা, অর্থাৎ পুরুষেরা আমাদের গায়ের স্বাভাবিক দৈহিক গন্ধ পছন্দ করে না। তাই এক গন্ধ ঢাকতে আর এক গন্ধের আশ্রয় নিতে হয়।

—সে যাকগে। আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি শুনেছি তোমরা অর্থাৎ এ দেশের রমণী নাকি একটু বেশী মাত্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ। একথা কি সত্যি ?

—হ্যাঁ, সত্যি। তার কারণও আছে। আমাদের দেশের জলহাওয়াটাই আমাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তোলে। হাজার হাজার

বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ দ্বীপময় অঞ্চলে এক ধরনের মুক্ত আর সহজ যৌনজীবনের ধারা বয়ে চলেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা সেই মানসিকতা পেয়েছি। এ ছাড়া আমাদের দেশের জল-হাওয়ায় এমন একটা মদিরতা আছে যা অনায়াসেই আমাদের ঘরের বাইরে টেনে আনে, গরম আবহাওয়ার জন্যে আমাদের স্বল্পবাস পরতে হয়, আর অলসগমনা হয়ে শ্রান্তির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হয়, তাই আমরা স্বাভাবিক কারণেই সতেজ, জৈবিক তাগিদে সাড়া দিতে উন্মুখ। এর আরও একটা কারণ আছে। আমরা জল খুব ভালবাসি। তাই আমরা জলের কাছাকাছি বাস করি। দশ বছর আগেও এই ব্যাংকক শহরে কি ছিল? এই ঝিমুনো শহরটায় রাস্তাঘাট বলতে বড় বিশেষ কিছু ছিল না। তার বদলে ছিল শহরের শিরা উপশিরার মত অসংখ্য ছোট-বড় খাল। এই খালের ধারে মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উপরে বাঁশের শক্ত খুঁটির উপর আমরা কাঠের ঘর বাঁধি। সে সময় এই শহরের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ লোক এই কাঠের বাড়িতেই বাস করত। আজও যদি তুমি কোন গ্রামে যাও তাহলে দেখতে পাবে যে গ্রামের অর্ধেক লোক খালের কোল ঘেঁষে এ রকম বাড়িতে বসবাস করে, এই খালগুলোকে আমাদের ভাষায় বলা হয় ক্লং। এই খালের জলে আমরা দিনে তিন-চারবার স্নান করি। জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমরা খেলা করি, এই জল খেলায় আমাদের অসীম আনন্দ। আমার মনে হয় এই আনন্দানুভূতির সঙ্গে আমাদের যৌন জীবনের কোথাও মিল আছে।

—কি জানি তোমার কথা সত্যি হলেও হতে পারে। আচ্ছা বল ত এ শহরে তোমার মত দেহপসারিণীর সংখ্যা কত?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে আশী নব্বই হাজারের কম নয়।

—এ শহরের লোকসংখ্যা তোমার জানা আছে?

—প্রায় তিরিশ লাখ।

—বল কি। এই তিরিশ লাখের মধ্যে প্রায় এক লাখই তোমরা?

—কেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। আমাদের চাহিদা যত বাড়ছে, আমরাও সেই সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছি।

—হুঁ। তোমাদের পৃষ্ঠপোষক কারা?

—সবাই। থাই নাগরিক ত আছেই। এ ছাড়া আছে অন্যান্য দেশের স্থায়ী বাসিন্দারা। এদের মধ্যে চীনা সম্প্রদায় আছে, ভারতীয় আছে, জাপানী আছে, ইউরোপীয়ান আর আমেরিকান আছে। তা ছাড়া আছে বিদেশ থেকে আসা হাজার হাজার পর্যটকের দল।

—প্রতি দিন কত পর্যটক ব্যাংককে আসে?

—তা হাজার থেকে দেড় হাজারের মধ্যে।

—পর্যটকেরা ত দেশ ভ্রমণে আসে। তাদের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক।

—সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তারা দেশ ভ্রমণের অছিলায় আমাদের কাছেই আসে।

—এ শহরে নিশিবাসর (নাইট ক্লাবের), মাসাজ পারলার 'বার' প্রমীলা অধ্যুষিত রেস্টুরেন্ট আর সাধারণ গণিকালয়ের সংখ্যা তোমার জানা আছে?

—সঠিক অংক না জানলেও সব মিলে বিশ-পঁচিশ হাজারের কম নয়।

—এ সব জায়গা ছাড়া আর কোথাও কি তোমাদের সন্ধান মেলে?

—মেলে বৈকি। সমাজের সর্বস্তরে আমরা মিশে আছি। ধর তুমি একটি বাড়ী খুঁজছো। এস্টেট এজেন্টকে হয়ত টেলিফোনে বললে তোমার একশো থেকে দেড়শো আমেরিকান ডলারের মধ্যে একটি বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট চাই। এস্টেট এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জিগ্যেস করবে তুমি বিবাহিত না বেচেলর। যদি বল তুমি বিবাহিত তবে একজন পুরুষ কর্মচারী তোমাকে বাড়ী দেখাবে। আর যদি বল তুমি অবিবাহিত তবে দেখবে গাড়ী নিয়ে বাড়ী দেখাতে যে আসবে সে একজন চোখ ধাঁধানো তরুণী। সেই মেয়েটি আমাদেরই একজন। বাড়ি ভাড়ার দক্ষিণা একটু বাড়ালে সেই তরুণীর সাহচর্যও পেতে পার। এ ছাড়া আছে ট্রাভেল এজেন্টের দল। পর্যটনের উদ্দেশে তুমি হয়ত থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথিয়া কিংবা পিৎসানুলোক যাবে। যদি ট্যুরিস্ট বাসে যাও তবে যাত্রীদের সংগে এজেন্টের বেতনভোগী একটি মহিলা গাইড যাবে। আর যদি তুমি ঐ ট্রাভেল এজেন্টের প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করে ঘুরে বেড়াতে চাও আর গাইডের সাহায্য নিতে চাও তবে দেখবে রূপের বন্যা ছুটিয়ে এক তরুণী গাইড হিসেবে গাড়ীতে একাসনে তোমার সংগে বসবে। ঐ গাড়ীগুলোর আবার একটু বিশেষ ধরনের। ড্রাইভারের সীটের আর পেছনের যাত্রীর সীটের মাঝের ফাঁকা জায়গাটা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দেওয়ার জন্যে একখানা রঙীন কাঁচের বেড়া রয়েছে। তোমার আর তোমার রূপসী গাইডের কথাবার্তা ড্রাইভারের চৌদ্দপুরুষও জানতে পারবে না। তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে তোমার গাইডটি খুসী মনেই তোমার সংগে হোটেলে রাত কাটাবে। এ ছাড়া এ শহরে এক অদ্ভুত ধরনের হোটেল আছে। হোটেল না ছাই। না মেলে খাবার দাবার, না মেলে কোন পানীয়। সারাদিন এ হোটেলগুলোতে জনমানবের চিহ্নও খুঁজে পাবে না। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই জিয়নকাঠির স্পর্শে এগুলো যেন সারাদিনের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে। এ হোটেলগুলো কেমন জানো? কখনও দেখনি বুঝি? আচ্ছা বলছি। একটা বিরাট বাঁধানো চত্বরের তিন পাশ ঘেরা ইংরেজি 'ই' সেপের একটা একতলা বাড়ী। এতে তিরিশ চল্লিশটা ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের সামনে একটি করে গ্যারেজ। অতিথিরা গাড়ীশুদ্ধু গ্যারেজে ঢুকে যাওয়ার সংগে সংগে গ্যারেজের সামনে একটা মোটা পর্দা ঝুলে পড়ে বাইরে থেকে গাড়িটাকে অদৃশ্য করে দেয়। পথচারীরা ঘুনাক্ষরেও জানতে পারবে না কে এলো আর কে গেল। গাড়ীর মালিক তার সঙ্গিনীকে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে দুপা হাঁটলেই সামনে সুসজ্জিত শীততাপনিয়ন্ত্রিত একটি ঘর।

—এসব জায়গা ছাড়া তোমাদের পৃষ্ঠপোষকদের সংগে মিলনের আর কোন জায়গা আছে।

—আছে। হয় হোটেলে, নয় তাদের আস্তানায় নয়ত আমাদের বাড়ীতে।

—বল কি! তোমাদের বাড়ীতে তাদের নিয়ে যাও?

—কেন, তাতে দোষের কি? এই দেখনা যেমন আমি। আমিও প্রায়ই আমার অতিথিদের বাড়ি নিয়ে যাই।

—তুমি বুঝি বাড়ীতে একলা থাকো?

—মোটেই না। আমার দাদা বৌদি আর তাদের দুটি ছেলেমেয়ে আমার সংগে থাকে।

—সেকি! তোমার দাদা বৌদি এতে আপত্তি করে না?

—আপত্তি করবে কেন। আমার স্বাধীন জীবনযাত্রায় বাধা দেবার অধিকার কারু নেই। আমি যখন প্রথম এ লাইনে আসি তখন আমি দাদার বাড়িতে থাকতাম। কিন্তু এখন হাতের পাশা উলটে গেছে। এখন তারা থাকে আমার বাড়ীতে। আমার দাদা আগে সামান্য একটা কাজ করতো। কিন্তু যেই জেনেছে আমার হাতে অঢেল টাকা, দাদা অমনি ঐ কাজটা ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে দিব্যি আমার অন্ন ধ্বংস করছে। আর বৌদি ত আমাকে খুসী রাখতে নিজের নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়। বুঝলে না, টাকা, টাকা। টাকায় সব হয়।

—আচ্ছা চরিত্রবান বলতে তুমি কি বোঝ?

—এই ধর যে মদটদ খায় না, জাল-জুয়াচুরী করেনা, এক স্ত্রী নিয়ে থাকে—এই আর কি।

—তোমার কথা শুনে মনে হচছে তুমি এখনও মধ্য যুগের অন্ধকারে আছ। তোমার ঐ ব্যাখ্যাটা মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক নৈতিক আদর্শ। আজকের ধনতন্ত্রের যুগে ঐ আদর্শ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তোমার সংজ্ঞা মত আজ যদি সারা পৃথিবীর পুরুষগুলো হঠাৎ চরিত্রবান হয়ে ওঠে তবে স্কটল্যাণ্ডের অত বড় হুইস্কির আর জিনের কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। স্পেন, ইতালী আর ফ্রান্সের দ্রাক্ষাকুঞ্জ শুকিয়ে যাবে জার্মানীর রাইন নদীর দুপাশের আঙুরের ক্ষেতে ঘুঘু চরবে। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ভোগ্যপণ্যের শিল্প সংস্থা মাঠে মারা যাবে। আর জালজোচ্চুরী কথা বলছো? তোমরা ধনী আর নির্ধনীর ব্যবধানের দেয়ালটাকে দিনে দিনে পোক্ত করার চেষ্টা করবে অথচ জাল, জোচ্চুরী, প্রতারণা থাকবে না—এটা সোনার পাথর বাটির মত শুনতে লাগে না। যাইহোক, একটা পুরুষ নিয়ে রাত কাটাবার গৌরবে সারাদিন তার দাসীবৃত্তি করতে পারবো না। তা ছাড়া রোজ একই তরকারী দিয়ে ভাত খেতে কি কারো ভাল লাগে?

—এবার বলোত এ দেশের কোন কোন অঞ্চল থেকে তোমরা শহরে আসো।

—আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বইটি মেয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে। চাষী পরিবার থেকেই বেশী।

—দূর গ্রামে থেকে নাগরিক জীবনের গেলামারের সন্ধান পাও কি করে?

—কেন। এ-দেশের ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানীগুলো প্রত্যেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে মাসে দু-তিনবার করে তারা সিনেমা দেখায়। হলিউডে আর জাপানে তৈরী থাই ভাষায় 'ডাব' করে ফিলম দেখানো হয়। হাস্যময়ী, লাস্যময়ী রূপে, ঐশ্বর্যে ভরপুর ঐসব অভিনেত্রীদের দেখে আমরা গ্রামে বসে শহরের গেলামারের হাল বুঝতে থাকি। এ ছাড়া এখন গ্রামে গ্রামে সস্তাদামের ফিলমী ম্যাগাজিনের ছড়াছড়ি। সে সব ম্যাগাজিন থেকে আমরা খবর পাই যে ব্যাঙ্ককের নাইট ক্লাবে, 'বার'-এ গায়িকা আর নর্তকীর এক বিরাট চাহিদা। আমাদের গ্রামের মেয়েদের মধ্যে যাদের গানের গলা আছে আর যে-সব মেয়েরা গ্রামের স্কুলে অল্পবিস্তর নাচের তালিম নিয়েছে তারা এসব দেখে শুনে আর গ্রামে পড়ে থাকতে চায় না। শহরের আনন্দ কোলাহল তাদের অস্থির করে তোলে। তারপর একদিন আমরা ব্যাঙ্ককে এসে উপস্থিত হই। নাইট ক্লাবের মালিকদের সঙ্গে টাউটরাই পরিচয় করিয়ে দেয়। এ ছাড়া কিছু ঠগ আর মতলববাজ লোকের খপ্পরে পড়েও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ লাইনে আসে। শহরে এসে ইয়োরোপীয় সঙ্গীত আর নৃত্য কিছুটা তালিম নিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি 'শো' বিজনেসে নেমে পড়ি। তারপর যা হবার তাই হয়। মাসাজ পারলার আর বার গার্লদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

—তোমাদের এই পেশায় রোগের ভয়ত আছে।

—নিশ্চয়ই আছে। রোগের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হয়। সপ্তাহে একবার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিই। প্রয়োজন হলে অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

—আমি শুনেছি 'ভিয়েৎনাম স্ট্রাণ্ড' বলে এক ধরনের যৌনব্যাধি নাকি এনটি-বায়োটিক রেজিসট্যান্ট। সে রোগ হলে তার প্রতিকার কি?

—কোন প্রতিকার নেই। এ ব্যাপারে অনেকটা কপাল ঠুকে চলতে হয়।

—আচছা, নারীদেহের ব্যবসার ব্যাপারে তোমাদের দেশে আইনগত অবস্থাটা কি?

—আইন একটা আছে। অর্থাৎ এ বৃত্তি আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু এ দেশে আইনের পরোয়া কে করে। আর করবেই বা কেন। আমাদের দেশের সরকার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এটা ভালো করেই বোঝে যে, এ ব্যাপারে আইন ধুয়ে জল খেলে দেশের যে আর্থিক ক্ষতি তা সামলাবে কে।

—এ প্রসঙ্গটা একটু বুঝিয়ে বল।

—বলছি। এই ধর টুরিস্টদের ব্যাপারটা। আগেই বলেছি যে, ব্যাঙ্ককে প্রতিদিন সুদূর আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটক এই শহরে আসে। তারা দরাজ হাতে মূল্যবান ডলার এদেশে ছড়িয়ে যায়। সেই ডলারের প্রসাদে বেঁচে থাকে আমাদের হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, আমাদের ট্রানসপোর্ট সার্ভিস। আমাদের জাতীয় এয়ার লাইনস-গুলো প্রচুর ভাড়া পায় তাদের কাছ থেকে। ভোগ্যপণ্য তারা উঁচু দাম দিয়ে সংগ্রহ করে। অগুনতি ট্যাকসি তাদের পয়সায় হুসহুস করে দিনরাত শহরের বুকে ঘুরে বেড়ায়। এরা আমাদের দেশের মূল্যবান মণিমাণিক্য কিনে নিয়ে যায়। আমাদের দেশের খনি থেকে তোলা চুণী, পান্না, ইন্দ্রনীলমণি ইত্যাদি মূল্যবান মণি ওরা উচচমূল্যে দিয়ে কেনে। আর নিয়ে যায় পুরাতত্ত্ব ঐশ্বর্য-মণ্ডিত ভাস্কর্যের নিদর্শন। এরা এদেশে আসে কেন জান? আসে শুধু আমাদের জন্যে। সরকার এই সত্যটা খুব ভালো করেই জানে। তাই উচচমহলের কর্তাব্যক্তিরা আর পুলিশ চোখে ঠুলি পরে থাকে। আর আমাদের দৌলতে পুলিশের রোজগার কি কিছু কম। আমাদের দৌলতে তারা দিব্যি ভুঁড়ি বাড়িয়ে চলেছে। টুরিস্ট ছাড়া আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে আর বৃহৎ শিল্প সংস্থায় হাজার হাজার লাখপতি কোটিপতি বিদেশীরা আমাদের দক্ষিণ হাতের দাক্ষিণ্য পাবার জন্যে লালায়িত। এ ছাড়া ট্যাংরা আর খলসেরা ত আছেই! তাদেরত হিসাবই রাখি না। এরা সবাই আনন্দস্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার আগে নিজেদের গাঁটের ডলার ভাসিয়ে দেয়। এতে আমরাই শুধু লাভবান হই না, আমাদের দেশও সমৃদ্ধ হয়। দেখতেত পাচছো ব্যাঙ্কক শহরের ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্যের ইমারত গড়তে আমাদের অবদানও বড় কম নয়।

তোমাকে আর একটা কথা বলি। এই যে শহর জুড়ে এত নাইট ক্লাব আর মাসাজ পারলার দেখছো এদের বেশীর ভাগ মালিক কারা জানো? মালিক আমাদের দেশের সরকারের বড় বড় মাথাগুলো। মিলিটারী আমাদের দেশ চালায়। সরকারের উচচপদে আছেন জেনারেলরা, ব্রিগেডিয়ার আর কর্নেলরা। এরা দেশ শাসনও করেন আবার মাসাজ পারলারও চালান। এবার হয়ত বুঝতে পারছো আমাদের ব্যবসায়ে আইনের ফাঁস কত আলগা। সব থেকে মজার ব্যাপার কি জানো। সেদিন পেচবুড়ি রোডে একটা জমকালো মাসাজ পারলার খোলা হলো। এর মালিক একজন জেনারেল। খুব ঘটা করে উদ্বোধন হলো। মঠ থেকে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এসে পুজোটুজো করে শান্তি জল ছিটিয়ে দিলেন বাড়ীটার গায়ে। ব্যস মন্ত্রপূত হলে সব পবিত্র হয়ে গেল।

—আচছা এ দেহের ব্যবসা যে পাপ সে বোধ তোমাদের আছে?

—পাপ! অবাক করলে। এতগুলো কথা বলার পরেও তুমি একে পাপ বলবে? তোমার পাপ পুণ্যের বালাই নিয়ে তুমি থাকো। আমি আর বকতে পারছি না। এখনো দিনের আলো ফোটেনি। চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। এতক্ষণ বক্‌বক্‌ করে আরো ক্লান্ত লাগছে। এক কাপ কফিও দিলে না।

—তুমি ত কফি খেতে আসোনি। এসেছিলে প্রতিবাদ জানাতে। সেত হয়ে গেছে, এবার বাড়ী ফিরে গিয়ে কফি খাও।

—আচছা, চলি তা হলে। হয়ত আবার কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা হবে। সাবাডি খাপ (নমস্কার)।

—সে রাতের এই কাহিনীটুকু আজো মনে আছে। কিন্তু এখনো আমি মনে করতে পারছি না সেদিন আমি এই মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে নিশুতি রাতে সে আমার শোবার ঘরে এসেছিলো।

সেই থেকে একটা মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছি। জানি না সংসারে কে হতভাগিনী আর কে নয়!

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভাল জমি দেখেই তারা দিতে চেয়েছিল—তিনি বললেন, না, যদি দিস এমন জায়গা দে, যেখান থেকে শুয়ে শুয়েও স্কুলটা দেখতে পাবো।

এঁরা যদি তপস্বী না হন তো সে শব্দের অর্থ কি তা বিনু জানে না।

স্কুলে ঘোরার পর সাহস কিছু বেড়ে গেল বৈ কি।

এ ধারেও অনেক দোর খুলে গেল। ওরা ফিরে এসে দাম মিটিয়ে দেয়। বেশী টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে খোয়া যাবার ভয় আছে বলে মধ্যে মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মনি অর্ডার করেও পাঠায়—এ কথা শোনবার পর 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'র মতো লোকমুখেই ছড়াল, অনেকেই ধারে বই দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো। যাঁর আগে 'না' বলেছিলেন তাঁরা ঠিকানা জেনে বাড়িতে এসে দেখা করলেন।

ভরসা বাড়তে বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা শুরু করল ওরা— পাটনা, ভাগলপুর মুঙ্গের, জামালপুর, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ কানপুর। সর্বত্রই ভাল অভ্যর্থনা বইয়ের বিক্রী ভাল।
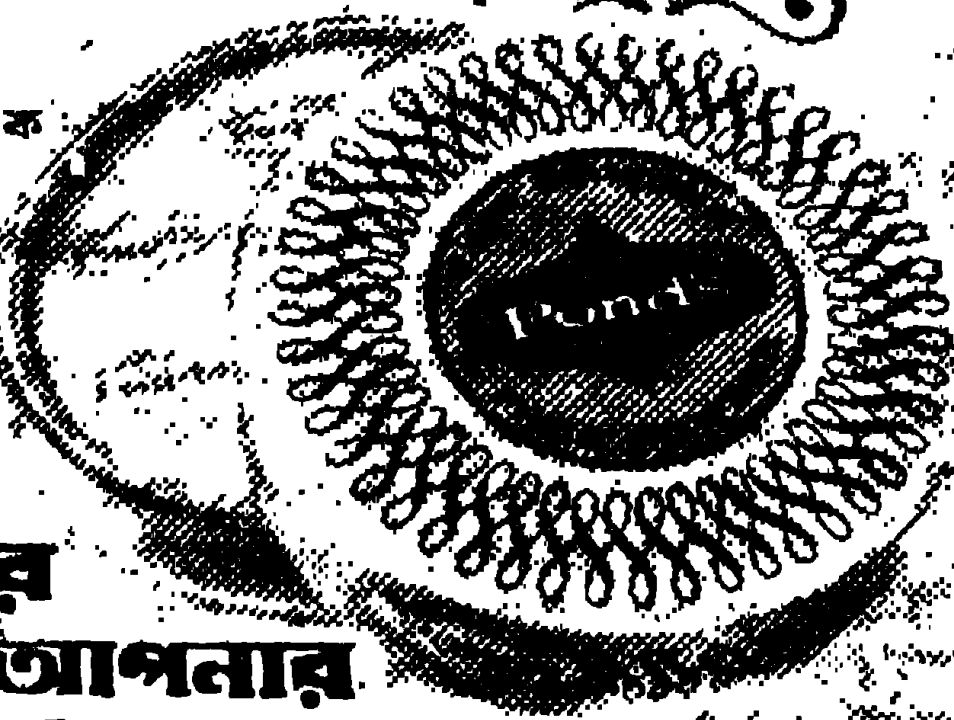
দেশবিদেশ ঘোরার সঙ্গে কিছু কিছু উপার্জন, এ এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। কষ্ট অবশ্যই করতে হয়। ধর্মশালায় থাকা অথবা সস্তাদামের অপরিচ্ছন্ন হোটেলে, যে জীবন, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে আদৌ সুখপ্রদ নয়। সঙ্গে রান্নার সরঞ্জাম নেই, মাটির হাঁড়ি কিনে কাঠ জেলে রান্না করা, খুন্তির বদলে পাতলা কাঠই ভরসা। পাতায় খাওয়া ডাল রেঁধে মাটির পাত্রে ঢেলে রাখা—বাজার থেকে রুটি কিনে এনে রাত্রে খাওয়া কিংবা কাঁচা রুটি ফেলে ডালের সঙ্গেই ফুটিয়ে নেওয়া। কিন্তু ওদের তখন নবীন বয়স, অবারিত জীবন সামনে পড়ে। আশার প্রাসাদে ঢুকে সেই ভাগ্যের মণিরত্ন আহরণে যাত্রা ওদের—এসব কষ্ট দুঃখ দিতে পারে না, বরং দুজনে থাকায় নিত্য পিকনিকের আনন্দ বহন করে আনে।

তাছাড়া পশ্চিমের দিকে তখন কিনে খাবার মতো খাদ্য প্রচুর। ডাল ঘিয়ে ভাজা খাবার, উৎকৃষ্ট দুধ দই রাবড়ি—দাম অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। পাটনাতে দু' আনা সের ডাল ছোলার ছাতু। এক পোয়া কিনলেই দুজনের প্রাত্যহিক নাস্তা হয়ে যেত। এলাহাবাদে পাঁচ পয়সায় এক পোয়া ঘিয়ে ভাজা জিলাপী ও তিন পয়সার দই—দু' আনায় নবাবী মেজাজের জল খাবার। পাটনায় বেনারসী ছ' পয়সার কুলপী বরফ খেলে রাত্রে খেতে হত না আর। কলকাতার ছ' আনা দামের বরফও তার কাছে নিকৃষ্ট। আগ্রা কানপুর লখনউতে ছ' আনা আট আনা শ্রেষ্ঠ রাবড়ির সের ছিল, বৃন্দাবনে চার আনা।

হাতে পয়সার স্বাচ্ছল্য থাকলে এই সবই খেত ওরা। কখনও কখনও দুবেলাই পুরী খেয়ে থাকত, প্রচণ্ড গরমেও। পয়সা কম থাকলে তিনবেলা খিচুড়ি খেতেও অসুবিধে নেই। এইটেই য়্যাডভেঞ্চার, অফুরন্ত আনন্দর উৎস এই নানা ধরনের জীবন-যাপন।

এর মধ্যে একটা সত্যিকারের য়্যাডভেঞ্চারও ঘটে গেল।

যত কাজই থাক, কলকাতায় থাকলে বিকেলে একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এর পুরনো বইয়ের বাজারটা দেখা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করত বিনু। সেদিনও প্রথমটা কিছু অলস কৌতূহলে ঘুরলেও হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। লক্ষ্য করল দুটি বিখ্যাত লেখকের অনেক বই। সম্ভ্রান্ত প্রকাশকের ছাপা—একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত যেন রেলিং মুড়ে দিয়েছে পুরনো বইওলারা।

চমকে ওঠার মতোই। একই লেখকের দশ-বারো রকমের বই অনেক কপি করে এভাবে বাজারে আসে না, তাও এমন অম্লান অবস্থায়। ফেদারওয়েট য়্যান্টিক কাগজে সুন্দর ঝকঝকে ছাপা, সবটাই সেলাই করা, যায় দপ্তরীরা যাকে তসমা-সিলি করা বলে সেই অবস্থায় শুধু মলাটটা লাগানো নেই। বোর্ড লাগিয়ে রঙীন সুদৃশ্য মলাট দিয়ে ছাপা হয়, কোনটা পুরো কাপড়ে কোনট বা অর্ধেক কাপড়ে অর্ধেক কাগজে। সেইটেই হয়নি।

এতদিনে এ জগতের রহস্য কিছু কিছু আয়ত্ত হয়েছে বিনুর, সে বুঝতেই পারল—এ কোন বিশেষ দপ্তরী বাড়ি থেকে চোরা পথে বেরিয়ে এসেছে। মলাটগুলো বোধহয় প্রকাশক নিজের কাছে রাখেন। যেমন যেমন বাঁধিয়ে আনা প্রয়োজন হয়—একশো বা পঞ্চাশ দপ্তরীদের বার করে দেন। ছাপা সবই দপ্তরীদের জিম্মায় থাকে, এ নিয়ম সনাতন, স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। দ্রুত কাজের সুবিধার জন্যে অবসর সময়ে ওরা সেলাই করে করে রেখে দেয়—তাতেই এইভাবে বেরিয়ে এসেছে, কেবল মলাট পায়নি বলেই একেবারে নতুন বইয়ের চেহারা দিতে পারেনি।

তা হোক—এ এমন একজন লেখক যাঁর নাম তখন প্রায় সর্বাগ্রগণ্য বলে ধরা হত। এই লেখকের আট-দশ রকম বই, আর রহস্য লহরী সিরিজেরও বারো-তেরো রকম—সেও এই একই অবস্থায় এসেছে। বিভিন্ন প্রকাশক কিন্তু দপ্তরী বোধহয় এক।

রহস্য লহরী সিরিজের দাম কম কিন্তু চাহিদা বেশ। বিনুর মাথায় চকিতে এক মতলব খেলে গেল। ওখানের সব বইওলাই ওর অল্প বিস্তর চেনা। এ বই এদের সকলের কাছে কিছু থাকলেও কোন একজন লট কিনেছে এটা ঠিক। সেটা জানতেও দেরি হল না। তার সঙ্গে কথা বলে দরদস্তুর ঠিক করে ফেলল ও পাইকিরি হিসেবে অনেক বই কিনবে শুনে সে গড়ে ঐ বিখ্যাত লেখকটির সব বই পাঁচ আনা করে আর রহস্য লহরীর বই তিন আনা করে দিতে রাজী হল।

রহস্য লহরীর নতুন দাম বারো আনা, অন্য বইগুলি পাঁচসিকে, দেড় টাকা, দু টাকা এমনকি একখানা তিন টাকাও আছে। এগুলো ওর কেনা পড়ছে সিকিরও কম দামে।

ওখান থেকে বেরিয়ে দুজনে এল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বই পাড়ায়। এতদিনে অনেক প্রকাশকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, কিছু কিছু করে চেয়ে শদেড়েক টাকা ধার পেতে অসুবিধা হল না। হাতেও বিশ-পঁচিশ টাকা ছিল। কলেজ স্ট্রীটে ফিরে এসে আগেই একটা বড় ট্রাঙ্ক কিনল তাতে যত বই ধরে ঠেসে নিয়ে বাকী কতক বই একটা বড় প্যাকেট করল তারপর সেই রাতের ট্রেনেই বেরিয়ে পড়ল ভাগলপুর।

বই বাঁধবার কথাও মাথায় এসেছিল। কিন্তু মলাট ছাড়া এমনি বাঁধিয়ে লাভই বা কি? আরও খরচ বৃদ্ধি আরও অকারণ বৃদ্ধি।

ওরা সোজাসুজি লাইব্রেরীগুলোয় গিয়ে অবস্থাপন্ন লোককে যা পাঁচসিকে লেখা আছে তা দশ আনায় দেবে, তিন টাকারটা দেড় টাকায়। রহস্য লহরীর বই ছ আনা হিসেবে।

ভাগলপুর আর পাটনার মধ্যেই সব শেষ করে বারোদিনে মোট চারশ টাকা লাভ করে ফিরে এল ওরা।

॥ ৪৭ ॥

কিন্তু—অতঃকিম?

সেই মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

এ সবই তো জীবনের বহিরাঙ্গ দিক।

সাহিত্য জগতে কিছু কিছু—প্রতিষ্ঠা না হোক—স্বীকৃতি পেয়েছে। বড়লোক কোন কোন দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান নিঃস্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ওপরে উঠে যান সর্বদা। কাউকে সামান্য একটু মাথা হেলিয়ে পরিচয়টাকে স্বীকার মাত্র করে যান। যাকে ইংরেজীতে নড করা বলে।

বিনু এতদিনে সেই স্তরে পেঁৗচেছে, পরিচিত কৃপাপ্রার্থীদের মধ্যে গণ্য হয়েছে। এই তো তার কাছে কল্পনাতীত ছিল—কিছু দিন পূর্বেও।

বই ছাপছেন প্রকাশকরা, কিছু কিছু টাকাও পাচ্ছে। তাতে অন্তত ওর নিজের খরচা চালিয়েও সংসারে কিছু কিছু দিতে পারছে। সাময়িকপত্রে দুহাতে লিখছে—তাদের প্রতিষ্ঠা বা পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা চিন্তা না করেই। এখন অবশ্য প্রায় সব কাগজই টাকা দেন—কেউ বেশী কেউ কম। অঙ্কটা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কেউ এসে ধরলে বিনা পয়সাতেও দেয়। অনেক সৃষ্টি বা কর্মশক্তি ওর ভেতরে যেন টগবগ করে ফুটছে—না লিখে থাকতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা ললিতকে কাছে পেয়েছে। সে এখন একরকম নিত্য সাথী। দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ই একত্রে কাটে।

তবু কেন মন ভরে না ওর। সেই যে একটা কি অবর্ণনীয় বিপুল তৃষ্ণা তা যেন বেড়েই যায়।

মধ্যে মধ্যে যেন পাগল হয়ে ওঠে সে আকুতির নিষ্ফলতায়।

ওর নাম হয়েছে—যেটুকু হয়েছে মিষ্টি প্রেমের গল্প লেখে বলে। এ কথাটা ছড়িয়েছে লেখক মহলেই। তা সে তাঁদের কারও কারও কাছ থেকেই শুনেছে।

কিন্তু সে প্রেম ওর জীবনে এল কৈ?

জীবনে যা পেল না—তার স্বাদ কি নিজের সৃষ্টির মধ্যে মিথ্যার মধ্যেই পেতে চায়? সাধ মেটাতে চায় নিজের সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের দিয়ে।

ললিতকে কাছে পেয়েছে ঠিকই, দুজনের জীবন অনেকটা জড়িয়ে গেছে। সেও একটু একটু করে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বিশেষ নাটকের দিকে বেশ নাম হয়েছে ওর। অভিনয় হচ্ছে অনেক জায়গায়। ওদের দুজনেরই কিছু কিছু গল্প ফিল্ম হয়েছে, হচ্ছেও। রেডিওতে দুজনেই বলছে মধ্যে মধ্যে, ওদের গল্প নাটক হয়ে অভিনীত হচ্ছে। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই একসঙ্গে কাটে।

কিন্তু তবু সে কি বহু দূরে নয়?

সেই একটা পাগলামি, ওর একান্তভাবে পাবার ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার স্বপ্ন সাধ—সেকি মিটল এতে?

না, বরং কাছে থেকেও কাছে না পাবার যন্ত্রণাও বেশী।

দোষ ও ললিতকে দেয় না। দোষ ওর নিজেরই।

দোষ ওর বিচিত্র মানসিক গঠনের।

ললিত ওকে ভালবাসে—তার মতো করে। সাধারণভাবে বন্ধুকে যেমন ভালবাসে বন্ধু, তার চেয়ে বেশীই হয়ত বাসে। তবে সে সাধারণ মানুষ, তার মধ্যেও কাউকে পাবার কাউকে ভালবাসার কারও ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে বৈকি!

সে কেউ অবশ্যই মেয়ে, মেয়েছেলে। আর তাই তো স্বাভাবিক। তাইতো উচিত। বিশেষ যে কৈশোরেই মেয়েদের প্রেমে পড়েছে—সে আরও পড়বে।

এর মধ্যে পড়েওছে সে। সেই জন্যেই ললিতের কর্মজীবন, মানে তার সৃষ্টি-কর্মের জীবন বিঘ্নিত ব্যহত হচ্ছে। বিনুর গতিতে তার চলা সম্ভব নয়। সৃষ্টি এমনই জিনিস—তা সে ছবিই হোক লেখাই হোক আর গান-বাজনাই হোক—সেখানে কোন সপত্নীজাতীয়ার সহাবস্থান চলে না। সেখানে শিল্পীকে একক নিঃসঙ্গ, অনন্য-চিত্ত হতে হবে।

বিনু বলতে গেলে দুহাতে লেখে। পরিমাণে সেই সময়ে ললিতের সিকিও হয়ে ওঠে না। ছবির চাহিদা কমেছে, কিন্তু লেখায় চাহিদা বাড়ছে। লিখে যা টাকা পায় তা ছবির থেকে বেশী। সে লেখাটাও হয়ে ওঠে না সময় মতো দিতে পারে না।

কেন হয় না তাও বলে সে বিনুকে। বোধ হয় একমাত্র তাকেই বলে সব কথা। একাধিক মেয়ে তার প্রেমে পড়েছে। কুমারী বিবাহিতা, বয়স্কা অল্প বয়স্কা। সে যে তাদের সব সময় দৈহিক অর্থে সম্ভোগ করে তা নয়—তাদের আকৃতি তাদের অনুকূলতা উপভোগ করে। আর তা করতে হলেও কিছুটা সময় তাদের দিতে হয়।

ললিত বলে, তার এ ব্যাপারটা নতুন নয় কিছু, বলতে গেলে বাল্যকাল থেকেই চলছে। কত মেয়ে যে ওর জীবনে এল। ওর যখন পনেরো বছর বয়স তখনই শুরু হয়েছে এ পর্ব। ভগ্নী, পাড়ার মেয়ে, জ্ঞাতি বৌদি—এরা। পরে এসেছে ছাত্রীরা। এখন নানা সূত্রে পরিচয় বেড়েছে সেই সঙ্গে—প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণীদের পরিধিও।

ললিতের মধ্যে কি আকর্ষণ আছে তা সে নিজেই নাকি জানে না। হয়ত তাই। তবে তার জন্যে যে রীতিমতো গর্ব অনুভব করে সেটা বিনুর লক্ষ্য এড়ায় না।

ললিত বুঝতে পারে না তার প্রিয় বন্ধুর এই মনের কথা নিবেদনে সে বন্ধুর মনের ব্যথা কী পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তীব্র জ্বালা অনুভব করে সে—গভীর অন্তহীন হতাশা।

তবে এর জন্যে কাকে দোষ দেবে সে?

বিনু কি চায়—তা কি নিজেই ঠিক বোঝে। ললিত যদি প্রশ্ন করে তাকে বোঝাতে পারবে?

ওর বারবারই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন কটা—

'আকুল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম,
কস্তুরী মৃগ সম।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'

আশা ভঙ্গ তার বারবারই ঘটেছে।

সে জন্যেও নিজেকেই দোষ দেয়—আর বোধ হয় ভাগ্যকেও দেওয়া চলে। সেই ভাগ্যই তার মনে চিরকাল আশা ও কল্পনায় মেশা স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে রেখেছে যা কেউ পায়নি পাওয়া সম্ভব নয়—এমন জিনিসের ছবি সামনে ধরে রেখেছে—সাধারণ লোকের মতো জীবন নিয়ে সুখী ও নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি।

দাদার বিয়েও তো এমনি এক আশা-ভঙ্গের ইতিহাস— যে আশার চেহারাটা এমনই এক কল্পনার রঙে আঁকা—যার সঙ্গে বাস্তবের মিল হয় না, হওয়া সম্ভব নয়।

দাদা অনেকদিন অপেক্ষা করে করে অবশেষে মন স্থির করেছিলেন। বিবাহের প্রয়োজন হয়েছিল অনেকদিনই, কিন্তু নিজের সঙ্গতির কথাটা হিসেব করেই সে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। যখন চাকরিতে বেশ কিছু উন্নতি হয়েছে—যা হয়েছে অন্তত তাতে স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার চালানো যায়—একটু জমিও কিনেছেন, পাড়াতেই আপিস থেকে ধার পাবেন তাতে ছোট্ট একটা বাড়ি করার অসুবিধা হবে না—এখন আর অপেক্ষা করার কোন কারণ নেই।

কারণ কোন দিকেই যাতে না থাকে রাজেন সে ব্যবস্থাও করেছেন। বিনুকে ডেকে আগেই বলেছেন, বিয়ে করলে খরচ বাড়বে, বিনুকে এখন থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু টাকা সংসারে দিতে হবে। কত দিতে হবে কম পক্ষেও তাও জানিয়েছেন।

বেশী কিছু নয়, যা চেয়েছেন তা বিনু দিতে পারবে, সে সহজেই রাজী হয়েছে। এখন তার বই আর কাগজের লেখা মিলিয়ে—আজকাল প্রায়ই বেনামে স্কুলের সহপাঠ্য বই লিখছে সে, এককালীন টাকা ব্যবস্থা, বই চলেও বেশী পাবে না, না চললেও লোকসান নেই— মাসে পঞ্চাশ-টাকা হয়। কোন মাসে বেশী পায়। কোন মাসে হয়ত খুবই কম—এইভাবে। এছাড়া ছোটখাটো ব্যবসার ব্যাপার তো আছেই, মাঝে মাঝে দমকা কিছু কিছু টাকা এসে যায়। এগুলোতে জামা-কাপড় থিয়েটার সিনেমা সার্কাস কিছু কিছু শৌখিন দেশ ভ্রমণ চলে, মাকেও কিছু কিছু দেয়।

আরও আসবে। লেখার চাহিদা বেড়েছে। গল্প অনেকেই চাইছেন। বড় উপন্যাসও একটা বড় সাপ্তাহিক ধারা-বাহিক বার করবে—সম্পাদক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে লিখতে হাত দিয়েছে। তবে এটা তাড়াহুড়ো করবে না সে আস্তে

আস্তে লিখবে। যে ছোট গল্প বেশী লেখে তার উপন্যাস লিখতে অসুবিধা হয়। সেটা জয় করতে হবে, সময় লাগবে তাতে।

মেটের ওপর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বরং আনন্দ সংবাদ।

ওদের বর্ণহীন একঘেয়ে সংসারে আলোকের বার্তা আনবে একটি মেয়ে, চিরদিন অন্ধকারই দেখেছে ওদের অন্তরঙ্গ জীবনে, সেখানে আলো জ্বলবে, প্রভাত হবে দীর্ঘ রাত্রি শেষে।

বিয়ের আগে যে পূর্ব—পাত্রী নির্বাচন সে ভারটা ওর ওপর—ওদের ওপরই এসে পড়ল প্রধানত, ওর আর ললিতের ওপর।

ওরা পছন্দ করলে মা দেখবেন। দাদা দেখবেন না। বলেই দিয়েছেন, বিস্ময়টা নষ্ট করতে চান না আগে দেখলে অভিনবত্ব চলে যায়।

বিনুর মহা উৎসাহ। অনেকদিন পরে নতুন আশার স্বপ্ন দেখছে সে। বিচিত্র অভাবিত কল্পনার উৎস খুলে গেছে। প্রবল একটা আবেগের দোলায় দুলছে মন। স্বর্গ রচনা করে চলেছে সে, বহু বর্ণাঢ্য বহু অভিজ্ঞতার—অতীত চিত্র অঙ্কিত হচ্ছে চিন্তা-ভাবনায়।

বৌদি।

পাতানো নয়, পাড়াতু সম্পর্কে নয়। আপন বৌদি।

ছোটখাটো সুশ্রী একটি মেয়ে, হাসি-খুশী প্রাণোচ্ছল।

দুটি কোমল অপটু হাতে সংসারের খুটখাট কাজ করে যাচ্ছে, দাদার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করছে। বেচারী দাদা এতখানি বয়সে যা কখনও পায়নি। বাইরে দেখে এসেছেন আনন্দের হাট, বাড়িতে যার আভাস মাত্র পাওয়া সম্ভব হয়নি। ঐ নতুন মেয়েটি প্রেম দিয়ে মাধুর্য দিয়ে তাঁর সেই বহুদিনের বুভুক্ষা অকাট তৃষ্ণা নিবারণ করছে অমৃত সিঞ্চনে, মরুভূমিতে স্বর্গোদ্যান রচনা করছে। এতদিনের ক্লিষ্ট জীবন সংগ্রাম শ্রান্ত দেহে ও মনে নতুন উদ্যম সঞ্চার করছে।

নতুন উৎসাহ উদ্যম সঞ্চার করবে বুঝি বিনুর জীবনেও।

ওর কাছে আবদার করবে, ফরমাস করবে নানাবিধ, ওর ফরমাশ খাটবেও। ওরও ছোটখাটো স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবে। সর্বোপরি পরিহাসে রসিকতায় সহানুভূতিতে সহবেদনায় ওর সকল ব্যথা ওর বিপুল শূন্যতাবোধ ভুলিয়ে দেবে।

নতুন করে দ্বিগুণ উৎসাহে পরিশ্রম করবে, তাতেই আজকের এই সামান্য সাহিত্যিক পরিচয়ে বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আসবে। এক অঙ্কুর স্নেহমমতা রসিকতার বারিনিষেকে বিরাট মহীরূপে পরিণত হবে।

একেবারে অসম্ভব কল্পনা কিছু নয়। খুড় বেশী আশা করছে না সে।

এমন দেখেছে বৈকি।

বহু দেশে এখন যাতায়াত। বহু গৃহে অতিথি হতে হয়েছে। সাধারণ নিম্নবিত্ত গৃহস্থ বাড়ি থেকে অধ্যাপক, ধনী—সব রকম পরিবারেই এক আধ দিন থাকতে হয়েছে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের বাইরে দাঁড়িয়ে একটি ভদ্রলোক— দীন বেশ মলিন মুখ—ঘি বিক্রী করছিল। মুড়াগাছায় বাড়ি, আশপাশের গ্রাম থেকে ঘি এনে ব্যবসা করছেন, বা করার চেষ্টা করছেন। এক বাঙ্গালী ফার্মে কাজ করতেন সে ফার্ম উঠে গেছে তাতেই এই দুর্গতি। সামান্য দু-চার বিঘে জমি আছে, একান্নবর্তী পরিবার তাই ভিক্ষে করতে হচ্ছে না একেবারে, তবে সংসারও বড় কিছু না আনলে ঋণের দায়ে ওটুকু জমিও চলে যাবে।

কথায় কথায় আলাপ জমে উঠল। বিনুর তখন মাথায় গেছে বাইরে থেকে ভাল ঢেঁকিছাঁটা চাল কিনে এনে পরিচিতদের মধ্যে সরবরাহ করবে। ওর কাছে কথাটা পাড়তে উনি খুব আগ্রহ দেখালেন। ওঁদের দেশের চাল বড় মিষ্টি, দামেও সস্তা। বিনু যদি যায় উনি ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘাঁৎঘোঁৎ সব দেখিয়ে দেবেন, মহাজনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, সাহায্য যতটুক যা করতে পারেন তার কোন অভাব ঘটবে না।

খুব আগ্রহ দেখালেন। সেদিনই ধরে নিয়ে যেতে চান। দিন কতক পরে সত্যিই একদিন গেল বিনু। বিকেলের ট্রেনে গিয়ে রাত হল পৌঁছতে। সে-রাত্রি ওঁদের বাড়ি অতিথি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। একান্তই নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসার। দাদা এক স্থানীয় মহাজনের গদীতে খাতা লেখেন, বাকী সবটাই নির্ভর ছ-সাত বিঘে জমির ওপর। বাড়ি পাকা, তবে কতকাল মেরামত হয়নি, এমন কি চুনও পড়েনি তা অনুমান করতে ভয় করে। অনেকগুলি লোক। খাওয়া—ওর জন্যেই একটু বিশেষ আয়োজন হয়েছে তা বুঝতে পারল। খুবই সাধারণ।

কিন্তু তবু কি আনন্দের হাট। বৌদি বয়স্কা। তৎসত্ত্বেও রসে রঙে যেন টনটন করছেন। তিনি নিজের বিবাহযোগ্য মেয়ে, ছোট জা, দেওর স্বামী—সকলের সঙ্গেই প্রতি মুহূর্তে রসিকতা করছেন, আর তার ফলে বাড়িময় অট্টহাস্য উঠছে। বিনুকেও রেহাই দিলেন না। প্রথম পরিচয়ের জড়তা ভাঙ্গাতে যা দশ-পনেরো মিনিট দেরি। তারপরই শুরু হয়ে গেল তার কন্টকহীন কথায় খোঁচা। আর তেমনি কথায় কথায় ছড়া। এত ছড়াও জানেন ভদ্রমহিলা।

ওখানে ব্যবসায় কোন ব্যবস্থা হয়নি। তবে সে রাত্রের স্মৃতি চিরদিন অমলিন হয়ে আছে ওর মনে।

এই শহরেও দেখেছে বৈকি। কলকাতাতেও কত বাড়িতে যেতে হয়। অনেক পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে। দেওর বৌদির মধুর সম্পর্ক অনেক দেখেছে। বইতে পড়ছে তো আবাল্য। এক এক সময় মনে হয় এর চেয়ে মধুর সম্পর্ক পৃথিবীতে নেই, 'কাম গন্ধ নাহি তায়।'—কলুষিত কামনা বাদ দিয়ে মেয়েরা পুরুষের জন্যে স্বর্গ রচনা করে করতে পারে দুই রূপে। মা দেন অমৃত, সঞ্জীবনী সুধা, বৌদিরা দেন মাধুর্য বিকশিত হবার উপাদান। একটা বাঁচার আর একটা বেঁচে থাকার শক্তি, যুদ্ধ করার ক্ষমতা যোগায়। মেয়েরা বাপের কাছে পায় অনেক, দিতে পারে কতটুকু? তাদের স্বতন্ত্র জীবন তাদের সংসার মনের অন্য দিকগুলোকে আবৃত আচ্ছন্ন করে রাখে। বোনেরাও তাই। নিজের সংসার নিজেদের স্বার্থ সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করে তবে বাবা কি দাদার কথা ভাবার সময় পায়।

আশা উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছালে তার পতন বোধকরি অনিবার্য, সে পতনের বেদনাও বড় দুঃসহ। উঁচু থেকে পড়লে যেমন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে যায়—মনেরও তেমনি ভাঙ্গে। বোধ হয় এ ক্ষতি আরও বেশী।

বৌদি এলেন, বিনুই পছন্দ করল, মা অনুমোদন করলেন শুধু।

ভদ্রঘরের মেয়ে, কিছু লেখাপড়াও জানেন, গানের গলা মিষ্টি, শান্ত ভদ্র, সংসারে মন আছে। অল্প বয়স—সেখানটায় কল্পনার সঙ্গে মিলে যায়। অপরূপ সুন্দরী কিছু নন, মোটামুটি চলনসই চেহারা, নিন্দা করার মতো নয়।

কাজকর্ম কিছু জানতেন না, কিন্তু শেখার আগ্রহ ছিল, অজ্ঞানের ঔদ্ধত্য ছিল না। মার কাছ থেকে সবই শিখে নিলেন। রান্নাবান্না, ঘরদোরের শ্রী বজায় রাখা, দাদার দরকারী জিনিস হাতে হাতে গুছিয়ে দেওয়া—একে একে সবেতেই অভ্যস্ত হয়ে এলেন, পারিপাট্যও আয়ত্ত হল।

দাদা তৃপ্ত, মাও। বধূদের সম্বন্ধে শাশুড়ির স্বাভাবিক ঈর্ষা বা বিদ্বেষও প্রকট হতে পারেনি বৌদির শান্ত স্বভাবের গুণে। বরং এক এক সময় মার আচরণেই বিনু অবাক হয়েছে—এত বই পড়া ও অপরের সংসার দেখার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও। শাশুড়ি ও ননদ সব দেশেই সমান এ ইংরেজী বই পড়ে ও জেনেছে। ঈস্টলীন উপন্যাসে বেচারী ইসাবেলার জীবনটা নষ্ট করে দেন অনূঢ়া ননদ কর্ণেলিয়া। এতো ছেলেবেলাতেই পড়েছে। তবু অবাক হয়েছে, ওর সেই দেবীর মতো মা, মহিমময়ী সহনশীলা, শান্ত, সংযতবাক মা—তিনি প্রবলতম আঘাতেও ধৈর্য হারান নি—সে মা বহুদিনই হারিয়ে গেছেন, তবুও অপর সাধারণ গৃহিণীদের মতো তিনিও পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা বোধ করবেন—তা সে ভাবেনি।

তা হোক—তৎসত্ত্বেও শান্তির সংসারই ওদের—মানতে হবে।

শুধু বঞ্চিত হল, অশান্ত রইল বিনুই। ওরই অদৃষ্টে ওর সঙ্গে আবারও বড় রকম পরিহাস করল একটা, ওর স্বপ্ন একটা রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে গেল, ভেঙ্গে দিল ওর ভাবপ্রবণতাকে, আবেগকে।

বৌদি ও দেওরের মধুর সম্পর্কটা কিছুতেই গড়ে উঠল না ওদের মধ্যে। বৌদি রসিকতা তত বোঝেন না, করতেও

পারেন না। বিনু চেষ্টা করতে গেলে হিতে-বিপরীত হয়েছে। কোনো সূক্ষ্ম কোমলতা—মন বোঝার চেষ্টা তার তত আসে না। কোথায় প্রবল স্নেহের ঢেউ আশ্বাস দেবার আশ্রয় পাবার প্রয়াস আহত হয়ে ফিরে আসে। সেই সম্রাট বাজে না যার জন্যে তার প্রাণ তৃষ্ণার্ত উৎসুক ছিল।

একটু কি নিষ্প্রভ প্রাণের উত্তাপহীন।

অথবা উদাসীন, ইংরেজীতে যাকে বলে ক্যালাস সেই রকম উদাসীন? অনুভূতি কম?

তাহলেও বিনুর বিশেষভাবে অনুযোগের কোন কারণ নেই। সে ভাব তাঁর স্বামী সম্বন্ধেও এমন কি সন্তানদের সম্বন্ধেও লক্ষ্য করেছে। বাড়াবাড়ি আদিখ্যেতা—ওর আসে না। অত মনে থাকে না বাপু কিংবা ঘরে খাবার থাকে জানেই তো তৈরী হয় তো রোজই— চেয়ে নিতে পারে না? মনে করিয়ে দিলে কি হয়? এই সব ছিল তাঁর যুক্তি। দাদা আপিসে বেরিয়ে যাবার পর কিছু রান্না হলে দাদার অংশ রাত্রের জন্যে তোলা থাকে। সেটা অর্ধেক দিনই তাক থেকে পেড়ে বা ঢাকা থেকে বার করে দিতে ভুল হয়ে যায়। পরের দিন ফেলে দেবার সময় তিনিই অনুযোগ করেন জানে তো থাকেই। একবার কেউ মনে করিয়ে দিলেও তো পারে। যত দায় যেন আমার।

কথাটা সত্য। মাও জানেন, বিনু জানে, দাদারও অনুমান করা উচিত।

সুতরাং বিনুর নিজেকে বিশেষভাবে বঞ্চিত বা অবহেলিত মনে করার কোন কারণ নেই। রসিকতাবোধ—করা বা উপভোগ করা—ওটা তামসার প্রবণতা, এ সকলের থাকে না। এর জন্য প্রত্যেকের দৈহিক তথা মানসিক গঠনই দায়ী—মানুষ কি করবে। দোষ দিতে হলে সৃষ্টি কর্তার দোষ দিতে হয়, প্রকৃতির খেয়ালকে দায়ী করতে হয়।

এসবই বোঝে বিনু, তবু সেই একটা প্রচণ্ড আশাভঙ্গের দুঃখ অবলম্বনহীনতা শূন্যতা বোধও না করে পারে না।

বড় বেশী আশা করে, বড় বেশী চায় বলেই তাকে বারবার জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন আঘাত পেতে হয়।

পৃথিবীতে শিল্পী মাত্রেই একক ও নিঃসঙ্গ। বিধাতার ছন্নছাড়া সৃষ্টি। ঘরছাড়া বন্ধুছাড়া করেই তাদের পাঠান। তাদের আবেগ তাদের প্যাসন, তাদের নিজস্ব বিচার বিবেচনা, প্রাপ্য সম্বন্ধে ধারণা—কারও সঙ্গে মেলে না, বলেই তাদের নিয়ে বই লেখা হয়-পাঠকরা জীবনকাহিনীর মধ্যে দিয়ে তাদের মনের গতিটা বুঝতে চেষ্টা করেন।

বিনুই বা অন্যরকম হবে কেন? সে কত বড় শিল্পী অথবা আদৌ শিল্পী কিনা—সে নিরবধি কাল বিচার করবেন, সে শিল্পী হতে চায়, সেই মানস নিয়ে জন্মেছে, অবুঝ রে সৃষ্টিছাড়া সে। তার জীবনে বাইরে থেকে যতই যা থাক—ভেতরটা শূন্যই থাকবে চিরদিন।

এইটে মেনে নিতে পারলেই হয়।

আশা না করলে আশাভঙ্গের প্রশ্ন ওঠে না।

অনেক দিন আগে প্রবাসীতে এক প্রাচীন পারসিক চিত্রের প্রতিলিপি বেরিয়ে ছিল, সেই সঙ্গে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অজ্ঞাত-নামা এক ফার্সী কবির দু-তিনটি শ্লোকও। —সেগুলো অনুবাদ করে দিয়েছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তার একটা শ্লোক আজও মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে—অবশ্য যদি স্মৃতি তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে থাকে—

'জীবনপথে যাহা আসে,
যে বা আসে সামনে তোমার,
হাস্যমুখে তারেই বরো,
মুক্ত রেখো বক্ষ আগার।।'

বোধ হয় ওর পরের শ্লোকটায় ছিল,

'সেই তো ভাল, ধন্য তুমি,
দিলে না মোর মিটতে আশা,
বেদন নিয়ে নিলাম মরণ,
বিদায়, ওগো ভালবাসা।'

এই দুটো শ্লোক আজও বার বার মনে হয়।

তবু ঐ আগের শ্লোকের সত্যটা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে কৈ?

।।৪৮।।

পিতৃকুলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই দীর্ঘকাল। অনাবশ্যক বোধেই সেটা রাখার চেষ্টা করেনা ওরা। কেবল মহামায়া সুযোগ-সুবিধা পেলেই সংবাদের টুকরো সংগ্রহ করেন। শ্বশুর কুলের সংবাদ সম্বন্ধে আজও তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহলের অন্ত নেই। এমন কি এক একসময়ে তা আতুরতার পর্যায়ে পৌঁছয়। ইচ্ছা প্রবল বলেই সুযোগের অভাব হয়না।

ওর কাছে খবর পৌঁছয় বলেই তা বিনুদের কানেও আসে। তারাপ্রসাদ বন্ধুদের ধরে ও জড়িয়ে অনেক ব্যবসার পত্তন করেছেন এমন কি ভাইপো কনককেও বাদ দেননি। তাকে অংশীদার করেও একটা কাজে নেমে-ছিলেন। লোকটি বুদ্ধিমান, কর্মঠ, মোটা-মুটি সৎ, তবু অদৃষ্ট গুণেই একটাও দাঁড়ায়নি। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনমতে জীবনধারণের জন্যে অবিরাম যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে। তবে পাঁচজনের চেষ্টায় বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, খুবই অল্প বয়সে—কিন্তু ভাল পাত্র বলে তারাপ্রসাদ দ্বিধা করেননি। সেদিক দিয়ে একটা অভি-ভাবকই হয়েছে বলতে হবে।

রাধাপ্রসাদ মধ্যে শেয়ার মার্কেটে বড়-লোক হবার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে প্রচণ্ড মা খেয়েছেন, মধ্যে ইনসলভেন্সিও নিতে হয়েছিল। এখন পুনর্মূষিকো। নিজের বৃত্তির ওপর নির্ভর করেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

অনাদির অবস্থাই সবচেয়ে ভাল। মাইনের চাকরি। তবে এখন আয় মাসিক দু হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কৃপণ নন। হিসেবী মিতব্যয়ী মানুষ। কাজেই টাকা কিছু হাতে জমেছে।

কনকের খবরও পায় বৈকি।

সে ইতিমধ্যে অনেক কারবার দেখে এখন একটা কাগজ বার করেছে। মাসিক ও সাপ্তাহিক।

কোন ব্যবসাই চালাতে পারেনি। এটাও পারবে না। লেখাপড়া জানে, ইংরাজী ভাল লিখতে পারে, বুদ্ধিমান—ব্যবসা চলে না অতিরিক্ত অলস বলে। ভাগ্যক্রমে সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে—ফলে ঘর ছেড়ে কোথাও যায় না। মনে হয় যেন স্ত্রীকে চোখের আড়াল করতে ভরসা পায় না। কেউ কেউ বলে বিশ্বাস করে না বলে পাহারা দেয়।

এসব ক্ষেত্রে অল্পবয়সী ছেলেদের হাতে টাকা পড়লে যা হয়—কতকগুলি মোসাহেব জুটেছে। যত ব্যবসাই করতে যাক, ঐগুলি এসে পড়ে তার মধ্যে, কাজের ভার নেয়। তাদের উন্নতির অবধি নেই, এক একজন ঘরবাড়ি করে ফেলেছে এর মধ্যেই—লোকসান খাচ্ছে কনক।

সেজকাকা অনাদি একটা ভাল চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। বিলিতি ফার্মের চাকরি। তাদের সঙ্গে অনাদির বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক আছে, তারা গোড়াতেই আড়াইশো টাকা দিতে চেয়েছিল। 'ও আমার ভাল লাগে না' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এই ধরনের উপদেশ আর উপকারের চেষ্টার উত্তর দিতে হবে এই ভয়ে সে কাকাদের বাড়ি কখনও যায় না—তাঁরাই আসেন খবর নিতে।......

এসব সংবাদ নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করেন মহামায়া, তা বিনুর কানেও যায়।

ইদানীং তার মাথায় এই কনকের কথাটা ঘুরছে।

সাময়িক পত্র। সাপ্তাহিক ও মাসিক।

বিনুর হাতে যদি পড়ত।

অনেকদিন ধরে নানাদিক বিচার করে কোন কথা ভাবা বিনুর ধাতে নেই। সে কয়েকদিনের মধ্যেই মন স্থির করে ফেলল। পটলে কাগজ দেখে ঠিকানা যোগাড় করে একদিন আপিসে গিয়েও হাজির হল।

যাঁরা আপিসে ছিলেন দুজন বেশ সুবেশ ভদ্রলোক, তাঁরা একটু অবজ্ঞার চোখে তাকালেন, একজন রূক্ষস্বরে বললেন, 'কনকবাবু এখন আপিসে নেই, কখন আসবেন বলতে পারি না।'

বিনু অসহায়ভাবে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। একপাশে একটি রোগা-মতো ছোকরা বসে কি খাতা লিখছিল। বিনু এ ভদ্রলোকদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তার কাছে গেল, ছোট ডেস্ক, এপাশে একটা টুল। বিনা আমন্ত্রণেই টুলে বসে একটু সাহায্য পাওয়ার ভঙ্গীতে প্রশ্নটার পুনরা-বৃত্তি করল।

সেই লোকটি বা ছোকরাটি বোধহয় এঁদের উপর খুব তুষ্ট নয়, সে অনেক খবর দিল। কতক এঁদের শ্রুতিগোচর করে, কতক ও দুজনের কানে না যায় এমনভাবে গলা নামিয়ে—এই বাড়ির ওপরতলাতেই কনক-বাবু থাকেন কিন্তু তিনি আপিসে আসেন সপ্তাহে একদিন, সেটা পর্যায়ক্রমে আটদিন বাদ বাদ গিয়ে পড়ে। তেমন কোন নিয়ম ঠিক বাঁধা নেই, কিন্তু উনি যা তারিখ দেন তাতে ঐরকমই দাঁড়ায়। মানে এ সপ্তাহে মঙ্গলবার এলে পরের সপ্তাহে বুধবার আসেন। এবারে শুক্রবার অর্থাৎ আসছে কাল আসবার দিন।

আরও বলল ছেলেটি।

এঁরা বাবুর বন্ধু, এঁদেরই কাজকর্ম দেখার কথা এঁরা এসে শুধু মুহুর্মুহু চা আনান, মধ্যে মধ্যে সিগারেট—আপিসেরই খরচায়—অথচ সে টিফিন তো দূরের কথা, এক কাপ চাও পায় না। খানিকটা এমনি সভা সাজিয়ে বসে থেকে খরচার নাম করে কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়েন। একবার শুধু নিয়ম করে ওপরে ওঠেন, বিরাট কাজের ফিরিস্তি দেন, বাবুর উপদেশ শোনেন—বাবু ভাবেন এদের মতো কর্মী আর জগতে হয় না। অথচ এদিকে প্রুফ দেখার একটা লোক নেই, প্রেস যা ভাল বোঝে তাই করে, ফিল্ম কোম্পানীর লোক এসে দয়া করে কিছু কিছু ব্লক দিয়ে যায় তাই সাপ্তাহিকে ছবি ছাপা হয়—যেসব লেখা ডাকে আসে—প্রেস কপি চাইলে তাই কতকগুলো বার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এইভাবে কাগজ চলবে? কোন কোন বড় লেখকের কাছে বাবু মধ্যে মধ্যে চিঠি দেন লেখার জন্যে, কিন্তু তাঁদের কি গরজ তাঁরা এসে লেখা পৌঁছে দিয়ে যাবেন? একে তো টাকা দেন চোদ্দ মাস পরে, যতটা সম্ভব কম। তার ওপর এঁরা কেউ তাগাদাতেও যান না। কাউকে পাঠানও না, যদিও বাসভাড়া বলে গাদা গাদা পয়সা নেন। একটু লক্ষ্য করে বুঝল বয়স হয়েছে—বিনুর থেকে অনেক বেশী। বেশ হাসিখুশী; একটু কথা বলেই মনে হল সে দেখেছে অনেক। খবরও রাখে—সেটা ঐ বাঁকা মন্তব্য থেকেই বোঝা গেল। কিন্তু বিষ নেই, এসব মন্তব্যের মধ্যে রসিক দর্শকের সুরটাই বেশী বাজে।

তারও বিনুকে ভাল লেগে থাকবে, সে চুপিচুপি বলে দিল, পরের দিন বেলা দুটো নাগাদ আসতে। ঐসময় বাবু নেমে একটু হিসেবপত্র দেখেন—সে সময় মোসায়েবরা কেউ বড় একটা আসেন না।

পরের দিন ঠিক দুটোতেই পৌঁছল বিনু। কিন্তু কনক তার আগে থেকেই আপিসে এসে বসেছেন, রাখাল খাতাপত্র সামনে সাজিয়ে দিয়েছে।

কনককে এই প্রথম দেখল বিনু। সুপুরুষ শুধু নয়—সুন্দরও। অনেকটা রাজেনের মত ধাঁচ আসে, তবে এঁর রঙ একেবারে সাহেবদের মতো, চোখ দুটিই বিশাল। মনে হয় সব পৃথিবীটা একেবারে দেখতে পারেন, একসঙ্গে।

কি চাই? বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলেন কনক। পূর্বদিনের বাবুদুটির মতো ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞার ভাব নেই এঁর, তবে একটু কৌতুক আছে চোখে। অর্থাৎ নবীন কবি কবিতা এনেছে, ছাপাবার আশায়—সে তো দেখাই যাচ্ছে।

বিনু সেটা বুঝেই সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ল।

সে লেখে, বহু কাগজেই। তার লেখা ছাপা হয়েছে, 'নন্দনবাজার', 'যুগবিপ্লব' পুজো সংখ্যায় বার্ষিক সংখ্যায় তার গল্প ছাপেন। গল্প প্রবন্ধ নাটক সবই লিখতে পারে। বড় লেখকদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁরা স্নেহ করেন। পরিশ্রম করতে পিছপাও হবে না। সে বইয়ের ক্যানভাসার হিসেবে বাংলাদেশের বহু জেলা ঘুরেছে, এখন বাংলার বাইরেও যায় কোন কোন প্রকাশকের হয়ে।

তাকে একটা চাকরি দেবেন ওঁরা? সামান্য মাইনেতেও সে কাজ করতে রাজী আছে। সে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে নিশ্চয় ওঁরা তার কথা বিবেচনা করবেন, আর সে কৃতিত্ব দেখাতেও পারবে—সেটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

কনকবাবু অনেকক্ষণ বড় বড় চোখ মেলে ওর দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'আমার খবর কে দিলে তোমায়?'

চমকে উঠল বিনু।

তুমি! ওকে দেখে কেউ কখনও প্রথম পরিচয়ে তুমি বলেনি।

তবে কি উনি চিনতে পেরেছেন ওকে!

সে মাথা নিচু করে উত্তর দিল, 'স্টলে কাগজ দেখে ঠিকানা যোগাড় করেছি। কালও একবার এসেছিলুম, শুনলুম আপনি আজ আসবেন আপিসে।

আবারও সেই নীরবতা আর স্থির দৃষ্টি। যেন মনে ওর আপাদমস্তক দেখে ওর কর্মশক্তি আন্দাজ করতে চান। একটু পরে বললেন, 'আমি তোমার দু-একটা লেখা পড়েছি। কাগজ সবই আসে, তবে বেশী সময় পাই না পড়ার। শরীরও ভাল থাকে না। মাথাধরার অসুখ আছে—অধিকাংশ সময়ই ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি।...তা কাজ তুমি করতে পারো—সম্পাদকের দায়িত্ব যদি কিছু নিতে পারো তো ভাল হয়। ডাকে যেসব লেখা আসে সেগুলো পড়া, বড় লেখকদের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করা—এগুলো দরকার। তবে মাইনে এখন আমি দিতে পারব না। কাজ করো—একসপিরিয়েন্স হবে সেটাই তো তোমার বড় লাভ। ট্রামভাড়া টাড়াগুলো দিতে পারি। এই পর্যন্ত।'

এ আবার কি অদ্ভুত প্রস্তাব। কাজ করতে পারো—তবে এটা তোমার চাকরি নয়। বিনা মাইনেয় বেগার দিয়ে কৃতার্থ হওয়া।

বিনু কিছুকাল বিমূঢ়ভাবে বসে থেকে রাজী হয়ে গেল।

এ যা দেখছে—এখানে তো কেউ অভিভাবক নেই, ন তাত ন মাতা—স্বাধীনতা তো পাবে।

কখন আসবে, কি কাজ করতে হবে মোটামুটি বলেই দিলেন। কোথায় লেখা থাকে তাও। ততক্ষণে সে বন্ধু দুটিও এসে গেছেন। তাঁরা খুব খুশি হলেন না—বলাই বাহুল্য। এই ছোকরা কাল এসেছিল ভয়ে ভয়ে—আজ এখানে কাজে লেগে গেল—কী ব্যাপার? এই তাঁদের মুখের ভাব। সন্দিগ্ধ ও বিস্মিত। তবে কিছু বললেন না। এটা, মানে এখানের পরিশ্রম তাঁরা বন্ধুকৃত্য হিসেবেই করেন, সে ভাবটা বজায় রাখা দরকার। তাছাড়া ওঁর সামনে একটু কর্মব্যস্ততাও দেখাতে হবে। একজন কতকগুলো ধূলিধূসর লেখার বাণ্ডিল নিয়ে বসে গেলেন, আর একজন বিজ্ঞাপনের খাতা খুলে রাখালকে ধমক দিতে লাগলেন।

বিনু এঁদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে—জলে বাস করতে গেলে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না—হাত তুলে সবিনয়েই নমস্কার জানাল, কিন্তু ভবিষ্যতের কাজকর্ম যতদূর সম্ভব রাখালের কাছেই বুঝে নিল, এঁদের সামনেই।

কাজ সেরে বিদায় নিয়ে উঠতে যাবে—কনকবাবু যেন একটি বোমা ছুঁড়লেন। ধীর মৃদু কণ্ঠে, অত্যন্ত সহজভাবে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি একদিন সেজকাকার কাছে গিয়েছিলে? একটা পুরনো আলমারি বেচতে?'

উত্তর দিতে বেশ একটু সময় লাগল। সদাসপ্রতিভ বিনুও যেন কিছুক্ষণ কোন শব্দ বা কণ্ঠস্বর খুঁজে পেল না। তারপর কতকটা আমতা আমতা করেই বলল, 'তিনি—তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন? কিন্তু আমি তো পরিচয় দিই নি।'

তোমার চেহারা দেখেই চিনেছেন। আমি চিনলুম কি করে।

এবার বিনু আর থাকতে পারল না। বহুদিনের নিরুদ্ধ অভিযোগ, বেদনা ও তিরস্কার বেরিয়ে এল ওর চাপা গলায়, তা যদি পেরেছিলেন, এতই যখন সাদৃশ্য চেহারায়—আমাদের স্বীকৃতি দেন না কেন? সেদিন দেননি কেন?

কনক একটু চুপ করে থেকে বললেন, সেজকাকা আমার বাবাকে খুব ভক্তি করতেন, মাকে মানে ওঁর বৌদিকে দেবী ভাবতেন। তোমাদের স্বীকার করলে বাবা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন, মার অপমান করা হয়—সেটা উনি সহ্য করতে পারবেন না। তোমার কথাবার্তা ব্যবসা বুদ্ধির খুব তারিফ করেছেন অবশ্য, তবু তুমি আর কখনও যেয়োনা—উনি এই স্মৃতিটাতেই বড় আপসেট হয়ে পড়েন।

কাগজ দুটি নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম শুরু করল বিনু।

আপিসে বসে তিন চার ঘণ্টা তো বটেই, কিছু কাজ—যেমন ডাকে-আসা লেখার তাড়া—বাড়িতেও নিয়ে যেতে লাগল। ঘোরাঘুরির তো অন্ত রইল না।

প্রথম প্রথম লজ্জায় ট্রাম বাস ভাড়াও চাইতে পারত না, রাখালই জোর করে এক টাকা দু টাকা গছিয়ে দিত—ভাউচার সই করিয়ে।

আপনি যেমন ন্যাকা। দেখছেন ঐ রাঘব বোয়াল মোসায়েবগুলো যথাসর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে। লোকটাকে তো দেউলে খাতায় নাম লেখাতে হল বলে। ....আর বাবু যে আপনার খাটুনি দেখে কাজ দেখে নিজে থেকে গাড়ি ভাড়া কি অন্য খরচা দেবেন—সে আশা মনেও ঠাঁই দেবেন না। তেমন লোকই নয়।

অগত্যা নিতে হয় এই টাকাটা। এখানে এতটা সময় যাবার ফলে ওদিকের উপার্জনে ক্ষতি হচ্ছে। এত পয়সা পাবেই বা [illegible] (চলবে)

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ আজ নিজেই গুণে গুণে একশ কটা তুলসী পাতা তুললেন। পাতা-লিতে আবার কোন খুঁত না থাকে। গুলো কলাপাতায় ভাঁজ করে ঠাকুর ঘরে খে এলেন। শালগ্রামের মাথায় এই একশ কটা তুলসীপাতা তিনি উৎসর্গ করবেন। স্তাঘাটে কত রকমের চোর-জোচচোর নিকান্ড, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কলকাতায় পৌঁছাতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, জন্য তিনি তার হাতের পাঁচ কাছে রেখে চছেন। তা না হলে নিশ্চিন্তে রতে মাতে পারবেন না। আত্মীয় অনাত্মীয় তিবেশীর বেলায় যেমন তিনি ঠাকুরের মনে বসে খুব নিমগ্ন হলে চোখের ওপর বি ভেসে উঠতে দেখেন—নিজের সন্তান-ন্ততির বেলায় সেটা সহজে দেখতে পান। ফলে বয়স যত বাড়ছে তত আরও শি ধর্মভীরু, তত উচাটন, তত যেন ঠিন হয়ে পড়ছে ঘরবাড়ি ঠিক ঠিক রেখে ওয়া। শত্রুপক্ষ চারিদিকে। কে কখন কি জে নেবে—ঈশ্বর নিজেও কম যা না। াপকেই সব চেয়ে বেশি ভয়। ফলে চাল বেলায় তিনি ঠেঙিয়ে গেছেন বুড়ি-বির হাতায়। হাতার দিঘী থেকে দুটো ম তুলে এনেছেন লক্ষ্মী জনার্দনের য়ে দেবেন বলে। গাছ থেকে নিজেই জ গোটা গোটা সব পদ্ম তুলে আর করণীয় কাজ বাইরের পড়ে থাকল—স বৌমাই তুলবে—বাড়তি আর না আছে, বিগ্রহ আর কি পেলে রও বেশি খুশি—এই সব চিন্তা জটিল ন্ধগুলো থেকে মুক্তি পেলে মনে হল মান্য তামাকু সেবনও চায় ঠাকুর। দকে তামাক সাজাতে বলে নিজে কটু কুশাসনে পদ্মাসন করে বসলেন। চাল বেলায় বিগ্রহের পূজা না হওয়া র্যন্ত জল গ্রহণ করেন না। মাঝে মাঝে তামাকু সেবন। তিনি চোখ বুজে তামাকু খাচ্ছিলেন তখনই মনে হল টিকিটা ধরে টানছে। চোখ মেলে দেখলেন টুটুল। হামা-গুড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টিকি টানছে।

—ও বৌমা দেখ, আবার আমার টিকি টানছে। আমি কিন্তু চিমটি কাটব। আ আমার লাগছে।

টুটুল অ আ তু তু করছে। বিচিত্র রহস্য টের পায় বুঝি টুটুল এর মধ্যে। চন্দ্রনাথ ভারি আরাম বোধ করছিলেন। গায়ে গা লেপ্টে আছে। টুটুলের শরীরে আশ্চর্য উষ্ণতা আছে। চন্দ্রনাথ চোখ বুজে টের পাচ্ছিলেন—বংশের পিন্ডদানের প্রথম অধিকারী এখন তার গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতে তিনি কেমন এক পরম নির্ভয় পান। মানুষের আর কি লাগে! বড়টার কেবল মেয়েই হচ্ছিল। তিনি মেয়েদের ব্যাপারটাকে কিছুটা অচ্ছুতের মধ্যে মনে করেন। এদের পিন্ডদানে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। যেন কোন দূর গ্রহ-লোকে বসে আছেন চন্দ্রনাথ। তাঁর এত কষ্টের ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। পূর্ব পুরুষদের জল দেবার অধিকারী এই শিশু। এবং মনে হয় দূরের গ্রহলোক থেকে তার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ সবাই দেখছে, চন্দ্রনাথের পাশে তার নাতি অভীক দীপংকর ওরফে টুটুল বসে বসে তার টিকি টানছে।

চন্দ্রনাথ বললেন, দাদু পারবিত ঘাড় দিতে।

টুটুল আরো সজোরে টিকি ধরে টান দিল। খুব বড় নয়, লম্বা নয় বেটে-খাটো টিকি। টুটুল ওটাকে কব্জা করতে পারছে না। ব্রহ্মতালু থেকে টুটুল বোধহয় চায় ওটা তুলে নিতে। বার বার চেষ্টার পরও যখন পারল না, তখনই টুটুল ভ্যাক করে কেঁদে দিল।

চন্দ্রনাথ নাতিকে কি আর করেন। কাঁধে তুলে নিয়ে বের হয়ে এলেন। কোথাও যাবেন মনে হয়। আসলে তিনি এই বাড়ি-ঘরের জন্য যে মায়া বোধ করেন এই উত্তরাধিকার তেমনি মায়া বোধ করুক মনে মনে বোধ হয় এমন চাইছিলেন। গাছপালায় ভর্তি বাড়ি-ঘর। পাখ-পাখালি কত—প্রজাপতি ফড়িং কীট পতঙ্গ সব এক প্রবহমান জীবনধারা। এই জীবনধারায় তার এক বছরের নাতি অভীক দীপংকরকে নিয়ে পরিভ্রমণে ব্যস্ত হলেন। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন, পায়ে পায়ে শ্রাবণীরা আসছে। আকাশ মেঘ চছন্ন। এই মাঠ গাছপালার ভিতর দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, আর অজস্র কথা বলছিলেন। কথাগুলো বড়ই অকিঞ্চিৎ-কর। তবু কেমন গভীর এবং তীক্ষ্ণ।

চন্দ্রনাথ বললেন, কত বড় আকাশ দেখ।

আবার বললেন, সামনে কি বিস্তৃত মাঠ।

বললেন, এখানেই আমরা ঘোরাঘুরি করব। কেউ বেশি দূর যাব না। বেশি দূর যেতে পারি না। পরমায়ু শেষ হলে আমি তোমাদের সবাইকে দেখতে পাব। সুখে থাকলে আত্মা শান্তি পাবে।

ধীরেনের মা সামনে পড়ে গেছে।—ওমা কর্তার ঘাড়ে এ কে গ। কি কথা বলছেন গ ঠাকুর।

চন্দ্রনাথ বড়ই লজ্জায় পড়ে গেল।—আর বলিস না। ঘাড়ে চড়ে ঘুরবে বলছে। খুব কান্নাকাটি করছিল।

—বৌমরা নাকি চলে যাবে আজ।

—হ্যাঁ।

—এই ত সংসার গ কর্তাঠাকুর। কে কোনদিকে যায় ঠিক থাকে না। মরণ আপনার। জ্বালায় জ্বলবেন।

অলকা তখন মিন্টুকে খাওয়াচ্ছিল। দুধ মুড়ি কলা। মিন্টু খাচ্ছে আর বলছে, আমরা বাবার কাছে আজ চলে যাব না মা?

নির্মলার সামান্য গোছগাছ বাকি। সেটা সকাল সকাল সেরে নিচ্ছিল। আজ আড়াই মাস মানুষটা নেই। এদিকে একবার আসেওনি। কত সহজে ভুলে থাকতে পারে। অভিমান, বড় অভিমান, কেন যে ভিতরে এই চাপা অভিমান—কোন প্রকাশ নেই। কাছে গেলেও প্রকাশ করতে পারবে না। তত দিন থাকি কি করে। তুমিই বা থাক কি করে। এবং অভ্যন্তরে কেমন রোমাঞ্চ। মানুষটাকে কত দীর্ঘকাল যেন দেখে না। দু আড়াই মাস সময়টা এত দীর্ঘ হয় এই প্রথম সেটা টের পেল নির্মলা। আর কি যে হয়, যেন সময় শেষই হচ্ছে না। তারপর যাত্রা, রিকস, ট্রেন উন্মুখ আকাঙ্খা—এই নিয়ে সে কতকাল যেন প্রতীক্ষায় বসে থাকবে। মনের মধ্যে এক অব্যক্ত সুখানুভূতি, যা পরম এবং চরম, কদিন থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। যেন স্টেশনে নামলে নির্মলা চোখ তুলে মানুষটার দিকে তাকাতেই পারবে না। সে কত দীর্ঘ চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে মাঝে মাঝে সে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো তার রাতে ঘুম হয় না জানিয়েছে। আর কত ইচ্ছের কথা ছিল—এখন ভাবলে কেমন লজ্জা বোধে নির্মলা পীড়িত হচ্ছে। চিঠিতে অত উতালা না হলেই যেন তার ভাল ছিল। চার বছরে তাকে মানুষটা পা না চিনেছে, এই আড়াই মাসে চিঠির মধ্যে দিয়ে তাকে যেন আরও বেশি চিনে ফেলেছে। এবং সেখানে কিছুটা এমন ইচ্ছের প্রকাশ ছিল, যা ভাবলে চোখে-মুখে রক্তচাপ বেড়ে যায়। ফলে নির্মলা সকাল থেকেই একটু বেশি চুপচাপ আজ। কারণ তার মনে হয়, এই পরিবার থেকে ছিন্ন হবার সময় তাকে কিছুটা দুঃখী দেখানো দরকার।

চন্দ্রনাথ আজ সকাল সকাল হাতার পুকুর থেকে স্নান সেরে এলেন। স্নান সারতে সারতে তিনি নিত্য কালী স্তোত্র, সূর্য কবচ গায়ত্রী কবচ পাঠ করেন, আজও সেই মন্ত্রোচচারণ—কেমন গম্ভীর নিনাদের মতো শোনায়। বাড়ির মানুষজন প্রাণীকুল

সহ এই গাছপালা মাঠ, প্রতিবেশীজনের মঙ্গলার্থে তার বিশ্বাস এই মন্ত্র পাঠ, মানুষের অকাল মৃত্যু, অপমৃত্যু বিনাশ করে। জনপদ শস্যহানি থেকে বেঁচে যায়। দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা দেয় না। নিরন্তর বিশ্বাসের মধ্যেই তার এই মন্ত্রোচ্চারণ। ধরনীর শান্তি বজায় রাখার এটি তার কাছে অমোঘ আয়ুধ। আজ আরও বেশি এ বিষয়ে তিনি কেমন সচেতন হয়ে পড়ছেন। কারো সঙ্গে তিনি এখন একটা কথাও বলছেন না। নিজ পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠাকুরঘরে এক সমাহিত মানুষের মতো বসে থাকবেন। ঠাকুরঘরে ঢোকার সময় নির্মলা শুনতে পেল বাবা বলে চলেছেন—ব্রহ্মোবাচ—গায়ত্রী কবচং বক্ষ্যে ধর্মকামার্থ সিদ্ধিদম। তারপর তিনি দরজা ভেজিয়ে দিলেন। নির্মলা আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। আজ তাকে অন্যদিনের চেয়েও পবিত্র দেখাচ্ছিল। কপালে গোল লাল বড় সিঁদুরের টিপ, সূর্যাস্তের মত সিঁথিতে লাল আভা। লাল পেড়ে শাড়ি পরনে, ভেজা চুল সারা পিঠে ছড়ানো। সে আগেই ফুল ফল নৈবদ্য সব সাজিয়ে রেখে এসেছে। যেখানে যা দরকার দুর্বা আতপচাল, হরতকি তিল তুলসী সব। পঞ্চ দেবতার উপাচার সহ ঠাকুরের আলাদা আলাদা নৈবদ্য। এছাড়া সন্তানের শুভ কামনায় তিনি স্থির করেছিলেন, সামান্য ভোগ দেওয়া হবে লক্ষ্মী-জনার্দনকে। ফলে আরও সকালে মা স্নান সেরে ভোগের রান্না সেরে ফেলেছে। এবং এগারটা না বাজতেই চন্দ্রনাথ পুজো-আচ্চার কাজ সেরে ঘন্টা কাঁসি বাজালেন। শংখে ফুঁ দিলেন। এই সব তার করার অর্থ, যত দূর এই শব্দ তরঙ্গ যাবে, তত দূর মানুষজনের কোন আপদ-বিপদ থাকবে না; ধর্মবিশ্বাসী মানুষটা এতক্ষণে যেন কিছুটা বিচলিত ভাব কাটিয়ে উঠেছেন। হাসিমুখে পুজোর ঘর থেকে বের হয়েই ডাকলেন, টুটুল কৈ রে।

টুটুলকে ভানু কোলে নিযে ঘুরছিল. সে দাদুর ডাকে ঠিক সাড়া পায়। সে বুঝতে পারে, দাদু তাকে কিছু এখন খেতে দেবে। ভানুর কোল থেকে জোরজার করে নেমে হেঁটে যাবার চেষ্টা করলে, চন্দ্রনাথ এসে ধরে ফেললেন—এখনও খুব ভাল হাঁটতে পারে না। কিছুটা গিয়েই পড়ে যায়। কিন্তু শিশুও ঈশ্বরের মহিমা বুঝি টের পায়। ঠিক হাত তুলে বলছে, আমা আমা। অর্থাৎ প্রসাদ দও। আমি খাব। মিন্টু কোথায় খেলছিল, সেও দৌড়ে গেছে। দৌড়ে এসেছে প্রতিবেশীদের বালক বালিকারা। তারা হাত পেতে পেতে দাঁড়িয়ে আছে। সবার হাতে হাতে চন্দ্রনাথ ঈশ্বরের মহিমা বিতরণ করতে লাগলেন। বললেন, তোরাই আমার ঈশ্বর। চাল কলা নারকেল এবং সামান্য পায়েস সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে বললেন, ওদের খেতে দিয়ে দাও ধনবৌ। প্রহ্লাদ কোথায় রে? খেয়ে নে। সময় হয়ে গেছে।

হানু ভানু আজ বাড়ি থেকে নড়েনি। সারাটা সকাল ভাইপো ভাইঝিকে নিয়ে পড়েছিল। অলকা একবার চিৎকার করে বলেছে, মা এখন আর কার তুমি নাক টানবে। ধনবৌ রান্নাঘরে—কোন সাড়া দেয়নি। অলকা আবার বলেছে, মা তোমার নাতির বোঁচা নাক তুলতে পারলে না। এ সংসারে সবারই নাক দীর্ঘ। টুটুল মায়ের গড়ন পেয়েছে। নির্মলার নাক কিছুটা চাপা। ধনবৌর কাজই ছিল স্নানের আগে টুটুলের সারা শরীরে ভাল করে তেল মালিস করে রোদে ফেলে রাখা। দু আঙ্গুলে তেল নিয়ে নাকটাকে টেনে তোল। নিত্য কাজের মধ্যে এই বড় কাজটা আজ থেকে আর করতে পারবে না। বোঁচা নাক নিয়েই টুটুলটা আজ চলে যাবে। এজন্য ধনবৌ বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। চোখে তার জল এসে গেছিল।

দেশ ভাগের পর সংসারটা অগাধ জলে পড়ে গেছিল। কিনা দিন গেছে। কত জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই আবাস বাড়ি-ঘর। সুখে দুঃখে সব সন্তান-সন্ততি নিয়ে এই বাড়িটা যখন ডালপালা মেলে দিচ্ছিল, তখনই সতীশ লিখল, মেসের খাওয়া সহ্য হচ্ছে না। সে বাসা করেছে। মানুষটা চিঠি পেয়ে গুম হয়ে বসেছিল। তারপর সব খালি করে ওরা চলে গেল। অতীশ নেই! সবে এদেশে আসার বছর তিন পরেই উধাও। তারপর খোঁজ নেই। তখন মানুষটা স্থির হয়ে চলতে পারছে না। কখনও ইস্টিসনে, কখনও পোড়ো বাড়িতে, কখনও রাস্তায় ফেলে তাদের কোথায় না কোথায় চলে গেছে। তারপর ফিরে এসেছে আবার। মাথায় বড় পার্টিশন। তারপর এই বাড়িঘর—সেও কত অনটনের মধ্যে। যখন সুখের মুখ দেখার কথা তখন আবার অন্য রকম এক কষ্ট। মানুষের কপালেই বুঝি এমন থাকে। মুখ গুঁজে ধনবৌ রান্নাঘরে কাজ সারতে সারতে এমনই ভেবে যাচ্ছিল—আর মাঝে মাঝে কেন যে চোখ জলে ভার হয়ে আসছে।

যেন সেই মা মা ডাকটা ধনবৌ এখনও শুনতে পায়। গভীর রাতে দরজায় দাঁড়িয়ে কেউ ডাকছে, মা মা আমি। আমি ফিরে এসেছি। বাঁশের মচান থেকে ধরফর করে জেগে উঠেছিল ধনবৌ। পাশের মানুষটাকে ঠেলে তুলে বলেছিল, হ্যাগ অতীশ ডাকছে। শুনতে পাচ্ছ। চন্দ্রনাথ এটা আগেও দেখেছে, ধনবৌ হঠাৎ হঠাৎ রাতে জেগে উঠে বলত, ঐ শোন, অতীশ ডাকছে না। কাজেই মানুষটার বিশ্বাসই হয়নি। মনের ভুল। সেদিন মানুষটা বলেছিল ঘুমোও। মন হাল্কা কর। ঈশ্বরকে ডাক। তিনিই তোমার সন্তান আবার ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু সেদিন ধনবৌ কোন কথাই শোনেনি। নেমে দরজা খুলে দাঁড়াতেই—বারান্দার অন্ধকারে ছায়ামূর্তি দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরিয়েছিল। —ওগো আমি ভুল বলিনি? এস না।

চন্দ্রনাথ অন্ধকারে ধনবৌ কি স
হিজিবিজি প্রলাপ বকছে ভেবে নিজে
দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেল। দেখ
অন্ধকারে কেউ ধনবৌর পায়ে পায়ে আছে
ক্ষমাপ্রার্থীর মতো। চন্দ্রনাথ বলেছিল, কে

—অতীশ। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না
অলকা ওঠ। আলোটা জ্বাল। আলে
জ্বাললে চন্দ্রনাথ পুত্রের লম্বা চওড়
সাহেব সুবো চেহারা দেখে বিশ্বাই করতে
পারেনি, এ তার অতীশ। কৈশোরে হারিয়ে
যাওয়া এ তার মেজ পুত্র। যেন যৌবনে
সেই বড়দা এসে হাজির হয়েছেন আবার
বড়দা পাগল হবার আগে কলকাতা থেকে
ফিরলে এমনই একটা মানুষের চেহার
পেয়েছিল। পরে সবাই ভেঙ্গে বলেছি
মানুষটা। ধনবৌ বলেছিল, ঠিক বলছ। বড়
ভাসুরঠাকুর যৌবনে এমন দেখতে ছিলেন
—ঠিক এই রকম। এই রকম উঁচ
লম্বা মানুষ। এমনই বড় বড় চোখ। ভারি
সুন্দর পোশাক ছিল গায়ে।

অতীশকে নিয়ে সেই থেকে কেম
একটা আশংকা ধনবৌর মনে। কারণে
অকারণে অতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে
দেখত—যদি সেই সব চিহ্ন অবিকল কখনও
ধরা পড়ে যায়। এই ভয়ে সে বেশিক্ষ
অতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে
পারত না। বুকটা কখনও কখনও হিম হয়ে
আসত। পরিবারে কে কখন যেন বলে গেছে
বংশে বড় অভিশাপ। কেউ না কেউ পাগল
হয়ে যাবেই। যদি বংশদোষে অতীশ পাগল
হয়ে যায়—সুপুরুষ, ভারি সুপুরুষ হয়ে
গেছে অতীশ। তিন বছরে শরীরে ভা
পরিবর্তন এসে গেছে। ঠিক সেই পাগল
মানুষটার মতো আচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে
বড় গভীর চোখ। গভীরে কোথাও কিছ
বুঝি জানে। সেটা কি কখনও ধরা
পারেনি। চুপচাপ শান্ত নিরীহ—অবা
পড়াশোনা, কাজ এবং সংসারে লেগে
থেকেও যেন সে ভারি আলাদা মানুষ
অতীশকে ধনবৌ কিছুতেই বুঝতে পার
না। আবার জাহাজে যেতে চেয়েছিল, বাপের
ইচ্ছে নয়, পরিবারের কারো ইচ্ছে নয়
ধনবৌ না পেরে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে
ছিল—তারপরই অতীশ অবাধ্য হতে বুঝি
*সাহস পায়নি। এখানেই থেকে গেল। গাছ-
পালার মতো শেকড় গজিয়ে ছিল। প্রতি-
বেশীরা কেউ কেউ দেশের—বন্ধু-বান্ধব
মিলে বিরাট মাঠের মধ্য দিয়ে সে তারপর
হেঁটে গেছে। কিন্তু কেন সে এত আচ্ছন্ন
থাকে, চুপচাপ থাকে, বড় বিষাদ চোখে-
মুখে—এদের ধনবৌ এতদিনেও টের
পায়নি। মাঝে মাঝে অনামনস্ক থাকলে
বলেছেন, তুই এত কি ভাবিস?*

অতীশ বলেছে, কৈ কিছুই নাত।

—তুই আমার পেটে হয়েছিস। আমি বুঝি না!

অতীশ তখন হেসে ওঠার চেষ্টা করত। মার ভয় দূর করার জন্য বলত, লীলাময় বলেছে, ওর জামাইবাবুকে বলে কোন স্কুলে ঢুকিয়ে দেবে।

হ্যাঁ বাবা, এখানেই লক্ষ কিছু একটা য় কিনা। তুই ভিতরে না—ন্তব বাবা কেমন লে পড়ে গেছিল। কাছে থাক, খাই না ই শান্তি।

তারপর ধনবৌর মনে হয়েছিল, বিয়ে দিলে হয়ত চোখে মুখের আচ্ছন্ন ভাবটা চটে যাবে। আর গাছের নিচে চুপচাপ বসে কে বিকেলটা কাটিয়ে দেবে না। কিংবা কা একা হেঁটে বেড়াবে না কোথাও। র্মলা আসার পরও সেই ভাবটা গেল না। ন্টু হবার পর ভেবেছিল, ঠিক হয়ে বে। মিন্টু টুটুল হবার পর ধনবৌ লক্ষ্য রেছে অতীশ কিছুটা সুস্থির বোধ রছে। এভাবে যদি সেরে যায়। ইদানিং ন হয়েছে ধনবৌর, সেরে গেছে। কিন্তু র্মলা সেদিন চুপি চুপি বলতেই বুকটা বার কেঁপে গেছে। নির্মলা বলেছে, আমি ছু বলি নি। ও বলতে বারণ করেছে। ন্তু বড় ভয় হয়?

—কি ভয়!

—ও রাতে মাঝে মাঝে ঘরে ধূপকাঠি লিয়ে বসে থাকে।

—ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকে!

—হ্যাঁ মা।

—তুমি কিছু বল না?

—কি বলব। এমন চোখ-মুখ, বলতে মার সাহস হয় না।

ধনবৌ চন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছিল, নেছ!

চন্দ্রনাথ হাতে দা নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে-ল। হাতে পায়ে ঘাস পাতা লেগে আছে। নবৌ চাল বাছছিল, সেসব ফেলে রেখে স ফিস গলায় গলায় বলেছিল, বৌমা কি লছে?

—কি বলছে?

—অতীশ মাঝরাতে ঘরে ধূপকাটি লিয়ে বসে থাকে।

নির্মলা বলেছিল, চোখে মুখে একটা াতঙ্ক। ভয় পেলে, ঘাবড়ে গেলে যেমনটা য়।

—কবে থেকে হয়েছে?

—স্কুলের ঝামেলার পর থেকেই।

চন্দ্রনাথ দা'টা পাশে রেখে বারান্দায় সে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ মাথাটা নিচু রে দূর অতীতেও কোন পাপ কাজ করে-ছেন কিনা যেন স্মরণ করার চেষ্টা। না। মন কোন কাজ তিনি করেন নি। ার পুত্র পাগল হয়ে যাবে তিনি ভাবতে পারেন না। শুধু বললেন, কিছু বল না। আমি দেখছি। তারপর একদিন খেতে বসে এটা-ওটা নিয়ে কথা হবার সময় চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি ভয় পাও?

—ভয় পাব কেন?

—দেখ অতীশ, জীবনে নানাভাবে গোলযোগ দেখা দেয়। তুমি বাঁচবে, অথচ কোন গোলযোগ পোছাবে না সে হয় না। তোমার ভীতির কোন কারণ আমি বুঝতে পারছি না।

অতীশ বুঝতে পেরেছিল, নির্মলা ভয় পেয়ে সব বলে দিয়েছে। সে বলল, মাঝে মাঝে নাকে কিসের দুর্গন্ধ লেগে থাকে। ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর ঘুম আসে না। তখন ধূপকাঠি জ্বালাই। স্বস্তি বোধ করি।

—দুর্গন্ধটা কিসের?

অতীশ চুপ করে থাকল।

—দুর্গন্ধটা কিসের বলবে ত!

—মানুষের। অতীশ কেমন মরিয়া হয়ে যেন না বলে পারল না।

—আমার গায়ে কি সেটা পাও? তোমার মার! বৌমার! পুত্রকন্যার!

অতীশ ভাত নাড়ছিল। খাচ্ছিল না। বড় কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন বাবা। সে কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না।

চন্দ্রনাথ কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, জবাব দাও। কথা বলছ না কেন? পাপ কাজ করলে মানুষের শরীরে দুর্গন্ধ থাকে। সবাই টের পায় না। কেউ কেউ টের পায়। তবে আমার বিশ্বাস, মানুষের একটা পাপ কাজের দুর্গন্ধ দশটা ভাল কাজে মুছে যায়।

অতীশ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল।

চন্দ্রনাথ ফের বললেন, বুঝলে পৃথিবীতে যখন এসেই গেছ, তখন প্রশান্ত চিত্তে সব ভালমন্দ মেনে নাও। এতে কষ্ট কম পাবে।

অতীশের মনে হয়েছিল, যেন সেই স্যালি হিগিনস তাকে পৃথিবী সম্পর্কে সুপরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। সে খেতে খেতেই বুড়োর সেই মন্ত্রোচ্চারণের মতো কথাগুলি হুবহু মনে করতে পারছিল—ছোটবাবু মনে রাখবে, গুডম্যান ইট টু লিভ, ব্যাডম্যান লিভস টু ইট। সে বলল, গন্ধটা সব সময় পাই না। এখানে এসে ভালই ছিলাম। কিন্তু বউবাবাদের মিথ্যা অভিযোগের পর থেকেই এক রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল বাবা। ওরা মিথ্যে করে আমার নামে ডি পি আই-এর কাছে অভিযোগ করেছে। যাতে কাজ ছেড়ে দি সে-জন্য। মানুষের নীচতা আমাকে বড় কষ্ট দেয়।

—তারপরই বুঝি গন্ধটা পাচ্ছ!

—তাই।

—মনে করনা, তারা তোমার কিছু অনিষ্ট করতে পারে না। তিনি যদি অনিষ্ট না করেন, তাদের কি ক্ষমতা অনিষ্ট করার। মনে কর না, এটাও তোমার জীবনের পক্ষে তাঁর কোন শুভ ইচ্ছার প্রকাশ।

অতীশ হেসে দিয়েছিল। কারণ এছাড়া তার যেন অন্য কোন উপায় ছিল না। সে বলেছিল, আপনার একটা আশ্রয় আছে আছে। আমার তাও নেই।

চন্দ্রনাথ জানেন, শৈশব থেকেই তার এই পুত্রটি ঈশ্বরের প্রতি বিরাগ। পরিবারের আর দশজনের মতো তার ধর্মবোধ গড়ে ওঠেনি। আচার বিচার নিয়ে মাঝে মাঝে পিতাপুত্রে কথা কাটাকাটি হয়েছে, ঈশ্বর আছেন, এও সে বিশ্বাস করতে কষ্ট পায়। মৃত্যুর পর সব শেষ সে এমন ভেবে থাকে। আত্মা এবং পরলোক সম্পর্কেও ভারি অবিশ্বাস। তিনি কিছু বই-এর উল্লেখ করে বলেছিলেন, এসব পড়, জানতে পারবে।

অতীশ ভিতর থেকে ভীষণ বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, মৃত্যুর পর কি আছে কেউ জানে না বাবা। যদি কেউ জানে না। যদি কেউ কিছু বলে থাকে, মিছে কথা বলেছে। আমার বোধ-বুদ্ধিতে তোমাদের ঈশ্বরকে ধরতে পারি না।

এখন পারবে না। আর একটু বয়েস হোক সবই পারবে। তারপরই চন্দ্রনাথ কিছুটা বিচলিত বোধ করেছিলেন। যদি সেটা না হয় অতীশের, তবে মানুষের দুর্গন্ধ তার নাকে লেগেই থাকবে। এবং এই দুর্গন্ধটাই তাকে শেষ পর্যন্ত পাগল করে দিতে পারে। তিনি বললেন, তোমার জন্য তিনি না থাকুন, তোমার সন্তান সন্ততির জন্য অন্ততঃ তিনি থাকুন। চন্দ্রনাথ কিছুটা বিরক্ত হয়েই যেন পুত্রকে এমন একটু কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অতীশ শুধু বলেছিল, আমারও এই ভরসা। এরা যদি বেঁচে থাকে, ভাল হয়, সজ্জন হয়, তবে তা আপনার পুণ্যফলেই হবে।

চন্দ্রনাথ আবার অনেক দূরে থেকে কথা বলছিলেন যেন, আমি চাই আমার পাপ-পুণ্য বলে যদি কিছু থাকে তা তোমাকেও স্পর্শ করুক। ঈশ্বর তোমাকে এই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি দিন।

নির্মলা পাশের ঘর থেকে শুনতে শুনতে কাঠ হয়ে গেছিল। এমন ঈশ্বর-বিহীন মানুষ নিয়ে তাকে সারা জীবন ঘর করতে হবে। ভাবতে গিয়ে ভয়ে কান্না উঠে আসছিল। তবু আশা বাবা বলেছেন, তাঁর পাপপুণ্য বলে যদি কিছু থাকে তা মিন্টু টুটুলকে স্পর্শ করবে। সেই আশায় আজ যাবার সময় বাবার দেওয়া সবকিছু বত্নের সঙ্গে নিয়ে নিল। বাবার হস্তাক্ষরে লেখা কালীর স্তোত্র, গায়ত্রী-কবচ—এই পাঠ করতে বলেছেন, বিপদে আপদে এটা পাঠ করতে বলেছেন। আর ঠাকুরের ফুল-বেল-পাতা—সেও সঙ্গে দিয়েছেন। সব শেষে তিনি যাত্রা করার আগে টুটুলকে বারান্দায় বসিয়ে তার মাথার ওপর গোটা পাটা তুলে দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর তোমাকে অনুসরণ করুক। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

সারি সারি তিনটে রিকশ যাচ্ছে। গাছ-পালার অভ্যন্তরে তিনটে রিকস চলে যাচ্ছে। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্র-নাথ ধনবৌ অলকা এবং প্রতিবেশীরা। চন্দ্র-নাথ হাত তুলে দিয়েছেন, টুটুলও মায়ের মাথা ডিঙ্গিয়ে পিতামহের প্রতি হাত তুলে দিয়েছে। নির্মলা একবার দেখল —যাত্রা আরম্ভ। কোথায় শেষ সে জানে না। তার চোখে জল নেমে গেল। (চলবে)

অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

হার মানে। তারা একজন প্রাপ্ত বয়স্ককে রামকুমার সাজিয়ে চাক্তিটা করিয়ে নিলে। যাবার সময় কেন গেল বাচচা রামকুমার। আর পড়বি ত পড় খোদ দ্বারকানাথের চোখে, দ্বারকানাথ তাকে ধাওয়া করে ধরলেন কুষ্টিয়ায়। এবং কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা করলেন। বিচারে আড়কাঠির সাজা হল জালিয়াতির অভিযোগ।

কিন্তু এরকম ঘটনা কটা? দ্বারকানাথ শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কয়েক বছর আগে বেঙ্গলীতে তাঁর প্রতিবেদনে লেখা গিবস সাহেবের স্বীকারোক্তি। তাঁর মুহুরী গোপালচন্দ্র লিখত। তিনি সই করতেন।

কুলিরা সই করতেন কেন? তিনি পরে সেগুলো রেজিষ্ট্রির জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ব্যাস। এই ত প্রথা। এই ত হয়ে আসছে। কুলি আইনকে এমনি করেই বুড়োআঙুল দেখান হচ্ছে। বক্তৃতা করতে করতে তিনি বললেন ডিব্রুগড়ের মাসিজল চাবাগানের কাহিনী। ম্যানেজার আর্নাডিং দুশ কুলি কামিনকে ন্যাংটো করে এমন চাবকে ছিলেন যে চারজন মারা যায়। এই ব্যাপার নিয়ে এতই হৈ-চৈ হয়েছিল যে আর্নাডিং সাহেব একেবারে বেকসুর খালাস পাননি। চারটে কুলি মারার সাজা হয় আড়াই শ টাকা জরিমানা। আর তিন মাস জেল। বলিহারি বিচারের বহর। দ্বারকানাথকে সমর্থন করেন হাজারিবাগের উকিল হরিচাঁদ মৈত্র আর গিরিডির উকিল কালীকৃষ্ণ চন্দ্র। সভাপতির ভাষণে মহেন্দ্রলাল দ্বারকনাথের এই প্রস্তাবের প্রশংসা করেন। অভিনন্দন জানালেন প্রস্তাবকদের। আসামের চা-বাগিচার শ্রমিকদের স্বার্থে ত এই প্রস্তাব সহানুভূতি মানবতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পরিচয় বহন করছে। কিন্তু প্রস্তাবেই সীমাবদ্ধ রইল ব্যাপারটা। তবে বার বার প্রাদেশিক অধিবেশনে তোলার জন্যে সরকার ও কংগ্রেসের ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি হতে লাগল। বিপিন পাল বললেন, খবর যথেষ্ট জোগাড় হয়েছে। বহু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে কুলিদের অসহায়তার। আইনের অসহায়তার। কাজেই এই অপদার্থ আইন বাতিল হয়ে যাক। কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন হয় কলকাতায়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রহিমতুল্লা সিয়ানী। আঠার শ ছিয়ানব্বই। সেই অধিবেশনে কংগ্রেস কুলিদের দাসত্ব মোচনের জন্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এই সম্পর্কে প্রথমবার প্রস্তাব আলোচ্য তালিকাভুক্ত করিতে সম্মত হল। দ্বারকানাথ তখন নির্বাণোন্মুখ। তাঁর লিভারের রোগ তখন সুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেসে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। সমর্থন করেন বিপিন পাল মশায় এবং রজনীকান্ত সরকার।

এই প্রসঙ্গে হেয়ার স্ট্রীটের কাগজ ইংলিশম্যানে প্রকাশিত এক চিঠির কথা বলা দরকার।

ডিব্রুগড়ের জয়পুর চাবাগানের মিষ্টার হোগার্থ বলে এক সাহেব চ্যালেঞ্জ জানালেন যে তিনি তাঁর চাবাগান নেটিভ যে কোন ভদ্রলোকের সরজমিন তদন্তের জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। তিনি এসে পরদেশী কুলিদের অবস্থা স্বয়ং দেখে যান। দেখে যান কুলিরা কিভাবে কাজ করছে, তাদের খাওয়াদাওয়াই বা তারা কিভাবে থাকে। চাবাগানের মাহিনা খাতা, রেজিষ্ট্রি বই, হাসপাতালের ব্যবস্থা বা অসুস্থ কুলিদের চিকিৎসার আয়োজন— সবই তিনি নিজে এসে দেখে যেতে পারেন। স্বভাবতই এই চিঠি যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা, সেই ভারত সভার সহকারী সম্পাদক শ্রমিক দরদী দ্বারকানাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি সেই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করে বললেন, হোগার্থ সাহেবের প্রস্তাব তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন, তবে এক শর্তে। শুধু হোগার্থ সাহেবের চা-বাগানই তিনি ঘুরে আসবেন না, আপার আসামের অন্যান্য কয়েকটি চা-বাগান পরিদর্শন করার অধিকারও তাঁকে দিতে হবে। দ্বারকানাথ তাঁর শর্ত দেবার পিছনে কারণগুলিও জানালেন। বললেন, মাত্র একটি চা-বাগান ঘুরে অবস্থা দেখার জন্য আসামের দারুণ মারাত্মক বর্ষায় এই দুর্গম ও ব্যয়সাধ্য যাত্রার কোন অর্থ হয় না। বর্ষায় আসাম যে কি ভয়াবহ, ভুক্তভোগী দ্বারকানাথের কাছে তা অজানা নয়। কাজেই হোগার্থ সাহেবের মতো আরও কয়েকটি বাগান ঘুরে আসার সুযোগ পেলে তবেই এই অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে তিনি রাজি। খোলাখুলি-ভাবেই লিখলেন দ্বারকানাথ যে তা' যদি না হয় তাহলে তিনি এই ধারণাই করবেন যে আসামের চাকরদের মধ্যে অত্যন্ত সৎ আঙুলে গোনা যায় কয়েকটা লোক আছেন যাঁরা তাঁদের কর্মচারীদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করেন। 'দেয়ার আর সাম জেন্টী গুড্ মেন এমঙ্গ দেম হু ট্রিট দেয়ার এমপ্লায়িজ উইথ ডিউ কনসিডারেশন।'

'ইংলিশম্যান' বললেন, 'দুও'। তাঁরা লিখলেন এ কিছুই নয় হোগার্থ সাহেবের নিমন্ত্রণ না রক্ষার একটা বাজে অজুহাত খুঁজে পেয়েছেন গাঙ্গুলী মশায়। চাকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ভারতসভার তিনি সহকারী সম্পাদক। কাজেই কয়েক শ' টাকা খরচ হবে বলে তার পক্ষে এটা গ্রহণ না করা যুক্তিসহ নয়। ইংলিশম্যানের এই চা পানের আসর উত্তর গাইলেন সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী'। আঠারশ উননব্বই খৃষ্টাব্দের বিশে জুলাই এর কাগজে তিনি বললেন, দুটো-কথা। প্রথমটা এই যে, বাপু হে, তোমার চাকর ভায়েরা যদি এতই সৎ তো, হোগার্থ সাহেব তাঁর প্রস্তাবের সময়-সীমা এই বর্ষাকালের পর আর বাড়াতে গররাজী কেন? দ্বিতীয়তঃ যদি ইংলিশ-ম্যান, সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে আসামের কুলিদের প্রতি এমন কোন অত্যাচার আদৌ হয়না যার সুরাহা চাই তবে তাঁরা কেন আসামের যে সব চা-বাগিচার মৃত্যুহার অত্যধিক তাদের এবং চিফ কমিশনারের 'ব্লাক লিষ্ট' করা যে সব চা-বাগান আছে— তাদের ম্যানেজারদের বলছেন না যেভাবে হোগার্থ সাহেব তাঁর বাগানের প্রবেশ পথ খুলে দিয়েছেন সাধারণের পরিদর্শনের জন্য তেমনি তাদের বাগানের দরজাও

লে দিতে।—

'্লেশম্যান' ভাজা করেই জানেন যে সামে এমন অসংখ্য চা-বাগান আছে গ্নলি কখনই এই তীক্ষ্ম তদন্তের ম্মুখীন হতে পারবে না। অবশ্য লিদের 'ইনডেনচার' প্রথা উঠে যায় আরও নেক পরে। স্যার হেনরি কটন তখন াসামের চিফ কমিশনার। তাঁরই চেষ্টায় ্লিদের এই বন্দীদশা, কম বেতন, নানা জ্নহাতে বেতন-কাটা, পালিয়ে গেলে া ফিরে ধরে এনে মারধোর, চাব্নক, ্নধ লাথির অত্যাচারের মোটামুটি কটা অবসান হয়। ব্রিটিশ প্ল্যান্টাররা াভাবিকভাবেই ক্ষেপে যায়। তবে কৃতজ্ঞ রতবাসীরা কটনকে কংগ্রেস সভাপতির ণিময় সিংহাসনে সাদরে বরণ করে নেন। কন্তু দ্বারকানাথ তখন আর ইহলোকে নই। তিনি শ্নধ্ন লড়াই করেই গেলেন। াঁর প্রয়াস যখন সার্থক হ'ল, ব্রহ্মপুত্র বাহিকার লক্ষ লক্ষ মান্নষের দ্নঃস্বপ্নের াত্রির যখন অবসান ঘোষণা করা হ'ল, সই আনন্দের প্রভাতে হাজির ছিলেন না, াত্রির তপস্যার সেই মগ্নচিত্ত দ্বারকানাথ।

না থাকুন। কিন্তু পরদেশী কুলিদের চলন্ত স্টিমারের বুক থেকে নদীজলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে বাঁচার কাহিনীর ওপর ক্রম যবনিকা টানা হ'ল। শেষ হ'ল শ্রমিক মানুষের লড়াইয়ের এক গৌরব-দীপ্ত অধ্যায়। আর সংগ্রামী-নায়ক দরিদ্রবান্ধব দ্বারকানাথের নানা কীর্তির এটাই অন্যতম মাইলস্টোন হয়ে রইল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধু কুলিজীবনের দুঃখকষ্ট লাঘব করায় মধ্যেই নিজের কর্মজীবনকে আটকে রাখেননি অক্লান্ত কর্মী মানবদরদী দ্বারকানাথ। ঊনবিংশ শতকের মানবতা-বোধের পতাকাবাহী এই মানুষটি যেখানেই দেখেছেন মানুষের আর্তি, মূক মানুষের নিঃশব্দ হাহাকার, সেখানেই হাজির হয়েছেন তাঁর ত্রাণের ডালি মাথায় ক'রে। আসামে যাবার আগে, আঠারশ' পঁচাশি খৃষ্টাব্দে বীরভূমে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ হয়। দ্বারকানাথ, রামকুমার বিদ্যারত্ন, গগণচন্দ্র হোম, গোপেন্দ্রনারাণ সিংহ আর শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ সাধারণ ব্রহ্মসমাজের এই 'পঞ্চ পান্ডব' বীরভূমের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজে আদাজল খেয়ে লেগে পড়লেন। ব্রাহ্মসমাজ থেকে এই কারণে ব্যয় হয় নগদ পাঁচ হাজার সাতশ' পাঁচ টাকা। ভারতসভাও তখন কর্মচঞ্চল। তাঁরাও বেশ কিছু টাকা খরচ করেন এই কাজে। আগে সপ্তাহে দু'বার আধ সের করে চাল দেওয়া হ'ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে। দ্বারকানাথের প্রচেষ্টায় প্রত্যহ আধ সের করে চাল দেবার ব্যবস্থা হয়।

গোদের ওপর বিষফোড়া। এই সময়েই খবর এল, মলহাটিতে কলেরা হচ্ছে। দ্রুত

ছড়িয়ে পড়ছে এই রোগের প্রকোপ। দ্বারকানাথ এখানেও ছুটে গেলেন। কুঞ্জবিহারী সেনের সহযোগে এখানেও আর্তের সেবায় কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন দ্বারকানাথ। 'দুর্ভিক্ষের কারণ ও অবস্থা'—শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধও লিখে-ছিলেন এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' কাগজে। অসহায়, দুর্বল, রোগকাতর, ক্ষুধিত মানুষদের জন্য তাঁর বেদনাকাতর হৃদয়ের অবিরল স্নেহধারা সর্বদাই উৎসারিত। সে মানুষ ডিব্রুগড়ের চা-বাগানেরই হোক—বা বীরভূমের রাঙামাটির ধুলো ধূসর কোন গ্রামেরই হোক—বা হোকনা নলহাটির কোন অখ্যাত অজ্ঞাত প্রত্যন্তের!

আঠারশ' উননব্বই খৃষ্টাব্দের চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলে এক বেশ বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়। বিদেশী শাসনে এটা একটা আকছার ব্যাপার ছিল। মানুষ মরে কুলে উঠে যেত। কর্তৃপক্ষ ত্রাণের একটা নকল আবহ সৃষ্টি করে দায়িত্ব শেষ করতেন। ভারতসভার সহকারী সম্পাদক তখন দ্বারকানাথ। তিনি নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার লোক নন। আর্তত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুর্গতদের জন্যে খাদ্যসামগ্রী বিলির ব্যবস্থা করলেন বহেরা, রাজনগর, উত্তরপাড়া, রামপুর, গোকর্ণিবন ও শ্যামনগর প্রভৃতি জায়গায়। এর আগে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার সামান্য কিছু ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েই বলে বেড়াতে লাগল, আর ভয় নেই. সব কিছু ব্যবস্থা হয়ে গেছে। 'সব ঠিক হো গিয়া'। দ্বারকানাথ তাঁর প্রতিবেদনে এই রঙীন ছবিতে যে মিথ্যার বেসাতি করা হয়েছিল তা' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। লিখলেন, আগে টাকায় তিনটে কিষেণ ছিল, এখন ছয়টা, সাতটা পাওয়া যাচ্ছে। সুদের হার শতকরা একশো ভাগ বেড়েছে। তৃতীয়তঃ জমির দাম দারুণ পড়ে গেছে। এগুলো কি দেশের আর্থিক অবস্থার সুস্থতার লক্ষণ—দ্বারকানাথ প্রশ্ন করলেন তাঁর রিপোর্টে।

সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সরাসরি আক্রমণ করলে সরকারকে, যে এইসব তথ্য কি প্রমাণ করে না চাষীদের অবস্থার অধোগতির কথা? বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যখন ত্রাণকার্য চালাচ্ছে তখন সরকারের পক্ষে কি সক্রিয়-ভাবে দুর্গতত্রাণে আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়—দ্বারকানাথের জিজ্ঞাসার প্রতি-ধ্বনি করেন সুরেন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক পত্রিকা!

সাত
।। সহধর্মিণী ।।

এই কাহিনীর যবনিকা উঠল কলকাতা থেকে অনেক দূরে—প্রাচীন অঙ্গদেশে—বিহারের শহর ভাগলপুরে। ব্রজ-কিশোর বসু থাকতেন সেখানে। বলাবাহুল্য, বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল ভাগলপুর। আশে-পাশে আরও অনেকে রয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মের বাতাস রয়েছে বাঙালীটোলায়। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী সবে এই শহরের পাশ দিয়ে রেল লাইন চালিয়েছেন। একটু দূরে জামালপুর শহরে বসিয়েছে রেল কারখানা। আঠারশ বাষট্টি। অনেকটা এই সময়েই ব্রজকিশোরের এক মেয়ে হল। কে জানে যেদিন জন্মেছিল মেয়েটি আকাশে আষাঢ়ের মেঘের ঘনঘটা ছিল কিনা, কিন্তু ব্রজ-কিশোর মেয়ের নাম রাখলেন কাদম্বিনী। কাদম্বিনী কিন্তু মেঘের মত কালো নয়—মেয়েটি টুকটুকে রূপসী। ফুটফুটে মেয়ে। এক রত্তি চাঁদের কণা। ব্রজকিশোর কিন্তু আসলে বরিশালের লোক। পৈতৃক বাড়ী চাঁদসীতে। এখানে আসেন কার্যব্যপদেশে। এবং এখানে এসে ব্রাহ্মধর্মেরই শুধু অনুরক্ত হয়ে পড়লেন না, অভয়াচরণ মল্লিকের সহযোগে নারী মুক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। অনেকটা এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ভাগলপুরে এলেন। জায়গাটা নতুন কর্মোদ্যমে মেতে উঠল। এবং ব্রাহ্মধর্মের এই মুক্ত, অবাধ, সজীব পরিবেশে শিশু কাদম্বিনী বড় হতে লাগলেন।

ছোট্ট কাদম্বিনী কোন সময়ে ভাগল-পুর থেকে কলকাতায় এল তার কোন হদিশ নেই, হদিশ নেই ব্রজকিশোর কেন এসেছিলেন ভাগলপুরে। তবে ব্রজকিশোর-বাবুর একটু অতীত ইতিহাস মুখে মুখে শোনা যায়। তাঁরা ছিলেন চাঁদসীর জমিদার। তিনি তাঁর সম্পত্তির অংশ দাবী করবেন না এই করারে তাঁর দিদি মনোমোহন ঘোষের মা, নিরাপদে তাঁকে দেশ থেকে ভাগলপুরে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। সে যাই হোক কলকাতায় কাদম্বিনীকে দেখা যায় চোদ্দ বছরের কিশোরী। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের সুবারবন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বসেছেন। এবং সকল ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। মোট আটত্রিশ নম্বরের মধ্যে পেয়েছেন একত্রিশ। ছাত্রী হিসেবে যে কাদম্বিনী খুবই নামকরা মেয়ে ছিলেন, তার প্রমাণও স্বয়ং চ্যান্সেলার সাহেব তাঁর ভাষণে বলেছিলেন। ম্যাট্রিকে এক নম্বরের জন্যে তিনি ফার্স্ট ডিভিসন পাননি, সেটা নেহাতই বরাত। এবং যেটা লক্ষণীয়, বাংলা ভাষায় তাঁর আশ্চর্য খ্যাতি যেমন গোড়া থেকেই দেখা গিয়েছিল, তেমনি লক্ষণীয় ছিল বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব এবং ছোট-বেলা থেকেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর প্রবণতা একদা তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডাক্তারের সম্মান এনে দিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই কাদম্বিনীর বাঙলা লেখা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখন মেয়ে ছিল কম। কাগজের সম্পাদকরা ছিলেন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে গভীর যত্নশীল। এবং ছাত্রীদের উৎসাহ দেবার জন্যে তাঁরা বার্ষিক পরীক্ষায় যত খাতা জড় হত, সেগুলি নিজেরা দেখতেন এবং উপযুক্ত মনে হলে ভাল রচনাটি ছেপেও দিতেন। 'বামাবোধিনী'র সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত মশায় এই কাজে অগ্রণী ছিলেন। বাঙলা ১২৮২ সনের আষাঢ় সংখ্যা 'বামাবোধিনী'তে তিনি কাদম্বিনীর 'নারিকেল বৃক্ষ' শীর্ষক রচনাটি ছাপেন। উমেশচন্দ্র তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছেন : 'সম্প্রতি কলিকাতার উপনগরস্থ

> বালিকা বিদ্যালয় সকলের যে বার্ষিক পরীক্ষা হয়, তাহাতে যত ছাত্রী রচনা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ইঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা ও ঈশ্বর বিষয়ে সচরাচর রচনা লিখিয়া থাকেন। কিন্তু 'নারিকেল ... বিষয়ে উপস্থিত প্রশ্ন পাই... বালিকা এইরূপ সুসজ্জিত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ রচনা লিখিতে পারেন তাঁদের শিক্ষা ও রচনা দক্ষতার প্রশংসা করিতে হয়।'

বাঙলা রচনার স্টাইল সত্যিই ভালো এবং সেকালের থার্ড ক্লাসের ছাত্রীর পক্ষে ...হীন, তা দেখার জন্যে তাঁর রচনার ... অংশ তুলে দেওয়া হল :

> দূরে হইতে নারিকেল বৃক্ষ-শ্রেণী দেখিতে ... মনোহরই হয়। যখন সায়ংকালে ... মৃদু মৃদু বায়ু হিল্লোলে নারি... বৃক্ষ সকল নড়িতে থাকে, ...তখন মনে কি অনির্ব্বচনীয় আ... উপস্থিত হয়। দয়াময় জগদীশ্বর যে আমাদের অভাব জানিয়া নারিকেল বৃক্ষ সৃজন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যদি এই বৃক্ষ একেবারে সৃজন না করিতেন তবে এখানকার লোকদিগের কত কষ্ট হইত বলা যায় না। গ্রীষ্মের পিপাসাকালে নারিকেল জল পান করিয়া যে সুখসম্ভোগ হয়, তাহা হইত না।

২

কাদম্বিনীর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে, যে নাটক হয়েছিল, এ নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ বিশেষ করে অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ কি তুলকালাম কাণ্ড করেছিলেন, সে কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবন নাটকের দ্রুত দৃশ্যান্তর হতে থাকল। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে—কয়েক মাসের মধ্যেই—বারই জুন, আঠারশ তিরাশি—দ্বারকানাথের সঙ্গে বিয়ে হল কাদম্বিনীর। এ নিয়ে অনেক কথা, অনেক গল্প। কাদম্বিনীর পরিবারের লোকজনদের মুখে শোনা যায়, তাঁর আশ্চর্য রূপে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চেয়ে-ছিলেন সিংহলের এক ব্যারন। অতদূরে যাবার দরকার কি, সারা কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজেই কি তাঁর রূপমুগ্ধ গুণমুগ্ধ প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর অভাব ছিল? অবশ্যই না। তারচেয়ে বড় কথা দ্বারকানাথের সঙ্গে কাদম্বিনীর বয়সের পার্থক্য সত্যিই দৃষ্টিকটু। কাদম্বিনী একুশ, দ্বারকানাথ উনচল্লিশ। আঠার বছরের তফাৎ। আপাত-দৃষ্টিতে, অনেকেরই এই ধরনের বিবাহের বিরুদ্ধতা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আসল ক্ষোভ বোধহয় অন্যত্র। সে জ্বালা যেন কোন কোন প্রণয়পীড়িত হৃদয়ের। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য লিখেছেন :

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে ২০-২১ বছরের তরুণীর পাণিগ্রহণ দ্বারকানাথের বন্ধুবর্গ অনুমোদন করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের কাগজে 'পরিচারিকা'র এই বিয়ের যে খবর বের হয়েছিল, তাতেও দেখা যায় দ্বারকানাথের বিবাহে তাঁর বিশিষ্ট সুহৃদ শিবনাথ শাস্ত্রীও যাননি, যদিও তাঁদের সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। খবরটা ছিল এই :

> বি,এ পরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে. শুনিলাম এই বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি,এ, শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য এম, এ, শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিবাহসভায় উপস্থিত হন নাই। শুনা যায় দ্বারিবাবু, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি, অথচ তাঁহার বিবাহে ব্রাহ্ম সমাজের উচ্চশ্রেণীর সভ্য ও প্রচারকগণ উপস্থিত হইলেন না। কেন যে উপস্থিত হইলেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেশবচন্দ্রের

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এই আত্মকলহের কারণ কি। বুঝতে পেরেই বুঝি বা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলেন সাধারণীদের এই ঘরোয়া কোন্দল।

তবে 'পরিচারিকা' যাই বলুন, কাদম্বিনীর শুভবিবাহে অতিথি-অভ্যাগত সমাগম বড় একটা কম হয়নি। আঠারশ বাহাত্তরের তিন আইনে রেজিস্ট্রি করে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এই বিবাহ সম্পন্ন করান। সাক্ষী ছিলেন দ্বারকানাথের আজীবন বন্ধু দুর্গা-মোহন দাস। এই শেষোক্ত তথ্যটি সরবরাহ করেন দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পৌত্র কল্যাণ-কুমার। এই শুভবিবাহে দ্বারকানাথের শুধু দেশীয় বন্ধুরাই আসেননি সপরিবারে, বহু বিদেশী সাহেব মেমও এসেছিলেন বিবাহ সভায়। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর সংবাদ উদ্ধৃত করে 'বেঙ্গলী' তার তেইশে জুন, আঠারশ তেরাশির সংখ্যায় লিখেছিল :

> On the 12th instant, Miss Kadambini Bose B.A, was married to Babu Dwarakanath Ganguly. The Brahmo Public opinion says: Babu Dwaraknath is a widower, a Brahmin by caste and aged about 39. Miss Kadambini, the eldest daughter of Babu Brojo Kishore Bose, teacher Beharampore College by caste a Kayastha, is aged about 22. The marriage was registered according to Act III of 1872. The service was conducted by Pandit Ramkrishna Vidyaratna, A large number of friends including European ladies and gentlemen, were invited and came to see the ceremony which was very interesting.

এই সংবাদটি পরিবেশনের ভঙ্গী থেকে এই বিবাহের আর একটি দিক চোখে পড়ে। মনে হয়, একদল ব্রাহ্ম প্রগতিশীল হলেও ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থ কন্যার অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারেন নি। অসম বয়সের বিবাহ স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বিরক্তি অর্জন করেছিল। দ্বারকা-নাথ-কাদম্বিনী এই দুই সামাজিক বাধার সামনে পড়েছিলেন এবং অশঙ্কচিত্তে, বিপুল দুঃসাহসে ভর করে, অনায়াসে এই দুই প্রতিবন্ধের গিরিচূড়া অতিক্রম করে-ছিলেন। এবং এই বাধা লঙ্ঘন করে বুঝিবা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

'বেঙ্গলী'র এই সংবাদটি থেকে আরও একটি খবর জানা যায়। কাদম্বিনীর বাবা ব্রজকিশোর তখন বহরমপুর কলেজের (?) শিক্ষক। ভাগলপুর থেকে সোজা এসে তিনি এখানে উঠেছিলেন না মাঝে অন্য কোথাও শিক্ষকতা করেছিলেন, তা অবশ্য জানা যায় না। তাঁর কন্যার বিবাহ-বাসরে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন কিনা, অর্থাৎ কন্যার এই সাহসী পদক্ষেপে পিতার স্বীকৃতি ছিল কিনা, সে তথ্যও অজানা। তবে তখনও তিনি জীবিত এটা ঠিক। এই বিবাহের পর অন্তত বছর দুই তিনি বেঁচেছিলেন।

আঠারশ পঁচাশি খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তাঁর দেহান্ত হয়। আঠারশ আট শকের পয়লা পৌষের সংখ্যায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয় :

> মৃত্যু—...বিগত ২০এ অগ্রহায়ণ বহরমপুর নগরে আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধু বাবু ব্রজকিশোর বসু মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। স্বর্গীয় বন্ধু অনেকদিন হইতে হাঁপানি কাশিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ সর্দি গরমি। বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। স্বর্গীয় বন্ধুর কোন আত্মীয় লিখিয়াছেন :—'বেলা ১।। ঘটিকার সময় মৃত্যু হয়। রাত্রিতে পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতেই গৃহ তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধুবান্ধবে পূর্ণ হইয়া যায়। সমস্ত স্কুলের ছাত্রেরা আসিয়া সমবেত হয়। শিক্ষকেরা সকলেই আসিয়াছিলেন।...

তবে কাদম্বিনীর বিবাহ কলকাতায় শুধু ব্রাহ্ম সমাজ নয়, সাধারণ জনমানসেও নিঃসন্দেহে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে-ছিল। তবে সে যুগের রক্ষণশীল শালীনতা-বোধ খুব সম্ভব কাগজগুলিকে এই নিয়ে খুব একটা মাতামাতি করতে দেয়নি, সোচ্চার হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছিল। তাই বুঝি তাঁরা সব প্রায় উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই নীরব। এর ব্যতিক্রম কেবল 'রেইস এণ্ড রায়ত'-এর সম্পাদক কৃতবিদ্য শম্ভুচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়। তিনি তাঁর কাগজে লিখলেন :

> A famous girl of the per[iod] Miss Kadambini, has, for a b[...]ing of light and lo[...]ing wh[o] was to revolutionize our socie[ty] by her example, suddenly th[...]ried to—beneath her—it is sai[d] but that is her affair, and [...] the disappointed lovers. We ca[n] appreciate better the oppositio[n] of her friends to the match—a[n] opposition which had nearl[y] caused another schism in the continually divided Brahm[o] community. But it was impo[s]sible to avoid it, when the [...] set her heart upon the ui[...] Girls now-a-days are notorio[us]ly obstinate, and here we hav[e] not only a girl of the period bu[t] a graduate in the bargain. So at the last moment a peace wa[s] patched up. Our girl's taste, it must be confessed, is towards the mature and [...]nding instead of the meretricious and th[e] fleeting she aught to be a better judge that we can pretend to be of the inmity [...] the in capacity of the boy of the period. We hope she may be happy and never has guse to repeat and we congratulate the lucky bridegroom.

শম্ভুচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে কাদম্বিনীর বিবাহের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে যে ঝড় উঠেছিল, তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যে আরও একবার ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছিল কাদম্বিনীর বিবাহকে উপলক্ষ করে সে কথা খোলাখুলিভাবেই বলা হয়েছে। আজকের যে কোন [...] পিতা-পিতামহের মত সেকালের [...] যেন আক্ষেপ করে বলছেন—[...] বোহেড, একগুঁয়ে হয়েছে দেখেছি [...] নাউ এ ডেজ আর নটোরিয়াসলি অবসটিনেট।' 'নারীকে [...] ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার'—সমাজ-বিধাতার কাছে এই দৃপ্ত বিদ্রোহবাণী উচ্চারণ করলে যে সুর করেছেন উনবিংশ শতকের সবলা তরুণীরা—এই খেদোক্তি তারই সাক্ষ্য।...

শম্ভুচন্দ্রের খেদোক্তি যাই করুন না কেন, কাদম্বিনীর বিবাহ উপলক্ষে তিনিই বোধকরি একমাত্র কবি যিনি একটি সনেট কাদম্বিনীর বন্দনা করেছিলেন। সেটা এই :

> She was a phantom of
> delight
> When first she gleaned upon
> my sight,
> A lovely apparition sent
> To be a moment's ornaments;
> Her eyes as stars of
> twilight fair.
> Like Twilight's, too her
> dusky hair,
> But all things else about
> her drawn.
> A dancing shape an image
> gay,
> To hauat, to stable, and
> way by.

I saw her upon nearer view,
A spirit, yet a woman too
Her house hold motions
light and free,
And steps of virgin liberty,
A countenance in which
as sweet,
A creature not too bright
or good
For human nature's
daily food
For-transient sorrows,
simple wiles
Praise, blame, love, kisses
teares and smiles

আনন্দের ছায়া মূর্তি, মর্ত্যের মায়া কিংবা ক্ষণিকের অলঙ্করণের মত রূপসী তরুণীর উদ্দেশে এই কবিতা যেন উনবিংশ শতকের মানস প্রতিমার প্রতি তার ভক্তজনের প্রণয়পুষ্পাঞ্জলি। ওয়ার্ডওয়র্থ-এর মিলির মত 'ফ্যানটম অফ ডিলাইট' এই মেয়েটির প্রসন্ন প্রত্যূষের উজ্জ্বল তারকার মত চোখ দুটি, প্রভাতের ধূসর ধূমেল কালোরঙা কেশ, বসন্ত ও তার আনন্দ প্রভাতের সকল মাধুর্য ছেনে গড়া তার অনিন্দ্যকান্তি যেন কোন নৃত্যপরা আকৃতি যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি—যা বার বার ঘুরে ফিরে প্রতিভাত হয়, চকিত করে এবং বার আপনাকে হারিয়ে যেতে নেই মানা।...তার মুখে আঁকা কৃতিত্বের স্বাক্ষর আর অধিকতর সাফল্যের উজ্জ্বল প্রত্যাশা, যা মানুষের নিত্যনিয়তের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়, যা নিন্দা প্রশংসা, ভালবাসা চুম্বন হাসি কান্নার আবর্তে ঘুরে মরার জনো নয়! প্রণয়তাড়িত যুবজনের মনোবেদনাকে চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক মরমী শম্ভুচন্দ্র তাঁর কাব্যে বাণীরূপ দিলেন বোধকরি।

কিন্তু কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে ঢুকলেন কবে? বিয়ের আগে না পরে? পুত্র প্রভাসচন্দ্র লিখেছেন : আগে। 'ইহার পরই—অর্থাৎ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার পরই কাদম্বিনীর সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হইয়া যায়। দ্বারকানাথের বন্ধুগণও মনে করিলেন যে বিবাহান্তে দ্বারকানাথ মেডিকেল কলেজে স্ত্রীকে পড়িতে দিবেন না। কিন্তু দ্বারকানাথ কর্তব্য পথ হইতে চ্যুত হইবার লোক ছিলেন না।' কিন্তু সেকালের কাগজে যেভাবে এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তাতে মনে হয় আগে নয়ে কাদম্বিনীর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ। তাঁরা ছিলেন এক আদর্শ উদ্বুদ্ধ দম্পতি। কর্মের বালুকাবেলায়ই তাঁদের হানিমুন। কাদম্বিনী দ্বারকানাথের বিবাহের তারিখ : বারই জুন, আঠারশ তিরাশি।' হইস এ্যান্ড রায়তের যে সংখ্যায় কাদম্বিনীর বিবাহের কথা জানা যায় সেই কাগজেই সাতই জুলাই, আঠারশ তিরাশির সংখ্যায়—লেখা হয়েছে কাদম্বিনীর মেডিকেল কলেজে ঢোকার খবর। 'মিস কাদম্বিনী বসু বি-এ বর্তমানে মিসেস গাঙ্গুলি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই কলকাতায় এই সুযোগ লাভ করলেন।' সংবাদে আরও মন্তব্য করা হয়েছিল : মেয়েদের ভর্তি হবার ব্যাপারে বিধিনিষেধ যদি আরও একটু আগে তুলে নেওয়া হ'ত, তাহলে বাবু দুর্গামোহন দাসের এক কন্যাকে আর ডাক্তারি পড়তে মাদ্রাজ যেতে হ'ত না। এখানে অবলাদাস, পরবর্তী জীবনে আচার্য জগদীশ বসুর স্ত্রী লেডি অবলা বসুর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 'বেঙ্গলী' কাগজেরও সাতই জুলাই, আঠারশ' তিরাশির সংখ্যায় মেয়েদের কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। কাজেই কাদম্বিনীর বিবাহের আগে মেডিকেল কলেজে ঢোকার ব্যাপারটা ঠিক নয় বলেই মনে হয়। দ্বারকানাথ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সংবাদ থেকে উৎকলন করে লিখেছেন... তিনি সর্বপ্রথম আপনার পত্নীকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।' এই সংবাদটিও আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

তবে কাদম্বিনী যে সুযোগ লাভ করেছিলেন তার পিছনে ছিল দ্বারকানাথের অক্লান্ত সংগ্রাম। সার এ্যাশলি ইডেনের জায়গায় তখন এসেছেন রিভার্স টমসন। নারী শিক্ষার প্রতি তিনিই খুবই সহানুভূতিশীল। তাঁর কাছে দরবার, আবেদন-নিবেদন করা এ ব্যাপারে জনমত সংগঠন করার ব্যাপারে সারা ব্রাহ্ম সমাজ বিশেষ করে দ্বারকানাথ যেন, যাকে বলে, একেবারে আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন। এর ফলেই বরফ গলেছিল। ডাক্তারি পড়ার জন্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজের সিংহদ্বার চিরদিনের জনো মেয়েদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে ব্রাহ্ম সমাজ বা দ্বারকানাথ এই ব্যাপারে যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু হদিশ দিয়েছেন প্রভাসচন্দ্র : '১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর দ্বারকানাথ তাঁহাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি লইবার জন্য দাবী করিতে লাগলেন। তখন যে কোন ছাত্র বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে চাহিলে বিনা বেতনে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতে পারিতেন। নিয়ম ছিল যে কেহ (এমি পারসন) বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিনা বেতনে মেডিকেল কলেজে পড়িতে পারিবেন। এই এমি পারসন শব্দের উভয়কেই বুঝায়, নিয়ম প্রস্তুতের সময় কোন মহিলার গ্র্যাজুয়েট হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু কাদম্বিনী গ্র্যাজুয়েট হইবার সময়েও ঐ নিয়ম অপরিবর্তিত থাকায় এই নিয়মের সুযোগ চাহিতে কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিতে বাধ্য হইলেন।' প্রভাতচন্দ্রের দেখান এই যুক্তিই যে কাদম্বিনীকে ডাক্তারী শিক্ষা জগতে প্রবেশের অধিকার দিয়েছিল, এটা দ্বারকানাথের সংগ্রামের ছবি পুরোপুরি তুলে ধরে না। শেষাবেশ বরফ গলেছিল লেফটনান্ট গবর্নর রিচার্ড টমসনের আনুকুল্যে। এই সম্পর্কে সরকারি যে 'রেজোলিউশান' নেওয়া হয়েছিল, তাতে একটা কথাই বেশী করে বলা হয়েছিল, যে ব্যবস্থা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চলছে, তা বাংলা প্রেসিডেন্সীতে কেন হবে না? যেখানে শিক্ষার এত প্রসার, সেখানে নারী শিক্ষা এত পিছিয়ে থাকবে কেন? দেশী লোকেরা কুসংস্কার বশতঃ তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ডাক্তারী পড়াতেই চান না।

(চলবে)

হারানো বই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ, অন্নদাশঙ্করের পথে প্রবাসে, প্রবোধকুমার সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে, দেবতাত্মা হিমালয়, অবধূতের মরুতীর্থ হিংলাজের পাঠক আরও সত্তর আশি বছর পিছিয়ে বেশ কিছু আকর্ষণীয় ভ্রমণকাহিনীর সন্ধান পাবেন।

আজকের মত তখন গাড়ি-ঘোড়া ছিল না। যাতায়াতও ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। তবুও তীর্থের আকর্ষণে সংসার বিরাগী মানুষ বেরিয়ে পড়তেন।

প্রবাস চিত্র, হিমালয় পথিক, হিমাচলবক্ষে, হিমাদ্রি, দশদিন, মুসাফির মঞ্জিল, দক্ষিণাপথ, মধ্যভারত—এসব কাহিনীর লেখক জলধর সেনকে এখনকার পাঠক ভুলে গেছে। প্রবাসচিত্র বেরিয়েছিল ১৮৯৯ সালে আর মধ্য ভারত বেরোয় ১৯৩০। মাঝের সময়ে অন্য সব বই ছাপা হয়। এ হল জলধর সেনের মৌলিক ভ্রমণকাহিনী। তাছাড়া বর্ধমানের মহারাজের ইম্প্রেসনের ছায়াবলম্বনে লিখেছিলেন 'আমার য়ুরোপ ভ্রমণ'। গল্প আর উপন্যাসও কম লেখেন নি। কিন্তু ও'র ভ্রমণকাহিনীর পাঠক সংখ্যা ছিল বেশী। এমন জনপ্রিয় লেখক একালেও দুর্লভ। তখন বই ছাপা হত কম সংখ্যায়। কিন্তু জলধরবাবুর কোন কোন বই ত্রিশটিরও বেশী সংস্করণ হয়েছে।

জলধরের ব্যক্তি জীবনের ছবিটা কেমন। সংসারে মন বসল না। স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিলেন। স্ত্রী, কন্যা, মায়ের মৃত্যু হয়েছে। চললেন হিমালয়ের পথে। ঘুরে ঘুরে একদিন শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। দুর্গম তীর্থ, সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রয় তাঁকে বাঁধতে পারল না। আবার ফিরে এলেন সংসারে। এবার শুরু হল মহিষাদল স্কুলে মাস্টারি। দীনেন্দ্রকুমার রায় তখন ও'র কাছে অঙ্ক শেখেন। সেই সঙ্গে চলে দুজনের সাহিত্যালোচনা।

জলধর সেন যখন হিমালয়ে যান, তখন সঙ্গে ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল গানের বই। বইখানা ছিঁড়ে যায়। এক বন্ধু বাঁধিয়ে দিল। বইয়ের সঙ্গে ছিল কয়েকখানি সাদা পাতা। ঐ পাতায় ঘুরে বেড়াবার স্মৃতি লিখে রাখতেন। সেই গানের বইখানি হঠাৎ একদিন পেয়ে গেলেন দীনেন্দ্রকুমার। পড়ে অবাক! দীনেন্দ্রকুমার তখন ভারতীতে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ধরে বসলেন। ভারতীতে হিমালয় ভ্রমণের কথা ছাপা হল। 'সম্পাদিকা মহাশয়া আমাকে জানাইলেন যে, আমার হিমালয় ভ্রমণ লিখতে হবে। জোর করে লিখিয়ে নিলেন। পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এই সংবাদ তিনি পাইয়াছেন।...সে যাহাই হউক, আমি 'ভারতীতে' লিখিতে লাগিলাম।... হিমালয়ের কথা তাহার পূর্বে কেহ বাংলায় হয়ত লেখেন নাই, তাই আমার লেখা যা তা-ই সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাসপল্লী হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, জলধর সেন নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুরবাড়ীর কেহ ছদ্মনামে হিমালয় কাহিনী লিখিতেছেন।...আমি যখন ভারতীতে হিমালয়-ভ্রমণ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহার কিছুদিন পূর্বেই পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইউরোপ যাত্রীর পত্র' প্রকাশিত করিয়া ছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাঁহারই অতুলনীয় লিখন-পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম.: ...সে সময় হয়ত বা ঐ লিখন পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন!...' যাই হোক জলধর সেন যে একজন সত্যিকার মানুষ তা প্রমাণ হয়ে গেল অল্প দিনেই।

যখন যে রাজ্যের ওপর দিয়ে গেছেন, সেখানকার জনজীবনের ছায়াছবি এ'কে রেখেছিলেন। আজকের চোখে জলধর সেনের লিখন রীতি সেকেলে হতে পারে কিন্তু ও'র ভাষার দক্ষতা যেমন ছিল অসীম, অন্তর্দৃষ্টি ছিল তেমন প্রখর। উত্তরকাশীর প্রচণ্ড শীত আর বর্ষার দাপট দেখেছিলেন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে তাঁর প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হন। এই সময়েও এখানে শীত অতি প্রবল.; কিন্তু তাহা অসহ্য নহে.: বৈশাখ জ্যৈষ্ঠই এখানকার বসন্তকাল। বৃক্ষে বৃক্ষে বিবিধ পার্বত্য কুসুমস্তবক বিকশিত হইয়া উঠে, পার্বত্য লতাপুঞ্জে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ-ভার ঢালিয়া দেয় এবং পর্বতের অন্তরাল হইতে প্রদীপ্ত সূর্যের শুভ্র কিরণ এই সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভাগিরথী-প্রবাহে প্রস্রবন-সলিলে এবং পুষ্পদলে অনুপম সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলে ; মনে হয়, কঠিন গিরিশৃংগ হইতে ঊর্ধ্বে উন্মুখ নীল আলোকসমুদ্ভাসিত আকাশ পর্যন্ত বিশ্বেশ্বরের বিপুল মহিমায় উদ্ভাসিত। দক্ষিণাপথ রচনাগুণে হিমালয় ভ্রমণের মত আকর্ষণীয় না হলেও, দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানের জ্ঞাতব্য তথ্য ও তীর্থের ইতিহাস। একবাট্টিখানা একবর্ণ ও একখানি বহুবর্ণের ছবি আছে। মধ্যভারত ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। পরে বহু পরিবর্তন করে বই আকারে ছাপা হয়। জব্বলপুর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, মান্ডু, ধার অজন্তা' ইলোরা নাসিক, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের সচিত্র বিবরণ মধ্যভারত।

জলধর সেনের প্রবাসচিত্র বেরোবার দশ বছর আগে ১৮৮৯ সালে ছাপা হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোম্বাই চিত্র। রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বোম্বাই কাটান। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন পত্রিকার পাতায়। পরে বই হয়ে বেরোয়। ১৯১৪ সালে ছাপা হয় 'আমার বাল্য কথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। কর্মজীবনে যেসব বিখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের কথাই বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন আমার বাল্য কথা পর্যায়ে। আমার বোম্বাই প্রবাস পর্যায়টি 'বোম্বাই চিত্রের' অনুরূপ রচনা। এর কোন অংশেই সাধারণ ভ্রমণকাহিনী নয়। স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছল ভাষায় প্রতিটি বিষয় চিত্তাকর্ষক। সাধু ও চলতি ভাষায় মিশ্রণ ঘটিয়ে রচনায় সৌকর্য বাড়িয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পী মানসিকতা এক কবিত্বময় রূপ পেয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ জীবনের এমন গভীর অনুভূতিময় রূপায়ণ বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত কমই দেখা যাবে। বোম্বাই শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে আছে : ...যখন অস্তোন্মুখ দিনকর-কিরণে এই দৃশ্য সমুজ্জ্বলিত হয়, তখন তাহার শোভা অতি চমৎকার। পশ্চিমের আকাশ চিত্র-বিচিত্র মেঘজালে রঞ্জিত, নীচে উপসাগরের শাখাম্বরে সূর্যের কণক বিম্বে ঝকঝক করিতেছে, তাহার ক্রোড়ে মুম্বাপুরী শয়ান.; সাগরবক্ষে দ্বীপপুঞ্জ ভাসমান, বন্দরে নোঙরবদ্ধ নানা জা[illegible] তরণী, কখনও বা এক একটি নৌকা [illegible]ন ভরে চলিয়াছে। স্থলে নারিকেল বৃক্ষরাজি, মধ্যভাগে তরুরাজির অভ্যন্তরে বিরাজিত সুরগরঞ্জিত হর্ম্যাবলী, দূর হইতে একাকারে এক অপূর্ব শোভা প্রকাশিত।' —সত্যেন্দ্রনাথের এই বই ছাপা হলে পাঠকের অভাব হবে না। আর এ ত নিছক ভ্রমণ-কাহিনী নয়, আরও কিছু।

এই প্রসঙ্গে আর একখানি অসাধারণ বই-এর নাম মনে আসে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। ভ্রমণ কাহিনী নয়। কিন্তু তিনি কর্মব্যাপদেশে কাশী, আগ্রা, এলাহাবাদ, অমৃতসর, সিমলা, নানা জায়গায় গেছেন। সৌন্দর্যে ছিল তাঁর অসীম আসক্তি। বইয়ের প্রাকৃতিক বেশ কিছু অংশই আকর্ষণীয়।

কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা আন্দোলনের কয়েকটি পদচিহ্ন

প্রথম ও তৃতীয় বইয়ের সংকলক যতীন্দ্রকুমার ঘোষ, দ্বিতীয়টির লেখক মুকুন্দ দাস, প্রকাশক—বরিশাল সেবা সমিতি, ৪ পূরণচাঁদ নাহার এভিনিউ, কলিকাতা ১৩; মূল্য যথাক্রমে পাঁচ টাকা ও দুই টাকা। দ্বিতীয়টির সংকলক যতীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রকাশক, অধ্যয়ন, ২০।এ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা-১২, মূল্য : ছয় টাকা।

অখন্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মানচিত্রে কোথাও কোথাও এমন বিশেষ পদচিহ্ন পড়েছে যেগুলো ঐতিহাসিক এবং এমন এমন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়; কিন্তু নতুন নতুন প্রজন্মের কাছে অতীতের সেই পৃষ্ঠাগুলো স্মরণ ও মননের ব্যবস্থা না থাকায় বিস্মৃতই থেকে যায় এবং তাৎক্ষণিক ঘটনাতরঙ্গের অভিঘাতে সেদিনকার রোমাঞ্চ তাদের স্পর্শ করে না, চমকে দেয় না।

ঐ রাজনৈতিক মানচিত্রের বহু স্থানের মধ্যে (যেমন কলকাতা বাদে মেদিনীপুর, রংপুর, বহরমপুর, ঢাকা, রাজশাহী) বরিশাল ও জলপাইগুড়ি বিশেষ দুটি নাম এবং ব্যক্তি হিসেবে অশ্বিনীকুমার দত্ত, শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁর অনুজ সুভাষচন্দ্র বসু, জাতির ইতিহাসে এক-একটি অবিস্মরণীয় নাম। তেমনি অশ্বিনীকুমার দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখক মুকুন্দ দাস স্বয়ং একটি চাঞ্চল্যকর নাম; তাঁর স্বদেশীযাত্রা, বৃটিশ রাজপুরুষদের হাতে তাঁর লাঞ্ছনা, বাঙালীচিত্তে অনুপ্রেরণা সঞ্চার তাঁর ভূমিকা ও সাফল্য আজ কিম্বদন্তী। এবং তিনি ছিলেন সেকালে বরিশালের মুকুটহীন রাজা অশ্বিনীকুমার দত্তের শিষ্য। তাঁরই প্রেরণায় তিনি স্বদেশী গান ও স্বদেশী যাত্রার দল বাঁধেন।

এই বরিশালে সমগ্র বাংলার এক অগ্নিগর্ভ মূর্তি ফুটে ওঠে ১৯০৬-এ। পুলিশ-ঘাতকের দন্ডাঘাতে রক্তাপ্লুত বালক চিত্তরঞ্জনের অদম্য মাতৃবন্দনায় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি চির-প্রতিষ্ঠালাভ করে। ঐ বছরের বরিশাল সম্মেলন বাঙলার মানসিকতায় মোড় ফিরিয়ে দেয়; তরুণ বাঙলা হাতে অগ্নি তুলে নেয়। ১৯০৮এর অগস্টে বরিশাল জেলা সম্মেলনের আগে (৩০ এপ্রিল) মজঃফরপুর বজ্রপাতে কেঁপে উঠেছিল, কিংসফোর্ড মারা না গেলেও, লক্ষ্যবস্তু নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসিত হয়েছিল। এই পটভূমিকায় যে সম্মেলন হয়েছিল প্রথম বইখানাতে তারই বিবরণ। মঞ্চে তৎকালীন বন্দী (মানিকতলা বোমা মামলায়) অরবিন্দ এবং মহারাষ্ট্রবীর তিলকের আলেখ্য প্রলম্বিত ছিল। কালটা পুরোপুরি 'স্বদেশী'র কাল, সুতরাং সম্মেলনেও ঐ সঙ্কল্পের সুর অনুরণিত। শ্রোতা যেমন হলের মধ্যেই হাজার দুয়েক, বাইরেও তেমনি জনমন্ডলী; আর তাঁদের পাহারাদার রেগুলেশন লাঠিধারী পুলিশ দঙ্গলের কর্তা রায়সাহেব বাবুরাম সিং, ইন্সপেক্টর। গোয়েন্দা পুলিশ সামনের সারিতে টুকছে 'রাজদ্রোহাত্মক' বক্তৃতা। এ সম্মেলনে ছাত্রেরা স্বেচ্ছাসেবক নয়, উকিল মোক্তারদের মুহুরীরা। স্বদেশী গানের দল এবং বরিশাল হিতৈষী', 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র রিপোর্টার হাজির। উপস্থিতদের মধ্যে কীর্তিপাশা, কলসকাঠি, জলাবাড়ি, বাসন্দা, লাখুটিয়া, রামচন্দ্রপুর, কেওরা, রহমতপুর, ভোলা, সোলকের জমিদারেরা। অশ্বিনীকুমার দত্তের কীর্তি স্বদেশী বান্ধব সমিতি' এর উদ্যোক্তা; ১৯০৫এর স্বদেশীকালে তার উদ্ভব।

'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে সম্মেলনের সূচনা, এবং 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির মধ্যে অশ্বিনীকুমার পৌরোহিত্যে বরণ। সমিতির বিবরণে প্রকাশ, ১৯০৭এর ১৮ মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ছিল বিনা অনুমতিতে কোনরকম সভা হবে না, তারপরই এল এক অর্ডিনান্স, সঙ্গে সঙ্গে ঝালকাঠি, উজিরপুর ও বৌফলে পিটুনী পুলিশ বসল। বরিশালে পাঠান ও গোর্খা সৈন্য। কোথাও পুলিশী অত্যাচার। সব অগ্রাহ্য করে বিলাতী লবণ বর্জিত, বণিকেরা পিটুনী কর দিয়েও বিলাতী কাপড় আমদানী করেন না। জাতীয় শিক্ষার জন্য পাঠশালা, স্কুল হচ্ছে।

অশ্বিনীকুমার বললেন, মা এতেই আমরা সন্তুষ্ট নয়। সুরাটে যে বিচ্ছেদ ঘটল তা একান্তই অনভিপ্রেত। 'স্বরাজ' শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে ঝগড়াই বা কেন? তাঁর মতে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতামুক্তাবস্থাই স্বরাজ বলে তিনি বোঝেন। তিনি দধীচির আত্মদানের কথা উল্লেখ করেন, তাঁরা সাধারণের সঙ্গে মেশেন না বলে দুঃখ করেন। তাঁরা তো সত্যিই ডেভিড হেয়ারের মতো ইংরাজদের ঘৃণা করেন না, থাকুন না, ইংরেজরা এদেশে, কিন্তু লাথি চালানো চলবে না। স্বভাবতই তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গে এসে বলেন, স্বভাবতই এর ফলে যে ভাবোদ্দীপনা দেখা দিয়েছে তা সংহার করা যাবে। 'নৌকো যখন যাত্রা করেছে তখন এ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোবেই।'

বর্তমান প্রজন্মের কাছে, বিশেষত, স্বাধীনতার পর এসব কথা অবান্তর ঠেকবে; কিন্তু আজকের স্বাধীনতা এইসব বাধা, বিঘ্ন, সঙ্কল্প, শপথের এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তো এসেছে। বরিশাল জেলা সম্মেলন তারই এক পদচিহ্ন। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সে সঙ্কল্প-শপথ উচ্চারিত—স্বদেশী ও বয়কট, যতদিন-না বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ততদিন বিলাতী-বর্জন, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ব্যায়াম ও স্ত্রীশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।

অর্থাৎ, এইভাবে, প্রায় শূন্যস্থান থেকে জাতিগঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯০৮ তারই একটা ধাপ।

তেমনি জলপাইগুড়ি অধিবেশন ১৯৩৯ সালের। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি মুখে। মিউনিক প্যাক্ট হয়ে গেছে। হিটলারের 'গুজ স্টেপ' ও 'ব্লিৎসক্রিগ' উদ্যত। এই অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগের প্রাক্কালে বাঙলার দুই রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন এবং স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীদের পথ নির্ণয়ে তৎপর হতে বলেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন শরৎচন্দ্র বসু ও উত্তরকালে 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র বসু। যুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ে সেপ্টেম্বরে, জলপাইগুড়ি অধিবেশন ফেব্রুয়ারিতে। দিশেহারা হওয়ার কোনই কারণ ছিল, যাত্রাপথ স্থির করার সময় ছিল। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিকদের প্রবীণ চক্ষুতে ছানি ফেলে দিয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন (মনোনয়ন নয়)। যেখানে গান্ধীজীর মনোমত ব্যক্তিকেই সুপারিশ করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের কথাই উঠত না, সেখানে সুভাষচন্দ্র নির্বাচনের কথা বলে, নিজেও পদপ্রার্থী হলেন। প্রবীণদের গ্রানাইট পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে পট্টভিসীতারামাইয়া হেরে গেলেন, গান্ধীজী হার স্বীকার করলেন। সুতরাং শরৎচন্দ্র বা সুভাষচন্দ্র—কারুরই কথা জাতীয় কংগ্রেসের নীতি নিয়ামকদের কাছে যথারূপে গ্রাহ্য হতে পারে না হয়ও নি। যুদ্ধ যখন বাধল সর্বভারতীয় নেতারা ইচ্ছে করেই দিশেহারা হয়ে রইলেন। জলপাইগুড়ি অধিবেশনে সেই ট্রাজেডির ভূমিকা ছিল।

কারও ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি (বলা হত 'রাষ্ট্রপতি') যা বলেন তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতাদের কাছে এটি ছিল একেবারে বিপরীত। সুতরাং সুভাষচন্দ্র জলপাইগুড়ি অধিবেশনে কি বলেছিলেন তাঁরা তা আমলেই আনেন নি। কি বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র?

'ইউরোপে যে সমস্ত ব্যাপার চলিয়াছে, তাহার ফলে এবং আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে বৃটিশ গবর্মেণ্ট এক সঙ্কটময় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার উপর সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হইলে তাহাকে ভারতের কাছে মাথা নত

তাঁরা ইউরোপে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইবে। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, যে সুবর্ণ সুযোগ এতদিন পরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করিয়া যদি আমরা জাতীয় দাবী উপস্থিত করি এবং তাহার পশ্চাতে আসন্ন সংগ্রামের সমস্ত আয়োজন তৈয়ার রাখি, তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা লাভ করিতে পারিব। ইংরেজ যখন দেখিল জার্মানীর দাবি পূরণ না করিলে সংগ্রাম বাধিতে পারে, তখন তাহারা সে দাবি স্বীকার করিয়া লইল। সেইরূপ তাহারা যদি বুঝে, ভারতের জনসাধারণের দাবি স্বীকার করিবেন। কিন্তু এখন সংগ্রামের জন্য তৈয়ার হওয়া চাই। আমাদের মনে হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।'

তিনি একথাও বলেছিলেন : 'ত্রিপুরী কংগ্রেসে কি প্রস্তাব গৃহীত হইবে, কেহ বলিতে পারে না। আজ বাঙ্গলার দিক হইতে সর্বসম্মতিক্রমে ও সুস্পষ্টভাবে আমরা আমাদের মনোভাব সমগ্র ভারতবাসীকে জানাইয়াছি। আমরা জানাইয়াছি, বৃটিশ গবর্মেন্ট যদি আমাদের জাতীয় দাবি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে যাহা করণীয় তাহা আমরা করিব।'

একথা বলার ফলে তাঁকে সংগ্রামে অবিশ্বাসী ও আপোষে ক্ষমতালাভ প্রয়াসী জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে চরম দন্ড পেতে হয়েছে। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র যখন ১০৪ ডিগ্রি জ্বরে কাতর, তখন রাষ্ট্রপতির সকল ধৈর্য ক্ষমতা কংগ্রেস-বহিভূর্ত গান্ধীজীর কাছে বন্ধক দিয়ে 'পন্থ প্রস্তাব' নামে কুখ্যাত একটি প্রস্তাব গৃহীত হল, ঐসব নেতার সমূহ অসহযোগিতার মধ্যে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, নতুন মনোনীত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আরও বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য বিনানুমতিতে কোন প্রকার আন্দোলন নিষিদ্ধ করে দিলেন, অমান্য করায় গান্ধীজীর স্বহস্ত রচিত প্রস্তাবে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন। নিরুপায় সুভাষচন্দ্রকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যেতে হল। তারপর? দেশান্তরে সুভাষচন্দ্রের সাফল্যের ফসল তুললেন সুভাষ বিতাড়কেরাই। জলপাইগুড়ি অধিবেশন তাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে এক অনন্য পদচিহ্ন।

পুলকেশ দে সরকার

1. The Barisal District Conference, 1908।

(২) অশ্বিনীকুমারের শক্তির উৎস

(৩) বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, জলপাইগুড়ি অধিবেশন, ১৯৩৯

ঋত্বিক ঘটক

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝার মত জীবন্ত ব্যক্তিত্বকে অনেক সময়ই আমরা যোগ্য সম্মানের জায়গা করে দিতে পারি না, দেই না। সেই অসম্মানের ভার আমাদেরই বইতে হয়। ব্যক্তিত্বটি ছোট হন না, ছোট হই আমরা। মাঝে মাঝে এই যোগ্য স্বীকৃতি আর সম্মানের অভাবে ব্যক্তিত্বটির পূর্ণ বিকাশ ঘটে না, ঘটতে পারে না। তখন কপালে করাঘাত করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

এমনতরো নির্বুদ্ধিতার সাম্প্রতিক উদাহরণ ঋত্বিক ঘটক, মৃত্যুর পরই তাঁকে নিয়ে শুরু হয়েছে সরকারী বে-সরকারী পর্যায়ে বারোয়ারী পুজো-পার্বণ, অথচ নিজে তিনি এই ধরনের উন্মত্ততার ঘোর বিরোধী ছিলেন, ঋত্বিক শুধু চেয়েছিলেন তাঁর ছবিগুলো বাঙালী দর্শকরা একটু বেশি সংখ্যায় দেখুক। তাহলে তো আর তাঁকে এভাবে আত্মঘাতী হতে হতো না।

এই হুজুগে পুজো-পার্বণের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম রজত রায়ের সম্পাদনায় 'ঋত্বিক ও তাঁর ছবি' বইটি। আকারে মাঝারি হলেও দেড়শ পাতার বইটিতে ঋত্বিকের ক্ষমতাকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সযত্ন প্রয়াস রয়েছে। যদিও ঋত্বিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈপুণ্যকে অত অল্প পরিসরে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়।

সম্পাদক মশাই কোনো বাড়তি দায়িত্ব কাঁধে নেন নি। বিভিন্ন লেখকের পূর্ব প্রকাশিত রচনাগুলিকে বাছাই করে দুই মলাটের মধ্যে হাজির করেছেন। ঋত্বিকের মূল্যায়ণ শ্রীরায়ের এই প্রচেষ্টা সূত্রপাতমাত্র হলেও মূল্যবান।

যদিও ঋত্বিকের বেশির ভাগ ছবিই ছিল লক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত, কিন্তু চিরায়ত শিল্পের মূল্যায়ণ সময়সীমার বাইরে। তাঁর মৌলিকত্ব, আপোষবিমুখ মনোভাব পুঁজিবাদি ফিল্ম ব্যবসায়ীদের কাছে ছিল বিকর্ষণের কারণ। আলোচিত প্রবন্ধগুলিতে ঋত্বিকের ছবি ও ব্যক্তিমানসের সেই সব আলো-আঁধারি কোনগুলো আলোকিত। প্রতিটি প্রবন্ধই নিজ গুণে সুপাঠ্য, যুক্তি সচেতন। বিশেষ কয়েকটি নাম হল—যশোধরা বাগচীর 'নাগরিক' সোমেশ্বর ভৌমিকের 'ঐতিহ্যে আধুনিকতার স্পন্দন' দীপেন্দু চক্রবর্তীর 'ঋত্বিকের যুক্তি, ঋত্বিকের তক্কো, ঋত্বিকের গপ্পো' গুরুদাস ভট্টাচার্যের 'সুবর্ণ রেখা'। কিন্তু বই-এর সব চাইতে ভালো আর দীর্ঘ প্রবন্ধটি হচ্ছে 'তিতাস একটি নদীর নাম : লেখক গৌতম ভদ্র। যদিও তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু শ্রীভদ্রের রচনা বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণী ভঙ্গির তারিফ না করে উপায় নেই।

সংকলক রজত রায় শুরুতেই জানিয়েছেন 'প্রথম প্রকাশনাটি পাঠক মহলে সাড়া জাগাতে পারলে দ্বিতীয় খন্ডটিকে অধিকতর পূর্ণাংগ ও সমৃদ্ধ' করে প্রকাশ করবেন। আমরা এখন সেই পুণ্য দিনটির আশায় রইলাম। —নির্মল ধর

ঋত্বিক ও তাঁর ছবি : সম্পাদক রজত রায়, সাম্প্রতিক, ৫২।২ শিকদার বাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম : দশ টাকা। (ফিল্ম সোসাইটি সদস্যদের জন্য আট)

সাঁইবাবার কথা

ভগবান সত্য সাই [illegible] জীবনী লেখেননি নি ভক্ত অরুণশঙ্কর সেন। এই পরমাত্মার অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় আছে বইটির পাতায় পাতায়। গল্প ও রূপকের সাহায্যে সাঁইবাবা ভক্তদের সামনে উপদেশ দিয়ে থাকেন। গ্রন্থকার সেসব কথাই তুলে ধরেছেন। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি আর উল্লেখযোগ্য ঘটনায় ঠাসা বইটি পড়তে গিয়ে পাঠক চমকে উঠবেন। ঘটনাই কাল্পনিক নয়। অবিশ্বাসীদেরও বইটি পড়ে দেখা উচিত।

সুরক্ষক সত্য সাই—অরুণশঙ্কর সেন। সত্যম প্রকাশনী। ৪।১এ আহিরীপুকুর ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। দাম ষোল টাকা।

প্রদর্শনী

সরমা ভৌমিকের ছবি দেখানো হলো আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে নভেম্বরের বাইশ থেকে আটাশ পর্যন্ত। ভারতীয়করণের প্রতি শিল্পীর ঝোঁক কিছু প্রবল। এই ঝোঁক যে কোনো জায়গায়ই সুফল দেয় নি তা নয়। কৃষ্ণলীলার ছবিটি বা নীরব ভষা নাম্নী প্রণয়-আলেখ্যটি এই ভারতীয়করণের জোরেই দর্শনসুভগ।

কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এই শৈলী একটু পুতুল-পুতুল ছাপ নিয়ে আসে। শিল্পীর অধিকাংশ ছবিতেই রমণী মূর্তি সন্নিবিষ্ট, কাজেই এইদিক থেকে একটি অতিলালিত্য সঞ্চারিত হয়ে যায় এবং এই দোষটি ঘটার জন্যে বর্ণ ও রেখা সংস্থানকে নিছক ক্রাফট মনে হতে থাকে। গ্রাম রমণীদের জীবনের ছন্দ বা জীবন যাপন, ব্যক্তিত্ব সব চাপা পড়ে যায় সাধারণ গ্রামিকতার মুনিয়র্মের তলায়। লোকগাথার উপজীব্য ছবির নেপথ্য থেকে ছবিকে বাঁচাতে পারে না।

একই সময় ধরে প্রদর্শিত হচ্ছিলো ওয়েস্ট বেঙ্গল ফেডারেশনের সদস্যদের শিল্পকর্ম। এই সংস্থাটি আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইয়াং আর্টিস্টস ফেডারেশন হিসবে পরিচিত ছিলো। পনেরোজন শিল্পীর কাজের সমবায়। প্রত্যেকেরই মনস্কতা লক্ষ করার মতো। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'মেলাঙ্কোলি' ছবিটি একেবারেই উত্তর

কলকাতার গঙ্গার ধারের কোনো পুরোনো বাড়ি। বাড়িটিকে নির্জন করা হয়েছে। ছবিটি হঠাৎ আমাদের অবস্থার সত্যের কাছাকাছি আমাদের নিয়ে যায়। তাঁর 'লস্ট হরাইজন'-ও অতি চমৎকার একটি বিষাদ। পুরোনো আমলের টেবিল, চেয়ার, পানপাত্র ও নাগরা প্রায় জলসাঘর পড়বার স্মৃতি নিয়ে আসে। একই সঙ্গে স্টিল লাইফ দেখার সৌভাগ্যও হয়। প্রদ্যোৎ রায়ের 'স্নান' ছবিতেও অন্ধকারময় মূর্তিগুলির প্রয়োগ খুব সুচিন্তিত এবং সঙ্গীত-ময়। পদ্ম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটি খুব সুন্দর। গরাদের বাইরের নবীন পল্লবে, আকাশে আলো রং গুঁড়িতে, গরাদ কাঠ খানিকটা ভেজা মনে হওয়ায় কোথাও একটা শ্রাবণম্লানিমা আছে, যা স্নায়ু সংস্কারের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করে। কিন্তু লিরিক এই ছবিটির নাম শিল্পী কেন যে 'প্রাণের উর্ধ্বতন' রেখেছেন তা বুঝতে পারলাম না। কার্তিক পাইনের দুটি আলেখ্যই আমাকে তাঁর পুরোনো দর্শক হিসেবে একটু হতাশ করালো। অসিত মন্ডলের ছবি দেখে ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের কথা মনে পড়ালো খানিকটা। নিশ্চয়ই তফাৎ রয়েছে। অসিত মন্ডলের ছবির ছিটকোনো ফুলঝুরির সঙ্গে দ্বিতীয়জনের লাফিয়ে ওঠা অজস্র পিংপং-এর তফাৎ খুব স্পষ্ট। সাম্প্রতিক মেজাজে।

ছাব্বিশে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের দুই তারিখ পর্যন্ত ছিলো অশোক ভৌমিক ও তিলক মন্ডলের মোট সাতাশটি ছবির প্রদর্শনী। তিলক মন্ডলের সঙ্গে কিছু কথা হচ্ছিল। প্রদর্শনীর ব্যাপারে এই শিল্পী আর আগ্রহ বোধ করছেন না। কেননা, তাঁর ভাষায়, 'ক্যানভাস, কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস, ক্যালকাটা পেইনটার্স এ-রকম কিছু গ্রুপ, আপনি-আমি, এই সেদিন দেবং বহুরূপী গ্রুপের নাটক করা খুব সেন্সিটিভ একজন—এই ক'লোকেরাই তো দেখতে আসেন। আশ্চর্য দেশ! এগারো কোটি লোক খেলার জন্যে মাঠে ছুটছে—অন্তত এক কোটি এদিকে যায়! আরো এনটারটেনার ব্যবস্থা রয়েছে টিভিতে।'

অশোক ও তিলকের ছবির সম্পর্কে অবশ্য আগ্রহীজন মাত্রই জানেন। দুজনেরই রীতি, ক্ষমতা ও পার্থক্য সুস্পষ্ট ও সম্মত। এই প্রদর্শনীর সাতাশটি ছবি (অশোকের পনেরো ও তিলকের বারোটি ছবি) অবশ্য কোনো পৃথক কাজ নয়—যাকে ডিপারচার বলা হয় সেই জাতীয় কিছু নয়। উদ্ভট প্রাণী, প্রেতগ্রস্ত চন্দ্রালোক, কালো গহ্বর—এই তিনটি মোটিফের ব্যবহারে অশোক একটি বাঙ্ময় চিত্রভাষা অর্জন করেছেন, যা সত্য ও দুঃস্বপ্নের এক পৃথিবীর ভাষা। যদি নতুন কোনো দর্শক তাঁর এই প্রদর্শনী প্রথম দেখতে আসেন, তাঁর পক্ষে পনেরোটি ছবির প্রত্যেকটিই বিদ্যুন্ময় লাগবে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমি যেহেতু কম করে দেখলেও তাঁর প্রায় পঞ্চাশটি ছবি দেখেছি, আমার পক্ষে আর সেভাবে স্পৃষ্ট হওয়া সম্ভব হলো না। আমার একটু ভয় হতে থাকলো যে একসপারটাইজ পেয়ে যাবার পর, চিত্রী কোনো নতুন উদ্যম না নিয়ে, একসপারটাইজকে হয়তো পেটেন্ট করে তুলছেন। হয়তো এ ভয় সিঁদুরে মেঘ দেখেই, কিন্তু এই ভয়ের কারণ বহুবারই এদেশে এমনটা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি ছবির আবহাওয়াগত এই ঐক্য কোথায় যেন একটু মধ্যবিত্ত ভিকটোরীয় পাপবোধের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তা-ও, বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো তাঁর সেলুলয়েড মহিলা—পনেরোটি ছবির মধ্যে এটি সামান্য ব্যতিক্রমও বটে।

তিলক মন্ডল বললেই আমরা বুঝি যে এবার রংয়ের তীব্র বন্যা আছড়ে পড়বে আমাদের পর এবং বেশ কিছুক্ষণ আমরা নিরক্ষর হয়ে যাবো। তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চেনা অবয়বকে ভেঙে দেওয়া—বেশ একটু আতিশয্যের সঙ্গেই। নিশ্চয়ই তাঁর ছবি বিদেশী ছবিকে একটু বেশি মনে করিয়ে দেয়—আসলে বিদেশকেই মনে করিয়ে দেয়, এবং এটা একটা গুণ, কেননা, কার্বণ কপি বা আচ্ছন্নতার অভিযোগ কখনো আসে না। তিনিও পালটানিনি খুব। হয়তো, এই দুজন শিল্পী যে স্তরে আছেন তার বিশদীকৃত ব্যাখ্যা দর্শকের কাছে রেখে যেতে চান।

সাতাশ বছর বয়সী ভাস্কর সুনীল দাশের এগারোটি কাজ দেখা নিশ্চয়ই একটা অভিজ্ঞতা। ফাঁসলকে ধরার চেষ্টা, কাজেই তাৎকালিকতার ফাঁদটি শিল্পী সহজেই এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। অবশ্য, এদেরই ড্রইং (বারোটি) দর্শকদদের প্রতি খুব সুবিচার করে নি। শিল্পবস্তুকে মসৃণ করার বদলে, শিলক করে আনার চেষ্টা সুফলপ্রদ হয়েছে ব্রোঞ্জের ছাগলে, অশ্বযুগে (যা শরবনের অধ্যাস বা গুল্মময়তার অধ্যাস হয়ে উঠে আরো একটি মাত্রা দিয়েছে) মাছে ও বিশ্রামে যে বিশ্রাম আসলে একটি কুকুরের পাঁজর-বেরিয়ে পড়া শবদেহ। শবদেহ হলেও, দেখা গেলো, তা সত্যিই গাঢ়, নিজের মধ্যে সংহত এক বিশ্রাম।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

জ্যোতিষ সম্মেলন

সম্প্রতি রাজজ্যোতিষী পত্রিকার সৌজন্যে জ্যোতিষ বর্তালের এ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ও এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত দুদিনব্যাপী দ্বিতীয় জ্যোতিষ সম্মেলন হয়ে গেল বাসুদেব মঞ্চে। উদ্দেশ্য—এই শাস্ত্রের প্রসার। কথা ছিল এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে না পারায়, উদ্বোধন করলেন ডঃ রমা চৌধুরী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, জড় ও জীবের মধ্যে সাম্য ও ঐক্য বজায় রাখা, এটাই এই শাস্ত্রের মূল কথা। অদৃষ্ট বলে কোনো কথা নেই, আছে কর্ম। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। একেই জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে মানি। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। সম্মেলনের দুদিনই বিভিন্ন গুণীজনদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। বিশিষ্ট দার্শনিক ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্র কিছুটা সম্ভাব্য অনুমানের ওপর নির্ভর-শীল। আন্দাজ নয়। এই শাস্ত্রের গাণিতিক পদ্ধতি যত্টা উন্নত হবে, বিজ্ঞান হিসাবে এই শাস্ত্রের উন্নতিও ততটা হবে। আর যাঁরা সম্বর্ধিত হন, তাঁদের মধ্যে আছেন তারকেশ্বর মঠের প্রধান পুরোহিত শ্রীরামরতন শাখ্যশাস্ত্রী, বিচারপতি শ্রী এল এ মাসুদ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, শ্রীমতী কানন দেবী, শ্রীমতী বেলা দে, বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়, সঙ্গীত সাধক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহন চ্যাটার্জি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মিল্টন এওয়ার্ড ম্যাকান। শেষোক্ত তিনজন মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সম্বর্ধনার উত্তরে অধিকাংশই, জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেউই—বিশ্বাস কিংবা আস্থা থাক বা না থাক—এই শাস্ত্রকে সরাসরি অস্বীকার করেন নি। বরং এই শাস্ত্র নিয়ে এই সংগঠনের নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকেও অনেকে এই শাস্ত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত, কেউ কেউ বিস্তৃত আলোচনা করেন। তবে প্রত্যেকেই বলেছেন, এই শাস্ত্র কখনোই মানুষের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। ভাগ্যের চেয়েও এঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন কর্মকে। সরকারের কাছে এঁরা আবেদন জানিয়েছেন, ভারত-বর্ষের এই সুপ্রাচীন শাস্ত্রের প্রসার কার্যে সরকার যেন পূর্ণ সহায়তা করেন। বক্তৃতা কতটা মনোগ্রাহী হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল, দুদিনই যখন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভদ্র বক্তৃতা দিতে এলেন। সম্মেলনের দুদিনই বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল গান, নাচ, ম্যাজিক, যাত্রা এবং গীতিনাট্য। সুদীপ্তা সেনের গুরুজন বন্দনা নৃত্য পরিবেশনা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। চোখ ও পায়ের কাজে আশ্চর্য দখল নিয়েছেনই এই বালিকাশিল্পীর। আলোর কাজ পূর্ব-পরিকল্পিত হলে সামগ্রিকতার দিক থেকে অনুষ্ঠানটি নিখুঁত হয়। রবীন্দ্রগীতিনাট্য কালমৃগয়া প্রসঙ্গে একই কথা।

নির্মলকুমার দাস।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

মৃণালকান্তি সাহা

প্রতিবারের মত এবারও সেই ঐতিহ্যময় নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বিজ্ঞানের তিনটি শাখায় পেলেন মোট সাতজন বিজ্ঞানী। পদার্থ বিজ্ঞানে পাকিস্তানের অধ্যাপক আবদুস সালাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক স্টিভেন ভিনবার্গ এবং শেলডন গ্ল্যাশো। রসায়নে পুরস্কৃত হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক হারবার্ট ব্রাউন এবং পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক জর্জ ভিটিগ। আর তৃতীয় বিভাগ অর্থাৎ চিকিৎসা ও শারীর বিজ্ঞানের জন্যও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যুগ্মভাবে। পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক ম্যাকলিওড করম্যাক এবং যুক্তরাষ্ট্রের গডফ্রে নিউকেল ও হাউনসফিল্ড।

পদার্থ বিজ্ঞান

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর কর্মময় জীবনের শেষ ভাগে যে তত্ত্বটি নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছিলেন তার নাম হল ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী বা একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্ব। বিষয়টি হল, পদার্থবিদেরা মনে করেন ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবী, সৌরজগৎ, মহাকাশ এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যে নানা রকম পরিবর্তন, প্রতিক্রিয়া, ভাঙ্গাগড়া চলে তার জন্য দায়ী চার রকমের ফোর্স বা বল। (১) গ্রাভিটি বা মাধ্যাকর্ষণ, (২) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তড়িৎ চৌম্বক বল, (৩) স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বা সবল বল এবং (৪) উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স বা দুর্বল বল।

আইনষ্টাইন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত মৌলকণা পদার্থবিদেরা চেষ্টা করে আসছেন এই চারটি বলের এক সমন্বয় সাধনের। অর্থাৎ আসলে এই চার বল আলাদা রকমের হলেও মূলে এরা একই ক্ষেত্রে অবস্থান করে। প্রকাশে পৃথক সত্তা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতিতে তারা এক-এটাই হল ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরীর মূল কথা। আইনষ্টাইনের বিশ্বাস ছিল এই তত্ত্বে। তিনি কঠোর চেষ্টাও করেছিলেন এই একীকরণের, সাফল্য তাঁর দুয়ারে আসে নি। কিন্তু আজ এই তিন বিজ্ঞানীর চেষ্টায় এই তত্ত্ব একাংশে সফল হয়েছে।

এবার চারটি বলের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। গ্রাভিটেশন বা মাধ্যাকর্ষণ, যার ফলে আমাদের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ আপন কক্ষে সঠিক কেন্দ্রের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোয়ার-ভাটা হচ্ছে, গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ছে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তড়িৎ চৌম্বক বল—যে বলের ক্রিয়ার ফলে আমরা পাই বিদ্যুৎ চালিত নানান যন্ত্রপাতি যেমন বৈদ্যুতিক পাখা, কলিং বেল তাছাড়া বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি।

এই দুটি বলের পরিচয় আমরা প্রাত্যহিক জীবনে পাই বলে এদের সঙ্গে পরিচয় করান খানিকটা সহজ হল। কিন্তু বাকী দুটি বলের পরিচয়ের পর্বে খানিকটা জটিলতা আসবে।

স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বা সবল বল—এই বলটির অস্তিত্ব পাওয়া যায় মৌলকণার কেন্দ্রে নিউক্লিয়সে। প্রোটন এবং নিউট্রন নিয়ে গঠিত এই নিউক্লিয়াস। নিউট্রন বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণা কিন্তু প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুতের আধান। এই প্রোটনের সংখ্যা বস্তু বিশেষে এক বা একাধিক হতে পারে। যেখানে একাধিক সেখানেই সবল বলের কাজ। সমধর্মী পজিটিভ চার্জড একাধিক প্রোটন যে বলের নিয়ন্ত্রণে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন না হয়ে একত্রিত হয়ে

বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম

থাকছে সেই বলকেই সবল বল বলা হচ্ছে।

উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স বা দুর্বল বল—এর ফলে মৌলকণা কিছুটা শক্তি ক্ষয় করে স্থিতিশীল মৌলকণা তৈরি করে। সোজাভাবে বলা যায় এই বলের প্রতিক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হয়। অধ্যাপক ভিনবার্গ বললেন দুর্বল বল প্রতিক্রিয়ার সময় মৌলকণার থেকে শক্তির যে ক্ষরণ ঘটে বিটা রশ্মি হিসেবে, আসলে এই বিটা রশ্মি হল ইলেকট্রন কণা।

এই দুর্বল বল এবং তড়িৎ চৌম্বক বল—এই দুটি বল আলাদা সত্তা সত্ত্বেও তারা যে একই প্রকৃতি এবং চরিত্রের আধার সেটাই প্রমাণ করেন অধ্যাপক সালাম এবং অধ্যাপক ভিনবার্গ। আর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে অধ্যাপক গ্লাশো আবিষ্কৃত কয়েকটি যন্ত্র। তাঁরা তিনজনেই কাজ করেছেন স্বাধীনভাবে, তবু তাঁদের তিনজনকেই মনোনীত করা হয়েছে নোবেল পুরস্কারের জন্য। ... আমরা পরিচিত চারটি বলের বদলে তিনটি বলের উল্লেখ করতে পারি কেননা তড়িৎ চৌম্বক বল এবং দুর্বল বল এক এবং অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৬১তে অধ্যাপক সালাম এবং জন ওয়ার্ড এই দুই বলের একীকৃতের জন্য একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন কিন্তু সেই তত্ত্বে ধরা পড়ে অনেক তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক সমস্যা। পরে ১৯৬৭তে অধ্যাপক সালাম এবং অধ্যাপক ভিনবার্গ স্বাধীনভাবে এই একীকৃতের জন্য কাজ করেন এবং সমাধান করেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরা হয় "গেজ থিয়োরী"কে, ফলে দুটি বিস্তৃত দূরত্বের বলের একীকৃতের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান হয় অধ্যাপক গ্লাশো আবিষ্কৃত কয়েকটি যন্ত্রের দ্বারা। কিন্তু এই দুটি বলের একীকৃতের ব্যাপারে সমস্যার বোধহয় শেষ নেই। আবার একটা বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা

বিজ্ঞানী সেলডন গ্ল্যাশো (বামে) এবং বিজ্ঞানী ষ্টিভেন উইনবার্গ (ডাইনে)।

গেল সেটি হল নিউট্রাল কারেন্ট। তড়িৎ চৌম্বক বলের প্রতিক্রিয়ার সময় দেখা গেল এই তড়িৎ নিরপেক্ষ নিউট্রাল কারেন্ট। যার সন্ধান পেয়েছিলেন ঘটের দশকে অধ্যাপক সালাম এবং অধ্যাপক ভিনবার্গ। কিন্তু 'উইক ইন্টার এ্যাকশন' বা দুর্বল বলের প্রতিক্রিয়ার সময় সেই নিউট্রাল কারেন্ট কিন্তু অনুপস্থিত। তড়িৎ চৌম্বক বল এবং দুর্বল বলের একীকৃতের জন্য এই নিউট্রাল কারেন্টের উপস্থিতি দুটি বলের মধ্যেই প্রয়োজন। ১৯৭৩এ জেনিভার সার্ন ল্যাবরেটরি আবিষ্কার করল দুর্বল বলের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিউট্রাল কারেন্টের উপস্থিতি। দুটি ভিন্নমুখী বলের একীকৃত করার সমস্যাগুলির মোটামুটি সমাধান হল। যদিও পদার্থবিদেরা মনে করেন এই তত্ত্বের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বাকী আছে এবং সেটা সার্ন ল্যাবরেটরিতে ১৯৮২তে করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

অধ্যাপক আবদুল সালাম পাকিস্তানের প্রথম নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী। জন্মেছেন ১৯২৬এ লাহোর থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে জং নামে জায়গায়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। অংকে এম এ করেন লাহোরে। পি এইচ ডি করেন যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আর অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স টেকনোলজির সঙ্গে। রয়েল সোসাইটির ফেলো হন খুব অল্প বয়সে। তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, কারণ তখন তাঁর বয়স ৩১-এরও কম। অনেক তত্ত্বের আবিষ্কারক, এই বিজ্ঞানী। বিষম মৌলকণার প্রতিসাম্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 'ওমেগা-মাইনাস' কণা। ১৯৬১ থেকে ইনি পাকিস্তান সরকারের মুখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা এবং তাঁর দাক্ষিণ্যেই গঠিত হয়েছে পাকিস্তানের স্পেস কমিটি ও ভিত গড়ে উঠেছে আণবিক শক্তি কমিশনের। বর্তমানেও তিনি লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির অধ্যাপক এবং তাছাড়াও ইটালির ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্সের ডিরেক্টার। গবেষণা বাদে তিনি ভালবাসেন ইতিহাস ধনবিজ্ঞান এবং ধর্মপুস্তক পড়তে। তাঁর অবসরের প্রায় সময়ই কাটে পুণ্য কোরাণ পাঠে। এই কোরাণের উক্তি তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করেন তাঁর গবেষণাপত্রে এবং ভাষণে। আরবী, পার্সি এবং উর্দু ভাষায় পারঙ্গম এই সৌম্যদর্শন, নম্রস্বভাব বিজ্ঞানী তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মীদের মধ্যে মৃদুভাষী এবং সুহৃদ বলে পরিচিত। তাঁর উদারতার পরিচয় মেলে তাঁর একটি প্রস্তাবে। তিনি স্থির করেছেন তাঁর পুরস্কারের একটি অংশ তিনি পাকিস্তানের তরুণ বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি দান করবেন।

অদ্ভুত যোগাযোগ দেখা যায় অপর দুই মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক স্টিভেন ভিনবার্গ এবং অধ্যাপক সেলডন গ্লাসোর মধ্যে।

দুজনেই নিউইয়র্কে জন্মেছেন আজ থেকে ৪৬ বছর আগে। স্কুলের লেখাপড়া, আরও একসঙ্গে। এবং একই শ্রেণীতে বিখ্যাত ব্রনস্ক হাই স্কুল অব সায়েন্স বিদ্যালয়ে দুজনেই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আর দুজনেই ছিলেন নোবেলজয়ী পদার্থবিদ জুলিয়ান শুইংগারের ছাত্র। যিনি তড়িৎ চৌম্বক বল এবং দুর্বল বলের সাম্যে প্রথম বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক শেলডনই কেবল অধ্যাপক শুইংগারের কাছে তাঁর বিষয়ের থিসিস দেন এবং এখান থেকেই তাঁদের গতির পরিবর্তন হয়। কিন্তু অন্তিমে যে তাঁরা একই থেকে যান যার ফল এই পুরস্কার।

বর্তমানে অধ্যাপক স্টিভেন ভিনবার্গ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অধ্যাপক গ্ল্যাশো ম্যাসাচুসেটস্ ইনিস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অধ্যাপনায় রত।

মন মাতানো জুডোর আসর

আমাদের দেশে যেমন ফুটবল, জাপানে তেমনি জুডো খেলা। পাড়ায় পাড়ায় জুডোর ক্লাব। জাপানের প্রায় সব ছেলেমেয়েরাই কিছু না কিছু জুডো খেলা জানে। তাই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও জাপানের প্রতিনিধিরা ভাল ফল দেখিয়ে থাকেন। প্রায়ই পান শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। ওলিম্পিক-এর স্বর্ণপদক।

ভারতে জুডো শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছরই। কলকাতাই এই বিষয়ে এগিয়ে আছে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে জুডোর আসর বসলেও এই বিষয়ে ভারত বিন্দুমাত্র এগোতে পারেনি। এখনো হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে চলেছে। শৈশব ছেড়ে কৈশোরের দিকে পর্যন্ত পা বাড়াতে পারে নি।

আমরা প্রায়ই দেখি জাপান থেকে জুডোবিদরা ভারতে আসেন। কলকাতা সহ ভারতের বড় বড় শহরে আধুনিক জুডোর কলা-কৌশল ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি দেখান। হাত ধরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেন। তারপর আবার দেশে ফিরে যান। কিন্তু বিশ্বশ্রেষ্ঠ জুডোবিদদের হাতের কাছে পেয়েও তার সুযোগ ভারতীয়রা কতোটা নিতে পারেন—সেইটাই প্রশ্ন।

ছয় দুয়েক আগেও জাপান থেকে কয়েকজন নামকরা জুডোবিদ কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার জুডো ক্লাবে প্রদর্শনী জুডোর আসরে তাঁদের আমরা দেখেছিলাম। সেই আসরেই ভারতীয়দেরও তাঁদের হাতে-কলমে শেখাতে দেখেছিলাম।

তারপর এই কিছুদিন আগে জাপান থেকে আর একটি দল কলকাতায় এসেছিলেন। দিন তিনেক তাঁরা কলকাতায় ছিলেনও কলকাতা থেকে দিল্লি যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁরা প্রদর্শনী আসরে মন-মাতানো জুডোর কলা-কৌশল দেখালেন। তারপর সেই একই দৃশ্য। জুডো-বিশেষজ্ঞদের প্রদর্শনীর আসরে শিক্ষার্থীদের হাস্যকর প্রচেষ্টা। সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে এই হাস্যকর শিক্ষার আসর কি না বসালেই চলতো না।

জাপ-জুডোবিদরা তো কলকাতায় তিনদিন ছিলেন। সেই সময়ে শিক্ষার্থীদের শেখানোর পালাটা চুকিয়ে ফেললেই বোধহয় ভাল হতো। কারণ মিউনিখ ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়ী কিম্বা জাপানের নামকরা জুডোবিদ নিশিয়ামা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কিকুচি কিম্বা জুডো বিশেষজ্ঞ ইয়োদার মন-মাতানো প্রদর্শনী আসরেই উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন দর্শকরা। ও'দের নিজেদের মধ্যের লড়াই সত্যিই দেখার মত, মনে রাখার মতো। দর্শকরা তা দেখে খুশী হয়েছেন, তৃপ্ত হয়েছেন, রোমাঞ্চিত হয়েছেন।

কিন্তু তার রেশ কেটে গেছে সেই আসরে ভারতীয় জুডোদের উপস্থিতি।

ওদের সঙ্গে আমাদের কতোটা তফাত, ওদের তুলনায় আমরা যে নগণ্য তা এইভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন ছিল? তবে একথা সেদিন আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, এই ক'বছরে জুডোতে আমরা একটুকুও এগোতে পারিনি। কলকাতার জুডো কর্তৃপক্ষ জুডো-বিশ্বের কনিষ্ঠতম দেশ বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সান্ত্বনা পেতে চাইলেও আমরা তা মেনে নিতে পারি না। গত ক'বছর ধরে দেখা যাচ্ছে জুডো বিশেষজ্ঞরা জাপান ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে ভারতে আসছেন। শেখাচ্ছেন। দেখাচ্ছেন। কিন্তু তার থেকে আমরা বিশেষ কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি। শুধু এই প্রদর্শনী জুডোর আসর বসিয়ে কি লাভ?

তারচেয়ে চেষ্টা করা দরকার তাড়াতাড়ি যাতে যুডোতে আরো উন্নতি করা যায়। জাপ-জুডো বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আরো অনেক কিছু শেখা যায়। শুধু কাচ খোকা সেজে থেকে কোন লাভই হবে না। আশা করবো এবার থেকে বিশেষজ্ঞ জুডোবিদদের আসরে শিক্ষার্থীদের এনে হাস্যকর প্রচেষ্টা ও পরিবেশ সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ করবেন না। শিক্ষার্থীদের শেখাবার সময় তো আরো পাওয়া যায়। যেমন দিয়েছিল। সেই সময়টা কলকাতার শিক্ষার্থীরা কাজে লাগিয়েছেন তো?

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্যানের বিগ্রহ ধ্যানচাঁদ

অজয় বসু

ইংরাজ শাসনকালে ভারতীয় ফৌজি বাহিনী ফার্স্ট ব্রাহ্মণ রেজিমেন্টে সুবেদার—মেজর বালে তেওয়ারির নাম হয়ত অনেকেই জানে না। আবার কেউ কেউ জানেন যে জাতীয় ক্রীড়ার স্বার্থে তেওয়ারিজী এক মহৎ কাজ সম্পন্ন করে গেছেন যে কাজের প্রভাব উত্তরকালে স্বদেশে তো বটেই, স্বদেশের পরিধি পেরিয়ে অন্যত্রও প্রসারিত হয়েছে।

বালে তেওয়ারি হকি খেলতে এবং হকিকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন তৎকালীন এক নবীন ফৌজিকে যিনি সবে নাম লিখিয়েছিলেন তাঁর রেজিমেন্টে। নবীন সেনানীর নাম ধ্যানচাঁদ, দুনিয়া যাঁকে সর্বকালের সেরা সেন্টার ফরোয়ার্ড, এক সম্পূর্ণ হকি খেলোয়াড় এবং হকি যাদুকর হিসেবে মেনে নিয়ে আত্মসুখ লাভ করতে চেয়েছে।
নবীন সেনানীর ক্রীড়াদক্ষতা ছিল সহজাত। সেই দক্ষতার ঠাওর পেয়েই হয়ত ওরা তেওয়ারি শিষ্যটিকে হাতে নাতে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বোধহয় উপলব্ধি করতে পারেন নি তখন যে তাঁর হাতে গড়া পুতুলটি একদিন হকি মাঠের জীবন্ত বিগ্রহে রূপান্তরিত হবেন, ভারতীয় হকি জগতে অবিসম্বাদী নায়কের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দেশীয় ক্রীড়া-ইতিহাসের গতিকে অন্য মুখে পরিচালিত করে দেবেন। বুঝে অথবা না বুঝে, যে ভাবেই হোক যে কাজে হাত দিয়েছিলেন তার পরিণতি হয়েছে জাতির পক্ষে কল্যাণকর। তেওয়ারি শিষ্যই হতে পেরেছেন কালে এক যুগস্রষ্টা ও যুগধারক।

গুরু তেওয়ারি ধ্যানচাঁদকে হকি খেলা শিখিয়েছেন প্রত্যেকে। আর শিষ্য ধ্যানচাঁদ তাঁর অসাধারণ দ্যুতিময় প্রতিচ্ছবির প্রভাবে পরোক্ষে হলেও গোটা দেশকে হকি খেলার দিকে টেনে এনেছেন। এক হিসেবে ধ্যানচাঁদই হলেন ভারতীয় হকির 'জনক', যেহেতু তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই ভারত হকি খেলতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। সমকালীন ও উত্তরকালীন তরুণেরা মাঠের দিকে ছুটেছেন এবং আত্মনিমগ্ন সাধনায় খেলোয়াড় হিসেবে ওঁর পাশে মানানসই হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টাও, উদ্যমের কল্যাণেই একদা ভারতীয় হকির মান উন্নত পর্যায়ে উঠে দাঁড়াতেও পেরেছিল। হায়, সেই কালটি আজ কোথায় হারিয়ে গেছে!

কোন সন্দেহ নেই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের মাটিতে যদি ধ্যানচাঁদের আবির্ভাব না ঘটত তাহলে সেই বিশের দশকে কোনও ভারতীয়ই আন্তর্জাতিক আসরে বা বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিকে যোগ দেওয়ার কথা কল্পনায় আনতে পারতেন না। ধ্যানচাঁদের আবির্ভাবই ভারতের মনে বড় আসরে যোগ দেওয়ার স্বপ্নের আভাস জাগিয়েছিল। এই আবির্ভাব বিলম্বিত হলে বিশ্ব ওলিম্পিকে আবির্ভাব ঘটাতে ভারতের পক্ষেও অনেক দেরি হয়ে যেত।

বিশের দশকে বহির্ভারতে স্বদেশীয়ত্ব বৈশিষ্ট্যের গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তি উপস্থাপনে যোগ্য ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল নিতান্তই সীমিত। সেইকালে বিধাতার আশীর্বাদের মত যে স্বল্প সংখ্যক ভারতীয়কে আমরা পেয়েছি, ধ্যানচাঁদ নিঃসন্দেহে তদেরই অন্যতম। তাঁর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ণ করা গেলে নির্দ্বিধায় তাঁকে ভারতের এক মহান সন্তান বলে অভিহিত করা যায়।

১৯২৮ সালে আমস্টারদামের ওলিম্পিক আসরে স্টিক হাতে ধ্যানচাঁদকে দেখে বিদেশীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। হকি খেলাতে যে শিল্পের পর্যায়ে তুলে ধরতে পারা যায় এ ধারণা তাঁদের ছিল না। ধ্যানচাঁদকে দেখে সেই ধারণার বীজ তাঁদের মনের মূলে অংকুরিত হয়। স্বদেশীয় দর্শকদের মত বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীরাও সেই দিন থেকেই ধ্যানচাঁদকে যাদুকর বলে ডাকতে থাকেন। এই উচ্চারণ প্রথম শোনা গিয়েছিল স্বদেশীয় দর্শকদের মধ্যে আরও আগে ঝিলামের এক প্রতিযোগিতাভূমিতে। পুনরুক্তি আমস্টারদামে। আরও পরে আমেরিকায় ইউরোপে, নিউজিল্যাণ্ডে, পূর্ব আফ্রিকায় এবং কোথায় বা নয়! যে দেশে তিনি গিয়েছেন সেই দেশই মুগ্ধ স্বীকৃতিতে ধ্যানচাঁদের যাদুকরী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায় আনত থেকেছে।

যাদুকর! নামকরণ সার্থক। শব্দটি সুপ্রযোজ্য। সত্যিই তিনি একখানি স্টিকের সাহায্যে ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। স্টিক তো নয়, যেন যাদুকরের হাতে সর্বকর্ম করে তোলার সম্বল অতি পরিচিত সেই দণ্ড। অথবা বলি, ওই স্টিক বুঝি স্বপ্নবিলাসী, সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর হাতের নরম তুলি। স্টিক দিয়েই তিনি ছবি আঁকতেন। দেখে দর্শকদের নয়নে স্নিগ্ধ প্রশান্তির প্রলেপ জড়িয়ে যেত। যখন খেলতেন তখন মাঠ-ময়দান এমন এক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত যা হাজার ওয়াট বাল্বের মত চোখ ধাঁধিয়ে দিত না। প্রদীপ শিখার স্নিগ্ধতায় চোখ, মন দুই-ই ভরিয়ে তুলত। যতদিন বয়স ছিল তাঁর তত দিনই এই শিখা ছিল অনির্বাণ। তাঁর খেলায় চমিতভঙ্গি বিশেষ ছিল না। স্টিকবাজীর আস্ফালিত নয়। যা ছিল তা হল চিকণ কারুকৃতি, লাবণ্য ঢলঢল। মস্তিষ্কের তাগিদে নমনীয় কব্জীর ব্যবহারে সবই সুন্দর এবং সহজ। অথচ কাজের হিসেবে সর্বাত্মক। টুকরো টুকরো চালে তিনি বিপক্ষকে সম্মোহিত করে ফেলতেন। আর সেই ফাঁকে গোল করতেন। সহযোগীদের দিয়ে গোল করাতেন। এককথায় তিনি ছিলেন 'স্ট্রাইকার' এবং 'স্কিমার'—যিনি নিজে গোল করায় সিদ্ধহস্ত তেমন সতীর্থদের খেলাতেও ওস্তাদ। একজনের মধ্যে এমন দ্বিবিধ গুণের সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। একাল-সেকাল কোনকালেই নয়।

তবে এ-কাল সে-কাল, এই সব শব্দ উচ্চারণের দরকারই বা কী? ধ্যানচাঁদকে আমি কোন কালের কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে তুলনা করতে চাই না। সব তুলনার ঊর্ধ্বে তিনি। সকলের মাথার ওপরে তাঁর ঠাঁই। তাঁর স্টিকের কাজ, খেলার গতিবিধি ও অন্য খেলোয়াড়দের অবস্থিতি সম্পর্কে ধারণার নির্ভুলতা এবং গোল করায় মুন্সিয়ানা—এইসব মিলিয়ে তিনি এক অনন্য খেলোয়াড়। তুলনারহিত। এমনটি অতীতে কখনও দেখিনি। ভবিষ্যতে যে দেখতে পাব, এমন দুরাশাও রাখি না। সময় যত এগোবে, শিক্ষা ও গবেষণার সুফল পাওয়া যাবে ততই। ফলে খেলাও হবে উন্নয়নমুখী। তবু ধ্যানচাঁদের মত সহজাত প্রতিভার অধিকারী দ্বিতীয় কোন ক্রীড়াবিদকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন, তাঁরা ভাগ্যবান। তাঁদের কাছে ধ্যানচাঁদ শুধু সর্বকালের সেরা হকি খেলোয়াড়ই নন, নন লোকঠকানো বিদ্যায় সিদ্ধকর্মা নিছক এক যাদুকর। তিনি শত্রুপক্ষকে ঠকাতেন বটে, কিন্তু রাজরাজেশ্বরের [illegible] অভিজাত মেজাজে দর্শক মনকে [illegible] আমেজে কানায় কানায় ভরিয়ে [illegible]। প্রত্যক্ষদর্শীদের আনন্দ দিতে [illegible] কোন কার্পণ্য ছিল না। এবং আমাদের মত দর্শকদের পাওয়ারও যেন কোন শেষ ছিল না। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত দূত। ধ্যানলোকের জীবন্ত বিগ্রহ। গত ৩ ডিসেম্বর তাঁর প্রয়াণের দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্রই এক পরম আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করেছি। ধ্যানচাঁদ নেই, তাই এ-যন্ত্রণা থেকেও বুঝি আমাদের মুক্তি নেই।

মানুষটিও ছিলেন একেবারে সাচ্চা। নিরভিমান, মিতবাক, তাঁকে ঘিরে সবাই বীরপূজায় মত্ত হতে চাইলে কী হবে, যাদুকরের যেন বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন সচেতনতাই থাকত না। দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন, পাশ্চাত্যের পোষাকী জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তবু নিজে কখনও কৃত্রিমতার কৌপীন গায়ে জড়াতে চাননি। কাছ থেকে দেখলেই মনে হোত যে, মানুষটির সঙ্গে মাটির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিজের মুখে নিজের কথা বলতে ছিল প্রবল অনীহা। ছত্রিশ পাতায় আত্মজীবনী লিখে গেছেন। কিন্তু

...কোথায়ও লেখক নিজেকে ...দের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা ...নি। নিজের প্রসঙ্গে আসামাত্র নিজের ...গুটিয়ে নিয়ে অন্যদের বক্তব্যের অংশ- ...উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, পাঠকবর্গকে ...র সন্ধান পেতে সহায়তা করতেই।

...আত্মচরিতে লিখেছেন যে, গরীবের ...সন্তান তিনি। লেখাপড়াও বেশি দূর ...নি তবু, জীবনে যা পেয়েছেন, ...তিনি পরম পরিতৃপ্ত। ধ্যানচাঁদ ...ন যে, অল্পশিক্ষিত এক ভারতীয়ের ...সাধারণ সিপাই থেকে ফৌজি অফিসার ...ও শেষপর্যন্ত মেজর পদে উন্নীত ...কী কম পাওয়া। তাও বৃটিশ আমলে। ...অগণিত মানুষের ভালবাসার দামও ...কম নয়।

...তবে এতো সব যে তিনি পেয়েছিলেন ...অন্যদের বদান্যতার দান হিসেবে নয়। ...খেলার ও চরিত্রগুণে তিনি তা ...করে নিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে ...তাঁকে যে পদ্মভূষণ উপাধিতে ...করেছিলেন তাও তাঁর ক্রীড়া- ...ও চারিত্রগুণের যথার্থ স্বীকৃতিতেই। ...খেলা তাঁর কাছে ছিল খেলাই। যুদ্ধ ...খেলে নিজে আনন্দ পেতেন। এবং ...আনন্দের নির্ভেজাল উপকরণ- ...আরও পাঁচজনের উদ্দেশ্যে দু-হাতে ...যেতেন। নিজের দলের কেউ যদি ...মানুষ লক্ষ্য করে স্টিক ...ধরতেন, তাহলে তাঁকে তখনই ...কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে তাঁর ...হোত না।

...একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ রাখছি। ...সেবার ভারতীয় দলের নিউজিল্যান্ড ...এক ভারতীয় ফুলব্যাক ফিরতি বল ...হিট করলে শূন্যে ছুটন্ত বলটি ...আগুয়ান এক ফরোয়ার্ডের মুখে ...লাগে। বেচারি চোট পান। সঙ্গে সঙ্গে ...দলপতি ধ্যানচাঁদ পিছিয়ে এসে ...নিজের দলের ফুলব্যাককে ...কী করছ তুমি? মানুষ খুন ...নাকি? ফুলব্যাকটি আমতা আমতা ...দেবার চেষ্টা করেন, না হলে ...হয়ে যেত। শুনে ধ্যানচাঁদ আরও ...গলা চড়িয়ে বলে ওঠেন, গোল ...ভয়ে মানুষ মারতে হবে নাকি? ...মাঠ খুন-জখম করার জঙ্গল নয়। ...ওরা একটি গোল দিলেই বা কী হোত, ...গোল করতে পারি না?

...অধ্যায়ে সেই খেলাতে ধ্যানচাঁদ ...গণ্ডা দুয়েক গোল করেছিলেন। ...খেলা ভাঙতে অপরাধী ফুলব্যাকটির ...হাত রেখে দলপতি সান্ত্বনা সুরে ...দেখলে তো, আমরা গোল ...পারি কিনা। কী দরকার বেপরোয়া ...চালানোর?

...গোল করতে পারি কিনা—বাক্যটি ...মুখে কৌতুকের মত শুনিয়েছে। ...গোল তিনি করেছেন শয়ে-শয়ে। ...ফরোয়ার্ড, বিশেষতঃ সহোদর রূপ সিংকে দিয়ে ত গণ্ডায় গণ্ডায় গোল করিয়েছেন। ধ্যানচাঁদ ও রূপ সিং, দুই সহোদর হকি মাঠে শোভা পেতেন এক বৃন্তে দুটি ফুলের মত। ১৯৩৫ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে ধ্যানচাঁদ যদি ২০১টি গোল করে থাকেন, তাহলে রূপ সিং-ও গোল করার বিষয়ে খুব পিছিয়ে থাকেননি। সেই সফরে লেফট ইনসাইড রূপ সিং-কৃত গোলের সংখ্যা ছিল ১৮৫। আর ডানপাশের ইনসাইড ফ্র্যাংক ওয়েলসকে দিয়ে ধ্যানচাঁদ গোল করিয়েছিলেন আরও ১১০টি। এই ফ্র্যাংক ওয়েলসও ছিলেন এক মস্ত সেণ্টার ফরোয়ার্ড। কিন্তু ধ্যানচাঁদ পথ জুড়ে থাকায় তিনি কোনদিন ভারতীয় দলে তাঁর অভ্যস্ত জায়গায় খেলার সুযোগ পাননি। নিউজিল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন ধ্যানচাঁদ পরিচালিত দলের রাইট ইনসাইড ফরোয়ার্ড-রূপেই। ১৯৩২ সালে ওলিম্পিকে এবং আসা-যাওয়ার পথে দেশে ও বিদেশে খেলার অবকাশে ধ্যানচাঁদ করেছিলেন ১৩৩টি গোল। আর সহোদর রূপ সিং ৯৪টি। ১৯৩৬-এ ধ্যানচাঁদের গোলের সংখ্যা ছিল ৫৯, আর রূপ সিংয়ের ৫০টি। খেলা ছেড়ে দেওয়ার মুখে পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে ভারতীয় দলপতি ধ্যানচাঁদ গোল করেছিলেন ৬১টি। সফরে সেবারেই তাঁকে গোলদাতা হিসেবে দ্বিতীয় স্থান পেতে হয়। কারণ, উধম সিং বাবু পূর্ব আফ্রিকায় তাঁর চেয়ে ন'টি বেশি গোল দিয়েছিলেন।
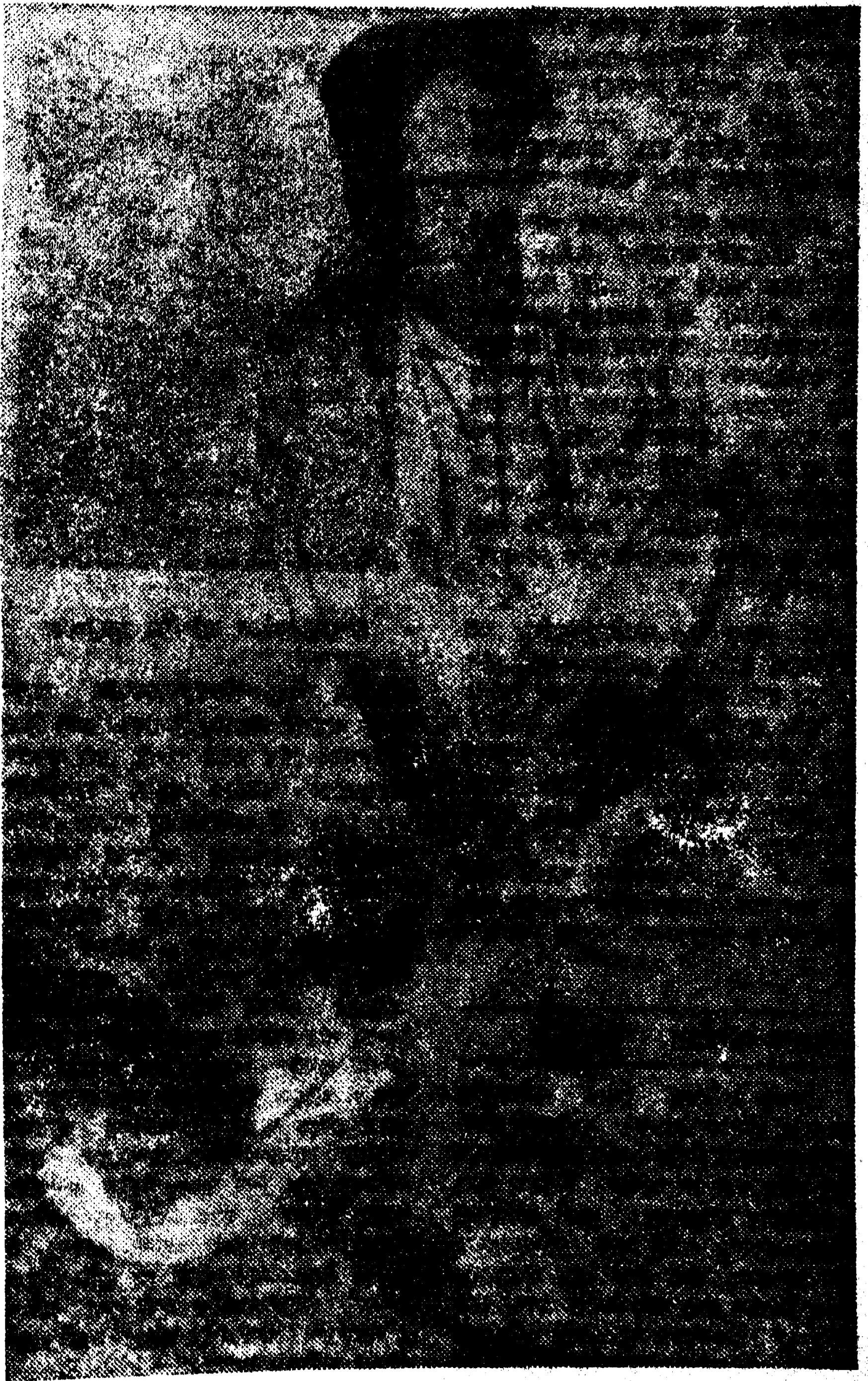
ধ্যানচাঁদ জাতীয় দলের প্রথম নেতৃত্ব-ভার পান ১৯৩৪ সালে পশ্চিম এশীয় ক্রীড়া উপলক্ষে। পরের বছর তাঁরই নেতৃত্বে ভারতীয় দল নিউজিল্যান্ড সফর করে এবং ১৯৩৬ সালে ওলিম্পিক হকি সোনা পেতে জাতীয় দলকে তিনিই সার্থক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বার্লিনের ফাইনালে জার্মানীর গোলে তিনি একাই তিন-তিনবার বল ঢুকিয়েছিলেন। জার্মানীর সঙ্গে এই ফাইনালে ভারত প্রথমার্ধে মাত্র এক গোলে এগিয়েছিল। বিরতির পর ধ্যানচাঁদ আর স্থির থাকতে পারেননি। বুট ছেড়ে কেডস পায়ে বাড়তি গতির সঙ্গতি যোগাড় করে তিনি জার্মান দলকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়েন।

ফৌজি দলের সদস্য হিসেবে ১৯২৬ সালে তিনি নিউজিল্যান্ড যান। সেই তাঁর প্রথম বহির্ভারত সফর। তারপর ওলিম্পিকে খেলেন পর পর তিনবার—১৯২৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৬-এ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না বাধলে ধ্যানচাঁদ হয়ত আরও দুবার ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে হাজির হয়ে ভারতের জন্যে আরও দুটি সোনা নিয়ে আসতে পারতেন

সেই সোনা বাটের দশকের পর থেকে ক্রমশঃই ভারতের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তে। ভারতীয় হকির এই অধঃপতিত অবস্থা দেখে শেষজীবনে ধ্যানচাঁদ বড়ই অসহায় বোধ করছিলেন। একালের এক খেলোয়াড় নিজের সন্তান রাজকুমারকে তাই কাছে ডেকে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগে ধ্যানচাঁদ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, কী করছ তোমরা? তোমাদের সাধনা নেই। কর্মকর্তাদের মত তোমরাও রাজনীতি নিয়ে মেতেছ। এ করলে আমাদের হকি যে একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

শেষ হতে আর কতটুকু বাকি কে জানে। শুধু জানি যে, মৃত্যুপথযাত্রী হকি যাদুকরের শেষ সাবধানবাণীতে কান পাতার সময় বুঝি এখনও আছে। হকি যাদুকর, জাতির হকি-জনকের শেষ ইচ্ছা পূরণের কর্তব্য কি একালের খেলোয়াড়েরা কাঁধে তুলে নিতে পারেন না? পারলে, তবেই লোকান্তরিত ক্রীড়া-প্রতিভার প্রতি যথার্থ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো যাবে। শুধু কথায় কথামালা গাঁথলে হকি যাদুকর এবং জাতীয় হকির প্রতি কোন কর্তব্য করা হবে না।

একাঙ্ক সমাচার

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে কলকাতার ভিতরে বা বাইরে একাঙ্ক নাটকের উপস্থাপনা আজকাল বড়ো একটা দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় তা কেবল বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতার উপলক্ষ্যে। নামী দলগুলো আজকাল একাংক করেন মূল পরিচালকের অন্যত্র ব্যস্ততার জন্য বাধ্য হয়ে তরুণদের সুযোগ দিতে। তবু সব বিধির মতো এই ব্যবস্থা বা অবস্থারও দু একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়, ভালো বা খারাপ। দুটি গোষ্ঠীর এ রকম তিনটি একাঙ্কের কথা এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে। প্রয়োজনবোধে পরে আবার এই আলোচনার বিস্তারিত সাধারণ বিন্যাস করা যেতে পারে।

উদ্ধার

একটি বা দুটি চরিত্রের মানসিক টানা-পোড়েনের উপর ভিত্তি করে তৈরি একাঙ্ক নাটকে একটা সুবিধা আছে যে মূল চরিত্ররা জোরালো হলে অনেক খামতি পুষিয়ে যায়। তবে সি ই এস নিবেদিত রবীন্দ্র গল্পানুসারী উদ্ধার নাটকে যে সমবেত ব্যর্থতা দেখা গেছে সে খামতি পোষানো একজন বা দুজনের মধ্যে নয়। বিশেষত নাটক যেখানে গড়ে উঠেছে সুন্দরী স্ত্রী গৌরীর প্রতি পরেশের

উদ্ধার নাটকে অর্পিতা মজুমদার

সন্দেহের তীব্র পরিণামে সেখানে রণেন বসুর পরেশই সবচেয়ে হাস্যকর। তাল দিয়ে আশেপাশে প্রায় সবাই অপটু এবং সংলাপ উচ্চারণের দায়টাও পারলে প্রম্পটারকে দিয়ে দেন। এই ডামাডোলের বাজারে একমাত্র গৌরীর ভূমিকায় অর্পিতা মজুমদার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন নাটকটিকে জাতে তুলতে। বস্তুত তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় এবং কণ্ঠস্বরই এ নাটকের একমাত্র সম্পদ। গৌরীর অন্তর্দাহ এবং নিষ্ঠা দুই-এর প্রতিই তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনিও শেষ মুহূর্তে নাটকটিকে উদ্ধার করতে পারেন নি। গৌরী তাঁর গুরুর কাছেও উদ্ধার-এর পথ দেখতে না পেয়ে শেষে মরে। এ নাটকের গুরুদেব নীহার মুখোপাধ্যায়ও আগাগোড়া ভালো অভিনয় করে শেষ দৃশ্যে উৎকট কম্পোজিশনের শিকার হয়ে গৌরীসহ নাটককে মারেন। ভাগ্যিস সেই দৃশ্যে মোক্ষদা বা অনন্ত ছিলো না। নইলে সে দুটি চরিত্রের শিল্পী মুকুলজ্যোতি দেবী এবং অনিল সেনগুপ্তর মোটামুটি ভালো অভিনয়ের কথাও গুলিয়ে যেতো।

মুক্তকণ্ঠ

সি ই এস তাঁর অন্য … মুক্তকণ্ঠ'র পরিবেশে তুলনায় … ছিলো। সাদা চামড়া আর পাদ্রীত… বিরুদ্ধে কালো মানুষের মুক্তি সং… এই নাটকের উপজীব্য প্রেরণা। রব… ভট্টাচার্য-র রচনায় বা শেখর ঘোষ… প্রয়োগে খুব বড়ো আকাঙ্ক্ষা ছিলো … কিন্তু ছিমছাম প্রযোজনাটি ঈষৎ উচ্চগ… হলেও মন্দ লাগলো না. মেজরের ভূমি… নীহার মুখোপাধ্যায় এ নাটকেও সপ্র… শ্যামল চক্রবর্তীর অজিত-কে অনেক… বহন করতে হয়েছে. ফলে তাঁর ত্রুটি … পড়েছে বেশি। তবু ভালোবাসার … তিনিও উৎরে গেছেন। শিবব্রত রায় কর… নন্দী বা প্রদীপ দাসকেও ভালোই লা… কিন্তু অলোক দত্তর ফাদার উচ্চারণ … এবং আড়ষ্ট অমনোযোগী হাঁটাচলায় এ… বারে অক্ষমণীয়।

খড়ির চিকে

উপরিউক্ত দুটি নাটকের সম্প… বিপরীত চিত্র বেহালা অবলম্ব… রক্তকরবী নাট্যসংস্থার খড়ির চি… মফঃস্বলের এই দলটি অক্লে… প্রমাণ করে দেয় খাস কলক… বুকের উপর বসে প্রচার এবং … সুবিধা না পেলেও সামগ্রিক নাট্য প্রচে… উন্নতি কোথাও আটকায় না, আন্তরিক… এবং প্রয়োগ ক্ষমতা থাকলে। নির্দেশন… যেমন কনক রায় তাঁর সংযম এবং ইঙ্গিত… প্রয়োগের প্রমাণ দিয়েছেন, তেমনি … সমৃদ্ধ করেছে দুলাল দেবায়-এর নিরাভ… দ্যোতক মঞ্চ। দৃশ্য সংস্থাপনে, ধ্বনি … কল্পনায় খুব সতর্ক অভিনিবেশে আমা… এগিয়ে নেওয়া হচ্ছিল এক সম্ভা… পরিণতির দিকে। চান্দু মিত্র এবং … ব্যানার্জীর সম্পন্ন অভিনয় তাতে স… ভূমিকা পালন করে … আগাগোড়… একটু অকারণ হাসলেও ভাস্বতী ভট্টাচা… ভাল লাগে. ভালো লাগে শক্তি সিংহকেও … বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীর অভাব দ… করার অন্বেষণে স্বপ্না পারেখ একটি … সম্ভাবনাময় আবিষ্কার হয়ে উঠতে পারে … যদি তাঁর দীর্ঘ শরীরকে মঞ্চে চলাফের… ওঠা-বসায় সুষম ব্যবহার করা যেতে পারে… কান্নার দৃশ্যে যে তিনি মুখসৌন্দর্যের কা… ভুলে গিয়ে কাঁদতে পেরেছেন তাতে … বর্তমান প্রতিবেদক আশান্বিত।

সুরজিৎ ঘো…

আজকের নাটক

নবকল্লোল রিক্রিয়েশন ক্লাব, গ… ৫ ডিসেম্বর, সুশীল মুখোপাধ্যায়ের লেখ… আজকের নাটক মঞ্চস্থ করলেন।

নাটকটি কয়েক বছর আগে লে… হলেও এর প্রভাব সমকালে বিস্তৃত… কাগজের কিছু আকর্ষণীয় খবর-

আজকের নাটকে জগন্নাথ চক্রবর্তী

গুলোকে পরিবর্তনশীল সমাজের পরি-
রূপে নির্দেশ করা চলে—এই নাটকটি
ই ভিত্তিতে রচিত। গোটা নাটকটিই
লত কৌতুকপ্রধান হওয়াতে, সামাজিক
চারকে যেকটি ক্ষেত্রে আঘাত করা
ছে, সেগুলি কখনোই নাটক বহির্ভূত
গানধর্মী হয়ে পড়েনি। নারীহরণকারী
ককে কেন্দ্র করে বহিরঙ্গ চমক ও
পাত সংঘাতের দিকে ঘটনাকে টেনে নিয়ে
ওয়ার লোভ সংবরণ করা হয়েছে। ওই
নর প্রতি উপযুক্ত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করে
কের সমাপ্তি মধুরেণ সমাপয়েৎ ভঙ্গীতে।
অভিনয়ের অংশে, শ্যামলবেশী জগন্নাথ
প্রশংসনীয়। এই ধরণের চরিত্রে অতি
ভিনয়ের সুযোগ থাকে, তিনি তা সযত্নে
রহার করেছেন। হিরন্ময়ের অসংলগ্নতা
কাশে সমর্থ হয়েছেন ধীরেন নাগ।
য়েন্দ্র ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে।
ন্নাথ চক্রবর্তীর অভিনয়ে। কমিক চরিত্র
সেবে সফল জীবন ভট্টাচার্য। এ ছাড়া
ল্লখযোগ্য দেবদাস সরকার, অমূল্য মণ্ডল
বং মদন দাস। সুরমার ভূমিকায় কাজল
খোজীর সাবলীলতা দর্শকদের আকর্ষণ
রতে পেরেছে। মঞ্চসজ্জা নাটকোপযোগী।
বল আলোর পরিবর্তন ও আবহ কণ্ঠস্বর
বিহার সৃষ্টি করে নীরেনের স্বপ্ন দৃশ্যটির
রিকল্পনা নাটকটির একটি সম্পদ বলা
ল। এই সম্পদের অধিকারী পরিচালক
র্গাদাস বর্মণ।

পুষ্পণ গুপ্ত

আরও কিছু রেকর্ড

পূজোর রেকর্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ে
মরগীতি শীর্ষক এল, পি ডিস্কে এ
ছরের হিট গানের গুচ্ছে এ'রা যেসব
শল্পীর একখানি বা দুখানি করে গানের
ংকলন করেছেন তাঁরা হলেন, তরুণ
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন
দাশগুপ্ত, বাণী জয়রাম, পিণ্টু ভট্টাচার্য,
বনশ্রী সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী
মজুমদার, অনুপ ঘোষাল, হৈমন্তী শুক্লা,
শ্যামল মিত্র, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী,
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঠিক এই গান-
গুলিই এ বছরের শ্রেষ্ঠ গান কিনা সে
বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও
কোম্পানীর পরিকল্পনায় অভিনবত্ব
অনস্বীকার্য।

আর একটি এল, পি ডিস্কে, নাম
বিস্তীর্ণ দুপারে, ভূপেন হাজারিকার
কণ্ঠের সাতটি গান বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ
করার কারণ শিল্পীর যথার্থ শিল্পীজনোচিত
অভিনিবেশের প্রসাদগুণ। অবাঙালী হয়েও
ভূপেনবাবু বাংলা ভাষা, সুর ও সাহিত্যকে
কতখানি ভালবেসেছেন এবং নিজের চিন্তা,
কল্পনা ও প্রতিভা দিয়ে এ গানের সেবায়
আত্মনিয়োগ করেছেন তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর
রয়ে গেছে গতবারের এবং এবারেরও এল, পি
ডিস্কে।

ব্রজেন্দ্রকুমার রচিত 'সোনাই দীঘির'
যাত্রারূপের এল, পি ডিস্কে অধুনাকালের
যাত্রাশিল্পের একটি নিদর্শন ধরে রাখা
হয়েছে অমিয় ভট্টাচার্যের সঙ্গীত পরিচালনায়
সত্যম্বর অপেরার এই পালাগানের লক্ষণীয়
বস্তু হল এর শক্তিশালী অভিনয়াংশ।

অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর গান (শ্যামল
মিত্রের সুরে) কণ্ঠ, সাবলীল পরিবেশনা
সব মিলেই আকর্ষণীয় ডিস্কের অন্যতম।
হৈমন্তী শুক্লা অন্যান্যবারের মত এবারেও
চারখানি গানে তাঁর নিজস্ব মান বজায়
রেখেছেন।

অনুপ ঘোষালের এবারের গানের
শ্রুতিমাধুর্যের ভূপেন হাজারিকা ও প্রশান্ত
ভট্টাচার্যের সুরের একটি উল্লেখযোগ্য
ভূমিকা আছে।

বাণী জয়রামের শিক্ষিত কণ্ঠে
'পায়েলিয়া ছমছম' শুনতে ভালই লাগে।

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের চারখানি
গান, বিশেষ করে 'বাঁশীতে সুযোগ
পেলেই' সুর, কণ্ঠ ছাড়াও যে বস্তুটির
জন্য চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে সেটি হল
তাঁর গাইবার আনন্দ।

মান্না দের গানগুলি বিশেষ করে
'নীলাম নীলাম' বা 'আকাশ আমায়
বলল'তে তাঁর সেই গায়নশৈলীর শীলমোহর
রয়েছে যা তাঁকে জনপ্রিয় করেছে।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের চারখানি
গানের মধ্যে আছে পুরোনো দুটি সুন্দর
গান। তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথমের দিকের
প্রজ্ঞাপতী আলোকে স্মরণ করায় 'ভাঙ্গা
তরীর শুধু এ গান' ও 'কপালে সিঁদুর
সিঁদুরে টিপ পরেছ'। একটিতে আছে সুধীন
দাশগুপ্তের সুরের স্বপ্ন অপরটিতে
অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছন্দের উচ্ছ্বাস।

নির্মল মুখোপাধ্যায় গুরু ধনঞ্জয়
ভট্টাচার্যের গানের ধারাটি নিষ্ঠার সঙ্গে অনু-
শীলন করে চলেছেন। এবারের চারখানি
গানও সেই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিল।

নিজস্ব চরিত্রগৌরব, প্রকাশভঙ্গির
অনন্যতা ও উচ্ছল প্রাণের আনন্দে ঝলমল
করছে নির্মলেন্দু চৌধুরীর চারখানি লোক-
গীতির ই পি ডিস্ক। অমিতাভ চৌধুরীর
কথা ও উপেন চৌধুরীর সুরের সঙ্গে
শিল্পীর গায়কী এমনভাবে একাত্ম হয়ে
উঠেছে যে তিনটিকে তফাৎ করা যায় না।
আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন

এ গানের কথাগুলি তাঁদের অনেক সাহায্য করবে।

ভারতী কোম্পানীর লেবেলে সুপ্রকাশ চাকীর চারখানি গানে তাঁর চিরকালের উন্নত মানের সঙ্গে ভাবুক মনের বিকাশের মিল গানগুলিকে এমন আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সুপ্রকাশবাবুর সুরে ছন্দা মুখার্জির গান দুটি সুখশ্রাব্য।

ডিস্কো কোম্পানীর লেবেলে দেবযানী চৌধুরীর দুখানি গানে শিক্ষা ও অনুশীলনী ছাড়াও যে বস্তু অনেক প্রতিশ্রুতি বহন করেছে সে হল তাঁর আত্মবিশ্বাস।

গ্রামোফোন কোম্পানীর তৃতীয় স্তবকে রত্না গুহঠাকুরতার পরিচালনায় ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের 'স্বদেশী যুগের গানে'র এল, পি ডিস্ক সযত্নে সংগ্রহ করে রাখবার মত। এতে আছে কাজী নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ, মুকুন্দ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দেশাত্মবোধক গান। প্রতিটি গানের পরিবেশনায় গীতিকারের প্রকাশভঙ্গির চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে হৃদয়স্পর্শী রূপদানের মূলে আছে রত্না গুহঠাকুরতার বৈদগ্ধ্য ও অভিনিবেশের ক্ষমতা।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'ওরে মোর শিশু ভোলানাথ' আর এক সার্থক প্রযোজনা। সুচিত্রা মিত্রের পরিকল্পনা সংকলন ও পরিচালনায় শিশুদের ছড়া, কবিতা ও গানে অফুরান আনন্দের ঝর্ণা উৎসারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বর ও আবৃত্তির ধাঁচে রাধামোহনের 'দাদাঠাকুরের' সৌম্য, প্রশান্ত কৌতুকদীপ্ত ভূমিকা বেশ লাগসই হয়েছে। অপর্ণা সেনের কণ্ঠকেও যথাযোগ্য কাজে লাগানোর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

আর একটি এল, পি ডিস্কে সুনীল গাঙ্গুলির গীটারের সুরে বারখানি হিন্দী ছবির গান শুধু সুরেলা অনুরণনের জন্যই শ্রুতিমধুর নয়। এর মধ্যে ঐসব সঙ্গীতস্রষ্টার রচনা, এ্যাপ্রোচের একটা নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। এই প্রেক্ষণেও এ ডিস্কের মূল্য যথেষ্ট।

বাংলা গানের পদকীর্তনের ধারাটি নিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদন করেছেন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চারখানি সুললিত গানে। গৌর ও কৃষ্ণের ভাবলীলায় ব্যাখ্যান আখরে আখরে মূর্ত।

দ্বিজেন্দ্রগীতি ও রজনীকান্তর গানের ধারাটি কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গায়কীতে শুধু প্রামাণ্য রূপই পায়নি। শিল্পীর অনুশীলনীজাত চিন্তার ছায়া পরিবেশনাকে এমন চিত্তগ্রাহী করে তুলেছে।

নির্মলেন্দু চৌধুরী

আধুনিক গানের মধ্যে আরতি মুখোপাধ্যায়ের চারটি গান, বিশেষ করে 'যেন চিরদিনই এই হয়' ও 'তোমার চরণের ধ্বনি'—এবারের উল্লেখযোগ্য আবেদন সৃষ্টি হওয়ার কারণ সুরকার ওয়াই. এস মুলকী ও নীতা সেন তাঁর উজ্জ্বল কণ্ঠকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছেন।

অমিতকুমারের কণ্ঠ, পরিবেশনা সব কিছুতে কিশোরকুমারের প্রভাবের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সপ্রতিভ ভঙ্গি মিলে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাঁর গাওয়া 'পথ চেয়ে বসেছিলাম' কিংবা 'যেওনা যেওনা' মনে দীর্ঘস্থায়ী রেশ রাখবার মত শক্তি তাঁর কণ্ঠে আছে। সেইরকম গানেই এবার আত্মনিয়োগ করছেন না কেন? বাপী লাহিড়ীর উদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষাসব কিছুরই প্রতিবিম্বন ঘটেছে তাঁর গানগুলিতে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে রানু মুখোপাধ্যায়ের চারখানি গানের মধ্যে শুনতে ভাল লাগে (অতীতের ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জেলোনা ও 'তুমি থমকে গে[...] কেন') সুর ও কথার মানের সঙ্গে সু[...] যুক্ত হওয়ার কারণেই।

কালিদাস নাগ

আশা ভোসলের কণ্ঠসৌন্দর্য প্রশ্নে[...] অতীত, উচ্চারণও সুন্দর। কিন্তু এম[...] দুর্লভ সম্পদের তিনি এভাবে অপচ[...] ঘটাচ্ছেন কেন? এই বয়সে এ-সব গা[...] (উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, বা এই যা সব ক[...] হয়ে গেল) গাওয়ার কোনো মানে হয়[...] এবারের পুজোর গানে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য[...] গান থেকে আমরা বঞ্চিত কেন?

অন্যান্য গান

মেগাফোন কোম্পানীর লেবেলে[...] কালিদাস নাগের কণ্ঠে চারখানি নজরু[...] গীতি শিল্পীর প্রথম রেকর্ড হলেও আ[...] করবার মত অনেক কিছুই পাওয়া গেল[...] প্রথমত মধুর কণ্ঠ ও সুরে। দ্বিতীয়[...] সঙ্গীত নির্বাচন এ ডিস্কে এমন গান আ[...] যা সচরাচর শোনা যায় না (যেমন পরদেশ[...] মেঘ বা তোমার আঁখির মত)। সবার ওপ[...] গাইবার সুললিত ভঙ্গি—সব মিলিয়ে[...] কয়ের ফোঁটা শিশিরবিন্দুর মত টলমলে[...] আবেদন রয়েছে তাঁর গানগুলিতে।

ঈগল কোম্পানীর ৪৫ আর, পি এ[...] ডিস্কে শেখরকুমার সরকার ইলেকট্রি[...] গীটারে বাজিয়েছেন দুখানি জনপ্রিয় লোক[...] গীতির সুর, বড়লোকের বিটিলো ও সুজ[...] মাঝি রে। গীটারে লোকগীতির ডিস্ক[...] আগে শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। শিল্পী[...] এই নূতন প্রয়াস সার্থক হয়েছে সুরেল[...] হাত ও যথাযথ যতির জন্য।

ই, পি-ই কোম্পানীর লেবেলে[...] সুপ্রিয়কুমার রায়ের কণ্ঠে দুটি নজরুল[...] গীতি 'তোমার হাতের সোনার রাখী' [...] 'পিউ পিউ বোলে পাপিয়া' সুখশ্রাব[...] শিক্ষিত কণ্ঠ ও পরিবেশনার আন্তরিকত[...] কারণে।

ইনরেকোর লেবেলে প্রদীপ চক্রবর্তী[...] কণ্ঠে বরাবর নজরুলগীতিই শুনে এসেছি[...] এবারে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় [...] সুরে তাঁর পরিবেশিত দুটি আধুনি[...] গানে ক্রমপরিণতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর তারি[...] করবার মতই।

ভারতী কোম্পানীর ই, পি ডিস্[...] অনিল দত্তর সুরে পরিচয় গুপ্ত গেয়েছে[...] দুখানি গান, মাধুরী আমার লুকায়ে, [...] চলো যাবে কি আমার সাথে, সারা গায়ে রো[...] মেখে। গলাটি ভারী সুন্দর, প্রথম গানটি[...] রাবীন্দ্রিক সুরে খুব মানিয়েছে। দ্বিতী[...] গানটির পরিবেশনা পরিচ্ছন্ন।

শৈলেন কর্মকারের কণ্ঠের দুটি গা[...] সু-গীত।

সন্ধ্যা সে[...]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

যদি সারিডনেও আপনার মাথার যন্ত্রনা দূর না হয়, তাহলে ডাক্তার দেখান।

Saridon

একটি সারিডনেই মাথার যন্ত্রনা চটপট দূর হবে, আর আপনি আরাম বোধ করে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।
কখনও কখনও মাথার যন্ত্রনা এত বেশী হয় যে,

সারিডনেও ছাড়তে চায় না। তখন আপনার ডাক্তার দেখানো দরকার। কারণ, একমাত্র ডাক্তারবাবু তখন আপনাকে সঠিক ওষুধ দিতে পারেন।

সারিডন

ট্রেডমার্ক 'রোশ'

জোরালো ও নিরাপদ!
কেবল একটাই যথেষ্ট!

অমৃত

১৯ বর্ষ, [illegible] সংখ্যা
25 JANUARY 1980

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
বড়বাজার হাত ছাড়া হল কী করে
লিখেছেন কমল চৌধুরী
ক্ষমতার অলিন্দে
লিখছেন সরোজ চক্রবর্তী
সমীর চট্টোপাধ্যায়ের গল্প
কলকাতা টেস্ট : লিখছেন [illegible] নন্দ,
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব রায়,
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাতশো মজা

রাবার পেয়ে যাবার পর কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ নাকি আলুনি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। জয়-পরাজয় ঠিক হওয়ার পর খেলার মাঠ উত্তেজনা হারায়। প্রথম তিনদিন ব্যাটিং একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান যখন ডিক্লেয়ার করে দিয়ে ভারতকে ব্যাট করালো—তখন থেকেই খেলায় আবার হারজিতের দোলা ফিরে এলো। বেতারের হিন্দিভাষী ভাষ্যকার বললেন, খেল দর্শককে লিয়ে মনোরঞ্জক হো গিয়া। বাঙালী গৃহস্থ বললেন, খেলায় মজা এসেছে।

চারদিকেই এখন সাতশো মজা। তবে অন্য সব মজা জানান দিয়ে আসে না। এ-মজা পাকিস্তান এনেছে। ডিক্লেয়ার করে। দনাদ্দন উইকেট ফেলে দিয়ে।
বাকি সব মজার চেহারা একটু অন্য রকম।

জ্যোতিবাবু বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধী গণতান্ত্রিক। শোনা যাচ্ছে—বংশীলাল রাজ্যপাল হয়ে আসতে পারেন। সঞ্জয় বলেছেন, কেন্দ্রের হাতে আরও ক্ষমতা থাকা দরকার। দমদম বিমানঘাঁটিতে আসামের ছাত্রনেতা বলেছেন, একুশ বছর বয়স হলেই তো মন্ত্রী হতে বাধা নেই। কিছু মার্কিন অ্যাথেলেট মস্কো অলিম্পিকে যোগ দেবেনই। মিশর ৯৩ জন রুশ বিশেষজ্ঞকে বরখাস্ত করেছে। মুসলিম সম্মেলন মিশরকে একঘরে করেছে। বাংলা কাগজের ভাষ্যকার রুশীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে সারা আফগানিস্তান চষে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সংবাদ সূত্র ট্যাক্সিওয়ালা। ফরেন অফিসের কর্মচারী। আবার বিদ্রোহীদের দখল-করা রুশী সাঁজোয়া গাড়িতে বসে ছবি তুলে তিনি কলকাতার কাগজের জন্যেও পাঠাচ্ছেন।

এর চেয়ে মজা আর কি হতে পারে? তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। শীত যাবার সময় আমাদের জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—লেপমুড়ি দিয়ে শুতে কত ভাল লাগে। এখন মনে হয়—গরম ও ঘামের কথা যেন আমরা ইতিহাসে পড়েছিলাম।

এত মজা চারদিকে। এর ভেতর ডাঙ্গেকে বাদ দিয়ে সি পি আই আরও বিমুখ হতে চান। সেজন্যে তাঁরা আরও ভাঙনবাদী হয়ে পড়েছেন। কংগ্রেসের সব ধাঁচের লোক এখন নানা নামের পার্টি করে বসে আছেন। ওঁরা এক হয়ে গেলে ভারতের রাজনীতির মজাটাই মাঠে মারা যায়। তবুও আনন্দের বিষয়—চিনি, কেরোসিন, কয়লা, সর্ষের তেল, চা, ওষুধ, কাগজ আমরা আগের দামেই কিনে যাচ্ছি। সামান্য যা বেশি দিতে হচ্ছে—সেজন্যে আমরা কিছু বলছি না। তাহলে মজা নষ্ট হয়ে যাবে।

মেঘের কাছাকাছি

আলোকময় দত্ত

সত্তরের দশকে কলকাতার বুকে এক-সঙ্গে অনেকগুলো বহুতল বাড়ি মাথা তুললো। এত জমি কোথায় ছিলো? এই কিছুদিন আগেও তো মনে হতো আর তিল ধারণের জায়গা নেই এ-শহরে। আসলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের স্থান ছেড়ে দিতে হলো পুরোনো বাড়িগুলোকে। যে বাড়ি-গুলো স্ব-ফেয়ার রোড, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড বা ময়রা স্ট্রিটের গর্ব ছিলো। যে অট্টালিকাগুলোর জমকালো ছিলো পুরোনো কলকাতার বহু পল্লী, আজ তাদের কবরের উপর মাথা তুলেছে এই আকাশছোঁয়া বাড়ি-গুলো। যাঁরা সেই কলকাতাকে দেখেছেন তাঁদের মন খারাপ হওয়ার কারণ নিশ্চয় আছে। কিন্তু, এই নতুন অট্টালিকাগুলোর বর্তমান বাসিন্দারা কি বলেন? তাঁদের কি খুব সুখ হয় মাটি থেকে অনেক উঁচুতে আকাশের কাছাকাছি থাকতে?

আমার এক আত্মীয় থাকেন সাদার্ন অ্যাভিন্যুর এক চৌদ্দ তলায়। তাঁর মুখেই শোনা—অনেক নীচের রাস্তার প্রতিটি গাড়ির হর্ন প্রায় একই তীব্রতায় পৌঁছোয় উপরে। মধ্যরাত্রে মদ্যপের অশ্রাব্য গালিও শোনা যায় পরিষ্কার। তবে, অতটা উপরে বাতাস নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত নির্মল।

কয়েক দিন আগে চৌরঙ্গির মোড় থেকে শেয়ারের ট্যাক্সিতে ফিরছি। আলাপ হলো সহযাত্রীদের সঙ্গে। একজন বললেন, দক্ষিণ কলকাতার এমন এক বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের মালিক ছিলেন তিনি কয়েক মাস। পরে, বেচে দিয়ে নেমে এসেছেন এক ভাড়া বাড়ির দোতলায়। ভদ্রলোক বললেন—'আরে মশাই, চিরকাল ঘরকুনো লোক আমি। থাকতে চাই নিজের মনে একা একা। তার কি উপায় আছে ওখানে। দিনের মধ্যে ছত্রিশবার লিফটে উঠতে নামতে দেখা হচ্ছে অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে। কথা বলতে হচ্ছে জোর করে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে প্রাণ যায়। তাছাড়া, প্রতি রবিবার সকাল-সন্ধ্যায় কো-অপারেটিভের মিটিং থাকবে অবধারিত নিয়মে। সেখানে হাজিরা দিতে ভুল হলে রক্ষে নেই—পরের বারে বেহাজিরার কৈফিয়ৎ জুৎসই হওয়া চাই। শান্তি নেই মিটিঙে উপস্থিত হলেও—মিসেস মিত্রের শাওয়ারে জল আসে না কেন, মিস্টার মুখার্জির বৈঠকখানার দরজায় শব্দ হয় কিংবা শ্রীমতী রায়ের রান্নাঘরের......ইত্যাদি ইত্যাদি।'

ভদ্রলোক একটানা কথাগুলো বলে জিরিয়ে নিলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—তাছাড়া ভেবে দেখুন—একটা এ্যাস-পিরিন কি এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে ভৃত্যকে পাঠাতে হবে পাতালে। অর্থাৎ, দশতলা থেকে রাস্তায়। সে একবার ছাড়া পেলে ফিরতে চায় না সহজে। আর ভৃত্য না থাকলে?—লুঙ্গি বা পাজামা ছেড়ে ধড়াচুড়ো ধরে নামতে হবে নিজেকে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুন লিফটের অপেক্ষায়। যতক্ষণে মাথা ধরার ওষুধ পেয়েছেন হাতে, ততক্ষণে হার্ট এ্যাটাক হয়ে যেতে পারে দুবার। এছাড়া এ-ফ্ল্যাটে ও-ফ্ল্যাটে রেষারেষি, চাকর চুরি আর পরি-চারিকা কাড়াকাড়ি নিত্যই। বহুতল বাড়ির কর্মিবৃন্দের গণতন্ত্র আছে। ইউনিয়ন থাকবেই। তাই হামেশাই ধর্মঘট—জল বন্ধ। লিফট চলে না। ভদ্রলোক বেজার মুখে বললেন—'বলুন তো আর কতো সয়।'

অন্য সবকিছুর মতো অবিমিশ্রিত মন্দ এই বহুতল বাড়িগুলো নয়। কলকাতার মতো বড় ও ঘনবসতির শহরে বাসযোগ্য বাড়ির অভাব বহু দিনের। তাই এতগুলো অট্টা-লিকায়—হাজার হাজার ফ্ল্যাটে আর এ্যাপার্ট-মেন্টে বহু পরিবার আধুনিক জীবন যাপনের সব চাইতে মূল্যবান উপকরণ পেয়েছেন—সেটা তো কম কথা নয়। ওঠা-নামার সুবিধা, গাড়ির জন্য জায়গা, রাতের পাহারা ছাড়াও আরো কয়েকটা জিনিস থাকা দরকার। সুখের বিষয় বহু স্থপতি সে বিষয়ে সচেতন। যেমন উপর থেকে নীচের নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলার প্রশস্ত নল, অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার ও জরুরি অবস্থায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা। স্বল্প জায়গায় উদ্যান ও প্রেক্ষা-গৃহ—এই সুবিধাগুলির প্রতি সচেতনতা প্রশংসাযোগ্য।

তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে—এই বিশাল বাড়িগুলোর জন্যে রাস্তার বা গলির সেই অংশে হঠাৎ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে জনসংখ্যার চাপ। সেই অঞ্চলে অকস্মাৎ যানবাহনের চাপ বেড়ে যাচ্ছে—বাড়ছে জলের প্রয়োজন। দরকার হচ্ছে বেশী পরিমাণ আবর্জনা দূর করার। এক কথায় এই বড় বাড়িগুলোকে কেন্দ্র করে কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে, অলিতে গলিতে রাতারাতি আত্মপ্রকাশ করছে এক-একটা মিনি-শহর। খুব স্বাভা-বিক নিয়মেই সে সব অঞ্চলে নাগরিক জীবনের ভাল দিকগুলোর সঙ্গেই জন্ম নিচ্ছে অপ্রীতিকর দিকটাও। আবহাওয়া কতটা দূষিত হচ্ছে বা রাস্তাঘাট কি পরি-মাণ নোংরা হচ্ছে তার থেকেও ভীতিকর—স্বল্প পরিসরে ভিন্ন রুচির, ভিন্ন কৃষ্টি ও মানসিকতার বেশ কিছু নরনারীর বাধ্যতা-মূলক সহাবস্থান। পশুপাখির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সোয়াস্তির একটা ন্যূনতম দূরত্বের ব্যাপার আছে। মানুষের বেলাতেও নেই এ ব্যতিক্রম। তবে, ভীড় বাসে, মফ-স্বলের ঠাসাঠাসি ট্রেনে বা ছোট একটা লিফটে কিছুক্ষণ ঘেঁসাঘেঁসি থেকে শহরের মানুষ অভ্যেস করে নিতে বাধ্য হয়েছে অন্য মানুষের নৈকট্য। কিন্তু, তা একটানা বিরামহীন সইতে হলে স্নায়বিক উত্তেজনা ও মনোবিকার অবধারিত। বহুতল বাড়ি-গুলোতে উঠতে বসতে বাসিন্দাদের নিতে আসতে হয় খুব কাছাকাছি। থাকতে হয় ঘেঁষাঘেঁষি—যা কোন অর্থেই স্বাস্থ্যকর নয়।

বহুতল বাড়িতে দীর্ঘ দিন বসবাসের আর একটা ভীতিকর সম্ভাবনা হচ্ছে রেজিমেন্টেশান। কোনো একটা নির্দিষ্ট বহুতল বাড়ির যে কোনো টু বেডরুম ফ্ল্যাটের সঙ্গে প্রায় কোনো তফাৎ নেই অন্য আর একটা টু বেডরুম ফ্ল্যাটের। তাই এক-জনের রান্নাঘর বা বাথরুমের টালির রং নীল না গোলাপী তাইতে যেটা ফ্ল্যাটের চেহারার পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য আনা কঠিন। বাসিন্দারা যেহেতু মোটামুটি একই অর্থ-নৈতিক মানের—তাঁদের সাজ পোষাক, রুচি, আয়ার মাইনে বা বাচ্চার ইস্কুল সাধারণতঃ একই। এঁরা যখন পরস্পরের এত কাছাকাছি থাকেন তখন এঁদের ঘর সাজানোর কায়দা, কথা বলার ধরণ এবং জীবনদর্শন ক্রমশঃ একই রকম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বাড়তে দেওয়ার পক্ষে আদর্শ নয় বহুতল বাড়ির আবহাওয়া। এর নিরাপত্তার কথাও ভেবে দেখা দরকার নিঃসন্দেহে। এখানে সারা দিন এত লোকের আনাগোনা যে কোন একটা ফ্ল্যাটে ঢুকে অপরাধ করে অবলীলায় অপ-রাধীর বেরিয়ে আসা সম্ভব। অন্য ফ্ল্যাটের লোকেদের পক্ষে তাকে সন্দেহ করা প্রায় অসম্ভব। এই অবস্থায় পাহারাওয়ালা কুকুর পুষতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু, সেটাও যে ফ্ল্যাটবাড়িতে কত অসুবিধের ভুক্ত-ভোগীরাই জানেন।

এত সত্ত্বেও আদিমযুগ থেকে মানুষের তীব্র আকাংক্ষা ঘর বানানোর, বাসা বাঁধ-বার। আজ মেগালোপোলিস-এর যুগে আলাদ আলাদা ছোট্ট সুন্দর বাড়ি বানানো ক'জনের পক্ষে সম্ভব। সকাল সন্ধ্যে জীবিকার জন্যে ছুটোছুটির মধ্যে নিজের গৃহনির্মাণের তদারকি করার সুযোগ আছে হয়তো গুটিকয় সৌভাগ্যবানের। অনেক সহজ তার চাইতে বিশেষজ্ঞদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিঃশ্চিন্ত হওয়া। তাছাড়া, প্রত্যেকের আলাদা বাড়ি বানানোর অত জায়গাই বা পাওয়া যাবে কোন শহরে। কিছু দিন আগেও প্রত্যেকের নিজস্ব বাড়ি করার স্বপ্ন সফল করা সম্ভব ছিল না। আজ এই বাড়িগুলোর আবির্ভাব অকস্মাৎ এনে দিয়েছে সব বিত্তের মানুষের সে আশাকে পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি।

হারানো বই

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনেকদিন পরে আবার ছাপা হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থ অনুবাদ করে তিনি বিনামূল্যে বিলিয়েছিলেন। এজন্য খরচ হয়েছিল আড়াই লক্ষ টাকা। এর ফলে সিংহ মশায়ের উড়িষ্যার জমিদারী ও কলকাতায় বেঙ্গল ক্লাব প্রভৃতি মূল্যবান সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ-প্রচারের বিরাট পরিকল্পনা কীভাবে কালীপ্রসন্নের মাথায় এসেছিল, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। কালীপ্রসন্ন নিজেই মহাভারতের কিছু অংশ অনুবাদ করেন। কথাপ্রসঙ্গে হরচন্দ্র ঘোষকে জানান সে-কথা। বিচারক হরচন্দ্র ছিলেন নাবালক কালীপ্রসন্নের অভিভাবক। হরচন্দ্র উৎসাহ দিলেন। কিন্তু একাকী এই দুঃসাধ্য কাজে না এগিয়ে পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে বললেন। সে-সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের অনুবাদ ছাপছিলেন। কালীপ্রসন্ন তাঁকে এই গ্রন্থ প্রকাশের অনুরোধ জানান। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সময়াভাব। নানা কাজের মানুষ। তিনি পণ্ডিতমণ্ডলী নির্বাচন করে দিলেন অনুবাদ কাজে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর হলেন তত্ত্বাবধায়ক। তখন কালীপ্রসন্নের বয়স মাত্র আঠার। বরাহনগরের যে-বাড়িতে অনুবাদ কাজ চলত, তার নাম ছিল সারস্বতাশ্রম ও পুরাণ সংগ্রহ কার্যালয়। অনুবাদকদের নাম কালীপ্রসন্ন সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছেন। তিনি স্বয়ংও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছিল ১৮৬৬ সালে। চার বছর বাদে ১৮৭০ সালে মারা যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ঊনত্রিশ।

কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ ছিলেন স্যর টমাস রমবোল্ড ও মিস্টার মিডলটনের অধীনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ান। তিনিই জোড়াসাঁকো সিংহবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। শান্তিরামের দুই ছেলে—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল জয়কৃষ্ণের একমাত্র পুত্র। কালীপ্রসন্ন বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত জানতেন ভাল। মাত্র তের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। ইংরেজি শিখেছিলেন কার্কপেট্রিকের কাছে। পণ্ডিতদের কাছে পড়েন বাংলা ও সংস্কৃত। সেকালের ধনী পরিবারের ছেলেদের

কালীপ্রসন্ন সিংহ

মত সৌখিনতায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে, মোটা চাদর ও চটি জুতো পায়ে বাংলা ভাষার সেবায় নামেন। সম্ভবত ১৮৫৬ সালে নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা। ঐ সভায় প্রবন্ধ পাঠ করতেন কৃষ্ণদাস পাল, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার ও সেকালের বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। এই পরিবেশ বদলে দিয়েছিল কালীপ্রসন্নকে। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে বেরোল তাঁর বিক্রমোর্বশীর অনুবাদ। তখন বয়স মাত্র সতের। নভেম্বর মাসে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে হল বিক্রমোর্বশীর অভিনয়। কালীপ্রসন্ন নেমেছিলেন পুরূরবা চরিত্রে। ডব্লু. সি ব্যানার্জিও একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। কলকাতার প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট য়ুরোপীয় ও দেশীয় মানুষ এসেছিলেন অভিনয় দেখতে। অনেকেই জায়গা না পেয়ে ফিরে যান। ১৮৫৯ সালে কালীপ্রসন্নের মালতীমাধব নাটক বেরোয়। এ-নাটকে তিনি ৮।৯টি সুন্দর গান লিখেছিলেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মারা যান ১৮৬১ সালের ১৪ জুন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কলম চালান নিরলসভাবে। দরিদ্র চাষীদের অপরিমিত দানও করতেন। যখন মারা যান, তখন তাঁর একখানি বাড়ি আর হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস ছাড়া কিছুই ছিল না। ফলে হিন্দু পেট্রিয়ট বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। কালীপ্রসন্ন হিন্দু পেট্রিয়ট বাঁচাতে এগিয়ে এসে পাঁচ হাজার টাকায় কিনে নেন পত্রিকার স্বত্ব। ফলে, তিনি রক্ষা করলেন এটি নিরাশ্রয় পরিবারকে। এছাড়াও কালীপ্রসন্ন পাঁচ হাজার টাকা দান করেন হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষায়। মোটসংগ্রহ হয় দশ হাজার টাকা। এই টাকা হরিশ্চন্দ্র মারা যাওয়ার পনের বছর পরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বাড়ি তৈরির সময় খরচ হয়েছিল।

পাদরী লঙের একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। কালীপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ কোর্টে সেই টাকা জমা দেন।

বিলেতী পেনী ম্যাগাজিনের আদর্শে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র বিবিধার্থ সংগ্রহ বেরোয়। ১৭৮২ সালের বৈশাখ থেকে এই পত্রিকার সম্পাদক হন কালীপ্রসন্ন। ১৮৬২ সালে ছাপা হয় হুতোম প্যাঁচার নক্সা—১ম খণ্ড। তখনকার কলকাতা সমাজচিত্র আঁকতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন আলালী ভাষা ব্যবহার করেন। হাস্যরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক এই সামাজিক নকসায় কালীপ্রসন্নই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারকারী। যা পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ করেন মধুসূদন। কবিকে সংবর্ধনা দানের অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন কালীপ্রসন্ন।

সংগীতেও ছিল কালীপ্রসন্নের অসীম অনুরাগ। সিংহবাড়িতে সংগীতচর্চার জন্য একটি সংগীতসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার একরকম কাগজের তুম্বী তৈরির চেষ্টাও করেছিলেন। স্বদেশের মঙ্গলজনক কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ বন্ধ আন্দোলনে কালীপ্রসন্ন ছিলেন অন্যতম সমর্থক। কলকাতা সমাজে কালীপ্রসন্ন ছিলেন অতি-শ্রদ্ধেয়। নির্ভীকভাবে বিবেকানুযায়ী কাজ করতেন। দেশবাসী বা রাজকর্মচারী কারো ভয়েই তিনি পিছিয়ে আসেননি। তাঁর অমায়িকতা, নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা ছিল সুবিদিত। পাদরী লঙের অর্থদণ্ড প্রদান ও স্যার মর্ডন্ট ওয়েলসকে তিরস্কার করা সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন সমাজে ছিলেন এক বিরল সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। ১৮৬৩ সালে তিনি কলকাতার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট আর জাস্টিস অফ দি পীস হন। তাছাড়া কলকাতার পার্শ্ববর্তী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারও হয়েছিলেন।

কালীপ্রসন্নের এই জীবনীগ্রন্থ লিখেছিলেন হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাতি মন্মথনাথ ঘোষ। মাত্র ১২৫ পৃষ্ঠার বই। ১৩২২ সালে ছাপা। বেশ কিছু মূল্যবান ছবিও আছে। মন্মথনাথের লেখা অন্য বইয়ের মধ্যে আছে—রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তিন খণ্ডে হেমচন্দ্রের জীবনী, সেকালের লোক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, রঙ্গলাল। বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি ইংরেজি প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ করে নাম দেন বাংলা সাহিত্য। তাছাড়া ইংরেজিতে লিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী। মন্মথনাথের প্রতিটি বই-ই ছিল সচিত্র। এর যে কোন একখানা বই টেনে নিয়ে একালেও পড়া যায়। তেমন আকর্ষণ এখনকার অনেক জীবনী গ্রন্থেরই নেই।

কমল চৌধুরী

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

স্বপ্ন

শুধু স্বপ্ন দেখি, হয়তো একদিন ভোরে
জেগে উঠবে সমস্ত পৃথিবী

এখন কেবল রাত্রি—দু'একটা তারা
হয়তো কোথাও জাগে
কোনো একদিন
মানুষের পাশাপাশি দাঁড়াবে মানুষ, আঁস্তাকুড় থেকে
বেজে উঠবে সঙ্গীত—নীল-জীনস-পরা মেয়ে
ছুটে যাবে কিশোরের কাছে

শুধু স্বপ্ন দেখি, আমি
তোমাদের মধ্যে আছি
তোমাদের দুঃখে-সুখে আছি
একটা রুটি ভাগ করে খাচ্ছি সকলে—
রুটির স্বপ্নের চেয়ে আর কিছু অতো সত্য নয়।

আবিষ্কার

আমাদের ঘর নেই, বাহির রয়েছে
গভীর বিকেল থেকে হাওয়া এসে ছুঁয়ে যায় বুক
আমাদের বুকে কোনো সুখ নেই, শুধু
দু'একটা দিন
চকিত আলোর মতো জ্বলে ওঠে
ফের নিভে যায়
মনে হয়, ছুটে চলে যাই
বাহির ভুবন যেন ফাঁকা মাঠ, নীল মেঘ, প্রেমিকার চিঠির উত্তর

আমাদের ঘর নেই—যা আছে তা বাহির ভুবন
নির্জন পুকুর পাড়ে জাগে চাঁদ
বারান্দার একপাশে পড়ে থাকে ঘন লাল ছাতা
আমাদের খুড়তুতো বোনের শান্ত ন্যালাখ্যাপা স্বামী
একা একা চলে যায় সবার আড়ালে
মনে হয়, ছুটে চলে যাই
আমিও অমন করে

অন্যদের ঘর আছে, বাহিরভুবন নেই কেন?

বোধ

শুধু ঝরে পড়ে পাতা
এদিকে ওদিকে—
এখানে কুয়াশা, গাঢ় ঘুম, আর ইজিচেয়ারের
নির্জনতা—আমি এর কতটুকু বুঝি
যতোটুকু জেগেছে প্রকৃতি
শুধু দু'একটা ভাঙ্গা, ছেঁড়াফাটা, সবুজাভ মানুষে
মুখে বিড়ি, ফুলে-ওঠা বগ,
বিহ্বলতা ও বেদনা মাখানো দু'চোখ
এরই মধ্যে সাজগোজ, মধ্যবিত্ত হাঁড়ি ও হেঁসেল—এরই মধ্যে
ঘৃণা ভালোবাসা
নিভন্ত উনুনের পাশে স্বচ্ছল বিড়াল—আমি এর
সবটুকু দেখি—তবু কেন রোজ
ভোরবেলা সূর্য ওঠে আমাকে ছাড়িয়ে?
আমি এর ততোটুকু বুঝি
যতোটুকু জেগেছে প্রকৃতি

যাওয়া হয় না

যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো ঠিক একদিন—
কোথায়, কিভাবে যাবো একথা ভেবেই শুধু
যাওয়া হয় না, থেকে যেতে হয়
যেখানে যেমন আছি—কখনো বা
রেঁধে খেতে হয়

দু'পাশে বাবলার ঝোপ, ছায়ামাখা সূর্যাস্ত, টিলা
টিলার উপরে একটা লোক যেন ঈশ্বরের মতো
ঝুঁকে আছে, পৃথিবী দেখছে
আরো একটু নুয়ে স্পষ্ট করে দেখে নিতে চায়
মানুষ কোথায় আছে,
কেমন ঘরে, কিভাবে রয়েছে—

কোথাও যাবার নেই, পথ নেই, পাথেয়ও নেই
একটু দূরে শালবন, শুকনো পাতা, হাওয়ার কাঁপুনি
সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে
এরই মধ্যে একটু আধটু ঘোরাঘুরি, কিম্বা তাস খেলা
সতরঞ্চ পেতে
তারপর, যে যার মতন শুধু ভেঙে ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া
এসব ভেবেই স্রেফ যাওয়া হয় না, থেকে যেতে হয়
যেখানে যেমন আছি—একা-একা
পাখীর মতন

দুই কবি সুধীন্দ্রনাথ ও যুবনাশ্ব

সমীর দাশগুপ্ত

'অর্কেস্ট্রা' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অল্প সময়ের ব্যবধানেই প্রকাশিত হয় পরের বই **ক্রন্দসী**। দ্বিতীয় গ্রন্থটি বেরিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই সুধীন্দ্রনাথ [illegible] দুখানি বইয়ের সমালোচনা যাতে **প্রবাসী**-তে স্থান পায়, সেজন্যে আগ্রহী হয়েছিলেন, এবং তাঁর ২৪শে অগাস্ট ১৯৩০ তারিখে লেখা এক চিঠিতে তাঁর বন্ধুস্থানীয় মণীশ ঘটককে এই প্রয়োজনীয় দায়িত্বটি বহনের অনুরোধ জানান। বলা বাহুল্য, সেই আমলে—যখন ঝাঁকে ঝাঁকে বস্তায় বস্তায় কবিতার বই বেরোত না—সুধীন্দ্রনাথের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎকালীন বাংলা দেশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত সাহিত্যপত্রে তাঁর নিজের প্রথম দুটি বইয়ের সমালোচনা উপযুক্ত ব্যক্তির হাত থেকে আসুক এটা বিশেষভাবে চাইছিলেন। উল্লিখিত চিঠিটি সেই উদ্বিগ্নতার স্বাক্ষর বহন করে। এবং মনে হয় অর্কেস্ট্রা বইটির ইতিপূর্বে **প্রবাসী**-তে সমালোচনা না-হওয়ার পিছনেও সুধীন্দ্রনাথের এই সংশয়জনিত গড়িমসির ভূমিকা ছিল। অন্তত চিঠি থেকে বোঝা যায় তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ যাতে মণীশ ঘটক **প্রবাসী**-র জন্য আলোচনা করেন এরূপ ব্যক্তিগত অভিলাষ তিনি **প্রবাসী**-র কর্তৃপক্ষকে জানান এবং সে-বিষয়ে সম্মতিও যোগাড় করেন। চিঠির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা : 'বলাই বাহুল্য, আমি আপনার কাছে সমালোচনা চাই, প্রশংসা নয়, কাজেই যত খুশী কড়া হবেন।' সুধীন্দ্রনাথকে যাঁরা চিনতেন, জানতেন, তাঁরাই শুধু বুঝবেন, আলোচ্য বিষয়ে অপরের যোগ্যতা [illegible]ততা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার এটা একটা বিরল উদাহরণ।

বস্তুত মণীশ ঘটককে তাঁর বেছে নেওয়াটা মোটেই আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে হয় না। নানা কারণেই তা মনে হয় না। প্রথমত একটা স্থূল কারণ এই যে, মণীশ ঘটকের সেদিনের যেসব সাড়া-জাগানো কবিতা (যেমন **পরমা**) অল্প কয়েক বছর পরে (১৯৪০-এ) **শিলালিপি**-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, অথচ ১৯৩০ সাল থেকেই বিদগ্ধজনের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে ফিরেছে, সেসব কবিতার পৌরুষ এবং ঋজুতা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যিক পরিমণ্ডলের আত্মীয়। অর্থাৎ দুজনেরই প্রেমের কাব্যিক অভিব্যক্তি পেলবতা মুক্ততার, তথা বিষয়মুখী গুণে, এক বিশিষ্ট স্বাদ এনে দিয়েছিল তখনকার বাংলা কবিতায়।

কিন্তু অভিব্যক্তির পিছনে প্রকরণ-চিন্তায় এক সহৃদ্ধির [illegible] [illegible]

পাওয়া যেতে পারে। যদিও সেই অন্তরালের জগতে—যেখানে কবিতার মূল উপাদান যে শব্দ—তা নিয়ে নিরন্তর বাছাই-ঝাড়াই চলে, যেখানে কবির সাকৃতিগত মেজাজ ও বৈদগ্ধের রসায়নে অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োজনীয় অর্থের আধার হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করে এবং চেনাজানা শব্দ তার সার্বিক অর্থের আঙিনা ছেড়ে বিস্তৃততর প্রান্তরে বিচরণের সাহস অর্জন করে—এই দুই কবির বিস্তর প্রভেদও লক্ষ্য করা যাবে। তবু মিলে-অমিলে মিলে **শিলালিপি**-র মণীশ ঘটক ও সুধীন্দ্রনাথের যতটা আত্মীয়তা দেখা যায়, তাঁদের সমবয়সী অপর প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তা আদৌ নেই। দু-চার বছরের বড়ো জীবনানন্দ, নজরুল, দু-তিন বছরের ছোট অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমচন্দ্র বাগচী, জসীমউদ্দীন, অজিত দত্ত—এঁদের সঙ্গেও উল্লেখযোগ্য কোনো সেতু অবর্তমান।

মণীশ ঘটক এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে উঁচু ঘরাণার লোক ছিলেন এবং খানিকটা অনুরূপ মানসিকতার কার্যকারণেই ব্যক্তিগত জীবনে খেয়ালী ছিলেন। কিন্তু খেয়ালীপণার ধরণ আলাদা ছিল। সুধীন্দ্রনাথ যে ফিউডাল-এবং-ইংরেজী কালচারের পরিবেশে লালিত-পালিত, তাকেই সাহিত্যিক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর মণীশ ঘটক ইংরেজ-রাজের আমলাতান্ত্রিক পরিবেশের আওতায় বাল্য-কৈশোর প্রথম যৌবনের দিনগুলি কাটিয়েও বস্তুত সেই উচ্চাঙ্গ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে ব্যঙ্গ ও কশাঘাত করেছেন। অন্য কথায়, সেই ফাঁপা হাস্যকর সমাজের দু-একটি বিরল চরিত্র বা ব্যতিক্রম (যেমন **মান্ধাতার বাবার আমল**-এর প্রধান চরিত্র ভায়োলেট, বা **স্বাহা** গল্পের করুণ নায়িকা লটি) মণীশ ঘটককে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ইতিবাচক মূল্যবোধকে স্থাপিত করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এবং একই সঙ্গে তাঁর উঁচু ঘরাণা মণীশ ঘটককে নোংরা সাহিত্যের নিষিদ্ধ অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা দেয় না। প্রসঙ্গত, সত্যিই

জানতে ইচ্ছা করে সুধীন্দ্রনাথের [illegible] সঙ্কেতন ব্যক্তি ও সাহিত্যিক গোর্কি সম্বন্ধে কী ভাবতেন।

যাই হোক, এখানে বক্তব্য এই যে, সুধীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরাধিকারে পাওয়া সামাজিক আত্মাকে গর্বভরে গ্রহণ করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। এই প্রচেষ্টা তাঁকে নিয়ে গেছে একদিকে সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার অপরিমেয় যত্নে, আর অন্যদিকে ইংরেজী তথা য়োরোপীয় নব্যচিন্তার অবগাহনে। এই সাহিত্যিক অনুশীলনের অন্যতম ফলশ্রুতি : তিনি বাংলায় অপ্রচলিত অনেক সংস্কৃত শব্দ পাঠকের সামনে হাজির করেছেন এবং প্রবল পরিশ্রমে ইংরেজী শব্দকে তাঁর যাবতীয় কবিতার অঙ্গ থেকে বাইরে রেখেছেন। অনেকের মতে অবশ্য এই প্রচেষ্টা তাঁকে এক বিশিষ্ট চোরাগলিতে নিয়ে গেছে। তাঁর ভাবের বহন একাধারে অযথা কৃত্রিমতাদুষ্ট এবং দুরূহতাকণ্টকিত এক আকৃতি নিয়েছে। একথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে, দুরূহ শব্দের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। বহুব্যবহৃত শব্দকে তিনি নিজেই বহু-ব্যবহৃত টাকার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন : 'বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলংক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরের শো-কেসে।' অনেকেই একমত হবেন, তুলনাটি আংশিক গ্রহণযোগ্য। 'হারাবে না পবিত্রতা নৈমিত্তিক ক্রিমির প্ররোহে।'—প্রকৃতি-প্রত্যয় অনুযায়ী যে প্ররোহ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ঝুরি; তাকে এখানে অঙ্কুর হিসেবে একটা অন্য অর্থ দেওয়া হয়েছে। অথচ প্ররোহ শব্দটি সাধু গদ্যেও অচল। বিকচ শব্দের চিরাচরিত অর্থ বিকশিত, প্রফুল্ল। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ 'বিকচ' অর্থে 'কচ'হীন বলতে চেয়েছেন তাঁর 'চপলা' কবিতায়—কারণ 'কচ' শব্দের একটি অপ্রচলিত মানে 'চুল'। সুধীন্দ্রনাথের দুরূহ শব্দার্থের প্রতি মোহ তাঁকে বুঝতে দেয় নি এসব বহু যত্নে গ্রথিত বেশি দামের টাকা মিণ্ট থেকে বেরিয়েই মিউজিআমের প্রত্নবস্তু হয়ে যেতে বাধ্য। মণীশ ঘটকও সংস্কৃত শব্দের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—কবিতায় সচেতনভাবে ব্যবহারও করেছেন প্রচুর। কিন্তু এই চর্চায় তিনি নিজের স্বাভাবিকতা হারান নি, অর্থাৎ সাধারণ বোধকে ফাঁকি দেন নি। সাধারণ বোধই তাই তাঁকে বারংবার নিয়ে গেছে কথ্যভাষা ও প্রাকৃত বুলির আলাদীন ভাণ্ডারে।

মনীশ ঘটক বেশি কবিতা লেখেন নি, এবং শ্রমবিমুখ, অপচয়ী সাহিত্যিক জীবনে নিজের প্রাথমিক প্রতিভাকে লালন করার প্রায় কোনো ঐকান্তিক চেষ্টাই তাঁর ছিল না। অবশ্যই তিনি মেজর পোয়েটের শিরোপা দাবি করতে পারেন না। তাঁর প্রাথমিক স্ফুরণের সেই কল্লোলিত যুগে তথাচ তিনি শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে অসামান্য ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন সেটাই বর্তমান প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। মনীশ ঘটকের জীবনদর্শনে পাপ-পুণ্য, শুদ্ধ-অশুদ্ধের ভেদরেখা যেমন

[illegible]: তাঁর শব্দ আহরণ ও নির্মাণের থেকেও লক্ষ করা যায় যে, কোনো শব্দই তাঁর বিচারে অস্পৃশ্য বা অচ্ছ্যুৎ নয়। একথা আমি তাঁর 'পটলডাঙার পাঁচালি' মনে রেখে বলছি না। 'শিলালিপি' বইয়ের অনেক কবিতায় যেমন তাঁর ভাষা একদিকে গম্ভীর ও [illegible]-শব্দবহুল, তেমনি আবার ইংরেজী, হিন্দি, উর্দু নানারকম শব্দ তিনি তাঁর নানা কবিতায় অবলীলায় ছিটিয়ে দিয়েছেন এবং স্বচ্ছন্দে যা কলমে এসেছে, নির্দ্বিধায় তাই বাসা বেঁধেছে তাঁর নানা উজ্জ্বল পঙক্তিতে। চরিত্রবান শব্দের, তাঁর বিচারে, কোনো শ্বেতপাথরের নির্মলতা থাকতে পারে না। মানুষের মতো শব্দেরও চরিত্রের প্রধান পরিচয় তার অকৃত্রিম প্রাণময়তায়।

মনীশ ঘটক সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু লিখে ছিলেন : 'পুরো 'কল্লোল' সম্প্রদায়ে কলকাতার ককনি বুলিতে তাঁর মত ওস্তাদ কেউ ছিলেন না, ঢাকার আঞ্চলিক ভাষাও মাঝে মাঝে ছিটিয়ে দিতেন তাঁর কলম থেকে—তাঁর রচনাশৈলীর ঝাঁঝালো আস্বাদ স্মরণ করে আজ পর্যন্ত আমি সুখ পাই।' আর বিষ্ণু দে তো তাঁর সম্পাদিত 'একালের কবিতা'য় 'কুজ্ঝটি' কবিতাটিকেই বেছে নিয়েছেন।

ভাষার প্রয়োগে এহেন ক্যাথলিসিটি মনীশ ঘটকের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের যে প্রভেদের নির্দেশ দেয় সেটা মোটেই বাহিরঙ্গ ব্যবধান নয়। এবং যেখানে এই দুই কবির প্রভেদের আসল তাৎপর্য, সে সম্বন্ধেও মনীশ ঘটকের নিজের বিশ্লেষণ আশ্চর্য স্পষ্ট। 'অর্কেস্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী'-র উল্লিখিত সমালোচনা প্রসঙ্গে মনীশ ঘটক লিখেছিলেন : '...কারু সুধীন্দ্রনাথ ও কবি সুধীন্দ্রনাথ যেন দুটি বিভিন্ন সত্ত্বা। যেখানেই দুয়ের সমন্বয় ঘটেছে, সেইখানেই অনবদ্য সুষমা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।... যথাযথ শব্দপ্রয়োগে, নিখুঁত ছন্দে, অপরূপ প্রকাশভঙ্গীতে তাঁর অবিসম্বাদিত অধিকার। কিন্তু শব্দ যেমন তাঁর সম্পদ, তেমনি শব্দের ঔৎকট্যে সময় সময় তাঁকে বিপদে যে পড়তে হয় নি, তা নয়। মনে হয়, এ বিপদ তাঁর স্বেচ্ছাকৃত। সন্দেহ হয়, এই মস্তিষ্কপ্রসূত দুর্বোধ্যতার মূলে তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধ। কবি সুধীন্দ্রনাথ, কারিগর সুধীন্দ্রনাথের বৈকল্যকে সব সময়ে ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি।'

কবিকর্মের ধারাবাহিকতার অভাবে মনীশ ঘটকের শব্দবিষয়ে অবদানও কখনোই বহুলভাবে আলোচিত হয় নি, যেমন হয়নি তাঁর 'পটলডাঙার পাঁচালি'-র সম্যক মূল্যায়ন। এমন কি, [illegible] লাগে, 'সমাজিক-বস্তুবাদী' সা[illegible]ক মহলও 'পাঁচালি'-কে সাদর আহ[illegible] জানায় নি। কিন্তু মনীশ ঘটকের আসল সার্থকতা বোধহয় এইখানেই যে, যতরকম শব্দ তিনি তাঁর কবিতার পংক্তিতে প্রায়শ বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করেছেন তার সবই বিস্ময়কর রসসঞ্চার করেছে। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তো অবান্তর, দুরূহতাদোষও তাঁর আবেগ ও চিন্তাকে কোথাও আড়ষ্ট করে নি। প্রচুর তৎসম শব্দের বিন্যাসেও এই দোষ কোথাও প্রবেশের পথ পায় নি।

অল্পদিন আগে মনীশ ঘটকের দেহবসানের পরে তাঁর 'স্বল্প উপেক্ষিত' জীবনের কথাই বারংবার মনে হয়েছে। কী এক অনির্দেশ্য কারণে সুধীন্দ্রনাথের কথাও ঘুরে ফিরে মনে আসছে বলে একসঙ্গে দুজনের কথা লিখতে ইচ্ছে হল। সুধীন্দ্রনাথের বৈদগ্ধ, রুচি ও শৈল্পিক ক্ষমতা লক্ষ্য করে আরো অনেকের মতোই আমি মোহাবিষ্ট, কিন্তু তাঁর কাব্য প্রতিভার বিপুল বন্ধ্যাত্ব আমাকে হতাশ করে। মনীশ ঘটকের পালকিয় মন ও মনন আমাকে চমৎকৃত করে, কিন্তু তাঁর প্রতিভার নিষ্ক্রিয়তা আমাকে বিষণ্ণ করে থেকে।

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি

স্বাধীনতা সংখ্যা অমৃত (১৩৮৬) থেকে ধারাবাহিক পর পর চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের লেখা রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি প্রবন্ধটির লেখককে অভিনন্দন জানাই। এ-বিষয়ে আরও গবেষণার জন্য পরবর্তী গবেষকদের কাছে এই প্রবন্ধ হয়তো প্রয়োজন হতে পারে। সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ও লেখকের ত্রুটির জন্যই এই পত্রের অবতারণা। ত্রুটিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম :

১) অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যার ৯০ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে লেখক বলেছেন যে, ১৮৬৬ সালের ২২শে জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভাগনে হৃদয়রামকে নিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানাদের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে এলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বছরের ও বিবেকানন্দ চার বছরের শিশু। সত্যিই কি তাই? রবীন্দ্রনাথের বয়স পাঁচ বছর মানলেও, বিবেকানন্দকে চার বছরের শিশু ঠিক বলা যায় না। তাহলে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বয়সের তফাৎ দেড় বছর বলে লেখক শুরুতেই যে উল্লেখ করেছেন, তাতে গরমিল থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স পাঁচ বছর মানলেও, বিবেকানন্দকে চার বছরের শিশু বলে মানা যায় না এই কারণে যে, বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করলে ১৮৬৬ সালের ২২ জানুয়ারী তাঁর বয়স দাঁড়ায় তিন বছর দশ দিন। অতএব বিবেকানন্দ তখন চার বছরের শিশু না বলে তিন বছরের শিশু বলাটাই কি উচিত নয়? এবং দুজনের বয়সের তফাৎ এক বছর আট মাস বলাটাই সমীচীন এই কারণে এটি একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক।

২) ৯৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে লেখক নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার-এর ১৮৯০ সালের ১৯ নভেম্বর সংখ্যার উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাতে বলা হয়েছে, বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের পুরনো বন্ধু তারকনাথ দত্তের ছেলে। সত্যিই কি তাই? আমরা তো জানি নরেন্দ্রনাথ বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র এবং লেখক ৯৩ পৃষ্ঠার প্রথম কলমেই এক জায়গায় বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দের ছোট-কাকা তারকনাথ দত্ত। অতএব নরেন্দ্রনাথ তারকনাথ দত্তের ছেলে না হয়ে হবে ভাইপো। এটি কি লেখকের ইচ্ছাকৃত, না নববিধান ব্রাহ্মসমাজের জানতে ইচ্ছা হয়।

৩) ঐ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের তৃতীয় লাইনে একটি ভুল চোখে পড়ে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার উল্লেখ থাকায়। এটি হবে প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার এবং সম্ভবত এটি মুদ্রণ প্রমাদ।

৪) ৯৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে লেখক এক জায়গায় বলেছেন যে, ডঃ আদিত্যপ্রসাদ [illegible], [illegible] এবং অমিতাভ চৌধুরীর বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের আকাশপাতাল তফাৎ রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে সাক্ষাৎ কি হয়েছিল—এই অংশে আমরা অমিতাভ চৌধুরীর কোন বক্তব্য খুঁজে পাই না বরং হেমলতা ঠাকুরের একটি মন্তব্য পাই। যতদূর মনে হয়, অমিতাভ চৌধুরীর জায়গায় হেমলতা ঠাকুর নামটা বসবে এবং লেখকের এটি অসাবধানবশতঃ ভুল বলে মনে হয়।

৫) এরপর ১০০ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরে এলে সংবর্ধনা জানানোর তারিখ হিসাবে একবার বলা হয়েছে ১৮৯৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী, আবার কিছু পরেই বলা হয় ১৮৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে স্বামীজীকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। কোন তারিখটি সত্যি স্পষ্ট করে বোঝা মুশকিল। লেখক এ-বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলে আনন্দিত হব।

৬) ১০৬ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে বলরাম বসুর বাড়ীতে রবীন্দ্রসংগীত অংশে লেখক এই বলে শুরু করেছেন যে, তার দু-মাস পরে (অর্থাৎ ৯ মে, ১৮৮৫) আবার নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু গ্রন্থের দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত এই তারিখটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা, দু-মাস আগে বিবেকানন্দ কোথায় গান গেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন সে-বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। কেবল ১০৬ পৃষ্ঠার ১ম কলমে আমরা দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খৃঃ অনেকগুলি গান শোনান। অতএব এই দুটি তারিখের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

৭) ঐ একই পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে আর একটি ভুল চোখে পড়ে লেখক যখন ১৪ জুলাই গানের প্রসঙ্গে বলেন, এই নিয়ে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে তৃতীয়বার গান গাইবার কথা পাওয়া গেল। কিন্তু এটা তৃতীয়বার না হয়ে চতুর্থবার হবে। কেননা, এর আগে আমরা ১। ৭ এপ্রিল, ১৮৮৩, ২। ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ এবং ৩। ৯ মে, ১৮৮৫ —এই তিনবার শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনান বলে দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য এটাও বলতে হবে গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে গানখানি বিবেকানন্দ ৭ এপ্রিল ১৮৮৩ ও ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৫ তারিখে গেয়েছিলেন। এ-হিসেবে লেখক যদি এ নিয়ে তৃতীয়বার রবীন্দ্রসংগীত বিবেকানন্দ গেয়েছেন বলে বোঝাতে চান, তাহলেও মারাত্মক ভুল থেকে যায়। আর বলরাম বসুর বাড়ীতে রবীন্দ্রসংগীত অংশে তার দু-মাস পরে (অর্থাৎ ৯ মে ১৮৮৫)....উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার দু-মাস আগে কোন গান গাওয়া হয়েছিল বলে বুঝতে পারছি না। বরং ৯ মে ১৮৮৫-এর দু-মাস পরে ১৪ জুলাই ১৮৮৫ হলে একটা যুক্তি থাকছে। এখানে একটা বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

৮) ১১০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ অংশে লেখক শুরুতেই জানান, ১৮৮৯ সালে স্বামী বিবেকানন্দ দেশভ্রমণে বেরোন। আবার ১১২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পরে স্বামী বিবেকানন্দ ভারত পর্যটনে পরিব্রাজক হিসেবে বের হন। দীর্ঘ ছ-বছর (১৮৮৭-১৮৯৩) এইভাবে কাটিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় যোগ দেবার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন। এই দুটি জায়গায় অসঙ্গতি দেখা দেয়। তিনি একবার বলছেন, ১৮৮৯ সালে, আবার বলছেন ১৮৮৭ সালে বিবেকানন্দ ভারত পর্যটনে বের হন। এর মধ্যে কোনটা ঠিক? তবে শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর ঠিক পরেই যদি বিবেকানন্দ ভারত পর্যটনে বের হন, তবে ১৮৮৭ সালটাই ঠিক হবে। কেননা, শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট দেহত্যাগ করেন। এ-বিষয়ে লেখক সঠিক আলোকপাত করলে ভাল হয়।

৯) ঐ সংখ্যার ৪৪ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে গোরা উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ অংশে শুরুতেই লেখক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদক উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ার্সনকে ১৯২২ সালে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : তারপরই ৪৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তব্য আরম্ভ হয়েছে। পিয়ার্সনকে পত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কি লেখেন অজ্ঞাত থেকে যায়। চিঠিটি পেলে বোধ করি ভালই হবে।

১০) এরপর আর একটি প্রশ্ন রেখে পত্র শেষ করছি। সেটি হল, ৪৫ পৃষ্ঠায় ৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় গোরা সম্পর্কে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের উক্তি থেকে বুঝতে পারছি যে, গোরা যখন মাঝে মাঝে প্রবাসীতে মুদ্রিত হত, নিবেদিতা তখন আগ্রহের সঙ্গে তা পড়তেন। আবার ঐ প্রথম কলমের শেষের দিকেই দেখতে পাচ্ছি, ১৯২৪-এ নিবেদিতার দেহত্যাগের তের বছর পরে উপন্যাসটি বের হয়। আবার ৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, গোরার ইংরেজী অনুবাদক পিয়ার্সনকে ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি লেখেন। এই তিনটি ঘটনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের রচনাকাল ও প্রকাশের সময়টা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না হওয়ার ব্যাপারটা অস্পষ্ট থেকে যায়। লেখক এ-বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানালে সাধারণ পাঠক হিসাবে কৃতজ্ঞ থাকব। —শোভন শেঠ, ১০, কৈলাস বোস তৃতীয় বাই লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া-৭১১১০৯।

নাগাল্যাণ্ডের ভেতর থেকে

নিবারণ চৌধুরী

নিবারণ চৌধুরী নাগাভূমিতে একাদিক্রমে ১৯৬৩ সাল থেকে পনেরো বছর শিক্ষকতা করছেন। নাগাভূমিকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে জানার সুযোগ পেয়েছেন এবং রাজ্যের সর্বত্র ঘুরেছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নিয়েছেন তিনি শান্তিনিকেতনে।

শিশুপাঠ্য ভূগোলে নাগা-পাহাড়ের রং থই থই নীল ছিল। আমার শৈশব আসামের কাছাড় জেলার চা-বাগানে। বর্গী এলো দেশে গান আমার অজানা। বর্গীর স্থান জুড়ে ছিল নাগারা। বালাধন চা-বাগান গত দশকে নাগাদের হাতে রক্তে লাল হয়েছিল। নাগাপাহাড় নাগাভূমি নাম নিয়েছে অনেক রক্ত দিয়ে এই নাম বদল। নাগাভূমির মানুষ আজ খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। অবহেলা থেকে মুক্তি পেয়ে বিদ্রোহীর রণসাজে।

আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, ব্রহ্মদেশ ও মণিপুর নিয়ে নাগাভূমির চারদেয়াল। অনাদিকাল থেকে মানুষ সেখানে ঘর বেঁধেছে। নাগাভূমির ইতিহাসের আদিপর্ব রূপকথার। নাগাভূমির উত্তর থেকে দক্ষিণে পাহাড়। পূর্ব প্রান্তে চিনদুইন নদী। পশ্চিমে রেলপথ। প্রথম এখানে আসা ১৯৬৩ সালে। মোকক্চঙতে। উত্তর-পূর্ব রেলপথ তখন স্টেশনগুলোর গুমটির ভাঙাচোরা পাণ্ডুর। সে সময় স্টেশনগুলোতে মৃত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্তূপীকৃত।

ইতিহাস পুরাণে এ দেশকে নিয়ে অনেক গল্প। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা মণিপুর কন্যা। মহাভারতের কাহিনীতে এখানকার উল্লেখ। প্রণয়সূত্রে আহোম রাজাদের ইতিহাসেও।

রহস্য রোমাঞ্চের ছায়াতে নগ্নতা ও অজ্ঞানতার যে ভাবমূর্তি নাগা পাহাড়কে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল একসময়ে সেটা অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত। নাগাভূমির সমাজ-ব্যবস্থা ও সংগঠনে তার সুস্পষ্ট প্রতিভার ছাপ রয়েছে। নগ্নতা নাগা পাহাড়ে সমানভাবে কারো দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। কেউ এই নগ্নতাকে বেশী করে দেখেছেন। কেউ কম করে দেখেছেন। পুরনো মানচিত্রে 'নগ্ন নাগা' এলাকা দেখানো হয়েছে।

১৮৫৯ সালে ইথনোলজি অব ইণ্ডিয়ার লিপিকার আর জি লাথাম লক্ষ্য করেছেন "...'নাংগা' উলঙ্গের সমার্থক। যদিও প্রকৃত অর্থে আমি নাগাদের এরকম দেখিনি ; আভরণ কিছুটা রয়েছে ওদের, যদিও সেটা যথেষ্ট নয়। অধিকন্তু, এগুলো ঘরে বোনা, নাগা মেয়েদের বোনা, ওদের হাতেই রং-করা।" কিন্তু, ১৯৩৬ সালে হ্যামেনডর্ফ কনিয়াক নাগাদের নিয়ে তাঁর সুপরিচিত 'ন্যাকেড নাগাস' বা 'নগ্ন নাগারা' নামে বই লিখেছেন। নগ্নতা নাগা পাহাড়ের অখণ্ড পরিচয় নয়। নাগা পাহাড়ের সর্বত্র, আভরণের স্বল্পতা নিয়ে এবং শরীর সম্বন্ধে আছে পরিশীলিত বোধ। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের তা [illegible]

[illegible]

য়েনে অনেক বহুজন কনিয়াক মেয়েদের ।, বলা ও বিভিন্ন কাজের উপকরণ অলা ।জনের জন্য মাধ্যমে তৃপ্ত হয়েছেন। ও-নাগা গানে গল্পে দুঃশাসনচেতনাচ্ছ বৃর। অনেকে আত্মহত্যা নায়িকা বিবস্ত্র হ খাওয়ার গল্প আছে। যারা উলঙ্গ দের বিবস্ত্র হওয়ার প্রসঙ্গ কেন? সভ্য- র শৈশবে সব সমাজেই পোশাকের শ্যতা ছিল। আও-নাগাদের, অন্ততঃ, নতার দিনের উল্লেখ নেই।

জনসমক্ষে নগ্নতার প্রকাশ গুরুতর াধ বলে বহু নাগা গোষ্ঠী বিবেচনা রেছেন। অন্যপক্ষে, জনসমক্ষে উলঙ্গ হয়ে ড়ানো প্রাণদণ্ডের সমতুল্য বলে অনেক াষ্ঠী বিবেচনা করেছেন। কোন কোন াষ্ঠীতে ব্যাভিচারিণী নারীকে শাস্তি ওয়া হয়েছে উলঙ্গ করে। নিরাভরণ রীকে হত্যা করবে না এমন দুঃশিরারী রামুণ্ড শিকারের দিনেও শোনা গেছে। রূর প্রতিপক্ষকে চূড়ান্ত অবমাননা করতে ান কোন গোষ্ঠীর নারীরা নিজের ধারিত পশ্চাৎদেশে চাপড় মেরে রোষ কাশ করেছেন।

নাগা-পাহাড় গত শতকে যেভাবে দেশীদের কাছে দূরবর্তী মনে হয়েছে, ই শতকেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে রেঃ ক্লার্ক কটা আও-নাগা থেকে ইংরেজী অভিধান লখেছিলেন। তাঁর স্ত্রী লিখেছিলেন আও- াগা ভাষার ব্যাকরণ। রেঃ ক্লার্ক-এর অভি- ান তখনকার জীবনের একটা ছবি। বাঁশের হু প্রতিশব্দ রয়েছে এই অভিধানে। স্কিমোরা যেমন বরফের অজস্র প্রতিশব্দ নেন তেমনি আও-নাগারা বাঁশের নাম থকে এর বয়স, গঠন, প্রয়োগস্থল ও ন্যান্য উপযোগিতায় ইঙ্গিত পেয়ে যান। ই শব্দের প্রাচুর্য থেকে বোঝা যায় বাঁশ আও-নাগাদের অনুশীলন কত রম। একসময় নাভিচ্ছেদ থেকে সূচী- র্মে বাঁশের প্রয়োগ ছিল। কান বেঁধা তো শ্চয়ই। শপথ গ্রহণ করে সত্য-মিথ্যা নর্ধারণেও বাঁশ প্রয়োজন ছিল। এককোপে নর্দিষ্ট জাতের বাঁশ কাটতে পারলে সত্য- াদীতার প্রমাণ নির্ভুল।

চাং নাগারাই বোধহয় একমাত্র নাগা গাষ্ঠী যাঁরা বাঁশের বাঁশীও বাজিয়েছেন। তবে সে বাঁশী মুরলী নয়, একফালি বাঁশ াত্র। কনিয়াকরা বাঁশ-বেতের বোনা ক্ষেতে াত খেয়েছেন। চাটনী বাজানের জন্যেও আলাদা বাঁশ বেতের বাটীও ওরা ব্যবহার রেছেন। কনিয়াক নাগাদের শিরভূষণ, টাকে এক ধরনের ঝুড়ি বলা যেতে পারে টা বহু শিল্প-সমালোচকের চোখে ড়েছে। পান-পাত্র হিসেবে বাঁশের মগের ন ব্যাপক ছিল। সাংতাম নাগাদের শ মগ কারুকাজে গৃহসজ্জার উপকরণ লেব ওদের পাত্র। এই চিত্রশোভিত গুলো তৈরী করা হতো প্রথমে
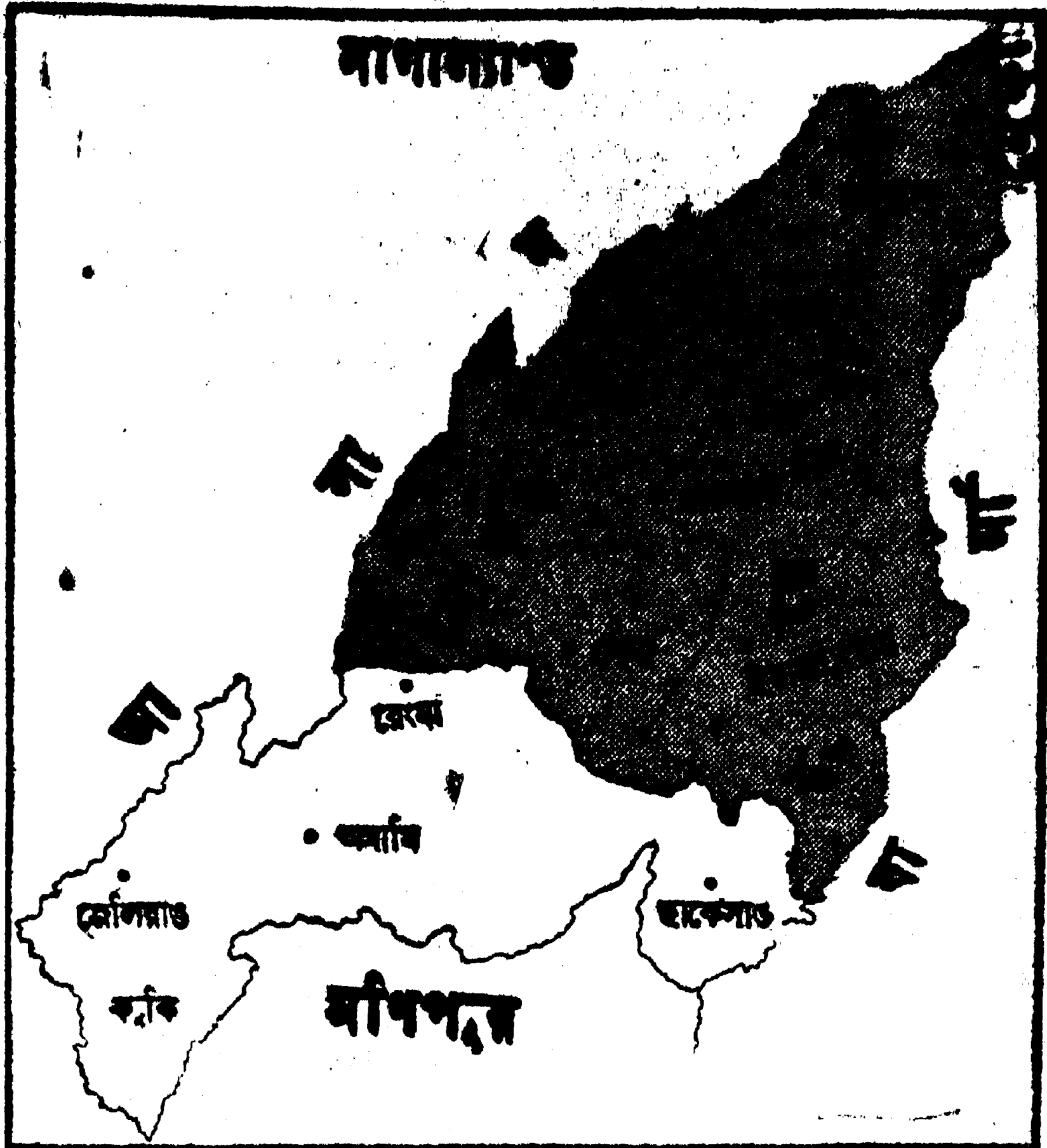
সেগুলোকে হলুদ সহ জলে সেদ্ধ করে নিয়ে। সেদ্ধ-করা, সহনশীল, বাঁশের মগে সহজেই তপ্ত লোহার ছাপ স্থায়ী হয়।

বাঁশ বেতের বোনার কাজ ছেলে বুড়ো সবাই করতো। মেয়েদের আবশ্যকীয় ঝুড়ির যোগান উদীয়মান প্রেমিকরাই দিতেন। ব্যবহার্য ঝুড়ি উপহার দেওয়াটাই প্রশংসনীয় ছিল। মেয়েদের বোনা কাপড় এবং ছেলেদের বোনা ঝুড়ি শিল্পগত গুণে সমস্তরের। বাঁশ বেতের কাজে মেয়েদের পারদর্শিতার প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু কাপড় বোনার কাজে ছেলেদের অধিকার নেই। সুতো কাটা, বোনা থেকে ছেলেদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই বোধহয় একটা প্রবাদ রয়েছে। 'কাপড় বোনার সময়ে সুতো টানার কাঠি (আও ভাষায় ইমলং) কোনো ছেলের গায়ে লাগলে সে ল্পার স্বামী হবে।' আও-নাগারা বাঁশের কারিগরকে ন্যায্য মর্যাদা দিয়ে গানে গল্পে তাঁকে স্থান দিয়েছেন। আও-নাগা লোক- কাহিনীর কোন নায়কের তৈরী মাদুর ছোট একটা বাঁশের চোঙ-এ পুরে রাখা যেতো। সেই মসলিনের মত মিহি মাদুরে নাকি অর্কিডের শাঁস দিয়ে নকসা কাটা হয়েছিল।

নাগা ঘরবাড়িগুলোও মূলত বাঁশের শন ও 'টগোপাতার' (তাল শ্রেণীর গাছ) ছাউনীতে সেই ঘরগুলোকেও বাঁশের দুর্গ বলা যায়। আও-নাগারা ঘরকে মাচানের ঢং-এ তৈরী করতেন। অন্যরা মাটির ওপর

নানা আকৃতির ঘর বেঁধেছেন। কোনও গোষ্ঠী ঘরের মেঝেকে সমতল করার দিকে, হয়ত সংস্কারগত কারণে, মনোনিবেশ করেন নি। ঠাস বুনুনী বাঁশের দেয়াল ও গোটা বাঁশের ওপর চাপান দিয়ে বাঁশের কার্পেটে একটা আও-নাগা বাড়ী একদিনে তৈরী করতে বিশেষ বাক্যালাপের অবসর নেই। এই নিমেষে গজানো বাড়ীগুলোতে নব্বুই মাইল গতিতে ঝড়ো হাওয়া বিশেষ উৎপাত করছে বলে শোনা যায় না। তবে দাহ্যগুণে গত পঞ্চাশ বছরে কয়েকবার ছাই হয়ে যায়নি এ-রকম গ্রামও বোধহয় নেই। আও-নাগা গ্রামগুলোই দূর থেকে সবচেয়ে মনোহর। বাঁশ দিয়ে আও-নাগাদের তৈরী বাড়ীগুলোতে সামনে পেছনে প্রসারিত মাচান রয়েছে। এই মাচানে রৌদ্র সেবন এবং গৃহস্থালীর নানা কাজ হয়। পেছনের দিকের মাচানে, সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে, রেলিং থাকে। মাচানের এককোণে শৌচাগার আধুনিক সংযোজন। এই শৌচাগার পায়- খানা নয়। সামনের মাচান এবং ঘরের মেঝের মাঝখানে ছোট্ট একটা আয়ত ক্ষেত্র শুধু জমি সংলগ্ন। এই অংশটুকুতে সাধারণত শুয়োর গরু রাখা হয়। জ্বালানী কাঠ এবং ধান কোটার সামগ্রীও এখানে। নৈমিত্তিক উপযোগীর প্রসঙ্গ বাদ দিলেও এই অংশকে একটা রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা হিসেবে মনে করা যেতে পারে। গঠনরীতিতে এই জমজমাট দিনের অবস্থাতেও একটা থাকের

মত অন্ধকার। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ এখানেই ব্যাহত হয়েছে বহু স্থানে।

ঘরের ভেতরে এককোণে দেয়ালে ঠেস দেওয়া বড় বড় বাঁশের চোঙ। এগুলো জলাধার। যেন এক-একটি ক্ষুদে চৌবাচ্চা। ঐ চোঙগুলো জল বহন করার কাজেও লাগে। জল বহন করার সময়ে সেগুলোকে সুবিধেমত আরেকটা বাঁশের ঝুড়িতে বসিয়ে নেওয়া হয়। বড় বাঁশের চোঙ একসময়ে মদের জালা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে অনেক গোষ্ঠীতে। নানা রকমের চোঙ ঘরের মধ্যে পাওয়া যাবে যেগুলো মূল্যবান জিনিস-পত্রের আধার। চারদেয়াল এবং দুই দরজার ঘরের ভেতরে গোটা পঞ্চাশ ঝাঁপি, ঝুড়ি, কুলো মাদুর চোখে পড়ে। ঘরের ভেতরটা অহরহ আগুনের তাপে ধোঁয়ায় ও জলীয় হাওয়ায় মিশে একস্তর ঝকঝকে আলকাতরার আস্তরণ মেখে থাকে।

আগুনের ব্যবহার এবং খুশীমত আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতই একটি সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আও এবং আংগামী নাগারা আগুনের উৎস পেয়েছিলেন বাঁশের মধ্যে। শুকনো বাঁশের দড়ির ঘর্ষণ থেকে আগুনের স্ফুলিংগ ছুটে নিতেন তুলোর মধ্যে। সেমারা কাঠের মধ্যে আগুন পেয়েছিলেন। এই বাঁশের টুকরোর গুরুত্ব জীবনের কদিনের মধ্যে শেষ হয়নি আংগামীদের ক্ষেত্রে। মরণে বাঁশের টুকরো দুটো আগুন সৃষ্টি করার কাজে সমাধিস্থ হয়েছে মরদেহের সংগে।

নাগা রণকৌশলে বাঁশের ব্যবহার বিস্তৃত। নাগা পাহাড়ের পানজীর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। 'পানজী'র ফাঁদ জন্তু-জানোয়ার মারার কাজেও লাগানো হতো। গ্রাম রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থায়ীভাবে 'পানজী' বসানো থাকতো। কোন কোন গোষ্ঠীতে বছরে একবার নতুন 'পানজী' বসানোর দিন উৎসাহ আনন্দের সময় ছিল। 'পানজী' প্রয়োগ অন্যভাবেও আছে। পেছনে তাড়া করে আসছে এমন শত্রুর দলকে ঘায়েল করার জন্যে আংগামী যোদ্ধারা ক্ষিপ্র হাতে মাটিতে 'পানজী' পুঁতে সরে পড়তে পারতেন। 'পানজী' ব্যবহারে যাতে কালক্ষয় না হয়, তার জন্যে ব্যাধের পিঠে তীরের মত একবোঝা 'পানজী' আংগামী যোদ্ধারা সংগে রাখতেন শত্রুর মোকাবিলা করার সময়ে।

জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে শত্রু নিধন করার সময়েও বাঁশের ঝাড় বিশেষ উপযোগী ছিল নাগা যোদ্ধাদের কাছে। হাওয়ার গতি ও পাহাড়ের অবস্থান অনুসারে নাগা-যোদ্ধারা অগ্নি-বলয় সৃষ্টিতে পারদর্শী। বাঁশের ঝাড়ে আগুন দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হতো বাঁশ ফাটার শব্দে। সম্প্রতি-কালেও বাঁশ ফাটানো শব্দে [illegible] সৈন্যদলের বিভ্রম সৃষ্টি করার কাহিনী জানা গেছে। এবং এই বিভ্রম উপযুক্ত পরিমাণ ফলপ্রসূ হয়েছে বলেও জানা যায়।

বাঁশের চাটাই মুড়ে মৃতদেহকে বাঁশের মাচানে, প্রথমে ঘরের ভেতরে এবং পরে সাধারণ সংকারের স্থানে আও নাগারা রেখেছেন। যেসব গোষ্ঠী মাচানে মৃতদেহকে তোলেন নি, ওরাও বাঁশের চাটাই মুড়ে গৃহাঙ্গনে অথবা সাধারণ সংকারের স্থানে সমাধিস্থ করেছেন।

শিল্পকৌশলে, জীবনে, মরনে, যুদ্ধে ও রসনার তৃপ্তিতে বাঁশ অদ্বিতীয়। বাঁশের কোড় সেদ্ধ করে খাওয়া যায়। বাঁশের কোড়ের নির্যাস দিয়ে রান্নাকে সুস্বাদু করা হয়। বাঁশের কোড় থেকে আরো কয়েকটা বিশেষ মশলা তৈরী করা হয়। বাঁশের কোড়ের নির্যাস মোটামুটি নাগা রান্নার মাধ্যম। ভোজ্যবস্তু থেকে বাঁশ বাদ পড়লে নাগা রসনার অতৃপ্তি সুবিদিত। বাঁশের চোঙ-এ রান্না করা মাংসও কম সমাদর পায় না নাগাভূমির নিভৃতে। তাছাড়া হাতা চামচ তো সবই বাঁশের।

সময়ের সংগে বাঁশের ওস্তাদরা হারিয়ে যাচ্ছেন। বাঁশের কাজের শিল্পগুণ, নৈপুণ্য সহজে চোখে পড়ে না। কাঠের পুতুল, কুশপুত্তলিকাও তৈরী হয় না। সরকারী সাহায্যে, নতুনভাবে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর চর্চা হচ্ছে এখন। সাধারণ দিন-মজুরী যেখানে, বর্তমানে, দশ থেকে কুড়ি টাকা সেখানে বাঁশের গুণী কারিগর অন্য যে কোনভাবে রোজগারের কথাই ভাববেন। এটাই স্বাভাবিক। বাঁশের কৃষিকাজের সরঞ্জামের এখন কোন প্রসঙ্গই নেই।

নাগাভূমিতে বাঁশ ও বনজ সম্পদকে নতুনভাবে কাজে লাগাবার জন্যে তুলিতে একটা কাগজের কল বসানো হয়েছে। নাগা-ভূমির অরণ্য আগরের উৎস বলেই এতদিন পরিচিত ছিল ভাগ্যান্বেষীদের কাছে। তুলি কাগজের কল বার্ষিক তেত্রিশ হাজার টন কাগজ ১৯৭৮ থেকে উৎপাদন করবে। তিজিত-এ একটা প্লাইউড কারখানা তৈরী হয়েছে। নাগাভূমিতে সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে ৩০৭ বর্গ কিমি। অসংরক্ষিত বন-ভূমি ৫১৮ বর্গকিমি এবং গ্রামের অধীনে অনির্মিত বনভূমির পরিমাণ ১০৭২ বর্গ কিমি। নাগাভূমির বনভূমিতে মূল্যবান গাছ রয়েছে। লংনাকের টিনে সংরক্ষিত ফল ও ফলের রস, নীচুখাটের চিনি নাগাভূমির অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ়তর করেছে। নাগাভূমিতে কমলালেবু এবং আনারসের ফলন ভাল হচ্ছে।

বাঁশের সংগে এত আত্মীয়তা সত্ত্বেও বাঁশের ফল সুলক্ষণা নয়। বাঁশের ফলের সংগে ইঁদুরের বংশবৃদ্ধির একটা সাক্ষাত যোগাযোগ রয়েছে বলে অভিজ্ঞ লোকেরা মনে নিয়েছেন। যে সব বাঁশে ফল ফোটে সেগুলোর গর্ভে সাগুদানার মত একটা মানুষের ভোজ্য বস্তুও জন্মায়। বাঁশের গর্ভে মুক্তো পাওয়ার কোন জনশ্রুতি এখানে নেই।

নাগা কবি কল্পনা সুপুরের সংগে বাঁশের তুলনা খুঁজে পেয়েছে। নাগা জীবন-দর্শন ঝড়ো হাওয়ার মুখে বাঁশের অনুসংগে মানুষকে বাঁচতে প্রেরণা দিয়েছে। আও-নাগা বুমোংসাংগের গানে প্রার্থনা জানানো হয়েছে : 'আমাকে বাঁচতে দাও, কাঁচা বাঁশ বা বেতের শীর্ষের মত আনত। অনাহত।' বাঁশের সংগে জীবনের উপমা, যৌবনের উপমা বিশ্বজোড়া মানুষের কাছে আও-নাগাদের একটা মূল্যবান উপহার। সুকৃতি সম্পন্ন মানুষকে অরণ্যে মহীরুহের সংগে তুলনা করা হয় আও-নাগা সমাজে। এরকম মহীরুহের হঠাৎ মৃত্যু হলে গ্রামের কুল-স্থবির-এর পরমায়ু শেষ হয়েছে বলে জানা যায়। গাছের সংগে মনুষ্যের প্রাণের সংযোগ। নাগাভূমির রাজস্বের সবচেয়ে বড় অংশটা এককভাবে বনসম্পদ থেকে পাওয়া গেলে সেটাকেই স্বাভাবিক বলে মানতে হবে। অরণ্য নাগাভূমির ধন-প্রাণ, সম্মান। কিন্তু পরিসংখ্যান অন্য কথা বলে। নাগা-ভূমির মাত্র সতেরো শতাংশ জমিতে বন-সম্পদ সীমিত। সামগ্রিকভাবে ভারতে বন-ভূমি রয়েছে আঠারো শতাংশ জমিতে। সাধারণভাবে পাহাড়ী অঞ্চলে শতকরা ষাট-ভাগ জমিতে বনভূমি রাখার সুপারিশ রয়েছে।

নাগাভূমির অরণ্যের পাখি ও বন্য-প্রাণীদের সমীক্ষা এখনও হয়নি। দামসিরি নদীর ধারে ইনতাংকিতে একটা অভয়ারণ্য রয়েছে। অনুমান করা হয়েছে সেখানে শ'দুই পঞ্চাশটা হাতী রয়েছে। আরো রয়েছে [illegible] হরিণ, বুনো শুয়োর ও ভালুক। [illegible] থাকতে পারে একসময়ে বিখ্যাত আসামের জাতীয় 'খেদা' নাগা [illegible] চালু হয়েছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংখ্যা [illegible] ৮০।

নাগাভূমির অরণ্যে [illegible] একসময়ে [illegible] 'মিথুন' ছিল। এখন মিথুন আজকাল দেখা যায়। বিত্ত-শালী মানুষের বিত্তের পরিমাপ একসময়ে মিথুনের সংখ্যা নির্ভর ছিল। মিথুন জাবরকাটা জন্তু। সংগঠিত ঝাঁপা শিং দুটোও মনোহর বলে নাগা পাহাড়ে স্বীকৃত। মিথুন এক ধরনের বন্যগরু। অন্যান্য বনগরু যথা বাইসন, [illegible] থেকে ভিন্ন। মিথুনকে গৌর বলেও অনেকে চিহ্নিত করেছেন। নাগাভূমিতে মিথুন অর্ধ-গৃহপালিত জন্তু অর্থাৎ মালিকানার আয়ত্তে এই পশু জঙ্গলে চরে বেড়ায়। নুন খাবার তাগিদে মালিকের সংগে সম্বন্ধ গড়ে [illegible] গ্রামের আশে পাশে। নাগা-ভূমির এই অর্ধ গৃহপালিত পশু [illegible] এখনও [illegible]। [illegible] এখন [illegible] কোহিমা অঞ্চলে। সংখ্যায় প্রায় ছয় শতাধিক।

পৃথিবীর বহু বিচ্ছিন্ন মানব গোষ্ঠী রক্তপাত করে তার আবাদী জমির কল্যাণ চেয়েছে। নরবলি দিয়ে বসুমতাকে তুষ্ট করতে চেয়েছে। নরমুণ্ড শিকারীদের মধ্যে বোর্ণিও-এর ল্যান্ড ওয়াক ও নাগাদের মধ্যে সাদৃশ্য অনেকে দেখতে পেয়েছিলেন। নাগাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও মুণ্ড শিকারের প্রয়োজনীয়তা এবং রীতিনীতির পার্থক্য ছিল। মোটামুটি মাংসের প্রয়োজনে পশুবধ করলেও নাগারা রক্তপান করতেন না। রক্ত মূল্যবান পানীর। মহাভারতে দুঃশাসনের রক্তপান কতটা আর্ষ, কতটা অনার্য আর কতটা বিশুদ্ধ নাটকীয় বলা শক্ত। নাগাদের মধ্যেও যে সব ধারণা নরমুণ্ড শিকারের সহায়ক হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) আবাদী জমির ও ফসলের শ্রীবৃদ্ধি, (২) পুত্রকন্যা লাভ, (৩) পরলোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক, (৪) স্ব-বংশীয়দের আত্মার সদ্‌গতি, (৫) নিজস্ব গোষ্ঠীর ইহলোক 'আত্ম-শক্তির' ক্ষয় পূরণ এবং (৫) ব্যক্তির ইহকালীন গৌরব।

মুণ্ড শিকারে সাবধানতা ঢের। কারণ, এটা সাক্ষাত সমর। সাক্ষাত সমরের সব সুযোগ আক্রমণকারী নিজের দখলে রাখার জন্যে এর আয়োজন গোপনে, প্রকাশ অকস্মাৎ। প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল, গোষ্ঠী দিবানিশি সজাগ পাহারা দিয়েছে, দূর পাহাড়ের প্রত্যেকটি চলমান বিন্দুকে চোখের তোলে তোলে যাচাই করেছে। এত সাবধানতা সত্ত্বেও হঠাৎ 'গাছের-মাদল' বেজে ওঠে : 'শত্রু শত্রু কে কোথায় আছো, এসো, শিগগির।'

একটা বিরাট বেড়-এর সম্পূর্ণ কাণ্ড দিয়ে 'গাছের মাদল' তৈরী হয়। গাছটার ভেতরের অংশ ফাঁপা করে নিলে এর আওয়াজ দূর দূরান্ত যায়। গাছটাকে শুলো শুইয়ে রেখে আরেকটা গদা পিটিয়ে সাংকেতিক সংবাদ পাঠাতে পারতেন নাগারা। আও-নাগাদের কাছে 'গাছের-মাদল' পবিত্র, পূজ্য জিনিস। কনিয়াক, ইমচুং-এর এবং সাংতাম নাগারাও 'গাছের মাদল' বাজিয়ে, হেসে খেলে জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু, 'গাছের মাদল' অল্প কয়েকটি নাগা গোষ্ঠীতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আও-নাগাদের নতুন গ্রাম পত্তনের পর একটা 'গাছের মাদল' প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আবার 'গাছের মাদল' কোন কারণে নষ্ট হলে 'নতুন গাছের' মাদল দরকার হতো। 'গাছের মাদল' প্রতিষ্ঠার সময়ে একটি নর-মুণ্ডের প্রয়োজন ছিল। যদিও এই নর-মুণ্ডের জন্যে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা চলতো।

নাগাদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী মুণ্ড ও নরমাংস দুটোই জমির উর্বরতার উৎস বলে জেনেছিলেন। আংগামী নাগারা শত্রুর মাংস আবাদী জমিতে পুঁতে চাষের উৎকর্ষ কামনা করেছেন। শত্রু নিধন, 'প্রবল-শক্তির' ক্ষয়পূরণ এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির মধ্যে আও-নাগারা ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির সন্ধানে মুণ্ডপাত করেছেন।

নরমুণ্ড শিকার ৮০ গ্রাম এমন যুবক যোদ্ধাদের কয়েসার পাল্লা। কিন্তু নায়িকারা নিছক হত্যার আনন্দে প্রাণের অধিক প্রিয়কে এই দুঃসাধ্য ব্রতে বারবার যেতেও নিষেধ করেছেন।

নাগা গানে বন-মোরগের চিত্রকল্প প্রাণ চঞ্চল যুবকের অনুধ্যানে। সুসজ্জিত হবার অভিলাষ, যোদ্ধার পূর্ণবেশ-এর অধিকার কামনা, নাগা সমাজের তরুণের কাছে এক বাধ্যতামূলক উত্তরাধিকার। যোদ্ধার পোশাক পরতে না পাওয়াটা কলংক। কিন্তু, খেয়াল খুশীতে কেউ হঠাৎ 'বন-মোরগের মত সুন্দর' হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এই অধিকার অর্জন করতে হয় শত্রুর ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে নিজের হাতে নিয়ে। আও-নাগাদের নরমুণ্ড শিকারীদের বিশেষ স্বীকৃতি ছিল ধনেশ পাখীর পালক, শুয়োরের দাঁতের কুণ্ডল, 'সুংগ্যেতেপসু' চাদরে মানুষের মাথার প্রতিকৃতি। 'সুংগ্যেতেপসু' চাদর অবশ্য বহ্যোৎসর্গ ('মিথুন' উৎসব) করেও সমাজের কাছ থেকে আদায় করা যেতো।

এই দুর্দমনীয় সজ্জার আকর্ষণ, নিঠুর হারামী প্রিয়ার বাহুবন্ধনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও মানুষের আরেকটা দিক আছে। মাতৃস্নেহ সবকালেই অন্ধ। একটি গানে মা ছেলেকে সম্বোধন করে বলছেন :

মা : 'বাছা আমার, মুণ্ডশিকারে কিছুতেই পারবি না যেতে। বয়েসটা তোর কাঁচা।

ছেলে : বীরের পোষাক পরতে আমার খুব সাধ।

মা : তুই আমার নীলমণি/তোকে হারাতে বড় ভয়/বয়সে তুই কাঁচা।

ছেলে : ফুলগুলো আমার কাছ থেকে/দূরে থাকবে দীর্ঘদিন।

১৮৮০ দশকে মোকচাং-এর অদূরে মুংসেমইয়ুতি গ্রামে ১৮৬টা মাথা নিমেষে হস্তান্তরিত হয়েছিল। অধিকাংশ মুণ্ড-হারারা ছিলেন শিশু ও বৃদ্ধা। যে কয়জন মুণ্ড হারায় নি ওরা দাসত্ব করে মাথা বাঁচাল জীবনের বাকী দিনগুলোর জন্যে। এদের অন্য নাম যুদ্ধবন্দী। অল্প বয়স্ক কয়েকজন ছেলে-মেয়েকে যুদ্ধবন্দী নেওয়া হয়। আক্রমণ হয়েছিল বেলা দুপুর সময়। সমর্থ নারী-পুরুষ সবাই তখন ক্ষেতে। সদাজাগ্রত প্রহরীরা সেদিন কোনও কারণে কর্তব্যনিষ্ঠায় ঢিলে দিয়েছিল। আক্রমণ-কারীরা গাছের মাদকের পাশ দিয়ে গ্রামে ঢুকেছে পিঁপড়ের সারির মত। রক্তবন্যার পর সেই গ্রামে আগুন দিয়ে ওরা আবার নিরুদ্দেশ। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববর্তী কোন ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়া।

শুদ্ধ প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্যে ১৮৮০ সালে আংগামীরা কাছাড়ের চা-বাগান আক্রমণ করেন। প্রতিশোধ প্রত্যাক্ষভাবে চরিতার্থ করার সুযোগ না পেলে ওরা একটা চা-বাগানে হামলা করে নিজে আসলে দ্বার দিকের পথের হাঁটা আশী মাইল পথ অতিক্রম করে গিয়ে। কোহিমাতে ইংরেজদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে ওরা জবাব দিলেন অন্যভাবে।'

নরমুণ্ড শিকার, দলগতভাবে, যুদ্ধেরই নামান্তর। এটা বিরামহীন যুদ্ধ। এই বিরামহীন যুদ্ধের প্রয়োজনে নারীরা চাষের পরিশ্রমের ভাগ নিজেদের ওপর বেশী নিয়েছিলেন। সারা দিনের শ্রমের পর জ্বালানী কাঠের বোঝা ঝুড়িতে নিয়ে ওরাই ঘরে ফেরেন। পুরুষের হাতে সদা-জাগ্রত বর্শা, যে কোন সময়েই শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত। বর্শা হাতে পুরুষরা সব সময়েই দলের সামনে ও পেছনে উপস্থিত থাকেন। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে, পরিবর্তিত জীবনধারার দাবীতে, এখন বর্শার বদলে বন্দুকের ছড়াছড়ি ক্ষেতে খাবার পথে।

নাগা রণকৌশলের গোপনীয়তা, সাবধানতা এবং সম্মুখ সমর এড়াবার প্রচেষ্টা, দলগতভাবে যুদ্ধে নামার সময়ে, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু, গ্রাম রক্ষার দায়িত্বে নিজের জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করার দু-চারটা গল্পও শোনা যায়। এই গল্পগুলোতে যদিও সাহসিকতার চাইতে অপরিণত বুদ্ধিকে জোরদার করে তুলে ধরা হয়েছে। এমন একটা জনশ্রুতি আছে যে আও-নাগা কোন গ্রামের বীর পুরুষরা নিজেদের হাঁটু অবধি মাটিতে প্রোথিত করে শত্রুর মোকাবেলা করেছিলেন। এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ওরা যাতে জীবন থাকতে শত্রু গ্রামে ঢুকতে না পারে।

আঙনগারা অন্যান্যদের মত যুদ্ধ ঘোষণা না করেই যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু, শান্তি স্থাপনের কলাকৌশল এবং অনুষ্ঠান-গুলো ওদের রীতিমত জমকালো। যুদ্ধবন্দী দাসদেরও ওরা যথেষ্ট মানবিক মর্যাদা দিয়েছেন। দাসীরা গোষ্ঠীগত গৌরব চিহ্ন উল্কি পরতে পারত না। সন্তান প্রসব করারও ওদের অধিকার নেই। দাসরা অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অধিকার পেলেও গ্রাম শাসনে ওদের অভিমত নেওয়া হত না বা শাসন কার্যে ওদের অধিকার কোনভাবেই বর্তাবার অবকাশ ছিল না। এই দাসদের অনেক ক্ষেত্রেই অন্য গ্রামের সঙ্গে বিরোধ মেটাবার জন্যে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু উপঢৌকন সামগ্রীকে প্রায়ই পরলোকে পাঠিয়ে দিতেন যাঁরা এই উপঢৌকন পেতেন। কারণ কোন নিহত ব্যক্তির গোষ্ঠীগত ক্ষত পূরণের জন্যেই এই উপঢৌকন।

শত্রুহত্যার ইতিহাস না থাকলে জীবন অর্থহীন, যৌবন বিষাদময়। আবার শত্রু-হত্যায় অতিরিক্ত বীরত্ব গ্রামকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনযন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তিরিশের বেশী মুণ্ড শিকার, আও নাগাদের ক্ষেত্রে, অমঙ্গলসূচক বলে বিবেচিত হয়েছে। অস্বাভাবিক বীরত্বের জন্যে, সমাজ সংগঠনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার জন্যে অনেক বীর প্রাণ দিয়েছেন বলেও জানা যায়। গল্পে, গানে বলা হয়েছে চোঙলীমুংসেম গ্রামে এক বীর-পুরুষ ছিল। তার নাম ওয়াতি। ওয়াতির কানের দুলে সব সময় একটা ছোট্ট পাখি বাঁধা থাকতো। পাখির ডাক শুনলেই গ্রামের দরজায় দরজায় পরবধূর ভীড় লেগে যেতো। লোকেদের কাছে এটা বিষবৎ। বাঘ শিকারের সময়ে ওরা ওয়াতির প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করলো। ওয়াতি এই গোপন পরামর্শের খবর আগেই পেয়ে গিয়েছিলো। বাঘ শিকারের সময় ওকে ঘিরে ব্যূহ রচনা করা হলে সে ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। গ্রামে ফিরে পরবধূদের জানালো সে সুন্দরীদের আনন্দবর্ধন করতেই ফিরে এসেছে।

স্বয়েকদিন শিকারে যাবার পথে ওয়াতির সঙ্গীরা খাবারের মোড়ক খুলে খেতে বসেছে। তিরিশজন শিকারী দেখলো তিরিশটা মুরগীর মাথা ওয়াতির মোড়ক থেকে বেরোলো। অন্যদের খাবারের মোড়ক থেকে শুধু মাংস আর ভাত, লোভনীয় মাথাটা নেই। এই নির্ভুল প্রমাণের পর শিকারীরা ওয়াতিকে একটা জলাশয়ের গভীরতা পরিমাপ নিতে বললো। ওয়াতি জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক বর্শা ওর ওপর আঘাত হানে।

ওয়াতি পরকীয়া প্রেম অথবা বীরত্বের জন্যে প্রাণ দিলো গল্প থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কিন্তু, একথা অবধারিত যে, নাগা সমাজে ভূলস্থাবিরের বিধান, শাসনযন্ত্রের বিধান, গৃহকর্তার সর্বময় কর্তৃত্ব, নারীর সম্মান অথবা পুরুষ সিংহের সুকীর্তির অবমাননা করলে সেটাকে বরদাস্ত করা হয় না।

বাঘের সঙ্গে লড়াই

বাঘ। বাঘ। একটা নয়, দুটো নয়, একপাল। কেউ বললে বাঘে জংগল ছেয়ে গেছে। ঘটনাস্থল মোককচাং থেকে চৌদ্দ-পনেরো মাইল দূরে সাংরাচি গ্রাম। মোপুং-চুকিট, ইমপুর, লংকা, কপুলং ও সাংরাচি এই পাঁচ গ্রাম পাহাড় চূড়ায় আসন নিয়ে একে অন্য থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। সাংরাচি থেকে নিমেষে দূর দূরান্তে খবর গেছে; শিকারির এসো, সাংরাচির বীরেরা কে কোথায় আছো। আও-নাগা অঞ্চলে রেকর্ডসংখ্যক বাঘ সাংরাচির বীররাই মারতে পারে। এবারেও ব্যতিক্রম হবে না। ডিসেম্বরের শীত ঠেলে (৭০) জীপের পর জীপ [illegible] গ্রামে এসে [illegible] থেকেই বাঘের [illegible] চোখে চোখে রাখছেন। বাঘ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা দক্ষ উটদের সাহায্যে পাখির ডাক, পায়ের ছাপ, বাঘের মল অবিরত লড়াই করছেন।

নির্দিষ্ট দিনে সূর্যোদয়ের আগে থেকেই ঘেরাও শুরু হলো। বাঘ শিকারে বন্দুক ব্যবহার হয় না। অগ্রবর্তী দল বাঁশ, গাছের ডাল দিয়ে ব্যূহ রচনা করে রেখেছে। বাঘের দলকে ব্যূহের ভেতরে ঠেলে দেওয়াই প্রধান কাজ। একবার কোণঠাসা করতে পারলে বাঘের আর নিষ্কৃতি নেই। বরং,

অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের অধিকার নিয়ে তিন তিনজনের ভিত্তিতে দল গঠন হলো। তিন-জনের ভিত্তিতে, তিন সারিতে ব্যূহ রচনা হবে। প্রথম সারিতে বাম হাতে ঢাল, ডান হাতে দা। দ্বিতীয় সারিতে ঢাল আর বর্শা। তৃতীয় সারিতে ঢাল নেই, বর্শা আর দা। আক্রমণ প্রথমে করবেন দ্বিতীয় সারির লোকেরা। আজকাল তৃতীয় সারিতে বন্দুক রাখা হলেও ব্যবহার নেই তার। সব শেষে, নিরাপদ দূরত্বে, দর্শকরা। বাঘের দলকে ঘিরে বৃত্ত যতই সংকুচিত হতে থাকে ততই উঃ-হ্যু-হ্যু হুংক তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

বাঘ শিকার খুব উঁচু দরের উৎসব। মৃত বাঘকে গ্রামে নিয়ে আসার পর মেয়েরা গান করে বীর শিকারীদের প্রশস্তি করে। তারপর বহুক্ষণ মৃত বাঘের উপর দিয়ে উল্লম্ফন চলতে থাকে বাঘ অশুভ শক্তি। বাঘের ওপর দিয়ে এইভাবে লাফিয়ে গেলে ভবিষ্যতে বাঘের হাতে মারা যাবার আশংকা নেই বলেই একসময়ে বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী জংগলে বাঘের দেখা পাওয়াটাও অমঙ্গলসূচক। বাঘের দেখা পেলে পরিজনদের মধ্যে অসুখ হওয়ার আশংকা থাকে। পুরনো দিনে, বাঘের সঙ্গে দেখা হওয়ার দোষ কাটাবার জন্যে গৃহস্থ সরাসরি নিজের ঘরে না গিয়ে প্রথমে মরাং ঘরে একবার ঢুকে যেতেন। সংস্কারের অর্থ যাই হোক, মরাং ঘরে বাঘের উপস্থিতির সংবাদ পৌঁছে গেলে অবিলম্বে বাঘের পরমায়ু নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। কারণ, গ্রামরক্ষা ও প্রাণরক্ষার সব ব্যবস্থাই মরাং ঘরের যুবকদের হাতে ন্যস্ত ছিল। বাঘ অথবা অন্য যে-কোন বিপদ বিষয়ে এরা অবিলম্বে বিশদ খবর নেওয়ার যত্ন নেবে।

মৃত বাঘের উপর দিয়ে লাফ ঝাঁপের পর ল্যাজ ধরে টানার পর্ব শুরু হয়। এই কাজের অধিকারী শুধু নির্দিষ্ট গোত্রের লোকেরাই। ওরাই পারেন বাঘের বিশেষ শক্তি নিজেদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে। ধর্মান্তর ও শিক্ষার প্রভাবে বাঘের এই শক্তি অপগত হলেও ল্যাজ ধরে টানার ব্যাপারে গোত্রগত দাবী অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

নাগাভূমিতে যে-সব ব্যাঘ্র-মানবের কাহিনী রয়েছে তার মূলে মানব সমাজের শৈশবের একটা ধারণা বদ্ধমূল। আও-নাগাদের ব্যাখ্যায়, মানুষের শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রাণ (আও-ভাষায়, টাকুম) এবং আত্মা (আও-ভাষায়, টাসেলা)। জীবদ্দশায় আত্মা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন, স্বপ্নে। স্বপ্নে মানুষ অজানা, অদেখা জায়গার সাক্ষাত দর্শনের অনুভব পায়। এটা নিশ্চয়ই আত্মার কাজ। ঘুমন্ত শরীর থেকে সাময়িকভাবে যে শুধু আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে তা নয়, আত্মা নানা রকমের জীবের ওপর নির্ভর করেও থাকতে পারে। উদাহরণ, ব্যাঘ্র-মানব।

এককালে বহুসংখ্যক ব্যাঘ্র-মানব আও-নাগাদের মধ্যে ছিলেন। ব্যাঘ্র-মানব [illegible] নানা বিপদ থেকে নিজের গ্রাম ও গোষ্ঠীকে সতর্ক ও রক্ষা করতে পারতো। কিছুদিন আগেও (৬৪) লংসা গ্রামে একজন ব্যাঘ্র-মানব অলৌকিক কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকার খবর জানা যায়। উপযুক্ত সাধনায় একজন মানুষ তাঁর আত্মার সঙ্গে হিংস্র বাঘের যোগাযোগ ঘটিয়ে ব্যাঘ্র-মানবে রূপান্তরিত হন বলে লোকশ্রুতি। ঐ বাঘের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জীবন-মৃত্যুর তিনিও অংশীদার। বাঘ মরলে ব্যাঘ্র-মানবও মরবে। মোককচাং গ্রামের এক বৃদ্ধা ব্যাঘ্র-মানব-এর (মানবী ?) ঘরে রাতে বা অসময়ে একটা বাঘের যাতায়াত অনেকেই দেখেছেন বলে দাবী করেন। কোনও কারণে বাঘের মৃত্যু হলে, তিনি অবিলম্বে নিজের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে, মৃত বাঘটিকে কোথায় পাওয়া যাবে এবিষয়ে হদিশ দিয়ে যান। সত্যিই যে একটা বাঘ এবং বৃদ্ধা একই সময়ে মারা গিয়েছিলেন এ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্বিমত নন।
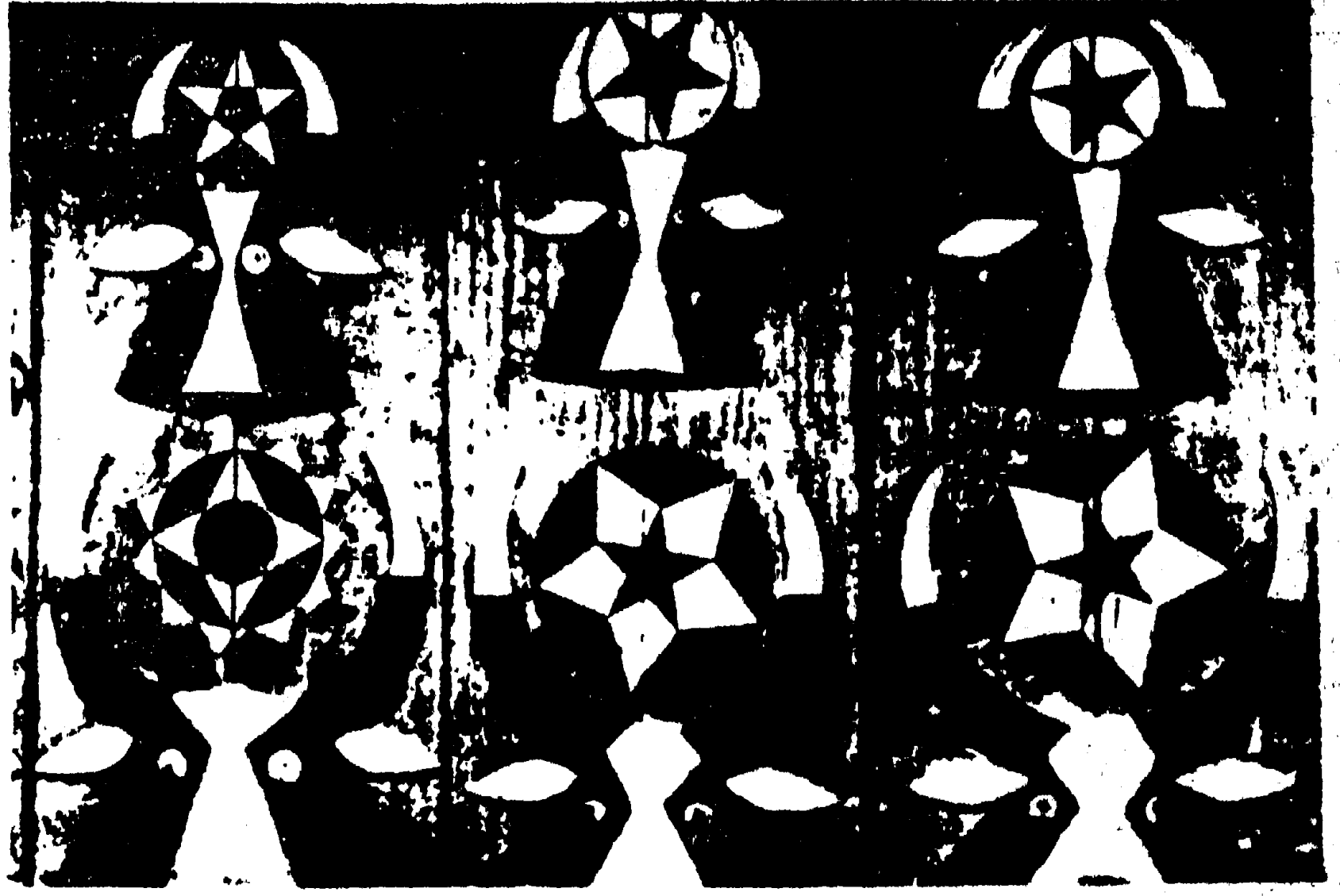
এই দোসর পাতানো বা আত্মার বিনিময় নাগা পাহাড়ে বাঘের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেমা-নাগারা সাপের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছেন ব্যাঘ্র-মানব-এর ধারায়। নব-ধর্মান্তরিত কোন সেমা নাগা মহিলা গির্জা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন চীৎকারে দশদিক মুখর করে—আমার ছেলেরা আমাকে কেটে ফেললো। ছেলেরা তখন ওদের বাড়ীর মধ্যে একটা সাপকে মেরেছে মাত্র। সাপের মৃত্যুর পর মহিলা বেশীক্ষণ বাঁচেননি।

নাগাভূমির অন্যতম আলোকিত স্থানেও ১৯৭৮ সালে এক ব্যাঘ্র-মানবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নাম শ্রীমতী আলিকালা, ধাম সংরাচি গ্রাম। শ্রীমতী একদিন প্রতিবেশীর ঘরে উনুনের পাশে পা ছড়িয়ে গল্প করছেন, চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি আহত বাঘের মত লাফিয়ে, মাটিতে আছড়ে পড়লেন। বাঘের অনুকরণে লাফিয়ে ঘরের চার দেয়ালের বাইরে যাবার চেষ্টা করলেন। মুঠো মুঠো আদা, এই তৎপরতার মধ্যে, চিবিয়ে খেলেন। ঢোঁকে ঢোঁকে জল খেলেন (আদা-জল প্রাণকে এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করে)। বললেন, গুলি গলায় লেগেছে। পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। এরই মধ্যে আহত বাঘের শরীর থেকে আত্মা সরিয়ে নিয়ে অন্য বাঘে ন্যস্ত করতে যত্ন নিলেন। বাঘ পাওয়া গেল না। এমনকি সাময়িকভাবে আত্মাকে সরিয়ে রাখার জন্যে জংগলে উপযুক্ত একটা কাঠ-বেড়ালীও পাওয়া গেল না। শ্রীমতী আলিকালা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সংরাচির ওয়ালিং গোত্রের লোকেরা বাঘের যথারীতি সংস্কার করলেন। শ্রীমতী আলিকালা মৃত বাঘের অবস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট হদিশ আগেই দিয়ে রেখেছিলেন।

আও-নাগা সমাজ মানুষে মানুষে সম্পর্ককে নানাভাবে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা দিয়েছে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক এর মধ্যে অন্যতম। উপহার আদান-প্রদান এবং উৎসর্গ, অনুষ্ঠান করে পাতানো বন্ধুরা একে অন্যের কাছে অবধ্য। এরা এক গ্রামের অধিবাসী নন। দুই গ্রামের মধ্যে যুদ্ধ হলে, দুই বন্ধু স্বভাবতই দুই পক্ষে থাকবেন। কিন্তু, দুই বন্ধু একে অন্যের মুণ্ডচ্ছেদ করবেন না। আনুষ্ঠানিক বন্ধুরা ভিন্ন গ্রাম ও গোত্রের হলেও, ওদের সন্তান-সন্ততিরাও এই সম্পর্ককে তুচ্ছ করেন না।

ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে যেভাবে বন্ধুত্ব হয়, ঠিক সেভাবে না হলেও, গ্রামের সঙ্গে গ্রামের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক একই গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না-ও থাকতে পারে। বন্ধু গ্রামের মধ্যে শুভেচ্ছামূলক সাক্ষাৎকার খুব ঘটা করে হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারের সময় পানভোজন গান সারারাত জুড়ে চলে। এই নিয়ম এখনও তার গুরুত্ব হারায়নি। এই সৌজন্য সহ সাংস্কৃতিক বিনিময়-এর সময় দুই গ্রামের

বাড়ির দরজায় আও-নাগা শিল্পকর্ম

জন্যে বংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় এবং আধুনিকতম পরিভাষায় যুক্ত ইস্তাহারে বন্ধুত্বকে পুনর্বার চিরজীবি বলে ঘোষণা করা হয়।

আও-নাগাদের আরো একটা রীতিকে কিথুংজায়ুংবো অর্থাৎ আত্মীয় সম্বন্ধ বলা হয়েছে। আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যে পিতৃ-সম্বোধন সবচেয়ে মধুর। পিতার নিজস্ব অনেক সন্তান-সন্ততি থাকলেও, নির্ভর-যোগ্য কোন বিদেশীর পিতৃ-সম্বোধনকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই পিতৃ-সম্বোধনকে সম্মান দেখিয়েছেন আরো অনেক নাগাগোষ্ঠী। নাগাভূমিতে এখন বহিরাগতদের পক্ষে সকল বৃদ্ধদের বাবা সম্বোধন সাধারণ পরিচায়ক। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে পাতানো বাবা ও ছেলের সম্পর্কে কোন বৃদ্ধই উদাসীন নন।

পিতৃসম্বোধন করে ইনার লাইনে নিয়ন্ত্রিত নাগাভূমির শহরে গ্রামে বহু-লোক জীবিকা অর্জনের পথ পেয়েছেন। গ্রামের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশে গেলেও এরা কিন্তু নাগরিক অধিকার পান না। সামাজিক অন্যান্য নিরাপত্তা বিধান অবশ্যই গ্রাম কিথুংআয়ুংবা সম্পর্কে আবদ্ধ লোককে দেবে। জামা গ্রামে এরকম একজন ভিনদেশী গ্রামের সুনাম বর্ধন করেছিল মাথা কাটাকাটির দিনে। ঐ বীর-পুরুষের নামে একটা জলাশয় আছে আর আছে গানে তাঁর সুকৃতির স্বীকৃতি। বিবাহবন্ধনে যেসব পুরুষ ইনার লাইনের বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁদের সমাজে কোন নির্দিষ্ট স্থান নেয়নি, নাগরিক অধিকার তো নয়ই।

চাকেসাং নাগা গ্রামের এক মোড়লের পুত্র শ্রীমহেন্দ্রসিং বেদী। ঘটনাক্রমে বৃদ্ধের কোন পুত্র নেই। এই সম্বন্ধ ঘোষণার সময় শ্রীবেদী সমস্ত গ্রামকে ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। তাঁকে একটা নতুন নামও গ্রাম থেকে দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পর একটা জীপ দুর্ঘটনার সূত্রে শ্রীবেদীর ওপর একটা আংগামী গ্রামের সম্মিলিত ক্রোধ পড়েছিল। খবর পেয়ে চাকেসাং পিতা অবিলম্বে গ্রাম উজাড় করে লোক নিয়ে পুত্রের কুশল সংবাদ নিতে আসেন। সকলেই দেখলেন শ্রীবেদীর কুশল নির্ধারণ করতে একটা লাল কম্বলের প্লাবন হাসপাতালে এসে থামলো। দুর্ঘটনায় শ্রীবেদীও আহত হয়েছিলেন। অবিলম্বে দুই গ্রামের মধ্যে একটা নিষ্পত্তির সূত্র পাওয়া গেল। জীপ দুর্ঘটনায় আহত মেয়েটি এবং শ্রীবেদীর পিতা এক গোত্রীয়, যদিও স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। শ্রীবেদীর চাকেসাং গ্রামের দেওয়া নাম ভেলহো। প্রতিপক্ষ তাঁর নাগা সমাজ স্বীকৃত পরিচয় পেলে আগেই আপোষ রফা হতে পারতো। যুদ্ধং দেহি ভাবটা কেটে গিয়ে সেখানে উপহার আদান-প্রদানের ঘটা শুরু হলো।

শ্রীবেদী নাগাভূমির বিচার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। সম্প্রতি ('৭৮) তিনি খবর পেয়েছেন যে, তাঁর বাবা বিয়ে করতে চাইছেন না। এই নিয়ে তিনি চিন্তিত। অশীতিপর বাবা সদ্য স্ত্রী হারিয়েছেন। স্ত্রী ছাড়া যে বৃদ্ধদের খুবই অযত্ন হয় সেটা স্বীকৃত। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নির্ভরে বার্ধক্যকে অনেকটা হালকা করে নিতে পারে।

পিতৃ-সম্বন্ধের আরেকটা বিস্তার রয়েছে গ্রাম সূত্রে। আও-নাগা গ্রামগুলো বংশবৃদ্ধির ফলে ক্রমে সংখ্যায় বেড়েছে এবং তার একটা পরম্পরা রয়েছে। কোন গ্রাম থেকে কোন গ্রামের সূত্রপাত সেটা পরিচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করার দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেক গ্রামের। বয়োজ্যেষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে গ্রামের মধ্যেও বিবাদ হয়। আও-নাগা দুটো গ্রামের মধ্যে কে বয়োজ্যেষ্ঠ এই নিয়ে বহু পুরনো মন-কষাকষি রয়েছে। এই মৌন এবং মৌল প্রসঙ্গ মনে না রেখে, পানীয় জল নিয়ে একটা সাধারণ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কোন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদও বিভ্রাটে পড়েছিলেন। এই মৌল সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে দুই গ্রামের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হবার সুযোগ রয়েছে।

মানুষ যে-রকম সম্মানসূচক সামাজিক পরিচয় চায়, আও-নাগা গল্পের পশুরাও সেদিকে উদাসীন নয়। রাগ ও ঝগড়া করে যে কিছু মানুষের কাছ থেকে আদায় করা যায় না, আও-নাগা গল্পে সেটা বহুভাবে বলা হয়েছে। রাগ ও হঠকারিতার খেসারত অনেক। সমাজে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব রাখার কাজে নির্ভীক পুরুষসিংহ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবেন। ব্যক্তিগত, গোত্রগত অথবা গোষ্ঠীগত ঝগড়াবিরোধ উপযুক্ত স্তরেই সামলানো হবে। সাধারণ লোকেদের কথিতে, আও-নাগা গ্রামে

দুজনের মধ্যে ঝগড়া হলে তৃতীয় ব্যক্তি এ-বিষয়ে যতদূর সম্ভব নিজেকে নির্লিপ্ত রাখবেন। কারণ, তৃতীয় ব্যক্তির একটা সাধারণ মন্তব্য এটাকে পারিবারিক দ্বন্দ্বের স্তরে নিয়ে যেতে পারে। তাই সুখে-দুঃখে, বিপদে-ভয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করাটাই আও-নাগা সমাজে পুরুষোচিত বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু মানুষ মাত্রেই অল্পবিস্তর রাগে এবং তার প্রকাশও সব সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। নিজের গ্রাম, গোত্রের মধ্যে হিতাহিতশূন্য ক্রোধের কারণ ঘটলে প্রতিপক্ষকে আঘাত না করে নিজের হাত কামড়ে রক্তাক্ত করতে দেখা গেছে।

উৎসব :—

মিথুন উৎসবের সংবাদ এখন আর আও-নাগা গ্রামে কয়েক দশক শোনা যায়নি। আংগামী নাগাদের এই উৎসব এখনও সতেজ, সফেন। ধর্মান্তরের ফলে এই পরিবর্তন। (কিন্তু, মিথুনের মাংস দিয়ে গ্রামবাসীকে আপ্যায়িত করার রীতি ও সম্মান যথাস্থানে রয়েছে।)

বৈদিক যজ্ঞকে ম্লান করে পশুমাংসের পাহাড় এবং মদের নদীর আয়োজন করতেন মিথুন উৎসবের হোতারা। উৎসবের শেষে এরা নতুন পোষাকের অধিকারী ছিলেন। আওদের হিসেবে যে পোষাক প্রায় নরমুণ্ড শিকারীদের সমপর্যায়ের। শুধু পোষাকেই নয়, অনেক গোষ্ঠীতে এই স্বীকৃতির বর্ণনা ঘরের খুঁটিতে দেওয়ারও নিপুণ ব্যবস্থা রয়েছে। অনেকের মতে এক হাতে বিত্ত পুঞ্জীভূত হওয়ার বিপদ থেকে মিথুন উৎসব এক সময়ে সমাজকে রক্ষা করেছিল। মিথুন উৎসবের একটি গান এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। উৎসবের শুরুতে গান :

'সর্বোত্তম বাসভূমি, সর্বোত্তম আমার গ্রাম/কোন রোগ যেন এখানে আসে না/আমাকে বেঁচে থাকতে দাও/কচি বাঁশ বা খেতের শীর্ষের মত আনত, অনাহত/আমাকে বেঁচে থাকতে দাও/প্রাচীন গাছ বা পাথরের গায়ে ব্যাঙের ছাতার মত/আমাকে দশটি ভাষায় কথা বলার জন্যে/বেঁচে থাকতে দাও/আমাকে দশবিধ মাংস খাওয়ার জন্যে/বেঁচে থাকতে দাও/সকল কঠোরতা সয়ে আমাকে বাঁচতে দাও।'

আও-নাগাদের কিক্কা সুচিমং বা মিথুন উৎসবের মত চাঁদ ও সূর্যকে বন্দনা করে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হতো। অন্যান্য নাগা গোষ্ঠীর মত ওরাও গাছ, পাথর ও জলের দেবতাকে তুষ্ট করেছেন। অন্যান্য পুজোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ১। জঙ্গল পোড়ানোর আগে পুজো, ২। জঙ্গল পোড়ানোর পর আগুনে পুড়ে মরা জন্তু-জানোয়ার ও সাপের হাড় পোড়ানোর শুদ্ধির জন্যে পুজো, ৩। বীজ বপনের পুজো, ৪। গ্রামের মঙ্গলের জন্যে পুজো, ৫। যুদ্ধে যাওয়ার আগে পুজো, ৬। পাথরের পুজো, ৭। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার পুজো, ৮। জলের পুজো, ৯। হাতী ও বাঘ মারার পুজো, ১০। মহামারীর ওষুধ তৈরির পুজো, ১১। অসুখের প্রতিকারের পুজো, ১২। গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের পরবর্তী পুজো, ১৩। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর পুজো ইত্যাদি।

সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই কম-বেশি পরিমাণে ডিম, রক্ত ও মদ ব্যবহার্য। বীজ বপনের পুজোতে পুরোহিত একলা গ্রামের বাইরে গিয়ে মুরগীর রক্তে ভেজা মাটিতে বীজ বপন করবেন। এই পুজোর পরই গ্রামবাসী বীজ বপন করবেন। পাহাড়ের ক্ষেতে আগাছার উপদ্রব বেশি বলে সেখানেও পুরোহিত একলা গিয়ে পুজো দিয়ে আসবেন। পুজোর পর আগাছা তোলার কাজে লাগবে গ্রামবাসীরা। আও-নাগা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মন্ত্রপাঠ অধিকাংশ সময়েই অঙ্গভঙ্গীসহকারে। উৎসর্গীকৃত মুরগীর পালক ছিঁড়ে ছিঁড়ে দশদিকে পুরোহিত সেগুলোকে ছুঁড়ে মারবেন সজোরে। আগাছা তোলার পুজোর সময়ে মন্ত্রের আনুষঙ্গিক ঘোষণায় পুরোহিত বলেন এই পাতাগুলো তেতো। ধানের পাতা চিবিয়ে এই উক্তির অর্থ হচ্ছে, ইঁদুররা যাতে শস্যের প্রতি লোভ না করে। গ্রামের মঙ্গলের পুজোতে গ্রামবাসীরা সুসজ্জিত হয়ে প্রথমে পুরোহিত নির্ধারিত জায়গায় সমবেত হবেন। সেখান থেকে নরমুণ্ড ঝুলিয়ে রাখার স্থানে (ইমরংমেন) যাবেন। প্রার্থনায় পুরোহিত বলবেন : 'এই গ্রামের নরনারীদের বংশবৃদ্ধি হোক এবং ওরা যথার্থভাবে পুরুষ ও নারীর গুণে মণ্ডিত হোক। এই গ্রামের আবাদী জমি সুফলা হোক। কোন পঙ্গপাল এখানে যেন না আসে। এই গ্রাম যোদ্ধাদের জন্মদাতা হোক এবং আমাদের সন্তানরা সাহসী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন হোক।' যুদ্ধে যাবার (নরমুণ্ড শিকার) আগের পুজোর মধ্যে যথোচিত গোপনতা থাকবে। দুপুরের পান-ভোজনের আয়োজন সঙ্গে নিয়ে যোদ্ধারা গ্রামের বাইরে সমবেত হবেন। অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ঢাল, বর্শা দাও সঙ্গে নেবেন। সারাদিনের আলাপ-আলোচনার পর ওরা গ্রামে ফিরে গাছের মাদলে আওয়াজ করবেন। এই অনুষ্ঠানে স্বাভাবতই নারীদের কোন প্রসঙ্গ নেই। অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে মেটচং বা যুদ্ধে যাওয়ার পুজো এখন সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত, বিস্মৃত। হুলুস্থুল করে মন্ত্রপাঠ হতো মহামারীর ওষুধ তৈরির পুজোয়। প্রথমেই একটা কালো বাঁদরের সন্ধানে জঙ্গল তোলপাড়। অতঃপর সেই কালো বাঁদরের (মৃত অবস্থায়) কানে তুলোর গোঁজ পরিয়ে সেটাকে বাঁশের কাঠামোর সঙ্গে এমনভাবে বসিয়ে আনা হবে যেন একটা জলজ্যান্ত বাঁদর বসে আছে। হুহুংকারে, মন্ত্রপাঠে, নাচে, গানে, নানা ঘোষণায়, মহানন্দে বাঁদরকে নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করা হবে। অনুষ্ঠানের সাফল্যের উপরই উপদেবতার বিদায় নির্ভর করছে। পৃথিবীর স্রষ্টা লিজাবার পুজো ইমকুলেপীমং বা গ্রামের মঙ্গলের জন্যে পুজোর মত কিছুটা গুরু-গম্ভীর। লিজাবার পুজোতে পুরোহিত একলা গ্রামের বাইরে গিয়ে শুয়োর ও মুরগী উৎসর্গ দেবেন। সেদিন গ্রামবাসীরা ঘর ছেড়ে বেরোবে না। সারাদিনের পুজোর পর পুরোহিত সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরবেন। সন্ধ্যার পর প্রত্যেক গৃহস্থ লিজাবার উদ্দেশ্যে ঘরের ভাঙা হাঁড়িকুড়ি বাইরে ছুঁড়ে ফেলবেন। এইগুলোই লিজাবার প্রীতি অর্ঘ্য। গভীর রাতে লিজাবা নিজে এসে এগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন।

লিজাবার সৃষ্টি-কাহিনী অন্যত্র বলা হবে। জনজাতিদের ঈশ্বরদের মধ্যে লিজাবা উল্লেখযোগ্য। লিজাবার সৃষ্টির প্রেরণা প্রেম থেকে। লিজাবাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। তিনি একাধারে ভয়ানক উগ্র এবং মধুর স্বভাবের। তাঁকে সর্বজ্ঞ অথবা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করার কারণ নেই, যেহেতু জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত তাঁকে অনায়াসে ফাঁকি দিতে পেরেছে বলে অনেক গল্প আছে। মানুষের সঙ্গে লিজাবার

শিল্পীর তুলিতে রাজকীয় মিথুন

সম্বন্ধ সম্পর্ক। মানুষ কোনভাবেই লিজাবাকে ফাঁকি দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। অন্যান্য ঈশ্বরদের সঙ্গে লিজাবার তফাৎ অনেক। লিজাবা ভয়ানক শব্দসচেতন। মোয়াৎসু উৎসবের সময় যখন তিনি গভীর রাতে গ্রামে পদার্পণ করেন, তখন যে-কোন রকমের অপ্রিয় শব্দ লিজাবার কানে গেলে সমুচিত শাস্তি বিধান অবিলম্বে হবে।

মিথুন উৎসব থেকে মোয়াৎসু উৎসব সব অনুষ্ঠানেই যৌন-সংসর্গের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যৌন-সংসর্গের নিষেধের নির্ঘণ্ট ও পরিধি খুবই বিস্তৃত। তবে নিষিদ্ধ আহার্য ও যৌন-সংসর্গ-বিগর্হিত দিনের হিসেব থেকে অশৌচকে চিহ্নিত করা যায়। আও-নাগারা যুদ্ধ, বাঘ শিকার ও মাছ ধরার দিনে সমস্ত গ্রাম জুড়ে অশৌচ বা যেনা পালন করতেন। অনুষ্ঠান অনুসারে যেনা পরিবার, গোত্র বা গ্রামের অংশ (খেল) জুড়ে পালন করার বিধান ছিল। আও-নাগাদের মধ্যে চেউক অশৌচ বা দুর্ঘটনায় মৃতের অশৌচ পালন পরিবারের মধ্যে সীমিত ছিল।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা অপমৃত্যুর প্রতিকার খুবই শ্রমসাধ্য। অপমৃত্যু গ্রামের বাইরে হলে মৃতদেহকে আর গ্রামের ভেতরে আনা হয় না। ঘরের ভেতরে অপমৃত্যু হলে পরিবারবর্গ তিনদিন ঘর ছেড়ে বেরোবেন না। ঐ সময়ের পর ওরা দু-দিনের জন্যে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবেন যাতে কোনো গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা না হয়। এই সময়ে বিবস্ত্র হয়ে থাকারও একটা বিধান হয়তো ছিল। সময় অতিক্রান্ত হলে গ্রামের পুরোহিত ওদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবেন এবং যতদিন ওদের জন্যে নতুন জায়গায়, নতুন ঘর তৈরি না হচ্ছে, ততদিন ওরা যুবকদের মরাং ঘরে আশ্রয় নেবেন।

শুধু আও-নাগা নয়, নাগাভূমির সকল গোষ্ঠীতেই (১) শপথ গ্রহণ, (২) শুভাশুভ বিচার ও অশৌচ পালন ধর্মীয় জীবনের মূলসূত্র ছিল। শপথ গ্রহণের জন্যে, হাজার প্রথা থাকলেও, বাঘের দাঁত ও মাটি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

আও নাগাদের শিশুদের খুব সম্মান। ছেলে-মেয়ের জন্ম হওয়ার পরই মা-বাবার নাম প্রায় লোপ পেয়ে যায়। স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করেন 'লালুর মা শুনে যাও।' অমুকের মা, অমুকের বাবা বলে সম্বোধন করেন। আবার লালুর মা তখন ঠাকুমা হবেন তখন তিনিও নিজের ছেলেকে অমুকের বাবা বলে উল্লেখ করতেও পারেন। শিশুদের জন্মকে গুরুত্ব দিয়ে আরো অনেক নাগাগোষ্ঠী এই রীতিতে সম্বোধন করেন। কোনও ক্ষেত্রে সন্তানহীন বিবাহিতরা সন্তানহীন মা বাবা নামেও পরিচয় দিয়েছেন একে অন্যের।

শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে আও নাগাদের গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। এখন যদিও এই গল্পের পরিবেশ নেই। আওনাগা লোককাহিনীতে চালাকি, ভাঁড়ামী বিশেষ স্থান পায়নি। পঞ্চতন্ত্র

ট্রাগোপ্যান ব্লাইথী : নাগাভূমির লাজুক পাখি

অথবা ঈশপের গল্পের মত শিক্ষামূলক গল্পে জন্তু-জানোয়ারকে নিয়ে আসা হয়েছে। হাসির গল্পে সেমা নাগারা ইকি ও মুগাতো নামে এক মানিক জোড় তৈরি করেছিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত অংশে এরা গোপাল ভাঁড়ের মত। এই জোড় শ্রম ও কামনার জয় দুটোই চালাকি করে লাঘব করতে পারতো।

শিশুদের বয়সের উপযুক্ত চলাফেরা আয়ত্ত করার দিকে মা-বাবাদের নজর প্রখর। কোন এক রহস্যজনক শিশু পালন রীতির জন্যে শিশুরা প্রয়োজনমত চুপ করে থাকতে পারে। বাড়িতে অতিথি সমাগম হলে আও-নাগা শিশুদের : উপদ্রবহীন শিশু আর হতে পারে না। শিশু শিক্ষায় মা-বাবারা যেটাকে সবচেয়ে ভয় পান সেটা হচ্ছে আহ্লাদিপনা। এই আহ্লাদিপনাকে কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। শিশু শিক্ষার প্রথম পাঠ নাম, গোত্র, গ্রামের নাম এবং লিংগভেদ। হাঁটি হাঁটি পা-পা হলেই গুরুজনরা মেয়েদের বারে বারে জিজ্ঞেস করেন 'মা তেতলের না?'— অর্থাৎ, তুমি মেয়ে না? কথা ফুটলেই মেয়ে বলতে শেখে হ্যাঁ আমি মেয়ে। ছেলেদের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম সর্বাগ্রে। তারপর বংশপঞ্জী। পরিবর্তনের খর স্রোতে বসেও আওনাগা শিশুরা চির পুরাতন ঘুম পাড়ানী আজও শোনে।

ঘুম পাড়ানী গান শেষ হলে শিশুদের দায়িত্ব সাধারণত দিনের বেলায় পড়শীদের যে কোনো একজনের উপর দিয়ে মা-বাবা ক্ষেতের কাজে বেরিয়ে যেতেন। এই বেবী সিটার-এর জন্যে কোনো খরচ নেই। দিনের খাবারটা একটা বাঁশের চোঙা-এ পড়শির কাছে দিয়ে গেলেই হলো। এই প্রথাতে এখনও কোনো ভাংগন নেই। বারো বছরের আগে পর্যন্ত ছেলেদের কোন কাজের দায়িত্ব নেই। এদের নামই ছিল গ্রামে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো ছেলের দল।' হাওয়া খাওয়া শেষ হলে ছেলেরা যেতো মরাং ঘরে। আওনাগা পরিভাষায় এর নাম আরিজু (আরি-শত্রু, জু-পতন)। আও নাগাদের ক্ষেত্রে আরিজু শিক্ষাকেন্দ্র ও সেনানিবাস। আরিজু বা মরাং নাগাভূমির বহু গোষ্ঠীতেই ছিল না। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত জাতিদের মধ্যে বহু দেশে বিভিন্ন সময়ে মরাং প্রচলিত ছিল। মরাং আওনাগা গ্রাম শাসন ও সংগঠনের সংগে অনাদীভাবে মরাং-এ মহিলাদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

আওনাগা শিশুরা সসম্ভ্রমে মরাং ঘরের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছে। কারণ, মরাং-এর শিক্ষাক্রম শেষ না করে কেউ গ্রাম সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদ পাবে না। এবং এই শিক্ষাক্রমকে কোন প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে এড়িয়ে যাবার বিধান ছিল না। মরাং-এর কঠোর শৃংখলা এবং ততোধিক কঠোর শাস্তি বিধান-এর ব্যবস্থা থাকায় বোধহয় অভিভাবকরা শিশুদের মরাং-এ পৌঁছে দেবার আগের বয়সে বিশেষ শাস্তি দিতেন না

মরাং-এ ভর্তি হবার দিন বছরে একবার। সারলুলেমাং গ্রামের শ্রীইমপাং-লেমবা ঐ দিনটি স্মরণ করে বলেছেন ছেলেরা অভিভাবকরা এবং মরাং-এর সদস্যরা নির্দিষ্ট জায়গায় আসন নিলেই একের পর এক নতুন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হতো। পরীক্ষক মণ্ডলী ভয়ানক তীব্র গতিতে এলো পাথাড়ী প্রশ্নবান ছুড়তেন। প্রশ্নগুলো সাধারণত নাম, গোত্র এবং বিভিন্ন গোত্রের সম্বন্ধ বিষয়ে। প্রার্থী ঘাবড়ে গিয়ে ভুল করলে স্বতোঃস্ফূর্ত হুহুংকার ধ্বনির মধ্যে মন্তব্য শোনা যেতো, এই ছেলে ক্ষণজীবী। মরাং-এ প্রবেশ করার সময় নিয়মানুবর্তীতার অলংঘনীয় শপথ নিতে হতো। এই শপথের একটা ছিল গরু অথবা শুয়োরের নাড়ি দিয়ে প্রার্থীর উচ্চতা মেপে, উপযুক্ত প্রক্রিয়ার পর সেই নাড়ি শপথ গ্রহণকারীদের খেতে দেওয়া হতো।

মরাং-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চুচুইমপাং গ্রামের এক বৃদ্ধ অনেক কথাই স্মরণ করছিলেন। তিনি প্রচ্ছন্ন মুণ্ড শিকারী। ইংরেজ সরকার যেসব শাস্তিমূলক অভিযান চালিয়েছিলেন তাতে তিনি একাধিকবার অংশ নিয়েছিলেন। বয়স শতাধিক। দাঁতগুলো এখনও অক্ষত। বলেছেন, বড়দের হুকুম তামিল করতে গিয়ে ছোটদের প্রাণ দফারফা হয়ে যেতো। নানারকম সহনশীলতার পরীক্ষাও বড়রা চালাতেন ছোটদের ওপর। সাহসের পরীক্ষা তো বটেই। আজকের পরিভাষায় র‍্যাগিং বলা যেতে পারে এটাকে তবে শতগুণ শক্তিশালী র‍্যাগিং।

মরাং-এর শিক্ষানবীশদের বয়সের হিসেবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এদের কাজ-কর্ম ও শোবার জায়গা আলাদা। সবচেয়ে ছোটদের দল (১) সুংপুর। এদের প্রধান কাজ ছিল মরাং-এর প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্বালানী কাঠ ও জল বয়ে নিয়ে আসা। এদের শিক্ষাক্রম তিন বছর জুড়ে। পরবর্তী শিক্ষাক্রমে যথাক্রমে এদের নাম। (২) টেনাভার (৩) সাংরেমিননেগর। এই দুই বয়সের দল প্রতি রাতেই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মহড়া দিতো। যুদ্ধের কলা-কৌশল ও ইতিহাস নিয়েও আলোচনা হতো। মরাং এবং গ্রামের অন্যান্য সুস্থ-সবল লোক নিয়ে আরেকটা বয়সের ভাগের নাম সুংচিলেপ জুংগ এরা যুদ্ধে সবার আগে যেতো।

শিক্ষাক্রম শেষ করেও অনেক যুবক মরাং-এ থেকে যেতো যতদিন না ওরা নিজেদের সংসার পাতছে। কাজের বিনিময়ে সময় বিশেষে এরা উপার্জন করতেও পারতো যুদ্ধ ও বাঘ শিকারের মত কাজে গ্রামের সব কটি মরাং একজোটে কাজ করতো। আওনাগা মরাং-এর নিজস্ব চাষের ব্যবস্থা ছিল না। লোথা নাগা মরাং-এর যুবকরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত জমিতে চাষ করতো। গ্রামের চার ভাগের একভাগ জমি মরাং-এর জ্বালানী কাঠ ও ঘর বানাবার বাঁশ কাঠের জন্যে সংরক্ষিত করা থাকতো আওনাগা গ্রামে।

আওনাগা গ্রাম শাসনের অনুরূপ একটা পরিষদ মারাং-এর পরিচালনা করতেন। মরাং-এর অসামরিক সর্বাধিনায়ক এর নাম চুজেন। তিনি গ্রাম সরকারের সহযোগীতায় কাজ করতেন। তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার মধ্যে শুধু মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেবার অধিকার ছিল না। মরাং-এর পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আরিজুতির হাতে। তিনি যুদ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা সময়, কলা-কৌশল নির্ধারণ করবেন। প্রকৃত সমর পরিচালনা যিনি করবেন তাঁর নাম জেরটিরজেন।

মরাং-এর দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যে একটা পরিষদ ছিল। পরিষদ সদস্য-দের নাম যথাক্রমে :

(১) একজন উংগের (তিনি গ্রামের অগ্রগন্য গোত্র থেকে নির্বাচিত)

(২) একজন টুজো (সহকারী প্রধান)

(৩) চোদ্দজন তাতার (এঁরা উপদেষ্টা মাত্র, তাতাররা চুজেন-এর সমবয়স্ক দল থেকে নির্বাচিত হতেন)

(৪) দুজন তিওয়ার (কার্য পর্যবেক্ষক) বেক্ষক)

(৫) দুজন চিবতুর (মরাং-এ আলোচনা, অনুষ্ঠানে এরা দুজন খাদ্য ও মদ্য পরিবেশন করেন)।

বারো বছরের পর ছেলেরা যেমন বাবা-মাকে ছেড়ে রাত্রি বাস করতে মরাং-এ যেতো অনূঢ়া মেয়েরাও তেমনি যুকিতে রাত্রিবাস করতো। জুকির তেমন কোন সাংগঠনিক গুরুত্ব নেই। দিনের বেলা মেয়েরা মা-বাবার সঙ্গে ক্ষেত-খামারে গিয়ে সন্ধ্যার পর জুকিতে চলে আসতো। জুকি পরিচালনা করতেন বিধবারা। গ্রামে একাধিক জুকি থাকতো এবং ছেলের দল দল বেঁধে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হতেন এখানে। মেয়েদের আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা আও থেমিউএন, চাং ও কনিয়াকদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল।

আওনাগা অঞ্চলে মরাং ও জুকি বাসের স্মৃতি ম্লান ও বিরল। আওনাগা গ্রামের অনূঢ়া মেয়েরা এখনও একসঙ্গে রাত্রিবাস করেন, যদিও এটা বাধ্যতামূলক নয়। বিধবাদের কর্তৃত্ব এখানে নেই আর। সমবেতভাবে রাত্রিবাস করার ব্যবস্থা ও দেখাশোনা গির্জার তরফ থেকে করা হয়। এই সব মেয়েদের শোবার জায়গা এখন স্কুলের মেয়েদের পাঠ্যাভ্যাস ধর্মকথা ও যীশুনাম গানে আয়োজিত।

মরাং হারিয়ে গেলেও তার কর্মধারার কিছুটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে নতুন সংগঠনের মধ্যে। আওনাগা অধিকাংশ গ্রামেই এখন সুতেমং (আক্ষরিক অর্থে কেন্দ্র) রয়েছে। যুবকরা বাধ্যতামূলকভাবে এর সদস্য।

এই কেন্দ্রের প্রধান কাজ ছিল গ্রাম সরকারকে সাহায্য করা, সংবাদ বহন করা, গ্রাম পাহারা দেওয়া, দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড ও নিরাপত্তার প্রশ্নে গ্রামের কুশল বিধান করা। সুতেমং দিন-রাত কাজ করে। কাজের বিনিময়ে গ্রামবাসীর কাছ থেকে কোন অর্থ সাহায্য সুতেমং পায় না। কিন্তু গরহাজির লোকেদের কাছ থেকে পাওয়া টাকা সুতেমং সদস্যরা নিজেদের আমোদ-আহ্লাদে ব্যয় করেন।

নাগাভূমির ভেতরে গ্রামের নামেই মানুষের পরিচয়। অনেক সময় কে যায়? এর বদলে শোনা যাবে কোন গ্রামের লোক? গোষ্ঠীভেদে গ্রামের শাসন ব্যবস্থা আলাদা আলাদা থাকে নিরূপিত হয়েছে। কনিয়াক ও চাং নাগারা এক কথায় রাজত্ব করে গেছেন। সেমা নাগাদের সেই হিসেবে সামন্ত তান্ত্রিক। আও নাগাদের গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অপ্রতিরোধ্য শাসন চালু রেখেছিলেন। নির্বাচিত সরকারের কার্যকাল তিরিশ বছর বা আওনাগা হিসাবে একযুগ। এই যুগব্যাপী শাসনকারীদের সংগঠনকে পুতু বলা হয়। পুতুর পরমায়ু ও গঠনের হেরফের গ্রাম ভেদে পাওয়া যায়। আওদের মধ্যে মংজেন-ভাষীদের পুতু ও যুগভাগের ভিন্নরীতি রয়েছে। চোংলীভাষীদের যুগের পরম্পরা যথাক্রমে মেচেনসাঙার মোলুঙসাঙার কোশসাঙার রিওনসাঙার ও মেটেম-সাঙার। গ্রামের ভাগ অনুসারে (খেল) শাসনের জন্যে এক-একটি তাতার মিনজেন রয়েছে। এরা গ্রামের অংশের শাসনের জন্য দায়ী। আবার এদের সম্মিলিত সংগঠনই পুতু বা গ্রাম সরকার। একটা গ্রামে অনায়াসে পাঁচ-ছটা তাতার মিনদেন থাকতে পারে কিন্তু পুতু একটাই। আবার যদি গ্রামে মংসেন ও চোংলীভাষী দুই ভাগ থাকে তবে দু দলের জন্য স্বতন্ত্র পুতু থাকবে। শাসন ক্ষমতায় থাকবে সকল
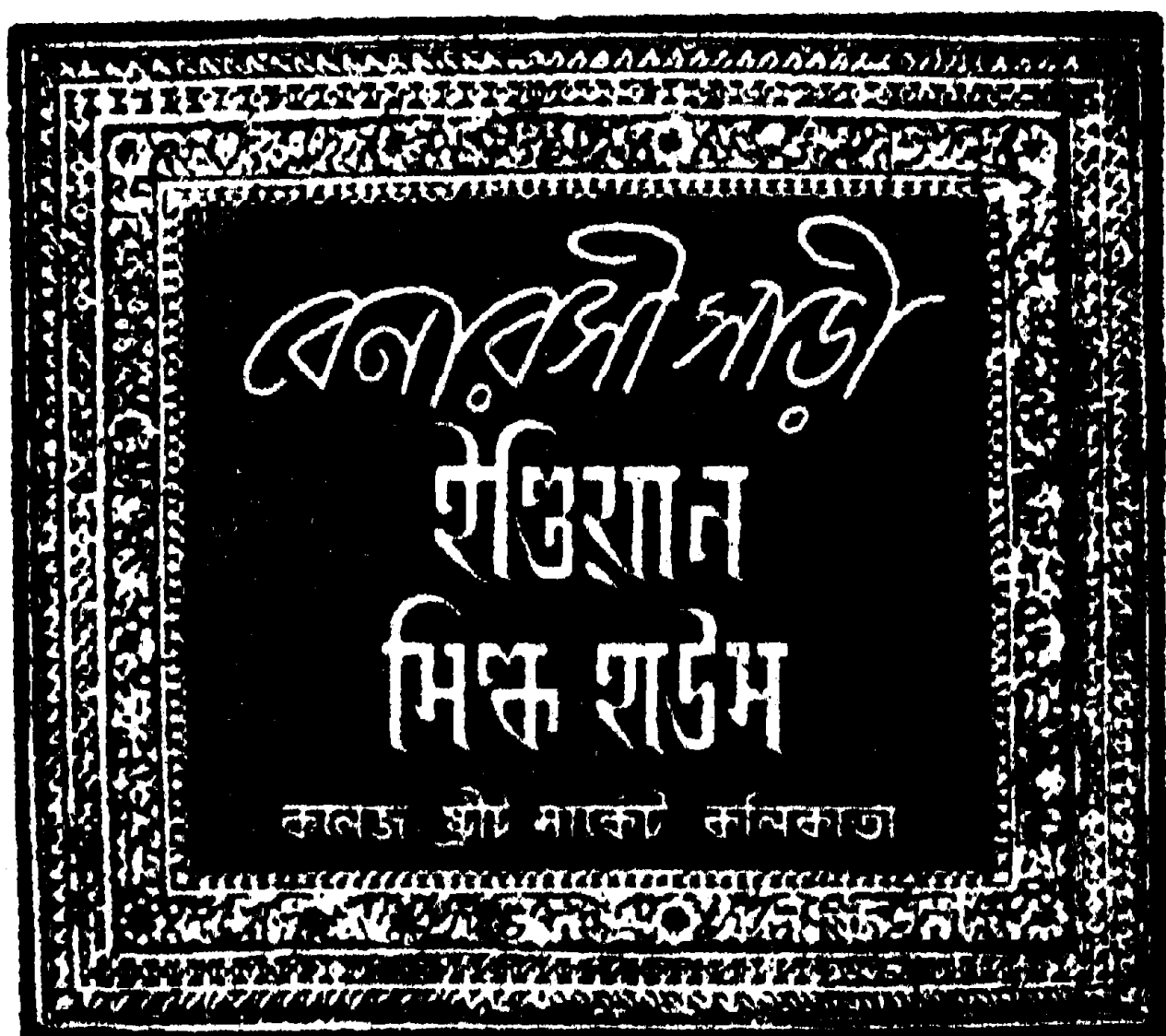
সদস্যেরা অবিসংবাদিত ক্ষমতা ভোগ করেন। গ্রামের মধ্যে বিবাদ ও অন্যান্য অপরাধের জন্যে সাধারণ জরিমানা ধার্য করা হয় গরু, শুয়োর-এর মাপে। এই জরিমানা আদায় হলে পুতুর সদস্যরা সেটা ভাগ করে খাবেন। সদস্যদের সম্মান ও পদাধিকার বলে মাংসের ভাগ ওরা পাবেন। কাজেই গ্রামের মধ্যে যতই বিরোধ থাকে পুতুর মাংস খাওয়ার পরিমাণও সেই অনুসারে বেড়ে যায়। এই মাংসের জন্যে অনুচচার কামনা এবং সোচচার প্রার্থনা দুটোই আছে।

জন্তুর পিঠের মাংসই উৎকৃষ্ট বলে আও-নাগারা বিবেচনা করেছিলেন। এই মাংসের অধিকারী ছিলেন পুতুর চারজন টাজাংপুরু। এই চারজনের মধ্যে যিনি বয়সে প্রাচীন তাঁকে টাজাংতিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। টাজুংপুরু আক্ষরিক অর্থ গাছের কাণ্ড।

মাংসের ভাগে পশুর গলার অংশের মাংস খাবেন চারজন তামবুরু। টাজাংতিক-দের পরই এদের স্থান। জরিমানা ছাড়াও পুজো এবং অন্যান্য উৎসবের জন্য পশুর মাংস প্রয়োজন। এই সব অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পশু নির্বাচন ও ক্রয় করার দায়িত্ব তামবুরুদের।

পশুর মাথা পাবেন ওংগের। তিনি সম্ভবস্থলে পোংলার গোত্র থেকে নির্বাচিত হবেন। গ্রাম পত্তনের সময়েই এদিক নজর রাখা হয়। কিন্তু এই গোত্রের লোক ছাড়া গ্রাম পত্তনের হিসেবও আছে। সেখানে পশুর মাথা নিয়ে একটু সন্দেহ থেকে যায়, যদিও বিলি ব্যবস্থার বিধান আছে। উংগেপ আইনত গ্রামের তথা পুতুর প্রধান। তাঁর বাড়ির সামনেই সমাবেশ এবং অন্যান্য কাজকর্ম হয়ে থাকে। বেশী সংখ্যক পশু বধ হলে ওংগেরের সহকারী টংশুও মাথার ভাগ পাবেন।

পশুর বুক, তলপেট ও যকৃত পাবেন লংকুমার গোত্রের দুজন সদস্য। হৃদপিণ্ড পাবেন জামির গোত্রের একজন সদস্য।

পুতুর জমায়েত অথবা উৎসবাদিতে রান্না করার জন্যে জোড় সংখ্যায় (কমপক্ষে দুজন) সদস্যেরা থাকবেন। ওদের পদ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে মদ ও মাংসের আস্বাদনকারী নামে পরিচিত। পুতুর আরো কয়েকজন সদস্য থাকেন যাদের সংখ্যা জনসংখ্যা ও গোত্র সংখ্যার পরিমাপে নির্ধারিত হয়। ওরাও মাংসের এটা-সেটা বাদ বাকী অংশ পেয়ে থাকেন। এবং অপেক্ষায় থাকেন কোন উচচতর পদ শূন্য হলে সেখানে বসে মাংসের বড় ভাগের জন্যে। এই পদোন্নতি অবশ্যই যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

আওনাগা গ্রাম থেকে পুতুর শাসন ব্যবস্থা সরে যায়নি। সরে যাওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। ইংরেজ সরকার গ্রামগুলোতে অর্ধ সরকারী শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। গাঁওবুড়ো ও দোভাষী নিয়োগ করে ইংরেজ আমলে গ্রামগুলোকে সাধারণ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সরকার গাঁওবুড়ো তিন বছরে একখানা করে লাল উলের কম্বল পেতেন সরকারের তরফ থেকে। তাঁর কোন মাইনে ছিল না। গ্রামের ঘর পিছু দু টাকা বার্ষিক খাজনা আদায় করা তাঁর দায়িত্বে ছিল। আদায় করা খাজনার শতকরা পাঁচশভাগ গাঁওবুড়ো পেতেন। বাকী অংশ সরকারী তহবিলে তিনি জমা দেবেন। গৃহ করের দু টাকাও গাঁওবুড়ার ক্ষেত্রে মকুব ছিল।

দোভাষীরা সরকারী মাইনে পেতেন আর পেতেন দু বছর অন্তর একখানা লাল উলের কম্বল। ওদের একটা লাল কম্বলের তৈরী জ্যাকেটও রয়েছে। দোভাষীর কাজ ছিল সরকার পক্ষকে শাসনকার্যে অনুবাদের মাধ্যমে সহায়তা করা। জাটিস রাজকর্মে যেমন মুণ্ডশিকার ঘটনার বিচার নিষ্পত্তির সময়ে দোভাষীর অনুবাদে সরকারী পুরস্কার অথবা তিরস্কারের যথেষ্ট হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এদের অনুবাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না বলে রাজকীয় প্রভাব দোভাষীরা এক সময়ে যথেষ্ট বিস্তার করেছিলেন এখন আর নিয়োগ করা হয় না। গৃহকর নাগাভূমিতে এখনও সমান ভাবে প্রযোজ্য। নাগারা ভূমিকর, আয়কর থেকে আগের মত এখনও মুক্ত।

গ্রাম সরকার বা পুতু একাধারে শাসন যন্ত্র আদালত এবং আইন প্রণেতা। পুতু বিভিন্ন গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। অন্য গ্রামের সঙ্গে উদ্ভূত বিবাদ ইত্যাদির বিচার করবে। গ্রামের চাষ-আবাদ জংগল কাটা, ক্ষেতে যাবার রাস্তা তৈরী ইত্যাদি পুতুর নির্দেশে হবে। পুতুর সম্মতি ছাড়া যেমন গ্রামের জমি ও বনভূমি হস্তান্তর হতে পারে না তেমনি বিক্রয়যোগ্য ধান ও বনসম্পদও পুতুর সম্মতি ছাড়া ব্যক্তি বিশেষে বিক্রী করতে পারেন না। এসব বিষয়ে পুতু পলিসি ঘোষণা করেন সময়ানুসারে। বাঘ, হাতী বা অন্য কোন বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার সিদ্ধান্তও পুতু নেবেন। মরাং লুপ্ত হওয়ার পর পুতুর কর্মকাণ্ড বেড়েছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের উপস্থিতি কিছুটা হয়তো পুতুকে সীমিত করেছে। গ্রামের জমিতে বীজ বপন থেকে বিবাহ বিচ্ছেদে পুতুর উপস্থিতি অনস্বীকার্য। ব্যতিক্রম হিসেবে গ্রামের বয়স্কের দল পুতুর সম্মতি ছাড়াই অন্য গ্রামে হামলা করতে পারে বলে একটা রীতিও ছিল।

আওনাগাদের মরাং-এর শিক্ষাক্রমে নিয়মানুবর্তিতার পরীক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় না দিয়ে কেউ পুতুর পদে ছাড়পত্র পায়নি বলেই জানা যায়।

সন্ধ্যের পর কিছুক্ষণ এবং সূর্যোদয়ের আগে গ্রামগুলো যেন এক একটা মৌচাক। রান্নার পর্ব ও দিনের খাওয়া সূর্যদেব খুব একটা দেখার সুযোগ পান না। দিনের আহার পর্ব শেষ করে শকুম আমাদের চা দিয়েছিল। ভূরি ভোজের আয়োজন দেখেও সাত-সকালে খিদেটা কিছুতেই জাগছিল না। শকুমের স্ত্রী দুটো ভাতের পাহাড় এবং সেই পরিমাণ আঁশ সুদ্ধ মাছ সেদ্ধ টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন। হাঁটু সমান উঁচু টেবিল সব বাড়িতেই একটা পাওয়া যায়। মাছ রান্নাতে নুন, শুকনো লঙ্কা এবং বাঁশের কোড়ের নির্যাস ছাড়া আর কিছু দরকার নেই। আধ কেজি লঙ্কা চটকানো শুটকী অবশ্যই 'চাটনী' নাম নিয়ে টেবিলে থাকবে। লঙ্কা, শুটকী এবং পাকা টম্যাটো সবগুলোই আগুনে ঝলসে 'চাটনী' তৈরী হয়।

শকুমের স্ত্রী খাওয়ার সময়ে অনর্গল কথা বলে গেলেন। শকুম চাং নাগা হলেও আও-নাগাদের সঙ্গে ওর পরিচয় সূত্র গভীর। আও-নাগা মেয়েদের মত শকুমের স্ত্রীও অতিথি আপ্যায়নে ভাষার প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করেন না। অতিথি বুঝতে না পারলেও গৃহকর্ত্রী নিজের তরফ থেকে সমাদর জানাতে, বক্তব্য রাখতে দ্বিধা করেন না।

শকুম চাং-এর স্ত্রীর 'প্রেসার কুকার' রীতিতে রান্না ভাতের স্বাদ ভালই ছিল। তখন যদিও ঐ রান্না অনভ্যস্ত জিবে দ্বিধান্বিত 'ভাল' বলে মনে হয়েছিল। প্রায় সব রকম নাগা চালই একটু আঠালো। ভাতের জল সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ার আগে হাঁড়ির ঢাকনার ওপর জ্বলন্ত কয়লা চাপিয়ে 'প্রেসার কুকার' পন্থা নাগাভূমিতে প্রচলিত। বাসমতী, কালজিরা চালে যাদের উল্লাস তাঁদের কাছে নাগা চালে রান্না ভাত কর্দমপিণ্ড অথবা 'কেক' বলে মনে হতে পারে। প্রাথমিক পরিচয় মনোরম না হলেও নাগাভূমির শীতে অন্য যে কোন চালের ভাত হাঁড়ি থেকে নামালেই বরফ কুচির মত ঠাণ্ডা মনে হবে। উন্নত মানের বীজ থেকে যদিও এখন অনেকেই ধান চাষ করছেন তবুও নাগা চালের কদর আলাদা।

খাওয়ার আগে পরে এবং খাওয়ার সময়ে যত সব আলোচনা, বলা বাহুল্য, সবই আস্বাদনকে কেন্দ্র করে। সুখাদ্য সম্বন্ধে কথাবার্তা জঠরাগ্নিকে উৎসাহিত করে। সেদিনকার প্রসঙ্গ ছিল বাঁদরের মাংস। বাঁদরের মাংস উপাদেয় এবং পুষ্টিকর। গরম জলে পড়লে বাঁদরের হাত মুঠো হয়ে আসে। রান্নার হাঁড়িতে যত সব মশলা মুঠোর মধ্যে নিয়ে হাত দুটো সেদ্ধ হয়। কাজেই বাঁদরের হাতের তালু খাবার দিকে খাদ্য রসিকদের নজর পড়ে। বাঁদরের সঙ্গে খাদ্য খাদক সম্পর্ক হলেও আরো একটা মৈত্রী সম্বন্ধ রয়েছে। এই মৈত্রী সম্বন্ধ আও-নাগা লোক কাহিনীতে সমর্থিত হয়েছে। বাঁদরের মাংসের প্রতি মানুষের নজর থাকাতে সেই বন্ধুভাব স্থায়ী হতে পারে নি। মানুষ যে বাঁদরের চাইতে বাঁদরামীতে কম নয় এটারও সমর্থন রয়েছে। আও-নাগারা বলেন যে, পুরাকালে একটা বাঁদর প্রতিবেশীদের সহযোগিতায়

মারা হয়েছিল। যে প্রতিবেশী গোষ্ঠী বাঁদরের হাত খেয়েছিল ওদের মধ্যে চৌর্য-বৃত্তি এবং যারা হৃদপিন্ড খেয়েছিল ওদের মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি বেড়েছে। কিন্তু আও-নাগার বাঁদরের মাথা খেয়েছিলেন বলে ওদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়েছে। লোথা-নাগরা লোক কাহিনীতে বাঁদরকে মানুষের স্বগোত্র বলে বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু বাঁদরামী করার ফলে সে আজ অরণ্যচারী।

শকুম চাং আরো জানালো, বাঁদর ধরা সহজ কাজ নয়। বাঁদর ফাঁদে পড়ার পাত্র নয়। কিন্তু বাঁদরের দুর্বলতা মানুষের অজানা থাকতে পারে না। সে মানুষকে অনুকরণ করতে ভালবাসে। এই অনুকরণ স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলে বাঁদরকে ধরা সহজ। বাঁদর ধরার আয়োজন করতে একটা পিকনিক খুবই দরকারী। সারাদিন হৈ-হট্টগোল পিকনিক করে যথেষ্ট পরিমাণ কড়া মদ রেখে মানুষেরা সরে পড়ে। অবিলম্বে মোড়ল গাছ থেকে নেমে এসে সরজমিনে তদারক করে অনুচরদের আহ্বান করেন। শুরু হয়ে আরেকটা হুলকাজাম পিকনিক। মদের প্রভাব বিস্তার হতে বেশীক্ষণ লাগে না। আর ততক্ষণে শিকারীরা এসে ঢুলু ঢুলু ঘুমন্ত বাঁদরের লেজগুলো একত্রিত করে জগন্নাথের রথ টানা শুরু করে দেয়। এই টানা হেঁচড়ায় শেষ পর্যন্ত ঘুম ভাঙালেও বাঁদরের হাড়-গুলো আর আস্ত থাকে না।

বাঁদরের গল্প শেষ হতেই গ্রাম ঝিমিয়ে পড়ল। কোথাও আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। সমর্থ স্ত্রী-পুরুষ সবাই চাষের কাজে চলে গেছে। কুকুর, শুয়োরগুলোও যে যার সরে পড়েছে। মাতব্বর কয়েকজন শকুমের বাড়ির সামনে জমায়েত বসিয়েছেন। কারো মুখে কথা নেই। আলাপ - আলোচনা ওখানেই হবে। আলাপ আলোচনার বিষয়-বস্তুতে আমার অধিকার নেই। পরিচ্ছন্ন আকাশের নীচে গায়ে গায়ে লাগানো ঘর-গুলোকে দু' পাশে রেখে রাস্তাটা গির্জাতে উঠে গেছে। আমি রাস্তাকেই অনুসরণ করলাম। গির্জার পাশেই একটা কাঠের বাড়ী। ইয়ংইমতি গ্রামের এই কাঠের বাড়ীতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে শিশু শকুমের বিস্ময় হয়ে কিছু শ্বেতকায় লোক ছিলেন। শকুমের কাছে সেটাই ছিল মনের দিক থেকে মহারণাঙ্গন—। গির্জাটা গতকাল থেকে (১৯৬৬) বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ গ্রামের সবাই যীশুর স্মরণ নিয়েছে। যীশু স্মরণ সার্থক করতে একযোগে ওরা সবাই পান-সিগারেট-মদ পরিত্যাগ করেছে। সত্তর-আশী বছরের পুরনো একটানা একটা সমস্যার সমাধান হওয়াতে গ্রাম বেশ খুশী। আমার সঙ্গে আলাপচারী বৃদ্ধেরও বয়স সত্তরের ঘরে। দেহ-মনের কোনো পরিণতি অথবা সংঘাত মুখে ছাপ রাখে নি তাঁর।

আমি বৃদ্ধকে একটা অতি প্রাচীন প্রসঙ্গে টেনে আনলাম। বললেন, 'মাথা? অনেক কেটেছি। এখন আর সব মনে নেই।' প্রসঙ্গটা আজকের দিনে অসামাজিক এবং অবাঞ্ছিত। বৃদ্ধ প্রচ্ছন্ন মুন্ড শিকারী মাত্র। তখন প্রচ্ছন্ন মুন্ড শিকারীদের নাম ছিল স্বেচ্ছাসেবক। ইংরেজ সরকার শাস্তিমূলক অভিযান চালাবার সময় সেপাইদের লটবহর বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বন্ধুভাবাপন্ন গোষ্ঠী থেকে কুলী নিয়ে যেতেন। কুলীদের অন্য নাম স্বেচ্ছাসেবক।

বৃদ্ধের মতে নরমুন্ড শিকারের সবচেয়ে বিরক্তিকর দিক হচ্ছে মানুষের মাংসের দ্রুত পচনশীলতা। এই গন্ধ বহুদিন ক্ষুধাকে ম্লান করে রাখে। মরা মানুষের (মাথার) অপলক চোখ বহু সুখ রজনীর উৎপাত। এমন স্পষ্ট দৃষ্টি আতংকজনক। মাথা কাটার কৌশল আয়ত্ত করতেও সময় লাগে। বজ্রমুষ্ঠিতে চুল ধরে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে গলায় কোপ বসাতে পারলে, প্রথম আঘাতেই মুন্ডটা শিকারীর কোমরে ঝোলানো বিশেষ ঝুড়িতে নিমেষে এনে রাখা যায়। ঘাড়ে কোপ বসানো নিরাপদ। কিন্তু চুল ধরে শিকার করার সুবর্ণ সুযোগ শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের ক্ষেত্রেই আশা করা যায়। অন্য ক্ষেত্রে বর্শা দিয়ে শিকার ঘায়েল করে তবেই গলায় দা' বসানো যায়। দা'-এর লক্ষ্য কন্ঠনালী আর বর্শার হৃদপিন্ড।

গল্প—এক

মেয়েটির নাম চুবালা। তার একটা দাঁত সোনার আর বোধকরি গোটা হৃদয়টাই একই ধাতুতে তৈরী।

টুয়েনসাং জেলার নোকসাং গ্রামে জন্ম। জেলাটি তখন ভারতের 'বহির্ভূত এলাকার' মধ্যে ছিল। গ্রামটি ছোট। শহুরে সঙ্গে মোকাবেলা করে জনক্ষয় হয়েছে।

নাগা মেয়েদের মধ্যে চুবালা এম-এ পাশ করে সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করছে এক যুগ ধরে। নাগাভূমির বিধান-সভার সদস্য ছিলেন। চুবালার এক ভাই। চুবালার বোনের রূপের খ্যাতি নাগাভূমি জুড়ে।

চুবালা শব্দের অর্থ রাণী। শ্রীমতী চুবালা আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে ভারতের পক্ষে বার্লিনে উপস্থিত ছিলেন এবং সুন্দর মুখশ্রীর জন্যে মহিলাদের সাপ্তাহিক কোন কাগজের প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছিলেন। নাগাভূমির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এক সময়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইউ ডি এফ-এর সঙ্গে যুক্ত। নাগাভূমির আরেকজন রাণীর নাম ভারতবর্ষ জেনেছিল।

চুবালা চাং নাগা গোষ্ঠীর। ওর মা আও-নাগা। ওর ছোট-বড় সব বোনরাই আও-নাগা গোষ্ঠীতে বিয়ে করেছে। জন্ম-সূত্রে আও-নাগাদের সঙ্গে জড়িত বলে ওর গোষ্ঠীগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে বিপদে পড়ে না। বলে 'আমাদের 'র'-এর সংস্থান নেই। খেমিউঙ্গেন-নাগাদের মত আমরাও অন্যের রাস্তাকে নিজেদের 'রাস্তা' বানিয়ে নিই। যেমন ইমচুং-এর এবং তাংখুল নাগারা অন্যের লাডডুকে 'রাডডু' বানিয়ে খেয়ে ফেলেন।' নাগাভূমির চলতি ভাষা নাগা-অসমীয়া নিয়েও ওর পরিহাসের সীমা নেই। আকাশবাণী কোহিমা কেন্দ্র নাগা অসমীয়াতে বহু অনুষ্ঠান প্রচারিত করেন। ও কিফ্রে জেলার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক পায়।

হোস্টেলে ছাত্র-ছাত্রীরা নুন, কেরোসিন বরাদ্দ বাদে পাঁচিশ টাকা মাসোহারা পায়। কলেজের ছাত্ররা ৭০ টাকা থেকে ৮৫ টাকা বৃত্তি পায় এখন। শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের উৎসাহিত করতে ওদের বৃত্তির হারও উঁচুতে রাখা হয়েছে। আজকের টুয়েনসাং, মন, কিফে জেলাতে ১৯৫৬ সালে কোন হাইস্কুল থাকার কথা নয়। সে বছরই টুয়েনসাং শহরে সপ্তম মান শ্রেণীর সূত্রপাত। ছাত্রীদের মধ্যে চুবালা চাং অন্যতম। বড়ভাই কোলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। সমগ্র টুয়েনসাং জুড়ে তখন সন্ত্রাস, বিদ্রোহ। ৬ই জুলাই, ১৯৫৬-এর অঝোর বর্ষায়, মধ্যরাতে, শিশু ভাইবোনদের নিয়ে চুবালার মা জঙ্গলে পালিয়ে গেছেন। বড়ভাই কোলকাতা থেকে গ্রামে ফিরেছে। পিতা-পুত্র মৃত্যুদূতের আপেক্ষায় রইলেন ঘরের ভেতরে। পরের দিন ২২ মাইল পায়ে হেঁটে সংবাদ এসে গেছে চুবালার কাছে। এই সংবাদ শুনে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। আমার গলা চেপে একটা পাহাড় বসেছিল। তিন দিন আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি একবার বাবা বলে ডাকতে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে, কাঁদতে। পারিনি। আমি সবাইকে চিনতে পেরেছি, সবার কথা বুঝতে পেরেছি। ওষুধ, ইনজেকশান, গরম তেল মালিশ কিছুই আমার গলার ভেতরের পাহাড়কে নড়াতে পারে নি।' এখন চুবালার গলা থেকে পাহাড়টা সরে গেছে কিন্তু বুকের ভেতরে কোথাও সেটা রয়েছে। এই অপমৃত্যুর জন্যে চুবালার কোন আক্রোশ নেই, মন্তব্য নেই। বিদ্রোহের নাগাভূমিতে প্রাণাধিকের মৃত্যুর সাক্ষী অনেকেই রয়েছে চুবালার মত।

কলপ—২

গল্পে জানা যায় আও-নাগারা নিজেদের ভাষাকে লিখতে পারতেন। ওরা পুঁথি লিখতেন পশুচর্মে। একটি কুকুর একদিন সমস্ত পুঁথিপত্র খেয়ে ফেলাতে ওরা অক্ষরজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রোমান হরফের সন্ধান পেতে যে সময়ের ব্যবধান সেটাও কম নয়। যাদের দায়িত্বে আবার শিক্ষা-প্রসার ঘটল নতুনভাবে মায়াংনোকচার সেবকমই একটি নাম। (একাদিক্রমে ৩৬ বছর শিক্ষকতার কাজ করে, নাগাভূমি রাজ্যের জন্ম লগ্নে, ১৯৬৩ সালে ৬৩ বছর বয়েসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

নাগাপাহাড়ের জন্যে শিক্ষার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৮৪০ সালে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আসামে পদার্পণ করার একযুগ পরেই নাগাপাহাড় সংলগ্ন এলাকায় আমেরিকা থেকে মিঃ জেরনসন ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী রোডা চলে এসেছিলেন। রোডা ও তাঁর মা অনেক প্রচেষ্টার পর নামসাং গ্রামে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের অনুমতি পেয়েছিলেন। রোডা কয়েক মাসের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে কোলকাতা চলে যান: সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। রোডার মৃত্যুতে নাগাপাহাড়ের অক্ষরজ্ঞান আরো অর্ধ-শতাব্দী পিছিয়ে গেল। রোডার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছাত্রীসহ ২০ জন। ছেলেরা আসেনি। রোডার আমন্ত্রণের জবাবে ওরা হেসে জানিয়েছে—"আমরা স্কুলে গেলে ঘরের জল আনবে কে? জ্বালানী কাঠ আনবে কে?' এ-প্রশ্নের জবাব রোডা দিতে পারেননি। রোডার স্কুলের শিক্ষার্থীরাও "হরিণের ডাক শুনতে পেলে নিমেষে উধাও হয়ে যেত স্কুল থেকে।" মায়াং যখন শিক্ষক হয়ে এলেন তখন ছেলেদের আর স্কুল ছেড়ে বাইরে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সার্টিফিকেট নিয়ে তিনি চাকিগ্রামে ফিরেছেন। সেটা ১৯২৭ সাল। মায়াং-এর আগে শ্রীকেভিচুঝা গ্রাজুয়েট হওয়ার সম্মান পেয়েছিলেন। সেই থেকে চাকিগ্রাম নাগাভূমির শিক্ষার পীঠ। সাতাশ বছরে বি-এ পাশ করে যে শুধু তিনি বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন তা নয়; খোদ ইংরেজ সরকারের নীতিকে বিপন্ন করেছেন। সরকার তা সুনজরে দেখতে পারেন নি। আমেরিকান মিশনারীদের কর্মকান্ডকে ইংরেজ সরকার সরাসরি রুখতে পারেননি কিন্তু পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন। ধর্মপ্রচার অব্যাহত রাখতে ইংরেজ সরকার উৎসাহী ছিলেন কিন্তু শিক্ষা বিস্তার নয়। মায়াংকে শিক্ষকতার কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার তাঁকে নানাভাবে ঘুষ দেবার চেষ্টা করেন। সবিনয়ে মায়াং তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ইমপুরে মায়াং-এর উপস্থিতির চাইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণে একটা হাইস্কুলে তাঁকে জড়িয়ে রাখা অনেক নিরাপদ মনে করেই বোধহয় ইংরেজ সরকার নাগাপাহাড়ের জন্যে দ্বিতীয় হাইস্কুলের প্রস্তাব রাখলেন। প্রথমটা ছিল কোহিমাতে। দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেও মায়াং এ-প্রস্তাবে রাজী হলেন। হাইস্কুলটা হবে মোককচাঙ-এ। এই হাই-স্কুলেও মায়াং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ছাপ রেখে গেছেন। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও আয়তক্ষেত্রের মত জটিল জ্যামিতিক সমস্যাগুলো সরাসরি ব্ল্যাকবোর্ডে তিনি তুলে ধরেননি। ছাত্রদের অসুবিধাগুলো জেনে তিনি ওদের নিয়ে ঘরের ভেতরে চতুর্ভুজ এবং বারান্দায় দিনের পর দিন আয়তক্ষেত্র খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন নাগাভূমির কর্ণধার, ভাগ্যনিয়ন্তা। নাগাভূমির সুপরিচিত নামগুলোর সঙ্গে ইমপুর মিডল স্কুল এবং মোককচাঙ হাইস্কুল অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইমপুর স্কুলে মায়াং-এর ছাত্রদের মধ্যে টি, আও ছিলেন। ভারতের এই জনপ্রিয় ফুটবল খেলোয়াড় সম্প্রতি নাগাভূমি সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তার পদ থেকে, অবসর নিয়েছেন।

শ্রীমায়াং শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি অথবা সামাজিক প্রশ্নে যাঁরা নাগাভূমির নেতৃস্থানীয় তাঁদেরও গুরু। পক্ষপাতিত্বহীনতায় তিনি নাগাভূমির স্থির, অল্পভাষী গুরু। ফিজোর হাতে অগ্নিগর্ভ নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিলের তিনিই প্রথম সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মায়াং গুরুত্বপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গেও তাঁর তৎকালীন পরিচয় এখনও অনেকে মনে রেখেছেন। শ্রীমায়াং সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সঙ্গে পরিচিত। তিনি বহু বিচিত্র প্রসঙ্গের অভিধান। অনেক প্রশ্নের মধ্যে "অমুকের বয়স কত?" সেটাও মায়াংকে নির্ধারণ করে দিতে হয়। নাগাসমাজে বয়সের প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বয়সের সঙ্গে নানারকম সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তি পাবেন।

প্রভাব ও পান্ডিত্যে যিনি নাগা-সমাজের বরণীয় ব্যক্তি তিনিই আবার অক্লেশে শুয়োর পালনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে যান নিমেষে। তাঁর মতে "পচা, বাসী খাবার শুয়োর মহানন্দে খেয়ে পুষ্ট হয়। কিন্তু সাবধান পচা মিষ্টি কুমড়ো দিও না শুয়োরকে, অনিষ্ট হবে।" মায়াং-এর হাতে লালিত শুয়োর হাজার টাকা দামে কেনার জন্যে অগ্রিম ক্রেতার অভাব হয় না। তিনি একজন চিকিৎসকও। নাগা চিকিৎসা বিদ্যাতে পারদর্শী। নাগা চিকিৎসায় মালিশ করেই অনেক রোগ সারানো হয়। ভাঙ্গা হাড় লাগাতে সরকারী হাসপাতালের চাইতে সাধারণ লোকের নির্ভরতা নাগা পদ্ধতিতেই সমধিক।

তিনি লেখক ও সুবক্তা। ১৯৬৪ সাল থেকে আও ও অঙ্গামী ভাষাতে ছাত্ররা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিয়েছে। আও ছাত্রদের জন্য পাঠ্য-পুস্তক তিনিই যোগান দিয়েছেন। যদিও তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ধর্ম নিয়েই বেশী। ধর্ম নিয়ে মাতামাতির মধ্যেও তিনি নেই, যেমন নেই রাজনৈতিক বিতন্ডায়। রিভাইবেল আসরে তাঁকে বলতে শোনা গেছে "পাহাড়ের ছেলেমেয়েরা বন্যা দেখেনি। সমতলের লোকেরা বন্যার প্রকৃতরূপ জানে। কিন্তু পাহাড়ে হোক অথবা সমতলে হোক, বন্যা নানাভাবে, নানারূপে আসে। মানুষের সমাজ ও সংগঠনের অনেক কিছু বন্যার জলে ভেসে যায়। বন্যার পর যে পলিমাটি পড়ে তাতে সমতলের লোকেরা আবাদ করে। ফসলও ভাল পায়। সব রকমের বন্যাতেই পলিমাটি পড়ে। পলিমাটির সন্ধান তোমাদের জানা আছে কি?" এই সরল, সাবলীল ভঙ্গিতে মায়াং সারা-জীবন শিক্ষকতা করে গেছেন। আজও করছেন। শিক্ষকতার কাজে স্বীকৃতি হিসেবে তিনি রাষ্ট্রপতির পদক পেয়েছিলেন।

মায়াং সব কাজে এখনও জনমানসে রয়েছেন, যদিও জনসভায় তাঁকে পাওয়া যায় না। চিরসঙ্গী ছাতা ও বাইবেল নিয়ে, পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গিনীকে নিয়ে, প্রতি রবিবার তাঁকে গির্জার পথে দেখা যায়। মুখে একটা স্মিত হাসি অবিরত উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে। তাঁর সঙ্গে কারো বিরোধ, বিতর্ক নেই। নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিলের প্রথম

টারী শ্রীআলিবা ইমতি, আই-এ-এস
ছেন : "শ্রীমায়াংনোকচা ·
ভিচ্ছা...এখনও আমাদের মধ্যে
ছেন।......এই দেশে এখন আমরা যা
ই করি না কেন এ'দের উপস্থিতি
এতে থাকবেই। আমাদের ইতিহাসে
র স্থান অক্ষয়।"

মায়াংনোকচা যে অক্ষরজ্ঞান নাগাদের
তুলে দিয়েছেন সেটা কোন লোভী
আর খেয়ে নিতে পারবে না। নাগা-
র টুলি কাগজের কল এবছর থেকেই
উৎপাদন করবে। টুলির কাগজে ছাপা
মায়াংনোকচার জীবনী উত্তরসূরীদের
গিয়ে পেঁছুবে। ১৯৬৫ সালে
ভূমি ইংরেজীকে সরকারী ভাষা
র স্বীকৃতি দিয়েছে। নাগাভূমির
সভা ভারত সরকারকে ইংরেজীকে
ম জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিতে
রাধও জানিয়েছেন সেই সঙ্গে। মায়াং-
ার একক সাধনা ও সার্থকতা নাগা-
। প্রতিটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নির্ভুল-
রয়েছে। আজ ৭৮ বছর বয়সে তিনি
তার প্রতিমূর্তি।

লি মেরেন ১৯৬৭ সালে এম-এ
করে মোককচাউ-এ ফিরেছে। ওর
াসীরা বোম্বাই, এলাহাবাদ, দিল্লীতে
পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছে
ই। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধের
লো ছাড়াও ওদের পক্ষে নাগাভূমির
নিরাপত্তার অভাব নিশ্চয়ই ছিল।
হরের বাড়ীর কাছেই নাগাভূমির
কলেজ। কার্ফুর মধ্যে নৈশ কলেজ
ব স্থাপিত হয়েছিল, ১৯৫৯ সালে।
ছর পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে এবং আসাম
লস-এর সিপাহীদের সহযোগিতায়
অধ্যাপকরা ক্লাস চালিয়ে গেছেন।
মরেন-এর প্রথম কর্মক্ষেত্র এইভাবেই
ওঠেছিল। পরে অবশ্য সে নাগাভূমির
। সার্ভিসে যোগ দিয়েছিল। কলেজে
ার সময়ে তিনি নাটকের দিকেও
ব। জয়সিংহের ভূমিকায় ওর কাকা
ক টাকালুংকে দেখা গেছে ১৯৭০
'বিসর্জন' নাটকে।
লিমেরেন তখন বিয়ের বাজারে উঁচু
পাত্র।

লিমেরেন-এর বাড়ীটা মোককচাং
হৃদপিণ্ডের বড় কাছাকাছি। নাগা-
ভেতরে পাহাড় চূড়ার উচ্চতা যতই
আলো-অন্ধকারের বিন্যাস ও
ত্য যাই হোক মোককচাং তার কেন্দ্র।
মরেন-এর সাদামাটা বাড়ীর শোভা
ট মোরগঝুঁটি, চন্দ্রমল্লিকা আর
অর্কিড। দুটো চার চালা ঘর।
মধ্যে একটা রান্না ঘর। মূল বাড়ির
গতা রান্না ঘরই অহরহ মেটায়।
এর বড় ভাই-এর মতে এই
বাড়ী গ্রামের আদি ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ
াহরে থাকার জন্যে নাগা বাংলো

কাঠের থালা
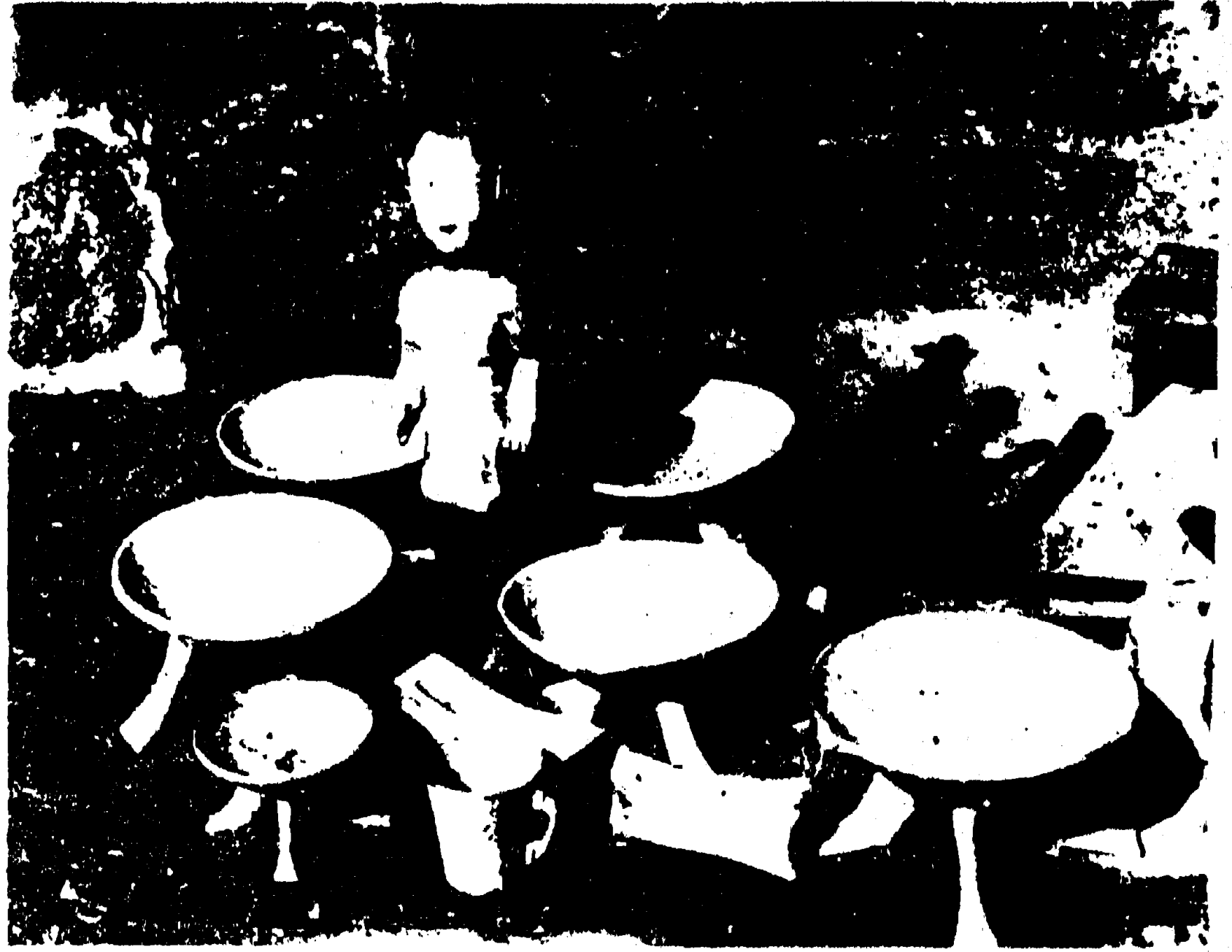
প্রিয় পিতা ডাঃ ইমকংলিবা বাড়ীর
বাইরে ছিলেন নাগাভূমি রাজ্য গঠনের মূল
প্রস্তাবক। ১৬-দফা প্রস্তাব নিয়ে দিল্লিতে
পেঁছুবার পরই নাগা পিপলস কনভেন-
শনের সভাপতি হিসেবে তাঁর জীবন বিপন্ন
হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তিনি স্পষ্টই
জানতেন নাগা অভিমতকে গঠন করতে
প্রাণ দান দিতেও হতে পারে। এর জন্যে
তিনি গোড়া থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু
আত্মরক্ষা করার কোন সাধারণ প্রস্তুতিও
তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। কখনও আততায়ী
রোগী সেজে এসেছে। বড় মাথা ধরার
অসুখ। হৃদয়বান নিঃস্বার্থ মানুষটিকে
এক পলকে চিনতে পেরে রোগী হঠাৎ
ঘর্মাপ্লুত। নিজের ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে
রোগীকে দিয়েছেন। সরকারী চাকুরী থেকে
অবসর নিয়ে ডাঃ ইমকংলিবা মোককচাং
শহরে একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রাইভেট
প্রাকটিস শুরু করেন। সেই ঘরটি এখনও
তার নাম বহন করে চলেছে। তাঁর পরি-
চালনায় এটা দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত
হবে এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহের
অবকাশ ছিল না। এই ফার্মেসী অবিলম্বে
ভ্রাম্যমান দাতব্য চিকিৎসালয় পরিণত
হলো। গ্রামে গ্রামে হাহাকার। ত্রাসে ভয়ে
কে কার চিকিৎসা করবে? এ সময়ে শুধু
চিকিৎসা নয়, পীড়িতেরা আরো অনেক
কিছু চায় হৃদয়বান মানুষের কাছ থেকে।
পীড়িতেরা চায় মানুষের জন্যে মানুষের
করুণার প্রমাণ, চায় এই যন্ত্রণা অবসানের
আস্বাদ। একমাত্র তিনিই মরণাপন্নদের
বাঁচাতে সাহস দিতে পারেন। ঘোরতর
বিরোধে বিচ্ছিন্ন জনমতকে তিনিই একসূত্রে
বাঁধতে পারেন। পীড়িত মানুষের বেদনা
নিয়ে তাঁর রাজনীতি চর্চাও চিকিৎসকের
করুণায় আদ্র।

তাঁর বাগ্মীতার সুখ্যাতি ছিল। নিজের
খরচে স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে
পুস্তিকা লিখে ছাত্রদের সভাতে নিয়মিত
উপস্থিত থাকতেন। বক্তৃতা দিতেন, বিনা-
মূল্যে পুস্তিকা বিতরণ করতেন। রাজনীতি
বিষয়ে তাঁর কোন সচেতন প্রস্তুতি ছিল না,
নেতৃত্ব বিষয়ে তো নাই। পিতা হিসেবে, নেতা
হিসেবে ঘনায়মান ব্যক্তিগত সংকটের দিনে,
রুদ্ধশ্বাস আততায়ীদের অপেক্ষমান রেখে,
নিবিষ্ট মনে প্রিয়জনকে তিনিই লিখতে
পারেন 'জীবনে সব কঠোরতার জন্যে
তোমরা প্রস্তুত থাকবে আর ঈশ্বরের ওপর
বিশ্বাস রাখবে।' এটাই তাঁর শেষ চিঠি।

সেদিন আকাশটা পরিচ্ছন্ন ছিল। ডাঃ
ইমকংলিবা ফার্মেসী থেকে ফিরছেন। তাঁর
কনিষ্ঠ পুত্রের চোখে জল। মার্বেল নিয়ে
বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদে সে হেনস্তা হয়েছে।
হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দে তার চোখের জল
শুকিয়ে গেছে। মার্বেলের দুঃখ ভুলে ত্রাসে
সে বাড়ীর দিকে ছুটেছে। মাত্র কয়েক হাত
দূরে প্রিয় পিতা রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছেন।
কনিষ্ঠ পুত্র নাকসীর চোখের জল নাগা-
ভূমিতে সঞ্চারিত হয়েছে। আহত
ইমকংলিবা চারপাশে ভীত, বিমূঢ় লোকেরা
দূরে সরে রয়েছে। আহতকে ভুলে সবাই
কয়েক নিমেষ নিজের প্রাণ হাতের মুঠোয়
চেপে ধরেছে। যে লোকটি প্রথমে এসে
তাঁকে তুলে ধরলো তাঁকে তিনি জানতেন।
বললেন, 'আমার ব্লাডারে গুলি লেগেছে।
আমি বাঁচব না। আমার স্ত্রীকে খবর দাও।'
তিন দিন পর তাঁর মৃত্যু হলো। ১৬-দফা
প্রস্তাবের ভিত্তিতে নাগাভূমির রাজ্যের
জন্ম হয়ে গেছে তখন। নিজের জীবনের
ত্যাগ ও সেবার মাপকাঠিতে অনন্য হয়ে
রইলেন তিনি।

কোন গাঁয়ের লোক?

নাগা পাহাড়ে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনায় প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে—'কোন গ্রামের?' গোষ্ঠীর পরিচয়-এর পর গ্রাম তারপর নাম। নামধাম নিয়েই মানুষ। গ্রামের পরিচয়ই একে অন্যের সঙ্গে লেন-দেন-এর সূত্র ও স্তর নির্ধারণ করে। কারণ অলিখিতভাবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি গ্রামের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে এবং ঐ গ্রামের মানুষ নির্ভুলভাবে সেই চারিত্রিক গুণাবলীতে ভূষিত। এটা সামাজিক স্তরের হিসেব।

সংগঠনের দিক থেকে 'প্রতিটি নাগা গ্রাম নিজস্ব ক্ষমতায় এক একটি রিপাবলিক।' এই উক্তি বৈরী নাগা সংবিধানের। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এটা অত্যুক্তি নয়। পাহাড় চূড়োয় এক একটি গ্রাম, ইংরেজ অধিকারের পূর্ববর্তী সময়ে, নিজেদের অলঙ্ঘনীয় সীমানা সদাজাগ্রত বর্শা হাতে পাহারা দিয়েছে। গ্রামের শাসন ব্যবস্থা ও সংগঠনে 'পুতু' ও 'মরাং'-এর ভূমিকা আগেই কিছুটা বলা হয়েছে।

'পুতু'র সদস্যদের অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম সত্যবাদীতা। একমাত্র 'পুতু'র সদস্যরাই বর্শার ছুঁচোলো মুখ মাটিতে বিদ্ধ করে শপথ গ্রহণ করতে পারেন। এই শপথ নিয়ে মিথ্যা বললে পর-মায়ু ক্ষয় অবধারিত। এবং শপথ নিয়ে মিথ্যা কথা বললে জরিমানা থেকেও তিনি মুক্ত নন। চাঁদ ও সূর্যের নামে শপথ নিয়ে, বাচনভঙ্গীর সঙ্গে তাল রেখে, 'বর্শার ছুঁচোলো মুখ সোজা মাটিতে বিদ্ধ করে' তিনি সত্য কথা বলবেন। প্রসঙ্গতঃ নাগা জীবনে বর্শার স্থান অতি বিস্তৃত। যোদ্ধার হাতে এটা অদ্ভুতভাবে কার্যকরী। শান্তিতে এটা শপথ গ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার আনুষঙ্গিক। বর্শা অন্ধের যষ্টি বা শক্তের হাতে ব্রহ্মাস্ত্রের মত সদা প্রস্তুত। এই সম্মানিত অস্ত্রকে সোজাভাবে বহন ও বিশ্রামে রাখাই প্রথা। হেলান দিয়ে নয়। অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও এতে বর্শার বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা। আজকের নাগা-ভূমিতে বর্শা গৃহসজ্জার অঙ্গ।

'পুতু'র বিচারে বাদী ও বিবাদী পক্ষ মানতে রাজী না হলে শপথ নিয়েও বিবাদের নিষ্পত্তি করা যায়। এক্ষেত্রে দৈব বিধান গ্রাহ্য। শপথ নিষ্পত্তি হাজার রকমের সম্ভব। নেহাৎ দৈব সহায় না হলে শপথ নিয়ে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়াও মুশকিল। যেমন, পূর্ব দিকে মাথা নুইয়ে থাকা কোন বিশেষ ধরনের বাঁশ দা'-এর এক কোপে কাটা অথবা উলুখড় জাতীয় ঘাস ('আমচি মুলুং') দু' হাতের তালুর চাপে দু' ভাগ করে নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণিত করা যায়। কাজটা খুবই কঠিন। কোনও ক্ষেত্রে 'পুতু'র বিচারের পর দু'দিন অথবা এক মাস পর্যবেক্ষণ-এর মধ্যে থাকতে হয় বিচার প্রার্থী দু' পক্ষকে। এই সময়ের মধ্যে বিচারে দোষী ব্যক্তির বাড়ীতে মানুষ ও পশুর রোগ অথবা মৃত্যু না হলে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। শিক্ষা ও ধর্মান্তর গ্রহণ করার পর এখন আর শপথ নিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি হয় না। 'পুতু' কোন বিচারের নিষ্পত্তি না করতে পারলে 'দো-ভাষী' বিচারালয়ে আপীল করা চলে। গ্রামের ভেতরে বিবাদ-বিসম্বাদগুলোর কয়েকটা গোত্রের প্রধানদের এক্তিয়ারে। যেমন চুরি, মিথ্যাবাদিতা, গোত্রের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ, গালাগাল ('তুমি এই গ্রামের নাগরিক না') রীতি-রীতির বিকৃতি, গান-গল্পের মধ্যে সংযোজন অথবা বিয়োজন, পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি।

মানুষের মধ্যে যেমন বয়সের হিসেবে সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট হয়, তেমনি আও-নাগা গ্রামের বয়স অনুসারে তার সম্মান। আও-নাগাদের বিশ্বাস চোংলিইমতি তাঁদের আদি গ্রাম। সেখানেই ওরা প্রথম প্রভাতের আলো দেখেছিলেন। সেই গ্রামটি এখন আর নেই। কিন্তু যে দুটি পাথর থেকে আও-নাগাদের জন্ম সেগুলো এখন আও-নাগাদের দুটি গোত্রের জন্ম সংবাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আও-নাগারা অযোনিসম্ভূত। এবং চোংলি-ইমতি গ্রামের পূর্ববর্তী কোন ইতি-হাসের চর্চা ওরা করেন না। চোংলিইম গ্রামে বসবাস করার সময়ে ওদের রীতিনীতি সুসংবাদ হওয়ার পর ক্রমে ওরা কোরিডাং ও সুমেডাং-এ বসতি স্থাপন করেন। বর্তমানে অবলুপ্ত গ্রামগুলির পরম্পরা অনুসারে উংমা গ্রামই বয়োজ্যেষ্ঠ। শুধু বয়স হিসেবে নয়, জনসংখ্যার অনুপাতে এটা আও-নাগাদের সর্ববৃহৎ গ্রাম। আও-নাগা রীতিনীতি ও আইন-কানুন ব্যাখ্যার ওপর উংমার কর্তৃত্ব রয়েছে। অন্য দিকে জনসংখ্যায় ভারী বলে উংমা যুদ্ধ-বিগ্রহে নিজের উচিত স্থান রক্ষা করতে পেরেছে। সমগ্র নাগাভূমির পরিপ্রেক্ষিতে উংমা জনসংখ্যার দ্বিতীয় বৃহৎ গ্রাম। কোহিমা শহর সংলগ্ন কোহিমা গ্রাম নাগাভূমিতে বৃহত্তম।

একটা নতুন গ্রাম পত্তনের সময় আদি গ্রামের সব গোত্রের লোকই স্থান পেতেন। গোত্রগত ভাগকে অস্বীকার করলে নতুন গ্রামের ব্যবস্থাপনায় নানা ত্রুটি দেখা যাবে। নতুন বসতির জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন পাহাড় চূড়োর নিরাপত্তামূলক অবস্থান, সাধারণ স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও পানীয় জলের উৎস। আবাদযোগ্য প্রচুর জঙ্গল অবশ্যই বিবেচিত হতো। এই সঙ্গে নানা শুভ সংকেত-এর বিবেচনা ও শুভ-স্বপ্ন-নির্দেশ নির্ভর করে নতুন গ্রাম পত্তন করা যেতো। গ্রাম পত্তনের প্রাথমিক কাজ তরুণদের 'মরাং' ঘর ও 'গাছের মাদলের' স্থান নির্বাচন। এই দুটো সার্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্বাচনের পর অন্যান্য জমি বনভূমি গোত্র অনুসারে ভাগ হয়ে যেতো। কিছু জমি অবশ্যই গ্রামের সাধারণ কাজের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হতো।

নতুন গ্রাম স্থাপনের তিন বছর পর্যন্ত গ্রামের পূর্ণ নাগরিক অধিকার যে কোন নতুন নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত। এই তিন বছর কেউ 'মিথুন' উৎসর্গ দেবে না। পরবর্তী পর্যায়ে যাঁরা গ্রামে [illegible] স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য [illegible] নাগরিক অধিকার কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে। নাগরিকতা লাভে ইচ্ছুক লোকেরা পলায়ন-কারী অথবা অপরাধী প্রমাণিত হয়ে থাকলে নাগরিকতা লাভ দুষ্কর ছিল।

গ্রামের সমষ্টিগত ক্রিয়াকাণ্ডে এক-একটা গ্রাম কি করে তিন-চার হাজার লোকের দু-চারদিন আপ্যায়নের দায়িত্ব নিতে পারে, সেটা অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য ঠেকে। চিরদিনের মত আজও নাগা গ্রাম তার নিঃশব্দ কর্মকৌশল বজায় রেখেছে। সানিস, উংমা, ইমনুর ও খনোমা গ্রাম রাজনীতি অথবা ধর্মীয়সূত্রে গত কয়েক দশকে এরকম বিশাল জনসভা করেছে। দেশ-জোড়া অনুষ্ঠানের হোতা হিসেবে একটা গ্রাম নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কিছুটা তহবিল সংগ্রহ করে। কিন্তু গ্রামের ভাগেও একটা বড় খরচের অংক থাকে। পরিচালনার দায়িত্ব তো নিশ্চয়ই। কয়েক হাজার লোকের প্রত্যেকেই মাননীয় অতিথি।

প্রত্যেক একটা বাৎসরিক খাজনা আদায় করে। এই খাজনার নাম সারু। বহু বিবর্তন ও বিপর্যয়ের মধ্যেও সারু অনাদিকাল থেকে বিনা বাক্য ব্যয়ে সংগৃহীত হচ্ছে। রাজ-নৈতিক ঘূর্ণীতে পড়ে গ্রামবাসীরা এই সারু থেকে আত্মগোপনকারী বৈরী দলকে ট্যাক্স দিয়েছেন আবার বৈরীদের সঙ্গে সহ-যোগিতা করার অপরাধে সরকারকে জরিমানা দিয়েছেন সমবেতভাবে। ১৯৩৭ সালের ব্লক ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় নাগা পাহাড়ে একজনের অপরাধে সমস্ত গ্রামকে অর্থদণ্ড অথবা শারীরিক পরিশ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। সম্প্রতি কালে একটা গ্রামের ওপর এক লক্ষ টাকা জরিমানার নজির আছে, যদিও সেটা পরে মকুব করা হয়েছিল। বৈরীদের সহযোগিতার অপরাধে ধার্য-করা জরিমানার টাকা শিলং সমঝোতার পর ফেরত দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চাশ বছর আগে তদানীন্তন মহকুমা শাসক জে পি মিলস আও-নাগা নামে এক প্রামাণ্য বই লিখেছেন। মিলস-এর গভীর পরিচয় সূত্র ছিল আও-নাগা তথা নাগাদের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন : এটা সব সময় লেখকের কাছে একটা বিস্ময়ের উৎস থেকে গেছে যে, কিভাবে একটা আও গ্রাম তার তহবিল সংগ্রহ ও নিরূপণ করে। আও-নাগা গ্রামের তহবিল লোকসংখ্যার ভিত্তিতে, প্রতিটি বাড়ি থেকে, ধানের পরিমাপে আদায় করা হয়। বিধবা ও অক্ষমদের সারু থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

গ্রামের সরকার বিনামূল্যে বা ধারে কোন জিনিস গ্রহণ অথবা সংগ্রহ করেন না। পরিষদ সদস্যরা প্রয়োজনমত ব্যয় করবেন এবং সারু সংগ্রহ হলে নিজের প্রাপ্য বুঝে নেবেন। বর্তমানে দু-ধরনের সারু সংগৃহীত হয়—একটা গির্জার নামে, অন্যটা গ্রাম সরকারের নামে আলাদাভাবে। ধান কাটা ও ধান ঘরে তোলার পর টাটিজনঙ্গেন নামক সদস্যরা প্রত্যেক মিলনেন-এর (গ্রামের ভেতরে বিভিন্ন অংশ) প্রধানদের বাড়ীতে

সমবেত হয়ে সারা বছরের হিসেবনিকেশ করেন। এই সাধু থেকে গ্রামের সমস্ত সমবেত ব্যয় বহন করা হয়। যেমন, পুজোর খরচ (এখন প্রযোজ্য নয়), পত্তুর অধিবেশন-এর সময়ে খাওয়াদাওয়ার খরচ, গ্রামের অতিথিদের আপ্যায়ন ও উপঢৌকন খাতে খরচ ইত্যাদি।

পত্তু-তে মেয়েদের স্থান নেই। গ্রামবাসীকে পত্তু নিজেদের সিদ্ধান্ত সান্ধ্য-ঘোষণায় জানান। কোন কোন গ্রাম ও গোষ্ঠীতে প্রতিদিন সান্ধ্য-ঘোষণার ব্যবস্থা আছে। সেই ঘোষণায় গ্রামে নতুন কোন অতিথি এলে অথবা কোন ব্যক্তি অভিপ্রায়-হীনভাবে গ্রামে পদার্পণ করলে সে-খবরও ঘোষক জানিয়ে দেন। গোষ্ঠীভেদে এবং প্রয়োজনমত সান্ধ্য, প্রভাতী ও মধ্যরাত্রির ঘোষণার জন্য নির্দিষ্ট লোক রয়েছেন। কোনও ক্ষেত্রে এই ঘোষণা প্রতিদিনকার সংবাদ পরিক্রমা। কোথাও বা জরুরী অবস্থাতেই এই ঘোষণা আও-নাগা গ্রামে এই ঘোষকরা নিজেদের কণ্ঠ-সম্পদের জন্য সুপরিচিত। সাধারণতঃ সদস্যগণের মধ্যে প্রবীণ, কণ্ঠ-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিই এই ঘোষণা দেন। ঝড়ো হাওয়া অথবা ঘন কুয়াশার মধ্যে সুরেলা কণ্ঠে, উপযুক্ত যতি দিয়ে, গ্রাম-বাসীর শ্রুতিগোচর ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতাকে আও-নাগারা মর্যাদা করেন।

ইংরেজ শাসনেও গ্রামের সরকারের অবক্ষয় ঘটায়নি। স্বাধীন ভারতেও নেহরুর আশ্বাস ও সংবিধানের রক্ষাকবচ গ্রাম সরকারকে স্বমহিমায় রাখতে সচেষ্ট। স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সেক্রেটারী শ্রী টি সাকরেকে সম্বোধন রে নেহরু লিখেছেন : ......এটা আমাদের নীতি যে, উপজাতীয় অঞ্চলগুলো যতটা সম্ভব স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত হবে যাতে নিজেদের বিধিব্যবস্থা ও ইচ্ছানুসারে ও'রা জীবন নির্বাহ করতে পারেন। নাগা-পাহাড়ের ওপর একটা অসংলগ্ন বিচার-ব্যবস্থা কেন চাপিয়ে দেওয়া হবে তার কোন যুক্তি আমি দেখি না। গ্রাম পঞ্চায়েত ও উপজাতীয় বিচারালয় ইত্যাদি নিজেদের ইচ্ছানুসারে অব্যাহত রাখার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ওদের থাকা উচিত। আমি আশা করি যে, স্বাধীন ভারতে কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যে উভয় স্থানেই, উপজাতীয় অঞ্চলের সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধানের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ থাকবে। আমি চাই না যে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দেশের অন্য অংশের লোক এসে ওদের ছেয়ে ফেলুক, সেখানে গিয়ে ওদের প্রবঞ্চিত করুক।

সংকটের সময়ে অথবা রুটিনমাফিক নাগরিকদের সভা ডাকলে গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের উপস্থিতি অবধারিত। যে যেখানেই থাকুক, এই দিনে উপস্থিত থাকতে না পারলে লজ্জার বিষয় এটা। গ্রামের পরিচয়ই মানুষের আসল পরিচয়। পরিচয়হীন, অসংলগ্নহীন জীবন কেউ কামনা করে না। গ্রামের ভাবনা ও কর্ম-ধারার সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য নাগাভূমির শহরগুলোতে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেরই ইউনিয়ন, এসোসিয়েশন আছে। [illegible]

সুনাম কোনভাবে হেয় না করে, তার দিকেই এগুলোর নজর। বড়দিনের আনন্দ-উৎসবেও গ্রামভিত্তিক মিলনক্ষেত্র তৈরি হয় বড় শহর-গুলোতে। তবে উৎসবে গ্রামমুখী হতে পারাটাই সবচেয়ে আনন্দের।

আও-নাগা দেশের কুশল প্রশ্ন সব ভালো তো? পরবর্তী প্রশ্ন ওসাং কুদ? —কি খবর। উদয়াস্ত পরিশ্রমের পরই এই সংবাদ পরিক্রমার সময়। ঘরের ভেতরে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে পা ছড়িয়ে, যে আলোচনার সূত্রপাত, সেটা অনায়াসে মধ্যরাত পর্যন্ত গড়াতে পারে। যে লোক পৃথিবীর সংবাদ যোগাতে পারে, তাঁর আগ্রহী শ্রোতার অভাব নেই। নাগা-ভূমিতে পাঁচ-ছয় দশকে সংবাদেরও অভাব নেই। স্পুটনিক থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধের কলাকৌশল সমানভাবে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছে। ফিকা চায়ের সঙ্গে ভূগোল ও ইতি-হাসের পাঠে নিরক্ষরতা কোন প্রতিবন্ধক নয়।

এই ব্যাকুল সংবাদ পর্যালোচনায় একটি সত্য পরিস্ফুট হচ্ছে যে, ইনার লাইনে ঘেরা পৃথিবীতে গত একশ বছরে একটা নতুন সত্তা জন্ম নিয়েছে। স্বাধিকারগত গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটে গেল যে, এবার থেকে আমরা তোমরা ভেদটা ইনার লাইনে চিহ্নিত। ইনার লাইনের ভেতরে আরোপিত নামটাই আমাদের নাম। এইভাবে একটা নামের জন্ম। নতুন নাম নাগাভূমি। নাগা-ভূমির রাজধানী কোহিমাতে ১৮৫০ খৃঃ নাগা নামটাই অর্থহীন ও অপরিচিত ছিল। এ-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন জি এফ এফ ভিন-সেন্ট তাঁর রিপোর্টে—**ডায়রী অব দি এক্স-পিডিশন টু দি আংগামী নাগাস ইন** ১৮৪৯। প্রতিবেশী কাছাড়ীরা সমস্ত স্বাধীন নাগাদের চিহ্নিত করতে নাগা শব্দটি ব্যবহার করতেন, যেটার অর্থ তাঁদের ভাষায় অপরাজিত। এ-কথার পুনরাবৃত্তি ক্যাপটেন বাটলার করেছেন ১৮৭৩ খৃঃ।

নাগা নামের উৎপত্তি নিয়ে যত মতই থাকুক, এখন একটা নির্ভুল সীমানায় নাগারা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নাগাভূমির বাইরে নিজেদের নিকটতম আত্মীয়গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছেন। নাগা নামটা এখন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খোঁজে না, এখন সে তাঁর সুস্পষ্ট প্রতিভার নজিরগুলো খোঁজে।

মহারানীর আমলে, ১৮৬১ খৃঃ বর্তমান নাগাভূমির অংশবিশেষ নিয়ে, নাগাপাহাড় জেলা সংগঠিত হয়। ক্রমে আরো বহু গ্রাম এই জেলার অধীনে আসে। ১৯১৯ খৃঃ ও ১৯৩৫ খৃঃ এই অঞ্চল যথাক্রমে অনগ্রসর অঞ্চল এবং বহির্ভুক্ত অঞ্চল নামে ঘোষিত হয়ে আসামের রাজ্যপালের অধীনে ছিল। ১৯৫০ খৃঃ সংবিধানের (ক অংশে) ষষ্ঠ তপশীলে এই অঞ্চল অন্ত-র্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৭ খৃঃ নাগাপাহাড়-টুয়েনসাং অঞ্চল নামে সংবিধানের (খ অংশে) ভুক্ত হয়ে এই পাহাড়শ্রেণী ১৯৬৩ খৃঃ পূর্ণ রাজ্যের সম্মান লাভ করে।

আহোম রাজত্ব ইংরেজদের কুক্ষিগত হওয়ার সাত বছরের মধ্যেই নাগা-পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আসাম ও মণিপুরকে যুক্ত করার তাগিদ ইংরেজদের দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, আসাম সীমানার মধ্যে নাগাদের আকস্মিক উপস্থিতিতে প্রজাদের প্রাণনাশ বন্ধ করতে ইংরেজ সরকার নাগা-পাহাড়ের ওপর দখল নেবার প্রয়োজন বোধ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় নাগাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান চালিয়ে সমতল-ভূমিতে নাগাদের তৎপরতা বন্ধ করতে সরকার যত্ন নেন। (চলবে)

ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

মিশনারি সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেট হ্যারিংটন সাহেবের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রুফরীডার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রায়ই ঠোকাঠুকি লাগত। একবার সংস্কৃত একটা গ্রন্থের প্রুফে ভুল ধরা পড়ল, সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডের দপ্তরে ডাক পড়ল পণ্ডিতের। খাশ বিলিতি সাহেব বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন—'পণ্ডিত আপনার ভুল হইয়াছে।' ব্যাপারটা দেখে পণ্ডিত জবাব দিলেন—'আমার ভুল হয় নাই। আমার ভুল হয় না।'

একথায় ব্যঙ্গ করে হ্যারিংটন মন্তব্য করলেন—'এতদিন জানিতাম একজনেরই ভুল হয় না, তিনি ঈশ্বর, এখন দেখিতেছি আরও একজনের হয় না, তিনি আমাদের এই পণ্ডিত! কিন্তু পার্টি এই ভুলটি সংশোধন করিতে অর্ডার দিয়াছে।' সাহেবের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক করে অবশেষে পার্টিকে তাঁর ভুল সম্পর্কে লিখে জানাতে রাজি করলেন পণ্ডিত।

ঘটনাটা আমার শৈশবের। কলকাতায় বাবার কাছে থেকে ইস্কুলে পড়ি। দুজনে পরস্পরের সঙ্গী। আর কেউ নেই। একখানা ঘরের বাসিন্দা আমরা। অতএব আলাপ-আলোচনায় পিতা পুত্রের অসাধারণ অন্তরঙ্গতা। সাহেবকে উনি বলতেন 'হ্যারিকেন - লণ্ঠন'। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ন'টি ভাষার প্রুফ দেখতেন। আমার চোখে বাবা অনন্যসাধারণ বিরাট বিস্ময় যত ভালবাসি, ভক্তি করি তার চেয়ে ভয় করি অনেক বেশি। শুধু আমি নয়, বোধ করি রাজবাড়ির সব মানুষই 'ভট্টাচায মশাই'কে ডরাতো। কেবল মহারাজা ছাড়া। শিয়ালদহের কাছে পাহাড়ওয়ালা কাশিম-বাজার রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন চৌহদ্দীতে আরও অনেক ছোট-বড় বাড়ি, মাঠ পুকুর—যেন কলকাতার মধ্যে এ একটা স্বতন্ত্র রাজ্য। দেউড়িতে বন্দুকধারী প্রহরীরা সময় জানাতো পেটা ঘড়ি বাজিয়ে। সকাল আটটার ঘন্টা বাজলেই বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন—'আরে এখনো ভাত দিতে পারলি না। আজ বোধহয় লেট হয়ে গেল।' চাল-ডাল বাছা ধোয়া, পুকুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আধ ঘন্টা ধরে স্নান-আহ্নিক করা—প্রতিটিই বিরাট পর্ব। কুকারে রান্না চড়িয়ে দিয়ে তিনি তেল মেখে ঘাটে যেতেন আমার কাজ ছিল কেবল কুকার থেকে ভাত, ডাল, তরকারি নামিয়ে বাবাকে খেতে দেওয়া।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর অমৃতবাজার পত্রিকার নতুন ভবনের উদ্বোধন করার সংবাদ পড়ে এক ঝলকে উনিশশ' পঁয়ত্রিশ সালের স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে শুরু করল। আপার সার্কুলার রোডের পাহাড়কে পিছনে রেখে, মালকোচা দিয়ে ধুতি পরা, গায়ের চাদর (জামা নয়) হাওয়ায় উড়িয়ে সেই সঙ্গে টাকের ওপর টিকিও উড়িয়ে পণ্ডিত সাইকেলে চড়ে ছুটতেন—একচল্লিশ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে পাদ্রীদের রাজ্যে তাঁর সারাদিন কাটতো। সাড়ে আটটা থেকে ডিউটি শুরু তখন ছিল ইন্ডিয়ান টাইম, স্ট্যান্ডার্ড টাইমে কেবল রেল চলত তাছাড়া সবই চলত ইন্ডিয়ান টাইমে।

বাবা ন'টা ভাষার প্রুফ দেখতেন কিন্তু ওই প্রেসে তখন চল্লিশটি ভাষায় বইপত্র ছাপা হ'ত।

ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস পত্তনের পিছনে ছিল খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলায় বাই-বেল মুদ্রণ। উইলিয়াম কেরি নীলকুঠির কাজের ফাঁকে ফাঁকে মদনাবাটিতে (মালদহ) বসেই নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করেন, কলকাতা থেকে একটা ছাপাখানাও কেনা হয়। ১৭৯৯ সালে শ্রীরামপুরে থাকার আমন্ত্রণ পেয়ে কেরি চলে এলেন সেখানে। বলা বাহুল্য যে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল মদনবাটিতেও তৈরি করেছিলেন, আর শ্রীরামপুরে সেটা আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে শুরু করলেন। তখনকার বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই পাদ্রীদের সইতে পারত না, তার কারণ, এদেশে কোম্পানি কেবল শাসন-শোষণের দিকে শকুনের মত নজর রেখে এসেছে। বিদেশীদের ধর্ম প্রচারে পাছে এদেশের মানুষ বিগড়ে যায়, যদি কারবারে তাতে বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় ব্যবসায়ের মূল ঘাঁটি কলকাতায় মিশনারি-দের ঠাঁই দিতে অনিচ্ছুক ছিল কোম্পানি। সে কাহিনী ফেঁদে বসলে সাত কাহন। অতএব আমরা ছাপাখানার কথায় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি।

১৭৯৯ সালে মার্শম্যান আর ওয়ার্ড বিলেত থেকে চলে আসেন সরাসরি শ্রীরাম-পুরে। ১৮০০ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুরের বড়দারছত্ত পত্তন হল। ওয়ার্ড ছিলেন মুদ্রণে বিশেষজ্ঞ। কাজেই উইলিয়াম কেরির বাংলা বাইবেল ছাপার কাজে আর অসুবিধে রইল না। এটা ১৮০৯ সালের কথা। উইলিয়াম কেরিকে ফোর্ট উইলিয়াম

চীনা ভাষায় কাঠের ব্লক থেকে লসন যে আলাদা আলাদা ধাতুর টাইপ তৈরী করেন তার নমুনা

[illegible]

CHINESE.

WOOD BLOCK.

TEXT. "And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand, not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth the man."

MATH. xv. 10, 11.

他喚眾曰
聽而明之
所入口者
則不穢人
也然所以
從口而出
即污人也

CHINESE.

MOVEABLE METAL TYPES.

TEXT. "In the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light." GEN. i. 1—3.

原始神創
造天地也
未成形陰
氣蘊于空
虛幽遂之
內神風運
行水上神
日光而遂
光

[illegible] বাংলা শেখানোর চাকরি দেওয়া হল। তার মাইনের টাকায় মিশনের কাজের বেশ সুবিধে হল। এদিকে ১৮১২ সালে কোম্পানি ভাবৎ খৃস্টধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ঘোষণা করার ফলে কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজে বাধা অপসারিত হল। শ্রীরামপুরের কৃশ্চান বন্ধুরেরা বিলেত থেকে আরও কাজের মানুষ আনার দিকে উদ্যোগী হলেন। এলেন লসন ও জনস। কিন্তু তাদের ফিরে যাবার হুকুম হল। অবশেষে অনেক দরবার করে লসনের থাকার অনুমতি মিলল—কারণ, লসন টাইপ বানাতে পারেন অর্থাৎ দক্ষ কারিগর হিসেবে তাঁকে রাখা যায়, প্রচারক হিসেবে নয়।

১৮১৮ সালে ধর্মমত নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফাটল—শ্রীরামপুরের হাঁড়ি হেসেল ভেঙ্গে হল। তার ফলে শ্রীরামপুর ছেড়ে রেভারেণ্ড জে পিয়ার্স আলাদা হয়ে চলে এলেন। কলকাতায় নতুন ছাপাখানা খুললেন।

এণ্টালিকে চালাঘরে ১৮১৮ সালে যে ছাপাখানার পত্তন হল, দেখা গেল প্রতিযোগিতামূলক কর্মতৎপরতার ফসল ফলিয়ে শ্রীরামপুরকে অল্প দিনেই টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে সেটি। ১৮২১ সালে ৭০০০০ ধর্মপুস্তিকা ও স্কুলের পাঠ্যবই এখানে ছাপা হল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিঃ য়েটস-এর সংস্কৃত ব্যাকরণ। ১৮২৯ সালে এখান থেকে প্রকাশিত হল নবকলেবরে আগের চেয়ে অনেক ছোট টাইপে নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ। এই প্রেস নিজেদের ব্যবহারের জন্য টাইপ তৈরি করতে এবং কলকাতার অন্যান্য প্রেসকেও সরবরাহ করতে লাগল। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনের এই ছাপাখানা ব্যবসায়েও সুফল মুনাফার মুখ দেখল।

১৮৩০ সালে প্রেসের লাভ হল এক হাজার পাউন্ড।

অবশেষে কোন্দলের মীমাংসা হল ১৮৩৭ সালে। শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রণ বিভাগ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায় এবং যুক্ত করা হল পিয়ার্সের প্রেসের সঙ্গে। আর শ্রীরামপুরে রইল কেবল টাইপ বানানোর অংশ বিশেষ ডঃ য়েটস বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের পরিমার্জিত অনুবাদ করেছিলেন সেটি ১৮৩৮ সালে সংযুক্ত পরিবর্ধিত নতুন ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল, এর বছর ছয়েক পরে তাঁর অনূদিত ওল্ড টেস্টামেন্টের বাংলা সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়। অনুবাদের কাজে মিঃ ওয়েঙ্গার তাঁকে সাহায্য করেন। মিঃ টমাসকে নতুন প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং মিশনের সেক্রেটারি করা হল। ধর্ম প্রচারের দিকে মিশনারিদের কর্মক্ষেত্র ক্রমেই প্রসার লাভ করছিল। তার ফলে বাইবেলের চাহিদাও বেড়ে চলল, ১৮৩৫-৪০ সালে দেড় লাখের ওপর এই গ্রন্থ বিতরণ করা হয়। প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বাইবেল বিতরণ চলে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত। ওই বছরে এর বাংলা পকেট সংস্করণ প্রকাশ করে প্রথম নগদ মূল্য ধার্য করা হয় ছ আনা। পয়সা দিয়ে বাইবেল কিনে পড়ার মত গরজ কজনেরই বা থাকে। অতএব গোড়ায় বই তেমন বিক্রি হত না। না হলেও গায়ে লাগত না। কেন না ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের ছাপা খুব ভাল, মুদ্রণ প্রমাদ নেই, অতএব বাইরের বই পত্তর ছেপে, টাইপ বেচে লাভ হচ্ছে। লাভের কাঁড় লাগিয়ে

বিভিন্ন ভাষার কম্পোজিং বিভাগ
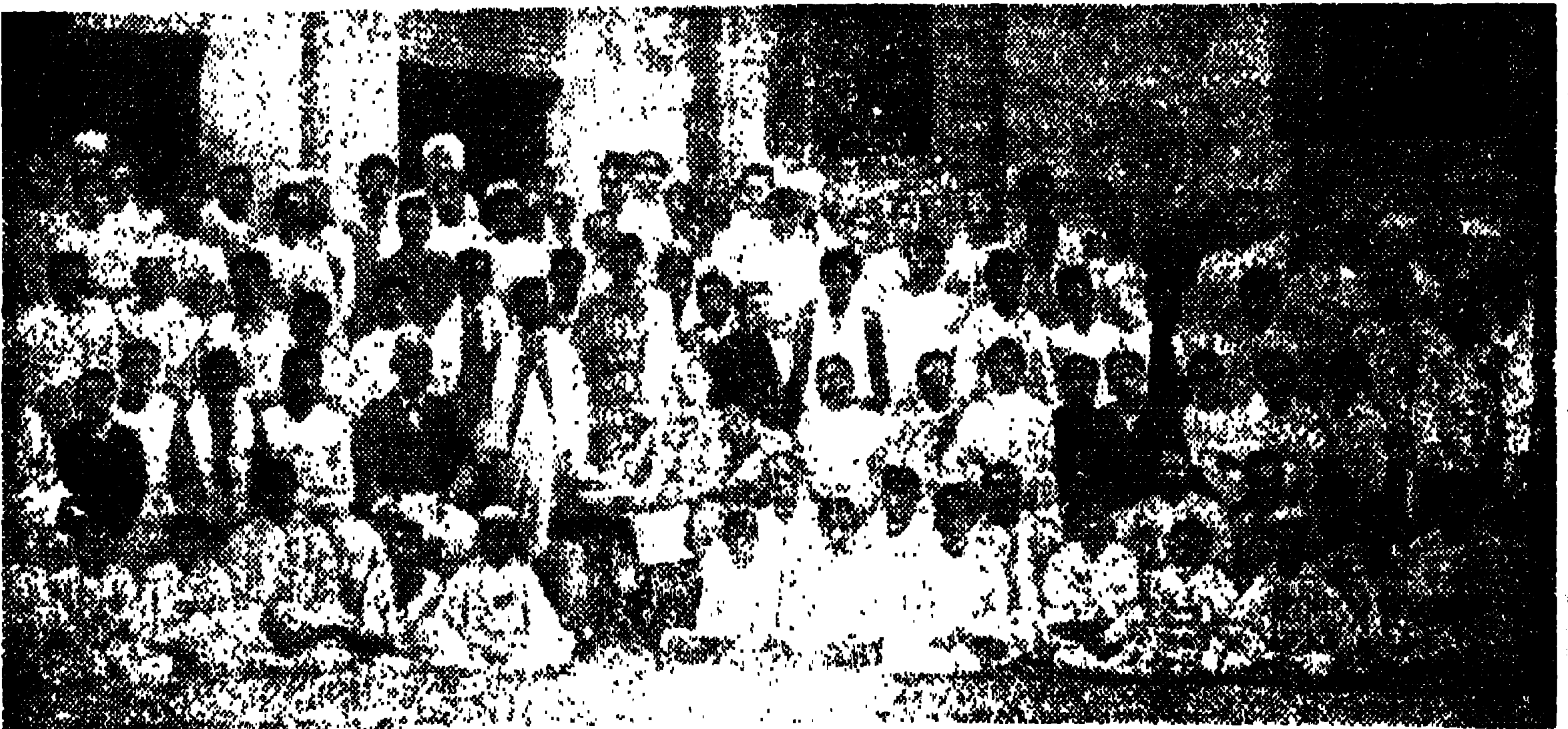
[illegible] জে ডব্লু টমাসের বিদায় সভায় মিশন প্রেসের কর্মীরা ১৯০১ খৃঃ

দেওয়া হোক ধর্ম প্রচারের-এর পিছনে, লাগিয়ে দেওয়া হোক ভারতের খৃস্ট ধর্মের বিজয় অভিযানে। ১৮৫৭ থেকে ৬৭ সাল পর্যন্ত দশ বছরে প্রেস যে ৩২০০০ পাউন্ড রোজগার করেছিল তা উপরোক্ত খাতে ব্যয় করা হয়েছিল। ১৮৬০ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য এখান থেকেই ছাপা হয়েছিল।

কেবল বাংলা অনুবাদ দিয়ে বিবিধ ভাষাভাষী ভারতের বিরাট জনগণের মধ্যে খৃস্টধর্ম ছড়িয়ে দেওয়া যাবে না এটা বুঝতে সায়েবদের অসুবিধে হয়নি। সেই উদ্দেশ্যে ক্রমেই বিভিন্ন ভাষার টাইপ তৈরি। আমদানি শুরু হয়: ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, মিশনারি সোসাইটির দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৪২ সালে যে ই আর মাই উইটনেসেস গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, তার বিবরণ থেকে জানা যায়, চল্লিশটি ভাষায় ছাপার কাজ হয়। অবশ্য শ্রীরামপুরের প্রেসে পাঞ্জাবী, মারাঠী, চীনা, ওড়িয়া, বর্মী, কানাড়ী, গ্রীক হিব্রু টাইপও থাকত এ-কথা ১৮১১ সালে ওয়ার্ডের বিবরণে পাওয়া যায়।

ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের (৪১এ লোয়ার সার্কুলার/আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) সঙ্গে পিতৃসূত্রে আমার কৈশোর স্মৃতি তিরিশের দশকে। বাবা আমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখিয়েছিলেন। মাটির নিচে একটা তলা ছিল, বেশ মনে পড়ে। সেখানে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ছাপা হত। এর নাম ছিল কনফিডেন্সিয়াল সেকশন। বাবার কাছেই জেনেছিলাম যে, গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কোশ্চেন পেপার জাহাজে ছাপা হয় এটা গুজব। আসলে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে সবরকমের টাইপ থাকার ফলে তার দ্বারস্থ হতেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার।

শুধু গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রেই এর কর্তৃপক্ষ সততা দেখাতেন না, তাঁরা নির্ভুল মুদ্রণের দায়িত্বও নিষ্ঠাসহকারে পালন করতেন। একবার একটি বিজ্ঞানের বই-এর বাংলা ও অসমিয়া সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। দুটিরই প্রুফ সংশোধন করেছিলেন আমার বাবা। বই ছাপার পর নাইট সাহেব (ইনিই আসল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) বাবাকে ডেকে একটি ভুল দেখিয়ে দিলেন। বাবা জবাব দিলেন 'বাংলায় কলি চুন আছে, তাই অসমিয়াতে বালি চুন লেখা দেখে আমার মনে হল, এটা সংশোধনের প্রয়োজন, অতএব দুটি একরকম করে দিয়েছি।' নাইট সাহেব বুঝিয়ে দিলেন যে, পার্টি অসমিয়াতে বালি চুনই রাখতে চান। অতএব আবার ওই অংশ নতুন করে ছেপে দিতে হবে। এর ক্ষতিপূরণ পণ্ডিতকে দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ বলতে কাগজের দাম, এবং সেটা ধীরে ধীরে কয়েক কিস্তিতে মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে।

কলকাতার মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত, কম্পোজিটর, প্রুফরিডার প্রভৃতি কর্মচারী-দের দারিদ্র্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কিন্তু ব্যাপটিস্ট প্রেস যেন আলাদা জগতের রূপ-কথার দেশ। সেখানে ওই সময়েই বছরে দুবার বোনাস দেওয়া হত, ছিল প্রভিডেন্ট ফান্ড—একশ টাকার নোট তখনই প্রথম চাক্ষুষ করেছিলাম। অবিশ্যি অর্থকৃচ্ছ্রতার উপশম তাতে সামান্য হত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটি সর্বদিক দিয়েই বিশুদ্ধতার পূজারী ছিলেন —ঘি, দুধ, দই ভালোই জুটত আমার ভাগ্যে। বহরমপুরে আমাদের পরিবারটি ছোট ছিল না। তার উপর আত্মীয়পোষাও কিছু ছিল। বাবা কলকাতায় থাকতেন আর দাদা দেশে চুটিয়ে স্বদেশী করতেন। আমাকে বাবার নিজের কাছে এনে রাখার সেটাই বড় কারণ।

কথায় কথায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে দূরে চলে এসেছি। স্মৃতির রাজ্যে ঢুকে পড়ার এটাই বড় উপসর্গ। মুদ্রার বাজারে প্রেস যখন কাজের অভাবে সংকটা-পন্ন তখনও ছাঁটাই-এর আশ্রয় নেয়নি, তখন ইংরেজ আমল এবং কর্মচারী ইউনিয়ন বলতে মুদ্রণ শিল্পে তেমন কিছু ছিল না। হাফ-ডে কাজ করিয়ে প্রেসের সকলের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের আরও উন্নতি হয়েছিল—ছেচল্লিশটি ভাষায় ছাপার বন্দোবস্ত হয়েছিল। মনে পড়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া প্রথমে এখান থেকেই ছাপা হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী এই প্রেস কেনার আগে ১৯৭২ সালে প্রেসের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর মূলে ছিল কর্মচারী-দের ধর্মঘট। লেঃ কর্নেল কোশি জজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তা হল এই: প্রেসের সঙ্গে যে দপ্তরীখানা ছিল সেখানেই গোলমালের সূত্রপাত হয়। দপ্তরীখানার কর্মচারীরা অযৌক্তিক কতকগুলি দাবি করেন এবং প্রথমে নিজেদের কাজ বন্ধ করে দিলেন। কর্তৃপক্ষ ওইসব দাবি মানতে অসম্মত হওয়ায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী প্রেসের কাজে নানারকম বাধা সৃষ্টি করলেন এবং শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দপ্তরীখানার কর্মীদের সংগে হাত মেলালেন। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল। অবশেষে ধর্মঘট। জট বেশ পাকিয়ে উঠল। ব্যাপটিস্ট প্রেস কোনো ভারতীয় শিল্পপতি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ছিল না এটি ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির সম্পত্তি। এখানকার লাভের টাকা এদেশে উক্ত সোসাইটির বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হয়ে এসেছে। প্রেসের শত শত কর্মচারী-

WORDS

(a) Local scripts

(b) Phonetic scripts

Sl. No.	ENGLISH	SANSKRIT	BENGALI	ASSAMESE
209	Hoof	(a) शफ- (b) japha-	(a) খুর (b) khur	(a) খুৰা (b) khura
210	Horn	(a) शृङ्ग- (b) ʃriŋga-	(a) শিং (b) ʃi : ŋ	(a) শিং (b) xiŋ
211	Horse	(a) अश्व-, घोटक- (b) ajwa-, ghoṭaka-	(a) ঘোড়া (b) ghoṛa	(a) ঘোঁৰা (b) ghora
212	Lamb	(a) मेषशावक- (b) mega-ʃa : waka-	(a) ভেড়ার ছানা (b) bheṛar chana	(a) ভেড়া পোৱালী (b) bhera poali
213	Leopard	(a) द्वीपिन्- (b) dwi : pin-	(a) নেকড়ে, নেকড়ে বাঘ (b) nekṛe, nekṛe bagh	(a) নাহৰ ফুটুকী (b) nahor phutuki
214	Lion	(a) सिंह- (b) sinha-	(a) সিংহ (b) ʃinho	(a) সিংহ (b) xinho
215	Lizard	(a) गोधा (महत्) गोधिका (लघु) (b) godha : (big) godhika : (small)	(a) গিরগিটি, টিকটিকি (b) girgiṭi, ṭikṭiki	(a) জেঠী (b) zethi
216	Louse	(a) उत्कुण- (b) utkuṇa-	(a) উকুন (b) ukun	(a) ওকণী (b) okoni
217	Mongoose	(a) नकुल- (b) nakula-	(a) নেউল (b) neul	(a) নেউল (b) neul
218	Monkey	(a) वानर-, मर्कट- (b) wa : nara-, markaṭa-	(a) বাঁদর (b) bãdor	(a) বান্দৰ (b) bandor
219	Mosquito	(a) मशक- (b) maʃaka-	(a) মশা (b) moʃa (moʃa)	(a) মহ (b) moh
220	Mouse	(a) मूषिक- (b) mu : ṣika-	(a) ইঁদুর (b) ĩdur	(a) নিগনি (b) nigoni
221	Owl	(a) पेचक-, उलूक- (b) pecaka-, ulu : ka-	(a) পেঁচা (প্যাঁচা) (b) pẽca	(a) ফেঁচা (b) phẽca
222	Parrot	(a) शुक- (b) ʃuka-	(a) টিয়া, টিয়াপাখী (b) ṭia, ṭia pakhi	(a) ভাটৌ (b) bhaṭou
223	Peacock	(a) मयूर- (b) mayu : ra-	(a) ময়ূর (b) moyur	(a) ময়ূৰা চৰাই (b) moura sorai
224	Pig	(a) शूकर- (b) ʃu : kara-	(a) শুয়র (b) ʃuor	(a) গাহৰি (b) gahori

(199)

একই সঙ্গে আটটি ভাষা ছাপার নমুনা।

HINDI	PANJABI	GUJARATI	MARATHI	Sl. No.
(a) खुर (b) khur	(a) ਖੁਰ (b) khūr	(a) ખરી (b) kheri	(a) खुर (b) khu:r	209
(a) सींग (b) sīg	(a) ਸਿੰਗ (b) sīng	(a) શીંગડું (b) śiŋgduŋ	(a) शिंग (b) śiŋge	210
(a) घोड़ा (b) ghoṛa	(a) ਘੋੜਾ (b) kōṛa	(a) ઘોડો (b) ghodo	(a) घोडा (b) ghoḍa	211
(a) मेमना (b) memna	(a) ਮੇਮਣਾ (b) māmmena	(a) ઘેટું (b) ghetuŋ	(a) कोकरू (b) kokru:	212
(a) चीता (b) cita	(a) ਚਿਤਰਾ (b) tʃittara	(a) ચિત્તો (b) citto	(a) चित्ता (b) citta	213
(a) शेर (b) ʃer	(a) ਸ਼ੇਰ (b) ʃēr	(a) સિંહ (b) sihŋ	(a) सिंह (b) [illegible]	214
(a) छिपकली (b) chipkali	(a) ਕੋਰਕਿਰਲੀ (b) kōṛ kirli	(a) ગરોળી (b) goroli	(a) सरडा, सरडोका (b) sarda, sardoka	215
(a) जूं (b) jū	(a) ਜੂੰ (b) dʒū	(a) જૂ (b) ju	(a) ऊ (b) u	216
(a) नेवला (b) newla	(a) ਨਿਉਲਾ (b) neōla	(a) નોળિયો (b) nolio	(a) मुंगुस (b) mungus	217
(a) बन्दर (b) bandar	(a) ਬਾਂਦਰ (b) bāndar	(a) વાંદરો (b) vandro	(a) माकड वानर (b) makad vanar	218
(a) मच्छर (b) macchar	(a) ਮੱਛਰ (b) mättʃhar	(a) મચ્છર (b) macchar	(a) डास (b) das	219
(a) चूहा (b) cuha	(a) ਚੂਹਾ (b) tʃūa	(a) ઉંદર (b) undar	(a) उंदीर (b) undir	220
(a) उल्लू (b) ullu	(a) ਉੱਲੂ (b) ūllu	(a) ઘુવડ (b) ghuvad	(a) घुबड (b) ghubad	221
(a) तोता (b) tota	(a) ਤੋਤਾ (b) tōta	(a) પોપટ (b) popat	(a) पोपट (b) popat	222
(a) मोर (b) mor	(a) ਮੋਰ (b) mōr	(a) મોર (b) mor	(a) मोर (b) mor	223
(a) सूअर (b) suar	(a) ਸੂਰ (b) sūr	(a) ભૂંડ (b) bhund	(a) डुक्कर (b) dukkar	224

বর্গও বঞ্চিত হননি কখনো। এতগুলি ভাষার মুদ্রণের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে কাজের ফরমাস আসতো। কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দিনে দিনে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে লাগল। মিশনের বিদেশস্থ কর্তৃপক্ষ এই ক্ষতির খেসারৎ গুণতে রাজি নন। এদিকে অনেক চেষ্টা করেও যখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী কর্মীদের সঙ্গে কোনো মীমাংসায় আসতে পারলেন না তখন প্রেস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের মত আর একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কি আমরা তৈরি করতে পেরেছি? পারিনি তার ছোট্ট একটি প্রমাণ স্বরূপ কোশি জর্জের কথায় ফিরে যাই। ১৯৭২ সালে যখন প্রেস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই সময়ে ভারত সরকারের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ ছাপা চলছিল বইখানির নাম Seven lauguage grammer এতে ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা, অসমিয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী মারাঠী, ভাষার ব্যবহার আছে। কাজটা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় প্রেস বন্ধ হয়ে গেল। অথচ আর সামান্য পরিমাণ ছাপা শেষ করতে না পারলে সরকারের কাছে ত্রিশ হাজার টাকার বিল করা চলে না। কোশি তখন কলকাতার বড়, ছোট সম্ভাব্য ছাপাখানায় হন্যে হয়ে ঘুরলেন কিন্তু কোথাও তিনটির বেশি ভাষার টাইপ নেই। অবশেষে নিজেদের প্রেসে ছাপা ফর্মা ঘেঁটে comparative vocabulary texts' অংশের টাইপ সাজানো সমাধা করলেন এবং ব্লক তৈরি করে ছাপলেন।

একসঙ্গে আটটি ভাষার ছাপার নমুনা

কোশি জর্জ কোনো বিদেশী ব্যক্তি নন, ভারতীয় কৃশ্চান এবং তিনি পাদ্রী নন। সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষিণ ভারতীয় মানুষটি ১৯৭১ সালে এই প্রেসে চাকরি নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত তাঁর দপ্তরে একখানি চিঠিতে দেখলাম, ১৯১৭ সালে এই প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ C H Harvey বর্মার মিশনারি সোসাইটিকে লিখছেন বিশ্বযুদ্ধের দরুণ নানা সমস্যার মধ্যে দিন কাটছে এবং যে লোকটা নিরপরাধ, শান্তিকামী মানবসমাজের ঘাড়ে হিংসা হানাহানি চাপিয়ে দিয়েছে সেই কাইজারকে যূপ কাষ্ঠে বলি দেওয়া উচিত মনে করি—তবু এর মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের কৃপায় লুসাই ভাষার লাইনো টাইপ তৈরি করে ফেলেছি। তার নমুনাও সেই চিঠির সঙ্গে গাঁথা রয়েছে দেখলাম। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের অবদানের কথা বলতে বলতে মনে পড়ে যাচ্ছে ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে লর্ড লিটনের আমলের দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের বেহায়া আইন আরোপের কথা। ১৮৭৭ সালে ভারতে অসাধারণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৭৮ সালে ভারত-আফগান যুদ্ধে অবতীর্ণ হল ইংরেজ সরকার এবং দুর্ভিক্ষ তহবিলের টাকা দুর্গত দুর্ভিক্ষ পীড়িত দাক্ষিণ ভারতের মানুষের ত্রাণকল্পে ব্যবহৃত হল না, তার বদলে যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্যচালনার পেছনে ঢালা হল। সরকারের এই দায়িত্বহীন নীতির সমালোচনায় কলকাতার যেসব সংবাদপত্র সোচ্চার হয়ে উঠেছিল অমৃতবাজার পত্রিকা তাদের অন্যতম। সংবাদপত্রের এই কণ্ঠরোধ প্রয়াসের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমপ্রকাশ, নববিভাকর ও সাধারণী প্রকাশ বন্ধ করা হল। আর অসাধারণ দৃঢ়চিত্ত শিশিরকুমার ঘোষ রাতারাতি অমৃতবাজার পত্রিকাকে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশের অনন্যসাধারণ কর্মতৎপরতার পরিচয় দিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান নিঃসন্দেহে মহীরুহ সদৃশ। এজন্য নানা সময়ে পীড়ন সইতে হয়েছে সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষকে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের অধুনাতম এই কাল পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর গতি অব্যাহত। ভারতীয় সংবাদপত্রে তার ভূমিকা অদ্বিতীয় বলা যায়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে কিনা বলতে পারব না। কিন্তু ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে গেলেও তার কিছু ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে না হোক ধারাবাহিকতা সূত্রে সেই অমৃতবাজার পত্রিকার কাছে এসে পড়েছে। না, ঠিক এসে পড়েনি, রীতিমত নগদ মূল্যে অধিকার করেছেন।

১৯৭২ সালের নভেম্বরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস বন্ধ হয়ে যাবার পর কিছুদিন কাটে। ১৯৭৩ সালে প্রেস বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন পাঠানো হয় বিভিন্ন জায়গায়। ইংরেজিতে বিজ্ঞাপনের যে কপি প্রকাশের জন্য পাঠান হয় তার একটি কপি আমারই হাতে পড়েছিল। কপিটা পড়ে যে তীব্র বিষণ্ণতা আমায় পেয়ে বসেছিল তা পরমাত্মীয় বিয়োগ ব্যথার সমগোত্রীয়। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসটি কিনেছেন। স্বভাবতঃই জনমনে এমনতর ধারণা হয় যে, শুধু ইমারৎটিই কেনা হয়নি, সেই সঙ্গে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও সমাধি ও শ্রীমণ্ডিত করবার দায়িত্বও গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর ১৯৮০ সালে উন্মোচনকালে কলকাতা তথা এই রাজ্যের নাগরিকদের কাছে যেন তারই উদ্বোধন করলেন।

তামস

সুজিত দাশগুপ্ত

ওর পিঠে একবার চটি আছাড় মারতেই নিশি ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকায়। ওর চোখ আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে এনে দেয়। নিজের জায়গায় গিয়ে বসি। মৃদু আলোর পর্দা সরিয়ে নিশি নিজের ঘরে ফেরে। আমার পুব দিকের এই খোলা বারান্দায় বসলে দেখি অনেক দূর থেকে অতি তীব্র গতিতে অন্ধকার ছুটে আসছে।

পার্থিব জগতের সীমায় এই যে সাদা বালির উঠোন—তারই এক ধারে আমার বাড়ি। সাদা রং। সন্ধ্যের পরে আমার ঘর-গুলোতে ল্যাপচে আলো জ্বলে। সন্ধ্যে যেমন তেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। কিন্তু দিনের বেলা, সারা দিন যেন কুয়াশা লেপ্টে থাকে দিগন্তপ্রসারী হয়ে। আর সারাদিন ঘুরে ফিরে দেখা হয় এক-জনের সঙ্গে। সে আমার নিশিদা। নিশিকান্ত।

ও কখনো আমার বাড়ির পেছনের ইউক্যালিপ্টাসের ছায়ায় বসে ঝিমোয়। কখনো দেখি প্যারাপেটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘাম ঝাড়ে। কখনো রোদে, ওই আকাশ-ছোঁয়া সাদা বালির ডাঙায়। আবার কখনো আমারই ঘরে আয়নার সামনে ওকে আবিষ্কার করি। ও কত সময় আমাকে ছেড়ে যেতে চায় কিন্তু আমি ওকে ছাড়ি নি। ছাড়ি না। সারাদিন ঘুরে ফিরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। একদিন ওকে অবস্থা খারাপ পেড়েছিলাম। আমার চটিটা আছাড় মেরেছিলাম ওর পিঠের ওপর। [illegible] সব উজ্জ্বল আলো নিভে গিয়ে-ছিল তখন। [illegible] একটা ল্যাপচে আলো [illegible] দিকে [illegible] থেকে [illegible]। [illegible] পুরোনো দিনের ড্রেসিং টেবিলের ওভালসেপের আয়নায় তার ঘোলাটে ছায়া পড়েছিল। আমার খাটের ওদিকে, দরজার আড়ালে, ড্রেসিং টেবিলের ধার জুড়ে একটা আবছায়া ভাব ছড়িয়ে ছিল। নিশির মুখের একটা দিক আমার চোখে পড়ছিল। চেঁচিয়ে উঠে-ছিলাম, শালা বদমাস, নিমকহারাম। আমার চটিটা শেষবার ওর পিঠে আছাড় মেরে পশ্চিমের ঝুল বারান্দায় এসে বসেছিলাম।

পশ্চিমের এই বারান্দায় বসলে একটা শতাব্দী আমার চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে নিভে আসছে তার আলো। তবু যতটুকু পারি দেখার চেষ্টা করি। উত্তরের দিগন্তের ওপর বিষণ্ণ ধ্রুবতারা জ্বলছে। আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র তারার আলো। চতুর্দিকের অন্ধকার অবয়বের ভেতর কোনো কোলাহল কারুর গলার স্বর শুনি না। এই সময়ে ঘরের ভেতরের ম্রিয়মান আলোর পর্দা সরিয়ে নিশি উঁকি দেয়। নিচু গলায় প্রশ্ন করে, খাবার দেব ছোটোবাবু? —ওকে দেখে রাগ পড়ে যায়। হ্যাঁ, না—একটা কিছু বলি। ও চলে যায়।

নিশি যখন আমাদের বাড়িতে এল তখন প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে লোকজনের হাট বসত। তখন কোথায় ছিল ওই আশমান-জমিনে ঠেকে যাওয়া ধু-ধু বালির সাম্রাজ্য। কোথায় এই পুবের আর পশ্চিমের ঝোলানো বারান্দা। তখন প্রয়ো-জনের অতিরিক্ত অবকাশ ছিল সমস্ত উঠোন জুড়ে। বাবা খাওয়া দাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রাম করে পান চিবোতে চিবোতে পাঁয়ে-সুস্থে টমটমে গিয়ে উঠত। সাহা [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] খাওয়া বন্ধ করে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াত কখন লাগামে টান পড়ে তারই অপেক্ষায়। বাবার ছিল দোভাষীর চাকরী। আমাদের অঞ্চলে তিনি দোভাষী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন।

বাবা চলে গেলে শুরু হত আমাদের উৎসব। আমরা ছোটরা বাড়ির আনাচে-কানাচে হৈ-চৈ তুলতাম। এইভাবে শুরু হত একটা নতুন আনন্দের দিন। শীতের সকালে সহজে ঠান্ডা মরতে চায় না। যখন শরীর জাগানো রোদ্দুর ওঠে তখন আকাশে ঘুড়ি উড়ছে। অবসর কুড়িয়ে বাইরের চাঁপাতলায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে নিশিদা। ওর সঙ্গে আমাদের বেশ মিলত। বাঁশি বাজাত। ডাংগুলি খেলত। ঘুড়িও উড়িয়েছে অনেক সময়।

বাবা দোভাষী হওয়ার সূত্রে অনেক সাহেবের সঙ্গে আলাপ ছিল। কোনো কোনো লালমুখো সাহেবকে কখনো সখনো আমাদের বাড়িতে আসতে দেখেছি। একবার সাহেবের সঙ্গে একজন মেম এসেছিল। আমাদের অন্দরমহলে এসে টানা টানা বাংলায় মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিল। আমাদের মত মায়েরও চোখ জুড়ে ছিল অবাক বিস্ময়। মা বলেছিল, আপনি খুব সুন্দর।

মেমটা মায়ের কথায় হেসেছিল। মাঝে মাঝে কৌতূহলী চোখে ঘরের ভেতর এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। এই সময় বাবা ভেতর ঘরে এসে আমাকে দেখেই বলল, এাই প্যান্টের বোতাম লাগান নেই কেন? যাও লাগিয়ে এস।—

আগে থেকেই আমরা তৈরী হয়ে ছিলাম। ভালভাবে স্নান করে, পরিষ্কার জামা-প্যান্ট পরে। সাহেব আসবে বলে নয়, অপরিচিত নতুন কোনো অতিথি আসবে বলেই। কখন বোতাম খোলার দরকার হয়েছে। অথবা আদৌ লাগাই নি হয়ত।

আমাদের ছিল অনেক ধানি জমি। গোটা চারেক লাঙ্গল। আটটা বলদ। কালো গরু ছিল। একটা ছিল বাদামী রঙের। তার কপালে খয়েরি রংয়ের চাঁদ আঁকা। আমাদের জমি গরু গাছপালা সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করত নিশিদা। হাটবারে হাটে যেত। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যে কুকথালি [illegible] চলে গিয়েছে সেই পথে বাঁকে বোঝাই করে হাটের জিনিসপত্র নিয়ে ফিরত ও। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাইরের বৈঠকখানার লাগোয়া বারান্দায় বসে ও হুঁকো খেত। চন্দ্রদার সঙ্গে ছিল ওর খুব ভাব। চন্দ্রদা আমাদের জমি জায়গার হিসেবপত্তর রাখত। একদিন কিভাবে যেন জেনেছিলাম চন্দ্রদা ভাল রামায়ণ মহাভারতের গল্প জানে। তারপর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের গল্প শোনানো চন্দ্রদার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ত। ভেতরের বৈঠকখানায় আমরা শুয়ে বসে গল্প শুনেছি। বাইরের বারান্দায় নিশিদা হুঁকোর গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ

জ্বলছে। প্রতি সন্ধ্যায় আমার পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হয়। সরমার মা পায়ে বিলিতি অলিভ অয়েল ঘষছে। শুয়ে শুয়ে শুনছি। ঘরের মধ্যে সেজের মৃদু আলো দেওয়ালে একেকটা বড় বড় ছায়া তৈরী করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় পঞ্চবটি বনে সোনার হরিণের পিছু ধাওয়া করতে করতে অনেক দূরে চলে এসেছে রাম। লক্ষণের এবার দরজার বাইরে গন্দি কেটে দেওয়ার পালা। এমন সময় ভেতর বাড়ি থেকে বাবার তারস্বরে চীৎকার, চন্দ্র কোথায়, চন্দ্র ?—

চন্দ্রদা আচমকা থতমত খেয়ে উঠল। আমরা পঞ্চবটি থেকে হঠাৎ নিজেদের বৈঠকখানায় ফিরে এলাম। কি হল তাই দেখার জন্য ভেতর বাড়িতে আসতেই দেখি বাবা চন্দ্রদার একটা কান ধরে নিজের ঘরের দিকে চলেছে। ঘরে গিয়ে বাবা নিজের জায়গায় বসল। চন্দ্রদা মাথা হেঁট করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। বাবা বলল, কি শুনছি তোমার নামে এসব ?—

চন্দ্রদা একবার মাথা তুলে অবাক চোখে তাকাল। বাবা বলল, তুমি এখানে চাকরী করছ আজ কত বছর ?

চন্দ্রদা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল; তা আজ্ঞে চোদ্দ বছর তো হবে।

বাবা একজন মোসাহেবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, নরেন্দ্র বলছে তুমি একটা মাটির দালান তুলেছ টিনের ছাউনী দিয়ে। তুমি কি এমন মাইনে পাও ও জানতে চেয়েছে।—

চন্দ্রদা কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ তুলেছি।

—তুমি একটা শুয়ার। তুমি চোদ্দ বছর চাকরী করে একটা পাকা দালান তুলতে পার নি ? লোকে কি বলবে, অ্যাঁ ?—

বাবার বন্ধু নরেন্দ্রর মুখ ম্লান হয়ে গেছে দেখলাম। বাবা বলল, এক মাস সময় দিলাম এর মধ্যে পাকা দালান তোলা চাই। যাও আমার সামনে থেকে।—

চন্দ্রদা মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল।

পুবের ঝুল বারান্দায় বসলে দেখতে পাই পার্থিব জগতের উঠোন জুড়ে সাদা বালির চর সেই দিগন্ত সীমায় গিয়ে মিশেছে। ওই বালিতে অনেক হেঁটে দেখেছি। পায়ের ছাপ পড়ে যায়। কখনো কখনো বসেও যেতে চায়। কিন্তু সম্পূর্ণ বসে না। এইভাবে অজস্র পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়ে আছে ওইখানে। দিনের বেলা খোলাটে সূর্য দেখা দেয়। চরাচর জুড়ে বিষাদের প্রতিমা জেগে থাকে। অনেক দূর থেকে অন্ধকার যাবতীয় হাসি-কান্নার ঢেউ ঢেকে দিয়ে ছুটে আসে। যেমন রেডিওর শর্ট ওয়েভ মিটারের নব ঘোরালেই বহুদূরে সমুদ্রের ওপার থেকে জল-স্থল কাঁপিয়ে বাতাসের ছুটে আসার শব্দ শোনা যায়। আমার শরীর মন জুড়ে এক অপার্থিব আক্রোশ ফেটে পড়ে। হঠাৎ সব উজ্জ্বল আলো হয়ত নেভে। মোমবাতির স্থির [illegible]

জোরে চেঁচিয়ে উঠি, শালা বদমাস, নিমকহারাম।

কেন ওকেই মারি বারবার, জানি না। চুরি করা ওর স্বভাব নয়। ও কোনোদিন কিছু চুরি করে নি। তবু ওরই ওপর আমার সমস্ত আক্রোশ ফেটে পড়ে।

ওর সঙ্গে মাঝে মধ্যেই দেখা হয়। প্যারাপেটের ছায়ায়, ইউক্যালিপ্টাস গাছের গোড়ায়। ওই সাদা বালির উঠোনে। নিশি বিষণ্ণ দৃষ্টি ছড়িয়ে আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে হেঁটে যায়।

চন্দ্রদার সঙ্গে জমিদারি সেরেস্তার কাজে সুচক্রদন্ডি গ্রামে গিয়েছিল নিশিদা। সবে ফিরে এসে বৈঠকখানার লাগোয়া বারান্দায় বসে গামছা উড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে, এমন সময় কয়েকজন লোক এল। কলেজে পড়া লোক। বাবা তখন সবে দিনের প্রথম হুঁকোয় টান দিয়েছে। লোকগুলো বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আপনার কাছে এসেছিলাম।—

—তাতো দেখতেই পাচ্ছি। তোমরা সব

কলেজে পড়া ছেলে প্রয়োজন ছাড়া আসবেই বা কেন?

লোকগুলো আমতা আমতা করে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে না, ইয়ে আমাদের কিছু চাঁদার দরকার।

—কেন?

—হুমায়ুন কবির আসছেন, তাঁকে সম্বর্ধনা দেব।

বাবা একবার তাদের আপাদমস্তক দেখল। বলল, নিশি যাও বড়মার থেকে পঞ্চাশ টাকা এনে দাও।—

প্রথম দল চলে যেতেই অন্য একদল এল। বাবা তাদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ছুঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল। ওরা বলল, আজ্ঞে হুমায়ুন কবির আসছেন।—

—হুঁ।—

—উনি হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করেছেন এবং লোক মোটেই ভাল নয়, ওঁকে আমরা এখানে নামতে দেব না।—

বাবা নিশির দিকে তাকাল, যাও পনের টাকা এনে দাও।—

নিশি চলে গেল। বাবা বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের খুসি চালিয়ে বাইরের বৈঠকখানায় এদিক ওদিক হাঁটতে লাগল।

পশ্চিমের ঝুল বারান্দায় যখন বসি তখন অন্ধকার এসে সমস্ত আলো শুষে নিয়েছে। তবু স্থির নেত্রে ধ্রুবতারা জ্বলে উত্তরের দিগন্ত সীমার ওপরে। মোমবাতির মৃদু আলোর পর্দা সরিয়ে নিশিদা উঁকি দেয়, ছোটোবাবু খেতে দেব?—

ওকে হ্যাঁ, না—একটা কিছু বলি। আমাদের সুদূরপ্রসারী জ্যোৎস্নার সময়ে ধীরে, চুপিসারে নামে একটা শ্বেত-শঙ্খ পেঁচা। খুব ধীর পায়ে এদিক ওদিক হাঁটে। কিছু একটা খোঁজেও। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই হয়ত বা। এই সময় সমস্ত কিছুই চুপিসারে হয়। উৎসব শেষ হলে যেমন জীবনের গতি ধীরলয়ে ছোটে। বাইরের বারান্দায় বসে নিশিদা ঝিমোয়। হাতে হুঁকো। ভেতরের ঘরে ঘুমোতে ঘুমোতে বাবা হঠাৎ জেগে ওঠে। জড়ান গলায় ডাকে, নিশি।—

সাড়া না পেয়ে আর একটু জোরে ডাকে। উৎসবের পরিবেশ ছেড়ে এ বাড়ির মেয়ে চলে যাওয়ার পর বিষণ্ণতা ঢেকে আছে বাড়ির অবয়ব জুড়ে। সেজের কমিয়ে দেওয়া আলোয় আলো আর অন্ধকার জড়াজড়ি করে আছে আনাচে কানাচে। নিশিদার ছায়াটা একটু নড়েচড়ে উঠল। বাবা আবার ডাকল, এ নিশি বাবুদের কড়াই ডেকচিগুলো দিয়ে এসেছিস?

নিশিদা ঝিমুনি ভাঙ্গতেই হুঁকোয় একটা টান দেয়। বলে, গেলাম বাবু, গেলাম। কিছুক্ষণ বাদে বাবা আবার ডেকে ওঠে, আরে এ নিশি, বাবুদের ডেকচি কড়াইগুলো দিয়ে এসেছিস?

আবার ঝিমুনি ভাঙ্গে। হুঁকোয় টান। [illegible] নিশিদা বলে, গেলাম বাবু, গেলাম। [illegible]

বলে, খালি নিশি, খালি নিশি......যাবে......'ক কাজ, আর লোক নেই।

—কিরে কি বলিস?

নিশিদা হঠাৎ জেগে উঠেই সম্বিৎ পেয়ে অন্য দিকে সরে যায়।

ওই যেখানে দেওয়ালের বাইরে পর পর দুটো লোহার আংটা লাগান আছে ওখানে বাঁধা থাকত আমাদের চিত্রা আর সুন্দরী নামের গরু দুটো। আমার মা যে পাল্কি চড়ে প্রথম এ-বাড়ি এসেছিলেন, যে পাল্কির পর্দা সরিয়ে আলতা মাখানো পা রেখেছিলেন ওই মাটিতে সেই পাল্কি এখন ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে ওই চালতা গাছের গোড়ায়। বাবা যে টমটমে চড়ে সদরে যেত তার ঘোড়াটা একদিন বিক্রী হতে চলে গেল সিঁদুর গ্রামের হাটে। তখন সে বুড়ো হয়েছে। দু' পা হাঁটলেই সাদা ফেনার লালা ঝরে মুখ থেকে। নিশিদা সেই বৃদ্ধের পিঠে চড়ে পেটে লাথি কষাতেই বাবা বলল, ওমনি করে মারে না নিশি...ও নিজে থেকেই যাবে, ও যে জেনে গেছে এবার যেতে হবে।—

নিশিদাকে পিঠে নিয়ে আমাদের হলুদ রং সর্ষে ক্ষেতের ধারে পথের শেষ বাঁকে চলে গেল সে।

রাতে সেজের মৃদু আলোয় আরাম কেদারায় বসে বাবা গড়গড়ার নলটা মাঝে মাঝে ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে। দরজার বাইরে বারান্দার একটু আড়ালে বসে হুঁকো হাতে ঝিমোচ্ছে নিশিদা। অদূরে কুলুঙ্গিতে রাখা কুপির আলো ছাড়িয়ে ওপরের দেওয়ালে পোড়া তেলের কালো ছোপ লেগে রয়েছে। বাবার হাত থেকে গড়গড়ার নলটা হঠাৎ খসে পড়তেই বাবা নড়েচড়ে বসল। নলটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা টান মেরে দেখল তামাকের আগুন নিভে গেছে। বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, এই নিশি। নিশিদার ঝিমুনি ভাঙ্গতেই হুঁকোয় একটা টান দিয়ে বলল, এ্যালাম বাবু এ্যালাম। বাবা কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার ডাকল। নিশিদা বলল, এ্যালাম বাবু এ্যালাম। তারপর নিচু স্বরে বলতে লাগল, খালি নিশি, খালি নিশি, আর লোক নেই।

—কি রে কি বলিস?

নিশিদা চুপ করে থাকে।

—ঘোড়াটার যেতে কোনো কষ্ট হয় নি?

—নাঃ।—

—লোক ভাল ছিল, সে নিল?

—হ্যাঁ বাবু।

দুটো কথার পর স্থির নৈঃশব্দ্য নেমে আসে। অদূরের পিলার দুটোর আড়ালে লম্বা ছায়া বেশ কিছুটা গিয়ে মিলিয়ে গেছে। বাইরের বৈঠকখানার বাচচারা পড়তে পড়তে ঘুমের দেশে ঢলে পড়ে। রান্নাঘর থেকে সম্বরা দেওয়ার পর কটকটে ঝাঁঝ বাড়ির ভেতরের বাতাসে ছড়িয়ে যায়। আর বাড়ির বাইরে হঠাৎ কোনো ঝোপে ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ শব্দে ডেকে ওঠে কোনো পোকা। কোনো বড়সড় বাদুড় সর্ষে ক্ষেতের ওপর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ধীরে ধীরে উড়ে যায় দূরের বাঁশ ঝোপের দিকে।

সেই বিশ্বস্ত ঘোড়াদের আর কোথাও দেখি না। টমটমের পুরোনো শরীর তার চিরকালের চেনা সওয়ারীকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে সেই কালের সীমানা ডিঙিয়ে। তার সেই ভাঙাচোরা-অবয়ব আর একটি অক্ষত চাকা নিয়ে সে শুয়ে আছে ওই ওখানে, পাল্কিটার পাশে।

আমাদের পুরোনো দিনের পারিবারিক ছবি মায়ের হাসি অথবা উদাস চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকা বিষণ্ণতা, ধুতি পরিহিত, কোট গায়ে, পায়ে পাম্প-সু, লাঠি হাতে চেয়ারে বসে থাকা বাবার অবয়ব—সমস্ত ছবিই কেমন যেন লাগছে, ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। পশ্চিমের আকাশ জুড়ে অন্ধকার। তবু স্থির নেত্রে ধ্রুবতারা জ্বলে উত্তরের দিগন্ত সীমার ওপরে। কখনো সুদূরপ্রসারী। জ্যোৎস্নার সময়ে ধীরে, চুপিসারে নামে একটা শ্বেত-শঙ্খ পেঁচা। খুব ধীর পায়ে এদিক ওদিক হাঁটে। কিছু একটা খোঁজে ও। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই হয়ত বা। মোমবাতির মৃদু আলোর পর্দা সরিয়ে নিশিদা উঁকি দেয়, ছোটোবাবু খেতে দেব?

হঠাৎ সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ওর ওপর। আমার চটি ওর পিঠে আছাড় মেরে বলি, শালা বদমাস, নিমকহারাম।—

কারণ, আমার পিতার মৃত্যুতে ও অদূরে বসে কেঁদেছিল। দাউ দাউ আগুনের ওধারে ওর ঝাপসা অবয়ব। এইদিকে আমি। আগুনের প্রত্যেকটি লকলকে জিহ্বা যেন হা-হা শব্দে হাসছে। কাছেই অন্ধকারে, পাড়ে এসে খল খল-কল কল শব্দে হাসছিল কর্ণফুলির ঢেউ। আর ওই আগুনের কোলে শায়িত দূরে বহু স্বাদ-আহ্লাদ বহু হাসি এবং দুঃখের অবয়ব নিয়ে একা আমার পিতা। আমাদের অতীত স্মৃতি।

সে ছিল এক অলৌকিক সভা। আশে-পাশে দু'-একজন কথা বলছে। নিচু স্বরে। নিশিদা কাঁদছে। চতুর্দিকের মৌন অন্ধকার, অনন্ত শূন্যের চাঁদোয়ায় নীল তারার আলপনা এবং কর্ণফুলির হাসির আড়ালে কে চলে যাচ্ছে। কে চলে গেল?—

সেই উদাস অন্ধকারে মুহূর্তের জন্য মহাকালের ছায়া দেখেছিলাম।

একদিন সবাই যায়। তবু তার জরা নির্বিকার পায়ে হেঁটে আসে। প্রায়ই! আজকাল একবার না একবার ওর সঙ্গে দেখা হয়। কখনো আমার বাড়ির সামনে ইউক্যালিপ্টাসের ছায়ায় বসে ঝিমোয়। কখনো দেখি প্যারাপেটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘাম ঝাড়ে। নিশ্চিন্তে গা চুলকোয়। কখনো রোদে, ওই আকাশ ছোঁয়া সাদা বালির ডাঙায় একা একাই দাঁড়িয়ে থাকে। আমার এবং আমাদের নিশিদা।

মাতাল
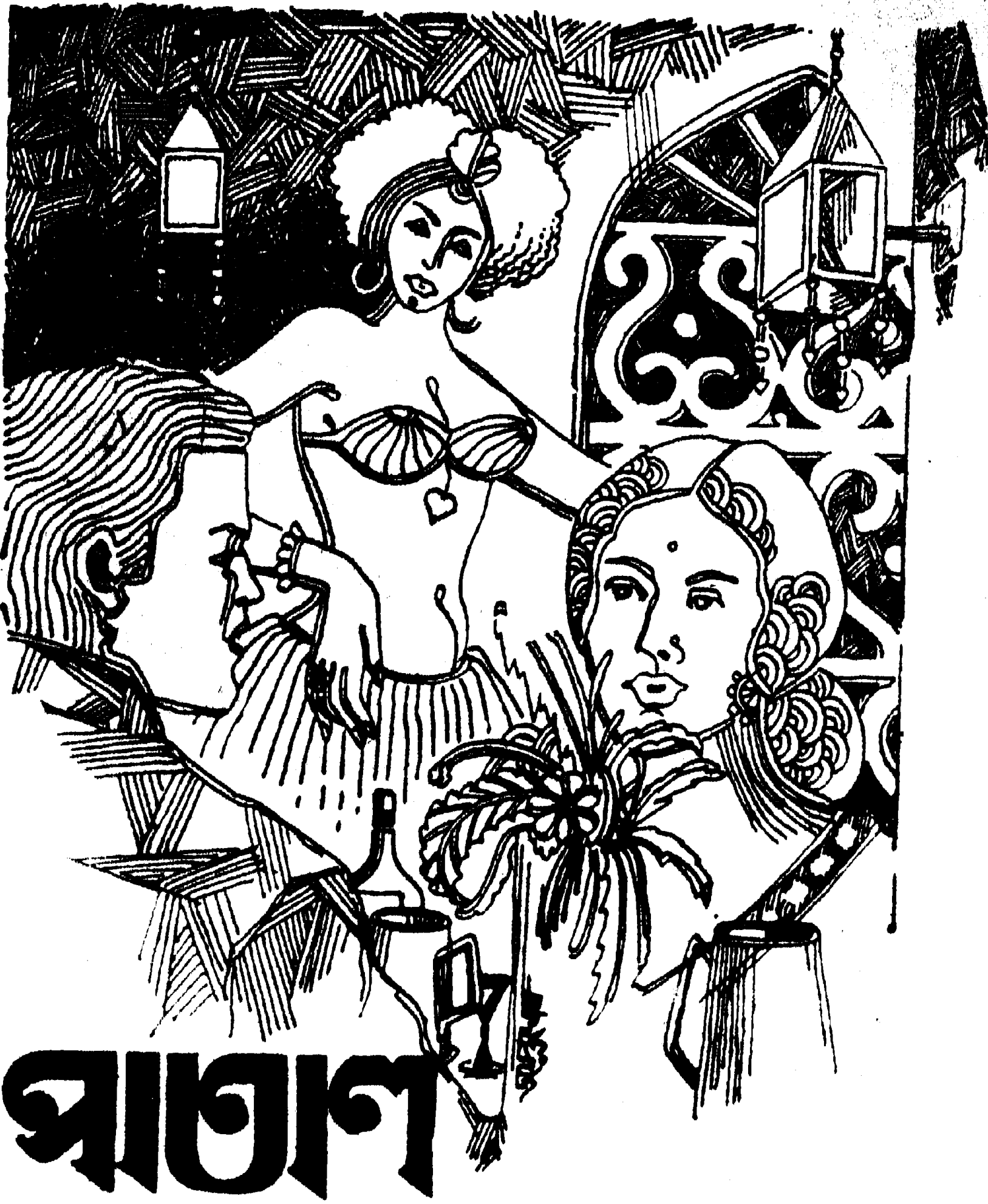
হরেন ঘোষ

ঘন হয়ে কুয়াশা নামে সন্ধ্যে হবার আগেই। রাস্তার আলো জ্বলে ওঠে টিমটিম নেশাখোরের রক্ত চক্ষুর মত। এ পাহাড় ও পাহাড়ের মাথায় জোনাকির মত আলোর মালা জ্বলে। ঘরে ফেরার তাড়া সকলের মনে। পথ ক্রমশঃ জনবিরল হয়ে পড়ে। দোকানের ঝাপ বন্ধ হয়। খোলা থাকে পান সিগারেটের দোকান রেস্টুরেন্ট বার। পথে দু-চার জন মাত্র পথিক। টহলদার পুলিশ উঁচু কলারে কান পর্যন্ত ঢেকে ডিউটি দেয়। এরই মধ্যে একটি দুটি করে গাড়ি হুসহাস করে এসে থামে ক্লাবের বাইরের প্রাঙ্গণে। সাদা কালো বাদামি ঘোড়া আসে পর পর। সওয়ারি লাফিয়ে নামে, বিচেসে ছড়ি বুলিয়ে ভিতরে ঢোকে। বিশেষ করে শনিবারের বিকেলেই ভিড় হয় বেশি। অন্য দিন সাধারণ, এই দিনটি অসাধারণ। নানা কারণে, নানা অর্থে।

কাছে দূরে অজস্র চা-বাগান। সভ্য সমাজের বাইরে। তাদের একঘেয়ে যান্ত্রিক জীবন। তাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে স্বাদ দেবার জন্যে, নতুন প্রাণরস সঞ্জীবিত করার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি এই ক্লাব। বাইরে তিনটি টেনিস কোর্ট, ভিতরে ব্যাডমিন্টন কোর্ট, বিলিয়ার্ড রুম, তাস-ঘর, দাবা কেরাম খেলার ঘর, স্টেজ ছাড়াও ছোটখাট ঘর অনেকগুলি। পেছন দিকে অফিস। আয়োজনের ত্রুটি নেই। মূল্যবান আসবাব, ভারি পর্দা, সাজসজ্জায় আধুনিক বিলাসিতার ছাপ সর্বত্র। প্ল্যানটারসরাই এখানকার দুর্গম বাগান থেকে ছুটে আসে তারা এই ক্লাবের বিচিত্র মদির তীব্র আকর্ষণে। সমাজের উঁচুস্তরের অভিজাতদেরই প্রবেশাধিকার আছে এখানে। শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তিরাও আসেন। পাশ্চাত্য সভ্যদেশের ক্লাবের অনুকরণে এটি তৈরি।

প্রায় সকলেরই মনের খোরাক আছে। কোণের দিকে লাইব্রেরী। পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, বই, রিডিংরুম। তবে সেখানে ভিড় কম।

পরপর গাড়ি আসছে, থামছে। আরোহী নামতেই চলে যাচ্ছে পার্কিং প্লেসে। একটি নতুন মডেলের স্টুডিবেকার এসে থামল। প্রথামাফিক সেলাম দিয়ে দরজা খুলে সরে দাঁড়াল তকমা-আঁটা উর্দি-পরা দারোয়ান। নতুন সাহেব, ভাবল মনে মনে। সবার মুখই চেনা তার। গাড়ির নম্বরও মুখস্ত। অনেকের নামও জানে। কে কোন বাগানের, কোন পোস্টে আছে সব তার নখদর্পণে।

সুদর্শন, লম্বা চেহারা, মানানসই স্যুট-টাই, বয়েস চল্লিশের নিচে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখ-নাক মিস্টার চিদাম্বরম ক্লাবঘরে ঢুকলেন। এদিক-ওদিক তাকালেন। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হল না। সোজা অফিসঘর। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন ডিউটি-ক্লার্ক। খাতা খুললেন মিস্টার চিদাম্বরম। তার নাম উঠে গিয়েছে। সই করলেন। টেবিল থেকে ক্লাবের নিয়মাবলী তুলে নিলেন একটা। পার্স খুলে এক টাকা বার করে রাখলেন। এবার পাশের সোফায় বসে পড়তে থাকলেন। ক্লাবের ইতিহাস, অন্যান্য নিয়মকানুন, সুযোগ-সুবিধা, কর্মকর্তাদের নাম, যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য রয়েছে এতে। দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টে গেলেন তিনি। কানে আসছে পদশব্দ, কলকাকলি। লোক বাড়ছে ক্রমশঃ। এবার হলঘরে এলেন তিনি। অধিকাংশ আসন ভরে গিয়েছে। চা-কফি পানীয় টেবিলে টেবিলে। বয়-বাবুর্চিরা তটস্থ। তাসঘর থেকে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বিলিয়ার্ড খেলা চলছে। চারিদিকে দেখতে দেখতে এগোলেন তিনি। অনেকে মুখ তুলে দেখছে, সাধারণ কৌতূহল। অনেকে তাকাচ্ছে না। তিনি নবাগত। এখনো পর্যন্ত কারো সঙ্গে পরিচয় হয়নি। এবার হলঘরে এসে নিরিবিলি চেয়ারে বসলেন। একেবারে কোণের দিকে। স্টেজে পুরু ভেলভেটের পর্দা, বাতাসে মৃদু কাঁপছে।

বয় এগিয়ে এল। মেনুকার্ড এগিয়ে দিল। এক পলক তাকিয়ে বললেন—দো বড়া স্কচ। সেলাম দিয়ে চলে গেল বয়। ভাবল রহিস আদমি। টুক করে অফিসে চলে গেল। নতুন লোক, নম্বরটি জেনে নেওয়া ভালো। বলা যায় না, দই দিয়ে থার শুরু, ভর সন্ধ্যায়, কতয় উঠবে তার রাত বাড়লে। শেষে বেহেড হয়ে গেলে কোন রকমে গাড়িতে তুলে দিতে হবে। দাম চাওয়াতো যাবেই না, বকশিসও মাটি। 'ও কস' এর নতুন ম্যানেজার মিস্টার চিদাম্বরম। নামটা মুখস্ত করে নিল। নম্বরটা টুকে রাখল নোট বুকে। ট্রে-তে করে অর্ডার অনুযায়ী পানীয় নিয়ে এল। এক বোতল সোডা নামিয়ে রাখল।

মাঝরাত পর্যন্ত চলবে ক্লাব। কোন ব্যস্ততা নেই। অনেকে ফিরে যাবে, অনেকে যাবে না। কাল ছুটি, তাড়া নেই। বেশির ভাগই বেহুঁস হয়ে যাবে। অনেকে মাত্রা ছাড়িয়ে ফুর্তি করবে। জুয়ায় হেরে মারামারি, গ্লাস ভাঙা, হাতাহাতি এসব তো নিয়মিত ঘটনা। সব ক্লাবেরই মোটামুটি এক ইতিহাস। এটা সাধারণ বার বা হোটেল রেঁস্তোরা নয়, অভিজাত ক্লাব। এর মালিক প্ল্যানটার্সরাই, সদস্য ও ওরা। তাই স্বাধীনতা অনেক বেশি। এখানকার কর্মচারীরাও ওদের অধীনে। প্রায় সব চেয়ারই ভরে গেছে চারি দিকে তাকিয়ে খুব ধীরে চুমুক দিলেন গ্লাসে। টেবিলে টেবিলে হাসি, গুঞ্জন, কলকাকলি। এখন আর চা কফি নয় গ্লাস। পুরুষ-মহিলা সকলেই এই পথের যাত্রী।

বাইরে অন্ধকারে। শীতের কাঁপুনি। ফায়ার প্লেসে গনগনে আগুন। চারিদিকে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। সুরার উত্তাপে শরীরে দাহ। সপ্তাহের পরিশ্রম, বিরক্তি, কাজের বোঝা নামিয়ে নতুন রসে মনকে স্নান করিয়ে পরিশুদ্ধি হবার চেষ্টা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন চিদাম্বরম। একটিও চেনা মুখ নেই।

স্টেজের আড়ালে বাজনা বেজে উঠল। প্রথমে মৃদু, পরমুহূর্তে প্রবল প্রচণ্ড বেগে একসঙ্গে যেন সহস্র দামামা, উদ্দাম উচ্ছল। ক্ষণিক বিরতি। তারপর ঘোষকের ঘোষণা। এবার সদস্য-সদস্যারা নৃত্যে অংশ গ্রহণ করবেন। পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে হল-ঘরের পূর্বদিকটা খালি করতে হবে। আবার বাজনা। সেই সঙ্গে হাততালি। যেন এই ঘোষণার অপেক্ষাতেই ছিল অনেকে। তরল পানীয় শিরায় শিরায় উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। এবার একদেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত হবে ঘন নিবিড় সান্নিধ্যের নাচের মাধ্যমে। তারপর আছে প্রয়োজনমত ছোট-খাট কামরা।

ভারি পর্দা সরে গেল। যন্ত্রবিদরা মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। শুরু হল বাজনা। এদিকে জোড়-খোঁজার তাগাদা। একইভাবে দেখছেন চিদাম্বরম। পাত্র প্রায় নিঃশেষিত। বয় সামনে এসেছে। একটি আঙুল তুলে ইসারা করলেন তিনি। আদেশ পালন করার জন্যে এগিয়ে গেল সে।

উদ্দাম উচ্ছল যুগল-নৃত্য। সেই সঙ্গে মন মাতাল-করা বাজনা। সুরার প্রতিক্রিয়া। দিন ঘণ্টা সময় সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। এ এক নতুন জগৎ, অন্য রাজ্য।

নতুন ঘোষণা শোনা গেল। সবাই উৎকর্ণ। আজকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মিস শেলী নাহাটার পাশ্চাত্য নৃত্য। আর আধঘণ্টা পর। অর্থাৎ তার মধ্যে শেষ করতে হবে যুগল সমবেত নৃত্য। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন চিদাম্বরম। নীরব একক দর্শক। শুধু শোনা আর দেখা। নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা। চোখ বুজে আসছে, মাথা ঝিমঝিম। আলো-আঁধারি পরিবেশ।

হঠাৎ প্রায় চমকে উঠলেন তিনি। যেন স্বর্গের অপ্সরী নেমে এসেছে ধুলোর ধরণীতে। যেন স্বপ্ন দেখছেন তিনি। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসিমুখে অসামান্যা এক রূপসী। স্বল্প বেশবাস, উৎকট প্রসাধন, সৌন্দর্য নেশা ধরায়। চোখ মেলে তাকালেন।

—বসতে পারি? সর্বাঙ্গে হাসি আর আনন্দের হিল্লোল।

—স্বচ্ছন্দে। নিজের আসনে একটু নড়েচড়ে বসলেন তিনি।

—অনেকক্ষণ থেকে দেখছি আপনি একা। পরিচয় দি, আমি মিস নাহাটা।

—মানে এখুনি যার নাম শুনলাম? আমি চিদাম্বরম।

—জানি। হাসিমুখে বলল শেলী।—চিনতে হয়। তাছাড়া আপনার যা চেহারা [illegible] একটা সিগারেট ধরাল শেলী। আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন রইল। রবিবার সারাদিন ছুটি আমার।

—ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো অনেক-দূরে থাকি। শনিবার ছাড়া আসা হয় না।
—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। বাঁকা চোখে তীর ছুঁড়ল শেলী।

বয় এসে দাঁড়াল আদেশের প্রতীক্ষায়।

—চলবে তো?

—না, মানে আমার কোটা শেষ।

—আমার অনারে। আদুরে গলায় বলল শেলী। সরু দুটি আঙুল তুলে ভি চিহ্ন আঁকল। বয় চলে গেল।

নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন চিদাম্বরম। তবু রাঁচোয়া একটু পরই মুক্তি পাবেন। স্টেজে চলে যাবে শেলী। অবাক হলেন তিনি। কিভাবে ওর খবর জানল, এসে হাজির হল। মাকড়সার মত এরা ক্রমশঃ জালে জড়ায়। দলিত মথিত নিঃশেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কথা-বার্তা তেমন জমল না। উৎসাহ পাচ্ছেন না। মাথা ঝিমঝিম করছে। নাচটা শুরু হলেই চলে যেতে হবে। ফিরতে অনেক দেরি হবে। পাহাড়ি পথ। তবে ড্রাইভার দক্ষ এই রক্ষে।

সব আলো জ্বলে উঠল। আবার ঘোষণা। আর মাত্র পাঁচ মিনিট। তারপরই নাচ।

—আমার সময় হয়ে গিয়েছে। পানীয়ের জন্যে ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে। চোখ ছোট ছোট করল শেলী। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। ঘাড় কাত করে হাসল। —চলে যাবেন না যেন।

হাসলেন চিদাম্বরম। কোন উত্তর দিলেন না।

আলো নিভল। এবার সব রঙ সব আলো স্টেজে, সব মুখ ওদিকে। বাজনা বাজছে ঝিম-ধরান, নেশা জড়ান। পর্দা সরে গেল। শুরু হল নাচ। শেলী নাহাটা ক্যাবের মক্ষিরানী। উদাস হয়ে পড়লেন চিদাম্বরম। চোখ, রয়েছে স্টেজে কিন্তু মন হারিয়ে গিয়েছে। অনেক পেছনে চলে গিয়েছে মন।

সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের, অনেক দূরে দেশের, প্যারিসের এক নাইট ক্যাবের ছবি ভাসছে চোখে। তখন প্রথম যৌবন। কতই বা বয়স। বুদ্ধিও অপরিণত। ঝড়ের হাওয়ায় ছুটে চলার সময়। পর্যাপ্ত টাকা হাতে, সময় অফুরন্ত, কোন দায়দায়িত্ব নেই। ফুলের মত কিশোরী জুলিয়ার সঙ্গে ওখানেই পরিচয়।

সেও ছিল নর্তকী। তবে অনেক নম্র ধীর স্থির। চটুল নয়। তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল একটি যুবক। চোখে স্বপ্নের ঘোর, মনে রঙের রোশনাই। জগতের পঙ্কিল দিক সম্পর্কে অচেতন। বিদেশ সম্পর্কে একটি মোহ আছে, তাই জুলিয়া আকর্ষণ অনুভব করল। অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। স্টেজে যে মেয়ে এত উদ্দাম, উন্মাদ, চটুল নির্লজ্জ সে বাইরে কেমন করে এত শান্ত নম্র ধীর হয়? যুবকটি বিস্মিত হতচকিত।

শহরের শেষ প্রান্তে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে যায় ওকে জুলিয়া। ধারণা বদলায় ওর। আলোর নিচে এত অন্ধকার। উজ্জ্বল আলোয় রঙিন পোশাকের আড়ম্বর ঐশ্বর্য, আর ওখানে অতি সাধারণ দারিদ্র পরিবেশ। মনে হত তার ওদেশে অভাব, দারিদ্র নেই, দুঃখ বেদনা নেই। কিন্তু না, সব সমাজের নিচের তলায় একই চিত্র। তার বাবার মুরগি পালন কেন্দ্র আছে একটি, সাতজন ভাইবোন, সংসার চলে না তাই স্কুল ছেড়ে ওকে নাইট ক্লাবে মাইনে করা নর্তকীর পেশা নিতে হয়েছে। সংসারের প্রয়োজনে। ওরা কত ভদ্র নম্র কি অমায়িক ওদের ব্যবহারে। ও অভিভূত হল। ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি হয়নি ওদের মধ্যে। সময় পেলেই চলে আসত ওদের বাড়ি। সকলের সঙ্গে হৈ-চৈ করে কাটাত। বেশ কেটে যেত দিন আর রাত। মনে হত না আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে অত দূরে দেশে রয়েছে।

তারপরই ঘটল অঘটন। নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি জুলিয়া। উভয়েই উভয়ের প্রতি আকর্ষণ করেছে। কাছাকাছি এসেছে, ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এবং তারই ফলে অসতর্ক মুহূর্তে সেই চরম সংকট। এর-পরই সুরু হয়েছে সংঘাত। ও এক কথায় বলেছে—এসো আমরা বিয়ে করি। আমি যখন দায়ী এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে দাও। কোন বাধা নেই। আর ছয় মাস পরই দেশে ফিরব আমি। তোমার মা-বাবাকে বলছি।

—না তা হতে পারে না। ওর মুখে হাত চাপা দিয়েছে জুলিয়া। ভুল আমারো। তোমার একার নয়। আমাদের আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ভাগ্যকে অস্বীকার করা যায় না। ওকে পৃথিবীর আলো দেখান চলবে না।

—এ কি বলছ তুমি। চিৎকার করে উঠেছে ও। তুমি এত নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়-হীন। এতটুকু মায়া-মমতা নেই?

—আমায় ভুল বুঝো না [illegible]। চোখে জল এসে গিয়েছে ওর। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্যে একটা সংসারকে ভাসিয়ে দিতে পারব না আমি। আমি সবার চেয়ে বড়, আমি চলে গেলে এতগুলি ছোট ছোট ভাইবোন অসহায় হয়ে পড়বে। বাবার একার উপার্জনে সংসার চলে না। আমাকে মস্ত হতে হবে। এই শরীর আমার সম্পদ, সম্বল। এতটুকু স্বাস্থ্যহানি হলে বিকৃতি ঘটলে ছাড়িয়ে দেবে তাড়িয়ে দেবে আমায়। অনেক কষ্টে নাচ শিখেছি, অনেক চেষ্টায় চাকরি পেয়েছি।

—এই তাহলে তোমার শেষ কথা? কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে তার। আমি কিভাবে বোঝাব নিজের মনকে?

—আমি নিরুপায়। তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভি-যোগ নেই। দু হাতে মুখ ঢেকেছে জুলিয়া। কান্নায় আবেগে ফুলে ফুলে উঠেছে ওর দেহ।

এর মধ্যে একটি নাচ শেষ হয়েছে। আর একটি [illegible]
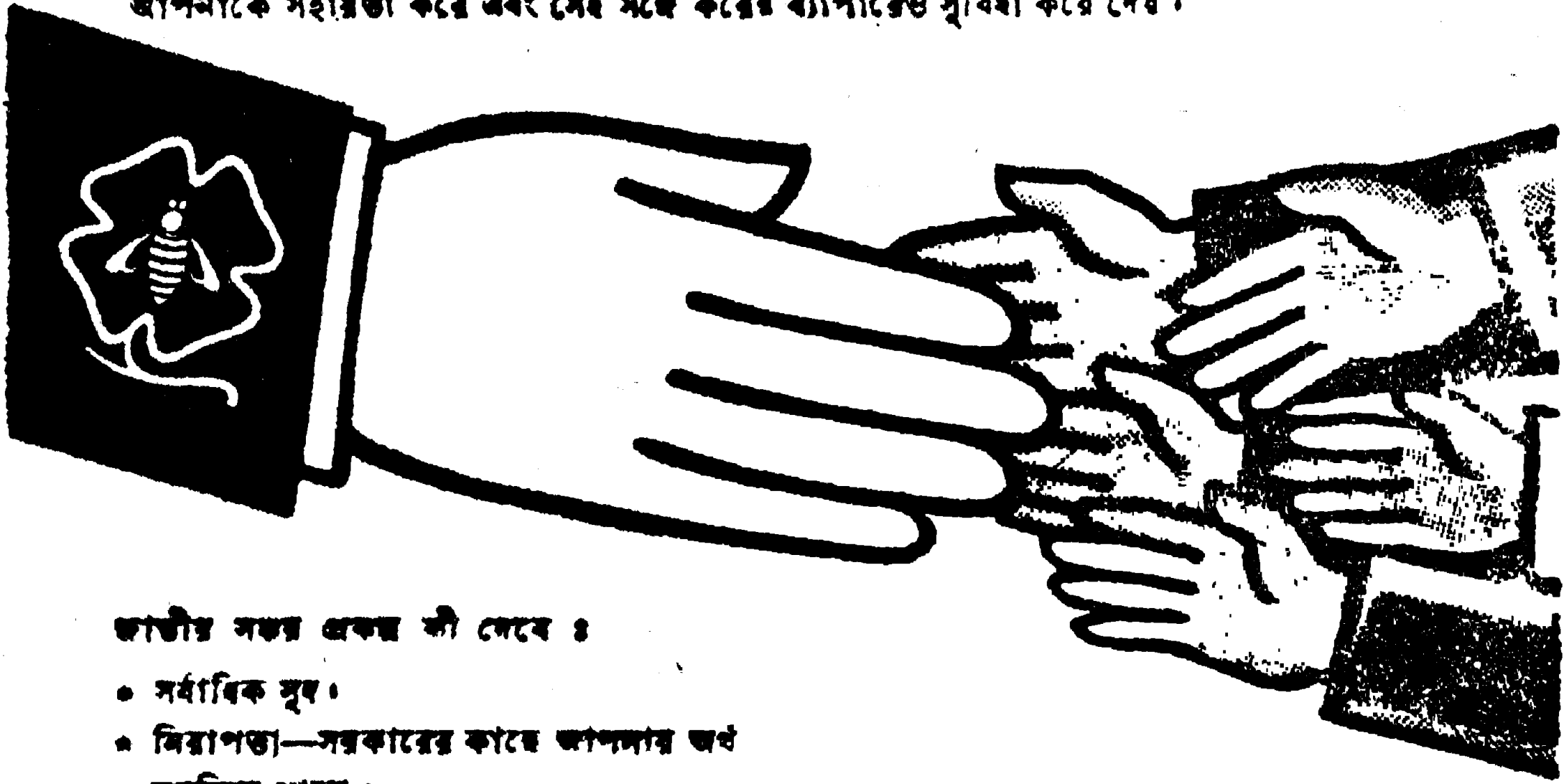
মন মাতাল করা। বাস্তবে ফিরে এলেন চিদাম্বরম। এতক্ষণ অন্যলোকে ছিলেন। ভালো করে দেখাও হয়নি নাচ। চোখ খোলা থাকলেও মন পড়েছিল অন্যত্র। এক মুহূর্ত ভুলতে পারেন না। একটা পাপবোধ তীব্র যন্ত্রণা কুয়ে কুয়ে খায় কোমল হৃৎপিণ্ড। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। একটি প্রাণ শেষ করেছেন, একটি নরম ফুলের কুঁড়ি দুমড়ে-মুচড়ে পিষে ফেলেছেন ফোটার আগেই। আজো হয়ত নাচে জুলিয়া। সে কি মনে করে ওর কথা? ছ'মাসের মাথায় চলে এসেছেন ওখান থেকে। এসে চিঠি দিয়েছেন, একটির পর একটি একাধিক। কোন সাড়া পাননি। অবশেষে হতাশ হয়ে লেখা বন্ধ করেছেন। আর কোন যোগাযোগ নেই। শুধু স্মৃতিই সম্বল। জোর করে উঠে পড়লেন। এখুনি চলে যেতে হবে। নইলে আবার হয়ত জড়িয়ে পড়বেন নতুন জালে।

ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে বিশ্রাম করছেন হাতে একটা খোলা ম্যাগাজিন। বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হল। কে এল আবার! উৎকর্ণ হয়ে তাকালেন। দারোয়ান এসে সেলাম দিল—এক মেমসাব—

কপালে চিন্তার রেখা। কে হতে পারে? উঠে বাইরে গেলেন। সামনে দাঁড়িয়ে শেলী নাহটা। হাসিমুখ। বাঘের চামড়ার ছাপ দেওয়া বিচিত্র পোশাক, উগ্র প্রসাধন। কানে হীরের দুল ঝিকঝিকিয়ে উঠল।

—খুব বিরক্ত করলাম?

—আসুন অভ্যর্থনা করলেন তিনি।

প্রায় লাফাতে লাফাতে উঠে এল শেলী, হাতের ব্যাগ ঘোরাতে ঘোরাতে। —বাঃ চমৎকার বাংলো। সত্যি কি আরামে আনন্দে থাকেন। হিংসে হয়। শহরের চিৎকার চেঁচামেচি একটুও ভালো লাগে না। সব মেকি ঝুটো। এই নির্জন প্রকৃতি মন কেড়ে নেয়। বসল সোফায়। —সেদিন না বলে পালিয়ে এলেন যে। কত খুঁজেছি। আধো আধো আদুরে ভঙ্গিতে বলল। —খুব রাগ হয়েছিল আমার এতক্ষণে অনেকটা সহজ হয়েছেন চিদাম্বরম। তবু বিস্ময় এবং চিন্তার ঝোঁক কাটেনি।

—ভাবলাম বেঁহুস হবার আগেই চলে আসি। শেষে কেলেঙ্কারি বাধাব।

একটা সিগারেট ধরাল শেলী। —কত খুঁজেছি আমি, কত জিজ্ঞেস করেছি। কেউ বলতে পারল না। শেষে দারোয়ান বলল অনেকক্ষণ আগে চলে গিয়েছেন। সেদিন থেকেই ভাবছি খুব ঝগড়া করব। আমার নাচ বুঝি ভালো লাগে নি? রাম্বা, জাজ, রক এন রোল, টুইস্ট সব জানি আমি।

—না, না তা কেন। চমৎকার নাচ হয়েছে।

—ওটা কথার কথা। আপনি বিদেশে ছিলেন কত জায়গায় ঘুরেছেন, অনেক ভালো জিনিস দেখেছেন। আমাদের দেখার বা শেখার সুযোগ নেই।

বাবুর্চি এল। আদেশের প্রতীক্ষায়। ওর দিকে তাকালেন চিদাম্বরম। —চা কফি না অন্য কিছু?

—এতদূরে এসে গাটা ম্যাজম্যাজ করছে, মাথা ধরেছে। হাসল শেলী।

ইসারা করলেন বয়কে। নীরবে মাথা নেড়ে চলে গেল। এবার উঠে এসে তার পাশে বসল শেলী। একটু সরে বসলেন তিনি।

—আপনার খুব অসুবিধে করলাম না? এত দূরে হুট করে চলে এলাম। খুব রাগ করেছেন তো? ভাবছেন কি অদ্ভুত আশ্চর্য মেয়ে।

—না না খুশিই হয়েছি। একা থাকি কিছুক্ষণের জন্যে সঙ্গ লাভের সুযোগ পেলাম এতো আমার সৌভাগ্য।

কলকলিয়ে হেসে উঠল শেলী। —যদি বলেন, সারারাত থাকব। আজ আমার ছুটি। আজ স্টেজে নামবে সেই মাতাল ছুঁড়িটা, ববিতা সাহানী।

চমকে উঠলেন তিনি। এ কোন জালে জড়িয়ে পড়ছেন। এত সামান্য পরিচয় ভালো করে জানা চেনা হয়নি, এই প্রস্তাব। মন শক্ত করলেন। হাসলেন।

—আপনি ঠাট্টা করছেন?

—ও নো আমি সিরিয়াসলি বলছি।

—আমার কিন্তু পাক্কা আট ঘন্টা ঘুমোতে হয়, নইলে শরীর খারাপ হয়, খাটতে পারি না।

—সো নটি, ওর বুকে ছোট করে টোকা দিল শেলী, ফরেনে গেলে পুরুষগুলো খুব চালাক হয়ে যায়। কথার মারপ্যাঁচ শেখে।

বয় এসে রেখে গেল পানীয়ের বোতল, গ্লাস। চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল শেলীর। পূর্ণ বোতলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। চোখে-মুখে এক রাশ লোভ।

—বাঃ চমৎকার জিনিস। বহুদিন পাইনি। হাসলেন চিদাম্বরম। —চট করে পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে জোগাড় করতে হয়। আমার এক বন্ধু জাহাজে কাজ করে, সেই জোগাড় করে দিয়েছে।

সময় নষ্ট করতে চায় না শেলী। বোতল তুলে নিল। গ্লাসে ঢালতে হবে।

—খুব কড়া জিনিস, মাত্রা ঠিক থাকে যেন। হাসল শেলী। বয় এসে রেখে গেল পটেটো চিপস কাঁচা পেঁয়াজ, লঙ্কা।

অনেক অনুরোধ উপরোধেও কাজ হচ্ছে না। খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে শেলী। তার গায়ের ওপর পড়ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখছেন তিনি কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছে, চোখ ঢুলুঢুলু। নিরাপদ দূরত্বে সরে বসছেন তিনি। আর নয়। নিজেকে শক্ত করলেন।

—রাত হয়েছে, অনেক দূরের পথ।

—তাড়িয়ে দিচ্ছেন? অলরাইট। আপনি ভীষণ ভীতু। সাধুপুরুষ! উঠে দাঁড়াল শেলী। টলছে।

—তবে আমাকে একটা বোতল দিতে হবে। কতদিন খাইনি। চমৎকার।

ভিতরে এলেন চিদাম্বরম। একটু পরই ফিরে এলেন হাতে একটি পূর্ণ বোতল নিয়ে।

উঠে দাঁড়াল শেলী। পা কাঁপছে, দাঁড়াতে পারছে না। —ওয়ান্ডারফুল। সত্যি আপনি খুব ভাল। জেন্টারাস, ব্রড হার্টেড। মনে রাখব আপনার কথা। হাত বাড়িয়ে বোতল নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল। আজকের মধুর সন্ধ্যা স্মরণীয়। শত সহস্র ধন্যবাদ। আবার আসব। আমার ওখানেও যেতে হবে কিন্তু।

ওর বাহু ধরে দরজার দিকে এগোলেন চিদাম্বরম। আর দেরি করা উচিত নয়। মন চঞ্চল হচ্ছে। নিজেকে বেশিক্ষণ সংযত রাখা কঠিন। মাথা ঝিমঝিম, রক্তে অশান্ত সমুদ্রের দাপাদাপি।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে এগিয়ে এল। ওর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন চিদাম্বরম। বলিষ্ঠ বৃষ স্কন্ধ কালো পাথরে কোঁদা চেহারা। চোখ দুটি রক্তবর্ণ, মুখে পাশবিক নিষ্ঠুরতার ছাপ। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল শেলী—হাম আউট হো গয়ি।

—জি মেমসাব। ধাতব কণ্ঠস্বর ওর। পিছনের দরজা খুলে দিল।

ওকে ধরে ভিতরে বসালেন চিদাম্বরম। সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল শেলী। —গুড নাইট। বা-ই।

বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। স্থানুর মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। পথের বাঁকের আড়ালে লাল আলোর বিন্দু হারিয়ে গেল। এবার পায়ে পায়ে ভিতরে এলেন। অদ্ভুত একটা সন্ধ্যা কাটল। বিচিত্র।

ভাবলেন শনিবারে শহরে যাবেন না। কিন্তু এই একঘেয়ে কর্মমুখর দিনগুলি থেকে সাময়িক ছুটি দরকার। আলাপ পরিচয় করতে হবে বিভিন্ন বাগানের লোক-জনের সঙ্গে। এটাই ওদের সোসাইটি। এক-ঘরে হয়ে থাকবার মানে হয় না। কাজে অকাজে বারবার শেলীর ড্রাইভারের মুখটা ভাসছে মনের চোখে। অন্ধকার রাত্রে এতটা পথ এভাবে একজন আধা বেঁহুস কামনাতুর নারীকে নিয়ে যাচ্ছে। ও কি নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে? বাধা দেবার ক্ষমতা কি থাকবে শেলীর? কি অসহায়। না যেতে দিলেই হত। যদি মাঝপথে হত্যাও করে কেউ হদিশ পাবে না। নিদারুণ অপরাধ-বোধে জর্জরিত হতে থাকেন মনে মনে।

বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন ক্লাবে। এখনো তেমন কেউ আসেনি। অফিসঘর থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরিতে গেলেন। নতুন পত্রিকার পাতা ওল্টালেন কিছুক্ষণ। নানা ধরণের ছবি, ফিচার। বাইরে গাড়ি আসছে থামছে, ঘোড়া আসছে। লোক বাড়ছে। বেরিয়ে এলেন। তাসঘর, বিলিয়ার্ডঘর ঘুরলেন। এবার এসে বসলেন হলঘরে। বয় এসে দাঁড়াল। একপেগ ব্ল্যাকনাইট অর্ডার দিলেন।

কোথায় ছিল কে জানে। একমুখ হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল শেলী। দারুণ

সেজেছে। মুখোমুখি বসল। —গল্প করব, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। ঠিক জানতাম তুমি আসবে। দারুণ এনজয় করেছি সেদিন। তবু তুমি আমায় তাড়িয়ে দিলে। তুমি দারুণ বোকা। চোখ ছোট করে ফিসফিস করে বলল। হাসলেন তিনি। কোন কথা বললেন না।

—মাঝপথে দারুণ ভমিটিং টেনডেন্সি হল। গাড়ি থামাতে বললাম। বাইরে দারুণ অন্ধকার, চারিদিকে জংগল। ভয় ভয় করছিল। তোমার ওপর রাগ হচ্ছিল। বমি করলাম। খুব ঘুম পেল। তারপর কখন এসেছি খেয়াল নেই। একসঙ্গে কলকল করে বলে চলল শেলী।

—অনাদি মণ্ডল দারুণ ভালো। খুব ভালো ম্যাসেজ করতে পারে।

—কে অনাদি মণ্ডল?

—আমার ড্রাইভার। হাসল শেলী।

একটু গুম হয়ে গেলেন তিনি। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিন্তার রাশ মাথায়।

—ও জিনিস খাবার পর আর কিছু ভালো লাগে না, নেশা জমে না। আমেজ আসে না। ফাঁক পেলেই চলে যাব তোমার কাছে। আপত্তি নেই তো?

হাসলেন তিনি। জানেন, হ্যাঁ বা না দুটি কথারই এক অর্থ। এ মেয়ে যা ভাববে তাই করবে। ওর নিজের মতই সবচেয়ে বড়, আর কারো কথার কোন দাম নেই।

লোক বাড়ছে। হলঘর প্রায় ভরে গিয়েছে। চারিদিক গন্ধে ম-ম করছে। বাইরের আলো। আঁধারে রূপান্তরিত, ভিতরে রঙিন আলোর রোশনাই। ওদিকে বাজনা শুরু হয়েছে।

একটু পরই ফিরে এল শেলী। —আজ আর গল্প করা যাবে না। স্পেশাল শো হবে। মিউজিক হ্যাণ্ডের সঙ্গে রিহার্সাল দিতে হবে। ফাঁক পেলে আর একবার আসব। পালিয়ে যেও না যেন। চলে গেল ও।

ভাবলেন তিনি বাঁচা গেল। খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। সকলেরই কেমন আড়চোখে দেখছে তাদের। কি ভাবছে কে জানে। আজ পরিচয় পর্ব শেষ হলে বাঁচা যাবে।

বেশ প্রসন্ন মনেই ফিরলেন চিদাম্বরম। প্রায় প্রত্যেকেই নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। হৃদ্য সৌজন্যমূলক ব্যবহার। তার সমপর্যায়ের অনেকেই আছেন। ফোর্ড কলিনস আনন্দ মেহতা, সোম, মিস জোনস, রুবী গ্যাব-রিয়াল, সব নাম মনে নেই। শিকারে যাবার নেমন্তন্ন করেছে কলিনস। বাড়িতে ছোটখাট মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলেছে। পাইথন, রাইনো, হায়না, সম্বর বাইসন লেপার্ড মাউন্ট করে রেখেছে। এই অঞ্চলের বিখ্যাত শিকারি। শুধু বন-জঙ্গল আর বন্য প্রাণীর গল্প। পাঁচ মাইল দূরে পাহাড় চূড়োয় ওর বাংলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই কানাঘুষো কানে এল। সবার চোখে-মুখে কৌতূহল, চাপা হাসি। তার সঙ্গে শেলীর নাম জড়িয়ে নানা কথা। বিরক্ত হন তিনি। এ নিশ্চয় শেলীর কাজ। ইচ্ছে করে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। ও মাখামাখি করতে চায়, তিনি পাশ কাটান। বারকয়েক এসেছে তার বাংলোয়। যাবার সময় একটি করে বোতল চেয়ে নিতে ভোলেনি। তবে প্রথমদিনের মত বাড়াবাড়ি করেনি। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে রেগে গিয়েছেন। দুর্বোধ্য এক হাসি তার জান্তব মুখে। নিশ্চয় প্রশ্রয় পায়। রক্ষক ও ভক্ষক নয় তো।

সবে ফিরেছেন ফ্যাক্টরি থেকে। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল শেলী। চমকে উঠলেন ওকে দেখে। আজ তেমন প্রসাধন করেনি। চোখে-মুখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। অগোছাল ভাব। বসে পড়ে হাঁপাতে থাকল শেলী। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। ক্লান্তির ছাপ সর্বাঙ্গে।

—একটু ড্রিঙ্ক দিতে বল ডিয়ার। খুব টায়ার্ড। উঠে গেলেন তিনি। এখনো বুঝতে পারছেন না। ফিরে এলেন একটু পরেই।

—খুব জরুরী প্রয়োজনে এসেছি আমি। দম নিল শেলী। আমি শেষ হয়ে গেছি।

দুহাতে মুখ ঢাকল।

—তার মানে? হতচকিত তিনি।

—মানে বোঝ না তুমি? সর্বনাশ হয়েছে আমার। এখন আমি কি করি?

—কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি তো এ সবের মধ্যে নেই।

—কি কি বললে তুমি। সাপের মত হিস হিস গলা শেলীর। —এখন ভালো-মানুষ সাজা হচ্ছে। আমায় ড্রিঙ্ক দিয়ে বেহুঁস করার পর সুযোগ নিয়েছ তুমি। নইলে আমি খুব সাবধান, এমন হতে পারত না।

—কি বলছ তুমি আবোল-তাবোল। ঠাট্টা না অভিনয়? এটা রঙ্গমঞ্চ নয়। গলায় তবু দৃঢ়তা ফুটল না। মনে হল যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। অনেক চেষ্টায় দেহমনকে সতেজ করলেন। —তুমি ভুল করছ শেলী আমি অমানুষ নই, অবিবেচক নই।

—ও সব বাজে কথায় কাজ হবে না ডিয়ার। সবকিছু ক্লিয়ার করার জন্যে দু হাজার টাকা চাই আমার। আমি কনসাল্ট করেছি। আমার অত টাকা নেই।

তুমি আমায় ব্ল্যাকমেল করতে চাও।

—ছিঃ ওসব কি কথা। সিগারেট ধরাল শেলী। যখন সবাই জানবে একজন সাধারণ নর্তকীর সঙ্গে তোমার এ্যাফেয়ার তখন তোমার মান-সম্মান থাকবে কোথায়? মালিকরাই বা কি ভাববে। তোমার মান মর্যাদা সম্মান আছে। তার চেয়ে এই প্রস্তাবটা কত সহজ কত ভালো।

নিজেকে শক্ত করলেন তিনি—শোন তুমি যখন বলছ, আমি দায়ী যদিও আমি জানি আমি নই এসো আমরা বিয়ে করি। আইন সম্মতভাবে সব দায়-দায়িত্ব নিতে রাজি আছি আমি! নরকের জীবন ছেড়ে দাও সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন কর। সম্মান মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারবে।

খিলখিল করে হেসে উঠল শেলী—লোভ দেখাচ্ছ? না তা হয় না। আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, ভালো-বাসতে পারবে না। প্রতি মুহূর্তে ঘৃণা, অবিশ্বাস, করুণা সইতে পারব না। আমার শরীর বড় ফিগার ঠিক রাখতে হবে। দাও টাকা দাও

একদৃষ্টে তাকালেন তিনি—তোমার টাকার প্রয়োজন হলে এমনি চাইতে পারতে। এমন বদনাম দিয়ে—

—সাট আপ। চেঁচিয়ে উঠল শেলী। আমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মজা লুটে এখন ভালো মানুষ সাজা হচ্ছে।

মাথা ঝিমঝিম করছে। রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। কত হীন জঘন্য মানুষের চরিত্র। মৃদু স্বরে বললেন তিনি—ঠিক আছে, টাকা পাবে তুমি। তবে এখন হাতে নেই। এখন চেক দিতে পারি।

উহুঁ, ক্যাশ টাকা চাই। ফাঁদে পড়তে রাজি নই আমি। শনিবারে যেন পাই। অন্য মতলব কোর না। আমায় চিনলে, তোমার মান-সম্মান আমার হাতে। এখন যাচ্ছি! টা-টা। প্রায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল শেলী। বিমূঢ়ভাবে তার গমন পথে চেয়ে রইলেন তিনি। একটু পরই গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ কানে এল। ভেসে উঠল একটি কুৎসিৎ জান্তব মুখের ছবি। কি যেন নাম। হ্যাঁ অনাদি মণ্ডল। একেই হয়ত বলে বিউটি এ্যাণ্ড দি বিস্ট। রক্ষক না ভক্ষক।

সোফায় বসলেন তিনি। আকাশ-পাতাল চিন্তা। গ্লাসে ঢাললেন তরল পানীয়। বয় এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। নিঃশব্দে ফিরে গেল। মাত্রা ঠিক রাখতে পারছেন না। প্রায় ভুলে যাওয়া অতীত স্পষ্ট হয়ে জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। এক জীবনে দুটি নর্তকী। অথচ কি বিরাট ব্যবধান দুজনের মধ্যে। তবে, এই কি আমার প্রায়শ্চিত্ত। এমন শাস্তিই নিশ্চয় আমার প্রাপ্য।

টলতে টলতে বাইরে এলেন তিনি। বয় রান্নাঘরে ব্যস্ত। চেনে বাঁধা কুকুরটা ঘাড় তুলে দেখে আবার ঘাড় গুঁজল। বাইরে অন্ধকার। বাগান পেরিয়ে গেটের বাইরে এলেন পাহাড়চূড়োর দিকে হাটতে থাকলেন। মায়া নেই, মমতা নেই, কোন বন্ধন নেই এই পৃথিবীর সঙ্গে। মনুষ্যত্ব নেই। একটা জাল তাকে চারিদিক দিয়ে জড়িয়ে ফেলেছে। মুক্তি নেই। শুধু অবিশ্বাস, শঠতা, বঞ্চনা। কিন্তু মুক্তি পেতেই হবে। সব ধরাছোঁয়ার বাইরে যেতে হবে। ওই পাহাড়চূড়ো থেকে সূর্যোদয় দেখে সবাই। কাল সকালে সকলে দেখবে আমার ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডিত প্রাণহীন দেহের জড়পিণ্ড। সেই ভালো। এতক্ষণে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন চিদাম্বরম। চারিদিকে তাকালেন। ঘন অন্ধকার। নিচে তাকালেন। অতলের আহ্বান। আর পা টলছে না তার। স্থির চোখে ঘন জমাট অন্ধকারের দিকে তাকালেন। জীবনযন্ত্রণাদগ্ধ পরাজিত সৈনিক আমি। অন্ধকারেই আমার মুক্তি।

মানুষ মুনিষ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সুদেব সকলের বড়ো। তার কান্নার ধকলও আলাদা। বুক চাপড়াচ্ছে, নিজের চুল ধরে টানছে, একবার একটানে পট-পট করে জামার সব বোতামই ছিঁড়ে ফেললো।

দুপুরে ধুতির ওপর শার্ট চড়িয়ে বি-ডি-ওর অফিসে গিয়েছিল সারের তদ্বিরে। ফেরার পথে সন্ধেবেলা ময়নাদের বাড়ি সবে তাস নিয়ে বসেছে, তাস বাঁটা হচ্ছে, সেও ওই ফাঁকেই একবার উঠে গিয়ে নেবুতলায় ময়নাকে গালটাল টিপে এসেছে, এসে ময়নার বাপের কাশি আর খোজকায় সেই একঘেয়ে মধুর জন্য কান্নাকাটা শুনতে শুনতে দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে, এমন সময় গজাই কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললো, বড়দাবাবু, আপনার মা মরে গেছে গো!

তার তাস ভালোই পড়েছিল, ময়নাকে রাতে মাংস-পরোটা খাওয়াবারও কথা ছিলো, সব মাথায় উঠলো।

সুদেবের গলা শুনে আশপাশ থেকে অনেক চেনা আধ-চেনা লোকজন ছুটে এসেছে।

সুদেব কাঁদতে কাঁদতে প্রত্যেকের চোখে একবার করে চোখ রাখছে। যেন সকলের কাছে পালা করে জানতে চাইছে, কেন, কেন, কেন আমার মা মরে গেল?

সুদেবের বউ সুদেবকে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে সেই যে একবার কেঁদে উঠেছিল, তারপর আর কাঁদেনি। সে সমানে সুদেবকে গাল পাড়ছে। সুদেব যতো কাঁদে, সেও ততোই তাকে গালাগাল দেয়। সুদেব কাঁদতে কাঁদতে পুকুরের দিকে দৌড়ে যেতেই তার বউ পেছন থেকে গিয়ে তাকে জাপটে ধরে দুম-দুম করে পিঠে কিল মারতে লাগালো।

সুদেবের পরের ভাই ভুদেব পাশের গাঁয়ে নতুন ইটখোলা করেছে। ভোরে উঠে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত করে। ইটখোলার কাছেই একটা মদ-গাঁজার দোকানে সন্ধে থেকে নেশা করে সাত-আট মাইল রাস্তা সে ঠিক সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসে। তখন দূর থেকে তার খোলা গলায় শ্যামাসংগীত শোনা যায়। কোনো কোনো দিন বাড়ি ফিরতে মাঝরাত পেরিয়ে যায়। আজ একজন মুনিষ গেছে তাকে খবর দিতে।

ভুদেবের পর জয়দেব। সে কখনো সন্ধেবেলা বাড়ি থাকে না। ঝড়জলের দিনেও সে ঠিক বেরুবে। কোমর সোজা করতে পারে না। হাঁটবার সময় হাত দুটো সামনের দিকে ঝলঝল করে। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় চার পায়ে হাঁটছে। নিজে-দের বাগানের ফলমূল, পুকুরের মাছ-কাছিম চুরি করাই তার পেশা। শীতকালে কাঁপ-বেগুন। গ্রীষ্মকালে আম-কাঁঠাল, শশা-তরমুজ। যখন যেমন। কাঁঠাল, আনারস চুরি করে সে বাগানের মধ্যেই গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখে। ওপরে ডালপালা, পাতাটাতা বিছিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে চুরি করে ধরা পড়ে গিয়ে দাদাদের হাতে তো মার খারই ছোটো ভাইরাও তার গায়ে হাত তোলে। যতোই মার খাক, সন্ধে হলেই সব ব্যথা-টাথা ভুলে এক ফাঁকে সে বেরিয়ে পড়ে। মাটির ওপর ঝুঁকে, প্রায় উবুড় হয়ে হাঁটে। হাত-দুটো সামনের দিকে ঝোলে। ঠিক একটা মার-খাওয়া ধূর্ত শেয়ালের মতন সে অন্ধকারে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ফল পাড়ে। কোঁচে গেঁথে মাছ মারে। তারপর বাজারে গিয়ে বেচে দেয়। বাজারের কাছেই একটা খোলার ঘরে তার বউ আছে। সন্ধে থেকে সার বেঁধে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সেও, সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে থাকে। জয়দেব বউয়ের জন্য ঠোঙা ভরা গরম সিঙাড়া ফুলুরি-বেগুনি কিনে নিয়ে যায়। বাকি টাকার সবটাই বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে, সে হাসে। ওই একটা সময় সে পেছনের দিকে ঘাড় ভেঙে মাথা তুলতে চায়। আজ সে বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই তার মা মারা গেছে। কাছাকাছি থাকলে নিশ্চয়ই বড়দার বীভৎস কান্না শুনতে পেতো। একমাত্র তাকেই কেউ খবর দিতে পারে নি।

বারান্দায় কোণে কর্ণাটি নেই। মহাদেবের ঘরের কুলুঙ্গিতে পাঁচ শেলের টর্চটাও নেই। সহদেব আর মহাদেব গেছে খরগোস শিকারে। এদিককার বন-জঙ্গলের সব খরগোস শেষ, আজকাল প্রায়ই তারা দূরের ঝোপঝাড়ে যায়। আজ কোনদিকে গেছে, কখন ফিরবে, কেউ জানে না। তাদের খবর দিতে তিন দিকে তিনজন মুনিষ পাঠানো হয়েছে। মা হঠাৎ চোখ বুজবে, কেউ ভাবেনি!

যে সব মুনিষ তেঁতুলতলার পুকুরে পাটগাছের আঁশ ছাড়াচ্ছিল তারা সুদেবের আকাশ-ফাটানো কান্না শুনে ছুটে এসেছে। দুজন অল্পবয়েসী মুনিষ মাঠ থেকে ফিরেই গোয়ালে ঢুকে ভাগাভাগি করে সাতটা গরু দোয়াচ্ছিল, তারা প্রথমে মেজ-বউয়ের কান্না শুনে ভেবেছিল মেজদাবাবু আজ হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। এখন বড়দাবাবুর চিৎকার কানে যেতে উঠোনে এসে তাদের মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

সুদেব একবার দাওয়ায় উঠে মায়ের মৃতদেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে

একবার উঁচু দাওয়া থেকে লাফ মেরে উঠোনে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছে।

মুনিষদের কারো চোখের পাতা পড়ছে না। সুদেবকে তারা এভাবে কাঁদতে দেখবে কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবে নি। মুনিষরা দম বন্ধ করে দেখলো, বড়দাবাবু কাঁদতে-কাঁদতে খুব কাতরভাবে তাদের চোখে একবার করে চোখ রাখছে।

পলাই বিকেল থেকে কাঠালতলায় সারের জন্য গোবর জড়ো করছিল, হাতে-পায়ে গোবর নিয়েই সে সুদেবের খোঁজে দৌড়েছিল. তার হাতের কনুই পর্যন্ত গোবর শুকিয়ে খরখর করছে. ওই অবস্থাতেই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুদেবের কান্না দেখতে লাগলো।

বউদের মধ্যে বেশি কাঁদছে মেজবউ। আরো অনেকেই কাঁদছে। সুদেবের তুলনায় অন্য সকলের কান্নাই বেশ ঢিমে। কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেউ কাঁদছে ইনিয়ে-বিনিয়ে। সুদেব একদম আলাদা। মনে হচ্ছে শুধু তারই মা মারা গেছে।

বর্ষার শেষেও আজকাল যখন-তখন হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। একটু আগেও লেবুবাগানে, সজনে গাছে জোনাকির ঝাঁক টরটর করছিল, চিড়বিড়িয়ে বৃষ্টি নামতেই সব অদৃশ্য। বড়ো-বড়ো ফোঁটা সোজা গায়ে এসে বেঁধে। প্রতিবেশী-দের অধিকাংশই যে যার ভিটের দিকে দৌড় লাগালো। কেউ কেউ উঠোনের চারপাশে এ-চালায় ও-চালায় মাথা গুঁজেছে। মুনিষরা তেমনি এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে। তারা জানে, আজ তাদের রাত কাটবে শ্মশানে।

মৃতদেহ উঁচু দাওয়ায় শোয়ানো ছিলো। মায়ের মুখেটুখে জলের ঝাপটা লাগছে সুদেব বিছানাশুদ্ধ সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, তার কাকা বললো, থাক, একটু জুড়োক।

এই সময় দেখা গেল দূর থেকে একটা শেয়াল বা কুকুর বৃষ্টির মধ্যে খলবল খলবল করতে করতে করতে ছুটে আসছে। উঠোনের কাছাকাছি এসে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার ঝলঝলে দু হাতে দুটো তাল। ভূদেবের বউ তাকে দেখতে পেয়ে নতুন করে ডুকরে উঠে বললো, জয়দেব রে! তোমাদের মা আর নেই।

ভূদেবের বউয়ের কান্নার আওয়াজ কম, কিন্তু মর্মান্তিক। এতো বড়ো বাড়িতে একমাত্র শাশুড়িই তাকে মাতাল ভূদেবের হাত থেকে বাঁচাতে পারতো। এই বয়েসেও রাতে শাশুড়ির বুকের কাছে শুতে পেলে সে আর কিছু চায় না।

জয়দেবের ওপর তার একটু বিশেষ মায়া। বিশেষ করে সব ভায়েরা মিলে যখন ওই পঙ্গু ছেলেটাকে ধরে মারে, তার সহ্য হয় না। সে বুক নিঙড়ে দিয়ে বললো, মরবার সময় মা তোমায় বড্ড কাছে চেয়েছিল গো!

এসব মায়া-মমতার কথা শুনেও জয়-দেবের এখন আর এগোবার উপায় নেই। তাল নিয়ে সে কিছুতেই বড়দার সামনে যেতে পারে না। উঠোনের বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দু-এক মুহূর্ত থমকে থেকে সে ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে নিলো, তারপর বাঁদিকের বনবাদাড়ে ঢুকে মিলিয়ে গেল।

বাড়ির ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা তালপাতার ভোঙ্গা মাথায় উঠোনে এসে জড়ো হয়েছে। আশ-পাশের বাড়ির মেয়ে-বউরা এসে তাদের নিয়ে যাচ্ছে। আজ তারা সেখানেই খাবে। আজ বাড়িতে উনুন জ্বলবে না। বড়োরা কেউ খাবেও না।

মুনিষদের কেউই এসে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে না, সুদেবের বউ তাদের একেকজন মুনিষ দিয়ে এবাড়ি ওবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। নিজের তিন ছেলে এক মেয়েকে এতোক্ষণ কারো সঙ্গে যেতে দেয়নি। একজন মুনিষকে দিয়ে এদের খগেন জ্যাঠার বাড়ি পাঠিয়ে দিলো। যাবার সময় সঙ্গের লোকটাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, বলিস—ঘি দিয়ে মুগের ডাল খেতে এরা ভালোবাসে।

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে আঁচলের তলা থেকে একটা চকচকে বেগুন বের করে দিয়ে বললো, একটু ছাঁকা তেলে ভেজে দিতে বলিস।

খগেনজ্যাঠার কাছে খুব গোপনে তার কিছু টাকা রাখা আছে।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে ফের ঘোলাটে চাঁদ উঠেছে। প্রতিবেশী পুরুষরা বেশ যত্ন করে খাটিয়া বানাচ্ছে। ছ-সাত ক্রোশ রাস্তা, বাঁধন-বুনোন মজবুত না হলে চলবে কেন।

সুদেব তখনো কাঁদছে। মাঝে একটু ঝিমুনি এসেছিল, আবার নতুন করে শুরু করেছে। এর মধ্যে এক ফাঁকে সে একজন মুনিষকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছে খই আনতে। আলাদা একটা দশ টাকার নোট দিয়েছে, পয়সায় ভাঙিয়ে আনতে। নাদুকে নোটটা দিয়ে বলে দিয়েছে, এক নয়া আজ-কাল আর পাওয়া যায় না। তবে দু পয়সার বেশি নিবি না। প্রথমে সবটা এক টাকা করে নিস। তারপর দরকার হলে দশ দোকানে ঘুরে খুচরো করবি।

এখন তার কান্নার মধ্যে একটা কথাই ফিরে ফিরে আসছে। মা নেই, এবার সংসার কে দেখবে? সংসার এবার ভেসে যাবে।

কাঁদতে কাঁদতেই সে দূর থেকে ভূদেবের গান শুনে, একটু ঢিমে দিলো। মাঠ থেকে হঠাৎ-হঠাৎ উলটো-পালটা হাওয়া আসছে। ভূদেবের দরাজ গলার গান স্পষ্ট শোনা যায়—এতো খেয়েও সাধ মেটে না, এবার কালী তোমায় খাবো। তুমি খাবে লোক-মুণ্ডু মা, আমি পাঁঠার মাংস খাবো।

ভূদেবের বউ শোকের মধ্যেও জ্ঞান হারায়নি। অন্যদিন মানুষটা ঠিক-ঠিক সম্বোসপ্তাই যায়। অসুস্থ হলেও কথা ঠিক থাকে। কী-সব মাথামুণ্ডু বকছে।

ভূদেবের বউয়ের আর শান্তি নেই। সব সময় সে ভয়ে কাঁপে। তার জীবনে আরো কী খারাপ ঘটতে পারে ভেবে সারাক্ষণই সে সিঁটিয়ে থাকে। ভিজে হাওয়ায় ভূদেবের প্রলাপ শুনতে শুনতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার এবারের জীবন এইভাবেই এক-দিন শেষ হয়ে যাবে।

ভূদেব গান বদলেছে। এবারও মনগড়া কথা মিশিয়ে গাইছে। একটু পরে তার সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। ঐ তো আসছে। দু-চাকা কাদায় মাখামাখি। চোখ লাল। সাইকেল থেকে নেমে, দাঁড়াতে পারছে না। পা টলোমলো। সামনে খাটিয়া পেয়ে তার ওপর ধপাস করে বসে পড়লো।

শুদেবের বউ কাকী দিদি হা-হা করে দৌড়ে এলো। দিদি বললো, নাম, নাম-- নেমে আয়। এক ফোঁটা জ্ঞানগম্যি হলো না তোর!

শুদেবের কাকী জামার কলার ধরে টানতে-টানতে তাকে তুলে দিয়ে বললো, মড়ার খাটিয়ায় কেউ বসে?

ভূদেব একটু শান্ত হয়ে বললো, সে হারামজাদী কই? শ্মশানে নিয়ে গেছে?

দিদি কিছু বলতে গিয়ে এবার কেঁদে ফেললো।

ভূদেব বড়ো একটা হাই তুলে বললো, যখন বেঁচে ছিলো আমায় জ্বালিয়েছে, এখন মরে গিয়ে জ্বালাবে!

শুদেব প্রায় লাফ মেরে তার কাছে এসে হুংকার দিয়ে বললো, থাবড়িয়ে মুখ ভেঙে দেবো বাঁদর! আর একটা কুকথা বলবি তো মেরে শেষ করে দেবো শুয়োর।

ভূদেবের দু-চোখ দু-টুকরো আগুনের মতন জ্বলছে। রাগে তার নেশা প্রায় কেটে গেছে। সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে শুদেবের গলা টিপে ধরে তাকে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বললে, বড্ড মায়া! অ্যাঁ, বড্ড মায়া! আজ ওই ছেনালীর সংগে সমরণে পাঠিয়ে তবে ছাড়বো! তবে আমার নাম ভূদেব বিশ্বাস!

লোকজন ছুটে এসে কোনো রকমে ভূদেবের হাত না ছাড়িয়ে দিলে কী হতো বলা যায় না। সবাই মিলে দুজনকে দু-দিকে টেনে নিয়ে গেল। ছোটকাকা ভূদেবকে বললো, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ভুদু? নিজের মাকে নিয়ে কেউ ও-রকম বলে? শত্তুর মরলেও তো কেউ ও-রকম করে বলে না। হাজার মাথা খুঁড়লেও ইহ-জীবনে আর কি মাকে পাবি?

তার গলা বুজে আসছিল। ছোটবেলা থেকে ওই বৌদিই তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে।

ভূদেব হঠাৎ সব বুঝতে পারে। ছোট কাকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, কাকা! আমার মা মরে গেছে? আমি ভেবেছিলাম-- ও! হো হো হো

[illegible]

আর রাত করা ঠিক হবে না। পথ কম নয়। তার ওপর বৃষ্টি-বাদলার কথা জোর করে কিছু বলা যায় না। সহদেব-মহাদেবের জন্য আর কতো অপেক্ষা করা যায়! যে-তিনজন তাদের খোঁজে গিয়েছিল, একে-একে সকলেই ফিরে এসেছে। চেনা-অচেনা মাঠে বনে ক্ষেতে খুঁজেছে, দেখা পায়নি। দু-ভাই আজ খরগোস মারতে কোন্ দুনিয়ায় গেছে কে জানে!

বিনোদ বৈরাগী সন্ধ্যে থেকে বসে-বসে তামাক খাচ্ছিল, মুখের সামনে থেকে হুঁকোটা সরিয়ে বললো, সবার ভাগ্যে থাকে না। ছাই হবার আগে বাপ-মাকে এক-বার চোখের দেখা দেখবার ভাগ্যি সবার হয় না।

সুদেব ভূদেব দুজনেই কাঁধ দিয়েছে। পায়ের দিকটা কাঁধে নিয়েছে দুজন জ্ঞাতি। ছোটকাকা চলেছে আগে-আগে। তার হাতে খইয়ের ধামা আর খুচরো পয়সা।

শবযাত্রীরা উঠোন পেরিয়ে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে চলেছে। পেছন-পেছন যাচ্ছে চোদ্দজন মুনিষ। অন্যদিন ভোর থেকে কাজ করে সন্ধেবেলা তারা যে যার ঘরে ফিরে যায়। আজ আর তাদের বাড়ি যাওয়া নেই। কেউ তাদের কিছু বলেনি, তারা নিজে থেকেই জানে, আজ তাদের শ্মশানে যেতে হবে।

পদ্মপুকুর ছাড়াতেই বাঁদিকের ঝোপ-জঙ্গল থেকে ভূদেবের মুখের ওপর টর্চের আলো এসে পড়লো। তার কপাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। সারা গা ঘামে ভেজা। কাকা পেছনে মুখ ফিরিয়ে বললো, সহদেব-মহাদেব আসছে।

বাহক ও মুনিষরা এবার একটু জোরে বললো, বল হরি হরি বোল। সুদেব ভূদেব দুজনেই গলা মেলাতে গিয়ে কেঁদে ফেললো।

চাঁদ এখন অনেক স্পষ্ট। মাঠভরা জোনাকি। সহদেব মহাদেব বাঁ-দিক থেকে টর্চ মারতে মারতে ঝোপ-ঝাড় ভেঙে রাস্তায় উঠেই দাঁড়িয়ে গেল। সহদেব হাতের টর্চ নেভাতে ভুলে গেছে। তার বাঁ-হাতে দুটো খরগোস। একসঙ্গে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়েছে। একটার কান দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আর-একটার মাথা দু-ফাঁক হয়ে রক্তে মাখা-মাখি। মহাদেবের হাতে বর্শা।

সহদেবের টর্চ এর-ওর মুখে ছটফট করতে করতে তার মায়ের মাথায় স্থির হয়ে গেল। অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে খর-গোস দেখলে দূর থেকে সে ঠিক এমনি করে খরগোসের চোখে পাঁচ শেলের টর্চ ফ্যালে। খরগোস আর নড়তে পারে না। মহাদেবের হাতে বর্শা দুলে ওঠে। তার টিপ ফসকায় না।

জঙ্গলে জ্যোৎস্নায় নিঝুম গ্রামের পথে নতুন করে রোদন শুরু হয়। সহদেব কাঁদে, মা রে, এ তুই কোথায় চললি?

খাটিয়া নামানো হয়েছিল। মহাদেব তার মায়ের মুখের ওপর ঝুঁকে দু-হাতে মায়ের মুখ ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে ডাকে, ও মা, মা, মা রে!

মহাদেব বর্শা ফেলে দিয়েছে। সহদেবের হাতে তখনো খরগোস-দুটো ঝুলছে। এখন তারা কাঁধ দেবে।

সহদেব পাশের ঝোপে খরগোস-দুটো ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিল, কাকা বললো, ফেলিস না। ওই মুনিষদের দে। ওদের তো আর অশৌচ নেই। গরীব মানুষ, তৃপ্তি করে খাবে। তোর মায়ের আত্মারও তাতে কল্যাণ।

সহদেব কাছেই তুঁতেকে পেয়ে খরগোস তার হাতে দিতে গেল।

কাকা বললো, যা, দৌড়ে গিয়ে তোর বাড়িতে রেখে আয়। কাল সকলে মিলে ভাগ করে খাস।

তুঁতে এক পা পিছিয়ে গিয়েছিল আমতা-আমতা করে বললো, আমার ঘরে রোজ শেয়াল ঢোকে।

সহদেব পলাইয়ের দিকে খরগোস-দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নিয়ে যা।

পলাই হাত বাড়ায় না। সে নেশা ভুধর, কানুদের দিকে তাকিয়ে অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করে।

--কী হলো রে! ধর--

পলাই তবু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এতো শোকের মধ্যেও [illegible] হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর গলায় হু[illegible]র দিলো, পলাই!

মুনিষদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তার মধ্যে থেকে নাদু গলা তুলে বলে উঠলো, ও-খরগোস আমরা কেউ খাবো না বাবু, ওতে পেত্নী লেগেছে!

সহদেব রাগের চোটে খরগোস-দুটোকে খুব জোরে ছুঁড়ে দিলো। গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সে-দুটো সোজা পদ্মপুকুরে পড়ে ঝুপুস করে শব্দ হলো।

খাটিয়া আবার কাঁধে উঠেছে। এবার চার কোণে চার ছেলে। কাকা খই আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে এগোচ্ছে। পেছনে শব-বাহকের দল।

তুঁতে আর পলাই বিড়ি খাবে বলে ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়েছিল। নাদুও দাঁড়াল। থুক্ করে খানিকটা শ্লেষ্মা ফেলে বললো বুড়ি বেঁচে থাকতে কোনো-দিন একটা মাছের কাঁটা পাতে দিলো না, সে মরেছে বলে খরগোসের ভোজ! থুঃ!

পলাই পর-পর ক'টা লম্বা টান দিয়ে বিড়িটা তুঁতের হাতে দিয়ে বললে, যা হার-কিপটে বুড়ি! আমরা খরগোস ছুঁলে ঠিক পেত্নী হয়ে ঘাড় মটকাতো!

পদ্মপুকুরে ঝপাস করে কী-একটা লাফিয়ে পড়লো। হয়তো সেই শেয়াল বা কুকুরটা। খরগোস-দুটোর লোভে নয় তো?

হরিধ্বনি অনেক দূরে চলে গেছে। তারা জোরে পা চালালো। প্রায় দৌড়োচ্ছে।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় তিনজনেই একসঙ্গে শুনলো, পেছনের

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সেই থেকেই নোনাধরা বাড়ির বার দেয়ালে বন্ধ প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনযাত্রা কবিগুরুর ভাষায় রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা। কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, কোথায়ই বা যাবে! কদাচিত কখনও সিনেমায় যাওয়া। যে কোম্পানীতে কাজ করে সেখান থেকে পাস পাওয়া যায় মধ্যে মধ্যে—তবে সেটাই তো সব নয়, অন্য খরচ আছে। রাখালের আয় সংকীর্ণ সীমায় বন্ধ, চার আনা পয়সা খরচ করতে হলেও হিসেব করে দেখতে হয়। পনেরো ষোল বছর যার মেসে কেটেছে কি আরও বেশী, তার সংসারী বন্ধু বেশী থাকার কথা নয়। দু-একজন অবশ্য আছে, তবে তাদের কাছেও যেতে সংকোচ বোধ হয়। কারণ ওরা গেলেই তারা আসবে, গরিবের সংসারে চা জলখাবারের আয়োজন করাই তো দুশ্চিন্তার কথা।

অতএব সংসার।

রান্না, ঘরমোছা, বাসন মাজা, সাবান কাচা—আর স্বামী বাড়ি থাকলে অজস্রধার চা করে যাওয়া। এতে চেহারা খারাপ হয়ে যাওয়ারই কথা, কান্তি মলিন—কিন্তু বিনু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে তা হচ্ছে না। বরং দিনে দিনে শতদল পদ্মের মতোই যেন বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। স্বাস্থ্য ভাল হল আরও। সত্যিই বোধহয় বাপের বাড়ি অর্ধাহারে থাকতে হত বেশিরভাগ দিন—এখানে শুধু পেট পুরে খেতে পেয়ে আর মানসিক শান্তিতে লাবণ্য উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল।

আর সবচেয়ে মুখখানি।

সুন্দর মুখ বলা যায় না কোনমতেই কোন অংশেই তার নিখুঁত নয়—তবু কী সে আছে একটা, এমন সরলতা আর কাঁচ স্বভ যে দেখলে সদ্যফোটা ফুলের উপমাটাই মনে পড়ে। তাও রজনীগন্ধা কি চাঁপা নয়—মনে হয় শিউলি ফুলের মতোই কোমল আর পবিত্র।

বিনু আকৃষ্ট হবে এ স্বাভাবিক। এর আগে এমনভাবে কোন অল্পবয়স্কা আর মিষ্ট স্বভাব মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি। বোন বৌদি কেউ না। মেয়েদের সম্বন্ধে আকর্ষণ তাই কখনও বিশেষ বোধ করেনি। বিশেষ অল্পবয়স্কা মেয়েদের সম্বন্ধে। সেই এক বৌদি এসেছিলেন—মানে কাছে আসতে চেয়েছিলেন, সে বুঝতেও পারেনি।

তবু আকৃষ্ট হয়েছে সে প্রথমটা অজ্ঞাতসারেই। এটা যে আকর্ষণ বা মোহ—তা ধরা পড়েনি নিজের কাছে। এমন অভিজ্ঞতাও তো এই প্রথম। তারপর অবশ্য সচেতন হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। কিন্তু তখন সে আকর্ষণের স্রোত প্রবল হয়ে উঠেছে। তাকে বাধা দেবার মতো শক্তি ছিল না আর, বোধহয় ইচ্ছাও না। আত্মসমর্পণ করেই যে সুখ এখানে।

ক্রমশ নেশার মতোই পেয়ে বসে তাকে এই সাহচর্য, এই দু-তিন ঘন্টার সঙ্গসুখ।

বিকেলের দিকেই ওদের বাড়ি আসে বেশিরভাগ, রাখালের আপিস থেকে ফেরার সময় নাগাদ। রাখালের ছুটির দিন ওর অবসর থাকলে সকাল দশটার মধ্যে এসে হাজির হয়। একেবারে শিয়ালদার বাজার থেকে মাছ কপি বা গরমের দিনে অন্য সব্জী নিয়ে যায়। অসময়ের ভাল কোন সব্জী নিয়ে গিয়ে টিয়াকে অবাক করে দেয়। ওখানেই খায় সেসব দিন।

খাওয়ার চেয়ে, টিয়া তোলা উনুনের সামনে পিঁড়ি পেতে বসে রান্না করে—সেদিকে চেয়ে থাকতেই বেশী ভাল লাগে। সেইজন্যেই এ সময় আসা। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে। সত্যিকারের চাঁপার কলির মতো আঙুলে খুন্তি ধরে নাড়ে।, কি বঁটি পেতে কুটনো কোটে—মনে হয় এ এক অপার্থিব দৃশ্য ও অনুভূতি। উনুনের আঁচের আভাটা মুখে এসে পড়ে—বিশেষ একটু মেঘলা ভাব থাকলে কড়া কি চাটুর তলা দিয়ে ফালিমতো আলো এসে পড়েছে বেশ বোঝা যায়—কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে। বিনু অপলক চোখে চেয়ে আছে সেটা কখনও কখনও কাজের ফাঁকে লক্ষ্য করে তার কপালে-কপালে কে আবীর ছড়িয়ে দেয়, সে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি।

কখনও এমন মনে হয়নি এর আগে, কল্পনাও করতে পারে নি তাই। এ একেবারেই অভিনব, আশ্চর্য। এর বর্ণনা দেওয়া যায় না। নিজেই কি হিসেবে পায় এ আনন্দ-আবেগের কারণ আর পরিমাণ!

টিয়ার রান্না খুব ভাল না। মায়ের রান্না খেয়ে পর আর কোন রান্নাই পছন্দ হবার কথা নয়। তবু—অন্য সাধারণ রান্না থেকে নিরেশ। কিন্তু সে হিসেব কি থাকে খাওয়ার আগে কি খাওয়ার সময়।.....

বিকেলে বা সন্ধ্যার সময় গেলেও কিছু না কিছু নিয়ে যায়। ভাল মিষ্টি কিছু, কিম্বা কচুরি সিঙ্গাড়া। কখনও রাম মশাইয়ের দোকান থেকে চিংড়ির কি মাছের কাটলেট। সেটা নির্ভর করে যেদিন যেমন পয়সা হাতে থাকে তার ওপর। টানাটানি থাকলে ওদেরই গলির মোড় থেকে বেগুনি কি ডালপুরি নিয়ে যায়।

যা নিয়ে যায় তাতেই কিন্তু টিয়ার আহ্লাদের সীমা থাকে না। সবেতেই আশ্চর্য লাগে তার। স্পষ্টই বলে, এসব জিনিষ সে কখনও খায়নি, চোখেও দেখেনি। ঘোড়ার রাসের মেলায় গিয়ে তেলেভাজা ফুলুরি এক পয়সায় খেয়েছে বটে—তবে সে ভাল না। তেলেভাজা গুড়ের জিলিপী খেয়েই কত ভাল লাগত, এখানকার মতো এমনভাবে জিলিপী হয় কোথাও তা তো জানত না।

এক একদিন ললিতও যায় ওর সঙ্গে আলাদাও যায়, একটু আগে বা পরে। সেও কিছু কিছু নিয়ে যায়। কিন্তু টিয়া বিনুর আনা জিনিষ নিয়েই বেশী উচ্ছ্বাস করে, সে উচ্ছ্বাস এক এক সময় রীতিমতো অশোভন হয়ে ওঠে। অন্য দিন আড়ালে তা বোঝাবারও চেষ্টা করে—টিয়া তখনকার মতো অনুতপ্ত হয়, আবার যথাসময়ে সে কথা ভুলে যায়। ললিতও হয়ত এটা লক্ষ্য করে ক্ষুন্ন হয়, কিন্তু বিনু কি করবে।

প্রথমবার পুজোর সময় লেখার টাকা থেকে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল টিয়াকে।

অনেক দুঃখের টাকা লেখার। লেখা থেকে—যা দু-একটা গল্প তখন ছাপা হচ্ছে ভাল কাগজে—টাকা পেতে পুজোর পর, নভেম্বর মাসেটাসে আশা করা যায়। এক নন্দন বাজারের টাকাটাই পুজোর আগে পায়। তবে সে আর কত?

এসময় টাকা মানে প্রকাশকদের কাছ থেকেই যাকে বলে ঠোঁপায়ে কিছু কিছু আদায় করা। তা ওর ভাগ্যে বড় সম্রান্ত প্রকাশক তখনও জোটেনি। সামান্য পুঁজির ব্যবসায়ী তারা, সকলকারই যেমন প্রায় সারা বছর ধারে কাগজ কেনে, প্রেস ধারে ছেপে দেয়, এমন কি দপ্তরী বিক্রেতা তাও ধারে চলে।

এতটা ধার পাওয়া যায় বলেই অল্প পুঁজির লোকেরা এই ব্যবসায় আসে। তবু ধার পাবার একটা সীমা আছে বৈকি। ঢাকে-ঢোলে মোটা পেমেন্ট করতে হয়—ঢাকে-ঢোলে মানে চড়কে আর পুজোয়। অর্থাৎ চৈত্রে ও আশ্বিনে। এসময় টানাটানির শেষ থাকে না। উচিত এই সময়

সময় পুরো পাওনা চুকিয়ে দেওয়া, প্রকাশকরা বেশির ভাগই তা পারেন না। তবু অনেকখানিই দিতে হয় যেমন করে হোক নইলে পরে আর ধার পাবার সম্ভাবনা থাকে না।

তবে পুজোর আগে না হলেও যখনই টাকা নিতে যায়—যথেষ্ট তাগাদা ও অনুনয় বিনয় করতে হয়। এর মধ্যে যিনি বেশ শাঁসালো পাইকিরি কারবার বেশি করেন বলে হাতে বেশ কিছু থাকে—তিনি দেনও, অনেক সময় আগামও দেন—তবু দিন কতক হাঁটাহাঁটি না করলে কিছু আদায় হয় না।

এ বছর পাওনাও কম। আসলে প্রত্যহ বেলেঘাটায় এতটা করে সময় কাটানোর জন্যে ফসলও কম হয়েছে, হয়ত এদিকে তেমন মনই দিতে পারেনি। প্রকাশকদের কাছে ঘুরে নতুন কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে অর্ডার নেওয়া বা তা লিখে দেওয়া কোনটাই হয়ে ওঠেনি। এমনিও ঘোরাঘুরি করতে করতে তাঁরাও নিজে থেকে কিছু ফরমাস করেন। সে সবই নির্ভর করে তাঁদের চোখের ওপর কতটা থাকবে তুমি তার ওপর। না গেলে গরজ করে বাড়িতে লোক পাঠাবেন—এমন মাতব্বর লেখক সে নয়।

টাকা বেশী পাওয়া যায় পাঠ্য বা উপপাঠ্য বই লিখলে। তবে এসব বই-ই পুজোর অনেক আগে লিখে দিতে হয়। পাঠ্য বই সে জুন মাসে ছেপে—জুনের শেষে কি জুলাইয়ের গোড়ায় সাবমিট করতে হয়। টেকসট বুক কমিটির কাছে, তাদের অনুমোদনের জন্য।

এ বছর সে সময়ের বেশীটাই কেটেছে একটা ঘোরের মধ্যে। কোথা দিয়ে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটেছে তা বুঝতেও পারেনি। বুঝল এখন, সামনে পুজোর খরচের মুখে পড়ে। আর কোথাও কিছু পাওনাও নেই বিশেষ। বাড়ি কি জমির দালালীতেও এই একই কারণে ঢিলে পড়েছে। ইনসিওরেন্সের দরুন যা কমিশন জমা হয়— এর মধ্যে অন্য উপার্জনের পথ বন্ধ থাকায় নিজে গিয়ে দু-তিন দফায় তুলে এনেছে। এখন একমাত্র ভরসা এঁরা। প্রকাশকরাই। পাঠ্য-পুস্তক লিখলে মোটা টাকা পাওয়া যায় কারণ তা অপর কোন শিক্ষক কি অধ্যাপকের নামে ছাপা হয়, রয়্যালটি বা লাভের অংশ যা হয়—তাঁরাই পান। লেখকদের এককালীন ব্যবস্থা। তাই বেশী পাওয়া যায়। এবছর তাও কিছু ফরমাস পায়নি। পায়নি—ঐ একই কারণ, ঘোরাঘুরি করেনি বলে।

আগে ভেবে রেখেছিল রাখালদের নিয়ে ও অর ললিত কাশী কি রাজগীর—কোথাও বেড়াতে যাবে দিন কতক। সে জন্যে যে টাকার দরকার তাও জানত, তবু রোজগারে মন দিতে পারেনি। অগ্রিম কাজ ঠেলে ঠেলে রেখেছে, কোনো সুদূর ভবিষ্যতের জন্যে।

সুতরাং বেশী কিছুই করা হয়ে উঠল না। মাকে কাপড় দিতে হবে, মাকে সে একসময় ভাল কাপড়ই দেয় এদিকেও টুক-টাকা খরচা আছে। পুজোয় মাকে দাদাকেও কিছু দেওয়া উচিত। এবার সব দিক দিয়েই টানাটানি। কোনমতে টাকা যোগাড় ক' পঞ্চমীর দিন আট টাকা দিয়ে একখানা আশমানি রঙের ঢাকাই শাড়ি কিনে নিয়ে এল। সাধারণ শাড়ি যাকে অনেক ভাল কাপড় দিলে মনে তৃপ্তি হয় তাকে এ জিনিস দিতে যেন একটা দৈহিক কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু উপায় কি। তবু এতেই কি খুশী টিয়া।

এ শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, তার কাছে এ যেন স্বপ্নেরও অতীত।

রীতিমতো ঐশ্বর্যের ব্যাপার এ জিনিস। খুব বড় লোকরা ছাড়া এমন কাপড় কে পরতে পারে।

এত ভাল কাপড় সে কখনও পরেনি, বাবা তো চিরদিন দেড় টাকা সাত সিকে জোড়া হেটো কাপড় এনে দিয়েছেন। হাওড়া হাটের নিকৃষ্ট শাড়ি বা। একবার করে পরলেই তার রং উঠে যেত। তাও সবসময় হয়ে উঠত না। গুণ চটের মতো মোটা মিলের শাড়ি দশ-বারো আনা দিয়ে কিনে আনতেন—খটির বাজার থেকে। তাও পরণের কাপড়খানা একেবারে শতচ্ছিন্ন তালি দেওয়ার অবস্থা পেরিয়ে গিঁট-বাঁধা না হলে আসত না।

ভাল কাপড়ের মুখ যা দেখেছে এই বিয়ের সময়ে। তাও রাখালদের দেওয়া গায়ে হলুদের কাপড়ই বা, বাবা একখানা দিয়েছে যেটা পরে বিয়ে হয়েছে, সে সাধারণ লালপাড় তাঁতের শাড়ি। তবে বারোমেসের থেকে একটু ভাল।

রাখালের বন্ধুরা প্রায় সবাই সিঁদুর কৌটো দিয়ে কাজ সেরেছে, একজন কে যেন একখানা শাড়ি দিয়েছে, চলনসই এই পর্যন্ত। মামীমা দিয়েছেন একখানা—ওরই মধ্যে ভাল কাপড়ই দিয়েছেন। বিনুরা কিছু দেয় নি। সে শুনেছে টিয়া, রাখালই বলেছে। নিজের দারিদ্র্য গোপন করে নি।

কাপড় পেয়ে টিয়া আনন্দে কচি মেয়ের মতো এক পাক নেচেই নিল। তখনও রাখাল আপিস থেকে আসে নি, সেদিন তাদের অনেক কাজ, ষষ্ঠীর দিন দুটোয় আপিস বন্ধ হয়ে যায়—কাজেই হিসেব-নিকেশ, টাকাকড়ির লেনদেন, এদের মাইনে বকশিশ সবই এই পঞ্চমীতে চুকিয়ে আসতে হয়। রাত দশটা সাড়ে দশটাও হতে পারে ফিরতে, রাখাল বলেই গেছে।

এ কথাটা জানত, অত খেয়াল ছিল না বিনুর। সে শাড়ি কিনবে, কিসে টিয়ার মনের মত হবে, অথচ ওর ট্যাঁকের জোরে টান পড়বে না—এই কথাই ভেবেছে সারা দিন, তাই রাখালের কথাটা মনে ছিল না। রাখালও কাপড় কিনবে, সে বকশিশের টাকা পেয়ে ষষ্ঠীর দিন।

এটা খেয়াল থাকলে বিনু হয়ত এখন আসত না, পরের দিন ভোরে আসত। সেও অবশ্য অসুবিধে, নতুন শাড়ি নিয়ে বাড়ি গেলে অনেক প্রশ্ন, অনেক মন্তব্য ও অনুমান।

এইটুকু যে টিয়ার এ সরব উচ্ছ্বাস নিশ্চয় বাড়িওলাদের কানে যাচ্ছে। কানে যে যাচ্ছে তার প্রমাণ তাঁরা উঠোনে নেমে আপাত উদাসীনতার মধ্যে এদিকে উঁকি মারছেন। রাখাল যে নেই দিন, একা—সে তথ্যও নিশ্চয় তাঁদের অজানা নয়।

বিনুর লজ্জা করতে লাগল খুব। কে জানে ওরা কোন খারাপ ভাবে নিচ্ছে কিনা। সেভাবে রাখালের কাছে কিছু লাগবে কিনা।

টিয়ার এসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, এত কথা, সুদূরে কোন বিপদের সম্ভাবনা তার মাথাতেই ঢোকে না, বোঝাতে গেলেও বুঝবে না।

সে বলে, জানো আমরা একবার ঘড়ির কলেজবাড়ি রাস দেখতে গিছলুম, সেখেনে এক বড়লোকের বৌ—হ্যাঁ গো, হেসো নি, মস্ত বড়লোক, গায়ে এক গা গয়না নিদেন আড়াইপো সোনা হবে—ঠিক এমনি একখানা শাড়ি পরে এয়েছেন। তখুনি মনে হয়েছিল আমার ভাগ্যে কখনও কি এত দামী কাপড় জুটবে। বাবার তো এই অবস্থা সে আর কি রে বে দেবে বলো, আমার চির-দিন এই রঙ-চটা ফ্যাঁসা কাপড় পরেই কাটাতে হবে। সত্যি বলছি, তোমরা গায়ে হলুদে যে শাড়ি দিছলে তাই দেখেই মা হিংসেতে জ্বলে-পুড়ে গেছে। বলে, উঠন্তি-মুলো পত্তনেই চেনা যায়—তোর বরাত খুব ভাল লো।......পুরনো-সুরনো হয়ে গেলে আমাকে দু দিন দিস বাপু পরতে। শোন কথা। এ কি আমি বারো মাস পরব যে, পুরনো-সুরনো হবে।

আবার হাত তুলে একটা নমস্কার করে বলে, তা ঠাকুর যেন স্থানে থেকে কানে শুনেছেলেন, নইলে তোমারই বা এমন বড়মানষী শখ হবে কেন, এক রাশ টাকা গুনে দে এত ভাল দামী কাপড় কিনতে যাবে কেন। আর বেছে বেছে ঠিক সেই রঙটিই। সত্যি আমার নাচতে ইচ্ছে করছে বাপু, যাই বলো।

অস্বস্তি আর চাপতে পারে না বিনু। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলে, ললিত আসে নি? তারও তো আসার কথা।

এ চেষ্টা আরও হিতে বিপরীত হয়, টিয়া বলে, না এসেছে সেই ভাল। তোমাকে তো একা পাওয়াই যায় না। এত ভাল কপড় পেয়ে একটু আহ্লাদ করছি, কেউ এলে কি পারতুম।

এবার বিনু উঠে দাঁড়ায় একেবারে। বলে, আজ আসি তাহলে। রাত হয়ে যাচ্ছে। রাখালবাবু কখন ফিরবেন তার কখন ঠিক নেই, বসে আর কি করব। বরং কাল—

ইললো। তা আর নয়। বচ্ছরকার দিন এলে—একটু কিছু না খাইয়ে ছাড়ছি তোমায়। ওসব ভুলে যাও। আর সে এসেই বা কি বলবে, অগ্নিঅস্ত পাতালঅস্ত করবে না। রোসো একটু মোহনভোগ করে দিই—তোমার জন্যেই এক ছটাক ঘি আনিয়েছিলুম ওকে দিয়ে। তুমি মোহন-ভোগ জলবাস—

না না, আজ বরং থাক। কাল এসে রাখালবাবুর সঙ্গে বসে খাবো—

দ্যাখো, অত চাল দেখিও না বলে দিচ্ছি। দোরে কুলুপ দিয়ে রেখে দোব রাত বারোটা অবধি। সে ভাল হবে?

বলে সত্যি সত্যিই পথ আড়াল করে দাঁড়ায়।

আর ঠিক সেই সময়ে বাড়িওলার স্ত্রী এদের ঘরে উঠে আসেন, কী শাড়ি আনলে গা বৌমা ও ছেলে, তুমি এত খুশী হয়েছ। একবার দেখতে পাইনে?

ওমা, তা আর কেন পাবেন না। ভেতরে আসুন না। খুব ভাল কাপড় এনেছে ঠাকুরপো—দামী কাপড়। এমন কাপড় যে কোন দিন অঙ্গে উঠবে তা ভাবিও নি। এই যে, দেখুন না কাকীমা, আবার বাকস করে দিয়েছে—

কাপড়খানা নেড়েচেড়ে দেখে কাকীমা মুখ টিপে একটু হেসে বললেন, তা ভালই তো। বেশ কাপড়। তা তোমার জন্যে আনবে না তো তার জন্যে আনলে বলো। তোমায় পরিয়েও সুখ। রূপের জন্যই তো কাপড় গয়না মা। তবে এ যেন এমনি ঘরে কাচকে-টাচতে যেও না, কম দামী ঢাকাই তো, সুতো সরে যাবে।

এই বলে আবারও একটু হেসে বেরিয়ে গেলেন।

দাঁতে দাঁত চেপে টিয়া বললে, শুনলে। কথা! ঠিক আমার নতুন ঘর মতো হিংসেয় ফেটে পড়ছেন একেবারে। এখন ভালোয় ভালোয় ভোগে এলে হয়। একটা সুতোর ছিটেড় নিয়ে থুথু দিয়ে নোনজুলিতে ফেলে দিতে হবে। কোসনি এই সব লোকেদের বড্ড নজর লাগে।

বসে যেতেই হল আর খানিক।

হালুয়া করতে ভাল পারে না টিয়া সুজি কাঁচা থাকে ময়দার। তাই মনে হল ঘিটা আগে সবটা দেয়নি, নামাবার সময় দিয়েছে খানিকটা—ওর বিশ্বাস এতেই ঘি চপচপে দেখাবে—আসলে যা হয়েছে কাঁচা ঘিয়ের গন্ধ লাগছে। বাজারের খোলা ভয়সা ঘি এর কতটা চর্বি আর কতটা ঘি তাই বা কে জানে।

তবু খেতেও হল বসে সুখ্যাতিও করতে হল। ছাড়া পেল যখন রাত নটা বাজে।

তাও, বেরোতে যাবে বলে ওমা দাঁড়াও দাঁড়াও দ্যাখো একবার মনের ভুলে তোমাকে গড় করা হয়নি যে।

ওকি আমাকে গড় করবে কি, না না ওসব করো না। এই তো ঠাকুরপো বলো বৌদিরা কি গড় করে।

তা হোক। বয়েসে বড় তো হাজার হোক। আজকে বছরকার দিন হাতে করে একটা কাপড় এনে দিলে। এ পর্যন্ত তো কেউ দেয়নি। নিজের বাপও না। এই বলে সত্যিই গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাল।

বিনুর এই মোহ টিয়ার প্রতি এই প্রবল আকর্ষণের কথা রাখালের বুঝতে বাকী থাকে না।

স্কেচ : সত্যেন্দ্রনাথ পোদ্দার

এ অবশ্য যে কেউ বুঝত, যে কোন স্বামী। বুঝে ঈর্ষিত, বিরক্ত হত। কিন্তু রাখাল তা হয় না। এইখানেই রাখালের বিশেষত্ব।

তার দৃষ্টি সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী তীক্ষ্ণ, অভিজ্ঞতা ব্যাপক সহজে তার মনের প্রশান্তি নষ্ট হয় না। অনেক দেখেছে সে—শুনেছে তার ঢের বেশী তাই মানব মনের এই সব দুর্বলতায় ক্ষুব্ধ কি রুষ্ট হয় না, কেমন একটা স-প্রশ্রয় বা সস্নেহ কৌতুক অনুভব করে। মানুষের দুর্বলতায় বিভিন্ন বিচিত্র পরিচয় তার মনকে তিক্ত কি বিষাক্ত করেনি বরং ক্ষমাশীল করে তুলেছে, সে এই সব মানসিক দৈন্যকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে, অনিবার্য ধরে নিয়ে আর উত্তপ্ত হয় না।

সে তাই বিনুর কাণ্ড-কারখানা দেখে মুখ টিপে হাসে শুধু।

টিয়াও স্বামীর কাছে কিছু গোপন করে না। বিনুর মনোযোগ, টিয়াকে খুশী করার সুখী করার চেষ্টা—প্রতিদিনের প্রতি ঘটনা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাও রাখালের কাছে গল্প করে।

আসলে এর মধ্যে যে কিছু দোষের আছে, তাও সে মনে করে না। স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি কল্পনাও এমন, কারও কাছ থেকেই এখানে যা পাচ্ছে। এর কাছ থেকে যা পাচ্ছে তাও শ্বশুর বাড়ি থেকে স্বামীর দৌলতেই পাচ্ছে—এটা স্বামীর কাছ থেকেই পাওয়া বলে মনে করে।

কিন্তু রাখালের অন্তঃপ্রসারী দৃষ্টি বোধহয় আরও দেখতে পায়।

টিয়াও যে একটু একটু করে বিনুর প্রতি আকৃষ্ট অনুরক্ত হয়ে পড়ছে—সেটাও তার চোখ এড়ায় না। ললিতও আসে প্রায়ই আসে এখনও বিনুর সঙ্গে কখনও একা, সেও ভেতরে ভেতরে মোহগ্রস্ত। টিয়া তার সঙ্গেও যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে। আদর-যত্ন অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় না, গল্প-গুজব সমানভাবেই চলে—কিন্তু এই অনুরাগটা প্রকাশ পায় না তার ক্ষেত্রে দৃষ্টি এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না তাকে দেখে—যেমন বিনুকে দেখলে হয়।

রাখাল এ দেখে বা বুঝেও বিচলিত হয় না।

এটা মানুষের সহজাত দুর্বলতা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে সে। ওর স্বাচ্ছন্দ্য ওর সুখে ও সম্ভোগে যখন কোন বিঘ্ন ঘটছে না, তখন ওর প্রাপ্য মিটিয়ে এরা যেটুকু আনন্দরস উপভোগ করতে পারে করুক না। এই ওর মনোভাব।

(ক্রমশ)
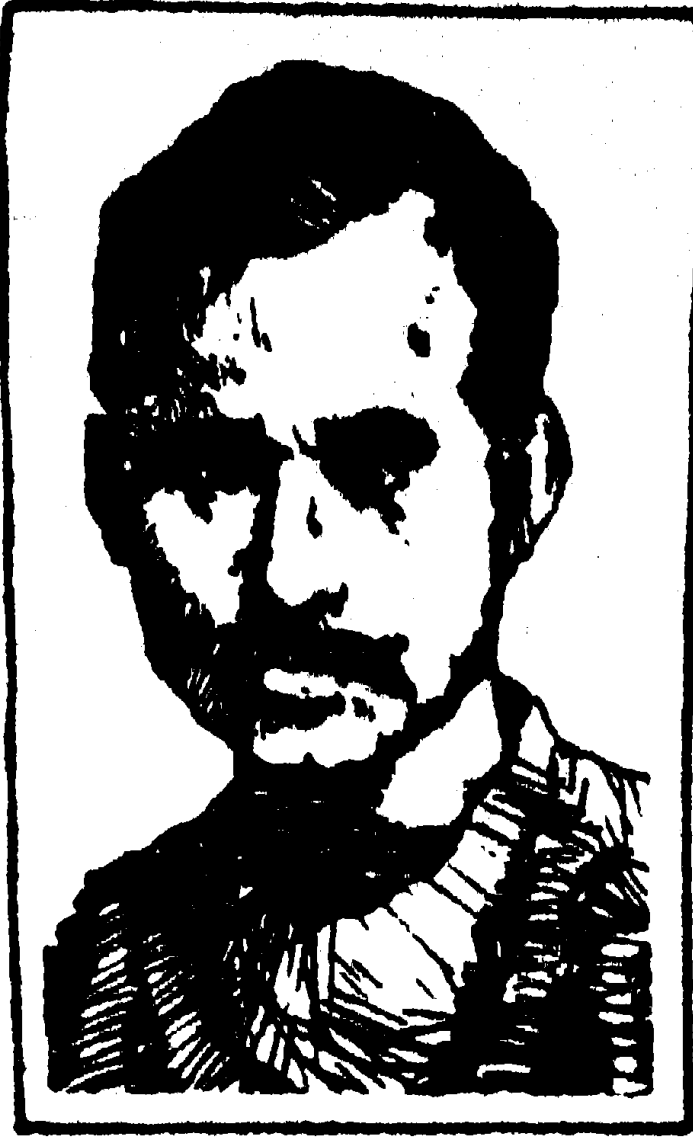
অবলাবান্ধব

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী

নারায়ণ দত্ত

কাদম্বিনী সম্বন্ধে কটাক্ষ করে আরও একটি সম্পাদক একটি কার্টুন ছেপেছিল। সেবারে কিন্তু কোর্টে যাননি দ্বারকানাথ। তিনি স্বয়ং তার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরিমল গোস্বামী তাঁর স্মৃতি চিত্রনে যে কাহিনী বলেছেন ঃ প্রতাপচন্দ্রের পিতা দ্বারকনাথ গাঙ্গুলির ধর্মে আঘাত দিয়েছিলেন এক কাগজের সম্পাদক। তাঁর ধর্ম ছিল স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসার। সেই সম্পাদক দ্বারকনাথকে ও তাঁর প্রচেষ্টাকে কার্টুন ছবির সাহায্যে বিদ্রূপ করেছিলেন। দ্বারকনাথ উত্তেজিতভাবে লাঠি নিয়ে সম্পাদকের বৈঠকে গিয়ে হাজির, পকেটে তাঁর সেই কাগজের বিদ্রূপাংশ। সেটি পকেট থেকে বার করে সম্পাদকের মুখে গুঁজে দিয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন—

'Eat your words:— 'East your words',

বলেছিলেন, আর লাঠি দেয়ে সেটি তাঁর মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন। একেবারে আক্ষরিক অর্থে 'Eat your words' 'যে কথা বলেছ সেই কথা আহার কর' বলা হয় ইংরাজীতে কিন্তু ওর আসল মানে হচ্ছে প্রত্যাহার কর। দ্বারকানাথ ঐ সম্পাদকের কথা তাঁকে প্রথম আহার করিয়েছিলেন এবং পরে তাকে দিয়েই প্রত্যাহার করিয়েছিলেন।' কিন্তু কাগজটি কোন কাগজ, কেই বা এই সম্পাদক, কিই বা ছিল কার্টুনে, কার্টুন না লেখা লেখ, কিছুই স্পষ্ট করে বলার উপায় নেই। তবে কার্টুন সম্বন্ধে শোনা যায়, যে সেটি নাকি ধূমপানরতা কাদম্বিনীর ব্যঙ্গচিত্র

তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, পদে পদে বাধা কোন কিছুই এই দম্পতির নিদারুণ কর্মোদ্যমকে দমাতে পারেনি। কাদম্বিনী অবশ্য তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছেন, এই বিদেশী সরকারের কাছে স্বীকৃতি আদায় করতে হলে খাস বিলিতি মুলুকের সার্টিফিকেট চাই। তিনি বিলাত থেকে তকমা আনতে যাবার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। সুদূর শিকাগোতে মার্কিন গভর্ণমেন্ট কলম্বাসের আমেরিকা

দ্বারকানাথ

আবিষ্কারের চারশো বছর উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী 'এক্সিবিশন'—'ওয়ার্লড ফেয়ার' করার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে তাতে দ্রষ্টব্যবস্তু সমূহ পাঠাবার আমন্ত্রণ জানান হল। ভারতবর্ষেরও কেউ কেউ এই ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'র রচয়িতা সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্রের অনুগামী প্রখ্যাত বাগ্মী ব্রাহ্ম প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। 'এক্সিবিশন' হবার কথা আঠারশ' তিরানব্বই সালে। এই প্রদর্শনীতে যাতে এই দেশের মেয়েদের হাতের কাজ, কারুকার্য ও শিল্পকর্ম পাঠান যায়, তার একটা উদ্যোগ নিলেন কাদম্বিনী। সেই উপলক্ষে একটা আবেদন-পত্র তিনি কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেটি এই ঃ

Dear Sir,

It would be desirable to collect from different ports of the country the best specimens of variours kinds of woman's work for the purpose of exhibiting them at the woman's section of the Chicago exhibition. The exhibits must be genuine production of a woman's hand. If an adequate representation of hand work of Indian women could e secured. I have no doubt these exhibits would attract considerable attention at the world's fair and would thus be the means of dispelling to a great extent the erroneous impression which unfortunately so largely prevails among a civilized nation that Indian women are devide of cultural and artistic sill. But to carryout this project successfully it would reguire not only the help and co-operation of my own sex, but also of gentlemen, who take an intelligent interest in the progress of women, and are willing and able to assist us in the matter. I venture to hope that both the imperial and provincial Governments will think, it a fit subject for encouragement a decent pecuniary grant from there it will not be possible to make the project the success. In a matter, like this I think I cna count upon your support.

এই বিষয়ে উৎসাহী ভদ্রমহোদয়কে কাদম্বিনীর সঙ্গে তাঁর তের নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট বাসভবনে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। চিঠির তারিখ ছিল পনেরই জুলাই, আঠারশ' নিরানব্বই। অবশ্য এই আবেদনে সাড়া কতটা পাওয়া গিয়েছিল, স্বদেশানুরাগী ও নারী প্রগতির সমর্থক কে কেই বা তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টার সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন,

প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারই বা কি সাহায্য করেছিলেন, তার হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে কাদম্বিনী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।। এবং 'বেঙ্গলী' ও 'সঞ্জীবনী'র সংবাদ-মত ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আঠারশ তিরানব্বই-এর রবিবারে ইংলণ্ডের উদ্দেশে তিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন। মিস প্যাশ বি ও তাঁর সঙ্গে গেলেন ইংলণ্ড। কথা ছিল তিনি সেখান থেকে যখন শিকাগো যাবেন তখন তাঁর সহযাত্রিনী হবেন অন্য এক মহিলা।। খবরে দেখা যাচ্ছে প্রতাপ মজুমদার মশায়ের যাবার কথা ছিল মার্চে। এবং রমেশ দত্ত মশায় যাবেন জুলাই-এ। 'বামাবোধিনী' বৈশাখ সংখ্যায় খবর দিচ্ছেন, 'ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন তিনি তথা হইতে আমেরিকায় যাইবেন।' কিন্তু কাদম্বিনী বিলিতী ডাকতারী ডিপ্লোমা পেলেন কবে? ঐ বছরই উনিশে আগস্ট 'বেঙ্গলী' খবর দিচ্ছেন, দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর কাদম্বিনী খুবই ভালোভাবে তিনটি পরীক্ষায় একই সঙ্গে কৃতকার্য হয়েছেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-আর-সি-পি এবং এল-আর-সি-এস এবং গ্লাসগো রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জনস থেকে এল-আর-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশেষ করে 'প্র্যাকটিক্যাল সার-জারি' এবং 'সারজিক্যাল এ্যানাটমি' এই দুটি বিষয় তাঁর জ্ঞান ও পারদর্শিতা পরীক্ষকদের উচ্চ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই ঘটনারই বছর খানেকের কিছু বেশী আগে বাঙালী ছেলে অরবিন্দ ঘোষ ভাবীকালের শ্রীঅরবিন্দ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাশ ট্রাইপস পেয়ে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তবে কাদম্বিনীর সেই মূল প্রয়াসের কি হল? ভারতীয় মেয়েদের শিল্পকর্ম কি পৌঁছেছিল শিকাগো বিশ্ব প্রদর্শনীতে? এটা ঠিক যে কাদম্বিনীর শিকাগো যাওয়া হয়নি। তবে তিনি যে কিছু কিছু সুন্দর শিল্পকার্য এদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বিটিশ রাজকুমারী এই সব শিল্প-কর্ম শিকাগোতে পাঠাতে সাহায্য করে-ছিলেন সে সংবাদ রয়েছে। এই খবর 'বামাবোধিনী'র। সেটা এই : ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গ মহিলাদিগের প্রস্তুত যে সকল শিল্পজাত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তদ্দর্শনে ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের মহিলাগণ প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রিন্সেস ক্রিশ্চিয়ানা সেগুলি শিকাগোতে পাঠাইবার সাহায্য করিয়াছেন। এ থেকে মনে হয় ডাক্তারী পরীক্ষাগুলিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবং তাঁর আরব্ধ কাজ একজিবিটগুলো শিকাগোয় পাঠাবার সুবন্দোবস্ত লণ্ডনেই হয়ে যাওয়ায় তিনি আর অহেতুক নিজে শিকাগো যাবার বাসনা পরিত্যাগ করে-ছিলেন। শুধু বেড়াতে যাবার জন্যেই ও আর তিনি আমেরিকা যেতে চান নি? তা ছাড়া পারিবারিক দিকটাও ভুলে যাওয়া

নারী হিতৈষী আর্থার হব হাউস

ঠিক নয়—কেননা তাঁর চতুর্থ সন্তান প্রভাতচন্দ্র, জংলু তখন মাত্র এক বছরের দুগ্ধপোষ্য শিশু। তাঁকে তিনি তাঁর মায়ের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, সেই বছর কাদম্বিনী দেশে ফিরলেন। তাঁর ঘরে ফেরার ছবি এঁকেছেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে : দিদিমা কবে যে বিলাতে গিয়ে-ছিলেন সে-কথা মনে নেই, কিন্তু তাঁর ফিরিবার দিনটি বেশ মনে পড়ে। বাড়িতে ঢুকেই দিদিমা দু হাত বাড়িয়ে জংলু মামাকে কোলে নিতে গেলেন। ছোট্ট এক বছরের জংলু মামাকে তাঁর কাছে রেখে দিদিমা বিলাতে চলে গিয়েছিলেন, এখন সে ছেলে মাকে চিনতে পারছে না। শক্ত করে ওর দিদিমার গলা আঁকড়ে রইল—কিছুতেই মায়ের কোলে গেল না।

বিলেত থেকে উপাধি নিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন দেশের লোক খুব আনন্দ আর গৌরব বোধ করলেন এবং আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব মিলে বাড়ীতে বেশ একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। আমাদেরও আনন্দের সীমা রইল না, সুন্দর সুন্দর খেলনা, পুতুল, ছবির বই ইত্যাদি উপহার পেয়ে। ছোট বড় সকলের জন্যই দিদিমা কিছু-না-কিছু উপহার এনেছিলেন।

কুমুদিনী দাস
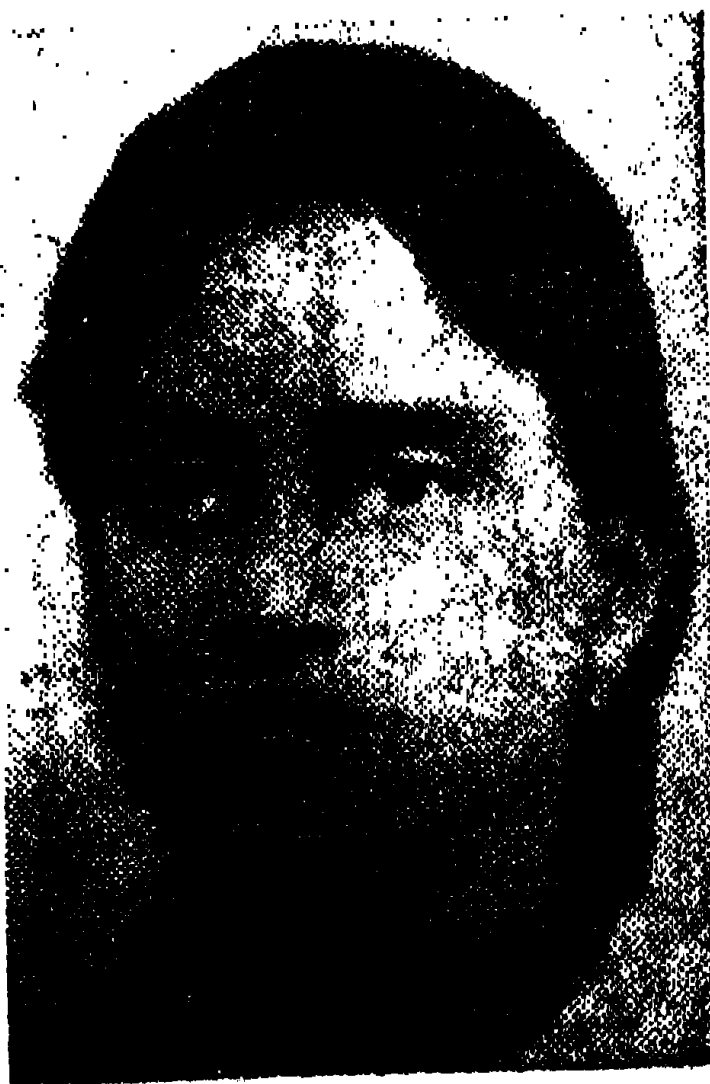
দেশে ফিরে দেশের লোকের কাছ থেকে কতটা সম্মান পেয়েছিলেন, উচ্ছ্বসিত বাঙালী কি ভাবে এই কীর্তিমতী বাঙালিনীকে ঢেলে দিয়েছিলেন তার অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, তার বড় একটা সাক্ষী নেই। তবে ডাফরিন কমিটি আর তাঁকে বর্জন করে থাকতে পারলেন না। অচিরেই ডাফরিণ হাসপাতালে তাঁর বহু-প্রার্থিত, আকাঙ্ক্ষিত সিনিঅর ডাক্তারের চাকরি হল। তবে সে চাকরিতে তিনি বেশীদিন থাকেন নি। তিনি নিজে স্বাধীনভাবে কাজ সুরু করেন। তাঁর তের নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ীটিতেও পরিবর্তন এসেছিল পুণ্যলতার কথায়। দিদিমা বিলেত থেকে ফিরলেন, নতুন কায়দায় তাঁর ড্রইংরুম সাজানো হল। দেশ বিদেশ থেকে আনা কত রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস। আমরা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে, আস্তে আস্তে সে সব নেড়ে চেড়ে দেখলাম। দাদামশাই-র ঘরের কোণে তাঁর ছবিগুলি সাজান থাকত। একটা ছিল বুলডগমুখো মোটা লাঠি, হলদে কাঁচের চোখওয়ালা বুলডগটা দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। আর একটা ছিল দারচিনি ডালের তৈরী লাঠি, সেটা কামড়ালেই দারচিনির স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যেত। আমাদের দাঁত বসে সেটা একেবারে বাদাম খোলার মত এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁর সেই পিঠ চুলকোবার ডাণ্ডাটা। কচি ছেলের হাতের মত ছোট সুন্দর সাদা হাতির দাঁতের তৈরী এক হাত, ঘরে ঢুকলেই সেটা দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নিতাম।

স্বাধীন ব্যবসা বা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে কাদম্বিনী অচিরে নাম করে ফেলেন। তাঁর নেপালের রাজ পরিবারের চিকিৎসাও আজ গল্পকাহিনী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, মেয়েদের রোগের চিকিৎসায় তাঁর নাম হয় প্রচুর। নেপাল রাজার কোন এক মরণাপন্ন রাণীকে চিকিৎসা করে ভালো করার জন্য নেপালের রাজা তাঁকে একটা টাট্টু ঘোড়া ও প্রচুর স্বর্ণসামগ্রী দেন। তাঁর উত্তর-পুরুষদের কাছ থেকে জানা যায় যে প্রায়শই রাজবাটীতে তাদের জন্য খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সব জিনিস আসত ভেট হিসেবে। এবং সেগুলি আসত রূপোর পাত্র করে। সে পাত্র রাজারা ফেরত নিতেন না।

অবশ্য কাদম্বিনী বিলেত থেকে ফেরবার পর দ্বারকনাথ বেঁচেছিলেন বছর সাড়ে চার। এই সময় তিনি আরও একটি পুত্র (অমলচন্দ্র) এবং দুই কন্যার (জ্যোৎস্না ও হিমানীর) জননী হন। হিমানী অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর প্রথম সন্তানপুত্র নির্মলচন্দ্র। তারপরে প্রফুল্লচন্দ্র, জ্যোতির্ময়ী ও প্রভাতচন্দ্র। প্রভাতকে মায়ের কাছে দিয়েই তিনি বিলেত গিয়ে-ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর কাদম্বিনীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা ছবি এঁকেছেন পুণ্যলতা : আমরা জন্মাবধি যে দিদিমাকে জানি, তিনি যে মার বিমাতা, ছেলেবেলায় সে কথা আমাদের জানা ছিল না। প্রথম যে দিন সে কথা শুনলাম, ছোট

অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে কি। দিদিমা বুঝি তোমার নকল মা?

নকল মা কথাটা নিয়ে খুব হাসাহাসি হল।

দিদিমা ছিলেন নতুন যুগের মানুষ। আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নতির পথে নানাদিকে তিনি অগ্রণী ছিলেন।... কাজের লোক ছিলেন তিনি। ডাক্তারিতে তাঁর খুব সুনাম ও পসার ছিল, নানা রকম দেশ-সেবা ও সমাজ সেবার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, তার উপরে দাদামশায়ের মৃত্যুর পর সাতটি সন্তানকে মানুষ করার ভার সম্পূর্ণ তাঁর হাতেই পড়েছিল। রান্না, সেলাই প্রভৃতি ঘরের কাজও তিনি খুব ভাল রকম জানতেন। একটুও সময় তিনি নষ্ট করতেন না। তখনও মটরগাড়ী ছিল না, শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে রোগী দেখে বেড়াতে ঘোড়ার গাড়ীতে অনেক সময় লাগত। সেই সময়টা তিনি লেস বুনে কাজে লাগাতেন। এ দিকে তিনি খুব সাহসী আর তেজস্বিনী, অন্যদিকে ভারি আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। যেখানে বসতেন হাসি-গল্পে একেবারে মাতিয়ে তুলতেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলত। আমরা হাঁ করে তাঁর গল্প শুনতাম আর তাঁর সুন্দর আঙ্গুলগুলির খেলা দেখতাম। কি অদ্ভুত তাড়াতাড়ি কি সুন্দর সূক্ষ্ম লেস বোনা হচ্ছে।

আঠারশ আটানব্বই খৃষ্টাব্দের সাতাশে জুন সোমবার দ্বারকানাথ মারা যান। অবশ্য তার আগে থেকেই তাঁর শরীর খুব খারাপ যাচ্ছিল। তাঁর মৃত্যুর বছর দুই তিন আগে তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। কর্মব্যস্ত কাদম্বিনী দিন-রাত ধরে তার সেবা-সুশ্রূষায় প্রাণপাত করেন। সাহেব ডাক্তার বার্টকে তাঁর চিকিৎসার জন্য আনতে হয়েছিল। তিনিও এত শিক্ষিতা ডাক্তার স্ত্রীর এই ধরনের প্রাণপাত সুশ্রূষা নিজের চোখে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। কাদম্বিনীর সঙ্গে দ্বারকনাথের বিবাহের সময় যাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে হয়ত কখনও কাদম্বিনীর জীবনে তাঁর বিবাহ নিয়ে পরিতাপের দিন আসবে, তাঁরা কি মূর্খের রাজ্যেই না বাস করেছিলেন।

দীর্ঘ পাঁচিশ বছর বৈধব্যজীবন যাপন করেছিলেন কাদম্বিনী। এর মধ্যে চুটিয়ে চিকিৎসা করেছেন, সুনাম অর্জন করেছেন প্রচুর, ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন, লেখা-পড়া শিখিয়েছেন বিয়ে-থাওয়া দিয়েছেন এবং স্বামীর পরিত্যক্ত কাজকর্মের কিছু কিছু বোঝা নিজের কাঁধেও তুলে নিয়েছেন। উনিশ শ ছয় সালে কলকাতা কংগ্রেসের, যে মহিলা সম্মেলন হয়, তিনিই ছিলেন তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। দুই বছর পরেই আবার আফ্রিকার ট্রান্সভালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহে সুরু হয়, তার সমর্থনে কলকাতায় যে সংস্থা হয়, তার পিছনে ছিলেন কাদম্বিনী। এমন কি তাঁর মৃত্যুর আগের বছর কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে তিনি পূর্ব ভারতে কয়লাখনির মেয়ে-শ্রমিকদের অবস্থার সম্বন্ধে স্ট্যাডি টিমের সভ্য হয়েছিলেন।

অবশ্য মৃত্যু যে তাঁর অতি দ্রুত নেমে আসবে, তা তিনি বুঝতেও পারেন নি। সেদিন বুধবার। তাঁর হাতে একটা বড় অপারেশন কেস ছিল। অপারেশন থিয়েটার থেকে বেড়িয়ে সোজা বাড়ী চলে এলেন। তখন তিনি থাকতেন তাঁর নিজের বাড়ী ছয় নম্বর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। প্রভাতরঞ্জন তখন বেড়িয়েছেন। বৌমাকে ডেকে বললেন, বৌমা, লোকে বলতে সুরু করেছে, ডকটর গাঙ্গুলি নাকি বুড়ো হয়ে গেছে। তাঁর হাত আর আগের মত চলে না। আজ যে অপারেশনটা করে এলাম, সেটা দেখলে তারা আর একথা বলতে সাহস করবে না। আপন মনেই যেন বলে গেলেন কাদম্বিনী। বললেন, খুব ভালো লাগছে বৌমা, খুব ভালো। দেহটা যেন হালকা হয়ে গেছে। আনন্দে উড়তে ইচ্ছে করছে। খুশি মনে একটু পায়চারি করে একটু পরেই বললেন বড় খিদে পেয়েছে বৌমা। আমি স্নান সেরে আসছি। তুমি খাবার আয়োজন কর। প্রভাতচন্দ্রের স্ত্রী খাবার আয়োজন করতে গেলেন। কাদম্বিনী ঢুকলেন স্নানের ঘরে।

বৌমা খাবার দিয়ে বসে আছেন। কাদম্বিনী আর আসেন না। অপেক্ষমাণ বধূমাতার কেমন যেন সন্দেহ হল, বড় বেশি দেরি হচ্ছে না। অধীর হয়ে কাদম্বিনীর খোঁজে পাশের ঘরে গিয়ে দেখেন কাদম্বিনী শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখে কাদম্বিনী অনেক কষ্টে যেন বললেন, ডাক্তার।.... বরফ।....একটু পরেই যেন বুঝতে পারলেন, তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত। চাপা স্বর বেরোল, সব শেষে ...

এমনি করেই শেষ হল কাদম্বিনীর একষট্টি বছরের আশ্চর্য কর্মময় জীবন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আর্ত-মানবের সেবায় ব্যয় করে গেলেন। দরিদ্র-বান্ধব এক আদর্শ উদ্বুদ্ধ অশঙ্কিতচিত্ত

কাদম্বিনী

কালিনারায়ণ গুপ্ত

স্বামীর সার্থক সহধর্মিণী গভীর মমতাময়ী এই নারী স্বামীর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে গুটিয়ে এনেছিলেন, মুখ্যতঃ তাঁর নিজের আটটি নাবালক ছেলে-মেয়ের সংসারের মধ্যে। তবু মাঝে মাঝে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ডাক একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। মাঝে মাঝে সে সব দায়িত্বও নিষ্পন্ন করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে অবিচল থেকেছেন তাঁর সেবাধর্মে। তাঁর মৃত্যুতে 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' ঠিকই লিখেছেন—

> The death of Dr Kadambini Ganguly's removes a notable and interesting vgure from Bengali Society.
> 'Laterally Dr Ganguli eschewed politicks—and possibly her husband's death was responsible for it—and her general and kindly face was always seen at the bed side her patients"

'স্নেহবিহ্বল করুণা ছলছল, শিয়রে
জাগে কার আঁখিরে
মিটেছে সব ক্ষুধা সঞ্জীবনীসুধা এনেছে
আমরণ লাগিরে।'

এই চিরন্তন মাতৃমূর্তি যেন কাদম্বিনীর বিভিন্ন কাগজে লেখিকা হিসাবেও কাদম্বিনীর উল্লেখ রয়েছে। 'বামাবোধিনী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা দুইটি ত' তাঁকে বার বার লেখিকা বলে সনাক্ত করেছেন। 'সঞ্জীবনী ত' কাগজ ছাপার বিজ্ঞাপন যখন দিতে সুরু করে, তবে কাদম্বিনী বসু বি-এ তাতে লিখবেন, সেকথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তাঁর নামে ছাপা লেখা আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকার সব কপি যদি কখনও আবিষ্কৃত হয় কাদম্বিনীর এই দিকটার [illegible] তখন দেওয়া সম্ভব হবে।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের শুভাশুভের বিশ্বাস থেকেই কথাটা বলা। এটাকে অতীশ সেভাবে ঠিক ঠিক ঈশ্বরে বিশ্বাস ভাবে না।

কুম্ভবাবু ভূত দেখার মতো অতীশকে দেখছে। মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকলে সে শুনেছে শয়তান হয়ে যায়।। একমাত্র শয়তানেরই ঈশ্বর বিশ্বাস থাকে না। আর সেই উটকো সব কম্যুনিস্ট আছে তারাও এটা করে না। কুম্ভর কাছে কম্যুনিস্ট আর শয়তান এক। সে তাদের ফারাক বড় বেশি বোঝে না। সে বলল, দাদা আপনি তাজে কম্যুনিস্ট।

অতীশ হা হা করে হেসে উঠল। বলল, সুযোগ পেলাম কোথায়। দাড়ি গোঁফ না গজাতেই পেটের টানে বের হয়ে পড়েছি।

—কিন্তু এটাও ভাল কথা নয়! তারপর তলে তলে কুম্ভর কুট অভিসন্ধি কাজ করতে থাকে। এই শয়তানের ভয় রাজবাড়িকে বড়ই কাবু করে রেখেছে। গন্ধ পেলেই হল। এবং এই সুযোগটা হাতছাড়া করা তার বোকামি হবে। সে আরও সামান্য রগড়ে দেখতে চাইল, বলল, ঈশ্বর ত কারো ক্ষতি করে না দাদা। তিনি মঙ্গলময়। সন্তান সন্ততি নিয়ে ঘর করেন, ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, অসুখে বিসুখে ভরসা পাবেন কিসে।

অতীশ বলল, এখনও ভেবে দেখিনি সেটা!

যাই হোক কুম্ভ বুঝতে পারল, সহজে নড়ে বসবে না। ধীরে ধীরে চামড়া খসাতে হবে। একদিনে হবার নয়। সে উঠে যাবার সময় বলল, দাদা যাই। তারপর টুটুলকে চুমু খেল। মিন্টুকে দুবার লাফিয়ে ওপরে তুলে ধরে ফেলল। নির্মলা বলল, মানুষটি বেশ।

অতীশ কিছু বলল না। সে জানালায় দেখল সেই পাতাবাহারের গাছ। সবাই শুয়ে পড়লে সে লেপুলে বের হয়ে দেখবে—আজও পাতায় জল লেগে আছে কিনা। তারপর কেমন ভীতু গলায় নির্মলাকে ডেকে বলল, সামনেই পুকুর। টুটুল মিন্টুকে চোখে চোখে রেখ। পুকুরটা ভাল না। প্রায় বছরেই কেউ না কেউ ডুবে যায়।

।।চোদ্দ।।

চার-পাঁচ দিন ধরে কি বৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। মানুষজন পথঘাট ট্রাম-বাস বাড়ি-ঘর সব বৃষ্টিতে লেপ্টে ছিল। সকালের কাগজে শুধু এক খবর। দেশের কোথায় বন্যা, কোথায় ব্রিজ ভেঙ্গে গেছে, কোথায় ট্রেন অচল হয়ে থেমে আছে তার খবরে সকালের কাগজটা ভরা। বড় বড় হেড লাইন, যেন কাগজে তখন এই খবরটাই মানুষের পড়ার কথা। সব কাগজগুলোয় সংবাদদাতাদের নিদারুণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা, শস্যহানির খবর। গবাদি পশু সব ভেসে গেছে। জলবন্দী মানুষজন উদ্ধারের জন্য মিলিটারি নেমেছে। বর্ষাকাল এলেই এই খবর। তারপর হেমন্ত আসে। সোনালী ধানের মাঠ তখন দিগন্তব্যাপী। বান বন্যায় ভেসে গিয়েও মানুষের জন্য কিছু না কিছু আবাদ টিকে থাকে।

মানস নারায়ণ চৌধুরীর ঘরেও আজকাল কেউ কাগজ দিয়ে যায়। সে বাথরুম থেকে ফিরেই দেখতে পায় কাগজটা পড়ে আছে। আজকাল সে আর উত্তেজিত হয় না। উত্তেজিত হলেই মাথার মধ্যে অযথা সব রেলগাড়ি ঢুকে যায়। সে ঠান্ডা মাথায় আজকাল কাগজ পড়তে পারে। এখন তার ঘরে তালা পড়ে না। সে ইচ্ছে মতো রাস্তায় বের হতে পায়। একদিন গড়ের মাঠে গিয়েও বসেছিল। বাইরে যেতে চাইলে তাকে পুরনো ভকসল গাড়িটা দেওয়া হয়। বাহাদুর তাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখায়। কোন পার্কে তার পায়চারি করতে ভাল লাগলে রাত করে ফিরতে ভালবাসে। কিন্তু রাজেনটা আবার কি মনে করবে—সেতো স্বাভাবিকভাবেই সব করে যায়, কিন্তু ঠিক সময়ে না ফিরলেই একটু বেশি হাঁটাহাঁটি করতে চাইলেই কেমন সংশয়ের চোখে তাকায় সব। সে বড়ই কুকর্ম করে ফেলেছে।

বৃষ্টির জন্য কদিন এই ঘরেই বন্দী হয়ে আছে। কাগজটা সারা দিন উল্টে-পাল্টে দেখে। কখনও কখনও একই লাইন বার বার পড়ে। নবীন যুবক ঐ দিকটায় চলে গেল। তার ঘরটায় গিয়ে আগে বসাটসা যেত। নবীন যুবকের পাশে বসে থাকলে সে কেমন স্বস্তি পেত। ওর চোখের ভেতর এমন কিছু আছে যা তাকে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরণা দেয়। সেটা কি সে ধরতে পারে না। বেচারা পঞ্চানন বলেছে, হুজুর অতীশবাবুকে বলেন ত ডেকে দি। পঞ্চানন কি বুঝতে পেরেছে সে অতীশের জন্য টান বোধ করে। সে ত কখনও কাউকে কিছু বলে নি। কিছু দিন মাত্র ছিল। ওর ছবির [illegible] অতীশ। বলেছে, দাদা আপনি কেন ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন। ওটা ছাড়বেন না। মানুষের ত বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা চাই। কত দিন পর যেন সে শুনতে পেল সে সত্যি ভাল ছবি আঁকে। তার হাত পরিষ্কার। মাস্টারমশাইরাও এমন বলতেন। মডেলের ক্লাসে তার মত সাবলীল ভঙ্গীতে কেউ তেমন করে সুষমামণ্ডিত ছবি আঁকতে পারত না। সবচেয়ে ওটাই ছিল তার প্রিয় ক্লাশ। ইদানীং সে আবার ছবি আঁকা শুরু করেছিল। বৃষ্টিতে বের হতে পারে নি। সরকারবাবুর কাছে পঞ্চাননকে দিয়ে একটা লিস্ট পাঠিয়েছিল। একটা ইজেল, কিছু জলরঙ এবং বুরুশ। এই সব দিয়ে গেছে কদিন হল। বৃষ্টির কদিন তার নিরন্তর ছুটি। অন্য দিনগুলি তার অনন্ত কাজ। তার মাথার মধ্যে রেলগাড়ি ঢুকে না গেলেও পাশ দিয়ে চলে যায়। সে সে-জন্য কিছুই করতে পারে না। উগ্রতা যখন চরমে তখনই সে হাবিজাবি দেয়ালে লিখতে শুরু করে দেয়। যেন গত জন্মের কথা লিখে যাচ্ছে। সেই কথাগুলো রাজেন এত ভয়াবহভাবে কেন মানস বোঝে না। ঘরে যারা ঢুকতে পায় তারা দেখে ফেলবে ভয়েই রাজেনটা তালা দিয়ে দিতে বলে। তারপর আবার নদীর জল সরে গেলে যেমন বালিয়াড়ি পড়ে থাকে তেমনি কখনও সে গত জন্মের কথা ভুলে গেলে, ভাল পোশাক, বনেদী—মানার সব পুরস্কার কপালে—আর তারপরই ঘরে চুনকাম হয়ে যায়। বার বার, পাঁচ-সাতবার বছরে ঘরটা চুনকাম করা হয়ে যায় এভাবে। মানস খুবই এতে মজা পায়।

কিন্তু সেই যে নবীন যুবক উসকে দিয়ে গেল, প্রায় আগুনে ঘি ঢালার মত, বলে গেল মানসদা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এটা বড় দরকার। আপনার কি হারিয়েছে আমি জানি না, মানুষ কিছু না হারালে এমন হয় না। আপনার ছবি আঁকা খুব দরকার। অভ্যাসটা রাখুন। অন্য এক রহস্য খুঁজে পেলে যা হারিয়েছেন তা আবার ফিরে পাবেন।

অতীশ চলে যাবার পর সে পঞ্চাননকে দিয়ে একটা ফিরিস্তি পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঘরে এখন ইজেল, রঙ, বার্নিস যা দরকার সব আছে। বৃষ্টির কদিন সে একটা মাত্র ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কি এঁকেছে সে নিজেই বুঝতে পারছে না। সে প্রথম আঁকতে চেয়েছিল, নদীর পাশে রাজবাড়ি, সামনে বালির চর, দুজন অশ্বারোহী যুবক রাজবাড়ির দিকে উঠে আসছে। ঘোড়া দুটো কদম দিচ্ছিল। প্রথম ছোট একটা আর্ট পেপারে স্কেচ করতে গিয়ে মনে হল একটা ঘোড়ার মুখ বড়ই লম্বা। আর একটা বড়ই বেটে। তারপর মনে হল, ঘোড়ার মুখই হয় নি কেমন জিরাফের মুখের মত লম্বা। তবু রঙ তুলি নিয়ে যখন বসল—সেটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল বুঝতে পারছে না। আবছা অন্ধকারে এক বিশাল রাজবাড়ির ছায়া, আরও অস্পষ্ট দুটো ঘোড়া, অশ্বারোহী আছে কি নেই

যোগা [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] নদীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হল, [illegible] [illegible] [illegible] দি [illegible] [illegible] [illegible] দেখছে। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]। সে [illegible], কিছু [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] আবছা [illegible] [illegible] করে দিচ্ছেই গোটা [illegible] [illegible] হয়ে গেল। মনে হল ঘোড়া [illegible] [illegible] পথে প্রাসাদ অলিন্দে কিন্নানা [illegible] [illegible] কোন সঙ্গীত শিল্পীর সুর [illegible] জেগে উঠছে না। গোটা ছবিটাই তার কাছে কেন জানি অর্থহীন মনে হচ্ছে।

মানস ছবিটা দু দিন ফেলে রেখে অন্য একটা ছবিতে মন দিয়েছিল। কিছু কাঁচের গ্লাস। লাল মদ। দুজন প্রবীণ মানুষ দরজা দিয়ে ঢুকছেন। একজনের মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে রাজার পোশাক। অন্যজন টাক মাথা বেঁটে-খাটো মানুষ। ধুতি পাঞ্জাবী গায়। কিন্তু মুখটা একজনের উটের মত হয়ে গেল। অন্যজনের বাঘ। সে বুঝল, হবে না। সে তারপর কদিন কিছুই আঁকে নি। কদিন থেকে অতীশের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, যে তাকে ডেকে দেখাবে। সে দেখলে বুঝতে পারত ছবিটা কিভাবে শেষ করা যায়। মাথায় এক রকমের চিন্তা থাকে, ছবিটা আঁকতে গেলে সেই চিন্তা গুলিয়ে যায়। তখন আর মনে করতে পারে না আসলে সে কি আঁকতে চেয়েছিল।

পঞ্চানন সকালের খাবার নিয়ে এসেছে। ওর খাওয়া হলে সব নিয়ে যাবে। সে খেতে খেতে বলল, অতীশবাবুকে ডেকে আনবি বলছিস ?

—হুজুর আপনার চোখ মুখ ভাল না। অতীশবাবু ছিলেন বলে বেশ ভাল ছিলেন।

—তা ছিলাম। কিন্তু বেচারা বৌ-ছেলেপিলে নিয়ে এসেছে। কারখানার কাজের চাপ। রাত-দিন পড়ে থাকছে শুনছি, বাড়িতে কি পাবি ?

—হুজুরে দেখে আসব।

—আয়।

—কিছু বলব ?

—আজ রববার না ?

পঞ্চানন বলল, আজ্ঞে।

—দাঁড়া। বলে মানস একটি চিঠি লিখল—অতীশ তুমি আমাকে ভুলে গেছ। আমি তোমার মানসদা। বড়ই বিপদে আছি। সময় এবং সুযোগমত একবার পারলে এস।

পঞ্চানন ফিরে এলে দেখল, অতীশ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন অভিমান হল দেখে। মানস অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, খুব ব্যস্ত।

অতীশ ভিতরে ঢুকে দেখল, এদিক-ওদিক অজস্র ছবি ছড়ান। সে খুব আগ্রহের সঙ্গে একটা তুলে নিয়ে দেখল—বিরাট ফাঁকা ঘরে দুজন সারেঙ্গিবাদক বসে আছে। নামাজ পড়ার মত হাঁটু ভাঁজ করে বসার ভঙ্গী। চোখ ঊর্ধ্বনেত্র। ছাদের ফুটো থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। ঠিক এমনই একটা ছবি বিলিয়ার্ড টেবিলটা যে ঘরে আছে সেখানে বাঁধান রয়েছে।

অতীশের মনে হল, তবে সেই ছবিটাও এই মানুষ এঁকেছেন। ছবিটা দেখে সে প্রথম ভয় পেয়ে গেছিল। একটা কাল কেউটে তার হাত দেয়াল ফুটো করে স্পর্শ করে দিয়েছে। নিচে নিস্তরঙ্গ জল। ছবিটা দেখে ভয় পাওয়ার চেয়ে শরীর বেশি শির শির করে উঠেছিল।

অতীশ বলল, অনেক ছবি দেখছি।

—অনেক কোথায়। দুটো ত।

সে বলল, এই যে।

মানস বলল, ওগুলো কিছু না। তুমি এটা দেখ। কিছু হয়েছে কিনা দেখ।

অতীশ দাঁড়িয়ে দু হাত মেলে ছবিটা দেখছিল।

—বসে দেখ না। এই পঞ্চানন, চেয়ারটা এগিয়ে দে না।

অতীশ বসতে বসতে বলল, আপনি করেছেন কি !

মানস কিছুটা যেন শঙ্কা বোধ করল। তাহলে কি সে সত্যি যা আঁকতে চেয়েছিল সেটাই ফুটে বের হচ্ছে। আর অতীশ সেটা বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গেছে। রাজবাড়ির চেহারাটা অতীশ তাকে দেখতে পাচ্ছে। সে বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ ?

অতীশ মানসদার কথার অর্থ ধরতে পারল না। ছবিটা থেকে মুখ তুলে মানসদার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—ভাবছিলাম ভয় পাচ্ছ কিনা। ছবিটা তালে যা আঁকতে চেয়েছি তাই হয়েছে বলছ। রাজেনটা তবে ক্ষেপে যাবে। কি যে করি।

অতীশ ভারি অবাক হল। বলল, ছবিটা আমাকে দিন। বাঁধিয়ে রাখব। দেয়ালে টাঙাব। রাজেনদা রাগ করবে কেন !

—কি জানি। আমি ত রাজেনকে ক্ষমাই করে দিয়েছি।

তার বলতে ইচ্ছে হল, রাজেনদা আপনার কে হয়। এ-বাড়িতে এসে বুঝেছি, সবাই এখানে বুঝে ফেলেছে, এই শেষবেলা, যে যে-ভাবে পারো গুছিয়ে নাও। সিগনাল ডাউন হল বলে। একমাত্র আপনিই নির্বিকার। রাজার সব লোক এখন টের পেয়েছে—এদের যা অবশিষ্ট আছে তার কিছুটা লুটেপুটে নিলেও তিন পুরুষের নিশ্চিন্তি। কিন্তু আপনি বসে আছেন। আপনি এই রাজবাড়িতে আশৈশব মানুষ। পুরানো লোকেরা কিছু খবর রাখে। কুম্ভ মাঝে মাঝেই বলে, বলতে পারি বলব না। এ-ব্যাপারে আমার আগ্রহ অনাগ্রহ সমান: ভয় যদি কুম্ভ আপনাকে ছোট করতে চায়, রাজেনদাকে ছোট করতে চায়। মানুষ ছোট হয়ে যাচ্ছে দেখলে আমার কেন জানি কষ্ট হয়।

—এই কি তুমি ছবিটা নিজেই কেবল দেখছ। কি দেখছ বলছ না কেন !.

—একটা বড় স্মৃতিসৌধ মনে হচ্ছে আঁকতে চেয়েছেন।

—গভীর অন্ধকার থেকে দুজন অশ্বারোহী পুরুষ উঠে আসছে। পেছনে সাদা বালিয়াড়ি। বোধহয় জ্যোৎস্না পড়ায় সেটা হয়েছে। আকাশ আবছা [illegible] [illegible] ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না বুনোটের [illegible] মতো নেমে আসছে। তার পেছনে [illegible]—ওপরে অস্পষ্ট কুয়াশা। সময়টা শীতকাল—ছবিটা দেখে এই মনে হচ্ছে।

মানস ছবিটা ওর হাত থেকে টেনে নিল। নিজে ভাল করে দেখল আবার। কিন্তু কিছুই মিলছে না। সেই কুমারদহ রাজবাটীর ছবি এটা যেন নয়। সে ত এখন ভগ্ন প্রাসাদ। দেবোত্তরের সেবাইত, দুজন গোমস্তা, একজন খাজাঞ্চি মাত্র থাকে। বিরাট সব আম বাগান, শহরে কিছু বাড়ি ভাড়া, একটা বাজার, কিছু বালির চর এবং বড় বড় সব তৈলচিত্র, মাঝে মাঝে রাজেনটা বিদেশে গিয়ে কি করে সব, তারপরই সাহেব-সুবোরা আসে। গাড়ি করে চলে যায়—কাঠের কাজ করা বাতিদান থেকে মিনে-করা সব সৌখিন আসবাবপত্র, পূর্ব-পুরুষদের সংগ্রহ করা ছবি পাচার করে দেয় তারা। এই রাজবাড়ির ঘরে ঘরেও জমে আছে সব এমন কত অমূল্য বিষয়-আশয়। সব খালি করে দিচ্ছে রাজেনটা। সে তা আঁকতে চায় নি। আঁকতে চাইলে শস্যবিহীন একটা মাঠের সে ছবি আঁকত। তাতেই বড় রকমের শূন্যতা ধরা যায়। আসলে যে পাপ বাপ পিতামহের আমল থেকে জমা হয়ে আছে তার কিছুটা প্রথা-প্রকরণ মেনে ছবি আঁকা ছিল তার বিষয়-বস্তু। অতীশ ধরতে পারছে না। না সে নিজেই সব ভুলে গিয়ে মানুষের ভাল থাকা ভালবাসার এক মহান চিত্রপট তৈরি করতে চেয়েছিল। ঘোড়ায় সে এবং রাজেন। পেছনের অন্ধকারে খুব আবছা মতো নারী মূর্তি—সেটা অতীশ কেন খেয়াল করল না। পেছনে সব ফেলে সেই নারীর আবছা অন্ধকারটা রাজপ্রাসাদ গ্রাস করছে সেটা অতীশের নজরে এল না কেন !

অতীশ অন্য সব ছবিগুলিও তুলে তুলে দেখছে। ছবিগুলির নাম দিয়েছেন সাদা ফুল। বসন্ত। নদীতটে [illegible] জারজ সন্তান। কালের ঘোড়া। পাতা [illegible]। এমন সব কত হিজিবিজি নাম। ছবির সঙ্গে নামগুলির প্রায় কোন দিক থেকেই মিল নেই। যেমন 'বসন্ত' ছবিটাতে শুধু কালো কিছু ফুটকরি। আঁকাবাঁকা গাছের অভ্যন্তরে কোন পক্ষী শাবকের লেজ। দুটো সরিসৃপ গোড়ায় ওৎ পেতে বসে আছে। অতীশ এ-বয়সেই কিছু কিছু শিল্পীর জীবনী পড়েছে। কোন না কোনভাবে এরা অধিকাংশই অর্ধ-উন্মাদ। সে এবার মানসদার দিকে তাকাল। মানসদা হাতে ছবিটা নিয়ে কেমন আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। কিছু তাকে বলছেনও না। কোথাও যদি আরও ছবি থাকে—সেখানে যদি মানসদা নিজেকে তুলে ধরেন। সে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকল। একটা ছবি আশ্চর্য লাল রঙে আঁকা। আগুনের লেলিহানে গ্রাসের মধ্যে নির্বিঘ্নে এক উলঙ্গ নারী, মুখ চোখ আশ্চর্য রকমের শান্ত। নাম দিয়েছেন ব্যাভিচারিণী। একমাত্র এই ছবিটার সঙ্গে

...গ্রহণ করণের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়ে বলল, মানসদা এ ছবিটা কবে আঁকলেন।

ছবিটা দেখে বলল, ও ওটা অমলার ছবি। ফেলে দাও। আমার কাছে ছবিটার কোন দাম নেই। ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পার। তোমার সঙ্গে শুনেছি খুব ভাব। তারপরই কেমন সচকিত হয়ে গেলেন। কি যেন মনে পড়ছে। কি যেন তার জিজ্ঞেস করার আছে অতীশকে। মানসদা এবার হাত থেকে ছবিটা কেড়ে ফেলে দিলেন। এতক্ষণ যেন বড়ই অপবিত্র বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করছিলেন, বললেন, অমলাকে তুমি চেন শুনেছি।

—কার কাছে শুনলেন?

—আমার কাছে সবাই খবর দিয়ে যায়। ও বাবু এবারে আবার খেলা জমে উঠল।

অতীশ বলল, একথা কেন?

—এই আর কি। ওরা বোঝে রাজেনটা আমাকে ঠকাচ্ছে। আমাকে সম্পত্তির ভাগ দিচ্ছে না। আমাকে ওরা খুব ভালবাসে।

অতীশ এইসব পারিবারিক রেষারেষি শুনতে কখনও আগ্রহী হয় না। বিষয় আশয়ের প্রতি এমনিতেই একটা তার উদাসীনতা আছে। সেটা বোধহয় সে বাবার কাছে থেকেই পেয়েছে। মানুষের চলে যাবার মতো উপার্জন থাকলে খুব ছোটাছুটি তার পছন্দ নয়। সে তা করেও না। অথবা তার মনে হয়, এ-বাড়ির সবাই সত্য মিথ্যা বানিয়ে বলতে ওস্তাদ। আসলে রাজেনদা কিংবা তার পূর্বপুরুষরা বৈভব রক্ষা করতে গিয়ে দেওয়ান থেকে ম্যানেজার সবার হাতের গুটি চলে যেত। সংসারে ব্যাভিচার ঢুকলে যা হয়। সেটা টাকায় হতে পারে, নারীর হতে পারে, যেমন এখন সে বুঝেছে যে কোনভাবে সব সম্পত্তি স্বনামে রাখা আর রাজেনদার নিরাপদ নয়। তার সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য সবাই উদ্যত। আইন বদলাচ্ছে। এবং এমন একসময় আসবে যখন বসবাস এবং উপার্জনে চলে যায় মতো সম্পত্তি ছাড়া তার আর কিছুই থাকবে না। রাজেনদার বাবার ঠাকুর্দা দুটো কোলিয়ারি বিক্রি করে এই এস্টেট গিলেণ্ডার কোম্পানী থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তারপর থেকেই বাড়িয়ে যাওয়া ছিল স্বভাব। প্রভুত্ব এবং পৌরুষ এই দুই মিলে এস্টেটের যখন রবরবা তখনই স্বাধীনতা। জমিদারী চলে গেল। কিন্তু কমপেনসেসন এবং যা থাকল তাও কয়েক কোটি টাকা। খেলিয়ে তুলতে পারলে অনেক। যার চোদ্দ বছরে রাজেনদা বুঝি বুঝে ফেলেছেন, অকর্মন্য সব মানুষজন পুষে রেখেছেন, সব ব্যবসাই যেতে বসেছে—এবং এ-জন্য দায়ি তার সব আমলারা। আসলে আভিজাত্য যে জীবনে কাঁটা হয়ে আছে সেটা রাজেনদা বুঝতে পারছেন না। ফলে সব স্বনাম থেকে বেনামে, সম্পত্তি বিক্রি বাটার সময় বেশি টাকাটার হিসেব থাকে না। পচা টাকায় এই রাজপ্রাসাদ ভরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এই পচা টাকার গন্ধ সে পায়। মানসদা পায়। সুরেন পায়। তারপরই মনে হয় বড়ই বিদঘুটে সব চিন্তাভাবনা। এগুলি নিয়ে তার মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। তিনি সে বুঝতে পারে আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে শরীর পুড়বে না, এমন রসিকতার কথা কবে সে শুনেছে। সেজন্য অতীশ ভারি বিমর্ষ বোধ করছিল।

মানসদা বললেন, নবীন যুবক তোমার কপালে সন্ন্যাস টন্ন্যাস নেই ত!

অতীশ হাসল।

—কথা বলছ না কেন। মাথা গুঁজে ছবিতে এত কি দেখছ। যা দেখছ তা ঠিক। এই জরুলটাও জংঘায় আছে। হাত দিলে টের পাবে। আমি মিছিমিছি ছবি আঁকি না।

আসলে আগুনে উবু হয়ে বসে থাকা নারীমূর্তিটি অতীশকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। অমলার সঙ্গে মানসদার কোন গভীর সম্পর্ক আছে।

ছবিটা যে কোন নারীমূর্তিরই হতে পারে। কারণ উবু হয়ে বসা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। চুল আগুনের মধ্যে ঝলকাচ্ছে। এবং পেট জংঘা বাহু সবই স্পষ্ট। ছবিটা একবার দেখার পরই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মাথা তোলেনি বলে মানস ভেবেছে, সে ছবিটাই দেখছে। মানসদার কথায় অতীশ ফের ছবিটা দেখে আঁৎকে উঠল। তার মনে হল সত্যি অমলা তার সামনে উলঙ্গ হয়ে বসে আছে। সে ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল।

—তুমি অমলাকে তবে চেন?

অতীশ বলল, চিনি।

—কবে থেকে।

—অনেককাল আগে। আমি তখন খুব ছোট। ওদের জমিদারিতে বাপ জ্যাঠারা কাজ করতেন।

—তালে এখন থেকে তুমিই আমার হয়ে অমলাকে যা বলবার বলবে।

অতীশ চুপ করে থাকল।

—কী চুপ করে থাকলে কেন?

—ওকেত আমি দু'দিনের বেশি এখানে দেখিনি। তাছাড়া আমার সঙ্গে দেখাও হয় না।

—হবে।

—হলে বলব।

—কি বলবে শুনলে নাত!

—কি বলব!

—শুধু বলবে আমি সত্যি পাগল নই। ওকে এটা তোমায় বোঝাতে হবে।

—আপনি সত্যি তো পাগল নন।

—সে তুমি বললে হবে কেন? পৃথিবী শুদ্ধ সব লোক বললেও হবে না। তারপরই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। জানালায় গিয়ে কি দেখার চেষ্টা করলেন। গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, পঞ্চানন। পঞ্চানন এলে বললেন, আমাদের একটু চা খাওয়া!

অতীশ কেমন আবার বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সে বলল, আচ্ছা মানসদা, বড় হলটায় একটা ছবি দেখলাম। একটা কোটের কালো হাতা, কাঠের ফ্রেমের ফুটো দিয়ে বের হয়ে আছে। ওটা আপনার আঁকা?

—মনে করতে পারছি না।

—বিলিয়ার্ড টেবিলটা যে-ঘরে আছে।

—আমলা হয়ত এখনও দু একটা ছবি রেখেছে। হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। রাজেনটা আমার কিছু রাখতে দেয় না। ছেলেবেলা থেকেই ও বড় হিংসুটে স্বভাবের ছিল। আমার সব কিছু কেড়ে নিতে চাইত। তারপর সামান্য থেমে কেমন নির্লিপ্ত গলায় বললেন, তুমি পল সেজানের নাম শুনেছ?

অতীশ বলল, না।

—সে যাই হোক। ছবিটা দুই নারীর। সম্ভবত মা মেয়ের। সম্ভবত দুই বোনের। কি ছবি এখন আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি না। কিন্তু চোখ দুটো আমি নিবিষ্ট হলে এখনও দেখতে পাই। সেই চোখ বালিকার, সেই চোখ যুবতীর, চোখ মায়ের, চোখ বারবনিতার। এতগুলো চোখ সেই দুই নারীর চোখে তিনি এঁকেছিলেন। এক জোড়া চোখ কখন কেমন হবে বলতে পার না।

অতীশের সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে কেমন মাথা ধরে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে সে যা ভেবেছে, তিনি সেখান থেকে তাকে কত সহজে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। সে বলতে চেয়েছিল, সেই হাতটা আপনার আঁকা কি না। সেই হাতটাই আমি ভুলে নির্মলার আসার আগের দিন রাতে দরজার পাশে ঝুলতে দেখেছি কি না। সেই হাতটাই আমার মাথার মধ্যে আর্চির প্রেতাত্মার ভয় অবাধে ঢুকিয়ে দিয়েছে কি না! কিন্তু বলে লাভ নেই। আমলই হয়ত দেবেন না। আর্চির কথাটা তাঁকে বললে কেমন হয়। কারণ এই মানুষ তার কাছে প্রথম যেন কত গোপন খবর এ-বাড়ির বলে দিল। অথবা দৈন্যের কথা, পরাজয়ের কথা—এসব কথা সহজে মানুষ অন্য মানুষকে বলতে চায় না। মানসদা তাকে বেশ স্পষ্টই যেন বলে দিল, তোমার কাছে আমার কিছু গোপনীয় নেই। তোমাকে অতীশ আমি বিশ্বাস করি।

অতীশ বলল, আপনার প্রেতাত্মায় বিশ্বাস আছে?

মানসদা উঠে দাঁড়ালেন, চোখ বড় বড় করে বললেন, সেটা আবার কি?

অতীশ একেবারে জলে পড়ে গেল। এমনভাবে সে বোকা বনে যাবে বুঝতে পারে নি। সে তবু মরিয়া হয়ে বলল, কালো কোট গায় একটা হাত শুধু আঁকলেন কেন! কি অর্থ এ-ছবির!

—দেখ সত্যি আমি মনে করতে পারছি না।

—আপনি সব পারেন। ইচ্ছে করলে সব পারেন। ভূতেও বিশ্বাস করতে পারেন। আপনি পারেন না এটা আমি বিশ্বাস করি না।

• ক্রমশঃ

ক্ষমতার অলিন্দে

সরোজ চক্রবর্তী

১৯৬২ সালের পয়লা জুলাই। গোটা বাংলা শোকে স্তব্ধ। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিতার আগুন তখনও বোধহয় ভালো করে নেবেনি। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু রাজভবনে রাজ্য সরকারের আইন-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শে বসেছেন। উপস্থিত রয়েছেন অ্যাডভোকেট-জেনারেল এস এম বসু এবং লীগ্যাল রিমেমব্র্যানসার অরুণকুমার হাজরা। একটা সাংবিধানিক প্রশ্নের মীমাংসার পথ সন্ধানের চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত কি মন্ত্রিসভার কোনো অস্তিত্ব থাকে না?—প্রশ্নটা ছিল এই। রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তখন কলকাতার রাজভবনে। বিধানচন্দ্রের ৮০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি এসেছিলেন। এই জটিল সাংবিধানিক সমস্যায় রাষ্ট্রপতির পরামর্শ পাওয়ারও সুযোগ পেলেন রাজ্যপাল। প্রফুল্লচন্দ্র সেনকেও এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শ্রীমতী নাইডু। প্রফুল্লবাবুই রায়-মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী বলে সকলে মান্য করতেন।

পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর সেই রাতেই রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে প্রচারিত হল সংক্ষিপ্ত এই প্রেস নোট:

'১৯৬২ সালের পয়লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়ের আকস্মিক তিরোধানের দরুন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বর্তমান সদস্য প্রফুল্লচন্দ্র সেন অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যাবেন।'

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ওপর ন্যস্ত হল স্বরাষ্ট্র ও অর্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। তাঁর পূর্বসূরীর হাতেও ছিল এইসব দপ্তর। ডঃ রায়ের মতো প্রফুল্লবাবুর সর্বভারতীয় খ্যাতি বা প্রতিপত্তি ছিল না, কিন্তু স্ব-রাজ্যে তাঁর রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল খুবই। তিনি যে কতো বড় দায়িত্ব নিতে চলেছেন তা তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ-ই জানত না। তাঁর খ্যাতিমান পূর্বসূরী আর তাঁর নিজের মধ্যে ফারাক কতোটা সে-বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। নতুন যিনি রাজ্যের কর্ণধার হলেন, তিনি যদি অর্থনীতির ও সমাজ-কল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরীর আরব্ধ কাজের গতি অব্যাহত রাখতে পারেন, তাহলেই তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর পদে কোনো অযোগ্য লোক নির্বাচিত হননি. এ-কথা আমরা জানতাম, বাংলার মানুষও জানত।

প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী হলেন

প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী হলেন হঠাৎ। গোড়ার দিকে তাঁর বরাতটাও ছিল ভালো। পশ্চিমবঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে তিনিই বোধহয় একমাত্র রাজনীতিক যাঁকে কংগ্রেস সংগঠন বা বিধানসভায় কংগ্রেসী সদস্যদের কাছ থেকে কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ থেকে শুরু করে মহান ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং অজয় মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সব মুখ্যমন্ত্রীকেই দলের ভিতরে ও বাইরে কোনো-না-কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থ রায় যে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন, তার প্রধান কারণ অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনিচ্ছা। সব দেশের মতো আমাদের দেশেও রাজনীতি হল আসলে বিভিন্ন শ্রেণী আর ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। ডঃ রায়ের মৃত্যুর পর যে-শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তাতে সকলেরই দৃষ্টি পড়ল প্রফুল্ল সেনের ওপর। তার কারণও ছিল। নলিনীরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর পর ডঃ রায় তাঁকেই মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় স্থান দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে দিয়েছিলেন খাদ্য আর কৃষির মতো সমস্যাবহুল দপ্তর। আর এই দপ্তর হাতে থাকায় তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রধান বিরোধী দল, কম্যুনিস্ট পার্টির আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। জ্যোতি বসু তখন কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা। প্রফুল্ল সেনের ওপর যে গুরুদায়িত্ব পড়েছিল, তা তিনি বহুলাংশেই পালন করেছিলেন আর এই কাজে অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীর সহযোগিতাও আদায় করতে পেরেছিলেন। এর আগে যখনই কোনো সংকট দেখা দিয়েছে, তিনি সর্বদাই দাঁড়িয়েছেন তাঁর নেতা ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পাশে। দুজনের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বজায় ছিল ডঃ রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত। অবশ্য ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলের কোনো কোনো মাতব্বর চেয়েছিলেন তাঁকে ছাঁটিয়ে দিতে। তবে প্রফুল্ল সেনের সবচেয়ে সুবিধে হয়েছিল যে, তিনি অতুল্য ঘোষের দ্বিধাহীন সমর্থন পেয়েছিলেন। দলীয় সংগঠন ছিল পুরোপুরি অতুল্যবাবুর হাতে। রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি হয় প্রফুল্ল সেনের কাছে। প্রফুল্ল সেনকে তিনি তাই বরাবরই গুরু বলে মেনেছেন, এখনও মানেন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ডঃ রায়ের জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'আমি যদি না-ও জিতি, কংগ্রেস তো জিতবে, আর প্রফুল্ল তো থাকবে।' ডঃ রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন প্রায়ই দেখা যেত, প্রফুল্ল সেন খুব সকালে ডঃ রায়ের ঘরে ঢুকছেন, তারপর চা খেতে-খেতে আলোচনা করছেন রাজ্যের নানা সমস্যা নিয়ে। ডঃ রায়ের আর কোনো সহকর্মী এই সুবিধে পেতেন না। ডঃ রায়ের মৃত্যুর পর সংগঠন বা সরকারের কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি প্রফুল্ল সেনের সমকক্ষ হতে পারতেন। জনসাধারণের মনকে উদ্দীপিত করার মতো ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। অবশ্য কালীপদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। কলকাতা শহরে তাঁর ঘাঁটিও ছিল শক্ত। কিন্তু স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর সংবাদপত্র চলে যায় তাঁর বিপক্ষে। লোকে মনে করত, তিনি ততোটা প্রগতিশীল নন, বরং রক্ষণশীল। ১৯৫৩ সালে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশী হামলার পর তাঁর সম্পর্কে আস্থা বেশ কমে যায়। তবু তিনি প্রবীণ বলে আর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথা মনে রেখে নতুন মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় স্থান দেন। তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিজের পাশের লাগোয়া ঘর। কি কংগ্রেস, কি কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত সরকার, সব সময়েই দেখেছি মুখ্যমন্ত্রীর পাশের ঘরটি যিনি পান তিনিই গণ্য হন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। জ্যোতি বসু এবং আবদুস সাত্তারকেও দেখেছি এই ঘরে বসতে। কালীপদবাবুকে এই মর্যাদা দেওয়ায় কেউ আপত্তি করেনি, প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে কোনো কানাঘুষাও হয়নি। লোকের মনে তখন ভাবনা ছিল একটাই। নতুন যিনি এলেন, তিনি ডঃ রায়ের আরব্ধ কর্মসূচীকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন তো?

আইন অমান্য আন্দোলনের তি[illegible] পর্বেই প্রফুল্ল সেন ছিলেন পুরোভাগে। তিনি আরামবাগের লোক। সেখানকার মানুষ তাঁকে বলে আরামবাগের গান্ধী। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে তাঁকে কঠোর মূল্যই দিতে হয়েছে। তাঁর যৌবনের অধিকাংশ দিনই কেটেছে বৃটিশ কারাগারের অন্তরালে। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে তাঁকে আত্মগোপনও করতে হয়েছিল। কিন্তু আত্মগোপন করে থেকেও তিনি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী, অপরের চোখের আড়ালে থেকে কাজ করতেই ভালোবাসতেন। তাই তাঁর আত্মত্যাগ আর নির্যাতনের কথা সকলে জানতে পারেনি। রাজনৈতিক নেতা বা প্রশাসক হিসেবে তাঁর জীবন বড় কম দিনের নয়। কিন্তু তিনি কখনও পাদপ্রদীপের সামনে আসার জন্যে চেষ্টা করেননি, বদমেজাজী হয়ে ধৈর্য হারাতেও তাঁকে কেউ দেখেনি। এটা একটা বিরল গুণ। স্বাধীনতা-উত্তর কালের অনেক পেশাদারী রাজনীতিকের মধ্যেই এই গুণ চোখে পড়ে না। আমার যখন অল্প বয়স, তখন দেখেছি, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়

অনেকেরই ছিল এই ধারণা। দেখে দুঃখ হয়, ত্রিশ শতকের আগে বা ঠিক পরেই যাঁদের জন্ম, তাঁদের তুলনায় আমাদের দেশের তরুণদের নেতাদের মধ্যে তেমন গুণের সমাবেশ ঘটেনি।

স্বাধীনতার পর কংগ্রেসসেবীদের নিঃস্বার্থ সেবা আর আত্মত্যাগের পথ থেকে সরে যেতে দেখে বড় দুঃখ হয়। আজ তার বদলে দেখি কংগ্রেসী এবং অ-কংগ্রেসী—মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা চলেছেন মহা আড়ম্বরে বড় বড় গাড়ি চেপে, তাঁদের সামনে চলেছে মোটর সাইকেল চড়ে পাইলট। পাইলট কারের কর্ণভেদী আওয়াজে পথিকেরা সন্ত্রস্ত। প্রফুল্ল সেন থাকতেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কাছেই। ডঃ রায়ের মতো তিনিও গাড়ির সামনে যানবাহন সরাবার জন্যে পাইলট-কারের আড়ম্বর পছন্দ করতেন না। রাইটার্সেও আসতেন বিনা আড়ম্বরে। আসার আগে নিজের বাসভবনে অনেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ভোর হওয়ার আগেই চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার পালা শেষ করতেন। বাংলায় শর্ট-হ্যান্ড নিতেন একজন। প্রফুল্লবাবু ডিকটেশন দিতেন। আমরা যাঁরা তাঁর নিজস্ব কর্মীগোষ্ঠী ছিলাম, তাদের অফিসে আসার জন্যে বরাদ্দ ছিল পুলিশের একটা পুরোনো কালো জীপ। ডঃ রায়েরই মতো সকাল আটটার মধ্যে প্রফুল্লবাবুকে দেখা যেত নিজের আসনে বসে আছেন, ফাইলপত্র দেখার জন্যে তৈরি হয়ে।

আমি খুব ভালো লোকের কাছ থেকে শুনেছি, প্রফুল্লবাবু যখন খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন ভোর চারটে নাগাদ তাঁর কাপড় কাচার আওয়াজে তাঁর বাড়ির কাজকর্মের লোকের ঘুম ভেঙে যেত। স্নান করার আগে তিনি নিজের কাপড় নিজে কাচতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁর এই অভ্যাস। এর জন্যে কিছুতেই তিনি বিশ্বস্ত চাকরবাকরের কাছ থেকে সাহায্য নিতে চাইতেন না। পরে কাজের চাপে এই অভ্যাস তাঁকে ছাড়তে হয়। স্নান করে সামান্য কিছু খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসতেন। এখনও এই অভ্যাস বজায় রেখেছেন। শরীরটা ঠিক রাখার জন্যে মধ্যে তিনি হাফ প্যান্ট পরে সাইকেলে চড়া শুরু করেছিলেন। ফলে নিরাপত্তা কর্মীদের পড়তে হয়েছিল সমস্যায়। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে তাদেরও সাইকেলে চড়ে কিছু দূর থেকে নজর রাখতে হতো তাঁর ওপর। অনেকে ঐ সময় ঠাট্টা করে তাঁর নাম দিয়েছিল 'হাফ প্যান্ট মুখ্যমন্ত্রী'। ব্যক্তিগতভাবে টাকা-কড়ির ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিস্পৃহ। এখনও তাই-ই আছেন। তাঁর নিজের কোনো সম্পত্তি নেই, বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, এমনকি ব্যাঙ্কেও নেই, যদিও তিন দফা তিনি মন্ত্রিত্ব করেছেন। বহুবার দেখেছি, মাজুর কংগ্রেসের একজন সাধারণ সম্পাদককে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর বাড়িতে এসে তাঁর বেতন বাবদ পাওয়া ১৪০০ টাকার চেকটা নিয়ে যেতে। ঐ টাকা জমা হতো পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তহবিলে। তাঁর সংসার খরচ চলতো দলেরই টাকায়। সেই খরচ অবশ্য বেশি ছিল না। হুগলী জেলার মায়াপুরে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক জীবনের কর্মস্থল। সেখানে তিনি একটা সাদামাটা বাড়ি তৈরি করান। গান্ধীজীর আশ্রমের আদলে তৈরি। সঙ্গে ফুলের আর তরকারির বাগান। (১৯৬৭ সালে নির্বাচনের আগে সেখানে একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার।) এটা অবশ্য তাঁর নিজের সম্পত্তি নয়। এটা ট্রাস্টের সম্পত্তি। তিনি ট্রাস্টিদের একজন।

কট্টর কংগ্রেসী নেতা

প্রফুল্ল সেনের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তা তাঁরা যে-স্তরের লোকই হোন না কেন—তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর অমায়িক আচরণে। ডঃ রায়েরই মতো তাঁর কাছে সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার। গ্রামের মানুষের সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর ছিল আরো সহজ হৃদ্যতার সম্পর্ক। তাদের মধ্যেই তিনি কাটিয়েছেন দীর্ঘ দিন। তবে একটা বিষয়ে বিধানবাবু আর প্রফুল্লবাবুর মনোভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য ছিল। সেটা হল প্রধান বিরোধীপক্ষ কম্যুনিস্ট পার্টি, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু সম্পর্কে। আমার মনে হত, কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে প্রফুল্লবাবুর মনোভাব ছিল আপসহীন। ডঃ রায়ের কিন্তু তা ছিল না। ডঃ রায় আর জ্যোতি বসুর মধ্যে ছিল গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক। প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে কিন্তু তা ছিল না। তিনি ছিলেন যাকে বলা যায় একেবারে কট্টর কংগ্রেসী নেতা। ডঃ রায় ও প্রফুল্লবাবু, দুজনেই ছিলেন চিরকুমার। সংসারের চিন্তাভাবনা ছিল না, সবকিছু, শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করেছিলেন জনগণের সেবায়। প্রফুল্লবাবু তাঁর পূর্বসূরীকে কতোটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তা বোঝা যাবে তাঁর এই কথা থেকে: 'ডঃ রায়ের মৃত্যুতে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা আমি পূর্ণ করতে পারব না। আমি শুধু চেষ্টা করব তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে।' কয়েক মাস পরে তাঁর এক অতি-উৎসাহী বন্ধু মন্তব্য করে বসেন যে, ডঃ রায় চলে যাওয়ার পর তো সরকারের কাজ বেশ চলে যাচ্ছে। এই কথা শুনে প্রফুল্লবাবু তাঁকে কড়া ধমক দিয়ে বলেন, 'ডঃ রায়ের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। ডঃ রায় হলেন ডঃ রায়।'

ডঃ রায় মেজাজের দিক দিয়ে ছিলেন অভিজাত। তাই জনগণ থেকে ছিলেন কিছুটা দূরে। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বিরল মানুষদের একজন যাঁরা জনগণের মনের কথা ঠিক অনুভব করতে পারতেন এবং তাদের সেবায় ছিলেন ক্লান্তিহীন। তাদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতিবিধানই ছিল

জওহরলাল, বিধানচন্দ্র রায় এবং প্রফুল্ল সেন

তাঁর স্বপ্ন। তিনি জানতেন সাধারণ মানুষের সমস্যাটা কোথায়। আর কী করে সেই সমস্যার মীমাংসা করতে হয় তাও তাঁর অজানা ছিল না। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তাঁদের অনেকে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। ডঃ রায় কিন্তু পশ্চিম বাংলার মানুষ আর পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের মধ্যে কোনো বৈষম্য করেননি। উদ্বাস্তুদের কল্যাণের জন্যে তিনি যা করেছিলেন তা নিয়ে লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়। পাঠকদের হয়ত মনে পড়বে, আমার 'মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে' বইয়ে আমি এ-ব্যাপারে অনেক কথাই লিখেছি। তাঁর মৃত্যুর পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে ভাঁটা পড়ে।

ডঃ রায়ের জ্ঞানের একটা উদাহরণ দিই। *উদ্বাস্তুরা দলে-দলে পূর্ব বাংলা থেকে আসছে পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিম বাংলায় আর তিল ধারনের ঠাঁই নেই। সেটা ১৯৪৮ সাল। রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারি* জনসাধারণের কাছে অবেদন জানালেন, *শরণার্থীদের আপনাদের বাড়িতে আশ্রয় দিন। মন্ত্রীদেরও বললেন শরণার্থীদের* আশ্রয় দিয়ে জনসাধারণের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। এই আবেদনের কথা শুনে ডঃ রায় হেসে উঠলেন। বললেন, 'রাজ্যপাল আগে রাজভবনের দরজা খুলে দিয়ে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিন না, তারপর মন্ত্রীদের বলবেন আশ্রয় দিতে। মন্ত্রীদের কাজকর্ম করার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ দরকার।' তিনি রাজ্যপালের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন, সহকর্মীদেরও পরামর্শ দিলেন তাই করতে, যদিও ডঃ রায় আর রাজাজী ছিলেন আজীবন বন্ধু।

ডঃ রায় প্রফুল্লবাবুর মত সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে তেমন মিশতে পারতেন না। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একবার তাঁর সঙ্গে দিল্লি গেছি (পঞ্চাশের দশকের কথা)। দুপুরে খাওয়ার আগে বললেন প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে। যদি পাওয়া যায় তবে তিনি খাওয়ার টেবিলে বসে কিছু জরুরী বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন। প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে ফোন করে জানলাম, তিনি সেদিন দুপুরে বাইরে কোথাও খাবেন। তাঁর বিশেষ সহকারী তখন এম ও মাথাই। (প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন তহবিলের ব্যাপারে মাথাই-এর কার্যকলাপ নিয়ে পরে সংসদে খুব হৈ-চৈ হয়। প্রধানমন্ত্রী তখন তাঁকে সরিয়ে দেন।) মথাই ফোনে কথা বলছিলেন। তিনি ডঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। ডঃ রায় জানতে চাইলেন, 'জওহরকে কি খাওয়ার টেবিলে পাওয়া যাবে? ওর সঙ্গে জরুরী কথা আছে, আমি আসতে চাই।' ওদিক থেকে মথাই বললেন প্রধানমন্ত্রী আজ বাইরে খাবেন। সেই সঙ্গে ডঃ রায়কে আমন্ত্রণ জানালেন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে এসে দুপুরের খাওয়া খেতে। হয়ত মাথাইয়ের বলার ঢং-এ কিছুটা মাতব্বরির ভাব ছিল। নেহরুর ওপর নাকি তখন তাঁর খুব প্রভাব, তাই তখন তাঁর আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। মাথাইয়ের কথা শুনে ডঃ রায় চটে আগুন। বললেন, 'যার-তার সঙ্গে আমি খাই না।' বলে টেলিফোনটা রেখে দিলেন। প্রফুল্ল সেন কিন্তু যে-কোন ধরনের লোকের সঙ্গেই একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতে পারতেন। চিঁড়ে গুড় আর মুড়ি খুব ভালবাসতেন। তবে একটা জিনিস ছিল দুজনেরই প্রিয়। সেটা হল মুরগীর মাংস।

রবিবার, ৮ জুলাই। এক দিকে চলছে ডঃ রায়ের শ্রাদ্ধের কাজ তাঁর বাড়িতে। তখনই শহরের অন্য প্রান্তে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। সর্বসম্মত এই নির্বাচনে সময় লেগেছিল মাত্র দশ মিনিট। বৈঠকে হাজির ছিলেন বিধানসভা আর বিধান পরিষদের ১৮৬ জন সদস্য। প্রফুল্লবাবুর নাম প্রস্তাব করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ। তাঁকে সমর্থন করেন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়। নেতা নির্বাচনের পর প্রফুল্লবাবু আর অতুল্যবাবু গেলেন রাজভবনে। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর মন্ত্রীদের নাম আর তাঁদের দপ্তর স্থির করা হল। মন্ত্রিসভায় এত দিন যে পনেরজন সদস্য ছিলেন তাঁরা সকলেই থেকে গেলেন। শুধু ডঃ রায়ের মৃত্যুতে যে-আসনটি শূন্য হয়েছিল তা পূর্ণ করা হল না। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তাঁর 'আদরের' খাদ্য, কৃষি ও সরবরাহ দপ্তর তো রইলই। সেই সঙ্গে তিনি আরও নিলেন সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক ও দুর্নীতি দমন শাখা, অর্থ ও উন্নয়ন দপ্তরের ভার। কালী মুখোপাধ্যায়ের স্থান ছিল তাঁর পরেই। (তাঁকে তিনি নিয়ে এলেন রাইটার্সে তাঁর পাশের ঘরে।) প্রশাসন আর দলের কাজে সব সময়ে পরামর্শের জন্যেই কালীপদবাবুকে কাছাকাছি রাখতে চেয়েছিলেন। জুলাইয়ের গোড়ার দিকে তৈরি হল যাকে বলা যায় 'ইনার ক্যাবিনেট'। প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ আর কালীপদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে। সরকার ও দলের বড় বড় ব্যাপারে তাঁরাই মিলেমিশে সিদ্ধান্ত নিতেন। কালীপদবাবুর হাতে স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) দপ্তরেরও ভার দেওয়া হল। তরুণকান্তি ঘোষ কিছু দিন আগে পূর্ণ মন্ত্রীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি পেলেন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের দায়িত্ব।

কার্যভার গ্রহণের পর প্রফুল্লবাবু প্রথম যে বিবৃতি দেন তার মধ্যেই তাঁর তখনকার মনের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল :

'আজ আমি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। আমাদের পরলোকগত নেতার আশীর্বাদ কামনা করি আজ। তাঁর মত মহান নেতার অকালমৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করা খুবই কঠিন। তবে আমার [illegible] কংগ্রেস দলে এবং সরকারে সকলে মিলেমিশে কাজ পরিবেশ তৈরি করতে পারা আমার নিশ্চিত ধারণা আমরা তাঁর স্বপ্ন সার্থক করতে পারব। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মারফত পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যাসংকুল রাজ্যকে সব বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাহস, নিষ্ঠা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে আমরা আত্মনিয়োগ করব। ডঃ রায়ের উত্তরাধিকার আমাদের পথ দেখাবে, আমাদের চলার পথকে আলোকিত করে তুলবে।'

পরের দিন সকালে রাজভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের কাছে শপথ গ্রহণ করলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। রাজভবন থেকে গেলেন বিধানসভায়। তখন চলছিল দ্বিতীয় বাজেট অধিবেশন। পরে এক দল সংবাদিকের কাছে ঘোষণা করলেন, 'ডঃ রায়ের অসমাপ্ত কাজ সবই চালিয়ে যাওয়া হবে।'

রাইটার্সে ডঃ রায় এত দিন যে ঘরে বসতেন সেই ঘরে এসে বসলেন প্রফুল্লবাবু সেই দিন। ডঃ রায়ের নামের ফলকের জায়গায় বসল তাঁর নামের ফলক। নতুন পরিবেশের সঙ্গে আমায় মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হল। অবশ্য তাতে সময় লাগল কিছুটা। মনে আছে, প্রথম-প্রথম কোন-কোন নোট বা ডি-ও চিঠির নিচে অনবধানতায় পি সি সেনের বদলে বি সি রায় টাইপ করে ফেলতাম। কিন্তু নতুন মুখ্যমন্ত্রী তাতে কিছু মনে করতেন না। টাইপ-করা কাগজে ভুলের জায়গাটায় হাত দিয়ে সহানুভূতির সুরে বলতেন, 'বুঝতে পেরেছি। অত বড় মানুষের সঙ্গে বছরের পর বছর কাজ করেছেন, হঠাৎ তিনি চলে গেছেন, এমন তো হতেই পারে।' আমি একটা অস্বস্তি বোধ করতাম, কিন্তু প্রফুল্লবাবুর সহানুভূতির স্বর আমায় সাহস যোগাত। ডঃ রায়ের নিজস্ব কর্মী যাঁরা ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে প্রফুল্লবাবু ছিলেন খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন। অতুল্য ঘোষও ছিলেন তাই। আমাদের কাজের দক্ষতা আর যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁদের ভাল ধারণাই ছিল। তাই থাকাই স্বাভাবিক। অত বড় একজন মানুষের সঙ্গে বছরের পর বছর আমরা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছি। এমন বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মীগোষ্ঠীকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হারাতে চাইবেন কেন? সাধারণত নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর মন্ত্রীদের নিজস্ব কর্মীগোষ্ঠীর রদবদল হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের বেলায় তা হয় নি। আগের ব্যবস্থাই বজায় রাখা হয়েছিল। তবে দীর্ঘ দিন ধরে খাদ্যমন্ত্রী থাকায় সময় যাঁরা তাঁর নিজস্ব কর্মী ছিলেন তাঁদের কথাও তিনি ভুলে যান নি। নতুন পার্টিশন ওয়াল বসিয়ে এবং পর্যায়ক্রমে ডিউটির ব্যবস্থা করে সকলকেই স্থান দেওয়া হয়েছিল

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের পার্সোনাল সেকশনে। স্বাধীনতার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের পদটি সাধারণত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকেরাই পেয়ে এসেছেন—এ বি গাঙ্গুলি, আর কে মিত্র প্রভৃতি। এস কে চ্যাটার্জিকে (ডঃ রায় তাঁকে 'সন্তোষ' বলে ডাকতেন) নতুন মুখ্যমন্ত্রী বহাল রেখেছিলেন। সুধীরমাধব বসুকেও রেখেছিলেন। পরিশ্রম ও বুদ্ধির জোরে সুধীরমাধব তলা থেকে ওপরে উঠেছিলেন। তবে ডঃ রায়ের আমলে অন্যান্য যে-সব অফিসারের খুব প্রতিপত্তি ছিল তাঁরা নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সুনজরে রইলেন না। নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে তুষ্ট করার আশায় তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেক সময়েই তাঁর অফিস ঘরের সামনে লাইন লাগাতেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের জন্যে শুরু হয় লড়াই। নতুন আমলের শুরুতেই দেখা গেল হীন চক্রান্ত আর নেপথ্য লীলার পালা।

মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের কাজকর্মের ব্যাপারে প্রফুল্লবাবু গোড়াতেই একটা বেশ বড় রকমের পরিবর্তন ঘটালেন। সরকারী ক্ষমতার প্রয়োগের মাধ্যম হল মন্ত্রিসভা। ডঃ রায়ের আমলেও তাই-ই ছিল। কিন্তু তাঁর আমলে দেখা যেত ডঃ রায়ই সব সরকারী নীতির রচয়িতা। সরকারী কাজকর্মেও সেই সব নীতিরই প্রভাব পড়ত। তাই প্রায়ই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠত যে, তিনি বড় বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখেন। প্রফুল্ল সেন কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর সহকর্মীদের জানিয়ে দিলেন যে, মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী তাঁরা নিজের নিজের দপ্তর সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সত্যি কথা বলতে কি, কোন বিশেষ ক্ষমতা তিনি আর নিজের হাতে রাখলেন না, সহকর্মীদের মধ্যেই তিনি তা ভাগ করে দিলেন। সহকর্মী মন্ত্রীরা অবশ্যই তাঁর কাছে পরামর্শের জন্যে যেতে পারতেন, কিন্তু সেটা যদি তাঁরা প্রয়োজন মনে করতেন তবেই। এইভাবেই তিনি মন্ত্রিসভায় একটা হৃদ্যতা আর যৌথ দায়িত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গোড়ার দিকে এতে বেশ কাজও হয়েছিল।

বিবৃতি শুরু বাংলায়

বুধবার ১১ জুলাই বিধানসভায় তাঁর প্রথম বাজেট বক্তৃতা। চাষবাসের ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতির কথা তিনি জানালেন সেই ভাষণে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমেই তাঁকে যে-সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি ছিল শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ কম্যুনিষ্ট পার্টির মোকাবিলা করা। ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান জ্যোতি বসু তখন কম্যুনিস্টদের নেতা। প্রফুল্ল সেন ডঃ রায়ের মত বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। তাই কীভাবে বিরোধী পক্ষের মোকাবিলা করবেন এবং সভার নেতার দায়িত্ব পালন করবেন, তাই নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। বিধানসভাতেও তিনি একটা ব্যাপারে পরিবর্তন আনলেন। সরকারের তরফে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিতে

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

শুরু করলেন বাংলা ভাষায়। বাংলায় তিনি খুব চমৎকার বলতে পারতেন, এখনও পারেন। হিসেবপত্র দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরতে পারেন। তখন থেকে বিধানসভায় অধিকাংশ বক্তাই বাংলায় বলতে শুরু করেন।

মন্ত্রিসভা গঠনের তিন মাসের মধ্যেই মৃত্যু হল কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের। এই মৃত্যু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছিল যেন ব্যক্তিগত ক্ষতির মত। ডঃ রায়ের মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যে কালীপদবাবুর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভারও কম ক্ষতি হল না।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই প্রফুল্লবাবু প্রধানমন্ত্রীকে একটা চিঠি লেখেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করতেন 'প্রিয় পণ্ডিতজী' বলে। কলকাতায় এসে বিধানসভার সদস্য ও কংগ্রেস কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দিতে, মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে এবং ডঃ রায়ের বাসভবন পরিদর্শন করার জন্যে তিনি ঐ চিঠিতে অনুরোধ জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে। শনিবার ২৮ জুলাই সন্ধ্যায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি ভাইকাউন্ট বিমানে প্রধানমন্ত্রী এসে নামলেন দমদমায়। মন্ত্রীরা অপেক্ষা করছিলেন টারম্যাকে। প্রধানমন্ত্রী যখন বিমান থেকে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে তখন সকলেই যেন মুহূর্তের জন্যে অনুভব করলেন দীর্ঘ-দেহ ডঃ রায়ের অনুপস্থিতি। নেহরুও নিশ্চয়ই তা অনুভব করেছিলেন। এত দিন ডঃ রায়ের বলিষ্ঠ চেহারা সর্বদাই তাঁর প্রথম চোখে পড়ত।

পর দিন সকালে নেহরু প্রথমেই গেলেন বিধানচন্দ্রের বাসভবনে। ডঃ রায় যে-ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন আমরা সকলে সেখানেই অপেক্ষা করছিলাম। ডঃ রায় যে-খাটে শুতেন সেটিকে সাজান হয়েছিল সাদা ফুল দিয়ে। খাটের ওপর রাখা হয়েছিল ডঃ রায়ের ছবি। নেহরু এলেন। সঙ্গে রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু আর মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। সারা ঘর তখন যেন থমথম করছে। অনেক বছর হয়ে গেল, তবু এখনও নেহরুর চেহারাটা আমার মনে পড়ে। সেই আগের নেহরু আর তিনি তখন নেই। মুখটা যেন ফুলো-ফুলো। মনে হল খুব দুর্বল। বড় মালাটা নিয়ে যখন ডঃ রায়ের বিছানার ওপর রাখতে গেলেন তখন তাঁর হাত কাঁপছিল। আমি এগিয়ে গেলাম তাঁকে সাহায্য করতে। দুজনে ধরে সেই বড় মালাটা যথাস্থানে রাখা গেল। তারপর সকলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন দু-এক মিনিট। রাজ্যপালই প্রথম কথা বললেন 'তিনি গেছেন তাঁর অনন্ত ধামে, আমাদের সকলকেই একদিন সেখানে যেতে হবে।' তারপর তাঁরা নীরবে চলে গেলেন, ঠিক যেমন নীরবে এসেছিলেন তেমনভাবেই। বাইরে তখন অপেক্ষমান বিরাট জনতা। তাদের মুখে শোকের ছায়া। কোন আওয়াজ নেই, নেই কোন 'জয়'-ধ্বনি।

ডঃ রায়ের বাড়ি থেকে পণ্ডিত নেহরু গেলেন রাজভবনে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনা করলেন বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্যে ডঃ রায়ের পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্তু কংগ্রেস ভবনে দলীয় সভায় তিনি জানালেন চীন সম্পর্কে তাঁর মতামত। বললেন, চীন আর ভারতীয় এলাকায় ঢুকে হামলা করতে পারবে না। লদাক সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কথা গোপন করেন নি। চীনকে যত নোট পাঠান হয়েছে সবই প্রকাশ করা হয়েছে। বিগত আট-দশ দিনে চীন বেশি দূর এগোতে পারে নি। ওরা চেষ্টা করছে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় ঢুকে পড়তে। রাশিয়ার কাছ থেকে 'মিগ' বিমান কেনার কথাও বললেন নেহরু। জানালেন 'অন্যের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান কেনার চেয়ে তৈরি করতেই বেশি আগ্রহী ভারত।' পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতীয় নীতি প্রসঙ্গে নেহরু বললেন, 'পাকিস্তান জাতীয়তার ভিত্তিতে চলছে না, চলছে ভারত-বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে। ওদের জাতীয়তাবোধ এখনও গড়ে ওঠে নি, তাই ওরা এখনও এমন সব কাণ্ড করছে যা আজকের যুগে করা সাজে না। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আমাদের কোন নাগরিক মুসলমান বলে তাকে আমরা দেশ থেকে বিতাড়িত করি না।' তাঁকে যদি পাকিস্তানের দায়িত্ব নিতে বলা-ও হয় তবু তিনি তা নেবেন না, কারণ এটা হবে ভারতের ওপর এক বিরাট বোঝা। আমাদের তুলনায় ওদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক খারাপ। তবে নেহরু জানালেন 'আমাদের কাছে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের যথেষ্ট দাম আছে।'

কলকাতার কর্মসূচী শেষ হলে ৩০ জুলাই প্রধানমন্ত্রী দিল্লি ফিরে গেলেন। ডঃ রায়ের মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যেই

পূর্ণ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হল ডঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটি। এই কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, তুষারকান্তি ঘোষ ও ব্রিজমোহন বিড়লা। এক মাসের মধ্যেই সংগৃহীত হল বাইশ লাখ টাকা। স্থির হল এই টাকা দিয়ে তৈরি হবে শিশুদের জন্যে একটি আধুনিক হাসপাতাল এবং একটি শিশুকেন্দ্র, জিমন্যাসিয়াম ও পাঠাগার। (সল্ট লেক এলাকা নির্বাচিত হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে, কিন্তু কাজ চলে খুব ঢিমে তালে।) এই তহবিলের জন্যে অর্থ সংগ্রহের আবেদন জানানোর সময় পণ্ডিত নেহরু ডঃ রায়ের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'এক মহান পুরুষের যেভাবে জীবনাবসান হওয়া উচিত সেইভাবেই তাঁর জীবনাবসান হয়েছে —শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জনগণের সেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। শুধু পশ্চিম-বঙ্গই নয়, গোটা দেশই যেমন এক দিকে এই ক্ষতিতে শোকস্তব্ধ, ঠিক তেমনি এই কথা ভেবে আনন্দিতও যে, এই দূরদর্শী মানুষটি যে কর্ম ও দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে রেখে গেছেন, বিদায় নেওয়ার পরও রেখে গেছেন তাঁর মহত্বের স্পর্শ।' শিল্পপতি, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই এই তহবিলে যথাসাধ্য দান করেন। মোট সংগ্রহের পরিমাণ পৌঁছয় প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকায়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভার আমলে এই তহবিলে দান করা হয় দশ লাখ টাকা।

এদিকে তখন চলছিল বিধানসভার বাজেট বৈঠক। দোসরা আগস্ট সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায় বিধানসভায় সবাইকে অবাক করে দিলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৫৮ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান। তিনি বললেন, আমি ছিলাম প্রফুল্লবাবুর কঠোরতম সমালোচকদের একজন। কিন্তু গত একত্রিশ দিনে প্রফুল্লবাবু যেভাবে কাজ করেছেন তা যদি বজায় থাকে তবে তাঁকে আমি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাব, তাঁর সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করব। সিদ্ধার্থবাবুর হঠাৎ মতবদলের রহস্যভেদ করা আমাদের পক্ষে মোটেই সহজ ছিল না। যাই হোক, নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাজেট বৈঠক শেষ হল সুষ্ঠুভাবেই।

আগস্ট মাসের দশ তারিখে কেন্দ্রীয় জ্বালানি দপ্তরের মন্ত্রী কেশবদেও মালব্য ঘোষণা করলেন যে, কয়লা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিতে সর্ব-
[illegible]
সরকারী প্রকল্পের চাহিদা মেটানোর জন্যে নিজস্ব কয়লা খনি সম্পাদনের অনুমতি পায়
[illegible]
[illegible] এ ব্যাপারে ডঃ রায়কে দীর্ঘ লড়াই চালাতে হয়েছিল।) রাজ্যের কয়লা ভিত্তিক শিল্পের চাহিদা মেটাতে রাজ্য সরকার অনুমোদিত এলাকায় কয়লা উত্তোলন করতে পারবেন, এটাই ছিল ঐ আট-দফা চুক্তির মূল কথা। কলকাতার কাগজে বড় বড় করে বেরোল এই খবর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরই জয় সূচিত হল এর মধ্যে দিয়ে। কয়লা উত্তোলন সম্পর্কে একটা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এই চুক্তি সম্ভব করার জন্যে মালব্যজী ডঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

ঐ মাসেই প্রফুল্লবাবু ঘোষণা করলেন যে, তিনি প্রতি সোমবারে অপরাহ্নে তাঁর রাজভবনের বাড়িতে জনসাধারণের কাছ থেকে সরাসরি অভিযোগ শুনবেন। কিছু দিন আগে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ রাষ্ট্রপতি ভবনে চালু করেছিলেন এই রেওয়াজ। তাঁর 'আম দরবারের' প্রথম দিনে অভিযোগ শোনার জন্যে তিনি বরাদ্দ করলেন দু ঘণ্টা সময়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই সরাসরি মোলাকাতের খবর সংবাদপত্রে ছাপা হল ফলাও করে। জন-সাধারণের মধ্যেও দেখা গেল প্রবল উৎসাহ। রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দেখা গেল আবেদনপত্র হাতে মানুষের দীর্ঘ সারি, তাতে গরীব মানুষের ভিড়ই বেশি। প্রথম 'আম দরবার' হয় আগস্টের [illegible] তারিখে। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন পাঁচ শ' জনের সঙ্গে কথা বললেন নিজে, তারপর তাদের আবেদনপত্রের ওপর দিলেন প্রয়োজনীয় আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তিই ছিল উদ্দেশ্য। মন্ত্রিসভার দুই সদস্য তাঁকে সাহায্য করছিলেন। তাঁদের একজন জগন্নাথ কোলে। অধিকাংশ অভি-যোগই ছিল ছোটখাটো ধরনের—নলকূপের অনুমোদন, ত্রাণ, ব্যক্তিগত সাহায্য ইত্যাদি সংক্রান্ত। সেই সময় আমাকে তিনি বলে-ছিলেন কাছে-কাছে থাকতে। আবেদনকারী-দের অভিযোগ শোনবার পর আদেশ লিখে কাগজপত্র দিয়ে দিতেন আমার হাতে। প্রথম দিনের 'আম দরবার' শেষ হতে-হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আবেদনপত্রের স্তূপ নিয়ে ছুটলাম রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। আমার জন দুই সহকর্মীর সাহায্যে সেগুলো ভাগ করে জরুরি তদন্ত আর রিপোর্টের জন্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম সংশ্লিষ্ট দপ্তরে-দপ্তরে। এখনও মনে পড়ে, অনেক ব্যাপারে বেশ দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, অনেকেই উপকৃত হয়েছিলেন। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করে অভিযোগের প্রতিকার হচ্ছে, এতে অবশ্য কোনো কোনো আমলা কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমলাতন্ত্রের ফাঁস সরকারী কাজকর্মকে [illegible] শম্বুকগতি করে তোলে। সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না কোথায় গেলে তাদের অভিযোগের প্রতিকার হবে। তাই ক্রমে ক্রমে 'আম দরবারে' প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। একদিন পৌঁছল হাজার খানেক। সেদিন মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্য কর-ছিলেন মন্ত্রিসভার আরো এগার জন সদস্য। কিছু আর্থিক সাহায্য চেয়ে যে-সব আবেদন আসত তার অধিকাংশই আসত শরণার্থী-দের কাছ থেকে। হিসেব করে দেখা গেল, যদি এমন ঢালাওভাবে সাহায্য মঞ্জুর করা হয় তবে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ ভাণ্ডার অচিরেই শূন্য হয়ে যাবে। ঐ বছরই নভেম্বর-ডিসেম্বরে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল। মুখ্য-মন্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মাস দুয়েক চলার পর ঐ সময় 'আম দরবার' বন্ধ হয়ে গেল।

সেপ্টেম্বরের চার তারিখে আইন-শৃংখলা রক্ষা নিয়ে দেখা দিল একটা বড় রকমের সমস্যা। একটি ছাত্র ট্রেনের নিচের ক্লাসের টিকিট কেটে ওপরের ক্লাসে চড়ে যাচ্ছিল বলে শিয়ালদহের রেল পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার সূত্র ধরেই একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়। যখন গোলযোগের খবর এল, মুখ্যমন্ত্রী তখন রাইটার্সে। বেলা এগারটা হবে। গোলমাল চলেছিল রাত আটটা পর্যন্ত, যদিও মধ্য কলকাতার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। জখম হয় আশি জন, গ্রেপ্তার হয় শ'দুয়েক। আগুন ধরানোর ঘটনা ঘটে সতেরটি। তেরটি ট্রাম গাড়ি পুড়ে যায়, ফলে লোকসান হয় আট লাখ টাকা। উত্তেজনা বেড়ে চলতে দেখে মুখ্যমন্ত্রী ডেকে পাঠান মুখ্য সচিবকে। মুখ্য সচিব তখন তার গুপ্ত। মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য সচিবকে বললেন, ঘটনা-স্থলে গিয়ে অবস্থাটা বুঝে আসতে। তিনি ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিলেন। আলাপ-আলোচনার পর নতুন নির্দেশ দেওয়া হল পুলিশ কমিশনার এস এম ঘোষকে—সাদা পোষাকের পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করুন পাণ্ডাদের। রাত আটটা নাগাদ অবস্থা আয়ত্তে এল। সারা দিন ধরেই টেলিফোন আসছিল। কেউ মুখ্য-মন্ত্রীকে বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কেউ করছিলেন গাল মন্দ। সেদিন রাইটার্স ছাড়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বললেন, জনসাধারণ যদি গুণ্ডা-বদমায়েস-দের ধরার ব্যাপারে সহযোগিতা না-করে তবে গুলি চালানো ছাড়া উপায় থাকে না। সাদা পোষাকের পুলিশ দিয়ে পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করানোর কৌশলটা ছিল অভিনব। এই পরামর্শ দিচ্ছিলেন মুখ্য সচিব। মুখ্য-মন্ত্রী সেই পরামর্শ সঙ্গে-সঙ্গেই মেনে নেন। যাই হোক, প্রফুল্লবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আইন-শৃংখলার ব্যাপারে এটিই ছিল প্রথম চ্যালেঞ্জ। দেখা গেল, বাইরে তিনি অমায়িক মেজাজের মানুষ হলেও প্রয়োজন হলে তিনিও কঠোর হতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার মাস দুই পরে সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে প্রফুল্লবাবু দিল্লি গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই তাঁর প্রথম দিল্লি যাওয়া। দিল্লি পৌঁছেই সোজা গেলেন ১৯ নম্বর ক্যানিং লেনে

গভর্নর চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মুখ্যমন্ত্রীর শপথ পাঠ করাচ্ছেন বিধানচন্দ্র রায়কে

অতুল্য ঘোষের বাসভবনে। ঐ বাড়িটি তখন হয়ে উঠেছে রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। ডঃ রায় নেই, পণ্ডিত নেহরুর শরীর ভালো নয়—এই অবস্থায় অতুল্য ঘোষের ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। সর্বভারতীয় কংগ্রেসও ক্রমশ আসছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি করেই তিনি আর খুশি থাকতে পারছিলেন না। অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও দিল্লি এলেই একবার তাঁর বাড়িতে এসে দেখা করে যেতেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মোহনলাল সুখাড়িয়া প্রায়ই আসতেন। অতুল্যবাবুর কাছে যাঁরাই আসতেন তাঁদের দরাজ হাতে আদর-আপ্যায়ন করা হত, তা তাঁরা ওপরতলার মানুষ হোন অথবা নিচের তলার। অসংখ্য দর্শনার্থীর এই ধরনের আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার উৎসটা কী ছিল তা নিয়ে তখন মাথা ঘামাই নি। যা দেখে আমাদের ভালো লাগত তা হল এই ব্যাপারে অতুল্যবাবু ছিলেন পুরোপুরি গণতন্ত্রী। তাঁর সমর্থক বা বিরোধী, সকলকেই তিনি সমানভাবে আদর যত্ন করতেন। ডঃ রায় দিল্লিতে এসে উঠতেন ৪২ নম্বর র‍্যাটেনডন রোডে। এবার ক্যানিং লেনের এই বাড়িতে এসে আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। এই জায়গাটা আমার অচেনা তা নয়, তবে পরিবেশটা একেবারেই ভিন্ন ধরনের। রাজধানীর সাংবাদিকদের কেউ কেউ রোজই অতুল্যবাবুর কাছে আসতেন। তাঁদের জন্যে তাঁর দরজা সর্বদাই খোলা থাকত। একদিন সকালে এক নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতিকের কথা শুনে খুব কষ্ট পেলাম। সেদিন খুব বেশি লোক ছিলেন না। তাঁদের সামনে তিনি ডঃ রায়ের দান সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ আর ব্যক্তিগত মন্তব্য করে বসলেন। বুঝলাম রাজনীতিটা বড় নোংরা ব্যাপার। মানুষের নীতিবোধকে নষ্ট করে দেয় রাজনীতি। সাধারণ মানুষ বা চরিত্রবান মানুষ তাই এক বিশেষ ধরনের রাজনীতিককে এড়িয়ে চলতে চান। তবে রাজনীতিক ছাড়া তো আবার রাজ্য চলে না। সেই রাজনীতিকটির কটু মন্তব্য শোনার পর ঘর ছেড়ে আমি চলে এলাম। এক জন রাজনীতিকের প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা করা এক জিনিস, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যিনি দীর্ঘ দিন ধরে বরণীয় নেতা হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছেন মৃত্যুর অল্প দিন পরেই তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে একজন অশালীন মন্তব্য করলেন, অথচ উপস্থিত কেউ তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না। কোনো কোনো রাজনীতিক কত দ্রুতই না ভোল বদলাতে পারেন। মাঝে মাঝে মনে হয় ভালো লোকদের রাজনীতি ছেড়ে সেই জীবনেই ফিরে যাওয়া উচিত যেখানে এই ধরনের মিথ্যাচার আর ভণ্ডামি নেই। তবে সবচেয়ে বিপদের কথা, রাজনীতিতে নিতান্ত সাধারণ কিছু লোক হীন কৌশল অবলম্বন করে কৃতী মানুষদের ওপরে উঠতে দেয় না। ডঃ রায় আর [illegible] এটাই আমি দেখেছি। ক্ষমতা লাভের এই লড়াই আমাদের দেশের ট্র্যাজিডি, আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা।

প্রফুল্লবাবু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন আট তারিখে। আধ ঘণ্টা তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। এদিকে অতুল্যবাবুর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যেরা প্রফুল্লবাবুর সংবর্ধনার আয়োজন করেন। নেহরু এসেছিলেন এই সভায়, দিল্লির ওপর মহলের অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সন্ধ্যেয় প্রফুল্লবাবু দেখা করলেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লির সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে আয়োজন করা হল সাংবাদিক বৈঠকের। ঐ বৈঠকে প্রফুল্লবাবু সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, "কম্যুনিজম আমাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। আজ যদি নির্বাচন হয় তবে কলকাতার ২৬টা আসনেই আমরা জিতব। কম্যুনিস্ট পার্টির এক নেতা কিছু দিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করে চুপি-চুপি বলে গেছেন যে আমি রাজনীতিতে যে-পথ নিয়েছি তাতে আন্দোলন শুরু করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে।" যদি সত্যিই তাই হত!

কলকাতায় ফিরে এসে প্রফুল্লবাবু তাঁর মন্ত্রিসভায় নিয়ে এলেন নামজাদা ব্যারিস্টার আর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শংকরদাস ব্যানার্জিকে। দিল্লিতে অতুল্যবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। প্রফুল্লবাবু যে সাড়ে চার বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ে সর্বদাই তিনি অতুল্যবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতেন মন্ত্রিসভায় রদবদলের ব্যাপারে। শংকরদাস পেলেন অর্থ আর স্বরাষ্ট্র (পরিবহন) দপ্তর। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ডঃ রায়ের মন্ত্রিসভায় ছিলেন ১৬ জন সদস্য। ডঃ রায় আর কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ঐ সংখ্যা কমে হয় ১৪। এখন আবার হল ১৬। শংকরদাসের আগে মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছিলেন নদীয়ার স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরের আগুনে

'রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আমি জনপ্রিয় করেছি একথা ভাববার স্পর্ধা আমি রাখি না। তাঁর গান গাইবার এবং শেখাবার অধিকার যাঁরা আমাকে দিয়েছেন এ গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য।'—অসাধারণ ভদ্র এবং বিনয়ী সেই সঙ্গীতসাধক তাঁর ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের প্রাপ্য ধন্যবাদটুকু নিতে না চাইলেও অনেকেই যে সে শংসাটুকু দিতে উৎসুক।

কবিগুরুর স্নেহধন্যা প্রবীণা সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর তো স্পষ্টই বলেছেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের এবং প্রচারের ক্ষেত্রে পঙ্কজবাবুর (পঙ্কজ মল্লিক) বিশেষ ভূমিকা ও অবদান অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। অসাধারণ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে এ গানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে তিনি সচেতন করেছিলেন। পঙ্কজবাবুর এই অসাধারণ কণ্ঠ ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কনভিনসড হয়েছিলেন বলেই রবিদাদামশায় তাঁকে নিজের গান সুর দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন।'

কবিগুরুর আর এক স্নেহধন্যা কনক বিশ্বাসের কথাও তাই, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে পঙ্কজবাবুর নিজের বিধিদত্ত কণ্ঠ আরাধনা ত ছিলোই'।

পঙ্কজ মল্লিক সম্পর্কে অরুন্ধতী দেবীর বক্তব্য হল, 'প্রথম যুগে রবীন্দ্র-সঙ্গীত মেয়েদের গান বলে অনেকের কাছে উপহসিত হত। সে অপবাদ থেকে তাকে মুক্ত দিলো পঙ্কজ মল্লিকের পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠ ও উচ্চারণ।....'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর' এখানে মিনতির মধ্যেও কি ওজস। বীরচিত্তের আহ্বান, অভিমান সব মিলে একটা প্রবল প্রচণ্ড অনুভূতির যে মর্যাদাগম্ভীর প্রকাশ ঘটেছে, পঙ্কজবাবু ছাড়া এ রূপ সৃষ্টি করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হতো না।'

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বলেছেন, 'এ গানের (রবীন্দ্রসঙ্গীত) লোকপ্রিয়তা সৃষ্টিতে পংকজদার অবদান সকল সন্দেহ ও প্রশ্নের অতীত'।

শান্তিদেব ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বাংলাদেশে (এখনকার বাংলাদেশ অর্থে নয়) রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গে পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, কানন দেবীর ভূমিকা নিশ্চয় স্বীকার্য।'

এ প্রসঙ্গটি রীতিমত স্পষ্ট হয়েছে একালের অন্যতম রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ শিল্পী অরবিন্দ বিশ্বাসের কথায়, 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পঙ্কজ মল্লিক একটা বিরাট আলোকস্তম্ভের মত'।

বিভিন্ন শিল্পীর চোখের আলোয় সঙ্গীত সাধক পঙ্কজ মল্লিক এমনিভাবেই [illegible]। [illegible]

ব্যক্তিত্ব—যা তাঁকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল তা রীতিমত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আবার সেই সঙ্গে প্রশ্নও জাগছিল এই বিরাট সঙ্গীতব্যক্তিত্বের প্রতি কি আমরা যথোচিত মর্যাদা দেখিয়েছি। জীবনের অপরাহ্নে কি আমাদের আচরণ তাঁকে আহত করেনি। এমন কি মৃত্যুর পরেও কোন কোন সমালোচক তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সমালোচনার মুখে দাঁড় করান নি কি? পুনর্মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় কিন্তু পুনর্মূল্যায়ন তাঁদেরই সাজে যাঁরা যোগ্যকে প্রাপ্য মূল্য দিতে কুণ্ঠিত নন।

এসব প্রসঙ্গ মনে ঝড় তুললো সন্ধ্যা সেনের সদ্য প্রকাশিত বইটি পড়ে। মহিলা সাংবাদিক শ্রীমতী সেনের পরিচয় নিশ্চয়ই নতুন করে দিতে হবে না। সঙ্গীতপ্রেমীর কাছে তাঁর পরিচয় নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইটির নাম 'সুরের আগুন'। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম সারির শিল্পীদের সাক্ষাৎকার সংবলিত এ বইটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে সাড়া তুলেছে। অনেক প্রশ্ন জাগিয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত সন্ধানীদের মনে।

অনাদিকুমার দস্তিদার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গুরু শুধু নন,—এ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক। তিনি বলেন, সা রে গা মা ঠিক রেখে গাইলেই তো সব সময় হয় না, সেটা স্বর গাওয়া হয়। কিন্তু স্বর গাওয়া ও গান গাওয়া এক জিনিস নয়। বরং দরদ দিয়ে ঢংটি বজায় রেখে গাইলে সা রে গা মা একটু ইতরবিশেষ হলেও হয়ত কিছু আসে যায় না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর এক গুরু রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী প্রসঙ্গে বলেন, 'যা শুনলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চেনা যায়। সূর্যের আলোয় যেমন সব রং মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের গানেও [illegible] সঙ্গীতধারা এ

গানের অন্তর গহনে প্রবাহিত। এই কথাটি মনে রাখলে গায়কী আসনই তৈরী হয়ে যায়।'

গায়কী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের কোন নির্দিষ্ট রূপ বা নকসার ধারণা ছিল কিনা এ সম্পর্কে রবীন্দ্রসংগীতে নিয়োজিত প্রাণ শান্তিদেব ঘোষকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন। 'একেবারেই না। বিভিন্ন গাছে নানা রং ও গন্ধের ফুল ফুটে ওঠার মতই গায়ক গায়িকার কণ্ঠ, সংগীত সংস্কার ও সৌন্দর্য-বোধ দিয়ে গড়ে ওঠে তাদের গানের এক্সপ্রেশন। এখানে কোনো নিয়ম বেঁধে দিলে গানের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগটি নষ্ট হয়ে যায়। —এসম্বন্ধে গুরুদেবের উদারতা ছিলো আমাদের ধারণার অতীত।

অথচ সংগীতের প্রবাদপুরুষ দেবব্রত বিশ্বাসের গান বন্ধ হল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা দেবব্রতকে ব্রাত্য করে দিলেন। যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতার কথা চিন্তা করেন তাঁরা কি গুরুদেবের উদারতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন? তাঁরা কি বিশ্বাস করেন না, সা রে গা মা ঠিক রেখে গাইলেই সব সময় গান হয় না? স্বর গাওয়া আর গান গাওয়া এক জিনিস নয়। এসব কথা ভাবার সময় এসেছে আজ। স্বীকার করার সময় এসেছে রবীন্দ্রনাথ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জমিদারী সম্পত্তি নন।

রবীন্দ্রসংগীতের জন্য পঙ্কজ মল্লিকের অবদান অনেক। উন্নাসিক অনেকেই তাঁর সে অবদান খোলা গলায় বলতে পারেন নি। মৃত্যুর পরও যুগধারকের প্রতিভা নিয়ে জন্মানো সেই সাধক শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। অনেক অবিচার হয়েছে। আজ তার ঋণ শোধ করা বোধ হয় আমাদের নৈতিক কর্তব্য।

উনিশশো একাত্তর থেকে দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করছেন না। তাঁর প্রতি আজও চলেছে অবিচার। এই মুহূর্তে নিজেদের ভুল স্বীকারের সময় এসেছে। সেই স্বীকারোক্তিতে 'দেবব্রত বিশ্বাসের নয় আমাদেরই লাভ। কেননা আমরাই বলেছি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার সময় যে কথাটি সবচেয়ে বেশী মনে রাখা দরকার তা হলো এ সঙ্গীতের কাব্যধর্মিতা। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কাব্যধর্মিতার দিকটি দেবব্রত বিশ্বাসের মত এত তীব্র অনুভূতিতে কেউ দেখেছেন বলে আমার জানা নেই।

এইসব কথা মনে এল 'সুরের আগুনে' পড়তে পড়তে। মনে আসা তো স্বাভাবিকই। এগুলো তো নিছক মামুলী সাক্ষাৎকার নয়। প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য অনেক ভাবনা অনেক জিজ্ঞাসা জমা আছে। অনেক অজানা তথ্য সাজানো আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা অমিয়া ঠাকুরেরও গাওয়া কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড সেই সময়েও বাতিল হয়েছিল। অজুহাত ছিল 'আরো [illegible] উচিত'। অমিয়া ঠাকুরের

কথাতেই যেন বড় অবহেলিত সমরেশ চৌধুরীকে নতুন করে মনে পড়ল। অথচ 'ফুল বলে মঞ্জরী ও মঞ্জরী' কিংবা 'এলো যে শীতের বেলা' কতবার রেকর্ডে শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

এমনিভাবেই শুভ গুহঠাকুরতার কথাতেই জানতে পেরেছি পঙ্কজ মল্লিকের গলায় 'তোমার আসন শূন্য আজি' শুনে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। এমনি সব কত কথা ছড়ানো বইটির পাতায় পাতায়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা ভাবনা চিন্তা করেন তাঁরা তাঁদের ভাবনাচিন্তার অনেক খোরাক পাবেন এতে। আর যাঁরা গবেষণা করতে চান তাঁরা গবেষণার প্রচুর সূত্র পেয়ে যাবেন। গ্রন্থের সার্থকতা তো সেখানেই যা পড়ার পর অনেক ভাবতে হয়। অনেক প্রশ্নে তোলপাড় হতে হয়। অনেক কিছু নতুন করে জানতে হয়। সন্ধ্যা সেনের সুরের আগুন সেই চিহ্নিত গ্রন্থের পর্যায়ে পড়ে। সাজানো প্রচ্ছদ বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎস ব্যালানিটিস্‌

মৃণালকান্তি সাহা

সমস্ত উদ্ভিদই কোন না কোন ভেষজ গুণসম্পন্ন, ভেষজজ্ঞরা এটা মনে করেন। যদিও সমস্ত গাছের গুণাগুণ পরখ করা সম্ভব হয়নি তবে হয়ত আগামী দিনে সেটা সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের মরু এলাকায় অশেষ গুণসম্পন্ন একটা গাছ জন্মায়, নাম ব্যালানিটিস। পুরো নাম ব্যালানিটিস রক্সবারগী। পশ্চিম রাজস্থানে এই গাছ সবচেয়ে বেশী জন্মায় আর সেখানে এই গাছকে বলা হয় 'হিংগোতা'। পর মরুভূমির প্রায় সর্বত্রই এই শক্তসমর্থ কাঁটাওয়ালা এই গাছটির দেখা পাওয়া যায়। প্রধানতঃ এই গাছের ফল এবং মূল ব্যবহৃত হয় জন্ম-নিরোধক ওষুধ হিসেবে। ট্যাবলেট বা বড়ি হিসেবে যেসব জন্মনিরোধক ওষুধ খাওয়া হয়, তার মধ্যে থাকে ডাইওজেনিন, যা নাকি পাওয়া যায় এই গাছের ফলে এবং শিকড়ে। বীজেরও ব্যবহার আছে নানারকম আর বীজ থেকে পাওয়া যায় হালকা হলুদ রংএর গন্ধহীন একরকম তেল, তারও ব্যবহার বহুবিধ। সমস্ত রকম হর্মোন চিকিৎসার জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায় এই গাছ থেকে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। ভারতে প্রতি বছরে ডাইয়োজিনের প্রয়োজন দুশ টন কিন্তু পাওয়া যায় মাত্র তিরিশ টন। ভেষজশিল্পে যাঁরা হর্মোন এবং হর্মোনের চিকিৎসার জন্য ওষুধ তৈরী করেন, তাঁরা আরও একটি গাছের উপর নির্ভর করেন, তার নাম 'ডাইওসোরিয়া', এরা এবং ব্যালানিটিস জাতভাই বলা যায় তবে কিছুটা পার্থক্য আছে। ডাইওসোরিয়া পাওয়া যায় হিমালয় অঞ্চলে। প্রতি বছরের বহুল ব্যবহারে, নতুন গাছ বপনের এবং সার্থক পরিকল্পনার অভাবে, ব্যালানিটিস কিংবা ডাইওসোরিয়া দুইএরই ফল উৎপাদনের পরিমাণে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। যার জন্য আজ হর্মোন জাতীয় ভেষজ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি অন্য পন্থার কথা ভাবতে শুরু করেছে। তবে উপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং নিয়মিত গবেষণার দ্বারা এই গাছ থেকেই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

'মরু-অঞ্চলের ভেষজ উদ্ভিদ'—১৯৬০এ ইউনেসকো পরিচালিত এই পরীক্ষায় ডাইওজেন প্রস্তুত করার জন্য ব্যালানিটিসকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ব্যালানিটিস সাধারণতঃ বালুময় সমভূমি এবং পাথুরে শুকনো জমিতে জন্মায়। আমরা যাকে জংলী বা বন্য গাছ বলি, ব্যালানিটিসকে সেই জাতীয় গাছ বলা যায়। অযত্নে, অবহেলায় প্রকৃতির স্বাভাবিক প্ররোচনায়ই এই গাছ জন্মায়। লম্বায় খুব বড় হয় না। সাধারণত উচ্চতা হয় পাঁচ মিটার। লম্বা লম্বা, সোজা, শক্ত কাঁটাযুক্ত কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখা, ফুলের রং হরিতাভ হলুদ। ফুল ফোটে বছরে দুবার। এপ্রিল-মে নাগাদ একবার আবার হয় অকটোবর-নভেম্বরে। কিন্তু এপ্রিল-মে মাসের ফুল থেকেই ফল হয়। অকটোবর-নভেম্বর মাসের ফুলগুলো কোনরকম ফলে রূপান্তরিত হয় না।

ফলের সাইজ এবং ওজন বিভিন্ন রকম হতে পারে। এক একটি ফলের ওজন ১২ গ্রাম থেকে ৮০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। ফলের শাঁস আঠালো কটু গন্ধযুক্ত।
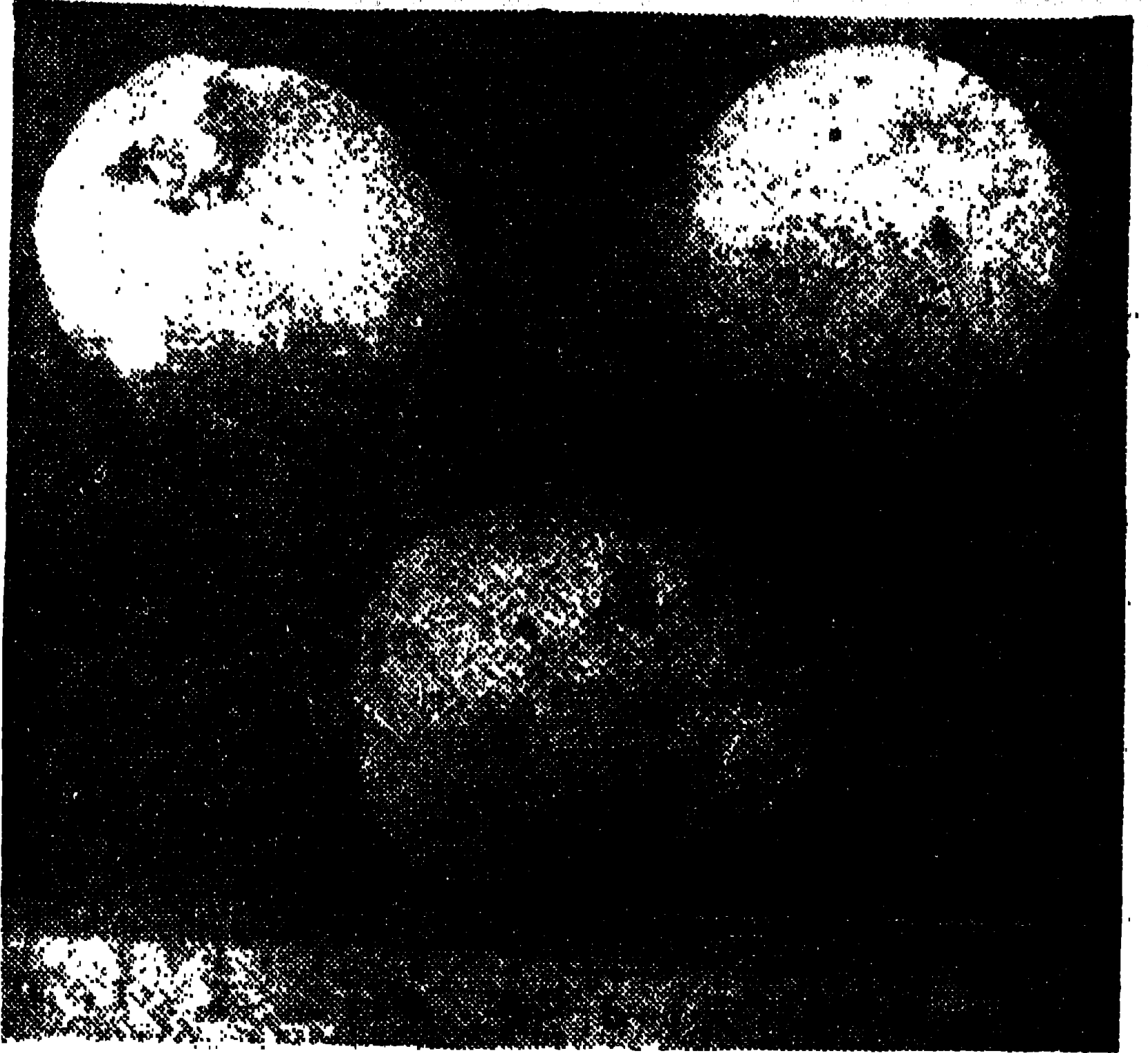
একই গাছ জন্মায় বিভিন্ন এলাকায়। আকারে ফল এবং মূলও একরকম। কিন্তু সেই ফল ও মূলের মধ্যে ডাইওজেনিনের যে পরিমাণ থাকে, সেই পরিমাণের তারতম্য দেখা যায় বিভিন্ন এলাকার গাছের মধ্যে। পশ্চিম রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকার গাছের ফল এবং মূলের ডাইওজেনিনের পরিমাণ নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। মূলের মধ্যে ডাইওজেনিনের পরিমাণ শতকরা ০-৩ ভাগ থেকে শতকরা ১-৫ ভাগ এবং ফলে ডাইওজেনিনের পরিমাণ ০-৩ ভাগ থেকে শতকরা ৩-৮ ভাগ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

পশ্চিম রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকার ব্যালানিটিস গাছের ফলের ও মূলের ডাইওজেনিনের পরিমাণের একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল :

(নমুনা সংগ্রহের এবং তালিকা নির্মাণের সময় : জানুয়ারি, ১৯৭৯)

জায়গার নাম	ডাইওজেনিনের পরিমাণ (শতকরা হিসাবে)	
	ফল	মূল
যোধপুর	২-৮৩	১-৩৭
কৈলানা	১-০৮	০-৭৫
পালি	২-৫১	০-৮১
দেবলিয়া	২-৮	১-৩৭
বেরিগাঁও	—	১-০৯
ধোলা	১-৪২	—

ঋতুবিশেষে ফল এবং মূলে ডাইওজেনিনের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। যোধপুরের সেণ্ট্রাল রিসার্চ ফার্মের কর্মীরা দেখেছেন যে, একই গাছের ফলে এবং মূলে ডাইওজেনিনের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায় বিশেষ বিশেষ সময়ে। মূল থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ডাইওজেনিন সংগ্রহ করা যায়

ব্যালানিটিসের ফল

পূর্ণবয়স্ক ব্যালানিটিস

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। আর ফল থেকে পাওয়া যায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। এই সময় সমস্ত ফলই একদম পেকে যায়।

বীজের শক্ত খোলসের ভিতরে থাকে বীজের শাঁস। যার থেকে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ (ফ্যাট)। এই বীজের শাঁস থেকে অন্ততঃ শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ ঈষৎ হলুদ রং-এর গন্ধহীন তেল এবং শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ ভ্যল লাইসিনযুক্ত প্রোটিন সংগ্রহ করা হয়।

আগেই বলেছি এই গাছের ফল, মূল (শিকড়) এবং বিভিন্ন অংশ নানারকমভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রধান ব্যবহার বিভিন্ন রকম ওষুধ হিসেবে। ব্যালানিটিনের ফলের স্বাদ তেতো কিন্তু সহজে পরিপাক হয়। এই ফল শরীরের পুষ্টির প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায় (অলটারেটিভ) পাকস্থলীর কৃমি ধ্বংস করে. ব্যথা, যন্ত্রণা উপশম করে, আমাশয়ের জীবাণু প্রতিরোধ করে। এছাড়া বিভিন্ন রকম ঘা সারাবার জন্য এই ফল অত্যন্ত ফলদায়ক, নিরাময় করে অনেক রকম চর্মরোগ ফোড়া এবং ইঁদুরের কামড়জনিত ক্ষত।

সুদান এবং ইজিপ্টে সালসা এবং জোলাপ হিসেবে আর কাশি, হাঁপানি, কিডনির অসুখ এবং রক্তের চাপ প্রভৃতির প্রতিকারক হিসেবে এই ফলের ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এর থেকে একরকম রুটি তৈরি হয় কন্টো নামে এক সুস্বাদু পানীয়। কাপড় পরিষ্কার করার জন্য ক্ষার হিসেবে এর ব্যবহার দেখা যায় আফ্রিকায়। ভারতবর্ষেও রেশম শিল্পে, রেশম পরিষ্কারের জন্য ব্যালানিটিন ফল ব্যবহৃত হয়। রাজস্থান এবং গুজরাটের গ্রামাঞ্চলে বীজের শাঁস শুকিয়ে গুঁড়ো করে গর্ভবতী মায়েদের সুপ্রসবের জন্য খেতে দেওয়া হয়। বীজের তেলের মধ্যে সম্প্রতি পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে ব্যাকটীরিয়া প্রতিষেধক এবং ছত্রাক প্রতিষেধক, আর জন্য শ্বেতী এবং অনেক রকম চর্মরোগের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়ার ভাল সম্ভাবনা এতে আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইসব অসুখের জন্য প্রয়োগ করে সুফলও পাওয়া গেছে। নিদ্রাজনিত দুর্বলতা (স্লিপিং সিকনেস) আফ্রিকার একটি প্রচলিত ভয়নক রোগ যার উপশম ঘটায় এই ফলের বীজের তেল।

সমস্ত উদ্ভিদেরই কোন-না-কোন ভেষজ গুণ আছে—এ সত্য হয়ত একদিন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সত্যিই প্রমাণিত হবে, আর এটা প্রমাণের জন্য আমরা যতটা এগিয়ে যাব, ততটাই বোধহয় আমরা শক্তিমান হব প্রকৃতির দেওয়া নানা অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, যে অভিশাপ প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে তাঁর নানা আশীর্বাদের সঙ্গে মিশিয়ে।

প্রদর্শনী

৮ তারিখ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত মনোজ দত্তের ড্রয়িং এবং অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত ছিলো আকাদামি অব ফাইন আর্টস-এর দক্ষিণ গ্যালারিতে। প্রেম, মৃত্যু, শবদেহ, যৌবন, শিল্পী—এসব বিষয় শিল্পীদের কেন ভালো লাগে বোঝা যায়, শিল্পীদের হয়তো মনে হয় যে, বিষয়ের একটা আলাদা নাটকীয় ঝাঁজ আছে। এবং, দূর থেকে, একমত হওয় । সম্ভব যে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু শিল্পীরা প্রেম, মৃত্যু বা শবদেহ বা যৌবন আঁকেন না, ছবিই আঁকেন। প্রেম, মৃত্যু বা শবদেহ, আঁকা সম্ভবও নয়। ছবি আঁকার সূত্রে এইসব অবলম্বন

আসে। এমন কথার অবতারণা এই কারণেই যে নির্বাচিত অবলম্বনের বিষয়েই যদি শিল্পীর মূল্যবোধ কিঞ্চিৎ বেশি হয়, তাহলে, দর্শকদের দিক থেকে ক্যাচ লুফে নেওয়ার অনুভূতি আসতেই পারে, যা, শিল্পীদ্বয়ের নানা ছবি দেখাকালীন এসেছিলো। শিল্পী দুজনকে অগ্রাহ্য করার কথাই ওঠে না। মনোজ দত্তের মা ও শিশুর ছবিটি নিশ্চয়ই স্মরণীয়, অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকৃতিদৃশ্য স্তিাই আচ্ছন্ন করার মতো। যে দুটি ছবির কথা এইমাত্র বললাম—দেখবার সময় বোঝা যাচ্ছিল তাদের এ-ধরনের কোনো নাটকীয় ঝাঁঝ নেই বা থাকলেও শিল্পীরা সে-সম্পর্কে পাদ্যাত্মকভাবে অবহিত ছিলেন না। বর্ণিত শিল্পীকে যদি মদের বোতলের অনুষঙ্গ দিয়ে বোঝাতে হয়, তাহলে মুশকিল। কেননা, মদের বোতল জিনিসটা বর্ণিত ও অবর্ণিত শিল্পী ও অ-শিল্পী দু দলেরই কাছাকাছি ঘুরতে দেখা যায়। বরং বিরোধাভাসের সূত্রে, সুরাপান নিবারণে উৎসুকদের সম্পর্কে কোনো কার্টুন—এই অনুষঙ্গটির একমাত্র ব্যবহার চলতে পারে। অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় এই সূত্র মানেননি, সুতরাং ওই দুজনে আমাদের স্নায়ুপীড়া ঘটলো—প্রায়ই বাংলা চলচ্চিত্রে যে-ধরনের অস্বস্তি বা স্নায়ুপীড়া হয়ে থাকে। আগেই বলেছি, তাঁদের এমন নির্বাচিতছবির সংখ্যা বেশি হলেও, সে-কটি শিল্পবস্তু অবিচলিত, সেখান থেকেই তাঁদের নিপুণতা বোঝা যায়।

শুভাপ্রসন্ন

ম্যাক্সমুলার ভবনে যাওয়া একটু শক্ত—বেশি বাস পাওয়া যায় না। আমার বেশ কষ্টই হয়েছিল পৌঁছোতে। গিয়ে অবশ্য বুঝতে পারলাম যে, এই নভেম্বরে কলকাতার চিত্রশিল্পের মূল আকর্ষণীয়তার কাছে এসে পড়েছি।

আমি প্রথমে বাঁদিকে যাই, কাজেই তেরো নম্বর ছবিটি (চাইল্ডিশ) প্রথমে দেখি। মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক তরুণ কিশোর লাল ঘুড়ি উড়িয়ে দিচ্ছে ঘনান্ধকারের দিকে, তার দু-হাতের মোচড়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালোর জন্যে ঘনসবুজ রং—তারই চলমান চালচিত্রের জন্যে। লাল যে ঘুড়িটি হাতে ধরা বলে লাল, আর একটি ঘুড়ি উড়ে গেছে, সেই উড্ডীয়মানটি ঘনসবুজ-ই।

এখন আমার প্রত্যেকটি ছবির কথা-ই খুঁটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তা সম্ভব নয় বলে, কয়েকটি ছবির কথা বলছি। উপস্থিত আর একজন দর্শক আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর সাত নম্বর ছবিটির দিকে। বহু গবাক্ষবিশিষ্ট একটি উইটিপি বা উঁচু-ওঠা অট্টালিকা—এর বর্ণব্যবহার সরাসরি ইন্দ্রিয়কে যোগাযোগ করে—শুধুমাত্র সৌন্দর্যের আবেদন রাখে না। যে দর্শকের কথা বলছি, ইনি অনন্য ছবি দেখেনই বেশ কাছে গিয়ে, অনেক বেশি ইন্দ্রিয়সচেতন তার অনুভূতি। উনি আর একটি ছবি

শিল্পী : শুভাপ্রসন্ন
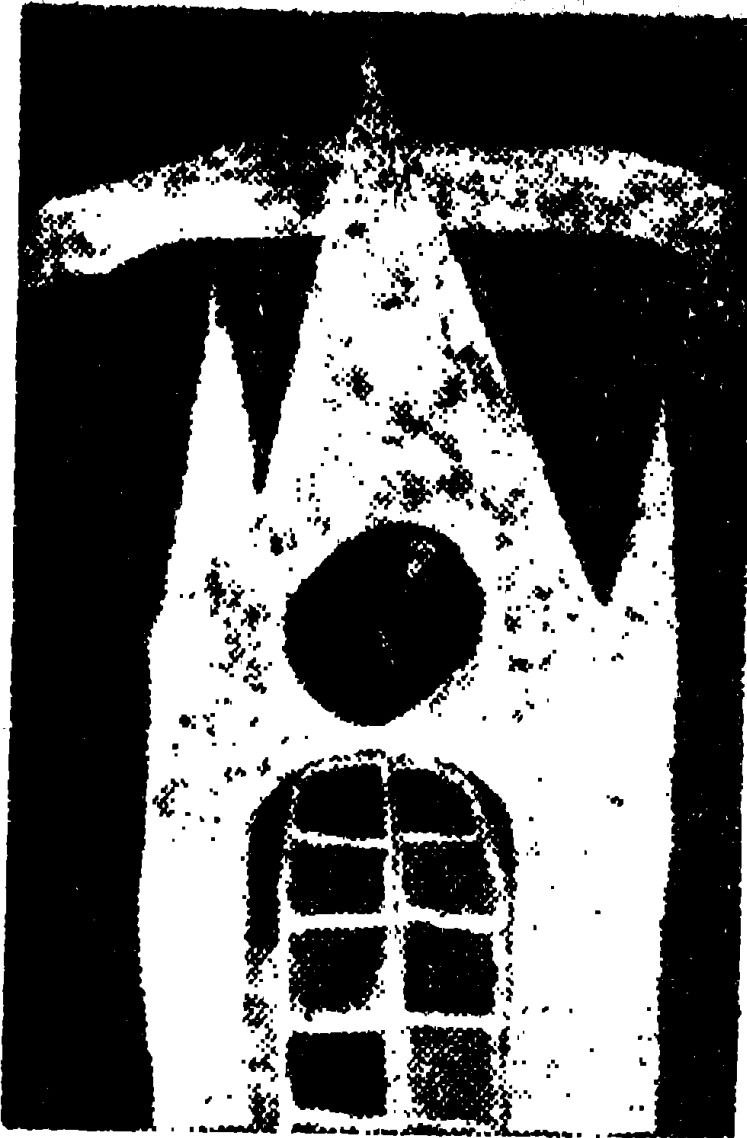
দেখালেন। সেটির নাম রাখা হয়েছে মারা বা ইলিউশন। মানুষ-মাথার ঊর্ধ্বে ও পাশের দূর তেঁতুল রং অন্ধকারে শাদা ও সবুজের গিরবুনোনে গড়া প্রজাপতি ও ফুলের মিশ্রণগত আকারবিপর্যাসের দিকে দুটি শৈল হাত—দুটি আর্তিময় হাত উঠে গেছে। লোকটির গলা হাস্যকর রকমে শীর্ণ এ সেই কারণেই সাবলাইম। ছবিটিও। এই ছবিটির যে শাদা লেগেছে ঐ গিরবুনোনে—সেটি বেশি আকর্ষণ করেছে আমার ঐ সঙ্গীকে।

দুটি ড্রয়িং-এর মধ্যে আমার পক্ষপাত ঘটানো তেইশ নম্বর ছবিটির বিষয়ে। ঊর্ধ্বের দিকে ক্রমস্ফীয়মান কিন্তু পদার মতো দুলছে এমন অভ্যাসে রাখা একটি ভুতুড়ে অট্টালিকা, কাঁপা মই চলে যাচ্ছে তার উপর দিয়ে। পিছনে কালোকুটোর তৈরি আয়তক্ষেত্র, অট্টালিকার ছায়া। তুলনায়, সময় নাম্নী আলেখ্যটির (২৪নং) পাখিটি যদিও নানা ধরনের পাখির আদলের সংমিশ্রণে একটি স্ফিংকসচোখ রোগা চিল, ছবিটির শাদা অংশটিকে অধুনা প্রকাশিত পেঙ্গুইন-বইয়ের শাদা-কালো কভারের মতো একটু বেশি প্ল্যাকার্ড লাগছিল।

দশ নম্বর ছবিটি দেখে শিউরে উঠলাম। যে-কোনো অসফল হোমিওপ্যাথের ডিস্পেনসারির জানালা—বা মাত্র করণিকদের ঘরের জানালা। এবং, এমন একটি জানালার রঙ-রেখার রিপোর্ট দেওয়াটা চিত্রীর ইচ্ছেয় ছিলো না, অথচ ছবিটাকে এমন দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ছবিটা দেখার পর ঐ ধরনের জানালা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে, মনে হয়, যখন ঐ দৃশ্য প্রদর্শনীর বাইরে আমরা দেখি, তখনি আর বাস্তবতা বুঝতে পারি না কেন। নয় নম্বর ছবিটির নাম বেদুন ও ঘর। এখানে জানালা দেওয়া বাড়ি হয়ে যায় পকেটওলা জামা ও প্যান্ট-পায়া কোনো পুরুষের [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

বেলুনের ভিতরকার মাছ ও শাঁস বিন্দুর মাংসহীন মাছ—এই ছবিতে কবিতা আছে। তিন নম্বর ছবিতে আমরা প্রথমেই দেখি ধূসর, পাটল ও মলিন হলুদ রঙের প্রাচীরগাত্র। যা সীমারেখা, যা জ্যামিতিক পরিকল্পনা। জানালার সৌজন্যে অথবা ঘন মেঘের কারণে আকাশের অতি প্রগাঢ় নীলের জন্যেই হোক, হু-হু করে আছড়ে পড়ছে শূন্যতা। দুই নম্বর ছবি, শুভাপ্রসন্নের ব্যালকনির সম্পর্কে একমাত্র বক্তব্য এই যে, উৎসাহীজন মাত্রেরই এই ছবি দেখা উচিত। অন্তত পরিবেশ ছবিকে কোথায় নিয়ে যায় তা দেখার জন্যেও। ছবিটি অবর্ণনীয়।

একসঙ্গে এতো ভালো ছবি দেখে হাঁফ ধরে যায়। সমস্ত ছবিতেই দুঃখ পাওয়া, ভয় পাওয়া, রোগে স্তব্ধ হয়ে থাকা ঔপনিবেশিকতাময় দেশের বাচ্চাবেলার ক্ষত লেগে আছে, কল্পনা-ও। সেই কারণে, সবাইকেই এই চব্বিশটি ছবি একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

মুষ্টিযুদ্ধের 'স্যার'

অজয় বসু

ফুটবল, ক্রিকেটের মত লোকপ্রিয় খেলার সঙ্গে নয়, পি এল রায় আজীবন জড়িয়েছিলেন মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে। যে-কোন কারণেই হোক, মুষ্টিযুদ্ধ আমাদের দেশে তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তাই বোধহয় পি এল রায়ের নাম ও পরিচয় সর্বজনের নয়। তবে এই নামটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে এদেশীয় মুষ্টিযুদ্ধের জনক হিসেবে। শিষ্য, প্রশিক্ষক, আত্মীয়-বন্ধু এবং বক্সিংপ্রেমীদের রেখে জনক পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেছেন গত ৩০ ডিসেম্বর। পি এল রায়ের জন্ম ১৮৯৮ সালের ২০ ডিসেম্বর।

পি এল রায়ের আগে আমাদের দেশে আর কেউ যে বক্সিং লড়েনি তা নয়। ইংরাজ আমলে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আরও পাঁচ রকম খেলার মত বক্সিং সম্পর্কেও দেশীয় তরুণদের অনেকে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। দু-চারজন তেজী বাঙালী হাতে তুলে নিয়েছিলেন বক্সিং গ্লাভস। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস ছিল বিক্ষিপ্ত। পি এল রায়ই শিক্ষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় জনসমক্ষে মুষ্টিযুদ্ধ প্রসারের পথ নির্দেশিত করে দেন। আমাদের দেশে সুসংগঠিত বা অর্গানাইজড বক্সিংয়ের তিনিই পথিকৃৎ। তাই তিনি মুষ্টিযুদ্ধের মূল-প্রবর্তক অথবা জনক।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলন্ড থেকে স্বদেশে ফিরেই কলকাতায় তিনি মুষ্টিযুদ্ধের একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দের মধ্যে কেউ কেউ উত্তরকালে বাংলা তথা ভারতের চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

ক্লাবের শুরু ওই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মারফৎ। ক্রমে ক্লাবের পরিধি বাড়তে থাকায় পি এল রায় সমমনোভাব সম্পন্ন কয়েকজন উৎসাহীদের সঙ্গে নিয়ে ১৯২৮ সালে বেঙ্গল অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করে নিজেই এই সংস্থার কর্মসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কর্মসচিব পি এল রায়ের আমলে একদিকে যেমন প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হোত, অন্যদিকে তেমনি মুষ্টিযুদ্ধের আকর্ষণীয় আসর বসাবার প্রয়াস নেওয়া হোত। এই চেষ্টার সূত্রে সেকালে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ, সিভিল বনাম মিলিটারি, রেলওয়ে বনাম আর্মি ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশের দশক থেকে শেষ সত্তরের দশক, অর্থাৎ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছেলেদের বক্সিং লড়তে শিখিয়ে গেছেন বলে প্রশিক্ষক পি এল রায়ের পরিচয় হয়ত অনেকের কাছে বড় বলে মনে হয়েছে। তবে বয়সকালে মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবেও তিনি মোটেই নগণ্য ছিলেন না।

ছাত্রাবস্থায় তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের প্যাবলিক স্কুল চ্যাম্পিয়ন। কেমব্রিজে পড়ার সময় ছাত্রমহলে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন। ১৯১১ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বক্সিং ব্লু পান। ইংলণ্ডে অপেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা মহলে তাঁর খ্যাতি এমনই ছিল যে, তাঁর সঙ্গে কারুর লড়াই স্থির হলে দর্শকদের এই নিয়ে বাজি ধরা হোত যে, রায় কতোক্ষণে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নক আউট করে দেবেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আন্তঃ সেনাবাহিনী মুষ্টিযুদ্ধে পি এল রায় বৃটিশ আর্মির প্রতিনিধিত্ব করে নিজের বিভাগে জয়লাভ করেছিলেন। পি এল রায় মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম পাঠ নেন কেমব্রিজেই প্রশিক্ষক বিলি চাইলডসের কাছে। পরে তাঁর সহজাত দক্ষতা উপলব্ধি করে ফেদারওয়েটে তদানীন্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন জিম ড্রিসকল স্বেচ্ছায় পি এল রায়ের শিক্ষাভার গ্রহণে এগিয়ে আসেন। সহজাত দক্ষতা থাকলেও, পি এল রায় বিশ্বাসী ছিলেন নিয়মিত অনুশীলন ও পরিশ্রম সাপেক্ষ টেকনিকে। গুরুগিরি করার কালেও তিনি শিক্ষার্থীদের অনুশীলন ও মেহনতে আত্মস্থ হতে পরামর্শ দিতেন।

অধ্যয়ন সেরে ইংলণ্ড থেকে দেশে যখন ফেরেন, তখন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার বয়স বা মেজাজ কিছুই ছিল না। তবু হঠাৎ বাধ্য হয়ে এক লড়াইয়ে যোগ দিতেই দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে স্বদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে যায়।

অতর্কিত সেই ঘটনা ঘটে ওল্ড এম্পায়ার থিয়েটার হলে আয়োজিত এক প্রদর্শনী মুষ্টিযুদ্ধ উপলক্ষে। প্রদর্শনী মুষ্টিযুদ্ধ লড়ছেন পেশাদার চ্যাম্পিয়ন, ইউরোপীয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও গোরারা। পি এল রায় সেই অনুষ্ঠানের এক দর্শক।

পি এল রায়

হঠাৎ এক বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষ থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া হতে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে পি এল রায় ছদ্মনাম ধরে রিংয়ে নামেন এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নক আউট করে দেন। সেই থেকেই স্বদেশে মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে পি এল রায়ের প্রসিদ্ধি।

ইংলণ্ড থেকে দেশে ফেরার পরে পি এল রায় নিজে বিশেষ লড়েননি, ব্যস্ত ছিলেন গড়ার কাজে—ছেলেদের হাত ধরে শিখিয়ে মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে মানুষ করে তোলার কাজে। তবু এরই ফাঁকে তিনি প্রতিযোগী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন দু-চারটি লড়াই-এ। তার মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর সঙ্গে অস্ট্রেলীয় চ্যাম্পিয়ন জো আলড্রিজের দশ রাউণ্ডব্যাপী এবং ব্যাণ্টামওয়েটে ভারতীয় চ্যাম্পিয়ান এডগার ব্রাইটের লড়াই। রায় বনাম ব্রাইটের লড়াই হয়েছিল পনেরো রাউণ্ড ধরে। স্বল্প পয়েন্টের ব্যবধানে পি এল রায় হেরে গেলেও, লড়িয়ে রায়ের বক্সিং রীতি দেখে সন্তুষ্ট দর্শককুল সেই সন্ধ্যায় পরাজিত নায়ককে নিয়ে কম নাচানাচি করেননি। শেষ বিশের দশকে ব্রাইট বনাম পি এল রায়ের মুষ্টিযুদ্ধে টিকিট বিক্রি বাবদ অর্থ সংগৃহীত অন্যূন সাত হাজার টাকা। রিং-সাইড টিকিটের দাম ধার্য হয়েছিল কুড়ি টাকা।

লাখুটিয়ার (বর্তমানে বাংলাদেশে) জমিদার বংশের সন্তান পরেশলাল রায় কেমব্রিজ অর্থনীতিতে এম-এ ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে রেলে উচ্চপদস্থ অফিসারের চাকুরি নেন। খেলাধুলায় সুদ্ধ বনামর অনেক বাঙালীর রেলে চাকুরির ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। বক্সিং ছাড়া স্যুটিংয়েও তাঁর পাকা হাত ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। যেহেতু দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ তিনি কাটিয়েছেন সঙ্গীণ উঁচিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছিলেন সাধারণ সেনানী। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেনাবাহিনীর এক মেজর। দুটি যুদ্ধেই তাঁর স্থান ছিল বাহিনীর অগ্রবর্তী দলে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের এক রণাঙ্গনে তাঁর প্রাণরক্ষা পেয়েছিল ভাগ্যক্রমে। শত্রুর গুলী তাঁর বুক ছুঁলেও ভেদ করতে পারেনি। বুকপকেটে রাখা শক্ত ধাতুতে গড়া এক মূল্যবান পকেট-ঘড়িতে লেগে অব্যর্থ গুলী ঠিকরে অন্যত্র চলে যেতে পি এল রায় সেবারের মত প্রাণে বেঁচে যান। জীবনদাতা পকেটঘড়িটি তাই তাঁর কাছে পরম প্রিয়। উত্তরকালে কখনওই তা কাছছাড়া করতেন না।

মুষ্টিযুদ্ধ ঘিরে দুটি ভিন্ন ধারার মত প্রচলিত আছে। একদল বলেন যে, মুষ্টিযুদ্ধ কোনও খেলাই নয় অথবা খেলা যদি বা হয়, তাহলেও মারাত্মক খেলা। কারণ, প্রতিযোগীদের লক্ষ্য অপরকে আঘাত করা। ঘে-আঘাতের পরিণাম মারাত্মকও হতে পারে। অপর পক্ষের অভিমত, বক্সিং হল এক নোবল স্পোর্টস। পি এল রায় ছিলেন শেষোক্ত দলে। আজীবন তিনি মুষ্টিযুদ্ধের সেবাই করে গেছেন। বক্সিংয়ে পিতৃস্নেহে আগলে রাখতে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা, বেশি বয়সের শত্রুতা, কোনও কিছুই তিনি আমলে আনেননি। বক্সিংয়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং এই অনুষ্ঠানের কল্যাণে তাঁর সক্রিয় উদ্যমের পরিচয় যাঁরা কাছ থেকে পেয়েছেন, তাঁরাই তাঁর আন্তরিকতায় বুঝি বিস্ময়বোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর বক্সিং-প্রীতি লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল না। ছিল নিখাদ সোনার মত সাচ্চা। এবং তা ছিল বলেই মুষ্টিযুদ্ধ মহলের সকলেরই কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন এক চরিত্র। ওই মহলে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। কিন্তু সব মতবিরোধের ঊর্ধ্বে শত্রু-মিত্র সবাই যাঁকে ঠাঁই দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের স্যার—ওরেফ পি এল রায়।

মন্ কা অঙ্গন

মন কা অঙ্গান মালয়ালম ছবি, হিন্দীতে ডাব করা। বলে রাখা ভাল এই ছবির ডাবিং যথেষ্ট খারাপ। প্রায় কোন সময়েই লিপ মেলে নি। দক্ষিণ ভারতীয় ছবি ডাব করা অবস্থায় বিশেষ দেখা যায় না বলেই এই ছবিটি সম্পর্কে কৌতূহল ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত ছবিটি দেখে যাওয়ার কষ্ট স্বীকারটি করতে হয়েছে। তবে দর্শকদের ভুল বোঝার কোন কারণ নেই। দক্ষিণ ভারতে অনেক ভাল ছবি হয়। ‘সংস্কারা’ বা ‘ঘটশ্রাদ্ধে’র মতো অবাক করে দেওয়া ছবি দক্ষিণ ভারতেই তৈরী।

মন কা অঙ্গানে রঙের ব্যবহার অনেকটা সেই রং-কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের মতো :

‘যেখানেই রং দেখছেন, সেখানেই আমরা আছি।’

যথা, সবুজ মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কমলা পোশাক পরা নায়িকা। বিকট সংমিশ্রণের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু অমন অদ্ভুত সবুজ মাঠ পৃথিবীতে কোথায়? বা যে ধরনের নীল

আকাশ ছবিতে দেখানো হয়েছে সে রকম নীল? বা অমন রঙিন সূর্য? বা ঐ বাদামী রঙের গাছ? প্রকৃতিতে রং বদলায় জানি, কিন্তু এতটা জানা ছিল না! তাছাড়া দক্ষিণ ভারতে লোকজনের গায়ের রং টকটকে লাল হয়—কখনো শুনিনি তো! দ্বিতীয়ত, পরিচালক অাই ভি শশীর মনে রাখা উচিত ছিল, ছবিটি ঠিক কোন গল্পের ভিত্তিতে তৈরী হচ্ছে। ছবির মাঝামাঝি দর্শকদের সন্দেহ হতেই পারে যে পরিচালক ছবিটি কিভাবে শুরু হয়েছিল তা ভুলে গেছেন। কারণ ছবিতে লাইনের উপর দিয়ে গড়গড়িয়ে এক-একটি ওয়াগন চলে গেছে যেন—পুরুষত্বহীনতা, ত্রিকোণ প্রেম, সন্তানবতী নারীর কামনা ইত্যাদি। একাধিক সমস্যার মুস্কিল হল ব্যবহার পদ্ধতিটি জানা না থাকলে শেষের দিকে সবকিছু ঠিকঠাক সময়মত থাকে না। এখানেও তাই হয়েছে। অবশ্য এই ছবির প্রতীকগুলি ভারি জ্ঞানগর্ভ। সব ক'টিই নিশ্চয়ই যৌন প্রতীক, কারণ যৌনপ্রধান দৃশ্যগুলোর মধ্যে এগুলো ঢোকানো ছিল। তবে প্রতীকগুলি বেশ নতুন ধরনের—শান দেবার যন্ত্র, ট্র্যাকটর, ক্ষেতে জল দেবার চাকা। আজ যদি তিনি থাকতেন! এখানে 'তিনি' বলতে ফ্রয়েড সাহেব আর কি। অতএব, অবশিষ্ট থাকেন নায়িকা জয়া ভারতী। অন্য সময় তিনি উদাস চোখে গাছ, আকাশ এইসব দেখেন যা দেখতে ভালই লাগে। কিন্তু অভিনয় করতে গেলেই কেন যে চোখ পাকিয়ে ওভাবে তাকান। এটা সিনেমা তো, পর্দায় অত বড় চোখ ওরকম মারাত্মকভাবে তাকিয়ে থাকলে একটু ভয় ভয় করেই।

শুভেন্দু গুপ্ত

বাংলা ছবির ষাট বছর

বাংলা ছবি গত বছর ৮ নভেম্বর ষাট বছর পূর্ণ করেছে। সময়ের হিসাবে ষাট বছর হয়ত এমন কিছু সময় ন। কিন্তু ইতিহাস, যদি তা কোন [illegible] ইতিহাস হয়, তাহলে ষাটটা বছর একবারে অবহেলা অবশ্যই পেতে পারে না।

১৯১৯ সালের ৮ নভেম্বর তৎকালীন কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে (এখন যার নাম শ্রী) ম্যাডান থিয়েটারের ছবি বিল্বমঙ্গল মুক্তি পেয়েছিল। পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ ব্যানার্জি, তার আগে ছোট ছোট ছবি অনেক হলেও, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র সেই প্রথম। ছবি তখন কথা বলতেও শেখেনি। শিল্পীরা হাত-পা-মুখ নেড়ে কথা বলেছেন অথচ একটি শব্দও কানে আসেনি দর্শকদের।

বাংলা ছবির এই বোবামিও কম দিন চলেনি। পাকা বারো বছর বাদে ১৯৩১ সালে কথা বলল ছবি! পর্দার শিল্পীরা সরব হলেন। যদিও আজকের দিনে অনেকের মতে নির্বাক ছবিই ছিল শিল্প সৃষ্টির আসল সুফলা ভূমি, কিন্তু মুখে কথা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র অন্য রূপ পেল দেশে দেশে।

বাংলা ছবিও পিছিয়ে ছিল না। প্রথম কয়েকটা বছর ঐতিহাসিক, ধর্মমূলক কাহিনীর আঁচলে আঁচলে ঘুরে একদিন বালক হল। প্রমথেশ বড়ুয়া, ডি জি, নীতিন বসু, দেবকী বসু, মধু বসু, বিমল রায় প্রমুখের স্নেহে ভালোবাসায় বাড়তে লাগল বাংলা ছবি। শুধু মুখে কথা নয়, বুকের মধ্যেও ভাষা অংকুরিত হল এক সময়।

সত্যজিৎ রায় সেই অংকুরিত ভাষাকে জীবনই দিলেন না। ফলে-ফুলে বাহারি করে সাজিয়ে তুললেন তিনি। পথের পাঁচালীর পরবর্তী ইতিহাস বাংলা ছবির সুবর্ণযুগ বললেও কম বলা হয় বুঝি। এই সত্যজিৎ রায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বাংলা ছবি দাঁড়াতে শিখল, হাঁটতে শিখল, এমনকি দৌড়তেও শুরু করেছিল। সবাইকে পিছনে ফেলে অনেক দূর অব্দি এগিয়েছিল বাংলা ছবি।

প্রমাণ?

জাতীয় পুরস্কারের সিংহভাগটাই এখনও বাংলা ছবির কব্জায়। গত ছাব্বিশ বছরের ইতিহাসে বারোবার বাংলা ছবি পেয়েছে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, বহু—বহু—বহুবার জিতে এনেছে সেরা পরিচালক ও কলাকুশলীদের পুরস্কার। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে দশ বছর এর মধ্যে পাঁচবারই পেয়েছে এই কলকাতার চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব।

আর আন্তর্জাতিক পুরস্কারের কথা তো না উল্লেখ করাই ভালো। একমাত্র বাংলা ছবি এপর্যন্ত যতগুলি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছে—সব আঞ্চলিক ভাষার ছবির পাওয়া পুরস্কারের যোগফলও তার কাছাকাছি বুঝি আসবে না। অবশ্য কলকাতার এই সোনার সাফল্যের সিংহভাগ সত্যজিৎ রায়ের দখলে।

এই সত্যজিৎ রায়কে ঘিরেই এক সময় কয়েকজন উদ্যমী, বুদ্ধিমান, শিল্পবোধসম্পন্ন পরিচালক এসেছিলেন টালিগঞ্জে। এখনও তাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই টিঁকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে ছবিতে অনেকে সময়ই ধার কমে যাচ্ছে। শুরুর সেই উজ্জ্বলতা আর তেমন করে চোখ ধাঁধাতে পারছে না। একমাত্র যিনি পারতেন, তিনি এখন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এবং ষাট বছর পরেও দুর্ভাগ্যের কথা—একটি উদ্যমী পরিচালকের দল তৈরি হল না এই টালিগঞ্জে। যাঁরা সত্যজিৎ পরবর্তী বাংলা ছবিকে নতুনতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন, কিংবা শিল্পরূপ সন্ধানে নতুন পথের সন্ধানী হতে পারেন।

অথচ এমনটি তো ছিল না। নির্বাক কি সবাক ছবির আদি যুগ—দু-যুগেই এই টালিগঞ্জে প্রতিভার ঘাটতি হয়নি। পরীক্ষার পাশাপাশি ব্যবসায়েও খ্যাতি পেয়েছিল বাংলা ছবি। এক সময় ম্যাডান ও নিউ থিয়েটার্সের ছবি চলত সারা ভারতে। সুনামও কুড়োত।

আর এখন? এই সত্তর দশকের শেষ পাদে টালিগঞ্জের অবস্থা বুঝি সেই শুরুর সময়ের চাইতেও খারাপ। সত্যজিৎ রায় এখনও কাজ করছেন, [illegible] জেন্টস নীরব, কেউ বেঁচেবর্তে আছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম মৃণাল সেন। তিনি এখন বাংলা ছবির প্রগতিশীল ঝাণ্ডাটি উঁচুতে তুলে এগোচ্ছেন।

বাকি সবাই গুটি গুটি পায়ে পেছনের দিকে হাঁটছেন। দেশে-বিদেশে সিনেমা যখন নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, নিজস্বতা নিয়ে স্বাধিকারে দাবি জানাচ্ছে, ঠিক তখনই বাংলা ছবি আবার আঁচল ধরছে ধর্মকাহিনীর, ভক্তিরচনার। সঙ্গে তুলে নিয়েছি তিরিশ দশকের পোষাক—নিটোল বায়োস্কোপিক গল্প বলার ফর্ম। চরিত্র হারাচ্ছে বাঙলা ছবি।

তাই আজকের দর্শক সমালোচক সকলেরই মুখে প্রশ্ন—বাংলা ছবি এই শৈল্পিক মুমূর্ষু অবস্থা আর কতদিন চলবে? ষাট বছরের বৃদ্ধ বাংলা ছবি আর কতকাল শিশুসুলভ আচরণ করবে?

নিম অন্নপূর্ণা ছবিতে মণিদীপা রায়

কোরাস রেপার্টরি থিয়েটার

বাংলা থিয়েটার যে অংশে সচল গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে, সে অংশটি নিজেদের সংজ্ঞা হিসেবে নানান শব্দ ব্যবহার করেছে আজ পর্যন্ত। 'গণনাট্য' আন্দোলন থেকে 'নবনাট্য' চলে আসা, 'গ্রুপ থিয়েটার' 'অন্য থিয়েটার', 'সৎ থিয়েটার' জাতীয় বিভিন্ন নামে আশ্রয় খোঁজা তার ইতিহাসে তাত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এসেছে। কিন্তু এই থিয়েটার আন্দোলনে কোনো দলই নিজেকে পেশাদারী বলে ঘোষণা করেননি। এই দ্বিধার প্রধান কারণ আমাদের একশ বছরের ব্যবসায়িক থিয়েটারের চরিত্রের প্রতি সঙ্গত অনাস্থা এবং 'ব্যবসায়িক' ও 'পেশাদারী' শব্দ দুটিকে অনাবশ্যক গুলিয়ে ফেলা। নচেৎ কার্যত অনেক দল এবং দলপ্রধান পেশাদারী ভিত্তিতেই কাজ করে গেছেন এই থিয়েটারেও। নিজেদের 'পেশাদারী' বলতে না চাওয়ার আর একটা কারণ অবশ্য হতে পারে 'পেশাদারী' দক্ষতা অর্জন করতে না পারা, যা এই থিয়েটারের দুঃখজনক সীমাবদ্ধতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। আজকে যখন আমাদের গ্রুপ থিয়েটারগুলি এক ফেডারেশনের অঙ্গীকারভুক্ত হয়েছে, তখন দাবী-

গ্রামোফোন কোম্পানীর অভিনন্দন সন্ধ্যায় সন্ধ্যা মুখার্জি, সুচিত্রা মিত্র, ভূপেন হাজারিকা, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

দাওয়ার লড়াই-এর ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা নিজেদের আরও শিক্ষিত ও নিপুণ করে নেওয়ার সুযোগও পাবেন আশা করি।

সম্প্রতি গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ইনফরেন্স 'কোরাস রেপার্টরি থিয়েটারকে' কলকাতায় আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তাঁদের 'চ্যেক ল্যাংমিডং' নাটকটি দেখানোর জন্য। বাংলা থিয়েটার-এর সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের থিয়েটারের যোগাযোগের পথে এটি তাঁদের প্রথম প্রয়াস। 'কোরাস রেপার্টরি থিয়েটারে'র বয়স বেশি নয়। ১৯৭৬-এর এপ্রিলে তাঁদের জন্ম। তবে এরই মধ্যে তাদের প্রযোজনার সংখ্যা বারো তেরোটিরও বেশি এবং তাঁদের তরুণ পরিচালক রতনকুমার থিয়াম মণিপুরী থিয়েটারে এখনই একটি অতি-পরিচিত নাম। দিল্লির 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা'র কৃতী ছাত্ররা যেকালে অনেকেই বেশি সুযোগ সুবিধার জন্যে আটকে যান, সেই সময় রতনকুমার তাঁর নিজের মাটিতে কাজ করতে চাইছেন, মণিপুরের লোকসংস্কৃতি এবং ধ্রুপদী নাট্যরীতির সংমিশ্রণে রূপায়িত করতে চাইছেন বর্তমান সমাজের সমস্যার বিবিধ প্রশ্ন। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা, থিয়েটারে এই কাজ তিনি করতে চাইছেন সম্পূর্ণ পেশাদারী ভিত্তিতে, তাঁর নৈপুণ্য অর্জন করে নেওয়ার আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে। 'কোরাস রেপার্টরি থিয়েটার' তাই নিজেদের পরিচয়ের গোড়াতেই বলে আমরা পেশাদারী দল।

অবশ্য নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তেমন কোনো অভিনবত্ব ছিলো না। সংস্কারের অত্যাচারে জর্জরিত 'চাওবি' একদিন 'ল্যাংমিডং' প্রীতিতে [illegible] হয়ে যায়। কিন্তু মানুষী সঙ্গস্পৃহা তাকে আবার টেনে আনে বিধবা 'শেকপিঙথাম্বি'র কাছে। কিন্তু 'শেকপিঙথাম্বি'র সঙ্গে 'লুয়াংলাবা'র বিয়ের পরেই আবার গোল বাধে। 'লুয়াংলাবা' যেতে চায় সামাজিকতায় ফিরে। আর 'শেকপিঙথাম্বি'র মন টানে 'চাওবি'র নিঃসঙ্গতার দিকে। এই বিরোধ শেষপর্যন্ত এতো তীব্র হয়ে ওঠে যে 'লুয়াং লাবা' হত্যা করে নিজের সন্তানকে। স্বামী-স্ত্রীর ভিতরের অবিচ্ছেদ্য সূত্র সন্তানকে বিনষ্ট করে এই সম্পর্কের ইতি টানা যায় কিনা এমন এক অমীমাংসিত প্রশ্নের উপর ঝুলে থাকে নাটকের শেষ। একদল ল্যাংমিডং পাখি কেবল সব দেখে যায় আর থেকে থেকে মন্তব্য করে মানুষের অবস্থা, তার শূন্যতা আর নিষ্ঠুরতা এবং অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে বেড়ানোর হতাশ ইচ্ছার উদ্দেশে।

নাটকটি অভিনয়ের সময় জোর দেওয়া হয়েছে এর অনাড়ম্বর আঙ্গিকের উপর। অপরিচিত ভাষার অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে গেছে শরীরের ভাষার গুণে। লোকসংস্কৃতির নাচ গান বাজনা থেকে যে চেনা ছন্দ উঠে আসে তার সঙ্গে মানুষের শিকড়ের যোগ, মুখের ভাষার অন্তরায়ও সেখানে কেটে যায়। নাট্যনীতির উৎকর্ষসাধনে তাই লোক-রঙ্গের গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে বারবার। রতনকুমারের কোরাস রেপার্টরি সেদিক দিয়ে অনেকটাই সার্থক থিয়েটার। তবে 'চাওবা'র চরিত্রে শ্যামের মূকাভিনয় এবং 'মামা তোম্বির' ভূমিকায় 'তোম্বি দেবী'র স্বরক্ষেপণ আরও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। অবশ্য দময়ন্তী দেবী 'চাওবি', ইন্দিরা দেবীর 'শেকপিঙথাম্বি' এবং ইবেচাওবামীতেই-এর 'পাখি দলপতি' অত্যন্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতা। রতনকুমার সৃষ্ট সঙ্গীতও এই নাটকে গুরুদায়িত্ব পালন করেছে। পাখিদের করুণ গানের রেশ নাটক শেষ হওয়ার পরেও থেকে যায় বহু[illegible]ক্ষণ এবং কলকাতার দর্শক [illegible]ন পর্যন্ত ভুলতে পারে না [illegible] দৃশ্যের সেই দুরন্ত ঢাকের আওয়া[illegible] শুধু পাখিদের মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়ার [illegible]ীতিপালনকে যদি নাটকের সঙ্গে আর [illegible] মেশানো যেত স্বাভাবিকভাবে বা [illegible]ঙ্গা'এর লুয়াং লাবা যদি আর একটু কম ভরসা করতো লাফঝাঁপের উপর আর ল্যাংমিডং পাখিরা অনায়াস শারীরিক নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় যোগ করতে পারতো তাদের দলপতির মতো তাহলে রতনকুমারের দেয় সাধুবাদের পরিমাণ বেড়ে যেতো বহুগুণ। **সুরজিৎ ঘোষ**

অভিনন্দন সন্ধ্যা

রবীন্দ্রসদনে গ্রামোফোন কোম্পানী প্রযোজিত অভিনন্দন-সন্ধ্যা সম্প্রতিকালের অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের। এটি ছিল একটি উৎসব, যে উৎসবে কোম্পানীর তরফ থেকে সম্মান জানানো হল পাঁচজন শিল্পীকে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং বাংলা গানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁদের কালজয়ী অবদান রসিকচিত্তের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে। শিল্পীরা হলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও ভূপেন হাজারিকা।

অনুষ্ঠান পরিবেশনার কাব্যিক সৌন্দর্য প্রেক্ষাগৃহে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচনা করেছিল। এ কৃতিত্ব অনন্য পরিকল্পনার। সারা হল অন্ধকার। নেপথ্য থেকে সুবীর ঘোষের সুললিত কণ্ঠের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সামনের সারি থেকে শিল্পীরা উঠে গিয়ে মঞ্চগ্রহণ করলেন। সামনের দিকে ওপর থেকে তাপস সেনের পরিকল্পনায় নিক্ষিপ্ত আলোরেখার পথ ধরে অন্ধকারকে পিছনে রেখে ওঁরা যখন আলোক-পুষ্প উজ্জ্বল ও সুরভিত মঞ্চে উঠে আসন গ্রহণ করছিলেন মনে হচ্ছিল ওঁরা যেন অনেক সংগ্রামক্ষুব্ধ, বন্ধুর পথ পেরিয়ে আলো ঝলমল লক্ষ্যে পৌঁছলেন।

হেমন্ত, কণিকা, সুচিত্রা, ভূপেন হাজারিকা ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে তাঁদের সতীর্থ এবং উত্তরসূরী অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, সাগর সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা ও মনবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে মাল্যভূষিত করাবার আইডিয়াটিক চমৎকার। মান্না দে উপস্থিত ছিলেন না। পরের পর্যায়ে, গ্রামোফোন কোম্পানীর অধিকর্তা অনিল সুদ শিল্পীদের হাতে এক একটি গোল্ডেন ডিস্ক তুলে দিয়ে তাঁদের দীপ্ত শিল্পকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রত্যেকের দীর্ঘ এবং উজ্জ্বলতর সাফল্যমণ্ডিত শিল্পীজীবন কামনা করেন। এঁদের কণ্ঠের গান রেকর্ডের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার এবং বাংলা গানের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার গৌরব অর্জন করে গ্রামোফোন কোম্পানী প্রতিটি মানুষ নিজেদের ধন্য মনে করছেন বলে তিনি জানান।

অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান বিমান ঘোষ। পি কে ব্যানার্জি ও বিশ্বনাথ মুখার্জির ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠান শুরু। শেষের পর্যায়ে শিল্পীরা গানে গানে ভরে দিলেন শ্রোতাদের মন-প্রাণ। গেয়েছিলেন সেইসব গানই যে গানগুলি তাঁদের জনপ্রিয়তার রাজপথ রচনা করেছে। 'গানগুলি মোর শৈবালের দল', 'তুমি ত সেই যাবেই চলে', 'পূর্বাচলের পানে তাকাই' (সুচিত্রা),—'ওগো তুমি পঞ্চদশী', 'সখি আঁধারে (কণিকা)', কণিকা-সুচিত্রার যুগ্ম-কণ্ঠে 'আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা' দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর্ব শুরু।

হেমন্তবাবু 'মুছে যাওয়া দিনগুলি', 'আজ দুজনার', 'রবে থমকে গেলি কেন' আরো অনেক চেনা গান যেন বহুযুগের ওপারের স্বপ্ন বয়ে নিয়ে এল। এঁর পর মঞ্চে এলেন ভূপেন হাজারিকা, 'গঙ্গা থেকে গঙ্গা অবধি' মুখর-করা 'সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি', 'যাযাবর' এবং আরও অনেক গানের ডালি নিয়ে।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত দিলীপ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' [illegible] দেবীকৃত) গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তারপর 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' থেকে কি নয়?

পরিবেশনযোগ্য আর একটি সংবাদ হল এই যে প্রথম এঁদের অনুষ্ঠান থেকে তোলা গানের এল পি ডিস্ক এ্যালবাম প্রকাশিত হবে। এর আগে বোম্বেতে আশা-লতার রজতজয়ন্তী বর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ডিস্ক প্রকাশিত হয়েছে, লতা-কিশোরের সাগরপারের অনুষ্ঠানের এল-পিও। কিন্তু কলকাতার শিল্পীদের এ ধরনের অনুষ্ঠানের রেকর্ড এই প্রথম, আর জন্য কোম্পানী অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

সবই সুন্দর। তবু একটি প্রশ্ন থেকে যায়। উপরোক্ত শিল্পীদের যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি মনটা আরো বেশি খুশি হোতো যদি এঁদের সঙ্গে সর্বশ্রী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও উৎপলা সেনকেও দেখতাম। বাংলা গানে যাঁদের অবদান এবং জনপ্রিয়তা দীর্ঘকালের। অবশ্য যদি ব্যবসায়িক সাফল্য প্লাস জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে সম্বর্ধনা হয়ে থাকে অবশ্য আমাদের বলার কিছু নেই।

সন্তোষ [illegible]

যাদু প্রদর্শনী

সম্প্রতি কোন্নগর-নবগ্রামের সেবক-সংঘ মঞ্চে পরপর তিনদিন এক আকর্ষণীয় যাদু প্রদর্শনী হয়ে গেল। যাদু দেখালেন তরুণ যাদুকর যাদুরাজ উৎপলকুমার। তিন দিনই রীতিমত আকর্ষণীয় খেলা দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। প্রতিদিনই উৎপলকুমারের যাদু প্রদর্শনীর তালিকায় ছিল আকর্ষণীয় এবং দুঃসাহসিক খেলা। ম্যাজিক এবং জিমন্যাস্টিক মিলিয়ে তিনি ম্যাজিন্যাস্টিকের খেলা দেখিয়েছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। খেলাটি তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার বলে দাবি করেছেন যাদুরাজ উৎপলকুমার। এ ছাড়া রূপালী ছাতা, হুডিনি বাক্স, ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া, তাঁদের খেলা শ্রোতাদের মন কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছিল। জল দিয়ে গেলাস ভরে ধাতুলো ব্লেড গিলে ফেলার খেলাটিও দর্শকরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উপভোগ করেছেন। রীতিমত পরিচ্ছন্ন, আকর্ষণীয় এমন একটি যাদু প্রদর্শনী চালাবার জন্য যাদুরাজ উৎপলকুমারকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সেবক-সংঘের সভ্যদেরও—এমন একটি অনুষ্ঠানকে সুশৃংখল রাখার জন্য।

যাদুকর উৎপলকুমার

মূকাভিনয়ে নিরঞ্জন গোস্বামী

মূকাভিনয়
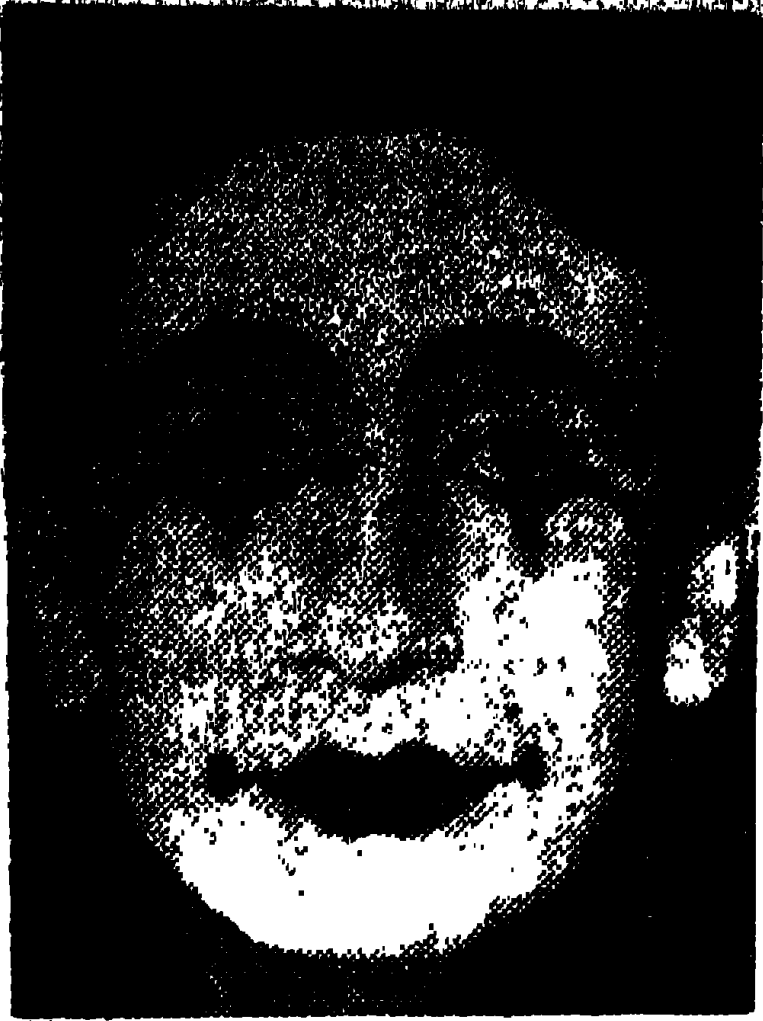
মূকাভিনয়ের মাধ্যমে যে শুধু হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করা হয় না, এটাও যে একটা অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম—একথা আজ প্রমাণিত ও স্বীকৃত। অথচ একনিষ্ঠ চর্চা ও যোগ্য শিল্পীর অভাবে, কিংবা এই শিল্পের প্রতি চরম উদাসীনতায় এই মাধ্যমটির তেমন প্রসার এখনো এদেশে ঘটে নি। আশার কথা, সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু কিছু উদ্যমী তরুণ এই মাধ্যমটি নিয়ে সিরিয়াসলি কিছু ভাবছেন, এ'দের একজন নিরঞ্জন গোস্বামী—যিনি নিজেকে মূকাভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রায় সমর্পণ করে দিয়েছেন। বিনামূল্যে মূকাভিনয় শিক্ষা দেবার জন্যে ইনি 'ইণ্ডিয়ান মাইম থিয়েটার' নামে গড়ে তুলেছেন একটি প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য—এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার।

সম্প্রতি নিরঞ্জনের একটি একক মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়ে গেল রবীন্দ্র সদনে। দিনটি ছিল আন্তর্জাতিক শিশু-বর্ষের শেষ দিন। তাই সুকুমার রায়ের লিমেরিকের নির্বাক মঞ্চায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথমাংশটি ছিল শিশুদের জন্যে নির্ধারিত। 'হারিয়ে পাওয়া' 'লড়াই ক্ষ্যাপা' 'খুড়োর কল' 'ছায়া বাজি'র মত লিমেরিকের নির্বাক মঞ্চায়ন যেন অভিনব পরিকল্পনা এবং পরিবেশনা। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ফীচারগুলির মূল ভাবনা সুকুমার রায়ের, তাই নিরঞ্জনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সুস্পষ্ট ছাপ তাতে পাওয়া যায় নি—যা পাওয়া গেছে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে। আর একটা কথা, প্রথমাংশের দু'-দুটি ফীচারের মধ্যবর্তী সময় কিন্তু বড্ড বেশী—ফলে ভাল লাগার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয়াংশের প্রথম পরিবেশনা ছিল, 'দ্য বয়।' অলিতে-গলিতে আমরা প্রায়ই শিক দিয়ে চাকা চালানো ছেলেদের দেখি। তাদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন নিরঞ্জন। পরক্ষণেই 'রোপ ওয়াকার।' তারপর বেলুন-ওয়ালা হয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। একটা ছেলে গ্যাস ভর্তি বেলুন কিনল, তারপর সে ঐ বেলুনটি নিয়ে যা খুশী তাই করতে লাগল। প্রচণ্ড কর্তৃত্ব তার ঐ বেলুনটির ওপর। এক সময় দেখি ঐ গ্যাস ভর্তি বেলুনটি তাকে ক্রমশঃ ওপরে, শূন্যে টেনে নিয়ে চলেছে। নিরঞ্জনের আশ্চর্য নৈপুণ্যতায় আমরা মহাশূন্যে বেলুনের সুতো ধরে একটি নিরুপায় ছেলেকে চোখের সামনে যেমন ঝুলতে দেখি, তেমনই কৌতুকের মাধ্যমে চরম সত্যিটি আমাদের প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে যায়। 'দ্য ম্যান এ্যান্ড হিজ ডগ' এবং 'মাদার এ্যান্ড চাইল্ড' ফীচার দুটি একেবারে বাস্তব চিত্র, কিন্তু কিছু কিছু মোটা দাগের ব্যাপার এ দুটিতে ছিল। হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে মানুষকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে নিরঞ্জন সচেষ্ট ছিলেন ঠিকই, কিন্তু আলো এবং ধ্বনি নিয়ন্ত্রণের চরমতম গোলযোগ এবং আরো কিছু কিছু বিরক্তিকর টেকনিক্যাল ত্রুটি তাঁকে বাধার সম্মুখীন করেছিল।

নির্মলকুমার দাস

রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন

সারা ভারত রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনের একটি বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার স্থান ছিল। এই সম্মেলনের জন্যে একই সঙ্গে শিল্পী ও শ্রোতা সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। কিন্তু এবারে ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ সেন্টেনারি হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের কলকাতা অধিবেশনটি বড় দৃষ্টিকটুভাবে অনাড়ম্বর ছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়—প্রেক্ষাগৃহ ছিল বস্তুত-পক্ষে খালি। এখানে উল্লেখ্য, প্রতি বছরের মত এবারে অধিকাংশ বেতার শিল্পিবৃন্দও আমন্ত্রিত হন নি। মাইক্রোফোনের অব্যবস্থা, সাউণ্ড সিস্টেমের বিভ্রাট—এ সব কিছুই ঐ সান্ধ্য অনুষ্ঠানকে মন্থর ও নিষ্প্রাণ করে তুলেছিল।

কণ্ঠ সঙ্গীতে নাসির জাহিরুদ্দীন এবং নাসির ফৈয়াজুদ্দীন ডাগরের দ্বৈত পরি-বেশনা বাগেশ্রীতে সুর প্রয়োগের দিক থেকে নিতান্তই সামান্য কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেছে। কিন্তু তাঁদের দৃঢ় এবং রীতিবদ্ধ রাগ কাঠামো তাঁদের মধ্যে সমতা বজায় রাখায় অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল। কণ্ঠ সঞ্চালন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ধৈবৎ এবং মধ্যম ঘিরে, এবং কদাচিৎ খাঁটি ডাগর ঘরানার ঐতিহ্য অনুসারে পঞ্চমকে প্রয়োগ করা হয়েছিল। জো[ড়] বেশ কিছু বুদ্ধিদীপ্ত গমক এবং চৌতা[লে] প্রশংসনীয় লয়কারীর কাজ সমগ্র [অনু]ষ্ঠানটিকে যথার্থ করে তুলেছিল। পাখোয়াজে তাঁদের আন্তরিকতার সং স[হ]যোগিতা করেছেন গোপাল দাস।

বিচিত্র বীণায় গোপালকৃষ্ণর মালকো[ষ] পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা—যদিও আলাপ অংশ[টি] তাড়াহুড়ো করে শেষ করা হয়েছিল। এ[ই] কঠিন যন্ত্রটির ওপর তাঁর দখল খুব ভা[ল] এবং অতি সহজেই তিনি দ্রুত তানের কা[জ] করতে পারেন। তাঁর রাগরূপ নিখুঁত এবং অতীতে তাঁর বাজনার যে আবেগ [ও] অনুভূতি তাঁকে বিশিষ্ট করে চিহ্নি[ত] করেছিল, সেই আবেগ ও অনুভূতি [এ] পরিবেশনাতেও পাওয়া যায় নি। মিশ্র পি[লু] পরিবেশনাটি খুবই সুমিষ্ট হয়েছিল মনমোহন সিং-এর তবলা সহযোগিতা সঠি[ক] হয়েছিল, কিন্তু সজীব হয় নি।

জেমিনী সার্কাস

এই বছর তেমন শীত না পড়লে[ও] সাইবেরিয়া থেকে যথারীতি শীতে[র] অতিথিরা এসেছে আর এসেছে শহ[রে] শীতকালের ছুটির আমেজের অন্যতম সঙ্গ[ী] সার্কাস। পার্কসার্কাস ময়দানে। গ[ত] ডিসেম্বর থেকে ভারতের অন্যতম শ্রে[ষ্ঠ] সার্কাস জেমিনী দল এসেছে শহরতলী[র] শহরবাসীদের আনন্দ দিতে।

এই বছর ১৪০ জন পুরুষ শিল্প[ী] ৬০ জন মহিলাশিল্পী ও ৬জনের গ্রু[প] ক্যাউন নিয়ে জেমিনী সার্কাসের দল গঠি[ত] হয়েছে। আইটেম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতি[দিন] প্রতি শোতে প্রায় ২৫টির মতন খেলা দেখা[নো] হচ্ছে। কিন্তু জেমিনীর বহুমূল্য সম্প[দ] বলতে বোঝায় এ'দের বিরাটসংখ্যক জন্ত[ু] জানোয়ার। ৪২টি ঘোড়া ১৭টি হাতি, ১২[টি] সিংহ, ৬টা বাঘ, বিশেষ জাতের ট্রেনিংপ্রা[প্ত] কুকুর ১৪টি। এ ছাড়াও উট, ভাল্লুক, বাঁদর, হরিণ, রামছাগল, জেব্রা, সিম্পা[ঞ্জি] প্রভৃতি অজস্র জীবজন্তু।

সার্কাসের ওস্তাদ শ্রী[...] জানালেন—সার্কাসের খেলায় গতানুগ[তিকতা]কে বিসর্জ[ন] দিয়ে এতে নতুনতর সম্ভারে খেলোয়াড়দে[র] নিয়ে প্রচুর কসরৎ করতে হয়েছে। যার ম[ধ্যে] বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে 'শূণ্যে ঝুলো' খেলাটি। তিন-তিনটে হাতির উপ[র] দিয়ে যখন উড়ন্ত মানুষ এসে মুহূর্তে[র] মধ্যে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল—সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখে ছোট বড় সব্বা[ই] ভয় পেয়ে যান। সার্কাস জগতের পাইয়োনীয়া[র] জেমিনীর আরও একটি শাখা 'জেমিনি' ইণ্টারন্যাশনাল এখন বিদেশে অর্থা[ৎ] নাইরোবিতে খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

অচ্যুতকুমার সিং

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

২৪ মাঘ, ১৩৮৬
১৯ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা
8th February 1980

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী

কলকাতায় বই মেলা উপলক্ষে
বই চাই বই
লিখেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প লিখেছেন

অমর মিত্র

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবনের নানাদিক

মাটি থাকলেই গাছ হয়। মানুষ আসে। রোদ ওঠে। বৃষ্টি নামে। পাল্টায় শুধু মাঝখানের জিনিসপত্তর। কিংবা উপকরণ। মোমবাতির বদলে ইলেকট্রিক। ঘোড়ার বদলে এরোপ্লেন। তালপাতার পুঁথির জায়গায় বই। মাইনে করা গায়কের বদলে রেকর্ড।

কয়েকটি জিনিস পাল্টানো যায়নি। গাছে ফলের জায়গায় সেফটিপিন ফলে থাকছে না। ঘৃণা, অভিমানের জায়গায় অন্য কিছু বসানো যাচ্ছে না। চামেলি ফুলের গন্ধকে নাকি ইংরাজিতে বলা হয়—ফরগেট মি নট। গোলাপ, কামিনীর সুবাস কোন কোন সেন্টে ধরা যায় বটে। কিন্তু এসব গন্ধ ফুলের বদলে শিশি থেকে শুকলে গা বিড়িয়ে ওঠে খানিক বাদে।

এমনদিন কি হবে কোনদিন—যখন—মুদিখানায় মাসকাবারি সওদায় পুরো ফ্যামিলির জন্যে বিশ্রাম, স্বপ্ন, আনন্দ ঠোঙায় করে মুটের মাথায় বাড়ি চলে আসবে? ঠাকুমার সুখস্মৃতি, গৃহস্থের পরিতৃপ্তি, বাবুর বাড়ির ছেলের জন্যে সুবোধ চরিত্র—সবই কি সেই মুদিখানায় বয়ম ভর্তি করে রাখা থাকবে!

তবু পাল্টেও গেছে অনেক। আগুন, মশল্লা, জল, নুন, মিষ্টি, টক মিলে রান্নার স্বাদ বদলে দিয়েছে। সেলাই, বুনোন, রং মিলেমিশে পোশাক পরিধেয়কে করেছে নিত্যনতুন। অশোক আকবর যে-গাড়িতে চলাফেরা করতে পারেননি—তার অনেক বেশি বেগ সাধারণ মানুষ ভোগ করতে পারেন শিয়ালদা থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে। কারখানায় হাতঘড়ি তৈরি হলেও পছন্দসই সময় কিন্তু এখনো উৎপন্ন হয় না।

সেরকম সময় কার্যকারণে ঘটে। নয়তো বহুধা মননের মানুষ হিসাবে সেরকম সময় খুব অল্প কিছু লোক বানিয়ে নিতে পারে। ওরা রামপ্রসাদ বা পরাশরের মতই আবহাওয়া করে নিতে পারে। মনের আবহাওয়া। সে তো আরও কঠিন।

জীবনের মূলে রয়েছে পরিপাক শক্তি। ভালোকথায় যার নাম জীবনতৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা আদিতে বুনো। জীবনধারণের সঙ্গে সঙ্গে এই তৃষ্ণাও ধারালো হয়। সংস্কৃত হয়। এই তৃষ্ণাই মানুষকে জীবনে আগ্রহী করে রাখে। জীবন কেন? এর অর্থ কি? এসব প্রশ্ন নিয়ে যত ঘাঁটাঘাঁটি করা যায়—ততই মন জ্ঞানী হয়। পরিণাম : জীবন নিয়ে আগ্রহ কমতে থাকে। কেননা, আমাদের জীবনও জন্মসংক্রান্ত ধ্যানধারণাগুলো এতই মহাজাগতিক—এতই কল্পনাময়—তার পাশে বুনো, স্থূল জীবন সব আকর্ষণ হারাতে থাকে।

শৈশব ও সুখ

আলোকময় দত্ত

কয়েক দিন আগে শ্রীমতী সোফিয়া লোরেন গিয়েছিলেন হোয়াইট হাউসে। প্রেসিডেন্ট কার্টার থেকে শুরু করে মার্কিন কংগ্রেসের নবীনতম সদস্য ঠেলাঠেলি লাগিয়ে ছিলেন এই বিখ্যাত অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্যে। কিন্তু শ্রীমতী লোরেন সেদিন ঐ মহারথীদের মাঝখানে চলচ্চিত্র জগতের নতুন কোন বিস্ময়কর বার্তা নিয়ে যান নি। তিনি গিয়েছিলেন জাতীয় শিশু-স্বার্থ-রক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে পৃথিবীর যাবতীয় শিশুর নিপীড়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার প্রত্যাশায় হায়। সারা পৃথিবী জুড়ে এমন প্রশংসনীয় অন্তত ছত্রিশটি সংস্থা থাকা সত্ত্বেও শুধু ব্রেজিলেই এক কোটি ষাট লক্ষ শিশুকে জীবিকার তাগাদায় সমানভাবে পাল্লা দিতে হচ্ছে বয়স্কদের সঙ্গে।

ব্রেজিল কেন, পৃথিবীর প্রতিটি অনুন্নত দেশে — এই ভারতবর্ষেই, কত কোটি শিশুকে অন্নের জন্যে যুঝতে হচ্ছে পরিণত বয়েসের লোকেদের সঙ্গে। যে সব ক্ষেত্রে বাবা-মা সন্তানের জন্মদান ব্যতীত বিশেষ কোন কর্তব্য পালন করতে পারেন না, সেখানে শৈশব শেষ হওয়ার আগে থেকেই শুধুমাত্র কোনমতে বেঁচে থাকার তাগিদে—উপার্জনে যোগ দেয় অপরিণত বয়স্করা।

গত কয়েক দিন ধরে আমাকে একটা প্রয়োজনে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে পাড়ায় পাড়ায়, বস্তি-বাজারে। অবাক লেগেছে আবিষ্কার করে যে, বাচ্চাদের দিয়ে আমরা কি না করাচ্ছি—ঠেলা, ময়লা কাগজ কুড়ানো মোটর গাড়ির মেকানিকের কাজ, চায়ের দোকানে ফাইফরমাস বাড়ির ভৃত্য ঝাড়ুদার—কী নয়? এমন কি, ঠিক শিশু না হলেও খুব কাঁচা বয়েসের ছেলেকে দেখেছি বারাঙ্গনার দালালির কাজে।

আজ সন্ধ্যায় প্রতিবেশীর বাড়িতে যে ইলেকট্রিকের মিস্ত্রিটিকে অনায়াসে বিদ্যুৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখলাম তার বয়স কোন মতেই বারো পার হয়নি। অথচ কী মারাত্মক জিনিস নিয়েই না ছেলেটি কাজ করছিল। একটু এধার ওধার হয়ে গেলেই তো মৃত্যুর সম্ভাবনা। কোন প্রতিকার কি নেই? শুনেছি বিদ্যুতের কাজে নাকি লাইসেন্স লাগে—কোথায় সে সব? কে আরোপ করে নিয়ম? জরিমানা যদি হয় তো তা হওয়া উচিত গৃহস্বামীর, আমাদের—যারা এই বাচ্চাগুলোকে মুখোমুখি রাখি মৃত্যুর। কেন রাখি তার কারণটা যেমন স্পষ্ট তেমনি সত্যও। বাচ্চাদের কাজে লাগানোর অনেক সুবিধে—এদের খাটান যায় যত ইচ্ছা দশবার পাটানো যায় সিগারেট আনতে, পা টেপানো যায়।

লক্ষ্য করেছি অপরিণত বয়স্কদের রোজগারের ব্যাপারে আমার শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন বন্ধুরা রীতিমত অস্থির ও মেয়েদের কোনমতেই জীবিকা উপার্জনে সোচ্চার। তাঁদের মতে অপরিণত ছেলে-নিয়োগ করা উচিত নয়। তারা যাবে ইস্কুলে খেলা করবে সময় মত এবং এক কথায় উপভোগ করবে শৈশব।

তলিয়ে না দেখলে সেটাই মনে হওয়ার কথা। তবে, শৈশব উপভোগ করতে কারই বা ইচ্ছে না করে? বিশেষ করে বয়েস হয়ে গেলে শৈশবের উপভোগের কথা বেশি করে মনে পড়ে। যাই হোক, উপভোগ কর বললেই কি করা যায়? দৈনিক দুবেলা আহারের ব্যবস্থা যদি না থাকে, শীতে একটা গরম জামা বা ঘুমোনোর নামমাত্র শয্যা, শৈশব কেন যৌবনেও উপভোগ আসে না। আমাদের দেশে এবং এরকম যাবতীয় অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশে শিশুদের খুব বড় একটা অংশ জীবন ধারনের ন্যূনতম উপকরণ থেকেও বঞ্চিত। তাদের কেবলমাত্র প্রাণ ধারনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকতে হয় উপার্জনে।

কিন্তু, যাদের অবস্থা স্বচ্ছল—যারা মধ্যবিত্ত বা বিত্তশালী—তাদের শিশুরা কি উপভোগ করছে শৈশব? কিভাবে? চার পাশে যা দেখি তা খুব একটা উৎসাহজনক বা আশাপ্রদ নয়। মধ্যবিত্ত সংসারে আজকাল বহু জননীকেই জীবিকার প্রয়োজনে হয় আপিসে নয় ইস্কুল-কলেজে চাকরি নিতে হচ্ছে। খুব বিত্তশালীরা আবার মনে করেন মহিলাদের বাড়িতে পড়ে থাকা যথেষ্ট সন্তোষজনক এক অবস্থা নয়। ফলে ধনী ঘরের মা-রাও সারা দিন চ্যারিটি, সোস্যাল ওয়ার্ক বা কফি-মীট জাতীয় রকমারি সৌখিন সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের শিশু-দের শৈশবের দীর্ঘ সময় কাটে ইস্কুল অথবা বাড়ি ফেরার প্রায় পরমুহূর্ত থেকে ইস্কুলের হোম-ওয়ার্ক নামক অভিশাপ মোচনে। যে সব ইস্কুলগামী শিশু স্কুল বাসে যাতায়াত করে তাদের অদৃষ্ট আর একটু বেশী কঠিন। হিসেব করলে দেখা যাবে এই সব বাচ্চাদের দিনের দুই-তৃতীয়াংশ কাটে ইস্কুলে যেতে-আসতে, সেখানে আটকা থাকতে এবং পাহাড় প্রমাণ বই ও খাতা সামলাতে।

তাহ'লে কোনটা বেশী আনন্দের? দশ-বারো ঘন্টা কাজ করায় না দশ-বারো ঘন্টা পড়ায়। বয়স্কদের কাছে দ্বিতীয় অবস্থাটা আনন্দের হলেও প্রতিটি শিশুর কি তাই মনে হয়? ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না একটা পিছল নল বেয়ে একটি বাঁদরের ওঠানামার সঠিক হিসাব নির্ধারণ অথবা ফরাসী বিপ্লব কোন সালে হয়েছিল স্মৃতিতে সঞ্চিত রাখা খুব একটা জরুরি। তার থেকে কম দরকারি নয় শৈশব থেকেই কোনো একটা হাতের কাজের তালিম নেওয়া। বিশেষ করে তাতে যদি সংসারের কিছুটাও সাশ্রয় হয়। যদি উচচাঙ্গ সঙ্গীত শেখাতে আমার বন্ধু তাঁর সুকুমার শিশুকে পাঁচ বছর বয়সেই খুব গর্বের সঙ্গে ওস্তাদের কাছে পাঠাতে পারেন তবে আমার ছেলেকে দশ বছর বয়সে কারিগরীতে ভর্তি করায় যুক্তির অভাব আছে কি? তাছাড়া, এও জানি ভারতবর্ষ, কি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যে সব মা-বাবা ছেলেমেয়েদের শিশু বয়েসে রোজগারের ব্যাপারে ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তারাই মার্কিন দেশে থাকাকালীন তাঁদের পুত্রদের খবরের কাগজ বিক্রি, অপরের বাগানের ঘাস ছাঁটা অথবা এমনি কোন জৌলুসহীন জীবিকার উৎকর্ষতা ও [illegible]তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আসলে মার্কিন দেশই হোক অথবা মলয় উপদ্বীপ—কাজ সব দেশে, সর্বকালে এবং সব বয়েসেই প্রশংসার যোগ্য। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করানো যেমন খারাপ, নিঃসন্দেহে ঠিক তেমনি খারাপ জোর করে শিশুদের আটক রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় গলাধঃকরণ করানো। অনেকের ধারণা শিশুদের শৈশব উপভোগ করানো সব চাইতে শ্রেয় পথ হোল তাদের অখণ্ড অবসর দিয়ে ইচ্ছে মতো খেলতে দেওয়া। কিন্তু শিশুদের শুধুই খেলতে ভাল লাগবে, কাজ ভাল লাগতে পারে না, মনে করা সমীচিন হবে না। তাছাড়া শৈশবের উপভোগ যদি পরিণত বয়সে উৎপীড়নের অংকুর বলে প্রমাণিত হয় সেটা কি যুক্তি-যুক্ত? তার থেকে অনেক কি ভাল নয় শৈশবেই ভবিষ্যত জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া—এমন কোন শিক্ষানবীশি করা যা কাজে লাগবে উপার্জনে।

শৈশবে লেখাপড়া শেখা এবং ইস্কুলে যাওয়া খুবই আনন্দের কথা। যে সব শিশুর মা-বাবারা তার সংস্থান করতে পারেন তাঁদের বিষয় স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা তা পারেন না—তাঁদের লজ্জার বা দুঃখের কোন কারণ দেখি না। অবশ্যই তাঁরা সন্তানদের নিজের পছন্দ মতো জীবিকায় বা ব্যবসায় লাগিয়ে দিন। একটা কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীর আর সব সমস্যার মতোই শিশুদের প্রকৃত অর্থে সুস্থ ও সুখী রাখার সমস্যা কোন-মতেই একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় হতে পারে না। তাদের ভাল রাখতে গেলে ভাল রাখতে হবে মা-বাবাদের। তাঁদের জীবিকা এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা যদি যথাযথ হয় তবেই সম্ভব হবে সন্তানদের সবল ও স্বাবলম্বী করা। শিশু কল্যাণ বা শিশু নির্যাতন বিরোধী সংস্থা গড়ে তোলায় কারো বিন্দু-মাত্র আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় নিপীড়িত পিতা-মাতা সহায়ক বিবেচক কোন সংগঠন।

হারানো বই

ঊনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। শিক্ষার উন্মেষ, চিন্তার প্রসার, জ্ঞানানুশীলন, চিত্তবিকাশ, সংস্কার মুক্তি, ধর্মীয় সংকীর্তনতাকে ভেঙে ফেলা—সব মিলিয়ে যুগটাই ছিল অস্থিরতায় চঞ্চল। এ যুগে বহু বিশিষ্ট বাঙালী ইতিহাসের গতিপথ ঘুরিয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁদেরই একজন। মননশীলতায় দীপ্ত সরল ও সহজ চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষায় পুরোধা। বিজ্ঞানের মূল সত্যকে সকলের উপযোগী করে তোলাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। বৈজ্ঞানিক সত্যের জগৎ থেকে তিনি দর্শনের আলোচনায় মনোযোগী হন। অনেক পরে দর্শন ও বিজ্ঞানের এক ভাব সম্মিলন ঘটে রামেন্দ্র প্রতিভায়। ভূবিদ্যা, অন্তরীক্ষ বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যায় প্রবন্ধ রচনায় দেশীয় বিজ্ঞানসেবকদের উদ্বুদ্ধ করার মূলে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির প্রচেষ্টায় বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু গভীর তত্ত্ব বা সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মূল সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক।

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। বেদ-বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনে তাঁর ছিল অসীম জ্ঞান। শব্দশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর দান নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য। আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা এবং প্রাচীন সভ্যতা গভীরভাবে পড়াশুনো করেন। মানব ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভই তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে করেছিল বিশাল ও বিস্তৃত। রামেন্দ্রসুন্দর তুলনীয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে। রামেন্দ্রসুন্দর অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে দেশের উন্নতির জন্য সব থেকে বড় দরকার ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নয়ন। ভাষাকে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তোলবার জন্য সাহিত্য সম্মেলনের গুরুত্ব অসীম। এ কাজে কেটেছে তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময়। ইংরেজি ভাষায় ছিল যথেষ্ট দখল। কিন্তু ঐ ভাষায় কোন বই লেখেন নি।

রামেন্দ্রসুন্দর তখন বি-এ ছাত্র। 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' বেরোল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনা' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দাসী এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ লিখলেন। বেশীরভাগই বিজ্ঞান বিষয়ে। মানসী, বঙ্গদর্শন, আর্যাবর্ত, মুকুল, উপাসনা, প্রদীপ, পুণ্য, ভারতবর্ষ ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়ও লিখতেন নিয়মিত। ১৩০১ সালে বেরোয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিখ্যাত গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা'। ১৩১৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভারত-শাস্ত্র পিটক গ্রন্থমালা সম্পাদনা দায়িত্ব দেয় রামেন্দ্রসুন্দরকে। ১৩২০ সালে প্রকাশিত 'চরিতকথায়' রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হর্মান হেলম্‌হোলৎজ, আচার্য মোক্ষমূলর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো কয়েকজন। অজস্র মূল্যবান প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়। যার কিছু সংগ্রহ করে ১৩২৪ সালে বেরোয় 'শব্দকথা' গ্রন্থ। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর বেরোয় 'বিচিত্র জগৎ' এবং 'যজ্ঞ কথা'।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর ঘনিষ্ঠতা ছিল সুদীর্ঘকাল। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, রামেন্দ্রসুন্দর গোঁড়া হিন্দু। তবু সেকালে এঁদের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি। দুজনের চলাফেরা বরং ছিল অনেক কাছাকাছি। ফলে পারস্পরিক চিন্তা বিনিময় ঘটে নানাভাবে। ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর, পরিষদে যোগ দেন রামেন্দ্রসুন্দর। দুজনে পাশাপাশি থেকে পরিষদের নানাভাবে উন্নতি ঘটান। ১৩২৬ সালে মারা যান রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর শয্যার পাশে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আশুতোষ বাজপেয়ী ১৩৩০ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের যে জীবনী লেখেন, তার ভূমিকায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'বাংলার লেখকমন্ডলীর মধ্যে সাধারণত লিপিনৈপুণ্যের অভাব দেখা যায় না, কিন্তু স্বাধীন মননশক্তির সাহস ও ঐশ্বর্য অত্যন্ত বিরল। মনন ও রচনারীতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যা তাঁহার ছিল প্রভূত, কিন্তু সেই বিদ্যা তাঁহার মনকে চাপা দিতে পারে নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার বিষয় বিচারে অথবা তাহার লেখনপ্রণালীতে অন্য কাহারও অনুবৃত্তি ছিল না।...জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। প্রিয়জনের মৃত্যুশোক তাঁহাকে বারম্বার মর্মাহত করিয়াছে। তিনি যে সকল ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে পালন করিতেছিলেন তাহাতেও নানাপ্রকার বাধাবিরুদ্ধতা তাঁহাকে কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অজস্র মাধুর্য-সম্পদের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই—রোগ তাপ প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহার প্রসন্নতা অম্লান ছিল।'—রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য উচ্ছ্বাস নয়, সার্থক মূল্যায়ণ। শিক্ষক-জীবনে যেমন সার্থক, শিক্ষা-সংস্কারেও তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

রামেন্দ্রসুন্দর মারা যাওয়ার অল্প কিছুকাল বাদেই নলিনীরঞ্জন পন্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' বেরোয়। ১৩৩০ সালে ছাপা হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের আত্মীয় আশুতোষ বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর'। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত বইটি মূল্যবান উপাদানে ঠাসা। এ জাতীয় বই একজন মানুষের জীবনের উপকরণসর্বস্ব নয়, সমকালীন সাংস্কৃতিক জীবনের দলিলও। বইটি ছাপার খরচ দিয়েছিলেন লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়। এমনকি পনের হাজার টাকা খরচ করে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মভূমি জেমোকান্দিতে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় পুকুর কাটিয়ে তার দুধারে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুটি পান্থশালা তৈরি করান। ১৩৩০ সালের ৯ বৈশাখ স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনে সভাপতিত্ব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সভায় উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়-বাহাদুর, নিখিলনাথ রায়, জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন পন্ডিত, অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিপিনবিহারী গুপ্ত এবং বহু বিশিষ্ট মানুষ।

রামেন্দ্রসুন্দর শতবর্ষ ১৩৭১ সালে উদ্‌যাপন হয়েছে। তাঁর সামগ্রিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু বই-ও সেসময় বেরোয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর'। বলা যায় রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন ও সাহিত্য সাধনার এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরকে ভুলে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

কমল চৌধুরী

অনুরাধা মহাপাত্রর কবিতা

।। নিসর্গ ।।

নিসর্গ জানে না সে, মাঝপ্রহরের দিকে ঘুম ভেঙে যেতে খোঁপা খুলে
দিতে দিতে সে দেখেছিলো তার সারাগায়ে লোধ্ররেণু
আর শাড়ীর উজ্জ্বল নীল পাড় ঢেকে আরও উজ্জ্বল বাস্তুসাপ
বাস্তুসাপ নারায়ণ, ও কেবল অপেক্ষায় অন্তরে যাবার
মেয়েটি কি ভেবেছিলো, নাকি তার স্বপ্নের আশির নখর গ্রাসীভাব?
ও কেবল আচ্ছন্ন আছে কাঠচাঁপা গাছটির কাছে
নদীর জলের কাছে, মন্দিরের অন্ধ ঘন্টার কাছে
দুরন্ত ফ্রকের ফাঁকে শুদ্ধতম কাঠচাঁপা? গন্ধ তার মনে পড়েছিল?
এখন জেগে থেকে কি করে ও সাপটিকে ভালোবাসা দেবে?
পুজো দেওয়া যায়? নখে ও সাপের চোখ খেলা করে
ওকি চুম্বন দেবে চাঁদের প্রকৃতি ভেবে? এরকম শিখরগ্রাসী
নিসর্গ মেয়েটি পারেনা নিতে। বরং ও আসন্ন আছে
ভোরের আলোয় প্রথম বৃষ্টিতে বুক একটু ভিজে গেলে
অন্ধপুরুষের বুকে শুদ্ধতম কাঠচাঁপা সহজ সত্যে ভরে দিতে!

।। এ রাঙা রবিবার ।।

জন্মে জেনেছি এই আত্মনির্যাতন, মানুষ নয় মানুষের খনিজ প্রকৃতি
টানে জলঘোড়া, দীর্ঘতম গরলপ্রদীপ নিভিয়ে এনে
মুখের ভিতরে মুখ, বুকের ভিতরে বুক ভেঙে ভেঙে
তাকে করে তুলি আঙরাখা, বাস্তুসংস্কৃতি, গাঙশরীর,
ভাওয়াইয়া গান, দখিনবাংলার শ্যাম জৈব প্রতিমা
জন্মে জন্মে কতোকাল আত্মপ্রতারক, ভালোবেসে
ফেলে যায় ঘাম, শূন্যের ভিতরে বৃষ্টি, দিগন্তে
আধেক মৃত্যুর মত রাঙা টিউকল, মূর্ছনায় ঠোঁট
আর সে মা এলে রক্তে, পরাগে শিল্পে সজল
মন্ত্রজোড়া পা ফেলে ফেলে, মিথ্যে লাগে
সব মিথ্যে হয়ে যায় সপ্তাহ মৃত্যুর পরে আশ্চর্য
রাঙানো এই দেখা, জন্মের চেয়েও বেশী স্পর্শময়
যা থাকে টিউকলে, ক্রিশেনধিমামে স্তব্ধ সমুদ্রভার
ভোর ও আমার আশ্চর্য মুগ্ধ এই রাঙা রবিবার।

।। গল্পের শুরু এবং শেষ ।।

নদীর ওপারে দেখি গল্পের শুরু হয়, অন্য সব নদী থাকে অন্ধকান্ডারে
আমি শূন্য প্রান্তর থেকে অশৌচ হাতে ডাকি একটি নদীকে
আরও ঘোর ভেড়ির মাথায় জ্বলে লাল লণ্ঠন
শববাহকের কাঁধ থেকে নন্দকৃষ্ণচূড়া উড়ে [illegible] রক্তিমআই
রাধাপ্রতিমার গাঢ় ভাসানের চুলে, রাঙাবুকে
জীবনের গন্ধ নেই, গমের মাঠ নেই ঘাস ও মাটির শান্তবর
শুধু নদী মাতৃকা, বিবাহকালীন কিছু বন্ধনের রঙ থেকে
নৈঃশব্দ্যতাড়িত মৃত্যু, হাঁস ও রাঙিলার কিছু দুপুরান্তের
জল খেলা থেকে বেজে ওঠে অচিন পাখিটি
জানি দীর্ঘ উপোসী আমি সহাস্য কাটারী হাতে
দৃষ্টে যেই দূরে হাহা নদীটির দিকে, বুক থেকে
লুকনো স্বপ্নের ঘন্টা ছিঁড়ে পড়ে, সোনার নাকি সে অমানুবিক?
ধুলোঝড় বয়ে যায়, ঢেউ দিয়ে ওঠে নন্দ পাতালগামী
কৃষ্ণচূড়া রাধা প্রতিমার গাঢ় ভাসানের চুলে
পেছনে বাঁশের সাঁকো ভিজে ওঠে, পোড়ো গাছ
পায়ে পায়ে শূন্য সাদা ঝিনুকের ভাঙা, চোখে জল
অন্য নদীর গন্ধ যদি আসে?
আমি সহাস্য কাটারী হাতে একে একে কেটে ফেলি
আর্শির গোড়ালি নখ ফুলের শেকল
নদীও প্রতিমা নিয়ে প্রতিস্বিক গল্পের আকাশ।

।। জঙ্গল যুদ্ধ ।।

এরকম সূক্ষ্ম মশাল জ্বলে ওঠে, নিমজঙ্গলের ঘোরঘাট্টার ভিতর
নিমজঙ্গলের মাথার ওপরে চাঁদ, স্কুটারে যুবক ও যুবতী দুটি
স্পীডে ছুটে যায়, রাত বাড়ে, আকাশের কালো হুকে
ঝুলে থাকে নিরম্বু প্রতিমার কালো চুল
নিমজঙ্গলের ভিতর ঘোড়ার মাংস ঝলসায়
রাতভর তাড়ি বিক্রী করে কারা, রাতভর কাঠ কাটে
রাতভর খড়ের নৌকো করে পারাপার,
আর খাড়াই পুরুষ একা নদীর ওপারে দেখে রক্তপাত
পাহাড়ে নদীর পাড়ে ধানের গোলায়
কালো বুটে মার্চ করে, ঘুম নেই, দীর্ঘ পাথুরে দেহে
উৎকাল জ্যোৎস্না গড়ায়, কালো ক্ষুরে বেজে ওঠে
জ্যোৎস্না জঙ্গল, আটশত মাথা ও হৃদয়ের উৎকাল্প
জেগে ওঠে দখিন বাংলার চরে, বেগ দেয় দখিনি জোয়ার
আর নিমজঙ্গলের ভিতর খাওয়াদাওয়া, জুয়াখেলা, গ্রাম্যকৃষ্টি
জমে ওঠে, তারপর জ্যোৎস্না ডুবে গেলে
খাড়াই পুরুষ একা রাইফেলে গর্জে ওঠে খরশান পাহাড়ের
ডাঙার মাথায়, হুইশল দিয়ে ওঠে, তারপর
জঙ্গলযুদ্ধের শেষে প্রান্তরে পড়ে থাকে
আদিম আঁধার নুলো হাত।

হাঙ্গেরিয়ান র‍্যাপসডি ছবির দৃশ্য

ফিল্মোৎসব '৮০

নির্মল ধর

কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম ভাঙা মন নিয়ে। কলকাতার পাওনা এই ফিল্মোৎসব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। কিছু কট্টরপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও 'দক্ষিণ'বাদী ফিল্মের লোকজন এক বছর আগে মাদ্রাজে ফিল্মোৎসব করেও খুশি হননি। দক্ষিণ ভারতীয়ের আধিপত্য বজায় রাখার দাবীতে তাঁরা কলকাতাকে বঞ্চিত করে মাদ্রাজ থেকে মাত্র ছ' ঘন্টার দূরত্বে ব্যাঙ্গালোরে আবার ফিল্মোৎসব করছেন। অথচ কলকাতা রইল নীরব। ব্যক্তিগতভাবে আমি চেঁচামেচি করেছি অনেক। গত বছর জানুয়ারী থেকেই লিখেছি। রাজ্য সরকার বিলম্বে চেষ্টা করেছিলেন, ফল হয়নি। সি-আই-এম-পি'এর 'লোক দেখানো' প্রতিবাদও কার্যকরী হয়নি। শেষপর্যন্ত ব্যাঙ্গালোরেই যেতে হচ্ছে। পি-আই-বি জানিয়েছিল ৩০ ডিসেম্বর থেকে প্যানোরামা বিভাগের ছবি দেখাবে। দেখিয়েওছে। কিন্তু আসল উৎসব শুরু হল ৩ জানুয়ারী। ব্যস্ততা সাজগোজ বাড়ল সেইদিন থেকেই।

৩ জানুয়ারী

যদিও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে বিকেলে, সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল ছবি দেখা। একদিন আগেই ছবিগুলো দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

আজ দেখতে হয়েছে সাতখানা ছবি। প্রথম দিন, তাই তেমন অসুবিধে হয়নি। পরে বোধহয় সংখ্যাটি কমবে। সকালবেলা সন্তোষ হলে ঢোকার আগে ছবির লিস্টটা দেখলাম। ল্যুইমালের 'প্রেটি বেবি', জেমস আইভরির 'দি ইয়োরোপিয়নস', ওয়াজদার 'রাফ ট্রিটমেন্ট' টপ্ ফেভারিট।

একমাত্র ভালো লাগলো 'প্রেটি বেবি'। ওয়াজদা বা আইভরির ছবি বুকে ধাক্কা দিতে পারল না। অথচ যুগোশ্লাভিয়ার 'অকুপেশন ইন ২৬ পিকচার্স' (লোরদান জাফরানোভিক) ও কানাডার 'স্ক্রিম ফ্রম সাইলেন্স' (অ্যানি ক্লেয়ার পোয়ারিয়ের) অবাক করে দিয়েছে। দুটো একেবারে ভিন্নশ্রেণীর ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবরুদ্ধ করা মেয়েটাকে সুন্দর অথচ ভয়ঙ্করভাবে তুলে ধরা হয়েছে যুগোশ্লাভিয়ার ছবিটায়। পরিচালকের মুন্সিয়ানাকে ধন্যবাদ। তিন বন্ধুর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি নাটকও গড়ে তুলেছেন। আবার পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতাটুকুও রয়েছে। কানাডার ছবিটা ধর্ষিতা এক মহিলার জবানবন্দী। পরিচালক 'ফিল্মের মধ্যে ফিল্ম' তৈরির স্টাইলে বিভিন্ন ধর্ষিতা তরুণীর সাক্ষাৎকার দেখিয়েছেন এবং গল্পের শিরদাঁড়া হিসাবে রয়েছে একটি তরুণীর করুণ মানসিক যন্ত্রণা। প্রকাশভঙ্গী জোরালো। তীব্র তীক্ষ্ণ গতি ক্যামেরার। ভাবিয়ে তোলে দর্শককে।

ল্যুই মালের 'প্রেটি বেবি' এক কিশোরী বারবনিতার কাহিনী। ছোটবেলা থেকেই সে ঐ নোংরা পরিবেশে বেড়ে উঠেছে। ঐ সমাজের সে অঙ্গীভূতও হয়ে পড়েছে। গা শিরশিরিয়ে ওঠা কিছু দৃশ্য থাকলেও কিশোরীর মানসিক গঠনকে সূক্ষ্মতার সঙ্গে তিনি বিশ্লেষণও করেছেন। মালের দক্ষতা ছবিটিতে দমবন্ধ করা বেশ্যালয়ের পরিবেশ উপস্থাপনে। নিখুঁত ডিটেলসের কাজ।

সন্ধ্যেবেলা সুসজ্জিত কাপালি থিয়েটারে ফিল্মোৎসবের উদ্বোধন হল। প্রায় জৌলুষহীন উদ্বোধন। শুরুতেই ছন্দপতন ঘটল উদ্বোধক দেবিকারানীকে নিয়ে। হলের সামনে একদল শ্রমিক ধ্বনি দিচ্ছিল 'রক্তচোষা দেবিকারানী, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ।' এহেন একটি আন্তর্জাতিক উৎসবের শুরুতে এমন ঘটনায় অনেকেই মনমরা। ব্যাপারটা হল ব্যাঙ্গালোরের অনতিদূরে দেবিকারানীর কারখানার একদল শ্রমিক বহুদিন ধরেই নাকি নানা দাবীতে আন্দোলন করছিলেন। আন্তর্জাতিক উৎসবের উদ্বোধন করতে আসছেন শুনে তারা হলের সামনে ধর্ণা দিয়েছিলেন। দেবিকারানী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—'বিদেশীদের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হল।' অবশ্য বেশিক্ষণ শ্লোগান চলেনি, পুলিশ তৈরি ছিল, কালো গাড়িতে তাদের চটপট তুলে নেওয়া হয়েছে। ঐ আন্দোলনের একজন নেতা বললেন—'দেবিকারানীর মর্যাদাকে ছোট করার জন্যই আমাদের এই আয়োজন।'

যাই হোক, প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করলেন ভারতীয় ছবির প্রথম মহিলা দেবিকারানী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের গভর্নর গোবিন্দনারায়ণ, দক্ষিণী ছবির জগতের এম ভক্তবৎসল, এন বিশ্বস্বামী, জি পি সিপ্পি এবং উৎসব পরিচালক শ্রীরঘুনাথ রায়না। ওঁরা সবাই বক্তৃতাও করলেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন পট্টভিরাম রেড্ডির মেয়ে সুন্দরী নন্দিনী ইসবেলিয়া।

নিয়মমাফিক উদ্বোধনের পর দেখানো হল রাশিয়ার ছবি 'কুই ভিভা মেকসিকো'। পৃথিবীর সেরা পরিচালক লাগেই আইজেন-

স্টাইন আমেরিকান সাহিত্যিক আপটন সিনে-ক্লেয়ারের সহযোগিতায় সেই ১৯৩০ সালে ছবির স্যুটিং করেছিলেন। প্রযোজকের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হওয়ায় ছবিটা আর শেষ হয়নি. করেননি। গত বছর ও'র সহকারী গ্রেগরী অলেকজান্দ্রভ পুরোন ফিল্মগুলোকে নিয়ে আইজেনস্টাইনের চিত্রনাট্য অনুসরণ করে ছবিটাকে খাড়া করেছেন।

রাশিয়ার বাইরে এই ছবির প্রদর্শনী প্রথম। ব্যাঙ্গালোরের উদ্বোধন তাই নানা-ভাবে মনে রাখার মত, 'ক্যুই ভিভা মেকসিকো' দেখার পরও বলতে হচ্ছে আজকের তাবড় তাবড় পরিচালকরাও বুঝি তাঁর কাছে শিশু। শট কম্পোজিশন, শট ডিভিশন. মন্তাজ এফেকট—কি অসাধারণ শিল্প সংযমান্বিত এবং শক্তিশালী। এক একটি শট্ যেন বন্দুকের গোলার মত এসে বুকে ধাক্কা মারে। মেকসিকোর ওপর অসাধারণ একটি ডকুমেন্টেশন এই ছবি।

কাল থেকে আবার শুরু হবে নিয়মিত ছবি দেখা। আজকের স্মৃতি, ভালোলাগা কাল কেমন হবে জানি না।

৪ জানুয়ারি

আজ সারা দিনে মনে রাখার মত ছবি দেখেছি মাত্র দুটো, আর মানুষ পেয়েছি একজন। সকালবেলার প্রথম ছবি ছিল সুইৎজারল্যাণ্ডের মেসিডোর। পরিচালক অ্যালা ট্যানার। ও-দেশের একমাত্র আন্ত-র্জাতিক ব্যক্তিত্ব। ছবিটা গত বছর বার্লিন উৎসবে প্রশংসা পেয়েছে। দুই তরুণীর হঠাৎ শখ করে নিরুদ্দেশ হবার গল্প। হাইকিং করে তারা ঘুরে বেড়ায়. এক সময় পুঁজি শেষ হলে চুরি শুরু হয়। সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে তারা, একটা বন্দুক চুরি করে ভয় দেখাতে শুরু করে। খবরের কাগজ, টি ভি-তে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত হয় দুজনে। এবং সবশেষে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে।

চরিত্র দুটির উড়নচণ্ডী মার্কা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ট্যানার এক ধরনের আলগা চটক রেখেছেন চিত্রনাট্যে। ফটোগ্রাফিতেও বোহেমিয়ান ভাব। ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি কিঞ্চিৎ বিদ্রূপও প্রকাশ পেয়েছে। এবং একই সঙ্গে শখের সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি কটাক্ষও করেছেন তিনি।

মনে রাখার মত যে-মানুষটার দেখা পেলাম দুপুরবেলা. তার নাম টি এস নাগাভরণ। ইণ্ডিয়ান প্যানোরামায় তাঁর গ্রহণ নামে একটি কান্নাড়ি ছবি দেখানো হয়েছে। যদিও ছবিটি না-বাচক, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুটি বড় সমাজ-সচেতনী। জানা গেল, নাগাভরণ আসলে নাটকের লোক। নিজের দলও আছে, ব্যাঙ্গালোরে নিয়মিত নাটক-টাটক করেন। বি ভি কারনাথ তাঁর মন্ত্রশিষ্য। গ্রহণ ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে নানা তথ্য দিলেন। বললেন, কর্ণাটকের অজগাঁয়ে নানা ধরনের ধর্মীয় অত্যাচার এখনও সগৌরবে প্রতিবাদ-হীনভাবে চলছে। প্রথম ছবিতেই এই তরুণ [illegible]

সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কথা ভেবে, এটা কি কম আশার কথা হল ?

রাত্রিবেলা, একটু আগে যে ছবিটা দেখে ফিরলাম, সেটি হল ফ্রান্সের দি স্পাইর‍্যাল। রাজনৈতিক ডকুমেণ্টারি ছবি। চিলির গণ-নির্বাচনে জিতে কবি, মার্কসবাদী সালভা-দোর আলেন্দে জনপ্রিয় সরকার তৈরি করে-ছিলেন ১৯৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। আর ১৯৭৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন তিনি। এই তিন বছরে তাঁর শুধু নয়, সমগ্র চিলির রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও গতি-প্রকৃতিকে সংবাদ-চিত্র, স্থিরচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। বিরুদ্ধ পক্ষরা কিভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে কব্জা করে আলেন্দের বিপক্ষে কাজে লাগিয়েছিল, চতুর্দিক থেকে হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছিল, তারই অসামান্য দলিল এই ছবি।

ম্যাকমিলিয়ন সেন্সের এণ্ড অফ দি গেম একটা সাধারণ রহস্যধর্মী ছবি। দেখার আছে শুধু জ্যাকুলিন বিসেৎ ও জন ভয়েটের অভিনয়। তাছাড়া বিদেশের ছবির ছিলাটান চিত্রনাট্য অসাধারণ ফটোগ্রাফি নিয়ে হৈ-চৈ করার কোন কারণই নেই। অস্ট্রেলিয়ার দি গেটিং অফ উইসডম.. বা বেলজিয়ামের আই, টিনটিন কোন উৎসবেরই উপযুক্ত ছবি নয়।

৫ জানুয়ারি

সন্তোষ ছবিঘরের কয়ারে প্রথমেই দেখা হল তরুণ কান্নাড়া পরিচালক গিরিশ কাসারাবল্লীর সঙ্গে। শুনলাম ও'র নতুন ছবি আক্রমণ দেখানো হবে ইণ্ডিয়ান প্যানোরামাতে। এ-সপ্তাহে নয়, পরের সপ্তাহে। দেখতেও বলল গিরিশ। বয়স বেশি নয় ও'র,বছর তিরিশেক হবে, কিন্তু এর মধ্যেই সোরগোল ফেলেছে। গতবার মাদ্রাজের ফিল্মোৎসবে ও'র প্রথম ছবি ঘটশ্রাদ্ধ দেখেছিলাম। দারুণ শক্তিবান ছবি। বললাম, নিশ্চয়ই যাব। তোমার ছবি আমাদের ভালো লাগে।

হলে ঢুকে প্রোগ্রামের পাতায় চোখ বুলিয়ে বুঝলাম আজকের দিনটাকে আমেরিকার দিন বলা যায়। প্রদর্শনীর পাঁচটি ছবি-ই ও-দেশের। মার্টিন স্কর্সিসের দুটো আর পশ্চিম জার্মানীর পরিচালক ওয়ার্নার হারজেগের ছবি বাদ দেওয়া যায় না। অন্যান্য ছবিগুলোও জানি কলকাতায় রিলিজ হবে, কিন্তু কি আর করি। ছবি দেখতেই হল। অন্ধকার হলে বসে চোখ বুজে তো থাকা যায় না।

এলেন রুডলফের রিমেমবার মাই নেম-কে এই উৎসবে কেন দেখানো হল সেটাই ভাবছিলাম বসে। চৌত্রিশ সালের ফর্মুলায় তৈরি ছবিটির গঠনপ্রণালীতেও কোন আকর্ষণী শক্তি নেই। একমাত্র জেরাল্ডিন চ্যাপলিনের অভিনয় ছাড়া।

ভেবেছিলাম পরের ছবি আর দেখব না। কিন্তু স্করসিসের নাম দেখে বসে পড়তেই হল। ছবির নাম দি লাস্ট ওয়াল্‌জ। গানের ছবি। [illegible]

গাইয়ে-বাজিয়ে দলের সংগ্রামী সময়গুলোকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গান এই ছবির নব্বুইভাগ জুড়ে। অবশ্যই রক্ মিউজিকসহ। স্করসিসের নতুন মাত্রা হল ছবিটির বাঁধুনিতে, কাইক কাটিংয়ে। এবং গানের মধ্য দিয়েই তিনি দলটির বিকেন্দ্রীকরণ পর্যায়টিকে একটি নাটকীয় মুহূর্তে হাজির করেছেন। উৎসবের উপযোগী না হলেও সঙ্গীতপ্রিয়দের কাছে এই ছবির চাহিদা হবেই।

দুপুরবেলা অশোকা হোটেলে গিয়ে-ছিলাম প্রেস কনফারেন্সে। কান্নাড়া পরি-চালক টি এস নাগাভরণ [illegible] মালায়লাম পরি-চালক পদ্মরাজনের [illegible] আলোচনা হবে।

আমি এমনি[illegible] কম কথা বলি। চালাক সাংবাদিকদের মত চুপচাপ বসে শুধু অন্যের করা প্রশ্নের উত্তর টুকে নেই। সব সময়ই দেখি আমার প্রশ্নটা কেউ-না-কেউ করে ফেলছেই। উত্তরও পেয়ে যাই। কেউ না করলে অবশ্যই হাত তুলে স্কুলের ছাত্রর মত প্রশ্ন ছুঁড়তেই হয়।

নাগাভরণের ছবি গ্রহণ দেখেছি। ছবিটির প্রতিবাদী নায়ক পটুস্বামীর মৃত্যু স্বাভাবিক হলেও আরেকজনকে তিনি জীবন্ত করে তোলেননি, যাতে প্রতিবাদের ধারাটা অব্যাহত থাকতে পারে। ফলে ছবিটি হয়ে পড়েছে না-বাচক। পরিচালককে এ-প্রশ্নটা আমিই করলাম। করতেই হল। নাগা-ভরণ বলল—আমি আশাবাদী নই, তাই অমনটা করেছি।

যুক্তিপূর্ণ উত্তর নয় মোটেই। বললাম পরিচালক হিসাবে আপনার দায়িত্ব তাহলে কোথায় ?

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আগের মতই উত্তর এল —আমি তো আর বদলে দিতে পারব না সামাজিক ব্যবস্থাটা।

মালায়ালম ভদ্রলোককে অনেক বেশি ধূর্ত মনে হল। প্রশ্ন শোনার আগেই উত্তর তাঁর জিভের ডগায় রেডি যেন।

শুনেছি পদ্মরাজন কেরালার নামকরা লেখক। ও'র গল্প নিয়ে অনেক গা-গরমকরা ছবি হয়েছে ওখানে। কিন্তু নিজে যে ছবিটি করেছেন, সেটি একবারে অন্য চরিত্রের। নাম পেরুভ্জি আম্বলাম (কানাগলি)। প্রথম ছবি হিসাবে বেশ ভালো ছবি বলা যায়। ছবির শট টেকিং, সম্পাদনাও দারুন। গাঁয়ের আতংক দুশ্চরিত্র [illegible] প্রভাকরণকে মুহূর্তের উত্তেজনায় ও আত্মরক্ষার তাগিদে খুন করে বসে গাঁয়েরই এক শান্ত কিশোর। পুলিশের ভয়ে গ্রামে থাকতে পারে না সে, পালিয়ে যায়। গ্রামের লোকরাও তাকে আশ্রয় দিতে চায় না। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে [illegible]।

পদ্মরাজন দেখলাম কথা বলেন [illegible] কেরালার ছবিতে যে নতুন [illegible] তাতে তিনি আশান্বিত। যদিও [illegible] পঁচিশটি ছবির মধ্যে সিরিয়স ছবির [illegible] পাঁচটার বেশি নয়, তবুও তিনি এই আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে [illegible] প্রেস কনফারেন্সের বাকি সব প্রশ্ন [illegible]

জন-মিলিউর ছবিটি বিষয়গত ব্যাপারে আকর্ষণীয়, এবং পরিচালনার কাজে দক্ষতার ছাপ আছে। হারিয়ে-যাওয়া কিশোরী মেয়েকে খুঁজতে এসে প্রৌঢ় বাবা লস এঞ্জেলসের নিষিদ্ধ পাড়ায় কিভাবে এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হল, তাই নিয়ে গল্প। কিছু উত্তেজক দৃশ্যের আধিক্য থাকলেও, হার্ডকে'র উৎসবের ছবির মানটুকু অন্ততঃ ছুঁতে পেরেছে বলা যায়।

সন্ধ্যেবেলা নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক না দেখে অভিনয় হলে গেলাম পোলানস্কির রিপালসন দেখতে। একা নয়, প্রায় সবাই-ই। অথচ হলে জায়গা নেই। তাই নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর জায়গা মিলল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে দেখি একদল অমিতাভ বচ্চনের অনুরাগী হয়তবা উত্তেজনার বশেই পোলানস্কিকে ঘিরে সই আদায় করছে। পোলানস্কিকে তাঁদের চেনার কথা নয়। তাঁকে রক্ষা করার কেউ নেই। এক সময় বিরক্ত হয়ে ভিড় ঠেলে নিজেই চলে গেলেন।

রিপালসন ছবির সাবজেক্ট ভয়ানক মরবিড। ফ্রয়েড তত্ত্বের বিশ্লেষণে হয়ত বা নায়িকা চরিত্রের অস্বাভাবিক কাজ ও খুনী হবার হদিশ মিলবে। এক ধরনের সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত সে। পোলানস্কির ধীর, শান্ত অথচ বিস্ফোরক ট্রিটমেণ্ট এই ছবির প্রধান গুণ। ক্ষুর দিয়ে বাড়ির মালিককে খুন করার দৃশ্যটি সত্যিই বিকর্ষণের কারণ। নায়িকা পুরুষ-সঙ্গে বিরক্ত বোধ করে। পুরুষের প্রতি রাগ জন্মায় তার। দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করে সে। হ্যালুসিনেশন তাকে ঘিরে ধরে। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হয়।

পোলানস্কির শক্ত হাতে ছবিটি বাঁধা। আজকের দেখা সেরা ছবি বলতে পারি এটিকে।

৬ জানুয়ারী

যে কোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কখনই সব ছবিগুলোই প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে না। পড়তে পারে না. একশটি ছবির মধ্যে পঁচিশটি ভালো ছবি পেলেই উৎসবকে সার্থক বলা যায়।

কিন্তু এপর্যন্ত ব্যাঙ্গালোরে যে তিরিশটি ছবি দেখলাম, তার একটিকেও মনে ধরে রাখার মত লাগল না।

সুজি তেরায়ামার 'দি বক্সার'কে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। নাটক-ঘটনা-দুর্ঘটনা দিয়ে এক তরুণ বক্সারের পতন ও উত্থানকে পরিচালক সাজিয়েছেন আধুনিক প্রকরণ সম্ভারে। ছবিতে তাঁর কাজটুকুই যা দেখার।

মিখালকভ্-কনচালভস্কির 'সাইবেরিয়ান সাগা' প্রামাণ্য ছবি বলা যায়। সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত গভীর জঙ্গলে সাইবেরিয়ার মানুষদের জাগরণের ইতিহাসকে গল্পের মোড়কে সুন্দরভাবে ডকুমেন্টারি স্টাইলে তুলে ধরেছেন পরিচালক। পিরিয়ড পিস্ হিসাবে এ ছবি ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে। গভীর ভালোবাসা আর মমতা দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ছবি। প্রকৃতি, মানুষ আর বিপ্লবের গভীরতম

দি ইউরোপিয়ানস

অর্থগুলো পরিচালক প্রেমের ছোঁয়ায় দারুণ আবেগময় করে তুলেছেন।

জিরি মেনজেলের (চেকোশ্লাভাকিয়া) ছবি ভয়ানক নিরাশ করেছে। অবশ্য ষাটের দশকের সেই রমরমা আর নেই চেক ছবিতে। রাশিয়ার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের পরই দিন বদলে গেছে। শক্তিমান পরিচালকদের শিরদাঁড়ায় আঘাত পড়েছে। মিলোস ফোরমান প্রায় বিতাড়িত, অনেকেই নীরব। জিরি মেনজেল হাল্কা ধরনের গল্প নিয়ে আরও হাল্কা ছবি করছেন। উনিশ শতকের শুরুতে ভ্রাম্যমাণ একজন ফিল্ম ফেরিওলার দুঃখে ভরা জীবনীবৃত্তান্ত নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন 'দোজ ম্যাগনিফিসিয়েন্ট মেন উইথ দেয়ার ক্র্যাংকিং মেশিন'। মেনজেলের নাম শুনেই দেখতে বসেছিলাম নচেৎ হয়ত দেখতাম না। উৎসবের অনুপযুক্ত ছবি।

ইস্তভান গল্পের 'ব্যাপ্টিজম' (হাঙ্গেরি) পুরনো ছবি। এই ছবিও তৃতীয় শ্রেণীর। কোন উৎসবের উপযুক্তই নয়। দুই বন্ধুর বহু বছর বাদে গ্রামের বাড়িতে দেখা হবার পর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আদর্শগত বিরোধটাকে সাম্প্রতিক সময়ে এনে ফেলেছেন। ছবিটির বিশেষত্ব ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্যগুলির কাব্যময়তা।

তুলনায় স্পেনের ছবিটি কিঞ্চিৎ দর্শনীয়। তিরিশের দশকে স্পেনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি সম্যক পরিচয় অন্তত পাওয়া যায় ছবিটিতে। কাতালুনিয়া রাজ্যের প্রেসিডেন্ট সামরিক অভ্যুত্থানের পর ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। ঠিক সেই সময়েই জার্মানীর কাছে হেরে যায় ফ্রান্স। আশ্রয়প্রার্থী প্রেসিডেন্টকে তুলে দেওয়া হয় জার্মানদের হাতে। স্পেনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে কোর্ট মার্শাল করা হয়। বিচারের নামে প্রহসনের দিকটাই বড় করে দেখান হয়েছে এখানে। পরিচালক জোসেফ ফর্ন ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করেছেন, কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিতে। ডকুমেন্টারি স্টাইলটি ছবিটিকে মন্থর করে দিলেও অন্য উপায় ছিল না। ভালো লেগেছে এটুকু বলতে পারি।

আজকের দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে মালয়ালম পরিচালক পি-এ-বেকার আসছে

পারেন নি। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ও'র নতুন ছবি 'সংঘগণম্' প্যানোরামায় দেখেছি। প্রথম সপ্তাহের একমাত্র প্রতিবাদী ছবি। কেরালার তরুণ পরিচালকের অগ্রগণ্য তিনি। ঘোরাটে নয়, পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছবি করেন বেকার। 'সংঘগণম' চেহারায় প্রতীকধর্মী, অথচ দুর্বোধ্য নয়। দেখা হলে আশা ছিল উদ্দেশ্য কিছু কথা শোনার। হল না, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

তেলুগু পরিচালক বি-এস-নারায়ণ পাকা ব্যবসায়ী পরিচালক। প্রৌঢ়। কুড়ি বাইশখানা ছবি করে ফেলেছেন। 'নিমজ্জনম' তাঁর অন্য ধরনের ছবি। তিনি নিজেই বললেন 'এই ব্যবসায়ীচক্রের মধ্যে থেকে পরীক্ষামূলক ছবি করা মুশকিল।' কয়েক-জন সুহৃদের পয়সায় তিনি তৈরি করেছেন এই ছবিটি। নারায়ণ বললেন 'ভারতীয় নারীর আদর্শ ও মহত্বকে গ্লোরিফাই করার জন্যই আমি এ ছবি করেছি।' বিবাহিত একজন মহিলাকে এক কোচোয়ান ধর্ষণ করার পর মহিলাটি আত্মহত্যা করে এবং গাড়োয়ান সেই কথা জানার পর অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে মারা যায়। উপস্থিত কয়েকজন সাংবাদিক ব্রাহ্মণ-হরিজন ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে পরিচালককে একটু রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন' পারেন নি। একজন প্রশ্ন তুললেন নায়িকার কল্পনাটি নগ্ন দৃশ্যের বাড়াবাড়ি নিয়ে। পরিচালকের জবাব ছিল—'গাড়োয়ানের চোখ দিয়ে দেখালে ঐসব দৃশ্য অশ্লীল মনে হবার কোন কারণ নেই। আর বাড়াবাড়ি? ঐভাবে না দেখালে সঠিক ইমপ্যাক্ট পাওয়া যেত না।' ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এই ছবি করেননি। তাঁর কাছ থেকেই জানলাম তেলুগু ছবির জগতে এখন নতুন হাওয়া আসছে। গৌতম ঘোষের 'মাভূমি' [illegible]ধারার গণ্ডী মহলে নাকি আলোড়ন তুলেছে। আরও কয়েকজন সুস্থ রুচির ভালো ছবি করার চেষ্টা করছেন। শুধু কানাড়া মালায়লম নয় তামিল-তেলুগুও এগোচ্ছে—এটা আশার কথা।

৭ জানুয়ারী

সকালবেলা সান্তোম হলে শ্রী ভক্তবৎসল'র সঙ্গে দেখা গতকাল থেকেই গুজব শুনছি ইণ্ডিয়ান প্যানোরামার ছবি নির্বাচন নিয়ে নাকি প্যানেল মেম্বার ও উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে। এখানকার তরুণ কয়েকজন পরিচালক আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন' ও সত্যজিৎ রায়ের 'জয়বাবা ফেলুনাথ' তালিকা-ভুক্ত করায় তাঁরা অখুশী। এই ভক্তবৎসল ঐ প্যানেল কমিটির সদস্য। তাই দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু জানতে চাইলাম। উনি বললেন 'আপনাদের কলকাতার প্রেসের কাছে আমার আলাদা কিছু বলার আছে। কাইণ্ডলি আজ সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে আসুন। ছোট্ট একটা গেট টুগেদার আছে। গাড়িও পাবেন অশোক হোটেল থেকে ছাড়বে।'

গেলাম সময়মত, কিছু বিদেশী অতিথি আর তরুণ কয়েকজন দক্ষিণী পরিচালক ছিলেন। দেখা হল পি লংকেশ-এর সঙ্গে। কলকাতার গৌতম ঘোষকেও পেলাম। উনি 'মাভূমি' নামে একটি তেলুগু ছবি করেছেন। ইণ্ডিয়ান প্যানোরামায় দেখানো হচ্ছে ছবিটা। শ্রীভক্তবৎসল ও লংকেশ-এর কাছ থেকে জানলাম মৃণালবাবুর ছবি নাকি কমিটিকে না দেখিয়েই নির্বাচন করা হয়েছে। অথচ লংকেশের ছবি নাকি কমিটির অনুমোদন পেয়েও রয়েছে 'অপেক্ষা তালিকায়'। ক্ষোভটি ঐখানেই। এমনকি ও'রা আলাদাভাবে পাল্টা প্যানোরামা করার ব্যবস্থা করছেন। যেসব দক্ষিণী ছবি 'ভালো' হওয়া সত্ত্বেও প্যানোরামা'য় জায়গা হয়নি সেগুলোই দেখানো হবে। ভক্তবৎসল বললেন— 'এব্যাপারে আমি কাগজপত্র এখনও রেডি করতে পারিনি, হলে কালই আপনাদের দেবো।'

ওখানেই দেখা হল, পরিচয় হল লণ্ডন ফেস্টিভ্যালের প্রধান কেন ওয়েলস্টিনের সঙ্গে, লোকার্নো উৎসবের ডিরেকটর মিঃ বোসার্দের সঙ্গেও। ও'রা দুজনেই দেখলাম ব্যাঙ্গা-লোরের আতিথেয়তায় খুব সন্তুষ্ট। ও'দের প্রধান আকর্ষণ এখানে ইণ্ডিয়ান প্যানোরামা। নিয়মিত ছবি দেখছেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম অন্নপূর্ণা' আর টি-এস-নাগাভরণের 'গ্রহণ' খুব ভালো লেগেছে। হয়ত নিজেদের উৎসবে নিয়েও যাবেন। ওয়েলস্টিন ও বোসার্দ এখানে এসেছেন ভারতীয় ছবি বাছাই করতে। ও'রা এভাবেই পৃথিবীর সব উৎসব ঘুরে ঘুরে নিজেদের উৎসবের জন্য ছবি ঠিক করেন। আর আমাদের এখানে কি হয়? অবহেলাভরে দেওয়া বিদেশীদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট!

আজ ছবি দেখেছি মোট চারটে। কোনটাই তেমন ভালো লাগেনি। রাশিয়ার সাইবেরিয়ান সাগা অবশ্যই ভালো এবং অন্য জাতের ছবি। উডি অ্যালেনের 'ইনটিরিয়র' তাকে অন্য পরিচয়ে হাজির করেছে। অর্থনৈতিকভাবে আয়ুষ্মেণ্ট সমাজে উচ্চবিত্ত আমেরিকান পরিবারগুলো কিভাবে ভাঙছে তাই নিয়ে একটি বাস্তব-চিত্র হাজির করেছেন তিনি। স্যাটায়ারধর্মী ছবি করায় অ্যালেন সিদ্ধহস্ত, এই প্রথম তিনি বুঝি সিরিয়স ছবি করলেন। নেদারল্যাণ্ডের 'রেমব্রাঁ ফেস্টি ১৬৬৯'যে (জোন স্টেলিং) বিখ্যাত চিত্রকরের বুড়োপাকা-একাকী দিনগুলোকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। খুবই সাধারণ ছবি।

আজকের দেখা বিতর্কিত ব্যক্তিটি হলেন রোমান পোলানস্কি। দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন ছিল তাঁর। ভদ্রলোক বহুদিন হল পোল্যাণ্ড ছাড়া। এখন আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স ঘুরে ঘুরে ছবি করছেন। ফিল্মোৎসবে তাঁর সাতখানি ছবি নিয়ে রেট্রোসপেকটিভ হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরে আসা থেকেই তিনি হোটেলঘরে বন্দী। শুধু ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছেন। প্রেস রুমে ঢুকেই তিনি বললেন—'আই ডিসলাইক প্রেস পিপল এণ্ড আই হেট প্রেস কনফারেন্স অথচ পরবর্তী এক ঘণ্টায় খুব শান্ত মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে অতি চালাকের মত বহু প্রশ্নের জবাব দিলেন পোলানস্কি। দারুণ চটপটে আর বুদ্ধিমান ভদ্রলোক। ও'র ছবির মধ্যেও এই ক্ষিপ্রতার আভাস দেখেছি। অন্ততঃ 'ফুল দ্য সাক' ও 'ডান্সেস অফ ভ্যাম্পায়ার' ছবি দুটোতে।

কাল সত্যজিৎ রায়ের প্রেস কনফারেন্স আছে। অনেকেই দেখলাম সেজন্য উন্মুখ।

৮ জানুয়ারী

সকালবেলা অশোক হোটেলের কনভেনশন হলে সেমিনার ছিল আজ। বিষয় : ভারতীয় ছায়াছবির অর্থনীতি। মোটেই আকর্ষণীয় হয়নি আলোচনা। একদল লোক ধারাবাহিক বক্তব্য রেখেছেন, কাজের কথা কোনটাই নয়। দেশী বিদেশী সবাই-ই আলোচনা করালেন প্রাথমিক স্তরে। সমস্যার গভীরে কেউ গেলেন না। এবং এও জানি ছমাস বাদে এইসব বক্তৃতা-গুলো পুস্তিকাবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করবেন। দাম হবে কুড়ি টাকা। সে বই বিক্রী হবে না, এবং কাজের কাজ হবে না কিছুই। এই ধরনের সেমিনার থেকে আমাদের মত উন্নয়নশীল ধনবাদী দেশে কোন উপকার হতে পারে না। তবুও প্রতি বছরই উৎসবের সময় অন্যান্য তত্ত্বকথা টক দেবার মত সেমিনার আর [illegible] চালবাজি হয়ে আসছে।

আজ সারাদিনে ছবি দেখেছি চারটি। সব চাইতে ভালো লেগেছে পশ্চিম জার্মানীর '১+১=৩'। কাতারিনা নামে একটি কুমারী মেয়ের মা হওয়া ও সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে তার দুই প্রেমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব এই ছবির গল্প। একজন চায় শুধু কাতারিনাকে, সন্তানকে নয়। অপরজন দুজনাকেই। কিন্তু কাতারিনার পছন্দ একেবারে উল্টো। শেষ পর্যন্ত কাতারিনা নিজেই নিজের মত করে বাঁচে। সন্তান হয়। হাল্কা চালে, কিছুটা স্যাটায়ারিক্যাল ঢংয়ে বলা হয়েছে গল্প। চরিত্রগুলোর মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশও পেয়েছে সুন্দরভাবে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে এখন যেন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা একেবারে অন্য আলোয় বিশ্লে-ষিত হচ্ছে। এই ছবি তারই উদাহরণ।

মার্টিন রিটের নর্মা রে (ইউ-এস-এ) একদিকে প্রেমের ছবি অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক ছবিও বটে। আমেরিকার এক কাপড়কলে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার গল্প। কিন্তু প্রাধান্য পেল নর্মার প্রেম কাহিনী। পরিচালকের বলার ধরনেও তাঁর প্রেমজনিত মানসিক টানাপোড়েনের ব্যাপারটাই [illegible]

...হুয়েরের (হংকং) 'রেইনিং ইন দি মাউন্টেন' ও নিউজিল্যান্ডের 'স্কিন ডিপ' কোন উৎসবের উপযুক্ত ছবি নয়। নিতান্তই নিয়মরক্ষার জন্য বোধ হয় পাঠানো। অবশ্য দুটো দেশেরই ছবি করার কোন ঐতিহ্য নেই।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলন বসেছিল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। প্রচন্ড ভিড়ও ছিল। সত্যজিৎবাবুও ছিলেন খোস মেজাজে। ধীরে সুস্থে হাসতে হাসতে সব প্রশ্নের সামনা সামনি হয়েছেন তিনি। সেন্সর প্রথা সম্পর্কে তিনি বললেন 'এই সেন্সারটা উঠে যাওয়াই ভালো।' রাজনৈতিক ছবির বিষয়ে তাঁর মত হল 'প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি আমার ছবিতে থাকে না বটে, কিন্তু রাজনীতিহীন আমি করি না।'

দক্ষিণ ভারতের নতুন ছবির আন্দোলনকে তিনি স্বাগত জানালেন। তরুণ পরিচালকদের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করলেন। আর বললেন—'কলকাতায় ছবি করা এখন অসহ্য-প্রায় অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এক নম্বর কারণ লোড শেডিং'। শুরুতে কেউ কোন প্রশ্নই করছিলেন না। প্রায় মিনিট দেড়েক সব সাংবাদিককে নীরব দেখে সত্যজিৎবাবু নিজেই বললেন—'বোধহয় কারো কোন প্রশ্ন নেই। আমি বরং আমার নতুন ছবির কথাই বলি।'

'হীরক রাজার দেশে' নিয়ে মিনিট দশেক কথা বলার পর শুরু হয়েছিল প্রশ্নের পালা। চলেছে প্রায় এক ঘন্টা। প্রেস কনফারেন্স শেষ হতেই সোভিয়েত ডেলিগেশন এসে সত্যজিৎবাবুকে রুশ ছবির ষাট বছরের পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ পুরস্কার হাতে তুলে দিলেন। গত বছর এই পুরস্কার নিতে মস্কো যাবার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু কলকাতা থেকে রওনা হয়েও যেতে পারেননি। দিল্লীতে আটকে গিয়েছিলেন প্লেনের দেরী ছিল বলে। এখন সেই পুরস্কার নিলেন।

৯ জানুয়ারী

আজকের একটা ছবিতেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। দুজনের আইনগত বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আইন নির্দেশ দিয়েছে বাবা-ছেলের সাক্ষাৎ নিষেধ। কিন্তু দুজনার মধ্যে অদৃশ্য নীরব ভালবাসা আইন মানবে কেন! স্কুল থেকে চুরি করে কিশোর ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যায় বাবা। মা জানতে পেরে পুলিশের আশ্রয় নেয়। এবং আশ্চর্যের ঘটনা হল আইনের কাছে হাতকড়া পরতে হয় ভালবাসাকে। প্যাচপেচে আদর্শবাদী প্রেমিক বাংলা ছবি নয়। ছবিটির নাম 'সাইলেন্ট লভ'। পরিচালক নেদারল্যান্ডের রেনে ভন নী। ইউরোপের একটি সামাজিক সমস্যাকে তিনি অসাধারণ মানবিক আবেদন নিয়ে তুলে ধরেছেন পর্দায়। বাবার নীরব ভালবাসা গুরুত্বহীন হল আইনের কাছে এটাই ট্রাজেডি।

কানাড়া ছবি গ্রহণ

ব্রাজিলের ডায়রী অফ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়্যালিস্টয়ে (পরিচালনা : লুইজ রোজেম বার্গ) নগ্ন দৃশ্যের আধিক্য চোখকে পীড়া দিয়েছে। ছবির বক্তব্য চাপা পড়ে গেছে বাড়াবাড়ির আড়ালে। ব্রাজিলের শোষণ ও শাসনের চেহারাটাকে প্রতীকী রূপে তিনি সাজিয়েছেন হয়ত, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। রবার্ট অল্টম্যানের 'থ্রি ওম্যান' কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য ঠেকবে সাধারণ দর্শকের কাছে। ভায়োলেট পার্সোনালিটির গল্প। আগামুড়ো, অতীত-বর্তমানকে খুঁজে বার করা মুশকিল। কাল যে হলে এছবি দেখানো হবে সেখানে পয়সা ফেরৎ দিতে হতে পারে : কারণ ইতিমধ্যে শুনলাম চার-পাঁচটা ছবিঘরে সাতটি শো'এর পয়সা ফেরৎ দিতে হয়েছে। দর্শকরা দাবী করেছেন 'সেক্স-ভায়োলেন্স ছবিতে নেই আমরা ছবি দেখবো না।

সত্যজিৎ রায় পাঁচদিন আগে যে শহরকে 'ভারতের মধ্যে সব চাইতে ফিল্ম সচেতন শহর তকমা দিলেন সেখানেই এই অবস্থা! এই বুঝি সচেতনতার নমুনা! সর্বত্র এই নিয়ে হাসাহাসি চলছে। জনান্তিকে শুনলাম উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েকটি হলমালিকের মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে পুনরায় 'সচেতন দর্শকরা বাড়াবাড়ি করলে উৎসবই বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

অভাবনীয় ঘটনা। দিল্লী-বম্বে-মাদ্রাজ কলকাতা কোথাও কখনও এমনটি ঘটেনি। আন্তর্জাতিক প্রযোজক সংস্থার প্রধান মিঃ ব্রিস এখন ব্যাঙ্গালোরে। তিনি এসব শুনে থাকলে কি ভাবছেন কে জানে!

দুপুরবেলা অশোক হোটেলে গিয়ে দ্বিতীয় সাতাহের প্রোগ্রাম পেলাম। খুঁজে পেতে আশান্বিত হবার মত ছবি মিলল সাতটা। উৎসব পরিচালক শ্রীরায় না বললেন আরও খান পাঁচেকে ছবি আছে। অলঙ্কার আর বাদামী হাউসে সকাল বিকেল দেখাবার ব্যবস্থা হবে।

এতো মহাফাঁপরে পড়া গেল। সন্তোষ-অলংকার-অভিনয়-বাদামী হাউস একসঙ্গে ম্যানেজ করবো কি করে? অনেকদিনই দু-তিনটে ছবি একই সময়ে নানা হলে দেখানো হবে। পিক এন্ড চুজ ছাড়া উপায় নেই।

বেলা একটায় ছিল গ্রীক পরিচালক মাইকেল ক্যাকোয়ানিসের সঙ্গে আলাপ পর্ব। অমায়িক, ভদ্র, প্রাণখোলা লোক ক্যাকোয়ানিশ। গ্রীসের রাজনৈতিক ছবি করার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করলেন। ইউ এন আই-এর প্রতিনিধি মিঃ নাগপাল তাঁর কপিরাইট-করা প্রশ্নটি ছুঁড়লেন—ভারতীয় ছবি সম্পর্কে আপনার মত কি? উত্তরদাতার সাফ জবাব—নো কমেন্ট। সেকস এবং ভায়োলেন্স সম্পর্কেও ক্যাকোয়ানিশের স্পষ্ট জবাব—প্যারিসে গিয়ে প্রথমে আমি বু ফিল্ম প্রাণভরে দেখে নিই। তারপর দেখি সিরিয়াস ছবি। অর্থাৎ সেকস মানুষকে ক্লান্ত করে। ৭৮ সালে মাদ্রাজে ও'র পাঁচখানা ছবি দেখানো হয়েছিল, তখন আসতে পারেননি বলে দুঃখ করলেন। এবার মাদ্রাজ ঘুরে সেটুকু পুষিয়ে নিয়েছেন। গ্রীসের আর কোন পরিচালকের নাম তেমন করে শোনা যায় না কেন জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন—তরুণদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিবান খুবই কম। অ্যাঞ্জেলা পোউলস নামে একজন আসছেন, ও'র ছবি ভালো হচ্ছে।

এখুনি কালকের ছবির লিস্ট নিয়ে বসব। কোন ছবি ছেড়ে কোন ছবি দেখব তার ফাইনাল লিস্ট করতে হবে।

১০ জানুয়ারি

কাল রাতেই ঠিক করেছিলাম, রিডলি স্কটের দি ডুয়েলিস্ট না দেখে ওসিমার এম্পায়র অফ প্যাশন দেখবো আর নরওয়ের নেকসট অফ কিন-এর বদলে দেখবো অ্যনা করনিউর (ফ্রান্স) সিরিনগ্যার। ওসিমার ছবিটির জগৎজোড়া নাম শুনেছি। ঠিক এর আগের ছবি এম্পায়ার অফ সেনসেস্ বিতর্কের ঝড় তুলেছিল নানা উৎসবে, এমনকি খোদ জাপানেও আপত্তি উঠেছিল। সুতরাং আজ সকালে আর সন্তোষে যাইনি, সোজা অলঙ্কারে অবশ্য দুটো হলই একবারে পাশাপাশি।

সত্যিই, অসধারণ ছবি করেন ওসিমা। একবারে চেয়ারের সঙ্গে সেঁটে বসিয়ে রাখেন। তাঁর এই ছবির বিষয় প্রেম, লাগাম-ছাড়া প্রেম। দুই অসম বয়সী স্ত্রী-পুরুষের প্রেম। প্রেমিকার স্বামীকে খুন করে দুজনে পথকে নিষ্কন্টক করে দেয়। তারপরই দুজনের মানসিক ভীতি নিয়ে পরিচালক শুরু করেন গভীরে খোঁড়া-খুঁড়ি। সমাজ বা রাজনীতির কোন আলোচনা নেই, একেবারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছবি।

পরিচালকের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের তারিফ না করে উপায় নেই। ফিল্মোৎসবের অন্যতম সেরা ছবি এটি। পরের ছবি গিরিনয়েরি কিন্তু ভালো লাগল না। খুন আর প্রেমের গল্প। নিতান্তই সাধারণ ছবি। এবং না-বাচক। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, যত সাধারণ ছবিই হোক না কেন, মেকিং কিন্তু সাধারণ নয়। বাংলা ছবির মত নাটক তৈরি করে গল্প বলেন না এ'রা। ক্যামেরা দিয়ে বলেন। আধুনিক ভঙ্গি ও প্রকরণগুলো এ'দের একেবারে আত্মস্থ।

দুপুরবেলা অশোক হোটেলে আজ লাঞ্চের নমন্তন্ন করেছিলেন উৎসব পরিচালক শ্রীরায়না। সুইমিং পুলের লাগোয়া ময়দানে খাবার আয়োজন। এই প্রথম দেখলাম সরকারী পর্যায়ের অনুষ্ঠানে বীয়র সার্ভ করা হচ্ছে। খেতে খেতে দেখা হল দেবিকারানীর সঙ্গে। মৃণাল সেন আর রায়নার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কলকাতার লোক পেয়ে বলেন—আহ। অনেকদিন পর বাংলায় কথা বলতে পারছি। অমায়িক মহিলা। বয়স হলেও এখনও জৌলুষ কমেনি। কলকাতার ছবির খবরাখবর নিলেন। কলকাতায় যাবার নেমন্তন্ন করতে তিনি বললেন—ইচছো তো হয়, কিন্তু সময় পাচ্ছি না যে। তবুও বি এফ জে-এর আগামী উৎসবে আসার জন্য নেমন্তন্ন করলাম। তিনিও পাল্টা নেমন্তন্ন করলেন সোমবার সকালে ও'র বাড়িতে যাবার জন্য। যাবো কথা দিয়েছি। দুপুরের শোয়ে কিউবার **দি সারভাইভরস** দেখানো হবে। পরিচালক টমাস আলেয়া। সুতরাং তাড়াতাড়ি খেয়েই চলে আসতে হল হলে। আসার মুখে শ্রীরায়না হাতে হাত জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এনি ডিফিকালটি ? খাঁটি হোস্ট। পেছনে ভদ্রলোকের অনেকে অনেক কথাই বলেন। কিন্তু রায়না সবার সঙ্গেই অমায়িক, হাসি দিয়ে অভ্যর্থনায় কোন ক্লান্তি নেই। কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মত আচরণ করেন। মিথ্যা দূরত্ব রাখেন না।

আলেয়ার সারভাইভরস বা হাঙ্গেরির ছবি হাঙ্গেরিয়ন র‍্যাপসডি কোনটাই মন ভরাতে পারল না। হয়ত আশাটা ছিল অতিরিক্ত। সন্ধ্যেবেলাও আবার ভুল করলাম। জেমস বিজেসের চীনা সাইনড্রোম বাদ দিয়ে দেখতে গেলাম কাকোয়ানিসের গার্ল ইন ব্ল্যাক। মনকে সান্ত্বনা দিলাম—সব ফেস্টিভ্যালেই এমন হয়। কি আর করা যাবে।

আজ সকালে সত্যজিৎ রায়ের ওপর সেমিনার ছিল। সেখানেও যেতে পারিনি। প্রবোধবাবুর (পশ্চিমবাংলা রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি গিয়েছিলেন) কাছ থেকে শুনলাম—সেমিনার নাকি দারুণ জমেছে। গার্ডিয়ান পত্রিকার সমালোচক ডেরেক ম্যালকম বলেছেন—আপনারা সত্যজিৎ রায়কে সংস্কৃতির মন্দির করে তুলেছেন। কিন্তু সেই মন্দিরের সংস্কার করছেন না। আর সবাই মুখ খুলে তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। জাপানের মাদাম কাওকিয়াতা, লন্ডনের কেন ওয়ালিশ্চিন, [illegible] জার্মানীর এডমন্ড লুফৎ আমাদের মৃণাল সেন, গিরিশ কারনাড সবাই-ই নাকি উচ্ছ্বসিত সত্যজিৎবাবুর কাজ নিয়ে।

১১ জানুয়ারি

কলকাতা থেকে এপর্যন্ত অল্প কয়েকজনকেই দেখলাম। পিনাকী মুখার্জি দুবেলা ছবি দেখেছেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এসে থেকেই **নিম অন্নপূর্ণার** প্রমোশন নিয়ে ব্যস্ত। নানা জায়গায় দু-তিনটে শো করেছেন। অশোক হোটেলের প্রথম শোয়ে গিয়েছিলাম। জায়গা খুবই ছোট। বিদেশী অতিথিরা অনেকেই ছিলেন। আমার সামনে আর পাশে বসেছিলেন ইজিপ্ট এবং সুইজারল্যান্ডের দুই সাংবাদিক। ছবিতে সাবটাইটেল ছিল না। ও'রা বললেন সংলাপগুলো অনুবাদ করে দিতে, বুঝতে পারছেন না। বুদ্ধদেববাবু নিজেও ট্রানস্লেট করছিলেন, কিন্তু শোনা যাচ্ছিল না। অগত্যা ফিস-ফিস করে অনুবাদ করতে হল। ছবি শেষ হবার পর সুইস সাংবাদিক আমব্রুস আইসেনবার্গার বললেন, পরিচালক ভদ্রলোক শুনেছি কবি, এ-ছবিও তাই হয়েছে—পোয়েট্রি অন পোভার্টি। ইজিপ্টের সুলেমান সাহেব অন্ধকারে বসেই অনেক নোট নিলেন দেখলাম।

সকালবেলা মিকলোস জাঁকসোর অ্যালেগ্রো বারবারো দেখেছি। একই ধরনের ছবি। ব্যালে নাচ, গান আর সবুজ মাঠের ব্যাকগ্রাউন্ডে হাঙ্গেরির ইতিহাসকে বলা হয়েছে। বলার ভঙ্গিটা পুরনো। কিঞ্চিৎ একঘেয়ে লাগছে। জাঁকসোর আগের পাঁচটা ছবিও একই ধরনে তৈরি। জানি না ও'র নিজের দেশে ছবিগুলো দর্শকরা কিভাবে নেয়। কলকাতায় একবার একজন হাঙ্গেরিয়ান সাহিত্যিক বলেছিলেন, জাঁকসোর ছবির বাজার নাকি দেশের বাইরে। হতেই পারে।

সামনের একটা হলে আজ থেকেই পাল্টা প্যানোরামার ছবি শুরু হবার কথা। শুনেছিলাম, ওখানে পি লংকেশের বিতর্কিত ছবি **এলিণ্ডালো বাংভারু** দেখানো হবে। নরওয়ের **সাইলেন্ট মেজরিটি** ছেড়ে গেলাম সেখানে। প্রায় ফাঁকা হল। খুব বেশি হলে পঞ্চাশজন উপস্থিত। সাবটাইটেল নেই। প্রায় কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন হ্যান্ড আউটও পাইনি। আধঘণ্টা থাকার পর বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। ডায়ালগ বুঝতে না পারলে অন্ধের ছবি দেখার মতই ব্যাপারটা দাঁড়ায় যদি না প্রকরণের মর্মভেদী ক্ষমতা থাকে। পি লংকেশের সে-ক্ষমতা নেই।

দুপুরের প্রেস কনফারেন্সে আজ দেখা হয়েছে উৎপল দত্ত আর হাঙ্গেরির ইস্তভান গালের সঙ্গে। উৎপলবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বামমার্গী জোরালো বকতব্য রাখলেন। ঝড় নিয়েও অনেক কথা চালাচালি হল। ছবি এখনও দেখিনি, সুতরাং নো কমেন্ট। গালের চারটি ছবি রয়েছে এই উৎসবে। তিনি বললেন, তাঁর ছবিতে রাজনীতি থাকবেই। রাজনীতি ছাড়া জীবন হতে পারে না। হয় না।

আজকের একমাত্র ভালো লাগার ছবিটি ছিল ব্রাজিলের **দি রিটার্ণ অফ দি প্রোডিগাল সন**। গ্রাম থেকে শহরে আসা বেকার এক যুবকের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। হতাশ যুবকটি গ্রামে ফিরে অন্ধ মায়ের হাতে খুন হয়ে যায় ঘটনাচক্রে। নাটকীয় পরিণতি। কিন্তু শেষ দৃশ্যে মেঘে ঢাকা তারা-র গীতার মত আবার আরেক যুবক শহরের পথে পা বাড়ায়। ছবিটির শৈল্পিক মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যায় তখুনি। ইপোতজুকা পোন্তিসের পরিচালনার কাজও পরিচ্ছন্ন।

দুপুরের শোয়ে দেখেছি কানাড়ি ছবি টি এস রঙ্গের সাবিত্রী। নব্যসিনেমা আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা নাকি তিনি। ধর্মীয় সংস্কার নয়, এ-ছবিতে তিনি বেছে নিয়েছেন দুই প্রতাপশালী শক্তির পুরনো বিরোধকে। একটি নিষ্পাপ প্রেম এই বিরোধের মধ্যে পড়ে কিভাবে ধ্বংস হল তাই নিয়ে গল্প। তিনি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন। কিন্তু তাঁর আঙুলে তেমন তেজ কম। নেগেটিভ ছবি। শেষও হয়েছে সেইভাবে।

সন্ধ্যেবেলা রাজ্যপাল সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিলেন চা খেতে। রাজভবনের লনে আয়োজন। বাদ্যভাণ্ড দিয়ে স্বাগত জানানো, সকলের সঙ্গে হাত মেলানোয় ত্রুটি ছিল না। আমার চোখ ঘুরছিল টমাস আলেয়াকে দেখতে। কিন্তু ভিড়ে খুঁজে পেলাম না। শুনেছি, গতকাল নাকি তিনি এসেছেন। মনটা খুব খারাপ। এত কাছে পেয়েও ভদ্রলোককে মেমারিজ অফ আণ্ডার ডেভালাপমেন্ট-এর বাংলা অনুবাদ করা বইটা দিতে পারব না। আমারই করা। কলকাতা থেকে আনানোরও কোন উপায় নেই। কাল অবশ্য দেখা হবে। প্রেস কনফারেন্স আছে। তখন না হয় কথা বলে ঠিকানাটা জেনে নেবো।

১২ জানুয়ারি

ব্যাঙ্গালোরের এই উৎসবে সবচাইতে বেশি ছবি এসেছে ইউ এস এ থেকে। দু-তিনদিন আগেই রবার্ট আলটম্যানের থ্রি ওম্যান দেখেছি। আজ সকালে ও'রই ছবি ক্যুইনটেট ছিল। যাইনি। আমেরিকান ছবি দেখতে দেখতে দুর্বল হয়ে পড়ছি।

শুধু উৎসব নয়, ভারত সরকারের ঝাপসা আমদানি নীতির জন্যই এমন ঘটছে, আমেরিকা যত ছবি পাঠাচ্ছে, সবই নিতে হচ্ছে। উপায় নেই। যে-ছবিগুলো এক-দু বছর বাদে এখানে রিলিজ হবেই, সেগুলোকেও উৎসবের ছবি হিসাবে গণ্য না করে উপায় নেই। সারা বছর ও-দেশ থেকে প্রায় দেড়শো ছবি আসে।

পরে গিয়ে শুনলাম ক্যুইনটেট নাকি প্রচণ্ড প্রিটেনসাস ছবি। অনেকেই বুঝতে পারেননি পরিচালকের বকতব্য। পরের ছবি ছিল ব্রাজিলের বিখ্যাত রায় গুয়েরার **দি গানস**। হতাশ--যন্ত্রণা দারিদ্র্য কুসংস্কার শোষণের বিষয়ে তোলা একটি অনবদ্য ডকুমেন্টারী এটি। খরা-পীড়িত একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে নিখুঁত ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন পরিচালক। সৈনিকদের

মুখোমুখি হয়ে জনতার তীব্র প্রতিরোধের দৃশ্যগুলি অবশ্যই অত্যন্ত সংযত হাতে পরিচালনা করেছেন। না-খেতে পাওয়া শোষিত মানুষের গরু কেটে খাওয়ার দৃশ্যটি ভয়ানক, অথচ তীব্রভাবে শিল্পসুষমান্বিত।

পাশের হল অলঙ্কারে দেখানো হচ্ছিল জাপানের ছবি ওগিন—**হার লভ এন্ড ফেথ**। পরিচালক কী কুমাই। পুরো ছবিটা দেখা হয়নি। ষোড়শ শতকের পটভূমিতে যখন খ্রীস্টধর্মের প্রচার ও-দেশে বে-আইনী—একটি মেয়ের সঙ্গে এক কিশ্চানের ভালোবাসার গল্পকে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেছেন। সেই সময়ের রাজনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণগুলো খুব সুন্দর। তবে এ-ছবির প্রধান আকর্ষণ তোশিরো মিফুন।

সাড়ে বারোটায় ছিল আজকের প্রেস কনফারেন্স কিউবার পরিচালক টমাস গুইতেরেজ আলেয়ার সঙ্গে। সেই বিখ্যাত ছবি **মেমোরিজ অফ আণ্ডার-ডেভালাপমেণ্ট**-এর পরিচালককে সামনাসামনি দেখার আগ্রহ ছিল মনে মনে। কিউবা সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য জানারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শুরুতেই আশাভঙ্গ হল সঙ্গে দোভাষী দেখে। অবশ্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে নিজেই উত্তর দিলেন। দোভাষীর সাহায্য তেমন নেননি। প্রথমটায় কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। আলেয়া নিজেই ওঁর ছবি **সারভ ইভরস** সম্পর্কে বললেন কিছুক্ষণ। তারপর প্রশ্ন ছোঁড়া শুরু হল। তাঁর কাছ থেকেই শুনলাম, বছরে ৮-১০টির বেশি ছবি সেখানে হয় না। এখন কিউবার সরকার সরকারী নীতির সমালোচনাকে স্বাগত জানায়। তবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোন ছবি করার অনুমতি নেই। তারকা-প্রথাও ওখানে আছে। এবং তারকাপ্রীতির জনাই নাকি তাঁর এই রূপক ব্যঙ্গধর্মী ছবি **সারভাইভরস** ভালো ব্যবসা করেছে কিউবায়।

তাড়াহুড়োতে খুব অল্প সময়ে প্রেস কনফারেন্স শেষ হতেই আলাদা করে নিয়ে বসলাম আলেয়াকে। ওঁর **মেমোরিজ**-এর চিত্রনাট্য বাংলায় অনুবাদ করেছি শুনে ধন্যবাদ জানালেন। একটা কপি চাইলেন। ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউটের একদল ছেলে এসে ভিড় করতে আমিই সরে এলাম, বললাম—পরে দেখা করব।

সন্তোষ থিয়েটারে পরের ছবি বেলজিয়ামের **দি এন কেলোজারস**। পরিচালক জাঁ গুয়েত। কোন সংলাপ নেই ছবিতে। নায়ক এক বোবা-কালা চিত্রশিল্পী। পাহাড়ের ওপর একটা পোড়ো বাড়িতে থাকে। নির্জনতা তার একমাত্র বন্ধু। একটা দূরবীণ দিয়ে প্রকৃতিকে কাছে এনে শুধু ছবি আঁকে সে। হঠাৎ একদিন আরেক নির্জনতাপ্রেমী শিল্পী হাজির হয় সেখানে বান্ধবীকে নিয়ে। ঐ মেয়েটির সঙ্গে নায়কের নীরবে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় ক্ষণিকের জন্য। ওরা বিদায় নিলে আবার সে একা। শুধু স্মৃতি নিয়ে বসে থাকে। পরিচালক দক্ষতার সঙ্গে কোনো সংলাপ ছাড়াই গল্পটি বলেছেন। সহজ-সরল ট্রিটমেন্ট।

সেইন-হুঁ (নরওয়ে)

ইণ্ডিয়ান প্যানোরামায় দুপুরের শোয়ে আজ ছিল মৃণাল সেনের নতুন ছবি **একদিন প্রতিদিন**। মৃণালবাবুর সেরা ছবি এটি। বিপ্লব বা রাজনীতির কথা আলোচনা না করেও দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ে ছবি করলে সেটা যে কতখানি রাজনৈতিক হতে পারে, তার প্রমাণ এই ছবি। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গোড়ায় আঘাত দিয়েছেন। ঘটনা সামান্যই। সাতটি মাথার সংসারে একমাত্র রোজগেরে মেয়ে অফিস থেকে ফিরতে দেরি করছে। শেষ পর্যন্ত সে ফিরেছে ভোর রাত্রে। এই সময়টুকুতে ঐ পরিবার ও প্রতিবেশীদের আচার-আচরণে কথাবার্তায় নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের একটা টুকরো উঠে এসেছে পর্দায়। স্বার্থপরতা সংকীর্ণতা আত্মসম্মানবোধ গুলোকে নিয়ে দারুণ ব্যঙ্গ করেছেন। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেও যে রাজনীতি রয়েছে, সেদিকে আঙুল তুলেছেন এবার। কোনো দলীয় রাজনীতির প্রচার নয়, জীবনের দুঃখ-হতাশাগুলোও যে কিভাবে রাজনীতির মোড়কে আশ্রয় নেয় তাই তিনি দেখিয়েছেন। দেখানোর ভঙ্গিও খুব সহজ সরল স্বাভাবিক। তাই বাস্তব-জীবনের অনুসারীও বটে।

এক মুহূর্তের জন্যও মুঠো আলগা হয়নি মৃণালবাবুর। খুব সংযত হয়ে অতি-নাটকীয়তা এড়িয়ে ঘটনাকে নাটকীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এই ছবি দেখার পর মৃণাল-বাবুকে বলতে ইচ্ছে করছিল, জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ছবি করলেই রাজনৈতিক ছবি হয়, আলাদা করে স্লোগান শোনানোর দরকার নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখি একদল বিদেশী অতিথি তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কিছু আর বলা হল না।

এই ছবির আর দুটি বড় প্রসাদগুণ হল কে কে মহাজনের ক্যামেরা ও বি ভি কারনাথের আবহসঙ্গীত। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে দিম-দিম শব্দে ড্রামের বাজনা সেতারের নীচু লয়ে সুর এবং বাইরের অন্যান্য সাউণ্ড এফেকটের মিকশ্চারে একটি সুন্দর আবহের সৃষ্টি হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই ছবি যদিও অনেকের মতে ইণ্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে নাকি 'বে-আইনী'ভাবে ঢুকেছে, কিন্তু ভারতের ছবির মুখ রেখেছে এই ছবিই। বিদেশী অতিথিরা সবাই প্রশংসা করেছেন। এবং সম্ভবত প্যানোরামার সেরা ছবি হবে এটাই।

যাই হোক, সন্ধ্যেবেলা চলে গেলাম সুইৎজারল্যাণ্ডের ছবি 'লিটল এস্কেপ' দেখতে। ছবির মহিলা প্রযোজক ম্যাডাম এলিয়া স্টুর্টাহাইন দুপুরবেলা অশোক হোটেলে বলেছিলেন—'অবশ্যই আমার ছবি দেখতে এসো।' নইলে প্রথমে ঠিক করেছিলাম কাহিনের 'কায়রো স্টেশন' দেখতে যাবো। যাওয়া হল না।

মিনিট কুড়ি দেখার পর ভালো লেগে গেল ছবিটা। বৃদ্ধ এক দিনমজুরকে ঘিরে ফার্মের মালিক ও তার পরিবারের ভেঙে যাওয়ার গল্প। আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাই-বোন-বাবা-কর্মচারীর সম্পর্ক-গুলোকে সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন পরিচালক। পেনসনের টাকায় একটা বাইক কিনে বুড়ো লোকটির জীবনের শেষ সময়ে দেশ দেখার নেশা চাপে। এই পর্বটাও সুসংবদ্ধ। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে কর্মচারীর শারীরিক সম্পর্কের দৃশ্য দুটি খুব চকিতে এসেছে চলে গেছে। প্রস্তুতি তেমন ছিল না। তবে দুটি দৃশ্যই দুঃসাহসিক। বিয়োগান্তক পরিণতি ছবিটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। নির্দেশক ইভ ইর্সিন দক্ষ পরিচালক। সুইৎজারল্যাণ্ডের ছবি-জগতে তাঁর জায়গা কোথায় জানি না নিশ্চয়ই প্রথম সারিতে। অন্তত এ-ছবি তৈরির পর তাঁর পদোন্নতি হওয়া উচিত।

১৩ জানুয়ারী

আজকের দিনটাকে উৎসবের সেরা দিন বলতে পারি। অন্তত ছবির দিক থেকে। একেতো এই উৎসবে 'ভালো' ছবির সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়, তায় একদিনে যদি চার-পাঁচটা প্রথম শ্রেণীর ছবি পাই তাহলে আর সেটিকে স্মরণীয় দিন বলব না কেন?

পঃ জার্মানীর ফাসবাইণ্ডার ফিল্ম জগতে একটি বিতর্কিত নাম। একটা সময় তিনি বছরে পাঁচ-ছটি ছবিও করেছেন। এখন গতি একটু কম। ব্যাঙ্গালোরে ওঁর তিনখানা ছবি আছে। আজ দেখলাম প্রথমটি: 'ম্যারেজ অফ মারিয়া ব্রাউন'। গত বছর বার্লিনে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি এই ছবির জন্য। শিল্পী হানা স্কাইগুলো আছেন প্রধান চরিত্রে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরের জার্মানীর এক দম-আটকে আসা অন্ধকার ছবিতে তিনি তুলে এনেছেন। ভেঙে-পড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মূল্যবোধগুলোর পরাজয় ইত্যাদির প্রেক্ষিতে প্রধান চরিত্রটির মানসিক বিশ্লেষণ করেছেন সুন্দরভাবে। তাঁর প্রধান গুণ হল নাটকীয় উপাদান, গল্পের গতি, ও বিশ্লেষণী ভঙ্গি কখনও হাতছাড়া হয়নি। পাশাপাশি চলেছে।

কানাড়া ছবি আক্রমণ

চিলির মিগুয়েল লিটিনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গত বছর দিল্লিতে। থার্ড ওয়ার্ল্ডের একজন প্রতিবাদী চলচ্চিত্রকার হিসাবে তিনি সুপরিচিত। এবং তাঁর 'জ্যাকল অফ নাহুলতোরো' ছবিটিরও খ্যাতি রয়েছে জগৎজোড়া। আজকের দিনের দ্বিতীয় ছবি ছিল ওটা। অসাধারণ পাওয়ারফুল ছবি। ক্যামেরা মুভমেন্ট বুকে এসে যেন ধাক্কা দিতে চায়। বিপ্লবী কোন কথা নেই ছবিতে। ছবিতে ব্যঙ্গ করা হয়েছে মৃত্যু-দণ্ডের ব্যবস্থাটিকে। একটি লোক ক্ষিধের জ্বালায় অস্থির হয়ে মাতাল অবস্থায় একটি পরিবারের পাঁচজনকে কয়েক মিনিটের মধ্যে খুন করে ফেলে। সেই খুনীর বিচার হয় মৃত্যুদণ্ড। ঠাণ্ডা মাথায় একদল শিক্ষিত পেটপুরে খেতে পাওয়া লোক একজন গরীব মানুষকে শাস্তির নামে 'খুন' করল। লিটিনের বক্তব্য পরিষ্কার, সরাসরি এবং তীক্ষ্ণও।

কিউবার ছবিটা (এ ম্যান, এ ওম্যান, এ শিফট) মনে হয়েছে খাঁটি প্রচার-ধর্মী আদর্শবাদী রাশিয়ান ছবির কার্বনকপি। কিউবার কাছ থেকে একবারে অন্য চরিত্রের ছবি পাব আমরা আশা করে-ছিলাম। আশাভঙ্গ হল। রেনে ভন নীয়ের দ্বিতীয় ছবি 'দি ডেডলি সিন' প্রকরণে অতি আধুনিক পোশাক। একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতার অতীত ও বর্তমান জীবনকে নিয়ে তিনি একটু বালখিল্য চপলতায় মেতে ছিলেন যেন। মাংসল দৃশ্যের আধিক্য দর্শকদের খুশি করলেও আসল রস থেকে বঞ্চিত হবেন তাঁরা। বাইবেল ও গ্রীক নাটকের নাট্যভঙ্গিতে গড়ে তোলা হয়েছে প্রধান শিল্পীর জীবননাট্য।

দিনের শেষ ছবি 'ক্যামেরা বাফ' (পোল্যান্ড) আনন্দ দিয়েছে এটুকু বলতে পারি। বাড়তি নম্বর সে পাবে না।

দুপুরে অশোক হোটেলে মৃণাল সেন সাংবাদিকদের সামনে শ্রীভক্তবৎসলের অভি-যোগের জবাব দিলেন। তেমন জোরালো ছিল না তাঁর বক্তব্য। শুধু বললেন—তাঁর ছবি প্যানেল কমিটিকে না দেখিয়েই নির্বাচন করা হয়েছে, একথা সত্যি! কিন্তু এমন ঘটনা সব আন্তর্জাতিক উৎসবেই হয়ে থাকে! এ-নিয়ে এত হৈ-চৈ-এর কি আছে? বিদেশী অনেক অতিথির কাছ থেকে তিনি নাকি শুনেছেন এবারের প্যানোরামায় ছবির মান নাকি খুবই খারাপ। সেক্ষেত্রে একটি ভালো ছবিকে জায়গা করে দেবার জন্য আইনের বিধি লঙ্ঘিত হলে দোষটা কোথায়?

কিন্তু এখানকার লোকেরাতো সে কথায় কান দিচ্ছে না। চিৎকার চলছেই। আজও শুনলাম মিনি প্যানোরামার ছবি প্রায় শূন্য ঘরে শুধু প্রোজেকশনিস্ট-ই দেখছেন।

১৪ জানুয়ারী

কাল রাত্রেই আজকের প্রোগ্রামটা নিয়ে বসেছিলাম। সকালবেলা অলঙ্কার ও সন্তোষ দুটো হলেই ভালো ছবি রয়েছে, অন্তত পরিচালকের নাম দেখে মনে সেরকম হচ্ছিল। দুপুরবেলা আবার দেবিকারাণীর সঙ্গে দেখা করার কথা। এতদূর এসে ভারতের সিনেমার প্রথম মহিলার সঙ্গে দেখা করব না, তা কি করে হয়। উপরন্তু তিনি যখন কলকাতার মেয়ে। সম্পর্কে রবি ঠাকুরের কেমন যেন ভাইঝি হন। অশোক হোটেলে ১০ তারিখ লাঞ্চ খাবার সময় দেবিকারাণী নিজেই বলে-ছিলেন, 'এসো না ভাই, অনেকদিন পর একটু মন খুলে বাংলায় কথা বলব।'

সুতরাং সকালবেলা ইতালীর ছবি বাদ দিয়ে প্রথমে গেলাম অলঙ্কার হলে। সেখানে দেখানো হল ব্রাজিলের ছবি 'ব্যারেন লাইভস'। পরিচালক আন্তর্জাতিক খ্যাত নেলসন পেরিয়ারা দ্য সান্তোস। ব্রাজিলের 'নতুন সিনেমা' আন্দোলনের সত্যজিৎ প্রায় বলা হয় তাঁকে। ছবিটা তোলা হয়েছে ১৯৬৪তে। কিন্তু ছবির আবেদন আজও সমান। ক্লাসিক ছবির গুণই এই। সময় স্থান পেরিয়ে সে এগিয়ে যায়। ছিন্নমূল একটি নিঃস্ব পরিবারের যাযাবরী জীবনকাহিনী নিয়ে এই ছবি। নিষ্ঠুর বাস্তবকে ঘিরে জীবনের বিস্তার। পুলিশের অত্যাচার, জমিদারের পীড়ন, দারিদ্রের যন্ত্রণার সর্ব-কালীন চেহারা পরিচালকের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় যেমনি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে তেমনি শিল্পময়।

দুপুরবেলা রুশ ছবি না দেখে যেতে হল পুণার তরুণ স্নাতক জাটলার প্রথম ছবি 'প্রত্যুষ' দেখতে। প্রায় জোর করেই নিয়ে গেল সে। শুধু আমি নয়, মৃণালবাবু, লণ্ডন উৎসবের ক্যান ওয়েলশিচন, মাদাম কাওকি-য়াত্তা, লোকার্নো উৎসবের পরিচালক, বুদ্ধ-দেব দাশগুপ্ত ও আরও কিছু বিদেশী অতিথিরাও ছিলেন।

'প্রত্যুষ'-এর বিষয়বস্তু খুবই আবেদন-সমৃদ্ধ এবং নাট্যধর্মী। অথচ পরিচালক জাটলা ঠিকভাবে চিত্রনাট্যটি তৈরি করতে পারেননি। অসম্ভব আলগা বাঁধুনি। এবং শেষ নাট্য-মুহূর্তটিও বাঞ্ছিত পর্যায়ে পৌঁছয়নি। এক দেবদাসী, অর্থাৎ এক বেশ্যা, মেয়েকে সে আর দেবদা[illegible] করতে রাজি নয়। ভালো ঘরে বিয়ে দি[illegible] সংসারী করতে চায় সে মেয়েকে। [illegible] গ্রামের লোকরা তাতে রাজি নয়। [illegible] উদ্ভট এক ওঝানী এসে বলে গ্রামে[illegible]র্দশা ও দেবদাসীর মায়ের অসুখের [illegible] নাকি তার এই আবধ্যতাই দায়ী। শেষ [illegible]ত একঘরে করে দেওয়া হয় তাকে। [illegible] অত্যাচারের যন্ত্রণায় মেয়েকে দেবতার কাছে বলি দেয় সে। বিষয়বস্তু জোরদার হলেও ফর্ম তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারেনি। অত্যন্ত স্লো। ক্লান্তিকর। আবহসঙ্গীতের ব্যবহারও বিষয় ও দৃশ্যের অনুসারী নয়। তবে একটা কথা—প্রথম ছবি [illegible]সাবে পরিচালককে ক্ষমা করতে হবে। প্যানোরামা বিভাগে যা সব ছবি দেখছি তার তুলনায় অবশ্যই সাহসিক প্রচেষ্টা বলব। আশা করা যায় দিল্লি উৎসবের প্যানোরামায় এই ছবির জায়গা হবে।

পরের ছবি দেখলাম চিলির 'জুলিও স্টার্টস ইন জুলাই'। পরিচালক সিলভিও কাওজ্জি। এই শতাব্দীর বিশ শতকের প্রেক্ষিতে এক জমিদার পুত্রের 'প্রাপ্তবয়স্ক' হয়ে ওঠার গল্প এটি। সাধাসিধে ভঙ্গিতে বলা হয়েছে গল্প। তখনকার অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে অতিরিক্ত ফিল্ম খরচ না করে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতিই তিনি বেশ নজর দিয়েছেন। ভালো ছবি, কিন্তু আহামরি কিছু নয়। কিউবার পরিচালক টমাস আলেয়া বললেন ওঁর খুবই ভালো লেগেছে।

আজ আর কোনও ছবি দেখিনি। প্রথম ছবি দেখার পর গিয়েছিলাম কুইনস রোডে

রিজন অব্যাদিন্যান্ড (ইউ কে)

দেবিকারাণীর বাড়িতে। পুরনো দিনের লোক বলেই বুঝি এত অমায়িক, এত হৃদয়বান। তাঁর সুন্দর কথা বলেন। কোন অহংকার নেই, কোন দূরত্ব রাখেন না। দোতলার সারা অফিসঘর ঘুরিয়ে দেখালেন নিজে। সেক্রেটারি থেকে ড্রাইভার সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কলকাতার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। আক্ষেপ করে বললেন 'বহুদিন বাংলা ছবি দেখি না।' ইলিশ মাছ না পাওয়ার দুঃখটাও জানাতে বাকি রাখলেন না।

পরিচয় হল ওঁর স্বামী বিখ্যাত চিত্রকর নিকোলাস রোয়েরিখের সঙ্গে। কার্পাস তুলোর মত চুল আর বিন্যস্ত দাড়িতে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। শিল্পচর্চা নিয়েই তাঁর দিন কাটে। কুলুর বাড়িতে হিমালয়ান গবেষণা কেন্দ্রটিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন জানালেন। দেশ-বিদেশের সহযোগিতাও পাবেন তিনি। ঘন্টা দুয়েক আড্ডার পরও ছাড়তে চাইছিলেন না। 'দাঁড়াও না, অত তাড়া কিসের? প্রেস কনফারেন্স আছে বলায়, দেবিকারাণী বললেন, 'খাও দাওয়া না হলে আর আটকাব না।' পরের বার এলে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব। ফেরার পথটুকু গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন।

আসতে আসতে ভাবছিলাম আজকের কোন শিল্পীর কাছ থেকে এমন আন্তরিক ব্যবহার কখনো পাইনি। অতীত আর বর্তমানের মধ্যে ফারাক বোধ হয় এখানেই।

অশোক হোটেলে আজ মুখোমুখি হলাম মিশরের এক নম্বর পরিচালক ইউসুফ কাহিনের সঙ্গে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাজনৈতিক লোক তিনি। সুন্দর কথাও বলতে পারেন। নিজের দেশের সরকারী ফিল্ম কমিটিকে একহাত নিলেন তিনি। বললেন—'কমিটির চোদ্দ ভাগ লোক ছবি সম্পর্কে কিছু জানেন না, নিতান্তই সরকারি আমলা কিংবা মন্ত্রীদের আত্মীয় পরিজন।' ওদেশে রাজনৈতিক ছবি করতে গিয়ে অনেক বাধার সামনে আসতে হয়েছে তাঁকে। অনেক সময় ছবির নেগেটিভ প্রিন্ট বাইরে চালান করেও দিয়েছেন তিনি। 'আফিং ছবি'র বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ। ফিল্ম তাঁর কাছে সবচাইতে বড় কমিউনিকেটিভ মিডিয়ম।

কাহিনের দুটি ছবি দেখেছি আমি—আলেকজান্দ্রিয়া হোয়াই ও কায়রো স্টেশন। বক্তব্যের সঙ্গে ছবির মিল নেই বলব না। কিন্তু কথার মত জোরদার নয়। মিশরের এক নম্বর পরিচালক হবার যোগ্যতা তাঁর অবশ্যই আছে। তবে তিনি বক্তা হিসাবে আরও বেশি শক্তিশালী মনে হল।

১৫ জানুয়ারী

গত বছর মাদ্রাজে গিরিশ কাসরাবল্লী আমাদের চমকে দিয়েছিলেন। ওঁর ঘটশ্রাদ্ধ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছিল। ইনস্টিটিউটের এই তরুণ গ্রাজুয়েট কানাড়া ছবির জ্বলন্ত সলতে। গিরিশের নতুন ছবি 'আক্রমণ' রয়েছে প্যানোরামায়। প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম 'আক্রমণ' দেখবই।

দেখলাম আজ। সত্যি কথা বলতে কি, নিরাশ হলাম। ঘটশ্রাদ্ধ-এর একটু আঁচও পেলাম না। হালকা ধরনের একটি প্রেমের ছবি। কমেডি' বলা চলে। হয়তবা তিনি একটু হাত ঝালিয়ে নিচ্ছেন। তবে ছবিটির সারা শরীরে মুন্সিয়ানার চমক আছে। আধুনিক ফিল্মী ব্যাকরণকে তিনি কয়েকটি জায়গায় বেশ রসময় ভাবে ব্যবহার করেছেন। নামের সঙ্গে ছবির বক্তব্য কিংবা ভঙ্গির কোন যোগ খুঁজে পেলাম না। এ-ছবিতে গিরিশ বুঝি রসিক প্রেমিক সেজেছেন, তারুণ্যের উত্তাপে একটু গা গরম করে নিলেন সরস রসিকতায়। কিন্তু এখনই কেন? মানসিক বিশ্রামতো বয়স হবার পর।

ফাসবাইন্ডারের বাকি দুখানা ছবি দেখা হল আজ। একবারে অন্যমূর্তি তাঁর। চেনাই যায় না। 'ইন এ ইয়ার উইথ ১৩ মুনস' রূপকধর্মী ছবি। একজন বিবাহিত পুরুষের বন্ধুকে খুসী করার জন্য সেকস-বদলে মেয়ে হয়ে যায়। অথচ সেই বন্ধু কিংবা তার নতুন ছেলেবন্ধু কেউই তাকে গ্রহণ করে না, আশ্রয় দেয় না ভালোবাসার চাদরে। শেষ অব্দি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সেই মেয়েছেলেটি আত্মহত্যা করে। দুর্বল ও বলবান দুজনের সামাজিক স্ট্যাটাসের ফারাকটুকু ধরা পড়েছে ফাসবাইন্ডারের চিত্রনাট্যে। শুধু আবেগ দিয়ে বাঁচা যায় না আজকের জগতে—এই সত্যটাকে তিনি উপস্থিত করেছেন বাস্তবের কষ্টিপাথরে। প্রেম ভালোবাসা বন্ধুত্ব আবেগ মানবিক সম্পর্কের তথাকথিত স্বার্থহীন জায়গাগুলো মোটেই নিঃস্বার্থ নয়, ব্যবহারিক জীবনের জটিল গোলোকধাঁধা ও গভীর অন্ধকারগুলোকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। অতি সরলদের মাথা আজকাল বুদ্ধিমানরা মুড়িয়ে খায়।

ওঁর পরের ছবিটাও ছিল স্যাটায়ারধর্মী। নাম 'থার্ড জেনারেশন'। ইয়োরোপের নানা দেশে এখন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদীদের উদ্ভট কাজকর্ম দেখা যায়। এস্টাব্লিশমেন্ট বিরোধী তারা। নিয়ম ভাঙার শ্লোগান থাকে তাদের মুখে। অথচ প্রকৃত ক্ষেত্রে তারা এস্টাব্লিশমেন্টের স্বার্থই রক্ষা করে। শ্লোগান ও বিপ্লবের ফাঁকা বুলির আড়ালে তারা আসলে উত্তেজনার আগুনে গা গরম করতেই চায়, আদর্শহীন তারা। ফাসবাইন্ডার এইসব স্বার্থপর বুদ্ধিহীন সন্ত্রাসবাদীদের একহাত নিয়েছেন। যদিও ছবিতে প্রকরণগত কারিকুরি আছে অনেক, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

অশোক হোটেলে গিয়ে আজ আর তেমন ভিড় দেখলাম না। কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানলাম বিদেশীরা অনেকেই চলে গেছেন। কলকাতার সত্যজিৎবাবু ও তাড়াতাড়ি গেছেন। পিনাকী মুখার্জি, তরুণ মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তও নেই। মার্কেটিং বিভাগে গিয়ে দেখি ই-আই-এম-পি-এর স্টলটি মা-হারা সন্তানের মত করুণ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যান্য স্টলগুলো কিন্তু মহিলা রিসেপসনিস্টে সুশোভিত।

অনাত্র ভাঙা হাটের মেলা, প্রেসরুমে যেন আর সেই চাঞ্চল্য নেই। ফটো ডেস্কের মিসেস পদ্মনাভন গা-আলগা দিয়েছেন। মিঃ কচরুকে কদিন হল দেখছি না। উনি বোধহয় ইন্দিরা গান্ধীর জয়ের খবর পেয়ে দিল্লী উড়ে গেছেন। পি-আই-বির ব্যস্ত মানুষ তিনি। ওঁর বদলে এখন নিয়মিত দেখতে পাচ্ছি মিঃ ভার্গবকে। তিনিই সবকিছুর তদারকি করছেন। ফিল্মকে আমরা

মন্ত্রিসভা গঠনের পর মনে হচ্ছে সরকারী কর্মচারী সবারই মন চলে গেছে দিল্লীতে। ব্যাঙ্গালোর ছাড়তে পারলে যেন বাঁচেন।

২৬ জানুয়ারী

শেষ পর্যন্ত বার্তোলুচির '১৯০০' এল। গুঞ্জন সত্যে পরিণত হল। এবং উৎসবের মান বাঁচল। দুপুরবেলা তার আগেই অবশ্য সুন্দর একটা ডকুমেন্টারি ছবি দেখলাম। বিখ্যাত সুইডিস অভিনেত্রী লিভ উলম্যানের ওপর আমেরিকার প্রতিষ্ঠ ডকুমেন্টারি ফিল্ম-মেকার রিচার্ড কাপলান তৈরি করেছেন ছবিটি। শিল্পীর সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, নানা ছবির উল্লেখযোগ্য অংশ ও একাধিক পরিচালকের মতামত নিয়ে তিনি ফিকশনাল স্ট্রাকচারে তৈরি করেছেন 'লুক অ্যাট লিভ'। বিভিন্ন চরিত্র ও নিজের অভিনয় নিয়ে সুন্দর এবং শিক্ষণীয় আলোচনা করেছেন লিভ উলম্যান। কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি আছে বটে কিন্তু মজাও আছে। এই ছবি দেখার পর বাসু ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—'ভাবছি লিভ উলম্যানকে ছবি করালে মন্দ হয় না। স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে উনি যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত।'

অসম্ভব নয় বাসুবাবু সত্যিই হয়ত দূর ভবিষ্যতে কখনও লিভ উলমানকে নিয়ে একটি ইংরেজি ছবি শুরু করে দেবেন।

দুপুরবেলায় পঃ জার্মানীর ছবিটাও মন্দ ছিল না। একটি সামাজিক ডকুমেন্টেশন বলতে পারি। নেপলসের একটি বস্তির ইতিহাসকে (১৯৪৪-৭৭) তিনি ধারাবাহিকতার সঙ্গে তুলেছেন। শুধু আর্থিক নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক—সম্পূর্ণ চেহারাটাই যেন বেরিয়ে আসে। পরিচালক ওয়ার্নার স্কোয়েটর জীবনের ছোটখাট দিকগুলোকেও অবহেলা করেননি। মাঝপথে রসভঙ্গ করে দিলেন হলের অপারেটর। রিল উল্টো-পাল্টা চালিয়ে ইতিহাসকে বর্তমান করে ছাড়ছেন। চেঁচামেচিতে কোন ফল হল না। ছবিটির নাম কিংডম অফ নেপলস।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠিক হয়ত নয় [illegible] রাতে বার্তোলুচির ১৯০০ দেখাতে গিয়ে অপারেটর কি যে করলেন—পাঁচ ঘন্টার ছবি চার ঘন্টার আগেই শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর আগে থেকে শুরু করে ঘটনার সময় চলে এসেছে ১৯৭৭ পর্যন্ত। জমিদার ও চাষীর দুই ছেলের বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীচক্রের রক্তাক্ত থাবার নীরব আগ্রাসী ক্ষুধাকে তিনি ধীরে ধীরে প্রকট করে দেখিয়েছেন। ঘটনার প্রতিটি অধ্যায় বিশ্লেষিত। যুদ্ধের কামান তেমন গর্জায়নি কোথাও, কিন্ত বিধ্বংসী যুদ্ধের ফসলগুলোর চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। পরিচালকের অন্তর্দৃষ্টি এত গভীর, এত বিশ্লেষণী যে জীবনবোধ ও আবেগের সঙ্গে রাজনৈতিক ওঠা-নামার গতি-প্রকৃতিকে [illegible]। [illegible] কাপ টির মত এই ছবিও ইতালীর ফিল্ম ইতিহাসে

দি টিনড্রাম (পঃ জার্মানী)

একটি ক্লাসিক বলে চিহ্নিত হতে পারে। উৎসবের মুখ রক্ষা করেছে এই ছবি।

ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগের ছবি—জি অরবিন্দনের 'কুমাট্টি' ভালো লাগল না। 'থাম্পু'-এর বুদ্ধিদীপ্ত জীবনমুখী চেনার অভাব চোখে পড়ল। ছবিটা রূপকধর্মী। কিন্তু রূপকের খোলস ছাড়ালেও তেমন কিছু গভীর চিন্তার বিষয় নজরে আসে না। ছবির রঙিন ফটোগ্রাফী অসাধারণ। অথচ জি অরবিন্দনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অন্য। আলাপ করার পর বুঝলাম রেগে গর্জে ওঠার মানুষ তিনি নন। হয়তবা ফুঁসে উঠতে পারেন। 'কুমাট্টি'তে তাঁকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'মজা' করতেই শুধু দেখলাম। এইসব ছবি জায়গা না পেলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

১৭ জানুয়ারী

উৎসবের আজই শেষ দিন। সর্বত্র কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ভাব। সন্তোষ থিয়েটারের দরজায় পি আই বি'র ম্যাডাম পদ্মনাভন বিদায়ক্ষণের হাসিটুকু মুখে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অশোক হোটেলেও ভাঙ্গা হাটের সুর। কনভেনশন হল, চাণক্য হল, বোর্ড রুম—সব কিছুই নীরব, স্তব্ধ, ব্যাঙ্কোয়েট হলের মার্কেটিং সেকশনে স্টলগুলো ফাঁকা। কয়েকটি ভাঙ্গাচোরা হচ্ছে। কেরালার স্টলের সামনে সেই ভদ্রমহিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, নিজেদের স্টলটাকেই দেখছেন। একটু বাদেই ভাঙ্গা হবে।

সারাদিনে আজ মাত্র দুটো ছবি দেখেছি, রিচার্ড কাপলানের 'রুজভেল্ট স্টোরি' দেখার ইচ্ছে হল না। ডকুমেন্টারি ছবি, ও'র 'কিং' অবশ্য দেখা, মার্টিন লুথার কিং-এর ওপর তৈরি তিন ঘন্টার এই ডকুমেন্টারী নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ও মানবিক দলিল।

আজকের প্রথম ছবি ছিল রোমান পোলানস্কির 'টেস'। একবারে আলাদা জাতের ছবি। পোলানস্কির নায়কের বা নায়িকার এ ছবিতে কোন মানসিক-শারীরিক রোগ নেই, দুজনেই স্বাভাবিক মানুষ। টেস নামে একটি মেয়েকে নিয়ে ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। একজন প্রেমিক, একজন স্বামী। প্রেমিককে খুন করে স্বামীর কাছে ফিরে এলেও ওদের পরিণতি বিয়োগান্তক, সুখের ঘর শুরুর আগেই চলে যেতে হয় জেলখানায়। পরিচালকের কাব্য চেতনা ছবিটিকে সরস করে তুলেছে। ঘটনা তুঙ্গে উঠেও অতি নাটকীয় হয় নি। আর ফটোগ্রাফীর কথা? বলা বাহুল্য—অসাধারণ।

পরের ছবি দেখলাম এ বছর বার্লিনের সর্বোচ্চ পুরস্কার পাওয়া ভোলকর স্কোলনডর্ফের 'দি টিনড্রাম।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে নাৎসীবাদের ওপর দারুণ স্যাটায়ার করেছেন এটি। একটা 'বামন' ছেলের চিৎকারে সামনের কাঁচের জিনিস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, কাঁচের মতই ক্ষণভঙ্গুর নাৎসীবাদ, যা অল্প আয়াসেই নষ্ট হতে পারে। নাৎসীবাদের কাঁচের জার থেকে একে একে বেরিয়ে পড়ে সাপ, ব্যাং, অজস্র শিশু। যুদ্ধের সময়ে নৈতিক বোধগুলোর অধঃপতনটিকেও 'ভয়ানক' অশ্লীল আর হিংস্রভাবে দেখিয়েছেন। বামন ছেলেটির পার্সপেকটিভে গল্প বলা হয়েছে। সে জন্য কল্পনানুক্রমিকভাবেই ঘটনা এসেছে পর্দায়। সহজ সরল, কিন্তু ক্যামেরা চালাতে গিয়ে [illegible] বহু জায়গায় ক্লোজ-আপ ও [illegible] অ্যাঙ্গেল লেন্সের সাহায্য নিয়ে বাঞ্ছিত এফেক্ট হাজির করেছেন।

গল্পটির লেখক গুন্তের গ্রাস। তিনি সহচিত্রনাট্যকারও বটে। 'টিন ড্রামের' মত সূক্ষ্ম স্যাটায়ার আর নজরে পড়ে নি। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও ছেলেটিকে বসিয়ে রেখেন ড্রাম দিয়ে। অরাজক, অমানবিক পরিবেশের মধ্যেও মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের চারিত্রিক স্খলন হয় নি বলা যায় না। সেটিকে তিনি স্যাটায়ার করেছেন পাশের বাড়ির মহিলার সঙ্গে বামন ছেলেটির যৌন সম্পর্ক দেখিয়ে। [illegible] সে দৃশ্য। ভোলা যায় না। স্কোল[illegible]র্ফের সেরা ছবি এটা এবং ফিল্মোৎসবে অন্যতম ভালো ছবি।

শুনেছিলাম পোলানস্কির টেনান্ট নাকি আধিভৌতিক সিরিজের শেষ ছবি। হাতে সময় ছিল—তাই চলে গেলাম 'টেনান্ট' দেখতে। পোলনস্কি নিজে এই ছবির নায়ক। কল্পনা হ্যালুসিনেশন তাঁকে ঘিরে। ছবির বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই, জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক দিকটার প্রতি তিনি যেন বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ, অন্য মুখো। এক আধিভৌতিক জগতে তাঁর মনের বাস। কিন্তু ফিল্ম মিডিয়মটির ওপর পোলানস্কির দখলদারিকে অস্বীকার করতে পারি না। অসম্ভব নিপুণ। পোল্যান্ড ছেড়ে তিনি ভালোই করেছেন, ওখানে থাকলে এ-জাতীয় ছবি করতে পারতেন না।

এই ছবি দেখা দিয়েই ফিল্মোৎসবের ছবি শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল ব্যাঙ্গালোর ক্লাবে। সন্তোষ থিয়েটারকে বিদায় নমস্কার জানিয়ে যখন বাসে উঠলাম তখন সন্ধে সাতটা।

বকুলতলা

অরুণ চক্রবর্তী

বিমল হিসেব কষে দেখল, তাদের এই ক্যাম্প থেকে মাইল চল্লিশেক উত্তরে গেলে সেই গ্রামটাকে পাওয়া যাবে। বকুলতলা। বছর আটেক বয়সে বিমল ওই গ্রাম ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছিল। বাবা মার হাত ধরে। তারপর জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বকুলতলার স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছে গেছে। টেবিলে পেতে রাখা ম্যাপটা থেকে চোখ সরিয়ে বিমল বাইরে এল। দালানের সিঁড়ি বেয়ে মাঠে এসে নামল। বকুলতলার কথা ভাবতে তার কেমন সাধ হল।

যশোর পেরিয়ে খুলনা। খুলনা পেরিয়ে এই বামনডাঙ্গা গ্রাম। বামনডাঙ্গা হাই স্কুলে তারা ছাউনি ফেলেছে। গত পনের দিনের দ্বধর্ষ যুদ্ধ শেষে এখন বিশ্রাম। চারপাশে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। ওপর মহল থেকে ফিরে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। ছাউনিতে এখন রসদ গুটিয়ে নেওয়ার পালা। কেননা, বিমল জানে, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ নয়। একটি দেশের বিপন্ন মানুষদের সাহায্যে তাদের সীমান্ত পেরিয়ে আসতে হয়েছে।

চারপাশে যুদ্ধজয়ের খুশি। জওয়ানদের মুখেও হাসির রেখা। সর্বত্র এক আশ্চর্য স্বস্তির চিহ্ন। বিমল গতরাতেও এই খুশির উৎসবে সামিল হয়েছে। অথচ আজ সকালে ওই ম্যাপটায় চোখ রাখার পর মনের কোথায় যেন এক আলতো ব্যাথা তিরতির করে বয়ে চলছে। কিন্তু বকুলতলার কথা তার তেমন করে মনেই পড়ছে না।

নদীর পারের সেই হেলানো বটগাছ। বটগাছের ছায়ার একটু বাইরে একটা দোকান। তার বন্ধু দোকানদার। বিমল নাম মনে করতে পারল না। চব্বিশ-পঁচিশ বছরে কি এমনি করে সব স্মৃতি মুছে যায়? বিমল সেন্ট্রিকে এড়িয়ে ছাউনির বাইরে এসে দাঁড়ালো। আকাশে কোথাও মেঘ নেই। ডিসেম্বরের শীত এই খোলা জায়গায় হু হু করে ছুটোছুটি করছে। ওভারকোটটাকে টেনে জড়িয়ে পাশের ছোট্ট পুকুর পারে বসল বিমল। বাবার মুখটা মনে পড়ে গেল। বিমল বাবার পাশে বসে মাছ গুণত। বাবা মাছ ধরতেন পুকুরে বঁড়শি ফেলে। বাবা গুণতে শেখাতেন। যোগ-বিয়োগ শেখাতেন—বলতেন, ঝর্দড় থেকে চারটে মাছ পুকুরে এমনিতর।

বিমলদের বাড়ির কাছে, কোথাও একটা পুকুর ছিল। এখন মনে পড়ল। পুকুরের ধার ঘেঁষে কাদের যেন বাড়ি ছিল। মস্ত ধবধবে উঠোন। বিরাট বিরাট ধানের পালা। আর মস্ত মস্ত মাটির দালান। বিমলদের বাড়িতে অত বড় উঠোন ছিল না। মা উঠোনের এক কোণে বসে রান্না করতেন। বাবা ক্ষেত থেকে ফিরে সোজা উনুনের পাশে গিয়ে বসতেন। বেশির ভাগ দিনই বিমল সে সময় দাওয়ায় বসে মুড়ি খেত।

বিমল কোন বন্ধুর মুখ মনে করতে পারল না। কিছু বন্ধু ছিলই। তাদের নামও মনে করতে পারল না। এক বন্ধুর বাড়িটা মনে পড়ল আবছা। ভেরাণ্ডা গাছের বেড়া ছিল ওদের বাড়ির চারপাশে। ওরা দুই বন্ধু বেড়ার এক ভাঙা অংশ দিয়ে বাড়ির পিছন পথে ঢুকত। বন্ধুর বাড়িটা অনেক বড় ছিল।

শেষটায় একটা হেলানো বট গাছ, [illegible] বন্ধুদের সেই বাড়ি আর বাবা-মা'র যৌবন বয়সের মুখচ্ছবির স্মৃতি নিয়ে বিমল বকুল তলার দিকে রওনা হ'ল। সঙ্গে কম্পানী সার্জেন্ট বলদেও সিং আর ড্রাইভার করপোরাল সুখদেব।

ম্যাপ আগেই দেখে নিয়েছিল বিমল। পথে দু' একটা গ্রামে খোঁজ নিয়ে ওদের জিপ একটা কাঁচা রাস্তা ধরল। গ্রামবাসীদের উৎসুক দৃষ্টি এখন আর বিমলদের কৌতুহল বা আনন্দ জাগায় না। ধুলো উড়িয়ে, মাটির ঢেলা, ঘাস বুনো জঙ্গল গুঁড়িয়ে ওদের জিপ এসে পড়ল বকুলতলার মাইলখানেক দূরে।

বিমল সুখদেবকে থামার ইঙ্গিত দিল হাত নেড়ে। সুখদেব 'ইয়েস স্যার' বলেই ব্রেক কষল। পিছন থেকে একরাশ ধুলো ওদের ঘিরে ফেলল।

ধুলোর মেঘ ধীরে ধীরে সরে যেতেই বিমল দেখতে পেল, বকুলতলা আশ্চর্য রোদ্দুরে ঝকঝক করছে। মাথা উঁচু করা নারকোল গাছ, রুপালী ফিতের মতো চকচকে নদীর রেখা। বটগাছের মাথা। আম বন। আর সেই ধূসর দালানগুলোর সারি। কলাগাছের বন এখনও গ্রামের প্রান্তে। বিমলের চোখের সামনে এখন এক স্মৃতির মিছিল। কাকে ধরবে?

বলদেও মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, শ্যাল উই প্রসিড স্যার? বিমল শুনতে পেল না। পা বাড়িয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। এক মনে দেখতে থাকে বকুলতলার আকাশ। বিস্তৃত দিগন্তে বকুলতলা যেন স্বীপখণ্ড। বিমল বলল, বলদেও দিজ ইজ মাই [illegible]

কেউ কিছু বলল না। অথচ বিমলের সারা শরীরে যেন শব্দের কোলাহল বেজে উঠল। পাখির ডাক, নদীতে নৌকার দাড় ছপছপ, ঝরা পাতার মৃদু শব্দ। এরই সঙ্গে উঠে এল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝপঝাপ শব্দ। যাত্রা গানের আসর। পালাজার বাজনা। ঘুড়ির খেলা। বিমল সিগ্রেট ধরাবার চেষ্টা করল। দেশলাইটা ফসস করে নিভে গেল। হাওয়াটা বড্ড জোরে বইছে।

মার আকুল ডাক সব শব্দকে নিভিয়ে দিয়ে নদীর পার থেকে ছুটে এসে বাজল বিমলের বুকে। এই রাস্তা বেয়ে একদিন গ্রামের মানুষ মিছিল করে এসেছিল। বর্ধনদের গরুর গাড়ির পিছনে বাকস পেটরার ফাঁকে মাকে কোন রকমে শুইয়ে দিয়েছিলেন বাবা। বিমল মার হাতে হাত রেখে গাড়ির পিছনে পিছনে ছুটেছে: মা'র পেটে প্রায়ই অসহ্য যন্ত্রণা হ'ত। আগের রাতে যন্ত্রণটা ছিল প্রচণ্ড। আর তা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার ওই সময়টাতেও ছিল। মা রাস্তাতেই মরে গেল। সাতক্ষীরায় পৌঁছুবার আগেই। বিমল আর বাবা সারা রাত নির্জন রাস্তায় মা'র মৃতদেহ পাহারা দিয়েছে।

বিমল গাড়ি ঘোরাতে বলল। বকুলতলায় সে যাবে না। দূর থেকে সে অনুভব করতে পারল, মার সেই লালপেড়ে শাড়িটা বকুলতলাকে আগলে আছে। ধীরগতির

ছড়িয়ে-পড়া ধূপের মতো বকুলতলার ওই দ্বীপখণ্ডে মা'র স্মৃতি প্রতিটি পাতায়, ধূলিকণায় মিশে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সকালের সুখব্যথাটা এখন এই রুদ্দুরে যন্ত্রণা হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিমল গাড়িতে বসতেই লক্ষ্য করল, বেশ একটা ছোটখাট ভীড় তাদের জিপের চারপাশে। বৃদ্ধ-যুবক-শিশু সবার মুখেই হাসি। অভিনন্দনের হাসি। খুলনা শহরে এই হাসি উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। ফুলের তোড়ায়, মালায়, ডাবের ছড়াছড়িতে সে ছিল রীতিমত এক উৎসব। বিমল এদের মুখে-চোখেও সেই অভিনন্দনকে লক্ষ্য করল, তবে তা অনেক সংযত। সুখদেব গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাবে, বিমল বাধা দিয়ে আবার নেমে পড়ল।

ভীড়ের কাছে এগিয়ে গেল। খুলনা অঞ্চলের ভাষাকে একটু সাজিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মধ্যে কেউ এই বকুলতলার মানুষ হন?

ভীড়ের প্রায় সবাই এর ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কেউ উত্তর দিল না। বরং সবাই একটু ঘাবড়ে গেল। সামরিক পোশাকের ওপর এমনিতেই এদেশের লোকের ঘৃণা। ভারতীয় বলে অবশ্য এখন সম্মানটা আলাদা। কিন্তু গ্রামের খোঁজ কেন? বিমল বুঝল। বলল এই বকুলতলায় আমি জন্মেছিলাম। গ্রামটিরে দেখতে চাই।

এবার ভীড়ে একটা সাড়া পড়ে গেল। এমন অবস্থা যেন সবাই বকুলতলার লোক। বিমল একটা মাঝবয়েসী লোকের কাঁধে হাত রাখল, চলেন আমাদের সাথে। লোকটাকে পাশে বসিয়ে বিমলদের জিপ ছুটল বকুলতলার দিকে। পিছন পিছন ছুটতে লাগল সেই ভীড়।

আশ্চর্য! সব ঠিক আছে। সেই নদী, সেই হেলানো বটগাছ। শুধু উধাও হয়েছে দোকানটা। বটগাছের অদূরে একজনের বাড়ির দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়েছে দোকান। সেখানে কিছু বয়স্ক লোকের দল। আজাহার বলল, ওটি সেলিম মিঞার দোকান। বটগাছের পাশের দোকানটি ছিল এক হিন্দু বুড়োর। 'তিনি চইল্যে গেছেন'। বিমল হাসল।

ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভীড় বেড়েছে। আজাহার নিজের পরিচয় দিল। এ গ্রামের ঘর জামাই সে। আদি বাড়ি দৌলতপারের ফুলতলায়। বিমল বুঝল, আজাহারকে বেছে নিয়ে সে ভুল করেছে। পারানো কথা এর জানার কথা নয়। বিমল জানল আজাহারের শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ নেই।

বিমল গ্রামটাকে বার কয়েক পাক খেলো, কিন্তু কিছুতেই নিজেদের বাড়িটাকে খুঁজে পেল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা-মার মৃত্যুর মতোই বাড়িটা কোথায় এক রহস্যময় দূরত্বে দাঁড়িয়ে গেল। বিমল বলল, চলি।

আজাহার ছাড়ল না। বাড়ি নিয়ে গেল। এঘর ওঘর থেকে চেয়ার টেনে নামিয়ে ওদের তিনজনাকে উঠোনে বসতে দিল। সুখদেব বসল না। একটু দূরে শব্জি বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। কথার ফাঁকে সুখদেবের দিকে তাকিয়ে বিমলের জায়গাটা কেন যেন চেনা-চেনা লাগল। বুকের তলায় কোথাও একটা সুখ তিরতির করে বইতে শুরু করল। আজাহারকে ডাকল বিমল, আপনার সম্বন্ধি-টম্বন্ধি কেউ নাই?

নাঃ। আজাহার জানায়।

কোনো বুড়ো মানুষ?

না। আজাহার এবার বিস্মিত হয়। বলে, আমার তিন কন্যা দুই পুত্র। আর পরিবার। বাকি সবাই মারা গেছে।

বিমল এবার যা ভাবতে পারে, তা আজাহারের স্ত্রীর কথা। কিন্তু দ্বিধা এল। মুসলমান ঘরের বউ। কথা বলার প্রস্তাব দেয় কী করে? বলল, উঠি আজাহার সাহেব।

আজাহার বাধা দেয়, না না না—ওই যে চা।

ঘোমটা আলতো করে কপালের ওপর ঝুলিয়ে একটি বউ, নিশ্চিত আজাহারের বউ, একটা কলাই-করা থালায় চার কাপ চা নিয়ে ধীর পায়ে দাওয়া থেকে নেমে এল। বড় উঠোন। বউটাকে সলজ্জ পা ফেলে অনেকটা আসতে হল।

বিমল সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। চা নেয় তুলে। ইচ্ছে হচ্ছিল, বউটিকে কয়েকটি কথা বলে। এ বাড়ির মেয়ে তাকে দেখলে চিনতেও পারবে হয়ত। বিমলের কেন যেন মনে হচ্ছিল, এ বাড়িতে সে ছোটবেলায় এসেছে। সুখদেব যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে বিমল দাঁড়িয়ে থাকত—জাতিস্মরের মতো বিমলের তা যেন স্পষ্ট মনে পড়ছে।

বিমল চারপাশে তাকায়। উঠোনের চারপাশের বড় বড় চৌ-চালা ঘরগুলোকে চেনা মনে হচ্ছে। ও-পাশের ঘরটার কাঁধ ছুঁয়ে যে নিমগাছ, বিমলের তা-ও চেনা-চেনা লাগছে। মেয়েটাকে প্রশ্ন করবার জন্য ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আজাহারের দিকে অসহায়ের মতো তাকায়।

বসেন স্যার। আমার পরিবার। পরিচয় করিয়ে দেয় বিমলের দিকে তাকিয়ে।

বউটা সলাজে পিছু হঠে যায়। বিমল আজাহারের বউয়ের দিকে তাকায় না। এই অঞ্চলের নিয়মকানুন তার জানা নেই। একে সে ভারতীয় তার ওপরে সেনাবাহিনীর লোক। মন চাইলেও বিমল মুখ খোলে না। বসে পড়ে।

বউটা যায় না। মাটির দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, আপনারে চিনি।

সবাই চমকে যায়। বিমলও। সবচেয়ে বেশি চমকে যায় আজাহার। এক অদ্ভুত বিজয়গর্বে ওর মুখে হাসি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে।

বউটি বলতে থাকে, আপনি [illegible] কাকার ছেলে বিমুভাই। বিমল [illegible] বিস্ময়ে আনন্দে বউটির দিকে তাকায়। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কতদিন এই বিমু নামটা উচ্চারিত হতে শোনে নি সে। শিহরিত হয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে পড়ে।

বউটি একটু দ্রুত পায়ে ঘরে চলে যায়। বিমল সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কী করবে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। আজাহারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বিমল।

আজাহার বলে, দাঁড়ান। আমি জিগাই। বলে সে দ্রুত দাওয়ায় ওঠে। বিমল কী করবে ভেবে পায় না।

✻

রাতে বিমলের ঘুম এলো না। বকুলতলা থেকে ফেরার পর একটি মাত্র দৃশ্যই তার চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা স্মৃতি—যা বকুলতলার হাজার ছায়ার মতো তার জীবন থেকে মুছে গিয়েছিল হঠাৎ তাই-ই যেন বিমলের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন বিমল কুণ্ডুর, যুদ্ধজয়ী বিমল

কুণ্ডুর সামনে বর্তমান হয়ে উঠল। তার ঘুম আসছে না।

বাবা বলল, বিমু, কাইয়ুম চাচার বাসায় গেছিলি? নমস্কার জানিয়ে আয়। আমরা তো আর ফিরব না।

বিমু সময় নষ্ট না করেই ছুটে গিয়েছিল। পুকুর পার ধরে ছুটে কাইয়ুম চাচার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। দেখে অনেক লোক। দাওয়ায় বসে চড়া চড়া গলায় সবাই কথা বলছে। বিমু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাইয়ুম চাচা কথা বলছে সবার সঙ্গে। নমস্কার জানাবে কী করে?

তাই ফিরে আসছিল। হঠাৎ দেখল মরিয়ম দাঁড়িয়ে আছে শাকসব্জি বাগানের বেড়ার ধারে। বিমুকে ডাকছে। বিমুর মনটা খারাপ খারাপ হয়ে গেল। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল কি রে?

তোরা চলে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ। বলেই বিমু দৌড় দিল বাড়ির বাইরে। পিছন পিছন মরিয়মও ছুটতে লাগল। মরিয়ম ডাকছে সমানে। বিমু যেন মরিয়মের কাছ থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে। এমন ঝোপঝাড় ভেঙে বিমু দৌড় দিল—মরিয়ম আর ধরতে পারল না।

বাবা তখন সবকিছু বাঁধাছাদা করে ফেলেছে। মা মাদুরের ওপর শুয়ে পেটের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বিমু মার হাত ধরে বসে আছে। এমন সময় ঘরের দাওয়ায় মরিয়ম এসে হাজির—এই বিমু শোন্!

কি এক কোঁচ পেয়ারা নিয়ে এসেছে মরিয়ম। বলল, পথে খেয়ে নিস। পথে খিদে পাবে। বিমু পরে মার মাথার কাছের বাক্সটা খুলে একটা সোনা রংয়ের লকেট এনে দিল মরিয়মকে। কালো সুতোর মাঝখানে ঝলমল করছিল লকেটটা।

এখন কালো হয়ে গেছে। বালিশের তলা থেকে লকেটটা বের করে বিমল লণ্ঠনের মৃদু আলোয় দেখল আবারো।

মরিয়মকে ওই লকেটটা দিয়েছিল কেন? মরিয়মকে কি ভালবাসত বিমল? আট বছর বয়সে কি কেউ এত পরিণত হয়? তবে বিমল লকেটটা দিয়েছিল কেন?—বিমল কিছুতেই কিছু মনে করতে পারছে না। একটা অস্বস্তি ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

মরিয়মের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হত। ওর মুখটা পর্যন্ত বিমল দেখতে পেল না। অথচ বিমল স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এক দীর্ঘ কাহিনীর সঙ্গে সে এতদিন অজ্ঞাতে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু কী ভাবে—সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না।

আর কোন দিনের কথাও তো মনে পড়ছে না। মরিয়মের ভাই ছিল। কিন্তু তাদের নাম, চেহারা—তারা ক'জন কিছুই মনে পড়ছে না তার। কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারেনি সে।

খানিক পরে আজাহার এসে বলল : আমার পরিবারের নাম মরিয়ম। ছোটকালে আপনে এটি দিইয়েছিলেন অকে। বড় আশ্চার্য্য!

বিমল লকেটটার দিকে তাকিয়েই চমকে যায়। হঠাৎ মেশিনগানের গুলির কটাকট আওয়াজ ভুলে সরে যেতে থাকে ওই দাওয়া, সাব্জি-বাগানের বেড়া, পুকুর-পার, ঝোপ-জঙ্গল, মরিয়মের ডাক। মার হাত ধরে বসে থাকা।

কী এক অজানা আশঙ্কায় বিমল বলেছে, চলি আজাহার সাহেব। আর কোন কথাই হয়নি কারো সঙ্গে। হাতের মুঠোয় লকেটটাকে চেপে ধরে জিপের গতিতে ধুলো উড়িয়ে বকুলতলাকে ঢেকে বিমল যেন পালিয়ে এসেছে। বকুলতলার দিকে ফিরে তাকাতে যেন তার আর সাহসই হয়নি।

খানিক পরেই সিগন্যালার বর্মণ ঘরে ঢুকে জানাল : মেসেজ ফর প্যাক আপ, স্যার!

তারা আড্ডায়

অনিলকুমার দলুই

দীপেন্তন বাড়ি ফিরে আসে। রাত এখন কত সে বলতে পারবে না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হাতে ঘড়ি ছিল। এখনো দিনের বেলা দেখা যায়, বাঁ হাতের কব্জির এক ইঞ্চি ওপর ব্যান্ডের দাগ আছে। ঘড়িটা বেমক্কা হাপিশ হয়ে গেছে। ঠিক এভাবে সে ভাবতে চায় না। হঠাৎ শব্দটা মগজে এসে ঢুঁ মারে। নস্যু-মাসীর জন্যে ঘড়িটা স্যাকরিফাইস করতে হয়েছে। ইংরিজি শব্দের সাউন্ড বেশ গম্ভীর শোনায় কানে। এবং এই স্যাকরিফাইস করার পর যদিচ তার অসুবিধের চৌহদ্দি বেড়ে গেছে, তবু নিজেকে বেশ বড় বলে মনে হয়। নিজের সাজা-কলকে নেশুড়ের হাতে তুলে দিলে মহৎ-টহৎ হওয়া যায়, তবে সেদিন নেশার মৌতাতে ইতি। কোন মানে হয় না, সে জানে এবং বোঝে, লোক পেছনে বলছে, গাড়লটাকে বেশ জব্দ দেয়া গেছে। ঘড়িটা যতদিন কব্জির সঙ্গে বাঁধা ছিল, ভাবতেই পারে নি, সময় জানবার জন্যে মন এমন আঁকপাঁক করবে। ঐ স্যাকরিফাইস তাকে গভীর গাড্ডায় ফেলেছে। সময় জানার জন্যে এখন তাকে পরের ওপর নির্ভর করতে হয়।

এই এখন, ঠিক ক'টা বেজেছে, সে বলতে পারবে না। শীতের রাত। সন্ধ্যের পর লোক ঢুকে পড়ে খোপে। তার-কাটা পার্টির কল্যাণে রাস্তায় ব্ল্যাক-আউট। দোকানপাট বন্ধ। অবিশ্যি দোকানের ঘড়ির ওপর তার বিশ্বাস নেই। যে-যার সময়মাফিক চলেছে, দুটো ঘড়ি এক সঙ্গে পা ফেলে না। বাড়ির দরজা-গোড়ায় দাঁড়িয়ে সময় জানার জন্যে আঙুলি-বিকুলি করার কোন মানে হয় না। সিঁড়ি ক'টা টপকে গেলেই ফাদারের ঘর। বেশ দামী ঘড়ি আছে, জলতরঙ্গের সুরে তুলে বাজে। না, ফাদারের ঘরে সে ঢোকে না, নিজের ঘর থেকে সে শুনতে পায় ঘড়ির বাজনা।

নির্জন শীতের রাতে, যখন দাঁড়কাকের ডানার মত অন্ধকার শুয়ে থাকে রাস্তায়, হাঁটতে হাঁটতে দীপেন্তনের কবরখানার কথা মনে পড়ে। অনেক রাতে বিজুর সঙ্গে সে কবরের ওপর বসে আড্ডা মেরেছে। বিরাট বিরাট গাছগুলো আকাশে অন্ধকারে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। জোড়-কলমা হয়ে উড়ে বেড়াত জোনাক পোকা। লাইন পার থেকে ট্রেনের ঘস-ঘস শব্দ চমকে দিত কবরখানা।

পাঁচিল টপকে গোরস্থানে ঢুকে তারা বসে পড়ত কবরের পাথরের ওপর। মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো, মাথার ওপর ছাদ। আঠারশো চুয়াল্ল সালে কোন জর্জ ম্যাকেঞ্জি তার বিলাভেড ওয়াইফের মৃত্যু স্মরণীয় করে রাখার জন্যে এটা করেছিল। দীপেন্তনের খুব হাসি পেত—যত শ্লা ধাঁকাবাজ। না মরলে ইস্ত্রি কখনো বিলাভেড হয় নাকি? অমন যে ডাকসাইটে সাজাহান, চক-বাজারের কোন জেনানা যার ইয়ে নজরানা না দিয়ে রেহাই পায়নি, সে হলো প্রেমিক প্রবর। ইতিহাস-লিখিত সু-সমাচার। ফাদারের ঘরে একখানা এনলার্জ-করা ফোটোগ্রাফ আছে। ফাদার আর ওল্ড গ্র্যান্ড লেডি। ফাদারের মুখে একটুকরো প্রেম-বিমোহিত হাসি—ডগলার ফেয়ারব্যাংকস দেখলে বোমকে যাবে। একেবারে মারকাটারি।

বিজু আধ-শোয়া হয়ে প্রেমের কথা বলত। রমলার সঙ্গে বিজু তখন প্রেম করছিল। রমলা ছাড়া আর কোন কথা ছিল না। দীপেন্তন ভেবে পেত না, একটা মেয়েকে নিয়ে কি এত কথা থাকতে পারে। রমলাকে সে দেখেছে এবং চলচেরা হিসেব কষেছে, তবু বিজুর বর্ণনার সঙ্গে তার-দেখা রমলার মিল খুঁজে পায়নি।

কবরখানার প্রেমের কথা শুনতে দীপেন্তনের ভাল লাগত না। বিজু গঙ্গায় যাবে না, পার্কে যাবে না, এ-কবরখানা তার ভারি পছন্দ। চারিদিকে মৃতের মেলায় তার প্রেমের কথা শুনতে বেখাপ্পা লাগত। বিজু কিন্তু অদ্ভুত কথা বলত—জানিস দীপু, এখানে যারা শুয়ে আছে, তাদের মধ্যে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা আছে। তারা আমার আর রমলার প্রেমের কথা শুনে আনন্দ পাবে।

দীপেন্তন অবাক। বলত—মামদোবাজি ছাড়, তোর মাথার টিট্রমেন্ট কর।

—তুই বিশ্বাস করিস না?

—পাগলামি বিশ্বাস করা যায়?

—পাগলামি বলছিস?

—তাছাড়া কি। মড়ার বোধশক্তি আছে নাকি?

—এটা যুক্তি-তর্কের ব্যাপার নয়, অনুভবের বিষয়।

—তোর এ-অনুভূতি হলো কি করে?

—প্রেম অনেক কিছু ভাবতে শেখায় রে।

কালিগোলা অন্ধকারে সে বিজুর মুখ দেখতে পেত না। চারিদিক থেকে বড় বড় গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়ত তাদের ওপর। ছিটান-কাদার মত কালো কালো বাদুড় উড়ে এ-গাছ ও-গাছ করত। অন্ধকারের বুকে আঁকা-বাঁকা রেখা টেনে ছুটোছুটি করত শেয়ালের আগুন-রাঙা চোখ। সেই থমকে থাকা স্তব্ধতার মধ্যে বিজুর স্বর কেমন অদ্ভুত শোনাত। মাঝে মাঝে মনে হত, বিজুর কথা হয়তো মিথ্যে নয়।

প্রেমের কথা শোনাবার জন্যে বিজু ওকে ডেকে আনত। রেস্টুরেন্টে খাওয়াত, গঙ্গার ঘাটে জেটিতে বসে [illegible] মেলে ধরত সিগারেটের প্যাকেট। ওর মজা লাগত—খাওয়াও শালা, তোমার বিয়ের কথা শোনা যাবে। প্রেম-ট্রেমের ধারে কাছে যেত না দীপেন্তন। কি যে শালা সুখ আছে এর মধ্যে। চাঁদি-ফাটা রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাড়া থাক, শিরদাঁড়া কনকন করবে, পা টনটন করব—কি, না দিলরুবা রানী আসবে। বোকচন্দর। একটা মেয়ের জন্যে এত মেহনৎ পোষায়?

বিজু বলত—দীপু, তোর জীবনটা বৃথা গেল।

—কেন?

—প্রেম না করলে জীবনের মানে বোঝা যায় না। রমলাকে ভালো না বাসলে বুঝতে পারতাম না, প্রেমে এত সুখ।

—খুব সুখ বুঝি?

—ডিভাইন হ্যাপিনেস। রমলাকে বলেছি, তোর জন্যে একটা মেয়ে দেখে দেবে।

—কেন? মেয়ে নিয়ে কি করব?

—প্রেম করবি।

—তা সে-মেয়ে আমাকে ভালোবাসবে কেন?

—সে বাসবে না, তার ঘাড় বাসবে। তুই দ্যাখ না, সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

শালা গাড়োল। এ যেন লোকের ঘরামির দরকার পড়েছে। তুমি বললে, দেবে যোগাড় করে, ঘর ছেয়ে দেবে। বিয়ে-শাদী নয়, প্রেম

করার মেয়ে রিক্রুট। প্রেম করলে মগজের নাট ঢিলে হবেই, নিমেষপক্ষে বোকা মেরে যাবে বকরির মত।

বিজু বলত—প্ল্যান আমার ছকা। চাকরি পেলেই বিয়ে। হানিমুনে যাব কাশ্মীরে, শিকারায় কাটিয়ে আসব ক'টা রাত। ছোট দেখে একটা বাড়ি নোব, সামনে ফুলের বাগান থাকবে, বেশ নির্জন নিরিবিলি, থাকব আমরা দুজন—আমি আর রমলা। তুই কল্পনা করতে পারবি না, কি সুন্দর জীবন।

—তারকদার তো লাভ মারেজ, দুবেলা বৌদির সঙ্গে চুলোচুলি হয় কেন? ওদের ধার-কাছে তো সুন্দর ঘেঁষতে পারে না।

—ওদের প্রেম ডিভাইন নয়।

—তোদের প্রেম?

—এ পারফেক্ট এন্ড আনবেকেবল লভ।

আজ, এই সময় না জানা রাতে, দীপেন বিজুর কথা ভাবে না। বিজুর হিসেব-নিকেশ ওলট-পালট হয়ে গেছে। ও ভালো চাকরি করে, অফিস থেকে গাড়ি পেয়েছে, গাড়োল গাড়োল ভাবটা মুখে আর ছায়া ফেলে না। কখনো যদি বিজুর সংগে দেখা হয় বলে—বুঝলি দীপু, প্রেম-ট্রেম সব বাজে। আমরা একটা মেয়ে চাই প্রয়োজনের খাতিরে। বায়োলজিক্যাল নেসেসিটি। সে রমলা-মন্দিরা-বিদিশা হতে পারে, কিন্তু সব চেয়ে যা সত্যি তা হলো ওরা এক-একটা মেয়ে—এ লাম্প অব ফ্লেশ।

বিজুটা ভালগার। কথাটা দীপেনের নয়, রমলার। বিজুর সংগে তখন রমলার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ওকে দেখে দীপেন খুব কষ্ট পেত। বিজু ওর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। ব্যাপারটা সে অনেক পরে জানতে পেরেছিল। সে-রাতে যদি সে রাস্তায় না দাঁড়িয়ে থাকত, জানতে পারত না, বিজু কত বড় স্কাউনড্রেল। বুকের কাছে ঠিক পাঁজরের নীচে ব্যথা অনুভব করা ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না। রমলাকে তার বলার কিছু ছিল না, রমলা চলে যাবার পর সে একা দাঁড়িয়ে-ছিল নির্জন ফুটপাতে। তার মনে পড়েছিল, বিজু রমলাকে নিয়ে একটা স্বপ্নের সংসার গড়তে চেয়েছিল। শয়তানকে সে চোখে দেখেনি, বিজুর মুখটা তার চোখের সামনে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল।

বাড়ি ফিরে এসেছে। বিজু-রমলা এখন থাক। ওলড গ্রান্ড ফাদারের বাড়ি। না, গ্রান্ড ফাদারকে সে চোখে দেখেনি। তবে শুনেছে, খুব পিটোয়ার লোক ছিলেন। নানা কাজে হুনহর, বাঁধা কাজ ছিল না, কি সব চালান-টালান দিতেন। নানা কীর্তি-টীর্তি করে গেছেন, পুরাকীর্তি এই বাড়ি। সুতরাং সে এ বাড়ির মালিকানা স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়নি। একখানা ঘর রয়েছে তার কব্জার মধ্যে দোতলার বাসিন্দা সে নয়, এক তলায় সে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। শিলিং থেকে একটা ল্যাম্প ঝুলছে। তার মাথার ওপর ঝরে পড়বে আলোর করুণা। তবে আজ কাল তার কাটার ফলাও কারবার চালু হওয়ায় মাঝে মাঝে বিপদে পড়তে হয়। তার জন্যেও সে তৈরী—মোমবাতি কিনে রেখেছে।

তার বাড়ি ফেরা, সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেও ওলড গ্রান্ড লেডির চোখে পড়বেই। তার মা। গ্রান্ড লেডি যে বাহুল্য সারারাত জেগে বসে থাকে তার আশায়। দীপেন অবাক না হয়ে পারে না। দোতলায় ওঠার মুখে সিঁড়ির মাথায় চল্লিশ পাওয়ারের ল্যাম্প জ্বলে। সে দেখতে পায়, রেলিং-এর ফাক দিয়ে দুটো চোখ চেয়ে আছে তার দিকে। ফাদার তাকে সংসারের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। একদিন মুখের ওপর বলে দিয়েছে—এটা ছত্তর নয়, তোমার রাস্তা দ্যাখ। বাড়িটা যে ছত্তর নয়, এ জ্ঞান-গম্যি তার আছে। এবং এ-ও সে ভাল ভাবে জানে, ঐ ফতোয়া জারি করার কোন অধিকার নেই ফাদারের। ফাদারের আগে তার দাবী সে ঘোষণা করতে পারত। বলতে পারত—জন্মদান কাজ যখন তার বিনানুমতিতেই হয়েছে, তখন প্রতি পালনের দায়-দায়িত্ব তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। সে জানে, এ কথায় ফাদারের গায়ে ফোসকা পড়বে না, তার চামড়া অত নমনীয় নয়। দীপেনের ওপর ভীষণ রেগে যেতে পারে, না, গায়ে হাত তোলার সাহস তার নেই। ছোটবেলায় পেটাত বেধড়ক, যাকে বলে মুখ বেঁধে গোরুর মার। এখন হাঁক-ডাক করে, সামনে দাঁড়ালে চুপ মেরে যায়, চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। ফাদার কাওয়ার্ড হয়ে গেছে। জন্মদানের কথাটা শুধু বলতে পারে না, মার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঐ গ্রান্ড লেডিকে সে কিছুতে আঘাত করতে পারবে না। মনের ভাষা জিবের ডগায় এসে থেমে যায়। রাগের হিসহিসে সাপটা ফাদারের বুক্ষতালুতে ছোবল মারতে যেয়ে ফণা গুটিয়ে নেয়। মা, কেন তুমি সামনে এসে দাঁড়াও? এ বাড়িতে মার বুকের মধ্যেই আছে ভালবাসার পলিমাটি।

পৃথিবী ভারী ফেরেববাজ। গোদা গোদা শব্দে বশ করতে চায় সকলকে। শালা ফোঁফরা ঢেঁকির শব্দ বেশী। তুমি শালা যদি বিশ্বাস কর গাড্ডায় পড়বে, কেটে বেরিয়ে গেলে চতুর চূড়ামনি।

মা ফাদারের বিয়ে-করা বৌ। বিয়ে-করা ব্যাপারটার মধ্যে একটা গভীর পরিশুদ্ধির ভাব আছে। বেশ একটা পবিত্র-পবিত্র ভাব আর কি। নাক তোলা যাবে না, সিঁদুরে শাস্তর ঝাড়া যাবে। ফাদারের আচরণ দেখে দীপেন বুঝতে পারে, মা মর্যাদা পায়নি ফাদারের কাছে ঠাট-বাট বজায় আছে তবু কি যেন নেই যা সহজে চোখে পড়ে। ব্যাপারটা এত খোলা-মেলা, এত নগ্ন আর এমন ন্যক্কারজনক, চোখ বুজে না থাকলে চোখে পড়বেই। ঘরে খিল দেয়া মানে ঘরের দখল পাওয়া নয়। ফাদারের জগতে মার প্রবেশের অধিকার নেই। তার সামনে মাকে এত ছোট, করুণ আর লাঞ্ছিত দেখায়, মাঝে মাঝে দীপেনের মাথা গরম হয়ে ওঠে।

একদিন বলেই ফেলেছিল—ওকে একদিন ধোলাই খাওয়াব।

গ্রান্ড লেডি চমকে উঠেছিল। নিভু নিভু চোখে চিকচিকে জলের ধারা। তার হাত দুটো চেপে ধরে বলেছিল—ও কথা মুখে আনা পাপ, উনি তোর বাবা—তোর গুরুজন।

একটা বিচছিরি খিস্তি খেয়ে গিয়েছিল কণ্ঠনালীর নীচে। মার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার থর-থর হাতের কাঁপুনি অনুভব করে, নিজেকে সংযত করেছিল। মার সামনে এলে সে ভীষণ অসহায় বোধ করে। তবু ফাদারের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন যে রাগ জমে উঠেছিল, তার জের আর সইতে পারছিল না। বলেছিল—তোমাকে অপমান করে কেন?

মার শুকনো ঠোঁটে ফ্যাকাশে হাসি ফুটেছিল। অত বিবর্ণ পাঙাস-মারা হাসি জ্যান্ত মানুষের মুখে কল্পনা করা যায় না। একটা গলিত শবের পচা গন্ধ বাতাস ভারি করে তুলেছিল। ছোরা এখনো আমূল বিঁধে রয়েছে বুকে। যন্ত্রণার সঙ্গে স্তিমিত হাসি। এমনি হাসি আর একদিন দেখেছিল রমলার মুখে। ঝিমঝিম রাত। ল্যাম্পপোস্টের চোখে ঢুল। কুকুরগুলো ঘুমোচ্ছিল বারান্দার নীচে। একটা ট্যাক্সি রমলাকে নামিয়ে দিয়েছিল গলির মুখে। দীপেন বলেছিল—এ কি করছ, রমলা?

কাজল-টানা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল রমলা। ক্লান্ত চোখের সাদা আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছিল বিষাদের পাখি। তেসাকুচ-রাঙা ঠোঁটে টাল খেয়েছিল দেউলিয়ার হাসি। আলো-জ্বলা ফুটপাথে, কবরখানার স্তব্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে দীপেনের মনে হয়েছিল, রমলা যেন তীর-বেঁধা মামথ যুগের পাখি। ফুটপথে বিলম্বিত ছায়া, শুকনো রক্তের কালচে দাগ।

রমলা বলেছিল—কি করব, বাঁচতে হবে তো।

মা বলেছিল—কে তোকে বললে, উনি আমাকে অপমান করেছেন?

চার্চের ফাদারের মত তার বলতে ইচ্ছে করেছিল—ও লর্ড। সী ডাস নট নো হোয়াট সী সেস। ছবির যীশু চিরকালই মেরী মাতার কোলে শিশু, কিন্তু দীপেন তরুবালার কোলে শিশু হয়ে থাকতে পারে না। তার বোধশক্তি আছে, বিচার-বিবেচনা করার শক্তি আছে। গ্রান্ড লেডির চোখে সে ছোট হলেও, সময় তাকে বড় করে তুলেছে। তরুবালা ফাদারের অপরাধ গোপন করার চেষ্টা করলেও, ধরা পড়তে দেরি লাগেনি। কাঁচা খুনী—এখানে-সেখানে ছড়ান রয়েছে হাজার সূত্র।

সে বলেছিল—মা, আমি বুঝি, বাড়িতে তোমার পজিসন কি। বাবা তোমাকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, কারণ তুমি বাবার কাজ সমর্থন করো না। বাবার ঘুষের পয়সা কিভাবে খরচ হয় তা তোমার অজানা নয়। বাবা রাতে কোথা কি করে তা কি তুমি জান না? সব জানো এবং প্রতিবাদ করো বলে বাবা কি তোমার গায়ে হাত তোলেনি?

—দীপু। থর-থর করে কেঁপে উঠে চীৎকার করেছিল তরুবালা।

গ্র্যান্ড লেডির সেই চীৎকার দীপ্তেন আজো শুনতে পায়। হয়ত সে জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবে না। চীৎকারটা আটকে গেছে পাঁজরের এক কোণে। ভয় নয়, লজ্জা নয়, অপমান নয়—একটা বিবস্ত্র নারীত্ব কঁকিয়ে উঠেছিল দুঃসহ বেদনায়. সযত্নে ঢেকে-রাখা ক্ষতটা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল, ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল রক্তের ধারা। মা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল—যেন একটা মিকি মাউস।

অসহ্য ক্রোধে সেও চীৎকার করেছিল—পরশু রাতে এ-ঘটনা ঘটেনি? বাবা তোমাকে ঘরের বাইরে ঠেলে দেয়নি?

একটা উন্মুক্ত জিঘাংসা তাকে গ্রাস করেছিল। সে তরুবালাকে আঘাত করতে চায়নি, মাকে আঘাত করতে পারে না কিন্তু মনের জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিটা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়েছিল। ফাদার তার লক্ষ্য তবু তরুবালাকে করেছিল চাঁদমারি। সে গ্র্যান্ড লেডিকে সমঝে দিতে চেয়েছিল, ফাদারকে সে ঘৃণা করে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে, ঠিক ক'টা বাজে এখনো জানা হয়নি। বাঁ হাতের কব্জির দিকে তাকায়। হাতটা হারিয়ে গেছে পাকার অন্ধকারে। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করে। অন্ধকারেও তার ঘড়িতে সময় দেখা যেত। রেডিয়াম ডায়াল। এখন সময় দেখার কোন কারণ আছে কিনা, সে জানে না। তবু মনের অবুঝ ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। নন্তু মাসীমার জন্যে স্যাক্রিফাইস করে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছে। নিজের ওপর তার ভীষণ রাগ হয়—কি দরকার ছিল নন্তু মাসীমার জন্যে ঘড়িটাকে জক দেবার। নিজেকে তার খিস্তি করতে ইচ্ছে করে।

এখন সে কি করবে? একটা লোকেরও পাত্তা নেই। এমন শীতের রাতে কে-ই বা সখ করে বাইরে বার হবে? সময় জানাটা তার দরকার। সে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অপেক্ষা করে. একটা-না-একটা লোক আসবেই। বিজু জানতে পারলে বলত—শালা তুই বাওরা হয়ে গেছিস। বিজুকে সে বোঝাবার চেষ্টা করবে না, তবে সে বাওরা নয়, সে সময়ের সঙ্গে যেন কানামাছি খেলছে, ছোঁয়া পাচ্ছে, ধরতে পারছে না।

বাড়িতে ঘড়ি আছে ফাদারের। বড়-সড় ঘড়ি। জলতরঙ্গের সুর বাজে। ফাদারের সময়ের বেজায় দাম। মিনিটে মিনিটে টাকারা পাখি হয়ে ডানা মুড়ে ঢুকে যায় তার পকেটে। তাকে সময় ধরতে হয় নানা কারণে। দীপ্তেন জানে তার কাজ-কারবার। সে বলে, ঘোড়েল দি গ্রেট। চালু, বেজায় চালু, কোন হাটের মাল কোন হাটে সওদা করে, তল পাওয়া ভার।

অতীতের ব্যাক গীয়ার ঠেলে সে যত-দূর যায়, দেখে, ফাদার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাদের নিয়ে কোনদিন কোথাও যায়নি। অফিসে যাবার আগে নিজের ঘরে টেবিলে বসে কি সব করে। অফিস যাবার পর আর তাকে দেখা যেত না। মাঝে মাঝে রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে দেখত, মা বসে আছে বারান্দায়। কোন কোন দিন ঘুমের মধ্যে শুনতে পেত সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মাঝে মাঝে একটা বুনো জন্তু চীৎকার করে উঠত। দরজা ভেজান থাকত, মনে হত, পাশবিক চীৎকারটা দূর থেকে আসছে।

রোববার ফাদার বাড়ি থাকত। খবরের কাগজ পড়ত কিংবা ইজিচেয়ার বারান্দায় টেনে নিয়ে বসে থাকত। মার সংগেও খুব বেশী কথা ছিল না। সে দূরে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। কাছে যেতে পারত না। ভয় ভয় করত। সন্ধ্যের পর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যেত।

সে বলত—মা, বাবা ঘরে কি করে?

—জানি না।

—বাবা আমাদের নিয়ে বেড়াতে যায় না কেন?

—সময় পায় না।

—রোববার তো ঘরে থাকে।

—সারা সপ্তার পর একদিন ছুটি, একটু জিরোবে না।

—বাবা রোজ অত রাতে বাড়ি ফেরে কেন?

—তুই জানলি কি করে?

—ঘুম ভেঙে গেলে তোমাকে যে বারান্দায় বসে থাকতে দেখি।

—আর কি...আর কি দেখেছিস?

—কিছু না।

মা, ছেঁড়া আঁচলে আর কত ঢাকবে? তুমি সেদিন ভয় পেয়েছিলে. ফাদারের অন্য একটা রূপ দেখেছি কিনা। তোমার এতো লজ্জা কেন? কেন তুমি গোপন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে? আমরা জানি. সব জানতে পেরেছি। ভাবি. একান্তে না ভেবে পারি না. কেমন করে তুমি ফাদারকে সহ্য করলে?

দাদা তৃপ্তেনের কথা মনে পড়তে সে বিরক্ত হয়। একটা বিচছিরি শিহর জাগে শরীরে। যেন একটা কেন্নো ছুঁয়ে ফেলেছে। গ্র্যান্ড লেডির অনেক আশা ছিল। লেখা-পড়ায় ভাল। ফি বছর ভালো রেজাল্ট করে। সোনার টুকরো ছেলে। মা নিজেকে বড় ভাগ্যবতী মনে করত। পরীক্ষায় তৃপ্তেনের সাফল্য মাকে খুশী করত।

তৃপ্তেন বিদেশী ফার্মের অফিসর। কোম্পানির ওয়েল ফার্নিশ্ড কোয়ার্টার পেয়েও বাড়ি ছাড়েনি। ফাদারের প্রতি তার একলব্য ভালবাসা। চাকরি জোটানোর পেছনে ফাদারের অবদান কম নয়। ওরা দুজন ভীষণ মাই ডিয়ার।

রোববারের বিকেলে বারান্দায় টেবিল পড়ে। খাদ্য পানীয় হাজির হয় টেবিলে। বাপ-ব্যাটা দুদিকে বসে। গ্র্যান্ড লেডি আজকাল আর গোপন করার চেষ্টা করে না। তৃপ্তেন এখন লায়েক ছোকরা। মাকে ডোন্ট কেয়ার করে। ফাদার বন্ধ ঘরে জলযানে বেরুতে ও ঢাক ঢাক গুড় গুড় পছন্দ করে না। খুব কারেজিয়াস ও আপ-রাইট। মায়ের চোখের ওপর বারান্দায় বসে।

তরুবালা একবার মৃদু আপত্তি করেছিল। ফাদার হেসে উঠেছিল উচচগ্রামে বলেছিল—তোমাকে একবার কন্টিনেন্টে ঘুরিয়ে আনতে পারলে এসব বস্তাপচা চিন্তা ধারা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যেত।

—তা বলে ছেলের সংগে বসে...

—ও এখন গ্রোন আপ, ফ্রেন্ডের মত।

—কি জানি।

—বুঝলে তরু, দুনিয়ার চাকা দুরন্ত বেগে ঘুরে চলেছে। যারা তার সংগে তাল রেখে না চলতে পারবে তারা পিছিয়ে পড়বে, তোমার মত মনের রোগে ভুগতে থাকবে।

ফাদারের মতে, মা মনের রোগে ভোগে। দুয়ে পাল্লার দৌড়ে মা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। দাদার ফ্রেন্ড ফিলোজফার ও গাইড ফাদার। মাকে গাইড করার কেউ নেই।

বাইরের বারান্দায় ওদের যখন পানাহার চলে তখন ঘরের মধ্যে কৌচে গা এলে দিয়ে বই পড়ে বা উল বোনে বৌদি বিপাশা। পিকিনিজ কুকুরটা কোলের ওপর শুয়ে থাকে। অন্য দিন বিপাশা ঘরে থাকে না। রোববার সকলে বাড়ি থা[illegible]। তৃপ্তেন যতক্ষণ বারান্দার টেবিলে [illegible]কবে বিপাশা ঘরের বার হবে না। তৃ[illegible] যখন আউট হয়ে যাবে বিপাশা ওকে ঘরে নিয়ে যাবে। বিপাশার কাঁধে মাথা রেখে ও বলবে—বিলিভ মী. আই মাস্ট নট ড্রিংক এনি মোর...আই হেট লিকার বাট ফাদার ইনজেকটস পয়জিন...হি ইজ এ স্যাটান...

ফাদার মাথা তুলে বলবে—হোয়াট ডাজ দ্য সন অফ এ বিচ সে?

—লেট আস গো সামহোয়ার...দিস ইজ হেল...আই কান্ট টলারেট দ্য ডেভিল... ডারলিং ডু যু বিলিভ আয়্যাম এন ইনোসেন্ট ম্যান...

—হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো।

—সে আই হ্যাভ এ কিস?

—নো ডারলিং. নট হিয়ার।

দীপ্তেন এই বিলিতি ছবি দেখেছে। একেবারে বিনি খরচে। ফাদার ভিলেন আর তার সুপুত্র নায়িকার কন্টেলণ্ন হয়ে কনফেস করছে। আহ কি গ্র্যান্ড সিন। সুপার হিট পিকচার। সে ভন্টুর মত বলতে পারত—ওরা লদগালদগির শপ খুলেছে।

বিপাশার পিপাসার শেষ নেই। গতায়াত আছে বার হোটেলে। সংগী তার হরেক পুরুষ। বৌদি তার বয়েস-বাড়তে দেয় না। স্থির যৌবনা। নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখা। আলো বিলিয়ে যায় ক্ষয় না হয়ে। মেয়েদের শরীর—রমলার ভাষায়. কারবারের মূলধন—পুরুষকে তাতিয়ে তোলে, কাছে টেনে আনে, সে জানে। দেহ পরিচর্যার সীমা নেই। ম্যাকস ফ্যাকটর ইত্যাদির কল্যাণে। বিপাশা বয়েসের ছুটন্ত ঘোড়ার রাশ টেনে রেখেছে।

সাত বছর আগে দেখা একটা মেয়েকে মনে পড়ে দীপ্তেনের। গাড়ি থেকে নেমে এলো ধীর পায়ে। নত চোখে দোল খাচ্ছিল খুশির বুলবুলি। সিঁথেমোর. ভেল. বেনারসী. নতুন গয়না পরে পায়ে পায়ে হেঁটে এসেছিল এক - অপার্থিব সৌন্দর্য।

আদিম রিপু কোথাও ছায়া ফেলতে পারেনি বিপাশার শরীরে।

দীপ্তেন বলেছিল—যাদের সংগে ঘুরে বেড়াও ওরা কারা?

—আমার বয় ফ্রেন্ড।

—বিয়ের পরেও এত বন্ধু?

—ক্ষতি কি। বিয়ে করেছি বলে সকলকে বিসর্জন দিতে হবে নাকি?

—সে কথা বলিনি। দাদা কিছু বলে না?

—কি বলবে? তোমার দাদার কি কম বান্ধবী আছে। ডিড আই সে এনিথিং টু হিম? তাছাড়া বলবার আছে কি। উই মাস্ট এনজয় আওয়ার ইউথ। এ্যাম আই মিসটেকন? ডিড আই ড্যু এনিথিং রং।

—লোকের চোখে অনেক সময় দৃষ্টিকটু লাগে।

—আই কান্ট বদার মাই হেড উইথ সাচ পিপল। লোকের কথা ধরলে জীবনে অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হয়।

বিপাশা জীবন উপভোগ করতে চায়। একদিন সে দীপ্তেনকে বলেছিল—তুমি এ বাড়িতে থাক কেন?

—কোথা যাব?

—এনি হোয়ার, লিভ দিস এ্যাকার্সড হাউস।

—মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। যেদিন মা মারা যাবে, সেদিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

বিপাশা অত্মগতভাবে বলেছিল—ওয়েটিং ফর টাইম।

—কি বলছ?

—শোন, এ আমি চাইনি...এ আমি চাইনি।

—কি চাওনি?

—স্টপ ইট, স্টপ ইট, ননসেন্স। হোয়াই ড্যু য়্যু পোক ইয়োর নোজ ইন টু মাই এ্যাফেয়ার? লিসন টু মী যারা নিনকমপুপ ওয়ান ডে আই শাল কিক দেম আউট... ড্যু য়্যু হিয়ার মী. ...আই উইল কিক দেম আউট...

বিপাশা কি বলতে চেয়েছিল দীপ্তেন বুঝতে পারেনি। সে ওর দিকে তাকিয়েছিল [illegible] হয়ে—ড্রিংক বেশী হয়ে গেছে নাকি? এটুকু বুঝতে পেরেছিল পাগলামি নয়—তাহলে? ওরকম উত্তেজিত বিপাশা হয় না বেশ শক্ত ধাতের মেয়ে। [illegible] [illegible] কিন্তু কি ভেবে? দাদার বিপাশা দীপ্তেন কি চায় সে জানে না। সত্যি ওদের কোন লক্ষ্য বস্তু আছে?

বিপাশার সংগীদের চরিত্র দীপ্তেন জানে। সে ওদের সংগে ঘুরে বেড়ায় নির্বিকার চিত্তে। কি চায় ও? কিসের নেশার পেছনে ছুটে চলেছে? দীপ্তেন বিপাশার জীবন সুখের নয়। ওপর থেকে কিছু বোঝার জো নেই। দুজনে একেবারে স্যান্ডউইচ। প্রেমের অভিনয়ে আমেরিকান ফিল্মের বেঙ্গলী ভার্সান।

এদের মধ্যে সে প্রক্ষিপ্ত। একের পর এক বছর পার হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা তার বয়েস কত? এই অন্ধকার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ফিরে সেই সময়ের কথাটা মনের মধ্যে উঁকি মারছে। বয়েসের চিন্তায় ওর হাসি পায়। জীবনে তুমি কিছু করতে পার বা নাই পার, দিনের পর দিন ঘাড়ের ওপর চেপে বসছে বয়েসের বোঝা। এর হাত থেকে রেহাই নেই।

রমলাও সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার বয়েস কত?

রেস্তোঁরার কাঠের পার্টিশন ঘেরা খুপরি ঘরে ওর সামনাসামনি বসেছিল। সে রমলার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। এ মেয়েটাকে দেখলে বিজুর কথা মনে পড়ে। রমলার পেছনে বিজুর এবং বিজুর পেছনে রমলার ছায়া বাঁধা থাকে। রমলার কাছে এলে অস্বস্তি হয়। ওদের প্রেম এবং বিচ্ছেদের জন্যে তাকে কেউ দায়ী করবে না ব্যাপারটা ওদের একান্ত ব্যক্তিগত। রমলার বর্তমান অবস্থার জন্যে সে বিজুকে দায়ী করে।

তার গিলটি কনসেনস-এর কোন মানে হয় না। বিজু শালা ফুর্তি লুটলো, তার মনে অপরাধের পাহাড় জমে কেন? মনটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে স্পঞ্জ হয়ে গেছে, অল্পেই যেন দুঃখ বোধ করতে শুরু করেছে। বিজু যেন তাকে বিশ বাঁও জলে ডুবিয়ে হাওয়া কেটেছে। বিপাশা তাকে বলেছিল, নিনকমপুপ। সত্যি কি সে দিনে দিনে বোকা চন্দর হয়ে উঠছে?

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসেছিল। রমলার সামনাসামনি বসেও তার দিকে তাকাতে পারছিল না। পার্টিশনের ওপাশ থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল একটা চাপা মেয়েলি স্বর। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একটু একাকীত্বের সুযোগে খেলায় মেতে উঠেছে। এ সেই খেলা যা পথে পার্কে নজরে পড়ে। কবরখানার কথা মনে আসে। বিজু প্রেমের তাজমহল বানাত। পাগলামি। প্রেমও বোধ-হয় এক ধরনের রোগ। দুটো বিপরীত দেহ কাছাকাছি এলো আর ছোঁয়াচে রোগের মত দুজনেই অসুখে পড়ছে। সোজা কথা, দুজনেই চায় দেহের স্বাদ। এতো ধানাই-পানাই করার কি আছে বাপু। সোজা কথা মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করে? নাকি কালচারের পালিশ করা গায়ে ফাটল ধরবে?

—চুপ করে আছ যে?

—ভাবছিলাম। বয়েসের হিসেব করি না। তিরিশ-টিরিশ হবে।

—কাজকর্ম কর না কেন?

—কোন জায়গায় বাঁধা পড়তে ভাল্লাগে না। তাছাড়া চাকরি পাব কোথা?

—তোমার বাবা-দাদা ভালো চাকরি করেন, ইচ্ছে করলে ওনারা তোমায় চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারেন।

ইচ্ছে করলে পারে কিন্তু ইচ্ছে করবে না।

—কেন?

—সে অনেক ব্যাপার। তাছাড়া ওদের মত চাকরি করা পোষাবে না।

—তাহলে কি করবে?

—জানি না।

—চিরকাল এভাবে জ্বালিয়ে যেতে পারবে?

—চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।

—বিয়ে করবে না?

আহ্‌ এট লাস্ট দ্য ক্যাট কেম আউট অব দ্য ব্যাগ। কি বলে যেন...চিরন্তনী মেয়েলি জিজ্ঞাসা। রমলা, তুমি বেজায় বোকা। এতো কিওর পর এখনো তোমার মাথায় বিয়ের ঘুরঘুরে ঘুরপাক খায়। তোমার জন্যে মাথার টুপি খুললেই হয়।

আলো জ্বলছিল মাথার ওপর। টেবিলে দুটো কালো ছায়া। ওর চুল চকচক করছিল। মুখে ঝাপসা আঁধার মাখামাখি। টেবিলে আনত চোখ। ওর প্রশ্নে দীপ্তেন অবাক হয়েছিল।

সে জানে, রমলা কি চেয়েছিল। বিজু তাকে সব বলেছিল। রাত-চরা পাখিরা গাছের এডাল ওডাল করত। কবরের ওপর আধ শোয়া হয়ে বিজু স্বপ্নের ছবি আঁকত। বিজুর কথার মেসিনে ধর্মঘট লক-আউট ছিল না। লাখো কথার মিছিল, আজ তা হারিয়ে গেছে। রমলার সংগে আলাপ ছিল না। দূর থেকে দেখেছিল। সুশ্রী সুতনু রমলা। বিজুকে সে ঈর্ষা করত। রমলা নামে একটা মেয়ে বিজুকে ভালবাসে। ভালবাসা-টাসা বুঝত না কিন্তু একটা পুরো তাজা মেয়ে ধরা দিয়েছে বিজুর মুঠোয়, ভাবলে শিহরণ খেলে যেত তরুণ শরীরে। সে বয়েসটা আলাদা। কাপড় ঢাকা মেয়েদের শরীর ডাক দিত ইশারায়।

রমলাকে বলেছিল—বিয়ে করে কি করব। আমার মত বোনাফায়েড বেকারের বিয়ে করা সাজে? আমাদের বাড়িতে বিয়ে করে কেউ সুখী হবে না।

—কেন?

—কেন ঠিক করে বলতে পারব না। শুধু জানি, ফাদার, দাদা বৌদি কিসের পেছনে ছুটে চলেছে। ওরা ঠিক কি চাইছে ওরা জানে না বোধহয়, তবু সকলে অদৃশ্য সোনার হরিণ ধরতে চাইছে। জানো রমলা, মা এদের আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমাকে বোঝাতে পারব না, মা কত নিরুপায়, ওদের সংসারে থেকে মা কি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।

—তুমি তো মাকে নিয়ে আলাদা থাকতে পার।

—না পারি না।

—কেন?

—আমার মনে হয়েছে, মা অপেক্ষা করছে।

—কিসের?

—বলতে পারব না। সব মানুষের মনের ভেতর যদি দেখা যেত তাহলে নিরর্থক হয়ে যেত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। কেউ কারো জন্যে ভাবনা-চিন্তা করত না।

দীপ্তেন বলেছিল—রমলা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কি?

—তুমি কি বিজুর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছ?

—ছিঃ ছিঃ তুমি একথা চিন্তা করতে পারলে?

—তাহলে?

—তাহলে কি?

রমলার চোখে চোখ পড়তে সে চোখ নামিয়েছিল। ওর মেদুর চাহনি হঠাৎ ঝলসে উঠেছিল। কাজল টানা চোখে প্রদীপের গর্ভে পোড়া সলতের দীপ্ত দীপান্বিতা। সে মুখ দেখতে পারে নি। মাথা নীচু করে বলেছিল—নিজেকে ধ্বংস করছ কেন?

—সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝিয়ে বললে, বুঝতে পারব না?

—সময় এখনো আসেনি।

—কবে আসবে?

—তারই অপেক্ষা করছি।

সিঁড়ি কটা টপকিয়ে উপরে উঠে যাবে কিনা ভাবে দীপ্তেন। ফাদার বৌদি-দাদা—এরা কি কেউ এখনো ফেরেনি? এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না, দালানের আলো জ্বলছে। কিনা। সিঁড়ির মুখের দরজা বন্ধ আছে বোধহয়। গ্রাণ্ড লেডি হয়ত একা জেগে বসে আছে।

মা কি সারা জীবন জেগে কাটিয়ে দিয়েছে? মা কি ইনসমনিয়ায় ভুগছে? সে ভাবতে চেষ্টা করে, কোনদিন মাকে ঘুমন্ত দেখেছে কিনা। খুব ছোটবেলার কথা মনে করতে পারে না। তবে ঘুমের ঘোর বাইরে যাবার দরকার হলে এক ডাকে সাড়া মিলত মার। দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠলে মার গলা শুনতে পেত—কাঁদিস নি, এই যে আমি আছি। সে একা নয়, মা আছে সঙ্গে ভয়ের মুহূর্তে, পাশে শুয়ে টেনে নিয়েছে বুকের নিবিড়ে। মার কোমল বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত।

একটু বড় হবার পর দীপ্তেন অন্য ঘরে শুত। কতদিন ঘুম ভাঙ্গা রাতে সে দেখেছে মা তার বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদছে। বাইরে সাঁই সাঁই বাতাস। কোথাও কোন শব্দ নেই। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকের জামা ভিজে যেত। কি বলবে ভেবে পেত না। অনেকক্ষণ পরে ডাকত—মা।

তড়িতে চলে যেত তরুবালা। তার মনে হত, সত্যি মা এসেছিল না সে স্বপ্ন দেখেছে। কতো কি মনে হত ঘুম-ঘুম নিদালীর মাঝে। স্যাঁৎস্যাঁৎ করত বুকের জামা। সকালে ঘুম থেকে উঠে সব প্রথম চোখ পড়ত বুকের কাছের জামা। জলের দাগের স্পষ্ট চিহ্ন।

মা কেন রাত গভীরে এসে কাঁদত সে বুঝতে পারত না। বোঝার মত বয়েস তার ছিল না। অনেক পরে সংসারের হালচাল যখন বুঝতে শিখেছে, বুঝতে পেরেছিল, কেন গ্রাণ্ড লেডি চোখের জল ফেলত গোপনে।

মাকে দেখত, সংসারের কাজে ডুবে গেছে। সকালে চান করে মা একটা সাদা খোলের লাল পাড় শাড়ি পরত। আঁচড়ান এক ঢাল চুলের মাঝে সিঁথিতে টক টক করত সিঁদুর। কপালের মাঝে জোড়া ভুরুর ওপরে বড় লাল সিঁদুরের টিপ।

সকালের সেই প্রসন্ন আলোয় মায়ের মুখে খেলা করত মমতার ছায়া। মাকে তার এতো ভালো লাগত। ঘুর ঘুর করত চারপাশে। মুখে কিছু বলত না, বার বার তাকাত মার মুখের দিকে।

মা বলত—পড়া নেই তোর?

—হ্যাঁ।

—তবে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?

—যাচ্ছি মা।

কিন্তু সে যেত না। মার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াত। একটা নেশা পেয়ে বসত। মাকে দেখে দেখে সাধ মিটত না।

বড় হয়ে তরুবালার গণ্ডি ছাড়িয়ে সে সরে এসেছে দূরে। দিনমানে রোজ দেখা হয় না, সবদিন বাড়ি ফেরে না। মার সংগে দেখা হয় রাতের বেলা। সে বাড়ি ফিরলে দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢোকে। সে দেখে, মা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। চল্লিশ পাওয়ারের আলোয় তরুবালার ঈষৎ কুঁজো চেহারা দেখে তার ভীষণ মায়া হয়। এ বাড়ির ঘরে বন্দী থেকে শেষ হয়ে আসছে মার জীবন। একদিন ফিরে হয়ত বহু দিনের পরিচিত মানুষটাকে আর দেখতে পাবে না।

মৃত্যু ভাবনা মনকে উতলা করে। এ বাড়িতে সম্পর্কের কোন যোগ অনুভব করে না। অভ্যাসের বশে বাড়ি ফেরে। এবং না ফিরলেও কারো কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। বাইরে থাকলে তরুবালার চিন্তা মনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে না। শুধু যখন বাড়ি ফেরে তরুবালার নিঃশব্দে উঠে যাওয়া তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় মা এখনো বেঁচে আছে। এবং সংগে সংগে এক ধরণের মায়া আচ্ছন্ন করে সারা মন। ঠিক সে মুহূর্তে সে অস্বীকার করতে পারে না, এ বাড়িতে তার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে মাকে ঘিরে।

নন্তু-মাসীমা তাকে একদিন বলেছিল—জানিস দীপু, তোর মার মত অভাগা বোধ হয় সংসারে কেউ নেই।

—কেন?

তোর মার অভাব কি। যা থাকলে যে কোন মেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে তোর মার বরাতে সব জুটেছে— ভাল ঘর ভাল স্বামী, ভাল ছেলে। তবু সুখী হতে পারল না।

—কেন?

—সব মেয়ে কি শুধু স্বামীর বাড়ি গাড়ি নিয়ে সুখী হতে পারে? তোর বাবা তোর মার কোন অভাব রাখে নি। কিন্তু যা না পেলে জীবনটা খা-খা করে সে-ভালবাসা পেল না।

কেন?

এবার নন্তু মাসীমা হেসেছিল—দূর বোকা, ভালবাসা বুঝি জোর করে পাওয়া যায়। যেচে সোহাগ আর কেঁদে ভালবাসা হয় না।

নন্তু-মাসীমা, তোমার কথা ঠিক—কেন ভালবাসা হয় না। অথচ দ্যাখ, এতো সাধারণ কথাটা আমরা বুঝি না, বুঝতে চাই না কেন বলোত?

কেঁদে ভালবাসা হলে বিজু কি রমলাকে ভুলে যেতে পারছে। রমলা তার কাছে চোখের জল ফেলেছিল কি না দীপ্তেন জানে না, তবু কথায় কথায় অনেক কিছু জানা যায়। বিজু সত্যি কি কোনদিন রমলাকে ভালবেসেছিল? কবরখানার সমস্ত উচ্ছাস কি সোডা ওয়াটারের গ্যাসের মত উবে গেছে?

রমলার কথায় বিজু এক চোখ টিপে বলে—শী ইজ চারমিং।

—স্বীকার করিস?

—সুন্দরকে অস্বীকার করব এতো বড়ো গাড়ল হলাম কবে।

—তবে তুই ওকে ছেড়ে গেলি কেন? তুই না ওকে ভালবাসতিস?

—ওটা কাফ লাভ।

—মানে?

—ও-বয়েসে মেয়েদের সম্বন্ধে সব ছেলেদের একটা ভীষণ কৌতুহল থাকে—কাপড় ঢাকা শরীরটার মধ্যে যেন সলোমনের খনির চেয়েও মূল্যবান কোন রত্ন লুকোন রয়েছে। এটা প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, এমন কি ভাললাগা নয়—শুধু কৌতুহল। সদ্য ডিম-ফোটা পাখির ছানা যেমন মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ঠিক তেমন। তারপর একদিন রহস্য ভেদ হলো এবং অবসান হলো কৌতুহলের।

—শুধু এই?

—তাছাড়া আর কি!

—কিন্তু প্রেম? ভালবাসা?

—অল বোগাস। পুরুষ চায় মেয়ে, মেয়ে চায় পুরুষ—এটা প্রয়োজন। এর মধ্যে ভালবাসা কোথা? বিয়ের পর দুটো মাস স্বামী তার স্ত্রীকে ভালবাসে, কারণ তখনো সে মনে করে স্ত্রী ভোগের বস্তু। পরে অন্য মেয়ের পেছনে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে। আর মেয়েরা সতীত্বের মুখোস এঁটে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে।

—এ কি তোর মনের কথা?

—দেখে দেখে শিখেছি। আগে ভারি বোকা ছিলাম

—হঠাৎ একথা বলছিস কেন?

—এক সময় প্রেম-ভালবাসায় বিশ্বাস ছিল। রমলার কথা তোকে অনেক বলেছি—তাই না? পরে দেখে-শুনে বুঝেছি, নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রয়োজনের ভিতের ওপর টিঁকে আছে। সুকুমার মনোবৃত্তি মুখোস মাত্র। ওর কোন মূল্য নেই। বেবাক ফাঁকা কথা।

দীপ্তেন আর কিছু বলতে পারেনি। মা সংসার আগলে পড়ে আছে। বিজুর কথা মেনে নিলে সে কি ভাববে, মা সুযোগ পায়নি বলে সংসারে পড়ে আছে সতী-সাধ্বীর রূপ ধরে? অথচ দিনের পর দিন বছরের পর বছর সে মাকে দেখছে। ওলড গ্রান্ড লেডি ক্ষয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে।

দু-চারবার সে তরুবালাকে বলেছে—তুমি রোজ বসে থাক কেন?

—সকলে না ফিরলে ঘরে ঢুকি কি করে?

—ওরা ফুর্তি করবে, তুমি কষ্ট করবে কেন?

—আমি যে মা।

—তোমার মুখের দিকে কে তাকায়?

—নাই বা কেউ তাকাল, আমি যে তোদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

বোকা, গ্রান্ড লেডি, তুমি ভীষণ এ জগতে কেউ কারোর মুখের দিকে তাকায় না। চারিদিকে চোখ মেলে দ্যাখ, সকলে চলেছে নিজের কাজে। কেউ থেমে নেই, কেউ কারোর জন্যে অপেক্ষা করে না। গ্রান্ড লেডি, লোকের চোখে তুমি বোকা আর তাই তুমি সতী-সাধ্বী। ফাদার চরে খাচ্ছে, ফাদার চালু, পারফেকট জেন্টলম্যান। ফাদার ডুডুও খায়, টামাকও খায়—ফাদার কলচর্ড।

ট্যাকসি থেকে ফাদারকে নামতে দেখেছিল। গাড়ির মধ্যে যে মেয়েটা বসেছিল তাকে দেখে চমকে উঠেছিল দীপ্তেন। সে-রাতে আলো-জ্বলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রমলা বলেছিল—কি করব, বাঁচতে হবে তো!

—এ ছাড়া পথ নেই? বিয়ে করো না কেন?

—আমার ছেলেকে কোথা রেখে যাব?

—তোমার ছেলে!

—হ্যাঁ।

—বাপ কে?

—বিজু।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়, সঠিক সময় এখনো জানা হয়নি। বাড়ির সামনে এসে কেন এমন চিন্তা এলো, সে বুঝতে পারে না। সময়ের কথা ভাবতে ভাবতে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। সকলে কি তার মত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে?

সে দেখে একটা লোক আসছে অন্ধকার সরিয়ে। লোকটা কাছে আসতে সে জিজ্ঞেস করে—সময় কত?

লোকটা মাথা তোলে। দীপ্তেন দেখে, একটা চাপ-বাঁধা অন্ধকার চেয়ে আছে তার দিকে। বলে—আমার ঘড়িতে ঠিক টাইম দিচ্ছে না, অপেক্ষা করুন, পরে কেউ এলে জেনে নেবেন।

সেই অন্ধকারে পরবর্তী লোকের আশায় দীপ্তেন অপেক্ষা করে।

নাগাল্যাণ্ডের ভেতর থেকে

নিবারণ চৌধুরী

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ ভারত সরকার ঘোষণা করলেন :

ভারত সরকার নাগাভূমিতে শান্তি স্থাপনের অভিপ্রেত ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং এই উদ্দেশ্য পূর্বে উল্লেখিতভাবে প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন; নাগাভূমি সরকারের প্রতিনিধিরা এ'দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মগোপনকারী নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত থাকবেন। আলোচনাকে সহজসাধ্য করতে এবং ১০ই আগষ্ট ১৯৬৪-এর উপরোক্ত চিঠির প্রতি নজর রেখে আদেশ করা হচ্ছে যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ সাল থেকে এবং তারপর আপাততঃ একমাস নিরাপত্তা বাহিনীকে নিযুক্ত করা হবে না—

(ক) জঙ্গলে তৎপরতা,

(খ) আত্মগোপনকারীদের ক্যাম্পে হানা দেওয়া,

(গ) নিরাপত্তা চৌকি থেকে ১,০০০ গজের বাইরে টহল দেওয়া?

(ঘ) গ্রাম তল্লাসী

(ঙ) আকাশ থেকে তৎপরতা

(চ) গেপ্তার, এবং

(ছ) শাস্তিমূলক শ্রম আদায়ে।

এই মেয়াদের মধ্যে আত্মগোপনকারীদের কার্যকলাপে সহযোগিতার অভিযোগে কোনো জরিমানা ধার্য করা হবে না।

এই ভিত্তিতে উপরোক্ত তৎপরতা মুলতবী থাকবে যে এই মেয়াদের ভেতরে স্বীকৃতভাবে আত্মগোপনকারীরা নিরস্ত থাকবেন—

(১) চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও 'এ্যামবুজ'

(২) জরিমানা ধার্যকরা—

(৩) কিডন্যাপ করা ও দলে লোক ভর্তি করা—

(৪) অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ

(৫) নিরাপত্তা চৌকি শহর ও শাসন কেন্দ্রে গুলিবর্ষণ ও আক্রমণ; এবং

(৬) সশস্ত্র অবস্থায় অথবা সামরিক পোষাকে শহর, গ্রাম ও শাসন কেন্দ্রে চলাফেরা নিরপত্তা চৌকি যেখানে রয়েছে এবং নিরাপত্তা চৌকির ১,০০০ গজের মধ্যে প্রবেশ করা থেকে।

১০ আগষ্ট, ১৯৬৪ সালের চিঠির ৫ম পংক্তিতে উল্লেখিত আশ্বাস নথিভুক্ত করা গেলো যে আত্মগোপনকারীরা এই মেয়াদের মধ্যে সশস্ত্র অবস্থায় অথবা সামরিক পোষাকে শহরে এবং গ্রামে এবং নিরাপত্তা চৌকির ১:০০০ গজের মধ্যে চলাফেরা থেকে নিরস্ত থাকবেন। এই বোঝাপড়া সমর্থিত হচ্ছে যে সশস্ত্র অথবা সামরিক পোষাকে কোন অঞ্চলে চলাচল অত্যাবশ্যকীয় হলে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে; যে স্থলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যথা, রাস্তার পাশে অথবা রাস্তা অতিক্রম করার সময়ে পুলের ওপর।

অপ্রত্যাশিতভাবে মুখোমুখি হওয়া এড়াবার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু ঘটনাক্রমে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে, তৎপরতা মুলতুবী রাখার মেয়াদের মধ্যে দু'পক্ষই এই নিয়ম মেনে চলবেন যে "প্রথমে গুলিবর্ষিত না হলে গুলিবর্ষণ করা হবে না।।"

এই আশ্বাস নথিভুক্ত করা হচ্ছে যে তৎপরতা মুলতুবী রাখার সময়ে জনবসতিতে, এই শর্তাধীনে নিরাপত্তা বাহিনী যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে অস্ত্র প্রদর্শন করে চলাফেরা করা যাবে না যাতে শান্তিপূর্ণ জীবন নির্বাহের পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে এবং মুক্ত পরিবেশে আলাপ আলোচনা চলতে পারে।

আমি নথিভুক্ত করছি যে নিরাপত্তা বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমানাতে তিন মাইল জুড়ে, সীমান্ত রেখা থেকে আকাশ-পথে কাক-ওড়া-পথের পরিমিতি নিয়ে, টহল দেবে বলে স্বীকৃত হচ্ছে এবং তৎপরতা বন্ধের পর এই এখনকার রদবদল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই আশ্বাস নথিভুক্ত হচ্ছে যে তৎপরতা মুলতবী রাখার মেয়াদের মধ্যে আত্মগোপনকারীরা বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করবেন না।

তৎপরতা মুলতুবী রাখার মেয়াদের মধ্যে ভারত সরকার নিরাপত্তা বাহিনীর রসদ যোগাবার জন্য কনভয় পাহারা অব্যাহত রাখবেন এবং যথারীতি রাস্তার দু'পাশে টহল থাকবে। রাস্তায় টহল, কনভয় চলে যাওয়ার পর, দিনের শেষে প্রত্যাহৃত হবে। কনভয়ের সাপ্তাহিক নির্ধারিত দিন ও গতিপথ পূর্বে ঘোষণা করা হবে এবং যতদূর সম্ভব সেটা আত্মগোপনকারী নেতাদের গোচরে আনা হবে। অসুস্থ ও আহত লোকাদের স্থানান্তরিত করার জন্য জরুরী কনভয় চালানো আবশ্যক হতে পারে। এই সব কনভয়ের জন্য পূর্বাহ্নে সংবাদ দেওয়া সম্ভবপর না হতে পারে। এইসব কনভয়ের জন্য রাস্তায় টহলদার বাহিনী থাকবে না। আত্মরক্ষার জন্য এরা স্ব-নির্ভর থাকবে। ১০০ গজ পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে টহলের সীমানা থাকবে বলে নথিভুক্ত হলো; কার্যতঃ এটা যথেষ্ট নয় এবং এই প্রসঙ্গ শীঘ্র পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত রাখা দরকার বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।"

৬ই সেপ্টেম্বর একটি বহু প্রত্যাশিত দিন। অস্ত্র সংবরণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যরাতের নাগাভূমি আনন্দ উল্লাসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭এ নাগাভূমি ঘুমে অচেতন ছিল মধ্যরাতে। টিবেটো বর্মণ নাগা ভাষা গোষ্ঠীতে ৬ সংখ্যাটি প্রায় একই উচ্চারণ ধ্বনি নিয়ে বিরাজ করছে। আও-নাগাদের জন্মবৃত্তান্ত দুটি পাথরের সঙ্গে যুক্ত। প্রধান দুটো উৎসব মায়ংৎসু এবং মিথুন উৎসর্গ ছ'দিন জুড়ে চলে। শুভাশুভ অসংখ্য বাদবিচার ছ'য় সংখ্যায় নির্ধারিত। বৈরী সংঘটন ৬ই অকটোবর ১৯৫৯ সালে ফেডারেল সরকার নাম নিয়েছিল। ৬ই নভেম্বর ১৯৬১ সালে ফিজো বৃটিশ নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে টুয়েনসাং-এর পংডিচাং হংকিং সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন বৈরীদের মধ্যে বিরোধের ফলে। অস্ত্রসংবরণ ঘোষণার পরবর্তী আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বৈরী নেতাদের সঙ্গে ছ'বার মিলিত হয়েছিলেন।

ব্যাপটিষ্ট গীর্জার ডাকে সাত শতাধিক গীর্জা মধ্যরাতে ঘন্টাধ্বনি করে প্রার্থনায়, গানে ও যীশু নামে ভরে থেকে আজয় এ সান্ত মুহূর্তের মধ্য। যেন গণগলীল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে যীশু নিজেই ভর্ৎসনা করে বলছেন : **Peace be still!** শহরে গ্রামে নিজেদের ও আত্মগোপনকারী স্বজনদের মধ্যে করমর্দনে, আলিঙ্গনে অনেকেই ভেবেছেন শান্তির এটা পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সুপ্রভাতে শোনা গেল মধ্যরাতে দু'টি তরুণকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতীকধর্মী ছ'য় সংখ্যার শুভাশুভ সংবাদ অবিলম্বে একটা উৎকণ্ঠার সুর জুড়ে গেলো যথাস্থানে। তবু শান্তি, নিরাপত্তা সব সময়ই ঈশ্বরের দান "তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক দিয়া সাগরকে বলিলেন, থাম, স্থির হও। ইহাতে বাতাস থামিয়া গেল ও সমস্ত প্রশান্ত হইল" বাইবেল)।

নাগাভূমির সার্বভৌমত্ব নি[illegible] অসংখ্য বৈঠক-আলোচনা হয়েছে। আলো[illegible]য় অনেক খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তবু কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ ব্যাপারে শান্তি মিশন নিজের উৎসাহে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ সালে আরেকটা দীর্ঘ পত্রে ভারত সরকার ও ফেডারেল সরকারকে সম্বোধন করে— এই অস্ত্র সংবরন চুক্তির অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন। শান্তি প্রস্তাবের সারাংশ : শান্তি মিশন মনে করে যে শান্তিকে স্থায়ী করা নাগাভূমির প্রত্যেকের দায়িত্ব— প্রকৃত বিশ্বাস ও আস্থা যার ওপর বর্তেছে। সেই অনুসারে শান্তি মিশন এই পত্রে দু'পক্ষকে সম্বোধন করছে।........

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ সালে নাগাভূমি শান্তি আলোচনা শুরু হয়ে এখন এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যখন নাগাভূমি ফেডারেল সরকার ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য নিজেদের দাবী উপস্থাপিত করেছেন।

নাগাভূমি ফেডারেল সরকার দাবী করেছেন যে নাগারা কখনই ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক বিজিত হয়নি, অথবা কোন ভারতীয় সরকার কর্তৃক শাসিত হয়নি, বরং

প্রায় একশ বছর আগে ইংরেজ সৈন্য ও সরকার এই অঞ্চল দখলে নিয়েছিলেন। তবু, সর্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত থেকে পৃথকভাবে ওদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে বলে দাবী করেছেন, এবং এখন ওরা সেই স্বাধীনতার স্বীকৃতি দাবী করছেন...।

অন্যদিকে ভারত সরকারের দাবী এই যে ১৯৪৭ সালের পূর্বে নাগাভূমি ভারতের অবিভাজ্য অংশ ছিল এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই নাগাভূমি ভারতের অংশ হয়েছে। এই সঙ্গে ভারত সরকার দাবী করেন যে নাগাভূমিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা গ্রাহ্য করেই নাগাভূমি রাজ্য গঠন করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে নাগাদের পূর্ণতম বিকাশ সাধন নিশ্চিত করতে এবং ওদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে স্বীকৃতি দিতে এবং ওদের চিরায়ত অধিকার ও সম্পদের অনুরূপভাবে নিরাপত্তা বিধান করতে. নাগারা বিদেশী শক্তির অধীনে নয়, নিজেরাই ওরা নিজেদের শাসক।

...নাগাদের একাংশ সর্বোত্তমভাবে নিজেদের স্বার্থের অনুকূল বলে নাগাভূমির পূর্ণরাজ্যের মর্যাদাকে গ্রহণ করেছেন। অপর অংশ এতে নিজেদের লক্ষ্য ও আদর্শ— যার জন্য এই সংগ্রাম,— সিদ্ধ হয়েছে বলে বিবেচনা করেন নি......।

......ভারত সরকার ও নাগাভূমি ফেডারেল সরকার উভয়েই একটা আলাপ আলোচনার সূত্রে পৌঁছুনো যায় কিনা সেটা গভীরভাবে বিবেচনা করবেন। এক পক্ষে, স্বেচ্ছা—প্রণোদিত হয়ে নাগাভূমি ফেডারেল সরকার ভারত ইউনিয়নে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এর শর্তাবলী স্থির করতে পারেন। অন্যপক্ষে, ভারত সরকার বিবেচনা করতে পারেন কিভাবে নাগাভূমি ও ভারত সরকারের সম্পদ ও কাঠামোর গ্রহণ ও পুনর্বিন্যাস করা যায় যাতে সর্বস্তরের রাজনৈতিক আকাংখার পরিতুষ্টি হয় এবং 'নাগা শান্তি ঘোষণায়' ব্যক্ত শান্তির আদর্শকে মূলতঃ রূপায়িত করা যায়...।

...দুর্ভাগ্যক্রমে, যুদ্ধবর্জনের দ্বিপাক্ষিক ঘোষণার পরবর্তী শান্তি মিশনের প্রস্তাবিত সমস্ত লুকায়িত অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদ হেফাজতে জমা রাখা এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজ থেকে প্রত্যাহৃত করা কার্যকরী হয়নি।

......নাগাভূমি ফেডারেল সরকার সৈন্য বাহিনীকে যে-সব অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়েছিলেন সেগুলো এক বা একাধিক স্থানে নিজেদের হেফাজতে ও নিজেদের অস্ত্রাগারে সংগৃহীত হোক যাতে ভবিষ্যতে ওদের সশস্ত্র বাহিনী অস্ত্র প্রদর্শন করে চলা ফেরার অথবা জবরদস্তি অর্থ অথবা রসদ আদায়ের অভিযোগের কোন ভিত্তি না থাকে। উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে ওরা

বাঁশের কাজ

নিজেদের কাছে এই প্রশ্ন রাখবেন যে দলে লোক ভর্তি করা এবং নাগাভূমির বাইরে পাকিস্তান অভিমুখে চলাচল এমন ধারণার সৃষ্টি করে কি-না যে এগুলো বৈরীতা পুনরারম্ভের প্রস্তুতি পর্বমাত্র, এবং যদি তাই হয়, তবে লোক দলে ভর্তি করা—এবং চলাচল বন্ধ করে এর প্রতিবিধান করবেন। ভারত সরকার লক্ষ্য রাখবেন নিরাপত্তা বাহিনী ও অসামরিক শাসনযন্ত্র যেন আক্ষরিক ও গূঢ় অর্থে চুক্তির শর্তাবলী কঠোরভাবে প্রতিপালন করা— অব্যাহত রাখেন......।'

এই প্রস্তাবে সাক্ষর দিয়েছেন রেঃ মাইকেল স্কট, শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা ও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। শান্তি মিশনের এক বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানে ব্যাপটিস্ট কাউন্সিলের নেতা রেঃ লংরী আও এই তিন সদস্যকে সমাদর জানিয়ে বলেন : 'শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে আমরা শান্তি মিশনের সদস্য হতে অনুরোধ করেছিলাম তিনি একজন উচ্চস্তরের নেতা বলে নয়, কিন্তু তিনি যেহেতু গান্ধীর শিষ্য। ঠিক এভাবে আমরা শ্রীবি. পি চালিহাকে শান্তি মিশনে যোগ দিতে অনুরোধ করেছি তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী বলে নয়, তিনি যেহেতু গান্ধীর একজন অনুচর। এবং আমরা রেঃ মাইকেল স্কটকে শান্তি মিশনে যোগ দিতে অনুরোধ করেছি তিনি বিশ্বের পরিচিত একজন নেতা বলে নয়, তিনি যেহেতু যীশুখ্রীষ্টের একজন সেবক—।'

শান্তি মিশনের আন্তরিকতা ও দৌত্য মেনে নিয়ে ভারত সরকার শ্রীগুনদেভিয়াকে বৈরী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য মনোনীত করলেন। শ্রীগুনদেভিয়া আলোচনার শুরুতে জানালেন : 'আমি প্রত্যেক সুবিবেচক নাগাকে অভিহিত করতে চাই যে স্বাধীকার, সাম্য ও স্বাধীনতা নিশ্চিতভাবে আপনাদের রয়েছে এবং এগুলো নিশ্চিত থাকবে এবং অন্য কোনো নিরাপত্তা অথবা নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার কোনো ব্যবস্থা, উন্নততর ব্যবস্থার শর্ত অথবা পূর্ণ ও সমৃদ্ধতর জীবনের প্রশ্নকে যথাযথ বিবেচনা ও পরীক্ষা করে দেখা হবে। সে জন্যই আমরা এখানে এসেছি। আমরা আপনাদের বলতে এসেছি আপনারা কি পেয়েছেন এবং জানতে এসেছি আপনারা অন্য কি চান।' কুড়ি বছর

আগে রাজ্যপাল ফজল আলী একই কথা জানিয়েছেন ঃ স্বাধীনতা বলতেই, আন্তরিকভাবে যদি এটিকে গ্রহণ করা হয় এবং যথার্থভাবে ভোগ করা হয়। গুনদেভিয়া নতুন রাজ্য এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের প্রতি দৃষ্টি রেখে বললেন যে, নাগারা তাঁর (গুনদেভিয়ার) চাইতেও বেশী স্বাধীনতা ভোগ করছেন। বৈরী দলের নেতারা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চান। সংবিধানের কোনো ব্যাখ্যায় প্রতি ওদের আগ্রহ থাকার কথা নয়। ওদের দাবি (১) সার্বভৌমত্ব, (২) এবং সাবেক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা। এই অনড় দাবির চার-দফা আলোচনায় গুনদেভিয়া শুনলেন। শ্রীগুনদেভিয়ার স্থলে শ্রীধর্মবীরকে মনোনীত করা হলো। তিনি কেবিনেট সেক্রেটারি হিসেবে পদমর্যাদায় কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রীর সমতুল্য। ধর্মবীরকে অস্ত্র সংবরণ চুক্তির বিষয়ে বিশদভাবে অবহিত করার দায়িত্ব নিয়ে শান্তি মিশনের সদস্যরা দিল্লিতে যাতায়াত করার সময়েই প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বৈরী নেতাদের সঙ্গে বিনাসর্তে কথাবার্তা বলার জন্যে আহবান করে পাঠালেন। ধর্মবীর আর আলোচনার মধ্যে এলেন না। আলোচনার গতি ক্রমে উচ্চস্তরে যাওয়াতে বৈরী নেতারা আশ্বস্ত হলেন।

অস্ত্র সংবরণ চুক্তি ও শান্তি আলোচনার ছায়ায় নভেম্বর, ১৯৬৫ এবং ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল ও মে ১৯৬৬ সালে লামডিং-মারিয়ানী রেলপথে যাত্রীদের প্রাণনাশ চলতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনদিনের মধ্যে দুটো বিস্ফোরণ করে শতাধিক প্রাণহানি এবং দুশ'-র বেশি লোককে আহত করা হয়। রেলযাত্রীদের হত্যা করার জন্যে প্লাস্টিক বোমা ভারতে তৈরি হয় না। বোমাগুলো বিদেশে তৈরি বলে রেলমন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিং লোকসভাকে জানালেন।

অস্ত্র সংবরণ চুক্তি থেকে বিচ্যুতির অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগগুলো যাচাই করে সত্যতা নিরূপণের জন্যে একটা শান্তি-পর্যবেক্ষকদল নিয়োগ করা হলো। এই দলে যাতে বিদেশী পর্যবেক্ষকরা অংশ নিতে পারেন সে দাবী আত্মগোপনকারীরা যথারীতি রেখেছিলেন। নিরপেক্ষতার অন্য দিগন্তে ছিলেন শান্তি মিশনের সদস্য রেঃ মাইকেল স্কট। তিনি বিশ্ববাসীকে নাগা-সমস্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চিঠি লিখতে শুরু করলেন। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে তিনি অনুরোধ জানালেন নাগাভূমি শান্তি মিশনে আরো বিদেশী পর্যবেক্ষকের স্থান করে দিতে। ব্রহ্মদেশের ভেতর দিয়ে বৈরী নাগাদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করাতে আপত্তি জানিয়ে তিনি চিঠি লিখলেন নে উইনকে। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুরকে নাগাভূমির সঙ্গে পরিচিত করতে তিনি লিখলেন—কিংবদন্তীর মত বিরুদ্ধ গুণে ভূষিত, এই নরমুণ্ড শিকারীদের শত শত বৎসর পরিব্রাজকরা ভয় করেছেন এবং এদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি অন্যায় করলে ওরা পরিতাপহীনভাবে প্রতিশোধ-প্রবণ...।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ফেডারেল সরকারের বিশ্বাস হারিয়েছেন এই সংবাদেতে এসে পদত্যাগ করলেন। মে মাসে শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহাও শান্তি-মিশন থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন নিজের রাজ্যের সীমানায় নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে জনমতের চাপে। একনিষ্ঠ রেঃ মাইকেল স্কট রইলেন শান্তি-মিশনের একমাত্র প্রবক্তা। জয়প্রকাশ ও বিমলাপ্রসাদের পদত্যাগের ফলে শান্তি মিশনের কোন লোকসান হলো না যেহেতু মিশনের প্রাথমিক উদ্যোগ অভীষ্ট লাভ হয়েছিল এবং রেঃ স্কটের দেশে-বিদেশে দ্বিমুখী শান্তি প্রচেষ্টা এককভাবে অব্যাহত রাখার সুযোগ পেলো।

রেঃ মাইকেল স্কট কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে উনিশ বছর বয়সে জীবন শুরু করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি নিজেও ধর্মযাজকদের পুত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও নিজেকে তিনি নির্লিপ্ত রাখেন নি ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ সালে যথাক্রমে কোলকাতা ও বোম্বাই শহরে এ্যাংলিকান গির্জায় চ্যাপলিন থাকার সময়ে। রাজনৈতিক কার্যকলাপের দায়ে তাঁকে ভারত ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরতে হলো। সেখানে অবিলম্বে তিন মাসের কারাদণ্ড পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমর্থনে কাজ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্যে এবং বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিপক্ষে জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর আত্মজীবনী এ টাইম টু স্পিক (১৯৫৮) সেবার, সমবেদনার দলিল।

চীনা আক্রমণের পর দিল্লি-পিকিং শান্তি পদযাত্রার প্রসঙ্গে তিনি নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সুযোগে ফিজোর লেখা চিঠি তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। ফিজোকে লণ্ডনে পৌঁছে দেবার এবং ফিজোর বক্তব্য ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। শান্তি মিশনে মাইকেল স্কটের অন্তর্ভুক্তি দ্বিধা থর থর চূড়া থেকে কখনই নেমে আসেনি। অবশেষে ভারত সরকার তাঁকে বহিষ্কার আদেশ দিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের পদত্যাগের চার মাসের মধ্যেই শান্তি মিশন বিলোপ হলো সদস্যদের বিভিন্ন কারণে পদত্যাগ ও অপসারণের ফলে। এই বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে মাইকেল স্কট তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। আরো প্রতিবাদ জানালেন তাঁর নির্দোষ কাগজপত্র আটক করার জন্যে। শান্তি মিশনের শেষ দশা তাঁর প্রতিবাদ ও নাগাভূমির রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ ভাষ্য রাখলেন—'নাগারা, ভারত, না পৃথিবীর সমস্যা', শীর্ষক বই লিখে।

স্কট ফিরে যাওয়ার সাতদিনের মধ্যেই ব্যাপটিস্ট কাউন্সিল নতুনভাবে একটা শান্তি মিশন গড়লেন। নতুন শান্তি মিশন দায়িত্ব নিতে পারলেন না। এবং আর কোনো শান্তি মিশন-এর মধ্যস্থতার বাইরেই শান্তি প্রচেষ্টা চিরজীবী হয়ে থাকলো শান্তি পর্যবেক্ষক দলের নানা বিবর্তনের মধ্যে। শান্তি পর্যবেক্ষক দলের আহবায়ক ছিলেন ডাঃ আরাম। বিশ্বশান্তি বিগ্রেডের এশিয়া অঞ্চলের সচিব ও শিক্ষাবিদ হিসেবে ডঃ আরাম নাগাভূমিতে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার আগেই সুপরিচিত ছিলেন। পর্যবেক্ষক দলে শ্রীমতী মার্জোরী সাইকস ও শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর উজ্জ্বল নামও ছিল। যে প্রস্তাবিত শান্তি মিশনের সদস্যরা বিভিন্ন কারণে নিজেদের অক্ষমতা জানালেন, তার মধ্যে ছিলেন (১) শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী, (২) শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন, (৩) শ্রীমায়াংনোকচা আও, (৪) শ্রীনুখা ও (৫) শ্রীভিজল। পূর্ববর্তী শান্তি মিশনের কার্যকালে আলাপ-আলোচনা ও নানা রকমের সন্দেহ নিরসনের জন্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিরোনামে এলেন : (১) নাগাভূমি ব্যাপটিস্ট কাউন্সিল (২) শান্তি মিশন (৩) ভারত সরকার (৪) নাগাভূমি ফেডারেল সরকার (৫) নাগভূমি রাজ্য সরকার (৬) শান্তি পর্যবেক্ষক দল (৭) তাতার হো হো (ফেডারেল পার্লামেণ্ট) (৮) নাগাভূমি ফেডারেল সরকারের রাজনৈতিক দল নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিলের প্রবাসী সভাপতি, ফিজো (৯) নাগাভূমি রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক দল নাগা ন্যাশনেলিস্ট ওর্গেনাইজেশন এবং আরো অনেকে নানা পদাধিকারবলে।

গুনদেভিয়ার সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে নানা প্রশ্নের আন্তর্জাতিক সমাধান ও গণভোটের প্রস্তাবকে অদৃশ্য অঙ্গুলি সঞ্চালনে কেউ যেন বার বার পুনর্মূষিক ভবঃ বলে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলো। গুনদেভিয়ার চাইতে পদাধিকারবলে উন্নত প্রতিনিধি ধর্মবীর আলোচনায় বসার সুযোগ পেলেন না। প্রধানমন্ত্রী আত্মগোপনকারী নেতাদের দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের কয়েকদিন আগে লালবাহাদুর তাসখন্দে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শান্তি মিশনের উদ্যোগে অস্ত্র সংবরণ চুক্তি ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হলো। নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিলের নেতাদের সঙ্গে আসামের রাজ্যপাল স্যার আকবর হায়দরী, স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্তে, ন-দফা সমঝোতা করার পরই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্যার আকবর হায়দরীর ন-দফার একটি শর্ত পরে বহুবিতর্কিত হয়েছিল। মৃত্যু সব সময়ই দুঃখদায়ক। এই তিনজন নেতার মৃত্যু নাগাভূমির আশা-নিরাশাতেও ছায়াপাত করেছে।

কোহিমার মহিমা

'সে এখনও আমার পথে অনিমেষ চেয়ে আছে'—আঙ্গামী নাগা ভাষায় লেখা এটা একটা উপন্যাসের নাম। লিখেছেন নাগাভূমির শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসখহোজলে। নাগাজন-গোষ্ঠীর একমাত্র ঔপন্যাসিক তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোহিমা রণাঙ্গনে এই উপন্যাসের

পটভূমি। যে আহত বিদেশী সৈনিক কোনো নাগা রমণীর পরিচর্যার প্রাণ পেয়েছিল, তারই স্মৃতিচারণ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একদা জীবন ফিরে পাওয়ার গল্প। সৈনিক যে বিদেশী ফুল বলে যে অন্যকে দেখেছিলো, তার কানে কি শঙ্খের বলয় ছিল? সে কি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর মত মুণ্ডিত মস্তক ছিল? আংগামী নাগা-ভাষায় লেখা এই উপন্যাসের স্বাদ থেকে আমরা অনেকেই বঞ্চিত। কিন্তু পরের মুখে ঝাল খেয়ে বুঝতে পারি এই উপন্যাস মেঘ ও কুয়াশার নীচে অন্য এক সমুদ্রের নোন। এই হৃদয়সংবাদ চিরদিনের এক মানব-সত্যকে ঘোষণা করে।

ইনার লাইন ও ম্যাকমোহন লাইনে আবদ্ধ নাগাভূমিতে বিদেশী সৈনিক যে-হৃদয়ের সংবাদ পেয়েছিলেন, সেটা পরবর্তী-কালে সাহিত্যে স্থান না পেলেও, সামাজিক বন্ধনে ধরা পড়েছে। নাগাভূমির নাগরিকরা দু-তিনজনের বেশি সুন্দরী অন্য প্রদেশ থেকে সংগ্রহ করেননি। কিন্তু নাগিনী-কন্যারা ভারতের প্রায় সব প্রদেশে স্থান করে নিয়েছেন। নাগাভূমির সুপরিচিত নেতারাও জামাই অথবা ভগ্নীপতি গ্রহণ করেছেন ইনার লাইনের বাইরে থেকে। এই নেতাদের মধ্যে ফিজো, ভোভিচুবা ও ইমলং চাং কন্যা-দান করেছেন, চুবাতুচি ভগ্নী সম্প্রদান করেছেন। ফিজোর কন্যা শ্রীমতী ম্যাভিশ্যানু অবশ্য পিতার আশীর্বাদ ছাড়াই রাধিকা নাম নিয়ে ভারতীয় স্থলবাহিনীর কোন অফিসারকে বরণ করে নিয়েছিলেন। ইনার লাইনের নাগপাশে নাগাভূমির জামাইরাও নিয়ন্ত্রিত। ইনার লাইনের বেষ্টন দিয়ে নাগা পাহাড়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল ১৮৭৩ সালে যাতে সমতলভূমিতে নেমে নাগারা অবাধে লুণ্ঠন করতে না পারেন। সমতলভূমিতে যেতে ইচ্ছুক নাগাদের ইনার লাইন অতিক্রম করার অনুমতিপত্র নিতে হতো। দুবার সংশোধিত হয়ে একই ইনার লাইন বজায় রয়েছে যাতে অন্যান্য লোকেরা সেখানে গিয়ে নিজেদের স্বার্থে নাগাদের প্রবঞ্চিত না করতে পারে।

ইনার লাইন রক্ষা করার তাগিদে সামাগুটিং থেকে কোহিমাতে উঠে এসেছিল রাজশকতি ১৮৭৬ সালে। সেই থেকে কোহিমা নাগাভূমির প্রাণকেন্দ্র। পরবর্তী রাজধানী। শুধু আঞ্চলিক ইতিহাস নয়, বিশ্বের ইতিহাস ও কোহিমাতে পৌঁছে একটা বড় মোড় ঘুরেছে। কোহিমাতে জেনারেল মুটাগুচি অশ্রুবর্ষণ করে ফিরে গেছেন। তিন মাসের যুদ্ধে, কোহিমার আশেপাশে কোন কোন পাহাড-চূড়ো দশ থেকে বারোবার যুযুধমান দুই পক্ষের মধ্যে হাতবদল হয়েছে, পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার সৈনিক আষাঢ়-শ্রাবণ ধারার সঙ্গে নিজেদের শেষনিঃশ্বাস মিশিয়ে দিয়েছেন। এরই মধ্যে মিত্রপক্ষের টিনে সংরক্ষিত খাবার নাগাভূমির শিশুদের জিবের কৌতূহল নিবৃত্তি করেছে আর জাপানীদের সয়াবীন ও ফার্ণ-এর খিচুড়ি ভরা বাঁশের চোঙ স্বাদ-গন্ধে অবি-লম্বে কোন আগ্রহ সৃষ্টি করেনি।

এক লক্ষ জাপানী সৈন্য ১৯৪৪ সালের ১লা মার্চ শ্রাবণের মত চিন্দুইনের কূল ছাপিয়ে পশ্চিম পাড়ে উঠে এসেছিল। মিত্র-পক্ষ এই আক্রমণের প্রতিরোধ গড়তে কোহিমাকেই রণাঙ্গনে পরিণত করলেন। জেনারেল উইন্গেট-এর প্রস্তাবে ও পরি-কল্পনায় এক অবিশ্বাস্য রণক্ষেত্র, চারদিনের মধ্যে, বারো হাজার সৈন্য এবং বারোশ' খচ্চর হাওয়াই জাহাজে চড়ে এসে উপস্থিত। যুদ্ধের ফলাফল মিত্রপক্ষের আয়ত্তে ছেড়ে, ধ্বংস ও মৃতদেহের স্তূপ সামনে রেখে, অবশেষে জেনারেল মুটাগুচি পশ্চাদপসরণ করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। সংকল্প নিলেন ইম্ফল থেকে আবার একটা চূড়ান্ত আঘাতে কোহিমার ৪,৮৬০ ফুট উঁচু শির পদানত করবেন। এই অসমসাহসিক প্রতিরোধ গড়ে জেনারেল উইংগেট বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ-ত্যাগ করেন। আর একবার পিছু হটে গিয়ে জেনারেল মুটাগুচি আর কোহিমাতে ফিরে আসেননি। এখানে তাঁর অশ্রু ঝরেছিলো। যদিও মুটাগুচি বলেছেন, 'আমার অশ্রু সংবরণ করে, এই যন্ত্রণার মধ্যে, আমার সেনাবাহিনীকে আপাততঃ আমি কোহিমা থেকে সরিয়ে নেব।'

যুদ্ধশেষে জেনারেল স্লিমের অধীনে মিত্রপক্ষের ১৬,৭০০ জন হতাহত হয়েছেন। জাপানীদের নিহতের সংখ্যা ৩০,৫০২ জন, আহত ২৩,০০০ জন। নেতাজী সুভাষের অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজের হতাহতের সংখ্যা অনুমানসাপেক্ষ কিন্তু এই যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ব্রহ্মদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের হতাহতের সংখ্যা অনুমান করার ঝুঁকি কেউ নেননি। ব্রহ্মদেশ থেকে প্রায় চার লক্ষ শরণার্থী নিরাপদ স্থানে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই সবচেয়ে অনিশ্চিত যাত্রায় সেখে পথশ্রমে, দস্যুর হাতে ইম্ফল-ডিমাপুর সড়কে প্রাণ দিয়েছেন। রণক্ষেত্রের বিচিত্র কলাকৌশল-এর কাহিনী অনেক লেখা হয়েছে। শরণার্থীদের কাহিনী সামান্য কজন লিখেছেন এক বিদেশী মহিলা ডিমাপুর ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই যুদ্ধ-কাহিনী নিয়ে নাগাভূমি সরকার শিগগির

রান্নার কাজে জনৈক চাং নাগা

একটা তথ্যচিত্র উপহার দেবেন বলে জানা গেছে।

দুই প্রবল প্রতিপক্ষের মরণপণ যুদ্ধে কোহিমা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। নাগা-পাহাড়ের লোকেরাও অযথা অপরিসীম দুঃখভোগ করেছেন, অপ্রত্যাশিতভাবে লাভবান হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী দু-পক্ষই নাগাদের বন্ধুত্ব কামনা করেছেন। মিত্রপক্ষের মহারথীরা নাগাদের সহায়তার কথা নানাভাবে স্বীকার করে গেছেন। লুকাস ফিলিপস তাঁর স্প্রিং বোর্ড টু ভিকটরী বই-এ লিখেছেন : ...ব্রিটিশদের প্রতি নাগারা অনুরক্ত ছিল... ব্রিটিশদের বন্ধু বলে জেনে ওরা ভয়ানক ঝুঁকি নিয়েছিলো। যুদ্ধের পর রিলিফ ও ক্ষতিপূরণ পেয়ে কোহিমাতে বিত্তশালী লোকের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল।

মুটাগুচির অশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরিত্যক্ত প্রচুর অস্ত্রও কোহিমার আশেপাশে সঞ্চিত হয়েছিল। মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার এক যুগের মধ্যেই এই অস্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। অস্ত্রের সংঘাতে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অবিলম্বে এই লুক্কায়িত অস্ত্রভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে চীন ও পাকিস্তান থেকে আমদানিকরা মারণাস্ত্র। স্ট্র্যাটেজি অব রিভলিউশনারী ওয়ারফেয়ার-এর গ্রন্থকার জানিয়েছেন যে, উনিশশ ষাট দশকে ভিয়েতনাম থেকে ব্রহ্মদেশ, নাগাভূমি মিজোরাম থেকে বোর্ণিও-তে এত ছোট মারণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র জড় হয়েছিল যে, সমস্ত পৃথিবীতে এত সংখ্যক অস্ত্র মানুষ কোন সময়ে দেখে নি।

আগ্নেয়াস্ত্রের উৎপাতে মৃত সব মানুষের স্মৃতিসৌধ তুলতে গেলে কোহিমার বড় একটা অংশ মৃতদের দখলে চলে যাবে। কিন্তু এখনও কোহিমার সুন্দরতম অংশ কমনওয়েলথ সমাধিক্ষেত্র। বিশ্বযুদ্ধে মৃত ২,৩৮৮ জন সৈনিক-এর নাম এখানে ফুলগাছের বন্ধনীতে খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে ডেপুটি কমিশনারের টেনিস মাঠের আশেপাশে শায়িত রয়েছেন যাঁরা কোহিমা যুদ্ধে লড়েছিলেন। যে যুদ্ধে ওরা এবং ওদের কমরেডরা ১লা এপ্রিল ১৯৪৪ সালের জাপানী বাহিনীর ভারত আক্রমণ চূড়ান্তভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন।

এই সমাধিক্ষেত্রের স্মৃতি ফলকের লেখা স্মরণ করিয়ে দেয় আদি ঐতিহাসিক হেরোডেটাসকে। থার্মোপলির যুদ্ধে নিহত স্পার্টার সেনাদের ও বীর লিওনিডাসের স্মৃতিসৌধে উৎকীর্ণ ছিল : যাও, স্পার্টার লোকদের বলো। তুমি যে, এ-পথ দিয়ে যাও, এখানে, ওদের নিয়মে অনুগত, আমরা চিরশয্যায়। এই স্মৃতিফলকের সাক্ষ্য হেরোডেটাস দিয়েছেন। অনুরূপ একটা স্মৃতিফলক লেখায় হিটলারও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কোহিমা স্মৃতিফলকে লেখা রয়েছে :

When you go home
Tell them of us and say
We give our today,
For your tomorrow.

কমনওয়েলথ সমাধিক্ষেত্রের দু-পাশে কোহিমা শহর প্রতিদিনই গা-ঝাড়া দিয়ে আয়তনে বাড়ছে। উন্নতিমূলক কাজের প্রয়োজনে, কল্যাণমূলক কাজের প্রয়োজনে হাজার হাজার লোক সমাগম হয়েছে রাজধানীতে। নাগাভূমির শতকরা প্রায় সাতজন নাগরিক সরকারী কর্মচারী। কোহিমাতে এঁদের একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপস্থিতি রয়েছে, যেমন রয়েছে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত লোকদের। জীবিকা ও কর্মসূত্রে সমবেত এত লোকের উপস্থিতিতে কোহিমা আত্মহারা হয়নি। শুধু ডিমাপুর-কোহিমা সড়কে জুপড়ায় রাস্তা, বর্ষার সময়ে, আত্মহারা হয়ে পড়ে। কোহিমা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে রাস্তার এই অংশে কখনও বা মাখনের মত গলে পাহাড়ে মিশে যায় কখনও বা পাহাড়টা গলে গিয়ে রাস্তাকে মুছে নেয়। রাস্তাটাকে পাহড়ের বুকে চেপে রাখতে মানুষ গলদঘর্ম। নিদারুণ কর্দমাক্ত পারাপারের শ্রান্তি লাঘব করতে যদিও সেখানে অবিলম্বে 'মধু'র অস্থায়ী যোগান কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

কোহিমার প্রবেশপথে ডিমাপুর শহর। ধানশিরি নদীর তীরে, ষোড়শ শতাব্দীতে, এখানে একটা উজ্জ্বল রাজছত্র ছিল। রাজা ছিলেন চক্রধ্বজ। তাঁর সাক্ষ্য বহন করছে কতগুলো ইঁট। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এগুলোই প্রাচীনতম ইঁট। ডিমাপুর এখন নাগাভূমির প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, শিল্পাঞ্চল। কোহিমা থেকে মোটরপথে দূরত্ব ৭৪ কিলোমিটার। রেল ও মোটরপথ ছাড়া নাগাভূমির একমাত্র বিমানবন্দর রয়েছে এখানে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর এফ-২৭ বিমান ডিমাপুরকে কলকাতা, জোড়হাট, লিখাবাড়ী ও গৌহাটির সঙ্গে যুক্ত রাখছে। ডিমাপুর পুরোপুরি সমতলভূমি। এখানকার জীবনধারা পাহাড় ও সমতলের যুগলবন্দী গান। তাল যে কখনও কাটেনি এমন নয়। মিলনক্ষেত্রেই, সংযোগ-এর বিন্দুতেই সংঘাত স্বাভাবিক।

ডিমাপুরকে ইতিহাসের পাতায় চার শতাব্দী পেছনে রেখে এখন কোহিমা মহিমাময়। কোহিমার তিমির অবগুণ্ঠন চিরদিনের মত অপসারিত। কোহিমার দিকে অকপট চেয়ে আছে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল, যেমন সরহোজলের নায়িকার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বিদেশী সৈনিককে। একই সঙ্গে কোহিমার আরেকটি বক্তব্য আছে— তোমার আঁখি চাইবে নাকি আমার বেদনাতে।

চীনের বন্দুক

পালাম বিমানবন্দরে কোনো শ্যামা কি মনে হয়েছিল, মহেন্দ্র নিন্দিতকান্তি উন্নত দর্শন। কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন। কঠিন শৃংখলে ? এই বন্দী জেনারেল মাউ। জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হতে দৈহিক গঠন ও চেহারার কোনো দাবি থাকলে মাউ জাইগুটসুর দাবি সেখানে সর্বাগ্রে। চীনদেশ থেকে ফেরার পথে ১৬ মার্চ, ১৯৬৯ সালে মাউ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করতে তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ছ-ফুট-এর মত মাথায় উঁচু, সুদর্শন চেহারার মাউ ফেডারেল সরকারের উজ্জ্বল রত্ন। জেনারেল কাইটোর হাত থেকে ক্ষমতা নেওয়ার পর তিনিই দ্বিতীয় জেনরেল। মাউ-এর আগে জেনারেল (পরবর্তীকালে) থিনুসিলে চীন থেকে বিপুল অস্ত্রসম্ভার নাগাভূমিতে এনেছিলেন। চীনা অস্ত্রের বড় সংগ্রহশালা কোহিমা জেলার জটগোমা ও মেজোমাতে গড়ে উঠেছিল। জেনারেল মাউ-এর চীন সফরের সময় পর্যন্ত প্রায় ২,৫০০ বৈরী সেনা তা-লি হুদের পাশে তালিম নিয়ে এসেছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম য়ুনান প্রদেশের এই গেরিলা-তীর্থ নাগাভূমির সীমান্ত থেকে পায়ে-হাঁটা পথে প্রায় তিনশ' মাইল;

চীন থেকে ভৈরব হরষে মাউ-এর দল রকেট ক্ষেপণাস্ত্র, ৬০ এম এম মর্টার, ৭-৬২ হালকা মেশিনগান, সব-মেশিনগান,, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে নাগাভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন। মাউ-এর পশ্চাৎবর্তী দল আইজ্যাক সু-এর অধীনে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে ২৪ বার মুখোমুখি সংঘর্ষের পর আত্মসমর্পণ করে। পনেরো দিনের মধ্যে দুই দল মোট ২২৩টি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। মেজর জেনারেল রাওলে মাউকে ফাঁদে ধরেছিলেন। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে নাগাভূমির পাহাড় চীন প্রত্যাগতদের জন্য কিছুটা অবশ্যই পিচ্ছিল হয়েছিলো। মাউ ফিরে আসার কয়েকদিন আগেই নির্বাচনের হাওয়া জনমতকে মত পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছে। ব্যাপটিস্ট মিশনের নেতারাও চীনা অভিসন্ধিকে চিহ্নিত করেছেন খোলাখুলি পর্যালোচনা করে। অন্যদিকে ফেডারেল সরকারের সশস্ত্র প্রতিপক্ষ রিভলিউশনারী সরকারও মাউ-এর পথের কাঁটা। আশা ছিল নতুন অস্ত্র সম্ভার নিয়ে এসে রিভলিউশনারীদের দমন করা সহজ হবে। রিভলিউশনারী সরকারের পত্তন হয়েছিল নভেম্বর, ১৯৬৮ সালে। ফেডারেল সরকারের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট স্কাটো সু ছিলেন নবগঠিত দলের প্রধানমন্ত্রী এবং 'জেনারেল' জোহাটো সেনাধ্যক্ষ। পরবর্তীকালে এঁরা দুজনেই নাগাভূমির সরকারকে সমর্থন করে অস্ত্র ত্যাগ করেন। স্কাটো সু ১৯৭৪ সালে রাজ্য সভায় মনোনীত হন এবং জোহটো ভারতীয় সেনাবাহিনীতে (নবগঠিত নাগা রেজিমেন্ট) যোগ দেন।

নাগাভূমি ছেড়ে তা-লি পৌঁছুতে কোন কোন দলের তিন মাস সময় লেগেছে। নাগাভূমি ও ব্রহ্ম দেশের জংগলে পরিচিত আহার সামগ্রী ছড়িয়ে রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। আহার্যের অনটন ঘটলে প্রকৃতির আধ-চেনা কোল্ড স্টোরেজ-এ হাত দিতে হয়েছে। অনভ্যস্ত মাংস অথবা জলের ধারে অসূর্যম্পশ্যা পাথরের গায়ে পুরু শ্যাওলা ক্ষিদে মিটিয়েছে। এরকম শ্যাওলা সুস্বাদু নয়, তবে পেট ভরে। তাছাড়া হাজার রকমের ছত্রাক যত্রতত্র তো রয়েছেই। ব্রহ্মদেশের জঙ্গলের পরই কিছুটা দুর্ভাবনা। সেখানে জল ও পরিচিত খাদ্যসামগ্রীর অভাব। য়ুনানে প্রবেশের মুখে অনুর্বর পাহাড়-শ্রেণী কোথাও দশ হাজার ফুট মাথা তুলে বৈরীদের সঙ্গে বৈরীতা করেছে।

মাউ-এর প্রত্যাবর্তন ব্রহ্মদেশেও নিরাপদ ছিল না। ব্রহ্মদেশের বৈরী কাচিনদের সঙ্গে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি ও ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত চুক্তি মাউ-এর শুভযাত্রার প্রতিবন্ধকতা করেছে, বিশেষতঃ, ঘরে ফেরার সময়ে। বৈরী কাচিনদের মত ব্রহ্মদেশ-এর সেনাবাহিনীও বৈরী নাগাদের শাল, সেগুনের জঙ্গলে অনুসন্ধান করেছে। গতের মাসে, বৈরী নাগাদের বড় একটা দল ব্রহ্মদেশের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িত হয়ে ৬৬ জন ধরা পড়ে। নিহতের সংখ্যাও দুঃখজনক। ব্রিগেডিয়ার দশোসিহু গ্রেপ্তার করা বৈরীদের অবৈধ প্রবেশকারী বলে ভারতে চালান দেওয়া হয়েছিল।

জুটসোমা ও মেজোমা ঘাঁটিতে চীনা অস্ত্রের সঙ্গে চীনা মন্ত্রেরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। মাও-এর **লাল বই** সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতকে কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মার সময়ে চীনা পরিব্রাজক কামরূপে চীনা গানের সুর শুনে গেছেন। তারপর প্রায় বারোশ' বছর চীনকদের গুণগান কেউ সরাসরি এদিকে আমদানি করেনি। মাউ বন্দীদশা লাভ করার ছ-মাসের মধ্যে এই দুটো ঘাঁটির অস্ত্র ও আনুষঙ্গিক বিরুদ্ধ কাগজপত্র নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে চলে আসে এবং এক বছরের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি বৈরীসেনা স্বেচ্ছায় অস্ত্রত্যাগ করে প্রকাশ্য জীবনযাত্রার ডাকে সাড়া দেন।

মাউ বন্দী হওয়ার একমাস আগেই চীনারা পূর্ব পাকিস্তানের রাঙামাটিতে পদার্পণ করেছেন। এটা দ্বিতীয় বৈরী তা-লি। ব্রহ্মদেশের কাচিন অঞ্চলে চলাচলের বিঘ্ন এড়াতে রাঙামাটির আকর্ষণ ও প্রয়োজনীয়তা। চীন প্রত্যাগত জেনারেল থিনুসিলে সেখানে তদারকিতে রয়েছেন। এক রাঙামাটি অনেক আশা পূর্ণ করতে পারে না, তাই রুমা, বান্দারবন, রংকিয়াং ও আলিকাদামে বৈরীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু হলো। মাউ-এর বন্দীদশার প্রতিবাদ ও বৈরীদের শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রাখা হলো আর্মি ও পুলিশ কনভয়ের ওপর আক্রমণ করে।

মাউ-এর বিফলতা ফিজোকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে এলো সরজমিনে তদন্ত করতে। তিনি এসে য়ুনানের পথে আরো অভিযাত্রীকে উৎসাহিত করে গেলেন। তাঁর সফরের পর তিনশতাধিক লোক আবার পথে নামলো। গন্তব্য য়ুনান। চীনে বৈরী সরকারের প্রবক্তা রইলেন শ্রীমুইবা। ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মের পর জেনারেল থিনুসিলে ও ব্রিগেডিয়ার নিভিলিও নিজেদের তিনশতাধিক অনুচর নিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায়, নিরাপত্তাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে, ভারতে ফিরে এলেন। বৈরীতার এক পৃষ্ঠপোষক সরে দাঁড়ালেন।

শিলং চুক্তির পর মাউ এবং অন্যান্য মহারথীরা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। শুধু মুইবা এখনও সীমান্তে কাচিনদের মধ্যে অনুচরদের নিয়ে। শিলং সমঝোতার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা এই প্রশ্ন নাগাভূমির ব্যাপটিস্ট চার্চ শান্তি কাউন্সিল প্রয়াস নিচ্ছেন। এই প্রচেষ্টাকে নাগাভূমি ও কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন করেন। ১৯৭৮ সালের গোড়ায় খবরে জেনারেল মাউ ও শ্রীমাইবা দুজনেই বিলম্বিত যৌবনে পরিণয়সূত্রে বাঁধা পড়েছেন। ভারত-সীমান্তের সংলগ্ন কাচিন এলাকায় মাইবার প্রেমের পরিণতি গীর্জার ঘণ্টাধ্বনিতে ঘোষিত হয়েছে। অন্যদিকে জেনারেল মাউ আও নাগা লংঘুম গ্রামের তৃতীয় জেনারেল জামাতা হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছেন। শান্তিপূর্ণ সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার শুরুতে এক আলমারি বই নিয়ে মাউ আত্মানুসন্ধানে বসেছিলেন। আলমারিতে

আও-নাগা 'মরাং' ঘর
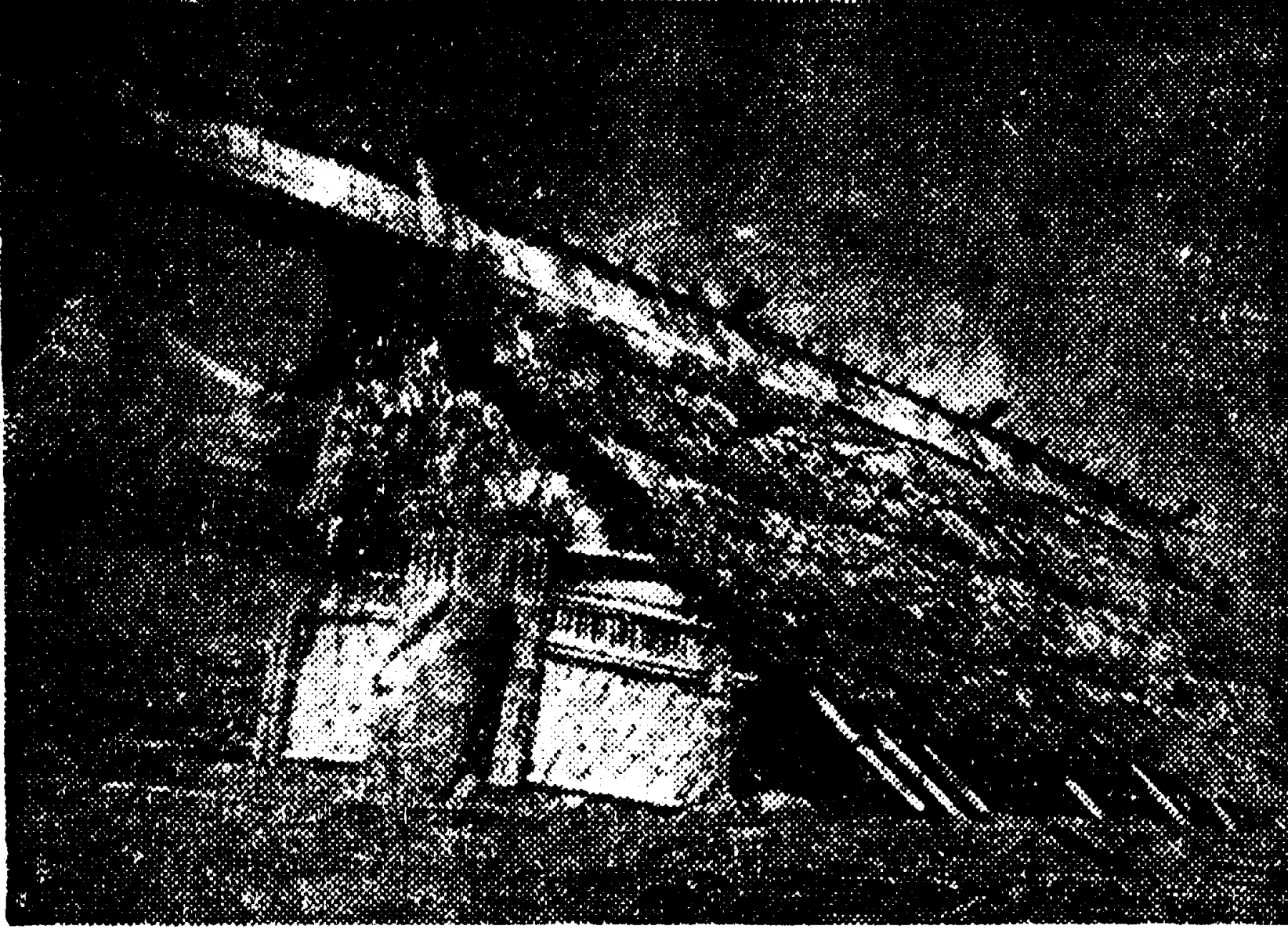
কোলরিজ থেকে কার্ল মার্কস স্থান পেয়েছিলেন।

মাউ দার্জিলিং-এর কোন কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পাঠ নিয়েছিলেন। শৈশবে তাঁর গ্রামের পাহাড়-চূড়োয় দাঁড়িয়ে কোহিমার যুদ্ধ দেখে বাহবা দিয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধের ভীমরণের মধ্যে তাঁর শিশুমন বিপদ দেখেনি। খানোমার শিশু-কাহিনী আদ্যোপান্ত গোলা-বারুদে মোড়া। এখনও এখানে শিশুরা গোলাবারুদ নিয়ে খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করে। ৩" মর্টার ভাঙ্গাতে গিয়ে খনোমা, কোহিমার আশেপাশে মৃত্যু ১৯৭৬ সালেও শোনা গেছে। সদ্যমৃতদের স্বর্গযাত্রা সুগম করতে সনাতনপন্থীরা বন্দুকের আওয়াজ তুলে 'পথের শত্রুনাশ করেন।' প্রাচীনকালে মৃতের মাথায় বর্শার আঘাত চিহ্ন এঁকে দিয়ে সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি ঘোষণা করা হতো যাতে মৃতব্যক্তিকে সসম্মানে পরলোকে স্বর্গত করা যেতে পারে। মাথায় আঘাত যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করার প্রমাণ। এই আঘাত হানতেন মৃতের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়।

খনোমা গ্রামের নাম নাগাভূমির প্রচ্ছদে এবং প্রথম পৃষ্ঠায়। খনোমার প্রথম আপোষহীন যোদ্ধা নীলহোলে। সন্ধি, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের প্রস্তাব দ্বিতীয়পক্ষ সরে যাওয়ার পরই নীলহোলের মন থেকে মুছে যায়। খনোমার আক্রোশ মেজেমার ওপর। এই দ্বৈরথ-এর সুযোগে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোহিমাতে আসর গড়ে তুলতে পেরেছিলো। ১৮২৬ সালে ইয়ারবান্দার চুক্তিতে আসামের ইতিহাসের মোড় ঘুরলো। আসামের কর্তৃত্ব পাবার দু' বছর পরই আংগামী নাগাদের বিরুদ্ধে কোম্পানীকে অস্ত্র ধরতে হয়। আংগামী তথা নাগা-পাহাড় নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি না নিয়েই আঠারো বছরে ন'টা অভিযান চালানো হয়। নবম অভিযানে খনোমা পর্যুদস্ত হয়েছিল, ১৮৫০ সালে। আগের বছরে সামাগুটিং থানার ভোগচাঁদ দারোগা খনোমা ও মেজেমার মধ্যে মধ্যস্থতা করতে এসে প্রাণ হারান খনোমার হাতে। ফেরার পথে, অকস্মাৎ আক্রমণে, ভীত সন্ত্রস্ত ভোগচাঁদের পার্শ্বচররা আহত ও মৃতদের সঙ্গ ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

১৮৫০ সালের অভিযানের আগেও খনোমাকে ভস্মীভূত করে শান্তিমূলক অভিযান ফিরে গেছে। খনোমা খাজনা দিতে নারাজ। এবারে আক্রমণ করে সাজা দিতে গিয়ে কোম্পানীর দলবল মেজেমাতে আটমাস ধরে সুযোগ খুঁজতে বসেছিল। দলপতি ভিনসেন্ট দীর্ঘদিন এখানে বসে থাকায় কর্তৃপক্ষ মহলের মনে হয়েছে তিনি বোধহয় প্রীতিরসে, পরমশান্তিতে রয়েছেন। এদিকে ভিনসেন্ট অধিকতর জোরদার বাহিনীর অপেক্ষায় ছিলেন। দুটো তিন পাউণ্ড গোলার কামান, সত্তর ফুট দূর থেকে, ১৬ ঘন্টা অবিশ্রাম আঘাত করে খনোমাতে প্রবেশের পথ পায়নি। রাত পোহালে জানা গেল খনোমা পরিত্যক্ত। তখন ভিনসেন্ট দলবলসহ খনোমাতে পদার্পণ করলেন। তিনি লিখলেন : '...১৬ ঘন্টা অবরোধের পর কদাচ দৃষ্ট আসামের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গের পতন হলো।' খনোমায় শাস্তির পর ১৮৫২ সালে লর্ড ডালহৌসী নাগা-পাহাড়কে বশে রাখতে শান্তিমূলক অভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঘোষণা করলেন, গ্রাম ও শস্য বিনাশ করা হবে এবং কঠোরভাবে এই হুঁশিয়ারী কার্যকরী করা হবে।' এই ঘোষণার সঙ্গে দ্বিধা থরথর নীতির অবসান ঘটলো।

১৮৭৬ সালে কোহিমাতে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার কারবাইনধারী পুলিশ নিয়ে আস্তানা করে নিলেন। কোহিমাতে এসে ডামন্ট অন্যান্য কাজের মধ্যে আংগামীদের সম্বন্ধে কিছু লিখলেন। তিনিই আংগামীদের টিবেটো-বর্মণ ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম চিহ্নিত করলেন। তাঁর স্মৃতিসৌধ খনোমাতে গড়ে উঠতে পারে এমন ইংগিত পেয়েও তিনি ২৩২ জন নতুন এনফিল্ডধারী পুলিশের কর্তা হিসেবে সতর্ক হতে পারেননি। গ্রামের উচ্চতম স্থানে একটা জলাধার। তার পাশেই ডামন্ট হত্যার স্মারক একটা মার্বেলে উৎকীর্ণ : 'এখানে ডামন্ট নিহত হয়েছিলেন।' ডামন্ট খনোমাতে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে এসেছিলেন। একঝাঁক বর্শা ও এক পশলা গুলি গ্রামের প্রবেশমুখে তাঁর দলের পঁয়ত্রিশটি প্রাণ এক মিনিষে উধাও করে দিল। উনিশ জন গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ে রইলেন।

খনোমা ডমন্টকে হত্যা করে কোহিমা থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করতে তেরোটা আংগামী গ্রামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে গেল। কোম্পানীর বিরুদ্ধেও আঁতাত তৈরী করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে খনোমার। ১৮৮০ সালের এগারো দিনের, কোহিমা অবরোধ তুলতে মণিপুরের রাজার সহায়তা নিতে হয়েছিল ব্রিটিশদের। এটাই খনোমার শেষ প্রয়াস ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। ডামন্ট-এর পূর্বসূরী বাটলারও নাগা-পাহাড়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। ন'টা শান্তিমূলক অভিযানের অবসরে অবশ্য খনোমা তোলপাড় হাতের সুখ মিটিয়ে প্রতিবেশী ও প্রান্তবাসীদের শিরঃচ্ছেদ করেছে।

খানোমার দেড় হাজার লোকসংখ্যা নাগাভূমিতে কৃতী মানুষের প্রথম সারিতে নিজেদের সন্তানকে বসিয়েছে। খানোমা শিক্ষায়, শান্তি প্রচেষ্টায়, সরকারী চাকুরীতে, রাজনীতির ডাইনে বাঁয়ে নৈরাতায় সর্বত্র উপস্থিত। নাগাভূমির প্রথম গ্রাজুয়েট, ডাক্তার ও আই-এ-এস খানোমার। খানোমার মেয়ে শ্রীমতী নিচোলু হারালু পানামাতে নাগাদের মধ্যে প্রথম ভারতীয় রাজদূত। নাগা ন্যাশনেলিস্ট কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ফিজো, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জাসুকী, ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক দলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান এম-পি শ্রীমতী রানো সাইজা খানোমার। খানোমা যেমন নাগাভূমি সরকারের একজন মুখ্য সচিব দিয়েছে তেমনি ফেডারেল সরকারকে একজন 'জেনারেল' দিয়েছে।

একটা তীক্ষ্ম পাহাড় চূড়োয় খানোমা গ্রাম। এই পাহাড়কে ঘিরে রয়েছে আরেকটা পাহাড়ের বৃত্ত। প্রকৃতির উদাসীন হাতে এর চাইতে সুরক্ষিত গ্রাম অন্তত নাগাভূমিতে তৈরী হয়নি। যে-কোন আংগামী গ্রামের মত খানোমাতেও ছোট-বড় অজস্র পাথর জমা করে রাখা হয়েছে প্রতিটি বাড়ির চত্বরে। পাথরের জন্যে বাড়িগুলোর আলাদা উপস্থিতি ম্লান। অথচ যাঁরা পাথরের সাংকেতিক ভাষা জানে, ওরা বুঝতে পারে এগুলো কত মানুষের ব্যক্তিগত ইতিহাস, অমরতার দাবী নিয়ে সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। পাথর থেকে চোখ সরালে, চোখ জুড়ানো জলসিঁড়ি ধান ক্ষেত পাহাড়ের প্রসন্ন কোলে। 'আমাদের মধ্যে অনেকেই খনোমা সম্বন্ধে কথা বলেন কিন্তু অনেকেই খনোমা দেখেন নি। খনোমা একটি প্রস্তরময় গ্রাম এমন কি এই গ্রামের লোকদের হৃদয়ও প্রস্তরবৎ।'—বলেছেন একজন বিশিষ্ট বৈরী নেতা আঝোটো রেংমা।

খনোমাকে অনেকে যেমন দেখেন নি, তেমনি খনোমাকে দেখতে আসা অনেক লোকের চাপে এখানে আত্মসচেতনতা অবধারিত। গাঁওবুড়া স্পষ্টই বলেছিলেন আরো পাঁচটা গ্রামের মত এখানেও কয়েকটা ঘরবাড়ি ও পাথর রয়েছে মাত্র।' সেদিন ১২ ডিসেম্বর, রবিবার, ১৯৭৬ সালের সাকরেনী পুজোর আগের দিন। ক্যাথলিক ও ব্যাপটিস্ট মতের দুটো গির্জা থেকে ভেসে-আসা প্রার্থনা গানের সুরকে একই সঙ্গে ব্যাহত করে বন্দুক গর্জে ওঠলো। বয়সের উপযোগী ঔৎসুক্য নিয়ে যে-দুটি ছেলে ওর্টার ভেঙেছিল তাদের মরনোত্তর যাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে এই আগ্নেয় আর্তনাদ। আবহমান কালের প্রতিনিধি রোদ্দুরসেবী বৃদ্ধদের হাতে ভরাপাত্র। এই ভরাপাত্র থেকে এখনও অতিথিরা ভাগ পান। আগামীকালের উৎসবের জন্যে, অতিথি ও গ্রামবাসীদের ভোজের জন্য তখন ২২টা 'মিথুন' বাঁশের গড়ে। পাথর ও গোলা-বারুদের বাইরে খনোমার অন্তঃশীলা জীবনধারা কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। খনোমার মানুষ তাঁর সুখ ও দুঃখের হিসেব আলাদা করে রাখতে পারে।

শান্তি মিশন

শান্তি মিশনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল অস্ত্রসংবরণ সমঝোতা। আলোচনার মাধ্যমে নাগা সমস্যার সমাধানকে একটা আশাতীত সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন অনেকে। শান্তি মিশনের সদস্যদের কাছ থেকে অস্ত্রসংবরণের মত একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রাথমিক প্রয়াস অন্ততঃ ব্যাপটিস্ট মিশনের সদস্যরা প্রত্যাশা করেছিলেন। শান্তি মিশনের সদস্যদের ভাবমূর্তি নির্ভুলভাবে তখন জনমানসে রয়েছে। গ্রামদান আন্দোলনে এবং শেখ আবদুল্লার মুক্তি দাবী করে নৈতিকতার গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন শিরোনামায়। নেহেরুর পর কে? এই প্রশ্নেও জয়প্রকাশ জনমনে। জয়প্রকাশ কি এককভাবে, নৈতিকতার কোন অলিখিত ধারা অনুসারে 'এখনও যাঁরা অসন্তুষ্ট রয়েছেন' তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন? অন্যদিকে রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট—'অসন্তোষকে' অখণ্ড এবং অপরিবর্তনীয় বলে গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছেন।

শান্তি আলোচনাকে সুগম করতে অস্ত্রসংবরণ সমঝোতার মেয়াদ কম করে ষাটবার বাড়ানো হয়েছে, আট বছরের মধ্যে। প্রত্যেকবার মেয়াদ বাড়াবার আগে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা পরবর্তীকালে সেমানাগা সুতোকাটা গানের মত বিলম্বিত সুরে শোনা গেছে, যেমন, 'ইহো জোলি জোলি জোলিনে ইহো/ইহো জোলি জোলি জোলিনে ইহো/ইযো কি গনি/ইহো জোলি জোলি জোলিনে ইহো।' তবু, কখনও একপাক্ষিক কখনও দ্বিপাক্ষিক ঘোষণা ও সমর্থনের মধ্যে নীতিগতভাবে সমঝোতা বহাল থেকেছে। ৩১ আগস্ট, ১৯৭২ সালে রাজ্যপাল শ্রী বি কে নেহেরু এই 'একপাক্ষিক অস্ত্রসংবরণ' ব্যবস্থাকে অপ্রয়োজনীয় বলে জানালেন। একই দিনে আত্মগোপনকারী মহল পরবর্তী দুমাসের জন্যে অস্ত্রসংবরণ সমঝোতাকে বাড়াবেন বলে জানালেন।

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর আত্মগোপনকারীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চেয়েছিলেন। লালবাহাদুরের ইচ্ছানুসারে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, আত্মগোপনকারীদের আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণের সূত্র ধরে প্রশ্ন উঠলো 'সাক্ষাৎকার কোথায় হবে?' ফেডারেল সরকার একটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিলিত হবার সুপারিশ রেখে দিল্লিতে গেলেন। ওরা এটাকে 'সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার' বলে বর্ণনা করলেন। প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎকারের তিনদিন পর লোকসভাকে জানালেন 'অতি নিশ্চিতভাবে নাগাভূমি ভারত ইউনিয়নের অংশ ছিল এবং আমাদের মনোভাব তদনুরূপ রয়েছে।' ফেডারেল সরকারের মুখপাত্র জানালেন, 'নাগাভূমি সার্বভৌমত্বের দাবী থেকে নড়বে না।' প্রধানমন্ত্রী আরোও জানালেন, 'এই আলোচনায় অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে।' ফেডরেল প্রতিনিধি জানালেন, 'এই ভুল বোঝাবুঝি' অস্ত্রসংবরণ চুক্তির প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। নাগাভূমি ও মনিপুর রাজ্যের সীমানায় বৈরীতার প্রকোপ এবং ব্রহ্মদেশের সোমরা অঞ্চলে বৈরীদের চলাচল মার্চ, ১৯৬৫ সালে শান্তি আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাকে জোরদার করেছে। এই এলাকার নাশকতামূলক কাজের অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগের ফলে শান্তি পর্যবেক্ষক দল নিয়োজিত হয়েছিলেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময়ে ফেডারেল প্রতিনিধিরা একটা ১৪-দফা স্মারকপত্র পেশ করে রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্থাপন করলেন। স্মারকপত্রে বলা হয়েছে:

'নাগাভূমি চিরকাল আসাম ও ব্রহ্মদেশের অঞ্চল সংলগ্ন স্বাধীন এলাকা ছিল।

১৮৩৭ ও ১৮৭৯ সালের মধ্যে নাগা এলাকায় গ্রেটব্রিটেন সামরিক অভিযান পাঠায়।

নাগাভূমি ১৮৮০ সালে গ্রেটব্রিটেনকে সীমিত এলাকায় সামরিক ঘাঁটি রাখতে দিতে সম্মত হয়েছিল, যে এলাকাকে 'নাগা পাহাড়' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নাগারা কোন লিখিত চুক্তি অথবা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে 'নাগা পাহাড়ের' সার্বভৌমত্ব সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল এবং কখনই নাগাভূমি ও গ্রেটব্রিটেন অথবা নাগাভূমি ও ব্রিটিশ ভারত সরকারের মধ্যে 'নাগা পাহাড়ের' সার্বভৌমত্ব সমর্পণ করে কোন চুক্তি হয়নি।

১৮৮০ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত 'নাগা-পাহাড়ে' দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের পালন ব্যবস্থা নাগাদের হাতে রয়েছে।

বৃটিশ ভারত সরকারের ভারতবিধি, ১৯৩৫, বলবৎ হওয়ার পর, ১৯৩৭ সালে 'নাগা-পাহাড়ের' নামকরণ হয় 'নাগা-পাহাড় বহির্ভুক্ত অঞ্চল'। এটা প্রমাণিত করে যে, নাগাদের দাবী অনুসারে 'নাগা-পাহাড়' বহির্ভূক্ত হয়েছে।

মে, ১৯৪৭ সালে ভারতের কনসটি-উয়েন্ট এ্যাসেমবলী নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিল-এর কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং ভারত ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার জন্যে নাগাভূমির কাছে প্রস্তাব করে।

জুন, ১৯৪৭ সালে পরিশোধিত আকারে '১০ বৎসর চুক্তি' পুনর্বার উপস্থাপিত করা হয়। কথাবার্তা চলতে থাকে। ভারত সেই যোগাযোগ ভঙ্গ করে।

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে নাগারা নাগাভূমির স্বাধীনতা ঘোষণা করে যেটি মে, ১৯৫১ সালের গণভোটে অনুমোদিত হয়।

২২ মার্চ, ...১৯৫৬ সালে নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিল এবং মুক্ত নাগাভূমি ফেডারেল রিপাব্লিক অব নাগাল্যান্ড নামে একত্রিত হয়েছিল।

মার্চ, ১৯৫৬ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ফেডারেল রিপাবলিক অব নাগাল্যান্ড এবং ভারত ইউনিয়নের সৈন্যদের মধ্যে সংগ্রাম অবিরাম চলতে থাকে।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ সালে দুই শক্তির মধ্যে শান্তি মিশন অস্ত্র-সংবরণ-এর আয়োজন করে।

২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ সালে শান্তি মিশন একটা প্রস্তাব করে যে, নাগাভূমি ফেডারেল সরকারের নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে 'ওদের নিজেদের বিবেচনায়' ভারত ইউনিয়নে যোগ দিতে সম্মত হওয়ার জন্যে উপদেশ দেবেন।

নাগাভূমি কখনই অন্য রাষ্ট্রে নিজের স্বাধীন সার্বভৌমত্বকে ন্যস্ত করবে না।

নাগাভূমি চিরকাল আসাম ও ব্রহ্ম-*দেশের সংলগ্ন স্বাধীন এলাকা ছিল।*

শেষ প্রশ্নের জবাব এখনও দেওয়া হয়নি। ভারত কি নাগাজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে?'

ফেডারেল সরকারের পাঁচজন প্রতি-নিধিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নতুনভাবে স্বতন্ত্রতার প্রশ্ন বিবেচনা করতে বললেন। অঙ্গরাজ্যের মর্যাদার চেইতে ভিন্নতর স্বতন্ত্রতা—
"difference status than a statehood"
রাজনীতির ছাত্ররা আবার বিভিন্ন দেশের সংবিধান খুলে বসলেন। নেহেরুর সময়ে 'ভিন্ন স্বাতন্ত্র্য' বলতে কানাডা-কুইবেক অথবা উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কের দিকে অনেকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। শান্তি মিশনের কল্যাণে পুয়েরটোরিকোর সঙ্গে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কও পরিচিত হয়ে ওঠলো। শ্রীমতী গান্ধীর এই প্রস্তাব হাতে নিয়ে ফেডারেল সরকার ন মাস চুপ থাকলেন। অবশেষে ফিজোই জনালেন 'যে অবধি আমরা আবার মুক্ত না হচ্ছি, সার্বভৌম লোক হিসেবে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবো........এই ভিত্তিতে, যেহেতু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে, এটাকে চালু রেখে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই এখন একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।' অন্যদিকে ফেডারেল সরকারকে গোপন সূত্রে আশ্বাস দিলেন ফিজো 'আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা বেশী দিন আর অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের।' ষষ্ঠ এবং শেষ দফা আলোচনায় ভিন্নতর সম্বন্ধের প্রশ্ন শেষ পর্যায়ে গেল না। পাঁচ প্রতিনিধি ফিরে এলেন এবং পরে ভিন্ন খাতে শান্তি সন্ধানে নিযুক্ত হলেন। এই আলোচনার সূত্র ধরে দিল্লিতে নাগা প্রতিনিধিদের তরফ থেকে খোঁজখবর নেওয়া হলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানা গেল ১৯৬০ সালে নাগাভূমি রাজ্যের জন্মের সঙ্গেই নাগা সমস্যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

শ্রীভিজল ও শ্রী আর সাইজা লণ্ডনে গিয়েছিলেন 'ভিন্নতর রাজ্যের মর্যাদা' প্রশ্ন ফিজোর সঙ্গে ফয়সালা করতে। নব নব দিগন্তে শান্তি প্রয়াস অব্যাহত রেখে সর্ব-দলীয় নাগা নেতাদের সভায় গৃহীত শান্তি প্রস্তাব নিয়ে শ্রীভিজল আবার দিল্লিতে এলেন। বৈদেশিক দপ্তরের সচিব জানালেন—(১) ভারতের মধ্যে সমাধান ও (২) চীন গমন বন্ধ করার শর্ত আগে মেনে নিতে হবে। ভিজলের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ফিরে এলেন। প্রসঙ্গ এখানেই থেমে গেল। ব্যাপটিস্ট মিশন কাউন্সিলের উদ্যোগে দুটো সর্বদলীয় সম্মেলন-এর মধ্যবর্তী সময়ে নাগাভূমি দুবার 'ব্যালট পেপারে' অভিমত ব্যক্ত করেছে। এই সময়ের মধ্যে ১৯৬৯ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কোহিমাতে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য সম্বর্ধনার নৃত্যগীতমুখর কোহিমাতে এক অবসরে বলেছেন 'আলোচনা ফলপ্রসূ হবে যদি বাস্তব পরিস্থিতির অনুধ্যান উন্নততর হয়।' প্রধানমন্ত্রী এই উক্তির পরবর্তী ভাষ্যকার রাজ্যপাল শ্রী বি কে নেহেরু। এপ্রিল, ১৯৬৮ সালে কর্মভার গ্রহণ করার পর *ফেডারেল প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুনরায় আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি জানালেন—'যে কোন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত।'*

পরবর্তী রাজ্যপাল শ্রী এল পি সিং 'ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে' কথাবার্তা বলতে রাজী হলেন নাগা সমস্যার সমাধানের জন্যে। এই আলোচনার ফলে 'শিলং সমঝোতার' জন্ম। 'শিলং সমঝোতাকে' নাগা সমস্যার পূর্ণ সমাধান বলে মনে করলেন অনেকে। সমঝোতায় বলা হয়েছে : 'আত্ম-গোপনকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা স্বেচ্ছায়, বিনাশর্তে, ভারতের সংবিধানকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করলেন; (২) এতে সম্মতি জ্ঞাপন করা গেল যে বর্তমানে লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র প্রকাশ্যে এনে নির্ধারিত স্থানে জমা রাখা হবে। এই সমঝোতাকে কার্যকরী করার বিশদ ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের, নিরাপত্তা বাহিনী ও সংযোগকারী কমিটির মধ্যে ধার্য করা হবে। (৩) এতে সম্মতি জ্ঞাপন করা গেল যে, আত্মগোপনকারী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা যুক্তিযুক্ত সময় পাবেন যাতে আলোচনায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে অন্যান্য প্রসঙ্গ বিষয়ে প্রস্তাবের অবতারণা করতে পারেন।' ফিজোর ভ্রাতা কেভিয়ালে সহ অন্য চারজন রাজ্যপালের সঙ্গে 'শিলং সমঝোতা'তে সাক্ষর করলেন ১৯৭৫ সালে। আত্মগোপনকারী সংস্থাগুলোকে ইতিপূর্বে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ সালে রাজ্যপাল শ্রী এল পি সিং জনালেন, 'যেসব রাজনৈতিক বন্দীরা 'শিলং সমঝোতা' মেনে নিয়েছেন, আমরা তাঁদের সকলকেই মুক্তি দিয়েছি। ওদের বিরুদ্ধে আদালতের সকল মামলা ও তদন্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছি। প্রাক্তন আত্মগোপনকারীদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা যথাসাধ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি যেভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময়ে দুর্গত পরিবারগুলোকে রিলিফ দেওয়া হয়েছে। কোন একটা বা অন্য কারণে অস্ত্রশস্ত্র এবং উখরুলের এবং মণিপুরের নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলের সকল আত্মগোপনকারীদের 'শিলং সমঝোতা' বের না করে আনা সত্ত্বেও আমরা এতসব করেছি এবং এইসব অঞ্চল থেকে এখনও ছোট ছোট [illegible] ব্রহ্মদেশে যাওয়া অব্যাহত রেখেছে

কারামুক্ত বৈর নেতা 'জেনারেল' মাউকে কোহিমাতে রাজকীয় অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছে। 'জেনারেল'-এর সঙ্গে অন্যান্য বহু মহারথীরা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন শিলং সমঝোতা'র আওতায় কিন্তু 'শিলং সমঝোতা'কে সম্পূর্ণভাবে নস্যাত করে কলম ধরলেন ফিজো। অন্যদিকে 'শিলং সমঝোতাকে পুরোপুরী কার্যকরী না করার জন্যে যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে। তিন বছর না গড়াতেই 'শিলং সমঝোতা'কে উহ্য রেখে নাগা ন্যাশনেল কনফারেন্স খনোমাতে আরেকটা সম্মেলন ডাকলেন। যে সম্মেলন আদ্যোপান্ত নাগা সমস্যার আলো-চনা করে সিদ্ধান্ত নিলো : (১) মিঃ এ জেড ফিজো, মিঃ ইমকংমেরেন এবং মিঃ টি, এইচ, মুইবার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রয়েছে নাগা *ন্যাশনেল কাউন্সিলের। এই সম্মেলন ভারত সরকার ও নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান বিষয়ে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে সিদ্ধান্ত* নিলো। (২) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, যারা বহির্দেশে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে অবিলম্বে। ১১-১২ মে, ১৯৭৮ সালের এই সম্মেলনে অসুস্থতার জন্যে ইমকংমেরেন যোগ দিতে পারেননি। মুইবা ব্রহ্মদেশে এবং ফিজো লণ্ডনে থেকে

নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিলের প্রাণরস যোগা-বেন। খনোমার দলিলে স্বাক্ষরকারী ছিলেন বিসেটো এম. কিহো, থংটিচাং, আমাজ, পি কেভিচুষা 'মেজর জেনারেল' সানিবা আও খনডাহো জামির এবং খুটোভি শেম। সম্মেলনের সিদ্ধান্তের গৌরচন্দ্রিকাতে, ভাষণে জানা গেল 'আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত।'

'শিলং সমঝোতা'র পর যে অচলাবস্থা তৈরী হয়েছে সেটার নিরসন হতে পারে মোরারজী-ফিজো সাক্ষাৎকার হলে। এই আশায় একটা সাক্ষাৎকার হয়েছে লণ্ডনে। সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু, যত শীঘ্র সম্ভব আরেকটু সাক্ষাৎকার সম্ভব করে তোলার পক্ষপাতী অনেকেই। অন্যদিকে ব্রহ্মদেশে থ্রামুইবা সহচরদের নিয়ে পাহ একটা গ্রাম পত্তন করে আছেন। যেখানে গ্রামের সাধারণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিবাহ বন্ধনও সম্ভব, সুন্দর ও স্বাভাবিক পর্যায়ে। নাগাভূমি ও ব্রহ্মদেশ সীমান্তে পানসা গ্রামে আত্মগোপনকারী মুইবার দলের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার প্রস্তুতি হচ্ছে। শান্তি আলোচনার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে যে-সব জটিল কূটনৈতিক সংকট ১৯৬৪ সালে দেখা গিয়েছিল সে-রকম আবার দেখা যাবে না অনুরোধের মধ্যে। ১৬ অকটোবর ১৯৭৮ সালে পাংসার সন্নিকটে একটা শান্তি শিবির খোলা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ভিজল জানিয়েছেন। পাংসার প্রাচীন গৌরব আর নতুন শান্তি প্রচেষ্টার প্রয়াস মিলে পানসা এখন নতুন দীপ্তিতে। নাগাভূমির গণতান্ত্রিক মানুষ অল্পদিন আগেই শতকরা ৮৩ জন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ৪ নভেম্বর, ১৯৭৮ কোহিমাতে জানিয়ে-গেছেন নাগাভূমিতে কোন রাজনৈতিক সমস্যা নেই।

ভক্তি - বিশ্বাস - ধর্ম

ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে নাগাভূমিতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের শতবার্ষিকী উৎসব। মোককচাং জেলার ইমপুর গ্রাম উৎসবের হোতা। শতবর্ষপূর্তির শতকথা। ইমপুরে কি আদি কেন্দ্র? না অন্য কোন গ্রামের এই সম্মানিত আসন প্রাপ্য? ছায়া ছায়া সূত্রপাতের পর ইমপুর নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের প্রধান কেন্দ্র হয়েছিল। তিরিশ বছরের সাংগঠনিক প্রচারের ফলে প্রায় দুশজন ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন আর ষাট বছরে গির্জার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৩২। শতবার্ষিকীতে নাগাভূমির ৬৬ শতাংশ জন খৃষ্টান।

আমেরিকান মিশনারী ডাঃ ক্লার্ক সেই অন্ধকার নাগাভূমির আলোকস্তম্ভ হয়ে এসেছিলেন ইমপুরে। অবিশ্বাসের জলঝড়ে আলোকস্তম্ভ বিনষ্ট হবারও সম্ভাবনা ছিল। ইমপুরের অদূরে ডাঃ ক্লার্ক প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। প্রাণ যায়নি, আঘাত পায়ে পড়েছিল। আহত পা নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিলেন তিনি। সেই গ্রামে প্রবেশ করার সময়ে বিরুদ্ধবাদী'দের আকস্মাৎ উপদ্রবে তিনি আহত হয়েছিলেন। রাতে আবার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হবে এমন সংকেত অনুগত কেউ দেওয়াতে তিনি গ্রাম ত্যাগ করে

৭৮-এ মায়াং নোকচার মোককচাং : রবিবার শুধু প্রার্থনার
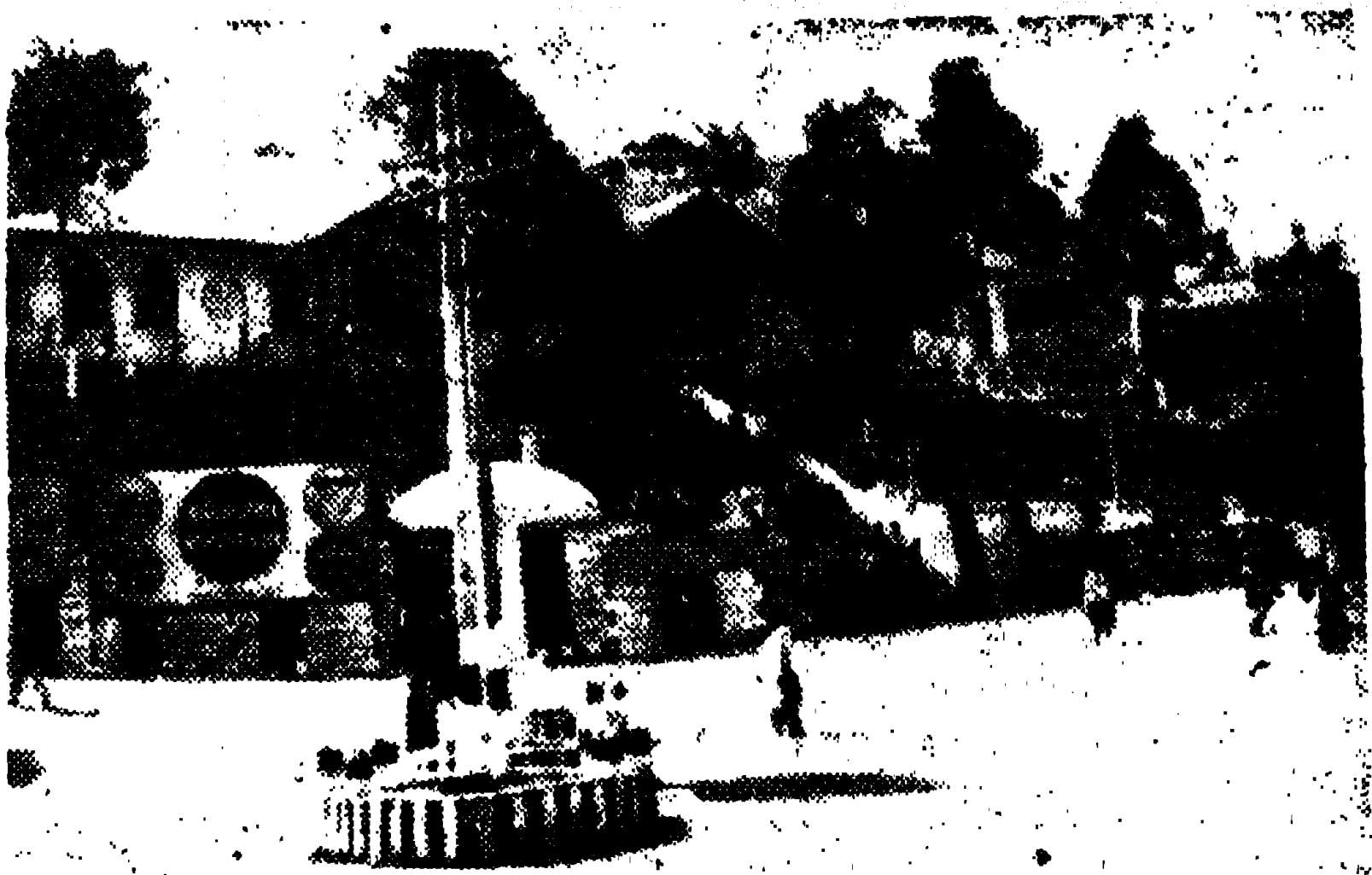
ইমপুরে ফিরে আসেন। ডাঃ ক্লার্ক প্রাণ ফিরে পেয়ে অনুপ্রেরণা হয়ে রইলেন। ডাঃ ক্লার্ক আসামের শিবসাগরে এসেছিলেন ১৮৬৯ সলে। ইতিপূর্বে শিবসাগর মিশনে রেভারেণ্ড এস ডবলু হুইটিং ও রেভারেণ্ড ব্রাউন মোট তিনজন নাগাকে ধর্মান্তরিত করেন। শিবসাগরে সওদা করতে গিয়ে মারেংকং গ্রামের লংজাংলেপজুক মিশনের সংস্পর্শে আসেন ১৮৫১ সালে। সওদার সঙ্গে নিয়ে এলেন তিনি 'ওসাং তাজুং'— সু-সমাচার। লংজাংলেপজুক গ্রামে ফেরার পর শত্রুপক্ষের আক্রমণে মারেংকং গ্রাম তছনছ হয়ে গেল এবং তিনি নিজে মাথা খোয়ালেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিবেশী কনিয়াক গ্রাম থেকে দুজন শিবসাগরে সওদা করতে গিয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। এই দুজনও নিজ গ্রামে, স্বজনের হাতে মাথা খোয়ালেন। শিবসাগর কেন্দ্রে হুবি নামে যে বালকটি সর্বপ্রথমে খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেছিল তার গ্রামের নাম বা গোষ্ঠীর নাম জানা যায়নি। ধর্মান্তরিতদের বিনাশ পাওয়ার ঘটনা অন্যান্য কারণের মধ্যে সু-সমাচারে নাগাদের সন্দিগ্ধ করেছিল। জয়পুর কেন্দ্র থেকে বেতের নামসাং গ্রামে রেভারেণ্ড বোরনসন এসে যে ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়াস নিয়েছিলেন ১৮৪০ সালে সেটা অন্যত্র বলা হয়েছে।

শিবসাগরে ডাঃ ক্লার্কের প্রথম দীক্ষিত আওনাগা সুপংমেরেন। ১৮৭১ সালে দীক্ষিত সুপংমেরেনকে নিয়েই জয়-যাত্রা শুরু। সুপংমেরেন-এর প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অসমীয়া ধর্মপ্রচারক গদুলা। দশ মাস গদুলার সঙ্গে শিবসাগরে থেকে দুজনে মুলুংইমচেন গ্রামে ফিরলেন এক সঙ্গে। উদ্দেশ্য সুপংমেরেন সহধর্মিণী সন্ধান করবেন আর গদুলা সরেজমিনে প্রচারের সম্ভাবনা যাচাই করে যাবেন। গদুলার উদ্যমে একদল গ্রামবাসী শিবসাগরে গিয়ে নবধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হলেন। নাগা-পাহাড়ের ভেতরে মুণ্ড শিকারীরা তৎপর থাকলেও তখন শিবসাগর নাগাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান। কিন্তু, নবধর্মে উৎসাহিত দলের অনেকেই দুর্ভাগ্যক্রমে কলেরার শিকার হয়ে শিবসাগরের পথে প্রাণ দিলেন। দলের মাত্র নজন শিবসাগর পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন।

ডিসেম্বর, ১৮৭২ সালে ডাঃ ক্লার্ক সুপংমেরেনের সূত্রে মুলুংইমচেন গ্রামে এসে পনেরজনকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষিত-দের মধ্যে দুজন অবিলম্বে ধর্মচ্যুত হলেন মুণ্ডশিকারে সহযোগিতা করার জন্যে। ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ সালে ডাঃ ক্লার্ক আবার ফিরে এলেন মুলুংইমচেন গ্রামে। কাজকর্মের অগ্রগতি লক্ষ্য করে এখানেই স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন এবারে। ধর্মান্তরিত-দের সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন প্রভাব থেকে মুক্ত করার সংকল্পে ডাঃ ক্লার্ক একটা নতুন গ্রাম পত্তন করলেন মুলুংইমচেন-এর অদূরে। নতুন গ্রামের নাম মুলংইমসেন।

মুলমইমসেন গ্রামে ডাঃ ক্লার্কের স্ত্রী ও অসমীয়া প্রচারক জিলিও সহযোগিতা করতে এলেন। নতুন গ্রামে উঠে এলেন তিরিশজন নবধর্মাবলম্বী। এই গ্রামের পর আর কোন নতুন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী গ্রামের পত্তন নাগা-পাহাড়ে হয়নি। অন্যান্য গোষ্ঠীর নাগাদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবার জন্যে ক্রমে রেভারেণ্ড উইটার এলেন ১৮৮৫ সালে লোথা নাগাদের মধ্যে এবং রেভারেণ্ড কিং এলেন ১৮৮৩ সালে আংগামী অঞ্চলে। রেভারেণ্ড কিং ১৮৭৬ সাল থেকে অবশ্য আংগামী অঞ্চলের প্রবেশদ্বার চুমুকেডিমাতে মিশন স্থাপন করে বসেছিলেন। এঁরা দুজনেই সস্ত্রীক প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ক্লার্কের নতুন গ্রাম ধর্মান্তরিতদের স্বজনদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিশ্রাম দিলেও নিজেদের প্রাণের টানে চঞ্চল করে তুললেন।

....'কিন্তু, নতুন খ্রীষ্টান গ্রামের বহু লোককে গির্জা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হলো, যেহেতু, এদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে পুরনো অ-খ্রীষ্টান উৎসর্গ, সামাজিক উৎসব এবং বিবিধ

ঈশ্বরের পুজোর মনোনিবেশ করেছিলেন' ১৯৭৬ সালে মলুংইমসেন গ্রামের শত-বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। শত বছর পরও প্রাচীনদের পান খাওয়ার অভ্যেসটা অনেকের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অভ্যেসটা নির্মূল করতে গ্রামবাসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রামের সমস্ত সুপুরী গাছ কেটে ফেলতে। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। সুপুরী গাছের মাল-মশলা দিয়ে একটা বিশাল প্রার্থনা সভার স্থান সংকুলান হয়েছে।

১৮৯৪ সালে ইমপুর গ্রামকে ডাঃ ক্লার্ক বেছে নিলেন আও-নাগা অঞ্চলের কেন্দ্র হিসেবে। তাঁর বিপুল প্রতিভার সাক্ষ্য ইতিমধ্যে চারটি গির্জা বহন করছে আও-নাগা অঞ্চলে। স্ত্রী ছাড়াও আরো দুজন সুযোগ্য আমেরিকান সহকর্মী তিনি পেয়েছিলেন এই অবসরে। পরের বছর নিজের সহকর্মীদের চালে ধর্মীয় অগ্রগতির বিবেচনা করতে গিয়ে দেখা গেল চারটি গির্জায় অনুগতের সংখ্যা দুই। বছরের শেষে শূন্য। প্রায় অর্ধশতাব্দীর যোগাযোগ এবং প্রায় কুড়ি বছরের সাক্ষাৎ পরিচর্যায় পরিষ্কৃত দেখলেন স্থিতি শূন্য। আফিম সেবন সম্বন্ধে কড়াকড়ি করাতে গির্জাতে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো।

পরের বছর গির্জা থেকে বহিষ্কৃত লোকদের মধ্যে জাগরিত হলো এক নতুন প্রেরণা। দেবসন্দর্শন ও দৈববাণীর অনুরণন শোনা গেল। গীর্জাগুলো আবার নিজের মহিমায় ফিরে এলো। আফিম সংকটের দশ বছর পর সাংগঠনিক শক্তি দেখে রেভারেন্ড পেরিন ঘোষণা করলেন 'নাগা মিশন শুধু নাগাদের নিয়ে ও নাগাদের জন্যে বলে বিবেচনা করলে চলবে না; এটি এশিয়ার মঙ্গোলীয়দের কাছে পৌঁছুবার জন্য একটা মহৎ প্রকল্পের অংশ।' পেরিনের মহৎ প্রকল্প এখন আরো বিস্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রচারকদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, 'নাগাভূমি থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপটিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা।'

ধর্মচর্চা এখন আর নাগাভূমির শৈল-চূড়ায় সীমাবদ্ধ নয়। নাগাভূমি ব্যাপটিস্ট চার্চ কাউন্সিল প্রচারের কাজে নাগাভূমি থেকে সুশিক্ষিত প্রচারক পাঠানোর জন্যে এক সংগঠনের প্রস্তাব রেখেছেন। প্রচার ও সংগঠনের কাজে চাংকি গ্রামের ডাঃ চেন ওয়াতির নাম ব্যাপটিস্ট জগতে সুপরিচিত। তাঁর সহধর্মিণী একজন বজলামা। সুইডেনের ক্রনোবার্গ মিশনের আমন্ত্রণে সেলজন নাগা, গায়ক-গায়িকা ধর্মীয় গান পরিবেশন করতে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ সফর করে এসেছেন জুন-জুলাই, ১৯৭৫ সালে। এই দল নাগা-নৃত্যও পরিবেশন করেছেন। গীর্জার তরফ থেকে নাগা-নৃত্য এই প্রথমবার পরিবেশিত হলো, যদিও বিদেশের মাটিতে।

ইমপুরে শতবার্ষিকী উৎসব স্বভাবতই নাগাভূমির আকণ্ঠ উৎসাহ উদ্দীপনার স্থল হয়েছিল। এর সাড়ম্বর প্রস্তুতি মাসের পর মাস মধ্যরাতে গড়িয়েছে ঘরে ঘরে। উৎসবের একমাস আগে ডাঃ বিলি গ্রাহাম কোহিমাতে এসেছেন। এই নামের সঙ্গে সাতটি অমরাবতী জেগে ওঠে। তদোধিক, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিকসনের বন্ধুজন, শ্রদ্ধাভাজন। কোহিমাতে স্থায়ী বসবাসকারীদের জলাভাব, স্থানাভাব প্রবাসও পরিহাসের উৎস। এখানে নাগাভূমির প্রতি পাঁচজনের একজন সমবেত হয়েছেন বিলি গ্রাহামের নামে। নাগাভূমি ৩.৫০৯ মাইল পথ উন্মুখ হয়েছে কোহিমার দিকে। মাত্র পনেরো বছর আগে ডিমাপুর-ইম্ফল সড়ক ছাড়া কোন মোটরপথ ছিল না এখানে। তিনটে জীর্ণ রোড রোলার সম্বল নিয়ে নাগাভূমি বাঁধভাঙা জলের স্রোত পথঘাট ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল।

বিলি গ্রাহামের প্রার্থনা সভায় শান্তি-ভঙ্গ করা হবে না এরকমের আশ্বাস ব্যাপটিস্ট মিশনের নেতারা আত্মগোপনকারীদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ফেডারেল সরকারের প্রেসিডেন্ট মাসিও নিজেও একজন রেভারেন্ড। যথাসময়ে প্রার্থনা সভার অদূরে নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয়-এর ওপর গুলি বর্ষণ-এর আওয়াজে জনতা বিভ্রান্ত ও শংকিত হলেন। আত্মগোপনকারীদের আগ্নেয় উপস্থিতি বিলি গ্রাহাম ও সংবাদ সংস্থাগুলোর প্রতি নিবেদিত। বিলি গ্রাহাম নিজের ভাষণে বললেন, 'বহুলক্ষ আমেরিকা-বাসী ভারতবাসীকে ভালবাসেন এবং ওদের অনেকেই এখানে আসেন শান্তির সন্ধানে।' গোলাবারুদ ব্যবহারে প্রার্থনা সভার শান্তি ব্যাহত হয়েছিল। এটাতে প্রাণনাশের প্রয়াস ছিল না, প্রচেষ্টা ছিল আত্মগোপনকারী সংস্থার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। মাসতিনেক আগে সমস্ত আত্মগোপনকারী সংস্থাগুলোকে সরকার অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

বাহাত্তরের শতবার্ষিকী উৎসবের মাস চারেক আগে অবশ্য রেভারেন্ড কিজুংলিবা প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। লক্ষ্য ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হোকিশে। রেঃ কিজুংলিবা ঘটনা-ক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক গাড়ীতে ডিমাপুর থেকে কোহিমাতে পাড়ি জমিয়ে-ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ীটা অকস্মাৎ রাইফেল-এর গুলির জলপ্রপাতের নিচে এসে পড়লো। শতবিদ্ধ গাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী ও রেঃ কিজুংলিবা অনাহত রইলেন অলৌকিকভাবে। গুলিবিদ্ধ হলেন মুখ্যমন্ত্রীর ষোড়শী কন্যা কোহুলী। হোকিশের প্রাণের উপলক্ষে এটা তৃতীয় আক্রমণ। অন্যবারে, তাঁর মাথার টুপি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানান্তরে শিশুদের আনন্দবর্ধন করেছিলো। রেঃ কিজুংলিবার নাম যুক্তরাষ্ট্রের ভালবর্গ শান্তি পুরস্কার ডাঃ মার্টিন লুথার কিং-এর সমান আসনে বসিয়েছে। তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ব্যাপটিস্ট গীর্জার পক্ষে জন-সংযোগ ও শান্তি প্রচেষ্টার জন্যে। এই ঘটনার পর হোকিশে বললেন, 'আমার জীবন আমার কাছে ততটা মূল্যবান নয় যতটা শতসহস্র নাগা জীবন, যাদের ক্রমাগত ধ্বংস হতে দেওয়া হবে না যে-ভাবে, ৮ আগস্ট ওরা আমার প্রাণনাশ করতে প্রয়াস নিয়েছে।'

রেঃ কিজুংলিবা অনাহত রইলেন তাঁর 'পদ্মশ্রী' শোভিত নামকে শতবার্ষিকীতে আরো সুরভিত করতে। তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বছর ইমপুর মিশনের সঙ্গে যুক্ত থেকে এখন অবসর নিয়েও নিরবচ্ছিন্ন প্রচার ও প্রার্থনার মধ্যে নিজেকে গোপন রাখতে কনিয়াক নাগা অঞ্চলে রয়েছেন। অন্যদিকে শতবর্ষের শতকথায় ফিজোর নামটাও স্মরণে আসে। নাগাভূমিতে তিনি একটা খ্রীষ্টধর্মীয় স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন করতে চেয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে ডাঃ ক্লার্ক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের নিয়ে একটা গ্রাম পত্তন করেছিলেন। পরিসংখ্যান যাই বলুক নাগা-ভূমিতে এখন প্রায় সবাই খ্রীষ্টভাবাপন্ন। ১৯৫৬ সালের ফেডারেল সরকারের সংবিধানে বলা হয়েছে 'শিক্ষা জনসাধারণের হাতে থাকবে। ধর্মমুক্ত থাকবে।' পরবর্তী ভাষ্যে জানা যায় এটা নাগাধর্ম ও ব্যাপটিস্ট ধর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য, অন্য কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। ১৯৬৭ সালে কয়েকজন ক্যাথলিক প্রচারককে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, ক্যাথলিকরা এই শতকের পাঁচ দশকে নাগাভূমিতে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন। গত শতকে ধর্মপ্রচার বিষয়ক অঞ্চল বাঁটোয়ারাতে নাগা-পাহাড় আমে-রিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের ভাগে পড়েছিল। এই হিসেবে ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনেরও এখানে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ ছিল না যদিও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পতাকা নাগাভূমির নীল আকাশকে লঙ্ঘিত করেছিল।

শতবার্ষিকীর পর আরো দু-বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। গীর্জাগুলো অধিকতর মজবুত মশলায় তৈরি হচ্ছে। হাজার লোকের এক-একটা গ্রামে আড়াই তিন লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত গীর্জার চূড়ো অভি-নন্দন জানাচ্ছে ধর্মপ্রাণ মানুষকে। এগুলো সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের কায়িক শ্রম থেকে সংগৃহীত অর্থের ভক্তি-বিশ্বাসের ডালিতে নিবেদন। বিদেশী শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও নাগাভূমির ধর্মচর্চার উদার অংশীদার। রিজার্ভ ব্যাংক-এর হিসেবে জানা যায়—এই সীমান্ত রাজ্য ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বছরে কেন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছে ২৭ কোটি টাকা আর আইনসঙ্গতভাবে বিদেশী সাহায্য শিক্ষা ও ধর্মের খাতে পেয়েছে ২৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু প্রায় সাড়ে চারশ' টাকা বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ।

মাছ ধরার গল্প

আও-নাগা গ্রামের আনন্দ উত্তেজনার শীর্ষবিন্দু মাছ ধরার দিনটি। গ্রামের সবাই সেদিন জেলে। ছেলেবুড়ো সবাই কর্ম-মুখর। শুধু যেসব ছেলেরা বয়সের দলে (age-groop) পড়েনি, তাদেরই ডাক পড়েনি। মন্ত্র ও তর্পণ ইত্যাদি বাদ দিয়ে মাছ ধরার দিনটি এখনও নিজস্ব আকর্ষণ নিয়ে গ্রামে গ্রামে সাড়া জাগায়। মাছ ধরার

দিনক্ষণ ও স্থান পুরু স্থির করবেন। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ জানাবার সিদ্ধান্তও পুরু-র একতিয়ারে। পুরু ইচ্ছে করলে প্রতিবেশী গ্রামের পুরু অথবা সমস্ত গ্রামবাসীকে যুক্ত অভিযানে নিমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এই আনন্দলগ্নে সরকারী আমলা, বিশেষতঃ পাবলিক ওয়ার্কসের ইঞ্জিনিয়রদের নিমন্ত্রণ করার রেওয়াজ আজকাল দেখা যায়।

পুরু মাছ ধরার ঘোষণা দিলে প্রথমেই খবর পড়বে মরাং ঘরের যুবক দলের। যুবকেরা মাছ ধরার আগের দিন জঙ্গলে গিয়ে গন্ধমাদন বোঝা নিয়ে আসবে। এই গন্ধমাদন ভেতরে গাছের পাতা, ছাল ও ফলের সংগ্রহ। পুরুর সদস্যরা বাঁশের ঝুড়ি বানাবেন সেদিন। যুবকেরা মরাং ঘরে পাতার বোঝা পাহারা দেবেন সারারাত। কারণ, বনবেড়াল পাতার ওপর মলত্যাগ করলে মাছ ধরা নিষ্ফল প্রয়াস হবে মাত্র। ভোরবেলা নদীর নির্দিষ্ট স্থানে পাতা, ছাল ইত্যাদি বাঁশের ঝুড়িতে গুঁড়ো গুঁড়ো করে মাছ ধরার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হবে। পুরোহিত একদা মন্ত্রপাঠ করে বলতেন, আজ আমাদের সিদ্ধিযোগ হোক। নদীর উৎস থেকে শুরু করে সঙ্গমের সব মাছ এসে আমাদের হাতে উঠুক। নদীর নুড়িগুলো মাছ হয়ে আমাদের ভোগ্য হোক। একটা মুরগীর ডিম পাতায় মুড়ে নদীতে নিক্ষেপ করবেন পুরোহিত। সহকারী পুরোহিত পাতাটা জল থেকে তুলে আনবেন। পাতা জলে হারানো দুর্লক্ষণ। এবারে ঝুপঝাপ একটা গোটা গ্রাম জলে। ততক্ষণে ঝুড়িতে নিঃস্পেশিত পাতা-ছালের রসে নদীর মাছ নির্জীব। কিছু মাছ ভেসে উঠেছে, কিছু পাথরের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে আছে নির্জীব হয়ে। সারাদিন ধরে স্নানের সঙ্গে মাছও জড় হবে এক জায়গায়। মাছগুলো নিয়মমাফিক ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে দিনশেষে। অনেক গ্রামে আবার মাছ ধরা জায়গার শেষভাগে আলাদা বাঁধ দিয়ে সবচেয়ে প্রাচীন বয়সের দল মাছ ধরেন। ওঁদের ধরা মাছ সাধারণ ভাগ-বাঁটোয়ারার মধ্যে পড়বে না।

মাছ ধরার কলা-কৌশল অনেক পালটেছে। চুন বা বিস্ফোরক দিয়ে সহজে কিস্তিমাৎ করার দিকেও নজর। সারাদিন ধরে মাছ-ধরা, আগুনের পাশে বসে মাঝে মাঝে শরীর গরম করে নেওয়া (অথবা, সময়বিশেষে তরল পানীয় দিয়ে শরীর চাঙ্গা করে তোলার সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়) অন্ততঃ এক বছর স্মৃতিতে প্রখরভাবে জেগে থাকার কথা। নাগাভূমিতে গত দুই দশকের নির্বাচন যুদ্ধ মাছ ধরার মতই প্রবল উত্তেজনায় ভরপুর সার্বজনীন উৎসব। মাছ ধরার স্বপ্ন সারা বছর একবার অন্তত বাস্তবে পরিণত হয় কিন্তু নির্বাচন যুদ্ধ আরো বেশি সময়ের ব্যবধানে হয় বলে সেখানে প্রতিযো[illegible]

বেশি। আরো দীর্ঘ প্রস্তুতি, আরো সুদূরপ্রসারী ফলাফল নির্বাচনের আদ্যোপান্ত মুড়ে রাখে।

১৯৫৭ সালের নির্বাচন বয়কটের মধ্যে দিয়ে উত্তেজনাময়। এ-সময়ে তিনটে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছিল। একজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে কয়েক মাস আসামের উপমন্ত্রীর পদেও বহাল হয়েছিলেন। এর আগের নির্বাচন-যুদ্ধ নির্বাচন পরিহার করার যুদ্ধ ছিল। ১৯৬৪ সালের প্রথম নাগাভূমি বিধানসভার নির্বাচন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে বিধায়কদের প্রতিযোগিতাকে ম্লান করে বিদ্রোহের উত্তাপ অনেকের গায়ে লেগেছে। সাধারণ নির্বাচন ছাড়া উপ-নির্বাচন এবং লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনগুলোও বিদ্রোহ ভাবনায় নষ্ট হয়েছে গোপনে। আত্মগোপনকারী ফেডারেল সরকারের সংবিধানে দলীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ রাখেননি। ওদের সংবিধান বলছে—প্রতিটি নাগাগ্রাম নিজস্ব ক্ষমতায় এক-একটি রিপাবলিক। প্রতিটি নাগা পরিবার অথবা গোষ্ঠী নিজস্ব সুস্পষ্ট সীমানার অধিকারী এবং জমিসহ সমস্ত বিষয়ে নিজেদের সমাজ সংগঠন, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার এবং বিধিব্যবস্থাতে যথাপূর্ব সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখবেন।

বিধানসভার প্রথম নির্বাচনের প্রতীক দুটি ১৯৭৪ সালেও প্রকটভাবে ফিরে এসেছে। এবারেও আসল লড়াই মোরগ ও মিথুনের মধ্যে। মোরগ প্রথমবারে ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট নামে লড়েছে। দ্বিতীয়বারে, ইউনাইটেড ফ্রন্ট। তৃতীয়বারে ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট নামে। প্রতিটির জনক শ্রীকেভিচুষ। চুয়াত্তরে কেভিচুবার অন্যতম সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীভিজল শ্রীমতী রাণু সাইজা ও শ্রীচুবাতোষী জামির। শ্রীচুবাতোষী একাত্তরের মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনে শ্রীকেভিচুবার বিরুদ্ধে লড়ে হেরেছিলেন মিথুনের প্রতীক নিয়ে।

ক্ষমতার অলিন্দে / সরোজ চক্রবর্তী

(৩)

নভেম্বরের ২১ তারিখে দেশ জুড়ে গ্রেপ্তার করা হল কম্যুনিস্ট পার্টির সাড়ে তিনশ সদস্যকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সংসদ সদস্য, রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের ৩০ জন সদস্য, কেরালার প্রথম কম্যুনিস্ট সরকারের পাঁচজন মন্ত্রী এবং দার্জিলিঙের এক নেপালী রমণী। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গ্রেপ্তার হন মাদ্রাজে—একশ' জন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল তারপরেই—৬০ জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের নেতা জ্যোতি বসু, বিধানসভায় কম্যুনিস্ট দলের চীফ হুইপ গণেশ ঘোষ, কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, মুজফফর আহমেদ এবং পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতার' সম্পাদক। পুলিশের গোপন রিপোর্টে জানা যায়, যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁরা সকলেই সি পি আইয়ের পশ্চিমবঙ্গ শাখার চীন-ঘেঁষা গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁদের কার্যকলাপ ভারতরক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিপন্থী। সেই সঙ্গে সীমান্তের পাঁচটি জেলার ৬০০ চীনা অধিবাসীকেও অন্তরিত করা হল।

২১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল পশ্চিমবঙ্গ হোম গার্ড বিল, ১৯৬২ এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল (পশ্চিমবঙ্গ) বিল, ১৯৬২। তারপর সদস্যেরা যাতে নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে যুদ্ধ প্রয়াসে যোগ দিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন সে-জন্যে বিধানসভার অধিবেশন মুলতবী রাখা হল। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় যে বিল দুটি উত্থাপন করলেন তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (নির্দল) বললেন, চীনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বিবেচনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু চীনের বর্বরোচিত আক্রমণের কথা মনে রেখে দেশকে আরো খারাপ অবস্থার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধির জন্যে তিনি প্রস্তাব করলেন কলকাতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা শাখা খোলা হোক। তিনি বললেন, 'আমেরিকা এবং বৃটেন ভারতের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাদের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব সাহায্য নিতে হবে। অতীতে যাই ঘটে থাকুক না কেন, আজ পশ্চিমবঙ্গ আসন্ন বিপদের মুখে আছে।' চীনের 'বন্ধুদের' গ্রেপ্তার করার জন্যে তিনি সাধুবাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

সোমনাথ লাহিড়ি তখন বিধানসভায় সি পি আইয়ের মুখপাত্র। তিনি দুঃখ করে বললেন, তাঁর দল যখন যুদ্ধ প্রয়াসে সহায়তা করার চেষ্টা করছিল তখনই পার্টির কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হল। (একদিন সকালে সোমনাথবাবু তাঁর দলের আরো কয়েকজনকে নিয়ে রাইটার্সে আমাদের ঘরে এলেন এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন বেশ কয়েক হাজার টাকা।)

২২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করলেন, আগের দিন মাঝ রাত থেকে সীমান্ত এলাকায় আর গুলি চলেনি। তিনি বললেন, 'মোট কথা, আক্রমণ করে চীন যা অধিকার করেছে তা সে নিজের দখলেই রাখবে এবং বাকিটা নিয়ে আলোচনা করবে। ভারত এই অবস্থা মেনে নিতে পারে না।'

চীনের সামরিক আক্রমণের কথা জানিয়ে সাহায্য চেয়ে নেহরু আগেই অন্যান্য দেশের প্রধানদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। বৃটেনের কমনওয়েলথ সচিব ডানকান স্যান্ডস এবং মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতা অ্যাভরেল হ্যারিম্যান ভারতের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন পর্যালোচনা করে দেখার জন্যে নভেম্বরের মাঝামাঝি দিল্লি এসে পৌঁছেছিলেন। আসাম এবং নেফায় সরেজমিনে অবস্থা দেখে আসার জন্যে তাঁরা একদল প্রবীণ সামরিক অফিসারকে পাঠান। ভারতের সামরিক প্রয়োজন সম্পর্কে পুরোপুরি খবর নেওয়ার পর হ্যারিম্যান ও স্যান্ডস গেলেন রাওয়ালপিণ্ডি। হ্যারিম্যান বললেন, উত্তর সীমান্তে চীনের শাসানি গোটা উপমহাদেশের ক্ষেত্রেই একটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। আর সংকটের সময় ভারতকে সাহায্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা স্বাধীন দুনিয়ার নিরাপত্তা বজায় রাখতে সাহায্য করছে। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের মাখামাখির দরুণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না, সে-বিষয়েও তিনি কোনো সন্দেহই রাখলেন না। বৃটেন অস্ত্র দিতে রাজি হল বিনা মূল্যে। সেই সংকটের সময় আমাদের দেশে বৃটেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা পৌঁছলো তুঙ্গে।
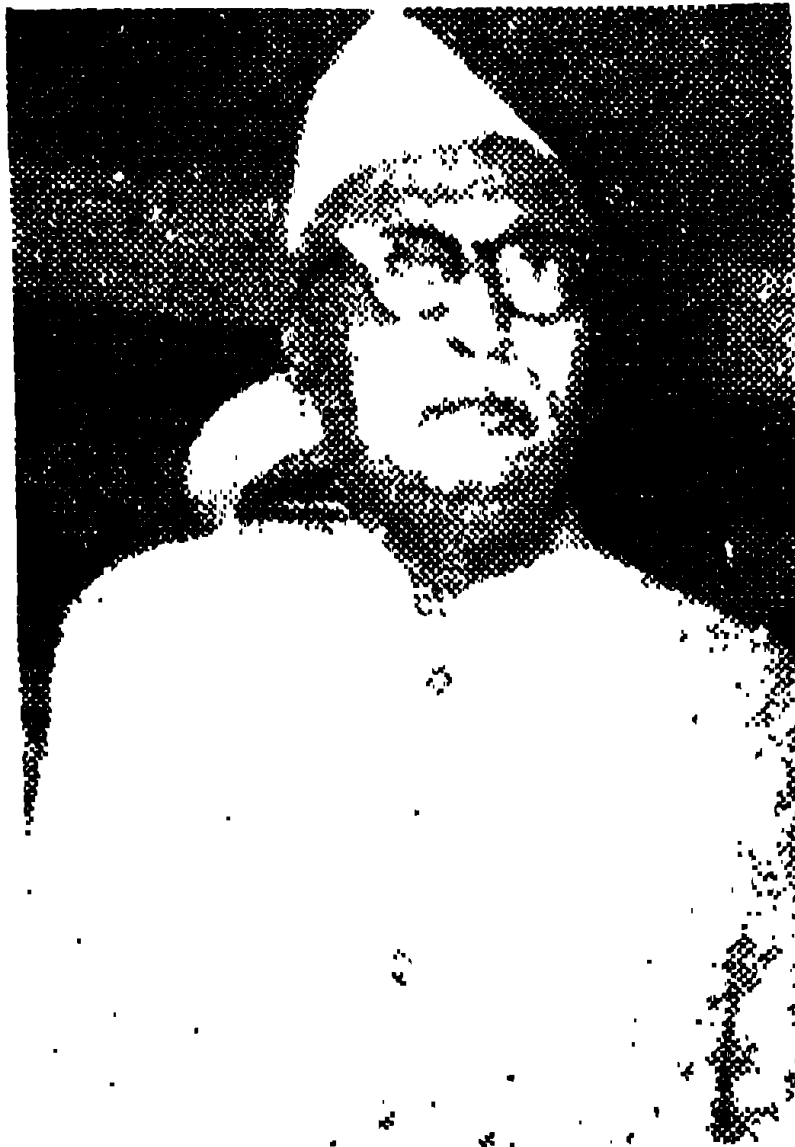
রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ডানকান স্যান্ডসের দৌত্যের ফলে ভারত-পাকিস্তান বোঝাপড়ার একটা পরিবেশ তৈরি হল। স্যান্ডস রাওয়ালপিণ্ডি থেকে দিল্লি ফেরার পর এক ইশতাহারে বলা হল, 'সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্যে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও প্রেসিডেন্ট আয়ুব শীঘ্রই আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়েছেন।' নেহরু অবশ্য পরের দিনই লোকসভায় জানালেন যে, কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার জন্যে জম্মু ও কাশ্মীর দু-টুকরো করার কোনো কথাই ওঠে না।

ঐ সময় কলকাতায় এলেন পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ডঃ লুবকে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরে ডঃ লুবকে বললেন, আপনাদের উত্তর সীমান্তে চীনের কম্যুনিস্ট সরকারের বর্বরোচিত আক্রমণে জার্মানীর মানুষ ক্ষুব্ধ।

আসাম সফরে গিয়ে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে নেহরু ঘোষণা করলেন, ভবিষ্যতে সামরিক দিক দিয়ে ভারত সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। 'যুদ্ধ যদি থেমেও যায় তবু আমাদের প্রস্তুতি চলতে থাকবে। একবার আমরা ঠকেছি, আর ঠকব না। চীনের আক্রমণে একটা কাজ হয়েছে। ভারতের জনগণকে তা ঐক্যবদ্ধ করেছে। আমরা অবশ্যই এই সংকট কাটিয়ে উঠব এবং এর দ্বারা আমরা উপকৃত হব। আক্রমণকারীদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা হবেই, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার মনে হয় চীনারা আবার ফিরে আসবে না কিন্তু যদি তাদের সেই স্পর্ধা হয়, তবে তাদের প্রবলভাবে প্রতিহত করব আমরা। প্রাণপণ করে আমরা দেশকে রক্ষা করব।' পরের দিন তেজপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বললেন, চীনারা যদি পুরোপুরি ভারতীয় এলাকা থেকে হটে না যায় তবে আমাদের জোর করেই তাদের হটাতে হবে। কখন তা করা হবে তা ভারতই ঠিক করবে।

লাসা আর সাংহাইয়ে ভারতীয় বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হল ১৫ ডিসেম্বর। ঐ দিন থেকেই কলকাতা ও বোম্বাইয়ে চীনা বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করে দিতে বলা হল চীন সরকারকে। কারণ দেখান হল, দূতাবাসের ভারতীয় কর্মীদের তাদের প্রাঙ্গণের মধ্যেই একরকম আটক করে রেখেছে চীনারা।

৯ ডিসেম্বর চীনের কাছ থেকে পাওয়া গেল পাঁচ হাজার শব্দের এক লম্বা নোট

এবং তা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে দেওয়া হল। তাতে দেখা গেল, চীনারা তাদের সৈন্য-বাহিনীকে ম্যাকমেহন লাইন এবং তার থেকে আরো বিশ কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু এদিকে তারা কয়েকটা অসামরিক চৌকি রাখবে। এই প্রসঙ্গে ঢোলা, খিঝান, কিবিতু আর ওয়ালং-এর কথা বলল চীন। পরে ব্যাখ্যা করে তারা বলল, ঢোলা ছাড়া আর সব চৌকি তারা ছেড়ে দেবে।

স্বাধীনতার পর প্রথম সাইরেন

ঐ দিন কলকাতায় বিমান আক্রমণ সাইরেন প্রথম শোনা গেল। অসামরিক প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রক পি কে সেন ষোলটা বাড়িতে বসিয়েছিলেন ষোলটা সাইরেন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম সাইরেন শুনলাম। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী বিমান আগমনের আগে এই ধরনের সাইরেন শোনা অভ্যেস ছিল।

১ ডিসেম্বর চীন সরকার জানালেন কলম্বো সম্মেলনে যোগদানের শর্ত। এটাকে চরমপত্র বলা যায়। শুধু চীনের আরোপিত শর্তেই আলোচনা শুরু হতে পারে। তাদের তিন-দফা প্রস্তাব ছাড়া আর কোনো প্রস্তাব তারা বিবেচনা করবে না। এই প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল, ১৯৫৯ সালে ৭ নভেম্বরের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা। ভারত চেয়েছিল ৮ সেপ্টেম্বর তারিখের ভিত্তিতে এই নিয়ন্ত্রণ রেখা স্থির করা হোক। ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় দূত পি কে ব্যানার্জিকে (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাতি) চীন তিনটি প্রশ্ন করেছিল। সেই তিনটি প্রশ্ন হল : ভারত কি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজী? ৭ নভেম্বরের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে দুপক্ষ বিশ কিলোমিটারে করে সরে যাবে এই প্রস্তাবে কি ভারত রাজী? দু পক্ষের সৈন্য অপসারণ করে সৈন্যমুক্ত অঞ্চল গঠন, চৌকি স্থাপন এবং ধৃত ব্যক্তিদের প্রত্যার্পণের প্রসঙ্গ আলোচনার জন্যে দুই দেশের পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বৈঠকের প্রস্তাবে কি ভারত রাজী?

১০ নভেম্বর নেহরু এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন লোকসভায়। (এক) চীন একতরফা ঘোষণা করেছে যুদ্ধবিরতির কথা, কিন্তু ভারত তাতে সম্মত হয়েছে এবং এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার ব্যাপারে কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি। (দুই) সাম্প্রতিক আক্রমণের ফলে চীন যে এলাকা দখল করেছে তা ছেড়ে যেতে হবে এবং ৮ সেপ্টেম্বরের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। (তিন) দু পক্ষের পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বৈঠকে ভারত রাজী। সৈন্য অপসারণের প্রশ্নে ছিল বিরাট মতবিরোধ, প্রশ্নটা ছিল ভারতের আড়াই হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে।)

কলম্বোয় বসল জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, কম্বোডিয়া, ঘানা,

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং সিংহল যোগ দিল এই সম্মেলনে। সীমান্ত বিরোধ নিয়ে তারা একটা গোপন প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই প্রস্তাব নিয়ে ভারত ও চীনের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হল সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ককে। প্রস্তাবটার কথা অবশ্য কাগজে ফাঁস হয়ে যায়। তাতে দেখা যায় ঐ প্রস্তাবে ভারতকে কোনো এলাকা থেকে সরে যেতে বলা হয়নি। প্রস্তাবটা ছিল এই : পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যরা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে, সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকার ৮ সেপ্টেম্বরের অবস্থা বজায় রাখা হবে এবং পূর্ব সীমান্তে (নেফায়) ভারতীয় সৈন্যেরা যাবে লংজু আর ঢোলা পর্যন্ত। (পরে আর একটি খবরে বলা হয় যে আগের খবরটি ঠিক নয়।) এই সময় চীন-রুশ বিরোধ

অমলেন্দু চৌধুরী

বাড়তে থাকে। রাশিয়ার চীন-বিরোধী প্রচারের জন্যে চীন সমালোচনা করে রাশিয়ার।

মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ সূত্রে যেসব গোপন রিপোর্ট পাচ্ছিলেন তাতে দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট পার্টিতে ভাঙন আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদকমন্ডলী দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর কাছে দাবি জানান, প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং মুজফফর আহমেদকে অবিলম্বে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এবং দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে (তাঁরা তখন কারাগারে।) তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা কলকাতায় পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' বন্ধ করে দিয়েছেন এবং ভারত-চীন সংঘর্ষ সম্পর্কে জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবটি কার্যকর করতে দেন নি পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট পার্টিকে।

চীনের আক্রমণের নানারকম ব্যাখ্যা দেন রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা। কিন্তু বিশেষ একজন ভাষ্যকারের যে ব্যাখ্যা আমি সতের বছর আগে পড়েছিলাম তার কথা মনে পড়লে এখনও আমি অভিভূত হই। এই বিশ্লেষণ যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনই উজ্জ্বল। সেই ভাষ্যকার আর কেউ নন, স্বয়ং জওহরলাল নেহরু। তাঁর সেই গোপন ভাষ্যের ও বিশ্লেষণের মূল কথা ছিল এই :

চীন ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতির মূলে আঘাত করতে চেয়েছিল। সেই সময় গোটা দুনিয়া দুটো শক্তিজোটে বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। যাকে বলা হয় ঠান্ডা লড়াই, তাই তখন চলছে দুনিয়া জুড়ে। পারমাণবিক বিপর্যয়ের আশংকা বড় হয়ে উঠেছিল। কিউবা নিয়ে অবস্থা তো প্রায় চরমে পৌঁচেছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা, কেনেডি ও ক্রুশ্চফের রাষ্ট্রনেতাসুলভ দূরদৃষ্টির ফলে তা এড়ানো সম্ভব হয়। কিন্তু বিপদ থেকে যায়। এই বিভ্রান্তির মধ্যে শান্তির কথা শোনা যায় এমন কয়েকটি দেশের মুখ থেকে যারা নিজেরা খুব শক্তিশালী নয়। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া, দুই গোষ্ঠীতেই যাঁরা বিবেচক লোক তাঁরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করতে থাকেন। জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রবক্তা হিসেবে ভারত ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। সে ক্রমে হয়ে উঠেছিল তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র। ভারতের এই নীতি 'পঞ্চশীল' নামেও পরিচিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়া ভারতের এই নীতির প্রশংসা করতে শুরু করেছিল।

এই জোট নিরপেক্ষতার নীতি চীনের নেতাদের পছন্দসই হয়নি। চীন বিশ্বাস করত সর্বাত্মক যুদ্ধে। পারমাণবিক যুদ্ধকেও চীন ভয় করত না। চীনের নেতারা ভাবতেন, কয়েক লাখ লোক মারা গেলে চীনের কিছু যায়-আসে না, কারণ তার লোকসংখ্যা বিরাট। চীন মনে করত ঐ ধরনের একটা পারমাণবিক যুদ্ধ লাগলে মহাশক্তিধর দুই দেশ, আমেরিকা ও রাশিয়া প্রায় পুরোপুরিই ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন

চীনই দেখা দেবে সবচেয়ে শক্তিমান দেশ হিসেবে এবং পৃথিবী নত হবে তার কাছে। কিন্তু চীনের পক্ষে পরিতাপের কথা, সোভিয়েট রাশিয়া এই ছলে ভুলল না। চীন আর রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ক্রমশই বাড়ছিল। রুশ কারিগরী বিশেষজ্ঞ আর কূটনীতিকরা যখন চীন ছেড়ে চলে গেল চীন আর রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ক্রমশই বাড়ছিল। রুশ কারিগরী বিশেষজ্ঞ আর কূটনীতিকরা যখন চীন ছেড়ে চলে গেল চীন আর রাশিয়ার মধ্যে মতান্তর তখন প্রায় সম্পূর্ণ হল।

এই সময় চীনের নেতারা ভাবলেন, ভারতকে যদি অপদস্থ করা যায়, জোট-নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করে একটি শক্তি-গোষ্ঠীতে যোগদানে বাধ্য করা যায় (চীনের ধারণা ছিল ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যাবে) তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্নেহ ভাঙবে এবং সে আবার চীনের সঙ্গে মিতালি পাতাতে চেষ্টা করবে। তখন চীন সোভিয়েট ইউনিয়নকে বোঝাতে চেষ্টা করবে যে ভারতের জোটনিরপেক্ষতা আর শান্তি-পূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি নিছক বুজরুকি।

সুতরাং ভারত আক্রমণ করে চীন সেই শক্তিকেই সরাসরি ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল যে পৃথিবীতে উত্তেজনা হ্রাসের জন্যে সচেষ্ট ছিল। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নও ক্রমশ ঝুঁকছিল। (চীনের সঙ্গে সামরিক আঁতাত থাকা সত্ত্বেও ভারতে দৃঢ় শিল্প বনিয়াদ গড়ে তোলার কাজে পূর্ণ সাহায্য করছিল রাশিয়া।)

তার ওপর চীন আশা করছিল নেফা ও লদাকে সামরিক আক্রমণের ফলে ভারতের ঐক্যে ফাটল ধরবে। সে ভেবেছিল ম্যাক-মোহন লাইন অতিক্রম করার পরও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তাকে সমর্থন করবে। কিন্তু এখানেও সে সম্পূর্ণ হতাশ হল। চীনের আক্রমণের ফলে দেশের সব শক্তি ঐক্যবদ্ধ হল। ভারতের অতীত ইতিহাসে এই ঐক্যের নজির নেই। এমনকি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিও এস এ ডাঙ্গের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠল। (আগে এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি।) এই আকস্মিক নগ্ন আক্রমণের ফলে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্যে এবং অখন্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে যে-কোনো মূল্য দেওয়ার জন্যে মানসিক দিক দিয়ে রাতারাতি প্রস্তুত হয়ে উঠল দেশ।

চীন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্যে তৈরি ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার রসদ যোগানোর ঘাঁটি ছিল তিন-চার হাজার মাইল দূরে। তার রসদ মজুত ছিল তিব্বতে। (দু দেশের মধ্যবর্তী এই দেশটিকে চীন আগেই গ্রাস করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত তখন কোনো কথা বলে নি।) সে প্রস্তুত হয়েছিল বিদ্যুৎগতি একটা লড়াইয়ের জন্যে এবং তার নিজের পক্ষে সুবিধেজনক ও ভারতের পক্ষে অসুবিধেজনক একটা এলাকায় লড়াই করে দ্রুত জয়লাভের জন্যে। তিব্বতে যে রসদ চীন মজুত করেছিল তাতে বেশি দিন কাজ চলত না। সুতরাং যুদ্ধ যদি আরো বেশিদিন চলত তবে ভারতকে শেষ পর্যন্ত আরো সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে হত, কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে ঘটত ঠিক তার বিপরীত, কারণ তাকে ঐ দীর্ঘ ও কঠিন পার্বত্য এলাকা পেরিয়ে সব রসদ আনতে হত।

ভারত তৈরী ছিল না

ভারত এই আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিল না। রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশের দাবি ভারত বরাবর সমর্থন করেছে। সেই বন্ধু দেশকে চীন মণ্ডলের প্রতিদানে এমন অমঙ্গল দেবে তা ভারত ভাবতে পারে নি। তার ওপর, রণাঙ্গন ছিল ভারতের প্রতিকূল, নেফার মতো উচ্চতায় যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যরা অভ্যস্ত ছিল না। (লদাকে এ ব্যাপার ঘটে নি। সেখানে ভারতীয় সৈন্যরা নিজেদের জায়গা থেকে টলে নি এবং ভালোভাবেই লড়াই করেছিল, কারণ অনেক উঁচু এলাকায় লড়াই করার অভ্যেস ছিল তাদের।) ভারতীয় সৈন্যরা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ছাড়াই লড়াই করেছিল, ওদিকে চীনাদের হাতে ছিল স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ সবরকমের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। সবচেয়ে বড় কথা, চীন যোগা-যোগের একটা সহজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং গোপনে তৈরি হচ্ছিল আক্রমণ করার জন্যে। কিন্তু শান্তিপ্রিয় ভারত সবেমাত্র নেফায় সীমান্ত সড়ক তৈরি করতে শুরু করেছিল। লদাকে পুরোদস্তুর আক্রমণের তিন বছর আগে চীনারা যে হামলা চালায় তার তিক্ত অভিজ্ঞতার পরই ভারত এই কাজ শুরু করে। ভারতের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজের সীমান্ত রক্ষা করা এবং চীনা অনু-প্রবেশ প্রতিহত করা। ঐ ভাষাকারের মতে, নেফা সীমান্তে ভারতের উপর্যুপরি বিপ-র্যয়ের মূলে ছিল এইসব কারণ।

অতঃপর চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণের প্রস্তাবের উল্লেখ করেন ঐ ভাষাকার। তাঁর মতে ভারত স্পষ্টতই এতে আপত্তি করতে পারে না, কারণ চীন যতই সৈন্য অপসারণ করবে ভারতের পক্ষে ততই ভালো। সামরিক দিক দিয়েও এটা ভারতের পক্ষে সুবিধা-জনক। ঐ সময়টায় ভারত নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে এবং সৈন্যবাহিনীকে আধু-নিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে পারবে। বৃটেন, আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশ থেকে তখন ঐ অস্ত্রশস্ত্র আসছিল। তা করতে পারলে ভারতীয় এলাকায় চীনের নতুন আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে। চীনের যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা এবং লড়াই চালিয়ে যাওয়া ভারতের পক্ষে বোকামি হত, কারণ ভারত সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। অবশ্য ভারতীয় এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ তেমন হয়নি। (আসলে অবস্থাটা ছিল এইরকম : ভারত চীনের যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নি, কিন্তু কয়েকটি শর্তে আপত্তি করেছিল। যাই হোক, যুদ্ধবিরতি বা সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব কার্যকর করার ব্যাপারে কোনো কথা দেয় নি।)

এরপর, ঐ ভাষাকার একটা নতুন ঘটনার উল্লেখ করেন। সেটা হল কলম্বোয় ছ'টি জোটনিরপেক্ষ দেশের সম্মেলন আহ্বান। দু'টি দেশের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ ছয় দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন কলম্বো সম্মেলনে। সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ নিয়ে চীন ও ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিংহলের প্রধানমন্ত্রীর ওপর। (কলম্বো সম্মেলন এবং শ্রীমতী বন্দর-নায়কের আসন্ন দিল্লি আগমনের সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ফলাও করে।)

তেসরা জানুয়ারি স্থল বাহিনীর নতুন অধ্যক্ষ জেনারেল জে এন চৌধুরী রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রায় সকাল দশটা বাজে। দেখলাম, পুরো সামরিক পোশাকে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকছেন। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকলাম তাঁদের কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে। জেনারেল চৌধুরী জানালেন হিমালয়ের সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক সফর করে সবে ফিরছি। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আমি খুশি। সব কিছু ঢেলে সাজানো হচ্ছে। একজন দক্ষ মানুষের হাতে যে দেশ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তারপর তিনি বাঙালির ছেলেদের কিভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানে আকৃষ্ট করা যায় সেই আলোচনা শুরু করলেন। নেফা সীমান্তে বাঙালি সৈন্যেরা বীরের মতো লড়াই করেছে বলেই এই কথা উঠে-ছিল। জেনারেল চৌধুরীর মতে, বাঙালির ছেলেরা যে শুধু ভালো সৈনাই তাই নয়, তারা খুব দক্ষ কারিগরী কর্মীও হয়ে থাকে। পরে অর্থমন্ত্রী শংকরদাস ব্যানার্জিকে ডাকা হল আলোচনায় যোগ দিতে। ঠিক হল, এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাচার্যদের কাছে চিঠি লেখা হবে স্থল বাহিনীতে কাজের সুযোগের কথা তারা ছাত্রদের কাছে বুঝিয়ে বলবেন।

চীনারা যে তিব্বতের বিভিন্ন এলাকায় সৈন্য সমাবেশ করেছে, এ খবরের সত্যতা সমর্থন করলেন নেহরু পরদিন কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে। তুইলিং থেকে এই সৈন্য সমাবেশ দেখা যাচ্ছিল। তুইলিংই ছিল ভারতের সবচেয়ে অগ্রবর্তী ঘাঁটি যেখানে অসামরিক প্রশাসন আবার চালু হয়েছিল এবং শত্রুপক্ষের অগ্রসর হওয়ার সব চেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণ সাহসের সঙ্গে লড়াই করছিল।

এদিকে কলকাতার অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছিল। পরিখা খনন করা হচ্ছিল, বিমান আক্রমণের সাইরেনের

মহড়া দেওয়া হচ্ছিল এবং নিষ্প্রদীপও পালন করা হচ্ছিল। ৫ জানুয়ারি নেহরু পশ্চিমবঙ্গে এই সব আত্মরক্ষার আয়োজনের নিন্দা করলেন। বললেন, এর বদলে আমাদের সামরিক প্রয়াস জোরদার করা উচিত এবং দেশকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করলেন, পরিখা খননের কাজ পরিত্যক্ত হল। অবশ্য অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে কয়েকটি ব্যাপারের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন। মুখ্যমন্ত্রী যে বিব্রত হয়েছিলেন তা বোঝাই যাচ্ছিল।

১০ জানুয়ারি কলকাতার বিশিষ্ট অতিথিদের তালিকায় ছিলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের নতুন মন্ত্রী ওয়াই বি চ্যাবন। উত্তরবঙ্গে পরিদর্শনের কাজ সেরে কলকাতায় ফিরেছিলেন জেনারেল চৌধুরী। চবন কলকাতার অস্ত্রশস্ত্রের কারখানাগুলি দেখলেন। তিনি ঘোষণা করলেন সরকারের কর্মসূচীর মধ্যে আছে বর্তমান অস্ত্র উৎপাদন কারখানাগুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম উৎপাদনের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা, বিদেশ থেকে দীর্ঘমেয়াদী সামরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা এবং খুব উঁচু এলাকার যুদ্ধ কৌশলে বহু সংখ্যক ভারতীয় অফিসারকে রপ্ত করে তোলা।

মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গেলেন। তারপর রাজ্যপালকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে। জওয়ানদের কল্যাণ কাজে নিযুক্ত কিছু নারী কর্মীর সঙ্গে তাঁরা তিনজনে দেখা করেন। রাজভবনে একটি জওয়ান কেন্দ্র খোলা হয়েছিল তখন।

এর আগের দিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী ঘোষণা করলেন সোনা নিয়ন্ত্রণ বিধি। এর ফলে গয়না ছাড়া অন্য কোনো আকারে অঘোষিত সোনা রাখা বেআইনী হল। এই বিধি চালু হওয়ায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল কলকাতার সোনার বাজার। এখানেই সোনা বেচাকেনা হয় সবচেয়ে বেশি। সীমান্ত রাজ্য বলে পশ্চিম বাংলা অনেকদিন ধরেই চোরাচালানকারীদের একটা বড় ঘাঁটি। বোম্বাইয়ের মতো কলকাতাতেও দুর্নীতি-গ্রস্ত আমলা আর দুষ্ট ব্যবসায়ীদের বেআইনী কাজকারবারের সূত্র হল সোনা আর গয়না। নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হওয়ার পর অবশ্য সোনার কারবারে সাময়িকভাবে দেখা দিল মন্দা।

কলম্বো সম্মেলনের মুখ্য প্রতিনিধি হিসেবে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক পিকিং থেকে দিল্লি এলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে তার বেশ কয়েকবার আলোচনা হল।

পিকিংয়ে ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় দূত পি কে ব্যানার্জি চীনের রাজধানী থেকে দিল্লি এলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইয়ের বিশেষ বার্তা নিয়ে। ঘানা এবং সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধিরাও পরে বৈঠকে যোগ দিলেন। দিল্লির এই আলাপ আলোচনা নিয়ে কলকাতা দুটি প্রধান দৈনিক যে প্রবন্ধ লেখে তাতে নেহরু বিরক্ত হন। ফেব্রুয়ারির ২ তারিখে নেহরু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে এই চিঠি লেখেন।

নয়াদিল্লি
২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩

প্রিয় প্রফুল্ল সেন,

কলকাতার সংবাদপত্রে কোনো কোনো প্রবন্ধ পড়ে আমি কিছুটা দুঃখ পেয়েছি। লোকসভায় সম্প্রতিক বিতর্কে আমাকে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করতে হয় বাধ্য হয়ে। ঐ প্রবন্ধে শ্রীমতী বন্দরনায়ক সম্পর্কে অত্যন্ত অশোভন মন্তব্য করা হয়েছিল। তার পরে আমি অমৃতবাজার পত্রিকাতেও কয়েকটি প্রবন্ধ দেখেছি। এইসব রচনা পড়ে আমি ব্যথিত, বিস্মিত। মতপার্থক্য নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু কিছুটা শোভনতা ও শালীনতা তো বজায় রাখতেই হবে, বিশেষ করে অপর দেশ সম্পর্কে। যদি ঐসব রচনায় নিছক ক্রোধ আর ক্ষোভের বদলে কিছুটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যেত তবে আরো ভালো হত। জাতি হিসেবে আশা করি আমরা পরিণতবুদ্ধি, শিশুসুলভ আচরণ আমাদের শোভা পায় না।

আমি আপনাকে শুধু আমার মতামত জানালাম। আমি বলছি না যে আপনি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিন, অবশ্য আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তা হলে অন্য কথা।

আপনাদের
জওহরলাল নেহরু

মুখ্যমন্ত্রী ডেকে পাঠালেন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক অশোক সরকারকে। তাঁর স্বাভাবিক নম্র অথচ দৃঢ় ভাষায় অশোকবাবুকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন ভবিষ্যতে এমন ভুল যেন আর না হয়। তারপর নেহরুকে লিখলেন।

কলকাতা
১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আপনার ২ ফেব্রুয়ারির চিঠি পেয়েছি। আমি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক সরকারকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তাঁকে আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি যে, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে যে প্রবন্ধমালা বেরিয়েছে, বিশেষ করে ১৩ জানুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকায় আপনার ও সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েকের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে আমার তা মোটেই পছন্দ হয় নি। তাঁর কাগজে এই ধরনের মতামত প্রকাশে আমার ক্ষোভের কথা তাঁকে জানিয়েছি।

শিলং থেকে ফিরে (সেখানে পূর্বাঞ্চল পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলাম) গতকাল শাস্ত্রীজী আর আমি আবার শ্রীঅশোক সরকারকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি যে পথ অনুসরণ করছেন তা পরিত্যাগ করতে বলেছি। তিনি পথ বদল করতে রাজি হয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁর কাগজে ঐ ধরনের লেখা আর বেরোবে না।

এই প্রসঙ্গে জানাই, অমৃতবাজার পত্রিকা এবং তার বাংলা সহযোগী যুগান্তর

আপনার মূল নীতির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।

শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনাদের
প্রফুল্লচন্দ্র সেন

ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাতে বাড়তি রসদ সংগ্রহের জন্যে তাঁর সরকারকে নতুন কর বসাতে হবে। তিনি সদস্যদের মনে করিয়ে দিলেন যে, বিপদ-সংকুল সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, সামনে আমাদের জবরদস্ত শত্রু। সাহস আর সহিষ্ণুতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করতে হবে। তিনি জানালেন, জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে পশ্চিমবঙ্গ দিয়েছে নগদ সোয়া চার কোটি টাকা এবং দেড় লাখ গ্রাম সোনা। খাদ্য প্রসঙ্গে তিনি জানালেন। গত বছরের তুলনায় ঘাটতি চার লাখ টন, তবে খাদ্য প্রসঙ্গে চিন্তার কোন কারণ নেই।

পরের দিন মুখ্যমন্ত্রীর এক পুরোনো বন্ধু বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মারা গেলেন। (কংগ্রেসের চীফ হুইফ হিসেবে) ডঃ রায়ের মন্ত্রিসভা ভাঙার চেষ্টায় যেসব আক্রমণ এসেছিল তা ঠেকাতে তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এবিষয়ে পূর্বতন চীফ হুইপ অমর ঘোষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল। অমরবাবু মন্ত্রিসভা ভাঙার ব্যাপারে কলকাঠি নেড়েছিলেন (প্রথমে প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা, পরে ১৯৪৮ সালে ডঃ রায়ের মন্ত্রিসভা ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টা)।

২০ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী শঙ্করদাস ব্যানার্জি পেশ করলেন তার প্রথম ঘাটতি বাজেট। ১৯৬৩-৬৪ সালের হিসেবে দেখা গেল ঘাটতির অঙ্ক ৯ কোটি ২২ লাখ টাকা। তৃতীয় অর্থ কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশের বিশদ বিশ্লেষণ করে অর্থমন্ত্রী বললেন, পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশের স্বাধনতার মাশুল দিচ্ছে। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ যেসব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, অর্থ কমিশন সেগুলো বিবেচনা করে দেখেন নি।

সেই সময় চালের দর কতো ছিল তা জানতে পাঠকদের কৌতূহল হতে পারে। ২১ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী বিধান পরিষদে যে বিবৃতি দেন তা থেকে এই তথ্য জানা যায়। তিনি বলেন, চালের দর অস্বাভাবিক রকমের চড়া। এই অস্বাভাবিক রকমের চড়া দরটা কী? মন প্রতি ২৫ টাকা ৬০ পয়সা। আগের বছর ঐ সময়ে ছিল ২০ টাকা ৪০ পয়সা।

রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর গ্রহনের পর রাজেন্দ্রপ্রসাদ থাকতেন পাটনার কাছে সদাকত আশ্রমে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তারই হাতে গড়া এই আশ্রম। ২৮ ফেব্রুয়ারি রাত সোয়া দশটায় তাঁর মৃত্যু হল। দেশের সব প্রান্তের নেতারা এলেন তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার আরো তিন সদস্য এবং অতুল্য ঘোষ। পরের দিন বিশেষভাবে ভাড়া করা ডাকোটা বিমানে আমরা পাটনা গেলাম। গঙ্গার তীরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সম্পন্ন হল রাজেন্দ্র প্রসাদের শেষ কৃত্য। দিল্লি থেকে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন। ডঃ প্রসাদের অন্তিম যাত্রায় যোগ দিয়েছিল দু লাখ লোক।

ভুট্টোকে প্রথম দেখলাম

মার্চের ১২ তারিখ থেকে কলকাতা হয়ে উঠল কূটনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্র-স্থল। কাশ্মীর আর অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে চতুর্থ দফা বৈঠক বসল রাজভবনে। পাক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে এসেছিলেন বিদেশ মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো। রেল মন্ত্রী স্বর্ণ সিং ছিলেন ভারতীয় দলের নেতা। মার্কিন রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ এবং বৃটিশ হাই-কমিশনার স্যার পল গোর-বুথও এসেছিলেন আলোচনায় জট ছাড়ানোর কাজে সাহায্য করতে। বৈঠকে অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো ফয়সালায় পৌছানো গেল না। ঠিক হল, দুই মন্ত্রী আবার বৈঠকে বসবেন করাচীতে। ভুট্টো যেদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখনই তাঁকে প্রথম দেখলাম। যেটা আমার চোখে লাগল তা হল, বেশভূষা, চালচলন, চেহারায় সনাতন মুসলমানের সঙ্গে তাঁর অনেক তফাৎ। আমার সুরাবর্দী সাহেবের কথা মনে পড়ল তাঁকে দেখে। ভুট্টো হলেন পাকা ইউরোপীয় কায়দার বুদ্ধিজীবী।

ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী বিরোধী দলের যেসব সদস্যকে (সি পি আইয়ের চীন ঘেষা অংশকে) গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের সম্পর্কে সরকার কী মনোভাব গ্রহণ করবেন, মুখ্যমন্ত্রী তা জানালেন ২ এপ্রিল এইসব আটক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক বন্দী নয়, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নয় বরং নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, গণতান্ত্রিক এক আন্দোলনের জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে ডাঃ রায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে বিবৃতি দানকালে মুখ্যমন্ত্রী এই কথা জানান।

ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৩১ জনকে। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন এম এল এ এবং ৪ জন এম এল সি সহ ৮৭ জনকে প্রথম শ্রেণীতে এবং ৪৪ জনকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখা হয়েছিল। এইসব আটক ব্যক্তি দেশপ্রেমিক নয়। মুখ্য-মন্ত্রী জানালেন, কারাগারের সাধারণ দণ্ডিত আসামীরা পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ করতে রাজি হচ্ছে না।

আগেই বলেছি, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম বছরে প্রফুল্লবাবুর ভাগ্যটা ছিল ভালো। নানা ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া গেল, নেফায় চীনের আক্রমণের ফলে দেশের দক্ষতম মুখ্যমন্ত্রীদের অন্যতম হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তিনি সেই সময়ে যেভাবে রাজ্য পরিচালনা করে-ছিলেন তাতে কম্যুনিস্টদের প্রবল প্রভাবের মধ্যেও জেগেছিল দেশপ্রেমের মনোভাব। চীনের আক্রমণের ফলে তার প্রধান রাজ-নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ফলে তাঁর পথ হয়ে গিয়েছিল পরিষ্কার। ৮ এপ্রিল রাজ্য বিধানসভার পাঁচটি উপনির্বাচনের ফল বেরোলে দেখা গেল পাঁচটি আসনই পেয়েছে কংগ্রেস। তার ওপর চারটিতে কংগ্রেস প্রার্থীরা ভোট পেয়েছে আগের নির্বাচনের তুলনায় বেশি। সেটা ছিল প্রফুল্ল সেনের একটা বৃহৎ সাফল্যের দিন।

রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কংগ্রেস সংগঠন যেভাবে কাজ চাল-চ্ছিলেন তাতে যে প্রধানমন্ত্রীর আস্থা ক্রমশই বাড়ছিল তার প্রমাণ, রাজ্য সরকার ও দলের অনুরোধে তিনি বেশ কয়েকবার পশ্চিমবঙ্গে এলেন এবং ২৮ এপ্রিল দীঘায় প্রদেশ কমিটির রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করতে সম্মত হলেন। কোনো রাজ্য সফরে আসতে প্রধানমন্ত্রীকে রাজি করানো সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে মোটেই সহজ কাজ নয়। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর থেকে এই ধরনের সফরের দুটো কাজ হত : রাজনৈতিক দিক তো একটা ছিলই, তা ছাড়াও কয়েক বছরের নীরব সাধনায় যেসব প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে সেগুলির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হত। আমার মনে হয়, প্রফুল্ল সেনের আমলে প্রধানমন্ত্রীর এইসব সফর হত রাজনৈতিক কারণেই, শিল্পপ্রসার বা সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারী কীর্তিকে তুলে ধরার জন্যে অতোটা নয়। তার কারণও দুর্বোধ্য নয়।

ডঃ রায়ের মতো খুব কম মুখ্যমন্ত্রীই কর্মব্যস্ততার মধ্যে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করার সময় পেতেন। ডঃ রায়ের কাছে অবশ্য দেশ গঠনের কাজ ছিল সব কিছু।

মেদিনীপুরে জেলায় সমুদ্রের ধারে ছোট শহর দীঘা। ডঃ রায়ই এর সৃষ্টিকর্তা। কয়েকশ মানুষের বাস সেখানে। কিন্তু নেহরুর বক্তৃতা শোনার জন্য সেখানেই জড় হল হাজার হাজার মানুষ। নেহরুর সঙ্গে এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। চীন সম্পর্কেই বেশি কথা বলেছিলেন নেহরু। কলম্বো প্রস্তাব ভারত মেনে নিয়েছে পুরোপুরি, চীন মানে নি। অবশ্য কলম্বো প্রস্তাবে ভারতের সব দাবি মেটে নি। চীন অথবা অন্য যে কোনো দেশের মোকাবিলা করতে হলে ভারতকে শারীরিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে হবে। অনেক দেশই ভারতের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন, কিন্তু ভারত যদি নিজের সর্বশক্তির সাহায্যে জোরালো উদ্যোগ না চালায় তব

ঐসব দেশের ও সাহায্য করার ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দেবে। দীঘা থেকে প্রধানমন্ত্রী গেলেন কাঁথি। সেখানেও ভাষণ দিলেন, এক বিরাট জনসভায়।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে মন্ত্রিসভার সদস্যেরা গেলেন দার্জিলিং। দার্জিলিং আর কালিম্পং-এ বসল আম দরবার। গোরখা লীগে, দার্জিলিং পৌরসভা এবং ভারতীয় চা সমিতির প্রতিনিধিরা এসে মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। এটা ছিল একটা নতুন ঘটনা। এর ফলে অবহেলিত পাহাড়ী মানুষদের মনে কিছু আশা জাগল। কালিম্পং-এও হল এর পুনরাবৃত্তি।

জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে হল চালের ব্যাপারে। ওড়িশা সরকার হঠাৎ নীতি বদল করাতেই এই উদ্বেগ দেখা দিল। বিজু পট্টনায়ক তখন ওড়িশার মুখ্য-মন্ত্রী তিনি ঘোষণা করলেন ওড়িশা আর পশ্চিমবঙ্গে চাল পাঠাবে না। এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ভান্ডার থেকে পশ্চিমবঙ্গ যে চাল পেত তা আসত ওড়িশা থেকে। ওড়িশা ছিল চালের দিক থেকে উদ্বৃত্ত রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ আর ওড়িশা নিয়ে ১৯৬০ সাল থেকেই চাল ছিল একটি সংযুক্ত খাদ্য অঞ্চল। প্রফুল্ল সেনের সেই সময় দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল দুটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য। একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের বৈঠক অপরটি হিমালয়ান মাউন্টেইনারিং ইনস্টিটিউটের বৈঠক। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। ওড়িশা একতরফাভাবে সংযুক্ত খাদ্য অঞ্চল ভেঙে দেওয়ায় সিদ্ধান্ত করায় যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা সমাধানের জন্যে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রী ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিজ নিজ বক্তব্য জানাবার জন্য তিনি দুই মুখ্যমন্ত্রীকেই আমন্ত্রণ জানালেন। সংকট মোচনের জন্যেই এই অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওড়িশাতেও তখন প্রচন্ড খরা চলছিল। ওড়িশা থেকে চাল পাঠানো বন্ধের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কোনো হস্তক্ষেপ করলেন না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে বিশ হাজার টন চাল পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রফুল্ল সেন নেহরুকে জানালেন, ঐ বছর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ঘাটতির অঙ্ক ১৮ লাখ টন। ৭ জুন কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে আশ্বাস দেওয়া হল যে, সমগ্র ঘাটতি পুষিয়ে যাওয়ার মতো চাল যোগান দেওয়া হবে, দরকার হলে আরো বেশিও দেওয়া হতে পারে, কেন্দ্রের হাতে আট লাখ টন চাল মজুত আছে। ঐভাবেই আপাতত সমস্যার সমাধান হল।

কলকাতায় মার্কিন চাল

এই সময়ে আরো একটা ঘটনা ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিন চাল আমদানি করতেন থলেয় ভর্তি করে। মে মাসের শেষে একটি মার্কিন মালবাহী জাহাজ তিন হাজার টন খোলা চাল নিয়ে কলকাতা বন্দরে হাজির হল। আসার পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে পড়ে এই জাহাজটি এত প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় এই শতাব্দীতে কমই হয়েছে। এই ঝড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে ষোল হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। মার্কিন চাল এসে পড়ায় পূর্ব ভারতের বিভিন্ন বাজারে দামের উর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়। দিল্লি থেকে কলকাতায় ছুটে আসেন বিশেষজ্ঞরা এবং রাসায়নিক পরীক্ষার পর ঘোষণা করেন যে এই চাল মানুষের খাওয়ার উপযোগী।

সিরিমাভো বন্দরনায়েক

১ জুলাই ডঃ রায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় এলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। উত্তর পূর্ব কলকাতায় বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ছিল তার কর্মসূচীর অঙ্গ। সাত মিনিটের বক্তৃতায় তিনি শিশুদের সমস্যার কথা বললেন, শ্রদ্ধা জানালেন ডঃ রায়ের স্মৃতির প্রতি। রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু, মহা-রাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ার এবং মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ঐ অনুষ্ঠানে। ডঃ রায়ের বাড়ির সামনে পার্কে অনুষ্ঠিত তাঁর ৮২তম জন্ম-দিন ও প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রার্থনা সভায় বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। ডঃ রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটির সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ ঘোষণা করলেন যে, ৬০ লাখ টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং তা জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেটে লগ্নী করা হয়েছে।

ভুট্টো

ঐদিন নেহরু ভারতীয় চিন্তাবিদ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিলেন। শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। বিনয় সরকার নামে এক তরুণ বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে ডঃ রায়ের সঙ্গে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও উপাচার্যদের সঙ্গেও তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল। এই সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহী। নেহরু তাঁর ভাষণে কয়েকটি মৌল সমস্যার কথা তুললেন। পশ্চিমী বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের সমন্বয় যে সমাজ সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করবে এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে না এমন সমাজ গঠন এবং সেই সমাজের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সম্পর্কের প্রশ্ন তিনি তুললেন। বললেন, নতুন পৃথিবী আরো নতুন হয়ে উঠছে, তার সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চলতে হবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে আমাদের মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমাদের সংস্কৃতিকে নষ্ট করলে চলবে না। চিন্তা করার রীতি আমরা বিঘ্নিত হচ্ছি। চিন্তা হচ্ছে নীরব সাধনা। অনু-সন্ধানের মনোভাব থেকেই এর সূচনা। শুধু কিছু শব্দ আর শ্লোকের পুনরাবৃত্তি মানেই চিন্তা করা নয়।

পরের দিন, অর্থাৎ ২ জুলাই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিরাট সমাবেশে নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে নেহরু ভারতীয় কম্যু-নিস্টদের একাংশের নিন্দে করলেন, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্টদের, তাদের নেপথ্য কার্যকলাপের জন্যে। এইসব কাজে শত্রুর (চীনের) সহায়তা হচ্ছে আর দেশের ক্ষতি হচ্ছে। হিন্দী চীনা ভাই ভাই শ্লোগান এক সময় উঠেছিল গোটা দেশ জুড়ে। তার কথা উল্লেখ করে প্রধান-মন্ত্রী বললেন, 'আমরা যদি এদের (চীনা-দের) গালমন্দ করতাম তবে আমাদের শক্তি বাড়ত না। ভারত যুদ্ধ চায় নি, কিন্তু ভারতের চাওয়ার ওপর এই যুদ্ধ নির্ভর করে নি। ভারত যদি চীনের হুমকির সামনে নতজানু হত তবে সে তার স্বাধীনতা হারাত। এই কঠোর বিশ্বে সামরিক প্রস্তুতি একটা সময়সাপেক্ষ ও কঠিন ব্যাপার। এই প্রস্তুতি বজায় রাখার জন্যে, সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে তৈরী করে রাখার জন্যে পাঁচসালা যোজনা অবশ্যই বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। তিনি আরো বললেন, ভারতে বিচ্ছেদ আর বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে চীন যে চেষ্টা করেছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারত চীনের আক্রমণের মোকাবিলা করেছে এবং চীনকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। এটা কল্পনা করে

করা হয় নি যদিও কেউ কেউ সেইভাবেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, চীন নিজের স্বার্থেই এই কাজ করেছে।'

জুলাইয়ের মাঝামাঝি বিধানসভার যে শারদ অধিবেশন শুরু হল তাতে যেন ঝড় বয়ে গেল। কলকাতা পৌরসভা সংশোধনী বিল নিয়ে প্রথম তুফান ওঠে। এই বিলে পৌর কমিশনারের ক্ষমতা খর্ব করতে চাওয়া হয়েছিল। তারপর হল খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বাগযুদ্ধ। কথার লড়াই থেকে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। সূত্রপাত মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্য নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, পুরুলিয়ার অনাহারে মৃত্যু নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হেমন্তকুমার বসু যে বিবৃতি দেন তা সঠিক বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে অবস্থা কঠিন, কিন্তু বলেন দাম বাড়ার জন্যে ব্যবসায়ীরা দায়ী নয়, দায়ী হল উদ্বৃত্ত চাষী। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তিত নীতির জন্যে রাজ্য সরকার মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষা বিধিও প্রয়োগ করতে পারছেন না। গোলমালে বিধানসভার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সি পি আই ছাড়া অন্যান্য সদস্যেরা বিধানসভায় তিনদিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। সি পি আই সদস্যরাও পরে যোগ দিলেন এই অনশনে। সরকারের খাদ্য নীতির আমূল পরিবর্তনের দাবিতেই এই অনশন। এর পর বিরোধী পক্ষ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটীশ দিলেন।

পরের দিনও বিতর্কের সময় যথেষ্ট উত্তাপ দেখা দিল। তার মূলে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বক্তৃতা। বিরোধী পক্ষে বসেও তিনি সমালোচনা করলেন অনশন ধর্মঘটের। তিনি বললেন, অনশন ধর্মঘট এক সময় ছিল একটা মহৎ ব্যাপার, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা তামাসা। বিরোধী পক্ষ চালের মণ ২২ টাকায় বেঁধে দেওয়ার যে প্রস্তাব করেছেন তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তা করা সম্ভব যদি কেউ মনে করেন তবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। 'হাজারটা প্রফুল্ল সেন এলেও তা করতে পারবে না।' খাদ্য ঘাটতির কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করলেন মুদ্রাস্ফীতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পাটের চাষের এলাকার প্রসার, উন্নত ধরনের বীজ ও সার যোগাতে এবং চাষের আধুনিক পদ্ধতি চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার কথা। বিরোধী আসনে বসে তার এই ধরনের বক্তৃতায় ক্ষোভের সৃষ্টি হল। বিরোধীরা তাঁকে বললেন, দিক বদল করে কংগ্রেসের আসনে বসতে। আগেরকার কম্যুনিস্ট বন্ধুদের সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন বলেই কি সিদ্ধার্থবাবু এমন মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন? সন্দেহ নেই, চীনের আক্রমণের পর কম্যুনিস্ট পার্টির আচরণ তাঁদের বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তিন দিন বিতর্কের পর মুখ্যমন্ত্রী জানালেন সরকারের খাদ্য নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে তিনি বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে সম্মত হলেন।

অনাস্থা প্রস্তাব

২২ জুলাই এল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব। সরকার আর বিরোধী, দু' তরফ থেকেই শোনা গেল গরম বক্তৃতা। আমরা যাঁরা গ্যালারিতে উৎকর্ণ হয়ে বসেছিলাম তাঁরা জানতাম এই প্রস্তাবের পরিণতি কী হবে। আট ঘন্টা ধরে বিতর্ক চলল, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু বসে রইলেন অবিচলভাবে। অনাস্থা প্রস্তাব তিনটি অগ্রাহ্য হল শেষ পর্যন্ত। বিরোধী পক্ষের অভিযোগ ছিল মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারের চরম ব্যর্থতা, মেহনতী মানুষের দুরবস্থা, ক্রমবর্ধমান বেকারী এবং সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি নিয়ে। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুর জোরালো ভাষণের ফলে এইসব মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অভিযোগের জবাব দেওয়া অনেক সহজ হয়ে গেল। সেন মন্ত্রিসভার কীর্তি হিসেবে সিদ্ধার্থবাবু উল্লেখ করলেন পৌর নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং বিধানসভার ব্যয় মঞ্জুরি (এস্টিমেটস) কমিটি নিয়োগের কথা। তাঁর বক্তৃতার সময় কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট বিরোধী সদস্যরা প্রায়ই বাধা দিচ্ছিলেন। তাতে বিচলিত না হয়ে সিদ্ধার্থবাবু জোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি কম্যুনিস্টদের সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছেন, না কয়েকজন কম্যুনিস্ট সদস্য তাঁর সাহায্য নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন? ফরওয়ার্ড ব্লকে ও অন্যান্য অ-কম্যুনিস্ট সদস্যদের লক্ষ্য করে তিনি প্রশ্ন করলেন, ধরুন আপনাদের অনাস্থা প্রস্তাব পাস হল, তারপর আপনারা কি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সরকার গড়বেন? (এই প্রশ্নের কোনো জবাব মেলে নি।)

এর আগে জুলাইয়ের ৮ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত হয়েছিল কামরাজ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল, প্রবীণ মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুই প্রথম মন্ত্রিত্ব ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তাতে সম্মত হন নি। কারণ তা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে বলে কমিটি মনে করেন। নেহরুর ওপর অর্পিত হয় অন্যান্য মন্ত্রীদের পদত্যাগের প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব। ১০ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত।

কামরাজ পরিকল্পনার ঢেউ অনিবার্যভাবেই এসে পৌঁছলো বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে। শুরু হল জল্পনা। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল অন্যান্য রাজ্যের থেকে পৃথক। কংগ্রেস সংগঠন ও রাজ্যের প্রশাসনে কোনো উপদলীয় কোন্দল ছিল না, দুইয়ের মধ্যে ছিল সুসম্পর্ক। মুখ্যমন্ত্রী যে তাঁর বন্ধু অতুল্য ঘোষ এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে পরামর্শ করেই মন্ত্রিসভার রদবদল করবেন, একথা রাজনৈতিক মহল জানতেন, আমি তো জানতামই। তবে এ বিষয়ে অতুল্যবাবুর মন্তব্যই হবে প্রধান। কারণ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, যেগুলো একান্তভাবেই প্রশাসনের ব্যাপার সেখানেও সংগঠন ক্রমশ পা বাড়াচ্ছে। ডাঃ রায়ের আমলে কিন্তু এই ব্যাপার একেবারেই ঘটে নি।

উইলিয়াম কেরীর সমসাময়িক প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার গোলোকচন্দ্র

অমিতাভ ঘোষ

জাত্যাভিমানের বাধা সরিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে কোনো বিদেশী মানুষ যদি কচিৎ ঠাঁই পান তাহলে সেই বিরল সম্মান মানুষটির মহত্ত্বের কথাই ঘোষণা করে। উইলিয়াম কেরী এমনই একজন মানুষ। শুধু বিদেশী হিসাবেই নয় তাঁর প্রতি আমাদের বিরূপ হবার মতো কারণের ঘাটতি ছিল না। তিনি পরাধীন ভারতে বহিরাগত প্রভুর দেশের সাদা মানুষ, বিধর্মী এবং তাঁর আগমন ভারতবাসীকে খ্রেশ্চান বানাবার মতলবে। উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজনদের সমস্ত উদ্যমের মূল ধারা কিন্তু বাঙলার জল মাটি মানুষের মোহিনী মায়ায় ভুলেই হয়তো সম্পূর্ণ অভাবিত এক পথে প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁরা এসেছিলেন ধর্মপ্রচারক হিসাবে। ধর্মপ্রচারের কারণে তাঁদের প্রয়োজন পড়ল বহুল প্রচারের মাধ্যম। প্রচার মাধ্যমের দাবী অনুযায়ী প্রয়োজন হল লিপি সংস্কার এবং গড়ে তুলতে হল মুদ্রণ শিল্প। মুদ্রণ শিল্প দাবী করল হরফ, কাগজ ও যন্ত্র। কেরী ও তাঁর সতীর্থরা প্রত্যেকটি দাবীকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁদের প্রাণপাত শ্রম গড়ে তুলেছে বাঙলা ভাষা, সাহিত্য ও মুদ্রণ শিল্পের বনিয়াদ এবং তার আড়ালে কখন যে তাঁদের মিশনারী বিশেষণটা ফিকে হয়ে এসেছে তা বোধহয় তাঁরা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পারেননি।

কেরী সাহেবের নাম উচ্চারণ করা মাত্র দিগ্দর্শন, পঞ্চানন ও মনোহর কর্মকার, শ্রীরামপুর কলেজ ও ছাপাখানা ইত্যাদি অনেক গৌরবময় নাম ও অধ্যায় স্মরণে আসে। গোলোকচন্দ্রের নাম এই তালিকাভুক্ত হয়নি এখনো কিন্তু এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়দেরই একজন। কারণ তিনিই প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার। গোলোকচন্দ্রের কীর্তিকথা শোনাবার আগে মুখবন্ধস্বরূপ কেরী সাহেবের কাছ থেকে লাভ করা আরেকটি উপহারের কথা বলে নিতে হবে। রেভারেণ্ড সাহেবের অসংখ্য কীর্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতবর্ষে যন্ত্রযুগের সূচনার আদি লগ্নে একটি শক্তিচালিত আধুনিক কারখানা স্থাপন। শ্রীরামপুরে মূলত তাঁরই উদ্যোগে স্থাপিত কাগজের কলটি ভারতের মাটিতে প্রথম বাষ্পের ইঞ্জিন চালিত কারখানা। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনী কাব্যে দর্শনীয় হিসাবে এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন :

> 'সর্ব্ব অগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়,
> মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ-গ্রন্থচয়।
> কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার,
> জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধ প্রকার।'

শ্রীরামপুরের কাগজের কলের ধূম্রোদানব যন্ত্র ফোঁস ফোঁস শব্দে বাষ্পের নিঃশ্বাস ছেড়ে কলের চাকা ঘোরাবার আগেই অবশ্য ভারতে বাষ্পের ইঞ্জিনের আগমন ঘটেছে। ১৮০৭ সালে বোম্বাইয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির জাহাজঘাটায়, ১৮০৯ সালে সামরিক বিভাগে ও রাণীগঞ্জে কয়লার খনিতে বাষ্পের ইঞ্জিন ব্যবহার করার কথা জানা গেছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের নায়ক বাষ্পের ইঞ্জিন ভারতে পৌঁছে প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদনের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিল শ্রীরামপুরের এই কাগজ কলে। আজ থেকে একশো ষাট বছর আগে এই বাষ্পের ইঞ্জিনটি কাজ শুরু করে এবং ১৮৬৫ সাল অবধি এই কারখানাটি ছিল ভারতে কলে প্রস্তুত কাগজ উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্র।

শ্রীরামপুরে কাগজের কল স্থাপনার পিছনে ছিল বই ছাপার উপযোগী কাগজের অভাব। কেরী সাহেব প্রথমে তাঁর বাংলা টেস্টামেণ্ট এক ধরনের অমসৃণ ছিদ্রযুক্ত কাগজে ছাপতে বাধ্য হন। একে বলা হত পাটনা কাগজ। এরপর তিনি আমদানী-করা কাগজের ওপর ভরসা করেছিলেন কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে কাগজ আসতে অনেক সময় এত দেরী হত যে তার ফলে ছাপার কাজ বন্ধ হয়ে যেত। তাছাড়া সে কাগজের দামও ছিল আকাশছোঁয়া। ওদিকে দিশী কাগজ আবার ব্যবহারের অযোগ্য। এই কাগজে এত পোকা লাগত যে, অনেক সময় বই ছাপা শুরু করা ও শেষ হওয়ার মধ্যেই দেখা যেত প্রথম দিকে ছাপা কাগজগুলো পোকা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের এই কাগজের সমস্যা দূর করার প্রচেষ্টা থেকেই প্রথম মনুষ্যচালিত কাগজের কলটির জন্ম।
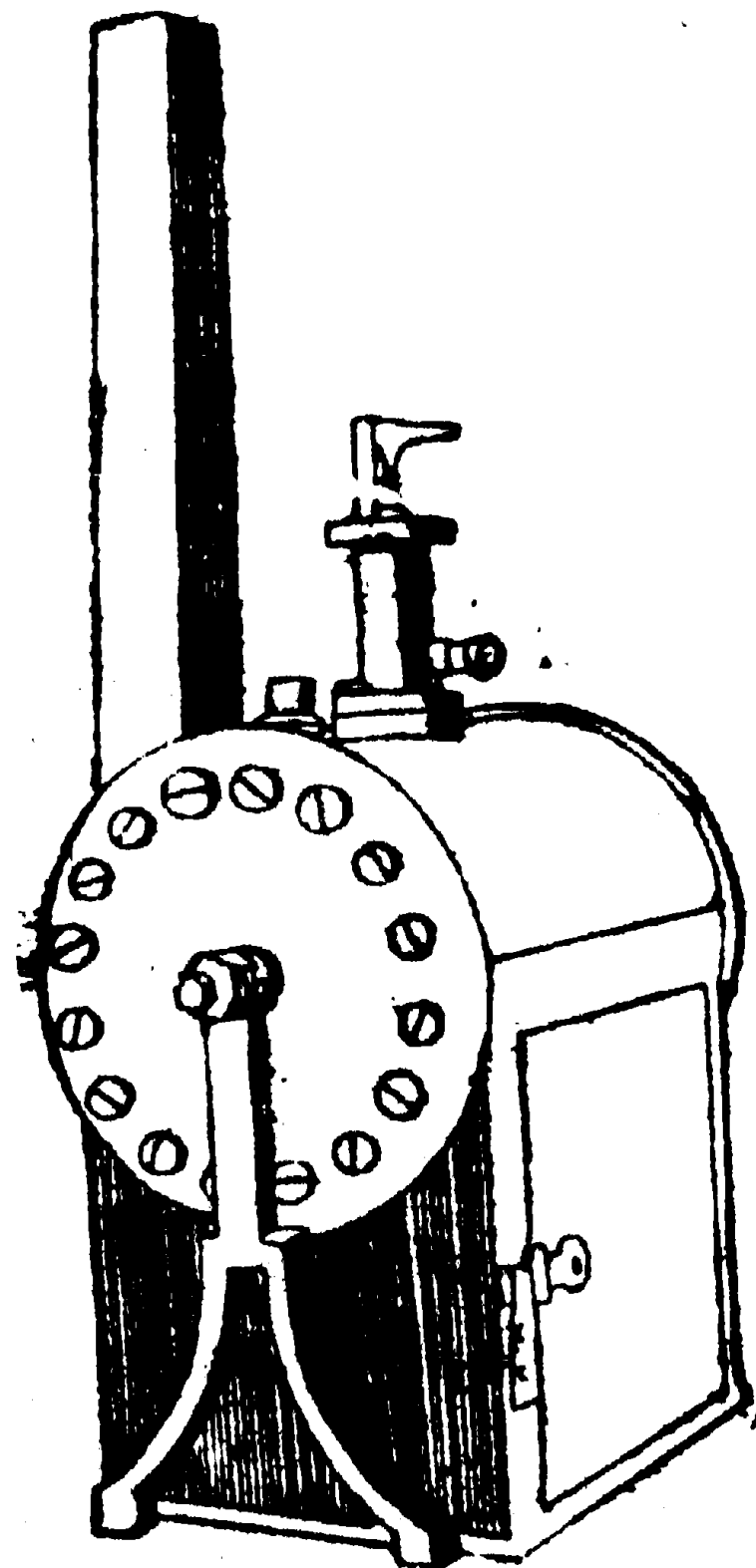
১৮০৪ সালে কেরীর সহযোগী উইলিয়াম ওয়ার্ড ইংল্যাণ্ডে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির কাছে একজন দক্ষ কর্মী পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন যাতে শ্রীরামপুরেই কাগজ তৈরি করা সম্ভব হয়। পরের বছর প্রয়োজনীয় জমি খরিদ করার পর কেরী কাগজের কলের লোহার যন্ত্রপাতি ও একটি মডেল চেয়ে পাঠান। কেরি লিখেছিলেন এই কাগজের কলে প্রস্তুত কাগজ তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করবেন এবং যা উদ্বৃত্ত থাকবে বিক্রি করবেন। সীমিতভাবে কাগজের উৎপাদন শুরু হতে আরো পাঁচ বছর লেগে যায় কিন্তু কারিগরী দক্ষতার অভাবে মিশনারীরা উচ্চমানের কাগজ তৈরি করতে পারেন না। পোকা ধরার সমস্যা না থাকলেও কাগজের রঙ এবং মান আশা পূরণ করেনি। এরপর ১৮১১ সালের জানুয়ারি মাসে আগেরটির চেয়ে বড় আরেকটি কাগজের কল বসাবার কাজ শুরু হয় এবং ওই বছরেই আগস্ট মাসে সে কাজ শেষ হয়। এটিকে শ্রীরামপুরের প্রথম সার্থক মনুষ্য-চালিত কাগজের কল বলা যেতে পারে। এরপর ১৮১২ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে আগত জন লসন ও উইলিয়াম জনস-এর পরামর্শে কাগজের মানেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়।

শ্রীরামপুরের পরবর্তী কাগজের কল তৈরি হয় ১৮১৪ সালে। ফোর্ট উইলিয়ামে নিযুক্ত এক বৃটিশ রেজিমেন্টের সুদক্ষ একজন কারিগরের (মিঃ রাইট) সাহায্যে নির্মিত এই নতুন কলটি আকারে আগেরটির চেয়েও বড় ছিল। এটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছিল দশ হাজার টাকা। শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ও হরফ ঢালাইয়ের কারখানা সমেত এই কাগজ কলটির অধ্যক্ষ ছিলেন কেরির সহযোগী উইলিয়াম ওয়ার্ড।

এই কাগজের কলে উদ্ভিদতন্তুর মণ্ড তৈরি করবার জন্য ঢেঁকির মতো এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হত—ট্রেড মিল। চল্লিশজন কর্মীর এক একটি দল পায়ে করে চাপ দিয়ে যন্ত্র চালাত। কিন্তু কাগজের কলে একটি দুর্ঘটনা মিশনারীদের অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দেয়। এক গ্রীষ্মের দুপুরে শ্রম-ক্লান্ত একটি কর্মী কলে কাজ করার সময় অপঘাতে প্রাণ হারান।

ভারতের নদীপথে তখনো বাষ্পের নৌকা দেখা না দিলেও (বাষ্পীয় ট্রেন তো নয়ই), ইংল্যাণ্ডে বাষ্পশক্তির ব্যবহার রীতিমতো চালু হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ঐতিহাসিক বাংলা পত্রিকা

শ্রীরামপুর কলেজের কেরী সংগ্রহালয়ে বয়লারের মডেল

'দিগ্দর্শন'-এর দ্বিতীয় সংখ্যাতেই (১৮১৮ সালে) বাষ্পচালিত নৌকা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি সেই বছরেই ভারতবর্ষের কয়লাখনি সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে পত্রিকাটিতে। একদিকে মানুষ-চালিত যন্ত্র ব্যবহারে দুর্ঘটনার আশংকা, অন্যদিকে তার বিকল্প হিসাবে বাষ্প-চালিত কলের ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিতি—এই দুইয়ের সমন্বয়ই নিশ্চয় কেরি ও ওয়ার্ডের সঙ্গে কলকাতার মিস্টার জোন্সের যোগাযোগ ঘটাটা অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। মিস্টার জোন্সই প্রথম ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে খনিগর্ভ থেকে কয়লা তুলেছিলেন। তার জন্য তিনি ইংল্যান্ড থেকে বাষ্পের কল-ও আনিয়েছিলেন। মিস্টার জোন্সের পরামর্শ মতে শ্রীরামপুরের কাগজের কল চালাবার জন্য এবার একটি বারো অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন বাষ্পের ইঞ্জিন আনানো হয়। অবশ্য বাষ্পের ইঞ্জিনটি আনার পিছনে র‍্যান্ডাল নামে এক ব্যক্তিরও কিছু অবদান থাকতে পারে কারণ ১৮১৭(?) সালে মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজ কল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের যে দলটি ইংল্যান্ড থেকে শ্রীরামপুরে আসেন তাঁদের মধ্যে র‍্যান্ডাল নামে এক ইঞ্জিনীয়ারের নাম দেখা যায়।

১৮২০ সালের ১৮ই জানুয়ারি উইলিয়াম কেরি তাঁর পুত্র জাবেজকে একটি চিঠিতে জানান, ইংল্যান্ড থেকে সদ্য একটি বাষ্পের ইঞ্জিন এসে পৌঁছেছে যার দাম একে স্থাপন করার ব্যয়সমেত কুড়ি হাজার টাকার কম হবে না।

এই ইঞ্জিনটি যখন শ্রীরামপুরে আসে সে সময় ওয়ার্ড ছিলেন ইংল্যান্ডে। ওয়ার্ডের অবর্তমানে ১৮১৮ সাল থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

শ্রীরামপুরে কাগজের কলের বাষ্পের ইঞ্জিনটি বোল্টনের থোয়েটস হিক অ্যান্ড রথওয়েলস কম্পানি তৈরি করেছিল। শ্রীরামপুর কলেজ ভবনে কেরী সংগ্রহশালায় রক্ষিত ইঞ্জিন প্রস্তুতকারকের নাম খোদাই করা আছে।

১৮২০ সালের ২৭শে মার্চ ইঞ্জিনটি চালু হয়। বয়লারের নিচে চুল্লীতে গনগনে আগুন জ্বলছে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বয়লারের মধ্যে জল ফুটে বাষ্প হয়ে সিলিন্ডারে আসছে। বাষ্পের ঠেলায় পিস্টন আর তার সঙ্গে লাগানো ডান্ডাটা ক্রমান্বয়ে নামা-ওঠা করছে আর বেশ কয়েকটা লোহার ডান্ডার (ক্র্যাঙ্ক, কানেকটিভ রড প্রভৃতি) এলোমেলো নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন বন করে ঘুরছে যন্ত্রের চাকা (ফ্লাই হুইল)। এই দৃশ্য দেখে সেকালের তাজ্জব দর্শক ইঞ্জিনটির নামকরণ করেছিল 'আগুনের কল'। শুধু যে ভারতীয়রাই এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখবার জন্য দলে দলে এসে জমা হত আর ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা ইঞ্জিন চালককে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলত তা নয়। বহু বিদেশী মানুষের কাছেও এ দৃশ্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন।

১৮২৪ সালের ২৭ মে ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত শ্রীরামপুর কলেজের

শ্রীরামপুর কলেজে কেরী সংগ্রহালয়ে বাষ্পের ইঞ্জিনের মডেল
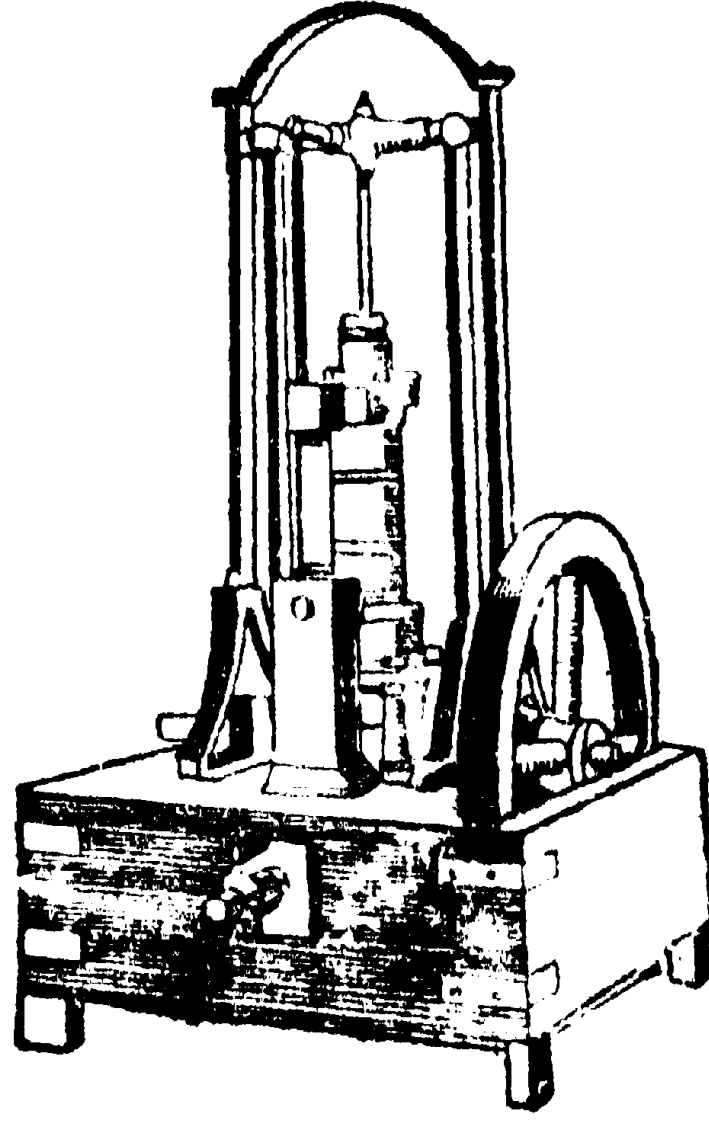
চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, 'বাষ্পের ইঞ্জিনটি চালু হবার পর চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু এখনো প্রতি সপ্তাহে ভারতীয়রা (নেটিভরা) এখানে এসে ভিড় জমায়। ইঞ্জিনটিকে নিরীক্ষণ করে। এমন কী নৌকারোহীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে যাবার পথে নৌকা ঘাটে বেঁধে নেমে আসে। বহুক্ষণ ধরে ঘুরে ফিরে পর্যবেক্ষণ করে। তাদের পূর্ব-পুরুষরাই শুধু যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী—তাদের এতদিনের এই বদ্ধমূল ধারণা যে ঠিক নয়, এটা তারা সব দেখে শুনে স্বীকার না-করে পারে না।'

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ভাষায়, এই ইঞ্জিনটি 'প্রথম বাষ্পচালিত নৌকা বা প্রথম রেল ইঞ্জিনের মতোই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল'। আগুনের কলটি 'দেবকুলের স্থপতি বিশ্বকর্মার কীর্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল।' (দা লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ কেরি, মার্শম্যান অ্যান্ড ওয়ার্ড)

এই বাষ্পের ইঞ্জিনটি কাগজের কলের পেষণযন্ত্র চালাবার কাজে ও কাগজ শোকাবার জন্য ব্যবহার করা হত। কেরি লিখে গেছেন, 'আমরা এখন যন্ত্রের সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করি। এর জন্য মন্ডটিকে প্রথমে তারের জালের ওপর দিয়ে আর তারপর কয়েকটি সিলিন্ডারের ওপর দিয়ে পাঠান হয়। এর মধ্যে শেষ সিলিন্ডারটিকে বাষ্প দিয়ে গরম করা হয়। তরলাবস্থা থেকে শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী হতে মিনিট দুয়েকের মতো সময় লাগে।'

১৮২০ সালের ২১শে এপ্রিল কেরি তাঁর পত্রে ফেলিকসকে লেখেন, কাগজের অভাবের জন্য আমাদের কাজ অনেক বাধা পেয়েছে এতদিন, কিন্তু এবার আমাদের বাষ্পের ইঞ্জিন চালু হয়েছে এবং কাগজেরও আর অভাব নেই।

শ্রীরামপুরের কাগজের কলটি ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করে এবং জানা যায় ১৮৪৫ সালে তিন তিনটি বাষ্পের ইঞ্জিন কল চালাবার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। তখন প্রতিদিন ডিমাই আকারের পঞ্চাশ রিম করে কাগজ উৎপন্ন হত। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত এই কাগজের কলটি ছিল ভারতের প্রধান কাগজ উৎপাদন কেন্দ্র।

কাগজের কলটি শেষ পর্যন্ত ১৮৬৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়। কলটি বন্ধ হয়ে যাবার পিছনে ছিল তদানীন্তন সেক্রেটারি অফ স্টেটস-এর একটি আদেশ : লেখা বা ছাপার যাবতীয় কাগজ ইংল্যান্ড থেকে ছাড়া কেনা চলবে না। এইভাবে স্থানীয় ও জাতীয় যন্ত্র উদ্যোগ এবং করদাতা জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বৃটিশ শক্তি তার সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছিল।

এরপর ১৮৬৭ সালে হাওড়া জেলার বালিতে স্থাপিত 'দি রয়্যাল পেপার মিল' কম্পানিতে শ্রীরামপুর কাগজের কলের যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার ৩৮ বছর পরে 'টিটাগড় পেপার মিলস' কর্তৃপক্ষ বালির পেপার মিলের স্বত্ব কিনে নেবার পর সেগুলি টিটাগড়ে নিয়ে আসা হয়। টিটাগড় পেপার মিল কম্পানির অধুনা অবসরপ্রাপ্ত শ্রী পি এন মজুমদারের কাছ থেকে শুনেছি, টিটাগড় পেপার মিলে বারো অশ্বশক্তির পুরনো ইঞ্জিনটি বর্তমানে নেই। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি এধরনের কোন ইঞ্জিন দেখেন নি কিন্তু পঁচাত্তর অশ্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি ইঞ্জিন বহুদিন আগে টিটাগড় পেপার মিলে আনা হয়েছিল বলে তাঁর মনে আছে। সন্ধান নিলে হয়তো মিল প্রাঙ্গণে এই ঐতিহাসিক ইঞ্জিনগুলির কিছু যন্ত্রাংশ এখনও পাওয়া যেতে পারে। সরকারী কারিগরী সংগ্রহশালাগুলির এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

পুরাবস্তু রসিকদের সৌভাগ্য যে

শ্রীরামপুরের একটি প্রাচীন মানচিত্র। উড়িয়া ও কামারপাড়ায়ই (নীচে বাম দিকে) সম্ভবত গোলোকচন্দ্রের নিবাস ছিল (কেরী গ্রন্থাগারের সৌজন্যে)

শ্রীরামপুর কলেজের কেরি সংগ্রহালয়ে বয়লার সমেত আদি বাষ্পের ইঞ্জিনটির একটি মডেল আছে। কেরি সংগ্রহালয় ও কেরি গ্রন্থাগারের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছেন যে এই মডেলটি শ্রীরামপুর কলেজের গবেষণাগারে বাষ্পের ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হত। সংগ্রহালয় স্থাপিত হবার পর এটিকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়। ইঞ্জিনের মডেলটির গায়ে এক জায়গায় 'জে বেকার'—এই নামটি দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটি মডেল নির্মাতা বা নির্মাণকারী কম্পানির নাম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে যোগ দেবার সময় ১৮২১ সালে জন ম্যাককে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য জেমস্ ডগলাস নামে এক ব্যক্তি পাঁচশ' পাউন্ড দান করেন। ওই বছর যে যন্ত্রাদি কেনা হয় তার তালিকাতেও একটি সক্রিয় বাষ্পের ইঞ্জিনের মডেলের উল্লেখ আছে—

> "An elegant working model of Watt's Steam Engine with apparatus to illustrate its theory".

একটা প্রশ্ন এই পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে: এই মডেলটিকে কোন্ যুক্তিতে আদি ইঞ্জিনটি অনুকরণে প্রস্তুত বলা হচ্ছে? তার কি কোন প্রমাণ আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের হদিশ না পেলেও ইঞ্জিন নির্মাণকারী থোয়েট্স্ হিক্ অ্যান্ড রথওয়েল্স কম্পানি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে কতকগুলি আকর্ষণীয় তথ্য সংগ্রহ করা গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের একজন প্রখ্যাত যন্ত্রবিদ ছিলেন জোসুয়া ফিল্ড। তিনি ১৮২১ সালে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করেন, কোথায় কোন্ পদ্ধতিতে কি কাজ হচ্ছে জানবার জন্য। তাঁর দিনলিপিতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সচিত্র লিখে রেখে গেছেন।

১৮২১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি বোল্টনে এলে থোয়েট্স্ হিক্ অ্যান্ড রথওয়েল্স্ কম্পানির যন্ত্রবিদ হিক্ তাঁকে তাঁদের ঢালাই ঘর, মেশিন ঘর ও বয়লার বিভাগ ঘুরিয়ে দেখান। জোসুয়া ফিল্ড লিখেছেন, এই কম্পানিতে তৈরি সব বয়লারই ছিল 'ওয়াগন'-ধাঁচের কিংবা গোলাকার। তাছাড়া বয়লারে জল সরবরাহের জন্য তাঁরা একটা বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। তাঁদের বয়লারের ওপর দিকে ঠিক সেফ্টি ভাল্ভের মাঝখানে জল-সরবরাহের কলটি থাকত, আর তার এক পাশে সংযুক্ত থাকত জলের নলটি। এই বৈশিষ্ট্য দুটি শ্রীরামপুরের বয়লারের মডেলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও জোসুয়া ফিল্ড ওই কম্পানির তৈরি যে ইঞ্জিনগুলো পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তার বর্ণনা থেকে জানা যায় ১২ অশ্ব ক্ষমতা পর্যন্ত সব ইঞ্জিনই চারটি স্তম্ভের মাথায় স্থাপিত হত এবং ইঞ্জিনের ক্র্যাংকটি একটি গর্তের মধ্যে ঘুরত। শ্রীরামপুরের মডেল ইঞ্জিনটির মধ্যেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। (নিউকোমেন সোসাইটি ট্র্যান্জাক্শান, খণ্ড ১৩, ১৯৩২-৩৩)

এই সাদৃশ্যগুলি মডেলটিকে পুরোপুরি সনাক্ত করছে বললে হয়তো বেশী দাবী করা হবে। তবে মডেলটির খাড়াভাবে স্থাপিত সিলিন্ডার, একটি ক্রশহেডের বদলে পিস্টন রডকে দুধারে নিয়ন্ত্রিত করা ও দুটি কানেক্টিভ রড মারফত পিস্টনের সরলরৈখিক ওঠা-নামাকে চক্রাকার গতিতে রূপান্তরিত করার রীতি যে খুবই প্রাচীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এই অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হলে অবশ্য লন্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার, কারণ থোয়েট্স্ হিক্ অ্যান্ড রথওয়েল্স্ কম্পানির মিস্টার হিক-এর আঁকা সেই আমলের ইঞ্জিনের কয়েকটি নক্সা এখানে সংরক্ষিত আছে। এটা আশা করা খুব অবাস্তব নয় যে এই নক্সাগুলির মধ্যে ঊনিশ শতকের প্রথম পর্বে তাঁদের তৈরি বারো অশ্বশক্তির কোন-না-কোন ইঞ্জিনের নক্সা খুঁজে পাওয়া যাবে।

উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজনদের স্থাপিত ছাপাখানা কাগজ তৈরির কল, হরফ ঢালাইখানা ইত্যাদি শিল্পোদ্যোগ যেমন শুধু মিশনারী উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লাগেনি, তেমনি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও

---

* বয়লারের মধ্যে জমা বাষ্পের চাপ খুব বেড়ে গেলে, সেফ্টি ভাল্ভ (কল) খুলে গিয়ে আপনা থেকে বাষ্প বেরিয়ে যায়, ফলে বয়লার বিস্ফোরণের আর ভয় থাকে না।

তাঁদের আগ্রহ শুধু ধর্ম সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়নি। বিজ্ঞানের প্রসারেও তাঁদের অবদান স্মরণীয়। শ্রীরামপুর কলেজের জন ম্যাক্ মূলত রসায়ন ও গণিত বিদ্যার অধ্যাপক হলেও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও পারদর্শী ছিলেন। বাষ্পের কল সম্বন্ধে তাঁর একটি নিবন্ধ দিগ্দর্শনে প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর রচিত 'কিমিয়া বিদ্যার সার' নামে রসায়ন বিদ্যা সংক্রান্ত প্রথম বাংলা গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে যুক্ত হয়। শুধু বিজ্ঞানের প্রসারই নয়, প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসারেও কেরী সাহেবের উৎসাহের অন্ত ছিল না। শ্রীরামপুরের কেরী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত একটি প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায় ছাপাখানা ও কাগজের কলের সংলগ্ন একটি অঞ্চলের নাম 'কামারপাড়া'। হরফ নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের এই অঞ্চল পরবর্তীকালে জুট মিল সংলগ্ন শ্রমিক বসতি গড়ে ওঠার পূর্বাভাষ। আজো শ্রীরামপুরে পঞ্চানন ও মনোহর কর্মকারদের বংশের গৌরবময় ধারাবাহী হরফ নির্মাতারা কর্মরত আছেন।

প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার গোলকচন্দ্রও নিশ্চয় এই কামারপাড়ারই বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাঁর মূল বাসস্থান ছিল টিটাগড়ে। মূলতঃ কেরীর উৎসাহেই এই দক্ষ কামার শ্রীরামপুরের কাগজের কলের বাষ্পের ইঞ্জিনটিকে সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে কোন রকম বিদেশী সাহায্য বা বিদেশী উপকরণ ছাড়াই একটি ক্ষুদ্র বাষ্পের ইঞ্জিন নির্মাণ করেন মূল ইঞ্জিনটির অনুকরণে। ইঞ্জিনীয়ার শব্দটির জন্ম হয় বাষ্পের ইঞ্জিন তৈরির শুরু হবার পর। গোলকচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় যিনি বাষ্পের ইঞ্জিন নির্মাণ করেছেন তাই প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারের শিরোপা তাঁরই প্রাপ্য।

গোলোকচন্দ্রের বাষ্পের ইঞ্জিনটি সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায় 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি'-র ১৮২৮ সালের ৯ই জানুয়ারির অধিবেশনের কার্যাবলীর বিবরণে। কেরী সাহেবের পরামর্শ মতো গোলোকচন্দ্রকে এই ইঞ্জিনটি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় সর্বজনসমক্ষে পেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ১৮২৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে এই প্রদর্শনী শুরু হয়। গোলোকচন্দ্র তাঁর ইঞ্জিনটি দিয়ে পাম্প চালিয়ে ও জল তুলে সবাইকে বিস্মিত করে দেন। সেবার ফলফুলের জলসায় ভারতের জেমস ওয়াটই সেরা ব্যক্তিটি করায়ত্ত করেন। জ্যান্ত লোহার ফুল ফুটিয়ে তিনিই সেবার প্রদর্শনীর সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেছিলেন —নগদ পঞ্চাশ টাকা। (ক্যালকাটা গেজেট, ১৭ই জানুয়ারি, ১৮২৮)।

গোলোকচন্দ্র প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার হলেও ভারতে প্রথম বাষ্পের ইঞ্জিন তৈরি করার গৌরব তাঁর প্রাপ্য কিনা বলা কঠিন। প্রায় একই সময়ে ফোর্ট-গ্লস্টারের (বাউরিয়া) মিস্টার ম্যাকনট একটি চার অশ্বক্ষমতা-সম্পন্ন ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। এটি ভারতবর্ষে নির্মিত প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন যা জলযান চালনায় ব্যবহৃত হয়েছিল। এই ইঞ্জিনটিতে উচ্চ চাপের বাষ্প ব্যবহার করে ম্যাকনট তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন কারণ বয়লারে বিস্ফোরণ ঘটার আশঙ্কায় তখন অবধি ইংল্যান্ডে প্রস্তুত উচ্চ বাষ্প-চাপ সম্পন্ন ইঞ্জিনের একটিও ভারতে আমদানী করা হয়নি।

গোলোকচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে বা ইঞ্জিন নির্মাতা হিসাবে তিনি পরবর্তীকালের আরো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন কিনা জানতে পারিনি। কিন্তু এ বিষয়ে খুব আশাবাদী হবারও কোন কারণ নেই। বৃটিশ শক্তির পক্ষে সে-যুগে তার উপনিবেশ ভারতভূমিতে ভাবী যন্ত্রশিল্প বিকাশের যে কোন সম্ভাবনাকে ব্যাহত করাই ছিল স্বাভাবিক। উপনিবেশকে স্বনির্ভর হতে না দেওয়াই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ টিকিয়ে রাখার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত উপায়।

আকর গ্রন্থ : ই ড্যানিয়েল পটস-এর 'উইলিয়াম ওয়ার্ড'। মুহম্মদ সিদ্দিক খান-এর 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা'। সুনীল চট্টোপাধ্যায়-এর 'বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন'। জর্জ স্মিথ-এর 'লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ উইলিয়াম কেরী, শু মেকার অ্যান্ড মিশনারী'। জন ক্লার্ক মার্শম্যান-এর 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ কেরী, মার্শম্যান অ্যান্ড ওয়ার্ড'। জি এ প্রিন্সেপ-এর 'অ্যান অ্যাকাউন্ট অব স্টিম ভেসেল্স...।'

৪৮ পাতার ব্লকটি উল্টো ছাপা হয়েছে। আমরা দুঃখিত।

আদি আছে অন্ত নেই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কেমন এক রকম বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে—কাছে এসে বিনুর হাতের ওপর হাত রাখল। হাতের চেটোর ওপর। বিনুই একদিন বলেছে, টিয়ার নরম হাতে অল্প অল্প ঘাম হয় অথচ জল ঘাটার মতো ঠাণ্ডা লাগে না, গরম থাকে—খুব ভাল লাগে তাই। টিয়া হাত বাড়বে তাই নিজের হাতটা সোজাভাবে পেতে দেয়।

হাতটা শুধু রাখল না, চেপেই ধরল হলাত গেলে। তেমনি চাপা বিকৃত কণ্ঠে বলল, যাবে? আর কোন রকমেই থাকা যায় না, না?

বিনু সে কণ্ঠস্বর আর স্বল্প ভাষণের অর্থ বুঝল বৈকি।

ওরও মনে যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে তাতে আর একটুও দেরি করা উচিত নয়—এখনই চলে যাওয়া দরকার, সময় থাকতে।

কিন্তু তা পারল না।

সেই প্রায় অন্ধকার ঘরে বাইরের জলে লেখা মেঘের যে সামান্য আড়াল এসে পড়েছে দরজার মধ্য দিয়ে—সেই আলোকে টিয়ার দিকে চেয়ে যেন সবটাই গোলমাল হয়ে গেল। আর সামলানো যাবে না সম্ভব নয়। সব প্রতিজ্ঞা, সব শুভবুদ্ধি বুঝি ভেসে চলে গেল কোথায়।

টিয়ার সুগৌর কপালে ললাটে কে যেন তখন নিবিড় করে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। নিবিড়তার হচ্ছে সে রং কপালে চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘাম ছিলই এখন তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে—ঠোঁটের ওপর, গলার খাঁজে ঘাড়ে ঘাম জমে উঠেছে, দেখতে দেখতে তা বাড়ছে, ওর আত্মহারা হয়ে চেয়ে থাকার কটি মুহূর্তের মধ্যেই। সবচেয়ে নিচের ঠোঁটের তলায় দুটি তিনটি বিন্দু টলটল করে সর্বদা—আজও তা তেমনি ফুটে উঠেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, যা বলা যায় না, যাবে না, সেই না বলা কথার ভার যেন সহ্য করতে পারছে না আর, কাঁপছে বিনুর হাতের মধ্যে ধরা হাত দুটোও—তাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে সমস্ত দেহটাই কাঁপছে থরথর করে—

তারপর? আর কোন জ্ঞান ছিল না বিনুর। ঝাপসা ঝাপসা যা মনে আছে—টিয়াকে সে সবলে সবেগে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর কম্পিত উৎসুক ঊর্ধ্বোত্থিত ঠোঁট দুটি নিজের পিপাসিত ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরেছিল। একে চুম্বন বলা যায় না, সে কাকে বলে তাও জানে না বিনু, কিন্তু দেহের নিয়ম আপনিই কাজ করে গেছে। অর্ধ বিকশিত শতদল আবেগের উত্তাপে দল মেলেছে—চুম্বনেই পরিণত হয়েছে। এই চুম্বনের মধ্য দিয়েই টিয়া যেন বিনুকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চাইছে। তারও কোন জ্ঞান নেই তখন, বিচার বিবেচনা লোকলজ্জা সংস্কার কিছু নয়—শুধু বহুদিনের কামনা আর তৃষ্ণা, আর কিছু নয়।

চেতনা ফিরেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই।

লজ্জায়, ভয় অনুশোচনায় শিউরে উঠেছে।

কিন্তু ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না তখনই।

তখন আর ওর কিছু করার নেই, টিয়া দুহাতে ওর মাথা চেপে ধরেছে, ঠোঁট চেপে আছে প্রাণপণে।

অবশেষে একসময় বাইরে ওদের দরজার কাছেই কোথাও বাড়িওলা গিন্নির কি কথা কানে যেতে টিয়ারও সম্বিৎ ফিরল। সে ওকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। বালিসের খাঁজে মুখ দিয়ে ব্যর্থ কামনার বেদনায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সে কান্নার শব্দ না পেলেও পিঠের ফুলে ফুলে ওঠা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বিনু বেরিয়ে এল আস্তে আস্তে। বাড়িওলা গিন্নি কি বলছেন, হয়ত কোন প্রশ্নই করছেন তা কানেও গেল না, উত্তরও দিল না।

সেই শেষ।

বিনু আর যায়নি রাখালদের বাড়িতে।

রাখাল প্রথমে বিস্ময় বোধ করেছে, সে বিস্ময় অনুযোগের মধ্যে দিয়ে প্রকাশও করেছে। তারপর—হয়ত ব্যাপারটা আন্দাজ করেই অনুনয় বিনয়ের পথ ধরেছে। তার মধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছে ঘটনা যাই ঘটুক তাতে রাখালের দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই, তার ঈর্ষা কি উষ্মার কোন কারণ ঘটেনি। বিনুর বেলায় তা ঘটতে পারে না। ঘটনা চরমে পৌঁছলেও তার কোন আপত্তি নেই। এত কোন বিকার দেখা দেবে না।

কে জানে হয়ত টিয়াই বলেছে।

টিয়ার এই এক আশ্চর্য স্বভাব। সে স্বামীর কাছে কখনও মিথ্যে বলে না পারত পক্ষে কারও কাছেই বলে না।

রাখাল অন্য পথও ধরেছে? টিয় খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটাকেও তেমন যত্ন করে না, বসে বসে কাঁদে—এসব কথা সবিস্তারেই বলে।

জানি নে মশাই, আপনাদের কি ব্যাপার। মান-অভিমান। কিসের তাও বুঝিনে। পৃথিবীতে তো আপন বলতে এই দুটি লোক আমার, তা তারাও যদি একজন নর্থ পোল আর একজন সাউথ পোলে বসে থাকে তো আমি বাঁচি কি করে। যদি অন্যায়ই কিছু করে থাকে জানেন তো মানুষটাকে, একেবারেই ছেলেমানুষ আর গোঁয়ো। আপনিই তো মানিয়ে নিতেন, এখন এমন বিরূপ হয়ে উঠলেন কেন?

না-না সেসব কিছু নয়। দেখছেন দিনকাল কি পড়ল, অন্য চিন্তা চমৎকার—সারা পৃথিবীতে একটা ওলট-পালট চলছে চলেছে। এখন কি এসব মান-অভিমানের কথা ভাবার সময়? এতদিন তো [illegible] কটা দিন দূরে থেকে দরটা বাড়াই না। আবার যাবো। এ নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন।

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বিনু।

সারা দেশেই যেন একটা আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার ভাব নেমে এসেছে সাধারণ স্বাভাবিক জীবনে যেন একটা অস্থিরতার ও বিপর্যয়ের কুয়াশা নেমে এসেছে। বিশেষ এই কলকাতা শহরে। মৃত্যু ভয় ও আসন্ন সর্বনাশের কথা ছাড়া কেউ কিছু ভাবছেই না।

বোমা তো পড়বেই এ শহরের কিছু থাকবে না কোথাও, চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না—এ বিষয়ে সবাই নিশ্চিত। সকলেই পালাচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় 'অন্য কোথাও অন্য কোথাও এ রাজ্যে আর নয়। ভগো মম স্বর্গপুরী হল বিষম ভয়।' —সেই অবস্থা।

ফলে অনেকে নতুন তৈরী শখের বাড়ি জলের দামে বেচে দিচ্ছে। এক বিখ্যাত লেখক বিয়াল্লিশ হাজারে বাড়ি উনিশ হাজারে বেচে দিলেন, এক বিনুর এককালীন ছাত্রের বাবা শিয়ালদার কাছে দুখানা বাড়ি তেরো হাজারে বেচে ভাগলপুরে চলে গেলেন, কিনল মোড়ের পানওলা। কাজ-কারবার অধিকাংশেই বন্ধ বা বন্ধর মতো। কোনো মতে শুধু কলকাতার বাইরে যেতে পারলেই হয়। তাহলেই যেন বেঁচে যাবে, এ আতঙ্ক থেকে অব্যাহতি পাবে।

শুধু কলকাতাতেই বোমা পড়বে কেন—একথা কেউ বলতে পারছে না।

যারা পয়সাওলা লোক তারা বিহারে যুক্তপ্রদেশে চলে যাচ্ছে, মধুপুর দেওঘর,

৩ মাসের পর, শুধু দুধই যথেষ্ট নয়

ডাক্তাররা সুপারিশ করেন

ফ্যারেক্স®

আপনার শিশুর
আদর্শ শক্ত আহার

ডাক্তাররা ফ্যারেক্স খাওয়াতে বলেন! কেন?

কারণ এটি এক নিখুঁত সুষম আহার, আপনার বাচ্চা শক্ত আহার শুরু করতেই ওর যা যা দরকার এটি তা যোগায়, আর কাঁচ বাচ্চার কোমল হজম শক্তির পক্ষেও উপযোগী।

বাচ্চার চাহিদা মেটাবার পক্ষে ফ্যারেক্স চমৎকারভাবে সুষম কেন?

ফ্যারেক্স, মস্তিষ্ক আর শরীরের বিকাশের জন্যে যোগায়—সঠিক আর সহজে হজম হয় এমন প্রোটিন, শক্তির জন্যে কার্বো-হাইড্রেট, মজবুত হাড় আর শক্ত দাঁতের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি, আর সবচেয়ে বড় কথা হল—আপনার বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখার জন্যে পর্যাপ্ত আয়রণ।

৩ মাস থেকেই কেন?

আপনার বাচ্চার ঠিকমত চিবিয়ে খাওয়া শেখা দরকার, নয়তো পরে গিলে খেতে শুরু করবে, ফলে পেটে ব্যথা হবে আর শরীরের বিকাশও ভালো হবে না।

তাছাড়া, ৩ মাসে ওর হজমশক্তি কোমলই থাকে, তাই গতানুগতিক আহারের বদলে ওর দরকার বিশেষভাবে তৈরী শিশুদের শক্ত আহার—যা ও সহজে হজম করতে পারবে।

কখন থেকে ওকে 'বড়দের' খাবার খাওয়াতে শুরু করবো?

ছেলেপুলে হাঁটতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ও 'বড়দের' খাবার খেতে শুরু করবে। একটু কল্পনার সাহায্যে আর আপনার স্নেহ উজাড় ক'রে ওর সমস্ত খাবারের সঙ্গেই ফ্যারেক্স মেশান।

এখন সেই একই গুণেভরা ফ্যারেক্স পাবেন নতুন ৪০০ গ্রাম টিনে।

FAREX

শিশুদের আদর্শ শক্ত আহার—সব দিক থেকে মজবুত বেড়ে ওঠার জন্য

শিমুলতলা জানাশুনো থাকলে মুঙ্গের ভাগলপুর, দারভাঙ্গাও কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ। এমন কি দিল্লিতেও। জাপানীদের বোমা কলকাতায় এলেও দিল্লি পৌঁছতে পারবে না, মনে মনে এই আশ্বাস সৃষ্টি করছে। যাদের আত্মীয়রা চাকরি কি ব্যবসা করে তারা এই সুযোগে বোম্বে মাদ্রাজ নাগপুর বাঙ্গালোর চলে যাচ্ছে—অনেকে জব্বলপুরেও চলে গেল, সেখানে মিলিটারী অস্ত্রশস্ত্রর কারখানা আছে জেনেও।

যাদের এমন কোন শাঁসালো আশ্রয় কি নিজেদের গাঁটের জোর নেই, তারা নবদ্বীপ কাটোয়া বর্ধমান—তাও যাদের সামর্থ্য নেই তারা কোন্নগর উত্তরপাড়াতে বাড়ি কি ঘর খুঁজে চলে গেল। আত্মীয় থাকলে তো কথাই নেই।

কি খাবে কি করে দিন কাটবে এমন অবস্থা কতদিন চলতে পারে তারপর কি হবে এসব কথা চিন্তাও করল না কেউ। প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছে, আরে মশাই প্রাণ বাঁচলে অনেক উপায় হবে। ভিক্ষে করেও খেতে পারব।

ভিক্ষেটাই বা দেবে কে?

সে যা হয় হবে। ভগবান আছেন। যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার যোগাবেন। —নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় উত্তর দেয় দিশাহারার দল।

কেবল ভগবানের ওপর এই নির্ভরতাটা কলকাতায় কেন থাকছে না—সে উত্তরটা কেউ দিতে পারছে না। আর প্রাণটা যদি বোমার আঘাত থেকে বেঁচে যায় তো—কোনদিন কোন কারণেই আর যাবে না—এমন ধারণাই বা হল কেন—সে কথাও কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। করলে সদুত্তর তো মেলেই না প্রশ্ন কর্তার ওপর রেগে ওঠে।

বিনু একটি প্রবীণ ভদ্রলোককে বলেছিল, বোমার হাত থেকে বাঁচলে কি চিরদিনের জন্যে বেঁচে যাবেন? বাঁচতে পারবেন? এই তো এইভাবে যেতে গিয়েই কত লোক মরছে। তাছাড়াও কে কখন কিসে মরবে তা কি কেউ বলতে পারে। মানুষ কি অমর?

তাতে তিনি মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, দেখব, দেখব। এসব ডেঁপোমি আর বড় বড় কথা কোথায় থাকে। মরবে তো একদিন সবাই তাই বলে কে আর যেচে সেধে জেনে শুনে মরণের দিকে এগিয়ে যায়।

রাখাল এই উপলক্ষে এদিক দিয়ে একটু গলাতে চেষ্টা করেছিল ওর ভাষায়—জাসট এটা একটা য়্যাপীল।

তার ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটারের আপিস—কাজ কারবার তাদেরও বন্ধ হতে বসেছে। মাইনে এক কিস্তিতে কখনই বিশেষ দেন না, এখন তো দু টাকা পাঁচ টাকা করে দিচ্ছেন, তাও নিত্য তাগাদা করে বলে। মালিকদের একজন জব্বলপুরে, একজন রাজপুতানা চলে যাচ্ছেন। টাকা কড়ি যা [illegible] আদায় করে নিয়ে কিছু সেখানের ব্যাঙ্কে সরিয়ে দিচ্ছেন—কিছু যা শোনা যাচ্ছে কাঁচা টাকা আর সোনাতেই রূপান্তরিত করেছেন বেশির ভাগ—সেগুলো নানা ভাবে বিচিত্র কৌশলে নিয়ে যাচ্ছে। জার্মানরা এলে ইংরেজ সরকারের নোট অচল হয়ে যাবে ব্যাঙ্কও কাজ করবে না এই ভয়টাই ধনী ব্যবসায়ীদেরই সবচেয়ে বেশী।

সুতরাং কর্মচারীদের বল মা তারা দাঁড়াই কোথা অবস্থা। এখানে থেকেই খেতে পাবে না—কোথাও যাওয়ার প্রশ্ন তো সুদূর পরাহত।

কনকরা আগেই কাশী চলে গেছে। রাখালের জায়গায় যে ছেলেটি কাজ করছে সুধীর বলে বস্তুত তার ওপরই ব্যবসা ও বাড়ির ভার। তাকে বলেছে যা আদায় হবে তা থেকে তোমার মাইনে নিও দারোয়ানের মাইনে দিও। বিনুকে ডেকে পাঠিয়ে মাসিক সাপ্তাহিক দুটো কাগজের ভার দিয়ে গেছে, বলে গেছে—যদি সম্ভব হয় যদি প্রেস কাজ করে বা কোন এজেন্ট কি হকার নিতে প্রস্তুত থাকে তে যেন কাগজ বার করে যায়। প্রেস ধারে কাজ করে, কাগজও ধারে পাওয়া যায় সুতরাং সেজন্যে কোন চিন্তা নেই। শুধু বিনুকে গোটা পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে গেছে—অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য কালের জন্য এককালীন পথের হাত খরচ ইত্যাদি বাবদ। অবশ্য বলেছে যদি ফিরতে দেরি হয়—টাকা পয়সার খুব ঠেকা পড়ে সুধীরের কাছ থেকে কোনটুকে দু-পাঁচ টাকা নিও।

কিন্তু আসল লোক সুধীরই বিনুকে বলেছে, আমিও কোথাও পালাব ভাই— যা বলুন। ত্রিশ টাকা মাইনের জন্যে এ শ্মশান আগলে বসে কি বোমা খাব। তাও তিরিশটে টাকাও তো আর মিলবে না। বলে গেছে আদায় করে নিতে। এ বাজারে কে টাকা দেবে বলুন তো। সব তো বরং যে যা পাচ্ছে হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ছে। বিজ্ঞাপনের টাকা কে দেবে আদায় বা কে করবে। উনি তো দশটা টাকাও দিয়ে গেলেন না। হীরেপুরে আমার এক বোন থাকে বি এন আরের নলপুর ইষ্টিশানে নেমে যেতে হয়—সেখানেই মনে করছি চলে যাবো জ্যাঠতুতো বোন তা বোধহয় ফেলবে না।

বিনু হাসে।

'ওপর থেকে এত হিসেব করে ওরা বোমা ফেলবে—ম্যাপ দেখে দেখে যে কলকাতায় শুধু পড়বে, তার দশ মাইল বারো মাইল দূরে পড়বে না! তাছাড়া কাছেই সব বড় বড় কল, বাউরিয়া, রাজগঞ্জ, আরও কত মিল আছে। না না, যেতে হয় দূরে কোথাও চলে যান।'

'কার কাছে যাবো বলুন।' সুধীর মুখ শুকিয়ে উত্তর দেয়, এখেনে সতাতো দাদার সঙ্গে একত্তরে আছি তাই চলছে, মাসে পনেরোটা করে টাকা দিই—কিছু বলে না। তিনি চলে যাচ্ছেন—ডায়মন্ডহারবারের কাছে কোথায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি, তারা আবার ভেতরে কোথায় গ্রামে বাড়ি পেয়েছে সেখেনে। দেশ আমারা মুর্শিদাবাদ জেলায় ভগীরথপুর—সেখানে জ্যাঠাইমা তাঁর নেন্তি-গেন্ডি নিয়ে থাকেন—তিনিই খেতে পান না। মা থাকেন মামার কাছে বাঁকড়ো জেলার এক গাঁয়ে—শশী বাঁড়ুজ্যেদের কালী মন্দিরে পূজরী। কোথায় যাই বলুন। সেখেনেই যাবো? ডায়মন্ডহারবারে দাদার শ্বশুরবাড়ি খালি পড়ে থাকবে—সেখেনে যেতে পারি, কিন্তু খাবো কি!'

'ক্ষেপেছেন! ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে কি করবেন মজা দেখার জনোই বিনু বলে। ঐসব ষ্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টেই আগে পড়বে।'

'তবে আর কি করি বলুন। হীরেপুরেই যাই। খুড়তুতো বোন, তবু ফেলতে পারবে না একেবারে। তাদের চাষবাসও আছে, সোম্বচ্ছরের চালটা হয় শুনেছি।'

রাখাল এসে মুখ শুকিয়ে বসে, আমার বাড়িওলারা তো যশোরে চলে গেল কাল। ওদের কে আছে—সয়ের বোয়ের বকুলফুলের বোনপো বোয়ের নাতজামাই—সেই সুবাদে, ঝিনাইদা না কোথায়। পাড়া তো শ্মশান। আছে যা কিছু লেবার ক্লাস আর চোর-ডাকাত। ওকে কোথায় সরাই বলুন তো। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে, ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলায় যেতে পারে না। এক তো আপনার অদর্শনেই আধখানা হয়ে গেছে—এখন তো খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটা কেঁদে উঠলে, এমন পাগল তাব মুখে আঁচল পুরে চুপ করাতে চোখ পাছে ওর কান্নায় লোক আছে জেনে জোর করে কেউ দোর ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে। এধারে মেয়েটা যে দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে পারে, সে খেয়াল নেই।...একটা কথা কদিন ভাবছি। মামার রিটায়ার করার সময় অবিশ্যি হয়ে গেছে তবে শুনছি যুদ্ধের বাজারে এখন ছাড়াবে না—এক্সপিরিয়েন্সড হ্যান্ডদের একসটেনশান দেবে। সেখানেই পাঠাবো?'

'সেটাই কি খুব নিরাপদ হবে রেলের এতবড় কারখানা—এই সবই তো বড় টার্গেট।'

'আর কোথায় পাঠাই বলুন। কোন চুলোয় কেউ নেই যে। যেমন আমার তেমনি ওর। শ্বশুরবাড়ি এমন, সেখানে গেলে মেয়েটাকে না খাইয়ে মারবে। এখানে থাকলে ভয়ে মরবে। জামালপুরে আর যাই হোক, এমন অহরহ চোর ডাকাত লুটেরার ভয় থাকবে না তো। মরে সকলের সঙ্গে মরবে।'

'তবে তাই যান।'

একটু চুপ করে থেকে আসল কথাটা পাড়ে রাখাল।

'আপনি একটু দয়া করবেন? জাস্ট দুটো দিন। একটু পৌঁছে দিয়ে আসবেন কাইন্ডলি? একটা রাতের তো ব্যাপার। আমি সঙ্গে গেলে এখানে ঘরদোরের জন্য সব্বধ খুলে নিয়ে যাবে। আর সব মাল তো পাঠানো যাবে না—ট্রেনে তো পেষাপেষি ভিড়। কিছু তো আছে, ঘর করতে গেলে এসব লাগবে।'

(চলবে)

ঈশ্বরের বাগান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সে ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। চার পাশে এত লোকজন, অথচ এরা তার কেউ না। হেমন্ত কাল এটা। শীতের বেলার মতো কলকাতার মাথায় রোদ্দুর ঠাণ্ডা তাপহীন। শরীরটা ভাল লাগছে না বলে সে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসেছে। এবং কি যে হয়, অফিস থেকে বের হয়ে এলেই তার মনে হয় কেমন একটা মুক্তির স্বাদ। যতক্ষণ থাকে, এক দণ্ড সে নিজের কথা ভাবতে পারে না। অজস্র সমস্যা। রঙের সমস্যা, ডাইসের সমস্যা, কামাইর সমস্যা, ওভারটাইমের সমস্যা। কেবল মনে হয়, এরা কেন ঠিকমত কাজ করে না। কেবল মনে হয়, ওরা যা পারে তার সিকি ভাগ কাজও করে না। এই দুর্বুদ্ধি তারা কোথায় পায়। সে তো দেশে-বিদেশে ঘুরে দেখেছে, জাহাজে কাজ করে দেখেছে—পুরো আট ঘণ্টা কাজ। এক দণ্ড ফুরসত ছিল না। কাজে কোন ফাঁকি ছিল না। মাইনে কম, কিন্তু যা পরিস্থিতি মাইনে বাড়াতে গেলেই মাল বাড়ান দরকার। সে সবাইকে ডেকে বার বার বুঝিয়েছে। ওরা বলেছেন ভেবে দেখি স্যার। সে বলেছে, এত কম মাইনেতে তোমরা বাঁচবে কি করে। আমাকে বাঁচাও, আমি তোমাদের বাঁচার পথ দেখছি। খুব তখন ওরা ভাল মানুষের মত স্বীকার করে গেছে, স্যার আপনি ঠিকই বলেছেন। কেউ কেউ গোপনে বলে গেছে, স্যার লাগানি-ভাঙানি হচ্ছে। কিছু করা যাচ্ছে না।

অতীশ হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছিল, সংসারে ভাল থাকার কোন দাম নেই। সে ভাবল, কালই কুম্ভবাবুকে এই কাজে লাগাবে। মানুষটার একটা অস্পষ্ট গুণ আছে তাকে বড় করে দিলে, সে সব করতে রাজি হয়। সে চায় সবটাই তার হাত দিয়ে হোক। এবং পরদিনই সে কুম্ভবাবুকে অফিসে ডেকে বলল, আপনি দেখুন না ওদের সঙ্গে কথা কয়ে কিছু একটা করতে পারেন কি না। কুম্ভ বলল, সব বেইমান দাদা। বেটারা খেতে পেতিস না, হাতে পায়ে ধরে ঢুকেছিল। ঢুকেই অন্য চেহারা। তা আপনি যখন বলেছেন দেখছি।

কুম্ভ জানে, তার একটা আলাদা সুবিধা আছে। সে যখন এদের টোপ দেবে, তখন অন্য কেউ আর এক পাশে টোপ ফেলে বসে থাকবে না। সব কিছু বানচাল করে দিতে চায়, আর কিছুর জন্য না, শুধু সে দেখাতে চায়, সব সেই করতে পারে। অতীশবাবু এভাবে সহজে তার কবজায় আসবে, সে কল্পনাই করতে পারে নি।

সে বলেছিল, কি ভাবে রফা করতে চান।

—আট ঘণ্টায় ওরা এ-মালটা তৈরি করতে পারে। বলে অতীশ টাইপ করা একটা লিস্ট কুম্ভবাবুকে দিল। তারপর বলল, আপনি কি ভাবেন? আপনি ত অনেকদিন এখানে। আমার চেয়ে এটা আরও বেশি ভাল বুঝবেন।

কুম্ভ তালিকাটি দেখল। যা পারে, বরং তার চেয়ে কমই চেয়েছেন। যতবার অতীশবাবু এ-নিয়ে ফয়সালা করতে চেয়েছে, ততবার কুম্ভ তলে তলে বাগড়া দিয়েছে। —তোমরা রাজি হলেই মরবে। কোম্পানীর কাছে এটা রেকর্ড হয়ে থাকবে। এগ্রিমেন্টে গেলেই ফেঁসে [illegible]।

কুম্ভ বলল, মাইনে কি রকম বাড়াতে চান?

অতীশ আজও একটি টাইপ করা তালিকা দিল তাকে। দুজন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তার। সে তাদের দিয়েই সব করিয়ে রেখেছে।

তালিকাটি কুম্ভ খুব ভাল করে দেখে বলল, আপনিত দেখছি রাজাকে দেউলিয়া করে ছাড়বেন দাদা।

অতীশ কিছুটা হতাশ গলায় বলল, এ-কথা কেন?

—আপনি দাদা মনে মনে কম্যুনিস্ট আছেন। না হলে কেউ এমন এগ্রিমেন্ট করে।

অতীশ বলল, মনোরঞ্জনের সঙ্গে এই নিয়েই তো কথা বলেছি। কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। আপনি আরও কমাতে চান।

—তা না হলে অ্যাগ্রিমেন্ট করে লাভ কি। সবটাই ওরা খাবে। রাজার থাকবেটা কি!

—ও নিজে এখান থেকে কিছুই পান না।

—কিছু পান না বলবেন না, পেতেন। আপনি আসায় সেটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু জানেন ত, এরা এ-সব শুধু দেখে দেখে আর দেখে। যদি কিছু না করতে পারেন সবই আপনার পেয়ারের লোক থেকে....

অতীশ মুখ নিচু করে বসে থাকল। তার যেমন জোর আছে অমলা বউরানি কুম্ভবাবুর জোর তার বাবা। সে এসে বুঝেছে এত বড় এস্টেটের এখনও যা কিছু স্থাবর অস্থাবর আছে তার বেচাকেনায় একটা বড় রকমের ব্যাভিচার রয়েছে। এই ব্যাভিচার শুধু ওপর মহলের দু-একজন অমলাই খবর রাখে। রাধিকাবাবু তার একজন। খুব একটা ঘাটাঘাটি করতে রাজাও তাকে সাহস পায় না।

সে বলল, এটা অন্যায় মনে করেছি। স্ক্র্যাপের টাকা তিনি পেতে পারেন না। আর এতে কটাই বা টাকা, এটা পেলে না পেলে তাঁর কিছু আসবে যাবে না। আমাদের আসবে যাবে।

কুম্ভ হা হা করে হেসে উঠল।—দাদা আপনি কোন যুগের লোক। টাকা মানুষের আত্মার কাছাকাছি। এদের কাছে আত্মার বিনাশ আছে কিন্তু টাকার বিনাশ নাই। শুধু রেখে যাওয়া। বাড়িয়ে যাওয়া।

অতীশের সবই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। এই লোকটাই রাজার হয়ে এত ভাবে, এই লোকটাই রাজার এমন অপযশ গায়। সে বলল, কোম্পানির লাভ হলে তিনি তো ডিভিডেন্ট পাবেনই।

—ভালোই হয়েছে। এতদিন সবুর সইবে না। আর কোম্পানীর লাভ বলছেন, এত সোজা। লাভ হলেই হাতে দিচ্ছেটা কে। এখন নতুন আছেন, রাজা হাত দিচ্ছেন না। পরে হাত দেবেনই। শুধু একটু রয়েসয়ে হাত বাড়াবেন এই যা!

অতীশ সবই বুঝতে পারে। যত বুঝতে পারে তত শিটিয়ে যায়। তত এক অশুভ প্রভাব টের পায় মাথার ওপর ঘোরাঘুরি করছে। ওর চোখ কেমন স্থির হয়ে থাকে। অন্য সমস্ত মানুষের মতো শুধু বলে, যা ভাল বুঝুন করুন।

কুম্ভ বলল, রাজার সঙ্গে সনৎবাবুর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন।

অতীশ বলল ওরা দেখেছেন।

—কী বলল দেখে?

—বলেছেন, ঠিক আছে। যদি তোমার মনে হয় এতে সুবিধা হবে তাই কর।

কুম্ভ বলল, চা খাব দাদা। বলেই বেল টিপে সুধীরকে ডাকল। সুধীর এলে চা করতে বলা হল। তারপর ফিস ফিস গলায় কিছু যেন বলল কুম্ভ। কিন্তু ও-ঘরে প্রিন্টিং মেসিন চলছে, গুম গুম আওয়াজ। অতীশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না। সে তাকিয়ে থাকল। কুম্ভর মনে হল, মানুষটা ভারি নিরুপায় এখন। এবং এখনই তাকে নিয়ে খেলা জমিয়ে তোলার প্রকৃষ্ট সময়। সে তালিকা দুটিই ভাঁজ করে ব্যাগে ভরে রাখল। তার পরে ব্যাগের মধ্যে আর যা যা থাকার কথা দেখল ঠিক আছে কিনা। যেন একটা মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেছে। সে ত আর অতীশবাবুর মতো বলবে না, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, সে বলবে, রাজার এই ইচ্ছে। রাজা এর চেয়ে এক পয়সাও বাড়াবে না। সে আগেই গেয়ে রেখেছিল, যাই করুন, রাজা এ-সব মানবে না। এগ্রিমেন্টের কোনো দাম নেই। দরকার পড়লে কারখানা বন্ধ করে দেবে। ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু হচ্ছে। আসলে [illegible]

রাধিকাবাবুর ছেলে, এবং সহজেই রাজ-বাড়ির অনেক গহ্য কথা জানার তার সুযোগ আছে। মনোরঞ্জন এটা বিশ্বাস করে। মনোরঞ্জন মানেই তার কর্মীরা। ইউনিয়নের সে এক নম্বর পান্ডা।

কুম্ভ চা খেতে খেতে বলল, দেখত সুধীর, আমার ওখানে কেউ বসে আছে কিনা। যদি থাকে বসতে বলবি। তারপর অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, মাইনেত দেখছি কারো কারো প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। যা মাল দেবে, সবটা ত ওরাই খেয়ে নিচ্ছে দেখছি।

—তা হবে কেন। কোম্পানী অন্যসব খরচা একই থাকছে। মার্জিনেল প্রফিট বাড়বে।

কুম্ভ বুঝতে পারে, অতীশবাবুর মাথা পরিষ্কার। সব ঠিক বোঝে। সামান্য ত্যাঁদড় হলে আখের গোছাতে পারত। সেটাই নেই। এ সময়ে মানুষের যেটা সব চেয়ে বেশি দরকার। সে আবার সেই ফিস ফিস গলায় বলল, আমাদের জন্য কি রাখলেন?

অতীশের এটা মাথায় আসে নি। মাইনে বাড়লে সবার বাড়া উচিত। সে বলল, আগে এটা হোক, অর্ডার-পত্র বেশি আনুন। আমাদেরও হবে।

কুম্ভ তত সহজে বুঝবে কেন। সে বলল, আমরাও দাদা মাইনে ভাল পাই না। একজন কেরানীর মাইনেও দেন না। ওতে চলে না। আসলে সে জন্যই যে তাকে ধান্দাবাজি করতে হয় সেটা ও বলে ফেলল, মানুষ চোর হয়ে জন্মায় না দাদা। পরিবেশ তাকে চুরি করতে শেখায়। কি, আপনি মানেন কিনা বলুন!

অতীশ বলল, সব সময় নয়।

হারামি। নিজের খুঁটি থেকে এক পা নড়বে না। তারপরই মনে মনে সে প্রফুল্ল হয়ে উঠল। আজই পিতৃদেবকে দিয়ে রাজার সঙ্গে একটা গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে! তালিকা দুটো এখন তার সম্বল। সে যে রাজার দিকটা কতটা দেখে, এই তালিকা দিয়েই আর একবার তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এবং সে উঠে পড়তেই সুধীর এসে বলল, বসে আছে। কুম্ভ কি ভেবে আবার বসল। লোকটা যখন এসে গেছে তখন কাজটা সেরে যাওয়াই ভাল। সে বলল, দাদা দশ টন পি সি আব কি পাওয়া যাচ্ছে। নেবেন। খুব সস্তায় হবে। পাউডারের কৌটা হবে।

—নরম মাল ত!

—নরম মাল।

—কত করে বলছে।

সে দামের কথাটা লিখে দিল।

অতীশ বলল, পঞ্চাশ টাকা কম করে হবে কিনা দেখুন!

কুম্ভর খিস্তি করতে ইচ্ছে হল। ঠিক সব খবর রাখে। তবু তার পনের টাকা করে দালালী থাকবে। অনেক কমে গেল। অগত্যা বলল, টাকাটা আজই দিন। না হলে, রাখা যাবে না।

অতীশ বলল, মালটা পাঠিয়ে দিতে বলুন। সবটাই এক সঙ্গে দিয়ে দেব। তারপর কি মনে হতেই বলল, কত গেজ।

কুম্ভ বলল, চলে যাবে। ত্রিশ একত্রিশ হবে। এসর্টেড।

পরদিন কুমার বাহাদুরের ঘরে তিন-জনের এক সঙ্গে ডাক পড়ল। সনৎবাবু ভিতরে ঢোকার আগে সবটা বুঝে নিয়েছেন। আসলে অতীশ হেলপারদের মাইনে অনেক বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছে। যারা সাতাশ টাকা পেত, তারা পাবে পঞ্চাশ টাকার মত। পাঞ্চম্যান, ফিটম্যান, কার্মাড়ম্যান, লেদম্যানের মাইনে বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছে গড়ে কুড়ি টাকা করে। প্রিন্টার ব্লকম্যানদের আরও কম। এই এগ্রিমেন্টে সবচেয়ে উপকৃত হবে হেলপাররা। তারাই সংখ্যায় বেশি। অতীশ এ-সব ভেবেই এটা করেছে। সে গরিষ্ঠের সমর্থন পেতে চায়। এরাই সবচেয়ে বেশি শোষিত। তালিকা দুটো করার সময় অতীশের মাথায় এই চিন্তা ভাবনাই কাজ করেছে। কিন্তু মনোরঞ্জন এবং ইউনিয়নের পান্ডারা সায় দিচ্ছে না। এই এগ্রিমেন্ট মেনে নিলে, তাদের ওভার-টাইম বন্ধ হয়ে যাবে—এমন কেউ বুঝিয়েছে। অতীশ বলেছে, আমরা পার্টিদের কাছ থেকে আরও অর্ডার আনব। প্রথম দিকে অসুবিধা হলেও আখেরে তোমাদের লাভ হবে। এত সব করেও সে পারে নি। এখন কুম্ভবাবুর হাতে ভার দিতেই রাজার ঘরে ডাক পড়েছে। সে বুঝতে পারছে না, কেন আবার এই নিয়ে দরবার হবে। সিদ্ধান্ত সে একা নেয় নি। রাজেনদা এবং সনৎবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেই এই তালিকা তৈরি করেছে।

ভিতরে ঢুকেই অতীশ দেখল রাজেনদা বড় গম্ভীর। নীল রঙের টাই পরেছেন। চোখে নীল রঙের চশমা। গোঁফে দুটো একটা পাকা চুল সে আগে দেখেছে—আজ তাও নেই। মুখে পাইপ। তিনজনই ঢুকে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকল। অতীশ দেখছে, তিনি মনোযোগ দিয়ে একটা ডিড়ের পাতা উল্টে যাচ্ছেন। এরা যে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে তা যেন তিনি বিন্দুমাত্র টের পান নি। অতীশ বুঝতে পারে বড়লোকদের এটা অভিনয়। স্পষ্টত এত ব্যস্ততার কিছু থাকতে পারে না। বাড়ির তিন চার বিঘে জমির ওপর গম চাষ হয়েছে। গমের সবুজ গাছগুলির ওপর দিয়ে কিছু শালিখ পাখি উড়ে গেছিল। শহরের মানুষজন যখন ফুটপাথে বস্তিতে জায়গার অভাবে কালাতিপাত করছে, তখন তার বিঘে জমিতে অসলার সখের গম গাছগুলি সহসা চোখের ওপর মাথা দুলিয়ে গেল। এ-পাশে ট্রাম লাইন, ও-পাশে রেল লাইন, উত্তর দক্ষিণে হাসপাতাল, ইস্কুল, বস্তি বাড়ি, এবং ঘিঞ্জি শহর। কত সুন্দরভাবে এরই মধ্যে মানুষটা বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। শহরের ময়লা জল পথ-ঘাট উপচে এই বাড়িতে কোনদিন ঢুকে যেতে পারে—সেটা কুমার বাহাদুরকে দেখে কিছুতেই ভাবা যাচ্ছে না। তখনই চোখ তুলে কুমার বাহাদুর বললেন, বস। সনৎবাবুকে বললেন, বসুন। ওরা উভয়ে বসে পড়ল। কুম্ভ তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য দিন অতীশই বলে, এ-পাশে এসে বসুন। আজ সে কিছু বলতে পারল না। সে কেমন টের পায়, কুম্ভবাবু জল বেশ ঘোলা করে দিয়েছে। রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। এবং মাথা ঝিম ঝিম করছে। সে মাথা নিচু করে বসে থাকল।

কুমার বাহাদুরই বললেন, তুই আবার দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? বোস। সেই বাড়ির ছেলের মতো, কুম্ভ যে এ-বাড়িতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে, এ-বাড়ির জন্য তার যে একটা মায়া থাকবে তাতে আর অবিশ্বাসের কি আছে।

কুম্ভ বসতেই বললেন, তোর কি মনে হয়?

এগ্রিমেন্ট ঠিকই আছে তবে...;

—তবেটা কি বল!

—অর্ডারপত্র কম। অর্ডারপত্র না বাড়িয়ে এই এগ্রিমেন্টে যাওয়া ঠিক হবে না!

—কেন হবে না? কুমার বাহাদুর আবার প্রশ্ন করলেন।

কুম্ভ বলল, কাজ ঠিক-ঠাক পেলে ফাঁকা মাঠ হয়ে যাবে।

—স্পষ্ট করে বল!

—লোকজন বসে পড়বে।

অতীশের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এ-দিকটা ভেবে দেখেছ?

অতীশ বুঝতে পারছে, কুম্ভবাবু সুযোগ সন্ধানী হয়ে উঠছে। কুম্ভবাবু অন্যভাবে বিষয়টা তার বাবাকে বুঝিয়েছে। তার বাবা, কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কাজ সেরে ওঠার সময় হয়ত বলেছিল, কুম্ভটা বলল, অতীশ ত ঠিক বোঝে না, ভাল মানুষ, ভাল মানুষ দিয়ে ত কুমার বাহাদুর সব কাজ হয় না, ঐ ত কি একটা এগ্রিমেন্ট করতে যাচ্ছে, গোড়ায় গলদ... এবং এই সবই মাথায় অতীশের কিলবিল করে পাক খাচ্ছে। সে কি বলবে বুঝতে পারছে না। মনে হল, সত্যি সে এদিকটা ভেবে দেখে নি। সে খুবই অক্ষম মানুষ। তার পক্ষে ঠিক এ-ভাবে এগ্রিমেন্ট করার কথা ভাবা ঠিক হয় নি। তারপরই সে কেমন নেতিয়ে যাচ্ছিল—আর ঠিক সেই সময় মনে হল কুম্ভবাবু চায় আবার সেই দুই নম্বর মাল বানাবার সুযোগটাকে কব্জা করতে। এই সুযোগে রাজার কাছ থেকে অনুমোদনটা করিয়ে নিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে রক্তপাত শুরু হয়ে যায়—মানুষের পক্ষে এতটা ধান্দাবাজি ঠিক না। দু' নম্বর মাল দিয়ে কি হয় সে জানে। সে পীড়িত বোধ করতে থাকল।

সনৎবাবু বললেন, প্রচুর অর্ডারপত্র হাতে থাকলেই এটা তোমার সম্ভব।

অতীশ কোথায় যেন এবার দৃঢ়তা পেয়ে যাচ্ছে। সে বলল, যা আছে তাতে বসে যাবার কথা না।

(চলবে)

পরাজিত নায়ক নাটকে তরুণ রায় দীপান্বিতা রায়

থিয়েটার সেণ্টারের রজত-জয়ন্তী

বিষ্ণু বসু

থিয়েটার সেন্টারের রজতজয়ন্তী উৎসব হল অ্যাকাডেমী মঞ্চে। চলল তিন দিন : ১৬, ১৭, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০। উৎসব অবশ্য বিভিন্ন পর্যায়ে চলবে সারা বছর ধরে। এ অনুষ্ঠানটি তার সূত্রপাত। প্রথম দুদিন সূর্য গ্রহণ ও অকাল বর্ষণের জন্য কিছু বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল। তাতে দর্শক ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে নি। হাজির ছিলেন মঞ্চ-চলচ্চিত্র-সঙ্গীত জগতের বিভিন্ন দিকপাল। পরিবেশন ও পরিমিতিবোধের আশ্চর্য সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি হৃদ্য হয়ে উঠেছিল।

প্রথম দিন তাপস সেন বললেন, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে কেমন করে এক নাট্যপাগল তরুণের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। কত বাধার মধ্য দিয়ে তাঁরা সেদিন নাটক নিয়ে 'লেগে পড়েছিলেন।' তারপর পঁচিশ বছর কেটে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই সকলের বয়স বেড়েছে। কিন্তু সেই তরুণটি আজও চলেছেন। বলাবাহুল্য তিনি তরুণ রায়। তাপসবাবু আশা প্রকাশ করেন এরপর অবশ্যই থিয়েটার সেণ্টারের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসব পালিত হবে। তখন হয়ত 'আমাদের চুল উঠে যাবে, সাদা হয়ে যাবে, দাঁত সব পড়ে যাবে, তবু আমরা নাটক করে যাব।'

তৃতীয় দিন বললেন তৃপ্তি মিত্র। তাঁর বক্তব্য, বহুরূপী ও থিয়েটার সেণ্টার প্রায় একসঙ্গেই যাত্রা শুরু করেছিল। বহুরূপী সামান্য আগে। সুখে-দুঃখে এতগুলো বছর কাটল। থিয়েটার সেণ্টার থেমে থাকবে না। বন্ধুর সম্পর্কে বন্ধু আর কিই বা বলতে পারে।

তরুণ রায় বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে তুলে ধরলেন। কোন সাংবাদিক নাকি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন থিয়েটার করে তিনি কি পেয়েছেন? তরুণ রায় জানালেন, তিনি পেয়েছেন অজস্র মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা। নইলে মাত্র একশ আসনের প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে এত দুর্বিপাক কাটিয়ে তিনি এগিয়ে চলতে পারতেন না। মঞ্চ একবার সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল তাতেও তাঁদের যাত্রা থেমে থাকে নি। থিয়েটার সেণ্টারই প্রথম প্রবর্তিত করেছিল একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা। শুধু বাঙলা নাটক নিয়ে নয়, সর্বভারতীয় ভাষায় নাটক প্রতিযোগিতার সূত্রপাতও তাঁরা করেছিলেন। তাঁদের এখানেই প্রথম স্থাপিত হয়েছিল নাট্যবিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের নাট্যপ্রযোজনার মাধ্যমে তাঁরা দর্শকদের মাতিয়েছেন, ভাবিয়েছেন। কখনো পেশাদার মঞ্চের ডাকডাকিতে সাড়া দিলেও মূল উদ্দেশ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নাটক কেন করেছেন তারও একটি কারণ তিনি পেশ করেন। তিনি যখন বিলেতে ছিলেন তখন বিখ্যাত পরিচালক জন ফার্নান্ড পরিচালিত লাভ অব ফোর কলোনেলস দেখেন। এত সাধারণ প্রযোজনা দেখে তিনি হতাশ হন। তখন মার্টিন ব্রাউনের নির্দেশে ফার্নাল্ড পরিচালিত অঙ্কল ভানিয়া দেখে সন্তুষ্ট হলেন। নিজের উচ্ছ্বাস তিনি পরিচালককে জানালেন। এবং বিস্ময় প্রকাশ করতেও ভুললেন না একই ব্যক্তি কিভাবে 'ফোর কলোনেল' করতে রাজী হয়েছিলেন। জবাবে জন ফার্নাল্ড বলেছিলেন, 'ফোর কলোনেল' হল থিয়েটার ফর রোড' অ্যান্ড বটার এবং আঙ্কল ভানিয়া হল থিয়েটার ফর লাভ। দুটোকে এক করে দেখলে চলবে না। তরুণ রায় জানালেন, তিনি নিজের জীবনে এ আদর্শ পালন করতে চেয়েছেন। থিয়েটার সেণ্টার তাঁর ভালবাসার থিয়েটার। তিনদিন তিনটি নাটক উপস্থাপিত হল : পাড়েও যা পোড়ে না, পরাজিত নায়ক এবং বিষবৃক্ষ। প্রথম নাটক দুটি ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা, তৃতীয়টি বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ। প্রথম দুটির পরিচালক তরুণ রায় এবং তৃতীয়টির দেবরাজ রায়। গত পঁচিশ বছরে থিয়েটার সেণ্টার তিনের অধিক নাট্য-

প্রযোজনা করেছে। তার ভেতর থেকে বর্তমান অনুষ্ঠানের জন্য তিনটি নাটক বেছে নেওয়া সহজ ছিল না। এ নির্বাচনের মধ্যেও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। বিষবৃক্ষ বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ। ক্ল্যাসিকের মধ্যে এটিকে নির্বাচিত করা হয়েছে সম্ভবত এই কথা ভেবে যে বিষবৃক্ষতেই বাঙলা কথাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ ধরা পড়েছিল। বাঙলা নাটক সে পথে চলতে পারে নি। অথচ চলা উচিত ছিল। প্রয়োজনও ছিল। নাটকের খাতিরেই। থিয়েটার সেন্টার এ প্রযোজনার মাধ্যমে সেই কুণ্ঠিত ভবিষ্যৎকে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিল। পরাজিত নায়ক সত্তর দশকের নাটক। অনেক সোরগোল তুলে সত্তর দশক শুরু হয়েছিল। সেটা ছিল নাকি মুক্তির দশক। কিন্তু লোভ ও নানা দুর্নীতির বন্ধনে সে মুকিত বিপর্যস্ত হয়েছিল। হিংসা, রাজনীতি ও গদীর লালসা জনজীবনকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল। পরাজিত নায়কে গত দশকের এ উদভ্রান্ত ছবি ধরা পড়েছে। শুধু গত দশকেরই বা কেন? স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতাব্যাকুল নেতাদের এ চেহারাই কি বারবার প্রকাশ পায় নি? মই-সাপের ওঠাপড়ার খেসারত দিতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। নইলে পশ্চিমবঙ্গে এক দশকে চারবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কেন? সে হিসেবে সাম্প্রতিক বাঙালির কাছে পরাজিত নায়ক অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল। অন্তত নিজেদের চেনবার জন্যও। 'পুড়েও যা পোড়ে না' থিয়েটার সেন্টারেরই একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপস্থাপনা। ১৯৬৪ সালে আগুন লেগে থিয়েটার সেন্টারের মঞ্চ পুড়ে যায়। অবশ্য থিয়েটারের—বিশেষ করে বাঙলা থিয়েটারের—কপালে আগুন এ প্রথম নয়। এ বিপর্যয়ের ধকল সামলে ওঠা সহজ ছিল না। তার জন্য দরকার অসাধারণ মানসিক বল। আর মানুষের উপর একান্ত বিশ্বাস। দুর্বিপাকের সুযোগে নানা সন্দেহ মাথা চাড়া দেয়, ছড়ায় বহু গুজব। পারস্পরিক অবিশ্বাসে সংগঠনের ভিৎ নড়ে ওঠে। শুধু অমরের অনশ্বর বিশ্বাস তাকে ধ্বসে পড়তে দেয় না। 'মনুষ্যের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—' রবীন্দ্রনাথের এ মহৎ বাক্য নাটকের উপসংহারে যেন প্রাণ পেয়েছে। মঞ্চে আগুন লাগার ঘটনাটিও এজন্য এক প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে। কেননা এ কথা ত নাট্যদুনিয়ায় সকলেরই জানা যে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ রেষারেষি, ভুল বোঝাবুঝি—যার অনেকটাই কোন আদর্শগত নয়—নাট্য পরিবেশকে কলুষিত করে দেয়। সব দলে অমর নেই। তাই দল ভাঙে। এ ভাঙন দহনের চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি করে। তাই রজত-জয়ন্তী উৎসবে এ নাটক উপস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

অবশ্য সব নাটক রচনা হিসেবে ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথাগত আঙ্গিকে নাটকটিকে হাজির না করা অবশ্য ভালই হয়েছে। চিত্রনাট্যের আদলে বিষবৃক্ষের কাহিনী ছুটে [illegible] অজস্র মুহূর্তগুলিতে। [illegible] ও দৃশ্যের কাঠামোয় বাঁধতে গেলে এ দ্যুতি ব্যাহত হত। কিন্তু চরিত্রগুলোর যে মানসিক টেনশন মূল উপন্যাসে আছে তার অনেকটাই এতে ফুটে ওঠে নি। অথচ এ টেনশনটাই বিষবৃক্ষের প্রধান ব্যাপার। চরিত্রগুলোর মনের গভীরে ফোকাস ফেলতে গেলে যে কৌশলের দরকার তা এখানে যেন যথাযথ হতে পারে নি।

নাটক হিসেবে পরাজিত নায়ক নিটোল। মাত্র তিনটি দৃশ্যের পরিসরে দুটি চরিত্র নিয়ে এমন ওঠা-পড়াসম্পন্ন নাটক লেখা সহজ নয়। অবশ্য আরও দুটি চরিত্র স্বল্প সময়ের জন্য এসেছে কিন্তু তা রূপায়িত করার জন্য অন্য কোন অভিনেতার আশ্রয় নেওয়া হয় নি। পরাজিত নেতার আত্মগোপনের দিনগুলোতে তাঁর বন্ধুর রক্ষিতা রমনীর সঙ্গে নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত দুটি বিধ্বস্ত নরনারীর জীবনে সামান্য শান্তির সন্ধান দিতে চলেছিল। এক সময়ে মনে হয়েছিল বুঝি বা বিগত ক্ষতলাঞ্ছিত মুহূর্তগুলো নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে। কিন্তু নেতার আকস্মিক ও অভাবনীয় বিজয় সংবাদ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। আসলে এমনটাই ত হয়। মানুষ নিজেই ত নিজের ট্র্যাজেডি রচনা করে। এমন কি সাফল্যের ট্র্যাজেডিও। নাটকের বহু হৃদ্য মুহূর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে নায়িকার আত্মকথনের সেই অংশটুকু, যেখানে সে বলছে আদিবাসীদের বিবাহপূর্ব অনুরাগের রিচ্যুয়ালটি তাকে কেমন অনুপ্রাণিত করেছিল। এবং সে জন্যেই নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে ভয়াবহ ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াতে সে দ্বিধা করে নি। মানবচরিত্রের এমন বিশ্বাসযোগ্য বিশ্লেষণ অনায়াসলভ্য নয়।

পুড়েও যা পোড়ে না সর্বত্র এমন নিটোল নয়। বিশেষ করে শুধুমাত্র বিষ্টুপদ ও অন্যান্য দুয়েকজনের পেশাদারী মঞ্চে যোগদান না করার সিদ্ধান্তের কথা শুনে মঞ্চের মালিকের চলে-যাওয়া কারণগ্রাহ্য হয়নি। কেননা সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী ছিল অমর, অন্য কেউ নয়। অমরবিহীন কোন চরম সিদ্ধান্ত বিষ্টুপদের দল নিতে পারে কি? শর্বরীও কি পারে? আর অমন ধূর্ত মালিকের পক্ষে অন্তত অমরের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাওয়া সঙ্গত হত না কি? তাছাড়া অনিমেষকে ঘিরে বিষ্টুপদদের যে-উষ্মা গড়ে উঠেছিল, তার সমাধানও ঘটেছে সহজ পথে। কিন্তু এহ বাহ্য। আগেই বলেছি, এমন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের নাটক আকচার চোখে পড়ে না।

প্রযোজনার দিক থেকে তিনটি নাটকই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, উপস্থাপনা-রীতির দিক থেকে প্রত্যেকটি পৃথক। মঞ্চ সজ্জার কথাই ধরা যাক। প্রত্যেকটি নাটকে একটি করে সেট ব্যবহার করা হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি সেট রীতির দিক থেকে আলাদা। পুড়েও পোড়ে না-র সেট বাস্তবকল্প। পোড়া মঞ্চের বিশ্বাসযোগ্য চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে তাতে। এমন কি, যবনিকাও অনুপস্থিত রয়েছে। কেননা তা-ও যে পুড়ে গেছে। মঞ্চের আসবাবের যথাযোগ্য প্রয়োগে এসব বিষয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রিসিয়ানরা লম্বা মই নিয়ে মঞ্চে আসতে দ্বিধা করে নি। এবং সেই মইটিকেও অ্যাকটিং
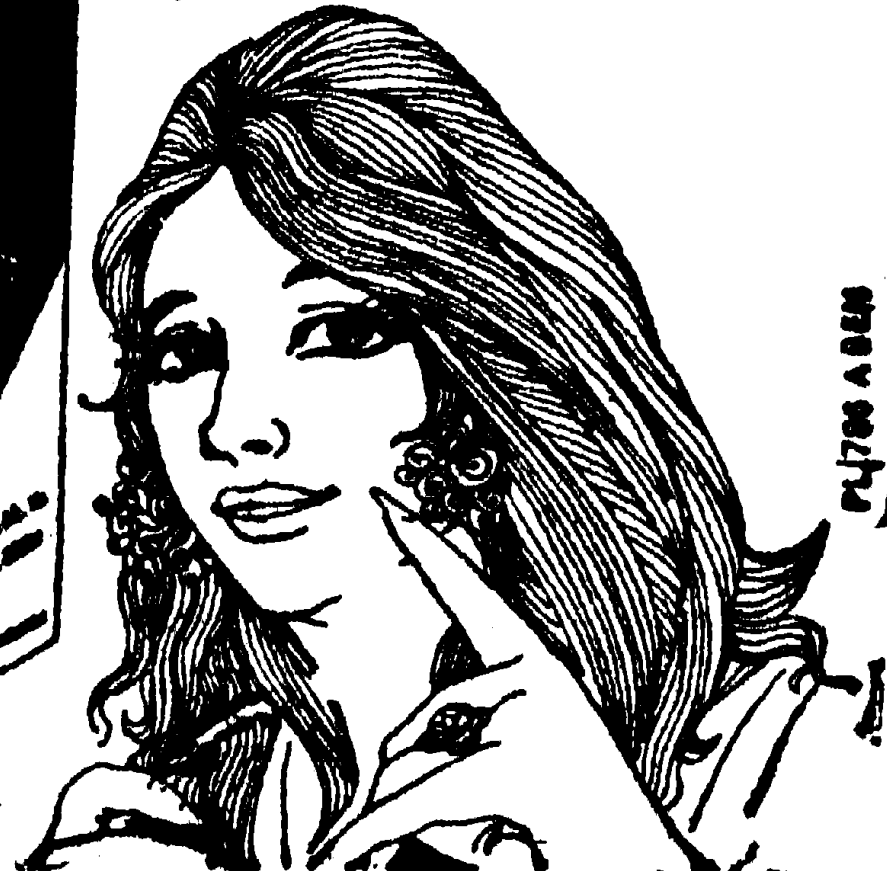
জোন বা অভিনয়ের এলাকা হিসেবে ব্যবহার করতে ভোলে নি। পরাজিত নায়ক-এর মঞ্চে তাৎপর্যপূর্ণ ফ্রেম চরিত্র দুটির অন্দর বাহিরের চেহারা তুলে ধরতে চেয়েছে। এ মঞ্চকে পুরোপুরি বাস্তবকল্প বলা যায় না। বিষবৃক্ষের মঞ্চরীতি এ দুটি থেকে স্বতন্ত্র। তা হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা অপর দুটি নাটকের মত বিষবৃক্ষের দৃশ্য স্ট্যাটিক ছিল না। দৃশ্য থেকে দৃশ্যে দ্রুত সঞ্চরমান নাটকে সঙ্গত কারণেই অন্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সাদা পরদা, বিস্তৃত উঁচু চত্বর, কিছু সিঁড়ি এবং আনুষঙ্গিক উপাদান অনায়াসে কখনো ঘর কখনো সরোবর কখনো বা পথের সংকেত নিয়ে দেখা দিয়েছে। এর ফলে পুরো প্রযোজনায় একটি চলচ্চিত্রের প্রতিভাস গড়ে উঠেছে।

মঞ্চের বিভিন্ন স্থান ব্যবহারের ভেতর দিয়েও পরিচালকদের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাই পুড়েও যা পোড়ে না-তে অনিমেষ অনন্তের বুদ্ধিতে স্টেজের আপ-লিফটে লুকোয়, পরাজিত নায়কে নেতা ফ্রেমের ওপারে দাঁড়িয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে যায়, এবং বিষবৃক্ষে মঞ্চের প্রতিটি অংশ অভিনয়ের এলাকা হয়ে ওঠে। মঞ্চের প্রতিটি আসবাবও ব্যবহৃত হয়েছে অনুরূপ নৈপুণ্যে। প্রসঙ্গত পরাজিত নায়কে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূর করবার জন্য আনা সিঁড়িটির কথা উল্লেখ করা যায়। এ নাটকে ফিল্মের ব্যবহারেও মুনসীয়ানা ধরা পড়েছে। বিশেষত বিপুল জনতার মিছিলকে প্রেক্ষাপটে রেখে নেতার হাত-পা ছুঁড়ে আস্ফালন পুরো বিষয়টিতে একটি গভীরতর মাত্রা এনে দিয়েছে। তবে সম্ভবত প্রোজেক্টরের গণ্ডগোলে কোন কোন ফিল্মের অংশ স্খলিত হয়ে পড়ছিল।

অভিনয়ের জন্য প্রত্যেকটি নাটকের অসাধারণ টিম-ওয়ার্ককে শিরোপা দিতে হয়। তবু তার মধ্যেও বিশেষ করে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমেই বলা যাক, পুড়েও যা পোড়ে না-তে অনন্তের ভূমিকায় পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়ের কথা। এমন অভিনয় সহজলভ্য নয়। তাঁর চলা বলা, হাসি ও নীরব অভিব্যক্তি এমন কি তাঁর ঘণ্টা নাড়ানোর ক্লান্তিও এক কথায় অসাধারণ। দলিলে সই করবার সময় অমর ও অনন্ত আকস্মিকভাবে সাজাহান নাটকের কিছু সংলাপ বলতে থাকে। অমর সাজাহান এবং অনন্ত মহম্মদ। অংশটি নাটকীয়তায় অনবদ্য। সাজাহান অমরের অনুরোধে মহম্মদ বলছে আমাকে মার্জনা করবেন বাবু। এ সামান্য সংলাপটি উচ্চারণে যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি স্পর্শ করেছে তা নাটকের একটি অনন্ত মুহূর্ত। এ সংলাপে বাবু শব্দটির প্রয়োগ মারাত্মক। জনার্দন, অণিমেষ, বায়নাদার প্রমুখ প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল অভিনয় করেছেন।

তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায় সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। দুটি নাটকেই তাঁদের অভিনয় অবিস্মরণীয়। পুড়েও যা পোড়ে না-তে অবশ্য দুজনকেই বয়সের দিক থেকে বেমানান মনে হচ্ছিল। কিন্তু তা দুজনেই পুষিয়ে দিয়েছেন অভিনয়ে। দীপান্বিতার নীরব অভিব্যক্তি, মর্যাদাপূর্ণ চলাফেরা এবং বিশিষ্ট বাচন-ভঙ্গী দুটি নাটকেরই সম্পদ। কখনো প্রাণোচ্ছল, কখনো বিষাদনিমগ্ন তাঁর বলা না-বলা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে পরাজিত নায়কে নেতার প্রস্থানের পর টেলিফোনের আওয়াজ শুনে তিনি সংলাপটি যে-ভাবে বলেছেন তার তুলনা সহজে মেলে না। ব্যর্থতা, ক্ষোভ, বেদনা ও অনুকম্পার মিশ্রণে তা অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তরুণ রায়ের অঙ্গসঞ্চালনে তারুণ্য ছিল, কিন্তু তার চাইতেও তাঁর অভিনয়ের। তিনি অবশ্য সংলাপে দুয়েকবার সামান্য ভুল করে ফেলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল হাত ও চোখের যথাযথ ব্যবহার। বিশেষত তার চোখের নিষ্কম্প গভীর দৃষ্টি অভিনীত চরিত্র দুটির আভ্যন্তরীণ আবেগ ও বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে সংহত করে রেখেছে। চপল বা গম্ভীর যে-কোন মুহূর্তকে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন।

বিষবৃক্ষের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল অভিনেতাদের দিয়ে তৈরি কম্পোজিশন ও গ্রুপিং। এবং এ কম্পোজিশনকে যথাযোগ্য সাহায্য করেছে ফ্রিজ ও মাইমের ব্যবহার। এই ধরনের ফ্রিজ ও মাইম ছাড়া নাট্য কাহিনীর দ্রুত সঞ্চরণ সহজ হত না। তাছাড়া এ পদ্ধতি ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসে বলা যায় এ-দৃশ্যটির কথা যেখানে নগেন্দ্র-কুন্দর বিয়ের সংবাদ শুনে কমল-শ্রীশ গোবিন্দপুরে এসেছে। দৃশ্যটিতে দেখা [illegible] কমলমণি ও সূর্যমুখী এবং আশ-পাশে শ্রীশ ও নগেন্দ্র কথা বলছে। সেন্টারে সিঁড়ির মাঝখানে কুন্দ চুপ করে বসে আছে। এ দৃশ্যে যদি ফ্রিজ ও মাইম ব্যবহার না করা হত তাহলে আবেগ সৃজনের কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যেত না। কম্পোজিশন হিসেবেও এ পরিকল্পনা সুন্দর। বরং কুন্দের মায়ের অশরীরী সংলাপের সময় চক্রাকারে বাল্ব ঘোরানোর ব্যাপারটি অবাস্তব মনে হয়েছে। শুধু মাত্র আলো-ছায়ার সঞ্চরণ ও কণ্ঠস্বরের ক্ষেপণেই তা গ্রাহ্য হত।

অভিনয়ে প্রথমেই নজর কাড়েন কুন্দ-নন্দিনীর ভূমিকায় অনুরাধা রায়। কুন্দের মত ইন্ট্রোভার্ট চরিত্র প্রকাশের জন্য যে ধরনের অভিব্যক্তি দরকার অনুরাধার অভিনয়ে তা অব্যর্থ হয়ে উঠেছে। তাঁর নীরবতা ও অর্ধোচ্চারিত সংলাপ সমান-ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। নগেন্দ্রর তুমি কি আমায় আর ভালবাস না? প্রশ্নের উত্তরে কুন্দর বাসি বই কি কথাটির উচ্চারণ কবিতার সুষমামণ্ডিত। সূর্যমুখীর ভূমিকায় মীনাক্ষি রক্ষিত সুন্দর। জোড় আবেগ ও অভিমান প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। পত্রছাড়া কমলমণি চরিত্র হিসেবে অসম্পূর্ণ, তবু তার মধ্যেও তন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। হীরার ভূমিকায় শিপ্রা বর্মা কিছু নাট্য-মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। তুলনায়, দেবেন্দ্রর ভূমিকায় দীপান্বিতা রায়কে একটু উচ্চ-গ্রামের মনে হয়েছে।

দেবরাজ রায়ের কণ্ঠস্বর ও স্বরের ক্ষেপণ সুন্দর। কিন্তু নগেন্দ্রর হিসেবে তাঁকে অনেক কম বয়েসী দেখিয়েছে। ফলে চরিত্রের গাম্ভীর্য যথাযথ ফুটে উঠতে পারে নি। শ্রীশচন্দ্রের ভূমিকায় গৌতম বসু মানানসই অভিনয় করেছেন।

সূত্রধারের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ভাল। তবে কখনো কখনো মঞ্চের আলো নিভে গেলে তাঁর চলাফেরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। উচ্চগ্রামের বাঁধা নাটক ও টিম ওয়ার্কের ক্ষেত্রে এমন অসঙ্গতি পীড়াদায়ক।

সাতটি প্রধান চরিত্র ছাড়া বাকি অপ্রধান চরিত্রগুলোর আহার্য অভিনয়ে মুখোসের ব্যবহার করা হয়েছে। এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

থিয়েটার সেন্টার সারা বর্ষব্যাপী বিভিন্ন ধরনের বহু অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাইতে অভিনয় ছাড়াও প্রদর্শনী ও সেমিনারের উল্লেখও রয়েছে। আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোর জন্য আগ্রহী হয়ে রইলাম।

অসাবধানী মন্তব্য একাধিক

আন্দামান বরাবরই আমাদের কাছে বিদেশ। কালাপানি, অপরাধ এবং নির্বাসনের সঙ্গেই একমাত্র সম্পর্ক এই দ্বীপপুঞ্জের ভারতবর্ষেরই অঙ্গ এই অঞ্চল। অথচ এর সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার সীমা নেই। তাই আন্দামান ও তার অধিবাসীদের নিয়ে লেখা আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নিয়ে কেউ দ্বিমত হবেন না।

আন্দামান অঞ্চল একটিমাত্র দ্বীপ নয়—দ্বীপপুঞ্জ। দু'শরও বেশী ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সব দ্বীপে মানুষ নেই, কোন কোন দ্বীপ অত্যন্ত ছোট, অধিবাসী যাঁরা আছেন তাঁদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। আদিবাসী, নির্বাসিত আসামীদের বংশধর এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু। এসব অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বিবরণ আলোচ্য বইটিতে আছে। আদিবাসীদের বর্ণনাই গ্রন্থটির অধিকাংশ ভাগ জুড়ে রয়েছে।

আন্দামানে নির্বাসিত অনেক আসামী—নারী ও পুরুষ—মুক্তির পর আর দেশে ফিরে যান নি। আজ তাঁদের বংশধররা স্থানীয় অধিবাসী। এঁদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি নিয়ে একটি অধ্যায় আছে এই গ্রন্থটিতে। এই অধ্যায়টি এই গ্রন্থের মূল্যবান অধ্যায়, আজকের এসব স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কেউ বাঙালী, কেউ বিহারী, কেউ হয়তো মুসলমান, কেউ হিন্দু। আজ তাঁদের বংশধরদের কাছে ধর্ম হয়ে গেছে ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই একই পরিবারে হয়তো দেখা যাবে ভাই হিন্দু, আরেক ভাই মুসলমান। এক ভাই যাচ্ছেন মন্দিরে, আরেক ভাই মসজিদে। কিন্তু এ নিয়ে কোন সমস্যা নেই। ধর্ম নিয়ে যেমন এঁদের ভেদাভেদ নেই। তেমনি জাত-পাত, ভাষা প্রদেশ—ইত্যাদির স্বাতন্ত্র্যও কোন সমস্যা নয়। আজ এঁরা ভুলে গেছেন কে ছিলেন বাঙালী, কে বিহারী, এঁরা এখন আন্দামানি। ভাষা প্রধানত হিন্দী।

দুঃখের বিষয় এঁদের এই সমাজের ক্রমবিবর্তনের পরিচয় এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় না। বরং কিছু অসাবধানী মন্তব্য পাঠককে পীড়িত করে। যেমনঃ শরীরে আসামীদের রক্ত থাকায়, এঁরা (অর্থাৎ স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা) ছিলেন স্বভাবে অপরাধপ্রবণ।

এ ধরণের অসাবধানী মন্তব্য গ্রন্থটিতে আরো রয়েছে। যেমন উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে চাষী সম্প্রদায়ের লোকদেরই এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। উচ্চজাতের লোকেদের পুনর্বাসতি এখানে হয় নি। ফলে অন্য জনসাধারণকে উপযুক্ত নেতৃত্বদেবার মত মানুষ নেই সুতরাং এই উদ্বাস্তু সমাজ যে একদিন প্রগতিশীল সমাজে পরিণত হবে এমন আশা কম। তাই সমাজের মানুষদের নৈতিক মানও উন্নত নয়।

যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এই ধরণের নানা ত্রুটি মন্তব্য গ্রন্থটিতে বর্তমান। আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বিবরণে অথবা দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনায় কোন গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া নেই। লেখিকার নিজস্ব কোন গবেষণা আছে এসব বিষয়ে এমন পরিচয়ও গ্রন্থটিতে মেলে নি। পরিশিষ্টে যে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ রয়েছে তার সূত্র নির্দেশ করা নেই। ফলে কোন তথ্য গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয় পাঠকের পক্ষে তা নির্ণয় করা কঠিন। এসব কারণে গ্রন্থটি কোনমতেই সমাজতত্ত্ব বা নৃতত্ত্বের ছাত্রের উপযোগী গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে পারবে না। সাধারণ পাঠক অবশ্য বইটি পড়ে এই দ্বীপপুঞ্জ এবং তার অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু ধারণা তৈরী করতে পারবেন। তবে তারও অসুবিধে দুটি। এক, গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত দুর্বল। এক-নাগাড়ে ১৬ পৃষ্ঠা বাবু ইংরেজী পড়া খুব কষ্টসাধ্য কাজ। দ্বিতীয়ত আয়তন ও গুণের তুলনায় বইটির দাম খুব বেশী।

গৌতম ঘোষ

The Andamans : Land of the primitives / Bandana Gupta / Jignasa : Calcutta, 1976 / Rupees Twenty-five only./102 pages.

নাটকীয় জীবনের ছবি

রম্যানি বীক্ষ্যের লেখক সুবোধকুমার চক্রবর্তীর এই উপন্যাসটি মূলতঃ আদর্শ-ভিত্তিক। একখানা নাটক নিয়ে শেষ অব্দি গড়ে উঠল জীবন নাট্যের ভূমিকা। জীবন কি নাটক? বোধহয় না। কিন্তু কোনো কোনো জীবন তার নিজস্ব যাপন ভঙ্গীমার গুণেই সম্ভবত কিছুটা নাটকীয় হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসের মূল পাত্র-পাত্রী সাত্যকি ও শাশ্বতী সেই নাটকীয় মাহাত্ম্যকেই চিত্রিত করেছে।

বলতে পারতাম, এই চিত্রিত করার কাজ করেছেন লেখক। কিন্তু না—স্বকীয় মাধুর্যে এই দুই চরিত্র এতই ভাস্বর—লেখক অনায়াসে নিজেকে পর্দার আড়ালে নিভৃতে রাখতে পেরেছেন। এবং নিজেকে নিভৃতে রাখতে পারেন বলেই লেখক কখনো নিভে যান না। কালের দরবারে একেবারে বিশিষ্ট তারকার মতো।

[illegible] প্রয়োজন নেই, বরং আলোচ্য উপন্যাসটির জন্য ভালোবাসা থাকুক। পাঠকের মনের মন্দিরে।

সুবোধবাবুর ভাষা সুন্দর। পারিবারিক ধরণের। এসবের নেপথ্যে একজন বিচক্ষণ পুরুষের মানসিকতা লেখককে ক্রমশঃ প্রিয় করে তুলেছে। বইটির প্রচ্ছদ মোটামুটি। আরো ভালো হতে পারত।

অভীক রায়

একটি নাটক নিয়ে : সুবোধকুমার চক্রবর্তী, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দাম—৯-০০।

চেয়ার ভাবনা

মৃণালকান্তি সাহা

ছোটবেলায় রেলের বুকিং কাউন্টারে যে ভদ্রলোক টিকিট দেয়, তাকে দেখে বড় অবাক লাগত। বাব্বাঃ লোকটা কি লম্বা। না হলে যে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আমার মাথা পৌঁছচ্ছে না, বসে বসে সেই জানলা দিয়ে টিকিট দেওয়া কি সোজা কথা। কৌতূহলে দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেছি, ওমা। লোকটা বসে আছে একটা মস্ত টুলে। এত উঁচু টুল হয়? কই আমাদের বাড়ীতে ত নেই। তবে আমাদের চেনা ডাক্তারখানায় ওরকম উঁচু টুলে বসে ওষুধ তৈরী করতে দেখেছি কম্পাউন্ডার বাবুকে। পরে বয়স হয়েছে, দেখেছি বিভিন্ন মাপের বিচিত্র চেয়ার। এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি, আমি, সবাই উপলব্ধি করতে পারি যে, যেসব কাজের জন্য চেয়ারের প্রয়োজন হয়, তার সবগুলি একই ধরণের চেয়ারে বসে করা সম্ভব নয়। এর জন্যই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য, বিভিন্ন আকৃতির চেয়ার। তবে সে কাজ যেমন একদিনে হয়নি এবং বলতে গেলে কোন চেয়ার নির্দিষ্ট কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তার অনুশীলন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ আজও হয়নি। দেশের শত শত প্রযুক্তিবিদ এবং কুশলীরা ব্যস্ত রয়েছেন এই অনুশীলনে। চেয়ারের উচ্চতা, হাতলের উচ্চতা, হেলান দেওয়ার জায়গার পরিমাপ এবং আরও খুঁটিনাটি মাপজোপের প্রয়োজন হয়, একটি উপযুক্ত চেয়ার তৈরির জন্য। যে যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ নেওয়া হয়, তার নাম অ্যানথ্রোপোমিটার। স্বভাবতঃই বারে বারে এই মাপ নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয় বলে, মোটামুটি একটা তথ্যের তালিকা করা হয়েছে, যে এই মাপের মধ্যে হলে চেয়ারের উচ্চতা এতটা হবে।

যে অ্যানথ্রোপোমেট্রিক ডাটা বা তথ্যগুলি আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়, তার বেশীর ভাগই বিদেশী তথ্য। কিন্তু সেই মাপের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের মাপের পার্থক্য থেকে যাচ্ছে এবং কাজ করতে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এমন কি ভৌগোলিক অবস্থিতি অনুসারে আমাদের এই ভারতবর্ষেই এক প্রদেশের মাপের সঙ্গে অন্য প্রদেশের মাপের পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশে সবচাইতে উঁচু মাপ দেখা গেছে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের ও ক্ষুদ্রতমের মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা, (আমাদের দেশের চেয়ারের সাধারণ উচ্চতা ১৬ই ইঞ্চি কিংবা ৪১ সেঃ মিঃ)।

বোম্বের একটি কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের ছাত্রদের (বয়স ২ থেকে ৫) উপযুক্ত চেয়ার টেবিলের নকসা করতে গিয়ে, প্রচলিত তথ্যের সাহায্য নিয়ে কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হলেন ভি পি বাপাত, যিনি যুক্ত আছেন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন সেণ্টার—ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির (বোম্বাই) সঙ্গে। তিনি চিন্তা করলেন, শুধু আরামদায়ক আসন তৈরি করলেই চলবে না। দেখতে হবে তাদের ভঙ্গী যেন ঠিক থাকে, তাতে যেন কোন রকম বিকৃতি না আসে, যা নাকি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে এবং সেই সঙ্গে লেখার সুবিধা, ব্ল্যাক বোর্ড দেখার সুবিধা ইত্যাদি। এই সব চিন্তার এবং প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই তৈরি হল একটি নতুন ধরণের অ্যানথ্রোপোমিটার। যার সাহায্যে অতি সহজেই সমস্ত প্রয়োজনীয় মাপ—যা নাকি চেয়ার টেবিল তৈরি করতে লাগে, খুব কম সময়ে অর্থাৎ মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে বের করা যাবে। এই নতুন অ্যানথ্রোপোমিটার তৈরির সমস্ত কৃতিত্বই শ্রীবাপাতের। এই যন্ত্র যে আসবাব তৈরির নকসার ক্ষেত্রে অশেষ উপকার করবে, তার জন্য আমরা তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাচ্ছি।

নতুন অ্যানথ্রোপোমিটারে আছে একটি ৩০×৩০×৩০ সেঃ মিঃ বাকস। যা নাকি বসান আছে ৮৬×৬০ সিঃ মিঃ মাপের একটি কাঠের তক্তার উপর। বাকসের উচ্চতা একই রাখা হয় এর কোন হেরফের করা হয় না। এই বাকসটি আসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর ঝুলন্ত পা ছুঁয়ে থাকে পা রাখবার জায়গা বা ফুটরেস্ট, পা রাখার জায়গাটিকে জমি হিসেবে ধরা হচ্ছে এবং এটিকে বিশেষ স্প্রিং-এর সাহায্যে ওঠান নামান যায়। বসার আসন থেকে পা পৌঁছোনো জমি পর্যন্ত হল চেয়ারের উচ্চতা। আগে যে বাকসের কথা বলেছি তার সংগে খাড়াখাড়ি বসান আছে একটি ধাতু দণ্ড, সেই ধাতু দণ্ডের গায়েই খোদাই করা আছে স্কেল, যার সংগে সংযুক্ত আছে কয়েকটি স্লাইডিং দুর বা বাহু। এই স্লাইডিংবারগুলি উঠিয়ে নামিয়ে প্রয়োজনীয় মাপ নেওয়া হয়। এ ছাড়া ধাতু নির্মিত আলাদা আরও একটি স্কেল থাকে অন্যান্য মাপ নেওয়ার জন্য।

আপনি একটি চেয়ারে কি ভংগীতে বসবেন। এর উত্তর নিশ্চয় হবে না যে, আপনি হাঁটু মুড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসবেন। সবচাইতে আরামদায়ক বসা হবে সেটাই, যখন আপনার পিঠ আপনি ছেড়ে দেবেন হেলান দেওয়ার জায়গায় পা ছুঁয়ে থাকবে মেঝে এবং আপনার পা ও উরু সমকোণে অবস্থান করবে। এই ভংগীতে আপনি আসনের সংগে আপনার দেহের অধিকতম সংযোগ ঘটাতে পারবেন। আমরা চেয়ারে বসার ফলে আমাদের নিম্নাংগের বেশীর ভাগ চাপটাই আসনের ওপর পড়ে এবং গতি সূত্র অনুযায়ী সেই চাপ আমাদের আসন আবার ফিরিয়ে দেয় এর ফলে যে স্থির ভার এর সৃষ্টি হয়। সময় বিশেষে তা আমাদের বিশেষ অসুবিধা ঘটায়। একভাবে বেশীক্ষণ বসে থাকলে পায়ে ঝিঁঝি ধরে। এর সরল অর্থ হল সেই দেহের চাপ এবং চেয়ারের ফেরৎ চাপের ফলে উরু এবং নিতম্বের রক্ত চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় আর আমরা যখন একই ভংগীতে বসে থেকে উঠি বা জায়গা পরিবর্তন করি তখনই আবার চালু হতে থাকে থেমে যাওয়া রক্ত। সেই সময় মাটিতে পা ফেলা যায় না, পা ঝিনঝিন করে, আবার রক্ত চলাচল পুরোপুরি সচল হলেই সব ঠিক হয়ে যায়। অনেক শয্যাশায়ী রোগীর দেখা যায় পিঠে পায়ে, শুয়ে থাকতে থাকতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার কারণ একই ভংগীতে শুয়ে থাকার ফলে শরীরের ওই অংশের রক্ত চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

যেকথা বলছিলাম বসার জায়গা যতটা বেশী হবে দেহের নিচের অংশ ততটা ছড়িয়ে থাকতে পারবে ফলে স্থির চাপ-এর অনুভূতি কম হবে বসাটা আরামের হবে। চেয়ার অনুযায়ী একটি খাটো লোক তার অনুপাতে বড় চেয়ারে বসে কি করবে? ঠিক তিনি ঝুলন্ত পায়ের অস্বস্তি কাটাবার জন্য পা মেঝেতে লাগানোর চেষ্টায় সামনের দিকে এগিয়ে আসবেন, চেয়ারের সামনের দিকের জায়গাটা তার মাঝ উরু বরাবর যে নরম টিস্যুগুলি আছে তার ওপর অধিক চাপ সৃষ্টি করবে যা নাকি হাঁটু এবং পায়ের ব্যথার কারণ হতে পারে। এক-দুদিন ঐভাবে বসলে সাময়িক ব্যথা হয়ে সেরে যেতে পারে কিন্তু বরাবর অনুরূপভাবে বসার ফলে স্থায়ী বেদনার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুপযুক্ত চেয়ার অনেক সময় বসার ভংগীকে বিকৃত করে। দেখা গেছে আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে যে কশেরুকা আছে, দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বসে থাকলে অন্তবর্তী কশেরুকার মধ্যে বেশী চাপের সৃষ্টি হয়। বিকৃত বসার ভংগী সেইজন্য পিঠের এবং মেরুদণ্ডের ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আজকের দিনে অফিসে বাড়িতে কিংবা অন্য কাজে প্রত্যেককেই অনেকটা সময় চেয়ারে বসে থাকতে হয়। আর বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন রকমের চেয়ারের যে কতটা প্রয়োজন সেটা সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

যাকে অন্তত ছয় থেকে সাত ঘণ্টা টানা চেয়ারে বসে লেখালেখির কাজ করতে হয়, তার চেয়ার অবশ্যই একটু প্রশস্ত হওয়া দরকার সেই সংগে মাঝে মাঝে হেলান দিয়ে বসার জন্য হেলান দেয়ার জায়গাটি মোটামুটি আরামদায়ক হওয়া একটু চওড়া অর্থাৎ কাঁধের মাপের অনুপাতে হওয়া দরকার। হেলান দেওয়ার অংশটি পুরোপুরি থাকলে আরাম বেশী হয় কিন্তু আমাদের মত গরম দেশে হাওয়া চলাচলের জন্য সাধারণত চেয়ারের পেছনের নিচের অংশটি খোলা রাখা হয়।

যারা টেলিফোন অপরেটিং-এর কাজ করেন তাঁরা কিন্তু হেলান দেওয়ার সুযোগই পান না, সর্বক্ষণই তাদের সামনের দিকে ঝুঁকে কাজ করতে হয় অতএব আসনটিকে যদি সামনে পেছনে নামানো ওঠানো যায় তবে তাঁদের কাজের এবং বসার সুবিধা হবে।

ডাকঘরে কিংবা অন্যান্য অফিসে যাদের বাছাবাছির কাজ (সর্টিং) করতে হয় তাদের টেবিলটি হয় মস্ত বড় আর চেয়ারে বসেই তাদের সারা টেবিলটির ওপর হাত চালাতে হয়। কাজটা খুব সহজ নয়, অতএব তাদের চেয়ারের পায়ার সংগে চাকা লাগানো থাকলে আগুপিছু করে বা পাশের দিকে সরিয়ে কাজ করার সুবিধা পাওয়া যায়।

সুতরাং যদি বলি, চেয়ার শুধু চেয়ারই। যে কোন একটায় বসলেই হল। দু-পাঁচ মিনিটের জন্য বসলে হয়ত চেয়ার শুধু চেয়ারই, কিন্তু জীবনের অনেকটা অংশ যে চেয়ারটির ওপর বসে কাটাতে হবে, সেই চেয়ারটি কিন্তু শুধু চেয়ার হলেই চলবে না।

নক্ষত্রজগতে সূর্য গ্রহণ

এবার সূর্যগ্রহণের আগে চারদিকে ছিল বেশ উত্তেজনা। কারণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে পূর্ণগ্রাস দেখা যাবে বলে জানা ছিল—যা গত ৮২ বছর পর এই প্রথম। বিজ্ঞানীদের কাছে এধরনের সুযোগ খুব কমই আসে। তাই বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এসে মিলিত হয়েছিলেন পুরী, কোনারক ও আরও নানা জায়গায়।

প্রকৃতির সংগে নিবিড়ভাবে যুক্ত গাছ-পালা, পশু-পাখি স্বভাবতই প্রাকৃতিক পরিবর্তনে সাড়া দেবে—এটাই সাধারণ নিয়ম। কাজেই গ্রহণের সময় সাময়িক আবহাওয়ার পরিবর্তন—যেমন আলোর তারতম্য,

তাপমাত্রায় পরিবর্তন বা বিশেষ আলোক-রশ্মির গুণে প্রাণীদেহের কোনও পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়। একই কারণে জীব-জগতে আচার ব্যবহারের তারতম্যও ঘটতে পারে। এই কারণে গ্রহণের সময় পশু-পাখির আচার-ব্যবহার বিশেষ করে জানবার জন্য আমরা একটি পরিকল্পনা নিয়েছিলাম।

ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় ২০ কিঃ মিঃ উত্তরে নন্দনকানন। প্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশে এখানে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি রয়েছে। একই এলাকায় নানা ধরনের পশু-পাখির আচার আচরণ লক্ষ্য করা যাবে এবং যে অঞ্চলটি প্রায় গ্রহণ-রেখার সঙ্গে রয়েছে —এইসব কারণে আমরা নন্দনকাননকে গ্রহণের কয়েকদিন আগে থেকে আমাদের লক্ষ্যস্থান হিসাবে নির্বাচন করলাম।

আগে থেকে চিঠি দিয়ে নন্দনকাননের ভেতরে কটেজে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। গ্রহণের আগের দিন আমরা ওখানকার যাবতীয় জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখির আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে যথাসম্ভব সেগুলোর মুভী ফটো এবং টেপরেকর্ডে শব্দ রেকর্ড করবার ব্যবস্থা করলাম। বিশেষ করে যে সময় গ্রহণ চলবে—সেই সময়ই বিভিন্ন প্রাণীর আচার-আচরণ লক্ষ্য করে ওদের ফটো নিয়ে রাখলাম। ১৬ ফেব্রুয়ারী গ্রহণের দিন। গ্রহণের আগে, গ্রহণ চলাকালীন সময়ে ও গ্রহণ ছাড়ার পরও যাতে বিভিন্ন পশু-পাখির ব্যবহারিক পরিবর্তন লক্ষ্য করার সুবিধা হয় সেজন্য সমস্ত নন্দনকানন এলাকাকে নিজেদের ভেতর ভাগ করে নিলাম। আলোর পরিমাণের তারতম্যের সঙ্গে স্পর্শকাতর এমন বিশেষ কয়েকটি পশু পাখি গাছের পাতা ও ফুলকে আলাদা করে বেছে নেওয়া হল, যাতে এদের উপর বিশেষ নজর দেওয়া যায়।

নন্দনকাননে ২-৩৫ মিনিটে গ্রহণ শুরু হয়। নিম্নাংশ থেকে ধীরে ধীরে সূর্য খন্ডিত হতে থাকে, ক্রমে বেলা ৩-৫১ মিনিট নাগাদ সবটাই প্রায় ঢাকা পড়ে সামান্য চুলের মত একটু অংশ দর্শকদের দিক থেকে ডান দিকে থেকে যায়, ফলে পূর্ণগ্রাস থেকে এ অঞ্চল বাদ পড়ে। সকাল থেকেই এখানে আবহাওয়া ভাল ছিল, আকাশ পরিষ্কার, বেশ জোরে হাওয়া বইছিল দক্ষিণ দিক থেকে। বেলা ৩-৫১ মিনিটে অর্থাৎ সূর্যের অন্তিম অবস্থায় হাওয়ার গতি কিছুটা বেড়ে গেল, স্বভাবতঃই আলো ছিল খুবই কম, পূব আকাশে বেশ কয়টি তারা দেখা দিল। আমরা একজন গ্রহণের আগে পত্রিকা ও আকাশবাণী মারফত বহুল প্রচারিত সতর্কতা অমান্য করে খালি চোখেই (অবশ্য একটি চোখ ব্যবহার করে) সূর্যের অবস্থা লক্ষ্য করছিলাম। সূর্যের অন্তিম অবস্থায় চারদিক যেন অনেকটা স্তিমিত ফিকা হলদে আলোতে উদ্ভাসিত হলো, এ অবস্থায় তাপমাত্রাও প্রায় (৪) চার ডিগ্রীর মত নেমে এল। এর কয়েক মিনিট আগে থেকেই দাঁড়কাক (এখানে অনেক দাঁড় কাকের বাস) পাতিকাক কা-কা শব্দে উড়ে বাসার দিকে চলতে শুরু করলো এবং একই সময় অনেক বক ওদের চড়বার এলাকা থেকে উড়ে এসে গাছের ডালে বসলো। আমরা কাল বিলম্ব না করে বিভিন্ন পশু-পাখির আচার ব্যবহার লক্ষ্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

সম্বর সূর্যের দিকে তাকিয়ে (১৬-২৪০) সময় ৩-৩০

প্রায় মিনিট খানেক পরই সূর্যের আলো ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করলো। সূর্য স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল প্রায় ৪-৫০ মিনিটে। এর পরও প্রায় ১ ঘন্টা সূর্যালোক ছিল সেদিন ঐখানে সূর্যাস্ত হয় প্রায় ৫-৪০ মিনিটে।

গ্রহণ চলাকালে যেসব জন্তু-জানোয়ারের আচার-ব্যবহারে কিছুটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে তাদের ভেতর রয়েছে, উল্লুক, সম্বর, পিপীলীকা-ভুক প্রাণী, এছাড়া পাখিদের ভেতর কাক, বক, হাঁস প্রভৃতি। নন্দনকাননে সম্পূর্ণ খোলা ছোট একটি দ্বীপের মত জায়গায় দুটি উল্লুকের বাস। মাঝখানে পাতাবহুল গাছে ও পাশে রাখা ঝুলন্ত দোলনায় সারাদিন খেলা দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেয় এরা। গ্রহণের দিন সূর্যের আলো কমে আসার সঙ্গেই এরা গাছে পাতার ফাঁকে বিশ্রাম নিল। অবশ্য গ্রহণ কেটে যাওয়ার আগেই অর্থাৎ আলোর পরিমাণ প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসতেই এরা এদের স্বাভাবিক আচরণ দেখাল। গ্রহণের সময় এখানকার সম্বরদের আচরণও বেশ মজার। আলো কমার সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো সম্বর একজোট হয়ে এদের এলাকার পশ্চিম ধারে এসে যেন অবাক হয়ে (সমস্ত সতর্ক বার্তা উপেক্ষা করে খালি চোখে) সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। এখানকার হরিণগুলো প্রায় একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রহণের জন্য প্রায় অন্ধকার হয়ে আসাতে কয়েকটি হরিণ ওদের খাবার খেতে শুরু করেছিল—সন্ধ্যে হয়েছে ভেবে।

কাক, বক, হাঁস-এদের ভেতর কাক ও বক সূর্যের অন্তিম অবস্থায় হঠাৎ দিন অবসান ভেবে বাসায় ফিরছিল—আবার আলো বাড়ার সঙ্গে ক্রমে সবাই উড়ে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়লো। নন্দনকাননের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোণার দিকে একটি বড় গাছে সেদিন পড়ন্ত বেলায় (৪-৩০) কাকদের একটি মিটিং বসেছিল। অবশ্য কাকের মিটিং-এর সঠিক 'আজেন্ডা' বা সিদ্ধান্ত কোনটিই বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও পরিষ্কার নয়। এছাড়া গ্রহণের সময় বিভিন্ন রকমের হাঁস ঠোঁট পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিব্বি বিশ্রাম নিচ্ছিল। আলো ফিরে আসতে এরা জলে নেমে চলাফেরা শুরু করে।

এক ধরনের স্তনপায়ী—পিপীলিকা-ভুক যারা সারাদিন কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়—নন্দনকাননে এদের তিনটির ভেতর দুটি গ্রহণের সময় সামান্য সময়ের জন্য কুন্ডলীমুক্ত হয়েছিল—আধ ঘন্টা পরে কিন্তু এদের আবার কুন্ডলীপাকানো অবস্থায় দেখা গেল। নন্দনকাননে যে কয়টি ভোঁদর আছে সেগুলো দিনে সাধারণতঃ বিশ্রাম নেয়। গ্রহণের সময় কিন্তু আলোর স্বল্পতায় এরা সন্ধ্যে হচ্ছে ভেবে বেরিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর আলোর পরিমাণ বাড়তে আবার গর্তে চলে যায়।

গ্রহণে গাছের পাতা, ফুল ইত্যাদির ওপব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। লজ্জাবতী, শিম্বজাতীয় যেমন বাঁদর লাঠি, কৃষ্ণচূড়া, গাছের পাতায় গ্রহণ শেষ হওয়ার প্রায় আধ ঘন্টা আগেই সন্ধ্যার সময়ের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, অর্থাৎ এসব গাছের পাতা গুটিয়ে গিয়েছিল। এসব গাছের পাতার বোঁটার গোড়ায় পালভিনাস থাকে, যেগুলো আলোর তারতম্যে [illegible]

স্পর্শকাতর। এরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় পাতায় কোষমধ্যস্থ জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে ফলকের বিস্তার ও সঙ্কোচন ঘটায়। গ্রহণের শেষদিকে আলোর পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ায় লজ্জাবতী ও অন্যান্য শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের পাতাগুলি ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ খুলে যেতে দেখা যায়।

নন্দনকাননের পূব দিকের লেকের ধারে কলমী গোষ্ঠীর হাল্কা বেগুনী রংয়ের ফুল সাধারণতঃ সূর্যের দিকে পাপড়ি মেলে রাখে। গ্রহণ শুরু হওয়ার কিছু পরেই পশ্চিমমুখো হয়ে পাপড়ির প্রান্ত শুকিয়ে গেল। গ্রহণের পরও এর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না।

পশু পাখি, গাছপালা ও ফুলের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া যা গ্রহণের সময় দেখা গেল, সম্ভবতঃ সেগুলো আলোর পরিমাণ ও তাপমাত্রার তারতম্যের জন্যই ঘটেছে। গাছপালা, পশুপাখির এইসব পরিবর্তনের পেছনে যদি সূর্যের অন্য কোন রশ্মির কোন প্রভাব থাকেও সে ব্যাপারে আমরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

আশুতোষ চক্রবর্তী;
প্রবীরকুমার গাঙ্গুলী।

কলকাতায় ক্লী; কান্দিনস্কী ও চারজন

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটিকে ধন্যবাদ তাঁরা কলকাতাস্থ পশ্চিম জার্মান কনস্যুলেটের সহযোগিতায় ক্লী, কান্দিনস্কী প্রমুখ ছ'জন বাঘা বাঘা শিল্পীর এক সার্থক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীটি ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নানা কারণেই প্রদর্শনীটি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। প্রথমতঃ ক্লী বা কান্দিনস্কীর ছবির প্রিন্ট কখনো সখনো দু-একটা কলকাতার ছিটকে এলেও একই সঙ্গে এতগুলো কাজ দেখার সৌভাগ্য আমাদের কখনোই হয় নি। দ্বিতীয়তঃ ক্লী বা কান্দিনস্কীর যে সব ছবির সঙ্গে আমরা সাধারণত পরিচিত তার অধিকাংশই তাঁদের শেষ দিককার কাজ। আলোচ্য প্রদর্শনী সেই গোত্রের কিছু কাজ থাকলেও, তাঁদের প্রথম দিককার শিল্পকর্মও স্থান পেয়েছে। ফলে দর্শকের পক্ষে তাঁদের শিল্প পরিণতির একটা বিবর্তন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয়তঃ এই প্রদর্শনীর সর্বাধিক গুরুত্ব এই কারণে, যে ছ'জন শিল্পীর কাজ দেখানো হয়েছে, তাঁরা সকলেই 'ব্লু-রাইডার' নামক একটি দলের সভ্য ছিলেন। এবং ঐ দলের সদস্য-সদস্যা থাকাকালীন তাঁদের শিল্পকর্মের কিছু নজীরও এই প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেয়েছে। ব্লু-রাইডার গ্রুপের কোনো প্রদর্শনী কলকাতায় এর আগে কখনো হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

ব্লু-রাইডার দলের একটা ইতিহাস আছে। যদিও এই দল স্বল্পায়ু হয়েছিলো

ইমপ্রোভাইজেশন নং ১৯
কান্দিনস্কী

তবুও জার্মান শিল্পের ইতিহাসে বা সামগ্রিকভাবে আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাসবেত্তাদের কাছে এর মূল্য কিছু কম নয়। কারণ এই দলের বেশ কয়েকজন শিল্পী বিমূর্ত নন্দনকলার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন।

এই শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ার বহু শিল্পী ফ্রান্স বা জার্মানীতে চলে এসেছিলেন। তাঁরা নিয়মিতভাবে এই দুটি দেশে বসবাস করতেন, শিল্পচর্চা করতেন, আবার কখনও কখনও স্বদেশেও ফিরতেন। এই শিল্পীদের অনেকেই সমকালীন বিমূর্ত চিত্রকলার আদিপুরুষ। এই শিল্পীদের প্রায় সবাই পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। দুটি একটি এখনও বেঁচে আছেন যেমন মার্ক শাগাল। মেলেভিচ তো অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। কান্দিনস্কীও রাশিয়ান। তিনি এবং আলেকসি জলেনস্কী মিউনিখ শহরে চলে এসেছিলেন এবং সেখানে জার্মাণ শিল্পী ফ্রানজ মার্ককে নিয়ে ১৯১২ সালে ব্লু-রাইডার নামক একটি দলের গোড়াপত্তন করেন। তার আগেও অবশ্য কান্দিনস্কী তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে নিউ আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন নামক একটা দল তৈরী করেছিলেন। আসলে প্রথম দলটিই পরে বড় সড় হয়ে ব্লু-রাইডার নাম নেয়। তখন তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন গাব্রিয়েল ম্যুনটের, অগাস্ট ম্যাক, পল ক্লীর মত শিল্পীরা। এঁদের স্বপ্ন ছিলো তৎকালীন স্বীকৃত শিল্পের পরিবর্তে একটা নতুন কিছু করা। শিল্পের একটি নতুন দিক উন্মোচিত করা।

স্টীল লাইফ উইদ ব্যাকভাস : জলেনস্কী

কান্দিনস্কী ও ক্লীর ক্ষেত্রে সেই স্বপ্ন বহুলাংশে সফল হয়েছে।

ব্লু-রাইডার নামের পেছনেও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। মার্ক ও কান্দিনস্কী দুজনেই নীল রঙ খুব পছন্দ করতেন। এর ওপর মার্ক-এর অনুরাগ ছিলো ঘোড়ার ওপর, আর কান্দিনস্কী আঁকতে ভালো বাসতেন ঘোড়সওয়ার। নীল রঙ, ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার—ব্লু-রাইডার নামের সঙ্গে এই দুই শিল্পীর এই বর্ণ ও প্রতীকি অনুরাগের সত্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

অন্যান্য শিল্পীরা

ক্লী আর কান্দিনস্কীর কথা বার বার বলছি তার অর্থ এই নয় প্রদর্শনীর অন্যান্য শিল্পীরা হেলাফেলা। জলেনস্কীর কথাই ধরা যাক। পুরো নাম আলেকসি ফন জলেনস্কী (১৮৭৪—১৯৪১)। প্রদর্শনীতে যে সব কাজের নমুনা ছিলো তার থেকে এই শিল্পীর গভীর রঙের প্রতি অকৃত্রিম মমত্বই প্রমাণিত হয়। রং আবার মৌল, রং মিল-মিশ খুব পছন্দ করতেন না। 'স্টীল লাইফ উইদ ব্ল্যাক ভাস' ছবিতে দেখি সাদা, কালো আর গোলাপী। প্রত্যেকটি বর্ণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত। কেউ কারও সীমা লঙ্ঘন করে নি, অথচ এক সুন্দর ঐকতান তৈরী হয়েছে। যেভাবে পটকে কোনাকুনি ভাগ্গা হয়েছে তার মধ্যেও শিল্পীর মৌলিকত্ব আভাষিত। 'হাউস ইন দ্য ট্রীস'-এ নির্মিতির খেলা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সবুজ, নীল ও লাল রঙে করা এই ছবিটিতে দ্রষ্টব্য একটি সেকেলে বাড়ী। চারপাশের গাছপালা এমন জরুপায়িত ভঙ্গীতে বাড়ীটিকে ঢেকে রেখেছে যে সহজেই দর্শক মনে এক রহস্যের ভাব ঘনীভূত হয়। হলুদে-কালোতে 'দ্য স্পানীশ ওম্যান' এক শক্তিশালী কাজ। বর্ণ এখানে ফর্মের অন্তর্নিহিত সত্তাটিকে অতি সহজেই বাইরে টেনে এনেছে।

কান্দিনস্কীর প্রথম দিককার কাজে, অর্থাৎ ১৯০৭-৮ পর্যন্ত যে সব কাজ সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়েছে, তাতে একদিকে লক্ষ্য করা যায় রূপদী শিল্প, ফ্রেস্কো, স্টেইনড গ্লাস অন্য দিকে ইমপ্রেশনিসম-এর পরোক্ষ প্রভাব। এসব কাজে আকারকে প্রথাগতভাবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। ডিটেলের প্রতি অসাধারণ নজর। 'রাইডিং কাপল' এবং 'দ্য কালারফুল লাইফ-এ' (১৯০৭) এই বৈশিষ্ট্য-গুলি সোচ্চার। কাজ দুটিও অনবদ্য। বলতে দ্বিধা নেই তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের বিমূর্ত ধারার অনেক নামী-দামী কাজের চেয়েও উপরোক্ত ছবি দুটি আমার ভালো লাগে। কারণ ঐ দুটি ছবিতেই আছে চিরন্তন সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা। ১৯০৯ থেকে তাঁর কাজে দেখা গেছে বিশেষ পরিবর্তন। আকৃতিতে খুঁটিনাটি, তথ্য এই সময়কার ছবিতে কম জরুরী হয়ে পড়েছে। রঙই ফর্ম-এর জায়গা দখল করেছে। 'চর্চ এট মারনো' বা 'ইমপ্রোভাইজেশন-১৯' এই জাতের কাজ।

ক্রীর কাজেও প্রথম দিকে অন্যতরো মেজা ছিলো। কখনো একটু কিউবিস্ট ধাঁচের কাজ করেছেন। ফরমকে দোমড়ানো, মোচ-কানো। কখনো ক্যানভাসে রং ছড়িয়ে হোলি খেলেছেন। প্রথম দিকের কাজের মধ্যে 'গার্ডেন ভিসন'কে আমার অসাধারণ মনে হয়েছে। কাঁটা ঝোপ ও তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরের বাগানকে বাইরের থেকে কেমন দেখায় তার অনবদ্য বিবরণ তিনি পেশ করেছেন। বিষয় সহজ। কিন্তু রূপ দিতে গেলে কস্তুরী খুলে যায়! ১৯২৫ সালের পর থেকে তাঁর কাজের ধারা আমূল বদলে যায়। বস্তুর মৌল ও আদি রূপকে ছেলেমানুষী রেখার মাধ্যমে কিভাবে ধরা যায় তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথা ব্যাথা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। 'ব্লাক মাস্ক' এই প্রচেষ্টার সার্থক ফসল।

অগাস্ট ম্যাক (১৮৮৭—১৯১৪) 'টিউনিশিয়ান ল্যান্ডস্কেপ'— জাতীয় কাজে যতটা সার্থক অন্যত্র ততটা নয়। 'দ্য ডানকি রাইডার' তাঁর শক্তিশালী কাজ। অল্প বয়সে ফ্রান্সে লড়াই করতে করতে ও'র মৃত্যু না হলে, একজন বিরাট শিল্পীকে আমরা পেতাম। ম্যুনটের আমায় তেমন টানেন নি। মার্কের কাজের যে চারিটি নমুনা প্রদর্শনীতে ছিলো তাতে বিমূর্ত শিল্পের বিশুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর গভীর প্রতীতির কথা উচ্চারিত।

স্বরাজ মজুমদার

হাল্কা চালে একক ক্রিকেট

অজয় বসু

ইডেন থেকে মোহনবাগান মাঠ। টেস্ট খেলার আঙিনা ছেড়ে একক ক্রিকেটের আসরে সরে আসতে পেরে কলকাতা নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করতে পেরেছিল।

টেস্ট খেলা বড়ই গুরুগম্ভীর ব্যাপার। যেমন এলাহী আয়োজন, তেমনি ক্রেতার চাপাচাপি ভিড়। হাত-পা ছড়িয়ে কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে বসবার সুযোগ পর্যন্ত নেই। খেলোয়াড়েরাও টেস্টের নামে টেনশানে ভোগেন। মর্যাদার লড়াই লড়তে করতে তাঁরা কেমন যেন এক অভিনব মানসিকতা সম্বল করে মাঠে নামেন। খেলতে নেমেও তাঁরা রাখতে চান নিজেদের গুটিয়ে। লক্ষ্য শুধু সময় কাটানোর রান তোলা নয়। উইকেটে নিজেদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখা, ব্যক্তি-ত্বের বর্ণচ্ছটায় মাঠকে ভরিয়ে তোলা নয়।

টেস্ট খেলার নাম করে অধুনা নামী নামী ক্রিকেটাররা পর্যন্ত শুধু যেন নিজেদের ধৈর্যের বহর দেখিয়ে দর্শকদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে বসেন। সে পরীক্ষায় দর্শকেরা পাশ নম্বর প্রান বটে। কিন্তু নিরুত্তাপ অনুষ্ঠানের সাক্ষী সেজে অজস্র প্রহরগুলি কাটিয়ে দেওয়ার অবকাশে মনের দিক থেকে তাঁরা যেন নিঃস্ব হয়ে পড়েন। যা তাঁরা পেতে চান, যা পাওয়ার আশায় মাঠমুখী ছোটাছুটি তাঁদের তা বড় একটা ভাগ্যে জোটে না।

একক ক্রিকেটের মেজাজ কিন্তু একে-বারেই ভিন্ন প্রকৃতি। সেখানে সদাই সক্রিয়তা। মার মার হুংকার তুলে রানের পিছু ধাওয়া করা। একের সঙ্গে আর এক-জনের দ্বন্দ্ব। ব্যাট বল হাতে নিয়ে সেই দ্বন্দ্বের ফয়সালা করে নেওয়ার সময় কেউ কিন্তু টেনশানে ভোগে না। কেউ মনেও করেন না যে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এই ক্রিকেটী সংগ্রাম হল মর্যাদার লড়াই।

মর্যাদার প্রশ্নটি তুলে রেখে প্রতি-যোগীরা মুখোমুখি হন। টেস্ট ম্যাচের গাম্ভীর্য গা থেকে ঝেড়ে ফেলে হালকা হতে চান। এবং তাঁরা যতোই হালকা চালে চলতে থাকেন, ততোই স্ফূর্তিবাজ আবহাওয়ার মোলায়েম বাতাস বইতে থাকে গ্যালারিতে। হালকা চালে খেলতে খেলতে প্রতিযোগী-রাও খেলার মজায় মেতে ওঠেন। এবং সেই খেলা দেখতে দেখতে দর্শকেরাও মজায় মজে যান। টেস্ট ম্যাচের টেনশান ভোলাতে এমনি এক মজাদার অনুষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন ছিল। কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব সে-প্রয়োজন মিটিয়ে কলকাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ইডেনে ভারত-পাকিস্তানের ষষ্ঠ বা শেষ টেস্ট ম্যাচ সাঙ্গ হওয়ার ঠিক পরেই ময়দানে একক ক্রিকেটের আসর বসানো হয়েছিল বলেই অনুষ্ঠানটি দর্শকদের কাছে সবিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছিল।

পাঁচদিন ধরে টেস্ট খেলা দেখে, টেস্টের প্রথম তিনদিন নিষ্ক্রিয় পরিমণ্ডলের ঝিম-ধরানো প্রভাব গায়ে মেখে যাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, অন্য স্বাদের ক্রিকেট দেখতে পাওয়ার আশায় তাঁরাই ধর্ণা দিয়েছিলেন মোহনবাগান মাঠে একক ক্রিকেটের আসরে। মনে হয়, তাঁদের প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকেনি। তাছাড়া একক ক্রিকেটের আসরে দর্শক হিসেবে তাঁরাও উপস্থিত ছিলেন ভারত-পাকিস্তানের টেস্ট খেলা দেখতে ইডেনে ঢোকার পাশপোর্ট যাঁরা যোগাড়ে আনতে পারেননি। টেস্ট খেলা দেখার সুযোগ না জুটুক, টেস্ট ক্রিকেটারদের দেখার সুযোগ তো ছিল একক ক্রিকেটের আসরে হাজির থাকার সুবাদে। যেহেতু এই খেলায় যোগ দিয়েছিলেন অন্যূন দশজন ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটার।

হালকা মেজাজে তাঁরা খেলেছেন। খেলতে খেলতে পরস্পরের সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গে মেতেছেন। আবার জেতার জন্যে সময়ে সময়ে সিরিয়াস হয়ে উঁচুমানের ক্রিকেট খেলতেও তাঁরা কসুর করেননি।

রঙ্গ-রসিকতার দু-একটি নমুনা :

কপিল বনাম গাভাসকারের ফাইনাল খেলায় বোলার গাভাসকার হাউজ দ্যাট হাঁক তুলেই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে দুহাত করে আম্পায়ারের উদ্দেশ্যে মিনতি জানা লাগালেন। কিন্তু আম্পায়ার বড়ই কঠি চীজ। কিছুতেই তাঁর মন গলল না, গাভাস কারের আবেদন, মিনতিতে তিনি কিছুতে সায় দিলেন না।

ফাইনালে গাভাসকার রান করেছিলেন চব্বিশ। প্রতিদ্বন্দ্বী কপিলদেব পনেরোটি বল খেলেই তেইশে পৌঁছে যান। তখনও আরও ন'টি বল খেলা বাকি। কপিলের জয় প্রায় নিশ্চিত। এমন সময় তিনি ডান হাত বদলে বাঁ হাতে ব্যাটিং শুরু করে দিলেন। বাঁ হাতে খেলে একটি রানও করলেন। কিন্তু তারপরই ইচ্ছে করে আউট হয়ে ফাইনাল অমীমাংসিত রেখে বিজয়ীর সম্মান ও প্রাপ্য পুরস্কার গাভাসকারের সঙ্গে সমান-ভাবে ভাগ করে নিয়ে মূল আসরের মেজাজকে দিলেন আরও হালকা করে।

তবে বাহ্যিক চালচলনে শিথিল ভাব বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকলেও ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোড়ার পর্বে কিন্তু কোমর কষে লড়েছেন। কপিল তেইশ রান করে ফেলার পর দুই প্রতিযোগী শিথিল হয়ে পড়েন। মনে হয়, কেউ যাতে না হারেন তার নিশ্চিছদ্র পরিকল্পনা তাঁরা আপোষে গড়ে নিয়েছিলেন সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগেই।

প্রথম রাউণ্ড থেকে [illegible]নাল, ধাপে ধাপে অনেকগুলি খে[illegible]য়। সবচেয়ে জমেছিল দিলীপ দোসী [illegible]ম গাভাসকার, কপিল বনাম যশপাল এ[illegible]পাল বসু বনাম জয়সীমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা[illegible]লীপ দোসী তো জিতেই গিয়েছিলেন। [illegible]কে সামাল দিতে গাভাসকারকে হিমসিম খেতে হয়। সব মিলিয়ে, হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-রসিকতার কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, একক আসরে মাঝে মাঝে ক্রিকেট দস্তুরমত জমে উঠে-ছিল। ডজন খানেক ছক্কা মেরে প্রতি-যোগীরা এই আসর আরও মাতিয়ে দেন। যাঁরা গ্যালারি জুড়ে বসেছিলেন, দিলখোলা স্বরূপ দেখে কিছু পাওয়ার সান্ত্বনায় তাঁরা তৃপ্ত হতে পেরেছিলেন।

সুদৃশ্য টেলিরামা ট্রফি ঘিরে আয়োজিত এই একক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। একালের ভারতীয় ক্রিকেটের দুই জনপ্রিয় চরিত্র কপিল দেব ও সুনীল গাভাসকার যুগ্ম-বিজয়ী হিসেবে সাড়ে তিন হাজার করে টাকা পুরস্কারস্বরূপ পান। স্বেচ্ছায় ফাইনাল অমীমাংসিত রেখে না দিলে বিজয়ী হিসেবে কপিলদেব আরও পাঁচশ টাকা পেতে পারতেন। কিন্তু সে-টাকার লোভ তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সেমি-ফাইনালে হেরেছিলেন যেসব প্রতিযোগী, যেমন দক্ষিণী তরুণ শ্রীনিবাসন ও বাংলার গোপাল বসু, তাঁরা পান দেড় হাজার টাকা এবং কোয়ার্টার ফাইনাল এগিয়ে যাওয়ার সাফল্যে দিলীপ দোসী, যশ-পাল শর্মা, জয়সীমা ও বিশ্বনাথেরা সাড়ে সাতশো করে টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

ফাইনালে কপিলকে আউট করেই গাভাসকারের উল্লাস

এবর নিয়ে মোট দুবার কলকাতায় একক ক্রিকেটের আসর বসল। বছর দুয়েক আগে এই প্রতিযোগিতার প্রথম অনুষ্ঠানে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছিলেন মোহিন্দর অমরনাথ।

একক ক্রিকেটে খেলা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রান ওঠার সম্ভাবনা ও ঘটনা ঘটার আশা থাকে বলে দর্শকদের কাছে এর আকর্ষণ বরাবরই বজায় থেকে যায়। তার ওপর নামী নামী খেলোয়াড়েরা যদি এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন, তাহলে অনুষ্ঠানের হাতছানি হয়ে ওঠে দুর্বার।

এবারের প্রতিযোগিতার নিয়মে বলা হয়েছিল যে, প্রথম দিকের খেলা তিন ওভারে এবং কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি-ফাইনল ও ফাইনালের খেলা হবে চার ওভার করে। প্রতিযোগিতা দুজনে, বোলার ও ব্যাটস-ম্যান। তাহলে বাকি দশজন ফিল্ডসম্যান কোথা থেকে আসবে? ফিল্ডসম্যান যোগানোর ভার ছিল উদ্যোক্তাদের ওপর। তাঁরা বাংলা রাজ্য দলের এবং স্থানীয় কিছু উঠতি খেলোয়াড়দের নির্বাচিত করার আমন্ত্রণ জানালে সে-নির্বাচন তাদের গৃহীত হল। ওঁদের সহযোগিতা ছাড়া অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হতে পারত না, তা বলাই বাহুল্য।

সেরা দুজন ফিল্ডসম্যানের যে পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল, নিজেদের দক্ষতা, যোগ্যতার পরিচয় রেখে সেই পুরস্কার অর্জন করে নেন সেরা ফিল্ডসম্যান সুজন মুখার্জি এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ফিল্ডসম্যান রাজা ভেংকটরামন।

সোহিনী মিউজিক কলেজ

সোহিনী মিউজিক কলেজ আয়োজিত শিশির মঞ্চের সঙ্গীতানুষ্ঠানটি ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের খুবই নিচু মানের একটি একঘেয়ে অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারত, কিন্তু শ্যামল চট্টোপাধ্যায় এবং অনুপ দাশগুপ্তের অনবদ্য যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনার জন্য সমগ্র অনুষ্ঠানটি উজ্জ্বল ও স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই—বিগত দুই যুগ ধরে একটানা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সেতার পরিবেশন করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তানের মতই তাঁর বাজনার পংক্তি-গুলি সর্বদা স্বচ্ছ। সব সময়েই তাঁর বাজনায় একটি দীপ্তি থাকে—যা তাঁকে অন্যান্য ছাঁচে-ঢালা - সেতার - বাজিয়েদের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। কোমল গান্ধারের সঙ্গে রাজেশ্রী এবং শুদ্ধ মিশ্রণ পরিবেশনায় খুবই বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে গঠন করা হয়েছিল। বিশেষত দিরি-দিরি অংশে বাজনার দ্রুতগতি আমার পদ্ধতিটি খুবই প্রশংসনীয়। বিমল রায় তাঁকে প্রশংসনীয়ভাবে তবলায় সহযোগিতা করেছেন। খুবই পরিণত তাঁর সহযোগিতা। কখনোই মুখ্য যন্ত্রকে অতিক্রম করেন নি। বরং কিভাবে অনুষ্ঠানটিকে উজ্জ্বলতর করে তোলা যায় সেদিকেই সচেষ্ট ছিলেন—যেমন তিনি সর্বদা থাকেন।

অনুপ দাশগুপ্তের গীটারে ভারতীয় মার্গসঙ্গীত পরিবেশন নিঃসন্দেহে ঐ সঙ্গীতসন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। যেকোনো ধরনের গিমিক এবং শোম্যানশিপ থেকে এই তরুণ শিল্পী একেবারেই আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত। শুধুমাত্র বাজনার আবেগ এবং সম্পূর্ণতা দিয়ে তিনি শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করতে পারেন। তাঁর সঙ্গীত খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে প্রবাহিত, দু যুগ আগে সঙ্গীতের যে আন্তরিক প্রবণতা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে প্রচলন শুরু এবং আজো যা-যেকোনো প্রকৃত সঙ্গীতপ্রেমীর মুখ্য আদর্শ। তাঁর 'দীপাবলি'—যদিও

সমকালীন 'ললিতা-ধ্বনি'র 'হেম-ললিত' অথবা 'বসন্ত' 'পঞ্চম' এর আধুনিকীকরণ খুবই সংবেদনশীল পরিবেশনা।

প্রতিটি পংক্তিই সম্পূর্ণতার দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে সযত্নে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং খুবই সূক্ষ্মভাবে আলাপ এবং জোড় বিভক্ত করা হয়েছিল। গীটারে দ্রুত তানের কাজে যে টেকনিকগত বাধা আছে, তা বৈচিত্র্যময় বোল এবং লয়ের মাধ্যমে ব্যালান্স করা হয়েছে।

সমগ্র বাজনা জুড়ে তাঁর নিখুঁত সুর প্রয়োগ বর্তমান সমালোচককে খুবই মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য শিল্পীগণ যখন বাজনায় দ্রুতগতি আনতেই মুখ্যত সচেষ্ট, তখন এই তরুণ শিল্পী মন্থরগতি এবং যথার্থ সুর প্রয়োগের ওপর সযত্ন দৃষ্টি রাখেন।

যদি তিনি সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসা এবং একাগ্র নিষ্ঠা বজায় রাখেন, তাহলে সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে তিনি বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবেন। এবং শ্রেষ্ঠতার দিক থেকে পিছিয়ে পড়বেন না।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা সহযোগিতা খুবই জীবন্ত হয়েছিল। প্রতিটি বোলই ছিল স্বচ্ছ, উজ্জ্বল এবং খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেগুলি সংযুক্ত করা হয়েছিল বলে শ্রোতৃবর্গের প্রশংসা পেয়েছে।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রণব রায়ের সেতারে 'পূরিয়াকল্যাণ' দিয়ে। পরে গান গেয়েছেন চিত্রা রায়, চন্দ্রকোষ' রাগে খেয়াল, ঠুমরি এবং ভজন।

গুরু বন্দনায় সুনন্দা পট্টনায়ক

পন্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্ধন ছিলেন বিগত দিনের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, যিনি তাঁর গুরু বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকরের সঙ্গীতধারা নিজের অসংখ্য শিষ্য ও শ্রোতাদের মধ্যে প্রসারকার্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অনেকেরই মনে আছে তাঁর সেই অবিস্মরণীয় দ্রুত তেরানা লয়কারি এবং ভজনের কথা—যা তিরিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ের যেকোনো প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত সম্মেলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। স্মর্তব্য এই শিল্পীর স্মরণে বাল-গন্ধর্ব কলাকেন্দ্র গত ২৮শে অক্টোবর রবিবার একটি প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন প্রভাতমন্দ ভবনে—যার জন্যে প্রশংসা তাঁদের অবশ্য প্রাপ্য।

ঐ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ সুনন্দা পট্টনায়ক। সেদিন খুব ভাল ফর্মে ছিলেন। খুবই পরিচ্ছন্ন এবং যথাযথ হয়েছিল তাঁর খেয়াল—তোড়ী। যা তিনি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে গেয়েছিলেন, এমন কি 'ডি' স্কেলেও। অনুষ্ঠান শুরুর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শ্রোতৃবর্গকে আবেগাপ্লুত করতে পেরেছিলেন। দৃঢ়তা এবং চিত্তাকর্ষকতার সঙ্গে তাঁর কন্ঠ ত্রিসপ্তক ঘিরে সঞ্চালিত হয়েছিল, ফলে সঠিকভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল এই প্রভাতী রাগের ভাব-পরিবেশটি। তাঁর কন্ঠের মডিউলেশন তাঁর ভাব প্রকাশকে নাটকীয় করে তুলেছিল। খেয়ালগানের প্রচলিত রীতির মাপকাঠিটিতে সুনন্দার মূল্যায়ন করাটা ভ্রমাত্মক কাজ বলে বিবেচিত হবে। কারণ সুনন্দা একজন ক্রীয়েটিভ আর্টিস্ট, এবং তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট একটি বিশেষ স্টাইলই পরিবেশন করেন—যে স্টাইলের প্রধান অঙ্গ বিস্তারে আবেগ এবং দ্রুত তান [illegible] গুলিতে কঠিনতম জমজমাট [illegible] কাজ। সামগ্রিকতার দিক থেকে অনুষ্ঠানটি খুবই অনবদ্য হয়েছিল।

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভবত মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলার প্রথম মহিলা খেয়াল শিল্পী, যিনি ভারতব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে গীতিমাল্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি পরে পরিবেশিত নজরুল নৃত্যনাট্য নীড় ভাঙা পাখির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাইলেন ঠুমরি, দাদরা, গজল এবং রাগপ্রধান বাংলা গান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কতটা পরিণত হয়েছেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—এটা নিঃসন্দেহে তারই পরিচয় বহন করেছে যখন যেকোন ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের শিল্পীদের পক্ষেই তাঁর যাবতীয় শিক্ষা, কলাকৌশল প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা সংবরণ করাটা কঠিন হয়ে পড়ে।

পাতিয়ালা ঘরানায় এই শিল্পী গান গেয়েছেন মুক্ত গলায় এবং অত্যন্ত সহজভাবে। সুরের সূক্ষ্ম পর্যায়গুলি ছিল স্পষ্ট, বলবান এবং স্বল্প প্রয়োগের দিক থেকে যথার্থ। মিশ্রপিলু রাগে ঠুমরি এবং মিশ্র গারা ও তিলককামোদে দুটি দাদরাই রীতিবদ্ধ এবং সূক্ষ্ম সিদ্ধালংকারিক কাজের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়েছিল। গালিবের কাব্যসুষমার সঙ্গে একটি স্পষ্ট বোঝাপড়া করে গজলগুলি গাওয়া হয়েছিল, এবং এর সঙ্গে পাঞ্জাবি অঙ্গ মিশ্রিত হয়েছিল— পরিবেশনটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য। তবলায় চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতা খুবই পরিণত। সাউন্ড এফেক্টগুলি ছিল খুব সূক্ষ্ম, স্পষ্ট এবং সর্বদাই অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলায় সচেষ্ট।

নৃত্যনাট্যটিতে পলি গুহর নাচ একেবারে স্বাভাবিক এবং লাবণ্যমন্ডিত হয়েছিল। সম্বুদ্ধ ঘোষ এবং বাণী ভট্টাচার্য উভয়ের কন্ঠই নাট্যানুষ্ঠানে বৈচিত্র আন[illegible] সক্ষম হয়েছিল। রোমান্টিকতা এবং কন্ঠে কারুকার্যতাই সম্বুদ্ধর গুণ, অন্যদিকে বাণীর সুর প্রয়োগের যথার্থতা এব[illegible] ঐশ্বর্যশালী কন্ঠ— 'নীড় ভাঙা পাখি' ভিস্যুয়াল এফেক্টকে অতিক্রম করে গেছে।

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল

সম্প্রতি মার্গসঙ্গীতের এক সান্ধ্য আসরে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল উপস্থাপিত করলেন এম আর গৌতমকে।

বুদ্ধি এবং শিল্পনৈপুণ্যের এক বিরল সমন্বয়ের অধিকারী গৌতম কখনো পরীক্ষা এবং গবেষণামূলক কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়েন না। মূল রাগকাঠামোর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না করে তাঁর এ[illegible] অক্লান্ত গবেষণা ও পরীক্ষণকার্য তাঁকে সমৃদ্ধ এবং এদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছে। সেদিন তাঁর উদ্বোধনী গান মিয়াঁ-মল্লারে, সুর প্রয়োগের যথার্থতা এবং সংবেদনশীলতা নট-মল্লার-এর চেয়ে অনেক বেশী ছিল। কঠিন কন্ঠসঞ্চালন শিক্ষা তাঁকে সুরসপ্তকের ওপর একটি ভা[illegible] দখল এনে দিয়েছে। যে দখলটি তাঁ[illegible] বিস্তার এবং মধ্যলয়ের [illegible]নপ্যাটার্নে' জটিল সমন্বয়ের বৈচি[illegible] প্রহ[illegible] পরি[illegible] কল্পনার সঙ্গে মাঝে [illegible] অ[illegible] উপকরণ হিসেবে ক[illegible] করেছে। খু[illegible] অল্পসংখ্যক শিল্পী এ জাতীয় কাজ করতে পারেন। সুর প্রয়োগে বিশুদ্ধতা আ[illegible] সত্ত্বেও—বিশেষত সা পা পর্যায়ে—তাঁ[illegible] নটমল্লার, গৌড়মল্লার-এর চেয়ে পৃ[illegible] হওয়ায় প্রশংসনীয় হয়েছিল। জয়বারী [illegible] সারকা সহযোগে মীরাবাঈ কী মল্লা[illegible] 'মীরা' এবং গৌড়মল্লার'এ কোমল এ[illegible] শুদ্ধ নোটের সমন্বয়ের বেশ কিছু জা[illegible] কাজ ছিল। পরবর্তী সময়ে গাওয়া প্রাচী[illegible] দাদরা, দেশঠুমরি এবং ভৈরবী—গৌতমের সুশিক্ষিত সাউন্ড তালিমের পরিচয় বহ[illegible] করেছে। অভিনব কম্বিনেশনের প্রতি তাঁ[illegible] আগ্রহে তাঁকে মাঝে মাঝে গোয়ালিয়র ঘরানা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে—কিন্তু কখনো মূল রাগকে বিচ্যুত করে নি। এটা মতু[illegible] পথ ও প্রয়োগপদ্ধতির সন্ধান— আগামী দিনের নতুনদের জন্য।

আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তব[illegible] সহযোগিতা খুবই সংযত হয়েছিল এব[illegible] হারমোনিয়ামে আশায় আলী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে বর্ণময় করে তোলায় প্রতি সচেষ্ট ছিলেন। [illegible]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইন্ডিয়ান এন্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। বিদেশের অতিরিক্ত [illegible] ১৫ পয়সা। [illegible] ২০ পয়সা।

নববর্ষের ঘোষণা

সেই বিতর্কিত গ্রন্থ

বিপ্লবী অনন্ত সিংহের শেষ আত্মজৈবনিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে ২১ এপ্রিল

অগ্নিযুগের প্রবাদপুরুষ অনন্ত সিংহের জন্ম ১৯০৩ সালে। অমিত শক্তিধর এই সিংহ পুরুষ মাস্টারদার সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী দলে যোগ দেন ১৯১৮ সালে। ১৯২৩ সালে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ১৭০০০ টাকার সফল রেল ডাকাতির নেতৃত্ব দেন অনন্ত সিংহ। এবং পার্টির কাজে সমস্ত অর্থ প্রদান করেন। তখন থেকেই অনন্ত সিংহের বৈপ্লবিক কর্ম-জীবনের ব্যাপকতা আমরা দেখতে পাই। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের তিনি সর্বোচ্চ অধিনায়ক। কূট বাস্তব বুদ্ধির প্রয়োগে ও সাংগঠনিক কাজে অনন্ত সিংহ ছিলেম অনন্য-সাধারণ। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রাম মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, এবং জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন ১৯৪৬এ।

উত্তরজীবনে অনন্ত সিংহের জীবন নানা পথে চালিত হয়। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করেন আর, সি, সি, আই পার্টি।

আজীবন যোদ্ধা, দৃঢ়সঙ্কল্প, চির দুর্জ্জেয় এই বিপ্লবী নায়ককে পুলিশ ১৯৭০ সালের ১০ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার করেন। পুলিশের ধারণা ষাট দশকের শেষ দিকে পরপর ঘটে যাওয়া কয়েকটি ডাকাতি (পার্ক স্ট্রীট রাসেল স্ট্রীট, ন্যাশনাল এন্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্ক) এবং দুর্গাপুরের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এক কোটি টাকার ডাকাতির পরিকল্পনা সবই অনন্ত সিংহের মস্তিষ্ক প্রসূত। ডাকাতির সঙ্গে অনন্ত সিংহ যুক্ত ছিলেন কিনা এ প্রশ্ন তাঁকে করা হলে তিনি 'হ্যাঁ'ও বলেন নি 'না'ও বলেন নি। তিনি বলেছেন পুলিশ তার নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত করুন।

সত্যিই কি তিনি ডাকাতি করেছিলেন?

এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন কেউ বলে বিপ্লবী

কেউ বলে ডাকাত গ্রন্থে।

তিনি লিখেছেন :

'আমাদের কমরেডরা ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে লুটের টাকা নিয়ে এসে ভ্যানে উঠল। ব্যাঙ্কের ভিতর তারা ঘোষণাপত্র বিলি করেছে, লাউডস্পীকারে তখনো ট্রানজিস্টারে ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল। ব্যাঙ্কের গেটের দারোয়ান আত্মরক্ষার জন্য আহত অবস্থায় কোথাও চলে যায়, ভেতরের দারোয়ানের সেখানেই মৃত্যু হয়েছিল। সবাই এসে ভ্যানে ওঠার পরে ভ্যানটি দুটি প্রাইভেট গাড়ীর নির্দেশ অনুসারে সাদার্ন স্ট্রীটের দক্ষিণ দিকে গিয়ে মিডলটনে পড়ে। তারপর [illegible] ঘুরে ক্যামাক স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে সেটি উধাও হল। পুলিশ বা মিলিটারী কোন গাড়ীর সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয়নি।'...

কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত

শৈব্যা - ৮।১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি - ৭৩ ।। দাম ২০

লালন ফকিরের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

লালন ও তাঁর গান ১০-০০

রবীন্দ্র চর্চায় অভিনবত্বের পথিকৃৎ

অমিতাভ চৌধুরীর

কবি ও সন্ন্যাসী ৮-০০

এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত সম্পূর্ণ নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ আরও আটটি প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেণীর পাঠকের অনেক আগ্রহ ও কৌতূহলের মীমাংসা করবে।

বহুপ্রশংসিত নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ

প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষের

নাটকের কথা

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। ১৮-০০

পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ৩৫-০০

সম্পাদনা : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃত

১৮ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা

১৩ বৈশাখ, ১৩৮৬

27, April, 1979

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী

নেকড়েদের চাঁদের হাট

লিখেছেন বাসুকীনাথ দাস

গল্প লিখেছেন শচীন দাস

সেলিনা হোসেন

স্বপনকুমার ঘোষের

ছাত্র বনাম বিদ্যাসাগর

ফিল্ম উৎসব '৮০

'৮০ সালের আন্তর্জাতিক ফিল্ম উৎসব ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। শোনা গিয়েছিল, ঐ উৎসব কলকাতাতেই হবে; কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল তা হল না। বলাই বাহুল্য এতে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা পূর্বভারতই মিয়মাণ বোধ করবে।

ফিল্ম উৎসব কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে, তার কতকগুলো বিশেষ যুক্তি ছিল বলে শুধু আশ্বাস নয়, প্রায় বিশ্বাসই জন্মে গিয়েছিল এ ব্যাপারে। যুক্তিগুলো মোটামুটি এইরকম।

এক, গতবারে ঐ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে মাদ্রাজে। কাজেই এবারও তা দক্ষিণ ভারতে ঘটার কোনো ভিত্তি ছিল না। বিশেষ করে, মাদ্রাজ থেকে ব্যাঙ্গালোরের দূরত্ব যখন সামান্যই। মাত্র ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই সে দূরত্ব বাস-এ অতিক্রম করা যায়। অতএব গতবারের উৎসবেও ব্যাঙ্গালোর অঞ্চলের লোকের পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল। যেমন মাদ্রাজ অঞ্চলের মানুষের পক্ষেও সম্ভব হবে ব্যাঙ্গালোরের উৎসবে যোগ দেওয়া। এবং পর-পর দুবার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্মগুলো দেখা।

দুই, বিন্দুমাত্র প্রাদেশিক মনোভাবকে প্রশ্রয় না দিয়েও একথা বলা যায় যে, সারা বিশ্বের ফিল্ম মানচিত্রে ভারতের স্থান যদি আজ সুচিহ্নিত হয়ে থাকে তার প্রধানতম কৃতিত্ব কলকাতার। সারা পৃথিবীর প্রথম দশজন চিত্রপরিচালকের একজন হলেন সত্যজিৎ রায়। তাছাড়া তপন সিংহ, মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকও কলকাতারই অবদান।

তৃতীয়ত, সারা ভারতের মধ্যে প্রথম ফিল্ম সোসাইটি গঠন করার গৌরব ছিল কলকাতার। গত তিন দশকে এই আন্দোলন সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এমন এক সুউন্নত দর্শকশ্রেণী তৈরি করেছে যার ভিতর থেকে নতুন নতুন পরিচালক ও অন্যান্য কলাকুশলী বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রবল।

তাছাড়া, ফিল্ম তৈরির কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ব্যাঙ্গালোরের চেয়ে কাজের পরিমাণ ও প্রকারভেদও এখানে বেশি।

কাজেই সমস্ত দিক থেকেই বলা যায়, সারা পৃথিবীতে নতুন ধরনের চিন্তা ও গঠনসৌকর্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কীভাবে আত্মপ্রকাশ করছে তা জানা কলকাতার কলাকুশলী এবং দর্শকসমাজের পক্ষে খুবই জরুরী।

খবরে প্রকাশ, '৮০ সালের ফিল্ম উৎসব কলকাতায় করা যায় কিনা, মুখ্যমন্ত্রী সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেছেন। আলোচনা ফলপ্রসূ হোক, এইটেই সকলে চাইবেন।

সাহিত্য ইত্যাদি

ধূসরতর পাণ্ডুলিপি

কেউ যদি আজ কালিদাসের হস্তাক্ষর দেখাতে পারেন, আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তিনি কোটিপতি হয়ে যাবেন। কালিদাস মানে বলাবাহুল্য মহাকবি কালিদাসের কথাই বলছি। কিম্বা কালিদাস না হয়ে তুলনামূলকভাবে যিনি একালের মানুষ সেই শেকসপীয়ারের হাতের লেখাই যদি কেউ দেখাতে পারেন, তিনিও কম বাণিজ্য করবেন না।

লেখকদের হাতের লেখা দেখার জন্যে, সম্ভব হলে তা সংগ্রহ করার জন্যে, উৎসাহ আমাদের খুবই বেশি। পৃথিবীর অনেক বড় লেখকের লেখা সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ সেগুলো দেখেন। দেখে, ছাপার অক্ষরের সেইসব ইমপার্সোনাল মানুষের সঙ্গে বেশ একটু পার্সোনাল সম্পর্কের আস্বাদ পান। মানুষের সামাজিক স্বভাবের এও এক আশ্চর্য নিদর্শন সন্দেহ নেই।

আমাদের প্রয়াত বন্ধু প্রাণতোষ ঘটকের একটি বিশেষ ঝোঁক ছিল এইদিকে। অনেক লেখকের অনেক রকম লেখা জোগাড় করেছিলেন তিনি। লেখার অংশ চিঠিপত্র, দলিলের বয়ান—এই ধরনের বেশ কিছু লেখা একদিন দেখিয়েছিলেন তিনি। বেশির ভাগই অর্থমূল্য সংগ্রহ করা। তাঁর কাছেই শুনেছি, এর একটা আলাদা জগৎ আছে—যেখানে টাকা দিয়ে না হলে হাত সাফাইয়ের সাহায্যেও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়। এবং তাকে কেউ অন্যায় কাজ মনে করেন না।

ইংরেজ আমলের অনেক লেখকেরই হাতের লেখা দেখা খুব কঠিন নয়। লেখার পাণ্ডুলিপি না পেলেও চিঠিপত্র পাওয়া যেতে পারে। কিম্বা তাও না পাওয়া গেলে পাওয়া যাবে হয়তো দলিল-দস্তাবেজে নামসই।

রবীন্দ্রনাথ আঠাশ বছর আগে গত হলেও তিনি এক হিসেবে এখনো আমাদের সমকালীন মানুষই। তাঁর হাতের লেখা সকলের কাছেই সুপরিচিত। শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির পাণ্ডুলিপি যথেষ্টই দেখা সম্ভব, এমনকি বিনা-পরিশ্রমেই তা পাওয়া যেতে পারে সঞ্চয়িতার মধ্যে গ্রথিত ফ্যাকসিমিলি ছবিগুলোতে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে পিছিয়ে যদি দেবেন্দ্রনাথ, বা দ্বারকানাথের আমলেও যাই তাঁদেরও হস্তাক্ষর দেখা বোধ হয় দুঃসাধ্য হবে না। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ভূদেব রাজনারায়ণ-এ'দের হাতের লেখাও নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবে দেখা সম্ভব।

কাজেই মনে হচ্ছে, উল্লেখযোগ্য প্রাচীন লেখকদের হস্তলিপি দেখা আয়াসসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়। মুশকিল বরং একালের লেখকদের নিয়েই। তাঁদের হস্তাক্ষরই বেশি অগোচর। ঠিক এই মুহূর্তে বা লেখকের জীবিতকালে না হলেও, মৃত্যুর পর তো বটেই।

ধরুন রবিন মৈত্র। 'মানময়ী গার্লস স্কুল' খ্যাত ঐ জনপ্রিয় লেখকের হস্তাক্ষর এখন কজন দেখতে পাবেন? কিম্বা ধরুন, শৈলবালা ঘোষজায়া? আমি বলছি না একেবারেই দেখা যাবে না। হয়তো খোঁজার দিকে উঠে-পড়ে লাগলে কোথাও-না কোথাও এ'দের কোনো না কোনো লেখা নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া সম্ভব। হয়তো এ'দের কারো কারো বেলায় অতো কাঠখড় পোড়াবারও দরকার হবে না। তবু একথাটা ঠিকই যে, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ, এমনকি সঞ্জীবচন্দ্র বা কামিনী রায়ের হস্তলিপির মতো এত সুলভ-দর্শন নয় একালের লেখকদের লেখার নমুনা।

তার প্রধানকারণ হল লেখকদের অমনোযোগিতা। লেখা যেহেতু অর্থকরী ব্যাপার, সেজন্যে লিখতে হয় এনতার। এবং লেখা মাত্রই পত্র-পত্রিকায় চলে যায়, নয়তো সরাসরি যায় প্রকাশকের কাছে। এত লেখার পাণ্ডুলিপি জোগাড় করে কে? লেখার পর কপি করে প্রেসে দেওয়া সম্ভব নয় এখন। একটি উপন্যাসকেই চার-পাঁচ দফায় দিতে হয় ছাপতে। কাজেই পাণ্ডুলিপি রাখতে গেলে উদ্ধার করে আনতে হয় প্রেস-কপিকেই। অতো উৎসাহ কি লেখকের থাকে? লেখার পর নিজের লেখাই যাঁরা দ্বিতীয়বার পড়ার সময় পান না তাঁরা যাবেন ছাপা-লেখার ম্যানাস্ক্রিপ্ট ফেরৎ আনতে। তার চেয়ে বরং নতুন লেখা নিয়ে বসবেন সে সময়ে। সেটা অনেক বেশি লাভজনক। উৎসাহজনকও বটে। যতো দায়ে-পড়ে লেখাই হোক, নতুন লেখা নতুন প্রেমের মতোই কৌতূহলোদ্দীপক হতে বাধ্য।

অবিশ্যি ওরই মধ্যে কেউ-কেউ যে পাণ্ডুলিপির বিষয়ে সচেতন থাকেন না তা নয়। যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দেখেছি কখনো কখনো ছাপা-লেখার ম্যানাস্ক্রিপ্ট ফেরৎ চাইতে। তারাশঙ্করবাবু নিজে কী করতেন জানি নে, তবে তাঁর ছেলে, আমাদের সদ্য-প্রয়াত বন্ধু সনৎকুমারকে দেখেছি কখনো কখনো পিতার ম্যানস্ক্রিপ্ট সংগ্রহ করতে।

আরো কেউ কেউ আছেন যাঁরা এম এস জোগাড় করেন। তবে নিজের নয় অন্যের। রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, এ'দের লেখার পাণ্ডুলিপি একজন ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন—কোনো এক পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীতে দেবেন বলে। কিন্তু পরে টের পেয়েছি সেটা ভুয়ো ব্যাপার, নিজেই তিনি আত্মসাৎ করেছেন লেখাগুলো। বোকা বনেছিলাম!

তা এরকম আরো কারো কারো বরাতে ঘটে হয়তো। কিম্বা যাঁদের কাছে এসব লেখা থাকে তাঁরা স্বেচ্ছাতেই দেন। অথবা দেন হয়তো অর্থ বিনিময়ে, যার কথা প্রাণতোষবাবু বলেছিলেন। না হলে এত প্রাচীন লেখকের এত লেখা ব্যক্তিগত সংগ্রহে চলে যায় কী করে! এমনকি একবার তো খবর বেরিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথেরও একটি লেখার পাণ্ডুলিপি (চার অধ্যায়ের কি ?) বাইরে চলে যাচ্ছিল, মাঝপথে তাকে আটকানো হয়েছে!

এইসব ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায়, লেখকদের হাতের লেখা এবং তাঁদের লেখার পাণ্ডুলিপি দেখার জন্যে খুবই একটা আগ্রহ রয়েছে দেশে-বিদেশে বিশেষ করে যাঁরা মৃত এবং অন্য কালের লেখক তাঁদের লেখার জন্যে।

কাজেই এমন কি কোনো ব্যবস্থা করা যায় না যাতে মৃত তো বটেই জীবিত লেখকদেরও কিছু-কিছু পাণ্ডুলিপি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে সংগ্রহ করা যায়? যেমন ধরুন, রবীন্দ্রভারতী, বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বা মহাজাতিসদন, কিম্বা আর কোনো জায়গায়। এবং বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে বা সময়ে তা সর্বসাধারণের জন্যে প্রদর্শিত হয়। ধরা যাক বই মেলা উপলক্ষে বা কবিপক্ষে: আর যদি সেইসঙ্গে লেখকদের বিষয়েও কিছু কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে সে তো সোনায় সোহাগা!

চেষ্টা করে দেখা যায় না?

মণীন্দ্র রায়

হারানো বই

সম্রাট শাহজাহান কঠিন অসুখে পড়েন ১৬৫৭ সালে। সিংহাসন দখলে পুত্র আওরংজেব অভিযান চালালে, পিতা তাকে আলমগীর উপাধি দিয়ে শান্ত করতে চান। আলমগীর অর্থাৎ বিশ্ব-বিজয়ী। এক বছর পরে সিংহাসনে বসে আলমগীর উপাধিই নিলেন আওরংজেব। তারপর থেকে আলমগীরের ইতিহাস বড় কঠিন আর নির্মম। কিন্তু সেই ধর্ম প্রাণ ও নির্মম মানুষটি, তার চিঠিপত্রে ভিন্ন স্বরূপে উপস্থিত। অসংখ্য চিঠি তিনি লিখেছিলেন নানা প্রয়োজনে। আলমগীরের পত্রাবলীর সংগ্রহ হল রুকায়াৎ-ই-আলমগীরী, রকাইম-ই-করাইম, আদাব-ই-আলমগীরী : আরও কয়েকটি আছে। পুত্র, পৌত্র আর কর্মচারী-দের কাছে লেখা এই সব চিঠিতে সম্রাটের চরিত্রের নানান দিক ফুটে উঠেছে। ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস, কুট কৌশলী আলমগীরের চরিত্রে যে পরিচয় ইতিহাসে আছে, তার বাইরে মানুষ হিসাবে পরিচয়টিকে খুঁজে দেখার সুযোগ কম। চিঠিপত্রে ন্যায় পরায়ন, দয়াবান, ধার্মিক, খাঁটি একজন মুসলমানকে পাওয়া যায়। তাছাড়া আছে সরকারী কাজকর্ম চালাবার নির্দেশ প্রজাদের ওপর সদয় হওয়ার উপদেশ কঠোর শাস্তিদানের আদেশ, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রসঙ্গ। আলমগীর রাজত্বের শেষ ২৬ বছর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে কাটান। অধিকাংশ চিঠি ঐ সময়ে লেখা। রুকায়াৎ-ই-আলমগীরী থেকে ৭১ খানা চিঠি অনুবাদ করেন যামিনীকান্ত সোম। ছোট বই। পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৮০! প্রকাশক : শিশিরকুমার চক্রবর্তী বিএসসি। মডার্ণ পাবলিশিং সিন্ডিকেট। ১৬-১ শ্যামা-চরণ দে স্ট্রীট। মুদ্রক : সুরেশচন্দ্র দাশ এম এ অবিনাশ প্রেস, ১৪ মির্জাপুর স্ট্রীট। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৪২, আশ্বিন। দাম বার আনা।

....বার্ধক্যের একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি, দুর্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে শিথিল, শক্তিহীন। একা আসিয়াছিলাম, একাই চলিয়া যাইতেছি। আমি বুঝিতে পারিলাম না, কে আমি, কেন আসিয়াছিলাম, কি কাজ করিলাম।! জীবন বৃথায় অতিবাহিত হইয়াছে, ভগবানের আরাধনা ত করা হয় নাই। একটি বিপুল সাম্রাজ্যের ভার আমার স্কন্ধে পড়িয়াছিল, কিন্তু দক্ষতার সহিত উহা পরিচালনা করিতে পারিয়াছি কি ? আকাংখিত অমূল্য জীবন হেলায় নষ্ট করিয়াছি। সংসারে যখন আসিয়াছিলাম, কিছুই স[illegible] আনি নাই, কিন্তু এখন ফিরিয়া যাইতেছি পাপের বোঝা লইয়া। জানি না আমাকে কি শাস্তিই ভোগ করিতে হইবে।........'

তৃতীয় ছেলে মুহম্মদ আজম শাহকে মৃত্যু শয্যা থেকে লিখেছিলেন বাদশাহ আলমগীর।

আলমগীরের পত্রাবলী

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট
১৬-১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা

তার বৃহৎ সাম্রাজ্য তখন ভেঙে পড়ছে। চার দিকে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ অশান্তি। রাজ কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ। পুত্রপৌত্রেরা স্বেচ্ছাচারী। পরস্পর বিদ্বেষ-বশত কলহে লিপ্ত। ছোট ছেলে সুলতান মুহম্মদ কামবকশকে লিখলেন : "আমি পাপের বোঝা বহন করিয়া লইয়া চলিলাম—সংসারে থাকিয়া কেবল পাপ কার্যই যে সঞ্চয় করিয়াছি! প্রকৃতির কি আশ্চর্য বিধান। আসিয়াছিলাম রিক্ত হস্তে, কিন্তু ফিরিয়া যাইতেছি পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া।....একটি কারণে প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভব করিতেছি। আমার অবর্তমানে আমার বিপুল বাহিনী এবং বিশ্বস্ত অনুচরগণ যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে সুপরিচালিত হইবে না। যাহাতে অনর্থক রক্তপাত হয় এবং মুসলমানগণের যাহাতে জীবন নষ্ট হয় সেরূপ ঘটনা রহিত করাই তোমাদের কর্তব্য। এই বৃদ্ধকে আর নিমিত্তের ভাগী করিও না।...পুত্র, আত্মীয় স্বজন এবং ভৃত্যগণ ভন্ড এবং কপটাচারী হইলেও তাহা-দের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। তাহাদিগকে পদচ্যুত বা কোনরূপ নিগৃহীত করিও না। পুত্র মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা কর। আশীর্বাদ করি সুখী হও। বিদায় পুত্র, বিদায়।"

জীবনের শেষ দিনে, মৃত্যুপথযাত্রী বাদশাহ আলমগীর পুত্র-পৌত্রদের কাছে এ রকম আরও অনেক চিঠি লিখেছিলেন। আর সে সব চিঠিতে জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি ফুটে উঠেছে বার বার। কিন্তু রাজ্য শাসনের সময় ছেলেদের লেখা চিঠিতে রাজকার্য পরি-চালনার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কর্মচারী-দের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মুহম্মদ আজমশাহ বাহাদুরকে লিখছেন : "সততা এবং নিষ্কপটতা-ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ দান মানবের আজন্মলব্ধ হইলেও এই দুইটি গুণ যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য ভৃত্যগণকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করার প্রয়োজন। কারণ এতদ্বারা ভৃত্যগণ সচ্ছন্দে এবং নির্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবার সুযোগ পায় এবং জীবিকা উপার্জনে তাহা-দিগকে কোনরূপ উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হয় না। ফলতঃ সাংসারিক অভাব ও অনটন তাহা-দিগকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে না। ইহার ফল বড়ই সুখকর হয়। কারণ যে ভৃত্য সুখী এবং নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট, সে অধিক কার্য করিয়া থাকে।" মুহম্মদ আজম শাহ বাহা-দুরের বড় ছেলে মুহম্মদ বিদার বকত বাহাদুরকে লিখছেন : পৌত্র, সংসারে কোন জিনিষই স্থায়ী নয়। বালু-কণা যেমন প্রবহ-মান বাতাসের মুখে দ্রুত সঞ্চালিত হয়, মানুষেরও তেমনি সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য-বৈভব প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা কখনও এক-ভাবে থাকে না। যে অত্যাচারী সে ভাবে, নিগৃহীত ব্যক্তি তাহার অত্যাচারে কত কষ্টই-না ভোগ করিতেছে। কিন্তু মানুষের কষ্টও চিরস্থায়ী নয়, কালপ্রভাবে অত্যাচারের রেখাও মন হইতে মুছিয়া যায়. কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার করে, তাহার অবস্থা অনেকটা স্বতন্ত্র—তাহার মন সর্বদাই ভারাক্রান্ত থাকে। ইহজীবনে ইহাই তাহার শাস্তি. এবং পরকালেও সে খোদার কিনট কঠিন দণ্ড পাইবে।"

বাদশাহ আলমগীর খাদ্যরসিক ছিলেন। তার চিঠিতে এর প্রমাণ রয়েছে তৃতীয় পুত্র মহম্মদ আজম শাহ বাহাদুরকে লিখছেন : ভাগ্যবান পুত্র, তুমি যে চমৎকার খিচুড়ী ও মাংস শীতের সময় আমাকে খাওয়াইয়াছিলে, তাহার আস্বাদ আমি ভুলি নাই। ইসলাম খাঁ যে খিচুড়ী রাঁধে, সে কিন্তু তার কাছে কিছুই নয়। তোমার পাচক সলিমানকে আমি চাহিয়াছিলাম কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড় নাই। তার কাছে রান্না শিখিয়া তারই মত পাকা রাঁধুনি হইয়াছে, এমন যদি কাহাকেও পাও, আমার নিকট পাঠাইয়া দিও। পুত্র, সেই দিনটিই আমার অতীব সুখের, যে দিন তুমি আসিয়া আমার সঙ্গে আহার এবং আমোদ-আহ্লাদ কর। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভালরূপ খাইবার সাধ এখনও আমার পুরা-দস্তুর রহিয়াছে।" আজমশাহকে আলমগীর দামী জলপত্র আর কুর্সি পাঠিয়েছিলেন। আর বিনিময়ে চেয়েছিলেন আম। চিঠিতে আছে : ভাগ্যবান পুত্র, চীন দেশের একটি উৎকৃষ্ট জলপাত্র এবং কাচকড়ার তৈরী একটি কুর্সি আমি উপঢৌকন স্বরূপ পাইয়াছিলাম। পুত্র, এই দুইটি জিনিষ আমি তোমাকে পাঠাইলাম। এই দুইটি উপ-ঢৌকনের জন্য আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। প্রতি-দান স্বরূপ তুমি আমাকে এক ঝুড়ি আম পাঠাইয়া দিবে।'

কমল চৌধুরী

সাহিত্যের নেপথ্যে

বিনয়কৃষ্ণ

১৩ এপ্রিল সংখ্যার অমৃতে 'হারানো বই' পর্যায়ে কমল চৌধুরী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের 'দি আর্লি হিস্ট্রি অ্যান্ড গ্রোথ অফ ক্যালকাটা' (সুবল মিত্রের বাংলা ভাষান্তরে যে বইটির নাম হয়েছিল 'কলিকাতার ইতিহাস') সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শ্রীচৌধুরী আরও লিখেছেন 'বিনয়কৃষ্ণ ছিলেন শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণের ছেলে। সাহিত্য ও রাজনীতিতে ছিল আকর্ষণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৪ সালে।' আজ 'সাহিত্যের নেপথ্যে' বিভাগে সেই বিনয়কৃষ্ণ দেব এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করছি। এর ভেতর দিয়েই রাজা বিনয়কৃষ্ণের সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় অনেকটাই মিলবে।

উনিশ বছর বয়সে বিনয়কৃষ্ণ পিতৃহীন হন। ঐ বয়সে ধনী পরিবারের অভিভাবকহীন ছেলেরা সাধারণত বিলাসিতা আর প্রমোদসড়কে হাঁটাচলা করেন। বিনয়কৃষ্ণ সে সড়কে হাঁটেন নি। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চেহারায় বড়বাড়ির অনেক লক্ষণই ছিল না। বালক বয়স থেকেই সাহিত্যপ্রীতি যে তাঁকে ছুঁয়েছিল তার প্রমাণ মেলে 'শোভাবাজার ডিবেটিং ক্লাব' শুরু করার ভেতর দিয়ে। বড় ভাই নীলকৃষ্ণের সহযোগিতায় এই ক্লাব চালু করে বিনয়কৃষ্ণ সাহিত্য আলোচনা আরম্ভ করেন। পরিচিত ধারার বাইরে অন্য ধরনের আচরণের সাক্ষ্য আরও পাওয়া গিয়েছিল সতের বছর বয়সে নিজের বাড়িতে 'শোভাবাজার 'বেনোভোলেন্ট সোসাইটি' গড়ার ভিতর দিয়ে। এ সংগঠন চালু করে বিনয়কৃষ্ণ গরীব এবং দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য দেওয়া শুরু করেন।

বিনয়কৃষ্ণের সবচেয়ে বড় কীর্তি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ, ইংরেজীর ১৮৯৩-এর ২৩ জুলাই 'দি বেঙ্গল একাডেমী অফ লিটারেচার '(বর্তমান সাহিত্য পরিষৎ) প্রতিষ্ঠা হয়। দিনটা ছিল সম্ভবত রবিবার। জায়গাটা ছিল শোভাবাজার রাজবাড়ী। ঠিকানা ২।২ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট। এই একাডেমী প্রতিষ্ঠায় সেদিন উদ্যোগী ছিলেন দর্শন শাস্ত্র এবং ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্গসাহিত্যপ্রেমিক এল লিওটার্ড, কবি এবং সমালোচক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী প্রমুখ। লিওটার্ড সাহেব ছিলেন একজন ইংরাজ। সত্যিকাবের বঙ্গসাহিত্যানুরাগী এই মানুষটি বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ প্রয়াসেই শুধু বাংলাভাষা শিখে নিয়েছিলেন।

দি বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচারের ৮ শ্রাবণ সভার পয়লা অধিবেশনে সতেরজন সদস্য যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এল লিওটার্ড, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, বিনয়কৃষ্ণ দেব, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন, আশুতোষ মিত্র, শ্যামলাল গোস্বামী, গোপালচন্দ্র গুপ্ত, সরোজমোহন দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমোহন দাশগুপ্ত, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ হরিমোহন সরকার, অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত এবং ব্রজভূষণ গুপ্ত। এ সভায় বিনয়কৃষ্ণ দেব একাডেমীর সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই হিসাবে বিনয়কৃষ্ণই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি।
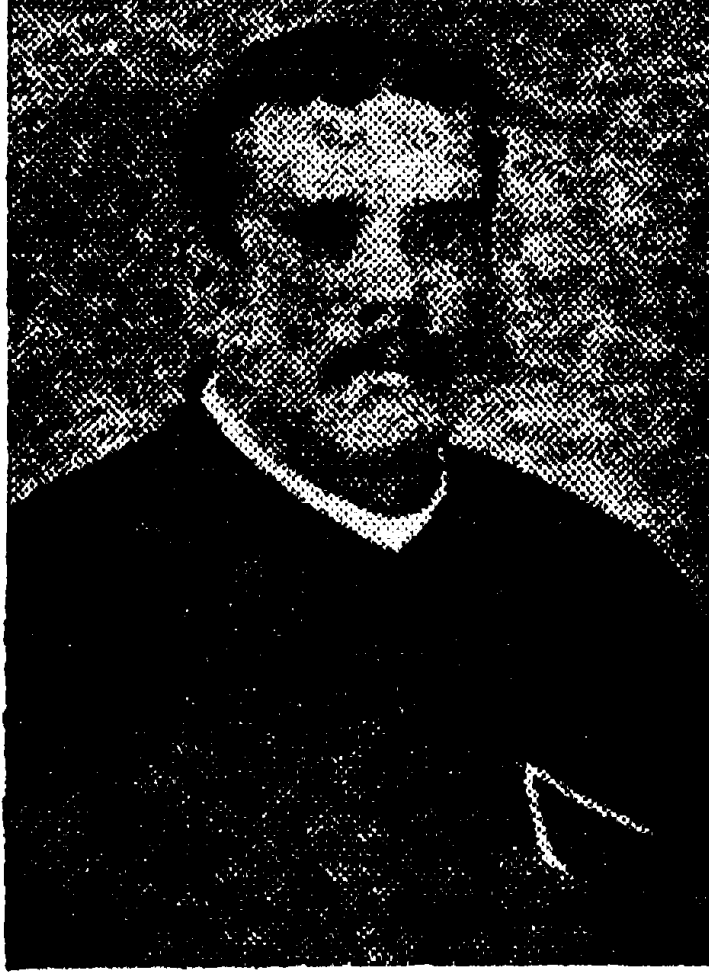
একাডেমী প্রতিষ্ঠার মাস তিনেকের মধ্যেই এ সংগঠনের কাজকর্ম ও আলোচনায় ইংরেজীর বেশি ব্যবহার হওয়ায় বাংলাভাষাপ্রেমী মানুষ আপত্তি জানান। এই মর্মে রাজনারায়ণ বসু মিঃ লিওটার্ড সাহেবকে এবং পরে সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ দেবকে চিঠি লেখেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস থেকে একাডেমী 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। নামটি উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রস্তাবিত।

রাজা বিনয়কৃষ্ণের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা, সংগঠন পরিচালকরা সব সময়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। সাহিত্য পরিষদের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে (১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৪ এবং ২৫ চৈত্র) বাৎসরিক কার্যবিবরণীতেও সে স্বীকৃতি আছে। '.....অবশেষে পরিষদের সভ্য, কর্মকারক, সহানুভূতিকারক ও অনুগ্রহকারক ও অনুগ্রাহক দিগকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া প্রথম বৎসরের কার্য বিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর—যিনি আশ্রয়দাতারূপে এই সাহিত্য পরিষদ-রূপ শিশুকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত করিয়া নব উৎসাহ ও নব অনুরাগের সহিত পরিষদ দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেছেন।

পরিষদের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সাহিত্যানুরাগী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রেমিক রাজা বিনয়কৃষ্ণ যে প্রথম সম্মিলনীর আয়োজন করেছিলেন তা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। সেই প্রথম সম্মিলনীর একটা মোটামুটি ছবি এইভাবে তুলে ধরা যায়, '২৫শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ধ্বজা, পতাকা, পুষ্প ও পুষ্পমালায় পরিশোভিত হইল।

প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শবর্তী গৃহসমূহ সুন্দর কার্পেট, সুন্দর চেয়ার, সুরঞ্জিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় চারিশত লোক সভাস্থল পূর্ণ করিয়া বসিলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগত উপস্থিত ছিলেনঃ মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সি এস সি আই ই (সভাপতি), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি), অনারেবল জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনারেবল জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ, মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, সি এস। রজনীকান্ত গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, রামব্রহ্ম সান্যাল, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিরাজ নবীনচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ডাক্তার আর জি কর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। এছাড়াও আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্যপরিষদের চারাগাছটি সযত্নে ছায়াবিস্তার করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বিনয়কৃষ্ণ। এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতার তুলনা ছিল না। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ হাতের কাছেই রয়েছে। তাতে দেখা যায় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার শৈশবকালে পরিষদ সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ দেব একে অপমৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। ১৮৯৩ সালের জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে যখন একাডেমীর চাঁদা আদায় মাত্র ৪৪ টাকা ১৪ আনা, অনাদায়ী ৩২ টাকা, ব্যয় ২২ টাকা ১০ আনার মত, বাজারে দেনাও ৫১ টাকা, তখনই বিনয়কৃষ্ণ সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছিলেন। সস্নেহ ছায়া বিস্তার পত্রিকাটিকে বাঁচিয়েছিল। সেই সংকট মুহূর্তে অসুস্থ বিনয়কৃষ্ণ গিরিডি থেকে সহ-সভাপতি লিউটার্ডকে চিঠি লিখলেনঃ 'অ্যাজ অ্যান আরনেস্ট......অফ মাই লাভ টুওয়ার্ডস দি একাডেমী, আই ইনটেন্ড টু রেজ মাই মান্থলি সাবসক্রিপসন ফ্রম রুপিজ ফোর টু রুপিজ এইট, টু মেনটেন আওয়ার গুড জারনাল।'

মাসিক আট আনা মাত্র সভ্য চাঁদাও তখন সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাওয়া যেত না। পরিষদের ১৩০১-এ বেহারা ও আদায়কারীর মাইনে বিনয়কৃষ্ণ দিতেন। পরে সামান্য কিছু পরিষদ দিতেন বাকিটা বিনয়কৃষ্ণ।

আজ যখন পরিষদের দুর্দশা এবং চরম অব্যবস্থার কথা শুনি তখন বড় বেশি করে সেই ছায়াবিস্তারী মানুষটির কথা মনে পড়ে যায়।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাকরিবাকরি

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক্তিয়ারের বাইরে, আর শতকরা তিরিশটি সংরক্ষিত পদ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সব চাকরিতেই, এমনকি সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলিতেও এখন শুধু **এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ** থেকে লোক নেয়া হচ্ছে। এটা শুরু হয়েছে গত বছর জানুয়ারিতে। **নিরক্ষর** থেকে সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন—যে-কোন বয়েসের যে-কেউ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন। কলকাতার বাসিন্দা, **ম্যাট্রিকুলেট** থেকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট ও **এল এম ই, এল সি** ইত্যাদি যাবতীয় কারিগরি ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের **নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে** রিজিওনাল এমপ্লয়মেন্ট **এক্সচেঞ্জ বা আঞ্চলিক কর্ম**-বিনিয়োগ কেন্দ্রে। **ঠিকানা : ৫ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা : ১। ফরম ওখানেই** পাওয়া যায়।

যাঁরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন বা গ্র্যাজুয়েট হবার পর বি-টি করেছেন বা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, চাটার্ড বা **কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি** পাশ করেছেন, পশ্চিম বঙ্গের যেখানেই তাঁদের বাসা হোক তাঁদের **নাম রেজিস্ট্রি** করতে হবে **এমপ্লয়মেন্ট** এক্সচেঞ্জের প্রফেশনাল অ্যাণ্ড একসিকিউটিভ সেন্টার ৬৭, বেন্টিংক **স্ট্রিট, কলকাতা ৬৯** এই ঠিকানায়।

যাঁরা নন-ম্যাট্রিক, এমনকি নিরক্ষর বা কোনো-না-কোনো কারিগরি অভিজ্ঞতা **আছে বা** ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট **থেকে পাশ** করেছেন, তাঁরা ধর্মতলা **স্ট্রিটের বাঁদিককার অর্থাৎ** মধ্য ও উত্তর **কলকাতার অধিবাসী** হলে নাম রেজিস্ট্রি করার ঠিকানা **:** উত্তর কলকাতা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র, ৬, বি টি রোড, কলকাতা-২। ধর্মতলা স্ট্রিটের ডান দিকের অর্থাৎ দক্ষিণ কলকাতার (খিদিরপুর ধরে) বাসিন্দাদের মধ্যে যাঁরা আই-টি-আই পাশ **করেছেন** বা কারিগরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাঁদের যেতে হবে খিদিরপুরের সব-রিজিওনাল এমপ্লয়মেণ্ট **এক্সচেঞ্জ**, কার্ল মার্কস সরণি (খিদিরপুর ট্রাম ডিপোর গায়ে)। ওই এলাকার **বাকি কর্মপ্রার্থীদের** (অকারিগরী) নাম **রেজিস্ট্রি করার ঠিকানা :** সাউথ ক্যালকাটা **এমপ্লয়মেন্ট** এক্সচেঞ্জ, ১৩ সেলিমপুর রোড, **কলকাতা-৩১। তাছাড়া পূর্ব কলকাতার জন্য আছে** ইস্ট ক্যালকাটা **এমপ্লয়মেন্ট** এক্সচেঞ্জ, ১৪ **গিরীশ ঘোষ রোড, কলকাতা-১৪** (রূপম **সিনেমার পিছনে)। কার কোন কেন্দ্র যে-কোন কেন্দ্রেই জেনে নেয়া যায়।**

পশ্চিমবাংলার প্রত্যেক জেলায়ও কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের এক বা **একাধিক** অফিস আছে। বর্ধমানে পাঁচটি—বর্ধমান টাউন, দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, সিতারামপুর ও আসানসোলে। বাঁকুড়ায় দুটো—সদরে আর বিষ্ণুপুরে। নিরক্ষর থেকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত যে-কেউ তাঁর জেলার কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন।

কী কী লাগে? পাশ-টাশ করা হলে সার্টিফিকেট ও তার নকল (অ্যাটেস্টেশন দরকার নেই), ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে রেশন কার্ড। ফোটো বা টাকা লাগে না।

যে-কোন **সময়েই নাম রেজিস্ট্রি করা** যায়। যে-মাসে করবেন, পরের **বছর** ঠিক সেই মাসের যে-কোনো তারিখে রেজিস্ট্রেশন কার্ড রিনিউ করতে হয়। সে-মাসের পর আর করা যায় না। একদিন দেরি হলেও না।*

যাঁরা এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বা সরকার পরিচালিত সংস্থায় চাকরির **ইন্টারভিউ** পাবেন, সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সব স্তরেই তাঁরা পঁয়ত্রিশ **বছর** বয়েস পর্যন্ত চাকরি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। রাজ্য সরকারের চাকরির জন্যে পাবলিক সারভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসার বয়ঃসীমার চেয়েও এটা পাঁচ বছর বেশি। এই নিয়ম নতুন হয়েছে।

এমপ্লয়মেন্ট **একসচেঞ্জে** নাম রেজিস্ট্রি করার **পর পাঁচ বছরের মধ্যে** চাকরি না হলে বেকারিভাতা পাওয়া যায়। **মাসিক** পঞ্চাশ টাকা। **যতদিন** না চাকরি হয়, ততদিন। **অবশ্য** সেই বেকারের বাড়ির **অভিভাবকের** মাসিক আয় পাঁচশো টাকার মধ্যে **হওয়া চাই।**

টেলারিং

টেলারিং শিখেও যাঁরা কোথাও কোনো কাজ পাননি, টাকার অভাবে নিজস্ব একটা মেশিন নিয়েও বসে যেতে পারেন নি, এক কথায়, আয়ের কোনো ব্যবস্থাই হয়নি, এই কলমে আমি শুধু তাঁদের জন্যেই লিখছি : প্রথমেই বলে দিই, আপনার বসে থাকার কোনো কারণ নেই। শহরতলী, জেলা শহর, বড় শহরের ছেলেদের তো নয়ই। এমনকি চাকরিজীবীপ্রধান বড় বড় গ্রামে যাঁরা থাকেন তাঁদেরও নয়।

টেলারিং সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে অর্থাৎ কাজ শিখে আপনি কী কী করতে পারেন শুনুন। চেনা-জানা **দরজির দোকানে পার্ট টাইম বা সহকারীর** কাজ করে আরো হাত **পাকাতে পারেন। বড় বড় ছিটকাপড়ের দোকানে** এক কোণে **একটা** মেশিন **নিয়ে বসে** যেতে পারেন। দোকানের **মালিকের সঙ্গে** সামান্য ভাড়ায় **বা কিঞ্চিৎ কমিশনে এই** ব্যবস্থা করে নেয়া খুব **কঠিন নয়। আর** কী করতে **পারেন? বড়-বড় পোশাক**-নির্মাতা দোকানের **কাছ থেকে অর্ডার** নিয়ে ঘরে **পাইকারি হারে পাজামা**-টাজামা, আণ্ডারওয়্যার, **বাচ্চাদের জাঙ্গিয়া ইত্যাদি** বানাতে **পারেন। শার্ট-পাজাবি** বানাতে **পারলে** তো **আরোই ভালো।** শয্যাদ্রব্য **বিক্রির দোকানের জন্যে** বালিশের খোল, লেপ তোষকের **ওয়াড়** নাইলনের **মশারি সেলাই করা যায়।**

যতগুলো **উপায় বললাম, তার যে**-কোনো **একটি** বা **একসঙ্গে দুটি আপনি** খুব শিগ্গিরই শুরু **করতে পারেন।** সেই সঙ্গে প্রতিবেশীদের **অর্ডার মতো** এটা-সেটা **সেলাই** করা তো **আছেই।** কাপড় তাঁরাই দেবেন, আপনার **কাজ** শুধু কাটা আর সেলাই **করা।**

যাঁরা চেনা-জানা দরজির দোকানে কাজ **করতে** চান, তাঁরা ওইসব দোকানে কথা বলে দেখুন। আর **যাঁরা সামান্য** ভাড়া বা **কমিশনের** বিনিময়ে **বড়-বড়** ছিটকাপড়ের দোকানে **নিজস্ব মেশিন** নিয়ে বসতে চান বা পোশাক **নির্মাতা** বা **শয্যাদ্রব্যের দোকান থেকে অর্ডার এনে** ঘরে বসে মেশিন চালাতে চান, **তাঁরা প্রথমেই ওইসব** দোকানে **কথা বলে কথা** পাকা করে **ফেলুন। বাকি থাকে একটা** মেশিন আর ফিতে কাঁচি **সুতো হাতে** পাওয়া। আপনার **এলাকার** যে **কোনো** ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কে গিয়ে **আপনার** পরিকল্পনা খুলে বলুন। **ও'রা আপনাকে** প্রয়োজনীয় টাকা ধার **দেবেন। ফরম-টরম কী** করে কী **পূরণ করতে হবে,** ওখান থেকেই জানতে পারবেন। **আপনি** যে আলাদা করে **ঘর** ভাড়া **করছেন না,** আর পোশাক কি শয্যাদ্রব্যের **দোকান ও** প্রতিবেশীদের কাছে **কাপড় নিয়ে** জিনিসটা শুধু বানিয়ে দেবেন, **সেকথা** ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে **জানাতে ভুলবেন** না। খুব তাড়াতাড়ি **ঋণ মঞ্জুর হয়ে** যাবে। তার **কারণ এই ব্যবসায় আপনার** ঝুঁকি খুবই **কম। টাকাও কম লাগে।** যাঁরা **প্রথম** থেকেই **দামী-দামী ছিট**-কাপড় সাজিয়ে **ঝকঝকে টেলারিং শপ** খোলার **স্বপ্ন** দেখছেন, তাঁরা **কিন্তু** এত তাড়াতাড়ি **ঋণের আশা করবেন না। সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কেরও অনেক কড়াকড়ি।** সেটাই **স্বাভাবিক।**

কর্মবন্ধু

সমালোচনা

কৃত্রিমতা নেই

মানুষের কাছে জীবনকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতার মতো রোমাঞ্চকর আর কিছু নেই। সে-দেখা যেমন মানুষকে তেমনি প্রকৃতিকে। বাল্যকালের দিনগুলো তাই সব মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। তা সে সুখ আনন্দের হোক কিম্বা দুঃখ বেদনার। কল্পনাপ্রবণ অবুঝ মনের সেই সব তুচ্ছা তিতুচ্ছ বাল্য অভিজ্ঞতা অন্তর্লীন স্মৃতি হয়ে আমরণ বেঁচে থাকে মানুষের ভেতরে, গোপন মৃগনাভির মতো। স্বভাবে সব বয়স্ক মানুষই নিশ্চয়ই একই রকমের হয় না কিন্তু বাল্য-স্মৃতির প্রতি সব মানুষই তাই সমান দুর্বল। ফলে স্মৃতি-মূলক যেকোন রচনাই সব পাঠককেই কোন না কোনভাবে আন্দোলিত করে যায়। অসীমকুমার দত্তের 'সোনারঙের দিনগুলি' অরুণ নামে এক বালকের বাল্য কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে পৌঁছুবার কাহিনী। এ উপন্যাসের স্মৃতিসৌরভ অনেককেই আনমনা করবে।

জীবন শুধুই কল্পনা আর স্বপ্ন নয়। জীবনের বিচিত্র জটিলতা রূঢ়তা ক্রমে কোমল অনুভূতিগুলিকে আঘাত করতে থাকে। অবুঝ মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলোকে ভেঙেচুরে রক্তাক্ত করে দেয়। দুঃখ জমে, বেদনা সঞ্চিত হতে থাকে বিন্দু বিন্দু। অরুণ বিমূঢ় বিস্ময়ে এসব অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করে। সে দেখে তার প্রিয় বেলাদিকে। অজিদার সঙ্গে তার ভালবাসা সে টের পায় অস্পষ্টভাবে। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারে না কেন অজিতদা এক অন্ধকার রাতে প্রহৃত হয়। তারপর বিতাড়িত। বেলাদির দুঃখ তাকেও মর্মাহত করে। অজিতদাকে মনে রেখেই অচেনা আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পরে বেলাদি কান্নায় ভেঙে পড়ে, তাকে বলে—আমি আর বাঁচব নারে অনু।

কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র। বহুদিন বাদে সন্তানবতী সেই বেলাদিকে দেখে স্বামীর সঙ্গে সুখী তৃপ্ত। অরুণ কিছুতেই এই দুই বেলাদিকে মেলাতে পারে না। দুঃখ পায়। ভালবাসা কী এত ঠুনকো?

দাদা অমরের জন্যও এমনি আরেক-রকমের দুঃখে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আদর্শবান মেধাবী ছাত্র অমরের প্রশংসা সবার মুখে, অরুণ গর্ববোধ করে। দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নে অমর বেছে নেয় সংগ্রামী জীবন। জেলে খাটে। জেলে বসে এম-এ পাশ করে। তার মুক্তির দিনের মিছিলের উন্মাদনা তাকেও গৌরবান্বিত করে। তার চেয়েও অরুণ বেশী সুখ বোধ করে যখন শোনে অমর মালতীকে বিয়ে করতে চায়। তাদের প্রচ্ছন্ন ভালবাসার সৌরভ তাকেও মুগ্ধ করে। কিন্তু মালতী নিম্নবর্ণের মেয়ে, ফলে বাবা রুষ্ট হন। নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটে যায় অমরের। সে মালতীকে গোপনে বিয়ে করে দূরগাঁয়ে চলে যায়। তবু তাদের এই অবিচল ভালবাসার শক্তি অরুণকে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতা তার সে-তৃপ্তিকেও গুঁড়িয়ে দেয় একদিন। অনুতপ্ত বাপ যখন কোমল হয়ে এসেছে এমনি এক সময়ে অরুণ অমরদের কাছে চলে যায়। কিন্তু সে পুনর্মিলনের আনন্দ ম্লান হয়ে যায় অমর-মালতীর জীবনের নিষ্ফলতায়। নিঃসন্তান এই দম্পতি তাদের সর্বকিছু দান করে দিয়ে পন্ডিচেরীর আশ্রমে চিরদিনের মতো চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শূন্য হাতে শূন্য বুকে ফিরে আসে অরুণ। শুধু তার দুটি মূর্তি ভরে ওঠে বেদনার সম্ভরে।

অথচ সুখী হবার মতো কৃতিত্ব অরুণের জীবনেও দুর্লভ ছিল না। সেও মেধাবী ছাত্র, স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে সে সকলের গর্ব। কিন্তু এই সুখ যেন মেঘাবৃত আকাশের ক্ষণিক বিদ্যুদ্দাম। গাঢ়তর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু যা রেখে যায় না। ব্যক্তিগত দুঃখ জমে ওঠে তার বয়ঃসন্ধিকালে। যখন নমিতার মত নম্র এক কিশোরীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে যায়। কী এক গভীর দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ সে অনুভব করে তার জন্য। যেন নমিতা ছাড়া জীবনের কোন অর্থ নেই। কিন্তু তরুণ বয়েসের এই গোপন ভালবাসা কী ভীষণ যন্ত্রণাময়। কারুকে মুখ ফুটে বলতেও পারে না সে। একমাত্র সমীরকে ছাড়া—যে তার প্রাণের বন্ধু। মানুষের বন্ধুত্ব যে এমন মহার্ঘ এ বয়েসেই শুধু তা অনুভব করা সম্ভব। সমীরকে জানাবার পরে সে যখন কিছুটা স্বস্তি পায় তার কিছুদিন বাদেই আসে নমিতার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র। অরুণের কাছে জীবন বর্ণ-হীন হয়ে যায় এক মুহূর্তে।

জীবন ক্রমে হয়ে ওঠে বৈচিত্রহীন। তবু দুই তরুণের বন্ধুত্ব জেগে থাকে সুখে দুঃখে। কিন্তু জীবনের অমোঘ প্রয়োজন একদিন এই বন্ধুত্বেও বিচ্ছিন্ন আনে। সমীর চলে যায় সুদূর বোম্বেতে জীবিকার অন্বেষণে। অরুণ পড়ে থাকে একলা। শুধু অতিবাস্তব এক পৃথিবীতে। শুধু বেঁচে থাকার জন্য। আর তরুণমনের প্রচ্ছন্ন বর্ণহীন কিছু আশা নিয়ে। তারো চেয়ে বেশী কিছু দুঃখ আর বিচ্ছেদের স্মৃতি নিয়ে।

এ-কাহিনীর চরিত্রগুলো এত বেশী জীবন্ত এবং ঘরোয়া যে কোথাও বিন্দু-মাত্র কৃত্রিমতা পাঠককে পীড়িত করবার অবকাশ পায় না। সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন থেকে সবাই উঠে আসে সহজভাবে। তবে কাহিনীর অতি সরলতা কখনো কখনো শুধুমাত্র বিবরণ ধর্মী হয়ে যায় বলে মহৎ শিল্পকর্মের কাছাকাছি পৌঁছেও যেন তাকে স্পর্শ করতে পারে না বলে মনে হয়। বস্তুতঃ গভীর কোন জিজ্ঞাসা বা দর্শন এ-উপন্যাসে আভাসিত হয়ে ওঠেনি। তবু বাল্যের স্বপ্ন কল্পনার ভাঙাচোরা দুর্গের ভেতর থেকে বাস্তব জীবনের রূঢ় অভি-জ্ঞতার টানাপোড়েনে সব মানুষকেই যে অনিবার্য দুঃখ সঞ্চয় করে যেতে হয় জীবনে সেই বেদনাময় সত্যটি দুর্লক্ষ্য নয়। এও কী লেখকের কম কৃতিত্ব।

সমীর রক্ষিত

সোনারঙের দিনগুলি : অসীমকুমার দত্ত। প্রকাশিকা : শ্রমতী পূর্ণিমা মোদক। অতন্দ্র প্রকাশনী। ১৬, লেনিন সরণী (পূর্ব)। কাঁচরাপাড়া, ২৪-পরগণা।

জীবন না জীবিকা?

জীবনের লড়াইয়ে নেমে জীবিকার তাগিদে মানুষকে একটা না একটা পেশা নিতেই হয়। মোট কথা জীবনে জীবিকার সন্ধান অনিবার্যই। আর সেই অনিবার্য জীবিকার সূত্রেই বিভিন্ন পেশার আশ্রয় নেওয়া। আজকের জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনে জীবিকার সন্ধান ঠিকই, কিন্তু জীবিকা কি জীবনকেও ছাড়িয়ে যায়? অর্থাৎ জীবনের চেয়েও কি জীবিকা বড়। আজকের এই জটিল জীবন বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যেও তাই একটা আত্ম বিকাশ রয়েই যায়—তার কাছে কোনটা বড়? জীবন, না জীবিকা?

কেশবভূষণ রায়ের ছকে বাঁধা নয় উপন্যাসের নাম জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত হয়েছে, জীবিকা কি জীবনের চেয়ে বড়—এ-জিজ্ঞাসার বারবারই সে নিজেকে পীড়িত করেছে।

নায়িকা জাতির মধ্যেও সেই একই প্রশ্ন। সেও নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে জীবিকার যে আনন্দ সে চেয়েছিল, তা কি পেয়েছে? পায়নি।

একটা গভীর অপ্রাপ্তির বেদনা অহরহই কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে।

ছকে বাঁধা জীবনে তৃপ্তি নেই। কেমন যেন পানসে। ৬এই ছকের বেড়া ডিঙিয়ে একবার যে বাইরে আসতে পেরেছে। তার কাছে কিন্তু জীবনের আস্বাই পাল্টে গেছে। এ-উপন্যাসের নায়ক সে অভিজ্ঞতাই পেয়েছে জীবনের পর্বে পর্বে। আর উপন্যাসকার জীবিকা আর জীবনের প্রশ্নে দ্বান্দ্বিকে বড় করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। সুখপাঠ্য এ-উপন্যাসটি পাঠকের স্বীকৃতি পাবে আশা করি।

ছকে বাঁধা নয়। কেশবভূষণ রায়, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। কলকাতা-৯। দাম দু' টাকা।

আমরাই দায়ী

চিঠিপত্র

গত অমৃতে প্রকাশিত নৌশাদ মল্লিকের আমরা মুসলমানরা কেমন আছি' শীর্ষক রচনাটির জন্য অমৃত সম্পাদক ও লেখককে ধন্যবাদ। যদিও নৌশাদ সাহেবের বক্তব্য আবেগধর্মী, ফলে অনেকখানি অসংলগ্ন কিছু বক্তব্যও অনুক্ত থেকে গেছে। তবু তাঁর প্রতিবেদন সাড়া জাগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমিও সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য রাখছি—

কথা হল 'আমরা মুসলমানরা কেমন আছি' এই কথা ভাবার আগে আমাদের আরো একটা কথা ভাবা উচিত, তা হল কেন আমাদের আজ এই দশা? যখনই আমরা নিজেদের দেখি, দেখতে পাই—অশিক্ষিত, অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু, সংস্কৃতিহীন, ভীরু এক সমাজের ছবি। পশ্চিম বাংলার বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম অংশের যথার্থ পরিচয় এই। প্রশ্ন হল কারা এঁকেছে মুসলমানদের কপালে এই কলঙ্ক তিলক? নিরপেক্ষ বক্তব্য বলে—আমরা মুসলমানরাই। অক্ষম সাম্প্রদায়িক বক্তব্য হল—না, হিন্দুরা। এ বক্তব্যের কোনটা কতটা ভাবি সে বিচার করবে ইতিহাস, আমার বক্তব্য ভিন্ন—

অতীত অতীতেই থাক—আমরা তার তিক্ত স্মৃতি রোমন্থন করতে চাই না। আজকের দশকে আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত পুরোন যা কিছু, অসঙ্গতি আছে তার বিলোপ ঘটিয়ে নতুন এক সমাজ গঠন করা—প্রগতিবাদ হবে যার মূলমন্ত্র। এখন প্রশ্ন হল কে বা কারা নেবে সেই সমাজ গঠনের দায়িত্ব? সাফ জবাব—নবীন ও প্রগতিশীল যুক্তিবাদী প্রবীণরা। এ ব্যাপারে বেশ কিছুদিন আগে আমি আমার আরো কয়েকজন বন্ধুসহ এক সংগঠনের ভিতর দিয়ে সমাজের মধ্যে প্রচার পুস্তিকাদি এবং গ্রামে গ্রামে উপসমিতি গঠন করে তার মাধ্যমে ঘুণধরা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চালাবার আয়োজন করেছিলাম। অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলাম। কিন্তু, তারপর পঞ্চায়েত নির্বাচন এসে যাওয়ায় এবং কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির অসহযোগিতার অভাবে (লেখক নৌশাদ সাহেব তাঁর রচনায় যাদের ধনী-জোতদার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন) কিছু দিনের জন্য আমাদের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এখন আবার সে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

লেখক নৌশাদ সাহেব তাঁর নিবন্ধের শেষের দিকে লিখেছেন মুসলমান ছেলেরাও এখন অনেকে জেগেছে। এ কথা সত্য—তবে সে জাগৃতি প্রয়োজনের তুলনায় অল্পই। স্কুল-কলেজের অসংখ্য ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি অধিকাংশেরই এখনও জুজুভীতি যায়নি—মেয়েদের কথা তো বাদই দিলাম।

এখন কথা হল সার্থক সমাজ বিপ্লব ঘটাতে হলে চাই বিরাট এবং বলিষ্ঠ এক সংগঠন ও বঙ্গব্যাপী প্রচার অভিযান। দু একটা গ্রাম বা অঞ্চল ভিত্তিক প্রগতি চিন্তা ও আন্দোলন সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে না। সমস্ত দেশ যদি একই বৃত্তের মধ্যে আসতে পারে তা হলেই এ গ্লানি সমাজ থেকে মুছে ফেলা সম্ভব।

এম মিজানুর রহমান

পোঃ আটুরিয়া, ২৪-পরগণা

স্পষ্ট ছবি নেই

আমরা 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। সম্প্রতি অমৃত পত্রিকার নানা ধরণের লেখা প্রকাশের প্রয়াসে আমরা খুশী হয়েছি। কিন্তু, মাঝে মাঝে দু একটি লেখা পত্রিকার এ প্রয়াসে বাধা হচ্ছে বলে মনে করি। যেমন কয়েক মাস আগে প্রকাশিত নৌশাদ মল্লিকের 'আমরা মুসলমানরা কেমন আছি' শীর্ষক রচনাটি। এই লেখার মধ্যে মুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থার কোন সুস্পষ্ট ছবি নেই। শুধু লেখকের আত্মকথাই বর্ণিত হয়েছে—যা কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবপ্রসূত এবং এখানেই বিষয়টি নিন্দার্হ। আশা করি এর পর এই ধরণের কোন লেখায় মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ব্যক্তিজীবনের আশ্রয়েই প্রকাশ পাবে। কেবলমাত্র লেখকের আত্মপ্রচারের মাধ্যম হবে না। এ ধরণের লেখা তথ্য ভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

স্বপন বসু, অনির্বাণ রায়চৌধুরী লক্ষ্মণ কর্মকার, পল্লব মিত্র, তপন কর।

কলিকাতা - ৯

দুঃসাহস দেখিয়েছেন

নৌশাদ মল্লিকের লেখা 'আমরা মুসলমানরা কেমন আছি' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করে সত্যিই দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সাধারণতঃ নামী পত্রপত্রিকায় মুসলমানদের সংস্কৃতিগত ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে কেউ কোন লেখা প্রকাশ করতে সহজে রাজী হন না। বাঙালী মুসলমান সমাজের সুখ-দুঃখের অভাব-অভিযোগ আর নানা ধরণের সমাজ কল্যাণকর চিন্তা-ভাবনার সংবাদের সঙ্গে খবরগুলো [illegible] সমাজ জানা 'অমৃত' নজীর সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন।

কেউ কেউ বলেন, মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের মেলামেশার অভাবেই ভুল বোঝাবুঝি। আমিও তাইই ভাবতাম। নৌশাদ মল্লিকের লেখা পড়ে জানলাম যে, বহু পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু মুসলমান ঘরে জন্মের অপরাধে নানাক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন উনি। মাঝে মধ্যে পশ্চিমবাঙলার দৈনিক পত্রিকা থেকে শুরু করে ছোটখাটো পত্র-পত্রিকাতেও যদি মুসলমানদের আচার, ব্যবহার ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় তাহলে সম্প্রীতি বাড়তে পারে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে।

এই জিনিসটা হয় না বলেই আজও আমাকে শুনতে হয় আপনি কি ভাষায় কথা বলেন? আপনার মাতৃভাষা আরবী না ফারসী। মুসলমানদের মাতৃভাষা যে বাংলা হতে পারে—এটা যেন অবিশ্বাস্য। আর মুসলমানরা যে বাঙালী হতে পারে তাও অনেকের জানা নেই। এ প্রশ্নও শুনতে হয়, আমি ভেবেছিলাম আপনি বাঙালী, আপনি তাহলে মুসলমান। তা আপনি বাংলা শিখলেন কি করে?

তাই যত বেশী মুসলমানদের পালা-পার্বণ সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কে লেখালেখি হবে ততই মঙ্গল। জেনে জেনে তো জানানো যায় না ডেকে ডেকে যে, মুসলমানরাও বাঙালী হতে পারে। 'অমৃতের' পাতায় নৌশাদ মল্লিক তাঁর রচনায় মুসলমানদের সমাজে মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের বুকে ছুরি মারার প্রবণতা ও হানাহানির কথা বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে অ-মুসলমান শোষকদের কথাও। আসলে সমাজে যাঁরা শোষণ করেন তাঁদের কারও জাত নেই। গ্রামীণ উন্নয়নে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যাতে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে না পারে তা দেখা দরকার। দুঃখের কথা প্রায়শঃই মুসলমান-প্রধান এলাকায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible]। [illegible] জেলার [illegible] থানার এক [illegible] [illegible] [illegible] তারা মানে। [illegible] সম্প্রীতির [illegible] বলে আমরা মনে করি। মুসলমান-দেরও দোষ কম নয়, তারাও নাম ভাঁড়িয়ে অমুসলমান হতে যান। মুসলমান সম্পর্কে খোঁজ-খবরও রাখেন না অথচ হেরে গেলে বলেন আমরা মুসলমান তাই এ অবিচার।

[illegible] এফ [illegible]

আকুনী, হুগলী

প্রাসঙ্গিক

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

যে কোন জ্যোতিষীর মতই তুমিও তোমার ভাগ্যকে জানো না
তুমি জানো সপ্তঋতুর মাঠ, জাহান্নাম হাঁস আর পানাপুকুরের গল্প
যে গল্পে ভেসে ওঠে কচুবন, কাঁটাঝোপ, লালনীল পাখি

যে কোন প্রেমিকের মতই তুমিও তোমার প্রেমিকাকে চেন না
তুমি চেন তার সন্ত্রাস, তোমার প্রতি বিশ্বস্ত হবার অবিশ্বাস
তার মধ্যে বেড়ে উঠছে তোমারই অস্পষ্ট আরেক প্রেমিক

অথচ তোমার প্রেমিকা জ্যোতিষে বিশ্বাস করে খুব
এই সংবাদেই তার হাত তুমি ধরেছিলে
বলেছিলে, 'আমি কবি
আমিই দেখেছি শুধু পৃথিবীর প্রকৃত জাহ্নবী
তোর মহিমায়'

এখন তো জেনে গেছ যত বেশি জানা যায় তত বেশি ভুল জানা যায়

কবিতার উপাসনা

ভক্তী বিশ্বাস

কবিতার উপাসনা নষ্ট স্বপ্নের বীজ বোনে বাতাসে
বস্তুতঃ অধিকারবিহীন এই সাম্রাজ্য
শব্দের ক্রীতদাস খুঁড়ছে কবর নিজ ক্রমলগ্নে
বরফ গলেনি ভাঙেনি প্রাচীর
বহুব্যসন ঘটেনি কোথাও
গাঢ় অন্ধকার শেকলের শব্দ নিয়ে কেটেছে আয়ুষ্কাল
আরাধ্য প্রতিমা ফিরিয়েছে মুখ
রক্তে বেজেছে অপবাদ যেন কলস্বনা নদী

নষ্ট বীজ ভেসে যায়
জানালিটে কপালে ক্ষত জমে
চতুষ্পদ হয় নির্মম পরিত্রাণ
পুণ্য নয়
উপাসনায় অর্জিত ভূমি শয়তানের কবলে
পাপের চুম্বনে বীজমন্ত্র বেড়ে ওঠে নির্লাজ অধরে।

কবিতা লেখার পর

রফিকুল ইসলাম

সিজারিয়ান মাতা তার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গেল—
নুয়ে পড়া শস্যক্ষেত্রের পাশে দাঁড়িয়ে কালো মানুষটি
আকাশের দিকে সটান তাকিয়ে আছে
বিশ্বাস সন্দেহ তর-তর করে সিঁড়ি ভেঙে কক্ষপথ ছুঁয়ে ফ্যালে
যেন এইটুকুর জন্য এতক্ষণে পৃথিবী থমকে দাঁড়িয়েছিল
এই তার অবয়ব—সুঠাম সুন্দর জীবনের মত।

আমি যখন হাস্নুহানার ঝোপের মধ্যে চই-চই খেলি
জীবনকে ছুটিয়ে দিই অনির্দিষ্ট বেলুনের মত
ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় একটা সুন্দর কবর খুঁড়ে
পুঁতে দিয়ে আসি—ফুসফুসের দূষিত বাতাস
গন্ধমাদন পৃথিবীর চূড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ি,
এস—আমরা পৃথিবীর মানুষ সব এক হয়ে যাই।

এখন ঠোঁটের পাতাজুড়ে চুমি ছন্দোবদ্ধ মহার্ঘ আরাম
যেন আজ আমার প্রথম জন্মদিন—
কটা শব্দ দিয়ে আমি বানিয়েছি মানুষের ঘরবাড়ি।

হে বিহঙ্গ মোর

তুষার চৌধুরী

এ ভব সংসার মাঝে কে আমায় একা ফেলে গেলো
লিপটনের বিজলী ঘড়ি শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য জ্বলে
শূন্য থেকে হঠাৎই ভেসে আসে নমিতার মুখ
ঘোড়ার ডিমের যাদুমন্ত্রবলে কলম্বাস এসে
হাঁসের ডিমের মত ওর মুখ লম্বাভাবে বসিয়ে দেবেন
আমি আশ্চর্য হব না

শিশিরের শব্দের মতন যেই স্বপ্ন নেমে আসে
মাথা থেঁৎলে দেয় যান্ত্রিক মুগুর
কবিতা কে লেখে আর কুকুরের লেজে ক্যানেস্তারা বেঁধে
কে করে মস্করা
কে আর লাফায় আজ সে রকম চুমু খায় বেবুনের ঠোঁটে
ফটিকচাঁদের মত অনেক প্রতিভাধর জেনে গেছে কবিতা-ফবিতা
মাইকেল রবির পর কিঞ্চিৎ জীবনানন্দ জেনেছিল এর পর আজ
যা কিছুই লেখা হয় ও'দের গয়ের
মহামান্য নপুংসক আপনার অলীক জীন ধুঁকতে ধুঁকতে
আজ পর্যন্ত বংশগতি বজায় রেখেছে

(আদি পিতা জেলি
কেন যে কৌতুক করে আমাদের করোনি বেবুন)
জারজ কুসুমগুলি ফোটে টবে পুষ্প প্রদর্শনী ঘুরে আসে
প্রতিযোগিতায় জেতে হারে
কেউ বা অপ্রতিযোগী লাজুক বিদ্রোহী
কেউ বা বোঁটার থেকে ঝরে পড়ে গিয়ে ভাবে ফুল জন্ম বৃথা
সেরিব্র্যাল বিছানায় নগ্ন গা নমিতা
মনুষ্য রেশম দ্রব্য সমবায় প্রথায় ফলেছে
শব্দের রেশম শিল্পে মাছিরাও পা পিছলিয়ে পড়ে
চিন্তার রেশম এত মিহি যে আলাদা করা কঠিন
উদোর পিণ্ড কত অনায়াসে

বুধোর গর্দানে চলে যায়
পুস্তকের দরজা যেই খুলেছি হরফ নয় পালঙ্কে আমিই অর্বাচীন
পাশেই রয়েছে এক ডানাকাটা পরী
যার আসমুদ্রহিমাচল জলজ্যান্ত সোনা

আদিগন্ত উন্মোচিত নীল নভে রামধনু ফুটেছে
শাদা কাগজের গায় তবু কেন আঁক কষে চলেছি কেন লিখি
কেন কিছু লিখি যাতে পিঁজরের কপাট খুলে শব্দের হাঁড়িটি
নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে পারে

কেন লিখি হে বিহঙ্গ মোর যদি বন্ধ কর পাখা
পালক সরিয়ে যদি দেখতে পাই মাংসের নিভৃতে
ফুটে আছে মনোরম কন্দলে কুসুম ক্যান্সারের
সে রকমই গন্ধ পাই হে মনিয়া কবে
নীলাভ অরণ্য থেকে উড়ে এসে আমার আঙুলে দোল খাবে॥

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

অশান্তির উৎস ?

বেদব্যাস বৈদ্য

সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের আয়ু প্রায় দু'বছর। বিদ্যুতের তার আকাল নিয়ে রাজ্যের নানামুখী সঙ্কট-সমস্যা দেখা দেওয়ায় সরকার দারুণভাবে বিব্রত। সরকার প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম থেকেই প্রবীণ জননেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নানা অভিযোগ তুলে তার সমালোচনা করে আসছিলেন। এতদিন তিনি ছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের একক এবং অন্যতম সমালোচক। সি পি আই (এম) বিরোধীরা অপ্রকাশ্যে থেকে শ্রীসেনের সমালোচনায় তৃপ্তি পেলেও প্রকাশ্যে তাঁর পক্ষ নিয়ে নিজেদের প্রকাশ করেন নি। কিন্তু বিদ্যুৎ নিয়ে যখন রাজ্যে নিদারুণ হাহাকার, শ্রমিক-মধ্যবিত্তের মধ্যে যখন বিদ্যুতের আকাল আকাশচুম্বী, সেই পরিস্থিতি এবং পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্ম দিনের অনুষ্ঠান একটু বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। মোমের আলো জ্বালিয়ে যখন তাঁর অনুরাগীরা আধা অন্ধকারে তাঁর জন্মদিন পালন করছিলেন, মিডলটন স্ট্রীটে তাঁর বাসভবনে তখন দুই কংগ্রেসের বহু নেতাদের উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। ঐ সময় বিদ্যুৎ সঙ্কটের প্রশ্ন তুলে তাঁরা সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে শ্রীসেনের কাছে অনুরোধ রাখেন। ভাবখানা এমন যেন প্রফুল্লবাবু একটু নড়ে বসলেই বঙ্গবাসী তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে মুখর হবেন।

প্রফুল্লবাবু অবশ্য জন্মদিনের আসরকে রাজনীতির বাইরে রাখেন নি। বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার নানা দিক তুলে ধরে স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক আচরণের অভিযোগ আনতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে ইস্যু ভিত্তিক একটা আন্দোলন করে সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঐ আন্দোলনে তিনি জনতা দল, দুই কংগ্রেস এবং অন্যান্য সমভাবাপন্ন দলের সহযোগিতাও কামনা করেছেন।

প্রফুল্লবাবু ব্যক্তিগত জীবনে জনতা দলের সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে সমর্থন [illegible] অতএব জনতা দলের নেতা ও কর্মীরা তাঁর পাশে সমবেত হবেন এটা খুব স্বাভাবিক কথা। কিন্তু দুই কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা তাতে কতখানি সক্রিয় সহযোগিতা করবেন, তা নিয়ে প্রফুল্লবাবুর মনেও বোধ করি সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁর জন্মদিনে জনতা, কংগ্রেস অথবা অন্যান্য দলের নেতা কর্মীর উপস্থিতির কথা বাদ দিলেও বলা চলে, ইন্দিরা কংগ্রেসের আবদুস সাত্তার, সুব্রত মুখার্জি, সাধন পান্ডে প্রমুখ শ্রীসেনকে শুধুমাত্র প্রণাম শ্রদ্ধা জানাতেই যান নি, রাজনৈতিক আশ্রয়ের কিছু আশাও তাঁদের মনে যে জাগরূক ছিল, রাজ্য রাজনীতির নেপথ্য খবর যারা রাখেন, তাদের কাছে তা অজানা নেই।

সভাপতি বরকত গণি খানচৌধুরীর বিরুদ্ধে সাত্তার সাহেবদের ক্ষোভ বহু দিন ধূমায়িত। দমদম বিমান বন্দরে মার্চের গোড়ায় শ্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতিতে যে ঘটনা ঘটে, তারপর থেকে সাত্তার সাহেব এবং তাঁর অনুগামী বলে বিবেচিত নুরুল-গোবিন্দ - সোমেন - আনসারিরা বরকত সাহেবের প্রতি আর কতটুকু আস্থাশীল তা নিয়েও সন্দেহ আছে। অতএব বরকত-বিরোধীরা এক জোট হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে তাঁর মোকাবিলা করতে দৃঢ়সংকল্প। তাঁদের ধারণা, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ছেলে সঞ্জয়কে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে যতখানি আগ্রহী, দলের নীতি ও আদর্শ রূপায়িত করতে ততখানি নন। আর ইন্দিরা-তনয় সঞ্জয়ের গুণমুগ্ধ প্রতিনিধি বরকত সাহেবের রাজ্যরাজনীতিতে ক্ষমতার মূল উৎসও স্বয়ং সঞ্জয় গান্ধী। আসলে পশ্চিম বাংলার ইন্দিরা কংগ্রেসের সংসারে এখন দুটি গোষ্ঠী দুমুখো নীতি নিয়ে চলতে চান। বরকত সাহেবরা সঞ্জয়কে সামনে রেখে ইন্দিরা আরাধনায় ব্রতী। আর সাত্তার-নুরুলরা সঞ্জয়হীন ইন্দিরার সেবক। 'সঞ্জয় গান্ধী' এখন রাজ্য কংগ্রেসের অশান্তির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং সাত্তার সাহেবরা যে পথে যাবেন, তাদের জব্দ করতে বরকত সাহেব চলবেন তার উল্টো পথে। রাজনৈতিক আদর্শ অথবা দলের নীতি এখন ব্যক্তিগত খাতে প্রবাহিত। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পরিকল্পিত বামফ্রন্ট বিরোধী ঐক্যবদ্ধ মোর্চার সামিল হতে সাত্তারপন্থীরা যতই আগ্রহী হবেন, বরকতরা তার বিরোধীতা করতে ততই নেতিবাচক নীতি গ্রহণে বাধ্য হবেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি বরকত গণি খানচৌধুরী মহাকরণে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে রুদ্ধকক্ষে আলাপ-আলোচনা করেন। আলোচ্য বিষয় অবশ্য কোন পক্ষই প্রকাশ করেন নি। তারও কয়েক সপ্তাহ আগে মুখ্যমন্ত্রীর জনৈক বন্ধু এক গোপন বার্তা বরকত সাহেবের বাসভবনে যান। ঐ বার্তা বিনিময় এবং দৌত্যিয়ালীর সঙ্গে বরকত-জ্যোতি বসু বৈঠকের কোন যোগসূত্র অথবা রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বামফ্রন্ট বিরোধী মোর্চা গঠনের আহ্বান এবং রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতি বসু-বরকত সাহেবের বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার এই যে, উগ্র সি পি আই (এম) বিরোধী বরকত সাহেব ইতিমধ্যে এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছেন, প্রফুল্লবাবুর নেতৃত্বে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে তাঁরা উৎসাহী বা আগ্রহী নন।

আনুপূর্বিক ঘটনাস্রোত ইন্দিরা কংগ্রেসের কর্মী ও নেতাদের মধ্যে যুগপৎ হতাশা ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। তাদের একাংশের অভিযোগ, সঞ্জয়সেবক বরকত-সাহেব জ্যোতিবাবুর সহায়তায় তাঁর বিরোধীদের শায়েস্তা করে দলীয় ক্ষমতা হাতে রাখতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না। আদর্শ বা নীতির চেয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ তাঁর অনেক বেশী প্রবল।

বরকত সাহেব যেদিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে মহাকরণে শলা-পরামর্শে ব্যস্ত, সেদিন তাঁর দপ্তরের কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী গান্ধীর উদ্দেশে একটি জরুরী তারবার্তা পাঠানো হয়। তাতে অভিযোগ ছিল, আট মাস ধরে প্রদেশ কংগ্রেসের (ই) কর্মীরা তাদের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত। বরকত সাহেবের কাছে বারংবার অনুরোধ জানিয়েও কোন ফল হয়নি।

বরকত সাহেব যখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটা সমঝোতা করে চলার পথ খুঁজছেন, তখন তাঁর দলের ঘরে বাইরে নানাভাবে ক্ষোভ ধূমায়িত। তাঁর অন্যতম সমর্থক-সহগোষ্ঠী শ্রীসুব্রত মুখার্জীও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বরকত সাহেবের গোপন বৈঠকে খুশী নন। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর সঙ্গী করেছিলেন যুবনেতা শ্রীরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। প্রফুল্লবাবুরা বামফ্রন্ট বিরোধী মোর্চা গঠনে কতখানি সফল হন তার উপর নির্ভর করছে বরকত-জ্যোতি সমঝোতার গুরুত্ব। তবে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীও যাচাই করে দেখতে চাইবেন, প্রফুল্লবাবুদের সরকার-বিরোধী আন্দোলনের ধার কতটা প্রখর এবং বরকতসাহেবের নেতৃত্বই বা কতখানি জোরদার।

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সংসারে এখন সুখ নেই। তার অসুস্থ নেতারা বারুদের স্তূপের উপর বসে। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। রাজ্য রাজনীতির এই হাল আঁচ করে শ্রীমতী গান্ধীও ক্ষুব্ধ [illegible] এবং পুরোদস্তুর হতাশ। (১৭-৪-৭৯)

বিদ্যুৎ-যন্ত্রণা

শ্যাম মল্লিক

বিদ্যুৎ সংকটে শুধু সরকারই নন এ রাজ্যের মন্ত্রীরাও বিব্রত। মাঝে মাঝে বিপন্নও বটে। শহর ও গ্রামের প্রায় সর্বত্রই ব্যঙ্গাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক পোস্টার। কনসটিটিউয়েন্সীতে গেলে শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন—এই সংকটের সুরাহা হবে কবে? মন্ত্রীর উত্তর—একটু ধৈর্য ধরুন একদিন না একদিন সংকটের অবসান ঘটবেই। অনেক মন্ত্রী-পরিবারের সদস্যরা তো পার্টি ক্যাডার নন। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। অন্যান্যদের মত বিদ্যুৎ সংকটে তারাও নাজেহাল। খোদ মহাকরণে অনেক মন্ত্রীকে বলতে শুনি, হোমফ্রণ্টকে আর বোঝাতে পারছি না। লোডশেডিং-এর মধ্যে বাড়িতে থাকলে কেউ ট্যাক ট্যাক কথা শোনাতে ছাড়ে না। মন্ত্রী হয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাড়িতে বসে থাকলে মনে হয় পাড়ার লোকগুলো সমালোচনায় মেতে উঠেছে।

দেওয়ালে দেওয়ালে ব্যঙ্গাত্মক পোস্টার। 'রাজ্যের হাতে আরো বেশি মোমবাতি দিতে হবে'। বলা বাহুল্য, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে বলে বামফ্রণ্ট সরকার যে শ্লোগান তুলেছেন ঐ শ্লোগানে তার প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে।

সেদিন এক মন্ত্রী এক বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। বর পিঁড়েয় বসেছেন। মেয়েদের উলুধ্বনি, শাঁখ বাজছে হঠাৎ আলো গেল নিভে। মাননীয় মন্ত্রী তখন খেতে বসেছেন। থাওয়া দাওয়া সেরে বরকর্তার কাছে একটু কিন্তু কিন্তু করে বেরিয়ে পড়লেন। মন্ত্রী নিজেও বিব্রত, এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটছে। ফাংশন বা কোন সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে মন্ত্রীরা লোডশেডিং-এর মধ্যে পড়লেন। প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বললেও চাপা গুঞ্জন উঠছে।

কয়েকদিন আগে একজন মন্ত্রীকে পাড়ার ছেলেরা এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পাড়ার ছেলেরা পার্টি ক্যাডারও। মাননীয় মন্ত্রী সময় মত হাজির হয়ে গেলেন। টেবিলে যেসব পুরস্কার সাজিয়ে রাখা হয়েছে তা দেখে তো তিনি বেজায় বিব্রত। আশেপাশে উদ্যোক্তারা সব ঘোরাফেরা করছেন। ভরসা করে তিনি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না ব্যাপারটা কি?। মাইকে একটা একটা করে নাম ঘোষণা করা হচ্ছে আর মন্ত্রী মহাশয় কাউকে হাতে তুলে দিচ্ছেন, টর্চ, কাউকে হ্যারিকেন কাউকে বা বড় মোমবাতির প্যাকেট। আজও পর্যন্ত তিনি উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন নি যে তাঁকে বা তাঁর সরকারকে হেয় করার জন্য ঐসব পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে কিনা। এ প্রসঙ্গে তিনি একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, আমার পার্টির ছেলেরা আমাকে ডোবাতে যাবে কেন?। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

এটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। আজকাল বহু পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেই হ্যারিকেন-ট্যারিকেন দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন মন্ত্রী এখন ফাংশান-টাংশন বর্জনও করছেন। লোডশেডিংকে এ রাজ্যের বিরোধী দলগুলো একটা রাজনৈতিক ইস্যু করেছেন। গত বিধানসভার অধিবেশনকে সরগরম করে তোলার জন্য কংগ্রেস সদস্যরা হাতে হ্যারিকেন নিয়েও সভায় ঢুকেছেন। বিদ্যুৎ সংকটের ব্যাপারে বিরোধী দলগুলো কয়েকবার ওয়াকআউটও করেছেন। বামফ্রণ্টের ক্যাডাররাও লোডশেডিং-এর ব্যাপারে দেওয়ালে দেওয়ালে বড় পোস্টার দিয়ে বলেছেন, ৩০ বছরের কংগ্রেসী অপশাসন এই লোডশেডিং-এর জন্য দায়ী। এই সবের মধ্যে দিয়ে তামাম পশ্চিমবঙ্গে উঠেছে এক নাভিশ্বাস। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঁচ পাঁচটা দিন এ রাজ্যের সব বড় বড় কলকারখানা স্তব্ধ। রাত্রি সাতটায় দোকান-পাট বন্ধ। প্রায় রোজই শহরের অর্ধেক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নাইট শো দেখা এক মন্ত্রীর অনেকদিনের অভ্যাস। সস্ত্রীক এক সিনেমা হলে একদিন হঠাৎ লোডশেডিং। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে বলেছেন, লোডশেডিং বন্ধ না হলে আর সিনেমা দেখতে যাবো না।

শুধু মন্ত্রী কেন তাবড় আমলাও নাজেহাল। এই সেদিন মহাকরণে বিদ্যুৎ দপ্তরের একজন প্রাক্তন সেক্রেটারী সাংবাদিকদের সঙ্গে গল্প করার সময় বলছিলেন, মশাই কয়েকদিন আগে আঠারো ঘণ্টার এক ভয়াবহ লোডশেডিং-এর মধ্যে পড়েছিলাম। আমি যখন সেক্রেটারী ছিলাম তখন বাপু এরকমটা হয়নি।

এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আইন-কানুন লংঘন করে অনেক বাড়ি ও অফিসের এয়ারকণ্ডিশনারগুলো ঠিকই চলছে। চীফ সেক্রেটারী অমিয়কুমার সেন কয়েকদিন আগে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন খোদ মহাকরণের এয়ারকণ্ডিশনারগুলোও সময়মত বন্ধ হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেছিলেন, তাঁর ঘরের এয়ারকণ্ডিশনার কিন্তু পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেখা যাচ্ছে সংকটকে কেন্দ্র করে বিভ্রাট এবং বিভ্রান্তি বেড়েই চলেছে। এক এলাকার বিরুদ্ধে আর এক এলাকার অভিযোগ। অমুক জায়গায় ভি আই পি'রা থাকেন বলে লোডশেডিং কম। নন ভি আই পি এলাকায় কখনও কখনও একটানা দশ-বারো ঘণ্টা লোড শেডিং চলে। আর একটা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বড়বাজারে লোড শেডিং কম। মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এরকম অনেক অভিযোগ এসেছে। তিনি নিজে কিছু কিছু যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সি ই এস সি এরিয়ার জন্য বাইরে থেকে যে বিদ্যুৎ আসে তা পুরোপুরি কন্ট্রোল করে ঐ সংস্থা। গত সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার আগে ভাগে কাউকে কিছু না বলে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ তার ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললেন, ভিকটোরিয়া হাউস। ভিকটোরিয়া হাউসে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন আশপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কন্ট্রোলরুমে গিয়ে তিনি সামগ্রিক অপারেশনটা দেখলেন। সেদিন রাত্রে বিদ্যুৎসচিব মুস্তাক মুর্শেদের নাম করে একজন অফিসার সংবাদপত্র অফিসগুলোতে টেলিফোন করে বললেন, ভিকটোরিয়া হাউসের সামগ্রিক ব্যবস্থা দেখে মুখ্যমন্ত্রী সন্তুষ্ট। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য কিছু বলেন নি। যে অফিসারটি সংবাদপত্র অফিসে ফোন করেছিলেন তিনি সি ই এস সির একজন অফিসার।

বিদ্যুৎ নিয়ে এইভাবে চতুর্দিকে একটা বিভ্রান্তি চলছে। এরই মধ্যে ১৭ এপ্রিল থেকে সাঁওতালডির একটা ইউনিয়ন তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। ধর্মঘট না করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ওঁদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিন্তু ওঁরা রাজি হননি। এই ধর্মঘট মোকাবিলার জন্য সরকারও তৈরি ছিলেন তাই ঐ ইউনিয়ন তেমন কিছু করতে পারেন নি।

ভয়াবহ এই অবস্থার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ওড়িশা এবং উত্তর প্রদেশকে কিছু বিদ্যুৎ দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ওড়িশা কিছু কিছু দিচ্ছেন। অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে গেছে সেই মতই। কোন দিন অবস্থার কিছুটা উন্নতি। কোন দিন আবার ভয়ানক ঘাটতি। সাঁওতালডি ঠিক থাকে তো ব্যাণ্ডেল যায় আর ব্যাণ্ডেল ঠিক থাকতো সাঁওতালডি গড়বড় করে। এই হল অবস্থা। সত্যি কথা বলতে কি বিদ্যুৎ বামফ্রণ্টকে দিচ্ছে বেগ আর জীবনকে যন্ত্রণা।

---

৪ মে তারিখের সংখ্যা থেকে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সোনার হরিণ নেই আবার নিয়মিত বেরোবে।

মঞ্জু গুপ্ত

সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সে এসেছিল। ধীরেই একদা এসেছিল। আর আসার পথে আর কোন বাধা পড়ে নি। শিল্পী জীবনে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছিল। পার্থিব জীবনে প্রবেশের আগে নিয়তি যেন একটু রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারে নি। সেটা নিছক রসিকতাই। যদি সেটা তা না হয়ে বাস্তবে রূপান্তরিত হত, তবে এই শিল্পীর পৃথিবীতে জন্মলাভই সম্ভব ছিল না। আরেকটু খোলাখুলিভাবে বললে হয়তো ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। বিবাহের ছ' বছর পূর্বে শিল্পীর পিতা উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিলাতে যান। তিন সপ্তাহ ধরে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার জন্য সবরকম সুখ-সুবিধাযুক্ত তৎকালীন একটি বৃহৎ বৃটিশ অর্ণবপোতের যাত্রী হতে পারায় তিনি হয়তো মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদই দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে সে জাহাজে তাঁর আসন সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও যাওয়া হয় নি। এক সপ্তাহ পরে অপেক্ষাকৃত ছোট ও সীমায়িত সুখ-সুবিধাযুক্ত আরেকটি জাহাজে বাধ্য হয়ে তাঁকে যেতে হয়। মনে মনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেও তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা বোধহয় তৃপ্তির হাসিই হেসেছিলেন। মাঝপথে দ্বিতীয় জাহাজের যাত্রীরা খবর পেলেন যে, তাঁদের অগ্রবর্তী জাহাজটি বিলাত পৌঁছবার আগেই তার সমস্ত যাত্রী সমেত অতল সমুদ্রে তলিয়ে গেছে—একটি জীবনও বাঁচে নি। তখনই সবেমাত্র প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেছে। জার্মানদের সাবমেরিনের 'টর্পেডো'র আঘাতে জাহাজটি জলমগ্ন হয়েছে সবকিছু সমেত। দ্বিতীয় জাহাজের অন্যতম যাত্রী শিল্পীটির পিতৃদেব কোনো অদৃশ্য শক্তিতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দুয়ার থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। পাঁচ বছর বাদে বিলেত থেকে কৃতবিদ্য হয়ে ফিরে এসে শিল্পীর পিতা এক সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁদের দুটি সন্তান—প্রথমটি পুত্র এবং শেষটি কন্যা—জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানরূপে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যাই শিশুকাল থেকে মধুর কণ্ঠের অধিকারিণী হয়ে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের এবং পরে সঙ্গীত-রসপিপাসুদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় ও প্রশংসার পাত্রী হন ও তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেন। রূপলাবণ্যময়ী, মধুর-কণ্ঠী, সৌন্দর্য-শ্রীমণ্ডিতা ও সর্বজন মনোহারিণী—এইসব গুণে গুণান্বিতা এই শিল্পীটি সকলেরই মন জয় করেছেন—"মঞ্জু" নামে। 'সুন্দর', 'মনোহর', 'মধুর'—এই তিনটি শব্দকেও আভিধানিক অর্থে—'মঞ্জু'-ই বলা হয়।

মঞ্জু জন্মেছিলেন পাটনায় ১৯২৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে। তাঁর বাল্যকাল বিহারের পাটনা শহরেই কাটে। মঞ্জু বাঁকিপুর বালিকা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে (পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাতার নামাঙ্কিত করা হয়) লেখাপড়া শেখেন ১৯৩৫ সাল থেকে এবং সেই বিদ্যালয় থেকেই তিনি ১৯৪৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্কুলের পড়া সাঙ্গ হলে তিনি পাটনার 'উইমেন্স কলেজে' আই-এ ভর্তি হন। কিন্তু এক বছর কলেজে পড়বার পর ১৯৪৪ সালে বাবা-মার সঙ্গে পাটনা ছেড়ে মাদ্রাজ চলে যেতে হয়। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত মঞ্জু দেবীর পাটনাতেই লেখাপড়া ও গানবাজনা শেখার মধ্যে কাটে। প্রপিতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের এবং পিতা সুধাংশুমোহনের মাতামহ ভুবনমোহন দাশের সাঙ্গীতিক ভাব ও রস সৃষ্টির ক্ষমতা এই দুই পূর্বপুরুষদের ধমণীর রক্ত বংশপরম্পরায় মঞ্জু গুপ্তের কণ্ঠে সাবলীলভাবে আশ্রয় পেয়েছিল, অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে যার প্রমাণ তিনি অতি শিশুকাল থেকেই দিয়ে এসেছেন। যখন লেখাপড়া শেখার বয়স তাঁর হয় নি, সেই প্রাক পঠন-পাঠন যুগে মঞ্জু দেবীর যখন অক্ষরজ্ঞান জন্মায় নি, তখন থেকে শুনে শুনে গান শিখে ফেলতেন এবং আশ্চর্যজনকরূপে অল্পসময়ের মধ্যে গানটি তাঁর কণ্ঠে হুবহু উঠে আসতো। শিশুকালে তাঁর এই ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ ও গানের ক্ষমতা দেখে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন খুবই বিস্মিত যেমন বোধ করতেন, শিশুকন্যাটিকে গানের ব্যাপারে তাঁরা সর্বদাই উৎসাহ দিতেন। বাড়ীতে পিতা সুধাংশুমোহনের গ্রামোফোন ছিল। তিনি নিত্য-নূতন রেকর্ড কিনে আনতেন আর সেই রেকর্ড বাজাতেন এবং রেকর্ডের গাওয়া শিল্পীদের গান শুনে শুনে শিশু মঞ্জু সেসব হুবহু নিজের গলায় তুলে নিয়ে গেয়ে সবাইকে শোনাতেন। এইভাবে ছেলেবেলাতেই মঞ্জু তাঁর ছোট ঠাকুরমা 'অমলা দাশের গাওয়া রেকর্ড থেকে কিছু গান শিখেছিলেন। এইভাবে আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা। আশ্চর্যময়ী দাসী, বেদানা দাসী, বিনোদিনী দাসী, কে মল্লিক, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতি সেকালের নামজাদা গায়িকা ও গায়কদের রেকর্ড করা গান শোনার সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছেন।

(দুই)

ছোটবেলায় মঞ্জুর গান শেখার ব্যাপারে আরেকজনের স্নেহসিক্ত অবদানের কথা মঞ্জুরা সবাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। মঞ্জুর মার বিয়ের আগে থেকেই ময়মনসিংহে থাকাকালীন একটি ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয় এবং পরে এই দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক জন্মায়। তখন মঞ্জুর দাদামহাশয় অর্থাৎ 'অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় সপরিবারে ময়মনসিং শহরের 'ব্রাহ্ম-পল্লীতে' বাস করতেন। কিশোরগঞ্জ থেকে দেবেন্দ্রকিশোরবাবু নামে এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক সপরিবারে প্রতি বছর মাঘোৎসব উপলক্ষে ময়মনসিংহ শহরে ব্রাহ্ম-পল্লীতে এসে কাটিয়ে যেতেন। দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও পুত্র দুজনেই খুব ভালো গান করতে পারতেন এবং মাঘোৎসবের নানা উপাসনানুষ্ঠানে ওঁরা ব্রহ্মসঙ্গীত (রবীন্দ্রনাথ কালীনারায়ণ গুপ্ত, মনোমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ ব্রাহ্মসঙ্গীতকারদের রচিত) গাইতেন। সে সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর বালকপুত্রকে তাঁর বাড়ীর অভিভাবকরা 'খোকা' নামেই ডাকতেন যদিও আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে তিনি 'দেবু' নামে পরিচিত ছিলেন। মঞ্জুর মা—মুকুলমালা দেবীকে বড়রা সবাই 'পুতুল' নামে ডাকতেন। সেই সুবাদে দেবুও তাঁকে 'পুতুলদি' নামেই চিরকাল ডেকেছেন এবং পরস্পরের মধ্যে ভাইবোনের একটা নিবিড় স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য দেবুর গান তাঁর পুতুলদি এবং তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা অর্থাৎ পরিমল, সুবিমল এবং ছোট ভাই নির্মল দত্ত খুব ভালবাসতেন। দেবু দত্তবাড়ীতে যেমন গান শোনাত সবাইকে তেমনি পুতুলদির হাতের অপূর্ব রান্না খেতে তার খুব ভাল লাগত। বিয়ের কয়েক বছর পর ১৯২৪ সাল থেকে

পাটনাতে সপরিবারে পুতুলদিরা যখন স্থায়ী বাসিন্দা হলেন তখন কলকাতায় দেবুর ছাত্রজীবন সবে মাত্র শুরু অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সাল। দেবু তখন কলকাতায় কলেজে আই-এ পড়েন, হস্টেলে-মেসে থাকেন ও পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজে ও কলকাতার চেনা-শুনা ব্রাহ্ম পরিবারের পারিবারিক অনুষ্ঠানে গান করে বেড়ান। ১৯২৯এ আই-এ পাশ, ১৯৩১এ বি-এ এবং ১৯৩৩এ এম-এ পাশ করে চাকুরীতে ঢোকেন এবং ১৯৭১-এ অবসর গ্রহণ করে কলকাতা শহরেই চিরকুমারের নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে বাচ্ছেন। এ হেন দেবুকে তাঁর পুতুলদি প্রায় ছুটিতে পাটনায় নেমন্তন্ন করে পাঠাতেন আর সে ডাকে সাড়া দিতে দেবুর ভুল হোত না। পুতুলদিদের শুধু গান শোনানোই নয়, তাঁর হাতের তৈরি নানা-রকম সুখাদ্যও দেবুর অন্যতম আকর্ষণ ছিল। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে দেবু বেশ কয়েকবার পাটনায় পাড়ি দিয়েছেন—তখন মঞ্জুর বয়স এক থেকে চার-এর মধ্যে। মঞ্জুর গানের প্রতি তিন-চার বছর বয়স থেকেই আকর্ষণ দেখে দেবুমামা অবাক হয়েছেন এবং পরে প্রায়ই, মঞ্জুকে কোলে বসিয়ে গান গেয়েছেন, শুনিয়েছেন ও শিখিয়েছেন। পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে সে যে বড়ো গাইয়ে হবে তার যথেষ্ট প্রমাণ মঞ্জুর কাছ থেকে পেয়ে তার দেবুমামা নিজে যেমন তাকে উৎসাহিত করার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালিম দিতে শুরু করেন তেমনি মঞ্জুর মা-বাবাকেও মেয়েকে গান গাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ করে উৎসাহিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকার জন্য অনুরোধও জানিয়েছেন। মঞ্জুর নিজের ছোট পিসিমা সাহানা দেবী—যিনি সেকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে প্রথম সারির শিল্পী হিসাবে একদা গণ্য হয়েছেন—তাঁর কাছে বাল্যকালে কিন্তু মঞ্জুর গান শেখার সুযোগ হয় নি, কারণ মঞ্জুর যখন সবেমাত্র বছর দুয়েক বয়স, সে সময়েই অর্থাৎ ১৯২৮ সালেই সাহানা দেবী কলকাতা তথা বাংলাদেশ ছেড়ে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আশ্রমিকার জীবনযাপন করছেন। সেজন্য তার দেবু মামাই তাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে সর্বপ্রথমে পরিচিত করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩১-৩২ সাল থেকে শুরু করে অর্থাৎ মঞ্জুর পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে ১৭ বছর (১৯৪৩ সাল) পর্যন্ত দেবু মামার কাছে প্রায় নিয়মিত—হয় ছুটিছাটায় পাটনায় অথবা মঞ্জুরা যখনই কলকাতায় বেড়াতে এসে বেশ কিছুদিন ধরে থেকেছে তখন—রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালিম পেয়েছে কেবলমাত্র এই দেবু মামারই কাছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত বহু গান মঞ্জু দেবু মামার কাছে শিখেছে। গেয়েছে, শুনিয়েছে এবং রেকর্ডও করেছে। দেবু মামার কাছে রবি ঠাকুরের যেসব গান মঞ্জু শিখেছেন তার কয়েকটি তোল—(১) তোমায় গান শোনাব, (২) আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান, (৩) তোমায় কিছু দেব বলে, (৪) তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়, (৫) কূল থেকে মোর, (৬) ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা ইত্যাদি আরও অজস্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত। যেসব রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি রেকর্ডেও গেয়েছেন তার মধ্যে উপরোক্ত ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা ছাড়াও রেকর্ড হয়েছে—(১) এবার আমায় ডাকলে দূরে, (২) আমার নয়ন তব নয়নের, (৩) হেথা যে গান গাইতে আসা, (৪) শেষ নাহি যে শেষ কথা প্রভৃতি এবং লংপ্লেয়িং রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'মায়ার খেলায়' শান্তার ভূমিকায় মঞ্জুর গীতিকণ্ঠ শোনা গেছে। তাঁর দেবু মামার কাছে গান শেখার প্রসঙ্গে মঞ্জু দেবী বলেন—'ছোটবেলা থেকেই গান করতাম আর শিখতাম প্রথমে রেকর্ড থেকে ও পরে দেবু মামার কাছে। দেবু মামা ছিলেন আমার মামাবাড়ীর দেশের লোক—অর্থাৎ ময়মনসিংহের। আমার মাতাঠাকুরাণীদের সঙ্গে দেবু মামাদের পরিবারের বহুদিনের পরিচয়—প্রায় একই বাড়ীর মত। আমার মাকে দেবু মামা চিরদিনই 'পুতুলদি' নামে ডেকেছেন, ভালবেসেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন। সেই সূত্রে তিনি আমার মামা ও আমি তাঁর কাছে ভাগিনেয়ীসমা। আমার অনেক আবদার জুলুম তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন চিরকাল এবং আজও করেন। আমি মাতৃ ও পিতৃহীন হবার পর তিনিই আমার পিতৃতুল্য অভি-ভাবকের মত। দেবু মামা প্রায় প্রত্যেক ছুটিতেই পাটনায় আসতেন ও আমাকে বছরের পর বছর গান শেখাতেন। আমার বিয়ের পরেও যখন কলকাতায় এসেছি, সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে গিয়ে গান শিখে এসেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া তিনি আমাকে হিমাংশু দত্তর (সুরসাগর) গান, সায়গলের গানও শিখিয়েছেন। ওঁর গলায় গান যে আমাদের কী ভালো লাগতো ও এখনও লাগে তা প্রকাশ করতে পারি না। কি অপূর্ব ভাবে-ভরা তাঁর কণ্ঠ। তাঁর কাছে গান শিখে আর কারো কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে আমার ভাল লাগতো না। মনে হত আরো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি—আরো অনেক শিখি দেবু মামার কাছে। দেবু মামা থাকতেন কলকাতায়। বাবা-মার সঙ্গে কলকাতায় আসার আমার একমাত্র ইচ্ছা ও কারণ ছিল দেবু মামার কাছে যত পারি গান শিখি। ভাব যে গানের কতোখানি—

বাবা

মা

তা আমি প্রথমে জানতাম না, বুঝতামও না। দেবু মামার গান শুনে ভাবের জানালা আমার সামনে খুলে গেল আর আমি ভাব-রসের স্নিগ্ধতায় ডুব দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে নেবার অবকাশ পেলাম।"

আজ গানের রাজ্যে বিশেষতঃ অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি প্রভৃতি বিষয়ে মঞ্জু গুপ্ত একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর দেবু মামা শুধু কলকাতা শহর বা পশ্চিম ও পূর্ববাংলায় নয় সমস্ত ভারতবর্ষে বাংলা ভাষাভাষীর ও রবীন্দ্রসঙ্গীতরসিকদের কাছে দেবব্রত তথা জর্জ বিশ্বাস নামে শুধু প্রখ্যাতই নন, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে একটি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বও। •

(তিন)

আগেই বলা হয়েছে মঞ্জুর শিক্ষাজীবন অর্থাৎ স্কুল-কলেজ জীবন পাটনাতেই শুরু ও সাঙ্গ হয় ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত। যদিও এ সময়ে তিনি বাংলা গান অর্থাৎ রবীন্দ্র-সঙ্গীত একমাত্র দেবু মামার কাছেই শিখতেন—অবশ্য কখনো পাটনায় কখনো বা কলকাতায়। হিন্দুস্থানী মার্গ বা উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শেখবার সুযোগও পাটনাতেই তাঁর কপালে জুটে যায়। মহম্মদ শাফী খাঁ নামে এক গুণী ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন মহারাজা দ্বারভাঙ্গার সভায়। তিনি পরবর্তীকালে পাটনা শহরের বাসিন্দা হন। এই গুণী ওস্তাদের কাছে দু' বছর ধরে—১৯৪১-১৯৪৩ পর্যন্ত মঞ্জু ক্ল্যাসিক্যাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তালিম নেন। এর পরে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন-চার বছর ধরে কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা থাকাকালীন মঞ্জু আবার হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে।

পিতৃদেব তাঁর বিবাহের পর তিন-চার বছর কলকাতার হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। যদিও সুধাংশুমোহন গুপ্তের (পিতৃদেব) বড় মামা চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতার একজন প্রথম সারির লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার—সুধাংশুমোহন তাঁর কাছ থেকে আইন ব্যবসা ব্যাপারে কোনও

বাস্তিগত সুবিধা নেবার চেষ্টা করেন নি যদিও চিত্তরঞ্জনের অর্থানুকূল্যে সুধাংশুমোহনের বিলাত যাত্রা ও ব্যারিস্টার হওয়া সম্ভব হয়েছিল। সুধাংশুমোহন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর অধিক আস্থাবান ছিলেন, উপরন্তু ললাট লিখনকে মেনে নিতেন হাসিমুখে। চার বছর কলকাতায় আইন ব্যবসা করার পর আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় সুধাংশুমোহন কর্মক্ষেত্র বিহারের পাটনা শহরে ১৯২৪ সালে স্থানান্তরিত করেন ও সেখানকার ইনকামট্যাক্স উকীল হিসাবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। তাঁর মেজো দাদা প্রফুল্লরঞ্জন দাস (চিত্তরঞ্জন দাশের সহোদর) তখন সেখানের বিখ্যাত ব্যারিস্টার—প্রচুর নাম-ডাক এবং বহু টাকা রোজগার করেন। সুধাংশুমোহন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য মেজো মামার কাছেও কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নি বিশেষতঃ আইন ব্যবসার ক্ষেত্রে। নিজের জোরেই তিনি দাঁড়িয়েছেন—বহু টাকা উপার্জন করেছেন। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি সবই সুধাংশুমোহন পাটনায় পেয়েছেন। শহরের এক্‌সিবিশন রোডে দুটি বিরাট বাড়ীর মালিকও তিনি হন। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত—দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে পাটনায় ইনকামট্যাক্সে ওকালতী করার পর সুধাংশুমোহন ইনকামট্যাক্স ট্রাইবুনালের সদস্য মনোনীত হয়ে সপরিবারে ১৯৪৪ সালের গোড়ায় মাদ্রাজ চলে যান নতুন কাজে যোগ দিতে। মঞ্জুর ছোট পিসিমা সাহানা দেবী তখন প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বাসিন্দা। ছোট পিসিমাকে আবছা মনে পড়ে—শেষ যখন তাঁকে দেখেছে, তখন মঞ্জুর বয়স মাত্র দু' বছর। পরে বড় হয়ে তাঁর গানের প্রতিভা ও প্রশংসার অনেক কথাই শুনেছে—তাই ছোট পিসিমাকে দেখতে, তাঁর গান স্বকর্ণে শুনতে এবং সম্ভব হলে তাঁর কাছে বসে গান শিখতেও অদম্য ইচ্ছা তার মনে জাগে। ইচ্ছা পূর্ণও হয়। মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরীর দূরত্ব খুব বেশী নয়—একশো মাইলের মত। আর সারা দক্ষিণ ভারতে মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়াবার মত সুন্দর রাস্তারও অভাব নেই। একদিন মঞ্জু নিজেদের বাড়ীর গাড়ীতে বাবা-মা-সহ বেরিয়ে পড়েন পণ্ডিচারী আশ্রমের পথে। আঠারো বছর বয়সে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে সেই সর্বপ্রথম পণ্ডিচারী গেলেন এবং ছোট পিসিমা সাহানা দেবীকে গান শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ভাইঝি মঞ্জুর মিষ্টি সুরেলা ও ভাবে-ভরা গলায় রবীন্দ্রনাথের 'তোমায় গান শোনাবো, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ' গানটি শুনে পিসি মোহিত। গানের পর গান—সবই প্রায় রবীন্দ্রনাথের গান—যেগুলি দেবু মামার কাছে এতদিন শিখেছে—মঞ্জু গেয়ে চলেন চোখ বন্ধ করে। গান গাইতে গাইতে যেন তিনি ভাবে বিভোর হয়ে স্থান-কাল-পাত্র সবই ভুলে যান—ভাবের অতলে যেন সাময়িকভাবে মঞ্জুর সমাধি ঘটে। সব দেখেশুনে সাহানা দেবী এতই আকৃষ্ট হন যে, তৎক্ষণাৎ মঞ্জুকে গান শেখাতে রাজি হয়ে যান। ঠিক হয় প্রতি মাসে মঞ্জু বেশ কিছুদিনের জন্য মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচারীতে গান শেখার জন্য যাওয়া-আসা করবে। মঞ্জু এই ব্যবস্থায় খুসী হয়ে যান। ছোট পিসিমা সাহানা দেবীর কাছে মঞ্জু অতুলপ্রসাদ রচিত বহু গান শেখেন, আরও শেখেন রবীন্দ্রনাথের গান এবং সাহানা দেবী ও আরেক পিসিমা অরুণা দেবী রচিত গানগুলি। পিসিরা শিখিয়ে দিতেন ভাইঝিকে শুদ্ধ সুরে আর মঞ্জু তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে আপন গায়কীতে ও ভাবে সমৃদ্ধ করে গানটি গেয়ে পিসিদের তৃপ্ত করেন। অতুলপ্রসাদের বহু গান তিনি ছোট পিসিমার কাছে শিখেছেন এবং উত্তরকালে রেকর্ডে ও বেতারেও গেয়েছেন সেগুলি যার মধ্যে কয়েকটি হোল—১। আপন কাজে অচল হলে, ২। বাদল ঝুমঝুম বোলে, ৩। সবারে বাসরে ভাল, ৪। কত গান তো হলো গাওয়া, ৫। বঁধু ধর ধর মালা, ৬। জানি জানি তোমারে ইত্যাদি।

(চার)

সে-সময়ে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র সঙ্গীতাচার্য ও সাধক দিলীপকুমার রায়ও ছিলেন পণ্ডিচারীর আশ্রমবাসী। সাহানা দেবী ভাইঝি মঞ্জুকে একদিন নিয়ে গেলেন দিলীপকুমারের কাছে। দিলীপকুমার মঞ্জুর কণ্ঠে গান শুনে শুধু মুগ্ধই নন, প্রচণ্ডভাবে মঞ্জুকে গান শেখাতে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন—বললেন, 'তুমি প্রায়ই এসো আমার কাছে, তোমাকে নানা ধরনের গান শেখাব।' একদিকে পিসিমার কাছে গান শেখার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে, অযাচিতভাবে দিলীপকুমারের কাছে গান শেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করে মঞ্জু তো প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েন। একদিকে মঞ্জুর মন যেমন খুসীতে ভরে ওঠে দিলীপকুমারের এই অযাচিত সম্মতিতে, অপরদিকে মঞ্জুর মনে বেশ ভয়ও ঢোকে। তার মনে পড়ে যায় দিলীপকুমারের ছাত্রী সেই অদ্বিতীয়া কিন্নর-কণ্ঠী গায়িকা উমা বা হাসির কথা। এ সেই উমা বা হাসি বসু যাঁর মধুর কণ্ঠের গান শুনে ভারতের দুই জবরদস্ত কলাকার গায়িকা

মঞ্জু গুপ্ত   স্বামী অসিতকুমার গুপ্ত

তথা বাঈজী—স্বনামধন্যা কেশরবাঈ ও কাশীর মোতিবাঈ অকপটে ও অকুণ্ঠচিত্তে উমা তথা হাসির কণ্ঠের ও গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় একদা মুখর হয়েছিলেন। ঐ খবর অনেকের মত মঞ্জুরও জানা ছিল। হাসির মত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রীকে পেয়ে দিলীপকুমার তাঁর গানের উৎস উজাড় করে ও সর্বশক্তি ঢেলে দিয়ে তাঁকে নিজের মনের মত শিল্পী করে গড়ে তুলে নিজে যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তেমনি কাছের ও দূরের সমস্ত সঙ্গীতরস-পিপাসু বাঙালীসমাজও উমার জন্য বেশ গর্বিতই হয়ে উঠেছিলেন। নিষ্ঠুর নিয়তি এই গর্ব খর্ব করে দিল উমার মাত্র একুশ বছরের জন্মদিনে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ২২শে জানুয়ারি তারিখে অতর্কিতে তাঁকে পৃথিবী থেকে টাইফয়েড রোগের অজুহাতে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, গানের জগতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে আবির্ভূত হয়ে দিলীপকুমারের শিক্ষায় ও যত্নে যশের শেষ শিখরে ওঠার প্রতিশ্রুতি দেবার মুহূর্তেই তাঁর পার্থিব জীবনে ছেদ পড়ে গেল।

মঞ্জু বারেক ভাবেন নিজের মনে—'আমি কি পারবো আমার কণ্ঠে হাসির মত অবলীলায় তানের কাজ করতে? আমি যে আবার তালে বড়ই কাঁচা।' দিলীপকুমারকে একদিন সব সংকোচের বাধা কাটিয়ে নিজের ভয়ের কারণের কথা বলেই ফেলেন। ততদিনে দিলীপকুমার মঞ্জুর বেশ কাছের মানুষ হয়ে গেছেন—'মামা' সম্বোধনের মাধ্যমে। সব শুনে দিলীপমামা মঞ্জুকে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে বলেন—'তাল জিনিসটা খুবই সোজা—একটু খেয়াল রাখলেই সড়গড় হয়ে যাবে—মোটেই ভয়াবহ কিছু নয়। তোমার গলা খুবই মিষ্টি, আর মীড়ের কাজও খুব পরিষ্কার—সুতরাং মাভৈ—কেবল রেওয়াজ করে যাও—দেখবে একদিন তোমার কণ্ঠ দিয়ে শুধু মধুই ঝরবে না, বিনা আয়াসে তোমার গলায় তান অদ্ভুত সার্থকতার সঙ্গে খেলা করে বেড়াবে আর গাইতে গাইতে তোমার স্বভাবসিদ্ধ ভাবরাজ্যে তুমি নিজেকে এমনই হারিয়ে ফেলবে

যে, তোমার গানের শ্রোতারা তোমার গান শুনে নির্বাক হয়ে সেই কবির কথাটাই ভাববে'—'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি।' মঞ্জুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় দিলীপকুমারের হবার ঠিক মাত্র দু' বছর আগে সেই অভিশপ্ত দিনটি দিলীপকুমারের জীবনে নেমে এসেছিল এক বিভীষিকার মত, অর্থাৎ উমার মত অসামান্যা প্রতিভাধর ও ক্ষণজন্মা শিল্পীর তথা ছাত্রীর জীবনদীপ চিরতরে নির্বাপিত হবার কারণে যে শোকাহত অবস্থা দিলীপকুমারের হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, অবসন্ন করেছিল, মঞ্জুর কণ্ঠে গান শুনে হয়তো তাঁর মনের জড়তা কেটে যায়—তাই তিনি স্বেচ্ছায় মঞ্জুকে গান শেখাতে আগ্রহী হন। সম্ভবতঃ আশা করেছিলেন প্রয়াত উমা তথা হাসি বসুকে মঞ্জুর মাধ্যমেই সগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠ করবেন। তাঁর সে-আশাকে কার্যকরী করাতে যেমন মঞ্জুর পিছনে আপ্রাণ খেটেছেন, মঞ্জুও গুরুর সব পরিশ্রম সার্থক করে সেদিন দ্বিতীয় 'হাসি বসু' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

উমার মৃত্যুর পর তাঁর সে স্থান পূর্ণ হবার আশা সম্ভবতঃ দিলীপকুমার সেদিন করেননি। তবে মঞ্জুর কণ্ঠে গান শুনে এবং তার গলায় মিষ্টি সুর ও ভাবের সহাবস্থান লক্ষ্য করে মঞ্জুকে অনেক আশা ও ভরসার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং মঞ্জুও সম্ভবতঃ তাঁর দিলীপমামার শেষ আস্থাভাজন প্রিয় ছাত্রী—যিনি নিষ্ঠাভরে শেষ পর্যন্ত গুরুর শিক্ষার পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে দিলীপকুমারের শিক্ষায় সঙ্গীত পরিবেশন করে এসেছেন। দিলীপকুমার সর্বপ্রথমে মঞ্জুকে যে-গানটি শিখিয়েছিলেন, সেটি ছিল নিশিকান্তর রচনা—'এদেশের দিকদিগন্ত নীল অনন্তে আপন-হারা।' প্রায় শতাধিক গান মঞ্জু দিলীপকুমারের কাছে শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন বিভিন্ন গীতিকারদের রচিত। দিলীপকুমারের ঐকান্তিক আগ্রহে, চেষ্টায় ও শিক্ষাদানে তাঁরই রচিত—'তব চির চরণে' গানটি দিলীপকুমার মঞ্জুকে দিয়ে এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানীর মাদ্রাজ শাখা-স্টুডিওতে রেকর্ড করিয়ে সর্বসাধারণের জন্য বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করে দেন। এইটাই মঞ্জু গুপ্তের কণ্ঠের প্রথম গানের রেকর্ড যেটি ১৯৪৪ সালেই প্রকাশিত হয়। দিলীপকুমারের নিজস্ব রচনা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক গান, স্তোত্র, স্তব মঞ্জুকে তিনি শিখিয়েছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হোল—১। ঘুম যাই মা, ২। ওরে উধাও আমার মন, ৩। বৃন্দাবন কি মঙ্গল লীলা ('সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি'র হিন্দি সংস্করণ), ৪। এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ—ইত্যাদি। তাঁর পিতৃদেব কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত বেশ কিছু গান তিনি মঞ্জুকে শিখিয়েছিলেন, যেগুলির মধ্যে—১। নীল আকাশে অসীম ছেয়ে, ২। আমি সারা সকালটি বসে বসে সাধের মালাটি গেঁথেছি, ৩। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, ৪। জীবনে পারিল না সাধ ভালবাসি—অন্যতম। পণ্ডিচেরীবাসী নিশিকান্ত (শান্তিনিকেতনের সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ভ্রাতা) রচিত কিছু গানও মঞ্জু তাঁর দিলীপমামার কাছে শিখেছিলেন, যেমন—১। তোমার আঁধার নিশাই, ২। এ যে কোন কর্মনাশা, ৩। পূজা আমার সাঙ্গ হল, ৪। এ দেশে দিক-দিগন্ত—ইত্যাদি। দিলীপমামার কাছে অতুলপ্রসাদের—১। আর কতকাল থাকব বসে, ২। পাগলা মনটা তুই বাঁধ, ৩। বিধি আর তো তোমায় নাহি ডরি প্রভৃতি উজ্জ্বল থানেক গানও মঞ্জুর শেখা হয়ে যায়।

(পাঁচ)

সারা বছরটা ধরে প্রতিমাসে দশ-পনেরো দিনের জন্য মঞ্জুর মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরীতে শুধুমাত্র দিলীপমামার কাছে গান শেখার জন্য ছোটাছুটি চলে। পণ্ডিচেরীতে ছোট পিসি সাহানা দেবীর আস্তানায় তাঁর সাময়িক বাসস্থান হয়ে ওঠে এবং সে-সুযোগে পিসির গলায় গান শোনা, এবং নিজেরও শেখা চলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান সাহানা দেবীর গলায় শুনে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি পান। পরবর্তীকালে মঞ্জু কলকাতার বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা সুচিত্রা মিত্র, মায়া সেন প্রভৃতি শিল্পীদের কাছেও কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন কিন্তু সেসব গানের এবং অন্যদের মুখে শোনা রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেরই আবেদন তাঁর প্রাণে সেরকম সাড়া জাগাতে পারেনি যা জাগিয়েছিল সেই একই গান দেবুমামার বা ছোটপিসির কণ্ঠে। ছোটপিসিমা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছেই, অতুলপ্রসাদের গান শিখেছেন তাঁর বড় পিসতুতো দাদা অতুলপ্রসাদেরই কাছে। দ্বিজেন্দ্রগীতি শিখেছেন কবিপুত্র দিলীপ রায়ের কাছে। সুতরাং পরবর্তীকালের তথাকথিত শিল্পীরা যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বা দ্বিজেন্দ্রগীতি অথবা অতুলপ্রসাদী ভায়া মিডিয়া অর্থাৎ স্বরলিপি কিম্বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় গাইয়ের কাছে শিখেছেন—তাঁদের গায়ন-রীতি, গায়কী, কিছুই সাহানা দেবীর মত শিল্পীর সঙ্গে না মেলাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে দেবুমামার গান বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবারের সন্তান দেবুমামা, ব্রাহ্ম পরিবার ও সমাজের বহুবিধ অনুষ্ঠানে তিনি শিশুবয়স থেকেই গান করে আসছেন। প্রথম দিকে তাঁর শিক্ষাগুরু দেবব্রতর মাতৃদেবী। পরে সে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজে এসে ধীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, ধীরেন্দ্রমোহনের দুই পিসতুতো ভগিনী সুপ্রভা রায় ও কনক বিশ্বাস, উষারঞ্জন ঘোষ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, উমা বসু প্রমুখের কাছে প্রতি বছর মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রাহ্মসঙ্গীত শিখে গিয়ে হাজার হাজার শ্রোতাকে তৃপ্তি দিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত সুরের সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটিয়ে যে অপূর্ব বাণীর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতেই হয় শ্রোতার হৃদয়কে নাড়া দিতে—এই আসল [illegible] নাড়ার ক্ষমতা ও কায়দা দেবব্রত বিশ্বাসের জানা আছে বলেই [illegible] 'জর্জ বিশ্বাসের' গান শোনার জন্য আজও পাগ[illegible] জর্জ বিশ্বাসের গান স্বরলিপির তর্জনীতে চোখ রেখে আ[illegible] হয়ে থাকে না। অনুভূতির গভীরতায় সুরের অবাধ মু[illegible] এক অপার্থিব বোধের জগতে নিয়ে যায়। সেখানে স্বরলি[illegible] যেটি আজকাল বছর বছর অজানা কারণে পরিবর্তিত হয়ে থাকে, [illegible] সবটা হুবহু মানা হল কিনা ও তবলার তালকে প্রাধান্য দেওয়া [illegible] কিনা—এ নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর শ্রোতারা মাথা ঘামাবার তেমন অবকাশ পান না। গানের সুরকে ঠিক রেখে ও ভাবকে সম্পূর্ণ প্রাধান্য দিয়ে কবির বাণীকে তিনি শ্রোতার মর্মস্পর্শী করে তোলেন বলেই তাঁর বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা। যাক্ সে কথা পণ্ডিচেরীতে দিলীপমামার কাছে প্রতি মাসে গান শেখার সময় ছোটপিসিমা সাহানা দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়াও তাঁর সুরারোপিত দিদি অরুণা দেবীর রচিত বেশ কয়েকটি গান শেখা হয়ে যায়। তার মধ্যে একটি গান হোল—'আমার মন কেন আজ উদাসী হায়'। মঞ্জু অতুলপ্রসাদের গান প্রথমে শেখেন [illegible] তাঁর পিতার ছোটপিসিমা সুবালা আচার্যর (অতুলপ্রসাদের ছোটমাসী) কাছে, যেমন ১। সে ডাকে আমারে, ২। কাঙাল বলিয়া কোরনা কো হেলা ইত্যাদি। অতুলপ্রসাদের এক মামাতো ভাই ধীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত অর্থাৎ মঞ্জুর ছোটকাকার কাছে এবং রেণুকাপিসির (রেণুকা দাশগুপ্ত) কাছেও অতুলপ্রসাদের কিছু গান শেখার সুযোগ মঞ্জুর ঘটেছে, যেমন—১। তব চরণতলে সদা রাখিও, ২। চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে, ৩। বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে, ৪। তব অন্তর এত মন্থর, ৫। কি আর চাহিব বলো, ৬। কেন এলে মোর ঘরে প্রভৃতি। এক পিসি অর্থাৎ কনকপিসির কাছে একবার শেখেন যারা তোরে বাসলো ভাল। দিন দিন তাঁর জানা গানের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তাঁর গলারও উন্নতি হয়। সুর তো তাঁর গলায় যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে একেবারে গেড়ে বসেছে। সেই সঙ্গে সাধিত হোল তান ও মীড়ের উৎকর্ষ এবং সর্বোপরি অনির্বচনীয় ভাবের একটা অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা। তাই দূর থেকে শুনলেও লোকের বুঝতে

ভুল হোক না যে, এ মঞ্জু গুপ্তেরই কণ্ঠ—আর চতুর্দিকে 'আহা' ধ্বনিতে সে-কণ্ঠস্বরকে শ্রোতারা অভিনন্দিত করতেন।

(ছয়)

এক বছর বাদেই অফিসের কাজে মঞ্জুর পিতৃদেব কলকাতায় বদলী হন। সেজন্য মাদ্রাজ ছেড়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। একটু মনমরা হয়েই মঞ্জু মাদ্রাজ থেকে চলে এলেন, কারণ দিলীপমামার এবং ছোটপিসি সাহানা দেবীর কাছে ঘনঘন যাওয়া, গান শেখা আপাততঃ বন্ধ হয়ে গেল। পণ্ডিচারী ছাড়ার আগেই ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে মঞ্জুর দেবদর্শন ঘটে গেল—অর্থাৎ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববরেণ্য মহামানব শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা তাঁকে দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করেন। কলকাতায় আসার অল্প কিছুদিন পরে মঞ্জুর জীবনে সানাই বাজলো অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ১৭ এপ্রিল (বৈশাখ, ১৩৫১ সন) তারিখে উনিশ বছর বয়সে বিবাহিতা হয়ে মঞ্জু লক্ষ্মৌতে স্বামীগৃহে সংসার করতে চলে যান। মঞ্জুর পিতৃদেব কন্যার বিবাহের দুই বছর পর ১৯৪৭-এ কলকাতা থেকে কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদে বদলী হন এবং আরও কয়েক মাস পর আবার মাদ্রাজে বদলী হন। সেখান থেকে ১৯৪৮ সালে বোম্বাই শহরে ইনকাম ট্যাক্স ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে চলে যান বম্বে এবং ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় আসেন। কিছুদিন পাটনার নিজের বাড়িতে, কখনও পুত্র প্রবীরমোহনের বিজয়রাজনগরের বাড়িতে, কখনও বা কন্যা মঞ্জুর কাছে কলকাতায় সস্ত্রীক সুধাংশুমোহন বাস করেছেন। মঞ্জুর স্বামী অসিতকুমার গুপ্ত লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের একজন এম-এ ও কৃতী ছাত্র। স্নাতক হয়ে তিনি তাঁর মাতা মীরা দেবীকে নিয়ে লক্ষ্মৌতেই বাস ও স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। সুগায়িকা বধূমাতা হিসাবে শাশুড়ী মীরা দেবী সাদরে মঞ্জুকে বরণ করেন। মীরা দেবী ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহযোগী মোহিতচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

(সাত)

মঞ্জুর হঠাৎ বিবাহ হয়ে গেল অসিতের সঙ্গে ১৯৪৫ সালে কলকাতার ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন্স-এ এক ভাড়া বাড়িতে। বাবা-মাকে ছেড়ে সজলচোখে মঞ্জু চলে গেলেন সুদূর লক্ষ্মৌ শহরে। এ সেই লক্ষ্মৌ শহর—যেখানে একদা বত্রিশ বছর ধরে মঞ্জুরই এক নিকটআত্মীয় (জ্যেঠামহাশয়) অতুলপ্রসাদ সেনের কর্মভূমি ছিল, যেখানে তিনি ভবিষ্যতের মানুষদের জন্য কতো ধরনের গান রচনা করে গেছেন। যাঁর রচিত কতো গান মঞ্জু এত-দিন ধরে পণ্ডিচারী আশ্রমে বসে ছোটপিসিমা সাহানা দেবীর কাছে, দিলীপমামার কাছে ও কলকাতায় কতো আত্মীয়স্বজনের কাছে শিখে ধন্য হয়েছে ও প্রচুর সুনাম পেয়েছে সেসব গান গেয়ে। হঠাৎ ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে একদিন পণ্ডিচারী আশ্রম থেকে দিলীপমামা তারবার্তা পাঠিয়ে মঞ্জুকে বলেন—'তাড়াতাড়ি কলকাতায় চলে এসো, আমিও রওয়ানা হচ্ছি—কটা নতুন গান তোমায় শেখাব আর কলকাতাতেই গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ডও করাবো, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, সুতরাং দেরি মোটেই কোরো না।' সেটা ছিল ১৯৪৮ সালের শেষের দিক। তার কিছুদিন আগে ১৯৪৬ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে মঞ্জুর প্রথম সন্তান—একটি কন্যার জন্ম হয়েছে। সেই শিশুকে স্বামী ও শাশুড়ীর কাছে রেখে ও তাঁদের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে মঞ্জু কলকাতার পথে একাই পা বাড়ান দিলীপমামার তারবার্তার মর্যাদা দিতে। অসুবিধা কিছু ছিল না, কারণ বাবা তখন মাকে নিয়ে কলকাতাতেই অফিসের কাজ উপলক্ষে বাস করছেন। মঞ্জু এলেন লক্ষ্মৌ থেকে বাপের বাড়ি। এদিকে দিলীপমামাও এসেছেন। পুরোদস্তুর গানের মহড়া চলে বেশ কিছুকাল ধরে। তারপর একদিন মঞ্জুর গানে খুসী হয়ে তাঁকে নিয়ে দিলীপমামা চলে যান দমদমের গ্রামোফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে। সেখানে কদিন ধরে অনেকগুলি গান রেকর্ড করিয়ে তারপর মঞ্জু ছুটি পায় ও যথাসময়ে আবার লক্ষ্মৌতে স্বামীগৃহে ফিরে যান। লক্ষ্মৌ ফেরার কিছুদিন পরেই মঞ্জু স্বামী, কন্যা ও শাশুড়ীসহ পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন।

সে-সময়ে যেসব গান দিলীপমামার শিক্ষায় রেকর্ড করে যান তার মধ্যে ছিল—১। ঘুমে যাই মা, ২। উধাও আমার মন, ৩। বৃন্দাবন কি মঙ্গললীলা, ৪। এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ—আরও কত যে গান যেগুলি সবই দিলীপকুমারের নিজের রচনা। ছোটপিসিমা সাহানা দেবী তাঁকে অতুলপ্রসাদের লেখা বেশির ভাগ গানই শিখিয়েছেন।

(আট)

লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে মঞ্জুর স্বামী অসিত গুপ্ত ১৯৪৮ সালের শেষভাগে কলকাতায় বিলাতী সওদাগরী কোম্পানীতে চাকুরিতে যোগ দেন। দীর্ঘ ২৮ বছর সে-চাকুরি সম্মানের সঙ্গে করে অসিত ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে অবসর গ্রহণ করেন। পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরে আসার দু' বছরের মধ্যে মঞ্জুর একমাত্র দাদা প্রবীরমোহনের ১৯৫০ সালে গীতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কদিন খুব আনন্দ ও গান-বাজনার মধ্যে কাটে। এর পর বেশ কয়েক বছর মঞ্জুর সংসার ও অসুস্থা শাশুড়ীর দেখাশুনাতেই কাটে। মাঝে মাঝে সামাজিক কিম্বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে গান গাইবার আহ্বানেও সাড়া দিতে হয়। মেয়ে অনুরাধা যখন বারো বছরের, তখন মঞ্জুর শেষ সন্তান—একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। ছেলের নাম দেওয়া হয় অমিত-কুমার। পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করার দু' বছর পর বম্বে থেকে পিতৃদেব চাকুরি থেকে পাকাপাকিভাবে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় এসে কিছুদিন বাস করেন। তখন আবার বাড়িতে ও বাইরে গান-বাজনার আসরে নিয়মিত গানের পালা শুরু হয়ে যায়। কলকাতা থেকে বাবা ও মা কিছুদিন পাটনায় গিয়ে নিজেদের বাড়িতেও বাস করেন। সে-সময়ে মঞ্জু তাঁর পুত্র-কন্যাকে নিয়ে প্রায়ই পাটনায় গিয়ে কাটিয়ে এসেছেন। লক্ষ্মৌতে থাকাকালীন ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মঞ্জু লক্ষ্মৌর বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত কলকাতার বেতার কেন্দ্রের ডাকে সাড়া দিয়ে বেতারে গান করে যাচ্ছেন। কলকাতায় টেলিভিশন শুরু হবার পর একবার ১৯৭৭ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৮ সালে গান করেছেন। ১৯৭১ সালে অতুলপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তিনি রবীন্দ্রসদনে অতুল-গীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের অতুলপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য ও গাইবার ঢং-এর সত্যিকারের পরিচয় দিয়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করেন।

মঞ্জুর বয়সের সঙ্গে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক কারণে শরীর ভেঙ্গে গেছে—সেই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠেরও কিছুটা অবনতি ঘটেছে সন্দেহ নেই। তবে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন। কয়েকজন ছেলেমেয়েকে তিনি নিষ্ঠাভরে গান শেখাচ্ছেন—অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি, দিলীপী, নিশিকান্ত, অরুণা-সাহানা (দুই পিসি), নিরুপমা দেবী রচিত সব অপূর্ব গান। তাঁর নিজস্ব ঢং-গায়কী-মীড়-তান ও ভাবের সমন্বয়ে। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের গানের একটা আসর কয়েকমাস আগে বিড়লা কালচারাল ইন্সটি-টিউটে হয়েছিল—তাতে প্রমাণিত হয়েছে এদের কারুর কারুর মাধ্যমে চিরদিন বেঁচে থাকবে বাংলা গানের জগতে উমা বা হাসি বসু, মঞ্জু গুপ্তর মত গাইয়েরা।

স্নান

সমীর রক্ষিত

ষাট বছরের পিসী সেফ উবে গেল, অমনো শরীরটা পুড়ে যেতে সময় লাগল আড়াই ঘন্টা। এখন পিসী বলে আর নেই। কিছু ছাইটাই পড়ে আছে, ও জলঢালা হচ্ছে।

রবির হাতে নতুন একটা পঁচকে মালসা। তাতে পিসীর নাভিকুণ্ডল। রর এটুকু পোড়ে না। দুপা নেবে রবি জলে ছেড়ে দেয়। জলের চোরা স্রোত বাড়িয়ে লুফে নিয়ে সেটাকে নাচায় টুলুক। রোদ ছিল, আচম্বিতে একটা মেঘ জলের ওপর দিয়ে নিজের ছায়া নিয়ে যায়। দুরন্ত।

—রবি, ডুব দিয়ে নে এবার। বলতে অখিল জলে আলোড়ন তুলে এক মারে। একে একে বাদবাকিরাও। মালসাটা আচমকা ইতিউতি দুলে উঠে করে ডুবে যায়। পিসীর শেষ কেও তলিয়ে যায় ইছামতীতে। হয়তো র মাছে ঠুকরোবে।

কাল বিকেলে পিসী বলেছিল— দিন গিমে শাকের বড়া খাইনি, রবি ন তো বাবা বাজারে—

সাধআহ্লাদ থাকে মানুষের মনে কিন্তু মানুষ থাকে না। রবির গায়ে ঠেস দিয়ে কালি মেরে একটা পোড়া কাঠকয়লা স্রোতে ভেসে যায়। ডুব দেবার আগে রবি ভাবে একটা বড় খুঁত রয়ে গেল নাকি? পিসীর জন্য কেউ চোখের জল ফেলেনি। আর সকলে তো পাড়া-পড়শি, অন্ততঃ তার চোখে জল আশা উচিত ছিল। ছিল কিন্তু সাতাশ বছর বয়েসে রবির চোখে আর জল আসে না। আসে নি। চোখের জল ফেলেই কোন ইষ্ট লাভ হবে? তাতে কী কারুকে আটকানো যায়! ঝুপ-ঝুপিয়ে পর পর তিনটে ডুব দেয় রবি। তারপর সে দুহাতে মুখে হাত বুক কচলে নেয়। বুকের লোমের সঙ্গে এক টুকরো নোংরা শ্যাওলা, রবি ফেলে দেয়। আর তখন তার নিজের শরীরটাতে নজর আটকে পড়ে। রোদে-জলে ঝিলিক দিচ্ছে। আপন মনে হাসে রবি—কাঠের আগুনের আড়াই ঘন্টার খোরাক। আহারে, শরীর! কুলকুচি করা জলে সাতটা রঙ। অখিল সেই রঙ দেখে আর বলে—পিসী কিন্তু একটুও ঝামেলা ছিল না রবি, আমি তো ভেবেছিলাম ঘন্টা চারেক লেগে যাবে।

সবাই সায় দেয়।

রবি সাড়া দেয় না দেখে অখিলরা যে যার জানা মরণের কথা বলে। তাদের হাত-পায়ের দাপানিতে জল ছিটকায়। পুঁটি মাছের সাদা পেটের মতো রুপালি জল।

—আমরা জলের মধ্যে এরকম হাত-পা ছুঁড়ছি, নারে? বলেই রবি ঝুপুস ডুব সাঁতার দেয় একটা।

অখিলরা হকচকিয়ে যায়।

সারা গা থেকে জল ঝরাতে ঝরাতে রবি পাড়ে ওঠে। চোখে জল ঢুকেছে—গাছ-পালা আকাশ নদী সব ঝাপসা ঠেকে। যেমন দেখায় তেমন নয়, ধোঁয়া ধোঁয়া। তার তখন ধনুকের মতো বাঁক-খাওয়া পাকুড় গাছের শূন্য শেকড়টা চোখে পড়ে, আর ছেলেটা ওখানে বসেছিল। খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ। নির্ঘাৎ কেটে পড়েছে। তবু রবি দুবার ডাকে—টুকু-টুকু!

অখিল বলে—আরে, এই তো একটু আগেও দেখেছি। বাড়ি চলে গেল নাকি?

পিসীর আদরের কুকুর—ধুলী'ও শ্মশানঘাট অবধি গিয়েছিল, এখন যেন দুলে দুলে সামনে হাঁটে। ধুলো পো উঠোনে এসে কী বুঝে আকাশে মুখ তু একবার লম্বা টানা ঘেউ শব্দ করে। কারুকে ডাকল।

রবিকে বাড়ি ঢোকার মুখে অটোকয়

নমিতার মা, বলে—দাঁড়াও বাবা, হরবর করো না। লোহায় কামড় দিয়ে নিমপাতা চিবিয়ে আগুন ছুঁয়ে তবে বাড়িতে ঢুকবে।

রবি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না, পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ে, বলে—ওসব ছেড়ে দিন মাসিমা, আপনি আমি কে থাকব? ওসব ঝনঝাট করে কিচ্ছু হবে না।

ভয়ে আতংকে নমিতার মার মুখ হাঁ হয়ে যায়—কী অলুক্ষুণে কান্ড। মানুষ মরে গেলেই কী আর তার সব মায়া কাটে? আপনজনের ওপর, বাড়ির ওপর নজর থাকে, একোণে ওকোণে ঘুরে বেড়ায়, মঙ্গল অমঙ্গল বলে কী কোন কথা নেই?

রবি উঠোন পেরয়, নমিতা ওদের বারান্দা থেকে বলে টুকুকে দেখছি না রবিদা। রবি গা করে না, সাদা গলায় বলে—বাড়ি ফেরে নি?

—নাতো। বলে নমিতাও উঠোনে নামে—আপনাকে এক কাপ চা করে দেব?

—না। রবি সোজাসোজি বলে। তার এসব আলগা পিরীত পছন্দ হয় না। বাইরে বাইরে মানুষ নিজেকে যতটা ভালো দেখায়, ভেতরটা মানুষের আদতে তেমন নয়, রবি এই সারবুঝ বুঝে গেছে। রোদ পানসে মেরে যাচ্ছে উঠোনে।

শেকল খুলে রবি ভেতরে ঢুকে যায়। ঘর জুড়ে আবছায়া। এরকম ঘোর ঘোর আঁধারে মনে হয় কেউ বুঝি আছে কাছা কাছি। অভ্যাসবশে চোখ চলে যায় পিসীর ফাঁকা ঘরে। 'রবি নাকি?' বলে পিড়ী আড় ভাঙতো তক্তপোষে, এখন কোন শব্দ নেই; ফলে বড় ফাঁকা লাগে! সর সর করে ইঁদুর ছুটে যায় পায়ের তলা দিয়ে গভীর অন্ধকারে।

—একটু কিছু খাবেন তো রবিদা? নমিতার কণ্ঠস্বর উঠোনে।

ভুরু কুঁচকে রবি বলে—না। ভীষণ মাথা ধরেছে।

—টুকুকে খুঁজতে বেরুবেন নাকি? নমিতা দাওয়ার কাছাকাছি এসেছে মনে হয়--ছেলেটা তো আজকাল প্রায়ই—

—পালিয়ে যাচ্ছে, যাক। একদম চলে যাক না কোথাও, বেঁচে যাই। ভেজা কাপড় পাল্টে রবি লুঙ্গি পরে।

—এবারে রবিদা, বৌদিকে নিয়ে আসুন। নমিতা দাওয়ায় বসেছে।

--পিসী হঠাৎ এরকম চলে গেল, এখন তো—

কুঁজো গড়িয়ে এক গ্লাস জল তুলেছে রবি হাঁ মুখের কাছে, ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে নমিতার মুখে গ্লাসের জলটা ছুঁড়ে মারে।

কত রকম ইচ্ছা যে কতভাবে জাগে মানুষের মনে! সেসব কাজ করতে গেলে পৃথিবীতে রক্তারক্তি কান্ড বেঁধে যেত। জল খেতে গিয়ে শুকনো গলায় বিষম লেগে যায় রবির। মুখ লাল করে সে কাশে। কাশির ধমক সামলে নিয়ে রবি বলে—বেশ তো আছে, এনে কী হবে?

নমিতা বলে—সেকি, মাকে ছেড়ে এইটুকু ছেলে এক একা এখন কী করে থাকবে।

খুশী দরজায় দাঁড়িয়ে কুঁই কুঁই করছিল। বিনানো কান্নার মতো। হঠাৎ ছুটে এসে এমন ধাঁ করে রবি এক লাথি কষায়, খুশী দুটো পাল্টানি খেয়ে উঠোনে গিয়ে পড়ে। এরপর রবি গিয়ে বিছানায় ঝপ করে শরীর এলিয়ে দেয়।

নমিতার বুক কেঁপে ওঠে। সে ঠোঁট উল্টে উঠে পড়ে। নমিতা ভাবে তারা পিসীর ভাড়াটে বলে রবিদার খুব গুমোর।

দুনিয়াতে কারোর জন্য কারোর কিছুই এসে যায় না। মায়ামমতা ভালবাসাটাসা আদতে স্রেফ বুজরুকি, মুখের ওপরে লাগানো স্নো পাউডারের মতো, লাগাও তুলে ফ্যাল, ওতে মুখটা একটু চকচকে ঝকঝকে দেখায় এইমাত্র, ও রকম চাকচিক্য থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী! পিসীর জন্য তো তার চোখে জলও এলো না, এলেই বা তার কোন্ স্বর্গবাস হতো!

রবি শুয়ে শুয়ে এসব ভাবে, যেমন সে আজ কাল ভেবে থাকে। বেশ তো পিসী চলে গেল, কার কী এলো গেল তাতে। পিসী তো মরল না, বেঁচে গেল। যেতেই হত—দুদিন আগে আর পরে, বরং দু দশদিন আগেভাগে যাওয়াই ভাল। রোগভোগ জ্বালা যন্ত্রণার হ্যাঁচড়-প্যাঁচর থেকে বাঁচোয়া। কী সুন্দর যাওয়া। সকালবেলায় তোকে চা দিয়ে নিজে চা খাচ্ছিল, হঠাৎ হাত থেকে কাপটা খসে গেল, শুধু একটা ডাক দিল—'রবি'। ছুটে যেতে না যেতে টলে গেল। বাস, দশ মিনিটের আঁকুবাকু, তারপর সব ঠান্ডা।

আহ্, কী শান্তি। রবি কুন্ডলী-পাকানো শরীরটা টান করে দেয় আরামে। সারা দিনের হা-ক্লান্তিতে দুচোখের পাতা কী রকম ঠান্ডা ঘুমে জুড়ে যাচ্ছে। লম্বা টানা ঘুমের মতো আর শান্তি কিছুতে নেই। এই ঘুম যদি লম্বা হতে হতে হতে হতে শেষ ঘুমে গিয়ে পৌঁছয় তবে রবি দুহাত তুলে সেই ঘুমকে সেলাম জানাবে—সাবাস। থ্যাংক ইউ। মশার চলন্ত পোঁন পোঁন শব্দের মতো একবিন্দু ভাবনা এখন টুকুকে নিয়ে পাক খাচ্ছে রবির বুকের কানায় কোণায়। ধোত্তেরি, আজ আর তোকে খুঁজতে বেরুচ্ছি না টুকু। তুই আজকাল বড় জ্বালাচ্ছিস! বাড়ি থেকে পালাস, ইস্কুল থেকে পালাস। তোর পাত্তা লাগাতে গিয়ে কুকুরের মতো জিভ্ লম্বা হয়ে যায় আমার। ইছামতীর ধারেই যাস আর স্টেশনেই যাস, পালাবি কোথায়? খুঁজে তো ঠিক বের করি আর তখন তো টের পাস আমার হেড়ডো হাতের থাপ্পড় কী জিনিস। তবু পালাস ভাবিস বাপটা পাষন্ড। যত ভাল-বাসা তোর মা'র কাছে! আদরের মধু ঢালবে তোর মা তোর জিভে—এই ভাবিস তো? যা, তুই চলে যা, একবার গিয়েই দেখ না কোথাকার মধু কোথায় গড়ায়। বাঁচতে চাস তো আজ আর ফিরিস না টুকু, ফিরিস যদি তো তোর হাড় আমি গুঁড়ো করে দেব। পিসী নেই, কেউ আর ছুটে এসে আগলাবে না তোকে।

মাটিতেও না, ভয়ানক উঁচু আকাশেও না, মাটির ওপর ওপর কাঁচা আমকাঠের ধোঁয়ার মতো শূন্যে ভাসে শরীর, শূন্যের দোলনায় দোল খেতে ভারী সুখ। ঘুমে তন্দ্রায়—ঘুমে তন্দ্রায় কতক্ষণ যে দোল খায় রবি, টেরও পায় না। আচমকা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে লাল চোখে।

রবি। অখিল ডাকে। ডোয়ায় সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে, ঘরে ঢোকে সে, লাইট জ্বালে। তার হাতে টুকু, বলে—নে টুকুকে নিয়ে এলাম, বাড়ি থেকে ফিরছি দেখি স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর একলা দাঁড়িয়ে আছে।

তৎক্ষণাৎ, একটা মস্ত গিরগিটি যেন, চকিতে রবি লাফ মারে বিছানা থেকে মেঝেয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা থাপ্পড় খেয়ে কাত হয়ে পড়ে টুকু। টুকু পড়ে না, কাঁদে না। তবু রবি আরেকবার হাত তুলতেই ভীষণ চমকে গিয়ে অখিল তার হাতটা চেপে ধরে —কীরে, তুই কী ক্ষেপে গেছিস। এইটুকু একটা ছেলে—

এক হ্যাঁচকায় হাত ছাড়িয়ে রবি গিয়ে বিছনায় বসে। টুকুর চোখে সেই দৃষ্টি যাতে 'পাষণ্ড' কথাটা ফুটে ওঠে! পিসী ছুটে এসে বলত—এই তো তোমার মুরোদ, বৌকে শাসনে রাখতে পার না, ছেলেকে মেরে গায়ের ঝাল মেটাও, পাষন্ড! পিসী আর একরম গা-জ্বালানো কথা কোনদিন বলবে না। অখিল টুকুকে টেনে তোলে, দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে নমু, টুকুকে একটু কিছু খেতে দে তো। অন্ধকার ফুঁড়ে নমিতা এসে টুকুকে নিয়ে চলে যায়।

রবি ফের বিছানায় ধেবড়ে যায়। অখিল পাশে বসে বলে—কীরে ব শরীরটরীর ঠিক আছে তো?

রবি নিরুত্তর। ধুম জ্বরের মতো ঘ তার প্রতি রোমকূপে। এই মুহূর্তে ম হয় সে শুধু দিনরাত ঘুমুবে। যতদিন বেঁ থাকবে।

—কী খাবিটাবি? অখিল কিছু ভেবেই পিঠে হাত রাখে রবির, বলে হবিষ্যিটবিষ্যি করবি নাতো বল্যা আরেকবার ভেবে দেখলে পারতিস।

গভীর শ্যাওলাধরা টানেলের গা বেয়ে যেন অখিলের কথা ভেসে আসে বা দূর থেকে। রবি শুনেও শোনে না। অখি হতাশ হয়ে কাজের কথা পাড়ে। এধারে রা জবাব না দিয়ে পারবে না: এই ভেবে আস্তে পা দোলাতে দোলাতে অখিল বলে—এক সুখবর আছে রবি....পিসীর নিউজ শুনে বোধহয় বৌঠাকুরের মনটা....বুঝলি

টুকুকে নিয়ে ফিরছিলাম দেখে ডাকল। কী বলল জানিস ?।

এবারেও রবি তাকে নিরাশ করে। কথা বলে না। অগত্যা তাকেই গুমোর ভাঙতে হয় —বলল রবির যেদিন খুশী জয়েন করতে পারে, এ্যাদ্দিন কিছু কাতে পারিনি— তোমরা তো অখিল বিশ্বাস যাবে না— ভীষণ মন্দা যাচ্ছে কাঠের বাজারে।

শোনে আর রবি নিজের মনে হাসে— আহা ধীরাজদা, তোমার বড় দয়ার শরীর গো, আড়াই বছর পায়ে তেল দিয়েই, আজ তোমার চাকরি দেবার মতি হল। থ্যাঙ্ক ইউ।

—থ্যাঙ্ক ইউ। রবি ছোট্ট একটা হাই তোলে—তাহলে আমার একটা হিল্লে হল, কী বলিস অখিল ?

—নিশ্চয়ই, শ তিনেক করে দেবে বলল। নে একটা সিগারেট ধরা—অখিল সিগারেট এগিয়ে দেয়। দেশলাই জ্বালিয়ে বলে—এবারে তুই মিতুকে নিয়ে আয়। ওহ্ কী দুর্দিনই গেল তোর।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ফের কাশি ছাপিয়ে ওঠে। উঠে বসে রবি—মিটকি মিটকি হাসে—তা'লে বলছিস, আমার সুদিন আইতাচে—আইয়া পড়ল আর কী। না ?

তার কথায় অখিল সন্দেহের চোখে তাকায়, বলে—আসছেই তো।

—তা ঠিক। নিজের বুক হাতিয়ে রবি বলে—আমিও টের পাই, আর খুব বেশী দেরী নেই।

অখিলের মুখটা চুপসে যায়। রবির গর্তে-ঢোকা নিষ্প্রভ দুটি চোখ তার কাকলাস শরীরটায় নজর বুলিয়ে চুপচাপ বসে থাকে অখিল।

রবিহেসে বলে—মানুষের সবচে' সুদিন কোনটা বলতো অখিল ?... পারলি না তো ? মুখভরা ধোঁয়া ছেড়ে রবি বলে— এই, মানুষ যখন ধোঁয়া হয়ে যায়। ফুস্—

ধ্যাত্। কী বাজে বকছিস। অখিল পা দুলিয়ে খোশমেজাজ আনে, বলে—ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে চাকরিটা কর, মিতুকে নিয়ে আয়, আবার নতুন করে ডামাডোল লাগিয়ে দে। অখিল রবির হাতে চুটকি একটা ছোবল মারে।

একটা গভীর শ্বাস পড়ে, রবি গম্ভীর গলায় বলে—আমি আর চাকরি বাকরি করব নারে অখিল। তিন বচ্ছর আগে যখন সবাইকে নিয়ে এখানে এলাম—একে তাকে ধীরাজদাকে কত মক্কেলকে তেল মেরেছি। যা হবার হয়ে গেছে, আম্মা; এবারে সুদিন চাই....ফিক ফিক হাসে রবি।

—ও রকম বললে তো আর হয় না। অখিল জোরালো হাত ঝাঁকিয়ে বলে—সব মানুষের জীবনেই ভাল সময় মন্দ সময় আসে, ও দুদিনের ব্যাপার। ওনিয়ে অত মাথা ঘামালে—

—ভাল মন্দ সময় আসে যায় অখিল, কিন্তু সুদিন একবারই আসে। যাউকগা। বলে রবি অখিলের উরুতে থাপ্পড় মেরে বলে—তা বলে ভাবিস না তোর বিয়েতে আমি বরযাত্রী যাব না, ঠিক যাব। পরশু তো।

—সে তো যাবিই। অখিল যথার্থ উদ্বিগ্ন মুখে বলে—সত্যি বলছিস তুই চাকরি করবি না ? যাঃ।

বিচারকের রায় জানানোর ভঙ্গি রবির —না। একদম না।

—কী বলছিস। এই টুকুটা রয়েছে, তার কথাও তো ভাববি। তাছাড়া মিতুও তো আর সখ করে চলে যায়নি। এবারে চাকরি পাচ্ছিস, ধরে নিয়ে আয়—

—কাকে আনব ? মিতা। মিতুকে ? রবি দুঃখিত গলায় বলে—মিতু তো মরে গেছে।

এবারে অখিল রেগে যায়—তুই তখন থেকে খালি ইয়ারকি মারছিস। আমি সিরিয়াস কথা বলছি আর তুই—

—কোথায় ইয়ারকি মারলাম। আরে। রবি ভারী অবাক হয়ে যায়।

—এসব ইয়ারকি না ? একটা লোক মরে গেল, যত দূরেই থাক, আমরা জানতাম না ?

—সব কী জানা যায় রে অখিল ? রবি খুব আস্তে বলে—সব যদি জানিস তাহলে তুইও বলবি মিতু মরে গেছে।

খুশী ফের অন্ধকার উঠোন থেকে আকাশে মুখ তুলে লম্বা ঘেউ দেয়, কারুকে যেন ডাকল।

বহুক্ষণ দুজনেই মুহ্যমান হয়ে বসে থাকে। অখিল রবির মুখের দিকে চাইতে পারে না. চেষ্টা করেও। অধোমুখে অস্ফুটে এক সময় বলে—তাহলে কী যা কানাঘুষো শুনি, তাই ঠিক ? পুলক না কাকে মিতু—

হ্যাঁরে। তুই অত লজ্জা পাচ্ছিস কেন ? অখিলকে একটা নিদারুণ খোঁচা মেরে রবি বলে—মিতু পুলকদার সঙ্গে আছে, অবশ্য ওদের বাড়ির পাশেই। আমরাও ওখানেই ভাড়া ছিলাম।

চোখ তুলে অখিল বলে—কসবাতেই !

—হ্যাঁরে। দে আরেকটা সিগারেট খাই। রবি ফের সিগারেট ধরায়, হেসে বলে —মাস ছ-সাতেক আগে লোক পাঠিয়েছিল টুকুকে নিতে, দিইনি।

—বেশ করেছিস।

ঠিক এসময় নমিতা ঘরে ঢোকে। তার কোলে ঘুমন্ত টুকু। তার দুটি হাত নিঃসাড়ে ঝুলছে যেন ওর হাত নয়। অখিল দাঁড়িয়ে বলে—ঘুমিয়ে গেল ?

—হ্যাঁ খেতে খেতেই ঢুলছিল। নমিতা শুইয়ে দেয় টুকুকে। মাথার তলায় বালিশ ঠেলে দেয়। টুকুকে দেখে রবি ভাবে ঘুম আর মরণের মধ্যে ফারাক বিশেষ কিছু নেই, শুধু জাগা আর না জাগা। বার বার জাগার চেয়ে একবারে ঘুমিয়ে যাওয়ার ঝনঝাট কম।

নমিতা বলে—অখিলদা, রবিদা কী কিছু খাবে ?

অখিল উৎসুক চোখে তাকায়, রবি টুকুর বেঁকা ঘাড়টার দিকে তাকিয়ে বলে— পিসীর খই আছে ওই খেয়ে নেব।

নমিতা নিঃশব্দে চলে যায়।

—তোর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না রবি। অখিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে— মিতু তোর লিগ্যাল ওয়াইফ, কেস করতে পারিস। নয়তো চল একদিন আমরা দল বেঁধে গিয়ে—

একটা লম্বা হাই তোলে রবি, জড়ানো গলায় বলে—ধ্যুস। কী যে সব বলিস না, কী হবে ? দুদিনের জন্য অত ঝনঝাট পোষায় !

সহসা উত্তেজিত একটা হাতে রবিকে ঝাঁকানি দিয়ে অখিল বলে—তুই সত্যি মরে গেছিস রবি। মানুষ মরে না গেলে এরকম কথা বলতে পারে ?

অখিলের হাতটা ধরে ফেলে রবি এক-হাতে, ঘুম ঘুম চোখে মৃদু হেসে বলে— আমার ধুতি নেই রে শুধু প্যান্ট। কিন্তু প্যান্ট পরে আমি কিছুতেই বরযাত্রী যাব না। পরশু তুই একটা ধুতি আমাকে ধার দিবি অখিল, ভুলবি না কিন্তু, ধুতি পাঞ্জাবি না হলে—

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না অখিল, পলকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সটান দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। সারারাত খুশী ডাকে। ক্ষণিক বিরতি দিয়ে দিয়ে। গভীর ঘুমের ভেতরেও সে শব্দ রবি শোনে। আর দেখে চারিদিকে ঘন কুয়াশার মতো গাঢ় ধোঁয়া ঘনিয়ে উঠছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছে। খুব ভোরে, তখনো সূর্য ওঠেনি, কাকও ডাকেনি, বুকের ভেতরে দম চেপে আসতেই —ঝপ করে ঘুম ভেঙে যায় রবির। ঘুম ভেঙে গিয়েও হাঁসফাস করে সে খানিক। তারপর লম্বা একটা শ্বাস টানে। এলোমেলো টুকুর একটা পা তার বুকের ওপর আড় হয়ে পড়ে আছে।

আলতো হাতে পা-টাকে নামিয়ে দেয় রবি। তখন প্রথম কাকটা ডেকে ওঠে।

ছেলেকে একটু ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে রবি টের পায় টুকুর শরীরটা কম ভারী নয়। আর তখনই ঝুঝকো অন্ধকারে টুকুর মুখটা দেখতে উবু হয় সে, স্পষ্ট চোখে পড়ে না। গালে হাত বুলিয়ে টের পায় তার আঙুলের দাগ ফুলে আছে। নুয়ে পড়ে রবি অস্ফুটে বলে—মার কাছে যাবি টুকু ?

আধো ঘুমে বিহ্বল টুকুর দুচোখ ঈষৎ ফাঁক হয়ে ফের বুজে যায়, তার সেই ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিতে যেন স্বপ্নের ভেতরে অচেনা কারুকে দেখার আভাস ফোটে। তবু তার দু-ঠোঁটে কী একটা মৃদু হাসি পলকে গড়ান দিয়ে যায় ?

রবি স্থির করে ফেলে আর কোন পিছুটান রাখবে না।

*

ঝাম্পাই ভীড়ে গর্ত পড়ে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে রবির পায়ে পা বেঁধে যায়। শেষ মুহূর্তে ছেলেকে নিয়ে লাফ মারে রবি। ততক্ষণে আগে-পাছে শঙ্খধ্বনি তুলে ট্রেণ প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে যায়। জোট হতে হতে একটা বস্তির বাঁয়ে ঝুঁকি নিয়ে [illegible]

ট্রেণটা মিলিয়ে যায়। ওপারে ঢলে-পড়া আকাশের পেটের ভেতরে ঢুকে পড়ল সহসা।

—চলো বাবা। টুকু তাড়া লাগায়। রবি চমকে ওঠে না, শুধু বাবা শব্দটা তার কানের ভেতর দিয়ে বুকের মধ্যে গলে পড়ে। বহুদিন পরে শব্দটা শোনা গেল। হেসে রবি বলে — চলো।

প্ল্যাটফরম থেকে গড়িয়ে নেমে পায়ে হাঁটা পথ একটা পাঁচিলের পাঁজর ভেদ করে চলে গেছে। টুকু ছটফটিয়ে সামনে এগোয়, পারে তো যেন ছোটে। রবি পিছিয়ে পড়ে বার বার। রোদ-হাওয়া মুখের ওপর ঝাপটা মারে বার বার। টুকুকে কোন রকমে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসা, তারপর আর তার কোন ভার নেই দায় নেই! সে তখন নিরা-ছাড়া সেফ একলা। তখন সে আরো পিছিয়ে পড়বে, এমন পিছিয়ে পড়বে সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

টুকুর ছটফটানি দেখে তবু বুকটা চুপসে যায় রবির। চোখ জ্বালা করে। রবি ডাকে—টুকু। টুকু থমকে দাঁড়ায়।

রবি বলে—তোর খুব আনন্দ, নারে?

চকিতে টুকুর হাসি মুখটা ঘুরে ফের সামনে চলে যায়। পা পা হেঁটে সে বলে—তুমি কিন্তু মাকে বকাবকি করবে না বাবা।

রবি মলিনমুখে আপন মনে হাসে—কাকে বকাবকি করবে সে? সবাইকে কী বকাবকি করা যায়? টুকু অত জানেও না, বোঝেও না।

—আমি তোকে খুব বকাবকি কার টুকু, নারে?

টুকু চুপ করে থাকে।

—তোকে খুব পেটাই মারি, তাইতো? রবি গাঢ় গলায় শুধোয়।

দুরন্ত অভিমানে টুকু ঘাড় ঘুরিয়ে বলে—মারই তো। আর কোনদিন মারবে না। মাকে আমি সব কথা বলে দেব।

তার চোখেমুখে রোদ আগুনের মতো জ্বলে ওঠে।

কিন্তু টুকু জানে না তার বাবা তার গায়ে হাত তোলবার সুযোগ পাবে না। রবি একবার ছেলের ক্লিষ্ট মুখটা দেখে। তারপর অপরাধীর স্বীকারোক্তির করার ভঙ্গিতে বলে —তোকে আর কোনদিন আমি মারব নারে টুকু। তুই ভাল হয়ে থাকিস, কেমন?

টুকু ছোটট একটা হোঁচট খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নেয়। এবং রবির কথা শুনেও তার মুখের— কঠিন পেশী একটুও নরম হয় না। তার সারা মুখে অবিশ্বাস। প্রচ্ছন্ন আতংক। রবি এই মুহূর্তে কিছুটা আনমনা হয়ে যায়। সে আস্তে বলে—তুই কিন্তু মার সঙ্গে থাকবি টুকু, কেমন? হয়তো এক দু-বছর আগে হলে টুকু শুধাতো—তুমি, তুমিও থাকবে তো বাবা? কিন্তু সময় বড় মস্তান খেলোয়াড়, কত কিছু পাল্টে দেয়। টুকুও পাল্টে গেছে। টুকু কিছুই বলে না—কিন্তু কিছুটা সপ্রশ্ন মুখে একবার ফিরে তাকায় মাত্র।

রবি বলে—আমি কিন্তু আজই ফিরে যাব টুকু। একথা রবি খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে, এবং ছেলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। টুকু এ-খবরে অখুশী হলে সে মনে মনে খুশী হত বৈকি। কিন্তু টুকু অখুশী হয় না, বরং তার সারা মুখে যেন ভেতর থেকে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে দপ্ করে। মন থেকে খুশী হলে মানুষের মুখ এমন দেখায়। এবং তদন্তে রবির ভীষণ রাগ হয়ে যায়। এমন রাগ হয় এক কদম এগিয়ে ঝাঁ করে একটা চড় লাগাতে ইচ্ছে জাগে তার। কিন্তু রবি তার এই চকিত ইচ্ছেটাকে খুব সহজেই বশ করে নিতে পারে কারণ এরপরে হয়তো কোনদিন আর টুকুর সঙ্গে তার দেখা হবে না। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আর দেখা হবে না। আর কোনদিন রবি ভুলেও এপথ মাড়াবে না। আজই কী আসত? কারো পক্ষে আসা সম্ভব? তবু যে সে এসেছে সে তো চিরদিনের মতো সে হাল্কা হতে চায় বলে। একেবারে দূরে চলে যেতে চায় বলে। সকলের নাগালের পুরোপুরি বাইরে চলে যেতে চায় বলে। শুধু শুধু আর টুকুকে আটকে রেখে কী লাভ, কি লাভ তার বাড়িয়ে?

তবু রবি অন্ততঃ একবার, শেষ বারের মতো মৃদু অভিযোগ তোলে, ছেলেকে বলে —টুকু, আমি কী শুধুই তোকে মারি, তোকে আমি আগে কোনদিন আদর করিনি? করতাম না, বল? টুকু সেকথার কোন জবাব দেয় না। হয়তো এর কোন গুরুত্ব নেই তার কাছে! শুধু সে আরো একটু জোরে হাঁটে। আরো একটু দূরত্ব বাড়ে তার বাবার সঙ্গে, আরো একটু সে এগিয়ে যায় তার মার কাছে। রবি আপন মনে বলে—বেইমান। ঠিক এসময়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। টুকুও। বেলা নটার রোদের তাতে হাল্কা একটা ঘূর্ণি পাখির মতো ঘুরে উঠে পালিয়ে যায়।

রবি টুকুকে নিয়ে রাস্তার লাগোয়া বাড়িটার দিকে পা বাড়ায়। ভীষণ অবাক হয়ে আতংকভরা মুখে টুকু বলে—দাদুর বাড়ি তো ঐদিকে?

—আয় না। হ্যাঁচকা টানে রবি তাকে নিয়ে প্রায়-নিঃশব্দে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে। টুকুর উৎকণ্ঠিত মুখটা কঠিন হয়, রবি ফিরেও দেখে না। সে শুধু দেখে দরজার পাশের নেমপ্লেট—পুলক সেন। গভঃ কন্ট্রাকটার। পুলকদাদের বাড়ির এ-অংশটা নতুন, হয়তো পুলকদার নিজের তৈরী। ধবধবে জ্যোৎস্নার মতো দেয়াল তাতে বিউটি স্পটের মতো একচিলতে ডবলওয়ে কলিং বেলের কালো সুইচ। দুবার হাত ফিরিয়ে নিয়ে তৃতীয়বারে জোবালো সুইচ টেপে রবি। এবং ভেতরের কলিং-বেলের শব্দে সে নিজেই আপাদমস্তক চমকে ওঠে।

—কে? পাশের ঘরে মিতুর গলা। তেমনি সুরেলা রয়েছে এখনো। চিনতে এক-মুহূর্ত সময় লাগে না রবির। সুন্দর গানের গলা ছিল মিতুর, ছিল গান-পাগল। রবিও। তারও নেশা ছিল গানেই। তার বাবা নিজে শেখাত দুজনকে। পরে মিতুর যখন সতের, তখন গানের চেয়েও রবিকে নিয়ে বেশী পাগল হয় মিতু। ক্ষেপে যায়। নিজের বাড়িতে ঝগড়া-ঝাঁটি করে, না খেয়ে না খেয়ে নিজেকে শুকিয়ে মারে, অগত্যা রাজি হয় তার মা-বাবা। রবিদাকে পাগল হয়ে বিয়ে করতে তার অত কান্ড।

—তুমি একবার দেখে এসো না। মিতু কারুকে তাড়া লাগায়। কাকে? পুলকদাকে?

চটির ফট ফট আওয়াজ আসে এ ঘরে—কে?

ছিটকিনি খুলে যায় চিট করে, সঙ্গে সঙ্গে দরজায় একটি পাল্লা। আর তদ্দণ্ডে পুলক চেঁচিয়ে ওঠে—আরে রবি, তুই! আয় আয়।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে রবি, টুকুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়, একটি মাত্র পাল্লা খোলা—তবু সে অনায়াসে ভেতরে ঢুকে যায়। সে মুহূর্তের মধ্যে এত সরু এত নীচু এত ছোট হয়ে গেছে।

—শীগ্‌গির দেখে যাও মিতু, কে এসেছে। পুলক চেঁচিয়ে ওঠে। রবি পুলকদার লম্বা-চওড়া শরীরটা দেখে, ভয়াণক উঁচু মনে হয় তাকে। বস্তুতঃ এই ঘর, ঘরের জানালা পর্দা, আলমারি সব-কিছু এত অতিকায় লাগে যে, রবি সঙ্কুচিত ছোট্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা বামনবীরের মতো।

—কেমন আছিস বল। পুলকদা চওড়া পাঞ্জা বাড়িয়ে দেয়। রবির হাত—সমস্ত শরীরটা কঠিন লোহার মতো বোধ হয়। আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠার পরে পিসীর শরীরটা এমনি শক্ত হয়ে এমন বেঁকে গেছিল যে ভারী কাঠসুদ্ধ ঠেলে উঠেছিল ওপরে। রবি এ সময় আচমকা নিজের শরীরের ভেতর থেকে মাংসপোড়া গন্ধ পায়। তার শরীরের ভেতরে কোথাও কী আগুন লেগেছে?

রবি নিজের ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—তোমার মনে আছে পুলকদা, ছেলেবেলায় তনুপুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে ম—

হা হা করে হাসে পুলক, রবির হাতে অসম্ভব ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—মনে নেই? তুই টেনে তুলেছিলি। টুকু ভড়কে যায়। রবিও নির্বাক। পর্দা সরিয়ে পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়ায় মিতু। স্তব্ধ স্থির হয়ে অপলকে তাকিয়ে থাকে টুকুর দিকে। রবি ভেবেছিল টুকু ছুটে যাবে, মা বলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, মিতুকে জড়িয়ে ধরবে দুহাতে। কিন্তু টুকু তেমন কিছুই করে না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মানুষ বোধহয় একদৃষ্টে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না, চোখে জল এসে পড়ে। মিতুর দু চোখ ভরে গিয়ে চোখের কোলে জল জমা হয়। আর সহসা সে ছুটে এসে নিঃশব্দে টুকুকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নেয়। টুকুও জড়িয়ে ধরে মাকে। নিঃশব্দে। সোফায় বসে মিতু টুকুর পিঠে সারা গায়ে হাত বুলাতে থাকে। রবি ছোট্ট একটা শ্বাস গোপন করে—আহা মানুষের বুকে কত মায়া।

রবি দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে পুলক বলে—কীরে তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস!

বুকের ভেতর থেকে চাপা শ্বাস বেরিয়ে আসতেই রবি যেন মাংসপোড়া গন্ধ পায়। বিশাল এই ঘরের ভেতরে খুব কাছাকাছি বসে আছে তার চেনাশোনা এতগুলো মানুষ কিন্তু সকলকেই তার বড় অচেনা মনে হয়। মনে হয় এরা যেন থেকেও নেই। আসলে এরা কাছাকাছি থাকলেও রবি এখন অনেক দূরে, এরা রবির কেউ নয়, রবির কেউ নেই। সে ক্রমে আরো দূরে চলে যাবে। পৃথিবীর কোন মানুষই আর তাকে কোন দিন বিরক্ত করতে পারবে না। তাদের গায়ের ঘ্রাণ সে পাবে না আর কোন দিন। কারুকেই আর সে 'এসো' বলে কাছে ডাকবে না কোনদিন। বলবে না—কেমন আছ?—ইস কী রোগা হয়ে গেছিস টুকু। মিতু বলে সম্ভবতঃ। রবি সঠিক শুনতে পায় না। সে বলে—না পুলকদা আমি আর বসব না! ওকে দিতেই আসা, কাল পিসী মরে গেল। তার শেষ কথাটা কিছুটা যেন অপ্রাসঙ্গিক, তবু সে কথায় সকলে চমকে ওঠে।

মিতু বিহ্বল চোখে তাকায় রবির দিকে। রবিও।

পুলক বলে—তাই নাকি? স্যাড।

রবি মলিন একটু হাসে, বলে—স্যাড কেন? আমরা কি আর বাঁচবো চিরকাল? বলো? একথায় একটা নৈশব্দ্য ঘনিয়ে ওঠে। রবি মিতুকে দেখে আর ভাবে এর শরীরটা একদা আগাগোড়া তার ছিল, তাকে ভালবেসে পাগল হয়েছিল এই মেয়েটি। আজ এর সবটাই পুলকদার। রবিও তো পাগলের মতো ভালোবেসেছিল, সে রবি কোথায় গেছে? পিসীর মতো দগ্ধ হয়ে ধোঁয়ার মতো উড়ে গেছে? কাল রাতে আঁধার যেন কী বলেছিল—তুই মরে গেছিস রবি। পেটের মধ্যে হাসির বুদবুদ গুড় গুড় করে, রবির ভীষণ জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে জাগে। পুলক বলে—ও... বসতো! এত তাড়া কিসের, দুপুরে খেয়ে-দেয়ে যাবি।

—ওরে বাবা, আমার অনেক কাজ। রবি মিথ্যা কথাটা এমন জোর দিয়ে বলে যে নিজেই হাসে। আসলে তার আর কোন কাজ নেই, কোন দিন আর তার কোন কাজ থাকবে না। পৃথিবীতে মানুষ কেন এত কাজ করে? কী হয়? মানুষই থাকে না আর কাজ! তার শুধু—পিসীর এঁদো আবহাওয়া ঘরটা আছে, সেটা থাকবে। উঁচু কবরের মতো, তার আঁধার গর্তের ভেতরে সে শুয়ে থাকবে বুকে মাংস পোড়া গন্ধ নিয়ে, যত দিন সে নিশ্বাস নেবে এমনি করেই তার কেটে যাবে—

মিতু গলা চড়িয়ে হাঁকে—পরী, শোন। খাবার কর। পরোটা করবি আর দুটো ডিম-সেদ্ধ। পেছনেই খাবার জায়গা তার ওপাশে [illegible] কিচেন, অদৃশ্য পরী বলে—করছি মাসি।

আমি কিন্তু খাব না—রবি বলে। মাসকয়েক ধরে টুকুটা ক্ষেপে গেছে এখানে আসার জন্য। বাড়ি থেকে ইস্কুল থেকে পালায়, আমি আর পারছিলাম না ওকে নিয়ে—

পুলক চোখের ইশারায় মিতুকে দেখিয়ে হেসে বলে—এর অবস্থাও তো অইরকমই।

রবি একটু দম নিয়ে বলে—এখানে আসব শুনে টুকুর তো আর হুঁশ ছিল না, এমন দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছিল—রবি ম্লান মুখে ছেলেকে দেখে। মিতুর বুকের ভেতর থেকে সে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। বিমূঢ় বা ভীত সে দৃষ্টি।

মিতু আলতো একটু চুমু খায় টুকুর গালে, বলে—আমার জন্য তোর মন খারাপ করত নারে টুকু?

টুকুর সেই গালে নিজের চড়ের দাগ এখনো নজরে পড়ে। একাগ্রে রবি সে-দাগ দেখে, এরকম অপলকে নিরীক্ষণ কেউ তাকিয়ে থাকতে পারে না, চোখে জল আসে।

রবির চোখ দুটিও তিরতির করে, চোখের জল ব্যাপারটা ভীষণ হাস্যকর। পিসীর জন্যও কাঁদেনি সে। শুধু বুকের ভেতরে শেকড় নামিয়ে দেওয়া টুকুকে টান মেরে উপড়ে এখানে ফেলে যেতে হবে। এতে কেন বুকটা জ্বালা করে? কেটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেলে যেমন হয়। এর জন্যই যেন রবি এক মুহূর্ত বসে পড়ে আর তখন কাঁচের আলমারির ভেতরে সে পুলক-মিতুর জোড়া ছবি দেখে। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ায় রবি, বলে—তাহলে তুমি থাকো টুকু। আমি যাচ্ছি।

তার কথাগুলো নৈশব্দ্যের ভেতরে প্রতিধ্বনির মতো যেন গমগম করে ওঠে। মনে মনে রবি আরেকবার বলে—তোকে আর কোন দিন মারব নারে টুকু।

—সত্যি তুই চললি! পুলকও উঠে দাঁড়ায়।

—হ্যাঁ। বলে রবি দরজার দিকে পা বাড়ায়। তার ছোট হয়ে যাওয়া শরীরটা পাথরের মতো ভারী বোধ হয়। কিন্তু সেতো আর কোন ভার বইতে চায় না। টুকুকে ছেড়ে দিয়ে সে নির্ভার হয়ে চলে যাবে। কোনদিন কারোর জন্য সে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না, কারোর কথা ভাববে না সে। পিসীর এঁদো ঘরে শুধু সুদিনের অপেক্ষায় সে [illegible] শুয়ে—

—মা, তুমি যাবে না? টুকু মাকে প্রশ্ন করতেই দরজায় থমকে দাঁড়ায় রবি। তার বুকটা কেঁপে ওঠে। টুকু বলে—তুমি চল মা।

—আমি কোথায় যাব? মিতু টুকুকে ফের ব্যগ্রহাতে জড়িয়ে ধরে, বলে—তুই থাকবি আমার কাছে। ইস্কুলে যাবি, পড়াশুনো করবি, আমি সব ঠিক করে রেখেছি টুকু। তোর জামা জুতো—টুকু একবার মিতু রবি পুলকের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর থমথমে মুখে মিতুর কোল থেকে নেমে দাঁড়ায় বলে—না মা তুমি চল, আমি ওখানে পড়ব।

সহসা মিতুর মুখটাতে কালি ছড়িয়ে পড়ে, কালো। চুপসানো সেই মুখ দেখে রবি খুশী হয়। নিজেকে হঠাৎ তার খুব উঁচু মনে হয়। সে তাকিয়ে দেখে পুলকদা ছোট্ট এইটুকু হয়ে গেছে, এত ছোট যেন টুকুর কাছে তাকে একটা পুতুলের মতো দেখায়। পুলক টুকুর গাল টিপে আদর করে বলে—তুমি থাকো টুকু, আমি আমার মোটর সাইকেলে তোমাকে স্কুলে দিয়ে আসব, তোমাকে নিয়ে রোজ বেড়াতে—

টুকু এক ঝটকায় পুলকের হাতটা সরিয়ে দেয়। দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে আসে। এসে রবির হাঁটু জড়িয়ে ধরে।

রবি তবু অবাক হয়, বিরক্ত। ধমক দিয়ে টুকুকে বলে—কী হচ্ছে টুকু, এই তো আসার পথে বললে তুমি এখানে থাকবে, এখন তুমি এমন বেয়াড়াপনা করছ কেন? যাও, মার কাছে যাও—বলে জোঁকের মতো কামড়ে থাকা টুকুকে সে দু হাতে ঠেলে দেয়। কিন্তু টুকু অনড়। কিন্তু ঠিক এসময় টুকুর চোখে জল দেখে রবি ভীষণ অবাক হয়ে যায়। মার খেয়ে বকাবকি শুনেও কোনদিন কাঁদেনি সে, পিসী মরে গেলেও তার চোখ শুকনো ছিল। সহসা রবি উবু হয়ে টুকুকে বুকের কাছে টানে। আর তখন বহুদিন বাদে টুকুর গায়ের ঘ্রাণ পায়। পোড়া মাংসের গন্ধ নয়, বালক টুকুর কোমল ত্বকের গন্ধ। টুকুকে তৎক্ষণাৎ বুকে তুলে নেয় রবি, কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে শুধোয়—তোকে এত মারি, পেটাই তবু তুই আমার সঙ্গে যাবি টুকু?

সজল চোখে মাথা হেলিয়ে টুকু সায় দিতেই টুকুর মাথাটা প্রবল দু'হাতে বুকে চেপে ধরে রবি। তার বুকের ভেতরে রক্ত লাফিয়ে উঠে সারা গায়ে ছড়িয়ে যায়। রবি তার কম্পিত দুটি ছোট ঠোঁট টুকুর কপালে চেপে ধরে। আশ্চর্য এক নোনা স্বাদ টের পায় রবি। ঝাপসা চোখ তুলে তাকায় সে কিন্তু পুলকদা বা মিতু কারুকেই আর তার চোখে পড়ে না। আর ঠিক তখন বহুদূরে স্টেশনে আগে পাছে শঙ্খধ্বনির মতো দূরের ফিরতি ট্রেনের ভোঁ বেজে ওঠে।

জিওনিস্ট আন্দোলন ও আইনস্টাইন

উৎপলকুমার দে

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিশেষতঃ পূর্ব ইউরোপে জিওনিষ্ট বা ইহুদি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। আধুনিক জিওনিস্ট আন্দোলনের সূচনা করেন অস্ট্রিয়াবাসী এক ইহুদী সাংবাদিক থিওডর হারজল। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বাসেল শহরে অনুষ্ঠিত এক সভার মধ্যে দিয়েই রাজনৈতিক দিক থেকে এ আন্দোলনের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হয়। দেখা যায়, আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের ইহুদিরা দীর্ঘকাল আগে থেকেই স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা স্থানীয় জনজীবনে পুরোপুরি মিশে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার ইহুদিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একেবারে অন্যরকম। দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব ইউরোপ ছিল রুশ জারের করতলে এবং তাঁদের রাজত্বে ইহুদিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের চেয়ে বেশী সুবিধা পেতেন না। এই কারণেই বোধহয় তারা নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি এবং স্বাতন্ত্র রক্ষা করে চলতেন। তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন এক নোতুন ইদ্দিশ ভাষা যার সঙ্গে প্রাচীন হিব্রুভাষার কোনও যোগই ছিল না। তারপর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে (১৮৫৫-'৮১) ইহুদিদের ওপর নীতিগত নির্যাতন শুরু হয়। এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক যে সমস্ত মধ্যযুগ ধরে ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস, একদিন স্বর্গের দূত এসে আবার তাদের প্রাচীন মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে নানা কাল্পনিক চিন্তা ও বিভিন্ন প্রচেষ্টায় ইন্ধন যোগাবে। যার পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় জিওনিষ্ট আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবেই এ আন্দোলনে সব চিন্তাধারার ইহুদি মানুষই মিশে গিয়েছিলেন। গোঁড়া ধার্মিকের যেমন অভাব ছিল না, তেমনই ছিলেন কিছু উদার মনের মানুষ। তাঁরা একদিকে যেমন ইউরোপে ইহুদি ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বাধিকার রক্ষা করার আন্দোলনে নেমেছিলেন, অন্যদিকে পৃথিবীর কোনও অঞ্চলে এক স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যে নানা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশ্যই মানসিক বাসনা ছিল, প্রাচীন মাতৃভূমি প্যালেস্টাইনকে ফিরে পাওয়া।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে বিশেষ করে ইহুদি যুব সম্প্রদায় প্যালেস্টাইনে এসে বসতি শুরু করে। তাদের নিরলস কর্মে তারা আরব মরু অঞ্চলে গড়ে ওঠে [illegible] খামার প্রতিষ্ঠান। অনেকে কারিগর প্রচেষ্টায় গড়ে তোলে ছোট ছোট কারিগরী প্রতিষ্ঠান। সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়, ইহুদি অধ্যুষিত নিজস্ব শহরাঞ্চল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে প্যালেস্টাইন ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসবাসে হয়তো তুর্কী সুলতানের বিশেষ আপত্তি ছিল না কিন্তু এক স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি একদিকে যেমন পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের বিরাট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়, তেমনি বেশ কিছু রাজনৈতিক সাফল্যও এনে দেয়।

জীবনের একটা সময়ে বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন এই আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসেন। তবে তিনি যে প্রথম থেকেই এ আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তা নয়, বরং প্রথমদিকে

তিনি এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর এই মানসিক রূপান্তরের ইতিহাস আমরা এখানে পর্যালোচনা করে দেখব।

আইনস্টাইনের জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, বিভিন্ন বিজ্ঞানের বই পাঠ করে বার বছর বয়সেই তাঁর প্রত্যয় হয়, বাইবেলের অধিকাংশ ঘটনাই গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘকাল বাদে সাতষট্টি বছর বয়সে তিনি যে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লেখেন, তাতে তিনি বলেছেন, "এই প্রত্যয় থেকে উপলব্ধি হল যে সরকারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের যুব সম্প্রদায়কে মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমার মুক্তভাবে চিন্তা করার অভ্যাস জন্মায় এবং যে কোনও রকমের কর্তৃপক্ষকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করি।......যা চিরকাল আমার মধ্যে রয়ে গেছে।"

অপরদিকে বালক বয়সে আইনস্টাইন ইহুদি ধর্মাচার ও ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন, যদিও তার মা-বাবা ছিলেন ইহুদি আচার সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। বালক আলবার্ট ও বোন মাজাকে এক সময়ে পড়তে হয়েছিল স্থানীয় ক্যাথলিক এলিমেন্টারী স্কুলে। দূরের ইহুদি স্কুলে না পাঠানোর মধ্যে হয়ত পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকখানি ক্রিয়া করেছিল, তাহলেও ধর্ম সম্বন্ধে পরিবারে যে যথেষ্ট উদাসীনতা ছিল সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকে না। এ উদাসীনতা সত্ত্বেও বাড়িতে গোঁড়া ইহুদিদের আনাগোনা ছিল। তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে বালক আলবার্ট ইহুদি ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। ইহুদি ধর্মগুরুর শিক্ষায় তিনি এতখানি অভিভূত হয়েছিলেন যে বালক বয়সেই গোঁড়া ইহুদি আচার অভ্যাস শুরু করে দেন। মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন যে মা-বাবা কোনও রকম ইহুদি আচার অভ্যাস করেন না। মা-বাবাকে পুরোপুরি অধার্মিক বলে ভাবতেও কুণ্ঠা করতেন না। কিন্তু বার বছর বয়সেই তাঁর মধ্যে ঘটে গেল বিরাট মানসিক রূপান্তর।

বার বছর বয়সের সেই অভিজ্ঞতার পর শুধু ধর্ম সম্পর্কে নয়, বহু বছর আইন-স্টাইন বোধহয় জাতি হিসাবে ইহুদিদের বিশেষ সমস্যা সম্পর্ক নিস্পৃহ ও উদাসীন ছিলেন। এর কারণ অবশ্যই তাঁর পরবর্তী-কালের বাসস্থান ইটালি ও বিশেষতঃ সুইজারল্যাণ্ডের মুক্ত রাজনৈতিক আব-হাওয়া। তিনি জার্মানীতে থাকলে এতটা উদাসীনতা কিছুতেই সম্ভব হত না, কারণ বালক বয়সেই লক্ষ্য করেছিলেন জার্মান সমাজে ইহুদিদের প্রতি কি প্রচণ্ড ঘৃণা! ধর্মে অনুরাগ না থাকলেও আইন-স্টাইন বোধহয় কোন সময়েই নাস্তিক ছিলেন না। তাঁর উত্তরজীবনে একবার এক ইহুদি পুরোহিত জিজ্ঞেস করেন, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা! উত্তরে জানান, "আমি স্পিনোজার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আমার ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর যোগসূত্রের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। আমার ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের ভাগ্য ও কর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না।" কিংবা কোয়ান্টাম বল-বিদ্যার আনসারটেনটি প্রিন্সিপল বা অনিশ্চয়তা সূত্রের বিরুদ্ধে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, "ঈশ্বর জুয়া খেলেন না," এক সর্বময় শক্তির ওপর তাঁর আস্থার কথাই বহন করে।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করলে ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে তাঁর উদাসীনতা বেশ স্পষ্ট হবে। ১৯১০ সালে প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার জন্যে আইন-স্টাইনকে আহবান জানান হয়। তিনি তাঁর আবেদন-পত্রে ধর্ম বিশ্বাসের জায়গায় অভ্যাস অনুসারে লেখেন, আন-এ্যাফিলিয়েটেড বা মতবিহীন। কিন্তু আবেদনপত্র পাঠাবার পর আইনস্টাইন জানতে পারেন, ঐ পদ গ্রহণ করার আগে সম্রাট ফ্রান্স জোসেফের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সম্রাটের বক্তব্য ছিল, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তার পক্ষে কোনও শপথ নেওয়াও সম্ভব নয়। অতঃপর আইনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে যান এবং 'মতবিহীন' কথাটা পরিবর্তন করতে চান। কিন্তু রেজিস্ট্রার বিশেষ অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন। তখন আইনস্টাইন সূক্ষ্ম তর্কের জাল বিস্তার করে প্রমাণ করেন, পরিবর্তনের অনুমতি আইনস্টাইন ছাড়া আর কারুর দেবার অধিকার নেই। তারপর 'মতবিহীন' পরিবর্তন করে লেখেন মোজেস মতাবলম্বী।

১৯১২ সালে তিনি জুরিখ পলিটেক-নিকে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ সালে বার্লিন কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। আইনস্টাইনের নিজের ভাষায়, জার্মানীতে এসে আমি প্রথম আবিষ্কার করি আমি একজন ইহুদি।" তখন সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের শিকার হিসাবে পূর্ব ইউরোপ থেকে বহু ইহুদি পরিবার আশ্রয়ের খোঁজে জার্মানী চলে আসছেন। জার্মানীতে তখন দারুণ ইহুদি-বিরোধী আবহাওয়া। সব দলের রাজনৈতিক নেতারাই এই হতভাগ্যদের দেশের সবরকম সমস্যার কারণ হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করছেন। ইহুদিদের এই ক্লেশ লাঞ্ছনা ও জীবনের অনিশ্চয়তা আইনস্টাইনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি যে নিজেও একজন ইহুদি এবং এইসব হতভাগ্যরা যে তাঁরই ভাই-বোন, এটা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। এসব সত্ত্বেও ১৯১৪ সালেই তিনি ইহুদি আন্দোলনে যোগ দেন নি, প্রকৃতপক্ষে ইহুদি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে ১৯১৯ সালের আগে নয়। একথা জানা যায় কার্ট ব্লুমেনফেল্ড-এর লেখা থেকে। ব্লুমেনফেল্ড ছিলেন জিওনিস্ট ইউনিয়ন অব জার্মানীর প্রচার বিভাগের প্রধান। বস্তুতঃ তিনি নিজে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন এবং আইনস্টাইনকে ইহুদি আন্দোলনের সামিল হবার জন্যে অনুরোধ করেন।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই আইন-স্টাইন সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও অতি-পরিচিতনামে পরিণত হন নি, যদিও পদার্থবিজ্ঞানীরা জেনে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এক অতি প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটেছে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে দেখা যায়, কোনও ঘন বস্তুর সামনে আলোকরশ্মিপথ অবশ্যই বেঁকে যাবে। এই বক্রতার পরিমাণ তত বেশী হবে যত বস্তুর ভর বেশী হবে এবং যত আলোকরশ্মিপথ বস্তুর কাছাকাছি

হবে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে অধ্যাপক এডিংটনের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালের মে মাসে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণকালে এক বৃটিশ অভিযান হয়। সূর্যের প্রচন্ড জ্যোতির জন্যে সাধারণ সময়ে সূর্যের কাছাকাছি আলোকরশ্মিপথ সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু পূর্ণ সূর্যগ্রহণকালে পৃথিবীর দর্শকের কাছে চাঁদ সূর্যকে পরিপূর্ণভাবে ঢেকে দেয় এবং তখন সূর্যের কাছাকাছি আলোকরশ্মিরপথ সম্পর্কে বিচার—বিবেচনা করা সম্ভব। অধ্যাপক এডিংটন ১৯১৯ সালের ৬ই নভেম্বর প্রথম তাঁর অভিযানের ফল প্রকাশ করেন। তিনি জানান, সূর্যের কাছাকাছি আলোকরশ্মিপথ সত্যই বেঁকে যায় এবং এই বক্রতার পরিমাণও আপেক্ষিকতাবাদ থেকে নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। এডিংটনের এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফল সমস্ত বিশ্বের সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হয় এবং স্বভাবতঃই আইনস্টাইনের নাম ও তিনি যে অসাধারণ প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক একথাও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। তারপরই আইনস্টাইনের নাম সর্বজনপরিচিতি লাভ করে।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্লুমেনফেল্ড আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সংগঠনের এক নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে। জার্মানীর জিওনিস্ট ইউনিয়ন ইতিপূর্বে জার্মানীতে বসবাসকারী ইহুদি খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবিদের এক তালিকা তৈরী করে। স্বাভাবিকভাবেই সে তালিকার মধ্যে আইনস্টাইনের নামও ছিল। তালিকা তৈরীর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, জার্মানীর এইসব ইহুদি বুদ্ধিজীবিদের জিওনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা এবং সম্ভব হলে তাঁদের ইহুদি আন্দোলনে শামিল করা। ব্লুমেনফেল্ডের লেখা থেকে জানা যায় আইনস্টাইন প্রথমে ইহুদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী নিয়ে নানা সন্দেহ প্রকাশ করেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে মানুষ বার বছর বয়স থেকেই যে কোনও প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন তাঁর পক্ষে এক কথায় জিওনিস্ট আন্দোলনের নেতাকে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে 'বালফোর ঘোষণা' অনুসারে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বৃটিশ সরকার অঙ্গীকার করেছে। সুতরাং আন্দোলন কর্মসূচীর একটা বিরাট অঙ্গ ছিল, কত তাড়াতাড়ি ও কিভাবে সেই মাতৃভূমির অধিকার অর্জন করা যায়। আইনস্টাইন প্রথমদিকে প্যালেস্টাইনে আলাদা মাতৃভূমির পরিকল্পনা একেবারেই সমর্থন করেন নি। যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময় তিনি কাটিয়েছেন সুইজারল্যান্ডের [illegible] আবহাওয়ায়। তাই পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজে [illegible] যাওয়া ইহুদিদের [illegible] প্রশ্ন ছিল—ইহুদিরা ইউরোপ ও আমেরিকার যে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সমাজে বাস করে, সেখান থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে অনুন্নত এশিয়ার এক অনগ্রসর পরিবেশে আলাদা রাষ্ট্র স্থাপনে বৃহত্তর ইহুদি সমাজের সত্যই কোন উপকার হবে কি? মরুপ্রধান প্যালেস্টাইনে আকাঙ্ক্ষিত মাতৃভূমিকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলবার জন্যে কর্মপদ্ধতি হিসাবে কৃষি-কার্যকে সবচেয়ে মূল্যবান ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। বুদ্ধিবৃত্তির ওপরে কৃষিকার্যের স্থানকে তিনি পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। ব্লুমেনফেল্ড বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের মত নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে ইহুদি আন্দোলন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলতেন এবং নানা সন্দেহ প্রকাশ করতেন।

তাঁদের এই আলোচনা দিনের পর দিন চলে। বছর গড়িয়ে যায়। তবুও আইনস্টাইনের নানা সন্দেহ দূর হয় না। কিন্তু আজ সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করলে নিশ্চিত হওয়া যায়, আইনস্টাইন এই আন্দোলন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং ব্লুমেনফেল্ডের সঙ্গে কথায় ততটা না প্রকাশ পেলেও ধীরে ধীরে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। বস্তুতঃ ১৯১৯ সালের মার্চ মাসেই তিনি অধ্যাপক এহরেনফেস্টকে লেখেন, "প্যালেস্টাইনে যে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে, এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের কথা।" সে সময়ে পশ্চিম ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠাবান ইহুদিদের ভয় ছিল, আলাদা ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপিত হলে বর্তমান সমাজে তাদের অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে। প্রথমে আইনস্টাইনও বোধহয় এই দলে ছিলেন, কিন্তু ১৯২০ সালেই তিনি তাঁর মত পুরোপুরি পরিবর্তন করেন। তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে ইহুদিদের আত্মসম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে আলাদা রাষ্ট্র একান্তভাবে দরকার। সেই সময়ে তিনি একজন ইহুদি নেতার মত বিরুদ্ধবাদী ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বিবৃতি দেন, "যেদিন আমরা একজাতি হিসাবে প্রকাশিত হবার সাহস দেখাতে পারব, যেদিন নিজেদের আত্মসম্মান সম্পর্কে আমরা সচেতন হব, সেদিনই আমরা অন্যান্য সকলের সম্মান অর্জন করতে পারব।" তাঁর এই মানসিক পরিবর্তনে যেমন কাজ করেছে ব্লুমেনফেল্ডের অক্লান্ত পরিশ্রম, তেমনি সাহায্য করেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীতে ইহুদিদের ক্রমবর্ধমান অসহনীয় অবস্থা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিওনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল বার্লিন থেকে লন্ডন চলে যায়। এর পেছনে অবশ্যই রাজনৈতিক কারণ ছিল। জিওনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম পর্ব থেকেই ইহুদি নেতারা বৃটিশ সরকারের সহানুভূতি পেয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধে যখন ইংলন্ড [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] নামল তখন [illegible] রাজনৈতিক [illegible] ইংলন্ডে স্থানান্তরিত হয়। লন্ডনের বিখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপক ওয়াইজম্যান হন জিওনিস্ট ইউনিয়নের প্রধান। ১৯২১ সালে মার্চ মাসে তিনি ব্লুমেনফেল্ডকে লিখে পাঠান, তিনি ইহুদি আন্দোলনের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যেতে চান এবং সঙ্গে আইনস্টাইনকেও নিয়ে যেতে চান। তিনি আইনস্টাইনকে জানাতে বলেন—জেরুজালেমে এক হিব্রু বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হবে এবং সে উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্যে তাঁকে অধ্যাপক ওয়াইজ-ম্যানের সঙ্গে আমেরিকা যাত্রা করতে হবে। আইনস্টাইনকে একথা জানান হলে তিনি প্রথমে সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তিনি বলেন, "আমি মোটেই সুবক্তা নই, মানুষকে বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই, সেক্ষেত্রে একমাত্র আমার নামটুকুই তোমরা ব্যবহার করতে পার।" শুধু তাঁর নাম দিয়ে ইহুদি আন্দোলনের যে বিরাট কোনও সাহায্য হতে পারে, একথা আইনস্টাইন মানতে কিছুতেই রাজী হলেন না। ব্লুমেন-ফেল্ডের কোনও যুক্তিই আইনস্টাইনের অনড় মনোভাবের পরিবর্তন আনতে পারল না। হতাশ ব্লুমেনফেল্ড প্রায় বিদায় নিতে যাচ্ছিলেন। পরিশেষে অসহায়ভাবে একবার শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি আরেকদিক থেকে আক্রমণ শুরু করলেন। বললেন, "এ বিষয়ে এইভাবে আমাদের তর্কে যেতে ওঠা উচিত বলে আমি মনে করি না। আমাদের উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হবে যখন আমরা এক জাতীয় নিয়মানুবর্তিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারব।.....আমি জানি না, এ অবস্থায় অধ্যাপক ওয়াইজম্যান আপনাকে কি বলতেন কিন্তু এটুকু জানি, সমগ্র ইহুদি সমাজ তাঁর ওপর ইহুদি আন্দোলন পরিচালনা করবার গুরুভার ন্যস্ত করেছে। তিনি ব্যক্তি হিসেবে নন আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে আমাকে বলেছেন আপনাকে আমেরিকা যাবার জন্যে রাজি করাতে। সুতরাং আমি আশা করতে পারি আপনি ডক্টর ওয়াইজম্যানের সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করবেন।"

আইনস্টাইন কয়েক সেকেন্ড ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলেন। তারপর ব্লুমেনফেল্ডকে বিস্মিত করে আর কোনও বাক্য ব্যয় না করে রাজী হয়ে গেলেন। যে মানুষ আজীবন প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করে এসেছেন, তিনি কত সহজে ইহুদি প্রতিষ্ঠানের কাছে নতি স্বীকার করলেন।

১৯২১ সালেই তিনি ও অধ্যাপক ওয়াইজম্যান আমেরিকা যান। আমেরিকা এসে আইনস্টাইন প্রথম বুঝতে পারেন শুধুমাত্র তাঁর নাম মানুষের মধ্যে কিরকম মোহ সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘ দুমাস ধরে তাঁরা ক্রমাগত ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ শেষে তিনি তাঁর আজীবন সুহৃদ মাইকেল বেসো-কে লেখেন, "আমি ইহুদি আন্দোলন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে এতখানি সাহায্য করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।... [illegible] বাঁড়ের পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমাকে অজস্রবার ছোট বা

বড় সমাবেশে কিছু বলতে হয়েছে। অজস্রবার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমাবেশে বকতৃতা দিতে হয়েছে। এটা আমার কাছে আশ্চর্য, আমি এতখানি কিভাবে মানিয়ে নিলাম! কিন্তু এখন সব শেষ, এখন পড়ে আছে...ভাল কিছু করতে পারার সেই সুন্দর অনুভূতি।

আমেরিকা ভ্রমণের পরই আইনস্টাইন ইহুদি আন্দোলনের বিরাট প্রবক্তা হয়ে ওঠেন! এরপর তিনি প্রায়ই ইহুদি আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই আন্দোলনের স্বপক্ষে লিখতে আরম্ভ করেন যে সব প্রতিষ্ঠাবান ইহুদি ইউরোপীয় সমাজে মিশে যেতে চাইতেন এবং ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের বিপক্ষে কাজ করতেন, তাদের বিরুদ্ধে তিনি বারে বারে ভর্ৎসনা বাণী উচ্চারণ করেছেন। ইউরোপীয় তথা জার্মান সমাজে ইহুদিদের প্রতি, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী ইহুদিদের প্রতি যত ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অবহেলা বর্ষিত হয়েছে, ততই তিনি ইহুদি আন্দোলনে গভীরভাবে মেতে উঠেছেন। একমাত্র স্বনির্ভর ইহুদি রাষ্ট্রই যে ইহুদি সমাজের আত্মিক মুক্তি আনতে পারে, এ ব্যাপারে তাঁর আর সামান্যতম সন্দেহ ছিল না।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আইনস্টাইন জাপান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে প্যালেস্টাইন যান। আইনস্টাইনের সে ভ্রমণ প্যালেস্টাইনীয় ইহুদিদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনে দেয়। ১৯২২ সালের ২৪শে জুন লীগ অব নেশনস প্যালেস্টাইনে ইংরাজের কর্তৃত্ব এবং 'বালফোর ঘোষণার বৈধতা স্বীকার করে নেয়। সুতরাং প্যালেস্টাইনে যে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে সে বিষয়ে ইহুদিদের আর সন্দেহ ছিল না। নতুন ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব স্থানীয় ইহুদিদের মধ্যে যে প্রচণ্ড কর্মোদ্দীপনা এনে দিয়েছিল, আইনস্টাইন তা দেখে মোহিত হন। তিনি তাঁর জাপান ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণের সময় এক স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করেন। তিনি খুব সংক্ষিপ্তভাবে একটা ডায়েরী লেখেন। যা আজ আমাদের কাছে অতি মূল্যবান তথ্য। সেই ডায়েরী থেকে জানা যায় ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি জেরুজালেম যান। জেরুজালেমে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যখন তিনি স্কোপাস পর্বতে বক্তৃতার উদ্দেশ্যে যান। এই স্কোপাস পর্বতই প্রস্তাবিত হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হিসাবে চিহ্নিত ছিল। আইনস্টাইনের প্রতি প্যালেস্টাইনীয় ইহুদি সমাজের কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা ও গর্বের সাক্ষর পাওয়া যায় আইনস্টাইনকে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান জানিয়ে যে সামান্য কয়েকটা কথা বলা হয়, তা থেকে। বক্তা বলেন, 'এই সেই পবিত্র ধর্মীয় বক্তৃতামঞ্চ (লেক্টার্ণ), যেখান থেকে আপনার বাণী শোনবার জন্যে ইহুদি সমাজ দু হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করেছে।' জেরুজালেমে তাঁকে বহুবার বক্তৃতা দিতে হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে সম্মানজনক ডকটরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি ডায়েরীতে লিখেছেন— 'বক্তৃতা শেষে হলের সমস্ত দর্শক একযোগে আবেদন জানায়, আপনি জেরুজালেমে বসবাস করুন। তাঁদের এ আবেদনে আমার হৃদয় বলে ওঠে হ্যাঁ, কিন্তু মন কিছুতেই সায় দেয় না।

বিশের শতকে জার্মানীতে ইহুদিদের সামাজিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ত্রিশের দশকে ধীরে ধীরে নাজিদের অভ্যুত্থান ঘটে। নাজিরা প্রকাশ্যভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচার করতে থাকে। বহু ইহুদি নেতাকে গোপন-হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়; আইনস্টাইন সে সময়ে এক প্রথম সারির নেতা। তাঁর নিরাপত্তা অত্যন্ত আশংকাজনক হয়ে ওঠে। ১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে তিনি প্রথমে বেলজিয়ামে আশ্রয় নেন এবং তারপর বসন্তের শেষে আমেরিকা চলে যান। হিটলার যখন জার্মানীর চ্যান্সেলর হলেন, তখন তিনি সুদূর কালিফোর্ণিয়ায়। ঐ বছরের শেষ দিকে তিনি স্থায়ীভাবে আমেরিকার প্রিন্সটনে অবস্থিত সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিসে যোগদান করেন। হিটলার আইনস্টাইনের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং আইনস্টাইনের মাথার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন। আইনস্টাইন আমেরিকায় অক্লান্তভাবে প্রচার করতে থাকেন হিটলারের ভণ্ডামি ও অসাধু উদ্দেশ্যের কথা। হিটলারের অভ্যুত্থান যে শুধু জার্মান ইহুদিদের কাছে আশংকাজনক নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীর নিরাপত্তা যে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন সে সাবধানবাণী তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই উচ্চারণ করেছিলেন। আইনস্টাইন আমেরিকা থাকাকালীন বহু জার্মান ও পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদিকে আমেরিকায় চলে আসতে সাহায্য করেছেন। তাঁর সমস্ত মন জুড়ে তখন কাজ করেছে, ইহুদিদের নিরাপত্তা চিন্তা। সে সময়ে জার্মান ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের অধিকতর নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনবার কাজই জিওনিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান সমস্যা হয়ে ওঠে। আমেরিকায় আইনস্টাইন এই প্রচেষ্টার পুরোভাগে ছিলেন।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন নতুন জার্মানীর উদয় হোল, তখন জার্মানীর বিভিন্ন একাডেমীর সদস্য হবার জন্যে আবার তাঁকে আহ্বান জানান হয়। তিনি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানান, 'জার্মানরা আমার ইহুদি ভাইদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। সেই জার্মানদের সঙ্গে আমি আর কোনও সংস্রব রাখতে চাই না।' আরেকবার তিনি বলেছিলেন, 'জার্মানরা এক ইহুদি গণহত্যার কাজে নেমেছিল, সুতরাং কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ইহুদির পক্ষে আর কোনও রকম সরকারী জার্মান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব নয়।'

১৯৪৮ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। অধ্যাপক ওয়াইজম্যান হন ইজরায়েলের প্রথম প্রেসিডেন্ট। ১৯৫২ সাল তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগিরন আইনস্টাইনকে অনুরোধ জানান পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে। যে মানুষটা আজীবন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়বার সংকল্প নিয়েছিলেন, তিনি নিজেই একদিন এক প্রতিষ্ঠানের নায়কে পরিণত হবেন—এটা আমাদের কাছ অকল্পনীয়। আইনস্টাইনও এ-ধরনের কাজে অনভিজ্ঞতা জানিয়ে বিনীতভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন।

আজকের দিনে যখন ইহুদি-আরব বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সমস্ত মধ্য এশিয়ার পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলেছে, তখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আজ আইনস্টাইন জীবিত থাকলে তিনি ইহুদি-সমাজকে কি বলতেন! বস্তুতঃ বহু আগেই তিনি ইহুদি সমাজকে এ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদি দাঙ্গার পর ইহুদিদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'যদি আরব ও আমাদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী বিবাদের সূত্রপাত হয়, তার চেয়ে দুঃখবহ আর কিছু নেই। যদিও আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে (লেখক—এ ব্যাপারে অনেকের মধ্যে কিছুটা মতভেদ দেখা দিতে পারে), তবুও আমাদের অবশ্যই আরব লোকেদের সঙ্গে এক ন্যায্য ও আপসের চেষ্টা করে যেতে হবে।...আমাদের মনে রাখতে হবে, সেই পুরনো দিনে আজকের আরব মানুষদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে আমাদের বড় বন্ধু আর কেউ ছিল না।'

যে ইহুদি জাতি দু হাজার বছর ধরে এক বাস্তুহারা জীবনের গ্লানি সহ্য করেছে, বর্তমান ইহুদি রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনীয় আরবদের সেই একই গ্লানিকর জীবনের দিকে ঠেলে দিতে চায়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক পরিণতি! জানি না, এখনও আইনস্টাইন জীবিত থাকলে এ পরিণতিকে কি দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতেন।

*এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত বহু উপাদান ১৯৭৪ সালে তেল-আবিবে অনুষ্ঠিত জেনেরাল রিলেটিভিটি ও গ্রাভিটেশন-এর সপ্তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অধ্যাপক ব্যানেস হফম্যানের দেওয়া বক্তৃতা থেকে সংগৃহীত।

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

দীপঙ্কর ওর কথায় টর্চটা জ্বালায়। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক পিছিয়ে আসে। পাঁচজনে হৈ হৈ করে ওঠে, মার শালা।

—সাপ!

দীপঙ্কর ছিটকে যায় দশ হাত। গায়ের ভেতরে কেমন যেন হচ্ছে। বুকটা ছমছম করছে। ভয় ঢুকে গেছে। এক্ষুণি কি যেন হয়ে যেত।

—হাই শালা ই রাজবাটিখানি ষিনো উঁহাদের, গেটের মুখে শুই থাকিবেন, বড় আরাম, গরম পাইছেন হাওয়া খাইতে বাইরিয়াছেন....!

অন্ধকারে সাপটা মিশে গেছে। ওরা ঢুকে যাচ্ছে রাজগৃহের অভ্যন্তরে।

।।দুই।।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। বিস্তীর্ণ এই পশ্চিম সীমান্ত বাঙলা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শাল মহুয়া আকাশমনি, আসন, হরিতকী কত রকম গাছ টান টান আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। এই ঝাড়খণ্ডী অঞ্চল তখন পুরোপুরি মানুষের অগম্য। মানুষের বাস খুব অল্প। শুধু কোথাও কোথাও জঙ্গল সরিয়ে বসতি করেছে দূরে পাহাড়তলী থেকে উৎখাত হওয়া এক একটি সাঁওতাল মুণ্ডা পরিবার। জঙ্গলের ভিতরে কোথাও পাহাড়ি ঝর্ণা ছোটনদী নিঃঝুম বয়ে যাচ্ছে। খুব নিবিষ্ট মনে কান পাতলে স্রোতের শব্দ শোনা যায়। কান পাতার মানুষ নেই। কাছাকাছি দুই দিকে দুই বড় নদী, সুবর্ণরেখা আর কংসাবতী। ছোট একটা নদীও আছে, ডুলং। অনেকটা সুবর্ণরেখার সন্তানের মত। কংসাবতী পুরুলিয়া বাঁকুড়া হয়ে এই অরণ্যাঞ্চল ভেদ করে চলে গেছে পূবের দিকে।

এখানকার ময়ূরভঞ্জ জেলা উড়িষ্যায়। এই ময়ূরভঞ্জ জেলার কোন এক গ্রাম থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছেন তরুণ ব্রাহ্মণ শঙ্করদাস শতপথী। বছর একুশ বয়স হবে। টকটকে গায়ের রঙ, উন্নত দেহ। চওড়া কপাল উজ্জ্বল চক্ষু এই মানুষকে দেখলেই মনে হয় এঁর জীবনে পরিবর্তন নিশ্চিত। এই দারিদ্র ঘুচে যাবে নিশ্চয়। শঙ্করদাসের হাতে শালগ্রাম শিলা, বুকের কাছে দেবতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন দূরে অঞ্চলের দিকে। রাত হয়, আশ্রয় নেন কোন জনপদে, আবার সকাল থেকে পথচলা। নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই, শুধু উদ্দেশ্য আছে ভাগ্য পরিবর্তনের। তখন জঙ্গল হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে পরিপূর্ণ। ঠ্যাঙাড়েবাহিনী ওৎপেতে থাকে। এই গহীন অঞ্চল দিয়ে একা দেবতার বলে বলীয়ান হয়ে মানুষটি যাচ্ছেন এমন কোথাও যেখানে তাঁর দারিদ্র শেষ হয়ে যাবে। এই দারিদ্র নিয়ে বেঁচে থাকা বড় কষ্টের। জঙ্গলে প্রাণ যায়, যাক না।

পথে নদী পড়ে। বিস্তৃত বালিয়াড়ি নিয়ে সুবর্ণরেখা। সোনার কণিকার মত বালি ঝকমক করে. জল স্বচ্ছ আয়নার মত। সুবর্ণরেখায় অবগাহনে হৃদয় সোনার হয়ে যায়। এইভাবে জঙ্গল নদী নালা টিলা ছোট পাহাড় অতিক্রম করে একদিন শঙ্করদাশ এসে উঠলেন ঝাড়গ্রামে। জঙ্গলের ভিতরে মাথা তুলেছে বিশাল রাজগৃহের শীর্ষ। মল্লদেবরা প্রবল বিক্রমে রাজত্ব করে যাচ্ছেন। শালগ্রাম শিলা হাতে শঙ্করদাশ সেখানে আশ্রয় পেলেন।

ক'দিন বাদেই তাঁকে আবার চলে যেতে হবে আরো দূরে অঞ্চলে। ব্রাহ্মণ বিমর্ষ হয়ে থাকেন। ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে না। অথচ শুনেছেন তাঁর জন্মমুহূর্ত গণনা করে পিতামহ বলেছিলেন কপালে রাজটীকা নিয়ে জন্মেছে এই সন্তান।

পিতামহ এখন নেই। তাঁর সেই ভবিষ্যৎ বাণীই তাঁর সম্বল। মায়ের মৃত্যুর পর পিতামহের সেই গণনা সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পৈতৃক বাস্তুভিটে পড়ে রয়েছে সেই কতদূরে। সেখানে হয়ত আর কখনো ফেরা হবে না। এদিকে কোথাও আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছে আছে। জঙ্গল পরিস্কার করে ঘর তুলবেন, কাছেই থাকবে নদী। সেই ঘরে শালগ্রাম শিলা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবেন। হয়ত রাজটীকার অর্থ, দাসত্ব নেই দেবতার কাছে ছাড়া। তিনি শতপথী। একশোটা পথ নির্দেশ আছে বেদে। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকারী।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। আকাশে চাঁদ উঠেছে সোনার থালার মত। বৈশাখের দিন, এই সময় জন্মেছিলেন ভগবান বুদ্ধ। তাঁর কথা অস্পষ্ট ভেসে আসে কানে। নারায়ণের জন্য ভোগ রাঁধতে হবে। কিছুর জোগাড় নেই। চোখ ফেটে জল আসে শঙ্করদাসের। মাঠ থেকে কাঁচ দূর্বা তুলে আনেন। সেই কাঁচ দূর্বা রান্না করে ভোগ নিবেদন করলেন দেবতাকে। দেবতা এতেই সন্তুষ্ট হবেন নিশ্চিত।

ঠিক এই সময় ভিতর মহল থেকে ডাক এল। মহারাজা ডাকছেন। কাঁপতে কাঁপতে শঙ্করদাস ছুটলেন। ভয়ে তাঁর সর্বশরীর নীল হয়ে গেছে। কি জানি মনের অলক্ষ্যে কি অপরাধ করে ফেলেছেন। এই আশ্রয়ও থাকল না। দেবতাকে নিয়ে আবার হাঁটতে হবে নতুন আশ্রয়ের জন্য।

শঙ্করদাসের নিবেদনকরা ভোগের গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজগৃহ চাঞ্চল্য হয়ে উঠেছিল সেই কারণে। শঙ্করদাস বিনম্রচিত্তে গিয়ে দাঁড়ান মহারাজার সামনে।

—এই গন্ধ কিসের, ব্রাহ্মণ।

শঙ্করদাস জবাব দেন। তারপর মহারাজার হাতে তুলে দেন দেবতার প্রসাদ। মহারাজা চমকে যান। অবাক বিস্ময়ে এই ভবঘুরে মানুষটির দিকে চেয়ে থাকেন।

—কিসের থেকে তৈরী হল এই প্রসাদ।

—দূর্বাঘাস, আমার কিছু নেই, আজ বৈশাখের পূর্ণিমা, দেবতাকে কি নিবেদন করব, তাই....। শঙ্করদাস কুণ্ঠিতচিত্তে জবাব দেন।

মহারাজ নিশ্চুপ হয়ে থাকেন। শঙ্করদাস ভীতচিত্তে ফিরে আসেন। পরদিন আবার ডাক এল মহারাজার কাছ থেকে।

মহারাজ ভেবেছেন কাল সারারাত। এমন মানুষকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এমন মানুষ রাজ্যে থাকলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। মানুষের কল্যাণ হয়। শঙ্করদাস এসে দাঁড়ালেন মহারাজের সামনে।

—তুমি কি চলে যাবে ব্রাহ্মণ?

শঙ্করদাস মৌন থাকেন।

—যদি যেতে না দিই।

শঙ্করদাস তাঁর অপরূপ চোখ মেলে দেন মহারাজের চোখের উপর। সেই চোখে কোন ভাষা নেই আজ, নেই আগের দিনের কুণ্ঠিত ভাব।

কাল মহারাজের কাছ থেকে ফেরার পর অনেক ভেবেছেন শংকর দাস। শেষে এই প্রত্যয়ে স্থির হয়েছেন যে, এই রাজগৃহ ত্যাগ করে চলে যাবেন। তার আশ্রয় আছে নারায়ণের কাছে। আর কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। দেবতা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে যাবেন তিনি।

—তোমাকে এই রাজ্য ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না, তুমি থাকলে রাজ্যের কল্যাণ হবে ব্রাহ্মণ। শংকর দাস চমকে ওঠেন। কি শুনছেন ভুল নয়ত।

—তুমি কি চাও? মহারাজা প্রশ্ন করেন।

শংকর দাস মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মহারাজ সন্তুষ্ট হন ব্রাহ্মণের নির্লোভী চরিত্রের পরিচয় পেয়ে। তখনই মনে মনে সব ঠিক করে নেন। তিনি জমি দেবেন শংকর দাসকে। ব্রাহ্মণ এখানে বসতি করুক। কিন্তু কতটা জমি দেবেন? এই জমির পরিমাণ তো তিনি ঠিক করতে পারেন না। ব্রাহ্মণ তার গুণের দ্বারা মুগ্ধ

...ছে তাঁকে। ...জের ভাগ্য নিজেই বুঝে ...নিক সে।

মহারাজ একটি সাদা ঘোড়া দিলেন শংকর দাসকে। বললেন, তোমার মাটি তোমায় অর্জন করতে হবে। এই ঘোড়া নিয়ে এক প্রহরে তুমি যতটা ভূমি অতিক্রম করতে পারবে, সব তোমার। আমি নিষ্কর দান করব।

ঘোড়া নিয়ে শংকর দাস চলে গেলেন কংসাবতীর দিকে। এক প্রহর ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এলেন পরিশ্রান্ত হয়ে। কথায় এতটুকুও ছলনা নেই। গ্রামের নামগুলো সব স্পষ্ট মনে রেখেছেন। মহারাজা সব দান করলেন শংকর দাসকে। ব্রাহ্মণের পিতামহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হল।

মহারাজা বললেন, যাও তোমার রাজ্য রক্ষা কর।

এক প্রহর ঘোড়া ছুটিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ শংকর দাস শতপথী হয়ে উঠলেন শংকর দাস প্রহরাজ শতপথী। কংসাবতীর তীরে এসে ঘর বাঁধলেন, দেবতা সঙ্গে আছেন। আস্তে আস্তে চুনে উল প্রহরাজ বংশের প্রদীপ নদীর তীরে কলাবনিতে মাথা তুলে দাঁড়াল বিশাল রাজগৃহ। নারায়ণের জন্য তৈরী হল মন্দির। চারপাশের গোটা সত্তরটা মৌজা নিয়ে রাজত্ব শুরু করলেন প্রহরাজ বংশের মানুষ।

সন্ধ্যায় বসে নির্মল বাবুর কাছ থেকে দীপংকর শুনছিল এই রাজ বংশের প্রচলিত কিংবদন্তী। রাত অনেক হয়েছে। সব থেমে গেছে। শুধু এই ঘরে দুজন মানুষ কথা-বার্তায় বহু বছর পেছিয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ।

এই ঘরটা বেশ বড়। পুরোন গন্ধ-চিহ্ন ঘরের সর্বত্র। জানালা দরজা সব বন্ধ। রাতের দিকে এই অঞ্চলে এখনো বেশ ঠান্ডা পড়ে। ঘরে শুধু মৃদু একটা ল্যাম্প জ্বলছে। কাঁচটার একাংশ ধোঁয়ার কালো হয়ে গেছে। ঘরের দুধারে দুটো খাট। তার মধ্যে একটা পালংকে। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা বেশ মজবুত। অন্তত তিনজন মানুষ পাশাপাশি শুতে পারে।

—এই খাটে রাজা রাণী শুতেন। নির্মলবাবু বলেন।

দীপংকর হো হো করে হেসে ওঠে। একদিন আপনি সেই পালংকে নিঃসঙ্গ নখ-দন্তহীন রাজা হয়ে শুয়েছিলেন?

নির্মল মজুমদার লোকটি ভাল। একেবারে নেহাতই ভাল মানুষ। বয়স তিরিশের উপর। চাকরী করছেন পেটের দায়ে। মন বসেনি। বিয়ে করেছেন, একটা বাচ্চা। বউয়ের সঙ্গে তেমন বনে না। বউ ছ মাস বাপের বাড়িতেই থাকে, নির্মলের শ্বশুরের অবস্থা ভাল। এখেনে একবার নিয়ে এসেছিলেন বউকে, বউ এক মাস পরেই চলে গিয়েছে। নির্মল আর থাকতে চায় না এখেনে। সমস্যা খুব জটিল, মনে শান্তি নেই। মানসিক অস্থিরতা নিয়ে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। দীপংকর আসায় বেঁচে গেছে। কাল বিকেলেই চলে যাবে, জয়েন করবে নতুন অফিসে মেদিনীপুর শহরে এবার পোস্টিং হয়েছে। বউকে আবার নিয়ে এসে সংসার পাতার চেষ্টা করবে। তার জন্য কলাবনি ছাড়ার দরকার।

—ঘরটার ভাড়া লাগে না? দীপংকর জিজ্ঞেস করে।

—তা আবার লাগবে না, পুরো তিরিশ টাকা, তবে এই খাট চেয়ার— টেবিলগুলো ফ্রী ব্যবহার করতে পারছি।

—এখানে অসুবিধেটা কি? দীপংকর জিজ্ঞেস করে।

নির্মলবাবু কথা বলেন না। একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, এখানকার মায়া কাটান শক্ত, আমি বেঁচে গেলাম, না হলে জীবনটা ছারখার হয়ে যেত মশাই, বিয়ে করেছি, সংসারি মানুষ।

—ব্যাপারটা কি?

—থাকুন বুঝবেন, জমি জমা সব তো দখল করে নিয়েছে চাষীরা, এর উপরে আপনিও কখন কার দখলে চলে যাবেন ঠিক নেই, বিয়ে—করেছেন?

—না, হয়নি।

—এখানে খুব সাপের ভয়, সামনে গরম আসছে—

—হ্যাঁ সেটা তো বুঝেছি মশাই, ঢুকবার মুখেই, ওটাতেই আমার সবচেয়ে ভয় তো বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

—এমনি। নির্মলবাবু সিগারেট ধরান।

দীপংকর চশমাটা খুলে মুছে আবার চোখে পরে নেয়। তারপর চোখটা বন্ধ করে চশমাটা খুলে আবার হাতে নেয়। সব অন্ধকার ওর চোখের ভিতরে ঢুকে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। মাঝে-মধ্যে কাশির শব্দ উড়ে আসছে। দ্রুতপদে কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে। এই ঘরটায় একদিন ঝাড়লণ্ঠন জ্বলত, এখন নেই। তাই থমথমে অন্ধকার। পিছনে ছিল রাজার অশ্বশালা। রাতের ঘোড়ার খুরের শব্দ, চিঁহি চিঁহি ডাক শোনা যেত সারাক্ষণ। ঘোড়াগুলো শক্ত মেঝেতে পা ঠুকত। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। প্রহরাজ বংশের রাজপুরুষ শুয়ে শুয়ে এসব শুনতেন। পালংকটার একাংশে উই ধরেছে, নির্মলবাবু উচ্চ জানালায় দেখিয়েছেন। পালংকের গায়ে সেট করা আয়নাগুলো ভেঙে গেছে। ঝুল জমে গে বিস্তর। বিবাহিত নির্মল মজুমদার বিপত্নীকের মত এই ঘরে এক বছর কাটিয়েছেন। সব এলোমেলো হয়ে আছে। ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক করে রাখলে তবুও রাজার ঘর বলে মনে হয়। এখন কেমন স্টক শেষ হওয়া পুরনো আসবাবের দোকান মনে হচ্ছে।

দীপংকর চোখ খোলে। নির্মলবাবু একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করে যাচ্ছেন। দীপংকরের কলকাতার কথা মনে হয়। কটা বাজে এখন? নটার মত? অথচ কত রাত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। সন্ধ্যের পর এই অঞ্চলে সকলে ঘুমিয়ে পড়ে যাদের ঘুমনোর। যারা ঘুমোয় না তারা তাদের মত থাকে যেমন রাজ বংশের শেষ পুরুষ। নির্মলবাবু বললেন।

—রাজা বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ ছাপ্পান্ন সালে সব চলে যাওয়ার পর এখন সামান্য আছে সেই তুলনায় সেই সব আগলাতে তিনি বেঁচে আছেন।

—সেই নারায়ণশীলা এখনো আছে?

—হ্যাঁ রাজ বাড়িতে ঢুকতেই ডানদিকে মন্দির। কাল সকালে দেখবেন।

—রাজ পরিবারে আর কে কে আছে?

—কেউ নেই বললেই হয়, রাণী মারা গেছেন, রাজা আছেন আর রাজকন্যা।

তা খারাপ কি? রাজ্য রাজকন্যে রাজগৃহ অনেকই তো আছে। দীপংকর হাসে।

—হ্যাঁ তা বলতে পারেন, শুধু হাতিশালে হাতি নেই ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, তোরণে বর্শাধারী প্রহরী নেই, সন্ধ্যায় ঘুঙুরের শব্দ নেই, কত কিছুই নেই। নির্মলবাবু খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন।

ঘরে বিষণ্ণতা গাঢ় হয়ে আসে।

—আর শুনবেন? নির্মলবাবু গম্ভীরে প্রশ্ন করেছেন।

দীপংকর সিগারেটে আগুন নিতে গিয়ে নির্মলবাবুর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে। আগুন নিভে যায়। ঘরের একাংশের অন্ধকার চমকে গিয়ে আবার স্থির।

—কি বলছেন ? দীপংকরের কণ্ঠস্বর চাপা।

—রাজার লেপ্রোসি

—কি বলছেন আপনি ?

নির্মলবাবু এখন নিশ্চুপ অন্ধকারে চোখ মেলে বসে আছেন। দীপংকরের বুকের ভিতরটায় গুরু-গুরু শব্দ ওঠে।

—রাজা অন্নদাশংকরের কুষ্ঠ তাই বাইরে বেরোন না। কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন না। আমার ধারণা কেমন জড়-বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছেন তিনি। অনেক দূর থেকে কথা বলেন। কাছে আসেন না। মেয়ে ছাড়া কাছে কেউ যায় না।

—আপনি কথা বলেছেন ?

—হ্যাঁ দূরে থেকে, মতুন মানুষ এই রাজগৃহে আসলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, সেটাই নিয়ম।

ওরা দুজন নিশ্চুপ বসে থাকে অনেক-ক্ষণ। দীপংকরের কৌতূহল তীব্র হচ্ছিল। কিন্তু নির্মলবাবু কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছেন।

—রাজকন্যার বয়স কত ? দীপংকর আর কৌতূহল চাপতে পারে না।

—বছর একুশ হবে। নির্মলবাবুর গলাটা কেঁপে যায়।

—আপনি কথা বলেছেন ?

——কোন জবাব হয় না। দীপংকর চুপ করে যায়।

কিন্তু দুজনে চুপচাপ বসে থাকা যায় না। তাছাড়া একজন এখান থেকে চলে যাচ্ছে অন্যজন এখানে আসছে। অন্য জনের জানার অনেক কিছু থাকতে পারে।

দীপঙ্কর চুপ করে বসে থাকতে পারে না বেশীক্ষণ।

—আচ্ছা। এখানকার উত্তেজনাটা কিসের ?

—এক শ্রেণীর মানুষ সব জমিজমা দখল করে নিয়েছে।

—সে তো আমি জানি, কিন্তু ব্যাপারটা কি ? রাজ পরিবারের জমি দখল হয়ে গেছে ?

—না, রাজ পরিবারের জমিতে হাত পড়ে নি, অথচ এখনো জমি কম নয়। ছোট বড় সব চাষীর জমির সেভেন্টি পার্সেন্ট দখল নিয়ে নিয়েছে ওর্গানাইজড ম্যাস।

পোলিটিক্যাল পার্টি আছে ?

—নামকে ওয়াস্তে, *তাদের কথা কেউ শুনছেন না, আর যে লোকটা সমস্ত ব্যাপারটা লিড করছে তাকে কোন রকমেই পোলিটিকাল ম্যান বলা যায় না, একটা বাজে লোক, বদমায়েশ।*

—একটা খারাপ মানুষ এতগুলো লোককে মোবিলাইজড করেছে, কারণটা কি ? দীপংকর জিজ্ঞেস করে।

—সেটা কিছু কিছু বার করেছি—আপনাকে বলে যাব, ইন্টারেস্টিং। এই যে রাজ পরিবারের এখনো অনেক জমি রয়েছে সেখানে কোন হাত পড়ছে না, রাজ পরিবারের অবস্থা পড়ে যাওয়ায় কমন পিপল তেমন খুসী নয়।

—হ্যাঁ এটা হয়, দীর্ঘদিন একজনের দাসত্ব বরণ করার পর মানুষের ভিতরে ভয় থেকে এক ধরনের শ্রদ্ধা বোধ তৈরী হয়ে যায় তবে সেই শ্রদ্ধাটা অবশ্যই ঠুনকো। মূল ব্যাপার হল ভয়। এখানকার রাজ-পরিবারের কাছে দীর্ঘদিন দাসত্ব করার পর মানুষের মনে রাজ-পরিবার সম্পর্কে একটা অসীম বিশ্বাস তৈরী হয়ে গিয়ে-ছিল। রাজপরিবারের পতন নেই। কিন্তু তিনিও যে সাধারণের মত, তাঁরও যে দুরা-রোগ্য অসুখ হতে পারে এটা ছিল অকল্প-নীয়। তাই হয়ত মানুষ এখন কষ্ট পায়, করুণা করে রাজবংশকে। সমস্ত দাসত্বের কাহিনী বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে।

দীপংকর থামে, দেখে নির্মলবাবু কেমন গুম হয়ে বসে আছেন। ঘরের পাশ দিয়ে দ্রুতপায় কে যেন হেঁটে যায়। নির্মলবাবু চট করে উঠে যান, একটু উত্তেজিত মনে হয়। দরজাটা খুলে বাইরে টর্চ মারেন। দীপঙ্কর উঠে নির্মলবাবুর পিছনে দাঁড়ায়। সব কেমন রহস্যময় লাগছে। দূরে আবছা একটা মানুষের মত ছায়া ঘুরে যায়। স্পষ্ট দেখা যায় না। নির্মলবাবুর মুখ চোখ বিপন্ন হয়ে গেছে।

—কে ? দীপঙ্কর ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে।

—কোন জবাব নেই।

—কথা শুনছিল ?

—না। নির্মলবাবু গা-হাত-পা কঠিন করে দাঁড়িয়ে আছেন।

—তবে এসেছিল কেন ?

—জানি না, আপনি থাকুন জেনে যাবেন। নির্মলবাবু কেঁপে যাচ্ছেন।

নির্মলবাবু ইজি চেয়ারটায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মুখ দিয়ে কি যেন বিড় বিড় করছেন। দীপঙ্কর এগিয়ে যায়।

—আপনার কি হয়েছে ?

কোন উত্তর নেই। একটু পরে নির্মল-বাবুই কথা বলেন।

—আপনি সাবধানে থাকবেন, কারোর সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন না, আমার ফ্যামিলি লাইফটা শেষ হয়ে গেল।

—কি হয়েছে আপনার ?

—নাই বা জানলেন, আমি তো চলে যাচ্ছি।

ঘরে অখণ্ড নীরবতা। বাইরে ঝিঁঝির *শব্দ প্রখর হয়ে উঠেছে। দুজনে এখন সত্যিই নিশ্চুপ। এই মুহূর্তে বাইরে কে সরে গেল। নির্মলবাবু জানেন, বলছেন না। কোথায় এসে পড়ল দীপঙ্কর।* তার মাথার ভিতরে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নির্মল-বাবু তো চলে যাচ্ছেন। সে একা। বড় নিঃসঙ্গ লাগছে এই মুহূর্তে। সমস্ত শরীরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। পাথর হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। বহুক্ষণ পরে দীপঙ্কর স্তব্ধতা ভাঙে।

—রাজকন্যার নাম কি ?

—লাবণ্যময়ী।

কতদূর থেকে যেন জবাব … কাঁপতে কাঁপতে লাবণ্যময়ী ভেসে … দীপঙ্করের কানে। সে চোখ বন্ধ করে…

খুব ভোরে নির্মলবাবুর ডাকে … ভাঙে ভোরের দিকে কেমন মিহিন … জড়িয়ে যায়, তখন দীপঙ্করের ঘুমট… হয়। সে উঠতে চাইছে না। আড়মোড়া … কাত হয়ে শোয়, গায়ে চাদরটা টেনে … কাল অনেক রাত দুজনেই চুপচাপ … ছিল। প্রথম দিন ঠিক নয়, প্রথম … অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় দীপঙ্কর ভার হ… ঘুম আসেনি তাই। ঘরটা পোড়া সি… আর দেশলাই কাঠিতে ভর্তি হয়ে … এখন ভোরের ঘুমটা খুব আরামের। …ঙ্কর কিছুতেই উঠবে না। নির্মলবাবু … ছাড়ে না, শেষে বিরক্তির মুখ নিয়ে দী… উঠে বসে।

—কি হল ট্রেন ধরাবেন নাকি ?

—উঠুন, প্রয়োজন আছে, চলুন … আসি।

—এই সক্কালে কাঁচা ঘুম ভাং… ঘুরতে যাওয়ার জন্য ? দীপঙ্করের ক… বেশ ঝাঁঝ। সে চোখ মুছতে থাকে দু…

নির্মলবাবুর চোখ-মুখে বেশ উ… কি হল আবার। একেবারে বেরোন… তৈরী হয়ে নিয়েছে ভদ্রলোক। দী… পাজামার উপর একটা পাঞ্জাবী … নিল। শীত শীত করছে।

—চলুন বেরোই, চোখমুখে জল … নিন। নির্মলবাবু দীপঙ্করের পি… রাখেন।

—চা খেলে হত। দীপঙ্কর … বলে।

—এসে খাব, … থেকে দি… ঘরে।

—এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন ? …ঙ্কর স্পষ্টত বিরক্ত।

নির্মলবাবু দরজার বাইরে চলে … দীপঙ্কর চোখমুখে জল লাগায়, নিম… জলভর্তি মগ টেবিলে রেখেছেন কখ… চুলটা চিরুনি বুলিয়ে সে বেরিয়ে… ক-দিন শেভ করা হয়নি, গালে খোঁচা… দাড়ি জমে গেছে।

আলো ফুটে সব পরিষ্কার হয়ে… এটা রাজবাড়ির ভিতর মহল। লম্বা… সারি। এই অংশটা একতলা। অন… গুলোয় চাবি দেওয়া। বাঁদিকে দোতল… অন্দরমহল। জানালাগুলো বন্ধ। ওরা… *দিয়ে একটু এগিয়ে সামনে ছোট চাত… একটা জায়গা পেল। কাল যখন … ঢোকে দীপঙ্কর তখন সব অন্ধকারে… ছিল। অন্ধের মত একজনের পিছনে …* হেঁটে নির্মলবাবু ঘরে পৌঁছেছিল। … সব উৎসাহ ভয়ে দেখছে।

চাতালটা আড়াআড়ি অতিক্রম করে… সরু একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

দিকে ঘরের সারি। দোতলার ব্যালকনিতে কেউ নেই। মাঝখানে ছোট লন। লনের সামনাসামনি ওপরে চোখের, সোজাসুজি সারিবন্ধ ঘর। ওখানে আগের আমলে কাছারি বসত। এখন সব বন্ধ আছে। কোনের দিকে তিনটে ঘরে জমিজমার অফিস বসছে। ডানদিকে মন্দির। মন্দিরে প্রবেশের মূল দরজাটা এখন বন্ধ।

এই সময় সব নিঃঝুম। কেউ ওঠেনি। তবে সদর দেউড়িটা খোলা। রাতে বন্ধ হয়ে যায়। তার অর্থ ভোরবেলায় কেউ নিশ্চয়ই দেউড়ি পেরিয়ে বাইরে গেছে। ভোরের স্বল্প আলোয় সব অবাক লাগছিল।

কি রকম রাজপুরি। ঠিক যেন সেই দৈত্যের কান্ড। সকলকে জলছুঁইয়ে পাথর করে রেখেছে। এসব দেউড়ি দালান ইটকাঠ গাছপালা সব এক-একটা মানুষ। রাজগৃহের মানুষ। সব নিথর। গাছের পাতা নড়ে না। দুঃখ-বিস্ময়ে নতুন মানুষ দেখছে। কবে যেন এক ভয়ংকর দৈত্য এসে জড়-পদার্থে পরিণত করেছে ওদের, তারপর কতদিন কেটে গেছে। কার যেন আসার কথা আছে। এসে দৈত্যের প্রাণ-সংহার করে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে সকলের দেহে প্রাণ সঞ্চার করবে। সেই মানুষ এসেছে কি? যদি এসে থাকে [illegible] আমাদের মনুষ্যজীবন ফিরিয়ে দাও [illegible] পাথর হয়ে কথা না বলে থাকতে [illegible] না।

দীপঙ্করের বুকটা ছমছম করছিল। বুকের ভিতরটা ভারি লাগছে। আস্তে আস্তে দুজনে বেরিয়ে আসে। নির্মলবাবু জোরে হাঁটছেন।

রাজবাড়ির চত্বরটা পেরিয়ে সেই বাজারের মত জায়গাটায় এসে দাঁড়াল দুজনে। দীপঙ্কর সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলেন দেশলাই আনেননি। নির্মলবাবুর কাছে চাইলেন। ওঁর কাছেও নেই।

বাজারটা থমথম করছে। কয়েকটা কুকুর কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। দোকানগুলোর ঝাঁপ এখনো খোলেনি। বড়-বড় গাছগুলোয় হাজার পাখি কিচির-মিচির শব্দ করছে ঠিক গ্রামাঞ্চলে যেমন হয় তেমনি। কোন পার্থক্য নেই।

—এটা রাসমঞ্চ। নির্মলবাবু আঙুল দেখিয়ে [illegible] একটা বাঁধান চত্বর দেখায়। একটা মঞ্চের মত রয়েছে। এখানে [illegible] যাত্রা-থিয়েটার হত দীপঙ্কর অনুমান করল।

বাজার পেরিয়ে ওরা [illegible] গেল। পায়ে [illegible] কংক্রিটের [illegible]। দুপাশে ধান কাটা ন্যাড়ামাঠ। [illegible] করছে। নির্মলবাবু হঠাৎ রাস্তা থেকে ধান-কাটা মাঠে নেমে যান। দীপঙ্কর অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কি হল মাঠে নামলেন কেন? চলুন নদীর দিকে যাই ভোরবেলায় [illegible] নদীর তীর।

নির্মলবাবু কোন কথার জবাব দেন না। নিচু হয়ে কাটা ধানের গোড়া দেখাচ্ছেন।

—দেখছেন মশাই।

—দেখার কি হয়েছে? আপনি কি পাগল হলেন?

—আমি হব না এখানকার মানুষ হবে, ধানগুলো কিভাবে কাটা হয়েছিল দেখছেন।

দীপঙ্কর ঠিক বুঝতে পারছে না। ভোরবেলা ঘুম থেকে টেনে তুলে এ কি ধরনের রসিকতা। বিরক্তি লাগছে ভদ্রলোকের উপর।

—দেখুন এই গোড়াটা কতটা উঁচু, এইটা একেবারে মাটির সংগে মিশানো।

—তাতে কি হল?

—ইচ্ছেমত জোর করে সব ধান কেটে নেওয়া হয়েছে, নাহলে এইভাবে কি ধান কাটা হয়? নির্মলবাবু হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধানকাটা মাঠ দেখাচ্ছেন।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার! কাটা ধানের গোড়া কখনো উঁচু কখনো নিচু, মনে হচ্ছে আক্রোশে উত্তেজনায় কাস্তে চালান হয়েছে পাকাধানের উপর।

নির্মলবাবু মাঠ থেকে উঠে আসেন। দীপঙ্করের পিঠে হাত রাখেন।

—এই হল কলাবনির অবস্থা, সমস্ত ধানকাটা মাঠগুলো আপনি এইরকম দেখবেন, ভিতরে ভিতরে বেশ টেনশন চলছে। আপনাকে মশাই সব বলে যাব। চলুন আরো দেখানোর ব্যাপার আছে।

ওরা হাঁটছে নদীর দিকে। দীপঙ্কর দেখে ডানদিকের মাঠ পেরিয়ে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মাথায় একটা চুড়ো দেখা যাচ্ছে। মন্দির বোধহয়।

দীপঙ্করের চোখে চোখ রেখে নির্মলবাবু বলেন, ওটা শিমুলেশ্বর শিবের মন্দির, এতক্ষণে পুজো হয়ে গেছে নিশ্চিত।

—কিসের পুজো?

—শিবের।

—এত ভোরে কে যায়। দীপঙ্করের কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

—আমার সংগে চলুন। সব জানিয়ে দেব।

ওরা দুজন কংসাবতীর দিকে জোরে পা বাড়িয়েছে। নির্মলবাবু কিছু জানাচ্ছে না। এত ভোরে তুলে আনল, ব্যাপারটা কি?

(চলবে)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বড়মা বহুদর্শী মানুষ, অনেক রকম লোক দেখেছেন, এখনও নিত্য দেখছেন। স্থিরভাবে সব শোনার পর বললেন, তা তুমি এখন কি চাও বাবা? তোমার তো এখন আর বিয়ে করার উপায় নেই, সেও রক্ষিতা থাকতে রাজি হবে না—তাহলে এখন কি করতে বলো, কি করা উচিত বলে মনে হয়?

মহেশ বললেন, না না, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, হয়ত একটা মোহ দেখা দিয়েছে মনে—তবে তার বেশী নয়। এটা কেটে যেতে হয়ত খুব সময় লাগবে না। মেয়েটা কোন ভাল পাত্রে পড়ুক, বিয়ে-থা করে এই অভাব আর লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতি পাক—এই আমি চাই। অথচ কি যে করব তাও তো বুঝতে পারছি না। ওরা আমার কাছ থেকে আর কোন সাহায্য নেবে না, জোর করে কিছু করতে গেলেও ওদের অনিষ্টই করব হয়ত। আমি আপনার কাছেই পরামর্শ চাইছি।....আপনি আপনার নাম করে যদি কিছু সাহায্য করেন? বা এখান থেকে বিয়ের চেষ্টা করেন? আমি যদি কিছু দিন ওদের সংস্পর্শে না থাকি তাহলে তো আর এ সব বদনাম দিতে পারবে না কেউ!

বদনাম কি দিচ্ছে সত্যি সত্যিই নিজেদের বংশের কি পাড়ার একটা সৎ ব্রাহ্মণের ইজ্জৎ বাঁচাতে? মেয়েটার হাতে বিয়ে না হয়, শেষ পর্যন্ত ওদের হাতে ধর্ম লজ্জা সব বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়—তাই চাইছে। বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলে ওখান থেকে সরিয়ে আনতে হবে। দেখি কি করতে পারি। তুমি কিছু টাকা দিয়ে যাও, তারপর দেখছি আমি।

বড়মা পরের দিনই দুই জায়ে মিলে একটা গাড়ি ভাড়া করে খুঁজে খুঁজে গিয়ে উপস্থিত হলেন কালীতারাদের বাড়ি।

প্রথমটা দুটি ধোপদুরস্ত কাপড় পরা বিধবাকে এইভাবে অভিযান করে আসতে দেখে একটু সন্দিগ্ধ—শুধু সন্দিগ্ধ কেন ভীতই হয়ে উঠেছিলেন কালীতারা। সেটা বুঝেই বড়মা কোন ভনিতা করলেন না, সোজাসুজি সত্যি কথাতেই এলেন। মহেশ সব কথাই তাঁদের কাছে খুলে বলেছেন। তাঁর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কোন উপকার করা সম্ভব নয়, করতে যাওয়া বরং এঁদের পক্ষে বিপজ্জনক — তা মহেশ ভালভাবেই বুঝে-ছেন। এখন ভবানীর বিয়ে কিভাবে দেওয়া যায় যাতে কালীতারা দায়মুক্ত হতে পারেন—সেই পরামর্শের জন্যেই তাঁদের কাছে এসে-ছেন। তাঁরা মহেশের গুরুবংশের বৌ, বড়মার স্বামীই মহেশের বাবার গুরু ছিলেন, সে হিসেবে মহেশ তাঁর ছেলের মত। এখন বংশে পুরুষ বলতে কেউ নেই। খুব ধরাধরি করলে বড়মাই দীক্ষা দেন। ঘরে বিগ্রহ আছে, নিত্য সেবা হয়। একজন পুরোহিত এসে পূজো করে যান। অন্নভোগ হয় ঠাকুরের। শ্বশুরের আমলের পূজোর্চনা, পাল-পার্বণ ওঁরা এখনও বজায় রেখেছেন। এ পুরোহিতটি ভাল, তেমন বুঝলে দেবতা আর দেবোত্তর সম্পত্তি [illegible] দিয়ে যাবেন ওঁরা।

এত কথার পরও কালীতারার সংশয় ঘোচে নি। এঁদের এসব কথার উদ্দেশ্য খোঁজারই চেষ্টা করছেন মনে মনে। এখন প্রশ্ন করলেন, তা আমায় কি করতে বলেন?

বড়মা বললেন, যা শুনেছি এখানে বসে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না। আপনি অন্য ভাল ভদ্র পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যান। একানে বাড়ি টাকা পনেরো হেসে-খেলে ভাড়া উঠবে। নতুন পাড়ায় গিয়ে নতুন করে ঘটকী লাগান, ভাল পাত্রই খুঁজুন, যা খরচা হয় মহেশ সব দেবে। আপনি তার জন্যে কুণ্ঠিত হবেন না, ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার ব্রাহ্মণের ধর্ম, পুণ্যের কাজ। তেমন বোঝেন, সব কাজ সুচ্ছেরেখলায় মিটে যায়—এই বাড়িটা তাকে লিখে দেবেন। ভাল জামাই হয় সেও দেনা শোধ করে এ বাড়ি উধরে নিতে পারবে।

কিন্তু কোথায় কে বাড়ি খুঁজবে, কে দেখা-শুনো করবে সেখানে, নতুন পাড়ায় যাব—আরও বেশী বিপদে পড়ব না তো? এ তব, এতকালের জানাশুনো—

বাড়ি আমরা খুঁজে দিতে পারব। ঠিকানা দেব—আপনি বরং একদিন মেয়েকে চাবি দিয়ে রেখে কোন বিশ্বাসী মেয়েছেলে—কি আপনাদের কে পুরনো গয়লা আছে চেনা-শুনো—একজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নিজে দেখে আসুন, পাড়া বাড়ি বাড়িওলা সব। একটা সন্ধান এখনই লিখে দিয়ে যাচ্ছি—আমাদের ওখানে গিয়েও থাকতে পারতেন, ঘর তো পড়েই আছে দুখানা, তবে সে নিত্য বিস্তর লোকের আনাগোনা, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে না থাকাই ভাল—আমাদের পূজুরী বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করে, ভাল বামুন ওরা, তার নিজের বাড়িতেই একটা বড় ঘর খালি আছে। আমি বললে এখনই ভাড়া দেবে, কে কোত্থেকে বদ লোক আসবে, এই ভয়ে দেয় না। তারাই দেখা শুনোও করতে পারবে। আমরা কাছেই থাকি, আমরাও খোঁজ-খবর করব। নামকরা গুরু বংশ আমাদের, এক ডাকে এখনও হাজার লোক জড়ো হবে, কেউ কোন ট্যাঁ-ফোঁ করতে সাহস করবে না। ব্রাহ্মণ-প্রধান পাড়া, একটা পাত্র পাওয়াও খুব শক্ত হবে না। আমি লোক পাঠাতে পারি তবে সে আপনার সন্দেহ হবে। আপনিই কাউকে নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে যাবেন বরং—

বড়মা একটা কাগজে ওঁদের পুরোহিতের ঠিকানা লিখে পাঁচিশটা টাকা জোর করে হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন। কালীতারাও আর বাধা দিতে পারলেন না। সত্যি সত্যিই দুদিন চিঁড়ে খেয়ে কেটেছে, কাল তাও জুটত না।

যে অপমান তিনি সেদিন করেছেন তার পরও সেকথা ভুলে গিয়ে লোকটা তাঁদেরই কল্যাণ চিন্তা করছে—এ দেবতা ছাড়া কি?

মেয়েটাকে চোখে লেগেওছে।

এই পাত্তর হাতে যদি ওকে তুলে দিতে পারতেন।

ঘর পাড়া দেখলেন, পছন্দও হল। মানুষগুলিও মোটামুটি মন্দ লাগল না। ভাড়া কত প্রশ্ন করতে বড়মা বললেন [illegible] মহেশ ওর সঙ্গে কথা বলেছে—যা করবার সেই করবে। আপনি মাথা ঘামাবেন না।

সব ঠিক হল একরকম—তবু [illegible] আসতে মন চায়। যতই হোক নিজের বাড়ি। এই বাড়িতেই এতকাল কাটল। চারিদিকে জ্ঞাতি আত্মীয় পরিচিত লোক সব। তাছাড়া—এভাবে চলে গেলে আরও কত কি দুর্নাম উঠবে তার ঠিক কি।

আবার মনে হয় এখানে থেকেই বা কি করবেন। এপাড়া আত্মীয়রা যেন তাঁদের সর্বনাশ করতেই বদ্ধপরিকর। এখানে বেশী দিন থাকলে হয় আত্মহত্যা নয় মেয়েটাকে নরককুণ্ডে ঠেলে দেওয়া এছাড়া কোন পথ থাকবে না।

অগত্যাই দিন স্থির করতে হয়। বড়মা পাকা লোক, তিনি সৎ পরামর্শ দেন,

দুটো একটা জিনিস আগে পাচার করো, তারপর তোমরা দুজনে চলে এসো। কোথায় যাচ্ছ কি বিত্তান্ত কাউকে বলবার দরকার নেই। আমার এক উকীল শিষ্য আছে বাগবাজারে থাকে খুব দুঁদে লোক, বাকী মাল আনা, বাড়ি বিক্রী করা সেসব করবে। তোমার কোন জিনিস ক্ষতি হবে না তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

ক্ষী আর আছে দিদি, ক্ষতি হবার মতো। সবই তো বেচে খেয়েছি। থাকার মধ্যে একটা ভাঙ্গা তক্তপোশ, আর ছেঁড়া বিছানা। দু-একখানা পাথরের বাসন—বিক্রী হয় না তাই পড়ে আছে। এই তো আর কি। পুরনো সেলেশন কটা—সে গেলেই বা কি থাকলেই বা কি।

তবু বলতে বলতেই চোখে জল এসে যায় কালীতারার।

নতুন পাড়ায় নতুন অনভ্যস্ত পরিবেশে এসেই হয়ত, এতকালের জীবন-যাত্রার মূল সুদ্ধ উপড়ে চলে আসার জন্যেই—অথবা দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা অর্ধাশনে, অনশনে আত্মীয়দের অদর্শ শত্রুতায় শরীর আগে থেকেই ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে আসছিল, এখন এইভাবে একেবারে পরভৃৎ হয়ে পড়ার অসম্মানে কালীতারার শরীর দ্রুত ভেঙ্গে আসতে লাগল।

আর সেটা কালীতারা নিজে যতটা না বুঝেছিলেন বড়মা বুঝেছিলেন অনেক বেশী। ভেতরে ভেতরে ঘুণধরা দেহ, যেদিন ভেঙ্গে পড়বে একেবারেই গুঁড়ো হয়ে যাবে। পশ্চিমের দিকে এক-একটা বিরাট শালগাছে জ্যান্ত অবস্থাতেই উই ধরে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, শেষ পর্যন্ত দু-চারটে নতুন পাতা লেগে থাকে—যেদিন ভেঙ্গে পড়ে সেদিন দেখা যায় গুঁড়ো মাটি কতকগুলো কিছুই ছিল না ভেতরে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘটক লাগান সম্বন্ধও আসে পছন্দ হলেই পরি-চয়ের প্রশ্ন ওঠে বাপের দিকে কে আছে মামার বাড়ি কোথায়—এতো প্রথম কথা। বিশেষ পাত্রপক্ষ এতবড় সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে বিনা ভাল রকম খোঁজ-খবরে নেবেন তাও সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের আত্মীয়-তার সূত্র কলমীর ফলের মতো বহুদূরে বিস্তৃত অথচ ঘনসম্বন্ধ, পরিচয় পেলে আত্মীয়দের খোঁজ পেতে আর কতক্ষণ লাগে।

সেই, কারণেই মেয়ে দেখে বিস্তর উৎসাহ দেখিয়ে যান, যাঁরা কত তাড়াতাড়ি এঁরা বিয়ে দিতে পারবেন জানতে চান তাঁরাও আর কোন খবর দেন না, একেবারে নীরব হয়ে যান। অন্যথা পাছে কি ঘটকী এসে মুখ দেখায় কখন বলে ফেলেছে মাতো যেন্তর বদনাম বড়াদিদিমা এর সম্বন্ধ করা যাবে না।'

একথা যেমন রেখে ঢেকে বলুন, কালীতারার বুঝতে বাকী থাকে না অবস্থাটা। তিনি এইবার একেবারেই শয্যা-গ্রহণ করেন। জ্বরজাড়ি কি অন্য কোন ভারী অসুখও নয়—শুধুই দুর্বলতা আর আহারে অরুচি। কিছু খান না বা খেতে চান না, অথচ উঠলেই মাথা ঘোরে জপে আহ্নিকে বসতেও কষ্ট হয়। এইবার তিনি নিজেও বোঝেন যে আর বেশী দিন নয়, মুক্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

বড়মা বিপদ বুঝে মহেশকেই খবর দেন শেষ পর্যন্ত।

মহেশ এসে বিছানার পাশে মেঝেতেই বসে পড়লেন, আস্তে আস্তে বললেন, 'মা, আমাকে ডেকেছিলেন?

কালীতারা সেদিন সকাল থেকেই নিঃশব্দে কাঁদছেন, ওঁকে দেখে সে জলের ধারা বেড়েই গেল। অনেকক্ষণ অবধি কোন কথা বলতে পারলেন না, শেষে কোনমতে উচ্চারণ করলেন,' বাবা, আমার মেয়েটা—?'

অবস্থা দেখে মহেশ আর বৃথা সঙ্কোচ রাখলেন না। ওঁর মেয়েকে তিনি সাদরে সাগ্রহে নিতে রাজী আছেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করে। কিন্তু তার শ্বশুরের সঙ্গে যা বন্দোবস্ত প্রকাশ্যে এখন অন্য বিয়ে করা চলবে না। পুরোহিত ডেকে শাস্ত্র মতেই বিয়ে করবেন তিনি, তবে যেটুকু ঐ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, নারায়ণ আর অগ্নি স্বাক্ষী রেখে, কুসণ্ডিকাণ্ড করানো—তার বেশি কিছু নয়। কাউকে এখন জানানো চলবে না। বিবাহের অন্য যেসব লোকাচার স্ত্রীআচার সে সবও বাদ দিতে হবে। উনি স্ত্রী বলেই গ্রহণ করবেন, সেইভাবেই রাখবেন, কালে আত্মীয় স্বজনের কাছে স্বীকৃতি দিতেও পারবেন। তবে এখন একটা বিরাট ব্যবসায় হাত দিতে যাচ্ছেন, তাতে শ্বশুরের কাছ থেকে অনেক টাকা নিতে হবে—এখন তাঁকে বিরূপ করা চলবে না। পরে এ কাজ সফল হলে, হবে তা তিনি জোর করেই বলতে পারেন—শ্বশুরের টাকা মিটিয়ে দেবার পর তিনি এটা প্রকাশ করবেন অবশ্যই। আর ইতিমধ্যে এই স্ত্রীর নামে তিনি কিছু কিছু বিষয় আশয় করতে থাকবেন—তাতে কারও কোন হাত থাকবে না। চাই কি এর নামে কিছু কিছু ছোটখাটো ব্যবসাও করবেন যাতে তার সাথে ওঁর প্রথম পক্ষের কোন দাবী না থাকে। তবে আপাতত শ্বশুরের কাছে কথাটা গোপন রাখতেই হবে।

কালীতারার কান্নার বেগ আরও বাড়ল। এই জন্যেই কি তিনি এতকাল এত দুঃখ করে এলেন! তবু বললেন, 'তাই যা হয় করো বাবা, আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার দিন একেবারেই ফুরিয়ে এসেছে, কোনমতে ওর সিঁথের সিঁদুরটা দেখব বলেই কোনমতে যেন প্রাণটা ধরে রেখেছি।' তারপর এক রকম আত্মবিকৃত হাসি হেসে বললেন, 'ও আবাগীও তোমার পায়ের কাছেই থাকতে চায়—বোধহয় ঝি হয়ে থাকতেও ওর আপত্তি নেই।'...

তাই হল। কালীতারা যে শয্যা নিয়েছেন সেই শেষ শয্যা তা বুঝতে কারও বাকী ছিল না। দু-তিন দিনের মধ্যেই একটা লগ্ন ছিল গভীর রাত্রে, সেই লগ্নেই বিবাহ হয়ে গেল। স্ত্রী আচার হল না, উলু পড়ল না—নিতান্তই মন্ত্র পড়ার হোম করার অনুষ্ঠান যেটুকু সেইটুকুই হল। কুসণ্ডিকাণ্ড শেষ হবারই মেয়ে নিয়ে ভোরবেলা মহেশ তাঁর নববধূকে নিয়ে চলে গেলেন। কালীতারা উঠে সম্প্রদানও করতে পারলেন না, পুরোহিতই আত্মদীক্ষাও সম্প্রদান করলেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে।

বাড়ি মহেশ আগেই ভাড়া করে রেখে-ছিলেন। একটু গলির মধ্যেই নিয়েছিলেন, নিয়মিত যাওয়া আসার দৃশ্যটা না চট করে কারও চোখে পড়ে। গত দুদিনের মধ্যেই বাড়ি পরিষ্কার করিয়ে আসবাবপত্র, বিছানা, ঝি-চাকর রাঁধুনী—সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ রেখেছিলেন। ভবানী সাজানো সংসারে নতুন বৌ নয়—যেন গৃহিণী হয়ে এসেই উঠল।

সেই নতুন জীবন নতুন সংসারের শুরু। মহেশের স্ত্রী ক্ষণপ্রভা নাকি এটা অনুমান করেছিলেন, মহেশকে প্রশ্ন করতে মহেশও তাঁর কাছে গোপন করেন নি। তার প্রয়োজনও ছিল না। ক্ষণপ্রভা স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একটি ছেলে হওয়ার পর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নানান অসুখে প্রায়ই শয্যাগত থাকেন, মেয়েরা বলে 'শুকনো সূতিকা', কেউ কেউ বলে থাইসিসের পূর্বাভাস। এইভাবে চিররুগ্ন হয়ে স্বামীর গলায় পাথরের মতো ঝুলে থাকলেন, এতে লজ্জার অবধি ছিল না তাঁর। রীতিমতো যেন অপরাধী বোধ করতেন নিজেকে। এটা জানতেন, বলেই মহেশ একমাত্র তাঁর কাছেই সত্য কথা বলেছিলেন।

ক্ষণপ্রভা রাগ কি অভিমান তো করেনই নি বরং বার বার বলেছিলেন 'তাকে এখানেই নিয়ে এসো। আমি ওবাকে বলে কয়ে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব। তুমি এই দিনরাত ভূতের মতো খাটছ, একটু সেবাযত্নও করতে পারি না। সে যদি সে ভারটা নেয় তাহলেও আমার শান্তি। চাই কি আমারও একটা গল্প করার লোক হয়।'

মহেশের এতটা সাহস হয় নি। ওর চাটুয্যের মেয়ের থেকে মহেশ তাঁকে চিনতেন। বলেছিলেন, 'এখন [illegible] একটা কাজে হাত দেবার ইচ্ছা। উনি এখন বিগড়ালে সব নষ্ট হয়ে যাবে। কিছুদিন যাক, এদিকটা একটু গুছিয়ে নিই, তারপর যা হয় হবে।'

সম্পূর্ণ স্ত্রীর মর্যাদাতেই রেখেছিলেন মহেশ ভবানীকে, শাশুড়ির মুখোপাধ্যায় তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন খুব পিণ্ডপিণ্ডই। এই মর্যাদা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিতও করাবেন তিনি। বন্ধুবান্ধবদের কাছে স্ত্রীই বলতেন, সামনে বলতেন আমার ছোট বৌ, আড়ালে বলতেন দু নম্বর। ভবানীকে রাজার হালেই রেখেছিলেন, এত সুখ এত স্বাচ্ছন্দ্য ভুল

সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা কল্পনার অতীত। বামনী রেঁধে দেয়, পরনের কাপড়টা পর্যন্ত ঝি কাচে। কোথাও যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই দুটো গাড়ি, ব্রুহাম আর ল্যাণ্ডোনট, যে কোন একটা এসে দাঁড়ায়, সহিস সেলাম করে দরজা খুলে দেয় গাড়ির। মহেশ আজকাল কারও সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্কিত কোন গোপন পরামর্শ করতে হলে এবাড়িতেই আনেন। তারাও 'বৌদি' বলে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে।

অভয়ের মতো পাকা ও দুঁদে লোক কি এখবর পান নি! একই শহরে, দুপক্ষেরই পরিচিত বহু লোক কাছাকাছি বাস করে। অভয়ের বাড়ি থেকে মহেশের নতুন বাসা দেড় মাইলেরও কম। বিশেষ গাড়ি যাতায়াত করে, সহিস কোচম্যান সবাই জানে যখন, সে সংবাদ ছড়াতে বেশী দেরি হবার কথা নয়, এরাই ভাল গোয়েন্দাও। রাত্রে এখানেই থাকেন আজকাল বেশির ভাগ দিন, তাই ভাল কোন খাবার হলে ক্ষণপ্রভা কোচম্যানকে কি দারোয়ানকে দিয়ে তা পাঠিয়ে দেন। তারা সে গল্প কারও কাছে করবে না তাও সম্ভব নয়। তবে মহেশ তাঁর অনুচর সকলেরই প্রিয় জেনেশুনে অনিষ্ট করে না।

খবর পেয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু আরও অনেক আগে থেকে পেয়েছিলেন বলেই উদ্বিগ্ন হবার কারণ বোঝেন নি, অর্থাৎ অন্যরকম ধারণা হয়েছিল। কালীতারা নিজেদের বাড়িতে থাকার কালেই রটেছিল তিনি মহেশের কাছে মেয়েকে ভাড়া খাটাচ্ছেন। সেই মেয়েকেই কোথায় সরিয়ে নিয়ে গিছলেন মহেশ, এখানে নানারকম কথা উঠছিল বলে। মেয়েটার মা মরে যেতে তাকেই এনে পুরোপুরি বাড়িভাড়া করে রেখেছেন। অর্থাৎ ধরে নিয়েছিলেন ভবানী মহেশের রক্ষিতা।

অভয় এ ব্যবস্থায় কোন দোষ দেখেন নি। তখন ধনী হওয়ার প্রধান একটা লক্ষণ বা কর্তব্য ছিল রক্ষিতা রাখা। ঘরে ঘরে এব্যাপার তখন চালু ছিল না, সুতরাং উপায়ই বা কি? ছেলে একাজ করলে বাপ খুশী হতেন, নিশ্চিন্তও হতেন। অভয়ও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আর তাঁর মুখ থেকেই সংবাদটা ছড়ানোয় মহেশের ভাইরাও ধরে নিয়েছিল এবং যুগধর্ম অনুযায়ী এতে দোষও দেখে নি।

ভবানীর সন্তান হতে শুরু হল যখন, তখনও মহেশ যা কিছু কৃত্য সমস্ত করে গেলেন, এমন কি অন্নপ্রাশনে নান্দীমুখ পর্যন্ত কিছু বাদ গেল না। কিন্তু এবার এদের ভবিষ্যতের কথাটা ভাবতে হয়, ভবানীও সে কথাটা যে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না তা নয়—অবসর পায় না। এর মধ্যে মহেশ বিরাট এক ব্যবসায় লেগে গেছেন দিনরাত সেই চিন্তা ও কাজেই কাটে। গুজরমল মারোয়াড়ি বিলিতি কাপড় আমদানী করত—জাহাজ জাহাজ। স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হতে বিলিতী জিনিস পোড়ানো শুরু হল যখন তখন বিস্তর ক্ষতি হয়ে গেল। আরও হতে পারত—মহেশেরই পরামর্শে বড়বাজারে আর জোড়াবাগানে কয়েকটা পুরনো বাড়ি-ভাড়া করে গুদোমজাত করতে বেঁচে গেল অনেকটা।

এর আগে একটা ঠিকার ব্যাপারে মহেশের সঙ্গে গুজারমলের আলাপ হয়েছিল। ক্রমে সেটা বন্ধুত্বে পরিণত হয়। মহেশ শুধু তখনকার মতো বাঁচালেন না, টাকাটা আটকে পড়েছিল, কাপড় পচে গেলে সবটাই লোকসান হত—তারও একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। স্বদেশীওলাদের কথা না শুনে গুজরমল দশেরার দিন রেলী ব্রাদার্সকে বিলিতী কাপড়ের অর্ডার দিয়েছিল—এই জন্যে তারা গুজর মলের খুব অনিষ্ট করার চেষ্টা করছে, ডাকাতী করা কি ওকে খুন করাও আশ্চর্য নয়—সরকারী মহলে এই বন্ধু সাহেবকে দশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে লাট সাহবের সেক্রেটারীর স্ত্রীকে হ্যামিলটনের দোকান থেকে জড়োয়া নেকলেস উপহার দিয়ে সব মালটা সরকারকে দিয়ে কিনিয়ে দিলেন মহেশ। মহেশ নিজে পেলেন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।

এরপর মহেশেরই পরামর্শে একটা আধমরা কাপড়ের কল কেনে গুজরমল। গুজরমলের চালাবার সাধ্য ছিল না, সে মহেশকে ধরল বিনা পুঁজির অংশীদার হয়ে কারবার চালু করতে। মহেশ রাজী হলেন, লেখাপড়াও একটা হল। যা লাভ হবে তা থেকে গুজরমলের বারো আনা, ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে মহেশের চার আনা। পার্টনারশিপ ব্যবসায়ে যে শর্ত থাকে, এখানেও তাই ছিল, মহেশের মৃত্যু ঘটলে এ অংশীদারত্বও এইখানে শেষ হয়ে যাবে। গুজরমলই কলের ক্রেতা হিসেবে পুরো মালিক থাকবেন।

কিছুদিন কল চালিয়েই মহেশ বুঝলেন, এসব কাপড় বাজারে চালানো যাবে না। গুণচটের মতো কাপড় হয়, পাড়ের রঙ থাকে না—নানান দোষ। মহেশের মাথায় ছুট করে বুদ্ধি খেলে গেল, তিনি চিঠি-চাপাটি করে জার্মানী থেকে মিলের পুরনো কলকব্জা পাঠিয়ে সেই মতো নতুন আনাবার ব্যবস্থা করলেন। সে অনেক টাকার খেলা। গুজরমলের হাতে আর তখন টাকা নেই, একটা বড় দাও মারতে গিয়ে শেয়ার মার্কেটে বড় ঘা খেয়েছে। স্থির হল এ টাকা মহেশই ঢালবেন ব্যবসায় তার জন্য দশ আনা ছ'আনা লাভের অংশ ঠিক হল। মহেশ পুরোপুরি অংশীদার হলেন। যে কোন অংশীদারেরই আগে মৃত্যু হলে আর একজন মৃতের অংশের যা মূল্য তা বুঝিয়ে দেবেন অথবা কারবার বেচে এই হিসেবেই ভাগ হবে।

এইসব শর্তের একটা দলিল বা 'ডীড' ও লেখা হয়েছিল, যথারীতি স্ট্যাম্প কাগজে—শুধু গড়িমসি করে সেটা রেজেস্ট্রী করা হয়নি। গড়িমসি বলাও হয়ত ভুল, আসলে সময়াভাব। দুজনেই অত্যন্ত ব্যস্ত, একটা সময় করে দুজনে একসঙ্গে রেজেস্ট্রী আপিস যাবেন সেই সময়টাই মেলে নি। তা ছাড়া তখন এমনই গাঢ় বন্ধুত্ব দুজনে, অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ওঠে নি। অন্তত মহেশের দিক থেকে। অথচ ওই টাকাটা—যা উনি ঢেলেছিলেন তার পুরোটা অনেক চেষ্টা করেও মহেশ যোগাড় করতে পারেন নি, শ্বশুরের কাছ থেকে হাজার কুড়ি টাকা ধার করতে হয়েছিল।

এরকম সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এই ভেবেই তাঁকে [illegible]তে চান নি মহেশ। আসলে ঠিকাদারীর [illegible] নিশ্চয়তা নেই, প্রতিটি কাজের জন্যেই ধরপাকড় আর ঘুষ—দেখে দেখে মহেশের একাজে অরুচি ধরে গিছল। অন্য একটা স্থায়ী বড় ব্যবসার কথা ভাবছিলেন অনেকদিন থেকেই। গুজরমলের এই কাপড়ের কল তাঁর সৌভাগ্য লক্ষ্মীর নির্দেশ [illegible] আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়েছিলেন।

মহেশের এটা মরার বয়স নয়, স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না। কোনদিন। এর মধ্যে কখনও কোন ক্লান্তিও বোধ করেন নি। কেউ এ সম্ভাবনার কথা একবারও ভাবে নি তাই। মহেশ নিজেও না। ভাবলে দলিলটা অন্তত রেজেস্ট্রী করিয়ে নিতেন।

দিল্লীতে তখন বিস্তর কাজ। নতুন রাজধানী বিস্তার লাভ করছে, ঘর-বাড়ি রাস্তাঘাট বড় বড় অফিস বিল্ডিং সবই দরকার, অনেক অনেক। বড় বড় ঠিকা দেওয়া হচ্ছে সরকার থেকে. কোটি কোটি টাকার। সাহেব কোম্পানী বা মার্টিনের মতো বড় বড় আধা-দেশী কোম্পানীই পাচ্ছে সে সব কাজ। কিন্তু বৃহৎ কাজে বরাহুতদের জন্যও কিছু ব্যবস্থা থাকে, ছোটখাটো টুকরো টাকরা, এদিক ওদিকে ছিটকে পড়ছে প্রত্যাশী কুকুরদের সামনে উচ্ছিষ্ট মাংস বা হাড়ের টুকরোর মতো। সেগুলো একটু তদ্বির করলেই পাওয়া যায়। তাছাড়া বড় ঠিকাদাররাও অপরকে ঠিকা দিচ্ছেন ভাগাভাগি করে। যাই পাওয়া যাক লাখ লাখ টাকা খেলা।

এমনি একটা কনট্র্যাক্টের প্রাথমিক কথাবার্তা হবার পর ব্যবস্থা পাকা করতেই দিল্লীতে গিছলেন মহেশ। সেটা বৈশাখের শেষ, দুঃসহ ভয়াবহ গরম। এখনকার বৃক্ষবহুল ছায়াচ্ছন্ন দিল্লী দেখে সে সময়কার সে মরুভূমি কল্পনাও করতে পারবেন না কেউ। তখন গ্রীষ্ম কালে চারিদিক থেকে আগুন বৃষ্টি হত, সমস্ত দেহও জ্বলত শুধু। এক ফোঁটা ঘাম হত না। জ্বালা শুধু, সব পুড়ে যাচ্ছে এই মনে হত।

মহেশ এ সময় কখনও আসেন নি, তবে তাই বলে গরমের জন্যে কি রোদ্রের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবেন, ঈশ্বর সে ধাতুতে তাঁকে গড়েন নি। সেখানে পৌঁছে সারাদিন টাঙ্গা করে ঘুরেছেন, বেলা পাঁচটায় হোটেলে এসে জামাকাপড় খুলে বাথরুমে ঢুকেছেন স্নান করতে। সরকার নিষেধ করেছিল উনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ঘামের ওপর চান করলে সর্দি গর্মি হয়, এ ঘাম কোথায়? কিন্তু যেমন ঠান্ডা জল মাথায় ঢেলেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। সরকার অতটা বোঝে নি প্রথমটায়, অনেকক্ষণ সাড়া শব্দ না পেয়ে প্রথম ডেকেছে, দরজায় দুমদুম করে লাথি মেরেছে তারপর দরজা ভেঙে দেখেছে ঐ ব্যাপার।

হোটেলের ম্যানেজার তখনই ডাক্তার ডেকেছেন, হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁর চিকিৎসার আর কোন অবসর ছিল না। হাসপাতালে যাবার আগেই মারা গেছেন। কিছু লিখে রেখে বা কাউকে কিছু বলে যেতে পর্যন্ত পারলেন না। বোধ হয় বুঝতেই পারলেন না তিনি মারা যাচ্ছেন।

সরকার বাড়িতে খবর দিতে ভাইয়েরা ছেলেকে নিয়ে গেছেন, দিল্লীতেই দাহ ইত্যাদি হয়েছে। ভবানীরা কোন খবরই পায় নি।

বিপদ বা... না এলে আসে না। ক্ষণপ্রভা বেঁচে থাকলে কি হত বলা যায় না। তিনি হয়ত এসে জোর করে ভবানীকে ভবানীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতেন, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে রাগারাগি করে নিজেই ছেলের অভিভাবক হিসেবে সম্পত্তির অংশ দিতেন। অবশ্য সম্পত্তি বলতে তখন পৈতৃক বাড়িই—যা কিছু উপার্জন করেছেন মহেশ সবই নতুন নতুন কারবারে ঢেলেছেন, তাঁর বিশ্বাস এবং মতও ছিল—জমিদার হয়ে বসতে গিয়েই বাঙালীরা লক্ষ্মী মাকে মাবোয়াড়িদের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে।

তবে ভবানীর জন্যে একটা কিছু করা দরকার এটা মহেশের মাথায় ছিল। দিল্লী যাবার আগেই সিমলে কাঁসারিপাড়ায় একটা ছোট বাড়ি দেখে ভবানীর নামে পাঁচশো টাকা বায়না করে গিছলেন, মোট ষোল হাজার টাকা দাম ঠিক হয়েছিল, দোতলা বাড়ি একটু গলির মধ্যে, তা হোক, ওপর নিচে মোট ছখানা ঘর, এদের যেমন দরকার। কথা ছিল ফিরে এসে য়্যাটর্ণীকে দিয়ে দলিলপত্র দেখিয়ে বাড়িটা কিনে দেবেন।

সেও হল না, সবচেয়ে ভাগ্যের বড় মার, ক্ষণপ্রভাও রইলেন না। এক আশ্চর্য খেল দেখালেন তিনি। দশপিণ্ডের দিন—ঘাট করতে যাবার সব ব্যবস্থা হচ্ছে যখন, তখন দেখা গেল ক্ষণপ্রভা কখন নিঃশব্দে মারা গেছেন। কাউকে ডাকেন নি কোন যন্ত্রণা প্রকাশ করেন নি, বোধহয় টেরও পান নি—ঘুমের মধ্যেই কখন মহাঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

তখন মহেশের প্রথম পক্ষর ছেলে কনকের বয়স মাত্র দশ। ক্ষণপ্রভার স্বভাব ছিল মধুর, দেওরদের মায়ের মতোই আগলে রাখতেন, যখন যা দরকার ওদের মুখ দেখেই বুঝতে পারতেন—সময় অসময়ে হাতে না থাকলে বাবার কাছ থেকে টাকা এনে ওদের দিতেন। যদিও বয়সে বড় দেওর মোহন তাঁর চেয়ে কিছু বড়ই হবে।

বৌদির প্রতি ভক্তি আর কৃতজ্ঞতায় তাঁর ছেলে সদ্য বাবা-মা মরা ভাইপোটার ওপরই সমস্ত সহানুভূতিটা গিয়ে পড়ল।

টাকা হাতে কিছুই ছিল না। মোহন ডাক্তার—প্রথম একটা চাকরিতেই ঢুকেছিলেন, সরকারী চাকরি ঠিক এই সময়ই বিদেশে বদলীর নোটিশ আসতে ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিশ শুরু করলেন, হয়ত বা বৌদির আশীর্বাদেই দেখতে দেখতে বেশ জমেও গেল। এও একটা বৌদির প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার কারণ।এই চাকরি নেওয়াতে ক্ষণপ্রভার ঘোরতর আপত্তি ছিল, তিনি নিজের গয়না বেচে ডিসপেনসারী সাজিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পরেরটি মরেশ পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী চাকরি পেয়েছিলেন, দুজনে উঠে পড়ে লাগলেন কনকের প্রাপ্য উদ্ধার করতে।

ঠিকাদারী ব্যবসাতে মহেশের আড়াই থেকে তিন লাখ টাকার মতো লগ্নী ছিল। সে হিসেবও সব পাওয়া গেল না। কাগজপত্রের ব্যাপারে মহেশ ছিলেন খুব অগোছালো। আশ্চর্য স্মৃতি শক্তি ছিল, সবটাই নিজের মাথায় রাখতেন। বলতেন, অত হিসেব রাখতে গিয়ে আমার যা সময় নষ্ট, সে সময়ে আমি ঢের রোজগার করে নিতে পারব। এদিকের লোকসান ওদিকে পুষিয়ে যাবে।' সরকারকেও সব সময় সব কথা বলতেন না। কোথায় কাকে কি দিলেন—চুনসুরকি বিলিতিমাটি রঙ বাঁশ-ওলাদের এমনি এক এক সময় থোক টাকা দিয়ে চলে আসতেন, রসিদ নিতেন না অনেক সময়ই। সদা ব্যস্ত, ওটুকু দাঁড়াতেও তর সইত না। অথচ মালগুলো মিস্ত্রীরাই নিয়ে আসত ও'র হুকুম-নামা 'চিট' দিয়ে সই করে। এখন কেউ কেউ সুযোগ বুঝে সে সব জমা অস্বীকার করলেন, দেনার হিসেবটা পাকা, সেটাই সামনে দাখিল করলেন। তেমনি কার কাছ থেকে কি আদায় হল সেটাও সরকারকে সব সময় বলতেন না খেয়াল করে। ফলে অতি কষ্টে ষাট পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র আদায় হল। হয়ত সরকারও এই সুযোগে পরকালের কাজ কিছু গুছিয়ে নিলেন। আবার কোথায় কবে চাকরি পাবে, পেলেও এমন মনের মতো চাকরি—তার তো ঠিক নেই। পেলেও বেহিসেবে এত পয়সা কেউ দেবে না। এই আকস্মিক সমূহ বিপদকালে সে যদি আখেরের কাজ গুছোয় খুব দোষ দেওয়াও যায় না তাকে।

যা সামান্য পাওয়া গেল নাবালক ছেলের নামেই জমা হল। একটা ইনসিওরেন্স ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা—ক্ষণপ্রভাই তার নমিনী ছিলেন—সে প্রাক ভবানী যুগের—সে তো কনক পাবেই। কিন্তু আসল পাওনা যেটা—কপাড়কলের অংশ সেটা গুজরমল স্রেফ উড়িয়ে দিল। সেবার করল আগের দলিল—ওআর্কিং পার্টনারের।

পরবর্তী সক্রিয় অংশীদার হওয়ার দলিল লেখা হয়েছিল, সইসাবুদও বাকী ছিল না কিন্তু রেজেস্ট্রী হয়নি। সেই অবস্থাতেই আপিসের দেরাজে পড়েছিল সেটা, মহেশের মৃত্যু সংবাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে গুজরমল ঐ দলিলটি হস্তগত করল, নিজের বাড়িতেও রাখতে সাহস করল না, দেশে পাঠিয়ে দিল। অথচ এ দলিলের কথা সবাই জানত। দুজন সাক্ষীও সই করেছে সে কথাও এরা জানে। মহেশের য়্যাটর্ণীর এক বাবু স্বীকার পেলেন যে তিনি সই করেছেন, তাঁকে দিয়ে একটা এফিডেভিটও করিয়ে নেওয়া হল কিন্তু অপর ইসাদী গুজরমলের এক বন্ধু। সে আকাশ থেকে পড়ল, সই? কিসের? কি ব্যাপার? না, এমন কোন দলিলের কথা সে জানে না, সইও করে নি।

যিনি এই মামলা চালাতে পারতেন—অভয় চাটুয্যে—গুজরমলকে টিট করার উপযুক্ত লোক—তিনি একমাত্র মেয়ে ও ছেলের মতো জামাইয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন একেবারে, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে

পড়েছেন—তাঁর আর এসব ঝামেলা করার সাধ্য নেই, সাফ জানিয়ে দিলেন। কিছু কিছু কূট বুদ্ধি দেওয়া ছাড়া বেশী কোন সাহায্য করে উঠতে পারলেন না।

মোহন একাই হাল ধরলেন। গজেন্দ্রমলের নামে দু-তিন দফা মামলা রুজু করা হল। জার্মানী থেকে মেশিনের পার্টস আনানোর টাকা মহেশ সব দিয়েছিলেন, অভয়ের কাছে দেওয়া রসিদে কেন টাকা নিচ্ছেন তার উল্লেখ প্রসঙ্গে কোম্পানীর নাম ও মোট কত টাকা উনি দিচ্ছেন তার পূর্ণ বিবরণ ছিল। সোজা উনিই পেমেন্ট করেছেন, ব্যাঙ্কের মারফৎ—ব্যাঙ্ক থেকে সে কাগজপত্র উদ্ধার করার জন্য মোহন ছুটোছুটি করতে লাগলেন। পুরনো খাতাতেও এ টাকা মহেশের নামে জমা ছিল সে খাতাও গজেরমল গায়েব করেছিল, সেটাই বরং গজেরমলের বিরুদ্ধে গেল। সব খাতা আছে, যে বছর এসব মাল এসেছে সেই বছরের খাতাই নেই কেন?

এ সবই শুনছে ভবানী তার কিছুই করার নেই, কিছু পাওয়ারও না। সে এবার একেবারেই অসহায়। যথার্থ অভাগী। মার মৃত্যুতেও এমন অসহায় বোধ হয়নি, কারণ তখন মহেশ ছিলেন, স্নেহ দিয়ে সহানুভূতি দিয়ে সমবেদনাবোধে—সর্বোপরি জীবনের তখনও পর্যন্ত অনাস্বাদিত মাধুর্যে অকল্পনীয় আনন্দ স্বাদ—প্রেম দিয়ে সব শূন্যতা পূর্ণ করে ছিলেন বরং মনের পাত্র ছাপিয়ে গিছল। আজ মনে হচ্ছে আশ্রয় বলতে অবলম্বন বলতে কেউ নেই কিছু নেই। পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে মাথার ওপর কেউ বা কিছু নেই—ত্রিশূন্যে ঝুলছে সে কতকগুলো অবোধ শিশু সন্তান নিয়ে।

ভবানী দেওরদের কাছে যায়নি। গিছলেন মহেশের দু-তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাঁরা জানতেন জীবনের এই শেষ কটি বৎসর ভবানীই মহেশের যথার্থ চিত্ত বিশ্রাম ছিল। চিন্তাও কর্মক্লান্ত দিনগুলির শেষে সেবা ও একান্ত তদগত প্রাণ সাহচর্য দিয়ে দৈহিক বিশ্রামও যথার্থ করে তুলত যা এর আগে কখনও কোথাও পাননি মহেশ।

এরা সবই জানতেন। এবাড়িতে যাওয়া আসা ছিল। তার আগের ঘটনাও জানতেন আদ্যন্ত। এ বিয়ের আকস্মিক কারণ ও তার বিবরণও জানা ছিল। তাঁরাই মোহন আর সেজভাই নরেশের কাছে গেলেন। তাঁদের অনুরোধ—ওরাও মহেশেরই ছেলে-মেয়ে ভবানী মহেশের স্ত্রী—ওদের দিকটাও একটু বিবেচনা করুক এরা।

নরেশ বললেন ও ব্যাপার আমরা কিছুই জানি না। দাদা আমাদের কোনদিনই কিছু বলেননি আমরা ওটাকে বিয়ে বলে মানতে রাজী নই।

(চলবে)

কামাল হোসেন

পরম বিশ্বাসের গন্ধ

কামাল হোসেন
পরম বিশ্বা
কামাল
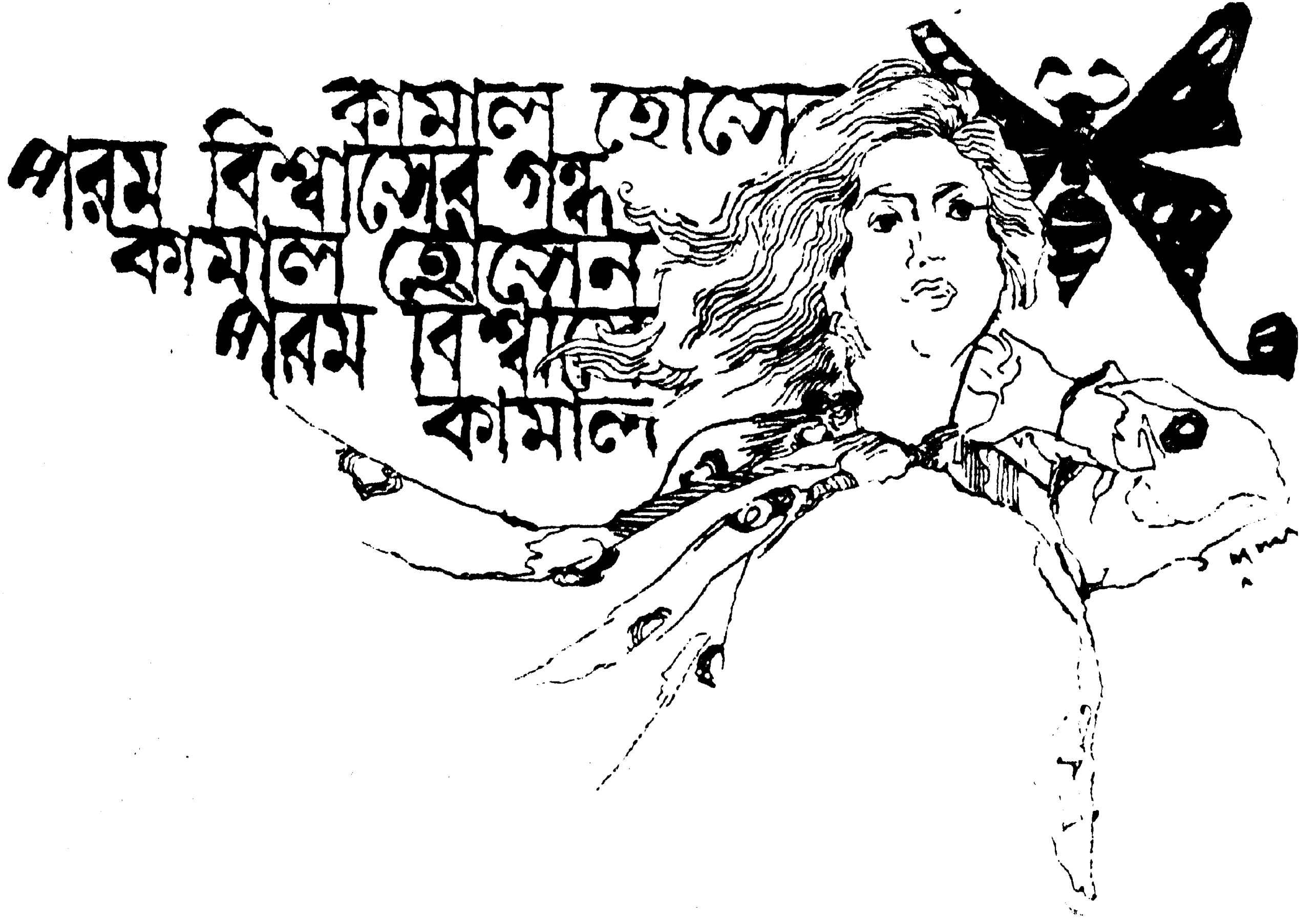
হয়ত সবকিছুই এরকম হঠাৎ হঠাৎ জীবনে চলে আসে। আগের মুহূর্তটিতেও জানা যায় না। কে জানে, কে হবে তার নিজস্ব জীবনের সেই পরম প্রার্থিত পুরুষ। অনেক কৌতূহল মনের মধ্যে ঝাঁকিবুকি টেনে যায়। আব্বুসোনার প্রতি তার কেমন যেন মায়া হয়। আব্বুরও অল্প-বয়সের বাগ-না-মানা আবেগ ছিল। কিন্তু মা? তার তো একটা দায়িত্ব ছিল, নিজের স্বামীর প্রতি, পেটের ভিতরের সন্তানের প্রতি। মায়ের প্রতি দারুণ ঘৃণায় আব্বুর ঢ্যাবড়া মোটা কালো শরীরটা কল্পনায় জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে হয় সুফিয়ার। তোমার বউ থুড়ি তোমার ভাবীর কাছে তুমি কতটুকু আদর পেয়েছ আমার জানা আছে। আসলে একটা উন্মাদনা, বড় চাচার কাছ থেকে মাকে ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের প্রশ্ন [illegible] ছিল। কিন্তু এখন? মায়ের কাছে [illegible] কী পেয়েছ জানি না, তবে তোমরা [illegible]ই ক্লান্ত। ইচ্ছে সত্ত্বেও আর [illegible] মনের কাছাকাছি আসতে পারছ [illegible] যতই শরীর নিয়ে মাঝে মাঝে মাড়াচাড়া কর না কেন?

মাকেও বলিহারি। এখনো আদিখ্যেতা করে ভালোবাসা আদায়ের ফন্ডামি। যখন তখন অসুখের বাতিক। এখন আবার মাথার মধ্যে নাকি যন্ত্রণা হয়। ভালো ডাক্তার কিছুতেই দেখাবে না। আব্বু কিছু জোরও করে না। রাধু কম্পাউন্ডার মাঝে মাঝে এসে পেথিড্রিন ইনজেকসন দিয়ে যায়। ইনজেকসনের পর ঝিমুনি আসবে...সব শান্তি...সে মুহূর্তে যুগপৎ ঘৃণা ও বিদ্রূপে সুফিয়ার শরীর কুঁকড়ে যায়...

জোনাকির মেজদির বিয়ের সময় দারুণ মজা হয়েছিল। জোনাকির বড় জামাইবাবুর সঙ্গে সুফিয়া আর জোনাকি প্রথম সিগারেট খেয়েছিল। অপটুভাবে আঙুলের ফাঁকে ধরে দু'টান দিতেই খক খক করে কাশি। মনে পড়লেই হাসি পায়। এখন মাঝে মাঝে আব্বুর পকেট মেরে বাথরুমে গিয়ে খেয়ে আসে। ঠিক নেশা না, গোপনে কিছু নিষিদ্ধ জিনিসের স্বাদ পাওয়ার মজাই আলাদা। এদেশে মেয়েদের সিগারেট খাওয়াকে কেন যে সবাই অসভ্যতা বলে, সে বুঝতে পারে না। হিন্দী সিনেমার নায়িকারা কী সুন্দর সবার সামনে মৌজ করে সিগারেট খায়। তামাকের মিষ্টি গন্ধ সুফিয়ার নাকে অন্য আবেশ এনে দেয়।

মাঝে কয়েকদিন সামসুলের পাত্তা নেই। রাবেয়ার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। সে একা একা কীভাবে কাটাচ্ছে বাবু বুঝবে কী করে? দিব্যি কোথাও গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। অনেকদিনের অনভ্যাসে বাড়িতে শুধু বসে থাকতে ভালো লাগে না রাবেয়া[illegible] সুফিয়াটাও দিন দিন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে[illegible] অথচ আগে সুফিয়াই ছিল সব থে[illegible] উচ্ছল। এখন যেন সুফিয়াকেই মনে হ[illegible] বড় বোন, রাবেয়া ছোট।

সেই ঘটনাটার পর থেকে সুফিয়া অ[illegible] বেশি কথা-টথা বলে [illegible] মেয়েও ক[illegible] সাংঘাতিক নয়।

সেদিন দুপুরে ফুফাতো ভাই হুমায়[illegible] আর সুফিয়া গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গ[illegible] করছিল। দু'জনেই সমবয়সী। বন্ধু[illegible] আছে। খোলামেলা গল্প করে থা[illegible] দু'জনে।

সামনের রাস্তা দিয়ে রফিক যাচ্ছিল সুফিয়াদের ক্লাশেই পড়ে। সামনের বছ[illegible] হায়ার সেকেন্ডারী দেবে।

সুফিয়ার কী দুর্মতি হয়েছিল হুমায়ুনকে তখন বলেছিল—জানিস, অনি[illegible] আমাকে রেগুলার লাইন মারে। একদি[illegible] চোখ মেরেছিল।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল রাবেয়া ওদের কথা না বুঝতে পারলেও কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আভাস পাচ্ছিল।

হুমায়ুনের বোধকরি পৌরুষ দেখাবা[illegible] শখ হয়েছিল। বিশেষ করে অনিন্দাকে[illegible] এরকম একা অবস্থায় পেয়ে।

সোজা অনিন্দ্যর সামনে গিয়ে চীৎকা[illegible]

রে মেজাজী চণ্ড-রে বলেছিল—কী এতদূর সাহস, আমার বোনকে লাইন মারিস?

অনিন্দ্য প্রথমটা অবাক হয়ে গেছল। কিছুটা বিব্রত, অপমানিত, থমথমে গলায় বলেছিল—আস্তে বাস্তে কথা বলছ কেন?

আমার বোনকে চোখ মারবে, আবার মস্তানি দেখানো হচ্ছে?

হুমায়ুন অনিন্দ্যর কলার চেপে ধরেছিল। ছাড়াবার চেষ্টা করে অনিন্দ্য বলেছিল—অসভ্যের মতো ব্যবহার করছ কেন?

—কী বললি, আমি ইতর? আমার বোন মিথ্যেবাদী? অনিন্দ্যর দু'গালে চড় মেরে পেটে এক ঘুঁষি মারল।

কোনোরকমে সামলে নিয়ে অনিন্দ্য পাল্টা মারবার জন্য হাত বাড়ানোর আগেই হুমায়ুনের লেংড়ি খেয়ে ধারে মাটিতে পড়ে গেল। হুমায়ুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গোটা কয়েক লাথি মারল।

ধুলোয় রক্তে মুখ ভাসিয়ে ছেঁড়া জামা নিয়ে অনিন্দ্য ছুটতে ছুটতে চলে গিয়েছিল। তখন সুফিয়া আর হুমায়ুনের কী হাসি' ছোঁড়াকে আচ্ছা জব্দ করে দেওয়া হয়েছে। লাইফে কোনো ছুঁড়ির দিকে তাকাবে না।

আসলে ব্যাপারটা রাবেয়ার একদম ভালো লাগেনি। এতটুকু সোয়াস্তি পায়নি। বস্তুত ঘন্টা খানিক পরেই অনিন্দ্য তার বন্ধুদের নিয়ে গেটের সামনে চলে এসেছিল। কারোর হাতে চেন, কারোর হাতে বেল্ট, কারোর পকেটে ছুরি ছিল কিনা তা অবিশ্যি বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। এসেই শুরু হল সুফিয়ার উদ্দেশে অশ্লীল থেকে অশ্লীলতম গালিবর্ষণ। ভয়ে সুফিয়ার ফরসা গাল পাংশু হয়ে গেছল। রাবেয়াও কম ভয় পায় নি।

অত ছেলে দেখে হুমায়ুনের মাস্তানী মুহূর্তে হাওয়া।

বাড়িতে মাত্র তিনজন: আর কেউ ছিল না। এমন সময় গেটে মায়ের গলা। মা বোধহয় কোনো বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফিরেছিলেন সে সময়।

মা কিছু একটা বলতে গেছলেন—অমনি সকলে কোরাসভাবে বাবা-মা'র সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মন্তব্য ছুঁড়তে শুরু করল।

পাড়ার নরেনকাকু এসে মাকে কোনো তর্ক না করে ভিতরে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাগে অপমানে টকটকে মুখ নিয়ে মা ওপরে উঠে চলে এসেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শফি এসেছিলেন। প্রথমটা হাল্কা চালে সকলের কথা বন্ধে দিয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

ছেলেগুলোর বক্তব্য ছিল—সুফিয়া আর হুমায়ুনকে ওদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। ওরা যা ইচ্ছে করবে।

মুখ বিকৃত করে শফি উত্তর দিয়েছিলেন—কী আবোল তাবোল বকছিস, তোদের সাহস আমার ছেলেকে ছেড়ে দেখ?

—আলবত দিতে হবে।

—চোপ। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ভালো মুখে বোঝালাম, শোনা হল না। ঠিক হ্যায়। তোদের ওষুধ দিচ্ছি!

সেই অসহ্য খিস্তি খেউড় আর অপরিচ্ছন্ন বাক্য নির্গমণের মধ্যে দিয়ে কোনোরকমে ঘরে ঢুকে থানায় ও-সিকে ফোন করলেন শফি।

খানিক বাদেই পুলিশের ভ্যান চলে এল। ছেলেরা ব্যাপার স্যাপার খারাপ দেখে বেপাত্তা। সাধ করে কে আর লালঘরের বাসিন্দা হতে চায়?...

রাবেয়ার ওসব ঝুট-ঝামেলা ভালো লাগে না। অথচ সে নিজেও অশান্তির উপলক্ষ্য হয়ে গেছে। আব্বা কোথা থেকে খবর পেয়েছিল সামসুলের সঙ্গে তার বড় মেয়ে ইদানীং ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাস, বাড়ি ফিরে সে রাতে আব্বার কী রাগ! আব্বাকে কোনোদিন ওভাবে মেজাজ দেখাতে দেখেনি সে।

সেদিন এসেই মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার মেয়ে কী সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে খবর রাখ?

—কোন মেয়ে?

—ন্যাকামি! মেয়ে তো একটাই। আমি গতর খাটিয়ে মানুষ করে দিলাম...

—মুখ সামলে কথা কথা বলবে..

—কী এখন আমাকেও মেজাজ দেখানো হচ্ছে,

সপাটে চড়ের শব্দ। ওরা দু'বোনে হ্যাবাচাকা খেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

—মোংরা ভাষায় কথা বলবে না!

—আমি মোংরা?

—হ্যা ইতর, ছোটলোক—এমন জানলে একটা ঘর ছেড়ে এখানে আসতাম না।

—তবে রে...

তারপর একেবারে বস্তির লোকেদের মতো বউ পেটানো—কিল চড় লাথি। সেই সঙ্গে অশ্রাব্য গালিবর্ষণ! শফির ওরকম রুদ্রমূর্তি তারা কোনোদিন দেখেনি!

মা কেবল মৃদুস্বরে কেঁদে যাচ্ছিলেন। আর কোনো প্রতিবাদ জানান নি। তারা

দু'বোন বরং শব্দ করে 'ও আব্বু, মাকে মেরো না গো' বলে অনেক কেঁদেছিল।

সে রাত্তির ছিল এক বিভীষিকার মতো। সত্যি কথা বলতে কি, মা বা আব্বা কারোর উপরই ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা কিছুই অনুভব করে না রাবেয়া। ওদের আর দোষ কী? পরস্পরের মনের টানে ঘর ছেড়ে এসেছিল। মাকে সে খুবে ভালোবাসে। তার দুর্বল শরীর নিয়ে ছোটবেলা থেকে সে মায়ের ওপর নির্ভরশীল। আব্বার ওপরও সে রাগ করতে পারে না। যেদিন জেনেছিল সত্যি সত্যি আব্বার মেয়ে নয় সে, যাকে বড় চাচা বলে জানে, সেই নাকি জৈবিক সম্পর্কে তার জন্মদাতা। মনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছিল। ছোট চাচীর ওপর জীবন বাধ্য হয়েছিল। কী দরকার ছিল সব কিছু জানিয়ে দেবার? একটা ভুলকে আঁকড়ে সে তো বেশ ছিল। কিছু কিছু সত্যি কথা না জানা ভালো।

এখন তার দ্বিমুখী সমস্যা। বড় চাচাকে আব্বা বলে মেনে নিতে পারে না। আব্বাও তো সত্যিকারের আব্বা নয়। অর্থাৎ মনের গভীরে মা ছাড়া আর [illegible] ভালোবাসা [illegible] কাছে। এবং সাম্প্রতিক। ঐ [illegible] ছেলের মধ্যে তার [illegible] কী এমন পেল অনেকেই [illegible] করে সে জানে। সম্প্রতি সে বাড়িতে আব্বার কাছে [illegible] যা যেন [illegible] সমর্থন দিয়ে তার আর আত্মসুখের সম্পর্কটা আরো গাঢ় করে দিয়েছেন।

[illegible] মাসে পাকার [illegible] শহরের [illegible] অফিসে [illegible] দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু [illegible] সাহস নেই [illegible] কানাকানি [illegible]। [illegible] তবে নির্দিষ্ট দিন [illegible] না। [illegible] জন্য কলকাতা গেলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

একজন খুব সাধারণ মানুষের জীবনের লক্ষ্য কতদূর? বেশিদূর দৃষ্টি নিশ্চয়ই যেতে পারে না। এবং পৃথিবীতে সাধারণ লোকের সংখ্যাই বেশি। ক'জন আর দর্শন এবং গাণিতিক ছকে নিজেদের জীবন প্রবাহ নির্দিষ্ট করে? অথবা নির্দিষ্ট করলেই কি সঠিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অত সহজ?

আসলে প্রতিটি মানুষের কিছু কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই সমাজ, এই জটিল সময়ের বিচিত্র মানসিকতার ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা কারো নেই। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু বোধ আছে। হয়ত কখনো তা প্রভাবিত করা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সবটাই ম্লান, মানুষের মনের শেকড় পাল্টানো অত সহজ কথা নয়। একজন মানুষ ছোটবেলা থেকে বংশগত এবং পারিবেশিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে যে ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান, ঐতিহ্য লাভ করেছে, সব কিছু স্পর্শ করে যে রূপ, স্মৃতি, ধারণা, প্রতীক প্রভৃতি সে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে—এর সবটাই একটা প্রকাণ্ড ভুলের বোঝা হতে পারে। কিন্তু সেই ভ্রান্তিটুকুই প্রত্যেকের জীবনের অবলম্বন। এখানেই একজন সাধারণ কৃষকের জীবনের সার্থকতা—আপাত ক্ষুদ্র মানসিকতার অধিকারী হয়েও তার মনেও যুক্তি গড়ে ওঠে, কখনো তা কাঁচের পুতুলের মতো ঠুনঠান করে ভেঙে যায়, কখনো সতেজে সবল মশালে আগুন জ্বালাতে ইচ্ছে হয়। অর্থাৎ মতবাদ এবং যুক্তির দ্বিবাহু বাদ দিলে মানুষের পা থাকে ওই অস্তিত্বের প্ল্যাটফর্মের ওপর। সেজন্যই মানুষের ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাজি জিতে নেওয়ার এত আগ্রহ। শফি আশা করেন এই শহরের অর্থনীতি তিনিই কব্জা করবেন, গড়ে তুলবেন একটি নতুন শিল্প নগরী। অথচ এই ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি পারিবারিক জীবন। নাজমা সুফিয়া আর রাবেয়া।

মদের বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে চমকে ওঠেন শফি। আজীবন তিনি শুধু একটি ভুলেরই বোঝা বয়ে গেলেন? বড়ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে নাজমা যখন পুরোনো পৈতৃক বাড়িতে এল, ঠিক যেন চোখের সামনে ভাসছে শফির। তারপর ছায়াছবির মতো দিনগুলো। লাফিয়ে লাফিয়ে চোখের সামনে দিয়ে কানামাছি খেলে চলে। ভাবীর সঙ্গে দেওরসুলভ ঠাট্টা ফাজলামি খুনশুটি।

বেশ স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু চলছিল। তারপর একদিন বড়ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে কীভাবে যেন ঘটে গেল। নিষিদ্ধ প্রান্তরে খেলতে খেলতে কখন যেন দুজনে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, পরস্পরকে ছাড়া দুজনে বাঁচতে পারবেন না।

এটাই তাঁর জীবনে সব থেকে বড় ভুল কিনা শফি বুঝে উঠতে পারেন না। সত্যই কি একজনকে না পেলে আর একজনের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে? আমরা তাহলে কিছু কার্যকারণের কাছে এত অসহায়? আমার সে নারীকে প্রয়োজন ছিল কারণ তার রূপ, তার অস্তিত্ব, সব মিলিয়ে একটা মোহ-র মতো আমাকে গ্রাস করেছিল। হয়ত জৈবাবেগ এবং ইন্দ্রিয়ের বিলাস থাবার মধ্যে খেলাধুলো করতে করতে এই সমাজ এই নানাবিধ সংস্কারের বিপক্ষে একটা দারুণ বিদ্রোহ ধরনের কিছু করে বসতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সমাজ, তার অর্থনীতি এবং শ্রেণীগত কাঠামো, এসবের মধ্যে ফিরে আসতে হয়। যেমন শিল্পনগরী নির্মাণের মোহ, এও তো সমাজকে নিজের থাবায় আনার অবদমিত প্রতিহিংসা। তার মানে নাজমা কি এখন শফির জীবনে একঘেয়ে হয়ে গেছেন? শফি নিজেও জানেন না। এসব ভাবতে গেলে নিজেকে হাস্যকর মনে হয়। কেন মিথ্যে মিথ্যে মানদণ্ড হাতে নিয়ে রঙিন আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে জেলকিবাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া? কী দরকার এই শহরের বুকে বজ্রের পরশ বুলিয়ে তাঁর লাভটা কী? ইতিহাসে স্থান? তাতে কি তৃপ্তি পাওয়া যাবে?

সাতষট্টির ইলেকশানের চোট এখনো ভুলতে পারেন নি শফি। প্রথমে চেষ্টা করে কংগ্রেসের টিকিট পেলেন না। অথচ শাসনযন্ত্রে প্রবেশেরও অদম্য আকাঙ্ক্ষা। ভাগ্যচক্রে কংগ্রেস থেকে ভেঙে আসা এক বিপ্লবী দলের টিকিট মিলে গেল। কিন্তু কপাল মন্দ। ঘন লাল এক বামপন্থী দলের নেতার কাছে গো-হারা হেরে গেলেন। জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছল। তবু সকলে তাঁকে ব্যঙ্গ করার সুযোগটুকু পেল না। ফলাফল ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত মালা আর থালাভর্তি মিষ্টি নিয়ে পৌঁছে গেলেন জয়ী প্রার্থীর পার্টি অফিসে। নিজ হাতে মালা পরালেন। ভাবাবেগমিশ্রিত গলায় সেদিন বলেছিলেন—আপনি যোগ্য লোক। জিতেছেন, খুব ভালো হয়েছে। আমি মাথা-মোটা মানুষ, রাজনীতির কোনো সঠিক শিক্ষা তো পাইনি। একটা কথা শুধু বুঝি, এইসব সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা বলবার জন্য লোক চাই। এদেরকে আমি ভালোবাসি। এদের জন্য লড়াই করব ভেবে ভোটে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু সকলের সব যোগ্যতা থাকে না। আপনি এদের ব্যথা বেদনা মোচনের জন্য লড়াই করুন কমরেড, সবসময় আপনার পেছনে আছি!...

সকলে সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সেই অপূর্ব অভিনয় চাতুর্যের কথা মনে পড়লে তিক্ত হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলেন শফি। কোথা থেকে কোথায় আজ তিনি এসেছেন। মফস্বলের গোঁড়া মুসলমান পরিবারের ছেলে তিনি। বাবা ও দাদার ভীষণ ইচ্ছে সত্ত্বেও ইস্কুল-কলেজের কোনো শিক্ষাই তাঁকে ছুঁতে পারেনি। লোভ, লালসা এবং অর্থের মোহ তাঁকে যেমন গোঁড়া মুসলমান করে তুলতে পারেনি, তেমনি পারেনি সমাজে কিংবা সংসারের স্নেহ ভালোবাসার বন্ধনে আটকে রাখতে। শফি আসলে স্বয়ম্ভু। তিনি কারো পিতা নন, কারো স্বামী নন, কারো বন্ধু নন। তিনি লোভী, তিনি নৃশংস, সংসারে আস্থাহীন ধর্মের প্রতি নির্মোহ। তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা চান। অর্থের সঞ্চয়ই তাঁর কাছে জীবনের মূল লক্ষ্য। শিশুকাল থেকে তাঁর রূপান্তর ঘটেছে লোভ থেকে বৃহত্তর লোভের দিকে। অমানুষতা তাঁকে দুঃখ দেয় না। বরং অমানবিক পথে জয়লাভটা তাঁর কাছে অনেক বেশী আনন্দদায়ক। ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর কাছে হাস্যকর। কারণ শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে গোঁড়ামিটা টিকে থাকে সে হল অর্থনৈতিক বিভেদের গোঁড়ামি। তাঁর হিসেবে মানুষে মানুষে ভেদ ধর্মে না অর্থে। অর্থের বুনিয়াদ যার [illegible] সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সেই ক্ষমতা পাকাপোক্ত [illegible]। তাই তিনি জনতার [illegible] দিতে চান, ইলেকশানে দাঁড়ান। পরিশ্রমে দরিদ্র মানুষকে একদিকে শোষণ করে অন্য-

দিকে থানায় গিয়ে সেই তাদের ছাড়িয়ে আনেন। অভাবে বাসি রুটি ছড়িয়ে দেন। যৌবনে যাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন ভালোবাসার তাগিদে, তাকে নিয়েই সারা জীবন ঘর করছেন। হয়ত তাঁর শারীরিক প্রয়োজনে যে নারীর প্রয়োজনীয়তা, নাজমার কাছে সেটুকু তিনি পেয়ে যান।

তবু শফি নিশ্চিন্ত নন। বোঝেন টাকা উপার্জন শেষ কথা নয়। যেমন মেয়েমানুষের শরীর পেলেই সবটা পাওয়া যায় না, কিছু যেন বাকি থেকে যায়। সেরকম এত কিছু, বিশাল বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে দাবার ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে শফি হঠাৎ অসহায় বোধ করেন। ইচ্ছে থাকলেও সব কিছু করা যায় না। তাঁর নিজের ক্ষমতা কতদূর? এই সমাজ এইসব মানুষদের ভিতরে ভিতরে গভীর গোপনে একটা পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই চলছে। নইলে ধীরে ধীরে এতসব রূপান্তর কিভাবে সম্ভব হচ্ছে?

নাজমার মাথার ভিতরের যন্ত্রণাটা বেড়ে চলেছে। প্রথম প্রথম ন্যাকামো মনে হত। অসুখ অসুখ বাতিকটা যেন একটা ম্যানিয়া। শফিকে কাছে পাবার ছুতো। ঠিক যেমন ঘর ছেড়ে শহরের অন্য প্রান্তে সেই ছোট্ট ভাড়াটে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন মনে হত পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। আর শরীর।

সেসব দিনগুলো মনে পড়লে শফি বেশ ভালো বুঝতে পারেন, নাজমার আকর্ষণ ছিল বন্যতা। তার কাছে পুরুষের ছিল বর্বরতার। নির্মম নৃশংস পাবো যুবতী নাজমার দেহে যখন ভোগের জোয়ার ... নাজমার নারীদেহ তখন ভরে ওঠে সার্থকতায়।

চার মাসের বাচ্চা পেটে নিয়ে নাজমা স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছিলেন। নাজমার রূপে মুগ্ধ শফি গর্ভের সন্তানটিকে ভেবেছিলেন তাঁর সন্তান। ভুল ভাঙল বাচ্চাকে দেখে। অবিকল বড় ভাই রবিউল ইসলামের মুখখানা কেটে বসানো। তখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই। সময় এভাবেই বুঝি মানুষের অহংবোধকে ব্যঙ্গ করে, প্রতিশোধ নেয়।

তখনো ভালোবাসা হারিয়ে যায় নি।

তখনো ছিল নেশা, শরীর ও যৌবনের। এবং অর্থ উপার্জনের। শহরে এখন তিনি একজন কৃতী মানুষ। সেই নেশার ঘোর সত্যি সত্যি কেটে গেছে? সন্দেহ আছে।

মদের বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে। নাজমা ঘরে ঢুকলেন। শফি একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।

নাজমা ড্রেসিং টেবিলের সামনে চুল আলগা করতে করতে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখের তারায় সেই পরিচিত বিহ্বলতা। নির্দিষ্ট সংকেতের মতো সেই আসুরিক বীভৎসতা তাঁর দিকে সরীসৃপের গতিতে এগিয়ে আসতে থাকে। চুল থেকে হাত নেমে আসে। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। মাথার কাছটা চেপে ধরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখের ভিতর থেকে অব্যক্ত শব্দপুঞ্জ বের হতে থাকে। যন্ত্রণায় চোখের কোণা বেয়ে জল গড়ায়।

শব্দ পেয়ে শফি ছুটে আসেন। গলায় ঈষৎ জড়তা। কিছুটা বিদ্রুপের স্বরে জিজ্ঞেস করেন—কী হয়েছে বেগম, বিবেক-দংশন?

নাজমার মুখ থেকে যন্ত্রণামিশ্রিত অর্থহীন ধ্বনি ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পায় না। বুকের মধ্যে হঠাৎ সেই বহুকালের পুরনো ভীতির হিমস্পর্শ অনুভব করলেন শফি। সাগ্রভাবে নাজমাকে বুকের কাছে টেনে ধরে রাখেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ শফির লোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকার পর ছটফটানি একটু কমে।

শফি জিজ্ঞেস করেন—নাজমা—নাজু—

—উঁ?

—এখন একটু সুস্থ বোধ করছ?

হঠাৎ কীরকম অপ্রকৃতিস্থের মতো শফির কাঁধের দুদিক চেপে ধরেন নাজমা। আঙুলের তীক্ষ্ণ নখ হিংস্রভাবে শরীরে বসে যেতে থাকে।

শফি চুপচাপ। কাঁধ থেকে হাত তুলে এনে শফির বুকের ওপর সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করতে করতে নাজমা এলোমেলোভাবে বলতে থাকলেন—আমার পাপের শাস্তি কতভাবে পাবো...কতভাবে...

—আঃ নাজু, কী সব আবোল তাবোল বকছ? আমরা কী পাপ করেছি?

—কী করেছি জানো না?

—আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি!

—তাহলে কেন সেই আগেকার বিশ্বাস খুঁজে পাই না?

মোটেই আমাদের বিশ্বাস হারায়নি।

—হয়তো ... নয়, আমি আর আগের আমিতে নেই।

—নেই?

—বুঝতে পারি না। সন্দেহ হয়। আজকাল খালি মনে হয়, রবিউলকে আমরা দুজনে ঠকিয়েছি।

—না ঠকাই নি। নিজেদের মনের কাছে পরিষ্কার থাকা ভালো নাজমা। তুমি তাকে কোনোদিন মনে ঠাঁই দাও নি। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা নিয়ে অপদার্থের মতো সামাজিকভাবে বাক্সবন্দী হয়ে জীবন কাটানোর থেকে, সে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা অনেক পুণ্যের। আমরা এতটুকু পাপ করিনি নাজমা।

—কেন-কেন তবে আমার এরকম হচ্ছে? আঃ—মনে হচ্ছে তোমাকে আঘাত করলেই বুঝি আমার অসুখ সেরে যাবে...

—নাজমা!

—তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়।

—আমাকে দেখে তোমার হিংসে হয়?

—তুমি কত সুখে আছ!

—সুখে আছি?

—নয়ত কি? দিনরাত কীভাবে আরো বড়লোক হবে সে চিন্তায় ব্যস্ত আছ। একবার আমার দিকেও কি ফিরে তাকাও?

—তোমায় এতটুকু অসুবিধায় রেখেছি?

অদ্ভুতভাবে হেসে ফেলল নাজমা। তারপর বলল—না—কত সুখে আছি!

ম্লানভাবে শফি হাসল। কিছু বলতে ইচ্ছে করল না। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকল। খানিকক্ষণ পরে সে বলল—সুখ পাওয়া কি অত সহজ?

বহুক্ষণ ঘরে আর কোন শব্দ নেই। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাতেও পারছিল না।

অনিশ্চয়তার এই উদ্বেগ বিরক্তিজনক। শফি সে স্তব্ধতা ভাঙল—এখন কেমন বোধ করছ?

—আমি আর পারছি না।

—ভালো ভালো ডাক্তার দেখাব। এখানে না সারলে কলকাতা যাব। আমার এত টাকা, সবই তো তোমাদের সুখে রাখার জন্য।

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা হয়ে গেছে। এক অদ্ভুত আলস্যের দিন কাটছে সুফিয়ার। কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাগানে গিয়ে ফুলগাছের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করে। চেয়ে চেয়ে নাম-না-জানা পাখি দেখে। ডাকপিওনের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকে। আর ঘুম। পরীক্ষার পর বন্ধুরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। কখনো কোনো বন্ধু এলে কিছুক্ষণ গল্প। তেমন কেউ জুটে গেলে নদীর ধারে যায়। আর একদল রঙীন কিশোরী এর মধ্যে নদীর ধারের সাম্রাজ্য দখল করে নিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে উচ্ছলতা ও

খোলামেলা আলাপ পরিচয় এই মফঃস্বল শহরেও বেশ সুলভ হয়ে পড়ছে। মনে মনে ঈর্ষা অনুভব করে সুফিয়া। একটি হারানো দুর্গের অস্পষ্ট স্মৃতি সুফিয়াকে বিষন্ন করে। স্মৃতিতেও বিশ্বাসঘাতকতার বিষাক্ত বায়ু উড়ে বেড়ায়। সেই পেছনে ঘোরা ছেলেগুলো কোথায় হারিয়ে গেল? হঠাৎ কাউকে চোখে পড়ে যায়। চায়ের দোকানে বা রকে বসে আড্ডা দেয়। আগের মতো অত সহজে শিস দিয়ে ওঠে না। কথা ছোঁড়ে না। সময় মুঠোর মধ্যে থেকে গলে গেছে। ওদেরও বয়স হয়েছে। সেই নীল দুর্গ সবুজ প্রহরী সবই ক্রমশ উজ্জ্বল রক্তিম হয়ে বঙ্কিম সীমান্তে মিলিয়ে যায়।

পরীক্ষার শেষ দিন সব বন্ধুদের সঙ্গে ঠিকানা বিনিময় হয়েছিল। বাইরে সকলেই এই দীর্ঘ অবকাশ কাটিয়ে আসবে। জোনাকিও গ্রামে যাবার আগে চিঠি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। অথচ একদিন একদিন করে দিনগুলি চলে যাচ্ছে। কেউ একটিও চিঠি দেয় না। ইস্কুলের বন্ধুরা এভাবেই বুঝি হারিয়ে যায়। তবু প্রতিদি ডাকপিওন এলে অভ্যেসবশে জিজ্ঞেস করে চিঠি আছে?

কেন এমন হয়? এই মনে থাকা না থাকা? অনিন্দার কথা মনে পড়লে এখন হাসি পায়। পরীক্ষার পর সেও কোথায় চলে গেছে। কী সব ছেলেমানুষী হয়ে গেছে। বেচারীকে হুমায়ুন খুব মেরেছিল। পাল্টা গণ্ডোগোলেও জড়াতে হয়েছিল। ওঃ তখন ক'দিন কী সাবধানে থাকতে হত! কী আশ্চর্য, শত চেষ্টাতেও সেই অনিন্দার মুখ-চোখ এতটুকু মনে পড়ে না। অনিন্দাকে মুখোমুখি আর একবার দেখতে ভারি ইচ্ছে হয় সুফিয়ার।

কী সব বিদঘুটে স্বপ্ন দেখে আজকাল। মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না। কত রকম চেনা-অচেনা মানুষ পাশাপাশি এসে ভিড় করে। আরো অদ্ভুত ব্যাপার, কোনোদিন একটাও রঙীন স্বপ্ন সে দেখতে পায়নি। ঠিক যেন সাদা-কালো চলচ্চিত্রের মতো। হয়ত ছোটচাচী ঘোমটা দিয়ে রান্না করছে, হঠাৎ কেউ কোথাও নেই, সে নিজে যেন একটার পর একটা ঘর দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আলো-আঁধারি, হঠাৎ রেললাইন, ট্রেন ছুটে চলেছে ইঞ্জিন আর ড্রাইভার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না......

রাবেয়াকে আর আগের মতো সহজভাবে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে শফি একবার কলকাতা যাওয়ার সুযোগে সামসুলের সঙ্গে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেল। অন্যতমা সাথী ছিলেন নাজমা। এখনো কেউ জানে না। নাজমার ইচ্ছে সামসুল পাশের শহরে একটা দোকান-টোকান করে বসুক। যা টাকা দরকার তিনি দেবেন।

সামসুলও নাকি ঘর দেখতে শুরু করেছে। দোকানটা সামান্য দাঁড় করালেই রাবেয়াকে নিয়ে চলে যাবে। প্রসন্ন কথা রাবেয়া সুফিয়াকে বলে। বিয়ে হলে কি সব মেয়েরই এরকম পরিবর্তন হয়ে যায়?

রাবেয়ার কথাবার্তার উচ্ছলতা দেখে সুফিয়া অবাক হয়। ভাবে, এই কি সেই রাবেয়া?

ইদানীং রাবেয়ার খুব ইচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় সুফিয়াও তার সঙ্গে চলুক নদীর ধারে। সামসুলের সঙ্গে বেড়াবে।

সুফিয়াও প্রতিদিন হাঁপিয়ে উঠেছে। আর মনে মনে সামান্য কৌতূহলও আছে, বিয়ের পর সামসুল কেমন হয়েছে। মৌলবী ডেকে আকদখানি করালে পাছে লোক-জানাজানি হয়ে যায়, সেজন্য ওই ছেলে পাশের মহকুমা শহরে গিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ের যোগাড়যন্ত্র করে এসেছিল, হুঁ হুঁ বাবা আইনমাফিক কাজ। শফি-সাহেবের সব কেরদানি চুপসে যাবে। ধনি৷ ছেলে বাবা! ওই বাঁদর ছেলের বিয়ের এত শখ? হাসতে গিয়েও হাসতে পারে না সুফিয়া।

মা এখন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ধরেছেন। যেন নামাজ পড়লেই সব পাপ ধুয়ে-মুছে যাবে। সুফিয়ার ঠোঁটে হাসি খেলা করে যায়। গত বছর ঈদের আগে এক মাস রোজা রাখার ধুম দেখে তাজ্জব বনে গেছল সুফিয়া। সেই ভোর রাত্তিরে ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে যায় কয়েকজন লোক। উচ্চস্বরে সুরহীন গলায় ধর্মীয় সঙ্গীত গাইতে থাকে ওরা। তখন সকলে সেহরী খায়। তারপর সারাদিন উপবাস, নামাজ। সন্ধ্যেবেলায় কাছের মসজিদ থেকে চৌধুরী মোল্লার ভাঙা গলায় আজান ধ্বনি কিছুটা দূরত্বের আর শোনা যায় না। খিদিরপুরে মেটিয়াবুরুজে দেখে এসে ক'বছর হল একটা সরু লম্বা বাঁশের আগায় লাল রঙের বাল্ব লাগানো হয়েছে। মোসলেম পঞ্জিকা মতে উপবাস ভাঙ্গার সময় হলে সুইচ টিপে বাতি জ্বালানো হয়। আশেপাশের মুসলমান বাড়িগুলিতে ছোট ছেলেমেয়েরা উৎসাহভরে চেঁচিয়ে ওঠে—বাতি জ্বলে গেছে—

তখন শান্ত মনে ওজু করে পবিত্র হয়ে মগরিবের নামাজ পড়ে তারপর ইফতারীর খাওয়াদাওয়া। সরবৎ, নুন-আদা, নানারকম নোনতা-মিষ্টি খাবার খেতে মন্দ লাগে না সুফিয়ার। রোজার মাসে। ওটাই প্রধান আকর্ষণ।

আব্বু অবশ্য ওসব পালন-টালনের মধ্যে নেই। সোজা কথা—প্রেসার আছে। তবে ঈদের দিন ফিতরা হিসেবে বেশ কিছু নতুন জামা-কাপড় লুঙ্গি-শাড়ি টাকা-পয়সা গরীবদের মধ্যে দান করেন।

অমনি করে কাটছে দিন। একদিন সকালবেলায় রাস্তা থেকে অনেক কণ্ঠে গানের ধ্বনি শুনে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল সুফিয়া।

কলেজের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে আসছে...আমার সোনার বাংলা...পথের দুপাশের বাড়ির লোকেরা পুরোনো কাপড় পয়সা চাল ডাল দান করছে।

কেন এসব হচ্ছে সবটা ভালো মতো না বুঝলেও বুকের মধ্যে একটা অনাস্বাদিত অনুভূতির স্পর্শ পায় সুফিয়া। ওই গানটা তো সে আগে কখনো এভাবে শোনেনি। তীব্র রোমান্টিক বিষাদে ভরে ওঠে সুফিয়ার বুক। নিজেকে এক বিশাল নারীর মতো, এই ছোট্ট শহরের বাইরের চারপাশে ছড়ানো সোনার বাংলার মতো মোহিনী রূপসী মনে করতে ইচ্ছে হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই এ-শহরেও ওপার বাংলা থেকে লোকজন চলে আসতে থাকল।

এখানকার আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে ও সহানুভূতিশীল মানুষদের বাড়িতে অনেকে আশ্রয় পেল। একটা মানবিক সচেতনতায় সকলেই যার যা সাধ্য সাহায্য করতে থাকেন।

আব্বুও দারুন উৎসাহে খান সেনাদের গালমন্দ দিয়ে ত্রাণকার্যে যোগ দিলেন। নিজের একটি খালি বাড়িতে কয়েকজন মধ্যবিত্ত পরিবারের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। সুফিয়া মাঝে মাঝেই রাবেয়াকে নিয়ে ওদের কাছে একটা সত্যিকার যুদ্ধের নির্মম কাহিনী শুনে আসত। গুলি-গোলা, কামান-বন্দুক এসব খারাপ জিনিসগুলোকে মানুষ কেন বিসর্জন দেয় না ভেবে সে উত্তেজিত হত। মানুষ কেন এত নিষ্ঠুর হতে পারে ভেবে সে বিষণ্ণ বোধ করত।

প্রথম দিকে সকলেই ভাবাবেগে থর থর করেছিল, তারপর ধীরে ধীরে বিশেষ করে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বিরূপতা অস্পষ্ট থাকছিল না।

একদিন তো বড়চাচা বলেই ফেললেন—তোমরা পাকিস্তানে এতদিন ফূর্তি মেরেছ—এখন নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে আমাদের ঘাড়ে এসে জুড়ে বসেছ, কী আমার নবাবের ব্যাটা হে!

অশিক্ষিত মানুষদের এমন করে বলতে আছে? সুফিয়ার দুঃখ হয়। কত শোক-তাপ সয়ে ওরা এসেছে। তার মানে ধর্মটাই বড় কথা নয়। দু-তরফই মুসলমান। অথচ ওপার বাংলার মুসলমানদের কেন ঈর্ষার চোখে দেখে এপার বাংলার মুসলমান? এ-ঈর্ষার জন্ম তো ধর্মের একক সত্তায় নয়, আছে অন্য কোথাও, অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধায়, সংখ্যাগরিষ্ঠতাসুলভ মনোবৃত্তিতে।

আজকাল ছোটবেলা থেকে চেনা ধ্যানধারণাগুলো আনাচে-কানাচে প্রশ্ন খুঁজে ফেরে সুফিয়া কোথায় যেন সুর কেটে যাওয়ার বেদনা তার অপরিণত মনে বার বার আঘাত করে। তার চোখে অশ্রু আসে। এ কোন অপরিচিত পৃথিবীতে সে পা রাখতে যাচ্ছে?

রাবেয়ার সঙ্গে পথ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল সুফিয়া। সুজাতাদি একটি স্টেশনারী দোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন। ছোট প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে সাবানের প্যাকেট দেখা যাচ্ছিল। চারপাশের বিষণ্ণ রমণীয় সান্ধ্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে এক মধ্যযৌবনা মহিলাকে দেখে আশ্চর্য সহানুভূতি বোধ করে সুফিয়া। সুজাতাদির সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, কপালে টিপ। দিব্যেন্দুদা এখনো কাজকর্ম কিছু করে বলে শোনা যায় না। এত উপহাস, ব্যঙ্গ, কটূক্তির মধ্যে সুজাতাদি নির্বিঘ্ন সংসার করে যাচ্ছেন। কে

যে কার মধ্যে কী খুঁজে পায়, বয়স সংস্কার এবং সামাজিক রক্ষণশীলতা তার কতটুকু ব্যাখ্যা দিতে পারে? পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের বিস্তার কি কোনো লৌকিক ধারণার বেড়াজালে সীমাবদ্ধ থাকে? কিছু চিরাচরিত বিশ্বাস, ঈর্ষা এবং দেখে যাওয়া ছাড়া সাধারণ মানুষের আর কোনো দায়িত্ব থাকে না।

চারপাশ অন্ধকার। নদীর ধারে এদিকটায় লোকজন নেই। পূর্ব-নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে সামসুল সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটের বিন্দু আগুনের অস্পষ্ট আভায় তার বিশাল মুখখানা অদ্ভুত দৈত্যের মত মনে হচ্ছিল সুফিয়ার।

সুফিয়াকে দেখে অস্পষ্টভাবে সামসুল বলল—শালীরানীও এসেছ যে, এ্যাদ্দিন বাদে এ-হতভাগাকে মনে পড়ল?

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সুফিয়া বলল—আমার দায় পড়েছে।

—আহা চটছ কেন? তুমি আসাতে আমি যে কত খুশি হয়েছি তা কী করে বোঝাই বল?

—বাজে কথা রাখুন। দুজনে কত জমা-হওয়া কথা বলবার জন্য হাঁশফাঁশ করছেন, মাঝখানে আমি এসেই যত ঝগড়া দিলাম।

—শালীরানী, বেশ গুছিয়ে কথা-টথা বলতে পারো। তোমার বুবুকে শিখিয়ে দিতে পার না?

—ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেন না? কেবল শালী-শালী করছেন?

—তাহলে কী বলব? ছোট বউ?

—আবার?

—ক্ষমা চাইছি। তা ঝগড়াই করবে, না নীচে গিয়ে বসবে?

ঢালু পাড় বেয়ে তিনজনে নামছিল। প্রথমে সুফিয়া, পেছনে সামসুল, সবশেষে রাবেয়া।

নামতে নামতে থমকে দাঁড়ায় সুফিয়া। হঠাৎ গায়ের ওপর অসভ্যের মতো হুড়মুড় করে সামসুল এসে পড়ে। গালের ওপর একজোড়া ঠোঁটের চাপ অনুভূত হয়, আর কর্কশ দাড়ির খসখসে ঘষটানি। মুহূর্তে সরে গিয়ে ডান হাতটা সজোরে ঘুরিয়ে সামসুলের গালে এক চড় বসিয়ে দিল সুফিয়া।

কেমন আশ্চর্যভাবে লম্বা ছুটিও ফুরিয়ে যায়, ভাবতে গেলে অবাক লাগে। রেজাল্ট বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট কলেজ [illegible]। ওদিকে রাবেয়াও কেমন দিব্যি সামসুলের সঙ্গে চলে গেল পাশের [illegible]। মায়ের দেওয়া টাকায় স্টেশনারির দোকান সাজিয়েছে। আব্বু খুব মেজাজ [illegible], এটাই ভয় ছিল। অথচ খবরটা [illegible]নে কিছুই বললেন না, মিটিমিটি একটু হাসলেন শুধু। সুফিয়া নিজেও ঘাবড়ে [illegible]ছিল আব্বুর ব্যবহারে।

মায়ের মাথার যন্ত্রণারও উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। সুফিয়া এখন বাড়িতে একদম [illegible]। ভাগ্যিস, কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। কলেজ জীবনের খোলামেলা স্বাধীনতার [illegible] মন্দ লাগছে না।

কো-এডুকেশন [illegible]লেরা ভারি মজার। যত রকমের দুষ্টুবুদ্ধি ওদের মাথায় গজায়। একজন বেশ মোটা থপথপে অধ্যাপকের নাম রেখেছে ব্যালট বাক্স। বিড়ির শেষ টান মেয়েছেলের চুমুর থেকেও নাকি বেশি মূল্যবান—এমন সব সারগর্ভ কথাও দেয়ালে লিখে রাখে।

আসলে প্রথম প্রথম একটু উন্মাদনা। কলেজ মানেই সাবালকত্ব প্রাপ্তি, এবং স্বাধীনতা। কো-এডুকেশন কলেজের সব থেকে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার, প্রথম থেকেই মনের মতো মেয়ে পছন্দের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ছেলেদের মধ্যে। ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি হয়। শহরের ছেলেরা একটু বেশি ফরোয়ার্ড, লাইন মারতে লজ্জা-শরমের ধার ধারে না। সেদিক থেকে গ্রামের ছেলেগুলোর দিকে তাকালে মায়া হয় সুফিয়ার। বেচারাদের পেট ভরা খিদে [illegible], অথচ স্বীকার করতে লজ্জা। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কোনোক্রমে একটা বাক্য বিনিময় কেউ করতে পারলে তাকে দেখে মনে হয় পৃথিবী জয় করে ফেলেছে।

অনিন্দ্য তাদের ক্লাশেই ভর্তি হয়েছে। মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয়ে যায়। কেউ এখনো সেই পুরোনো রাগ মনে করে রেখে দিয়েছে? আচ্ছা ছেলেমানুষ তো!

কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশন শিগগিরই হবে। সিনিয়ার দাদা-দিদিরা তাঁদের বিভিন্ন দলে যোগ দেবার জন্য সকলের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন। ক্যান্টিনে সভা হচ্ছে। গরম গরম বক্তৃতা হচ্ছে।

এখন সব কিছু অনেক শান্ত। বছর দুয়েক আগের টাল-মাটাল পশ্চিমবঙ্গের আঁচ এই ছোট শহরের দেহও স্পর্শ করেছিল। কিছুদিনের জন্য এই নিরুপদ্রব শহরটা কেমন উত্তেজিত এবং ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মাঝে-মধ্যে পথেঘাটে চেনা-অচেনা যুবকের বুলেটের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যেত। সুফিয়ার মনে আছে মাঝ রাত্তিরে আব্বুর ড্রয়িংরুমে একদল অল্পবয়সী ছেলে কখনো কখনো জমা হত। ভিতরে কী আলোচনা হত সে জানে না। এরা মাঝে মাঝে পুলিশের খপ্পরে পড়লে প্রভাব খাটিয়ে থানা থেকে তাদের ছাড়িয়ে আনতেন আব্বু।

অত কিছু বুঝতে চেষ্টা তো করেই না, মনের দিক থেকেও আগ্রহ পায় না সে। তার নতুন বন্ধু সাগরিকার সঙ্গে গল্প করে। মসৃণভাবে কেটে চলেছে তার কলেজ জীবন।

সাগরিকা নতুন এসেছে এ শহরে। এখানে ওর মামার বাড়ি। পুরোনো বন্ধুদের অনেকেই কলেজে ঢুকেছে। অথচ কলেজে পা দেবার পর ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে কীভাবে দূরত্ব এসে যায়, ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যায় সুফিয়া।

অনেক দিন থেকেই সাগরিকা ওর প্রেমিকের সঙ্গে সুফিয়ার আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলছিল। সুফিয়া নিজে সামান্য কৌতূহল ছাড়া এমন কিছু উৎসাহ প্রকাশ করেনি। ছেলেটি সাগরিকার দাদার বন্ধু। এ শহরেই ব্যাঙ্কে চাকরী নিয়ে এসেছে। সেজন্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মামার বাড়িতে থেকে পড়বার ব্যবস্থা করে সাগরিকাও এখানে চলে এসেছে।

একদিন কলেজে ঠিক হল, পরের রবিবার তিনজনে সিনেমা দেখবে, সেই প্রেমিক ভদ্রলোকও সঙ্গে থাকবেন।

পরিচয় হল। অবিনাশ সরকারের বয়স তিরিশের কাছাকাছি। শ্যামবর্ণ। মার্জিত কথাবার্তা। বেশ ভালো লাগল অবিনাশকে। কথাবার্তায় অন্তত ন্যাকামি ছিল না।

এভাবেই কেটে যাচ্ছে সুফিয়ার সময়। কলেজে নিত্য নতুন মজার ব্যাপার আবিস্কার, মাঝে মাঝে সিনেমা, সাগরিকার সঙ্গে শরীর ও মন নিয়ে অহেতুক ফাজলামি, ইচ্ছেমতো রেকর্ড প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, আর কোনো কিছু করার না থাকলে মন খারাপ করে নিশ্চল প্রহর গণনা। মাঝে মায়ের কাছে সোয়েটার বোনা শিখবে ভেবেছিল। কিছুটা বুনে আর উৎসাহ পেল না। এক ধরনের আলসেমি, সেই ঘরের পর ঘর বুনে যাওয়া, বিরক্তিকর। দিন দিন ধৈর্যও যেন কমে আসছে, অল্পেতে রাগ বেড়ে যাচ্ছে।

মায়ের শরীর দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। কয়েকজন স্থানীয় ডাক্তারকে দেখানো হয়েছে, কিছু বোঝা যায়নি। হাসপাতালে নতুন একজন ডাক্তার এসেছেন, তাঁকে দেখানোর কথা চলছে।

বস্তুত আব্বুকে কোনোদিনই ভালো মতো বুঝতে পারল না সুফিয়া। ছেলেবেলায় সেই আগ্রা ভ্রমণের কথা মনে পড়ে। রাতের বেলায় মায়ের সঙ্গে অত ঝগড়াঝাটি পরস্পরের প্রতি অত বিষোদ্গার—পরদিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে আব্বুর একেবারে অন্যমূর্তি। মাকে আদর করে ডেকে বলেছিলেন—শুনেছ বেগমসাহেবা — ভারত-চীন যুদ্ধ শুরু হয়েছে: এতকাল পরে একটা যুদ্ধ বাধল তাহলে। সেই কবে অল্প বয়সে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ধুমধাম দেখেছিলাম। চোখের সামনে বরকত মিয়া। সেই যুদ্ধের মার্কেটে লাখোপতি হয়ে গেল। ওঃ এই একটা সুযোগ—আল্লা এ্যাদ্দিন বাদে এনে দিলেন। জিনিসপত্তর বাঁধো—বাড়ি যাবো।

মা অবিশ্যি সামান্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—কাল সন্ধ্যেয় আগ্রা এলাম। এখনো তাজ দেখলাম না। এখনি চলে যাবে কি গো?

এখনো সুফিয়ার ভালো মনে আছে তার আব্বু এ জন্মের মতো তাজমহল দেখার আশা ত্যাগ করে ঝটপট বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। পথে রেলগাড়িতে আসতে আসতে অবশ্য প্রবোধ দিয়েছিলেন—আল্লা কপাল ফিরিয়ে দিলে আর রেলগাড়িতে না—প্লেনে করে বেড়াতে যাবো ইনশাল্লাহ্—

সেবার শহরে কী উত্তেজনা। রাজ্যপাল এলেন। স্থানীয় সিনেমা হলে সভা হল। আগ বাড়িয়ে আব্বু বেশ কিছু টাকা ও অলংকার ত্রাণ তহবিলে দান করে বসলেন। বাড়ি ফিরে এসে অবশ্য আফসোস করেছিলেন।

তা কয়েক বছরের মধ্যে ভারত-পাক যুদ্ধ বেধে গেল। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে একটা অন্তত ভীতির সঞ্চার হল। আব্বু বিচিত্র তৎপরতায় একই সঙ্গে শহরের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতে থাকলেন। বেশীর ভাগ গরীব মুসলমানদের তিনি বোঝালেন—বর্ডার পেরিয়ে ইস্ট-পাকিস্তানে চলে যা—জানে বেঁচে যাবি। নইলে পাকিস্তানের স্পাই বলে সব কটা এপারে হাজতে পচে মরবি।

ওদের মধ্যেও ওপারে পালানোর হিড়িক পড়ে গেল। নামমাত্র মূল্যে ওদের ভিটে জমি কিনে ফেলতে থাকলেন আব্বু। মুখে আওড়াতে থাকলেন—কসমের খেদমতের জন্যই জানটা নিয়ে এখানে পড়ে আছি। আল্লার কসম, তোদের জন্য শহীদ হলে গেলে এ জিন্দেগীতে আর কোনো আফসোস থাকবে না। খোদাতালার ইচ্ছে থাকলে পাকিস্তানে বেহেসত পাবি তোরা সাপ। আর পাকিস্তানের জমিতে পা দিলে জানিস তো —খরচ করে মক্কা যেতে হবে না হজ্ব করতে

পরে সুফিয়া দেখেছে এইসব গরীব মানুষেরা পাকিস্তানে গিয়েও স্বর্গরাজ্য পায়নি। আবার ফিরে এসেছে এদেশে। বেশীর ভাগ মানুষই ভিখিরী হয়ে গেছে। ফিনু দরজী এখন অক্ষম শরীর নিয়ে মোড়ে বসে ভিক্ষে করে।

কীভাবে একই শহরে দুই সম্প্রদায়ের কাছে উদার প্রকৃতির মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আব্বু—ভাবতে গেলে অবাক হয় সুফিয়া। মসজিদ কমিটির যেমন সম্পাদক তিনি, পাড়ার শারদীয়া পুজো কমিটিরও সহ-সভাপতি। দু পক্ষকেই মোটা চাঁদা দেন। দু-পক্ষই তাঁকে মাথায় করে রেখেছে। মাঝে মাঝে সকলের সামনে রসিকতা করে বলেও ফেলেন—হিন্দুদের এত গন্ডা দেব-দেবীর মধ্যে পুজো যদি করতেই হয়, লক্ষ্মী আর গণেশের করাই ভালো! আমি নিজে বসব পুরুত হয়ে...

নিজের জন্য ভাবতে গেলে কষ্ট হয় সুফিয়ার। টের পায়, বুকের মধ্যে সেই বহুদিনের লুকোনো গুটিপোকাটা ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়ে কবে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। সাতরঙা ডানা মেলে প্রজাপতিটা আকাশে রোদ্দুরে রোদ্দুরে উড়ে বেড়াচ্ছে, ডানায় বিচিত্র নকশাগুলি ঝিকমিকিয়ে উঠছে, অথচ কোন বাগানের কোন ফুলগাছে মধু আছে, তার জানা নেই। এই সুন্দরতম দিনগুলি সে হেলায় বিনা উদ্দেশ্যে অর্থহীনভাবে অপচয় করে চলেছে।

বাড়ি যেন পাষাণপুরী। রাবেয়ার মতো একটি রোগা নির্বিরোধ মেয়ের নিশ্চুপ অস্তিত্বও যে অনেকখানি ভরিয়ে রাখত, একথা কে তখন ভাবতে পেরেছিল? সুফিয়া মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। রিজিয়া-খালার সঙ্গে গল্প হয়। কোনোদিন ছোট চাচীর সঙ্গে দেখা করে আসে। কখনো বড় চাচাও এ-বাড়িতে আসেন। বেশীর ভাগ সময়েই আব্বুর সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত। ইদানীং এ ভদ্রলোকের ওপর এতটুকু করুণা করতে পারে না সুফিয়া। যত গন্ডগোলের মূলে এই লোকটা। কেন তিনি নিজের বউয়ের মন জয় করতে পারেন নি? নিজের মেয়ে প্রেম করে বিয়ে করে পাশের শহরে দিব্যি ঘর-সংসার করছে, অন্তত তার সম্পর্কেও এতটুকু আগ্রহ কেন দেখান না? রাবিটাও আচ্ছা স্বার্থপর মেয়ে। একটা চিঠি পর্যন্ত দেয় না। সুফিয়াকে না হোক মাকে তো দিতে পারে। মাঝে মাঝে সুফিয়া ভাবে—এই যে জীবন, তার আব্বুর, মায়ের, রাবেয়ার বা অন্য সকলের, কারোর সঙ্গে কারোর কোনো মিল নেই, প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন পথে অনির্দেশ যাত্রা।

আজকাল মনে মনে মৃত্যুভয় উপলব্ধি করেন শফি। বেলা তো গড়িয়ে এল। তাঁর ঠাকুর্দা অল্প বয়সে মারা গেছেন। বাবাও বেশীদিন বাঁচেন নি। আসলে তখন এত ভালো ভালো ওষুধ ছিল না। চমকে উঠলেন শফি—এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই কি তিনি ভাবতে চেষ্টা করছিলেন? এখন কত ভালো ভালো ডাক্তার, ওষুধ—তবু নিত্য নতুন বিদঘুটে অসুখ—

হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু নাজমাকে পরীক্ষা করে আন্দাজ করেছেন—ব্রেন অ্যাবসেস। এই মফস্বল শহরের হাসপাতালে ওসব ডেলিকেট অপারেশন সম্ভব নয়। কলকাতাতেই যেতে হবে।

অনেকদিন কোনো ফুলের সুগন্ধ গ্রহণ করেন নি শফি। অথবা খেয়াল করেন নি। বাগান থেকে হাসনুহানার মিষ্ট গন্ধ ভেসে আসছে। গন্ধ কি স্মৃতি বয়ে আনে? কানের পাশে কাঁপা কাঁপা গলায় সম্বোধন—শফি... বাবা শফি রে...

বুকের গভীরে বিহ্বল ঢেউ খেলে যায়। হাতের মদের পাত্র থেকে ছলকে উঠে খানিকটা মদ পড়ে যায়। হাত কাঁপে! বুক টন টন করে। প্রাচীন কুসংস্কার জাগ্রত হয়। মা বলত—হাসপাতালে গেলে কেউ ফিরে আসে না রে শফি—

—শফি—শফিরে কে ডাকে? সেই স্নেহময় সম্বোধন হাসনুহানার গন্ধের সঙ্গে শফির সমস্ত চেতনায় মুঠো মুঠো অতৃপ্তির বিষাদ ছড়িয়ে দেয়। ব্যাকুলতা বেড়ে ওঠে। এ কোন ভালোবাসাহীন তৃষ্ণার জগতে তিনি হারিয়ে যাচ্ছেন? চোখের সামনে ভেসে ওঠে রান্নাঘরের সামনে ছোট ঘেরা জায়গাটায় বড় ভাই আর শফি একসঙ্গে ভাত খাচ্ছে। বড় ভাই মায়ের জাল মাছের চচ্চড়ি আর একটু চেয়ে নিল। সেই বড়ভাই, সেই শফি, আব্বা মা চাচা চাচী আর সকলে—এতদিন কাউকে

তাঁর মনে পড়েনি? ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কত আপনার লোককেও এরকম ভুলে যাওয়ার অতল গহ্বরে ইচ্ছে করে ঠেলে দিতে হয়।

শফির এখনকার পৃথিবীতে কোনো ছায়াঘন বৃক্ষের গভীরে সেই পুরুষ তার নারীর চিবুকে হাত রাখে না। কতকাল কোনো রূপকথা তার মায়ামহলের রূপালী বন্যায় দুদ্দাড় ঝাঁপিয়ে পড়ে না। কোনো শিশু নিঃসাড় অমাবস্যায় অন্ধ ভবিতব্যকে স্মরণ করে প্রকুঞ্চিত করে না। এখনো প্রবাসের শেষে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আশা করে শফি? পায়ের তলায় সোনালী সবুজ ঘাস দলে যাচ্ছ, এখনো স্বদেশ চিনতে পারলে না? শুধু শুধু ফুল ছড়ানোর খেলা করার দিন তোমার শেষ হয়ে গেছে শফি।

চোখের সামনে সবকিছু ঘোলাটে হয়ে গেল। তবু কেন এত দুঃখেও চোখে অশ্রু আসে না? শেষ পর্যন্ত তাহলে নত মস্তকে পরাজয় মেনে নিতে হয়। ক্ষতি নেই! উত্তেজিত হন শফি। নাজমাকে তিনি সুস্থ করে তুলবেন। সুফিয়ার বিয়ের চিন্তা করে দরকার নেই। একালের মেয়ে, ঠিক মনের মতো কাউকে বেছে নেবে। তাঁর নিজের বলতে এখনো কিছুই করা হল না। কলকাতা থেকে ঘরে এসে কাজে লেগে পড়লেন। বড় বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে। শফিনগর প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

তাসের প্যাকেট বের করে একা একা পেসেন্স খেলতে থাকেন শফি।

কাল ভোরের ট্রেনে কলকাতা যাওয়া হবে।

সবকিছু গোছানো হয়ে গেছে। ক'দিন থাকতে হবে ঠিক নেই। ব্যবসা-পত্তর দেখার সব বন্দোবস্ত করে যাচ্ছেন শফি। সুফিয়া অবশ্য বুঝে পায় না, এত দেখাদেখির কী আছে! সবাই তো এক-একটা যন্ত্র। আপন নিয়মে দিব্বি গড়গড় করে চলে যাবে।

রাবেয়ারা কোনো যোগাযোগ রাখেনি। সেজন্য খবর দেওয়া গেল না। ভালো হয়েছে। সুফিয়া মনে মনে খুশী, ওরা তাহলে সত্যি সত্যি নিজেদের পৃথিবী গড়ে নিতে পেরেছে। চোখের আড়ালে যাওয়া মানেই তো আর মন থেকে নির্বাসন নয়। সেই শীর্ণ লাজুক প্রকৃতির মেয়েটার মধ্যে জীবনের প্রতি এত আকাঙ্ক্ষা ছিল? সামসুলের হৃদয়েও এত জীবন-স্পন্দন সম্ভব? হয়ত বাইরে থেকে কিছু বিচার করতে যাওয়া বোকামি।...

স্বাধীনতার পর এতগুলো বছরে সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে খণ্ডিত এই পশ্চিম বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা রূপান্তর ঘটেছে। সে একটা ভারত-পাক যুদ্ধ নয়, কিম্বা শোষণ থেকে শোষণ-বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতৃত্বও নয়, এ রূপান্তর আজো প্রচ্ছন্ন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মানুষের ভাবনায় স্বপ্নে কিম্বা প্রতিদিনের বাস্তব জীবনেই এই বাংলার মুসলমান নামক পরিচিত সম্প্রদায়টি বিরাট এক হিন্দু সম্প্রদায়ের ছায়ার নীচে প্রায় অদৃশ্য প্রায় পরিচয়হীন। এদের প্রতি যত করুণা আছে, ভোট-যুদ্ধে সংখ্যাবৃদ্ধির তাড়নায় দলে দলে এদের নিয়ে যত কাড়াকাড়ি আছে, বিগত তিনটি দশকের বিবর্তনের সে তুলনায় পরিচয় প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রিয় পাঠক, এ কাহিনী একটি আধাশিক্ষিত সুখাভিলাসী অতি সাধারণ মুসলমান পরিবারের ক্রমিক রূপান্তরের ইতিহাস। এ ইতিহাসের কুশীলবেরা নিজ নিজ রূপান্তরের পথে নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নীরব রূপান্তর ঘটেছে এই সংসারের আশে-পাশের জগতে, শান্তিপ্রিয় প্রকৃতির একটি ছোট মফস্বল শহরের ওপর। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রতিনিয়ত একটি সমাজের যে রূপান্তর ঘটছে সে রূপান্তরে [illegible], শফিউল, নাজমা, রাবেয়া, সামসুল, আনিন্দ্য, লক্ষ্মী—অংশ নিয়েছে সবাই। [illegible] ছবি উন্মেষ হয়েছে দিনে দিনে বেড়ে ওঠা সুফিয়ার চোখের তারায়।

আজকের সুফিয়া মাথার্ণমারী তন্বী যুবতী। [illegible] স্বপ্ন [illegible] থেকে পাঁচিশ বছর আগের সে কোনো একটি মুসলমান মেয়ের থেকে একেবারে [illegible]। [illegible] পরিবর্তন ঘটেছে, সুফিয়ার রূপান্তর সে তুলনায় অনেক অনেক বেশী।

আসলে মানুষের প্রতিটি মৌলিক আবেগের সহযোগী কতকগুলি চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং আত্মদর্শন। মৌলিক আবেগে যখন সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন এই সহযোগীরা তার সংকেত পায়, সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়সাধনকারী এক নতুন আবেগ জন্ম নেয়। এভাবেই মানুষ পরিবর্তনের নতুন আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।

উদ্ভিন্ন যুবতী সুফিয়ার দেহে-মনে রূপান্তর ঘটেছে প্রত্যহ এবং প্রতিদিন। আর এই রূপান্তরগুলো জলছবি নয় যে মুছে যাবে—তা স্পষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী এবং নিজস্ব সত্তায় উজ্জ্বল। সুফিয়া মাঝে মাঝে ভাবে, তার এই আজন্ম স্বপ্নের জগৎ থেকে কি নিষ্কৃতি পাবে না? সে কি স্বপ্নোম্মাদ, তাই নিজের এই ছায়াকল্পগুলি নিয়ে সদা বিব্রত?

যখন অল্প বয়স ছিল, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি কিছু চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। মনের মধ্যে একটা ধারণা জন্ম নিয়েছিল, আমরা ধনী। পৃথিবীর সমস্ত সুখ টাকা না থাকলে পাওয়া যায় না। বাড়ি-গাড়ি আসবাবপত্র গহনা পোশাক এ সবের জন্য যাদুদণ্ড থাকা দরকার। আব্বু ছিলেন সেই অতীব রোমাঞ্চময় ম্যাজিসিয়ান। অলাদীন হেলানে হাজার হাজার অশুভ আত্মা নতজানু হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করত। এ-রকম একটা দৃশ্য কল্পনা করে সে আনন্দ পেত, শিহরণ হত, শির শির করে বাতাস বয়ে যেত মগজের মধ্যে।

তারপর চারপাশে নিত্যদিন পরিবর্তনের ঢেউ খেলা করে যায়। নিজের সুন্দর দেহের বিচিত্র রূপান্তর মুগ্ধ রহস্যময়তায় আকুল করে সুফিয়াকে। তার নিজের কী পরিচয়? জন্মসূত্রে একটি মুসলমান পরিবারের মেয়ে সে। কিন্তু এই ভাগ্যচক্রে পাওয়া মিথ্যে খোলশের বাইরে তার অস্তিত্বের মধ্যে যে নিজস্ব নারীসত্তা, প্রকৃতির মতো অনন্ত বিস্ময়ে ভরা—এই একান্ত পরিচয়লিপি আবিষ্কার করে সুফিয়া পুলকিত হয়। আজ যদি অনিন্দ্য এগিয়ে আসে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব সরিয়ে রেখে, একজন পুরুষের হাত ধরে একজন নারী হিসেবে চিরকাল পথ হাঁটতে মনের দিক থেকে অন্তত সুফিয়া কোনো বাধা খুঁজে পায় না। অন্যমনস্কভাবে একটি প্রিয় গান গুনগুন করে গেয়ে ওঠে...হৃদয়ের এ কূল ও কূল দু'কূল ভেসে যায়, হায় সজনী...

অন্ধকার নিভৃত কক্ষ। সুখের আদলে বিবর্ণ স্বপ্নের আনাগোনা। সুফিয়া যেন সেই দুয়ারেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, হলুদ হেমন্ত যেমন রিক্ত পত্রহীন। প্রহরে প্রহরে গির্জার ঘণ্টা। অন্ধকার ভেঙে বেড়ালের চিৎকার। হঠাৎ ঘুম ভেঙে অর্ধেক চেতনায় শার্সিতে অস্পষ্ট দৃষ্টিপাত, কেউ আসে না আসে ঈশান থেকে। টুকরো টুকরো দুঃস্বপ্নের পুনরাভিনয়, ছোট ঘর, উঠোনে রজনীগন্ধা, মধ্যবিত্ত সুখ...

এরাই তার নির্দিষ্ট চাওয়া পাওয়া—আঁচলের খুঁটে বাঁধা শস্যের দানা। নিষ্কম্প প্রদীপের আলোয় কারোর পথ চেয়ে বসে থাকা। নরম আঁখির তন্দ্রার পুরোনো শ্যাওলার ছাপ, অস্ফুট রক্তগোলাপ কেমন ম্লান, ঈপ্সিত রুমালের কোণে কত দিনের চেনা দাগ—ঠিক এখনই তো রাজপুত্তুরের আসার সময় হল। চারদিক বালি আর বালি, [illegible] আসছে ঘোড়সওয়ার, জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি তার সর্বাঙ্গে, চাবুক আঁকড়ে হিংস্র শ্বাপদের রক্তলেখা শেষ করে দিচ্ছে, না—চোখ তার নীল কাচের মতো জ্বলজ্বলে নয়, মুখে নেই নেকড়ের অক্ষর। এ মুখ কারো [illegible] মেলে না, অথচ কতকালের চেনা, যেন জন্ম-জন্ম ওই রাজপুত্তুর একদিন জ্যোৎস্নার ছুটে এসেছে।

তারপর প্রবল উৎসাহে সেই পুরুষ যান্ত্রভাবে সুফিয়ার প্রতিমা নির্মাণ করে, তার আকুল করা প্রার্থনা-ছন্দে অন্তহীন রঙের তরঙ্গ বৃষ্টির জলে ধুয়ে বাতাসে মিশে যায়। প্রকৃতির আন্তর স্পর্শে পাতাঝরা বাতাসে শিশুর কান্নায় স্থিরতর স্মৃতি চঞ্চল হয়, মৃত পাখির পালক কুয়াশায় ফাটলে অদৃশ্য হয়।

ঘুমের মধ্যে যুবতী সুফিয়ার ঠোঁট কাঁপে, আঁচল সরে যায়, রঙ্গীন শরীরের মর্মর ছবি নির্বাক স্বপ্নের মালা গাঁথে।

অপাপবিদ্ধা

দীপঙ্কর সেন লিখিত

পরিতোষ সেন চিত্রিত

মন্দিরা

বাইশ বছর পরে প্রতীপের সেদিন হঠাৎ **ইচ্ছা হল মন্দিরাকে** দেখতে। অল্প বয়সে **এমন প্রায়ই হত।** তখন কোনদিক থেকে **বাধা ছিল না। আজ সবই** বদলে গেছে। বিয়ে **করে প্রতীপ** এখন পুরোদস্তুর সংসারী। **শর্বরীর মত স্ত্রী পাওয়া** ভাগ্যের কথা। **নম্র, শান্ত এই মেয়েটির সহজ সরল** জীবনে **যেমনই গভীর আস্থা,** তেমনই অসাধারণ **ভীতি নিয়ম** বহির্ভূত চাল-চলনে. দীঘির **জলের মত গভীর** তার চাহনীতে আছে নীড় **বাঁধার** আমন্ত্রণ। বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত **খোলা মাঠের মত** বৈচিত্র্যহীন, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। **তার গায়ের** মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে **মায়ের আঁচলের** নিরাপদ **আশ্রয়ের** প্রতি-**শ্রুতি।**

মন্দিরা ছিল **এর** ঠিক উল্টো। যেখানে যা কিছু নিয়ম সব ভেঙ্গে ফেলতেই তার যত আনন্দ। নিয়ম ভাঙ্গতে শিখেই প্রতীপ আদায় করে নিয়েছিল তার কাছে এগিয়ে যাবার অধিকার। বিধাতাও যেন সমস্ত নিয়মকে উপেক্ষা করে মন্দিরাকে সৃষ্টি করে-ছিলেন। এক শিল্পী বন্ধু বলতেন মাইকেল এঞ্জেলো কালো পাথর দিয়ে নারী মূর্তি গড়লে তা নিশ্চয় মন্দিরার মত হত। তার মত সে মূর্তিটিও তার দীর্ঘ কৃশ অঙ্গের বিন্যাসে এবং যৌবনছন্দে চতুর্দিককে সংক্রামিত করত। প্রতীপকে বড়ই কাছে টেনে নিয়েছিল মন্দিরা। তার জাগরণে এবং নিদ্রাকে আচ্ছন্ন করে তার স্বপ্নেও সে **অগ্নি সঞ্চার করেছিল।**

ওদের আলাপ আত্মীয়তার ক্ষীণসূত্রে। প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল মন্দিরা যার সঙ্গে সাত-পাকে বাঁধা পড়েছিল তার প্রাণের সন্ধান সে কোনদিন পায়নি। প্রতীপ তার নিরানন্দ জীবনে এনেছিল একটা নতুন সুরের সন্ধান। সড়জোর তিনটে বছর। সময়ের বিচারে সংক্ষিপ্ত হলেও বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসে অভিসিঞ্চিত একটা যুগ। তার সবটুকুই সুখকর নয়। কারণ মন্দিরার খেয়ালীপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে প্রতীপ সবসময় পারেনি। বহুবার প্রতিজ্ঞা করেছে মন্দিরার ম[illegible] আর করবে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা র[illegible] পারেনি।

মন্দিরা [illegible] আত্মাভিমানে আঘাত করে, তার স্নায়ু[illegible] ছিন্নভিন্ন করে বারবার তাকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু তারপরেই তার চোখে ফুটে উঠেছে নিবিড় প্রেমের এমন এক ইশারা যাকে উপেক্ষা করার সাধ্য কোন পুরুষের নেই। সেই মুহূর্তে মন্দিরার চোখের দিকে তাকিয়েই মনে হয়েছে তার হৃৎস্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। অতীতে মেয়েদের যে পরিচয় সে পেয়েছে তা সহজ বশ্যতাপূর্ণ আত্মসমর্পণের একঘেয়েমিতা-ভরা। একবার জানা হয়ে গেলে যার সম্পর্কে আর কোন কৌতূহল থাকে না। কিন্তু মন্দিরা তার জীবনে এনে দিয়েছিল অপূর্ব বেদনাভরা এক আনন্দের আস্বাদ। যার মৃদুতম, ক্ষীণতম আভাসটুকু পেলেই দেহ-মন-অন্তরাত্মা যেন সমস্ত চৈতন্যের উপর ভীড় করে ছুটে আসে।

ব্যাপারটি শুরু হল আচমকা। পুজোর ছুটিতে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে প্রতীপ গেছিল মধুপুরে। কথা ছিল পনেরো দিন থাকার। কিন্তু চার-পাঁচদিন পরেই সে অস্থির হয়ে উঠল। জোর করে আরো দু-চারদিন কাটাবার পর বুঝতে পারল কল-কাতায় না ফিরলেই নয়। বাকস-বিছানা বেঁধে তাড়াঘাড়ি রওনা হল। হাওড়া স্টেশন থেকে কোনমতে বাড়িতে জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়ে ছুটল মন্দিরাদের বাড়ি। মন্দিরা তখন তার স্বামী ত্রিলোকেশের এক বন্ধুর পরি-বারের সঙ্গে মোটরে করে দক্ষিণ ভারত সফরের আয়োজন করছে। বন্ধুটির নাম ব্রজ-গোপাল মজুমদার। বিখ্যাত সার্কাস পার্টির অধিনায়ক। ঠিক হয়েছে তাদের দশ বছরের মেয়ে সুচন্দ্রাকে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে রেখে ত্রিলোকেশ আর মন্দিরা এক মাসের জন্য বেরিয়ে পড়বে। এমন চমৎকার সুযোগ ত রোজ পাওয়া যায় না। কোন ব্যাপারে কেউ এতদূর এগিয়ে যাবার পর তাকে বাধা দেওয়া **অর্থহীন। প্রতীপ তবু একবার ভাবল যে**

এতটা পথ একটা ছোট গাড়ি করে পাড়ি দেবার প্রয়াস খুব নিরাপদ নয়। বিস্তারিত-ভাবে পথের দুর্ঘটনা, চোর-ডাকাত কিম্বা তার চেয়েও খারাপ লোকদের কথা মনে এলেও বলল না। মন্দিরা একবার যখন মন-স্থির করে ফেলেছে তখন সে বিষয়ে আলোচনা করা বাহুল্য বলেই মনে হল।

বাড়ি ফিরে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল প্রতীপ। কিন্তু মনের সে অবস্থায় কি কেউ বই পড়তে পারে। মন্দিরার উপর তার যে কোন অধিকার নেই, তা সে জানত। কিন্তু এমন করে সেই অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি কোনদিন দাঁড়াতে হয়নি। অসহ্য তার জ্বালা। আগের রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। এলোমেলো নানা কথা চিন্তা করতে করতে ঘুম নেমে এল চোখে। স্বপ্ন দেখল মন্দিরা তার পাশে এসে বসেছে। তার চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলো বুলিয়ে দিচ্ছে তার মাথার চুলে। ঘুম ভেঙ্গে যেতে ধড়মড় করে উঠে দেখল স্বপ্নটা পুরোপুরি মিথ্যা নয়।

'কখন এলে?' জিজ্ঞাসা করল প্রতীপ।
'একটু আগে', বলল মন্দিরা।

'বাড়িতে তোমার কত কাজ...সেসব ফেলে...'

'তুমি যেরকম রাগ করে চলে এলে তারপর না এসে উপায় কি?'

'আমি রাগ করলে তোমার কি এসে যায়? তাছাড়া আমি ত তোমার উপর রাগ করিনি।'

'তবে?'

'একথারও উত্তর দিতে হবে?'
'নিশ্চয়!'

'তোমার প্রশ্নটা সাধারণ নয়। তাই উত্তরটাও হবে একেবারেই অসাধারণ।'

এতদিন দুজনে কত বেড়িয়েছে। সিনেমা হলে অথবা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসেছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও কেউ কাউকে স্পর্শ করেনি। সেদিন একটা জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সংযমের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। দু-হাত দিয়ে মন্দিরাকে টেনে নিল বুকে। ওর চুলের গন্ধে, তার কোমল নিবিড় যৌবনের সংস্পর্শে মনের মধ্যে একটা উন্মাদকর ঢেউ উঠে লুপ্ত করে দিল তার বিচারবুদ্ধি। স্পর্শের বিচিত্র যাদুতে জেগে উঠল সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক নারী। প্রতীপের ঠোঁটে সেও এঁকে দিল তার প্রেমের প্রথম স্বীকৃতি। একটি মাত্র চুম্বনের মধ্য দিয়ে উন্মাটিত এই মন্দিরার রূপের, তার স্পর্শ মাধুর্যের যেন লগ্ন-ক্ষণ নেই। সেই বিশেষ মুহূর্তটি হয়ে উঠল গানের মত বাধাবন্ধনহীন। নিয়ম কানুনের কোন বালাই রইল না তাতে। কলকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলিতে বিধাতা সেদিন যেন দিগন্তের বাড়ির বাল্মীকিতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। যাবার

শর্বরী

আগে মন্দিরা বলে গেল একটা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আশ্বাস দিল ফিরে এসে আবার সেদিনকার মত আদর করবে প্রতীপকে।

মাত্র একটা চিঠিই সে লিখেছিল। বোধ-হয় মাদুরা থেকে। নিতান্ত মামুলী পত্র। রজকিনীর প্রেমের মত কামগন্ধহীন। একটু উপদেশের সুরও ছিল তাতে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত ঊর্ধ্বে টেনে নেওয়া যায়। অথচ প্রতিনিয়ত তাকে নিচের দিকে নামিয়ে আনতে আমরা কি উন্মুখ। মনে মনে হাসল প্রতীপ। এ নিশ্চয় প্রকৃতির শোভা আর তীর্থ দর্শন করে ক্ষণিকের বৈরাগ্য। কলকাতার পরিবেশে এ জিনিস স্বাভাবিক কেটে যাবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন মেয়েদের মনের কথা দেবতারাই জানেন না ত মানুষ তার কি বুঝবে। মন্দিরা ফিরে আসার পর কথাটির তাৎপর্য বুঝতে পারল প্রতীপ। তাদের মধ্যে একটা কিছু যে ঘটে গেছে একথা মন্দিরা হয় ভুলে গেছে অথবা মন থেকে মুছে ফেলেছে। একদিন মার্টিন কম্পানির ছোট ট্রেনে আটপুরে যাবার পথে প্রতীপ সোজাসুজি সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। মন্দিরা কি তাকে আর ভালবাসে না? চমকে উঠল মন্দিরার উত্তর শুনে। প্রতীপকে সে ভালবাসে। খুবই ভালবাসে। কিন্তু প্রেমিকের মত নয়, ভাইয়ের মত। তাই প্রতীপ যেমন করে তাকে চায় তেমন করে ধরা দিতে সে কোনমতেই পারবে না। একটা মানুষের মনের ভাব যে এত তাড়াতাড়ি এমন করে বদলে যেতে পারে প্রতীপ তা জানত না। মন্দিরার এরূপর তাকে সন্তানের মত মনে হলেও তার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তার জীবনে সে সমস্যটা বিচারের নয়। সেটা তার ভালবাসার বস্তু। ফুলে-ফলে গন্ধে বর্ণে অপূর্ব তার সমারোহ। তবু মাঝে মাঝে মনে হত এমন সুন্দর একটি মেয়ে কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে! যে তাকে ভালবাসে তার কাছে ধরা না দিয়ে, তাকে নির্দ্বিধায়

প্রতীপ

কি তার যত আনন্দ! কখনো যামিনী রায়ের আঁকা মায়ের ছবির মত শান্ত সমাহিত তার রূপ। কখনো সে অপ্রতিরোধ্য তার মোহিনী মায়ায়। পরিস্থিতির বিপরীতধর্মী নানা দিকগুলো মানুষকে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করে তোলে: তাই বোধহয় যাকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করা উচিত সেই হয়ে উঠল প্রতীপের জীবনের ধ্রুবতারা। মূল্যবোধের রং কবেই ফিকে হয়ে এসেছিল। এরপর তোর কিছুই আর রইল না। মনের যা-কিছু বিস্ময় সবই পরিণত হল জিজ্ঞাসায়।

সাহস করে মন্দিরাকে আর একবার বুকে টেনে নিতে কোথা থেকে আসছিল দুস্তর বাধা। একি সাহসের অভাব? মনস্তাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ বলেন সাহস জিনিসটিকে নিয়ে চিরদিনই একটু বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। লালাগ্রন্থি আর স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপে একটি বিশেষ ধরনের আচরণকেই আমরা সাহস বলে থাকি। এরপর বলতে হয় একটা লম্বা লোককে একজন বেঁটে লোকের থেকে মহৎ বলে স্বীকৃতি দান করতে না পারলে সাহসীকতা কথাটিকে নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি আছে? মনস্তাত্ত্বিকদের খবর প্রতীপ অবশ্য রাখত না। নিজের ভীরুতা এবং সঙ্কোচের জন্য তার মনে একটা গ্লানির ভাব জমা হয়ে উঠেছিল। নিজের চরিত্রে অসীম ধৈর্য এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়েও সে ভাবটি কাটেনি। অবশ্য তার প্রতিদানে মন্দিরা তাকে তার কাছাকাছি থাকতে দিয়েছে। যেমন করে মেয়েরা পোষা বেড়ালকে পাশে পাশে রাখে।

একদিন গ্লোব সিনেমায় বসে নোয়েল কাওয়ার্ডের একটা নাটকের চিত্ররূপ দেখছিল দুজনে। মন্দিরা হঠাৎ প্রতীপের ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল নিজের বুকে। প্রতীপের উষ্ণ করস্পর্শে একটা আবছাভাবে অনুভব করা অস্বস্তি দূর করবে বলে। অসংখ্য অপরিচিত মানুষের সঙ্গে একটা বদ্ধ অন্ধকার ঘরে বসে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফুলের পাপড়ির চেয়েও কোমল অঙ্গের স্পর্শে দ্যুলোক এবং ভূলোকের সম্মিলিত স্পন্দন অনুভব করল প্রতীপ। ছবিটা শেষ হলে মন্দিরাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেল।

ত্রিলোকেশ সকালে ব্যারাকপুরে এক

ত্রিলাকেশ

শ্বশুর পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে ফোনে খবর দিয়েছে রাত্রে সে আর ফিরবে না। ওরা সিনেমা থেকে ফেরবার আগেই সুচন্দ্রা ঘুমিয়ে পড়েছিল। রান্নাঘরে চায়ের ফরমায়েশ দিয়ে মন্দিরা বাথরুম গেল হাতমুখ ধুয়ে আসতে। প্রতীপ মন্দিরাদের শোবার ঘরের একটা ইজি চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালো। মধ্য বিত্ত বাঙ্গালীর শয়নকক্ষের কোন সরঞ্জামেরই অভাব ছিল না সেই ঘরে। পরিবারের নানা-জনের ছবির সঙ্গে দেশের বিখ্যাত ধর্মগুরু, কবি, রাজনীতিবিদ এবং ক্যালেণ্ডার থেকে কাটা একটা বাঘের ছবিও ছিল। তাছাড়া ছিল অলোকেশের বিলেতে তোলা একটি ফটো-গ্রাফ। মাথার চেয়ে চোয়ালটা অনেক বেশি স্পষ্ট। দৃষ্টিতে একটা বোকা সরল্য এবং আত্মতৃপ্তির ভাব। সব মিলে চোখ দুটো একটা লড়াইএ জেতা ষাঁড়ের মত।

সাবান আর পাউডারের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে মন্দিরা ফিরে এলে প্রতীপের চিন্তার স্রোত প্রতিহত হল। প্রতীপকে অনুরোধ করল শোবার ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় গিয়ে বসতে। মন্দিরা এই কথাটি বুঝে উঠতে পারে নি যে একটা দশক অতিক্রম করার পর প্রতীপের মত ভীরুরও ভয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর তার লালাগ্রন্থি এবং এবং স্নায়ুতন্ত্র তাদের চিরপরিচিত ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন করে ফেলে। আয়ত্তাধীন একটি আগুনের শিখা দমকা হাওয়া লেগে তার অনেকদিনের জমে ওঠা ক্ষোভ এবং ক্রোধের রূপটি উদ্ঘাটিত করলে তাকে যেমন ভয়ংকর দেখায় সেই মুহূর্তে প্রতীপের তেমনই মনে হচ্ছিল। জোর করে মন্দিরাকে টেনে নিয়ে গেল শোবার ঘরের সংলগ্ন ভিতরের একটি ছোট কামরাতে। মানুষের তৈরি আবরণ বিধাতার নিজের হাতে গড়া সম্পদকে কখনো কখনো ম্লান করে দেয়। মন্দিরা যখন শুধুই মন্দিরা তার বিস্ময়ের নেই সীমা, নেই পরিসীমা। একি জমাট বাঁধা সঙ্গীত না ধরিত্রীরই আরেক রূপ। অতি পরিচিত একটি মুখ সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কি রহস্য সৃষ্টি করেছে। মাতৃত্বের পরম গৌরবে ভূষিত সে মূর্তির প্রতিটি অঙ্গ পরিতোষ সেনের চিত্রের পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিতা নারীর মত যেন গান গেয়ে উঠছিল—আমা-দের দেখ। সৃষ্টি, কীর্তি এবং প্রাণের চরম উপাদান আমরা। পৃথিবীর পরম ঐশ্বর্য। বিধাতার লক্ষ কোটি বছরের ধ্যানের ফল-শ্রুতি।

*

মন্দিরার অফিসের টেলিফোন লাইনটা চাইবার পর পুরনো সব কথা এক ঝলকে মনে পড়ে গেল। কতদিন মন্দিরাকে দেখে নি অথচ এই দীর্ঘ কুড়ি বাইশ বছর দুজনেই কলকাতায় কাটিয়ে দিয়েছে। মন্দিরার গলা ভেসে এল। তাতেএকই সঙ্গে রয়েছে কৌতূহল এবং ব্যস্ততার সুর।

মন্দিরা সেন বলছি।

আমি প্রতীপ গুপ্ত।

কোন প্রতীপ গুপ্ত।

এক বিখ্যাত রাজনীতিবিদের যাদুর মতই প্রতীপ গুপ্তও একটিই। যাকে তুমি চেন।'

'কি ব্যাপার ?'

তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'পঞ্চাশ বছর বয়সে এমন ইচ্ছা হওয়া ভাল নয়।'

'না, না শোন মন্দিরা........'

বহু কষ্টে মন্দিরাকে আলিপুর পশু-শালার দরজার সামনে গিয়ে হাজির হতে রাজী করানো গেল। কলকাতার প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ায় এমন সুন্দর মিলনের স্থান আর একটিও নেই। দুটো টিকিট কেটে দুজনে সোজা এগিয়ে গিয়ে গোল মত একটা পাখির খাঁচার পাশে বসল। সামনে শ্যাওলায় ঢাকা একটা বড় পুকুর। তার পাড়ে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় বসে গল্প করছে।

মন্দিরা বলল—বল কি খবর।

খবর কিছু নেই।

'তবে এত কাণ্ড করে অফিস পালিয়ে এখানে আসার মানে কি ?'

মানে একটা নিশ্চয় আছে। কিন্তু এমন করে জেরা করলে সে-সব কথা বলা যায় না।

তুমি ত জান কবিত্ব জিনিসটা আমার আসে না। তাছাড়া আমার সময়ও বড় কম।

কবিদের কথা জানি না তবে এক সময় তুমি ভাল গান গাইতে। শুধু রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদ নয়। দিলীপ রায়ের গানও গাইতে তুমি। গাও না একটা।

কথাটা মন্দ বল নি। চার পাশের তরুণ-তরুণীদের উদ্দীপ্ত করার জন্য আমরা হাতে হাত দিয়ে একটা গান করলে মন্দ হয় না।......এবার আমি উঠি।

আমার কথা আজ শুনতেই হবে।

তোমার কথা আমি কেন শুনব ? সে সব শর্বরীকে বল।

তোমাকে যা বলতে চাই শর্বরীকে তা বলা যায় না।

কারণ !

কারণ তার মধ্যে আগুন নেই। তোমার আছে।

আমার চুল পেকে যচ্ছে। চামড়া যাচছে কুঁচকে। এখনও আমার মধ্যে আগুন খুঁজে পেলে, তোমার দৃষ্টি শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির উপরেও দোষ দিতে হবে।

মন্দিরা এখন কত ব্যস্ত। একটা বড় স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটার। তার মেয়ে-জামাই জাপান আর অ্যামেরিকায় প্রায়ই যাওয়া-আসা করে। প্রতীপের মত ডিমে তাপে চলার সময় তার নেই। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল প্রতীপের ছেলে সুশোভনকে ব্যারিস্টার হিসাবে সে চেনে। এখন পিতৃ পরিচয় পেয়ে তার চেহারার একটা চেনা চেনাভাব আবিষ্কার করতে কোন অসুবিধা হল না মন্দিরার। তবে এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে চিন্তা করার সময় বড় একটা থাকে না তার।

মন্দিরা শেষবার উঠি উঠি করার সময় প্রতীপ বলল— আমাদের ছাড়াছাড়ি কেন হল সে সম্পর্কে তোমার কোন কৌতূহল নেই।

না।
সে কি ?
কারণ আমি সবই জানি।

তা কি করে সম্ভব।

খুব সহজেই। আমার চিরকালের অভ্যাস ধোয়া শাড়ির ভাঁজে টাকা-পয়সা এবং চিঠিপত্র রাখা। যে কাপড়টার তোমার দুটো চিঠি ছিল খেয়াল না করে সেটি দান করলাম মেয়ের আয়াকে। সে আবার বুদ্ধি করে চিঠিগুলো আমার হাতে না দিয়ে ত্রিলোকেশকে দিয়ে দিল। তারপর বাকিটা ভেবে নিতে সবাই পারে।

এর পর আমার কি অবস্থা হয়েছিল একবার ভেবে দেখ।

ভাববার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ত্রিলোকেশের কাছে সবই শুনেছি। তোমাকে ডিনার খাবার আমন্ত্রন জানিয়ে একটা সন্ধ্যার ঘরে নিয়ে গিয়ে তোমারই একটা চিঠি তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল ত্রিলোকেশ। তুমি ভয়ে ঘামতে লাগলে। গলা শুকিয়ে তোমার শরীর কাঁপতে লাগল। ত্রিলোকেশ মেফিস্টো-ফিলিসের মত হেসে হেসে তোমায় উপদেশ দিল পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করা উচিত নয়। ভুল হয়েছে, গোল হয়েছে বলে তুমি ক্ষমা চাইলে। তাই না।

ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

তবে কি ?

আমি ত্রিলোকেশের কথায় কান না দিয়ে বললাম বেশ করেছি। তার উত্তরে সে বলল তোমাকে সে স্লো পয়জন করবে। দরকার হলে তার জন্য ফাঁসীকাঠে ঝুলতেও তার আপত্তি নেই।

সুতরাং তার নির্দেশ মত তুমি আমাকে একটা চিঠি লিখলে। লেট আস কল ইট অফ। তার পরেও আবার সে কথা তুলতে তোমার লজ্জা করছে না ?

এসব তুমি কি বলছ ? আমি এছাড়া আর কিই বা করতে পারতাম ?

এখন সে কথা আলোচনা করে লাভ কি ?

তবু বল আমার কি করা উচিত ছিল।

প্রতীপ তুমি সর্বক্ষণ সার্ত্রে, কামু, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, মালার্মে, অ্যাপলো-নারিসের নাম জপ করতে। শেলী আওড়াতে। তোমার অল্পদিনের বিলেতবাসের সময়কার নানা অভিজ্ঞতায় রং চড়িয়ে কত কাহিনী শোনাতে। ভ্যালেরির সঙ্গে সারা রাত মটরকারে ঘোরা : রোজমারির সঙ্গে প্রণয়। তার পতিদেবতা ডোনিসকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে জব্দ করা। আরো কত কি ? কিন্তু নিজের দেশের একটা রোমশ কালো গণ্ডারের মত জুট মিলের কর্মচারীর সঙ্গে একটু সংঘাত হতেই তোমার ভিতরকার ধুক ধুক করা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আত্মাটা পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। প্রুস্তের জগত, দিতুঁসভ্যাগের জগত কোথায় হারিয়ে গেল। বেরিয়ে এল সেই জিনিসটি যা শ্যামবাজার থেকে নিউ আলি-পুর বা যোধপুর পার্ক পর্যন্ত অনেকটা জায়গা দখল করে আছে। ক্ষীণপ্রাণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী। অবশ্য এর চেয়ে বেশি কিছু অধিকাংশ বাঙ্গালী পুরুষদের সম্পর্কে বলা যায় না।

তুমি সমগ্র বাঙ্গালী পুরুষদের এবং বিশেষ করে আমার প্রতি নীরদ চৌধুরীর মত অবিচার করছ।

বোধহয় না। কিন্তু সেকথা থাক। তারপর দীর্ঘকাল আমার উপর কি অকথ্য অত্যাচার চলেছে সে খবর নেবার প্রয়োজন বোধ কর নি তুমি। একা কোথাও যাওয়া চলবে না। কারোর সঙ্গে মিশতে পারব না। এমন কি মেয়েদের সঙ্গেও না। যাক নিজের চেষ্টায় তাও আমি বন্ধ করেছিলাম।

কি করে পারলে ?

আমার এসব আলোচনা করতে আর ভাল লাগছে না।

দয়া করে বল মন্দিরা।

কি আর বলব......ত্রিলোকেশও ত তোমারই মত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পুরুষ। তোমার চেয়ে হয়ত তার কব্জীর জোর একটু বেশি। কিন্তু তার চেয়ে শক্তিশালী কাউকে দেখলে সেও ভয় পায়।

সেরকম কারোর সহায্য নিতে হয়েছিল নাকি ?

ঠিক সাহায্য নিতে হয় নি। আমার ছোটবেলার বন্ধু এক পাঞ্জাবী এঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হব বলাতেই ম্যাজিকের মত কাজ হল। ত্রিলোকেশ নিজেকে সামলে নিল।

তারপর।

তারপর আর কোন গোল নেই।

মন্দিরা চলে গেল। বাইশ বছর ধরে পড়া নানা বইয়ের নতুন নতুন কথা শুনিয়ে তাকে জব্দ করতে পারল না প্রতীপ। চির-দিনের মত শেষ কথাটি মন্দিরাই বলে গেল। ওর কথা ফেলবার মত নয়। বয়সের চাপে একটুখানি নুয়েপড়া মেয়েটি আজও কোথায় যেন তার মেয়ের বয়সীদের অনায়াসেই হারিয়ে দিতে পারে বলে প্রতীপের মনে হল। তার চলে যাবার পথের দিকে প্রতীপ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।
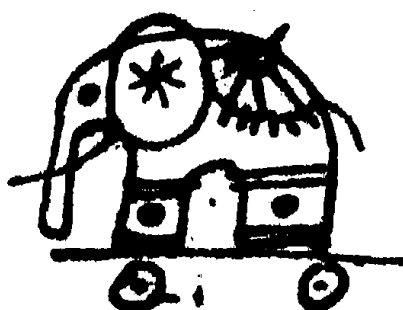
দলের প্রথম পুরুষ ভেংকট

অজয় বসু

সতীর্থদের দীর্ঘতর ছায়ার আড়ালে এতোকাল লুকিয়ে থাকার পর ভেংকট রাঘবন এবার নিজেকে স্পষ্ট করে দেখাবার সুযোগ হাতে পেয়ে গেলেন। এ সুযোগ কতকটা অযাচিত। পারবেন কি তিনি এই সুযোগে নিজের প্রতিচ্ছবির আয়তনকে যথার্থই বড় করে তুলতে? ভেংকটের কপালে কী লেখা আছে, তা ভবিষ্যৎই জানে। তবে এই মুহূর্তে বলা যেতে পারে যে গুরুভার কাঁধে নিয়ে যে চ্যালেঞ্জের সামনে তিনি দাঁড়াতে চলেছেন, সার্বিক মূল্যায়নে সেই চ্যালেঞ্জ সত্যিই ক্ষমাহীন।

নিজের দেশে নয়, খেলার ব্যবস্থা ইংলন্ডে। ইংলন্ড ক্রিকেটের ধাত্রীগেহ। সেখানকার মাঠ ও মাটি অন্যরকম। ভারি আবহাওয়ায় বল ঘোরে শূন্যে। ঘাস বিছানো পিচের স্পর্শে ছুটন্ত বলের গতি বৃদ্ধি পায়। ঘাস থাকলে পিচ থেকে বল তুলে ব্যাটসম্যানদের নাকাল করা যায়। ওখানে খেলোয়াড়দের জাত যাচাই হয় পদে। পদে। পরীক্ষা ব্যাপক। পারবেন কি ভেংকট আর তাঁর দলবল এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে?

এ পরীক্ষায় পাশ করা যে কতো কঠিন ইতিহাস তার সাক্ষী। এর আগে ভারতীয় ক্রিকেট দল আটবার ইংলন্ড সফর করেছে। সে দেশে টেস্ট খেলেছে অন্যান্য পাঁচিশটি। তার মধ্যে জিৎ হয়েছে কটিতে? নামমাত্র একটিতে। আর হার হয়েছে নয় নয় করে আঠারোটিতে।

আগের আটবারের সফরে টেস্ট খেলায় জাতীয় দলের হাল ধরতে হাজির ছিলেন সি কে নাইডু, বিজয় হাজারে, অজিত ওয়াদেকারের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ দলনায়ক। এবং পাতৌদির ইফতিকার ও মনসুর আলি খানের মতো ইংলন্ডের পরিবেশ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ক্রিকেটার। ভি জি ও ডি কে গায়কোয়াড়েরাও ইংলন্ডে দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথা ধর্তব্য নয়। যেহেতু নেতা হিসেবে তাঁদের ভূলে থাকাই ভাল।

ইতিহাসবন্দিত এইসব দলনায়কের মধ্যে একমাত্র অজিত ওয়াদেকারই যা ইংলন্ডের টেস্টে এক দিনের জন্যে জেতাতে পেরেছিলেন। তাও পরমুহূর্তে তাঁরই নেতৃত্বাধীন দলের অস্তিত্ব প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এসব কথা মনে পড়লেই উপলব্ধি জাগে যে ভেংকর রাঘবন ও তাঁর সতীর্থরা এবার কী কঠিন পরীক্ষারই না মুখোমুখি হতে চলেছেন!

এর আগে নিতান্তই অতর্কিতে যে এক আধবার ভেংকট রাঘবনকে জাতীয় দলের নেতৃপদে বসানো হয়েছিল তখন তাঁর নেতৃজনোচিত যোগ্যতা ঘিরে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন অনেকের মনে উঁকি দিয়েছিল। সীমিত সুযোগে ভেংকট নিজেও সে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি। তবে সম্প্রতি রণজি ও দলীপ ট্রফির আসরে তিনি যেভাবে তামিলনাড়ুর এবং দেওধর ট্রফিতে উত্তরাঞ্চলের নেতৃত্ব করেছেন তা দেখে বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত তাঁর গুণাবলীর প্রতি আস্থা রাখতে উৎসাহ বোধ করছেন।

চলতি বছরে শক্তিধর উত্তরাঞ্চলের হাত থেকে দেওধর ট্রফি ছিনিয়ে আনতে দক্ষিণাঞ্চলের নেতা ভেংকট রাঘবন যে ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় রাখেন সম্ভবতঃ তার স্বীকৃতিতেই ইংলন্ডগামী দল পরিচালনার ভার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া দল পরিচালনার ভার কাঁধে নিয়ে সুনীল গাভাসকার তেমন স্বস্তিবোধ করছিলেন না। সেকথা সুনীল স্বমুখে বারবার জানিয়ে-

---

ছেন এবং দেবধর ট্রফিতে বোম্বাইয়ের নেতৃত্বভার ছেড়েও দিয়েছিলেন। পাতাদ-কারের এই অবাঞ্ছিত নেতৃপদে ভেঙ্কটের অভিষেককে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

ভেঙ্কট রাঘবন এখন পুরোপুরি দলনায়ক। আইন মনে, বিকল্প ব্যবস্থা নন। আক্ষরিক অর্থে ক্যাপ্টেন। দলের প্রথম পুরুষ। ক্রিকেটার হিসেবে ভেঙ্কট এখন প্রতিভায় পরিণত। মানুষ হিসেবে ভদ্র বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আজকের যিনি প্রথম পুরুষ, অতীতে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট ছিল পার্শ্বচরিত্রে। নেতৃপদে তাঁর মনোনয়ন বিস্ময়কর না হলেও ভেঙ্কটের অতীত কিন্তু আশ্চর্যজনক বৈকি। প্রসন্ন, বেদী, চন্দ্রশেখরেরা যখন সক্রিয় ও খ্যাতির তুঙ্গে তখন জাতীয় দলে ভেঙ্কটের পাকা ঠাঁই-টুকুও ছিল না।

টেস্ট দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তিও এক অতর্কিত ঘটনা! ১৯৬৫তে চন্দ্রশেখর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তবেই না নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে খেলতে তাঁর ডাক আসে। হঠাৎ পাওয়া সুযোগ ভেঙ্কট দু' হাত বাড়িয়ে সে সুযোগ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সেবারের খেলায় তিনিই ছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে সফল বোলার। তবুও বছর ঘুরতে না ঘুরতে ভেঙ্কটকে আবার পর্দার আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষে আত্মপ্রকাশ ঘটাবার আবার সুযোগ পান ১৯৬৯-৭০ মরশুমে যখন শারীরিক আঘাতে জন্যে চন্দ্রশেখর অবসর নেন সাময়িকভাবে।

১৯৭১এ সহ-অধিনায়ক হিসেবে ভেঙ্কট ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যান। পরে ইংলণ্ডে। গোটা সফরে তাঁর কৃতিত্ব অপর অফ স্পিনার প্রসন্নের কীর্তিকে ডিঙিয়ে গেলে কি হবে, জাতীয় দলে তাঁর মর্যাদা ছিল দ্বিতীয় অফ স্পিনার হিসেবে। পয়লা নম্বরের স্বীকৃতি ছিল প্রসন্নের জন্যে সংরক্ষিত। গত বছর পাকিস্তান সফর পর্যন্ত এই ধারাই চলেছিল। পাকিস্তান সফরে ভেঙ্কট ছিলেন একেবারেই বিস্মৃত। ওদেশে একটি টেস্টেও তাঁকে খেলানো হয়নি।
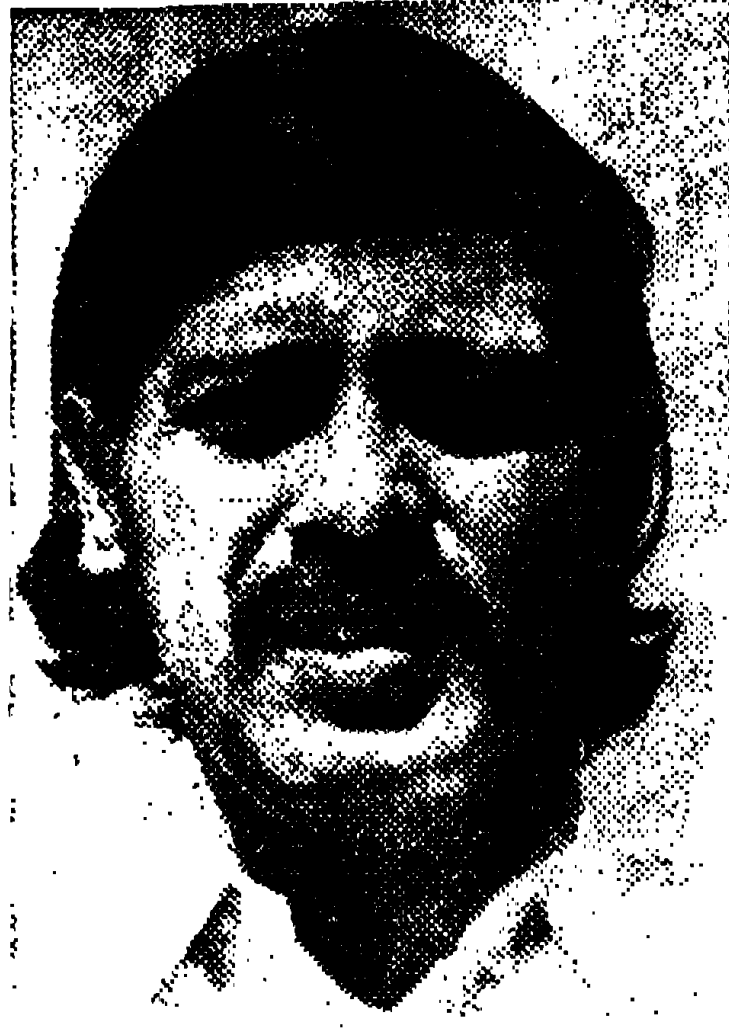
ভেঙ্কট রাঘবন

কিন্তু তারপরই পরিস্থিতির চাকা উল্টোমুখে ঘুরে যায়। আবর্তিত চক্রের আনুকূল্য পেয়ে কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে সবকটি ম্যাচে খেলার সুযোগ আসে ভেঙ্কটের সামনে। আর সেই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে তিনি শুধু সেরা অফ স্পিনারেরই নয়, শ্রেষ্ঠ ভারতীয় স্পিন বোলারের সম্মান আদায় করে নেন। মনে হচ্ছে যে এতো দিনে বুঝি স্পিনার ভেঙ্কট রাঘবন সম্পর্কে সন্দেহবাতিকদের মনও সংশয়মুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছে।

প্রসন্ন ও ভেঙ্কট, দুজনেই আক্ষরিক অর্থে অফ স্পিনার। তবে ওঁদের বোলিংয়ের প্রকৃতি ও মৌল চরিত্র একেবারেই আলাদা। তবু সব দিক ভেবে, বুগুদের গুণাগুণ খতিয়ে বিচার করে বলা যায় যে অফ স্পিনার হিসেবে প্রসন্ন ছিলেন উন্নততর পর্যায়ের। বিশ্বমতে, সমসাময়িক কালে বিশ্বের সেরা দুজনের অন্যতম প্রসন্নই। হয়ত বা সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাই প্রসন্ন থাকতে দীর্ঘতর আড়াল ছেড়ে ভেঙ্কট বাইরে আত্মপ্রকাশ ঘটাবার সুযোগ বেশি পান নি। যদিও বা কোনো সুযোগে জাতীয় দলে তাঁর সাড়ম্বর প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন তবুও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে তার সময় তেমন লাগে নি।

এবারে অবশ্য পরিস্থিতি ভিন্নতর। নির্বাচকদের রায়ে ভেঙ্কট হলেন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। দলের প্রথম পুরুষ। প্রথম পুরুষটি শেষ পর্যন্ত উত্তম পুরুষের সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করতে পারবেন তো?

বেদীও একদিন প্রথম পুরুষের পিঁড়ি পেয়েছিলেন। অনেক আশা জাগিয়ে কাজ আরম্ভ করে উত্তম পুরুষের সংজ্ঞাও পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্বহ চাপে বেদীকে আনত হয়ে পড়তে হয়। বেদীর বেহাল অবস্থা দেখে ভেঙ্কটকে ঘিরে আমাদের জিজ্ঞাসা আরও তাৎক্ষণিক হতে চাইছে। কে জানে এ জিজ্ঞাসার কী উত্তর পাওয়া যাবে।

খেলার মাঠের রাজপুত্তুর

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়।

রাজপুত্তুরেই বটে।

কোন অংশেই কম নয়। তাঁদের দাপট তাঁদের হাবভাব, তাঁদের পকেটের অঙ্ক আর তাঁদের জনপ্রিয়তা সে-যুগের রাজপুত্তুরেদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়; হয়তো বা বেশীই।

তার প্রমাণ যে কোন বছর টেস্ট ম্যাচের সময় পাওয়া যাবে। রাজার হালে থাকেন খেলোয়াড়রা। থাকবেন পাঁচতারা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সে এক এলাহী ব্যাপার। লোকাল ম্যানেজাররা তো সব সময় হাতজোড় করে 'জো-হুজুর' হয়ে থাকেন। মুখের কথা খসে না। হুকুম তালিম হয়ে যায়।

ভক্তরা সব সময় তাঁদের ঘিরে থাকতে চান। চান একটু ছোঁয়া পেতে। মেয়েরা তো আরো এক কাঠি এগিয়ে যেতে চান।

এতো সব কিছুর বিনিময়ে খেলোয়াড়রা কি করেন? মাঠে নেমে ব্যাট-বলের লড়াই চালান। তাঁদের সাফল্য দেশের লক্ষ-কোটি মানুষকে আনন্দের সাগরে ভাসায় আর ব্যর্থতা দেশবাসীর মন ভেঙে দেয়। এই এক একটি খেলার জন্যে খেলোয়াড়দের হাতে দেওয়া হয় দশ হাজার দু'শ করে টাকা। এর মধ্যে ট্যাকস দিতে হয় পাঁচ হাজার টাকার ওপর। বাকীটা এমনভাবে দেখানো থাকে যাতে ট্যাকস দেবার প্রশ্নও ওঠে না। এতেও সন্তুষ্ট নন খেলোয়াড়রা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টের সময় তাঁরা দল-বেঁধে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচরণ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে ট্যাকস রেহাইয়ের জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন।

ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা কিন্তু ঐ দশ হাজার দু'শ টাকাতেও খুশী নন। তাঁরা আরো চান। মাত্র ক'বছর আগে টেস্ট প্রতি ভারতীয় খেলোয়াড়রা পেতেন মাত্র তিনশ টাকা করে। কয়েক বছরের মধ্যে সেই টাকা বাড়তে বাড়তে দশ-হাজার ডিঙিয়ে গেছে। তাতেও কিন্তু তাঁরা সন্তুষ্ট নন—দর বাড়াবার জন্যে এখন তাই প্যাকার জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিসন মহারথী কেরি প্যাকার নামক টাকার কুমীরটি সম্প্রতি সনাতন-টেস্ট ক্রিকেটের ওপর মোক্ষম আঘাত হেনেছেন। টাকার টোপে তিনি গেঁথেছেন অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর পাকিস্তানের তা-বড় সব খেলোয়াড়দের। বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ঠিক করেছিলেন প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের কিছুতেই তাঁরা জাতীয় দলে নেবেন না। সেইজন্য মুশকিলে পড়েছিল ইংলণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া। কারণ এই

দুটি দেশের সামনের সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় সকলেই প্যাকারের দলে চলে গেছেন। ফলে নতুন করে দল গড়তে হয়েছিল। ইংলণ্ড দল মোটামুটি 'সেট' হলেও অস্ট্রেলিয়া এখনো পারেনি। তবে তারাও যে নির্ভরযোগ্য দল শিঘ্রই গড়ে নিতে পারবে তার আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান প্রথমে তাদের খেলোয়াড়দের বাদ দিলেও পরে আবার প্যাকারের খেলোয়ড়দের ডেকে এনে জাতীয় দলে খেলাচ্ছে।

প্যাকার সাহেবের নজর এতদিন ভারতীয় খেলোয়াড়দের ওপর পড়েনি। যদিও বেদী বলেছেন যে আগেও নাকি তিনি দুবার কেরি প্যাকারের ক্রিকেট সার্কাসে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু দুবারই তিনি টাকার কাছে মাথা নীচু না করে ভারতের পক্ষে খেলার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। তবে সেসব কথা এতদিন কিন্তু আমরা কেউই জানতে পারি নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ভারতের কানপুর টেস্টের সময় হঠাৎ বাজার গরম করা সেই খবরটা বেরুল। গাভাসকার, বিশ্বনাথ, ভেঙ্গসরকার, মহিন্দর অমরনাথ, বিষেণ সিং বেদী, সৈয়দ কিরমানী ও ভাগবৎ চন্দ্রশেখর নাকি কেরি প্যাকারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। খেলোয়াড়দের মুখপাত্র হিসেবে ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার বোর্ডের সঙ্গে মৌখিক আলোচনাও করলেন। কিন্তু লিখিতভাবে তাঁরা কিছু করেন নি। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি খেলার সাপ্তাহিককে গাভাসকার বললেন, 'শো মাস্ট গো।' অন্য খেলোয়াড়রা কেউই বিশেষ কিছু বললেন না। খেলোয়াড়রা আভাস দিলেন যে তাঁরা কেরি প্যাকারের ক্রিকেট সার্কাসের সঙ্গে ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলাতেও অংশ নিতে চান। বোর্ড এই ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেন, জানার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড এ ব্যাপারে কড়া মনোভাব গ্রহণ করলেন। বোর্ড সাফ জানিয়ে দিলেন যে, যাঁরা প্যাকারের দলে থাকবেন তাঁদের শুধু টেস্ট ম্যাচ নয়, ভারতে রণজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি প্রভৃতি কোন প্রথম শ্রেণীর খেলাতেই খেলতে দেওয়া হবে না। তারপরই ইংলণ্ড সফরের জন্যে প্রাথমিকভাবে মনোনীত কুড়িটি জন খেলোয়াড়ের কাছে এক বছরের চুক্তিপত্র পাঠালেন ক্রিকেট বোর্ড।

চুক্তিপত্রে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে যে সই করার এক বছরের মধ্যে বোর্ড অ-অনুমোদিত কোন ব্যক্তি কিম্বা সংস্থার পক্ষে কোন খেলোয়াড় খেলতে কিম্বা খেলার জন্যে চুক্তিপত্রে সই করতে পারবেন না। অর্থাৎ বোর্ডের চুক্তিপত্রে সই করা মানেই এক বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়রা আর প্যাকারের দলে খেলতে না পারা।

এখানেই শেষ নয়, অন্য সূত্রে বলা হয়েছে যে খেলোয়াড়রা কোন কাগজে লিখতে পারবেন না, বিজ্ঞাপন এবং টেলিভিসন রেডিওতেও অনুমতি ছাড়া অংশ নিতে পারবেন না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কলকাতায় ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের সময় ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রতিদিনের খেলার বিবরণ লিখেছিলেন। তাঁর বিনিময়ে রোজ তাঁকে ঐ পত্রিকার পক্ষ থেকে কয়েক হাজার টাকা করে দেওয়া হত।

শুধু তাই নয়, গাভাসকার নিজের নামটি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন। সিনেমার স্লাইডে তাঁকে দেখাতে হলে দিতে হবে দশ হাজার টাকার ওপর। পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্যে আড়াই হাজার টাকা গাভাসকার পান। এছাড়া টেলিভিসন-রেডিওর বিজ্ঞাপন তো আছেই। বোর্ডের চুক্তিপত্রে এই সবই মানা হয়ে গেছে।

যদিও গাভাসকার পাঁচ হাজার টাকা মাইনের চাকরী করেন এবং তা ক্রিকেটের দৌলতেই, তবু ঐ সুযোগগুলি মেনে নিতে তাঁর অসুবিধে যথেষ্ট। এছাড়া গাভাসকাররা চাইছিলেন চুক্তিপত্রগুলির মেয়াদ এক বছরের বদলে ছ'মাস করতে। কিন্তু বোর্ডের যা ভাবভাব তাতে মনে হয় তাঁরা তা করবেন না।

কারণ ক্রিকেট বোর্ডের ধারনা হয়তো গাভাসকার সহ কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ই কেরি প্যাকারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান নি। তাঁদের মত আমাদেরও এই ধারনা দৃঢ় হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে কেরি প্যাকারের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন যে তাঁরা কোন ভারতীয় খেলোয়াড়কেই আমন্ত্রণ জানান নি। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেরি প্যাকারের ক্রিকেট সার্কাসে যাচ্ছি বলে গাভাসকাররা কেন এইভাবে বাজার গরম করলেন? উত্তর একটাই, খেলোয়াড়রা বোধহয় টেস্ট পিছু দশ হাজার দশ টাকারও বেশী চাইছেন এখন। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারছেন না।

না পারাই স্বাভাবিক। ক্রিকেট খেলোয়াড়রা আজকাল কতো টাকা পান একবার হিসেব করে দেখুন। যাঁরা পাকিস্তানে গিয়েছিলেন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সব কটি টেস্ট খেলেছেন তাঁরা তো কয়েক মাসের মধ্যে লাখখানেকের ওপর টাকা ঘরে তুলেছেন। জুন মাসে ইংলণ্ড সফরে যাবেন যাঁরা তাঁরা পাবেন বাহান্ন হাজার টাকার ওপর। ফিরে এসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছ'টি টেস্ট। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটি। তারপর অস্ট্রেলিয়ার সংক্ষিপ্ত সফর—সেখান থেকে ফিরতে না ফিরতেই পাকিস্তান এসে যাবে ভারত সফরে। এইবার হিসেব করে দেখুন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা আগামী দু বছরের মধ্যে কতো টাকা ঘরে তুলবেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেরি প্যাকারের দলে গেলে এ'রা কত টাকা

পেতেন। খবর পাওয়া গিয়েছিল, প্যাকার সাহেবের সঙ্গে গাভাসকারদের তিন বছরের চুক্তি হবে। প্রতি বছরে এ'রা পাবেন তিরিশ হাজার ডলার। মার্কিন নয়, অস্ট্রেলিয়ান ডলার। অস্ট্রেলিয়ান ডলারের দাম অনেক কম। তবু টাকার হিসেবে দু লাখের মত দাঁড়াবে। কিন্তু ঐ টাকার ওপর দুটি দেশ ট্যাক্স কাটবে। ফলে কতো টাকাই বা খেলোয়াড়রা ঘরে তুলতে পারবেন। আরো একটি বিষয় আছে—প্যাকারের বিশ্ব পর্যায় ক্রিকেটে খেলতে হলে খেলোয়াড়দের মাইনে ছাড়া ছুটি নিতে হব। ফলে হিসেব নিকেশ করলে বোঝা যাচছে যে খুব একটা লাভ খেলোয়াড়দের হবে না।

তাহলে কেন খেলোয়াড়রা প্যাকারের ক্রিকেটে খেলার জন্যে লাফাচ্ছিলেন? সেই সন্দেহটা যে আরো একবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে তবে কি প্যাকার নিয়ে এই সব চেঁচামিচি, এই সব জল ঘোলা করারনেপথ্য কারণটি আর কিছু নয়—টেস্ট পিছু টাকার অঙ্কটা আরো কয়েক হাজার বাড়ানো?

টেস্ট খেলার সময় উদ্যোক্তা সংস্থাগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেন। খেলোয়াড়রা তাই আরো বেশী টাকা দাবী করতে পারেন নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার—এতো টাকার বিনিময়ে খেলোয়াড়রা কতোটা প্রতিদান দিচ্ছেন? পেশাদারী মনোভাব যখন খেলোয়াড়দের মধ্যে এতোটা জাঁকিয়ে বসেছে তখন নিয়ম করা উচিত—টেস্ট খেললেই খেলোয়াড়রা একটা নির্দিষ্ট টাকা পাবেন। এরওপর থাকবে সেঞ্চুরি, হাফ সেঞ্চুরি, হ্যাটট্রিক, পাঁচটা বা তার বেশী উইকেট এবং ক্যাচ লোফার ওপর আলাদা আলাদা টাকা। যে যতো রান করতে পারবেন তিনি ততো বেশী টাকা পাবেন। যে যতো উইকেট দখল করতে পারবে কিম্বা ক্যাচ লুফতে পারবেন তিনি ততো টাকা পাবেন। অর্থাৎ খেলে এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে তুমি যতোটা পারো টাকা আদায় করে নাও। এই রকম নিয়ম হলে খেলোয়াড়দের মধ্যে রান করার, উইকেট দখল করার এবং ক্যাচ লুফে বেশী রোজগার করার উৎসাহ বেড়ে যাবে এবং দর্শকরাও খুশী হবেন।

খেলার মাঠের রাজপুত্তুররা তখন কার কতোটা 'এলেম' তা তাঁরা নিজেরাই হাড়ে হাড়ে টের পাবেন! কারণ তখন আর এমনিতে টাকা পকেটে আসবে না—খেলা দেখিয়ে তা আদায় করে নিতে হবে। এতে খেলাও তাহলে জমবে।

গুরদেব সমাচার

জয়ন্ত চক্রবর্তী

এশীয় ফুটবলে ভারতের অধিনায়ক পাঞ্জাবের ফুটবল তারকা গুরদেব সিং মামলা ঠুকে দিয়েছেন চণ্ডীগড় হাইকোর্টে পাঞ্জাব আর্মড পুলিশের তাঁর নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে। গুরদেবের রিট পিটিশানের আর্জি—'কেন তাঁকে চাকরি থেকে রিলিজ করা হবে না, তার কারণ দর্শানো হোক।' গত আগস্টে গুরদেব পাঞ্জাব আর্মড পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দেন। পুলিশ সার্ভিস রুল অনুযায়ী ইস্তফাপত্রের সঙ্গে তিনি তিন মাসের মাইনেও জমা করেন। এরপরই সেপ্টেম্বরে গুরদেব আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রের আবেদন করেন। ৩১ মার্চের পর সেই আবেদন মঞ্জুরও হয়েছে। ৩ এপ্রিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে গুরদেবের নাম নথীভুক্ত করা হয়েছে আই এফ এ অফিসে। এসব ব্যাপারে কোন গণ্ডগোল নেই। গন্ডগোল বেধেছে অন্য জায়গায়। পাঞ্জাব পুলিশ ফেব্রুয়ারির গোড়ায় গুরদেবকে একটি চিঠি দিয়ে জানায়,—'তোমাকে চাকরি থেকে রিলিজ করা হচ্ছে না, অতএব তোমাকে জলন্ধরেই থাকতে হবে।' পাঞ্জাব পুলিশের এই ফতোয়ার বিরুদ্ধেই গুরদেব আইনের সাহায্য নিয়েছেন। গুরদেব যখন গত আগস্টে পাঞ্জাব পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দেন তখন তাঁকে কি কি করতে হবে সে-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছিলেন কলকাতা তথা ভারতের প্রথম সারির এক ব্যারিস্টার। সেই ব্যারিস্টার ভদ্রলোকই মামলা করার ব্যাপারে গুরদেবের পরামর্শদাতা গুরদেব মামলা করেছেন পাঞ্জাবের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, ডেপুটি ইন্সপেকটর জেনারেল অব পুলিশ এবং পাঞ্জাব আর্মড পুলিশের পাঁচাত্তর নম্বর ব্যাটালিয়নএর কম্যানডান্টের বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সূত্রের খবর ওই ব্যারিস্টার নাকি ব যে গুরদেবের কলকাতায় খেলার ব কোন অসুবিধা হবে না।

গুরদেব সিং-এর কলকাতায় লাল জার্সি গায়ে খেলার ব্যাপারে আর বাধা ছিল। ডিসেম্বরের এক হিমেল মহামেডান স্পোর্টিং-এর এক ক আমাকে বলেছিলেন,—'গুরদেব যদি কাতায় খেলেন তাহলে ও'কে সাদা জার্সি গায়েই খেলতে হবে।' কর্ম জোর দিয়ে ওই কথাটি বলেছিলেন, মহামেডান স্পোর্টিংই প্রথম গু আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই করাবার করেছিল এবং মহামেডানের দুই প্রতি সামনে পাঞ্জাবে বসে গুরদেব আন ছাড়পত্রের দরখাস্তে স্বাক্ষর করে এরপরই গুরদেবের কাছে ইস্টবে অফার যায় এবং গুরদেব ইস্টবেঙ্গলে মনস্থ করে 'বি' ফর্মেও সই দেন। ম্বরেই গুরদেব কলকাতায় আসেন। ও'কে প্রথম দেখা যায় শীল্ড ফা মোহনবাগান-আরারাতের খেলার দিন, দবের সঙ্গে ছিলেন মনজিত সিং মাথায় ছাতা ধরেছিলেন ইস্টবে সুপরিচিত এক কর্মকর্তা। ইস্টবেঙ্গল গিয়ে গুরদেব এবং মনজিত দুদিন টিসও করেন, লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ও'দের দুজনের ছবি সংবাদপত্রে

পাতাতেও ঠাঁই পায়। দুজনেই কলকাতায় এসেছিলেন 'ডিল' পাকা করতে। কথাবার্তা সেরে ও'রা পাঞ্জাব ফিরে যান। যাবার আগে ময়দান মার্কেটে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের বুট যাঁরা তৈরি করেন, তাঁদের কাছে দুজনই পায়ের মাপ দিয়ে যান।

এত শত জানার পরও মহামেডান কর্মকর্তারা বেশ জোরগলাতেই বলছিলেন গুরদেবকে খেলতে হবে সাদা-কালোর দলেই, যদিও ও'রা জানতেন যে আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্র শুধুমাত্র মঞ্জুর হয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের জন্য, কোন ক্লাবে খেলবেন সেটা খেলোয়াড়ের মর্জি। গত ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় মহামেডান তাঁবুতে সেই কর্মকর্তাটিকে গুরদেবের কথা জিজ্ঞেস করতে স্পষ্টতই তিনি পাশ কাটিয়ে গেলেন। হাবভাব দেখে মনে হল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে পারলেই তিনি খুশী হন। তবে, এই সম্পর্কে যে কটি কথা তিনি বললেন তাতে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না যে গুরদেব ময়দানে লাল-হলুদের দলের হয়ে নামবেন সেটা ও'রা নিশ্চিত ধরে নিয়েছেন। তাছাড়া ইস্টবেঙ্গল আই এফ এ-তে গুরদেবের নাম নথীভুক্ত করে নিয়েছে।

অতএব গুরদেবের কলকাতায় খেলার ব্যাপারে সামনে শুধু একটিই প্রাচীর—চাকরি থেকে রিলিজ হওয়া। গুরদেবকে অবশ্য পাঞ্জাব [illegible] পক্ষ [illegible]ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। [illegible] যে গুরদেব দু-রকম চিন্তার দোলনায় [illegible] নয়, তবে মনস্থির করতেও তাঁর বেশীদিন সময় লাগেনি। পাঞ্জাবে গুরদেব সিং কলকাতায় খেলতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও গুরদেবকে কলকাতায় আনার ব্যাপারে সমান উৎসাহী। তদ্বির-তদারকি চলছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক প্রতিনিধি তো চণ্ডীগড়েই আছেন। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহা শেষ কথা শোনালেন,—গুরদেব কলকাতায় খেলবেই এবং ইস্টবেঙ্গলেই খেলবে।

খেলা

কমনওয়েলথ টেবল টেনিস

এডিনবরায় পঞ্চম কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় হংকং বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। প্রতিযোগিতায় মোট খেতাব ছিল সাতটি। হংকং পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে খেলে চারটি খেতাব জয়ী হয়েছে—পুরুষ ও মেয়েদের দলগত এবং পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব। ইংল্যান্ড সাতটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে দুটি খেতাব পেয়েছে—মেয়েদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব। পুরুষদের ডাবলস খেতাব জিতেছে অস্ট্রেলিয়া।

ভারত পুরুষদের দলগত বিভাগে ৪র্থ স্থান এবং মেয়েদের দলগত বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করে। ব্যক্তিগত বিভাগের খেলায় সুধীর ফাড়কে এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়ান শৈলজা সালোখে কোয়ার্টার-ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইনালে সুধীর ফাড়কে ২০—২১ ১৬—২১ ও ১৪—২১ পয়েন্টে কানাডার ক্যাটেনোর কাছে হেরে যান। অপরদিকে মেয়েদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার-ফাইনালে শৈলজা সালোখে ১১—২১, ২০—২১ ও ১৬—২১ পয়েন্টে পরাজিত হন ইংল্যান্ডের লিন্ডা হোয়ার্ডের কাছে। মেয়েদের ডাবলসের সেমি-ফাইনালে শৈলজা সালোখে এবং ইন্দু পুরী ২২—২৪, ১৫—২১ ও ১৯—২১ পয়েন্টে পরাজিত হন হংকংয়ের চাং এবং হুয়ের কাছে।

ফাইনালে খেলা

দলগত বিভাগ

পুরুষ বিভাগ : হংকং ৫—২ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : হংকং ৩—১ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগ

পুরুষদের সিঙ্গলস : ভং লু-ভেং (হংকং) ২১—১৬, ১৬—২১, ২১—১২ ও ২১—১৬ পয়েন্টে জিমি ওয়াকারকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : হুই সো-হুং (হংকং) ২১—১৩, ২১—১৪ ও ২১—১৪ পয়েন্টে ক্যারোল নাইটকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : স্টেভ ন্যাপ এবং বব জাভর (অস্ট্রেলিয়া) ২১—১৫, ২১—১৯ ও ২১—১১ পয়েন্টে জিমি ওয়াকার এবং ১১ বছরের বালক কালিন উইলসনকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : ক্যারোল নাইট এবং লিন্ডা হাওয়ার্ড (ইংল্যান্ড) ২১—১৪ ২২—২০ ও ২১—১৯ পয়েন্টে হুই সো-হুং এবং চ্যাং সুই-জিংকে (হংকং) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : ইংল্যান্ডের জিমি ওয়াকার এবং লিন্ডা হাওয়ার্ড কানাডার এরোল এবং মোরিয়ানকে পরাজিত করেন।

নাগজী ফুটবল প্রতিযোগিতা

কোজিকোড়ায় প্রখ্যাত নাগজী স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গোয়ালিয়ার জগজিৎ কটন টেক্সটাইল মিলস ১—০ গোলে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিংকে

পরাজিত করে। প্রথমার্ধের ৩০ মিনিটের মাথায় লেফট্-আউট সুহিন্দর জয়সূচক গোলটি দেন।

সেমি-ফাইনালে জগজিৎ কটন টেক্স-টাইল মিলস ০—০ ও ২—১ গোলে ইস্ট-বেঙ্গলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। অপর দিকের সেমি-ফাইনালের প্রথম পর্বে মহ-মেডান স্পোর্টিং ২—১ এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রিমিয়ার টায়ার্স ২—১ গোলে জয়ী হয়। শেষ পর্যন্ত টাইবেক্রেরে মহমেডান স্পোর্টিং জিতে ফাইনালে যায়।

ফেডারেশন কাপ ফুটবল

গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে এপ্রিল ২২ থেকে তৃতীয় ফেডারেশন কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের আসর বসেছে। এবারের প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে ভারতের সেরা পনেরটি ফুটবল দল। তবে গতবারের যুগ্ম-বিজয়ী মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল যোগদান না-করায় অনুষ্ঠানের জৌলুষ খুবই হ্রাস পেয়েছে।

যোগদানকারী পনেরটি দল নীচের চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে :

গ্রুপ ১ : মহমেডান স্পোর্টিং রাজস্থান পুলিশ, অয়েল ইণ্ডিয়া এবং সাউথ-সেন্ট্রাল রেলওয়ে।

গ্রুপ ২ : ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, মফৎলাল এবং শিলং একাদশ।

গ্রুপ ৩ : জে সি টি মিলস, ভাসকো স্পোর্টস ক্লাব এবং আসাম পুলিশ।

গ্রুপ : ৪ : প্রিমিয়ার টায়ার্স, ইম্বং ফিতাক (মণিপুর)।

সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

গৌহাটিতে তৃতীয় সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় নীচের বারটি দল অংশ গ্রহণ করবে। খেলা শুরু হবে মে ১ তারিখ থেকে।

যোগদানকারী বারটি দল সমানভাবে নীচের চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে।

গ্রুপ এ : উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং মণিপুর।

গ্রুপ বি : বাংলা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরল।
গ্রুপ সি : কর্ণাটক, রাজস্থান এবং রেলওয়ে
গ্রুপ ডি : আসাম, ত্রিপুরা এবং ওড়িষ্যা।

ওয়ার্ল্ড হকি

অস্ট্রেলিয়ার পার্থে 'এসানডা ওয়ার্ল্ড হকি' টুর্ণামেন্টের আসর বসেছে এপ্রিল ২০ থেকে। এটা নিঃসন্দেহে খুদে বিশ্ব হকি কাপের আসর। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দশটি দেশ সমান দু'ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। এবং প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পি-য়ান এবং রানার্স-আপ দল পরবর্তী সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে।

ভারতের কাছে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব আজ খুবই বেশী। কারণ হকিতে ভারত তার হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার একটা বড় সুযোগ হাতে পেয়েছে। ভারতের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে। এখানে ভারতের প্রতি-দ্বন্দ্বী গত অলিম্পিক হকির রানার্স-আপ অস্ট্রেলিয়া, গত বিশ্ব কাপ হকির রানার্স-আপ নেদারল্যাণ্ডস, কানাডা এবং ফ্রান্স। অপরদিকে 'বি' গ্রুপে আছে গত অলিম্পিক হকির স্বর্ণপদক বিজয়ী নিউজিল্যাণ্ড, গত বিশ্ব কাপ হকির চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান, বৃটেন, কেনিয়া এবং মালয়েশিয়া।

হকি খেলার পন্ডিত ব্যক্তিদের দৃঢ় ধারণা, 'এ' গ্রুপ থেকে অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডস এবং 'বি' গ্রুপ থেকে পাকি স্তান ও নিউজিল্যান্ড সেমি-ফাইনালে উঠবে এবং ফাইনালে জিতবে পাকিস্তান।

প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ

সি-এ-বি পরিচালিত ১৯৭৮-৭৯ সালের প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগের প্লেঅফ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৭ উইকেটে মোহনবাগানকে হারিয়ে মোট ৩ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৪—৭৫ সালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল যুগ্মবিজয়ী হয়েছিল। গতবার (১৯৭৭-৭৮) লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এবং রানার্স-আপ মোহনবাগান। প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ খেলায় সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোহনবাগান—মোট ১৩ বার (এর মধ্যে যুগ্মবিজয়ী তিনবার)। তাছাড়া মোহন-বাগানের উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯৬৩–৬৭) লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড আজও কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি।

১৯৭৮—৭৯ সালের লীগের প্লে-অফ ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে মোহনবাগান ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৩৭ রান সংগ্রহ করেছিল। মলয় ব্যানার্জি দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন। তিনি ১৭৫ মিনিটে তাঁর ৮১ রানে আটটা বাউণ্ডারি করেন।

দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগানের ইনিংস শেষ হয় ৩৪১ রানের মাথায়। খেলার বাকি ২১৫ মিনিট সময়ে ইস্টবেঙ্গল দুটো উইকেটে ১৮৬ রান করে। পলাশ নন্দী ১১৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। এবারের ক্রিকেট মরসুমে এটা তাঁর ষষ্ঠ সেঞ্চুরী।

শেষ তৃতীয় দিনে ইস্টবেঙ্গালের প্রথম ইনিংসের ৩৪৪ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) খেলা শেষ হয়ে যায়। এইদিন পলাশ নন্দী ১৬৯ রান করে আউট হন। তিনি ৩২৫ মিনিট ব্যাট করে তাঁর ১৬৯ রানে ১৬টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে পলাশ নন্দী এবং দেবু মিত্র ২০০ মিনিটে দলের ১৯৫ রান তুলে দিয়েছিলেন। দেবু মিত্র ১১১ রান করে অপরাজিত থাকেন। বাউণ্ডারী করেছিলেন ১৩টা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মোহনবাগান : ৩২৯+১২=৩৪১ রান (মলয়ব্যানার্জি ৮১ প্রণব নন্দী ৬২ এবং সুবীর ভট্টাচার্য ৫০ রান। বরুণ বর্মন ৭০ রানে ৩, রবি ব্যানার্জি ৮৬ রানে ৪ এবং অলক ভট্টাচার্য ২১ রানে ৩ উইকেট)।

ইস্টবেঙ্গল : ৩৪৪ রান (পলাশ নন্দী ১৬৯ এবং দেবু মিত্র ১১১ রানে অপরাজিত। প্রণব নন্দী ১৩৩ রানে ২ উইকেট)।

দর্শক

বি এফ জে এ : একটি বালখিল্য অনুষ্ঠান

বি বসু

বাজার পরনে যে কিছু নেই, তিনি
সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে
ড়াচ্ছেন—সে কথাটা এই মুহূর্তে বলা
শেষ জরুরী হয়ে পড়েছে। বেঙ্গল ফিল্ম
র্নালিস্টস এসোসিয়েশন দীর্ঘ ৪২ বছর
র সারা ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পী, কুশলী,
র্মাতা এবং রসিকদের কাছে যে শ্রদ্ধা
সম্মান আকর্ষণ করে আসছিলেন, আজ
তে ভাঁটা পড়তে পড়তে এখন এক জায়গায়
স পৌঁচেছে যেখানে শ্রদ্ধা আর সম্মানের
নিটুকুও বুঝি আর অবশিষ্ট নেই। ১৩
প্রল সকালে রবীন্দ্র সদনে যাঁরা বি এফ
এর পুরস্কার বিতরণ উৎসবে উপস্থিত
লেন তাঁরা এক লজ্জাকর, বেদনাদায়ক,
খিল্য অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে রইলেন।
া পরে কী কথা, অধিকাংশ পুরস্কার-
কের পক্ষ থেকে যে অবজ্ঞা ও অসম্মান
র্শত হল, তার পরও এই সংস্থার
ত্বের প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা সে
টি সুস্থ চিত্তে গভীরভাবে ভেবে দেখার
অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা উজ্জ্বল
াকিত মঞ্চে কয়েক ডজন ফটোগ্রাফার
ক নিক্ষিপ্ত হঠাৎ আলোর ঝলকানির
সাফল্যের আত্মপ্রসাদ খুঁজে পেয়েছেন,
, প্রায়ান্ধকার প্রেক্ষাগৃহে চাপা কণ্ঠে যে
মন্তব্য উচ্চারিত হয়েছে তাতে সংস্থার
সক্রিয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী হিসেব
প্রতিবেদকের চোখ-মুখ ক্ষণে ক্ষণেই
হয়ে উঠেছে।

অথচ এই তো সেদিন পর্যন্ত বি
জে এ পুরস্কারের কী গুরুত্বই না
নির্বাচনের ফলাফল জানবার জন্য
তার চলচ্চিত্র মহলে সে কি উৎকণ্ঠা
উদ্দীপনা। বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র
সাগ্রহে অপেক্ষা করত ফলাফল
র জন্য। ফলাফল জানবার সপ্তাহ-
র মধ্যেই বোম্বাই ও দিল্লির বড় বড়
সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হত
। প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।
র দিন ঘোষণার পর সারা ভারতে
সাজো সাজো রব পড়ে যেত। বাংলার
থেকে যাঁরা পুরস্কার নেবার জন্য
ন তাঁরা বেশ কিছু দিন আগে থেকেই
বুক করে রাখতেন। যথাদিনে যথা-
যাতে প্লেনের টিকিট পাওয়া যায়
। পূর্বাহ্নেই প্রচেষ্টা চালাতেন তাঁরা।
রত সরকারও কম গুরুত্ব দিতেন না বি
ফ জে এ পুরস্কারকে। ন্যাশনাল এওয়ার্ড
বর্তনের আগে তো বটেই, তার পরও
শেষ মর্যাদার দাবীদার ছিল এই
রস্কার। যে কারণে কেন্দ্রীয় তথ্য ও
চারমন্ত্রী হিসেবে রাজবাহাদুর, ইন্দ্র
মার গুজরাল, নন্দিনী সতপথী, সত্য-
রায়ণ সিনহা, ধরমবীর সিনহা প্রমুখ
রাও বি এফ জে এ উৎসবে যোগ দিতে
ছেন বিভিন্ন সময়ে। আর ভারতীয়
চিত্রের স্বনামধন্য পুরুষদের মধ্যে কে বা
আসেন নি তা খুঁজে বার করতে হবে। এখন
যিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী, দক্ষিণ
ভারতের সেই বিখ্যাত শিল্পী এম জি রাম-
চন্দন একবার কথা প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন,
বি এফ জে এর মতামতকে তিনি বিশেষ
একটা গুরুত্ব দেন। প্রচণ্ড শারীরিক
অসুস্থতা নিয়েও পরিচালক হৃষিকেশ
মুখোপাধ্যায় উৎসবে যোগ দিতে এসে আমায়
ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন নয়াদিল্লির বিজ্ঞান
ভবনের ন্যাশনাল এওয়ার্ড অনুষ্ঠানের চেয়েও
বি এফ জে এর অনুষ্ঠান কোন কোন কারণে
গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন। বোম্বাই-
এর শিল্পীরা অর্থ পেতেন বোম্বাই থেকে,
কিন্তু মর্যাদার জন্যে তাকিয়ে থাকতেন কল-
কাতার দিকে। যে সব শিল্পী ও কুশলী বি
এফ জে এ পুরস্কার নিতে কলকাতায়
আসতেন বম্বের প্রযোজকরা সানন্দে তাঁদের
শুটিং বন্ধ রাখতেন। ওই সব ব্যস্ত শিল্পী-
দের একটা ডেট পেয়েও ছেড়ে দেওয়া যে
কত বড় ক্ষতির ব্যাপার তা যাঁরা অনু-
সন্ধিৎসু তাঁরা ভাল করেই জানেন। সে
ক্ষতি তাঁরা হাসি মুখেই মেনে নিতেন। আর
এখন? এবারে ড্যানির না আসার অজুহাত
হিসেবে জানা গেল তিনি মিউজিক টেকিং-য়ে
আটকে পড়েছেন। সঞ্জীবকুমার এবং শাবানা
আজমি নাকি খুবই অসুস্থ। অথচ ক বছর
আগেও বিপদসীমা ছুঁই-ছুঁই হাই প্রেসার
নিয়ে হৃষিকেশ মুখার্জি ছুটে এসেছিলেন
পুরস্কার নিতে। সেদিন আর এদিনে সত্যিই
কত তফাত!

এবারে বি এফ জে এর নির্বাচন এবং
উপস্থিতি অনুপস্থিতি নিয়ে কিছু পর্যা-
লোচনা করা যাক। পৃথিবীর কোন নির্বাচনই
তর্কাতীত নয়, তবে সাংবাদিকদের দ্বারা
নির্বাচনের চেহারা একটু স্বতন্ত্র হয় বৈকি।
সাংবাদিকদের নির্বাচন যদি জনপ্রিয়তার পথ
ধরেই চলে তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাঁরা
করছেন তাঁরা ভরসা রাখবেন কাদের উপর।
এবারে ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত
ছবির মধ্যে থেকে নির্বাচন হয়েছে। প্রথমে
১৯৭৭ সালের তালিকাটির উপর চোখ
বুলিয়ে নেওয়া যাক। শ্রেষ্ঠ ছবি পাঁচখানি।
গুণানুসারে প্রথম বাংলা ছবি যুক্তি তক্ক
গপ্পো, দ্বিতীয় এক যে ছিল দেশ, তৃতীয়
হিন্দী ছবি স্বামী, চতুর্থ বাংলা স্বাতী এবং
পঞ্চম হিন্দী ছবি শংকর হুসেন। ছবিগুলির
বাছাই মন্দ নয়, তবে স্থান নিয়ে প্রশ্ন
উঠতে পারে। পরলোকগত বিরাট প্রতিভা
ঋত্বিক ঘটকের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এবং
বাঙালী হিসেবে গৌরবান্বিত বোধ করেও
সিনেমা হিসেবে যুক্তি তক্ক গপ্পোকে প্রথম
স্থান দিত আমার অন্তত বাধে। আমার স্থির
বিশ্বাস ঋত্বিক ঘটক বেঁচে থাকলে তিনিই
সর্বাগ্রে এর প্রতিবাদ জানাতেন মঞ্চের উপর
দাঁড়িয়ে। অসামাজিকতাকে যে তিনি সারা
জীবন নিষ্ঠার সঙ্গে ঘৃণা করে এসেছেন।
ঋত্বিকের পুরস্কার নিলেন তাঁর স্ত্রী
সুরমা ঘটক। একটা চাপা বিষাদ তখন মঞ্চে
এবং দর্শক আসনে। স্বামীর হয়ে শ্রেষ্ঠ
বাংলা ছবির পরিচালকের পুরস্কারও তিনিই
হাত পেতে নিলেন। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির
পুরস্কার নেবার জন্যে ডাকা হল প্রযোজক
রাজকাপুরকে, উঠে এলেন আর এন মালহোত্র
—যিনি ওঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ।
ঘোষকের মুখে ওই নাম সংশোধিত হল
অন্ধকারের সীমারেখা পার হবার অনেক
পরে। পুরস্কারপ্রাপকদের স্বতন্ত্র আসন
পর্যবেক্ষণ করে এ ত্রুটি আগেই সংশোধন
করে নেওয়া যেতে পারত। তৃতীয় শ্রেষ্ঠ
ছবি 'স্বামী'র পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি
হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত
হয়েছেন। বোম্বাই থেকে এসেছিলেন উনি
পুরস্কার নিতে। ওঁকে দেখে দর্শকরা তবু
খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছেন। আরও দুজন
এসেছিলেন বম্বে থেকে। ১৯৭৭-এর হিন্দী
ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী কাজরী গুপ্ত
(বালিকা বধূ ছবিতে) এবং ১৯৭৮ সালের
বাংলা রঙ্গীন ছবির শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী
অশোক মেহতা (লালকুঠি ছবিতে)। বাস,
বহিরাগতের তালিকা এই তিনজনেই সীমা-
বদ্ধ। শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসেবে ওয়ান
ফ্লু ওভার দ্য কাক্কুজ নেস্ট' এবং পরিচালক
হিসেবে 'প্যাসেঞ্জার'-এর জন্য মাইকেলেঞ্জেলো
আন্তোনিওনির নির্বাচন খুবই ভালো।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারার জন্য
আন্তোনিওনি দুঃখ প্রকাশ করে একটি
চিঠিও পাঠিয়েছেন। 'বাবুমশাই' ছবিতে
অভিনয়ের জন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ
অভিনেতার পুরস্কার পেলেন। এই স্বীকৃতি
সৌমিত্রবাবুকে কতটা মর্যাদা দেবে জানি না,
তবে তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য
যে বাড়িয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
ওঁর খুব তাড়া ছিল, শুটিং ফেলে চলে
এসেছিলেন, তাই ওঁর পুরস্কারটি সর্বাগ্রে
দিয়ে দেওয়া হল প্রচুর করতালির মধ্যে।
হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সঞ্জীবকুমার
(এহি হ্যায় জিন্দগী) অনুপস্থিত। কারণ,
অসুস্থতা। হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
শাবানা আজমি (স্বামী) অনুপস্থিত।
কারণ ওই একই। বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভি-
নেত্রী সুমিত্রা মুখার্জি (প্রতিমা) নম্রপদে
তাঁর পুরস্কারটি নিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা
পুরস্কার নেবার পরই মাইকের সামনে
একবার করে দাঁড়াচ্ছিলেন, সুমিত্রাও
দাঁড়ালেন। সকলকে ধন্যবাদ জানালেন,
আগামী দিনের পাথেয় হিসেবে সকলের
আশীর্বাদ চাইলেন। আজকের ব্যস্ত শিল্পী
সুমিত্রার এই নম্র ভাবটি ভারী ভালো
লাগলো। বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী
মহুয়া রায়চৌধুরী (শেষরক্ষা) তাঁর পুর-
স্কারটি নিলেন কম্প্রবক্ষে। এই প্রথম তিনি
বি এফ জে এ পুরস্কার পেলেন। তাঁর
বক্ষের কম্পন তাঁর দুটি বাক্যের ভাষণের
মধ্যে দিয়েও ধরা পড়ল। হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ

সহ-অভিনেত্রী কাজরী গুপ্ত (বালিকা বধূ) স্বর্ণপদ কিংবা কল্পবক্ষের ধার-কাছ দিয়েও গেলেন না। হাঁটা-চলা, পুরস্কার নেওয়া, স্বর্ণপদেষের ইংরিজি ভাষণ—এই বালিকার সব কিছুতেই স্মার্টনেশের ছোঁয়া। তবে সত্যিকারের স্মার্টনেশ কাকে বলে সেটা দেখিয়ে দিলেন অনিল চ্যাটার্জি। উনি 'এক যে ছিল দেশ' ছবিতে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতার স্বীকৃতি পেয়েছেন। ও'র একটি বাক্যের ভাষণ-না-দেওয়ার ভাষণটি ছিল এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপার। 'বাবা তারকনাথ' ছবিতে শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালনার জন্য পুরস্কৃত হলেন নীতা সেন। এই গুণী মহিলাটির স্বীকৃতি লাভে আমি সত্যিই আনন্দিত এবং অভিভূত। কিন্তু সিনেমার সংগীত হিসেবে কি বি এফ জে এ-র সদস্যরা কেবল সুরের ব্যাপারটিকেই অগ্রাধিকার দেন? হিন্দী ছবির জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন আর ডি বর্মণ (হাম কিসিসে কম নেহি)। এ'র ক্ষেত্রেও ওই একই প্রশ্ন। এবং ইনিও যথারীতি অনুপস্থিত। উপস্থিত অবশ্যই ছিলেন শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (আনন্দ আশ্রম), তবে উপস্থিতির কারণ হিসেবে উনি যে ভাষণটি দিলেন তা খুবই মর্মান্তিক: উনি জানালেন: একই জায়গায় পর পর অনেক ইনজেকশন নেবার পর রোগীর যেমন কোন বেদনাবোধ থাকে না, তেমনি অজস্রবার বি এফ জে এ পুরস্কার পাবার পর এ ব্যাপারে ও'র আর কোন তাপ-উত্তাপ নেই। ও'রা দিতে হয় দিয়ে যান, উনি নিতে হয় তাই নিতে আসেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৯৭৭-এর শ্রেষ্ঠ কলাকুশলীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলা ছবির আলোকচিত্রী বিমল মুখার্জি (এক যে ছিল দেশ), সম্পাদক অমিয় মুখার্জি (কবিতা), শিল্পনির্দেশক সুব্র চক্রবর্তী (সব্যসাচী)। অনুপস্থিত ছিলেন আলোকচিত্রী অলোক দাশগুপ্ত (আনন্দ আশ্রম), জি সিং (লায়লা মজনু), সম্পাদক কমলাকর (অমর আকবর অ্যান্টনি), শিল্পনির্দেশক সুধেন্দু রায় (লায়লা মজনু)। নেপথ্য গায়ক-গায়িকা হিসেবে বাংলা ও হিন্দী ছবির জন্যে যে চারজন নির্বাচিত হয়েছিলেন, সে চারজনই অনুপস্থিত। তাঁরা হলেন বাংলায় কিশোরকুমার (কবিতা) এবং আরতি মুখার্জি (বাবা তারকনাথ), হিন্দীতে মহম্মদ রফি (হাম কিসিসে কম নেহি) এবং লতা মঙ্গেশকার (চলতে চলতে)। হায় পুরস্কার, হায় তার মর্যাদা। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্য বাংলায় তপন সিংহ (এক যে ছিল দেশ) এবং হিন্দীতে বাসু চ্যাটার্জি (স্বামী) নির্বাচিত হয়েছেন। তপনবাবুকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে তিনি বাক্যে এবং ভাবভঙ্গীতে উভয়তই বিরক্তির ভাবটি প্রকাশ করে গেলেন। বাসুবাবু যা বললেন তাও দায়সারা এবং নিয়মরক্ষার ভদ্রতা। এ বছরের অল ইন্ডিয়া ক্যাটাগোরির স্পেশ্যাল অ্যাওয়ার্ড পেলেন 'স্বাতী' ছবির জন্য তনুশ্রীশংকর। কিসের জন্য? নিশ্চয় অভিনয়ের জন্য। তাহলে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচনের সময় সে প্রশ্নটি বিবেচিত হল না কেন? শ্রেষ্ঠ স্বর্ণপদেষের ছবি হিসেবে এবারে পুরস্কৃত হল পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 'অবনীন্দ্রনাথ'। পুরস্কার নেবার জন্য প্রযোজক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হল অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। আসলে ওই নামটি হবে অরবিন্দ ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্য উঠলেন, পুরস্কার নিলেন, চলে গেলেন, কিন্তু ঘোষণায় তাঁর নামটি আর সংশোধিত হল না। বি এফ জে এ-র এখন এই হাল।

এ তো গেল ১৯৭৭ সালের স্মরণ পুরস্কারের ব্যাপার। এবারে ১৯৭৮ সালের পুরস্কার প্রাপকদের ব্যাপারটা দেখুন। মোট ৩৭ জন পুরস্কার পেয়েছেন, নিতে এসেছেন মাত্র ১০ জন। ২৭ জনই অনুপস্থিত। তাঁদের নামের তালিকাটা একবার লক্ষ করুন, তাহলেই ব্যাপারটা বোধগম্য হবে। 'মন্থন' শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য পুরস্কার পেয়েছে, কিন্তু তার পরিচালক শ্যাম বেনেগল অনুপস্থিত। কারণ অজ্ঞাত। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি, কিন্তু তার প্রযোজক সুরেশ জিন্দল, কিংবা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুনীল জিন্দল কেউই উপস্থিত ছিলেন না। অথচ তিনি কলকাতারই বাসিন্দা। সত্যজিৎ রায় ওই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত, তিনিও বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। অথচ তাঁর নিবাস রবীন্দ্র সদন থেকে মাত্র কয়েক ফার্লং দূরে। যতদূর জানি তিনি সেদিন কলকাতাতেই ছিলেন, এবং যতদূর মনে পড়ে তিনি সাধারণত চলচ্চিত্রের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকেন। এই আভিজাত্য তাঁর চরিত্রে আছে। বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ড্যানি ডেনজোংপা (লালকুঠি) অনুপস্থিত। কারণ মিউজিক টেকিং-এ আটকে গেছেন। হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গিরিশ কার্নাড (মন্থন) অনুপস্থিত। কারণ অজ্ঞাত। বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী গীতা সিদ্ধার্থ (বারবধূ) এবং হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী স্মিতা পাটিল (ভূমিকা) উভয়েই অনুপস্থিত। কারণ অজ্ঞাত। বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জির (সিংহদুয়ার) অনুপস্থিতি আরও বিস্ময়কর। শুভেন্দু কি কলকাতায় ছিলেন না! হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শা-ও (মন্থন) অনুপস্থিত। বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রী রেহানা সুলতান (তুষারতীর্থ অমরনাথ অনুপস্থিত) পরিবর্তে তাঁর এক ভাই, যিনি সম্ভবত কলকাতায় থাকেন, পুরস্কারটি নিয়ে গেলেন। এইসব ব্যাপারগুলি যে কি পরিমাণ হাসির খোরাক যোগায় তা যাঁরা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে দিয়েই খালাস তাঁরা কেমন করে বুঝবেন। যেমন ঘটেছিল কিছুক্ষণ আগে শাবানা আজমির পুরস্কারটি নেবার জন্য বাসু চ্যাটার্জির ডাক পড়ায়। সারা প্রেক্ষাগৃহে তখন চাপা কৌতুক। অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী বাসুবাবুর অবস্থা তখন অস্বস্তিকর। হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী বীণা (শতরঞ্জ কে খিলাড়ী) অনুপস্থিত। হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক বনরাজ ভাটিয়া (মন্থন), বাংলা ও হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ গীতিকার যথাক্রমে মুকুল দত্ত (লালকুঠি) ও নরেন্দ্র শর্মা (সত্যম শিবম সুন্দরম) এবং হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার বিজয় তেন্ডুলকর (মন্থন)—এই চারজনই অনুপস্থিত। কুশলীদের তালিকায় বাংলা ছবির আলোকচিত্রী শক্তি ব্যানার্জি (বারবধূ), হিন্দী ছবির আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায় (শতরঞ্জ কে খিলাড়ী), হিন্দী ছবির সম্পাদক ভানুদাস দিবাকর (মন্থন) এবং হিন্দী ছবির শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত (শতরঞ্জ কে খিলাড়ী)—সকলেই অনুপস্থিত। আর নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীদের চারজনই—কিশোরকুমার (লালকুঠী), আরতি মুখার্জি (ময়না), ভূপেন্দ্র সিং (ঘরৌন্দা) এবং লতা মঙ্গেশকর (সত্যম শিবম সুন্দরম)—চারজনই অনুপস্থিত। একই পথের পথিক হয়েছেন স্পেশ্যাল অ্যাওয়ার্ড-প্রাপ্তা দুলহন ওহী যো পিয়া মন ভায়ে-র অভিনেত্রী রামেশ্বরীও। হিসেব করে দেখা গেল শ্যাম বেনেগলের মন্থন ও ভূমিকা ছবি মিলিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলেন সাতজন, কিন্তু একজনও আসেন নি। আবার সত্যজিৎ রায়ের শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর জন্যে পুরস্কার পেয়েছিলেন পাঁচজন, তাঁদেরও কেউই আসেননি। তাহলে কি ধরে নেব ইনটেলেকচুয়ালদের খাতা থেকে বি এফ জে এ-র নামটি কাটা পড়েছে।

অনুপস্থিতির এই দীর্ঘ তালিকা শোনার ফাঁকে ফাঁকে যে দশজন পুরস্কার নিতে মঞ্চে উঠলেন তাঁদের স্বচ্ছন্দ বোধ করার কথা নয়। যারা পুরস্কার নিলেন, তারা রুপোলী পর্দার বর্ণময় ব্যক্তিত্ব নন, অতএব প্রেক্ষাগৃহের হাততালিও তেমন জোরদার হল না। পুরস্কার নিলেন 'বারবধূ'র প্রযোজক, ওই ছবির পরিচালক বিজয় চ্যাটার্জি, সংগীত পরিচালক আনন্দশঙ্কর এবং সম্পাদক গোবিন্দ চ্যাটার্জি। এছাড়া পুরস্কার নিলেন 'লালকুঠী' ছবির জন্য আলোকচিত্রী অশোক মেহতা, 'তুষারতীর্থ অমরনাথ' ছবির জন্য শিল্পনির্দেশক প্রসাদ মিত্র এবং 'সফেদ হাথী' ছবির শিশু-অভিনেতা অশ্বিনীকুমার। 'সফেদ হাথী' ছবির প্রযোজনার পুরস্কার নিয়েও একটু মজা হল। ওই ছবির প্রযোজক দুজন—আর এ জালান এবং প্রতাপ আগরওয়াল। প্রথমে ডাকা হল শ্রীজালানকে, কিন্তু তিনি আগরওয়াকে বাদ দিয়ে মঞ্চে উঠতে রাজি নন। অবশেষে আগরওয়ালেরও ডাক পড়ল ও'রা দুজন হাত ধরাধরি করে মঞ্চে উঠলেন হাত ধরাধরি করে পুরস্কার নিলেন, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বেশ একটা হিন্দী ছবির শেষ দৃশ্যের মত ব্যাপার। প্রায় হাত ধরাধরির মত অবস্থায় মঞ্চে উঠেছিলেন আরও দুজন। 'বারবধূ'র চিত্রনাট্যকার হিসেবে বিজয় চট্টোপাধ্যায় এবং সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীলবাবু যে সমকালীন সাহিত্যের এক বিশিষ্ট

প্রতিভা, ঘোষণায় কিন্তু সে সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করা হল না। তিনি প্রায় বৃদ্ধদের দলে পড়ে গেলেন। এটা অজ্ঞতা না অবহেলা? যাই হোক, সুনীলবাবুর ওই অবস্থা দেখার পর আর কোন সাহিত্যিক বি এফ জে এ-র মঞ্চে উঠতে প্রবৃত্ত হবেন বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের কলাকুশলীদের দ্বারা নির্মিত কোন উল্লেখযোগ্য অল্প দৈর্ঘের ছবি, অথবা তথ্যচিত্র, কিংবা নিউজ-রীল এ-বছর খুঁজে পাননি বি এফ জে এ-র বিচারকরা। তাই ওই বিভাগে কোন পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হয়নি। এটা স্থানীয় কলাকুশলীদের কাছে একটা অগৌরবের বিষয় হয়ে রইল।

এত সব ব্যাপারর পরও বি এফ জে এ অভিনন্দন পাবেন একটি কারণে। উদ্বোধক হিসেবে তাঁরা যাঁকে মঞ্চে উপস্থিত করেছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র তাঁর কাছে নানাভাবে ঋণী, নানাভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি চলচ্চিত্রশিরোমণি ভি শান্তারাম। এই মানুষটি যে চলচ্চিত্রের উন্নতি অবনতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন তা তাঁর ভাষণের আন্তরিকতা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি বেঙ্গলকে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতই আবার আবির্ভূত হতে আহ্বান জানালেন হিন্দী ছবির এই সেক্স-ক্রাইম-ক্যাবারে অধ্যুষিত অবক্ষয়ের কালে। বামফ্রন্ট সরকার যে এই রাজ্যে নির্মিত ছবির ক্ষেত্রে কিছু অনুদান দিচ্ছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। এর ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হবার যে প্রশ্নটি কোন কোন মহল থেকে উঠেছে তাকে তিনি এক কথায় হেসে উড়িয়ে দিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র, কেরালা, গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে বললেন, তাঁরা যদি তাঁদের রাজ্যে নির্মিত ছবির জন্য রক্ষাকবচ-এর ব্যবস্থা করতে পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গ পারবে না কেন? আঞ্চলিক ছবির গুণগত মান বাড়লে তবেই সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ছবির মান বাড়বে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য আবেদন জানালেন যা অন্যান্য অনেক রাজ্য দিচ্ছে।

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীশ্যামলাল জালান ছিলেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বাংলা ছবির মানোন্নয়নে বি এফ জে এ-র ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় বি এফ জে এ-র সভাপতি নির্মলকুমার ঘোষের স্বাগত ভাষণে। প্রসঙ্গত তিনি লোডশেডিং-এর কথা উল্লেখ করে এই রাজ্যে চলচ্চিত্রশিল্পের অন্ধকার দিনের কিছু আভাস দিলেন। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে এই শিল্পের সকলকে একত্র হয়ে পথ-সন্ধানের আহ্বান জানালেন। তিনি বাংলা ভাষায় ভাষণ শুরু করে সকলের ধন্যবাদভাজন হন। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির সভাপতির উপযুক্ত কাজই তিনি করেছেন। অবাঙালী হলে পর্যন্ত পুরুষই তাঁদের মাতৃভাষাকে ভুলে থাকেন।

কিন্তু ও'র স্বাগত ভাষণের আগে মাল্যদান পর্বটি একটি কুৎসিত হাসির খোরাক যোগাল। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের মাল্যদান করতে এগিয়ে এলেন সংস্থার ত্রিশোর্ধ তরুণ সহ-সম্পাদক তাপস ব্যানার্জি। মাইকে তখন সম্পাদক বাগীশ্বর ঝা যাঁকে মাল্যদান করা হবে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিচ্ছেন। দর্শকাসনে বসে আমরা দেখলাম মাল্যগ্রহিতাকে আবৃত করে তাপসবাবুর পশ্চাদ্দেশ প্রায় অনড় অটল। এরকম একবার নয়, একাধিকবার। এমন কুৎসিত দৃশ্য আমার জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। এ সম্পর্কে তাপসবাবুকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এটা অনুষ্ঠানের সামগ্রিক অব্যবস্থারই একটি ফসল মাত্র।

যেমন অনুষ্ঠানসূচীর ঘোষণা। এটা বি এফ জে এ-র একটা চিরকালীন হাস্যকর সৌন্দর্য। এবারে ঘোষক হিসেবে তরুণ উৎপল চক্রবর্তীকে দেখে ভেবেছিলাম হয়তো ততটা হাস্যকর কিছু ঘটবে না। ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে স্মার্ট, উচ্চারণও পরিশীলিত, কিন্তু ক্রমাগত চতুষ্পার্শ্ব থেকে প্রম্পট হতে থাকলে তাঁর স্মার্টনেসও দিশাহারা হতে বাধ্য। সে বিরক্তি একবার যেন তাঁকে প্রকাশ করতেও দেখা গেল। দু-একবার তো তিনি পার্শ্ববর্তীর অনুপ্রবেশে স্থানচ্যুতই হয়ে গেলেন। বাসু চ্যাটার্জির হাতে পুরস্কার তুলে দেবার জন্য মৃণাল সেনকে ডাকা হল। এটা বোধ হয় ঘোষককে প্রবাহে অবহিত করা হয়নি। তাই ঘোষণাটি এমন দাঁড়াল যে 'স্বামী' ছবির পরিচালনার পুরস্কার নেবার জন্য যেন দুজনকেই ডাকা হচ্ছে। এমনি নানা এলোমেলো ঘটনা। একেই বলে অব্যবস্থা।

সবশেষে সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক-এর কাছে আমার একটি সানুনয় নিবেদন আছে। আমার এ প্রতিবেদন গভীর দুঃখ এবং যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত। নির্মলদা, আপনি তো ভারতবিখ্যাত সাংবাদিক, আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রচুর, বয়স আপনার চিন্তা ও ক্রিয়াশীলতাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি আজও। আপনি কি পারেন না বি এফ জে এ-কে আবার নতুন করে সঞ্জীবিত করতে? ঝা-জী, আপনি প্রবীণ, শ্রদ্ধেয়, অক্লান্ত কর্মী। এই সংস্থার প্রতি আপনার স্নেহ, কর্তব্য এবং ভালোবাসার পরিমাপ হয় না। আপনি কি পারেন না সংস্থাটিকে আবার নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে? আর তা যদি না পারেন তবে এই স্থাবির জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বৃক্ষটিকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলুন। সকলের হাসি কুড়িয়ে এবং করুণা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার তো কোন মানে হয় না। তাছাড়া এই সংস্থার সঙ্গে বাংলা চিত্র-সাংবাদিকতার সম্মানিত ঐতিহ্যের প্রশ্নটিও যে জড়িত। সেটাকে এমন করে নষ্ট করার অধিকার তো আপনার আমার কারোরই নেই।

চিত্রধ্বনি

১৮ রিলের ১৮ দশা

সব গোরুই যেমন দুধ দেয় না তেমন সব গ্যামলারই গ্রেট নয়। এই গ্রেটত্ব নির্ভর করে কে গ্যামলার, তার ওপর। আর একটা কথা জেনে রাখা ভালো যে আপনি বা আমি যদি কখনো গ্যামলার রূপে আত্মপ্রকাশ করি তাহলে আমাদের গ্রেট হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকবে না।

অথচ শ্রীযুক্ত অমিতাভ বচ্চন পর্দায় ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেট লাগছিল। ইহাকেই ভাগ্য কহে!

অমিতাভ একা—দুই অমিতাভ। একজন জয় অমিতাভ, অন্যজন বিজয় অমিতাভ। জয় অমিতাভ জুয়াড়ী। বিজয় অমিতাভ পুলিশ। জয়-বিজয়ের কর্মযজ্ঞ শুধুমাত্র ভারতের মাটিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছে কায়রোতে, রোমে। শক্তি সামন্ত পরিচালিত দি গ্রেট গ্যামলার সেকারণে ভূগোলের ছাত্রদের কাছে পাঠ্য সিনেমা (পুস্তক) বা সিলেবাশ অন্তর্ভুক্ত ছবি। তার ওপর ছবিটি পলিটিক্যাল সায়েন্স কিংবা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন-এর ছাত্রদের কাছেও সমান জরুরী হয়ে উঠেছে। যখন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের তৈরী 'কে-২ প্ল্যান' বিদেশে বিক্রী ইত্যাদি ব্যাপারই প্রধান।

অমিতাভ গ্যামলারই হন আর যেই হন তিনি তো আর শুধু তাশ বা জুয়া খেলেই জীবন কাটাতে পারেন না। তাঁকে প্রচুর ঝাড়পিঠ করতে হবে। প্রেম করতে হবে। নাচতে হবে, গাইতে হবে বা গানে মুখ নাড়তে হবে। কার-ড্রাইভিং থেকে স্পীড-বোটে বাজীমাৎ করতে হবে। সেই অনুযায়ী কাহিনী চিত্রনাট্য বা সংলাপ।

জয়-বিজয় যেহেতু দুজনেই অমিতাভ। সে কারণে ভ্রান্তিবিলাস হবে। উধোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে বা উধোর বোঝা বুধোর কাঁধে এসে যাওয়ার সম্ভাবনাকে নষ্ট করেন নি শক্তিজী। এ ব্যাপারে তাঁর হাতযশের তুলনা নেই। শক্তি সামন্তের দার্শনিক চিন্তার মূল কথা সম্ভবত—'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিবে তাই, পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।' কাজেই ডিটেল-এ বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই। কায়রো-র হোটেলে নাচপর্বে নর্তকীর শরীর দেখানোর বা শরীরের ডিটেল দেখানোর মাধ্যমেই তাঁর পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে। জীনাত-ই কম কিসে। কতটুকু দেখালে কতটুকু সুড়সুড়ি লাগে সত্যম শিবম খ্যাত জীনাতের তা জানতে বাকী নেই। কাজেই নাচতে নেমে উনি ভুল করেও ঘোমটা টানেন নি।

নীতু সিং-এর ব্যাপারে অনেকের দুর্বলতা হিংসে করার মতো। কিন্তু নীতু এখানে যেন ডল পুতুল। সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করা হয়েছে তাকে। নীতুকে যাঁরা খোলামেলা দেখবেন ভেবেছিলেন, তাঁদের হতাশ হতে হয়েছে। একটু কাহিনী অংশে আসি। মজাটা দেখুন। জয়-অমিতাভ বাবার ফোটোতে প্রণাম করে বা ফোটোর আশীর্বাদ চেয়ে জুয়া বা তিন তাশের আসরে যায়। সেখানে হুজ্জোতি। হুজ্জোতি থেকে ...ড় ঠেকে। যেখানে শেঠ রতন দাস মালিক। সাভের ওপর ভাগবাটোয়ারা। জয়-অমিতাভ গ্যামলার। এই বোর্ড এক লাখ টাকাতেও 'বাস্ট' করে না। এক উচ্চপদস্থ অফিসার হারার পর শেঠ রতন দাসের মুখে 'কে-টু' প্ল্যানের কথা প্রথম শোনা যায়। এটা এমন একটা যন্ত্র যার সাহায্যে ৫০ মাইল দূরের জাহাজ-ডুবোজাহাজ - উড়োজাহাজ সবই রেডারে ধবা পড়বে এবং এক শক্তিশালী রে বা রশ্মি দিয়ে সেই জাহাজ ডুবো-উড়ো সবকেই পুড়িয়ে দেওয়া যাবে। এহেন যন্ত্র বা যন্ত্রের প্ল্যান বিদেশের বাজারে দাম প্রচুর। ক্রেতাও প্রচুর। বিক্রেতা উৎপল দত্ত এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। উৎপল দত্ত শেঠজীর বিশেষ বন্ধু।

বিজয় অমিতাভ যেহেতু পুলিশ সেকারণে তার উপর দায়িত্ব আসে জাতির এবং দেশের সম্পদ রক্ষা করার।

জয়-অমিতাভ রোমের পথে পা বাড়ায়-তার ভাবী বধূর সঙ্গে মিলতে। বিজয়েরও যাবার কথা ছিল। বিজয় ট্রেন ফেলের মতো প্লেন ফেল করে। কাজেই উৎপল-চক্রীদের কাছে জয় হয়ে যায় বিজয়। বা জয়কে বিজয় করানো হয়। আর বিজয় পরে নীতুর কাছে জয় হয়ে ওঠে। অবশ্য ও... জয় পেয়েছিল জীনাতকে। এ ব্যাপারে... বিজয়ের মধ্যে কে বেশী লাভবান হ... সে প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু দু... অমিতাভ।

বিজয় অমিতাভর অভিযান '... প্ল্যান উদ্ধার। যা ইতিপূর্বে চুরি ... উৎপল চক্রীদের এক পলাতক এবং ব... মালিক—সেটাকার বদলে ভারতকেই ... দিতে চায় প্ল্যানটা। উৎপল চক্রীরা ... হাতাতে চায়।

একেই মা মনসা, তার ওপর ধ... গন্ধ। অমিতাভ একজন হলেই রক্ষা ছিল... প্ল্যান উদ্ধারতো হতোই। কাজে যে... দুই অমিতাভ সেহেতু আমরা নিশ্চি... কিছুট ঘুমিয়ে নিলেও ক্ষতি হ'ত না... একটা।

ভারতের প্ল্যান ভারতে ফিরে এ... উৎপল চক্র থরা পড়েছে। জয়-বিজয় ভ... ভাগি ক'রে জীনাত নীতুকে পে... রাহুল দেবের সৌজন্যে গান শোনা ... বেশ কয়েকটা। জীনাতের স্নানের পো... থেকে গুলি চালনা সব দেখা গেছে—... কি চাই? পুরো ১৮টি রিল ১৮টি অ... রূপে নব—মহাভারত শক্তি সামন্ত কী ... খেল দি গ্রট গ্যামলার যুগ যুগ ... আউর পিও।

প্রভাত চৌধ...

ছবির খবর

লোডশেডিং-এর কথা নতুন করে ব... লাভ নেই। বরং স্টুডিওগুলোর অবস্থ... কথাই বলি।

তখন বেলা তিনটে। নিউ থিয়েটার্স... গোলঘরে একদল ...নিসিয়ানস হা... আলোচনায় সময় ... করছে।

কাট।

পরিচালক অজয় কর অফিস ঘরে বে... মুখে বসে আছেন। আলো নেই। গত ... নারও এই আলোর সঙ্গে লুকোচুরি... ছেন তিনি রাত নটা অব্দি।

অপর্ণা সেন রেস্টরুমে প্রো... সুমনা ভট্টাচার্যের সঙ্গে বসে। আ... বিষয় জানি না। শুনলাম আগামী স... ওঁর ছবি 'দেবিকা'র সুটিং আছে। ... ব্যস্ত হয়ত। তাছাড়া সময়তো কাটাতে...

কাট।

এক-নম্বর ফ্লোরের দরজা বন্ধ। ... 'দুই পৃথিবী' ছবির সুটিং হবার ... সকাল থেকে মাত্র এক ঘন্টা মাফি আ... দেখা পাওয়া গেছে। আলো সা... সাজাতেই আলো নিভেছে। সুটিং হয়... কাট।

উত্তমকুমার গেরুয়া রংয়ের ধুতি-পা... পাস মিসর্জিত সমস্ত সর্জি ...

আপ রুমে বসে। সঙ্গী রয়েছেন অসীম সরকার, পীযূষ বসু।

কাট।

আলো এল ঠিক চারটের সময়। ব্যস্ততা পড়ল চারদিকে। সব টেকনিসিয়ানরা দু-দলে ভাগ হয়ে চলে গেলেন 'নৌকাডুবি' আর 'দুই পৃথিবীর' সেটে। আবার আলো সাজানো শুরু হল।

কাট!

অপর্ণা সেন ম্যাক্সি ছেড়ে পরলেন বেনারসী। কপালে টিপ টিকুলী।

কাট!

উত্তমকুমার মুখের ঘামে স্পঞ্জ বুলিয়ে নিলেন।

কাট!

উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন ঢুকলেন দুটো ফ্লোরে। একজন 'দুই পৃথিবী'র ফ্লোরে। অন্যজন 'নৌকাডুবি'র।

কাট!

সৌমিত্র রেডি। ক্যামেরা সাজিয়ে অজয় করও প্রস্তুত। বৌ-বেশে অপর্ণা এলেন। রিহার্সাল হল কয়েকবার। একটা শট টেক করাও হয়ে গেল। পরবর্তী দৃশ্য গ্রহণের চলছে প্রস্তুতি।

কাট!

এবারে আলো গেল নিভে। নেমে এল অন্ধকার সারা ফ্লোরে। টর্চ জ্বালিয়ে বাইরে নিয়ে আসা হল সৌমিত্র-অপর্ণাকে।

কাট!

উত্তমকুমার আধো অন্ধকারে পায়চারি করছেন স্টুডিও লনে। তরুণ মজুমদার রাজেন তরফদার, সন্ধ্যা রায় ও আরও একটা ভিড় স্টুডিওর প্রোজেকশন রুমের সামনে। অন্ধকারে আলো নিয়ে কথা হচ্ছে। হঠাৎ দাপিয়ে সেখানে ঢুকলেন নিরঞ্জন রায়। আলোর অবস্থা নিয়ে বুঝি তিনিও চিন্তিত। তরুণ মজুমদারের সঙ্গে কিছুক্ষণ নীচু গলায় কথা বলে রাজেন তরফদারের পাশে গিয়ে বসলেন।

কাট!

রাত আটটা। এখনও অন্ধকার। স্টুডিওর ভেতরে ভিড় এখন পাতলা। অজয় কর চিন্তা করছেন কাল হয়ত আবার সুটিং করতে হবে। উত্তমকুমার মেক-আপ তুলছেন মোমবাতির আলোয়। অপর্ণা সেন কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত। কাল আবার সুটিংয়ে আসতে হলে অনেকগুলো জরুরী কাজ বাতিল করতে হবে।

কাট।

এখনও অন্ধকার।

*

উত্তমকুমার সমীপেষু,

না, উত্তমবাবু, আপনার অভিনয় গুণের প্রশংসার পাঁচালি গাইবার জন্য এ চিঠি লেখা নয়। গাইবার প্রয়োজনও দেখি না

পূর্ণেন্দু পত্রীর মালঞ্চ ছবিতে মাধবী

অগুণতি ছবিতেই আপনার ক্ষমতার প্রকাশ।

সম্প্রতি কয়েকবার স্টুডিওয় কিংবা স্টুডিওর বাইরে আপনার শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারাটা দেখে একটা কথা বার বার মনের দরজায় উঁকি মারছে। সেই কথাটা বলার জন্যই এই চিঠি লেখা।

কলমটা নিয়ে বসার আগে অন্ততঃ আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় কাটিয়েছি চিন্তার ভেতরে ডুবে দিয়ে। ভেতরের প্রশ্নটার সত্যতা যাচাই করার কোন সুযোগ নেই, নইলে করে নিতাম। চিঠি আর লিখতাম না তাহলে। কারণ ব্যক্তিগত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার বিরোধী আমি।

সত্যজিৎ চিত্রের উৎসব

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রকার জীবনের দ্বিতীয় দশক থেকে নির্বাচিত সাতটি ছবি নিয়ে ২ থেকে ৮ মে শিশির মঞ্চে (কলকাতা তথ্য কেন্দ্র) একটি উৎসব হচ্ছে। স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাহায্যার্থে এই উৎসবের আয়োজন করেছেন শান্তি দাস। ছবির তালিকায় আছে : চিড়িয়াখানা, গুপী গাইন বাঘা বাইন, অরণ্যের দিনরাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, অশনি সংকেত, সোনার কেল্লা ও জন-অরণ্য। সত্যজিৎ রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে শিশিরমঞ্চে ২ মে সকালে।

জানি, বড় হওয়ার জ্বালা অনেক, জন-প্রিয় হবার যন্ত্রণা বড় কঠিন এবং সেই জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা সকলের থাকে না। আপনি রেখেছেন। ধন্যবাদ, সেজন্য বুঝি মূল্যও কম দিতে হয়নি আপনাকে। ব্যক্তিগত জীবনের অনেক চাওয়া পাওয়াকে সংযত করতে হয়েছে কিংবা উদার হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছে। শিল্পীজীবনের সংকটতো এখানেই।

ব্যক্তিগত জীবনের সব টেনশনকে সব বেদনাকে যন্ত্রণাকে কখনও সামনের সারিতে নিয়ে আসা যায় না। বিশেষ করে পারফর্মিং আর্টসের শিল্পীদের তাঁর কষ্টটা সেখানেই প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় রং মেখে, অন্য মানুষ সেজে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যেতে হয় তাঁদের।

আপনার কষ্টটা কি সেই ধরনের? আপনার চারপাশের স্তাবকের দল, যাদের কারুই আপনার পায়ের জুতো খোলার যোগ্যতাটুকু পর্যন্ত নেই তাঁরা আপনাকে কি কোনভাবে আঘাত দিয়েছে? নাকি যন্ত্রণটা নেহাৎই পারিবারিক?

বড় কথা, আপনি নিজেতো বাঁচুন আগে। নিজের জন্যই বাঁচুন। পারিবারিক সমস্যাগুলো ঝেড়ে ফেলুন। শরীরে টিউমার হলে সেটিকে কেটে ফেলাই বুদ্ধিমত্ত। আপনি আপনার মানসিক টিউমারটিকে অপারেশন করে ফেলুন।

[illegible]

সিংধু রঙীন ছবিতে মিঠু

অমসৃণ হীরকখণ্ড

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের জীবনে প্রায়ই নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আনন্দ-বেদনার সন্ধান পাওয়া যায়। বলা চলে এই সব অমূল্য দুঃখ, আকস্মিকতা বা কখনও খামখেয়াল তাঁদের সৃজনীক্ষমতাকে সম্পন্ন করে তোলে। কিন্তু সে যতো বিচিত্রই হোক, তা নিয়ে কোন নাটক গড়ে উঠতে পারে কদাচিৎ। হেমিংওয়ের ব্যক্তিত্ব ও জীবনে ছিল সেই দুর্লভ ইশারা। রিচার্ড মারকোয়াণ্ডে 'রাফ ডায়ামণ্ড' নামের চিত্র-আলেখ্যটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন হেমিংওয়ের জীবনের এক খণ্ডমুহূর্তের নাটকীয় সংঘাত। যেখানে নায়ক হেমিংওয়ে, প্রতি-নায়ক হেমিংওয়ে, সংলাপ হেমিংওয়ের সঙ্গে হেমিংওয়ের এবং সাক্ষাৎকার নিতে আসা এক তরুণীর ভূমিকা তার মানচিত্রে মঞ্চসজ্জার বেশি কিছু নয়। যে হেমিংওয়ে 'ডাস নট স্পীক ওনলি রাইটস'—তার কোন বার করা রুক্ষ হীরের আলো ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে। লরী হুডেকফ কিছু সময়ের জন্য হেমিংওয়ের অবয়বে আশ্চর্য বিশ্বাস্য হয়ে থাকেন। এমনই এক অনুভবের নাম 'রাফ ডায়মণ্ড'।

নৃত্যনাট্য না গীতিনাট্য

রবীন্দ্রনাথের 'নৃত্যনাট্য' বিষয়ে বর্তমান প্রতিবেদক এই কাগজের পাতায় প্রায় বৎসরকাল পূর্বে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটা জরুরি বিষয় ছিল এই যে কবির নৃত্যনাট্যের সংখ্যা মাত্র তিনটি হলেও অসংখ্য আলেখ্য কবির নৃত্যনাট্য হিসেবে প্রযোজিত হয়। ফলে নৃত্যনাট্য হিসেবে সেগুলির দুর্বলতার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা যায় না। তাঁর গীতিনাট্য বা গাথা কবিতাগুলির নৃত্যনাট্যসুলভ মঞ্চ-যোগ্যতা স্বভাবতই নেই। আর সেই কারণেই সেইসবের প্রযোজকরা অসংহতির শিকার হয়ে পড়েন। 'হংসধ্বনি'র 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্যের(?) প্রযোজনার ভাগ্যেও সেই দুর্ভোগ ঘটেছে।

'মায়ার খেলা' কখনোই কোন কারণে নৃত্যনাট্য নয়। এ ব্যাপারে 'হংসধ্বনি'কে অন্যমনস্ক লঘুচিত্ত বলেও মনে হয় না। নাটকের আগে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য বিষয়ে 'অমিতাভ চৌধুরী' ও 'হরপ্রসাদ মিত্র'র নাতিদীর্ঘ আলোচনার আয়োজন এ-বিষয়ে তাঁদের সৎ ও গভীর অনুসন্ধিৎসারই পরিচয় দেয়। এবং অমিতাভবাবুও তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের শেষপর্বে গীতিনাট্যের রূপান্তর বিষয়ে সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি আরও দুটি মারাত্মক সত্য-ভাষণ করেছিলেন।

(১) রবীন্দ্রনাথের নাচে নৃত্যশিল্পী-দের ঘুঙুর না পরার পিছনে কোন নান্দনিক কারণ নেই, আছে তালভঙ্গের ভয়।

(২) ভাড়া করে পোশাক হয়, মঞ্চ হয়, কিন্তু শিল্পী ভাড়া করে হয় না।

'হংসধ্বনির' সমস্ত সততাও এই তিনটি কঠিন বিপদকে অতিক্রম করতে পারেনি। 'মায়ার খেলা'র মঞ্চযোগ্যতার অভাব নৃত্য-শিল্পীদের অধিকাংশ সময়েই দ্বিধাগ্রস্ত করে রাখে, অনেকেই সঠিক ভঙ্গি বা মুদ্রা খুঁজে পান না। বিশেষত 'কুমার'-এর নৃত্যে লালু সিং-কে সারাক্ষণই কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে মনে হয়। শুভাশিস ভট্টাচার্যর অমর এবং সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায়-এর শান্তাও কাজ চালানোর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

সেই তুলনায় 'হংসধ্বনি'র সঙ্গীতাংশ উজ্জ্বল। সাগর সেন-এর অমর, সুমিত্রা রায়-এর শান্তা, মনোশ্রী লাহিড়ীর প্রমদা, শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়-এর কুমার বা সমবেত ভাবেগীত অংশগুলি প্রশংসা পায়। 'মায়ার খেলা' শতকরা একশ ভাগ গীতিনাট্য। গানগুলি ভালো হওয়ার ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানের অনেকটাই লাভ হয় শেষ পর্যন্ত। 'হংসধ্বনি'কে কেবল গানের সংস্থা হিসেবে মেনে নিতে ভালো লাগে।

সুরজিৎ ঘোষ

পার্কসার্কাস সঙ্গীত সম্মেলন

পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতার দিয়ে শুরু হল পার্ক সার্কাস সঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। ইন্দ্রনীলের অনুষ্ঠান ছিল বেশ পরিণত এবং পরিচ্ছন্ন। তবলায় তাকে সহযোগিতা করেছেন শংকর ঘোষ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে শোনা গেল সরাফৎ হুসেন খানের খেয়াল, রাগ নটবেহাগ। আগ্রা আতরাউলি এবং রঙ্গীলা ঘরের পূর্ণ তালিম সরাফতের থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিলম্বিত আলাপের ক্ষেত্রে তিনি খুব নিচু পর্দা থেকে শুরু করতে পছন্দ করেন এবং মূল রাগ গঠনের জন্যে বিস্তারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গার পুনরাবৃত্তি এবং জোর দেওয়াকে প্রাধান্য দেন। মিশ্র রাগের 'বেহাগ' এবং 'নট' অংশগুলির প্রকাশের জন্যে নিশাদ এবং রেখাবের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ছিল একেবারে নির্ভুল। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি কখনোই খুব বেশী মাত্রায় হয়নি। এবং জোড়ের কাজগুলি ছিল আশাতিরিক্ত রকমের ভাল। রঙ্গীলার বর্ণবহুল অলংকার সহযোগে কাজগুলি ছিল খুবই উপভোগ্য। তানগুলি ছিল সুস্পষ্ট, সরল, খুব দ্রুত অংশগুলির ক্ষেত্রেও টোন্যাল মডিউলেশন ফর্মাল প্রশংসনীয়। একতালে সাওচার বিস্তারের ভঙ্গী তার আলাপের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এটা পরিষ্কার প্রমাণ করে যে বিভিন্ন সঙ্গীতসারে তিনি এখনো নানান মূল্যবান শিক্ষনীয় বস্তু সংগ্রহ করেন। আজকের শিল্পীদের মধ্যে এটা খুবই কম দেখা যায়। কন্ঠ দিয়ে তাঁকে যোগ্য সহযোগিতা করেছেন সাবির খান। মহাপুরুষ মিশ্রের তবলায় কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষত 'সাথ' অংশগুলিতে।

ভায়ালিনে—যা বীণা, সেতার কিম্বা সরোদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়—শিশিরকণা ধরচৌধুরীর দরবারী কানাড়ার আলাপ সেনিয়া ঘরানার বাজনার কথা মনে পরিয়ে দিয়েছে। গভীর ও কোমলতর সঙ্গে

'কোমল ধৈবৎ' ও কোমল গান্ধারের প্রয়োগ সর্বক্ষণ কানাড়ার পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। শিশিরকণা মূলতঃ সিরিয়াস শিল্পী। তাই তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার জন্যে কখনো সংগীতকে হাল্কা পর্যায়ে নামিয়ে আনেন না। তাঁর আলাপ এবং জোড় রীতিবদ্ধ এবং ঐতিহ্যময়। রাগের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি ধরা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'দরবারী'তে তাঁর ভায়োলিন সাধারণের চেয়ে খুবই নিচু সুরে বাধা ছিল— সম্ভবত রাগের গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলতে। তিন তালে বাধা তাঁর চন্দ্রনন্দনের গৎ ছিল সুমিষ্ট এবং তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। সুর পরিবর্তন করে যখন ভায়োলিনকে উচ্চগ্রামে বাধা হল, তখন আগেকার বিরক্ত সৃষ্টিকারী শব্দগুলি উধাও, এবং একতার টোন্যাল এফেকট প্রকাশ পায়। তবলায় সহযোগিতা করেছেন শংকর ঘোষ। বিস্তার অংশে তিনি কতটা পারিণত, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন। মাঝে মাঝে এমন একজন কণ্ঠশিল্পীর আত্মপ্রকাশে আমরা খুশী হই, যাঁরা প্রতিভাবান এবং সংগীত তাঁদের কাছে পুরোপুরি পেশা নয়। যেমন পূর্ণেন্দু সেন—বিভিন্ন সংগীতাসরে যাঁর অবদান ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি তাঁর ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখলেন—কলামন্দিরে, শনিবারের সন্ধ্যায়। শুদ্ধ কল্যাণ রাগে তাঁর খেয়াল প্রমাণ করল শুধু ব্যবসায় নয়, সংগীতেও তিনি পর্যাপ্ত সময় ঢালেন। রাগ সযত্নে নির্মিত। সুরের প্রয়োগ সুস্পষ্ট এবং যথাযথ। গমকগুলি সুগঠিত। মাঝে মাঝে নাটকীয় স্তব্ধতার সঙ্গে, রুচিজ্ঞানসম্পন্ন ছোট ছোট টুকরো কাজে তাঁর গুরু ভীমসেন যোশীর প্রভাব ফুটে উঠেছিল। আবেগপূর্ণ প্রয়োগের জন্যে তাঁর পরিবেশিত দুটি ঠুংরিই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তবলায় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন মহাপুরুষ মিশ্র।

মুনওয়ার আলি খান সংগীত জগতের এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত পার্সোনালিটি—এমনকি সেই পঞ্চাশের দশকে তিনি যখন তাঁর পিতাকে সহযোগিতা করতেন, তখন থেকেই। তারপর সময়ের সঙ্গে সূক্ষ্মতা এসেছে এবং [illegible] অল্পদিনের মধ্যেই সুরের ক্ষেত্রে তাঁর নিপুণ, কোমল ও পরিণত প্রয়োগ রসজ্ঞ শ্রোতাদের মনোগ্রাহী হয়েছে এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তিনি বর্তমানে ভারতের প্রথম সারির গায়কদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। শুদ্ধ[illegible]রাগ চিহ্নিত তাঁর রাগেশ্রীতে ছিল তান পড়তার [illegible]টিলতা এবং সরগমের দীপ্তি। [illegible]তিয়ালা ঘরানার কিছু ছোট ছোট [illegible]র্মির কাজ সহযোগে ঠুংরিগুলি [illegible]ল অনবদ্য। হারমোনিয়াম এবং তবলায় [illegible]কে সহযোগিতা করেছেন যথাক্রমে সোহন[illegible]ল এবং মহাপুরুষ মিশ্র।

দ্রুত একতালের তাড়ানা সহযোগে নন্দা পট্টনায়কের বিলাসখানি টোড়ী রাগের খেয়াল সম্ভবত সারা রাত্রিব্যাপী ঐ আসরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল। তাঁর স্টাইল যদিও প্রথাগত নয়, কিন্তু ক্রিয়েটিভ এবং ভাষণ আবেগপ্রবন। প্রত্যেকটি সুরই শ্রোতার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এই মস্তবড় গুণটির জন্যেই তিনি জনপ্রিয়—এমন কি যাঁরা সংগীতরসজ্ঞ নয়, তাঁরাও তাঁর সংগীতে মোহিত হয়।

বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়ের 'বসন্তমুখারি' 'ভাটিয়ার' এবং 'ভৈরবী' আবার প্রমাণ করল সেতারের ওপর তাঁর দখল। হালকা গতি সম্পন্ন তানগুলি ছিল স্পষ্ট। আলাপ বিস্তারের ক্ষেত্রে বেশকিছু জটিল 'মীড়' ছিল। ধামার এবং তিনতালে চিত্রেশ দাসের কত্থক নাচ তাঁর আজিকার অনুষ্ঠানের থেকে আলাদা ছিল। স্বাগত পরিবর্তন। তেহাই-এর কাজগুলি ছিল সবল। যথার্থ দুজন যন্ত্রবাদক এবং চিত্রেশকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন স্বপন চৌধুরী। এই তরুণ বয়সেই স্বপন এক আশ্চর্য রকমের পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। যেকোনো তালের ক্ষেত্রেই তিনি অত্যন্ত সহজ, সাবলীল। চিত্রেশের সঙ্গে তাঁর ধামার ছিল পাখোয়াজ অঙ্গের—এইটি বিধিসম্মত হওয়া উচিত। তবলা অঙ্গের নয়—যা আমরা মাঝে মাঝেই দেখি। বিভিন্ন ধরনের বোল-এ তাঁর সমান এবং আশ্চর্য দক্ষতা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন—গতিশীল জায়গাগুলিতেও।

ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি

সারা বছর নিয়মিতভাবে কয়েকটি আসর বসিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে তরুণ শিল্পীদের সুযোগ এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্যে ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি একটি প্রশংসনীয় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আজকের দিনে তরুণ শিল্পীদের পক্ষে অনুষ্ঠান করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে যখন—তখন নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই পরিকল্পনায় তরুণ শিল্পীরা উপকৃত হবেন। সম্প্রতি বিড়লা আকাদেমীতে তিনজন শিল্পীসমন্বয়ে সোসাইটি উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম ধ্রুপদী আসর বসিয়েছিলেন। যেখানে আমরা পেলাম সেতারে অরুণ সাহা, সরোদে বিদ্যুৎ খান, এবং ভারতনাট্যমে করবী সেনগুপ্তাকে।

করবীর পরিবেশন ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন এবং তার মুভমেন্ট সর্বক্ষণ যন্ত্রীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেছে। একটি সুনির্দিষ্ট পরিধিতে ছিল তার পরিক্রমা এবং মুদ্রার সঙ্গে তার কণ্ঠ ছিল সীমিত। অল্প সময়ের মধ্যে সে যাই করেছে, পুনরাবৃত্তি ছাড়া। খুবই সাবলীল মুভমেন্ট—কখনো কৃত্রিম, অনমনীয় বলে মনে হয়নি। সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্যের এক পরিপূর্ণ বিচক্ষণতা তার অনুষ্ঠানকে একঘেয়েমী থেকে মুক্ত রেখেছিল। চোখের কারুকার্যে যদি করবী আরো একটু মনোযোগী হতেন তাহলে তাঁর পরিবেশিত ভারতনাট্যম আরো উত্তীর্ণ হত। সহযোগী গায়কের সুশ্রাব্য কণ্ঠস্বর তাকে আশ্চর্য সহযোগিতা করেছিল।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ খানের সেতার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ছোট ছোট কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও বিদ্যুৎ তার কৌশিকির মাধ্যমে একটি সাঙ্গীতিক পরিবেশ গড়ে মাধ্যমে সক্ষম হয়েছিলেন। তার আলাপ রীতি বদ্ধ এবং সুগঠিত। রেকাব ও ধৈবতের প্রয়োগে কানাড়ার ইঙ্গিত। সামগ্রিক বিচারে তার অনুষ্ঠান শিল্পিত—কল্পনামূলক।

পিতা বাহাদুর খানের বেশকিছু শিক্ষগুণ বিদ্যুৎ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। মাঝে মাঝেই ওর সুরের প্রয়োগ ভীষণ রোমান্টিক। লয়ের ওপর ওর আশ্চর্য দখল এবং সবচেয়ে যে গুণটি আমাকে মুগ্ধ করেছে, তা হল সম্পূর্ণতার দিকে ওর আশ্চর্য দৃষ্টিপাত। তবলায় সুজিত সাহার টাকরা এবং চক্রধর সুস্পষ্ট এবং যথার্থ।

মণিলাল নাগের ছাত্র অরুণ সাহা ঐ অনুষ্ঠানে সেতার বাজালেন। অনুত্তীর্ণ পরিবেশনা। পাবলিক কনসার্টে আসার আগে এখনো তার একনিষ্ঠ অনুশীলনের প্রয়োজন আছে: অরুণের তান স্পষ্ট এবং দ্রুত, লয় ও ঝালার কাজে রিদম আছে—কিন্তু সমস্ত কিছুই বেসুরে বাধা, তাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। সেতার অনুশীলনের সঙ্গে, নিজের কানকে সজাগ রাখার অত্যন্ত জরুরী শিক্ষার প্রয়োজন এখনো অরুণের আছে।

ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক

এক শুক্রবারের সন্ধ্যায় ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক শিক্ষায়তন হলে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের আসরে উপস্থিত করলেন নিশাদ খান এবং ইরশাদ খানকে। অনুষ্ঠানে নিশাদ বাজিয়েছেন সেতার এবং ইরশাদ সেতার ও সুরবাহার তাঁর প্রপিতামহ ওস্তাদ ইমদাদ খানের ঐতিহ্যে। সেনিয়া ঘারানার কিছু আলাপ এবং জোড়ের জন্য সুরবাহারের সৃষ্টি, এবং এই যন্ত্রের মধ্যে বেশকিছু পরিবর্তন এনে ওস্তাদ ইমদাদ খান এবং তাঁর পুত্র ওস্তাদ এনায়েৎ খান

কিছু উন্নতি করেন। বিভিন্ন সংগীত সম্মেলন, আসর থেকে এই ব্রিলিয়ান্ট যন্ত্রটিকে বঞ্চিত রাখার জন্যে আমি আজকের অধিকাংশ শ্রোতাদের গতিপ্রিয়তাকেই দায়ী করব। সুরবাহার যাতে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যায়, অতীতের গুণী শিল্পীদের যন্ত্র সুরশৃঙ্গার ও রবাবের মত মিউজিয়মে বড় কষ্টকরভাবে রক্ষিত না হয়—সেই জন্যে ইমদাদ খানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। সুরবাহার এখন তাঁর হাত থেকে পুত্র ইরশাদের হাতে কার্যকরীভাবে হস্তান্তরিত। আশা করব আজ থেকে অন্তত অর্ধশতাব্দীকাল ইরশাদ এই যন্ত্রটিকে জীবন্ত করে রাখবে।

ঝিঁঝিঁটের আলাপে বেশকিছু উজ্জ্বল তালি ছিল এবং মাঝে মাঝেই কিরানা গায়কী স্টাইলে রে গা মা কিংবা ধা নি ধা সা-য় শেষ হচ্ছিল। এক্ষেত্রে দৃঢ়তার জন্যে নিশাদ এক কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। অত্যন্ত কোমল এবং প্রশান্তভাবে ইরশাদ তাকে অনুসরণ করেছে। সুরবাহার এবং সেতারের সাধারণ স্কেল নিরূপণের কঠিন কাজটি এখানে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুরবাহার পঞ্চম এবং সেতারে সা দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। তান-বিশেষত্তা গমকের তানগুলি ছিল সুস্পষ্ট, বুনটের ক্ষেত্রেই কোনো ফাঁক ছিল না। সমস্ত কিছুতেই একটা সুপরিকল্পনার ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। এটাই প্রমাণ করে কী অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন ঐ যুগ্মশিল্পী, তাদের নিজ নিজ যন্ত্রে দখল আনতে। সুসংবদ্ধ লয় ভাগ যন্ত্রসঙ্গীতের বোলে অঙ্গকে জোরদার করেছে। স্পষ্ট এবং উজ্জ্বলতার জন্যে নিশাদের সপাট তান বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।' সাবির খানের তবলা সহযোগিতা ছিল স্পষ্ট এবং যথাযথ। কখনোই তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাননি। গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিকেই তার নজর ছিল সর্বক্ষণ। তাঁর দুটি হাতের কাজেই আশ্চর্য ভারসাম্য লক্ষ্য করেছি এবং গতি, বোলের পরিচ্ছন্নতা—সব কাজেই সাউন্ড এফেক্ট সেদিনের অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

লা মার্টিনিয়ারের অনুষ্ঠান

গত কয়েক দিন আগে তরুণ সেতারবাদক নিশাদ খানের সেতার শুনলাম লা মার্টিনিয়ার হলে। সেতারের কলাকৌশল নিয়ে যুগ যুগ ধরে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা চলে এসেছে এবং নানান ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে জন্ম হয়েছে নানান ঘরানা। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সেতারে দখল আনতে নানান বৈজ্ঞানিক পথ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। তাই, নিশাদের আঙুলে যখন স্পষ্টভাবে এমন কি ভীষণ গতিময়তার মধ্যেও অত্যন্ত সহজে মূল সুর—সপ্তকে ছোটাছুটি করে—আমরা তেমন অবাক হই না। তবে নিশাদ-এর যে জিনিসটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, তা হল—মীড়ের জটিলতা, তান, বিস্তারের সম্পূর্ণতা, কম্পোজিশন: নিঃসন্দেহে নিশাদ পরিশ্রম করেছে এবং তার পিতার কিছু স্বাতন্ত্র্য গুণ, বিশেষত ঝুঁকিদার মীড় এবং সুগঠিত তেহাই, সে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। উল্টো ঝালাগুলি ছিল উন্নত এবং রীতিবদ্ধ। মাঝে মাঝে দ্রুত তান সংমিশ্রিক। এই সবই প্রমাণ করে দিন দিন নিশাদ ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছে। একই কথা তার 'দ্রুত' কম্পোজিশনের দ্রুত তান সম্পর্কে। শুদ্ধ ধৈবতের সরাসরি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা যদি জোর দেওয়া হত, এবং নি রে সা'র ব্যবহার যদি কিছুটা কম হত, তাহলে 'তার মারোয়া আরো উত্তীর্ণ' হত। কুমার বসুর তবলা মাঝে মাঝে উচ্চগ্রামে গেলেও, সামগ্রিক বিচারে অনবদ্য।

ঐ অনুষ্ঠানে চিত্রেশ দাসের কথক প্রায় ডোভার লেনের অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি। তথাপি বেশ উপভোগ্য অনুষ্ঠান। এ-বিষয়ে আমরা চিত্রেশকে খুব একটা দোষারোপ করতে পারি না, কেন না বিরজু মহারাজ থেকে শুরু করে যামিনী পর্যন্ত আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীরা গত কুড়ি বছর ধরে একই অনুষ্ঠান পরিবেশন করে আসছেন। সেই একই আইটেম, একই সংলাপ, যান্ত্রিকভাবে একই বিরতি, এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেই ধরাবাধা প্রশংসা—সম্ভবত সবসময় সেই একই দর্শক দ্বারা।

যাই হোক চিত্রেশের কথক পরিবেশনায় পরিশ্রমের ছাপ আছে। যে কজন নৃ[illegible] শিল্পীর পায়ের কাজ আমাদের দেশে [illegible] বলে চিহ্নিত—চিত্রেশ তাদের একজন। [illegible] রসে তার একাগ্রতা এবং তার [illegible] পুরুষালি, সতেজ। জয়পুর ঘরানার শি[illegible] চিত্রেশের লয়ের ওপর প্রচণ্ড দখল। চি[illegible] ক্রিয়েটিভ শিল্পী। বোলের ক্ষেত্রে [illegible] অভিনবত্ব নিয়েই রসগ্রাহীদের দৃ[illegible] এড়ায় নি।

তবু অনেকের প্রশ্ন থেকে যায়, [illegible] চিত্রেশ নগমা এবং তবলা ছাড়াই অতি[illegible] কিছু শ্রমসাধ্য অনুষ্ঠান পেশ করে। চিত্রে[illegible] এর ব্যাক্যালংকার, তার নাচের মতই চি[illegible] কর্ষক। তার বোলের শব্দ-মাধুর্যতা, শ্রো[illegible] বর্গের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করে[illegible]

সুব্রত রায়চৌধু[illegible]

রং করা মুখ

থিয়েটার ক্যাম্পের সাম্প্রতিকতম প্র[illegible] জনা : রং করা মুখের অভিনয়াংশ সংহত বিন্যাসে দানা বেঁধেছে, তার ক[illegible] দল হিসেবে থিয়েটার ক্যাম্প মোটাম[illegible] পরিণত। প্রত্যেকেই গ্রুপথিয়েটারো[illegible] মনস্কতায় অভিনয়ের প্রয়াস পেয়েছে[illegible] অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে সর্বাগ্রে [illegible] আসছে ঘটোৎকচরূপী বিমল দেবের ক[illegible] চরিত্রটির অন্তর্গূঢ় বেদনা তাঁর অভি[illegible] অতি-জীবন্ত। এমনকি, যেখানে মেলোড্রা[illegible] আস্বাস্থ্য আছে—সেখানেও তিনি নিজে[illegible] অভিনয়নৈপুণ্যে অনেক দূর পর্যন্ত স্ব[illegible] রেখেছেন। খুব ভালো অভিনয় করে[illegible] সোমনাথ চৌধুরীও—প্রশান্তর ভূমিক[illegible] শ্লেষে-পরিহাসে এবং শেষাংশে ভয়পী[illegible] অস্তিত্ব উপস্থাপনায় তাঁর কৃতিত্ব সর্বা[illegible] প্রশংসনীয়। সুনীলবেশী দেবব্রত বসু [illegible] করে দাগ কাটেন না—সম্ভবত চরিত্রটি[illegible] অবকাশের স্বল্পতাজনিত কারণেই। হ[illegible] সামন্তর ভূমিকায় সমীর দাসকে সফল [illegible] চলে—তিনি দর্শকদের হাসাতে পেরেছে[illegible] মালতীরূপিনী সন্ধ্যা দে, যতোটা প্রয়ো[illegible] তার চেয়েও একটু বেশী রুক্ষ। শেষা[illegible] মেলোড্রামা-আহত। সেটা অবশ্য নাট্যক[illegible] পরিচালকের ত্রুটি। গোপাল বন্দ্যোপাধ[illegible] (ভি গড়গড়ি), অজিত চট্টোপাধ[illegible] (ধরণী), তাপস বসু (সন্তু) তাঁদের দা[illegible] পালনে অচেতন ছিলেন না।

মঞ্চসজ্জার জন্য কৃতিত্ব দাবি কর[illegible] পারেন বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় এবং তাপস ব[illegible] স্মৃতি জাগাতে ধ্বনি প্রয়োগ যথাযথ হয়ে[illegible] সঙ্গীত পরিচালনায় সমীর মজুমদা[illegible] পদস্খলন দৃষ্ট হয়নি। 'ধন ধান্যে প[illegible] ভরা' গানটির সুরের ব্যঙ্গাত্মক প্র[illegible] প্রশংসার্হ। তাপস সেনের সুষম আ[illegible] প্রয়োগ সম্বন্ধে মন্তব্য করবার কিছু [illegible]

শুভশংকর ভট্টা[illegible]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।